সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীযুক্তা মীরা দেবী

WELCOME TO
THE LUSH
NEW WARMTH
OF FRIENDLY
BLANKETS
BY CENTURY SPINNING
Here, at last !
An exciting new range of warm, friendly rugs, created by a leader in the field. So lush, so lovely ! So Dependably cosy that just sitting out is going to be fun. And yet priced most reasonably. Varieties included.
MANALI, NEPTUNE, NANDI, GLACIER, VENUS, GEMINI, POLAR, TIGER and KAILASH.
ART SILK BLANKETS : AIRLINE SHEPERD, MONARCH SONEMARG
Take your pick today.
SHRUG OFF THE COLD. HUG A RUG BY CENTURY SPG.
MANUFACTURED BY :
THE CENTURY SPG. & MFG. CO. LTD.
HEAVY FABRICS DIVISION
CENTURY BHAVAN DR ANNIE BESANT RD WORLI BOMBAY-25 DD

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১
শনিবার ২০ কার্তিক ১৩৭৮
Saturday 6 November 1971

[illegible]

[illegible] পত্রিকার [illegible] শেষ হল। নতুন বছর আরও একটি বছর শুরু। [illegible] এই পত্রিকার অনুরাগীদের [illegible] জানাই। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সকলেরই [illegible] আছে, তবু পাঠক সমাজ, লেখকবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা এঁদের সহানুভূতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এ-যাবৎ যে সমর্থন আমরা পত্রিকাটির জন্য বিভিন্ন মহল থেকে লাভ করে এসেছি, আশা করি ভবিষ্যতেও তা থেকে বঞ্চিত হব না।

বাংলা দেশে সাময়িক পত্রের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। তাকে [illegible] উপেক্ষা করা যায় না। এই পুরোনো ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, বাঙালীসমাজে সেই সব পত্রপত্রিকাই অধিক সমাদর লাভ করেছে যেগুলি প্রধানত সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তাকে সমান প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ পত্রিকার অঙ্গীভূত করতে পেরেছিল। আমাদের এই পত্রিকাটিও মূলত এই দু-টি প্রয়োজনীয় অংশকে অপরিহার্য মনে করে।

বাঙালী সমাজের নানা দিক রয়েছে, তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এমনকি তার মধ্যে যে নব নব উন্মাদনা দেখা দেয় তারও একটি চরিত্র রয়েছে। দেশ পত্রিকার পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন, আমরা সব-কয়টি দিককেই যথাসম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন রচনায় ও আলোচনায়। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বাঙালীর [illegible] ঐতিহ্যকে [illegible] রেখে [illegible] আমরা যেমন পালন করে চলেছি, আমার একালের বাঙালী মানসিকতাকেও প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা রাখিনি।

সম্প্রতি কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ওলট-পালট চলছে তার দিকে মুখ ফেরানো সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পশ্চিমবঙ্গে যে মারাত্মক অর্থনৈতিক ভাঙন দেখা দিয়েছে তাকে অস্বীকার করা। দেশ পত্রিকার নানা রচনায় এই সব সংকট ও সমস্যার আলোচনা বার বার হয়ে থাকে। লক্ষ করে আমরা দেখেছি, পাঠকের উৎসাহ এতে কম নয়। আমাদের শিক্ষা, আর্থিক দৈন্য, হঠকারী রাজনীতি, সরকারী উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকদের প্রবল-আগ্রহ তাঁদের আলোচিত রচনা-গুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বস্তুত আমাদের চেষ্টা, মত বিনিময় ও সুস্থ আলোচনার পরিবেশে একটি উদার আব-হাওয়া গড়ে তোলা, যা আজকের দিনে বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

সাহিত্য বিষয়েও আমাদের কোনো বিশেষ গোঁড়ামি নেই। এখানে প্রবীণ ও নবীনের স্থান রয়েছে। বিষয়েরও নানান পার্থক্যকে আমরা সাধ্যমত স্থান দেবার চেষ্টা করে থাকি। হয়ত আরও সুযোগ থাকলে ভাল হত, কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে ব্যয়ের যে আংশিক সম্পর্ক জড়িত হয়ে রয়েছে, আজকের দিনে তার এমনই অবস্থা যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও অধিক কিছু স্থান সংকুলান করতে পারি না। সাধারণ পাঠক হয়ত এটি বোঝেন না, ফলে অভিযোগও করেন কখনও কখনও। আমাদের যে ত্রুটিগুলি সংশোধনযোগ্য আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা না করি এমন নয়, তবু যা থেকে যায় তার জন্যে দুঃখিত।

দেশ পত্রিকা মূলত বাঙালী পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সাময়িক পত্র: এর স্থান নিয়ে আমাদের যতটুকু গৌরব, এই পত্রিকার অনুরাগীদের গৌরব তার চেয়ে কম নয়। আমাদের নতুন বছর শুরু হবার মুখে আজ আবার এই অনুরাগী-বৃন্দকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম
৫০ পয়সা

[illegible] ও [illegible]
[illegible] বিমান মাশুল
[illegible] পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-র
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
৩৩-২২৮০
৩৩-৮৩৫১

চাঁদার হার
[illegible]
বার্ষিক : ৩১.০০ টাকা
ষান্মাসিক : ১৬.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক : ৮.০০ টাকা

ভারতে [illegible]
(ভারতীয় [illegible])
বার্ষিক [illegible] : ৩৬.০০ টাকা
ষান্মাসিক : ১৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক : ৯.৫০ পয়সা

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক : ৫৬.০০ টাকা
ষান্মাসিক : ২৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক : ১৪.৫০ পয়সা

চাঁদার হার
[illegible]
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক : ৪৪.০০ টাকা
ষান্মাসিক : ২২.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক : ১১.৫০ পয়সা

ভারতের বাইরে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক : ৮০.০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৪২.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক : ২১.৫০ পয়সা

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১
শনিবার ২০ কার্তিক ১৩৭৮
Saturday 6 November 1971

আমাদের নববর্ষ

এ পত্রিকার আটত্রিশ-বর্ষ শেষ হল। নতুন করে আরও একটি বছর শুরু হবার সময় এই পত্রিকার অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সকলেরই অংশ আছে, তবু পাঠক সমাজ, লেখকবৃন্দ, বিজ্ঞাপনদাতা এঁদের সহানুভূতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এ-যাবৎ [illegible] সমর্থন আমরা পত্রিকাটির জন্য বিভিন্ন মহল থেকে লাভ করে এসেছি, আশা করি ভবিষ্যতেও তা থেকে বঞ্চিত হব না।

বাংলা দেশে সাময়িক পত্রের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। তাকে [illegible] উপেক্ষা করা যায় না। এই পুরোনো ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, বাঙালীসমাজে সেই সব পত্রপত্রিকাই অধিক সমাদর লাভ করেছে যেগুলি প্রধানত সাহিত্য ও সমাজ-চিন্তাকে সমান প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ পত্রিকার অঙ্গীভূত করতে পেরেছিল। আমাদের এই পত্রিকাটিও মূলত এই দুটি প্রয়োজনীয় অংশকে অপরিহার্য মনে করে।

বাঙালী সমাজের নানা দিক রয়েছে, তার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এমনকি তার মধ্যে যে নব নব উন্মাদনা দেখা দেয় তারও একটি চরিত্র রয়েছে। দেশ পত্রিকার পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন, আমরা সবকয়টি দিকেই যথাসম্ভব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি বিভিন্ন রচনায় ও আলোচনায়। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বাঙালীর অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমরা যেমন পালন করে চলেছি, আবার একালের বাঙালী মানসিকতাকেও প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা রাখিনি।

সম্প্রতি কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ওলট-পালট চলছে তার দিকে মুখ ফেরানো সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পশ্চিমবঙ্গে যে মারাত্মক অর্থনৈতিক ভাঙন দেখা দিয়েছে তাকে অস্বীকার করা। দেশ পত্রিকার নানা রচনায় এই সব সংকট ও সমস্যার আলোচনা বার বার হয়ে থাকে। লক্ষ করে আমরা দেখেছি, পাঠকের উৎসাহ এতে কম নয়। আমাদের শিক্ষা, আর্থিক দৈন্য, হঠকারী রাজনীতি, সরকারী উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকদের প্রবল-আগ্রহ তাঁদের আলোচিত রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। বস্তুত আমাদের চেষ্টা, মত বিনিময় ও সুস্থ আলোচনার পরিবেশে একটি উদার আবহাওয়া গড়ে তোলা, যা আজকের দিনে বিশেষভাবেই প্রয়োজন।

সাহিত্য বিষয়েও আমাদের কোনো বিশেষ গোঁড়ামি নেই। এখানে প্রবীণ ও নবীনের স্থান রয়েছে। বিষয়েরও নানান পার্থক্যকে আমরা সাধ্যমত স্থান দেবার চেষ্টা করে থাকি। হয়ত আরও সুযোগ থাকলে ভাল হত, কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে বহুবিধ যে আর্থিক সংকট জড়িত হয়ে রয়েছে, আজকের দিনে তার এমনই অবস্থা যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও অধিক কিছু স্থান সংকুলান করতে পারি না। সাধারণ পাঠক হয়ত এটি বোঝেন না, ফলে অভিযোগও করেন কখনও কখনও। আমাদের যে ত্রুটিগুলি সংশোধনযোগ্য আমরা তা সংশোধনের চেষ্টা না করি এমন নয়, তবু যা থেকে যায় তার জন্যে দুঃখিত।

দেশ পত্রিকা মূলত বাঙালী পাঠকের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সাময়িক পত্র; এর স্থান নিয়ে আমাদের যতটুকু গৌরব, এই পত্রিকার অনুরাগীদের গৌরব তার চেয়ে কম নয়। আমাদের নতুন বছর শুরু হবার মুখে আজ আবার এই অনুরাগীবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম
৬০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
শ্রীঅংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ২২৮০
২৩-৮০৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়
বার্ষিক ঃ ৩১.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ১৬.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ঃ ৮.০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ঃ ৩৬.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক " ঃ ১৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক " ঃ ৯.৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ঃ ৫৬.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ২৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ঃ ১৪.৫০ পয়সা

চাঁদার হার

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ঃ ৪৪.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ২২.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ঃ ১১.৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ঃ ৮৩.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ৪২.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ঃ ২১.৫০ পয়সা

পুতুল নাচ

সম্প্রতি ভুট্টো
মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলি
সফর করে
এসেছেন।

ভুট্টো

ভারত-চীন সম্পর্ক

গোটা পৃথিবীতে এখন চীনের সঙ্গে ভাব করার জন্য একটা হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে। বড় বড় নানা দেশ চীনের সঙ্গে খাতির করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রাশিয়া এবং রুশ-অনুগামী পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি। চীনের সঙ্গে ভাব করার জন্য তাঁরা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মত ব্যস্ত নয়। বরং তাঁদের, বিশেষ করে রাশিয়ার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় পৃথিবীতে এই চীন-প্রেমের বন্যায় তাঁরা বেশ কিছুটা আতঙ্কিত। তাই তাঁরাও যেন একটা পাল্টা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন।

ভারতও চীনের সঙ্গে নতুন করে ভাব করার জন্য বিশেষ আগ্রহী। সরকারীভাবেই এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারী-ভাবেই জানান হয়েছে, ভারত আবার পিকিংএ একজন পূর্ণ মর্যাদার রাষ্ট্রদূত পাঠাতে আগ্রহী। ভারত চায়, চীনও দিল্লিতে পূর্ণ মর্যাদার রাষ্ট্রদূত পাঠাক। সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকেই দু দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে কিছুটা কাটছাঁট করা হয়েছে। পূর্ণ মর্যাদার রাষ্ট্রদূত বিনিময় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখনও অবশ্য পিকিং-এ ভারতের এবং দিল্লিতে চীনের দূতাবাস আছে। কিন্তু কোথাও পূর্ণ মর্যাদার রাষ্ট্রদূত নেই। কম মর্যাদার রাষ্ট্রদূত দিয়েই কাজ চলছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে

কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এমন কিছু লিখবেন না যাতে চীনের সঙ্গে আমাদের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বর্ণ সিং এই সেদিন দিল্লিতে ঘোষণা করেছেন, আমরা চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।

এ সব অবশ্য প্রকাশ্য ঘোষণার কথা। গোপনেও ভারত সরকার নানাভাবে চীনের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতরা সুযোগ পেলেই চীনা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। চীন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলায় কতটা আগ্রহী সেটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় রয়েছেন।

বাংলা দেশ সরকারের রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমেও এই একই চেষ্টা চলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বেশ কিছুদিন থেকেই চীনের ভাল সম্পর্ক সেইজন্য যেসব প্রাক্তন পাক রাষ্ট্রদূত এখন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চলে এসেছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই চীনা কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ভাল সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কগুলিও কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ সরকারও তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের সমর্থন চান। সেই হিসাবেও বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা চীনের সঙ্গে, চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আগ্রহী। তাঁদের নিজেদের স্বার্থেও বাংলাদেশ সরকার চান চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ তাঁরা জানেন, যতদিন ভারত-চীনে বৈরিতা থাকবে ততদিন পাকিস্তান চীনের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে, ততদিন চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও বিরূপ চোখে দেখবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারত না হয় চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী, চীন কি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে চায়?

ভারত সরকার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে ইতিমধ্যে চীনে যেসব বিষয়ে

[illegible] তার জবাব একেবারেই [illegible] করতে পারে নি। পূর্ব বাংলার [illegible] জানিয়ে পূর্ব বাংলার [illegible] পাশবিকতার ব্যাখ্যা করে এবং এই ছোট্ট জিনিসটা সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করে ভারত [illegible] রাষ্ট্রের কাছে চিঠি দিয়েছিল। সেই চিঠি দিয়েছিল পিকিং-এও, কিন্তু পিকিং থেকে এখনও কোনও জবাব পাওয়া যায় নি।

ইতিমধ্যে অবশ্য চীন ভারতীয় পিংপং টিমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, চীনা ভূমিতে তাঁরা পদার্পণ করা মাত্র তাঁদের বিরাট সম্বর্ধনা দিয়েছে, ভিয়েনায় এক রাষ্ট্রীয় সম্বর্ধনা সভায় চীনা রাষ্ট্রদূত খুব হেসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং চীনা রাষ্ট্রীয় উৎসব উপলক্ষে পাঠানো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণীর পূর্ণ বয়ান পিকিং রেডিও প্রকাশ করেছে।

কিন্তু চীন এখনও খোলাখুলিভাবে ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে নি। যেমন করেছেন আমাদের প্রধান-মন্ত্রী। যেমন করেছেন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

*

একদা অবশ্য ভারত-চীন সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। যখন অকমিউনিস্ট দুনিয়ার কেউই কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে একাসনে বসতে রাজি ছিলেন না তখন ভারতই তাকে বিশ্বের দরবারে ঠাঁই করে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। যখন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফস্টার ডালেস চৌ এন লাইর সঙ্গে করমর্দন করতে পর্যন্ত রাজি হন নি তখন নেহরু রাষ্ট্রসংঘে চীনের আসনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

তখন চীনও ভারতের সঙ্গে সদ্ভাব করতেই এগিয়ে এসেছিল। পঞ্চশীল চুক্তি হয়েছিল দুই রাষ্ট্রে। চৌ এন লাই কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন : নেহরু আমার বড় ভাই। চীন এবং ভারতে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আদান প্রদানও পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। গোটা অ-কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ভারতই ছিল তখন চীনের প্রধান বন্ধু।

আস্তে আস্তে সে জিনিসটা পাল্টে গেল। বন্ধুত্বে ক্রমে ক্রমে ফাটল ধরল। ক্রমে শত্রুতা বাড়ল। চীন সন্দেহ করল, ভারত সাম্রাজ্যবাদেরই ক্রীড়নক। সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক হিসাবেই ভারত চীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানা রকমের শত্রুতা করে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে শত্রুতা তীব্র হল। শুরু হল সীমান্ত সংঘর্ষ। চীনা সৈন্যবাহিনী ভারতের উত্তর সীমান্তে বেশ কিছুটা এলাকা দখল করে নিল। হিন্দী-চীনী ভাই ভাই পরিস্থিতিটা একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়াল।

তারপর চীন নিজেই বন্ধ বিরতি ঘোষণা

করে তার সৈন্য বাহিনীকে কিছুটা সরিয়ে নিল। কিন্তু অন্যদিকে চীন ভারতের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়েই চলল। নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের সঙ্গে চীন যোগাযোগ করল। তাদের ট্রেনিং দিল। হাতে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিল। বেতারে তাদের সমর্থন জানাল। ভারত-পাক সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর চীন ভারতের নকশালপন্থীদের সমর্থন জানাল—পিকিং রেডিও তাদের প্রচণ্ডভাবে বাহবা দেওয়া শুরু করল। ভারত সরকারকে পিকিং রেডিও অবিশ্রান্ত গালি-গালাজ করে চলল।

অতি সম্প্রতি আবার আকারে ইঙ্গিতে সেই চীনই বলছে যে সে ভারতের সঙ্গেও সদ্ভাব করতে চায়। কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিককে চীনা নেতারা এই কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চীনা নেতারা ভারত সম্পর্কে তাঁদের সংশয় প্রকাশ করতেও ছাড়েন নি। তাঁদের কথাবার্তায় এখনও মনে হয় তাঁরা ভারতকে, শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের মিত্র এবং চীনের শত্রু বলেই মনে করেন।

সব মিলিয়ে চীন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে সত্যিই আগ্রহী কিনা এখনও ভারত সরকার তা স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

*

আদর্শগত কারণে চীন-ভারত সমঝোতায় কোনও বাধা আছে বলে অবশ্য মনে হয় না। ভারতের ক্ষেত্রে তো তেমন কোনও বাধা নেই-ই (ভারত সরকারের এখন সবচেয়ে বড় মিত্র কমিউনিস্ট রাশিয়ার সরকার), চীনের ক্ষেত্রেও তা নেই।

একদা বহু কমিউনিস্ট দাবি করতেন, আদর্শগত বিচারে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এখন এক অন্ধ ছাড়া কারু পক্ষে সে দাবি করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি ইরানের শাহ পারস্য সাম্রাজ্যের ২৫০০ বছর পূর্তি উৎসব করলেন। বিরাট ব্যাপার হল। পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নিজে ইরানে গিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে চীনের কর্তারা যান নি বটে, তবে কমিউনিস্ট চীনও এই অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে এবং এজন্য ইরানের শাহকে অভিনন্দন জানিয়ে বিরাট বার্তা পাঠিয়েছে। এবং সেই বার্তা পিকিং রেডিও থেকে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। তার কয়েকদিন পরে পিকিং-এ ইরানী রাষ্ট্রদূত শাহের জন্ম উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন। সেখানে স্বয়ং চৌ এন লাই উপস্থিত ছিলেন। একজন সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় নি।

আদর্শগত কোনও বিচার বিবেচনা হলে কমিউনিস্ট পদগোর্নি একটি সাম্রাজ্যের ২৫০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই যোগ দিতেন না; আর কমিউনিস্ট চীনও সেই অনুষ্ঠানে অভিনন্দন বার্তা পাঠাতো না। আসলে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিও জাতীয় স্বার্থেই পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে। রাশিয়াও তাই করছে, চীনও তাই করছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল দুই রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন। তাই দুজনেই ইরানের শাহকে তৈলমর্দনে আগ্রহী।

আমি অবশ্য এর মধ্যে কোনও অন্যায় দেখি না। জাতীয় স্বার্থেই তো একটা রাষ্ট্রের সব নীতি নির্ধারিত হবে! চীনও তাই করছে। চীনা নেতাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য, তাঁরা প্রায় গোটা পৃথিবীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে পেরেছেন। চীন আজ শক্তিশালী রাষ্ট্র সবাই সেটা বুঝেছে। বুঝেছে, এই চীনের সঙ্গে খাতির গড়ে তোলাই ভাল। তাই আমেরিকার মত রাষ্ট্র, যারা এত দিন শত শত কোটি ডলার খরচা করছে শুধু চীনকে খর্ব করতে তারা আজ চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সব রকমে চেষ্টা করছে।

চীন আজ জাতীয় স্বার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে খাতির করতে চাইছে। চীন বুঝেছে, এটা তার প্রয়োজন। তাই মুখে যতই চীন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে গালিগালাজ দিক না কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের আলোচনায় সে বিশেষ উৎসাহী।

ভারতের সঙ্গে চীন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হবে কিনা সেটাও স্থির হবে চীনা জাতীয় স্বার্থের বিচারে। চীন যদি মনে করে তার জাতীয় স্বার্থে এটা প্রয়োজন তাহলে চীন তাতে আগ্রহী হবে। অন্যথা নয়। চীনা নেতারা যদি মনে করেন যে ভারত সরকারের সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখলেই তাঁদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হবে তাহলে তাঁরা শত্রুতাই চালিয়ে যাবেন। পিকিং রেডিও যতই তত্ত্বকথা প্রচার করুন চীনা নেতারা অত্যন্ত বাস্তববাদী—গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে কমিউনিস্ট চীনের নেতারা যেসব কাজ করেছেন তাতে তাঁদের মধ্যে অবাস্তব আদর্শের গোঁড়ামীর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩১-১০-৭১।

নবারুণ গুপ্ত

উপরে : রাজ্যপাল ও বিদেশী পর্যটকদের স্বাগত জানানোর জন্য দার্জিলিঙের চৌরাস্তায় অপেক্ষারত স্থানীয় বাঙালী মেয়েরা।

পর্যটক মেলা

নীচে : দার্জিলিঙের চৌরাস্তার মোড়ে পর্যটক মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ নেপালী লোকনৃত্যের আসর।

গত মাসের আট তারিখ থেকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত, দীর্ঘ এগারো দিন ধরে, দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে চমৎকার এক পর্যটক মেলা হয়ে গেল। মেলাটির উদ্দেশ্য ছিল শৈলাবাস-শ্রেষ্ঠ দার্জিলিঙের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সম্পদের সঙ্গে পর্যটক-দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটক বিভাগ মেলাটির ব্যবস্থা করেছিলেন; আর, এর সংগঠনের দায়িত্ব ছিল একটি পাবলিক কমিটির ওপর। এই এগারো দিনের মেলার অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল নেপালী নাচ, লেপচা নাচ এবং লামা নাচ সমেত তিব্বতী নাচের এক অকল্পনীয় সমারোহ। পাশের সমতল জেলা জলপাই-গুড়ির রাজবংশী নাচ ছিল আবার এর সঙ্গে এক বাড়তি আকর্ষণ। তিব্বতীদের মেলা, তাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতা, শিশুদের জন্য চমরী গরুর

পিঠে চড়া, উৎসব-রাত্রি প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শো, হিমালয় অঞ্চলের পোশাক প্যারেড, পাহাড়ী অঞ্চলের বিয়ের পোশাকের প্রদর্শনী এবং আরও অনেক কিছু ছিল

পাশে : দার্জিলিঙের টাউন হলে পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলার লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান।

নীচে : পর্যটক মেলায় যোগদানকারী বিভিন্ন লোকনৃত্য দলগুলি দার্জিলিং শহরের রাস্তায় পরিভ্রমণরত।

এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় হস্তশিল্প এবং চিত্রকলার প্রদর্শনী, পুরানো দার্জিলিঙের ফোটোগ্রাফ এবং পার্বত্য হিমালয় অঞ্চলের ওপর লেখা নানান বই ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ সম্ভার করেছিল। আট তারিখের সকালে ম্যাল-এ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস এই মেলার উদ্বোধন করেন। তিনি এই ধরনের প্রগতিমূলক কার্যকলাপের প্রশংসা করেন এবং এই অঞ্চলের পর্যটন-ব্যবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন বলে জানান।

পিকিং এলো

ড্রাগনের ভূত আমেরিকার ঘাড় থেকে নেমেছে এতদিনে। বাইশ বছর পরে লাল চীন তাই ঠাঁই পেয়েছে জাতিপুঞ্জে। মহাচীনের জাতিপুঞ্জে এই প্রথম আসা নয়। জাতিপুঞ্জের পত্তন থেকেই চীন তার সভ্য। শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা পরিষদেও তার একটা পাকা আসন আছে। তার মত না নিয়ে কোনও প্রস্তাব সে পরিষদে পাস হতে পারে না। রুশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স আর ব্রিটেন এই চারটে দিকপাল দেশের যেমন নিরাপত্তা পরিষদের যে কোনও প্রস্তাব বাতিল করে দেবার ক্ষমতা আছে তেমনই আছে চীনেরও। জাতিপুঞ্জের পাঁচটা সরকারী ভাষার একটা হচ্ছে চীনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর শেষে এশিয়ার পয়লা নম্বর শান্তিকামী গণতন্ত্রী দেশ হিসেবে ধরা হয়েছিল চীনকে। তাই তাকে খাতির দেখানো হয়েছিল যখন জাতিপুঞ্জ গড়া হয় ১৯৪৫ সনে। তখন চীনে কুয়োমিণ্টাং দলের রাজত্ব। জাতিপুঞ্জে সে সরকারই প্রতিনিধি পাঠাতেন, সেখানকার কমিটী-কাউন্সিলে থাকতেন তাঁরাই। সে ব্যবস্থা তখনকার দিনে ঠিকই ছিল। তা নিয়ে কোনও তর্ক বাধেনি, কোনও আপত্তি জাতিপুঞ্জের বৈঠকে কী ঘরে বাইরে কেউ তোলেনি।

গোল বাধলো ১৯৪৯ সনে যখন কম্যুনিস্টরা মহাচীনে ক্ষমতা দখল করলো। মাও সে-তুং হলেন সর্বেসর্বা, কুয়োমিণ্টাং দলের চাঁইরা মেনল্যান্ড অর্থাৎ মূল চীন ছেড়ে আশ্রয় নিলেন তাইওয়ানে প্রধানমন্ত্রী চিয়াং কাই-শেক সমেত। জাতীয়তাবাদীরা কিন্তু কম্যুনিস্টদের হাতে সরকার চালানোর ভার ছেড়ে দিয়েও গেলেন না, জাতিপুঞ্জেও নিজেদের অধিকার ছাড়লেন না। তাঁদের দাবি হলো তাঁরাই চীনের আসল আইনসঙ্গত সরকার, কম্যুনিস্টরা হচ্ছে বেআইনী হানা-দার, তাদের তাড়িয়ে তাঁরা আবার খাস চীনে ফিরে যাবেন। এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা জাতিপুঞ্জেও চীনের আসনটি দখল করে বসে রইলেন। তুমুল তর্কের ঝড় উঠলো ব্যাপারটা নিয়ে। এক পক্ষ বললেন—জাতিপুঞ্জে প্রতিনিধি পাঠায় দেশের সরকার। যখন যে দলের হাতে ক্ষমতা তখন তারাই প্রতিনিধি পাঠায়। বিলেতে যখন টোরিরা সরকার চালায় তাদের লোকই আসে জাতিপুঞ্জে বিলেতের প্রতিনিধি হয়ে। আবার তারা হেরে গেলে, শ্রমিকরা জিতলে আসে শ্রমিক প্রতিনিধি। তেমনই আমেরিকাতেও। ডেমোক্রাটদের আমলে জাতিপুঞ্জে আসে ডেমোক্রাট দলের প্রতিনিধি, রিপাবলিকানরা ক্ষমতা পেলে আসে তাদেরই দলের লোক।

এই স্বাভাবিক আর সহজ নিয়ম কিন্তু চীনের বেলা খাটাতে চাইলেন না আর এক পক্ষ। তাঁদের কথা হলো ও নিয়মকানুন খাটে গণতন্ত্রী দেশে যেখানে পালা করে নির্বাচন হয়, সরকার ভাঙে-গড়ে সাধারণ লোকে নির্বাচন মারফত তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, পছন্দ-অপছন্দ জানায়। কম্যুনিস্টরা যদি নির্বাচনে জিতে গদি দখল করতো তা হলে তারাই আসতো জাতিপুঞ্জে। কুয়োমিণ্টাংদের থাকার কথাই উঠতো না। তা তো তারা করেনি। তারা জবরদখল করেছে চীনের শাসনযন্ত্র। তাদের তো আর ও-দেশের ন্যায়-সঙ্গত সরকার বলে মেনে নেওয়া যায় না। জোর যার মুল্লুক তার এ রীতি মানতে পারে তারা যাদের গণতন্ত্রে বিশ্বাস নেই। যারা জাতিপুঞ্জের সনদ মেনে চলে তাদের ধরন-ধারণ ভিন্ন। তা ছাড়া, চীনেরও কম্যুনিস্ট সরকার কদিন টেঁকে কে জানে? যে সরকারের স্থিতভিত নেই, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত তাদের কেমন করে জাতিপুঞ্জের দরবারে ঠাঁই দেওয়া যায়? আর চিয়াং কাই-শেক তো আর দেশছাড়া হননি, তিনি দেশেরই এক অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছেন। তিনি যে বাকী এলাকাও উদ্ধার করে সারা চীনের মালিক হয়ে বসবেন না এমন কথা কী জোর করে বলা যায়? কাজেই জাতিপুঞ্জে চীনের তরফ থেকে জাতীয়তাবাদীরাই থাকবে, কম্যুনিস্টরা নয়।
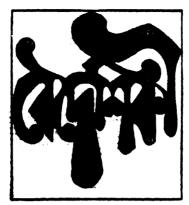
দেবরাজ

চীনবিরোধী জোটের চাঁই ছিল আমেরিকা। পিকিংয়ের কম্যুনিস্ট সরকারকে সে স্বীকৃতি দেয়নি, তাকে যে সব দেশ মান্য করে তাদেরও একই পথের পথিক হতে বাধ্য করেছে। কম্যুনিস্ট চীন তো আর কোনও দিনই নির্বান্ধব ছিল না। তার পক্ষে যে সব দেশ তারা শোরগোল তুললো জাতিপুঞ্জের বৈঠকে। বেগতিক দেখে আমেরিকা রব তুললো জাতিপুঞ্জে চীনের তরফ থেকে কারা আসবে এটা একটা ইম্পর্টান্ট অর্থাৎ কিনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এর মীমাংসার জন্যে জাতিপুঞ্জের সদস্যদের তিন ভাগের দু ভাগকে অন্তত একমত হতে হবে। ভোটা-ভুটি হলো প্রথম ১৯৫০ সনে। তাতে প্রজা-তন্ত্রী চীনের পক্ষে ভোট পড়লো মাত্র ১৬টি, বিপক্ষে ৩৩, গরহাজির ১০। আমেরিকার মুখরক্ষা হলো—কম্যুনিস্ট চীন জাতিপুঞ্জে একঘরে হয়ে রইলো। পিকিংয়ের বন্ধুরা কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে না। বাইশ বছর ধরে তারা তাদের লড়াই চালিয়েছে সমানে জাতিপুঞ্জের বৈঠকে। ফল কিন্তু কিছু হয়নি। ফি বারই তারা হেরেছে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোহারান। কাজেই জাতীয়তাবাদীরাই এ যাবৎ রয়ে গেছে জাতিপুঞ্জে মহাচীনের প্রতিনিধি হিসেবে।

হাওয়া পালটাতে শুরু করেছে বছর পাঁচেক। যারা এতকাল আমেরিকার দলে ভিড়ে চোখ বুজে হাত তুলেছে প্রজাতন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে, খটকা লাগলো তাদেরও—তাই তো, কাজটা কী ঠিক হচ্ছে? তারা সবাই যে হঠাৎ কম্যুনিস্ট কী কম্যুনিস্ট-দরদী বনে গিয়েছিল তা নয়। তবে মহা-চীনে কম্যুনিস্টরা যে কায়েম হয়ে বসেছে এটা দেখেই তাদের যত অস্বস্তি। জাতিপুঞ্জ থেকে তাদের বাদ দেওয়া মানেই তো মহা-চীনের ষাট কোটি লোককে বাদ দেওয়া। ওদের সরকারের মতবাদ যাই হোক না, সেই অজুহাতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জাতকে আন্তর্জাতিক সমাজে একঘরে করে রাখা সঙ্গত নয়। আমেরিকা প্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পাতবে কী পাতবে না সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী চীনকে জাতিপুঞ্জে ঢুকতে না দেওয়াটা [illegible]। এবারকার [illegible] পারে পিকিংয়ে কোনও দিন [illegible] জাতি-পুঞ্জে [illegible] হবে।

এইবার চীন [illegible] ঢুকে গেছে। জাতিপুঞ্জের সদস্য এখন ১৩১। তার মধ্যে ৭৬টি দেশ ভোট দিয়েছে পিকিংয়ের দিকে। তবে এদের মধ্যে আমেরিকাও আছে। তার চোখ খুলেছে নিক্সনের আমলে। প্রজাতন্ত্রী চীন যে মায়া নয়, তা নিক্সন মেনে নিয়েছেন। পিকিংয়ে যাবার জন্যে তিনি তৈরি। আসছে বছরের জানুয়ারিতে তাঁর সেখানে যাবার বন্দোবস্ত পাকা করে এসেছেন কিসিংগার। জাতিপুঞ্জে যখন চীন নিয়ে বিতর্ক চলছিল তখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা সম্বন্ধে পরামর্শদাতা প্রজাতন্ত্রী চীনের রাজধানীতে খানাপিনা করছিলেন তিনি। এ কথা ঠিক, আমেরিকা রুখে দাঁড়ালে প্রজাতন্ত্রী চীনের এবারেও জাতি-পুঞ্জে ঠাঁই হতো না। তবে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমেরিকা পিকিংকে আর বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারতো কি না সন্দেহ। জাতিপুঞ্জের সদস্য যত বাড়ছে ততই বাড়ছে প্রজাতন্ত্রী চীনের সমর্থকও। নতুন স্বাধীন দেশগুলোর সরকার প্রায়ই বামপন্থী, তাদের বেশির ভাগই আমেরিকার মাতব্বরি পছন্দ করে না। যে সব দেশে আমেরিকার প্রভাব ছিল সে সব দেশেও সরকার পালটে যাচ্ছে—মার্কিন দরদীর জায়গায় আসছে মার্কিন বিরোধীরা। আজ না হোক, কাল যা হবেই তা মেনে নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন নিক্সন।

নীরার দুঃখকে ছোঁয়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কতটুকু দূরত্ব? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলঙ্কৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে
চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়
ইচ্ছে করে তোমার দুঃখের সঙ্গে
আমার দুঃখ মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে
স্ফুরিত হয় একটি মুহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে.....

বাইরে বড় চ্যাঁচামেচি, আবহাওয়ায় নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এসব কিছুই তুচ্ছ
যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে
যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মত বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মুখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
প্রতীক্ষা
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দ্যুলোক-সীমানা
প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গির
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না
বুকে বুক রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথা সরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দূরত্ব পেরিয়ে
চোখ শুকনো, তবু পাদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে!
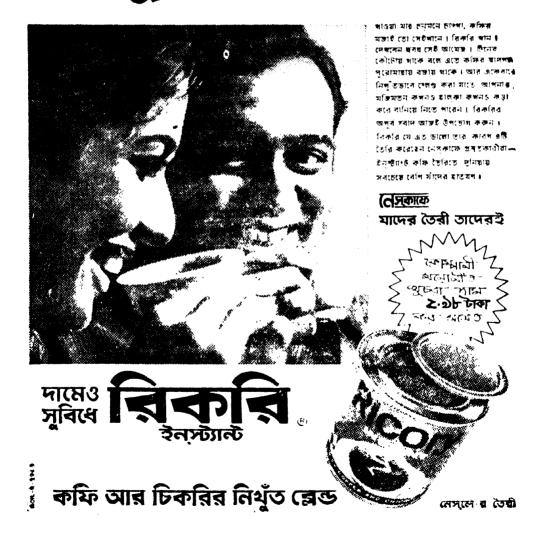
ত মোনাশবাবু লাঠি হয়ে গেলেন। বেশ মজবুত গাঁটওয়ালা, মাথাটা খোদাই করা আর মটকাটুকু রূপোয় বাঁধানো ঠি।

আশ্চর্যের কথা, তমোনাশবাবু সবটাই টের পেলেন, বেশ ট করে।

প্রথমে পায়ের দিকটা বদলে গেল তাঁর চোখের ওপরই। পায়ের জুতো, মোজা-প্যাণ্ট সব বদলে গিয়ে গাঁট-দেওয়া লশ করা লাঠি হচ্ছে তিনি দেখতে পেলেন, তলার লোহার লেটা পর্যন্ত।

পড়েই যাচ্ছিলেন কাত হয়ে। কিন্তু মেঝেতে পড়তে হল ডিভানটার গায়ে হেলে পড়ে তারই মাথার দিকের গদির ক আটকে গেলেন।

পড়তে পড়তে চিৎকার করবার কথা একবার মনে াচ্ছিল। কিন্তু বড় লজ্জা করল। হঠাৎ তাঁর মত মান্যগণ্য নভ্রান্ত মানুষটার লাঠি হয়ে যাওয়া দেখলে লোকে ভাববে বিশ্বাসই ত করতে চাইবে না। আর যদি বা বিশ্বাস ক'রে লেও তারা কি-ই বা করতে পারবে।

তমোনাশ তাই চেঁচান নি।

কিন্তু পড়তে পড়তেও একটু চমকে উঠেছিলেন। ক উঠেছিলেন স্ত্রী মনোরমাকে ওই সময় ঘরে ঢুকতে য।

চমকটা তেমন বেশী নয়, তার চেয়ে বেশী যেন আফসোস। মনোরমার কি এই সময়টাতেই ঘরটায় না ঢুকলে হ'ত না? এমন সময় তার ত এ ঘরে আসবার কথা নয়। ঠাকুর চাকর ঝি-র খবরদারী করতে এ সময়টা ত তার রান্নাঘর মহলেই কাটে! কপালে তার এই দেখাটা আছে তা তিনি আর খণ্ডাবেন কি করে?

তমোনাশের মুখে তাই একটু যে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তা না দুঃখের না কৌতুকের ভাবটা এই—এসে যখন পড়েছ তখন নিজের চোখেই দেখে ফেলো।

মনোরমা কিন্তু কতটুকুই বা আর দেখছেন? ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা পর্যন্ত ত শুধু। ওইটুকু তাঁর চোখের ওপরেই লাঠির মাথা হয়ে গেছে তমোনাশের শেষ মুহূর্তের হাসিটুকু সমেত। লাঠির খোদাই করা মাথাটার সে হাসিটা চেষ্টা করলে আন্দাজ করা যায়। কাঠের গায়ে খোদাই করা হাসিটা অবশ্য কেমন একটু রহস্যময় দেখায়।

মনোরমা কি করলেন তমোনাশবাবুর ঘাড় থেকে মাথাটা খোদাই করা লাঠি হয়ে যেতে দেখে?

একটু দাঁড়ালেন। চোখটা রগড়ালেন দু'বার। কস্তাপাড় শাড়ির আঁচল দিয়ে একবার মুছে আর একবার তাকালেন লাঠিটার দিকে। লাঠিটা তখন ডিভানটার পাশে কাত হয়ে

পৌঁছেছেন, মাঝামাঝি উন্নতি, মাথা-
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাফল্য। কিন্তু তাতে
নোশদাকে কি সত্যিই বোঝানো যেত!
পলকের মধ্যেই কথাগুলো মাথায় খেলে
রায় রতিকান্ত সুর পাল্টে দিলে। বললে
চরিত্র বর্ণনার সত্যি কিছু দরকার আছে
? মানুষটাকে আগে খুঁজে পাওয়া দরকার
চেষ্টা ত আপনারা করবেন জানি!...
বলছেন!...না, না সেরকম কিছু হয়নি।
সম্ভবই নয়। মানুষটাই আলাদা!...
আবার সেই চরিত্র বর্ণনাই আসছে...
দরকার বলছেন খোঁজার জন্যে! আচ্ছা
আচ্ছা...ধন্যবাদ...
নামিয়ে রতিকান্ত মনোরমার কাছে
দাঁড়াল।

একটু হেসে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা
মনো বউদি? রাগ কোরো না কিন্তু।
অনুমতির অপেক্ষা না করেই রতিকান্ত
জিজ্ঞাসা করলে তারপর—তোমাদের ঝগড়া-
কিছু হয়নি ত?

ঝগড়া!

মনোরমার গলার স্বর আর মুখের
ভাবেতেই অপ্রস্তুত, একটু হাসি হেসে
রতিকান্ত বললে—আমিও তাই বললাম মিঃ
ওকে। নাটক নভেল সিনেমা দেখা
লোকেরা কি, যে, ঝগড়াঝাটি করে বাড়ি
ছেড়ে যাবে! অমোনাশদা ঝগড়া রাগারাগি
র মানুষই নয়, এই এতদিন ধরে...
হঠাৎ আরেকটা কথা মনে পড়ে কি যেন
একটু খটকা লাগল রতিকান্তর। আগের
বলতে বলতে থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা
—বদলে যাবার কথা কি যেন বলছিলে
বউদি!

মনোরমা বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে
এবার। একটু বিপন্নও। এতক্ষণ
মনে বলবার মত করে সাজাবার চেষ্টা
বুঝেছেন যে তাঁর বক্তব্যে তাহা
হয় না। নিজেই আজগুবী প্রলাপ
রে।

আগে সেটুকু বলে ফেলেছেন তার
হোক একটা মানের ইঙ্গিত না রাখলে

সাবধানে তাই বললেন—বদলে...
মানে এই ধরো নিয়ম বাঁধা মানুষের
নিয়মে অরুচি হতে পারে ত একদিন?
ত ওই বিবাগী হয়ে যাওয়ারই মত।
কান্ত মাথা নাড়ল—অমোনাশদার সেরকম
লক্ষণ দেখেছ ইদানীং? আর দেখা
যায় তাহলেও বিবাগী হওয়ার বদলে
টা কি করবেন? সন্ধেয় বেড়াতে
বাঁধা দস্তুর ভেঙে যাবেন কোথায়?
থিয়েটারে? না নেশায় গিয়ে
নতুন ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে?
উত্তরটার বাতুলতায় নিজেই হেসে
রতিকান্ত। তারপর যাবার সময়
দিয়ে গেল—তুমি কিছু ভেবো না
বউদি। আজকের মধ্যে একটা খবর

পালটে যাওয়ার কথা কি বলছিলে?

পাবেই। ফিরেই আসবেন বলে আমার
বিশ্বাস।

সেই কথাই বলে এসে ভাইপো সুবীর।
মেজ ভাই-এর ছেলে। চালাক চতুর চৌকস
ছেলে। লেখাপড়ায় বাহাদুরীর জন্যে
নয় কিছুটা খাটির জোরে বড় বিলিতী
কোম্পানীর চাকরি পেয়েছে। কলেজে পড়-
বার সময় ইউনিয়ন টিটিনিকানের
পাণ্ডাগিরি করত, এখন সব ছেড়ে দিয়েছে।

হাসপাতাল কি থানা থেকে হঠাৎ কোনো
খবর পাওয়া যায় না—জোর দিয়ে বলে
সুবীর—তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে
তেমন ভাবনা করবার মত কিছু হয়নি
জেঠামশাই-এর। এমন কিছুতে আটকা

পড়েছেন যেটা শুধু আমরা ভাবতে পারছি না।

সেটা কি!—মনোরমা নিজেকেই যেন জিজ্ঞাসা করেন।

সেটা...সেটা কতরকম হতে পারে—সুবীর তার কল্পনা খাটায়—যেমন ধরো কোনো পুরোন বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ হয়ত দেখা হয়ে গেছে। সে বন্ধু ধরে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে। বাড়িটা ধরো তিনজলা কি সিঁথির দিকে।

সুবীর নিজের কল্পনায় নিজেই মেতে ওঠে—সেখান থেকে ফেরার বাস ধরতে পারেননি ঠিক সময়ে। রাত হয়ে গেছে বলে বন্ধুই আর আসতে দেয়নি।

একটু থেমে সুবীর সম্ভাব্য প্রতিবাদগুলো নিজেই তুলে ধরে আবার খণ্ডন করে, কিংবা হয়ত বন্ধুটি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ছেড়ে আসতে পারেন নি। কাছাকাছি ফোন করবার সুবিধেও নেই। পিসেমশাই তাই একেবারে নিরুপায় ঠুঁটো হয়ে আছেন...

তার চেয়ে বল না তোর পিসে হঠাৎ... জমে পাথর হয়ে গেছে—মনোরমার মুখ দিয়ে কথাটা এইভাবে যে বার হবে তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি।

সুবীর তখন হাসছে। কথাগুলোয় কি যেন একটা মজা পেয়ে হাসছে। হাসতে হাসতেই বলে—ঠিক বলেছো, ঠিক তা-ই হয়ত হয়ে গেছে। লোকে বলে রাগে আগুন, শোকে পাথর, ভয়ে কাঠ। সত্যি সত্যি তাই হলে কি কাণ্ডটাই হত ভাবো ত!

কথাগুলো সুবীর যেন নিজে থেকে বলছে না। কে যেন তাকে দিয়ে বলাচ্ছে।

এই তুমি বসে আছো সামনে—সুবীর বলে যায়—পিসেমশাই-এর শোকে হঠাৎ পাথর হয়ে গেলে! দুনিয়ায় কত পাথর কত কাঠই তাহলে বাড়ত!

একটু থেমে কিছুটা গম্ভীর হবার ভান করে আবার বলে সুবীর।—কিন্তু শোকে পাথর হবার মত পিসেমশাই-এর ত কিছু হয়নি! বলো না। হয়েছে? হবেই বা কোথা থেকে? একেবারে ত ঘড়ির কাঁটা ধরা জীবন! শোকে পাথর না হলে ভয়ে কাঠ? তা ভয়টাই বা ও'র কিসের? যে দিকে ভয়ের কিছু আছে উনি ত তার ধার মাড়ান না!

কি আজেবাজে বকছিস!—মনোরমা ধমক দেন। ধমকটায় খুব জোর কিন্তু নেই। সেটাও যেন নিজের মনের জিজ্ঞাসা একটু বাইরে আনার একটা ছুতো।

উনি কাঠ কি পাথর হয়েছেন তা নিয়ে বিচক্ষণতা করতে তোকে ডেকেছি? না, সত্যি ওরকম কিছু হয় বলে তুই ভাবিস!

পাগল—এবার গলা ছেড়ে হেসে ওঠে সুবীর—এমনি তোমার মনটা একটু হাল্কা করবার জন্যে আজেবাজে কথা বলছিলাম। তোমার কিন্তু সত্যি অত ভাবনার কিছু নেই পিসিমা। আজ বিকেলের মধ্যেই দেখবে পিসেমশাই এসে হাজির, আর আমাদের মাথায় যা এখন আসছে না তেমনি কোনো তুচ্ছ ব্যাপারেই আটকা পড়েছেন নিশ্চয়...

চলে যেতে যেতে আটকা পড়বার যে কারণটা সুবীরের মাথায় ঝিলিক দেয় সেটাকে কিন্তু তুচ্ছ বলা চলে না। একালের ছেলে। খুব বুদ্ধিমান না হলেও মামুলী গোঁড়ামি নেই ভাবনা চিন্তায়। কুসুমের কীট দেখবার ঝোঁকই বেশী।

যেতে যেতে মনে মনে বেশ একটা সরস কেচ্ছা সে সাজিয়ে ফেলে।

পিসেমশাই বলেই ত আর কেউ তুলসী পাতাটি নয়। বয়সই বা হয়েছে তাঁর? এই বয়সে তিপান্নর বেশী নয় কখনো। এখনো বেশ শক্তপোক্তই ত আছেন আর এই বয়সটাই নাকি বিপদের। জীবনের ধাপগুলো পেরিয়ে পৌঁছিবার আগের শেষ বেড়া বাঁক। এ বয়সেই নাকি অনেক বাহাদুরেরা একে হোঁচট খেয়ে পড়েন। পড়েন নিজেদেরই দোষে। পঞ্চাশ পার হয়ে ষাটের দিকে বয়স এগুচ্ছে। তখনই গেল, গেল ভাব। বসন্ত গেল যৌবন গেল! যা গেল তা ফিরবে না। মনের সব রাশ এই সময়ে কখন নিজের অজান্তে ঢিলে হতে শুরু করে। পিসেমশাই-এরও যে হয়নি তার ঠিক কি! কোথায়? কেমন করে? কেন ওঁর অফিসের ওই স্টেনো অ্যাংলো মেয়েটাই বা নয় কেন? পিসেমশাই-এর অফিসে দু'চার দিন যেতে হয়েছে। বড় অফিস কিন্তু পিসেমশাই হোমরা-চোমরাও নয় ছোটো পেটিও না। তাঁর নিজের কামরা নেই। যেমন তেমনি বড় হল ঘরে সকলের সঙ্গে এক সারিতেও বসেন না। কাঠের রেলিং দিয়ে তাঁর বসার জায়গাটুকু ঘেরা। সেখানেই মিস ম্যাকেঞ্জিকে দেখেছে। দেখতে ভালো কিছু নয়, কিন্তু চটক আছে। ও

একটা আলাদা পরিচয় আর আস্তানা গড়ে তোলা যায় না। তার মানে হঠাৎ এই নিরুদ্দেশ হবার অনেক আগে থেকে তমোনাশ যাকে বলে দ্বৈত জীবন কাটাচ্ছে।

হিসেবী সাবধানী নেহাৎ সাধারণ মাপের মানুষ তমোনাশ। কিন্তু এদের বোঝাই বুঝি সব চেয়ে শক্ত। এদের সামনেটা যত সোজা পেছনের গোলকধাঁধা তত জটিল।

নীলরতন চলে যাবার পর মনোরমা নিজের ঘরে এসে আলমারীর ওপর থেকে লাঠিটা একবার নামালেন।

বিছানায় সেটা শুইয়ে দিয়ে দেখতে দেখতে নিজের মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকখানি যেন কেটে গেল।

মনে হল লাঠির মাথা থেকে তমোনাশবাবুর শেষ হাসিটুকুই যেন ফুটে বেরিয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর গলাও যেন শোনা যাচ্ছে—যা দেখছ খুব অবিশ্বাস্য আর মনে হচ্ছে কি? আমার সম্বন্ধে সকলের কল্পনার দৌড়টাও তো দেখলে। লুকিয়ে হিন্দী সিনেমা দেখার বেশী একটা চরিত্রদোষেরও প্রমাণ নেই। নেহাৎ মাঝারী সাধারণ মামুলী লাঠিটার সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ কি আমার ছিল?

পঁচিশ

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে ভববাবু বলে একজন আসতেন। জ্যাঠামশাই আর বাবার সঙ্গে তঁার খুব ভাব ছিল। বাবারই বন্ধুর মতন, জ্যাঠামশাইকে দাদা বলে ডাকতেন। আমরা বলতাম, ভবকাকা। ভবকাকা ছিলেন রেলের গার্ড, মালগাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। এদিকে কোথাও মালগাড়ি এসে আটকে গেলে ভবকাকা আমাদের বাড়িতে এসে জিরিয়ে স্নান খাওয়া করে আবার তঁার গাড়িতে ফিরে যেতেন। ভবকাকার গার্ডসাহেবের সাজ-পোশাক ছাড়াও বগলে থাকত গুটোনো লাল সবুজ ফ্ল্যাগ, আর হাতে ঝুলোনো থাকত গার্ডসাহেবের বাতিটা। বিকেলের দিকেটিকে ভবকাকা এলে ফেরার সময় তাঁর বাতিটা নিয়ে আমায় খেলা দেখাতেন। এই ছিল লাল, তারপর হয়ে গেল সবুজ: আবার লাল, আবার সবুজ। আমি খুব অবাক হয়ে, নিবিষ্ট মনে দেখতাম, আর অবাক হতাম। ভবকাকা আমায় বলতেন, নে তুই এবার কর দেখি। আমার ছোট্ট হাতে অতটা শক্তি ছিল না যে আমি রঙ পালটে ফেলি। ভবকাকা চাকরি থেকে ছুটি নেবার পর রাজগীরের দিকে বাড়ি করে থাকতেন, সেখানেই মারা যান।

খুব ছেলেবেলায় ভবকাকার হাতের লণ্ঠনটার রঙ পালটানো আমায় যেমন অবাক করত, অবিনের স্বভাব-চরিত্র এই বয়েসে আমায় যেন সেইরকম অবাক করে। সে যে সত্যি কী—কোন্ স্বভাবের তা আমার কাছে স্পষ্ট হল না। এখানে এসে প্রথম প্রথম সে আমায় বার বার চমকে দিয়েছে: আমি তার ভয়ে তটস্থ থেকেছি, তারপর অকারণ ভাবিয়ে মেরেছে; শেষে তার জিবের ধার আমার যখন সহ্য হয়ে এল তখন আমায় কত রকমভাবেই না কুণ্ঠায় ফেলেছে। কলকাতায় ফিরে গিয়েও সে আমায় স্বস্তি পেতে দিল না। প্রথম চিঠিতে তার হাসিঠাট্টা ছাড়াও যা ছিল—তা হল স্তব, যদিও হালকা করে। অবিন নিজেই তাকে স্তুতি বলছে। সেই অবিন তার দ্বিতীয় চিঠিতে দেখি, মশাল হাতে ডাকাতের মতন বেরিয়ে পড়েছে, তার খেয়ালই নেই ওই আগুনে কে জ্বলল বা কোথায় কার ঘরখানা জ্বলে উঠল। আমি সেই চেহারা দেখে ভাবলাম, এর সাহস তো কম নয়, ওর মত্ততা থামাবে কে! আর তৃতীয় চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, শচিদার সঙ্গে যেন ওর এমন এক জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক যে শচিদার অসুখে অবিনের ব্যগ্রতার শেষ নেই। চিঠিটা যতবার পড়ি ততবার ভাবি, এ কেমন করে হয়? শচিদার জন্যে আমাদের গোটা পরিবারের যে সমবেদনা, দুঃখ, উদ্বেগ—অবিন যেন তার চেয়ে অনেক বেশী সহানুভূতি ও বেদনা বোধ করছে। ভব-কাকার সেই লণ্ঠনের মতন অবিনকে চোখের সামনে যে রঙে দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি তা বদলে গেছে।

আমি ভাবি, মানুষটা তাহলে সত্যি-কারের কোন স্বভাবের? আমায় যে অক্লেশে লিখতে পারে: 'খানিকটা আগে কানে এল পালিতবাবুর হাত-রেডিয়োর 'কপালকুণ্ডলা' পালা হচ্ছে। মেসের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আধখানা চোখ বুজিয়ে বাকি আধখানা জানলার খড়খড়ির গা দিয়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি হালদারদের বাড়ির ছাদে আলসে ঘেঁষে আপনি এসে দাঁড়িয়ে-

ছেন। ওটা আমার স্বপ্ন, না মায়া না মতিভ্রম তা জানি না। আপনাকে টেনে আনার সুতোটা যেন আমার মনে জড়ানো ছিল; ছলদার বাড়ির ছাদ থেকে যখন মোহিনীকে আমার চোখের সামনে টানতে টানতে নিয়ে এলাম, আপনি আমার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে মতিবিবির মতন করেই বললেন, 'কখনও কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই?' আমি, মেসের অবিন, অবিকল নবকুমারের মতন বললাম, 'স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার মতন সুন্দরী দেখি নাই।' শুনে আপনি দুমুহূর্ত আমায় দেখলেন। তারপর দেখি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। আমি হোহো করে হেসে উঠে দেখলাম আমার পাট খোলা জানলার খড়খড়ির গায়ে বাঁধা দড়িতে রমাপতিদার গামছাটা ঝুলছে।'

অবিনের চিঠিতে এইসব কথা পড়লে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। আমার মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। কী নির্লজ্জ, বেহায়া, অসভ্য ছেলে! আমি কী তোমার মতিবিবি; তুমি যে স্ত্রীলোক সত্যি সত্যি দেখো নি তা আজ আমি বুঝতে পারি। যে স্ত্রীলোক দেখেছে তার চোখ তোমার মতন নয়।

চিঠিটা পড়তে পড়তে মনে হয়, দ্বিধা করাটা অবিনের প্রকৃতি নয়, দুঃসাহস দেখানোটাই তার স্বভাব। মানুষের বোধ থাকলে সে দ্বিধা করে, যার বোধ নেই অথচ বচনক্ষমতা আছে সে অবিনের মতন সাহসটা বাড়াবাড়ি করে দেখাবে। নয়ত ওই অবিনই কী করে আমায় লেখে যে, যে নদী পাড় ছাড়ে না, কূল ভাঙে না, যার বর্ষার জল দুই তীর ডুবিয়ে দেয় না সে নদী নিতান্তই মানুষের হাতে কাটা খাল, তার জল আটকাবার কৌশল আছে কারিগরের হাতে। 'মানুষের ফাঁদে ধরা দেয় নি এমন নদীর দিকে তাকালে তার চরিত্রটা বোঝা যায়। সে স্বাভাবিক। তার জল বাড়লে সে কোনো কিছুকেই রেহাই দেয় না। আপনি নিজেকে অন্যের কৌশলের কাছে ধরা দিয়ে বসে থাকবেন একথা ভাবতে আমার গা রিরি করে ওঠে। সংসারে যে কারা তপস্যা করে আপনাকে এই মর্তভূমিতে এনেছিল পাপী তাপী উদ্ধার করতে তা আমি জানি না। আপনি ভাগীরথী নন, অথচ সেই পুণ্যের লোভে বসে আছেন।'

অবিন যে কতটা স্পর্ধা দেখাতে পারে এইসব কথাগুলোই তার প্রমাণ। আমার নিজেরই গা রিরি করে উঠেছিল। কাছে থাকলে বলতুম, আমার পুণ্য আমি বুঝব তুমি তার হিসেব করার কে? আমি কোথায়, কোন্ কৌশলের কাছে ধরা দিয়েছি তার জন্যে আমার যদি দুঃখ না থাকে তবে তোমার এত গরজ কেন? যে নদী পাড়

ভাঙে, তার পাশে তোমার বাড়ি হলে বুঝতে দুঃখটা কোথায় লাগে।

আবার এই অবিনকেই দেখলাম, শেষের চিঠিতে একেবারে অন্যরকম। কোথায় তার সেই বেঁকা কথার ধার, নাটুকে ঢঙ, সেই স্পর্ধা! মনে হবে না, এই অবিন আর আগের চিঠির অবিন একই মানুষ। যে মানুষটা ভাবে, ঘোড়া ছুটলে খুরের শব্দে চারপাশ কাঁপবে তবেই সেটা ছোটার মতন ছোটা হল—তাকেই দেখলাম পায়ের খুরে ভোঁতা করে বসে আছে।

অবিন এখানে থাকার সময় আমি তার সঙ্গে শচিদার মেলামেশা খানিকটা লক্ষ করেছি। শচিদাকে যে অবিনের খুব পছন্দ হয়েছিল তা আমার মনে হয় নি। বরং শান্তশিষ্ট গোবেচারী শচিদাকে অবিন যখন তার কথা দিয়ে বিঁধত আমার রাগ হত খুব। সুহাসরা হল অবিনের বন্ধু; তারা আর শচিদা এক নয়। সেই শচিদাকে সে অনর্থক জ্বালাবে এটা আমার পছন্দ হত না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখতাম, শচিদার সঙ্গে অবিনের আলাপটা জমে উঠেছিল। এটা নেহাতই শচিদার গুণে বলে আমার মনে হত। কোনোদিন মনে হয় নি, অবিন এমন আন্তরিকভাবে শচিদাকে বুঝবে।

শচিদার কথা বলতে গিয়ে অবিন লিখেছে, 'আপনার কাছে প্রথমেই স্বীকার করি, আমি আপনাদের শচিপতিবাবুর ভক্ত নই। তাঁর প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ আছে, নেই, বিরাগও নয়। মানুষটি বড় ভাল, শিষ্ট, সরল। শিষ্টতা, সরলতার ওপর আমার কোনো মোহ নেই। তবু আজ শচিবাবুর জন্যে আমি বিশেষ উদ্বেগ বোধ করছি। মানুষের কাছে মৃত্যু কোনোদিনই সহজ নয়। অন্তত সেই মানুষটির কাছে যিনি বছরের পর বছর ধরে, ওই বিষয়টাই চিন্তা করে চলেছেন। মৃত্যুকে ভয় পাওয়া মানুষের স্বভাব, আমারও সেই একই স্বভাব। কিন্তু শচিপতিকে আমি বোঝাতে পারলাম না, বেঁচে থাকা আরও ভয়ের। উনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকার মধ্যে অহরহ যে ভয় আছে তা বোধহয় কোনোদিন ভেবে দেখার চেষ্টা করেন নি। আপনি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন সে ভয় আপনার আছে। ঠাকুমশাইয়ের আছে। সুহাসের আছে। শচিপতিবাবু জীবনের ভয়টাকে এড়াবার জন্যে মৃত্যুর ভয় মাথায় নিয়ে বসে আছেন। এ ধরনের মানুষকে আমার পছন্দ হয় না। আমি বলি এঁরা হলেন সেই দলের মানুষ যাঁরা দাঁড়িপাল্লার ওজনটা ঠিকভাবে করেন না, একদিকে ঝুলিয়ে রাখেন। শচিপতিকে আমি যতটুকু জেনেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথার বালিশের তলা থেকে যে চশমাটা চোখে পরে নেন, সেটা হল ওই মৃত্যুর। শোক, মৃত্যু, ব্যাধি এই তিনের চিন্তা নিয়ে সকালে গাত্রোত্থান করলে জীবনে নাকি অনেক সৎকর্ম করা যায় বলে শুনেছি। আপনাদের শচিদা বোধহয় রোজই এই ভাবনা মাথায় নিয়ে জেগে ওঠেন; কিন্তু তিনি কোন্ কর্ম করেন তা আমি জানি না। আপনাকে স্পষ্ট করেই বলছি, আমি শচিপতিবাবুর একেবারে উলটো মুখে দাঁড়িয়ে; তিনি যদি পূর্বদিকে মুখ করে আছেন, আমি তবে পশ্চিম দিকে। ওঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, মনেরও মিল নেই। তবু ওই মানুষটিকে কলকাতায় আনাবার জন্যে আমি আপনাদের শরণাপন্ন। আপনি হয়ত ভাববেন, আমার স্বার্থ কোথায়? আমার স্বার্থ নিতান্তই সাধারণ, তার বেশী কিছু নয়। সামান্যমাত্র কর্তব্য বোধ করছি, তার বেশী আর কি!'

অবিন যতই বলুক তার কোনো স্বার্থ নেই, তবু আগাগোড়া চিঠিটা পড়লে বোঝা যায়, শচিদা বাঁচবার কোনো চেষ্টা না করেই সংসার থেকে চলে যাবে এটা তার পছন্দ নয়। এই বোকামির কোনো অর্থ অবিনের কাছে নেই।

আরও অনেক কথা লিখেছে অবিন, আমি তার সবটুকু হয়ত বুঝতেও পারি নি। তবে এটা বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি, অবিন যতটা সর্বনেশে ততটাই আবার কোমল। ও হল সেই ধরনের মানুষ যার হাতের কাছে আগুন রাখলে আগুন নিয়েই খেলায় মাতবে, আবার কাদা রাখলে তাই নিয়ে মাটির পুতুল গড়তে বসবে। কী জানি আমি ওই অদ্ভুত মানুষটিকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম না।

আমার জীবনে পুরুষমানুষকে আমি তেমন করে চোখ খুলে দেখার সুযোগ পাই নি। তাদের রূপের যে হেরফের আছে এটা আমার খুব বেশী করে জানাও

নয়। আমার বাবা ছিল পুরোপুরি গৃহী মানুষ, ঝুঁকি নিয়ে মস্ত করে ব্যবসা ফাঁদতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলে মানুষ যেমন করে আছড়ে পড়ে বাবা সেইভাবে আছড়ে পড়েছিল। জ্যাঠামশাই হলেন দেবতার মতন মানুষ, অসীম সহ্য আর স্নেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখনও। ওঁদের কথা বাদ দিলে যে পুরুষটিকে আমি প্রথম নিজের মতন করে চোখ মেলে দেখেছিলাম, সে হল শচিদা। আজকের শচিদা সে নয়। আমার সদ্য যৌবনের মুখে সকালের মতন সে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার রূপে ছিল নির্মল, শান্ত। তার আলোয় তেজ ছিল না; দুর্বল ও স্নিগ্ধ ছিল। আজ এই বয়সে এসে জীবনের সেই সকাল বেলার দিকে তাকালে মনে হয় ওই বেলাটুকু চোখ চাইতে চাইতে যেন কেটে গেছে। বুঝতে পারি, ওটা থাকার নয়, রাখারও নয়।

একটা দিনের কথা আমার মনে আছে শচিদা আর আমি স্টেশন পাড়ার কালী পুজো দেখে ফিরছিলাম। রেলফটক পর্যন্ত দেওয়ালীর আলো ছিল, তার পর রাস্তাঘাট অন্ধকার। দূরে যা বাতি জ্বলছে পথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

সেবারে কালীপুজোতে বেশ শীত পড়ে গিয়েছিল। আগে কদিন বৃষ্টি-বাদলা গেছে। দুজনে অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে আসছি, আমার খুব শীত ধরে গিয়েছিল। গায়ে আমার গরম কিছু ছিল না। শচিদা একটা চাদর জড়িয়ে রেখেছিল।

আমি বললাম, "তোমার চাদরটা একটু দাও, শীত করছে।"

শচিদা বলল, "নাও।" বলে তার চাদরটা আমায় দিয়ে দিল।

আমি বললাম, "সবটা কেন, তুমি অর্ধেকটা নাও।"

আমরা এক চাদরে গা ঢেকে দুজনে গায়ে-গায়ে হয়ে ফিরছি, ফিরতে ফিরতে হঠাৎ কী মনে করে আমি বললাম, "শচিদা, আমরা এখন জোড় না বিজোড়?"

"বিজোড়।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "জোড়।"

শচিদা বলল, "না, বিজোড়।"

আমি বললাম, "ধ্যাত—জোড়।"

আমরা জোড় না বিজোড় করতে করতে অনেক হেঁটে এলাম। ছেলেমানুষীর কী শেষ ছিল! কত কী বলেছি তখন। শেষে শচিদা বলল, "এবার থেকে বাইরে বেরুবার সময় তোমার গায়ের শাল নিয়ে বেরিয়ো, মোহিনী!" তখন শচিদা আমায় আদর করে 'মোহিনী' বলত।

"কেন?" আমি বললাম।

"যা বলছি তাই করো। এই সব জোড় বিজোড়ের খেলা আর করা যাবে না।"

আমি তখন বুঝি নি। কয়েকদিন পরে জানলাম, শচিদা আমাদের জোড়ের সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ার কথা জানে।

শচিদার পর আমার জীবনে অন্য যে পুরুষ এল তার সঙ্গে আমার ছাদনাতলায় সব চোখের মিলন হলেও সেই পুরুষটিকে আর আমার দেখার ইচ্ছে থাকল না। তার কথা মনে এলেও আমার সারা গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

শচিদা, আর আমার এক-সময়ের স্বামী—এই দুই পুরুষকে আমি জীবনে দেখেছি। একজনের জন্যে আমার অনিকট মায়া আছে, মমতাও আছে—কিন্তু তার বেশী কিছু নেই। অন্যজনের জন্যে আমার কোথাও কিছু নেই। শচিদা অক্ষম পুরুষ, তার না আছে সাহস, না তেজ, না দাম। সে সংসারে এসেছে দুর্বলের মতন। দুর্বলের মতন থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে চিরটাকাল মাথা নুইয়ে থেকেছে। তাকে দেখে মেয়েদের মায়া হতে পারে মন ভরে না। আর যে-মানুষটার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তার মতন পুরুষকে আমি কোনো দাম দিই না।

আর এখন দেখছি এই অবিন। এ যে কোন্ ধরনের পুরুষ আমি বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে দেখছি। ওর যেন সবটাই বিচিত্র। আমি তার সম্মানীয়, তবু সে আমায় কমলেশদের মতন সম্মান করে না; তার সম্মানের ধারণাটাই আলাদা। আমায় সে মর্যাদা দেয় অথচ সেই মর্যাদা আমার এতদিনের পাওয়া মর্যাদার মতন এক ধাতুর নয়। তার চোখে আমি বিমুগ্ধ ভাব দেখেছি, কিন্তু সে আমায় ভান করে স্তব করতে বসে নি। আমি জানি না ওর স্বভাবে কী আছে—!

পুরুষমানুষের মধ্যে একটা স্বভাব আছে যা কোনোদিকে তাকায় না, কর্তব্য প্রেম স্নেহমায়া বোধবুদ্ধি কোনো কিছুই তাদের পথে কাঁটা হয় না; তারা আমার সেই স্বামীর মতন একটা খিদে নিয়ে জন্মেছে। তাদের মধ্যে অরুচি বলে কিছু নেই। এরা হল ইঁদুর জাত, মেয়েদের সব শান্তি ভেঙে দেয়। এই জাতটাকে আমি ঘৃণা করি। অবিন সে জাতের পুরুষ নয়। তার চোখে আমি সে দৃষ্টি কোনোদিন দেখি নি।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবিন যতখানি বেগে ঝড়ের হাওয়ার মতন ছুটে আসে ততটা প্রলয় করতে পারে না। তার বেগ আছে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। সে দক্ষ-

ঘজ্ঞ বাঁধানোর মানুষ নয়। তার মধ্যে যেটা খেয়ালিপনা সেটা ভর করলে তাকে কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে বলা মুশকিল, কিন্তু অবিন যখন তার মতি ফিরে পায় তখন সে বড় সুন্দর হয়ে ধরা দেয়। শচিদার বেলায় যেমন দিয়েছে।

আজ আমার এক এক সময় আচমকা মনে হয়, অবিন কী সত্যি সত্যি নির্লোভ নির্লিপ্ত কোনো পুরুষ? তার মুখে যতটা অবিনয়, মনেও কী তাই? আমি বুঝি না।

অবিনও আমায় বোঝে না। তার বোঝার ঝোঁক আছে, আমার নেই। তবু এই যে সারাদিনের মধ্যে আমি থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, হঠাৎ কোথাকার এক ভয় এসে আমার বুক কাঁপায়, রাত্রে শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে নিজের জীবনটাকে বার বার দেখি, এই যে আমি এতটা রাত করে প্রথম বর্ষার ঝিপঝিপে বৃষ্টির মধ্যে অবিনকে চিঠি লিখতে গিয়েও পারি না—এসবই যেন আমার কী এক লজ্জা হয়ে উঠেছে। দুঃখও। কোথাও এক শূন্য হয়ে যাবার বেদনা-দুঃখ আজ আমার মধ্যে ভরে উঠছে। (ক্রমশ)

॥ ২ ॥

কিছু প্রবাসী জমিদারতনয় ও প্যাগান ব্রাহ্মণ বিলিতী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে এ দেশের উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে যে ঝগড়া দেখা দিয়েছিল তাকে আমরা বাংলার নবজন্ম আখ্যা দিয়ে থাকি। ওই উথাকথিত নবজন্ম এসেছিল সাহেবী বই ও অব্যবহৃত দেশী মেধার সহসা সঙ্গমে। ইংরাজী কেতাব থেকে জাত ও ইংরেজী কেতাবনির্ভর ওই আন্দোলন শুধু যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক ক্ষুদ্র নাগরিক অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়; যে মুহূর্তে ওই সব কেতাব, শিক্ষার ব্যাপ্তির সাথে সাথে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই এক বৃহৎ মেধানির্বিশেষ অংশের হাতে এল, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার ঝিমিয়ে এল। আমরা যদি উপনিবেশ না হতাম, সাহেবরা যদি আমাদের কর্তা না হয়ে অতিথি হতো, জাপানে যেমন, এবং যদি সাহেবদের সংস্কৃতিতে আমাদের সমাজ প্রবিষ্ট হত ছাপা কাগজের মধ্য দিয়ে নয়, বেঁচে-থাকার সঙ্গে বেঁচে-থাকার সংঘাতে, তা হলে এই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি হয়ত অন্য ধরনের হত। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মূল লক্ষণই এই যে, সে একটি ছিন্নমূল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরি করে, যে মধ্যবিত্ত প্রথমে এলিটভাবাপন্ন ও পরে গড্ডালিকা-প্রবাহী: স্বদেশে যার যথেষ্ট আর্থিক খুঁটি নেই, অথচ দিনব্যাপী কায়িক পরিশ্রমের দায় হতে যে মুক্ত, সেই সম্প্রদায়ই রাজসংস্কৃতির নিবিষ্টতম পড়ুয়া; যেহেতু রাজসংস্কৃতি রাজধানীকেন্দ্রিক, তাই এই সম্প্রদায় সতত রাজধানীর দিকে দেশান্তরী। এবং রাজসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে শাসক হয়ে ওঠে। ফলত ঔপনিবেশিক সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এমন একটি সম্প্রদায়, যে আত্মভীরু, জনক সংস্কৃতির দিকে সূর্যমুখী, সমাজের অন্য অংশের সঙ্গে তার বিশাল ব্যবধানই যার অস্তিত্বের পাটাতন।

সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অব্যবহৃত ও বেওয়ারিশ মেধা প্রবলতর সংস্কৃতির ধাক্কায় যখন জেগে ওঠে তখন সমাজের করণীয় কাজগুলি তাদের দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু রাজা শিক্ষা চালু করেন বিদেশী প্রজার আত্মার উন্নতির জন্য নয়; রাজার পছন্দ কায়দায় শাসন চালাতে সক্ষম এমন একটি শ্রেণী তৈরির উদ্দেশ্যে। ফলত শিক্ষার ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার মান পড়তে থাকে, অব্যবহৃত মেধার সঙ্গে তার সংঘাত মৃদুতর হতে থাকে। যে বৈপ্লবিকতার জন্ম ছিল বই নামক অতি তরল ঔরসে, তার লালন সম্ভব ছিল খালি উত্তরোত্তর উত্তেজক শিক্ষায়। অথচ শিক্ষার সাধারণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে তার তীব্র কৌণিকতাগুলি অপসৃত হলো: ফলে, যাকে আমরা নবজাগরণ বলে থাকি, তা পর্যবসিত হলো এক আধজাগন্ত তন্দ্রাময় অস্বস্তিতে। যে ইংরাজী ইতিহাসের বই একদিন স্বপ্নময় অরণ্যের মতো মধ্যবিত্তকে আত্মবিকাশের ঐতিহাসিক পথ দেখিয়েছিল, যে আইনের বই একদিন তাকে স্বাধিকারে আত্মবিশ্বাসী করেছিল, যে দর্শন তাকে উত্তরোত্তর উন্নতির অনিবার্যতা বুঝিয়েছিল, তাদের দেখা গেল নিজেদের ক্ষীণ গরীব চেহারায়; অর্থাৎ ছাপা কাগজ, পরীক্ষা পাশের কল, চাকরি জোটাবার মই। প্রথম ধাক্কাতেই যে জোয়ার এসেছিল, তার বহমান ক্রমিক ঢেউ কিছুদিন চলল তাদের মধ্যে যারা, পয়সার দৌলতে, সাধারণীকৃত শিক্ষার অংশভাক হয়নি; এখন ডোবা নিশ্চল।

অন্য সংস্কৃতির ধাক্কায় জাত মধ্যবিত্তের প্রাথমিক চরিত্রলক্ষণ এই যে সে এলিট এবং সে শাসক। এই ঔপনিবেশিক কেতাবনির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোনোদিনই সমাজের নিরক্ষর নীরব অধিকাংশের দিকে চোখ ফেরায়নি। কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের জন্যই সে একদিন দিগন্ত সরাতে চেয়েছিল, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই করে। সেই মোহময় বাহুবল সে হারাতে শুরু করে সেই মুহূর্ত থেকে, যখন সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা তার এলিট চরিত্র গ্রাস হয়, এবং যে মুহূর্তে তার ওই সঞ্জীবনী ভূমিকা লোপ পায়, অথচ শাসক শক্তি বজায় রাখে, তখনই সে সমাজের স্বাধিকারের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

সাহেবরা একদিন চলে যাবার পর ক্ষমতা হাতে এল তার বিরক্তিকর পোষ্যপুত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে, যে মধ্যবিত্ত বহুদিন হল তার উদ্ভাবক চরিত্র হারিয়েছে। শাসক শ্রেণী যখন তার সীমান্তসন্ধানী ভূমিকা থেকে সরে আসে তখন অবধারিতভাবে তার চরিত্র অকর্মণ্য, দায়িত্বহীন ও অশ্লীল হয়ে ওঠে। বর্ণশাসিত সমাজের সঙ্গে নি বি ড় ভা বে শ্রেণীশৃঙ্খলিত ভিক্টোরীয় সমাজের এই জায়গায় খুব মনে মনে মিল হয়েছিল যে, নীচের তলার ছোট-লোকরা চিরদিনই নীচে থাকবে; সমাজ মোটামুটি এইভাবেই চিরকাল ভাগাভাগি থাকবে যে কিছু লোক মানুষের মত বেঁচে রইবে এবং ঈশ্বরনির্বাচিত এই সব মাতব্বরদের অভিভাবকত্বে অন্য সব লোকেরা মানুষের মত বেঁচে থাকার প্রয়াস পাবে।

ওই জগদ্দল বুকে নিয়েও ইংল্যান্ড এগুতে পেরেছিল, এবং পারে, কেননা তার মধ্যবিত্তশ্রেণী স্বদেশীয় ঐতিহ্যনির্ভর, সেহেতু অধিকাংশের হাতধরা ও দায়িত্বপরায়ণ এবং তদুপরি এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক তাড়নায় ছুটন্ত। এই শ্রেণীবোধ—বা বিকার—এদেশে অবধারিতভাবে রূপ নিল চরম দায়িত্বহীনতার; ফাঁদ পাতা হলো এক শিল্পোন্মুখ-দ্যোগী সমাজের, রাষ্ট্রিক নেতৃত্বে শিল্প-বিপ্লব ঘটানোর; এবং ওই টেকনলজিকাল উচ্চাশাকে সঁপে দেওয়া হলো এক ঘোর

সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের হাতে। ফলত শ্রমিক কেরানি সকলেই বর্গাদার চাষীর এক কারখানার কালিমাখা সংস্করণমাত্র হয়ে দাঁড়ালো, মালিক প্রবাসী অপগণ্ড জমিদারের দায়িত্বহীনতা অবিকল রাখলেন এবং আমলারা চেহারা নিলেন নায়েবের। সরকারী ব্যুরোক্রেসি বা বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের এই শাসনে ডিসিপ্লিনের অর্থ দাঁড়ালো চাকর-পনা, উদ্ভাবনের জায়গা নিল চাটুকারিতা এবং বেগার ঠেলা উৎপাদনে উৎসাহের। এই সামন্ততান্ত্রিক আমলাবাজি যদি প্রাচুর্যের কাকতালীয় সাহচর্য পেত তাহলে সন্দেহ নেই এমনটাই চলে যেত। যেহেতু অভাব ছিল এবং গাড়ল শাসনে কমবার চিহ্ন দেখা গেল না, তাই অধিকাংশ, যারা কেরানি বা মজুর, হিংস্র নৈরাজ্যবাদের মধ্যে মানুষের অধিকার খুঁজতে বাধ্য হলো। পাশ দিয়ে বড়ো আমলা চলে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকাই রীতি ছিল; কাঁপতে আপত্তি থাকতো না যদি পেট ভরতো, কেননা পেট ভরানোর কৃতিত্ব সে আমলার জাঁদরেলামি। পেট যেহেতু ভরলো না, তাই হঠাৎ একদিন ঘিরে দাঁড়িয়ে গালি দিয়ে, প্রহার করে, আমলাকে ভয়ে কাঁপতে দেখে, গরীব কেরানি নিজের মনুষ্যত্ব পুনরাধিকার করতে বাধ্য হয়। যে নষ্ট সমাজের চোখে নিয়মানুবর্তিতার অর্থ একদিন ছিল সাহেব মা-বাপ, সমানাধিকারের অর্থ তার চোখে অবধারিতভাবে, এই যে সাহেব শুওরের বাচ্চা। অর্থাৎ যে মানুষী আত্মসম্মান ও শক্তি শ্রমিক কেরানি অবিচ্ছেদ্য অথচ যা তাকে বোধ করতেও দেওয়া হয়নি, তার এক বিকৃত বিস্ফারিত রূপে সে বাধ্যত তৃপ্ত হয়ে নেয়।

বিপর্যয় এই যে, ওই সব কেরানিও একই-রূপ পাপী। চাপরাশি বা কুলীর সাথে শ্রেণীভেদ বজায় রাখতে সেও হিংস্র মরিয়া। তফাৎ বজায় রাখতেই হবে, প্রত্যেকেরই চাই নীচের একটি শ্রেণী যার উপর সে মাতব্বর। এই জমিদারী চাল শুধু ব্যুরোক্রেসিতে নয়, শিল্পগুলিতে নয়, ইস্কুল কলেজেও। শিক্ষক এই সমাজের অন্যতম দুঃস্থ শ্রেণী —ছড়ি ঘোরানোর জন্য যোগাড় করেন যে শ্রেণী তার নাম ছাত্র সম্প্রদায়। এখানেও শৃঙ্খলা বলতে বোঝা হয় গবা ভক্তি, শ্রদ্ধার অর্থ বুদ্ধি দিয়ে পাল্লা নয়, পায়ে লুটিয়ে পড়া, জোর মনোবিকাশের উপর নয়, রীতি, প্রবাদ ও নিয়মগুলি নীরেট পালনের উপর। কর্তৃত্ব মানতেই হবে এই বিকৃত লোভের উপর; যেহেতু শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপিত, তাই সেখানেও আজ শ্রেণীসংগ্রাম শিক্ষকের চোখের সামনে নকল করা শুধু পরীক্ষা পাশের সহজতম অস্ত্র নয়, পরোক্ষে প্রভু-দিগের দিকে নিক্ষিপ্ত প্রাক্তন দাসশ্রেণীর আমর্মমূলে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য।

এক সম্পূর্ণ পরমুক্ত শ্রেণী, যার

সংস্কৃতির উৎস বিদেশী সভ্যতার ধাক্কা অথচ নিয়ত পুষ্টিকর যোগসূত্রে নেই; ফলত যে নিরাবলম্ব, অস্বাভাবিক আত্মমুখীন, বস্তুত এত অরক্ষিত যে অধিকাংশ যদি না কুকুর বেড়ালের মতো থাকে, যদি না ওই অধিকাংশ কুকুর বেড়ালের তুলনায় সে পরম পুরুষের মতো থাকে তাহলে তার বেঁচে-থাকা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আরেক দল মানুষের বুকের উপর পা না রাখলে তার সমাজে দাঁড়ানোর জায়গা নেই; মাথা হেঁট করে থাকো, হাত কচলে তবে মুখ খোলো, নম ধরলে জিভ উপড়ে নেব, বন্ধু চাই না, সহকর্মী চাই না, চাকর চাই, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, কারখানায়, সরকারী অফিসে স্কুল কলেজে, সাহিত্য সভায়, সংগীতবাসরে তার এই এক রুদ্ধশ্বাস চিৎকার সকল এক ধাপ নিচের মানুষের প্রতি। বন্ধু চাই না, চাকর চাই: ফলত বন্ধু জোটে না, চাকর একদিন ছুরি তোলে।

বলতেই হয়, এই ক্ষমতার লোভ মনুষ্য-চরিত্রেরই অংশ; কিন্তু এই লোভকে ছাপিয়ে সমাজ কখনো কখনো কিছু ক্লিশে বিস্তার করে; যেমন ক্লিশে চাপরাশিকে চেয়ারম্যানের ডাক নাম ধরে ডাকায়, যদিও দুজনের কেউই স্বকীয় বুদ্ধিবশে মনুষ্যের মৌলিক সাম্য হঠাৎ আবিষ্কার করেনি, একটি প্রবল ব্যবহারের দাস মাত্র। এবং ওই সব অজ্ঞান অভ্যাসই শ্রেণীসংগ্রাম ডিঙিয়ে সমাজে একটি তারল্য আনে যে তরলতা শ্রমিক-ধনিক কেরানিকে ত্রিকোণ যুযুৎসুতা থেকে সরিয়ে এনে কাজে লাগায়, উৎপাদন বাড়ে। আরেকজন মানুষ কৃতাঞ্জলি না হলে আমার মনুষ্যত্ব চরিতার্থ হয় না, এই কর্তৃত্ব লোভ দুহাতে খুন করে। তাকে যার এই লোভ কেননা সে জীবনের দুরূহ নিঃসহায়তার উপর এই সব খড়কুটো চাপিয়ে গভীর ঝড় গুলির জন্য অপ্রস্তুত থাকে; এবং তাকে, যার উপর এই লোভ কার্যকরী, কেননা হয় সে ব্যক্তিত্ব বিকিয়ে চাটুকার হয় কিম্বা ওই অস্বাভাবিক দাবি তাকে এক অযৌক্তিক হিংস্র অন্তিমে ঠেলে নিয়ে যায়।

শ্রেণীবিন্যস্ত ভিক্টোরিয়ান সমাজের নকলে, কিন্তু তার আন্তরিক পেটারনালিজম, দায়িত্বপরায়ণতা বাদ দিয়ে, যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তার অন্য অবশ্যম্ভাবী রূপ: ব্যক্তিগত অকর্মণ্যতা। সমাজের অন্য শ্রেণীর সঙ্গে সে যোগসূত্রহীন এবং নির্দায়িত্ব; সেই কারণেই সে নিজ শ্রেণীর অন্য সদস্যদের প্রতিও দায়িত্বহীন: ফলত সমাজে তার ভূমিকা বারো ভূতের, শুধু দুঠেঁপটে তুলে নেবার। দু' হাজারী মনসবদার থেকে শুরু করে দু' শো টাকা মাইনের কেরানি পর্যন্ত সকলেই তাই এমন নষ্কর্মা, নির্বীজ। চাকরি, পেশা একটা বাঞ্ছিত টাকার থলি মাত্র। নিয়মিত প্রাপ্য তুলে নেবার পর অবশিষ্ট নিজ নিজ সন্তানের হাতে তুলে দিতে পারলেই জীবনগত পাপ-ক্ষয় হয়ে গেল। গুণ্ডু রাজনীতিক, অকর্মণ্য আমলা, বাচাল, কেরানি, অনুৎপাদক শ্রমিক, গতানুগতিক চাষী—শিকলের এই বলয়গুলি তাই এমন পরস্পরের দ্বারা সংপৃক্ত ও আবদ্ধ। শ্রেণীবিকৃত বুঝি, কিন্তু কেন শ্রমবিমুখ হলাম? কেন আমাদের কাজের জীবনে উৎকর্ষতার প্রতি অন্বেষণ এমন নিদারুণ অনুপস্থিত? সাহেবরা আশ্বাস দিয়েছিল লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়া চড়া যাবে; আমরা ততোটা পর্যন্ত শিখিনি যখন বোঝা যায় গাড়ি-ঘোড়া চড়ার লোভ ও লেখাপড়ার সৃষ্টি একই তাড়না থেকে: অনির্ধারিত বহির্জগতকে করতলগত করতেই হবে। ওই তাড়না ব্যতিরেকে লেখাপড়া হয়ে উঠলো একটা প্যাঁচ মত, অর্থাৎ কিছু খবর জিভ পর্যন্ত নিয়ে আবার জিভ থেকে নামিয়ে পরীক্ষার খাতায় রেখে এলে চাকরি মিলে যায়; এবং চাকরি হয়ে উঠলো শুধুমাত্র গাড়িঘোড়া চড়ার কল। বহিরঙ্গকে জয় করবার তাড়না যেমন গাড়িঘোড়া চড়ায়, তেমনি প্রথমে গাড়িঘোড়া তৈরিও করে। সমাজ যখন তাড়নাবিরহিত তখন সে বাঁজা সম্ভোগী, অবদানশূন্য। কিন্তু এই তাড়না-হীনতাই যদি পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের কুম্ভকর্ণবৃত্তির কারণ হয়, তাহলে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশগুলির মধ্যবিত্ত সমাজ, যারাও অনুরূপ সাংস্কৃতিক সংঘাতে জাত, কাজ করে কেন? প্রথমে উপকূলে ভাগে ও পরে অন্তবর্তী অঞ্চলগুলির সব মধ্যবিত্ত সমাজেরই নবজন্ম হয়েছিল বিলিতি সংস্কৃতির ধাক্কায়। এবং পশ্চিমবাংলার মতোই অনুরূপ ভাবে এইসব সমাজেও মধ্যবিত্ত সেই শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছিল যারা গরীব মানুষকে চাকর বানিয়ে সুখ পায়। কিন্তু অন্য অঞ্চলগুলিতে একটি প্রভেদ হয়ত ছিল: ধর্মের প্রবলতর অস্তিত্ব। সতীদাহ, বহুবিবাহ, মোল্লাবাজি যদিও এদেশেও ভীষণ চালু ছিল, হিন্দুধর্ম বা ইসলামের ভদ্রাসন চিরকালই ছিল বাংলার বাইরে। উদাহরণ স্বরূপ, দক্ষিণাঞ্চলের ব্রাহ্মণ মধ্যবিত্ত সমাজের, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী সমাজের একটি কঠিন শিকড় ছিল, আজো আছে, ধর্মের মধ্যে। ধর্মবোধের যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হাত দাঙ্গা বাধায়, সে-ই আবার এই বিশ্বাস চালু রাখে যে মানুষের ভাগ্য একটি কার্যকারক শৃংখলায় বন্ধ। হয়ত এই ধর্মবোধ ও পাশ্চাত্য কালচারের সংমিশ্রণ ওইসব সংস্কৃতিতে খানিকটা সেই তাড়না দিয়েছে যা অংশত ইওরোপ-আমেরিকার পিউরিটান কালচারের স্বরূপ: পরিশ্রমের ফল পুরস্কার, বেশি পরিশ্রমের ফল বেশি পুরস্কার, সৃষ্টি একটি সুবিধা-বাদী শৃংখলায় বাঁধা, সাহেবেরা আমাদের মাথার উপর, কেননা তারা বেশি খেটে এই পুরস্কার পেয়েছে। অপরকে চাকর না

রামালো জীবনে মনে আসে না এই বিকার অন্য ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজের বিকার; কিন্তু বাংলা দেশে এবং পূর্বাঞ্চলের সেইসব প্রদেশে যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজ গাড়ছে বাংলার প্রভাবে, ওই বিকারের সঙ্গে কোনো প্রসমুখীনতা যুক্ত হয়নি। ফলে ওই বিকার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী, তার যাতকচরিত্র ধার্দাবহীন।

হয়ত আমরা এমন যে নিষ্কর্মা তার ঐতিহাসিক কারণ ওইরূপ : বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত কোনো মৌলিক কার্যকারক শৃঙ্খলায় অর্থাৎ ধর্মবোধে আস্থাপরায়ণ ছিল না, যে আস্থা তাকে শ্রমবিনিয়োগের ঐশী যাথার্থ্য বোঝাতে পারত; অথচ তার সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত এত লঘু ছিল যে সে উদ্ভাবনের তৃষ্ণাহীন। এবং ওই কারণের

ক্রমবিকাশে দেখা গেল সুবিধাপন্নরা নিরুদ্যোগ সম্ভোগী ও পরবর্তীকালে, লেখাপড়ার শেষেও চাকরি নেই। অর্থাৎ যা এই সমাজকে যে লোভ দেখিয়ে তৈরি করেছিল, তার একটি মিথ্যা, সুতরাং অন্যটি অপ্রাসঙ্গিক।

বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের দৃশ্যমান সংকট আজ এই যে, যে কারণে তার একদিন তৈরি হয়েছিল, অর্থাৎ গরীবদের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে মাঝারি কাজগুলি চালাবার জন্য একটি ইংরাজীনবিশ শ্রেণীর প্রয়োজন সেই কারণ আজ অপসৃত; অনিবার্যভাবে, যে প্রক্রিয়ায় তার জন্ম হয়েছিল সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাও আজ ভূপাতিত। গরীব দেশে জন্মানোর দুর্ভাগ্য স্বীকার করলেও এই সংকট বহুলাংশে বাঙালী মধ্যবিত্তের নিজের হাতে তৈরি : তার গত পঞ্চাশ বছর ব্যাপী অপরিসীম দায়িত্বহীনতা ও অকর্মণ্য অভ্যাসের ফল। যদিও, স্বাভাবিকভাবেই, আজকের দুঃখ কৃতকর্মের ফল এই বোধ কখনোই জন্মায় না; প্রত্যেকে অপরকে দায়ী করে।

পশ্চিমবঙ্গের চেহারাটা এখন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই পারস্পরিক দোষা-রোপের : উপরের অংশ, নিবন্ধ আমলার রূপ নিয়ে একধারে দাস; এবং ওই শ্রেণীর তলার বৃহৎ অংশ শুধু বস্তুগুলি দাবি করে ছুটে বেড়াচ্ছে; ধারণা, ওই বস্তুগুলিই ক্ষমতা। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজকে চালিত করে সেই আজ তার জনক হেতু-গুলির অনুপস্থিতিতে টুকরো টুকরো হয়ে এমন আত্মবিধ্বংসী লড়াইয়ে উন্মাদ।

গরীব দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবের স্বপ্ন খুব স্বাভাবিক; বিশেষত সেইরকম গরীব দেশে, যেখানে মধ্যবিত্ত ভ্রষ্টচরিত্র, দায়িত্বহীন ও কলত নিজের উপরই অবুঝ হিংস্র—অর্থাৎ উপনিবেশ ছিল এমন কিছু কিছু সমাজে—সাম্যবাদী বিপ্লবই একমাত্র আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে, যা স্বভাবী কর্মবিমুখতা তা আন্দোলনের ভেক পরে একটি আন্তর্জাতিক আত্মপ্রসাদ যোগায়। কিন্তু বিপ্লবও সস্তায় হয় না, যেহেতু বিপ্লবের অর্থ অধিকতর শক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রশক্তিকে যুদ্ধে হারানো। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় করতে গেলে দরকার করে প্রচণ্ড কর্মিষ্ঠতা, জনগঠন-প্রতিভা; অর্থাৎ মধ্যবিত্তকে ফিরে পেতে হয় তার একটি উদ্ভাবনী চরিত্র, তার বিশাল সৃষ্টিপিপাসা। যে চরিত্রের, পিপাসার চিহ্ন-মাত্র পাওয়া যাবে না পশ্চিমবাংলার আমলাতান্ত্রিক সাম্যবাদী দলগুলির অগ্রে, পাশে বা তলায়।

এই উদ্ভাবনী চরিত্র ও সৃষ্টির উৎকণ্ঠা সমাজে একসারি নতুন আপ্তবাক্য আনে ও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দৃশ্যমান করে; যেমন উনিশ শতকের যুবকবাংলা তার গোষ্ঠীর মধ্যে একদিন করেছিল। কারো কারো ধারণা

নকশালপন্থী যারা বাংলাদেশের সেই বিক্ষোভকারী। পশ্চিমের সমাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তৎকালীন অব্যবহৃত মধ্যবিত্ত বুদ্ধি যেমন কিছু নতুন উত্তেজক জ্ঞান আহরণ করেছিল তেমনি এই সমাজের দ্বারা অব্যবহৃত মধ্যবিত্ত মেধা চীনের নতুন জঙ্গীবাদ সংস্কৃতির দ্বারা আজ আক্রান্ত ও উদ্দীপিত; টয়েনবি যাদের বলেছেন অন্তর্বর্তী বিচ্ছিন্নের দল, দি ইণ্টার্নাল প্রোলেটারিয়েট, যারা পুরোনো সমাজকে দীর্ণ করে নতুন সমাজের জন্ম দেয়, এরা সেই অভিমানী ত্যাজ্যপুত্রেরা, নতুন জ্ঞানের দ্বারা সশস্ত্র।

কী এই ত্যাজ্যপুত্রদের চরিত্র ও কার্যকলাপ? একসারি নতুন আপ্তবাক্য তারা নিঃসন্দেহে আহরণ করেছে—যা দেয়ালে দেয়ালে ছড়ালাপ—এবং দ্রুত দখলবুদ্ধিতে বোঝা যায় এই আপ্তবাক্যসমূহ কেমন তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করছে। কিন্তু উদ্ভাবনী চরিত্রের মূল লক্ষণ এই যে সে উদ্ভাবন করে। খুন সেই উদ্ভাবন যা পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে নকশালদের ঐতিহাসিক অবদান। এই অবদান ছোট নয়; আজ থেকে মাত্র তিন-চার বছর আগের কথা চিন্তা করলেও আমরা বুঝতে পারবো, অবিকার খুন করে ও নির্বিচারে খুন হয়ে নকশালরা এই সমাজকে কী দ্রুত এগিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রতি মাসে আমরা এখন দৃশ্যমানভাবে বরস্কতর হচ্ছি; বারাসতের রহস্যময় মৃত্যুগুলির উত্তেজনা দ্বিতীয়বার আমাদের জাগলো না কোন্নগরের মৃতরাশি দেখে, বরানগরের ব্যাপক হত্যা দেখে। ছুতে নিয়ে যাওয়ার মতো এই পশ্চিম বাংলায় এখন মানুষ খুন হয়ে যায়; রোজই কিছু লোককে ঘর থেকে, বাস থেকে, রাস্তা থেকে, ট্রেন থেকে ছুতে নিয়ে যায়। খুনকে এমন দৈনন্দিনতার মধ্যে নিয়ে আসা, এমন আমাদের রোজকার আহার, অফিস, মিথুন, জোচ্চুরি, সন্তান পরিচর্যার মধ্যে জলচল নিরীহ সদস্য করে ফেলা এক যুগান্তকারী পরিবর্তন, যার পূর্ণ কৃতিত্ব নকশালদের প্রাপ্য। যদিও অগণিত নকশালও খুন হয়ে বুঝিয়েছে এই সমাজ এখন সর্বতোভাবে ভূতের হাত ধরা, সর্বনাশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উল্কিগুলি তার গায়ে যথারীতি ফুটে উঠেছে, কিন্তু কৃতিত্ব নকশালদেরই কেননা খুনকে তারাই একমাত্র শক্তিশালী আপ্তবাক্য হিসেবে সমানে চালু করতে সক্ষম হয়েছে।

এবং এই উদ্ভাবনই নকশালপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রকে অতি নিষ্ঠুরভাবে চিহ্নিত করে। খুনোখুনিকে এমন ঘরোয়া ও গতানুগতিক করে তুলে এবং, ফলত, পুলিস খুন, বিপ্লবী খুন, জোতদার খুন, বালক খুন সব এক গভীর তামসিকতার মধ্যে একাকার করে দিয়ে নকশালীরা এই কথাই প্রমাণিত করে যে, মধ্যবিত্তের ওই অব্যবহৃত ভ্রাম্যমান অংশ কোনো উদ্ভাবনী এলিট চরিত্রের দ্বারা বিদ্ধ নয়; অর্থাৎ ওই অংশ এই সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, শিকার মাত্র, কোণে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বেড়াল, কোণ ছেড়ে দিলেই যে আবার পোষা থাকে। যে আপ্তবাক্যগুলি তাদের চালক—যেগুলি মূলত গণযুদ্ধ কীভাবে জিততে হয় সেই সম্পর্কে কিছু অতি-সরলীকৃত উপদেশ—তাদের কোনোটিই সামগ্রিক জীবনসমস্যার দ্বারা সম্পৃক্ত নয়। যেহেতু সম্পৃক্ত নয়, তাই বর্তমান ধ্যান-ধারণাগুলির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও অনুপস্থিত। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান এই অভিনব স্লোগান আসলে এদেশের প্রচলিত জাতীয়তাবাদী স্লোগানের উপর আক্রমণরত একেবারেই নয়: স্থাণু ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজে যা অবশ্যম্ভাবী সেই ব্যক্তিপুজোর মুখ্য ডাক মাত্র। কৃষকের প্রতি হিংস্র ভালোবাসার উৎস নিজেদের স্থানচ্যুতি; ফলত শহর ও শহরতলিতে খুন: শিক্ষাব্যবস্থার মৃতের উপর খাড়া-খা কেননা ওই শিক্ষাব্যবস্থা চাকরি জোটায় না অথচ বজায় থেকে মিহিত আশ্বাস এখনো বদমাইসের মতো ঝুলিয়ে রাখে। অর্থাৎ এই সমাজের অবহেলায়, অব্যবহারের নির্ধারিত প্রত্যুত্তর হিসেবে কতকগুলো ক্রোধের সমষ্টি; ব্যবহারের হাত বাড়ালেই যা প্রশমিত হবে। সেই প্রেরণা অনুপস্থিত যা অব্যবহৃত থাকায়—কেননা সে ব্যবহৃত হতে অস্বীকৃত—সমাজের বর্তমান প্রবণতাগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী, যে প্রেরণার বশে উদ্ভাবক মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠে দি গ্রেট আউটসাইডারস অব সোসাইটি, এক বিশাল আগন্তুক। নকশালপন্থীরা তাই এই সমাজের—কিছু আসে যায় না তারা ক্রমবর্ধমান কি অপসৃত হচ্ছে—অব্যবহৃত অংশের সেই অনিবার্য বিকাশ মাত্র যা নিয়মিত অবক্ষয়ের গতিকে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ও প্রতীয়মান করে তোলে। তাদের ঐতিহাসিক যথার্থ্য শুধু এই যে কাঁটাবিহীন ঘড়িতে তারা সময় পড়তে সাহায্য করে।

এই জরদ্গব ও ছিন্নমস্তা মধ্যবিত্ত সমাজের সামনে একটাই প্রশ্ন; একটি বিশাল জনসমষ্টির জীবনধারণাগুলি কিসে এমন বদলাতে পারে যে আমাদের জীবন চালিত হয় সেইসব অজ্ঞান অভ্যাসের মধ্য

দিয়ে যাদের সামগ্রিক যোগফল কল্যাণকর; অর্থাৎ আমরা দায়িত্বশীল বাঁচি, সমাজকে করুণিবৃত্তির পরিবর্তে কিছু ফেরত না দিয়ে থাকতে পারি না, অপরের স্বাধিকারে নিজের অধিকার দৃঢ়তর হতে দেখি এবং ক্রমশ আপাতিক অসুবিধার দিগন্তে পৌঁছুবার জিদ জেগে ওঠে। চীন-আমেরিকা-রাশিয়া যে-ই আমাদের আদর্শ হোক, প্রাক্তন ঘটনাগুলি বিভিন্ন বলে আমরা কখনোই সম্পূর্ণ অনুরূপ হতে পারি না; এবং অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে এমন শাসনে রাখে যে এক সমাজের ঘটনার নকলে অন্য সমাজ জোর করে ঘটনা আনতে পারে না, পরিবেশের রসায়নে ঘটনা পাল্টে যায়, ঘটনার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। আমরা কতকগুলি অপরিবর্তনীয় অতীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজকে এইরূপ বিকশিত; এখান থেকে কী করে আমরা জীবনের দিকে ফিরতে পারি, যদি পারি?

জৈবসূত্রে অধিকাংশ লোকই নির্বোধ ও গতানুগতিক; কতিপয় মাত্র লোকই ধীমান ও কল্পনাপরায়ণ। ওই মুষ্টিমেয় লোকই কি সমাজের নির্ধারক আপ্তবাক্য-

গুলির জন্ম দেয়? নাকি তারাও অসহায় শিকার, প্রক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিই জনক এবং অবক্ষয়ী সমাজ অচারিতার্থ প্রজননক্ষমতা নিয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য—ঘটনার অপেক্ষায়?
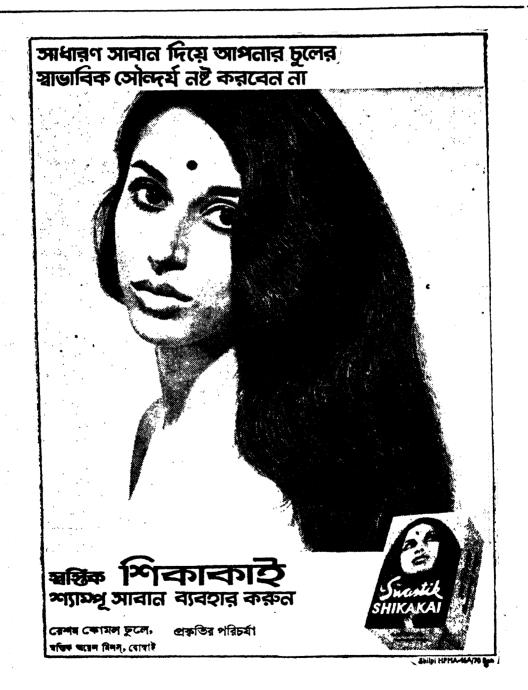
সন্দেহ নেই তথাকথিত জাগ্রত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হঠাৎ হাওয়া থেকে নতুন জীবনধারণা আহরণ করে সমাজকে সেই দান দিয়ে যায় না। প্লেটো কথিত অন্ধ গুহাবাসীদের একজন অকস্মাৎ সূর্যালোক দেখে ফিরে গিয়েছিল, বলেছিল পুরানো সাথীদের, এই মলিনতা অস্বাভাবিক, দ্যাখো, বাইরে কী প্রচণ্ড আসল বিভিন্নতা; ফলত সে গণউপহাসের সম্মুখীন হয়। সারভানতাসের নায়ক তার বিশেষ উদ্দেশ্যজয়েই একেবারে ব্যর্থ, কেননা পারিপার্শ্বিক জনসমুদ্র থেকে সে একেবারে বিচ্ছিন্ন থেকে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলে। পাথর নিঙড়ে রক্ত বেরোয় না; তেমনি বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি খালি ঝড়ের বিরুদ্ধে অশ্রুত চীৎকার করতে পারে, যেহেতু অশ্রুত অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াহীন, সেইজন্য যে চীৎকারের তেজ ও ব্যাপ্তি ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধি অপরিচ্ছন্ন হয় অবহেলাজাত ক্ষোভের বিকারে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী পর্যবসিত হন সেই নিষ্ফলা জীবে, যাকে বলা হয় ক্যাংক, যিনি, যতোই যথার্থ হোন, সমাজে অবান্তর।

এই ব্যর্থতাবোধ কখনো কখনো আগে-ভাগেই বুদ্ধির উপর অশ্রদ্ধা দিয়ে যায়; সংখ্যালঘুর সেই হীনমন্যতা আনে, যার বশে বুদ্ধিজীবী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন বহু লোককে যে দ্বিধাহীন চালিত করতে সক্ষম তার দিকে; চিন্তাবিদ ও পোলিটিকাল মাস্‌ম্যানের এই একপক্ষীয় প্রেমের গল্প ইতিহাসখ্যাত।

অবক্ষয়ী সমাজের লক্ষণই এই যে, সেখানে মেধা সুপ্ত ও অব্যবহৃত; সদ্‌বুদ্ধি পর্যবসিত পাড়ার পাগলে; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাবে বিকৃত। অর্থাৎ গতানুগতিকতার প্রতি প্রবণতা এত আগ্রাসী থাকে যে, বুদ্ধি উন্মাদ উন্নাসিক হতে বাধ্য হতে হয় বা নিজেকে অস্বীকার করে। বস্তুত জনপ্রিয়তা, অর্থাৎ সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ছাড়া বুদ্ধি বাঁচে না; শুধু যে নিরংকুশ ক্ষমতাই নিঃশেষভাবে নষ্ট করে তাই নয়, সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীনতাও সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে।

এই সমাজে বুদ্ধি কী করে তার জীবন-সঙ্গিনী দুঃসাহসিতাকে ফিরে পায়? এবং জীবনাভিমুখী ধারণাগুলিকে সকলরবে আবিষ্কার করে? কী সেই মায়া, যার বশে ধীমান সংখ্যালঘু নবাবিষ্কৃত ধারণাগুলির মশালে নিজেদের জ্বালিয়ে ধরা মাত্র অধিকাংশ অবুদ্ধিও ওই আলোকের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করে? ফলে, সদভ্যাস সৃষ্টি হয়, সমাজ অভ্যাসবশত প্রগতিশীল হয়?

মোটা কথায়, যদি মেনে নিই পশ্চিম-বঙ্গ আজ ভীষণ দুর্দশা, তা হলে কী করে সম্ভব হতে পারে সেই পরিবর্তন, যখন আমরা দেখবো শাসক মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি সদস্য নিজের সৃষ্ট কিছু দেখে যেতে চায়, নিজের সৃষ্টির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ দেখতে চায়; অর্থাৎ শিক্ষক আরো ভালো শেখাতে চায়, ছাত্র আরো অস্থির আবিষ্কারী, ডাক্তার উকিল আমলা কেরানী রাজনীতিক সবাই নিজের কাজটুকু আরো ভালো করে সমাধা করে যাবার—অর্থাৎ, সৃষ্টির—এক বিশাল জিদ্‌ বোধ করে, যে জিদ্‌ তার শ্রেণীর মহত্তম চারিত্রলক্ষণ? এবং এই জিদ্‌, এই স্নায়বিক জ্বর যেহেতু ফল-প্রসূ হতে বাধ্য, তাই সারা সমাজে সঞ্চারিত হতে থাকে?

আরো দশটা বড়ো কারখানা চালু করে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে যাদের ধারণা তাদের ভ্রষ্ট ও গতানুগতিক বুদ্ধির বশেই পশ্চিম-বঙ্গের গত পঞ্চাশ বছরে এই চেহারা: যা-কিছু নতুন করা হয়েছে সেগুলি জন্মরুগ্ন, যা ছিল সেগুলি হারাধনের সন্তানদের মতো অপসৃয়মান। আরো দশটা কারখানা এখন এই নষ্টবুদ্ধি দেশে আরো একশ কোটি কাঁচা টাকা মাত্র; যা ভেঙে এখনকার কয়েক লাখ লোক খাবে, পরবর্তী লোকেরা আবার কাদায় বসে থাকবে। সন্দেহ নেই, এই দুঃস্থ সমাজে ওই পাড়-পাওয়া কাঁচা টাকাই অনেক; কিন্তু এই সমাজের সংসার ওতে চলবে না। যা দরকার তা হলো নিদ্রিত বুদ্ধিমান অংশের পুনরুত্থান, তার উদ্ভাবনী চরিত্রের পুনরাধিকার, তার বিশাল কর্ম-পিপাসা জেগে ওঠা; সৃষ্টির অবিরাম তাড়নায় যে নিজেকে সমাজের শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে, যে উদাহরণ প্রচলিত অভ্যাসগুলিকে অজুলচল করে তোলে এবং সমাজ অনুকরণবশত সদভ্যাসী হয়। অথচ কী করে ওই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে?

এমন ক্লান্ত বিশ্বাস করা অসুবিধে যে, ইতিহাসের সেই সব মুহূর্ত সমকালীন মানুষের চোখে অজানিত থাকে সমাজ যখন অন্তর্লীন কিন্তু অমোঘ বাঁক নেয়; কিংবা সুপ্তিময় বুদ্ধি কোনো ঘটনার প্রবল বহিরাঘাতের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে বাধ্য। অর্থাৎ কারো নিজে থেকে কিছু করার নেই, কেননা সেই চেষ্টা অজানিত ব্রাহ্মমুহূর্ত ছাড়া কৃত্রিম ও ব্যর্থ হতে থাকে।

হয় আমরা দেখে শিখতে পারি, নয় আমাদের ঠেকে শিখতে হবে, অর্থাৎ অজানিত ঘটনা ক্রমে অকল্পনীয় শিক্ষা দিয়ে যাবে। ঘটনার আশায় যদি বসে না থাকি, সজ্ঞানে আজ আমরা কেবল দেখে শিখতে পারি। অর্থাৎ অসমাপ্ত নবজাগরণের সুতো কুড়িয়ে নিয়ে আমরা আমাদের আহরিত পরিবর্তন সমাপ্ত করতে পারি। ওই নব-জাগরণ নিরতিশয় অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য হয়, কেননা উৎস শিক্ষা তার সাধারণী-করণের সাথে সাথে প্রাথমিক সংঘাতময়তা হারিয়ে ফেলেছিল। দরকার ছিল পুনঃ পুনঃ ও অবিরাম আঘাতের, যাতে চাঞ্চল্য শুধু মাঝনদীতে গোষ্ঠীবদ্ধ না থাকে; অথচ ধাক্কা একবারই মাত্র লেগে সরে গেল। কী করে আমরা এখন তাকে ফিরে আনতে পারি? নষ্ট সমাজে রক্ষকই যেহেতু ভক্ষক, তাই শুরু কোথা থেকে হবে? যে দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটেনি, সেখানে রাষ্ট্রিক উদ্যোগে শিল্পবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করা হয়; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি যার উদাহরণ। অথচ এই শিল্পবিপ্লব সার্থক হয় না একটি পূর্বতন সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া, যা জীবন সম্পর্কে সাধ-ইচ্ছার রূপ পালটে ওই শিল্পবিপ্লবকে ঘরোয়া করে তোলে, আমলা কেরানি, শ্রমিক কৃষক অংশীদার হয়, সমাজে অব্যবহৃত অংশ থাকে না। গণতান্ত্রিক সমাজে এই ধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সরকারী উদ্যোগে ঘটতে পারে না এই সরল কারণে যে, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রবল সংস্কার-কুসংস্কারগুলির সঙ্গে আপাতত আপোস করে চলতে বাধ্য থাকে; কোনো আমূল পরিবর্তনে সে অক্ষম।

বস্তুত ক্ষয়িষ্ণু সমাজে এ ধরনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব একমাত্র মোহময় বা অবাধ একনায়কেরাই হঠাৎ সংঘটিত করেছেন, যে একনায়ক এলিট সংখ্যালঘুর সংকীর্ণতম উদাহরণ। এই সমস্ত কল্কি অবতার কখনো কখনো অবদমিত ক্ষোভগুলির বাস্তবরূপ সম্ভব করে সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করেন; যেমন হিটলার। অথবা বিপ্লবকে যখন উপর থেকে আরোপ করা হয় রাষ্ট্রিক ক্ষমতার বশে, যেমন বিসমার্ক, স্টালিন, অথবা ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার বশে, যেমন লেনিন, যে আরোপিত বিপ্লব কালক্রমে একদিন অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। অথবা নিজের অস্বাভাবিক চারিত্র্যবলের সংঘাতেই যিনি একটি উদ্ভাবক সংখ্যালঘুর সৃষ্টি করেন, যেমন যীশু বা মহম্মদ, যেমন গান্ধী পারেন নি। অথচ একনায়কের দ্বারা সংঘটিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব জন্ম থেকেই অভিশপ্ত থাকে; এলিট তার প্রজননক্ষমতা হারায়, শাসন চলে নির্বুদ্ধি ভক্তের দ্বারা, সমাজ প্রাথমিক উত্তেজনা পার হলেই আবার নিশ্চল আটকে যায়। বস্তুত, সব সাংস্কৃতিক বিপ্লবই আরোপিত এই অর্থে যে, বুদ্ধিমান সংখ্যালঘু যে জ্ঞান নিজবলে আহরণ করে, অধিকাংশ নির্বোধ তাকেই অন্ধ অনুকরণের দ্বারা সামাজিক অভ্যাসের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য যা দরকার তা হলো সেই মায়াবী রসায়ন, যখন অনুকরণ

স্বতঃস্ফূর্ত হয়, ফলে জৈব জন্নায় বিত্তগত শ্রেণীভেদ ভেঙে যে বুদ্ধি যত্রতত্র জন্মায়, তার নতুনতর জ্ঞানপ্রচারের পথ খোলা থাকে।

সুতরাং সরকারের হাত দিয়ে নয়, আমাদের উদ্ধার গুরুর পা ধরেও নয়। বাকি একমাত্র আশা থাকে এই যে, সমাজের এই প্রচণ্ড ধাবমানতাই সেই সংঘাত, যা ধীমান সংখ্যালঘুর নিদ্রাচরতা বন্ধ করে দিতে পারে; সময় যে আর নেই এই বোধ হয়ত সেই বিদ্যুৎস্পর্শ, যার বলে অব্যবহৃত মেধা তার মহৎ ক্ষুধা নিয়ে জেগে ওঠে; এবং ওই ক্ষুধার তীব্রতাই তাকে যথাযথ খাবার চেনায়।

এবং যতদিন পর্যন্ত না এই মেধার পুনরুজ্জীবন ঘটে, বারবারোসার মতো, ততদিন এইরকমই চলতে থাকবে: এক দিকে অবক্ষয়ের ধূলিপ্রপাত, অন্য দিকে তারই সাথে তাল রেখে সর্বনাশের আস্ফালক আগাম গুরুঢাক।

শেষ

॥ ৩৮ ॥

হাসপাতালে আকাশের চেহারাটা মেঘলা ছিল। এখানে এসে রামানন্দ দেখল মেঘের ভাবটা প্রায় বারো আনা কেটে গেছে, বিশেষ করে পশ্চিম দিকটা। সবে সূর্য অস্ত গেছে, ফলে ওদিক থেকে একটা গোলাপী হলদে আভা বাগানের ওপর, গাছের ওপর অক্ষয়ের টালির ছাদের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সাদা রঙের গরু চরছিল খালের ধারে। গরুটাকেও কেমন গোলাপী হলদে-হলদে দেখাচ্ছিল।

তেমনি রামানন্দর হাত হাতের তেলো পা, হাঁটিতে হাঁটিতে সে দেখছিল তার গায়ের চামড়াটাতেই সম্পূর্ণ অন্য রং ধরেছে। পরনের ধুতি শার্ট দুটোই ময়লা, তা না হলে জামা কাপড়েও এই হলদে গোলাপী আভা ফুটে উঠত।

সূর্যাস্তের এক একটা বিকেলে, যাকে আমরা গোধূলী বলি, আকাশে এমন আশ্চর্য রং ফুটে ওঠে, অবশ্য একটু মেঘটেঘ থাকা চাই, একেই বোধ করি কনে-দেখা আলো বলে, রামানন্দ চিন্তা করল।

কলকাতায় তো আর এই জিনিস দেখার সুযোগ হয় না, দেখবেই বা কখন, এখন ছটা সোওয়া ছটা হবে, পাঁচটা বাজতে না বাজতে পট পট রাস্তার আলো জ্বলতে আরম্ভ করে, গাছের আগায় ছাদের মাথায় রীতিমত রোদ থাকে, শীতের বিকেলে তো কথাই নেই। কাজেই কনে-দেখা আলো-টালোর বালাই সেখানে নেই।

অক্ষয়ের উঠোনের এপাশে মনসা গাছটার কাছে এসে রামানন্দ থমকে দাঁড়াল। হুঁ, এমন বিকেলে, এই মোহিনী আলো, মোটামুটি একটা সুন্দর ছবিই সে দেখবে আশা করেছিল, কিন্তু সেটা যে এত ভয়ংকর সুন্দর হবে তার ধারণা ছিল না।

গাছটাকে আড়াল করে উঠোনের দিকে চোখ রেখে চোরের মতন রামানন্দ দাঁড়িয়ে রইল। সে যত বেশি মুগ্ধ হচ্ছিল, তত ভয় পাচ্ছিল, তার কপাল ঘামছিল, একবার উত্তেজিত একবার রোমাঞ্চিত, কখনো তার মনে হচ্ছিল ক্লান্ত নিস্তেজ হয়ে পড়ছে সে, এখনি ভেঙে পড়বে।

শফী হলে তবু কথা ছিল। রংটা ময়লা। শরীরটা শুকনো। এই ছোঁড়ার গায়ের রং দুধে-আলতায়, দীপ্ত স্বাস্থ্য—তায় কিনা এখন একেবারে খালি খোলা গা। সবটা শরীর তরোয়ালের মতন ঝকমক করছিল। নাভি থেকে উরুর ওপর ভাগ পর্যন্ত একটুখানি অংশ মাত্র একটা সবুজ নীল ডোরাকাটা হাফ্-প্যান্টে ঢাকা, কাজেই শরীরে মেয়েলী লাবণ্য থাকা সত্ত্বেও সবল ঢেঙা দুটো পা, দুটো বলিষ্ঠ হাত, পুষ্ট ঘাড় গলা ও ঢালের মতন ছড়ান চওড়া বুকটা নিয়ে মনতাজকে পুরোপুরি জোয়ান পুরুষের মতনই দেখাচ্ছিল। এই জনাই না সেদিন মেলায় নন্দদুলাল হাসতে হাসতে বলেছিল বাঁশে বাঁশ কঞ্চিতে কঞ্চি—কথাটা রামানন্দ এখন অস্বীকার করতে পারল না। ছোঁড়ার সামনে মাজাঘষা নরম শরীরের মাধুরীকে একটা পুতুলের মতন ঠেকছে। খুব টেনেটুনে খোঁপা বেঁধেছে, চোখের কিনারে পুরু কাজলের প্রলেপ, পায়ে আলতা, আঁটসাঁট করে পরা একটা হলদে বুটিদার শাড়ি। শাড়িটা আর কোনো দিন দেখেনি রামানন্দ। হয়তো বাক্সে তোলা ছিল।

সে যাই হোক, দুজনে এ কী খেলা খেলছে! বোঝা যায় মুরগি জবাই করা হয়েছে। জিনিসটা কিন্তু এই বাড়িতে নতুন। আর কোনোদিন অক্ষয়ের বাড়িতে মুরগি কাটা হয়নি বা মুরগির মাংসও রান্না হয়নি। অন্তত রামানন্দ এসে দেখেনি। অক্ষয়ের কত মুরগি! অক্ষয় বলত, মুরগির মাংস তার ভাল লাগে না। খেতে কেমন ছিবড়ে ছিবড়ে লাগে। আসলে অবশ্য তা নয়। বাড়ির মুরগি বধ করতে তার প্রাণে লাগত। তা না হলে মুরগির মাংস যে তার, খুব ভাল না লাগুক, একেবারে অপছন্দের জিনিস তা নয়। অক্ষয়ের অসাক্ষাতে কথাটা কবে জানি মাধুরীর মুখে শুনেছে রামানন্দ।

তা মাধুরীর যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, অক্ষয়ের অনুপস্থিতিতে একটা মুরগি কেটে খাবে, সেটা খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, কিন্তু চোখের সামনের এই দৃশ্যটা!

বাঁ হাতে মুরগিটা ধরে রেখেছে মাধুরী। গলা বেয়ে টস টস করে রক্ত ঝরছে, বোঝা যায় এইমাত্র জবাই করা হয়েছে, একেবারে গলা আলাদা করা হয়নি, তাই হবে, কেননা মনতাজের হাতে যখন রক্তমাখা ছোরা রয়েছে। মনতাজ মুরগির গলা আলগা করবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই ছোরা কি অক্ষয়ের ঘরে ছিল? রামানন্দ সঠিক জানে না, কেননা কোনোদিন তার চোখে পড়েনি। হয়তো মাধুরীর বাক্স পেঁটরায় তোলা ছিল, বা এমনও হতে পারে ছোরাটা মনতাজের আমদানি।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ ভাবল, তা হলে এমনও হতে পারে; মুরগিও এ বাড়ির না, মনতাজই হয়তো রাজাবাজার কি শেয়ালদা থেকে কিনে এনেছে। যেমন কাল দিদির জন্য একটা বোয়াল মাছ নিয়ে এসেছিল। শফীর মতন দিদিকে এটা ওটা

এনে খাওয়াবার নেশা মনতাজকেও যে পেয়ে বসবে তাতে আর আশ্চর্য কি। দুদিনেই দিদির সঙ্গে তার যেমন ভাব জমে গেছে! তা না হয় মুরগি এনে খাওয়াল, কিন্তু দুটিতে এমন খিলখিল হাসছে কেন। মনতাজ যত হাসছে, মাধুরী তার দ্বিগুণ হাসছে। হাসির ধমকে অক্ষয়ের গিন্নীর ছিপছিপে দেহ থরথর করে কাঁপছে। হাসতে হাসতে বেঁকে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে, দেখলে মনে হবে সরু কোমরটা মট করে না ভেঙে যায়। ভাঙবে না যদিও। মেয়েদের শরীর বেতের মতন, রবারের মতন। মোহন পালের চায়ের দোকান না কোথাকার একটা আড্ডায় কে যেন কবে রস করে কথাটা বলেছিল, রামানন্দ সঠিক মনে করতে পারছে না, এবং এটাও সত্য, মনে করতে তেমন একটা আগ্রহও করছিল না সে, কেননা এখানে এই হাসিটা তার মোটেই ভাল লাগছিল না। কি নিয়ে হাসতে পারে, মুরগি জবাই করতে করতে এমন কি ব্যাপার ঘটল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে থেকে দুটিতে কেবল হেসেই চলেছে।

ভুরু কুঁচকে থেকে রামানন্দ অনর্গল ঘামছিল। তার ভাবনা ঠিকই হয়েছে। যেন পৃথিবীর সব কিছু ভুলে গিয়ে অক্ষয়ের স্ত্রী হাসছে, সুন্দর চেহারার ছেলেটা হাসছে। দুজনের একজন ভুলেও একবার এদিকে তাকাচ্ছে না। মনসা গাছের গুঁড়িটা খুব এমন মোটা না যে আড়ালে দাঁড়িয়েছে বলে রামানন্দকে একেবারেই দেখা যাবে না, মুখটা দেখা না যেতে পারে, কিন্তু একটু চোখ ফিরিয়ে এদিকে তাকালেই এটা অন্তত বোঝা যাবে একটা মানুষ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ ফেরাবে কে! মনতাজ যেমন তার দিদিকে দেখছিল আর হাসছিল তেমনি মাধুরীও কালো চোখের তারা নাচিয়ে নাচিয়ে মনতাজকে দেখে খিল খিল হাসছিল। কেবল উঠানের এধারের মনসা গাছ কেন, অন্য কোনোদিকেই তাদের চোখ ফেরাবার সময় ছিল না, ইচ্ছা ছিল না।

রামানন্দর ইচ্ছে হল একটু কেশে গলা খাঁকারি দিয়ে দুজনকে জানিয়ে দেয় এখানে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত। মাথার ওপর একটা স্তব্ধ আকাশ নিয়ে ফুটফুটে বিকেলের আলো গায়ে মুখে মেখে নিরিবিলি মাদার ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে উঠন্ত জোয়ান বয়সের একটি ছেলে ও এক যুবতী গিন্নী বেহুঁশ হয়ে যত খুশি হাসতে পারে, কিন্তু হাসির কারণটা মোটেই জানা যাচ্ছে না বলে তৃতীয় ব্যক্তির চোখে জিনিসটা খারাপ ঠেকতে পারে এটা ওদের বুঝতে দেবার জন্যই যেন রামানন্দর শব্দ করে কাশতে ইচ্ছে হল—প্রায় কেশে উঠেছিল সে, নিজেকে সংযত করল, তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল, চোখ গোল হয়ে গেল। সত্যি তো, এ কী খেলা খেলছে ওরা, মাধুরীর বাঁ হাতে কাটা মুরগিটা ঝুলছে, রক্তমাখা ডান হাতটা সে ফস করে কিনা মনতাজের গালে থুতনিতে বুলিয়ে দিল, মনতাজও কিছু চুপ করে থাকল না, ছুরির গায়ে লেগে থাকা মুরগির খানিকটা তাজা গরম রক্ত হাতের তেলোয় নিয়ে তক্ষুনি মাধুরীর মুখে ভুরুতে কপালে আচ্ছা করে লেপে দিল। দিয়ে হাসতে লাগল। খোঁপা নাচিয়ে কোমর দুলিয়ে মাধুরীও হাসছিল। রক্তমাখা হয়ে সুন্দর দুটো মুখ গোধূলীর সোনালী হলদে আলোয় যে রূপ ধরল দেখে রামানন্দর ভয় করতে লাগল। শফীর সঙ্গেও অক্ষয়ের বউকে অনেক হাসি-ঠাট্টা ইয়ারকি করতে দেখা গেছে, কিন্তু মনতাজের সঙ্গে আজকের রঙ্গরসের যেন কোনো তুলনাই হয় না। অথচ এইমাত্র রামানন্দ হাসপাতাল থেকে ফিরেছে, কাল শুক্রবার অক্ষয়ের অপারেশন হচ্ছে, কালকের তারিখের আর নড়চড় হয়নি, কাল সকাল সাড়ে নটায় অক্ষয়কে অপারেশন থিয়েটার নিয়ে যাওয়া হবে, সব ঠিকঠাক। অক্ষয়কে আজ আর তেমন হাসিখুশি দেখল না সে, বরং বেশ একটু বিষণ্ণ ক্লান্তই দেখল। অবশ্য নার্স তরলা বোস, নতুন নার্স সোহিনী তালুকদার এবং সোহিনীর আগে দিনের ডিউটিতে যে নার্সটি ছিল, সেই মোটা মেয়ে ফুলরেণু মজুমদারকে নিয়ে রামানন্দর সঙ্গে অন্যদিনের মতন দুচারটে রসের গল্প যে না করল তা নয়, তা হলেও অক্ষয়কে চিন্তিত বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। গল্পটল্প করার পর রামানন্দ উঠে আসবে, অক্ষয় তার হাতটা চেপে ধরল। 'শোনো মাস্টার, তুমি কিন্তু মাধুরীর কাছে জিনিসটা আর গোপন করবে না, আজ এখনি বাড়ি গিয়ে তাকে বলে দেবে কাল আমার অপারেশন হচ্ছে। আমি চিন্তা করে দেখলাম ওর কাছে এত বড় ব্যাপারটা চেপে রাখা ঠিক না। আর কাল, সকালের দিকে দরকার নেই, আমি তো তখন থিয়েটারেই থাকব, বেড-এ ফিরতে ফিরতে বেলা হবে—বরং বিকালের দিকে ওকে একবার হাসপাতালে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসো।'

বলতে কি, রামানন্দ আর একটা কথাও বলতে পারছিল না। তার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠেছিল। অপারেশনের কথা মাধুরীকে জানাবে কি জানাবে না, এই নিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে এই কদিনে অনেক কথাই হয়েছে, কিন্তু আজ যেমন করুণভাবে অক্ষয় তাকে বলল আর কোনোদিন

বলে নি। তা ছাড়া আজই অক্ষয়ের মুখে সে প্রথম শুনল : 'তুমি সংগে করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসবে।'

কাজেই সেই মুহূর্তে অক্ষয়ের চোখের দিকেও রামানন্দর তাকাতে সাহস হচ্ছিল না, তার যেন মনে হল হাসপাতালে এসে মাধুরীর কথা ভেবে অক্ষয়ের দু চোখ এই প্রথম ছলছল করছে।

'হুঁ, বলব, তা ছাড়া কাল ওকে সংগে করে নিয়েও আসব।' মুখটা দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখে সংক্ষেপে কথা দুটো সেরে রামানন্দ কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তাই তো, সবটা দায়িত্ব রামানন্দ নিজের ঘাড়ে তুলে রেখেছে। কেনো অর্থ হয় না। কান্নাকাটি করুক মাথার চুল ছিঁড়ুক, উপোস থাকুক—অপারেশনের কথাটা মাধুরীকে বলে রাখাই ভাল, বলা যায় কি—

তার পরের ব্যাপারটা রামানন্দ অবশ্য খুব বেশি একটা ভাবতে চাইল না, তবে রাস্তায় আসতে আসতে সে ঠিক করল বাড়ি গিয়ে এখনি অক্ষয়ের কথাটা মাধুরীকে জানিয়ে দেবে এবং কালই

মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসবে।

কিন্তু কাকে বলবে, কোথায় বলবে এসব কথা? মনসা গাছের এ পাশে দাঁড়িয়ে রামানন্দ বোকা হয়ে গেল। এত আনন্দ করছে অক্ষয়ের যুবতী গিন্নী, এই অবস্থায়—

তা ছাড়া আর একটা জরুরী কথাও, যাকে বলে জিভের ডগায় নিয়ে রামানন্দ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সোজা এখানে চলে এসেছে। তার পকেট আজ একেবারে ফাঁকা। ফাঁকা যাচ্ছে অবশ্য কদিন ধরেই। এবং এটা সে বেশি অনুভব করে, কেবল অনুভব কেন, রীতিমত অস্বস্তিবোধ করে বিকেলের দিকে, যত অন্ধকার হতে থাকে অস্বস্তিটা কেমন যেন একটা ভয়ের আকার দিতে শুরু করে। তবে গতকাল এবং পরশু সন্ধ্যেটা তার ভাল কেটেছে, কেবল ভাল কেন, খুব ভাল কেটেছে—ছোটলোক হলেও আলুর আড়তদার ননীমাধব পর্যাপ্ত পরিমাণ তাকে নেশা করিয়ে ছেড়েছে. পয়সার তো অভাব নেই, দুদিনই দু হাতে খরচটরচ করল। কিন্তু ঐ যে, দোকান থেকে বেরিয়ে কাল একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল—অবশ্য রামানন্দ যদি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আজ হাটতে হাটতে ওদিকে চলে যেত এবং চোখ কান বুজে বৈঠকখানার দোকানে ঢুকে পড়ত, দেখা হলে ননীমাধব নিশ্চয় তাকে ডাকত, সমাদর করে পাশেও রাখত এবং তক্ষনি নতুন পাইট আনিয়ে নিত। তা ছাড়া ওই দোকানে গেলে দেখা হতই, মাঝখানে কদিন নাকি ওখানে একদম আসত না আড়তদার, কাল বলছিল, এখন আবার রোজ আসছে, দোকানে বসে কিছুক্ষণ খেয়ে-টেয়ে ইন্দুর কাছে চলে যায়। আর এও সত্য, নেশার ঝোঁকের ঝগড়াঝাটি কেউ মনে রাখে না। সেদিন মেলার মাঠে নন্দলালের সঙ্গে এত বড় ঝগড়াটা যে হয়ে গেল, কই, কাল তো নন্দদুলাল সেসব কিছুই মনে রাখেনি। কী চমৎকার ব্যবহারই না করল। এবং লোকটা যে খাঁটি আর্টিস্ট এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বেশ্যা টাইপের মেয়ে হোক আর যাই হোক, রেখাকে তো সে বিয়ে করেছে, আইনত এখন তার স্ত্রী. কিন্তু কাল নন্দ কী কথাটা বলল? রেখার কাছ থেকে ইন্সপিরেশান নিন রামানন্দবাবু, দু রাত ওর সঙ্গে—মনটা খুব বড় না হলে ভেতরটা সাংঘাতিক উদার না হলে নিজের বউকে নিয়ে কেউ এমন কথা বলে! আর ঐ যে ছোটলোক আলুর বেপারী—একটা সাধারণ রক্ষিতাকে নিয়ে তো হাবুডুবু খাচ্ছে, একেবারে হাড়কাটার খাতায় নাম লেখান প্রস, তার ঘরে রামানন্দকে নিয়ে যাবার নামেই বেটার প্রাণ শুকিয়ে গেল—যাক গে, সেটা কিন্তু কথা না, তার সোহাগের জিনিস গলায় ঝুলিয়ে রাখুক কি পেটে বেঁধে রাখুক এই নিয়ে কিছু বলার নেই। গলা পর্যন্ত রামানন্দকে খাইয়ে দিয়েছিল এই যথেষ্ট—হুঁ, পকেটে একটা বাস ভাড়ার আধুলী ছাড়া আর কিছু নেই, কাজেই একবার সে ঠিক করেছিল বৈঠকখানার দোকানে ঢুকে আজ আবার আড়তদারের পয়সায় খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নেবে, কিন্তু ওই যে ওখানে রাস্তায় কলা নিয়ে লশা নিয়ে আনাজ নিয়ে বসে থাকে, ননীমাধবের পা-চাটা সব সাকরেদ—লোকগুলির চেহারা মনে হতেই রামানন্দর মনটা খিঁচড়ে গেল, না ননীমাধবের কাছে আর যাওয়া চলে না, আত্মসম্মান বলে একটা কথা আছে যে। এদিকে নন্দদুলালেরও আজ আর দেখা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। সব দিক চিন্তা করে রামানন্দ ঠিক করেছিল মাধুরীর কাছে দুটো টাকা চাইবে। কোনোদিন তো চায়নি, চাইলে হয়তো না বলবে না।

কিন্তু কার কাছে চাইবে, চাওয়ার সময় কোথায়।

অথচ দুটোই জরুরী কথা। অক্ষয়ের অপারেশন এবং তার নিজের মদ খাওয়ার জন্য দুটো টাকা ধার চাওয়া। দুটোর মধ্যে কোন্ কথাটা আগে বলবে রামানন্দ তখন পর্যন্ত অবশ্য ঠিক করে উঠতে পারছিল না—যাই হোক, অবস্থা বুঝে আগে ও পরে যেটা বলার সে ঠিকই বলত, কিন্তু সুন্দর চেহারার ওই ছোঁড়াকে নিয়ে যেমন ফুর্তির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে অক্ষয় সমাদ্দারের ঘরণী—

যেন বেগতিক দেখে রামানন্দ আর একবার গলা খাঁকারি দিতে চেষ্টা করল। মাধুরীর বুকের আঁচলটা টেনে ধরেছে মনতাজ, আঁচল দিয়ে ছোঁড়া তার মুখের রক্তটা মুছে ফেলতে চাইছিল, মাধুরী কিছুতেই কাপড়ে রক্ত মুছতে দেবে না, বরং পাল্টা সে চেষ্টা করছিল লতার মতন শরীরটা ঝুঁকিয়ে বাঁকিয়ে কোনোরকমে গলাটা একটু লম্বা করে দিয়ে মনতাজের পরনের ঐ একরত্তি হাফ-প্যাণ্টে তার নিজের রক্তমাখা মুখখানা একবার ঘষে দিতে পারে কিনা। বেপরোয়া হয়ে মনতাজও তা হতে দিতে চাইছিল না, ফলে দুটিতে ধস্তাধস্তি। এদিকে দুজনের খিলখিল হাসির বিরাম নেই। সত্যিকার ঝগড়া তো না, সেভাবে কিছু হাতাহাতি মারামারিও না—খেলা, সুতরাং খেলার খাতিরে—

রামানন্দ কেশে উঠবার আগেই মনতাজ হঠাৎ কেন জানি এদিকে চোখ ফেরাল, সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাজেই মাধুরীর দৃষ্টিও মনসাগাছের দিকে ঘুরে গেল। মুহূর্তের জন্য একটা চমক, স্তব্ধতা একটা অপ্রস্তুতের ভাব। তারপর সেটা চলে গেল। চমৎকার স্বাভাবিক চেহারা করে মাধুরী এদিকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াল।

'ওখানে এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে মাস্টার?'

'না না, আমি এই তো এলাম।'

'যা, মুখটা ধুয়ে ফেল গে।' মাধুরী মনতাজের দিকে ঘাড় ফেরায়। মনতাজ আর দাঁড়ায় না, ছুটে খালের দিকে চলে গেল। লজ্জায় ছোঁড়া মুখ তুলতে পারছিল না। রামানন্দ বুঝল মাধুরীর মতন চট করে স্বাভাবিক হতে আরও ক বছর লাগবে ছেলের।

'কি হল হাসপাতালে গিয়েছিলে?'

'হুঁ, এই তো হাসপাতাল থেকে

ফিরলাম।' এক-পা দু-পা করে রামানন্দ মাধুরীর কাছে সরে গেল।

'দাঁড়াও, এটা রেখে মুখ হাতটা ধুয়ে আসছি।' মুরগি নিয়ে মাধুরী ঘরে গিয়ে ঢুকল। বালতির শব্দ জলের শব্দ রামানন্দর কানে এল। বোঝা গেল মুখের রক্ত ধুয়ে ফেলছে অক্ষয়ের স্ত্রী।

বাইরে দাঁড়িয়ে রামানন্দ ভাবনায় পড়ল, আগে মদের টাকাটা চাইবে, না কি অক্ষয়ের অপারেশনের কথাটা বলবে।

থালের জলে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে মনতাজ ফিরে এল। মাধুরীও তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গায়ের আঁচলটা ঠিক করে নিয়েছে, চিরুনি বুলিয়ে চুলটা ঠিক করেছে, ধস্তাধস্তির দরুন তার চুল শাড়ি কোনোটাই ঠিক ছিল না।

'মা মুরগিটা চট করে ছুলে দে।' মনতাজকে বোঝা গেল তখনও ছোঁড়ার লজ্জা কাটছিল না, সহজভাবে মাস্টারের দিকে তাকাতে পারছিল না বলে কৌশল করে একটা কাজের অছিলা দেখিয়ে মাধুরী অন্যত্র সরিয়ে দিল। 'তারপর কি খবর হাসপাতালের শুনি?' রামানন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'হুঁ, এই তো এলাম।' রামানন্দ ঢোক গিলল। মাধুরীর মতন রামানন্দ কিন্তু তত দ্রুত সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছিল না। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের উঠোনটা দেখল, গাছের মাথাগুলি একবার দেখল। রোদটোদ মুছে গিয়ে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

'সে ভাল আছে?' মাধুরী প্রশ্ন করল।

'হুঁ', রামানন্দ এদিকে চোখ ফেরাল। [illegible] অক্ষয় ভাল আছে—কাল তার অপারেশন।'

'ও!' অস্ফুট একটা শব্দ করল মাধুরী, তারপর চুপ করে অন্ধকার আকাশটা দেখল। 'যাক গে, যদি অপারেশন করে অসুখটা সেরে যায় ভালই হবে।' একটু পরে রামানন্দর মুখের দিকে চোখ [illegible]মিয়ে মাধুরী যেন সামান্য হাসল। ফ্যাল-ফ্যাল করে রামানন্দ যুবতীর মুখটা দেখল। [illegible] মাধুরীকে চিনতে তার কষ্ট হল কি। [illegible]ক্ষয়ের অপারেশন হলে কি হবে না তখন[illegible] [illegible] ঠিক ছিল না, কিন্তু একদিন কথাটা [illegible]নার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন চেহারা হয়ে[illegible]ল [illegible]য়ের?

যাক গে, অবাক যেমন হল তেমনি মনে [illegible]ন একটু নিশ্চিন্তও হল রামানন্দ। তা [illegible]ল অক্ষয়ের স্ত্রী কান্নাকাটি করবে না। [illegible]খ ভার করে থেকে তিনদিন উপোসও করবে না। এটা কম কথা কি।

'কাল তোমাকে একবার হাসপাতালে [illegible]য়ে যাব।'

'না বাপু, ওটি হবে না। হাসপাতাল ভীষণ ঘেন্না করে আমার। শুনেছি কেবল ফিচ্ছিরি ওষুধবিষুদের গন্ধ আর রুগ্নের রুগীর হাউমাউ চিৎকার ওখানে। রোজ তুমি যাচ্ছ, কালও তুমিই যাবে।'

বাস, এর পর আর কথা চলে না। অক্ষয় তোমাকে দেখতে চাইছে কথাটা বলতে রামানন্দর মুখে আটকে গেল। চুপ থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার সে বাইরের অন্ধকার দেখল। আকাশে তারা ফুটেছে।

'দেখি, ওদিকে আবার রান্নাবান্না সব পড়ে আছে।' যেন এবার মাধুরী নিজের মনে কথা বলল। 'কত বড় একটা মুরগি নিয়ে এসেছে ছোঁড়া। দিদিকে মুরগির মাংস খাওয়াবে। আচ্ছা করে বকুনি লাগিয়েছি। রাত করে এসব মাংসটাংস সেদ্ধ করা আমার ভাল লাগে না।'

আবছা অন্ধকারেও রামানন্দ দেখল মাধুরী তার সুন্দর মুখটা কেমন বিকৃত করে ফেলেছে।

'তুমি তো আবার বেরোচ্ছ মাস্টার, তাই না?'

'হুঁ', রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'একটু বেরোবার ইচ্ছে আছে।'

'যাও, গলা পর্যন্ত ঢেলে এসো গে।' শরীরে একটা ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে মাধুরী ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। 'তুমিই সুখী, এই সংসারে তোমার মতন নিশ্চিন্দি পুরুষ কটা আছে।'

গলার স্বরে বিশ্রী ঝাঁজ ছিল অক্ষয়ের স্ত্রীর, তা হলেও কেমন যেন বেহায়ার মতন রামানন্দ বলল, 'শোনো একটা কথা আছে।'

'কি?' মাধুরী ঘাড় ফেরাল।

'আমাকে দুটো টাকা দেবে।'

'মদ খাবার জন্য তো!' আর একটা মোচড় দিয়ে মাধুরী ঘুরে দাঁড়াল।

একটু থমকে গেল রামানন্দ, তারপর অল্প শব্দ করে হাসল। 'ধার চাইছি, পরে ফিরিয়ে দেব।' অনুনয়ের গলায় বলল সে।

'কোথা থেকে তুমি ফিরিয়ে দেবে শুনি?' যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল অক্ষয়ের স্ত্রী। এক লাফে তার গলার স্বর এতটা চড়ে যাবে রামানন্দর [illegible] ছিল না। 'টাকা ধার করে শোধ [illegible] ক্ষমতা আছে তোমার যে আমার কাছে ধার চাইছ? চাল নেই চুলো নেই চাকরি নেই, এই অবস্থায় আর একটা মেয়েছেলের কাছে মদ খাবার জন্য হাত পাতছ—তোমার লজ্জা ঘেন্না বলে কি কিছুই নেই।'

রামানন্দ অধোবদন হয়ে রইল। তার দু কান গরম হয়ে গেছে।

'শোন মাস্টার, অনেকদিন ভেবেছি কথাটা তোমাকে বলব বলব। আর একটা মানুষ আজ কতদিন হাসপাতালে পড়ে আছে, তার জন্য জলের মতন টাকা খরচ হচ্ছে—এদিকে একটা বাড়তি মুখ হয়ে তুমি এখানে জুটেছ, আমার কিছু রাজার সংসার না যে চিরকাল তোমাকে এভাবে বসে বসে খাওয়াতে পারব—বন্ধুবান্ধব নিয়ে তুমি মদ খাচ্ছ ফুর্তি করছ—তোমার এসব ভাবনা নেই, নিজের জন্যই ভাবনা নেই তো আর একটা সংসারের অভাব অসুবিধার কথা আর ভাববে কি—কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এখন এখান থেকে সরে পড়াই ভাল।'

'যাব যাব, আর আমি এখানে বেশিদিন নেই।' যেন লজ্জা ঢাকতে, আগুনের হলকার মতন অপমানটা তাড়াতাড়ি চাপা

দিতে রামানন্দ 'একরকম করে হাসল। 'কাল অক্ষয়ের অপারেশনটা হয়ে যাক, ভালয় ভালয় সে বাড়ি ফিরুক, তারপর আমি চলে যাব—দু টাকা না পার, অন্তত দেড়টা টাকা আজ দাও—ওতেই আমার হয়ে যাবে, বাসেটাসে আর যাওয়া হবে না, হেঁটেই খালপোলের দোকানে চলে যাব, হেঁটে বাড়ি ফিরব।'

'ইস, কী নির্লজ্জ তুমি, একটা পুরুষ এমন হয় আমার জানা ছিল না।' গজগজ করতে করতে মাধুরী ঘরে ঢুকল, এক মিনিট পর একটা দু টাকার নোট এনে রামানন্দর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে তখনি আবার ঘরে ফিরে গেল।

যেন তার চোখে মুখে কেউ নাইট্রিক অ্যাসিড ছুঁড়ে দিয়েছে; চোখ মুখ জ্বালা করছিল, আর এই জ্বালা ভুলতেই চেহারাটা বিকৃত করে রামানন্দ ফ্যা ফ্যা করে হাসল। ঘরের পৈঠা ছেড়ে সে অন্ধকার উঠোনে নামল তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে মনসা-তলা পার হয়ে লবণ হ্রদের বালুর ওপর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। সাড়ে আটটায় মদের দোকান বন্ধ হয়ে যায়।

(ক্রমশ)

॥ ১৯ ॥

ভোটবাগান (২)

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোটবাগান মঠ প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুরাণ গিরি কিছুদিন সেখানে বসবাস করেন। এদিকে হেস্টিংস ভাবলেন, মঠ প্রতিষ্ঠার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়ায় তাশী লামা যেহেতু অনুগৃহীত বোধ করেছেন অতএব তাঁর মারফৎ বিলেতী পণ্যের বাজার হয়ত তিব্বত ছাড়িয়ে চীন অবধি প্রসারিত করা যেতে পারে। পুরাণ গিরির কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও পূত চরিত্রের জন্য তাশী লামার খ্যাতি তাবৎ বৌদ্ধজগতে দূরবিস্তৃত ছিল। এই কারণেই সমকালীন চীনসম্রাট বেশ কিছুদিন ধরে তাশী লামার কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ করবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। হেস্টিংস স্থির করলেন, পুরাণ গিরি ও বোগলেকে তাশী লামার সঙ্গে চীনে পাঠাবেন। কিন্তু চীন-সম্রাটের আগাম অনুমতি ছাড়া তাঁর রাজসভায় বোগলের মতো এক অনাহূত ফিরিঙ্গীর উপস্থিতি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে পারে ভেবে ঠিক হল, শুধু পুরাণ গিরিই তাশী লামার সঙ্গে চীনে যাবেন; পরে অবস্থা বুঝে বোগলকে পাঠানো হবে। পুরাণ গিরি সেই মতো তিব্বতে পৌঁছবার পর, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি, তাশী লামা পিকিং রওনা হন। এই ভ্রমণের এক মকপ্রদ বিবরণ পরবর্তীকালের জন্য রক্ষিত রয়েছে। পুরাণ গিরির লেখা সে রোজনামচাটির এক ইংরেজী অনুবাদ হেস্টিংস-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে অ্যালেকজাণ্ডার ডালি রিম্পল্ নামে জনৈক ইংরেজ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ওরিয়েণ্টাল রেপারটরি'তে তা প্রকাশ করেন। এই ভ্রমণ-

বৃত্তান্তের পথের ও চীন-সম্রাটের দরবারের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুরাণ গিরির পর্যবেক্ষণক্ষমতা ও রচনাকৌশল খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিকিং-এ পৌঁছবার আগেই চীন-সম্রাট এগিয়ে এসে আর এক শহরে তাশী লামাকে অভ্যর্থনা করেন ও সেখানকার বিরাট রাজপ্রাসাদেই দীক্ষাদান সম্পন্ন হয়। তারপর রাজধানীতে গিয়ে সম্মানিত অতিথিদের মহাসমারোহে অভিনন্দিত করা হয় দ্বিতীয়বার। যে বৃহৎ প্রাসাদে তাশী লামা ও পুরাণ গিরির থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, চীন-সম্রাট মাঝে-মধ্যে সেখানে আসতেন। এখানেই তাশী লামার মধ্যস্থতায়, পুরাণ গিরি চীন-সম্রাটের দেখা পান ও তাঁকে জানান যে, তিব্বতের দক্ষিণে সম্প্রতি এক ফিরিঙ্গী-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার আয়তন চীনের থেকে অনেক ছোট হলেও সামরিক শক্তি কম নয় এবং তার শাসনকর্তা, ওয়ারেন হেস্টিংস, চীন-সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিলাষী। পুরাণ গিরির দৌত্যে সন্তুষ্ট হয়ে চীন-সম্রাট ভারতবর্ষের ফিরিঙ্গী রাজার কাছে এক পত্র পাঠাবেন স্থির হল। কিন্তু এই সময়ে, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তাশী লামা পিকিংয়েই দেহরক্ষা করলেন। যে শববাহী-দল তাঁর মরদেহ তিব্বতে নিয়ে এল, পুরাণ গিরি তাঁদের সঙ্গেই রওনা হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়।
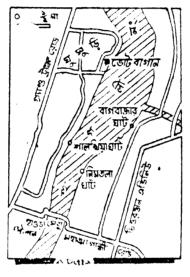
বছর তিনেকের মধ্যেই, লামারা এক শিশুর মধ্যে তাশী লামার পুনরাবির্ভাব কল্পনা করে তিব্বতী প্রথা অনুসারে তাঁকেই

ভোটবাগান মঠের মহাকাল মূর্তি

ধর্মগুরুর শূন্য গদিতে বসালেন। এই অভিষেক-উৎসব উপলক্ষে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস আবার পুরাণ গিরি ও স্যামুয়েল টার্নার নামে এক মিলিটারী অফিসারকে তিব্বতে পাঠান। শেষোক্ত ব্যক্তির লেখা ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এমব্যাসী টু টিবেট্' গ্রন্থে এই ভ্রমণের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে পুরাণ গিরির বারংবার সপ্রশংস উল্লেখ আছে। পুরাণ গিরি শেষ বার তিব্বতে যান ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখন হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে গেলেও পরবর্তী বড়লাট ম্যাকফার্সন এই দৌত্য-যাত্রায় সানন্দে সম্মতি দেন। কিছুদিন পরে দেশে ফিরে এসে পুরাণ গিরি ভোটবাগান মঠেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। পর পর দু'জন বড়লাটের স্নেহভাজন এই দশনামী সন্ন্যাসীটির তখন কলকাতার সরকারী মহলের উঁচুতলায় খুবই বোলবোলা। পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩) ও সার জন শোর-এর (১৭৯৩-৯৮) আমলেও এ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। তিব্বত ও চীন-সম্পর্কিত সব বিষয়েই তাঁর পরামর্শ নেওয়া হত এবং লাটসাহেবরাও তাঁর সংগে দেখা করবার জন্য মাঝে মধ্যে ভোটবাগানে যেতেন।

ব্রিটিশ মহলে যাঁর এত খ্যাতি তিব্বতী মহলেরও তিনি কম আস্থাভাজন ছিলেন না। প্রধানত তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্য ভোটবাগান অচিরেই তিব্বতী তীর্থযাত্রী ও বণিকদের এক বড় কেন্দ্রে পরিণত হল। লামারা তো সংবৎসর বহু সংখ্যায় আসতেনই আর
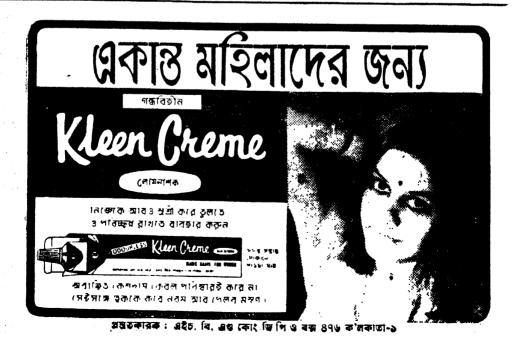
আসতেন নানা শ্রেণীর তিব্বতী ব্যবসায়ী, যাঁদের অগাধ বিশ্বাস ছিল পুরাণ গিরির উপর। এই আস্থাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে তাঁর বহুমুখী চরিত্রের বৈষয়িক দিকটিরও দেখা মেলে। ভারতের বাজারে তখন তিব্বতী সোনার প্রচুর চাহিদা ছিল এবং ভোটবাগান মঠেই এই চালানী সোনা প্রতি বৎসর আমদানি হত প্রচুর পরিমাণে। আরও আশ্চর্যের কথা, পুরাণ গিরি নিজেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন ও বিক্রি হওয়া অবধি গচ্ছিত সোনা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ভোটবাগান স্বর্ণভাণ্ডারের বিপুলতার কথা লোকমুখে প্রচারিত হতে দেরি হল না। ফলে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের এক রাতে ডাকাত পড়ল সেখানে। ঘুসুড়ি তখন আজকের মতো জনবহুল অঞ্চল ছিল না। সামান্য কিছু কর্মচারী ও সন্ন্যাসী নিয়ে বিরাট ডাকাতের দলকে বাধা দিতে গিয়ে পুরাণ গিরি সড়কির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হলেন। দস্যুরা সোনাদানা লুঠ করে চলে গেল। এ খবর কলকাতায় পেঁছিলে বড়লাট তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠালেন। কিন্তু প্রায় দেড় দিন বেঁচে থেকে, মাত্র ৫২ বছর বয়সে, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই অদ্ভুতকর্মা সন্ন্যাসীর জীবনদীপ নিবে গেল। পুরাণ গিরির প্রধান শিষ্য দলজিৎ গিরির কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে বড়লাট ডাকাতদের ধরবার জন্য যে কড়া হুকুম দিলেন তাতে দলের চারজন কিছুদিনের

ভোটবাগান মঠের তারা মূর্তি

মধ্যেই ধরা পড়ল। বিচারে তাদের ফাঁসির আদেশ হলে, ভোটবাগান মঠের প্রাঙ্গণেই তাবৎ জনতার সামনে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়।

দশনামী সম্প্রদায়ের মহন্তদের সমাহিত করবার ব্যাপারে এক বিশেষ রীতি প্রচলিত। কবরের মতো গর্ত খুঁড়ে তাঁদের মৃতদেহ উপবিষ্ট অবস্থায় সমাহিত করা হয়ে থাকে। পুরাণ গিরিকে যেখানে এভাবে সমাধিস্থ করা হয় সেখানে পরে এক মাঝারি গড়নের আটচালা-মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন তাঁর প্রধান শিষ্য দলজিৎ গিরি। এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন মৃত্যুর পরে জীবের শিবত্বপ্রাপ্তি ঘটে। সেজন্য এ জাতীয় সমাধিসৌধে তাঁরা সর্বদাই শিব-লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। এখানেও তাই করা হয়েছে। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ আছে তা পিতলের পাতের উপর খোদাই করা। এহেন ধাতব প্রতিষ্ঠাফলক পশ্চিমবঙ্গের খুব কম মন্দিরেই দেখেছি।

কয়েকবার সংস্কারের ফলে প্রধান মঠের আকারপ্রকারে আজ যে তিব্বতিয়ানার কোন ছাপ নেই সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু উপাসিত মূর্তিগুলি খাঁটি তিব্বতী বা চৈনিক। তিব্বত এবং চীন থেকে পুরাণ গিরিই সেগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। কারুকার্যের দিক থেকেও তারা অপূর্ব। প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণে ঢুকে তার বিপরীত প্রান্তে সমতল ছাদের যে দালান-মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায় সেখানে মূর্তিগুলি রক্ষিত। অতি বিশাল ও সুচারু কারুকার্যে মণ্ডিত পিতলের এক বৃহৎ সিংহাসনের উপর চতুর্মুখ শিব, তিনটি মহাকাল ও একটি দুর্গামূর্তি স্থাপিত। সব কটিই খুব ছোট আকারের —মাঝখানের মহাকাল মূর্তিটি সবচেয়ে বড় হলেও তার উচ্চতা ছ ইঞ্চির বেশী নয়। সিংহাসনের বাঁয়ে যে ধাতব তারা-মূর্তিটি আছে তার উচ্চতা প্রায় দু ফুট ও সেটির কারিগরি খুব উচ্চাঙ্গের। এসব দেবদেবীর নিত্য পূজা মঠের সামান্য আয় থেকেই চালানো হয়। সামান্য বলছি এই জন্য যে সাবেক কালের তিব্বতী সাহায্য লুপ্ত হয়েছে অনেকদিন। দশনামী সম্প্রদায়ের অন্যান্য কেন্দ্র—যেমন তারকেশ্বরে—সাধারণ বাঙালীর পৃষ্ঠপোষকতা যে পরিমাণে

নিবন্ধ ছোটবাগানে তা নয়। কেননা, সেখানকার বৌদ্ধ দেবদেবীরা শিবের মতো জনপ্রিয় দেবতা নন। ফলে প্রণামীর অংকটা তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া শিল্পপ্রসারের দরুন মঠের বহু জমি হস্তান্তরিত হয়েছে। সম্পত্তির মোকদ্দমায় রিসিভার নিযুক্ত হয়েছেন কয়েকবার। তাঁরাও, স্বার্থের খাতিরে, মঠের ভূসম্পত্তি বেহাত হওয়ার ব্যাপারে তলে তলে সাহায্য করেছেন মনে হয়। হেস্টিংসের দেওয়া ১৫০ বিঘা জমির মধ্যে সেজন্য ৫ বিঘাও এখন অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ। একদা ভারত-তিব্বত সংস্কৃতির মিলনস্থল এ কেন্দ্রটির এখন একেবারে অন্তিম দশা। সে দুর্গতি থেকে একে আর উদ্ধার করা যাবে বলে মনে হয় না।

(এ প্রবন্ধ রচনার জন্য পাঠ্যাংশে উল্লিখিত পুস্তকাদি ছাড়া ২৯-১২-৫৯ তারিখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত ভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী লিখিত 'ডিপ্লোম্যাট সাধু পুরাণগিরি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সাহায্য পেয়েছি।)

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

॥ ১৭ ॥

নতুন ধরনের জিনিসের উপর গগনেন্দ্রের এত আগ্রহ ছিল যে, নব-আবিষ্কৃত যা কিছু প্রথম পাওয়া যেত তাই তিনি সংগ্রহ করতেন। চোঙা-রেকর্ড ফোনোগ্রাফ কিনলেন। এ দিয়ে নিজেদের গলার স্বর, কথাবার্তা, গান চোঙার গায়ে তোলা যেত। তুলতেন আর শুনতেন। সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতেন। তারপর উঠল কুকুর মার্কা গ্রামোফোন—হিজ মাস্টারস ভয়েস। একদিন এক গাড়ির মাথায় বসিয়ে প্রকাণ্ড চোঙাসহ গ্রামোফোন নিয়ে এলেন। তার সঙ্গে চ্যাপ্টা গোল গোল রেকর্ড। রেকর্ড বাজাতেন আর ছোটদের বলতেন কলের ভিতর ছোট্টো সব বামন আছে, তারাই গান গাইছে। ছোটরা তাই বিশ্বাস করত। অনুবীক্ষণ যন্ত্র যখন উদ্ভাবিত হল জগদীশচন্দ্র বসুকে বলে সেই যন্ত্র আনালেন। তারপর যখন দূরবীন বেরুল—দূরবীন।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র কেনবার আগে গগনের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে জানা-শোনা হয়েছিল, তাঁর নাম ডাঃ রস্। তিনি ছিলেন একজন বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর তাঁর মস্ত গুণ ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি সরস করে তিনি বক্তৃতা দিতে পারতেন, বুঝিয়ে দিতে পারতেন। গগন ঠিক করলেন এঁকে বাড়িতে ডাকতে হবে। তারার গল্প শুনতে হবে বেশ জমিয়ে বসে। রস্ সায়েব এলেন ম্যাজিক লণ্ঠন আর স্লাইড নিয়ে। নীচেকার বড় হল অন্ধকার করে বক্তৃতার জায়গা হল। বাড়ির সবাইকে বলা হল। মেয়ে জামাইদের খবর দেওয়া হল। অন্যান্য আত্মীয়েরা এলেন। সায়েব সত্যিই বললেন অতি সরস করে আকাশের তারার বিষয়ে, নীহারিকার বিষয়ে, সূর্য-মণ্ডল, চন্দ্রের কলা, গ্রহণ, জোয়ার ভাঁটা সব গল্পের মতো। স্লাইড ফেলে শনিগ্রহের চারিপাশে ঘেরা আংটিটি দেখানো হল, ছায়াপথ বড় করে দেখানো হল, গ্রহ আর তারকার তফাৎ বোঝানো হল। বেশ ক-দিন ধরে বক্তৃতা হল অতি মনোজ্ঞ। সবারই ভালো লাগল খুব।

এই রস সায়েবের কাছে আরো একটি মূল্যবান যন্ত্র ছিল। সেটি একটি রেডিয়াম যন্ত্র। ক-টাকা ফী নিয়ে এটিও তিনি দেখতে দিতেন। এটিতে চোখ দিলে দেখা যেত রেডিয়ামের টুকরো থেকে অবিরত রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার পিছনে কোন শক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে না, তার ক্ষয়ও হচ্ছে না। সেই প্রথম রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছে কাজেই সে-ও একটা দেখবার মতো জিনিস।

গোলবাগানের অপর একটি দৃশ্য। জাপানী ধরনের দোলনা, বসলেই তক্তাটা মাটিতে ঠেকেই লাফিয়ে ওঠে

কিন্তু এই সব দেখে গগন বললেন, ছবি দেখে স্লাইড দেখে কি হবে, চোখে দেখতে হবে আসল জিনিস। খোঁজা কোথায় টেলিস্কোপ পাওয়া যায়। টেলিস্কোপ তখন সবে বেরিয়েছে বাজারে। খুঁজে পেতে ছোট বড় দু-তিনটে দূরবীন যন্ত্র এনে ফেললেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে। তারপর দূরবীন পাতা হল। তারা দেখা হতে লাগল। ছায়া ফেলে সূর্যের কলঙ্ক দেখা হল। শেষ অবধি আংটা পরা শনি গ্রহকেও দেখা গেল টেলিস্কোপের কাচের মধ্যে দিয়ে।

এর ফলে গগনের এমনই উৎসাহ লেগে গেল যে বইয়ের দোকানে গিয়ে অ্যাসট্রনমির বই কিনতে লাগলেন। আকাশের চার্ট কিনলেন। মস্ত একটা প্লোব কিনলেন—পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ কেমন করে ঘোরে তাই থেকে বোঝা যেত। সূর্যমণ্ডলীর একটা মণ্ডল কিনলেন। পড়াশোনা চলতে লাগল রীতিমত।

এই সময় আরো একটি চমকপ্রদ নতুন জিনিসের আবির্ভাব ঘটে গগনেন্দ্রর প্রসাদে। জগদীশচন্দ্র বসু সে সময় বেতার নিয়ে পরীক্ষা করছেন গবেষণা করছেন। গগনেন্দ্র ধরলেন জগদীশচন্দ্রকে, তাঁকেও একটা এই যন্ত্র করে দিতে হবে। এঁদের সকলকেই অত্যন্ত স্নেহ করতেন জগদীশ। তিনি গগনের জন্যে করে দিলেন এক বেতার যন্ত্র। সে কী উত্তেজনা। গগন এ ঘর থেকে কল ঘোরান, ও ঘরের কলে ঘণ্টা বাজে অথচ পরস্পরকে যুক্ত করা কোনো তার নেই। মার্কোনীর বেতার যন্ত্র। এখনকার দিনের বেতারে বোতাম ঘুরিয়ে দূরাগত গান যন্ত্রে শুনে লোকে যে আনন্দ পায়, সেদিন গগন পাশের ঘরে বেতারে ঘণ্টা বাজিয়ে তার চেয়ে শতগুণ পুলকিত হয়েছিলেন।

কলকাতায় যখন প্রথম বিজলি এলো, প্রথম যাঁরা বাড়িতে বিজলি নেন তাঁর মধ্যে ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। এ-ও নতুন বলে। গ্যাস তুলে দিয়ে বাড়িতে বিজলির লাইন বসলো। এর বহু বহু বৎসর পরে যখন এঁদের জমিদারি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে যায় তখন ম্যানেজার বাড়ির কাগজপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর কাছে এঁদের একটি টাকাও গচ্ছিত ছিল না দেখে। কোম্পানীর কাছ থেকে প্রথম ক্ষেপে যাঁরা কারেন্ট নেন তাঁদের যে কিছুই গচ্ছিত দিতে হয়নি একথা ম্যানেজারের জানবার কথা নয়—তিনি যে পরের যুগের মানুষ।

গগনের একবার কুকুর পোষার শখ হয়েছিল। চেনাশোনাদের বাড়িতে গিয়ে দেখতেন তাঁরা পোষেন বড় বড় লোমওয়ালা কান ঝোলা কুকুর, ঝালরের মত তাদের ল্যাজ। গগনেন্দ্র কিন্তু চান নতুন রকম কুকুর পুষতে। জাপানীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, তাদের একদিন জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা তোমরা তো বনসাই কর, বামন গাছ। গাছকে বেঁটে করে দাও, ছোট্ট করে দাও, তোমাদের দেশে ছোট্ট পুতুলের মত কুকুর নেই?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব—আছে বইকি। কিন্তু কে এনে দেবে সেই কুকুর? তা ছাড়া সে কুকুর এ দেশে বাঁচবে কিনা তাও আমরা জানি না।

গগন বললেন—সে আমি দেখব। মোট-কথা জাপান দেশের বনসাইয়ের মতো গুড়িয়া কুকুর আমার চাই।

বলে তিনি খোঁজা শুরু করে দিলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন রুটলেজ কোং জন্তু-জানোয়ার আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করে। হাতি, বাঘ, কুমীর, সাপ, বাঁদর এ দেশ থেকে চালান দেয় পশ্চিম দেশে। সে দেশ থেকে ঘোড়া রপ্তানি করে এ দেশে। আফ্রিকা থেকে জেব্রা, স্বর্গের পাখি আমদানি করে আমাদের চিড়িয়াখানার জন্য। চলে গেলেন রুটলেজের বাড়ি। তাঁদের বললেন কি দরকার!

তারা বলল—জাপান থেকে মিনিয়েচার কুকুর আনিয়ে দিতে পারবে তারা ঠিক। বাঁচা না বাঁচা ঠাকুর সায়েবের কপাল।

তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল গগন বেড়িয়ে ফিরলেন তাঁর ঘোড়ার গাড়ি করে। গাড়ির মাথায় প্রকাণ্ড এক বাক্স। সবাই উৎসুক, অত বড় বাক্সয় করে কি নিয়ে এলেন! সবাই ঝুঁকে এল। দেখা গেল বাক্সের

My dear Cozy,

This enclosed bill of [illegible] will intimate you. Please keep it or send it to the Victoria Memorial if you like.

I hope you are doing well. You had very [illegible] time the other day.

Yours Affly
G. Tagore

গগনেন্দ্রর খুড়তুতো ভাই, যাঁকে ঠাট্টার ছলে "কজ" বলে ডাকতেন, তাঁর কাছে লেখা একটি চিঠি (কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

দুই ফোকর দিয়ে দু জোড়া চোখ আর নাক উঁকি দিচ্ছে। বাক্স নামাতে তার মধ্যে থেকে বেরুল এক-রত্তি দুটি জাপানি কুকুর।

গগন পেলেন তাঁর নতুন জাতের কুকুর, যা আর কারো নেই। এখন এদের বাঁচাতে হবে। যত্ন দরকার, চোখে চোখে রাখা দরকার। কুকুরের তদ্বিরের জন্যে বহাল হল অরুণ মেথর। তাকে আর অন্য কোন কাজ দেওয়া হল না। কুকুর দুটোর নাম দেওয়া হল চিন। কুকুরদের জন্যে আলাদা রান্নার ব্যবস্থা হল। সকালবেলা গগনের সঙ্গে ব্রেক-ফাস্টের সময় ডিম রুটি পেত। দুপুরে রান্না হত মাংস আর পোলাও। এর উপর আবার একজন বয় নিযুক্ত হল কুকুরদের সঙ্গ দেবার জন্যে। অরুণ মেথর কুকুরদের নাওয়াতো ধোওয়াতো পরিষ্কার করত। রান্নাবাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে কুকুরদের খাওয়াতো। আর নেপালী বয় তাদের সিঁড়ির ধারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিত আর সারাদিন পাহারা দিত। খুদে কুকুর হলে আর সকলে যেমন করে কোলে নিয়ে আদর করে, গগন কিন্তু কুকুরকে কখনও কোলে করেননি। যখন বারান্দায় বসে থাকতেন নেপালী বয় কখনও কখনও চিনদের এনে ছেড়ে দিত তাঁর পায়ের কাছে। কুকুররা মাথা নীচু করে চুপটি করে বসে থাকত সেখানে। বাড়ির ছেলেদের কুকুরের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হত না। তারা কুকুরের খাওয়ার আর আদরের বহর দেখে হিংসেয় জ্বলে যেত। কুকুরের খাবার যখন নিয়ে যাওয়া হত, তার গন্ধে বাড়ির ছেলেদের জিভে জল ঝরত।

চিন-যুগল খুব বেশীদিন বাঁচেনি। এরা মরা যাবার পর গগন আর কোনো কুকুর পুষেছিলেন বলে শোনা যায়নি। তবে একবার খেলনার এরোপ্লেন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে কেমন করে এরোপ্লেনটা কুকুর হয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে মাথা নীচু করে বসেছিল সেই গল্প এইবার বলছি। তাঁর হয়তো সে সময় চিন্ কুকুরদের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

গগনের খেলনা কেনার শখ ছিল। ছেলে-মেয়েদের খেলনা দিতে ভালবাসতেন। নিজের ছেলেমেয়েদের ভাইদের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে খেলনা দিতেন। ছেলেরা প্রায় সবাই একরকম খেলনা পেত, মেয়েরাও একরকম। গগনেন্দ্র, কনক, সুনন্দিনী, পূর্ণিমা, অলীন্দ্র, সুবীন্দ্র, বড় পুটি, ছোট পুটি, দেবেন্দ্র উমা, অশোক, করুণা, শোভা, প্রভাতী, রতন, অনুভা, কালিদাস, ছেলে-মেয়ে বড় কম ছিল না। সবার একরকম খেলনা চাই। নইলে সবাই বলবে এরটা ভাল হল।

একবার ইংরেজী খেলা নাইন পিনস্ এনেছিলেন। ছেলেপিলেদের খেলার নিয়ম শিখিয়ে দিতে হবে। নাইন পিনসের লাঠি-গুলি বারান্দায় সাজিয়ে দিয়ে খেলা শেখাতে গিয়ে এমনই উৎসাহ লাগল যে নিজেরাই তিন ভাইয়ে মেতে গেলেন খেলায়।

একবার এনেছিলেন খেলনার প্রজাপতি। দম দিলে ডানা মেলে আকাশে উড়ত। ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেকে একটা করে প্রজাপতি পেয়েছিল। সবাই একসঙ্গে বাগানে নেমে যখন নিজের নিজের প্রজাপতি আকাশে উড়িয়েছিল, সে এক দৃশ্য হয়েছিল।

ট্রাই-সাইকেল আমাদের পুরোনো হয়ে গেছে বাই-সাইকেল চড়তে সাহসও হয় না হুকুমও নেই, সেই সময় গগনেন্দ্র কোথা থেকে জানি না নিয়ে এলেন কতকগুলো স্কুটার। তখনকার দিনে স্কুটার কেউ দেখেনি। এক-পা স্কুটারে রেখে অন্য পা মাঝে মাঝে মাটিতে ধাক্কা মেরে যেভাবে স্কুটার নিয়ে ছোটা যায় তা সাইকেল চালানোর চেয়ে কম উদ্দীপনাপূর্ণ নয়। আমরা এক-একটি স্কুটার নিয়ে গোল বাগানের বাঁধানো গোল রাস্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। চাকার শব্দে গোল বাগান মুখর হয়ে উঠল।

একবার যখন এই রকম অনেক খেলনা আমাদের হয়েছে, সেই সব খেলনা সাজিয়ে আমরা একটা মেলা করেছিলাম। সেবার উত্তরবঙ্গ বন্যায় ভেসে গেছে। চারদিকে তার দুঃখ কষ্ট। দেশের নানা জায়গায় দুঃস্থদের সাহায্যের জন্যে চাঁদা তোলা হচ্ছে। আমরা ভেবেছিলুম আমাদের যা খেলনাপাতি আছে বেচে দিয়ে আশ্রয়হীনদের জন্য কিছু টাকা তুলে দেব। ছোটদের পত্রিকা মৌচাক থেকে একটা ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। সেই ভাণ্ডারে টাকাটা দেব বলে মেলার নাম দিয়েছিলুম মৌচাক মেলা।

মন্দ টাকা তুলিনি আমরা সেবারে। আমাদের পুরোনো আধভাঙা খেলনা তো সব বেচেই দিয়ে-ছিলুম তাছাড়া ছবির পোস্টকার্ড সাজিয়েছিলুম অনেকগুলি। সেগুলি আমাদের কাঁচা হাতের আঁকা হিজিবিজি কিন্তু দাদা মশায় কিংবা বড় দাদা মশায়ের তুলি দু-এক টানে চমৎকার ছবিতে দাঁড়িয়ে যেত। অনেকেই কিনতেন সেগুলি। সে সময় পাশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গলের রিহার্সাল নিতেন প্রতি-দিন আর অনেকে তাই শুনতে আসতেন। আমরা এদের ধরে নিয়ে আসতুম আমাদের মেলায়। খদ্দেরের অভাব হত না। রবীন্দ্র-নাথও একবার এসেছিলেন আমাদের মেলায়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার ছিলেন গগনেন্দ্র। তিনি যেমন আমাদের খেলনা দিতেন তেমনি কিনতেনও। স্কুটারগুলি তখন সবে আমরা পেয়েছি। বন্যাত্রাণের আবেগে সেগুলিও আমরা দোকানে সাজিয়ে-

নূতন মিল্‌স্
ধুরন্ধর ৭টি মিলের একটি
লালভাই গ্রুপ-এর
কাপড়

ছিলুম বিক্রির জন্যে। খবর পেয়ে গগনেন্দ্র এসে সব স্কুটার কিনে নিয়ে গেলেন। মৌচাক মেলা ভেঙে যাবার পর এগুলি আমরা ফেরত পেয়েছিলুম।

এরপর গগন একদিন কোথা থেকে দুটি মডেল এরোপ্লেন কিনে নিয়ে এলেন। দম দিয়ে ছেড়ে দিলে সেগুলি উড়ে বেড়াতো আমাদের বাগানে। কিন্তু বাগান তো আর খোলা মাঠ নয়; বাগানে ছিল প্রচুর গাছ-পালা। কাজেই গাছের ডালে এরোপ্লেনের লাগতো ধাক্কা। বেশী জোরে ধাক্কা লাগলে ভেঙে পড়ে যেত। ভাঙা এরোপ্লেন কুড়িয়ে নিয়ে গগন গেলেন যে দোকানে কিনেছিলেন সেখানে। বললেন—এগুলো সারিয়ে দিতে পারবেন।

দোকানদার বলল—সারিয়ে কি হবে? নতুন কিনুন। আমরা সারাতে জানি না।

কিন্তু গগন অত সহজে ছাড়লেন না। ভাঙা এরোপ্লেনগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদের বিভিন্ন অংশগুলি সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে মনে। তিনি এবার শেষ অবধি দেখতে চান। নানা দোকান ঘুরে হালকা কাঠের কাঠি, মজবুত তার, সরু অথচ শক্ত বাঁধনের দড়ি, শিরিসের আঠা, পার্চমেন্ট কাগজ, ছুরি কাঁচি বাটালি করাত এমনি নানা জিনিস কিনে বাড়ি এলেন। তারপর নিজেই অতি যত্নে ভাঙা এরোপ্লেন দুটিকে সারালেন। আকাশে আবার উড়লো তারা। কিন্তু এই এরোপ্লেন সারাতে গিয়ে অন্য ধরনের এরোপ্লেনের চিন্তাও তাঁর মাথায় এলো। আরো কাঠ, আর কাগজ আঠা কিনে নিয়ে এলেন আর নিজের মতলব মাফিক এরোপ্লেন বানাতে লাগলেন। তাদের কোনোটা উড়লো, কোনোটা উড়ল না, গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল। এই করতে করতে শেষে এক ধরনের গ্লাইডার করা শিখে গেলেন। গ্লাইডারে পাক দিয়ে দম দিতে হত না; ছুঁড়ে দিলেই উড়ে থাকতো, হাওয়া থাকলে তো কথাই নেই, আর হাল্কা হাওয়ার দরুন গাছের ডালে ধাক্কা লাগলেও সহজে ভাঙতো না।
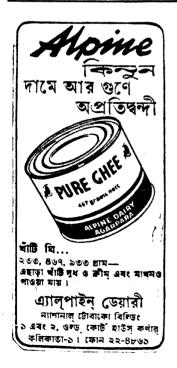
এই গ্লাইডার নিয়ে একবার এক কাণ্ড হয়। এই রকম একটা গ্লাইডার করে এক-দিন উড়িয়েছেন। তখন সন্ধে হয় হয়। পূব দিক থেকে একটা হাওয়া উঠেছে। যেই না গ্লাইডার ছাড়া অমনি কোথা থেকে এক দমকা বাতাস এসে সেটাকে পাখির মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। কেবলই উপর দিকে উঠতে লাগল। শেষে আমাদের মস্ত উঁচু আমগাছটাকে ছাড়িয়ে গেল। একেবারে মগ ডালে গিয়ে বসে গেল এরোপ্লেনটা। তখন কি করে তাকে নামানো যায় সেই হল এক মস্ত সমস্যা। গাছে উঠে চাকরেরা সেটাকে লগি দিয়ে নামাতে চেষ্টা করলে, পারল না। গগনই বারণ করে দিলেন—খোঁচা দিসনে, ছিঁড়ে যাবে।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। রয়ে গেল সেটা সেখানে।

সারা রাতই রয়ে গেল। কেউ জানে না কিছু, সকালবেলা গগন দক্ষিণের বারান্দায় এসে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসতে যাবেন দেখেন গ্লাইডারটা চেয়ারের পায়ের কাছে পায়ের দিকে মুখ করে শুয়ে রয়েছে। কি আশ্চর্য ব্যাপার। একে ডাকেন, ওকে ডাকেন। বলেন—দেখ দেখ দুষ্টু ছেলেটা ঘরে ফিরে এসেছে। পায়ের কাছে শুয়ে আছে যেন কুকুর ছানাটির মতো।

ঝড় দাদা মশায়ের ঘুড়ি দু-এক টানে চমৎকার ছবিতে দাঁড়িয়ে যেত

সবাই দেখে অবাক। হয়েছিল কি, রাতে একটা ঝড় হয়েছিল। সেই ঝড়ের দাপটে গাছের মাথা থেকে আলগা হয়ে গ্লাইডার আবার আকাশ পথে ঝড়ের তোড়ে ঘরে ফিরে এসেছে। আর শুয়ে আছে গগনের পায়ের কাছে ঠিক যেন চিনা কুকুরের মতো।

(ক্রমশ)

দূরে হটো প্রাচীন

তিবাদে মুখর পাশ্চাত্ত্য কিশোর সমাজ বহু দিনের আচরিত সামাজিক প্রথাকে াশ্য উপেক্ষায় জর্জরিত করে তুলেছেন। উ বা তাতে দুঃখ পান, কেউ বা সমর্থন ন লেও সায় দেন, কারণ তা ভিন্ন অন ায় নেই। মা-বাবার দল হাস্যকরভাবে ুণ দলের মনোরঞ্জন করেন আবার কখনও দূরে সরে থাকেন। পাশ্চত্তোর এই প্রপঞ্চ ানেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন সা নেই। প্রতিবাদ কিশোর সমাজে নতুন ারও নয়, তবু জোর করে একথা বলতে র এমন দ্বন্দ্ব আগে কোথাও ছিল না। যেন দুই যুগের মুখোমুখি যুদ্ধ। যে ই সে যুদ্ধ ধারণ করুক অভিযান মূলত ধর্মের বৈষম্য উদ্দেশ্য করে।

বৈষম্যের রাজনৈতিক প্রকাশ সম্বন্ধে লোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। সে খবে জ বিষয়। বৈষম্যের সামাজিক প্রকাশটাই বার ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। এই ত্রো দন এক বিদেশিনীর লেখায় প্রাচীন ও ীনের সংঘর্ষ সম্বন্ধে একটি উদ্ধৃতি লাম :

Come mothers and fathers
throughout the land
on't criticize what you can't
understand
Your sons and your daughters
are beyond your command
he old road is rapidly
changing
lease get out of the new one
if you can't lend a hand.

অল্প কথায় মানে দাঁড়ায়, "বাবা-মা সব েনা, যা বোঝ না তার সমালোচনা কারো তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে তোমার শ মানবে না আর। প্রাচীন পথ মোড় াচ্ছে, নতুন পথের সাথী না হও যদি, ট তবে ছাড়।" কবিটি কিশোর বিদ্রোহের সম্পাদক। নাম তার বব ডাইলান। কিন্তু ছাড়া তো সহজ কথা নয়। প্রাচীন ও ীন একই পথের ভিন্ন অংশ যে। আজ বীন কাল সেই প্রবীণ। পাশ্চত্তোর নবীন বিদ্রোহকে আপসে মিটমাট সপক্ষে সারা সমাজ। যে মা জানে বিপথে ছুটেছে সে মাও শাসন করবার রাখেন না। সাবধানে, আতঙ্কে কাল া। অঘটন ঘটিয়ে তাকে বিপদে না নষ্ট হলো। ছেলের বেলায় তো কথাই লণ্ডনে দেখেছি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের মা গতর খেটে পয়সা কামাচ্ছে। বাপের নেই। কিশোরী কন্যা তার ছোকরা কে বগলে করে একই গৃহে বাস । মায়ের সমস্যা সব কটা মুখের আহার করা। কন্যা সন্তান সম্ভাবনার পাকে না ফেললেই তিনি খুশী মনে সে করবেন। তাদের আর সুখ স্বার্থের বাধা দেবার সাহস মায়ের নেই। এ যে

নতুন পথ! বিপরীতধর্মী সংস্কৃতি।

দূরে থেকে দর্শক হিসাবে দেখতে এক রকম। চিন্তা করে চর্বিতচর্বণ করে মত প্রকাশ করতেও বেশ। কিন্তু ভেবে দেখুন বাপ-মাকে দূর হটিয়ে এমন সব ব্যবস্থার মুখোমুখি ছবি দেখতে কেমন লাগে? ও

মেয়েরা সুযোগ পেলে আত্মত্যাগের জন্য সদাই প্রস্তুত। তাদের মনের সাধ মিটিয়ে নেবার পরম প্রিয় পথ এটি—বলেছিলেন সমার সেট মম্।

মেয়েদের মধ্যে যা অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত তাই আমাদের যুগ যুগ ধরে টেনে নিয়ে চলেছে—বলেছিলেন গেটে। কিন্তু কটু মন্তব্য করতেও কারও বাধেনি। হয়তো তার সংখ্যাই বেশী। সেক্সপীয়রের অনেক উক্তি সর্বজনবিদিত। মেয়েদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে বহুবার বহু কিছু বলেছেন। যেমন, "Constant you are, But you are a woman—অবিচলিত একনিষ্ঠ তুমি। তবু তুমি নারী। বাইবেলও শুনুন কি বলেন—a Continued dropping in a very rainy day and a Contentious woman are alike—বর্ষমুখর বাদল দিনের অবিশ্রান্ত বারিধারার মত কলহপ্রিয় কামিনীর বিরামহীন বিতণ্ডা।

পোপ বলেছিলেন, পুরুষ কেউ বা কাজ করে কেউ বা মধু লুটে বেড়ায়। মেয়েরা প্রত্যেকেই অন্তরের অন্দরে বহুগামিনী বহুচারিণী।

দেশে তো তবু বুড়োবুড়ির পিঁজরাপোল আছে। অকর্মণ্য গরু ঘোড়ার মত তাদের আহরণ দু-মুঠো মিলবে। পয়সা থাকলে তো কথাই নেই। ভাল পানাহার, জমকের জামা-কাপড় সবই মিলবে। আমাদের বেলায় কি হবে! সবাই প্রতিবাদের শোভাযাত্রায় এগিয়ে যাবে। সমাজের বুড়োবুড়ির দল হাঁ করে থাকবে। প্রতিবাদের কোন সমর্থন তাদের জন্য মিলবে না। নতুন পথের মোড়ে মাথা ঠুকে মরবে। ডুকরে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। অচেনা পথের আগাছায় আটকে যাবে তাদের চিরবাস। পাথরে আঘাত লেগে রক্ত ঝরে যাবে পায়ে। তবু তাদের প্রাচীনত্বই মস্ত অপরাধ হয়ে নতুনকে অভিনন্দন করবে। এতটুকু বাঁচবার স্বার্থ যে তাদেরও আছে।

পাশ্চাত্ত্য সমাজ ঠিক তাই করছে। আমাদের দুয়ারে বৈষম্যের মৃদু করাঘাত শোনা যাচ্ছে। জানি না ভারতীয় সংস্কৃতির অজানা ইশারায় বৈষম্যের তীব্রতা হার মানবে কি না। বয়সকে মান দিয়ে যে সমাজ মাথায় করে রেখেছিল তার প্রতি গৃহকোণে নতুন পথের তাড়নায় পুঞ্জীভূত বেদনা হয়তো হাহাকার করবে। হয়তো বা করবে না। অনেকটাই নির্ভর করে অনুকরণের ঝড় বইবে কোন দিকে, তীব্র গতিবেগ ধারণ করার শক্তি আমাদের সমাজের কতটা আছে তার উপর। আপনি আমি এই তুমুল তুফানের মাঝখানে আছি। সত্যের উপলব্ধি আমাদের আশ্রয় দিক।

টুকিটাকি

প্রসাধনপর্বের প্রথম প্রয়োজন ভালো আলো। দিনের আলো যথেষ্ট আসে এমন জায়গায় আপনার প্রসাধন ও সাজসজ্জার আয়না-মেজ বসাবেন। রাতের আলোর বেলায় দেখবেন যেন মুখে ছায়া না পড়ে। নিজের মাথার উপর আলো থাকলে মুখে বেশী রকম ছায়া হয়।

ললাটে অপেক্ষাকৃত হালকা প্রসাধনী ব্যবহার করবেন তাতে মুখের ভারীভাব কম দেখাবে।

যাঁরা রুজ অর্থাৎ লাল আভা গালে লাগান তাঁরা চোখ ও গালের মধ্যবর্তী অস্থিকেই সীমানা ধরবেন। তার উপরে রক্তিমাভা হাস্যকর দেখায়।

ওষ্ঠ ও নাকের চারপাশের ত্বক সাধারণত মুখের অন্যান্য অংশের চেয়ে কম পরিষ্কার হয়। প্রসাধনীর স্পর্শ সেখানে গাঢ় হওয়া দরকার।

[illegible] কম্প্যাক্ট ব্যবহার করার [illegible] [illegible] মেয়েরা বাইরে কাজ করেন বলে [illegible] নেওয়া সহজ, প্রলেপ লাগানোর কাজ [illegible] সারা যায়। কিন্তু সময় যখন একটু হাতে থাকে তখন ভাল হয় পাউডার কম্প্যাক্ট না ব্যবহার করে হালকা গঁড়োর তুলি বা প্যাড বুলিয়ে প্রসাধন সুন্দরতর করতে পারেন। কম্প্যাক্ট অনেক সময় আঠালো প্রলেপের মত হয়। আমাদের ভ্যাপসা গরমে কম্প্যাক্ট ব্যবহারের অসুবিধা, যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা সবাই জানেন। পাফটি পর্যন্ত পাউডারও ভিজে ভিজে আবহাওয়ার আর্দ্রতা মিশে যেন অকেজো হয়ে যায়। যদি ব্যবহারই করতে হয় তবে অল্প দিন পরে পরে পাফটি অন্তত বদল করবেন।

যাঁরা নানা ধরনের নয়নরঞ্জনীর ব্যবহার করেন তাঁরা চোখের প্রসাধনের আগে একবার পাউডার বুলিয়ে নিলে প্রসাধনী সংযোগ সহজ ও সুন্দর হবে। এমন কি লিপস্টিক ব্যবহারের আগে ওষ্ঠাধরে হালকা পাউডার লাগালে লিপস্টিক প্রয়োগ উজ্জ্বলতর হবে।

শ্রীমতী

চমবঙ্গ মহাকরণের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

তপন্ন সুধীবিদ্বজ্জনের প্রতি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের একটি পত্র উদ্ধৃত
—

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা ৩।১০।৭০

শ্ধাভাজনেষু,

চমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ র উদ্যোগে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ কলিকাতা কেন্দ্রে (১।১ লোয়ার সার্কুলার রোড) । লোকসংস্কৃতির আলোচনাচক্রের নার) আয়োজন করা হয়েছে।

আলোচনাচক্রের জন্য আমরা নিম্ন- বিষয়ে আপনার নিকট একটি প্রবন্ধ করি। বাংলায় লিখিত মূল প্রবন্ধ সহ অনধিক তিনশটি শব্দের একটি ী সার মর্ম নিম্নলিখিত ও তারিখের আমরা আপনার নিকট থেকে পেতে করি। আপনার মূল্যবান রচনা ও কাশের অনুমতি দানের জন্য আমরা স্তে মাত্র ১৫০.০০ টাকা উপহার দিবার সিদ্ধান্ত আপনার জ্ঞাতার্থে করছি। এক সপ্তাহের মধ্যে সংবাদ ও আপনার সহৃদয় সম্মতি- ঠিয়ে বাধিত করবেন।

ধপাঠ ও আলোচনাচক্রে আপনার ন অংশ গ্রহণের সুবিধার্থে খসড়া ী এই সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

। করি আপনার মূল্যবান সক্রিয় য় ঐতিহ্যপূর্ণ জাতীয় সংস্কৃতির দ্ধশালী হবে এবং আসন্ন বাংলার স্কৃতির আলোচনা সার্থকতা লাভে বে।

ধন্যবাদসহ
প্রকাশস্বরূপ মাথুর
তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা

. ...
... ...
বিষয় ....
প্রেরণের শেষ তারিখ ১-১২-৭০

। কাছে এই অনুরোধ জানানো তাঁরা বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যেও ঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের অধি- আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণও করে- অবশ্য যথাসময়ে প্রবন্ধপ্রাপ্তির চমবঙ্গ সরকার একাধিক রিমাই- পাঠাতে দ্বিধা করেননি। রের পর কিন্তু লেখকদের প্রাপ্য া প্রদান করবার কথা মাননীয় গ সরকার ইচ্ছা করেই বিস্মৃত

হয়েছেন। লেখাগুলি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা তাও জানা যায়নি কারণ সেরকম কোনও পুস্তিকা লেখকদের মধ্যে কেউ পাননি বলেই জানি। এ বিষয়ে কোনও পত্রের উত্তর সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে কেউ পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। লেখাগুলি ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন খবরও আমাদের কাছে নেই। তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তার পক্ষে জনৈক শ্রীমানিক সরকার লেখকদের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হস্তগত হবার পর থেকেই তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

লেখকদের কাছে অর্থের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্রুতির অসারত্ব এবং অসৌজন্যই অধিকতর পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। লেখাগুলি অন্তত তাঁরা ফেরত দিতে পারতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁদের অসুবিধার কথাও গোচর করতে পারতেন। কিন্তু কোনটাই তাঁরা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে বলে মনে করেননি। দেশের বিদ্বজ্জনের প্রতি এই ধরনের নিকৃষ্ট এবং অধম ব্যবহারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের চরিত্রের যে দিক উদ্ঘাটন করেছেন সেই দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে অপর ভদ্রজনকে আমরা সরকারী অনুরোধ সম্বন্ধে সাবধান হতে উপদেশ দেব।

তিনটি গ্রন্থ

সম্প্রতি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তিনটি মূল্যবান গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে: একটি শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত "আসরের গল্প"; অপরটি অধ্যাপক শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত নিধুবাবুর গীতসংগ্রহ "গীতরত্ন" (লেখক গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন—বিস্মৃতদর্পণ)। আর একটি গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীপুলকেন্দু সিংহের লেখা—"মুর্শিদাবাদে"র লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য।'

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সাঙ্গীতিক গবেষণার জন্য সুপরিচিত। ঘর-ঘরনা এবং শিল্পীদের জীবন ও বহু বিষয় ব্যাপারে তাকে বিশেষজ্ঞ বলেই জানি। বিপুল পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস রচনায় প্রচুর কাজে লাগবে। নামে "আসরের গল্প" হলেও এই বইয়ের কোনও কাহিনীই কাল্পনিক নয়, বরঞ্চ সত্যের ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে আছে। গ্রন্থকার বলছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হল—"যে গুণীরা অতীতের ছায়ালোকে আত্মগোপন করেছেন এবং রাগসঙ্গীতের যে সমৃদ্ধ যুগ কালের পটক্ষেপে ইতিহাস হয়ে উঠেছে, তাঁদের প্রসঙ্গ সেই পৃষ্ঠপটে চিত্রিত করা।" তাঁর অপর উদ্দেশ্য হল সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতজগতের যোগাযোগ স্থাপন। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। গ্রন্থে যাঁদের আখ্যায়িকা আছে তাঁরা হচ্ছেন— যাদুমণি, মহেশ সরকার, শ্রীজান বাঈ, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীণকার রবাবী কাসেম আলী খাঁ, সরোদী এনায়েৎ খাঁ, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাময়ী, ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রাও, অমৃতলাল দত্ত (ওরফে হাবু দত্ত), রামাচরণ ভট্টাচার্য, বিনোদ গোস্বামী, কোকব খাঁ, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, বাদল খাঁ, হারেন্দ্রকৃষ্ণ শীল, জগদীপ মিশ্র, মৌজুদ্দিন খাঁ, নন্দ দীঘল, আশুতোষ রায়, আবদুল করিম খাঁ, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, সাতকড়ি মালাকার,

মোহিনীমোহন মিত্র, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মবাবু, মুরারীমোহন মিত্র প্রমুখ বিগত যুগের স্মরণীয় গুণীশিল্পিবৃন্দ। প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, দাম বারো টাকা।

নিধুবাবু সম্বন্ধে এ যুগে বিশদভাবে আলোকপাত করেন ডঃ সুশীল দে মহাশয়। অতঃপর অনেকেই লিখেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত মহাশয়ও তাঁর ঈশ্বর গুপ্ত ও কবিজীবনী গ্রন্থে বহু সংবাদ আমাদের গোচর করেছেন। সবশেষে বহু তথ্য প্রদান পূর্বক নিধুবাবুর জীবিতাবস্থায় মুদ্রিত তাঁর গীতসংকলন গ্রন্থ "গীতরত্ন" প্রকাশ করলেন শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়। গ্রন্থের মুখবন্ধস্বরূপ যে সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলি হল—নিধুবাবুর জীবনী, টপ্পা গানের সামাজিক পটভূমি, পক্ষীর দল, আখড়াই গান, অন্যান্য কবি, নিধুবাবুর নামে প্রক্ষিপ্ত পদ ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকায় লিখেছেন—"গীতরত্ন গ্রন্থটির কথা আমরা

প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। নিধুবাবুর সঠিক জীবনী এবং তাঁর গানের সম্পূর্ণ তালিকার এ-টিই হল একমাত্র নির্ভরযোগ্য বই। এই-রূপ দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পাদনা করে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত চক্রবর্তী বাঙালী সংগীতরসিকদের খুবই উপকার করেছেন। গ্রন্থটির অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।" গ্রন্থের প্রকাশক সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, দাম ষোলো টাকা।

"মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য" নামক পুস্তকটির লেখক শ্রীপুলকেন্দু সিংহ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রাম ও জনপদ পরিভ্রমণ করে লোক-সাহিত্যের নানা বস্তু সংগ্রহ করেছেন। তারই কিছু তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশ করেছেন। নয়টি প্রবন্ধে তিনি মুর্শিদাবাদের ব্রতকথা, কীর্তন গান, ভাদুই গান, বাউল গান, বোলান গান, গাজনের গান, জারি গান এবং কতিপয় আঞ্চলিক লোকসংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই ধরনের বই নানা দিক থেকেই মূল্যবান। তাঁর কাছে আরও যেসব সংগ্রহ আছে সেগুলি পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে। 'এই সংগ্রহের জন্য তাঁকে একক ভাবে বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন জেলার আগ্রহী ব্যক্তিগণ যদি এই-ভাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে সামাজিক পটভূমিকার ইতিহাস ও সংস্কৃতির বহু মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে এখনও প্রচুর অনুসন্ধানের প্রয়োজন এবং সেটি অচিরে করা দরকার, কারণ পল্লী-জীবন ক্রমেই নাগরিক প্রভাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে। আশা করি লেখক তাঁর উৎসাহ অটুট রাখবেন। লেখকের ঠিকানা—পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ, বই-এর দাম পাঁচ টাকা।

ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের-এর প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত গানের আসরে ওস্তাদ আমীর খাঁ

২৩ অক্টোবর হিন্দী হাই স্কুল-হলে আয়োজিত একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেড পদ্মভূষণখ্যাত স্বনামধন্য ওস্তাদ আমীর খাঁকে তাঁদের বিশেষ সাধনা ও গবেষণার নির্মিত রেকর্ডপ্লেয়ার "ফিলিপস স্টিরিও সিস্টেম" উপহার প্রদান করেন এবং তাঁকে সম্মানিত করেন। এই নোরন রেকর্ডপ্লেয়ারটি সর্বদিক থেকেই উৎকৃষ্ট, এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যোগ্য পরিবেশে যোগ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুযোগ্য সংগীতশিল্পীর সম্বর্ধনা খুবই আনন্দের বিষয়।

অনুষ্ঠানে প্রথমে কথক নৃত্য প্রদর্শন

ফিলিপস ইণ্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে শ্রী এস দাস একটি স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার যন্ত্র উপহার দিচ্ছেন ওস্তাদ আমীর খাঁ কে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রী এ কে বসু

করলেন শ্রীমতী মায়া চ্যাটার্জি। তাঁর নৃত্য উপভোগ্য হয়েছিল। বিশেষ করে ভাব-প্রকাশ করে তিনি যে ভজনটি গাইলেন সেটি খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। ইনি পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্রের শিষ্যা।

ওস্তাদ আমীর খাঁ কল্যাণ, বাগেশ্রী, কানাড়া প্রভৃতি রাগকে ভিত্তি করে কয়েকটি খেয়াল গেয়ে শোনালেন। গানে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হল। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর সরগম এবং তান বিস্তারে খুবই পুলকিত হয়েছেন। উত্তম তবলাসঙ্গত করেছিলেন শ্রীগোবিন্দ বসু। সারেংগীতে ছিলেন মুনির খাঁ সাহেব। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় হারমোনিয়ামে সংগত করে আসরকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

সংগীতাচার্য রামপ্রসন্ন জন্মশতবার্ষিকী

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার উদ্যোগে নব নির্মিত ভবনে সংগীতাচার্য রামপ্রসন্ন জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবীণ ও নবীন প্রায় অধিকাংশ সংগীতশিল্পী (যাঁরা বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছেন) সমবেত হয়েছিলেন রামপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতে। পরলোকগত সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্রীগৌরী দেবী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন ধ্রুপদ গেয়ে। তারপর বাংলা খেয়াল এবং ভজন গাইলেন বিষ্ণুপুরের প্রবীণ সংগীত শিল্পী শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যো-পাধ্যায়। সত্যকিংকরবাবুর পর সেতার বাজালেন সংগীতাচার্যের দ্বিতীয়

পুত্র শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতাচার্যের শিষ্য শ্রীহরিপদ চট্টো-পাধ্যায় ও তাঁর পুত্র স্বপন চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে ধ্রুপদ গান করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে সংগীতাচার্য রামপ্রসন্নের কনিষ্ঠ-পুত্র শ্রীআশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এস্রাজে মালকোষ বাজিয়ে শোনালেন। অনুষ্ঠানে আরও যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামপ্রসন্নের পৌত্র শ্রীঅরূপ বন্দ্যো-পাধ্যায়, দৌহিত্র শ্রীতারাপদ গোস্বামী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীঅমাদি দত্ত, শ্রীরবি রাহা এবং শ্রীশিবপ্রসাদ গোস্বামী।

শার্ঙ্গদেব

হৎ আকারের কোনও ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখার সুযোগ আমাদের খুবই কম মেলে। বহু ভাস্কর্য নিদর্শন াধারণত ভারী—প্রদর্শনীস্থলে পাঠানো, বশেষ করে বহির্বঙ্গের শিল্পীদের পক্ষে ায়সাপেক্ষ। তা ছাড়া ক্ষণভঙ্গুরতা ত াছেই। স্থানীয় প্রদর্শনীগুলিতে তাই নানা বর সঙ্গে কয়েকটি মাত্র ভাস্কর্য নিদর্শন াখ পড়ে থাকে। সুতরাং শ্রীমতী রাজুল রওয়াল যখন অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে র ভাস্কর্যকলার একক প্রদর্শনীর য়োজন করেন তখন সকলেই আগ্রহী হয়ে ঠন ও অনেকেই প্রদর্শনীটি দেখতে যান।

হারমনি ইন ইনটেগ্র্যালস্ (কংক্রীট)
—শ্রীমতী রাজুল ধারিওয়াল

র্শনীতে ভাস্কর শিল্পীর ২২টি নিদর্শন া যায়। শিল্পী মাত্র চার বছর পূর্বে ন্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষা শেষ করেন, মানে বরোদায় নানা ধাতু মাধ্যমে ভাস্কর্য ায় নিযুক্ত আছেন। শিল্পী কাঠ, কংক্রীট, পাথর, প্লাস্টার অব প্যারিস ছাড়া ধাতু বভিন্ন মাধ্যমের সংমিশ্রণে কাজ করেছেন। র্শনগুলি দেখে মনে হয়, শিল্পী দেশীয় ছাধারা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে সম- ীন গঠনরীতিরও আশ্রয় নিয়েছেন। প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখে এই শিল্পীর া ও গভীর চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। একটি লক্ষণীয় জিনিস হল শিল্পীর ম নির্বাচন ও সেই মাধ্যম অনুযায়ী রীতি। কোন মাধ্যমের সম্ভাবনা ও প্রকৃতি কত ব্যাপক সে বিষয়ে যে শিল্পী নিঃসন্দেহ তা তাঁর গঠন নিদর্শনে দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। যেমন কাঠ—এক বা দুটি নীরেট কাঠের স্তূপে খোদাই করে তিনি আধুনিক রীতিতে পজিটিভ ও নেগেটিভ আকার সৃষ্টি করেছেন, যেমন অ্যাগনি অ্যান্ড একস্টেসি। পরিকল্পনা ও প্রকাশ- ভঙ্গীর দিক থেকে স্ক্রু-ও উল্লেখ্য। পাথরের কাজের নিদর্শনগুলি বাইরে রাখার উপ- যোগী, এগুলির আকার ও স্থাপনপদ্ধতির সঙ্গে আবেষ্টনের একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি লক্ষণীয় (থ্রি ইন ওয়ান)। কংক্রীট নিদর্শন- গুলি সুন্দর। পরিকল্পনা ও একই রীতিতে বিভিন্ন আকারের বৃত্ত ও চতুর্ভুজের ওপর প্রাধান্য দিয়ে শিল্পী সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত, শ্রীমতী রাজুল ধারিওয়ালের কংক্রীটের কাজগুলি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই হারমনি ইন ইনটেগ্র্যালস-এর নাম করা যায়। সুললিত ছন্দ ও গতির দিক থেকে স্পাইস (প্লাস্টার অব প্যারিস) বিশেষভাবে উল্লেখ- যোগ্য। পরিকল্পনা ও সাবলীল প্রকাশ- ভঙ্গীর জন্য মেলাঙকলি-র (ব্রঞ্জ) নাম করা চলে। শিল্পী কাঠ, লোহা ও টিন ব্যবহার করে ভাস্কর্যকলা নিদর্শন সৃষ্টি করার চেষ্টাও করেছেন; তবে এগুলি ঠিক ঐ মানের নয়। শ্রীমতী রাজুল ধারিওয়ালের প্রতিভা আছে সন্দেহ নেই। তাঁর কাজে, শ্রদ্ধেয় রাম- কিংকরের প্রভাব দেখা গেলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি তা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, আধুনিক রীতি অনু- সরণ করলেও দেশের নিজস্ব সত্তার কথা তিনি ভোলেননি। কাঠের কয়েকটি নিদর্শনও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে আয়তনিক গঠন ও সজ্জার দিকে ভে ড্রিমার অনেকের চোখে পড়ে।

*

প্রতি বছর বহু শিল্পীই কলকাতা ও অন্যান্য শহরে তাঁদের শিল্পকর্মের

ডেথলেস অ্যান্টিক —বিকাশ ভট্টাচার্য

প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। অনেকে আবার প্রতি বছরেই, এমন কি কয়েকজন বছরে দু-তিনবার প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যিই প্রতিভাধর তাঁরা অবশ্যই চিত্ররসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের প্রদর্শনীটি দেখেই এই কথাগুলি মনে এল। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় গ্যালারী ৫২-র উদ্যোগে। এখানে শিল্পীর ২৬টি শিল্প-নিদর্শন দেখা যায়। দেশের তরুণ শিল্পীদের মাত্র অল্প কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে যাঁরা আজ সুপরিচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিকাশ ভট্টাচার্য অন্যতম। গত কয়েক বছর যাবৎ নানা প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর রচনাধারা দেখার সুযোগ হয়েছে এবং বলতে বাধা নেই যে একমাত্র আপন অনুভূতি, আদর্শ ও আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এই শিল্পী দ্রুতগতিতে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই শিল্পীর একটি সবল স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে যেটি তাঁর প্রত্যেক রচনার পরিস্ফুট। চোখে না দেখে, কণ্ঠস্বর ও গাইবার পদ্ধতি শুনেই যেমন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীকে অবিলম্বে চেনা যায়, তেমনি স্বাক্ষর না দেখেও বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি দেখেই সনাক্ত করা যায়। এটি একটি দুর্লভ গুণ এবং বলা চলে যে এই গুণের অধিকারী একমাত্র বিকাশ ভট্টাচার্যই। ক্রমাগত নানা রীতিতে পরীক্ষা করাই এই শিল্পীর ধর্ম এবং এবারেও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা থেকে শিল্পীর রচনাবলীর উদ্ভব হয়েছে। একটি বড় আধুনিক ডল নিয়ে একজন তাঁর স্টুডিওতে আসেন, অনুরোধ জানান চোখ দুটি ভাল করে এঁকে দিতে। চোখ দুটি তিনি এঁকেছিলেন কি না, বা কবে এঁকেছিলেন তা জানি না—তবে ডলটি বহু দিন তাঁর কাছে ছিল। নিষ্প্রাণ, নির্বাক ও নিষ্পাপ ডলটি যেন ক্রমশ তাঁকে এক অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ আকর্ষণের জালে বেঁধে ফেলল—সেটি যে মাত্র ডল তা বুঝি তিনি ভুলে গেলেন—ডলটি যেন প্রাণ পেয়ে হঠাৎ সরব হয়ে উঠল। ফলে শিল্পীর মনে হল নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি, এবং তারই ফলে তিনি আঁকলেন পর পর ২০ খানি ছবি। বলা বাহুল্য, ছবিগুলির অর্থ খোঁজা নিরর্থক—কারণ অধিকাংশই সাররিয়ালিস্টিক জাতীয়। তা হলেও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ডলকে রেখে তিনি যেন সেটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। কোথাও শহরের হর্ম্যশ্রেণীর পাশে ফুটপাথের ওপর অনাদৃত অবস্থায় ডলটি পড়ে আছে—কোথাও বা আবার ওপর থেকে একটি দড়ির ওপর সে ঝুলছে—নীচে দুটি ব্যগ্র হাত তাকে ধরবার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে, আবার কোথাও বা ডলটি টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। কারুকার্যের দিক থেকে কয়েকটি ছবি খুবই সুন্দর—বিশেষ করে ৬, ৮ ও ১০নং। যেভাবেই শিল্পী এঁকে থাকুন না কেন, বিভিন্ন কম্পোজিশনের মধ্য দিয়ে তিনি একটি নিষ্প্রাণ ডলকে ছবির বিশিষ্ট পরিপূরক অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করে তার মধ্যে যেন নতুন রূপ ও প্রাণ দুই-ই দান করেছেন। শিল্পী হিসাবে এটি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়। অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে ডেথলেস অ্যান্টিক ইতিপূর্বে দিল্লিতে দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকী (Second Triannale)-তে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কুটিল, পঙ্গু, পার্থিব জীবনের তুলনায় মরণ যে কত সহজ ও সুন্দর নিও-রিয়ালিস্টিক এই ছবিতে শিল্পী তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন। সাররিয়ালিস্টিক নিদর্শন হিসাবে ডেথ অব এ হিরো উল্লেখযোগ্য।

*

নয়াদিল্লির শিল্পী বিমল দাশগুপ্ত, ধীরাজ চৌধুরী, জগদীশ দে ও বীরেন সেনগুপ্ত কয়েক মাস পূর্বে বাংলাদেশ শরণার্থীদের সাহায্যকল্পে কলকাতায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, সে কথা অনেকেরই স্মরণ আছে। সম্প্রতি তাঁরা বোম্বাই জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতেও এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ও এই উপলক্ষে বিভিন্ন ড্রয়িংয়ের প্রতিলিপি সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন।

*

চিত্রাংশু ইনস্টিটিউট অব আর্ট অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফটের কর্তৃপক্ষ সংস্থার ছাত্রছাত্রী সহ পূজার পূর্বে অজন্তা ও এলোরা পরিভ্রমণে যান। সেখানে ছাত্রছাত্রীগণ অনেকগুলি স্কেচ করেন। বিজয়া দশমী উপলক্ষে চিত্রাংশু ভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি-সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীদের নানা স্কেচ ও দ্রষ্টব্য বিভিন্ন দৃশ্য ও স্থানের ড্রয়িং প্রদর্শিত হয়। পূজার পূর্বে ৬১।৬ মুর অ্যাভিনিউ-এ বেনীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

চিত্রপ্রিয়

॥ ছত্রিশ ॥

ব উবাজারের কর্ণার থেকেই কিক্ শুরু হোলো—কাগজ নিয়ে ফেরি করতে ড়াতেই না! একশ' গজ ঠিকরে পড়লাম। 'আরে ইয়ে বংগালি ফিন কাঁহাসে আয়া !' গুঞ্জন উঠল সেখানকার হকারদের ভেতর। মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমনটা হয়। 'দো চার মুক্কা লাগা দেও না, ভাগি।'

মনে করেছিলাম ওদের সংগে মানিয়ে নিতে পারব কিন্তু মৌরসী পাট্টার বনেদীরা জে বনে না। কায়েমী স্বার্থ আপোস তে জানে না।

মুক্কার কথা উঠতেই আমি নিজেকে টিয়ে নিই, বেমক্কা পড়ে পড়ে মার খাওয়ার য় বেমক্কা এখান থেকে সরে পড়াই র। এক ধাক্কায় চলে যাই মীর্জাপুরের ড়ায়।

গোলদিঘির রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ক—আনন্দবাজার! আনন্দবাজার! জোর র হাঁকতে থাকি।

আমার শোরগোল একজনের কানে লাগে এমন বিটকেল আওয়াজ ছাড়ছো কেন ' চেঁচাচ্ছ কেন এখানে দাঁড়িয়ে? এখানে মার আনন্দবাজার কিনবে কে? পয়সা । কিনতে যাবে কেন শুনি? যখন একটু-ন এগিয়ে গেলে দিঘীর ওপারে গিয়ে গারাঙ্গ প্রেসের গায়ে লাগানো আনন্দ-ার অমনি অমনি পড়তে পাওয়া যায়?'

থাটা আমার মনে লাগে। আরে, আমিও তাই ভেবে রেখেছিলাম আজ সকাল-য়।

াগজ নেবার কালে প্রথমটায় ভাবলাম শষ কাগজখানা বেচব না, নিজের পড়ার রাখব। তার পরেই ভেবে দেখলাম, যদি ক'খানাই বেচা যায়, একটা কাগজও বেঁচে যায় মন্দ কী! বিকেলে যখন সে টাকা জমা দিতে আসব তখন রর দেয়ালে সাঁটা (আমার নজরে ঠেকে-তখনই) কাগজটা পড়ে নিলেই চলবে

সেখান থেকে সরে চলে গেলাম সোজা হ্যারিসন রোডের ধারে—কেষ্টদাস পালের ছত্রতলে।

মর্মর মূর্তির এলাকায় কাগজের ফেরিওয়ালা ছিল না একজনাও। হকারদের জমায়েত ছিল মুখোমুখি ঠিক তার উল্টোদিকে। খদ্দেরেরও ভিড় ওধারেই।

জনকয়েক বাঙালীর ছেলেও বেচছিল সেখানে দেখলাম। বিক্রি হচ্ছিল বেশ তাদের।

কিন্তু হিন্দুস্থানীরা খানিক পরেই রুখে উঠল তাদের ওপর। কিন্তু ছেলেগুলোও দেখলুম বেশ তেঁড়িয়া, কোনো তাড়নাতেই নড়বে না সেখান থেকে।

পিঠোপিঠি পিটাপিটি শুরু হয়ে গেল। দোরোখা কিলচড়ঘুঁষি দু' তরফে। ছেলেরাও ছাড়বার পাত্র না। যেমন মার খাবার তেমনি মারবার জন্যে তৈরি। দু' পক্ষই নাছোড়বান্দা।

ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখা ভালো, বলতেন বাবা। তাছাড়া, যার বাহুবল নেই মারামারির মধ্যে যাওয়া তার পক্ষে বাহুল্য। শখ করে ঠোকাঠুকির ঠক্করে না গিয়ে অলক্ষ্যে সেখান থেকে সরে পড়াই সমীচিন বোধ করলাম।

ভবী যেমন নিজের ভবিষ্যৎ ভোলে না তেমনি প্রথম আখর দেখেই আখেরের কথা ঠাউর নিতে পারে।

দুর্জনদের দূরে পরিহার করে দূর থেকে নমস্কার ঠুকে সদুরপরাহত হয়ে গেলাম। চলে এলাম ঠনঠনের মুখে।

সেখানে শুধু ভক্তজনের ভীড়। মা কালীর মাহাত্ম্যের তুক সবাইকার, খবরের খিদে নেই কারোই। বিশেষ সুবিধে না করতে পেরে সেখান থেকেও সরতে হোলো।

শংকর ঘোষ লেন, শিবনারায়ণ দাসের গলি কৈলাস বোস স্ট্রীট একে একে পার হয়ে শেষে দাঁড়ালাম গিয়ে বিবেকানন্দ স্কোয়ার-এ। গোড়া পত্তনের কালে বিবেকানন্দ রোডের ঐ নামটাই ছিল তখন। সেখানেও কিন্তু কাগজের কোনো চাহিদা নেই।

একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক ভাবলাম।

স্কোয়ারের পাড়া পার হয়ে কাগজের তাড়া নিয়ে হেদোর মোড়ে গিয়ে খাড়া হলাম।

এক ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে হন্তদন্ত হয়ে এলেন।—'দেখি তো আজকের কাগজটা।'

তাঁর হাতে একখানা তুলে দিলাম। তিনি

গোটা গোটা আখরের খবরে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে মেজ মেজ ছোট ছোট হরফের ছোটখাট সংবাদগুলোও খুঁটিয়ে দেখলেন। আমি অপলক প্রত্যাশায় তাকিয়ে রয়েছি।

মিনিট পনের ধরে কাগজখানার আগা-পাশতলা নজর দেবার পর আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন আবার—'এই নাও বাপু, তোমার কাগজ।'

আমি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছি দেখে অযাচিত উপদেশ দিলেন আমায়—'এখানে বাবা তোমার এক কপিও কাগজ বিক্রি হবে না। হেদোয় লোকে বেড়াতে আসে আর সাঁতার কাটতে আসে, সকালে বিকেলে হাওয়া খায় এসে—এখানে কারো কাগজ পড়ার গরজ নেই। কাগজ যদি বেচতে চাও তো চলে যাও হাতিবাগানের মোড়, নয়ত সেই শ্যাম-বাজারের পাঁচ মাথায়। এখানে তোমার কাগজ কিনবে কে?

'আপনি অন্তত একটা কিনবেন আশা করেছিলাম।' আমি বলি। সত্যি, ওঁর হাতেই আজকের বউনিটা হবার ভরসা ছিল আমার। কিন্তু বউনির বদলে পেলাম বকুনি। এবং কিছু কথার বকুনিও।

'আমার এখন কাগজ পড়ার ফুরসং আছে নাকি? আমি যাচ্ছি এখন হাতিবাগান, বাজার করতে বেরিয়েছি দেখছ না!' দৃষ্টান্তস্বরূপ থলিটা আমার নাকের উপর তুললেন—'একদণ্ডও সময় আছে আমার!'

'বেশ ত মশাই এতক্ষণ ধরে পড়লেন আমার কাগজ। তার তো সময় ছিল খুব। কাগজ পড়ার ফুরসং ছিল আর কেনবার

বাজার করতে বেরিয়েছি, দেখছ না?

বেলাতেই...' ইচ্ছে হল বলি একবার। কিন্তু বলব কাকে? ততক্ষণে তিনি হাতিবাগানের দিকে সাত হাত এগিয়ে গেছেন!

কাগজের পাঁজা ঘাড়ে হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে হেদোচ্ছি, কতক্ষণ ধরে জানি না, হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে বইখাতা হাতে ওধারের ফুটপাথ ধরে চলেছে।

কিশোরী মেয়ে! চমক লাগল কেমন! রিনি! রিনিই না?

ট্রাম বাস মোটর কোনো দিকে না তাকিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে ছুটে গেছি আমি ওধারে। পড়েছি গিয়ে প্রায় মেয়েটির ঘাড়ের ওপর।

হতচকিত হয়ে সে দাঁড়িয়েছে—কী?

না, রিনি নয়। আমি অপ্রস্তুতের মত বলেছি—'কাগজ নেবেন একখানা? আজকের কাগজ? মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন...'

আর বলতে হল না। মেয়েটি কোন কথা না বলে দাম দিয়ে কাগজখানা নিয়ে পাশের গেটের ভেতর দিয়ে সেঁধিয়ে গেল সটান।

দেউড়ির মাথায় দেখলাম, ঘোরালো সাইনবোর্ডে লেখা: বেথুন স্কুল অ্যানড কলেজ।

দেখেই আমার চক্ষুস্থির! আরে, এখানেই রিনি পড়ে যে! এখানে পড়ানোর জন্যই তো ওকে চাটগাঁ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

এ কী! যে পার্বতী কিনা মুহম্মদের ডাকেও সাড়া দেয় না তাই কি আজ মা পার্বতীর দয়ায় এই আহাম্মকের কাছে এসে গেল—না চাইতেই!

আহীরিটোলার পথ নই চিনলাম, নাই কেউ দেখালো আমায়—আমার চাইনেকো আর। আহীরিটোলার আহীরিণীকে আমি এখানে দাঁড়িয়েই আহরণ করতে পারব। আমার কাগজের ফেরি নিয়ে সেখানে ঘোরা-ফেরা না করেও সেই বনহরিণীকে আমি ধরতে পারব এখানেই অনায়াসে।

বেচতে পারি আর না পারি আমার পসরা নিয়ে এই পথেই আমি দাঁড়াব এসে রোজ। রোজকার রোজ না না রোজ।

একটু বাদে আরো আরো মেয়েরা আসতে লাগল একে একে। একা একা জোড়ায় জোড়ায় বড় মেয়ে মেজ মেয়ে ছোট ছোট মেয়ে যত।

আর আমিও হাঁকতে লাগলাম জোর জোর—আনন্দবাজার? আজকের আনন্দবাজার। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন আর দশ মাসের মধ্যে স্বরাজ দিব।

মহাত্মা গান্ধী ঠিক কী কথাটি যে বলে-ছেন জানি না। কাগজে চোখ বোলানোর ফাঁক পাইনি তখনো কিন্তু ঐ বড়ো খবরটা মোটা মোটা হরফে গোটা পাতা জুড়ে কাগজের মাথায় জানানো হয়েছিল। যা পথচলতি লোকেরও চোখে না পড়ে যায় না।

সেই কথাটাই হাঁকছিলাম খালি খালি। আর কাগজ বিক্রি হচ্ছিল চোটপাট। আমার হাঁকডাকে চকিত হয়ে প্রায় মেয়েই কিনছিল একখানা করে।

সংবাদ পরিবেশনায় এই বাহাদুরি—এই নিত্য নতুনত্ব এখনকার মত তখনো ছিল ওই আনন্দবাজারের। এই নৈপুণ্য এই দক্ষতা আর এই বৈশিষ্ট্য তার গোড়ার থেকেই।

প্রতিদিনকার জোর খবরটা জোরালো অক্ষরে ছাপানো থাকত পাতা জুড়ে কাগজের মাথায়। কারো চোখে না পড়ার কোনো ওজোর ছিল না।

এতে করে আমার কাগজ কাটানোর যা সুবিধা হত!

দেখতে দেখতে সব কাগজ কেটে গেল আমার—শেষ মেয়েটিও চলে গেল কলেজের ভেতর।

পড়ে রইল খালি একখানা বসুমতী। এটা আর বেচব না। নিজেই আমি পড়ব এখন এক সময়।

রিনি আজ ইস্কুলে আসেনি কিন্তু। কেন আসেনি? অসুখবিসুখ করেছে নাকি ওর? নাকি বিয়েই হয়ে গেল শেষমেশ?

না না, এখনই বিয়ে হবে কী, ওইটুকুন তো মেয়ে—মায়ের চোখে হলেও সত্যিই ওর বিয়ের বয়েস হয়েছে নাকি? এনট্রেন্স পাশের আগে বিয়ে করবে না বলেছিল না সে? তাই ভেবেই আমি নিজেকে ভরসা দিতে চাই। সান্ত্বনা পাই।

আজ আসেনি, কাল সে অবশ্যি আসবে। ক'দিন ইস্কুল কামাই করবে? তাকে আমি দেখতে পাবই...একদিন না একদিন... এই এখানেই। নিশ্চয়!

• রিনিকে দেখতে পাব ঠিকই, কিন্তু সেই ছেলেটির দেখা বোধ হয় পাব না আর। ভেবে মন ভার হয়। ভবানীপুরের থেকে যদি সে কোনোদিনও এধারে আসে কোনো রাস্তার মোড়েই আমার পাত্তা পাবে না। আমি যে কাগজ ফেরিতে বেরিয়ে ওয়েলিংটন বউবাজার-হ্যারিসন রোডের সব ফেরিঘাট পেরিয়ে ফেরারী হয়ে শেষ এখানে এসে ঠেকেছি তা সে টের পাব কি করে?

হাতীবাগানের ফেরত সেই ভদ্রলোককে এবার বাজারের থলি হাতে ফিরতে দেখা যায়।

'ও বাবা! তোমার সব কাগজই যে এর মধ্যেই বেচে ফেলেছো দেখছি!' দেখে বিস্মিত হন।—'না, একখানা রয়েছে দেখছি এখনো। দাও, তাহলে ওটা আমিই কিনে নি না হয়।'

তিনি ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করেন।

'না, এখানা আমি বেচব না মশাই!'

'বেচবে না, তার মানে?' তিনি বিস্মিত হবেও।

'মানে, এটা আমি নিজেই পড়ব বলে রেখেছি।'

'তুমি পড়বে! তুমি পড়বে কাগজ!' তাঁর বিস্ময় যেন ধরে না—'পড়তে পারো তুমি? পড়লে বুঝতে পারবে? লেখা পড়া শিখেছ নাকি?' পয়সাটা তিনি ফতুয়ার পকেটে ভরেন—'আনন্দবাজারটা পড়েছি, তখনি পড়া হয়ে গেছে আমার—বসুমতীটা কিনতে চাইছিলুম মশাই। তোমার ভালোর জন্যেই বাপু!'

'আমার ভালোর জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'চিনির বলদ চিনি খায়, কাগজের হকার কাগজ পড়ে! অবাক কাণ্ড!' বিড় বিড় করে রাগ্তে ভরে তিনি চলে যান।

কাগজ নেবেন একখানা?

'শুধু পড়ি না মশাই! এই কাগজে আমি লিখিও। লিখেও থাকি তা জানেন?' ইচ্ছে হল ডেকে বলি ওনাকে। কিন্তু যেমন হনো হয়ে সকালে তিনি বাজার করতে বেরিয়েছিলেন তেমনি হন হন করে বাড়ির দিকে চলেছেন এখন।

এবং বললে পরে কথাটা প্রায় মিথ্যেই বলা হত নাকি? বসুমতী কি আনন্দবাজারে একছত্রও আমি লিখিনি তখনো, লেখার কল্পনাও ছিল না আমার, (লিখেছিলাম তার অনেক অনেক দিন পরে।) তবে বিজলীতে লিখেছিলাম তো ঠিকই। আর বিজলী কিছু বসুমতীর চেয়ে খাটো নয় কোনো দিকেই।

হাতের কাগজখানা নিয়ে হেদোর ভেতরে গিয়ে বসলাম—ঘেরাটোপের ছত্রছায়ায়।

কয়েকখানা বেঞ্চি জুড়ে জনকয়েক ঘুমোচ্ছিল আয়েস করে। তাদের কারো আরামের বিঘ্ন না ঘটিয়ে একজনের পায়ের তলায় একটুখানি ফাঁক পেয়ে সেখানে বসেই কাগজটা পড়তে লাগলাম।

কাগজখানার গোড়ায় সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ থেকে শুরু করে শেষ লাইনে মুদ্রাকরের ঘোষণা পর্যন্ত গড়িয়ে যেতেই বারোটা বেজে গেল। টনক নড়ল আমার। মাথায় আর পেটে যুগপৎ! এখন তো কিছু না খেলেই নয়।

মল্লিকবাড়ি যেতে হয় এবার। ছেলেটা বলেছিল একটার পরেই নাকি তারা খেতে দেয়। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতেই একটা বেজে যাবে।

গিয়ে দেখি প্রায় হাজার খানেক ভিখিরির ভিড়। তাদের সারির ভেতর খাড়া হয়ে গেলাম এক জায়গায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম মার্বেল প্যালেস।

এই সেই বিশ্ববিখ্যাত মর্মর প্রাসাদ! আপাদমস্তক মার্বেল প্রস্তরে গঠিত—দেখে চোখ ঠিকরে যায়। দেশবিদেশ থেকে কৌতূহলী পর্যটক যা সাধ করে দেখতে আসে। সেই দানধন্য পুণ্যশ্লোক রাজেন মল্লিকের বাড়ি—যাঁর বদান্যতা ভারতবিদিত।

বরাট প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা য়ারায় জল উপচে পড়ছিল—এখানে-ানে মর্মরমূর্তির ভাস্কর-কীর্তি। সারস খরা চরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। কয়েকটা ণও দেখেছিলাম মনে হয়।

এ ধারে আমরা সারবন্দী দাঁড়িয়ে—ারের প্রত্যাশায়।

আসতে আসতে আমার পালাও এল পাবার।

'কিসে দেব হে তোমাকে? থালাটালা কিছু আনোনি?' শুধালো পরিবেষক।

'আনি নি তো। আনতে হয় জানতাম না। আজ প্রথম আসছি কিনা!'

'দেখছ না সবাই তাদের সানকিতে নিচ্ছে।'

দেখলাম বটে, সানকি কিম্বা কলাই চটে-যাওয়া প্লেট করেই নিচ্ছেন সবাই।

দিচ্ছিল খিচুড়ি। চরাচরের খাদ্যাখাদ্যের মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয়তম।

'আমাকে এই কাগজটাতেই দিন না হয়। কাগজেই খাব আমি।'

'কাগজে খাবে? সে কী!'

'খাওয়া নিয়ে কথা। কাগজ তো আর খেতে যাচ্ছিনে।'

পরিবেষক একটু হেসে বলল—'তুমি কি পড়োটড়ো কোথাও? ইস্কুলের ছাত্র নাকি?'

'হ্যাঁ। ছাত্র বইকি। কলেজে পড়ি আমি। ন্যাশনাল কলেজে।'

'তাহলে তোমায় এই ভিখিরিদের মধ্যে বসে খেতে হবে না। ছাত্রদের জন্যে ভেতরে খাবার ব্যবস্থা আছে। তাদের সংগে বসে খাবে তুমি।'

ভেতরে গিয়ে ছাত্রদের পংক্তি ভোজনে বসলাম। সেখানে খাবার ব্যবস্থা ভালোই। তাদের মধ্যে সেই ছেলেটিকে কিন্তু দেখা গেল না। তার ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টা পড়েনি বোধ হয় এখনো, কিম্বা হয়ত সে কাগজ বেচে ভবানী-পুরের থেকে এসে পৌঁছাতে পারেনি যথা-সময়ে। ইস্কুল কামাই করেছে আজ।

মার্বেল প্যালেসে খাওয়া আমার সেই প্রথম হলেও সেই শেষ নয়। তার পরেও, অনেক দিন পরে আরো ভেতরে গিয়ে খাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল।

প্রায় দশক দুই আগে হবে মনে হয়, মল্লিকবাড়ির ছেলে বীরেন্দ্র মল্লিক গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসুর সহযোগিতায় 'সম্প্রতি' নামে একটি আধুনিক সাহিত্যপত্র বার করেছিল, আর সব লেখকের সাথে আমার লেখাও ছিল তাতে—তার কয়েক সংখ্যাতেই। সেই সূত্রে বীরেনের সংগে আমার পরিচয়। তার বাবার সংগেও যোগাযোগ।

সন্ধ্যা বেলায় সম্পাদকের বৈঠক বসত—একতলার বাঁ দিক ঘেঁষা ঘরে বীরেনের নিজের ড্রইংরুমে। ওদের কুলদেবতা জগন্নাথের সান্ধ্য পূজোর শেষে মহাপ্রসাদ আসত, প্লেটে করে বড়ো বড়ো সাইজের লুচি আর তরকারি। ঘি দিয়ে রাঁধা তরকারি সব—তার স্বাদই আলাদা। আর সেই সংগে তাদের নতুন বাজারের ইয়া ইয়া কড়াপাক সন্দেশ। তুলনা হয় না যার।

চমৎকার সেতার বাজাত বীরেন। আর খাসা আধুনিক কবিতা লিখত—একেবারে নতুন ধাঁচের। প্রেমেনকে তার কবিতার প্রশংসা করতে শুনেছিলাম।

সেই ছেলেটির লেখাটেখা আর দেখা যায় না। সে কি আর সেই ছেলেটি আছে এখনো? তারই হয়ত তার মতন একটি ছেলে হয়েছে এতদিনে, সে ছেলেও হয়ত এখন আর ছেলে মানুষটি নেই।

বীরেনের বাবা কুমার দীনেন্দ্র মল্লিকের
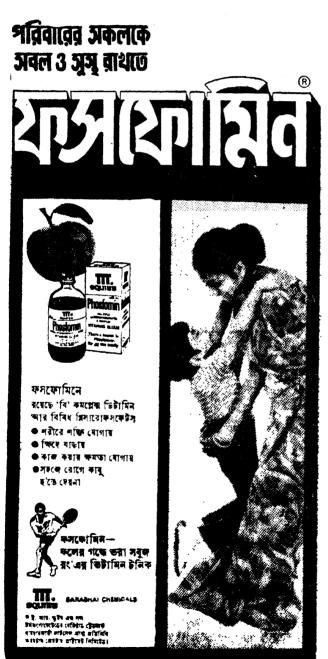
ছবি আঁকার প্রতিভা ছিল। আশ্চর্য পোর্ট্রেট আঁকতেন। কয়েকখানা তাঁর ছবি সম্প্রতিতে প্রকাশিতও হয়েছিল। অন্য পত্রপত্রিকাতেও সম্ভবত।

তিনি একদিন আমায় মার্বেল প্যালেসের ভেতরে বিভিন্ন ঘরে বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর আর শিল্পীদের বহুমূল্য ভাস্কর্য আর চিত্রকর্ম দেখিয়েছিলেন ঘুরিয়ে। সেগুলির শিল্পব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও শিল্পী ছিলেন ত।

মল্লিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাগজ বিক্রির আমার প্রাপ্য কমিশনের লভ্যাংশ থেকে তিনটে সিনেমা দেখলাম সেদিন। তিনটেয়, ছটায়, নটায়। তারই ভেতরে এক ফাঁকে কাগজের আপিসে টাকা জমা দিয়ে এসেছি গিয়ে।

সাড়ে এগারোটায় শেষ শো খতম হবার পর ফিরে এলাম ঠনঠনেয়। সকালে একটা পাঞ্জাবি হোটেল দেখে গেছলাম সেখানে। সেইখানেই রাত্রের খানা খাব ঠিক করা ছিল।

পাঞ্জাবী রুটি আর গরমাগরম মাংসের …প খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করা গেল এতক্ষণে। …কালের সেই খিচুড়ির পর এখন এই …ওয়া।

অবশ্যি সারাদিন ধরেই টুকটাক চলেছে আমার। ডালমুট চানাচুর চিনেবাদামের …য় হয়নি। সেই সঙ্গে ফাঁকে ফোকরে …লো নারকেলের টুকরোটাকরাও।

খাবার পরে এবার শোবার ধান্দা। শোবার আগে সব কাজকর্মের কামারে …লিকের শেষে মায়ের চরণদর্শন করা …ক এবার।

কালী মন্দিরে গিয়ে দেখি, আরে, …খানেই ত সারি সারি শুয়ে কতজনা! …খিরিই বোধ হয়। এদের মাঝখানেই তো …মি শুতে পারি। এরই এক কোণে গড়িয়ে …ড় না কেন? তোফা শোবার জায়গা!

সকালে ভিখিরিদের সামিল হয়ে …য়েছি, রাত্রে তাদের সঙ্গেই শোয়া গেল …য়, ক্ষতি কি!

…ত্যি বলতে আমি তো ওদেরই একজন। …ভেবে দেখলে এ সংসারে কে ভিখিরি …? সকলেই কখনো না কখনো কারো কারো কাছে কিছু না কিছুর প্রত্যাশী। …ং পরম শিবের থেকে অধম এই শিবরাম …ন্ত ভিখারী সবাই—পার্থক্য যা কিছু তা …ল আপেক্ষিক।

কেউ চায় অন্নসুধা, কারো শুধু ক্ষুধা।

ঘুমোবার আগে আরেক দুর্ভাবনা হানা … মাথায়। শোবার ধান্দা তো চুকেছে … ওঠার সমস্যা? আমাকে যে ভোর …টয় উঠে ছুটতে হবে, কাগজের লাইনে … জুটতে হবে সবার গোড়ায়—সেই সমস্যা? সেটা কে মেটায়?

আমার যে অঘোর ঘুম তার থেকে টেনে তোলে কে আমাকে?

মতি শীলের ইস্কুলে সেই ছেলেটির কাছে শুতে পেলে তার সহজ সমাধান ছিল। সে নিজের গরজেই উঠত, ছুটত, আমাকেও সঙ্গী করে নিত যথাকালে।

কিন্তু এখানে এখন—এই অকালে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন। গভীর রাত্রে আমার ঘনঘোর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ—কাঁসর ঘণ্টার শোরগোলে। মার মঙ্গলারতি শুরু হয়েছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। হাতঘড়িতে দেখলাম, চারটে বাজেনি তখনো।

না, রাত গভীর নয়। মন্দিরের সামনেও বেশ ভিড়। ভক্তজনরা জড়ো হয়েছেন সেই অতি ভোরে মার আরতি দর্শনে।

একপলক দেখেই না প্রণাম ঠুকতে হয়েছে আমায়। গোলদিঘির শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে গিয়ে এখনি লাইন লাগাতে হবে সবার গোড়ায়। তারপর সেখানকার কাজ সেরে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে বৌবাজারে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে। ব্যাক, মুক্তারাম-বাবু স্ট্রীটের এমোড় থেকে ওমোড়ে—সকাল দুপুরে মল্লিকবাড়ি আর রাত দুপুর কালীতলা—এই দুই মেরুর মধ্যে আমার গতিবিধির ছক বাঁধা হয়ে গেল। ব্যাস্!

খাওয়া শোয়া আর অতি প্রত্যূষে কাজে যাওয়া এই তিন ধান্দাই মিটে গেল এক যাত্রায়। অবলীলাতেই।
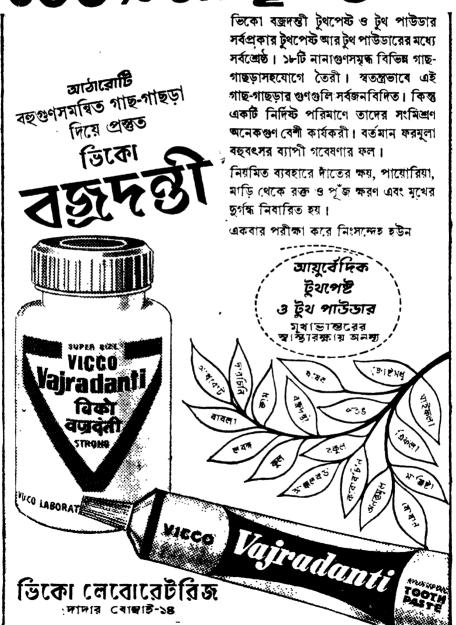
এখন নিশ্চিন্ত।

ক্রমশ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনবদ্য মৌলিক আবিষ্কারের জন্যে ডঃ আর্ল ডব্লু সুদারল্যান্ড, জুনিয়রকে সম্প্রতি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল। প্রায় দেড় দশক আগে তাঁর আবিষ্কার সাইক্লিক অ্যাডেনোসাইন ৩´, ৫´- মনোফসফেট অথবা সংক্ষেপে এ এম পি প্রাণী কোষের উপর হরমোনের সরাসরি কর্তৃত্ব সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করে। পরবর্তী দশকে পৃথিবীর সর্বত্র বিতর্কের জাল রচনা। অতঃপর এই প্রথম সুদারল্যান্ড সর্বসম্মত স্বীকৃতি পেলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ আবিষ্কার ষাটের দশকের শ্রেষ্ঠতম অবদান। সে অর্থে বর্তমান নোবেল পুরস্কার কিছুটা [illegible] ঘটনা।

নোবেল পুরস্কার

ডঃ আর্ল সুদারল্যান্ড এবং তাঁর পত্নী ক্লডিয়া মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। এটা তাঁদের নেশা। যথাসময়ে নাশভিলের বাড়িতে ফিরে যখন মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জামগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন এমন সময় একদল ক্যামেরাম্যান ভিড় করে এসে দাঁড়াল। ওঁরা এসেছেন [illegible] ন্যাশনাল টেলিভিশন থেকে। মুহূর্তেই শুরু হল একের পর এক আলোর ফ্ল্যাশ, নানাভাবে, নানা দিক থেকে। সেই সঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন। না। সুদারল্যান্ডের কাছে এটা মোটেই চমকে ওঠার মত ঘটনা ছিল না। কারণ, তিনি জানতেন এ ধরনের ঘটনা এর অনেক আগেই ঘটে যেতে পারত। অতএব নিতান্ত সহজ মেজাজেই ওঁরা যা করতে শুরু করলেন তাতে তিনি কোন বাধা দিলেন না। ওঁরা যা জিজ্ঞেস করলেন সহজ সুরেই তার উত্তর যোগালেন।

এবং পরদিন স্টকহোমের রয়েল ক্যারোলিন্স্কা ইনস্টিটিউট থেকে সরাসরি টেলিফোন এল। খবর, ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানী সুদারল্যান্ড তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের পরিমাণ নব্বই হাজার ডলার। অর্থাৎ ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। কৃতিত্বের বিষয় হরমোন সম্পর্কীয় কার্যকলাপ।

বয়েস পঞ্চান্ন। মার্কিন নোবেল বিজ্ঞানী-দের তালিকায় তাঁর চল্লিশতম ব্যক্তি। গত [illegible] বছরে একক হিসেবে নোবেল পুরস্কারের [illegible]ত শ্রেষ্ঠতম সম্মানলাভের ঘটনা এই প্রথম। নোবেল পুরস্কার কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রলফ লুফট-এর মন্তব্য, 'ইদানিং দেখা যাচ্ছে, কোন আবিষ্কারের কৃতিত্বই এককভাবে কেউ দাবি করতে পারছেন না। [illegible]ল নোবেল পুরস্কারের অংশীদার হয়ে দাঁড়াচ্ছেন দুই বা ততোধিক বিজ্ঞানী। সুদারল্যান্ড এই পটভূমিকায় একটি বিশেষ ব্যতিক্রম এবং নিশ্চিতভাবে যোগ্যতম ব্যক্তি।'

হ্যাঁ, বর্তমান দশককে যদি বলি জীবরসায়নের ডি এন এ, আর এন এ-র যুগ, পঞ্চাশের দশককে বলা চলে হরমোনের যুগ। হরমোন বা অন্তঃস্রাবী রস সম্পর্কে পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানী মহলে তখন দুরন্ত কৌতূহল। প্রাণীদেহের মধ্যে

আছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, যেমন থাইরয়েড, পিটুইটারি প্রভৃতি। শরীরের প্রতিটি কোষের বিপাকীয় বা মেটাবোলিক কার্যকলাপের উপর ঐ সমস্ত গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক যৌগের প্রভাব অপরিসীম। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য কোন কোষ কীভাবে কাজ করবে, কতটা কাজ করবে এ সবের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হরমোনের উপর। বিভিন্ন গ্ল্যান্ড বা অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুসারে তারা বেরিয়ে আসে। এসে মেশে রক্তে। তারপর রক্তের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে যেখানে যেটির দরকার সেখানে তারা গিয়ে হাজির হয়। অতঃপর ঐ সমস্ত অংশের যথাযথ কাজ

সুদারল্যান্ড সাধারণের কাছে খুবই আমুদে এবং চটপটে। কিন্তু যথেষ্ট আত্মসচেতন

করার নিয়ন্ত্রক হিসেবে তারা কাজ করে। যেমন ধরুন প্যানক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় [illegible] এই অন্ত[illegible] গ্রন্থিটির অব[illegible] স্থলীর কাছ বরাবর। এর থেকে নির্গত হয় গ্লুকাগোন (Glucagon) নামে এক ধরনের হরমোন। এর কাজ যকৃৎ থেকে চিনিজাতীয় সামগ্রীকে বের করা। যেমন ধরুন অ্যাড্রিনেলিন নামে আর এক ধরনের হরমোন। বিশেষ ধরনের এই হরমোনটি আকস্মিক ভয় বা অন্য কোন রকম উত্তেজনার সময় আমাদের রক্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কাজ শরীরে সঞ্চিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে সহজতর পর্যায়ে পরিবর্তিত করা। দেহ-ত্বকের নিচে জমে থাকা কঠিন স্নেহজাতীয় পদার্থ তখন তরলে রূপান্তরিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে যে সমস্ত পেশীর কাজ করার দরকার তাদের শক্তি যোগায়। এবং ইত্যাদি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত গবেষকরা বিশ্বাস করতেন প্রয়োজন অনুসারে হরমোন সরাসরি কোষে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যক্ষভাবে তার যাবতীয় রাসায়নিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু ঐ বছর সুদারল্যান্ড যকৃৎ-এর কোষকলায় সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করে বসলেন। যার নাম রাখলেন তিনি সাইক্লিক অ্যাডেনোসাইন ৩´, ৫´ মনোফসফেট বা সংক্ষেপে সাইক্লিক এ এম পি। শুরু তখন থেকেই। অভিনব এই বস্তুটির উপর নিপুণ পর্যবেক্ষণের পর সুদারল্যান্ড সিদ্ধান্ত করলেন, আগে যে ধারণা ছিল হরমোনই প্রত্যক্ষভাবে কোষের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে, এটা সর্বৈব খাঁটি কথা নয়। অনেক হরমোনের ক্ষেত্রে দেখা গেল আসলে কোষে উপস্থিত হয়ে যা করে, তা হল কোষের মধ্যেকার এক প্রকারের যৌগিক রাসায়নিক যৌগের মাত্রাকে তারা শুধু নিয়ন্ত্রিত করে। কোষে কখনও তার পরিমাণ বাড়ায়, কখনও বা কমিয়ে দেয়। এরই নাম সাইক্লিক এ এম পি। যাকে বলা হল 'সেকেণ্ড মেসেঞ্জার।' সুদারল্যান্ডের আবিষ্কার, আসলে এই এ এম পি-ই কোষের যাবতীয় রাসায়নিক কাজ কর্ম নিরূপণের বা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, যখন কেউ উত্তেজিত হয় তখন তার অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় অ্যাড্রিনেলিন হরমোন, যার কথা এই মাত্র উল্লেখ করেছি। অ্যাড্রিনেলিন নিঃসরণের পর ঐ ব্যক্তির হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন, অ্যাড্রিনেলিন

হৃদপিণ্ডের পেশীকোষে সাইক্লিক এ এম পি'র মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং এই বস্তুটিই পেশীর কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। পরে দেখা গেল, সাইক্লিক এ এম পি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণেও সাহায্য করে। যেমন ধরুন, এর উদ্দীপনায় স্টেরয়েড হরমোন, যেমন অ্যাড্রিনাল থেকে হাইড্রোকরটিসোন নিঃসরণ প্রভৃতি হয়ে থাকে। এটি শরীরকে দীর্ঘ পরিশ্রমের সঙ্গে যুঝতে সাহায্য করে। এমন কি শরীরে ইনসুলিন নামে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ হরমোনটির নিঃসরণের ব্যাপারেও এ এম পি ঐ একই ভাবে কাজ করে। উল্লেখ্য, শারীরিক প্রয়োজনে স্টার্চ এবং সুগার বা চিনিজাতীয় সামগ্রীর যথাযথ বিপাকীয় ব্যাপারে এই হরমোনটির ভূমিকা বিশিষ্টতম।

তবু অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটে থাকে এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। যে কোন মৌলিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি সব সময়ই বিলম্বিত লয়ে অগ্রসর হয়। সুদারল্যান্ডের আবিষ্কারের ঘটনা মুহূর্তে জীবরসায়ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। অনেকে তো ব্যাপারটাকে সরাসরি অস্বীকার করে বসলেন। শুধু অসীম ধৈর্য এবং প্রতীক্ষাকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে লাগলেন সুদারল্যান্ড। কারণ, ভেঙে পড়ার মত লোক তিনি নন। তাঁর মন্তব্য, 'হার্ভে যখন আবিষ্কার করেন হৃদপিণ্ডের মধ্যে দিয়েই শরীরের সারা অংশে রক্ত সংবাহিত হয়, এবং ঐ সময় হার্ভের পাশে আমিও যদি উপস্থিত থাকতাম, ব্যাপারটাকে প্রথম দিকে আমার কাছেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হত। ঐ আবিষ্কার কোন ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে যে সাহায্য করতে পারে, সেটা বিশ্বাস করে নিতে আমারও সময় লাগত। সুদারল্যান্ডের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সম্ভবত এখানেই। প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে তিনি এক কথায় নস্যাৎ না করে, শুধু অপেক্ষা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হবেনই।

ক্রমে অবিশ্বাস স্তিমিত হয়ে এল। ১৯৬০-এর পর পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপক-ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল সাইক্লিক এ এম পি'র কার্য-কারিতার অনুসন্ধানে। বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসায় এর সাহায্যকারের ভূমিকার উপর পর্যবেক্ষণ চলতে লাগল। সকলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ সুদারল্যান্ডের 'সেকেণ্ড মেসেঞ্জারের' ভূমিকাকেই কেন্দ্র করে।

পরবর্তীকালে অন্যান্যরাও লক্ষ করলেন প্রাণীকোষের বহিরাংশের স্তরের উপর উপস্থিত হয়ে হরমোন যখন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তখন সেখানে অ্যাড্রেনাইল সাইক্লেজ নামের হরমোন উদ্দীপিত হয়। এই অ্যাড্রে-নাইল সাইক্লেজ সাইক্লিক এ এম পি সংশ্লেষণে সাহায্য করে। পরে সেখানে সাইক্লিক এ এম পি'র মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজাইম সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই এন-জাইম অতঃপর হয় হরমোনের সঙ্গে প্রতি-ক্রিয়া করে আকাঙ্ক্ষিত কোন জীবরাসায়নিক কার্যকলাপ চালায় অথবা অন্য কোন রকমের এনজাইমকে উদ্দীপিত করতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা গেল, সাইক্লিক এ এম পি-ই মুখ্যত 'এসচেরিয়াসিয়া কোলি' (Escherichia coli) নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার দেহে বিটা-গ্যালাকটোসাইডেজ নামে এক ধরনের এনজাইম সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রিত করে। মেরিল্যান্ডের বেথেসডাস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর এক দল বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারটি সমর্থন করে-ছেন। দলটির নেতৃত্ব করেন ডঃ এইচ ই ভারমুস। সম্প্রতি বলা হয়েছে, সাইক্লিক এ এম পি শরীরের ক্ষুদ্রান্ত্রে জলের এবং তড়িৎবিশ্লেষ পদার্থের ঘাটতি ঘটানর ব্যাপারে সাহায্য করে। এবং বোস্টন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জিওফ্রে ডব্লু জি সার্প এবং স্ক্রিটাস হাইনি দেখিয়েছেন এর ফলে কঠিন ডায়েরিয়া বা উদরময় রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, শরীরে গ্লাইকোজেন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও

পরিবর্তিত বা দুষ্ট কোষ কলা **স্বাভাবিক কোষ কলা**

সাইক্লিক এ এম পি'র ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়। প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে টি বোনার, ডঃ ই এম হল এবং ডক্টর সাচসেন-মায়ার দেখিয়েছেন এই বস্তুটি অ্যামিবার কাজকর্ম করার ক্ষমতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু আরও চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন গাইস হসপিটাল মেডিকেল স্কুল এবং টুটিং বেক হসপিটালের দুজন বিজ্ঞানী যথাক্রমে ডঃ ওয়াই এইচ আবদাল্লা এবং ডঃ কে হ্যামাডো। এঁদের বক্তব্য মানসিক রোগ মানসিক ডিপ্রেসিভ-এর সঙ্গে সাইক্লিক এ এম পি'র প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের মতে ডিপ্রেসিভ বা মানসিক অবসাদে যাঁরা ভোগেন তাঁদের শরীরের প্রতিটি কোষে সাইক্লিক এ এম পি'র মাত্রা দারুণভাবে কমে যায়। আবার কোষে যদি এই বস্তুটির মাত্রা বেড়ে যায় তা হলে তা 'ম্যানিয়া' নামক মানসিক রোগ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। পরীক্ষা করে এই বক্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন। ফলে মাঝে ওই ধরনের রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে সাইক্লিক এ এম পি'র উপর চিকিৎসকরা অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশ্য সম্প্রতি কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে লিথিয়ামের কার্যকারিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। ডি এন এ-র কার্যকারিতার উপরও যে সাইক্লিক এ এম পি যথেষ্ট সক্রিয় সে সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন এ ডি রিগস, জি রাইন্সে এবং জি জুবে। এঁদের প্রথম দুজন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষের জন নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের।

বেথেসডার ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হেলথ-এর বিজ্ঞানীরা আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনা লক্ষ করেছেন। ওঁরা দেখেছেন কোন কারণে শরীরের কোষকলা যখন পরিবর্তিত হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন সেল ট্রান্সফরমেশন তখন তারা আর স্বাভাবিক কোষকলার মত নিজের ধর্মাবলী অটুট রাখতে পারে না। ঐ সমস্ত কোষের **বিপরীত কার্যাবলীও পালটে যায়। বরং** বলা চলে তারা অস্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম শুরু করে। এর আগে দেখা গেছে সাইক্লিক এ এম পি এবং তার সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু যোগ কোন কোন টিউমার কোষকলার বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। অথচ স্বাভাবিক কোষের ক্ষেত্রে তেমন কিছুই করে না। এও দেখা গেছে 'পলিওমা-ট্রান্সফরমড' কোষে অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ নামে এক ধরনের এনজাইমের পরিমাণ অনেক সাধারণ কোষের চেয়ে কম। উল্লেখ্য, এই এনজাইম সাইক্লিক এ এম পি তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করে।

যেমন ধরুন সাধারণ এবং স্বাভাবিক ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ মাকুর মত দেখতে এবং লম্বাটে। তাদের অক্ষগুলি প্রায় এক দিক বরাবর মুখ করে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করার সময় একটি নির্দিষ্ট আয়তন পাওয়ার পর তার কোষ কলা আর বাড়তে পারে না। কিন্তু পরিবর্তিত বা দুষ্ট কোষগুলি কতকটা গোলাকার এবং বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তার কোষ কলায় থেমে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এতে করে মনে হয় সুস্থ এবং স্বভাবিক কোষে এমন কোন কিছু আছে যা কোষকলা একটি নির্দিষ্ট আকার পাওয়ার পর উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত কোষকলা একটি নির্দিষ্ট আকার পাওয়ার পরিবর্তিত কোষে তার অভাব থাকে। জনসন ইঁদুরের দেহ থেকে টিউমার কোষ সংগ্রহ করে তাতে উপযুক্ত পরিমাণ সাইক্লিক এ এম পি মিশিয়ে দেন। এবং প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ঐ অবস্থায় রাখার পর লক্ষ করেন অস্বাভাবিক কোষগুলি যেন প্রায় স্বাভাবিক কোষের মতই কাজকর্ম শুরু করেছে। যৎসামান্য ত্রুটি ছাড়া। অর্থাৎ নানাভাবে এবং নানা দিক থেকেই পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী সুদূর-

ল্যাণ্ডের আবিষ্কারটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং অবশেষে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন, তার 'সেকেণ্ড মেসেঞ্জার'টিকে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শরীরের বিপাকীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের প্রথম দূত যদি হরমোন হয়, তাহলে সাইক্লিক এ এম পি-ই হবে দ্বিতীয় দূত। এবং দৈত্য-কর্মে তার দায়িত্ব অপরিসীম।

অতএব বলা চলে সুদারল্যাণ্ডের আবিষ্কার অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি, যেমন ডায়েবেটিক, ম্যানিক ডিপ্রেসিভ, টিউমার, কলেরা প্রভৃতির নিরাময়ে সাহায্য করবে বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে, সাইক্লিক এ এম পি প্রাণীকোষের সর্বত্রই উপস্থিত থাকে। তার পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর নির্ভর করে কোষের কার্যকলাপ। এই বস্তুটির যথাযথ পরিমাণটুকু যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে ব্যাধির প্রকোপ রোধ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী কিছু ওষুধও বের হয়ে গেছে।

তবু এই মানুষটির একটি ব্যক্তিগত দিকও রয়েছে। কান-এর বার্লিংগেম-এ উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর হাতে এসে পড়ে পল দ্য ক্রুইফস-এর লেখা বই 'মাইক্রোব হান্টারস'। ঐ গ্রন্থেরই 'মাইক্রোব হাণ্টারস' অর্থাৎ 'জীবাণুঘাতক' নামে অধ্যায়টি তাঁকে তখনই অনুপ্রাণিত করেছিল। তখন থেকেই তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা করার আকাঙ্ক্ষার শুরু। পরে মার্কিন দেশের ব্যাপক মন্দার বাজারে বাবার সমস্ত পয়সা-কড়ি নিঃশেষ হয়ে যায়। পরিবার তখন সম্বলহীন অবস্থায়। কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুদারল্যাণ্ড। অতএব স্কলারশিপ বা অ্যাসিস্টেন্টশিপের অভাব হল না। এবং তারই সাহায্যে প্রথমে টোপেকার ওয়াশবার্ন কলেজ, পরে সেণ্ট লুইস-এর ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের দরজাও পার হয়ে গেলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিকিৎসক হিসেবে সেনাবিভাগে নাম লেখানো। যুদ্ধকালীন কাজকর্মের জন্যে পৃথিবীর বহু জায়গাতেই তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে আবার ফিরে আসেন তাঁর পুরনো সাধনপীঠ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। শুরু হল গবেষণার কাজ। গুরু প্রখ্যাত নোবেল বিজ্ঞানী কার্ল ফার্দিনান্দ কোরি।

সুদারল্যাণ্ডের জনৈক সহকর্মী মন্তব্য করেছেন, 'যদি বলেন, সুদারল্যাণ্ড নারুন পড়ুয়া বা পণ্ডিত, তাহলে ভুল বলা হবে।' আসলে সমস্ত কাজেই ওঁর মধ্যে সক্রিয় থাকে নিজস্ব অনুপ্রেরণা। বরং বলা চলে একজন শিল্পীর চরিত্রই তাঁর মধ্যে বেশি প্রকাশিত। যখন কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন সেই সময়েই তিনি সাইক্লিক এ এম পি আবিষ্কার করেন।

শিক্ষক হিসেবে কেমন ছিলেন?

মোটেই ভাল নয়। ও কাজটি ওঁর কখনই ভাল লাগেনি।

১৯৬৩ সালে সুদারল্যাণ্ড পরিবারের ভ্যাণ্ডারবিল্টে আগমন। এখানেই ওঁর মূল্যবান মুহূর্তগুলি কেটেছে বিজ্ঞান গবেষণায়। এখনও কাটছে।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, এখন কী রকম মনে করছেন?

উত্তর, মজার ব্যাপার বইকি? তার জন্যে আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি হিসেবে সুদারল্যাণ্ড সব সময় চটপটে এবং আমুদে। অথচ নির্ভীক এবং প্রচণ্ড আত্মসচেতন।

সমরজিৎ কর

পাহাড়ী সান্যাল

আমার অতুলপ্রসাদ

॥ পাঁচ ॥

এর পর একটি অদ্ভুত কথা আমার মনে পড়ছিল। মিস্টার সেনের ওখানে সেই সন্ধ্যাটা কাটাবার ফলে আমার মনে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর দারিদ্র্য অনুভব করতে লাগলাম। গান আমাকে এখানে ওখানে সেখানে গাইতে হত, বাঙালীদের মাঝে বাংলা গান আমি নির্ভয়ে গাইতামও, কিন্তু এখন দেখলাম যে বাংলা গান আর নিঃসংকোচে গাইবার ক্ষমতা আমি হারিয়েছি। শুধু বাংলা গান নয়, গান গাইতে গেলেই কোথায় যেন মিস্টার এ পি সেনের চেহারাটা ভেসে উঠত আর মনে হত গান গাওয়ার স্ফূর্তিটাই যেন হারিয়েছি।

তার কারণটা আজকে আমি বুঝতে পারি। সেটা হল যে অতুলপ্রসাদের সেই সৌম্য অসামান্য ব্যক্তিত্ব আমার বার-তের বছরের জীবনটাকে কেমন যেন ভাঙতে শুরু করেছিল। সেই সন্ধ্যায় সাক্ষাতের পর তাঁর সঙ্গে প্রায় মাসাধিককাল দেখা হয়নি। এর মধ্যে প্রায় ভেবেছি কবে আবার মিস্টার এ পি সেনকে দেখতে পাব। কাজেই আমার মেলামেশা বলা-কওয়ার মাঝখানে মিস্টার এ পি সেন কেমন যেন আমাকে জ্বালাতন করে তুলছিলেন। এটা হয়তো প্রেমের কাহিনীর অংশ বলে মনে হতে পারে, এবং প্রেম যে নিশ্চয়ই সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ধারাটা ছিল নিতান্তই অন্য রকম। মিস্টার এ পি সেনের কথা ভাবতে গেলেই কেমন করে যেন আমার বাবার কথাগুলো তার মাঝে মিলেমিশে যেত। আজ বুঝতে পারি, সেদিনকার ওই ভাবটা ছিল আমার সেই কিশোর মনের শূন্যতার অভাবপ্রসূত।

শূন্যতার কথা বলতে গিয়ে আমি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার একটি অদ্ভুত ঘটনা আপনাদের জানাতে চাই। জানাবার আগে আপনাদের কাছে আর একটি অনুরোধ এই যে, যে-কথাগুলো আমি লিখতে চলেছি সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি যে এর থেকে বড় সত্য ঘটনা আমার জীবনে কমই ঘটেছে। এই ঘটনাটির কথা ভাবলে আজকেও একটা অদ্ভুত দুঃখময় আনন্দ অনুভব করি।

এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখের কথা জানাই। শ্রীযুক্ত কল্যাণ বসু নামক এক ভদ্রলোক—যিনি অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে "আমারে এ আঁধারে" বইখানি লিখেছেন—তিনি এক সময় অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য আমার কাছে আসেন। যে ঘটনাটি আমি লিখতে চলেছি, কল্যাণবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় সে ঘটনার সামান্য একটু ইংগিতমাত্র দিয়েছিলাম। তিনি সেটিকে ফুলপাতা গজিয়ে নিজের মনের মত করে লিখে আমার উক্তি বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এটাতে হয়তো

তার কিছু আসে যায় নি, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।

এবার যে কথা বলছিলাম। তখন মিস্টার এ পি সেন থেকে অতুলপ্রসাদ আমার "অতুলদা' হয়েছেন। বারো থেকে আরো পাঁচ-ছ বছর অতিক্রম করে তখন আমার আঠার উনিশ বয়স হয়েছে। আমি তখন ইণ্টার-মিডিয়েট পড়ি। সেই সময় একবার মণ্টুদা শ্রীদিলীপকুমার রায়) লখনৌতে এল এবং তার নিজের রচিত একটি গান যেটির প্রথম ছত্র হল—"যদি দিন না নেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়া"—এই গানখানি আমাকে খুব যত্ন করে শেখালো। আমার অসম্ভব ভাল লাগল শিখতে এবং শিখে আমি অতুলদার কাছে গানখানি গাইলাম। মণ্টুদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

গানটি গাইবার পর মণ্টুদার মুখে প্রশান্ত সন্তুষ্টি। অতুলদা উচ্ছ্বসিত। অতুলদা বললেন যে, "চমৎকার—চমৎকার। একটা সত্যিকারের সুন্দর কম্পোজিশন। সুরটাও তেমনি হয়েছে।" তারপর অতুলদা বললেন, "আবার গাও তো পাহাড়ী—"

তখন আমি মণ্টুদাকে আমার সঙ্গে গাইতে অনুরোধ করে আমরা দুজনে মিলে সমীমায়িত অলঙ্কার এবং বিন্যাস যোগ করে গানখানি গাইলাম।

তখনকার দিনে মণ্টুদার গলা প্রায় অতুলনীয়। কাজেই মণ্টুদাতে আর আমাতে বোধ হয় একটা ভাল পরিবেশের সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। গান শোনার পর আমাকে আর মণ্টুদাকে জড়িয়ে ধরে অতুলদা যে কী প্রশংসা করেছিলেন তা আজ ভাবলেও আনন্দ হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি যে, অতুলদার সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুদার কণ্ঠ এবং সংগীত আমাকে এমন আকৃষ্ট করেছিল যে তাঁকেও আমি বাংলা গানের ব্যাপারে আমার আদর্শ বলে মনে করেছিলাম। আজও করি। কিন্তু আজকের মণ্টুদাকে নয়, সেদিনকার মণ্টুদাকে।

মণ্টুদাকে অতুলদা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার থেকেও অনেক বেশি। যার জন্য যখনই মণ্টুদা লখনৌয়ে আসত, যতদূর মনে পড়ে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অতুলদার কাছেই উঠত। আর সেই সব সময় অতুলদার বাড়িটা একটা Carnival of Music & Culture হয়ে উঠত। অর্থাৎ কিনা সংগীত এবং সংস্কৃতির একটা মেলা বসে যেত। বলাই বাহুল্য, আমাকেও তার থেকে বাদ দেওয়া হত না।

মণ্টুদার কাছ থেকে আমি অনেক গান শিখেছি এবং সে সব গান গেয়ে অনেকের কাছে, বিশেষ করে অতুলদার কাছে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছি। কাজেই 'যদি দিন না নেবে' গানখানি অতুলদাকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বোধ হয় আর আপনাদের বলে দিতে হবে না।

আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে যে, যদিও অতুলদা আমাকে আঁকড়ে ধরে গান শেখাতেন তা সত্ত্বেও যদি অন্য কারও কাছ থেকে গান শিখে তাঁকে শোনাতাম তবে তিনি তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। এতে করে আমি বুঝতে পারতাম যে অতুলদা আমার কাছ থেকে শুধু তাঁর শেখানো গান শুনতেই ভালবাসতেন না, গানটাকেই তিনি সত্যিকারের ভালবাসতেন। এমন সংগীত-রসিক এবং এমন সংগীতপিপাসু জীবনে বোধ হয় কমই দেখেছি। তাঁর সঙ্গে নানান রকম মান-অভিমান আমার হয়েছে। যে ঘটনাটি লিখতে চলেছি সেটি এই মান-অভিমানেরই একটা পালা।

আমি আজ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে অতুলদা আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন, আর সেই জন্যেই তাঁর গানগুলো অমন উৎসাহিত হয়ে আমাকে শেখাবার চেষ্টা করে-ছিলেন। আমার দিক থেকে বয়সটা ছিল আমার প্রতিবন্ধক। কাজেই তাঁর ভালবাসার মূল্য বুঝতে পারিনি। অবহেলাই করে-ছিলাম। আমি তাঁর কাছে স্বার্থের জন্য যেতাম বটে, সে স্বার্থটা হল গান গেয়ে তাঁকে কৃতার্থ করা, অতএব কিনা নিজেকে বড় করে ভাবা। তাঁর কাছে যে সব বড় বড় মানুষেরা আসতেন সেই নিয়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে চাল দেওয়া আর নিজেকে বড় মনে করা। অতুলদার ওখানে

গাওয়ার সঙ্গে খাওয়ার পর্বটাও কম স্বার্থের ব্যাপার ছিল না।

আমার সঙ্গে অতুলদার যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল সেটা লিখতে বসে আমার মনোবৃত্তির তুচ্ছতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি না করে পারি না। আপনারা বিশ্বাস করুন, আজ আমি অতুলদাকে সত্যিই ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে পেরেছি, তাঁকে অন্তরঙ্গ করে পেয়েছি। জীবনে স্বপ্নে আমার বাবাকে, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে এবং অতুলদাকে দেখতে চেয়েছি। স্বপ্নে দেখেছি বাবাকে, ভোরবেলায় যেমন তিনি বসে ভজন গাইতেন আর আমি তাঁর কোলের কাছে শুয়ে থাকতাম। স্বপ্নে দেখেছি অতুলদাকে কত অন্তরঙ্গভাবে কত নিবিড়ভাবে দেখেছি তা কাউকে বলে বোঝান যায় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে স্বপ্নে আজও দেখতে পাইনি, বাবাকেও অনেকদিন দেখিনি, কিন্তু অতুলদাকে আজও কখনো কখনো স্বপ্নে দেখতে পাই। তার কারণ বোধ হয় অতুলপ্রসাদকে নিয়ে আজকের দিনে এত আলোড়ন, এত উৎসাহ, তাঁর কথা চারিদিকে বেশি শুনতে পাই, তাই হয়তো তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পাই। অতুলপ্রসাদ আজও সত্যিই আমার কাছে জীবিত, ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ।

গান-বাজনা আমি বাইশ-তেইশ বছর ধরে সেটাই করিনি, যার জন্যে অতুলদার কাছে শেখা বহু গান ভুলেও গিয়েছি না। কিন্তু আজ তিন-চার বছর ধরে নিজেকে গান শোনাতে বড় ভাল লাগে। কাজেই প্রত্যহ বসে গানের অভ্যাস করি এবং অতুলদার শেখানো যে গানগুলি ভুলে যেতে পারিনি সেগুলি নিবিড় হয়ে গাই, হাসি, কাঁদি। একটা বিরাট অস্তিত্বের মাঝে একটা প্রগাঢ় শূন্যতা অনুভব করি।

শূন্যতার কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, একটি ঘটনা জানাবার প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়ে রেখেছি। তাই সেখানেই ফিরে আসা যাক। অতুলপ্রসাদ তাঁর জীবনের শূন্যতাকে কিভাবে ভরিয়ে তুলতে চাইতেন এ-ঘটনাটি আমার মনে হয় তার পরিচায়ক।

মন্টুদা অনেকদিন হল কখনো থেকে চলে গেছে। অতুলদার সঙ্গে যেমন মাঝে-মাঝে সাক্ষাৎ হয় তেমনই হচ্ছে। কখনো তিন দিন অন্তর, কখনো সাতদিন অন্তর, কখনো বা পনের দিন অন্তর। আমার তখন সময় কোথায়! এরই মধ্যে একদিন অতুলদা হঠাৎ চিঠি লিখে পাঠালেন : আজ সন্ধ্যাবেলায় এলে খুশী হব। আমার কাছেই খেয়ো।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই তো, অতুলদা বলে কেউ একজন আছেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অতুলদা খুব খুশি। বললেন, "আজকাল তো তুমি আসতেই চাও না।"

উত্তরে আমি আমতা আমতা করে কি বলেছিলাম মনে নেই।

চায়ের অর্ডার দিয়েই অতুলদা উচ্ছ্বসিতভাবে আমায় বললেন, "তোমাকে আজ আমি খুব সুন্দর একটা গান শেখাব।"

অতুলদাকে যত অবহেলাই করি না কেন, যে সময়টুকু তাঁর কাছে গান শিখতাম বা তাঁকে গান গেয়ে শোনাতাম সে সময় যেন কোথা থেকে নিষ্ঠা এসে আমায় ঘিরে ধরত। তার মধ্যে কোন ফাঁকি বা অবহেলা কোনদিনও থাকেনি। কারণ সংগীতটা আমি ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবেই পেয়েছিলাম। কাজেই সংগীতের নিষ্ঠাসূত্র কোনদিন ছিঁড়ে যায়নি।

অতুলদা গান শেখাতে উৎসাহী হলে কি হবে, গান শিখতে বসার ইচ্ছেটা তখন আমার আদৌ নেই। কারণ তার পরের দিনই আমায় বাংলাদেশের দিকে রওনা হতে হবে। কারণ দ্বিজুদার বিয়ে। দ্বিজুদা অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল—যে নামটা পাঠকদের মধ্যে অনেকেই চিনতে পারবেন। কারণ তিনিও অতুলপ্রসাদের কম অনুরাগী নন। দ্বিজুদা আমার দাদা তো বটেই, কিন্তু তারও বেশি সে আমার বন্ধু। আমার গান-বাজনার ব্যাপারে দ্বিজুদা আমাকে যেভাবে উৎসাহিত করেছিল, যেভাবে সহায়তা করেছিল সে কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে সর্বাংশে স্বীকার না করলে অধর্ম হবে। তাই এটুকু বলে রাখলাম।

দ্বিজুদা বিয়ে করতে যাবে, উপরন্তু বাংলাদেশ দেখতে পাব, তার জন্যে মনে যেমন বা চাঞ্চল্য তেমনই বা শিহরণ। তাই অতুলদাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বললাম, "অতুলদা, আজ থাক। কালকেই শ্রীরামপুরে যাচ্ছি আমার দাদার বিয়েতে। বাড়ি গিয়ে গোছগাছ করতে হবে। আমি ছ-সাতদিন পরে ফিরেই সোজা তোমার কাছে এসে গানটি শিখে নেব।"

আমি যে কতবড় মূর্খ তার পরিচয় দিয়ে বসলাম। অতুলদা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "ও—তাই নাকি। হ্যাঁ, বিয়েটা একটা নিশ্চয়ই ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। কাজেই তোমার এক্সাইটেড হওয়াটা আশ্চর্য নয়।...তা হলে সময় পেলে তুমি এসো।"

এর পরে আবহাওয়াটা কেমন যেন সুখকর রইল না। অতুলদাও কেমন যেন খাপছাড়া কথাবার্তা বললেন আর আমিও তেমনি খাপছাড়াভাবে উত্তর দিয়ে গেলাম। যদিচ আমার দুঃখ হল এই কথা ভেবে যে অতুলদার মনে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু তারও উপরে ছাপিয়ে ছিল বাংলাদেশে যাবার চাঞ্চল্য, কাজেই বোধ হয় অতুলদার ব্যথাটাকে তেমন আমল দিলাম না।

যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পর যখন চলে আসছি তখন অতুলদা বললেন, "আশা করি

তোমার দাদার বিয়ের পর তুমি আমার কাছে আসবে।"

আমিও বোধ হয় খুব একটা বড় ধরনের 'নিশ্চয়ই' বলে চলে এলাম।

বরযাত্রী সেজে শ্রীরামপুরে এসে দাদার বিয়েতে যোগ দিলাম। নতুন সুন্দরী বৌদিকে পেয়ে আরোই আপ্লুত বোধ করলাম। তা ছাড়া সব সময় মনের মধ্যে একটা আনন্দের ব্যস্ততা রয়েছে যে এইবার কলকাতা শহর দেখতে পাব। কলকাতা শহর তখন আমার কাছে 'ওয়ান অব্ দি মিরাকিউলাস ওয়াণ্ডার্স অব্ দি ওয়ার্ল্ড'। ওই আঠার-উনিশ বছর বয়সেও কলকাতার পথে বেরিয়ে কেমন যেন নিজেকে পাঁচ বছরের শিশু বলে মনে হত, আর ভাবতাম, পৃথিবীতে এমন শহরও আছে। লখনৌ ফিরবার পথে মনটা কেমন যেন হাহাকারে ভরে গেল।

দাদা-বৌদি-বরযাত্রী সব একত্রে লখনৌয়ে তো ফিরলাম। হিসেবমত আমার তখন অতুলদার কাছে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হিসেব মেলাতে মন তখন আমার রাজী নয়। ফলে অতুলদা কোথায় হারিয়ে গেছেন।

বৌভাতের ব্যস্ততা, নতুন বৌদিকে নিয়ে ব্যস্ততা; উপরন্তু আমার বড়দা—যিনি তখন দিল্লিতে পোস্টেড ছিলেন—চিঠি লিখে জানিয়েছেন বৌভাতে উপস্থিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না; কিন্তু দ্বিজুদা আর তাঁর স্ত্রী যেন দিল্লিতে তাঁর কাছে গিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে। আরও লিখেছেন, 'পাহাড়ীকে নিয়ে এসো, জমবে ভাল।'

যদিও তখন আমার কলেজে পড়া-পড়া খেলা চলছে, কিন্তু পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়াটা আমি পুণ্য বলে মনে করতাম; কাজেই দ্বিজুদার সঙ্গে দিল্লি চলে যাওয়া বিশেষ শক্ত হল না। তখনকার দিনে বিলাতি ইনস্টিটিউশনগুলোতে 'খ্রস্টমাস'-এর ছুটিটা একটু লম্বাই হত। তা সত্ত্বেও কামাইটা অনেক দিন ধরে করেছিলাম মনে আছে।

যথারীতি দিল্লিতে প্রচুর জমিয়েছি। প্রচুর জমেওছি। ফলে অতুলদার অস্তিত্বের কথা মনে রাখবার কোন কারণ খুঁজে পাইনি।

লখনৌ ফিরে এসেছি। দিল্লির ব্যাপারে মন-কেমনটা তখনও থামেনি। দাদা-বৌদিরা দিল্লিতেই রয়ে গেছেন। কাজেই ফিরে এসে আবার কলেজ যাবার ভণ্ডামিটাকে জোয়ালের মত ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছি। এরই মধ্যে আমাদের বেঙ্গলি ক্লাব অ্যাণ্ড ইয়ং-মেনস অ্যাসোসিয়েশন-এর একটা খেলার দিন নির্ধারিত হয়েছে। বলে রাখা ভাল, মিস্টার এ পি সেন অর্থাৎ শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন, অর্থাৎ আমার অতুলদা লখনৌ সমাজের যে কোন ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সে সামাজিক ব্যাপারেই হোক, ইউনিভার্সিটির ব্যাপারেই হোক আর আইন বা রাজনীতির ব্যাপারেই হোক। অতুল-

প্রসাদের জীবদ্দশায় তাঁর সে স্থান আর কেউ কোনদিন গ্রহণ করতে পারেনি। সমাজের ছিলেন তিনি মধ্যমণি, সেই সূত্রে বেঙ্গলি ক্লাব অ্যান্ড ইয়ংমেন'স অ্যাসোসিয়েশন-এর আনকাউনড্ কিং অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট। লখনৌয়ের সমাজে অতুলপ্রসাদের ঋণ আশা করি কেউ কোনদিন ভুলবে না। শোধ করার তো কথাই ওঠে না। তাঁর প্রতি আমার যে ঋণ তা শোধ করতে পারব না কোনদিন, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব না কেন!

থিয়েটারের দিনগুলোতে অতুলপ্রসাদের জন্য একটা বিশেষ আসন থাকত ফ্রণ্ট রো-তে। আর আমিও অবলীলাক্রমে তার পাশের সিটটাতেই বসে পড়তাম।

অতুলদার মনে যে বাথা দিয়েছি সে কথা ভুলেই গিয়েছি। নাটক যে-রাত্রে মঞ্চস্থ হবে সে-রাত্রে আমি অতুলদার বিশেষ আসনটির পাশে টুক করে গিয়ে বসে আছি। জানি, অতুলদা যখনই আসুন, যত-ক্ষু সময়ের জন্যই থাকুন না কেন—আসবেন তিনি নিশ্চয়ই। একথা শুধু আমি নয় সকলেই জানত। এবং যদি কখনো কোন সময় অতুলদা না এসে উঠতে পারতেন সে সিটটা কেমন যেন ম্লান হয়ে যেত। এটা শুধু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব নয়, তাঁর মনুষ্যের না-চাওয়া দাবি।

আমি প্রায় ছবির মত দেখতে পাচ্ছি, অতুলদার শূন্য আসনের (কারণ অতুলদা তখনো এসে পৌঁছাননি) পাশে বসে নিশ্চিন্তে নাটক দেখছি, হঠাৎ কেমন যেন নাকের মধ্যে একটা আনন্দের গুঞ্জন শুনতে পেলাম। চমক ভেঙে দেখলাম অতুলদা। চমৎকার একটি স্যুটের উপরে দামি আলস্টার পরা, মাথায় সুন্দর করে বাঁধা পাগড়ি, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি কেমন যেন সব ভুলে গিয়ে অতুলদাকেই দেখলাম, আর লাফিয়ে উঠে বললাম, 'এই যে অতুলদা, কেমন আছ?'

—আমি ভালই আছি। তুমি কেমন আছ?'
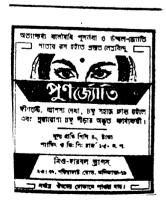
কথা শুনে মনে হল অতুলদা বুঝি আমাকে চেনেন না। আমি বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরেও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম আর একটু অপ্রস্তুত ভাব করে বললাম, 'বসো, অতুলদা, বসো।'

ততক্ষণে ক্লাবের কর্তৃপক্ষরাও সব ছুটে এসেছেন অতুলদাকে বসাবার জন্যে, এবং অতুলদা বসেই আমার দিকে দৃকপাত না করে যেন অত্যন্ত মন দিয়ে নাটক দেখতে শুরু করলেন।

সে সময় আমার মনের যে ভাবটা হয়েছিল সেটা আজও যেন অনুভব করতে পারি। কেমন যেন একটা অচেনা অভিমানে মনটা ভরে উঠেছিল। অথচ কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কেন এমনটা হল। দু-চারবার অতুলদার মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম কী সব যেন ফিসফিস করে বলে। অতুলদা খুবই উদাসীনভাবে দু-চারটে ছোট্ট অক্ষরের কথার মধ্যে দিয়ে কী যেন উত্তর দিলেন। আমি বুঝলাম অতুলদাকে ফেরানো যাবে না।

এই প্রহসনটা কতক্ষণ অবধি চলেছিল আমার ঠিক মনে নেই। হঠাৎ দেখলাম, অঙ্ক শেষের পর্দা পড়ল। তখন যাকে বলা হত ড্রপসিন। আমার কেমন যেন অতুলদার কাছ থেকে দূরে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করল। তাঁর ওই নির্লিপ্ততা আমার কাছে তখন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেমন যেন কান্না কান্না পাচ্ছে। তাই আমি সত্যিই ছুটে পালিয়ে গেলাম।

স্টেজের ভিতরে গিয়ে সকলের সঙ্গে কথায় হাঁ হুঁ বলে অনেক করে নিজেকে অন্য-মনস্ক করবার চেষ্টা করলাম। কোন লাভই হল না। অতগুলো সাজপোশাক পরা মানুষের মধ্যে কেমন যেন নিজেকে নিঃসঙ্গ বলে মনে হতে লাগল।

[ক্রমশ]

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ১৪ ॥

রদিকে একটা থমথমে ভাব। কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রান্তকারীদের তপ্ত বাসে করাচী লাহোর, ঢাকার বাতাস ভু হয়ে উঠলো। প্রতিক্রিয়াশীল-চক্র ফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়কে স্ত করতে পারলো না। ফলে, বলে লে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে গদিচ্যুত র প্রচেষ্টা শুরু হলো। পশ্চিম পাকি- ী সংবাদপত্রগুলি দিবারাত্র মুসলিম র অপগুলি ফেলনে যুক্তফ্রন্ট তথা গীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার অব্যাহত । পূর্ব বাংলার অবাঙ্গালীদের নিরা- ব্যাপারে এই সব উর্দু ও ইংরেজী ত্র কল্পিত কাহিনীতে ভরপুর হয়ে অথচ এ কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে া থেকে মাত্র আট মাইল দূরে নিগঞ্জে যখন মিল-মালিকদের কর- এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় শত শত ব্যক্তি লো, তখন ঢাকা শহরে সামান্যতম ছিল না। ঢাকার জীবনযাত্রা পূর্ণ ক ছিলো। তবুও করাচীর প্রাসাদ- রীরা কর্ণফুলী মিল ও আদমজী ঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গার ইন্ধন পূর্ব বাংলায় আইন ও শৃংখলা ভেঙে বলে জিগির তুললো।

এমনি সময়ে কালাহান নামে এক- নী সংবাদদাতা করাচী থেকে 'নিউ মস'-এ একটা উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ লো। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী র প্রধানমন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে নী সাংবাদিক করাচীতে আস্তানা া। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠনের াহ কালের জন্য কলকাতা সফরে লী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত যে া বলেছিলেন, সেই সব বক্তব্যের কালাহান লিখলেন যে, 'ফজলুল ান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ চযন্ত্র করছেন।' নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ এই খবর ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করাচী-লাহোরের সংবাদপত্রগুলি উল্লসিত হয়ে উঠলো। এ ধরনের খবর লুফে নিয়ে করাচীর ইংরেজী 'ডন', উর্দু জং থেকে পেশোয়ারের 'খাইবার মেইল' কাগজ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করবার জোর দাবি জানালো।

শেরে বাংলার অপরাধ হচ্ছে, তিনি মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন: তিনি বাংলার মনুষ, বাংলার মাটি আর বাংলার ভাষাকে ভালোবেসে ছিলেন। তাই তিনি ভারত উপ- মহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হবার প্রায় সাড়ে ছ' বছর পর ১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তাঁর সেই চিরপরিচিত কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই বললেন, 'এই কলকাতা শহরে ষাট বছরেরও বেশী আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় দিনগুলো কাটিয়েছি। সে সব দিনের কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে।' তিনি আরও বললেন, 'বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু-ভাগ হয়েছে সত্য, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উভয় বাংলার মাঝে কোনই ফারাক নেই।'

শেরে বাংলার সঙ্গে এলেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, দশ বছরের সন্তান আর ভাগনে ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সৈয়দ আজিজুল হক। নিয়তির পরিহাস, ষোল বছর পরে সেই আজিজুল হক সত্তুরের সাধারণ নির্বাচনে বরিশাল থেকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। আর শেরে বাংলার একমাত্র বংশধর ফয়জুল হককে এবারের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু নিজে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র দিয়ে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে মার্চ ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার বর্বর হামলার পর ফয়জুল হকই দালাল রাজনীতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শেরে বাংলা ফজলুল হক যেখানে জীবনে বহুবার অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েও কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি, সেখানে তাঁরই পুত্র মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই প্রথম হামলার মুখে ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আর সৈয়দ আজিজুল হক গভর্নর মালেকের আওতায় ভূয়া উপনির্বাচনে বিনা প্রতি- দ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে শোষকচক্রের

ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। অথচ গোপালগঞ্জের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে যে সন্তান একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো, সেই সন্তানই পরবর্তীকালে শেরে বাংলার সান্নিধ্যে এসে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বাঙ্গালীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজ সাড়ে সাত কোটি মানুষের নয়নমণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হিসাবে ইতিহাসে স্থান লাভ করলেন।

কলকাতায় এই স্বল্পকালীন সফরকালে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, 'বাংলার মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙ্গালী জাতির উন্নতিই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য—একমাত্র লক্ষ্য।' বেঁচে থাকতে শেরে বাংলা তাঁর আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণ দেখে যেতে পারেননি বটে; কিন্তু তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী বাস্তবে রূপ দেবার জন্য নিজেদের স্কন্ধে নিয়ে এক মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন।

যাক, যা বলছিলাম। আদমজী দাঙ্গার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী করাচীতে তলব করে বসলেন। এর মধ্যেই পূর্ব বাংলার নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দও জঘন্য ভাষায় শেরে বাংলার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক পরিবেশটা বিষাক্ত করে তুললো। বাংলার গণতান্ত্রিক মহল থেকে এসব বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করা হলো। তবুও তিরিশে মে তারিখে মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী করাচী থেকে এক বেতার ভাষণে শেরে বাংলাকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিযুক্ত করলেন। ফজলুল হক এই দিন তাঁর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—আতাউর রহমান খান, সৈয়দ আজিজুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে সঙ্গে করে ঢাকা রওয়ানা হলেন। পথে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে ঘণ্টাখানেক কাটাবার সময় শুধু বললেন, 'আমি কিছুই বলতে পারবো না—আমার মুখ বন্ধ।'

ঢাকার তেজগাঁ বিমান বন্দরে নামবার সঙ্গে সঙ্গে জনাব হক জানতে পারলেন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে ৯২(ক) ধারার অর্থাৎ গভর্নরের শাসন চালু করেছেন। পূর্ব বংলার পথে-প্রান্তরে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। সাধারণ নির্বাচনে বাঙ্গালী জনসাধারণের একচেটিয়া ভোটে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা মাত্র ৫৮ দিনের মাথায় বরখাস্ত হলো। গণতন্ত্রের প্রতি এর চেয়ে বড় প্রহসন আর কী হতে পারে? শেরে বাংলা ফজলুল হককে তাঁর কে এম দাস লেনের বাড়িতে অন্তরীণবদ্ধ করা হলো। আর বাংলাদেশের তারুণ্যের প্রতীক আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে কারান্তরালে পাঠানো হলো। পূর্ব বাংলার বুকে অত্যাচারের স্টীমরোলার নেমে এলো। সংবাদপত্রের উপর জারী করা হলো কড়া সেন্সারশীপ। হাজার হাজার ছাত্র-যুবক কর্মী বিনাবিচারে আটক হলেন। এঁদের সঙ্গে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। তৎকালীন প্রগতিশীল গণতন্ত্রী দলের প্রধান সিলেটের মাহমুদ আলীও গ্রেফতার হলেন। সতেরো বছরে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পদস্খলনের ফল হিসেবে সেই মাহমুদ আলী আজ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ক্রীড়নক হিসেবে জাতিসংঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। হায়রে রাজনীতি! একই সঙ্গে শেখ মুজিব ও মাহমুদ আলী মুসলিম লীগের কারাগারে দিন কাটিয়ে একজন বঙ্গবন্ধু হিসেবে ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছেন; আর একজন গণধিকৃত হয়ে মীরজাফরের ভূমিকায় নর্দমার কীটে পরিণত হয়েছে। মাহমুদ আলী আজ শুধু ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এদিকে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারী হবার পর মুর্শিদাবাদের মীরজাফরেরই বংশধর এবং পাকিস্তান সরকারের দেশরক্ষা সেক্রেটারী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা নয়া গভর্নর হিসেবে ঢাকায় এসে হাজির হলেন। সঙ্গে এলেন নয়া চীফ সেক্রেটারী হিসাবে পাঞ্জাবী অফিসার নিয়াজ মোহাম্মদ খান। অবিভক্ত বাংলায় দেশপ্রেমিকদের প্রতি এন এম খানের বর্বরোচিত ব্যবহার বৃটিশ অফিসারদেরও হার মানিয়ে দিয়েছিলো। ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর হিসাবে ঢাকায় এসেই তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, 'পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও ৩৮ হাজার বাঙ্গালী পুলিসকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে। শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে প্রয়োজন হলে আমি সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত লেলিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করবো না।' এ থেকেই মনে হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী যা করছে, তার মানসিক প্রস্তুতি পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ অনেক আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করবার সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন। তাই নয়া গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা হুংকার দিয়ে বললেন, "দেশদ্রোহী মওলানা ভাসানীর কোন স্থান পাকিস্তানে নেই। যদি মওলানা দেশে ফিরবার চেষ্টা করেন তবে আমি তাঁকে গুলি করবার জন্য একজন সুদক্ষ হাবিলদারকে পাঠাবো।"

রাজনীতির অপার মহিমা রয়েছে। মাত্র চার বছরের মধ্যেই এই ইস্কান্দার মীর্জাকেই দেশদ্রোহীতার অভিযোগে পাকিস্তান থেকে নির্বাসিত করা হয়। আর এই নির্বাসিতের জীবনযাপন করার সময় লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হলে সেই মরা লাসটা পর্যন্ত পাকিস্তানে কবর দেয়া সম্ভব হয়নি। সুদূর তেহরানে ইস্কান্দার মীর্জার কবর হয়েছে। আর মওলানা ভাসানী এখনও পর্যন্ত বাংলার আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মুক্তির সংগ্রাম করে চলেছেন। (ক্রমশ)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে অধ্যাপক সাইমন কুজনেৎস

এ বছরের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক সাইমন কুজনেৎস অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে যে মৌলিক বিশ্লেষণ করেছেন তার কয়েকটি দিক আলোচনা করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব কিরূপ হওয়া উচিত, সে প্রসঙ্গে অধ্যাপক কুজনেৎসের অভিমত হল, উন্নতি-কামী বা উন্নয়নশীল দেশগুলির বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হতে পারে। শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানসম্মত ধারণা করা সম্ভব নয়। অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন মূলত একটি পরিমাণসূচক ধারণা (Quantitative concept), এবং যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ করা যায় সেজন্য নির্ভর করতে হয় জনসংখ্যা ও জনপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর। জন-সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অধ্যাপক কুজনেৎস গুরুত্ব আরোপ করেছেন মৃত্যুহার হ্রাসের উপর; কেননা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মৃত্যুহার হ্রাস সম্পর্কযুক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি লক্ষণ এবং এই অভিমত যে প্রকৃত তথ্যের উপর নির্ভরশীল তা বোঝা যেতে পারে ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে তাকালে। কুজনেৎসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কৃষি থেকে শিল্প ক্ষেত্রের প্রতি ধাবিত হবার জন্য শ্রমিক-দের প্রবণতা এবং গ্রামগুলির শহরে রূপান্তরিত হবার প্রবণতার ফলে শিল্প-কাঠামোয় পরিবর্তন সূচিত হয়। কোন উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা অধ্যাপক কুজনেৎস উল্লেখ করেছেন তাঁর বিখ্যাত "Toward a Theory of Economic Growth" প্রবন্ধে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হল, (১) স্থূল মূলধন সৃষ্টি (Gross Capital Formation) স্থূল জাতীয় আয়ের (Gross National Income) ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ হয়ে থাকে—কিন্তু, নীট মূলধন সৃষ্টি নীট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ হয়ে থাকে। (২) শিল্পোন্নয়নের পূর্ববর্তী স্তরে মূলধন সৃষ্টির হার অপেক্ষাকৃত দ্রুত-তর হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেমন একটি স্তরে খুব বেশি হয়ে থাকে, তেমনি একটি স্তরে মূলধন সৃষ্টির হারও বেশি হয়ে থাকে। (৩) উন্নতির পথে কোন দেশ দ্রুত অগ্রসর হবার পর মূলধন-উৎপাদন অনুপাতে (Capital-output Ratio) স্থিতিশীলতার লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, প্রভৃতি দেশে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল।

অধ্যাপক রসটো (Professor Rostow) অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে উত্তরণ পর্যায়ের (take off stage) যে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন (যেমন, জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ বিনিয়োগ, এক বা একাধিক শিল্পক্ষেত্রে সংযুক্ত উন্নয়ন হয়, এবং উন্নয়নের অনুপ্রেরণা কাজে লাগাবার মত রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো যার ফলে উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারে), অধ্যাপক কুজনেৎস তার সঙ্গে আরও তিনটি যুক্তি সংযোজিত করেছেন। ডক্টর কুজনেৎসের মতে জাতীয় আয়ের এবং স্থির মূল্যসূচীর ভিত্তিতে জনপ্রতি আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উত্তরণ স্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। কুজনেৎস আরও মনে করেন, রসটোর (Rostow) মতে বস্ত্রশিল্প, অথবা কোন কোন গুরুভার শিল্পের উন্নতি যদি উত্তরণ স্তরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তবে তা হবার কারণ হল সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির তৈরি জিনিসের জন্য বর্ধিত চাহিদা, শিল্প-গুলির উৎপাদন কৌশলের উন্নয়ন, শিল্প-গুলিতে উৎপাদকের বেশি লাভের আশা ও সেই লাভের অংক পুনর্বিনিয়োগ করার সুযোগ, এবং এই শিল্পগুলির সম্প্রসারণের ফলে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে কলা-কৌশলের পরিবর্তন ও উন্নয়ন। উত্তরণ-স্তরটি প্রকৃতপক্ষে স্বল্পকালীন এবং কুজনেৎস মনে করেন, উত্তরণ স্তর এবং তার পরবর্তী স্তরের মধ্যে দূরত্বের সীমারেখা টানা খুবই কঠিন। কুজনেৎসের যুক্তি অনুযায়ী কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কতটা এগিয়ে গেছে তার আরও বাস্তবভিত্তিক ও তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। কয়েকটি চিরাচরিত মাপকাঠির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে বিবেচনা করা দরকার, সংশ্লিষ্ট দেশটি কী অবস্থায় এবং কী পরিবেশে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ যে দেশগুলি খুবই উন্নত তাদের প্রাক উত্তরণ স্তরের অবস্থা এবং বর্তমানের উন্নতিকামী দেশগুলির প্রাক উত্তরণ স্তরের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য প্রচুর রয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংলন্ডে যখন উত্তরণ-স্তর শুরু হয় তখন জনসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপ ইংলন্ডের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করেনি। কিন্তু বর্তমানে ভারতের উত্তরণ-স্তর শুরু হবার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারাকে ব্যাহত করছে। ইংলন্ড যে বিরাট সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তৈরি বাজারের সুযোগ পেয়েছিল, বর্তমান বিশ্বের কোন উন্নতিকামী দেশই সেই সুযোগের অধিকারী নয়।

অধ্যাপক কুজনেৎসের "Economic Growth and Structure" বইয়ে যে প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে, তার প্রতিটিই অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তব দিকের উপর আলোকপাত করেছে। তাঁর অন্যান্য বইগুলিও, যেমন "Economic change," "Capital in

the American Economy," "Postwar Economic Growth," "Modern Economic Growth" "Economic Growth of Nation,"— সবগুলিই অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথ্যনিষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কৃষি-প্রধান দেশগুলিও যে কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে, কুজনেৎস তাও দেখিয়েছেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান হল (১) উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কিত (Product Contribution), (২) দেশের ভিতর এবং বাইরে কৃষিজাত সামগ্রীর নতুন বাজার সৃষ্টি বা বর্তমান বাজারের সম্প্রসারণ সম্পর্কিত (Market Contribution) এবং (৩) একটি ক্ষেত্র থেকে আরেকটি ক্ষেত্রে শ্রম-শক্তির স্থানান্তর সম্পর্কিত (Factor Contribution)।

উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ভোগীর দীর্ঘকালীন আচরণ (Long-run Consumption Function) কিরূপ হতে পারে সে সম্পর্কে কুজনেৎসের গবেষণার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুজনেৎস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন, ১৮৮৪ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ভোগের গড় প্রবণতা আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল (·৮৪ থেকে ·৮৯-এর ভিতর) ছিল। ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume) একের চেয়ে কম। মূলত, আয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক আনুপাতিক নয়। তবে কুজনেৎস বিশ্বাস করেন, দীর্ঘকালীন ভোগের গতি-প্রকৃতি বহুলাংশে জনসমষ্টির গঠন ও বণ্টনের উপর নির্ভরশীল। কেননা জাতীয় আয়ের গঠন ও বৃদ্ধি তার সঙ্গে জড়িত।

উন্নতিকামী দেশগুলি যদি শিল্পোন্নত ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী উন্নত হতে চায় তবে কুজনেৎসের মতে চারটি শর্ত পূরণ করা দরকার : (১) দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে এবং বিদেশ থেকে কাজে লাগানো যেতে পারে এরকম সম্পদ আহরণ করা ও সেই সম্পদের যোগান অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, (২) উদ্বৃত্ত সম্পদ আধুনিক শিল্পের প্রয়োজন যেভাবে মেটাতে পারে সেভাবে রূপান্তরিত করা, (৩) আধুনিক শিল্পের উৎপাদিত জিনিসের জন্য যাতে নতুন বাজার সৃষ্টি করা যায় সে-জন্য দেশের ভিতর চাহিদার সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সুবিধা অর্জনের চেষ্টা চালানো এবং (৪) প্রতিষ্ঠান-গত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা যার ফলে আধুনিক শিল্পে প্রতিভাসম্পন্ন উদ্যোক্তা সহজলভ্য হয়।

সুব্রত গুপ্ত

দেশবন্ধুর অমর জীবন কাহিনী
জীবনী সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়

শিক্ষাবিদ সাংবাদিক ও দেশবরেণ্যদের অভিমত

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ বহু পরিশ্রম করে বিস্মৃতপ্রায় অনেক কথার পুনরুত্থাপন করেছেন "চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জনের" নামে। গ্রন্থকার চিত্তরঞ্জনের তিরোভাবের পর বহু পত্রিকা ও চিঠিপত্রে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা সংগ্রহ করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আশা করি বইখানির বহুল প্রচার হবে।......তবে বাঙ্গালী, ইতিহাসে যে সব মহামানবের গৌরবময় চরিত্র অলঙ্কৃত করেছে—তাঁদের বিষয়ে যথাযথ সব তথ্যই বিস্মৃতির অতল থেকে বাঁচিয়ে রাখা জাতির দায়িত্ব। এই ক্ষেত্রে এটি রাখতে যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য লেখক আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

সত্যেন বোস
জাতীয় অধ্যাপক

ডাক্তার নরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন" বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত-গ্রন্থ হইয়াছে। লেখকের পাঠ ও অভিনিবেশের প্রচুর পরিচয় এই বই-এর প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। বইখানি বিশেষ দরদ দিয়া ও শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা। প্রতি পদে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যের মূলে উৎসস্বরূপ নানা পুস্তক ও পুস্তিকা পত্র ও পত্রিকা ও প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি উদ্ধার করিয়া পুস্তকের মূল্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। বইখানির মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বহু ব্যক্তিগত পত্রের ও সংবাদপত্র হইতে সংকলন করিয়া দেওয়ায় এবং এতদ্ভিন্ন ২৫ খানি মূল্যবান চিত্র এই পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত করায়। আশা করি এই বইয়ের যথাযোগ্য সমাদর হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতীয় অধ্যাপক

দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার জন্য নানা ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশবন্ধুর মহাজীবন আলোচনা করে প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ লেখা হয়নি।' ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ আমাদের এই অভাব পূরণ করেছেন 'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন' বইটি লিপে। 'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন' পড়ে দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক কথা জানবার ও ভাববার সুযোগ পেলাম সেইজন্য তাঁর লেখককে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন
উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন' সব দিক থেকেই একটি অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টি। ভাবের গাম্ভীর্য ভাষার মাধুর্য এবং পরিকল্পনার ঐশ্বর্যগুণে এই চিত্তজয়ী গ্রন্থটি জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করেছে, নিঃসন্দেহে।

রমা চৌধুরী
উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন' ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ কৃত একটি বৃহৎ গ্রন্থ। দেশবন্ধুর কর্ম ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্পর্কিত নানা তথ্যের সঙ্কলন। সেই সব তথ্য সংখ্যায় এত অধিক যে, সেগুলি সংগ্রহ এবং যথাযথ-ভাবে বিন্যস্ত করতে গ্রন্থকারকে স্পষ্টতঃই প্রভূত শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে।......গ্রন্থটির মূল্য অনস্বীকার্য। পাঠক এই গ্রন্থের মাধ্যমে দেশবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তৃপ্তি লাভ করবেন এবং তথ্য সম্পদের জন্য এই গ্রন্থ দেশবন্ধুর ভবিষ্যৎ চরিত্র লেখকদের পরম সহায়ক হবে।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থখানি সকলেই অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করবেন। চিত্তরঞ্জনের এক অতি বিস্তৃত জীবনালেখ্য [illegible] সহজ ভাষায় এর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে বলে তা সকলেরই আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। তথ্যের দিক থেকে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। প্রামাণিক সূত্র থেকেও তথ্যগুলি সমর্থিত। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার দ্বারা জাতির কল্যাণে উৎসর্গিত জীবন এই মহাপুরুষ সম্পর্কে সকলেই যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
রবীন্দ্র অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন পাঠ করে মুগ্ধ হলাম। তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থখানি দেশবন্ধুর জীবনাদর্শ ও ভাবধারার একটি সুনিপুণ আলেখ্য। কবি, সাহিত্যিক, ব্যবহারজীবী, রাষ্ট্রনায়ক বহুমুখী প্রতিভার ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জনের সর্বাঙ্গীণ চরিত্র-চিত্রণে গ্রন্থকার যে সফলতা অর্জন করেছেন তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু
কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র

দেশবন্ধুর এমন পূর্ণাঙ্গ জীবনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ যে নিষ্ঠার সহিত এই মহৎ কর্ম সম্পূর্ণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কোনগুণে চিত্তরঞ্জন দাশ দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন তাহার সার্থক ব্যাখ্যা যে ডাঃ ঘোষ মহাশয় তাহার গ্রন্থে করিতে পারিয়াছেন তাহা কম কৃতিত্বের কথা নয় বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি বিশিষ্ট সংযোজন।

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু
সম্পাদক, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড

প্রতিঘরে, শিক্ষালয়ে, গ্রন্থাগারে রাখিবার মত একখানি অমূল্য গ্রন্থ

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন

বহু অপ্রকাশিত ও অজানা তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ একখানি আধুনিকতম পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য বিরাট জীবনীগ্রন্থ।

সংবাদপত্র ও পত্রিকার সমালোচনা

আনন্দবাজার পত্রিকা

চিত্তরঞ্জনের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এর আগে বেশ কয়েকখানি বই বেরিয়েছে। 'তাহলে আরও একখানি বই কেন?' লেখক তার ভূমিকায় এ প্রশ্নের ছোট্ট একটি জবাব দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনকথা মহাভারতের মতই 'অমৃত সমান'। এই স্মরণীয় জীবনকে বার বার স্মরণ করতে দোষ কি?' কিন্তু প্রায় ছ'শ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থে তিনি এই মহৎ চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন তাতে পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন যে, চিত্তরঞ্জনের এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রয়োজন ছিল। চিত্তরঞ্জনের চরিত্র সমুদ্রের মতই বিশাল। এই বিরাট চরিত্রের উন্মোচনে ডাঃ ঘোষ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়েছেন।' তিনি। স্মরণ রেখেছেন চিত্তরঞ্জনের জীবনী সম্পর্কে সুভাষ বসুর সতর্কবাণী। 'চিত্তরঞ্জনের জীবনী যেন অকারণ ভাবালুতায় আচ্ছন্ন না হয়। ডাঃ ঘোষের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই অসাধারণ জাতীয় নেতার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাবান হয়েও তিনি তার রচনাকে কোথাও ভক্তিবাদে পর্যবসিত হতে দেননি। এই বিরাট চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি প্রকৃত গবেষকের গুরুদায়িত্ব সুন্দরভাবে সমাধা করেছেন। গ্রন্থ শেষে তিনি যে কতগুলি দুষ্প্রাপ্য ছবি যুক্ত করেছেন সেগুলি অবশ্যই মূল্যবান। শুধু তথ্যই নয়, তথ্যকে কীভাবে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করতে হয়, ডাঃ ঘোষের বইতে তার পরিচয় পাওয়া গেল।

দেশ

লেখক বহু নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও পরিশ্রমের সঙ্গে এই সুদীর্ঘ পৃষ্ঠাবলী-ব্যাপী জাতীয় জীবনের একদাকালের অন্যতম কর্ণধার স্বাধীনতার উজ্জ্বল তপস্বী 'চিত্তরঞ্জনের ঘটনাবহুল জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে মহৎ এবং অভিনন্দনযোগ্য। ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন, অনেকদিনের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মুখ্য লক্ষ্যই ছিল মোটামুটিভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চিত্তরঞ্জনের সম্পূর্ণ মনুষ্য মূর্তিটিকে নিরপেক্ষ আলোক সম্পাতে ফুটিয়ে তোলা এবং এ ব্যাপারে তিনি অনেকখানি সফলও হয়েছেন।

প্রবাসী

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ নিজের অপরিসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে যে সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন তা বাংলা ভাষার জীবনী-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবে, নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই জীবনী-গ্রন্থখানি শুধু তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক নহে। একালের ঐতিহাসিক ও গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইহা রচিত। এই মহামূল্যবান সময়োপযোগী ও অতি প্রয়োজনীয় জীবনী গ্রন্থখানি রচনা করে ডাঃ ঘোষ দেশের যে কল্যাণ সাধন করলেন তার জন্য তিনি দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন ও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

যুগান্তর

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই দেশরঞ্জনের মহান আলেখ্য পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। ভাষা সহজ ও সরল। রচনা ভঙ্গীতে সাবলীল। পরিশিষ্টে নানা বিষয় ও স্মরণীয় আলোকচিত্রমালা এই গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

AMRITA BAZAR PATRIKA

Dr. Nares Chandra Ghosh shows considerable competence in assessing the literary works of Chittaranjan and devotees nearly fifty pages to this exercise. Another 70-page chapter is devoted to an assessment of Chittaranjan as a man. This chapter is necessarily full of anecdotes, many of them wholly enjoyable ones.

MODERN REVIEW

"We have no doubt that this magnum volume will be very warmly received and will be fondly preserved in all academical institutions and public libraries as it has been a splendid publication and as such it will be of invaluable service to the people of the country".

গল্প-ভারতী

ডাঃ ঘোষ এই সুবৃহৎ জীবনী-গ্রন্থ রচনা করে যে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছেন তার স্বাক্ষর মিলবে 'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন'-এর প্রতিটি পাতায়। আমাদের জাতীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই অতি প্রয়োজনীয় জীবনী-গ্রন্থখানিকে পাঠ্যপুস্তকরূপে স্বীকৃতি দান করুন এবং দেশের সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা করে জনসাধারণকে পাঠ করার সুযোগ দিন। তাহলে দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হবে। বাংলা সাহিত্যে এমন একখানি সার্থক-নাম্মা জীবনী-গ্রন্থ রচনা করার জন্য ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

অমৃত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এই জীবনী-গ্রন্থ অতুলনীয় উপাদান-সমৃদ্ধ।......দেশবন্ধুর জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকখানি। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে ডাঃ ঘোষ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন চিত্রণই করেছেন। ঠিক এই ধরণের আর একখানি তুলনীয় গ্রন্থ পাওয়া যাবে না। অসংখ্য আলোকচিত্র বইটির আকর্ষণ।

রচয়িতা : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ
প্রকাশক : জয়শ্রী প্রকাশন
২৫৯এ/৩২ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড
কলিকাতা-৪৭
বিক্রয় কেন্দ্র : জয়শ্রী প্রকাশন
১৮এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯
এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়
৫৯৬ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ, মূল্য কুড়ি টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

জীবনী

হো চি মিন। প্রদ্যোৎ গুহ। জ্যোতি প্রকাশনী। ৪৭, শশিভূষণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম—আট টাকা।

বর্তমান উত্তর ভিয়েতনামের জনক হো চি মিন সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বইয়ের অভাব নেই। এই বইটি হো-ভক্ত এক বাঙালীর লেখা। ভিয়েতনামের এক বিদ্রোহী পরিবারে হো'র জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন বুদ্ধিজীবী। পরিবারের এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। হো'র কৈশোর, বিদেশযাত্রা, ফরাসী দেশের রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়া, সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া, পরবর্তীকালে ফরাসীদের হাত থেকে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে হো'র ভূমিকা, চীনের কারাগারে বন্দীজীবন এবং উত্তর ভিয়েতনামের স্বাধীনতালাভের পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সরকার ও তার তল্পিবাহকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হো'র নেতৃত্ব—সবই বর্তমান গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বইতে হো চি মিনের রচনা থেকে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথাও হো'র কোন কাজ বা রচনার সমালোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। লেখক হো'কে বড় দেখাতে গিয়ে অন্যদের ভিন্নভাবে চিত্রিত করেছেন। যেমন—"গান্ধীজীর কাছে দারিদ্র্য ছিল সাধনা, আর হো চি মিনের কাছে দারিদ্র্য ছিল কঠোর নির্মম সত্য। আর সেই দারিদ্র্য অতিক্রমের প্রয়াসই ছিল হো চি মিনের জীবনব্যাপী সাধনা?" (পৃ ২)। হো চি মিনকে যে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কৈশোরে বা পরবর্তীকালে কাটাতে হয়েছিল, পরবর্তীকালে জীবনযাত্রার মান তার চেয়ে কমাতে হয়নি। পক্ষান্তরে গান্ধীজী [illegible] ব্যারিস্টার নন, দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনব্যবসায়ে তাঁর পসারও হয়েছিল। সেই অবস্থা থেকে তিনি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন। চরকা, গো-সেবা, গ্রাম উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তিনি গরীব ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান [illegible] করেছেন, দারিদ্র্যের সাধনা করেন নি। অপর পক্ষে স্বাধীনতালাভের পর উত্তর ভিয়েতনামের জীবনযাত্রার মান কতখানি উন্নত হয়েছে, তা কিন্তু বইটিতে বলা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয়তাবাদী চীন সরকার জাতীয়তাবাদী ভিয়েতনামীদের বদলে রহস্যজনক কারণে হো চি মিনকে অস্থায়ী সরকার গঠনের ব্যাপারে ভিয়েতমিনদের সম্মেলন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য নেতাদের চীনে পালিয়ে যাওয়ার কথা বইটিতে স্থান (পৃ ৬৮) পেলেও কুয়োমিন্টাং সরকারের সাহায্যের কথা নেই। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর ভিয়েতনাম চীনের নিকট থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য পেয়েছিল। বর্তমান বইটিতে কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনের কোন সাহায্যের কথাই উল্লেখ করা হয়নি। এই সব দেখে মনে হয়, বইটি ভিয়েতনাম সম্পর্কে রুশ-ভাষ্য ছাড়া আর কিছু নয়। লেখক একাধিক বার কোচিন চীনের উপর হো'র দাবির কথা বলেছেন। কোচিন চীনের বেশীর ভাগ অধিবাসী 'খমের', তাই প্রিন্স শিহানুক এলাকাটিকে কম্বোডিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের জেনেভা-চুক্তির বিরুদ্ধে প্রিন্স শিহানুকের আপত্তির এটা একটা কারণ। দুঃখের বিষয় কোচিন চীনের সমস্যার এই দিকটা বইটিতে একবারও বলা হয়নি।
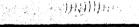
কয়েকটি সাহিত্য পত্রিকা

বড় বড় পত্র পত্রিকাগুলি সাহিত্যের যে ছবি ফুটিয়ে তোলে, তার পাশাপাশি অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে সাহিত্যের আর একটি ধারা প্রবাহিত। নানারূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রথা-ধ্বংস ও নতুন দিকদর্শনের কাজ এই ধারাটিতে বেশী হয়, যা হওয়া উচিত।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে এবার আলোচনা করছি। এছাড়াও কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, আসাম, ত্রিপুরা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলা ভাষায় আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—সবগুলির আলোচনা একত্রে হয় অসম্ভব—একথা দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করছি।

আলোচ্য পত্রিকাগুলিতে প্রথমেই চোখে পড়ে যত্ন ও নিষ্ঠার চিহ্ন। ছাপা ও প্রোডাকশান খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি রচনা যত্ন করে ছাপা—ছাপার ভুল প্রায় নেই বললেই চলে। চকলেটের বাক্স হওয়ার দরকার নেই, তবে লিটল ম্যাগাজিন পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর একটি কথা, ইদানীং অনেক লিটল ম্যাগাজিনেই পরস্পর গালাগালি, ঝগড়ার একটা প্রাবল্য দেখা যাচ্ছিল—এবার, সুখের বিষয়, সেরকম কিছু চোখে পড়েনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত **এক্ষণ** (৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯)—এই সংখ্যায় নবম বর্ষে পদার্পণ করলো। একটু গম্ভীর চেহারা, কিন্তু এই পত্রিকায় প্রতি সংখ্যাতেই কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় 'বিদ্যা বিদ্বান বিদ্যালয় বিদ্যার্থী বিদ্রোহ' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন বিনয় ঘোষ। প্রবন্ধটির তথ্য ও বিশ্লেষণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে—তবু এই প্রশ্ন থেকেই যায়, বিদ্যা ও জ্ঞানের সম্পর্ক কি এবং বিদ্যার পরিমাপ কি থেকে করা যায়? কেন না, তিনি একটি জায়গায় উচ্চ ডিগ্রিধারী ক্ষমতাবান ব্যক্তির চেয়ে সুশিক্ষিত স্কুল মাস্টার বেশী জ্ঞানী হতে পারে—এমন ইঙ্গিত করেছেন। প্রবন্ধটির এত বেশী ফুটনোট কি এড়ানো যেত না? বস্তুত, এক্ষণ-এর অধিকাংশ প্রবন্ধেই বেশী ফুটনোট। এই রীতি বদলাবার কোনো পথ কি নেই? পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন নির্মলকুমার চন্দ্র এবং পল্লী সমাজের সংগীত ও সংগত সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাস। অপর তিনটি প্রবন্ধের লেখক পরেশ চট্টোপাধ্যায়, মুরারি ঘোষ ও অমিয় বাগচী। গল্প লিখেছেন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—দুটি গল্পের পটভূমিকা আলাদা—শহর ও গ্রাম। কবিতা লিখেছেন বিনয় মজুমদার থেকে ফিরোজ চৌধুরী—১৫ জন। সতু সেনের আত্মস্মৃতিও উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গল্প কবিতা (১৭।১-ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২) পত্রিকাটি একটি বিশেষ চরিত্র দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। প্রধানত নতুন বা সম্পূর্ণ নতুন লেখকদের এই একটি নির্ভরযোগ্য এরেনা। বাংলার বাইরের লেখকরাও এখানে সমাদৃত। এঁদের প্রতি সংখ্যায় সম্পাদক বদলায়। এবারের পূজা সংখ্যায় এঁরা নানা ধরনের লেখককে একত্র করতে পেরেছেন। যেমন অনেককাল বাদে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। দেবেশ রায়, অসীম রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার—এঁদের রচনাও দুর্লভ। এবং কমলকুমার মজুমদার। এই মহান বিস্ময়কর লেখকের রচনা পড়তে পাওয়া একটি ঘটনা। তবে, এখানে তাঁর যে পূর্বে প্রকাশিত গল্পের অপ্রকাশিত অংশ ছাপা হয়েছে তা

পাঠ করে মর্ম উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব—দেবতাদের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে। দেবেশ রায় ও মতি নন্দী গল্প লিখেছেন বর্তমানের হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির পটভূমিকায়। সাধারণত যিনি কবিতাই লেখেন, সেই অমিতাভ দাশগুপ্তের গল্পটি বিস্ময়কর ভাবে শক্তিশালী ও সার্থক। পত্রিকাটির আরও অনেক কিছুই ভালো, কিন্তু দশজন মেয়ের কবিতা আলাদাভাবে ছাপা খুব সুরুচির পরিচয় হয়নি। কবিতা সিংহ তো রাগ করতেই পারেন।

এককালে খুব নামডাক ছিল, সেই **কৃত্তিবাস** (৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭) আবার নতুনভাবে বেরিয়েছে সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের সম্পাদনায়। কবিতা প্রেমিক ও নতুন কবিদের কাছে সুসংবাদ। কৃত্তিবাস এককালে তরুণতম কবিদের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল—এই সংখ্যাতে, নতুন কবিদেরই প্রাধান্য। প্রসূনকুমার মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ দাস প্রমুখ নবীনেরা ছিলা টান করা কবিতা লিখেছেন। একটি মাত্র প্রবন্ধ, লিখেছেন তরুণ দত্ত, যা পড়তে শুরু করলে নড়েচড়ে বসতে হবে। অবশ্য নিছক সাড়া জাগানো প্রবন্ধ এটি নয়—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন, রবীন্দ্র সাহিত্য এবং আমাদের ভালোবাসা সম্পর্কে বোধ—এই ব্যাপারে এত স্পষ্ট ও গভীর ভাবে আর কেউ আলোচনা করেন নি। এই প্রবন্ধ পড়ার পর, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক ধরনের দুঃখ ও মমতা জাগে। কৃত্তিবাসের মুদ্রণ পারিপাট্য সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি প্রকাশ করছেন, কিন্তু সেটা এক ধরনের হীনমন্যতা।

দৈনিক কবিতার (১৬বি গোবিন্দ ঘোষাল লেন,কলকাতা-২৫) নতুন সংখ্যা এবার প্রবন্ধেই বেশী সমৃদ্ধ। কবিতার ভোটের ব্যাপারে বৈচিত্র্য। কয়েকজন কবি সম্পর্কে পাঠকদের ভোট নেওয়া হয়েছিল, তার ফলাফল ও বিশ্লেষণ। যে-কোনো ভোটের ফলাফলের মতন, কবিতার ভোটও নিশ্চিত খুব বিতর্কমূলক—শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টে এই ভোট পরিচালনার বিরুদ্ধে কোনো মামলা না ওঠে! 'রবীন্দ্রনাথের কুটাভাস' নামে আবদুল মান্নান সৈয়দের বিখ্যাত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র নাটকে গদ্য পদ্য গান সম্পর্কে লিখেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, রবীন্দ্র-সমালোচনা বিষয়ক সমালোচনা লিখেছেন দেবতোষ বসু ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কে সঞ্জয় দত্ত। কবিতা অনেকগুলি—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আল মাহমুদ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবারতি মিত্র, কবিতা সিংহ প্রমুখ। বহুকাল পর এবছর বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ—এই পত্রিকায় তাঁর কবিতাটি অনবদ্য। সম্পাদনা করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত **কলকাতা'র** (২১৭-এ যোধপুর পার্ক) বর্তমান সংখ্যাটি রচনা সম্ভারে মূল্যবান। বেশ কয়েকজন নবীন লেখককে তিনি প্রায় আবিষ্কার করেছেন বলা যায়। দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর 'জনৈক বাঙালি যুবকের আত্ম প্রতিকৃতি'—খুবই আন্তরিক রচনা, পড়তে পড়তে অপরাজিতর অপুর কথা মনে পড়ে। এবারে পুজায় আমি যতগুলি রচনা পড়েছি, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে জ্যোতির্ময় দত্তের "দেবলোকে যুধিষ্ঠির" নামে উপাখ্যানটি। এতে যে কল্পনাশক্তির প্রকাশ—সাহিত্যে তার নজির ইদানীং খুব কম দেখা যায়।

ফণিভূষণ আচার্য সম্পাদিত নহবৎ পত্রিকাটি এখন নাম বদল করে হয়েছে **মহারাজ** (১৪জি স্টেশন রোড, কলকাতা-৩১)। এই পত্রিকায় সাম্প্রতিক শক্তিশালী লেখকদের সমবেত ভাবে পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, অভ্র রায়, সুধাংশু ঘোষ, সত্যেন্দ্র আচার্য, শংকর দাশগুপ্ত এবং সুভাষ ঘোষাল। কবিতা অনেকগুলি—এখানেও দেখা যায় অনেক শক্তিমান নবীন কবিকে। ফণিভূষণ আচার্য তার ছেঁড়া ক্যানভাস রীতিমতন জমিয়ে তুলেছেন।

শৈলেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত **বেলা অবেলার** (পি-৭০১এ/১ নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩) বর্তমান সংখ্যায় অরুণকুমার সরকার লিখেছেন চমকপ্রদ আত্মকথা। খুবই আন্তরিক। নরেশ গুহ, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শান্তি লাহিড়ীর রচনাতেও কবিদের অন্তঃপুরের খবর পাওয়া যায়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, আলোক সরকার ও শিবশম্ভু পালের প্রবন্ধ সাহিত্য ও সাহিত্য-পত্রিকা বিষয়ক। এবং অনেকের কবিতা।

সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত **অনুক্ত** (২২ বনফিলড লেন, কলকাতা-১) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে স্মৃতিকথা লিখছেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী। দীনেশ রায়ের উপন্যাস "জন্ম-জন্মান্তর"-এর এই পর্যায়ে, যাকে বলে বাস্তববাদ ও দেহবাদের ছড়াছড়ি। পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী খুব মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের পরিপার্শ্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

মৃণাল চট্টোপাধ্যায় ও অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত **প্রগতির** (৩৯বি ডেন্ট মিশন রোড, কলিকাতা-২৩) আয়তন বেশ ভারী—সাহিত্য পত্রিকার পক্ষে। এতে নানা ধরনের রচনায় সাহিত্যের প্রায় সব কটি শাখাকেই স্পর্শ করা হয়েছে। এঁরা তারাশঙ্কর সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পেরেছেন—বিমলচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও মৃণাল চট্টোপাধ্যায়ের।

এতগুলি সাহিত্য পত্রিকা পড়ার পর একটি কথা মনে জাগে। সব পত্রিকাতেই কবিতার সংখ্যা বড্ড বেশী। কেন? কবিতা লেখা কি খুব সহজ কাজ? এক সঙ্গে এত কবিতা ছাপা হলে কবিতার মূল্য কমে যায় যেন।

সনাতন পাঠক

সম্ভাবনাময় মুষ্টিযোদ্ধা

স্পেনের বার্সিলোনা শহরে প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার আসরে সমাগত ক্রীড়া-সাংবাদিকদের ভোটে নির্ধারিত বিশ্ব একাদশের মধ্যে অশোককুমারের নাম দেখে আমার সহকর্মী সাংবাদিক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'বাপকা বেটা', অশোক ধ্যানচাঁদের নাম রেখেছে।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। কিন্তু ধ্যানচাঁদের মত কি হতে পারবে অশোককুমার? 'কেন পারবে না' বলে বন্ধুবর ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার অধিকারী পিতা-পুত্রের ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করলেন। পাতৌদির নবাব মনসুর আলী কি বাবা ইসরার আলীর মত হতে পারেনি? মহীন্দার ও সুরিন্দার অমরনাথ, অশোক মানকড়, গুলেরেজ আলী কি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ক্রিকেটে এগিয়ে চলেছে না? কিংবা ১৯১১-র আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী দলের খেলোয়াড় মনমোহন মুখার্জীর পুত্র বিমল মুখার্জী কি ঐতিহ্যের ধারক নয়? আরও কতই তো আছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এবং ভারত তথা কলকাতার খেলার মাঠে। আলোচনা চলতে লাগল। গোষ্ঠ পাল, ডাঃ সন্মথ দত্ত, বলাই চাটার্জী, দুলাল গুহঠাকুরতা প্রভৃতি স্বনামধন্য ফুটবল খেলোয়াড়দের আত্মজরা প্রথম ডিভিশনে ফুটবল খেললেও কেউ কিন্তু বাবার মত হতে পারেনি। আবার পিতা-পুত্র, দুই পুরুষের প্রতিষ্ঠায় বাবলী কুমার, পেস সোম এবং ফুটবল কানন থেকে কালে ঝরেপড়া ফুল অসীম সোমের পরলোকগত নাটকী) যথেষ্ট অবদান আছে। বড় মাঠের খেলা ফুটবল ক্রিকেট ক ছেড়ে আমরা চলে এলাম মুষ্টিযুদ্ধের ঘরে। মনের পটে ভেসে উঠল সার্বজনীন দাদা অর্থাৎ জে কে শীলের মুখ।

পরলোকগত মুষ্টিযোদ্ধা জে কে শীলের পাঁচ পুত্র, তারাপদ, শঙ্কর, রমেশ, বংশী ও প্রদীপের মধ্যে শঙ্কর ও বংশী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছে। বাংলার উঠতি মুষ্টিকদের মধ্যে দুজনই সম্ভাবনাময়। তবে বংশীর খাতিই বেশী। বংশী শুধু সম্ভাবনাময়ই নয়, ওর ওয়েটে ভবিষ্যৎ ভারত চ্যাম্পিয়ন। ভবিষ্যৎ কথাটির মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু ভারত চ্যাম্পিয়ন হতে বংশীর কি বেশী সময় লাগবে? মুষ্টিযুদ্ধ মহলের খবর: মোটেই না। জগাদার নাম রাখবে বংশী।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, পরিবেশ এবং সুযোগ-সুবিধা বহু পরিমাণে প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করার সহায়ক। বংশীর ক্ষেত্রেও তাই। বলতে গেলে শঙ্কর ও বংশী যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটতে শিখছে, তখনই ওদের হাতে উঠেছে বক্সিং-গ্লাভ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে স্কুল ফিজিক্যাল কালচারের মুষ্টিযুদ্ধের রিংয়ে অতি শৈশব থেকেই ওদের ঘুঁষো-ঘুঁষির লড়াই। প্রতিযোগিতা বা প্রদর্শনী মুষ্টিযুদ্ধের আগে প্রায়ই দেখা যেত শঙ্কর, বংশী বা ওদের খুড়তুতো ভাই শৈলেনের

সম্ভাবনাময় বক্সার বংশী শীল

প্রদর্শনী লড়াই। বয়স তখন ওদের মাত্র চার, পাঁচ কি ছয়। যখন ক্লাস ফোর-এর ছাত্র, তখন থেকে আন্তঃ স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু। ১৯৬৩তেই পর পর ৪ জনকে হারিয়ে বংশী ৬০ পাউণ্ড ক্যাটাগরিতে স্কুল চ্যাম্পিয়ন। বয়স তখন সবে এগারো। পরের বছরও চ্যাম্পিয়ন এবং নেপালে দুটি প্রদর্শনী ফাইটে বিজয়ীর সম্মান। ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬তে জাতীয় স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে বংশী হেরে গেলেও শেষবার ১০৮ পাউন্ড ক্যাটাগরিতে এন সাধুখাঁর সঙ্গে ওর ফাইট দেখে ভারতীয় বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পি মিশ্র ওকে একটি স্পেশাল প্রাইজ দিলেন। কয়েক মাস পরে সিংহল টিমের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ট্রায়াল ফাইটে বংশীর ডাক। দুই মিনিটের মধ্যে গুজরাটের উঠতি মুষ্টিযোদ্ধা গজেন্দ্র-প্রসাদকে বংশী প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী করলেও শেষ পর্যন্ত পয়েন্টে হেরে সিলেকশন পেল না। কিন্তু ওর টেনাসিটি বেড়ে গেল। আরম্ভ হল কঠিন অনুশীলন: রোজ ভোরে চার-পাঁচ মাইল দৌড়, কিছু ফ্রি হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ এবং বিকেলে মুষ্টিযুদ্ধ রিংয়ে দু' ঘণ্টা ধরে ফাইট। কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী দাদার সঙ্গে, কখনো সমবয়সীদের সঙ্গে, আবার কখনো স্যাণ্ড-ব্যাগের বিরুদ্ধে। ফলে চার বছর ধরে চারটি প্রতিনিধিমূলক ফাইটে বংশীর বেস্ট বক্সার-এর প্রাইজ।

প্রথম ১৯৬৭তে ১১৫ পাউণ্ড ক্যাটাগরিতে অন্ধ্রের নাগভূষণকে ফাইনালে হারিয়ে জাতীয় স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবের সঙ্গে। পরের দুই বছর একই প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক-আউটে এবং পয়েন্টে হারিয়ে। চতুর্থবার বার্নপুরে আয়োজিত আন্তঃ স্টিল চ্যাম্পিয়নশিপে লাইট-ওয়েট বিভাগে বিজয়ী হয়ে। হ্যাঁ, ১৯৭০-এ হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা পাশ করার আগেই বংশী বক্সিংয়ের দৌলতে বার্নপুরে চাকরী পেয়েছিল। এখন চাকরী করছে সাউথ ইস্টার্ন রেলে। পড়াও ছাড়েনি। সায়েন্স নিয়ে পড়ছে নাইট কলেজে। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

'তোমার সবচেয়ে স্মরণীয় ফাইট কোনটি?'

বংশীর উত্তর: ১৯৭০-এ সেকেন্দ্রাবাদে আন্তঃ রেল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন জন টমাসের সঙ্গে। সেন্ট্রাল রেলের মারমুখী মুষ্টিযোদ্ধা জন টমাস লাইট ওয়েটে যতজনকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল তাদের সবাইকেই রক্তাক্ত কলেবরে রিং থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু ফাইনালে বংশীর হাতের মার খেয়ে টমাসের দেহ থেকেই অনেকখানি রক্ত ঝরল। জন টমাস বলল, জীবনের ১৫৬টি ফাইটের মধ্যে ১৩৫টি ফাইট জিতেছি নক আউটে, ১৫টি পয়েন্টে। এটি আমার ষষ্ঠ পরাজয়। কিন্তু সিভিল মুষ্টিকের কাছে এই প্রথম। বাকি পাঁচটি মিলিটারি মুষ্টিকের কাছে।

আরও কতগুলি স্মরণীয় ফাইটের কথাও বলল বংশী, যে ফাইট দেখে দর্শকরা সমস্বরে চীৎকার করে বলেছে, 'ইউ ক্যান কিল হিম; তুমি বাঘের বাচ্চা, ওকে মেরে ফেলতে পার।'

মুষ্টিযুদ্ধের বিশারদরা জানালেন বংশীর মধ্যে রয়েছে যুদ্ধের টেনাসিটি। ক্ষিপ্রপদ এবং ক্ষিপ্রহস্ত। চমৎকার স্টেপিং। মুষ্টি কোনও অলসভাব। বংশীর লেফ্ট জ্যাব উইথ রাইট হুক প্রায় নিখুঁত।

এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ডাক পড়লেও অদৃষ্টের পরিহাসে বংশী এখনো জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে লড়ার সুযোগ পায়নি। রেলের প্রতিনিধি হিসাবেই এ বছর গিয়েছিল আম্বালার জাতীয় আসরে। কিন্তু লাইট ওয়েটের প্রতিযোগী হিসাবে ওর ওজন একটু কম হয়ে গেল। এবং যেহেতু ফেদার ওয়েটে রেলের আর একজন বক্সার আগেই নির্বাচিত হয়েছিল সেহেতু ফেদার ওয়েটে ও লড়তে পারেনি। সুতরাং জাতীয় আসর থেকে খালি হাতেই বংশীকে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু কতদিন ওর হাত খালি থাকবে?

মুকুল

কলকাতার ফুটবল কোন পথে?

খেলার মাঠে

কলকাতার ফুটবলে নজিরের অভাব নেই। আই এফ এ-র অব্যবস্থায় এবং কোন কোন ক্লাবের অসহযোগিতায় অতীতে বহু নজির সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ বে-মরসুমের ফুটবল খেলা থেকে মোহনবাগান এবং আর কয়েকটি ক্লাব দূরে সরে থাকা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয় কোন নতুন নজির নয়। এমন কী, এই অবস্থার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল শীল্ড জিতলেও সেটা নতুন নজির হবে না।

১৯৩৯ সালে যেবার মোহনবাগান ক্লাব প্রথম লীগ বিজয়ী হয় সেবারও কয়েকটি ক্লাব রেফারির পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে লীগ থেকে দূরে সরে থাকে। শুধু দূরে সরে থাকে বললে অনেক কথাই অ-বলা থেকে যায়। সেবার তিনটি বড় ক্লাব—মহমেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গল এবং কালীঘাট আই এফ এ থেকেই সরে গিয়ে বি এফ এ (বেংগল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) নামে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা গঠন করে। বি এফ এ-র পরিচালনায় লর্ড ব্রাবোর্ন কাপের খেলার অনুষ্ঠিত হয়। পরে তিনটি ক্লাব আই এফ এ-তে ফিরে এলেও লীগ ও শীল্ডের খেলা ওদের বাদ দিয়েই অনুষ্ঠিত হয়।

সালটা ঠিক মনে পড়ছে না। হাতের কাছে রেকর্ডও নেই। সম্ভবত পঞ্চাশ দশকের কোন এক সালে হবে। ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ড থেকে দূরে সরে ছিল এবং ইস্টবেঙ্গলের নাম খেলার তালিকার বাইরে রেখেই শীল্ডের খেলা শেষ করা হয়েছিল—এবার যেমন মোহনবাগানকে বাইরে রেখে লীগের খেলা শেষ করা হল, শীল্ডের খেলাও শেষ হতে যাচ্ছে।

পার্থক্য, অতীতের নজির ফুটবলের ভরা মরসুমে, দর্শকদের উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে; এবারের নজির ম্রিয়মাণ ময়দানের বুকে ফুটবলের ভাঙ্গা হাটে। লীগের বাকি খেলাগুলির মধ্যে এবার মাত্র একটি খেলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মধ্যে। হাসপাতালের জন্য অর্থ সংগ্রহের মানবিক কারণও খেলাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু ইসলামিয়া হাসপাতালের সাহায্যে আয়োজিত ওই লীগ চ্যারিটি খেলায় ক'জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন? জোর পাঁচ-সাত হাজার। এ খেলায় দর্শকে

জার্সি উঁচিয়ে পড়ার কথা যে খেলায় কি হাল!

বে-মরসুমের খেলা হলেও মোহনবাগান যদি লীগ থেকে দূরে সরে না থাকত তাহলে কি খেলার এই হাল হত? নিশ্চয়ই না। খেলাকে কেন্দ্র করে হই-হল্লা হতই। দর্শকদের মধ্যেও উন্মাদনা আসত। কেননা, মোহনবাগান তো লীগ থেকে পিছিয়ে পড়ে ছিল না। ইস্টবেঙ্গলের মতই তাদের লীগ জয়ের সুযোগ ছিল। তবু মোহনবাগানের দূরে সরে থাকার কারণ কি?

ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলেছেন, অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁরা খেলতে পারবেন না। খেলতে পারবেন ১৫ ডিসেম্বরের পরে।

আই এফ এ মুখপাত্রদের বক্তব্য: ফুটবল মরসুমের সীমারেখা পার হয়ে গেছে। মারডেকা ফুটবলে যোগদান, রাশিয়া সফর এবং নানা অসুবিধায় মরসুমের চৌহদ্দির মধ্যে খেলা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ক্রিকেট মরসুমও পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং আর দেরি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া মোহনবাগানের যেমন অসুবিধা তেমন অপর ক্লাবেরও সমান অসুবিধা। তারাও প্র্যাক্টিস করতে পারেনি। এবং বিনা প্র্যাক্টিসেই তো কলকাতার বড় বড় ক্লাব রোভার্স, ডুরাণ্ডে খেলতে যায়। সুতরাং মোহনবাগানের যুক্তিহীন দাবিতে তাঁরা খেলা বন্ধ রাখতে পারেন না। পরে আরও অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তাই আই এফ এ দিনগত পাপক্ষয়ের মত মোহনবাগানকে বাদ দিয়েই মরসুম শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যদিও মোহনবাগানের না খেলার সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করতে পারছি না, তবু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মারডেকা ফুটবলের জন্য আই এফ এ খেলা বন্ধ রাখলেন কেন? মরসুমের শুরুতে তাঁরাই তো বড় গলা করে বলেছিলেন, মারডেকার জন্য ক্লাবের খেলা বন্ধ থাকবে না। বস্তুত কোন ক্লাব খেলা স্থগিতেরও আবেদন জানায়নি। আজ আই এফ এ যে দৃঢ়তা নিয়ে মরসুম শেষ করলেন, আগে ওই দৃঢ়তার পরিচয় দিলে কলকাতা ফুটবল এভাবে মাঠে মারা যেত না।

ফুটবল কলকাতার সবচেয়ে প্রাণ-মাতানো খেলা। ফুটবলের জন্য কলকাতা পাগল। প্রতি ক্লাবের প্রচুর পয়সা খরচ ফুটবলেরই জন্য। অথচ সেই ফুটবলের

কলকাতা ফুটবল লীগের ১৯৭১-এর অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা শেষ খেলায় মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দর্শকদের অভিনন্দন নিচ্ছে

ফটো—[illegible]

র দিন কি হাল হচ্ছে! নানা অজুহাতে বার লীগ থেকে ওঠা-নামার ব্যবস্থা চল, শীল্ড ফাইনাল স্থগিত, দল বাড়ানো কমানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিরতি লীগ ার বদলে একক লীগের প্রবর্তন, সুপার গর প্রহসন প্রভৃতি ঘটনায় ফুটবলের ায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

ঘাতকের ছুরিতে যাদের প্রাণবায়ু য়ে যায়, অত্যন্ত বিষাদময় ঘটনা হলেও অন্তত মুক্তি পায় সংসারযন্ত্রণা । কিন্তু ঘাতকের হাতে ঘা খেয়ে খেয়েও াতার ফুটবল তো মুক্তি পাচ্ছে না। দিন আগে থেকেই তার নাভিশ্বাস ছ। এবারও যে অবস্থার মধ্যে ফুটবল ম শেষ হচ্ছে সেটা তার মুমূর্ষু ার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। কোথায় কলকাতার ফুটবল?

হাট বেলায় পড়েছি, 'সবর চাঁদরা যার স্রোতের প্রায় যে জন বুঝে না তারে ত ধিক'। আই এফ এ-কেও ধিক। থাকতে খেলার ব্যবস্থা করলে অন্তত র কলকাতা ফুটবলের এই হাল হত

সাঁতার

দরাবাদে সদ্য সমাপ্ত ভারতের ২৮তম সাঁতারে ২০টি বিষয়ে নতুন র প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সাঁতার ক্ষেত্রে র আশাব্যঞ্জক পরিচয়। বিশেষ করে সাঁতারুর কৃতিত্ব আরো উল্লেখযোগ্য

দাবি রাখে। একজন সার্ভিসেসের জওয়ান খাসক সিং অপরজন মহারাষ্ট্রের বালক সাঁতারু মাইকেল জওয়ালকার।

খাসক সিং ভারতের সাঁতার ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করেছে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এক মিনিটের কম সময়ে অতিক্রম করে। ১৯৫৮ সালে অর্থাৎ ১৩ বছর আগে এই বিষয়ে শেষ রেকর্ডটি করেছিল মহারাষ্ট্রের নানু বাজাজ ৬০·৩ সেকেন্ডে। এতদিন পরে খাসক সিং সেই রেকর্ডকে কমিয়ে আনল ৫৯·৭ সেকেন্ডে। বলা বাহুল্য, ভারতের কোন সাঁতারু আজ পর্যন্ত এক মিনিটের কম সময়ে ১০০ মিটার অতিক্রম করতে পারেনি।

খাসক সিংয়ের মতই কৃতিত্ব মহারাষ্ট্রের বালক সাঁতারু জওয়ালকারের কিংবা তার চেয়েও বেশী। জওয়ালকার ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক ও ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে জিতেছে তো নতুন রেকর্ড করেছেই ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল জিতেছে৷ তার ১০০ মিটার পাড়ি টেনেছে ৬০·৫ সেকেন্ডে। অর্থাৎ সিনিয়র সাঁতারু নানু বাজাজের সেই ১৩ বছর আগের রেকর্ড স্পর্শ করেছে বালক বয়সে। যে সাঁতারু ফ্রি স্টাইল, ব্যাক, ব্রেস্ট ও বাটারফ্লাই স্ট্রোকে প্রায় সমান, দক্ষতার চারটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড করতে পারে সেই সাঁতারুকে একটি বা দুটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করলে অদূর ভবিষ্যতে [illegible] তার পক্ষে

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সম্মান অর্জন অসম্ভব নয়।

অবশ্য সাঁতারে ভারত এত পিছিয়ে আছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে বহু সাধনার প্রয়োজন। খাসক সিংয়ের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের যে রেকর্ড নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করছি সেই ১০০ মিটারে মেয়েদের বিশ্ব রেকর্ড ৫৮·৯ সেকেন্ড। আমাদের পুরুষদের কোন জাতীয় রেকর্ডই মহিলাদের অলিম্পিক বা বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে উন্নত নয়। অনেক পেছনে। তবু সাঁতারে আগের চেয়ে যে আমাদের কিছু উন্নতি হয়েছে তার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এবারকার জাতীয় সাঁতারে সার্ভিসেস সাঁতারুদেরই জয়জয়কার। পুরুষদের ১৪টি বিষয়ের মধ্যে ১০টি বিষয়েই তারা স্বর্ণপদক পেয়েছে, ৮টি বিষয়ে রৌপ্য ও ৫টি বিষয়ে পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ৭টি রেকর্ডের মধ্যে ৬টিই তাদের দখলে।

বালক বিভাগে, বালিকা বিভাগে এবং মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান পেয়েছে মহারাষ্ট্র। তবে বালক বিভাগে বাংলার কৃতিত্ব রয়েছে। রেকর্ড করার কৃতিত্ব সমেত পেয়েছে ৩টি স্বর্ণ পদক। রেকর্ড করেছে কল্যাণ পাল ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে, সুধীর দাস ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে এবং বাংলা দল ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে রেসে।

একলব্য

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

'মনের মতো সঙ্গী খুঁজছে পাহাড়ী ডাইনী, কিন্তু একজনকেও তার পছন্দ হচ্ছে না .....'

নাঃ, এরা কেউ নিখুঁত মানুষ নয়!

'বেছে নিয়ে একটার-পর একটা মহামারি সে বাধিয়ে দিচ্ছে।'
3/14

'তখনও তার সঙ্গী খোঁজার নেশা কাটেনি।'
যেমন করেই হোক, নিখুঁত মানুষ খুঁজে বার করতে হবে!

'যত রাজ্যের ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোকে সে পরামর্শের জন্যে ডেকে আনল।'

ওরে মায়া-আয়না, এমন আমাকে দেখা, যে একাধারে বুদ্ধিমান, সুন্দর আর সাহসী! যার চরিত্রে কোনও খুঁত নেই, চেহারাতে না।

'শেষ পর্যন্ত তার দেখা মিলল!'
সাবাস!
একেই চাই, একেই চাই!

কে সেই মানুষ মজা ?
কে?
চুমুকে এসো, ছেলেরা!

আটাত্তর দিন পরে

এম এল শ্রোতাঙ্গন

গ] ল্প বলার বিশেষ ভঙ্গির জন্য কোন কোন ছবি মনকে বেশি আকর্ষণ করে। জিত লাহিড়ীর "আটাত্তর দিন পরে" রকমই একটি বিশিষ্ট ছবি। সিনেমার র্ম সম্পর্কে যে তিনি সচেতন সেটা আটাত্তর দিন পরে"-র ক্রেডিট-টাইটেল ড়বার সময়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। কটা ফাকাশে ফ্রিজ শট—একজন ওয়াগন কার রেলওয়ে ব্রিজের উপর পুলিসের লিতে ছিটকে পড়েছে। ওই মুহূর্তে মনে , বুঝি কোন বিদেশী ছবির দৃশ্য দেখছি, ফ্রিজ শটের এমনই অব্যর্থ প্রয়োগ। মনই বিজয় দে'র ক্যামেরা এবং গোবিন্দ াপাধ্যায়ের এডিটিংয়ের কাজ। পরিচালক ছবিতে সিনেমাটিক ফর্মটাকে উপেক্ষা রেননি বলেই ক্যামেরা ও এডিটিংয়ের যোগ নিয়েছেন পুরোপুরি। রাত্রির ধকারে ওয়াগন ভাঙা ও পুলিসের পরস্তার অ্যাকশন দৃশ্যগুলি ক্যামেরা ও ডিটিংয়ের গুণে খুবই রিয়্যাল ও রোমাঞ্চ- হয়েছে। অবশ্য এটা বাইরের টেকনিক্যাল , খুবই উঁচু পর্যায়ের সন্দেহ নেই যা লা ছবিতে দেখাই যায় না, বোম্বাইয়ের র পরিপাটি টেকনিক্যাল কাজের সঙ্গেই তুলনীয়। তার চাইতেও পরিচালকের ও বড় কৃতিত্ব, তিনি গল্পটাকে ওই মেরা ও এডিটিংয়েরই সাহায্যে ফিল্মের করে বলে গেছেন প্রায় আগাগোড়া।

সত্যি বলতে কী, চিত্রনাট্যের (রচনা : জগদেশ্বর রায়) সূচনায় ওয়াগন ব্রেকার- দেখার পর ছবির বক্তব্যটা স্পষ্টই হয়ে েছিল। পাকা ওয়াগন ব্রেকার ও জবিরোধী নায়ক ফটিকের প্রতি দর্শকের তে যদিও উচ্চারিত, তবু পরিচালকের নুভূতি ফটিক হারায়নি। এবং ফটিকের ছেলেদের বিপথগামিতার মূলে যে জের অব্যবস্থাই দায়ী, বাংলা ছবিতে বক্তব্য নতুন নয়। তারা যে আপাত- ন্ত ...বড়লোক সমাজের হাতের

'ফরিয়াদ' (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে সুচিত্রা সেন ও পার্থ মুখোপাধ্যায়। ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

পুত্তলিকা এটাও নতুন দেখা গেল না। এই ছবির অভিজাত ভিলেন লক্ষ্মী মুখার্জির মত চরিত্র হিন্দীচিত্রে প্রায়ই দেখা যায়। তবু একটা দিকে নতুনত্ব আছে। নায়িকা ঝর্ণার কথাই ধরা যাক। ফটিকের পৌরুষ ও প্রাণশক্তি দেখে তার প্রতি ঝর্ণা আকৃষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সিনেমার দর্শকরা যা চান, ঝর্ণা কিন্তু সেরকম অস্বাভাবিক নয়। ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে বলে সমাজবিরোধী ফটিককেই জীবনসঙ্গী করে নি। সে ভালবেসেছে ফটিকের ছোট ভাই অভয়কে। অভয় ভাল ছেলে, ফটিকের বিপরীত চরিত্র। সে ঝর্ণাকে "চোখের বালি" পড়ে শোনায়। অভয় ও ঝর্ণার মেলামেশায় কোন বাড়াবাড়ি নেই এখানে কোন তথাকথিত রোমান্টিক উপাখ্যানও গড়ে তোলা হয়নি। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দেখানো হয়েছে খুব রুচিসম্মত- ভাবে। ওদের দুজনের সম্পর্কটি প্রণয়ের পরিণতিতে যে-ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে তাতে পরিচালকের রসবোধ ও সংযমের পরিচয় মেলে। বৃষ্টির রাতে অতুলপ্রসাদের গানের (বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে) ব্যবহারও চমৎকার। তবে গানটি অভয়ের মুখে না দিয়ে রেডিওতে বাজালেও চলত। গানটি খুবই সুন্দর গেয়েছেন মান্না দে। আধুনিক গানের প্রতি পরিচালকের ঝোঁক ছিল না বলেই এই পর্বে এসথেটিক রস পাওয়া গেল। "কেন এলে মোর ঘরে" অ তু ল প্র সা দে র গানটিও (আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুগীত)। অভয়- ঝর্ণার ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে সুপ্রযুক্ত। যে অসংযম বিশ্লেষণে এমন মুক্তির রূপ, সেখানে সেই মামুলি ধারায় ঝর্ণাকে বিয়ের আগেই সন্তানসম্ভবা করা হল কেন? সে কি

ফটিকের উষ্মা সৃষ্টির জন্য? এর কোন দরকার ছিল না। অভয়ের প্রতি ঝর্ণার অনুরাগই যথেষ্ট ছিল। ফটিক যে ফিল্মের গল্পের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অনুজের প্রতি স্নেহবশত মুহূর্তের মধ্যে অভয়- ঝর্ণার প্রণয়কে মেনে নেয়নি, তার মধ্যে যে জ্বালা ও উন্মত্ত অধিকারবোধ দেখা গেছে সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই রিয়্যালিটি। চিত্র- কাহিনীতে (মূল রচনা : সমরেশ বসু) এই জটিলতার ইঙ্গিত আছে। পরিচালকও তা সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। অবশ্য ছবিতে কোন কোন জায়গায় সরলীকরণের ব্যাপারও আছে, যেমন, বাবা মারা যাওয়ার পর ঝর্ণার মত মেয়ের পক্ষে এক কথায় ফটিকের বাড়িতে এসে ওঠা। ঝর্ণার চরিত্রে যে ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধ দেখা গেছে তাতে তার পক্ষে হেমন্তর বাড়িতে আসাই স্বাভাবিক ছিল। হেমন্ত ছবির আর এক চরিত্র, ফটিকের কনট্রাসট হিসাবে পরিকল্পিত। চাকুরি যাওয়ার পর হেমন্ত অন্যায় পথে পা বাড়ায় নি। সে গেছে সংগ্রামের ও শ্রমিক আন্দোলনের পথে। হেমন্তকে কেন্দ্র করে ছবিতে শ্রমিক আন্দোলন, বিক্ষোভ, শোভা- যাত্রা ইত্যাদি রাখা হয়েছে। এই অংশে "আটাত্তর দিন পরে" কিছুটা পলিটিক্যাল ফিল্মের মত হয়েছে। অন্যদিকে আছে ফটিকের গল্প। জয়ন্তী মিলের সামনে কর্মীদের শোভাযাত্রার উপর সেই হাঙ্গামায় আটাত্তর দিন পর ফেরার ফটিকের মনে আত্মবিশ্লেষণের ইচ্ছা জেগেছে। তার আগে সে চেয়েছিল অন্যায়ের পথ ছেড়ে দিতে। কিন্তু পারেনি। ধর্মঘটীদের আক্রমণ করার জন্য তাকে টাকা দিয়েছিল লক্ষ্মী মুখার্জি। ফ্যাক্টরির সামনে সেই হাঙ্গামার পর হেমন্তও ফেরার। ফেরার অবস্থায় দেখা

স্নেকারকেই যেন আমরা দেখছি সমিত ভঞ্জ চরিত্রোচিত অভিনয়, আচরণ ও কথা বলার ভঙ্গিতে। কখনও নির্মম, কখনও বা আবেগে কাতর ফটিক ঝণ্টির জন্য অথবা নিজের দুর্দশার কথা ভেবে। সব মুহূর্তেই সমিত ভঞ্জের চরিত্রচিত্রণ উঁচুমানের। শেষে যখন অভয় ও ঝণ্টির উপর প্রতিশোধ নিতে এসে তাদের ক্ষমা করে যায় ফটিক তখন সমিত ভঞ্জ দর্শকের হাততালি পান।

ফটিকের সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসাবে চিন্ময় রায়ের অভিনয়ও মনে রাখার মত। তিনি দর্শককে হাসিয়েছেন খুব, অভিনীত চরিত্রটিকেও রিয়্যাল করে তুলেছেন।

জয়া ভাদুড়ি হয়েছেন ঝণ্টি। বেশ স্মার্ট তাঁর অভিনয়ের ধরন। কোন কোন মুহূর্তে স্বাভাবিক দৃঢ়তা দেখা গেছে তাঁর আচরণে। তাঁর প্রণয়ীর চরিত্রে ভাস্কর চৌধুরীকে বেশ ভাল ছেলেই মনে হয়েছে। অবশ্য বিশেষ কিছু করবারও ছিল না তাঁর। অনুপকুমার হেমন্তের দরদ ও আদর্শপ্রীতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। ভারতী দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা প্রত্যেকেই চিত্রনাট্যের উপযোগী অভিনয় করেছেন।

এঁদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিচালক ছবিটিকে সহজেই উপভোগ্য করে তুলেছেন। সংগীতও (কালীপদ সেন পরিচালিত) এই উপভোগ্যতার সহায়ক। যদিও শেষ পর্যন্ত নাট্যরসে হঠাৎ কেমন যেন ভাঁটা দেখা গেল। কাহিনীর যবনিকায় পুলিসের গুলিতে নায়কের মৃত্যুই হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু ফটিকের মৃত্যু ঘটেছে আচমকা, বিশেষ কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে নয়। এই আকস্মিক ছেদ বাঞ্ছিত নাট্যমুহূর্ত রচনা করতে পারেনি। চিত্রনাট্যের গতি শেষের দিকে মন্থর, অভয়-ঝণ্টির উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য যখন ফটিক আসছে তখনকার দৃশ্য এত দীর্ঘ না হলেও পারত। তার আগে পর্যন্ত চিত্রনাট্য সুরচিত।

ক্লাইম্যাক্স ঈপ্সিত নাট্যরস দিতে না পারলেও শেষ দৃশ্যের ফ্রিজ শটটি ওই ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে—শটটি মনকে ধাক্কা দেয়। আগে যা বলেছি, এই ছবির গল্প বড় কথা নয়, বড় জিনিস হল গল্প বলার ভঙ্গি। কয়েকটি শট স্মরণীয়—যেমন, রেল-লাইন ও গাড়ি চলার মধ্য দিয়ে ফটিকের মুখ ভেসে রয়েছে, কিংবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফটিকের মনে তার মার মুখ ভেসে আসার দৃশ্য-কল্পনা, গ্লাসের ভিতর দিয়ে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসা। এগুলি শুধুই টেকনিক নয়, রীতিমত ব্যঞ্জনাধর্মী। আরও চমৎকার ওই ঝণ্টিতে ফ্ল্যাশব্যাক, ফটিক এসে ঝণ্টিকে বুকে টেনে নিতেই যার শুরু। অনেক জায়গায়ই পরিচালক তাঁর প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। এবং "আটাত্তর দিন পরে" অজিত লাহিড়ীকে একজন ক্ষমতাবান পরিচালক হিসাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে। তাঁর "আটাত্তর দিন পরে"-র কাজ অনেকদিন অবধি আমাদের মনে থাকবে।

'বসন্ত বিলাপ' (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে অনুপকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায় কণিকা মজুমদার ও রবি ঘোষ

বাংলাদেশের ছবি "জীবন থেকে নেয়া"

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক শ্রীজহির রায়হানের "জীবন থেকে নেয়া" ছবিটি অবিলম্বেই কলকাতায় মুক্তি পাচ্ছে। ভরতে ছবিটি সেন্সর হয়েছে। এবং সরকার ছবিটিকে প্রমোদকর-মুক্ত করে দিয়েছেন। চিত্রমুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ মিশন এবং কলকাতার চিত্রপরিবেশক-সংস্থা বলাকা পিকচার্স-এর মধ্যে গত শুক্রবার এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে কলকাতার চলচ্চিত্রলোকের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ মিশনের প্রধান শ্রীহোসেন আলী উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবেদন জানান, তাঁরা যেন এই ছবি মুক্তির ঘটনাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। কারণ বাংলাদেশের ছবি এই প্রথম এপার বাংলায় দেখানো হচ্ছে।

"জীবন থেকে নেয়া" ছবির নায়িকা সুচন্দা, পরিচালক জহির রায়হানের স্ত্রী

ফটো—দেশ

ছবির লভ্যাংশ বাংলাদেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের জন্য দান করা হবে—এই কথা ঘোষণা করেন পরিচালক-প্রযোজক শ্রীজহির রায়হান। যেসব প্রতিকূল অবস্থায় ছবিটি তৈরি হয়েছে তাও শ্রীরায়হান সাংবাদিকদের জানান। সত্তর সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে তোলা এই ছবির প্রদর্শনী পাক সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে ছবির মুক্তির আন্দোলন হয়। শ্রীরায়হান বলেন, শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের হস্তক্ষেপের ফলে ছবিটি বাংলাদেশে মুক্তি পায়।

অনুষ্ঠানে ছবির নায়িকা এবং শ্রীরায়হানের স্ত্রী শ্রীমতী সুচন্দা উপস্থিত ছিলেন। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পেতে পারে।

রেকর্ডে

অতুলপ্রসাদের গান

অতুলপ্রসাদের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস তিনটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড বের করেছেন। একটি রেকর্ডে পাই গায়ক অতুলপ্রসাদের পরিচয়

—তিনি নিজেই তাঁর দুটি গান (মিছে তুই ভাবিস মন/জানি জানি তোমারে রঙ্গরাণী) গেয়েছেন। এই রেকর্ডের মূল্য অপরিসীম। রেণুকা দাশগুপ্তের চারটি পুরনো গানের (যদি গোকুলচন্দ্র/পাগলা মনটারে তুই বাঁধ/ওগো সাথী মম সাথী/চোখ বেঁধে ভবের খেলায়) নতুন ই-পি রেকর্ড পেয়ে শ্রোতারা উল্লসিত হবেন। এই গানগুলির ঐতিহাসিক জনপ্রিয়তার কথা কারো অজানা নয়। "যদি গোকুলচন্দ্র" গানটির সুর অতুলপ্রসাদের দেওয়া। বাকি তিনটি গানের কথা ও সুর অতুলপ্রসাদের। সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের দুটি গান (আর দে দে বলব না তোরে/হরি হে তুমি আমার) চমৎকার।

বোম্বাই বিচিত্রা

বহুদিন পর বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে আবার 'জমাট' গল্পের কদর বেড়েছে। হঠাৎ আবার নতুন করে একথা প্রায় প্রমাণিত যে শুধু স্টার, মিউজিক ডাইরেক্টর, সেট সেটিং, কাশ্মীর, টোকিও, দার্জিলিং বা উটির দৃশ্যকে যে কোনো ছন্দে গেঁথে দিলেই ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত নয়। গ্ল্যামার-সর্বস্ব নায়ক-নায়িকাতে আর কাজ চলছে না। গল্প চাই, চরিত্র চাই, শুরু চাই, শেষ চাই এবং এইসব জিনিসকে ব্যবহার করার মধ্যে শৃঙ্খলা চাই নইলে দর্শকরা আর মজছে না।

বোম্বাই-এ রাজকাপুর, দিলীপকুমার, দেবানন্দ প্রভৃতির পর যাঁরা সিলভার জুবিলী স্টার হয়ে আকাশ থেকে পড়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই অভিনেতা-অভিনেত্রী না হয়েই স্টার হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা ততদিন রাজত্ব করেছেন যতদিন তাঁদের ছবি হিট হয়েছে যেই তাদের ছবি ফ্লপ করতে শুরু করেছে অমনি তাদের অবস্থা কাহিল। গতকালের অনেক স্টারের অনেক ছবি বর্তমানে অসম্পূর্ণ পড়ে আছে বন্ধ টিনে। দু-একজন স্টার নিজের ঝুঁকিতে এই ধরনের দু-একটি ছবি শেষ করে অশেষ দুর্ভোগ পোহায়েছে। সুতরাং সে-রেওয়াজও বন্ধ। আজকাল বেশীর ভাগ গতকালের স্টারই প্রযোজনা এবং পরিবেশনের ব্যবসা শুরু করেছেন বা করতে চাইছেন। কারণ এঁদের হাতে কাজ না থাকলেও অর্থের অভাব এঁদের অধিকাংশেরই নেই। এঁদের যখন সুদিন ছিল তখন গল্প লেখক থেকে শুরু করে সকল কলাকুশলীরাই এঁদের হাতে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা স্টার-শাসিত রাজত্বে নেহাৎই চুনোপুঁটি ছিলেন সুতরাং পেটের দায়ে মুখটি বুজে চুপটি করে সব সহ্য করে গেছেন। আজকাল সেইসব কলাকুশলীদের দিন আবার আসছে [illegible] এবার তাঁদেরও চাল-চলন এবং [illegible] দেখা যাচ্ছে। জানি না এই ধরনের রকমফের কিরকম ভবিষ্যতের জন্ম দেবে! চলচ্চিত্র জগৎ কলাকুশলী শাসিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এই কলাকুশলীদের চরিত্রে যদি কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে, সুযোগ সুবিধা এবং সাফল্য যদি তাঁদের ব্যবহারের নিয়ামক হয় তাহলে সামগ্রিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র কতখানি উপকৃত হবে তা ভাববার বিষয়।

বোম্বাই-এ নির্মিত বেশীর ভাগ ছবির গল্পই এতদিন সাহিত্য-নির্ভর ছিল না। আজও নেই। যদিও গল্প ছাড়া এদেশে এখনো ছবি হয় না। বোম্বাই-এ বেশীর ভাগ চিত্রকাহিনীকারই গল্প বলিয়ে। শোনা শোনা গল্প থেকে চিত্রনাট্য এবং ডায়লগ লেখার রেওয়াজ এখানে! তাও বেশীর ভাগ কাজই হয় 'অন দ্য স্পট'। কারণ সময়ের অভাব! অসংখ্য ছবিতে কাজ করে সর্বদা ব্যস্ত নায়ক/নায়িকারা গল্প পড়ার সময়ই পেতেন না সুতরাং গল্প বলিয়েরা বেশ পসার জমিয়ে ছিলেন। আজকাল গল্প শোনার থেকে ঝোঁকটা এসেছে গল্প পড়ার দিকে। স্টাররা গল্প পড়তে চাইছে আজকাল! ভাল গল্প ভাল দরে তাঁরা করতে চাইছেন। কিন্তু যেসব কলাকুশলীদের নিয়ে ভাল গল্প তাঁরা করতে চাইছেন আজকাল সেই সব কলাকুশলীদের গল্প-পড়ার সময় নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন! এতদিন কলাকুশলীরা স্টারদের যেসব অভিযোগ করতেন, আজকাল কিছু সফল কলাকুশলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেই একই অভিযোগ করছেন! 'হঠাৎ 'হিট' হলে সকলেরই মাথা খারাপ হয়' ফিল্মি লাইনের এ প্রবাদটা এখনো মিথ্যে প্রমাণিত হয়নি।

সরল শর্মা

চিৎপুর-চিত্র

রক্তে রাঙা কাশ্মীর

কেবল নাট্যগুণের বিচার যদি করা হয়, কিংবা তোলা হয় বিষয়বস্তুর কথা, তবে জোর গলায় বলা যেতে পারে অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর 'রক্তে রাঙা কাশ্মীর' নিঃসন্দেহে মরসুমের শ্রেষ্ঠতম পালা। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর কার নতুন করে এ-প্রশ্নের আর জবাব দেবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই দল, এই পালা পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় ধরে লক্ষ কোটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অংশত নয়, গোটা কাশ্মীরই (জম্মুসহ) কেবল ভারতের! দশ-হাজারী আসরে বসে দেখেছি জনমন আলোড়িত। [illegible] ফেটে পড়ছে। [illegible]

আশংকা যে মানুষের মধ্যে এমন উদ্দাম প্রেরণার সঞ্চার করতে পারে 'রক্তে রাঙা কাশ্মীর' না দেখলে তা বিশ্বাস করাই শক্ত।

উনিশ শ' সাতচল্লিশের অকটোবর মাসের কথা। চক্রান্তকারী পাক সৈন্যরা মুজাহিদের বেশে মহম্মদ আলী জিন্নার নির্দেশে গোটা ভূস্বর্গকে গ্রাস করতে উদ্যোগী। চারদিকে চলেছে ভয়াবহ লুণ্ঠন এবং বীভৎস অত্যাচার। সেই দুঃসময়ে কাশ্মীররাজ চাইলেন ভারতের সাহায্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল রণদামামা, শুরু হল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ যে সত্যিকারের কতখানি নৃশংস হতে পারে অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর প্রয়োগ আসরে তারই প্রমাণ দিয়েছে।

ঝিলম নদীর তীরে পালার শুভ-সূচনা। তারপর একুশটি ছোট বড় দৃশ্য জুড়ে এই দুঃখ-কাহিনীর বিস্তার। ঘটনার ঘনঘটা যদি প্রাণ, এখানে তা পর পর ঘটেছিল। নাটক গড়ে তোলার জন্যে দু'একটি দৃশ্যের অবশ্যই সত্যি কল্পনা, কিন্তু কাশ্মীর-যুদ্ধের ইতিহাস সে জন্য কোথাও মলিন হয়ে ওঠেনি। চণ্ডীচরণ ব্যানার্জি ঐতিহাসিক তথ্যকে সামনে রেখে ঘটনার মালা সাজিয়েছেন। সেই ঘটনার প্রত্যেকটি প্রবল উত্তেজনার। পালার তৃতীয় দৃশ্য থেকে শেষাবধি যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, হত্যার বিভীষিকা। লক্ষ্য এক হলেও চরিত্র এই যে বিচিত্র উপস্থিতি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে তা দেখতে হয়। আরও অবাক হই যখন দেখি যাত্রার আসরে মহম্মদ আলী জিন্নার হুবহু প্রতিরূপ। না, মডেল নয়, মানুষ। বহু দৃশ্যে তাকে যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করতেও দেখা গেছে।

বিস্মিত হবার মতন বহু গুণে পালা পরিবেশনায় উপস্থিত। বিশেষ করে উল্লেখের দিক এর সুচিন্তিত প্রয়োগ এবং শক্তিশালী দলবদ্ধ অভিনয়। অভিনেতা-পরিচালক অমিয় বসু দুটি বিশিষ্ট দিকই পাশাপাশি রেখে আসরে কাহিনীর ক্রমোন্মোচন ঘটিয়েছেন। সকল শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জনের দিকটিও এখানে বিবেচিত। কাশ্মীররাজ হরি সিংয়ের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং তার মন্ত্রী এখানে খলনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত। নাচ-গানের কয়েকটি মজাদার অংশও সুপ্রযুক্ত। তবে কেবল যুদ্ধের ভয়াবহতা, গোলাগুলির শব্দ ফাটানো আওয়াজ, শত্রুহত্যার নৃশংস উল্লাস এবং পাক হানাদারদের অমানুষিক অত্যাচার কোথাও ক্লান্তিকর ক্ষণ রচনার অবকাশ পায় নি। ভারতীয় সৈন্যরা এখানে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে হাসিমুখে।

অসম্ভব নাটকীয়তা 'রক্তে রাঙা কাশ্মীর' পালার সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে লাগানো হয়েছে জোরালো অভিনয়ের মাধ্যমে। এমন নিখুঁত টিমওয়ার্ক সচরাচর চোখে পড়ে, যাত্রার অভিনয়েও প্রত্যেকটি

"ছিন্নপত্র" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে চন্দ্রাবতী দেবী ও উত্তমকুমার

শিল্পী বলিষ্ঠ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে অসহায় হরি সিং-এর অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে পড়াকে বলিষ্ঠ রেখায় যেন এঁকেছেন চন্দ্রশেখর। আফ্রিদি সর্দার-রূপে বিমল লাহিড়ীর অভিনয় নিশ্চয় স্মরণযোগ্য। কাশ্মীরের দেওয়ান 'ওয়েক-ফিল্ড' চরিত্রে গুরুদাস মিত্র এবং মন্ত্রী মেহেরচাঁদ রূপী নকুল দাসকে তৈরি খলনায়ক মনে হয়েছে আগাগোড়াই। শান্তি হাজরার 'কামাল' নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠতায় উজ্জ্বল। 'সোলেমান' নামক এক কাশ্মিরী যুবক, যে ছিল পাক হানাদারদের গোপন সর্দার, ওই চরিত্রে প্রণয়কুমার সার্থক অভিনয় করেছেন। 'মহম্মদ আলি জিন্না' চরিত্রের কথা আগেই বলেছি। ওই চরিত্রটি বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে পান্না ভট্টাচার্যের অভিনয়ে। ছোট একটি চরিত্র 'মকবুল শেরোয়ানী' রূপে অমিয় বসুর অভিনয় বুঝি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংলাপ এবং নাট্যমুহূর্তকে একজন অভিনেতা কী কৌশলে কাজে লাগাতে পারেন, শ্রীবসু এখানে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। স্ত্রীচরিত্রসমূহের মধ্যে ছবি রায়ের 'লাইলী' নাচ-গান অভিনয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে চরিত্রায়িত। মায়া পালের 'শমীম', দীপিকা দাসের 'রাবেয়া', শিবানী সরকারের 'মাদার' এবং নমিতা নন্দীর 'মকবুলের মা' স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক চরিত্রায়ন। কুমারেশ ব্যানার্জি, শ্যামল দাস, মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, বিশ্বনাথ বিশ্বাসের অভিনয়ও দীর্ঘকাল মনে থাকবে।

—সূত্রধার

বি এফ জে-এর অনুষ্ঠানে পোলিশ চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদ্বয়

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক মিঃ মারগোলস্টার্ন ও চিত্রাভিনেতা মিঃ টি ইয়ানজার এক আলোচনাচক্রে মিলিত হয়েছিলেন গত ৩০ অক্টোবর বিকেলে ই-আই-এম-পি-এর সভাগৃহে। গত সপ্তাহ থেকে ভারতে যে পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে সেই উপলক্ষে ওঁরা কলকাতায় এসেছিলেন। বি এফ জে ঐ আয়োজিত এই ঘরোয়া সভায় ওই দুই বিশিষ্ট অতিথি বাংলার চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওঁদের দেশের চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক ধারা সম্পর্কে প্রায় একঘণ্টা আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।

বি এফ জে-এর নতুন কর্মপরিষদ

৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্য-নির্বাহক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত। নতুন কার্যনির্বাহক সমিতির পূর্ণ তালিকা : সভাপতি—শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ; সহ-সভাপতি—শ্রীমহেন্দ্র সরকার ও শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়; সম্পাদক—শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত; সহ-সম্পাদক—শ্রীঅশোক মজুমদার ও শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগোপাল পাল; সদস্যগণ—শ্রীবাগীশ্বর ঝা, শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়, শ্রীরবি বসু, শ্রীশৈলেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন মল্লিক, শ্রীনির্মল ধর, শ্রী পি এন উপাধ্যায়, শ্রীসময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বরঞ্জন সান্যাল, শ্রীগোপেন লাহিড়ী, শ্রীসোমেশ কুণ্ডু, শ্রীঅনন্ত সাহিত্যালঙ্কার ও [illegible]।

শ্রী বি বি ঘোষের পরলোকগমন আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশন এবং সি এম ডি এ'র চেয়ারম্যান শ্রী বি বি ঘোষ ২৭ অকটোবর বুধবার পরলোকগমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর। তিনি অকৃতদার ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষের কর্মব্যস্ত জীবনের সমাপ্তি ঘটে আকস্মিকভাবে। বৃহস্পতিবার সকালে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবসর গ্রহণ করে শ্রীঘোষ কলকাতা পোরট কমিশনারস-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তার পরে ১৯৭০ সালে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে বৎসরকাল রাজ্য প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কলকাতা মেটরোপলিটান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি এম ডি এ) এবং শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশন (আই আর সি) স্থাপিত হয় প্রধানত তাঁরই চেষ্টায়। গত বছর বৃহত্তর কলকাতায়

পণ্য প্রবেশ কর (চুঙ্গি) প্রবর্তনে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সাহায্য আদায়ের ব্যাপারেও তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা স্মরণীয়। ১৯০৫ সালে বরিশালে বিনয়ভূষণের জন্ম।

দেশী সংবাদ
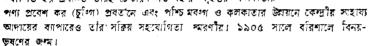
২৫ **অকটোবর**—নদীয়ার তিন দিকে—গেদে, বানপুর ও শিকারপুর অঞ্চলে প্রচুর পাকিস্তানী ফৌজ আমদানি ও সাজানো হয়েছে। হিলি, রাধিকাপুর ও করিমগঞ্জ সীমান্তে পাকিস্তানীরা গোলাগুলি চালাচ্ছে। মেখলিগঞ্জ সীমান্তের কাছে পাক গোলন্দাজ বাহিনী হাজির হয়েছে। ত্রিপুরা ও আসামে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে।

ধোড়াল যক্ষ্মা হাসপাতালের একশটি শয্যার খরচ বাবদে সি এম ডি এ কলকাতা করপোরেশনকে দু'লক্ষ টাকা সাহায্য হিসাবে দিতে আগ্রহী। কিন্তু পৌরকর্তৃপক্ষের কোন সাড়া নেই। এ সম্পর্কে ডেপুটি মেয়র শ্রীপান্নালাল দাস হেলথ অফিসারের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছেন।

২৬ **অকটোবর**—কর্তব্যে চরম অবহেলা ও শৃঙ্খলাহীনতার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদ এই সংস্থার বেশ কিছু সংখ্যক কর্মীকে সাসপেনড করার ব্যাপারে একটি তালিকা তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই সোমবার জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের সাতজন কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

ভারত সরকার একজন শ্রমিক নেতাকে দুর্গাপুর ইসপাত কারখানার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইনি হচ্ছেন দুর্গাপুরের শ্রমিক নেতা শ্রীআগারাম তুলপুলে। শ্রীতুলপুলে হিন্দ মজদুর সভার সাধারণ সম্পাদক। তিনি শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই নন, একজন বিশিষ্ট ইনজিনিয়ারও।

২৭ **অকটোবর**—কেন্দ্রের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগারজন সদস্যের একটি জরুরী পর্ষদ গঠন করেছেন। রাজ্যের মুখ্যসচিব শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত ওই পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। প্রয়োজন হলে আধঘণ্টা নোটিসে এই পর্ষদের বৈঠক ডাকা হতে পারে। আপৎকালীন বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই এই জরুরী পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

ভারতের পূর্বোত্তর অঞ্চলকে ৫টি রাজ্যে ভাগ করা হবে এবং মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ নাম দিয়ে কেন্দ্র দুটি এলাকা শাসন করবেন। কিন্তু এই এলাকায় রাজ্যপাল থাকবেন একজন এবং হাইকোর্টও থাকবে একটি। এভাবে রাজনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে একটি উপদেষ্টা পর্ষদও থাকবে।

২৮ **অকটোবর**—পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে চার হাজার পাঁচশ' বাহান্নজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় সর্বাধিক ১৮২৪ জন। তারপরেই ২৪ পরগনায় ৬৬৬ জন, সবচেয়ে কম পুরুলিয়ায় ৩৮ জন। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত ২১ জন কোন না কোনভাবে মারা গিয়েছেন।

২৯ **অকটোবর**—ওড়িশার তিনটি রাজনৈতিক দল—নব কংগ্রেস, সি পি আই ও পি এস পি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ দাসের কাছে একটি চরমপত্র পাঠিয়েছে। ওই চরমপত্রে সাতদিনের মধ্যে ৮ দফা দাবি পূরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এবার ইলিশের মরসুমে প্রধানত ইলিশ মাছ বেচেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশী হাজার টাকার ওপর রোজগার হয়েছে। আগস্ট মাসের মাঝামাঝিই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মাছ ধরা পড়ে। সেই সময়ে একদিনে সাতটি শক্তি-চালিত নৌকার সাহায্যে তিন হাজার কেজিরও বেশী ইলিশ ধরা হয়।

৩০ **অকটোবর**—পাকিস্তানের আপত্তির দরুণ রুশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মারশাল কুতাকোভ আজ সোজা পথ ছেড়ে ঘুর পথে মসকো থেকে নয়াদিল্লি আসেন ছয়দিনের ভারত সফরের উদ্দেশ্যে। বিমানটিকে পাক আকাশ-পথ দিয়ে যেতে দিতে আপত্তি জানায়। ফলে বিমানটি ইরান ঘুরে আরব সাগর পেরিয়ে অবশেষে পালাম বিমান বন্দরে নামে।

বন্যপক্ষী ও প্রাণী সংরক্ষণ আইন বলে রাজ্য সরকার নরখাদক বাদে বাঘ ও চিতাবাঘ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন। ওই আইনটি আগামী পাঁচ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে বলে এক **সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়।** রয়েল বেঙ্গল টাইগারের **সংখ্যা কমে যাওয়ায়** সরকার **ওই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।**

৩১ **অকটোবর—শুক্রবার ও শনিবার** সমস্ত কটক জেলা এবং বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ জেলার কিছু অংশের উপর দিয়ে ১৫০ কিলোমিটার বেগে যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়, তাতে প্রায় একশ লোক নিহত ও শত শত গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটে এবং কটক জেলাতেই দশ লক্ষাধিক লোক গৃহহারা হন। চাষ আবাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

২৫ **অকটোবর**—মাওয়ের উত্তরাধিকারী বলে উল্লিখিত চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও সম্পর্কে যে রহস্য দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি তা আরও ঘনীভূত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ চীন তার দীর্ঘদিনের রীতি ভঙ্গ করে এবার রুমানিয়ার সেনাদিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অভিনন্দন জ্ঞাপক বার্তা প্রচার করতে পারেনি।

২৬ **অকটোবর**—রাষ্ট্রপুঞ্জে সাধারণ পরিষদ গতকাল ভোটাধিক্যে সমাজতন্ত্রী চীনকে সদস্যভুক্ত করেছে এবং তাইওয়ানকে বহিষ্কৃত করেছে। সাধারণ পরিষদে ৭৬—৩৫ ভোটে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১৭টি দেশ ভোটদানের সময় অনুপস্থিত থাকে। চীন কূটনীতিকরা হয়ত শীঘ্রই এখানে আসছেন।

২৭**অকটোবর**—ইউরোপের তিনটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র থেকেও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। গত দু'মাস ধরেই এই অস্ত্র আসছে। সম্প্রতি এই সরবরাহ বেড়েছে। প্রথম আসছিল শুধু হালকা অস্ত্র, এখন কিছুটা ভারি অস্ত্রশস্ত্রও আসছে।

২৮ **অকটোবর**—অসট্রিয়ার চ্যান্সেলার ব্রুনো ক্রেইস্কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানার্থে ভিয়েনার ফেডারেল চ্যান্সেলারিতে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। অসট্রিয়াস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত ওয়াং ইউই তিং সেই সভায় শ্রীমতী গান্ধীকে আন্তরিকভাবে সম্বর্ধনা জানান। সুতরাং বলা যায়—ভারত-চীন সম্পর্কের মাঝে যে বাধার পাহাড় ছিল তা অপসারিত হয়েছে।

২৯ **অকটোবর**—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বেঁচে আছেন। পাক সরকার তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি সামরিক জেলে রেখেছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেনট বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে লিখিতভাবে একথা জানিয়েছেন। মুক্তিাঙ্গনগর থেকে ফিরে এসে শ্রী ডি পি ধর কলকাতায় একথা জানান।

৩০ **অকটোবর**—মারকিন বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীটি গত রাত্রে সেনেট নাকচ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অপ্রত্যাশিত। তবে কিনা বিদেশকে সাহায্যদানের বিরূপ সমালোচনা ক্রমেই উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক ও সামরিক খাতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র গত ২৫ বছর ধরে বিভিন্ন দেশকে প্রায় ১৪৩০০ কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে।

৩১ **অকটোবর**—মুক্তিফৌজ যশোর রণাঙ্গনে তিনটি সীমান্ত চৌকি পাকিস্তানী হানাদারদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। পাক ফৌজ এখন পিছু হটছে। পিছু-হঠা সেনারা এখন ঝিকরগাছার মূলে শিবির বসিয়ে সেখান থেকে অগ্রবর্তী এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

mcm/s/4 bn

সূচীপত্র

(সি ৩১১১)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বাচ্চার জন্যে মায়ের কামনা...
ও যেন পায় সুখস্বপ্ন
অসীম ভালবাসা—
টুকটুকে গাল, তুলতুলে পা
যা কিছু মোর আশা
অস্টারমিল্কই দেব ওকে—
যা সবচাইতে ভালো বেঁচে
থাক সোনা
আমার
ঘরটি ♥♥♥
করে আলো!
OSTERMILK
আপনার মত বিচক্ষণ মায়েরা
অস্টারমিল্ক
Creative Unit-294

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীসুবল দাস

ঘরে-বাইরে দুদিকেই
দিব্যি মানিয়ে নিয়েছি

রূপ যৌবন বেশবাসে অপরূপ হয়ে আছে বসে!

বরুণ সেনগুপ্তের

দ্বিতীয় গ্রন্থ : প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস

সব চরিত্র কাল্পনিক

দাম ৫·০০

১৯৭১ সালের জুলাই-অগাস্ট। কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তখন কায়েম এক ঘোরতর আতঙ্ক এবং সন্ত্রাসের বিভীষিকা। প্রতি মুহূর্তে বোমার জহ্লাদী অট্টহাসি, রিভলভার-পাইপগানের উন্মত্ত উল্লাস, আর ছুরি-ভোজালির হিংস্র ঝলসানিতে পশ্চিমবঙ্গের আত্মা শিহরিত, বিমূঢ়, ত্রস্ত। চারিদিকে শুধু হিংসা আর হিংসা। রক্তের নদী বয়ে চলেছে গণ-বেকারির অভিশাপে ক্লিষ্ট, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাঙনের নির্মম কশাঘাতে প্রায়মৃত, রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির ঘৃণ্য ক্লেদে কলুষিত পশ্চিমবঙ্গের বুকের ওপর দিয়ে। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে মিঃ অরিন্দম চ্যাটার্জি এলেন পশ্চিমবঙ্গ সফরে—দিল্লি থেকে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিশেষ প্রতিনিধি হয়ে। উদ্দেশ্য : পশ্চিমবঙ্গের এই সার্বিক সংকটের কারণ অনুসন্ধান। পুরো একটি সপ্তাহ রইলেন তিনি এখানে। সব দেখলেন, শুনলেন। কথা বললেন এস আই বি-র ডি ডি, পুলিস কমিশনার থেকে আরম্ভ করে শিল্পপতি, অধ্যাপক, ছাত্র, কৃষক, সাধারণ মানুষ—সবাইয়ের সঙ্গে। এই উচ্চশিক্ষিত, চিরপ্রবাসী, মুক্তমন বাঙালী ভদ্রলোকের নিরপেক্ষ ও আন্তরিক চোখ দিয়ে বিখ্যাত সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত তাঁর প্রথম উপন্যাসে পশ্চিম বাংলার বর্তমান সংকটের কারণটি ধরতে চেয়েছেন—যার ফলে গোয়েন্দা-কাহিনীতুল্য রুদ্ধশ্বাস আগ্রহসঞ্চারী এ বইটি উপন্যাস হয়েও ইতিহাসের গুরুত্ব—এবং ইতিহাস না হয়েও প্রামাণিক দলিলচিত্রের মর্যাদা—পাবে।

প্রকাশিত হল

পালাবদলের পালা ॥ বরুণ সেনগুপ্ত ॥ ১২·০০

১৯৬৭ থেকে ১৯৭০—পশ্চিমবঙ্গে দু-দুবারের যুক্ত ফ্রন্ট শাসনের এই তিন বছরের লোকলোচনের অন্তরালে সংঘটিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেপথ্য-ঘটনাগুলি সংগ্রহ করে সেগুলি নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা বরুণ সেনগুপ্ত রচনা করেছেন তাঁর প্রথম বই এ-কালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এই ইতিহাস-গ্রন্থখানি। এ-যাবৎ বারো হাজারেরও বেশী বিক্রীত।

সত্যজিৎ রায়ের বই

গ্যাংটকে গণ্ডগোল ॥ দাম ৪·০০

ব্যোমকেশ বক্সীর উত্তরসাধক সাহিত্যে নবাগত কিন্তু ইতিমধ্যেই স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের নতুন রহস্য অ্যাডভেঞ্চার 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' রহস্যের জটিলতায়, রোমাঞ্চকরতায় এবং রহস্য উদ্‌ঘাটনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ততায় বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যে এক অভূতপূর্ব সংযোজন।

প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ॥ দাম ৪·০০

প্রোফেসর শঙ্কুর আবিষ্কারের সীমাসংখ্যা নেই। যে-কোনও প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারা 'রোবো' থেকে আরম্ভ করে তিন মিনিটের মধ্যে যে-কোনও ভাষার কথা বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া আশ্চর্য যন্ত্র 'লিংগুয়াগ্রাফ'—কী না তিনি আবিষ্কার করেছেন! সেই বিশ্ববিখ্যাত প্রোফেসর শঙ্কুর পাঁচটি রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এক ডজন গপ্পো ॥ দাম ৬·০০

দুটি গোয়েন্দা-কাহিনী, তিনটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, গুটি চারেক অলৌকিক কাহিনী, দুটি স্রেফ মজার গল্প এবং একটি সিরিয়াস গল্প—মোট এই বারোটি গল্প এ গ্রন্থে আছে। যদিও গল্পগুলি বিচিত্র স্বাদের, তবুও মূলত সর্বদা কি-হয় কি-হয় সংশয়, রক্ত হিম করা ত্রাস এবং অনাবিল কৌতুকের হাসিই গল্পগুলির প্রধান সুর।

বাদশাহী আংটি ॥ দাম ৪·০০

একে তো রোমাঞ্চকর ও বুদ্ধি-ধাঁধানো ঘটনা-সন্নিবেশ হেতু এ কাহিনীর আকর্ষণ প্রচণ্ড, এবং আশ্চর্য সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ এর রচনা-ভঙ্গি, তার ওপর রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের নিজের আঁকা বহুরঙা অপরূপ প্রচ্ছদ এবং বারোটি পুরো-পাতা ইলাসট্রেশন। উল্লেখ্য যে, 'বাদশাহী আংটি'ই ফেলুদার সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েন্দা-উপন্যাস।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯ ॥

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২
শনিবার ২৭ কার্তিক ১৩৭৮
Saturday 13 November 1971

ওড়িশায় ঘূর্ণিঝড়

সাম্প্রতিকালে যে কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারতের নানা অঞ্চলকে বিপর্যস্ত করেছে কয়েক দিন পূর্বের ওড়িশার ঘূর্ণিঝড় তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। এমন সর্বনাশা ঝড় ইদানীং-কালে তো বটেই, অনেকের মতে গত তিয়াত্তর বছরের মধ্যে ওড়িশায় আর দেখা যায় নি। গত ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলাগুলি ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ঝড় বয়েছে ঘণ্টায় দেড় শো কিলোমিটার বেগে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হানা দিয়েছে ষোলো ফুট উঁচু হয়ে। ঝড়ে জলে একাকার হয়ে যে তাণ্ডব ঘটে গিয়েছে তাতে কম করেও প্রাণহানি ঘটেছে দশ হাজার হতভাগ্যের, দশ লক্ষ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। চল্লিশ লক্ষেরও বেশী মানুষ বিপন্ন।

মানুষের ক্ষমতা আজ অনেক; তবু প্রকৃতি তার আয়ত্ত নয়। নিয়তির মতনই সে অজ্ঞেয়। কোন্ যুক্তিতে এক একটি দুর্যোগ এসে মানুষের নিরন্তর পরিশ্রমে গড়া জনপদকে মুছে দিয়ে যায় কেউ তা বলতে পারে না। এখানে যা ঘটে তাই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয়, সহ্য করে নিতে হয়; অভিযোগ জানাবার মতন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওড়িশার উপকূলে ঝড়বৃষ্টির ধাক্কা বরাবরই লেগে আছে। সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী এলাকার পক্ষে এটা প্রায় স্বাভাবিক। তবু মানুষ তার চেষ্টায় এখানেই ঘর বাঁধে, সংসার করে, রুজির জন্যে নানা পেশায় নিযুক্ত হয়। সেই ঘর যখন প্রকৃতির নিমেষের খেয়ালে রাতারাতি মুছে যায় তখন হাহাকার করা ছাড়া পথ থাকে না। এমনই কয়েকটি এলাকা ওড়িশার সাম্প্রতিক ঝড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মতন হয়েছে। যেমন, পারাদীপ। পারাদীপ অঞ্চলে কম করেও তিন হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। এখানে ক্ষতির পরিমাণ দু কোটি টাকা। বালেশ্বরের জাম্বুর এলাকারও একই অবস্থা। জাম্বুর পাঁচ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন। এখানে শরণার্থীদের বসবাস বেশী ছিল। কেন্দ্রপাড়া মহকুমাতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ হাজার। কটক শহরের ক্ষতিও নগণ্য নয়। তাছাড়া ওড়িশার মধ্যে রেল যোগাযোগ বহু জায়গায় বিচ্ছিন্ন, তারবার্তা অচল, বিদ্যুতশক্তি নষ্ট হয়ে আছে।

সরকারীভাবে ওড়িশার ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করার এবং ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্যে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার অতি দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ক্ষয়ক্ষতির যে চেহারা তাতে জরুরী ভিত্তিতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও ত্রাণের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমস্যা আরও গভীর হয়ে দাঁড়াবে। শোনা যাচ্ছে, এই সর্বনাশা ঝড় শ্মশান-সদৃশ এলাকাগুলিতে শেয়াল শকুনিও রাখে নি। তা যদি হয়, তবে স্বাস্থ্যের কারণে অনতিবিলম্বে এই সব এলাকায় সামরিক পদ্ধতিতে একটা ব্যবস্থা নেওয়া কর্তব্য। ওড়িশার জনজীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এমন নিশ্চয় কেউ চান না, সরকারী তরফে সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ওড়িশার রাজনৈতিক অবস্থা যেমনই হোক, বিভিন্ন দলের নেতা এবং সকল রকম সেবা প্রতিষ্ঠানের উচিত এই সংকটে একযোগে জন-কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ। শুধু সরকারী চেষ্টায় এই ব্যাপক ক্ষতি সামলানো সম্ভব হবে না।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম
৬০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
[illegible] পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার

কলিকাতায়
বার্ষিক ঃ ৩১.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ১৬.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ঃ ৮.০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)
বার্ষিক সডাক ঃ ৩৬.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক " ঃ ১৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক " ঃ ৯.৫০ পয়সা

ভারতের বাইরে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ঃ ৫০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ২৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ঃ ১৪.০০ পয়সা

চাঁদার হার

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ঃ ৪৪.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ২২.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ঃ ১১.৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ঃ ৮০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ঃ ৪২.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ঃ ২১.৫০ পয়সা

উড়ুক্কু সাধু

চ্যবন
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অচিরেই বন্ধ করব
মূল্যবৃদ্ধি অচিরেই নিয়ন্ত্রিত হবেই—
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অচিরেই বন্ধ করব
মূল্যবৃদ্ধি অচিরেই নিয়ন্ত্রিত হবেই—
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অচিরেই বন্ধ করব
মূল্যবৃদ্ধি অচিরেই নিয়ন্ত্রিত হবেই—

একটি বিজ্ঞপ্তি

আপনাদিগের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, আমাদের মহান মাকুবাদী কমিউনিস্ট পারটির পূজনীয় ত্রিমূর্তি কমরেড জ্যোতি বোসদা, কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদা এবং কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারদা প্রভৃতি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বাজারে যে গুজব ছড়াইয়াছে তাহা সত্যই গুজব। ওই রটনার কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। তাঁহারা সকলেই সুস্থ দেহে এবং সম্পূর্ণ কর্মক্ষম অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে, আগে তাঁহাদিগকে পবলিক ফাংশানে যতটা দেখা যাইত, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনড, কি শহীদ মিনার, কি পাড়ার অথবা বেপাড়ার জনসভাগুলিতে, বর্তমানে সে-তুলনায় তাঁহারা কিঞ্চিৎ পর্দানশিন হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

আপনারা জানিয়া নিশ্চিন্ত হউন যে, আমাদের মহান মাকুবাদী কমিউনিসট পারটির এই তিনজন উজ্জ্বল তারকা/রেড স্টার সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ নিভৃতে রেওয়াজ করিতেছেন। তাই বর্তমানে বাহিরে বিশেষ আর আওয়াজ দিতেছেন না। রেওয়াজের প্রয়োজন হইল কেন?

মাকুবাদী কমিউনিসট পারটির মাকুবাদ অর্থাৎ গদি দখলের জন্য হয় বিপ্লব নয় নির্বাচন প্রায় সাফল্যের মুখে আসিয়াও নিতান্ত ভাগ্যদোষে নয়-ছয় হইয়া যায়। তাহাতেও অসুবিধা হইত না, যদি প্রগতির অবতার মহামান্য শান্তিস্বরূপ, যিনি কিনা অধম পশ্চিমবঙ্গকে তরাইবার জন্য এক হাতে গীতা এবং অন্য হাতে মারকসবাদ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আরও কিছুদিন রাজভবনের ঢালাও গদিতে গা ঢালিয়া বস্তিবাসের দুঃখ কষ্ট অনুভব করিবার জন্য এ পোড়া পশ্চিমবঙ্গে টিকিয়া যাইতেন।

তাহা হইলে মাকুবাদের মহিমা আরও প্রকট করিয়া তোলা যাইত। সরকরী দফতরখানার বেতনভুক কেরানী-বিপ্লবীগণ প্রশাসনকে সোজা পঙ্গু করিয়ার অবাধ গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করিয়া হয় বিপ্লবকে গাজাইয়া তুলিতে পারিতেন। প্রশাসন অবসন্ন থাকিলে মক্কুবরদের পোয়াবারো হইত। তখন আমাদের ক্যাডার-কমরেডদিগের সতত তৎপরতার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল জনসাধারণের আর টাঁ-ফোঁ করিবার জো থাকিত না। সেই মওকায় নির্বাচন করিয়া ফেলিতে পারিলে আর কথা ছিল না। ভোটের জোরে

ভাসাব কাণ্ডারে, বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও।

কিন্তু ভাল রেওয়াজ ছিল না বলিয়া যাহা হইবার তাহাই হইল। সুর ছুটিল, লয় টুটিল, এবং তাল ভঙ্গ হইল। মাকুবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে স্পিডে ছোটা রথ গাড্ডায় পড়িয়া উল্টাইয়া গেল। আমাদিগের যে যে কাদের কমরেড পাড়ায় পাইপ গান উঁচাইয়া, রিভলবার দেখাইয়া এক একজন অনারারি কমিশনার বনিয়া গিয়াছিলেন, বন্ধুভাবাপন্ন প্রগতিশীল পুলিসের প্রশ্রয়ে পাড়ার দণ্ডমুণ্ডের ভার যাঁহারা সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারাই একদিন বেকায়দায় বমাল পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়া আসামী বনিয়া গেলেন। হাঁ, আসামী। আমাদের মাকুবাদী উকিলবৃন্দরাই আমাদের হবু কমিশনারদের জামিনে খালাস করিবার নিমিত্ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদালতে এই মর্মে জামিননামা দাখিল করিলেন যে, "আসামী একজন পৌরপিতা, সি পি এম-এর বিশিষ্ট সদস্য এবং কলিকাতায় তাঁহার খান কয়েক বাড়ি আছে।" কলিকাতায় খান কয়েক বাড়ি থাকা কায়েমী স্বার্থ ধ্বংস করার পক্ষে যে একটা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, আশা করি সে-বিষয়ে আপনারা এখন নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। এবং ইহাও বুঝিয়া গিয়াছেন যে, এই ধরনের বহু যোগ্যতাসম্পন্ন নেতার সমাহারে আমাদের মাকুবাদী কমিউনিসট পারটির উচ্চতম নেতৃত্ব সুগঠিত বলিয়াই আমাদের হাতে সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ এত নিরাপদ। আমরা ভুষিমালের কারবার করি না।

তবে, এত সরেস মাল থাকা সত্ত্বেও গদি হাতের ভিতরে আসিয়াও যে আসিল না, তাহার জন্য আমাদের নীতির বা নেতৃত্বের কোনও গলতি নাই। উহা গ্রহের ফের।

নীতিগতভাবে আমরা এখনও মাকুবাদী। সে নীতি আমরা বিসর্জন দিই নাই। আপনারা সকলেই জানেন, আমরা প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনে জিতাইতে, ইন্দিরাজীর ইমেজ রাংতা ঘষিয়া চকচকে করিয়া তুলিতে এবং সংবিধানের মৌলিক অধিকার খর্ব করিতে নব কংগ্রেসকে মদত দিতে কোনোই ত্রুটি করি নাই। কিন্তু তথাপি উহা যে বংশ অবতার হইয়া আমাদিগের যুদ্ধের সংকটস্থলে প্রবিষ্ট হইতেছে, গ্রহবৈগুণ্য ছাড়া ইহা আর কী?

তাই আমাদের মাকুবাদী নেতৃত্বের উচ্চ মণ্ডলের তিন অধীশ্বর এখন নিভৃতে ফাঁড়া কাটাইবার কর্মকাণ্ডে ব্রতী হইয়াছেন। উঁহাদের কেহই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই। ফাঁড়াটি যে কিরূপ কঠিন, পাড়ায় আমাদিগের সন্তর্পণে বিচরণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা তো প্রায় অহিংসকেই পরিণত হইয়াছেন। এখন তাঁহার মুখে বাল্মীকির মত কেবল দয়া কর, দয়া কর ছাড়া দ্বিতীয় কোনও বাক্যই নাই। আমাদের সংগ্রামী কেরানী নেতাদের বরখাস্তের সংবাদ তাঁহার বুকে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছে। অন্য সময় হইলে তাঁহার ক্ষাত্র তেজ রে রে করিয়া চাগাড় দিয়া উঠিত। আরক্তিম ঘূর্ণিত লোচনে তিনি 'যুদ্ধ, যুদ্ধ' বলিয়া হুংকার ছাড়িতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁহার হৃদয় থইথই করুণার পাথার। তাই তিনি রাজ্যপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি সদ্‌বৃত্তিসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। আহা, এখন তাঁহাকে দেখিলে রিফরমড বিশ্বামিত্রের কথাই চকিতে মনে পড়িয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলা করিবার জন্য রাজ্যপাল ডায়াসের উদ্যোগে সম্প্রতি (৫ নভেম্বর) যে নাগরিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে আমাদের প্রিয় মাকুবাদী নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। এবং এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালকে লিখিত তাঁহার পত্রখানি তাঁহার রিফরমড মানসিকতাকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। "আমাদের পারটির প্রতি সরকার যে-কোনও দৃষ্টিভঙ্গী দেখান না কেন, জনগণকে জাগিয়ে তোলার কাজে উপযুক্ত ভূমিকা নেওয়া বাঞ্ছনীয়।" দেখুন, [illegible] তাহা কত সংযত, কত সুললিত কত মধু-মধুর। ইহা সেই রেওয়াজেরই মহিমা, যাহা আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশকে আপাতত নিভৃতে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

অসীম চ্যাটার্জী

অসীম চ্যাটার্জীকে পুলিস অনেকদিন ধরেই খুঁজছিল। এতদিন পায় নি। এবার পেয়েছে। বিহারের দেওঘরে। অসীম ধরা পড়েছেন। আর ধরা পড়েছেন তাঁর দুই সঙ্গী।

অসীমের ক্রিয়াকলাপের উপর পুলিস বহুদিন থেকেই নজর রাখছিল। অসীম কোন্ কোন্ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে পুলিস তা জানত। অসীমের বেশ কিছু সঙ্গীকেও পুলিস চেনে। তাদের খোঁজ খবরও রাখে। এতদিন অসীম কোনও একটা অঞ্চলে এসে চলে যাওয়ার পর পুলিস খবর পেত। এবার খবর পেয়েছিল নির্দিষ্ট অঞ্চলে পৌঁছবার আগেই। তাই পুলিস এবার অসীমকে ধরতে পারল।

কীভাবে পুলিস অসীমকে ধরেছে তার বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে। মাস দুই তিন আগে একবার নাকি পুলিসের এক সংবাদদাতা কলকাতায় অসীমকে দেখেছিল। দিনের বেলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অসীম। সংবাদদাতা নাকি সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসও ছুটেছিল। কিন্তু অসীমকে আর সেখানে দেখা যায় নি।

পুলিসের অফিসাররা বলেন, অসীমকে একটুর জন্য তারা মিস করেছেন বহুবার। জামসেদপুরে, বীরভূমে, দুমকায়, দেওঘরে তাঁরা বার বার অসীমের খোঁজ করেছেন। কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞরা গিয়েছেন। বিভিন্ন জেলায় পুলিস নিজস্ব লোক ছেড়ে রেখেছে। কিন্তু তবু ঠিক অসীমকে ধরতে পারে নি।

হাওড়া স্টেশনে পুলিসের গুলিতে অসীম মারা গিয়েছে, এইরকম একটা খবরও একবার রটেছিল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে অসীমের মিল দেখে পুলিস বহুভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিল তিনি অসীম কিনা। ছবি তোলা হয়েছিল মৃত ব্যক্তির। অসীমের বাবা মার কাছে সেই ছবি পাঠানো হয়েছিল। তাঁর তরুণ বন্ধুদেরও ছবি দেখানো হয়েছিল। এমন কি গোটা পশ্চিমবঙ্গে যেসব পুলিস অফিসার অসীমকে চিনতেন তাদেরও এনে ছবি দেখান হয়েছিল। কেউ

বলেছিলেন, ওই অসীম। কেউ কেউ আবার বলেছিলেন, না, ও কিছুতেই অসীম নয়। অসীমের মুখটা একটু বাঁকানো। শোনা গিয়েছিল একজন বিখ্যাত ডাক্তার প্লাসটিক সারজারি করে তাঁর বাঁকা মুখ সোজা করে দিয়েছেন। তাই কনফিউশনটা একটু বেশি রকমের হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত পুলিসের কর্তারা জানতে পেরেছিলেন হাওড়া স্টেশনে গুলিতে যিনি

মারা গিয়েছেন তিনিও অসীম—তবে চ্যাটার্জী নন, মজুমদার। তিনি নাকি হুগলী জেলায় নকশালপন্থীদের একজন বড় নেতা ছিলেন।

পুলিস যে মুহূর্তে বুঝতে পারল মৃত ব্যক্তি অসীম মজুমদার, চ্যাটার্জী নয়, তখনই আবার পুরোদমে এক দুর্ধর্ষ অসীমের জন্য খোঁজ খবর শুরু হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার দুই পুলিসই অসীমকে খুঁজছিল। অসীম চ্যাটার্জী বিহারে এবং ওড়িশায়ও অপারেট করতেন। বিহার-ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত কমিটির তিনিই ছিলেন প্রধান নেতা।

*

অসীম চ্যাটার্জী ছিলেন নকশালপন্থীদের সবচেয়ে সক্রিয় নেতা। এক কানু সান্যাল ছাড়া ওদের মধ্যে আর কেউ নাকি অত পরিশ্রমী ছিলেন না। অসীমের প্রচণ্ড সাংগঠনিক ক্ষমতাও সবাই স্বীকার করেন। প্রথমে কাজ করতেন কলকাতায়। প্রধানত মধ্য কলকাতায়। তারপর গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। আদি নিবাস বীরভূম জেলায়। সিউড়ি শহরেই ওঁদের বাড়ি আছে। অসীমের বাবা এখন জেলা নব কংগ্রেসের সভাপতি।

শোনা যায় ছাত্রাবস্থায় গোড়ায় কিছুদিন অসীম কংগ্রেসের লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করেছিল। তারপর যখন অসীমকে প্রথম সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতিতে দেখা যায় তখন সে ছাত্র ফেডারেশনে। সি পি এম প্রভাবিত ছাত্র ফেডারেশনের প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিটের নেতা।

অসীম তাঁর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট পপুলার ছিলেন। এক্সেপশনাল ছেলে বলে প্রথম থেকেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অসীমের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এখন আই এ এস অফিসার। তাঁরা অনেকেই এখনও ব্যক্তি অসীমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ক্রমে ক্রমে অসীম নকশালপন্থী হয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ এলাকায় তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন দলের প্রধান। প্রায় প্রতিদিনই তখন কলেজ গেটে অ্যাকশন লেগে থাকত। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে অসীমকে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালবাসছে তাঁকেই তারা ভয় করছে। অসীমের বিবর্তন তখন পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

নকশালপন্থীরা যখন পার্টি ফর্ম করলেন তখন দলের ভেতরে অসীমের বেশ প্রভাব। নবগঠিত দলে তিনিও একজন নেতা। নকশালপন্থীদের কাছে কারো কাছে শোনা যেত, পশ্চিমবঙ্গে দলের ভেতরে চারুবাবু, সুশীতলবাবু, সরোজ দত্ত এবং কানু সান্যালের পরেই অসীমের স্থান। অসীম দলের রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটি দুটোতেই ছিলেন। আরও শোনা যেত অসীম চারুবাবুর দক্ষিণ হস্ত। কানু সান্যাল গ্রেপ্তার হওয়ার পর চারুবাবু নাকি দলের সর্বোচ্চ কমিটিতেও অসীমকে নিয়েছিলেন।

বাইরের লোক অর্থাৎ সাধারণ মানুষ প্রধান নকশালপন্থী নেতা বলতে পশ্চিমবঙ্গের যে তিনজনকে খুব বেশি চিনতেন তাঁদের একজন অসীম। চারুবাবু, কানু সান্যাল এবং অসীমকেই নকশালপন্থী নেতা বলতে, সাধারণ মানুষ বেশি চেনে।

দলের ভেতরে মতবিরোধ যত বাড়ল অসীমের গুরুত্বও ততই বাড়তে থাকল। প্রথম মতবিরোধ দেখা দিল পার্টি গঠিত হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই—তখন সেন, নাগি রেড্ডিদের সঙ্গে। সে বিরোধে অসীম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন বলে কিন্তু শোনা যায়নি। তার কিছুদিন পরে দেখা দিল আরও বড় মতবিরোধ। সারা ভারত কমিটিতেই জোর মতবিরোধ। এই মতবিরোধে, দলের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুশীতল রায়চৌধুরী চারুবাবুদের সঙ্গে ভিন্নমত হলেন। প্রধান

মতবিরোধের বিষয় হল আরবান অ্যাকসন অর্থাৎ শহুরে ক্রিয়াকলাপ। নকশালপন্থীরা তখন স্কুল কলেজে হামলা, জাতীয় নেতাদের মূর্তি ধ্বংস এবং গলাকাটা পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন। সুশীতলবাবুরা এ সবের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কতকগুলি কাজে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। চারুবাবু, সরোজবাবু, সুনীতি ঘোষ প্রভৃতিরা কিন্তু শহুরে অ্যাকসন এবং খতম অভিযানের পূর্ণ সমর্থক। শোনা যায়, দলের ভেতরের এই মতবিরোধের সময় অসীম চারুবাবুকে সমর্থন করেন। এও শোনা যায় যে এইসব কাজের প্রধান প্রবক্তাই হয়ে দাঁড়ান অসীম চ্যাটার্জী। নকশাল রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলেন, অসীমের সমর্থন এভাবে পেয়েছিলেন বলেই চারুবাবুর পক্ষে তখন সুশীতলবাবুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ সহজ হয়েছিল।

কানু সান্যাল তখন জেলে। দলের অপেক্ষাকৃত কম বয়সের নেতাদের মধ্যে অসীমই তখন প্রধান। তিনিই সবচেয়ে সক্রিয়। পারটির বিহার কমিটির মূল নেতৃত্ব সুশীতলবাবুদের পক্ষে চলে গিয়েছিল। তাঁরা চারুবাবুকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেছিলেন। অসীম চারুবাবুর হয়ে মূল পারটির পক্ষে বিহারে নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা প্রভৃতি জেলাতেও অসীমের প্রচণ্ড প্রভাব।

এরপর হঠাৎ দেখা গেল, চারুবাবুর সঙ্গে অসীমের মতবিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মতবিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলল। দলের ভেতরে দু পক্ষই নিজেদের বক্তব্য প্রচার করতে শুরু করলেন। দু' পক্ষই দলের অধিকাংশকে সঙ্গে পেতে চান। একদিকের নেতা চারুবাবু, আর একদিকে তাঁরই প্রধান শিষ্য অসীম চ্যাটার্জী।

মতবিরোধের ক্ষেত্র কী কী তা নিয়ে অবশ্য নানা কথা শোনা গিয়েছে। মূল মতবিরোধটা নাকি ছিল দলের কর্মসূচী নিয়ে। সেই অসীমই নাকি শহুরে অ্যাকসন, নির্বিচার খতম প্রভৃতির বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নাকি চারুবাবুর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও তুলেছিলেন যে, ভদ্রলোক "ব্যক্তিগত খেয়াল খুশীমত দলকে চালাচ্ছেন"। গ্রামাঞ্চলে পারটির কর্মসূচী পরিবর্তনের কতকগুলি প্রস্তাবও নাকি দিয়েছিলেন অসীম চ্যাটার্জী।

পুলিস বলে, মতবিরোধটা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে এক গোষ্ঠীর লোকেরা অন্য গোষ্ঠীর লোকদের পেলে খতম করে দিত। বিভিন্ন জেলা কমিটিও নাকি পুরোপুরি দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এবং অসীম চ্যাটার্জী নাকি বহু কমিটিকে সঙ্গে পাচ্ছিলেন।

এ সব কথার সত্যাসত্য বিচার করা কঠিন। কারণ এদের পারটির সবটাই এত গোপনে চলে যে বাইরের লোক খুব কমই সত্য ঘটনা জানতে পারে। নানা খবর শোনা যায় বটে। কিন্তু তার কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বোঝা বড় মুশকিল। পুলিস যা যা বলে তার যে সব সত্যি তেমনও নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পুলিস নকশালদের সম্পর্কে যে খবর দিয়েছে তা ভুল।

কিন্তু চারুবাবু এবং অসীমের মতবিরোধের মূল খবরটা ঠিকই। এবং এই মতবিরোধের জন্যই অসীম গত দু তিনমাস যাবত প্রচণ্ডভাবে ছোটাছুটি করছিলেন। নানা এলাকা থেকে শোনা যেত, অসীম চ্যাটার্জীকে দেখা গিয়েছে। নিজের সমর্থনে দলে অধিকাংশকে পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে গিয়ে তাঁকে নানা ঝুঁকিও নিতে হয়েছে।

এর ফলে পুলিসের সুবিধা হয়েছে। পুলিস অসীম সম্পর্কে বহু খবরাখবর জানতে পেরেছে। কোনও রাজনৈতিক দলে যখন আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দেয় তখন পুলিসের খুব সুবিধা হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

পুলিসের একটা খবর হল, কিছুদিন আগে স্বাভাবিকভাবেই চারুবাবু মারা গিয়েছেন।

চারুবাবু জীবিত না মৃত তার সঠিক খবর অবশ্য পাওয়া কঠিন। তবে পারটির পক্ষ থেকে ওরকম কোনও খবর এখনও ঘোষণা করা হয় নি। এবং ওই মৃত্যু সংবাদ রটনার পরও চারুবাবুর ক্রিয়াকলাপের কিছু কিছু খবর শোনা গিয়েছে।

চারুবাবুকে ধরা কঠিন। কারণ চারুবাবু অসীমের মত ছোটছুটি করেন না। তিনি অসুস্থ। এবং বয়সে প্রবীণ। পারটিরও খুব কম লোক তাঁর খবরাখবর রাখে।

কিছুদিন আগেও পুলিস চারুবাবুকে ধরার জন্য কলকাতার সব হাসপাতাল, নারসিং হোম এবং শ্মশানে খোঁজ নিয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনও খবর পায় নি। তাঁর খোঁজে লোক পুরী, গোপালপুরে এবং দীঘাও গিয়েছিল। কিন্তু সে অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে।

এখন অবশ্য পুলিস বলছে, বেঁচে এবং দেশে থাকলে চারুবাবুও শীঘ্রই ধরা পড়বেন।

৭।১১।৭১

নলাবজ্ঞে গুপ্ত

শুক্রবার উনত্রিশে অক্টোবর।
রাত তখন গভীর।
বিধাতার অভিশাপের মত
হঠাৎ নেমে আসে
বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়
আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের
উন্মত্ত তাণ্ডব
ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের
উপকূলবর্তী জেলাগুলির
ঘুমন্ত গ্রামসমূহের উপর।
দু' দিন ধরে চলে এই
ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
ঘণ্টায় দেড় শ'
কিলোমিটার বেগে বয়ে-
যাওয়া ঘূর্ণিঝড়
এবং প্রায় ষোল ফিট
উঁচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের
যুগ্ম তাণ্ডবনৃত্যের
তীব্রতা হ্রাস পেলে
দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গের
মেদিনীপুর জেলার কিছু
অংশ এবং ওড়িশার
ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর ও কটক
জেলা শ্মশানে পরিণত।
শুধু ওড়িশার ওই
তিনটি জেলাতেই
প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ
এবং অসংখ্য গবাদি পশুর
প্রাণহানি ঘটেছে। হাজার
হাজার ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন
হয়ে গিয়েছে।
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও প্রায়
পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ।
এই ভয়ংকর সর্বনাশের
খানিকটা আঁচ অন্তত পাওয়া
যাবে পাশের চিত্রগুচ্ছ
থেকে। এগুলি ওড়িশার
ভদ্রকের নিকটবর্তী
পাঁজিহাট, চাঁদবালী প্রভৃতি
অঞ্চল থেকে তোলা।

তাইপে গেলো

দেবরাজ

জাতিপুঞ্জে লালচীনকে ঠাঁই দেবার জন্যে আলবানিয়ার আনা যে প্রস্তাব জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় পাস হয়েছে তার শর্ত ছিল দুটো। এক, জাতিপুঞ্জে চীনের নাম করে যে আসনটি রাখা আছে তাতে পিকিং সরকারকে বসানো; দুই, এতকাল সে আসনটি যাঁরা দখল করে ছিলেন সেই তাইপে সরকারকে সেখান থেকে বিদেয় করা। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে জাতিপুঞ্জের দরবারে পিকিং সরকারের আসন পাকা হয়ে গিয়েছে, সংগে সঙ্গে যাকে বলে পত্রপাঠ বিদেয় নিয়েছেন সদল-বলে তাইপে সরকার। শুধু খাস জাতিপুঞ্জ থেকে নয়, তার যে সব মূল সংস্থা আছে সেগুলো থেকে তো বটেই, তার সংগে জড়িত যে সব সংস্থা আছে সেগুলো থেকেও। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা থেকে ছাড়পত্র পেয়ে লালচীন তার সভ্য হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের আসনটিও পেয়েছে। বাকী সংস্থাগুলোতে যেখানে নির্বাচন দরকার সেগুলোতে নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকারই সে এখন পর্যন্ত পেয়েছে। নির্বাচনে জিতে সেগুলোতে তাকে ঠাঁই করে নিতে হবে। জাতীয়তাবাদী চীনের অস্তিত্ব আর জাতিপুঞ্জের কাছে নেই। কাজেই তার প্রতিনিধিদের কোনও সংস্থায় রাখার প্রশ্নই আর ওঠে না।

কিন্তু তাই কী? গোটা মহাচীনের ওপর কর্তৃত্বের যে দাবি জাতীয়তাবাদী চীন সরকার তুলেছেন তাইপে থেকে তা অবশ্য ধোপে টেঁকে না। পুঁচকে তাইওয়ান—যেখানে ১৯৪৯ থেকে ডেরা বেঁধেছেন গোটা চীনের এক কালের প্রধান মন্ত্রী চিয়াং কাইশেক দল-বল নিয়ে—তো আর খাস চীনের বেনামদার হতে পারে না। যার অধিকার তাকে দিয়ে জাতিপুঞ্জের সদস্যরা ন্যায্য কাজই করেছেন এ কথা মেনে নিয়েও অনেকে বলছেন তাইওয়ানকে একেবারে খারিজ করে দেওয়াটা কি উচিত কাজ হয়েছে? চীন সাধারণতন্ত্র বলে তাকে অবশ্য মেনে নেওয়া যায় না—প্রজাতন্ত্রই হোক আর সাধারণতন্ত্রই হোক চীন হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার এক বিরাট এলাকা, তার রাজধানী পিকিং। সেখানে যে সরকার কায়েম হয়ে বসেছেন, রাজনীতির আদর্শ তাঁদের যাই হোক না কেন, তাঁরাই চীনের আসল সরকার। বাইশ বছর ধরে তাঁদের জাতিপুঞ্জের বাইরে রাখা খুবই অন্যায় হয়েছে। আমেরিকার ও গাজোয়ারির ব্যাপারে জাতিপুঞ্জে আর দুনিয়ায় রাজনীতি-কূটনীতিতে একটা অবাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

ধর করা নামে তাইওয়ান না হয় জাতিপুঞ্জে থাকতে পারে না, কিন্তু নিজের নামেও কি সে ঢুকতে পারে না?—এমন একটা তর্ক তুলেছেন কেউ কেউ। ময়ূরপুচ্ছ পরলে দাঁড়কাক ময়ূর হয়ে যায় না এ কথা ঠিক। কিন্তু ময়ূর-চীন না হয় তাইওয়ান না-ই হলো, কিন্তু সাদামাটা দাঁড়কাক-তাইওয়ান তাকে হতে দিতে আপত্তি কিসের? মহাচীনের তুলনায় তাইওয়ান অবশ্য ছোট্ট জায়গা, যেন হাতির পাশে মশা। তা হলেও জাতিপুঞ্জের ১৩১ জন সদস্যের মধ্যে এমন দেশ বেশ কিছু আছে যারা আকারে তাইওয়ানের চেয়ে অনেক ছোট, লোকসংখ্যাও তাদের অনেক কম। আর সংগতিতে তাদের সঙ্গে তাইওয়ানের তুলনাই চলে না। ছোট্ট একরত্তি দ্বীপ হলে কী হয় তাইওয়ান চাষবাসে, শিল্প-বাণিজ্যে অনেক বিরাট দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সেখানকার লোকেদের জীবনযাত্রার মানও খুব উঁচু। জাপানকে বাদ দিলে তার নাগাল পেতে পারে এমন এলাকা দক্ষিণ পূর্ব কেন সারা এশিয়াতেই মিলবে না এক ইস্রায়েল ছাড়া। পিকিং না হয় এলো, কিন্তু তাইওয়ানকে বিদেয় করা হলো কেন? এ নিয়ে কারু কারু মনে খটকা লেগেছে।

লালচীনের বেলা যেমন তাইওয়ানের বেলাতেও তেমনই জট পাকিয়েছে আমেরিকা। গোড়ায় গলদ অবশ্য চিয়াং কাইশেক নিজেই করেছেন নিজেকে গোটা চীনের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে জাহির করে। চীন দুই নয়, এক জোর গলায় এ কথা তিনি বলে এসেছেন আর বলে এসেছেন ওই একটি মাত্র চীনের তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় নায়ক। তাতে সায় দিয়ে আমেরিকাও এতকাল বলে এসেছে মহাচীনের আইনসংগত সরকার হচ্ছে চিয়াং কাইশেকের সাধারণতন্ত্রী সরকার—সে সরকারকে প্রবাসী সরকার বলা ঠিক হবে না, কেন না, চীনের এলাকার বাইরে জাতীয়তাবাদীরা যাননি তাঁরা কোণঠাসা হয়ে চীনেরই এক কোণে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছেন। সোজা কথায়, আমেরিকার মতে তাইওয়ান চীনেরই একটা প্রদেশ যদিও সেটি একটি দ্বীপ মূল ভূখণ্ড থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। কুয়োমিণ্টাং দলেরও ওই মত। জাতিপুঞ্জে ছোটাছুটির পরও সে মত তাদের বদলায় নি। আজও তারা দাবি করছে চীনের আসল আইনসংগত সরকার চালাচ্ছে তাইপে থেকে তারাই, একদিন না একদিন মূল ভূখণ্ডে কম্যুনিস্টদের ঘাঁটি ভেঙে তারা ফিরে যাবে।

জাতিপুঞ্জে চীনের শ্যাম আর তাইওয়ানের কূল দুই রাখবার চেষ্টা করেছিল শেষ পর্বে আমেরিকা। তা সফল হয়নি খানিকটা চীনের একগুঁয়েমির দরুন খানিকটা তাইওয়ানের। খানিকটা আবার আমেরিকার এতকালের অবাস্তব নীতির ফল। আমেরিকা যদি গোড়াতেই চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে মেনে নিত, আর তাইওয়ানকে চীনের বাইরে একটা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য করতো তা হলে ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে উঠতো না। চিয়াং কাইশেকের মর্যাদায় তাতে আঘাত লাগতো, কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে পারতেন তিনি আস্তে আস্তে, হয়তো বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন নিজেকে। তেমন হলে তখনি না হোক উত্তেজনা মিটে গেলে জাতিপুঞ্জে তিনি ঢুকতে পারতেন চীনের নয়, আলাদা একটা স্বাধীন দেশ, তাইওয়ানের প্রতিনিধি হিসেবে। গোড়ায় আপত্তি তুললেও কম্যুনিস্টরাও হয়তো এ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত মেনে নিত। একটা দেশ ভেঙে দুটো দেশ গড়ার নজির ইতিহাসে ঢের আছে। তবুও তো তাইওয়ান মহাচীনের লাগোয়া নয়, পিকিংয়ের শাসনের বাইরেও সে ছিল অনেক কাল।

পিকিং যে জোট ধরে বসেছিল তাই-ওয়ানকে না তাড়ালে সে জাতিপুঞ্জে যোগই দেবে না—সাধারণ সভার মঞ্জুরি পেলেও নয়—তার কারণ আমেরিকা আর তাইওয়ানের তাইপে সরকারকে চীনের সরকার বলে চালানোর চেষ্টা। চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানকে চীনের এলাকা বলে ঘোষণা করেছেন। চীন যে দুটো নয় একটা তাও বলেছেন। চীন যদি একই হয় তা হলে পিকিংয়ে আর তাইপেতে দুটো সরকার তো চলতে পারে না। এক চীন নীতি মেনে নিলে কেমন করে পিকিংয়ের সঙ্গে তাইপেরও ঠাঁই হয় জাতিপুঞ্জে? তা হতে পারতো তাইওয়ান যদি নিজেকে চীনের বাইরে আলাদা দেশ বলে স্বীকার করতো। চিয়াং কাইশেক তাতে নারাজ। কাজেই বেরিয়ে আসতে হয়েছে তাঁর প্রতিনিধিদের মুখ কালো করে জাতিপুঞ্জের দরবার থেকে। আর যে তাঁরা ফিরে যাবেন সে ভরসাও নেই। এরপর কখনও যদি তাইওয়ান জাতিপুঞ্জে আসতে চায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে তার সে দাবি নাকচ করে দেবে চীন। নিরাপত্তা পরিষদে তার অমতে কোনও কাজ তো আর হতে পারবে না।
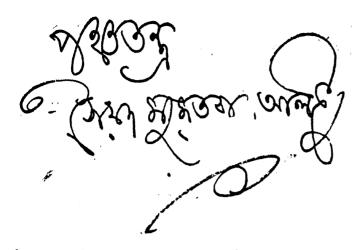
বিদেশে (২৯)

হেরমান দুষ্টু হাসির মিটমিটি লাগিয়ে বললে, "লোভ হচ্ছে না?"

আমি বললুম, "সে আর কও কেন, ব্রাদার?"

লটে বুঝতে পারেনি। চটে বললে, "কি সব হেঁয়ালিতে কথা বলছো তোমরা?"

কবি বলেছেন,

> "মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
> মধুকর তারে না বাখানে।"

আসলে লটে কি করে জানবে, সামান্য কয়েক গ্লাস ওয়াইন খেতে না খেতে তার গাল দুটি আরো টুকটুকে হয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছে হেরমান, লক্ষ্য করছি আমি। লটে জানবে কি করে? আমাদের দেশের সাধারণ জনের বিশ্বাস, ইয়োরোপের মেম-সায়েবরা সায়েবদেরই মত জালা জালা মদ গিলে ধেই ধেই নৃত্য করে। দ্বিতীয়টা সত্য। পুরুষের তুলনায় মেয়েরা নাচতে ভালোবাসে বেশী (কাষ্ঠরসিকরা তার সঙ্গে আবার যোগ দেন, "বাচ্চা বয়সে তারা আপন খেয়াল-খুশীতে নাচে; একটু বয়স হওয়ার পর বেকুব পুরুষগুলোকে নাচায়") কিন্তু মদ তারা ...য় পুরুষের তুলনায় ঢের ঢের কম। কেন ...ম খায়, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তবু ...কটা ইঙ্গিত দিতে পারি; কাচ্চাবাচ্চা ...ওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাওয়ার পর অনেক ...রেছেলেই পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ...দ খেতে শুরু করে এবং বিস্তর ...য়সাওলী বৃথা খাটে শুয়ে শুয়ে রাত ...রোটা অবধি খাসা চুকুস্ চুকুস্ করে। ...টের এখনো বাচ্চা হতে পারে কিনা বলা ...ঠিন—অসম্ভব নয়। তবে এ-কথা ঠিক, ...টের ওয়াইন চুকুস্ চুকুস্ করার কায়দা-...তা থেকে পষ্ট মালুম হয়, ও-রসে এ-গোবিন্দদাসী বঞ্চিত না হলেও আসক্তা তিনি নন। তাই কুল্লে আড়াই গ্লাস চুষতে না চুষতেই তার গোলাপী গাল দুটি হয়ে গিয়েছে টুকটুকে লাল—বুড়োদের নাক হয়ে যায় বিচ্ছিরি কোনী ঘেঁষা লাল।

হেরমান নির্ভয়ে বললে, "হের সায়েব তার দেশের কি এক মাছের বিরাট বয়ান দিয়ে বলছিল না, সে-মাছ যে খায় না সে মূর্খ। তোমার গাল দুটি যা টুকটুকে লাল হয়েছে—মনে হয় ঠোনা দিলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে—সে গালে একটু-খানি হাত বুলিয়ে দিতে যে-লোকের ইচ্ছে হয় না সে মূর্খের চেয়েও মূর্খ, গবেট, গাড়ল এবং বর্বর।"

লটে আমার দিকে তাকিয়ে শুধোলে, "আর তুমি সায় দিচ্ছিলে?"

আমি ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে—এ-পোড়ার দেশে আবার টাইট কলারের চাপে আপন অপ্রতিভ ভাবটা যথারীতি পাকা ওজনে চুলকোনোও যায় না—নানা প্রকারের অস্ফুট অনুনাসিক মার্জার সুলভ অ্যাঁও ম্যাঁও করতে করতে বললুম, "তা,—সে,—ওটাতে—সত্যি বলতে কি,—এহেন দুরাকাঙ্ক্ষা যদি আমার হৃৎ-কন্দরে অঙ্কুরিত হয় তবে সেটা এমন কি অন্যায্য হল বলো তো। তোমাদের দেশেই তো, বাপু, প্রবাদ আছে, "বেরালটা পর্যন্ত খুদ কাইজারের দিকে তাকাবার হক্ক ধরে।"

আমি মনে মনে ভাবছিলুম, লটে বোধ হয় বিরক্ত হয়েছে।

ওমা, কোথায় কি! লটে চটেনি।

বললে, "আমার বয়স পঞ্চাশ—বুড়ি হতে আর ক'বছর বাকি?"

আমি গম্ভীর কণ্ঠে বললুম, "জরমনিতে বুড়ি নেই। এ-দেশে কেউ বুড়ি হয় না।"

"মানে?"

"এ তত্ত্বটা আমি শিখি এই গোডেসবের্গ শহরেই। তোমার মনে আছে, আমাদের সেই ফুলওলা? সবে এখানে এসেছি, তার সঙ্গে আলাপ হয় নি। ইতিমধ্যে আমার মা'র পেটে কি যেন একটা হল। জব্বর অপারেশন করলেন কলোন থেকে এসে ডাকসাইটে এক সার্জন।"

লটে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার পষ্ট মনে আছে। আমাদের পাড়ার হাসি-খুশী তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।"

"একদম খাঁটি কথা। আমার মা যখন সেরে উঠছেন তখন ভাবলুম, কিছু ফুল নিয়ে যাই। ঢুকলুম সেই ফুলের দোকানে। সেই ছোকরা—প্রায় আমার বয়সী—তো উল্লাসে প্রায় নৃত্যমান। বার তিনেক জপ-মন্ত্রের মত 'গুটেন্ মর্গেন্' বলতে বলতে

শুধোল, 'আপনার ইচ্ছে? আদেশ করুন।' এবং পূর্ববৎ অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে লাগল।

জর্মন ফুলের তত্ত্ব তখনো কিছু জানিনে। কোন্ ফুল নিলে ভদ্রদুরুস্ত হয় সে বাবদে আরো অজ্ঞ। তাই 'কিন্তু কিন্তু' করছি দেখে অতিশয় লাজুক খুশী-ভরা মুখে বললে, 'স্যর। কিছু মনে করবেন না। কে, কার জন্য, কোন্ ফুল নেবেন কি নেবেন না, সে-সম্বন্ধে আমার কোনো প্রকারের কৌতূহল দেখানো আমার পক্ষে, সর্ব ফুলবেচনেওলার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই, হে'—হে', কিছু মনে করবেন না, যদি সামান্যতম ইঙ্গিত দেন—'

আমার বয়স তখন আর এমন কি। লজ্জা পেয়ে থতমত হয়ে তোতলালুম, 'না, না, সে-রকম কিছু নয়। আমি ফুল কিনব একজন অসুস্থা বৃদ্ধা—'

সঙ্গে সঙ্গে—যেন কেউ তার উদোম পিঠে সপাং করে বেত মেরেছে—কোঁৎ করে ককিয়ে বললে, 'এমন কথাটি বলবেন না, স্যর।'

আমি তো রীতিমত ভীত সন্ত্রস্ত। নাচতে গিয়ে আবার কোন্ এটিকেট্ নাম্নী মহিলার পা মাড়িয়ে দিয়েছি।

কোমরে দু ভাঁজ হয়ে বাও করে বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললে—'আপনি বিদেশী: তাই জানেন না, আমাদের এই "ডয়েচ্ শ্লান্ট্ য়ুবার আলেসের" দেশে, বিশেষ করে এই সুর-কানন-সুন্দর রাইনল্যাণ্ডে কোনো বৃদ্ধা, এমন কি প্রৌঢ়া মহিলাও নেই। কস্মিনকালে হয়নি, হবেও না। বলতে হয় "বর্ষীয়সী" এবং সর্বোত্তম পন্থা, কিঞ্চিৎ "হে' হে'" করে যেন বড়ই অনিচ্ছায় বলছেন, "এই একটুখানি বয়স হয়েছে আর কি।" সেই আমার প্রথম শিক্ষা। তাই বলি, পঞ্চাশ! ছোঃ! সে আর এমন কি বয়স!"

লটে বললে, "পিরামিডের তুলনায় তেমন আর কি?...সেই যে বলছিলুম, আর বচ্ছর যখন আমি মুনিক গিয়েছিলুম—"

আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'হিটলার', 'যোগাযোগ' 'ড্রেজেন হোটেল' এসব দিয়ে কেমন যেন একটা ক্রসওয়ার্ড পাজ্ল্ বানাচ্ছিলে?"

"মুনিকে পরিচয় হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, পরবের শেষ পার্টিতে। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, তিনি হিটলারের যে আরোপ্লেন পাইলট ছিলেন বাওর, তাঁর নিকট আত্মীয়। আমাদের মধ্যে কে যেন আলকথা পালকথার মাঝখানে 'যোগাযোগের' মাহাত্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। আত্মীয়টি তখন বললেন, 'এই যে পাঁচ বছর ধরে পৃথিবীর বীভৎসতম যুদ্ধ হয়ে গেল, কত নিরপরাধ ইহুদি কনসানট্রেশন ক্যাম্পে মারা গেল, বমিঙের ফলে হাজার হাজার নারী শিশু মারা গেল এর কিছুই হয় তো শেষ পর্যন্ত ঘটতো না, যদি না সামান্য একটা 'যোগাযোগে' একটুখানি গোলমাল হয়ে যেত।' তার পর বিশেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি গডেস-বের্গের বাসিন্দা বললেন না, সেই গডেস-বের্গের ড্রেজেন হোটেলে গিয়ে উঠেছেন হিটলার। তারিখটা ২৯-এ জুন, ১৯৩৪। আমার আত্মীয় বাওর বলেন, হিটলারের আশু প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কেউই বিশেষ কিছু জানতো না। তবে হিটলার তাঁকে বলে

রেখেছিলেন, তাঁর প্লেন যেন হামেহাল তৈরী থাকে। বাওর খানিকক্ষণ পরে এসে বললেন, সে-প্লেনে নাকি কি একটা গলদ দেখা গিয়েছে তবে তিনি অন্য প্লেনে বার্লিন গিয়ে সেখান থেকে রাতারাতি স্পেয়ার নিয়ে আসতে পারবেন। হিটলার অসম্মতি জানালেন। রাতের খানাদানা শেষ হলে পর হিটলার কেমন যেন চুপ মেরে গেলেন। যথারীতি তাঁর প্রিয় ভাগনারের রেকর্ড বাজতে শুরু করলো। হিটলারের সেদিকে যেন কান নেই, অভ্যাসমাফিক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে উরুতে ঠেকাও দিচ্ছেন না, আর সর্বক্ষণ উসখুস করছেন। বাওর তখন সেই একঘেয়েমি থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হিটলারের কাছ থেকে ঘণ্টা দুত্তিনের ছুটি চাইলেন। ইচ্ছে, পাশের বন্ শহরে একটা রোঁদ মেরে আসেন। এটা কিছু নূতন নয়। হিটলার হামেশাই এধরনের ছুটি সবাইকে মঞ্জুর করতেন। আজ কিন্তু বললেন, "না, তোমাকে যে কোনো সময় আমার প্রয়োজন হতে পারে।" দুপুর রাতে বাওরকে বললেন, "খবর নাও তো, ম্যুনিক ফ্লাই করার মত আবহাওয়া স্বাভাবিক কি না।" বাওর পাশের বড় অ্যারপর্ট কলন শহরে ট্রাংককল করে খবর পেলেন, আবহাওয়া খারাপ। হিটলার কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বাওরকে আদেশ দিলেন, খানিকক্ষণ বাদে বাদে যেন তিনি ট্রাংককল করে আবহাওয়ার খবর নেন। বাওর তাই করে যেতে লাগলেন। শেষটায় রাত তিনটের সময় বাওর সুসংবাদ দিলেন, এখন ফ্লাই করা সম্ভব। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে মোটরে উঠলেন, প্লেনে চেপে ভোরের আলো ফুটি ফুটি করছে এমন সময় ম্যুনিক পৌঁছলেন। এস্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, হিটলারের আপন প্লেন মেরামৎ হয়নি বলে তিনি ম্যুনিক পৌঁছলেন, অন্য প্লেনে। অ্যারপর্টে পৌঁছেই হিটলার জোর পা চালিয়ে গিয়ে উঠলেন মোটরে। সে গাড়িতে তাঁর কয়েকজন অতিশয় বিশ্বাসী সশস্ত্র সহচর তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। মোটর সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে উধাও হল। বাওর প্লেন হ্যাঙারে তোলার ব্যবস্থা করে দিয়ে অ্যারপর্টে পাইচারি করছেন এমন সময় তাঁর পরিচিত এক অফিসার তাঁকে দেখে শুধোলেন, "আপনি এখানে?" "কেন, ফ্যুরারকে খানিকক্ষণ আগে প্লেনে করে এখানে নিয়ে এলুম যে।"

অফিসার আরো আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, "সে কি? তাঁর প্লেন তো দেখতে পেলুম না।"

"আমরা অন্য প্লেনে এসেছি। কিন্তু ব্যাপার কি?"

অফিসার অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, "কেপটেন রোয়াম আমাকে খাড়া হুকুম দিয়েছিলেন, আমি যেন এখানে কড়া চোখ রাখি, ফ্যুরারের প্লেন দেখা গেলেই যেন তাঁকে ফোন করে খবর দি। এখন করি কি?"

বাওর বললেন, "করার তো কিছুই নেই আর। ফ্যুরার তো এতক্ষণে কেপটেন রোয়ামের ওখানে নিশ্চয়ই পৌঁছে গিয়েছেন।"

*

এস্থলে বলা প্রয়োজন, হিটলার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বই পড়া না থাকলেও একাধিক ফিলমের মারফৎ অনেক পাঠকই জানেন, এই কেপটেন রোয়ামই হিটলারের সর্বপ্রধান অন্তরঙ্গ সখা যিনি হিটলারকে জর্মনির চ্যানসেলার রূপে গদী-নশীন করার জন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান। তাঁর অধীনে প্রায় পাঁচ লক্ষ নাৎসি যুবক আধা-মিলিটারি ট্রেনিং পেয়েছিল। হিটলার নাকি হঠাৎ খবর পান—কখন পান বলা কঠিন—যে রোয়াম নাকি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, তাঁকে হটিয়ে স্বয়ং গদীতে বসবেন। তাবেতে আছে, বিশেষ করে তাঁরই (রোয়ামেরই) অনুগত পাঁচ লক্ষ নাৎসি—এদেরই নাম ব্রাউন শার্ট।

হিটলার তাই কাউকে কোনো খবর না দিয়ে, গোপন ব্যবস্থা করে হঠাৎ গোডেস-বের্গে থেকে (সেখানে গিয়েছিলেন যেন পূর্বাভ্যাস মত বিশ্রাম নিতে—আসলে রোয়ামের চোখে ধুলো দেবার জন্য; অবশ্য রোয়ামও কিছুটা সন্দেহ করে-ছিলেন বলে পূর্বোল্লিখিত অফিসারকে অ্যারপর্টে মোতায়েন করেছিলেন) ম্যুনিকে পৌঁছে সোজা রোয়াম যে হোটেলে স্বাস্থ্যোদ্ধার করছিলেন সেখানে অতি ভোরে পৌঁছে তাঁকে অতর্কিত ভাবে হামলা করে বন্দী করেন।

রোয়াম এবং তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ষড়যন্ত্রকারীদের গুলি করে মারা হয়।

*

লটে বললে, "আবহাওয়ার যোগাযোগ তো আছেই কিন্তু আসল কথা এই, হিটলার যদি আপন প্লেনে আসতেন তবে সেই পাহারাদার অফিসার তৎক্ষণাৎ রোয়ামকে জানাতেন। রোয়ামও তৈরী থাকতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে জড়ো করতেন। কে জানে, আখেরে কি হত। হয় তো রোয়ামই জিততেন। তা হলে কি হত? কে জানে? হিটলারের মতে, রোয়াম তো ফ্রানসের প্রতি বিরূপ ছিলেন না—ভালো-বাসতেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আর জানো, সব-কিছু ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার পর বাওর এই প্লেনের গুবলেট-কাহিনী হিটলারকে বলেন।

হিটলার নাকি প্রত্যুত্তরে বলেন "নিয়তি।"

লটে বললে, "আমি বলি, 'যোগাযোগ'।"

বাংলা দেশের কাছে

অঞ্জন সেন

তুমি আমাকে মুক্ত হতে বললে
আমি যে নিজেকে তোমার ঐ
অসীম বৃত্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি
বাংলা দেশ।
তোমার বুকে আলো যত দীপ্ত হয়ে আসে
অন্ধকার তত গাঢ় নয়
যেন তিন দিকে মুক্ত মাঠ
খাড়া পাহাড়ের বেড়া একদিকে
সেখানেই স্থির থাকা সার্থকতা
এ ছাড়া অন্য কোনো সন্ধান নেই।

সর্বদিকে সবুজের ধ্বজা উড়ছে দেখি
সর্বদিকে পাচ্ছি বিবেকের ঘ্রাণ
আর কোনো সংশয় নেই;
এবার মাথা পেতে নেব তোমার সম্ভাষণ, ভর্ৎসনা
কেননা তুমি যে আমাকে মুক্ত হতে বললে।

অদৃশ্য কীটেরা সব

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যতবার পা তুলেছি গোছ অদৃশ্য কীটেরা সব সাফ করে গেছে
আমার ফিতের পাশে বাসমতী, দুধেশাল
নধর গতর নিয়ে আমাকে শাসায়
বোশেখের খরা মাঠে আমি যেন টানিনিকো মই!

অজন্মা আমার কাছে নব্য কোন দুঃখবোধ নয়
হাজা-মজা মাঠে রোজ পাশুটে বকেরা আসে, ওত পাতে
দুচারটে কেঁচোর ঠোঁটে ভরে নিয়ে ফিরে যায় পিয়ালীর চরে
আমি একা পড়া ভাঙি, কাদা করি বিষণ্ণ সময়।

বরবা দুর্ভাগ্য যদি বসন্ত কি কোনদিন আমায় ডেকেছে?
শীতে-ভেজা ফড়িঙের মত—সাপের আহার ভেবে
নিজেকে দিয়েছি ফেলে বাকসের নিষিদ্ধ অরণ্যে
মাংসের বদলে ওরা হালি-ধরা মৌরীশাল চিবিয়ে খেয়েছে।

একদিন

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

...রে এলাম আবার। এই সেই পুরানো পথঘাট
... অন্ধকারে অন্ধকারে জন্ম, এরাও নিস্তব্ধ হবে—কিছু পরে
কোন অদৃশ্য সুতোয়?
...খো, চমকে উঠছে তোমার দাঁতের ভেতর নখ
...বার কি শীত নেমেছে আগের চেয়ে বেশী, কান পাতো
...আমার হাতের ঠকাঠক্ শব্দ শুনতে পাবে তুমি।
...আমাদের অতীত ঘুমিয়ে আছে সাংঘাতিক স্বপ্নে
...টের তলায় মরে পড়ে আছে ছাতাধরা নীল জুতো
...কদিন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম আমরা অদ্ভুত ভাবে
...খলাম ছিলো মহৎ, ছিলো বিষাদজড়ানো অতীত
মুখোশ পরা—
...ইক মাইল দূরে আমার বদলে আমার হলুদ হাত
...রে ছিলো তোমার হাতের নিচে, এবং ভয়ে
কালো, ভয়ংকর কালো হয়ে উঠলো জোড়া-শরীর;
...রপর টুনু এলো, তারের ওপর মেলে দেয়া হলো
তার ছোট্ট জামা—
...ক ঠান্ডায় আটকে গ্যাছে তোমার চোখের দুই পাতা, টুনু
... জলে ভুলো ভিজিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে তাদের, হাওয়া
...শাঁ করে এসে উল্টে দিলো ওই টেবিলল্যাম্প, ভয়ে
...টিসুটি মেরে তুমি সরে আসছো পেটের কাছে
...আমার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তোমার হাঁ, হাত, পা
...রিয়ে রইলো শুধু শান্ত সোনা বুড়ো আঙুলের আংটি;
...ষ্টভরা ছাদে ছুটতে ছুটতে গান গাইছে
টুনুর ছেলে-মেয়ে।

দ্বিতীয় ঈশ্বরকে

দীপ সাউ

তুমি কি নিঃশঙ্ক ছিলে—নির্জন দুপুরের মতো
তোমার সারা শরীরের বিস্তার।
অসংশয়ের নীল মাছি চারপাশে কোথাও ওড়েনি।
আমার চোখে স্বপ্নের মৃদু হাত
—কেন সারা মুখে তার গভীর চুল।
তোমার কৃশ শরীর জুড়ে কেন ফাল্গুনের দেবদারু পাতা।
তুমি আমাকে কি চেনাতে চেয়েছিলে
—তোমার নিদ্রা/তোমার বিশ্বাস/তোমার শরীরে
মসৃণ বিভা।
নির্জন দুপুরে কেন জানলা ভেঙে রোদ নামে
সারা মেঝেয়।
তুমি কী সন্দেহ হীন—আমার সারা শরীরে কোথাও
মোমবাতির সুতো নেই।
তোমার দীর্ঘপক্ষ্ম জুড়ে নিদ্রাচারী অকম্পিত রোম
—পোর্সিলিনের কাপের মসৃণ অভিজাত গ্রীবা
দু ঠোঁটে জবাফুলের ঢেউ।
তামার পয়সার মত নম্র স্তনের আভাস
অপ্রহরিত ব্লাউজে।
তুমি কি ঢেকে রাখতে চাইছিলে বেদেনীর দুই বাদুকরী
—হাতে—তোমার হাতের কারুকাজ/তোমার শঙ্খ সাদা লজ্জা?
আমি কি ঈশ্বর? আমার হাতে তুলি কই?
উতকাটে তোমার বিভা ছেঁকে নেবো, পাথরের শরীর জুড়ে
মসৃণ ছান্দসিকতা।

তোপ

বনফুল

প্রথম দৃশ্য ॥ রাজপথ ॥

[কথা বলতে বলতে যদু ও নবীনের প্রবেশ]

দু। ওহে ললিতবাবু এই দিকেই আসছেন। হেঁটে আসছেন, আশ্চর্য।

বীন। উনি যে রোজ সকাল বেলা হাঁটেন। ডায়াবেটিস হয়েছে। ডাক্তাররা হাঁটতে বলেছে

দু। এইখানেই তাহলে বলা যাক

[ললিতবাবুর প্রবেশ]

দু। (নমস্কার করে।) আপনার কাছেই যাব ভাবছিলাম, সার।

লিত। কেন

দু। সিমেণ্টের পারমিটটা যদি দেন আমাদের দয়া করে।

লিত। [নবীনকে দেখিয়ে] ইনি কে

দু। ইনি আমার পার্টনার

বীন। আপনার প্রণামী আমরা দেব। বেশী পারব না, হাজার দশেক জোগাড় করেছি

লিত। এসব কথা কি রাস্তায় হয়? অপিসে আসবেন

দু। তাই যাব

বীন। প্রণামীটা এখানেই দিয়ে দেব?

লিত। আমার একান্ত সচিব বিজয়কে চেনেন? তার সঙ্গেই এ বিষয়ে আলাপ করুন।

[ললিতবাবু চলে গেলেন।]

বীন। তার মানে বিজয়কেও কিছু খাওয়াতে হবে

দু। খাওয়াব। চার না ফেললে কি রুই কাতলা ধরা যায়

(নবীন ও যদুও চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা পাগলাটে গোছের ছেলে প্রবেশ করে তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়াল)

নবীন। ফটিক যে, কি খবর

ফটিক। খবর শোনেন নি আপনারা?

যদু। কি খবর

ফটিক। তোপ আসছে। মস্ত তোপ।

নবীন। [একটু হেসে] ইসকুরুপ এখনও ঢিলে আছে দেখছি। চল হে চল, বিজয়বাবুর বাড়ি বেশ দূরে আছে

(নবীন ও যদু চলে গেলেন। ফটিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

ফটিক। কি আশ্চর্য, এরা শোনে নি? আমি কিন্তু তোপের গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করে আসছে—মস্ত তোপ। (দূরের দিকে চেয়ে।) ও বাবা, এরা আবার কারা! একটু আড়ালে যাই।

[রাস্তার ধারে একটা থামের পিছনে গিয়ে লুকোল। স্বর্ণকুন্তলা একটি তন্বীর পিছু পিছু একটি যুবকের প্রবেশ]

তন্বী। (ভঙ্গী ভরে) কী যে বিরক্ত কর তুমি

যুবক। তোমাকে দেখলে আর নিজেকে সামলাতে পারি না। তুমি যা চাও তোমাকে তাই দেব।

তন্বী। আগেই তো তোমাকে বলেছি বিয়ে করতে পারব না। তুমি জান, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমি বাবার একমাত্র সন্তান। বিশাল সম্পত্তির মালিক তিনি। তাঁর অমতে তোমাকে বিয়ে করলে তিনি আমাকে দূর করে দেবেন। আমি আমাদের এয়ার-কণ্ডিশনড্ তেতলা বাড়ি ছেড়ে তোমার সঙ্গে ফ্ল্যাটে গিয়ে বাস করতে পারব না।

যুবক। কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি,

তন্বী। বাস, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু দূর থেকে বাস। আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না

যুবক। কিন্তু আমার সন্তান যে তোমার গর্ভে—

তন্বী। আজকাল তো আইন পাস হয়ে গেছে। ভালো ডাক্তার দিয়ে সে সন্তানকে গর্ভ থেকে বার করে দেব। ও নিয়ে আমার মোটেই চিন্তা নেই

যুবক। তুমি কি পাষাণ?

[এর উত্তরে মেয়েটি হো-হো-হো করে হেসে উঠল। অদ্ভুত সে হাসি]

তন্বী। না, আমি পাষাণ নই। আমি একালের এ কালের এ কালের—

[চলে গেল। যুবকও অনুসরণ করল তার। ফটিক থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল]

ফটিক। তোপ কিন্তু আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি—ঘড় ঘড় ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় —প্রকাণ্ড তোপ

[কি যেন শুনতে শুনতে চলে গেল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পিছু-পিছু চারটি চোং-প্যান্ট-পরা ছোকরার প্রবেশ। প্রত্যেকেই সিগারেট ফুঁকছে।]

১ম ছোকরা। ও মশাই, শুনুন

প্রৌঢ়। আমাকে বলছেন

২য়। হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই আপনাকে। কিছু ছাড়ুন দিকি

প্রৌঢ়। ছাড়ব? কি ছাড়ব

৩য়। পকেটে পয়সা কড়ি যা আছে দিয়ে দিন।

চতুর্থ। আমরা একটা স্বদেশ-সেবক ক্লাব করেছি তাতেই চাঁদা-স্বরূপ দিন আপনি। আমরা রসিদ দেব আপনাকে

প্রৌঢ় (সবিস্ময়ে, বিহ্বলভাবে) স্বদেশ সেবক ক্লাব! চাঁদা! আমি গরীব ছাপোষা গেরস্ত লোক নুন আনতে আমার পানতো ফুরিয়ে যায়। আমার স্বদেশ আমার বউ আর ছেলেমেয়ে, তাদেরই সেবা করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়েছি। আপনাদের চাঁদা দেব কি করে?

১ম। সোজা আঙুলে ঘি না বেরুলে আমরা আঙুল বেঁকাবো

২য়। (প্রৌঢ়ের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে) ন্যাকা সেজে কোন লাভ হবে না

[প্রৌঢ় অসহায়ভাবে এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগলেন, যদি কোন পুলিস টুলিস দেখতে পান]

৩য়। পুলিস খুঁজছেন? আমরা যে দিকে যাই পুলিস সে দিকে থাকে না।

৪র্থ। দিন দিন আর ঝামেলা করবেন না

১ম। আরে কেড়ে নে না—

[সকলে প্রৌঢ়কে জাপটে ধরল। পকেট থেকে ব্যাগ বার করে নিয়ে সরে পড়ল]

প্রৌঢ়। হায় ভগবান, এ কোন দেশে বাস করছি। দিন দুপুরে রাহাজানি করছে এরা—ওরে বাবা, একি। না, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়—

[চলে গেলেন। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলের পিছনে পিছনে আর একটি ছোকরা ছুটতে ছুটতে এল। তার হাতে ছোরা। সে পিছন থেকে ছেলেটির পিঠে ছোরা বসিয়ে দিতেই ছেলেটি পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিনটি ছেলে ছুটে এল। তাদের হাতে পাইপ গান। পাইপ গান দিয়ে শেষ করে দিলে তারা ছেলেটিকে। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। প্রৌঢ় আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন]

প্রৌঢ়। কি কাণ্ড! ভাগ্যে আড়ালে সরে গেসলাম। এখন পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে পালানো যাক। ব্যাগে পাঁচ সিকে ছিল সেইটের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে গেল—বাপ্‌সৃ!

[ফটিকের প্রবেশ]

ফটিক। আপনি ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?

প্রৌঢ়। আওয়াজ! কিসের আওয়াজ?

ফটিক। গাড়ির চাকার। যে গাড়িতে চড়ে তোপ আসছে—তার আওয়াজ! পাচ্ছেন না?

প্রৌঢ়। না

ফটিক। আকাশে কান পেতে শুনুন

[প্রৌঢ় অনুমান করলেন ফটিক তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করছে। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন—'যতো সব'। তারপর হন হন করে চলে গেলেন। 'মা' 'মা' বলে কাঁদতে কাঁদতে পাঁচ-ছ' বছরের একটি ছেলের প্রবেশ]

ফটিক। কি হল? কাঁদছ কেন

ছেলেটি। আমার মা কোথায় চলে গেছে।

ফটিক। তোমার বাবা কোথায়

ছেলেটি। বাবা নেই

ফটিক। বাবা কোথা গেল

ছেলেটি। কি জানি

[সুধাংশুশেখরের প্রবেশ]

সুধাংশু। এই যে এখানে এসেছে দেখছি। খোকা পালিয়ে এলে কেন। চল আমাদের বাড়ি

ছেলেটি। না, যাব না। আমি মাকে খুঁজে বার করব

ফটিক। [সুধাংশুকে] আপনি চেনেন না কি একে

সুধাংশু। আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে মশাই

ফটিক। এর মা বাবা কোথায়

সুধাংশু। [নিম্নকণ্ঠে] কি জানি কোন পার্টিকে ওরা ... দিয়েছিল। প্রথমে মিস্টার রায় নিখোঁজ হলেন তারপর কাল থেকে মিসেস রায়েরও আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। আমরাই ছেলেটাকে ... রেখেছিলাম আমাদের কাছে। কিন্তু যে রকম কান্না ছেলে ওকে বাড়িতে রাখা মুশকিল। একে আমার স্ত্রীর হিস্টিরিয়া—

ফটিক। ও আমার কাছেই থাক

সুধাংশু। (সাগ্রহে) আপনি ভার নিলেন তাহলে?

ফটিক। [হেসে] কে কার ভার নেয় মশাই। ভগবানই কিছু একটা হিল্লে করে দেবেন। ... আমার কাছে—

সুধাংশু। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আচ্ছা চলি তাহলে নমস্কার

[চলে গেলেন]

ফটিক। (ছেলেটিকে) চল আমার সঙ্গে—

ছেলেটি। কোথায়

ফটিক। তোমার মাকে খুঁজে বার করব

[ছেলেটি সাগ্রহে তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

ফটিক। খাবে কিছু? ক্ষিধে পেয়েছে? কখন খেয়েছ?

ছেলেটি। (কুণ্ঠিতভাবে) আজ খাইনি

ফটিক। কিছু খাও নি? সে কি (দূরের দিকে চেয়ে এই ফেরিওলা এদিকে এস—

[খাবারের পসরা মাথায় নিয়ে একজন ফেরিওলার প্রবেশ]

কি খাবার আছে তোমার কাছে—

ফেরিওলা। সন্দেশ, রসগোল্লা, সিঙাড়া, নিমকি—

ফটিক। কি খাবে তুমি খোকা? সিঙাড়া খাবে?

(ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল)

খোকাকে চারটে সিঙাড়া দাও।

(ছেলেটি সিঙাড়া খেতে লাগল)

ফটিক। দাম কত

ফেরিওলা। ছ আনা

ফটিক। বল কি! এত দাম কেন?

ফেরিওলা। দাম আরও বাড়বে বাবু। কিছুদিন পরে—টাকায় একটা করে সিঙাড়া বেচব। আলু, ময়দা, ঘি, ডালদা মসলা-কোনটা শস্তা বলুন। শালা কালোবাজারীরা সব জায়গায় আগুনে ধরিয়ে দিয়েছে। বাজারে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ নেবাবার চেষ্টা করছে না

[ফটিক ফেরিওলাকে পয়সা দিল]

ফটিক। এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে

ফেরিওলা। কে ঠিক করবে

ফটিক। (ওপরের দিকে আঙুল তুলে) ওপরওলা। তোপ আসছে—

ফেরিওলা। [সবিস্ময়ে] তোপ! তোপ মানে?

ফটিক। [হেসে] সে তুমি বুঝবে না

ফেরিওলা। বুঝব না কেন। বুঝিয়ে বললেই বুঝব

ফটিক। ইতিহাস পড়েছ?

ফেরিওলা। না।

ফটিক। পড়লে বুঝতে পারতে। তোপের চাকার ঘড় ঘড়ও শুনতে পেতে তাহলে [ছেলেটিকে] চল খোকা তোমাকে ওই বাড়িটাতে বসিয়ে রেখে আসি। কেমন? একটু পরে তোমাকে নিয়ে তোমার মাকে খুঁজতে বেরুব।

[ছেলেটিকে নিয়ে ফটিক চলে গেল, ফেরিওলাও চলে যাচ্ছিল, এমন সময় চার-পাঁচটি ছোকরার প্রবেশ। মস্তানি গোছের চেহারা]

১ম ছোকরা। এই ফেরিওলা, কি আছে দেখি—

ফেরিওলা। খাবার আছে

২য় ছোকরা। নাবা না—

[ফেরিওলা খাবারের পসরাটা নাবাতেই সবাই টপ টপ করে তার খাবার খেতে লাগল]

ফেরিওলা। আরে, কি করছেন আপনারা

২য় ছোকরা। [দাঁত বার করে] খাচ্ছি—

ফেরিওলা। খাচ্ছেন, মানে—?

৪র্থ ছোকরা। ভোজন করছি—

[হো হো করে হেসে উঠল সবাই]

ফেরিওলা। দাম দিয়ে কিনে তারপর খান-

৪র্থ ছোকরা। দাম দিতাম কিন্তু আমাদের ট্যাঁক গড়ের মাঠ। একদম ফাঁকা। শহীদ মীনার টিনারও নেই। স্রেফ ফাঁকা—

[আবার হেসে উঠল সবাই]

ফেরিওলা। [তার হাত চেপে ধরে] দাম দিয়ে তবে যান

[৪র্থ ছোকরা হাত ছাড়িয়ে নিলে]

৪র্থ ছোকরা। দাম সরকারের কাছে চাও গিয়ে, যে সরকার আমাদের এতগুলো লোককে বেকার করেছে—

ফেরিওলা। [উচ্চকণ্ঠে] কে কোথায় আছেন আমাকে রক্ষা করুন। এরা আমার সব লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁচান আমাকে—

[রাস্তার দু-পাশের বাড়ির একটি বন্ধদুয়ারও খুলল না। ছোকরারা খাওয়া শেষ করে চলে যাচ্ছে, এমন সময় ফটিকের প্রবেশ]

ফটিক। কি হল?

ফেরিওলা। এরা আমার খাবার জোর করে কেড়ে খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দাম দেয়নি এক পয়সা

[ফটিক ৪র্থ ছোকরার হাতটা চেপে ধরল]

ফটিক। দাম দিয়ে তবে যান

[৪র্থ যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করল ফটিকের গালে। ফটিক মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। চলে গেল ছোকরার দল। ফেরিওলা এগিয়ে এসে দেখল]

ফেরিওলা। একি! অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখছি। ইস নাক দিয়ে রক্তও পড়ছে। ব্যাপার ঘোরালো হয়ে পড়ল দেখছি। না, এখানে থাকা ঠিক নয়। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। সরে পড়ি

[ফেরিওলা তার জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ল। তর্ক করতে করতে দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

প্রথম ভদ্রলোক। আমি বলছি আমি পঞ্চাশটা ভোট যোগাড় করব

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। তুমি বাজে কথা বলছ। লাহিড়ী তোমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। লাহিড়ী ভিতরে ভিতরে ব্যাক করছে সিংঘিকে। তোমাকে ভাঁওতা দিচ্ছে।

প্রথম ভদ্রলোক। সিংঘি গদিতে বসলে ওর লাভ? ও তো ঝাড়া হাত-পা ব্যাচিলার।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওর লাভ সিংঘি গদিতে বসলে নিকুঞ্জ চাকরি পাবে

প্রথম ভদ্রলোক। নিকুঞ্জ আবার কে

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওর রক্ষিতার ছেলে

[এবার তাঁরা অজ্ঞান ফটিককে দেখতে পেলেন]

এ আবার কে পড়ে আছে এখানে? মাতাল না কি?

প্রথম ভদ্রলোক। নাকে মুখে রক্ত দেখছি। খুন টুন করে গেছে বোধহয়। উঃ যা দিনকাল পড়ল। চল চল এখানে দাঁড়ান ঠিক নয়—

[দুজনেই হন হন করে চলে গেলেন। কথা বলতে বলতে আরও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

প্রথম ভদ্রলোক। বলেন কি!

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যা বলছি তা ঠিক। আমার চেয়ে অনেক জুনিয়রকে আমার ওপর ঠেলে তুলে দিয়েছে। হাতে মাথা কাটছে ওরা। একটা দরখাস্ত করেছিলাম,

সেটাও একটা কেরাণী চেপে দিয়েছে, অপিসে হাঁটাহাঁটি করে করে জুতো ক্ষইয়ে ফেললাম, কিন্তু তাকে ধরতে পারছি না। একটি কেরাণী ঠিক সময়ে অপিসে যায় না। ফাইলের স্তূপ জমে গেছে, কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রথম ভদ্রলোক। কি করবেন তাহলে—

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। কি আর করব। মুখ থুবড়ে ওইখানেই পড়ে থাকব, অন্য উপায় তো আর নেই। পাঁচটি মেয়ে, চারটি ছেলে, দুটি ভাইপো ঘাড়ে। তাছাড়া বিধবা বোন আর পিসি—আরে মশাই এ কে

[দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে ফটিককে দেখতে লাগলেন]

প্রথম ভদ্রলোক। কে আবার রাজনীতির বলি

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। হায় ভগবান, আমরা কোথায় চলেছি—

প্রথম ভদ্রলোক। আপাতত আপনার বাসায় চলুন

[দুজনেই চলে গেলেন। ফটিকের জ্ঞান ফিরেছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল]

ফটিক। কই, তোপ তো এখনও এলো না [আকাশের দিকে মুখ তুলে] ইতিহাসের কথা, পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী কি মিথ্যে হয়ে যাবে তাহলে? পাপের রাজত্বই চলতে থাকবে। এর প্রতিকার হবে না, প্রতিবাদ হবে না—

[একটি কুলি জাতীয় লোকের প্রবেশ। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা আঠা-লাগানো পোস্টার। সেটা সে একটা বাড়ির দেওয়ালে লাগিয়ে দিল। পোস্টারে লেখা আছে—(বড় অক্ষরে) লাস্যময়ী অনঙ্গমোহিনীর অদ্ভুত নৃত্য। মড়া উঠে বসবে। পাথরও জীবন্ত হয়ে লাফাবে। কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। জীবন্ত থাকবে তো, মাত্র সাত দিনের জন্য। গুহা থিয়েটারে অগ্রিম টিকিট বিক্রি হচ্ছে। পোস্টার লাগিয়ে কুলি চলে গেল। ফটিক নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল সে দিকে]

ফটিক। আমি কিন্তু ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সত্যি শুনতে পাচ্ছি—আমার কল্পনা নয়। মতিভ্রম নয়। [শ্রোতাদের দিকে চেয়ে] আপনারা বিশ্বাস করুন আমার কথা। আসছে, তোপ আসছে। ঠিক সময়ে সে আসবে—

[কাঁদতে কাঁদতে সেই ছেলেটি আবার এল]

ফটিক। ওখান থেকে চলে এলে কেন

ছেলেটা। মায়ের কাছে যাব। আমার মা কোথা—

ফটিক। মা আসবে। আচ্ছা এখানেই ব'সো—

[স্নেহভরে ছেলেটিকে পাশে বসাল]

তোমার নাম কি খোকা?

ছেলেটা। নিতু

ফটিক। বাঃ, চমৎকার নাম

[রাস্তার পাশের একটা বাড়ির ভিতর থেকে চীৎকার কলহ শোনা গেল। হঠাৎ কে যেন চীৎকার করে বলে উঠল—'এর সঙ্গে না থাকতে পার, বেরিয়ে যাও।' হঠাৎ বাইরের দিকের কপাটটা খুলে গেল। একটি বলিষ্ঠ লোক ধাক্কা মেরে একটি মেয়েকে ফেলে দিল রাস্তায়। বলিষ্ঠ লোকটির পিছনে আর একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল। মুখে মুচকি হাসি। যে মেয়েটি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল সে উঠে দাঁড়াল। দেখা গেল তার বেণী এলিয়ে পড়েছে। এলায়িতকুন্তলা মহিলা দৃপ্ত ভঙ্গীতে চেয়ে রইল বলিষ্ঠ লোকটার দিকে]

মহিলা। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমাকে দূর করে দিয়ে তুমি ও নটীটাকে নিয়ে থাকবে?

বলিষ্ঠ লোকটা—থাকব। আমার খুশি মতো আমি যাকে ইচ্ছে নিয়ে থাকব

মহিলা। তোমার ভয় নেই?

বলিষ্ঠ লোকটা। আমার যথেষ্ট টাকা আছে। কাউকে ভয় করি না

মহিলা। [কম্পিতকণ্ঠে] কিন্তু মনে রেখো, ধর্ম আছেন, ভগবান আছেন

বলিষ্ঠ লোকটা। তাদেরও টাকা দিয়ে বশ করব। হা-হা-হা-হা-হা। টাকায় সবাই বশ হয়

[ঠিক এই সময় চতুর্দিক সচকিত করে তোপের আওয়াজ হল। ক্রমাগত তোপ পড়তে লাগল]

ফটিক। তোপ এসেছে—তোপ এসেছে—তোপ এসেছে—

[উত্তেজিত হয়ে ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেল। ছেলেটি তারস্বরে কাঁদতে লাগল। ক্রমাগত তোপের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। তারপর নানা কণ্ঠের আর্তনাদ আর চীৎকার। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রথম দৃশ্য শেষ হল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি রূপসী রমণী সেই ছেলেটিকে কোলে করে বসে আছেন। তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি।]

ছেলেটি। তুমি কে

রমণী। এখন আমি তোমার মা

ছেলেটি। এখন আমার মা? আগে কি ছিলে!

রমণী। আমি। তোপ হয়ে এসে পাপকে ধ্বংস করেছি। এখন আমিই আবার মা হয়ে তোমাকে পালন করব। আবার নূতন সৃষ্টি হবে নূতন যুগের

ছেলেটি। আমার মা কোথা গেল

রমণী। তিনি আমার মধ্যেই আছেন। এস—

[স্নেহভরে তাকে চুম্বন করলেন]

যবনিকা

অবিন

ছাব্বিশ

আজ সন্ধ্যেবেলায় সুহাস এল। সঙ্গে যতীন।

সাদরে অভ্যর্থনা করে বললাম, "এসো এসো; মাথাটা একটু বাঁচিয়ে এসো।"

সুহাস ভেতরে এসে আমার ঘরটা দেখতে লাগল; আর যতীন তার জিরাফের মত লম্বা গলা আরও লম্বা করে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দরজার মাথাটা মাপতে শুরু করল।

ঘর দেখে সুহাস বলল, "এটা তোমার বৈকুণ্ঠ নিবাসের চেয়ে ভালই হয়েছে অবিন; আর-একটু বড় হলে হাত-পা ছড়াতে পারতে আরাম করে।"

যতীন ততক্ষণে ঘরে এসেছে। বলল, "তোর ঘরের বাইরে একটা লোহার টুপি রাখিস অবিন, এভাবে আর মাথা বাঁচিয়ে ঢুকতে পারব না।"

আমি বললাম, "টুপির দরকার কী! আমি বরং ভাবছি বাইরে একটা বোর্ড ঝুলিয়ে দেব 'মাথা লইয়া সাবধান'। বড়-লোকরা বাজে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা এড়াবার জন্যে কুকুর দেখায়, আমি দেখাব মাথা।"

যতীন বলল, "সেটা আর নতুন কী, ওটা তো তুই বরাবরই দেখাচ্ছিস। ইচ্ছে হয়, আরও দেখাতে পারিস। তবে তোর কাছে এসে ওই জিনিসটা আমাদেরও ঠিক রাখা মুশকিল।"

সুহাসরা হেসে উঠল। আমিও হাসলাম।

"অবিন, তোমার এই হোটেলটা আমার খুব কাছাকাছি হল—" সুহাস, আমায় বলল, "একটা রিকশা করেও আমার বাড়িতে চলে যাওয়া যায়।" ...একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী গত রবিবারেই উঠে এসেছ?"

"হ্যাঁ। তিন চার দিন হয়ে গেল।"

"কেমন লাগছে?"

"চমৎকার। ওপরের ছাদ দিয়ে একটু আধটু জল চোয়ায়, নয়ত দেখছ না—চিলে কোঠার মতন এই ঘরটা একেবারে ফাঁকায়, দুদিকে ছাদ, আলো বাতাসের ছড়াছড়ি।"

যতীন বলল, "বর্ষায় তো তোর জানলা দরজা দিয়ে জল ঢোকে রে, যা বাহার দেখছি—!"

"ঢোকে, তবে ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তোদের মতন অত জল-বৃষ্টি রোদের খুঁতখুঁতোনি আমার নেই যতীন। তোরা কলকাতার ফিনফিনে বাবু, মাথার রোদ লাগলে পিত্তি বমি করিস, দু ফোঁটা জল গায়ে পড়লে থ্রোট লজেন্স খাস। আমার ধাতটা আলাদা।"

যতীন চোখ টিপে বলল, "তুই শালা মানুষ নয়, ধাতু।...নে, চা-টা বলে আয়।"

এটা আমাদের সেই মেস নয় যে ঘরে বসে শুয়ে শুয়ে হাঁকডাক করে কিছু পাওয়া যাবে! নীচে নেমে চেঁচাতে হয়। দোতলায় ম্যানেজারের ঘর। ভদ্রলোকের পুরো চেহারাটা বুড়ো বুলডগ ধরনের, নাকভরা নস্যি, চোখ দুটো অনবরত ছলছল করে। দাঁতের বাঁধানো পাটি দুটো দেখি জলের গ্লাসে ডোবানো থাকে। কথা বলার সময় ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন ভদ্রলোক, জিবের লালার যেন জড়ানো থাকে অর্ধেক কথা। আমার আদপেই বরদাস্ত হয় না ম্যানেজারকে। হোটেলের মালিকের সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচয়ের সুবাদে ওপরের ঘরটা আমি পেয়ে গিয়েছি এতেই আমার খুশী থাকা উচিত। সেই খুশী

নিয়ে রয়েছি আপাতত। ম্যানেজারকে আমল দিই না।

তেতলায় নামতে ভানুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে চায়ের কথা বলে ওপরে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে দেখি, সুহাস আমার ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় বসে, যতীন বিছানায় পিঠ টান করে শুয়ে পড়েছে।

আমার এই নতুন ঘরটা লম্বায় মাঝারি, চওড়ায় কিছুটা ছোট। গোটা তিনেক জানলা, একটু বেঁটে-খাটো বেখাপ্পা ধরনের, জানলার পাল্লায় অ্যাসবেসটাসের সিট আঁটা। মাথার ছাদটা কড়ি বরগার। বাইরে অনেকটা খোলা জায়গা, ছাদের অন্য পাশে জলের ট্যাঙ্ক, টিনের শেড করা হোটেলের একটা গুদোমখানা মতন।

আমি ঘরে ঢুকতে সুহাস বলল, "হোটেলটার নীচে দেখলাম দোকান?"

"নীচে দোকান; দোতলা তেতলায় বোর্ডার; ছাদের চিলে কোঠায় আমি। সর্বোচ্চে অধিষ্ঠান করছি।" বলে হাসলাম।

"কত লোক থাকে?"

"জনা ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সবাই পার্মানেন্ট বোর্ডার।"

"তোকে কত দক্ষিণা দিতে হয়, অবিন?" যতীন জিজ্ঞেস করল।

"প্রায় একশো পঁচাত্তর।"

"বলিস কী! ... হোটেল ছেড়ে দে অবিন, আমার বাড়িতে চলে আয়— তোকে পেয়িং গেস্ট করে রাখব।"

কয়েকটা এলোমেলো হালকা কথার পর সুহাস বলল, "শোনো অবিনবাবু, তোমায় যে খবরটা দিতে এলুম—, কাল জ্যাঠা-মশাই আসছেন।"

"কাল?"

"শচিদা, আয়না, জ্যাঠামশাই—; দল বেঁধে আসছে।"

দেশ ছেড়ে চলে আসার আগে আমি জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি আসবেন জানিয়েছিলেন। কবে নাগাদ আসতে পারবেন সঠিক করে জানাতে পারেন নি। মোহিনীর চিঠি পেয়েছিলাম তারও পর। তিনিও নির্দিষ্ট করে কিছু জানাতে পারেন নি। লিখেছিলেন, জ্যাঠা-মশাইরা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আসবেন।

সুহাস বলল, "কাল বিকেলে আমায় হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। তারপর লটঘট নিয়ে আসা, বেশ ঘাবড়ে যাচ্ছি।"

যতীন বলল, "সংসার ধর্ম না করলে এই রকমই হয়। তুই তিনটে অ্যাডাল্ট লোককে সামলাতে পারিস না, আর আমরা বউঝি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যত্রতত্র ঘুরি, কত ঝামেলা সামলাই। সংসারের ঝামেলা সামলাবার একটা ট্রেনিং নে সুহাস; বিয়েটা করে ফেল, দেখবি সাগর লঙ্ঘনের মতন শক্ত কাজটাও করে ফেলতে পারবি।"

আমি হেসে বললাম, "হনুমান কী বিয়ের পর সাগর ডিঙিয়েছিল?"

"সে আর বলতে! হনুমান তো ফেল-বাবু! রামের মতন সাধাসিধে মানুষটাকে লঙ্কা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে লড়াই বাধাবার কোনো দরকার ছিল না। বিয়ে না করলে বেচারীকে রাবণের সঙ্গে অমন লড়াইটাই লড়তে হয় না। সাতকাণ্ড রামায়ণ দু তিনটে কাণ্ডতেই শেষ করে ফেলা যায়। অথচ যায়সা বিয়ে তায়সা বউয়ের বায়নাক্কা। নে শালা, বনবাসে নিয়ে চল। বুঝলি অবিন, বিয়ে করলেই কাণ্ড বাড়ে।"

"বুঝলাম," আমি হেসে বললাম। "কাণ্ডটাই বাড়ে, জ্ঞানটা নয়।" সুহাসও হাসল।

একটু পরেই চা এল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাদা।

চা খেতে খেতে সুহাস বলল, "অবিন, কাল থেকে আমার নানা ঝঞ্ঝাট থাকল। এর খানিকটা দায় তোমায় বইতে হবে। তুমি চারদিক থেকে ঝামেলা টেনে এনে জড় করেছ, মাইন্ড দাট।"

আমি বললাম, "তুমি শচিবাবুর কথা বলছ?"

"আবার কার কথা বলব?"

"বেশ তো, আমি হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছি।"

"তারপর?"

"তারপর কী?"

"আপাতত শচিদা আমার ওখানে এসে উঠল। কিন্তু তারপর?"

"একটা হাসপাতালের খোঁজ আমিও পেয়েছি।"

"যতীন অন্য কথা বলছে। কী যতীন?" সুহাস যতীনের মুখের দিকে তাকাল।

যতীন মুখের খাবার শেষ করে বলল, "প্রথমেই হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিলে ভদ্রলোকের হয়ত নার্ভ ফেল করবে। আমি বলছিলাম, একজন কাউকে দেখানো হোক, বড় ডাক্তার কাউকে। অমিয়র দাদাকেও আনা যেতে পারে। আমারও চেনাশোনা একজন আছেন। বড়ো মানুষ। খানিকটা খেপাটে ধরনের। কিন্তু ভেরী গুড ফিজিশিয়ান। চেহারাটাও বেশ সৌম্য। পেশেন্টের কনফিডেন্স হয়।"

"বাড়িতে কী ব্যবস্থা হবে?" আমি বললাম।

যতীন বলল, "না হবার কিছু নেই। আমি যা শুনেছি তাতে হুড়মুড় করে একটা লোককে কলকাতায় এনে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দেওয়াটা ভুল হবে। ডাক্তার দেখুক. ক্যানসার বললেই ক্যানসার হয় না। লেট দি ডক্টর সী অ্যান্ড জাজ...। যদি ডাক্তার মনে করে ইমিডিয়েট, তাহলে হাসপাতালে ভরতি করো, আগেভাগে কেন একটা আধমরা লোককে চিতায় চড়াতে যাচ্ছ?"

যতীনের সাংসারিক বোধ বুদ্ধি প্রখর। তার মাথা ঠাণ্ডা। ভেবেচিন্তে কাজ করাই তার স্বভাব। যতীনের কথায় আপত্তি করার মতন কিছু নেই। আমি সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, "যতীন তো ঠিকই বলছে।"

যতীন বলল, "হাসপাতালের জন্যে ভাবনা কী! সুহাস মোটামুটি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেই রেখেছে।"

"কোথায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যতীন কিছু বলল না, শুধু সুহাসকে আড়চোখে দেখিয়ে দিয়ে মুচকি হাসল।

সুহাস বলল, "আমার বাড়ির উলটো দিকে একজন মেয়ে ডাক্তার থাকেন। তাঁর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্টালি আলাপ হয়েছিল একদিন। মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে বলেছিলাম একবার. ডিরেক্টলি ঠিক নয়, ইনডিরেক্টলি।"

চায়ে চুমুক দিয়ে যতীন ঠাট্টা করে বলল, "সুহাসের অর্ধেকটা জীবন ইনডিরেক্টলি করে করেই কেটে গেল, অবিন। আমি বলি, লেডী ডাক্তারটির নাম ইন্দু, মিস ইন্দুমতী হালদার। বাঙালী ক্রিশ্চান। দেখতে ভাল, কিন্তু মুখে শ্বেতীর দাগ আছে। সুহাসকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছে। ইন্দুমতী সদ্য ডাক্তারী পাশ করে হাসপাতালে হাউস সার্জন হয়ে আছে। কোন ডিপার্টমেন্টে রে সুহাস?"

সুহাস হেসে বলল, "জেনারেল ওয়ার্ডে।"

"ওখানে বেশিদিন থাকবে না; পার্সোন্যালে চলে আসবে।"

আমরা হেসে উঠলাম।

যতীন সিগারেট ধরাল। আমরাও সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

সুহাস বলল, "আমি সত্যি বলছি ভাই শচিদাকে ফেস করতে আমার কেমন ভয় করছে। সাম হাউ আমার মনে হচ্ছে, মানুষটা যেখানে ছিল সেখানেই বাকি ক'টা দিন শান্তিতে থাকতে পারত। কলকাতায় টেনে এনে হয়ত ভুল করলাম।"

আমি বললাম, "সুহাস, আমাদের দেশের বেশীর ভাল লোকই বোকার মতন কোনো কিছু না জেনেই মরে; জানলে তাদের মরা কিছুটা আটকাত। অজ্ঞতা জিনিসটাকে আমরা আশীর্বাদ বলে ধরে নিয়ে যতটা আত্মতৃপ্তি পাই ততটা তৃপ্তি পাবার কোনো কারণ নেই।"

সুহাস আমার কথাটা ভাল করে শুনল না, নিজের মনেই বলল, "একদিকে শচিদাকে নিয়ে ডাক্তার হাসপাতাল, অন্যদিকে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে চিন্তা; আমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যাবে। এসব কাজ আমি জীবনে কোনোদিন করিনি। আমার ভাল লাগছে না।"

সুহাস যে সংসারের কোনো দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেয় না, তা আমি জানি। ঝঞ্ঝাটকে ও বরাবর এড়িয়ে থাকতে চায়। শচিবাবুকে নিয়ে তাকে কত না হুজ্জত-হাঙ্গামা পোয়াতে হবে, জ্যাঠামশাইকে নিয়ে কী পরিমাণ উদ্বেগ বোধ করতে হবে—যতই সুহাস এইসব ভাবছে ততই তার ভয় বাড়ছে।

আমি হেসে বললাম, "তুমি কিছুই করবে না, ভুঁড়ি মেরে দিন কাটাবে—তা তো হয় না সুহাসবাবু; সংসারের জন্যে একটু-আধটু বোঝ।"

আমার কথায় সুহাস যে চটে গেল তা নয়, তবে রাগের মতন করে বলল, "লেকচার মেরো না; তুমি আমায় রেসপনসিবিলিটি শেখাবে? মস্ত ইরেসপনসবল ম্যান......"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "আমার তো ভাই সংসার নেই। আমি একলা।"

যতীন বলল, "তোর বাগাড়ম্বরটা তাই বেশী।"

আমি বললাম, "আড়ম্বর জিনিসটা সকলকে মানায় না, যতীন; বড়কেই মানায়। যেমন দেখ বর্ষার মেঘ। যখন আসে তখন তার আড়ম্বরখানা দেখেছিস! ওটা সেইরকম। আমার মানায়।"

"তুমি কে হে হরিদাস?"

"আমি অবিন। তোর যদি বুদ্ধি বলে কিছু থাকত দেখতে পেতিস, জাত বলে একটা কথা আছে; তোরা হলি বেগুনের জাত. মাথায় বাড়বি না, দামে চড়বি না, মাঠে ঘাটে মাটি কুপিয়ে তোদের চাষ হবে। আমার জাত আলাদা। আমি রেয়ার স্পেসিসের মধ্যে। হাটে বাজারে আমায় পাওয়া যায় না।"

যতীন মুখ খারাপ করে বলল, "শালা, রেয়ার স্পেসিস।"
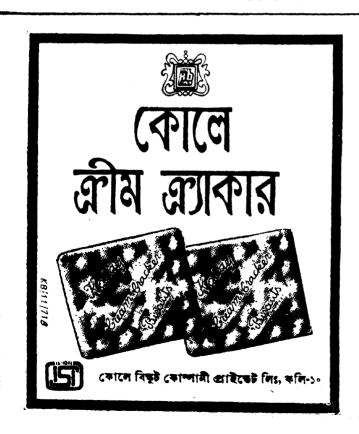
তিনজনেই হেসে ফেললুম।

আরও দু-পাঁচ কথার পর যতীন উঠল। সে বেহালার দিকে থাকে। রাত হয়ে আসছে। বৃষ্টি আসারও সম্ভাবনা রয়েছে। বাইরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। যাবার সময় যতীন বলে গেল, কাল সে খোঁজ নেবে সুহাসের। যদি ঠিক করে ফেলা যায় তবে সে তার চেনাশোনা বড় ডাক্তারের খোঁজ খবর করে পরশু দিনই তাকে সুহাসের বাড়িতে আনতে পারে।

যতীন চলে যাবার পরও সুহাস আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল "বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে আসছে; একলা দিদি থাকবে, আমার ভাল লাগছে না।"

পাঁচপাঁতিকে কলকাতায় পাঠাতে বলার পরিণাম যে এমন দাঁড়াবে আমিও আগে বুঝিনি। পরে জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি থেকে বুঝেছি, তিনি আসছেন নিজের তাগিদে। পাঁচপাঁতিকে একা পাঠাতে তাঁর ভরসা হয়নি। আয়না তাঁর সঙ্গে আসতে পারে লেখেছিলেন, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারে আসছেন তা আমায় লেখেননি। মোহিনীর চিঠিতে বরং তার উল্লেখ যেন দেখেছি।

আমি বললাম, "সুহাস, জ্যাঠামশাই আয়নার বিয়ের ব্যাপারেও কিছু কথাবার্তা বলতে চান নাকি?"

সুহাস আমার দিকে দু মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল। "জানি না।"

"জান না?"

"ও আর হবে না," বলে সুহাস অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকল। তার বাঁ হাতটা চেয়ারের মাথার দিকে হেলানো। ওকে অন্যমনস্ক, ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, "যতীন কী বলল?"

"যতীন কি করবে! ওর নিজের ব্যাপার নয়। ওর ফ্যামিলি হলেও কথা ছিল। তবু বেচারী অনেক চেষ্টা করেছে; তার পিসিমাকে বুঝিয়েছে। ভদ্রমহিলা রাজী হচ্ছেন না।" সুহাস যেমন বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেল। বসে থাকতে থাকতে আবার একটু সিগারেট খেল। "আমি তো যতটা সম্ভব খোলাখুলি জ্যাঠামশাইকে সবই লিখেছি। ওর বেশী কিছু লেখা যায় না। অক্টোর অল চিঠির ব্যাপার কোনো রকমে দিদির চোখে পড়লে অবস্থাটা কী হবে বুঝতে পার?"

না বোঝার কারণ নেই, বুঝতে পারি। সামান্য চুপচাপ থেকে বললাম, "যতীনের সেই পিসতুতো ভাই কী বলে?"

"সে কী বলবে?"

"বিয়েটা সে করবে। তার মতটাই আসল।"

সুহাস বিরক্ত হয়ে বলল, "জানি না। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।...ওকে আমার দরকারটাই বা কিসের?"

আমি বললাম, "ও যদি রাজী থাকে তবে বিয়েটা হতে পারে।"

সুহাস অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। "মানে?"

"বিয়েটা ও করে ফেলুক।"

"অবিন, তামাশা করো না।"

"না, তামাশার কী দেখলে! ছেলেটা যদি বিয়ে করতে রাজী হয়ে থাকে—তবে তাকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দাও।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী!"

"ওর বাড়ি নেই। ... দাদা নেই? বিয়ে করে বউ নিয়ে কী তাঁবু খাটিয়ে থাকবে? তুমি যে কী রাবিশ বলো অবিন!" সুহাস

রীতিমত বিরক্ত ও অবাক হচ্ছিল।

আমি হেসে বললাম, "দেখো সুহাস, আমি তোমাদের এই বিচিত্র সমাজ আর সামাজিকতা বুঝি না। যতীনের ভাই যদি বিয়ে করতে রাজী হয়ে থাকে তবে তাকে ডেকে বলো। এ-রকম বিয়ে আজকাল হয় না? কাঁদিস সেদিন করল না এরকম বিয়ে? তবে? ওর মা দাদাকে নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।" বলে আমি একটু চুপ করে থেকে সুহাসের ভাব-গতিক লক্ষ করলাম। সে আমার কথাগুলো গ্রাহ্য করছিল না। তার বিরক্তি দেখে বললাম, "কথাটা আমি হালকা করে বললাম বলে তুমি ভাবছ, আমি ঠাট্টা করছি। তাহলে তোমায় সত্যি করে বলছি, ব্যাপারটা আমার যদি হত, আমি ছেলেটিকে সরাসরি ডেকে বলতাম, কি হে আমার বোনকে বিয়ে করতে রাজী? সে যদি বলত, রাজী, তবে তার মা মাসি দাদার মুখ চেয়ে আর বসে থাকতাম না। বিয়েটাকে তোমরা বারোয়ারী পুজোর মতন করে তুলেছে। বারভূতে না নাচালে তোমাদের বিয়ে হয় না। সেখানে ছেলেমেয়ের ব্যাপারটা চাপা পড়ছে; তাদের পরিবারের মা পিসি বাবা দাদার দিকেই তোমাদের চোখ। লোক জড়ো করার এই তামাশা আমার পছন্দ হয় না।

সুহাস অসন্তুষ্ট হয়ে হাত নেড়ে বলল, "তুমি ফ্যামিলির মধ্যে থাকো নি, অবিন; তুমি বড় সংসারের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠো নি। একলা থেকেছ, একলা বড় হয়ে উঠেছ, তুমি আমাদের সমাজের পরিবারের ব্যাপারটা বুঝবে না।"

"বুঝব না?"

"না। তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বিয়েটা ব্যক্তিগত হতে পারে; কিন্তু সংসারের মধ্যে তার জায়গা। আলাদা করে আমি ওটা ভাবতে পারি না। আমার মা জ্যাঠাইমা, বাবা জ্যাঠামশাইকে আমি না দেখলে কথা ছিল...!"

ওকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "তোমাদের এমতন মানুষকে নিয়ে বড় মুশকিল, সুহাস। আমি কী বলছি সেটা তুমি বুঝছ না। যতীনের ভাই যদি এই বিয়েতে রাজী হয়ে থাকে তবে তার মার আপত্তির জন্যে এখন আরজী হওয়াটার মানে কোথায়? ...যাক্ গে, আমার অন্য কথা শোনো: আমি বলব, এই বিয়ে তোমরা দিও না।"

সুহাস তর্কের সুরে বলল, "কেন?"

"কেন দেবে! যে-পরিবারের লোকজন তোমাদের গোড়াতেই বিশ্বাস করতে পারছে না, তারা তোমাদের বিশ্বাস করবে না। ওদের মনে নানান সন্দেহ ফেনাচ্ছে, সেটা যে বাড়বে না এমনও নয়। সে বাড়িতে আয়নাকে কেন দেবে? তুমি কী জোর করে বলতে পার—এই অশান্তি আয়নাকে বরবর ভোগ করতে হবে না!"

সুহাসের চোখমুখ দেখে মনে হল এবার সে আমার কথা শুনছে। চুপচাপ বসে থেকে বলল, "আমারও নিজের ইচ্ছে নেই আর। আমি যতীনকে সব বলেছি। একদিন ওর সঙ্গে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়েছিলাম। ভাল লাগে নি। উনি বোধ হয় আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।"

"সেটাই স্বাভাবিক। ওঁরা হলেন বিশুদ্ধ হিন্দু সমাজের মেয়ে, গোবর জল ছিটিয়ে সংসারকে শুদ্ধ করতে জন্মেছেন।"

"কিন্তু জ্যাঠামশাই—! উনি যদি সত্যিই ছেলেদের বাড়িতে দেখা করতে যেতে চান?"

"যাবেন না।"

"যাবেন না?"

"যাওয়া উচিত হবে না। তুমি ওঁকে সব বুঝিয়ে বলো।"

"বলব! কিন্তু জ্যাঠামশাইকে মাঝে মাঝে আমার কেমন মনে হয়, অবিন; উনি যেন আজকাল বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বাবা মারা যাবার পর থেকে আরও এটা দেখছি। কী জানি হয়ত মাথা নোয়াতে তাঁর আটকাবে না।"

"আটকাবে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না, জ্যাঠামশাই আয়নাকে ঠিক ওই জন্যে কলকাতায় আনছেন। আয়না কলকাতায় আসবার জন্যে মাঝে মাঝে আমাকেও বলত। হয়ত ক'দিনের জন্যে বেড়াতে নিয়ে আসছেন। কিন্তু সেটা ওখানে বলা যেত না বোধ হয়। খানিকটা লুকোচুরি বুড়ো বয়েসে তাঁকে খেলতে হচ্ছে সুহাস, উপায় কী! কেন, তা তুমি জানো।"

সুহাস বিষণ্ণ মুখে বসে সিগারেটটা শেষ করল। আবার চুপচাপ। হাই তুলল ছোট করে। তারপর গা তুলে বলল, "আমি যখন আমাদের পরিবারের কথা ভাবি অবিন, কেমন যেন হয়ে যাই। অদ্ভুত এক অবস্থা হয়েছে আমাদের। কোথায় যেন এসে আটকে গিয়েছি। দিদি, আমি, আয়না—সকলেই। জ্যাঠামশাইও কিছু করতে পারছেন না। পারবেন না। আমরা যে কোথায় আটকে গেলাম—তোমায় বোঝাতে পারব না।"

আমি কোনো কথা বললাম না। সুহাসকে এখন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, যেন সত্যিই ও কোথাও আটকে পড়েছে।

"তুমি কিছু বলতে পার?"

"আমি কী পারব, সুহাস! তবু বলি। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের পরিবারের মধ্যে একটা ক্ষয় এসে দেখা দিয়েছে। যাকে চলতে হয় তাকে ক্ষইতে হয়। তোমরা এই সত্যটা স্বীকার করতে চাও না। আমার রামদাস বলত, ধুতিকোর্তা পরনে থাকলে তা দিনে দিনে জীর্ণ হবে, তারপর ছিঁড়ে খুঁড়ে ফালা ফালা হবে। জগতের এই ক্ষয়ের হিসেবটা মাথায় না রাখলে আফসোস করতে হয়। যদি ওটা মানতে পার, দুঃখ থেকে খানিকটা বাঁচবে।"

সুহাস আমার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে গেল।

সুহাস শেষে উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলি। কাল তুমি আসছ তাহলে!"

"যাব। নিশ্চয় যাব।"

"হাওড়া স্টেশনেই আসবে। ওই যে-ট্রেনটায় তুমি ফিরেছিলে, সেইটেতে ওরা আসছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি আকাশের কোণে বিদ্যুতের চমক আরও বেড়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে।

সুহাস বলল, "যেতে যেতে বৃষ্টি এসে যাবে না তো?"

আমি বললাম, "আসতে পারে।"

সুহাসকে হোটেলের নীচে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার যখন উঠে এলাম, মনে হল খোলা ছাদে অন্ধকারে আমায় যেন কেউ ডাকল। তাকিয়ে দেখলাম না। ডাকটা কানে শুনতে পাবার মতন নয়। মোহিনী আমায় যখন ডাকেন—এমন করেই ডাকেন।

(ক্রমশ)

॥ ১৮ ॥

জোড়াসাঁকো বাড়ির দক্ষিণে ছিল মদনমোহন চাটুয্যে লেন। দক্ষিণ দিকের বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে একটু পূবে গেলেই নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই নলিনচন্দ্র পরে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। নলিনচন্দ্রের শখ ছিল ঘুড়ি ওড়ানো। এখন যেমন ছেলে-ছোকরারাই ঘুড়ি ওড়ায়, তখনকার দিনে গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তিরাও দিবানিদ্রা সারা করে বিকেলবেলা ঘুড়ি ওড়াতেন। বাজি রেখে ঘুড়ির প্যাঁচ খেলার রেওয়াজ ছিল। তবে নলিনচন্দ্র প্যাঁচের বা বাজির ভক্ত ছিলেন না। তিনি ওড়াতেন ঢাউস ঘুড়ি। কারিগর ডেকে এনে যত্ন করে তিনি ঘুড়ি বানাতেন। মোটা সুতোয় সেই ঘুড়ির কল বেঁধে উড়িয়ে দিতেন আকাশে। ছোটোখাটো সরু সুতোর ঘুড়ি তাঁর ঘুড়ির কাছে ঘেঁষতেই সাহস করত না—তাঁর লোহার মতো শক্ত সুতো কাটতে আসা দূরের কথা।

নলিনচন্দ্রের ঢাউস ঘুড়ি জোড়াসাঁকো বাগানের নারকোল গাছ আর বকুল গাছের মাথার উপর দিয়ে পাঁচ নম্বর বাড়ির ছাদের উপর গোঁ গোঁ করে ডাক দিয়ে উড়ে বেড়াতো। বিকেল বেলা ছাদে বা বাগানে বসে গগন দেখতেন নীল আকাশে সেই ঘুড়ির সঞ্চরণ আর তারিফ করতেন। নলিনচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলে ঘুড়ি ওড়ানোয় তাঁকে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু নিজে কোনোদিন ঘুড়ি ওড়ান নি।

তারপর একবার সে সুযোগ এল।

গরমের সময় যেমন প্রতিবার জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে ময়দানের কাছে ফাঁকা বাড়ি ভাড়া নিয়ে দু-তিন মাস কাটিয়ে আসেন, সেবারেও গেছেন। এবারে বাড়ি পাওয়া গেছে চৌরঙ্গীর উপর। ফাঁকায় এসেছেন, হেঁটে হেঁটে বেড়ান—তখন তো কলকাতায় এত ভিড় ছিল না—চৌরঙ্গী পাড়া, বিশেষ করে ময়দান তো ফাঁকাই থাকত। এমনি একদিন গিয়ে হাজির হয়েছেন আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স-এ। দোকানটা চৌরঙ্গীর উপর, এখন যেখানে লয়েডস ব্যাংক হয়েছে। গগন সভ্য ছিলেন আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স-এর, সেই হিসেবে দোকানে যেতেন বিলিতী জিনিস টিনিস এটা ওটা কিনতে। ম্যানেজারের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় ছিল।

সেদিন গিয়ে দেখলেন একটা নতুন জিনিস এসেছে দোকানে—এক জোড়া বাক্স ঘুড়ি। নতুন জিনিস দেখে গগনের লোভ হল, তখনই কিনে নিলেন। ম্যানেজার

সায়েব বুঝিয়ে দিলেন যে এ ঘুড়ি একটা একটা করে আলাদাও ওড়ানো যায়। আবার দুটোকে এক সঙ্গে বেঁধেও ওড়ানো যায়। গগন তো ঘুড়ি দুটি বগলে করে বাড়ি ফিরে এলেন। জোড়জোড় করতে লাগলেন, তার পরদিন যাতে ঘুড়ি দুটো ওড়ানো যায়।

পরের দিন মস্ত আয়োজন। বিকেল বেলা বাড়ির সবাইকে ছাদে টেনে তুললেন। চাকর দাসী পর্যন্ত বাড়ির কাজ ফেলে ছাদে উঠে এল। নতুন রকম ঘুড়ি ওড়ানো দেখবে সবাই। সেদিনটা যাচ্ছিল খুব গরম, গুমোট; কিন্তু একটু পরেই হাওয়া উঠল। হাওয়া উঠতেই গগন ছেড়ে দিলেন ঘুড়ি দুটোকে এক সুতোয় বেঁধে আকাশে। হাওয়ায় ভর পেয়ে সোঁ সোঁ করে উঠে পড়ল তারা। গগন সুতো ছেড়ে চললেন। যত টানে ততই সুতো ছাড়া হতে লাগল। দেখতে দেখতে জোড়া ঘুড়ি অনেক উঁচুতে উঠে পড়ল আর সেখান থেকে গোঁ গোঁ গর্জন ছাড়তে লাগল। ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দেতেই সবাই মত্ত, এদিকে গুমোট কেটে যাবার পর থেকে হাওয়ার জোর যে ক্রমেই বাড়তে আরম্ভ করেছিল কেউই লক্ষ করেননি। হঠাৎ

ঘুড়ির গর্জন যেন সারা আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল, ঝোড়ো হাওয়া এসে গেছে ততক্ষণ। হাওয়ার দাপটে বক্স ঘুড়ি একবার থরথর করে কেঁপে উঠল আর তারপরেই পটাং করে ছিঁড়ে গেল সুতো।

গেল গেল করতে করতে ঘুড়ি গোঁত্তা খেয়ে কোথায় যে ছিটকে বেরিয়ে গেল কেউ তার দেখতে পেল না। ছাদ থেকে নেমে এলেন সবাই। ঘুড়ি ওড়ানোর শখ মিটল।

গগন আকাশকে ভালবাসতেন। আকাশের রং আকাশের মেঘ, মেঘের কোল ঘেঁষে বকের পাতি তাঁর মনে যে দাগ কেটে যেত তা নিয়ে কত ছবিই না এঁকেছেন আকাশের। নিজে ঘুড়ি ওড়াতেন না—ওই একবারই উড়িয়েছিলেন কিন্তু নীল আকাশের গায়ে হালকা-পাখা ঘুড়ির খেলে বেড়ানো দেখে আনন্দ পেতেন। কালী পুজোর দিকেতে যখন কলকাতার আকাশ রঙিন ফানুসে ছেয়ে যেত, রাতের কালো আকাশে হাউই বাজি ছাড়া হত আর তার থেকে ঝরে-পড়া রঙিন তারায় আকাশের পট হয়ে উঠত চিত্র বিচিত্র, বারান্দার রেলিংয়ের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বসে দেখতেন সে বাহার। দার্জিলিংয়ে যখন গেছেন, সেখানে পেয়েছেন সমস্ত আকাশখানা নিজের মুঠোর মধ্যে। আর কলকাতার বারান্দার ফাঁক দিয়ে সারি সারি নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে যেটুকু আকাশ পেতেন সেটুকুও তাঁর কাছে কম মূল্যবান ছিল না। জোড়া-সাঁকোর আকাশের গায়ে নারকেল গাছের কত অপূর্ব ছবিই না এঁকেছেন।

যাই হোক, পরদিন সকাল বেলা গগন গিয়ে আবার হাজির হয়েছেন আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স-এ। ম্যানেজার সায়েবকে বললেন গতকালের দুর্ঘটনার কথা।

ম্যানেজার একটু অবাক হয়ে গেলেন সুতো ছেঁড়ার কথা শুনে। বললেন—আপনি কিরকম সুতো নিয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার টেগোর?

গগন সুতো দেখাতে ম্যানেজার বললেন, নিশ্চয় আমার সহকারীরই ভুল। এ হচ্ছে একটা ঘুড়ি-ওড়াবার সুতো। ওর বলে দেওয়া উচিত ছিল। হয়তো বুঝতে পারেনি আপনি এক সঙ্গে দুটো ঘুড়ি ওড়াতে চান। আমাদের যে ডবল ঘুড়ি ওড়াবার সুতো আছে তাতে ঝড় এলেও ছেঁড়বার নয়।

গগন বললেন—যাক, যা হবার হয়ে গেছে। এখন মোটা সুতো আর আরেক জোড়া বাক্স ঘুড়ি দিন তো আমায়।

সায়েব মহা দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন—কি করি মিঃ টেগোর, ওই দুটিই ছিল আমাদের শেষ ঘুড়ি। আর তো নেই। আপনাকে আবার এর পরের চালানের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সে-ও এক মাসের উপর।

গগন বললেন—আছে সায়েব আছে। আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্সে এই ঘুড়ি আছে।

সায়েব অবাক হয়ে বললেন—আপনি বলছেন কি মিঃ টেগোর?

গগন বললেন—আমি ঠিকই বলছি। চলুন তো একবার আপনাদের ছাদে!

সায়েব আরো অবাক হয়ে বললেন—ছাদে? ছাদে তো আমরা কোন স্টোর রাখি না। ছাদে কোনো ঘর নেই—খোলা ছাদ।

গগন বললেন—তা হোক, চলুনই না।

তখন হাঁকডাক করে দারোয়ানকে ডেকে দারোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সায়েব গগনকে নিয়ে আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স-এর ছাদে উঠে ছাদের দরজা খুললেন। খুলে দেখেন অবাক কাণ্ড, কালকের সেই ঘুড়ি দুটো ছেঁড়া সুতো সুদ্ধু ছাদে পড়ে রয়েছে।

দুজনের তখন খুব হাসি। ঘুড়িটা যে উপড়ে গিয়ে লটপট করতে করতে আর্মি অ্যান্ড নেভির ছাদে গিয়ে পড়েছিল, ধুলোর ঝড়ের মধ্য দিয়ে, গগন ঠিক লক্ষ্য করেছিলেন। কাউকে বলেননি।

ঘুড়ি উদ্ধার হল। তবে সে ঘুড়ি আর চৌরঙ্গীর বাড়ি থেকে ওড়ানো হয়নি। আসলে নলিনচন্দ্রকে দেবেন বলেই ঘুড়ি দুটো কিনেছিলেন। জোড়াসাঁকোয় ফিরে গিয়ে তাঁকেই উপহার দিলেন।

গগন ঘুড়ি ওড়ানোর চেয়ে আকাশে ঘুড়ি দেখতেই ভালবাসতেন। (ক্রমশ)

গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে কলকাতার আকাশে আসন্ন ঝড়

॥ ৩৯ ॥

সেই চোঙা প্যান্ট আঁটসাঁট জামা গায়ে, মস্তানের মতন চেহারা, তা হোক, আজকাল সব ছোঁড়ারই এমন পোশাক, চুল ছাঁটারও এই ছিরি।

কিন্তু জায়গাটার নাম শুনেই রামানন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কটমট করে ছেলে দুটিকে সে আর একবার দেখল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আবছা অন্ধকারে চোখের ভাষা, মুখের রঙ খুব একটা ভাল বোঝা যাচ্ছিল না; তা হলেও দুটিরই কথাবার্তার মধ্যে একটা বিনয়, দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে খানিকটা নম্রতা শিষ্টতা ছিল—এটা অবশ্য রামানন্দর চোখে পড়ল।

কিন্তু তা বলে গলার স্বরটা সে একটুও সুন্দর করল না, রুক্ষ তিক্ত চেহারা করে কেমন যেন হই-হই করে কথা বলল।

'তা পাইকপাড়া তো বিখ্যাত জায়গা, খুব সম্মান পেয়ে এসেছি সেখান থেকে, আবার আমার কাছে কেন?'

ঘাড় নিচু করে রেখে ছেলে দুটি চুপ করে থাকল। দুজনের হাতে দুটো বাণ্ডিল। খবর কাগজ দিয়ে মুড়ে কিছু এনেছে।

'ওগুলোর মধ্যে কি, বোমা পিস্তল?' ব্যঙ্গের গলায় রামানন্দ বলল, 'আবার একটা ফাংশন-টাংশন জোড়া হয়েছে নাকি, এবারও চীফ গেস্ট, না কি রামানন্দ সেনকে প্রেসিডেন্ট করে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে আসা হয়েছে, মতলবটা কি শুনি?'

'স্যার, আমরা এমনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'এমনি? খামকা? সন্দেহটা যে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছ হে।' বিকৃত স্বর করে রামানন্দ হাসল। 'পাইকপাড়ার ছেলেদের মধ্যে এত সততা এত মহত্ত্ব কবে থেকে জাগল?'

'আমরা আপনাকে ভালবাসি স্যার।' দুজন একসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল।

'আবার ভালবাসা, আবার প্রেম!' রামানন্দ চোখ তুলে দেখল পূব দিকে একটা হলুদ-পোড়া মাথাভাঙা চাঁদ উঁকি দিয়েছে। আকাশে যে দু-চারটে তারা জ্বলছিল এবার দেখতে দেখতে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। রামানন্দ চোখ নামাল। 'দারুণ ভালবেসেছিলেন তোমাদের পাইকপাড়ার ক্লাবের হেনা দেবী, হ্যাঁ, হেনা সেন, নিশ্চয় চেন, আমাকে ভালবেসে নাকে দড়ি দিয়ে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন, আশা করি সে খবরও তোমাদের অজানা নেই।'

'আমরা সবই জানি স্যার।' একটি ছেলে কেমন যেন বেদনার্দ্র গলায় বলল, 'আমরা আর ওই ক্লাবে নেই, সোনালী বাসর ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'যে ক্লাব, যে সমিতি কবি রামানন্দ সেনকে অশ্রদ্ধা করে অপমান করে সেই সমিতির সঙ্গে আমাদের কোনো সংস্রব নেই।' দৃপ্ত গলায় আর একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, 'আপনি শুনলে সুখী হবেন, ফাংশনের পরদিনই আমরা ছজন সভাসভ্যা সোনালী বাসর থেকে বেরিয়ে আসি, আমাদের দেখাদেখি কাল আরও তিনজন বাসরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।'

'মানে আমাকে মারধোর করেছিল অপমান করেছিল তার প্রতিবাদস্বরূপ?' অন্ধকার মাঠে রামানন্দর গলা গমগম করে উঠল।

'নিশ্চয়,' দ্বিতীয় ছেলেটির গলা আর একটু চড়ে গেল। 'সংস্কৃতি কাকে বলে, প্রগতি শব্দের অর্থ কী যারা জানে না, একজন বিদগ্ধ মননশীল আধুনিক কবিকে যে তারা অসম্মান করবে, অপমান—এমন কি দরকার হলে পীড়ন পর্যন্ত করবে এ তো জানা কথা। চিরকালই এমন হয়ে এসেছে। রামানন্দ সেনের কবিতা বুঝবার মগজ তাদের কোনোদিনই হবে না।'

'কবিতা বলতে তারা জানে জল পড়ে পাতা নড়ে, কবিতা বলতে তারা জানে পাখি সব করে রব—' তেমনি গাঢ় বেদনার্দ্র গলায় প্রথম ছেলেটি বলল, 'কিছু মাথামোটা হুজুগে ছেলেমেয়ে নিয়ে ওই ক্লাব—ঘটা করে নাম দেওয়া হয়েছে সোনালী বাসর, আসলে রক্ষণশীল সেকেলে বুড়োর দল পিছন থেকে ওই ক্লাবটা চালাচ্ছে, সেদিনের ঘটনার পর আমরা ভাল করে বুঝলাম, ওই ক্লাব, ওই সমিতি পাইকপাড়ার কলঙ্ক, তথাপি আমরা ক'জন ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম—'

'বেশ বেশ, ভাল কথা—' রামানন্দ আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না, অবশ্য সেটা

প্রকাশ করল না, ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের হেনাদিদিটির খবর কি? তিনিও কি সোনালী বাসর ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না,' চড়া গলার স্বর একটু নামিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'ইচ্ছে থাকলেও কলেজের চাকরির কথা ভেবে তিনি ক্লাব ছাড়বেন না, পাইকপাড়ার বুড়োর দল অসন্তুষ্ট হলে ওঁ'র পক্ষে অসুবিধে আছে।'

'মুশকিল, ভারি মুশকিল', রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'অথচ মহিলা আমাকে খুব ভালবাসেন, দেখলাম আমার কবিতা-টবিতা মুখস্থ।'

'আমাদের আপনার প্রত্যেকটা কবিতা—' এবার আর বেদনা না, থমথম আবেগের স্বরে প্রথম ছেলেটি আবৃত্তি করে উঠল:

ভালবাসার গোলাপ-রাঙা দিনে
এক পশলা মেঘের কান্না কেঁদে নিও—

'থাক থাক,' রামানন্দ ব্যস্ত হয়ে একটা হাত শূন্যে তুলে ধরল। 'হেনা সেনের মতো আমার সব কবিতা তোমাদের কণ্ঠস্থ, আমি বুঝতে পেরেছি, বেশ বেশ, আর একদিন এসো দুটিতে, কথাটথা বলা যাবে, এখন আমি—' চট করে দূরের হলদে ভাঙা চাঁদটাকে একবার দেখে নিয়ে রামানন্দ

ব্তীয় ছেলেটার দিকে চোখ রাখল। 'এখন টা বাজে হে, তোমাদের সঙ্গে ঘড়িটড়ি আছে?'

'ঘড়ি নেই স্যার, তবে এখন সাতটা-সাওয়া সাতটার বেশি হবে না।'

'উঁহু,' প্রথম ছেলেটি মাথা নাড়ল, পৌনে আটটা হবে।'

'অ্যাঁ!' রামানন্দর সবটা শরীর নেচে উঠল, তার মানে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠল স, অধৈর্য হয়ে উঠল। 'দ্যাখো দিকিনি—তোমাদের সঙ্গে আগড়-বাগড় বকতে গিয়ে াচ্ছেতাই দেরি হয়ে গেল—নাও, এবার স্তা ছাড়, আমাকে যেতে দাও—'

'আপনি কি কলকাতা যাচ্ছেন স্যার?'

'না, কলকাতা যাব কোন্ দুঃখে,' ুজনকে হাত দিয়ে একরকম ঠেলে সরিয়ে দয়ে রামানন্দ সামনের দিকে পা বাড়াল। আমাকে যেতে হবে এখন বেলেঘাটা খাল-পোলের ধারের মদের দোকানে—শালারা প্রল মাস থেকে সাড়ে আটটায় দোকান ন্ধ করতে আরম্ভ করেছে।'

ছেলে দুটি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর একজন, দ্বিতীয়টি রামানন্দর দিকে তাকাল। 'আজ ওই দোকানে না-ই বা গেলেন স্যার।'

'বাঃ, না-ই বা গেলেন স্যার।' রামানন্দ াথা সঙ্গে ভুরু কুঁচকোল, হাত নাড়ল। েন তোমার খুশি মতন আমি মদ খেতে াব আর যাব না—'

'আমরা আপনার জন্য সামান্য কিছু প্রেজেণ্টেশন এনেছি স্যার।'

'আর রেখে দাও তোমাদের প্রেজেণ্টেশন, ক এনেছ আমার জন্য শুনি?' রামানন্দ ক লাগল। 'বেশ তো, এনেছ, দাও—' ামানন্দ হাত বাড়াল। 'ওই নিয়েই এখন াখালপোলের দোকানে ছুটতে হবে। বেটারা টার কাঁটায় সাড়ে আটটায় দরজা বন্ধ ে। দাও, দেখি কি উপহার।'

কথা না বলে প্রথম ছেলেটি তার হাতের ্যাকেটটা রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'অ্যাঁ, বইটই আছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ স্যার, দুখানা ইংরেজী বই, আর কটা ভাল পেনও এনেছি আপনার জন্যে, ক সঙ্গেই বেঁধে এনেছি।

'কি বই, কবিতার বই নয় তো?' স্বরটা কৃত করে ফেলল রামানন্দ।

ছেলেটি হাসল।

'না স্যার, ক্রাইম নভেল, কবিতার বই র আপনাকে কোন্ দুঃখে—

'কবি রামানন্দ সেনকে আর কারো লেখা তা, এ-দেশের কি ও-দেশের, উপহার র সাহস আমার নেই।'

'গুড্, কবিতা আমি লিখিও না, কারো তা এখন আর পড়িও না—কবিতার বই লে শুনলে প্যাকেটটা খালের ওপর ছুঁড়ে লে দিতাম। বরং ক্রাইম নভেল এক

বুদ্ধিমানের কাজ করেছ—দাও, তোমারটা দাও—' রামানন্দ দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে হাত বাড়াতে ছেলেটি কাগজে মোড়া একটা বড়সড় প্যাকেট রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'কি আছে এতে, অ্যাঁ!' রামানন্দ চমকে উঠল। প্যাকেটটা হাতে নিয়েই বুঝল বোতল-টোতল কিছু। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের কাগজটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলল।

'একটা হুইস্কি এনেছি আপনার জন্য।' ছেলেটি বিড়বিড় করে বলল।

'আরে তাই তো দেখছি, তাই তো দেখছি।' ফিকে জ্যোৎস্নায় বোতলের মুখের

রাংতাটা চিকচিক করছিল। রামানন্দ খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। 'অ্যাঁ, আসল কথা বলছ না, এতক্ষণ কেবল শিবের গীত গাওয়া হচ্ছিল।' বোতলটা আকাশের দিকে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সে। 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! আজ আর খালপোলের দোকানে যায় কে, খুব ভাল কাজ করেছ হে, হুঁ, উপহারের মতন উপহার বটে। এসো, আমার ঘরে এসো, বসে গল্পটল্প করা যাবে—কর্কখোলার প্যাঁচট্যাঁচ সবই আমার আছে।' রামানন্দ সমাদর করে ভক্ত দুটিকে ডাকল। তারা খুশি হল।

দুজনকে সংগে নিয়ে লম্বা পা ফেলে সে বাড়ির দিকে চলল।

হলুদপোড়া রঙটা কেটে গিয়ে চাঁদটা ক্রমে রুপো রুপো হয়ে উঠছিল। ফলে জ্যোৎস্নাটাও খুলছিল ভাল। প্রথম ছেলেটি ভাবাল, গলায় আবার আবৃত্তি করে উঠল:

'ভালবাসার গোলাপ-রাঙা দিনে
এক পশলা মেঘের কান্না কেঁদে নিও—
মিলনের চরম ক্ষণে এক খাবলা
অভিমানও মন্দ হয় না।'

'কেন এই হাবিজাবি জিনিসগুলো উগরাচ্ছ।' রুষ্ট গলায় রামানন্দ ধমক লাগাল। 'এমন চমৎকার মাঠে চাঁদের আলোয় অন্য কথা অন্য প্রসংগ আলোচনা করো।'

ছেলেটি হাসল।

'এগুলো যদিও আপনার আগের দিকের রচনা, তা হলেও আমাদের ভাল লাগে।'

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'আপনার এ-দিকের এক-একটা কবিতার কোনো তুলনা হয় না, অসাধারণ কম্পোজিশন, সাধারণ পাঠক অবশ্য এক বর্ণও বোঝে না—এ কবিতায় দাঁত ফোটানো সত্যি তাদের নয়—তাদের কাছে কবিতা একটা এন্টারটেনমেণ্টের মতন কিছু—মানে পড়ে ভাল লাগবে।'

'এই, তুমি আবার বকবক শুরু করলে' রামানন্দ এই ছেলেটির দিকে ঘাড় ফেরাল, 'চুপ কর দিকিনি।'

ছেলেটি চুপ করল না। রামানন্দের হাঁটছিল এবং অনেকটা যেন নিজের বকে যাচ্ছিল: 'শিল্পী তার বিচিত্র বেদনাকে কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ চায়, এখানে ভাল লাগা মন্দ লাগার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কবিতা হল আত্মবিশ্লেষণের শাণিত অস্ত্র—অবশ্য কিন্তু কবি নয়—'

'চুপ কর চুপ কর, আমরা এসে দুজনকে নিয়ে রামানন্দ একটা চকচকে ঝকঝকে উঠোনে ঢুকল। ছেলে দুটির ভাল লাগল। কিছু দিয়ে ছবির মতন টালির ঘর। শান্ত পরিবেশ।

'মনতাজ!' রামানন্দ চেঁচিয়ে ডাকল

না সে দেখছিল তার ঘর অন্ধকার, টা হাট-খোলা হয়ে আছে।

অবশ্য মাধুরীর শোবার ঘরটাও কার। তবে দোরটা ভেজান। কেবল ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। তাই বলো, তো রান্নাবান্নার সময়, হ্যাঁ, আজ গ রান্না হচ্ছে—কথাটা মনে হওয়ার র সঙ্গে মাংসের গন্ধ সে টের পেল, বেশ ট মতন একটা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে ছে। দুটিতে তবে এখন ওখানেই বসে ছ। শফীও দিদির রান্নার সময় উনুনের শ বসে গল্প করত। 'মাধুরী!' চড়া য় রামানন্দ ডাকল।

কিন্তু মাধুরী বেরোল না, একটা রাসিনের ডিবি নিয়ে মনতাজ ছোঁড়াই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রামানন্দ ছোঁ র তার হাত থেকে বাতিটা তুলে নিল। ঃ, আবার গিয়ে দিদির সাথে বসে রসের প কর।' বড় করে সে একটা ভেংচি কাটল। ড় নিচু করে মনতাজ রান্নাঘরের দিকে রে গেল। রামানন্দ ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে দিকে ডাকল, 'এসো, তোমরা ঘরে এসো।'

রামানন্দর সঙ্গে তারা ছোট ঘরটায় ঢুকে ড়ল। আলোটা নামিয়ে রেখে রামানন্দ টের প্যাকেট এবং বোতলটা এক পাশে খল, তারপর তার ছেঁড়া মতন মাদুরটা ঝেয় বিছিয়ে দিল। 'বস, বসে পড়।' এক-খ হাসি নিয়ে এবার সে ভক্তদের দিকে কাল। 'এই হল আমার আস্তানা, এখানেই ট বসা বিশ্রাম করা ঘুমোনো মদ খাওয়া ম করা, বাকি সময়টুকু বাইরের দিকে চোখ রে গাছগাছালি শালিক বুলবুলি আকাশ দ মেঘ লবণ হ্রদের বালু—এই সব দেখা।'

'বুঝতে পেরেছি।' প্রথম ছেলেটি বিজ্ঞের মতো হাসল। কলকাতা আপনার ভাল লাগছিল না, শহরের আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা কতকটা সত্য।' গায়ের জামাটা রামানন্দ একটানে খুলে ফেলে দাঁড়াতে ঝুলিয়ে রাখল।

ছেলে দুটি জুতো ছেড়ে মাদুরের ওপর পা গুটিয়ে বসল। তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখল।

'এটা অবিশ্যি আপনার কয়েকটা কবিতার মধ্যেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে—' গদগদ গলায় দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, স্যার, সভ্যতা আপনাকে পীড়া দেয়, অবক্ষয়ী সভ্যতা—চোখ মেললেই আজ কলকাতা শহরের সর্বত্র যা চোখে পড়ছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হিংসা-হতাশা বিষণ্ণতায় কলুষিত এই শতাব্দী মানুষকে মানুষের সভ্যতাকে জীর্ণ করে দিচ্ছে—কোনো কবি কোনো শিল্পীই এই অন্ধকার এই অবক্ষয় মেনে নিতে পারে না, যদিও এককালে ধরে নেওয়া হত শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রিয়ালিজম ও রোমান্টিসিজম একসূত্রে আছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানভাবনা যুক্ত হয়ে—'

'উফ্, এ যে কলেজী লেকচার শুরু করে দিলে।' ভাঙা ফাইবারের সুটকেসটা হাতড়ে রামানন্দ তৎক্ষণে বোতলের ছিপি খোলার প্যাঁচ ও একটা কাচের গেলাস বের করে নিয়ে দুজনের মাঝখানে মাদুরের ওপর এসে চেপে বসল। 'শিল্প সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে কলেজে পড়াও নাকি হে ছোকরা?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটা মাথা নাড়ল। 'না স্যার, আমি সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছি।'

'তুমি!' রামানন্দ প্রথম ছেলেটির দিকে চোখ রাখল।

'আমি অল্প কদিন হল একটা ব্যাংকে ঢুকেছি স্যার—'

'বাঃ, চমৎকার। খুব ভাল লাইন বেছে নিয়েছ দুজনেই।' প্যাঁচ ও বোতলটা প্রথম ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দিল রামানন্দ। 'খোল, হুঁ, খুব ভাল লাইন—তবে আর এ সব শিক্ষা কাব্যভাবনা নিয়ে এত মাথা কোটাকুটি কেন তোমাদের?'

ছেলে দুটি এক সঙ্গে হেসে ফেলল।

'বিজ্ঞানের ছাত্র, ব্যাংকের চাকুরে, তা হলেও কবিতা আমাদের ভাল লাগে, বিশেষ করে রামানন্দ সেনের কবিতার আমরা দারুণ ভক্ত।'

'নাও, নাও, এবার ঢেলে ফেল।' ছিপি খোলা হয়ে গেছে। রামানন্দ কাচের গেলাসটা বাড়িয়ে দিল। সোডা-ফোডা নেই, আমার অবশ্য র-ই চলে, তোমরা একটু একটু জল মিশিয়ে খাও—ওই যে কুঁজোয় জল রয়েছে।' আঙুল দিয়ে সে কোণার দিকে দাঁড় করানো মাথা ভাঙা মাটির কুঁজোটা দেখাল। 'কুঁজোর মুখের অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটায় করে জল গড়িয়ে নিলেই হবে—আচ্ছা। দাঁড়াও, ওটা বরং এখানেই নিয়ে আসা যাক।'

'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন স্যার, আপনি খান, আমরা খাব না।'

'ধেৎ তা কি হয়—' রামানন্দ উঠে গিয়ে কুঁজোটা তুলে নিয়ে এল।

'আমরা ড্রিংক করি না স্যার।'

'কর না—একদিন করলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না—বেশ তো, আমার প্রসাদ খাবে—আমার ঠাকুর্দা বাবা কাকা কোনোদিনই মদ খেতেন না, কিন্তু কালী-পুজোর রাত্রে প্রসাদী কারণ, অবশ্য সেটা

রাংতাটা চিকচিক করছিল। রামানন্দ খুশিতে গদগদ হয়ে উঠল। 'অ্যাঁ, আসল কথা বলছ না, এতক্ষণ কেবল শিবের গীত গাওয়া হচ্ছিল।' বোতলটা আকাশের দিকে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সে। 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! আজ আর খালপোলের দোকানে যায় কে, খুব ভাল কাজ করেছ হে, হুঁ, উপহারের মতন উপহার বটে। এসো, আমার ঘরে এসো, বসে গল্পটল্প করা যাবে—কর্কখোলার প্যাঁচট্যাঁচ সবই আমার আছে।' রামানন্দ সমাদর করে ভক্ত দুটিকে ডাকল। তারা খুশি হল।

দুজনকে সঙ্গে নিয়ে লম্বা পা ফেলে সে বাড়ির দিকে চলল।

হলুদপোড়া রঙটা কেটে গিয়ে চাঁদ ক্রমে রুপো রুপো হয়ে উঠছিল। ফ জ্যোৎস্নাটাও খুলেছিল ভাল। প্রথম ছেলে ভাবালু গলায় আবার আবৃত্তি করে উঠল

'ভালবাসার গোলাপ-রাঙা দিনে
এক পশলা মেঘের কান্না কেঁদে নিও—
মিলনের চরম ক্ষণে এক খাবলা
অভিমানও মন্দ হয় না।'

'কেন এই হাবিজাবি জিনিসগু উগরাচ্ছ।' রুষ্ট গলায় রামানন্দ ধমক লাগা। 'এমন চমৎকার মাঠে চাঁদের আলোয় অন কথা অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করো।'

ছেলেটি হাসল।

'এগুলো যদিও আপনার আগের দিকে রচনা, তা হলেও আমাদের ভাল লাগে।'

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'আপনা এ-দিকের এক-একটা কবিতার কোনো তুল হয় না, অসাধারণ কম্পোজিশন, সাধার পাঠক অবশ্য এক বর্ণও বোঝে না—এ দ কবিতায় দাঁত ফোটানো সত্যি তাদের ক নয়—তাদের কাছে কবিতা একটা এণ্ট টেনমেণ্টের মতন কিছু—মানে পড়ে ভাল লাগবে।'

'এই, তুমি আবার বকবক শুরু করল' রামানন্দ এই ছেলেটির দিকে ঘাড় ফেরা 'চুপ কর দিকিনি।'

ছেলেটি চুপ করল না। রামানন্দের সঙ্গে হাঁটছিল এবং অনেকটা যেন নিজের মনে বকে যাচ্ছিল; 'শিল্পী তার বিচিত্র বোধ ও বেদনাকে কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চায়, এখানে ভাল লাগা মন্দ লাগার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কবিতা হল কবি আত্মবিশ্লেষণের শাণিত অস্ত্র—অবশ্য সব কিন্তু কবি নয়—'

'চুপ কর চুপ কর, আমরা এসে গেছি' দুজনকে নিয়ে রামানন্দ একটা চকচকে তকতকে ঝকমকে উঠোনে ঢুকল। ছেলে দুটির ভাল লাগল। কিছু গাছগাছ দিয়ে ছবির মতন টালির ঘর। নিরিবি শান্ত পরিবেশ।

'মনভাজ!' রামানন্দ চেঁচিয়ে ডাক

না সে দেখছিল তার ঘর অন্ধকার, টা হাট-খোলা হয়ে আছে।

অবশ্য মাধুরীর শোবার ঘরটাও রে। তবে দোরটা ভেজান। কেবল রে আলো দেখা যাচ্ছে। তাই বলো, তো রান্নাবান্নার সময়, হুঁ, আজ গ রান্না হচ্ছে—কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে মাংসের গন্ধ সে টের পেল, বেশ মতন একটা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে ছে। দুটিতে তবে এখন ওখানেই বসে। শফীও দিদির রান্নার সময় উনুনের বসে গল্প করত। 'মাধুরী!' চড়া য় রামানন্দ ডাকল।

কিন্তু মাধুরী বেরোল না, একটা রাসিনের ডিবি নিয়ে মনতাজ ছোঁড়াই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রামানন্দ ছোঁ র তার হাত থেকে বাতিটা তুলে নিল। আবার গিয়ে দিদির সাথে বসে রসের কর।' বড় করে সে একটা ভেংচি কাটল। নিচু করে মনতাজ রান্নাঘরের দিকে রে গেল। রামানন্দ ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে টিকে ডাকল, 'এসো, তোমরা ঘরে এসো।' রামানন্দর সঙ্গে তারা ছোট ঘরটায় ঢুকে এল। আলোটা নামিয়ে রেখে রামানন্দ টের প্যাকেট এবং বোতলটা এক পাশে বল, তারপর তার ছেঁড়া মতন মাদুরটা কের বিছিয়ে দিল। 'বস, বসে পড়।' এক-ঋ হাসি নিয়ে এবার সে ভক্তদের দিকে কাল। 'এই হল আমার আস্তানা, এখানেই বসা বিশ্রাম করা ঘুমোনো মদ খাওয়া করা, বাকি সময়টুকু বাইরের দিকে চোখ খে গাছগাছালি শালিক বুলবুলি আকাশ মেঘ লবণ হ্রদের বালু—এই সব দেখা।'

'বুঝতে পেরেছি।' প্রথম ছেলেটি বিজ্ঞের তো হাসল। কলকাতা আপনার ভাল গছিল না, শহরের আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে ঠছিলেন।'

'হুঁ, তা কতকটা সত্য।' গায়ের জামাটা নন্দ একটানে খুলে ফেলে দাঁড়াতে লিয়ে রাখল।

ছেলে দুটি জুতো ছেড়ে মাদুরের ওপর গুটিয়ে বসল। তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রে ভিতরটা দেখল।

'এটা অবিশ্যি আপনার কয়েকটা বিতার মধ্যেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে—' গদগদ গলায় দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, স্যার, সভ্যতা আপনাকে পীড়া দেয়, অবক্ষয়ী সভ্যতা—চোখ মেললেই আজ কাতা শহরের সর্বত্র যা চোখে পড়ছে, দ্বন্দ্ব হিংসা-হতাশা বিষণ্ণতায় জর্জরিত এই শতাব্দী মানুষকে মানুষের সত্তাকে জীর্ণ করে দিচ্ছে—কোনো কবি কোনো শিল্পীই এই অন্ধকার এই অবক্ষয় মেনে নিতে পারে না, যদিও এককালে ধরে নেওয়া হত শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে রিয়্যালিজম ও রাশনালিজম একসূত্রে আছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানভাবনা যুক্ত হয়ে—'

'উফ্, এ যে কলেজী লেকচার শুরু করে দিলে।' ভাঙা ফাইবারের সুটকেসটা হাতড়ে রামানন্দ তৎক্ষণে বোতলের ছিপি খোলার প্যাঁচ ও একটা কাচের গেলাস বের করে নিয়ে দুজনের মাঝখানে মাদুরের ওপর এসে চেপে বসল। 'শিল্প সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে কলেজে পড়াও নাকি হে ছোকরা?'

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ছেলেটা মাথা নাড়ল। 'না স্যার, আমি সায়ান্স কলেজে রিসার্চ করছি।'

'তুমি!' রামানন্দ প্রথম ছেলেটির দিকে চোখ রাখল।

'আমি অল্প কদিন হল একটা ব্যাংকে ঢুকেছি স্যার—'

'বাঃ, চমৎকার। খুব ভাল লাইন বেছে নিয়েছ দুজনেই।' প্যাঁচ ও বোতলটা প্রথম ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে দিল রামানন্দ। 'খোল, হ্যাঁ, খুব ভাল লাইন—তবে আর এ সব শিক্ষা কাব্যভাবনা নিয়ে এত মাথা কোটাকুটি কেন তোমাদের?'

ছেলে দুটি এক সঙ্গে হেসে ফেলল।

'বিজ্ঞানের ছাত্র, ব্যাংকের চাকুরে, তা হলেও কবিতা আমাদের ভাল লাগে, বিশেষ করে রামানন্দ সেনের কবিতার আমরা দারুণ ভক্ত।'

'নাও, নাও, এবার ঢেলে ফেল।' ছিপি খোলা হয়ে গেছে। রামানন্দ কাচের গেলাসটা বাড়িয়ে দিল। সোডা-ফোডা নেই, আমার অবশ্য র-ই চলে, তোমরা একটু একটু জল মিশিয়ে খাও—ওই যে কুঁজোয় জল রয়েছে।' আঙুল দিয়ে সে কোণার দিকে দাঁড় করানো মাথা ভাঙা মাটির কুঁজোটা দেখাল। 'কুঁজোর মুখের অ্যালুমিনিয়ামের বাটিটায় করে জল গড়িয়ে নিলেই হবে—আচ্ছা। দাঁড়াও, ওটা বরং এখানেই নিয়ে আসা যাক।'

'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন স্যার, আপনি খান, আমরা খাব না।'

'ধেৎ তা কি হয়—' রামানন্দ উঠে গিয়ে কুঁজোটা তুলে নিয়ে এল।

'আমরা ড্রিংক করি না স্যার।'

'কর না—একদিন করলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না—বেশ তো, আমার প্রসাদ খাবে—আমার ঠাকুর্দা বাবা কাকা কোনোদিনই মদ খেতেন না, কিন্তু কালী-পুজোর রাতে প্রসাদী কারণ, অবশ্য সেটা

দেশী মদই, সকলকেই একটু একটু খেতে হবে।'

'আচ্ছা তাই হবে—আপনি খেয়ে প্রসাদ করে দিন—' প্রথম ছেলেটি এক সঙ্গে অর্ধেক গেলাস হুইস্কি ঢেলে রামানন্দর হাতে তুলে দিল। রামানন্দ সবটা একবারে গলায় ঢালল। মুখটা বিকৃত করল। 'সিগারেট আছে?'

'আছে বইকি।' দ্বিতীয় ছেলেটা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও একটা সুদৃশ্য লাইটার বের করে রামানন্দর হাতে তুলে দিল। রামানন্দ সিগারেট ধরাল। দেখতে দেখতে তার চোখ লাল হয়ে উঠল, মুখে একটা প্রশান্তির ভাব দেখা দিল।

'খাও, এইবেলা তোমরা খাও।' রামানন্দর কথা মতন কুঁজোর জল মিশিয়ে দুজনেই খানিকটা করে হুইস্কি খেয়ে নিল। তারাও সিগারেট ধরাল।

'দেখি কি বই আনলে।' বইয়ের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলল রামানন্দ। 'কিস্ ইন মুনলাইট—মানে চাঁদের আলোয় চুম্বন? চমৎকার নাম বইয়ের, আর এটা? সার্পেন্ট ইন দি বেড। শয্যায় সর্পিণী না কি সর্পিণী শয্যাসঙ্গিনী?' রামানন্দ হো-হো করে হাসল। 'অদ্ভুত নাম ক্রাইম বইয়ের। বেশ, দুখানা বই-ই পড়ে ফেলব।'

'কলমটা দেখুনে স্যার, একটা ভাল কলম এনেছি আপনার জন্য।'

'দেখেছি।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। বইয়ের মোড়কের ভিতর একটা দামী ফাউন্টেন পেন রয়েছে, কিন্তু এটা সম্পর্কে তার তত যেন উৎসাহ ছিল না। 'নাও ঢেলে ফেল, আর এক রাউন্ড হোক।' বোতলের দিকে চোখ রাখল সে।

এবার দ্বিতীয় ছেলেটি অনেকটা মদ কাচের গেলাসে ঢেলে রামানন্দর হাতে তুলে দিল, এক চুমুকে রামানন্দ শেষ করল। 'তোমরা খাও, তোমরা খাও।' রামানন্দ আর একবার মুখ বেঁকাল।

'আমরা আর খাব না স্যার।'

'আলবৎ খাবে।' রামানন্দ ধমক লাগাল। 'একটা বোতল নিয়ে এয়েছ, ইয়ার্কি! এক ফোঁটা সোডা জল আননি।' তার লাল চোখ গোল হয়ে উঠল। 'সবটা আমায় গিলিয়ে মাতাল করে দিয়ে চলে যাবে, উঁহু সেটি হবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা আর একটু নিচ্ছি।' দুজনে খানিকটা খানিকটা করে গেলাসে ঢেলে নিয়ে গলায় ঢালল। এবার তারা নির্জলা হুইস্কি খেল।

'দাও এখন আমার কাছে দাও।' বলতে বলতে রামানন্দ ছোঁ মেরে বোতলটা নিজের কাছে নিয়ে গেল। গেলাসটা টেনে নিল। তারপর গপগপ করে প্রায় সবটাই ঢেলে ফেলল।

'আমরা কিন্তু আর একটু করে প্রসাদ চাই স্যার।' দুটি ছেলের চোখই তখন চমৎকার লাল।

'নেবে নেবে, আমার সেবাটা তো পুরো পুরি হোক।' রামানন্দ তাদের মুখের দিকে তাকাল না।

'না স্যার, আপনি খান।' বিনয়ে গদগদ হয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, 'আপনার ফুল স্যাটিসফ্যাকশন হয়ে গিয়ে তারপর যদি এক আধটু তলায় লেগে থাকে—'

'সে দেখা যাবে, সিগারেট দাও।'

'মনে হয় বাড়িতে মেয়েছেলে আছে' প্রথম ছেলেটি বিড়বিড় করে উঠল। রামানন্দ শুনল। ঢুলুঢুলু চোখ ক… সিগারেট ধরাচ্ছিল, কথাটা শুনেই সে চো… দুটো আবার গোল করে ফেলল।
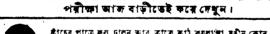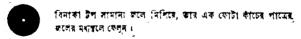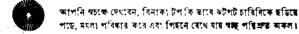
'আছে বইকি। গেরস্থবাড়ি, মেয়েছেলে থাকবে না!'

'খেঁকখেঁক করছে, তবু গলাটা ভারি মিষ্টি।'

'হুঁ মিষ্টি!' এক নম্বর ছেলেটির দিকে চোখ তুলে রামানন্দ ভেংচি কাটল। 'ওদিকে এত কান দেবার দরকারটা কি শুনি?'

'না, ওদিকে আমরা কান দেব না।' যেন কানমলা খাওয়ার ভঙ্গিতে দু নম্বর ছেলেটি বিনয়ে ঘাড় কাত করল।

রান্নাঘরে মাধুরী সত্যি খুব চেঁচাচ্ছিল। 'এই মাত্তর পায়ে ধরে দুটো টাকা চেয়ে নিয়ে গেল। এখনি আবার কোথা থেকে দুই সাকরেদ জুটিয়ে বাড়িতে মদের আসর জমিয়েছে। সে আসুক, বুঝলি মনভাজ, অপারেশন করিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরুক, আমি সব কথা বলব, বলে কিনা বন্ধু, কোথাকার হাড়-হাভাতে বাউন্ডুলে, মেরে না তাড়ালে এখান থেকে কিছুতেই নড়বে না...'

'আজ যেন তুমি একটু বেশি চটে গেছ মাধুরী। আমাকে মেরে তাড়াবার কথা তোমার মুখে এই প্রথম শুনছি।' রামানন্দ মনে মনে বলল, 'তোমার ধারের দু' টাকা কাল সকালেই আমি ফিরিয়ে দেব। টাকাটা আমি খরচ করিনি, খরচ করতে হয়নি।'

'মুরগির মাংস রান্না হচ্ছে স্যার।' এক নম্বর হঠাৎ বাতাসে গন্ধ শোঁকার মতন নাকের চেহারা করল। 'ভারি মিষ্টি গন্ধ।'

'আচ্ছা মানুষ তো! মুরগি রান্না হোক বা হাঁস রান্না হোক, তাতে তোমার কি, তুমি ওদিকে এত মন দিচ্ছ কেন আমায় বলতে পার?' রামানন্দ দাঁত খিঁচলো। 'আমি আবার বলছি তোমার ফ্রেন্ডকে সাবধান করে দাও হে।' রামানন্দ দু নম্বরের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'না স্যার, ওদিকে আমরা মন দেব না। ওদিকে আমাদের মন দেবার কান দেবার কিছু দরকারই পড়ে না। অসিত!' বন্ধুকে সাবধান করে দিতে দু' নম্বর এক নম্বরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের ইশারা করল।

'মিষ্টি গন্ধ, তাই বলছিলাম।' এক নম্বর আস্তে বলল, 'মাংসের এমন চমৎকার ঘ্রাণ আমি আর কোথাও পাইনি।'

'মিষ্টি মাংস মিষ্টি গলা!' চেহারা এবং গলার স্বর বিকৃত করে তুলল রামানন্দ। 'একটু সোডা না, একটু খাবার-দাবার সঙ্গে আনবে তা-ও না, এক বোতল হুইস্কি দিয়ে উনি আমার মন ভোলাচ্ছেন। খবরদার, আমার ফ্রেন্ডের ওয়াইফ সম্পর্কে, হুঁ, কি ওর রান্না—কি ওর গলার স্বর নিয়ে কোনোরকম রিসার্চ এখানে চলবে না!' ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে রামানন্দ মাথাটা কেমন করে যেন দুলিয়ে দুলিয়ে অসিত নামের ছেলেটিকে দেখল। অসিত আর কথা বলছে না। বোতলটা শেষ করে রামানন্দ এক দিকে ছুঁড়ে দিতে গড়াতে গড়াতে সেটা গিয়ে ছেঁড়া ফাইবারের সুটকেস্‌টার গায়ে ঠেকেছে।

'ঠিক আছে স্যার।' দু নম্বর ছেলেটি মিহি নরম গলায় বলল, 'কাল আবার একটা হুইস্কি আপনার জন্যে নিয়ে আসব, সঙ্গে সোডা ও খাবার নিয়ে আসব।'

'ভা-ল খাবার আনবে।' রামানন্দর জিভ জড়িয়ে আসছিল। 'টিফিন ক্যারিয়ারে করে ব্রেস্ট কাটলেট, ফাউলকারী, ফিস্‌-ফ্রাই—স-ব নিয়ে আসবে। বাড়ির রান্না চাই। বুঝলে। হোটেল-রেস্তোরাঁর মাল চলবে না।'

'না, তা আনব না।' ছেলেটি মাথা ঝাঁকাল। 'বাড়ির রান্না করা খাবারই আনব।'

'আর শোন!' পা দুটি ছড়িয়ে বসল রামানন্দ, যেন আলস্য এসেছে, পিঠটা বেঁকে গেছে। 'তোমার নাম কি?'

'রণেন।'

'হুঁ, রণেন, শোনো—তোমার জানা-শোনা মেয়েটেয়ে আছে? উঁহু, তোমার প্রেমিকা না বান্ধবী—কেউ না, এমনি মেয়েছেলে, মানে ব্যবহার করা যায়?'

'আছে স্যার।' অসিত নামের ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'শাট আপ।' রামানন্দর আধবোজা চোখ বড় হয়ে গেল। 'তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে না—রণেন!' রামানন্দ দু' নম্বরের দিকে চোখ রাখল।

'আছে স্যার, আপনার চাই?' রণেন ঝুঁকে বসল।

রামানন্দ আবার চোখ বুজল। একটু পরে চোখ খুলল।

'আপনার চাই স্যার?' রণেন আর একটু ঝুঁকে বসল।

'এখনও অবশ্য কিছু ঠিক করতে পারছি না, কাল—কাল বলব, তুমি তো আসছ?'

'নিশ্চয়, হুইস্কি, সোডা এবং বাড়ির রান্না করা খাবার নিয়ে আসব।'

'হুঁ,' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। 'সিগারেট দাও।'

রণেন চটপট হাতের প্যাকেট থেকে সিগারেট খুলে রামানন্দর হাতে না, সরাসরি মুখে গুঁজে দিল এবং লাইটার জেলে ধরিয়েও দিল।

'গুড্‌।' খুশি গলায় রামানন্দ বলল, 'বুঝেছ, কাল, কালকে এমন সময় আমরা ডিসাইড করব মেয়েটির কাছে যাওয়া হবে কি হবে না।'

'সেই ভাল হবে।' রণেন সোজা হয়ে বসল।

'অবশ্য আজ রাত্রেই আমি জিনিসটা চিন্তা করে দেখব—যদি দরকার মনে করি, কাল এখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়ব, বেলেঘাটার রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে—'

'তাই ভাল হবে স্যার, চমৎকার হবে।'
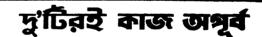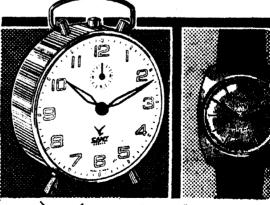
'আমি এমন ছিলাম না, মেয়েছেলের চিন্তা একদম আমার মাথায় ছিল না।'

ন্দ জোরে জোরে সিগারেট টানল। য় মুখটা ঢেকে গেল। 'বুঝেছ রণেন, শালা আলুর আড়তদার এই বদখেয়াল র মগজে ঢুকিয়েছে. হাড়কাটায় ওর তার ঘরে আমায় নিয়ে যেতে চাইছিল।'

'তারপর?'

'যায়নি. ছোটলোক কথা রাখেনি, এক খেনো খাইয়ে বৈঠকখানার দোকান থেকে আমায় রাস্তায় নামিয়ে দিলে। ঘুষি. মেরে—'

'ঠিক আছে স্যার, আপনাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাব।'

'ঘুষি মেরে শুয়োরটার নাক ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে কর'ছল আমার, বুঝেছ রণেন—'

'যাক গে, ওসব হাড়কাটা-ফারকাটা যাওয়া আপনার মতন শিল্পীর এমনিও শোভা পেত না, ছোটলোকদের ভিড়, খুব সুন্দর জায়গায় আপনাকে আমি নিয়ে যাব, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর দারুণ অ্যাট্রাকটিভ সেই মহিলা, যেমন আলাপ-ব্যবহার তেমনি।'

'মহিলা!' রামানন্দ গুজগুজ করে হাসল 'আমি তো ভাবলাম খুব কাঁচা কচি মেয়ে টেয়ের সঙ্গে তোমার জানাশোনা।'

অল্প হেসে রণেন মাথা ঝাঁকাল। 'ডাঁশা মেয়েই ভাল, একটু বয়েস হলেই রমণীর দেহের আস্বাদ বাড়ে, মনের দিক থেকেও চাপচাপটা একটু বেশি দেয়।

'সুন্দর কথা, খুব ভাল বলেছ, শুনেছি বাৎসায়নের কামসূত্রেও এমন একটা ইঙ্গিত রয়েছে।'
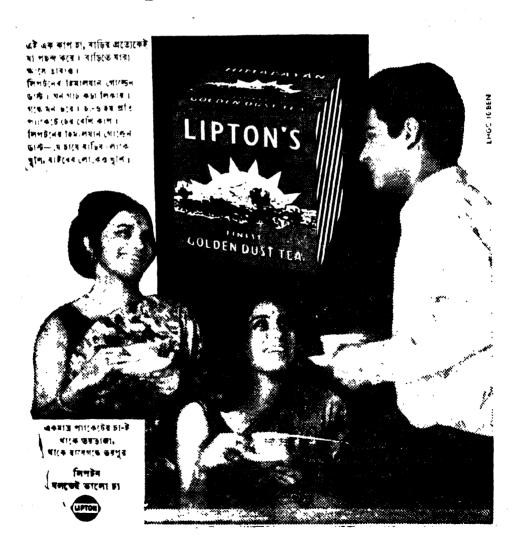
'তা হবে স্যার, আমি বাৎসায়ন পড়িনি, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—' চোখ টেরা করে রণেন তার বন্ধুকে দেখল, সেই যে ধমক খেয়ে অসিত চুপ, আর কথা বলছে না। রণেন আবার রামানন্দর দিকে তাকাল। 'কলমটা একবার হাতে নিয়ে দেখুন—খাঁটি বিলিতি জিনিস।'

'তাই নাকি।' খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও রামানন্দ পেনটা হাতে তুলে নিল। 'হুঁ, দেখতে খুব ফ্যান্সি।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে।

'লেখাও চমৎকার আসে—কালি ভরা আছে—একটু আঁক কেটে দেখুন।'

'আমার ঘরে এক টুকরো সাদা কাগজ নেই তো—' রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'কাগজ কলমের পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি।'

'আমার কাছে আছে—এই নিন।' ফস্ করে পকেট থেকে একটা সুদৃশ্য ছোট বাঁধান খাতা বের করে রণেন রামানন্দর সামনে মেলে ধরল। 'এখানে আঁক কাটুন।'

তৎক্ষণাৎ ছেলেটির চোখের দিকে তাকাল রামানন্দ, একটা চাপা দুষ্টামির হাসি সে সেখানে আবিষ্কার করল।

'বুঝেছি, বুঝেছি', কলমটা ধরে রেখে গম্ভীর হয়ে রামানন্দ থুতনি নাড়ল। 'এক্ষুনি বলবে, একটা অটোগ্রাফ দিন স্যার—তাই ঘটা করে কলম উপহার, এই তো?'

'আপনি সব বোঝেন, তা না হলে এতবড় শিল্পী!' রণেন মিষ্টি করে হাসল। 'কিন্তু রামানন্দ সেনের শুধু অটোগ্রাফ নিয়েই মন ভরবে না, একটা ছোট্ট কবিতা, দু লাইন চার লাইন, যা আপনার মনে আসে, লিখে দিন।'

প্রচণ্ড শব্দ করে রামানন্দ হাসল। এত জোরে হাসল যেন রামাদের মাথার চেঁচামেচিটা হঠাৎ থেমে গেল। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছিল। ঘরের চালের ওপর গাছের পাতার সরসর শব্দ শোনা গেল। নেশাচ্ছন্ন শিথিল দেহটা মাদুরের ওপর প্রায় আধখানা ছড়িয়ে দিয়ে ঢুলঢুলু চোখ নিয়ে কি যেন একটু ভাবল, তারপর রণেনের দিকে তাকাল।

আচ্ছা দাও, তুমি যখন বলছ, তোমার মতন ভক্তকে একটু তুষ্ট করা যাক', হাত বাড়িয়ে সে খাতাটা নিল। 'কিন্তু খবরদার আর কোনোদিন কবিতার জন্য আবদার করবে না—বহুকাল আমি এই নোংরা ব[illegible] ছেড়ে দিয়েছি।'

'আর কোনোদিন চাইব না।' রণেন কি[illegible] ভেঙে পড়ল।

মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রামানন্দ লিখল :

> গোধূলি বেলায় গাছের তলায়
> রমণী এক
> সুন্দর কিশোর নিয়ে
> খেলা করে, খেলা করে—
> রমণীর চোখে অরণ্য আদিম
> কিশোরের চোখে লোভী সূর্য,
> খেলা করে, দুটিতে খেলা করে—
> রক্ত নিয়ে খেলা?
> অন্ধকার বিদ্ধ করার দুরন্ত
> উল্লাসে সূর্য
> ধক্ ধক্ জ্বলে, দানবী মানবী
> সিংহ-শিশু নাচাবার মতন
> চপল নধর কিশোর নিয়ে
> খেলা করে—

লেখা হয়ে গেলে হাত থেকে কলম খাতা ফেলে দিয়ে গভীর আলস্য নিয়ে রামানন্দ মাদুরের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় চোরের মতন নিঃশব্দে খাতাটা তুলে নিয়ে ছেলে দুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের মুখে রাজ্য জয়ের আনন্দ। ঝিঁঝি ডাকছিল। গাছের পাতার সরসর শব্দ হচ্ছিল। যথেষ্ট তেল না থাকার দরুন কেরাসিনের ডিবিটা একবার দপদপ করে জ্বলে উঠে নিবে গেল।

নেশার ঘোরের মধ্যেও এক সময় রামানন্দ টের পেল মনতাজকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে আলো নিবিয়ে মাধুরী যেন শুয়ে পড়েছে। এমন আর কোনোদিন হয়নি। তাকে খেতে ডাকা হল না।

ঠিক বলা যায় না, রামানন্দর মনে হল, নেশা না করলে তার দু চোখ একটা চাপা অভিমান নিয়ে আজ হয়তো ছলছল করত। কিন্তু এখন একটা বাঁকা হাসি ঠোঁটে নিয়ে শোয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে সে উঠে বসল। হাতড়ে হাতড়ে মেঝে থেকে একটা পোড়া সিগারেট তুলে নিয়ে মুখে গুঁজলে। তারপর দেশলাই খুঁজতে লাগল।

(ক্রমশ)

মুকুর
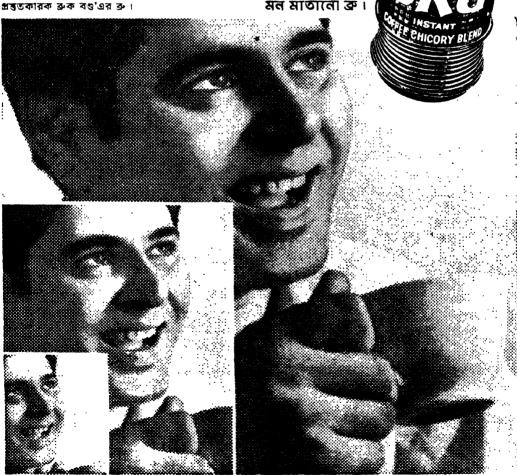
মুকুরের জন্ম কবে কোথায় আমরা জানি না। মহেন-জো-দারো বা হরপ্পার খননে, ঐতিহ্যের অবশিষ্ট যেদিন হঠাৎ মিলে গেল, তার মধ্যে ছিল চকচকে জেল্লা-র মৃৎশিল্পের নিদর্শন। গলার মালার নানা অলংকার কাচ পরানো (glazed) পাওয়া গিয়েছিল সেটাই প্রথম কাচের নিদর্শন বলে ধরা হয়। মিশরেও প্রায় ঐ সময়ের পাথর এবং মৃৎশিল্পের glazed জিনিস পাওয়া গেছে। কাচের কথা হয়তো তারা ভবেনি, ভেবেছিল মৃৎশিল্পের অলংকার কথা। তারও আগে প্রকৃতিদত্ত কাচের জন্ম হতো এখানে সেখানে। বিজলী চমকের আগুনে জ্বলে জন্মাতো কাচের কণিকা। ৭,০০০ বছর আগের এমন একটি কাচের টুকরোও পাওয়া গেছে। রং তার নীলকান্তমণির মত গাঢ়।

মানুষ হাতে করে কাচ যেদিন তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল সেদিন বালি, সোডা এবং চুন ছিল সম্বল। বৈজ্ঞানিক শত আবিষ্কারের পরও কাচের উপাদানের সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। পালিশ করা বা পরিষ্কার করার জন্য যা কিছু অন্য জিনিস ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু মুকুর হিসাবে কাচের ব্যবহার অল্পদিনের কথা। গ্রীক ও রোমান সুন্দরী ধাতুর আরসি ব্যবহার করতেন। আমাদের মানিনী মহিলার মুকুরও ধাতুরই হতো। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাচের কদর বাড়লো যেদিন কাচ রূপসীর রূপসজ্জার সাথী হিসাবে তার প্রসাধনাগারে প্রবেশ করেছিল। মুকুর নিয়ে সেদিন থেকে কত কথা, কত গল্প, কত-না রোমাঞ্চ-কর যাদুর জন্ম। মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে আয়না ভাঙ্গা ছিল মস্ত অলক্ষণ। সম্ভবত আয়নার দাম এত ছিল যে তাকে যত্ন করে রাখার জন্য নানা গল্পের অবতারণা হতো।

ভেনিসের শিল্পী প্রথম কাচের আয়না তৈরি করেন। বর্ণহীন কাচের এক দিকে ধাতুপাত বা পারদের প্রলেপ দিয়ে প্রতিবিম্ব ধরে দিতে সক্ষম হবার উপলব্ধির শুরু সেখানে। প্রতীক্ষিত প্রতিমূর্তি ঝলমল করে উঠলো কারিগরের হাতে। শিল্পী সাবধান হয়ে গেলেন। এমন যে আবিষ্কার তাকে ধরে রাখতে হবে। অন্য কারও কাছে যেন প্রকট না হয় তার প্রচেষ্টায় ভেনিস তার শিল্পীকে পাঠিয়ে দিলেন ছোট্ট এক দ্বীপে। নাম তার মুরানো। বিদেশী এসে কোন খবর সংগ্রহ না করেন সেদিকে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মুরানোর মুকুর শিল্পী যদি কেউ বাইরে বিন্দুমাত্র কিছু প্রকাশ করতেন তবে তার দণ্ড হতো সাংঘাতিক। মৃত্যুদণ্ডেও

দ্বিধা ছিল না। শিল্পী যদি বিদেশে গিয়ে বাঁচতেন, দণ্ড পেতেন আত্মীয়স্বজন। অবশ্য এর ক্ষতিপূরক দিকও ছিল। মুকুর শিল্প পেয়েছিল সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান। মূল্যবান গহনার চেয়ে মুকুরের মান বেশী ছিল, আর ছিল শিল্পীর মর্যাদা। যে কোন অভিজাত-কুলে আদর করে নিয়ে যেত মুকুর শিল্পীর কন্যাকে বধূরূপে। আভিজাত্য তাতে বাড়তো বই কমতো না।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভেনিস-বাসী সামলে রেখেছিল মুকুরমহিমা। তার-পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী সরকার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। তথ্য সংগ্রহ করতেই হবে। রাজদূতের উপর ভার পড়লো ছলে-বলে কৌশলে যেভাবে হক কাচের আয়নার গুপ্ত খবর চাই। তাঁর কূটনীতির কুশলী পরিচালনার পরম পরীক্ষা হবে। অন্যথায় তাঁর ভবিষ্যতের ভরসা মুছে যাবে ব্যর্থতার কালিমায়। বিদেশ মন্ত্রীর আদেশ। অমান্য করাও কঠিন, আবার যত্নে লুকিয়ে রাখা তথ্য সংগ্রহ করাও সামান্য কথা নয়। শেষ পর্যন্ত রাজদূত কূটনীতির চালে জয়ী হলেন। ভেনিসের গুটিকতক শিল্পী সরে এলেন ফ্রান্সে। বর্ণহীন কাচ আর ঝলমলে আয়নার গোপন খবরটি পৌঁছে গেল ইউ-রোপের অন্যান্য দেশে। সুন্দরীদের আর আনন্দের সীমা রইল না।

আজ আয়নার ব্যবহার মাত্র প্রসাধনের সহায় হিসাবে নয়। আয়না দিয়ে গৃহ-সজ্জা থেকে টেলিস্কোপ পর্যন্ত হয়। নিজের প্রতিবিম্ব ধরে দিত যে আয়না তার ব্যাপক ব্যবহারের হিসাব অসীম। ঘর সাজানোর কাজে আয়নার আধুনিকতম ভূমিকা। ছোট্ট সরু ঘরখানা আয়নায় সাজিয়ে দিন সুন্দর করে। মনে হবে যেন কত প্রশস্ত সে ঘর। চার দেওয়ালের সীমারেখা ছাড়িয়ে যাবে আপনার অনুভূতি। আয়নায় প্রতি-ফলিত আলোক শীষমহল যেমন ঝলমল করে আপনার অপেক্ষাকৃত অন্ধকার গৃহ-কোণটিও আয়নার বাহারে হেসে উঠতে পারে। আয়নার সামনে রাখা একটি আলো বিনা খরচায় অনায়াসে সেজে উঠবে দুটি হয়ে। ঘুচিয়ে দেবে অন্ধকার আনবে নূতন নেশা। দিনের বেলাতেও কায়দা করে আয়না রাখলে ঘরে অল্প আলোকিত অংশ উজ্জ্বল দেখাবে। বাইরের মুক্ত আকাশ আর ফুলের স্তবক আয়নায় ধরে রাখতে পারেন। যেখানে আপনার দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে সেখানে এমন করে ধরে রাখা রূপ আপনাকে আনন্দ দেবে। ছোট্ট একটি স্নানাগার আপনার। যদি আয়না দিয়ে এদিক ওদিকে সম্পূর্ণ করতে পারেন তবে মনে হবে যে কোন মহলের হামাম একটি!

হয়তো নিছক গল্প বই নয়

আকবর বাদশার সভা আলো করা ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বীরবল ছিলেন উদ্ভাবনী শক্তি আর রসিকতায় অদ্বিতীয়। বাদশা নাকি তাঁকে বলেছিলেন মহাভারত ফারসীতে অনুবাদ করতে। বীরবল রাজানুগ্রহ লাভের ভাবনায় অনুবাদের কথাটি কিছুদিন চালু রাখলেন। কাজ অগ্রসর হচ্ছে আস্তে আস্তে এই ভাব। এদিকে বাদশা দেরি দেখে বিচলিত হচ্ছেন। অবশেষে বীরবল বললেন, তিনি লিখছেন নূতন মহাভারত। কিন্তু দ্রৌপদীর পঞ্চ-পতিতে এসে পড়েছেন বিপদে। এখন বাদশা বলুন সম্রাজ্ঞীর পঞ্চপতি তাঁর অপছন্দ হবে না তো? সভাসদদের কাকে কাকে তিনি সম্রাজ্ঞীর পতিত্বে বরণ করবেন?

শোনা যায় এরপর আর মহাভারত নিয়ে বাদশা মাথা ঘামান নি। তবে বীরবল সম্বন্ধে এমন অনেক গল্প প্রচলিত আছে। অনেকটাই তার হয়তো নিছক কল্পনা।

টুকিটাকি

সম্রাট অশোকের সময় থেকে নাকি ভারতবর্ষে নিরামিষ আহারের প্রচলন বেড়েছিল। কলিঙ্গ জয়ের সর্বনাশা রূপ দেখে সম্রাট হিংসার গতিরোধ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। সম্প্রতি এক ব্যাপক সমীক্ষায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন দেখেছেন নিরামিষ ভোজন ক্রমশ কমে আসছে। সর্বভারতীয় হিসাবে নাকি শতকরা ৩০ জন নিরামিষ ভোজী।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং উৎকলে শত-করা জনা পাঁচেকের বেশী নিরামিষ খান না। মহীশূরে আটজন, মহারাষ্ট্রে ৩৬। গুজরাতে নিরামিষ আহার বেশী প্রচলিত,

সংখ্যা শতকরা ৫৯। রাজস্থানে আরও বেশী, শতকরা ৬২।

মটর, সীম নানা ধরনের ডাল এবং সয়াবীন নিরামিষ আহারে প্রোটিনের অভাব দূর করে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে সামাজিক বাধা না থাকা সত্ত্বেও শখ করে নিরামিষ খান এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বার্নার্ড শ' নিরামিষ খেতেন। বিশ্বাস করতেন, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য নিরামিষ আহার প্রশস্ত। তাঁর দেখাদেখি সে সময় অনেক ইউরোপবাসী নিরামিষ খেতে আরম্ভ করেন।

নিরামিষ যাঁরা খান তাঁদের পক্ষে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খাওয়া দরকার বলে অনেকেই মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসায় মাছ মাংস বাদ দেবার কথা অনেক বিশেষজ্ঞ বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন। নানাবিধ চর্মরোগেও মাছ মাংস বর্জন করার বিধি আছে। কাজেই ভারতের নিরামিষ আহারের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও হয়তো ছিল।

শ্রীমতী

গদিবেড়ো

॥ ২০ ॥

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছেন রাজপুত্র। গায়ে তার ঝকমকে পোশাক, মাথায় পালক-বসানো পাগড়ি, কোমরে ধারালো তলোয়ার, তরুণ উদ্দীপ্ত চেহারা। পক্ষীরাজে সওয়ার তেজী শঙ্খের মতো সাদা সেই ঘোড়া দুই ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে। নীচে ছবির মতো কত নদনদী, গ্রাম, প্রান্তর। পক্ষীরাজের কিন্তু ক্লান্তি নেই। তীক্ষ্ণ চোখ চারদিকে চেয়ে দেখছেন রাজপুত্র— কোথায় সেই ঘুমন্ত পুরী। অনেক অনেক দূর পারে, দিগন্তসীমার কাছে, সবুজ পাহাড়ের কোলে নীল এক হ্রদ দেখা গেল। তার তীরে রাজধানী; বাড়িঘরের ছায়া, পাশের পাহাড়ের ছায়া পড়েছে সেই হ্রদের কাকচক্ষু জলে। একটু উঁচুতে, পাহাড়ের গায়ে, ধবধবে শ্বেতপাথরের বিশাল রাজপ্রাসাদ। কিন্তু পথঘাট জনহীন, সরোবরে কেউ স্নান করছে না, জীবনের কোন চিহ্ন নেই কোন দিকে। রাজপুত্র ঠিকানা লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছেন। রাজপুরীর বিরাট ফটকের সামনে নেমে এল পক্ষীরাজ। তলোয়ার কোষমুক্ত করে নির্ভয়ে চারদিকে চাইলেন রাজপুত্র। তারপর, খোলা দরজা পার হয়ে রাজপুরীর ভিতরে চলে গেলেন।

গল্পটা এখানেই থামাই। কেননা, এ রূপকথার বাকি অংশটুকু আমার মতোই সকলের ছেলেবেলা থেকেই জানা। কিন্তু সে কাহিনী শুনতে শুনতে শৈশবের সরল কল্পনায় যেসব উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠত চোখের সামনে, তা হয়ত সকলের কাছে হুবহু একই রকম নয়। আর যে যাই দেখুক, আমি কিন্তু রাজপুত্রকে দেখেছি এক নীল হ্রদ পার হয়ে পাহাড়ের গায়ের সেই বিরাট প্রাসাদের চত্বরে গিয়ে নামতে। আমি স্পষ্ট দেখেছি হ্রদের সেই স্বচ্ছ জলে ডানামেলা পক্ষীরাজের সাদা ছায়া পড়েছিল। শাণিত কৃপাণ হাতে রাজপুত্র যখন তোরণ পার হয়ে প্রাসাদের ভিতরে দূর থেকে দূরে চলে গেলেন তখন তেজী ঘাড়টা বাঁকিয়ে পক্ষীরাজ তার সামনের পা দুটো পাথরবাঁধানো উঠোনের উপর ঠুকছিল, ফেনা ঝরে পড়ছিল তার মুখ থেকে, ইস্পাতের স্তরের মতো পেশী-গুলো ঘামে ভিজে চিকচিক করছিল। আমি একটুও ভুল দেখিনি; এ সব একেবারে স্পষ্ট দেখেছি। আর এক শিশু, রূপকথার আর এক শ্রোতা, হয়ত এ সব ছবি ভিন্নভাবে দেখে থাকবে। তার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। আমার শৈশব-স্মৃতিতে সেই সবুজ পাহাড় আর সেই নীল হ্রদের দৃশ্য এখনো এতই উজ্জ্বল যে চার-পাঁচ দশক পরে বাস্তবে তার হঠাৎ দেখা পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। রূপকথার রঙীন কল্পনা যে এতদিন বাদে এভাবে সামনে এসে দাঁড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

*

পুরুলিয়া থেকে রঘুনাথপুর, শালতোড়া, বড়জোড়া হয়ে দুর্গাপুরে আসছিলাম মোটরে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরব। সকাল ও দুপুরটা কেটেছে পুরুলিয়া জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে। রঘুনাথ-পুরে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা

আয়না-হ্রদ ও নীল পাহাড় : গদিবেড়ো

পড়ে আসছে। প্রায় নব্বই মাইল দূরের দুর্গাপুরে ঠিক সময়ে হাজির হতে হলে বেশ জোরেই গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে। আর কোথাও থামবার সময় নেই। গাড়ি জোরেই ছুটল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই মন ফেলে আসতে লাগলাম পথ ও পথের প্রান্তে। এমন ঢেউখেলানো পথ আর কোথায় পাবেন! এক তরঙ্গের শীর্ষ থেকে দেখা যায় মসৃণ কালো পিচের ফিতে হু হু করে নীচে নেমে গেছে। আবার পরক্ষণেই উঠে এসেছে আর এক তরঙ্গের শীর্ষে। সেই অস্থায়ী চূড়া থেকে আবার নেমেছে নীচে, আবার উঠেছে উপরে। এই চলার দোলা মাইলের পর মাইল। আর দু পাশের শাল-পলাশ-মহুয়ার বন? এমনটি বুঝি আর দেখবেন না কোথাও! দীর্ঘ পথের দুধারে, আপনার পাশে পাশে, তরঙ্গায়িত বনভূমির নিকটে দূরে তারা আপনার সহযাত্রী। এ-পথে ভ্রমণের সময়টা যদি প্রথম বসন্তে ফেলতে পারেন, তা হলে দেখবেন ননীর মতো নরম টোপাটোপা সাদা ফুলে মহুয়া গাছের তলা ছেয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে কিছু পলাশের নেশা ও কিছু চাঁপা-সবুজে মেশানো শালপাতার আশ্চর্য সতেজ রঙে চোখ জুড়িয়ে যাবে আপনার।

মুগ্ধ চোখ সেই দিকে রেখেই গাড়ির জানালায় বসে ছিলাম। নিবিড় নীল আকাশ; পড়ন্ত সূর্যালোকে আলোকিত প্রান্তর। ছবির পর ছবি আসছে, সামনে থাকছে কিছুক্ষণ, তারপর সরে যাচ্ছে পিছনের দিকে। রঘুনাথপুর থেকে মাইল ছয়েক আসবার পর সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা একেবারে চোখের উপরই ঘটল। রাস্তার বাঁ দিকে, কিছু দূরে, শৈশব-কল্পনার সেই সবুজ পাহাড় আর নীল হ্রদ সহসা যেন ইন্দ্রজালের মতো ভেসে এল মহাশূন্য থেকে। চমকে উঠলাম—এই তো সেই তরঙ্গিত-চূড়া পাহাড়, ওই তো সেই আয়নার মতো স্বচ্ছ সরোবর। শুধু রাজ-প্রাসাদটা এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে, নিশ্চয়ই আছে কোথাও, হ্রদের ধারে যে সব বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। দিনশেষের সোনালী আলোয়, নির্মল আকাশের নীচে, সমস্ত দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ স্বপ্নের মতো ঝলমল করতে লাগল আমার চোখের সামনে। গাড়ি থামিয়ে, কিছুক্ষণ সেই বাস্তবায়িত কল্পনার দিকে তাকিয়ে রইলাম মুগ্ধ বিস্ময়ে। ঘুমন্ত রাজপুরীর পরিবেশের যে পরিষ্কার ছবিটা আমার শৈশবস্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে তার থেকে কোনই তফাত নেই। এই ছবিটাই মনের গোপনে লুকিয়ে ছিল এত দিন—

গাঁদবেড়ো গ্রামের পথের দৃশ্য

বাইরে কোথাও তার দেখা পাইনি।

ড্রাইভার এদিকে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। দুর্গাপুরে ট্রেন ধরতে হবে তাকে। তার সময় নেই। সে জানে না, প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছনে ফেলে-আসা এক সুমধুর স্মৃতির স্বাদ এখন আস্বাদ নিচ্ছিলাম পুরনো মদের মতো। কোন্ গ্রাম, কি তার নাম, কারা সেখানে থাকে, কিছুই খোঁজ নেওয়া হল না। দুর্গাপুরে যথাসময়ে পৌঁছে কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু হঠাৎ-দেখা সেই উজ্জ্বল ছবিটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রইল অল্প জ্বরের মতো।

*

মাসখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে গেলাম সে পথে। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ছাড়িয়ে, পশ্চিমমুখী রাস্তায় কয়েক মাইল গেলে, রাস্তার পাশে পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি থানার বাড়ি। দারোগাবাবুকে জায়গাটির একটা বর্ণনা দিতে তিনি বললেন, বুঝেছি, গাঁদবেড়ো গ্রামের কথা বলছেন। রঘুনাথপুরের দিকে সাত-আট মাইল গেলে, ডানহাতি এক পাহাড়ের কোলে সে গ্রাম পাবেন। পিচের সড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় আরও মাইলটাক। কিন্তু সেখানে কি দেখবেন? ওটা তো মাদ্রাজীদের গ্রাম।

মাদ্রাজীদের গ্রাম? বিস্ময়ের ওপর এ যেন আর এক বিস্ময়। 'গাঁদবেড়ো' এই অপরিচিত নামটা শুনে আমার রূপকথার রাজকন্যার ভাবকল্পনাটা ইতিপূর্বেই বেশ আহত হয়েছিল। মাদ্রাজীদের গ্রাম শুনে যেন পায়ের তলার মাটি সরে যেতে লাগল। দারোগাবাবু বললেন, বাঙালীও আছে, তারাই সংখ্যায় বেশী, তবে গ্রামের নেতৃত্ব মাদ্রাজীদের হাতে। তাঁরা ব্রাহ্মণ। গ্রামের অধিকাংশ লোক তাঁদেরই শিষ্য, জমিজমার মালিকানাও বেশীর ভাগ তাঁদের হাতে। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সীমান্তে অবস্থিত এই দূর পল্লীতে দ্রাবিড়সন্তানেরা কিভাবে, কতদিন আগে এসে বসতি করেছেন দারোগাবাবু তা জানেন না, তবে এখানে তাঁদের বাস যে কয়েক পুরুষের তাতে সন্দেহ নেই। মনে আছে 'হাইলি ইন্টারেস্টিং' বলে ঘুঁষি মেরেছিলাম দারোগাবাবুর টেবিলে। তারপরে, কাল-বিলম্ব না করে গাঁদবেড়োয় ঢুকবার মুখে সেই হ্রদের তীরে এসে পৌঁছেছিলাম। না, এখনো কিছু রূপকথার আমেজ আছে দূরের পাহাড়ে আর সামনের হ্রদে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্তে তামিলভাষীদের কয়েক পুরুষের এই উপনিবেশের আকর্ষণও কিছু কম নয়। শৈশবকল্পনার রঙিন ফুলের মালাটা থেকে ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় ছিন্ন পাপড়ি ছড়াতে ছড়াতেই তো রুক্ষ দুনিয়ার পথপরিক্রমা করছি আর দশজনের মতো। কিন্তু তাতে কি খুব নিঃস্ব হয়ে গেছি? ছেলেবেলার হাফ-প্যাণ্ট এখন পরি না বলে কি দুঃখ বোধ করা সাজে? প্রতি বছর পাতা ঝরে যায় বলে গাছের কি খুব ক্ষতি হয়? বেঁচে থাকি নতুন চিন্তা-ভাবনাকে অবলম্বন করে, নতুন মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে। এরই নাম জীবন—পুরনো, শুকনো পাপড়ি ফেলে আসার সাথে সাথে নবীন, সতেজ পাপড়ি কুড়নো।

একটু খোঁজ করে, রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় যখন এসে বসলাম (পথে শ্বেতপাথরের বিরাট রাজ-প্রাসাদ কোথাও দেখিনি) তখন এ সব চিন্তাই মাথায় ঘুরছিল। মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ু) তিনেভেলী জেলায় আদি নিবাস হলেও পরিষ্কার বাংলা বলেন রাম-

রঘুনাথ মন্দির : গাঁদবেড়ো

পরিত্যক্ত জোড়া-বাংলা মন্দির : গদিবেড়ো

চন্দ্রবাবু। অনেক পুরুষ আগে, তিরুপতিতে তীর্থ করতে গিয়ে, তাঁর পূর্বপুরুষ গোপালাচারীর সঙ্গে দেখা হয় পঞ্চকোট-রাজের। রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত সন্ত এই আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণের পূত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে পঞ্চকোটরাজ তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। সাধন-ভজনের জন্য পাহাড়ের কোলে এই নিরিবিলি স্থানটি গুরু পছন্দ করেন। এখানেই তাঁর আশ্রম স্থাপিত হয়। কিছু মন্দিরাদিও তৈরি হয়। এক বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাশয়টির সৃষ্টি হয় কিছুদিন পরে। পাহাড়বেষ্টিত স্থান বলে নাম হয় 'বেড়ো'; রাজগুরুর গদির অবস্থানের জন্য 'গদিবেড়ো'। মৌজার নাম 'বেড়ো', থানা রঘুনাথপুর। আসানসোল-আদ্রা রেলপথের বেড়ো স্টেশনটি কাঁচা রাস্তায় দু মাইল দূরে অবস্থিত।

রামচন্দ্রবাবু বললেন, বর্তমান পুরুষে তাঁরা দু ভাই। তিনি ছোট। গ্রাম থেকে যজমানি ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা করেন। বড় ভাই শ্রীনিবাস আচার্য গোস্বামী এম এ বি এল। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসাবে তাঁর নাম লেখানো আছে বটে তবে গুরুগিরির জন্য তাঁকে প্রায়ই এখানে এসে থাকতে হয়। পঞ্চকোটরাজ বাঁকুড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলায় যে ১০৪টি মৌজা তাঁর গুরুকে প্রণামীস্বরূপ দিয়েছিলেন, সে বিশাল ভূসম্পত্তির এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তবে, এই সম্প্রসারণের সুযোগ পেয়ে তিনেভেলী জেলার আম্বাসমুদ্র থেকে রাজগুরু গোপালচারীর বহু আত্মীয় ও দীক্ষিত শিষ্য ক্রমে ক্রমে এখানে এসে বসতি করেন। গুরু পরিবার শুধু যজমানিই করেন না, গ্রামের নানাবিধ উন্নতির জন্যও তাঁরা দায়ী। স্থানীয় হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, আয়ুর্বেদীয় হাসপাতাল ও স্কুলটি তাঁদেরই কীর্তি।

গ্রামের বর্তমান লোকসংখ্যা ছহ হাজারের মতো। তার মধ্যে ষাটটি পরিবারভুক্ত প্রায় সাড়ে-তিন শ' জনের পূর্বপুরুষ মাদ্রাজী। স্থানীয় বাঙালীরা নানা বর্ণের—যথা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ (মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী প্রভৃতি); গন্ধবণিক (দাঁ, মল্লিক); সুবর্ণবণিক (পোদ্দার); তাঁতি (নাথ); কর্মকার, শরাফ ইত্যাদি। গোপালাচারীর যেসব দীক্ষিত শিষ্য এখানে এসেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই নাকি ছিলেন মৎস্যজীবী। তাঁরা কালক্রমে স্থানীয় বাঙালী কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহাদি করে প্রায় বাঙালী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গুরু-পরিবার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বিয়েসাদি এখনও হয় তিনেভেলী জেলায় তাঁদের নিজেদের সমাজে। বাইরে বাংলা বললেও বাড়িতে তাঁরা তামিলই বলে থাকেন।

পঞ্চকোটরাজের অর্থানুকুল্যে বাংলা-রীতির যে দুটি আটচালা ও একটি জোড়-বাংলা মন্দির একদা এখানে নির্মিত হয়েছিল তার কোনটিতেই প্রতিষ্ঠাফলক নেই কিন্তু অল্পবিস্তর টেরাকোটা অলংকরণ আছে। সেগুলির রচনাশৈলীর নজিরে দেখলায় তিনটির বয়স দুশ বছরের কাছাকাছি মনে হয়। অতএব এখানকার দ্রাবিড় উপনিবেশও মোটামুটি তদ্দিনের প্রাচীন। প্রধান মন্দিরটি আটচালা; বিগ্রহ কেশবজীউ (কৃষ্ণ) ও রাধিকা। দ্বিতীয়টিও ক্ষুদ্রতর আটচালা; বিগ্রহ রঘুনাথ। 'টেরাকোটা' অলংকরণ এ মন্দিরেই সবচেয়ে বেশী। তৃতীয়টি এক পরিত্যক্ত জোড়-বাংলা মন্দির; আগে তাতে কি বিগ্রহ ছিল কেউ বলতে পারেন না। আটচালা মন্দির পুরুলিয়া জেলায় আরও দু চারটি আছে কিন্তু এইটিই সম্ভবত সেখানকার একমাত্র জোড়-বাংলা মন্দির। আর একটি জোড়-বাংলা ইমারত অবশ্য দেখেছি ঝালদার কাছে; কিন্তু সেটি এক মুসলমানী কবরের উপর নির্মিত।

✻

গদিবেড়ো গ্রাম পরিক্রমা করে, পিছনের পাহাড় ও মন্দিরগুলির ছবি তুলে আমরা যখন রামচন্দ্র আচার্য গোস্বামী মহাশয়ের বৈঠকখানায় এসে বসলুম (তিনি অনুগ্রহ করে সব সময়ই সঙ্গে ছিলেন) তখন বেলা গড়িয়েছে। ছোট ছোট দু তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। তাদের পরনে মাদ্রাজী ধরনের কুর্তা ও ঘাগরা। নিজেদের মধ্যে তারা তামিলে কথা বলছে মনে হল। রামচন্দ্রবাবুকে বললুম—বাড়িতে আপনারা তো তামিলেই কথা বলেন; সে ভাষায় একটু কথা বলুন এই মেয়েদের সঙ্গে। তিনি কি যেন বললেন মেয়েদের। আর তারা ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল। অনতিকাল পরে এক গেলাস জল আর এক কাঁসি মালপুয়া এনে রাখল আমার সামনে। সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে করতে কোনই সংশয় রইল না, এঁরা এখনও উৎকৃষ্ট তামিল বলেন। যে তামিল মেয়েরা এমন সুখাদ্য সামনে এনে হাজির করতে পারে তার উচ্চ মানে সন্দেহ কি!

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

জটিল চোখের রোগ নিরাময়ে ট্রম্বে

সম্প্রতি ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিষয়ক [illegible] কুশলীরা এক ধরনের লেজার [illegible] তৈরি করেছেন। কারোর চোখের [illegible] অর্থাৎ অক্ষিপটে যদি কোন রকম ছিদ্র [illegible] চিড় ধরা পড়ে, এই যন্ত্র সেই ছিদ্র [illegible] চিড় খাওয়া জায়গাটি সহজে এবং কয়েক [illegible] মধ্যে জুড়ে দিতে পারবে। যন্ত্রটি [illegible] হালকা। ব্যবহার পদ্ধতিও যথেষ্ট [illegible]।

[illegible] মূল অংশের মধ্যে আছে খুদে [illegible] লেজার ইউনিট। ইউনিটটি [illegible] চিকিৎসা বিষয়ক এক ধরনের [illegible] জুড়ে দেওয়া হয়। ডাক্তারী [illegible] বলা হয় অপথ্যালমোস্কোপ। [illegible] বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের ইউনিট। [illegible] সংযোগ ঘটানর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] থেকে স্ফুলিঙ্গের মত আলোক [illegible] বেরিয়ে আসে। যার স্থিতিকাল [illegible] এক মিলিসেকেন্ড অর্থাৎ এক [illegible] এক হাজার ভাগের এক ভাগ [illegible] এবং সেই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য [illegible] অ্যাংস্ট্রম। রোগীবিশেষে স্ফুলিঙ্গের [illegible] পরিবর্তিত করা যেতে পারে। [illegible] লেজার চালাতে গেলে যেখানে [illegible] হাজার ভোল্ট তড়িৎ বিভবের [illegible] ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের [illegible] এই লেজারের জন্যে দরকার হবে [illegible] ৬০০ ভোল্ট। তুলনামূলক ভাবে [illegible] এটি বড় রকমের একটি সুবিধে। [illegible] এর স্ফুলিঙ্গের স্থিতিকাল স্বল্প-[illegible] চিকিৎসা করার সময় [illegible] অজ্ঞান করার দরকার হবে না। [illegible] যা কিছু, তা এত কম সময়ে [illegible] করে রোগী কোন রকম [illegible] কষ্ট পাওয়ার মত অবসরই পায় না।

ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করুন। আমাদের অক্ষিগোলকের বাইরের অংশ এক ধরনের আবরণীর সাহায্যে ঢাকা থাকে, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্ক্লেরোটিকা। এর রঙ সাদা। তুলনামূলক ভাবে পুরু, বাঁকান এবং সামনের এক-পঞ্চমাংশ ছাড়া সবটাই অস্বচ্ছ। স্ক্লেরোটিকার নিচে আছে আর এক ধরনের পর্দা। নাম করয়েড। অক্ষি-গোলকের ভেতরে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে করয়েড বিস্তৃত। করয়েডের নিচে এবং চোখের তরল লেন্সের ঠিক বিপরীত দিকে ভেতরে পর্দার মত আরও একটি অংশ থাকে। নাম রেটিনা বা অক্ষি-পট। করয়েডের কাজ রেটিনার কোষ-গুলিকে নিয়মিত পুষ্টি যোগান। চোখের লেন্সের ভেতর দিয়েই আলো এসে পড়ে অক্ষিপটের ওপর। তখন ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার রাসায়নিক প্রলেপ মাখান ফিল্মের মতই অক্ষিপটের স্নায়ুকোষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ঐ উদ্দীপনা পরে অপটিক্যাল নার্ভ যা দৃষ্টিশক্তি বহনকারী স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে হাজির হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুটি থেকে আলো এসে চোখে প্রবেশ করেছিল আমরা তাকে দেখতে পাই। কিন্তু রেটিনার কোন অংশ যখন করয়েড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন ঐ বিচ্ছিন্ন অংশের স্নায়ুকোষের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সংবাহিত হওয়ার ব্যাপারে বাধা পায়। ফলে চোখ আংশিকভাবে অন্ধ হয়ে পড়ে।

রেটিনার এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নানা কারণে হতে পারে। যেমন, বড় রকমের
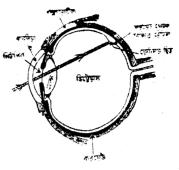
বাঁ পাশ থেকে লেজার রশ্মি গিয়ে পড়ছে বিচ্ছিন্ন রেটিনার ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ রশ্মি রেটিনার ছিদ্র জুড়ে দেবে, পরে করয়েডের গায়ে যথাযথভাবে স্থাপন করবে

আঘাত, চোখের রোগ ইত্যাদি। চিকিৎসক-দের বক্তব্য, গোড়াতেই যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে পরে আংশিক অথবা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। ওঁদের মতে, গোড়ার দিকে রেটিনার খানিকটা অংশ ফুটো হয়ে গিয়ে বা চিড় ধরে প্রাথমিক বিচ্ছিন্নকরণের কাজটি শুরু করে। এরপর ঐ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চোখের ভেতরকার তরল সামগ্রী ভিট্রেয়াস চুঁইয়ে রেটিনা এবং করয়েড-এর মাঝে এসে জমতে শুরু করে। এবং শেষ পর্যন্ত উভয় পর্দাকে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু কোন রকমে একবার যদি ঐ ছিদ্র বা চিড় জোড়া লাগান যায়, তখন আবার

বোম্বাই-এর জি জে চক্ষু হাসপাতালে লেজারের সাহায্যে জনৈক রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে

আগের মত অবস্থা ফিরে আসে। চোখ তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পায়।

গত কয়েক বছর ধরে এ ধরনের চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা জেনন গ্যাসের আর্ক ল্যাম্পকে কাজে লাগিয়ে আসছেন। এর জন্যে জেনন আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে রেটিনার চিড় খাওয়া অংশটি উত্তপ্ত করা হয়। কিছুক্ষণ উত্তাপের পর বিচ্ছিন্ন জায়গাটি জোড়া লাগে। কিন্তু জোড়া লাগলেও একটা দাগের মত সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া এ ধরনের চিকিৎসা রোগীর পক্ষেও যথেষ্ট কষ্টকর। রোগীকে অজ্ঞান করারও দরকার হয়।

কিন্তু লেজারের সাহায্যে এ কাজটি অনেক স্বচ্ছন্দে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সময় লাগে দুই থেকে তিন মিনিট মাত্র। রোগী শারীরিক কোন কষ্টও পায় না। অতএব তাকে অজ্ঞান করারও দরকার হয় না। এখানে লেজার রশ্মিকে সরাসরি করনিয়া, পিউপিল, লেন্স এবং ভিট্রেয়াস হিউমার নামধারী তরলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করা হয় চিড় খাওয়া অংশের ওপর। মুহূর্তে জায়গাটি দরকার মত গরম হয়ে ওঠে এবং ছিদ্রাংশটুকু জুড়ে যায়

রূপে রেটিনার বিপরীত দিকে গিয়েও ছিন্ন হয়। অবশেষে করয়েড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গিয়ে আবার করয়েড-এর গায়ে লেগে যায়। ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, শুধু চোখের চিকিৎসাই নয়, নতুন এই লেজার যন্ত্রটি দরকার হলে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিক রোগী-দের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহী নলও প্রয়োজনে জোড়া লাগাতে পারবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সাধারণ পদ্ধতিতে বহুমূত্র রোগীর ক্ষেত্রে ঐ ধরনের অসুবিধে দূর করা খুবই শক্ত।

নতুন এই যন্ত্রের একটি ইউনিটকে ইতিমধ্যে বোম্বাই-এর জে জে হাসপাতালে বসান হয়েছে। যন্ত্রটির সাহায্য ঐ হাস-পাতালে দুজন রোগীর রেটিনার ছিদ্র বন্ধ করা হয় এবং তাদের বিচ্ছিন্ন রেটিনা করয়েডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ভিট্রিয়াস রসের ক্ষরণ রোধ করার জন্যে আরও দশজন ব্যক্তির উপর এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান হয়েছিল। তাদের তিনজন মোটামুটিভাবে তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। বাকি সাতজনও নিরাময়ের পথে।

যন্ত্রটির ফ্লাশল্যাম্প এবং রুবি দণ্ডের দাম তিন হাজার টাকা। এ দুটি অংশ ছাড়া ইউনিটটির যাবতীয় অংশই দেশজ মালমসলায় তৈরি হয়েছে।

টেলিভিশনের মত পর্দায় যে ছবিটি দেখছেন সেটি মেরু অঞ্চলে সাগরের বুকে ভেসে বেড়ান বরফের টুকরোর নয়, পেঁয়াজের কোষ-কলার। পেঁয়াজের কোষগুলিকে ছবিতে ৪০০ গুণ বিবর্ধিত করা হয়েছে। বিবর্ধিত করেছে আলট্রাসোনিক বা অতি কম্পনশীল শব্দের সাহায্যে যার কম্পন ১০০ মেগ হার্টজ। ছবি তোলার জন্যে এই শব্দ প্রথমে পেঁয়াজের খোসার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। পরে আলোর মত সেটি এসে পড়ে এক ধরনের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উপর। যন্ত্রটি শব্দরশ্মিকে তখন বিবর্ধিত করে এবং লেজারের সাহায্যে তায় সেই বিবর্ধিত ছবিটি বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত হয়ে পর্দার উপর এইভাবে ফুটে ওঠে। জীববিজ্ঞানীরা ইদানিং আলো ছাড়াও জীবকোষের ছবি তোলায় শব্দ তরঙ্গের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন

কম্পনজনিত রোগ

আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে অলীক এবং অদ্ভুত বলে মনে হলেও, আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন না। আধুনিক শিল্প সভ্যতাকে মানুষ যেদিন স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি দিয়ে বসল, এ রোগের প্রাদুর্ভাবের সূচনা তখন থেকেই। ক্রমে শিল্পের যতই সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল, নানাভাবে এবং অধিক মাত্রায় আমরা আক্রান্ত হতে শুরু করলাম। বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন কম্পনজাত রোগ।

কারণ ওঁরা বলছেন, আমাদের পরিবেশ এখন বেশি কম্পিত হচ্ছে এবং নিয়ত, যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একান্ত দুষ্কর। যাঁরা কলকারখানায় কাজ করছেন, ভাবুন তাঁদের চারপাশে সব সময় বড় বড় কল-কব্জার দুমদাম শব্দ। যন্ত্র কাঁপছে। তার সঙ্গে তাল ঠুকে কাঁপছে ঘর বাড়ি। যায় যাঁরা সেখানে কাজকর্ম করেন বা যাঁদের সেখানে আশে পাশে বাস করতে হয়, তাঁরাও কেঁপে চলেছেন। তাঁদের শারীরিক যন্ত্রপাতিও। যাঁরা প্লেনে দূর দেশে যাতায়াত করেন, যতক্ষণ তাঁরা প্লেনে বসে থাকেন, তা সে যত আরামেই হোক, প্লেনের ইঞ্জিনের কাঁপুনির কিছু অংশ তাঁরাও ভোগ করে থাকেন। মোটরগাড়ি, বিশেষ করে কলকাতার মত স্টেটবাসে চড়ে কলকাতার পথঘাটে যাঁরা চলাফেরা করেন, যাঁরা ট্রাক্টার চালান অথবা রোলিং মিলের ভারী যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করেন, যাঁদের বাস বড় বড় কারখানার পাশে যেখানে নিয়ত ভারী ভারী যন্ত্র প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি করে এবং ইত্যাদি, তাঁদের শারীরিক যন্ত্রপাতি দিনে অন্তত কয়েক ঘণ্টার মত কাঁপবেই। মানে স্পন্দিত হবে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধি। সম্প্রতি "পোলিশ ফ্যাকটস অন ফাইল" পত্রিকায় বলা হয়েছে, শুধু পোল্যাণ্ডেই নাকি এমন চল্লিশ হাজার ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, নিয়মিত যান্ত্রিক কম্পনের মধ্যে কাজ করার ফলে যাঁদের শরীরে নানারকম উপসর্গ দানা বেঁধে উঠছে। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা এ বছরের গোড়া থেকেই ঐ সমস্ত ব্যক্তির দেহে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। অবশেষে প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা করার জন্যে পোলকাসিন স্লোজ শহরে একটি নিয়মিত স্বাস্থ্যনিবাসও খুলে ফেলেছেন।

জায়গাটি কোসজালিন ভয়ভোদশিপে অবস্থিত। সাধারণের কাছে পরিচয় পোমেরানিয়ান সুইটজারল্যাণ্ড নামে। শব্দ-জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। খুদে এই শহরটির প্রতিষ্ঠা চোদ্দ শতকের কাহিনী। এবং আধুনিক সভ্যতা তার প্রাচীন ঐতিহ্য আজও মলিন করতে পারে নি। আঁকাবাঁকা সরু সরু গলি। আশপাশে তার পুরনো আমলের ঘরবাড়ি। জীবন সেখানে শ্লথ। ছুটে চলা ভারী লরি বা মোটর গাড়ির ভিড় নেই বললেই চলে। সপ্তদশ শতকে এখানে এক ধরনের কাদামাটির স্তর এবং লবণাক্ত জলের প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হয়। অদ্ভুত সেই কাদামাটির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা জায়গাটিকে সেদিন থেকেই যেন ঐতিহ্যময় করে তুলেছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এখন এখানে বসেই কম্পনজাত রোগ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। ওঁদের উদ্দেশ্য, কারোর ঐ ধরনের কোন রোগ হলে সারিয়ে তোলা। এবং যান্ত্রিক কম্পনের ফলে ভবিষ্যতে কেউ যাতে রোগে আক্রান্ত হতে না পারে তার উপায় অনুসন্ধান করা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রোগটিই বা কী।

ওঁরা বলছেন, একটি নয়, নিয়ত যান্ত্রিক কম্পন শরীরে নানা রকমের রোগ ঘটাতে পারে। যেমন ধরুন, অতিরিক্ত কম্পনের মধ্যে থাকার দরুন কারোর হাত পা আর্দ্র পরিবেশ বা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কাজকর্ম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এর পরবর্তী উপসর্গে হয়ত দেখা যাবে কেন্দ্রীয়

বি এস সি জুতো
যেমন শক্তসমর্থ
তেমন নির্ভরযোগ্য

স্নায়ু কেন্দ্র যেন ক্রমেই কমজোর হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু শারীরিক ব্যাধি, যেমন হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, পাকস্থলী এবং মূত্রাশয়ে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি রক্তসংবহনকারী নল সংক্রান্ত স্নায়ুর কাজও বিঘ্নিত হতে পারে। ওঁদের মতে, বরং কম্পনের দরুন শরীরে এই ধরনের ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কাই নাকি বেশি। এর ফলে ঠান্ডায় রক্ত সংবহনের কাজ ব্যাহত হয়। এবং শরীর গরম করলেও স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরে আসে না।

যাঁরা নিয়মিত একই ধরনের কম্পনশীল যন্ত্রের পাশে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে এ ধরনের রোগের সম্ভাবনা বেশি। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই নির্দিষ্ট সহনশীলতা থাকে। ফলে আক্রান্ত হলেও, কেউ হন দেরীতে, কেউ বা দু-তিন বছরের মধ্যেই। গোড়ার দিকে উপসর্গগুলি তেমন কষ্টদায়ক হয় না। কিন্তু পরে শারীরিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে আসে। ঐ সময় হাত তাদের স্বাভাবিক শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। এমনকি অতিরিক্ত কম্পনে শরীরের মধ্যেকার কোন যন্ত্র ছিঁড়েও যেতে পারে।

পোল্যান্ডের ঐ স্বাস্থ্যনিবাসটিতে এই ধরনের রোগীদের চিকিৎসার জন্যে নানারকম পদ্ধতি কাজে লাগান হচ্ছে। কখনও সইয়ে সইয়ে গরম করে অংগপ্রত্যংগের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। সেই সংগে আছে গরম জলে অংগ সঞ্চালন, প্যারাফিন বা কাদার কম্প্রেস ইত্যাদি।

বেঁটে গাছ চান তো গাছ দোলান

নিয়মিত কম্পন মানুষকে রোগাক্রান্ত করে জেনে, পাঠক-পাঠিকারা হয়ত কিছুটা হতাশ হয়েছেন। শুনে সুখী হবেন, কম্পন শুধু মানুষকেই নয়, গাছপালার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য কম্পন বলতে এখানে আমি ঝাঁকুনি বা দোলানির কথা বলছি।

অদ্ভুত এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী—পি এল নিল এবং আর ডবু হ্যারিস। সম্প্রতি এই প্রসংগে ওঁদের দেওয়া একটি বিবরণ 'সায়েন্স' পত্রিকার ১৩৭ খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। যার মূল বক্তব্য এই রকম :

দেখা গেছে গভীর জঙ্গলের প্রবেশ পথে যে সমস্ত গাছপালা থাকে তাদের বেশির ভাগই বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা এবং তাদের গুঁড়িগুলিও কিছু দূর উঠেই যেন থেমে পড়তে চায়। কিন্তু বনের গভীরে একবার প্রবেশ করুন। সেখানকার ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখবেন সেখানে লম্বা লম্বা গাছ, সরু গুঁড়ি, তুলনায় সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। দেখে মনে হয় জঙ্গলের বাইরের অংশের গাছগুলির দায়িত্ব যেন চারপাশে থেকে গভীর অংশের গাছগুলি পাহারা দেওয়া। এমনও দেখা যায়, যে সমস্ত গাছ ফাঁকা জায়গায় ছাড়া-ছাড়িভাবে থাকে, জঙ্গলের বাইরের অংশের গাছপালার মত তারাও যেন কতকটা বেঁটে হয়েই পড়ে।

অতঃপর নিল সমান মাপের আটটি গাছের চারা সংগ্রহ করলেন। কাচে ঘেরা একটি বন্ধ ঘরের মধ্যে তাদের রেখে দেওয়া হল। সেই সংগে সেখানকার তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রিত করা হল। এরপর প্রত্যেক দিন সকাল সাড়ে আটটার সময় গাছগুলির কয়েকটিকে ঝাঁকাতে শুরু করলেন নীল। দিনে অবশ্য একবার এবং তিরিশ সেকেণ্ড ধরে। এইভাবে চলল সাতাশ দিন।

অবশেষে ঝাঁকান গাছগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠলেন নিল। দেখলেন, যে সমস্ত গাছ মোটেই ঝাঁকান হয়নি, তারা এ কয়দিনে গড়ে প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার করে বেড়েছে। কিন্তু বাকিগুলি অর্থাৎ নিয়মিত যাদের ঝাঁকান হয়েছিল তাদের বৃদ্ধির পরিমাণ গড়ে ৪·৩ সেন্টিমিটার। শুধু এই নয়, এমনও দেখা গেল, আটটি গাছের মধ্যে ছয়টিতে যে কান্ড ডগার দিকে বেড়ে ওঠে তাদের ডগায় বৃদ্ধিরোধকারী মুকুল দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ বোঝা গেল গাছগুলির এবার ওপর দিকে ঠেলে ওঠা বন্ধ হবে। অবশ্য বাকি দুটি গাছে ঐ ধরনের মুকুল দেখা না গেলেও সাতাশ দিনে কেউ তাদের ৬·৮ সেন্টিমিটারের বেশি বাড়ে নি।

পর গাছগুলির শরীরবৃত্তীয় গঠন পরীক্ষা করতে গিয়ে নিল লক্ষ করেছেন, ঝাকুনির ফলে গাছগুলির কাঠের আঁশ সরু এবং খাটো হয়ে গেছে। খাদ্যবাহী নল-গুলির দৈর্ঘ্যও কম। কিন্তু কেন, সে কথা কিন্তু কেউ এখনও বলতে পারেন নি। উল্লেখ্য, অনুরূপ পদ্ধতিতে গাছের পাতার আয়তনও ছোট করে ফেলা যায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে এটা বড় রকমের একটি রহস্য। উদ্ভিদের শারীরিক কার্যকলাপের সঙ্গে যান্ত্রিক শক্তির সম্পর্ক কী, সে সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক গবেষণাগারেই ইদানিং নানা রকমের কাজকর্ম চলছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ করছি। সকলেই দেখেছেন, গাছের শেকড় সব সময় নিচে এবং কাণ্ড উপরের দিকেই ওঠে। কিন্তু মহাকাশ যানে অঙ্কুরোদ্গম করে দেখা গেছে, পরিবর্তিত মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে পড়ে শেকড় এবং কাণ্ড যেন দিকভুল করে। কখনও শেকড় যায় উপরের দিকে, কাণ্ড নিচে অথবা ভিন্নতর দিকে। এ ধরনের সমস্যা উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের নতুন পথে মৌলিক গবেষণার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সমরজিৎ কর

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ১৫ ॥

পূর্ব বাংলায় ইস্কান্দার মির্জার গভর্নর শাসনে এক ভয়াবহ অন্ধকারের ত্রাসের রাজত্ব শুরু হলো। হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বন্দী করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আওয়ামী লীগ সমর্থক একমাত্র পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাককে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিকভাই শেরে বাংলা ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অত্যন্ত সংগোপনে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ইয়ার মোহাম্মদ খানের নাম পরিবর্তন করে সরকারী নথিপত্রে নিজের নাম মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসেবে এফিডেভিট করে নিয়েছিলেন। ফলে মাত্র চার মাস সময়ের মধ্যে মানিকভাই ইত্তেফাকের সম্পাদক ছাড়াও পত্রিকা মালিকে পরিণত হলেন। অবশ্য তখনও পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নাম প্রকাশিত হতো।

এদিকে ইত্তেফাক বেআইনী ঘোষণা হওয়ায় আমরা পত্রিকার কর্মচারীরা চারিদিক অন্ধকার দেখলাম। তখন আমি বিবাহিত। এই সাংবাদিকতা পরিত্যাগ করে অন্য পেশা অবলম্বন করবো কিনা একরম একটা চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু সেদিন আমার জীবন সঙ্গিনী আমাকে সাংবাদিকতার পথ পরিত্যাগ করতে দিলো না। দিন ১০/১২ পরে মানিকভাই একদিন আমাদের তাঁর [illegible]গঞ্জের বাসায় ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, "ইত্তেফাক বেআইনী থাকা কালীন মাস পয়লা আপনারা এসে বেতন নিয়ে যাবেন। যখন আমি নিঃস্ব হয়ে যাবো, তখন আপনাদের নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেবো।" মানিকভাই-এর প্রতিশ্রুতিতে আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে পড়লাম। দৈনিক ইত্তেফাক যতদিন বেআইনী ছিলো ভদ্রলোক তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছিলেন। সেদিন মানিকভাইয়ের এই মহানুভবতা না পেলে হয়তো বা আমাকে সাংবাদিকতার পেশাই পরিত্যাগ করতে হতো।

এক মাস সাতাশ দিন বন্ধ থাকার পর দৈনিক ইত্তেফাক আবার পুনঃপ্রকাশের অনুমতি পেলো। কিন্তু এর মধ্যেই গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা এক নির্দেশে ১৯৫৪ সালের ৫ই জুলাই তারিখে পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তাঁর প্রভু মার্কিনীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য মীর্জাকে দিয়ে এই নির্দেশ জারী করালেন। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলো ছাড়াও মিয়া ইফতেথার উদ্দীনের প্রগতিশীল আজাদ পাকিস্তান পার্টিও বেআইনী ঘোষিত হলো।

পূর্ব বাংলায় গভর্নর শাসন জারী রেখে বেশী দিন শাসন চালানো সম্ভব নয় বলেই করাচীতে ক্ষমতাশীন কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকার এর বিকল্প বের করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। অনেক বিবেচনার পর মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে এলো যে, পূর্ব বাংলা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেও বিশেষ ফায়দা হবে না। তাই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে হবে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গোপনে শেরে বাংলা ফজলুল হকের সমর্থক সৈয়দ আজিজুলহক, মাল্লা মিয়া, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মোহন মিয়া প্রমুখের সঙ্গে আর প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তাঁর এককালীন ওস্তাদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ শুরু করলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন বগুড়ার এই মোহাম্মদ আলীই তাঁর অর্থমন্ত্রী ছিলেন। রাজনীতির আবর্তে সেই মোহাম্মদ আলী হলেন

নিখিল পাকিস্তান মুসলীম লীগের সভাপতি এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আর সোহরাওয়ার্দী সাহেব মুসলীম লীগ-বিরোধী মোর্চা যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম হোতা।

আলাপ-আলোচনা কালে মোহন মিয়া ও নান্না মিয়ার দল অবিলম্বে শেরে বাংলার উপর প্রদত্ত অন্তরীণাবদ্ধের নির্দেশ প্রত্যাহার করে পূর্ব বাংলায় আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে মন্ত্রিত্ব দাবি করলেন। এদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমঝোতা করবার জন্য মওলানা ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের শর্ত আরোপ করলেন। সবার অজান্তেই যুক্তফ্রণ্টে বিরাট ভাংগন ঘটে গেল। কেবলমাত্র মওলানা ভাসানী লণ্ডন থেকে প্রেরিত চিঠিতে উভয় গ্রুপকেই কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তখন যুক্তফ্রণ্টের অধিকাংশ সদস্যই ক্ষমতাশীন হবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাই দিন কয়েক পরে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকা সফরে এলে তেজগাঁও বিমান বন্দর ও কার্জন হলে সম্বর্ধনা সভায় মাল্যদানের জন্য এক 'দুঃখজনক' প্রতিযোগিতা হলো।

যুক্তফ্রণ্ট নেতৃবৃন্দকে ষড়যন্ত্রের জালে পুরোপুরিভাবে আটকাবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন যে, এঁদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অংশীদার করে পূর্ব বাংলাকে শোষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। এরই ফল হিসেবে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে কলমের খোঁচায় এক ফরমান জারী করে কেন্দ্রীয় গণপরিষদকে ভেংগে দিয়ে পরোক্ষ নির্বাচনে নতুন গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করলেন। যুক্তফ্রণ্টের উভয় দলই এতে উল্লসিত হলো।

এর মধ্যেই শেরে বাংলার উপর থেকে অন্তরীণের নির্দেশ প্রত্যাহার হয়েছে, আর প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তাঁর মন্ত্রিসভা ভেংগে দিয়ে 'ট্যালেণ্ট-মন্ত্রিসভা' গঠন করেছেন। এতে করে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান দেশরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নয়া মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করলেন। পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের-রাজনীতিতে নতুন পরিচ্ছেদের সংযোজন হলো। সামরিক বাহিনীর প্রধান প্রকাশ্য রাজনীতির অংশীদার হলেন। এতদিন পর্যন্ত করাচী লাহোরের শিল্পপতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সংগে অবাংগালী অফিসাররা মিলিত হয়ে সামরিক জেনারেলদের সংগে গোপন যোগ-সাজসে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখবার যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল তা আইনসংগতভাবে প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ করলো। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত দ্রুত এই ষড়যন্ত্রের জালে ধরা দিলেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব আইনমন্ত্রী হয়েই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আপসের নতুন রক্ষাকবচ সংখ্যাসাম্যের বুলি নিয়ে ময়দানে নামলেন। কায়েমী স্বার্থবাদীর দল উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে পূর্ব বাংলারই একজন জনপ্রিয় নেতাকে দিয়ে এই সংখ্যাসাম্যের শ্লোগানকে বাংগালীদের দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিতে হবে। বাংগালীরা পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার

শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও ছয় ভাগ বিসর্জন দেবে আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা শতকরা ৪৪ ভাগ হয়েও ৫০ ভাগের অধিকারী হবে। ইসলাম, 'মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই' আর দেশের উভয় অংশের মধ্যে তিক্ততার অবসানের তাবিজ হিসেবেই পূর্বে বাংলায় এই সংখ্যাসাম্যের জিগির তোলা হলো। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসে আওয়ামী মুসলীম লীগ নেতৃবৃন্দকে ওই মর্মে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে সামরিক বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি ক্ষেত্রে ৫০ : ৫০-এর ব্যবস্থা হলে আপাতত বাঙালীরা লাভবানই হবে। কেননা কেন্দ্রীয় সরকারের কোথাও বাঙালীরা শতকরা ১৫/২০ ভাগের উপর সুবিধা পাচ্ছে না। সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক বিরাট দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লেন। তিনি দৌড়ে ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক মানিক ভাইয়ের কাছে পরামর্শ করতে এলেন। কিন্তু মানিকভাইও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মতামতের পক্ষে রায় দিলেন। কেবলমাত্র আওয়ামী মুসলীম লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে সংখ্যাসাম্যের বিরোধীতা করলেন। মওলানা ঘোষণা করলেন ঐভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা অর্থহীন।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী থাকা-কালীন মওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করলেন। মওলানা সাহেব লণ্ডন থেকে বোম্বাই হয়ে কলকাতার টাওয়ার হোটেলে দিন কয়েক অবস্থানের পর সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের বিশেষ বার্তা পেয়ে ঢাকায় ফিরে এলেন। প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিকের এক বিরাট জনতা বৃদ্ধ মওলানাকে তেজগাঁও বিমানবন্দরে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। অন্যান্যদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে মওলানাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। বৃদ্ধ মওলানা ঢাকার মাটিতে পা দিয়েই গুমরে কেঁদে উঠলেন। বিদেশ সফরে যাবার আগে পরাক্রমশালী মুসলীম লীগকে ধরাশায়ী করে তিনি যে যুক্তফ্রন্টকে রেখে গিয়েছিলেন, সেই যুক্তফ্রন্ট এখন দ্বিধাবিভক্ত, অধিকাংশ নেতাই মরীচিকার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঙালীর সেই ইস্পাত-কঠিন একতা আজ অনুপস্থিত। মওলানা রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। গুরু-শিষ্যে বহু আলাপই হলো। কিন্তু আপাতত কোন সমাধানেই আসতে পারলেন না।

জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী সংখ্যাসাম্যের বিরুদ্ধে বাঙালীদের মধ্যে জোর মতামত গড়ে উঠবার আগেই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে এর অন্তর্ভুক্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। ঢাকার পল্টন ময়দানের এক বিরাট জন-সভায় তিনি ঘোষণা করলেন যে প্রয়োজন হলে মার্শাল ল' জারী করে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র চালু করা হবে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা যে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের গদীর লোভ দেখিয়েই এ কাজে নামাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই অবস্থায় আওয়ামী মুসলীম লীগের অধিকাংশ নেতাই মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। কেবল মাত্র দৈনিক ইত্তেফাক সংখ্যাসাম্যের পক্ষে ওকালতী করলো। ওই সময় ইত্তেফাকের প্রচারসংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাওয়া থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে বাঙালীরা সংখ্যাসাম্য মানতে রাজী নয় — এ'রা

গণতন্ত্রের পূজারী। কিন্তু সেদিন থেকে শুরু করে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ, জেনারেল ইয়াহিয়ার আবির্ভাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দ যুগ পর্যন্ত পাকিস্তানে সংখ্যাসাম্য চালু থাকা সত্ত্বেও বাঙালীরা যেভাবে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তা' ইতিহাসে বিরল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালে একটা চার্ট থেকে ঐ ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সংখ্যাসাম্যের যুক্ত হয়ে কত বড় ভুল করেছিলেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীদের স্থান

দেশরক্ষা	ঃ	৮·১%
স্বরাষ্ট্র	ঃ	২২·৫%
শিক্ষা	ঃ	২৭·৩%
তথ্য ও প্রচার	ঃ	২০·১%
স্বাস্থ্য	ঃ	১৯%
কৃষি	ঃ	২১%
আইন	ঃ	৩৫%
উন্নয়ন পরিকল্পনা	ঃ	৩৬%

যাই হোক, এইরকম একটা অনিশ্চিত অবস্থায় নয়া গণপরিষদের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। মোট আশিটি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার কোঠায় চল্লিশটি আসন। পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী মুসলিম লীগ মাত্র তেরটি সিট দখল করতে সক্ষম হলো। এই পরোক্ষ নির্বাচনের সময় কম্যুনিস্ট সমর্থক সরদার ফজলুল করিমের নির্বাচন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্ব বাংলা সরকার ফজলুল করিম সাহেবের নামে বিনা বিচারে আটক একজন রাজবন্দীর মুক্তির নির্দেশ দিলে জেল-কর্তৃপক্ষ ভুলক্রমে প্রখ্যাত মার্কসিস্ট নেতা সরদার ফজলুল করিমকে মুক্তি দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গণপরিষদের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। প্রাদেশিক পরিষদের সকল হিন্দু কম্যুনিস্ট সদস্য এবং কিছু-সংখ্যক আওয়ামী লীগ সদস্যদের 'প্রেফারেন্শিয়াল' ভোটে করিম সাহেব গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের অন্যতম মেধাবী ছাত্র এই সরদার ফজলুল করিম পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পারিবারিক কারণে বণ্ডেরেড করিম মুচলেকা প্রদান করে মুক্ত হবার পর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। অতঃপর তিনি বাংলা অ্যাকাডেমিতে চাকুরি গ্রহণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক গণহত্যার পরও সরদার সাহেব এখনও বাংলা অ্যাকাডেমিতে চাকুরি করছেন। পূর্ব বাংলায় প্রগতিশীল আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য এ ধরনের কত তরুণ নেতা যে সংসার-জীবনের আবর্তে হারিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ এবং এক-কালীন প্রগতিশীল ছাত্র-নেতা মুনীর চৌধুরী এ ধরনের আর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অধ্যক্ষ চৌধুরী বর্তমানে গণধিকৃত গভর্নর মোতালেব মালেকের মোসাহেবী করে চলেছেন।

আগের কথায় ফিরে আসা যাক। নয়া গণপরিষদ গঠন হবার পর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এর প্রথম অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শৈলাবাস মারী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু এবার আর যুক্তফ্রন্টের সদস্যরা একত্রিত নেই। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। পিছনে পড়ে রইল বাংলাদেশের লক্ষ কোটি বঞ্চিত মানব-সন্তান।

[ক্রমশ]

শিল্পী শ্রীমতী করুণা সাহা সম্প্রতি ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন ...স প্রেক্ষাগৃহে তাঁর একটি প্রদর্শনীর ...য়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে ... তাঁর ১৬টি শিল্পনিদর্শন দেখা ...।

...দেশের অল্প কয়েকজন মহিলা ...দের মধ্যে শ্রীমতী করুণা সাহা আজ ...সুপরিচিতা। গত ২০ বছর যাবৎ ... বিভিন্ন স্থানের প্রদর্শনীতে যোগদান ... বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। নিখিল ...র ডাকটিকিট প্রতিযোগিতায় তিনি ...স্কার অর্জন করেন ও তাঁর পরি-...ল্পনায় সাঁচি স্তম্ভ ডাকটিকিট পরে ভারত ...কার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। খ্যাতনামা ...সী পরিচালক জাঁ রেনোয়া যখন দি ...র ফিল্ম তোলেন তখন এই শিল্পী ...ই প্রয়োজনায় যোগদান করেন। পরে ...লি সরকারের বৃত্তিলাভ করে দেওয়াল-... অঙ্কন শেখার জন্য তিনি ফ্লোরেন্স ...। যাঁরা তিন বছর আগে কলকাতায় ...ষ্ঠিত এই শিল্পীর রচনানিদর্শন ...খেছেন তাঁরা তাঁর সাম্প্রতিক কাজে ...শেষ পার্থক্য লক্ষ করবেন। শিল্পীর ...একটি রচনায় ফ্লোরেন্সের অঙ্কন-...শৈলী দেখা যায়। তবে এই প্রদর্শনীর ...গুলি অপেক্ষাকৃত সরল, অর্থাৎ ...ন কাচের (Stained Glass) বৈচিত্র্য ...লেও বিষয়বস্তু ও আকারের দিক থেকে ...লি সম্পূর্ণ ভারতীয়। সম্পূর্ণ অংকন ...টি তিনি বিষয়বস্তু অনুযায়ী নানা ...রে ভাগ করেছেন ও সেই বিভিন্ন ...গুলি সুনির্বাচিত নানা রঙে ভরিয়ে ...লেছেন। মোটা রেখা ও উজ্জ্বল রঙ ...রের ফলে ছবিগুলি বিশেষ আকর্ষণীয় ...ছে। বস্তুত, এই জাতীয় অংকনরীতি ...পী নীরদ মজুমদার ও করুণা সাহার ...ই দেখা যায়। এই প্রদর্শনীর প্রায়

বার্ড সেলার —করুণা সাহা

প্রত্যেক ছবিতেই তাই শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় শিল্পীর বিষয়বস্তু নির্বাচন। অংকন রীতিতে বিদেশী প্রভাব থাকলেও প্রত্যেকটি নিদর্শনেই দেশীয় রূপ ও মাধুর্য ফুটে উঠেছে। যেমন মেলন স্লোর। কমপোজিশন

নন্দী —শুচিব্রত দেব
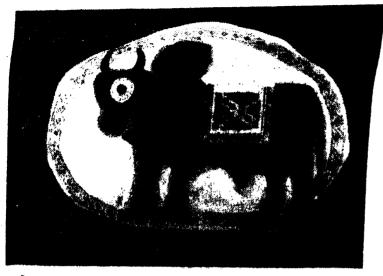
হিসাবে দি ডন একটি সার্থক সৃষ্টি। বজরাঙা উদীয়মান সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকমূলক নীলরঙ ব্যবহার ও মূর্তির অবতারণা দ্রষ্টব্য। কয়েকটি ছবি চোখে পড়ে সুন্দর কারুকার্যের জন্য। এই প্রসঙ্গে বার্ড সেলার-এর নাম করা যায়। একটি সরল নিষ্পাপ মুখ, লাল ও নীল রঙের সুসংযত ব্যবহার ও কারুকার্যখচিত রেখা-বিন্যাসের ফলে ছবিখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু'একটিতে পল্লীচিত্রের আভাস মেলে, যেমন প্যাস্টোর‍্যাল। প্রতীক-মূলকভাবে কয়েকটি সোচ্চার রঙের অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করে কিভাবে বক্তব্য প্রকাশ করা যায় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ফেস্টিভ মুড। আরও দুখানি ছবি অনেকের চোখে পড়ে যায়—হোয়াইট ন্যুড ও শি। প্রথমটির বলিষ্ঠ ড্রয়িং ও দ্বিতীয়টির আবেদনভঙ্গী বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ দি টু-রও নাম করা যায়। করুণা সাহার এই প্রদর্শনীর কয়েকটি নিদর্শন অনেকেরই মনে থাকবে।

*

শিল্পী শুচিব্রত দেব, জহর দাশগুপ্ত, অমিত রায়, পার্থপ্রতিম দেব, চিন্ময় রায়, সমীর দে ও শান্তনু ভট্টাচার্য অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এঁরা সকলেই তরুণ ও শান্তি-নিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। এঁদের মধ্যে অমিত রায় ও সমীর দে বর্তমানে পাঁচগানির কোনও বিদ্যালয়ে কলাশিক্ষক হিসাবে কাজ করছেন। পার্থপ্রতিম দেব ও চিন্ময় রায় আগরতলার একটি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষক এবং জহর রায় কলকাতারই একটি বিদ্যালয়ে কলাশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। শান্তনু ভট্টাচার্য কলাভবনে গবেষক ছাত্র হিসাবে কাজ করছেন ও শুচিব্রত দেব নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থায় ডিজাইনার হিসাবে কাজ করছেন। সাতজন শিল্পীর মধ্যে দুজন গ্রাফিক শিল্পী, অবশিষ্ট কয়েকজন তেলরঙ ও টেম্পারা মাধ্যমে কাজ করেছেন। কলাভবনে সকলে শিক্ষালাভ করলেও এঁদের প্রত্যেকের রচনাধারায় আপন বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকের শিল্পকর্মেই প্রগতিবাদ ও পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে গ্রাফিক নিদর্শনগুলি উন্নত মানের পরিচায়ক। সমবিমূর্ত রচনা হিসাবে জহর দাশগুপ্তের ম্যান অ্যান্ড উওম্যান (৭) অনেকের চোখে পড়ে, যদিও নায়িকা রমণীর মুখমণ্ডলটি সমান্তরাল-ভাবে না আঁকলে ছবিখানি কমপোজিশন হিসাবে আরো রসোত্তীর্ণ হত। শিল্পীর ৯নং নিদর্শন উল্লেখ্য। অমিত রায়ের নিদর্শন-গুলি স্যুরিয়ালিস্টিক জাতীয়। শিল্পী অঙ্কনক্ষেত্রটি বিভিন্ন আকারে বিভক্ত করেছেন ও মানবদেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানাভাবে সাজিয়ে বিভিন্ন রঙে ভরে ত্র... বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। সবগুলি চোখে না পড়লেও ... অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দাবাখেলার ক্ষেত্র অবলম্বনে রচিত ছবিখানির মধ্যে তিনি বিভিন্ন আকার সংস্থাপন ক... সঙ্গতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। শুচিব্রত দেব টেম্পারা মাধ্যমে কা... করেছেন, কয়েকটিতে ভারতীয় ঐতিহ্যের আভাস মেলে। যেমন নন্দী। অলংকার-ধর্মী এই ছবির গভীর কালো কালিতে আঁকা বলীবর্দের বহির্ভাগে হালকা ... রঙের রেখা ব্যবহার করার ফলে এটিতে ত্রিমাত্রিক আয়তন বৈশিষ্ট্য। ফ...টে উইন্ডো আউলও উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে ড্রয়িং নিদর্শন হিসাবে—তবে, মনে হ... বহির্ভাগে বেগুনী রঙের ব্যবহার সার্থক নয়। চিন্ময় রায়ের মিউর‍্যাল শ্রেণীর রচনা-গুলি বিমূর্তজাতীয়। তেলরঙ ও পঙ্ক... কুচি প্রভৃতি ব্যবহার করে শিল্পী কয়েকটি প্যানেলের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। রঙ ও উপাদান ব্যবহার করার ফলে দু'এক ক্ষেত্রে কিছু কারুকার্য সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে কম্পো-জিশনের দিক থেকে এগুলি এক... পরীক্ষামূলক মনে হয়। তা হলেও সব... সাদা ও গেরুয়া রঙ প্রধান ২৭নং ... ভাল লাগে। সমীর দের কয়েকটি ছবি সমকালীন চিন্তাধারার আভাস মেলে ... রেখা বলিষ্ঠ ও রঙ নির্বাচনও যুক্তিসঙ্গত ... অ্যান ইমপ্রেশন প্রথমেই চোখে প... কয়েকটি অসহায় নারী ও শিশুর মূর্তি ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে প্রধানত ... ও হলুদে রঙ ব্যবহার করে ... এই সমবিমূর্ত নিদর্শনে বক্তব্যটিকে ... করেছেন। এই প্রসঙ্গে উইডো-ও ... গ্রাফিক প্রিন্টগুলির মধ্যে প্রথমেই ... প্রতিম দেবের নিদর্শনগুলি দৃষ্টি ... করে। বিশেষ করে লিনো ও উডকাট... প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রা... বিমূর্ত শ্রেণীর। এই প্রসঙ্গে না... নট ন্যাচারাল, নট ফানি, (বি) ফে... ওয়ান ও বিশেষ করে নট ফানি (লিনোকাট) নাম করা যায়। গভী... ত্রিমাত্রিক আয়তন বৈশিষ্ট্যের জ... সকলের চোখে পড়ে। শান্তনু ভ... লিথোগ্রাফ ও এচিং নিদর্শনের কমপোজিশন ও বিশেষভাবে বিমূর্ত ... মেলা আর্ট শান্তিনিকেতন ও শপ... দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীল র... দ্বিতীয়টি প্রতীকমূলক, ... সুকল্পিত। তৃতীয়টি রঙীন সু... প্রশংসনীয় নিদর্শন।

শিল্প-উপনগরী এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন কাজ সমীক্ষা কমিটি এই রাজ্যে সাতটি শিল্প-উপনগরী বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপন করার সুপারিশ করেছেন। এজন্য সরকারের কাছ থেকে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার সাহায্যের আশ্বাসও মিলেছে। বলা হয়েছে, এই সাতটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ১০,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে; তার মধ্যে ৪০০০ শরণার্থীও (যারা মার্চ মাসের আগে ভারতে এসেছেন) কাজের সুযোগ পাবেন। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই সাতটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ২৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্প এবং তিনটি মাঝারি শিল্প স্থাপিত হবে। এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের জন্য যদি কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় তবে যে সকল ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার, তার অনেক কিছুই এখন পর্যন্ত করা হয়নি। গ্রামাঞ্চলে নতুন শিল্প-প্রকল্পের মাধ্যমে—বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করে এবং শ্রম-নিবিড় (labour-intensive) উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করে কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা এখন খুবই দরকার। যদি গ্রামাঞ্চলে অধিক-সংখ্যক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপন করা হয় তবে গ্রামের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং বিবিধ নাগরিক সুবিধার জন্য সরকারের খরচ কিছু পরিমাণে কমানো সম্ভব হয়; কেননা, গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ শ্রমিকই নিজেদের বাড়িতে থেকেই কল-কারখানায় কাজে নিযুক্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গের বেকার শ্রমিকদের কর্ম-সংস্থানের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই সামান্য। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে শিল্প-উপনগরীর সংখ্যা অনেক বেশি। পাঞ্জাবে ৩১টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট আছে; তার মধ্যে লুধিয়ানায় কারখানা-ঘরের সংখ্যা হল ২২৩। উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সংখ্যা হল যথাক্রমে ৭০টি এবং ৩৬টি। মহারাষ্ট্রে আগামী দুই বছরের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সংখ্যা ৫৯টি হবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মেদিনী-পুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলায় এখন পর্যন্ত একটিও শিল্প-উপ-নগরী স্থাপিত হয়নি। হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে আশা পোষণ করা হচ্ছে; অথচ ওই অঞ্চলে একটিও শিল্প-উপনগরী স্থাপন করা হয়নি। অথচ কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শংকর রায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এক লক্ষ লোকের জন্য কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এখন পর্যন্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির যা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তাতে সরকারের এই প্রতিশ্রুতি প্রহসনে পরিণত হবে বলে ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের মাধ্যমে

শিল্পগুলি ঘর, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা পায়। কিন্তু দেশের শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য এগুলিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস নয়। শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য আরও প্রয়োজন এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল মূলধন ও কাঁচামালের সরবরাহ। দেশের শিল্পোৎপাদন যে বেশি হারে বাড়ছে না,—তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক আমাদের শিল্পক্ষেত্রে মন্দার জন্য দায়ী। সেগুলি হল, কাঁচা মাল ও উপাদান সরবরাহ সম্পর্কিত বাধা-বিপত্তি (input constraints), ক্ষেত্রবিশেষে চাহিদার ঘাটতি (demand constraint) এবং শিল্পবিশেষে উৎপাদন ক্ষমতার প্রতিকূল অবস্থা (capacity constraint)। সম্প্রতি যোজনা কমিশন চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার যে অন্তর্বর্তী পর্যালোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় শিল্পোৎপাদনের হার খুবই কমে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করাও আশানুরূপ সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণ করতে হয়। তবে শ্রম-নিবিড় [illegible] শিল্প-প্রকল্পের উপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং এটা সম্ভব হতে পারে যদি গ্রামাঞ্চলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কারণ এই এস্টেটগুলির মাধ্যমে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তার সঙ্গে যদি সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন উন্নয়

কগুলির প্রদত্ত মূলধন যুক্ত হয় তবেই য়তন শিল্পগুলির আরও ব্যাপক সারণ করা সম্ভব হবে এবং কর্মসংস্থান ডির হার আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। রে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক পিছিয়ে আছে।

র যোগানদার কমানো দরকার

লিত অর্থনৈতিক গবেষণা সংক্রান্ত য় পরিষদ (National Council of plied Economic Research) ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য আর যোগান না বাড়াবার সুপারিশ ছেন। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে যে তের সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করার জন্য ীয় সরকারকে ক্রমাগত টাকার যোগান তে হয়েছে। তার ফলেই জিনিসপত্রের ম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে। পরিষদ সতর্ক দিয়ে বলেছেন, কৃষিজাত কাঁচামালের যদি আরও বাড়তে থাকে এবং এগুলির যদি আন্তর্জাতিক দামের চেয়েও বেশি হবে ভারত সরকারকে রপ্তানি-বাজার ছেড়ে হারাতে হবে অথবা বিকল্প ব্যবস্থা সেরে রপ্তানিযোগ্য জিনিসের জন্য রকারকে খয়রাতি দিতে হবে। টাকার গান না কমাতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি তিরোধ করা সম্ভব হবে না বলে পরিষদ নে করেন এবং যাতে টাকার যোগান আর বাড়াতে হয় সেজন্য সরকারী ব্যয়ের রিমাণ আরও কমানো প্রয়োজন বলে রিষদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যদিও ১৯৬৯-৭০ সালের অক্টোবর থেকে এপ্রিল াসের মধ্যে যে পরিমাণ নতুন মুদ্রা বাজারে াড়া হয়েছিল (৭২০ কোটি টাকা) তার তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালের অনুরূপ সময়ে ম পরিমাণ মুদ্রা (৫৭২ কোটি টাকা) াজারে ছাড়া হয়েছে, তবুও ১৯৬৯-৭০ ালে যেভাবে নতুন মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছিল, র পরেই ১৯৭০-৭১ সালের তুলনায় য়। ১৯৭০-৭১ সালে সরকারের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়েছে। ই অক্টোবর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতির পরিমাণ হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা;—এটা নতুন মুদ্রা ছাড়ার পরিমাণের চেয়েও বেশি। এপ্রিল মাসের র থেকেও এই ঘাটতি অব্যাহত আছে। ই এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত রকারের ঘাটতির পরিমাণ হয়েছে ২৩৫ কোটি টাকা; ১৯৬৯-৭০ সালে এই সময়ের ধ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৩০ কোটি টাকা।

টাকার যোগান যে হারে বাড়ছে এবং যে-কারণে বাড়ছে,—তা খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ভারত সরকার অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে আরও ৭০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছেন। নতুন মুদ্রা বাজারে না ছেড়ে কর ধার্যের মাধ্যমে আরও রাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়া সরকারের বিকল্প কোন পথ নেই: একথা সত্য। কিন্তু যোজনা কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়ে সরকার কি কৃষিক্ষেত্র থেকে, বিশেষ করে ধনী কৃষকদের থেকে, আরও কর আদায় করার ব্যবস্থা করতে পারেন না? মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য এবং নতুন টাকা বাজারে ছাড়ার দায় এড়াবার জন্য কালো টাকা উদ্ধার করার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা যেত। প্রশাসনিক দুর্বলতা দূর করে সরকার যদি কালো টাকা উদ্ধার করার কাজে আরও সচেষ্ট হন, তবে অনেক সমস্যারই সুরাহা হবে। আরও নতুন টাকা বাজারে ছাড়া এখন দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

সুব্রত গুপ্ত

ফুলে ফুলে

মুমূর্ষু কলকাতা
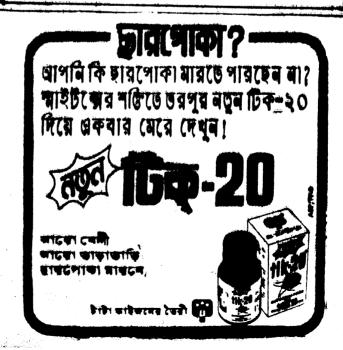
শ্রীশিবনারায়ণ রায় লিখিত 'মুমূর্ষু কলকাতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি আগ্রহ সহকারে পড়লাম। সমস্ত লেখাটির মধ্যে এক অব্যক্ত বেদনা, কাতরতা ও অসহায়তার করুণ ছবি ফুটে উঠেছে যা প্রত্যেক দেশপ্রেমিককেই ব্যথাতুর করে তুলবে। আমরা যাঁরা শহর ও শহরতলীবাসী, তাঁদের চোখে গত কয়েক বৎসরে কলকাতার এই পরিবর্তন বা অধঃপতন প্রাত্যহিকতার জন্যই বোধ হয় এত স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না। কিন্তু কয়েক বৎসর বাদে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে শিববাবুর চোখে তা অত্যন্ত সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে এবং তিনি নিখুঁত মুন্সিয়ানার সঙ্গেই তা পাঠকবর্গের কাছে তুলে ধরেছেন।

একজন অতি সাধারণ অ-রাজনৈতিক নাগরিক হিসাবে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে। শিববাবু অবশ্য শহর কলকাতার এই মুমূর্ষুতার প্রশ্নটি মূলত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি Peloponesian যুদ্ধোত্তর গ্রীস এবং বর্বর-লুণ্ঠিত রোমের অন্তিমদশাপ্রাপ্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত যে অবস্থার উল্লেখ করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই তুলনা যদিও অপ্রাসঙ্গিক নয় না, তবুও কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপরোক্ত উদাহরণ দুইটির চেয়ে অনেক বেশী করুণ ও পরিতাপের কারণ এখানে আমাদের মাতৃভূমি আজ কোন বৈদেশিক শক্তির দ্বারা লুণ্ঠিত অথবা ধর্ষিত নয়; আমরা বাঙ্গালী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং আরও সূক্ষ্ম অর্থে হিন্দু বাঙালীই আজ আমাদের প্রিয়তমা জন্মভূমিকে লুণ্ঠন ও ধর্ষণ করছি। পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে বোধ হয় এই নজির পাওয়া যাবে না। এখানে Thucydides রচিত Peloponesian যুদ্ধের ইতিহাসের নিম্নোক্ত লাইন কয়টি উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না:—

"There was death in every shape and form. And, as usually happens in such situations, people went to every extreme and beyond it. .... greater extravagance of revolutionary zeal, expressed by an elaboration in the methods of seizing power and by unheard-of atrocities in revenge. ... Family relations became a weaker tie than party membership. ... Revenge was more important than self-preservation. Love of power, operating through greed and through personal ambition, was the cause of all these evils. ... As for ending this state of affairs, no guarantee could be given that would be trusted, no oaths sworn that people would fear to break; everyone had come to the conclusion that it was hopeless to expect a permanent settlement."

কলকাতার সমস্যা নানাবিধ; তা লিখে শেষ করা যায় না। এদের মধ্যে বেশ অনেকগুলি বহুদিনের, বর্তমানে তা ভয়ংকর আকার নিয়েছে। অবশ্য এ কথা খুবই সত্য যে, দলীয় রাজনীতি গত কয়েক বৎসরে কোন সমস্যাকেই আদৌ সমাধান করতে পারে নি, বরং অনেক সমস্যাকেই তীব্রতর করে তুলেছে শুধু। কিন্তু এই শহর সামাজিক চরিত্র হারাতে শুরু করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এটা হয়ত যুদ্ধেরই অন্যতম অবদান। মানুষের চোখে মূল্যবোধ বদলাতে লাগল। যে নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম ধারক ও বাহক তাঁরাই সমূলে উৎপাটিত হলেন এই যুদ্ধের বলীরূপে—অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক দিক থেকে। যুদ্ধের সুযোগে ব্যবসাদার ও বণিক সম্প্রদায় ফাটকাবাজি ও কালোবাজারী মারফত প্রভূত অর্থের মালিক হলেন। আর 'কালোবাজারী' শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগ বোধ হয় জনসাধারণ তখনই জানতে পারলেন। মুদ্রাস্ফীতি ভয়ানক আকার ধারণ করল। ফলে ধনী ও ব্যবসাদার সম্প্রদায় অধিকতর ধনী হল; আর সাধারণ লোক

যাদের কাছে তখনও অসততা ও অন্যায়ের পথে অর্থোপার্জনের চেয়েও চরিত্র অধিকতর কাম্য ও গর্বের ছিল, তাঁরা অর্থের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে গেলেন ও চরিত্রের দিক থেকে রিক্ত হয়ে পড়লেন। অর্থই হল তখন সামাজিক প্রতিপত্তি, অধিকার এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। সেখানে চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা, সততা, শিক্ষা ও নিষ্ঠার কোন মূল্য রইল না। অসহায় নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকে তখন প্রাণের তাগিদে হারালেন তাঁদের চরিত্র ও মনোবল। সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সব একাকার হয়ে গেল। মনুষ্যত্বের সামান্যতম মূল্যও রইল না। তাই আমরা দেখেছি একদিকে যখন হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে কুকুর-বেড়ালের মত মারা গেছে, অন্যদিকে তখন কালোবাজারী ও ফাটকাবাজিতে গুদাম ভর্তি হয়েছে। এই ঘটনার নজিরও বোধ হয় কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এর পরে ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (Statesman-এর ভাষায় The Great Calcutta Killing) সামাজিক নিরাপত্তার অবনতি ঘটালেও আমাদের চারিত্রিক জীবনে তার ফল এত বিষময় হয়ে দেখা দেয়নি। যদিও অবশ্যই এই সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী অবসানকল্পে দেশ বিভাগ হয়েছিল, তবুও আমাদের নেতাদের দূরদৃষ্টির অভাবে এই সমস্যা সমূলে উৎপাটিত হল না। পূর্ব পাঞ্জাবে যা সম্ভব হয়েছে পশ্চিম বাংলায় তা তো হলই না, বরং সমস্যা তীব্রতর হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছিল। আর তার ফলস্বরূপ আজ এই দেশের প্রত্যেককে প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে নিজেদের সর্বস্ব খুইয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পশ্চিমবঙ্গই আজ সর্বাধিক অবহেলিত রাজ্য, যদিও দিল্লির রাজকোষের অর্থ অন্যান্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্য থেকে সংগৃহীত হয় সবচেয়ে বেশী। বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা চল্লিশ শতাংশ উপার্জন করে পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে এই রাজ্যের ত্যাগ ও অবদান সবচেয়ে বেশী। কিন্তু নূতন দিল্লির আচরণ আগাগোড়াই বৈষম্যমূলক; আর এই রাজ্যের নেতাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয় একমাত্র স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছাড়া আর কোন নেতাই (কংগ্রেস অথবা কংগ্রেস-বিরোধী) রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে জন্মভূমির উন্নতিকল্পে আন্তরিক চেষ্টা করেন নি।

এটা বোধ হয় ইতিহাসের নিয়ম যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে প্রত্যেক শহরেরই বার্ধক্য আসে এবং সে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন তাকে বাঁচাতে গেলে প্রয়োজন হয় তার মডার্নাইজেশন—সময়, কাল ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। কলকাতার মূল্য শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী বলে নয়; সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যতম এবং পূর্ব-ভারতের বৃহত্তম শিল্পক্ষেত্র ও ব্যবসা কেন্দ্র। উত্তর ভারতের কিয়দংশ এবং সমগ্র পূর্বভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদির আদান-প্রদান ও আমদানি-রপ্তানির কেন্দ্রস্থল এই শহর। বহির্ভারত রপ্তানির ক্ষেত্রে কলকাতা আজও ভারতের বৃহত্তম বন্দর। পাটশিল্পের কেন্দ্র স্থল ও চা রপ্তানির বৃহত্তম কেন্দ্র। কিন্তু শুধু আমদানি-রপ্তানি নিয়ে কো
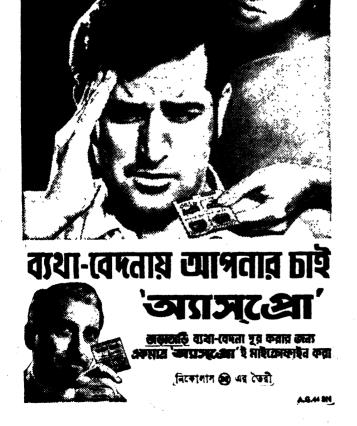
শহর দীর্ঘায়ু হয় না। সে দীর্ঘজীবী হয় বিশেষ করে তার শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে। আজ কলকাতার শিল্পেরই অপমৃত্যু ঘটেছে, আর এও বোধ হয় ইতিহাসের নিয়মেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি পঁচিশ বৎসরাধিক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে আছি। কলকাতা ও তার আশে-পাশের শিল্পনগরী বোধ হয় আমাদের দেশে প্রাচীনতম শিল্পক্ষেত্র। বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের দিক থেকে বিচার করলে। ফলে বিভিন্ন কলকারখানায় যে সব যন্ত্রপাতি আছে তা শুধু মান্ধাতার আমলের নয়, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এবং অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মেণ্টেন্যান্সের অভাবে, তা লক্কড় হয়ে গেছে। অধিকন্তু, সেই সব মেসিনারীর ডিজাইন ও কর্ম-পদ্ধতি অত্যন্ত পুরাতন। ফলে এই সব যন্ত্রপাতিজাত দ্রব্যাদিতে পড়তা খরচ পড়ে বেশী এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন আধুনিক কলকারখানায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির সহিত কি গুণে, কি দামে, তা 'কম্পিট' করতে পারে না। দ্বিতীয়ত বাঙালী শিল্পপতিরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অত্যন্ত মামলাপ্রিয়। তাঁরা কারখানাজাত দ্রব্যাদির আধুনিকীকরণ এবং উৎকর্ষতার দিকে বিশেষ নজর কমই দেন, অথবা তৈরী খরচ কমাবার জন্য নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিকেও মাথা কম ঘামান। গতানুগতিকতায় তাঁরা সাধারণত গা ভাসিয়ে দেন। এই জন্য দেখা যায় কলকাতার বাজারে ছেলেমেয়েদের খেলনার জিনিস থেকে আরম্ভ করে বড় বড় কলকারখানার জন্য প্রয়োজনীয় 'মাদার মেসিনারী' পর্যন্তও দ্রব্যাদি অন্য রাজ্যজাত বস্তুতে ছেয়ে গেছে। অতি সাধারণ জিনিস যেমন একটি ভাল ছুরি বা কাঁচি যা সকল গৃহস্থালীর প্রয়োজন হয়, অথবা কল-কারখানার জন্য সামান্য একটি ড্রিল বা ফাইল—এ সবের জন্যও আমাদের অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যেতে পারে যে, আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বেবীফুড, প্রসাধন দ্রব্য মায় ভাল একটি পেনসিলের ক্ষেত্রে পর্যন্তও আমরা দেখি এই একই ছবি। নানা ধরনের শৌখিন পরিধেয় বস্ত্রের কথা না হয় উল্লেখ নাই করলাম, যার প্রায় ষোল আনার জন্যই আমাদের চেয়ে থাকতে হয় পশ্চিম ভারতের উপর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আরও বলতে পারি যে, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং রাজ্য সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের ফলে আজ এগিয়ে আছে পশ্চিম ভারত ও পৌঁছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ। অতি সাধারণ হাঁসের ডিম অথবা পাতি লেবু, এসের জন্যেও আমাদের নির্ভর করতে হয় সুদূর দক্ষিণ ভারতের উপর। অন্যান্য কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্যের কথা বাদ দিলাম, যা অবশ্য ভৌগোলিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে ভাল জন্মায় না। সুতরাং কলকাতার মৃত্যু শুধু রাজনীতির জন্য নয়, এ মৃত্যুকে অবধারিত করেছে তার প্রাচীনত্ব, তার শতাব্দী-পুরানো শিল্প-সংস্থা; আর এই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে তার দলীয় রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যার একটি অতি সুন্দর ছবি শিববাবু আমাদের দিয়েছেন।

গত কয়েক বৎসর আগে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে শিববাবুর বক্তৃতা ও আলোচনা শোনার সৌভাগ্য আমার

হয়েছিল। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, তদুপরি দার্শনিক এবং কমিউ-নিজম শাস্ত্রে দিকপাল, বিশেষ করে স্বর্গত এম এন রায়ের অনুগামী হিসাবে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে তিন কমিউনিসট পার্টির যে চরিত্র তিনি উল্লেখ করেছেন এবং বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার অবনতির জন্য মূলত এরাই এবং বিশেষ করে সি পি এম দায়ী, এত অবধারিত। নীতিগত, চরিত্রগত ও তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে এ'রা তিনজন সহোদরজাত, তফাত শুধু স্ট্র্যাটেজিগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অনিরাপত্তাই এ'দের রাজনীতিক মূলধন, 'ক্যাওস' এ'দের ইনভেস্টমেণ্ট ও আন্দোলন জিইয়ে রাখা এ'দের পলিসি এবং টেরোরাইজেসন দ্বারা জনগণকে বশে আনাই এ'দের উদ্দেশ্য। এ'রা এক হাতে সমস্যা সৃষ্টি করেন আর অন্য হাত এগিয়ে দেন জনগণের ত্রাতা হিসাবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন মারফত। এ'দের রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ যে আন্দোলন জিইয়ে রাখা এটি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তাই আমরা দেখেছি যখন বেকার সমস্যায় এই রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনীতিক ভিত পর্যন্ত টলে উঠেছে, তখন শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতির স্বার্থে একদিকে ব্যাপক আন্দোলন ও অন্যদিকে উৎপাদন হ্রাস দ্বারা এ'রা একটার পর একটা কারখানা বন্ধ করে গত তিন-চার বছরে লক্ষাধিক নূতন বেকার সৃষ্টি করেছেন। এই সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে আমার মনে হয় একদিকে সরকার আইন প্রণয়ন করে নানা ধরনের নাশকতামূলক আচরণ যেমন 'টুল-ডাউন, পেন-ডাউন, গো-স্লো, ওয়ার্ক-টু-রুল' ইত্যাদি কঠোর হাতে দমন করুন যেমন তাঁরা আইন করছেন লক-আউট ও ক্লোজার বন্ধ করবার জন্য যাতে চালু কারখানাগুলি অন্তত বজায় থাকে, সেই রকমভাবেই উপযুক্ত আইন দ্বারা এই সব তথাকথিত জনদরদী রাজনীতিক নেতাদের ও বিশেষকরে ট্রেড ইউনিয়ন পাণ্ডাদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করুন অনুরূপ কঠোরতার সঙ্গেই। দ্বিতীয়ত, নূতন দিল্লিকে আজ দরাজ হাতে এগিয়ে আসতে হবে বন্ধ কারখানাগুলি খুলে সেইগুলিকে চালু করতে এবং সর্বতোভাবে তাদের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করতে। অবশ্য এজন্য চাই প্রচুর অর্থ ও বৈদেশিক টাকা। তার জন্য ইতস্তত করলে চলবে না কারণ পশ্চিম বাংলা এতদিন নূতন দিল্লিকে প্রচুর টাকা উপায় করে দিয়েছে। এর পর যুক্তভাবে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এই রাজ্যের সমুদয় কলকারখানা গুলিকে প্যাট্রোনাইজ করতে হবে তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এই সব কলকারখানাগুলিকে সরবরাহ করবার সুযোগ দিয়ে এবং সেখানে শতকরা দশ-পনের শতাংশ পর্যন্তও 'প্রাইস্ প্রেফারেন্স' দিতে হবে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন শুল্কের হার পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং সমস্ত শিল্প সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। সর্বশেষে শ্রমিক ও কর্মচারিবৃন্দের অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ত্রিদলীয় একটি স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল কমিটি (জুডিশিয়াল ক্ষমতা সহ) গঠন করা এবং তাঁদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া যে বর্তমান নেতাদের উদ্দেশ্য যতখানি দলীয় রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য-পূর্ণ, ঠিক সেই অনুপাতে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী।

অমল চট্টোপাধ্যায়
বারুইপুর

পঞ্চতন্ত্র

গত ১৬-১০-১৯৭১ তারিখের "দেশ"-এ সৈয়দ মজুতবা আলী তাঁর "পঞ্চতন্ত্রে" শ বিষয়ক একটি সংস্কৃত কবিতার ার্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং পাঠকদের রোধ করেছেন তাঁদের মূল সংস্কৃত তাটি জানা থাকলে "দেশ" সম্পাদকের রে কবিতাটির প্রতিলিপি তাঁরা যেন ঠয়ে দেন। তাঁর সেই অনুরোধ রোধার্য করে নিম্নে সংস্কৃত কবিতাটি ৃত করে দিচ্ছি:

বিশ্বাধারোহি বায়ুস্তদুপরি
কমঠ স্তত্র শেষ স্ততোভু
স্তস্যাং কৈলাসশৃঙ্গাং তদুপরি
গিরিশো মস্তকে যস্য গঙ্গা!
তস্যামিল্লীশ মৎস্যঃ সকল ঋধবর!
স্বাদু পীযূষতুল্যঃ
কিং ব্রুমস্তস্য তত্ত্বং বদতি
কমলভুভোজনে যস্যামুক্তিঃ॥

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
ব্যারাকপুর

দরবারি নটী কলাবন্ত

"দরবার নটী কলাবন্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে ২৯ আশ্বিন, ১৩৭৮) শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রাণা হাম্মিরের হাতে মুহম্মদ বিন তুঘলকের পরাজয় প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা ইতিহাস মতে সম্পূর্ণ ভুল। তিনি লিখেছেন: "সাঙ্গোলির যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের সেই আক্রমণকে রাণা হাম্মির পর্যুদস্ত করে দেন। সেই রক্তাক্ত সংগ্রামে পরাজিত ও বন্দী হল মুহম্মদ তুঘলক। রাণা হাম্মির তাঁকে তিন মাস চিতোর দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। তারপর সুলতান মুক্তিলাভ করেন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাণাকে আজমির, নাগোর ও রণথাম্ভোরের কর্তৃত্ব, ৬ লক্ষ টাকা এবং ১০০ হস্তী উপঢৌকন দিয়ে। মুহম্মদ তুঘলকের আর কখনো চিতোর আক্রমণ করবার সাধ জাগেনি।"

মুহম্মদ বিন তুঘলকের উপর রচিত দুটি গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থ ইংরাজীতে বাজারে চালু আছে। একটি ঈশ্বরীপ্রসাদের লেখা "Qarauna Turki in India" আর অপরটি মেহ্‌দী হোসেনের "Tughluq Dynasty"

যাই হোক, উপরোক্ত কোনো গ্রন্থেই কৌতূহলের বিষয় শ্রীমুখোপাধ্যায় কথিত অমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কোনো উল্লেখ করা হয় নাই। ঈশ্বরীপ্রসাদের মতে, "The independent Rajput States were left unmolested; for the Sultan knew that it was impossible to retain permanent possession of such strongholds as Chittor and Ranthambhor—a policy which was not liked by the clerical party". (vide. Mediaeval India. P.—277-78; 3rd Edition).

১৯৬৩ সালের প্রকাশিত গ্রন্থে মেহ্‌দি হোসেন এ সম্পর্কে প্রচুর শ্রমসাধ্য গবেষণা করেছেন। "Chittor Inscription" (Epigraphia Indica; Arabic and Persian Supplement; 1955—56; P. 67-70)-উপর ভিত্তি করে তিনি বরং উল্টো সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। তাঁর মতে চিতোর দিল্লীর অধীনে ছিল। (Vide Tughluq Dynasty; P. 112)।

খুব সম্ভবত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের রচনার ভিত্তি হিন্দীতে লেখা ১৯২৬ সালে প্রকাশিত রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর ওঝার তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ "রাজপুতানা কা ইতিহাস।" ওঝা মহাশয়ের লেখার প্রধান উৎস: ১) রাজপুত চারণ কবির গান—যার ইতিহাস মূল্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষ; ২) মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর তিনশো বছর পরে রচিত Nainsi-র লেখা "Khyat"—যা সমসাময়িক বিবরণী নয়।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ওঝা মহাশয়েরও মনে সন্দেহ আছে যে, মুহম্মদ বিন তুঘলক

সবাই বন্দী হয়েছিলেন কিনা!

সুতরাং আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে যে যুদ্ধ কখনোই হয়নি, সে যুদ্ধে সুলতানদের পরাজয়ের কোনো প্রশ্ন ওঠে না—উপঢৌকন দেয়া ত' দূরের কথা।

শ্যামাপ্রসাদ বসু
খড়গপুর

॥ ২ ॥

আমি 'দেশ' পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠক হওয়া সত্ত্বেও, কয়েক মাস যাবৎ নানা কারণে উহা নিয়মিত পাঠ করিবার সুযোগ পাই নাই। কাজেই, এই পত্রখানা লিখিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। সে যাহা হউক, উক্ত পত্রিকায় দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত 'দরবার নটী কলাবন্ত : বারাণসী ঘরানা তবলা' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে ২১শে আগস্টের 'দেশ' পত্রিকায় নির্মলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিবাদপত্র এবং ১১ই সেপ্টেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় দিলীপবাবুর পত্র আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, দুইখানা পত্রেই তথ্যগত কিছু ভুল পরিলক্ষিত হইল।

মৌলভীরাম যখন মুক্তাগাছা শহরে বাস করিতেন, তখন আমি তাঁহার এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য রামকৃষ্ণ কর্মকারের প্রতিবেশী ছিলাম। সেই সূত্রে, তাঁহাদের উভয়ের গৃহে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল এবং তাঁহাদের, বিশেষভাবে, মৌলভীরামের সঙ্গীত-জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

নির্মলবাবুর অভিযোগ, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলভীরামের শিষ্য ছিলেন না। ইহা ঠিক নয়। মৌলভীরামের নিজ মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি—কেশববাবু তাঁহার কৃতী শিষ্যবর্গের অন্যতম ছিলেন। কেশববাবুকেও আমি মুক্তাগাছায় মাঝে মাঝে গুরুসন্নিধানে আসিতে দেখিয়াছি।

দিলীপবাবু লিখিয়াছেন, মিশ্রজী মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর সংগীতসভার তবলাবাদক ছিলেন। ইহাও ঠিক নয়। তিনি ছিলেন রাজা জগৎকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সভাবাদক। কুমার জিতেন্দ্রকিশোর নিজে যেমন একজন খুব উঁচুদরের গায়ক ছিলেন, তেমনি তিনি ভারতের নানা স্থান হইতে প্রথম শ্রেণীর গায়ক ও বাদককে নিজ সংগীতসভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদের গান ও বাজনা শ্রবণ করিতেন। কুমার জিতেন্দ্রকিশোর কাশীতে মৌলভীরামের তবলাবাদন-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার সভাবাদক নিযুক্ত করিয়া মুক্তাগাছায় লইয়া আসেন।

মৌলভীরাম মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত কুমার জিতেন্দ্রকিশোরেরই সংগীত-সভার অন্যতম তবলাবাদক ছিলেন।

কালীপদ সাহা
দিনহাটা, কুচবিহার

॥ ৩ ॥

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'দরবার নটী কলাবন্ত' প্রবন্ধের শেষে (দেশ, পৃঃ ১০৩৭) হামীর রাগের যে ধ্রুপদটি দেওয়া হয়েছে তার শুদ্ধরূপ বাংলায় দিলাম :

সরস রস দেখী তিহারী জো
গুণীয়নকো গুণী সমঝ
রাখত হো আদর মান॥
সব বিধ পুরো বিধান কীনো
তুমকো তিহারী বড়াই
কহো কৈসে করূঁ বখান॥

রাণু সান্যাল
বম্বে-৭১

পাহাড়ী সান্যাল

অতুলপ্রসাদ

॥ ছয় ॥

স্টেজ থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে এলাম। স্টেজের পাশেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। সে মাঠটাতে কিছু কিছু জায়গায় চা-চাট এসবের দোকান সাজানো হয়েছে দর্শকদের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে। তখনকার কালে লাইটের এত ঘটা ছিল না, কাজেই সেই স্টলগুলি ছাড়ালেই অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যথাটা নিজের কাছেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করলাম। কেমন যেন মনে হল সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতাম গোলমালটা কোথায়। কিন্তু তখন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছি অভিমানভরে। কেবলই ভাবছি অতুলদা কেন এমন ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। যে অতুলদার কাছ থেকে এমন আদর পেয়েছি, এত আবদার তিনি আমার সহ্য করেছেন, সেই মানুষটি কেন এমন অচেনার মত ব্যবহার করলেন। এই রকম আকাশ-পাতাল যখন ভাবছি তখন হঠাৎ আমার ঘাড়ের উপর একটি হাত পড়ল এবং সংগে সংগে অতুলদার গলা শুনতে পেলাম, "এখানে একলাটি দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

বিশ্বাস করুন, ওই আধো-অন্ধকারে অতুলদাকে ছায়ার মত দেখে আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আমার প্রগাঢ় অভিমানে, প্রচণ্ড ব্যথায় বুকটা কেমন যেন ভেঙে যেতে লাগল। আমিও খুব নির্লিপ্তভাবে বলবার চেষ্টা করলাম, "না—এমনি দাঁড়িয়ে আছি।...তুমি কি চলে যাচ্ছ?"

অতুলদা বললেন, "না; তুমি প্লে দেখছ না, তাই ভাবলাম—কি হল। এক ভদ্রলোকের সংগে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, দেখলাম তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ।"

আমি বোধহয় ছোট্ট করে একটা "ও" বলেছিলাম।

তারপর অতুলদা বললেন, "তুমি বোধহয় এখনো খুব ব্যস্ত।'

আমি ধড়ফড় করে বলে উঠলাম "কই—না তো!"

তিনি বললেন, "তাহলে বোধহয় তোমার অতুলদাকে ভুলে গেছ—না?"

আমি ধরা ধরা গলায় বললাম, "সে কী!".

উনি বললেন, "গান শিখতে বুঝি আর ইচ্ছে করে না?"

এর পরে আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম আমার মনে নেই। ওই অন্ধকারে আমি অতুলদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছে এবং সে জল চোখ দিয়ে গড়িয়েও পড়ছে। আমি থাকতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে

বলে উঠেছিলাম, "তুমি আমাকে ক্ষমা কর অতুলদা। আমি কালই তোমার কাছে গান শিখতে যাব।...তোমার সেই নতুন গানটা কি আর কাউকে শিখিয়ে দিয়েছ নাকি?"

অতুলদা চোখের জল সংবরণ করবার চেষ্টা করে আমাকে বললেন, "গানটা তোমাকেই শেখাব বলে রেখেছি।"

আমি আবদার করে বললাম, "কালকে তুমি আমায় গাড়ি পাঠিয়ে দেবে?"

অতুলদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "নিশ্চয়ই।"

অত অন্ধকার এক নিমেষে যেন সরে গেল। আবার দুজনে গিয়ে পাশাপাশি বসলাম। অতুলদা আরও অনেকক্ষণ থাকার পরে আমাকে উদ্ভাসিত চেহারায় হেসে হেসে বলে গেলেন, "কাল সন্ধ্যাবেলা গাড়ি তোমার কাছে যাবে। আর আমার সঙ্গে খাবে তো বটেই।"

আমার থিয়েটার দেখা তখন চুলোয় গেছে। মনে হল বুঝি আমার হারানো রাজত্ব আবার ফিরে পেয়েছি।

পর্বতের স্বাধীনতা

আরতি দাস

ঢাকা জেলের লৌহগরাদের অন্তরালে দাঁড়িয়ে এক স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেছিলেন, আমার প্রিয় জন্মভূমিতে ক্রীতদাসের মত বাঁচতে চাই না, বরং এই বন্দীশালায় আমি মরবো।

এ উক্তি খাসি পাহাড়ের নঙখলাও (Nongkhlaw) রাজ্যের সিয়েম বা রাজা তিরোত সিংয়ের। নিজের জন্মভূমিকে ইংরাজের শাসন আর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিরোত সিং। নিরস্ত্র হয়েও শুধু সাহস, একাগ্রতা আর অটুট মনোবল নিয়ে মারণাস্ত্রে সজ্জিত অগণন শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি তিনি। নানা সংকট, দুঃখ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নিরন্তর সংগ্রামের শেষ পরিণতি তাঁকে ঢাকার জেলখানার ছোট্ট একটি সেলে বন্দী করে আনল। দীর্ঘ চার বৎসর (১৮২৯-১৮৩৩) যুদ্ধ চলেছিল। সম্মুখযুদ্ধে যখন পরাজয় অনিবার্য বলে মনে হল, তখন আত্মগোপন করে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়েছিলেন তিরোত সিং। আজ থেকে একশ সাঁইত্রিশ বৎসর আগে সিল্লিয়াও পাহাড়ে তিনি ধৃত ও বন্দী হন। প্রথমে গোহাটি, সেখান থেকে ঢাকায় পাঠানো হয় তাঁকে। কুশলী কূটনৈতিক ইংরাজ আপোসের প্রস্তাব দিয়েছিল বন্দী তিরোতকে। আমাদের আনুগত্য স্বীকার কর, নঙখলাওয়ের শাসকের পদে কায়েম করব তোমাকে। সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তিরোত। বললেন, ক্রীতদাসের মত জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চাই না। ঢাকার এই কয়েদখানায় মৃত্যুকে আমি শ্রেয় মনে করি।

সমস্ত পূর্বাঞ্চল আজও এ সংগ্রামের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

॥ ১ ॥

ইংরাজ তখন ভারতের পূর্ব সীমানায় ব্রহ্মপুত্রের সমতলভূমির প্রায় সবটাই অধিকার করেছে। একদিকে আসামের কামরূপ, বিপরীত দিকে বাংলার শ্রীহট্ট পর্যন্ত তার অধিকার। মাঝে বাকী শুধু খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়ী অঞ্চল। ইংরাজেরা দেখলেন, খাসি পাহাড়ের মাঝবরাবর যদি একটি সড়ক তৈরি করা যায় তবে শ্রীহট্ট ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই পথে খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়ী অঞ্চল দখলে আনা সহজ হয়ে উঠবে। এ উদ্দেশ্য নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মেজর ডেভিড স্কট তিরোত সিংয়ের কাছে ধর্না দিলেন। কামরূপের সঙ্গে শ্রীহট্টের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য খাসি পাহাড়ের মাঝ বরাবর যে সড়ক বানাতে চাই, তুমি সেই চুক্তি যদি মেনে নাও, বড়ই বাধিত হব। তিরোতকে বোঝাবার জন্য স্কট একথাও বললেন, সমতলে কোম্পানীর এলাকার মধ্য দিয়ে খাসি ব্যবসায়ীরা যাতায়াত করে থাকে, সুতরাং নঙখলাও এবং প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতের দাবি করতে পারি আমরা।

তিরোত সিংয়ের বয়স তখন মাত্র পঁচিশ বৎসর। ইংরাজের আসল উদ্দেশ্য সরল আদিবাসী এই তরুণ সিয়েম তখন বুঝতে পারেননি। তবুও জানালেন, কোন চুক্তি মেনে নেবার মালিক তিনি একা নন। খাসিরা চিরকাল গণতান্ত্রিক। প্রকাশ্য দরবারে প্রজাসাধারণ, প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্যের প্রধান, মন্ত্রী, দলপতি সকলের সম্মতি না নিয়ে স্বেচ্ছাসুখে কোন সম্মতি দিতে পারেন না সিয়েম।

প্রায় পঁচিশ লোকের সম্মেলনে নঙখলাও দরবারে মেজর স্কটের আর্জি পেশ করলেন তিরোত সিং। চুক্তি মেনে নেবার পক্ষে বিপক্ষে তর্ক বিতর্ক গড়িয়ে চলল সারাদিন। বিলম্বে ধৈর্যচ্যুত স্কট সাহেব বেশ কয়েক বোতল বিলাতী সুরা পাঠিয়ে দিলেন দরবারে। সেসব তৎক্ষণাৎ ফেরত গেল। না, রাস্তা তৈরির ব্যাপারে একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ উপহার গ্রহণ করবে না দরবারের কেউ। দ্বিতীয় দিনের বৈঠক মধ্যরাত পর্যন্ত চলেছিল। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর মেজর স্কটের আবেদন নঙখলাও দরবারে গৃহীত হল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইংরাজের আবেদন মঞ্জুর করে ইঙ্গ-খাসি মৈত্রী স্বীকার করে নিলেন তিরোত সিং।

বন্ধুত্বের প্রথম দিকটা বেশ মসৃণ ভাবেই এগিয়ে চলল। নঙখলাওয়ের ওপরেই রাস্তা তৈরির একটা ঘাটি তৈরি হল। তিরোত সিংয়ের মা ছেলের বন্ধুর প্রতি বিশেষ স্নেহাকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। আদিবাসী খাসিরা ইংরাজ স্কটের কাছে আলু, বাঁধাকপি, বীট, ন্যাসপাতির চাষ করতে শিখল। কিন্তু এ সৌহার্দ্য বেশী সময় স্থায়ী হল না। নয়া সড়ক বানাবার মাঝ পথেই ইংরাজের বন্ধুত্বে সংশয়ী হয়ে উঠলেন তিরোত সিং।

সড়ক তৈরির মজুরদের সঙ্গে একদল সৈন্যও পাঠান স্কট সাহেব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং নবাগত এই সৈন্যদল কিছুদিনের মধ্যেই খাসিদের ওপরে নানারকম জুলুম শুরু করে দিল। জোর করে গরীব খাসির কাছ থেকে খাদ্য-বস্তু নিয়ে যেত তারা। দাম দিত না। কাঠুরে এবং চাষীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে মজুরি দিত না। তাদের ওপর দুর্ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হত না, নানাভাবে জানিয়ে দিত সমতলবাসীর মতই পাহাড়ের লোকদের কর দিতে বাধ্য করবে ইংরাজ। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিরা বোঝাতে চাইত যে প্রভুত্ব করবে বলেই এ অঞ্চলে পদার্পণ করেছে ইংরাজ। কোম্পানীর অধীনস্থ সিপাহীদের বর্বরের মত আচরণে যখন কুমারী মেয়েরা বিপন্ন হয়ে উঠল তখন ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত খাসি জনসাধারণ প্রতিকারের জন্য তিরোতকে চাপ

গেল। তিরোতের যারা শত্রুপক্ষীয় রাজ তলে তলে তাদের উসকানি দিচ্ছে এ রে তিরোত সিং নিজের মারাত্মক ভুল রতে পারলেন। ইতোমধ্যে গৌহাটি ও হট্টে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে রাজ।

সর্বদিক বিবেচনা করে ১৮২৯ ষ্টাব্দের মার্চের শেষে ইংরাজকে খাসি হাড় ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন রোত সিং। মঙখলাওয়ের উন্মুক্ত বারে বিদেশীদের নির্মূল করবার পরি-পনা গৃহীত হল। ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ফটেনাণ্ট বুরটন ও বেডিং ফিল্ডকে ঙখলাও দরবারে আহ্বান করা হল। সামান্যই বেডিং ফিল্ড ও তাঁর অনুচরদের ত্যা করল খাসিরা। বুরটন অশ্বারোহী পাহীদের নিয়ে কামরূপ পালাতে চেষ্টা রলে খাসিরা তাদের পিছু নিয়ে মাঝ-থই তাদের সকলকে হত্যা করে। এই ঘর্ষে ইংরাজের এক গ্যারিসন সৈন্য পূর্ণ বিনষ্ট হয়। তিরোত সিংয়ের মা বাঁকেই এই পরিকল্পনার বিষয় মেজর টকে জানিয়েছিলেন। তিনি স্কটকে পুঞ্জিতে পালিয়ে যাবার উপদেশ দেন। স্কট মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে ফ্লাঙ (Maw-phlang) চলে গেলেন। রিম পৌঁছে সেখানকার শাসকের খাসি কৃষকের ছদ্মবেশে চেরাপুঞ্জি ছিলেন তিনি। চেরাপুঞ্জীর উ দুওয়ান স্কটের মাধ্যমে ইংরাজের সঙ্গে মৈত্রী-তে আবদ্ধ হলেন। তিরোত সিং তথা খলাওয়ের সিয়েমদের সঙ্গে আগে কই শত্রুতা ছিল দুওয়ান সিংয়ের। য়ান সিং ইংরাজকে শুধু ঘরের মধ্যে ক এনেই ক্ষান্ত হননি, চেরাপুঞ্জীতে ই তৈরি করে বৃটিশের সৈন্য সমাবেশের বধা করে দিয়েছেন। এভাবে শুরু কই কিছু সংখ্যক খাসি সর্দার ও সিয়েম তের বিপক্ষে ইংরাজের সহায়তা করে।

॥ ২ ॥

যুদ্ধ ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। দলসহ বুরটন ও বেডিং ফিল্ডের র সংবাদ ইংরাজ কর্তৃপক্ষের কাছে ছবামাত্র কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম আদেশ দেওয়া হল, বিদ্রোহী তিরোত কে দমন করে তাকে যেন বন্দী করে আনা কিন্তু বৃটিশ কাজটাকে যত সহজ ছিল ঠিক তত সহজ হল না। চেরা-পুঞ্জীতে ইংরাজের নেতৃত্বে শক্তিশালী সৈন্য-জমায়েত হতে লাগল। অপরপক্ষে রাও প্রস্তুত হতে লাগল। এ প্রস্তুতি সাহস, একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতার। দের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে দের প্রধান হাতিয়ার ছিল তীর ধনুক এবং কিছুসংখ্যক দিশী গাদা বন্দুক।

মাইরাঙে তিরোত স্মৃতিস্তম্ভ। ১৯৫৩ সালে স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচনের পর তৎকালীন আসামের রাজ্যপাল জয়রামদাস দৌলতরাম এবং তাঁর পাশে স্থানীয় 'সিয়েম' কেড্রো মানিক সিং

এ যুদ্ধে তিরোত সিংয়ের প্রথম ও প্রধান সহায় ছিলেন মিল্লিয়েম অঞ্চলের সিয়েম বরমাণিক। মাওইয়াঙ, মাওসিনরাম, মাহারাম রাজ্য তিরোতের পক্ষে আসে। সোবার, ওয়ালঙ, মাওডন সেল্লা, দোয়ারা নঙতিরমেন থেকেও তিরোত সিং সাহায্য ও সমর্থন পান। উত্তরের দিকে রামব্রাই মিরিয়াও এবং নঙপোর খাসিরা কোম্পানীর বিরোধিতা করে তিরোতের দিকটা জোরদার করে তোলে। যেসব রাজ্যের সিয়েম তিরোতের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং সক্রিয়ভাবে ইংরাজের বিপক্ষে বিদ্রোহে যোগ দেন তাঁরা যথাক্রমে মাওসিনরামের অধর সিং, বিরুঙের সুকসিয়েম, ডাওয়ালের ঘার সিয়েম, রামব্রাইয়ের জিবর সিং এবং মিরিয়াওয়ের লার্ সিয়েম।

সবচেয়ে বিস্ময়কর চেরাপুঞ্জির রাজা উ দুওয়ানের ভাগ্নে মুকেন সিংয়ের কাহিনী। দুওয়ান ইংরাজের সহায়ক হলেও মাউস-মাইয়ের মালিক মুকেন সিং বিদ্রোহীদলে যোগ দেন। যুদ্ধের মাঝপথে ইংরাজ তাকে যথেষ্ট লোভ দেখিয়েও দলে টানতে পারেনি। এই বিদ্রোহে সমর্থন পাবার জন্য তিরোতের পক্ষ থেকে জয়ন্তীয়া, আসাম এবং ভুটানেও লোক পাঠানো হয়। প্রায় সমস্ত খাসি পাহাড় জুড়ে এই ব্যাপক সংঘর্ষে যারা যোগ দেননি এবং নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে যুদ্ধের হারজিত লক্ষ্য করেছেন তাদের মধ্যে খাইরিম, নঙসপুঙ এবং নঙস্টোইনের নাম করা যেতে পারে।

ওদিকে শ্রীহট্ট থেকে ক্যাপটেন লীস্টার ও গৌহাটি থেকে লেফটেন্যাণ্ট ভেচ এসে ডেভিড স্কটের সঙ্গে যোগ দিলেন।

॥ ৩ ॥

ডেভিড স্কট ও ক্যাপটেন লীস্টার চেরাপুঞ্জী থেকে মাউসমাই ও মাওমলুর দিকে অভিযান চালালেন। হয়তো বা পথ চিনিয়ে দিতেই কোম্পানীর ফৌজের সঙ্গে কিছু খাসি অনুচর দিলেন উ দুওয়ান সিং। মাওমলুর পাহাড়ের উঁচুতলা থেকে অসংখ্য খাসিকে নামিয়ে এনে তাদের গুলি করে হত্যা করল ইংরাজ। মাউসমাই দুওয়ান সিংয়ের ভাগ্নে মুকেন সিংয়ের এলাকা। বিদ্রোহী অনুচরদের নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মুকেন মাউসমাই রক্ষা করতে পারলেন না। মাউসমাইয়ের পতন হতেই মুকেন সিং দক্ষিণের দিকে পালিয়ে গেলেন এবং সেখানকার খাসিদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

ভূমিকের অঞ্চলে ছোট ছোট গ্রাম। অস্ত্র-শস্ত্র নেই। তা সত্ত্বেও গ্রামের লোকেরা হাতের কাছে যা ছিল সেই সব হাতিয়ার নিয়ে কোম্পানীর ফৌজকে সরাসরি আক্রমণ করল। ফলে ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মত নিশ্চিহ্ন হতে লাগল খাসিরা।

লোন্থার ওয়াদাদাররা আগে থেকেই কোম্পানীর ওপরে আক্রোশ পুষে রেখেছিল। নানা জায়গায় ঘাঁটি তৈরী করে মরিয়ার মত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা। তা সত্ত্বেও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লোন্থার পতন হল। শেষ পর্যন্ত লোন্থার চারজন ওয়াদাদার চার হাজার টাকা দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হল। ওয়ালঙের সুক সিয়েম স্বতন্ত্রভাবে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েও ওয়ালঙ রাখতে পারেননি এই বীর সংগ্রামী।

চারদিকে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে তখন চেরাপুঞ্জীর রাজা উ দুওয়ান ইংরাজের সঙ্গে নতুন করে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। মিত্রতার উপহার হিসেবে তিনি ইংরাজকে মাইওসোপেন অঞ্চল উপহার দিলেন। পরিবর্তে শ্রীহট্টের পাণ্ডুয়া এলাকায় কিছু জমি পেলেন। মাইওসোপেন দখলে আসায় সেখানে ঘাঁটি বসিয়ে যুদ্ধ চালাবার খুবই সুবিধা হল ইংরাজের।

দোয়ারা নঙতিরমেনের খাসিরা অবিশ্রান্ত লড়াই করছিল যাতে বৃটিশের ফৌজ তাদের রাজ্যে কোনমতেই না প্রবেশ করতে পারে। এ যুদ্ধে খাসিরা হেরে যায়। কিন্তু সেই থেকে দোয়ারার নতুন নাম হল ওয়ারডিং, যার অর্থ আগুনে জ্বালানো অঞ্চল।

এবারে তিরোত সিংয়ের বিশ্বস্ত অনুগামী মুকেম সিংকে হাত করবার জন্য ইংরাজ খুব উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। মাওলমাই ফিরিয়ে দিয়ে মুকেম সিংকে রাজা করা হবে সেখানে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন ডেভিড স্কট। উ দুওয়ান ইংরাজের পক্ষে যোগ দেবার জন্য মুকেমকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করলেন। প্রচুর টাকাকড়ি ও মূল্যবান উপহার সামগ্রীর লোভ দেখানো সত্ত্বেও মুকেম সিং এ ফাঁদে পা দিলেন না। পুনর্বার বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

॥ ৪ ॥

এবারে নঙখ্লাও অবরোধ করবার জন্য কোম্পানীর ফৌজ তৎপর হয়ে উঠলো। স্কট লোক পাঠিয়ে তিরোত সিংকে ১৮২৯ সালের সেই পুরোনো চুক্তি মেনে নেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিরোত কোনমতেই রাজী হলেন না। নঙখ্লাও রক্ষার জন্য সর্বরকমে প্রস্তুত হতে লাগলেন তিনি। নঙখ্লাওয়ের সাহসী মেয়েরাও যুদ্ধে যোগ দিল। শিশু ও বৃদ্ধেরা ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকল। অস্ত্রের অভাবে দেশজ তরবারি ও একখানি ঢাল সম্বল করে সক্ষম পুরুষমাত্রই এগিয়ে এল। শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী খাসিরা তীর-ধনুক নিয়ে গাছ, পাহাড়ের আড়ালে শত্রুর অপেক্ষায় লুকিয়ে রইল। এপ্রিলের (১৮৩০) মধ্যেই ক্যাপটেন লীস্টার কয়েকটি বিদ্রোহী গ্রাম দখল করে নঙখ্লাওয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। খাসিরা নঙখ্লাও যাবার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। প্রবল সংঘর্ষে লীস্টার ও তিরোত সিং দুজনেই আহত হলেন।

নঙখ্লাওয়ের এই অবরোধের সময় দেশরক্ষার জন্য খাসি মেয়েরা কিভাবে প্রাণ-পণ চেষ্টা করেছিল তার দু-একটি কাহিনী এ অঞ্চলের মানুষেরা আজও মনে রেখেছে। কা ফান নঙলাইট নামের একটি মেয়ে কোম্পানীর ফৌজের একদল সৈন্যকে আতিথ্যের ছলনায় ভুলিয়ে ডেকে আনে। নানা কৌশলে মুগ্ধ করে তাদের অন্য-মনস্কতার সুযোগে এক জায়গায় জড়ো করে রাখা বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র নঙরমাইয়ের নদীতে ভাসিয়ে দেয় মেয়েটি। ফৌজের সিপাহীরা ব্যাপারটা অবহিত হবার আগেই খাসিরা জঙ্গলের পেছন থেকে আক্রমণ করে সমস্ত দলটাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

নঙখ্লাও থেকে তিরোত সিংকে যে সহজে হটানো যাবে না একথা বুঝতে পেরেই গৌহাটি থেকে একদল সৈন্য নিয়ে লেফটেনাণ্ট ভেচ্ এগিয়ে এলেন। কিন্তু নঙখ্লাও পৌঁছবার আগেই প্রবল প্রতি-রোধের সম্মুখে পিছিয়ে যেতে হল তাঁর। পশ্চাদপসরণের পথে সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেল ইংরাজ। আগুন জ্বালাবার হেতু দেখাতে গিয়ে স্কট সাহেব বলছেন, জঙ্গলের মধ্যে শত্রুরা লুকিয়ে থাকে, তাদের গ্রাম পাহাড়ের উঁচু টিলায়, আমাদের সৈন্যদের অবস্থান নিরাপদ করবার জন্যই জনপদের ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালাতে বাধ্য হয়েছি আমরা। কিন্তু ক্রমশ [illegible] হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

ঘরের আগুন থেকে বাঁচতে গিয়ে যখন বাইরে এসে বন্দুকের গুলিতে মরছিল খাসিরা, তখন ডেভিড সাহেব তাঁর স্মৃতি-কথায় যে শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন তা রোমসম্রাট নীরোর কাছাকাছি পৌঁছয়। তিনি লিখছেন:

.... looking upwards, a lofty pillar of fire rose from the deserted village, and beyond it dense column of smoke towered up to the highest heaven, presenting an object of great sublimity ..... : a strange Bacchanalian scene. (Memoir of the late David Scott)

সময়কাল ফিরে গিয়ে লেফটেনাণ্ট ভেচ আরও দু দল সৈন্য সংগ্রহ করেন। ক্যাপটেন উরকুহার্ট (Capt. Urquhart) এবং এই দুই দল সৈন্যসহ ভেচ আবার নঙখ্লাও ফিরে এসে লীস্টারের সঙ্গে যোগ দিলেন।

॥ ৫ ॥

নঙখ্লাও রাজ্যে বিভীষিকার রাজত্ব নেমে এল। ক্ষেতে ফসল বোনা হয়নি। জ্বলে যাওয়া ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানুষের সাড়া নাই। লোহার খনির কামারশালা বন্ধ। ফৌজের সিপাহীরা নিরীহ গ্রামবাসীদের যা কিছু হাতের কাছে পেয়েছে নির্বিচারে নষ্ট করেছে সব। পোড়া মাটি ছাই আর ইতস্তত ছড়ানো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের নিঃশব্দ হাহাকার তিরোত সিংয়ের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে উঠল। তিরোত বুঝলেন সম্মুখযুদ্ধে কোন লাভ নাই।

তবু নিরাশ না হয়ে সংগ্রাম অবিচল রাখলেন তিরোত সিং। গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাবেন বলে মনস্থির করে দলবল নিয়ে এক গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। সে গুহাকে এখনও লোক কেম তিরোত বা তিরোতের গুহা বলে থাকে। এই সময় গারো, মিকির, জয়ন্তীয়া এবং আরও অধিবাসীরা বিদ্রোহে যোগ দিল।

ওদিকে নেপালী, শিখ, গুর্খা, পুরবী সৈন্যদের এনে কোম্পানীর ফৌজে শক্তি বৃদ্ধি করছিল ইংরাজ। রামরাই, মিরিয়াও এবং উত্তরের আরও কয়েকটি অঞ্চলের যুদ্ধে হার হল খাসিদের।

অন্যভাবে বাধ্য হয়েই তিরোত সিং তাঁর দলবল নিয়ে তিরেপ্গারেই পাহাড়ে সরে এলেন। সেখান থেকেই গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

দেশে খাদ্য নেই। দেশের যারা বীর সন্তান তারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, নয়তো ইংরাজের হাতে বন্দী। কামরূপের সঙ্গে খাসি পাহাড়ের সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ইংরাজ। ফৌজের সিপাহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার কাজে লেগেছে। এই দুর্দিনে লাইতক্রর (Laitkroh) প্রচণ্ড যুদ্ধে তিরোত সিংয়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সহায়ক বন্ধু বরমাণিক ইংরাজের হাতে বন্দী হলেন। শেষ পর্যন্ত সিংমাণিককে খাইরিম (Khyrim) রাজ্যের সিয়েমের পদ ছেড়ে দিতে রাজী হওয়ায় ইংরাজ বরমাণিককে মুক্তি দিয়ে নজরবন্দী করে রাখল। কিন্তু বরমাণিককে তাঁর রাজ্যে আর কখনো দেখা যায়নি। জনশ্রুতি, কিছু অনুচর নিয়ে তিব্বতে পালিয়ে যান বরমাণিক এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন কাটান।

সিংমাণিক খাইরিমের সিয়েম্ হওয়ায় ইংরাজের খুবই সুবিধা হল। কেননা শান্তিপ্রিয় সিংমাণিক যুদ্ধে যোগ না দিয়ে প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ছিলেন। দেশের বিশৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি ইংরাজের প্রতি বিশেষ বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়েন।

বিদ্রোহী মুকেনসিংও যুদ্ধে ইংরাজের কাছে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ তাঁকে বন্দী করে শ্রীহট্টে পাঠাল। সামান্য বৃত্তিভোগীর মত শ্রীহট্টেই মুকেনসিংয়ের জীবনের অবসান ঘটে।

দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা, অরাজকতা সারা দেশকে গ্রাস করছিল ক্রমশ। জাতীয় চেতনা কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছিল। তিরোত-সিংয়ের সমর্থকরা একে একে দল ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। মাওসিনরামের (Mawsynram) সিয়েম অধর সিং তিরোতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর সেনারা নিষ্ঠুরভাবে তাঁর রাজ্যের লোকদের হত্যা করছিল। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। নিরুপায় অধর সিং ১৮৩১ সালের ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ডেভিড স্কট অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরই ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সমস্ত কর্তৃত্বভার নিয়ে রবার্টসন এলেন। রবার্টসন এখানে পৌঁছেই খাসি পাহাড়ে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে বিদ্রোহীদের পর্যুদস্ত করবার চেষ্টায় উদ্যোগী হয়ে পড়লেন। খাসি পাহাড়ের সমস্ত বাজার বন্ধ করে দিলেন। ফলে খাসিদের আর্থিক সঙ্কট দুঃসহ হয়ে উঠল। দুই দল গুর্খা সৈন্য এবং দু শো নেপালী ও মান সৈন্য আমদানি করলেন রবার্টসন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আরও কিছু য়ুরোপীয় অফিসার এলেন খাসি পাহাড়ে।

মাত্র তিনজন ঘনিষ্ঠ অনুগামী নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিরোত সিং। এ তিনজনের নাম মনভুত, লরসন আর খেইন্ কোঙর্। (Monbhut, Lorshon, Khein Kongor) আকস্মিকভাবে তিরোতের এক আত্মীয়কে হত্যা করে ফেলে ভয়ে বিচলিত মনভুত তিরোতের দল ছেড়ে পালিয়ে যান। পরে ইংরাজ ক্যাপ্টেন টাউনসেণ্ডের (Townsend) কাছে আত্মসমর্পণ করেন। দারুণ দুঃসময়ে মনভুতের মত ক্ষিপ্র, কুশলী এবং দুর্দ্ধর্ষ বীরের দলত্যাগে তিরোত সিং যে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন সে কথা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

নানাভাবে তিরোতকে কোণঠাসা করে এনে এবারে অন্য পথ ধরলেন ইংরাজ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে লিস্টার ও রাদার ফোর্ড অনুচরদের নিয়ে নঙ্ক্লেম এসে পৌঁছন এবং সিংমাণিকের সঙ্গে বন্ধুভাবে দেখা করেন। ইংরাজ তিরোত সিংয়ের সঙ্গে আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক জানিয়ে সিংমাণিককে তিরোতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করলেন তাঁরা। সিংমাণিক এই মর্মে বার্তা পাঠালেন এবং কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী হলেন তিরোত সিং।

সিংমাণিক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে তিরোত সিং নঙ্ক্লেমে ইংরাজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলেন। এই আলোচনায় কোন ফল হল না। কারণ তিরোত সিং দাবি করলেন ইংরাজকে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।

এর পরে ইংরাজ নূতন করে যুদ্ধ শুরু করল। তিরোত সিং এক জায়গায় আত্মগোপন করে রইলেন। খাসি পাহাড়ে অর্থনৈতিক অবরোধ আরও কঠিনভাবে আরোপ করা হল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মলাই সোহাতরের সিয়েম ক্যাপ্টেন ইংলিজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ডিসেম্বরে জাওয়াদের ফার সিয়েম (Phar Syiem) ক্যাপ্টেন টাউনসেণ্ডের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলে ইংরাজের কড়া হুকুমে এই দুই সিয়েমই বিদ্রোহীদের বাজারে আসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

এখন তিরোত একা। তাঁর সঙ্গীরা অনেকেই মৃত অথবা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। অনেকে বাধ্য হয়ে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেছে। ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দেশের ও দেশবাসীর ধ্বংস ডেকে আনা নিশ্চিত মনে করে অনেক খাসি রাজা আগেই সন্ধি করেছেন। নিরুপায় দেখে তিরোত্ সিং তাঁর মন্ত্রী জিত্ রায়ের মাধ্যমে ক্যাপটেন ইংলিজের কাছে শান্তির প্রস্তাব করে পাঠালেন। সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে সিল্লিয়াঙ উম্ (Shilliang Um) পাহাড়ে, ইংরাজের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন। ধূর্ত ইংরাজ এ সুযোগ হাতছাড়া করেনি।

॥ ৬ ॥

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের তেরই জানুয়ারী সিল্লিয়াঙ পাহাড়ের এক মাইল দূরের নরসিং গিরিতে ক্যাপটেন ইংলিজের সঙ্গে তিরোত দেখা করতে আসেন। খাসি প্রথায় তরবারির ফলায় রাখা লবণে জিভ ছুঁইয়ে ইংলিজ আগেই শপথ নিয়েছিলেন যে তিরোত্ সিংয়ের কোন রকম অনিষ্ট করবে না ইংরাজ। কিন্তু আসামাত্রই ধৃত ও বন্দী হন তিরোত্ সিং।

শৃঙ্খলিত তিরোতকে প্রথমে গৌহাটিতে, তারপর ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করে নঙখ্লাওয়ের শাসকের পদে ফিরে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তিনি।

ঢাকার বন্দীশালায় ছোট একটি সেলে মাত্র দুখানি কম্বল ও একজন অনুচর দেওয়া হয় তিরোতকে। অনভ্যস্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় দীর্ঘ [illegible] কারাবাসের যন্ত্রণার পর একদিন মৃত্যু এসে মুক্তি দিল তাঁকে।

মৃত্যুর আগে অনুচরকে ডেকে তিরোত বলেন, তুমি আমার দেশের মানুষকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বোলো, একজন [illegible] রাজার মতই মৃত্যু হয়েছে আমার।

উপন্যাস

সূর্য কাঁদলে সোনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র। গ্রন্থ-প্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পনর টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিভা বহুমুখী। সাহিত্যকে একটি তরু হিসেবে কল্পনা করে বলতে পারি যে, তার হরেক শাখায় তিনি হরেক রকমের ফুল ফুটিয়েছেন। সে-সব ফুলের প্রত্যেকটিই বর্ণে সমুজ্জ্বল, গন্ধে মনোহারী। কবিতা, কথাসাহিত্য, শিশু-সাহিত্য, রহস্য-কাহিনী, ছড়া—বাংলা সাহিত্যের যেদিকেই তাকাই, তাঁর অসংখ্য উজ্জ্বল রচনা আমাদের চোখে পড়ে। বুঝতে পারি, তাঁর কল্পনা বৈচিত্র্যে স্ফূর্তি পায়, তাঁর আগ্রহ নিতান্ত একটি-দুটি ক্ষেত্রের সীমায়িক পরিসরে আবদ্ধ থাকতে চায় না। তার চাইতেও বড় কথা, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই কল্পনাশক্তি ও আগ্রহ তো ঝিমিয়ে যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু অদ্যাপি সেই দুর্ঘটনা ঘটেনি। ষাট পেরিয়েছেন, তবু লেখক হিসেবে তাঁর চিত্ত আজও সমান সতেজ, সৃষ্টির নতুন-নতুন ক্ষেত্র খুঁজে নেবার ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা আজও সমান অক্লান্ত। তার সাম্প্রতিক প্রমাণ এই বিপুলকলেবর গ্রন্থ, 'সূর্য কাঁদলে সোনা'।

'সূর্য কাঁদলে সোনা'কে যে সাহিত্যের ঠিক কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করব, বুঝে উঠতে পারছি না। উপন্যাস অবশ্যই। কিন্তু কোন জাতের উপন্যাস? এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে শ্রীঘনশ্যাম দাসের মুখ দিয়ে। ঘনশ্যাম দাস, অর্থাৎ অবিস্মরণীয় সেই ঘনাদা। বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই যাঁর কীর্তি-কাহিনীর খবর রাখেন। এবং ঘনাদা যখন গল্প বলছেন, তখন সেই গল্পের মধ্যে বেশ-কিছুটা প্রীতিকর অনৃতভাষণের ময়ান থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। সেই ময়ান যে এই উপন্যাসে আদৌ নেই, এমন কথা বলছি না। কিন্তু একই সঙ্গে বলতে হয় যে, সেই অনৃতভাষণ কিংবা অবিশ্বাস্য অতিশয়োক্তির সম্পর্কে নেহাতই মূলে কাহিনীর ডালপালা আর পত্রপল্লবের সঙ্গে; পক্ষান্তরে, কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার যে রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে আশ্রয় করে এই উপন্যাস দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে কোথাও কোনও ফাঁকি নেই। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র সূচনায় বলা হয়েছে যে, এর 'ভৌগোলিক বিস্তৃতি ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূল থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব তীরের উত্তুঙ্গ আণ্ডিজ পর্বতমালার দেশ পেরু সাম্রাজ্য পর্যন্ত। সময় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক।' প্রশ্ন উঠবে, এই যার স্থান ও কালগত পটভূমিকা, সেই কাহিনী ঘনাদার মতন মানুষকে দিয়ে বলানো কেন? বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মহিমা কি এর ফলে ক্ষুণ্ণ হয়নি? উত্তরটা নিশ্চয় এই যে, বিষয়বস্তু যতই গুরুভার হোক, তার আখ্যানকেও গুরুভার করে তুলবার কোনও ইচ্ছাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, ঐতিহাসিক নানা ঘটনা-সংঘাতের ঘনঘটার মধ্যেও পাঠক যেন স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারেন। সেইজন্যেই তিনি হাল্কা চালে, রঙ্গ-কৌতুক-ব্যঙ্গ-পরিহাসের ভিতর দিয়ে, তাঁর কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন; এবং সেইজন্যেই তাঁর দরকার হয়েছিল ঘনাদাকে।

চিত্তাকর্ষক সেই কাহিনীর নায়ক অবশ্য ঘনশ্যাম দাস নন; নায়ক তাঁর পূর্বপুরুষ ঘনরাম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'আগ্রা যখন টলমল' গ্রন্থেই সেই কাহিনীর কিঞ্চিৎ পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। এ যখনকার কথা, একটার-পর-একটা দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযাত্রা তখন ইউরোপের রক্তে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন ঐশ্বর্য আবিষ্কারের সে এক আশ্চর্য যুগ। 'সূর্য কাঁদলে সোনা' যেন ইতিহাসের সেই অতীত অধ্যায়ের মধ্যে, প্রায় মন্ত্রবলে, আমাদের টেনে নেয়। তার আনন্দ ও যন্ত্রণা, প্রণয় ও বিদ্বেষ, ঔদার্য ও শঠতা, উন্মাদনা ও রক্তপাত আমাদের অস্তিত্বকেও ভয়ংকর-ভাবে আলোড়িত করতে থাকে। মনে হয়, তার পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে আমরাও যেন এক দুরন্ত অভিযাত্রায় বার হয়ে পড়েছি। কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের ছত্রিশ বছর পরের এই ঘটনাবলীর মধ্যে এমনভাবে

আমরা প্রবিষ্ট হই যে, নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের কথাটা আর আমাদের মনেই পড়ে না।

শাসক পেড্রারিয়াসের প্রতিনিধি বাল-বোয়াকে যখন কান্তিকলা দে অয়োর একজন আদিবাসী-সর্দার বলে, "এমন দেশের খোঁজ আমি দিতে পারি, যেখানে...সূর্য কাঁদলে সোনা ঝরে", তখন থেকেই জমে ওঠে এই উপন্যাসের কাহিনী। অতঃপর অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে, অসংখ্য ষড়যন্ত্র সংঘর্ষ আর কূটকৌশলের পথ বেয়ে সেই কাহিনী, কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত লয়ে, তার পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। এবং তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে লেখক অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন বলেই কাহিনীর অগ্রগতি কোথাও বাধা পায় না। তখনকার মানুষ, তাদের আচার-আচরণ, নগর-বিন্যাস, স্থাপত্য ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারের বর্ণনায় লেখক তাঁর এই উপন্যাসে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, বস্তুত তা চমকপ্রদ।

'সূর্য কাঁদলে সোনা'কে তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসই বলা যাক। কিন্তু একই সঙ্গে বলা দরকার যে, বাজার-চলতি আর-পাঁচটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে এর কোনও তুলনাই চলে না। এ-বইয়ের শৈলী ও স্বাদ একেবারে স্বতন্ত্র।

কবিতা

অহংকার, হে আমার। শান্তি লাহিড়ী, কবয়ঃ, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

সাম্প্রতিক কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে শান্তি লাহিড়ী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ইতিপূর্বে অনেকগুলি কবিতার বই তাঁর প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রথম থেকেই একটা স্বাতন্ত্র্যে তিনি উজ্জ্বল। সেই স্বাতন্ত্র্য কোনো জটিল দুর্বোধ্যতা বা দুর্মোচ্য কোনো দার্শনিকতায় নয়, স্বাভাবিক বিষণ্ণ জীবন ভাবনায়। 'স্বাভাবিকতা' গত দু-দশকের যে কজন কবি অর্জন করতে পেরেছেন শান্তি লাহিড়ী তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁর কবিতাগুলি স্বাভাবিক প্রতীকী ছবির মধ্য দিয়েই ব্যঞ্জনার মাধুর্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে। জীবন, মৃত্যু, ছোট ছোট বিরহ-বিচ্ছেদ, প্রেম, ছোট ছোট ভালোবাসার মুহূর্ত, দুঃখ-সুখের দোলা এই সমস্তই শান্তির কলমে আশ্চর্য রক্তিম হয়ে ফোটে। সমস্ত জীবনের বর্ণোচ্ছ্বাস মূলত যে দুঃখেরই ছোঁয়ায় রক্তিম একথা শান্তির কবিতা বার বার মনে করিয়ে দেয়, এ কাব্যেও সেই রক্তিমতার অভাব নেই : 'কারো ঘরে আজ অন্নকূট/দুয়ারে আল্পনা দিতে দিতে রং-এর বাটিতে লাগে রক্তের ছোঁয়া/দুঃখ বলতে আমি এটুকুই বুঝি।... তোমরা কেউ আমাকে একটা দুঃখের চারা গাছ দিও।'

কিন্তু বিষাদ থেকে কবি যখন মাঝে মাঝে উঠে আসেন তখন সুখের জন্যে কী তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কবি যে অস্থির হয়ে ওঠেন তার প্রমাণ আছে 'আস্তাবলে ঘোড়াগুলি' কবিতাটিতে। বোঝা যায় বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে 'গুপ্ত কথকের মধ্যে সিন্দুকের নিচে' রেখে কবি বিষাদজয়ী 'সবচেয়ে বড় রাজা' হবার চেষ্টা করেন; অনাত্রই দেখি, কোনো এক হিরন্ময় বাঁকের প্রত্যাশায় নিজেকে দৃঢ় বিশ্বাসে নিঃশেষ করে দেন, অস্থির অস্তিত্বের অতিবিম্ব কখনো নিশ্চয় স্থির হবে এই ভেবে কবি প্রতীক্ষা করেন এবং এই সব ক্ষেত্রেই কবিকে সবচেয়ে বড় জীবন রসিক বলে মনে হয়। জীবনের অহংকার ডুবে গেলে কবি যে মমতাময় একটি সকালে পৌঁছোবেন এই বিশ্বাস কবি তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যে দিতে পেরেছেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

সঙ্গীত

তান-আলাপ। শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য। এস চন্দ্র অ্যান্ড কোং, ৪, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা॥

"তান-আলাপ" গ্রন্থটির বিশেষত্ব এই যে, তান ও আলাপের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সত্তরটি রাগের পরিচয় এতে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত এত বেশী রাগের বিবরণ খুব কম গ্রন্থেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া এতে বহু তালের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দশটি ছোট খেয়ালের স্বরলিপিও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যথার্থ পদ্ধতি অনুযায়ী তানের প্রয়োগ সকলে করতে পারেন না, যদিচ আজকালকার আসরে শিল্পীদের মুখে প্রচুর তানকর্তব শোনা যায়। আলাপের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে রাগের বিস্তার কম শিল্পীই করতে পারেন। এই গ্রন্থে যত্নসহকারে আলাপ ও তানের পদ্ধতি নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অল্প আয়াসেই এই গ্রন্থ থেকে এই সব তান-আলাপ শিক্ষা করতে পারেন। গ্রন্থটি রেফারেন্সের পক্ষেও প্রয়োজনীয় হবে। সংগীতশিক্ষার দিক থেকে এটি একটি উত্তম গ্রন্থ।

বিশ্ব বিজয়ী বাঙালী মল্লবীর

ক্যামেরায় সদ্য তোলা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মল্লবীর গোবর গুহের যে ছবি এই সঙ্গে ছাপা হচ্ছে তার বর্ণ সত্যিই পাংশু। ছবি না বলে ছায়া বলাই হয়তো সংগত। কেননা এই ছবি বা ছায়া দেখে কায়ার অধিকারী ৮০ বছরের বৃদ্ধ মানুষটির গৌরবদীপ্ত জীবনের সত্যিকার কাঠামো এবং স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের আন্দাজ পাওয়া শক্ত। অথচ এই কাঠামোই একদিন অযুত শক্তির অধিকারী ছিল। এই কাঠামোই একদিন কুস্তি জগতের কুতব শীর্ষে আরোহণ করেছিল। খেলাধুলোর একক কৃতিত্বে বিশ্ব জয়ের সম্মান অধিকারী একমাত্র বাঙালী গোবর গুহ।

ছবির পাংশু বর্ণের মত ক্রীড়ামোদিদের মধ্যে বোধ হয় গোবর বাবুর কীর্তির স্মৃতিও আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে। এবং গোবর বাবুর গৌরব-রবি অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে মল্লক্রীড়ায় বাঙালীর ঐতিহ্য। শুধু বাঙালীর কেন, মহাভারতের উপাখ্যান অনুযায়ী কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে যে ক্রীড়ার কদর ছিল, যে ক্রীড়ায় ভারত এক সময় জগৎ সভায় পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ আসন সেই মল্ল ক্রীড়া আজ রীতিমত উপেক্ষিত।

সেদিন গোবরবাবু দুঃখ করেই বললেন, "কুস্তি বোধ হয় বাংলা থেকে একেবারে উঠেই যাবে। কই কারো তো তেমন আগ্রহ দেখি না, আমাদের খেলাধুলো পরিচালনার কর্তা ব্যক্তিরাও কুস্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ এক সময় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, এমনকি শহরের শিক্ষিত বঙালী সমাজে মল্লক্রীড়ার কি কদরই না ছিল!"

দুঃখ হবারই কথা। কারণ মায়ের সঙ্গে সন্তানের, মাতৃভূমির সঙ্গে দেশের মানুষের যেমন সম্বন্ধ, মল্লক্রীড়ার সঙ্গে গোবর বাবুর এবং দর্জিপাড়ার গুহ বংশেরও তেমন সম্বন্ধ। দূরে অতীতে মল্লবীরেরা রাজা মহারাজার অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা এবং আতিথ্য পেলেও কলকাতার শিক্ষিত বাবু সমাজের মধ্যে আখড়ার মাটি মাখার সাধনা এবং ব্যায়াম চর্চায় অনুপ্রেরণা দেবার পথিকৃৎ হচ্ছেন গোবর বাবুরই পিতামহ স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ গুহ।

গোবর বাবুর নিজের কথায় পরে আসছি। তার আগে মল্ল ক্রীড়ায় এঁদের পারিবারিক অবদানের কথা বলা প্রয়োজন।

একশো বছরেরও আগের কথা। ১৮৫৭ সনে দর্জিপাড়ার গুহদের বসতবাড়ির পাশে মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে মল্লযুদ্ধের আখড়া স্থাপন করেছিলেন অম্বিকা চরণ গুহ, ইনি কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে অম্বু নামে পরিচিত ছিলেন। ধন, জন, বিত্ত, বৈভব, [illegible] অভাব ছিল না গুহদের। অম্বু [illegible]

কলকাতার অভয় গুহ স্ট্রীট, তিনি সাত সাতটি বিলিতী অফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন। বাড়িতে ভোজপুরী দারোয়ান গুলো নিত্যই গায়ে মাটি মেখে মল্লক্রীড়ার মহড়া দিত। তাদের বিশালকায় দেহ দেখে অম্বু বাবুরও শিশুমন আখড়ার মাটি মাখতে চাইত। ভাবতেন ওদের মত শরীর বাগানো যায় না! শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদা শিবচরণ গুহের উৎসাহে এবং অর্থানুকূল্যে

৮০ [illegible] গুহ

বাড়ির পাশেই আখড়া তৈরি হল। চোবে পণ্ডিতরা মথুরা থেকে বয়ে নিয়ে এল মল্লবীরদের আরাধ্য দেবতা বীর হনুমানের প্রস্তর মূর্তি। শাস্ত্রসম্মত বিধিবিধান এবং পূজা পার্বণের মধ্য দিয়ে সে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল আখড়ার অঙ্গনে।

গোবর বাবু বললেন, যদিও তাঁর প্রপিতামহ অভয়চরণ গুহের কুস্তির আখড়া প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ছিল না এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ শিবচরণ গুহই ছেলের আগ্রহ এবং নাতির আবদারে আখড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তবু দুজনের পৃথক একটি উদ্দেশ্যও ছিল। কলকাতায় তখন বাবুদের রাজত্ব। দিনকাল অন্য রকম ছিল এবং বখেয়ানা ফলাবার পথও ছিল কণ্টকমুক্ত নানা প্রলোভনে যুবকরা গা ভাসিয়ে দিত। এবং যারা কিছুটা স্বাস্থ্যচর্চা করতো তাদের কু-পথে পরিচালিত করতে বা সমাজ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে উৎসাহ দিতেও অনেকে পেছপাও হত না। এই সব যুবকদের শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে মল্লক্রীড়ায় উৎসাহ দেওয়াও ছিল আখড়া খোলার অন্যতম লক্ষ্য। বস্তুত আখড়ার ছেলেদের অনেককেই অভয় গুহ বিভিন্ন বিলিতী অফিসে চাকরি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ছেলের এমনকি অভিজাত পরিবারের বহু ছেলে গায়ে মাটি মেখে 'মেহনৎ' করার সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দও পরে অম্বু বাবুর আখড়ায় মল্লক্রীড়া করতেন। অম্বু বাবুর অনুপ্রেরণা ও দৃষ্টান্তে কলকাতার কয়েকটি বনেদী বাড়িতেও কুস্তির আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন ঝামাপুকুরের মিত্তির বাড়ি, জানবাজারের মাড়বাড়ি, উত্তর পাড়ার মুখার্জি পরিবার, পাইকপাড়ার লালা বাবুর বাড়ি প্রভৃতি।

আন্তরিক সাধনায় এবং ভারত বিখ্যাত পালোয়ানদের শিক্ষায় গোবর বাবুর পিতামহ অম্বু বাবু উঁচু দরের পালোয়ান হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। পালোয়ান মহলে তিনি 'রাজাবাবু' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজার মতই মেজাজ ছিল। আখড়ার খরচও ছিল রাজসিক। তখনকার সস্তাগণ্ডার দিনেও আখড়ার খরচ ছিল প্রতি মাসে সাত-আটশো টাকা। তাছাড়া শিক্ষার জন্য ভারতের অন্য প্রান্তের যে সব পালোয়ানদের ওখানে রাখা হত তাদের পৃথক মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। ছিল মল্লবীরদের ভোজন আহারের বিরাট আয়োজন। ব্যায়াম চর্চা ও কুস্তির পর অতগুলো ছেলের পুষ্টিকর খাদ্য চাই, দুধ চাই। তাই মসজিদ বাড়ির আখড়া সংলগ্ন গোয়ালে বাঁধা থাকত শ' আড়াই ছাগল আর গোটা পঞ্চাশেক গাই-গরু।

(আগামী সংখ্যায় শেষ অংশ)

মুকুল

১৪ বছর পরে মহমেডানের শীল্ড জয়

সময়ে না হলেও এবং শেষ মুখে ফুটবলের উৎসাহ-উদ্দীপনায় যথেষ্ট ভাটা পড়লেও শেষ পর্যন্ত কলকাতার ফুটবল মরসুম যে শেষ হল এটাও মন্দের ভাল। লীগ শীল্ডের খেলা শেষ না করার পূর্ব নজিরের সঙ্গে অন্তত আর একটি নজির খাড়া করার ব্যাপারে আই এফ এ যে আমাদের মত সমালোচকদের সুযোগ দিলেন না সেটা তাদের দৃঢ়তারই পরিচয়। আশা করা যায় এই দৃঢ়তার নজিরে যদি তাঁরা চলতে পারেন তবে আগামী মরসুমে তাঁরা আর বিপাকে পড়বেন না।

কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা যে ফুটবলের ডাকে সাড়া দিতে সদা প্রস্তুত, ঝিমিয়ে পড়া ময়দানে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাই তার প্রমাণ। সুপ্ত নগরী হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙে ময়দানমুখো হয়ে উঠেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ও টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মধ্যে ফাইনাল খেলাটি দেখতে। কলকাতা ফুটবলের তিন প্রধানের এক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং এক পক্ষে থাকার ফলেই স্বভাবত খেলার আকর্ষণ বেড়েছিল। আবার শক্তিশালী মহমেডানের সঙ্গে একটি তরুণ দল শীল্ড ফাইনালে কেমন খেলে তা দেখার আকর্ষণও কম ছিল না। বিশেষ করে যে দলটি লীগের খেলায় এই মহমেডান স্পোর্টিংকেই ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল এবং শীল্ডের ফাইনালে উঠেছিল গত বারের লীগ-শীল্ড বিজয়ী

এবং ৫ বছরের অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন 'দুর্ধর্ষ' ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে হারিয়ে।

ইস্টবেঙ্গলের নামের আগে 'দুর্ধর্ষ' বিশেষণটির যোগে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর যেমন কৃতিত্বের পরিচয় মেলে তেমন ব্যর্থতার পরিচয় মেলে ইস্টবেঙ্গলের। ওই টালিগঞ্জ দলের কাছেই এ মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম পরাজয় এবং শীল্ড থেকে বিদায়। ব্যর্থতার কোন কৈফিয়ত নেই। ব্যর্থতা হচ্ছে ব্যর্থতা, আংশিক ভাগ্য বঞ্চনাও বটে। ইস্টবেঙ্গল ১৫টি কর্ণার কিক এবং গোল করবার কয়েকটি সহজ সুযোগ সৃষ্টি করেও টালিগঞ্জের বিরুদ্ধে পারল না, একটি শট গোলপোস্টে লেগেও ফিরে এল। আর সারা খেলায় একটি মাত্র কর্ণার কিকের সুযোগ পেয়ে সেই সুযোগ থেকেই টালিগঞ্জ জয়সূচক গোল করল। খেলায় এমন ঘটনা ঘটে থাকে। তাই বলে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কি কৃতিত্ব নেই? নিশ্চয়ই আছে। অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে দীর্ঘ ৯০ মিনিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিপক্ষের আক্রমণের উপর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত করা গোলটি বজায় রেখে খেলায় বিজয়ী হওয়া কৃতিত্বেরই পরিচয়।

ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে কিন্তু সেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি অগ্রগামীর ছেলেরা. ইস্টবেঙ্গলের তুলনায় মহমেডান অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন দল হওয়া সত্ত্বেও। তবু একটি দল, মাত্র এক বছর আগে যারা প্রথম ডিভিসনে এসেছে তাদের

আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর দৃঢ়চেতা ব্যাক রঞ্জিত পাল মহমেডান স্পোর্টিংয়ে একজন খেলোয়াড়ের ধাক্কায় দেহের ভারসাম্য হারিয়ে বল মারার মুখে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে

ফটো—বোস
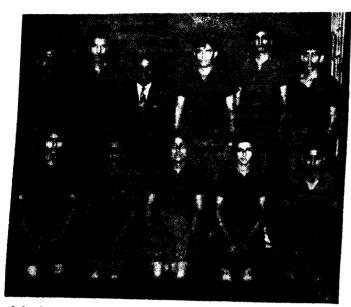
পিকিংয়ে আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিসে অংশ গ্রহণকারী ভারতীয় দল। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—ফারুক খোদাইজি (নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন), জি জগন্নাথ, টি ডি রঙ্গরাজানজম (দল নেতা), মীরকাশিম আলী, দীপক ভাদেরা ও দিলীপরাজ সাকসেনা। বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—নায়েরে মোলা, শৈলজা সালোখে, রূপা মুখার্জি, কোর্ট চারজম্যান ও এ টি এস ইয়াহিয়া

ফাইনাল খেলার জন্যই ১৯৭১-এর আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল স্মরণীয় হয়ে রইল। দীর্ঘ ১৪ বছর পরে শীল্ড জয় করে মহমেডান। মহমেডান অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলের স্বীকৃতি জোরদার করল।

লীগের খেলা লোকাল অ্যাফেয়ার। লীগে বাইরের দলের খেলার সুযোগ নেই। আই এফ এ শীল্ড সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা। কিন্তু সম্প্রতি শীল্ডের খেলাও লোকাল অ্যাফেয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বছর তো এলাহাবাদের ইয়ং স্টারস জব্বলপুর একাদশ এবং কটক কম্বাইন্ড শক্তিহীন তিনটি দল ছাড়া বাইরের কোন দল শীল্ডে খেলতেও আসেনি। তবু শীল্ড জয়ের এক বিশেষ মর্যাদা আছে, পৃথক আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ আছে অপ্রত্যাশিত ফলাফলে নক-আউট হয়ে বিদায় নেবার ব্যাপারে। যেমন লীগের খেলায় হেরে গেলেও প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে, একটি হারের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায় আর পাঁচটি দলকে পরাজিত করে। কিন্তু শীল্ডে সে সুযোগ কোথায়? হার অর্থে বিদায় সম্ভবত এই কারণেই শীল্ডের খেলায় মহমেডানের রেকর্ড লীগের মত উজ্জ্বল নয়। এমন কি মহমেডান স্পোর্টিংয়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে যখন তারা সত্যিই দুর্ধর্ষ দল ছিল এবং ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত একটানা পাঁচ বছর লাভ করেছিল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ, তখনো মহমেডান একবারের বেশী শীল্ড জিততে পারেনি। আর যেখানে তারা মোট ৯ বার লীগ বিজয়ী হয়েছে সেখানে শীল্ড পেয়েছে মাত্র ৪ বার। এবার নিয়ে তারা ৫ বার বিজয়ী হল। এবং আগেই বলেছি ১৪ বছর পরে তাদের শীল্ড জয় নিঃসন্দেহে ফুটবলের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। মহমেডান তৃতীয় রাউন্ড থেকে খেলা শুরু করে বেহালা ইউথকে ৫—০ গোলে, উয়াড়ি ক্লাবকে ৪—০ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে এরিয়ানকে ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিক থেকে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ফাইনালে ওঠে একে একে বি এন আর, কটক কম্বাইন্ড, বাটা ও ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করে। সব ক্লাবের বিরুদ্ধেই একটি করে গোল করে। ফাইনালে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ২—০ গোলে জয় ক্রীড়াধারার সংগতিসূচক ফলাফল তো বটেই. মহমেডানের বেশী গোল করাও উচিত ছিল। গোল দুটি করে আকবর ও বিমান লাহিড়ী।

পিকিংয়ের টেবল টেনিস

পিকিংয়ে আফ্রো-এশিয়ান আমন্ত্রণে টেবল টেনিস প্রিতযোগিতায় দলগত খেলা শেষ হয়েছে। এখন চলছে ব্যক্তিগত ও জুটিগত প্রাধান্যের লড়াই।

দলগত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে অংশ গ্রহণকারী ৪৪টি দেশের মধ্যে ভারতের ছেলেরা পেয়েছে পঞ্চম স্থান, মেয়েদের দলগত প্রতিযোগিতায় ৩২টি দেশের মধ্যে ভারতের মেয়েদের স্থান হয়েছে চতুর্থ।

সোয়েদলিং ও কার্বিলন কাপের নিয়মে বিভিন্ন দেশকে গ্রুপে ভাগ করে করে 'রাউন্ড রবিন' প্রথায় প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। গ্রুপের প্রাথমিক পর্যায় ভারতের ছেলেরা পরাজিত করে কেনিয়া, দাহোম, ইয়েমেন ও ইরাককে একটি ম্যাচও না হেরে। অর্থাৎ প্রতি দেশের বিরুদ্ধে ৫—০ খেলায় বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মালয়েশিয়াকে উত্তর কোরিয়ার কাছে ০—৫ খেলায় হেরে ছেলেরা চতুর্থ স্থানের খেলার জন্য উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ৩—২ ম্যাচে এগিয়ে থেকেও ভারত পরাজিত হয় ৫—৩ খেলায়। ফলে পঞ্চম স্থানের প্রতিযোগিতায় নাইজিরিয়াকে ৫—১ খেলায় হারিয়ে ভারতের ছেলের দল পায় পঞ্চম স্থান।

প্রাথমিক পর্যায়ে মেয়েরা পরাজিত করে সিরিয়া, নেপাল ও ইথিওপিয়াকে। প্রতি খেলায় পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। অর্থাৎ কোন ম্যাচ না হেরে প্রতি খেলায় ৩—০ ম্যাচে মেয়েরা বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম খেলাতেও তারা বিজয়ী হয় উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ৩—২ খেলায়। কিন্তু শক্তিশালী জাপানের কাছে দ্বিতীয় খেলায় ভারতের মেয়েরা ০—৩ ম্যাচে হার স্বীকার করে। পরে বরমাকে ৩—০ ও মালয়েশিয়াকে ৩—১ খেলায় হারিয়ে মেয়েরা পায় চতুর্থ স্থান। সুতরাং মেয়েদের পরাজয় শুধু একটি দেশ জাপানের বিরুদ্ধে। নাগোয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মেয়েরা পেয়েছিল একাদশ স্থান। যদিও আফরো-এশিয়ান টেবল টেনিসে খেলার গুণাগুণে এবং জয়-পরাজয়ের প্রশ্নের চেয়ে খেলার মধ্য দিয়ে মৈত্রী স্থাপনই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের টেবল টেনিস শক্তিও সীমিত তবু মেয়েদের চতুর্থ স্থান লাভ উন্নতির পরিচয়।

দলগত প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে জাপান চ্যাম্পিয়ন, উত্তর কোরিয়া রানার্স ও চীন তৃতীয় স্থানের, অধিকারী হয়েছে, মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চীন, দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে উত্তর কোরিয়া। জাপান পেয়েছে তৃতীয় স্থান। উল্লেখ্য নাগোয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের বিভাগে চীন ও মেয়েদের বিভাগে জাপান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

একলব্য

ফরিয়াদ

পর্ণা পিকচার্স

সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের ছবির নায়ক-নায়িকারা প্রায়ই নালিশ জানিয়ে থাকে, "ফরিয়াদ"-এ নায়ক নেই বললেই চলে, থাকলেও তাকে অল্প সময়ের মধ্যেই ছবিটা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নায়িকা-সর্বস্ব এই ছবির নালিশ অতএব নায়িকারই, অবশ্যই সমাজের বিরুদ্ধে। তবে নালিশটা যদি তার নিজেরই বিরুদ্ধে হত তবে দর্শকের তরফ থেকে বোধ হয় কোন নালিশ থাকত না। নায়ক নেই, কিন্তু খলনায়ক রয়েছে ছবিতে আগাগোড়া। নায়িকা রম্ভা তারই কাছে বিক্রীত। অর্থাৎ মার্লেন হোটেলের মালিক লম্পট বরেন মল্লিকের হাতে নিজের বিবাহিতা মেয়েকে তুলে দেওয়া ছাড়া রম্ভার বাবার যে আর কোন উপায় ছিল না সেটা গল্পের খাতিরে মেনে নিতেই হবে। হয়ত এমন বাবাও দেখা যায় যিনি টাকা তছরুপের দায়ে কয়েক মাস জেল খাটার পরিবর্তে নিজের বিবাহিতা মেয়েকে দুশ্চরিত্রের হাতে তুলে দেওয়া অনেক বেশি সমীচীন মনে করেন। কিন্তু রম্ভা তো অশিক্ষিতা সরল গ্রাম্য বালিকা নয় যে তার অজ্ঞাতেই এই লেনদেন ঘটতে পারে। সে চোখ-বুজে বরেন মল্লিকের কাগজে সই করে দিয়েছে এই বলে যে তার বিয়ে হয়নি, তার স্বামী নেই। চুক্তিপত্রে সই করার পর থেকে রম্ভা মার্লেন হোটেলের ক্যাবারে গায়িকা, জনমনোরঞ্জনই তার কাজ। রম্ভার বাবা অবশ্য সব জেনেশুনেই সই করেছেন, রম্ভা নয়। এই ব্যাপারে রম্ভার মনে জ্বালা-যন্ত্রণা যতই থাকুক, সে জেনে ফেলেছে যে তার আর কিছু করবার নেই, বরেন মল্লিকের হাতে সে পুত্তলিকা মাত্র। বরেন মল্লিকের হাত থেকে ছাড়া পাবার একটা চেষ্টা অবশ্য রম্ভা করেছিল। স্বামীর হাতে ধারালো ছোরা তুলে দিয়েছিল বরেন মল্লিককে খুন করতে। এর পরিণাম স্বামীর পক্ষে কতখানি গুরুতর হতে পারে পতিপরায়ণা রম্ভার সেটা হয়ত খেয়াল ছিল না। একটার পর একটা এমন সব সাজানো

"ছদ্মবেশী" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী

ঘটনার পর ছবির শেষে সমাজের বিরুদ্ধে রম্ভার ফরিয়াদ একটু মিথ্যা শোনায় না কি?

ঘটনাবলীর অবাস্তবতার দিকে না তাকিয়েও হয়ত অনেক দর্শক ছবি ঠিকই উপভোগ করেন যদি তাতে বড় স্টার থাকেন এবং সেই সঙ্গে সিনেমার সম্ভাব্য প্রমোদ-উপকরণ। পরিচালক বিজয় বসুর আস্থা বোধ হয় ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের উপরেই যাঁরা এই প্রথম সুচিত্রা সেনকে হোটেলের ক্যাবারে গায়িকার ভূমিকায় দেখতে পাবেন। ওই ভূমিকায় শ্রীমতী সেনকে নানা বেশ পরতে হয়েছে, অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে ইংরেজি ও বাংলা চটকদার গানও গাইতে হয়েছে। অবশ্য বিলিতি পোশাকে তাঁকে দেখতে বেশ লেগেছে। গানগুলি (নচিকেতা ঘোষ সুরারোপিত) যে সুরের বৈশিষ্ট্যে দর্শকের মন জয় করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আশা ভোঁসলে ও আরতি মুখোপাধ্যায় গানগুলি গেয়েছেনও সুন্দর। সংগীত পরিচালক ছবির আরম্ভেও চমৎকার এফেক্ট মিউজিক ব্যবহার করেছেন—খাঁচায় বন্ধ পাখির আর্তনাদের মত। আরম্ভে পরিচালক বিজয় বসুও একটা সুন্দর ব্যঞ্জনা দেখিয়েছেন—গাড়িতে করে বরেন মল্লিক যখন রম্ভাকে নিয়ে যাচ্ছে তখন দেখা গেল গাড়ির পিছনের কাচে একটি পুতুল ঝুলছে। রম্ভা যে বরেন মল্লিকের হাতের পুত্তলিকা সেটা পরিচালক বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে ওই ব্যঞ্জনাটি তিনি দেখিয়েছেন বারে বারে, কখনও ক্লোজ-আপে যার ফলে স্টোর ধার অনেকটা কমে গেছে। তা-ছাড়া, দর্শকের মনে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—রম্ভা যখন ক্যাবারে গায়িকা হিসাবে এত জনপ্রিয় তখন অত সহজে কি কেউ তাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিতে পারে? জনপ্রিয়তার সঙ্গে এক শ্রেণীর বড়লোক সমাজে তার প্রতিপত্তি বাড়বারই কথা। এহেন গ্ল্যামার স্টার রম্ভাকে কি শুধু একটা সইয়ের অজুহাতে ও টাকার জোরে কিনে রাখা যায়?

ছবিটির যা গল্প (মূল রচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) তাতে নাটক থাকবারই কথা। তবে সে নাটক হোটেলে নয়, রম্ভার ঘরে। নাটক অবশ্যই জমেছে ছবির শেষের দিকে, রম্ভা ও তার ছেলে প্রশান্তকে ঘিরে। প্রশান্ত তার মায়ের প্রতি অপমান ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছে বরেন মল্লিককে খুন করে। শেষ দৃশ্যে প্রশান্ত পুলিসের ভ্যানে। তার মায়ের চোখে জল। ওই নাট্যমুহূর্তের প্রস্তুতি,

"ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট" (পরিচালনা : পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী) **ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে**

যেখানে প্রশান্ত তার মাকে অভিযুক্ত করছে এবং পরে মায়ের দুঃখের কথা জানতে পেরেছে এবং ক্লাইম্যাক্স দর্শকের মনকে করুণ নাট্যরসের আস্বাদ দেয়।

এই নাটকীয় অধ্যায়ে জননীর অন্তরের ব্যথা, যন্ত্রণা এবং অপরিসীম স্নেহ সুচিত্রা সেনের অভিনয়ে মূর্ত। আগে ছেলের প্রতি তার অবজ্ঞা ও ঘৃণা যে-সব মুহূর্তগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তখনও শ্রীমতী সেনের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার মত। তবে ছেলের প্রতি রত্নার ঘৃণা ও ঔদাসীন্য সম্ভব কিংবা যুক্তিসঙ্গত কিনা সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। ছবিতে রত্নার স্বামীকে দুর্বল ও ক্লীব করা হয়েছে হঠাৎ। তার পক্ষে ছোরা হাতে নিয়ে বরেন মল্লিককে খুন করতে যাওয়া যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অবিশ্বাস্য বরেনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার পালিয়ে যাওয়া। সুশিক্ষিত ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির ঘাড়ে এই ক্লীবত্ব ও অসভ্যতা যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি নায়িকাপ্রধান বলে কি তার আশেপাশে সব চরিত্রকেই এমনিভাবে ঘৃণ্য বা দুর্বল করে দিতে হবে। রত্নার বাবার চরিত্রের কথা তো আগেই বলেছি। তবু এমন একটি অবিশ্বাস্য চরিত্রে বিকাশ রায় অল্পক্ষণের জন্য যে অভিনয় করে গেলেন সেটা উঁচুদরের। রত্নার স্বামীর কষ্টকল্পিত চরিত্রে আনন্দ মুখার্জি চিত্রনাট্যের শর্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

স্বামীর প্রতি ঘৃণাবশত রত্না তার ছেলেকেও আপন করে নিতে পারল না। মা ও ছেলের মধ্যে এই দূরত্ব ও সংঘর্ষ নিয়ে একটি সুন্দর নাটক গড়া যেতে পারত। যাই হোক, নাট্যসুখ দর্শকরা পেয়েছেন রত্না ও তার ছেলের মধ্যে বোঝাপড়ার পর। এই বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে হঠাৎ যখন প্রশান্ত তার বাবা-মায়ের একটি পুরনো ছবি দেখতে পেল। তখনই তার মনে প্রশ্ন—বরেন মল্লিকের সঙ্গে কী সম্পর্ক তার মায়ের? কে এই বরেন মল্লিক? প্রশান্তর তখন যা বয়স ও বুদ্ধি তাতে এই ব্যাপারে তার আগেই খেয়াল হতে পারত। সেদিক থেকে প্রশান্তও কিছুটা বিসদৃশ চরিত্র-কল্পনার শিকার। তথাপি প্রশান্তর ভূমিকায় পার্থ মুখোপাধ্যায় বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। শেষের দিকে সে যখন বিপথগামী ও মস্তান তখনও চরিত্রটিকে স্বাভাবিক করে তোলার কাজে শিল্পী দক্ষতা দেখিয়েছেন। খুবই দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি অনুরক্ত একটি মেয়ের ভূমিকায় মোম মুখার্জিকে মন্দ লাগে না। তার দিদিমার চরিত্রে চন্দ্রাবতী দেবীও স্নেহশীলা। অন্তত কয়েকটি মুহূর্তে তিনি দামাল ছেলে প্রশান্তকে সামলে নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারিবারিক নাটক তেমন জমল না। পরিচালকের নাট্যসৃষ্টির চেষ্টা বিশেষভাবে দেখা গেছে রত্না ও বরেন মল্লিককে কেন্দ্র করে। এখানেও নাটক জমেনি। রত্নার নিষ্ফল আক্রোশ ও বরেনের শাসানির পৌনঃপুনিকতা ছাড়া পরিচালক বেশি কিছুই দেখাতে পারেননি। এবং এই পৌনঃপুনিক সিচুয়েশন খুবই ক্লান্তিকর। তবে এর মধ্যেও দেখবার জিনিস হল বরেন মল্লিকের চরিত্রে উৎপল দত্তের চমৎকার অভিনয় যা দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবেন। শ্রীদত্তর অভিনয়ের গুণে তাঁর প্রতি দর্শকের নজর থাকবে সর্বক্ষণ।

"ফরিয়াদ"-এর ক্যামেরার কাজ দিলীপরঞ্জন মুখার্জির। ছবিটিতে যে একটি টেকনিক্যাল জৌলুস এসেছে তার মূলে

ক্যামেরার মূল্য আছে। ছবির অন্য বিশেষ জোয়ার হোটেলের দৃশ্য, যা খুবই বাস্তবসম্মত। এই সব দৃশ্যের বড় আকর্ষণ অবশ্যই সুচিত্রা সেন, নানা রূপসজ্জায় তিনি উপস্থিত হয়েছেন হোটেলের মালিকা হিসাবে। দর্শকদের কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা বৈকি।

হিন্দুস্থান স্টীল নিবেদিত দুটি তথ্যচিত্র

আগুন ও ইস্পাত, ভারী ভারী যন্ত্রপাতি ও অক্লান্ত খাটুনি এবং ইস্পাত তৈরির বিশাল কর্মকাণ্ড যে তথ্যচিত্রের বিষয় তাতেও যে কাব্যের আমেজ থাকতে পারে সেটা শ্যাম বেনেগাল-কৃত "দ্য প্যালসেটিং জায়েন্ট" না দেখলে জানা যাবে না। এই অসাধারণ তথ্যচিত্র তিনি প্রযোজনা করেছেন হিন্দুস্থান স্টীল-এর জন্য। হিন্দুস্থান স্টীল গত ১ নভেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে "দ্য প্যালসেটিং জায়েন্ট" এবং "স্টীল—দ্য হোল ওয়ে অব লাইফ" ছবি দুটির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। দুটি ছবি হিন্দুস্থান স্টীলেরই উপহার।

"দ্য প্যালসেটিং জায়েন্ট" নামটিও সুন্দর। এতে দেখানো হয়েছে ভারতের ইস্পাত-শিল্পের প্রসার। হিন্দুস্থান স্টীলের কারখানার বিরাট ইস্পাত শিল্প-যজ্ঞের পুরোপুরি পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক এই ছবিতে। এটা দর্শকের জ্ঞান লাভের বিষয়। কিন্তু যা দেখে মুগ্ধ হওয়া ও আনন্দ পাবার কথা সে হল পরিচালক শ্যাম বেনেগালের শট নেওয়ার বৈশিষ্ট্য, ইস্পাত তৈরির শব্দের সঙ্গে সংগীতের (বনরাজ ভাটিয়া-কৃত) ঐকতান রচনা এবং আগুনে গলিয়ে গলিয়ে ও নানা যন্ত্রে পিটিয়ে পিটিয়ে ইস্পাত তৈরির মধ্যেও সিনেমাটিক ভিস্যুয়ালস-এর সৃষ্টি। ছবিটি মনে রাখবার মত ছবি।

দুর্গাপুরে ইস্পাত-নগরের পটভূমিতে দ্বিতীয় ছবিটি। কৃষি-অর্থনীতি এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে ইস্পাত শিল্প কী ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তা-ই "স্টীল-এ দ্য হোল ওয়ে অব লাইফ" ছবিটির বিষয়-বস্তু। এই ছবির নির্মাণ-কৌশলও দেখবার মত।

হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড নিবেদিত ছবি দুটি বারোটি ভাষায় ডাব করা হয়েছে। ফিল্মস ডিভিশন ছবি দুটি দেখাবেন।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

প্রযোজক শ্রীগোপাল দত্ত গত সপ্তাহে ফিল্মের জন্য বম্বে গেছেন। ফিল্মটো

'নায়িকার ভূমিকায়' (পরিচালনা: অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সৌমিত্র ও অপর্ণা সেন

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেবার জন্য। সত্যজিৎ রায়ের "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবিটি ওই উৎসবে ভারতের পক্ষ থেকে সরকারী-ভাবে পাঠানো হয়েছে। শ্রীদত্ত এর পর লণ্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে যাবেন। ওখানেও ভারতের পক্ষ থেকে "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবিটিকে পাঠানো হয়েছে।

সমকাল নাট্য সংস্থা দুটি একাংক নাটক "চাঁদনী রাত" ও "আমেন" পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছেন ১৯ নভেম্বর মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। দুটি নাটকেরই নির্দেশনা ও মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী: মধু বসু, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, চিন্ময়শংকর, অনন্ত ঘোষ, দেবু বসু, গোরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুছন্দা রায়।

অনির্বাণ-এর "কাঁটাতারের বেড়া" নাটকটি মঞ্চস্থ হবে ১৪ নভেম্বর সকাল দশটায়। নাটকটি রচনা করেছেন শচীন ভট্টাচার্য। নির্দেশক: দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুদর্শনের নতুন প্রযোজনা জোৎস্নু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিসর্গ" নাটক মঞ্চস্থ হবে ৩ ডিসেম্বর মুক্ত-অঙ্গনে। নাট্য নির্দেশনা ও সংগীতের দায়িত্ব কুমার শোভন-এর।

কনসার্ট ইন সিমপ্যাথি

বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সাহায্যার্থে লনডনে কলকাতার শিল্পীদের নিয়ে একটি গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে। শ্রীবীরেন্দ্রশংকর এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। লনডনে স্যাডলারস ওয়েলস থিয়েটারে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠান শুরু হবে। পরে শিল্পী-দল ইংলনডের নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করবেন। এক মাসের জন্য তাঁরা বাইরে যাচ্ছেন।

এক সাংবাদিক বৈঠকে এই অনুষ্ঠানের সংবাদ দিয়ে শ্রীভূদেবশংকর জানান, শিল্পীরা বাউল, লোকসংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, মুকুন্দদাস ও লালন ফকিরের গান পরিবেশন করবেন। পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের দলটি গঠিত। এঁরা হলেন: নির্মলেন্দু চৌধুরী, সবিতাব্রত দত্ত, রুমা গুহঠাকুরতা, রাধাকান্ত নন্দী, মহম্মদ মোস্তাক আলি, শাহ আলি সরকার, চন্দ্রকান্ত নন্দী ও ফণিভূষণ ভট্টাচার্য।

সাংবাদিক বৈঠকে শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। মহান দায়িত্ব পালনের জন্য উপস্থিত সকলে তাঁদের অভিনন্দন জানান।

বোম্বাই বিচিত্রা

বোম্বাই-এর চলচ্চিত্র জগতে প্রায় প্রতিদিনই নানান রকম উদ্ভট, অভিনব ও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে থাকে। এইসব ঘটনাকে সাধারণভাবে অঘটন বলা যেতে পারে কিন্তু এইসব ঘটনার বিবরণ লিখতে বসলেই বিপদ। কারণ সেই সব ঘটনা বা অঘটনের বিবরণ সুখপাঠ্য হলেও তার লেখকরা সভ্য সমাজের মাপকাঠিতে মোটেই মার্জনীয় নন। আর যেহেতু চিত্র-সংবাদ এখনো সুধী সমাজে সাহিত্য-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয় সেই হেতু আমি সাধারণত এই সব অঘটন থেকে দূরে থাকি। কিন্তু দূরে থাকলেই কি দূরে থাকা যায়! সেদিন সাত-সকালে এক হিরোর সদ্য বহিষ্কৃত সেক্রেটারী এসে হাজির। চোখ তার লাল। চুল উসকো-

খুঁসেকো। যাতে আমি প্রথম দর্শনেই ভুল না বুঝি তাই সে নিজের 'বরখাস্ত' হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মোক-আপের বললে যে গত তিনরাত সে ঘুমোয় নি। নামজাদা হিরোর সেক্রেটারীরা যখন তিন রাত ঘুমোয় না তখন বুঝতে হবে যে, হিরোর বৃহস্পতি তুঙ্গে। কিন্তু তিন-রাত না ঘুমিয়ে যখন কোনো হিরোর সেক্রেটারী কোনো চুনোপুঁটি সাংবাদিকের দ্বারস্থ হয় তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। আদ্যোপান্ত শুনে জানা গেল ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে। এবং সেই গোলমালের জন্য নাকি আমিই দায়ী। কথা শুনে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া। এইবার ঘটনাটা একটু খুলে বলা দরকার। ঘটনাটা বলবার আগে অঘটনটাও পরিষ্কার হওয়া উচিৎ। কয়েকদিন আগে একজন স্বনামধন্য হিরো তার 'বিশ্বস্ত' সেক্রেটারীকে বরখাস্ত করেছে বিনা খেসারতে। আপাতত এইটেই অঘটন। সেক্রেটারী বরখাস্ত করাটা অঘটন নয়। অঘটন বিনা খেসারতে বরখাস্ত করা। আর সেইখানেই আমার আবির্ভাব।

আজ থেকে বছর দশেক আগে আমি তৎকালীন কোনো এক হিরোকে সেক্রেটারী সায়েস্তার টেকনিক শিখিয়েছিলাম। আজকের সেক্রেটারী সেই টেকনিকেই বহিষ্কৃত। এবার সেই প্রায় একযুগ আগের ছটা ঘটনাটা বলি। একদিন দুপুরে সেদিন-কার সেই হিরোর আপিসে গেছি। গিয়ে দেখি সেখানকার আবহাওয়া থমথমে করছে। হিরোর একজন চামচা বললেন, হিরো ভীষণ আপসেট ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না। অনেক দূর থেকে ট্যাক্সি ঠেঙিয়ে গেছি সুতরাং দেখা না করে ফিরতে মন চাইলো না। বিরাট ঝুঁকি নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম হিরো সত্যি আপসেট। কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে হিরোর সেক্রেটারী ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। হিরোর অজান্তে লাখ পাঁচেক টাকা হাতিয়ে নিয়েছে! কিন্তু মাত্র পাঁচ লাখ বেহাত হওয়ায় একজন পাঁচলাখি হিরো আপসেট হতে পারে ভাবতেই অবাক লাগলো এবং সেটা আমি হিরোকে বোঝাতে চাইলাম। বললাম পাঁচ লাখ তো আপনার হাতের ময়লা। তাতে হিরো বললেন, টাকার অংকটা প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন অনেস্টির, বিশ্বাসের। আমি আরো অবাক হলাম। অনেস্টি! হিরো বললেন, কেন নয়? হিরোকে বোঝালাম, তা হলে এক কাজ করুন। আপনার সেক্রে-টারীকে পুলিসে ধরিয়ে দিন, শাস্তি পাবে!" চমকে উঠলেন হিরো, "উপায় থাকলে কি আর ছেড়ে দিতাম, অ্যাকাউন্টেন্টটা যে আমার সমস্ত [illegible] [illegible] খবর রাখে, আর যেটা হাতিয়েছে সেটাও কালো টাকা যে—" বুঝলাম। বললাম "আপনি চাইছেন আপনার কালো টাকার দেখাশুনায় হবে একজন অনেস্ট লোক। কিন্তু তা তো আর হয় না, যে আপনার কালো টাকার হিসেব রাখতে রাজী হবে, সে যদি আপনার আপনজনও হয়, তবু তাকে সাদা লোক বলা যাবে না—সুতরাং আপনি এক কাজ করুন, আইনের ভয় যাকে দেখানো যায় না তাকে প্রাণের ভয় দেখান। আপনি নিজেও জানেন, পৃথিবীর সমস্ত অসৎ লোকই বহুদিন সুখে বেঁচে থাকতে চায় আর মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পায়।" হিরো মন দিয়ে আমার কথা শুনেছিলেন, এবং আমার উপদেশ কাজে লাগিয়ে সফল হয়েছিলেন। সেই হিরো এবং সেক্রেটারীর জুড়ি এখনো অবিচ্ছেদ্য। আজকাল তাঁরা পার্টনারশিপে বিজনেস করছেন। সেই পুরাতন হিরো আজকের সেক্রেটারীর হিরোকে আমার দেওয়া পরামর্শ দিয়ে আজকের সেক্রেটারীর ভাগ্যহাৎ কচলে দিয়েছে। সুতরাং পরোক্ষ-ভাবে দোষটা আমারই। দোষটা স্বীকার করে এই সেক্রেটারীকেও একটা উপদেশ দিলাম। উপদেশটা কি তা আর বলছি না!

সরল শর্মা

চিৎপুর-চিত্র

গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা

মঞ্চে নয়, চারপাশ খোলা মাঠের আসরে নট্ট কোম্পানীর 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা' দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় কখন পার হয়ে গিয়েছিল জানি না। যখন, 'বুড়ি গঙ্গার তীরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে' বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের কাছে সম্রাট ফিরোজ শাহের পরাজয় এবং তার সহচরেরা করুণা ভিক্ষা করছিল, সেই বিস্ময়কর মুহূর্তে একবার গর্বে বুক ভরে উঠেছিল। যুদ্ধস্থলে তখন শান্ত, সুরশাঁটি একটি করুণ সুরের মায়া বিস্তার করেছিল, সে সময়, এই পরিণতি দৃশ্যে বাঙালীর জয় ঘোষিত হতে দেখলাম। এবং আশ্চর্য, তখন সচকিত হয়ে অনুভব করলাম যেন এই জয় আমার, আমাদের তামাম বাঙালীর। মনে পড়ে না, কোনো শিল্প আমাকে এমন করে 'বাঙলা'র সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পেরেছে।

'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা' খিলজি বংশের সময়কার ঘটনা। কত বছর আগেকার কথা! অথচ আশ্চর্য, আজ, বাংলা দেশ এবং করাচীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, এই ঘটনা হুবহু যেন তাই। সেদিন দিল্লীর সম্রাট 'ফিরোজ শাহ' যেভাবে বাঙালী জাতিকে শোষণ করেছিল, যে-ভাবে সুলতান ইলিয়াস বাঙলার স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে দিল্লীশ্বরের নৃশংস অত্যাচারকে বরণ করে নিয়েছিল—আজকের 'বাংলা দেশ' এবং মুজিব-এর সঙ্গে তার বিশেষ কোনো

জানিয়ে দিয়েছেন অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্য শিষ্য, পাহাড়ী সান্যাল। যথেষ্ট যুক্তি দিয়েই বললেন পাহাড়ীবাবু যে অতুলপ্রসাদের সংগীতের গায়কী এখনও অবজ্ঞায় ডুবে রয়েছে। পরিপাটি করে গাইলে তাঁর গান ভাল লাগবেই; কিন্তু সেই পরিচ্ছন্ন, সুরেলা, বাণীপ্রতিমার বোল আনে অতুলপ্রসাদ নেই। তিনি যে ডাইমেনশান এনেছিলেন বাংলার সংগীতে তা কেবল রবীন্দ্রসংগীতের অনুকরণে বিঘ্নিত হবার জন্য নয়। রীতিসমকে অতুলপ্রসাদ অস্বীকার করেননি কিন্তু সেই রূপদীচেতনার সংগে তিনি মিশিয়েছেন তাঁর স্বকীয় চিন্তা এবং কল্পনাকৌশল। এই ব্যক্তিগত মনোভঙ্গি অস্বীকৃত হবে যদি নানান ভাবের স্রোতে তাঁর গায়কী লুপ্ত হতে চলে। অতুলপ্রসাদের অনুরাগী হিসেবে আমিও এই মতকে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তাই গায়কী বোঝাতে পাহাড়ীবাবু তাঁর গলায়

পাহাড়ী সান্যাল

ওঠালেন সেই মনমাতানো গান "আমার বাগানে এত ফুল তবু কেন চলে যায়।" লক্ষ্ণৌয়ের বিশিষ্ট ঘরানা, পরিবেশ যেন প্রাণ পেল এই ওস্তাদী ঠুংরীতে। একাধিক ঠুংরী অলংকরণে পাহাড়ীবাবু তাঁর গানটি ভরপুর করেছিলেন। গোটা কয়েক 'পুকার' মাধ্যমে তিনি জাগিয়ে তুললেন সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ঠুংরীস্মৃতি, সুনিপুণ অঙ্গ বিচারে পরিবেশিত এই গানে খুঁজে পাওয়া যায় সেই মানুষ অতুলপ্রসাদকে যিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন অভিনবত্বকে বা "এক্সপেরিমেনট"কে এড়িয়ে চলেননি।' তাঁর বাণীর গাম্ভীর্যের সংগে তিনি যে সাংগীতিক কাঠামোকে নিরন্ত পরিচর্যা করে চলেছিলেন (ইংরেজীতে যাকে form এবং content-এর পরিমার্জনা বলা যেতে পারে) সেই মননশীলতার ছোঁয়া আছে তাঁর সংগীতের ঢঙে। এই ঢঙকে অনুসরণ না করা হল একটা মহৎ নান্দনিক ভ্রান্তি। তাই আলোচনার পরিশেষে এই কথাই বলব যে, যে সুষ্ঠু শিক্ষায় ইংরেজরা দেখিয়েছে তাদের আদরের ধন Robst Bnrns-এর গানের সেই 'Summy joy' কিংবা "deep pathos"কে চিরায়ত করার জন্য, আমাদের অতুলপ্রসাদের সংগীতকে বাঙ্গালী জীবনে একটি সংহত মূর্তি দেওয়ার জন্য আমাদেরও সে রকম সমঝদারি গড়ে তুলতে হবে। না করলে নয়।

—সংগীত সমালোচক

অতুলপ্রসাদ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গীতিকার অতুলপ্রসাদের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ২০শে অক্টোবর সন্ধ্যায়, রবীন্দ্রসদনে। ঘোষিত অনুষ্ঠানসূচী ছিল শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা, সহযোগে বিশিষ্ট শিল্পীদের গান।

অতএব, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা দিয়েই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। সংক্ষিপ্ত সময়ে অতুলপ্রসাদের গানের বিচার ও বিশ্লেষণ এবং রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি সহযোগে শ্রীঠাকুরের আলোচনাটি সুন্দর। গীতিকার অতুলপ্রসাদের প্রতিভা এবং প্রতিভার ক্রমোন্মোচন শ্রীযুক্ত ঠাকুরের আলোচনায় প্রতিভাত।

আলোচনা শেষে গানের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী সুচিত্রা মিত্র গাইলেন 'একা মোর গানের তরী।' একটিই গান উনি গেয়েছেন এবং তা বেশ দরদ দিয়ে। শ্রীমতী মিত্রের পর একে একে গান শোনালেন হিমেষু রায়চৌধুরী, শিখা বসু, সর্বানী সেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, মানসী দাশগুপ্ত, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, মীরা দাশগুপ্ত, অলকা দে ও দিলীপ রায়। শিল্পীরা প্রত্যেকেই দুটি করে গান গেয়েছেন এবং গানগুলি গাওয়ার দিক থেকে প্রশংসা পাবার মতো।

এলাহাবাদে অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী

প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সভার উদ্যোগে এলাহাবাদে শ্রীঅতুল মুখোপাধ্যায়ের মুকারগঞ্জের বাড়িতে বিশিষ্ট সুধী সমাবেশে অতুলপ্রসাদ শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। ১০০টি বাতি জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পৌরোহিত্য করেন শ্রীসুনীল বসু। শ্রীশিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে গবেষণামূলক ও নানা অপ্রকাশিত তথ্যে পূর্ণ একটি কথিকা কলকাতার দুই শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী এষা মুখোপাধ্যায়ের সংগীত সহযোগে পরিবেশিত হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

মহেন্দ্র আনন্দ স্মরণিকা

মহেন্দ্র আনন্দ স্মরণিকার বিজয়া সম্মিলনী সম্প্রতি সম্পন্ন হয়। সংস্থার সম্পাদিকা বীণাদেবী সেন তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে কার্যবিবরণী পেশ করেন। অভাবগ্রস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারবর্গকে সাহায্য করা এই সংস্থার একটি বিশেষ কাজ। কানন দেবী সংস্থাটির সভানেত্রী। সভ্যদের সংখ্যা এখন দেড়শ।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হয় সুদীপ্তা চৌধুরীর আবৃত্তি দিয়ে। পাহাড়ী সান্যাল কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। সুশ্রীতি ঘোষও রবীন্দ্র সংগীত এবং অতুলপ্রসাদের গান করেন। অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীতে ছিলেন ডাঃ অজিত মুখোপাধ্যায়। সুচন্দা চৌধুরী প্রভাত দেন...

অরণ্যদেব ★ লী ফক

পাহাড়ী ডাইনী কি শেষপর্যন্ত তার মনের মতো সঙ্গীর খোঁজ পেল?
তা পেল বই কী!
শিগগির ঘুমুতে এসো, ছেলেরা!
কে সে?

মজের গল্পটা শুনে তারপর ঘুমুব, দিদিমণি!
সকালে শুনবে। এখন ঘুমুতে এসো।
দুর ছাই-

ঘুমের মধ্যেও গল্পের জের ..... রাজা আর টম স্বপ্ন দেখছে .....
আ-আ-

খেয়ে নাও ...
খিদে নেই!
মজ বুড়ো গেল কোথায়?

মজ, তারপর কী হল? বলো, বলো।
পাহাড়ী ডাইনী খোঁজ পেল নিখুঁত মানুষের?
তা পেল বই কী।
3/21

"দুর্গের মধ্যে মায়া-আয়নায় চেহারা ফুটে উঠল সেই নিখুঁত মানুষের ....."
সাবাস!
সাবাস!

চেহারা তো ফুটে উঠল।
কার চেহারা?
কে সে?

৬
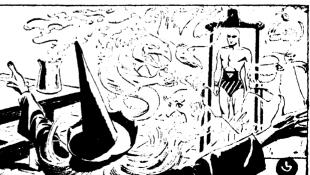
হোয়াইট হাউসে শ্রীমতী গান্ধী ও নিকসনের বৈঠক এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। ৪ নবেম্বর হোয়াইট হাউসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে বহুধা বিস্তৃত এক আলোচনায় মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট নিকসন শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন: উদ্বিগ্ন হবেন না। পাকিস্তানকে মারকিন সাহায্য অল্পই দেওয়া হয়েছে, তার উপরে তাও শেষ হয়ে এসেছে। তাছাড়া তাঁর সরকার ইয়াহিয়া খাঁর ওপর যতটা পারা যায় চাপ দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেছেন—পাকিস্তান ও ভারতের উচিত সীমান্তের দুই দিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের উপস্থিতির সম্মতি দেওয়া। তিনি নাকি আরও বলেছেন যে, তাঁর সরকার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ দিবে এবং ভারতেরও উচিত উত্তেজনা কমাতে সীমান্ত থেকে পরস্পরের সৈন্যবাহিনী সরানোর ব্যাপারে রাজি হয়ে যাওয়া। শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য: পাকিস্তানকে দেওয়া মারকিন সাহায্য নিয়ে ভারত অত্যন্ত বিচলিত, তাছাড়া শেখ মুজিবরকে মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানের উপর আমেরিকার চাপ দেওয়া উচিত। পাকিস্তান ইতিমধ্যে ভারতের উপর তিনবার আক্রমণ চালিয়েছে। ৫ নবেম্বর প্রেসিডেন্ট নিকসন ও শ্রীমতী গান্ধী-বৈঠক শেষ—নিকসন বলেছেন: দক্ষিণ-এশিয়া সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য তাঁর দেশ যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

দেশী সংবাদ

১ নবেম্বর—আজ রাত সওয়া সাতটায় কিষেণগঞ্জের কাছে রেল লাইনে বিস্ফোরণের ফলে ৪৫ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিন এবং তিনটি কামরা উড়ে যায়। বারোজন যাত্রী আহত হন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের খেজুরিয়াঘাট-নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে ব্রডগেজ লাইনে সমস্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এটিকে পাক নাশকতামূলক কাজ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলাগুলির উপর দিয়ে যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায় তাতে হাজার হাজার নরনারী প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের কম হবে না। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রায় ৪০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রাণ কার্যের জন্য এখনই ২০ কোটি টাকা দরকার।

২ নবেম্বর—নয়াদিল্লির এক খবরে প্রকাশ: পাক হাইকমিশন ভবনে অবশিষ্ট যে এগারজন বাঙালী কর্মী ছিলেন তাঁর মধ্যে দশজন প্রায় সপরিবারে বাইরে পালিয়ে আসেন। একজন বাঙালী কর্মীকে পাকিস্তানীরা ধরে ও প্রচণ্ড প্রহার দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। তিনি এখন তাদের হাতে বন্দী।

৩ নবেম্বর—গতকাল বেশ কিছুক্ষণধরে চার চারটি পাক জেট জঙ্গী বিমান পাঞ্জাব খণ্ডে ভারতের আকাশ ঘোরাফেরা করে। তাদের মতিগতিতে সন্দেহ করে ভারতীয় বিমানগুলি তাদের আক্রমণ করে। অগত্যা তারা পালায়। তবে বিমান চারটির একটিকেও নামানো সম্ভব হয়নি। এদিকে আজ ভোরে একটি পাক হেলিকপটার গেদের কাছে ভারতের এলাকায় ঢুকে পড়ে। সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গুলি ছোড়ে। অক্ষত অবস্থায় সেটিও সরে পড়ে।

৪ নবেম্বর—বন্ধ বা ওই ধরনের অবস্থায় সরকারী কর্মচারিরা অনুপস্থিত হলে তাঁদের বেতন কাটা যাবে এবং একই সঙ্গে চাকুরিতেও ছেদ পড়বে। আংশিক অননুমোদিত অনুপস্থিতিও শাস্তিযোগ্য হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের ওই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যের পদস্থ অফিসারদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন।

বেলগাছিয়া সেনট্রাল ডেয়ারিতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ওই ডেয়ারিতে রাজ্য সরকারের পুলিসের একজন অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ পুলিস অফিসারকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওই পুলিস

অফিসারের উপর কারখানার নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যস্ত হবে।

৫ নবেম্বর—আজ পুলিস টিটাগড়ে নেতাজীনগর ও গান্ধী কলোনি অঞ্চলটি ঘেরাও করে তল্লাসী চালায়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, বোমা তৈরির মাল-মশলা ধরা পড়ে ওখানে একটি গোপন অস্ত্র কারখানারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পুলিস একটি লুকানো চিকিৎসা কেন্দ্রও খুঁজে বের করেছে। এখানে মোট ৭৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

যত দিন যাচ্ছে কলকাতার বাস-যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু বাসের সংখ্যা বাড়ছে না, বরং ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ট্রামে বাসে বাদুড়-ঝোলা অবস্থাটা নতুন কিছু নয়। এর ওপর আছে যখন তখন ট্রাফিক জ্যাম। ফুটপাথে বসে পাউরুটি, কাচের বাসন, রবার ক্লথ, কাটা কাপড়, অসংখ্য খাবার দোকান আর পাইকারি বাজার। লক্ষ লক্ষ লোকের অবস্থা এখন চরমে।

৬ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেস এবং সি পি আই নেতারা আলোচনায় বসার মুখে আজ কলকাতায় একজন সর্বভারতীয় নব কংগ্রেস নেতা জানান: "আমরা গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চাই। তবে এর মধ্যে আদি কংগ্রেস এবং বাংলা-পন্থী বাংলা কংগ্রেসকে নিতে মোটেই রাজী নই। কারণ ওরা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিনিধি।"

অন্তত ২০০ জন ধীবর গতকাল গভীর সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে ডুবে মারা গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুরী থেকে ২৯ কিলোমিটার দূরে হরচণ্ডীর কাছে ধীবরদের নৌকাগুলি ঝড়ের মধ্যে পড়ে উল্টে যায় বলে মনে হয়। ইউ এন আই-এর খবর—প্রায় ৩০০ লোক ঝড়ের মধ্যে পড়ে মারা গিয়েছে। কোন মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায়নি।

৭ নবেম্বর—নব কংগ্রেসে শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির যোগদান ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বাংলা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা বলেন। সি পি এম-এর দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গেও কথাবার্তা অনেকটা এগিয়েছে বলে তিনি জানান।

আজ অপরাহ্ণ তিনটায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে বনগাঁ লোকাল ট্রেনের কামরায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে ১০ জন যাত্রী আহত হন। আহতদের একজন মহিলা। এঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা নাকি সি পি এম-এর ময়দানের সমাবেশে যোগ দিতে আসছিলেন।

বিদেশী সংবাদ

১ নবেম্বর—পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন: পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধ 'আসন্ন' এবং যুদ্ধ হলে চীন, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দেবে। শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান বলেছেন যে, দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর বিচার হচ্ছে, তবে দেশবাসী তাঁর মুক্তি দাবি করলে তিনি শেখ মুজিবরকে মুক্তি দেবেন।

২ নবেম্বর—গতকাল ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে প্রতিদিন প্রায় ৪০০০ শিশু মারা যাচ্ছে। সেনেটর কেনেডির আশঙ্কা এ ছাড়া অনাহারে মারা যেতে পারেন দুর্ভিক্ষের মত নরনারী।

৩ নবেম্বর—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছেছেন। এই সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের সঙ্গে বৈঠক। এই বৈঠকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো: (১) ভারতের বাংলাদেশের শরণার্থীদের বোঝা এবং এই ভার লাঘবের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কি করণীয়, (২) ভারত পাক যুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমনে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা কি হওয়া উচিত।

৪ নবেম্বর—মারকিন স্বরাষ্ট্রদফতর বলছে, সেনেট ২১,৭০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক সাহায্য বিল বাতিল করে দিয়েছে। ফলে এমন আশঙ্কা করা যায় ভারতে আশ্রয়প্রার্থী লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশ শরণার্থীর কাছে মারকিন ত্রাণভাণ্ডার পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে।

৫ নবেম্বর—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রচুর ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাক প্রতিনিধিদল আজ হঠাৎ পিকিং-এ পৌঁছেই চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইয়ের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। অস্ত্র সাহায্য এবং পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

৬ নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সমস্যা এবং তার দরুন ভারতীয় উপমহাদেশে উত্তেজনা সম্পর্কে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিকসন ও মারকিন সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে আজ নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছেছেন।

৭ নবেম্বর—গতকাল সানটিয়াগো ক্যাথলিক ইউনিভারসিটি হাসপাতালে চিলির জনৈকা ২৬ বৎসর বয়স্কা নারী একসঙ্গে ৭টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। হাসপাতালের ডাক্তাররা জানিয়েছেন যে, সপ্তসন্তান-জননী ও তাঁর ৬টি শিশু-সন্তান সুস্থই আছে। সপ্তম শিশুটি শ্বাসকষ্টে ভুগছে।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

ভৃগুজাতকের

॥ ভাগ্য গণনার বই ॥

নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন ২৲

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হওয়ায় (৪৪০০) বহু পাঠকের, গ্রন্থ বিক্রেতাদের এবং আমাদের এজেণ্টগণের অর্ডার অনুযায়ী বই পাঠাইতে পারি নাই। সেজন্য দুঃখিত। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলকেই দ্রুত বই পাঠানো হইতেছে।

এবার ভৃগুজাতকের আর একটি অনন্য সৃষ্টি।

রাশি নক্ষত্র, লগ্ন এবং জন্মমাস

মিলিয়ে আপনার জন্য

১৯৭২ কেমন যাবে

ভাগ্য গণনার ক্ষেত্রে ভৃগুজাতকের আর একটি অবদান। যাঁহারা অর্ডার পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই বই পাঠানো হইতেছে।

মূল্য মাত্র দু টাকা

আমাদের এজেণ্টগণকে এখনই সম্পূর্ণ চাহিদা জানাইতে অনুরোধ করিতেছি।

মিত্র ও ঘোষের অনন্য অভিযান

আবার সাতটি নূতন বাংলা পকেট বই

১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি ২৲

এবারের বিশিষ্ট লেখকগণ

প্রমথনাথ বিশী — সন্তোষকুমার ঘোষ

লীলা মজুমদার — বিমল কর

শঙ্কু মহারাজ — পরিমল গোস্বামী

ডাঃ এন, আর, গুপ্ত

এবার পকেট বইয়ের গ্রাহকদের আরও লোভনীয় সুযোগ। সাতটি বইয়ের মধ্যে আপনার পছন্দ-মত কমপক্ষে যে কোন পাঁচটির দাম অগ্রিম দিলে অথবা ২৲ জমা দিয়ে পুরো সেটের গ্রাহক হ'লে ২০% ডিসকাউণ্ট পাবেন। অর্থাৎ দশ টাকার বই আট টাকা এই হিসেবে পাবেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সর্বশেষ উপন্যাস

এপার বাংলা ওপার বাংলার পটভূমিকায় রচিত অসাধারণ গ্রন্থ

প্রকাশিত হয়েছে **উনিশ'শ একাত্তর** দাম ৬৲

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **শত রূপে দেখা**

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের **শ্রীমদভগবদগীতা** ১০৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২ ফোন ৩৪৮৭৯১, ৩৪-৩৪৯২

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

আজকের আধুনিক
হাতের সৌখিন রূপসজ্জা
কি ? ল্যাকমে নেল
এনামেল,—আপনার
মনমেজাজ, সাজসজ্জা
আর আপনার ঠোঁটের
রঙে রঙ মিলিয়ে।
আপনার নখাগ্র পর্যন্ত
রূপে ঝলমলিয়ে উঠবে।
ল্যাকমে নেল এনামেল
লাগানো যায় সমান করে
মসৃণভাবে,—শুকোয়ও
তাড়াতাড়ি। আপনার
নখ আরো লম্বা···
আরো সুন্দর দেখাবে।
ল্যাকমে আল্ট্রা গ্লো
লিপস্টিক-এর রঙে রঙ
মিলিয়ে নিয়ে আসুন
নানান রঙের ল্যাকমে
নেল এনামেল !
এছাড়া পাওয়া যায়
ল্যাকমে নেল
এনামেল রিমুভার।
হাতের আঙুলে চমক
পায়ের আঙুলে ঝলক
হাল ফ্যাশানের নানা রঙের
ল্যাকমে নেল এনামেল
আপনাকে রাঙিয়ে তুলবে
Lakmé
Nail
Enamel
Remover
ASP/L-93 BEN

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রাণেশ মণ্ডল

AIYARS-A-169 BN

শওকত ওসমানের

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস

জাহান্নম হইতে বিদায়

দাম ৫·০০

ওপার-বাংলায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। তাঁর রচনা বিচ্ছিন্ন বাঙালী জাতির বড় শরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, কল্পনা-ভাব প্রমূর্ত। একটা বহু-পোড়-খাওয়া পিছিয়ে-পড়া জাতির বড় অংশের উজ্জীবনে আন্তরিকতাও বিধৃত অতি সুনিপুণভাবে। কিন্তু এমনই আমাদের দুর্ভা যে, সেই জাতির অন্যতম শরিক হয়েও আমাদের অপর অংশটি সাংস্কৃতিক ফসলের স্বাদ গন্ধ এতকাল প্রায় কিছুই পেতে পারিনি। রাজনৈতি বাধাই ছিল এ ক্ষেত্রে দুস্তর। আজ এক প্রলয়ংকর বিপদের মধ্য দিয়ে সেই দুস্তরতার স্থির যবনিকা কম্পমান—যার ফলে ওপার-বাংলার সাহিত্য-শিল্পের কিছু টুকরো-টাকরা অংশ আমাদের এখন দৃষ্টিগোচর। এ উপন্যাসও তেমনি একটি খণ্ডাংশ। ...জঙ্গী দানব ইয়াহিয়ার অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ আমাদের শরণার্থী—যাঁরা আমাদেরই এক অংশ, আমাদেরই আত্মীয়। পিছনে ফেলে এসেছেন তাঁরা তাঁদের প্রিয় জন্মভূমি 'সোনার বাংলা'কে—আজ যা মর্টারের আওয়াজে, কামানের হুংকারে, রণতরীর শেল-বর্ষণে, খান-সেনাদের নারকীয় নিপীড়নে এক এক জাহান্নমে পরিণত। সেই জাহান্নম থেকে চোখের জলে সাময়িক বিদায় নিয়ে এসেছেন যেসব নিরুপায় নিপীড়িত অসংখ্য মানবাত্মা, কোনো এক অনতিবিলম্বিত শুভ-দিনে তাঁদের 'সোনার বাংলা'য় আবার ফিরে যাওয়ার আশা বুকে নিয়ে, তাঁদের অক্ষমতা, লজ্জা, দুঃখ, দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি বুক-ভরা প্রত্যাশার এক নব মহাভারত এই অনুপম ঔপন্যাসিক কাহিনী।
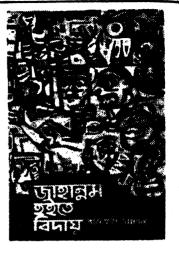
প্রকাশিত হল

কিশোর ও শিশুসাহিত্যের বই

যাঁর নাম ঘনাদা (ঘনাদা কাহিনী) ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম ৪·৫০
আগ্রা যখন টলমল (ঘনাদা কাহিনী) ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ দাম ৪·০০
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা (জীবনচরিত) ॥ ইন্দ্রমিত্র ॥ দাম ৩·০০
আমাদের নিবেদিতা (বর্ণাঢ্য চিত্রবহুল জীবনচরিত) ॥ শংকরীপ্রসাদ বসু ॥ দাম ৬·০০
রাজার রাজা (চিত্রে জীবনী) ॥ মৌমাছি (বিমল ঘোষ) ॥ দাম ৪·০০
ছেলেদের বিবেকানন্দ (জীবনচরিত) ॥ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ দাম ২·০০
বাজনা (রূপকথা : উপন্যাস) ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা (রূপকথা : গল্প) ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৪·০০
মিতুল নামে পুতুলটি (রূপকথা : উপন্যাস) ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ৩·০০
অরুণ বরুণ কিরণমালা (রূপকথা : নাটিকা) ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ দাম ২·০০
ভূমিকম্পের পটভূমি (অ্যাডভেনচার কাহিনী) ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ৩·০০
ভয়ের মুখোশ (গোয়েন্দা-উপন্যাস) ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০
পাপুর বই (ছবি ও লেখার সংকলন) ॥ পাপু (সুব্রত সরকার) ॥ দাম ৫·০০
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া (ছবি ও ছড়ার অ্যালবাম) ॥ রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত ॥ দাম ৫·০০
আমাদের প্রতিবেশী কীটপতঙ্গ (কীটপতঙ্গের কথা) ॥ ননীগোপাল চক্রবর্তী ॥ দাম ৪·০০
দেবতার পাহাড় (কিশোর উপন্যাস) ॥ নকুল মুখোপাধ্যায় ॥ দাম ৩·০০
পিনকুর ডাইরি (কিশোর উপন্যাস) ॥ সরলাবালা সরকার ॥ দাম ২·০০
ইতুর থেকে ইত্যাদি (সরস রহস্য-উপন্যাস) ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ দাম ৩·০০
শিব্রামের বারো আড়ি (হাসির গল্প) ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ দাম ৫·০০
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন (হাসির গল্প) ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ দাম ৪·০০
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন (হাসির গল্প) ॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥ দাম ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯ ॥

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩
শনিবার ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
Saturday 20 November 1971

কলকাতার হাল

শহর কলকাতার উন্নয়ন-পর্ব যে শুরু হয়ে গিয়েছে তা বুঝতে আজকাল বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। গোটা শহর জুড়ে যে ধরনের খনন-কার্য চলছে—(যাকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পর্যায়ে ফেলা যায়) তাতে কলকাতার অর্ধেকেরও বেশী রাস্তা দুর্গম হয়ে পড়ে আছে, প্রধান প্রধান সড়কের মুখ বন্ধ, গাড়িঘোড়ায় এক একটি পথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। জলের পাইপ বসানো, রাস্তা সংস্কার, কোথাও কোথাও বা জল-নিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজের দরুণ কিছু কিছু অসুবিধা শহরবাসীর হবারই কথা, কিন্তু হালের কলকাতা শহরের চেহারা দেখলে বোঝা যায়, উন্নয়নের কাজে হাত দিয়ে এমন একটা বিলম্বিত লয়ে কাজকর্ম চলছে যে স্বাভাবিক অসুবিধের চেয়ে এর ভোগ আমাদের কাছে দীর্ঘ এবং অসহ্য হয়ে ওঠার অবস্থা হয়েছে। উন্নয়নের কাজ হাতে নেবার আগে নিশ্চয় একটা পরিকল্পনা থাকে, তা ছাড়া এই ধরনের একটি শহরের জীবনযাত্রা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে যাতে কাজকর্ম করা যায় তারও চিন্তা থাকে। আমরা ধরে নিচ্ছি, উন্নয়নের কাজে হাত দেবার সময় এইসব বাস্তব অবস্থার কথা ভাবা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন যে ঢিমে তালে কাজকর্ম চলছে, কেন যে ক্রমাগতই অসুবিধে বাড়ানো হচ্ছে তা বুঝতে পারি না। কলকাতার চার দিকে আজ রাস্তাঘাটের এমন হাল, যে শহরে ঢোকার একটির বেশী দুটি পথ খোলা নেই। যানবাহনের সমস্ত চাপ গিয়ে পড়ছে ওই একটি দুটি পথে। তাও সেই পথে যানবাহন চলার বিশেষ কোনো ধরাকাটা নেই। ট্রাফিক পুলিস সব সময় সর্বত্র থাকেও না। অন্ততে সেটুকু থাকলেও চলত।

কলকাতা উন্নয়নের দায় নানা শরিকের। শরিকদের মধ্যে মতৈক্যও হয় না শুনি। এতে তাঁদের হয়ত ক্ষতি নেই; ক্ষতি আমাদের। এই প্রসঙ্গে পৌরসভার কথা ওঠে। কলকাতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে বাজার হাট, অফিস—সেই এলাকাগুলি মানুষের পথ চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। চৌরঙ্গি, ধর্মতলা, কলেজ স্ট্রীট, শ্যামবাজার, রাসবিহারী অ্যাভিনু, গড়িয়াহাটার মোড়ের দিকে তাকালে বোঝা যায়—ফুটপাথ বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, হকারদের দোকানে দোকানে তা ভরে আছে। মানুষ হাঁটবে কোথা দিয়ে? শিয়ালদা স্টেশনের সামনের রাস্তার চোদ্দ আনা ব্যাপারীরা দখল করে নিয়েছে, হাওড়া ব্রিজের দু পাশের ফুটপাথ জুড়ে মস্ত বাজার, চাল ডাল শাক সবজি মাছ থেকে গামছা গেঞ্জি পর্যন্ত হরেক রকম সওদা কেনাবেচা হয়। সরকার এবং কলকাতার পৌরসভা এসব দেখছেন, দেখেও চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মাঝে কথা হয়েছিল, বেআইনী দোকানপাট ফুটপাথ থেকে তুলে দেওয়া হবে। তারপর হঠাৎ মতটা পালটে গেল। এখন শোনা যাচ্ছে যত-তত্র দোকান খুলে বসা আইনসিদ্ধ করা হবে। প্রশ্ন হল, নগরবাসীর সামান্যতম সুবিধে অসুবিধের দিকে চোখ না রেখে শুধুমাত্র দোকানদারদের দিকে চোখ রাখার কারণ কী? কলকাতা শহরটাকে দিনে দিনে কী ধরনের কুৎসিত করার চেষ্টা হচ্ছে তা কি পৌর কমিটির নজরে আসে না? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যে কলেজ স্কোয়ারটি ছিল—এখন তার তিনদিক জুড়ে দোকান উঠেছে, অবশ্য এগুলি বেআইনী নয়, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারও বোঝার উপায় নেই, দোকানের আড়ালে একটি বড় পুকুর, সামান্য পার্ক রয়েছে। শহরের ওই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, খোলামেলা একটি পার্ক আর পুকুর থাকবে এটা নিশ্চয় অযৌক্তিক দাবি নয়। অথচ হকারদের চাপে শহরবাসীর সামান্যমাত্র সুবিধেও নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু দিন। এই শহরের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় কেন্দ্রে যেভাবে রাস্তা-জুড়ে কেনাবেচা চলছে তাতে মনে হয় পথ আর পথচারীর নয়।

কলকাতার শ্রীহীন চেহারাটা যদি শোধরাবার চেষ্টা করতেই হয় তবে তার প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মের সঙ্গে এই শহরের যে ব্যবস্থাগুলি শহরবাসীর সুবিধার জন্যে পূর্বেই করা ছিল সেগুলিও বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। না হলে এই শহরের শ্রীহীনতা ঘুচবে না, কলকাতাবাসীরও কষ্ট লাঘব হবে না।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম
৭০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৫১

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

মুদ্রণের কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর ব্যয় এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কাগজ কিনে এবং সেই কাগজে সংবাদপত্র ছেপে আমাদের ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তদুপরি ১৫ নভেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি কপি কাগজের উপর ০.০২ পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আগামী ২০ নভেম্বর থেকে আমরা দেশ পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি। বর্ধিত হারে প্রতি কপির নূতন বিক্রয় মূল্য হবে ০.৬৮ পয়সা ও অন্তঃশুল্ক ০.০২ পয়সা অর্থাৎ মোট ০.৭০ পয়সা।

সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে এই ব্যাপারে অতীতের মতই, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সারকুলেশন ম্যানেজার
দেশ

সি পি আই-য়ের সঙ্গে
কংগ্রেস (নব)-র কথাবার্তা
চলছে।
'পুরো ঝুড়িটার দর কত?'
সি পি আই

নব কংগ্রেসের ব্যর্থ চেষ্টা

নব কংগ্রেস বেশ কিছুটা চেষ্টা করলেন. কিন্তু হল না।

নব কংগ্রেসের চেষ্টাটা ছিল এইরকম : বিভিন্ন সি পি এম-বিরোধী দলকে নিয়ে আপাতত একটা অলিখিত সমঝোতা গোছের করে রাখা যাতে হুট করে যদি ফেবরুয়ারি-মার্চ নির্বাচনটা এসে পড়ে তাহলে যেন জোট বাঁধার আলোচনায় সময় না নষ্ট করতে হয়. যেন চট করেই আসরে নামা যায়।

কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। নানা-ভাবে নানাদিক থেকে বাধা এল।

নব কংগ্রেস দুভাবে এগিয়েছিলেন। একটা দিক হল. বিভিন্ন ছোট দলকে পারটির ভেতরে নিয়ে আসা। এবং আর একটা হল সি পি এম-বিরোধী অন্যান্য দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখা।

এর একটা কাজেও রাজ্যের নব কংগ্রেসী নেতারা তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না।

প্রথমত, ছোট দল বলতে কেউই দলগত-ভাবে এখনই নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেতে রাজি হলেন না। বিদ্রোহী এস এস পির কাশীকান্ত মৈত্র নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কিছু অনুগামীও সঙ্গে গিয়েছেন। কিন্তু এটাকে ঠিক দলগত মিলন বলা চলে না। কারণ বিদ্রোহী এস এস পির সবাই এই সঙ্গে নব কংগ্রেসে যান নি। তাঁরা অনেকেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন. কাশীবাবু যা করেছেন সেটা দলগত ব্যাপার নয়, সেটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

কাশীবাবুকে সঙ্গে পাওয়া অবশ্য নানা কারণেই নব কংগ্রেসের একটা বড় সাফল্য। কারণ কাশীবাবু বেশ ভাল একজন বক্তা। নদীয়ার একটা অঞ্চলে তিনি জনপ্রিয় নেতা। তাছাড়া কাশীবাবু একটা বেশ দৃঢ় কংগ্রেস বিরোধী এবং বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী-বিরোধী ছিলেন। নানা বিচারেই কাশী-বাবুর নব কংগ্রেসে যোগদান বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে নব কংগ্রেস তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। যেমন ধরুন বাংলা কংগ্রেসের ব্যাপারটা। অর্থাৎ অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেসের প্রসঙ্গ। নব কংগ্রেসের নেতারা সংযুক্তি বা মিলন বা মার্জারের প্রস্তাব নিয়ে সবচেয়ে আগে কথা বলা শুরু করেছিলেন এই দলের সঙ্গে। কারণ তাঁদের আশা ছিল যে এই ব্যাপারে তাঁরা খুব চট করে সফল হবেন এবং এই সাফল্যের একটা বেশ বড ইমপ্যাক্টও হবে। অজয়বাবু নব কংগ্রেসে যোগ দিলে অন্যান্য ছোট দলের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব পড়বে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা আগ্রহের সঞ্চার হবে।

অজয়বাবু নিজেও অবশ্য এখনো নব

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পক্ষপাতি। তিনি নব কংগ্রেস নেতাদের তাঁর সে মনোভাব জানিয়েছিলেনও। তাই নব কংগ্রেস নেতারা এই ব্যাপারে আরও উৎসাহী হয়ে উঠে-ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়—বাংলা কংগ্রেসের একাংশ এখনো নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী।

এই দলের নেতা হলেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রণব মুখার্জী এবং চব্বিশ পরগণার নেতা আমজাদ আলি। এঁরা আরও কিছু লোকের সাহায্য পেলেন। এবং ফলে বাংলা কংগ্রেসের কর্মসমিতির বর্ধিত সভায় এখনি নব কংগ্রেসে মিশে যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। ও'রা ঠিক করেছেন. ডিসেমবর মাসে দলের এক সম্মেলন হবে এবং সেখানে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আবার আলোচনা হবে। এবং তারপর ঠিক করা হবে. বাংলা কংগ্রেস নব কংগ্রেসে মিশে যাবে কি যাবে না। এই বৈঠকে অবশ্য অজয়বাবু উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অসুস্থ। তাতে প্রণববাবুদের আরও সুবিধা হয়।

এবং অজয়বাবুর নব কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবটা এইভাবে আটকে যাওয়ায় বিদ্রোহী পি এস পির দু অংশের সঙ্গে মার্জার আলোচনার গতিও অত্যন্ত মন্থর হয়ে গিয়েছে। সুধীর দাস এবং বিদ্যুৎ বসুরাও এখন ধীরে এগোতে চাইছেন। অজয়বাবু যদি চট করে নব কংগ্রেসে যোগ দিতেন তাহলে সুধীর দাস এবং বিদ্যুৎ

বসুরাও নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিবেন।

*

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ছোট বা মাঝারী দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করার ব্যাপারেও নব কংগ্রেস তেমন কোনও সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না।

তাঁরা চেয়েছিলেন, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের সঙ্গেও নির্বাচনী সমঝোতার কথাবার্তা অনেকটা এগিয়ে রাখবেন। কিন্তু তাও হল না। সি পি আই প্রকাশ্যে বলেছেন, তাঁরা এখন কোনও ফ্রন্ট গঠন করতেই রাজি নন। ফরওয়ারড ব্লকের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, তাঁরা সি পি এম বা নব কংগ্রেস কারও সঙ্গেই জোটে বা নির্বাচনী সমঝোতায় যাবেন না। মুসলিম লীগ অবশ্য নব কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় উৎসাহী।

সি পি আইয়ের নীতিগতভাবে নব কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করতে কোনও আপত্তি নেই। বরং তাঁরা সেই ব্যাপারে আগ্রহী। তাঁদের সর্বভারতীয় সিদ্ধান্তই হল নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে চলা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যাপারে সি পি আইয়ের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। এক নম্বর অসুবিধা, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আবহাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ ঠিক ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত নয়। অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যে দক্ষিণপন্থীরাই প্রবল। সেখানে বামপন্থী ঐক্যের নামে নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে তেমন অসুবিধা নেই। কিন্তু এই রাজ্যে বলতে গেলে নব কংগ্রেসই দক্ষিণপন্থী দল। নব কংগ্রেস বা সি পি আই যাদের দক্ষিণপন্থী দল বলে চিহ্নিত করেন সেই জনসংঘ, আদি কংগ্রেস বা স্বতন্ত্র পার্টির এখনও পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনও আধিপত্য নেই। তাই এখানে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে নব কংগ্রেসের সঙ্গে চট করে হাত মেলানোয় সি পি আই-র বেশ কতকগুলি অসুবিধা আছে। সি পি আই নেতৃত্ব জানেন, দলের অনেক কর্মী এটাকে ভাল চোখে দেখবেন না। সি পি আই নেতৃত্বের আরও ভয় আছে, রাজ্যের বামপন্থী মনোভাবের সাধারণ মানুষও এটাকে স্বাগত জানাবে না।

সি পি আইয়ের দু নম্বর অসুবিধা ফরওয়ারড ব্লক প্রভৃতিকে নিয়ে। সি পি আই নেতারা জানেন, ফরওয়ারড ব্লক এখনই কিছুতেই নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হবে না। ফরওয়ারড ব্লকও যদি সঙ্গে না যায় তাহলে সি পি আই অনেকটা একা হয়ে যাবে। সি পি আই একা জাতিচ্যুত হতে রাজি নয়। এমন একটা অবস্থায়, এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে চান যাতে জনসাধারণ এবং দলের কর্মীদের বোঝানো যায় যে সি পি এম নামক দৈত্যকে প্রতিরোধ করার জন্য নব কংগ্রেসের সঙ্গেও সমঝোতা অত্যাবশ্যক এবং এতে অন্যান্য দলও রয়েছেন।

সি পি আই নেতারা তাই চাইছেন, আগে নব কংগ্রেস সহ আরও কয়েকটি দলকে আন্দোলনের প্লাটফর্মে একত্র করতে। যাতে সকলের মধ্যে একটা একাত্মতা গড়ে তোলা যায়। এবং জনসাধারণকেও দেখানো যায় যে এই জোট জনকল্যাণই চায়।

এই জন্যই সি পি আই নব কংগ্রেসের যুব অংশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যৌথ আন্দোলন করার একটা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। এবং ইতিমধ্যেই অন্যান্য দলের যুব সংগঠনগুলির কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তাঁরাও এসে সঙ্গে যোগ দেন। সি পি আই খুব ভালভাবেই জানেন, এই ব্যাপারে সি পি এম তাঁদের সঙ্গে আসবে না। কারণ সি পি এম নব কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এরকম কোনও আন্দোলন করার বিরোধী। সি পি আইয়ের মূল লক্ষ্য, ফরওয়ারড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, বিদ্রোহী পি এস পি ইত্যাদি দল। এই যৌথ আন্দোলনে সি পি আই তাঁদেরও সঙ্গে পাওয়ার চেষ্টা করবেন।

এই যৌথ আন্দোলনের জন্য যে ইস্যুগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি যে জনপ্রিয় ইস্যু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী, কর ফাঁকি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সি পি আই ও নব কংগ্রেসের যুবকেরা যদি বড় কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন এবং যদি তার ফলে কিছুটা কাজ হয় তাহলে যে বহু লোকের দৃষ্টিতে তাঁদের ইমেজ বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

*

বাংলা কংগ্রেস, বিদ্রোহী পি এস পি প্রভৃতি এখনই নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাক সেটাও সি পি আইয়ের নেতাদের ইচ্ছা নয়। তাঁরা জানেন, তাহলে তাঁদের বারগেনিং পাওয়ার কমে যাবে এবং নব কংগ্রেস অনেক বেশি শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবে।

সি পি আই এই জিনিস চট করে হতে দিতে চায় না। তাহলে সি পি এম-বিরোধী ফ্রনটের নেতৃত্বটা এখন থেকেই পুরোপুরি নব কংগ্রেসের হাতে চলে যায়। সি পি আই নেতারা জানেন যে, নির্বাচন হলে খুব সম্ভবত জোটের নেতৃত্ব নব কংগ্রেসের হাতেই চলে যাবে। কিন্তু তা বলে ফ্রন্ট হওয়ার আগেই তাঁরা নেতৃত্বটা নব কংগ্রেসের হাতে তুলে দিতে চান না।

এই জন্য সি পি আই প্রাণপণে চেষ্টা করছেন যাতে বিশেষ করে অজয়বাবুর দল এখনই নব কংগ্রেসে না ঢুকে যায়। অজয়বাবুর দলের ভিতরে এখন সি পি আই-এর ঢুকিয়ে দেওয়া বেশ কিছু লোক আছে। এদের মাধ্যমে সি পি আই বাংলা কংগ্রেসের নব কংগ্রেসে ঢুকে যাওয়াটা আটকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

এখনই ফ্রনট গড়ায় সকলেরই আর একটা বড় অসুবিধা হল মুসলীম লীগ। বাংলাদেশ সমস্যার ভবিষ্যতের উপর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অনেক কিছু নির্ভর করছে। কবে নির্বাচন হবে, কার কী ভবিষ্যৎ হতে পারে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্যার উপর মুসলীম লীগের ভবিষ্যৎ যেভাবে নির্ভরশীল সেভাবে বোধহয় আর কোনও পারটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে না।

বাংলাদেশের ব্যাপারটার পর নব কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক প্রভৃতির পক্ষে মুসলীম লীগকে তুলে ধরা খুব কঠিন। কারণ, মুসলীম লীগকে মানা মানেই সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিকে স্বীকৃতি এবং আসকারা দেওয়া। বাংলাদেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের কোনও দলের পক্ষেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আসকারা দেওয়া সহজ নয়। তাতে বিরাট ক্ষতির ভয় রয়েছে।

তাই সি পি আই বা নব কংগ্রেস এখনই মুসলীম লীগকে সঙ্গে নিতে চান না। আবার মুসলীম লীগকে ছাড়তেও তাঁরা সাহস পাচ্ছেন না। কারণ ভয় আছে যদি তারপর ওরা সি পি এমের দিকে চলে যায়।

মুসলীম লীগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সি পি আই ও নব কংগ্রেস আরও কিছুটা দেখে নিতে চান।

এখনই জোট বাঁধার পথে এটাও একটা বড় বাধা।

নবারুণ গুপ্ত

ভারত আবার আক্রমণের সম্মুখীন। যে-কোনও মুহূর্তে প্রতিবেশী পাকিস্তানের মদগর্বী জঙ্গী শাসক তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। পূর্ব পশ্চিম উভয় খণ্ডেই সীমান্তে এখন তীব্র উত্তেজনা। ছোটখাটো ঘটনাও যে সীমান্তে এখন ঘটছে না এমন নয়: মাঝে মাঝে আমাদের আকাশসীমা লংঘনের ঘটনাও ঘটছে প্রায়ই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামরিক কর্তৃপক্ষের মতন অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরও তৎপর হয়ে উঠেছেন। আরম্ভ হয়ে গেছে এরই মধ্যে ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে বিমান আক্রমণের সংকেত-বাঁশি বা 'সাইরেন' বাজিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়ার, এবং রাত্রে বিমান-আক্রমণকালে শহরাঞ্চল অপ্রদীপ করার মহড়া। পাশের ছবিগুলিতে অপ্রদীপকালীন কলকাতা শহরের কয়েকটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ডান দিকের ছবিতে একজন অসামরিক প্রতিরক্ষা-কর্মী ও পুলিস কর্মী যথাক্রমে একটি ট্যাক্সি ও স্টেট বাসের হেডলাইট নেবাবার জন্যে অনুরোধ করছেন। বাঁ দিকের মাঝের ছবিতে জনসাধারণকে 'সাইরেন' বাজার সময়ে আত্মরক্ষার্থে রাস্তায় শুয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে: উপর ও নীচের ছবি দুটিতে অন্ধকার কলকাতায় চলন্ত দোতলা বাস ও খোলা দোকানের দৃশ্য।

শরিকী জোটে

ইংলিশ চ্যানেলের গালভরা নাম হলে কী হয়, তাকে মহাসমুদ্র তো নয়, সাগরই বলা চলে না। যেখানে সে চ্যানেল সব চেয়ে চওড়া সেখানেও তার মাপ ১৫০ মাইলের বেশী নয়। আর যেখানে সে বেশ সরু সেখানে তো তার মাপ কুল্লে ২২ মাইল। ওস্তাদ সাঁতারুরা তো সাঁতরেই পার হচ্ছে সেখানে ইংলিশ চ্যানেল, নৌকো, স্টীমার, জাহাজের তোয়াক্কা করছে না। কিন্তু যে প্রণালী পার হতে বিমানে পনেরো মিনিটের বেশী লাগে না, জাহাজে লাগে ঘণ্টা চারেক সেই প্রণালী আলাদা করে দিয়েছে বিলেতকে খাস ইউরোপ থেকে। ভূগোলে বিলেত দেশটাকে ইউরোপেরই একটা রাষ্ট্র বলে দেখানো হলেও এতকাল কণ্টিনেণ্টের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ ছিল না বললেও ভুল হয় না। বিলিতী আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, খাওয়া - দাওয়া, পোশাক - পরিচ্ছদ—সবই আলাদা। ইংরিজী সাহিত্য আর কণ্টিনেণ্টের সাহিত্যের মধ্যে অনেক তফাত, চিত্রকলা আর ভাস্কর্যেও অনেক অমিল। ব্যবসা-বাণিজ্যও বিলেতের ঘরের পাশের ফ্রান্স-স্পেন, জার্মানি-ইটালির সঙ্গে এতকাল ছিল না, ছিল দূরান্তরের উপনিবেশগুলোর সঙ্গে।

সে সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পরও বেশ দিনকতক ইংরেজরা তাদের রেওয়াজ পাল্টায়নি। ধসে-পড়া সাম্রাজ্য নতুন করে গড়ে তোলার কোনও চেষ্টা অবশ্য তারা করেনি কিন্তু দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো তারা সাম্রাজ্যের চিতার ওপর খাড়া করতে চেয়েছিল কমনওয়েলথের ঝকঝকে ইমারত। সে ইমারত ধুলোয় লুটিয়ে এখনও পড়েনি, কিন্তু ইংরেজরা যা চেয়েছিল তা হলো কই? পুরোনো দিন তাদের আর কমনওয়েলথের দেশে দেশে ফিরে এলো না, ব্যবসা বাণিজ্য সে সব দেশে আর জমলো না। সাবেকি চাল ছেড়ে তারা নতুন করে ঘরকন্না পাততে চাইলো খাস ইউরোপে, সাত সাগর পারে কমনওয়েলথ থেকে নজর ফিরিয়ে আনলে কণ্টিনেণ্টের দিকে। দেখা গেল সে দরজাও আর খোলা নেই। ১৯৫৮ সন থেকে পশ্চিম ইউরোপের ছ'টা দেশ—ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইটালি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড আর লুকসেমবুর্গ—মিলে পত্তন করেছে এক শরিকী বাজার। ব্যবসা বাণিজ্য এদের সঙ্গে ভালোভাবে করতে গেলে সে বাজারে ঢুকতে হবে। নইলে বাণিজ্য অবশ্য চলা যাবে, কিন্তু তাতে শাঁস আদৌ মিলবে না—মিলবে শুধু ছোবড়া।

বিলিতী সরকার দু'বার চেষ্টা করেছিলেন বাজারে ঠাঁই করে নিতে। একবার ১৯৬১ সনে, আর একবার ১৯৬৭ সনে। প্রথম বার বিলেতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন টোরি ম্যাকমিলান, পরের বার শ্রমিক উইলসন।

দেবরাজ

দু'বারই সে চেষ্টা ভণ্ডুল করে দেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি দ্য গল। ইংরেজরা তাতে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়নি। ইউরোপের ছয় দেশের জোটে ভিড়ে পড়বার চেষ্টা সমানে চালিয়ে গেছে। ১৯৬০ সন থেকে আর একটা পাল্টা জোটও তারা চালিয়েছে। অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড আর যুক্তরাজ্য এই আটটি দেশ ভিড়েছে ওই জোটে, তাদের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডও আছে। এ জোটের লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের দেশগুলোতে বিনা শুল্কে শিল্পে তৈরি পণ্য কেনা-বেচা করা। দেখা যাচ্ছে স্পেন, আয়ারল্যাণ্ড, সাইপ্রাস আর মালটা ছাড়া ইউরোপের অকম্যুনিস্ট দেশগুলো দুটো জোটের মধ্যে কোনওটা না কোনওটাতে ভিড়েছে। তবে দু' জোটের মধ্যে বোলবোলাও ছ' সঙ্গীর কমন মার্কেটেরই বেশী। তার বাইরে যারা আছে তাদেরও ইচ্ছে ওই শরিকী বাজারে ঢুকে পড়ার।

ব্রিটেনের পথ পরিষ্কার হয়েছে দ্য গল চলে যাবার পরই। অনেক সাধ্য সাধনায় পম্পিদু রাজী হয়েছেন বিলেতকে তাঁদের শরিকী বাজারে ঠাঁই দিতে। কিন্তু অনুমতি এক তরফা হলে চলবে না, চাই দু' তরফের—বিদেশেও চাই আবার দেশেও চাই। শরিকী বাজারে ঢুকতে গেলে টোরি প্রধান-মন্ত্রী হীথ বর্তে যান। ম্যাকমিলানের আমলে তিনি ছিলেন লর্ড প্রিভি শীল। তাঁরই ওপর ভার ছিল কমন মার্কেটে ঢোকার জন্যে আলাপ-আলোচনা চালানোর। সে আলোচনা সফল হয়নি বলে তিনি মরমে মরেছিলেন। ফ্রান্সের কাছে ছাড়পত্র পেয়ে এবার তাঁর আর খুশির সীমা নেই। কিন্তু সে ছাড়পত্র তো আর শেষ কথা নয়, পার্লা-মেণ্টকে ভজাতে না পারলে সবই ভেস্তে যাবে। সেখানে তাঁর বিপদ ঘরেও, বাইরেও। কমন মার্কেটে ঢোকার ব্যাপারে তাঁর নিজের টোরি দলে দুমত যদিও অধিকাংশই তার পক্ষে। ওদিকে বিরোধী শ্রমিক দলেরও একই অবস্থা। দলের বেশীর ভাগ লোকই চায় কমন মার্কেটের বাইরে থাকতে যদিও কমন মার্কেটে ঢুকতেও বেশ কিছু সদস্যের ইচ্ছে। পার্লামেণ্টে ভোটাভুটি হলে কী যে হবে তা ভেবে দুশ্চিন্তায় অস্থির হচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হীথ।

ঘাম দিয়ে তাঁর জ্বর ছেড়েছে ২৮ অক্টোবর রাত্তিরে। কমন মার্কেটে ব্রিটেনের ঢোকা নিয়ে ভোটাভুটি হয়েছে ওদিন। ফল যা হয়েছে তা তাঁর আশার বাইরে। ১১২ ভোটে শরিকী বাজারে ঢোকার প্রস্তাব পাস হয়েছে হাউস অব কমন্সে। হাউস অব লর্ডসে গরিষ্ঠতা আরও বেশী। তবে তার কোনও সার্থকতা নেই। হাউস অব কমন্সের রায় যদি বিপক্ষে যেতো তা হলে লর্ডসে দারুণভাবে জিতেও হীথের কোনও লাভ হতো না। কিন্তু কমন্সে যা ঘটেছে তা একটা আজব কাণ্ড বললেও ভুল হয় না। পার্লামেণ্টারি রীতি অনুযায়ী তা হবার কথা নয়। টোরিদের দলে হাজির ছিলেন ৩২৬ জন সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৩৯ জন কমন মার্কেট বিরোধী বলে ভোট দিয়েছেন বিপক্ষে। তবুও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৫৬। কেন না ৬৯ জন শ্রমিক দলের সদস্য টোরিদের সঙ্গে এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়েছেন শরিকী জোটে ভিড়ে পড়বার প্রস্তাবের পক্ষে। এতেই হয়েছে প্রধানমন্ত্রী হীথের কেল্লাফতে।

এতেই কিন্তু শেষ নয়। এর পর পার্লা-মেণ্টকে দিয়ে কমন মার্কেটে ঢোকার আইন পাস করিয়ে নিতে হবে। তার জন্যে তুলতে হবে গোটা কয়েক বিল। তখনও যে হীথ অত সোজায় পার পেয়ে যাবেন তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এবারে ভোটাভুটির আগে তিনি একটা চতুর চাল দিয়েছিলেন। যখন তিনি বুঝলেন নিজের দলের সবাইকে তিনি নিজের মতে আনতে পারবেন না তখন তিনি পার্লামেণ্টের রীতি ভেঙে দিয়ে হুকুম দিলেন যেমন খুশি ভোট দিতে পারবেন তাঁর দলের লোকেরা—কোনও নির্দেশ দিয়ে হুইপ জারি করা হবে না। হলোও তাই। তাঁর দল ভাঙলো না অথচ কাজ উদ্ধার হলো। তার কারণ তাঁর চালে বেসাল হলেন বিরোধী নেতা উইলসন। টোরিরা যখন ভোট দেওয়া নিয়ে কড়াকড়ি করলে না তিনিও ততটা জোর করলেন না। তাতে লাভ হলো হীথেরই। শ্রমিক দলের ৬৯ জন কমন মার্কেট ভক্ত সদস্য ভোট দিলেন শরিকী বাজারের পক্ষে দলের নীতির বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে আছেন পার্লামেণ্টে সে দলের ডেপুটি লীডার রয় জেঙ্কিন্সও। ভোটের পর উপদলপতির পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি জিতেছেন নতুন নির্বাচনে। উইলসন এতে প্রমাদ গণলেও হীথ আনন্দে আত্মহারা।

অজাত বাঙলা দেশ সম্বন্ধে আমরা সবাই আপাতত কিঞ্চিদধিক উত্তেজিত। আমি তো আঁদ্রে মালরো নই। আমার বলবার অধিকার নেই, বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, যে একটা ট্যাংক পেলে আমি আজই পূর্ববঙ্গে মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতাম। তবু পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে উপায় নেই একেবারে উদাসীন থাকবার। হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে প্রতিবেশী আগুনের তাপ, অন্তত আঁচ। গত মার্চ মাসে যখন ইয়াহিয়া খানের রক্তাভিলাষী সৈন্যসামন্ত পূর্ববঙ্গের অস্ত্রহীন এবং সরলমনা জনসাধারণের উপর মধ্যযুগীয় নির্যাতনপর্ব সূচনা করে, তখন আমি সুদূর শীতল লন্ডনে। আঁচ তবু লেগেছিল; ইয়াহিয়া যখন তার বাঁধছিলেন, সে যে বিষম ব্যথা। তার বাঁধা হয়নি। বদলে গৃহদাহ। শিখা লেলিহান।

পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার মেয়াদটা অনতিদীর্ঘ। সম্বন্ধটা তবু অকারণে একটা। এমন উক্তি বিশদতর ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে অগ্রহণীয়। প্রাবন্ধিক আত্মজীবনী রচনায় আমার গভীর অনীহা সত্ত্বেও তাই কয়েকটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ প্রায় অপরিহার্য। আমার জন্ম, যাতে আমার সক্রিয় ভূমিকা ছিল সামান্যই, হয় উত্তরবঙ্গের রঙপুর জেলার কোনো গ্রামে, মামাবাড়িতে। বয়স যখন একুশ দিন তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বারাণসীতে। কর্মব্যপদেশে বাবা যখন চাঁদপুর যান, তখন আমার বয়স প্রায় সাত বছর। "পাকিস্তান" কথাটা সেদিন আর কেউ শুনে থাকলেও আমি শুনেছিলাম বলে স্মরণ করতে পারিনে। তারপর স্কুল। সে পর্ব শেষ হল পনের বছর বয়সে। তারপর এলাম কলেজে, কলকাতায়, ১৯৩৬ সালে, এবং মশা ও মাছি নিয়ে অদ্যাবধি এই দুঃস্বপ্নময় নগরীতেই আছি। মাঝে মাঝে ছাড়া পেয়েছি কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে। এমন কি পূর্ববঙ্গেও শেষ গিয়েছিলাম ১৯৪১ সালে। তা ছাড়া আমি কলকাতায় স্বেচ্ছাবন্দী। দোষ দেব না নিজেকে বা আর কাউকে।

*

কলকাতায় পৌঁছবার স্বল্পকালের মধ্যেই আমাকে সন্দেহশূন্য করে দেওয়া হল যে, আমি পূর্ববঙ্গীয়, অর্থাৎ বাঙাল। এই অভিজ্ঞান তখন ঠিক পদ্মশ্রী বা পদ্মবিভূষণের পর্যায়ভুক্ত মনে হত না। ক্ষুদ্রতার স্বাভাবিক উত্তর ক্ষোভ; প্রত্যুত্তর ক্ষুব্ধতর ক্ষুদ্রতা। আমি তাই কলকাতায় এসে পূর্ববঙ্গীয় ভাষণে সগর্বে ঘোষণা করতাম যে কলকাতায় আমি বিজয়ী প্রবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো অনারব্ধ। বিজিত পশ্চিমবঙ্গবাসী তখনো হাসি ভোলেনি।

আমার পূর্ববঙ্গীয় বিদ্রোহ শুধু ছিল হঠাৎ আলোর মেঘমেদুর ঝলকানি।

পরবর্তী পর্বও আদৌ আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়। আগ্রাসী বর্তমানের প্রথমতম ধর্মই হচ্ছে নিকট অতীতের প্রচণ্ড প্রত্যাখ্যান। কলকাতার ভাষা—যদি এমন কোনো সভ্য বস্তু থাকে—হল আমার ভাষা। যত দূর মনে পড়ে, একটা গিলে-করা পাঞ্জাবিও করিয়েছিলাম। অফিস যাবার আগে একখিলি পান খাওয়ার অভ্যাসও আয়ত্ত করেছিলাম। তবু কোথায় যেন ভুল ছিল গো ভুল ছিল। আমি কলকাতার; কলকাতা আমার; এখনো আমি মনে করি, কিছুটা ডক্টর জনসনের মতো যে, কলকাতায় যার স্পৃহা নেই সে হারিয়েছে জীবনের আগ্রহ। তবু...

তবু কী এক অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়ে গেছে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে। "এরে পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে"। কেউ আমার এতাদৃশ অনিশ্চয়তাকে স্বৈরাচারী দৌর্বল্য বলে প্রত্যাখ্যান করলে আমি আহত হব। আমি রাশিয়ায়, আমেরিকায়, য়ুরোপে নদী দেখেছি বিস্তর। ওদের কোলে আদর পেয়েছি অনেক। তবু পদ্মার পদাঘাত আর মেঘনার মমতার তুলনা কোথাও পাইনি। যে মা শুধু চুমু খায়, কখনো মারে না, সে মা নয়। ক্ষীণস্রোতা হুগলীর অতিমৃদু স্পর্শ, প্যারিসের সেইনের কোমল চুম্বন, কোথায় যেন একটা কিছু নেই। বিভীষণা পদ্মা বা বিবসনা মেঘনার শহুরে শালীনতার আতিশয্য ছিল না, কিন্তু ছিল একটা অনির্দেশ্য প্রাণপ্রাচুর্য যার অর্ধবিস্মৃত আস্বাদ আজো জিহ্বা থেকে মুছে নিতে পারেনি পশ্চিমের তীব্রতম মদিরা।

*

কয়েকটির মৌল সত্য তবু স্মর্তব্য। চিত্তাশ্রয়ী হলেও ভাবপ্রবণতা যুক্তিশীল চিন্তার চিরশত্রু। রবীন্দ্রনাথ যাকে বিধির বাঁধন বলেছিলেন, যা বিদেশী সরকারের কাটবার অধিকার ছিল না এবং যে অভিমান তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই বাঁধন আমরা একদিন নিজহাতে ছিন্ন করেছিলাম। "এ পাপ তোমার, আমার"। নিগৃহীত বাঙলা দেশ আর উদ্বাস্তু-পর্যুদস্ত পশ্চিমবঙ্গকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পূর্ব-পাপ স্মরণ করে। আমরা দুজনেই সম্মতি দিয়েছিলাম, অশ্লীল সেই যুগল অনুমোদনে, দেশবিভাগে। আজ তাই আমি না পারি যোগ দিতে ভারতীয় কুম্ভীরাশ্রু-বর্ষণে অথবা পূর্ববঙ্গের পাকিস্তান থেকে প্রস্তাবিত বিবাহবিচ্ছেদে।

অপ্রিয় সত্যের প্রতি আমার আসক্তি মজ্জাগত এবং বোধ হয় আরোগ্যাতীত। তাই না বলে উপায় নেই যে পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ বাঙালীদের পুনর্ভাবনা আবশ্যক। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সমাগত হিন্দু-মুসলমানদের একমাত্র রাখি যদি হয় ইয়াহিয়া খাঁনের বর্বর নির্যাতন তা হলে ভবিষ্যৎ সাম্যের সম্ভাবনা অসামান্য বলে গণ্য করতে পারিনে। ভাষায় বন্ধন আর যাই হোক সে বিধির বাঁধন নয়। চিন্তনীয় অন্যান্য সম্ভাব্য সেতু, যাদের ভাবী অস্তিত্ব আদৌ নয় অকল্পনীয়। সাম্প্রতিক বাঙালী ঐক্য, ধর্মনিরপেক্ষ এবং একান্তই ভাষাভিত্তিক, নিয়ে যে উচ্ছ্বাসাতিশয্য আজ সর্বত্র প্রত্যক্ষ তার চেয়ে মনোরম দৃশ্য আমার জানা নেই। তবু "আমার হিয়া বিরাম পায় না কো, ওগো দুখজাগানিয়া।" ওর নাম ইয়াহিয়া নয়। সে আমার আর তোমার অন্তরে নিহিত কোনো দুর্মর দুশমন।

প্রকাশ কর্মকারের একটি ছবি

অরুণকুমার সরকার

আকাশে আবিল সূর্য। অকূল পাথারে
ভাসমান দৃষ্টিহীন নরমুণ্ড পাঁচটি
কোন গূঢ় রহস্যের উন্মোচন প্রতীক্ষায়
তরঙ্গের অঙ্গাঙ্গী উদগ্রীব।
প্রকাশ, তোমার ছবি দশবছর আমার দেয়ালে।

কেন চোখ উপড়ে নিয়েছ
ওই লুব্ধ নরনারীদের?
মানুষ সবাই বুঝি অন্ধ আবেগে ধাবমান?
কিসের প্রতীক্ষা যদি সূর্য স্থির নিরক্ত নিস্তেজ?
প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা বুঝি প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা শুধু
তটরেখা মায়াবী হরিণ?

প্রকাশ, তোমার ছবি দশবছর আমার দেয়ালে
দিনরাত্রি রাত্রিদিন তরঙ্গের অবিশ্রাম চলা।
কোন মুগ্ধ নিয়তির বঙ্কিম ইঙ্গিতে শস্যতায়
হে মাধব, রাত নামে, দিন চলে গেল।

কোথায়

বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়

আমি কোথায় উপড়ে করে দিই ভালবাসা—
তাজা সবুজ ও রসালো ফলের খোঁজে আমি দোকানে
খোঁজ রাখি
আমার যোগ্যতার ন্যূনতম মূল্যবোধ—
তড়িৎ গতির জন্য কত কি পেছনে পড়ে রইল
মন্থরতায় আমি কত পেছনে।
প্রত্যেকটা গতির পেছনে কিছু শব্দ জমা হয়ে থাকে
ভিক্ষার পাত্রে পয়সা দেওয়ার শব্দ, অরণ্যের শব্দ এবং
প্রবহমানতায় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার শব্দ।

মৃত্যুর মুখ নিয়ে কেশে ওঠে মানুষ
জীবনের গান নিয়ে ফিরে যায় পাখি
আমি নিয়মিত খোঁজ রাখি ইন্টারভিউর কোথায় কি
নতুন কবিতার বই—
আমাকে চমক দিয়ে প্রতিদিন এক একটা ফুল পরিপূর্ণ
হয়ে ওঠে
পেছনে তাকালেই যেন বয়েস বেড়ে যায়
অসংখ্য মান অভিমান অভিবাদন অতীতের রূপসজ্জা।

আমি তোমায় এমন কি দিতে পারি যা
বাসনার অধিক—
আমিও অলীক কিছু আশা করি না। অথচ শূন্যতায় মিলে মিশে
অনন্ত গহ্বর সৃষ্টি করা। অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার বীজ।
যেমন অপার ঔৎসুক্যে দূর হতে নক্ষত্রেরা পৃথিবীকে দেখে
কখনও বিকেল সকালের পূর্ণতা পায় ভোর হয়ে ওঠে
রক্তের শিশির
দু' হাতে অসংখ্য শব্দ ঠেলে প্রকৃত ভালবাসায়
কিছুতেই যেন আমরা পৌঁছতে পারছি না।

কবিতা কলকাতা খেলাঘরে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবিতার মধ্যে খুবই উপদ্রব সম্প্রতি বেড়েছে।
কোনো গুপ্তচর শব্দ মুহূর্তে ভণ্ডুল করে দেয়,
উজ্জ্বলে মলিন করে ক্ষয়া ও খর্বুটে, বর্ণমালা
পাইকার এবং করে সমস্তরকম নাশকতা......
সজ্জা, সিঁড়ি, গ্রীবা ফাটে, চোরাজল নিশ্চিত নষ্টের
মূলে টেনে আনে আর ধ্বংস করে, কাটাকুটি করে।
আমার কলকাতা আজ নিষ্প্রদীপ, কবিতারই মতো
মহড়ায় প্রাণপণ, অসতর্ক নিষ্ফল বাস্তবে
কবিতারই মতো তার ডালপালা সর্বস্ব রয়েছে....
নেই, যাকে বলে অগ্নি, বলে প্রাণ, হরিৎ উদ্গার!
তবুও, খড়ের স্তম্ভে-স্তূপে ফোটে একাকী জীবিত
কোঁড়ক, স্বপ্নের মধ্যে আকাশেরও বিবৃতি সঠিক;
সেই পুরাতন চাঁদ সাক্ষী রেখে হৃদয়স্থাপন
করে হুলস্থূল প্রেম, কবিতা কলকাতা খেলাঘরে॥

রাগে রক্ত ফোটে

জয়োৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় যে সে হারিয়ে গেল ছিলাম অন্যমনা
তোমার কোলে দুঃখ সুখের দিন
বর্গী এল বাংলা দেশে বিশাল ক্ষুধা নিয়ে
বললো, এবার শুধতে হবে ঋণ।

বাড়িয়ে দিল দস্যু লোভী হাত
হিংসা চোখে ঝল্‌সে ওঠে, ঝল্‌সে ওঠে দাঁত
শহর-গঞ্জ শ্মশান ধূ ধূ শস্যহীন মাঠ
চতুর্দিকে শুধু রক্তপাত।

ভাঙলো ওরা জুতোর নিচে মাথার খুলি, হাড়
উল্লাসেতে গর্জে ওঠে কৃতঘ্ন রাইফেল
কিন্তু মাটি কার!
কার অধিকার বুকের রক্তে, দেহের ঘন ঘামে
জড়িয়ে আছে শস্যে তৃণে গভীর ভালবাসা
ঘাতক তুমি জবাব দিতে পারো,
জীবন নিয়ে এমন খেলা কেমনতরো নেশা?

রক্ত ফোটে রাগে, বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে
প্রলয়নাচন নাচে মৃত্যু আকাশ, জলে, স্থলে।
শাঁখা ভাঙা দু হাত মা তোর রক্তে রাঙা বেশ
নীরব হয়ে যায় কি থাকা
অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা
অপমানে জর্জরিত যখন বাংলাদেশ।

ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা রুদ্র হয়ে ওঠে
রাগে রক্ত ফোটে বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে
প্রলয়নাচন নাচে মৃত্যু আকাশ, জলে, স্থলে।
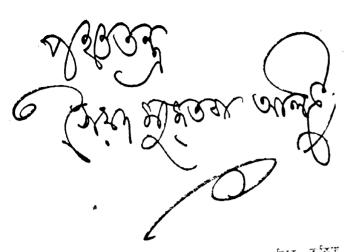
বিদেশে (৩০)

আচ্ছা, লটে, আর পাঁচজন জর্মনের মত তুমি তো হিটলার-যুগটা একটা বিভীষিকা-ভরা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেতে চাও না। তবে একটি কাহিনী আমি শুনতে চাই—বরঞ্চ বলা উচিত, আমি শুনতে চাই আর নাই চাই, আমার দেশের ছেলেছোকরা মোকা পেলেই আমাকে শুধোয়, হিটলার বিয়েশাদী করলেন না কেন? তা সে করুন আর নাই করুন—ইয়োরোপে যখন দুধ সস্তা তখন গাই কিনে সেটার দেখভালের ঝনঝাক্কা-ঝামেলা পোয়ানো নয়। আত্মসুখী—প্রেমমুগ্ধের দিকে তাঁর কি কোনো প্রকারেরই ঝোঁক ছিল না?"

লক্ষ্য করেছি, এ প্রশ্নে অনেক জর্মনই অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। কিন্তু লটে মেয়েটির সমঝ-বুঝ আছে। একদিকে যেমন খানিকটে প্যুরিটানিজম আছে, অন্যদিকে কথা প্রসঙ্গে যদি প্রেম এমন কি আলোচনা দৈহিক কামনার দিকে মোড় নয় তবে সে সব সময় নাসিকা কুঞ্চিত করে না। এমন কি মাঝে মাঝে হাজার ভল্টের প্রাণঘাতী শকও দিতে জানে। যেমন আমাদের তিনজনাতে বেশ যখন জমে উঠেছে তখন লটে বেশ রসিয়ে রসিয়ে য়োহানেস-আগুনেস্-আমর স্নানবিহারের বিপর্যয় কাহিনী হেরমানকে শোনালে। হেরমান কৌতুকভরে আমাকে শোধালে, "আচ্ছা, সায়েড, সবই তো জল কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে তাণ্ডাদর্শী আগুনেসের বার্থ ও ফ্রকপরা যে অনাবিল সৌন্দর্য—"

ঝোপের ভিতর দিয়ে আসার সময় কাহিনী বলতে বলতে যখন এই অংকে পৌঁছই তখন যেরকম রসভঙ্গ করে লটে ধমক দিয়ে বলেছিল "চোপ" এস্থলেও সেটা তদ্বৎ।

আমি হেরমানের দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে ফরিয়াদ জানালুম, "ভায়া, হেরমান আড়াল থেকে মাত্র দুটিবার এ জীবনে নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—"

ঠোঁটকাটা হেরমান শুধোলে " আর মুখোমুখি?"

লটে ফের ধমকালে, "চোপ!"

এ-"চোপেতে" আমার সর্বান্তঃকরণের সম্মতি।

রূঢ়বাক্য প্রয়োগের বেলায় লটের শব্দ-ভাণ্ডার বড্ডই বাড়ন্ত। অনুমান করলুম, প্রাচীন দিনের সেই নবীনা লটে নানা অনাবশ্যকীয় কিন্তু অনিবার্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই লটে এখনো শক্ত নাম দিতে পারে। কাউকে ধমকটমক দিতে দিতে কড়া কথার স্টক বড় একটা বাড়াতে পারেনি।

আমি হেরমানকে করুণতর কণ্ঠে বললুম "শুনলে ভাইয়া, শুনলে? দেখলে, কী মারাত্মক প্যুরিটান, ঝুরঝুরে সেকেলে পাদ্রিপাস!'

লটে স্থির নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আমার সঙ্গে যুগল অভিসারে বেরিয়েছো আমারই বাড়ির সামনেকার কুঞ্জবনে—"

(আমি মনে মনে খানিকটে আমেজ করে গুনগুনালুম,

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙিনা দিয়া)

লটে বাক্যের শেষাংশ পুনরাবৃত্তি করে বললো—"আমারই বাড়ির সামনেকার কুঞ্জবনে, আর আমাকে শুনতে হবে, কান ভরে শুনতে হবে, প্রাণভরে 'আমরি-আমরি' বলতে হবে আগুনেসের নগ্ন সৌন্দর্য-বর্ণনার প্রতিটি শব্দ যখন আমার কানের পর্দাতে কটাং কটাং করে হাতুড়ি ঠুকবে। ভেবো না আমি হিংসুটে। নগ্ন সৌন্দর্যের বর্ণনা যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো রমণীর এবং ছাইস-ভাসা দিক। আমার তাতে বিন্দু-মাত্র আপত্তি নেই—তা সে বিন্দু সরেসতম নেপোলিয়ন ব্রান্ডিরই হোক আর নিরেসতম জাপানী বিয়ারেরই হোক কিন্তু তুমি যদি দিতে চাও—তা সে তোমার জীবনে প্রথমবারের মতই হোক, আর শেষবারের মতই হোক—তুমি দেবে আমায়। বইলো কথা।"

হেরমান বললে, "ব্রাভো, ব্রাভো। এ-বউ বাঁচলে হয়!"

এবার আমার "চোপ" বলার পালা।

হেরমান যেন রণাঙ্গনে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে বললে, "কেন? শুনতে পাবার মত অধিকার আমার আছে কি, বর্ণনাটা গেলবার মত প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি কি, সে সিনেমাটা এ-মার্কা না বি মার্কা, জানতে পারি কি? কেন আর্টিস্টরা কি নুড মডেল সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকে না? আর দাঁড় করিয়েই বা বলছি কেন? আর্টিস্ট পিটমুলারের স্টুডিয়োতে যখনই গিয়েছি, তখনই দেখেছি, নিদেন গোটা তিনেক মডেল বার্থডে-ফ্রক পরে কেউ বা কফি বানাচ্ছে, এখান থেকে দেশলাই আনছে, ওখান থেকে চিনিটা আনছে, সেখানে আতিপাতি খুঁজছে, কফির কৌটোটা গেল কোথায় শুধোচ্ছে, জানো তো আর্টিস্ট মাত্রই কি রকম মারাত্মক গোছ-গোছানোর নী... আন্ড ক্লীন বেড়ালটির স্বভাব ধরেন—অন্য জন ম্যুলারের আসন্ন প্রদর্শনীর জন্য ছবি খুঁজতে গিয়ে কখনো কত হা... গড়াতে গড়াতে সোফার নিচে ঢুকছেন কখনো বা অর্ধলম্ফে জানলার চৌকাঠে উপর উঠে একটি বাহু সম্প্রসারিত করেছে সর্বোচ্চ শেলফের দিকে, আমি তো জা... মরি হাতখানির প্রলম্বিত ঐ টান-টান টানে ফলে দেহশ্রীর উচ্চার্ধ না বক্ষচ্যুত হয়—"

লটে বললে, "বাস! হয়েছে।"

হেরমান সবিনয় বললে, "তাই স... বাকিটা সংক্ষেপে সারছি। কারণ তৃতী... মডেলটি সবাকার সেরা। সেই বি... স্টুডিয়োর মাঝখানে তিনি মেদব... নিবারণার্থে জিমনাস্টিক জুড়েছেন। সে যা তা জিমনাস্টিক নয়—ভার... সাপুড়ে নাচ থেকে শুরু করে মিশরী বে... ডানস্—নাভিকুণ্ডলীটি কেন্দ্র করে।

আর ঐ সব হুরীপরীদের কর্মকলা... মাঝখানা যেন তুর্কীর পাশা জর্মন ... ম্যুলার তার খাস-প্যারা ডিভানটির... অঘোরে ঘুমঘোরে নাক ডাকাচ্ছেন। এর... পিটকে শুধিয়েছিলুম, মঞ্চের উপর ...

জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সে নাহয় বুঝি। কিন্তু কাজকর্ম করার সময় ওনারা জামা-কাপড় পরলে কি দোষটা হয়। পিট্ বললে আমি নাকি একটা আস্ত বুদ্ধু। দুনিয়ার তাবৎ মেয়েই তো এমন কিছু আর্টিস্টের মডেলের মত 'যাবজ্জীবেৎ' তত কাল মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে 'সুখং জীবেৎ' বরাত নিয়ে আসে না। ওরা হাঁটে, কাজ করে, উপুড় হয়ে এটাসেটা কুড়োয়, পায়ের আট আঙুলের উপর ভর দিয়ে নাগালের প্রায় বাইরের তাকটা থেকে আচারের বোয়াম নামায়। এগুলোও তো আঁকতে হয়—অবশ্য ফ্রক ব্লাউস তখন তাদের পরনে থাকে, আমিও তাই আঁকি। কিন্তু অংগপ্রত্যংগের স্থান-পরিবর্তন এবং তজ্জনিত নানাবিধ আন্দোলন ন্যুডে না দেখা থাকলে ছবি ডাইনামিক হয় না। উদাহরণ দিয়ে পিট বলেছিল গাছের যে ডালপালা—তার গতিবিধি হুবহু জানতে হলে গাছটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, যখন শীতকালে সে সর্ব পত্র বিবর্জিত নগ্ন।"

আমি বললুম, "তা হতে পারে। কিন্তু আর্টিস্টরা সব-কিছু দেখে নিরাসক্ত নয়নে। ন্যুড গাছ, ন্যুড রমণীকে—একই নিরাসক্ত নয়নে। কিন্তু আর পাঁচজন তো প্রভু খৃস্টের মত নয়। তিনি বলেছেন, 'পাপনয়ন উপড়ে ফেলো'। তার বললে বিশ্বাস করবে না, আমাদের দেশের এক বেশ্যাসক্ত পাপী ঐ উপদেশ না জেনেও জ্ঞানচক্ষু খুলে যাওয়াতে চর্মচক্ষু উপড়ে ফেলে। আশ্চর্য, প্রভু খৃস্ট উদ্ধার করলেন ভ্রষ্টা নর্তকী মারি মাগ্-দেলেনেকে আর ভ্রষ্টা নর্তকী চিন্তামণির উপদেশে উদ্ধার পেল পাপী বিল্বমঙ্গল। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি বলছি, তোমার বউ তো বিরাট একগাছ—"

লটে: "কি বললে! আমি ধুমসী মুটকী একগাছ?"

"আহা চটো কেন? অন্য হাতটা আনতে দাও—"

"সে আবার কি জ্বালা?"

"পরে হবে।—কিংবা তুমি ফুলবংশী তিনার গাছও নও! তা হলে, বলো বৎস, হেরমান, করি কি?"

হেরমান: "কে বললে তোমাকে, আর্টিস্টরা নিরাসক্ত নয়নে কুল্লে দুনিয়ার দিকে তাকায়? তা হলে কোনো ন্যুডকে সরলা, কোনোটিকে চিন্তাশীলা, কোনোটিকে কামুকা, কো ন টি কে চিত্তপ্রদাহিনী, কোনোটিকে শান্তিদায়িনী আঁকে গড়ে কি প্রকারে? নিশ্চয়ই তাঁদের হৃদয়মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদয় হয়। অবশ্য পূর্ণ সিদ্ধ মডেল তার থোড়াই পরোয়া করে। "সঙ অব সঙ"—"সঙ অব সলমন" নামেও পরিচিত—ফিলিম দেখেছ? আমাদের ঐ পাশের শহর কলোনের মেয়ে—হিটলার বৈরী রমণী মার্লেনে ডীট্রিষ সে ফিলিমের প্রধান নায়িকা। গাঁইয়া মেয়ে এসেছে শহরে পিসির দোকানে কাজ করতে। সেখানে এক ছোকরা ভাস্করের সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের অলাপ। ছোকরা পিসির ভয়ে বেরুবার সময় শুধু আঙুল দিয়ে দেখালে—সামনের পাঁচতলার বাড়ির চিলেকোঠায় তার স্টুডিও। মেয়েটা মজেছে। সে-রাত্রেই গেল আর্টিস্টের কাছে। আর্টিস্ট সত্যই মেয়েটিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে—যেন সন্ধান পেয়েছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, মাস্টার-পীস, 'সঙ্ অব্ সঙস্' সর্বগীতির সেরা গীতি' ওরই ন্যুড দিয়ে নির্মাণ করবে। অনুপ্রাণিত ভাষায় মেয়েটিকে তার আদর্শ, তার সর্বকীর্তির শ্রেষ্ঠতম কীর্তির কথা বলে বলে সেই সরলাবালার হৃদয়ে তার ভাবাবেগ সঞ্চারিত করলো। অবশেষে অনুরোধ করা মাত্র সর্ব আবরণ খুলে ফেলে দাঁড়ালো মঞ্চের উপর সে মেয়ে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আর্টিস্ট ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুততম গতিতে এঁকে যেতে লাগল প্রথম স্কেচ। সম্বিতে ফিরে এলো স্কেচ শেষ হওয়ার পর। তখন, এই সর্বপ্রথম, সে লক্ষ করলো মেয়েটির দেহের সৌন্দর্য। তার চোখের উপর ফুটে উঠলো সে ভাব পরিবর্তন। মেয়েটি এক পলকেই সে-আবেশ লক্ষ করলো। সঙ্গে সঙ্গে পেল নিদারুণ লজ্জা। ছুটে গিয়ে সর্বাঙ্গ জড়ালো, হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে।

এতক্ষণ অবধি দুজনার কারোরই কোনো আচরণে কোনো প্রকারের আড়ষ্টতা ছিল না। দুজনা একই সৃষ্টিকর্মের ভাবাবেগে নিমজ্জিত, একই আদর্শে অনুপ্রাণিত—একজন ডাইনামিক, অন্যজন স্টাটিক। এক-জনের সে-ভাব পরিবর্তন হওয়া মাত্রই সে পরিবর্তন ওর মনে সঞ্চারিত হল। মৃন্ময় দেহ সম্বন্ধে সে এই প্রথম সচেতন হল। সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তে উদয় হল, সংকোচ ব্রীড়া লজ্জা। সঞ্চারিত হল দেহে।

অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে এ-মেয়েটির বিবস্ত্র হওয়া, আর্টিস্ট যতক্ষণ স্কেচ কর-ছিল আপন নগ্নদেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন থাকা, স্কেচ শেষে হঠাৎ আর্টিস্টের চোখে ভাবান্তর লক্ষ্য করে চিন্ময়ভুবন থেকে মৃন্ময়লোকে পতন—এসবই সম্ভব হয়ে-ছিল, তার একটিমাত্র কারণ সে ছিল জনপদ-বালা সরলা কুমারী।"

হেরমান ঠিক সময়ে এসেই থামলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "বে-আদবী মাফ হয়। আমি একটু আসি।"

আমি লটের দিকে তাকালুম। তার নয়ন মুদ্রিত। হেরমানের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার শব্দ শুনে চোখ মেলে আমার দিকে গভীর স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে বললে, "হেরমান অনায়াসে চিন্ময় মৃন্ময়ে আনাগোনা করতে পারে। আমার অতখানি বুদ্ধি নেই অতখানি স্পর্শকাতরও আমি নই। আমি অত্যন্ত সাদামাটা রাইনের কাদায় গড়া মানুষ। তবু বলবো, হেরমান যেভাবে সমস্যাটা বুঝিয়ে বললে এরপর হিটলারের প্রেম নিয়ে আলোচনা করা যায় না। লোকে বলে "হিটলারের প্রেম"। কিন্তু সে-পংকিল বস্তুটাকে প্রেম নাম দিতে হলে অনেকখানি কল্পনা শক্তির প্রয়োজন। ওটা আজ থাক।"

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে শুধোলে "আজ চাঁদের আলোটা ঠিক তেমন উজ্জ্বল নয়, সেই সে-রাত্রে তুমি যখন রাইন গল্ড্ এক্সপ্রেসের তুফান বেগে চিঠি ডাকে ফেলতে যাচ্ছিলে। তবু নেই নেই করে কিছুটা তো আছে। আচ্ছা তুমি কখনো চাঁদের আলোতে ক্যানভাসের ফোল্ডিং বোট্-এ রাইনের উপর ঘোরাঘুরি করেছ?"

আমি বললুম "কেন?"

"আমাদের একটা আছে! যাবে?"

আমি শুধালুম, "সে তো বেশ কথা। হেরমান নিশ্চয়ই ভালো নৌকো বাইতে জানে—রাইনের পারে জন্মাবধি এতটা কাল কাটালো।"

লটে খিল খিল করে হেসে বললে, "তুমি কি ভেবেছো আমাদের ফোল্ডিং বোট স্বর্গীয় মানওয়ারী জাহাজ 'বিসমার্ক' বা 'কুইন মেরি' সাইজের জাহাজ। ওটাতে মাত্র দুজনার জায়গা হয়।"

আমি বললুম, "সর্বনাশ॥"

॥ মহড়া ॥

"আমি অতি সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষের কথা আজকালকার ক্ষমতালোভী মানুষেরা শুনিবে কিনা জানি না। ক্ষমতা পাইবার লোভে মানুষে যখন আজকাল যে-কোনও অন্যায় আচরণ করিতে প্রস্তুত, সেই সময় আমার মত সাধারণ মানুষের কাহিনী শুনিবার মত লোক নাই জানিয়াও আমি আমার এই জীবনী লিখিতে বসিয়াছি। এই অবিশ্বাসের যুগেও আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও একজন বিশ্বাসী-প্রাণ মানুষ আছে। সে মানুষ এখনও সততা এবং সত্যবাদিতাকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ধর্মকে, বিশ্বাস করে ভালবাসাকে এবং বিশ্বাস করে ঈশ্বরকে। এই তিন শক্তিকে যে বিশ্বাস করে না তাহার জন্য আমার এ-কাহিনী নয়। তাহারা আমার এই কাহিনী না-পড়িলেও আমি দুঃখ করিব না। ঈশ্বর যদি একজন যিশু খৃষ্টের জন্য হাজার-হাজার বছর অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার মত নগণ্য লোক একজন সৎ পাঠকের জন্য লক্ষ-লক্ষ বছর অনায়াসেই অপেক্ষা করিতে পারিব। আমার বয়স এখন......"

এই পর্যন্ত লিখেই সদানন্দবাবু থামলেন। বয়েসটা হিসেব করতে হবে। বয়েস কত হলো তাঁর? ভাবতে ভাবতে সদানন্দবাবু ভাবনার তলায় তলিয়ে গেলেন। কম দিন তো হলো না। অত দিনের সব কথা মনে রাখা কি সহজ! অথচ মনে করতেই হবে। মনে না করতে পারলে জীবনী লেখা ব্যর্থ হবে। সব কথাই তাঁকে খুলে লিখতে হবে। কোনও কথা গোপন করা চলবে না তাঁর। যে-জীবন থেকে সরে এসে তিনি এখানে এই চৌবেড়িয়াতে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছেন সেই ফেলে আসা জীবনের কথা তাঁকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আবার মনে করতেই হবে। আবার তাঁর ফেলে আসা জীবনটাকে আগাগোড়া পরিক্রমা করতে হবে।

তাঁর সেই ছোটবেলার কথা।

তিনি লিখতে লাগলেন—"আপাত-দৃষ্টিতে সেই ছোট বেলা হইতেই আমার কোনও অভাব ছিল না। যাহাকে সংসারী লোক অভাব বলে তাহা আমার ছিল না। আমি নবাবগঞ্জের প্রবল-প্রতাপ জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পৌত্র, আর হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সদানন্দ চৌধুরী যাহা চাহিতাম তাহাই পাইতাম। চাহিয়া না-পাওয়ার দুঃখ যে কী ভীষণ অসহনীয় তা আমাকে কখনও বুঝিতে হয় নাই। অথচ সেই আমার কপালেই না-চাহিয়া সব পাওয়ার বিপর্যয় যে এমন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা সেই অল্প বয়সে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।"

লিখতে লিখতে সদানন্দবাবুর ভাবতে বড় ভালো লাগলো। নবাবগঞ্জের সেই বাড়িটা, সেই গাছ-পালা-পুকুর, সেই বারোয়ারি-তলা, আর সেই চণ্ডীমণ্ডপ। কথাগুলো যেন ভোলা যায় না। অথচ ভুলতেই তো চেয়েছিলেন তিনি। ভোলবার জন্যেই তো এই চৌবেড়িয়া গ্রামে এসেছেন।

ঘরের মধ্যে একটা ছোট তক্তপোষ। তের টাকায় কিনে এনেছিলেন চৌবেড়িয়ার বাজার থেকে। আর ওপর একটা মাদুর। যখন এখানে এসেছিলেন তখন কিছুই সঙ্গে আনেন নি। তাঁর কিছু থাকলে তবে তো সঙ্গে আনবেন। নবাবগঞ্জ থেকে ট্রেনে উঠে একবার শুধু ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে কেষ্টনগর। আর তারপর ভাসতে ভাসতে একেবারে এই এখানে। এখানে তখন কে-ই বা ছিল! একেবারে যেন পৃথিবীর ওপিঠ। না আছে একটা হাট, আর না আছে একটা স্কুল।

প্রথম আশ্রয় পেলেন পালেদের আড়তে। রসিক পাল ধার্মিক মানুষ। তিনি আপাদ-মস্তক ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেন। বললেন—আপনার নাম?

—সদানন্দ চৌধুরী।

—ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

—ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনে খুব খাতির করে বসতে বললেন। তারপর নানা খবরাখবর নিলেন। কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, কী উদ্দেশ্যে চৌবেড়িয়ায় আগমন। বিদ্যা কতদূর। সব শুনে বললেন—ঠিক আছে, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন আর কোনও ভাবনা নেই, আপনি এখানে থাকুন—

রসিক পাল মশাই চৌবেড়িয়ার বনেদী কারবারী। পাট, তিসি, তিল, মস্তার কারবার করে তিনি বড়লোক হয়েছেন। বিরাট আড়ত ছিল তাঁর। সেই আড়তে বসে তিনি কারবার করতেন আর মহাজনী-কারবারের নামে নানা লোককে সাহায্যও করতেন। চৌবেড়িয়া গ্রামের সাধারণ মানুষ পাল মশাইকে ছাড়া তাদের জীবনযাপনের কথা কল্পনাও করতে পারতো না। বাড়িতে উৎসবে-অনুষ্ঠানে, বিবাহে-শ্রাদ্ধে, অন্নপ্রাশনে-পৌষ সংক্রান্তিতে সব ব্যাপারেই রসিক পাল মশাই-এর কাছে এসে হাজির হতো। বলতো—যাবেন পাল-মশাই, আপনি গিয়ে পায়ের ধুলো দেবেন—

সেই রসিক পালের বড় ইচ্ছে হয়েছিল চৌবেড়িয়াতে একটা স্কুল হোক। গ্রামের ছেলেদের বাইরের গ্রামে গিয়ে লেখা-পড়া করতে হয়, এটা তাঁর ভালো লাগতো না। নিজে তিনি লেখা-পড়ার ধার ধারতেন না। কিন্তু তার জন্যে তাঁর দুঃখ ছিল। ছেলেদের কলকাতার হোস্টেলে রেখে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন বরাবর। কিন্তু গ্রামে স্কুল করতে গেলে মাস্টার দরকার। এমন মাস্টার চাই যার সময় আছে ছাত্র পড়াবার। তেমন বেকার লোক কোথায় পাবেন? কে মাস্টারি করতে রাজি হবে?

তা শেষ পর্যন্ত এই সদানন্দ চৌধুরীকে পেয়ে গেলেন। রসিক পালের আড়তে অনেক লোক খাওয়া-দাওয়া করে। ব্যাপারীরা কাজ-কর্মে আড়তে এলে তাদেরও খাওয়া-শোওয়ার বন্দোবস্ত রাখতে

হয়। সদানন্দ সেখানেই থাকুক।

কিন্তু সদানন্দ হাত-জোড় করলে। বললে—তার চেয়ে পাল মশাই আমি বরং স্বপাক আহারের ব্যবস্থা করি। আমার চাল-ডাল-নুন-তেলের ব্যবস্থাটা শুধু আপনি করে দিন। আমি বরং মাইনেই নেব না—

রসিক পাল তাজ্জব হয়ে গেলেন কথা শুনে। বললেন—মাইনে নেবে না?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে তোমার খরচ চলবে কেমন করে?

সদানন্দ বললে—আমার তো খরচের কিছু দরকার নেই। আমি নেশা-ভাঙ করি না, চা খাই না, পান-তামাক-বিড়ি কিছুরই দরকার হয় না। মাছ-মাংস খাওয়া আমার নিষেধ। দু' বেলা দু' মুঠো ভাত আর আলুভাতে পেলেই আমার চলে যাবে—

রসিক পাল অনেক কাল ধরে অনেক লোক চরিয়ে বুড়ো হয়েছেন। এমন কথা কারো মুখে কখনও শোনেন নি। আবার ভালো করে আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন সদানন্দর। তাঁর মনে হলো এখনও যেন তাঁর অনেক দেখতে আর অনেক শিখতে বাকি।

বললেন—আচ্ছা, আজ রাত্তিরটা তো আড়ত-বাড়িতে থাকো, তারপর কাল যা-হয় করা যাবে—

বলে তিনি সে-রাত্রের মত বাড়িতে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। আড়তের ক্যাশ-বাক্সে চাবি পড়লো। যাবার আগে হরি মুহুরিকে বললেন—ওই লোকটাকে একটু যত্ন-আত্তি কোরো হরি, লোকটা ভালো মনে হচ্ছে—

হরি মুহুরিই সদানন্দের সব বন্দোবস্ত করে দিলে। পরের দিন রসিক পাল হরি মুহুরিকে জিজ্ঞেস করলেন—কালকে ওই ছোকরার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

হরি মুহুরি রসিক পালের আড়তের পুরোন লোক। আড়তে বহু লোকের আনাগোনা দেখেছে, বহু লোকের তদ্বির তদারক করেছে।

বললে—আজ্ঞে অসুবিধে হবে কেন? অসুবিধে হবার কথা তো নয়।

—কী খেতে দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে ভদ্দরলোক কিছুই খান না। বলতে গেলে উপোস। উপোসই এক রকম।

—কী রকম?

—আজ্ঞে, একখানা রুটি আর সিকি বাটি ডাল। আর কিছু নিলেন না।

—মাছ হয়নি কাল?

—আজ্ঞে হয়েছিল, কিন্তু উনি মাছ-মাংস ডিম কিছুই ছোন্‌ না।

—শোওয়ার কোনও অসুবিধে হয়নি? নতুন জায়গা তো!

—অসুবিধে হলে কি আর গান গাইতেন?

—গান?

রসিক পাল অবাক হয়ে গেলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন—গান? কী গান?

হরি মুহুরি বললে—ঘুমোতে ঘুমোতে অনেকের গান গাওয়া যেমন অভ্যেস থাকে তেমনি আর কি।

—কী, গানটা কী?

হরি মুহুরি বললে—কবির গান আজ্ঞে—ছোটবেলায় হরু ঠাকুরের কবির গান শুনেছিলুম, সেই গান—

—হরু ঠাকুরের কোন্‌ গান?

হরি মুহুরি গানটা বললে—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত,
কারো মুখে যদি শুনিতাম॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম॥

রসিক পাল সাদাসিধে মানুষ। কবি নয়, কিছু নয়, সহজ সাধারণ মানুষের গানের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান গায়, পাগল নাকি?

হরি মুহুরি বললে—গানও করতে লাগলেন আবার কথাও বলতে লাগলেন। সারা রাত গান আর কথার জ্বালায় আমাদের কারো ঘুম হয়নি কর্তামশাই—

—গান তো হলো, কিন্তু কথা? কথা কিসের আবার?

হরি মুহুরি বললে—সে সব অনেক কথা, সব কথার মানে বুঝতে পারিনি। কখনও আবার একজন মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে, আবার কখনও...

—মেয়েমানুষ? মেয়েমানুষ মানে? চরিত্র খারাপ নাকি লোকটার?

হরি মুহুরি বললে—আজ্ঞে তা বলতে পারবো না, তবে যে-মেয়েটার নাম ধরে ডাকছিলেন তার নামটা ভারি নতুন—

—কী রকম?

হরি মুহুরি বললে—নয়ন। কখনও নয়ন বলছিলেন, কখনও আবার নয়নতারা—মনে হলো নিশ্চয়ই কোনও মেয়ে মানুষের নাম হবে। রাত্তির বেলা ঘুমোতে ঘুমোতে মেয়েমানুষের নাম ধরে কথা বলে, পীরিতের গান গায়, এ তো ভালো লক্ষণ নয় কর্তামশাই, আপনি কেন অমন লোককে আড়তে ঠাঁই দিলেন বুঝতে পারছি নে, কাজটা কি ভালো হলো?

রসিক পাল তখন আর কিছু বললেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন। এতদিন সংসারে বাস করে এসে এত লোক চরিয়ে তিনি কি শেষকালে ভুল করবেন নাকি! হরি মুহুরির কথার কোনও সোজা উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন—ঠিক আছে, তুমি একবার ওকে আমার গদিতে পাঠিয়ে দিও তো—

গদিবাড়িতে রসিক পাল রোজ সকালে এসে কয়েক ঘণ্টা বসেন। সেই সময়ে খাতক পাওনাদার পাড়া-প্রতিবেশী নানা রকম লোক নানা আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে আসে। কেউ টাকা খয়রাতি চায়, কেউ শুধু মুখটা দেখাতে আসে। তারপর আছে ব্যাপারীরা। কারবারের লেন-দেন কথা-বার্তা হয় সেই সময়। রসিক পাল মশাই তখন কুড়োজালির মধ্যে হাত পুরে মালা জপ্ করেন আর মুখে কথা চলে। রসিক পালের সব কাজই ঘড়ি ধরা। সকাল বেলা উঠেই গঙ্গাস্নান। তখন ঘড়িতে ভোর ছটা। পাল মশাইকে দেখেই সবাই বুঝতো তখন ঘড়িতে ছটা বেজেছে। কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা তার কোনও ব্যতিক্রম হতো না। তারপর গদিবাড়িতে এসে যখন বসতেন তখন ঘড়িতে কাঁটায়-কাঁটায় আটটা। তারপর যখন ঘড়িতে সকাল ন'টা তখন একবার হাঁচবেন।

এ-রকম ঘড়ি মিলিয়ে কাজ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সেই লোকেরই একদিন সকাল ন'টার সময় হাঁচি পড়লো না।

সে এক বিস্ময়কর কাণ্ড। ঘটনাটা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ কী হলো! এমন তো হয় না! সকলেই বুঝলো এবার একটা কিছু সর্বনাশ ঘটবে।

রসিক পাল হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—হরি—

এক ডাকেই আড়ত থেকে হরি মুহুরি এসে হাজির। হরি মুহুরি আসতেই পাল মশাই বললেন—হরি, একবার বলাই ডাক্তারকে ডাকো দিকিনি। বলবে আমার শরীর খারাপ, আমি এখুনি বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি—

তারপর ডাক্তার এলো। পাল মশাইকে পরীক্ষা করলো। হয়ত ওষুধ-বিষুধও দিলে। কি ওষুধ দিলে ডাক্তার তা কারো জানবার কথা নয়। কেন ঘড়িতে ঠিক ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাঁচি সেদিন পড়লো না ডাক্তারি-শাস্ত্রে তার নিদান আছে কিনা তাও কেউ জিজ্ঞেস করলে না। কিন্তু দু'দিন পরে আবার সবাই দেখলে ঠিক ঘড়িতে যখন কাঁটায়-কাঁটায় ছ'টা তখন তিনি গঙ্গাস্নানে চলেছেন। তারপর ঠিক আটটার সময় গদিবাড়িতে এসে বসলেন। আর ঠিক তারপর যখন ন'টার ঘরে ঘড়ির বড় কাঁটাটা ছুয়েছে তখন 'হ্যাঁচ-চো' শব্দে তাঁর হাঁচি পড়লো। তখন সবাই নিশ্চিন্ত!

নরনারায়ণ চৌধুরীরও ঠিক এমনি ঘড়ির কাঁটা ধরা কাজ ছিল। নদীতে স্নান করে এসে বসতেন কাছারি-ঘরে। তখন কৃষাণ, খাতক, পাওনাদার, গ্রামের আরো পাঁচ দশজন গণ্যমান্য লোক এসে বসতো। বিরাট কাছারি ঘর। কাছারি-ঘরের পেছনে ঢাকা বারান্দা। সেই বারান্দার লাগোয়া সিঁড়ি দিয়ে নরনারায়ণ চৌধুরী দোতলায় উঠতেন। দোতলায় ছিল তাঁর শোবার ঘর। সেই শোবার ঘরের মধ্যেই ছিল তাঁর লোহার সিন্দুক।

সদানন্দ একদিন বলেছিল—দাদু তোমার কত টাকা!

টাকা! শুধু টাকা নয়, থাক্ থাক্ নোট। তার পাশে হীরে পান্না চুনি মুক্তো! আরো কত দামী-দামী জিনিস।

নরনারায়ণ যখন সিন্দুক খুলেছিলেন তখন দেখতে পাননি যে তাঁর নাতি কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন সদানন্দর বয়েস পাঁচ কি ছয়। পাঁচ ছ' বছর বয়েস থেকেই নাতি যেন কেমন সব লক্ষ্য করতো। সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, সব জিনিস সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাবে। বলবে—তোমার দাড়ি শাদা কেন?

ঠাকুর্দা বলতেন—একে নিয়ে তো মহা মুশকিল হলো দেখছি—ওরে কে আছিস, কোথায় গেলি সব—

দীনু চৌধুরী-বাড়ির পুরনো ভৃত্য। দীননাথ। দীননাথ এসে তখন নাতিকে টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেত।

ঠাকুর্দা বলতেন—যা দীনু, ওকে নিয়ে পুকুরের হাঁস দেখা গে যা—

সত্যিই তখন অনেক কাজ নরনারায়ণ চৌধুরীর। একগাদা লোক কাছারি বাড়িতে। টাকা-কড়ির কথা হচ্ছে তখন খাতকদের সঙ্গে। সুদের কড়া-ক্রান্তির চুল-চেরা হিসেব। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই লোকসান হয়ে যাবে দাদুর। টাকার ব্যাপারে নরনারায়ণ চৌধুরীর কাছে সব কিছু তুচ্ছ। অন্য সময়ে দাদুর খুব ভালোবাসা। অন্য সময়ে নাতি না হলে দাদুর চলে না। কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করেন—সদা কোথায় গেল, সদাকে দেখছি নে যে—

রসিক পাল মশাইকে দেখে সদানন্দর সেই ঠাকুর্দাকেই মনে পড়তো কেবল। ঠিক তেমনি কারবার, ঠিক তেমনি ব্যবহার।

পরের দিন হরি মুহুরি এল।

বললে—কেমন আছেন বাবু, ঘুম হয়েছিল তো?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ—

—আপনাকে পাল মশাই একবার ডেকেছেন গদিবাড়িতে—

কথাটা শুনেই সদানন্দ সোজা গদি-বাড়িতে যাচ্ছিল। হরি মুহুরি বললে—না না, এখন যাবেন না। এখন নয়—

সদানন্দ বললে—কেন, এখন নয় কেন? এখনও ঘুম ভাঙেনি বুঝি তাঁর?

হরি মুহুরি বললে—ঘুম? ঘুম কর্তা-মশাইএর ভোর চারটের ভেঙেছে, তারপর ছ'টার সময় গংগাস্নান করেছেন, তারপর আহ্নিক সেরে আটটায় গদিবাড়িতে এসে বসেছেন—

সদানন্দ বললে—তা এখন তো সাড়ে আটটা, এখন যাই—

—না, এখন না। ন'টা বাজুক, ন'টার সময় হাঁচবেন—

—হাঁচবেন?

—হ্যাঁ।

—হাঁচবেন মানে?

হরি মুহুরি এই বেকুবকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়লো। বললে—আরে আপনি কি বাঙলা কথাও বোঝেন না? হাঁচি মশাই হাঁচি। সর্দি হলে যে-হাঁচি মানুষে হাঁচে সেই হাঁচি। আপনি কখনও হাঁচেন না?

সদানন্দ বললে—হাঁচবো না কেন?

—সেই রকম কর্তামশাইও হাঁচেন। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ন'টার সময় ঘড়ি মিলিয়ে হাঁচেন।

সদানন্দ তখন চৌবেড়িয়াতে নতুন। তাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—একেবারে ঘড়ি ধরে ন'টার সময়?

হরি মুহুরির তখন হাতে অনেক কাজ। সে-কথার উত্তর দেবার সময় ছিল না তার। সে নিজের কাজে চলে গিয়েছিল আড়ত-ঘর ছেড়ে। তারপর আড়ত-ঘরের ঘড়িতে যখন ন'টা বাজলো ঢং-ঢং করে তখন সদানন্দ সবে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় পাশের গদিবাড়ি থেকে একটা বিকট হাঁচির শব্দ এলো। একেবারে ঘর কাঁপানো কান ফাটানো হাঁচি। ঘড়ির সংগে সদানন্দ আর একবার মিলিয়ে দেখে নিলে হাঁচির টাইমটা। তারপর গদিবাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

পাল মশাইএর ডান হাত তখন কুঁড়োজালির ভেতরে মালা জপে ব্যস্ত আর বাঁ হাত দিয়ে কাগজ-পত্র দেখছেন আর সামনে বসা লোকদের সংগে কথা বলছেন। এমন সময় সদানন্দকে দেখেই বাঁ হাতের খাতাটা সরিয়ে পাশে রাখলেন।

বললেন—এই যে, এসো এসো, বোস—

সদানন্দ তক্তপোষের ওপরে পাতা মাদুরের ওপর পা গুটিয়ে বসলো। যারা এতক্ষণ সামনে ছিল তারা একটু নড়ে চড়ে সরে বসলো।

—বলি, তুমি যে সংগীত-সাধনা করো তা তো আমাকে আগে বলোনি। তোমার দেশ কোথায়, দেশে কে কোথায় আছেন কে নেই সব বলেছ আর আসল কথাটাই বলো নি তো। তুমি গানের চর্চাও করো নাকি আবার?

গান! সদানন্দ কথা বলতে গিয়ে একটু থমকে গেল।

বললে—গান?

—হ্যাঁ হ্যাঁ গান! হরি মুহুরি সব বলেছে আমাকে। আড়ত-ঘরে ঘুমোতে ঘুমোতে তুমি গান গেয়েছ, নয়নতারার সংগে কথা বলেছ, আরো কী-কী সব করেছ, ও সব বলেছে আমাকে। তুমি কি কবির দলে ছিলে নাকি?

সদানন্দ লজ্জায় পড়ে গেল। কী বলবে বুঝতে পারলে না।

পাল মশাই আবার বললেন—তোমার চেহারা দেখে কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি তুমি গান গাইতে পারো। আমি ভেবেছিলুম অভাবে পড়ে এখানে এসেছ, আমার কাছে আশ্রয় চাও, তাই তোমাকে ইস্কুলের কথা বলেছিলুম। গাঁয়ের ছেলেরা লেখা-পড়া করতে পারে না....তা নয়নতারা তোমার কে?

সদানন্দ বললে—নয়নতারা? আমি বলেছি?

—হ্যাঁ, গান গেয়েছ, নয়নতারার নাম ধরে কথা বলেছ। ঘুমোতে ঘুমোতে তোমার গান গাওয়ার অভ্যেস আছে বুঝি?

সদানন্দ কোনও উত্তর দিলে না। আর উত্তর দেবেই বা কী? উত্তর দেবার কিছু থাকলে তবে তো উত্তর দেবে।

—কী গানটা যেন বললে হরি মুহুরি। দাঁড়াও মনে করি। ছোটবেলায় আমিও গানটা শুনেছি—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম॥
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম॥

লজ্জায় মাথা কাটা গেল সদানন্দর। পাল মশাই গানের কলিগুলো বলছেন আর আশে-পাশের সবাই শুনছে।

রসিক পাল মশাই আবার বলতে লাগলেন—কিন্তু বাপু, তোমায় বলে রাখছি গান-টান করলে তো আমার চলবে না। গান গাইতে ইচ্ছে করে অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ। আমি গান-টান বিশেষ পছন্দ করি নে। আর গান যদি ভক্তিমূলক গান হয় তাও বুঝি? এ-সব গান তো চাপলোর গান হে—কী বলো, তোমরা কী বলো?

রসিক পাল সকলের দিকে চেয়ে তাদের মতামত চাইতে তারা সবাই একবাক্যে বললে—হ্যাঁ কর্তামশাই, আপনি তো হক কথাই বলেছেন—

—ওই দেখ, সবাই আমার কথায় সায় দিলে। আমি অন্যায্য কথা কখনও বলিনে তা জানো?

তারপর বাঁ হাত দিয়ে আবার হিসেবের খাতাটা কাছে টেনে নিলেন। খাতকরা যে প্রাণের দায়ে তার অন্যায্য কথাতেও সায় দিতে বাধ্য এ-কথা সদানন্দর পক্ষে ম

ফুটে বলা অন্যায়। তাই আর সে কোনও কথা বললে না। চুপ করে রইল।

রসিক পাল মশাই খাতার হিসেবে মনোযোগ দিতে দিতে এবার বললেন—যাও, তুমি এবার যাও—

সদানন্দ আর সেখানে বসলো না। তক্তপোষ থেকে উঠে সোজা গদিবাড়ির বাইরে চলে গেল। রসিক পালের তখন আর ও-সব কথা ভাববার সময় ছিল না? মুহূর্তে হিসেবের গোলকধাঁধার মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। রসিক পাল আর নরনারায়ণ চৌধুরীদের কাছে হিসেবটাই ছিল সব। হিসেবই ধর্ম, হিসেবই অর্থ, হিসেবই ছিল মোক্ষ কাম এবং সব কিছু। হিসেব করতে করতেই নরনারায়ণ চৌধুরী একদিন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। তখন আর উঠতে পারেন না তিনি।

মনে আছে তখনও পাল্কী করে কালীগঞ্জের বৌ আসতো দাদুর কাছে। সদানন্দ দেখতে পেলেই পাল্কীর কাছে দৌড়ে আসতো। বেশ ফরসা মোটা-সোটা মানুষ, সাদা থান পরা। অমন ফরসা মেয়েমানুষ সদানন্দ আর জীবনে দেখেনি। নয়নতারাও ফরসা। সদানন্দর মা হরনারায়ণ চৌধুরীর স্ত্রী, তিনিও ফরসা। কিন্তু কালীগঞ্জের বৌ শুধু ফরসা নয়, দুধে আলতায় মেশানো ফরসা। গায়ের রং-এর দিকে একবার চাইলে কেবল চেয়েই দেখতে ইচ্ছে করে। পাল্কীটা উঠোনে নামতেই কালীগঞ্জের বৌ নামতো। মুখের ওপর একগলা ঘোমটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে বারান্দায় ঢুকতো। সঙ্গে থাকতো একজন ঝি। ঝি আগে আগে চলতো আর পেছনে কালীগঞ্জের বৌ। চলতে চলতে একেবারে সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় দাদুর ঘরে চলে যেত।

নরনারায়ণ তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে হিসেবের খাতা দেখছেন। আর মাথার কাছে সেই সিন্দুকটা। ওটা তিনি কাছ-ছাড়া করতে পারছেন না।

—কে?

তারপর ঠাহর করে দেখতেই যেন বিচলিত হয়ে উঠতেন।

—আমি নায়েব মশাই, আমি। কালীগঞ্জের বৌ।

—ও!

বলে যেন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়তেন। একটু নড়ে চড়ে সরে শুতে চেষ্টা করতেন। বলতেন—তা আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন বৌ-মণি! আমি তো বলেইছিলুম আপনাকে আসতে হবে না—

কালীগঞ্জের বৌ বলতো—কিন্তু আর তো আমি অপেক্ষা করতে পারছি না নায়েব মশাই। আর কত দিন অপেক্ষা করবো? এই দশ বছর ধরে আপনি বলে আসছেন আমাকে আসতে হবে না, আমাকে আসতে হবে না। শেষকালে আমি মারা গেলে কি আমার টাকাগুলো দেবেন? তখন সে-টাকা আমার কে খাবে? সে টাকায় কি আমার পিণ্ডি দেওয়া হবে?

—আঃ, বৌ-মণি আপনি বড় রেগে যাচ্ছেন! আমি যখন বলেছি আপনার টাকা দেব তখন দেবই।

—কিন্তু কবে দেবেন তাই বলুন! আজই টাকা দিতে হবে আমাকে। এই আমি এখানে বসলুম। এখান থেকে আমি নড়ছি না আর যতক্ষণ না আমার দশ হাজার টাকা পাচ্ছি—

বলে কালীগঞ্জের বউ সেইখানে সেই মেঝের ওপরেই বসে পড়লো।

হঠাৎ দাদুর নজরে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে—ওরে, খোকা এখানে কেন? ওরে, কে আছিস, খোকাকে এখান থেকে নিয়ে যা, ও দীনু—

দীননাথ কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে সদানন্দর হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যেত। সদানন্দ আর দেখতে পেত না কালীগঞ্জের বৌকে। কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারতো না দৃশ্যটা। থেকে থেকে কেবল কালীগঞ্জের বৌ-এর চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠতো। ঘুমের ঘোরেও মনে হতো ওই বুঝি কালীগঞ্জের বৌ এল!

একদিন দীনুকে জিজ্ঞেস করেছিল—ও মেয়েমানুষটা কে দীনুমামা?

দীনুমামা বলেছিল—চুপ, ও-কথা জিজ্ঞেস করতে নেই—

তবু ছাড়েনি সদানন্দ। জিজ্ঞেস করেছিল—ও দাদুর কাছে টাকা চায় কেন? কীসের টাকা? দাদু ওকে টাকা দেয় না কেন? ও কে?

দীনু বলেছিল—ও-সব কথা তোমার জানতে নেই। ও কালীগঞ্জের বউ—

এর বেশি আর কিছু বলতো না দীনু। শুধু দীনুই নয়, ওই কালীগঞ্জের বউ বাড়িতে এলেই বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যেত। দাদু থেকে শুরু করে বাবা মা সবাই কেমন চুপ করে থাকতো। কারোর মুখে আর কোনও কথা বেরোত না তখন। ও যেন কালীগঞ্জের বউ নয়, যম। যেন নবাবগঞ্জের চৌধুরী-বাড়িতে সাক্ষাৎ যম এসেছে চৌধুরীবাড়ির সর্বনাশ করতে। যেন সে চলে গেলেই সবাই বাঁচে!

কিন্তু রসিক পাল মশাই-এর এখানে অন্য রকম। রসিক পাল মশাই চৌবেড়িয়ার সুখী মানুষ। ধর্মভীরু, দয়া-দাক্ষিণ্য করেন। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে। আড়তে যেমন বহু লোক থাকে খায় শোয়, তেমনি আবার সুদের একটা পয়সা পর্যন্ত ছাড়েন না। বলেন—না হে, ওটি পারবো না। দাতব্য করতে বলো করছি কিন্তু সুদের হিসেবে গরমিল করতে পারবো না—ওটা পাপ—
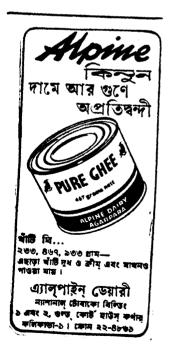
রসিক পাল মশাই সত্যিই রসিক পুরুষ।

হঠাৎ হঠাৎ তাঁর অনেক কিছু মনে পড়ে যায়। সেদিনও তেমনি। কাজ করতে করতে আবার হঠাৎ ডেকে উঠলেন—হরি—

পাশের আড়ত-ঘর থেকে হরি মুহুরি দৌড়ে এল। বললে—আজ্ঞে ডাকছেন আমাকে?

রসিক পাল বললেন—দেখ হরি, ওই যে লোকটা, ওর নামটা কী যেন...?

—আজ্ঞে কার কথা বলছেন?

—ওই যে, কাল বিকেলবেলা আমার গদিবাড়িতে এসেছিল। রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান গাইছিল? আমি তাকে ডেকে সব জিজ্ঞেস করেছি। তা আমি ভাবছি কি জানো, আসলে ছেলেটা খারাপ নয়, বুঝলে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান গাইলে ওর কী দোষ বলো? ঘুমোলে তো আর কারো জ্ঞান থাকে না! ঘুম না মড়া!

হরি মুহুরি বললে—আজ্ঞে, তা তো বটেই—

—তবে যে তুমি বললে ছেলেটা ভালো নয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পীরিতের গান গায়, মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে!

হরি মুহুরি বললে—আজ্ঞে যা ঘটেছে আমি তাই-ই আপনাকে বলেছি—

—না হে, আমি ভেবে দেখলাম, ওর কিছু দোষ নেই। ওর জন্যে তোমাদের যদি ঘুমের ব্যাঘাত হয় তো ওর বিছানাটা না-হয় তোমরা অন্য ঘরে করে দাও—

হরি মুহুরি বললে—কিন্তু কর্তামশাই তিনি তো চলে গেছেন—

—চলে গেছেন মানে?

—আজ্ঞে তিনি যে বললেন আপনি তাকে চলে যেতে বলেছেন।

—আমি? আমি তাকে চলে যেতে বলেছি?

—আজ্ঞে, তিনি তো তাই বললেন। বলে আড়ত-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন!

রসিক পাল রেগে গেলেন। বললেন—তোমাদের কি কোনও আক্কেল বলে কিছু নেই। তিনি বললেন আর তোমরাও তাঁকে যেতে দিলে? কোথায় যাবেন তিনি? তোমরা জানো তার কোনও যাবার জায়গা নেই। তাকে জিজ্ঞেস করেছ তিনি যাবেন কোথায়? তাঁর কোনও চুলোয় কি কেউ আছে যে সেখানে তিনি যাবেন?

হরি মুহুরি আর সেখানে দাঁড়াল না। সোজা একেবারে দৌড়তে লাগলো রাস্তার দিকে। সামনের বড় রাস্তাটা একেবারে গিয়ে পড়েছে গঙ্গার কাছে। তখনও সদানন্দ কোথায় যাবে ঠিক করতে পারেনি। গঞ্জের মুখে খান কয়েক দোকান। সেখানে গিয়েই ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়। সেই কোথায় নবাবগঞ্জ, আর কোথায় সেই নৈহাটি, আর কোথায় সেই ভাগলপুর। সব জায়গা থেকে ভাসতে ভাসতে একেবারে এই অজ গ্রাম চৌবেড়িয়াতে এসে হাজির হয়েছিল। এবার এখান থেকেও চলে যেতে হলো।

হঠাৎ পেছনে হরি মুহুরির গলা শোনা গেল।

—ও মশাই, ও মশাই—

ডাকতে ডাকতে সামনে এসে হাঁফাতে লাগলো বুড়ো মানুষটা।

বললে—আপনি তো খুব ভদ্রলোক মশাই, কর্তামশাইকে কিছু না বলে কয়ে চলে এলেন, এদিকে আমার হয়রানি, চলুন—

তখনও সদানন্দ ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারেনি।

হরি মুহুরি সদানন্দর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললে। ধরে টানতে লাগলো। বললে—আর বোঝবার কিছু নেই, চলুন, কর্তামশাই আপনাকে ডাকছেন—

বলে টানতে টানতে একেবারে গদি-বাড়িতে কর্তামশাই-এর সামনে হাজির করলে।

রসিক পাল বললেন—তুমি চলে যাচ্ছিলে যে?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে, আপনি যে চলে যেতে বললেন—

—তুমি বলছো কী? আমি তোমাকে চলে যেতে বলেছি? এই যে এতগুলো লোক এখানে রয়েছে, এরাও তো শুনেছে, এরা কেউ বলুক তো আমি তোমাকে কখন চলে যেতে বললুম। বলুক এরা—

তা তার আর দরকার হলো না। সদানন্দ আবার রয়ে গেল চৌবেড়িয়াতে। তার জন্যে অন্য একটা ঘরের বন্দোবস্ত হলো। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হলো। গভর্নমেন্ট থেকে প্রাইমারি স্কুলের টাকাও ধার্য হলো শেষ পর্যন্ত। সবই করে দিয়েছিলেন সেই রসিক পাল মশাই।

হায়, কিন্তু কোথায় গেলেন সেই রসিক পাল, আর কোথায় রইল তাঁর সেই স্কুল। সে-সব চলে গেছে এখন। সেই নরনারায়ণ চৌধুরী, সেই হরনারায়ণ চৌধুরী, সেই নয়নতারা, সেই নিখিলেশ, সেই কালীগঞ্জের বৌ, সবাই কে কোথায় চলে গেল তা জানবার প্রয়োজন তাঁর ফুরিয়ে গেছে আজ। সেই রসিক পালের দেওয়া ঘরখানাতেই তাঁর দিন কাটে এখন, এই চৌবেড়িয়ার রসিক পালের এস্টেট থেকেই তাঁর ভরণ-পোষণটা এসে যায়। আর সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেটে যায়, কী করে কাটে তারও খেয়াল থাকে না সদানন্দ-বাবুর। রসিক পালের এস্টেটের টাকায় জীবন চলছে তাঁর। শুধু তাঁর নয়, অনেকেরই জীবন চলে। এ যেন ধর্মশালার মত অনেকটা। এককালের মাস্টার-মশাই, এখানকার অনেকেরই মাস্টার মশাই, তাঁকে মানে সবাই। তাছাড়া আসে অতিথিশালা

থেকে, আর তিনি রুটিন বেঁধে জীবনযাপন করেন। বেশ শান্তিতেই আছেন তিনি। তাই তাঁর একদিন ইচ্ছে হলো তাঁর জীবনটার কথা তিনি লিখে যাবেন। অনেক পাতা লেখা হয়েও গেছে। সেদিন আবার তিনি খাতাটা নিয়ে লিখতে বসেছেন।

তিনি লিখতে লাগলেন—"আমি এখন ঘরেও নাই ঘরের বাইরেও নাই। ঘরই আমার নিকট পর, আবার পরই আমার নিকট ঘর। আমার চাওয়ারও কিছু নাই, তাই পাওয়ার পর্বও আমার চুকিয়া গিয়াছে চিরকালের মত। আজ এত দূরে হইতে বাল্যকালের দিনগুলির দিকে চাহিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করিবারও নাই। যাহা কিছু ইহ-জীবনে করিয়াছি তাহা ভাল করিবার উদ্দেশ্যেই করিয়াছি। পরের ভালো বাতীত আর কিছু ভাবি নাই, তবে....."

হঠাৎ ঘরের দরজায় একটা ধাক্কা পড়লো।

লিখতে লিখতে থেমে গেলেন সদানন্দবাবু। জিজ্ঞেস করলেন—কে?

বাইরে থেকে কেউ উত্তর দিলে না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কে?

তবু উত্তর নেই।

সদানন্দবাবু এবার উঠলেন। উঠে দরজাটা খুলতেই দেখলেন একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় তাঁরই বয়েসী। হাতে একটা পুঁটুলি।

সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কাকে চাই?

—আপনার নাম কি সদানন্দ চৌধুরী?

সদানন্দবাবু বললেন—হ্যাঁ—

—আপনার পিতার নাম কি হরনারায়ণ চৌধুরী?

সদানন্দবাবু আবার বললেন—হ্যাঁ—

—আপনার নিবাস কি নবাবগঞ্জে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বলতেই ভদ্রলোক আর কোনও কথা না-বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। বললে—আরে মশাই, আপনাকে আজ কুড়ি বচ্ছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর আপনি এখানে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছেন—

বলে তক্তপোষের ওপর বসে রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলো।

সদানন্দবাবু তখনও বুঝতে পারছেন না কিছু। বললেন—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না আপনার কথা—

—আরে মশাই, আপনার নামে হুলিয়া আছে যে। আপনি খুন করে এখানে লুকিয়ে আছেন, ভেবেছেন কেউ টের পাবে না—

সদানন্দবাবু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আরো হতবাক। বললেন—আমি খুন করেছি? বলছেন কী আপনি? কাকে?

(ক্রমশঃ)

রূপদর্শী-কে খোলা চিঠি

শিবনারায়ণ রায়

কল্যাণীয়েষু,

খোলা চিঠি, যা আধা চিঠি, আধা প্রবন্ধ। চিঠির খাস কামরায় বাইরের মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, প্রবন্ধের আমদরবারে নিয়মকানুনের ভারী কড়াক্কড়ি। যে প্রসঙ্গ তুলব ভেবেছি সে সম্পর্কে তুমি ছাড়া আরো কিছু পরিচিত এবং অপরিচিত লোকের আগ্রহ থাকা সম্ভব। অপর পক্ষে, কয়েক বছর বাইরে কাটানোর ফলে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের মুখ আমার স্মৃতিতে কিছুটা ঝাপসা হয়ে এসেছে; ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অন্তত এমন একজন পাঠক সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দরকার যার এবং আমার মানসিক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে প্রতিষঙ্গ বর্তমান। চেনাজানা বাঙালী বন্ধুদের মধ্যে তোমার চাইতে সুবেদী পাঠক কোথায় পাব?

বছর পাঁচিশেক আগে যখন তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় তখন আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যবধান ছিল। বয়সের খুব তফাত না থাকলেও তুমি তখনো মফস্বলের মানুষ, অবস্থাচক্রে পড়াশুনোয় বেশী দূর এগোতে পারনি, তোমার মধ্যে যে প্রতিভা আছে তার খোঁজ অন্যেরা দূরে থাক, তুমি নিজেও জানতে না। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলের তুমি ছিলে একজন অখ্যাত কর্মী, আর সেই হিসেবেই কৃষ্ণনগরে তুমি নিজে থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলে। আমি কলকাতায় জন্মেছি, বড় হয়েছি (পারী, লণ্ডন, ন্যুইয়র্কের সঙ্গে তুলনীয় যে শহর), পরিচয়ের বছরখানেক আগে থেকে অধ্যাপনা শুরু করেছি, বাংলায় এবং ইংরেজীতে আমার খান দুই বই ইতিমধ্যে ছাপা হয়েছে, দ্বিতীয় বইটিতে স্বয়ং মানবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন। ফলে, আমাদের মধ্যে সমানে সমানে সখ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সহজ ছিল না। তোমার প্রতিন্যাসে শ্রদ্ধার ভাবটা ছিল অনেক বেশী প্রবল, আমার দিক থেকে ছিল স্নেহ।

কিন্তু যেহেতু সব কিছুকেই বিশ্লেষণ করে দেখা আমার আকৈশোর অভ্যাস (অনেক শুভার্থীর মতে, বদভ্যাস), সেহেতু প্রায় প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই আমি লক্ষ করি যে তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে একটা পারস্পরিক পূরকতার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত। তুমি যখন জীবনের নানা ঘাটে জল খেয়ে বেড়াচ্ছ, আমি তখন সারাদিন ডুবে আছি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ফয়েরবাখ, মার্ক্স, এঙ্গেলস্, প্লেখানভ্, রোজা লুক্সেমবুর্গের কেতাবাদির মধ্যে। দারিদ্র্য অনিশ্চয়তা, তাচ্ছিল্য, সমাজ-সংসারের কাছ থেকে পাওয়া নিরন্তর আঘাত তোমাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। তোমার প্রবল প্রাণশক্তি, অতন্দ্র কৌতূহল, সহজাত কৌতুকবোধ তোমাকে রক্ষা করেছে অসূয়া, হীনমন্যতা এবং ব্যাধিত নির্বেদ থেকে। অভিজ্ঞতার মক্তব থেকে তুমি শিখেছ সাধারণ মানুষের মধ্যে অসামান্যতাকে খুঁজে পাওয়ার সহজ সূত্র। পরিচয়ের গোড়া থেকেই বুঝতে পারি মানুষকে ভালবাসা তোমার স্বভাব—কেতাবী নির্দেশে নয়, নিজের তাগিদেই তুমি সব সরহদ্দ পেরিয়ে অন্যের মনের অন্দরে আসন জুড়তে পার। পরে তুমি যখন তোমার প্রথম বই "এই কলকাতায়" লেখ তার প্রাণৈশ্বর্যের উৎস ছিল তোমার এই নির্বাধ মানবতা।

সে সময়ে তোমার সঙ্গে আমার মনের বৈসাদৃশ্য ছিল স্পষ্ট। আত্মীয়, পরিজন, সতীর্থ সহকর্মীদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ দুর্বল, চারপাশের স্ত্রী-পুরুষদের সম্পর্কে আমি প্রায় কৌতূহলহীন, অপরিচিত জনের সান্নিধ্যে আমার অপাটব স্বজন মহলে প্রসিদ্ধ, দু চারজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু (এবং বন্ধবী) থাকলেও সাধারণ মানুষদের হৃদ্যতা অর্জন ব্যাপারে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। প্রলেটারিয়েটের বৈপ্লবিক বীর্যবত্তা সম্পর্কে মনে তখনো ভরসা ছিল বটে, কিন্তু কি করে মজুর-চাষীর মনোসাথী হতে হয়, কেতাবে কিংবা অনুভূতির মধ্যে তার কোনো হদিস পাইনি। (মার্ক্স্ পেয়েছিলেন কি?) আমার আজনবী চেতনার দোরোখা কাঁথার এক-পিঠে বুনেছি ঋতুরঙ্গের বিচিত্র প্রতিরূপ, অন্য পিঠে বিভিন্ন দেশকালের মানস অন্বেষণের স্বনির্বাচিত হকিকত্। কলকাতায় যে প্রায় হাজার জাতের তরুলতা আছে তাদের অনেকেরই জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে সেকালে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অপর পক্ষে, আমার অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে নিজের মনে প্লেটোর সঙ্গে তর্ক করে, তরুণী সুন্দরীর চাইতেও স্পিনোজার সঙ্গ মনে হয়েছে বেশী লোভনীয়, হলবাখ হেলভেশিয়াসের লেখা পড়ে হাজার তারিফ করেছি। ডীটজেন-কে মেনেছি নিকট আত্মীয় বলে। গত প্রায় হাজার তিনেক বছর ধরে নানা দেশকালের প্রচেতারা ভাব-ভাবনার যে জগৎ গড়েছেন সেখানে ছিল, আমার নিত্য আনাগোনা, যদিও পড়শী মানুষদের মধ্যে বেগানা হিসেবে বাস করতে আমি প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

তোমার সঙ্গে ক্রমে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে তার ফলে আমার কম লাভ হয়নি। তোমার সূত্রে নানা প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, মনীষার দীপ্তি না থাকলেই যে মানুষ নিরস হয় না এটা বুঝতে শিখি, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে রসের খোঁজ পাই। আমি প্রধানত ইংরেজীতেই লিখতাম। সে সময়ে বাংলায় কালেভদ্রে যেটুকু লিখেছি তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুধীন্দ্র দত্তের উৎসাহে এবং প্রভাবে—সে সব লেখায় চিন্তার যেটুকু গাঁথুনি ছিল ভাষায় তার তুলনায় কোনো স্বাচ্ছন্দ্য আসেনি। এখনো যেমন মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমনি বাংলা ভাষায় নিজের কথা গুছিয়ে বলার ব্যাপারে আমি মাঝে মাঝে আড়ষ্ট বোধ করি—তবু যেটুকু স্বচ্ছন্দতা এসেছে তার জন্য তোমার কাছে আমার ঋণ কম নয়। তোমার (এবং পরে তোমার সূত্রে সাগরময়ের) আগ্রহ না থাকলে আমি সম্ভবত কোনোদিনই 'দেশ' পত্রিকায় লেখার কথা ভাবতুম না, এবং 'দেশ' পত্রিকায় না লিখলে আমার বাংলা লেখার রীতি 'প্রেক্ষিত' থেকে 'সাহিত্যচিন্তা'-য় পৌঁছত কিনা সন্দেহ। সে হিসেবে আমার কাছে তোমার ঋণ খুবই কম। তবু স্মরণ করতে ভাল লাগে যে, স্টার্নের লেখার সঙ্গে তোমার পরিচয় আমিই ঘটিয়েছি, দিদেরো-র "নিয়তিবাদী যাক"-এর খবর আমি না দিলে তোমার নিজের পক্ষে

খ'জে বার করতে হয়তো অনেক বেশী সময় লাগত, এবং আধুনিক পশ্চিমী ভাবধারা সম্পর্কে তোমার কৌতূহল উদ্রেকের ব্যাপারে আমার কিছুটা হাত আছে। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ হকিয়ৎ-কে মূল্য দিতে, আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে চেষ্টা করেছি যুক্তি নির্ভর অন্বেষণের উদ্যমে।

অবশ্য আমাদের মন সমান্তরাল পথে চলতে পারত যদি না আমাদের পারস্পরিক অনুরাগের মূলে গভীর কোনো মিল থাকত। পশ্চিমে যাকে বলা হয় র‍্যাডিক্যালিজম্, বাংলায় যার কোনো প্রতিশব্দ ভেবে পাই না (মৌলতন্ত্র? রাজশেখরবাবু জীবিত থাকলে তাঁর শরণাপন্ন হতুম), পরিচয় হবার আগে থেকেই তুমি আমি সেই পথের পথিক। ঈশ্বর, আত্মা, মোল্লা-পুরুত, মন্ত্র-মাদুলি, জাত-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদিকেই শুধু আমরা অমূলে প্রত্যক্ষ বলে খারিজ করিনি; ভূগোলপ্রতিমার পুজো আমাদের কাছে কৌতুকবহ ঠেকেছে; জাতিপ্রেম এবং সাম্প্রদায়িকতা উভয়কেই আমরা ব্যাধিত প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করেছি। নিজের নিজের অনুসন্ধানের সূত্রে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, মানুষ স্বয়ং তার ভাগ্যবিধাতা, ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য মানুষের বাইরে কোনো তুরীয় প্রাধিকার খোঁজা নিষ্ফল এবং নিষ্প্রয়োজন, ব্যক্তির নিহিত সৃজনক্ষমতার বিকাশে যা কিছু সাহায্য করে তাই শ্রেয় এবং যা সেই বিকাশে বাধা দেয় তাই অকৃত্য। পরম্পরার চাইতে উদ্ভাবনাকে আমরা বেশী মূল্য দিয়েছি: কোনো মৌরুসীস্বত্বে আমাদের আস্থা ছিল না; সব রকমের আমড়াগাছিকে আমরা ঘৃণা করেছি; নানা উপায়ে অন্যদের বঞ্চিত করে যারা ক্ষমতায় আসীন প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং নানা কারণে সমাজে যাঁরা নীচের তলার মানুষ তাঁদের পক্ষে হয়ে লড়াই করা গোড়া থেকেই আমাদের মনে হয়েছে সঙ্গত কাজ। এই কারণেই আমরা তরুণ বয়সে মার্ক্সীয় ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম (কম্যুনিস্টদের নির্বোধ, নিষ্ঠুর এবং অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও সে আকর্ষণ অন্তত আমার ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি শিথিল হয়নি), এবং যৌবনে মানবেন্দ্রনাথের রানেসাঁস আন্দোলনের প্রতি। বাংলাদেশের যে সব ভাবুক এবং সাহিত্যিককে আমরা দুজনে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করেছি—উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, তারপরে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, এবং আমাদের অগ্রজদের মধ্যে "তারুণ্য", "প্রকৃতির পরিহাস" এবং "পুতুল নিয়ে খেলা"-র অন্নদাশঙ্কর "মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী"র শিবরাম, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁদের চরিত্রে এবং চিন্তায় র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্-এর লক্ষণ স্পষ্ট। যাকে আমি আমার একটি বইতে "মৌমাছিতন্ত্র" আখ্যা দিয়েছি, তুমি আমি দুজনেই আগাগোড়া তার বিরুদ্ধপন্থী। গান্ধীবাদী অতিনৈতিকতার মধ্যে আমরা যেমন কোনো পরোৎকর্ষের সন্ধান পাইনি, উগ্র জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্রকে "নেতাজী" আখ্যা দিয়ে উদ্দীপ্ত হতে আমাদের তেমনি বেধেছে।

র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্-এর সূত্রে এই মিল আমাদের মধ্যে ব্যবধানকে বাধা হতে দেয়নি, বরং যা হতে পারত সমান্তর তাকে করেছে পুরোয়িতা।

॥ ২ ॥

এ তো গেল পূর্বরঙ্গ। আসল কথায় আসি। মাস তিনেক আগে এক ভিজে সকালে পুরনো দিনের মত তোমার ঘরে আমরা আড্ডায় বসেছিলাম। ছিল চা, সিঙ্গাড়া, মুড়ি এবং তুলুর হাসিমুখের অকৃপণ আতিথ্য; খবর পেয়ে হাজির হয়েছিলেন কিছু সাহিত্যিক বন্ধু—যতদূর মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ, নীরেন নরেন, গৌরী, সন্দীপন, অরুণ এবং তরুণ কবি মেহবুব তালুকদার। সেখানে যে সব প্রসঙ্গ উঠেছিল—যা নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে তক আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি—তার কয়েকটি এই চিঠিতে আবার তুলতে চাই।

আমরা যারা জীবনের মৌলিক নানা সমস্যা নিয়ে ভাবি এবং সেই ভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে অন্যদের মনে পৌঁছে দেবার কমবেশী মুরোদ রাখি (কখনো মুখের কথায়, কখনো বা লিখে)—ইংরেজীতে যাদের বলা হয় ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল, চলতি বাংলায় বুদ্ধিজীবী (বাংলা প্রতিশব্দটি আমার মোটেই পছন্দসই নয়, কিন্তু ভাবুক, মনীষী, বুজরুগ কিংবা প্রাজ্ঞ বোধ হয় আরো বেমানান প্রতিশব্দ)—সমকালীন ভারতে তাদের স্থান, বৃত্তি, ক্রিয়াকর্মের চেহারাটা কেমনতর? এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউবা শিল্পী সাহিত্যিক, কেউ গবেষক অধ্যাপক কিংবা ছাত্র, কেউ আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বাস্তুকার, কেউবা রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসাদার কিংবা সরকারী চাকুরে—কিন্তু যে সব লক্ষণের জন্য তাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা যায় তা হল : তাঁরা তথ্যের পিছনে তত্ত্ব খোঁজেন, ঘটনার পিছনে কারণিক পরম্পরা, বিচার-বিশ্লেষণ না করে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তকে মেনে নেন না, তাঁদের মন নিয়ত প্রশ্নশীল, অনেক দিন ধরে চলে আসছে অথবা অনেক মানুষ সমর্থন করে বলেই কোনো অভ্যুপগমকে তাঁরা প্রমাণিত সত্য বলে গ্রহণ করতে গররাজী, প্রতি প্রকল্পকেই তাঁরা যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে অভ্যস্ত। জাড্য, যূথচারিতা এবং একান্বয়ের প্রকোপ থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা এঁদের প্রধান কাজ, এবং এ কাজ এঁরা করতে পারেন যেহেতু এঁদের মনে জিজ্ঞাসা নিত্য সক্রিয়। যে পেশাতেই থাকুন না কেন, পড়ে পাওয়া জবাবের মকুশ করতে এঁদের স্বভাবে বাধে; মুফতে মেলা মন্ত্রের নিশ্চিতি এঁদের কাছে অশ্রদ্ধেয়।

এখন এই অর্থে বুদ্ধিজীবী প্রাচীনকালেও ছিলেন—সক্রাতেস-কে এঁদের আদিরূপে ধরতে পারি—তবে আধুনিক কালে এঁদের উপস্থিতি অনেক বেশী ব্যাপক এবং সক্রিয়ভাবে অনুভূত। গত চার পাঁচ শ' বছর ধরে পশ্চিমের চিন্তা জগতে এবং সমাজজীবনে যে প্রবল আলোড়ন চলেছে—যার ধাক্কা এই শতকে আর কোনো দেশই এড়াতে পারছে না—তাতে বুদ্ধিজীবীদের অংশ বিশেষভাবে স্পষ্ট। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে কিছু বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি নজরে পড়ে—কোনো কোনো উপনিষদে, অংশত বুদ্ধের এবং আরো অনেক প্রবলভাবে বৈশেষিক এবং চার্বাকপন্থীদের চিন্তায়—কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে মনে হয় এ-দেশে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত উপযুক্ত অর্থে বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় এবং প্রভাবের দিক থেকে নগণ্য। তাঁদের জায়গা দখল করেছেন শাস্ত্রকারেরা, টীকাকারেরা, পরের যুগে মহন্ত, পুরুত, মোল্লা-মৌলবীরা। এঁরা প্রশ্ন তোলেন নি, নিয়মের পরে নিয়ম বানিয়েছেন, ঐহিক পারত্রিক উৎত্রাসনের ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসার সংবেশন ঘটিয়েছেন, অতিপ্রজ নিষেধের চাপে সমাজকে প্রায় গতিহীন করে তুলেছেন। পাঠান-মোগল যুগে প্রচলিত আচার-আচরণ ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে যে সব আন্দোলন হয়েছে তাদের প্রবর্তকেরা বুদ্ধিজীবী নন, তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই মরমিয়া। তাঁদের অস্মিতা স্বজ্ঞানির্ভর; আরোহী-অবরোহী বিচার-বিশ্লেষণ তাঁদের কাছে বর্জনীয়।

পশ্চিমের তুলনায় ভারতীয় ইতিহাসে যে গতিহীনতা দেখা যায় তার নানা ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু সম্ভবত তুমি স্বীকার করবে যে তার একটা প্রধান কারণ হল আমাদের পরম্পরা নির্ভর সমাজ-সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের আশ্চর্য নিষ্ক্রিয়তা। বুদ্ধিজীবীদের যেটি প্রধান লক্ষণ এবং বৃত্তি সেটি হচ্ছে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা কায়েমী ব্যবস্থার নৈতিক-মানসিক ভিত্তিকে দুর্বল করে সমকালীন মানুষদের সামনে বিকল্প নানা সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসা। আমাদের দেশে যাঁরা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁরা কায়েমী ব্যবস্থাকে আক্রমণ না করে স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন জাতিভেদ ব্যবস্থাকে মজবুত

করতে, যে ব্যবস্থায় তাঁদের নিজেদের স্থান সমাজের সব চাইতে উপরতলায়। মোল্লা-মৌলবীরা উঠে-পড়ে লেগেছেন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রবলতর করতে—যে গোঁড়ামির ফসল জমা হয়েছে তাঁদের খামারে। সমকালীন রাজশক্তিকে দুই পক্ষই যুগিয়েছেন পরিপোষণ এবং মন্ত্রণা, এবং তার পারিতোষিক হিসেবে রাজশক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন সমাজ জীবনে এ'দের একচেটিয়া প্রতিপত্তি। ফলে, এক দিকে সমাজ যেমন তার গতি হারিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি এই রক্ষণশীল বিদ্বজ্জনেরা হারিয়েছেন জিজ্ঞাসার সমর্থ্য—সংস্কৃতি হারিয়েছে উদ্ভাবনের স্ফূর্তি, বুদ্ধির আপজাত্য ঘটেছে যুক্ত্যাভাসে।

এই অবস্থা কিছুটা বদলাতে শুরু করে উনিশ শতকে। ইংরেজ এ-দেশে শুধু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেননি, পশ্চিমের প্রাণবন্ত ভাবধারার সঙ্গেও এ-দেশে কিছু মনুষের পরিচয় ঘটান। তার ফলে দেখা দিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা। এ'দের মেজাজ বেদস্তুর, এ'দের ভাবনার ঢং শাস্ত্রকার, টীকাকার, মোল্লামৌলবীদের মুতাবিক নয়। রামমোহন প্রথার উপরে স্থান দিলেন যুক্তিকে, শাস্ত্রের উপরে স্থান দিলেন ব্যক্তির বিবেককে। লোকহিতবাদী তাঁর "শতপত্রে" উপস্থিত করলেন বেশুমার নতুন জিজ্ঞাসা; ফলে তাঁর "গোলামগিরি" পুস্তকে হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির একেবারে গোড়া ধরে টান দিলেন। (যদি তোমার কোনো মারাঠী-জানা বাঙালী সাহিত্যিক বন্ধু থাকেন তাঁকে দিয়ে এই বই দুটির অনুবাদ করিও—এমন মুক্তবুদ্ধির পরিচয় ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে আর কোথাও পাবে কিনা সন্দেহ।) ডিরোজিওর ছাত্ররা শুধু তাঁদের লেখার মারফত নয়, তাঁদের বাঁচার স্টাইলের ভিতর দিয়েও ফুটিয়ে তুললেন যথার্থ বুদ্ধিজীবীর বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু বলার দরকার করে না—ব্যালানটাইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত চিঠিকে আমি তো নব যুগের ম্যানিফেস্টো বিবেচনা করি। আর নির্বোধ ব্যঙ্গের জবাবে তাঁর সেই যে প্রত্যয়ী উক্তি—বরং আলুপটল বিক্রি করে চালাব—তার মধ্যে শুনি স্বপ্রতিষ্ঠ অস্মিতার কণ্ঠস্বর। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মাইকেলের সেই আশ্চর্য পত্রের কথা তোমার মনে পড়ে? "These men, my dear Raj, little understand the heart of a proud, silent, lonely man of song! They regret his want of popularity, while, perhaps, his heart swells within him in visions of glory, such as they can form no conception of." নিরীহ, নির্বীজ, সুরাপান বিরোধী হেডমাস্টার কি ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক কবির এই বেপরোয়া নির্বাজ ঘোষণার মানে বুঝেছিলেন?

তিনি বুঝুন, চাই নাই বুঝুন, ভারতীয় ভাবনা-কল্পনার মরা গাঙে এই আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা যে নতুন স্রোতের সঞ্চার করেন তা নিয়ে আজ আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এ'দের প্রাণের ধাক্কায় এক এক করে ভারতীয় ভাষারা সজীব হয়ে উঠল—জন্ম নিল গদ্য সাহিত্য, বিপ্লব ঘটল কবিতার জগতে। সমাজজীবনেও এ'রা কিছুটা আলোড়ন ঘটান—বিধবাবিবাহ থেকে বিধানিক বিবাহ একটা স্মরণীয় যুগ—কিন্তু গভীরতা এবং ব্যাপকতায় তা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আর এইখানেই হয়তো আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের মূল দুর্বলতা। যে অন্বেষী প্রতিন্যাস বুদ্ধিজীবীর লক্ষণ, ইংরেজ আমলে সাধারণ মানুষের মনে তার কতটুকুই বা প্রভাব বিস্তার করে? দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাসী অশিক্ষিত চাষী—নতুন ভাবনা-কল্পনাকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রায় কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। মেয়েরা বেশির ভাগ রয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে পর্দার আড়ালে; দেশের বিরাট মুসলমান সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন; শহুরে মধ্যবিত্ত উচ্চ বর্ণের হিন্দু পুরুষদের একটা অংশ বাদ দিলে বাকী প্রায় সকলেই পড়ে রইলেন কমবেশী ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবনযাত্রার কবলে। পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ অথবা জাপানের মুতাবিক ভারতবর্ষেও যদি ব্যাপক শিল্প বিপ্লব ঘটত তা হলে সমস্ত সমাজের চেহারাটাই পালটে যেত। কিন্তু বিদেশীর শাসনাধীন উপনিবেশে তা তো সম্ভব ছিল না; ইংরেজ এ-দেশে সমাজবিপ্লব চাননি, চেয়েছিলেন শোষণের ক্ষেত্র।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা এখন আমরা খানিকটা। বুঝতে পারি। স্বাধীন চিন্তার তাকতে যে কায়েমী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা লড়বেন তার একটা

অংশ হচ্ছে তাঁদের নিজেদের জড়ভরত সমাজ-সংস্কৃতি, অন্য অংশ হচ্ছে দেশের ওপরে চাপানো ঔপনিবেশিক শোষণ-ব্যবস্থা। দুইয়ের সঙ্গে পাল্লা কষার তাকত ছিল না; অথচ এক অংশের সঙ্গে লড়তে গেলে অন্য অংশের সঙ্গে রফা করতে হয়। গোড়ার দিকে তাঁরা নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তরকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। আশা ছিল এ উদ্যমে বিদেশী শাসক নিজের স্বার্থেই সহযোগিতা করবেন। কিন্তু ক্রমে তাঁরা বুঝলেন, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এ আশা নিতান্তই অবাস্তব। বিদেশী শাসকদের চোখে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মনস্বী মাত্র; এ দেশে স্বাধীন চিন্তার লক্ষণ দেখলে তাঁরা আতঙ্কে উঠে যে-কোনো অজুহাতে তার প্রকাশ রোধ করতে প্রস্তুত; তাঁরা চান ঘুষ আর ধমক মিশিয়ে এমন এক পদ্ধতির প্রয়োগ যার ফলে বুদ্ধিজীবীরা পর্যবসিত হবেন শিরদাঁড়াহীন কেরানী মুৎসুদ্দীতে। অপর পক্ষে, সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীরা দেখলেন এই উদ্যম তাঁদেরকে স্বজাতীয় সমাজ থেকে ক্রমেই সরিয়ে দিচ্ছে; না যন্ত্রবিপ্লব, না আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটায় তাঁদের ভাবনা-চিন্তা প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে ফলপ্রসূ হতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব ত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তাঁদের মুখ্য উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশ হয়ে উঠলেন ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ তাঁদের সঙ্গে হাত মেলালেও অনেকেই ইংরেজ-বিরোধী না হয়ে হিন্দু-বিরোধী হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁদের বিচারে মুসলমানদের বিকাশের পথে প্রধান বাধা বিদেশী শাসন নয়, তাঁদের নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মবিশ্বাসের গলদ এবং জড়িমা নয়, তা হল হিন্দুদের সংখ্যাগুরুত্ব এবং সবক্ষেত্রে প্রাধান্য। মোদ্দা ফল দাঁড়াল কি হিন্দু, কি মুসলমান বুদ্ধিজীবী নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমেই হয়ে উঠলেন রক্ষণশীল এবং তাতে যে শুধু দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়ে দাঁড়াল তাই নয়, যে আত্মসমালোচনা উনিশ শতকে এ-দেশে রেনেসাঁসের সূচনা ঘটিয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে এল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে এ-দেশে যখন রুশ বিপ্লবের ঢেউ এসে লাগে তখন মনে হয়েছিল বুঝি বা এবারে এই সঙ্কটের মোচন ঘটবে। এ-দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের আদি প্রবক্তা মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নানা লেখার ভিতর দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের মত উপনিবেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরস্পরনির্ভর, এর একটিকে অবহেলা করলে অন্যটিও ব্যর্থ হতে বাধ্য। (১৯২২ সালে প্রকাশিত রায়ের বিখ্যাত বই "ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন" বহুদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল সম্প্রতি বোম্বাই থেকে নতুন সংস্করণ ছাপা হয়েছে—আবার পড়ে দেখো—মূল বক্তব্য এত দিন পরেও অবান্তর ঠেকবে না।) বিশের এবং ত্রিশের দশকে এ-দেশে কিছু বুদ্ধিজীবীর মনে এই যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিভাত হয়েছিল, তাঁদের লেখায় তার প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু তোমার আমার মত সে-যুগের কিছু তরুণ এই চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হলেও এ-দেশের সাধারণ শিক্ষিত মনে মানবেন্দ্রনাথ অথবা অন্য র‍্যাডিকাল ভাবুকেরা গভীর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মানবেন্দ্রের সঙ্গে কম্যুনিস্টদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ১৯২৯ সালে; তিরিশের দশকের প্রথম ছ' বছর তিনি কাটিয়েছেন কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দীদশায়; তারপর ছাড়া পাওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একাগ্র অধ্যবসায়ে এ-দেশে র‍্যাডিকাল ভাবান্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাঁকে শেষ পর্যন্ত একাকিত্বে ঠেলে দিয়েছে। অপর পক্ষে, তিরিশের দশক থেকে এ-দেশের কম্যুনিস্টরা আগাগোড়াই সুবিধাবাদী এবং পরমুখাপেক্ষী; মুখে মার্ক্সীয় বুলি আওড়ালেও তাঁদের চিন্তায়, জীবনে এবং ক্রিয়াকলাপে নির্ব্যাজ র‍্যাডিকালিজ়ম্-এর স্বাক্ষর কচিৎ চোখে পড়ে; সামাজিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চাইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে, যে সমস্যার কথা আগে উল্লেখ করেছি তার সমাধানে কম্যুনিস্টদের দান নিতান্ত নগণ্য। স্বাধীন বুদ্ধির এবং নৈতিক সত্তার অভাব স্টালিনী যুগে প্রায় সব দেশের কম্যুনিস্টেরই সাধারণ লক্ষণ (স্টালিনের পরের যুগেও তাদের সেই অভাব যে হ্রাস পেয়েছে এমন মনে করার স্বপক্ষে খুব বেশী প্রমাণ দেখি না), কিন্তু ভারতীয় কম্যুনিস্ট-দের মধ্যে এই লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকট।

অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার আগে আমাদের দেশে সেই ধরনের বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় খুব কম, যাঁরা এ-দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আমূল পুনর্বিচারে উদ্যোগী, যাঁদের বলা যায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর-লোকহিতবাদী-ফুলের যথার্থ উত্তরসাধক। তোমার আমার বয়ঃপ্রাপ্তির যুগের কথা যখন ভাবি, মনে পড়ে বাঙালী শিক্ষিত হিন্দুদের উপরে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব তখন কত প্রচণ্ড, অবাঙালী হিন্দুদের ওপরে গান্ধীর এবং বেশির ভাগ মুসলমানের উপরে উদীয়মান প্রৌঢ় নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার। অবশ্য জবাহরলালও সেই যুগেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন—কিন্তু তিনি তখনো গান্ধীর সমর্থনের ওপরে নিতান্ত নির্ভরশীল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের সূর্যাস্তমহিমা আমরা দেখেছি, কিন্তু "নামঞ্জুর" গল্প থেকে "ল্যাবরেটারী"তে যে ভদ্রতোয়ারি অগ্নিগর্ভতা বর্তমান তার উত্তাপ এ-দেশের শিক্ষিত মনে কতটুকুই বা সঞ্চারিত হয়েছে? রামনামের সঙ্গে জয়হিন্দ, কিংবা আজানের সঙ্গে পাকিস্তান জিন্দাবাদ মেশালেই কি মনের মুক্তি ঘটে?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নতুন সূর্য্য

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাখু ডাক্তারের সঙ্গে আপনাদের একটু পরিচয় থাকা ভাল।

রাখু-ডাক্তারের পুরো নাম রাখহরি সরকার। কেমন করে সে ডাক্তার হলো সে কথাও আপনাদের জানা প্রয়োজন।

রাখু-ডাক্তারের বাপ ছিলেন ডাক্তার। হাতুড়ে-ডাক্তার। কোত্থেকে তিনি ডাক্তারী শিখেছিলেন, কোন্ কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন কেউ কিছুই জানতো না, জানবার প্রয়োজনও ছিল না। গ্রামের সবাই জানতো তিনি ডাক্তার।

ভিজিট ছিল মাত্র একটি টাকা।

তাইতেই তিনি জমি-জায়গা কিনেছিলেন। একতলা একখানি বাড়ি করেছিলেন। আশী বৎসর বয়সে তিনি মারা গেলেন।

রেখে গেলেন তাঁর একমাত্র পুত্র রাখহরিকে।

উত্তরাধিকার সূত্রে রাখহরি পেলে তার বাপের ডিসপেন্সারি, কিছু ওষুধপত্র, আর একজন বুড়ো কম্পাউণ্ডার।

কম্পাউণ্ডারের গ্রামেই বাড়ি। নাম—বনমালী বাঁড়ুজ্যে।

রাখহরি ডাক্তারীর কিছুই জানে না, লেখাপড়াও শেখেনি।

বুড়ো বনমালীকে জিজ্ঞাসা করলে, ডাক্তারখানা তুমি চালাতে পারবে?

বনমালী বললে, কেন পারবো না বাবা? তোমার বাপের কাছে সবই তো শিখেছি। এক-আধদিন নয়, তিরিশ বছর। কিন্তু বাবা, আমি না হয় ডিস্পেনসারী চালালাম, আমি কম্পাউণ্ডার। ডাক্তার কোথায়? একজন ডাক্তার চাই যে!

রাখহরি বললে, ডাক্তার কি হবে? আমি ডাক্তার।

বনমালী মনে মনে হাসলো একটুখানি। জোরে জোরে হাসতে পারলে না। বয়েসে ছোট হলে কি হবে, মনিবের ছেলে তো!

চোরের ছেলে চোর হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারের ছেলে হলেই ডাক্তার হয় না।

তবু হলো।

রাখহরি সরকার ডাক্তার হলো।

নেহাৎ পাড়াগাঁ, সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষের বাস সেখানে। কেউ কেউ ভাবলে বুঝি-বা বিদ্যেটা সে শিখেছে তার বাপের কাছে।

রাখহরি তার বাপের জামা গায়ে দিয়ে স্টেথিসকোপটা গলায় ঝুলিয়ে বাপ ঠিক যেমন করে রুগী দেখতে যেতো তেমনি রুগী দেখতে যায়। আশ-পাশের দশখানা গাঁয়ে ডাক্তার নেই, কাজেই কারও অসুখ-বিসুখ হলে নেহাৎ দায়ে পড়ে রাখহরিকে ডাকে। কিন্তু টাকা দেবার সময় আট আনার বেশি দিতে চায় না।

আট আনা আট আনাই সই।

কিন্তু ভেতরের খবর যারা জানে, রাখহরির ওষুধে রুগী যখন কিছুতেই সারতে চায় না, তখন চুপি চুপি ডেকে নিয়ে যায় বনমালী-কম্পাউণ্ডারকে।

কিছুদিন পরে হিসেব করে দেখা গেল—বনমালীর ডাকই হয়েছে বেশি। রাখহরির কম।

বুক চড়চড় করতে লাগলো রাখহরির। বললে, দ্যাখো বনমালী, তুমি যা পাচ্ছ তার অর্ধেক দিতে হবে আমাকে। হাফ অ্যাণ্ড হাফ।

—কেন, তা কেন দেবো? আমার জন্যেই তোমার যা-কিছু! আমি যদি কাল থেকে তোমাকে আমার ডিস্পেন্সারীতে ঢুকতে না দিই!

বনমালী বললে, তুমি তো ওষুধ দিতে পার না বাবা। রুগী দেখে এসে আমাকে

বল—জবর হয়েছে, ওষুধটা দিয়ে দাও। কিরকম জবর কিছুই জানলাম না—রুগী দেখলাম না তবু ওষুধ দিতে হয়। রুগী সারে না। কাজেই তারা আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। আর তুমি বলছো কিনা আমার ভিজিটের টাকার অর্ধেক তোমাকে দিতে হবে। তা কেমন করে হয় বাবা?

শুরু হলো দু'জনের ঝগড়া।

এমনি ঝগড়া হতে হতে শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় বনমালীকে রাখহরি একদিন তার ডিস্পেনসারী থেকে দিল তাড়িয়ে।

শহর থেকে ওর বদলে যেমন তেমন একজন কম্পাউন্ডার ডেকে আনলেই চলবে।

কিন্তু শহর থেকে কেউ আসতে চায় না। শুকনো পঁচিশ টাকা মাইনেয় শহরের কোনও কম্পাউন্ডার রাখহরির কাছে আসতে চাইলে না।

দু'জনেরই হলো মুশকিল।

রাখহরির ওষুধে রুগী সারে না—কথাটা জানাজানি হয়ে গেল।

ওদিকে বনমালী কম্পাউন্ডারকে ডাকতে গেলেও সে আসতে চায় না। বলে, আমি গিয়ে কি করবো বাবু, রাখহরি আমাকে

ডিস্পেন্সারীতে ঢুকতে দেয় না। ওষুধ দেবো কোত্থেকে?

বনমালীর দিন আর কাটতে চায় না। বাড়িতে বসে বসে পঞ্জিকার পাতা ওল্টায় আর বিজ্ঞাপন পড়ে। একদিন সেই পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে কলকাতা শহরে লিখে ফেললে একখানা চিঠি। দিনকতক পরে বনমালী বাঁড়ুজ্যের নামে এলো একটি ভি-পি পার্শেল। একখানি পারিবারিক চিকিৎসার বই আর একটি হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স।

দেখাই যাক না হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোনও গুণ আছে কিনা।

বনমালী প্রথমে ঠিক করলে গ্রামে সে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করবে। প্রথম প্রথম কারও কাছ থেকে কিছু নেবে না। কিছু টাকা না হয় তার যাবে। ধর্মভীরু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যে ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে সে নিজেই কিছু জানে না—তার দাম সে নেবেই-বা কেমন করে?

বনমালী বই দেখে দেখে সিম্‌টম্‌ মিলিয়ে মিলিয়ে ওষুধ দেয়।

সবাই বলে, বুড়ো কোথাও জল-পড়া শিখে এসেছে। জলের ওপর কি যেন মন্ত্র পড়ে দিচ্ছে, ব্যস, তাইতেই অসুখ সারছে।

কাঙাল-বউ-এর ছেলেটার জ্বর দেখে এলাম—গা যেন আগুন; জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, আজ গিয়ে দেখলাম, সেই ছেলে উঠে বসেছে, বসে বসে খেলা করছে।

গিরিবালার ছেলেটা বমি করে সারা হচ্ছিল, পেটে জলটুকু পর্যন্ত থাকছিল না, কাল থেকে আর বমি করছে না। দেখে এলাম—ছেলেটা ভাল হয়ে গেছে।

এমনি দু'চারটে ছোটখাটো অসুখ ভাল হতেই মুখে মুখে এমনি সব নানান কথা রটে গেল চারিদিকে। একে বিনা পয়সার ওষুধ, তার ওপর ওষুধ খেতে নাক বন্ধ করতে হয় না, ছেলেপুলেরা একমাত্রার জায়গায় চারমাত্রা সুগার অব মিল্ক (Sugar of milk) এক সঙ্গে খেয়ে ফেলতে চায়। ওষুধ খাবার নাম শুনলে আগে যেসব ছেলেমেয়ে ছুটে পালাতো, আজকাল সেই ওষুধ খাবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

মোটামুটি দশ-বারোটা ওষুধকে সে হাড়ে হাড়ে চিনে ফেললে। ডাকলে সাড়া দেয়—এইরকম কয়েকটি ওষুধ।

এলোপ্যাথি ওষুধ যখন সে দিত, তখন রোগের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। এখন রোগের বদলে পরিচয় দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো ওষুধের সঙ্গে। ঘন ঘন ওষুধের পার্শেল আসতে লাগলো কলকাতা থেকে। রুগী দেখে ওষুধ দিয়ে আর শেষ করতে পারে না।

পাশের গ্রামে মস্ত মেলা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা।

গ্রীষ্মকাল। চারিদিকে জলের কষ্ট। পুকুরগুলো সব শুকিয়ে গেছে।

এই সময়টায় প্রতি বৎসর কলেরা হয় দু'চারজনের। সে বৎসর কলেরা আর বসন্ত দুইই একসঙ্গে লেগে গেল।

এই দুটো মারাত্মক ব্যাধির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না বনমালীর। কারণ রাখহরির বাবা কলেরা-বসন্তের নাম শুনলে আর সে পাশ মাড়াতেন না। সেলাইন ইন-জেক্‌সেনের নামটা মাত্র শুনেছিল বনমালী। কিন্তু কেমন করে সেটা দিতে হয় কিছুই সে জানতো না তখন।

বনমালীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের হলো কলেরা।

হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স আর বই নিয়ে সে কপাল ঠুকে চলে গেল নয়ানজুলি গ্রামে। তখন সেখানে আরও তিনজনের হয়েছে কলেরা। বনমালী সেদিন আর বাড়ি ফিরে এলো না। চারজন রুগীর ভেতর একজনকে সে বাঁচাতে পারলে না। বাকি তিনজন তার সেই কয়েক ফোঁটা ওষুধেই ভাল হয়ে গেল।

গ্রামের লোক যখন বনমালীর জলপড়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বনমালী নিজে তখন স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক। এই মহৌষধির আবিষ্কর্তা মহান হ্যানিম্যানের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করছে আর ভাবছে—এ বিদ্যা সে আগে শেখেনি কেন?

বনমালীর 'ডাক' বেড়ে গেল। বন-মালীর ভিজিটের দাম ধার্য হলো এক টাকা, আর প্রতিমাত্রা ওষুধের দাম দু'পয়সা।

বনমালীর বিশ্বাস হলো দৃঢ়। বইএর পর বই, ওষুধের পর ওষুধ আসতে লাগলো। এর জন্যে তাকে যদি সর্বস্বান্ত হতে হয়, তাও সে হবে। তখনও তার মনের সংশয় ঘোচেনি। জ্বর আর কাশি সে সহজে সারাতে পারছে না। এলোপ্যাথি ওষুধ দিয়ে সে এখুনি সারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এলোপ্যাথি ওষুধ সে আর স্পর্শ করবে না।

রাখহরির ডিসপেন্সারি তখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। রাখহরির সমবয়সী পাড়ার কয়েকজন লোক গিয়ে বসে সেখানে। কয়েক পেয়ালা চা খায় আর বনমালীর শ্রাদ্ধ করে। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে কালী-কীর্তনের আসর বসে।

রাখহরির আজকাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, বুড়ো বনমালী কবে মরবে সেই কথাই ভাবে। আঙ্গুলে গুনে গুনে তার বয়সের হিসেব করে।

রাত্রে একদিন রাখহরি স্বপ্ন দেখলো—বুড়ো কম্পাউন্ডারকে সে পুকুরের জলে চুবিয়ে মারছে। একপেট জল খেয়ে বনমালী কম্পাউন্ডার প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর রাখহরি বলছে—'ডাক্তারী তুমি ছেড়ে দাও।'

বনমালী প্রাণের দায়ে বললে, 'ছেড়ে দেবো।'

তারপরেই রাখহরির ঘুম গেল ভেঙে। স্বপ্ন—স্বপ্নই। স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না।

রাখহরি দেখলো, বনমালীর হোমিও-প্যাথি ডাক্তারী বেশ ভালই চলছে। আজকাল শুনেছে নাকি রোজগারও বেশ ভাল। দূরের গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে চড়ে রুগী আসছে বনমালীর কাছে।

কিন্তু রাখহরি তো জানে না বনমালীর মনের কথা। যতই শক্ত শক্ত ব্যারামের রোগী আসছে বনমালীর কাছে, বনমালী ততই বিপদে পড়ছে। হাতজোড় করে বলছে 'তোমরা কেন এলে বাবা আমার কাছে? শহরে বড় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন। তোমরা তাঁর কাছে যাও।'

তারা যায় না কিছুতেই।

তখন সে তাদের আদ্যোপান্ত ইতিহাস নিয়ে নিজেই ছোটে শহরের ডাক্তারের কাছে। নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনা করতে চায় না বনমালী। কী অমৃতের আস্বাদ সে পেয়েছে এই হোমিওপ্যাথির মধ্যে তা সেন নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারে না।

একদিন এক বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে বনমালী। বলছে, 'আর ক'দিনই-বা বাঁচবো। বয়স যদি থাকতো তো কলকাতায় গিয়ে কোনও হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হয়ে ভাল করে শিখতাম এই বিদ্যেটা।'

রাখহরিও গিয়েছিল সেই বিয়েবাড়িতে। তারও নেমন্তন্ন ছিল।

কথাটা শুনে সে চট্‌ করে বলে বসলো, 'থামো, থামো, হোমিওপ্যাথি শেখার কি আছে বাবা! জল তো! চোখ বুজে এক ফোঁটা দিয়ে দিলেই হলো! সারলো তো সারলো, বলিহারি ওষুধ। আর না যদি সারলো তো ছোট্‌ এই রাখহরি শর্মার কাছে।'

বুড়ো কম্পাউন্ডার বললে, 'না বাবা তা নয়। তোমার বাপের সঙ্গে আমি ত্রিরিশটি বছর ওষুধ দিয়েছি। এলোপ্যাথিটাকে আমি বেশ ভাল করেই জানি। আর এই হোমিওপ্যাথির কিছুই জানি না, তবু বলছি—এর তুলনা হয় না। এর আবিষ্কার যিনি করেছেন—'

এই বলে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হাত দুটি জোড় করে হোমিও-প্যাথির আবিষ্কর্তা হ্যানিম্যানের উদ্দেশে বোধ করি প্রণাম করছিল বনমালী।

রাখহরি বললে, 'খুব হয়েছে, আর ভণ্ডামি করতে হবে না!'

এই বলে রাখহরি সজোরে ঠেলে দিয়েছিল বনমালীকে। বুড়ো মানুষ, টাল সামলাতে পারেনি। উলটে পড়ে গিয়েছিল

একটা পাথরের ওপর। মাথায় বড় বেশি চোট লেগেছিল তার। গল গল করে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল তার মাথা দিয়ে।

সবাই ঘা-তা বলেছিল রাখহরিকে।

রাখহরিও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল কাজটা তার ভাল হয়নি।

ডাক্তারখানা থেকে টিনচার আইডিন আনবার ছুতো করে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে।

বনমালীর কি হয়েছিল জানি না। তারপরেই গ্রাম ছেড়ে আমি চলে এসেছিলাম কলকাতায়। শুনেছিলাম, টিনচার আইডিন সে লাগায়নি। 'আর্নিকা' খেয়ে আর 'কেলেন্ডুলা' লাগিয়েই বনমালী ভাল করে-ছিল তার মাথার ঘা।

নিজের জীবনের তিরিশটি বছর এ্যালো-প্যাথি ডাক্তারের কম্পাউন্ডারী করেও কী এমন আশ্চর্য বস্তু সে লক্ষ্য করেছিল এই হোমিওপ্যাথিতে, যার জন্য সে এর ভক্ত হয়ে গেল জানি না।

কলকাতায় এসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মুখেও একদিন হোমিওপ্যাথির গুণগান শুনেছিলাম। বলেছিলেন, আশ্চর্য আবিষ্কার এই হোমিওপ্যাথি। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।

তিনিও যেন এই বৃদ্ধ কম্পাউন্ডারের ভাষার প্রতিধ্বনি করেছিলেন।—'সময় পেলে এই জিনিসটার আর-একটু ভাল করে চর্চা করতুম।'

তাঁর হাতের কাছে টেবিলের ওপর দেখেছিলাম হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি বড় বাক্স।

বলেছিলেন, অনেকগুলো ওষুধ। এত-গুলো ওষুধের অত অত সিমটম্ মনে রাখা সম্ভব নয়। আমার সে সময়ও নেই।

তাই তিনি শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি ছেড়ে বায়োকেমিক্ ওষুধের চর্চা করে-ছিলেন।

বায়োকেমিক্ ওষুধের ইংরেজি বাংলা অনেকগুলি বই আমি দেখেছিলাম তাঁর কাছে। সুসলারের Twelve Tissue Remedies' বইখানি তিনি সজনীকান্তকে (শনিবারের চিঠির সম্পাদক) দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বইখানি মন দিয়ে পড়ে দেখো।

সজনীকান্ত আবার সে বইখানি দান করেছিল আমাকে।

আমার কাছে এখনও আছে সেই অমূল্য গ্রন্থখানি। ১৮৯৯ সালের ছাপা বই। অতি সাবধানে পাতা ওলটাতে হয়। অনেক দিনের পুরনো কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আমি আবার সেলোটেপ দিয়ে জুড়ে রাখি।

শরৎচন্দ্রও হোমিওপ্যাথির ভক্ত ছিলেন। তাঁরও পানিত্রাসের বাড়িতে আমি হোমিও-প্যাথি ওষুধের বাক্স আর বই দেখেছি।

সেই থেকে আমারও শখ হলো এই শাস্ত্রটি অধ্যয়ন করবার।

অধ্যয়ন করেছি ছাত্রের মত।

এই শাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়া যে কী দুরূহ কর্ম সেইটুকু মাত্র হৃদয়ঙ্গম করেছি।

দেখেছি এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে একটি পুরো জীবনকে উৎসর্গ করতে হয়। সারা জীবনের একাগ্র সাধনায় সিদ্ধি এবং প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা যাঁরা লাভ করেছেন—তাঁদের আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি প্রণাম নিবেদন করি সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষকে—যিনি এই অমৃততত্ত্বের আবিষ্কর্তা—যিনি তাঁর সাধনা-লব্ধ এই অমৃততত্ত্ব ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। সেই মৃত্যুঞ্জয় মহা-পুরুষের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল ছিল নিরবধি কাল আর এই বিপুলা পৃথিবী।

এই পৃথিবীকে তিনি সুন্দর করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন স্বাস্থ্যের চেয়ে সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই। আর দেখেছিলেন, সেই স্বাস্থ্যের সব চেয়ে বড় শত্রু—রোগ। সে শত্রু সবার এমন—যাকে চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্যলোকের এই শত্রু সবার অলক্ষ্যে অদৃশ্য যে জীবনী-শক্তি—তাকে আক্রমণ করে। মানুষের দেহে এবং মনে—জড়ে এবং চৈতন্যে তখন আলোড়ন শুরু হয়। সেই আলোড়নের প্রকৃতি দেখে আমরা বুঝতে পারি—শত্রুর আকৃতি কেমন।

অদৃশ্যলোকের এই সংগ্রামকে প্রতিনি-বৃত্ত করতে হলে—অশরীরী রোগশক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করবার মত সধর্মী সম-গোত্রীয় আর এক অশরীরী মিত্রশক্তিকে খুঁজে বের করবার পদ্ধতিই হলো হোমিও-প্যাথির মূলমন্ত্র।

পৃথিবীর সর্ববিধ পাপকে বিনষ্ট করবার মূলে অনন্তবীর্যা যে বৈষ্ণবীশক্তি আত্মগোপন করে থাকে, হোমিওপ্যাথির শক্তিরহস্যও আমার বিশ্বাস—সেই সর্ব-মঙ্গলা মাতৃশক্তির সমগোত্রীয়া।

এই মহাসত্যকে শুধু আবিষ্কার করে নয়—অন্তরে উপলব্ধি করে যে সত্যব্রত মহর্ষি তাঁর জ্ঞানের ভান্ডার বিশ্বমানবের কাছে চিরকালের তরে উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন, সেই জ্ঞানতপস্বী হ্যানিম্যানের অপরূপ জ্ঞানশক্তিকে নমস্কার! ●

বিরুদ্ধবাদী একদল লোক এখনও পৃথিবীতে আছেন—যাঁরা এই বিদ্যাকে উপহাস করতে কুণ্ঠিত হন না। যাঁরা এর অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন না, চান না, এই বিদ্যা তাঁদেরই কাছে উপহাসের বস্তু। যেখানে সত্যের উপলব্ধি, সেইখানেই আনন্দ।

সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই নিরানন্দ।

যে সত্যে আমাদের আনন্দ নেই, সে সত্যকে আমরা শুধু জানি মাত্র, তাকে আমরা অন্তর দিয়ে পাই না। যে সত্য আমা-দের কাছে নিরতিশয় সত্য সেইখানেই আমাদের আনন্দ। সেইখানেই আমাদের প্রেম।

॥ ৪০ ॥

সেই নরম হলদে রোদ, ডালিম ঝোপে শালিক চড়ুইয়ের নাচানাচি কিচির-মিচির, অন্যদিনের মতোই ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন একটা আকাশ নিয়ে সকাল হয়েছিল, সূর্য উঠেছিল। মাধুরীর খাঁচার মুরগিগুলি কক্ কক্ ডাকছিল। প্যাঁকপ্যাঁক শব্দ করে সার বেঁধে হাঁসের দল খালের দিকে ছুটে গেছে।

অর্থাৎ আজ যে একটা অন্যরকম দিন, অক্ষয়ের অপারেশন হবে, একটা বিশেষ দিন, ঘুম থেকে জেগে উঠে বাইরের দিকে চোখ রেখে রামানন্দ তার কোনো লক্ষণ দেখেনি।

যেন সব আগের মতন আছে। কিছুই বদলায়নি। যে কারণে কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে, স্তব্ধ হয়ে থেকে অক্ষয়ের উঠোনের রৌদ্র ঝলমল নধর ডালিম গাছটার দিকে সে ফ্যালফ্যাল করে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল।

অথচ মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে গায়ে জামা চড়িয়ে হাসপাতালে বেরোবার জন্য সে তৈরী হয়েছিল।

মাধুরী নিজে আসেনি, মনতাজকে দিয়ে চা পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সেটা অবশ্য তেমন কিছু না। এই সময়টায় মাধুরীর খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। একদিকে তার হাঁস মুরগি ছাগল, অন্যদিকে ধোয়া মোছা, ঘর-দুয়ার নিকানো। শফী থাকলে শফীকে দিয়ে কতদিন চা পাঠিয়ে দিয়েছে।

তা নয়, আসলে অন্যদিনের মতোই একটা নিশ্চিন্ততা নির্ভাবনা এই ছোট্ট শান্ত সংসারটাকে ঘিরে রয়েছে, চোখের সামনে দেখে রামানন্দ আজ আবার মাধুরীকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সাহস পাচ্ছিল না। অর্থাৎ বেলা সাড়ে নটায় অক্ষয়ের অপারেশন হয়ে যাচ্ছে, দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ তাকে কেবিনে ফিরিয়ে আনা হবে—বিকেলের দিকে মাধুরী অক্ষয়কে একবার দেখতে যাবে কিনা। যদি কালকের মতোই মাধুরী আজ আবার নাক সিঁটকায়—হাসপাতালে গেলে ঘেন্না করে বমি আসে এসব বলে?

যে কারণে রামানন্দ চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

তাতে বেশ একটা মজা হয়েছিল। এভাবে রামানন্দর চুপচাপ বেরিয়ে আসাতে, অন্তত রামানন্দর যা অনুমান, মাধুরী নিশ্চয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। ও তখন ভেবেছে তার কালকের জবাবটা মোটেই ভাল হয়নি—স্বামী হাসপাতালে আছে, সেখানে ঘেন্নার প্রশ্ন ওঠে না, মাস্টার রেগে গেছে। যে কারণে ঘুম থেকে উঠে মাধুরীকে কিছুই না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কেননা বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে রামানন্দ যখন সল্ট-লেকের বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছে তখন পিছনে ছোট্ট একটা কাশির শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাতে দেখে বড় বড় পা ফেলে মনতাজ তার দিকে ছুটে আসছে। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

'কি ব্যাপার?' কাছে আসতে মনতাজকে সে প্রশ্ন করেছিল। ছোঁড়া হাসছিল। রামানন্দ অবাক হয়নি। কাল বিকেলের অপ্রস্তুত ভাবটা, এত বড় একটা রাত গেল মাঝখানে, কাটিয়ে ওঠার মতন যে যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছে শফীর মামাত ভাইটি তা সে চোখের ওপরই দেখছিল। আর এদিকের ব্যাপার, অর্থাৎ অক্ষয়ের আজ অপারেশন, যে জন্য সাত সকালে রামানন্দকে হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে, মাধুরীরও একবার সেখানে যাওয়া দরকার—এসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামানর কথা নয় এই ছেলের, শফী হলে কথা ছিল। গোড়া থেকে এ বাড়িতে যাতায়াত। অক্ষয়ের হাসপাতালে যাওয়ার প্রথম অবস্থায় মাধুরীর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা এমন কি কিছু কিছু কান্নাকাটিও শফী দেখেছে। মনতাজ এসব কিছুই দেখেনি। খুব হালে এখানে তার আসা। বরং মাধুরীর হাসিখুশি চেহারাটাই সে দেখছে বেশী। 'হুঁ, কি হয়েছে মনতাজ?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকে ছোঁড়ার সুন্দর মুখের হাসিটা লক্ষ্য করছিল। 'আজ বিকেলে শফীদা আসবে, শফীদার সঙ্গে দিদি কি হাসপাতালে যাবে?' রামানন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে মনতাজ প্রশ্ন করেছিল। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তর দিতে পারেনি। মনতাজের দিক থেকে চোখটা সরিয়ে নিয়ে বাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়া সকালের লাল রোদ দেখছিল। একটু ভেবে নিয়ে পরে গম্ভীর হয়ে বলেছিল : 'হুঁ যেতে পারে, আপত্তি কি।' খুবই সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল সে। জবাব শুনে এক গাল হাসি নিয়ে মনতাজ তক্ষুনি সেটা মাধুরীর কাছে পৌঁছে দিতে সাঁই সাঁই করে আবার বাড়ির দিকে ছুটে গেছে। একটু মুচকি হেসে রামানন্দও বেলেঘাটার রাস্তায় বাস

ধরতে আবার হাঁটা আরম্ভ করেছিল। গম্ভীর হয়ে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার অন্তত এটুকু কাজ হয়েছে, রাস্তায় আসতে আসতে সে ভাবছিল, শফীকে নিয়ে মাধুরী আজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অক্ষয়কে দেখতে আসছে।

কাজেই অপারেশন ঘরের লাগোয়া মাঠটায় একটা আম গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে প্রায় সারাটা সকালই রামানন্দ ঘুরে ফিরে মাধুরীর ছবিটা দেখেছে। সেই ছবিতে কখনও মনতাজ কখনও শফীর মুখটা ভেসে উঠেছে, এমন কি অক্ষয়ের উঠোনের রোদ লাগা ডালিম ঝোপ, হাঁস মুরগি, একটু দূরের মনসা গাছ—কখনও স্পষ্ট কখনও ঝাপসা হয়ে চোখের সামনে কবারই ফুটে উঠতে দেখল রামানন্দ।

ঘাসের ওপর বসে থাকতে থাকতে তার হাই উঠছিল। নতুন কিছু তো দেখবার ছিল না। এক মাস হতে চলল, ধরতে গেলে প্রায় রোজই দুবেলা অক্ষয়কে সে এখানে দেখতে আসছে। হাসপাতালের এত বড় কম্পাউণ্ডের ভিতর কোথায় কি আছে না আছে তার একরকম মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। যে জন্য গাছের ছায়ায় দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থেকেও অন্য কোনোদিকেই তার তাকাতে ইচ্ছে করছিল না, ভালও লাগছিল না। কেবল হাই তুলেছে, আর বেশির ভাগ সময় চোখ বুজে থেকে সময় কাটিয়েছে, মাঝে মাঝে এক আধটা সিগারেট ধরিয়ে টেনেছে। তাও কি আজ সিগারেট খাওয়া হত। কাল ঐ ছেলে দুটো উঠে চলে যাবার সময় তার জন্য একটা প্যাকেট রেখে গিয়েছিল। খুব একটা হুঁশ ছিল না, তা হলেও রামানন্দর এটুকু মনে আছে, বেশ চালাকি করে দুটিতে মিলে তাকে দিয়ে একটা কবিতা লিখিয়ে নিতে আটাক পড়েছিল। আজও আবার একটির আসবার কথা না? হুইস্কি নিয়ে খাবার-দাবার নিয়ে? ঐ যে মিহি মাজা গলায় বেশ বিনয় করে করে দু নম্বর ছেলেটা বার বার তাকে শোনাচ্ছিল? কিন্তু রামানন্দ নিশ্চিত, বদমাশ দুটো আর এ-মুখো হবে না। লেখা আদায় করেছে, বাস হয়ে গেছে।

হুঁ অপারেশন হলঘরের লাগোয়া মাঠটার আম গাছের ছায়ায় বসে ফচকে ছেলে দুটোর মুখও রামানন্দর কয়েকবারই মনে পড়ছিল। একটা ভাল কলম উপহার দিয়ে গেছে তাকে। এই কলমটাই আজ তার সম্বল। মাধুরীর টাকা দুটো ইচ্ছে করেই সে ফিরিয়ে দেয়নি। কেননা মাধুরীও জানে মাস্টারের হাতে পয়সা নেই। ঐ দু টাকা থেকেই হাসপাতালে যেতে কি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে তাকে বাস ভাড়া দিতে হবে। কাজেই অক্ষয়ের স্ত্রীকে টাকাটা ফেরত দেওয়া হল

না বলে রামানন্দর নিজের দিক থেকে আর একটুও খারাপ লাগছিল না।

না, যে কথাটা সে বেশি করে ভাবছিল। কলমটা। অক্ষয়ের অপারেশন হচ্ছে ঠিকই। এবং ভালয় ভালয় যাতে কাজটা সেরে যায় এই জন্য সে বার বার ঈশ্বরকেও ডাকছিল। কিন্তু এটাও তো সে অস্বীকার করতে পারছিল না, বিকেল পড়তে তার মদের দোকানে ঢুকতে ইচ্ছে করবে। করবেই। ঈশ্বর না করুন, অক্ষয়ের অবস্থা খুব একটা খারাপের দিকে না গেলে রামানন্দ ঠিক করছে সন্ধ্যে নাগাদ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা ধর্মতলার দিকে চলে যাবে। দামী ফাউন্টেন পেন। বিলিতি জিনিস। মোড়টোড়ে কোথাও দাঁড়িয়ে বেচে দিতে একটুকুও কষ্ট হবে না। চোরাই মাল ভেবে উচিত দাম কেউ দেবে না, অর্ধেকও হয়তো দেবে না। তা হলেও একটা দাম পাওয়া যাবে। কুড়ি পঁচিশ বারো চৌদ্দ পাঁচ সাত —যা পাওয়া যায় কলমটা সে ছেড়ে দেবে। অন্তত দু'দিনের ধেনোর খরচটা হাতে এলেই হল।

বলে কিনা দু'দিন পরে আবার কোথায় তুমি টাকা পাবে মদ খাবার!

কথাটা মনে হতে রামানন্দ একা একা ঘাসের ওপর বসে নাকের নিচে হেসেছিল। দোতলার অপারেশন রুমের প্রকাণ্ড কাচের জানালাটা রোদ লেগে ঝকমক করছিল। সেদিকে চোখ রেখে সে মনে মনে বলেছিল, সামনে একটা মেজর অপারেশন হচ্ছে—এক সেকেণ্ডের এদিক ওদিকও কিছু বিশ্বাস নেই—অস্থির, দুরন্ত চঞ্চল এই প্রাণগঙ্গা, আরও বিশদ করে বললে বলতে হয়, পদ্ম-পত্রে নীড় আমাদের এই জীবন। সেখানে দু'দিন তো অনেক বেশি। দু'দিনের মদের খরচ অনেক—তারপরে কি হবে, অন্তত আজকের দিনে কথাটা চিন্তা করাও মূর্খতা।

এগারোটা বেজে গিয়েছিল। গাছের ছায়াটা ছোট হতে হতে আর বিশেষ কিছুই ছিল না। মাথায় রোদ লাগতে সে ঘাস ছেড়ে উঠে পড়ে। একটু চা খেতে ইচ্ছে করছিল তার। লোহার গেটটা পার হয়ে বাইরে রাস্তার ওপারে ছোটখাট একটা চায়ের দোকান আছে। হাসপাতালে ঢোকার মুখে বা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাস ধরার আগে মাঝে মাঝে রামানন্দ ওই দোকানে বসেই চা খায়। বাইরে যাবার আগে আর একবার অপারেশন রুমের একতলার বারান্দায় গিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি। জায়গাটা কেমন খাঁ খাঁ করছিল, অন্ধকার লাগছিল। হঠাৎ রোদ ছেড়ে ওখানে ঢোকার দরুণ। অবশ্য অন্ধকারটা চোখে বেশি লাগছিল।

যাই হোক, তখন আর দারোয়ানকে সে সেখানে দেখতে পায়নি। তা না হলে এর আগে দুবার দারোয়ানকে সে ওপরের খবরটা জিজ্ঞেস করেছিল। জিজ্ঞেস করে বিশেষ কিছু ফল হয়নি। দারোয়ান বেচরাই বা কি করে জানবে দোতলায় ডাক্তারবাবুরা ছুরি কাঁচি চালিয়ে অক্ষয় সমাদ্দারের পেট নিয়ে তখন কি সব কাণ্ডকারখানা করছেন। লিফটের পাশে একটা বেঞ্চির ওপর বসে সেই সকাল থেকে তো ওটা ঝিমোচ্ছে। তবে হ্যাঁ, বাহারের একটা গোঁফ আছে, ভুঁড়িখানাও চমৎকার। বোধ করি এই ভুঁড়ি ও গোঁফের গর্বেই নিজেকে সে একজন কেউ-কেটা মনে করছিল। কেননা, যতবার রামানন্দ তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, রামানন্দকে নিতান্তই একটা গেঁয়ো চাষাভূষা ভেবে ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে সেখান

থাকে দাঁড়িয়ে দেখার মতন ভঙ্গি করে দেখে উঠেছে। তুম্ আদমী বহুৎ ঝামেলা করতা হ্যায়, হঠ যাও, বড় অপারেশন মিলনা হোগা পেসেন্ট আপসে উসকো কোঈ দিন এ চলা যায়গা। তুম্ কাহে বেহুদা ইঁহা পে ধুরধুর করতা হ্যায়—'

তবে লিফটম্যান লোকটা ভাল। বাংলা জানে—কে জানে বাঙালী কিনা, এখানকার হালচাল দেখে রামানন্দর অবশ্য বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না দারোয়ান লিফটম্যান জমাদার আর্দালী বেয়ারাদের মধ্যে বাঙালী কেউ আছে। লিফটম্যান দুবারই বেশ সম্মান করে তার সঙ্গে কথা বলেছে, কথাবার্তাও মিষ্টি: 'খুব বড় অপারেশন হচ্ছে তো বাবু, বেলা বারোটা একটা হয়ে যেতে পারে। আপনি বাইরে বসে কোথাও বিশ্রাম করুন। অপারেশন হয়ে গেলে ঠিক জানতে পারবেন।'

কিন্তু চা খেতে যাবার আগে আর একবার একতলার বারান্দায় উঠে রামানন্দ দারোয়ান বা লিফটম্যান কাউকে দেখতে না পেয়ে খুবই অবাক হয়েছিল, যেন আশান্বিতও হয়েছিল কিছুটা। কেননা লিফট ওপরে চলে গেছে। তা হলে বোধ করি অক্ষয়ের অপারেশন শেষ হল, এবার স্ট্রেচারে শোয়ান অক্ষয়কে নিয়ে লিফট নিচে নামবে, দারোয়ানও এই জন্য আর নিচে বসে নেই, নিশ্চয় ওপরে তার ডাক পড়েছে। এসব ভেবে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকিয়ে লিফট-এর ঝুলন্ত ফিতেটার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে রামানন্দ দশ মিনিট, আরও বেশি, পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেছিল, এই বুঝি ফিতেটা নড়ে ওঠে। হুঁ, ফিতে যখন ওপরের দিকে উঠবে তখনই বুঝতে হবে গড়গড় করে লিফট নামছে—কিন্তু রামানন্দ দেখছিল ফিতেটা একভাবে ঝুলছে, নড়বার কোনো লক্ষণই নেই।

ঘাড়ের শিরা টনটন আরম্ভ করতে হতাশ হয়ে ঘাড় সোজা করে সে তখনই বারান্দা থেকে নেমে এল। কত কারণেই লিফট ওপরে যেতে পারে, অন্য কোনো কাজে দারোয়ানটাও হয়তো কোথাও গিয়েছে—চিন্তা করে রামানন্দ হাসপাতালের কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে সোজা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছিল। কেবল চা না, ক্ষুধা পেয়েছিল, অতিরিক্ত আট আনা খরচ করে চায়ের সঙ্গে আলুর দম ও পাউরুটি খেতে হল তাকে। তার ধারণা ছিল বেলা দশটা সাড়ে দশটার মধ্যেই অক্ষয়ের অপারেশন হয়ে যাবে। অক্ষয়কে একবার দেখে অবস্থা ভালর দিকে বুঝলে দুপুরে নাহয় বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাত খাবে, ভাত খেয়ে তারপর আবার হাসপাতালে চলে আসবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত অক্ষয়ের নিচে আসার কোনো লক্ষণই সে দেখতে পাচ্ছিল না। কাজেই সে ধরে নিয়েছিল দুপুরে আজ আর বাড়ি যাওয়া হবে না। তাছাড়া এখন আবার হাসপাতালে ঢুকলে কখন সেখান থেকে বেরোতে পারবে, বা পারবে না, চিন্তা করেও চায়ের দোকানে বসেই যা-

হোক কিছু সে খেয়ে নেক।

মিনিট কুড়ি ছিল রামানন্দ চায়ের দোকানে। চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে পাশের সিগারেটের দোকানে একটা সিগারেট কিনে সেখানেই সেটা ধরিয়ে নিয়ে অপারেশন রুমের কাছে ফিরে যেতে দেখল লিফটম্যান বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে দাঁত বের করে হাসছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে তার মুখেই শুনল পেশেণ্ট এইমাত্র কেবিনে ফিরে গেছে।

রামানন্দ তখন উর্ধশ্বাসে অক্ষয়ের কেবিনের দিকে ছুটে আসে।

হুঁ, সোহিনী তালুকদার। অক্ষয়ের কথাটা মনে পড়ল রামানন্দর। বুঝেছ মাস্টার, যাকে বলে মোহিনী মূর্তি যে-কোনো পুরুষ, যতবড় বিশ্বামিত্র হোক, ঐ ছুঁড়িকে দেখলে—

মা, মাত্র দুদিন হয় অক্ষয়ের কেবিনে তিনি এসেছেন, মোহিনী সোহিনীর পরিচয়টা তেমন ভাল করে পায়নি রামানন্দ। কিন্তু আজ বুঝল এমন একটা বদমেজাজী মেয়েছেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে কিনা সন্দেহ।

ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া স্পেশাল পাস সঙ্গে ছিল তার। আজ সারাদিন সারারাত অক্ষয়ের কেবিনে সে থাকতে পারবে।

কিন্তু তাতে কাজ হল কি! যেন ওটা কিছুই নয়, ছেলে ভোলান খেলনা, সোহিনী ওই দেখে ভুলবে না, রামানন্দর হাতের কাগজটার দিকে ভাল করে তাকালই না।

'দেখুন—' রামানন্দ ভিতরে ঢুকতে যাবে, রণচণ্ডী মূর্তি ধরে মহিলা কেবিনের দরজা আগলে দাঁড়াল। 'এই মাত্র পেশেণ্ট অপারেশন থিয়েটার থেকে ফিরেছে, এখনই আপনি কেবিনে ঢুকতে চাইছেন কোন্ সাহসে আমি বুঝতে পারছি না!'

অক্ষয়কে দেখতে এসে রামানন্দ এই পর্যন্ত কারো কাছে বাধা পায়নি। সকাল দুপুর বিকেল, যখন খুশি, যেদিন খুশি অক্ষয়ের কেবিনে সে ঢুকে পড়েছে। এবং তার বেলা ভিসচার্জ আওয়ারের কোনো বালাই ছিল না। দারোয়ান জমাদার ওয়ার্ডবয় থেকে আরম্ভ করে সবকজন ডাক্তার-নার্সের সঙ্গে তার কেবল জানাশোনা না, বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। যতক্ষণ খুশি কেবিনে বসে অক্ষয়ের সঙ্গে গল্পটল্প করে কাটিয়ে গেছে। আজ হঠাৎ এভাবে বাধা পেয়ে রামানন্দ থমকে গেল, অপ্রস্তুত হল।

'দেখুন, অক্ষয় আমার বন্ধু, আমি কালও এসেছিলাম, আপনি নিশ্চয় দেখেছেন।'

'কি জানি, ভাল করে লক্ষ্য করিনি।' ভুরু কুঁচকে হাঁড়ির মতন চেহারা করে সোহিনী মাথা নাড়ল। 'তা বন্ধুই হোন আর যাই হোন, পেশেণ্টকে এখন দেখতে দেওয়া হবে না।'

রামানন্দ রুষ্ট হল। তা হলেও ভদ্রতা করে একটু হাসতে চেষ্টা করল। 'আমি তার সঙ্গে কথা বলব না, একবার শুধু চুপি চুপি দেখে যাব।'

'কথা বলবেন কার সঙ্গে!' ফর্সা হাতের তেলো দুটো উল্টে দিয়ে মেয়েটা এমন করে রামানন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল যেন নিতান্তই বোকা মুর্খসুর্খ একটা লোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। 'আচ্ছা মানুষ তো! পেশেণ্টের কি সেন্স্ আছে যে আপনি এখন কথা বললেও তিনি শুনবেন?'

'হুঁ, সে আমি খুব জানি।' রামানন্দর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। 'মেজর অপারেশন হয়েছে, রুগীর সেন্স্ আসতে এখনো দেরি আছে, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমি তার ফ্রেন্ড, এই অবস্থায় পেশেণ্টকে দেখবার রাইট আমার আছে।'

'ফ্রেন্ড—রাইট!' যেন একটা পায়রা বকবকম করে উঠল। বিড়বিড় করে উঠতে সুন্দরীর গলার তুলতুলে নরম মাংস সেভাবেই ওঠানামা করল। কিন্তু তারপর এমন কুৎসিতভাবে ঠোঁট উল্টে দিল—দেখে রামানন্দর প্রায় থুথু ছিটোতে ইচ্ছে করল। আর মহিলার মুখের ভাষাও তেমনি। 'ঐ ফ্রেন্ডই তো ফ্রেন্ডের পেটের বারোটা বাজিয়েছেন, একেবারে ঘা করিয়ে ছেড়েছেন —এক সঙ্গে বসে খুব বোতল-টোতল চলত নিশ্চয়!'

স্তম্ভিত হয় রামানন্দ মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এর উত্তরে কী বলা যেতে পারে রামানন্দ ভেবে পাচ্ছিল না।

'এখন এখান থেকে সরে যান। ফ্রেন্ডকে দেখতে হয় দু ঘণ্টা পরে আসবেন।' কোমর ও পাছায়, বোঝা গেল ইচ্ছে করেই ওটা করল, একটা বিশ্রী কামোদ্দীপক ঢেউ তুলে অক্ষয়ের মোহিনী মূর্তি কেবিনের দরজা ছেড়ে ভিতরে চলে গেল। চাপা রাগে উত্তেজনায় এবং কতকটা দুঃখে রামানন্দর কপালের রগ টিপটিপ করছিল। তাই তো, সিঁড়ি কটা ডিঙিয়ে নিচে নামতে নামতে সে চিন্তা করল, তরলা হলে কথা ছিল, ফ্লরেন্স হলে কথা ছিল, তারা ঢের বেশি শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, কথাবার্তায়ও মার্জিত ভদ্র—তাদের কাছে বললে তারা বুঝত এবং বিশ্বাসও করত, অক্ষয় কোনোদিনই মদ খেত না, অতিরিক্ত চা খেত। হুঁ, মদ ছাড়াও যে

আরও কত কারণে মানুষের পেটে ঘা হতে পারে নার্স হয়ে এই বজ্জাত ছুঁড়ি কি জানে না! নিশ্চয় জানে, রামানন্দ আর একবার ভাবল, নেহাৎ বদমায়েসী করে কথাটা তাকে শুনিয়ে দিল।

হঠাৎ তার খুব খারাপ লাগছিল। হাসপাতালের আবহাওয়াটা অসহ্য ঠেকছিল। ভিতরে কোথাও বসতে ইচ্ছে করল না। ব্লাড-ব্যাংকের পাস দিয়ে হেঁটে লোহার গেট্ পার হয়ে আবার রাস্তার ওপারের সেই চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল। ঢুকল এবং তখনি তাকে বেরিয়েও আসতে হল। এখন আর চা পাওয়া যাবে না। সবক'টা চেয়ার উল্টে রাখা হয়েছে। জল ঢেলে মেঝেটা ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। রামানন্দর মনে পড়ল, এই সময়টায় মোহনবাবুর চায়ের দোকানেরও এই চেহারা হয়। সব ক'টা চেয়ার উল্টে রাখা হয়, মেঝেয় জল ঢেলে দেওয়া হয়। মোহনবাবুর কর্মচারী রমেশ রাস্তার কলে চান করে এসে ছোট একটা আরশি নিয়ে চুল আঁচড়াতে লেগে যেত। এখানেও দেখা গেল চানটান সেরে এসে কর্মচারীটি আরশি চিরুনি হাতে নিয়ে ঘটা করে মাথার চুল ঠিক করছে। তফাতের মধ্যে এই—মোহন-বাবু দোকানেই থাকেন, দুপুরে বাড়ি যান না, ওখানেই খাওয়াদাওয়া সারেন। কিন্তু এই দোকানের বাবুটিকে আর দেখা গেল না, সম্ভবত ভাত খেতে বাড়ি চলে গেছে, চিন্তা করে রামানন্দ ফুটপাথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল। উঁহু, হ্যারিসন রোডের দিকে না, বউবাজারের দিকে। হ্যারিসন রোডের দিকে শুভেন্দুদের আড্ডা, সেদিকে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। কোনো ফুটপাথেই ছায়া ছিল না। রামানন্দ ঘামছিল। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের মুখে এসে হঠাৎ জগৎ মণ্ডলকে তার মনে পড়ল। কেননা আর একদিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জগৎ মণ্ডলের সঙ্গে রিকশায় চড়ে ঐ বিখ্যাত গলিটার কথা চিন্তা করতে করতে সে বউবাজারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বাস্তবিক, মণ্ডল আফ্রিকা চলে যাচ্ছে, এ যেন ভাবাও যায় না। পরশু নন্দদুলাল ও রেখার মুখে খবরটা শোনার পর থেকে কথাটা মাঝে মাঝেই সে ভাবছে। একদিন তা হলে বুধধু ওস্তাগর লেনে গিয়ে মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে আসতে হয়। নন্দ অবশ্য বলেছে জগতের এই চাকরি হবে না, হতে পারে না। রেখা বলেছে হবেই, জগতবাবুর যেমন মেরিট, আঁকার যেমন হাত এবং দু একদিনের মধ্যেই নাকি খবরটা পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো দরখাস্তের উত্তর ইতিমধ্যে এসেও গেছে। সরকারী মহলে ঘোরাঘুরি করে রেখাও তলে তলে একটু খোঁজখবর নিচ্ছে। তুমি একটু বেশি অপ্‌টিমিস্ট নন্দ ঠাট্টার ভঙ্গিতে রেখাকে বলেছিল, হু, যদি চাকরি হয়েই যায় খুব

জাল কথা, আমরা এই ব্লু-ফক্স জগতকে নিয়ে এসে দারুণ করে একটা ফেয়ারওয়েল দেব—কি বলেন রামানন্দবাবু? রামানন্দ হেসে ঘাড় কাত করেছিল—'নিশ্চয়, দেওয়া উচিত, মানুষটা যখন আমাদের ছেড়ে এত দূরে চলেই যাচ্ছে।'

অক্ষয়কে নিয়ে এই ঝামেলার জন্য রামানন্দ সময় পাচ্ছে না, তাহলেও, মনে মনে সে ঠিক করল, অক্ষয় একটু ভাল থাকলে কাল বা পরশু একবার বন্ধু গুপ্তাগর লোনে যাওয়া যাবে। নন্দ অবশ্য বলছে ব্লু-ফক্সে সকলে একদিন একত্র হয়ে মণ্ডলকে ঘটা করে ফেয়ারওয়েল জানাবে—কাজেকর্মে সেটা আদৌ হবে কিনা তার ঠিক কি। নেশার ঝোঁকে নন্দ কথাটা বলেছিল। নেশার ঝোঁকে বলা কথার কটাই বা আমরা রাখি। হাঁটতে হাঁটতে রামানন্দ বউবাজারের মোড়ে চলে এল।

দু ঘণ্টা এভাবে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে, তাও এই চড়া রোদে দু ঘণ্টা সময় কাটান কি মুখের কথা! ছুঁড়ির চেহারাটা মনে পড়াতে রামানন্দ নতুন করে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। যদি কোনোদিন সে সুযোগ পায়, নবাবের বেটিকে—নবাবের বেটি কি আসল মাজা ঝিয়ের সন্তান কে বলবে, নাম নিয়ে এখন ফুটানি তেকাতেকানি—হুঁ, যদি সুযোগ পায় এমন জব্দ করবে রামানন্দ!

দাঁতে দাঁত ঘষে চুপ করে দাঁড়িয়ে মোটাকে দেখছিল সে। না, এখন কোনো চায়ের দোকানে ঢুকে বিশ্রাম করা যাবে না। সব দোকানেই এক অবস্থা, মাছি ময়লা দূর করতে মেঝেয় জল ঢালা হয়েছে, চেয়ার টুল উল্টে দেওয়া হয়েছে, বরং—

অক্ষয়ের চিন্তার মতন সন্ধ্যার চিন্তাটাও তাকে কম বিব্রত করছিল কি! এখন একটু ফাঁক পাওয়া গেছে। ধর্মতলা ছুটে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। শেয়ালদা-বৈঠকখানার মোড়ে দশ বিশ মিনিট দাঁড়ালেই কলমটা অনায়াসে সে বেচে দিতে পারে। এভাবে হরদম সেখানে ঘড়ি, পেন, টর্চ, ট্রানজিস্টার, হুঁ প্রচুর শার্ট প্যাণ্টের কাপড়ও বেচা কেনা হচ্ছে—রোজ দেখছে সে। লাফিয়ে রামানন্দ শেয়ালদহমুখো একটা ট্রামে উঠে পড়ল। কাল রাত্রির চাঁদের টুকরো ছেলে-মেয়েটার কথা ভেবে মনে মনে সে হাসল। কত সাধ বাছাদের! দামী পেন উপহার পেয়েছে, রামানন্দ সেন খুশি হয়ে নাইয়ের কাপড় চাঁদে করে দিয়ে নতুন করে পদ্য লিখতে লেগে গেছে।

আহ্, পাঁচ টাকা? বাস্তবজ্ঞান বলতে তোমার কিছু নেই, অরণ্যে গিয়ে তোমার বাস করা উচিত। কথাটা কিন্তু কদিনই বলেছিল পূরবী। আমি না থাকলে দুবেলা দু-মুঠো ভাতও জুটবে না তোমার, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইস্কুলে পাঠাচ্ছি, যদি আমি কোথাও চলে যাই, আমার তো মনে হয় চাকরিটাও তুমি রাখতে পারবে না।

কথাটা ফলেছে। খুবই ফলেছে। অবশ্য এই জগতে খারাপ কথাটাই বেশি ফলে। যদি অক্ষয়ের স্ত্রী আর একটু বেশি অ্যাডামেণ্ট হয়ে ওঠে রামানন্দকে স্রেফ রাস্তার কলের জল খেয়ে—

যাক, সেটা কথা না, অক্ষয় সেন্সলেস হয়ে তার কেবিনে পড়ে আছে, হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে সে কী করবে না করবে পরে দেখা যাবে, এখন তো রামানন্দ তার ডিউটি করে যাচ্ছে, এই নিয়ে আজই মাথা গরম করার কোনো মানে হয় না। তবে, হ্যাঁ, পূরবীর চোখ আছে, মানুষ চেনে। রামানন্দকে দারুণ চিনতে পেরেছিল। বাস্তব-বুদ্ধি তার ছিটেফোঁটা নেই, প্র্যাক্টিক্যাল জগত সম্পর্কে কোনোরকম আইডিয়া রামানন্দর নেই। কোথায় পাঁচ, আর কোথায় কিনা কুড়ি—করকরে দুটো দশ টাকার নোট। অবশ্য দশ পনেরো মিনিটেই কাজটা সারতে পারেনি। ঘণ্টাখানেক বৈঠকখানার একটা গলির মুখে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এই সময় আর কলমের খদ্দের কোথায়! কলম কিনিয়ে বাবুরা তো অফিসে অফিসে কলম পিষছে। এখন এই বেলা বারোটা-একটায় সস্তার শাকসব্জি মাছ মাছের কাঁটা কিনতে ফেরিওয়ালা, রিকশাওয়ালা, দোকানের গোমস্তা ও মর্নিং সিফট্-এর কাজ সেরে ঘরমুখো ট্রামবাসের কণ্ডাক্টারের দল বাজারে ভিড় করছে, রামানন্দর হাতের কলমের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। কলমে তাদের দরকার নাই। হতাশ হয়ে চলে আসত সে, এমন সময় পাশের আর একটা গলি থেকে হুট্ করে একটা লোক বেরিয়ে এসে রামানন্দর হাত থেকে কলমটা তুলে নিয়ে নেড়ে দেখল। পরনে একটা জ্যালজেলে লুঙি, গায়ে ময়লা গামছা জড়ান, বাবরি চুল, মুখে ফুটফুট বসন্তের দাগ, খালি খোলা পা—এই লোক কলম কিনবে কি, দর জিজ্ঞেস করতে রামানন্দ অন্যদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিল চল্লিশ—ইচ্ছে করে, মানে লোকটাকে তাড়াবার জন্য সে এই দর হেঁকেছিল। না বাবু সাব, বিলিতি জিনিস হলে হবে কি, নিবটা কমজোরী, কালি টানা স্প্রীংটাও খুব একটা সুবিধের না, তবে কিনা ফ্যান্সী, জিনিসটা ভাল, আমি এই দিতে পারব। অবাক কাণ্ড, রামানন্দ চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে লোকটার মুখের দিকে তাকাতে না তাকাতে ট্যাঁক থেকে দুটো দশ টাকার নোট খুলে সে রামানন্দর হাতে গুঁজে দিল। রামানন্দ একটা শব্দ করতে পারল না। কলমটা নিয়ে মাথার বাবরি নাচাতে নাচাতে লোকটা তক্ষুনি আবার গলির ভিতর অদৃশ্য হল। রামানন্দ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না—চুপ করে কুড়িটা টাকা তার হাতে এসে গেছে। একটু পরেই অবশ্য তার আফশোস হল—আরও বেশি দর চাওয়া উচিত ছিল, খুব দামী কলম যে—এই লোকও কলম [illegible] কিছু করবে না, লেখাপড়া করার লোকই নয়, বিকেলে পড়তে অফিস ফেরতা [illegible]র দল যখন রাস্তায় ভিড় করবে, [illegible] চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় কারো না কারো কাছে জিনিসটা বেচে দেবে, তাই এ[illegible] করে কুড়িটা টাকা ফেলে দিয়ে রামানন্দর হাত থেকে একরকম ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিয়ে গেল।

যাক গে, এই নিয়ে আর ভেবে কাজ নেই, নোট দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে রীতিমত গরম হয়ে উঠল। সন্ধ্যার জন্য আর ভাবনা কি। রয়ে সয়ে খেলে অন্তত তিন চার দিন খুব খেতে পারবে। চোখ তুলে দেখল গীর্জার ঘড়িতে একটা বেজে পনেরো। হাসতে হাসতে রামানন্দ পাশের হালুইকরের দোকানটায় ঢুকে পড়ে বেশ করে কচুরি জিলিপি খেয়ে নিল। ঠাণ্ডা জল খেল। খানিকক্ষণ বসে বিশ্রামও করা হল। মাথার ওপর একটা চকচকে পাখা ঘুরছিল। দেখে রামানন্দ ভাবল, মোহন রেস্টুরেন্টের মোহন পাল এমন পাখা জীবনে দেখেনি।

কাঁটায় কাঁটায় দুটোয় সে হাসপাতালে পৌঁছোল। অক্ষয়ের কেবিনে ঢোকার পথে এবার তাকে বাধা দিল না। কিন্তু ওই কি অক্ষয়! রামানন্দ শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল, চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। এক দৃষ্টে লোহার খাটটার দিকে তাকিয়ে রইল। (ক্রমশ)

॥ ২১ ॥

বনকাটি

গ্রামের নাম 'এগারো মাইল' এ আর শুনিনি। অথচ বোলপুরে রেল স্টেশনের বাইরে বোলপুর-পানাগড় রুটের বাসে সওয়ার হয়ে কন্ডাকটরকে যখন বোঝালাম যে ইলামবাজার ছাড়িয়ে অজয় ব্রীজ পার হবার পর ডান দিকে কিছু দূরের গ্রাম বনকাটিতে যেতে চাই, তখন বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই সে বললে—আপনাকে 'এগারো মাইল'-এ নামতে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বাস-রাস্তায় বোলপুর থেকে 'এগারো মাইল' গিয়েই বুঝি বা যাত্রাবিরতি। কিন্তু ম্যাপ খুলে বুঝলাম এ ধারণা ভুল না হয়ে যায় না, কেননা বোলপুর থেকে বনকাটির দূরত্ব অনেক বেশী। আসলে, পানাগড়-বোলপুর বাস রুটে পানাগড়

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

থেকে এগারো মাইলের মাথায়, রাস্তার পাশে যে খানকয়েক কুঁড়ে ঘর আছে (তাকে গ্রাম বলা যায় কিনা সন্দেহ) তারই লোক-চলতি নাম 'এগারো মাইল'। সেখান থেকে গরুর গাড়ির চাকার রেখা অনুসরণ ক'রে তিন মাইলটাক পশ্চিমে গেলে এদিক-কার বড় গ্রাম অযোধ্যায় পৌঁছনো যায়। বনকাটি অযোধ্যার সংলগ্ন পশ্চিমের গ্রাম। বোলপুর থেকে যাঁরা আসতে চান, তাঁদের ক্ষেত্রে, বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানার উত্তরপ্রান্তবর্তী এ পল্লীতে আসবার এই-ই পথনির্দেশ। কলকাতার দিকের লোকেরা হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল সওয়া ছ'টায় ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে চেপে পৌনে ন'টায় পানাগড়ে এসে নামতে পারেন। তারপরে, বোলপুরগামী বাসে দশটা নাগাদ 'এগারো মাইল'-এ পৌঁছে প্রায় সাড়ে-তিন মাইলের মতো পদযাত্রা শুরু। যাতায়াতে সাত মাইল ও বনকাটি, অযোধ্যা পরিভ্রমণ শেষ ক'রে বিকেল তিনটের মধ্যে বাস-রাস্তায় ফিরে আসা সম্ভব। সেজন্য কলকাতায় ফিরতে রাত আটটার বেশী না হওয়ারই কথা। ভাগ্যবানেরা জীপে বা গাড়িতেও বনকাটি অবধি যান শুনেছি।

'এগারো মাইল'-এর সামান্য উত্তরে বাস চলা-চলের পথের উপর বন-বিভাগের চেক-পোস্ট আছে তার পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখী এক রাস্তা এ গ্রাম অবধি গিয়েছে, সে পথে জীপ যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। গাড়িতে যাওয়াও খুব কষ্টকর নয়।

শীতের এক কনকনে সকালে 'এগারো মাইল'-এ যখন এসে নামলাম, তখন কিছু লোক সে বাস ধরে পানাগড়ের দিকে চলে গেল আর কিছু দেখলাম পথের ধারে বসে আছে বোলপুরের বাসের অপেক্ষায়। বনকাটির কথা জিজ্ঞেস করতেই তারা বলে উঠলে—এই মাঠটুকু পেরোলেই ওই যে দূরের গাছপালা দেখা যাচ্ছে, ওইখানে বনকাটি। আমাদের পোশাক-আশাকে হয়ত বা একটু শহুরে ছাপ থেকে থাকবে। গ্রাম্য জনতার কোলাহল আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি না এই অনুমানে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো চেহারার এক প্রৌঢ় উঠে বসে আর সবাইকে থামালে, আদ্যোপান্ত আমাদের আরজি শুনলে আর একবার, তারপর সেই একই গাছপালার দিকে দেখিয়ে, শহুরে বাবুদের বোঝবার সুবিধার জন্য ভাষাটা

বনকাটির পিতলের রথ
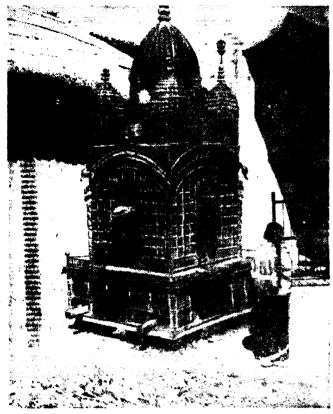
মার্জিত করে বললে—যাত্রা করুন; বনকাটি সাতিশয় সন্নিকট।

এর পরে হয়তো সংস্কৃতে কথা কইতে হবে এই আশংকায় ক্ষণমাত্র দেরী না ক'রে আমরা পা বাড়ালাম। গরুর গাড়ির চাকার দাগের পাশে পাশে পায়েচলা পথ। শূন্য, বন্ধ্যা মাঠজুড়ে এখানে সেখানে কুশ-কাশের ঝোপ। শীতের হাওয়ায় শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে; ধূলোর কুণ্ডলী উঠেছে ছোট ছোট। মাথার উপরে মেঘমুক্ত দিনের প্রসন্ন আকাশ। ... আধ ঘণ্টা পরে মাঠের শেষে গাছপালার কাছে পৌঁছলাম বটে কিন্তু কোন গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই। হনহন করে মেঠো পথ ধরে কিছু লোক আসছিল। তারা বললে সামনের মাঠটি পার হলেই অযোধ্যা, তারপরেই বনকাটি। দ্বিতীয় মাঠের প্রসার আগেরটির থেকে যে বেশ বেশী তা দিগন্তের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল। 'সাতিশয় সন্নিকট' কথাটা তখনো কানে বাজছে। আবার পা চালালাম।

বাকি পথটুকু হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, গ্রাম বাংলার লোকেরা প্রায় সর্বত্রই দূরত্বকে যে এভাবে কম করে দেখান তাতে আমি অন্তত দুঃখিত নই। "উই দেখা যায়", বা "ক্রোশ খানেক হবে" এ জাতীয় নির্দেশ পাবার পর সাত-আট মাইলও হেঁটেছি কোন কোন ক্ষেত্রে। ক্লান্ত হয়েছি নিশ্চয়ই, কিন্তু এই দীর্ঘ পথে কত মনোহর দৃশ্য দেখেছি যা সঠিক দূরত্বটা গোড়ায় জানতে পারলে হয়ত দেখতেই পেতাম না এইজন্য যে পরিশ্রমের ভয়ে সে পথে হয়ত পা-ই বাড়াতাম না। বাংলা দেশের দূরদূরান্তে যা কিছু দেখেছি, তার কিছু অংশের নাগাল পাবার জন্য এহেন ভুল নির্দেশই যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তা কি করে অস্বীকার করি। বনকাটি ভ্রমণও তার এক দৃষ্টান্ত। সে গ্রামের খবরই আমরা জানতাম, সেখানেই আমরা যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু 'সাতিশয় সন্নিকট' হয়ে বনকাটি যদি অযোধ্যার এদিক হত তাহলে অযোধ্যা সম্বন্ধে আমরা তো খোঁজ করতামই না, অন্যেও আমাদের কিছু বলত না। অথচ অযোধ্যায় যে এক সারিতে চারটি বেশ বড় দেউল-মন্দির আছে তা রীতিমত চিত্তাকর্ষক। অন্য দিক দিয়েও এ গ্রামের গুরুত্ব আছে। বারান্তরে সে বিষয়ে হয়তো লিখতে পারি।

সে যাই হোক, বনকাটিতে অবশেষে পেশছলাম এক সময়ে। প্রচুর নকাশি কাজে মণ্ডিত এখানকার পিতলের রথটিই আমাদের দ্রষ্টব্য। সে সৌন্দর্য ভাণ্ডারের খবর আমাদের অনেক আগে পেয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। আর অমনি, বিশ্বভারতী কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এখানে এসে অলংকরণগুলির ড্রইং করে বা ছাপ তুলে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সে সব 'মোটিফ' তাঁকে ও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এহেন নবতর প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখনও দেখা যায় শান্তিনিকেতনের মাটির তৈরী ছাত্রাবাসটির দেওয়ালে যেখানকার একাধিক ভাস্কর্যের আদি নকশা বনকাটির রথ থেকে সংগৃহীত। এ প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত লাঠি-হাতে বুড়োর ছবিটির রেখার সাবলীলতা শিল্পাচার্যকে নিশ্চয়ই এত মুগ্ধ করেছিল যে মাটির ভাস্কর্যের আকারে সেটি স্থান পেয়েছে ওই ছাত্রাবাসের গায়ে।

অথচ কারুকার্যের সমারোহে রত্নপেটিকার সঙ্গে তুলনীয় বনকাটির এই পিতলের রথটিকে জনসাধারণের গোচরে আনবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয়নি। যে সব গবেষণ-অভিমানী ডক্টরেট লাভের বৈষয়িক উদ্দেশ্য বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লাইব্রেরীতে বসেই চর্বিতচর্বন করছেন তাঁদের অধিকাংশের দৃষ্টিও এদিকে, অথবা ব্যাপকভাবে কাঠ বা পিতলের রথ নির্মাণ শিল্পের দিকে এখনও তেমন আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। সেজন্য পাণ্ডিত্যবর্জিত হলেও, বর্তমান সিরিজের লেখাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা হয়ত করা যেতে পারে।

*

রথ বলতে আমরা কাঠের রথই বুঝি। কেননা, পূব ও পশ্চিম বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে যে অসংখ্য রথ দেখা যায় তার অধিকাংশই কাঠের। পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট কাঠের রথ যাঁরা দেখেন নি এমন শহুরে মানুষও হয়ত গুপ্তিপাড়া, চন্দননগর, মাহেশ, দশঘরা বা মহিষাদলের রথের মেলায় গিয়ে থাকবেন সেসব উৎসবের খ্যাতির জন্য বা কেনাকাটার তাগিদে। এগুলিই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রথ এবং এরা সবই কাঠের তৈরী। পিতলের রথও একদা যথেষ্ট নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু যেহেতু সংখ্যায় তারা অনেক কম এবং মেদিনীপুর জেলার রামগড়, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বীরভূম জেলার জয়দেব-কেন্দুলি প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলি আয়তনেও বেশ ছোট, সেজন্য সাধারণের কাছে তারা বিশেষ পরিচিত নয়। দীর্ঘদিন অনুসন্ধানের পর শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকার
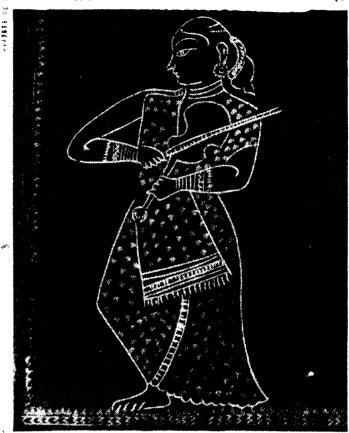
পিতলের পাতের উপর খোদাই নকশা: বেহালাবাদিকা

১৩৭৭ খৃষ্টাব্দের 'বর্ষা সংকলন' সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় পিতলের রথের যে মূল্যবান তালিকাটি প্রকাশ করেছেন তা থেকে দেখা যায় তিনি কলকাতায় দুটি, পুরুলিয়ায় একটি, বর্ধমানে চারটি, বাঁকুড়ায় বারোটি, বীরভূমে নটি, মেদিনীপুরে ছটি, মুর্শিদাবাদে চারটি ও হুগলিতে তিনটি, অর্থাৎ মোট একচল্লিশটি, পিতলের রথের উল্লেখ করেছেন। [উৎসাহী পাঠক শ্রীযুত সাঁতরার এই বহুমূল্য নিবন্ধটি দেখতে পারেন।] এছাড়া আরও কিছু পিতলের রথ যে গ্রামবাংলার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও তাদের মোট সংখ্যা যে কাঠের রথের থেকে অনেক অনেক কম সেকথা বলাই বাহুল্য।

চিরাচরিত কাঠের রথের বদলে পিতলের রথ তৈরি হয়েছে নানা কারণে। প্রতিষ্ঠাতারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছিলেন বড় ভূস্বামী অথবা ধনী বণিক। অর্থব্যয়টা তাঁদের কাছে বড় কথা ছিল না। একই আয়তনের কাঠের

বলরাম : 'টেরাকোটা' সজ্জার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়
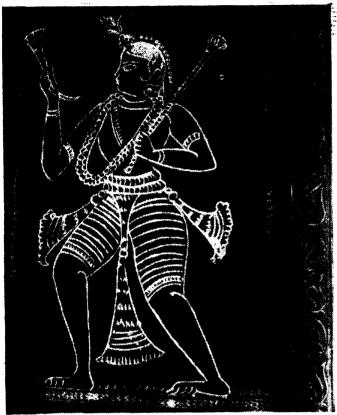
রথের থেকে পিতলের রথের খরচ অনেক বেশী পড়লেও তাঁরা কাঠের ক্ষয়িষ্ণুতা ও পিতলের দীর্ঘ-স্থায়িত্বের কথা বিবেচনা করে এই নতুন সৃষ্টির দিকেই ঝুঁকেছিলেন। 'নতুন' বলছি এই জন্য যে শ্রীযত সাঁতরা ও আমার দেখা যাবতীয় প্রতিষ্ঠা-লিপিসংবলিত পিতলের রথের মধ্যে বনকাটির নিদর্শনটি প্রাচীনতম। এটির নির্মাণকাল ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দ (১৮৩৪-৩৫ খ্রীস্টাব্দ), অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১৩৬-৩৭ বছর আগে। ১০৪ বছর আগে নির্মিত বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যার পিতলের রথটি ছাড়া অন্য কোনটিই ৭৬ বছরের বেশী পুরাতন নয়। তুলনায়, মাহেশের বিখ্যাত কাঠের রথটি খ্রীস্টীয় ষোল শতকের প্রথম দিকে তৈরি বলে অনুমান করবার সংগত কারণ আছে। বারংবার সংস্কারের ফলে, মাহেশের সাবেক রথের একটি কাঠের টুকরোও হয়ত এখন আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রায় সাড়ে চার শ' বছর আগেও বাংলাদেশে যে কাঠের রথ তৈরির রেওয়াজ ও কারিগরি দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল, এ রথটিই তার প্রমাণ।

পিতল ব্যবহারের অর্বাচীন রীতিটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এই নতুন উপাদানে নির্মিত রথগুলি হয় কাঁসা-পিতলের বিখ্যাত কেন্দ্রগুলির কাছাকাছিই তৈরী হয়েছে, নয়ত সেসব কেন্দ্রের কাঁসারী বা কামার সম্প্রদায়ের শিল্পীরা দূরবর্তী স্থানে গিয়ে সেগুলি তৈরী ক'রে দিয়ে এসেছেন। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ কলকাতার কাঁসারীপাড়া; বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে; মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, সৈদাবাদ, লালবাগ ও হুগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পিতলের রথগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের অবস্থান কাঁসা-পিতলের প্রখ্যাত কেন্দ্রগুলি বা তাদের কাছাকাছি। আবার বিভিন্ন রথের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায় যে বিষ্ণুপুরের অদূরের গ্রাম পাতলাপুরের কারিগরেরা একদা দূরবর্তী স্থানে গিয়েও পিতলের রথ তৈরী ক'রে দিয়ে এসেছেন যেমন পুরুলিয়া শহরের চকবাজারে বা বিষ্ণুপুর থেকে ২৫।৩০ মাইল দূরের শ্যামপুরে। কলকাতার আপার চিৎপুর রোডেও একদা এ জাতীয় শিল্পীর বসবাস ছিল, কেননা মেদিনীপুর জেলার হাজিপুর প্রভৃতি স্থানের পিতলের রথে তাঁদের নামোল্লেখ আছে। কাঠ বা পিতলের রথ এখন আর বড় একটা তৈরী হয় না; পুরনোগুলির সংস্কার ক'রেই কোনরকমে কাজ চলছে। এখন অবধি আমরা যেটুকু অনুসন্ধান করতে পেরেছি তা থেকে দেখা যায় ১৩৪৫ সালে নির্মিত হাজিপুরের পিতলের রথটিই প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে, সবচেয়ে আধুনিক। পরবর্তীকালের অন্য কোন দৃষ্টান্ত আমাদের এখনও জানা নেই।

[পাঠক-পাঠিকারা যদি লিপিযুক্ত কোন নিদর্শনের সন্ধান দিতে পারেন তবে কৃতজ্ঞ বোধ করব।] কাঠের রথের তুলনায় পিতলের রথ তৈরীর শিল্পটি সেজন্য শুধু অর্বাচীনই নয়, অল্পায়ুও বটে। কেননা, এখন অবধি 'আবিষ্কৃত' উদাহরণগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে আধুনিক দৃষ্টান্তের ভিতরে সময়ের ব্যবধান মাত্র ১০৪—৫ বছরের। আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষে, একথা হয়ত মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, আনুমানিক দেড় শ' বছর আগে আবির্ভূত হয়ে এই সুকুমার শিল্পটি বছর তিরিশ আগে লুপ্ত হয়েছে।

সময়ের এই ব্যবধানটি লক্ষণীয়। শেষ-মধ্যযুগে বাংলাদেশের 'সূত্রধর'-শিল্পীরা 'কাষ্ঠ, পাষাণ মৃত্তিকা ও চিত্র' এই চারটি মাধ্যমে যে উচ্চাঙ্গের শিল্পচর্চা ক'রে গিয়েছেন, ঠিক এই সময়টিতে তার কিছু অবনতি ঘটলেও পাথরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ছাড়া অন্যগুলি মোটামুটি সজীবই ছিল। সেজন্য কাঠ-খোদাই, পোড়ামাটির মন্দির-অলংকরণ বা পটচিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে পিতলের রথের নকাশি কাজের বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত বলরাম বা বেহালা-বাদিকার ছবি দুটি যে মন্দির-'টেরাকোটা'র সগোত্র তা যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই নজরে পড়বে। আবার লাঠি হাতে বৃদ্ধ বা উপবিষ্ট সুন্দরীর ছবিগুলির সঙ্গে পটচিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের

লাঠি হাতে বৃদ্ধ: পটচিত্রের মতো রেখার সাবলীলতা

কমল
আননকে
কোমল করে
তুলুন...
রূপচর্যার দুর্লভ
তেলের সমন্বয়,—
ল্যাক্মে
কোল্ড ক্রীম দিয়ে
Lakmé
COLD CREAM
ল্যাক্মে
কোল্ড ক্রীম
ASP/L-74

কথা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য 'সূত্রধর' শিল্পীরা যে পিতলের মাধ্যমেও কাজ করেছেন এরকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এ বিষয়ে অকাট্য কোন প্রমাণ নেই। তবে কাঁসারী বা কর্মকার সম্প্রদায়ের কারিগর যাঁরাই এ শিল্পের চর্চা করে থাকুন না কেন সমকালীন 'সূত্রধর'-শিল্পীদের কলাকৌশল যে তাঁদের খুবই প্রভাবিত করেছিল তা সন্দেহাতীত।

লোহার ফ্রেমের উপরে পিতলের পাত বসিয়ে পঞ্চরত্ন বা নবরত্ন মন্দিরের আদলেই এ রথগুলি সাধারণত তৈরী হয়েছে। তপ্ত পিতলের পিণ্ডকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পাতে পরিণত করবার কারিগরি-দক্ষতা আমাদের কাঁসারী বা কর্মকার শিল্পীদের বহু দিনের। উপাদান সংগ্রহের এই দেশী পথটি খোলা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে যে বিদেশী পাতও ব্যবহৃত হয়েছে তার লিপিগত প্রমাণ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যার রথটিতে যার উপকরণ জার্মানী থেকে সংগৃহীত মনে হয়।

দু'জাতীয় নকাশি কাজ হয়েছে পিতলের রথে—চাদরের গায়ে ছেনি দিয়ে রেখাচিত্র খোদাই ক'রে অথবা পিতলের পাতকে ছাঁচে ফেলে উলটো পিঠে হাতুড়ি ঠুকে উঁচু 'মোটিফ'-টির সৃষ্টি ক'রে, যার বিদেশী নাম 'রাপুসে ওআর্ক'। দ্বিতীয় শ্রেণীর অলংকরণের বেশ ভাল নিদর্শন দেখা যায় বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জ পাড়ার রথটিতে। এই পর্যায়ের রথগুলি সম্বন্ধে হয়ত বারান্তরে লিখব। তবে এ জাতীয় নকাশি কাজ সম্পর্কে যাঁরা একটা ধারণা করতে চান তাঁরা আমার লেখা 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' বইটিতে মুদ্রিত মকর-বাহিনী গঙ্গার আলোকচিত্রটি দেখতে পারেন। সহজতর কারিগরির জন্য প্রথম শ্রেণীর সজ্জাই অধিকাংশ পিতলের রথে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার বনকাটি, বাঁকুড়া জেলার হদল-নারায়ণপুর, বীরভূম জেলার জয়দেব-কেন্দুলি প্রভৃতি স্থানের রথগুলি উল্লেখ-যোগ্য। বনকাটির রথটি আকারে মাঝারি, উচ্চতা অনধিক ১৫ ফুট, একতলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, দোতলার ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি। কিন্তু খোদাই কাজের প্রাচুর্য ও সাবলীলতায় এটিই যে এ দলে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহমাত্র নেই। "সন ১২৪১ সাল তাং ২ মাঘ আরম্ভ সন ১২৪২ সাল ১০ আষাঢ় তৈয়ার"—এই প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বোঝা যায় এই বিপুল শিল্পকর্ম প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসে সম্পন্ন হয়েছিল। একাধিক শিল্পী নিযুক্ত হয়ে থাকলেও এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

নকশার নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট ধাতুশিল্পীরা হুবহু মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পীদের কল্পলোকেই শুধু বিচরণ করেননি তাঁদের ও পটুয়া শিল্পীদের অভিজ্ঞতাকেরও অনুসরণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, দশাবতার, সামাজিক মায় ফিরিঙ্গী জীবনচিত্র, শিকার

উপবিষ্ট সুন্দরীঃ পটচিত্রের স্মারক

প্রমোদ ভ্রমণের দৃশ্য এবং অজস্র ফুলকারি নকশা স্থান পেয়েছে বনকাটির রথের গায়ে। খোদাই করার আগে পিতলের পাতের উপর সম্ভবত খড়ি দিয়ে নকশাগুলি এঁকে নেওয়া হত। কেননা, শ্রীতারাপদ সাঁতরার অনুসন্ধান অনুসারে সে সময়ে এ কাজের জন্য 'খড়িপেতো' নামে এক বিশেষ শিল্পি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা যে পোড়া-মাটির মন্দিরসজ্জা ও পটচিত্র অংকণের আঙ্গিকে রীতিমতো অভ্যস্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁদের ও কাঁসারী কর্মকার শিল্পীদের পরিচর্যাপুষ্ট এই সুকুমার কারুকলা সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। পিতলের রথ আর হয়ত তৈরী হবে না বাংলাদেশে। সেজন্য এদের মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট তার দু'চারটি নিদর্শন আমাদের প্রধান সংগ্রহশালাগুলিতে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

(ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

এশিয়ার নারী সমাজের নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান

আমি যখন লিখতে বসেছি তখন বৈঠকের সবেমাত্র শুরু। বিরাট বৈঠক বসেছে। উদ্দেশ্য মহিলা সমাজকে আলোকের পরশ দিয়ে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক উন্নতির অংশীভূত করে তোলা। স্থান ভারতের রাজধানী, নূতন দিল্লি। উদ্যোক্তা WIDF [বা Women's International Democratic Federation এবং National Federation of Indian women.] সহযোগী UNESCO এবং Ind'an National Commission for working with UNESCO. প্রস্তুতি সমিতিতে আছেন ভারতের বহু বড় বড় মহিলা সংস্থা। লম্বা তার নামের তালিকা।

WIDF-এর পত্তন হয় ১৯৪৫ সালে। ৪০টি ইউরোপীয় দেশ এগিয়ে এলেন এক নূতন মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে। আর একটি বিশ্বযুদ্ধ জগতে ঘটতে দেওয়া হবে না—এই ছিল প্রতিজ্ঞা। ১৯৫৩ সালে WIDF ডেনমার্কের কোপেনহাগেন শহরে এক বিশ্বসভার আয়োজন করেন। বিষয় "নারীর অধিকার"। ভারতে সবেমাত্র ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। কিছু মহিলা পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথী হিসাবে ভারতীয় মেয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিল তার পূর্ণতার আশায় সে নূতন দিনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ডেনমার্ক-এর সমাবেশে নারীসমাজের কাছে সেই নূতন দিনেরই ডাক এল। ভারতবর্ষ থেকে ২৬ জন মহিলা প্রতিনিধি গেলেন যেখানে বিশ্বের জননী জায়া জমা হয়েছেন আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায়। অধিকার মানে কর্মের অধিকার, দায়িত্বের অধিকার। শ্রীমতী ইউজিন কটন, মৃদুভাষী কোমল ফরাসী মহিলা বৈজ্ঞানিক তখন WIDF-এর প্রেসিডেন্ট। দেশবিদেশ থেকে নামী নারী

অনুষ্ঠান আরম্ভে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি

নেত্রী সব এসেছেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েত বীরাঙ্গনা মাদাম নিনা পোপোভা, স্পেনের গৃহযুদ্ধের নায়িকা মাদাম ইবরারি, সুইডেনের বিদুষী ডঃ আন্দ্রিয়া আন্দ্রিয়ান প্রভৃতি ছিলেন সমাগত সভার

বাংলাদেশের শ্রীমতী মোতিয়া চৌধুরী ভাষণ দিচ্ছেন

দলে। আন্তর্জাতিক নারীসমাজের সমর্থন সঙ্গে করে ফিরে এলেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা। তাঁরাই আরম্ভ করলেন ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান উইমেন।

উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে বিদেশিনীরা এসেছেন বহু দেশের। তার মধ্যে আছেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভুটান উইমেনস্ অরগানাইজেশন, সিলোন উইমেনস্ ফ্রন্ট, মংগোলিয়ার হুরাল উইমেনস্ কৌন্সিল, মালয়েশিয়ার মহিলা সমিতি ইত্যাদি। এশিয়ার মহিলা সমাজে নিরক্ষরতা অবিশ্বাস্য রকম বেশী। প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা ৩৫৫০,০০০০০। ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা নিবারণ তার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। তাই ১৯৫১ সালে নিরক্ষর ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল ২৮৮,০০০,০০০। এখন ১৯৭১ সালে সে সংখ্যা হয়েছে ৩৮৬,০০০,০০০। জনসংখ্যা বেড়েছে ১৮৬০ লক্ষ আর অক্ষর পরিচয় হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১০২০ লক্ষ। নিরক্ষরতা দূর করায় আর একটি নূতন দিক সবার নজরে এসেছে। নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দেওয়াই যথেষ্ট নয়। দরকার তার অক্ষর জ্ঞানকে কার্যকরী করা। সামান্য আর্থিক উন্নতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে নিরক্ষরতা মোচন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট গিরি বলেন যে, গান্ধীজী মহিলা সমাজে শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন কারণ পুরুষের শিক্ষা একটি মানুষের শিক্ষা। মেয়ের শিক্ষার প্রভাব পায় সমস্ত পরিবার। কারণ, সে মা। সন্তানের শিক্ষার প্রথম সোপান তার হাতে। পরিবারের অবস্থান কেন্দ্র সে। কাজেই সংসারকে সার্থক

করবার সব দায়িত্ব তার।

আইনের চোখে ভারতে নারী পুরুষে ভেদ নেই। শাসনতন্ত্র অথবা সংবিধানে সে সর্বতোভাবে সমান। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশকে সগৌরবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ডাক্তার আছেন, মহিলা আইনজীবী আছেন, বৈজ্ঞানিক আছেন, শিক্ষাব্রতী আছেন—তবু বিরাট এক নারী সমাজ নিরক্ষর, জীবন তাদের দুঃখ ও দৈন্যের অন্ধকারে ভরা। জাতীয় জীবন ও শান্তির প্রতিষ্ঠায় তাদের শিক্ষাও উন্নত হ'লে তবে অগ্রগতির পদক্ষেপ বাধাবহুল থাকবে না।

শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি সেমিনারের প্রস্তুতি সমিতির সভাপতি হিসাবে সমাগত সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, জনগণের শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত মানুষের বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার। বাংলাদেশের প্রতিনিধি মালিকা বেগম এবং শ্রীমতী মোতিয়া চৌধুরীকে তিনি বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। বাংলাদেশের বিপন্ন নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে দুস্তর পথ অতিক্রম করে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের দেশের মানুষ আজ অসহায়, নিরপরাধ বন্দি হয়েছেন। তাই তাঁরা জগতে সহমর্মিতার অধিকারী।

শ্রীমতী মোতিয়া চৌধুরীর মর্মস্পর্শী কথাগুলি অতবড় সভাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভ বাংলাদেশের অদৃষ্টে পরাধীনতার রূপান্তর মাত্র। তাই বাংলার নারী পুরুষ আজ আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমেছে। শিক্ষার প্রবর্তনে সেখানে কি আর আশা করা যায়। ব্রিটিশ শাসনে যে সংখ্যা ছিল শিক্ষিত মানুষের আজ তার সংখ্যা নেমেই এসেছে। ১,০০০ মাইল ব্যবধানের অত্যাচারী অংশ নিজেদের শাসক মনে করে শোষণ চালিয়েছে, আপন মনে করে সংশয় নেয়নি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে শেষ করে ফেলাই ছিল তাদের একান্ত উদ্দেশ্য। সফল না হ'য়ে আজ তারা নির্মম তাণ্ডবের অভিযান চালিয়েছে। স্কুল কলেজের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা হ'য়েছে। জোর করে বাংলার বদলে উর্দুর বোঝা চাপানোর চেষ্টা হ'য়েছে। শতকরা ৫৬ জন বাংলা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে মর্যাদা দিতে তাদের আপত্তি ছিল। গণতন্ত্রবাদের গলা টিপে যখন পাকিস্তানের সামরিক সরকার তার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে গেছে তখন অত্যুৎসাহিনী ধারায় পুষ্ট হ'য়ে মুজিবুরের ভক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব পণ করেছে। কোথায় সেখানে শিক্ষার সুযোগ, কোথায় বা নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস। প্রতিটি গ্রামের বিদ্যালয় এখন পাকসৈন্য শিবির। বাংলার মানুষ মুক্তি সংগ্রামে যদি জয়ী হয়, যদি বেঁচে থাকে তবেই তো অক্ষর চিনবার সময় পাবে। ভারতবর্ষে যে উদ্বাস্তু এসেছে তা' বাদে যারা প্রাণ ভয়ে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রায় কোটি কোটি অসহায় মানুষ।

বাস্তুহারা শিবিরে সামান্য লেখাপড়ার বন্দোবস্ত যা হয়েছে তাতে মন ভরে না। বাংলার মানুষ চায় স্বাধীন দেশের সগৌরব নাগরিকত্ব, মুক্ত আনন্দে শিক্ষার মহড়া। তার জন্য যে কোন ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত।

মোতিয়া চৌধুরী শেষ কথাগুলির সঙ্গে তাকিয়ে দেখলাম সবায়ের চোখ চকচক করে উঠেছে। এদেশের মানুষ বিদেশের অতিথি, ঘরের গৃহিণী, শাসনতন্ত্রের সেরা মানুষ সকলেই সহানুভূতিতে সজল। মোতিয়া চৌধুরী বলছেন, সেই মুক্তির জন্য কি না ঘটেছে। ২৫শে মার্চ ১৯৭১। ছাত্রাবাস জগন্নাথ হল। ঢাকার অসতর্ক রাত্রি। পাকিস্তানের সৈন্যদল ঢুকে ছাত্র দলকে সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে হাঁকলো "আর বলবে জয় বাংলা?" নির্ভীক ছাত্রদল সমস্বরে জবাব দিল "জয় বাংলা!" কণ্ঠ-ধ্বনি অকম্পিত। ভয়ের লেশমাত্র নেই। মেশিনগান চললো। লুটিয়ে পড়লো বীরের দল মাটিতে। সারা বাংলার সাত কোটি মানুষের আত্মা এক হ'য়ে বলছে জয় বাংলা। হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু।

শিক্ষার আলোচনা সভা। মোতিয়া চৌধুরী যেন সেই শিক্ষার মূল ধরে প্রশ্ন তুললেন। আগে জীবন, তবে তো শিক্ষা। আগে মানুষের অধিকার তবে তো অক্ষর জ্ঞান। মনে হ'লো এ প্রশ্নের সমাধান সবচেয়ে বড় শিক্ষাব্রতীও বলতে পারবেন না।

শ্রীমতী

মরুভূমির প্রাণী

হ্যাঁ প্রাণীজগতে ওরা অদ্ভুত সৃষ্টি। জন্ম মুহূর্ত থেকেই প্রতিকূল এক চরম আবহাওয়ার সঙ্গে শুরু ওদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ওদের জৈবিক ধর্ম এবং আচরণের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। মরুভূমির ঐ আদিবাসীদের সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল চিরকালের। তবু বলা চলে, গত দশ বছরে আধুনিক প্রাণী বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ঘটনার দিক থেকে তারা অনেক বেশি চমকপ্রদ, অনেক বেশি অভিনব।

কারণ, শুধু মানুষই নয়, যে কোন প্রাণী এবং উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্যে অন্তত কিছুটা জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন। মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে অভাব এটারই। ফলে বিস্তৃত এবং সুসামঞ্জস্য জীবজগৎ কোন দিনই সেখানে গড়ে উঠতে পারেনি। কোথাও বা শত শত মাইল বালিয়াড়ির উষর প্রান্তর, কোথাও থাকে থাকে সাজান নিষ্প্রাণ পাহাড়ের স্তূপ। অথবা কঠিন শিলীভূত জমাট বরফ। অনিবার্য কারণে ঐ সমস্ত অঞ্চলের আবহাওয়া কোথাও পুরোপুরি, কোথাও বা আংশিকভাবে জলীয় বাষ্পহীন হয়ে পড়েছে।

সূর্যের খর তেজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অ্যারিজোনার মরুভূমিতে লতাপাতার ছায়ার নিচে আশ্রয় নিয়েছে হীরক-চিত্রে র‍্যাটল সাপ। হীরের মত চকচকে অংশ সূর্যের তাপ প্রতিহত করার ব্যাপারেও সাহায্য করে। অত্যন্ত বিষাক্ত এই সাপ সেখানকার মরুভূমিতে আর সমস্ত প্রাণীর কাছে প্রচণ্ড এক বিভীষিকা

এমন পরিবেশে কোন প্রাণীই প্রচলিত অর্থে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম হতে পারে না। বিশেষ করে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে যে সমস্ত মরুভূমি ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের দিকে চাইলে তো একথাই মনে পড়ে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর মোট স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশই মরুভূমি।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, মরুভূমির কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বলা শক্ত। তবে একটি ব্যাপারে সকলেই এক মত, মরুভূমি মুখ্যত বাষ্পহীন পরিবেশ। অবশ্য বাষ্প বলতে এখানে জলীয় বাষ্পের কথাই বলছি। কোন না কোন কারণে পৃথিবীর ভূভাগে যখন নিয়মিত জলীয় বাষ্পের অভাব ঘটে তখন সেই জায়গাটি ক্রমেই শুকনো খটখটে হতে শুরু করে। এবং অবশেষে মরুভূমি বা প্রায়-মরুভূমি অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমনও হতে পারে, আজ যেখানে মরুভূমি, একদিন হয়ত সেখানেও কিছুটা পরিমাণ জল সঞ্চিত অবস্থায় ছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঐ জল পুরোপুরি বাষ্প হয়ে উবে গেছে। আবার কোথাও বা এখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে। প্রখর রৌদ্রে মুহূর্তে সেই বৃষ্টির জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে উবে যায়। মেরু অঞ্চলে দেখা গেছে, এমন কি সাইবেরিয়ার কোন কোন জায়গাতেও, অতিরিক্ত শীতের দরুন সেখানকার জলীয় বাষ্প মুহূর্তে জমাট বেঁধে শক্ত বরফে পরিণত হয়। যার অবশ্যম্ভাবী ফল মরুভূমির সৃষ্টি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ধরুন কোন একটি অঞ্চল সমুদ্র থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে। হয়ত ভূ-ভাগের প্রত্যন্ত প্রদেশে। অথবা ঐ অঞ্চলের এক দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে বিরাট পর্বতমালা। এর ফলে জলবাহী মেঘ সেখানে আর পৌঁছতে পারল না। নিয়মিত বৃষ্টিও হল না। আর এই ভাবেই তৈরি হয়েছে তাকলা মাকান, গোবি এবং মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি। নেভাদা, উটাহ, অ্যারিজোনা এবং কলোরেডোর মরুভূমির
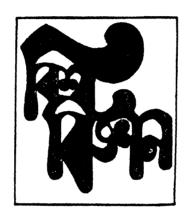
জন্যে দায়ি ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাদা। এর শৃঙ্গমালা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে জলীয় বাষ্প বয়ে আনা বাতাসকে বাধা দিয়ে ঐ সমস্ত অঞ্চলকে বর্ষার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত করেছে। ওই একই কারণে রূপ পেয়েছে আর্জেন্টিনার পশ্চিম অঞ্চলের মরুভূমি। সেখানকার বাধা আন্দেজ পর্বতমালা।

কিন্তু ওদের বাদ দিলে বেশির ভাগ মরুভূমিরই অবস্থান নিরক্ষ রেখার উত্তর এবং দক্ষিণ বরাবর যথাক্রমে পাঁচ থেকে তিরিশ ডিগ্রি অঞ্চল জুড়ে। প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পবহী বাতাস ঐ সমস্ত অঞ্চলে এসে ক্রমে অনেক বেশি ওপরে উঠতে শুরু করে। এবং শেষ পর্যন্ত চলে যায় নিরক্ষ রেখা বরাবর। নিরক্ষ অঞ্চলে এসে ঊর্ধ্বাকাশের এমন জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়, যখন অতিরিক্ত ঠাণ্ডার ফলে ঐ বাষ্প ঘনীভূত হয়। পরে সেখানে বৃষ্টি ঝরায়। এরই নাম পরিচলন পদ্ধতিতে বৃষ্টি। অথচ যে অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে এল সেই জলীয় বাষ্প অর্থাৎ যেখানে বর্ষা নামল তার পেছনের এক বিস্তৃত অঞ্চলে এক বিন্দু বৃষ্টির জন্যে কত হাহাকার। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছে সাহারা, আরব, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ডের

কালাহারি, মেক্সিকোর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সোনারা, দক্ষিণ অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, পেরু এবং চিলের আতাকামা, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমি।

সমুদ্রের ধারেও কিছু কিছু থাকে থাকে মরুভূমি দেখা যায়। এদের উৎপত্তির কারণটি কিছুটা স্বতন্ত্র। দেখা গেছে, মহাসাগরের শীতল স্রোতের উপর দিয়ে যে বাতাস বয়ে যায়, সেই বাতাস সঙ্গে করে নিয়ে আসে ঠাণ্ডা জলীয় বাষ্প। পরে ঐ বাতাস ভূভাগের উষ্ণ অঞ্চলে এসে পড়লে হঠাৎ গরম হতে শুরু করে। গরম হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জলীয় বাষ্প গ্রহণ করার ক্ষমতাও বেড়ে যায়। ফলে ভূ-ভাগের ঐ অঞ্চলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি ঝরার বিশেষ কোন সম্ভাবনাই আর থাকে না। এই ভাবেই তৈরি হয়েছে চিলের উত্তরাঞ্চল এবং পেরুর দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমি। প্রশান্ত মহাসাগরে এদেরই পাশ দিয়ে উত্তর দিকে নিরক্ষ রেখার উদ্দেশে বয়েছে শীতল হামবোল্ট স্রোত।

একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বেশির ভাগ মরুভূমিতেই বছরে গড় বৃষ্টিপাত দশ থেকে পনের ইঞ্চি। তবে কোন কোন অঞ্চলে এই পরিমাণ আরও কমও হতে পারে। যেমন ধরুন, সাহারার বেশিরভাগ অঞ্চল কালাহারি, সোনারা, আতাকামায় গড় বৃষ্টি বছরে পাঁচ ইঞ্চিরও কম। পেরুর লিমায় দুই ইঞ্চি। মিশরের কায়রোতে এর চেয়েও কম। আবার চিলের কালামায় এক নাগাড় তের বছর কোন বৃষ্টিই হয়নি। চিলের ইকুইকি
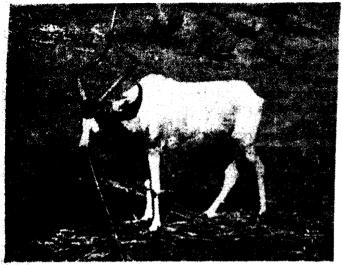
মধ্য সাহারার কৃষ্ণসার হরিণ 'প্যাডেকস' দীর্ঘ দিন জল পান না করেও বেঁচে থাকতে পারে

ভা-এ দেখা গেল পাঁচ বছর কোন বৃষ্টিই নেই। তারপর যেটুকুও বা বর্ষা হল তার পরিমাণ মাত্র ০·৬ ইঞ্চি মাত্র। এবং আরও একটি অসুবিধে এই, সাধারণভাবে ভূ-ভাগের অন্যান্য অঞ্চলে কখন বর্ষা নামবে এটা যেমন আগে থেকেই ছক মেলানোর মত বলে দেওয়া যায়, মরুভূমির ক্ষেত্রে এমন সঠিক ভবিষ্যৎ-বাণী করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বর্ষার ব্যাপারে সেখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত খেয়ালী, অনেক বেশি অনিশ্চিত।

এবং খেয়ালী সেখানকার তাপীয় অবস্থাও। উত্তর ত্রিপোলিতে দেখা গেছে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে দিনের তাপমাত্রা যখন প্রায় ৫১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তখন গভীর রাতে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় শূন্যেরও এক ডিগ্রি নিচে। অর্থাৎ দিন এবং রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান ৫২ ডিগ্রি। মোঙ্গোলিয়ার উরাগা অঞ্চলে জুলাই মাসে তাপমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ১৮ ডিগ্রি সেণ্টি-গ্রেডে। অথচ রাতের তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ২৭ ডিগ্রির মত। সাধারণ কোন প্রাণীর পক্ষে দিন রাতের তাপমাত্রার এত ব্যবধানের মধ্যে বেঁচে থাকা সত্যিই যেন অকল্পনীয় ব্যাপার।

এর পরও আছে ধূলি ঝড়। প্রচণ্ড হাওয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত বালির বর্ষণ। ঝড়ের তোড়ে সামান্য সময়ের মধ্যে বড় বড় বালিয়াড়ির স্তূপে অনেক কষ্ট করে বেঁচে ওঠা গাছপালাদের কবরস্থ করছে, কখনও বা শীতল আবহাওয়া সূঁচ ফোটানর মত গায়ে এসে বিঁধছে। সুজলা এবং সবুজ পরিবেশের প্রাণীর কাছে সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। যেন বিভীষিকা।

*

তবু এত সবের মাঝেও মরুভূমির বুকে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়। বৈপরিত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা সেখানে বাস করে, বেঁচে থাকে। বংশ বৃদ্ধিও করে। প্রয়োজনে দল বেঁধে কখনও তারা ঘুরে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তাদের চাল-

চলন, এমন কি শারীরিক নিয়মকানুনও যথেষ্ট ভিন্ন সুরে বাঁধা। আবার কোন কোন জীব পুরোপুরি মরুভূমিতে বাস না করলেও, মরুভূমির পরিবেশে খাপখেয়ে চলার ক্ষমতা অপরিসীম।
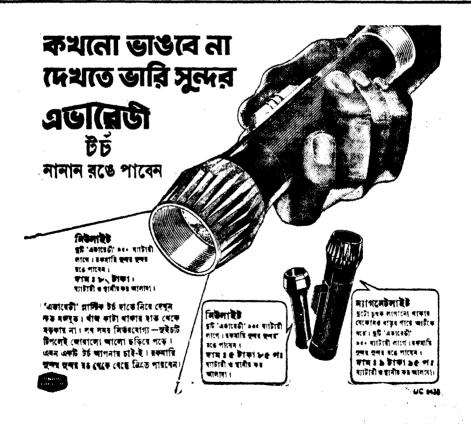
উটের কথাই ধরা যাক। উট প্রাণী জগতে 'ম্যামালিয়ান' বা স্তন্যপায়ী গোষ্ঠির মধ্যে পড়লেও সাধারণ স্তন্যপায়ীর চেয়ে তার শারীর-বৃত্তীয় কলাকৌশল বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। উট কখনই চায় না ঘামের মধ্যে দিয়ে তার শরীরের সঞ্চিত জল অহেতুক কমে যাক। পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে তার নিজের শরীরের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। দেখা গেছে সকালের দিকে কোন উটের দৈহিক তাপমাত্রা যখন ৩৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, বিকেলে সেই তাপমাত্রা উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৭ ডিগ্রিতে। সাধারণ স্তন্যপায়ী প্রাণীর পক্ষে নিজের দেহের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় এতটা তাপমাত্রার ব্যবধান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আপনার নিজের কথাই ভাবুন। সুস্থ অবস্থায় আপনার দেহের তাপমাত্রা সাতানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটের কিছু বেশি। যতই রোদে ঘোরাঘুরি করুন, ঐ তাপমাত্রা বড় জোর আধ ডিগ্রির মত বেড়ে যেতে পারে। তার বেশি নয়। কিন্তু উট দেখুন নিজের শরীরের তাপমাত্রা প্রায় ৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত বাড়িয়ে তুলল। তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির ফলে ঘামও কম হয়। এ ছাড়াও, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার পরিবেশের উচ্চতর তাপমাত্রার সংগে তার নিজস্ব তাপমাত্রার পার্থক্য কমে আসে। ফলে বাইরের অতিরিক্ত তাপ অনেক কম পরিমাণে তার দেহে প্রবেশ করতে পারে। এবং তখন ঐ তাপের হাত থেকে শরীর ঠান্ডা রাখার জন্যে ঘামের সংগে প্রচুর জল বের হয়। বাষ্পের উচ্চতর তাপমাত্রায় ঘামের জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। কারণ, অনেকেই হয়ত জানেন, তাপমাত্রার পার্থক্য যত বাড়ে, তাপশক্তির চলাচলও সেই হারে বেড়ে যায়। অথচ পার্থক্যটা কম হলে উত্তাপের আদান প্রদান কম হয়। অতএব নিজের শরীরকে অতিরিক্ত তাপের হাত থেকে বাঁচানর জন্যে উটকে তার নিজের শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বের করে দিতে হয় না।

সম্প্রতি জে ডি ফিনডলে দেখিয়েছেন ষাঁড়, মোষ, ভেড়া, শুয়োর, গাধা এবং ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুও অবশ্য দৈহিক তাপমাত্রা কমাতে বাড়াতে পারে। তবে এদের কেউই উটের মত অত বেশি ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে না। ভেড়ার ক্ষমতা এ ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি সীমিত। দৈনিক এবং ঋতু বিশেষে বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তন কালো জলহস্তী, মোষ, কালো হরিণের দেহেও তাপমাত্রার পরিবর্তন

সাময়িক বর্ষায় মরুভূমিতে মাঝে মাঝে এই ধরনের ছোট ছোট জলাশয়ও সৃষ্টি হয়। সুদানে একে বলা হয় হাফির। বিশুষ্ক মরুসমুদ্রে তৃষ্ণার্ত উটের কাছে এরা এক একটি ওয়েসিসের মত

আনে। বিশেষ করে কালো হরিণ অনায়াসে দৈহিক তাপমাত্রা অনেকটা বাড়াতে পারে এবং না ঘেমে। ফলে তার শরীরে সঞ্চিত জলের পরিমাণ হ্রাস পায় না। সি আর টেইলর এবং সি পি লাইম্যান এই সমস্ত উত্তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে এরা রসাল ফলমূল খায়। ঐ ধরনের খাবার থেকেই বেশ কয়েক লিটার জল সংগ্রহ করে তারা প্রয়োজনীয় খাবারের সন্ধানে অনেকটা দূরত্ব পর্যন্ত চলাফেরা করতে পারে।

দেখা গেছে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বেশীর

ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে অনেক কম চর্বি জমে। এর ফলে সহজেই তাদের দেহ বিকিরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত তাপ ত্যাগ করতে পারে। উটের শরীরে চর্বি জমে তার কুঁজের মধ্যে। ষাঁড়ের বেলাতেও একই ব্যাপার। মরুভূমির ভেড়ায় চর্বি জমে লেজে। গায়ের পুরু লোমও সরাসরি সূর্যের তীব্র রশ্মি অথবা রাত্রিকালীন শীতের হাত থেকে প্রাণীদের রক্ষা করে। কারণ লোম তাপের ব্যাপারে কুপরিবাহী। তবে পুরু লোমের ঐ চাদরের মধ্যে প্রয়োজন মত যাতে হাওয়াবাতাস খেলতে পারে সেটাও দেখতে হবে। নইলে, গাত্র ত্বকের উপর জমে থাকা ঘামের পক্ষে বাষ্পীভূত হতে সময় লাগবে। প্রাণী বিজ্ঞানীদের ধারণা গায়ের ঘাম বিতাড়ন অথবা কী ভাবে মরুভূমির প্রাণীদের দেহে ঘামের মাত্রা কম হয় সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা গেলে দৈহিক বিবর্তনের মূল্যবান কিছু আভাস পাওয়া যাবে। ও'দের ধারণা লোমহীন ত্বকের থেকে লোমশ ত্বকের পক্ষে ঘাম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।

টি কে ডাওসন লক্ষ করেছেন, যে সমস্ত ক্যাঙারু মরুভূমিতে বাস করে

নিজেদের শরীরের তাপীয় অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে তারা হাঁপাতে থাকে। গ্রীষ্মের দুপুরে কুকুর যেমন জিভ বের করে হাঁপায়, কতকটা সেই রকম। ঐ সময় ক্যাঙারুর শরীর ঘামে কম। তবে পার্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত ক্যাঙারু বাস করে তাদের চেয়ে লাল ক্যাঙারুরা ঘামে বেশি। দিনে অনেক সময় রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তারা বড় বড় পাথরের আড়ালে বা গিরিগহ্বরে আশ্রয় নেয়। সেখানকার আর্দ্রতা স্বভাবতই বেশি থাকায় তাই তারা ঘামেও বেশি।

ছোট ধরনের কৃষ্ণসার হরিণ, যেমন ধরুন ডরকাস নামে বারশিঙা হরিণ। নিজেদের শরীরের তাপীয় অবস্থা পরিবর্তন করাটা এদের কাছে কিন্তু বড় রকমের সমস্যা। কেন কোন মরুভূমি অঞ্চলে জল পান না করেও এরা হয়ত কিছুকাল চালাতে পারে। তবে সাহারায় সম্ভব নয়। মরুভূমিতে চলা ফেরা করার সময় সুযোগ পেলেই এরা ছায়ার আশ্রয়ে বিশ্রাম করে। বাবলা গাছের পাতা চিবিয়ে খায়, যাতে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ জল থাকে। তারপর দীর্ঘপথ ছুটে চলে অসম্পন্ন জলের উৎস সন্ধানে। উটের মত অত গরম এবং অত্যন্ত শুকনো হাওয়ার তোড় এরা সহ্য করতে পারে না।

আরও একটি চমকপ্রদ ব্যাপার লক্ষ করুন। মানুষের বেলায় দেখা গেছে, বাইরের তাপমাত্রা যদি অস্বাভাবিক বেশি হয় এবং সেই সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়, তার শরীরের সঞ্চিত জল দ্রুত কমে যেতে থাকে। ক্রমে তার রক্তের তারল্য হ্রাস পায়। জলের পরিমাণ কমতে কমতে শরীরের ওজন যখন শতকরা সতের থেকে কুড়ি ভাগ কমে যায়, তখন মেটাবলিক হিট বা বিপাকীয় উত্তাপ রক্তের পক্ষে বয়ে নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব হয় না। কারণ থক থকে রক্তের পক্ষে দ্রুত আনাগোনা কার শক্ত। যার অবশ্যম্ভাবী ফল মৃত্যু। লু লাগার দরুন এইভাবেই অনেকে মারা যান। কিন্তু উটের বেলায় এমন কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না। তার শারীর বৃত্তীয় গঠন এমনই, ওই ধরনের কোন পরিস্থিতিতে প্রথমে তার কোষকলা থেকে জলের পরিমাণ কমতে থাকে। অথচ রক্তের পরিমাণ হ্রাস পায় না। রক্ত প্রায় স্বাভাবিক তরল অবস্থাতেই থাকে। এ ছাড়া জলের প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দিলে প্রস্রাব এবং মলের মধ্যে দিয়ে অতিরিক্ত জল যাতে না বেরিয়ে যায় এ ব্যাপারেও তার শারীরিক যন্ত্রপাতি লক্ষ রাখে।

মরুভূমির চরম অবহাওয়ায় আরও একটি প্রাণীর সংগ্রাম করার ক্ষমতা রীতিমত উল্লেখ যোগ্য। এরা উট পাখি। প্রয়োজনের শতকরা কুড়িভাগ সমুদ্রের জল
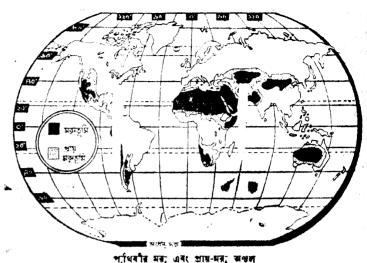
পৃথিবীর মরু এবং প্রায়-মরু অঞ্চল

খেয়ে এরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। ওই জলে দ্রবীভূত অতিরিক্ত লবণ ওরা নাকের কাছে এক ধরনের গ্রান্থির মাধ্যমে বের করে দেয়। বাইরের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বৃদ্ধি পায়। এরা দ্রুত দৌড়তে পারে। এবং ওই সময় ঘামের ভেতর দিয়ে শরীরের ওজনের শতকরা পঁচিশ ভাগ জল বের হয়ে গেলেও অনায়াসে তা করতে পারে। আবার সুযোগ পেলে একবারে জল পান করেই সেটা মিটিয়েও নিতে পারে। এদিক দিয়ে উটের সঙ্গে উটপাখির মিল অনেক বেশি। এ ছাড়াও মরুভূমিতে বাস করে নানা রকমের ছোট ছোট পাখি। এদের দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা বেশি। প্রস্রাব অত্যন্ত ঘন। প্রস্রাবে অদ্রাব্য ইউরিক অ্যাসিডের ফেনাসও মিশে থাকে। সাধারণ প্রাণীর চেয়ে পাখিরা শরীরে এমনিতেই ঘাম হয় বেশি। অতএব ওই সমস্ত পাখির বেঁচে থাকার জন্যে দরকার রসাল ফলমূল অথবা দৈনিক অন্তত কিছুটা পরিমাণ জল। মরুভূমির কোন কোন ম্যামালের থাইরয়েড গ্র্যান্ড বদলে গেলে অকেজোই থেকে যায়।

অতিরিক্ত উত্তাপের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে সরীসৃপেরা কখনও-বা ছায়ায় আশ্রয় নেয়, কখনও নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে শরীরের বেশির ভাগ অংশ সূর্যের আড়ালে রাখে অথবা এমন কোন বস্তুর গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় যার ফলে তার শরীরের তাপ ওই বস্তুটি সহজে শুষে নিতে পারে। কুকুরের মত হাঁপিয়ে হাঁপিয়েও কখনও এরা নিজেদের শরীর ঠাণ্ডা রেখে শরীরেরই সঞ্চিত জল বাষ্পীভূত করে। কখনও বা এদের বেশ কিছুটা তাপ প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রতিহত করে।

সাহারার মরুভূমিতে এক ধরনের কচ্ছপ দেখা যায় যারা অতিরিক্ত উত্তাপের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে মুখ থেকে লালা বের করে নিজেদের মাথা গলা এবং পা ভিজিয়ে নেয়। উত্তর আমেরিকার মরুভূমি অঞ্চলে আর এক ধরনের কাছিম ঐ একই উদ্দেশে শুধু লালাই ব্যবহার করে না, পেছনের পা দুটিও প্রস্রাবের সাহায্যে ভিজিয়ে নেয়।

উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে মরুভূমিতে বাস খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ এদের ডিম পাড়ার জন্যে জলাশয় চাই। যার সেখানে একান্তই অভাব তবু কিছু কিছু উভচর প্রাণীও সেখানে বাস করে। আর আছে নানা রকমের কীট পতঙ্গ, বিশেষ ধরনের, বিশেষ ধাঁচের। এমন কি সেখানে শামুকেরও দেখা পাওয়া সম্ভব। যখন স্বল্পকালীন বৃষ্টি ঝরে, আশপাশে কিছু কিছু খাদ্যেরও প্রাচুর্য দেখা দেয় ঠিক তখন ঐ সমস্ত শামুক একে একে বহির্গত হয়ে পড়ে। সীমিত সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব ওরা খেয়ে নেয়। তারপর আবার

চলে দীর্ঘকালীন বিশ্রাম। বছরের অবশিষ্ট সময় ঐ ভাবেই তারা কাটিয়ে দেয়। তখন অতিরিক্ত উত্তাপ তারা উপেক্ষা করতে পারে, অক্সিজেনেরও প্রয়োজন হয় খুব কম। শরীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে জলের ব্যবহারও দারুণভাবে হ্রাস পায়। এত বেশি হ্রাস পায় যে, পর পর কয়েক বছর এক ফোটা জল না খেয়ে তারা বেঁচে থাকতে পারে।

আর এমনি করেই চলে পৃথিবীর মরু-দেশের নীরব সভ্যতা। সেখানকার বৈচিত্র্য-হীন প্রাকৃতিক পরিবেশের যারা অধিবাসী গতানুগতিকতা তাদের জীবনে বেদ মন্ত্র। বিবর্তনের গতি সেখানে শ্লথ, প্রাচীনতম পৃথিবীর জৈবিক মৌলিকত্ব আজও অনেকখানি সেখানে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থেকে গেছে। সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাণীজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমিত। ঠিক মত অনুসন্ধান চালালে মরুভূমির প্রাণী আধুনিক শারীর বৃত্তীয় সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট যে সাহায্য করবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সমরজিৎ কর

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ ৩৬ ॥

অনেকদিনের পরে আবার এক সকালে জনাব সাহেবের স্লিপারের ধুলো পড়ল আমার দোরগোড়ায়।

আরেক পাটি স্লিপার তখন আমার ঘরেই—আমার বিছানায় বিলম্বিত। স্বয়ং আমিই।

পরিপাটি ঘুম দিচ্ছিলাম কিন্তু দ্বারদেশে তিনি এসে দাঁড়াতেই ঘুম ভেঙে গেছে আমার।

কোনো আবির্ভাব ঘটলে অবচেতনায় কেমন করে যেন টের পাওয়া যায়। চটকা ভেঙে যায় চট্ করে।

তাকিয়ে দেখি তিনি আমার দরজার কড়া দুটি নেড়ে চেড়ে দেখছেন। নিঃশব্দে।

'কী দেখছেন? জানান দেবার জন্য এখানে কড়া নাড়ার কোনো কড়ার নেই, কড়াকড়ি নাস্তি।' আমি জানালাম : অহোরাত্র আমার অবারিত দ্বার।'

'দরজা খুলেই ঘুমান? কিছু চুরিচামারি যায় যদি? তাছাড়া...তাছাড়া যেমন দিনকাল...কোনো ভয় করে না আপনার?'

'ভয় কিসের? চোর ডাকাত ঘাতক কি পকেটমারের দুর্ভাবনা আমার নেই। প্রথমত, আমার প্রাণের কোনো দাম আছে আমি ভাবি না—কারই বা প্রাণের দাম রয়েছে একালে? তাছাড়া চোরের ভয় করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার ঘরের এই পুঞ্জীভূত জঞ্জাল ইনক্লুডিং নেংটি ইঁদুর আর কাঁকড়া-বিছেদের নিতে আসবে কে? এবং আমার পকেট ফুটো। এক পয়সাও নেই সেখানে। কখনো থাকে না। তাহলে?'

'এত এত টাকা উপায় করেন যে...?'

'এত এত?' আমার চোখ বুঝি টাকার মতই গোলাকার হয়।

'এত এত না হলেও কিছু কিছু তো বটে। সেসব যায় কোথায়?'

'কে জানে! দু পয়সা উপায় না হতেই কী করে যে তারা উপে যায় দেখতে না দেখতেই—সেইটেই একটা রহস্য আমার কাছে। কখনই আমি তা ভেদ করতে পারিনি মশাই। জলের মত খরচ করলেও

দুপাক মুচড়েই ভেঙে ফেলল কড়াটাকে

তো চোখে পড়ত, হয়ত তা হাওয়া হয়ে যায় বলেই দেখতে পাই না।...সে কথা যাক, আপনি আমার দরজার ওপর অমন কড়া নজর দিচ্ছিলেন কেন?'

'কড়া দুটো দেখছিলাম। একটা লোহার একটা পেতলের—দরজায় দুটো পাল্লার দুরকম কড়া—অদ্ভুত না? এরকম তো দেখা যায় না কোথাও।...এমনটা কেন বলুন তো?'

'কড়া পাল্লায় পড়েছিল বোধ হয় একবার। সেইজন্যই।' আমি কই।

'কী বললেন? কার পাল্লায়?'

'কোনো সোনালি হাতের ছোঁয়া লেগে একটা কড় হয়ত স্বর্ণময় হয়ে গিয়েছে। এই ঘরের দ্বার ভেঙে নয়, ঐ কড়া ভেঙেই ঢুকেছিল একবার—একটি মেয়ে! তার স্মৃতিটা অক্ষয় করে রাখতেই ভাঙা কড়াটার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারে অন্য রকমের লাগিয়েছি। অন্য কড়াটা সাবেক, তাই কালো ভুত, আর নয়া আমদানি ঐ সোনা সোনা! কি রকম কৃষ্ণ রাধিকার মিলন রহস্যের ইঙ্গিতবহ—তাই না?'

'আপনার জীবনেও আদিরস এসেছিল তাহলে একদিন?'

'কার না আসে? অনাদি কাল থেকেই আসছে সবার জীবনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই—আমার বেলাও তার অন্যথা হতে পারে না। তবে আমারই আদিম রস সেই আদ্যিকালেই ফুরিয়ে গেছে—ছেলেখেলা যত সেই ছেলেবেলাতেই খতম্। তারপরই সব বিলকুল তামাদি।'

'আপনার ঐ কড়া কথাটা শুনতে চাই মশাই!'

'কথাটা কী আর! চাবি হারিয়ে গেছল, ঘর ঢুকতে পারছিলাম না। রাত বারোটা বাজিয়ে বাসায় ফিরেছি, সব নিশুতি। এদিকে আমার ফুরফুরে পাতলা সিল্কের জামা ফুটো হয়ে ঘরের চাবি গলে রাস্তায় পড়ে গেছে কোথায়। এই রাত দুপুরে কি করি, কোথায় যাই, চাবিওয়ালা কোথায় পাই, এমন সময় মেয়েটা এসে হাজির! দুপাক মুচড়েই ভেঙে ফেলল কড়াটাকে। কব্জির জোর ছিল তার। বস্তির মেয়ে তো।'

'বস্তির মেয়ে!'

'শ্রাবস্তির মেয়ে কোথায় পাব! আমি যখন এ পাড়ায় প্রথম আসি তখন এর চারধারেই বস্তি ছিল। কোকেনের কারবার হত গলির ঐ কোণটায়......চোর ছ্যাঁচোর গুণ্ডা বদমায়েস কিলবিল করত চারধারে।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনার কোনো বোন টোন হবে বুঝি! বিনি টিনি! ইতু টিতু! তা নয়, বস্তির মেয়ে!' হতাশার সুর ধ্বনিত হয় তাঁর গলায়।

ইতু টিতুর দেখা পাইনি তখনো... তখনো তারা জন্মায়নি। না, বিনিও না। আকৃতিতে হলেও আমার বোনদের মত প্রকৃতিই ছিল না মেয়েটার। অন্য প্রকৃতির— একটু বন্য প্রকৃতির। তা ঈষৎ বন্যরূপ হলেও, আমার বোনদের সঙ্গে এক জায়গায় ভারী মিল ছিল তার। শুধু তার কেন, তার মতই প্রায় আমার সব বন্ধুরই—কী ছেলে কী মেয়ে! সেটা তাদের ঐ লাবণ্যরূপ।'

'তার কথা বলুন।' কথাটায় আমায় পাকড়াবার জন তিনি উন্মুখ।

'তার কথা কী শুনবেন। সে কি একটা কথা হলো!' সেটা কোনো কথাই নয়। শোনবার মত কোনো কথা না—শোনাবার মতও নয়।' এক কথায় উড়িয়ে দিই কথাটা।

দেয়াল জুড়ে এসব কী লিখে রেখেছেন মশাই?

ততক্ষণে তিনি আমার দেয়াললিখন দেখতে লেগেছেন।

'দেয়াল জুড়ে এসব কী লিখে রেখেছেন মশাই? হিসেব পত্তর নাকি?'

'বেহিসেবী লোকের আবার কিসের হিসেব? নাম ঠিকানা যত।'

'কাদের নাম ঠিকানা?'

বোনদের—বন্ধুদের। বোনদের বন্ধু—বন্ধুদের বোন—এইসব। আবার কার?'

'দেয়ালে লেখা কেন? খাতায় লিখে রাখলেই হয় ত!'

'খাতা যে হারিয়ে যায়। খাতায় যেমন আমার হিসেব থাকে না তেমনি খাতারও কোনো হিসেব থাকে না যে!—কোনটা যে কোথায় যায় টেরই পাই না। দরকারের সময় পাওয়া যায় না। আবার কখন হয়ত বিনা প্রয়োজনে আপনার থেকেই আত্মপ্রকাশ করে বসেছে।'

'তাই দেয়ালে দেয়ালে লিখে রেখেছেন?'

'ঠিক তাই। দেয়াল কখনো হারায় না—নেহাৎ যদি ভূমিকম্প না হয়। অশোকের শিলালিপির রহস্য এইখানেই। ভূর্জপত্রে না লিখে রেখে প্রস্তরগাত্রে খোদাই! খোদার বানানো পাহাড় ভূমিকম্পেও যাবার নয়, তার ওপর খোদকারি চিরদিনের জনাই অটুট।'

'তাই দেখছি। আপনার এগুলোও হুবহু প্রায় তাই—অশোকের শিলালিপির মতই...কিছুতেই কোনো পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না। কিন্তু আশ্চর্য বোনেদের নাম ঠিকানাও আপনার মনে থাকে না—লিখে রাখতে হয়, এই ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি আরো।'

'বোনেদের মনে থাকে ঠিকই, কিন্তু তাদের ঠিক ঠিকানা থাকে কি?' আমি কই, তাঁর কথাটায় আমিও কিছু কম অবাক হই না—'বিয়ের পরে পদবীর সঙ্গে তাদের ঠিকানাও কি পালটে যায় না? বিয়ের পর সব মেয়েই ত পর হয়ে যায়—তা বোনই কি আর বন্ধুই কি!'

তার পরেই আমার পুনশ্চ অনুযোগ: 'বিয়ের আগে পরী, বিয়ে হলেই পর!'

'তাহলেও, যত পরই হয়ে থাক, চিঠি লেখালেখির সম্পর্কটা রাখেই। আর তাদের চিঠিতেই তো ঠিকানা থাকে!'

'থাকে নাকি! সেই প্রথম চিঠিতেই থাকে যা, তার পরে আর না। তারা তাদের মতন তাদের ঠিকানাটাও আমি স্মৃতিপটে চিরদিনের মত অঙ্কিত করে রেখেছি! কিন্তু স্মৃতি শক্তিতে আমি একেবারেই পটীয়স নই; আমার স্মৃতিপট হচ্ছে আসলে সেই যবনিকাই। যে-পটক্ষেপের পরে আর উত্তোলন করা যায় না।'

'তাহলেও ভায়ের বাড়ি বোনের যাতায়াত থাকেই।...।'

'কই আর থাকে! দু একজন বাদে সব বোনই ত প্রায় হারিয়ে যায়—চিরকালের মতই। সহোদরা হলে তেমনটা হয় না অবশ্যি। তারাই যাতায়াতটা বজায় রাখে। কিন্তু তা না হলে শুধু সহৃদয়া কজন মাত্র
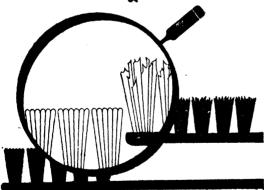
হয় যদি? তাহলে? হৃদয় একবার হারালে যেমন আর ফিরে পাওয়া যায় না, সহৃদয়াদের বেলাতেও তাই। সে সব বোন তখন অরণ্য হয়ে যায়। তাদের সংসার অরণ্যে হারিয়ে আরো গভীর হয়ে রীতিমতই শ্বাপদসংকুল তখন। সেই অরণ্যে রোদন করতে কে যাবে?

'বোনদের ব্যাপার থাক্, তাদের ত সব ওপর ওপর, গভীর কিছু নয়। আপনি এই বস্তির মেয়েটির কথা বলুন...তার সঙ্গে কতদূরে গড়িয়েছিল শুনি...অবশ্যি যদি আপনার তেমন আপত্তি না থাকে।

'না আপত্তি কী, তবে কথাটা এই' আমি তাঁর গভীর কথায় কান দিতে যাই না, নিজের কথার ভিড়েই থাকতে চাই— 'জীবনের সবরকম সম্পর্কই ত মৌলিকতা : যৌনিক। সব সঙ্গই তো সংগম—কার্যত তেমন গভীরতার গর্ভে না গেলেও আসলে ঠিক তাই নয় কি? এমন কি, নিছক আদর করার মধ্যেও সেই আসঙ্গলিপসাই।'

'ঠিক তাই কি? অবশ্যি ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতরা সেই রকমটাই বলেছেন বটে!' তবুও যেন তাঁর দ্বিধা থেকে যায়।

'জীবনের মূলরস তাই হলেও তার ওপরেও আরো সাফল্য আরো প্রফুল্লতা

থাকে—থাকে না? মূলের গর্ত থেকেই তো ফুল ফোটে—ফল ধরে—জীবনের ডালপালায় সৌরভাহূত পাখিরা মৌমাছিরা এসে জোটে কিন্তু তাহলেও, মূলতঃ সেক্সই অস্তিত্বের আদি রস হলেও এবং দুনিয়ার সবাই সেই রসে বশে থাকলেও—এমনকি তিনিও নাকি ওই রসের ওপর বৈসে রইলেও—উপনিষদে তাঁকে রসো বৈ সঃ বলেছে না?—সেই আদি রস অনাদি অনন্ত অফুরন্ত ইত্যাদি হয়েও তাই কিছু জীবনের আদ্যন্ত নয়। বৃন্দাবনের পরও কুরুক্ষেত্র থেকে যায়। এমন কি থোড়া বহুৎ ঐ মথুরাও থাকে! শিবের লিঙ্গপ্রতায় আর কৃষ্ণের রাস পঞ্চাধ্যায় বাদেও জীবনের অনেক প্রত্যয় অনেক প্রকাশ থেকে যায়। আদিম রস ছাড়াও আরও নানা রস রয়েছে। এই জীবনে, যা নাকি অকৃত্রিম। এমন কি ওই কসের মধ্যেও রস রয়ে গেছে—কটুতিক্ত কষায়ের মধ্যেও রসায়ন। কদর্যের ভেতরেও সৌন্দর্য। আদি রসকে ছাপিয়ে উঠে ছাড়িয়ে গিয়েই যত রূপারূপে আর শিল্পরূপে— রসোত্তীর্ণ হয়েই না! আদ্যিকালের থেকে জীবনও, মহাশূন্যের মতই, ক্রমেই আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে নাকি? সব হবার পরেও আরও কিছু বাকী থাকে। জীবনের সবখানে সেক্স থাকলেও সেক্সই কিছু জীবনের সবখানি নয়।'

আমি হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই তাঁর মারেক লাফ।

'যথা?' তিনি আরো বিশদের পক্ষপাতী: 'দৃষ্টান্ত স্বরূপ?'

'জীবনটা যেন সাতমহলা বাড়ি—তার সবটাই কিছু বাথরুম হয় না। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বিরাট প্রাসাদের মধ্যে তার জন্যেও একটুখানি আলাদা করা থাকে বটে। কিন্তু সেইটাই তার সর্বস্ব নয়। বিধাতার প্রসাদে কারো যদি এই প্রাসাদে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয় সে কি শুধু সেই বাথরুমেই বসে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেবে তার? সে কি তার ঘরে ঘরে ঘুরে—ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখবে না? তার রঙমহল রূপমহল শীষমহল নাটমহল... মহলে মহলে টহল দিয়ে নিজের কৌতূহল মেটাবে না? এমনকি যেখানে গেলে সে রাজতুল্যই তার সেই রাজমহলে গিয়েও নিজের সিংহাসন দখল করবে না সে?...তা না হলে তার জীবনজোড়া অভিজ্ঞতার মালাই বা গাঁথা হবে কি করে? হাটের সব সওদা না সংগ্রহ করলে তার এই জবরাত্রার পালাই যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমার আবোল তাবোলের থেকে কী বোঝেন তিনিই জানেন। জনাব সাহেব আপন মনে ঘাড় নাড়েন তাঁর—কোনো উচ্চ-বাচ্য করেন না আর। আমার বোঝা তাঁর

ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমি যেন কিছু হালকা হতে পারি।

'মহৎ উপন্যাস যেমন ধারা, আমাদের জীবন বিন্যাসেও প্রায় তেমনটাই দেখা যায় না কি? মহৎস্রষ্টা তাঁর উপন্যাসের পাঠককে সামনের সিংহদ্বার দিয়ে না নিয়ে হয়ত বা পিছনের, মেহতরদের যাতায়াতের খিড়কি-দোর দিয়েই ঢোকাতে পারেন কিন্তু নিশ্চয় তাকে সেইখানেই বসিয়ে রাখেন না সব সময়? জগৎস্রষ্টা কোনো মহান লেখকের চেয়ে কম যান না—একথাটা মানবেন অবশ্য?

...জগন্মাতাও তাঁর ছেলেমেয়েদের নিজের সব কক্ষেই নিয়ে যান, ভালো মন্দ সবরকমই দেখান, চেখান—সবার প্রতি তাঁর সমান পক্ষপাত। আমার বেলাও তার কোনো অন্যথা হয়নি। লক্ষ্যপথ কী জানিনে কিন্তু সব কক্ষপথেই ঘুরতে হয়েছে আমায়। তাঁর প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বেড়িয়েছি বাস করেছি কিন্তু আটকে রাখেন নি তিনি কোনো-খানেও। আর, আমারও এমন কিছু কোষ্ঠ-বদ্ধতায় পায়নি যে সেই বাথরুমেই গিয়ে বসে থাকব সারা দিন। আমার প্রাতঃকৃত্য যা কিছু জীবনের সেই প্রাতঃকালেই সারা হয়ে গেছে। সব।

সেই বন্দিত নন্দিনীর কথা জানতে চাইছিলেন না? হ্যাঁ, তার সম্পাসুখেও নন্দিত হয়েছি বই কি কিছুকাল, কিন্তু সেটা তেমন কালান্তক হয়নি—সংগীদের মতন সাংগনীরাও এক সময় ছেড়ে যায়—ছাড়িয়ে যায়। এগিয়ে যায় কি পিছিয়ে পড়ে। আর, আমার দৌড়ও তো বেশিদূরে নয়। আমি ভালোই জানি যে নন্দনকানন আমার জন্য হয়নি।

[ক্রমশ]

কাফী

বর্তমানে "কাফী" রাগ খুবই পরিচিত। এটিকে একটি ঠাট বলেই আমরা জানি। অবশ্য বিশুদ্ধ কাফী অনেকে গান না, অন্যান্য রাগের সঙ্গে মিশিয়ে গেয়ে থাকেন —যেমন, কাফী খাম্বাজ, কাফী সিন্ধু ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন রাগ সিন্ধুই হচ্ছে আসলে কাফী। কাফীতে অনেক পুরোনো ভাল ভাল বাংলা গানও আছে। কিন্তু একটা সন্দেহ অনেক দিন থেকেই পোষণ করে আসছি। সেটি হচ্ছে এই যে, কাফী কি সত্যিই একটি রাগ ছিল? না কি গায়কপরম্পরা এটি একটি আলাদা রাগে পরিণত হয়েছে? কাফী নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন রাগ নয়। সংগীতরত্নাকর পর্যন্ত গ্রন্থাদিতে এই রাগের উল্লেখ আছে বলে মনে পড়ছে না, এমন কি রাগদর্পণ গ্রন্থেও বোধ করি কাফীর উল্লেখ নেই। কিন্তু তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই রচিত তুহফাতুল্ হিন্দ্ গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। সিন্ধুর সঙ্গেই এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, হিন্দীতে এর আসল নাম কি সেটা জানা নেই। অনুমান হয় মোগল যুগের শেষ দিকে কাফী প্রাধান্য লাভ করে এবং একটি রাগে পরিণত হয়। হিন্দীতে (অর্থাৎ ভারতীয় ভাষায়) এর প্রতিশব্দ না থাকায় স্পষ্টই বোঝা যায় এটি ভারতীয় শব্দ নয়। আসলে এটি আরবী শব্দ—যাতে প্রাচুর্য বোঝায়। হিন্দী এবং উর্দুতে এই শব্দটি সব সময় ব্যবহৃত হয়, এটা বোধ হয় অনেকেরই জানা।

আমাদের সংগীতে কাফী এবং সিন্ধু প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। সিন্ধু, যাকে অনেকে সৈন্ধবী বলেন সেটি বেশ গম্ভীর রাগ। এতে কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ লাগে, কিন্তু আরোহণে সোজা তীব্র নিষাদও লাগানো হয়; অন্তত বাংলা রাগসংগীতে তো বটেই। কাফীতে ওই একই ঠাট ব্যবহৃত হয়, তবে অনেকে শুদ্ধ গান্ধার এবং শুদ্ধ নিষাদও লাগিয়ে থাকেন। সিন্ধু-কাফী বলে যে বিশেষ রাগটি আমরা শুনে আসছি তাতে তীব্র রে-কে কেন্দ্র করে চড়া এবং খাদে একরকম বিশেষ মূর্ছনার কাজ করা হয়। এতে বহু টপ্পা রচিত হয়েছে। যাঁরা এই ধরনের গানে অভিজ্ঞ তাঁরা এই মূর্ছনার সম্যক পরিচয় অবগত আছেন। আসলে কাফী শব্দের সঙ্গে সিন্ধুর যোগটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; কারণ, দুটির মধ্যে গভীর মিল বর্তমান। অপর রাগগুলির সঙ্গে কাফীর সংযোগ বোধ হয় এর পরবর্তী কালে ঘটতে আরম্ভ হয়েছে।

সিন্ধুর সঙ্গে কাফী নামক একটি বিজাতীয় শব্দ ব্যবহার করবার কারণ কি—

এ প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রশ্নের সমাধান করতে হলে চিন্তা করতে হবে—কেন এই শব্দটির প্রয়োগ হল। কাফী শব্দের অর্থ "প্রচুর", ইংরেজীতে যাকে বলে "সাফিসিয়েণ্ট।" তা হলে "কাফী-সিন্ধু" শব্দে বোঝাচ্ছে "প্রচুর সিন্ধু",—যার অর্থ হল এই যে, এটি একটি মিশ্র রাগ যাতে সিন্ধুর উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। অনেকে কাফী বলতে বোঝেন সিন্ধু এবং খাম্বাজের মিশ্রণ। অনুমানটি অসংগত নয়। অধিক পরিমাণে সিন্ধু এবং স্বল্প খাম্বাজের মিশ্রণেই তথাকথিত কাফীর রূপটি ফুটে উঠেছে। কাফী-খাম্বাজ বললেও এটিই বোঝা উচিত যে, সেই সুরটিতে খাম্বাজের প্রাচুর্য থাকবে এবং সেই সঙ্গে থাকবে অপর এক বা একাধিক রাগের স্বল্প মিশ্রণ।

গোড়াতে আমাদের সংগীতে মুসলমান ওস্তাদগণ এইভাবেই কাফী শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন এটি বোধ করি নিশ্চিত। পরে কেবলমাত্র এই "কাফী" শব্দটিই একটি রাগের অধিকার অর্জন করে নেয় এবং যে সিন্ধুর প্রাধান্য এটি নির্দেশ করত সেটিকেই আত্মসাৎ করে বসে। বিবেচনা করে দেখলে এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, "কাফী" নামক একটি শব্দ কখনই একটি রাগবাচক হতে পারে না, কেননা "প্রচুর" বললেই প্রশ্ন ওঠে—কিসের প্রাচুর্য বা প্রাচুর্যটা কোন বস্তুর? এই কারণেই একটা সুপরিচিত রাগের সঙ্গে "কাফী" শব্দটা যুক্ত হয়েছে। কিভাবে এই সংযোগ ঘটেছে সেটা পূর্বেই বলেছি।

এইরকমভাবে দুটি একত্রিত শব্দের মধ্যে কেনও কোনও ক্ষেত্রে একটির বিলোপ ঘটেছে। সেতারকে বলা হত "বীণ-সেহতার" (যার অপর নাম ছিল 'যন্তর')। ক্রমে 'বীণ' শব্দটি লোপ পেয়ে গেল, প্রচলিত রইল "সেতার" শব্দটি। এমন বহু শব্দ আমাদের রাগসংগীতে আছে যেগুলির সম্যক তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারি না। উদাহরণ-স্বরূপে "আলাইয়া" শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এটিকে ইচ্ছামত উচ্চারণ করা হয়, যথা—আলাহিয়া, আলহৈয়া, আল্লেয়া ইত্যাদি। "বিলাবল" শব্দটিও যথাযথ কিনা বলা শক্ত। একে অনেকে আবার "বেলাবলি"ও বলে থাকেন। বহু ধুন আছে যেগুলির নাম সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান।

যেসব বিশেষ রাগ, ধুন বা গীত মুসলমান গায়ক-সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে, সেগুলির যথাযথ নাম এবং পরিচয় সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এর ফলে কিছু অজানা তথ্যও আমাদের গোচরে আসতে পারে।

শার্ঙ্গদেব

ত্বক কত সুন্দর, কত মোলায়েম
কেবল সিন্থেল কোল্ড ক্রীম
ব্যবহারের ফলে
Cinthelle
Cold Cream
by Godrej
এই ক্রীমের সাহায্যে ত্বকের শুকনো, টান ভাব দূর হয়...পুরোনো মেক-আপ বা ধূলো বালি লেগে লোমকূপ যদি বন্ধ হয়ে যায়, এই ক্রীম দিয়ে আপনি অনায়াসে তা পরিষ্কার করতে পারবেন।
সিন্থেল কোল্ড ক্রীম গোদরেজের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন। আপনার ত্বককে সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখে।
একটি গোদরেজের উৎপাদন

সারাংশ

মোহিনী আমায় কেন স্মরণ করেছেন বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হল না। আমি হলাম সেই দাগী চোর, কোতোয়ালিতে ডাক পড়লেই যে বুঝতে পারে কোথাও কিছু খোয়া গিয়েছে। মোহিনীর সামনে হাজির হতেই তিনি ভর্ৎসনা করে বললেন সুহাসের কানে এই সব কুমন্ত্রণা দেওয় তিনি পছন্দ করছেন না। 'কে বলেছে আমাদের পরিবারের মধ্যে ক্ষয় ধরেছে? ওটা মিথ্যে কথা, মনগড়া কথা।'

মোহিনীর ক্ষুব্ধ মূর্তিটি আমি স্পষ্টই যেন মনে মনে দেখছিলাম। কোতোয়ালিতে চোরদের হাসতে নেই; বিনয় করে বললাম, অপরাধ মার্জনা করুন, আপনারা অক্ষয়।

রাগ করে মোহিনী যেন আমার সামনে থেকে তরতরিয়ে চলে গেলেন। ছাদে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাতাসের ঝাপটা খেতে খেতে আমি মোহিনীর উষ্মাটুকু অনুভব করলাম। আকাশটা কালো করে মেঘ জমেছে; বিদ্যুত চমকাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। আশেপাশের বাড়ির খোলামেলা জানলায় আলোগুলো যেন মুখ বাড়িয়ে বর্ষা আসার অপেক্ষা করছে।

ঘরে ফিরে এসে দেখি বাতিটা দপদপ করছে। সামান্য সময় নিববে, কি নিববে না, করে বাতিটা নিজেকে সামলে নিল। আমি ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম।

জগতে এক ধরনের নির্বোধ থাকে যারা কোনো কিছু হারাতে রাজী নয়। স্বাভাবিকভাবে যেটা যায় তাও তারা হারাতে চায় না। এরা হল কথাসরিৎসাগরের সেই মূর্খ রাজার মতন—যে যথাসাধ্য ভোগ-সুখ করেও বয়সকালে ভেবেছিল ভোগের জন্যে যৌবনটাকে ধরে রাখার নিশ্চয় কোনো পার্থিব উপায় আছে। যেটা সত্য সেটা সে বিশ্বাস করে নি, যা মিথ্যে তা বিশ্বাস করে এক শঠের হাতে পড়েছিল। এমন মূর্খের ভাগ্যে যা জোটার তাই জুটেছিল, সে না পেয়েছিল নব-যৌবন না প্রবীণত্বের সান্ত্বনা। যযাতিও যৌবন-ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মূর্খ বলি না, মানুষের ভোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার জন্যে কবি তাঁকে অকালে জরাগ্রস্ত করেছিলেন। কারোর কৃপায় যতটা ভোগসুখ যযাতির বেড়েছিল তা না বাড়লেও বিশেষ কোনো ক্ষতি ছিল না। সত্য হিসেবে তাঁর ভিক্ষাটুকুই বেঁচে আছে—বাকিটুকু নেই।

মোহিনীকে আমি বুদ্ধিমতী বলেই মনে করি। কিন্তু অনেক সময় তিনি বুদ্ধিকে শাসন করে চলেন। ফলে বুদ্ধিটা আর মাথা তুলতে সাহস পায় না। সুহাসকে আমি যখন বললাম, তাদের পরিবারের মধ্যে ক্ষয় ধরেছে তখন সুহাস চমকে ওঠে নি, আপত্তি জানায় নি, চুপ করে শুনেছিল; সে যে এ-সব কথায় দুঃখ পায় তা আমার অজানা নয়। তবু আমার কথায় নতুন করে তার দুঃখ জাগে নি, এ-দুঃখ সে যেন আজকাল বোধ করে। সুহাসকে যখন আমার অভিমতটা বলছি, তখনই আমার মনে মোহিনীর উদয় ঘটেছিল। আমি জানতাম, কথাটা মোহিনীর কানে উঠলে তিনি না না করে ছুটে আসবেন।

মোহিনী সাধারণ একটা কথা বুঝতে চান না। যা গড়ে তোলা যায় তার গড়ন একটি নিজস্ব আকার পেলেও গড়নের মধ্যে নানাদিকে নানান কারিকুরি থাকে। অমন যে মাটির প্রতিমা তার মধ্যেও এই কারিকুরি। যন্ত্রের বেলায় এটা যেমন উন্মুক্ত, নেহাত অন্ধেও দেখতে পায়, মানুষের বেলায় তা নয়। সুহাসের ঠাকুরদা অনেক সাধ করে যে পরিবার গড়ে তুলে-ছিলেন সেটা নেহাত ইটকাঠের আশ্রয় নয়। তিনি হয়ত ভেবে দেখেন নি, তাঁর দুই ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনীদের নিয়ে যে পরিবার গড়ে উঠবে তাতে প্রত্যেকটি মানুষের একটি নিজস্ব সত্তা থাকবে; কেউ হবেন জ্যাঠামশাই, কেউ হবেন সুহাসের বাবা; সেখানে সুহাসের মণিমা যেমন থাকবেন, তেমনই থাকবেন মোহিনী। মানুষ তো আর কড়ি বরগা নয় যে তাকে মাপ মতন কেটে যে বাড়িতে বসানো হবে সেখানেই সে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। মানুষ তার নিজের মতন বাড়ে। নিজের মতন সরে যায়, নিজের মতন কাছে আসে। মোহিনীদের পরিবারে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা এখনও রয়েছেন তাঁদের চার কোণে খুঁটি করে,

বাঁধিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার যত চেষ্টাই থাক—ভেতরে ভেতরে এদের প্রত্যেকের নিজের সত্তার চাপে মাটিতে অনেক আগেই চিড় ধরে গিয়েছিল। সেটা যে আরও বাড়ছে এটা মোহিনীরা দেখতে চান নি। এখনও চান না। তাকে এ-কথাটা বোঝানো মুশকিল., সংসারের ভাঙনটুকু তার ছাদের তলাতেই লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ে ওঠে।

একদিন কথায় কথায় মোহিনীকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনারা সবাই মিলে যে-জিনিসটা ধরে রেখেছেন সেটা কী?"

মোহিনী বুঝতে পারেন নি। অবাক চোখ করে তাকিয়ে ছিলেন।

আমি বলেছি, "আপনাদের এই বাড়িটার ভিত থেকে শুরু করে তার বতগুলো, দেওয়াল সব ওই ছাদটাকে মাথার ওপর ধরে রেখেছে। কিন্তু আপনারা, এই কজন মিলে কোন জিনিসটা ধরে রেখেছেন আমায় বলুন তো?"

মোহিনী আমার কথায় সন্তুষ্ট হন নি। বলেছিলেন, "ওটা আমাদের বলার কথা নয়।"

"তবু শুনি।"

"সুহাস বলবে। আমি জানি না।"

মোহিনী আমাকে এড়াতে চাইছিলেন। না এড়িয়ে তাঁর কোনো উপায় ছিল না; আমি জানি তিনি আমায় স্পষ্ট করে কোনো জবাব দিতে পারতেন না। আমরা অনেক কিছু না জেনেও জানার মতন গ্রহণ করি। মোহিনী তাঁদের পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, আভিজাত্য, মর্যাদা, তাঁদের পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতির বন্ধনকে অশেষ মূল্য দেন। আমি বলি না, তার কোনো মূল্য নেই; কিন্তু ভাবের ঝোঁকে ঠাকুরের পায়ে বেশী মূল্য ধরে দিলেই দেবতার মূল্য বাড়ে না। মোহিনীদের পারিবারিক বন্ধনের পাশাপাশি যে কয়েদখানা তৈরী হয়ে গিয়েছে তার দিকে তাঁর নজর দিতে আপত্তি কেন? মানুষ হিসেবে তাঁরা কে কতটা খর্ব হয়েছেন, হচ্ছেন এই হিসেবটা কোথায়? হিসেবটা মোটামুটি করে ধরলেও মোহিনী বুঝতে পারতেন, যাদের নিয়ে এই পরিবার—সেই মানুষগুলির পৃথক পৃথক চরিত্র থেকে স্বাভাবিক একটা বিরোধ এসেছে। সেটাকে জোর করে বরাবর অস্বীকার করা যায় না।

আমি এই ঢাক-পেটানো সভ্যতাব সংগে নেচে বেড়াই না। বন্ধুবান্ধবের সংগে আমার ঝগড়াটা এইখানে। তারা আমায় বোঝাতে চায়, মানুষ লাফ মেরে মেরে কতটা এগিয়ে এল আমি নাকি সেটা চোখে দেখেও স্বীকার করতে পারি না। আমি তাদের স্পষ্টই বলি, জগৎসুদ্ধ মানুষের যদি লাফাবার ক্ষমতা থাকত তবে আমার কথা ছিল না; দু দশটা মানুষ পা তুলে লাফাতে পারে, বাকিগুলো হয় খোঁড়া না হয় বেতো, তারা পা সোজা করে হাঁটতেই পারে না, দশটা লোকের লাফ নিয়ে জগৎসুদ্ধকে লম্ফবান ভাবলে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। তোমাদের দু একটা বুদ্ধ যীশুকে দেখিয়ে সবই যদি বদ্ধ চাও তবে আমি নাচার। বুঝলে যতীন, সক্রেটিস হাসিমুখে বিষ খেয়েছিলেন বলে তুমি বিপিন—সবাই তোমরা নীলকণ্ঠের বংশ নাকি? তাহলে বলব, তোমরা মহা ভণ্ড।

এই ভণ্ডামি নিয়েই সংসারটা চলে আসছে। মানুষের দৌড় শুরু হবার পর যে দু পাঁচ বা দশজন বড় রকম দৌড় দিয়ে ছুটে অনেকটা চলে যেতে পারল তার সাধারণের মধ্যে নয়, ওরা অসাধারণ—মানুষ হয়েও অতি-মানুষ, সুপারম্যানদের গোত্র। সেই সেই অতি-মানুষদের নিয়ে এই সাধারণ মানুষের বিচার করো না। সাধারণরা তাদের হামাগুড়ি-পর্ব এখনও শেষ করতে পারে নি।

বন্ধুদের সংগে তর্কাতর্কিতে আমি এই কথাটা বারবার বোঝাতে চেয়েছি। আমার বিশ্বাস, আমাদের একটা বড় অনর্থ এইখানে ঘটে যাচ্ছে। সুহাসকে সেদিনও বলেছি, আমরা যাকে সভ্যতার মস্ত মস্ত কীর্তি বলি সেগুলো অতিমানবের কীর্তি, তার সংগে সাধারণ মানুষের যোগ ছিল কিঞ্চিৎ-মাত্র। অথচ এই মানুষগুলোকে আজ তোমরা নেহাতই মহৎ সভ্যতার রথ ঠেলাতে ধরে এনেছ। বেচারীরা না পারছে রথে চড়তে না পারছে পালাতে।

মোহিনীকে আমি এবারকার চিঠিতে লিখেছি: "মানুষের পক্ষে এটাই হয়েছে সবচেয়ে বিড়ম্বনা। সমাজ সংসার তার সামনে কর্তব্য অকর্তব্যের এমন একটা বৃহৎ ফর্দ ধরে দিয়েছে যে-বেচারী সেই বজ্ঞের ফর্দ মিলিয়ে বাঁচতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এই ফর্দ তার মেনে নেবার কোনো দরকার ছিল না, কেননা সেটা তার সাধ্যাতীত। কিন্তু সমাজ এমনই পদার্থ যা আমাদের ক্ষমতা অক্ষমতা, মরজি, স্বাধীনতাকে পরোয়া করার জন্যে বসে নেই। সে বসে আছে রাজাসনে, আমরা তাকে সেলাম দেব এটাই তার ইচ্ছে। মানুষকে বাঁধবার এমন ষড়যন্ত্রকে আমি ঘৃণা করি। মানুষের পক্ষে এটা মুক্তি নয়, আনন্দ নয়। এ হল দাসত্ব।"

মোহিনীকে চিঠি লিখতে বসলে আমার ভেতরকার একরোখা অবিনটা যে বেজায় ক্ষেপে যায় আমি তা বুঝতে পারি। মনে হয়, মোহিনী আমার প্রতিপক্ষ, শত্রু। তিনি প্রায় মুখ বুজে আমার বিরোধিতা করছেন।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর পরিবার এবং সংসারকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে, নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে সহ্য করে, তাঁর ভালমন্দ নীতিজ্ঞান নিয়ে আমায় স্পর্ধার সংগে দেখাতে চাইছেন, তিনি স্বাভাবিক সত্য। মোহিনীর এই অহংকার আমার সহ্য হয় না।

আমি তাঁকে বলি, 'আপনি জানেন না মানুষ হিসেবে মুক্তির আনন্দ কোথায়। আপনাকে চীনা উপকথা থেকে একটা গল্প শোনাই। এক নদীর ধারে একটা ষাঁড় এবং শুয়োর ছানার মধ্যে ভাবসাব হয়েছিল। তারা রোজই এক জায়গায় চরতে আসত, এসে গল্পগাছা করত। ষাঁড়ের বড় দুঃখ ছিল তাকে মানুষ অনাদর করে। একদিন তার কপাল ফিরল, কিছু মানুষজন এসে ষাঁড়টাকে খাতির করে ধরে নিয়ে গেল। শুয়োর ছানাটা পালিয়ে গিয়ে দূরে থেকে শুধু দেখল, ষাঁড় বাবাজী হাসতে হাসতে মানুষদের সংগে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পরে সেই ষাঁড়টাকে খাইয়ে দাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে, স্নান করিয়ে লোকগুলো আবার তাকে নদীর ধারে নিয়ে এল। এবার অবশ্য দড়িতে বেঁধে। তারপর দেখা গেল, নদীর ধারে এনে তাকে হাড়িকাঠে চাপানো হচ্ছে। আর, খানিকটা দূরে নদীর কাদায় সেই শুয়োর ছানাটা নিজের মনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। হাড়িকাঠে যাবার চেয়ে ওই শুয়োর ছানাটার কাদায় গড়াগড়ি দেওয়াটা যে অনেক সৌভাগ্যের এটা হয়ত আপনি স্বীকার করবেন। আমি নিজে শুয়োর ছানার মতন জন্মজন্ম কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে বেঁচে থাকতে রাজী, তবু মানুষের খাদ্যের উপকরণ হতে রাজী নয়।...'

মোহিনী একে সাজানো মিথ্যে নিয়ে বেঁচে আছেন। তিনি চেয়ে দেখছেন না, তাঁর অন্দরমহলে যে কুকুরটা বাঁধা আছে সেটা আয়নার টোপর জাতীয় জীব নয়। মোহিনী যে-জীবটাকে বেঁধে রেখেছেন তাকে শুধু শেখানো হয়েছে বাইরের লোক ঘরে পা দিলেই চেঁচাতে। চোর ধরার শিক্ষা পেয়ে কুকুরটা শুধু চেঁচাতেই শিখেছে, তার জ্ঞান নেই কে চোর, কে অতিথি। মোহিনী নিজের মধ্যে এই রকম একটা নীতিকে বেঁধে রেখেছেন, সে শুধু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজেকে জাহির করে, তার মনিবকে বোঝায় চোর এসেছে। মনিব বোঝে না, সব শব্দই চোরের পায়ের নয়।

মোহিনীকে আমি লিখেছি, মেয়েদের চরিত্র হল, তারা নৌকোর মতন ভাসতে পারে। নিতান্ত ঝড়ে ঝাপটায় কাবু না হলে তারা জলের তলায় ডোবে না। আপনি সংসার তরঙ্গে অনন্তকাল ভেসে থাকুন তাতে অন্যদের আফসোস হবে না। আমি বেচারী এই আফসোসে মরব, হায় হায়, আপনি চিরটাকাল ঘাটেই শুধু বাঁধা থাকলেন না পারলেন স্রোতে ভেসে যেতে, না পারলেন ডুবতে। আমার যদি সাধ্যে কুলোয় বাঁধা দড়িটা খুলে দিয়ে বলব, হয় নৌকোটাকে জলের টানে ভেসে যেতে দিন, না হয় জলের তলায় ডুবুন, দয়া করে আর ভেসে থাকবেন না। ওটা আর আমি দেখতে পারি না।'

মোহিনী আমার চিঠিপত্রের ধরণটা তেমন পছন্দ করছেন না। তাঁর জবাব থেকে আমি বুঝতে পারি, আমার মতন বর্বর জীবটিকে নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েছেন। আমায় তিনি রুখতে পারছেন না, তাঁর নাগালের মধ্যে এমন কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে তাড়া করে আমায় দূরে সরাবেন। তিনি নিজের অন্তরমহলকে সামলাবার জন্যে জানলাটা দরজাটা ভেজিয়ে ছিটকিনি তুলে দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমি যে তাঁর মাথার ওপরের আলো আসার পথ দিয়ে ঢুকে পড়েছি তা বুঝতে পেরে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। উনি মনকে বোঝাচ্ছেন, আমি নিতান্তই চকমকি। এক সময়ে 'অবিন মার্কা' দেশলাইয়ের ব্যবসা ফেঁদে লোকসান খেয়েছি এইটেই বোধ হয় তাঁর সান্ত্বনা। আমি ভাবছি, আবার যদি নতুন করে কোম্পানি খুলি তবে সেই দেশলাইয়ের নাম হবে 'মোহিনী'। তার আগুনের ফুলকি দেখে আমি আত্মহারা হয়ে বলব, সাবাস মোহিনী দেশলাই, তোমারই জিত হল অবিন।

আমি হোহো করে হাসছি, দেখি বাইরে থেকে হুড়মুড় করে বৃষ্টি ঢুকে পড়েছে, বাতাসের দমকায় জলের ছাট এসে বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে। জানলা বন্ধ করতে করতে দেখলাম ঘরের আলোটা আবার সেই রকম দপদপ করতে শুরু করেছে। মোহিনীর অবস্থা হয়েছে বাতিটার, জ্বলবে কি নিববে বুঝতে পারছে না।

শুয়ে শুয়ে শুয়ে কি কথা ভাবতে ভাবতে কালকের কথা মনে পড়ল। শচিপতিরা কাল আসছেন। শচিপতি আসার পর তাঁকে নিয়ে আমাদের ব্যস্ততা কতটা বাড়বে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। যতীনের পরামর্শই ভাল। হয়ত আমাদের এত উদ্বেগের কোনো সঙ্গত কারণ আর থাকবে না। কিংবা সে উদ্বেগ আরও বাড়বে। আপাতত কিছু বলা যায় না। সবই অনিশ্চিত।

জ্যাঠামশাইয়ের কলকাতা আসার কতটা প্রয়োজন ছিল আমি বুঝতে পারছি না। তিনি আমাকে তেমন করে কিছু লেখেননি, শুধু লিখেছিলেন, শচিপতির সঙ্গে তিনিও আসবেন। একেবারে অনর্থক যে তিনি আসবেন এমনও আমার মনে হয় না। শচিপতিই তাঁকে টেনে আনছেন কি-না আমি জানি না। বা, এমনও হতে পারে জ্যাঠামশাইয়ের মনে হয়েছে, শচিপতির হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে যাওয়াই তাঁর কর্তব্য।

আয়নার কলকাতায় আসার বড় সাধ ছিল। সে আসছে আসুক। কিন্তু তার এই সময়ে এসে কী লাভ হবে জানি না। সুহাসদের বাড়িতে মোহিনী একা পড়ে থাকলেন, অন্যরা চলে এলেন আমারও যেন এ কেমন ভাল লাগছিল না। মোহিনীও এলে পারতেন। জ্যাঠামশাই হয়ত অন্য কিছু ভেবে আসছেন। কলকাতায় তিনি বেশীদিন থাকবেন এমন হয়ত স্থির করেননি। শচিপতিকে পেশীছে দিয়ে কয়েক দিন থাকবেন মাত্র, তারপর ফিরে যাবেন।

আয়না আমায় মাঝে মাঝেই চিঠিপত্র দেয়। তার চিঠি থেকে বুঝতে পারি, বাড়িতে সে বড় একা একা বোধ করে। ইদানীং তার শু একটা চিঠি পড়ে আমার ধারণা খানিকটা পালটে গেল। আয়নার মধ্যে যে ছেলেমানুষী ছিল সেটা যেন সরে গেছে। সে দেখছি, হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে চিঠিপত্র লিখতে পারছে। আয়না মোহিনী নয়; তার সরলতা, চঞ্চলতা গোপন করার কোনো চেষ্টা আমি আগে দেখিনি। কলকাতায় ফিরে এসে তার প্রথম দিককার চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে আমি অট্টহাস্য হাসতাম। একেবারে নাকে দেখলাম আয়নার লেখার ভাষা পালটেছে। সে আর সরল করে কিছু লেখে না, তার উচ্ছ্বাসের মাত্রা খুবই কমে গিয়েছে। মোহিনী যে তাকে কিছু নীতি-শিক্ষা দিয়েছেন, এমন ধারণা আমি করছি না, কিন্তু আয়না যে মেয়ে এই বোধটা যেন সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমার কাছে তার সংকোচের কোথাও কোথাও কারণ থাকলেও সে লিখেছে, 'অবিনদা, এখানে আমার আর ভাল লাগে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকি। দিদি তার নিজের মতন কাজকর্ম নিয়ে থাকে, জ্যাঠামশাই থাকেন নিজের ঘরে, আর আমি সারা বাড়ির মধ্যে একা একা মুখ বুজে বসে থাকি। আমার বন্ধু বিনু এলে তার সঙ্গে একটু গল্প করি। বিনুও চলে যাবে এবার। কলকাতায় গেলে আমি বেঁচে যাব। এখানে আমার আর একেবারেই ভাল লাগে না। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। আপনি আবার ঠাট্টা করবেন। তা নয়, অবিনদা। মোটেও তা নয়।'

কলকাতায় আসার আগে আগে আয়না আমায় কোনো চিঠি দেয়নি। ভেবেছে, চিঠি দিয়ে আর কী লাভ, সে আসছেই।

আমি ভাবছি, কলকাতায় এসে আয়না কী দেখবে? দেখবে, তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। কেন ভেঙেছে জানতে তার আটকাবে না। তার দিদির জন্যে সে-বেচারীর বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে এতে তার খুশী হবার কথা নয়। কেনই বা সে খুশী হবে? সুহাসরা তাকে ছোটোর আদর আতিশয্য দিয়ে নাবালিকার মতন করে রাখলেও সে সাবালিকা। তার নিজের একটা জীবন আছে, সাধ স্বপ্ন আছে। তার বয়েসটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মেয়ের অবলম্বনই খুঁজে বেড়ায়। সেটাই স্বাভাবিক, সহজ নিয়ম। আয়না যে-জাতের মেয়ে সে-জাতের মেয়েরা ঘরের মধ্যেই বেশী মানায়। ও হল গৃহস্থের বাগানে বেড়ে ওঠা ফলের মতন, সংসারের ভোগে লাগবে বলেই সে নরম খোসা গায়ে নিয়ে বেড়ে উঠেছে। সুহাসরা তাকে শৌখিন করে সাজিয়ে রেখে রেখে তার স্বভাবটাকে ফুলের মতন করতে চেয়েছে হয়ত, কিন্তু আয়না ফুলের জাত নয়। আমি লক্ষ করে দেখেছি, আয়নার মাথায় তাদের পরিবারের চাপা অহংকার বোধটা নেই। সে যে খুব একটা কিছু বোঝে তাও নয়, সংসারের অন্য পাঁচজনের মধ্যে থেকে থেকে একটা সমীহের ভাব এসেছে, তার বেশী নয়। তার দোষ হল, সে চারদিক থেকে চাপা পড়ে গিয়ে একটু ভীতু ধরনের হয়ে গিয়েছে। নিজেকে মেলে দিতে পারেনি। আমার মনে হয়, আয়না খুব সাধারণ, তার যেটুকু চাওয়া তার মধ্যেও অসাধারণত্ব নেই। সে তার নিজের অংশটুকু সহজ সংসারের মধ্যেই খুঁজে বাঁচতে চায়। তার এই সাধ অপূর্ণ থাকলে সে কী করবে আমি জানি না। মোহিনী যে এমন করে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন আয়না হয়ত ভাবতে পারেনি। যখন বুঝতে পারবে, তখন কোন্ চোখে তার দিদিকে দেখবে কে জানে।

সুহাসকে আমি আয়নার বিয়ের কথা খুব কিছু জিজ্ঞেস করিনা। যা বলার সে নিজেই বলে।

আমাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থাটা হল ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে। আমরা তাকে ব্যবহার করি, স্বতন্ত্র করে মূল্য দিই না। এটা সর্বত্রই চলেছে, এখানে কিছু বেশী। মেয়েদের নিয়ে আমাদের যত হইচই তার আড়ালে যে আমাদের স্বার্থটুকু গোপনে কাজ করে চলেছে তা আজকাল চোখে পড়ার উপায় থাকে না। কিন্তু যাদের চোখ আছে তারা বুঝতে পারে, ভগবান মেয়ে জাতটাকে আলাদা আকার দিয়ে গড়েছেন বলে বেচারীদের নিয়ে কত তামাশাই করি। কতরকম ফন্দি করে কাজে লাগাই তাদের— হায় রে!

আমার মাকে আমার মনে পড়ে। পুণ্যবালা—আমার মা তাঁর স্বামীর কাছে নারী হিসেবে কোনো মূল্য পায়নি। বাবার চার পাশে ছড়ানো সরকারী অফিসের নিতান্ত তুচ্ছ একটা ফাইলও যতখানি নজর কাড়ত আমার মা বোধ হয় তাও নয়। বাবা তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের কতক আচার পালন করার জন্যে যেন মাকে এনেছিলেন। মা শুধু সেইটুকু পালন করত। আমার ধারণা, বাবা এবং মার মধ্যে কোনো হৃদয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, বাবা ছিলেন নিজের কৃতিত্ব নিয়ে ব্যস্ত আর মা থাকত নিজের জীবনের বেদনা নিয়ে আড়ালে। আমার সঙ্গে মার সম্পর্কটাও কেমন খাপছাড়া ছিল। আমি ঠিক জানি না, মা তার স্বামীর সংসার করতে এসে কী ধরনের অবহেলা এবং আঘাত পেয়েছিল যার ফলে মার মন থেকে সন্তানের জন্যেও কোনো আকুলতা তেমন করে ফুটত না। মা যেন নিজের মধ্যে একটা আশ্চর্য জগৎ গড়ে নিয়েছিল। সেখানে স্বামী তো নয়ই, ছেলেরও পা রাখার জায়গা ছিল না। আমার সেই মাকে আমি বুঝতে পারতাম না। মনে হ'ত, বাবা এক জগতে বেঁচে আছেন, মা অন্য জগতে। আমার বাবা দাশভারী, রাগী প্রকৃতির মানুষ হলেও স্ত্রীর সঙ্গে অসভ্য আচরণ করতেন না। আমি কোনো দিন বাবাকে মার সঙ্গে ঝগড়া করতে

পাননি। তিনি বোধ হয় ধরেই নিয়েছিলেন, অফিসে বাবার যে মর্যাদা বাড়িতেও সেই একই মর্যাদা, বেয়ারা পিয়নের মতন মার সঙ্গে অসদাচরণ তাঁর মতন পদস্থের শোভা পায় না। বাবা পদস্থ হবার ঝোঁকে ক্রমশই ওপরে উঠছিলেন, আর মা ক্রমাগত দূরে সরে গিয়ে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মা যেন নির্বাসিতা হয়ে থাকল।

আমার মা, পুণ্যবালা অসুন্দর ছিল না। মার চোখ ছিল বিষণ্ণ আলোর মতন, কপালটি শুভ্র, নাকটি জোরালো। মার গলার স্বর ছিল নরম, মৃদু। শুভ্র বসন ছিল মার প্রিয়। মাকে দেখলেই মনে হত, মা একা একা নিজের মনে বেঁচে আছে। 'আমি থাকি নিজ মনে।'

মার এই নিঃসঙ্গতা কেমন এক মোহ হয়ে দাঁড়াল। হয়ত মার মৃত্যুও সেই মোহবশে।

মোহিনী আমার মার মতন নন। আমার মা বিধাতার কাছে বর চেয়ে একটি আশ্চর্য শান্ত নম্র নিরাসক্ত হৃদয় পেয়েছিল। সেই হৃদয় মাকে নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ম্লান করেনি। মোহিনী সে-বর পাননি।

(ক্রমশ)

॥ ১৯ ॥
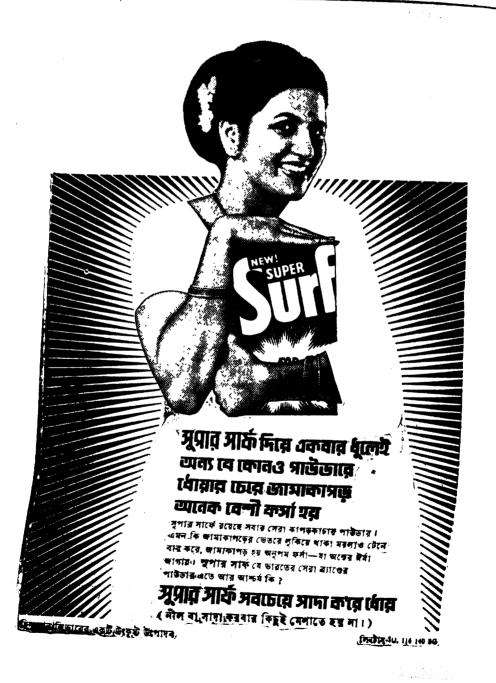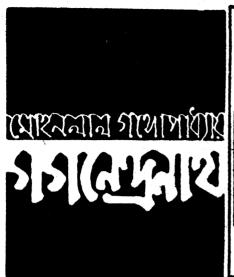
গগনেন্দ্র একবার একটা চুরি ধরেছিলেন। তাঁর চুরি ধরার প্রথাটা বিচিত্র। টোপ ফেলে ফেলে চোরের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে তারপর হঠাৎ যেমন ঝটকা টানে মাছ গাঁথা হয় তেমনি করে ধরেছিলেন। যাদের উপর সন্দেহ গিয়ে পড়ে তেমন লোক বহু ছিল; তাদের মধ্যে থেকে আসল চোরকে খুঁজে বার করা সহজ ছিল না। অনেকে বলেন, গগন এই যে চোরকে ধরেছিলেন, এটা সম্ভব হয়েছিল তিনি দাবা খেলার পরম ভক্ত ছিলেন বলে। দাবাতেও টোপ ফেলার প্রথা আছে—সেটাই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। খুবই দাবা খেলতেন গগন। পাকা খেলোয়াড়ের সঙ্গে তো খেলতেনই, তা ছাড়া যারা খেলতে জানে না বা কাঁচা তাদের শেখাতে ভালোবাসতেন। অনেক দাবার সেট ছিল। সবগুলিই ছিল কাঠের inlay বসানো সুন্দর ছক। ঘুঁটি ছিল বড় বড়। ছোট ছোট হাতির দাঁতের ঘুঁটি একেবারেই পছন্দ করতেন না। বড় আর ভারী হওয়া চাই।

এখন যে কথা বলছিলুম।

গগনের ছবি আঁকার টেবিল থেকে একবার একটা বেশ ভালো ফাউণ্টেন পেন হারিয়ে গেল। টেবিল থেকে তুলে হয়তো কোনো খোপে রেখেছেন ভেবে সব খোপগুলো খুঁজে দেখলেন—কোথাও নেই।

তুলির বাক্সের মধ্যে খুঁজলেন, যদি ভুল করে রেখে থাকেন, বইয়ের আলমারির চালে খুঁজলেন, জামার পকেটগুলো সব হাতড়ালেন—বৃথা। কলমটা উবেই গেছে। কে জানে কোথায় হারালো, এই ভেবে মার্কেটে গিয়ে সেইরকম আর একটা কলম কিনে নিয়ে এলেন। ছবির টেবিলে রেখেছিলেন সেটা, দু দিন পরে সেটাও হারালো। টেবিলের উপর কলম চিরকালই খোলা পড়ে থাকত, এমন কখনও হয়নি। বুঝলেন হারাচ্ছে না, কেউ সরাচ্ছে। তারপর আরও গোটা দুই কলম টেবিল থেকে উড়ে গেল।

গগন দক্ষিণের বারান্দায় যেখানে বসে ছবি আঁকতেন তার ডান-হাতী ঠিক পিছনে একটা ঘর ছিল, যেটাকে বলা হত লেখার ঘর। সেই ঘরে থাকত একটা লেখার টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার। টেবিলে থাকত কাগজ, প্যাড, ব্লটিং পেপার, আর দোয়াত কলম। খাড়া-করা খাপের মধ্যে থাকত বাড়ির ঠিকানা লেখা মনোগ্রাম করা চিঠির কাগজ আর খাম। যার দরকার সে ওই ঘরে ঢুকে লেখার টেবিলে বসে চিঠি অথবা অন্য কিছু

লিখতে পারত। টেবিলে যে কলম থাকত তা ছিল দোয়াতে ডুবিয়ে লেখার কলম। দোয়াতে রোজই টাটকা কালি ভরে দেওয়া হত। গগন এবার সেখানে একটি কালি-ভরা কলম সাজিয়ে রাখলেন। এই হল তাঁর প্রথম টোপ। টোপ দেবার ক'দিন বাদেই ফাউন্টেন পেন অদৃশ্য।

টোপ খাচ্ছে বুঝে আবার একটা ফাউন্টেন কলম রাখা হল। সেটাও উবে যেতে দেরি হল না। এমনি চললো একটার পর একটা কলম নিয়ে খেলা। গগন শুধু লক্ষ্য রেখে যাচ্ছেন লেখার ঘর দিয়ে কে কে আনাগোনা করে, আর মাঝে মাঝে উঠে দেখেন যাকে সন্দেহ করছেন এমন কেউ চলে যাবার পর কলম উধাও হচ্ছে কিনা। এমনি করে একটার পর একটা কলম খোয়া যেতে লাগল অথচ গগন কাউকেই ধরলেন না—কেবল কলম সরবরাহ করে যেতে লাগলেন।

তবে তাঁর যে একজনকে বিশেষভাবে সন্দেহ হয়েছিল সেটা পরে জানা গিয়েছিল। তিনি হচ্ছেন খুদিনবাবু। ওই লেখার ঘরের মধ্যে দিয়ে তাঁর আনাগোনা ছিল বটে, কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি যাতে করে তিনি হাতেনাতে ধরা পড়ে যান। খুদিন-

লেখার ঘরে উপবিষ্ট গগনেন্দ্রনাথ

বাবু ছিলেন একজন ঠিকেদার। জোড়াসাঁকো বাড়িতে নানারকম কাজের তিনি কন্‌ট্রাক্ট নিতেন আর ছুতোর মিস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে রাজমিস্ত্রী সবই খাটাতেন। পাশেই মদন চাটুয্যে লেন—সেইখানে নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকতেন। নির্মলচন্দ্র তখন ঠাকুরবাড়ির জামাই হয়েছেন। যাই হোক, সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও গগন খুদিনবাবুকে কিছু বলেন নি, নির্মলচন্দ্রকেও কিছু জানান নি। একটার পর একটা শুধু কলম ছেড়ে যাচ্ছিলেন।

সেই সময় এক কাণ্ড হল। জোড়াসাঁকো বাড়িতে তখন বিখ্যাত ভারতবিদ ও কলা-সমালোচক আনন্দ কুমার-স্বামী এসে রয়েছেন। তিনি ওই লেখার ঘরের টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন। একদিন সকালে তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসে গগনকে বললেন—দেখুন, আমি একটা চিঠি লিখতে লিখতে উঠে গিয়েছিলুম স্নানের ঘরে। টেবিলে আমার কলমটা ছিল। ফিরে এসে সেটাকে আর পাচ্ছি না।

কী সর্বনাশ! কুমারস্বামী অতিথি। মাননীয় অতিথি। তার উপর এটা তাঁর খুবই দামী আর শখের কলম। গগন-সমর-অবন তখনকার দিনে কালো রঙের ওয়াটার-ম্যান বা সোয়ান কলম ব্যবহার করতেন। কুমারস্বামীরটা ছিল সোনা-মোড়া আরও অনেক ভালো জাতের কলম। বড়ই লজ্জার কথা। গগন বড় লজ্জা পেলেন। সেই সঙ্গে রাগও হল। গগন কখনও রাগতেন না। অনেকে বলেন ঐ একবারই তাঁকে রাগতে দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু তাঁর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কুমার-স্বামীকে বললেন—আপনি একটু বসুন।

বলে সোজা নেমে গেলেন নীচে। খুব সম্ভবত খুদিন-কে একটু আগে যেতেও দেখেছেন। খুদিন তখন উঠোনে কুলি খাটাচ্ছিলেন। গগন চুপিসাড়ে এগোলেন। খুদিন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তার পিছনেই ছিল একটা পিছল জায়গা। কুলিরা তখন আওয়াজ করে মাটি পিটছিল তাই খুদিন গগনের আসার শব্দ শুনতে পাননি। গগন সেই পিছল জায়গাটা পার হয়েই চকিতে খুদিনের পাশ-পকেট চেপে ধরলেন। আচমকা পকেটে হাত পড়তেই খুদিন পিছন ফিরে গগনকে দেখে ঝটকা মেরে পকেট ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গগন পকেট ধরে এক টান টানতেই খুদিন সেই পিছল জায়গাটার উপর পড়ে গেলেন। গগনের হাতে রয়ে গেল ছেঁড়া পকেট আর পকেটের মধ্যে কুমারস্বামীর ফাউন্টেন কলম।

খুদিনের আর কিছু বলার ছিল না। ঘাড় নীচু করে সেখান থেকে চলে গেলেন। কুলিরা বাড়ির বড়কর্তার কাণ্ড দেখে হাঁ করে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কুমারস্বামীকে কলম ফেরত দিয়ে গগন খবর পাঠালেন নির্মলের কাছে। নির্মলকে জানালেন খুদিনের সব ব্যাপার। প্রার্থী দেখে ভদ্রলোক দেখে নির্মল খুদিনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর এই ব্যবহারে বড়ই বিব্রত হলেন। খুদিনের ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু খুদিন ফিরলেন না। খুদিনের এক চাকর ছিল আবদুল। সে বলল—বাবুকে আমি জানি, বাবু দিনের আলো থাকতে ফিরবে না।

নির্মল তখন খুদিনের ঘরে ঢুকে তাঁর ডেস্কের চাবি ভেঙে ফেললেন। ডেস্কের ভিতর খান কুড়ি ফাউন্টেন পেন পাওয়া গেল। সেগুলি গগনকে পাঠিয়ে দিতে গগন দেখলেন সবগুলিই তাঁর কলম। দেখা গেল কোনো কলমই খুদিন বিক্রি করেন নি বা কাউকে দেন নি, বরং যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিয়েছেন। বিচিত্র চরিত্র। বোঝা গেল লোকটি আসলে ক্লেপ্টোম্যানিয়াক।......

তারপর খুদিনের তো সারাদিন দেখা নেই। নির্মল দুবার এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন খুদিন জোড়াসাঁকো বাড়িতে এসেছেন কিনা। বলে গেছেন খুদিনবাবু ফিরলেই তাঁকে ধরে পুলিসে দেওয়া হবে।

শেষে রাত করে খুদিন ফিরলেন। একেবারে অচল অবস্থা। সারা দিন মদ খেয়ে এখন আর দাঁড়িয়ে কোনো রকমে দু পায়ের উপর খাড়া আছেন। টলতে টলতে গগনের কাছে গিয়ে পলাতক খুদিন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

খুদিনের অবস্থা দেখে গগন বললেন—ওরে আবদুল, ওকে তুলে নিয়ে যা। নির্মলকে বলে দিস্ পুলিসে-টুলিসে যেন না দেয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেশ ছেড়ে খুদিন

জোড়াসাঁকোর তিন শিল্পীর প্রতিকৃতি—গড়গড়া মুখে শুয়ে গগনেন্দ্রনাথ; বই পড়ছেন সমরেন্দ্রনাথ; অবনীন্দ্রনাথ ঘুমিয়েই পড়েছেন; সোফায় হেলান দেওয়া কুমারস্বামী মাটিতে-বসা নন্দলালকে নির্দেশ দিচ্ছেন

[illegible] কোন ঠিকেদারি কাজ করছিলেন [illegible] করেছেন। কলমও বোধ হয় এর পরে আর ধরেননি।

[illegible] কাজের অভাব হয়নি। বাড়িতে ভাঙাচোরা [illegible] লেগেই থাকত। তার উপর দেখতে দেখতে অলোকের বিয়ে এসে পড়ল, [illegible] মন ধরে কাজ [illegible] ঠিকেদারি পেয়ে গেলেন।

(ক্রমশ)

একটি চিঠি

'দেশ' পত্রিকায় মোহনলালের লেখা '[illegible]' পড়ে দেখলুম তাতে অনেক ভুল আছে। বড় ভূমিকম্পের সময় ও লিখেছে, 'বড়মাসিমাকে' (আমার মা) খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে কথা ঠিক নয়, আসলে আমাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার বড় দাদা গেহেন্দ্রনাথের বিয়ের সময়কার ঘটনায় কথাতেও অনেক ভুল চোখে পড়ল। বৌঠানকে [illegible] মেয়ে বলায় তার ভাইয়ের নজরে পড়তে সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে। মণীন্দ্র যা লিখেছে তাই ঠিক। নবদ্বীপের বীরপুর গ্রামেই তাদের দেশ। ইংরাজী ১৯০১ সালে ওরা কলকাতায় চলে আসে। বড়দাদার বিয়ে হয় ১৯০৪ সালে। তখন [illegible] বাংলা ১৩১০ সাল। অলোকের চিঠি পড়ে দেখলুম সেখানেও ভুল রয়েছে। অলোকের বয়স তখন ছয় বছর। অলোকের জন্ম হয় বাংলা ১৩০৪ সালে। অলোক নিতবর হয়েছিল বটে, কিন্তু মেয়ের বাড়ি থেকে বিয়ে না হয়ে কালী সিংহের বাড়ি থেকে বিয়ে হওয়ার কারণ সে কিছুই জানে না। না হলে দেখতে পেত মণীন্দ্র যা বলেছে তাই ঠিক। নবুর (নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বয়সের কথা অলোক লিখেছে। নবুর জন্ম হয় ১৩০৬ সালে। বাবা জানতেন মেয়ের বাবার এমন অবস্থা নেই যে কালী সিংহের বাড়ি ভাড়া নেবেন, তাই একমাস আগে থেকে ঐ বাড়ি ভাড়া করে বৌঠানের বাবাকে 'এনে রেখে-ছিলেন এবং বিয়ের যাবতীয় খরচ নিজে বহন করেন। মেয়ের বাবা শুধু সম্প্রদান করেন। কিন্তু পাছে মেয়ের বাবার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নিজের ঐশ্বর্যের কথা প্রচার করা হয়, সেজন্য বাবা সে কথা সম্পূর্ণ গোপন করেছিলেন, কেউই বিশেষ জানতে পারেনি। অলোকের তখন জানবার বয়স হয়নি। যারা জানত এমন লোকেদের মধ্যে এখন শুধু আমি আর মেজদিদি (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে উমারাণী) জীবিত আছি। মোহনলাল ভুল খবর শুনে লিখে গেছে। সেও এখন নেই। রচনাটির উদ্দেশ্য বাবার স্বভাব ও গুণাগুণ জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরা। কিন্তু এত বেশী ভুল ত্রুটি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পক্ষে না বলা অন্যায় হবে বলে জানাতে বাধ্য হলুম। এই রচনার সবকটি প্রকাশিত অংশ আমি পড়ে দেখেছি এবং সকলের চিঠিও দেখেছি। বাবাকে লোকের কাছে বেশী করে প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে কোনও কোনও জায়গায় আরও ছোট করে ফেলা হয়েছে। তিনি যেখানে গাঠির শাল, আলোয়ান, কাপড়, গরদ, হীরের আংটি দরাজ হাতে বিলি করতে পেরে আনন্দ পেয়েছিলেন এবং সকলকে খুশী করে-ছিলেন, সেখানে মোহনলালেরও রচনায় দেখলুম তিনি চুপি চুপি একেবারেই কোচ-ম্যানকে ডেকে বখশিস করলেন। একথা একেবারেই ঠিক নয়। তিনি এরকম লুকোচুরি করার মত লোক ছিলেন না এবং অন্য লোকদের বঞ্চিত করার মতলব তাঁর থাকার কথা নয়। বাড়ির প্রথম ছেলের বিয়েতে সকলকে খুশী করার জন্য তিনি অকাতরে দান করেছিলেন, এমন কি পাল্কী বেহারাদেরও বঞ্চিত করেননি।

নিবেদক

পূর্ণিমা দেবী (চট্টোপাধ্যায়)

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজমেয়ে

কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে আলোক চিত্রশিল্পী অজয় দে সম্প্রতি একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে সাধারণ, অর্থাৎ কালোসাদা ও রঙীন আলোকচিত্রের মোট ৭৩টি নিদর্শন দেখা যায়।

আলোকচিত্র বলতে আমরা সাধারণত বুঝি প্রতিকৃতি অথবা নিসর্গ বা বহিদৃশ্যের অনুলিপি। প্রকৃত পক্ষে যথার্থ কোনও আলোকচিত্রের বিষয়বস্তু ধরা পড়ে আলোকচিত্র শিল্পীর শিল্পীসুলভ চোখে। দেখার বা ছবি-তোলার মত নানা দৃশ্য তথা বিষয়বস্তু চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে— সাধারণ আলোকচিত্র শিল্পী হয়ত তাদের মধ্য থেকেই বিষয়বস্তু নির্বাচন করে নানাভাবে ছবি তুলে থাকেন। দৃশ্যমান জগতের বিশেষ কোনও বস্তুর অনুলিপির দিক থেকে হয়ত সেটি নিখুঁত হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে আলোকচিত্র শিল্পীর শিল্পীসুলভ সন্ধানী চোখের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রতিকৃতি বা নিসর্গ দৃশ্যাদি ছাড়া দেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রণালীর নানা বিশিষ্ট পদ্ধতিও যে আলোকচিত্র শিল্পের প্রধান উপযোগী বিষয়বস্তু হতে পারে অজয় দে তাঁর প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। আলোকচিত্র শিল্পী হিসাবে অজয় দে সুপরিচিত—ইতিপূর্বে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। শিল্প প্রসারে আমাদের দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, দেশবাসীদের তার সঠিক পরিচয় দেবার জন্য কয়েকটি বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান অজয় দে-র দ্বারা কয়েকটি আলোকচিত্র নেবার ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত নানা ছবি দেখা যায়। ছবিগুলি বর্ধিত আকারের হলেও তাদের মধ্যে আলোকচিত্র শিল্পীর বিষয়বস্তু নির্বাচন, কমপোজিশন প্রণালী ও ক্যামেরা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য ও কারখানার চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের মত আলোক উৎপাদনের ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, অভ্যন্তরের কৃত্রিম আলোকের উজ্জ্বলতার অনুপাতে আলোকচিত্র শিল্পীকে ক্যামেরার যন্ত্রপাতি ঠিক করে নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ছবি, শেক্সপিয়র সরণী শাখা, কনফারেন্স রুম, ভাইস প্রেসিডেন্টস রুম, হাই ভোলটেজ স্পার্ক ডিসচার্জ, পলিশিং [illegible]

ও পারফেকটিং দি ডিস্ক-এর নাম করা যায়। কারখানার কয়েকটি ছবিও চোখে পড়ে, যেমন দি ফ্যাক্টরী ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। চা-বাগানের কয়েকটি দৃশ্য সুন্দর, বিশেষ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফ্রম তামসুঙ ও দি প্লাকার। শিল্পভিত্তিক আলোকচিত্র অর্থাৎ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফটোগ্রাফির প্রধান উপাদান মানবিক আবেদন—অর্থাৎ বিভিন্ন ও বিরাট যন্ত্রপাতির ছবির সঙ্গে যদি সুপরিকল্পিতভাবে কোনও শ্রমিককেও ছবির অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে সেই ছবির আবেদন ও পারিপার্শ্বিক রূপ বিশেষভাবে ফুটে ওঠে— নীরস কলকারখানার যন্ত্রপাতির মধ্যে রসের সঞ্চার হয়। এই প্রসঙ্গে সুপরিচিত আলোকচিত্র শিল্পী টি এস নাগারাজনের কথা মনে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিনি বহু ছবি তুলেছেন ও তাঁর তোলা প্রত্যেক ছবিতেই তিনি সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনমত এক বা একাধিক শ্রমিক তথা উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে রেখে
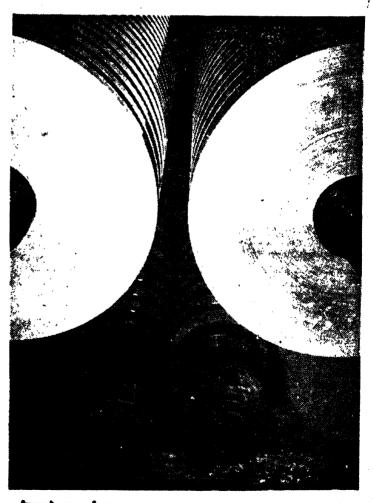
— [illegible] — [illegible]

পেভমেন্ট জোয়েলার্স —কমলা ঘোষ

ছবিতে সুন্দর ও স্বাভাবিক আবেদনের সৃষ্টি করতেন। অজয় দে কৃতী আলোকচিত্র-শিল্পী, ক্যামেরার নানা কৌশল বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ। মনে হয় মানবিক আবেদনের দিকে লক্ষ্য রাখলে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পভিত্তিক আলোকচিত্র শিল্পী হিসাবে পরিচিত হবেন। নাগাল্যাণ্ডের ছবিগুলির মধ্যে এজ ওল্ড উইজডম-এর নাম করা যায়। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে আর্লিং ইন ব্রহ্মপুত্র ও বাটারি উল্লেখ্য। রঙীন ছবিগুলি সুন্দর —বিশেষ করে পাণ্ডুয়া, দুর্গা ও রেকর্ড কভার, রেডরুম ডেকর ও টি প্রসেসিং।

*

শিল্পী শ্রীমতী কমলা ঘোষ তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ১৬টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পী হিসাবে কমলা ঘোষ একেবারে অপরিচিতা নন। ইতিপূর্বে তিনি দু একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ও অন্যান্য যৌথ প্রদর্শনীতেও যোগদান করেছেন। শিল্পী অর্থনীতি শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং কিছুকাল স্থানীয় সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষালাভও করেন। ইতিপূর্বে এই শিল্পীর আঁকা কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজে পরিবর্তন লক্ষণীয়। নিসর্গ দৃশ্যের পরিবর্তে তিনি কমপোজিশন রচনায় ব্রতী হয়েছেন ও সেই সঙ্গে তেলরঙের সঙ্গে নানা উপাদানও ব্যবহার করেছেন। শিল্পী গভীর রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী—ফলে সুনির্বাচিত রঙ ও সম্ভবত সিমেন্ট ক প্লাস্টার জাতীয় উপাদান সংমিশ্রণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট কারুকার্য ফুটে উঠেছে। এই শ্রেণীর ছবিতে শিল্পী বেগুনী রঙ ব্যবহার করেছেন পর্যাপ্ত রূপে, তার সঙ্গে আছে খয়েরী নীল ও হলুদ রঙ। লাল রঙের মাত্র পরিমিত ব্যবহার লক্ষণীয়। শিল্পীর রচনারীতি সমবিমূর্ত ও প্রতীক জাতীয়। এই শ্রেণীর ছবির মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে ক্যালকাটা, ৭১—১ ও ক্যালকাটা, ৭১—২। যদিও দ্বিতীয়টি উল্লেখযোগ্য। দুটিই সমকালীন কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি—বোমাবর্ষণ, হত্যালীলা—ছি বিচ্ছিন্ন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র ক শিল্পী গভীর রঙের মধ্য দিয়ে সমকালী কলকাতার ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা করা চেষ্টা করেছেন। এ দুটির তুলনায় প্রসেশন নীরব হলেও অধিক অর্থব পুরোভাগের ফিগারগুলির বিষয়ে অধি তর সচেতন হলে এটি রসোত্তীর্ণ হ কমপোজিশনের দিক থেকে দি কাই অনেকের চোখে পড়ে। নীলরঙ ও রেখাপ্রধ পেভমেন্ট জোয়েলারসও অনেকের দৃ আকর্ষণ করে। উপাদানপ্রধান দ্বিত শ্রেণীর রচনাবলীতেও শিল্পী গভীর র ব্যবহার করেছেন, কিন্তু উপাদানম ভিত্তির ওপর রঙ লাগানোর ফলে রং ঔজ্জ্বল্য ও গভীরতা হ্রাস পেয়েছে, বিভি স্তরভেদ ফুটে ওঠেনি। শুধু তাই ন উপাদানপ্রধান হওয়ার জন্য এ জাত ছবিগুলির মধ্যে অঙ্কনক্ষেত্রের কারুকা অর্থাৎ টেক্স্চার বিশেষভাবে ফু উঠেছে, এমন কি কয়েক ক্ষেত্রে রিলিফে বৈশিষ্টও (rellevo) আত্মপ্রকাশ করেছে বলা বাহুল্য, এগুলির অধিকাংশই পরীক্ষা মূলক। দুটি কমপোজিশনের মধ্যে ১৩ন বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সবুজ, হলুদ ও রূপালী জাতীয় রঙ ব্যবহারের ফলে এটির মধ্যে যেন কাব্যসুষমা ফুটে উঠেছে অপরপক্ষে, ঘনসন্নিবিষ্টভাবে স্থূল রেখ ব্যবহারের ফলে ১২নং রচনাটি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মিউর‍্যাল কমপোজিশনও প্রয়া হিসাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও উপাদানমিশ্রি ভিত্তির পরিবর্তে শিল্পী ক্যানভাসের ওপর বিমূর্ত ছবিটি আঁকলে এটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত, কারণ এ জাত রচনায় ডিজাইন ও সোচ্চার উজ্জ্বল রং দুই-ই অপরিহার্য। উপাদানমিশ্রিত অঙ্ক ক্ষেত্রের ওপর সুনির্বাচিত রঙগুলি ঠি বিকশিত হয়ে ওঠেনি। শিল্পীর সাম্প্রতি রচনাবলী দেখে মনে হয় তিনি নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে উন্নতির পথে স্থি পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন।

চিত্রপ্রি

চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানে কৃষিক্ষেত্রের অবদান

যে কোন উন্নতিকামী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা হল অর্থ সরবরাহের অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করা। সম্প্রতি চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার অর্থসংস্থানের জন্য কিভাবে আরও সম্পদ আহরণ করা যায় সে সম্পর্কে বহু আলোচনা চলছে। যোজনা কমিশনের মতে গ্রামাঞ্চলে যে-সব কৃষক নতুন ধনী হয়েছেন তাঁদের উপর আরও বেশি করে কর ধার্য করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। কমিশনের মতে কৃষির উপর প্রধান প্রত্যক্ষ কর হল ভূমি রাজস্ব এবং তা একর প্রতি জমির উপর একটি ফ্ল্যাট হারে ধার্য করা হয়। তার ফলে আয় এবং কৃষিজাত সামগ্রীর দাম বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল হারে এই কর থেকে রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ১৯৭০-৭১ সালে ভূমি রাজস্ব এবং কৃষিগত আয়কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের মোট পরিমাণ হয়েছে ১৩৭ কোটি টাকা, এবং এই রাজস্বের পরিমাণ হল মোট কৃষিজাত উৎপাদনের ১ শতাংশেরও কম। অপর দিকে ১৯৭০-৭১ সালে আয়কর এবং অ-কৃষিগত আয় থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে হয়েছে ৪৭৩ কোটি টাকা এবং এটা হল কৃষি ক্ষেত্রের বাইরে সৃষ্ট আয়ের ২·৬ শতাংশ। ব্যক্তিগত আয়-কর ছাড়া যদি কোম্পানী আয়কর ধরা হয় তবে গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের আয়-উপার্জনকারীদের মধ্যে বৈষম্য আরও প্রকট হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রেও শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে করের বোঝা অপেক্ষাকৃত কম। সেজন্য যোজনা কমিশন মনে করেন, যে-সব কৃষক জলসেচ ব্যবস্থা, ভাল বীজ, সার, পোকানাশক ব্যবস্থা, স্বল্প সুদে ঋণ পাবার ব্যবস্থা এবং কৃষির উন্নতির জন্য গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের উপর আরও কর ধার্য করার এবং বর্তমানে প্রচলিত কর-গুলির হার আরও বাড়াবার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

যোজনা কমিশনের মতে কৃষিক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর সম্পদ কর ধার্য করা যে শুধু অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করার উপায়, তা-ই নয়। কৃষিক্ষেত্রে সম্পদের বৈষম্য কমিয়ে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যও এই করের উপযোগিতা খুবই বেশি।

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকেই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। খাদ্যশস্যেও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর্যায়ে আমরা আসতে পেরেছি বলে সরকার এবং যোজনা কমিশন দাবি করছেন। "সবুজ বিপ্লব" দেশে আদৌ হয়েছে কিনা এ-বিষয়ে যদি কোন মতভেদ থাকে, তবুও একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কৃষি-উৎপাদনের, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার বিগত চার বছর ধরে খুবই সন্তোষজনক এবং গত বছর এই উৎপাদনের হার চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে হারে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে সেই হারে রাজস্বের পরিমাণ না বাড়ায় চতুর্থ যোজনার অর্থসংস্থানে যে ফাঁক আছে তা দূর করার পথে সরকারকে অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। অনুমিত হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালে ঘাটতি অর্থসংস্থানের মোট পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকার উপর দাঁড়াতে পারে যদিও গত বাজেটে অর্থমন্ত্রী ২২০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। বর্তমানে জিনিসপত্রের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। ইতিমধ্যেই সরকার অতিরিক্ত লেভি ধার্য করে ৭০ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায়ও জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। অথচ বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি আরও তৎপর হলে কৃষিক্ষেত্র থেকে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে পারতেন এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে আরও কম পরিমাণে ওভার-ড্রাফট নিতে পারতেন। কেন যে কৃষিগত আয়কর ব্যবস্থার সংস্কার হচ্ছে না তা পরিষ্কার। কারণ, সরকার গ্রামাঞ্চলের একটি বিরাট নির্বাচকমণ্ডলীকে চট করে চটাতে সাহস পাচ্ছেন না।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের ক্রমোন্নতি

ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের (Industrial Development Bank of India) সাত বছর পূর্ণ হয়েছে। ১৯৬৪ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হিসেবে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকটি স্থাপিত হয়। শিল্প-মূলধন সরবরাহের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি এখন শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। সম্প্রতি এই ব্যাংকের সপ্তম বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০-৭০ সালে এই ব্যাংক বিভিন্ন খাতে শিল্পগুলির সাহায্যের জন্য ৬৫·২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল এবং তার মধ্যে ৫২·৩ কোটি টাকা প্রকৃতপক্ষে বণ্টিত হয়েছিল। ১৯৭০-৭১ সালে মঞ্জুরীকৃত অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ হয়েছে ১৩১·৯ কোটি টাকা অর্থাৎ, প্রায় দ্বিগুণ; তার মধ্যে বণ্টিত হয়েছে ৭৮·৪ কোটি টাকা। মঞ্জুরী-কৃত অর্থ-সাহায্যের মধ্যে রপ্তানির অর্থ-সংস্থানের জন্য প্রত্যক্ষ ঋণ এবং পুনঃ ঋণ প্রদানের সুবিধাও (re-financing facilities) আছে। এই ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১৯৭০-৭১ সালে নতুন বিনিয়োগের পক্ষে একটি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং সামগ্রিক-ভাবে বে-সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭০-৭১ সালে শিল্পগুলিকে এই ব্যাংক কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বেড়েছে। শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক যে সকল প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য করেছে তার মধ্যে আছে ভারতীয় কৃষক সার সমবায় লিমিটেড (Indian Farmer's Fertilizer Co-operative Limited); অনুরূপ আরেকটি প্রকল্প হল Escorts Tractors Ltd.-এর কৃষি-ট্র্যাক্টর নির্মাণ-কারী সংস্থা। তাছাড়া অ্যালুমিনিয়ম শিল্পও যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যক্ষ সাহায্য (direct assistance) শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে পেয়েছে। যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে তার মধ্যে আছে Braithwaite & Company-র একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প, Shri Bhenkatachalapathi Mills-এর একটি ইউনিট, Plastic Resins & Chemicals-এর একটি প্রকল্প এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক কারিগর-নির্ভরশীল প্রকল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। পূর্বে শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক ছিল অন্যান্য উন্নয়ন-ব্যাংক (Development Banks) বা শিল্প মূলধন সরবরাহকারী সংস্থাগুলির প্রধান হিসেবে একটি সমন্বয়কারী ব্যাংক। কিন্তু ১৯৭০

সাল থেকে এই ব্যাংক নতুন শিল্প স্থাপনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে। যে কোন উন্নতিকামী দেশে বে-সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পোন্নয়নে কয়েকটি মূলধন সরবরাহ-কারী সংস্থা বা উন্নয়ন-ব্যাংক থাকা দরকার। জাপানে গত শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্প-ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বের বহু উন্নতিশীল দেশে আমরা উন্নত দেশগুলির অনুকরণে শিল্প-ব্যাংক দেখতে পাই। ভারতে এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান হল ১৯৪৮ সালে স্থাপিত শিল্প ঋণ-সরবরাহ কর্পোরেশন (Industrial Finan-cial Corporation)। তার আগে থেকেই একটি আলাদা শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে এই ব্যাংকের কাজের রেকর্ড এমন কিছু ছিল না যাতে আশা করা যায়, বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করার দায়িত্বের বোঝা বেশির ভাগ এই ব্যাংকের পক্ষে বহন করা সম্ভব। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে এই ব্যাংকের কার্যাবলী অনুধাবন করলে দেখা যায়, প্রকৃতই এই ব্যাংক দেশের শিল্পোৎ-পাদন বৃদ্ধিতে মূলধনের অভাব যাতে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতে পারে তার চেষ্টা করছে; সেই সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যের অর্থসংস্থানেও এই ব্যাংক ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

সুব্রত গুপ্ত

পাহাড়ী সান্যাল

মানুষ অতুলপ্রসাদ

॥ সাত ॥

এবার যে সন্ধ্যার কথা বলতে চলেছি তাই বলি। অতুলদার বাড়িতে গিয়ে যথারীতি চায়ের পর্ব শেষ করা গেল। অতুলদা এই ফাঁকে একবার বলে নিয়েছেন—"ভয় হচ্ছিল। ভাবছিলাম আবার হয়তো তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ!"

শুনে আমি বোধহয় একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসেছিলাম।

আমি ফরাসে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসলাম। অতুলদা চোখে চশমা এঁটে আগে তাঁর লেখা গানখানি পড়ে শোনালেন। গানের কথাগুলি খুবই ভাল লাগল শুনতে। কাজেই গানের ওই কথার সঙ্গে কি ধরনের সুর দেওয়া হয়েছে সেটা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে হারমোনিয়মে সুর টিপলাম। অতুলদা গানের প্রথম ছত্রটি যখন গাইলেন তখন আমি হঠাৎ হারমোনিয়ম থামিয়ে বলে উঠলাম, "এ কি অতুলদা! এ যে মণ্টুদার 'যদি দিন না দেবে'-র সুর!"

অতুলদা খুব উঁচু গলায় হেসে উঠে বললেন, "আরে তা তো নিশ্চয়ই। তার সুরটা এমন করে মনে সাড়া তুলেছিল বলেই তো এই গানটা লিখতে পেরেছি।"

গানটির প্রথম ছত্রটি হল : "কত গান তো হল গাওয়া/ আর মিছে কেন গাওয়া"। এ গানখানি কি পরিমাণ খ্যাতি অর্জন করেছে সেটা বোধহয় কাউকে বলে দিতে হবে না। সারা ভারতবর্ষময় তো এ গান শুনতে পাওয়া যায় বটেই, ভারতবর্ষের বাইরে যে সব অতুল-প্রেমিক গায়ক-গায়িকা আছেন তাঁরা বিদেশী মজলিসে এ গান যে বহুবার গেয়েছেন সে কথাও আমার শোনা আছে।

এই গানটি শিখে নেবার পর আমি যখন পুরো গানটি গেয়ে অতুলদাকে শোনালাম তখন তাঁর আদরের ঘটার কথা আপনাদের কাছে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই।

এর পর থেকে যাঁরা আমার কাছে "যদি দিন না দেবে" গানখানি শুনেছিলেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের কাছেই একই সুরে গাওয়া অতুলপ্রসাদের লেখা "কত গান তো হল গাওয়া" গাইতে আরম্ভ করলাম। কালক্রমে মানুষের মন থেকে মণ্টুদার লেখা ও গাওয়া "যদি দিন না দেবে" গানখানি মুছে গেল। আর মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বেঁচে রইল অতুলপ্রসাদের "কত গান তো হল গাওয়া"।

আজকের দিনে বহু লোক যাঁরা মণ্টুদার গানখানি শুনে একসময় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তাঁদের বোধ হয় আর মনেই নেই যে মণ্টুদা "যদি দিন না দেবে" লিখেছিল বা গেয়েছিল কোনদিন। সেদিন অতুলদা "কত গান তো হল গাওয়া" গানখানি রচনা

করেছিলেন মণ্টুদার সুরে, আজ লোকে হয়তো ভুল করে একথা ভাবলে আশ্চর্য হব না যে কবে যেন অতুলদার দেওয়া সুরে মণ্টুদা "যদি দিন না দেবে" গানটি লিখে-ছিল। মানুষের মনকে অতুলপ্রসাদের কবি-সত্তা যে কতখানি প্রভাবিত করেছিল এই গানখানি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ কথা অস্বীকার করব না যে মণ্টুদার লেখা গানখানি অত্যন্ত সুরচিত হয়েছিল, কিন্তু অতুলপ্রসাদ যে অতুলনীয় তা কী করে অস্বীকার করা যায়। এই গানখানি সাহানা দেবী তাঁর রেকর্ডের মাধ্যমে অদ্ভুত সুন্দর-ভাবে প্রচার করেছেন মানুষের কাছে। এর জন্য আমি নিজে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সাহানা দেবী যে সুগায়িকা সে সম্বন্ধে কারও মনে কোন সন্দেহ থাকবার কারণ নেই কিন্তু সাহানা দেবী যে সত্যিই একজন দরদী গায়িকা সেটা অতুলপ্রসাদের এই গানখানি রেকর্ডের মাধ্যমে শুনে আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

অনেক কথা লেখার মাঝে অতুলদার কাছে প্রথম যেদিন একক গান শিখতে বসে-ছিলাম সেটা কেমন করে যেন দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা না লিখলে হয়তো বা এ লেখার কোন সার্থকতাই থাকবে না। কাজেই সেখানেই ফিরে আসা যাক।

আপনাদের আগেই জানিয়েছি, মিস্টার এ পি সেনের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা। এও জানিয়েছি তারপর মাসাধিককাল তাঁর সঙ্গে আমার কোন রকম সাক্ষাৎ হয়নি।

হঠাৎ একদিন সকালে সত্যকুমারদা আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, "আজ সন্ধ্যাবেলা তুমি অতুলদার বাড়িতে যাবে। গাড়ি আসবে তোমায় নিতে। প্রস্তুত থেকো। আমিও অবশ্য যাব পরে। সেটা তোমাদের গাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে যখন খাওয়ার পর্ব আরম্ভ হবে, তখন।"

সত্যকুমারদাকে আমার তখন প্রায় দেবদূত বলে মনে হয়েছিল। সারাদিন ছটফট করেছি কখন সন্ধ্যা হবে, কখন গাড়ি আসবে। এটা কি অভিসারের চাঞ্চল্যের মতই কোন ভাব? জানি না। তবে সেদিন সাত-আট ঘণ্টাটা সাত-আট দিনেরও বেশি মনে হয়েছিল।

তখন স্কুলে পড়ি, কাজেই কামাই করবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং শরীরটা আমার স্কুলে হাজির হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মন কামাই করেছিল। ক্লাসে কি পড়ান হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই তেমন খেয়াল ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমাকে এ-কথাও দু-চারজনের কাছে শুনতে হয়েছিল "আমা মাজ্‌রা ক্যা হ্যায়? আজ কুছ্ খোএ খোএ সে নজর আতে হো।" অর্থাৎ "ওহে ব্যাপারটা কি? আজ তোমাকে হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া বলে মনে হচ্ছে যেন?"

আমি খুব উচ্চকণ্ঠেই বলেছিলাম, "না, কিছুই তো নয়।" কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলাম অজকের দিনে আমার মনটা অন্য পথের সন্ধানে।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছি। সন্ধ্যাও হয়েছে। বাড়ির বারান্দায় এধার থেকে ওধার হাঁটাহাঁটি করছি। হঠাৎ দূরে একটা হেড-লাইট দেখা গেল। বুঝলাম নিশ্চয় মিস্টার এ পি সেনের গাড়ি। আজকের দিনে হলে এ কথাটি নিশ্চিতভাবে কিছুতেই বোঝা যেত না কারণ আজ গাড়ির ঠ্যালায় মানুষ সরে যায়। তখনকার দিনে মোটরকার বস্তুটি ছিল বিরল। সারাদিনে একখানি গাড়ি দেখতে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। আর সারা লখনৌ শহর জুড়ে একশখানি মোটরকার ছিল কি না সন্দেহ। কাজেই ঠিকই বুঝেছিলাম মিস্টার সেনের গাড়িই আসছে।

গাড়িতে উঠে যখন বসলাম তখন প্রচুর আনন্দ। গাড়ি যখন চলমান তখন কিন্তু অসম্ভব নার্ভাস লাগছে। কারণ একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, সত্যকুমারদা সকালে এ-কথাও বলে গিয়েছিলেন যে আজ থেকে মিস্টার সেন আমাকে গান শেখাতে আরম্ভ করবেন। কাজেই বুঝতেই পারছেন গাড়িতে উঠে কেন এত নার্ভাস বোধ করছিলাম। গাড়ির বেগের সঙ্গেই বোধ হয় আমার নাড়ির চাঞ্চল্যটা তাল রেখে চলেছিল। হঠাৎ দেখলাম মিস্টার এ পি সেনের কএসর্‌বাগের বাড়িতে গাড়ি ঢুকছে।

গাড়ি থামল বটে কিন্তু আমার হৃদয়ের স্পন্দন বোধ হয় আরও বেড়ে গিয়েছিল।

বোধ হয় গাড়ির শব্দ শুনেই মিস্টার সেন নিজেই পোর্টিকোতে বেরিয়ে এলেন আর আমাকে অত্যন্ত আদর করে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

আবার সেই আশ্চর্যজনক পরিবেশ। সেই সুন্দর করে সাজানো গোছানো বৈঠক-খানা—থুড়ি ড্রইংরুম। তবে এবার মিস্টার সেনের হাসিখুশি চেহারাটা দেখে বুঝি বা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

মিস্টার সেনের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছই তখন যতদূর মনে পড়ে সাড়ে ছটা বেজে গেছে। আবার সেই বিপুল চায়ের সরঞ্জাম: বয়-বেয়ারাকে হাঁকডাক। হার-মোনিয়মটি দেখলাম আগের থেকেই ফরাসে রাখা আছে। ফরাস বলতে কিন্তু বাঙাল ঘরের ফরাস নয়। বাঙালী ঘরের জীর্ণাঙ্গ গালচেও নয়। অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট চেহারার গালিচা। অর্থাৎ যাকে সত্যিই বলা যা কার্পেট।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ এই অবান্তর কথাগুলির জন্য যেন আমায় ক্ষমা করেন কারণ আমার মনে কিরকম একটা ধারণ আছে যে লিখতে বসে কিছুটা বিন্যাসে প্রয়োজন আছে। আপনাদের যদি ভাল লাগে তাহলে এইরকম স্থানগুলি শু একবার তাচ্ছিল্যভরে চোখ বুলিয়ে এগি যাবেন।

ফরাসে গিয়ে বসলাম। মিস্টার তাঁর লেখা গান "যাবনা যাবনা যাবনা ঘ বাহির করেছে পাগল মোরে"-র কথাগ আগে আমাকে শুনিয়ে দিলেন। একে অ বাংলায় দিগ্‌গজ, তার বুক ঢিপঢিপের কানের মধ্যে এত চেঁচামেচি করছে গানের কথাগুলির মর্মোদ্ধার মোটেই ক পারলাম না। কিন্তু যে মুহূর্তে গানখানি গাইতে আরম্ভ করলেন যেমন যেমন সুরবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এগে থাকলেন—আমিও কেমন যেন অভিভূত গেলাম। গানের কথায় মনের মধ্যে সাড়া জাগেনি সে কথা যখন সুরের দিয়ে কানে গেল তখন আশ্চর্য অনুভব করলাম, বুক ধড়ফড়ানি গেছে। সারা মনে কেমন যেন আনন্দময় স্পন্দন অনুভব করছি।

কারণটা আজ বুঝতে পারি। ভাষার সঙ্গে সেদিন সখ্যতা না থাকে ওই সুরের ভাষার সঙ্গে আমি সেই যর অন্তরঙ্গ। (ক্রম

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ১৬ ॥

১৯৫৫ সাল। নয়া গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। কেননা তখনও পর্যন্ত নির্বাচন পদ্ধতি, এক ইউনিট গঠন এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের মতো মৌলিক প্রশ্নগুলোর সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা-ভিত্তিক সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর বিলুপ্তি সাধন ঘটিয়ে এক ইউনিট অর্থাৎ একটিমাত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এর আগে এক ইউনিটের প্রতি সমর্থন লাভের আশায় কেন্দ্রীয় চক্রান্ত সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গা-গড়া করতে সক্ষম হয়েছে। এই চক্রান্তের ফল হিসেবে সীমান্ত প্রদেশে পুলিস বিভাগের একজন প্রাক্তন আই জি, সরদার রসিদ খানকে, মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসানো হলো। সিন্ধু প্রদেশেও ক্রীড়নক সরকার ক্ষমতাসীন হলো।

একথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ক্ষমতাসীন দলের পূর্ব প্রতিশ্রুতির জের হিসেবে একটার পর একটা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন হচ্ছিলো, তখন পাকিস্তানে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর বিলুপ্তি সাধনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে। সীমান্তের প্রবীণ নেতা খান আবদুল গফফর খান, সিন্ধুর আইয়ুব খুরো ও জি এম সৈয়দ এমন কী পাঞ্জাবের মিঞা ইফতেখার উদ্দীন এক ইউনিট গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট-বিরোধী আন্দোলনের ... বাংলা ... প্রদেশগুলি ... থাকলেও এক ইউনিট গঠনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করা হলো। কেননা পূর্ব বাংলাকে শোষণের উদ্দেশ্যে সংখ্যাসাম্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনার ষড়মন্ত্রে নয়া শিল্পপতি গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্ম-ভিত্তিক সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো কেন্দ্রীয় চক্রান্তের সমর্থন দিলো। কিন্তু বৃহত্তর পরিবেশে ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার আশংকায় সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোর এক শ্রেণীর মুসলিম লীগ-মার্কা ভূস্বামীর দল এক ইউনিট প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করলেন। আশ্চর্যজনকভাবে এইসব ভূস্বামীর দল রাতারাতি রং পাল্টিয়ে এক ইউনিট-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এলো। অন্যদিক দিয়ে বিচার করলে, এটাই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে নয়া শিল্পপতি আর পুরানো সামন্ত-প্রভুদের প্রকাশ্য শ্রেণী সংগ্রাম।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এক ইউনিট বাস্তবায়িত করবার ব্যবস্থা যখন পাকা হয়ে গেলো, তখন গোলাম মোহাম্মদ-আইয়ুব-ইস্কান্দার চক্র মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করলো যে, এক ইউনিটের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে নিজস্ব কোন গ্রুপ না থাকায় বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রমাদ গুনলেন। কোন রকম পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই গভর্নর জেনারেলের ফরমান জারী হলো। পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছেন। প্রথম পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও জনাব আলী লেবাননের এক মহিলার গলায় মাল্যদান করেছেন।

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে সবার অজান্তে ব্যুরোক্রেসীও নিজেদের বলিষ্ঠ স্থান করে নিয়েছে। সামন্ত প্রভু,

নয়া শিল্পপতি, সামরিক জেনারেল, ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে ব্যুরোক্রেসীর সংমিশ্রণে প্রাসাদ-চক্রান্তের নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবার প্রধানমন্ত্রীর গদীতে এলেন পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। বৃটিশ আমলের আই, সি, এস, এই চৌধুরী সাহেব বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর সময়ে পাকিস্তান সরকারের চীফ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পূর্ব বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে আঁতাত করে নয়া মন্ত্রিসভা গড়লেন। মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে শেরে বাংলা ফজলুল হক 'দেশদ্রোহীতার' অভিযোগে অন্তরীণাবদ্ধ হয়ে ছিলেন, সেই হক সাহেব নতুন মন্ত্রি-সভায় স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ দখল করলেন। এ ছাড়া নোয়াখালির হামিদুল হক চৌধুরী, কুমিল্লার নূরুল হক চৌধুরী, পশ্চিম বাংলার মোহাজের আব্দুস সাত্তার, রংপুরের আবু হোসেন সরকার প্রমুখ কে এস পি দলের প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করলেন। সমগ্র পূর্ব বাংলায় দারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো।

জনাব হামিদুল হক চৌধুরী এই সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের পক্ষে 'সিয়াটো' চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন। এ ছাড়া সুয়েজ-খাল সংকটের সময় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন করেন। ফল হিসেবে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের এতোদূর অবনতি ঘটে যে পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নির্দেশে কায়রোতে পি, আই, এ, বিমান অবতরণ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রায় দশ বছর পর পুনরায় কায়রোতে পি, আই, এ বিমান অবতরণের অনুমতি দেয়া হলে উদ্বোধনী-ফ্লাইট দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং দুইজন ছাড়া ১৪২ জন যাত্রী নিহত হন।

পাকিস্তান অবজারভার, পূর্বদেশ, ওয়াতন এবং চিত্রালী পত্রিকার মালিক এই হামিদুল হক চৌধুরী বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন।

অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মোহাজের আব্দুস সাত্তার সাহেব পরবর্তী-কালে ঢাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে চাকুরী করেন। ইনিই হচ্ছেন বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের সামরিক জানতার প্রধান নির্বাচনী কমিশনার এবং এ'রই তত্ত্বাবধানে পূর্ব বাংলার দখলীকৃত এলাকায় তথাকথিত উপ-নির্বাচনের অছিলায় নির্বাচনের প্রহসন চলছে। অথচ সত্তরের সুষ্ঠু নির্বাচনের পর বিচারপতি সাত্তারের দস্তখতে সরকারী গেজেটে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী হিসেবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। অন্যদিকে এককালের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী নেতা রংপুরের আবু হোসেন সরকার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন।

পাকিস্তানের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের মৌলিক নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিরাট আন্দোলন গড়ে তুললেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যন্তরেও দক্ষিণ ও বামপন্থী মনোভাবাপন্নদের মধ্যেও প্রচণ্ড কোন্দল দেখা দিল। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান একযোগে প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কেননা এই জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজেদের আদর্শ ঘোষণা করেছে। অবশ্য আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখনও পর্যন্ত নির্বাচন-পদ্ধতির প্রশ্নে নিজের মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ঢাকার সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন বসলো। বহু বাক-বিতণ্ডার পর ভাসানী-মুজিবের বিজয় ঘোষিত হলো। প-
পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ন-
থেকে চিরকালের জন্য 'মুসলিম' শব্দটি ব-
পড়ে গেল। আওয়ামী লীগের জ-
মাত্র ছ' বছরের মধ্যে এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠা-
দ্বার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত হ-
পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত এবং র-
নৈতিক পরিবেশের কথা চিন্তা করলে
ধরনের একটা রাজনৈতিক দলের না-
'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়াটাই এ-
বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বলা চলে বইকি।

আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল
বেশনেই ফরিদপুরের অ্যাডভোকেট অ-
সালাম খানের নেতৃত্বে প্রায় ৫০

দক্ষিণপন্থী নেতা পদত্যাগ করে একটা পৃথক আওয়ামী মুসলিম লীগ স্থাপন করেন। এ'দের সমর্থক ১৮ জন পরিষদ সদস্যদের গ্রুপ পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করল। অ্যাডভোকেট সালাম কে এস পি মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হলেন আর আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যালঘু দলে পরিণত হল। তবুও ভাসানী-মুজিব নীতির প্রশ্নে অবিচল রইলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিব তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিবাদী হিসাবে অভিযুক্ত হলে এই সালাম খানই তাঁর প্রধান কৌসুলী হিসাবে ট্রাইব্যুনালে মামলা পরিচালনা করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে অ্যাডভোকেট সালাম আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মোকাবেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং বর্তমানে নুরুল আমীনের পি ডি পির নেতা হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক জানতাকে সমর্থন জানাচ্ছেন।

যাক যা' বলছিলাম। আওয়ামী লীগ থেকে নীতির প্রশ্নে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাপন্ন নেতৃবৃন্দ বেরিয়ে যাবার পর মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দলে দলে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন যুবক আওয়ামী লীগে যোগদান করল। এই সর্বপ্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানে শরিক হল। সত্যি কথা বলতে কী আওয়ামী লীগের মাধ্যমে জনসাধারণ গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়ার দরুনই প্রগতিশীল ও বামপন্থী 'গণতন্ত্রী' দল এ সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে নি।

অন্যদিকে মাত্র বছর সাতেক আগেকার ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান এখন বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়ে বাংলা মায়ের আসল রূপ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গ, গ্রাম বাংলার শ্যামল প্রান্তর, বাউল-ভাটিয়ালী-ভাওয়াইয়া গানের সুর, মেঠো-মানুষের সরল মন আর রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের দুখিনী বাংলার চেহারায় শেখ মুজিবের নবজন্ম হলো। কী আশ্চর্য? এতোদিন কী তাহলে আলেয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম?

[ক্রমশ]

কবিতা ও ছন্দ

কবিতায় ছন্দের ব্যবহার কি একেবারেই উঠে যাচ্ছে? যে-কোনো পত্র পত্রিকা দেখলে আজকাল হঠাৎ যেন তাই মনে হয়।

মিলের বন্ধন থেকে কবিতার মুক্তি পেতে অনেকদিন লেগেছিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তা ছিল বাধ্যতামূলক, ততদিনই বন্ধন। মরুভূমিতে বসবাস করা কষ্টকর কিন্তু মানুষ তো মরুভূমিতেও বেড়াতে যায়। এক সময় লাইনের শেষে মিল দিতে পারাই ছিল কবিত্বের পরীক্ষা—তার ফলে রাশি রাশি আড়ষ্ট কবিতা রচিত হয়েছে। অন্ত্যমিলের দায়িত্বে অনেক সময় চিন্তা বা বক্তব্যকে ঘুরিয়ে দিতে হয়েছে। মাইকেল বা গিরীশ মিল বর্জিত কবিতা রচনা করে পরবর্তী কবিদের পথ প্রশস্ত করে দিলেন। কিন্তু একথাও ঠিক, কোনো কোনো সময় উপযুক্ত সমিল কবিতা এখনও আচমকা ভালো লেগে যায়। কবিতায় শব্দ-মিলের আবেদন চিরকালই থেকে যাবে। কোন্ কবি কখন সেই মিল ব্যবহার করবেন—সেটা তাঁর স্বাধীনতা। কিন্তু আধুনিক কবিতা মিল বর্জিত হবে—এটা এক ধরনের গোঁড়ামি। যতদিন কবিতা রচিত হবে—ততদিন মিলের মাদক আবেদন থাকবেই।

মিলহীন ছন্দোবদ্ধ কবিতায় গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা কাব্য সমৃদ্ধ। মাঝখানে গত কয়েক শো বছরের কীর্তি বাদ দিলে এই ধারা সংস্কৃত কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকে বলেন, কবিতায় মিলের ব্যাপারটা আরব দেশ থেকে আমদানি। ইসলামের আগমনের পরই আমাদের দেশের সাহিত্যে এই আরব্য অলংকারটি যুক্ত হয়েছে। তাতে ক্ষতি তো কিছু হয়ইনি, বরং সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সাহিত্য। মধ্যযুগে যখন সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশ্বজোড়া দৈন্যদশা, তখন আরব সংস্কৃতিই তাদের পুনর্জীবিত করেছে। যাই হোক, আধুনিক কালের চিন্তা অনুযায়ী মিলহীন সছন্দ কবিতাই কবিদের কাছে সবচেয়ে সাবলীল মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও গ্রহণ করেছেন এই রীতি। একটু উদাহরণ :

তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল গান্ধার
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন করে

কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।

এই রীতির পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে—এখানে মিলের জন্য কলম কামড়াতে হয় না, [illegible] করতে হয় না, চিন্তাকে বদলাতে হয় [illegible] মধ্যে যা অনুরণিত হচ্ছে তা [illegible] ভাষায় রূপ গ্রহণ করতে পারে। [illegible] কবিতায় মিল দেওয়া একটা শক্ত কাজ —এটা অকবিদেরই ধারণা। প্রকৃত কবির

পক্ষে, মিল দেওয়া নিছক ছেলেখেলার মতন সহজ। মিল দেওয়ার জন্য থামতে হয় কদাচিৎ। তবে চিন্তা বা বক্তব্য বদলানো বা ঘোরানোর ঝুঁকিটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সারা পৃথিবী জোড়া একটা হাওয়া ওঠে যে, কবিতার মধ্যে পরিশ্রমের চিহ্ন থাকা কবিতার পক্ষে ক্ষতিকারক। কবিতা হবে স্বতঃস্ফূর্ত, যে-কোনো শিল্পেরই মতন। বস্তুত কোনো শিল্পই নিছক স্বতঃস্ফূর্ত নয়—আবার শুধুই শ্রমের ফসলও নয়। প্রত্যেক শিল্প সৃষ্টির পেছনেই আছে এক ধরনের প্রেরণা এবং প্রভূত পরিশ্রম—কিন্তু সৃষ্টির পর সেই পরিশ্রমের আর কোনো চিহ্ন থাকে না। কোনারকের সুরসুন্দরী মূর্তি দেখে যেমন মনে পড়ে না বাটালি-ছেনির ঘায়ের কথা। কিন্তু অনেকে বললেন, কবিতার শরীরে ছন্দের আভরণই এক ধরনের পরিশ্রমের চিহ্ন। স্বতঃস্ফূর্ততার সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন সুররিয়ালিস্টরা—কিন্তু মোটামুটি হিসেবে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই পৃথিবীর সব কটি উল্লেখযোগ্য ভাষায় গদ্য কবিতা লেখার প্রচলন হলো।

ছন্দটা পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার কিনা এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। অকবির পক্ষে নিশ্চয়ই পরিশ্রমসাধ্য, কবির পক্ষে নয়। ছন্দ ব্যবহার তাঁর কাছে কথাবার্তার মতন স্বাভাবিক হয়ে আসে। অভিজ্ঞ গায়কের পক্ষে যেমন গলা থেকে বেসুরো আওয়াজ বার করাই শক্ত। মৃত্যুর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের ডিকটেশান দেওয়া কবিতাও ছন্দোবদ্ধ। এবং একথা মানতেই হবে, কোনারকের সুরসুন্দরীর মতনই, অনেক ছন্দ-মিল সমৃদ্ধ কবিতা পাঠের সময় বাটালি-ছেনির কথা মনেই পড়ে না।

যাই হোক, গদ্য কবিতাও স্বাগত হবার যোগ্য। কারণ এখানে কবিদের স্বাধীনতার প্রশ্নটিই মূল্যবান। কবি কোন্ আঙ্গিকে লিখবেন সেটা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। কবিতা লেখার সময় কতকগুলি নির্দিষ্ট রীতির কথা মনে রাখা সত্যিই হাস্যকর। কবি যখন যেরকম খুশি আঙ্গিকে লিখবেন—গত কয়েক দশক ধরে কবিরা নানা আঙ্গিকেই লিখেছেন।

আমরা যাকে চলতি কথায় 'গদ্য কবিতা' বলি, যা আসলে শুধু কবিতাই—মৃত্যুর আগে শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ সেরকম যথেষ্টই লিখেছেন—কিন্তু কল্লোল আমলের কবিরা যখন ঐ ধাঁচের কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন চারদিকে খুব শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, কবিতা লেখার ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেল। ছন্দ আর মিলের ঝামেলা যখন নেই, তখন যে সে কবিতা লিখবে। কবিতার আর মানসম্মান রইলো না। গদ্য কবিতায় অসংখ্য প্যারোডি বেরিয়েছিল—অনেক শিক্ষিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও এই প্রকার কবিতাকে "গবিতা" বলে বিদ্রূপ করেছেন। সেই মূঢ়তার কাল পার হয়ে গেছে। ছন্দ ব্যতিরেকেও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে। অনেকে অবশ্য এই কবিতার মধ্যেও এক প্রকার ছন্দ খুঁজে পেয়ে "গদ্যছন্দ" নাম দিয়েছেন এবং স্ক্যান করে সেই ছন্দ দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন—কিন্তু এ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই।

মিল সম্পর্কে যা বলেছি, ছন্দ সম্পর্কেও তাই—অর্থাৎ ছন্দ ভাঙার অর্থ নয় ছন্দকে চিরতরে বর্জন করা। ছন্দের আকর্ষণ কোনোদিন ঘুচবার নয়। আর কিছু না হোক, কবিতাকে স্মরণযোগ্য করে রাখার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আছে ছন্দের। সেইজন্য আঙ্গিক গ্রহণের স্বাধীনতা পাবার পর কবিরা ছন্দকে ভেঙেছেন যেমন, তেমনই

অথবার কখনো কখনো পরার সমালোচনা প্রয়োগ করেছেন ছন্দকে। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা যেমন ছন্দ বাদ দেওয়া কবিতা লিখেছেন তেমনি ছন্দে গাঁথা কবিতাও লিখেছেন অনেক। যতদূর জানি, সমর সেন বা অরুণ মিত্র কখনো ছন্দ-সমন্বিত কবিতা লেখেন নি, আবার মঙ্গলা-চরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ কবিরা ছন্দের দুর্ধর্ষ পরীক্ষা করেছেন। "গদ্য কবিতা"র প্রচলনের পরেও ছন্দ বা মিল একটুও গৌরব হারায়নি।

কেউ কেউ বলেন, "গদ্য কবিতা" লেখার আগে কবিদের ভালো করে ছন্দ শিখে নেওয়া উচিত। কিন্তু ছন্দ জানার পরীক্ষা নেবে কে? যিনি কোনো কবিকে বলবেন, তুমি ছন্দ জানো কিনা প্রমাণ দেখাও তো—তিনি উপহাসের যোগ্য। ছন্দ একেবারে না জেনেও কবিতা লেখা যায়, যেমন প্রভূত ছন্দ জানা থাকলেও কবিতা লেখা যায় না। কবিতা ও গদ্যের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সীমা-রেখা আছে, সেটা যে জানে সে জানে, যে জানে না—তার কোনো আশা নেই।

কবিকে কোনো ব্যাকরণ মেনে লেখার দরকার নেই, কবিদের লেখা অনুযায়ী ব্যাকরণ নির্মিত হয়। কবিকে জানতে হয়, যে ভাষায় তিনি লিখছেন, সেই ভাষার সমস্ত খুঁটিনাটি। সেই ভাষাজ্ঞান এমন গভীর ও প্রখর হওয়া দরকার যাতে তিনি কখনো প্রয়োজন হলে ভুল ভাষা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করবেন না। জ্ঞান শব্দটি হয়তো এখানে ঠিক প্রযোজ্য নয়—ভাষার কান বললেই ঠিক বোঝায়। এই ভাষার কান যাঁর আছে, তাঁর কাছে ছন্দ শেখা তো তুড়ি মারার মতন সহজ ব্যাপার।

যে প্রশ্নটা প্রথমে তুলেছিলাম, এখন কি ছন্দ বাদ দিয়েই অধিকাংশ কবিতা লেখা হচ্ছে? যদি হয় তবে তার কারণ কি? আমার সামনে একটি লিটল ম্যাগাজিন রয়েছে, নাম 'অনাদিন'। এতে আছে প্রায় ৬০ জন কবির কবিতা—অনুবাদ কবিতা-গুলি বাদ দিয়ে। প্রথম থেকে উল্টে দেখছি প্রায় সকলেই ছন্দ বাদ দিয়ে লিখেছেন। এ সব কবিতা ভালো কি খারাপ, সে প্রশ্নের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু একথা মনে হচ্ছে, প্রত্যেক কবিতায় ছন্দ বাদ দেওয়া অবধারিত ছিল না। ছন্দ বাদ দেওয়া কবিতায় সাধারণত বক্তব্য অনেক স্পষ্ট বা সোজাসুজি থাকে অথবা কবির নিজস্ব আবেগ ফোটাবার জন্য শব্দ নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্কতা থাকা দরকার—প্রত্যেকটি শব্দের উপস্থিতিরও যাতে মূল্য থাকে। এর মধ্যে সব কবিতায় তো সেরকম দেখছি না।

যে কবিতাগুলিতে সরাসরি ছন্দ বাদ যায়নি, সেগুলি এক ধরনের ঢিলেঢালা পয়ারে লেখা। (পয়ার বোধ হয় এই ছন্দের সঠিক নাম নয়—অন্য একটা কি যেন বিজ্ঞানসম্মত নাম আছে, কিন্তু পয়ার বললে যে ছন্দের কথা মনে পড়ে—আমি তার কথাই বলছি।) কিন্তু এই ছন্দটির ব্যবহার সম্পর্কেও সব জায়গায় সঠিক যুক্তি পাওয়া যায় না। বাংলার অন্যান্য ছন্দের চেয়ে এই পয়ার ছন্দটি এখন বহুল প্রচলিত, তার কারণ এই ছন্দটি অনেকটা আমাদের মুখের ভাষার সিনট্যাক্সের কাছাকাছি। এই ছন্দকে আরও গতিশীল করার জন্য পর্বের মধ্যে এক আধ মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি—এই ছন্দের ভাঙা ভাঙা অসংগত ব্যবহার। যেমন, 'রাত্রির সিঁড়ি ভাঙা পথ শেষে এইবার/হৃদয় আমার, পলাশের রক্তিম শাখায়।' এটাকে কি ছন্দ বলা যাবে? আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করবার মতন। একেবারেই নতুন যাঁরা লিখছেন, তাঁদের প্রায় সবারই কবিতা ছন্দোহীন—একটু অভিজ্ঞ কবিদের হাতে দেখা যাচ্ছে ছন্দের ব্যবহার এবং সঠিক! এর কি কোনো ব্যাখ্যা আছে?

মোট কথা, সম্প্রতি ছন্দ বাদ দেওয়া কবিতাই বেশী চোখে পড়ছে। এর পাশাপাশি সার্থক ছন্দের কিছু কবিতা পড়লে টাটকা স্বাদ পাওয়া যেত!

সনাতন পাঠক

"পাবলো নেরুদা"

দেশ (৩০শে অক্টোবর) পত্রিকাতে এ বছরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চিলির কবি পাবলো নেরুদা সম্বন্ধে শ্রীঅসমঞ্জ রায় ও শ্রীসনাতন পাঠকের লেখা পড়ে খুবই আনন্দিত হলাম। অন্যের কোন পত্রিকাতে এখনও এভাবে নেরুদার কাব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা চোখে না পড়াতে বাংলাদেশের সচেতন কাব্যরসিকদের সম্পর্কে গর্ব বোধ করলাম।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৪৮ সালে বম্বেতে নেরুদার "রেসিডেন্স অন আর্থ" কাব্য সংগ্রহটি প্রথম আমার হাতে আসে। তখন মুগ্ধ হয়েছিলাম কবিতাগুলি পড়ে। ওই বইটি পরে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলাম আমার [illegible] কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত শুভময়ের (ঘোষ) নিকট। তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হলেও শুভময়ের নিকট তখনও কিন্তু নেরুদা অপরিচিত ছিল না। বইটি পড়ে আমাকে ১৮-৬-১৯৪৯ তারিখের এক চিঠিতে নেরুদার কবিতা সম্বন্ধে তার মতামত জানিয়ে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে যা বলেছিল, এখানেও তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শুভময়ের চিঠির অংশ নীচে তুলে দিলাম।

"Pablo Neruda-র কবিতাগুলি পড়লাম। ওঁর Stalingrad কবিতাটা তো বেশ বিখ্যাত। Spanish Guerilla-দের নিয়ে কবিতাও খুব সুন্দর। তবে প্রথম দিকের অবিশ্বাসের আর frustration-এর কবিতাগুলো Cleverly Written—এই পর্যন্ত। Neruda নিজেও একথা বুঝেছিলেন, তাই পরের দিকের কবিতায় অনেক পরিবর্তন দেখা যাবে। সেখানে বেশ জোরের সঙ্গে যুদ্ধের (খবরের কাগজী ভাষায় সংগ্রাম) কথাটা বলেছেন। এই কবিতাগুলোই এখন বেশী appealing। প্রথম দিকের কবিতাগুলো এখন অনেকটা stale মনে হয়। সব কবির বেলাতেই একথা সত্যি। তার জন্যই T. S. Eliot এখন আর লোকে তেমন আগ্রহের সঙ্গে পড়ে না। বাংলা কবিতাতেও বিষ্ণু দে, সমর সেনের জীবন সম্বন্ধে অবিশ্বাস আর ব্যঙ্গ এককালে খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু তারপর কেমন unsubstantial মনে হল। পড়তে ভাল লাগলেও সেরকম thrilling (stirring বললেই ভাল হবে) আর মনে হয় না। এই কারণেই সুভাষ মুখার্জি, সুকান্ত ভট্টাচার্য এঁদের কবিতা এখন বেশী পছন্দ হয়। এঁরা কম্যুনিস্ট কবি। Neruda-ও তাই। নতুন দেশ। নতুন সমাজের জন্য সত্যিকারের অনুভব করার ক্ষমতা রয়েছে—খুব sincerely এঁরা বিপ্লবের কথা প্রকাশ করেছেন। ঠিক, জীবন সম্বন্ধে শুধু অবিশ্বাস আর হতাশা ক্লান্তি আনে। এঁরা এই হতাশার কারণ খুঁজে পেয়েছেন। এঁদের

Marxism-এ বিশ্বাস না করলেও কিছু এসে যায় না। এঁদের বিশ্বাসের ক্ষমতা, অনুভূতির sincerity ভাল না লেগে পারে না। এখন হাতের কাছে কোন কবিতা নেই। খুকীর* বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসে চিঠি লিখছি। পরে তোমাকে আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে নানা নিদর্শন পাঠাব। আগে আমরা "সংবাদ-সাহিত্য"× পড়ে, আধুনিক বাংলা কবিতাকে না পড়েই বোকার মত গালাগাল করতাম। এখন মত সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিক কবিতার দোষত্রুটি অনেক আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সত্যিকারের ভাল কবিতা আর কবিও পাওয়া যাবে। কিছুই নেই, সব বাজে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। তা করলে ক্ষতিটা আমাদেরই হবে। গুরুদেবের কবিতা নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার অপমান আর গুরুদেবকে করা যায় না। গুরুদেব যা লিখেছেন, তার চেয়ে ভাল বা অন্য রকম, নতুন কিছু করা অসম্ভব—একথা প্রচণ্ড মিথ্যে। গুরুদেব যেমন অনেক কিছু করেছেন—তেমনি অনেক কিছু করেননি। সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। গুরুদেব সে কথা নিজেও স্বীকার করেছেন। এরকম পরিবর্তন না থাকলে তো সবই মরে যাবে। পরিবর্তনের সময় প্রথমটা কিছু Conscious effort চাই-ই। কিন্তু বাড়াবাড়ি তখন হবেই। নতুন রাস্তা চাই বললেই তো পাওয়া যায় না। তাই প্রথম প্রথম কিছুটা অনেক কবিতাই থাকবে বাজে। এঁদের একমাত্র কাজ হল নতুন নতুন রাস্তা খুঁজে বার করা। আস্তে আস্তে এর মধ্যেই ভাল কাব্য, ভাল কবি গড়ে উঠবে। গড়ে

---

* ভগিনী সুজাতা।

× শনিবারের চিঠির "সংবাদ সাহিত্য" বিভাগ।

উঠেছেও। তাই হতাশ হবার কিছুই নেই। আধুনিক কবিতা যদি seriously পড়া যায়, পড়ে অভ্যাস করা যায়, তবে ভাল না লেগে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা উল্টে পড়লে হয়ত ভাল লাগবে না। কিছুটা অনু-শীলনের প্রয়োজন আছে। সে আজকালকার সব ব্যাপারেই প্রয়োজন। আগেকার মত মানুষের মন অত সহজ সরল নেই। তার Intellect-এর ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, সে আজকাল জানেও অনেক কিছু, ভাবেও অনেক বেশি। তার জীবনও অনেক বেশী Complicated। তাই একটু দুর্বোধ্য হয়ত মনে হবে প্রথম প্রথম। কিন্তু পড়ে অভ্যাস করলে ক্রমশ অনেক কিছুই বোঝা যাবে, ভাল লাগবে। গুরুদেবের কবিতা আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ছি, বাবারাও পড়েছেন, তাই এখন অনেক সহজ লাগে। প্রথম প্রথম বাংলাদেশের সবাই বলেছিল দুর্বোধ্য। হঠাৎ এখন কোন প্রবাসী বাঙালী, যে কোনদিনও রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত শোনেনি, সে যদি প্রান্তিক বা রোগশয্যায় পড়ে—কিছু বুঝবে কি? ভাল লাগবে না তার নিশ্চয়ই। কিন্তু গুরুদেবের কবিতা প্রথম থেকে পড়ে গেলে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আধুনিক কবিদের বেলায় আধুনিক মানুষের কথাই স্বভাবত বলা হয়। তাই আধুনিক মানুষকেই জানতে হবে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শনের পরিচয় পাওয়া চাই। কবিদের ব্যক্তিগত imagery, উপমা, প্রতীক, রূপক—এ সব বুঝতে পারা চাই। সেগুলোও হয় এ যুগের উপযোগী। Sex, Electron, Atom, বুর্জোয়া, Ether, প্রোলিতারিয়েত—এই সব ব্যাপারগুলো আজকাল খুবই প্রধান হয়ে উঠেছে, পরিচিত হয়ে গেছে। পড়ে অভ্যাস করলে এসব জিনিস বেশ বোঝা যায়—appreciate করাও চলে।

যদি কেউ বলে আধুনিক কবিতা খারাপ, তবে বুঝতে হবে তার পড়ার অভ্যাস নেই। পড়লে পর কেউ খারাপ বলবে না, Ideological, Technical মতান্তর হতে পারে। কিন্তু আধুনিক কবিতা—ও কিস্সু না, স্রেফ Bogus অপাঠ্য এ কথা বলা আসলে বক্তার অজ্ঞতা ও বোকামি।"

"অভয়ের এ বিষয়ে মতামত ও মন ছিল উদার, উন্মুক্ত। অন্য অনেকের মত একমুখী নয়।

এর পর আমেরিকার বিখ্যাত এক বাম-পন্থী সাহিত্যপত্রিকা "Masses & Main-stream"-এ Neruda-র সুদীর্ঘ কবিতা "Fugitive" পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওই পত্রিকাটি বহু বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। Neruda স্বৈরাচারী ডিকটেটর Videla-র হাত থেকে তখন পলাতক। পলাতক জীবনের নানান অভিজ্ঞতা ও মানুষের ভালবাসা তিনি যেভাবে নিজস্ব ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন তা পড়ে মোহিত হয়েছিলাম।

এই সেদিন কবিতাটি যখন আবার পড়ছিলাম, তখন মনে হল এখনকার 'বাংলা-দেশের' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "Fugitive" কবিতাটি কিভাবে ১ কোটি শরণার্থীর মনের কথা ব্যক্ত করছে।

সলিল ঘোষ
হিন্দু কলোনী, বম্বে

দেখা হয় নাই

'দেশ' ১২ই কার্তিক ১৩৭৮ সংখ্যায় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেখা হয় নাই' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে ভোটবাগান (১) পর্বে কোচবিহার ও ভুটানের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ল।

অমিয়বাবু লিখেছেন ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে কোচবিহার রাজ রুদ্রনারায়ণ ভুটান রাজের বিরাগভাজন হলে তাঁকে বন্দী করে ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসঙ্গত রুদ্রনারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনারূঢ় রাজা ছিলেন না। কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থে সুস্পষ্ট পাওয়া যায় ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে কোচ-বিহারের সিংহাসনে আরূঢ় হন ধৈর্যেন্দ্র-নারায়ণ (ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ)। রুদ্রনারায়ণ ছিলেন ছত্র নাজির। ধৈর্যনারায়ণের সিংহাসনে বসার সময় তিনি তাঁর মস্তকে ছত্রধারণ করেছিলেন। এই ছত্র নাজির রুদ্রনারায়ণ মারা যান ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে, সুতরাং ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভুটনরাজ বন্দী করে নিয়ে যান রাজা ধৈর্যেন্দ্র-নারায়ণকে এবং তাঁর সঙ্গেই রাজভ্রাতা দেওয়ান দেও সুরেন্দ্রনারায়ণকেও বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বন্দী অবস্থায় রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়নি। ১৭৭২ সালে যিনি মারা যান তিনি তাঁর ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণ, যাঁকে ভুটান রাজ ধৈর্যেন্দ্রের স্থলে কোচবিহারের সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন।

রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পর বন্দী ধৈর্যেন্দ্রের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের সিংহাসনে বসেন।

ধরেন্দ্র ভুটানের বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থী হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত ভুটান রাজের সঙ্গে তাশীলামার মধ্যস্থতায় ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের ২৫শে এপ্রিল যে সন্ধি চুক্তি হয় তারই তৃতীয় ধারা অনুযায়ী বন্দী রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ এবং রাজভ্রাতা দেওয়ান দেও মুক্তি পান।

ধৈর্যেন্দ্র সিংহাসনে বসতে অনিচ্ছুক হন। কারণ নিজেকে তিনি ধর্মচর্চায় নিয়োজিত রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পুত্র ধরেন্দ্রর ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে আকস্মিক মৃত্যু হলে তিনি আবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

('কোচবিহারের ইতিহাস' খান চৌধুরী আমানতুল্লা আসেদ রচিত।)

বসন্ত চৌধুরী
কলিঃ ৪০।

॥ ২ ॥

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস শিল্প ও শিল্পী প্রসঙ্গে আলোচনায় (দেখা হয় নাই, দেশ, ১ আশ্বিন ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) শ্রীঅমিয়-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অসতর্ক উক্তি চোখে পড়ল। 'অসাধারণ দক্ষতা দেখাতে পারলে এ'দের মধ্যে কেউ কেউ 'ফৌজদার' এই রাজ-পদবীতেও ভূষিত হতেন।'—কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। অন্তত তাঁর এই উক্তির সমর্থনে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কোনো প্রমাণ দেখান নি। বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট তাসশিল্পী শ্রীসুধীর ফৌজদার আমাকে বলেছিলেন পূর্ব পুরুষরা রাজার ফৌজে চাকরি করতেন বলেই তাঁরা ফৌজদার পদবী পেয়েছেন। এই জাতীয় জীবিকা বা পেশা-নির্ভর কিছু রাজ-পদবী বিষ্ণুপুরে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। 'অসাধারণ দক্ষতা' বলতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কোন্ বিষয়ে দক্ষতা বোঝাতে চাইছেন? তাসনির্মাণে দক্ষতা নিশ্চয় নয়।

বিষ্ণুপুরের অসাধারণ তাসশিল্পীরা দশাবতার তাস ছাড়াও আর একরকম তাস তৈরি করতেন বা এখনো করেন। তা হলো নক্সা (নকশা?) খেলার তাস—আটচল্লিশটি গোল তাসে এক সেট। এই তাসও সমান শিল্প গুণান্বিত এবং এর খেলাও বেশ জমজমাট। লক্ষ্য করেছি সবাই দশাবতার তাসের কথাই বলে থাকেন, অথচ এই তাসের বিষয়ে কেউ কোনো খোঁজ খবরও রাখেন না। না হলে এর উল্লেখ পাই না কেন?

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদেশীপাড়া, সিউড়ী

অসিতকুমার

২২ আশ্বিনের দেশ পত্রিকায় শ্রীযুত ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা আমার ১ আশ্বিনের আলোচনা বিভাগে অবনীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে অসিতকুমার হালদার ——— ——— প্রকাশিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যথা : ১। "১৯১১ সালে অসিতকুমার হালদার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কলাবিভাগে যোগ দেন। এ তথ্য ঠিক নয় বলে মনে করি। কারণ সেই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কোন কলা বিভাগ বলে কিছু ছিল না। কলাভবন পত্তনের পরে কলা বিভাগের সৃষ্টি হয়। কলাভবন হবার পূর্বে অসিত হালদারকে প্রতিবারে অল্প-কালের জন্য মাঝে মাঝে তিন-চারবার বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান করতে দেখেছি, তবে নিয়ম করে তাঁকে বিদ্যালয়ের ড্রয়িং ক্লাস নিতে দেখি নাই" এ সম্পর্কে আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতকোষ প্রথম খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুত পুলিনবিহারী সেন অসিতকুমার হালদারের বিষয় যা লিখেছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি—"শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কলা বিভাগে যোগ দেন" অতএব এ তথ্যের জন্য আমি দায়ী নয়। আগেকার কথা বলতে পারি না তবে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৩ সালে তাঁর শান্তিনিকেতন ত্যাগ অবধি বরাবর তাঁকে শান্তিনিকেতনে বাস করতে দেখেছি বলেই মনে পড়ে। ২। "লেখক আরো লিখেছেন যে সেই সময়ে অসিত হালদারের ছাত্রদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিনোদ মুখোপাধ্যায়ও ছিল জানি না কি তথ্যের উপর নির্ভর করে তিনি এই কথা লিখেছেন। তবে এ তথ্যও ঠিক নয়, কারণ বিনোদ মুখোপাধ্যায় ১৯১১ সালের কয়েক বছর পরে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।" ৩। ১৯১৯ সালে কলা ভবনের কার্যারম্ভ হলে তারপরে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলাভবনে এসে ভর্তি হন, এর পূর্বে রমেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে কখনও আসেন নাই।" আমি কোন সময়ের উল্লেখ করিনি ও সেই সময় অসিতকুমারের ছাত্রদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ ও বিনোদবিহারী ছিলেন তাও লিখিনি—বিনোদবিহারী ১৯১৭ কি ১৯১৮ সালে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও পরে কলাভবনে যোগ দেন—বিদ্যালয়ে ইনি আমার সহপাঠী ছিলেন, রমেন্দ্রনাথ যে ১৯১৯ সালে কলাভবনে ভর্তি হন এ তথ্যও আমার জানা ছিল। আমি লিখেছি যে ১৯১১ সালে অসিতকুমার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কলা বিভাগে যোগ দেন ও তাঁ[র] ছাত্রদের মধ্যে অনেকে পরে শিল্পী হিসাবে নাম করেন, অসিতকুমারের ছাত্ররা ব্রহ্ম বিদ্যা-লয় ও কলাভবন দুই বিভাগ থেকেই তাঁ[র] কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন। আমি তাঁ[র] শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরই কথা উল্লে[খ] করেছি, কোন বিশেষ বিভাগের বা কাল[ের] কথা উল্লেখ করিনি, এতে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তার জন্য আ[মি] দুঃখিত। ইতি—১২ই অক্টোবর, ১৯৭১

শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকু[র]

সাহিত্য প্রবন্ধ

ভাষার ইতিহাস : প্রথম পর্ব। ডঃ মুরারিমোহন সেন। এস ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। ৮·৫০ পয়সা।

প্রধানত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষার ইতিহাসের পাঠক্রমের দিকে নজর রেখে গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ পালি ও প্রকৃত ভাষার ইতিহাস, বিবর্তন, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্যকীর্তির টুকরো টুকরো আলোচনা-বিচার-ভাষ্য ইত্যাদিতে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে বইটিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে পালি ও প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, শ্রেণীকরণ এবং ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য—এক কথায় ভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত বৈচিত্র্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে পালি ও প্রাকৃতের বিভিন্ন সাহিত্যকীর্তির অংশবিশেষের অনুবাদ, শব্দার্থটীকা ইত্যাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হয়েছে।

ভাষা-বিচার নিঃসন্দেহে এক জটিল কর্ম। এ বিষয়ে অধ্যাপক সেন কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। বিশেষ করে ভাষার ইতিহাসের বিবর্তন এবং বৈচিত্র্যের রূপরেখা অংকনে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা এবং বিচার-পদ্ধতিকে সরলীকৃত করার মত যোগ্যতা সন্ধিৎসু পাঠককে চমৎকৃত করবে। এমন কি, ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বিচারে যে কাজ যথার্থই দুঃসাধ্য—যেমন, শব্দরূপ ও ধাতুরূপের আদর্শ এবং ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি ইত্যাদি ব্যাপারে লেখকের বিশ্লেষণ-ভঙ্গী প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে ব্যাপক বাঙ্গালী পাঠকসমাজে এ গ্রন্থের আকর্ষণ তেমন একটা না থাকলেও—যাদের উদ্দেশে লেখা, অর্থাৎ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা—এই গ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হবেন—একথা বলা যায়।

সঙ্গীত

মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য। শ্রীপুলকেন্দু সিংহ। কলিকাতা, সিগমা পাবলিশার্স। ১৩৭৭. ৫,

ইতিহাস লিখতে বসলেই আমরা রাজনৈতিক ইতিহাস লিখি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনকে উপজীব্য করেও যে ইতিহাস লেখা যায় সেকথা মোটেই মনে হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 'লোক্যাল হিস্ট্রি' বা 'সোস্যাল হিস্ট্রি'র মর্যাদা রাজনৈতিক ইতিহাসের চেয়েও বেশী। অতি আধুনিক কালে অবশ্য আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রণয়নে ব্রতী হয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস এরই মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তবে ওই ধরনের বই খুব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিহাস রচিত হবে কিন্তু 'মুর্শিদাবাদ' তাতে স্থান পাবে না একথা আমরা ভাবতেই পারি না। মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ বহির্ভূত নয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রণয়ন করতে গেলে মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা সেখানে থাকা উচিত।

শ্রীপুলকেন্দু সিংহ মহাশয় বর্তমান গ্রন্থটি পাঠককে উপহার দিয়ে সেই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করেছেন।

মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চল লোক সংগীত ও লোক সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত ও অমূল্য খনি বিশেষ। এখানকার কীর্তন গান, রামায়ণ গান, মনসার গান, বাউল গান, ছড়া ও পাঁচালীতেই ছড়ান আছে এখানকার জনজীবনের কথা। সিংহ মহাশয় অনেক আয়াসে সেই সমস্ত গান সংগ্রহ করেছেন এবং বর্তমান গ্রন্থে তিনি ইন্দমতী সংগৃহীত : রাঢ় মুর্শিদাবাদের ব্রতকথা, মুর্শিদাবাদের কীর্তন গান, ভাদুই গান, বাউল গান, বোলান গান আমাদের উপহার দিয়েছেন। আর তাছাড়া 'মুর্শিদাবাদের কয়েকটি আঞ্চলিক লোকসংগীতে লোক-জীবন চিত্র, মুর্শিদাবাদের গাজনের গানে সমাজ চিত্র ও মুর্শিদাবাদ জেলার জারিগান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি মুর্শিদাবাদের সামাজিক ইতিহাস। গ্রন্থটি পাঠক ও গবেষকদের প্রয়োজনে লাগবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

(সি-১০৮২)

উত্তর-রাঢ়ের লোকসংগীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলকাতা-১। ছয় টাকা॥

কোন অঞ্চলের লোক-সংগীতের ভেতর সেই অঞ্চলের লোকজীবন এবং সংস্কৃতির নানা মূল্যবান পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে থাকে। উত্তর রাঢ়ের লোক-সংস্কৃতির ইতিহাস স্মরণাতীত কাল থেকেই সুসমৃদ্ধ। উত্তর রাঢ় বলতে আমরা সাধারণভাবে সমগ্র বীরভূম, মুর্শিদাবাদের কান্দী এবং বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা—এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকেই চিহ্নিত করে থাকি। এতদঞ্চলের লোক-সংগীত নানা শাখা উপশাখা এবং বৈচিত্র্যে সম্ভাবনাপূর্ণ। যা উত্তর রাঢ়ের লোকবৃত্তের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রযত্নে এই অঞ্চলের লোক-সংগীতের ভূমিকা-ব্যাখ্যাসহ একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদানে ব্রতী হয়েছেন। লেখকের আন্তরিকতা হেতু এই অঞ্চলের সংগীত-ধারার পৃথক পৃথক পরিচয় দৃষ্টান্তযোগে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘেঁটু, ঝুমুর, ভাদু, আলকাপ, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি সুপরিচিত গানের বিচার-বৈশিষ্ট্য থেকে বেদের গান, ছাদ পেটানোর গান এমন কি সাঁওতালদের বিবাহ ও গীত প্রভৃতি স্বল্পপরিচিত গণ-গীত কোন কিছুই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রত্যেকটি সংগীতের সামাজিক তাৎপর্য, অনুষ্ঠানবিধি ইত্যাদি বিষয়েও লেখক অল্প কথায় চমৎকার আলোকপাত করেছেন। এবং প্রয়োজনবোধে দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের সংক্ষিপ্ত টীকা ব্যবহার করে গানগুলি যাতে ব্যাপক বাঙালী পাঠকের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে সে বিষয়েও লেখক সচেষ্ট থেকেছেন।

শুধু লোকসংগীতের রীতি প্রকৃতি এবং দৃষ্টান্ত নয়, সেই সঙ্গে উত্তর রাঢ়ের লোক-জীবন এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব সম্পর্কে গ্রন্থের পূর্বভাগে লেখক যে সুচিন্তিত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তা-ও সন্ধিৎসু পাঠককে কৌতূহলী করে তুলবে।

৩৮।৭১

জীবনী

বিদ্যাসাগর। সন্তোষকুমার অধিকারী। রূপা অ্যান্ড কোং, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ' টাকা॥

প্রাতঃস্মরণীয় যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের জীবন এবং প্রধান প্রধান কীর্তির কথা সাধারণ বাঙালী সমাজের কাছে অপরিচিত নয়। এই বইটি বিদ্যাসাগরের মহৎ প্রতিভার মূল্যায়নে এক নতুনতর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। প্রচলিত অর্থে জীবনীগ্রন্থ বলতে যে জাতীয় রচনাকে বোঝায় বইটি সে পর্যায়ের নয়। লেখক ধারাবাহিকতার সূত্রে বিদ্যাসাগর-জীবনকে বিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হননি। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজতত্ত্বের আদর্শগুলো বহু অপ্রচলিত তথ্যযোগে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই সব আলোচনার ভেতরে রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা, নারীর বন্ধু, মহান অধমর্ণ, নিঃসঙ্গ জীবন ইত্যাদি পরিচ্ছেদগুলি পাঠকের সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এবং বিদ্যাসাগর-কীর্তির বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এমন কিছু তথ্যের অবতারণা করেছেন যা প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলিতে সচরাচর দেখা যায় না। লেখকের বিশ্লেষণপদ্ধতিতে সমাজসচেতনতা এবং আন্তরিকতা সর্বত্র সুস্পষ্ট হলেও বিচার-পরিমিতি অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হওয়ায় পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ হয় না।

গ্রন্থের শেষে বিদ্যাসাগরের গুটিকয় অপ্রকাশিত চিঠির মুদ্রণ এবং বংশতালিকা অংশটি সংশ্লিষ্ট গবেষকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে সন্দেহ নেই।

২৩৭।৭০

পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসূচী : **বর্ষ ১-৭৫ ॥ ১৩০১-৭৫** বঙ্গাব্দ—দেবজ্যোতি দাশ। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·০০।

বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হবার (১৩০১ বঙ্গাব্দ) সঙ্গে সঙ্গে তার মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'ও প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পরিষৎ-পরিচয়' গ্রন্থে এই পত্রিকার কিছু রচনার সূচী (বিষয়ানুযায়ী) অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তা থেকে প্রয়োজনীয় রচনার নাম বা লেখকের নাম খুঁজে বের করা ছিল কিছুটা সময়-সাপেক্ষ। তাই পরিষৎ-পত্রিকার গবেষক পাঠক বর্তমান গ্রন্থের মতো একটি গ্রন্থের প্রয়োজন বহু দিন থেকে অনুভব করছিলেন। সে অভাব দূর করলেন লেখক শ্রীদেবজ্যোতি দাশ। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার লেখকসূচী বর্ণানুক্রমে প্রকাশিত হলো। বর্তমান লেখকসূচীতে প্রত্যেক লেখকের নামের পরে তাঁর লিখিত প্রবন্ধের নাম, পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা পর পর বিন্যস্ত হয়েছে।

'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়', 'সজনীকান্ত দাস', 'অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ' প্রভৃতি সাহিত্যসাধক চরিতমালার লেখক শ্রীদাশ তাঁর এই লেখকসূচীতে যে পরিশ্রম ও গবেষণামূলক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি তথ্যানুসন্ধানী গবেষক-পাঠকদের কাছে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবেন নিঃসন্দেহে। আমরা এও আশা করবো, লেখক যেন ভবিষ্যতে সাহিত্য পরিষদ-পত্রিকার বিষয়সূচীও প্রণয়ন করেন।

আরটিস্ট। অসিত পাল সম্পাদিত। ২৬, ডক্টর লেন। কলকাতা-১৪। মূল্য ৩·০০॥

দশটি উড-কাট ছবি এবং দশটি কবিতার সংকলন এই আরটিসট। ছবি অসিত পালের আঁকা এবং কবিতা রত্নেশ্বর হাজরার লেখা (ইংরাজিতে)। ছবিগুলি কবিতার ইলাসট্রেশন নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাট পর্যন্ত ঝকঝকে তকতকে, মার্জিত রুচির পরিচায়ক। সম্পাদনা করেছেন অসিত পাল নিজে। সম্পাদকীয়তে বেশী কথা বলা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে 'আরটিসট' নিজেই বলবে তার নিজের কথা, সত্যিই তাই। বছরে চারটি করে আরটিসট প্রকাশিত হবে। এর পরের সংকলনে থাকবে দশটি ছোট গল্প এবং দশটি রেখাচিত্র। অভাববোধ হয় হচ্ছিল না, কিন্তু আরটিসট হাতে আসার পর মনে হল যেন অনেক অভাব মিটেছে। ছবি দশটি মনোরম, কবিতা দশটি অনবদ্য। বেশ উচ্চাঙ্গের মুদ্রণ। রসিক মহলে এ বইয়ে সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

বিশ্ব বিজয়ী বাঙালী মল্লবীর

গোবর বাবুর ভাল নাম যতীন্দ্রচরণ গুহ। ছোট বেলায় খুব মোটসোটা গোল-গাল ছিলেন। ঠিক যেন গোবর গণেশ। তাই ঠাকুরদা অম্বিকাচরণই 'গোবর' নাম রেখে-ছিলেন।

একে গোল-গাল 'গোবর গণেশ'। তার উপর আখড়ার মাটির সার স্বরূপ দেহে। এবং ব্যায়াম ও মেহনতি পরিচর্যা। সুতরাং পরবর্তী জীবনের 'গোবর' দশাশই চেহারার বিশাল পুরুষ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। মাথায় উঁচু ৬ ফুট ১ ইঞ্চি। যখন বিশ্ব-বিজয়ী পালোয়ান তখন দেহের ওজন ছিল ২৯০ পাউণ্ড, বুকের ছাতি ৪৮ ইঞ্চি, কবজির বেড় ৮ ইঞ্চি এবং ১৮ ইঞ্চি গলার বেড়। 'অর্ডার দেওয়া' দেহ এবং দুর্লভ স্বাস্থ্যশ্রীর অধিকারী।

শুধু গোবর বাবুই নন গুহ বংশের এটাই ধারা। প্রকৃতির অকৃপণ দানে তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বিশালকায় ছিলেন গোবর বাবুর বড় জ্যেঠামশাই অন্নদাচরণ গুহ—পা থেকে মাথা পর্যন্ত যাঁর মাপ ছিল ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। এই অন্নদাচরণই ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ বন্ধু। এবং সেই সূত্রেই বিবেকানন্দ গোবর বাবুর পিতামহ অম্বিকাচরণ গুহর আখড়ায় কুস্তি চর্চা করতে যেতেন, যদিও অন্নদাচরণকে অম্বু-বাবু আখড়ায় আগ্রহী করতে পারেননি। তবে হ্যাঁ, গুহ বংশের ঐতিহ্য ও বাবার নাম রেখেছিলেন অম্বুবাবুর দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পুত্র ক্ষেত্রচরণ এবং রামচরণ।

মল্ল ক্রীড়ায় পারিবারিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় দেবার জন্য আমাদের আর একবার পেছন দিকে তাকাতে হচ্ছে।

রামচরণ গুহর একমাত্র পুত্র হচ্ছেন গোবর গুহ। গোবর বাবু বললেন, পালোয়ান হিসাবে বাবার প্রতিষ্ঠা বহুদূর বিস্তৃত না হলেও মল্লক্রীড়ার প্রসার প্রচার এবং প্রতি-ষ্ঠায় জ্যাঠামশাইয়ের ভূমিকা এবং অবদান ঠাকুরদারই মত। জ্যাঠামশাই নিজেও ছিলেন খুব উঁচু দরের পালোয়ান। মহাবলী বড়ো পালোয়ান করিম বক্স, যোধপুরের মহারাজার আশ্রিত বিখ্যাত মল্ল ঠাকুর শোভা সিং, মথুরার গোবিন্দ চৌবে প্রভৃতি যেমন ঠাকুরদার আখড়ায় এসে 'জোর' অর্থাৎ অনু-শীলন করতেন, তেমন জ্যাঠামশাইয়ের আখড়ায়ও আসতেন সব 'গুরুজ বন্ধ' রুস্তম হিন্দ খেতাব প্রাপ্ত ভারত বিখ্যাত কুস্তিগীর। এমন কি জ্যাঠামশাইয়ের নাম শুনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মল্ল গোলাম পালোয়ান—১৯০০ সালে প্যারিসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ক্রীড়া-নুষ্ঠানে মতিলাল নেহরু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে যিনি বিশ্বজয়ের খেতাব পেয়েছিলেন, তিনিও এসেছিলেন। কিন্তু কলকাতার মল্ল অনুরাগীদের তাঁর মল্লক্রীড়া দেখার সুযোগ ঘটেনি। কলেরায় হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে গোলাম পালোয়ান এই কলকাতা শহরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'জ্যাঠামশাই ক্ষেত্রচরণ গুহ ক্ষেতুবাবু নামে পালোয়ানী সমাজে পরিচিত ছিলেন। আজ যেখানে 'দর্পণা' প্রেক্ষাগৃহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ওই জায়গায়

গোবর গুহর গৌরবদীপ্ত মল্লজীবনের ছবি

জ্যাঠামশাই আখড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যে আখড়ায় ভীম ভবানীও নিয়মিত কুস্তি করতেন।'

মাত্র ১০ বছর বয়সে জ্যেঠতাত ক্ষেত্রচরণ গুহর কাছেই গোবর গুহর মল্লক্রীড়া শিক্ষা শুরু। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর বাবা রামচরণ গুহর কাছে শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে রামচরণ গুহ খোলসা চৌবে, রহমনী পালোয়ান, বগলা খলিফা প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত মল্লদের কাছে পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে কুস্তির নানা রকমের প্যাঁচে পারদর্শী হয়ে ওঠেন গোবর গুহ। শৌখীন মল্লবীর হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠাও ছড়িয়ে পড়ে।

কথার মধ্যেই এক সময় গোবর বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম পালোয়ানীজীবনে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কেমন ব্যবস্থা ছিল?

গোবর বাবু বললেন, খাওয়া-দাওয়া যে খুব বেশী ছিল তা নয়। তবে ঝামেলা ছিল। বগলা খলিফাই সব ব্যবস্থা করে দিত। রাত আড়াইটায় উঠে ব্যায়াম করার আগে দুটো সন্দেশ। ব্যায়ামের পর একটু চিনির সরবৎ। তারপর শরীরের ম্যাসাজ। ম্যাসাজের পর সেরটাক বেদানার রস ও আধসেরটাক বাদামের সরবৎ গোলমরিচ মৌরী ইত্যাদি সহযোগে। ভোরে আবার একটি মালিস এবং সকাল ১০টায় আর একটি মালিসের পর মাছের ঝোল তরকারি, এবং একটু ঘি সহযোগে দু' চামচ ভাত। বিকাল ৩টায় আবার সরবৎ খেয়ে ডন বৈঠক। প্রায় ১৮ শোর মত ডন বৈঠক করতাম, ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম করতাম। বিকেল ৫টার খাবারটাই ছিল রাজসিক। দুটো মুরগি রোস্ট, এক শো কি দেড় শো বাদামের সরবৎ এবং সেরটাক ঘি। পালোয়ানী ভাষায় ওই খাবারটাকে বলা হয় 'আকনি।' রাত ৮টায় সেরটাক দুধ এবং ১০টায় আবার সেরটাক দুধ খেয়ে শুয়ে পড়া।"

এক সের ঘি খাওয়ার কথায় আমি আঁৎকে উঠতেই গোবর বাবু বললেন, হ্যাঁ, আমাদের পরিবারের চিকিৎসকও প্রথমে বিশ্বাস করতেন না। বলতেন কোন মানুষ এক সের ঘি খেয়ে হজম করতে পারে না। কিন্তু বগলা খলিফা ডাক্তারবাবুর সামনেই আমাকে খাইয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল রোজ এক সের ঘি খাওয়া সম্ভব। তবে ঘি-এর সঙ্গে ও কি একটা সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিত যা হজমের সহায়তা করত।

১৯১০ সনে মাত্র ১৮ বছর বয়সে গোবর বাবুর প্রথম পেশাদারী লড়াই ত্রিপুরার মহারাজের পোষ্য পালোয়ান পাঞ্জাবের নওরং সিংয়ের সঙ্গে। অবশ্য সে লড়াইতে গোবর বাবু কোন অর্থ গ্রহণ করেননি। ফলা-ফল ছিল অমীমাংসিত। ওই বছরই গোবর বাবুর ইউরোপ যাবার সুযোগ আসে বেঞ্জামিন ও হ্যামিল্টন নামীয় দুই অস্ট্রে-লিয়াবাসীর মাধ্যমে। বেঞ্জামিন ও হ্যামিল্টন প্রতি বছরই ঘোড় দৌড়ের জন্য কলকাতায় আসতেন। তাঁরা ছিলেন মল্লক্রীড়ায়ও উৎসাহী। ভারতীয় মল্লবীরদের উন্নত কলা-কৌশল দেখে তাঁরা গোবর বাবুর ভগিনীপতি শরৎচন্দ্র মিত্রকে বলেন এরা ইউরোপে গেলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে। প্রধানত তাঁদেরই উৎসাহে গোবর বাবু, বড় গামা, ইমাম বক্স, আমেদ বক্স, গামু পালোয়ান প্রভৃতি ইউরোপ যাত্রা করে। তখন পেশাদার কুস্তির কোন সংস্থা ছিল না। সাধারণত প্রোমোটররা কুস্তির ব্যবস্থা করতেন। কয়েকটি লড়াইয়ে অংশ গ্রহণের পর গোবর বাবু দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু ওই সফরে বড় গামা

পালোয়ান প্রচুর সুনাম অর্জন করে। ১৯১২ সালে আবার গোবর বাবু ইউরোপ যাত্রা করেন ব্রিটিশ এম্পায়ার ও ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণের জন্য। স্কট-ল্যাণ্ডের চ্যাম্পিয়ন জিমি ক্যাম্বেলকে পরাজিত করবার পর এডিনবরায় জিমি এসেনকে পরাজিত করে গোবর বাবু ব্রিটিশ এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ন আখ্যা পান। এর পর প্যারিসে এবং ইউরোপের নানা জায়গায় তিনি একে একে পরাজিত করেন স্ট্যানিস্লাস জিবস্কো, জো চেস্টার, জিমি লণ্ডাস, টম ড্রাক, ওয়ালডেক জিবিস্কো প্রভৃতি বিশ্বের নামী মল্লদের। বাঙালী মল্লবীর গোবর গুহ তখন মল্ল জগতে আলোড়ন তুলেছেন। জার্মানীর শ্রেষ্ঠ মল্ল কার্ল স্যাফটের কাছ থেকে এর পর চ্যালেঞ্জ আসে। স্যাফটকেও হারিয়ে গোবর পালোয়ান পান ইউরোপ বিজয়ী কুস্তিগীরের স্বীকৃতি। তিন বছর তিনি ইউরোপে ছিলেন।

মনে তাঁর তখনো উচ্চাশা। বিশ্ব জয়ীর সম্মান তখনো অর্জিত হয়নি। তাই, ১৯২০ সালে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন এবং সান-ফ্রান্সিসকোতে ৭০ মিনিটব্যাপী তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় লাইট হেভি ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যাড স্যান্টেলকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব পান। ১৯২০ থেকে ১৯২৬, দীর্ঘ ৬ বছর মার্কিন মুলুকে অবস্থান করে তিনি প্রচুর লড়াইয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তাঁর সংগেই অর্জন করেছেন দেশের সম্মান।

ভারতে তাঁর বিখ্যাত লড়াইগুলির মধ্যে গুল্‌পমু পালোয়ানের সংগে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট লড়াই এবং ১৯২৯ সালে পার্ক সার্কাস ময়দানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন মণ্ডপে ছোট গামার সংগে লড়াই দুটি স্মরণীয়। দুটি লড়াইয়ের ফলাফলই অমীমাংসিত থাকে।

সংগীতের ঘরানার মত মল্লদেরও ঘরানা আছে। এবং আছে প্যাঁচ পয়জারের রকম-ফের। 'লুকোনোর ধোকা', 'টিব্বি', 'গাধালোট', 'ঢাক', 'টাং', 'কুল্লা' প্রভৃতি প্যাঁচের রকমফের গুহ ঘরানার বৈশিষ্ট্য।

গোবর বাবুর পুত্রদের মধ্যে মানিক গুহ এবং জহর গুহও কুস্তি ক্ষেত্রে কম খ্যাতি অর্জন করেননি। পৌত্ররাও কিছু কিছু কুস্তি করেছে। তবে গোবর বাবু, ক্ষেতুবাবু বা অম্বুবাবুর মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করা পৃথক কথা। সেটা সনিষ্ঠ সাধনার বস্তু।

গোবর গুহকে মল্লযোদ্ধা না বলে মল্ল-যোগী বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। আখড়ার মাটি ছিল যাঁর শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, যৌবনের উপবন, আখড়ার মাটিই তাঁর বার্ধক্যের বারানসী। বলতে গেলে ১৯৩৬ থেকে উনি আখড়ার আশ্রমবাসী। ১৯ নম্বর গোয়াবাগান স্ট্রীটের গোবরস জিমন্যাসিয়ামে মথুরা থেকে আনা সেই হনুমানজীর মূর্তির সামনে ওঁর প্রশিক্ষণের আয়োজন। ছেলেরা আসে সকাল সন্ধ্যায়। ব্যায়াম করে, কসরৎ করে গুরুজীর সতর্ক চোখের সামনে। ওই জিমন্যাসিয়ামই গোবর বাবুর বাড়িঘর, ওই কুস্তির আখড়াই ওঁর কাছে পবিত্র তীর্থ।

সমাপ্ত

মুকুল

খেলাধুলা এবং রাজনীতি

কথায় বলে 'স্পোর্টস অ্যান্ড পলিটিকস ডিফারস'। অর্থাৎ খেলাধুলার সংগে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা দেখতে পাচ্ছি খেলাধুলাকে কেন্দ্র করেই রাজনীতির প্রশ্ন বেশী করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার উৎকট বর্ণবিদ্বেষ এবং কালো আদমীদের সংগে মিলেমিশে সর্বক্ষেত্রে খেলাধুলোয় তাঁদের অনীহার ফলে আন্তর্জাতিক খেলাধুলো থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় একঘরে হবার প্রশ্ন তুলছি না। সমান অধিকার আদায়ের জন্য আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড়দের ব্ল্যাক পাওয়ার ডিমনেস্ট্রেশনের কথাও না। যে ব্যাপারে খেলাধুলোর সংগে রাজনীতির প্রশ্নটা সম্প্রতি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছে সেটা হচ্ছে আগামী আগস্ট মাসে মুানিখ অলিম্পিকে চীনের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন। অর্থাৎ অলিম্পিকে চীন যোগ দেবে কিনা।

আমরা জানি যেহেতু তাইওয়ান আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশ সেইহেতু প্রজাতন্ত্রী চীন অলিম্পিকের সংগে সকল সম্পর্ক ছেদ করে একলা চলার নীতি আঁকড়ে আছে।

আবার এও জানি খেলাধুলোই যে মানুষের মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এবং মিলনগ্রন্থি রচনার সহায়ক, চীন সেই মতবাদে পুরোপুরি বিশ্বাসী। প্রমাণ পিকিংয়ে সদ্য সমাপ্ত আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা। প্রমাণ চীনা টেবল টেনিস দলের দেশে দেশে সাম্প্রতিক সফর। সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে আমেরিকার সংগে চীনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, টেবল টেনিস খেলার মাধ্যমে সেই আমেরিকার সংগে চীনের সম্পর্কের উন্নতি যাকে চীন-মার্কিন মিতালির প্রথম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এটাও সবার জানা কথা, সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশের মূলেও রয়েছে আমেরিকার সহায়তা যদিও আমেরিকা শ্যাম ও কুল দুইদিক রক্ষা করতে পারেনি। চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী তাইওয়ানকে রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে।

কথাটা উঠেছে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনের প্রবেশের পর। অর্থাৎ চীন এবার অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করবে কিনা। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মার্কিন সভাপতি শ্রীআভেরি ব্রাণ্ডেজ তৎপর এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, চীনকে অলিম্পিকে গ্রহণ করতে তাঁদের কোনই আপত্তি নেই যদি চীন অলিম্পিকের সনদ মেনে নেয়। সংগে সংগে শ্রীব্রাণ্ডেজ একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা রাষ্ট্রসংঘ নয়। রাষ্ট্রসংঘে যাই ঘটুক না কেন, তাইওয়ানকে বাদ দিয়ে তাঁরা চীনকে গ্রহণ করবেন না।

সুতরাং প্রশ্নটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যাচ্ছে। দুই চীনের স্বীকৃতিতেই প্রজাতন্ত্রী চীন অলিম্পিকের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে তাইওয়ানের সদস্যপদ বহাল থাকলে চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে যেত কিনা সেটা পৃথক প্রশ্ন। কিন্তু খেলাধুলোর ব্যাপারে তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তাইওয়ান থাকলে চীন অলিম্পিকে যোগ দেবে না।

শুধু তাই নয়, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে বাঙ্গালোরে যে এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসবে চীন তাতেও যোগ দেবে না। এমন কি এশিয়ান টেবল টেনিস ফেডারেশনের অন্যতম সদস্য তাইওয়ানকে বহিষ্কার করা হলেও না। এখানে চীনের আপত্তি দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং খেমার রিপাবলিকের অংশ গ্রহণে। এই তিনটি দেশ এশিয়ান ফেডারেশনের সদস্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে খেলাধুলোর মাধ্যমে রাজনীতি দিন দিন আরও বেশী করে

সাংবাদিকদের ভোটে নির্বাচিত পশ্চিম জার্মানীর 'ফুটবলার অফ দি ইয়ার' হ্যানস-হুবার্ট ভগটস-এর বল মারার বিরল ভঙ্গি। ৪১টি আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ গ্রহণের মধ্যে ভগটস ৩৪৯টি ম্যাচ খেলেছে একটানা। পশ্চিম জার্মানীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলোয়াড়

প্রবেশ করছে। খেলাধুলায় চীনের ভূমিকা নগণ্য নয়। টেবল টেনিসে তারা বিশ্ব শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য খেলাধুলোয় উন্নতি করা এবং খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ জাতি গঠন করার ব্যাপারেও চীন পুরোপুরি সজাগ। অর্থাৎ সমস্ত উন্নতিশীল দেশের মতই খেলাধুলো চীনের জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। অথচ রাজনীতির জন্যই পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের দেশ চীনকে খেলাধুলোর শ্রেষ্ঠ আসর অলিম্পিক থেকে দূরে সরে থাকতে হচ্ছে।

পিকিংয়ে জাপানের প্রাধান্য

পিকিংয়ে আফ্রো-এশিয়ান আমন্ত্রণে টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় বিশ্ব শ্রেষ্ঠ চীনের উপর এবার জাপানের প্রাধান্যই প্রমাণিত হয়েছে। যদিও চীন মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে এবং মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নও হয়েছে চীনের মেয়ে চেং হুয়াই ইঙ্গ, তবু পুরুষদের দলগত ও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ জাপানের দখলে। শুধু তাই নয়, পুরুষ বিভাগের কোয়ার্টার ফাইন্যালে চীনের তিনজন কৃতী খেলোয়াড়ের পরাজয় রীতিমত বিস্ময়কর। এদের মধ্যে রয়েছে চীনের এক নম্বর লি চিং কোয়াংও। চীনের দুই নম্বর খেলোয়াড় সি এনটিং পরাজিত হয়েছে সেমিফাইনালে। চীনের মহিলারা দলগত প্রতিযোগিতা জয় করলেও ব্যক্তিগত ও জুটিগত প্রতিযোগিতায় জাপানের দুই জুটি ফাইনাল খেলে বিজয়ী ও রানার্সের সম্মান পেয়েছে। পুরুষদের সিঙ্গলসেও একই ঘটনা। ১৯৬৭ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জাপানের নবুহিকো হাসেগাওয়া জাপানেরই কৃতী খেলোয়াড় মিৎসুরো কোনোকে ২১—১৫, ১৮—২১, ২১—৬, ১৯—২১ ও ২১—১৫ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চীনের মেয়ে চেং হুয়াই ইঙ্গ ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার মেয়ে পাক ইউং ওককে ২১--১০, ২১-১৫, ২৩-২৫, ১৭-২১ ও ২১-১৫ পয়েন্টে পরাজিত করে। পুরুষদের ডাবলস জিতেছে চীনের লি চিং কোয়াং ও টিয়াও ওয়েন উনান। মহিলাদের ডাবলসেও চ্যাম্পিয়নের সম্মান পেয়েছে জাপানের জুকি ওজেকি ও ইয়া-সুকো কোনো।

আগের সপ্তাহেই লিখেছি দলগত প্রতি-প্রতিযোগিতায় ভারতের মহিলা দল চতুর্থ এবং পুরুষ দল পঞ্চম স্থান পেয়েছে। আশা করা গিয়েছিল ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতাতেও ভারত ভাল করতে পারবে। কিন্তু চতুর্থ বাছাই ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় জি জগন্নাথ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার আগেই হেরে যায়। মহিলা বিভাগে ভারতের এক নম্বর কেইটি চারজনান ওঠে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত। তবে বালিকা বিভাগে ভারতের নায়েরে মৌলার তৃতীয় স্থান লাভ প্রশংসনীয়। মৌলা তার গ্রুপে তিনজন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে মিশরের একটি মেয়ের কাছে হেরে যায়।

আফ্রো-এশিয়ান টেবল টেনিসে খেলার গুণাগুণ এবং সখ্যতা ও মৈত্রীর প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছিল। এই কারণে প্রতিযোগিতার ফলাফল হয়তো বহু খেলোয়াড়ের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় নয়। তবু টেবল টেনিসে চীন-জাপানের প্রাধান্যই প্রমাণিত। ভারত এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করল ভবিষ্যতে তার থেকে সুফল পাবার আশা করা যায়।

একলব্য

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট

জয়দীপ পিকচার্স

গোয়েন্দা যখন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জহর রায় তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট (ছবিতে ওঁদের উপাধি পাল্টে ভানু রায় ও জহর ব্যানার্জি করা হয়েছে) তখন সহজেই অনুমেয়, "ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট" ছবিটি ক্রাইম থ্রিলার নয় নিছক কমেডি। ছবিতে ভানু-জহরের গোয়েন্দাগিরির আসলে প্রহসন, বিয়ের ভয়ে বাড়ি থেকে পলাতকা নায়িকা নূপুরকে (শীলা চক্রবর্তী) খুঁজে বের করে তার বাবার (পাহাড়ী সান্যাল) কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়াই তাঁদের কাজ। দিল্লি থেকে পলাতকা নায়িকা যথাসময়ে কলকাতায় আধুনিক বাংলা গানের খ্যাতনামা শিল্পী অকৃতদার নায়ক অঞ্জনের (শুভেন্দু চ্যাটার্জি) গৃহে আশ্রয় পেয়েছে, নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয়ও দিতে হয়েছে, গোয়েন্দা ভানু ও তার সহকারী জহরের দৃষ্টি এড়াবার জন্য অনেক জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে, একবার নূপুর পুরুষের ছদ্মবেশও পরেছে। এই লুকোচুরি খেলার পর্বে অঞ্জন-নূপুরের প্রণয়ও যথাসময়ে গভীর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জানা যায়, অঞ্জনই ছিল নূপুরের জন্য নির্বাচিত পাত্র। নূপুর মামার কাছে শুনেছিল তার জন্য নির্বাচিত পাত্র কালো, বেঁটে, মোটা! তাই সটান কলকাতায় পলায়ন। এমন একটা নির্বন্ধ যে শেষ পর্যন্ত চিত্রনাট্যে দেখা যাবে সেটা আগে থেকেই অনুমান করা গিয়েছিল।

আসলে কমেডির আঙ্গিকে হাল্কা প্রেমের কাহিনী "ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট"। পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী নানা সিচুয়েশনের মাধ্যমে দর্শকদের হাসাবার সুযোগ পেয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে কমেডির অজুহাতে বাস্তবতা ও যুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগও নিয়েছেন যথেষ্ট। নায়িকা নূপুরও দেখা গেল সুগায়িকা এবং নৃত্যপটীয়সী। সুতরাং যৌক্তিক তাকে নিয়ে নাচ-গানের দৃশ্যও রাখা হয়েছে। শ্যামল মিত্র সুরারোপিত গানগুলি চিত্তাকর্ষক—বিশেষ করে সুরের জন্য। তবে যখন-তখন গান বিরক্তিকর।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়েন্দা হিসাবে একটু বেশি সিরিয়াস। তাঁর গাম্ভীর্যও একটা হাসির উপকরণ। জহর রায় কৌতুক-রঙ্গে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। রোমান্টিক জুটি হিসাবে শুভেন্দু চ্যাটার্জি ও শীলা চক্রবর্তীকে বেশ লেগেছে। নায়িকার বাবা পাহাড়ী সান্যাল সব সময়েই বেশি রাগান্বিত। চরিত্র বিশ্লেষণটি মন্দ নয়।

ওঁদের নিয়ে পরিচালক কিছুক্ষণের জন্য নির্ভেজাল আমোদ পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করেছেন। বহির্দৃশ্য (লখনৌ ও লালটিলা) থাকায় ছবির আঙ্গিক পারিপাট্যের অভাব কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা পড়েছে। রামানন্দ সেনগুপ্তের ক্যামেরার সুন্দর কাজ উল্লেখযোগ্য।

"সংসার" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে নন্দিনী মালিয়া

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন" একটি তথ্যচিত্র

দুই রিলের একটি তথ্যচিত্রে দেশবন্ধুর জীবন-কাহিনী, আদর্শবাদ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কবি-প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার কাজটি সহজ নয়। এর জন্য দরকার দেশবন্ধুর কর্মবহুল জীবনের বিশেষ ঘটনা ও তথ্যের সুপরিকল্পিত সমাবেশ। এই দুরূহ কাজে সফল হয়েছেন বীরেন দাস। ফিল্মস ডিভিসন প্রযোজিত এই প্রামাণিক চিত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করে একটি মহৎ জীবনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরির টেকনিকটি শ্রীদাসের করায়ত্ত। যে-কারণে দেশবন্ধুর মর্মর-মূর্তি উপস্থাপনের মধ্যেও ছবিটিতে বক্তব্য ও গতি এসে গিয়েছে। তা ছাড়া দেশবন্ধুর সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী, কন্যা অপর্ণা দেবী ও কল্যাণী দেবী এবং একদা-সহযোগী শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীকে দিয়ে ছবিতে দেশবন্ধুর কথা বলানো হয়েছে। ওঁদের কথা, ধারা-ভাষ্য এবং ক্যামেরার সুষ্ঠু ব্যবহার—এই তিনে মিলে প্রামাণিক চিত্রটি হয়েছে বস্তুনিষ্ঠ এবং মহৎ ভাবনায় সমৃদ্ধ। মাঝে মাঝে অতি পরিচিত কণ্ঠে ও ঢঙে নেপথ্যে নজরুলের কবিতার আবৃত্তি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। বরঞ্চ পরিশীলিত পরিচালনার কাজে ঘন ঘন নেপথ্য আবৃত্তি বেসুরোই মনে হয়েছে। কবি দেশবন্ধুর কথা যেখানে বলা হচ্ছে সেখানে তাঁর নিজের কবিতার আবৃত্তি থাকলে বেশ হত। যাই হোক দেশবন্ধুর মহান জীবনের পরিচয় ছবিটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা গিয়েছে। এই ছবির বহুল প্রদর্শনী আবশ্যক।

আগামী সপ্তাহে "ছদ্মবেশী"

চলচ্চিত্র ভারতীর "ছদ্মবেশী" (কাহিনী: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। অগ্রদূত পরিচালিত এ-ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বিকাশ রায়, অনুভা ঘোষ, তরুণকুমার, শমিতা বিশ্বাস, অজয় ব্যানার্জি, বঙ্কিম ঘোষ ও জহর রায়। সুধীন দাশগুপ্ত সংগীত-পরিচালক।

॥ নাটক ॥

তেপান্তরের মাঠ

প্রয়াসী নাট্যসংস্থা

আজকাল শৌখিন মঞ্চে নাটক দেখার সময় সব কথা বোঝার আশা জলাঞ্জলি দিয়েই বসতে হয়। যা বোঝা যায় তা-নিয়েও মনে মনে তর্ক চলে। এক কথায়, বুদ্ধিটাকে সজাগ রেখে নাটক উপভোগ করতে হয়। খুব কম নাটকই দেখা যায় যা শুধুই উপভোগের জন্য, যুক্তি-বিচার নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য নয়। "তেপান্তরের মাঠ" (রচনা : অমিতাভ চৌধুরী) ওই অল্পসংখ্যক সুখভোগ্য নাটকের মধ্যে একটি। "তেপান্তরের মাঠ" দেখার সুখ অনেক।

নাটকটির সুখভোগ্যতার কারণ দুটি। এক, অমিতাভ চৌধুরীর চমৎকার নাটক ও সংলাপ রচনা; দুই, প্রয়াসী নাট্যসংস্থার সুপ্রয়োজনা ও সুঅভিনয়। "তেপান্তরের মাঠ" ঠাকুরমার ঝুলির আদলে রচিত হলেও রূপকথা নয়। বরং রূপকথার আধুনিকীকরণ। একালের কোন ছেলের মনে ঠাকুরমার ঝুলি যদি কোন রোমান্টিক কল্পনা বা শিভালরির ভাব জাগায় তবে, ধরে নেওয়া যেতে পারে, "তেপান্তরের মাঠ" তার ওই সুখকল্পনারই রূপকথা। রাজপুত্র একালেরই ছেলে, প্রি-ইউ ফেল করে নির্বাসনে গেছে। রাজপুত্র, রাক্ষস, খোক্কস প্রভৃতির বেশভূষা রূপকথার চরিত্রের মতো, তবে তাদের কথাবার্তা, আচরণ ও মানসিকতা একালের। আসলে রূপকথার পরিবেশে নাট্যকার অমিতাভ চৌধুরী সমকালেরই গল্প বলেছেন। এখানেই নাটকের বিশেষ আকর্ষণ ও নতুনত্ব। নাটকটি কমেডির ধাঁচে তৈরি। এই নাটক সকল বয়সের দর্শকের ভাল লাগবে। ছোটরা নাটকটি উপভোগ করবে এক ভাবে, বড়রা অন্যভাবে। ছোটরা এর মধ্যে রূপকথার চরিত্র তো পাবেই, তা-ছাড়া, সুকুমার রায়ের রামগরুড়ের ছানাকেও পাবে। তা-বাদে অমিতাভ চৌধুরীর মজাদার ছড়া তো আছেই। বড়রা এতে পাবেন সুন্দর স্যাটায়ার, কিন্তু তা দিয়ে হুল ফোটাবার কোন ইচ্ছা নাট্যকারের নেই। পুরো ব্যাপারটাই হাসির। আজকের বাস্তবের কোন হদিস যদি নাটকে মেলে, তবে তা ওই হাসির ভিতর দিয়েই। খোক্কসের প্রেমিকা হল রাক্ষসের ভাইঝি চুমকি। চুমকির লিপস্টিক ও অন্যান্য কসমেটিকস যোগাতেই রাক্ষসের নিঃস্ব হবার উপক্রম, আর চুমকির আইসক্রিম যোগাতে খোক্কসের প্রাণ যায়

আর কী! রাক্ষস চুন্নির সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট। এই পর্বে প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল পড়ে। চুন্নিকে পাবার জন্য খোক্কসের জনতার স্বারস্থ হবার ব্যাপারটি খুব মজার।

"অপেরাধর্মী" এই নাটকের শুরু ভুঁড়ি-ঝুড়ির গান দিয়ে। ওদের সূত্রধারের ভূমিকা। যাত্রার আঙ্গিকেই মূলত নাটকটি পরিবেশিত। বাদ্যযন্ত্রীদল ও গায়করা সর্বক্ষণ মঞ্চেই উপস্থিত। অন্যদিকে আধুনিক নাট্য আঙ্গিকও দেখা যায় মঞ্চে। "তেপান্তরের মাঠ"-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে রবীন্দ্রনাথের তাসের ঘর-এর একটা প্রভাব পাওয়া যায়। নাটকের একাধিক গানে রবীন্দ্র সংগীতের সুর। নাটকটি অনেকটা রবীন্দ্রিক। সংগীতের ভূমিকা নাটকটিতে খুবই বড়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজনার গুণের কথা আগেই বলেছি। শিল্পীদের অভিনয়ও উচ্চমানের। বিশেষ প্রশংসার যোগ্য শ্যামল ভট্টাচার্য যিনি তালপাতার সেপাইয়ের চরিত্রে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। সিতাংশু রায়-চৌধুরীর খোক্কস আর একটি প্রশংসনীয় চরিত্রসৃষ্টি। ব্যাঙগুরুড়ের চরিত্রে সুনন্দন সেনও কম যান না। অন্যান্য শিল্পীরা হলেন চঞ্চল দাশগুপ্ত (রাজপুত্র), শিবানী সেন (চুন্নি), সোমেন রায় (জুড়ি), আনন্দ ঘোষ (ভুঁড়ি), বিক্রম সেন (রাক্ষস) প্রদীপ মজুমদার (বাচস্পতি) কুমার আবীর বসু প্রভৃতি। চঞ্চল দাশগুপ্তের নাট্যপরিচালনা প্রশংসনীয়।

"হে বন্ধু বিদায়"

অন্তত দুটি ঘণ্টার নির্মল আনন্দ এবং রসাস্বাদন সুখানুভূতির অবকাশ আছে নটনীড় প্রযোজিত "হে বন্ধু বিদায়" নাটকে (রচনা ও পরিচালনা : বিনয় চক্রবর্তী)। মুক্ত অঙ্গন এবং অন্যান্য মঞ্চে এ নাটকের বেশ কয়েকটি অভিনয় ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

নাট্যকাহিনী একটি রাত্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঘটনাচক্রে এক তরুণ ও তরুণী একটি বাড়ির একটি কক্ষে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে। উভয়ের কোন পূর্ব-পরিচয় নেই। বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দারাও এদের অপরিচিত। শুরুতে তরুণীর মনে তরুণের সম্পর্কে কিছু সন্দেহ, কিছু অস্বস্তি। রাত যত গভীর হয় অপরিচয়ের বাধাটাও ততই দূরে সরে যায়। ভোরের আলো যখন ফুটল তখন দেখা গেল ওদের দুজনের হৃদয় অনেক কাছাকাছি।

চমৎকার একটি কমেডি। কৌতুক রসের সঙ্গে রোমান্টিক ভাবটি চমৎকার মিশেছে। কিছুটা আবেগও আছে যা হৃদয়কে আপ্লুত করে। দুটি মনে অনুরাগের পুষ্পটি আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলছে—এ ভাবটা নাটকে ধরে রাখা বড়, কম কথা নয়। ঘটনার উপস্থাপনা এবং সুন্দর বিন্যাস নাটকের বড় গুণ। মঞ্চে সেটিকে চমৎকারভাবে উপস্থিত করা নির্দেশকের কৃতিত্ব।

"পিকনিক" (পরিচালনা : ইন্দর সেন) ছবিতে জয়শ্রী রায়, আরতি ভট্টাচার্য ও সামন্ত দত্ত

নাটকের সাফল্যের অপর কারণ চমৎকার অভিনয়। বিশেষ করে তরুণীটির। ওই চরিত্রে শ্রীমতী শিপ্রা চক্রবর্তী খুবই স্বতঃস্ফূর্ত এবং বাস্তবোচিত অভিনয় করেছেন। ওই পরিবেশে ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। তরুণের চরিত্রে দেবোত্তম চক্রবর্তী বেশ সাবলীল। তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতটিও শুনতে ভাল লাগে। অন্যান্য চরিত্রে প্রশান্ত চ্যাটার্জি, নিতাই ঘোষাল, অনিতা দত্ত ও পীযূষ মজুমদার সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন।

'পাঁচ মিনিটের স্বামী'

দক্ষিণায়ন প্রযোজিত 'পাঁচ মিনিটের স্বামী' মিনিট পাঁচেক দেখবার পরই অনুমান করা গিয়েছিল পাঁচ মিনিটের স্বামীত্ব অচিরাৎ চিরস্থায়ী হবে। হলও তাই। অতএব নাট্যকাহিনীতে এজন্য বাড়তি কোন চমক নেই। নাটকের সূচনা পর্ব থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসির উপকরণ অনেক, কিন্তু সবগুলোই সুপরিবেশিত নয়। ফলে প্রেক্ষাগৃহে বাঞ্ছিত হাস্যরসের অভাব দেখা গেছে।

পিতৃহীন একটি ছোট পরিবারের অভিভাবকরূপে পিসেমশাই যখন হঠাৎ দেশের বাড়ি থেকে পাত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসে তপতীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করেন, সেই সময় থেকেই নাটকের গতি কিছুটা ক্ষিপ্র এবং হাস্যরসের উপকরণও জুটে যায় অনেক। তারপর নাটক যেভাবে এগোয় এবং পরিণতিতে যেখানে গিয়ে থামে তার সঙ্গে বাঙ্গালী দর্শকরা পরিচিত। পিসেমশাই এর মনোনীত পাত্র 'ভোঁদা' এই কাহিনীর অন্যতম চরিত্র, যাবতীয় হাস্যরস একে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা। কিন্তু নাটকের এই অংশের সংলাপে শালীনতার প্রশ্ন কোথাও কোথাও উঠতে পারে। বিশেষত শালীনতার দিক থেকে এই চরিত্রটি আদৌ সুবিচার পায়নি। এ ব্যবস্থা কি স্রেফ হাসির নাটক বলেই?

২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যায় আলোচ্য নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় পরিবেশিত হল মুক্ত অঙ্গনে। দ্বিতীয় অভিনয়, তবুও অধিকাংশ শিল্পীকে যে বার বার স্মারকের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছিল সেটা দুঃখের। নাট্যকার এবং নির্দেশক সন্তোষ সেন কিছু কিছু অংশে মৌলিকতার পরিচয় রেখেছেন। বিশেষ করে তপতী এবং মদনের রাত্রি জাগরণের মুহূর্তগুলি এবং একেবারে শেষ পর্ব, সুরচিত এবং সুঅভিনীত। মদন বড়লোকের ছেলে বটে নাটকে বর্ণিত, অতএব নাটকের শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে একই পোশাকে রাখাটা দৃষ্টিকটু।

অভিনয়াংশ খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও, প্রেক্ষাগৃহে হাসির হুল্লোড় তুলতে যাঁরা সবচেয়ে বেশি নাট্যকারের সহায়ক হয়েছেন তাঁরা হলেন, শিশির গাঙ্গুলী, মুকুল সরকার, সমীর মজুমদার, হর্ষ চ্যাটার্জি ও ননী দাশগুপ্ত। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরাও প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হবেন না। এঁদের মধ্যে আছেন গৌতমহরি চ্যাটার্জি, রবীন ব্যানার্জি, যূথিকা ভট্টাচার্য ও মীনা মুখার্জি।

নাট্যসমালোচক

রূপদক্ষ'র বার্ষিক উৎসব

রূপদক্ষ নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উপলক্ষ—রূপদক্ষর একাদশ বর্ষে পদার্পণ। অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন রাজ্যেশ্বর ভট্টাচার্য রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে। এই পর্যায়ের শেষ শিল্পী ছিলেন গৌতম মুখোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে আলোচ্য নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা মঞ্চস্থ করলেন কল্লোল মজুমদারের 'ঝড়ের গান'। একটি ক্রনিম প্রোরেশনের ওপর নাটকের কাহিনী গ্রথিত। যেখানে দেখি বরিশালের বাস্তুহারা শিক্ষক আজ প্রায় ভিখেরী, এখানে পুলিসের অত্যাচার, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত, হতাশা, বিভ্রান্তি আর সংগ্রাম ইত্যাকার বিষয় নিয়ে একটি ভাবালুতার নাটক। বাংলা নাটকে এই সমস্যার ওপর লেখা একাধিক নাটক দেখেছি হয়তো, আরো দেখতে হবে। কিন্তু রূপদক্ষর কৃতিত্ব সেখানে নয়, তাঁদের কৃতিত্ব নাটকটির ছিমছাম প্রযোজনায়। সামগ্রিক প্রযোজনার সঙ্গে দলের অভিনয়ও সহজ এবং উপভোগ্য। দর্শককে আসনে বসিয়ে রাখার ক্ষমতা শিল্পীদের আছে। নাটকের মধ্যে সহজ এবং মামুলী ভাবালুতার দিকটা যে শিল্পীদের অভিনয় গুণে বহুলাংশে চাপা পড়ে গেছে সে কৃতিত্ব অবশ্যই নাট্য নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরীর প্রাপ্য। মঞ্চসজ্জা ও আলোর কাজও শিল্পানুগ বিশেষত স্বপনদাশ্যাট পরিকল্পনার দিক থেকে হৃদয়গ্রাহী।

অভিনয়ে তড়িৎ চৌধুরী এবং সুতপা চক্রবর্তী আমাদের সহানুভূতি পেয়েছেন সর্বক্ষণ। কিরণময় লাহিড়ীর 'ফটকে' যতক্ষণ মঞ্চে থাকে ততক্ষণ দর্শকদের অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন রবীন সোম, জয়ন্ত বোস, ভারত সিমলাই, নিখিল চক্রবর্তী ও শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়।

"ফেরার" (পরিচালনা : অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে তুহিন মুখোপাধ্যায়

অনুষ্ঠানে সভাপতি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীবিজন ভট্টাচার্য ও শ্রীপাহাড়ী সান্যাল।

নাট্যসমালোচক

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

"তিন পয়সার পালা"-র দ্বিশততম অভিনয়

"তিন পয়সার পালা"-র দ্বিশততম অভিনয়েই নাটকটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ। নান্দীকার নাটকটির দ্বিশততম অভিনয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি উৎসবের আয়োজন করেছেন ২০ নভেম্বর শনিবার, রংগনা প্রেক্ষাগৃহে, বিকাল চারটায়। অপেশাদার সংস্থার পক্ষে এই কৃতিত্ব অর্জন দুর্লভ। নাটক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক মূকাভিনয়

মূকাভিনয়ে শ্যামস্কোন্দু চক্রবর্তী সম্প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দমদমের অনন্ত দত্ত মেমোরিয়াল হলে তিনি গত ৭ নভেম্বর একক মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। মোট আটটি ফিচার তিনি উপহার দেন। তার মধ্যে "বেকারের জ্বালায়", "পরীক্ষা ও প্রহসন", 'বিভিন্নতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্রেণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক।

রক্তকরবীর সদস্যবৃন্দ নভেম্বর মাসের প্রতি বুধবার থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে শক্তিশেখর দাস রচিত ও পরিচালিত হিংসা, খুন ও সন্ত্রাস বিরোধী নাটক "সত্যদা আসছে" নিয়মিতভাবে পরিবেশন করবেন।

মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানে মূকাভিনয় প্রদর্শন করে ফিরে এসেছেন। জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতের অন্যান্য অংশে মূকাভিনয় প্রদর্শন করতে যাবেন।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যালমানাক

ভারতীয় সিনেমার যাবতীয় তথ্য সম্বলিত বই বিশেষ পাওয়া যায় না। "ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার অ্যালমানাক" এই অভাব দূর করেছে। শ্রীবাগীশ্বর ঝা এটি সম্পাদনা করেছেন। প্রতি বছরেই "বেংগল মোশান পিকচার ডায়েরি" বের করেন। এবারেও বের করেছেন। সেই সঙ্গে দীর্ঘ পরিশ্রম ও গবেষণার পর বের করেছেন এই অ্যালমানাক যাতে ভারতীয় সিনেমা সম্পর্কিত মোটামুটি সকল তথ্য তো আছেই, তাছাড়া আন্তর্জাতিক সিনেমাশিল্পের খোঁজ-খবরও দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের সিনেমা অ্যাক্টস অ্যাণ্ড রুলস এবং চলচ্চিত্রশিল্পের পরিচয় বইটিতে সংকলিত। এক কথায় বইটিকে ভারতীয় সিনেমা-কোষ বলা যেতে পারে। এই বই প্রকাশের জন্য (শট পাবলিকেশনস, ৩বি ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩) শ্রীঝা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবেন। চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত এবং সিনেমা যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের সকলের কাছেই বইটি মূল্যবান মনে হবে।

কেরলে শিশুরংমহল

কেরলে শিশু রংমহলের অনুষ্ঠান সফল হয়েছে। বিশেষ আমন্ত্রণে সি-এল-টি'র শিশুশিল্পীরা এবার ভারতের শেষ প্রান্তে গিয়েছিল। কেরলের পবিত্রতম মন্দির গুরুভায়ুরের কাছে অডিটোরিয়াম। সেখানে অভিনীত হল সং অব ইণ্ডিয়া। গুরুভায়ুর থেকে আলোয়ে, কোচিন থেকে কোট্টায়াম—সর্বত্র সি-এল-টি পেল বিপুল অভিনন্দন। কন্যাকুমারী ঘুরে দলটি এল ত্রিভান্দ্রমে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সি-এল-টিকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করলেন। সেনেট হলে অভিনীত হয় "রামায়ণ"। কেরলের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ফেরার পথে কুইলনে ফাতিমা কলেজের প্রেক্ষাগৃহে 'রামায়ণ' শো হয়। বাসভবন তৈরির জন্য "রামায়ণ" দেখিয়ে ৭০ হাজার টাকা তোলা হয়।

বোম্বাই বিচিত্রা

হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের চাল পালটেছে। নতুন ঢঙে 'সাজ সাজ' রব উঠেছে হিন্দী চলচ্চিত্রের সাজঘরে। লম্বা চওড়া তারকারা বেঁটে খাটো পরিচালকদের কথায় ওঠ বোস করছে বলে শোনা যাচ্ছে। বিশেষ বিশেষ মহলে এমন একটা কথাও রটতে শুরু করেছে যে চলচ্চিত্রের প্রকৃত চালক আবার কলাকুশলীরা হল বলে। অর্থাৎ হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে সুদিনের সূর্যোদয় আসন্ন। শুভ মুহূর্তের সন্ধিপূজো শুরু হয়ে গেছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত দপ্তরে দপ্তরে। নামকরা নায়করা প্রখ্যাত পরিচালকদের হাতে হাত মিলিয়েছেন। ফলে নায়িকারা আপাতত কিঞ্চিৎ কাবো উপেক্ষিতা। হিন্দী চলচ্চিত্রের বম্বে বাজার প্রায় প্রথম যুগ থেকেই নায়ক শাসিত। নায়িকাপ্রধান গল্পও কম। কারণ সর্বভারতীয় দর্শক মহলে নায়কদের বাজার যেমন গরম, নায়িকাদের তেমন নয়। নামকরা নায়ক, নামকরা পরিচালক, যে কোনো নায়িকা, চলনসই সঙ্গীত পরিচালক, ছবি বিক্রী হয়; কিন্তু নামকরা নায়িকা, যে কোনো নায়ক, নামকরা পরিচালক, বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক তবু ছবি কোল্ড স্টোরেজে। সুতরাং নায়িকারা আপাততঃ নয়। সেদিন একজন নামকরা নায়িকা কথায় কথায় অভিযোগ করলেন, "দেখুন না, নানান ঢঙ লেজুগুড়ে কেবল নেচে গেয়ে আর কেঁদে ছবি শেষ করেছি। অভিনয় করার সুযোগই হচ্ছে না। যে সামান্য কয়েকজন ভাল পরিচালক আছেন তারা আজকাল যত গল্প ভাবছেন সব নায়ক-প্রধান। 'পরিণীতা', 'সুজাতা', 'মাদার ইণ্ডিয়া', 'সীমা' জাতীয় ছবি আজকাল আর হচ্ছে না। জানি না কেন নায়িকারা আজকাল অকারণে অবহেলিতা।" এই ধরনের অর্থাৎ একই ধরনের কথা অনেকক্ষণ ধরে চলল। তারপর হঠাৎ কথায় কথায় চলচ্চিত্র জগতের কেচ্ছার দিকে বাঁক নিলো আলোচনা। বিভিন্ন নায়ক, নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন উঁকি মারতে লাগল এ ফাঁক ও ফাঁক থেকে। হঠাৎ নায়িকা এক অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, "একটা জিনিস লক্ষ করেছেন ফিল্মের হিরো হিরোইনরা ব্যক্তিগত জীবনে নিজেদের মধ্যে প্রেম করা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল হিরো হিরোইনদের নিয়ে তেমন গুজবও শোনা যায় না।" কথাটা একেবারে খাঁটি না হলেও খুব একটা মিথ্যেও নয়। ইদানীং কালে চলচ্চিত্রের হিরো হিরোইনরা সাধারণ-সমাজে চলতে আরম্ভ করেছে। স্টুডিও মহলে সাধারণ মানুষের ভীড় বেড়েছে, স্টুডিওর মানুষরা সাধারণ মানুষের সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি হতে আরম্ভ করেছে। এছাড়া হিরো হিরোইনরা পরস্পরকে একটু বেশী চিনে ফেলতে শুরু করেছে। বেশী চেনা

"রাখওয়ালা" (পরিচালনা ঃ এ সুব্বারাও) ছবিতে ধর্মেন্দ্র ও লীনা চন্দাভারকর। ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

"তেরে মেরে সপনে" ছবির আউটডোরে হেমা মালিনী ও দেব আনন্দ ফটো-দেশ

লোকের সঙ্গে নাকি তেমন ভাবে 'পেয়ার মহব্বৎ' হয় না। হিরোইন বললেন, "হিরো হিরোইনদের মধ্যে ভালবাসা না হওয়ার আরো একটা কারণ আছে, আমার মনে হয় নিজেদের মধ্যে প্রেমালাপ করতে গিয়ে আমরা সকলেই কোনো না কোনো ছবির ডায়লগ বলে ফেলি, এবং সেই মগ্ন মুহূর্তে হঠাৎ সচেতন হয়ে গিয়ে সব ভেঙ্গে যায়।" একটু অন্যমনস্ক হলেন মহিলা। হঠাৎ বললেন, "গুড্ডি দেখেছেন?" জানালাম "হ্যাঁ।" উনি বললেন, "গুড্ডিতে যা হোল, তা কিন্তু আসল দিক থেকে নকল।" বললাম, "তার মানে?" উনি বললেন, "ধরুন আমি যদি গুড্ডি হ'তাম তাহলে আমি নতুন করে ধর্মেন্দ্রর প্রেমে পড়তাম—এমন মহান সত্যবাদীর প্রেমে না পড়ে থাকা যায়! আর গুড্ডির মত মেয়ে সিনেমা জগতে যাতায়াত করেছে বলেই না, ফিলিমের হিরোরা আর হিরোইনদের "প্রেমে পড়ছে না।" মনে হ'ল মহিলার মনে খেদ আছে, বললাম, "তার মানে হিরোইনরাও তো ফিলিমের হিরোদের—" কথা শেষ করতে দিলেন না, মহিলা বললেন, "এই তো দেখুন না, আমিই যখন বিয়ে করলাম, তখন আমার চোখ গিয়ে ঠেকলো এক ব্যবসাদারের ওপর।" বললাম "তবে?" উত্তরে মহিলা সারা মুখ এ'টো করে হাসলেন।

সরল শর্মা

"অর্চনা" (পরিচালনা পীযূষ গাঙ্গুলি) ছবিতে তরুণকুমার, মাধবী চক্রবর্তী ও অনুভা ঘোষ

"পথের দাবী" নাট্যাভিনয়

ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক এমপ্লইজ ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক শাখা গত ১৬ অক্টোবর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী"-র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন। নাটক পরিচালনা করেন কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে ভাল অভিনয় করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সব্যসাচী), পঞ্চানন রায় (থেনমঙ্), শীতল মুখোপাধ্যায় (শশিকবি), সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (হীরা সিং), প্রণব মুখোপাধ্যায় (তলোয়ারকর), সমীরণ বসু (নিমাই), সলিল বসু (অপূর্ব), অমল মুখোপাধ্যায় (রাইমোহন), সনৎ গোস্বামী (জামাল), সবিতা মুখোপাধ্যায় (সুমিত্রা), আরতি ঘোষ (ভারতী), সান্ত্বনা ঘোষ (নবতারা) প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

"আজকের নায়ক" (পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত) ছবিতে নিরঞ্জন রায় ও শান্তি ভঞ্জ

"ম্যাজিকানা অব ইণ্ডিয়া"-র বিদেশ সফর

বিশিষ্ট যাদুকর ও পি আগরওয়ালের ৩২ জন সদস্যবিশিষ্ট "ম্যাজিকানা অব ইণ্ডিয়া" দলটি আগামী জানুয়ারী মাসে জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি স্থানে যাদু প্রদর্শনের জন্য যাচ্ছেন। তাঁদের এই সফর ৩ মাস ধরে চলবে। সফরের আয়োজন করেছেন দিলীপ এণ্টারপ্রাইজেস-এর শ্রীদিলীপ শাহ। শ্রীশাহ সম্প্রতি মহাজাতি সদনে প্রদর্শিত ও পি আগরওয়ালের যাদু প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হন এবং এই সফরের আয়োজন করেন।

সংগীতশিল্পীর জন্মবার্ষিকী

সংগীত সম্মিলনীর উদ্যোগে বিখ্যাত সেতারশিল্পী স্বর্গত অমিয়কান্তি ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয় গত ১ নভেম্বর, নিউ আলিপুরে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সেতারী শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত। শ্রীবিমান ঘোষ স্বর্গত শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার্থে স্থায়ীভাবে কিছু করার প্রস্তাব করেন। গোরা মিত্র, গৌরী দাশগুপ্তা, ইভা গুহ, বিমল চ্যাটার্জী প্রমুখ বক্তা স্বর্গত শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন। সভায় কুমারী কেয়া দাশগুপ্ত কুণাল গুহ ও গীতশ্রী মালা দাস সংগীত পরিবেশন করেন।

অরণ্যদেব

লী ফক

অরণ্যদেবই সবচাইতে নিখুঁত মানুষ? বলো কী?
পাহাড়ী ডাইনী তারপর কী করল মজ?
শ-শ, শ-শ

বুড়ো যে কেন ছেলেপুলেদের মাথায় এইসব ছাইভস্ম ঢোকাচ্ছে, বুঝি না।
বুড়ো জ্ঞানী মানুষ। অরণ্যের আসল ইতিহাস ও জানে।

'পাহাড়ী ডাইনী তো বিস্তর খুঁজে নিখুঁত মানুষের হদিশ পেল!'
হ্যাঁ, হ্যাঁ একেই চাই!
একেই!
একেই চাই!

আচ্ছা মজ, এ কোন অরণ্যদেব? আমাদের ওয়াকার-বাবা, না তাঁর বাবা, নাকি ঠাকুরদা?
অত জানি না। অরণ্যদেব মানে অরণ্যদেব। ওই একজনকেই আমরা জানি।
3/28

'অরণ্যদেবের কাছে দূত পাঠাল ডাইনী। আদর করে তাঁকে ধোঁয়া-পাহাড়ের দুর্গে নিয়ে আসার জন্যে।'
না!
?
?

সে কী! লোকটা এল না?

'ডাইনী তখন অরণ্যদেবের কাছে বিস্তর ধনরত্ন পাঠাল।'
না!
?!

তবু এল না? আসতে তাকে হবেই।
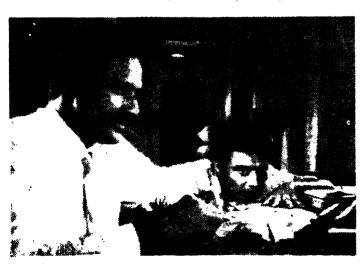
ফরাক্কা সেতুর উদ্বোধন বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১১ নবেম্বর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী কে হনুমন্তিয়া ফরাক্কা রেল সেতু তথা ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসামের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হল। এটিই ভারতের বৃহত্তম রেল সেতু। কলকাতা থেকে প্রায় তিনশো মিটার দূরে ছোট গ্রাম ফরাক্কায় এই সেতুটি গড়া হয়েছে। এতে মোট ৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং এই প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ ২৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। এই সেতুর দক্ষিণ প্রবেশ পথে ফরাক্কা জংশন স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে যে সময় লাগত এখন তা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা কম লাগবে। দারজিলিং মেল এখন এই সেতুর উপর দিয়েই চলাচল করবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত হননি। তাদের অবহেলা করা হয়েছে এবং ঠিকমত আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সেতু নির্মাণের পেছনে রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বি সি গাঙ্গুলীর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই উদ্বোধন উৎসবে যাঁরা ভাষণ দিলেন তাঁদের বক্তব্যে শ্রীগাঙ্গুলীর নাম উল্লেখিত না হওয়ায় রেলকর্মীদের মধ্যে চাপা বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

২২ নবেম্বর পর্যন্ত পুলিস হাজতে আট[ক] রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৪ নবেম্বর—কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ এ[বং] বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডঃ শান্তিভূষণ দত্ত আ[জ] হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর দক্ষিণ কলকাতা[র] বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়[স] হয়েছিল ৭৬। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়-জগতে তি[নি] ছিলেন একজন দিকপাল।

রেলের ভাড়া ও ডাক বিভাগের কয়েক রক[ম] জিনিসের উপর বিশেষ কর হিসাবে এ[বং] সংবাদপত্র ইত্যাদির উপর অন্তঃশুল্ক হিসা[বে] যে নতুন লেভি বসানো হয়েছে, আগামীকা[ল] ১৫ নবেম্বর থেকে তা কার্যকর হচ্ছে। গ[ত] ২২ অকটোবর রাষ্ট্রপতি তিনটি অর্ডিন্যান[্স] জারি করে নতুন লেভি প্রবর্তন করেন।

দেশী সংবাদ

৮ নবেম্বর — কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কালোবাজারী অতি মুনাফাখোর, ধান-চাল নিয়ন্ত্রণ আইন, কেরোসিন ও সার নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের অভিযোগে ৩৯ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চলবে।

৩০ সেপটেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থীদের ব্যয় বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য মাত্র ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কিন্তু ওই তারিখ পর্যন্ত এ বাবদে রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে অনেক বেশী। রাজ্য সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণার্থী বাবদ দৈনিক খরচ এক কোটি টাকার উপর।

৯ নবেম্বর—এ বছর ১ অকটোবরের বদলে ১ নবেম্বর থেকে রেলের সময়সূচী বদলে গেছে। হাওড়া বিভাগে শহরতলি শাখায় ট্রেন বাড়ছে তিনটি মাত্র, আর শিয়ালদায় বাড়ছে দু জোড়া। কিন্তু এই সময়সূচী বদলে নিত্য যাত্রীদের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা বাড়ছে না।

১৮ বছর বয়সের আদিবাসী তরুণী কুমারী সীতা গিরাসিয়া রাজস্থানের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে মিস আরাবল্লী উপাধি লাভ করেছে। এইরূপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা আদিবাসী মেয়ের পক্ষে এই প্রথম। আর একটি আদিবাসী মহিলা শ্রীমতী দিতি গিরাসিয়া এবং কুমারী রমা রাঠোর যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে।

১০ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ডেপুটি সেক্রেটারি ও একজন অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি সহ ছ-জন কর্মচারীকে চারজ-শিট দেওয়া হয়েছে। এই চারজ-শিটে কেন তাদের বরখাস্ত করা হবে না, তার কৈফিয়ৎ ৩০ দিনের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে।

সি পি আই (এম এল)-এর এক বৈঠকে শ্রীচারু মজুমদারকে দল থেকে বহিষ্কার করে সে-জায়গায় দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসত্যনারায়ণ সিংকে বসানো হয়েছে। শ্রীচারু মজুমদার বিগত দেড় বছর দলের সর্বোচ্চ সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকতে অস্বীকার করে আসছিলেন।

১১ নবেম্বর—নব কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক "জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদ" ব্যবহারের অধিকারী হলো। এই মর্মে নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্ত আজ সুপ্রিম কোর্টে বহাল হলো।

পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের (নব) সভাপতি শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী জানান, আজ তাদের সংগঠনে বাছাই শুরু হচ্ছে। সংগঠন থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেন, সংগঠনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রচণ্ড অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

১২ নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোন কলকারখানা অন্য রাজ্যে সরাবার চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস একথা জানান। তিনি একথাও বলেন যে এই রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ উৎসাহ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৩ নবেম্বর—আজ নব কংগ্রেস জোর করে ৭ যন্তর মন্তর রোডে আদি কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়টির দখল নিয়েছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে এই ভবনটিই অবিভক্ত কংগ্রেসের সদর দফতর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দু' ভাগ হবার পর ভবনটি আদি কংগ্রেসের দখলে আসে। বাড়ি দখলের প্রতিবাদে আদি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসাদিক আলি দ্বিতল ভবনটির একতলার একটি ঘরে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেন।

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅজিত বিশ্বাসের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিস আজ কলকাতা করপোরেশনের ফরোয়ার্ড ব্লক দলভুক্ত কাউনসিলার শ্রীঅজয় দে-কে গ্রেফতার করেছে। আদালত তাঁকে

বিদেশী সংবাদ

৮ নবেম্বর—আমেরিকা পাকিস্তানকে [...] ৩৬ লক্ষ ডলারের সামরিক সাজসরঞ্জা[ম] রফতানির লাইসেনস বাতিল করে দিয়েছে ব[লে] আজ ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা ক[রা] হয়। তবে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ডলার মূ[ল্যের] যন্ত্রাংশের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

৯ নবেম্বর — চেয়ারম্যান মাও সেতুং-[এর] বাণীর উধৃতিপূর্ণ বিখ্যাত রেড বুক গত [...] সপ্তাহ ধরে পিকিং-এ পাওয়া যাচ্ছে [...] সরকারী হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত এই বই[টি] ৭৪ কোটি কপি বিক্রি হয়েছে। রেড বু[কের] অন্তর্ধান ও ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও-[এর] অবস্থা সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে[ছে] তিনিই চেয়ারম্যান মাওয়ের ভাবী উত্তরাধিকা[রী]

১০ নবেম্বর—পূর্ববঙ্গের ব্যাপার ভার[ত] পাকিস্তান সমস্যা নয়। পাকিস্তানের [...] অংশের মধ্যে এক রাজনৈতিক সমাধান চ[াই] ভারত পশ্চিম জারমানির পদস্থ অফিসার[দের] মধ্যে আজ বনে বাংলাদেশ সমস্যা [...] আলোচনার সময় পশ্চিম জারমানির প্রতিনি[ধিরা] এই অভিমত মেনে নেন।

১১ নবেম্বর — পিপলস্ পারটির [...] শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টোকে লক্ষ্য করে [...] কয়েকবার পিস্তল থেকে গুলিবর্ষণ করা [...] তবে তাঁর আঘাত লাগেনি। শ্রী ভুট্টো [...] লাহোর ডেনটাল ক্লিনিকে ঢুকছিলেন, তখন [...] দিকে গুলিবর্ষণ করা হয়।

১২ নবেম্বর—চীন পাকিস্তানকে সংযত [...] কাজ করতে এবং পূর্ব বাংলা সমস্যার এ[ক] রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা চালা[তে] পরামর্শ দিয়েছে। লনডন টাইমস্ পত্রিকা[র] রাওয়ালপিনডির সংবাদদাতা একথা বলেছেন চীন বলেছে, কোন অবস্থাতেই ভারত আক্রম[ণ] করা পাকিস্তানের উচিত নয়। এবং তাদে[র] মতে ব্যাপারটি নিরাপত্তা পরিষদে তোলারও এ[টা] উপযুক্ত সময় নয়।

১৩ নবেম্বর—গতকাল চার ব্যাটেলিয়ন ম[ত] পাক সেনা নদীয়া জেলার শিকারপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে ঘাঁটি দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্তরক্ষী দলের সতর্ক প্রহরায় তাদের সে চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। পালটা আঘাতে শতাধিক পাক সেনা নিহত হয়।

১৪ নবেম্বর — মারকিন যুক্তরাষ্ট্র গতকাল ম্যারিনার-৯ মহাকাশযানটিকে মঙ্গলগ্রহ প্রদক্ষিণের জন্য কক্ষপথে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী ছাড়া অপর একটি গ্রহকে মানুষের তৈরি কোন বস্তুর প্রদক্ষিণের নজির এই প্রথম। অর্থাৎ মঙ্গলে এখন তৃতীয় চন্দ্রের সৃষ্টি হলো।

তারাশংকরের সর্বশেষ কীর্তি

এপার বাংলা ওপার বাংলার সর্বনাশা পরিস্থিতিতে বেদনাবিদ্ধ অন্তরের অবদান

১৯৭১ ৬৲

তিরোধানের মাত্র মাস দুই আগে লেখা এই উপন্যাস
বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

ভৃগুজাতকের লেখা

১৩৭২ কেমন যাবে

প্রতিটি রাশিগত ফলাফল বিচার ঃ লগ্নগত, জন্মমাস হিসাবে রাশিগত বিভিন্ন মাস হিসাবে স্বতন্ত্র রাশিগত ভাগ্য বিচার করা হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রফলও আছে।

প্রবীণ জ্যোতিষাচার্যের অপূর্ব অবদান এই বিপুল গ্রন্থ সাধারণের সুবিধার্থে দাম
॥ মাত্র দুই টাকা ॥

ভৃগুজাতকের

নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন

মাত্র দেড়মাসে ৪৪০০ কপি নিঃশেষিত। দ্বিতীয় মুদ্রণের দুই সহস্র কপি দুই সপ্তাহে বিক্রী হয়ে গেছে।

এই বইটি মিত্র ঘোষের বাংলা পকেট বুক সিরিজের অন্তর্ভুক্ত—দাম মাত্র ২৲
পকেট বুকের আসন্ন তৃতীয় দফার আর সাতটি বই ঃ

লেখক ঃ **লীলা মজুমদার, পরিমল গোস্বামী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, শংকু মহারাজ, প্রমথনাথ বিশী, ডঃ এন. আর. গুপ্ত**

বিষয় ঃ **উপন্যাস, রহস্য উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, নাটক, কেশচর্চা তথা সৌন্দর্য বিজ্ঞান। ২৲ ক'রে**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস

শত রূপে দেখা ১৪৲

চলচ্চিত্রে রূপায়িত

শংকর-এর অসামান্য গ্রন্থ

সীমাবদ্ধ ৬৲

৮ম মুদ্রণ

জ্যোতিরিন্দ্র চৌধুরী ও রবিজিৎ চৌধুরীর
নেফা অঞ্চলের একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ

সুবনসিরির উপজাতি ৫৲

লীলা মজুমদারের **পাখী ৫॥**
আবদুল জব্বারের **মুখের মেলা ৮৲**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা

বিভূতি রচনাবলী ১৪৲

১ম হইতে ৭ম পর্যন্ত পাইবেন ।। ৮ম খণ্ড বাহির হইতেছে

প্রমথনাথ বিশীর লালকেল্লা ১৮৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **আমি কান পেতে রই ১৪৲**

বাংলা পকেট বই

১১টি উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অধরামাধুরী
বাণী রায়ের অগানের দিন
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সুরের বাঁধনে
বিমল মিত্রের ফুলো ফটুক
আশাপূর্ণা দেবীর দূরের জানালা
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের তবু মনে রেখো
সুমথনাথ ঘোষের ফাগুন কখনো যাবেনা
অবধূতের সাচ্চাদরবার
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্ণচাঁপার দিন
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মালবী মালঞ্চ
নীহাররঞ্জন গুপ্তের নিরালা প্রহর

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-১২ ফোন ঃ ৩৪-৮৪৯১ ।। ৩৪-৩৪৯২

সূচীপত্র

অনেকে মিল্কমেড ভালোবাসেন কারণ এতে
চা আর কফি আরও সুস্বাদু হয় ব'লে।
কিন্তু শুধু এই নয়—মিল্কমেড দিয়ে আরো
অনেক কিছুই তৈরী হয়!
দুখানি লুচির ওপর
খানিকটা মিল্কমেড
কনডেন্সড মিল্ক ঢেলে
পাকিয়ে দিন।
এবার চুপি চুপি ওদের
টিফিনের বাক্সে
ভরে দিন।
কর্ণফ্লেক্স বা চিঁড়েভাজার
সঙ্গে কিছুটা মিল্কমেড
মাখিয়ে দিন। সকালের
জলখাবার খেতে
ওদের আর তাড়া দিতে
হবেনা।
দুধ : ১ লিটার
মিল্কমেড : ১ টিন
কিসমিস : ১৫টি
পাঁচ মিনিট সময় দুধ ফোটান।
একমুঠো খোসাছাড়ানো
চিনেবাদাম আর
কিছুটা মিল্কমেড—আহ...
জমাটি জলখাবার।
মাখন মাখানো
গরম গরম টোস্ট আর
তার ওপর বেশ
খানিকটা মিল্কমেড—
দেখবেন ওরা
কাড়াকাড়ি ক'রে খাবে।
খাঁটি দুধ আর
চিনি দিয়ে তৈরী,
ভিটামিন 'এ' ও
'ডি' সমৃদ্ধ
MILKMAID
SWEETENED
FULL CREAM CONDENSED MILK
মিল্কমেড
কনডেন্সড মিল্ক
খেতে ভালো,
খাওয়াও ভালো
নেস্‌লের তৈরী
NPM 6366

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীপ্রদীপ দাস

ASP L-87
মোহিনীময়ি! এ তোমারই জন্যে....
ল্যাক্‌মে
আল্ট্রা গ্লো
আর
আল্ট্রা ফ্রস্ট
ঠোঁটের রঙ

রূপ যৌবন বেশবাসে অপরূপ হয়ে আছে বসে।

বুদ্ধদেব গুহর

উপলব্ধির গভীরতায় ঋদ্ধ অনবদ্য উপন্যাস

বা তি ঘ র

দাম ৪·০০

'বাতিঘর' নিছক প্রেমের মিষ্টি মোলায়েম এক কাহিনী নয়; উপলব্ধির গভীরে ডুব দিয়ে সাহিত্যিক সত্যের মূল্যবান মুক্তোটি তুলে এনে তাকে এক অনবদ্য শিল্পরূপ দান করেছেন তরুণ লেখক বুদ্ধদেব গুহ তাঁর এই নতুন উপন্যাসে। রাতের ঘন অন্ধকারে চক্রাকারে নিয়ত-আবর্তিত বাতিঘরের জোরালো আলোকরেখার মত মানুষের মনও সদা-সর্বদা চরাচরের যাবতীয় কিছুর উপর সঞ্চারিত হয়ে হয়ে অবিশ্বাসের অন্ধকারের মধ্যে অহরহ যেন খুঁজে ফিরছে তার জীবনের পাথেয়টিকে। যে পাথেয়টুকুর তিল তিল সঞ্চয়ে সৃষ্ট তার বিশ্বাসটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে সে এই জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা-বাধা-বিপত্তিময় উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে পাড়ি জমায়। হৃদয়ে একটিমাত্র আশাকে লালন ক'রে : তার ওই বিশ্বাসের চাবিটুকু সাগ্রহ প্রতীক্ষমাণ তার কোনও এক উত্তরসূরীর হাতে যেন সে তুলে দিতে পারে, তারও পরবর্তী আর কারওর হাতে সেটিকে তুলে দেবার জন্যে—যাতে এই পরম্পরা একদিন চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে সার্থকতা দেয় তাকে, তার বিশ্বাসকে। সব বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত হয়তো বা সার্থকতায় পৌঁছয় না, অধিকাংশই হয়তো হারিয়ে যায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে; তবু এই-ই জীবন—এই খুঁজে খুঁজে ফেরা, আর সেই সন্ধানের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় নিয়ে সার্থকতার স্বপ্নমাখা চোখে এক সুদূর অজানা বন্দরের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করা।

প্রকাশিত হল

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস : **নগ্ন নির্জন** ৪·০০ **হলুদ বসন্ত** ৪·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

যাঁর নাম ঘনাদা

ঘনাদা-কাহিনী ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ৪·৫০

প্রতিভা বসুর

উজ্জ্বল উদ্ধার

উপন্যাস ॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ দাম ১০·০০

রমাপদ চৌধুরীর

পিকনিক

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

দর্শকের ভূমিকায়

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

মনোজ বসুর

প্রেমিক

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

ভালোবাসার অনেক নাম

হাসির গল্প ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তুঙ্গভদ্রার তীরে

ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ॥ একাদশ মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সারারাত

উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥ দাম ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

তিন দিন তিন রাত্রি

উপন্যাস ॥ চতুর্থ মুদ্রণ ॥ দাম ৬·০০

সুবোধ ঘোষের

ভারত প্রেমকথা

মহাভারতীয় প্রেমকাহিনী ॥ ষোড়শ মুদ্রণ ॥ দাম ৮·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯ ॥

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪
শনিবার, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
Saturday 27 November 1971

শীত আসন্ন

হেমন্ত এখনও শেষ হয় নি, তার ভাবগতিকে যাই যাই ভাব, দেখে মনে হচ্ছে শীত আসন্ন। এখনকার সকালের চেহারাটিতে শীতকে অনুভব করা যায়, মাঝে মাঝে উত্তরের বাতাস এসে গায়ে লাগে, বেলা ছোট হয়ে আসছে, রাতের বেলায় কিছু একটা গায়ে না দিয়ে আর পারা যায় না। দেখতে দেখতে শীত তার জাঁকজমকের চেহারাটি নিয়ে হাজির হবে। অনেকের আশঙ্কা, এবার যে ধরনের অস্বাভাবিক বর্ষা গেল, তাতে শীত হয়ত জাঁকিয়েই পড়বে।

গৃহস্থ মানুষের পক্ষে শীতকালটা এক হিসেবে ভাল, দু চারটে গরম পোশাকের বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় বটে কিন্তু মুখের স্বাদ পালটানোর এমন সুযোগ আর জোটে না। এই সময় শাকসব্জির প্রাচুর্য, সহজ স্বাস্থ্য-রক্ষার বিভিন্ন উপকরণও বাজারে এসে যায়, নানা জিনিসের দামও পড়ে আসে। যাঁরা কলকাতায় থাকেন তাঁরা অবশ্য বুঝতে পারছেন, বাজারে নানা ধরনের শীতের শাকসব্জির আমদানী শুরু হলেও তার দাম বেশ চড়া। সাধারণত এ-সময় এটা থাকে না। এবার কেন থাকছে তা বোঝা যায়। চাহিদা কিছু বেশী, আমদানি সে-অনুপাতে কম। কম হোক বেশী হোক পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই একটা নতুন চাপ সৃষ্টি হয়েছে, ও প্রান্ত থেকে এসেছেন লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। আমাদের যেটুকু আছে তার মধ্যে থেকেই এ'দের মুখে কিছু কিছু তুলে দিতে হবে, এটাই আমাদের মানব ধর্ম।

এই শরণার্থীদের জন্যে সরকারী যেসব ব্যবস্থা আছে আমরা তার সমালোচনা বা নিন্দা করছি না। শুধু মাত্র মনে করিয়ে দিচ্ছি, শীত আসন্ন। যেসব শরণার্থী কোনো রকমে মাথা গুঁজে শিবিরগুলিতে পড়ে আছেন তাঁদের জন্যে আসন্ন শীতে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে? রিক্ত এবং নিঃস্ব হয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের শীত কাটাবার ব্যবস্থা আছে বলে মনে হয় না। শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্যে শীত-বস্ত্রের প্রয়োজন যে কতটা তা বলার দরকার করে না। শীতের হাত থেকে এ'দের সকলকে রক্ষা করার জন্যে কম করেও এক আধখানি কম্বল ও কিছু গাত্রবস্ত্র প্রয়োজন। এই প্রয়োজন কেমন করে মিটবে? সরকার যদি এদিকে নজর দিতে বিলম্ব করেন তবে শিবিরগুলিতে অসুখ বিসুখ দেখা দেবে। বিশেষ করে শিশুদের। ব্যাপক হারে কোনো ব্যাধি যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যে অনতি-বিলম্বে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিলে আমরা খুশী হব। সেবা প্রতিষ্ঠান-গুলির সহযোগিতাও কাম্য। অবশ্য শরণার্থী-সাহায্যের নাম করে কিছু কিছু সুবিধা গ্রহণের দৃষ্টান্ত না আছে এমন এমন নয়। কিন্তু পরিচিত এবং বড় সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এ-কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। সরকারের ওপর এতই চাপ যে তার পক্ষে হয়ত সবদিক সামলানো সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে রাখতে হবে। শীত যেমন আসন্ন সেই রকম আরও এক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। এই শীতে ভারত আক্রমণের একটি পরি-কল্পনা পাকিস্তানের রয়েছে। পশ্চিম সীমান্তে তারা যেভাবে প্রস্তুত তাতে যে কোনো সময়ে বিরোধটা বাধিয়ে তুলতে পারে। ভারত তার জন্যে সর্বোতভাবে প্রস্তুত যদিও তবু এই যুদ্ধ তার পক্ষে অনর্থক একটা চাপ সৃষ্টি করবে। ভারতের পূর্ব প্রান্তেরও অবস্থা ভাল নয়, পাকিস্তানের চোখ সুযোগ সন্ধান করছে। আগামী দু একটি শীতের মাসে কী হবে, পাকিস্তান হঠকারিতা করে ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা তা বলা যায় না। তবে সম্ভাবনা যথেষ্ট। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আগামী দু তিনটি মাস আমাদের নানা বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে হয়ত। যদি হয়, তবু বলি, সেই শীতের পর বসন্ত কী দেখা দেবে না?

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম
৭০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

মুদ্রণের কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর ব্যয় এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কাগজ কিনে এবং সেই কাগজে সংবাদপত্র ছেপে আমাদের ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তদুপরি ১৫ নভেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি কপি কাগজের উপর ০.০২ পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আগামী ২০ নভেম্বর থেকে আমরা দেশ পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি। বর্ধিত হারে প্রতি কপির নূতন বিক্রয় মূল্য হবে ০.৬৮ পয়সা ও অন্তঃশুল্ক ০.০২ পয়সা অর্থাৎ মোট ০.৭০ পয়সা।

সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে এই ব্যাপারে অতীতের মতই, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সারকুলেশন ম্যানেজার
দেশ

ভারত-পাক সম্পর্ক যাতে
অধিকতর বিপজ্জনক অবস্থায় গিয়ে
না পৌঁছয় তার জন্য সব রকম
চেষ্টাকেই আমেরিকা সমর্থন জানাবে।
নিক্সন
ইয়াহিয়া

পাকিস্তানের সংকট

পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ এবার সত্যিকারের বেকায়দায় পড়েছে। যেদিকে এগোবে বিপদ। যেদিকে যাবে সর্বনাশ। একমাত্র দৈব শক্তি ছাড়া আর কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

মুক্তি সেনাদের আক্রমণে পূর্ব বাংলায় পাক-সেনারা আজ ভীষণ ব্যতিব্যস্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, সরকারী কাজকর্ম প্রভৃতিতে যে সব পশ্চিম পাকিস্তানী রয়েছে তারা এবার সত্যিকারের আতঙ্কিত। তাদের অধিকাংশই গত কয়েক মাস ধরে পাক সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙালীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। এখন পাল্টা আক্রমণ আসছে। এখন তারা দেখছে যে, সেনাবাহিনী সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী এবং ভেতরে মুক্তিবাহিনীকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তার নিজেরই আত্মরক্ষার বিরাট তাগিদ, সে নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত। তাই এখন ওই সব পশ্চিমার সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা কমেছে, আতঙ্ক বেড়েছে এবং যে যেমন পারছে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে খোদ পশ্চিম-পাকিস্তানে।

এদিকে পূর্ব বাংলায় কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও কার্যত বন্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানীরা এই জিনিসটায় অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। মারচ মাসে পশ্চিমাদের কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একটু একটু করে আবার চালু হয়েছিল। কলকারখানায়, বিশেষ করে চটকলগুলিতে উৎপাদন স্বাভাবিকের শতকরা প্রায় চল্লিশভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। রফতানীও হচ্ছিল। চট্টগ্রাম, চালনা প্রভৃতি বন্দরে বিদেশী জাহাজের আনাগোনা বেশ ভালভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। আভ্যন্তরীণ যানবাহন চলাচলও শুরু হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ভালর দিকে যাচ্ছিল। এবং, কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমাদের আশা ছিল যে, শীতকালে তাদের অবস্থা আরও ভাল হবে।

সেই আশাতেই এখন ছাই পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে। পাক সেনাবাহিনী দেখছে তার সর্বদিকে শত্রু। সীমান্তে মুখোমুখি ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা। পূর্ব বাংলার ভেতরে সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর লোকেরা। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চলছে। এবং এই আক্রমণে সেনাবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

হওয়ার কথাও। কোনও সেনাবাহিনীই চতুর্দিকের আক্রমণের সঙ্গে লড়তে পারে না। সাধারণত সেনাবাহিনী সামনা-সামনি লড়াইয়ে অভ্যস্ত। সেইভাবেই তার শিক্ষা। যখনই চারিদিক থেকে আক্রমণ আসে, যখনই সেনাদের সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে হয় তখনই তার শক্তি প্রচণ্ডভাবে কমে যায়। পূর্ব বাংলায়ও পাক সেনাবাহিনীর তাই হয়েছে। গেরিলারা সব দিক থেকে আক্রমণ করছে। অতর্কিত আক্রমণ। কোন চক্ষুর গেরিলা আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে। সম্প্রতি যে সব বিদেশী সাংবাদিক পূর্ব বাংলায় গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই বলছেন, মুক্তি-সেনারা সর্বত্র সক্রিয়। প্রত্যেকটি বাঙালী তাঁদের সমর্থক। সব সরকারী এবং বেসরকারী খবর তাঁরা পাচ্ছেন। সেনাবাহিনী এবং সরকারী কর্তাদের গতিবিধি তাঁদের নখদর্পণে। তাঁরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

এই বিপদে ভিয়েৎনামে মার্কিন সেনারাও পড়েছে। গোটা ভিয়েৎনাম তাদের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ গোটা ভিয়েৎনামের সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটি ভিয়েৎনামীকে মার্কিনীদের সন্দেহ করে চলতে হয়। প্রত্যেকটি ভিয়েৎনামী সম্পর্কে

যাঁরা শিক্ষিত। ভিয়েৎনামের গেরিলারা অবশ্য বহুদিনের অভিজ্ঞ। গেরিলা লড়াই গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁরা চালাচ্ছেন। কখনও ফরাসীদের বিরুদ্ধে। কখনও জাপানের বিরুদ্ধে। এবং তারপরই মার্কিনীদের বিরুদ্ধে। চল্লিশ বছর ধরে লড়াই করতে করতে গোটা জাতি লড়াইয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। চীন এবং রাশিয়া থেকে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছেন। সেই জন্য প্রবল প্রতাপান্বিত বিরাট শক্তিশালী মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গেও তাঁরা বিজয় বিক্রমে লড়ে যেতে পারছেন। এখানেও গেরিলাদের আচমকা এবং চারদিকের আক্রমণে মার্কিন সৈন্যরা ব্যতিব্যস্ত।

পূর্ব বাংলায় যদি পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ আরও বহু সৈন্য আনতে পারত তাহলে অবশ্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে তাদের সুবিধা হত। কিন্তু সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। মারচে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের প্রায় দেড় ডিভিসন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিল। তার পর গত সাত মাসে আরও প্রায় আড়াই ডিভিসন এসেছে। কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছে না। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পুরোদমে লড়াই চালাতে গেলে পূর্ব বাংলায় আরও অন্তত চার ডিভিসন সৈন্য চাই। অত সৈন্য আনা সম্ভব হচ্ছে না।

মারচ মাসে অবশ্য পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে সব পাক সৈন্য সরিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল। সীমান্তের পোস্ট-গুলি তখন ফাঁকা ছিল। এখন আর সেটা পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে আনাও পাক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটাও তাদেরই ভুলের জন্যই।

ভারত সরকারকে ভয় দেখাবার জন্য পাকিস্তানীরা বাংলাদেশ সমস্যা দেখা দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই গোটা পশ্চিম সীমান্তে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে আসে। তারা কাশ্মীর আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজনও শুরু করে দেয়। ফলে সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীও সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন পাকিস্তানকে আরও সৈন্য সীমান্তে নিয়ে আসতে হয়। এখন এর ফলে পাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বরং, সম্প্রতি তারা বাংলাদেশ থেকেই কিছু সৈন্য সরিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এই ভারতকে ভয় দেখাবার নীতি অবলম্বন করতে গিয়ে পাকিস্তানকে বাংলাদেশেও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। যে মুহূর্তে পাক কর্তৃপক্ষ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে, অমনি ভারত সরকারও পূর্ব সীমান্তে বহু সৈন্য নিয়ে আসেন। ভারতীয় সৈন্যরাও এখন গোটা সীমান্তে হাজির। পাক কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাই সীমান্ত থেকে সরিয়ে ভেতরে সব সৈন্য নিয়ে যাওয়াও কঠিন। ভেতরে যে সৈন্যরা রয়েছে তারা মুক্তিবাহিনীর সবদিকের আক্রমণের মোকাবিলা করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

পাক কর্তৃপক্ষ রাজাকার বাহিনী গড়ে কিছুটা অ-সামরিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতেও তেমন সুবিধা হয় নি। কারণ প্রথমত, বাঙালী রাজাকারদের পাক কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতে পারছে না। এবং দ্বিতীয়ত, অ-বাঙালী রাজাকাররাও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের ধাক্কায় ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাদের কৃতকার্যের ফলে এবং মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবাঙালীরা বাংলাদেশে থাকতেই এখন ভয় পাচ্ছে। যে পারছে পশ্চিম পাকিস্তানে পালাবার চেষ্টা করছে।

*

পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবুরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা রফা করতে চেয়েছিল। সেই রফার প্রধান শর্ত ছিল যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু তাতে তারা শেখকে রাজি করাতে পারে নি।

শেখ যদি এই রফায় রাজি হতেন তাহলে অবশ্য পাক কর্তৃপক্ষ আপাতত মুখ রক্ষার একটা পথ পেত। তাহলে তারা শেখকে মুক্তি দিয়ে ঢাকায় নিয়েও আসত। কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হয় নি, তাই এ-পথে সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনাও আর নেই।

ইয়াহিয়া খাঁ এমন চেষ্টাও করে যাচ্ছে যাতে বৃহৎ শক্তিগুলি ভারতকে চাপ [দিয়ে] মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করা বন্ধ [করে।] বৃহৎ শক্তিগুলি যে চেষ্টা করেওছি[ল] জন্য ভারত-পূর্ব বাংলা সীমান্তে সম্মিলিত লোক বসাবার প্রস্তাবও এ[সেছিল।] কিন্তু ভারত সরকার তাতে রাজি [হন নি।] বরং, ইন্দিরা গান্ধী সব বৃহৎ [শক্তিকে] বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত কিছুতেই [মুক্তি]বাহিনীকে সাহায্য করা বন্ধ করবে [না।] তিনি তাঁদের আরও জানিয়েছেন যে ভারতে সাধারণ মানুষের এবং সব [দলের] দাবি হল বাংলাদেশ সরকারকে [স্বীকৃতি] দিয়ে একেবারে খোলাখুলিভাবে [মুক্তি]বাহিনীকে পুরোদস্তুর সাহায্য দেও[য়া।]

মুক্তিবাহিনীর লোকেরা কতটা ভ[ারতের] সাহায্য পাচ্ছেন বা পান নি সে প্রসঙ্গ [থাক।] কিন্তু এটা ঠিক যে, ভারত সরকারকে পাকিস্তানী প্রস্তাবে রাজি করানো [গেলে] তাহলে মুক্তিবাহিনী নানা অসুবিধায় প[ড়ত।] সে অসুবিধায় তাঁদের পড়তে হয় [নি।] তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র এবং শক্তি দিনকে [দিন] বাড়ছে। বাংলাদেশের আরও হাজা[র] হাজারে ছেলে এগিয়ে আসছে মু[ক্তি]বাহিনীতে যোগ দিতে। তারা অভি[জ্ঞ] সৈনিকদের কাছে শিক্ষা পাচ্ছে। প[াচ্ছে] অস্ত্রশস্ত্র। তাঁদের সাহসের তুলনা নে[ই।] এই বাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তান এ[খন] ব্যতিব্যস্ত। আর দু-তিন সপ্তাহে এ[দের] আক্রমণে পাগল হয়ে উঠবে।

*

তাই পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের সাম[নে] এখন দুটো পথ রয়েছে। (এক) রফা ক[রে] দেওয়া—স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নেও[য়া] এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া। শে[খ] মুজিবের মুক্তির বিনিময়ে তারা বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করতে পারে। আর, (দুই) তারা সে পথে না গিয়ে ভারতের সঙ্গে পুরোদমে লড়াই শুরু করে দিতে পারে। অতর্কিত বিমান আক্রমণ শুরু করতে পারে।

এর যে পথেই যাক পাকিস্তানকে রক্ষা করা আজ পাক সামরিক নেতাদের পক্ষে কঠিন। কারণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিলেও পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙে যাবে—নানা অঞ্চল থেকে স্বাধীনতার দাবি উঠবে। আর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেও পাকিস্তান শেষ হয়ে যাবে—কারণ বৃহৎ কোনও রাষ্ট্র এবার তাকে রক্ষা করতে আসবে না।

পাকিস্তানের সমর নায়করা পাকিস্তানের পক্ষে জীবনমরণ সমস্যা সৃষ্টি করেছেন।

২০-১১-৭১

নবারুণ গুপ্ত

শেষে ভৌগোলিক মানচিত্রে ভারত বা হিন্দুস্থানের স্থান ছিল বহু শতাব্দী। ভাস্কো-ডা-গামা থেকে জেমস্‌ প্রেট আর তার কলম্বাস পর্যন্ত সবাই এই দুঃসাহসিক সন্ধানে ঘরছাড়া হয়ে...। ঔপনিবেশিকতার ঔদ্ধত্য তখন ...শী; সামুদ্রিক তরঙ্গ তো ... তলায় এবং ওলন্দাজ, ফরাসী আর ...র আধিপত্যের অবসান আনল ...পর আন্তর্ঘাতিক কলহ; এই নাটকের ... অঙ্ক বোধহয় এখনো আমরা দেখিনি ...মধ্যে, মাত্র বছর দুশো আগে, স্থাপিত ...া ব্রিটেনের বিশাল ভারত সাম্রাজ্য ...লে যেসব মানচিত্র দেখেছি তাতে স্পষ্টই ...নো ছিল যে, এই সমস্ত অঞ্চলে সূর্যাস্ত ...ত। দাবিটা একেবারে অসত্য ছিল ...। আজকের তরুণদের মাঝে মাঝে স্মরণ ...রিয়ে দিতে হয় যে, সেই উদ্ধত ইংরেজ ...র্যের প্রথম উত্তাপ পড়েছিল বাঙলায় ...থাৎ ভারতবর্ষে—অর্থাৎ কলকাতায়। সংবিধানের ভাষ্যে ইন্ডিয়া তথা ভারত কথাগুলো আমি অবহেলা করতে পারি অবলীলাক্রমে। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ শাসিত প্রাচ্যের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

অপরিমিত ক্ষমতার অবশ্যম্ভাবী সঙ্গী নিরঙ্কুশ নির্বুদ্ধিতা। আমাদের গতকালীন শাসকরাও এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিস্তার পাননি। মোগলী মোহে তাঁরা ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী সরিয়ে দিলেন কলকাতা থেকে কোন অজ্ঞাত গ্রামে যার নয়া নামকরণ হলো নয়াদিল্লি। স্থপতি লাচিন্স আর বেকার আজ জীবিত থাকলে বুঝতে পারতেন যে, তাঁরা অমিততেজ সাম্রাজ্যের অজেয় রাজধানীর পরিবর্তে তার সমাধি বা শ্মশানেরই পরিকল্পনা করেছিলেন। আজকের নয়াদিল্লির অফুরন্ত ফোয়ারা দিয়ে ঢাকা যাবে না তার অন্তর্নিহিত অবাস্তবতা আর সীমাহীন শূন্যতা। কলকাতার সমস্যার সীমা নেই; শহরের সামগ্রিক কদর্যতার প্রবক্তাও সংখ্যাহীন; তবু অপবাদবিশারদ বিদেশী প্রতিবেদকদের কাছেও শুনেছি যে, কলকাতার মতো প্রাণবন্ত শহর অন্যত্র অনুপস্থিত। মন্তব্যের সম্ভাব্য অত্যুক্তি অমার্জনীয় নয়।

*

সাময়িক প্রবাসান্তে সাম্প্রতিক প্রত্যাবর্তনে প্রত্যহ আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে একমাত্র এই যে, কলকাতা এক মুমূর্ষু নগরী। অবক্ষয়ের অসীম সাক্ষী রাস্তার ধারে ধারে। কলকাতা সম্বন্ধে এই পরিসংখ্যানসমৃদ্ধ ধারায় আমি তবু প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য, কেননা কোনো জাতির জীবনীশক্তির একমাত্র বা সর্বোচ্চ পরিমাণ নয় তার ধনদৌলতের আরোহণ বা অবরোহণ। গভীরতর প্রশ্ন নিশ্চয়ই এই যে, আমি বাঁচতে চাই কিনা এবং সেজন্য আমি কী করতে প্রস্তুত আছি বা নেই। কলকাতার আত্মঘাতী প্রবৃত্তির বৃত্তান্ত আমি অদ্যাবধি শুনিনি। রোজ সকালে কাগজ খুললেই অন্নদাশংকরের লাইন বদলে বলি : শয়নের শেষ চিন্তা প্রভাতের প্রথম ভাবনা; আজ ট্রাম রবে কি রবে না। অসংখ্য অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আমি পরের বুলি ধার করে বলি—কলকাতা আছে, থাকবে। এই আপাত-অগ্রাহ্য আশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই কল্পিত জ্যোতিষের ক্রোশদীর্ঘ কোষ্ঠীতে বা তথাকথিত রাজনীতিক বিশ্লেষকদের অর্ধ-বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীতে। অস্বীকার করা বৃথা যে, প্রতিদিন কলকাতা ও পার্শ্বাঞ্চলে বহুজন হতাহত হচ্ছে; তাঁরা ঠিক তোমার আমার মতো। তবু মনে রাখি, স্বেচ্ছায় মরতে যায় কে যে গোড়ায় বাঁচতে চায়নি?

কলকাতার মৃত্যুসংবাদ তাই আমার কাছে মার্ক টোয়েনের ভাষায় প্রিম্যেচিওর, যেন সন্ধ্যার আগেই শাঁখ বাজানো। এর পর আমার অধিকার আছে স্পষ্টই বলবার যে, বর্তমান কলকাতা অতীত গৌরবের স্বল্পায়ু সন্তান। সাময়িক স্বস্তির জন্য আমি সব দোষ ঠেলে দিতে পারিনে লর্ড কর্জন বা ইয়াহিয়া খানের দরজায়। আমার অপরাধী বিবেক আদেশ করে নির্মম অন্তর্দর্শন। দৃশ্যটি আর যাই হোক, আকর্ষণীয় নয়। আত্মজিজ্ঞাসার বাড়া অনুসন্ধানী অনুশীলন আমার অজানা।

*

সহজ কথা যায় না বলা সহজে, কিন্তু কলকাতাকে আজ কবুল করতেই হবে যে, বর্তমানে দিল্লির বাদশাহী যদি স্বদেশ সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর বলে প্রতীয়মান হয় তবে কলকাতার হাতও রক্তমুক্ত নয়। আমরা একদা রাখিবন্ধন, স্বদেশী মেলা ইত্যাদি নানা উৎসব পালন করেছিলাম। এসবের প্রয়োজন হয়েছিল, কেননা ঠিক তার পূর্বদিবসেই প্রতিবেশীর প্রতি ন্যূনতম সৌজন্য প্রদর্শন করিনি। যেহেতু কলকাতা ছিল বৃহৎ ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী, ইংরেজীশিক্ষিত কতিপয় বাঙালী হয়ে গেলেন বেনামী সাম্রাজ্যবাদী। এই সীমায়িত ময়ূরপুচ্ছাবৃত কমপ্রাডর্‌ বাবুসম্প্রদায়ের দ্রুত বিস্তার হয় সর্বভারতে। এর সদস্যদের ঋণীকৃত এবং প্রধানত কলমসর্বস্ব বলবত্তায় বিনয়ের স্থান ছিল অল্পই। বিনয় সেকালে ক্লীবের ভূষণ। তবু তৎকালীন বাঙালীর দেশটার কল্যাণকামনা। নইলে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ কেন বাধ্য করবেন তাঁর প্রিয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথকে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসক[illegible] হতে? স্বেচ্ছাচারী পৈতৃক কর্তৃত্বের তখনও দায় ছিল প্রজার কল্যাণসাধন। নানা কারণে, যা সর্বথা অসঙ্গত ছিল না, সে ঋণ আজ বিস্মৃত। বিহার, ওড়িশা, আসাম, এমন কি পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙালীর সুপরিকল্পিত বিতাড়ন সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় না অন্যের গূঢ় অনাচারে।

কলকাতার বর্তমান অপরিমেয় অখ্যাতির জন্য আমি তার আদিম বাসিন্দা বা পরবর্তী আগন্তুকদের বেকসুর খালাস দিতে পারিনে—কাঠগড়ায় আমিও আছি—কেননা বর্তমান বাঙালী অসহায়তার মতো এমন বৃহৎ বিপর্যয় সম্পূর্ণ বহিরাগত হতে পারে না। আবহাওয়া দফতর প্রায়শ বলে, ডিপ্রেশন ইন দি বে-অব বেঙ্গল। বঙ্গোপসাগরে বিষাদ নাহি, আছে অন্তরে।

কলকাতা যে দ্রুতগামী বিশ্বপর্যটকের গতিপথে প্রথম বা দশম সারিতেও স্থান পায় না, তার জন্য দিল্লিকে দোষী সাব্যস্ত করলে অবিচার হয় না। তবু দিল্লির বাদশাহী ঔদাসীন্য বর্তমান বাঙালী সম্বলহীনতার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না। পাকিস্তানী বর্বরতা লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে ঘরছাড়া করেছে। নাকি ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছে? ক্ষীয়মান কলকাতা, মুমূর্ষু কলকাতা আজও নির্ভয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে : বিশ্বে কোথায় পাবে এমন স্থান? কার জন্য জায়গা নেই কলকাতায়? দিল্লির কথা আলাদা। ওটা শহরই নয়। পরাশ্রিতের উপায় কোথায় পরকে কোল না দিয়ে? কলকাতা বাকি ভারতকে শোষণ এবং পালন করেছিল—একদা। অধুনা ঊর্ধ্বগামী শহরদের হিংসা করিনে। মাদ্রাজে বা আহমেদাবাদে কেন হবে না নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান? এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গেও মতবৈষম্য অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, কেন পড়শীর কয়লা বা ইস্পাত আমার দ্বারে একই দামে বিক্রীত হবে যা সুদূর মাদ্রাজে বা পাঞ্জাবে পৌঁছোতে অনেক বেশী রেলভাড়া লাগে। হেন তর্ক অন্তহীন।

তবু ভাবতে ভালো লাগে যে, কলকাতায় ঠাঁই আছে সবাকার। মার্কিন টুরিস্ট তার ডলার নিয়ে যাক ম্যানিলা বা হংকঙ। আমার মায়ের কোলে আসুক সারা পৃথিবীর গৃহহারা মাতৃহারা সকল সন্তান। আমি তো পান করি শুধু মায়ের একটি স্তন : কুখ্যাত কলকাতার অপরাধ মুক্ত আজও সবাকার তরে। এমন দাবি আজও ভারতের দ্বিতীয় কোনো শহর করতে পারবে বলে জানিনে। অতএব, কলকাতা, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

একটি চীনা ধাঁধা

দেবরাজ

তামাম দুনিয়ার কাছে লাল চীন একটা হেঁয়ালী আজও। কম্যুনিস্ট বিপ্লব সে দেশে ঘটেছে বাইশ বছর আগে, সেখান-কার সর্বেসর্বা হয়ে দেখা দিয়েছেন চেয়ার-ম্যান মাও। এই বাইশ বছরে তাঁর ক্ষমতা একটুকুও কমেনি, আজও চেয়ারম্যান মাওয়ের ওপর চীনের নাগরিকদের অগাধ বিশ্বাস। কোনও দিন তিনি যে তাদের ছেড়ে চলে যাবেন এ কথা তারা ভাবতেই পারে না। শতায়ু তিনি তো হবেনই, হয়তো নব্বেরে কোঠা পেরিয়েও অনেক কাল তিনি কলা দেখাবেন যমকে। তবুও মাও সে তুং আর যাই হোন অমর তো আর নন—রক্তমানুষ তিনি। একদিন না একদিন ইহ জগৎ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। বয়স তো তাঁর কম হয়নি। এখন তাঁর ৭৭ চলছে। কাজেই তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে সে প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই মাঝে মাঝে উঠছে। নামও একাধিক এ প্রসঙ্গে শোনা গেছে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত লোকে জানতো মাও-য়ের শূন্য গদিতে বসবেন তখনকার দিনের রাষ্ট্রপতি লিউ শাও চি। তাত্ত্বিক পণ্ডিত বলে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পর্দার আড়ালে।

অতঃপর আড়াই হলো নতুন উত্তরাধিকারী হয়েছে নিয়েছেন মাও সে তুং। তাঁর নাম লিন পিয়াও। কিন্তু ইদানীং যা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে নিয়েছেন বলা বোধ হয় ভুল হলো, নিয়েছিলেন বলাই বোধ হয় ঠিক। লিন পিয়াওয়ের নাকি কপাল পুড়েছে, চীনের দু' নম্বর নেতা তিনি নাকি আর নন। এমন কী এমন কথাও উঠেছে, তিনি মাওয়ের ডান হাত তো আর ননই, হয়তো বা ইহলোকেই আর নেই। বিস্তর কাহিনী দেশে দেশে রটেছে লিন পিয়াওকে নিয়েই। তার বেশীর ভাগই যে গালগল্প তাতে ভুল নেই। সে সব শোনা গেছে হয় হংকংয়ে, নয় তো ওয়াশিংটনে। চীনের হালচাল যাঁরা বোঝার চেষ্টা করেন তাঁদের ওই দুই শহরে। যে আড্ডা মাঝে মাঝে জাঁকাবাজারী গুলির আড্ডা হয়ে যে দাঁড়ায় তাঁর প্রমাণ ঢের পাওয়া গেছে। চীনকে অপদস্থ করার জন্যে কখনও কখনও ইচ্ছে করে অনেক গাঁজাখুরি গল্প বানানো হয়, কখনও আবার তিলকে তাল করে ছোটো একটা তুচ্ছ ঘটনাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বড় করে তোলা হয়ে থাকে।

তবুও যা রটে তার কতকটা তো বটে। লিন পিয়াওয়ের কপাল ভেঙেছে এ-খবরটা গোড়ায় হংকং-তাইপে-ওয়াশিংটনে চালু হলেও তা মস্কোতে পর্যন্ত পৌঁছেছে। রুশীদের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস আর তাদের পয়লা খবরের কাগজ প্রাভদা মেনে নিয়েছে, লিন পিয়াও চীনের ক্ষমতার স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকতে নাও পারেন এমন ইঙ্গিত করতেও তারা ছাড়েনি। তাদের মতে চীনে নাকি একটা জাতীয় আত্মিক লড়াই চলছে, তার ফলে খুব উঁচু পর্যায়ে তীব্র ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে। লিন পিয়াও নাকি তারই প্রথম বলি। চেয়ারম্যান মাও তাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করা থেকে এই সেদিন পর্যন্ত তাঁর আর মাওয়ের ছবি রোজ একসঙ্গে বেরুতো। তাঁদের দুজনের জয়ধ্বনি একসঙ্গে দিত জনতা। সরকারী-বেসরকারী অনুষ্ঠানে, ভোজসভায়, পার্টিতে তাঁদের দুজনের স্বাস্থ্যপান করাই ছিল রেওয়াজ। খবরের কাগজে বেতারে টেলিভিশনে, জনসভায়, পার্টির মিটিঙে গাওয়া হতো তাঁর দীর্ঘ প্রশস্তি, পৌঁছে দেওয়া হতো তাঁর বাণী মাওয়ের পুণ্য বচনের সঙ্গে চীনের ঘরে ঘরে।

এখন নাকি তা আর হচ্ছে না। লিন পিয়াওয়ের ছবি আর বেরুচ্ছে না, তাঁর প্রশস্তি আর গাওয়া হচ্ছে না। তাঁর বাণী লোকের কাছে আর কেউ তুলে ধরছে না, তাঁর স্বাস্থ্যপান ভোজসভায় ভোজসভায় কেউ করছে না। এমন কী তাঁকে চীনের কেউ দেখেনি অনেককাল। শুধু তাই নয়, চাকাটা উলটো দিকেই দিব্যি ঘুরে চলেছে। লিন পিয়াওয়ের বিরূপ সমালোচনাও শুরু হয়েছে খোলাখুলি। কানাঘুষো চলছিল বেশ কিছুদিন, এখন ক্রমে রঙও চড়ছে, সুরও। লিন পিয়াও এমনই অস্পৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে, তাঁর লেখা ভূমিকা আছে বলে লাল চীনের বাসিন্দাদের বেদ-বাইবেল-গীতা-কোরাণ যে বিখ্যাত বই—যাতে আছে মাওয়ের বাছা বাছা বাণী—তাই নাকি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোনও কিছু হঠাৎ করা হয়নি। রাতারাতি রাজনৈতিক ভোজবাজীতে লিন পিয়াও উবে যাননি। তাঁর অন্তর্ধান হয়েছে আস্তে আস্তে, তাঁর পতনের কথা দেশের লোককে সইয়ে সইয়ে বলেছেন কর্তারা। সেই জন্যে অক্টোবর বিপ্লবের যে স্মারক বই বেরিয়েছে বিদেশী ভাষায় তাতে লিন পিয়াওকে বড় করেই দেখানো হয়েছে, ছোট করার কোনও চেষ্টাই তাতে নেই।

কী এমন দোষ করেছেন লিন পিয়াও যে তাঁকে একেবারে চরম শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কেউ কেউ বলছে লিন পিয়াওয়ের এমন বাড় বেড়েছিল যে, মাও বেঁচে থাকতে থাকতেই তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজে গদি দখল করার ফন্দি আঁটছিলেন। মাওকে বন্দী করার নয়, খুন করার মতলবই নাকি তাঁর ছিল। কিন্তু কপাল দোষে তাঁর সে চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তিনি একটা বিমানে চেপে দেশের বাইরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। সে মতলব ফাঁস করে দেন তাঁরই মেয়ে লিন টু-টু। সে বিমানকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় মঙ্গোলিয়াতে। তাতে ছিলেন তাঁর বউ, ছেলে, আর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাওয়ের এককালের অত্যন্ত অনুগত সহকর্মী চেন পো-তা আর চীনা বিমান-বহরের বড়কর্তা উ ফা-হসিয়েন। ওঁরা তিনজনই ছিলেন নাকি ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু। বিমানটা মাটিতে ভেঙে পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে যায়।

বিমান দুর্ঘটনার কথাটা সত্যি। ওটা ঘটেছিল ১১ সেপ্টেম্বর। খবরটা পাওয়া যায় রুশীদের কাছ থেকে। তারা বলছে, বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে এগারোটি লাশ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে একটি মেয়ের। এর পর সাত হপ্তা কোনও বিমান আকাশে উড়তে দেওয়া হয়নি চীনে। একটা বড় রকমের কিছু যে ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যিই কী লিন পিয়াও মারা গেছেন ওই দুর্ঘটনায়? চীনের তরফ থেকে তো কথাটা আজও স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। অনেকে বলছেন ব্যাপারটা স্রেফ গাঁজাখুরি। লিন তো জানতেনই মাও সে-তুংয়ের পর গদি তাঁর বাঁধা। তা হলে খামোকা মাওকে তিনি খুন করতে চাইবেন কেন? লিন পিয়াওকে অনেক দিন দেখা যায় নি বলে তিনি মারা গেছেন কী বন্দী হয়েছেন, এমন কী কথা আছে। মাও সে তুংকে কিছুদিন দেখা না গেলেই তো রব ওঠে তিনি আর নেই।

মাঙ্গোলিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় তিনিই মারা গেছেন এমন কথাও তো উঠেছিল। হাইলে সেলাসির সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার পর প্রমাণ হচ্ছে ওটা মিথ্যে রটনা। লিন পিয়াওয়ের বেলাও যে তাই হচ্ছে না তা কী জোর করে বলা যায়? তিনি যক্ষ্মা রুগী, স্বাস্থ্য তাঁর ভালো নয়। তাই তাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যায় না। তাতে কী প্রমাণ হয় তিনি বেঁচে নেই?

মনকে শুধিয়েছ, আমি তোমাকে সর্বক্ষণ কোন প্রশ্নটি, মাত্র একটি প্রশ্ন শুধোতে চাই? বলে।"

এর চেয়ে পকেট-বুক সাহেবের কেশব, মোচার খোলও অক্লেশে বলা যেতে পারে ত্রিসংসারে হয় না। জর্মন জাতটাই দুই

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিদেশে (৩১)

কথায় বলে "কানু ছাড়া গীত নেই।" অবশ্য সে গীত শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যবীর্য তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এমন কি তিনি যে মথুরায় একাধিক বিবাহ করেছিলেন এবং হয়তো বা এঁদের কোনো একজন বা একাধিক জনকে ভালোও বেসেছিলেন— এসব বিষয় নিয়ে নয়। সত্রাজিতদুহিতা সত্যভামার প্রতি তিনি যে বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতে আছে, "সত্যভামা কোপাবিষ্ট চিত্তে রোদন করিতে করিতে বাসুদেবের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কোপানল উদ্দীপিত করিলেন।" এবং ফলস্বরূপ পরে যে হানাহানি আরম্ভ হয় সেটাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিস্তর ভোজ এবং অন্ধক বংশের বীরদের বিনষ্ট করেন। কিন্তু প্রশ্ন, সত্যভামার প্রতি বাসুদেবের অনুরাগ নিয়ে কোনো কবি উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি করেছেন বা "গীত" গেয়েছেন এ-কথা তো কখনো শুনিনি। কানুর গীত মানেই শ্রীরাধার উদ্দেশে কৃষ্ণের প্রেমনিবেদনের গীত এবং তার চেয়েও মধুরতর এবং বেদনায় নিবিড়তর— বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়— কানুর বিরহে রাজার ঝিয়ারির আর্তগীতি।

গোডেসবের্গ-মেলমের অতি কাছেই রাইনের দুটি অপরূপ সুন্দর দ্বীপ। অর্থাৎ লটেদের বাড়ি থেকে দূরে নয়। কিন্তু উজান বাগে।

ছেরমান নৌকোটি ফিটফাট করে সেটাকে এক ধাক্কায় ভাটির দিকে চালু করে দিয়ে বেশ উঁচু গলায় বললে, "বলি, লটে, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। রিভার-পুলিস কাছেই।" আমাদের স্টেশনে স্টেশনে যে-রকম একদা সাইনবোর্ড সাবধানবাণী শোনাতো "পকেটমার নজ্দীক হৈ।" আমি বললুম, "তবেই হয়েছে।" বলেই ফিক করে আধগাল হেসে নিলুম।

তোমার কথায় আর আচরণে কোনো মিল নেই। এদিকে বলছো, "তবেই হয়েছে", অর্থাৎ কাছে পিঠে রিভার-পুলিস থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে। ওদিকে ঠোঁটের আলোতে খেলে গেল মোলায়েম হাসি। মানে খুশী। কোনটা ঠিক? হেঁয়ালি ছেড়ে কথা কও। তুমি চিরকালই বেখেয়ালী। অভদ্র ভাষায় বলতে হলে নির্ভয়ে বলবো, তুমি আমার মনে আমার বুকে কি চলছে সে-সম্বন্ধে উদাসীন। আচ্ছা, তুমি কি এক বারের তরেও নিজের

একসপ্তাহ নিয়ে গোণ্ডবী খেলতে ভালোবাসে—ক্ষণে আসমান ক্ষণে জমীন ক্ষণে মোচার খোল নৌকো ক্ষণে জেপেলীন। এ জেলাটি সাইজে দেশের মাদ্রাজী মেস-বাড়ির—মাদ্রাজী উচ্চারণে হিন্দীতে "চোটা সে চোটা"—জলপোষের যমজ ভাই দৈর্ঘ্যে প্রস্থে। অবশ্য নৌকাটির হাল আর দাঁড়ের দিক দুটো ছুঁচলো বলে সে দু'প্রান্তে জলপোশকে অবশ্যই হার মানায়। লটে হাল ধরে বসেছে এক প্রান্তে, আমি অন্যদিকে। দেশের কোঁদা নৌকোর সঙ্গে এ-জেলার আর একটা সর্বনাশা প্রাণঘাতী মিল আছে। কোঁদা নৌকোতে ওঠার সময় নৌকোর ঠিক মধ্যিখানে পায়ে ভর না দিলে আসন নেবার সময় তাগ করে দাঁড়ের ঠিক মধ্যিখানে না বসলে, বসার পরও ডাইনে বাঁয়ে পয়তাল্লিশ ডিগ্রীর বেশী, হঠাৎ কাৎ হয়েছো কি অমনি নৌকো কুপোকাৎ। হাটবারে কচ্ছপকে চিৎ করে রাখে, আর ইনি হয়ে যান উপুড়। হ্যাঁ, হেরমান অতি নিশ্চিত তাকেবর মাল। এ-জেলায় আর যা হয় করতে চাও করো কিন্তু ঢলাঢলিটি—উভয়ার্থে—করতে যেয়ো না, বাপধন। আচ্ছা এক নয়া সেফটি-বেল্ট আবিষ্কার করেছে রামঘুঘু হেরমান। ওদিকে আমি তো "ঘুঘু দেখেই নাচতে পারি। ফাঁদ তো, বাবা, দেখি নি॥"—হেরমান যখন পার্কের বেঞ্চিতে বসার প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে কত না সোহাগ করে তরণীবিহারের প্রস্তাবটা পাড়লে তখন সে ধুরন্ধর, বুঝতে পারিনি—পরে লটে বলেছিল।

সংস্কৃতের ডাকসাইটে অধ্যাপক প্রফেসর কিফের্ক বহু বৎসর রাইনের পারে বাস করেছেন। এক দিন আমি যখন রাইনের পারে বসে আত্মচিন্তায় মগ্ন তখন তিনি আমার পাশে এসে বসাতে আমার ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি শুধোলেন, "রাইন আজ কি রকম?" আমি বললুম, "নদীর এ-পার ও-পার দু'পারই তো বেশ পরিষ্কার কিন্তু ঠিক জলের উপরটা কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখায়।" প্রফেসর বললেন, "সে প্রায় গোটা বছর ধরেই চলে। তাই যেসব আর্টিস্ট রাইনের ছবি এঁকেছেন তাঁরাই রাইনের ঠিক উপরটা যেন সামান্য কুয়াশা ঢাকা ঝাপসা ঝাপসা এঁকেছেন।" এ বাক্যালাপের পর আমি রাইনের বহু ছবি দেখেছি। প্রফেসরের কথা নাসিকে খাঁটি।

আজও তাই লটেকে দেখতে পাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলো আজ রাতে তেমন উজ্জ্বল নয়। কিন্তু সে-আলো কুহেলির জাল ছিন্ন করে মাঝে মাঝে তার মুখের রেখা স্পষ্ট করে দিচ্ছে। কপালের উপরকার অতি সামান্য ঘাম তখন চিক চিক করে ওঠে। আর চিক চিক করে ওঠে তার আঁখি কৃষ্ণ কুন্তলের মাঝখানে শুভ্রবর্ণশুভ্র সীমন্ত রেখা। এ-রকম শুভ্র সিতের সমন্বয় তো আমাদের দেশে চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে আমার দিকে এক ঝলক তাকায় আর একটুখানি মুচকি হাসে।

শুধোলে "কই? আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না?"

মুশকিল! বললুম, "তুমি কি প্রশ্ন শুধোতে চাও সেটা আমি এতক্ষণ চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আমার একটি কবিতা মনে পড়ে গেল। তাই সমস্যাটার কোনো শেষ সমাধানে পৌঁছতে পারিনি। কখনো পারবো বলে মনেও হয় না।"

"আমি বলবো?"

"বলো।"

"তুমি বাকী জীবন এই গোডেসবের্গ-মেলেমে কাটাবে না, সে আমি জানি। কিন্তু কদিন এখানে থাকবে সেটা আমি বারবার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থেমে গিয়েছি। যদি হঠাৎ বলে বসো, কালই চলে যাচ্ছো তখন কি? এটা বলতে তোমার তো এতটুকু বাধবে না সে আমি ভালো করেই জানি। তোমার হৃদয়ে যে বান্ধবীর মায়ামমত্ব নেই সে আমি খুব ভালো করেই জানি। আর সত্যি বলতে কি, তোমার আমার অদৃষ্টে সুপ্রসন্ন যে চাঁদের আলোতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একলা জানলার পাশে এসে আমি দেখি, তুমি ছুটে চলেছ মায়ের চিঠি ডাকে ফেলতে। তুমি যদি সেদিন রহস্য করে, যা লোকে আকছারই করে থাকে, বলতে 'হেঁ' হেঁ' হেঁ' হেঁ' এই —এই—প্রিয়ার চিঠি ডাকে ফেলতে যাচ্ছি—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ছিঃ! দশ বছরের বাচ্চা মেয়েকে কেউ কখনো এ-রকম কথা বলে?"

লটে অবাক হয়ে বললে, "কেন? সবাই তো বলে, সকলের সামনে।"

"আমাদের দেশে বলে না।"

"সে কথা থাক্‌! আসল কথা, তুমি যে তোমার মাকে খুব ভালোবাসো সেটা আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছিল সেদিন। ঐটুকু ছিল বলে—"

"কাকে চিলে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়নি।

"মানে?"

"অতি সরল। অর্থাৎ এমনই পচা জিনিস যে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। পচা জিনিসের প্রতি লোভ কার? কাক চিলের। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি, লটে, যদি প্রতিজ্ঞা করো, আমি যা বলতে যাচ্ছি সেটা নিয়ে তারপর তুমি আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা জুড়বে না, কোনো প্রশ্ন শুধোবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করছি।"

গলায় দরদ ঢেলে বললুম, "তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে লটে। তাহলে বলি। আমি আমার মাকে জানা অজানায় যতখানি কষ্ট দিয়েছি অন্য কেউ সে রকম দিয়েছে কি না বলতে পারবো না। আর আমি আমার জীবনে যা কিছু দুঃখকষ্ট পেয়েছি সে শুধু মাকে কষ্ট দিয়েছিলুম বলে তার শাস্তিস্বরূপ, সে-কথা জানি। ব্যস্! এ বিষয়ে আর কোনো কথা না। এবারে তোমার কথার উত্তর দি। আমি গোডেসবের্গ ছেড়ে কাল যাচ্ছিনে পরশু যাচ্ছিনে তরশুও না।"

খুশীতে গলা ভরে বললে, "বাঁচালে।" তারপর মনমরা হয়ে শুধোলে "তরশুর পর?"

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম, "লটে তোমার কথা শুনলে যে কোনো লোক ভাববে যেন কোনো বাচ্চা মেয়ে জীবনে এই প্রথম প্রেমে পড়েছে।"

নিশ্চিন্ত মনে লটে বললে "তা ভাবুক না। আমার তাতে কি? যে-জিনিসের মূল্য না বুঝে কিংবা নিজেদের এঞ্জেলের মত মন করে দম্ভ ভরে কতকগুলো পাড়ি হাসি ঠাট্টা করে তার গায়ে তাতে কার যে কোন ক্ষত হয় না।"

আমি উৎসাহ ভরে বললুম, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার কথাতে আমার গুরুর একটি আপ্ত বাক্য মনে হল। শোনো, শোনো।

'আহারে মস্ত, রাহুরে মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।"

হায় অনুবাদে কি আর সে রস আসে। সাধে কি বিবেকানন্দ বলেছেন, অনুবাদ—সে তো কাশ্মীরী ডিজাইনের উল্টো দিকটা দেখার মত।

লটে বললে, "মূর্খ, মূর্খ মূর্খ। কি ভাববে সবাই? বুড়ি লটের ভীমরতি ধরেছে। এইবারে দেখে নিয়ো, কী কেলেঙ্কারিটাই না হয়। ড্যাং ড্যাং করে লাফাতে লাফাতে হের সায়েডাকে বগলে চেপে চললে লটে মন্তে কার্লো। কিংবা হাওয়াই দ্বীপে। জব্বর অপারেশন করিয়ে মুখের চামড়া টান-টান করাবে। পাকি-পাকছি পাকি-পাকছি চুলের উপর লাগাবে তিন পলস্তরা কলপ—

"তা হলে?"

"তা হলে? এই যে তুমি তিন দিন থাকবে আমি কি তোমার পিছন পিছন ছোঁক ছোঁক করবো নাকি? তোমার গায়ে পোস্টেজ স্ট্যাম্পের মত সেঁটে রইব নাকি—"

"গেল, গেল", চিৎকার করে উঠলাম আমি। কি যেন কি একটা ভাসন্ত জিনিসের সঙ্গে নৌকো খেয়েছে জব্বর এক ধাক্কা॥

রূপদর্শী-কে খোলা চিঠি

শিবনারায়ণ রায়

॥ তিন ॥

তারপর দেশ দু' ভাগ হয়ে স্বাধীন হল। নবজীবনের সূচনা ঘটল সমাজ-বিপ্লবের পথে নয়, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে। মনে পড়ে সেই সব আর্ত, উদ্‌ভ্রান্ত দিন-রাত যখন ব্যাধিত পৈশুন্য আর যূথাচর ধর্ষকামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য সহযোগী মেলা কঠিন ছিল? গান্ধী সে সময়ে দেখা দিলেন নতুন রূপে—দেশব্যাপী প্রমত্ত শুভনাস্তিকের বিরুদ্ধে নির্ভীক, প্রায় নিঃসঙ্গ, বিবেকী পুরুষ। গান্ধীবাদের বেশিটাই আমার কাছে অগ্রাহ্য ঠেকলেও গান্ধীর অনুকম্পায়ী পৌরুষকে সেদিন গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেছি। সে আজো অকস্মাৎ নিবল।

কিন্তু আশা নেবে নি। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল স্রেফ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি তারই সঙ্গে ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন নব্য বুদ্ধিজীবী। কোনো কোনো ব্যাপারে তাঁর ব্যর্থক রাজনৈতিক আচার-আচরণের যতই সমালোচনা করি না কেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থিক কায়েমী স্বার্থের কবল থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার উদ্যমে তিনি যে একাগ্রচিত্ত তা নিয়ে তখনো সংশয় ছিল না, এখনো নেই। দেশের পুনর্গঠনে লোকায়ত চিন্তাকে তিনি বিশেষ মূল্য দিলেন; তাঁর চেষ্টায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ অনেকটা স্বীকৃতি লাভ করল; শুরু হল এক দিকে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা শিল্প-বিপ্লবের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা অন্য দিকে উদ্‌বৃত্ত সম্পদকে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নয়নে নিয়োগের উদ্যম। রক্ষণশীল হিন্দুদের সংগঠিত বিরোধিতাকে হটিয়ে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা লোকসভায় নতুন সংহিতা পাস করালেন, যার ফলে এ-দেশের হিন্দু মেয়েদের অনেকগুলি মানবীয় অধিকার আইনের চোখে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। শুধু আইনের জোরে সমাজ বদলায় না—এ কথা তুমিও জান, আমিও মানি; হিন্দু সংহিতা আর হিন্দু সমাজের মাঝখানে ব্যবধান আজও স্পষ্ট; তবু সংস্কারের অন্যতম উপায় হিসেবে আইনের মূল্য আছে, সেটা লক্ষ না করলে ভুল হবে। (আমার দুঃখ, এই সংহিতার সুযোগ শুধু হিন্দু মেয়েরাই পেয়েছেন — মুসলমান মেয়েদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এ-দেশে আজও নেতৃত্বের অভাবে নিতান্ত দুর্বল রয়ে গেছে। নেহরুকে দোষ দেওয়া নিরর্থক—এ-দেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এমনি প্যাঁচালো যে, যতক্ষণ মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মুসলমান সমাজের সংস্কারে না নামছেন, অন্য কেউ সে চেষ্টা করলে ভালর চাইতে মন্দের আশঙ্কাই বেশী।)

নেহরুর নেতৃত্বে যে ব্যাপক রূপান্তরের উদ্যম শুরু হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার সুফল আজ প্রত্যক্ষ। তোমার আমার শৈশবে এ-দেশে গড়পড়তা বাঁচার মেয়াদ ছিল তিরিশ বছরেরও কম—স্বাধীন ভারতে তা অন্তত বছর পনের দীর্ঘতর হয়েছে। জন্মের হারে রদবদল না ঘটলেও মৃত্যুর হার উল্লেখ্যভাবে কমেছে। দেশের অনেক অঞ্চলেই জমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; চাষীদের মধ্যে যাঁদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে তাঁরা সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য নন। সদরে-মফস্বলে মেয়েরা বেশ কিছুটা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন; হিন্দু সমাজে যাঁদের একেবারে নীচের তলায় হেঁট করে রাখা হয়েছিল তাঁদের অনেকে আজ মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারছেন। যা

হওয়া উচিত ছিল, যা হওয়া নিতান্ত জরুরী, তার হিসেবে উন্নতি যে যথেষ্ট হয় নি, এটা ঠিক। তবু দেশে যে আর্থিক-সামাজিক রূপান্তর ঘটেছে তার মধ্যে কিছুটা আশার চিহ্ন দেখতে পাই।

কিন্তু যেখানে সেই চিহ্ন সম্প্রতি প্রায় অপহৃত সেটা হল আমাদের বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র, ক্রিয়াকর্মে, আচার-আচরণে। নেহরু নিজে বুদ্ধিজীবী ছিলেন বলেই হয়তো দেশের রূপান্তরের কাজে এঁদের সহযোগিতা খুঁজেছিলেন। পেছন ফিরে মনে হচ্ছে, সব মিলিয়ে এই সহযোগিতার ফল ভাল হয়নি। নেহরুর আমলেই বিপদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল, ইন্দিরার আমলে সেটা প্রায় বিপর্যয়ের আকার নিয়েছে। যাঁদের হবার কথা স্বাধীন সমালোচক তাঁদের অনেকেই হয়ে দাঁড়িয়েছেন সভাসদ, কর্মচারী। যাঁদের নির্বিশঙ্ক বিচার-বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, উদ্ভাবনা সমাজ-সংস্কৃতিতে নতুন সম্ভাবনা এবং বিকল্পের প্রতিশ্রুতি আনবে তাঁদের অনেকেই সরকারী তকমা, খেতাব, বৃত্তি, চাকরি কিংবা পৃষ্ঠপোষণার লোভে আশ্রয় নিয়েছেন মাকুছলে, অবক্ষয় ঘটিয়েছেন আপন আপন অস্মিতার, ভাগীদার হয়েছেন প্রশাসনিক অপচারের, হারিয়ে ফেলেছেন জিজ্ঞাসার সামর্থ্য, বিবেকের স্বপ্রতিষ্ঠ প্রাধিকার।

উপাত্তের প্রয়োজন আছে? তুমি শুধু সাহিত্যিক নও, সাংবাদিকও—হাঁড়ির খবর আমার চাইতে তুমি অনেক বেশী রাখ। তবু দু-একটা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করি। নেহরু তখনো তুঙ্গে, সেই সময়ে পারী শহরে একটা পুরো দিন কাটাই সর্দার পানিকরের সাহচর্যে। তিনি তখন ফ্রান্সে ভারতীয় রাজদূত, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর যেটুকু চেনা-জানা তা ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে। পানিকর আমাকে খান কুড়ি উৎকৃষ্ট বইয়ের তালিকা দিয়ে বললেন, এগুলি ভারতবর্ষে সরকারী নির্দেশে নিষিদ্ধ, অথচ তার বিরুদ্ধে কোনো ভারতীয় মনীষী এতাবৎ প্রতিবাদ করেননি। (এর মধ্যে একটি বঃ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেনঃ অব্রি মেনেনের "রামা রিটোল্ড্"—ঝকঝকে লেখা—কাহিনীছলে হিন্দু অবতারতত্ত্বের ব্যঙ্গাত্মক পুনর্বিচার—টমাস মান ইহুদীদের "দশ হুকুম" নিয়ে যে ধরনের কাহিনী লিখেছিলেন।) তিনি নিজে কেন এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে নীরব—এই প্রশ্ন করায় পানিকর সোজা স্বীকার করলেন, "সরকারের কাছ থেকে সম্মান এবং চাকরির প্রশ্ন নিয়েই যে।" তারপর তিনি বললেন, অন্য যেস বুদ্ধিজীবী এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁরাও মুখ খুলবেন না, কারণ হয় তাঁর কোনো-না-কোনো সরকারী আধা-সরকার প্রতিষ্ঠান বা কমিশনের সঙ্গে যুক্ত, না তাঁরা পদ্মশ্রী-জাতীয় খেতাব পেয়েছে কিংবা কোনো আকাদেমি পুরস্কার, অথ তাঁরা গোঁফে তেল মাখাতে ব্যস্ত এই ধরনে কোনো কাঁঠাল যদি তাঁদের বরাতে জো তারই প্রত্যাশায়।

প্রতিবাদ যে একেবারেই হয়নি তা সা নয়। (ভারতবর্ষে সেন্সরশিপ সম্পর্কে তুমি হয়তো অধ্যাপক এ বি শাহ-র, অম এবং সরকারী সম্পর্কহীন আরো কা কারো প্রবন্ধাদি দেখে থাকবে।) কি এ-দেশে যাঁরা পণ্ডিত, সাহিত্যিক, চিন্ত শীল হিসেবে খ্যাতিমান তাঁদের মধ্যে বো

ভাগই এ সম্পর্কে নীরব। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এ-দেশে যে কত বই নিষিদ্ধ হয়েছে তার খোঁজ পর্যন্ত এ'রা রাখেন না। আমাদের গঠনতন্ত্রে যে সব মৌল অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে তা নিয়ে সকলে গর্ববোধ করেন, কিন্তু পদে পদে সেই সব অধিকারকে যে কিভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা নিয়ে কারো বিশেষ মাথাব্যথা দেখি না। এই স্বাধীন রাষ্ট্রে অধ্যাদেশের জোরে কত স্ত্রী-পুরুষকে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে তার হিসেব মেলা শক্ত, অথচ তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাহিত্যিক-সাংবাদিক-অধ্যাপকদের অংশ খুঁজতে অণুবীক্ষণ লাগে।

সরকারী অন্যায়ের সমালোচনায় যাঁরা নির্বাক, শক্তিমানের সাফাই গাইতে কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আশ্চর্য পটুতা দেখা গিয়েছে। এটা বাংলার বাইরে বেশী প্রত্যক্ষ—দিল্লীতে কবি-সাহিত্যিকদের সম্মেলনে এক বিদগ্ধজনদের আলোচনা - সভায় এক সময়ে নেহরুর, এবং সম্প্রতি ইন্দিরার যেরকম নির্লজ্জ প্রশস্তি শুনেছি তা পুরোনো দিনের রাজচাটুকারদেরও হার মানায়—কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কি এই প্রতিন্যাস স্বাধীনতার পরে প্রবল হয়ে ওঠেনি? ছোটদের কথা ছেড়ে দিলেও সেই সুবিখ্যাত অগ্রজ সাহিত্যিকের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়বে (খোলা চিঠিতে নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়), যিনি এক সময়ে কম্যুনিস্টদের সহযাত্রী ছিলেন, তারপর কম্যুনিস্ট-বিরোধী হয়ে ওঠেন, এবং সেই অবস্থাতেই সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধ পাওয়া মাত্র পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যতন্ত্রের কর্ণধারকে অভ্যর্থনা উপলক্ষে গদ্গদ স্বাগত সম্ভাষণ লিখে মুখ্যমন্ত্রীকে পৌঁছে দেন। কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার প্রতি যদি তাঁর সে সময়ে কোনো শ্রদ্ধা থাকত, তা হলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তাঁর সংগে তোমার আমার পরিচয় ছিল, তিনি তাঁর কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষ গোপন করেননি; অথচ এই অনুরোধ তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিলেন। কিংবা সেই বিখ্যাত অর্থ-বিজ্ঞানীর কথা মনে কর (ইনি বাঙালী নন—বাংলার বাইরে অধ্যাপনা করার সময়ে তাঁর সংগে পরিচয় হয়), যিনি দীর্ঘদিন নানা দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন আমাদের অর্থনৈতিক পরি-কল্পনা কিভাবে বিত্তবান এবং দরিদ্রের মাঝখানে ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছে (বিশেষ করে কিভাবে এ-দেশের ভূমিহীন চাষ-মজুরদের আমরা দ্রুত সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি), অথচ যেই তাকে সরকার একেবারে উপরতলায় আসন দিলেন অমনি তাঁর সমালোচনা ক্ষীণ হয়ে এল। এসব যে

মোটেই ব্যতিক্রম নয় তা আমার চাইতে তোমার বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জানার কথা।

ভারতবর্ষে ফিরে গত ছ' মাস ধরে যে প্রতিষ্ঠানে আমি একটি বই লেখার কাজে ব্যাপৃত ছিলাম সেটি বয়সে অর্বাচীন হলেও দেশে-বিদেশে তার ইতিমধ্যেই প্রচুর খ্যাতি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করা কিছু নবীন এবং প্রবীণ বিদ্বান-বিদুষী এখানে গবেষণা করছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সরকারী উঁচু মহলে চেনা-জানার সূত্রে এখানে আসার সুযোগ পেলেও বাকী বেশির ভাগ সদস্যই আপন আপন ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত। কিন্তু এখানেও ছ' মাসে যেটুকু অভিজ্ঞতা হল এ-দেশের জ্ঞানী গুণীদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখায় তা মোটেই সাহায্য করে না। এ'রা নিজেদের গবেষণার স্বাধীনতার চাইতে আপন আপন গবেষণা-বৃত্তিকে টিকিয়ে রাখা এবং তাকে দীর্ঘস্থায়ী করার সমস্যা নিয়েই বেশী উৎকণ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অথচ নীতি-নির্ধারণে গবেষকদের কোনো অংশ বা দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগ স্বীকার করেননি। যা কিছু সিদ্ধান্ত তা নেন দিল্লীতে বসে এই প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি (যার সভাপতি স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী), এবং তার সঙ্গে গবেষকদের যোগাযোগের কোনো প্রবিধান নেই।

মাস কয়েক আগে এখানে একটি সপ্তাহব্যাপী সেমিনার হয়। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে এ-দেশীয় মনীষীদের তারামৈত্রীর

কিছু নিদর্শন সেই সূত্রে পাওয়া গেল। এলেন রাজ্যপাল, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, মায় প্রাক্তন মন্ত্রী—তাঁদের সামনে কায়িক অর্থে, না হোক আত্মিক অর্থে প্রায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলেন এই উচ্চ গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং এখানকার অধিকাংশ সদস্য। (পূর্বে যিনি পরিচালক ছিলেন তিনি, শুনেছি, প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং সম্মান রক্ষায় বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন।—কিন্তু আমি যাঁর কথা বলছি তিনি যদিও কবি এবং বিদ্বান ব্যক্তি, তাঁর চরিত্রে প্রত্যয় এবং বলিষ্ঠতার অভাব আমাকে বিশেষ পীড়া দিয়েছে। তিনি সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন, এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে পরিচালকহীন।) যে দু-চারজন গবেষক-সদস্য মন্ত্রী এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের অসম্বন্ধ উক্তির কিছুটা সমালোচনার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের ওপরে চাপ পড়ল তাঁরা যাতে সেমিনারের তৈলাক্ত প্রশান্তি না নষ্ট করেন।

এই সেমিনার যখন হয় তখন আমি সবে এখানে যোগ দিয়েছি। ফলে এটির পরিকল্পনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারপর আরেকটি সেমিনার ডাকার সিদ্ধান্ত হয়—এটির আলোচ্য বিষয়: "ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র, ক্রিয়াকলাপ, দায়িত্ব" ইত্যাদি। অন্য কয়েকজন স্থানীয় গবেষক—সহকর্মীর সঙ্গে এটি পরিকল্পনা করার আংশিক দায়িত্ব আমার ওপরে পড়ে। আলোচনার বিষয়-সূচী সম্পর্কে একটি খসড়া তৈরি করি, এবং কমিটিতে বিচার-বিবেচনার পরে কিছু রদবদল সমেত সেটি গৃহীত হয়। কিন্তু আলোচনায় অংশ নেবার জন্য প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে তার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল। আমরা সেমিনার কমিটির কয়েকজন সদস্য প্রস্তাব করি যে, এই আলোচনায় সরকারী মাতব্বরদের কোনো অংশ থাকবে না, শুধু যেসব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আপন আপন ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা এবং/অথবা মূল্যবান গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের ভিতর থেকেই কয়েকজনকে বাছাই করে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে। কিন্তু দেখা গেল, স্বয়ং পরিচালক এবং কমিটির অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রপাল, মন্ত্রী প্রমুখদের বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় অবিশ্বাসী। শেষ পর্যন্ত যদি বা তাঁদের নিমরাজী করানো গেল, আরেক আপত্তি উঠল। আমরা তালিকায় যাঁদের নাম প্রস্তাব করি তাঁদের কয়েকজন সম্পর্কে শোনা গেল কারণ তাঁরা নাকি বেতারভাবে নিজের নিজের বেদস্তুর মতামত প্রকাশ করে থাকেন (যেমন মহীশূরের কবি-প্রাবন্ধিক তাঁদের নিমন্ত্রণ করা সঙ্গত হবে না, গোপালকৃষ্ণ আদিগা, দিল্লীর নীরদ চৌধুরী ইত্যাদি), অথবা তাঁদের ডাকলে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ নানা কারণে নারাজ হতে পারেন (যথা, চাগলা)। যখন শুধোই, কী আসে-যায় তাতে, উত্তর শুনি, দিল্লী নারাজ হলে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎও যে অন্ধকার। শেষ পর্যন্ত এই সেমিনার হল না। পরিচালক ভদ্রলোক দিল্লীতে বিস্তর তদ্বির করেও চাকরি বজায় রাখতে পারলেন না: নতুন পরিচালক এখনো নিযুক্ত হননি, দিল্লী নির্দেশ পাঠালেন সেমিনারের প্রস্তাব আপাতত ফাইলের নীচে চাপা রাখতে। মাঝখান থেকে এ আই সি সি-র অধিবেশনের সূত্রে সস্ত্রীক শিক্ষামন্ত্রী তাঁর জন তিনেক উপমন্ত্রী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত এই প্রতিষ্ঠানে কয়েক দিন আহার-বিহার করে গেলেন। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত তুললেন না, এ আই সি সি-র সদস্যরা কোন অধিকারে এই গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের আতিথ্য উপভোগ করেন। প্রশ্ন উঠবে কি করে, যখন প্রশ্ন যাঁদের তোলার কথা তাঁরা নিজেরাই প্রভুদের শরণার্থী।

॥ চার ॥

এখন এই অবস্থার জন্যে দায়ী করবে কাকে? আমার বিশ্বাস নেহরুর উদ্দেশ্য ভালই ছিল, তিনি চেয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীদের সম্মান এবং স্বীকৃতি দিতে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে গেলেন প্রলোভনের জালে—শিরোপা, খেতাব, বড় মাইনের চাকরি, খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুযোগ ইত্যাদির আকর্ষণ এড়াবার মত চরিত্রবল তাঁদের ছিল না। শিশির ভাদুড়ীর মত স্বাধীনচেতা পুরুষ এ-দেশে আর কজনই বা দেখা গেল! তবু নেহরুর সময়ে কিছু স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান ছিল এ-দেশে, এবং সরকারের সমালোচনা করতে পারেন এমন কিছু বিরোধী দল এবং সাহসী ব্যক্তি। ইন্দিরার আমলে তাও প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন মুমূর্ষু দশা: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নানা প্রকাশ্য এবং গোপন অভিসন্ধিদুষ্ট প্রভাবের দ্বারা আক্রান্ত; সংবাদপত্রের উপরে সরকারী উৎত্রাসনের অপচ্ছায়া ক্রমে বিবর্ধমান। পার্লামেন্টে

মাত্র এক চামচ-
একাই একশো!
MINADEX
ভালো চোখের দৃষ্টি
এর জন্যে চাই ভিটামিন এ। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, চোখের দৃষ্টি ভালো রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ।
সুস্থ রক্ত
এর জন্যে চাই আয়রণ। অধিকাংশ ভারতবাসীর আহারে আয়রণের অভাব থাকে। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এর আয়রণ এই অভাব পূরণ করে।
মজবুত হাড়
এর জন্যে চাই ভিটামিন ডি। এক চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, হাড় মজবুত রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি।
মনে রাখবেন, প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ মিনাডেক্স আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করে, আর এর কমলালেবুর স্বাদগন্ধ—বাচ্চার ভালো লাগবেই।
সিরাপ
মিনাডেক্স®
মাত্র একচামচ— তিনগুণের এক টনিক
CMGM-4-244Ben
গ্ল্যাক্সো

স্বাধীন বক্তা সম্প্রতি দুর্লক্ষ; বিরোধী দলেরা প্রায় নিরুপায়; ইন্দিরা তাঁর নিজের দলকে এমন করে ভেঙে গড়ছেন, যাতে সে দলে কেউ আর না থাকেন যিনি নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষণার ওপরে নির্ভরশীল নন। তারই সঙ্গে তিনি দিল্লীতে গড়ে তুলছেন এক উচ্চশিক্ষিত পারিষদ-গোষ্ঠী, যার সদস্যরা বিভিন্ন শাস্ত্রে কম-বেশী ব্যুৎপন্ন, যাঁদের তাবার ওপরে দখল আছে, কিন্তু যাঁরা সরকারের মুখাপেক্ষী এবং নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য যাঁরা নিজেদের স্বাধীন চিন্তা এবং প্রকাশকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

তবু শুধু সরকারী নেতৃত্বকে দায়ী করা অসংগত ঠেকে। যাঁরা সরকারী ক্ষমতায় নেই তাঁদের প্রতিষ্ঠান, ক্রিয়া-কলাপই বা কেমনতর? খবরের কাগজের মালিক এবং সম্পাদকরা সাংবাদিক স্বাধীনতা রক্ষায় কতটুকু আগ্রহী? অথচ ইংরেজ আমলে এঁদের অগ্রজদের মধ্যে অনেকেই বিস্তর ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন। এখন তাঁদের বেশির ভাগই চান কায়েমী শক্তির সঙ্গে রফা করে চলতে। যে সংবাদ, রিপোর্ট, অথবা সমালোচনা কোনো প্রতিষ্ঠিত শক্তির অপছন্দসই হতে পারে, তাকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলাই এঁদের নীতি। আমাদের অধিকাংশ গ্রন্থ-প্রকাশকের মনোভাব এঁদের চাইতে কম ভীরু অথবা হিসেবী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়রাই বা কি করছেন? এক দিকে আর্থিক সমর্থন এবং সংকটকালে পুলিশী সাহায্যের জন্য তাঁরা সরকারের মুখাপেক্ষী: অন্য দিকে ছাত্র বিক্ষোভের ভয়ে তাঁরা শিক্ষার মানকে যত দূর সম্ভব নীচুতে নামিয়ে এনেছেন। যে-সব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসীন না তাঁরাও নির্দলীয় স্বাধীন জিজ্ঞাসার টুঁটি টিপে ধরতে সক্রিয়।

সবই সত্যি, তবু বলি, এই অবস্থার জন্যে মুখ্যত দায়ী আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। সমাজে যা তাঁদের বিশিষ্ট বৃত্তি, ইতিহাসে যা তাঁদের মুখ্য অংশ, তার অকৈতব স্বীকারে তাঁরা পরাঙ্মুখ। স্বাধীন, স্বাবলম্বী অনুসন্ধানের দ্বারা সমাজে গতি সঞ্চার করেন বুদ্ধিজীবীরা, ইতিহাসকে মুক্ত করেন আবর্তক ব্যর্থতা থেকে। ক্ষেতে ফসল ফলাতে তাঁরা পারেন না, কিন্তু মনকে জড়তার আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার সামর্থ্য তাঁরা রাখেন। কিন্তু সেই শক্তির উৎস হচ্ছে নিরন্তর অনুসন্ধান, অকম্প জিজ্ঞাসা, নির্ভীক প্রকাশ। প্রতিষ্ঠিত শক্তি, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, অভ্যাসের কাছে যে মুহূর্তে কোনো বুদ্ধিজীবী নিজের প্রশ্নশীলতাকে বন্ধক রাখেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর আত্মিক অধঃপতন শুরু হয়—যা তাঁর বিশিষ্ট সামর্থ্য, যার জোরে তিনি ইতিহাসে এবং সমাজে বিবর্তনের বাহক, তা ক্রমে ব্যামোহগ্রস্ত হয়—তাঁর ভেতরকার বুদ্ধিজীবীকে গ্রাস করে সেখানে আবার দেখা দেন পুরুত-মোল্লার প্রেত। নিজেদের তাঁরা ঠকাতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসকে ঠকানো যায় না।

এ-দেশের বুদ্ধিজীবীরা যে এত সহজেই প্রলোভনে ধরা দেন তার একটা কারণ হয়তো এ-দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য। কিন্তু এটাকেই প্রধান কারণ বলে মানা শক্ত। তাঁদের ভিতরে যে সম্পদ বর্তমান তাকে মূল্য দিতে শিখলে অভাবের চাপেও শির-দাঁড়া শক্ত রাখা সম্ভব। দিদেরো, টম পেইন, উইলিয়ম ব্লেক নিঃসম্বল অবস্থাতেও কোনো শক্তির কাছে মাথা নীচু করেননি; এ-দেশেও ফুলে, আগারকরের মত মানুষ দেখা গেছে। (অক্লান্ত উদ্যমে রক্ষণশীল সমাজের সমালোচনায় কলম চালিয়ে আগারকর যখন অল্প বয়সে মারা যান তখন শেষকৃত্যের কড়ি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি।) তা ছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বুদ্ধিজীবীদের আর্থিক অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হয়েছে। গত বিশ পঁচিশ বছরে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপকদের রোজগার, অন্তত রোজগারের সম্ভাবনা, আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু মনের জোর বাড়ল কই।

আসলে বুদ্ধির যে একটা নৈতিক দিক আছে সেটা এ-দেশে বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় এবং জীবনে ব্যাপক এবং গভীর স্বীকৃতি লাভ করেনি। বুদ্ধির প্রাণশক্তি আসে জিজ্ঞাসা থেকে, এবং জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বৈমনস্য ঘটলে বুদ্ধিতে জাড্য সঞ্চারিত হয়। জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত রাখা হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর মূল নীতি এবং দায়িত্ব। হিন্দু-মুসলমান যুগে জিজ্ঞাসাকে আচ্ছন্ন করেছিল আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-নির্দেশ। ইংরেজ আমলে এই জিজ্ঞাসাবোধ কিছুটা সক্রিয় হয়ে ওঠে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত সমাজ বুদ্ধির পথ থেকে সরে এলেন। (প্রাচীন কালে বৌদ্ধরাও এই কাণ্ড করেছিলেন। নাস্তিক বুদ্ধ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, আমার ওপরে নির্ভর করো না, নিজের নিজের মনে প্রদীপ জ্বালাও, তারই শিখায় পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু বৌদ্ধরা শেষ পর্যন্ত খাড়া করলেন বেশুমার বোধিসত্ত্ব দেবদেবী এবং তাদের অবলম্বন করে প্রয়াস পেলেন ধর্ম এবং সংঘকে টিকিয়ে রাখতে) যে শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুললাম তার উদ্দেশ্য তরুণ-মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলা নয়, বরং জিজ্ঞাসাকে স্তব্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থবিদ্যায় পারঙ্গম করাই তার উদ্দেশ্য। দেশ শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হল, কিন্তু, হায়, মনের স্বাধীনতা এল না।

ফলত, যদিও সমকালীন ভারতবর্ষে কিছুটা রাজনৈতিক সুস্থিতি এবং আর্থিক উন্নতির লক্ষণ দৃশ্যত উপস্থিত, এখানকার মানসজগতে সামাজিক নির্বিঘ্নতা দ্রুত প্রসারমাণ। এবং মনের জগতে জড়তা বাসা বাঁধলে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক জগতেও ক্রমে জড়তা আসতে বাধ্য। তা যদি আমরা না চাই তা হলে এ-দেশে আবার স্বাধীন জিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এবং এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব মুখ্যত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের।

এই দায়িত্ব সম্পর্কে তুমি নিজে সচেতন—তোমার জীবনে এবং লেখায় তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তোমার মত আরো কিছু বিবেকবান বুদ্ধিজীবী এ-দেশে আছেন—তাঁরা সংখ্যায় অল্প, সেই কারণেই তাঁদের দায়িত্ব বেশী। তাঁরা যদি অকম্প নিষ্ঠায় তাঁদের স্বাধীন বুদ্ধির শিখা জ্বালিয়ে রাখতে পারেন তবে তারই আগুন থেকে হয়তো ক্রমে আরো অনেক প্রদীপ জ্বলে উঠবে। একদিন আমি তোমাদের পাশে কাজ করেছি—আজ কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর অন্য অঞ্চলে আমার কর্মক্ষেত্র। সেখানেও স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব এবং প্রয়োজন কম নয়, এবং অন্তত তুমি জান, আমার অসংখ্য ত্রুটি থাকলেও দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা আমি করিনি। তবু মনে হয় তোমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসে কাজ করতে পারলে আমার মধ্যে যেটুকু জিজ্ঞাসার সামর্থ্য বর্তমান তার সব চাইতে সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে। এবং সামর্থ্যের সার্থক প্রয়োগের বাইরে অন্য কোনো অমরত্বের সন্ধান তুমিও জান না, আমিও জানি না।

২৭ অক্টোবর, ১৯৭১   শুভার্থী—
শিবনারায়ণ রায়

সমাপ্ত

শচিপতি

আটাশ

সকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, আমাদের পুরোনো বাড়ির দক্ষিণের ফাঁকা বাঁধানো উঠোনে সংকীর্তন বসেছে। তুলসীতলার দিকে একটা হ্যাজাক বাতি, সেটা যে কত লম্বা বোঝাও যাচ্ছে না, দাউ দাউ করে জ্বলছে, আসরের মাঝখানে সাজিতে রাখা ফুলের মালা, ফুল; ধূপ ধুনোও যেন জ্বলছিল কোথাও, চারদিকে বাবা, মেজকাকা ছোটকাকা, মা কাকিমারা বসে। মেয়েদের মাথায় কাপড়, ছোটকাকির হাতে একটা পাখা; বাবা দু হাতে খঞ্জনি নিয়ে বসে আছেন, মেজকাকার সামনে খোল। সবাই মিলে কীর্তন গাইছে। আর আমি, কোথায় যে ছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখি ছোটকাকা আমায় আসরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আমি হেলেদুলে নাচতে নাচতে গাইতে শুরু করেছি। গাইতে গাইতে দেখছি, বাবা মা কাকা কাকিরা সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। বাবা খঞ্জনি বাজাচ্ছেন। ক্রমেই চারদিক থেকে ঘন হয়ে এসে ওরা এক সঙ্গে ভীষণ জোরে জোরে গাইতে শুরু করে দিয়েছে। গাইতে গাইতে আমি যত আত্ম-ভোলা হয়ে পড়ছি, ওরা তত চারদিক থেকে আমার কাছে জড় হয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। শেষে আমার পা রাখার মতন জায়গাও আর পাই না, পায়ের তলায় আমার বাবা মা কাকা কাকি, আর দেখি সেই আমার খুড়তুতো বোন শান্তা। হ্যাজাক বাতিটা ক্রমেই লম্বা হয়ে যাচ্ছে; তার আলো কমে আসছে। খানিকটা পরে সব অন্ধকার হয়ে এল, আমি মাথার ওপর তাকিয়ে দেখি ঘুটঘুটে আকাশ, অনেক তারা, সব কেমন থমথম করছে; আর পায়ের তলায় আমার বাবা মা কাকা কাকি, বোন— সবাই মিলে অদ্ভুত এক নীচু স্বরে গাইছে :

'বল হরি, হরিবোল; বল হরি হরিবোল।'

স্বপ্নটা ভেঙে গেল কখন আমি জানি না। আমি স্বপ্নেই থাকলাম। অনেকক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে গান গেয়ে, নেচে আমার সমস্ত শরীর যেন ঘেমে ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, গা মাথা টলছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বড়। তখনও আমি শুনছিলাম, আমার চারপাশে 'বল হরি হরিবোল' হচ্ছে, খুব মৃদুস্বরে, মনে হচ্ছিল শ্মশানের কাছাকাছি এসে সবাই যেন বড় ক্লান্ত হয়ে গেছে।

এরপর ঘুমটা ভাঙল। কাক ডাকছে। সকালে কাকরা যেমন করে ডাকতে পারে, বেলা বেড়ে গেলে আর তেমন করে ডাকতে পারে না। শুয়ে শুয়ে আমি এক কানে কাকের ডাক শুনছি, অন্য কানে ক্ষীণ করে 'বল হরি, হরিবোল'। অবশেষে হরিবোল ধ্বনিটা দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল।

চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলাম। আমার মাথার দিকে বাঁ পাশে জানলা। জানলাটা পুরোপুরি ভেজানো ছিল না। অন্য জানলাটা পায়ের দিকে। সকালের আলোর রঙ দেখে মনে হল, আজ আকাশ পরিষ্কার, মেঘটেঘ বোধ হয় নেই। আরও একটু শুয়ে থাকলাম। ভোর বেলার স্বপ্নটা মাথার মধ্যে জড়িয়ে ছিল, বাবার চেহারাটা আমার মোটামুটি মনে থাকলেও মেজ কাকার মুখ একেবারেই অস্পষ্ট। ছোট-কাকাকেও ভুলে আসছি। মেজকাকিকেই আমার সবচেয়ে বেশী মনে আছে। মা যেন গরদের শাড়িটা পরে বসেছিল। ছোটকাকিকে বিধবার থানে দেখেছি, না শাড়িতে, আর আমার মনে পড়ছিল না। ওদের মুখ গান গাইতে গাইতে শেষের দিকে কেমন লম্বা লম্বা হয়ে গিয়েছিল। ওরা সবাই আমার দিকে মুখ তুলে এমন করে গাইছিল যে সকালে যেন আকাশে গোল চাঁদ দেখে লম্বা লম্বা মুখ করে জীবজন্তুর মতন কাঁদছিল। হ্যাজাক বাতিটাও কেমন অদ্ভুতভাবে লম্বা হয়ে যাচ্ছিল, রবারের মতন। শেষে যখন সব অন্ধকার, আমি মাথার ওপর আকাশ আর তারা দেখছি—তখন আমার কেন মনে হল, বাবা কাকা মা কাকিমাকে আমরা যেভাবে পথ হেঁটে হেঁটে উঁচুনীচু মা[ঠ] ভেঙে নদীর পাড়ে শ্মশানে নিয়ে যেতা[ম] ধুনুরির তুলো ধোনার মতন শব্দ হত 'বল হরি হরিবোল— বল হরি, হরিবোল'— সেইভাবে হরি ধ্বনি হচ্ছিল। আমা[র] মৃত আত্মীয়স্বজন সকলেই আমার চারপা[শে] ভিড় করে বসে আমায় নিয়ে কীর্তন করছে এটা বুঝতে পেরে আমার ভয় দুঃখ হ[ল] না। কিন্তু ছোট কাকি এখনও বেঁচে রাঁচিতে পাগলা হাসপাতালে, কাকি বেঁ[চে]

কাকেও বেঁচে নেই অবশ্য, তবু কাকিকে অন্তরের মধ্যে দেখে আমার একটু অবাক লাগছিল।

অস্বস্তি মনে মনেই থাকল। বিছানায় উঠে বসলাম। বাড়িতে সবাই জেগেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। জ্যাঠামশাই হয়ত জেগে বসে আছেন। সুহাস বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। আয়নারও দেরী করে ওঠা অভ্যেস। বাড়ির মধ্যে যেটুকু শব্দ হচ্ছিল তাতে কেউ কেউ উঠেছে বোঝা যায়।

বিছানা ছেড়ে উঠে মাথার দিকের জানলাটা খুলে দিলাম। যা ভেবেছি, আকাশ পরিষ্কার, মেঘ নেই। আমরা কলকাতায় পা দিয়েছি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। বেশ বৃষ্টি ছিল গোটা দিন। তারপর আকাশ শুকিয়ে দু তিনটে দিন খটখটে থাকল। আবার মেঘলা শুরু হল। মেঘলায় মেঘলায় দুটো দিন কাটল। তারপর এল বৃষ্টি। খুব বৃষ্টি চলল দিন দুই। কালও থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। আজ আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ রোদ ভাব হচ্ছে দেখে আমার ভাল লাগছিল।

জানলা দিয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ল, খুব ছেলেবেলায়

একবার কলকাতায় এসেছিলাম। মার সঙ্গে। কোথায় উঠেছিলাম আমার কিছু মনে নেই। মার কোনো ভাইয়ের বাড়িতে, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই হবে। বিয়ে-থা উপলক্ষে এসেছিলাম। আমাদের ওপর তলায় একটা ঘরে থাকতে হত। সরু, ছোট মতন ঘর; একেবারে মেঝে ছুঁয়ে লম্বা মতন জানলা, কাচের শার্সি আর খড়খড়ি। জানলার বাইরে ছিল লম্বা লম্বা সাবুগাছ, তার ওপাশে পুকুর, ঝোপঝাড়। রাত্রে মার শুতে আসতে দেরী হত। আমি আগাগোড়া মাথা মুড়ে শুয়ে থাকতাম, জানলাটা থাকত বন্ধ। সাবুগাছের মাথায় জড়ানো অন্ধকার দেখলে আমার ভয় করত। সকাল বেলায় সেই ভয় কিন্তু থাকত না, তখন সাবুগাছগুলো ভালই লাগত। বিকেল থেকেই মন খারাপ হয়ে আসত, ভয় জমতে শুরু করত। প্রথম দেখা সেই কলকাতার ভয় এখনও যেন আমার থেকে গেছে।

বড় হয়ে কলকাতায় এসেছি আরও একবার। মাস খানেকেরও বেশী ছিলাম। তখন আমার ওঠার জায়গা হয়েছিল শম্ভু-দের বাড়ি। শম্ভুরা থাকত বউবাজারে। শম্ভুর সেই বাড়িতে একটা আস্তাবল ছিল, নীচের তলার উঠোনে সকাল বেলায় কত যে রিকশা ধোওয়া হত। সে বড় বিচিত্র বাড়ি, আলো ঢোকার জায়গা ছিল না।

কলকাতা আমার তখনও ভাল লাগেনি। এরপর হুট করে এক আধদিনের জন্যে কলকাতায় যদিবা কারও সঙ্গে এসেছি পরের দিনই আবার ফিরে গিয়েছি। এই শহর, লোকজন, হট্টগোল, ধুলো ময়লা নোঙরা আমার ভাল লাগত না।

আজ আবার আমায় কলকাতায় আসতে হয়েছে। সুহাসদের পাড়াটা খারাপ নয়। তার বাড়িটাও বেশ। তবু আমার ভাল লাগছে না। আমি এসে পড়ায় সুহাসের এই ছোট বাড়িতে খানিকটা অসুবিধেই হচ্ছে। তার শোবার ঘরে জ্যাঠামশাই আর আয়নার জায়গা হয়েছে, বসার ঘরে আমার খাট পড়েছে, আর সুহাস গিয়েছে বাড়তি একটা ঘরে. তাতে কোন-রকমে থাকা যায়। সুহাসদের কাছে এসে ওঠার পর ওদেরই অসুবিধে বেড়েছে, আমার নয়। জ্যাঠামশাই এভাবে থাকতে কোনোকালেই অভ্যস্ত নন, তাঁর যে অসুবিধে হচ্ছে এটা বোঝা যায়, মুখ ফুটে তিনি তা বলেন না; বরং তাঁর কথাবার্তায় মনে হয়—তিনি বেশ আছেন। সুহাস একা বাড়িতে ছিল; এখন তাকে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেচারী তার ঘরে রাতটুকু কোনোরকমে কাটাতে পারছে এই যথেষ্ট। আয়নার দেখছি কলকাতা মন্দ লাগছে না। তবে সে যতটা আশা নিয়ে এসেছিল তা মিটছে না। সবই আমার জন্যে। আমাকে নিয়ে এই বাড়িটার হুলুস্থুলু চলছে।

আকাশে রোদ এল। রাস্তায় ময়লা তোলা শুরু হয়ে গেছে। একটা লোক শেকল-বাঁধা কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। দু চারজন করে মানুষ হাঁটছে পথে, রিকশা দেখছি।

স্বপ্নটা চোখের তলায় আবার পাতলা ধোঁয়ার মতন ভেসে গেল। মনে পড়ল, বাবা যখন আমার দিকে তাকিয়ে গান গাইছিলেন তখন তাঁর দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাবা পুরুষ মানুষ হয়েও মেয়েদের মতন কথায় কথায় কাঁদতেন। কান্না তাঁর স্বভাব ছিল। খুব দুর্বলচিত্ত মানুষ ছিলেন। মা বাবার চেয়েও শক্ত ছিল। মার চেয়ে শক্ত দেখেছি আমার মেজকাকিকে। মেজকাকিকে দেখেছি, বহ্রাখাতে মেজকাকা মারা যাবার পর বাকি সকলের সঙ্গে আমাকে

গিয়েছিল, গরুরগাড়িতেও উঠতে চায় নি। একাকি আমায় শেষ পর্যন্ত বুক দিয়ে আগলে ছিল। পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে আমায় টেনে বার করে আনল কাকি বাঁচাবার জন্যে। আমায় দিয়ে আলাদা ঘর তোলালো। কাকি তো ভগবান নয়, আমি কার বরাতে এতদিন বেঁচে থাকলাম তাও জানি না। এবার ওরা আমায় ডাকছে। আমায় নিয়ে যাবার জন্যে চারিদিকে জড় হয়েছে।

হঠাৎ নিজের শরীরের দুর্বলতা অনুভব করলাম। ঘুমে যেটুকু শক্তি জুগিয়েছিল, সেই শক্তি যেন ফুরিয়ে আসার মতন হয়েছে। মাথা ঘুরে টলে পড়ার মতন কোনো দুর্বলতা নয়, তবু খানিকটা ক্লান্ত লাগল। কালও অনেকটা রক্ত গিয়েছে শরীর থেকে। এসে পর্যন্ত রক্ত যে কতটা রক্ত দিলাম বুঝতে পারছি না। বার তিনেক, নিশ্চয়। আমায় এখন রোজই কিছু একটা দিতে হচ্ছে শরীর থেকে। শরীরটাকে তন্নতন্ন করে ওরা দেখছে।

এই জিনিসটা আমি চাই নি। আমি চেয়েছিলাম, আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকু নিয়ে চলে যেতে। সুহাসরা আমায় যখন যেতে দেবে তখন আমার কতটুকু আর থাকবে, কে জানে!

দরজায় খুট খুট শব্দ হল।

সাড়া দিয়ে দরজা খুলতে দেখি আয়না দাঁড়িয়ে।

"আপনি কতক্ষণ উঠেছেন, শচিদা?"

"অনেকক্ষণ।"

"ঘুম হয় নি?"

"হয়েছে। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল।"

"আমি তাই ভাবলাম।"

"জ্যাঠামশাই উঠেছেন?"

"কখন। জ্যাঠামশাইয়ের বোধ হয় সারা রাত ঘুমই হয় না।"

"ছটফট করেন?"

"না। আমি বুঝতে পারি। উসখুস করেন।"

"তুইও ঘুমোস না?"

"আমি ঘুমোই। মাঝে মাঝে ভেঙে যায়... আপনি তা হলে মুখটুখ ধুয়ে নিন, শচিদা। আমি আপনার খাবার তৈরী করি।"

মুখ ধুয়ে ফিরে আসার পর বেশ দুর্বল লাগছিল। পা দুটো ঝিমঝিম করছে, হাত দুটো যেন ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। এবার আমার আশ্চর্যভাবে মনে হল, ভোরের স্বপ্নের সঙ্গে আমার এই দুর্বলতার কোনো যোগ রয়েছে, হাত তুলে গা দুলিয়ে অনেকক্ষণ সঙ্কীর্তনের নাচ নাচতে হলে হাত পা অবশ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

ঘরের জানলায় রোদ এসেছে সবে। অনেক পরে মেঘলা কেটে রোদ ফোটার জন্যে সকালটি দেখতে ভাল লাগছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করেছে, মানুষজন হাঁটছে, নানা ধরনের সাড়াশব্দ আসছিল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে হলেও আমি কাছাকাছি বিছানার এসে বসে পড়লাম। কলকাতায় আসার আগেও আমার শরীর এত দুর্বল লাগত না। এই আট দশ দিনের মধ্যে কেমন হয়ে গেলাম। শরীরটার ওপর ডাক্তারদের পীড়ন চলছে বলেই হয়ত। কাল সকালে অনেকক্ষণ বমি বমি ভাব ছিল, আজ এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু বুঝছি না। কিন্তু ক্লান্ত লাগছে।

আয়না আমার জন্যে অল্প কিছু খাবার নিয়ে এল। সবই নরম, পাতলা জিনিস: পাতলা সুজির পায়েস, তার চেয়েও পাতলা চা, জলের মতন। এর পর আসবে হরলিকস, তারপর ফলের রস। আমার খাওয়াদাওয়া এখন ধরাকাটা করে চলছে। ওষুধপত্রও নানা রকম, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খেয়েই যাচ্ছি।

জ্যাঠামশাই এলেন।

"আজ কেমন লাগছে, শচি?"

"একটু দুর্বল লাগছে।"

"তা লাগতে পারে—" জ্যাঠামশাই আমার চোখ মুখ ভাল করে দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখে আমি যতটা উদ্বেগ আগে দেখেছি এখন তার চেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা দেখতে পাই। তিনি সেটা প্রকাশ করতে চান না। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকালে স্পষ্টই কিন্তু বুঝতে পারি, জ্যাঠামশাই ভেতরে ভেতরে কতটা বিষণ্ণ।

"তুমি আজ খুব সকাল সকাল উঠেছ?" জ্যাঠামশাই বললেন, "রাত্রে কোনো কষ্ট হয় নি তো?"

"না", আমি মাথা নাড়লাম। রাত্রে আমার কষ্ট হয়েছে। পেটের সেই যন্ত্রণা অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়েছিল। তারপর জ্বালা ভাবটা থাকতে থাকতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন। ও'কে এসব কথা বলতে চাই না।

জ্যাঠামশাই বসলেন।

ভোরবেলার স্বপ্নটা আবার আমার মাথায় ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর আঁশের মতন উড়ে এসে জড়িয়ে গেল।

"জ্যাঠামশাই?"

"বলো।"

"আপনি তো আমায় কলকাতায় সুহাসের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ডাক্তার টাক্তারও দেখা-শোনা করছে। আপনি এবার নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারেন।"

জ্যাঠামশাই আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। কলকাতায় আসার পর ও'র দৃষ্টি কখনো কখনো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, উনি যে দিশেহারা হয়ে পড়েন এটা বোঝা যায়। "এই তো"—উনি বললেন, "এবার ফিরে যাব। তোমার একটা ব্যবস্থা হলেই আমায় ফিরতে হবে।"

"আমার জন্যে আপনি কতদিন কলকাতায় পড়ে থাকবেন? মানু একলা আছে।"

"মানুর জন্যেও তো ভাবছি, শচি", জ্যাঠামশাই মাথা নুইয়ে নেড়ে আস্তে আস্তে বললেন, "মেয়েটা একলা আছে বাড়িতে; কার্তিক কমলা রয়েছে, হরিমোহনকে বলে এসেছি, তবু রোজই ভাবনা হয়। দেখি আর ক'দিন। আজ বিকেলে একটা রিপোর্ট পাওয়া যাবে তোমার।"

"আজ?"

"আজই শুনলাম। সুহাসরা বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাবে।"

আমি কোথায় কোন দিকে তাকাব ভেবে না পেয়ে যেন বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সুহাস উঠে পড়েছে। বাইরে বারান্দায় সে আয়নাকে ডাকছিল। আচমকা আমি বললাম, "ডাক্তাররা কী বলছে, জ্যাঠামশাই?"

জ্যাঠামশাই খুব সাবধানে আমার দিকে চেয়ে আছেন বুঝতে পারলাম। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "পুরোনো রোগ, চট করে ধরা মুশকিল। দেখছ না, কত রকম পরীক্ষা করছে। আমার তো মনে হচ্ছে শচি, তুমি শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে খুব অবহেলা করেছ। কোনো নিয়ম মানো নি; খাওয়া-দাওয়ায় যত্ন নাও নি; তোমার পেটে ঘা-টা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আলসার। আলসার রোগটা শুনতে আজকাল তেমন একটা মনে হয় না; কিন্তু রোগটা ভালো না। খুব খারাপ। বড় ভোগায়। অযত্ন করলে ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।"

"আজ বিকেলের পর আমার অসুখটা জানা যাবে?" এবার আমি জ্যাঠামশাইয়ের দিকে তাকালাম।

জ্যাঠামশাই যেন খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করলেন। বললেন, "সব রোগ সরাসরি বোঝা যায় না শচি, জটিল ব্যাধি ধরা খুব কঠিন। ডাক্তাররা ভগবান নন, তাহলে মানুষের ভোগ বলে কিছু থাকত না! তোমার অসুখটা ধরতে পারলে চিকিৎসা শুরু হবে। এখন ঠিক রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না, শরীরটাকে ঠেকো দেওয়া হচ্ছে।"

আরও খানিকটা বসে থাকলেন জ্যাঠামশাই, অন্য পাঁচটা কথা বললেন।

"আয়নার কী হল?" আমি কথা পালটে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি যেতে পারছি না—"

"সুহাস বলছিল—"

"হ্যাঁ; ওই সম্বন্ধটা ভেঙেই গিয়েছে একরকম। আমারও যেতে মন উঠছে না, শচি। ভাবছি কী করব। আয়নাকে এখানে রেখে দি কিছুদিন। কী বলো?"

"থাক্ না। পুজো পর্যন্ত থাক।"

জ্যাঠামশাই খানিকক্ষণ পরে চলে গেলেন। আমি চার-একবার উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাস্তাময় লোক, দোকান

পশার খোলা, রোদ লুটোচ্ছে রাস্তায়, একটা তিন চাকার গাড়ি একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ঢাকা খোলা। কোথাও কী বিয়ে হচ্ছে নাকি? সানাইয়ের সুর ভেসে আসছিল।

জানলায় দাঁড়িয়ে থাকার সাধ থাকলেও সাধ্য আমার নেই। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। পা দুটো আমার ঝিমঝিম করছে।

বিছানায় এসে বসে থাকতেও ভাল লাগছিল না। শুয়ে পড়লাম। পেটের কোথাও টানটান লাগছিল।

শুয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখের ওপর সকালের স্বপ্নটা আবার জলের ঝাপটার মতন এসে লাগল। চোখের পাতা বন্ধ করেও তাকে এড়ানো গেল না, চোখের তারায়, পালকে যেন লেগে থাকল, চোখ ভিজিয়ে রাখল।

আমি অনেকদিন ধরেই দু-একটা জিনিস ভেবে আসছি। ছেলেবেলা থেকেই আমার মাথা খুব পরিষ্কার নয়, বুদ্ধি আমার কম। আমার স্বভাবটা বাবারই মতন। বাবা সাত পাঁচ ভেবে কাজ করতে পারতেন না। বাবাকে নিয়ে বাড়িতে একটা হাসিঠাট্টা ছিল—কাকা, মা, এমন কি কাকিমাদের মধ্যেও। বিয়ে বাড়িতে কিছু কিছু কর্মকর্তা থাকে যারা কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু তাদের হাঁকডাক বাড়িটাকে জমজমাট করে রাখে। আমার বাবা সম্পর্কে বাড়িতে এই রকম একটা ধারণা ছিল। বাবা কোনো কাজই পারতেন না, হাত দিয়ে মাঝখানে ফেলে রাখতেন। শেষটা কাকাদের সামলাতে হত। তিনি ছিলেন হাঁকপাঁক করা মানুষ; সবই করতে ছুটতেন, তারপর রাজ্যের ঝঞ্ঝাট ভাইদের ঘাড়ে চাপিয়ে পালিয়ে আসতেন। সরল, নিষ্কর্মা মানুষ আর কি! অল্পেতেই অধীর, অধৈর্য হতেন, ভেঙে পড়তেন, হাউমাউ করে কাঁদতেন। বাবার সংগে আমার মিল হল, আমি তারই মতন অকর্মণ্য, তারই মতন কাতর-স্বভাব। আমার সংগে বাবার চরিত্রগত মিল আর কিছু নেই। আমার চেহারাতেও মার ছাপ বেশী। কাকাদের মধ্যে ছোটকাকার আমি সবচেয়ে আদরের ছিলাম। আমার মেজকাকি আর ছোটকাকাই আমায় মানুষ করেছে। আমার মার একরকম পক্ষাঘাত রোগ হয়, পা থেকে কোমর পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছিল। মা বেশীর ভাগ সময়টা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটাত। মেজকাকি আমায় সবচেয়ে বেশীদিন যেমন আঁকড়ে ছিল সেই রকম আমার স্বভাবটাকেও কুঁকড়ে দিয়েছে। কাকি কত কী মানত, বিশ্বাস করত। আমিও অনেক কিছু মানি, মানতে ইচ্ছে করে।

আমাদের পরিবারে যখন একটার পর একটা অঘটন শুরু হল, ছোটকাকা ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল, মা গেল, মেজকাকা ঝড়বৃষ্টির দিনে বজ্রাঘাতে পুড়ে গেল, বাবা আত্মহত্যা করলেন, ছোটকাকি আগুনে পুড়ে মরতে গিয়ে শেষে পাগল হয়ে গেল—তখন আমার এমন একটা বয়েস নয়। আমি চার-পাশে একটার পর একটা অঘটন ঘটতে দেখে ধরে নিয়েছিলাম, আমাদের সংসারের বেলায় এই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা ঘটে যাবার নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। এটা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হতে পারে না। তা হলে কী হতে পারে? ভগবানের রোষ? ভগবান একেবারে অকারণে আমাদের ওপর রুষ্ট এটা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল ছিল। আমি ভগবানের ওপর রুষ্ট হতে পারতাম। তা পারিনি। আমি ভাবতাম, কোনো ভয়ংকর পাপ কোথাও ঘটে গেছে। কী পাপ আমি জানি না।

মেজকাকি আমায় বলত, মানুষ তার কর্মফল ভোগ করে।

বাবা, কাকারা কোন্ পাপে এই দণ্ড ভোগ করল আমি বুঝিনি। কিন্তু মনে মনে একটা ভয় থেকে গেল। আমি তখন থেকেই ভয়ের মধ্যে বাঁচতে লাগলাম। আমার দিন কাটত ভয় নিয়ে। যে কোনো মুহূর্তে আমার জীবনেও কিছু ঘটতে পারে।

ভয় নিয়ে কতদিন বাঁচা যায়।

ভয় ভাঙার একটা বড় উপায় ভয়ের বস্তুটাকে জানা। যেখানে অন্ধকার, পা ফেলতে ভয় করে সেখানে আলো ফেললে বোঝা যায় রাস্তায় ভয়ের কিছু পড়ে আছে কিনা! কিন্তু মৃত্যুকে আলো ফেলে দেখা যায় না। সে কখন, কবে, কোন চেহারা নিয়ে আসবে কেউ জানে না। মেজকাকা যেদিন বজ্রাঘাতে মারা গেল, সেদিন সকালেও আমি কাকার সংগে মাছ ধরতে যাব বলে ছিপ তৈরী করছিলাম। আমার সেই ছোট ছিপখানা আমার হাতে ধরা থাকল, মেজকাকা অন্য ছিপের টানে নিজেই ধরা পড়ল।

মৃত্যু নিয়ে আমার যে উৎকণ্ঠা তার কারণ এই নয় যে, আমি মরব; আমার প্রশ্ন, আমি কেন অসঙ্গত ভাবে মরব? আমার সঙ্গে মৃত্যুর রেষারেষি তখন থেকেই। তাকে আমি আলো ফেলে দেখতে চাই, অথচ পারি না। সে আড়ালে থাকে, লুকিয়ে থাকে।

আমি তাকে আমার সাধারণ বোধ-বুদ্ধি দিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। পারি নি।

একজন আমায় বলেছিলেন, মানুষের জীবন হল দাঁড়িতে বাঁধা আর্তজীবের মতন, পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঝুলছে। যে কোনো সময়ে সেটা ছিঁড়ে যেতে পারে। তোমার করবার কিছু নেই। চেষ্টা করো, কোথাও যদি পা রাখার মতন জায়গা পাও, তাতে দড়িটা দুলবে কম, টান পড়বে আরও কম।

আমায় যিনি একথা বলেছিলেন তাঁর সংগে আমার আলাপ হয়েছিল এক ছোট স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। শীতের রাতে তিনি কাঠের আগুন জেলে নিজেকে শীতের হাত থেকে বাঁচাচ্ছিলেন, আর গুনগুন করে তুলসীদাসের দোঁহা গাইছিলেন। সন্ন্যাসী মানুষ, কিন্তু পথেঘাটে দেখা সন্ন্যাসী নয়। আমি তাঁর পাশে বসে আগুন সেঁকতে সেঁকতে কখন যে হাঁটুতে মাথা রেখে ঘুমে পড়েছি জানি না; ভোর রাতে দেখি আগুনটা তখনও ছাই চাপা পড়ে অল্প অল্প জ্বলছে, তিনি নেই। কুয়াশা আর হিমে ভেজা বিশাল একটা মাঠ সামনে পড়ে, তিনি যেন সেই পথ দিয়ে চলে গেছেন আমাকে না ডেকে।

তারপর থেকে আমি হাতড়ে যেটুকু জায়গা পেয়েছি, সেখানে পা রাখার চেষ্টা করছি। এ জায়গাটুকুই আমার সম্বল। আমার বিশ্বাস।

(ক্রমশ)

রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক প্রতিবেদনে ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক প্রতিবেদনে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি এবং সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ১৯৭০-৭১ সালের (১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত) প্রতিবেদনে আগেকার বছরের তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের সঙ্গে ভারতে ব্যাংকের ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি এবং উন্নতি সম্পর্কেও একটি বিশেষ পর্যালোচনা আমরা দেখতে পাই। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া হল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ করে থাকে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রিজার্ভ ব্যাংক হল দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা ও বজায় রাখার প্রধান নিয়ন্ত্রণী সংস্থা। অপরদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থসংস্থানে রিজার্ভ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সরকারের নির্দেশে সরকারী ব্যয়ের ঘাটতি মেটাবার জন্য রিজার্ভ ব্যাংককে নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়তে হয়। সেই সঙ্গে কৃষি, শিল্প (ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) ও রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহেও রিজার্ভ ব্যাংকের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। সেজন্য রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদনে দেশের অর্থনীতির একটি খতিয়ান বা যথার্থ মূল্যায়ন আমরা দেখতে পাই।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭০-৭১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি বা অবনতি সবক্ষেত্রে সমান হয়নি, যদিও সামগ্রিকভাবে ১৯৭১ সালে গত বছরের অনুপাতে উন্নয়ন হার সন্তোষজনক। ১৯৬৯-৭০ সালে জাতীয় আয় যা ছিল, ১৯৭০-৭১ সালে জাতীয় আয় তা অপেক্ষা শতকরা ৫ ভাগ থেকে ৫·৫ ভাগ বেড়েছে। প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও পর পর দুই বছর চতুর্থ যোজনার লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী জাতীয় আয় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার মতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির এই হার বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন ছয় শতাংশেরও বেশি বেড়ে যাবার জন্য। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, চতুর্থ যোজনায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক লক্ষ্য মাত্রা হল পাঁচ শতাংশ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধারা পর পর চার বছর ধরেই খুব আশাব্যঞ্জক। ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের অনুপাতে ৮ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। একদিকে যখন কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, অপরদিকে শিল্পোৎপাদনের হার অনেক কমেছে। ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬·৪ শতাংশ এবং ৭·১ শতাংশ; কিন্তু ১৯৭০ সালে তা হয়েছে ৪·৫ শতাংশ। ১৯৭০ সালের শেষ ছয় মাসে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র তিন শতাংশ। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হওয়ার কারণ হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির উল্লেখ করা হয়েছে: কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের অভাব (যেমন, কার্পাস, তৈলবীজ এবং মূল ধাতু), বিদ্যুৎ ও পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন অসুবিধা, শিল্প সম্পর্কের অবনতি এবং সরকারী ক্ষেত্রে লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ না হওয়া।

বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যদিও ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম সমাপ্ত করতে পেরেছে তবুও চলতি লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি আরও বেড়েছে। রপ্তানির পরিমাণ ১৯৭০ সালে ছিল ১৪০৯·৫ কোটি টাকা, ১৯৬৯ সালের চেয়ে তার পরিমাণ ১১·৫ কোটি টাকা বেশি। অপরদিকে আমদানির পরিমাণ ১৯৭০ সালে ছিল ১৬৭৮·৩ কোটি টাকা— ১৯৬৯ সালে ভারতীয় মুদ্রার বহির্মূল্য হ্রাস করার পর থেকে আমদানি কমে যাবার যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ১৯৭০ সালে তার ব্যতিক্রম হয় এবং আমদানি বেড়ে যায়।

ভারতের বেকার সমস্যা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সুসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে সামগ্রিকভাবে কর্মসংস্থানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৬৯-৭০ সালে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি যথাক্রমে ১·৯ শতাংশ এবং ২·৫ শতাংশ বেড়েছিল। এই দুই বছরে বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে সরকারী ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি বেড়েছিল। ১৯৭০ সালে এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কর্মসংস্থানের ২·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে বেকার লোকের সংখ্যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ছে। জনসংখ্যা গত দশকে বৎসরিক ২·৪ শতাংশ হারে বেড়েছে; তার মধ্যে কর্মক্ষম এবং কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা আরও বেশি হারে বেড়েছে। সরকার একটি Crash programme গ্রহণ করে আরও বেশি পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু, প্রয়োজনের তুলনায় এটা খুবই সামান্য। গত মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশ থেকে অগণিত শরণার্থী আসায় দেশের অর্থনীতির উপর যে একটি গুরুতর চাপ পড়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ক্রিয়াকলাপ কিরূপ হচ্ছে সে সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। একথা ঠিক যে স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া এবং অপর চৌদ্দটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণ, এবং কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও রপ্তানি সম্প্রসারণে অর্থ সংস্থানে বিশেষ উৎসাহী হয়েছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এখনও কৃষি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি (স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া ব্যতীত) আশানুরূপ সাফল্য দেখাতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রে যাদের প্রকৃতই ঋণ দেওয়া উচিত, তাদের হয়তো ঋণ দেওয়া হয়নি,—অথচ এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে যেক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ দেওয়া উচিত হয়নি।

রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদনে

১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গত জুন মাসের পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গত পাঁচ মাসে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই আরও সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় এক কোটি শরণার্থীর চাপ, এবং পাকিস্তানের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি জোরদার করার জন্য ভারত সরকারকে গভীর অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সরকার একদিকে জনসাধারণের উপর করের বোঝা বাড়িয়েছেন, অপরদিকে ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের মাত্রাও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। গত ছয় মাসে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে,—প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অর্থনৈতিক জীবনকে বহুলাংশে বিপর্যস্ত করেছে, এবং সর্বোপরি বেকার সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়েছে। ভারত সরকার এখনও চতুর্থ পাঁচসালা যোজনা অপরিবর্তিত রাখতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সর্বদিক রক্ষা করা সম্ভব হবে কি?

সুব্রত গুপ্ত

॥ ২ ॥
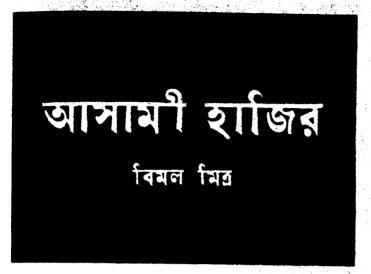
ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলো। যেন বেশ একটা মজার বিষয়-বস্তু পেয়েছে সদানন্দবাবুর কথার মধ্যে। আর তা ছাড়া যেন অনেক দূর থেকে হেঁটে এসে বড় ক্লান্তও বটে।

বললে—দাঁড়ান মশাই আজ এত বছর ধরে আপনার পেছনে পড়ে আছি, আপনার জন্যে আমার চাকরি যায়-যায় অবস্থা—

সদানন্দবাবু ভদ্রলোকের হাল-চাল দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বললেন—দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন—

ভদ্রলোক বললে—কেন, আমি তো সোজা বাঙলা ভাষাতেই কথা বলছি, আপনি নিজেও তো বাঙালী মশাই। আপনার নিবাস নদীয়া জেলার নবাবগঞ্জ গ্রামে, আপনার পিতামহের নাম নরনারায়ণ চৌধুরী, আপনার পিতার নাম হরনারায়ণ চৌধুরী, আপনারা নবাবগঞ্জের জমিদার, আমি কি কিছু জানি না বলতে চান?

সদানন্দবাবু তখনও অবাক হয়ে দেখছিলেন ভদ্রলোকের মুখখানা। মনে হলো কোথায় যেন আগে দেখেছিলেন লোকটাকে। ভদ্রলোক তখন একটা মোটা ঝাড়নের মত রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছেন ঘষে ঘষে। অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছে লোকটা মনে হলো।

ভদ্রলোকের যেন হঠাৎ নজরে পড়লো। বললে—আরে, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না—আপনার তো এখন কোনও কাজ-কর্ম নেই, কেবল খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন—রসিক পালের পুষ্যিপুত্তুর হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছেন—

কথাগুলো সদানন্দবাবুর ভালো লাগলো না। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বললেন—আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি বলুন তো—

—আমাকে কোথায় আর দেখবেন। কোর্টেই দেখেছেন।

—কোর্টে? কোর্টে তো আমি কখনও যাইনি।

—তাহলে কালেক্টরি অফিসে দেখেছেন। আমি কোর্টে যাই, কালেক্টরিতে যাই, দুনিয়ার সব জায়গাতেই আমায় যেতে হয়। দুনিয়াতে যে-যে কিছু সম্পত্তি করেছে তার কাছেই আমাকে যেতে হয়। আমার কাজই তো আসামীকে কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করা! যেমন আপনি! আপনি একজন আসামী বলেই আপনার কাছে এসেছি—

তারপর একটু থেমে বললে—এক গ্লাস জল দিতে পারেন, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

সদানন্দবাবু বললেন—আপনি বসুন, আমি জল আনি—

রসিক পালের এস্টেটে বন্দোবস্ত সব পাকা। আগে আরো পাকা ছিল। তখন রসিক পাল বেঁচে ছিলেন। কাছারি-বাড়িতে পাকা খাতায় সকলের নাম লেখা থাকতো। কে আজ খাবে, কী তার নাম, কজন খাবে, কী কাজে তারা চৌবেড়িয়ায় এসেছে, হরি মুহুরির লোক সব কিছু খাতায় লিখে রাখতো। রসিক পালের টাকাও যেমন ছিল, তেমনি আবার টাকার সদ্ব্যবহারও ছিল। যেদিন স্কুল উঠে গেল সেদিন রসিক পাল বড় কষ্ট পেয়েছিলেন মনে মনে। কিন্তু উঠে যাবার কারণও ছিল! রসিক পাল সুদ-খোর মানুষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষটাকে যে ভালো ভাবে না চিনেছে সে রসিক পালকে বুঝতে ভুল করবে। রসিক পাল কথায় কথায় বলতেন—আমি কি টাকা নিয়ে দান-ছত্তোর করতে বসেছি হে যে সুদের টাকা ছেড়ে দেব?

কিন্তু হরি মুহুরি যখন এসে খরচের কথা বলতো তখন রেগে যেতেন। বলতেন—খরচ হবে তো খরচ হবে, আমি কি টাকা নিয়ে স্বগ্যে যাবো? আমি সঙ্গে করে টাকা নিয়েও আসিনি, সঙ্গে করে নিয়েও যাবো না। যা খরচ হবে তা হবে। চালের দাম বাড়ছে বলে কি আমি অতিথিশালা তুলে দেব ভেবেছ?

লোকে বলতো—পাগল, পাগল মশাই একজন আস্ত পাগল—

সদানন্দবাবু সব ভালো করে দেখতেন। এমন লোক আগে কখনও দেখেননি তিনি। দেখলে তাঁর জীবনটা অন্য রকম করে গড়ে উঠতো। হয়ত এমন করে এভাবে জীবনটা শেষ করতেও হতো না।

আত্মজীবনীটা লেখবার সময় ওই রসিক পাল সম্বন্ধে অনেকগুলো পাতা লিখতে হবে। যে-পৃথিবী থেকে ছেড়ে এসে এখানে এমন করে আশ্রয় পেয়েছেন সেখানকার সেই আশ্রয়দাতার কথা না লিখলে তাঁর লেখা

আনন্দে থেকে যাবে।

স্কুল যেদিন উঠে গেল সেদিন রসিক পাল খুব দুঃখ করে বলেছিলেন—মাস্টার, আমি পারলুম না—

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—আপনি যে পারবেন না পাল-মশাই তা আমি জানতুম—

—কী করে জেনেছিলে?

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—কারণ কেউ-ই পারেনি। কেউ পারেনি বলেই আপনি পারলেন না।

—তার মানে? রসিক পাল অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিলেন মাস্টারের দিকে।

সদানন্দবাবু বলেছিলেন—মানে হুঁকোর খোল নলচে খারাপ হয়ে গেলে কি তামাক ধরে, না ধোঁয়া বেরোয়!

রসিক পাল কথাগুলো তবু বুঝতে পারেননি সেদিন। রসিক পাল দেদার টাকাই উপায় করেছিলেন, কিন্তু টাকার ওপর আসক্তি তাঁর কমেনি। টাকার আসক্তি যার আছে তার দ্বারা টাকার সদ্ব্যয় কেমন করে হবে? তাই ছেলেরা স্কুলে আসতো না, সদানন্দবাবু বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের ডেকে আনবার চেষ্টা করতেন।

শেষকালে সদানন্দবাবু একদিন হাল ছেড়ে দিলেন।

বললেন—এবার স্কুল তুলে দিন পাল মশাই, আর আমাকেও মুক্তি দিন—

—কেন? কী বলছো তুমি?

সদানন্দবাবু বললেন—আমি গোড়াতেই আপনাকে বলেছিলুম এসব কাণ্ড আরম্ভ না-করতে, কিন্তু আপনি কিছুতেই শুনলেন না। এখন আর কেউ লেখা-পড়া করবে না। এখন লেখা-পড়া না করেই ছেলেরা হাজার টাকা মাইনের চাকরি চাইবে—

—ওটা তোমার রাগের কথা মাস্টার, তুমি আর একটু চেষ্টা করে দেখ না। মাসে মাসে আমি এতগুলো টাকা দিচ্ছি, গভর্মেন্টের ঘর থেকেও টাকা আনবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, দেখবে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে—

কিন্তু ঠিক শেষ পর্যন্ত হলো না। যত দিন যেতে লাগলো ততই যেন কারা সব গ্রামে আসতে লাগলো লুকিয়ে লুকিয়ে। অচেনা সব মুখ তাদের। রাত্রের অন্ধকারে তারা গঙ্গার ধারে গঞ্জের হোটেলে এসে ব্যাপারি সেজে রইল। তারপর একদিন কোথাও কিছু নেই হঠাৎ রসিক পাল মশাই-এর বসত-বাড়ি থেকে একসঙ্গে একটা আর্তনাদ উঠলো।

সে অনেক রাত তখন।

তারপর পুলিস এল, এনকোয়ারি হলো। কয়েকদিন ধরে চৌবেড়িয়াতে খুব হইচই হলো। লোকজনকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চললো। কয়েকজন গ্রেফতারও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুরই ফয়শলা হলো না। যে মানুষ একদিন সামান্য অবস্থা থেকে নিজের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়ে দশজনের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁকে খতম করে দেশকে পাপ-মুক্ত করা হলো। তাঁর অপরাধ কী? না, তিনি সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দিতেন। গভর্মেণ্ট টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করলে দোষ হয় না, দোষ হয় ব্যক্তির।

তারপরও কিছুদিন স্কুল চলেছিল। কিন্তু পাশের গ্রামে আর একটা স্কুল হলো। তারা সব ছেলে ভাঙিয়ে নিয়ে চলে গেল।

রসিক পাল মশাই-এর ছেলে বেহারী পাল বললে—মাস্টার মশাই, এবার কী করবো তা হলে?

সদানন্দবাবু বললেন—আর কী করবে? এবার স্কুল বন্ধ করে দাও, আর, আমাকেও এবার মুক্তি দাও—

বেহারী বললে—কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন?

সদানন্দবাবু বললেন—আমি আর কোথায় যাবো বাবা, যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই চলে যাবো। তোমাদের ঘাড়ে কতদিন বসে বসে খাবো, বলো?

বেহারী বললে—তা হবে না মাস্টার মশাই, আমি জানি আপনার কোথাও যাবার জায়গা নেই—

সদানন্দবাবু বললেন—ও-কথা বোল না বেহারী, মানুষের সমাজে জায়গা না হোক, বনে-জঙ্গলে জানোয়ারের সমাজে তো জায়গা হবেই—

তবু বেহারী পাল ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রসিক পালের সব ক্রিয়া-কর্মই বেহারী চালিয়ে যাচ্ছে। বার-বাড়ির উল্টোদিকে অতিথিশালা ছিলই আগে থেকে। কখনও সেখানে কেউ থাকতো, আবার কখনও কেউ থাকতো না। তীর্থের গুরুমহারাজ, পাণ্ডা-ঠাকুর কেউ এলে তাঁদের অতিথিশালার একটা মহলেই আশ্রয় দেওয়া হতো। তাঁদের জন্যে যেমন ব্যবস্থা ছিল, মাস্টার মশাই-এর জন্যেও ঠিক সেই তেমনি ব্যবস্থাই হলো।

সদানন্দবাবু সেই দিন থেকে আর কোথাও যেতে পারলেন না। এই চৌবেড়িয়াতেই রয়ে গেলেন।

হরি মুহুরি প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল।

বলেছিল—আচ্ছা মাস্টার মশাই নয়নতারা কে?

সদানন্দবাবু একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। বললেন—কেন, মুহুরি মশাই? নয়নতারার কথা তুমি জানলে কেমন করে?

—আপনি নিজেই বলেছেন।

বলে হরি মুহুরি হাসতে লাগলো।

সদানন্দবাবু বললেন—ও বুঝতে পেরেছি, আমার ওই এক বদ্ অভ্যেস, ঘুমোতে-ঘুমোতে কথা বলি। আজকে পাল-মশাইও তাই বলছিলেন আমাকে। আমি নাকি গান গেয়েছিলুম—

—আমিই তো বলেছি কর্তামশাইকে। আমি তো আপনার পাশের ঘরে শুয়েছিলুম তাই মাঝ-রাত্তিরে আপনার মুখে ঠাকুরের কবি গান শুনে চমকে উঠেছিলুম। ভাবলুম সেকালের গান একালে এত রাত্তিরে কে গায়! তা আপনি কবিগানের দলে ছিলেন নাকি?

সদানন্দবাবুর হাসি পেল। মুখে

বললেন—না না, কবির দলে ছিল্ম না। কবির দলে থাকতে যাবো কোন্ দুঃখে। কথাটা শুনেছি তাই মনে আছে—

—আপনার দেশ কোথায় মাস্টার মশাই? আপনার বাড়ি?

এই চৌবেড়িয়াতে আমার পত্র থেকে এই প্রশ্ন তাঁকে অনেক বারই শুনতে হয়েছে। আরো যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন শুনতে হবে। রসিক পালও জিজ্ঞেস করতেন প্রথম প্রথম। অজ্ঞাত-কুল-শীল মানুষকে নিজের আস্তানায় আশ্রয় দিতে গেলে তার কুলজি জানতে হয়। কোথায় নিবাস, পিতার নাম, সব কিছু।

রসিক পাল বলতেন—ঠিক আছে বাবা, তোমার কিছু বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি কোথাও তোমার একটা ঘা আছে—

—ঘা?

—হ্যাঁ, বাবা হ্যাঁ, এতদিন মহাজনী কারবার করছি আর লোক চিনতে পারবো না? তোমার কিছু বলতে হবে না। কবির গানের কথাও বলতে হবে না, মরলোকেরা কে তা-ও বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি—

বলেই একটা লম্বা হাঁচি হাঁচলেন। আর সদানন্দবাবু ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বেলা নটা।

হাঁচির পরেই মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠলো রসিক পালের। হাঁচির সঙ্গে ঘড়ির কাঁটা মিলে গেছে এমন ঘটনায় রসিক পাল বরাবরই প্রসন্ন হয়ে উঠতেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন হরি মুহুরিকে। হরি মুহুরি আসতেই বললেন—হরি, আজকে বাড়িতে একবার খবর দাও তো নালতে শাক যেন রান্না করে বামুন-মেয়ে—

—নালতে শাক?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নালতে শাক, নালতে শাক খাওনি কখনও?

—আজ্ঞে না।

রসিক পাল অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি আমাকে অবাক করলে হরি, নালতে শাকই খাওনি?

তারপর সদানন্দর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি খেয়েছ বাবা?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো বোশেখ মাস, এই বোশেখ মাসই তো নালতে খাবার সময়—

—বাঃ বাঃ, তুমি তো বেশ পণ্ডিত মানুষ হে দেখছি। বোশেখ মাসে নালতে শাক খেতে হয় তুমি জানলে কী করে?

সদানন্দ বললে—আমি জানি। গৌরী পিসির কাছে শুনেছি।

—কে গৌরী পিসি?

—আজ্ঞে, আমাকে ছোটবেলায় যে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সে একটা ছড়া কাটতো—

—ছড়া? ছড়া আবার কীসের হে?

সদানন্দ বললে—ওই খাওয়ার ছড়া—'বারোমাস্যা'—

—খাওয়ার ছড়া? কী রকম? বলো তো দেখি ছড়াটা?

চৈতে চাল্‌তে মিঠে
বৈশাখে মিঠে নাল্‌তে।
জৈষ্ঠ্যে মিঠে দই
আষাঢ়ে মিঠে খই॥
শ্রাবণ মাসে ওল্ মিঠে
ভাদ্রে মিঠে তালের পিঠে॥
আশ্বিনে মিঠে শশা।

কার্তিকে মিঠে খলসে মাছের মনা॥
পৌষে মিঠে বাসনা ভাত
ওরে পাটি পাতা পাত্॥
মাঘে মিঠে সরষের তেল
ফাল্গুনে মিঠে গুড় আলা আর বেল॥

ছড়াটা শেষ করতেই রসিক পাল তার হাতটা কুঁড়োজালির মধ্যে আটকে ছিল বলে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন সদানন্দর দিকে। বললেন—বড় খুশী হলুম বাবা, এসব কথা বলবার কি শোনবার লোকও আজকে আর কেউ নেই। চারদিকে সবাই কোট-প্যাণ্ট পরে একেবারে সাহেব হয়ে গেল। হরি মুহুরিকেই দেখ না, বলে কি না মাল্‌তে শাকই খায়নি। তুমি তো 'বারোমাস্যা' শোনালে আমাকে, এবার আমি তোমাকে একটা ছড়া শোনাবো?

সদানন্দ বললে—শোনান না—

আশে-পাশের যারা টাকা ধার নিতে এসেছিল তারাও বললে—শোনান না কর্তা-মশাই—

রসিক পাল সত্যিই রসিক মানুষ। বলতে লাগলেন—তবে শোন—

চৈত্র মাসে চাল্‌তে মিঠে
মিঠে ডাব্‌কের রাও
গাছের তলায় ছায়া মিঠে
মিঠে দখিণ বাও॥
ঘরের মিঠে পানে রে ভাই
পান মিঠে চুনে,
বয়েস কালে কামিনী মিঠে
ঘৃত মিঠে নুনে॥

ছড়াটা শেষ করতেই উপস্থিত সবাই সাধুবাদ দিতে লাগলো। তারপর থেকেই হুকুম হয়ে গেল সদানন্দকে যেন স্পেশ্যাল খাওয়া দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল ব্যবস্থা মানে কর্তামশাই যা খাবেন সদানন্দবাবুরও সেই খাওয়া। তাঁর খাওয়া অন্দর মহলের ভেতর থেকে আসবে।

সদানন্দবাবু চৌবেড়িয়াতে আসার পর থেকেই রসিক পাল মশাই-এর মেজাজ যেন কেমন মিষ্টি হয়ে গেল। তিনি দু' হাতে দান শুরু করতে লাগলেন। বেহারী পাল বাবার কাণ্ড দেখে একদিন বাপকে বললে—এখন দিনকাল বদলে গেছে, এখন কি আর এত খরচ বাড়ানো উচিত বাবা?

রসিক পাল আশে-পাশের লোকজনদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন—দেখ দেখ, বেহারীর কথা শুনলে তোমরা! আজকাল-কার ছেলে তো, কেবল কোট-প্যাণ্ট পরতেই শিখেছে। আরে, আমি আমার নিজের টাকা খরচ করবো তাতে তোর কী? তুই কথা বলবার কে? আমার রোজগার করা টাকা আমি খরচ করবো তাতে তোর অত মাথা-ব্যথা কেন?

তা এমন কথা নেই মোক্তার, দিনকার। বেহারী তখন সবে কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। [illegible]

পাল খুন হলেন সেইদিনই বেহারী বাবার সব কারবারের ভার তুলে নিলে মাথায়। আড়তের কাজ আবার পুরোদমে চলতে লাগলো আগেকার মত। কিন্তু বাপের মহাজনী কারবার বন্ধ করে দিতে হলো। সদানন্দবাবু তখনই চৌবেড়িয়া ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেহারী যেতে দেয়নি। বলেছিল—আপনি যাবেন না মাস্টার মশাই, বাবা আপনাকে বরাবর এখানে রাখতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

সদানন্দবাবুর বড় সঙ্কোচ হয়েছিল। বলেছিলেন—কিন্তু আমি তোমাদের এখানে কিছু কাজ না করে শুধু বসে বসে খাবো?

উত্তরে বেহারী বলেছিল—আপনার কাজ আমাদের আশীর্বাদ করা। আপনি আমাদের আশীর্বাদটুকুও করতে পারবেন না? আপনাকে কোনও কাজ করতে হবে না, শুধু আমাদের আশীর্বাদ করে যাবেন—

*

তা এদিকে তখন ঘরের মধ্যে বসে ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিল। লোকটা কি পালালো নাকি? জল আনতে গেল তো গেলই। এতক্ষণ লাগে এক গেলাস জল আনতে! ভদ্রলোক হাতের পোঁটলাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঘরের বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কে একজন যাচ্ছিল উঠোন পেরিয়ে।

ডাকলে—ও গো, কে তুমি? একবার ইদিকে এসো তো ভাই—

অতিথিশালার লোক। ডাক শুনে কাছে এল। ভদ্রলোক বললো—তুমি এ বাড়ির লোক তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী নাম তোমার?

—গণেশ।

—গণেশ! বেশ নাম। ভাই গণেশ, তুমি বলতে পারো এই ঘরের সদানন্দবাবু কোথায় গেলেন।

—আমাদের মাস্টার মশাই-এর কথা বলছেন?

ভদ্রলোক বললে—সদানন্দবাবু যাঁর তোমাদের মাস্টার মশাই?

—আজ্ঞে, এখন আর মাস্টারি করেন না, আগে করতেন। তাঁকে দরকার?

—হ্যাঁ ভাই, এক গ্লাস জল চেয়েছিলুম তাঁর কাছে। অনেক দূর থেকে আসছি কিনা আমি। বড় জল তেষ্টা পেয়েছিল—

গণেশ বললে—আপনি মাস্টার মশাই-এর কাছে জল চেয়েছিলেন? তবেই হয়েছে। আজকে তাহলে আর জল পেয়েছেন।

—তা কী? কেন? তিনি যে আমাকে ... বলে চলে গেলেন?

... বললে—তাঁকে নিজেকেই যে জল ... তার ঠিক নেই, তিনি আনবেন জল। ... নিজের হাতে কখনও জল গড়িয়ে ... ? তাঁর নিজের জল তেষ্টা পেয়েছে কি না তাই-ই বলে তিনি বুঝতে পারেন না ...।

কথাগুলো শুনতে ভদ্রলোকের বেশ ... লাগলো। বললে—তাহলে মাস্টারি করছেন কী করে এখানে?

গণেশ বললে—ওই জন্যেই তো কর্তা-মশাই-এর ইস্কুলটা উঠে গেল।

—পড়াতে পারতেন না বুঝি?

—পড়াতে পারবেন না কেন? বড় ভালো মানুষ যে তাই কেউ তাঁকে মানুষ বলেই ... না। ... করলে কি ইস্কুল চলে? ... ভালো মানুষ বলেই তো ... একে অত ভালোবাসতেন।

ভদ্রলোক বললে—... তো দেখছি মুশকিলে পড়া গেল—

গণেশ বললে—... আর কেন পড়বেন, আমি জল এনে দিচ্ছি—

বলে গণেশ ভেতর দিকে কোথায় চলে গেল। দুপুর বেলা। সাধারণত এমন সময় সকলেরই একটু বিশ্রাম। সকাল থেকে কাজ চলতে চলতে এই দুপুর বেলাতে এসেই কাজের চাকাটা যা একটু থামে। তারপর বিকেল বেলা সেই যে শুরু হবে তার শেষ হবে অনেক রাত্রে পৌঁছিয়ে। নবাবগঞ্জের বাড়িতেও ঠিক এমনি হতো। অথচ সংসার বলতে তো ওই তিনটে প্রাণী। নরনারায়ণ চৌধুরী মারা যাওয়ার পর বাবা, মা আর ওই সদানন্দ। অনেকে নামটা ছোট করে দিয়ে ডাকতো—সদা। সেই সদা আবার শেষকালে হয়ে গেল সদু।

চৌধুরী বাড়িতে নতুন বউ এসেছে। পালকী আসছে রেলবাজার থেকে। ট্রেন থেকে বর আর বউকে নামিয়ে তোলা হয়েছে পালকীতে। ছ' ক্রোশ রাস্তা। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথ।

চৌধুরী মশাই-এর শ্যালক ছিল সঙ্গে সেই বর-বউকে সঙ্গে করে আনছিল। তা সঙ্গে আসছিল নরনারায়ণ চৌধুরী গোমস্তা। একেবারে সামনের পালকীতে আর একেবারে সকলের সামনে-স... দীনু—

গোমস্তা আগে আগে চলেছে। কৈলা... গোমস্তাকে লোকে দূরে থেকে নমস্ক... করছে। এক-একটা গ্রামে ঢোকে তারা অ... গাঁয়ের বউ-ঝি-ছেলে-বুড়ো সামনে এ... হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বলে—গোমস্তা মশা... বউরাণীকে একবার দেখবো—

কৈলাশ গোমস্তা বলে—আরে না না, এ... না, কাল চৌধুরী বাড়িতে বউরাণ... সাজিয়ে গুজিয়ে দেখাবো তোদের—

ওমা, তা এখন কি সাজগোজ নেই?

—তা থাকবে না কেন? এখন সেই যে... গঞ্জ থেকে রেলে চড়ে বউ ঘেমে-... আসছে, এখন কি কেউ দ্যাখে রে? কাল সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখবো বউমাকে ... দেখিস—

এমনি সারা রাস্তা। সকলকে ঠ... করতে করতেই কৈলাশ গোমস্তা অ...

পেছনের পালকীতে প্রকাশ মামা ... বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো—একটু... চালিয়ে, পা চালিয়ে দীনু—

যেন প্রকাশ মামারই বিয়ে। তার স... গোয়েন্দার বাহার বরকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে গে... বিয়ের উৎসবের কুর্নিশ করে তার খাটুনি...

যেমন শেষ নেই, আবার উৎসাহেরও তেমনি শেষ নেই।

হইচই করতে করতে বর-বউ নবাবগঞ্জের চৌধুরীবাড়ির উঠোনে এসে ঢুকলো। গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোক-জন এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

কৈলাশ গোমস্তা হাঁ হাঁ করে উঠলো —সরো গো, সরো সবাই, সরো। বউ-এর দম আটকে আসবে, সরো, ভেতরে হাওয়া ঢুকতে দাও—

প্রকাণ্ড হাঁকাও কম যায় না। কোঁচানো ধুতি আর চিকন পাঞ্জাবি নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সে-ও বলে উঠলো—যাও, যাও, যাও, ওদিকে যাও ভাই সব, এদিকে ভিড় নয়, এদিকে ভিড় নয়—

গৌরী পিসীর আর তর সইলো না। সে কারো মানা শুনবে না। একেবারে দৌড়ে এসে পালকীর দরজায় সামনে নিচু হয়ে বউ-এর ঘোমটা তুলে মুখখানা দেখলে।

নয়নতারাও চমকে গেছে! এ আবার কে? শাশুড়ি নাকি?

বউ দেখে গৌরী পিসীর খুশীর আর শেষ নেই। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো —ওলো, জোরে জোরে উলু দে, জোরে জোরে উলু দে তোরা—

তারপরে খুশীর চোটে একেবারে ছড়া কেটে উঠলো—

ইস্টিশানের মিষ্টি কুল
সখের বাজার গোলাপ ফুল।
ইজিল-বিজিল-সিজিল আ
রূপের বাহার দেখে যা—

সত্যিই নয়নতারার রূপের বাহার দেখে গাঁ সুদ্ধ লোক অবাক। এমন রূপও হয় নাকি! দোতলার ঘরে নরনারায়ণ চৌধুরী তখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর প্রথম নাত-বউ বাড়িতে এসেছে। তাঁকেই প্রথমে প্রণাম করতে হবে।

—চলো বউমা, তোমার ঠাকুরবাবাকে পেন্নাম করবে চলো—

নরনারায়ণ চৌধুরীর বহুদিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে তখন। অনেক অভিশাপ তিনি কুড়িয়েছেন। এবার যাবার সময় নাত-বউ-এর মুখ দেখতে পেলেন। এবার তাঁর বংশের ধারা আবহমান কাল ধরে চলুক। বংশ-পরম্পরায় নবাবগঞ্জের চৌধুরী বংশের গৌরব আরো বৃদ্ধি হোক। অনাগত কালের মানুষ বলুক—এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নর-নারায়ণ চৌধুরী মানুষের সমাজে সত্যিই ছিলেন এক নরনারায়ণ। তিনি ছিলেন দানবীর, কর্মবীর, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, মহাপুরুষ। এই তাঁর পৌত্র, এই সদানন্দ চৌধুরীরই একদিন সন্তান হবে, সেই সন্তানেরও আবার একদিন সন্তান হবে। এমনি করে সন্তানের পর সন্তানের জন্ম হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পুরুষানু-ক্রমে তাদের বংশাবলীর মধ্যে দিয়েই তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন। এ-বয়েসে এই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় এই-ই তাঁর একমাত্র কামনা, এই-ই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা—এই-ই তাঁর একমাত্র সুখ!

হঠাৎ কৈলাশ গোমস্তা এসে খবর দিলে —কর্তামশাই, কালীগঞ্জের বউ এসেছে—

—কে?

—আজ্ঞে, কালীগঞ্জের বউ।

—তা কালীগঞ্জের বউ হঠাৎ আজকে এল কেন? তাকে কি তোমরা নেমন্তন্ন করেছিলে?

—আজ্ঞে, সে কী কথা। তাকে নেমন্তন্ন করতে যাবো কেন? আপনি তো তাকে নেমন্তন্ন করতে বারণ করেছিলেন।

—তাহলে খবর পেলে কী করে যে আজকে আমার নাতির বিয়ে?

—তা জানি নে, তবে নতুন বউয়ের মুখ দেখবার জন্যে একখানা শাড়ি আর এক হাঁড়ি মিষ্টিও এনেছে। নতুন বউ-এর মুখ দেখতে চাইছে—

সমস্ত বাড়িময় তখন উৎসবের আবহাওয়া। লুচি ভাজার গন্ধে বাড়ি একেবারে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে থম-থম করছে। আত্মীয়-কুটুম্ব এসে গেছে দূর দূর থেকে। এমন সময় কি না কালীগঞ্জের বউকে আসতে হয়।

নরনারায়ণ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন—বংশী ঢালী কোথায়?

—ডেকে দেব?

—ডেকে দাও, আর দেখো যেন আমার ঘরের কাছে এখন কেউ না আসে, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে। যাও—

তা বংশী ঢালী এল। কর্তাবাবুর বাড়ির বিয়েতে সে পরনের কাপড়খানা রঙীন করে ছুপিয়েছে। মাথার চুলগুলো তেল চকচকে করে আঁচড়ে নিয়ে বাহার করেছে।

সামনে এসে দাঁড়াতেই কর্তাবাবু কৈলাশ গোমস্তার দিকে চেয়ে বললেন—কালীগঞ্জের বউ যা-কিছু এনেছে, সন্দেশ শাড়ি গয়না সব নেবে, খুব খাতির করে নেবে। বুঝলে?

—বউ দেখাবো?

—হ্যাঁ, আর দেখ, খাতিরের যেন কমতি না হয়। যেমন করে বাড়ির আত্মীয়কুটুম্বদের খাতির করা নিয়ম, কালীগঞ্জের বউকেও ঠিক তেমনি করে খাতির-যত্ন করবে। যেন কোথাও কোনও ত্রুটি না থাকে। বুঝলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে, তুমি এখন যাও, গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো, দেখবে যেন এদিকে কেউ না আসে—

কৈলাশ গোমস্তা চলে যেতেই কর্তাবাবু চাইলেন বংশী ঢালীর দিকে। বললেন—বংশী, আগে তুমি তো আমার ইজ্জত অনেকবার বাঁচিয়েছ। আর একবার বাঁচাতে পারবে?

—হ্যাঁ হুজুর, আপনি যখন যা বলবেন তাই করবো। বলুন, কার ঘাড় থেকে মাথা নিতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—তাহলে ঘরে ঢোকবার দরজাটা বন্ধ করে দাও তো, তোমাকে একটা কাজের ভার দেব—

বংশী ঢালী দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে হুড়কো লাগিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে নবাবগঞ্জের চৌধুরী বংশের আত্ম-... সব শান্তি যেন এক ফুৎকারে নিবে গিয়ে দিগ্বিদিক একেবারে অন্ধকার করে দিলে। কারণ নরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পৌত্র, ... হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র সদানন্দ চৌধুরী তখন উৎসব-অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে একেবারে দূরে সরে এসেছে। এক্ষুনি আগে ... নগরের একটা বাড়িতে একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের সম্প্রদান হয়েছে, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতরা ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত ... উদগার তুলতে তুলতে যে যার বাড়িতে চলে গেছে। বাসর-ঘরের চার-দেয়ালের মধ্যে ... নব-বধূর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছে। ভেবেছে এ কাকে সে বধূ ... নিয়ে চলেছে তার বাড়িতে। এ-ও ... সংসারের আর পাঁচজন মানুষের মত ... মানসিকতার এক অতি সাধারণ প্রতীক। এ-ও কি কলের পুতুলের মত সুতো টানলে হাত-পা-মাথা নাড়াবে, কল টিপলে খাবে, ঘুমোবে আর যান্ত্রিক নিয়মে কেবল সন্তানের জন্ম দিয়ে নবাবগঞ্জের লোকসংখ্যা বাড়িয়ে যাবে!

সেদিন কালরাত্রি। গ্রামের লোক সবাই ... দেখে দলে দলে যে-যার বাড়ির দিকে ... যাচ্ছে। সদানন্দ অন্ধকার বার-বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে যাচ্ছিল। জায়গাটা বড় নিরিবিলি নির্জন! হঠাৎ মনে হলো সামনের চণ্ডীমণ্ডপের পেছনে চোর-কুঠুরির ভেতর থেকে কে যেন হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে উঠলো—আঃ—

একটা মেয়েলি গলায় চাপা আর্তনাদ। কিন্তু আর্তনাদটা একবার গলা ছিঁড়ে বার হবার পরেই যেন আবার হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

সদানন্দ খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চোর-কুঠুরিটা থেকে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসতেই তার যেন কেমন সন্দেহ হলো। সদানন্দ চোর-কুঠুরির দিকে দৌড়ে যেতেই দেখলে সামনে অন্ধকারের মধ্যে থেকে কে একজন বেরিয়ে আসছে।

সদানন্দ চিনতে পারলে না লোকটাকে। বললে—কে? কে তুই? কে? কে কেঁদে উঠলো চোর-কুঠুরির ভেতরে?

(ক্রমশ)

ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে বরফের কুচি পরীক্ষা করছেন ডঃ চেং

ঝড়ের উৎস সন্ধানে

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ওড়িশার পারাদ্বীপ এবং জম্বুদ্বীপে প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড়ে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল বর্তমান শতাব্দীতে ভারতে ঐ ধরনের নজির দ্বিতীয় আর একটি আছে কী না সন্দেহ। সংবাদ, মাত্র ঐ দুটি অঞ্চলেই মোট মৃতের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। সম্পত্তি এবং ফসল নষ্ট হয়েছে কয়েক কোটি টাকার মত। অথচ দুর্ঘটনা ঘটার প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে খবর এসেছিল, বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঘূর্ণীঝড় দানা বাঁধছে। সেখানকার বাতাসের চাপ ভীষণভাবে কমে যাচ্ছে। ক্রমে ঘূর্ণীর গতি বাড়ছে এবং তা এগিয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব উপকূলের দিকে, ঘণ্টায় দেড়শ কিলোমিটার বেগে। দুর্ভাগ্য, কিছুটা সময় এবং তার চেয়েও বেশি উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে যতখানি সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেল। আধুনিকতম আবহাওয়াজ্ঞাপক দূত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে শমনের আগমন বার্তা যথাসময়ে পৌঁছল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। উল্লেখ্য, এ ধরনের পূর্বাভাস সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক নজিরের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগে সোভিয়েত দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ মলনিয়া আতলান্তিক মহাসাগরে অনুরূপ একটি ঘূর্ণীঝড়ের সন্ধান পায়। যার লক্ষ্যস্থল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকার আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিষয়ক সংস্থার মাধ্যমে ব্যাপারটা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে জানিয়ে দেন। পরে সময় মত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় সেবার কয়েক শ কোটি টাকার সম্পত্তি এবং কয়েক লক্ষ মানুষ অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পান। নজির আরও আছে। গত দশকে শুধু জাপান এবং চীনের দক্ষিণ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ঝড় সম্পর্কে ঐভাবে আগাম পূর্বাভাস পাওয়ায় কয়েকটি দেশ যথেষ্ট উপকৃত হন। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ঝড়ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস আরও আগে থেকে তাঁরা জানাতে পারবেন। কোথায় কখন কী ধরনের ঝড় উঠবে তার খবর পাওয়া যাবে দশ, এমন কি, বিশ বছর আগে। তখন সম্ভব হলে সম্ভাব্য ঝড়কে দ্বারা ধ্বংস করারও চেষ্টা করবেন।

অবশ্য আপাতত এটা জল্পনা। তার আগে, ঝড়ের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে যথাযথ তথ্যগুলি জেনে নেয়া দরকার। এবং মুশকিল এখানেই। বিশেষ করে মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, ঝড়ের সত্যিকারের উৎস ক্রমেই রহস্যাবৃত হয়ে চলেছে। ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানীদের আধুনিকতম মতবাদ, বাতাসে অনিয়ত বিদ্যুৎ শক্তির সমাবেশই ঘূর্ণীঝড় এবং শিলাবৃষ্টির অন্যতম কারণ।

ওঁদের বক্তব্য, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের উপর নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি। এই রশ্মিগুলির বড় রকমের একটি অংশ আসে সূর্য থেকে। অবশিষ্টদের উৎস সুদূর কোন কোন নক্ষত্র বা নক্ষত্র জগত। পৃথিবীর ঊর্ধাকাশে ভ্যান অ্যালেন বলয় থাকার দরুন তাদের প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে আমরা রক্ষা পাই। প্রাথমিক মহাকাশ রশ্মির কণিকাগুলি ঊর্ধ্বাকাশেই ভেঙে গিয়ে তৈরি করে গৌণ বা সেকেণ্ডারি মহাকাশ রশ্মি। বাতাসের মধ্য দিয়ে

এমনি করেই আবহাওয়া মণ্ডলে শিলার টুকরোর গায়ে সৃষ্টি হয় থরে থরে বরফের গাছ। তারা দ্রুত শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এবং অবশেষে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়

এগিয়ে আসার সময় এই রশ্মি অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতিকে আয়নিত কর[illegible] সূর্যে সাময়িকভাবে জোরাল তাপ পরমাণু কেন্দ্রিক বা থার্মো-আয়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটলে বায়ুমণ্ডলেও তার প্রভাব এসে পড়ে। তখন বায়ুমণ্ডলের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বৈদ্যুতিক আধানের মাত্রা বেড়ে যায়। আধানযুক্ত বায়ু কণারা প্রবল বেগে পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে কতটা, সেটা নির্ভর করছে সমধর্মী বিপরীত ধর্মী আধানের ওপর। বাতাসের মধ্যে তখন শুরু হয় প্রবল আলোড়ন। সে আলোড়নই শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে ঝড়ের উপকেন্দ্র। আয়নের মাত্রা বেড়ে গেলে বাতাসের তাপ বহন করার ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা ভবিষ্যতে কৃত্রিম উপায়ে আয়নের [illegible] পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে ঝড়ের উপকেন্দ্র ধ্বংস করা হয়ত অসম্ভব হবে না। [illegible] তার আগে ঐ বিদ্যুৎ আধান বাতাসে [illegible] বিশেষ করে বাতাসের মধ্যে ভাসমান জলকণা এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণার উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেটা জেনে [illegible] দরকার। জানা দরকার বাতাসের তাপমাত্রা জলীয় বাষ্প প্রভৃতি পরিবর্তনের রহস্য।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের [illegible] চিন্তা করুন। ১৮৪০ সালে উইলিয়াম আর্মস্ট্রং এবং মাইকেল ফ্যারাডে লক্ষ করেন স্টিম বয়লারের কোন ছিদ্রপথে প্রবল বেগে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বের হতে থাকে [illegible] বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হয়। ওঁরা দেখলেন বেরিয়ে আসা ঐ বাষ্প ঘনীভূত হ[illegible] বয়লারের গা থেকে জলবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। পরে তারা ঝরে পড়ছে [illegible] কিন্তু বিস্মিত হলেন আর্মস্ট্রং [illegible] ফ্যারাডে। নিষ্ক্রান্ত বাষ্প যে [illegible] জলবিন্দু তৈরি করেছে তাদের মধ্যে ঘর্ষণ জনিত বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্ট হয়েছে। [illegible] গুলি ক্রমে বয়লার থেকে যতই দূরে [illegible]

... বিদ্যুতের বিভবমাত্রা সেই হারে ... হচ্ছে। ১৮৪৩ সালে অভিনব ... ব্যাপারটির উপর ভিত্তি করে তৈরি করে ... অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ আধান ... যন্ত্র। যন্ত্রটি বাইশ ইঞ্চি লম্বা ... তৈরি করতে সম্ভব হয়। এর ... ঐ যন্ত্র কয়েক হাজার ভোল্টের মত ... প্রভেদ বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স স্থাপন করতে পারত। আমস্ট্রং-এর মতে, ওই সময় এত শক্তিশালী বিদ্যুৎ আধান সৃষ্টিকারী যন্ত্র পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। ইংরেজিতে এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ইলেকট্রো গ্যাস ডাইনামিক পাওয়ার জেনারেশন। অর্থাৎ সচল বিদ্যুৎ আধান সমন্বিত গ্যাস কণিকা থেকে শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা।

যাই হোক, এই আবিষ্কার আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট কৌতূহলী করে তুলল। ও'দের বক্তব্য, স্টিম বয়লারের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও তো সেটা ঘটা সম্ভব? ব্যাপারটাকে এইভাবে চিন্তা করুন। পৃথিবীর বুকে সূর্যের তাপ এসে পড়ছে। জল বাষ্পীভূত হচ্ছে। ভূস্তরের সন্নিহিত বাতাস তাপের প্রভাবে সম্প্রসারিত

হচ্ছে। ফলে তারও ঘনত্ব কমে যাচ্ছে। হালকা বাতাস এবং জলীয় বাষ্প অতঃপর ভেসে চলে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে। উপরের দিকে উঠতে উঠতে পরিবহন এবং বিকিরণের মধ্যে এক সময়ে তাদের ভেতরকার সঞ্চিত তাপের মাত্রা দারুণভাবে হ্রাস পায়। সঙ্গের জলীয় বাষ্প বিশেষ অবস্থায় জমাট বরফে পরিণত হতে পারে। অতঃপর ঐ জমাট বরফের কণা নিজস্ব-ভাবে নিচের দিকে নামতে শুরু করে। এর দরুন তারা ক্রমেই উষ্ণ থেকে উষ্ণতর বায়ুস্তরের মধ্যে এসে পড়ে। শুরু হয় বিগলন। বরফের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমতে থাকে। এবং এক সময়ে ওই জলবিন্দু মূল বরফ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অতএব আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মন্তব্য, ঐ বিচ্ছিন্ন জলবিন্দুর মধ্যেও তো স্থির বিদ্যুৎ আধান থাকা সম্ভব? এবং ঐ বিন্দুর মধ্যে যে ধরনের আধান থাকলে, মূল বরফটির মধ্যে থাকবে ঠিক তার বিপরীত আধান। অর্থাৎ জলে যদি নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আধান সঞ্চিত হয়, বরফের মধ্যে থাকবে তার বিপরীত আধান পজিটিভ বা ধনাত্মক? এইভাবে এক দিকে তৈরি হয় ঋণাত্মক আধানের স্তর, আর এক দিকে ধনাত্মক আধানের স্তর। মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় স্তরের তড়িৎ বিভব যখন দারুণভাবে বেড়ে যায় তখনই ঘটে বজ্র বিদ্যুৎ। উভয় স্তরের বাতাসের ধূলিকণার মাত্রা বেড়ে গেলেও আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে পারে। শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মোটরের জ্বালানি এবং কারখানার চোঙ থেকে লক্ষ লক্ষ টন ভাসমান কণিকা পৃথিবীর বায়ুস্তরকে আজ দূষিত করে চলেছে। ঝড় সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই ধূলিকণার প্রভাব কতটা, আজকের ভূপদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে সেটা সঠিকভাবে নিরূপণ করাও বড় রকমের এক সমস্যা।

নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ রোজার চেং সম্প্রতি কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হাত দিয়েছিলেন। এর জন্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজের গবেষণাগারেই তাঁকে কৃত্রিম আবহাওয়ামণ্ডল সৃষ্টি করতে হয়েছিল। ও'র বক্তব্য, প্রাকৃতিক আবহাওয়া মণ্ডলের মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরীক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

যেমন ধরুন, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে এক টুকরো বরফের ছবি তোলেন ডঃ চেং, বরফটির আকৃতি, ঝড়ের সময় যে শিলাবৃষ্টি হয়, ঠিক সেই শিলার মত। ছবি তোলার আগে গা থেকে জলবিন্দুগুলি মুছে নিয়ে সেটিকে তিনি পলিথিনের একটি মোড়কের মধ্যে পুরে নেন। তারপর

ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে খুদে বরফের টুকরোকে বিবর্ধিত করে দেখা হচ্ছে। টুকরোটি থেকে খুদে খুদে তড়িতাহিত কণা কীভাবে মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, লক্ষ করুন

ধীরে ধীরে মোড়কটিকে উষ্ণ করতে শুরু করেন। ঝড় বৃষ্টির সময় শিলা যেমন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে নিচে নামার সময় ক্রমে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে এবং ক্রমে তার চারপাশে বিন্দু বিন্দু জলকণা এবং তুষারের মত হাল্কা বরফের কুচি জমতে শুরু করে, ডঃ চেং দেখলেন, ওই একইভাবে পলিথিনের মোড়কের মধ্যেকার বরফের টুকরোটির গায়েও জলবিন্দু এবং তুষার কণা জমতে শুরু করেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন মাত্রা বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বিন্দুগুলির চেহারা দাঁড়িয়েছে খুদে খুদে গাছের মত। উষ্ণতা বাড়ার পর ক্রমে তারা পল্লবিত হয়ে উঠল। অবশেষে আয়তনও গেল বেড়ে। পরক্ষণেই কৃত্রিম ঐ শিলার গা থেকে অজস্র বরফ কণা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর এইভাবেই শিলাবৃষ্টির সময় বরফের গুঁড়ো উষ্ণ মেঘের স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তে ঐ মেঘের মধ্যে সঞ্চিত জলীয় বাষ্পকে জলবিন্দুতে পরিণত করে। যেখানে এটা ঘটে সেখানে দ্রুত নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আশপাশের বাতাস তখন দ্রুতবেগে সেখানে ছুটে আসে। শুরু হয় বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি অথবা হিম ঝঞ্ঝার সঙ্গে তুষারপাত। ডঃ চেন লক্ষ করেছেন, পলিথিন মোড়কের মধ্যে মূল বরফ টুকরো থেকে বিচ্ছিন্ন কণাগুলির মধ্যে ঋণাত্মক তড়িৎ আধান থাকে। টুকরোটির মধ্যে থাকে ধনাত্মক আধান। বায়ুমণ্ডলে এইভাবেই সৃষ্ট হয় ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক

[illegible] সমাবেশ। ওদের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভেদ প্রভেদও বেড়ে যায়। তারপর সংঘর্ষ বা বিস্ফোরণ ঘটলেই দেখা যায় বিদ্যুৎঝলক। অনেকটা বৈদ্যুতিক [illegible] মত। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ঐ ধরনের বিদ্যুৎ সমাবেশ জোরাল হওয়ার আগে যদি আগে থেকেই কৃত্রিম উপায়ে ধ্বংস করা যায়, তাহলে অনিবার্য ঝড়ের উৎপত্তি কেন্দ্রকে হয়ত নষ্ট করা অসম্ভব হবে না। এর জন্যে দুটি জিনিসের উপর লক্ষ রাখতে হবে। এক, ঠিক কোথায় আধানের মাত্রা বাড়ছে, সেই জায়গাটি। কৃত্রিম সাহায্যে এটা জানা যেতে পারে। দুই, দূরে রকেটের ডগায় বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ রেখে, রকেটটিকে অকুস্থলে পাঠিয়ে ঐ রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে তড়িৎ মোক্ষণের কাজটি সেরে ফেলা যাবে।

মোটর গাড়ির জ্বালানির নিক্ষিপ্ত অবশেষে যে সমস্ত কণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ডঃ চেং তাদের ওপরও পর্যবেক্ষণ চালান। তাঁর বক্তব্য, বড় বড় শহরে শুধু মোটর গাড়ির দরুনই প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একশ বিলিয়ন পোড়া গ্যাসের কণিকা

বাতাসের মধ্যে ইতস্তত ভেসে বেড়ায়। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার বাতাসে এই সূক্ষ্ম কণার সংখ্যা ১৫০০০০। এরা মাসের পর মাস, কখনও বা একাধিক বছর ধরে বাতাসেই ভাসমান অবস্থায় থেকে যায়। পরে কয়লা প্রভৃতি জীবাশ্ম-জ্বালানি পোড়ানর সময় যে আইওডিন নির্গত হয়, সেই আইওডিন ঊর্ধাকাশে গিয়ে ঐ সমস্ত কণিকার সঙ্গে মিলিত হয়। এবং অবশেষে সৃষ্টি করে খুদে খুদে বরফকণার সূতিকাগার। কিছু সময় পর বরফকণার পরিমাণ যখন বেড়ে যায় এবং জলস্পৃক্ত মেঘের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তখন শুরু হয় প্রচণ্ড তুষার ঝড়।

ঝড়ের উৎস আবিষ্কারের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ দিকটির উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং অজ্ঞাতসারে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্য এই ছবিটি তোলেন ডঃ চেং। বরফ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কণাত্মক বরফ-গুঁড়ো পরস্পর বিকর্ষিত হয়ে এইভাবেই বিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ছবিটির জন্যে ডঃ চেংকে প্রথম পুরস্কারে ভূষিত করা হয়

প্লুটো অদৃশ্য হতে চলেছে

পৃথিবীর ভর কত আমরা জানি। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ, যেমন বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতিরও মোটামুটি গড় ভর কত, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার হিসেব রাখেন। কিন্তু ফ্যাসাদ বেধেছে প্লুটোকে নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী সুদূরতম এই গ্রহটির ভর মাপতে গিয়ে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এক সময়ে বলা হয়েছিল প্লুটোর ভর পৃথিবীর ভরের সমান। কিন্তু সম্প্রতি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল-এ (৭৬ খণ্ড, পৃঃ ৪৮৮) প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে, প্লুটোর ভর পৃথিবীর ভরের ০·১১ ভাগ মাত্র। অবশ্য এই পরিমাণটিতে শতকরা কুড়ি ভাগ ভুলও হতে পারে। তুলনায় প্লুটোর নিকটতর প্রতিবেশি ইউরেনাসের ভর পৃথিবীর ভরের ১৪·৫ গুণ এবং নেপচুনের ভর ১৭·২ গুণ। অবশ্য তাদের গড় ঘনত্ব পৃথিবীর একের তিন অংশ মাত্র। কিন্তু প্লুটোর গড় ঘনত্ব পৃথিবীর অনুরূপ। বরং বলা চলে ভর এবং ঘনত্বের দিক থেকে এর মিল মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে আরও বেশি। সূর্য থেকে দূরত্ব ৩·৫ বিলিয়ান মাইল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, প্লুটো এক সময়ে নেপচুনের উপগ্রহ রূপে বিরাজ করত। অবশেষে কোন এক সময়ে নেপচুনের প্রত্যক্ষ আকর্ষণ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রহের মর্যাদা লাভ করে।
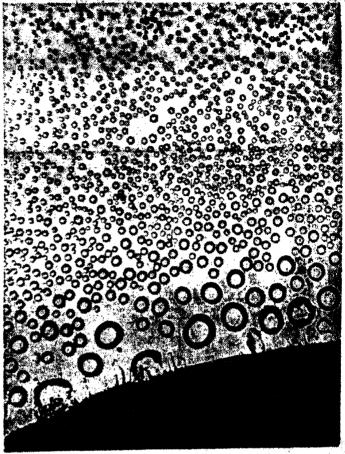
তবে তত্ত্ব যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, প্লুটোর ভর সব সময় সমান অবস্থায় থাকে না। বরং দিন যত যাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে সে তার নিজের ভর কমিয়ে নিচ্ছে। এবং যেভাবে কমাচ্ছে, তাতে মনে হয় আগামী ১৯৮০র দশকে এই গ্রহটি তার সমস্ত ভরটাই হারিয়ে ফেলে আমাদের গ্রহমণ্ডল থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান পত্রিকা

শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৯৭১। প্রধান সম্পাদক : শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। তিন টাকা।

সাধারণ শারদীয় পত্রিকার সঙ্গে শারদীয় বিজ্ঞান বিষয়ক এই পত্রিকাটির মৌলিক একটি পার্থক্য থাকায় বিলম্বিত হলেও, এ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কারণ, আলোচ্য এই পত্রিকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী এমন কিছু কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, শুধু রচনাশৈলীতে নয়, বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও অন্যান্য বারের তুলনায় তারা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। স্বভাবতই কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার রচনাগুলি ভাল লাগার কথা। এবং যেহেতু বিজ্ঞানকে কখনও শারদীয়ার সাময়িকীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা

হল না, পরবর্তীকালেও পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ঐ সমস্ত রচনার মূল্য হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। অর্থাৎ সোজা কথা, এই সংখ্যাটি যে কোন সময়ে সংগ্রহ করা চলে, পড়া চলে। এবারকার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে ছিল সুভাষচন্দ্র বসাক ও জগৎজীবন ঘোষের জিন-প্রযুক্তি বিদ্যা ও মানুষের ভবিষ্যৎ, বলাইচাঁদ কুণ্ডুর আফ্রিকার তৈল প্রদায়ী পাম গাছ, অমৃতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধ বিজ্ঞানে সনাক্তকরণ, প্রিয়দারঞ্জন রায়ের বৈজ্ঞানিক শিল্প প্রবর্তনে দূষিত পরিবেশ এবং তার প্রতিকার, ক্ষমা মুখোপাধ্যায়ের অলৌকিক সংখ্যা ও পাই, সূর্যেন্দুবিকাশ কর-এর জীবন-জিজ্ঞাসা, লীলা মজুমদারের তিনটি গাছ, জীবন সর্দারের হিম-কপোতের খোঁজে এবং জয়ন্ত বসুর ছাপা সার্কিট। তাৎপর্যপূর্ণ প্রচ্ছদ এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়। সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার জন্যে এমন একটি দুর্লভ সংস্করণ প্রকাশ করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ অনেকেরই ধন্যবাদ অর্জন করবেন আশা করি।

সমরজিৎ কর

॥ ৪১ ॥

পশ্চিম দিকটা অসম্ভব লাল হয়ে আছে। আজকের দিনে আকাশের এই চড়া রং না হলেই যেন ভাল হত। অক্ষয়ের কেবিনের বাইরে বারান্দায় একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চির ওপর পিঠ এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রামানন্দ হাই তুলতে তুলতে চিন্তা করল। এত ঘটা করে সূর্যাস্ত না হয়ে মেঘে মেঘে বিকেল হয়ে কোনোরকমে সন্ধ্যাটা নেমে আসলে ক্ষতি ছিল কি! কতদিনই তো এমন হয়।

সন্ধ্যার অবশ্য একটু দেরি আছে। এখন পাঁচটা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। এই মাত্র তরলার ঘড়িতে রামানন্দ দেখে এসেছে। তরলা একটু সকাল সকাল চলে এসেছে। তিনটে বাজতেই চলে এসেছে। অক্ষয়ের জন্য নিশ্চয় ডিউটির সময় বদলে গেছে। বেলা তিনটে থেকে রাত কটা অবধি থাকবে ও, কে জানে। সোহিনী সন্ধ্যা সাতটায় চলে যাচ্ছে। তরলাকে তখন বলছিল। রাত্রের জন্য আর একজন নার্স আসছে. দুজনের কথাবার্তা শুনে রামানন্দ বুঝতে পেরেছে। তা তো আসবেই, এমন সীরিয়াস কেস। তরলার পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল হতে পারে। এখনও অক্ষয়ের জ্ঞান ফেরেনি যে।

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে রামানন্দ বিদঘুটে লাল আকাশটা দেখতে লাগল।

কেবিনের ভিতরে যেতে আর যেন তার ইচ্ছে করছিল না। ক'বারই পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে এসেছে। দেখার পর ক্লান্ত বিষণ্ণ চেহারা করে বেরিয়ে এসে এই বেঞ্চিতেই বসেছে। দেখার আছেই বা কি।

এক দৃশ্য এক ছবি। কাগজের মতন সাদা ফ্যাকাশে হয়ে আছে অক্ষয়ের মুখটা পা ও হাতের তেলোয় কেমন যেন একটা কালচে তামাটে রং ধরেছে। পা দুটো খাটের রেলিঙের সঙ্গে বাঁধা। একটা টকটকে লাল কম্বল দিয়ে শরীরটা ঢেকে রাখা হয়েছে।

হ্যাঁ, যে কারণে বিকেলের পশ্চিম আকাশের এই চড়া লাল রং রামানন্দর চোখকে পীড়া দিচ্ছিল—অক্ষয়ের গায়ের লাল কম্বলটাই বার বার মনে পড়ছে।

নাকের ছিদ্র দিয়ে এত বড় একটা টিউব ঢুকিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে, বিশ্বাস কি, অচৈতন্য থাকতে থাকতে যদি দম ফুরিয়ে যায়! অক্সিজেন, তার সঙ্গে রক্ত, প্রচুর রক্ত এখন অক্ষয়ের শরীরে ঢোকান দরকার। বাঁ-পায়ের চামড়ায় সূঁচ বিঁধিয়ে সেই সঙ্গে একটা রবারের নল জুড়ে পায়ের কাছে ঝুলোন কাচের বয়ামটার সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছে। বয়াম থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতন টিপটিপ করে রক্ত ঝরছে, নল বেয়ে সেই রক্ত অক্ষয়ের নিস্তেজ স্তিমিত শরীরে এসে জমা হচ্ছে। চোখের সামনে হাতঘড়ি তুলে ধরে তরলা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ছোট্ট শরীর, মিষ্টি মুখ, কালো চক্ষু। ছবির মতন দেখাচ্ছিল তরলাকে।

হ্যাঁ, সেই তরলা, যার গলার স্বর অক্ষয়ের কানে পাখির ডাকের মতন ঠেকত। রামানন্দর মনে হল অক্ষয় এখন আর শুনতে পাবে না বলে তরলার মুখেও শব্দ নেই বোবা হয়ে গেছে। মুখখানাও বিষণ্ণ। কালো চোখ দুটো ঘড়ির ডায়ালের ওপর অপলক ধরে রেখে মিনিট গুণছে, মিনিটে ক'ফোঁটা রক্ত রামানন্দর শরীরে ঢুকছে তার হিসেব রাখছে? তাই হবে, আজ এটাই তরলার কাছে সবচেয়ে জরুরী, অক্ষয়ের পক্ষেও মূল্যবান। তরলার পাখির-ডাক গলা সে অনেক শুনেছে।

কেবিনের ভিতরটা ভীষণ রুক্ষ স্তব্ধ মনে হচ্ছিল। কোণার দিকে একটা টেবিলে কাগজপত্র নিয়ে সোহিনী ঘাড় গুঁজে কি যেন সব লিখছে। না, রামানন্দ যা ভেবেছিল, মেয়েটা খুব খারাপ না। অপারেশন থিয়েটার থেকে অক্ষয়কে এখানে আনার পর এইসব রক্ত-টক্ত স্যালাইন অক্সিজেন দেবার তোড়জোড় চলছিল, রামানন্দ পরে বুঝেছে, যে কারণে ঠিক তখনই তাকে কেবিনে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কই, আর তো সোহিনী তাকে বাধা দেয়নি। অক্ষয়ের চোখ আছে। সোহিনী মোহিনীই বটে। রামানন্দর ক'বারই মনে হয়েছে, কোণার দিকে টেবিলে একটা সূর্যমুখী ফুটে রয়েছে, আর অক্ষয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বর্ষার চোখ জুড়ানো নীল অপরাজিতা। একটা রূপে জ্বালা ধরায়, আর একটা জ্বালা জুড়োয়। এক সঙ্গে আজ দুজন তার কেবিনে। দুটি রূপ। অক্ষয় দেখতে পাচ্ছে না। লোহার খাটটার দিকে যতবার চোখ গেছে রামানন্দর, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠছে। 'মাস্টার,' নতুন খবর,

একটা দারুণ মজার সংবাদ নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

হয় [illegible]রেন্দ্রর কথা, নয়তো তরলার অথবা সোহিনীর। কথাটা বলেই ক্যা ক্যা করে হেসেছে। কত রাগারাগি করেছে রামানন্দ। আজ সেই মানুষ নীরব, চেতনাহীন। তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই, তরলার হাতের ঘড়ির টিকটিক শব্দ, টিপ টিপ রক্তের ফোঁটা, লম্বা লম্বা টিউব, স্যালাইন-ওয়াটার, অক্সিজেন-এর সঙ্গে অক্ষয়ের সত্তা মিশে গেছে।

'কখন সেন্স আসবে?' ফিসফিস করে রামানন্দ একবার প্রশ্ন করেছিল।

তরলা ঘাড় ফেরায়নি। ঘড়ির দিকে চোখ রেখে অল্প মাথা নেড়েছিল। 'মনে হয় না রাত বারোটার আগে, পাল্‌সের গতি যতক্ষণ না মন্থর হয়ে—' বলতে বলতে তরলা থেমে যায়, অক্ষয়ের ডান কব্জির শিরায় বেঁধানো সূচটা নড়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি ওদিকে ঝুঁকে তরলা সেটা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর কিছু প্রশ্ন না করে রামানন্দ আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে এই বেঞ্চিতে বসেছে। একটু

পরে আবার ভিতরে গেছে। আবার বেরিয়ে এসেছে।

এখন আর বেঞ্চি ছেড়ে তার উঠতে ইচ্ছে করছিল না। আকাশের টকটকে লালটা খানিকটা সাদা হয়ে হলুদ হলুদ রং ধরেছে, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য। দেখতে দেখতে হলুদটা কালচে হয়ে গেল। তার মানে অন্ধকার হচ্ছে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের দিক থেকে একটি শিশুর কান্নার চিৎকার ভেসে এল। সেদিকে ঘাড় ফেরাতে গিয়ে রামানন্দ নিরস্ত হল। তরলা কেবিন থেকে বেরিয়ে পা পা করে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'এখানে বসে আছেন?'

'হুঁ।' রামানন্দ পিঠ সোজা হয়ে বসল। অন্ধকার হয়ে আসা বাইরেটা দেখল তরলা। হাসপাতালের সব আলো এখন জ্বলে উঠবে।

'শুনুন', রামানন্দর দিকে তরলা ঘাড় ফেরাল, 'আপনি কি জানেন অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর আজ হাসপাতালে আসার কথা ছিল?'

'হুঁ, জানি বইকি।' খুব চমকে উঠল রামানন্দ, যদিও সেটা তখনি সামলে নিল, তরলার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকাল। 'বিকেলে তাঁর আসার কথা।'

'কই, এলেন না তো?'

'তাই তো দেখছি।' বোকা বোকা চোখ করে রামানন্দ বাইরের দিকে তাকাল। আশ্চর্য, মাধুরীর কথাটা এতটা সময়ের মধ্যে আর একবারও ভাবেনি সে। তখন বাইরে মাঠে বসে খুবই মনে হয়েছে। শর্মীকে নিয়ে আজ অক্ষয়ের স্ত্রী অক্ষয়কে দেখতে আসছে। কিন্তু কেবিনে এসে অক্ষয়ের এই অবস্থা দেখার পর কথাটা সে একেবারে ভুলে গেছে।

'উনি আপনাকে কিছু বলেননি?' তরলা আবার প্রশ্ন করল। 'আজ অক্ষয়বাবুর অপারেশন উনি জানেন নিশ্চয়?'

'হুঁ, জানেন বইকি, খুব জানেন, এত বড় কথাটা কি বন্ধুপত্নী মানে অক্ষয়ের ওয়াইফের কাছে আমি গোপন রাখব ভেবেছেন?' বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল রামানন্দ। 'আগে বলিনি, কিন্তু পরশু বলেছি, কাল রাতেও। দু'বার বলেছি, বিশেষ করে কাল অক্ষয় নিজে যখন আমায় বলে দিলে স্ত্রীকে তার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'আজ সকালেও শুনলাম থিয়েটারে যাবার আগে অক্ষয়বাবু মিস তালুকদারকে বলেছিলেন।'

'কি বলেছিল অক্ষয়?' রামানন্দ গলাটা উঁচু করে ধরল।

'তাঁর স্ত্রী বিকেলের দিকে এখানে আসবেন।'

'হুঁ, আমি তো খুব সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, অক্ষয়ের ওয়াইফ আমায় তখন বললে বিকেলে একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসবে।'

তরলা চুপ করে রইল। হাসপাতালের ভিতর ও বাইরের সব ক'টা আলো জ্বলে উঠেছে।

'আপনি কি মনে করেন ও'র মানে আমার বন্ধুর স্ত্রীর আসার জরুরী দরকার?'

'আপনি একটা ফোন করে দিতে পারেন?' 'মানে তাঁর স্ত্রী যাতে চলে আসে?'

কথা না বলে তরলা আস্তে থুতনিটা নাড়ল।

'কিন্তু অক্ষয়ের বাড়িতে টেলিফোন নেই, ওই তল্লাটে টেলিফোনের লাইনই যায়নি, লবণ হ্রদ, চারদিকে ধুধু বালি, বুঝতে পারছেন?' বেঞ্চি ছেড়ে রামানন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তরলা আর কিছুই বলছিল না।

'তা হলে কি আমিই এখন চলে যাব, গিয়ে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব, এখনো যখন এসে পৌঁছোল না?'

'দেখুন যা ভাল বোঝেন।' সংক্ষেপে কথাটা সেরে তরলা কেবিনের দরজার দিকে ঘুরে গেল।

'অক্ষয় এখন কেমন? নিশ্চয় সেন্স ফেরেনি?'

'না, একই রকম আছেন।' এদিকে আর তাকাল না তরলা, ভিতরে ঢুকে পড়ল। রামানন্দ আর ভিতরে গেল না। কপাল কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে তিন চার সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল তারপর লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিচে চলে এল। বউবাজারের মোড়ে পৌঁছে কপাল গুণে তখনই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। সেই ভাল, চিন্তা করল সে, বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলে দেরি হবে, ট্যাক্সি নিয়ে সে লবণ হ্রদের দিকে ছুটল। ক'টা টাকা বেরিয়ে যাবে সত্য, এত ভাবতে গেলে চলবে না। এখন ট্যাক্সি নিয়ে সে লবণ হ্রদের দিকে ছুটল। এখন ট্যাক্সি ভাড়াটা সেই দেবে—যদি মাধুরী হাসপাতালে আসে এই ট্যাক্সি নিয়েই আসতে হবে—তখন না হয় মাধুরীর কাছ থেকে ভাড়াটা চেয়ে নেওয়া হবে। এখন অক্ষয়ের বাড়ি পর্যন্ত যেতে ছ সাত টাকার কম নেবে না বেটা। হালুইকরের দোকানে একটা টাকা খরচ হয়েছে কাজেই রামানন্দ মনে মনে হিসাব করে দেখল—বারো টাকার মতন তার থেকে যাচ্ছে। না, কলমের কুড়ি টাকা বাদ দিয়ে আগের কিছু খুচরো ছিল। সুতরাং সব মিলিয়ে যা থাকছে যথেষ্ট, মদ খাওয়া তার আটকাবে না। আজ খেতে পারবে, কাল খেতে পারবে, পরশুও খেতে পারবে। পরশুর পরে কি হবে সে ভাবতে চায় না। হালুইকরের দোকান থেকে বেরিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছিল, নিশ্চিন্ত হয়ে সে সিগারেট ধরাল। যদি মাধুরী আসে তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে একটু চা খেতে যাচ্ছি বলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে রামানন্দ সোজা মদের দোকানে চলে যাবে। যা হোক একটু গলায় ঢেলে আবার হাসপাতালে ফিরে গেলেই চলবে। হুঁ, সময় থাকবে, ট্যাক্সি করেই তো যাচ্ছে, যেতে চল্লিশ পাঁতাল্লিশ মিনিট— আবার লবণ হ্রদ থেকে মেডিকেল কলেজে ফিরতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট। স্পীডে নিয়ে গেলে আরও কম লাগবে। এখন সওয়া ছ'টা। কাজেই পৌনে সাতটা আটটার মধ্যেই হাসপাতাল থেকে আবার সে বেরিয়ে আসতে পারবে খুব। মোটের ওপর গলা না ভিজিয়ে সে থাকতে পারবে না, যে যতই বলুক। কিন্তু অবাক লাগছিল তার

অক্ষয়ের স্ত্রীর কথা ভেবে। কেমন আছেন! স্বামী হাসপাতালে মরছে, তিনি আসবেন না, কেন? না, হাসপাতাল আমার যেন্না করে ভয় করে।

রামানন্দ জোরে জোরে সিগারেটটা টেনে শেষ করে গাড়ির জানালার বাইরে ছুঁড়ে দিল। রেল-ব্রীজের পর থেকে বেশ স্পীড নিয়ে ছুটেছিল ট্যাক্সি। মনে মনে ড্রাইভারের ওপর সে খুশি হল।

হুঁ, রামানন্দ আবার চিন্তা করল, যদি শফী আজ অক্ষয়ের বাড়ি না গিয়ে থাকে? সেটাও একটা কথা হতে পারে। কেননা শফীকে নিয়ে অক্ষয়ের স্ত্রীর হাসপাতালে আসার কথা ছিল। শফী না গেলে একলা তার হাসপাতালে আসা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু তা মনে হয় না। কাল যখন যায়নি, আজ ছোঁড়া দিদির কাছে যাবেই। তবে কিনা ইয়াকুব যেমন চটে গেছে, চটবারই কথা, ইয়াকুবের আবার 'আর্ট' করছে ছোঁড়া, ছবি আঁকছে পুতুল গড়ছে, কারবারীর সন্তান কারবারের দিকে মন নেই। শুনে রামানন্দরই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে, রামানন্দর যদি রাগ হত তো খেয়ালটার হাড়গোড় অনেকদিন আগেই চুরমার করে দিত। কাজেই বুড়ো যে ছেলেকে পরে আরও মারধর করেনি গালি-গালাজ করেনি নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। যদি রাগ করে, অভিমান করে ছেলে বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়তো বেলেঘাটা আর গেলই না।

রামানন্দ আর একটা সিগারেট ধরাল। ঐ তার দোষ। সিগারেটের যে খুব একটা ভক্ত সে তাও নয়। কিন্তু পকেটে যতক্ষণ আছে টেনে যাবেই।

তাই তো, রামানন্দ এবার ভাবল, মনতাজকে নিয়ে মাধুরী চলে আসতে পারত। কিন্তু মনতাজ যদি আজ বেলেঘাটা না গিয়ে থাকে? মেটিয়াবুরুজের ছেলে মেটিয়াবুরুজ ফিরে যেতে পারে।

মাধুরীর হাসপাতালে না আসা নিয়ে নিজে নিজে কয়েকটা প্রশ্নই করল রামানন্দ। কিন্তু একটারও সদুত্তর না পেয়ে মুখটা গম্ভীর করে সিগারেট টানতে লাগল।

'আর যাবে না গাড়ি।'

'না, আর যাবে না।' ট্যাক্সিওয়ালার কথায় সায় দিল রামানন্দ। 'এর পরে শুধু বালি—বালির ওপর দিয়ে গাড়ি চলবে না, চাকা বসে যাবে।' ভাড়া মিটিয়ে দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে লোকটা চলে গেল। রামানন্দ হাঁটতে আরম্ভ করল। ফাঁকায় এসে হাওয়া চমৎকার লাগল।

কালকের সেই হলুদপোড়া চাঁদটা আজ আবার উঁকি দিয়েছে। আজ আরও চমৎকার চেহারা ধরেছে। যেন কোথা থেকে মুখে এক পোঁচ কালি লাগিয়ে এসেছে। নিশ্চয় কারো হাঁড়িতে মুখ ঢোকাতে গিয়েছিল বেটা! কথাটা চিন্তা করে রামানন্দ নিজের মনে একটু হাসল। বালুর রাস্তাটা শেষ করতে বেশি সময় লাগল না তার, বড় বড় পা ফেলে হাঁটছিল। কিন্তু অক্ষয়ের বাড়ির সীমানায় পৌঁছে সে থমকে দাঁড়াল। মনসা গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে এক থোকা জোনাকি নাচানাচি করছে। অক্ষয়ের ঘরদোর বড্ড বেশি চুপচাপ। কেমন যেন একটা ঝিমোনির ভাব।

তা চুপচাপ তো থাকবেই। অক্ষয়ের কি গন্ডা দেড়েক আন্ডাবাচ্চা আছে যে চেঁচামেচি করবে, রামানন্দ সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করল; মাধুরীর শ্বশুর শাশুড়ি দেওর কি ঝগড়াটে একটি ননদ থাকলেও কথা ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা হাঁকডাক কথাবার্তা চেঁচামেচির ঠেলায় কানে তালা লাগত।

একেবারে খঞ্জ হাত-পা নিয়ে মাধুরীর সংসার। তাও আবার কর্তাটি হাসপাতালে।

লক্ষণ দেখে রামানন্দর মনে হল না শক্ত সমর্থ কেউ বাড়ি আছে। কাজেই একা একা সন্ধ্যাবাতি লাগতেই অক্ষয়ের স্ত্রী যদি ঘুমোতে থাকে বলার কিছু নেই। ঈশ্বর জানে মেয়েটার কপালে কি আছে! অর্থাৎ অক্ষয়ের কথা চিন্তা করে রামানন্দ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

হুঁ, এই পর্যন্ত রামানন্দর চিন্তা ভাবনাটা সুন্দর ছিল। স্বাভাবিক ছিল। মনে কোনোরকম গোলমাল ঘোর প্যাঁচ ছিল না। হঠাৎ যে তার মাথায় কেন দুর্বুদ্ধি এল!

অন্যদিন মনসা গাছটার কাছে থাকতেই সে হাঁকডাক আরম্ভ করে বা কেশে গলা খাঁকারি দিয়ে জানান দেয় যে সে বাড়ি এসেছে। আজ সেসব কিছুই করল না।

মাধুরীর শোবার ঘরে আলো জ্বলছে অথচ দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ। এই দেখে কি চোরের মতন পা টিপে টিপে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে উঁকি দিতে গিয়েছিল! তা কতদিনই তো মাধুরীর ঘরে এভাবে আলো জ্বলে, ভিতর থেকে দোরও বন্ধ থাকে। সেটা কথা না।

আসলে চিরকালের যেটা সত্য—সেই বহু-কথিত বহু-পঠিত উক্তি রামানন্দ ভুলে গিয়েছিল। স্ত্রী জাতিকে উঁকি দিয়ে দেখতে নেই। উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে পুরুষ বার বার ঠকেছে, হোঁচট খেয়েছে। মেয়েদের দেখে তোমরা পুরুষ কেবল মুগ্ধ হবে পুলকিত হবে। কৌতূহলের চোখ নিয়ে আড়াল থেকে তাদের একটি দিকেও তাকাতে গিয়েছ কি মরেছ।

রামানন্দর অবস্থা তাই হল। বন্ধ জানালার কাছে বেড়ার একটা ফুটোর গায়ে বাঁ-চোখটা চেপে ধরে সে শিউরে উঠল। একটা বেশ বড় আলো জ্বলছে ভিতরে। হ্যাজাক লণ্ঠন। রামানন্দ চিনল। এই জিনিস অক্ষয়ের ঘরে ছিল না। বোঝা গেল বাইরে থেকে আমদানী। তাই তো, দিনের আলোর মতন ঝকঝকে আলো না হলে এখন চলত কি করে। ইলেকট্রিক আলো নেই, অক্ষয়ের টিমটিমে হ্যারিকেনে সব কিছু এত উজ্জ্বল প্রখর হয়ে ফুটে উঠত না যে। সুতো-গাছটিও নেই মাধুরীর অঙ্গে। একেবারে বিবসনা। উঁহু, করালবদনা কালী নয়। তা হলে পিঠময় চুল ছড়িয়ে দিত, লাল টুকটুক জিভ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরত। বা নওলকিশোর অ্যাডোনিসের সামনে এক-গলা কামনা বাসনা নিয়ে গনগনে কয়লার মতন লাল উত্তপ্ত হয়ে দেবী ভিনাসের জ্বলতে থাকার সেই ভয়ংকর মূর্তিও এ নয়—এমন কিছু দেখলেও যেন রামানন্দ শান্তি পেত, নিজেকে সান্ত্বনা দিত। এ যে মোহিনী সেজে হয়ে অক্ষয় গিন্নী দাঁড়িয়ে আছে গো! মুখে পলাশ রাঙা হাসি। বোঝা গেল বিকেলে পান খেয়ে খুব করে ঠোঁট রাঙিয়েছিল। টান করে খোঁপা বাঁধা। এভাবে খোঁপা না বাঁধলে ঘাড় গলার সব ক'টা রেখা নিখুঁত হয়ে তুলির আগায় ধরা পড়বে কেন। সামনে এত বড় ইজেল দাঁড় করিয়ে রাজাবাজারের শেয়ালটা ঘাড় গুঁজে পাগলের মতন উলঙ্গ মাধুরীকে এঁকে চলেছে।

রাগ করল না রামানন্দ। রাগ করত সে কার ওপর! একজনের শিল্প-ভাবনার ওপর আর একজনের হাত নেই। আমার ছবি কল্পনা আমার রূপতৃষ্ণা আমার কান্না আমার গান আর কেউ বুঝবে না, বোঝা উচিত নয়—এই জিনিস একান্ত করেই আবার পাইকপাড়ার সভায় গলা বড় করে রামানন্দ বলে এসেছিল না?

বেড়াটা ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে সে উঠোনের মাঝখানে চলে এল।

তার দুঃখ হচ্ছিল জগত মণ্ডলের জন্য নন্দদুলালের জন্য। অক্ষয়ের রূপসী স্ত্রীকে নিয়ে গল্প লিখতে ছবি আঁকতে চেয়েছিল তারা, আর এই নিয়ে সে সেদিন মেলার মাঠে কত রূঢ় কথাই না দুজনকে শোনাল, নন্দর সঙ্গে তো রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেল।

উঁহু, হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল না রামানন্দ। আস্তে আস্তে মনসা গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল। তার মনে হচ্ছিল তার বুকের ভিতরটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। অনেক কিছু হারিয়ে অনেক কিছু ছেড়েছুড়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে একটা মূল্যবান পুঁজি বুকে নিয়ে প্রকাণ্ড আকাশের নিচে বিস্তৃত বালুর মাঠের এক প্রান্তে মাদারঝোপে ঘেরা ছোট্ট এই টালির বাড়িটায় বড় প্রসন্ন মনে দিন কাটাচ্ছিল সে। ইয়াকুবের ছেলে দু হাতে তার পুঁজিটুকু কেড়ে নিল।

'আমরা এসে গেছি স্যার।'

রামানন্দ চমকে উঠল। তাই তো, কালকের সেই ছেলে দুটি না? 'কি খবর!' গলার স্বরটা সে হালকা করতে চেটা করল।

'বলেছিলাম আজ আবার আসব।' দুজন এক সঙ্গে রামানন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমরা কথা রেখেছি।'

'চমৎকার, চমৎকার—এদিনে ক'টা মানুষ কথা দিয়ে কথা রাখে!' রামানন্দ হাসল, হাসতে পারল। 'তারপর?'

'আজ আবার আপনার জন্য উপহার এনেছি।' দুজনের কাঁধে দুটো থলে ঝুলছিল। দেখে খুশি হয়ে রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ বেশ, বোতল এনেছ? আসল জিনিস?'

'নিশ্চয়। তাই তো আনতে গিয়েছিলাম স্যার।'

'বাড়ির রান্না করা ভাল খাবার?'

'তা-ও এনেছি।'

'গুড। চলো আমরা একটু এগিয়ে যাই। ওই যে চাঁদের আলোয় খালের জল চিকচিক করছে।' রামানন্দ আঙুল তুলে দেখাল। 'ওখানে গাছতলায় ঘাসের ওপর আসর জমবে ভাল।'

'কেন আপনার ঘরে বসা যায় না! চমৎকার ঘর—কালকের মতো মাটিতে মাদুর বিছিয়ে তিনজন গোল হয়ে বসব!' এক নম্বর ছেলেটি বলল।

'উঁহু', ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনটা একবার দেখে রামানন্দ বড় করে নিশ্বাস ফেলল। 'ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই, এখন ঘরে গিয়ে বসলেই দেরি হয়ে যাবে।'

'আপনি কি কোথাও বেরোচ্ছেন স্যার?' অবাক হওয়ার মতন গলার সুর করল দু নম্বর ছেলেটি। থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল।

দেখাদেখি এক নম্বরও কাঁধের থলে হাতে নিল। 'তাই মনে হচ্ছে। আপনার যেন কোথাও যাবার তাড়া আছে স্যার?'

'হুঁ।' চোখ তুলে রামানন্দ আকাশ দেখল। কালকের মতনই কালচে হলদে রং কাটিয়ে চাঁদটা রুপো রুপো চেহারা ধরছে। একটু দেরি হচ্ছিল যদিও। 'তাড়া আছে', রামানন্দ চোখ নামিয়ে

দুজনের মুখের দিকে তাকাল। 'আমাকে মেডিকেল কলেজে যেতে হবে, আমার বন্ধুটির আজ অপারেশন হয়েছে।'

'হাইড্রোসিল?' এক নম্বর প্রশ্ন করল।

'অ্যাপেণ্ডিসাইটিস!' দু নম্বর বিড়বিড় করে উঠল।

রামানন্দ মাথা নাড়ল।

'গ্যাস্ট্রীক আলস্যার—পেট অপারেশন হয়েছে।'

'তাই বলুন।' ছেলে দুটি হালকা নিশ্বাস ফেলল, হালকা গলায় হাসল। 'অর্ডিনারী কেস, গ্যাসট্রিক আলসার, রাতদিনই এই ব্যারাম হচ্ছে লোকের, অপারেশনও হচ্ছে খুব—এর জন্য আপনি ঘাবড়াচ্ছেন!'

'এখনো সেন্স ফেরেনি।' গম্ভীর গলায় রামানন্দ বলল।

'ফেরেনি, ফিরতে কতক্ষণ।' এক নম্বর চোখ আড় করে দু নম্বরের দিকে তাকাল। দু নম্বর রামানন্দর মুখের ওপর চোখ রাখল। 'বরং আপনি একটু খেয়েদেয়ে নিন, দেখে মনে হচ্ছে ভারি টায়ার্ড আপনি, বন্ধুর জন্যে খুব ছুটোছুটি করতে হচ্ছে বুঝি?'

'খুব।' রামানন্দ এক সেকেণ্ড কিছু চিন্তা করল। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'তাই ভাল, বোতলটা বের কর, একটু গলায় ঢেলে নি—হুঁ, বেজায় ছুটোছুটি করতে হচ্ছে অক্ষয়ের ব্যাপারে, আর এই দুশ্চিন্তা, আমি আর পারছি না।'

'আপনি একদম চিন্তা করবেন না স্যার।' এক নম্বর তার থলে থেকে বোতল বের করে রামানন্দর হাতে তুলে দিল। 'এ সব অপারেশন কেস্ কিছু না—'

দু নম্বর তার থলে থেকে এত বড় টিফিন ক্যারিয়ার বের করল। 'আপনার জন্য বাড়ি থেকে রান্না করিয়ে এনেছি, মুর্গির মাংস, ব্রেস্ট কাটলেট, ফিশ ফ্রাই।'

'ও-সব এখন থাক।' হুইস্কির বোতলটা জ্যোৎস্নার মধ্যে তুলে ধরে রামানন্দ দেখছিল। বোতলের মুখের রাংতা চিকচিক করছে। 'প্যাঁচটা ঘরে রেখে এসেছি, এটা এখন খুলি কি করে, মুখটা?'

'আপনি বরং এক কাজ করুন স্যার—ঘরে গিয়ে যখন বসতে চাইছেন না, আমাদের গাড়িতে চলে আসুন—প্যাঁচ গ্লাস সোডা সবই সেখানে পাবেন। গাড়িতে বসে একটু খেয়ে নেবেন।'

'সে কি! তোমরা গাড়ি নিয়ে এসেছ!' রামানন্দ খুশি হল। 'তবে তো কথাই নেই, তোমাদের গাড়িতেই বসে আমি হাসপাতালে চলে যেতে পারব।'

'হুঁ, তা যাবেন।' দু নম্বর ঘাড় কাত করল। 'কিন্তু আমরা ভেবেছি কি, তার আগে আপনাকে ওখান থেকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। খুব একটা সময় লাগবে না।'

'কোথায়!' রামানন্দ অবাক হবার চেহারা করল। 'কোথায় ঘুরতে শুনি?' ধমকের মতন শোনাল তার গলা।

'আপনি ভুলে গেছেন স্যার।' দু নম্বর চাপা গলায় হাসল। 'এখানে ট্যাক্সিফ্যাক্সি হুটহাট পাওয়া যায় না, যে জন্য বাবার ল্যাণ্ডমাস্টারটা চেয়ে নিয়ে এলাম—আপনাকে নিয়ে একজনের কাছে যাব, তার সেরকমই কথা ছিল যে।'

'মাই গড্।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। এখন বুঝল। 'হুঁ, হুঁ, মনে আছে।' অল্প হাসল সে। 'কিন্তু কিন্তু—' সঙ্গে সঙ্গে সে গম্ভীর হয়ে গেল। 'অক্ষয়কে এই অবস্থায় ফেলে এসেছি—হাসপাতালে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না—শহরের বাইরে তো আর আমরা যাব না, যার কাছে যাচ্ছি কলকাতার ভেতরেই সুন্দর একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছে।'

'কতক্ষণের ব্যাপার!' এক নম্বর বলল, 'ওখান থেকে বেরিয়ে এই গাড়ি করে আমরা আপনাকে মেডিকেল কলেজে পৌঁছে দেব।'

'তা ছাড়া বললাম তো, খুব একটা ভাববার কিছু নেই, রাতদিন হচ্ছে এ সব অপারেশন।' দু নম্বর তার হাতের থলে আবার কাঁধে তুলে নিল। 'বরং যেমন একটা স্ট্রেন যাচ্ছে আপনার শরীরের ওপর, মনের ওপর—একটু রিলাকসেশনের দরকার—একটু হুইস্কি খেতে খেতে ওখানে চলে যাওয়া যাবে—দরকার হলে ওখানে বসে আর একটু খাবেন, সব ব্যবস্থাই আছে তার কাছে—ফাইন লেডি—হুঁ, আমি লেডিই বলব, যেমন চমৎকার আলাপ-ব্যবহার—ব্যস্, একটু বিশ্রাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে ফিরে এলেই চলবে।'

'ক'টা বাজে এখন তোমার ঘড়িতে?' রামানন্দ এক নম্বর ছেলেটির দিকে তাকাল, তার হাত ঘড়ির কাঁটা জোনাকীর মতন জ্বলছে।

'সাতটা চল্লিশ।' ছেলেটি ঘড়ি দেখল।

'কিছুই রাত হয়নি,' দু নম্বর সামান্য কাশল। 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা ফিরে আসতে পারব—রাস্তায় আপনাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না।'

'হুঁ,' এক নম্বর মাথা ঝাঁকাল। 'এসে দেখবেন আপনার বন্ধুর সেন্স ঠিক ফিরে এসেছে।'

'কোথায়, গাড়ি কোথায় তোমাদের?' রামানন্দ এদিক-ওদিক তাকায়।

'ওই তো।' এক নম্বর আঙুল দিয়ে দেখাল। 'একেবারে বালুর কাছে আমরা গাড়িটা নিয়ে এসেছি।'

রামানন্দ দেখল ফণিমনসার একটা ঝোপের কাছে বিরাট ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। এটা খুব ভাল করেছ—ট্যাক্সি নিয়ে বেটারা এতটা রাস্তা আসে না।'

'আমরা এসেছি স্যার, আসতে পেরেছি। চলুন আর দেরি না।'

কথা না বলে রামানন্দ দুজনের সঙ্গে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

'তোমরা বলছ অক্ষয়ের সেন্স শীগগির ফিরে আসবে?'

'নিশ্চয়ই। আসতেই হবে, গ্যাসট্রিক কেস, পেট অপারেশন হয়েছে—এই নিয়ে আজকাল কেউ একটা মাথাই ঘামায় না।' এক নম্বর পিছনের দরজা খুলে দিল। রামানন্দ দু নম্বর ছেলেটিকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। এক নম্বর সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে স্টীয়ারিং-এ বসল।

'এই যে স্যার দুটু গেলাস।' দু নম্বর এক সঙ্গে দুটো জিনিস রামানন্দর হাতে তুলে দিল।

'সত্যি, তোমাদের মতন ভক্ত আমি আর পাই নি।' ছিপিটা খুলে ফেলে রামানন্দ আর গেলাসে ঢালল না। মুখের কাছে বোতল তুলে ধরে গলায় ঢালল।

'সোডা আছে স্যার।'

'দরকার নেই।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল।

'কাল সোডা ছাড়াই খেয়েছেন—আজও স্যার র খাবেন।' এক নম্বর একটু একটু করে গাড়ির স্পীড বাড়াতে লাগল।

'সিগারেট দাও।'

এক নম্বর বাঁ হাতে একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলে এদিকে চালান দিল।

'তোমরা একটু খাবে না?' বোতলটা কানের কাছে কেমন কায়দা করে যেন দাঁড় করিয়ে রেখে রামানন্দ সিগারেট ধরাল।

'আমরা আসবার সময় একটু খেয়েছি স্যার—এই বোতলটা আপনি একলা খান—আপনার এখানে আসতে আসতে গাড়িতে বসে একটা পাঁইট দুজনে শেষ করেছি।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি। গোড়াতেই তোমাদের মুখে গন্ধ পেয়েছি।' রামানন্দ গলার নিচে হাসল। 'তা না হলে আর গাড়িতে বোতল গেলাস ছিপি-খোলার যন্ত্রপাতি রাখার আড়ম্বর।'

'আপনার জন্য ভাল প্যাস্ট্রি এনেছিলাম—একটা কামড় দিয়ে দেখবেন স্যার।'

'ধোৎ, এখন পানীয় ছাড়া কিছুই চলবে না।' সিগারেট ফেলে দিয়ে রামানন্দ আবার মুখের কাছে বোতল তুলে ধরল।

'হুঁ, খাবার-দাবার যা সেখানে গিয়েই হবে।' সামনে লাল বাতি দেখে এক নম্বর গাড়িটা দাঁড় করাল।

'আর সিগারেট দেব স্যার।' দু নম্বর আস্তে বলল। বোতলটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে রামানন্দ চেহারাটা বিকৃত করে জোরে মাথা ঝাঁকাল।

'এইবেলা একটু সোডার জল মিশিয়ে খেলে পারতেন।'

'চুপ কর, দেখছ সোডা ছাড়াই আমি দিব্যি খেয়ে যাচ্ছি—এখন কথা বলো না।'

দুজন কথা বলল না। গাড়ি ফুল স্পীড নিয়ে ছুটছিল।

'এটা কোন্ রাস্তা।' রামানন্দর জিভ একটু জড়িয়ে এল।

'লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে আমরা থিয়েটার রোডে ঢুকলাম।'

'আমরা সাউথে যাচ্ছি, তাই না?' রামানন্দ জানালার বাইরে চোখ রাখল।

'সাউথে যাচ্ছি স্যার।' এক নম্বর উত্তর করল। এবং মনে মনে হাসল। কেননা এতক্ষণ পর কবি রামানন্দ সেনের খেয়াল হয়েছে তিনি সাউথে যাচ্ছেন।

'হুঁ, এখন তো সাউথেই বেশির ভাগ বনেদী মানুষ থাকে। কি বলো।' রামানন্দ গলার স্বর বাড়িয়ে দিল।

'তা ছাড়া আর কি।' দু নম্বর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, 'যার কাছে যাচ্ছি সে-ও বনেদী ঘরের মেয়ে—যা বউ, অন্তত এককালে ছিল।'

'দাও, সিগারেট দাও।' সিগারেটের জন্য রামানন্দ হাত বাড়াল কিন্তু তখনি আবার বোতলটা মুখের কাছে তুলে ধরল। 'দাঁড়াও, এটুকু ঢেলে শেষ করে দি।'

'এখন আর না।' খালি বোতলটা পায়ের কাছে ফেলে রেখে রামানন্দ সিগারেটের জন্য হাত বাড়াল। 'ওখানে পৌঁছোবার আগেই দেখছি আমার নেশা লেগে যাচ্ছে।'

'তাই তো লাগবে স্যার, নেশার চোখ নিয়ে আমরা তার কাছে যাচ্ছি।' দু নম্বর গলা ছাড়িয়ে হেসে রামানন্দর হাতে সিগারেট তুলে দিল।

'আর একটা বোতল আছে স্যার।'

'ঠিক হল না হে রণেন।' সামনের সীট থেকে এক নম্বর বলল, 'বরং বলো চোখে রং নিয়ে আমরা একটি রঙিন মানুষের কাছে যাচ্ছি।'

'হুঁ, এটা বলেছ ভাল।' পিঠ এলিয়ে দিয়ে রামানন্দ আধ-বোজা চোখে সিগারেট ধরাল। 'আহা, রঙিন মানুষ—মনে হয় খুবই এক সুন্দরীর কাছে আজ আমরা যাচ্ছি।'

'বা-রে, সুন্দরের সাধক আপনি, কবি রামানন্দ সেনকে কি আমরা পেঁচি-খেঁদি মানে কেলেকুচ্ছিত কারো কাছে নিয়ে যাব। বলেছি তো, ও-সব হাড়কাটা-ফাড়কাটার জিনিস না।'

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আধ-বোজা চোখেই রামানন্দ হাসল।

'তোমরা যেমন বলছ, মনে হয় আমার ফ্রেন্ড অক্ষয়ের বউ-এর চেয়েও সুন্দরী কোনো মানুষের কাছে আমাকে নিয়ে চলেছ।'

'তাই তো, স্যার।' দু নম্বর পিঠ টান করে বসল। 'আপনার ফ্রেন্ডের ওয়াইফের চেয়ে সে অনেক বেশি সুন্দরী।'

'চুপ কর।' টকটকে লাল চোখ নিয়ে

রামানন্দ দু নম্বরের দিকে তাকাল, ধমক লাগাল। 'তোমরা কি অক্ষয়ের বউকে কাল দেখেছিলে?'

'কেন বাজে বকছিস স্বপেন।' ওদিক থেকে এক নম্বর নরম গলায় বলল, 'না স্যার, আপনার ফ্রেন্ডের গিন্নীকে কাল আমরা দেখিনি, দেখার কোনো স্কোপ ছিল না, তিনি রান্নাঘরে মুর্গির মাংস পাক করছিলেন—তবে তাঁর গলার আওয়াজ শুনেছি, খুব মিষ্টি গলা।'
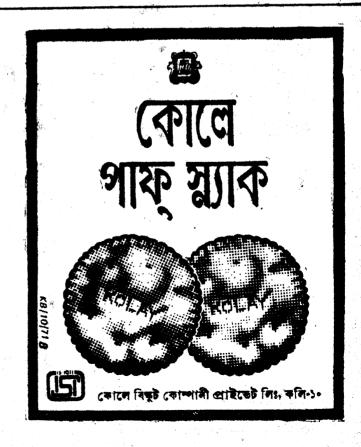
'হুঁ, তাই বলো।' যেন রামানন্দ তুষ্ট হল। দাঁত বের করে হাসল। 'মিষ্টি গলা—যাকে বলে মধুক্ষরা গলা মাধুরীর।'

গাড়িটা একটা বড় বাঁক ঘুরল।

'কিন্তু মনে হয় অক্ষয়ের সেন্স আর ফিরবে না।' রামানন্দ তখনি আবার গম্ভীর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'ওকথা বলবেন না স্যার।' এবার যথেষ্ট বিনয় নিয়ে দু নম্বর বলল, 'আকছার এখন পেট অপারেশন হচ্ছে—'

'হুঁ।' ওপাশ থেকে এক নম্বর বলল, 'আপনি হসপিটালে ফিরে গিয়ে দেখবেন অক্ষয়বাবু চোখ মেলে তাকিয়েছেন।'

'না না না।' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে

...নন্দ মাথা নাড়ল। 'তখন নার্সের কথায় ঝলাম অক্ষয়ের অবস্থা মোটেই সুবিধের ।। সন্ধ্যা ছটায়ও পালসের স্বাভাবিক তি ফিরে আসেনি।'

গাড়ির ভিতরটা একটু সময়ের জন্য থমে হয়ে রইল। বাইরে রাস্তায় আলোর ছোড়াছড়ি, শব্দের ছড়াছড়ি। ট্র্যাফিক জ্যাম্। গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল।

'আমার মনে হয় অক্ষয় বাঁচবে না, তোমরা যত কথাই বলো,—ঠিক মরবে।'

'যদি তাই বলেন স্যার', এক নম্বর ঘাড় ঘুরিয়ে 'এদিকে তাকাল, 'জীবন যেমন সুন্দর তেমনি মৃত্যুকেও তো কবি রামানন্দ কম সুন্দর করে দেখেন নি, আঁকেন নি।'

'চুপ কর।' ধমকের গলায় রামানন্দ গজগজ করে উঠল। 'সে তোমাদের রবিঠাকুর —মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' হাত নেড়ে ভেংচি কেটে রামানন্দ আবৃত্তি করল। ছেলে দুটির এতে হাসি পেল, তা হলেও ধমক খাবার ভয়ে চেপে রাখল।

'আমাদের রবিঠাকুর হতে যাবে কোন্ দুঃখে, স্যার।' জ্বালমানবী গলায় দু নম্বর বলল, 'আমাদের বাপ-কাকাদের রবিঠাকুর, আমাদের হল গিয়ে কবি রামানন্দ সেন—'

'হুঁ,' ওপাশ থেকে এক নম্বর আবৃত্তি করল :

'কেউ না থাক আমার
মৃত্যু আছে
অবহেলিত প্রেয়সী,
কালো বটে, কুরূপাও খুব
তবু ভাল
ঠাণ্ডার রাতে
মোহময়ী বালাপোশ।'

'তোমার মুণ্ডু তোমার মস্তক।' রামানন্দ আগের চেয়েও বড় করে ভেংচি কাটল। 'মস্ত এক কবিতা বুঝনেঅলা আদমী তুমি।' উত্তেজনায় রামানন্দ কাঁপছিল, লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতন অবস্থা। 'আরে গর্দভ,' হাত নেড়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'এই মৃত্যু আমার জন্যে, মৃত্যুর মোহ রামানন্দ সেনের, চোদ্দ বছর আগে যে মরতে চেয়েছিল—তা বলে অক্ষয় মরবে কেন, কোন্ দুঃখে—যার ঘরে এত সুন্দর মাধুরী আছে।'

ছেলে দুটি কথা বলছিল না। গাড়ি ছুটছিল।

'হুঁ,' রামানন্দ চুপ ছিল না, যেন একটা চাপা কান্নায় তার গলার স্বর এবার বিকৃত হয়ে উঠল। 'অক্ষয় হাসপাতালে মরছে, এক শয়তান তার মাধবীকে ন্যুড্ করে মডেল করে ছবি আঁকছে—অহো-হো-হো—'

'এখানেই তো ট্র্যাজেডী, স্যার।' এক নম্বর ছেলেটি বিজ্ঞের মতন মাথা নাড়ল। 'এই জন্যই বলে কিনা শিল্প নিষ্ঠুর, শিল্পীর কাছে দয়া মায়া মমতা বলে কিছু—'

'এই উল্লুক!' রামানন্দ আবার গর্জন করে উঠল। 'আমায় তত্ত্ব শোনাবে না, শিল্প—এমন শিল্পের মাথায় লাথি মারি, শিল্পীর মুখে পেচ্ছাব করি—'

'এই অসিত চুপ! বড় বেশি বকছিস।' দু নম্বর রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'স্যার, এ-সব নিয়ে আপনি আর একদম ভাববেন না, আপনার মনের ও । শরীরের ওপর ভয়ানক স্ট্রেন্ যাচ্ছে, রিল্যাক্সেশনের দরকার এখন আপনার, একটু আনন্দ—'

'হুঁ', ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গী নিয়ে রামানন্দ আবার পিঠ এলিয়ে বসল। 'তাই আমি বলতে চেয়েছিলাম, যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমি আনন্দ করতে ফূর্তি করতে যাচ্ছি, সেখানে আমি একবারের জায়গায় দশবার

মন্তে দেখব, উলঙ্গ মেয়েছেলের শরীর দেখব—কেননা অন্তর নেই সেখানে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ফ্যাকাশে চোখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকা নেই।'

'না, সেসব কিছুই নেই, সেখানে সবটাই আনন্দ সবটাই উপভোগ। স্যার আর একটা সিগারেট খান।' দু নম্বর এবার নিজের হাতে রামানন্দর মুখে সিগারেট গ‍ুঁজে দিয়ে লাইটার জেলে সেটা ধরিয়েও দিল। 'শুধু মন্ত্র কাকে বলে, নগ্ন নারীদেহের আসল রূপ কি করে ফুটিয়ে তুলতে হয় তা ওর, মানে আমরা যার কাছে যাচ্ছি, এত বেশি জানা আছে, ওটাও একটা উঁচুদরের আর্ট কিনা, আপনি দেখবেন। যেমন তার ঘাটক যেমন তার প্রেস্ট—উম্—'

'থাক, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।' রামানন্দ থুথু ফেলল, সিগারেট যত না টানছিল থুথু ছিটোচ্ছিল তার চতুর্গুণ, ঢুলঢুলু চোখ, যেন শরীরটা ক্রমেই নুয়ে পড়ছিল ভেঙে পড়ছিল। 'যাচ্ছি যখন সেখানে——চোখেই দেখা যাবে।' জড়িয়ে তার শেষের কথা ক'টা অস্পষ্ট হয়ে গেল। তারপর চুপ থেকে রামানন্দ কেবল ঢুলতে লাগল, হাত থেকে সিগারেট খসে পড়ল।

'শেষ পর্যন্ত সামাল দেওয়া মুশকিল হবে অসিত।' দু নম্বর সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল।

'আমার ইচ্ছে ছিল না গাড়িতে বসে সবটা খেতে দেওয়া।' নিচু গলায় এক নম্বর বলল, 'দেখছি অবস্থা যেন কাহিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'আসলে আমি চাইছিলাম কোনোরকমে সেখানে নিয়ে গিয়ে ওর ঘরে বসিয়ে আর একটা কবিতা লিখিয়ে নেওয়া—'

'তা তো বুঝলুম।' এক নম্বর ঘাড় বেঁকাল। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হলে হয়—'

'কিছু বলছ তোমরা!' রামানন্দর বোজা চোখ খুলে গেল, যেন কিছু একটা শুনেছে।

'না, স্যার—' এক নম্বর ওদিক থেকে চট করে বলল, 'বলছিলাম আমরা আমাদের জায়গায় এসে গেছি।'

'তাই নাকি!' ড্যাবড্যাব চোখে রামানন্দ বাইরেটা দেখল, তারপর তক্ষুনি ঘাড় নিচু করে, মনে হল যেন হাত থেকে পড়ে যাওয়া সিগারেটটা খুঁজল।

'থাক স্যার,' দু নম্বর রামানন্দর কাঁধে হাত রাখল। 'ওটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি নতুন সিগারেট দিচ্ছি—'

'থাক বাবা, আর নতুন ধরিয়ে কাজ নেই—' ঘাড় তুলে রামানন্দ সামনের সীটের দিকে তাকাল। 'কি হে ছোকরা, এসে গেছি আমরা?'

কথা না বলে অসিত বাঁ-দিকের পেভমেন্ট ঘেঁষে গাড়িটা বেঁধে ফেলল।

রণেন দরজা খুলে দিয়ে রামানন্দর হাত ধরল। 'আসুন স্যার, নামা যাক।'

চমৎকার হাস্নুহানার গন্ধ নাকে লাগল। শান্ত নিরিবিলি পাড়া। জ্যোৎস্নাটা টলটল করছে। কাদের একটা কুকুর একবার ঘেউ ঘেউ করে উঠেই আবার থেমে গেল।

রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। 'মনে হয় জায়গাটা আমার চেনা চেনা।'

'কলকাতা শহরে এমন অনেক জায়গাই হঠাৎ চেনা চেনা লাগে স্যার।' রণেন রামানন্দর একটা হাত ধরল। পা খুব বেশি টলছিল, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, যেন রামানন্দ নিজে নিজে চলতে পারছিল না। এপাশ থেকে অসিত রামানন্দর আর একটা হাত ধরল।

'হুঁ, তাই!' রণেনের কথায় সে সায় দিয়ে বলল, 'আবার এই শহরেই অনেক জায়গা হঠাৎ অচেনা অচেনাও ঠেকে।'

রামানন্দ শব্দ করল না। তার মাথাটা আবার ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। দুটো বাড়ি পিছনে রেখে তাকে ধরে ধরে দুজনে একটা বেশ বড় ফটকের সামনে চলে এল। বোঝা গেল প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট বাড়ি।

'হুঁ, হুঁ,' আধবোজা চোখ নিয়ে রামানন্দ ওপরের দিকে তাকাল। 'মনে হচ্ছে বাড়িটা আমার চেনা চেনা, যেন কবে একদিন এসেওছিলাম।'

'কলকাতায় এসব ধোঁকা লাগে স্যার, অচেনা বাড়ি হঠাৎ চেনা মনে হয়।'

রামানন্দকে নিয়ে তারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। একতলা শেষ করে দোতলায়, দোতলার সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় উঠতে লাগল।

'ধুত্তোরি আনন্দ!' একদলা থুথু ছিটিয়ে রামানন্দ গজগজ করে উঠল। 'রাবণের সিঁড়ি, আমার ঘুম পাচ্ছে, এত সিঁড়ি ভাঙা যায়!' মোটা শরীর নিয়ে সে হাঁপাচ্ছিল।

'এসে গেছি স্যার।' দুজনের একজন বেল টিপতে আচমকা অন্ধকার বারান্দা ঝলমল করে উঠল। নানারকম ফুল দিয়ে অর্কিড দিয়ে থরে-বিথরে সাজান টব। দরজা জানালায় শোভন পর্দা। ভিতর থেকে হালকা মেয়েলী নিশ্বাসের মতন ল্যাভেণ্ডার ডিউ বা ঐ জাতীয় একটা সেন্টের গন্ধ ভেসে এল। রামানন্দর চোখ খুলে ভাল করে তাকাতে ইচ্ছে হল, কেননা সেই মুহূর্তে দুর্দান্তরকম সংক্ষিপ্ত বেশবাস ও হালের যা ফ্যাশান, প্রসাধন না, চুলে মুখে প্রসাধনের একটা ইশারা মাত্র নিয়ে মানুষটি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মতন একটা কিছু বয়ে গেল। রামানন্দ কি ওকে চেনে। ও রামানন্দকে চেনে?

'দূর দূর—এ তোমরা কাকে ধরে নিয়ে এলে—সরিয়ে নাও সরিয়ে নাও!' যেন কদাকার একটা পশু দেখে আর্তনাদের মতন চিৎকার করে উঠে পূরবী সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। ছেলে দুটি বোকা হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইল। 'স্কাউণ্ড্রেল, ইডিয়েট!' কেবল দুটো শব্দই রামানন্দ উচ্চারণ করতে পারল। যেন তার সব নেশা টুটে গেছে। এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল না। আহত পশুর মতোই গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে সব ক'টা সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিচে নেমে এল। না, পশুটশু না, নিজের শরীরটাকে একটা প্রকাণ্ড উপহাসের বস্তার মতন ঠেকছিল তার, কোনোরকমে সেটা হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!' রামানন্দ ছুটতে লাগল। ছুটতে গিয়ে দেখা গেল তার দু পা আবার টলছে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। 'রিকশা—হেই রিকশাঅলা!'

হুঁ, রিকশাই অগতির গতি। রিকশা না থাকলে কলকাতার মানুষ কবে অরণ্যে চলে যেত।

'মেডিকেল কলেজ, মালুম হ্যায়? মিটিয়া কলেজ।'

'হাঁ, হাঁ, বাবুসাব, সিধা হোকে বৈঠিয়ে—কিত্না সরাব পিয়া!' বিনবিন করতে করতে ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশাঅলা ছুটল। রিকশার ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে অনর্গল থুথু ছিটোচ্ছিল রামানন্দ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মুনসাং

॥ ২২ ॥
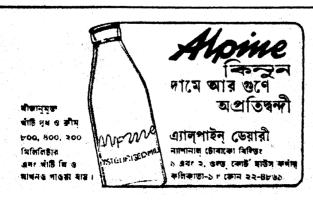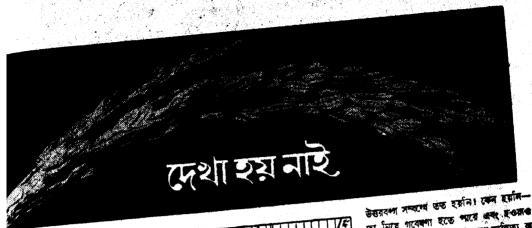
বর্তমান সিরিজে উত্তর বাংলার কোন জায়গা সম্বন্ধে এখনও কিছু লিখিনি। সেজন্য কিছু অনুযোগপত্রও পেয়েছি। আজ এ বিষয়ে লিখতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে, তাঁরা সব দিক দিয়েই অবহেলিত এরকম একটা ধারণা উত্তরবঙ্গবাসী জনসাধারণের মনে বেশ দৃঢ়বদ্ধমূল। এর নানা কারণ আছে। পাল-সেন যুগে বরেন্দ্রভূমির যে প্রাধান্য ছিল আজ অবশ্যই তা নেই। পরবর্তী আট শ' বছরের পরিবর্তনের কথা মনে রেখে এজন্য আজ আর কোন খেদ প্রকাশ করা যায় কিনা সন্দেহ। মুসলমান আমলেও, রাজধানী যখন ছিল রাজমহল বা গৌড়ে তখনও হয়ত

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের এত অনাদর আরম্ভ হয়নি। কিন্তু শাসনকেন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদ ও পরে হুগলীকে ছুঁয়ে কলকাতায় স্থানান্তরিত হল তখন থেকেই হল এই অবহেলার সূত্রপাত। তারপর যখন পূর্ণ হল, দেশ-বিভাগের সময় যখন সারা সেতু সমেত উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সরাসরি রেল-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মোটামুটি এই অবস্থাই চলেছে গত ২৪ বছর। বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থায় কোনক্রমে কাজ চলে গেছে মাত্র। সম্প্রতি, ফারাক্কা সেতুর উপর দিয়ে উত্তর বাংলার সঙ্গে আবার সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবস্থার এখন দ্রুত উন্নতি হওয়াই সম্ভব। প্রশাসন কেন্দ্র থেকে দূরের অঞ্চলগুলি সব সময়েই যে ইচ্ছাকৃত-ভাবে অবহেলিত হয় এমন নয়; নানাবিধ বাস্তব প্রতিবন্ধকই তার কারণ। সে ধারণা-ভাবে বলতে গেলে, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কিন্তু প্রশাসনিক দিক নিয়ে বিস্তৃত

আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শাসন-যন্ত্রের মুখপাত্রেরা সে বিষয়ে সঠিকভাবে বলতে পারবেন। সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েও দেখতে পাই, বাংলা ভাষায় দক্ষিণবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গকে অবলম্বন করে যত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পুস্তক লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে তত হয়নি। কেন হয়নি—তা নিয়ে গবেষণা হতে পারে এবং হওয়াও উচিত। উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে ভ্রমণ-সাহিত্য বা স্থান-পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ, পুস্তকেরও খুবই অভাব। জলপাইগুড়ির শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবিকার মধ্যে থেকেও তাঁর অঞ্চল সম্বন্ধে যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তা সকলেরই জানা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যে যথেষ্ট নয় সেকথা শ্রীযুক্ত সান্যালের মতো নিরভিমান ও নিরলস ফিল্ড-ওয়ার্কার অকপটে স্বীকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, মালদহ জেলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে সত্য কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরের জেলার, ইসলামপুর এলাকা ছাড়া, আর সর্বত্র, গ্রামে গ্রামে, পাল-সেন যুগের যে অগণিত পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আজও পড়ে আছে সে সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় কিছুই জানি না।

আজ দার্জিলিং জেলার এক অখ্যাত স্থান 'মুনসাং' সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবছি, সামান্য কিছু সরকারী প্রকাশন ছাড়া (যেগুলিকে কিছুতেই সাম্প্রতিক কালের বলা যায় না) এ জেলার শহর-গঞ্জ হাট-বাট-

পাহাড়ের কোলে জলসা ডাক বাংলো : মংপাং

এদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা লেখা হয়েছে আজ অবধি! শুধু শীতে নয় সব ঋতুতেই তারা উপেক্ষিত। টুরিস্ট আকর্ষণের জন্য প্রকাশিত কিছু প্রচার-পুস্তিকা জেলার সদর শহর দার্জিলিং, মহকুমা শহর কার্শিয়াং ও কালিম্পং এবং ঘুম, টাইগার হিল, সান্ডাকফু ও ফালুট-এর অতি-সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সীমাবদ্ধ। শিলিগুড়ি মহকুমার সমতলক্ষেত্রে, দূরে নীল পাহাড়ের পটভূমিতে, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রামের একটির নামও আমাদের কানে আসেনি যতদিন না খবরের কাগজের পাতায় হঠাৎ দেখলাম নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এই নামগুলি। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় কিছু হয়ত আমরা পেয়েছি কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় পেয়েছি কিনা সন্দেহ। সমতলক্ষেত্র ছাড়া পাহাড়ী এলাকায় কত যে সুন্দর জায়গা এখনও 'আবিষ্কার'-এর অপেক্ষায় রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গিয়েলখোলায় তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে বাঁহাতি যে রাস্তা গেছে গ্যাংটকের দিকে (ডানহাতি পথ গেছে কালিম্পংয়ে) তাতে কয়েক মাইল গেলেই ভারত-সিকিম সীমান্তে রংপোতে পৌঁছনো যায়। তিস্তার শাখা নদী রংপো এখানে এসে মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। সংগমের কাছাকাছি উপলাকীর্ণ চড়ার চারদিক ঘিরে কাকচক্ষু জলের তীব্র স্রোত তরতর করে বয়ে চলেছে নুড়িপাথরের উপর দিয়ে। কাছে, দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যশ্যামল সব পাহাড়। কান-জুড়ানো জলকল্লোল ছাড়া আর কোন শব্দ নেই চরাচরে। অবিকৃত নিসর্গ প্রকৃতির কোলে পরিপূর্ণ প্রশান্তির এমন নিরিবিলি স্থান খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুনেছি, উৎসাহী বিদেশী পর্যটকদের কেউ কেউ এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করে যান কয়েক দিন। আমার দেশের এহেন মনোহর অভিজ্ঞতা বিদেশে রপ্তানি হয়ে যায়, অথচ আমরা তার নাগাল পাই না।

অথবা ধরুন তিস্তা ও ছোট রংগীত নদীর মিলনস্থলের কাছে সিংলাবাজার নামে ছোট্ট গ্রামটি। আজকাল দার্জিলিং শহর থেকে রোপওয়েতে চেপে অবলীলাক্রমে সেখানে পৌঁছনো যায়। শুধু ভ্রমণের সে

অভিজ্ঞতা, চারিদিকের অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, হাটের দিনে সিংলাবাজারে সমবেত জনতার বিচিত্র পরিবেশ অতি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ কাহিনী রচনার উপাদান। কিন্তু আমরা, সাধারণ বাঙালী পাঠক, তার কতটুকু জানতে পেরেছি? লাটপাঞ্চার এই অদ্ভুত নামটা পর্যটন বিভাগেরও কজন শুনেছেন জানি না। অথচ এখানকার সমতলশীর্ষ পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে দেখা যায় অরণ্যাবৃত গিরিশ্রেণী ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে শেষ হয়েছে সমতলভূমিতে। কুয়াশা-বিহীন পরিষ্কার দিনে, আঁকাবাঁকা পথে সাদা ফিতের মতো নদীগুলিকে দেখা যায় জলপাইগুড়ি পার হয়ে রংপুর দিনাজপুরে জেলা অবধি। কার্সিয়ং থেকে সমতলভূমির দৃশ্যের প্রশংসায় যাঁরা পঞ্চমুখ তাঁরা নিশ্চয়ই লাটপাঞ্চারে যাননি। অথচ পর্যটকদের সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, জায়গাটার নামও বিশেষ কোথাও উল্লিখিত হয় না। অথবা ধরুন মিরিক। সেখানে যাবার পথঘাট এখন হয়ত খুব উন্নত নয়। কিন্তু কষ্ট করে যিনিই একবার গিয়েছেন তিনি নিশ্চয়ই বলবেন এমন নয়নলোভন পাহাড়ী বসতি দার্জিলিং জেলায় কমই আছে। মংপু নামটা অবশ্য অনেকের পরিচিত 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটির কল্যাণে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত বাড়িটিকে কেন্দ্র করে সেখানে যে সুন্দর একটি স্মারক-প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে সে কথা কজন জানেন? কালিম্পং পর্যন্ত দৌড় আমাদের অনেকেরই। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে স্থল-বাণিজ্য বন্ধ হবার পর থেকে কালিম্পং বাজারের বর্ণাঢ্যতা লোপ পেয়েছে অনেক-খানি। অথচ কয়েক মাইল উত্তরে, পেডং বাজারে, পাহাড়ী জনতার এখনও যে বিচিত্র সমাবেশ হয় হাটের দিনে তা মনে রাখবার মতো।

ডাকবাংলো থেকে তিস্তার দৃশ্য

আমি সামান্য যেটুকু ঘুরেছি দার্জিলিং জেলায় তার ভিত্তিতে দৃষ্টান্তের সংখ্যা হয়ত আরও অনেক বাড়ানো যেত। কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না; যেকটির উল্লেখ করেছি তা থেকেই হয়ত বোঝানো গেছে পরিচিত শহরগুলির বাইরে যথেষ্ট স্থান আছে দার্জিলিং জেলায় যেগুলি সাধারণের গোচরে আসা উচিত।

এমই এক জায়গা মুনসাং যার সম্বন্ধে আজ লিখতে বসেছি। সেখানে একদিন থাকব এই প্রোগ্রাম করে গিয়ে যে পুরো পাঁচদিন ছিলাম সে কথাটাই সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বলে মনে হচ্ছে। ক্যামেরার বোঝা কাঁধে ফেলে যখন বাইরে দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি তখন পথপঞ্জি এমন আটো-সাঁটো করে ছকা থাকে যে তার নড়চড় হওয়া অসম্ভব। দ্রষ্টব্য স্থান সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবরাখবর আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখলে হলে, নিয়মের ব্যতিক্রম করার দরকারও হয় না অধিকাংশক্ষেত্রে। কিন্তু লোকমুখে শোনা, চিঠিপত্রে জানা বা বই থেকে পড়া সে সব আগাম সংবাদ বিলকুল বরবাদ হয়ে যায় কখনো কখনো—যেমন আমার বেলাতে হয়েছে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোয়, রাজপুতানার জয়-শলমীঢ়ে, মহারাষ্ট্রের অজন্তা-ইলোরায়, মহীশূরের হালেবিড়-বেলুড়ে অথবা সিংহলের অনুরাধাপুরে। বিশ্ববিখ্যাত এসব জায়গায় যাত্রাবিরতির নিশ্চয়ই মানে হয়। তাই বলে মুনসাং? নামও তো কেউ শোনেনি সেখানকার! সাধারণের কাছে মুনসাং যে অজ্ঞাত তা জেনেও বলছি, সেখানে একদিনের জায়গায় পাঁচদিন থেকে বিশ্ববন্দিত ওই সব স্থানের সঙ্গে তাকে আমি একাসনে বসিয়েছি। যে যাই বলুক, আমি তার জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই।

ডাক বাংলো থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণীর দৃশ্য

কালিম্পং থেকে উত্তরমুখী যে পিচের সড়ক আলগাড়া হয়ে পেডং গিয়েছে তার নবম মাইল-পোস্টের কাছ থেকে ছোট এক রাস্তা বার হয়েছে বাঁ দিকে। সে পথ পেডং রোডের মতো প্রাচীনও নয় প্রশস্তও নয়; তাতে জীপ বা ল্যান্ড-রোভার ছ'মাইল দূরের মুনসাং অবধি যেতে পারে যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম সিংকোনা-বাগান
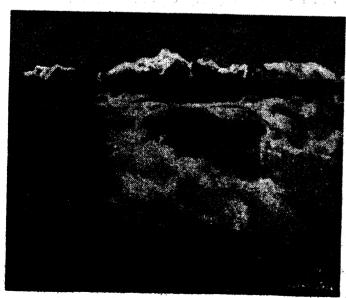
সিংকোনা বাগানের সুন্দরী

অবস্থিত। সংগৃহীত সিংকোনার ছাল এ-পথেই কালিম্পং হয়ে মংপুতে যায় সেখানকার কারখানায়। বাগানের শ্রমিকদের বস্তি আর দু'চারজন অফিসারের কোয়ার্টার ছাড়া গ্রাম বলতে তেমন কিছু নেই মুনসাং-এ। বাজারহাট নেই; মুদিখানা দোকানেও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায় না। বাগানের গাড়ি করে নানাবিধ রসদ সেজন্য আনতে হয় পনেরো মাইল দূরের কালিম্পং থেকে। তদুপরি বিদ্যুৎ নেই বলে (আমার পরিদর্শনের সময়ে অন্তত ছিল না), বিজলী বাতি নেই, পাখা নেই, 'ফ্রিজ' নেই। কিন্তু আছে যা তা এক ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের সামনে অনেকখানি খোলা জায়গার ওপর এক অপরূপ ডাক-বাংলো। কাঠের বাড়ি; দু'প্রস্থ শোবার ঘর, বাথরুম, ডাইনিং রুম আর সামনের বারান্দা। রান্না-ভাঁড়ারের পিছনে মালী ও চৌকিদারদের দু'তিনটি কুটির।। এছাড়া আর জনবসতি নেই প্রায় আধ মাইলের মধ্যে। সামনের বাগানের প্রান্তে পাহাড়ের ঢাল সোজা নেমে গেছে প্রায় তিন হাজার ফুট নীচে তিস্তা নদীর স্রোতোপথ অবধি। বহু অভিজ্ঞ ভূপর্যটকও নাকি স্বীকার করেন, এখান থেকে সর্পিলগতি তিস্তার মনোরম দৃশ্যপটের মতো নয়ন-বিমোহন দৃশ্য তাঁরা অন্যত্র দেখেননি। ডান দিকে সিকিম এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে রংপো নদীর সংগমের পর তিস্তা পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় প্রবেশ করেছে। সঙ্গের দ্বিতীয় ছবিটিতে তিস্তার ওপারে যে খাড়া পাহাড় দেখা যায় তারই পিছনের গা বেয়ে গ্যাংটকের রাস্তা এসেছে সিরেলখোলা থেকে রংপো অবধি। ছবির একেবারে ডান প্রান্তে, ভারত-সিকিম সীমান্তের ঝোলানো সেতুটি পাহাড়ের পিছনে দেখা যায় না; তার পরেই সিকিম রাজ্য। সামনে ছবির মতো প্রসারিত নদী-পর্বত-অরণ্য-আকাশের দৃশ্যে গা ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে বসে থাকা যায়। ডাক-বাংলোর পিছনের পাহাড়ের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এসে যখন কোমল, শুভ্র মাধুরী ছড়িয়ে দেয় তিস্তার ওপর তখনকার সে

শা ভোলবার নয়। দিনের বেলায় এত চু থেকে জলকল্লোল শোনা যায় না। কিন্তু তের প্রগাঢ় নীরবতা ভেদ করে অত রাগত যে ধ্বনিটুকু ভেসে আসে তারই া তুলনা কোথায়। এই অমৃতধ্বনি শুনতে, পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে ওই রূপোলী ফতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে আমায় একদিনের জায়গায় পাঁচদিন লেগেছিল। আবার বলি, আমি সেজন্য কিছুমাত্র অনুতপ্ত নই।

মুনসাং একেবারে সিকিম-সীমান্তে অবস্থিত। সেজন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার সব ক'টি তুষারাবৃত শৃঙ্গ শোবার ঘরের জানালা থেকেই দেখা যায়। দার্জিলিং শহর থেকে মূল কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরটি কিছু বড় দেখালেও, সব ক'টি শৃঙ্গ যে চোখে পড়ে না সেকথা হয়ত সুবিদিত নয়। দার্জিলিং ও গ্যাংটকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত বলে, পরিষ্কার রাত্রে এই দুই শহরেরই আলো দেখা যায় মুনসাং থেকে। সে আর এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ভ্রমণের সময় যাঁরা সাবধানে লোক-সংসর্গ পরিহার করে চলেন না (অভিজাত-ম্মন্য অনেকেই করেন দেখেছি) তাঁরা কিছু মনের খোরাক পেতে পারেন সিংকোনা-বাগানের কুলি-কামিনদের সঙ্গে দু দণ্ড কাটিয়ে। শীতের দেশ, জল গরম করবার 'গেইজার' নেই হতভাগাদের। অতএব খুবই ডার্টি তাতে সন্দেহ কি! তবে মন বড় পরিষ্কার। মহানগরের কেরানীপাড়ার যে খুপরিতে উদয়াস্ত কলম পিষে জীবিকা-নির্বাহ করি তার চারপাশের পরিবেশে অথবা উচ্চ কোটির অভিজাত সমাজে কতকাল—হায় কত কাল—এহেন নির্মল মনের দেখা পাইনি। তারা অমার্জিত নিশ্চয়ই, নিরক্ষর অবশ্যই, অসভ্য নিঃসন্দেহে। তদুপরি এত-দূর অশিক্ষিত যে কপট মুখোশের আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির নিপুণ চালগুলো কিভাবে চালতে হয় এখনো তা শেখেনি; উপকারীর ঋণ যে নিমকহারামি দিয়ে, বেইমানি দিয়ে শোধ করতে হয় তাও জানে না। সভ্যতার ক্ষত এক শহর থেকে পালিয়ে এই ঘোরতর পশ্চাৎপদ সমাজে আমি একদিনের জায়গায় পাঁচদিন কাটিয়েছিলাম। আবার বলি, সেজন্য আমার কোন খেদ নেই।

মুনসাং-এর আর এক আকর্ষণ জলসা ডাকবাংলোর (ডাকবাংলোটি এই নামেই পরিচিত) কাছাকাছি রমণীয় কয়েকটি বন-পথ। সিকিমের খুব কাছাকাছি হওয়ায় অরণ্যপ্রকৃতি একই রকম শ্যামল-নির্জন, একইরকম ভয়াল-গম্ভীর। বহুসময় আমার কেটেছে আলোছায়ার আলপনা আঁকা এসব অরণ্যপথে। নিজেকে খুঁজে পাবার এমন পরিবেশ আর হয় না।

কিন্তু মুনসাং-এর কোন কৌলীন্য নেই, 'স্ট্যাটাস' নেই। সুইটজারল্যান্ড বা জাপান পরিভ্রমণের পর, নিদেনপক্ষে শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরী বা উটি ঘুরে এসে, ড্রয়িং-রুমের জমায়েতে যে আত্মগরিমা লাভ করা যায়, পচা বাংলাদেশের অখ্যাত এই গিরিনীড় তা কখনই দিতে পারবে না। তবুও সবাইকে আমন্ত্রণ জানাব মুনসাং-এ আসবার।

(ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

আলোছায়াঘেরা বনপথ : মুনসাং

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ১৭ ॥

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও ষড়যন্ত্র-রাজনীতির অন্যতম হোতা গোলাম মোহাম্মদ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পাপস্খালনের উদ্দেশ্যে জীবনের শেষ ক'টা দিন 'আল্লার এবাদতে' কাটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মক্কাশরীফে গমন করলেন। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসেবে গদী দখল করলেন। যে মীর্জা সাহেব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর পদলেহী অফিসার হিসেবে একদিন সীমান্ত প্রদেশে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়েছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন। মাস কয়েকের মধ্যেই গোলাম মোহাম্মদ পরলোকগমন করলে ইস্কান্দার মীর্জা পাকাপাকিভাবে গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত লাভ করলেন। পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং বাংলার জনাব এ কে ফজলুল হক যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নে মনোনিবেশ করলেন। এর আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে অগণতান্ত্রিকভাবে ভেঙে এক ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য পদ্ধতি চালু করে তা' শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির জনাই এটা করা হয়েছিলো। রাজনৈতিক ডামাডোল এবং 'মুসলমান ভাই ভাই'-এর মিষ্টি শ্লোগানের মাঝ দিয়ে পূর্ব বাংলার শতকরা বারো ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিশ্চিহ্ন করাই ছিলো এই এক ইউনিটের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া এক ইউনিটের মাধ্যমে পশ্চিম পাঞ্জাবের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলিকে বেপরোয়া শোষণ আইনসম্মতও করা হলো।

মুসলীম লীগ, কৃষক পার্টি, তফশিলী ফেডারেশন এবং পাকিস্তান কংগ্রেসের (শ্রীবসন্তকুমার দাসের নেতৃত্বে) সমর্থনপুষ্ট চৌধুরী মোহাম্মদ আলী-ফজলুল হক মন্ত্রিসভা অত্যন্ত দ্রুতে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে একটা খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেন। এতে পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে ইসলামিক রি-পাবলিক অব পাকিস্তান এবং রাষ্ট্র প্রধানের পদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে প্রস্তাব করা হলো। এছাড়া নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নটি ভবিষ্যতে নির্ধারিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হলো, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন মন্ত্রিসভার অংশদলগুলো এই প্রশ্নে একমত হতে পারলো না। তবুও অংশদলগুলোর মধ্যে মতবিরোধের ফলে যাতে মন্ত্রিসভার পতন না ঘটে তা' এড়াবার জন্য নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা নেয়া হলো। কেননা বিরোধীদলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ ও পাঞ্জাবের মিয়া ইফতেখারউদ্দীন তখন গণপরিষদে এই প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন।

ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা শুভেচ্ছা সফরকারী সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যখন করাচী এসে পৌঁছালাম তখন গণপরিষদে আলী-হক শাসনতন্ত্র পাশ হয়ে গেছে। বিরোধী দলের তেরোজন আওয়ামী লীগ সদস্যের একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাড়া বাকী বারোজন এই শাসনতন্ত্রের মূল দলিলে দস্তখত পর্যন্ত করলেন না। করাচীতে পৌঁছেই শুনলাম গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা আগেই স্পষ্টভাবায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ফজলুল হক সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শাসনতন্ত্রে গভর্নর জেনারেলের অপরিসীম ক্ষমতা দেয়া না হলে গণপরিষদে পাশ হলেও তিনি গভর্নর-জেনারেল হিসেবে তাতে সই করবেন না। তাই শাসনতন্ত্রকে মীর্জার কথামতো সংশোধন করে পাশ করানো হলো। এরপর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও শেরে বাংলার নেতৃত্বে সরকারপক্ষীয় সদস্যরা শাসনতন্ত্র বগলে একটা শোভাযাত্রা করে লাটভবনে পৌঁছলে মুর্শিদাবাদের মীরজাফরের বংশধর ইস্কান্দার মীর্জা তাতে সম্মতিসূচক

কতৃত্ব করলেন। ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন।

প্রাচুর্যে ভরপুর করাচী এক অদ্ভুত শহর। বলতে গেলে প্রায় রাতারাতিই এই শহর গড়ে উঠেছে। ভারত বিভাগের সময় বিপুলসংখ্যক বিত্তশালী মুসলমান তাদের সমস্ত টাকা-পয়সা সংগে করে এই শহরে 'হিজরত' করেছে। এছাড়া বন্দরের সুবিধা থাকায় করাচীতে দ্রুত একটার পর একটা শিল্প স্থাপিত হলো। আর কেন্দ্রীয় সরকারও রাজধানী করাচী নগরীতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করলো। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার কাঁচা পাট প্রায় আড়াইগুণ মূল্যে রপ্তানী করে পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে বিপুল উদ্বৃত্ত দেখা দিলো, তার প্রায় সবটাই করাচীর শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগ করা হলো। উপরন্তু বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ ও এককালীন দানের সিংহভাগ এই করাচীর হস্তগত হলো। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে পাকিস্তানের কাগজের চালু মুদ্রার শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ এই করাচী শহরেই রয়েছে। পরবর্তীকালে পাকিস্তানে মনোপলী ও কার্টেলের বদৌলতে যে বাইশটি পরিবার
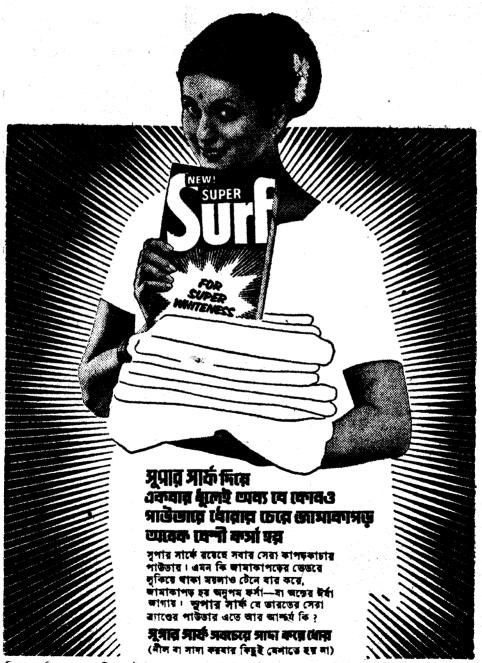
গড়ে উঠেছে, তার উনিশটি পরিবার হচ্ছে এই করাচী নগরীর। এঁরাই পাকিস্তানের মোট সম্পদের এক বিরাট অংশ কুক্ষিগত করে রেখেছেন। এমনকী পূর্ব বাংলার কল-কারখানার প্রায় সত্তর ভাগ এঁদের কবজায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসার প্রায় সবটুকু এঁদের করায়ত্ত রয়েছে। তাই স্বাভাবিক-ভাবেই এঁদের অঙ্গুলী হেলনে পাকিস্তানের রাজনীতি পরিচালিত হতে শুরু করলো। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই 'ব্যুরোক্র্যাট্স' ও সামরিক জেনারেলরা এঁদের সঙ্গে আঁতাত করে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র-রাজনীতির পূর্ণতা ঘটালো।

করাচী নগরীর চাকচিক্য, নৈশ ক্লাব, নতুন নতুন মডেলের গাড়ি আর পাশ্চাত্য প্রভাবে গড়ে উঠা জীবনধারা দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। মুখে ইসলামের বুলি আর কার্যক্রমে ইউরোপীয় সভ্যতা গলাধঃ-করণের একটা উন্মাদ প্রচেষ্টার প্রতিযোগীতা দেখে যে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে হতবাক হবারই কথা। বহু চেষ্টা করেও পূর্ব বাংলার সংগে পশ্চিম পাকিস্তানের একাত্ম-বোধের কোন সূত্র দেখতে পেলাম না। প্রতি পদে পদে উপলব্ধি করলাম, আমি একটা বিদেশী রাষ্ট্র সফর করতে এসেছি। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এমনকি আচার-ব্যবহার কোথাও সামান্যতম মিল দেখতে পেলাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু সাহিত্য আর ইউরোপের গ্রীক সাহিত্য আমার কাছে সমান দূরত্বের মনে হলো। বাঙ্গালীরা অসুস্থ-বোধ করলে যেখানে গমের রুটী খায়, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেখানে ভাত দিয়ে পথ্য গ্রহণ করে। বাঙ্গালীরা যেখানে নিজেদের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেখানে বাইজী নাচ দেখতে যায়। বাঙ্গালীরা যেখানে অবসর ও ছুটী বিনোদনের জন্য বন-ভোজন ও দেশ-সফরের ব্যবস্থা করে, পশ্চিম পাকি-স্তানীরা সেখানে হোটেলে ক্যাবারে নৃত্য উপভোগ কর। বাঙ্গালীরা যখন বই-এর লাইব্রেরী করতে ব্যস্ত, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তখন 'হুলাহুপ' নাচের প্র্যাকটিস্ করছে। তাই এই সফরে এসে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করলাম, আমরা পূর্ব ওরা পশ্চিম। আমাদের সঙ্গে ওদের কোথাও সামান্যতম মিল নাই। শুধুমাত্র ধর্ম আর পাকিস্তান ইণ্টার ন্যাশানাল এয়ার লাইনস দিয়ে শাসন ও শোষণের উদ্দেশ্যে এই দুটো অংশকে বেশীদিন একটা অদ্ভুত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এক রাখা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয়, তাহলে ইতিহাস ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান মিথ্যা হয়ে যাবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক সেদিনের ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার সম্পর্কের চেয়ে কোন অংশেই উন্নত নয়।

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গণ-পরিষদে পাশ হবার পর শেরে বাংলা ফজলুল হক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে পদ-ত্যাগ করে পূর্ব বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন। কেননা মির্জা-বিভক্ত যুক্তফ্রণ্টের কৃষক-শ্রমিক পার্টি নামক উপদলকে পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন করতে হবে। রংপুরের এককালীন কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী মুসলীম নেতা জনাব আবু হোসেন সরকার পূর্ব বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন। অ্যাডভোকেট সালাম খনের নেতৃত্বে ১৮ জন সদস্য আওয়ামী মুসলীম লীগ নামে উপদল গঠন করে শুধুমাত্র মন্ত্রিত্বের লোভে সরকার মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন জানালেন। আর আতাউর রহমান, শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দল বিরোধী দলের আসনে বসলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক অদ্ভুত মোড় পরিবর্তিত হলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশের যেসব ভূস্বামীরা এতোদিন পর্যন্ত মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে প্রাদেশিক সরকারগুলোকে কুক্ষিগত রেখে ক্ষমতার সুবিধা গ্রহণ করছিলেন, এক ইউনিট গঠনের ফলে বৃহত্তর পরিবেশে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে দেখে গোপনে তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে শুরু করলেন। এদিকে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জাও নিজের গদীকে পাকা-পোক্ত করবার উদ্দেশ্যে তলে তলে নিজস্ব দল গঠনে ব্রতী হলেন। তাই এই সুযোগে মীর্জাসাহেব মুসলীম লীগকে দ্বিখণ্ডিত করে নিজস্ব পকেট প্রতিষ্ঠান রিপাবলিকান দল গড়ে তুললেন। ফলে অচিরেই চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো।

ইস্কান্দার মীর্জা তেরোজন সদস্যের সমর্থনপুষ্ট আওয়ামি লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে রিপাবলিকান পার্টীর কোয়ালিশনে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। তিনি পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী রূপে ক্ষমতাসীন হলেন। কিন্তু আশিজন সদস্য সমবায়ে গঠিত পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর দলীয় সদস্য সংখ্যা মাত্র তেরোজন বিধায় তিনি ইস্কান্দার মীর্জার রিপাবলিকান পার্টির ক্রীড়নকে পরিণত হলেন। তবুও সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে শত বিরোধীতা সত্ত্বেও তেরো মাস পর্যন্ত তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রি-সভাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তেরো মাস প্রধান-মন্ত্রীত্বের সময়টা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এর মধ্যেই পূর্ব বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার খাদ্য সংকটের মোকা-বেলায় দল ঠিক রাখবার উদ্দেশ্যে পরিষদ সদস্যদের মাধ্যমে সরকারী গুদাম থেকে তেত্রিশ লাখ মণ ধান-চাল কোনরকম বিধি-

নিষেধ ছাড়াই বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। উপরন্তু সরকার ও কে এস পি পরিষদ সদস্যদের বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতির অভিযোগ এলো। শেষ পর্যন্ত সরকার-মন্ত্রিসভা পরিষদে বাজেট পাশ করতে ব্যর্থ হয়ে পদত্যাগ করলেন। দিন কয়েকের জন্য পূর্ব বাংলায় গভর্নর-শাসন জারী হলো। কেননা গভর্নর জনাব ফজলুল হক আওয়ামী লীগকে মন্ত্রি-সভা গঠনের আহ্বান জানানোর ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগলেন। এদিকে পূর্ব বাংলায় তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। হু হু করে চালের দাম বাড়তে লাগলো। অনুষ্ঠিত হলো চক বাজারের দুঃখজনক ঘটনা। ঢাকা শহরের আশেপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার বুভুক্ষু নর-নারী দু'মুঠো অন্নের আশায় রাজধানীতে জমায়েত হলো। শুরু হলো ভুখা মিছিল। চক বাজারে পুলিসের গুলি বর্ষণে তিন ব্যক্তি নিহত হলো। ঢাকাবাসী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো ভুখা মিছিলের পুরোভাগে শেখ মুজিবর রহমান রক্তাক্ত লাশ কাঁধে এগিয়ে চলেছেন।

[ক্রমশ]

তিন মূর্তি —রণজিৎ ভট্টাচার্য

ভারতের অন্যান্য শহরের, এমন কি দিল্লীর তুলনায়ও কলকাতা শহরে প্রদর্শনীর সংখ্যা বেশী। তা সত্ত্বেও এ শহরে যাঁরা নিয়মিতভাবে প্রদর্শনীতে যাতায়াত করে থাকেন তাঁদের মনে একটি দুঃখ থেকে যায় : এখানে তাঁরা ভারতের অন্যান্য কৃতী শিল্পীদের শিল্পকর্ম দেখার বিশেষ সুযোগ পান না। কারণ, বহির্বাংলার খ্যাতনামা কোনও শিল্পীই আজকাল, যে কারণেই হোক, এখানে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন না। ফলে কলকাতার চিত্ররসিকবর্গ দেশের বিশিষ্ট সমকালীন চিত্রকলাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন না। স্থানীয় বাৎসরিক কোনও প্রদর্শনীতে কদাচিৎ দু একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সাক্ষাৎ মেলে তবে তা ধর্তব্য নয়। কলকাতার রসিক-বর্গের সুবিধার জন্য বিড়লা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটি কার্যক্রম তৈরী করেছেন। ভারতের বয়স্ক ও খ্যাতনামা শিল্পীদের শিল্পধারা নিয়মিতভাবে দেখাবার জন্য তাঁরা এই পর্যায়ে প্রথমে শিল্পী গোপাল ঘোষের শিল্পকর্মের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন—এটি ২ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ যথাক্রম খ্যাতনামা শিল্পী রামকিঙ্কর বৈজ ও মকবুল ফিদা হুসেনের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার আশা রাখেন। বিড়লা কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

গোপাল ঘোষের প্রদর্শনীতে মোট ১৩০ খানি ছবি দেখা গেল। ছবিগুলি ১৯১৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে অর্থাৎ তাঁর শিল্পী জীবনের বিভিন্নকালে আঁকা। ছবিগুলি সুনির্বাচিত, সেজন্য বিড়লা অ্যাকাডেমির কে এস মাথুর ধন্যবাদার্হ। কারণ, শিল্পীর চোখ দিয়েই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ছবি নির্বাচন করেছেন। শিল্পী হিসাবে আমাদের দেশে গোপাল ঘোষ এত খ্যাতিলাভ করেছেন যে নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সমকালীন চিত্রকলাক্ষেত্রে তিনি একটি বিশেষ ধারার পথিকৃৎ। সব চেয়ে বড় কথা, নামের স্বাক্ষর না দেখেও সহস্র ছবির মধ্যে থেকে তাঁর আঁকা ছবি চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। গোপাল ঘোষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি বঙ্গদেশের বাঙালী শিল্পী—ছবির বিষয়-বস্তুর সন্ধানে তিনি অন্য কোথাও না গিয়ে নিজের দেশেরই বিভিন্ন পল্লী প্রান্তে সরল পল্লীবাসীর মতই ঘুরেছেন ও পুকুর, শস্য-শ্যামল বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নীল আঁচল বিস্তৃত আকাশ ও নানা ফুলের রঙ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং দেশের সেই রূপের বিভিন্ন বিকাশই ছবির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ছবির ভিতর দিয়েই যেন পল্লীগ্রামের একটি বিশিষ্ট রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। গোপাল ঘোষ রঙের পূজারী ও সেই সঙ্গে তুলি চালনায় সিদ্ধহস্ত—মাত্র দু একটি টানেই তিনি বস্তুটুকু প্রকাশ করতে পারেন এবং এ বিষয়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রদর্শনীতে লাইন ড্রয়িং, ফুলের স্টাডি, নিসর্গ দৃশ্য ও নতুন ধরনের রঙপ্রধান ছবি দেখা যায়। অধিকাংশ ছবিই গত তিরিশ বছরের মধ্যে আঁকা। প্রতিকৃতি নিদর্শনগুলি বলিষ্ঠ; বিশেষ ক'রে শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় ও নন্দলাল বসুর। নীল, সবুজ, কালো ও বিশেষ করে কয়েকস্থানে বেগুনী রঙ ব্যবহার করে শিল্পী বঙ্গদেশের পল্লীরূপ ও সৌন্দর্য নানাভাবে প্রকাশিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ৩৫,১২২,১২৭ ও ১৩৫নং উল্লেখযোগ্য। কয়েকটিতে কার্টুন গ্রাফিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যেমন ৮৪নং। সংক্ষিপ্ত তুলি ব্যবহার করে যেখানে তিনি অপরূপ রসসৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে ৪, ৯, ১০, ৫, ৬ ও ২০নং বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এক-খানি ছবি অনেকেরই নজরে পড়ে—ল্যাণ্ড অব কলারস। দুদিকে সারিবদ্ধ গাছ, তারই নীচে ঢালু জমি। নীল লাল ও হালকা হলুদ রঙ ব্যবহার করে শিল্পী এই সাধারণ দৃশ্যটুকুই অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গত কয়েক বছর যাবত শিল্পী পোস্টকার্ড আকারের বা তার চেয়ে ঈষৎ বৃহৎ কাগজে নানা ছবি এঁকেছেন। এগুলিরও অধিকাংশই নিসর্গ দৃশ্য, কিন্তু সুচিন্তিত বিভিন্ন
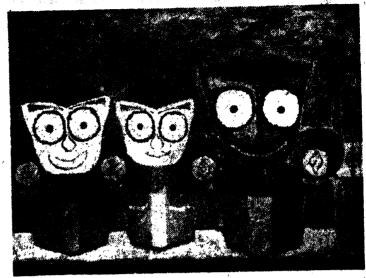
রঙ ব্যবহার ও প্রকাশভঙ্গীমার গুণে এগুলি যেন ঝলমল করে—যেমন ৬৬ ও ৬২নং ছবি দুটি। এই প্রসঙ্গে মিনিয়েচার জাতীয় বার্ডসআই ভিউ অব হোলি প্লেসও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিল্পী যে কলাদেবীর একজন একনিষ্ঠ সাধক তা এই প্রদর্শনী দেখেই জানা যায়। তবে গোপাল ঘোষ মুখ্যত নিসর্গ পূজারী, রঙ ব্যবহার ও তুলি চালনার গুণে এ জাতীয় ছবি এ'কে তিনি সাফল্যের উচ্চতম সোপানে পৌ'ছে গেছেন। নানা রঙ অবলম্বনে রচিত তাঁর সাম্প্রতিকতম কয়েকটি নিদর্শন পরীক্ষামূলক মনে হয়—এগুলির মধ্যে ঠিক যেন গোপাল ঘোষের নিজস্ব সত্তার পরিচয় মেলে না।

*

শিল্পী রণজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। দশ বছর পূর্বে তিনি ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন এবং বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। একক প্রদর্শনী হিসাবে এটাই প্রথম। এখানে তেলরঙে আঁকা তাঁর ২০টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীর অধিকাংশ রচনাই ইমপ্রেসানিস্টিক এবং নিসর্গ ও বহির্দৃশ্য সম্বন্ধীয়। যদিও স্টিল লাইফ ও কম্পোজিশনের নমুনাও চোখে পড়ে। শিল্পীর রঙ সুনির্বাচিত। নীল, সবুজ ও বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে তিনি হলুদ রঙ ব্যবহার করেছেন সেখানেই তিনি অধিক সাফল্যলাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রেভারবারেশন অব কলারস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হালকা হলুদ রঙের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কুটীরের লাল রঙের চাল, পুরোভাগে হলুদ রঙেরই স্তরভেদ-প্রধান ফুলের স্তবক রাশি। সুকৌশল আলো-ছায়ার প্রকাশভঙ্গীমার মধ্য দিয়ে শিল্পী সমগ্র দৃশ্যটুকু সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। অন্যান্য নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে পরিপ্রেক্ষিতবোধ, পরিমিত নীল ও হলুদ রঙ ব্যবহার এবং সুবিস্তীর্ণ আকাশের জন্য অটাম রিফ্লেকশন মন্দ লাগে নি। তবে ল্যান্ডস্কেপ (১৫) শিক্ষার্থীসুলভ। কমপোজিশনের দিক থেকে দুটি অনেকের ভাল লাগে—তিন মূর্তি ও হাওড়া ব্রীজের (স্টেশনের দিক থেকে) স্টাডি। প্রথমটিতে সরলতা ও বিশেষত কারুকার্য লক্ষনীয়। দ্বিতীয়টি পরিকল্পনা, সমবিমূর্ত কমপোজিশন ও কারুকার্যপ্রধান প্রাচীর চিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য নজরে পড়ে। পৃষ্ঠভূমির হাওড়া ব্রিজের পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে শিল্পী সচেতন হলে কমপোজিশনটি আরও আকর্ষণীয় হ'ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

প্রতি বছরের মত সি এল টি কর্তৃপক্ষ আগামী ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক উৎসবের সময়ে ছেলেমেয়েদের চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছেন। আট থেকে ১৬ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগে প্রতি-যোগিতা করতে পারে। ছবি পাঠাবার শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর। বিস্তারিত নিয়মাবলী অবন মহল, গড়িয়াহাট রোড কলকাতা-১৯ থেকে পাওয়া যাবে।

*

চারদিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে চন্দননগর ও মগরা আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রী-গণের আঁকা ছবির একটি যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পাঁচ থেকে ১৭ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জলরঙ ও প্যাস্টেলে আঁকা নিদর্শন ও সেই সঙ্গে এই বছরের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলিও প্রদর্শনীতে দেখা যায়।

চিত্রপ্রিয়

॥ ২০ ॥
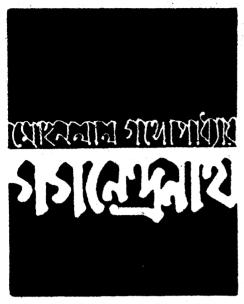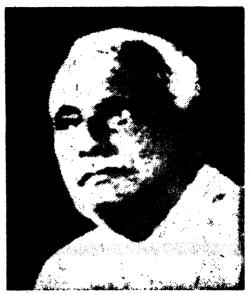
অবনীন্দ্রের বড় ছেলে অলোকেন্দ্র। গেহেন্দ্রের বিয়ের মতো অমন রাজসিক ব্যাপার না হলেও অলোকের বিয়ের জাঁকজমক নেহাত কম হয়নি। সারা বাগানে শামিয়ানা পড়েছিল। পেশাদারী থিয়েটার হয়েছিল তিন দিন, গড়ের বাদ্যি তো এসেছিলই। আর হয়েছিল খাওয়া, দিনে-রাতে অজস্র লোক খাওয়ানো হয়েছিল। বাড়িতে যতগুলো লম্বালম্বা বারান্দা ছিল তাতে সব সময়ই লোক খাওয়ানোর জন্য কার্পেটের টানা আসন পাতাই থাকত।

এই বিয়েতে এক ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন বাড়ির কর্তারা। বিয়ের আগে থেকেই এই ডিনার নিয়ে বহু আলোচনা চলেছিল। অনেকেই অনেক কিছু প্রস্তাব করেছিলেন; তবে ডিনারে কি কি খানা থাকবে, কোন কোন পদ দেওয়া হবে, কারা রাঁধবে—তার প্রধান ভার পড়েছিল গগনের উপর। চারজন বাবুর্চি, তাদের মেট আর অন্যান্য সাহায্যার্থী নিযুক্ত হল। প্রত্যেকে ভার পেল কে কি রান্না করবে, কে কি যোগান দেবে তার। একদল চাকর নিযুক্ত হল, যারা বাবুর্চিখানা থেকে খাবার বয়ে এনে বাবুদের প্লেটে পেঁছে দেবে। গগন প্রায় প্রতিদিনই বাবুর্চিদের ডেকে তাদের রান্নার বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো এ কোর্সটা বদলে ও কোর্সটা ঠিক করে দিচ্ছেন, কিন্তু শেষদিন অবধি ডিনারে কি পুডিং থাকবে তার কোনো নির্দেশ দিলেন না। বাবুর্চিরা নিজেদের মধ্যে কথা কওয়া-কওয়ি করল, অবাক হল, কিন্তু ভয়ে কেউ গগনকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না।

পুডিং কি বাবু তাহলে এবার বাদ দিলেন? সবাই ভাবল তাই। অথচ ঠাকুরবাড়ির কোনো ডিনার থেকে কোনো দিন তো পুডিং বাদ যায়নি। যে পুডিং-এর উচ্চারণ শোধরাতে গিয়ে অবনকে ইস্কুল ছাড়তে হয়েছিল সেই পুডিংই এবারে নেই? অবনেরই বড় ছেলের বিয়েতে?

সন্ধ্যেবেলায় নিমন্ত্রিতরা সকলে এসে গেলেন। ডিনারের সময় হয়েছে। বাবুর্চিখানা থেকে সুরুয়ার গন্ধ নাকে এসে লাগছে। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ছিলেন খুবই উঁচু দরের খাদ্যরসিক—ফরাসী ভাষায় যাকে বলে গুর্মোয়া। তিনি গগনের কাছে জেনে নিলেন আজকের ডিনারের ক'টা এবং কি কি কোর্স। সব বলা হলে প্রফুল্ল বললেন—শুনে তো মনে হচ্ছে ডিনার খুবই ভালো হবে, তবে পুডিং করেন নি? ডিনারে সবই হলো, পুডিং বাদ?

গগন শুধু একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন, কিন্তু উত্তর করলেন না।

প্রফুল্ল বুঝলেন, বিয়ে-বাড়ির গোলমালে একটা ভুল হয়ে গেছে। তাই এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না।

তারপর ডিনার শুরু হয়ে গেল। একটার পর একটা কোর্স আসতে লাগল। গরম সূপ এল প্রথমে। মাছের কোর্স একের পর এক তিনখানা। তরকারির স্যালাডে ভর্তি করে দেওয়া হল টেবিল। মাংস আসতে লাগল নানারকম। মোগলাই রান্না, ইংরেজী রান্না, ফরাসী রান্না, পর্তুগিজ রান্না। সব শেষে বেহারারা যখন ফল আর বাদাম আনবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, হঠাৎ দেখা গেল উর্দি-পরা একদল 'বয়' ডিনার -হলে ঢুকে পড়ছে—তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ট্রে। সাজানো অনেকগুলি প্লেট। প্লেটের উপর একটি করে বড় সন্দেশ কপি। শোনা গেল এইমাত্র পো কোম্পানি থেকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছে জোড়াসাঁকোর গাড়ি-বারান্দায়, তার থেকে নামছে কেতা কেতা কপি।

ততক্ষণে নিমন্ত্রিতদের সামনে একটি

...ক্কার প্লেট এবং তাতে একটি করে কপি ...া শুরু হয়ে গেছে। অনেকেই ভাবছেন, ...ার শেষ হতে চললো এখন সিদ্ধ করা ...প, এ কি পরিহাস। আর যাঁরা ছুরি দিয়ে ...পির মাথাটা একটু কেটে দেখেছেন তাঁরা ...ঝেছেন এ এক অপূর্ব জিনিস। কপি নয়, ...পির আকারে কেক। কপির মধ্যে সিদ্ধ করা ...না ফল, সিরাপ আর কাস্টার্ড ভরা—...রফে ঠান্ডা করা—ফলের পুডিং। কপিটি ...াসলে সবুজ রং-করা চিনি দিয়ে তৈরী।

এইবার সবার মুখে হাসি ফুটল।

সেদিনের ডিনারে এইটিই ছিল সেরা ...শ। কারণ, সে ডিশ ছিল সকলের ...পনার বাইরে গগনের যাদুকাঠি দিয়ে তৈরী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিল সেই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার অসুস্থ হয়ে জোড়া-সাঁকোয় আসেন। শান্তিনিকেতনে সি এফ এন্ডরুজের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দ্বিজেন্দ্র শান্তিনিকেতন থেকে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আসায় এন্ডরুজও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলেন, তাঁকে দেখা-শোনা করবার জন্যে, তাঁকে সেবা করবার জন্যে।

অসুখে পড়বার আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ বোয়ার যুদ্ধের অগ্রগতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করছিলেন। অসুখে পড়েও তার কমতি দেখা গেল না। যুদ্ধের বিকাশ, যুদ্ধের ফলাফল জানবার প্রচুর উৎসাহ দ্বিজেন্দ্রনাথের। এন্ডরুজের কাছ থেকে সমস্ত খবর নেন। এন্ডরুজ তাঁর মাথার কাছে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে শোনান। বোয়াররা জিতলে, ইংরেজরা হারলে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। এন্ডরুজ সায়েব যে খাঁটি ইংরেজ, তাঁর সামনেও ইংরেজের পরাজয়ে পুলক প্রকাশ করতে দ্বিজেন্দ্রের একটুও বাধে না। এন্ডরুজ পরম অনুরাগ ও অভিনিবেশের সঙ্গে রবীন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করে চলেন। খবরের কাগজে যেখানে ইংরেজের হারার খবর থাকে সেখানটা ফলাও করে বলেন দ্বিজেন্দ্রকে আনন্দ দেবার জন্যে।

যখন খবর বলা শেষ হয়ে যায়, দ্বিজেন্দ্র জানতে চান এন্ডরুজের ঘর-সংসারের কথা। এন্ডরুজ অবিবাহিত, বাড়িতে গেলে তাঁকে রেঁধে খাওয়ান তাঁর মা।

দ্বিজেন্দ্র বলেন—কি খাওয়ান? কি রাঁধেন তোমার মা? কি খেতে তুমি ভালবাস?

এন্ডরুজ বলেন—কি খেতে আমি ভালবাসি? কি খাওয়াতে ভালবাসেন আমার মা? জানতে চাও! শোনো তবে। বলি। আমাদের পরিবারের প্রিয় খাদ্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কেচ : গগনেন্দ্রনাথ

হচ্ছে আপেলের টার্ট। মা খুব ভালো টার্ট বানাতে পারেন।

শুনে দ্বিজেন্দ্র চুপ করে গেলেন। এন্ডরুজের সেবায় দ্বিজেন্দ্র ক্রমেই ভালো হয়ে উঠছিলেন। শেষে সম্পূর্ণ সেরে উঠলেন। বোয়ার যুদ্ধও সেই সময় শেষ হয়ে গেল। বোয়াররা জিতলো। ডাক্তাররা দ্বিজেন্দ্রকে পথ্য করতে বললেন।

দ্বিজেন্দ্র এন্ডরুজকে ডেকে বললেন—সায়েব, অসুখ তো সারল, বোয়াররাও জিতল। সেলিব্রেট করব। আপেলের টার্ট খাবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে, খাওয়াতে পারো?

এন্ডরুজ সায়েবের মাথায় হাত। ইংলণ্ডে থাকলে মা-কে বলে এখনই এই ভারতীয় দার্শনিককে আপেলের টার্ট খাইয়ে খুশী করে দিতেন। এখানে এই গরমের দেশে আপেলই বা তিনি কোথায় পান, টার্টই বা তাঁকে কে বানিয়ে দেয়? বুড়োকে টার্ট-এর লোভ দেখিয়ে আচ্ছা মুশকিলে পড়লেন তো তিনি।

কার কাছেই বা উপদেশ নেন। এন্ডরুজ সাহেব ছুটে গেলেন পাশের বাড়িতে গগনের কাছে পরামর্শ চাইতে।

গগন শুনে বললেন—এই কথা! কিছু ভাববেন না, সায়েব। বন্ধুকে বলে দিন, ভালো আপেলের টার্ট এনে দেব। কালই পাবেন।

তখনকার দিনে পেলিটি নামে এক ইটালিয়ান খাবার-দোকান কলকাতায় ছিল। এদের সঙ্গে গগনের পরিচয় ছিল খুব। তিনি ওদের রান্নাঘরে গিয়েও খাবার তৈরি দেখে আসতেন, নানারকম খাবারের অর্ডার দিতেন।

পেলিটিকে বলতেই তারা আপেল, ময়দা, কিশমিশ, চিনি আর ময়ান দিয়ে একথালা আপেল টার্ট করে গগনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। দ্বিজেন্দ্র ও এন্ডরুজ তো খেলেনই, গগনের বাড়ির সবাই খেয়ে দ্বিজেন্দ্রের আরোগ্যলাভ সেলিব্রেট করলেন। সেই সঙ্গে বোয়ার যুদ্ধ সমাপ্তিও সেলিব্রেট করা হল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

প্রতিষ্ঠা আর মর্যাদা

আমাদের শাসনতন্ত্রের আইনে অর্থাৎ কনস্টিটিউশনের শর্ত হিসাবে মেয়ের অধিকার পুরুষের সঙ্গে সমান এ কথা আর কারও অজানা রয়নি। নানা অনুবিধিতে অধিকার সম্পূর্ণ হয়েছে। শহরে এবং শিক্ষিত সমাজে নারীর মর্যাদার মাত্রা নিয়ে চিন্তা করার দিন চলে গেলেও দেশের জনসাধারণের এক মস্ত অংশ নারীর অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন। বিশেষ করে নারী নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রচেষ্টা করে না। হয়তো বা সে জানেও না কি তার স্বত্ব। ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয় সে বিষয়ে আলোচনা করবার ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই Committee on the Status of Women এর চেয়ারম্যান প্রাক্তন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ ফুলরেণু গুহ। নয়-জন সভ্য নিয়ে সমিতি। শ্রীমতী শকুন্তলা মাসানি হয়েছেন মেম্বর সেক্রেটারি। শ্রীমতী লতিকা সরকার আইনের দিক দেখবেন, কারণ তিনি আইনজ্ঞ। দলের সকলেই স্বীকৃতিসম্পন্ন। শ্রীমতী নীরা ডোগরা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান। আলিগড়ের সাকিনা হাসান নোট দিয়েছেন মুসলিম মেয়েদের মর্যাদা নিয়ে। কাজেই সাংবাদিকমহলের মন্তব্য বা টিপ্পনি আমরা মানি না। কোথাও কোথাও মত প্রকাশিত হয়েছে যে কমিটিতে বিশেষজ্ঞের বালাই নেই। বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হবার মত কাজ তো নয়। বরং কমিটি যদি

ঠিকমত 'সার্ভে' করতে পারেন তবে বরং উত্তরকালে তথ্যগুলি কাজে লাগবে। শুনলাম দরকার হলে তাঁরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন ও প্রয়োজন মত তাঁদের দেশের নানাদিকে ঘোরাফেরার সুযোগ দেওয়া হবে। কাজেই বিশেষজ্ঞ না থাকা বিশেষ চিন্তার কিছু নয়। কমিটি যদি কনস্টিটিউ-শনের অনুবিধির মত কাগজপত্রে কাজ না চালিয়ে সত্য তথ্য ও তার প্রতিকারের পরামর্শ দেন তবেই অহেতুক ভয় পাবার প্রয়োজন থাকে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শুভেচ্ছাসহ শ্রীমতী গুহ তাঁর কমিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনপর্ব আরম্ভ করলেন। সমস্ত সমস্যাটিকে দু'চারকথায় সুন্দরভাবে বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মঙ্গলাভিলাষ জানিয়ে-ছেন:

"The Committee on the Status of Women has been set up mainly in order to help up in fomulating social policies which will make equal right for women a reality."

নারীর অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ক এ কমিটির মুখ্য কর্তব্য মেয়েদের দাবিকে বাস্তবে পরিণত করা। 'বাস্তবে পরিণত' করাই যে সবচেয়ে বড় সমস্যা এতে কোন সন্দেহ নেই। অধিকার এবং তার বাস্তব পরিণাম সমান গুরুত্বপূর্ণ। বরং বলবো অধিকারের চেয়ে বেশী তার সার্থকতার স্বরূপ। নারী বহুক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফহাল নয়। যেখানে সে ওয়াকিফহাল সেখানেও সমাজ ও সংসারের বিচারে সংস্কারাচ্ছন্ন তার মর্যাদা। একদিকে যে জননী। শাস্ত্রমতে স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী। অন্যদিকে অন্যায় ও অবিচার তার প্রতিপদক্ষেপ কুণ্ঠিত করে রেখেছে। একদিকে সে 'গৃহিণী সচিবসখী' অপরদিকে সে তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের চব্বিশ ঘণ্টার দাসী, অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে!

বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি নারীর অবস্থার পরিবর্তনকে প্রায় অপরিহার্য করে তুলেছে। সরকার কমিটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে তথ্য সংগ্রহ করার ফতোয়া দিয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছে অনেক আশা রাখি। কাজ কঠিন। কিন্তু দায়িত্ব যখন তাঁরা নিয়েছেন তখন এক মূক সমাজের মুখপাত্র তাঁদের হতেই হবে।

সমস্যাকে ও'রা ভাগ করেছেন। আনু-ভূমিক ভাগে তাঁরা নিজেরাই জানেন নারী প্রগতিতে আমরা বিশ্বের বিস্ময়। তবে অগ্রগতির পরিমাণ, উল্লম্ব বা খাড়া। সমাজের মুষ্টিমেয় মেয়েই এ ঊর্ধ্বাধঃভাবে ভাগ করার সীমানায় পড়েন। দিগন্তপ্রসারী এ দেশের বিস্তীর্ণ পল্লীসমাজে আজও প্রগতির স্পর্শ অতি সামান্য। নেই বললেই হয়।

ও'রা অর্থনীতিক, কানুন সম্বন্ধীয়, রাজনীতিক এবং সামাজিক সব সমস্যাই সমীক্ষায় আনবেন বলে স্থির করেছেন। অর্থনীতির জটিল প্রশ্নটির ইতিহাস বেশী-দিনের নয় বটে কিন্তু তার সমাধান সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠছে। যেমনই তার চাপ সমাজে সবমহলে প্রকট তেমনই তার উপায় নির্ণয় করা শক্ত। মেয়েদের অর্থ উপার্জন করা দরকার অথচ পুরুষের জীবিকার যেখানে আশানুরূপ আয়োজন নেই সেখানে মেয়ের ভূমিকা গ্রহণ সমস্যাকে জটিলতর করে তুলছে। শিক্ষিত মেয়ের অধীত বিদ্যাকে বেকার করে রাখা জাতীয় অপচয়। আবার সীমার মাঝে সংকীর্ণ চাট্টি চাকরি বা পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ঠেলাঠেলি পরিণামে কি দাঁড়াবে কে জানে! কমিটি কি ভাবে

যাদের সমীক্ষার সামনাসামনি হবেন আমাদের তাও জানা নেই। প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে মতগ্রহণ 'সার্ভে' করার নিয়ম সবচেয়ে বেশী চলে। কিন্তু কাজটি যাঁদের মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাবেন বলে আমরা আশা করি তাঁরা হয়তো প্রশ্ন বা তার উত্তরের বাইরে।

আইনের বেলায় বহু উন্নতি সত্ত্বেও ফাঁক রয়ে গেছে প্রচুর। কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন বা Personal Law এখনও মহিলা সমাজকে সমান অধিকার দেয়নি। মুসলিম আইন এ ব্যাপারে বিশেষ জটিল। অথচ মুসলিম রক্ষণশীলদল ব্যক্তিগত আইনে পরিবর্তনবিরোধী। মুসলিম মহিলাদের অধিকার সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করবো। জানিনা আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে মুসলিম মহিলার সংখ্যা কত। তাঁদের মতামত কিছু থাকলে জানতে ইচ্ছা হয়। হয়তো বা মহিলা সমাজের অনেক উপকার হবে তাতে। আমাদের সমস্যা নারীর অধিকার নিয়ে। সেখানে কোন সম্প্রদায়ের কোন বিশ্বাসে আঘাত করার উদ্দেশ্য নেই।

সামাজিক সমস্যার দিকও একটি নয়। নারীর স্থান পরিবারে নিত্য নানারূপে। বিবাহ তার মধ্যে প্রধান। বিবাহে দুটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মর্যাদার সমীকরণ বা Epuation হয়। সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ও এলাকার প্রশ্ন ওঠে। অধিকারের প্রতিষ্ঠার বিষয় ভাববার কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় কি এবং কেন তাও খুঁজে দেখতে হয়। বিবাহে যৌতুক যেমন অবাঞ্ছনীয় তেমনই তার প্রসার বাড়ছে। সোজাভাবে যৌতুকগ্রহণ বাদ দিয়ে যৌতুক নানা ছলে নেবার ব্যবস্থা হয়। সম্পত্তিতে কন্যাকে অথবা স্ত্রীকে অধিকার দেওয়া হয়েছে কিন্তু ওজর আপত্তি তো বটেই, মিথ্যা অজুহাতে নারীকে বঞ্চিত করার কথা আগের মতই তাদের অসহায় করতে চায়। কোন কোন বড় মহিলা কল্যাণ প্রতিষ্ঠান অসহায় নারীকে সাহায্য করবার কাজের ভার নিয়েছেন কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে-সাহায্য পেতে যা সুযোগ দরকার তা-ই বা এদেশে কটা মেয়ের আছে? গণিকাবৃত্তি অথবা নারীদেহ পণ্যের উপার্জন ভোগ করায় সমস্যা সমান রয়েছে। আইনকে ফাঁকি দিতে কৌশলের অভাব হয় কি? বিধবা ও বৃদ্ধা কতটুকু আশ্বাস পেয়েছেন সমাজের অগ্রগতির কাছে? বৃদ্ধবৃদ্ধার সমস্যা এককভাবে মস্ত সমস্যা। তার মধ্যে নারীর যৌবন বা কর্মদক্ষতা ফুরিয়ে গেলে সমাজ তার দাম ধরে বিয়োগের ঘরে।

এ প্রসঙ্গে একটি দিনের কথা বলে আজ শেষ করবো। মাদার টেরেজার যে অন্তিম আশ্রয়দানের ব্যবস্থা আছে কালীঘাটে প্রায় কালীমন্দির ঘেঁষে, সেখানে একদিন সকালে গিয়েছিলাম। নির্মল হৃদয় শরণার্থীর সারি সারি বিছানা গৃহতলে পাতা। মুমূর্ষু মানুষ পথ থেকে কুড়িয়ে আনেন মাদারের সেবিকা সেবকবাহিনী। পাতা। মুমূর্ষু মানুষকে পথ থেকে কুড়িয়ে বেঁচে যায়। যারা বাঁচে না তারাও অন্তিমে

শান্তিতে শয়ন করবার সুযোগ পায়। পথের আবর্জনা জড়িয়ে তাদের মৃত্যু যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া থেকে বাঁচবার সুযোগ মেলে। যে 'নান' বা সন্ন্যাসিনী সংগে ছিলেন তিনি ফরাসী। কুসুমকোমল কিশোরী সুন্দরী। কেন সন্ন্যাসিনী হয়েছেন কে জানে! তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েদের ঘরটি কোন দিকে? গভীর নীল চোখ তুলে বললেন, সহ্য করতে পারবে সে দৃশ্য? কেন? এইতো দেখছি মরণপথযাত্রীদের মেলা। সন্ন্যাসিনী বললেন, মেয়েদের দুঃখ আরও বেশী, আরও করুণ সে দৃশ্য। বিভীষিকাময় হয়ে যাবে তোমার আগামী মুহূর্তগুলি। তবু গেলাম। কি সাংঘাতিক সে দৃশ্য। বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। মরণেও ভেদ? কি করে হয়! সুন্দরী সন্ন্যাসিনী বললেন, মরণেও নারীর জ্বালা অনেক বেশী। যেটুকু পুরুষ পায় সমাজে বা সংসারে, নারীকে তা দেয় নিষ্ঠুর মানুষ। তাই তাদের এমন দশা। বলুন এবার ফনুরেণু, গৃহ আর তার কর্মীটি কেমন করে তাঁরা এখানে নারীর মর্যাদায় নতুন মাপকাঠি সংযোগ করবেন।

শ্রীমতী

॥ লাইব্রেরি ॥

জনাব সাহেব তারপর পড়াশোনার কথায় এনে পাড়ার চেষ্টা করেন আমাকে—'না, ওকথা শুনচি না। বিদ্যাস্থানে ভয়েবচ-র কথায় ভুলচিনে আমি। লেখাটেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আপনার বেশ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।'

'একদম কিছু না জানার ঐ তো মজা মশাই! কিছুই না জেনেও স্বচ্ছন্দে সবজান্তা হওয়া যায়।'

'তা কি হয় নাকি কখনো? লেখক হতে হলে অনেক পড়াশোনা করতে হয়। কল্লোল যুগের আপনার বন্ধুরা প্রায় সবাই দারুণ পণ্ডিত। তাঁদের বাড়ি গেলে ঘর-বোঝাই আলমারি-ঠাসা বই দেখতে পাই, একালের সেকালের নামকরা দেশি বিদেশি নানারকম বই।'

'আমার এখানে দেখছেন কি? তাঁতি-পাঁতি করে খুঁজলেও আমার নিজের লেখাও একখানা প্যাবেন না।'

'তার মানে?' তিনি মানতেই চান না—'এখানে বই না থাক, লাইব্রেরিতে গিয়ে আপনি পড়াশোনা করে থাকেন নিশ্চয়। অনেক লেখক যেমন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যান পড়তে, আবার সেখানে বসে লিখতেও।'

'রিসার্চ স্কলাররা। কিন্তু ট্রামবাসের ধকল ঠেলে সাত মাইল ঠেঙিয়ে ওখানে যাবার আমার উৎসাহ হয় না। কানেই শোনা, কোনোদিন চোখেও দেখিনি, কেমন দেখতে লাইব্রেরিটা। তাছাড়া, আমার রিসার্চ করার কিছু নেই। আমার যাকিছু রিসার্চ তা শুধু এই আমাকে নিয়েই।'

'কিন্তু না পড়লে কি মশাই লেখক হওয়া যায়?'

'যায় না বোধহয়। গোড়ায় কিছু কিছু পড়তেই হয় বইকি—ঐ লেখার অক্ষর-পরিচয়ের জন্যই। কী লিখব, কেমন করে লিখব—সেইটে জানতেই। কথাটা আপনার মিথ্যে নয়, রবীন্দ্রনাথও একদা ঐ কথাই বলেছিলেন আমার বন্ধু শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়কে।'

'কিরকম?'

'সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায়ের শৈশব থেকেই লেখক হবার শখ। কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সেইকালেই। তিনি তাঁকে স্নেহ করতেন খুব। কী করে লেখক হওয়া যায় এই কথা শুধোতে তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, লেখক হতে হলে তার আগে পাঠক হতে হয়। বড় বড় লিখিয়েরা সব বড় বড় পড়ুয়া। বিস্তর পড়াশুনা না করলে লেখক হওয়া যায় না। লেখাপড়া শেখার কালে যেমন আগে লেখা, তার পরে পড়া। প্রথমে হাতে খড়ি হোলো, তারপরই তুমি প্রথম ভাগ ধরলে—লেখক হবার বেলায় ঠিক তার উল্টোটাই। আগে অনেক কিছু পড়া, তার পরেই লেখাটেখা। আগে তোমায় পড়তে হবে বিস্তর, তবেই তো তুমি লেখক হবে। গোড়ায় পড়ো, পরে পাড়ো।'

'ভারী চমৎকার কথাটা বলেছিলেন তো গুরুদেব।'

'কী ভাষায় বলেছিলেন জানিনে, তবে কথাটা এইরকমই। আমার ব্যক্তিগত ভাষণে বিবৃত করলাম। তবে এই ধরনের একটা কথা বিশুবাবুর মুখেই আমি শুনে-ছিলাম অনেক দিন আগে।'

'তা, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না যান কলকাতায় আরো তো ঢের পাঠাগার আছে তার থেকেও কি বইটই এনে পড়া যায় না?'

'পড়েছিলাম।' আমার মনে পড়ে—'যখন কলকাতার রাস্তায় খবর কাগজ ফেরি করতাম না? সেও আমার সেই কৈশোর কালেই, আমারই সগোত্র একটি ছেলে একটা লাইব্রেরির খবর আমায় দিয়েছিল, [illegible] লাইব্রেরি। বিডন স্ট্রীট দিয়ে বাঁ ফুট ঘেঁষে গেলে মিনার্ভা থিয়েটারের ঢের আগেই পড়ে সেই লাইব্রেরিটা, বাতলেছিল

যে। সেখানে টাকা জমা দিয়ে মেম্বার হলে চাঁদার বদলে বই নিয়ে পড়তে দেয় সে বলেছিল। সেখান থেকে বিস্তর বই নিয়ে পড়েছি একসময়। মানে, সেই সময়েই।'

আমার মনে পড়ে যায়—'কাগজের পাঁজা বগলে নিয়ে সাত সকালে গিয়ে দাঁড়াতাম তো হেদোর ধারে। আমার আনন্দবাজার, বসুমতীর খদ্দের তো যতো দিদিভাইরা। তখনো ঢের দেরি তাঁদের আসবার। দশটার আগে তো কেনো দিদিভাই-ই আসছেন না আর!'

'দিদিভাই? দিদিভাইরাই আপনার কাগজ কিনতেন নাকি? অপত্যস্নেহ বলে একটা কথা আছে জানি, কিন্তু নাতিবৃহৎ বাৎসল্যের ব্যাপার বলে তো শুনিনি কখনো?'

'আহা, সেই দিদিভাই নাকি মশাই?' বাতলাতে হয় আমায়—'বেথুন স্কুল আর কলেজের মেয়েরাই তো খদ্দের ছিল আমার না? দিদি আর ভাই পাতিয়ে পটিয়ে ফেলেছিলাম তাদের। মেয়েদের সঙ্গে, চেনাই কি আর অচেনাই কি, ভাব জমাতে আমি ভারী পটিয়স, সেই ছেলেবেলার থেকেই—জানেন তা?

'জানলাম। তা কী রকমটা, শুনি একবার?'

'আমার চেয়ে বড়ো মেয়েদের, কলেজের মেয়ে তারা, তাদের কাছে গিয়ে বলতাম কাগজ নেবেন দিদি? আর যারা বয়সে ছোট তাদের সাধতাম—কাগজ নেবে ভাই? মহাত্মা গান্ধী আজ কী বলিয়াছেন শুনবে? নাও না একখানা। পড়ে দ্যাখো।'

'নিত তারা?'

'না বলত না কেউ। প্রায় সবাই-ই নিত। যত কাগজ আনতাম, যা পেতাম আর কি আপিস থেকে—হু হু করে কেটে যেত সব। তা শুনুন......সেদিন সকালে হেদোর মোড়ে দাঁড়াতেই ছেলেটার কথাটা খট করে আমার মনে পড়ল। সামনেই তো বিডন স্ট্রীট? খটকাটা আজই মিটিয়ে ফেলা যাক না! আমার দিদিভাইরা আসবার আগে হিরণ লাইব্রেরির খোঁজ নিই না গিয়ে।

কাগজের পাঁজা বগলে বিডন স্ট্রীট-এর পথ ধরলাম। মাঝে মাঝে এক আধখানা কাগজও ঐ ফাঁকে বিক্রি হচ্ছিল না তা নয়—এমনি যেতে যেতে মিনার্ভা থিয়েটার পেরিয়ে গেছি—তখন আমার চৈতন্যোদয় হোলো। সামনে চৈতন্যোদয় দেখলাম।

'সামনে চৈতন্যোদয়? সে আবার কী ব্যাপার?' তাঁর বোধগম্য হয় না।—'সেরকমটা আপনার হয় না নাকি?'

'চৈতন্য লাইব্রেরির আবির্ভাব দেখলাম' আমি কই—চৈতন্য লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রী রিডিং রুম। আরে, আরেকটা লাইব্রেরি যে রয়েছে এখানেই। বেশ বড়ো লাইব্রেরিই বোধ হচ্ছে। এর কথা তো কই বলেনি সেই ছেলেটা। ঢুকলাম ভেতরে। বড় হল-এ বৃহৎ টেবিলে নানান পত্র-পত্রিকা বিস্তারিত—বসে বসে পড়ছিল বহুৎ লোক। আমি ভেতরে যেতেই একজন, হয়ত ঐ পাঠাগারের কর্মকর্তাই হবেন কেউ, বললেন আমাকে—তোমার কোনো কাগজ চাই না আমাদের। খবর কাগজ কি পীরিয়ডিক্যাল আমাদের কিনতে হয় না, অমনি আমরা ওসব কমপ্লিমেন্টারি পাই। অনেক দিনের বিখ্যাত লাইব্রেরি আমাদের... অমনি মেলে তাই। যাও, এখান থেকে কেটে পড়ো ভাই।'

'কেটে পড়লেন?'

'কী করবো? এমন অকাট্য কথার পর আর কি এক মুহূর্ত সেখানে কাটানো যায়? তবু তার মধ্যেই আমার কার্যোদ্ধার করেছি, জেনে নিয়েছি তাঁর কাছ থেকেই হিরণ লাইব্রেরির ঠিকানাটা। এই রাস্তারই কোথায় যেন হিরণ লাইব্রেরি বলে আরেকটা লাইব্রেরি আছে না? সেখানেই আমি যেতে চাইছিলাম মশাই। আরে সে তো তুমি ছাড়িয়ে এসেছো অনেক আগে, জানালেন তিনি, এই ডান দিকের ফুট ধরে চলে যাও বরাবর, মিনার্ভা থিয়েটার পেরিয়ে খানিক এগিয়ে গেলেই নজরে পড়বে তোমার। সাইনবোর্ড আছে রাস্তার ওপর। কিন্তু, সে লাইব্রেরি তো সন্ধের আগে খোলে না বাপু, তাও আবার ঘন্টা দুয়েকের জন্যেই। ছোট্ট লাইব্রেরি। আমাদের মতন এত বড় ফ্রী রীডিং রুম নেইকো তার।'

'তার পর?'

'তারপর আর কী? সেদিন ছ'টার শো-র সিনেমা না দেখে যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলাম যথাস্থানে। অনেক দিন সেই লাইব্রেরির সদস্য ছিলাম, প্রায় সব বই-ই পড়ে ফাঁক করেছি তার। লোকগুলো ভারী ভদ্র সেই লাইব্রেরির। যে বই-ই চাইতাম, দিয়ে দিত চটপট। চার আনা কি আটআনা দামের তাদের লাইব্রেরির একটা ক্যাটালগও দিয়েছিল আমাকে—দেখে দেখে বাছাই করে বই নিতাম। যেমন চমৎকার সেই লাইব্রেরিটা—তেমনি তার লোকগুলোও।'

'তারপর?'

'তারপর সেই হিরণ লাইব্রেরী ফাঁক করার পর আর কোথাও তাক করার সুবিধে হয়নি। তাকাব কি, কলকাতার কোথায় কোন পাবলিক লাইব্রেরি আছে তার খবরই রাখতাম না। অনেক দিন বাদে একটা সুযোগ এল আবার। তখন আমি চোরবাগানের বাসায় থাকি, চোরবাগান আর কলাবাগান যেখানে এসে গলাগলি করেছে সেই চোরা গলির মোড়ে কি করে সেই গোপালবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল হঠাৎ। পুরো নামটা তাঁর মনে পড়ে না—গোপালচন্দ্র শীলই হবেন বোধ হয়। তিনি কী একটা লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের একজন জানলাম। সুহৃদ লাইব্রেরি, মহম্মদ আলি পার্কের কাছাকাছি কোথায় যেন সেই পাঠাগারটা। আলাপের পর তিনি আমায় তাঁর বাড়িতেও নিয়ে গেছলেন একবার। খাইয়েছিলেনও খুব, মনে আছে।'

'সেই জন্যেই তাঁকে আপনার মনে আছে বোধ হয়।'

'তা ঠিক। জন্মভোর তো পরের খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছি আর ওই খাবার ঠেলায় আমার হৃদয়দেশ ডায়ালেটেড হয়ে উদরের কাছেই এসে ঠাঁই নিয়েছে প্রায়। আমার অন্তরে স্থান পেতে হলে যুগপৎ আমার উদর আর হৃদয় আক্রমণ করতে হয়। শুধু আমার বেলায় নয়, সবার বেলাতেই বুঝি, ঐ হৃদয় ভেদ পেতে হয়। যাক্ গে—গেলাম তো তাঁদের বাড়ি। বাড়ি দেখে মনে হলো তাঁরা অনেক কালের বনেদী। পুণ্যশ্লোক মতিলাল শীলেরই কেউ হবেন কি না জানি না।'

'কি রকম বাড়িটা? খুব জমকালো? মার্বেল প্যালেসের মতন?'

'তার ধারে কাছে না। বাড়িটার বৈশিষ্ট্য উচ্চতায় ততটা নয় যতটা গভীরতায়। কারো বাড়ি গেলে সদর দরজা পেরিয়ে উপরেই উঠতে হয় তো? তাঁর বাড়িতে ঢুকতে হলে সদরের চৌকাঠ পেরিয়ে তিন ধাপ নামতে হয়। রাস্তার সমতল থেকে তাঁর গ্রাউন্ডফ্লোরের তলদেশ আরো তলায়। জব চার্ণকের আমলের বাড়িই হবে বোধ হয়। তার পরে কলকাতার পথ ঘাটের উন্নতি হয়েছে কিন্তু তাঁর বাড়িটা আর উন্নীত হতে পারেনি।'

'তারপর আর যাননি তাঁর বাড়িতে কখনো?'

'বর্ষাকালে গিয়ে দেখবার কৌতূহল হয়েছিল একবার—সেই সময় তাঁর বাড়ির তলদেশের কী দশা দাঁড়ায় দেখতেই—কিন্তু তার সুযোগ ঘটেনি।

তাছাড়া, সাঁতার জানিনে, সেদিক দিয়েও বাধা ছিল আমার।...সে কথা যাক্, তাঁর সুহৃদ লাইব্রেরিতে বিদেশী বইয়ের বেশ ভালো সংগ্রহ ছিল। মোপাসাঁ, হার্ডি, হামসুন, গোর্কি, ইবসেন, শ, পীরান্দেল্লো, মেটারলিংক, বেনাভেনতে যোহান বোয়ের প্রভৃতি কতজনের বইয়ের সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় সেইখানেই আমার। সেই শীল

আমার সৌজন্যেই যা আমার বিদেশী সাহিত্যের অনুশীলন। আজও আমি কৃতজ্ঞ-চিত্তে সে কথা স্মরণ করি, চাঁদা না নিয়ে অমন জোর করে আমায় গিলিয়ে না দিলে যথার্থ সাহিত্যের আস্বাদই আমি পেতাম না কোনোদিন। সুহৃদ পাঠাগারেই বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় হল।'

'তাতে আপনি লাভবান হয়েছেন, একথা আপনি মানবেন নিশ্চয়?'

'আমার লাভ? না, আমার কী হবে—তবে বাংলা সাহিত্যের যে লাভ হয়েছে তা আমি বলব। লিখতে হলে কী লিখতে হয় আর কী করে লিখতে হয় টের পেয়ে গেলাম আমি। সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে অমন ধারাই করতে হয়—অমনটাই হওয়া চাই। আর বুঝলাম যে তা আমার দ্বারা হবার নয়। ওদিকেই তাই গেলাম না আর—বেঁচে গেল বাংলা সাহিত্য—আর বাঙালী পাঠক—একটা উপকার হলো না? সাহিত্যও বাঁচল, আমিও বেঁচে গেলাম। সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে চলে এলাম এই সাংবাদিকতায়—যে বিষয়ে রপ্ত হচ্ছি এখনো— যৌনক নিয়ে আমার আমরণ বর্তমান।'

'না না, আপনি গল্প-টল্পও তো লিখেছেন কিছু কিছু—ছোটদের বড়দের। সাত সতের অনেক কিছুই লিখেছেন আপনি। সাহিত্যিকও বলা যায় বইকি আপনাকে।'

ভদ্রলোক তাঁর ক্ষোভকথা শোনান।

'ঐ ঠিক বলেন। সাত সতের অনেক কিছুই লিখেছি বটে, সব মিলিয়ে সংখ্যায় সাত শো ছেরই হবে হয়ত বা—লেখার ঐ মোট নামিয়ে লম্বা ফর্দ ফেঁদেই তো মোটামুটি বেঁচে থাকতে হয়েছে এতকাল—কিন্তু সত্যি বললে কিছুই কিছু হয়নি। শিশুসাহিত্য শিশুদের হয়নি, বড়দের লেখা বড়দের পড়ার মত নয়।'

'তবে কাদের জন্য? কী লিখেছেন এতদিন ধরে তাহলে?'

আমার লেখা ফর অ্যাডাল্টস ওনলি

'আমিও তাই ভাবি। কী লিখলাম তবে? আমার লেখা কী ধরনের ছোট-বড়রা পড়ে বলুন? যারা সত্যিকারের ছোট নয়, আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে বড়, বয়সে বারো কিন্তু মনের বাড় তার ঢের বেশি—আসলে ভেতরে ভেতরে তারা যুবকই বলতে গেলে। প্রায় যুবক, কিম্বা যুবকপ্রায়—যাই বলুন। তারাই আমার লেখায় রস পায়। আর বড়োদের কথা শুধোচ্ছেন? যারা বয়সে অনেক বেড়ে গেলেও অন্তরে সেই শিশুটি কি কিশোরই রয়ে গেছে—মনের দিকে বদলায়নি বিশেষ—আমার বড়দের লেখা কেবল তাঁরাই পড়ে থাকেন। এককথায়, আমার লেখা ফর অ্যাডাল্টস ওনলি। আর ঐ মার্কার যা কিছু, ছোটরাই তার গ্রাহক তা জানেন ত? আর, ছোটদের বড়ো হবার শখ—বড়র ঝোঁক, কেনা জানে? এবং বিস্ময়কর শোনালেও বড়রা সব ছোট হতে চায়। তাই যারা ফের মনের কৈশোরে ফিরে যেতে চান—সেই বড়রাই আমার অনুগ্রাহক। এককথায় আমার লেখা আসলে অ্যাডাল্টারেটেড।'

'অ্যাডাল্টারেটেড? মানে, ভ্যাজাল বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ ভ্যাজাল বইকি। আর এই কারণেই আমি সাহিত্যে না গিয়ে সাংবাদিকতায় এলাম। অবশ্য, বলতে পারেন সাহিত্য আর সাংবাদিকতা একাকার হয়ে গেছে একালে। এও এক রকমের ভেজাল। কিন্তু ভেজাল হলেও বেশ মুখরোচক, এবং পুষ্টিকারক নয় কি? তবে, আমার দিক থেকে সেটা বোধ হয় আলাদা। যথার্থ সাহিত্যিক যেমন হতে পারিনি, তেমনি যথোচিত সাংবাদিকও আমি হইনি সঠিক। গোঁজামিল রয়ে গেছে সেখানেও। হয়ত সেটা গাঁজার মিল। সেই কারণেই হয়ত একটু মৌজ লাগে, একদল অ্যাডিকটেড পাঠক চিরকালই পাওয়া যায়—যারা কিনা ওই গাঁজাদারের মজাদারির লোভে তার রুজি-রোজগার বজায় রাখে। কিন্তু এটাকে তো নির্ভেজালে বলা যায় না কিছুতেই।'

'ওকথা থাক।' প্রসঙ্গটা তিনি চাপা দিতে চান—'কথা হচ্ছিল আপনার বই পড়ার বিষয়ে। সুহৃদ লাইব্রেরি না হয় গেল কিন্তু ও ছাড়া কি আর সুহৃদ ছিল না আপনার? ঐ কল্লোল গোষ্ঠীর? আপনার প্রায় সব বন্ধুরই তো চমৎকার ঘরোয়া পাঠাগার রয়েছে। আমি দেখেছি। আপনিই খালি ব্যতিক্রম। আপনার ঘরেই বইয়ের কোনো পাত্তা নেই।...তাহলেও আপনি বন্ধুদের বাড়ি কি পা বাড়াম না নাকি? তাঁদের কাছ থেকে বই এনেও তো পড়া যায়।'

'তা যায়। পাও বাড়াই না যে তা নয়। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাক্ষাতে যাই বইকি। অন্তত প্রেমেনের বাড়ি তো গিয়েই থাকি। লেটেস্ট আমদানি আনকোরা বই সব দেখেছি তার নাকশালে। কিন্তু সেলফ-হেলফ করা যে তার সুযোগ কই? হাত বাড়াবো কি সেদিকে সে ঘেঁষতেই দেয় না। বইকে সে প্রায় বউয়ের মতই আগলে রাখে। ঐ-বই

আর বই পরের হাতে গেলে পাখির মত হয়ে যায় জানেন? পাখা মেলে কোথায় যে উড়ে যায় তার পাত্তাই মেলে না আর। কিম্বা... কিম্বা...।

'কিম্বা?'

'কিম্বা বোধ হয় মার্ক টোয়েনের সেই বিখ্যাত বয়েতটা তাদের মনে রয়ে গেছে এখনো—ভুলতে পারেনি। তাঁর ঘরময় বইয়ের ছড়াছড়ি দেখে কে একজন শুধিয়েছিল—আলমারিতে এসব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন না কেন? জবাবে মার্ক টোয়েন বললেন, বই তো পড়বার জন্যে পরের কাছ থেকে নিয়ে আসি, কিন্তু ওই আলমারি আমায় কে দিচ্ছে! বই ধারে পাওয়া যায়, কিন্তু আলমারি তো কেউ আর ধার দেয় না! দুঃখ করেছিলেন মার্ক টোয়েন।'...তবে প্রেমেনের কাছ থেকে একবারেই যে কোনো বই আনিনি তাও নয়। আমার দেওয়া সব বইগুলিই নিয়ে এসেছি এক সময় না একসময়।'

'নিজের বই বন্ধুকে উপহার দিয়ে কেউ ফেরত নেয় নাকি আবার?'

'বললাম না, আমি ব্যতিক্রম? আমার কোনো বই-ই তো আমার কাছে কখনো থাকে না, হঠাৎ কোনো পাবলিশার এলে, এসে গেলে, তখন আমার বই মেলে কোথায়? প্রেমেনের কাছেই পাওয়া যায়। সে তো কোনো বই সহজে হাতছাড়া করে না, এমন কি, আমার বইও নয়। ওখানে গেলেই মিলে যায়। এই করে আমার সব বই-ই তার কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছি পরম্পরায়।'

'পাবলিক লাইব্রেরিগুলোয় খোঁজ করলেও পেতে পারতেন আপনার বই।'

'তাও কি করিনি আর? নিজে না যাই, ভাগনে ভাগনিদের পাঠিয়েছি। তারা এসে খবর দিয়েছে যে লাইব্রেরির বইয়ের তালিকায় তোমার বইগুলোর নাম আছে—কিন্তু আসল জায়গায় নেই, লাইব্রেরিতে নেই একদম।'

'তার কারণ?' তিনি বিস্মিত হন।

'ছেলেদের বইতো যতো আমার। ছেলেরা নিয়ে গেছে। হাতে হাতে ঘুরেছে সেসব বই। তারপর হাতাহাতি হতে হতে তার সামনের পাতাগুলো উড়ে গেছে, শেষের পাতাগুলো খসে গেছে—তখন সেই ছেঁড়াখোঁড়া বই ফেরত দেওয়া তারা বাহুল্যই বোধ করেছে। লোকপ্রিয় লেখক না হয়েও, নেহাৎ বালকপ্রিয়তার হেতুই আমার বইয়ের এই বিরল-দশা। এই আমার ধারণা। তবে এটা একরকমের আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। এই ভাবেই বোধ হয় আমার বইয়ের কাটতি বেড়েছে। লাইব্রেরিতে পায় না বলে কিনে পড়তে হয়েছে তাদের। কিন্তু আমার বই না পড়লেই বা তাদের কী আসে যায়? খেলাধুলোয় সিনেমা-দেখায় সময় কেটে যায় তাদের।'

'তাদের না হয় কাটলো, কিন্তু আপনার কাটে কী করে? একদম কোনো বইটই না ছুঁয়ে, কিছু না পড়ে-টড়ে সময় কাটান কী করে?'

'কিছু পড়ি না যে কে বললে? পড়তে হয় বইকি—বই না হলেও ঐ খবরের কাগজ পড়তে তো হয়ই। তিন চারখানা কাগজ পড়ি রোজ—আগাপাশতলা খুঁটিয়ে পড়তে হয় আমাকে। তিন শ' লাইন পড়ে তবে হয়ত একটা লাগসই খবর পাই, যা আমার ওই তিন লাইনের টিপ্পনিতে লাগে। লেখা অল্প—কিন্তু পড়া বিস্তর—এই আমার অল্পবিস্তর লেখাপড়া এখনকার। বললাম না, সারা জীবনটাই আমার সাংবাদিক? খবরের কাগজ ফেরি করে এই জীবনের শুরু, এখনও সেই ফেরিঘাটেই রয়ে গেছি। খবরের কাগজের হকার থেকে খবরের কাগজের জোকার এখন।'

'তা আছেন বেশ।'

'তা আছি। এই খবর কাগজই আমায় বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেইসঙ্গে ঐ বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরাও। বেথুনে পড়া বাঙালীর মেয়েরা কাগজ কিনত, তা-ই বেঁচে খেয়েছি এককালে। আর, ছোট ছোটরা আমার বই কিনেছে বলেই আমি খেয়ে বেঁচেছি, বড় হয়েছি। এবং যখন আর লিখতে পারব না, এই কলম চলবে না, মগজে কিছু আসবে না আর, কাগজে আমার লেখা নেবে না ভুলেও...তখন...তখন...

'তখন কী করবেন?'

'সেই বেকারি দশায় গিয়ে হয়ত আমায় এই কাগজের হকারিতেই ফিরে আসতে হবে আবার। ঐ একটা কাজই তো কেবল জানা আছে জীবনে। অবশ্যি, এখন এটা আরও লাভজনক হবে আশা করি। তখন দু' পয়সার আনন্দবাজারে আধ পয়সা কমিশন মিলত মোট, এখন কাগজের দাম বেশি, কমিশনও বেশি। মোটামুটি লাভ। বেশ আনন্দেই কাটাবো।'

ক্রমশ

পাহাড়ী সান্যাল

মানুষ অতুলপ্রসাদ

॥ আট ॥

যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে" গানের প্রথম ছত্রটি অতুলদা খুব ধরে ধরে আমাকে শোনালেন। শুনিয়ে বললেন, "এইবার গাও।"

আমি গাইলাম, কিছু ভুল-ভ্রান্তি সুদ্ধ। মিস্টার সেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার গানটি গেয়ে শুনিয়ে বললেন, "এবার আবার গাও তো।"

আবার গাইলাম। দ্বিতীয়বার গাইবার পরই মিস্টার সেন আমাকে বললেন, "দেখ পাহাড়ী, গানের কথাগুলো আগে ভাল করে বুঝে নেবার চেষ্টা কর তো! তুমি প্রথম ছত্র ঠিকই গেয়েছ, কিন্তু কথা আর সুর দুটো এখনো কাছাকাছি হতে পারে নি।"

এই কথা বলে উনি আমায় বললেন, "তুমি শুধু হারমোনিয়মে সুর টিপে রাখ তো—" আমি তাই করলাম আর মিস্টার সেন সম্পূর্ণ গানখানি বারংবার গেয়ে শোনালেন আমাকে। তারপর গানের কথাগুলির তাৎপর্য ভারি মিষ্টি করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অনেক কথাই আমাকে বললেন যে কথাগুলি সব আজ আর আমার মনে নেই, কিন্তু তার মর্মটা হল এই যে, তিনি সুর আর কথাকে আলাদা হতে দিতে চান না।

আমার দুর্ভাগ্যবশত সেই সন্ধ্যায় অত ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমি ভাসা ভাসা ভাবে এইটুকুই বুঝেছিলাম যে, মিস্টার সেন যেমন করে চাইছেন তেমন করে আমি গাইতে পারছি না। মনে কেমন একটা বিরক্তি এল যে, ঠিকই তো গাইছি—তবু কেন তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। আজ বুঝেছি কি চাইছিলেন মিস্টার সেন। ঠিক আজ বুঝেছি বললে ভুল হবে, যেমন যেমন মিস্টার সেনের কাছে গান শিখেছি, যেমন যেমন আরও তাঁর নিকটে আসতে পেরেছি, তেমন তেমন বাংলা ভাষার সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি এবং তার ভাবটাও কিছু কিছু অনুভব করতে পেরেছি। তাই পরের দিকে যখন অতুলদার শেখানো গান তাঁকে শুনিয়েছি, তখন তাঁর চেহারায় নানারকম ভাব ফুটে উঠতে দেখেছি, এমন কি তাঁর চোখে জলও দেখেছি কয়েকবার। তখনই কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলাম কেন মিস্টার সেন আর আমার মাঝে এত অসুবিধা।

আমার খুব ভাল করেই মনে আছে, গোড়ার দিকে যখন মিস্টার সেনের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করলাম তখন খুব তাড়াতাড়ি গানটা তুলে নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে তেমন কোন প্রশংসা শুনতে পাই নি। বরং অনেক সময় এটা

বুঝতে পেরেছি যে গান শিখিয়ে তিনি যেন তেমন সুখ পাচ্ছেন না। অথচ যে সময় মিস্টার সেনের শেখানো কোরাস গান গেয়েছিলাম তখন তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, আর আমার ফুলে ফেঁপে ফেটে যাবার মতন অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যখন একক ভাবে একটির পর একটি গান তাঁর কাছ থেকে শিখতে আরম্ভ করলাম তখন কেমন যেন ভাসা ভাসা ভাবে বলতেন "বাঃ বেশ হয়েছে"। অথচ এটুকু আমি বুঝতে পারতাম যে তিনি যেমন "বেশ" হওয়াকে চেয়েছিলেন তেমন "বেশ"টি হয়নি।

এই সবের মাঝে আমার এক এক সময় মনে হত যেন আর গান শিখতে ইচ্ছে করছে না। এমন কি মাঝে মাঝে পনের-কুড়ি দিনের গ্যাপও দিয়েছি। তারপরে আবার এমন হয়েছে, নিজের ভেতরকার জ্বালাটা আমাকে এতই অস্থির করে তুলেছে যে সাইকেলে উঠে ছুটে চলে গিয়েছি মিস্টার সেনের বাড়িতে। কিন্তু তখন তিনি বাড়ির বাইরে। তারও তিন-চার দিন পরে হয়তো আবার মিস্টার সেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নিতান্তই মৌখিক সৌজন্যে তিনি জানিয়েছেন, সেদিন বাড়ি না থাকার জন্য তিনি দুঃখিত। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঈষৎ বিরক্ত সুরে বলেছেন, "না জানিয়ে যদি আস, সব সময় তো আমি বাড়িতে বসে থাকতে পারি না।"

এ কথা শুনে যেমন বা লজ্জিত হয়েছি তেমনি ক্ষুব্ধও হয়েছি। কারণ একথা বুঝতে পারছিলাম যে, যে আশা নিয়ে মিস্টার সেন আমাকে গান শেখাতে আরম্ভ করেছিলেন আমার মধ্যে সেই আগ্রহ এবং অঙ্গীকারের অভাব তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। আমিও যে উৎসাহ নিয়ে গান শিখতে আরম্ভ করে-ছিলাম সেটারও কেমন যেন অভাব বোধ করতে লাগলাম ক্রমেই।

এর মধ্যে মিস্টার সেন অনেক গানের কথা আমাকে শুনিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। কেমন করে কথার সঙ্গে সুরকে মিলিয়ে মিশিয়ে গাওয়া দরকার সেটাও বুঝিয়েছেন, কিন্তু হল কপাল, আমার অবস্থা তখন "ভঁএস্ কে আগে বীণ বাজাএ ভঁএস্ খাড়ি পবুরাএ"। এর প্রাঞ্জল বাংলা হল, মোষের সামনে বীণ বাজালেও তার কোন ভাবান্তর হয় না, সে শুধু জাবরই কেটে চলে। আমারও ঠিক সেই অবস্থাই তখন।

বাংলা ভাষায় আমি র‍্যাংলার। বয়েস তের কি চোদ্দ। কাজেই মিস্টার সেন যা বোঝান কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু আমার মনে তখন প্রচণ্ড একটা জিদ্। মিস্টার সেনের গান ঠিক ঠিক ভাবে শিখতেই হবে এই প্রতিজ্ঞাটি সর্বক্ষণ মনে মনে পুষে রাখতাম।

যখন পাঁচ-ছ খানি গান মিস্টার সেনের কাছ থেকে শেখা হয়ে গেছে তখন আর এক সন্ধ্যায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সেই সন্ধ্যায় যখন তাঁর কাছে গান শিখতে গেছি তখন দেখি কিছু অতিথি বসে আছেন সেখানে। তাঁদের মধ্যে কিছু বাঙালী, বাদবাকী ব্যক্তিরা লখনৌয়েরই হিন্দু বা মুসলমান। এটাও বুঝলাম যে এতগুলি মানুষ মিস্টার সেনের ড্রইংরুমে সমবেত হয়েছেন ঘটনাচক্রে। এটা সাজানো আসর নয়।

আমি গিয়ে পৌঁছতেই একজন মুসল-মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার সেন, "মীট মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড পাহাড়ী সানিয়াল।"

ইংরিজি ভাষার কেতা দুরস্ত ছিল, তাই মিস্টার সেনের ওই ইনট্রোডাকশন-এ মনে ভীষণ খুশি বোধ করলাম। মিস্টার সেন আমাকে বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন! এর পরে বহুবার বহু লোকের সঙ্গে মিস্টার সেন ঠিক ওই কথাগুলি ওই-ভাবে ইংরিজিতে বলে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই প্রথম দিনটিতে ওই কথায় যে শিহরণ অনুভব করেছিলাম (সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না) পরের দিকে সেটার সন্ধান আর পাইনি। মনে হয়েছিল অতুলদার দ্বারা ওইভাবে পরিচিত হওয়াটাই আমার জন্মগত অধিকার।

সেই মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করাবার সময় মিস্টার সেন এ কথাও বললেন যে, "হী সিংস্ ভেরী ওয়েল।" আরও বললেন, "ইসকী উর্দু জবান কী অদাএগী ভী কাবিলে তারীফ হ্যায়।"

এই কথা শুনে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে উর্দুতেই আলাপ করতে শুরু করলেন। ভদ্রলোকের চেহারাটি যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর তাঁর মুখের উর্দু ভাষা। আমার উর্দু বলা শুনে তিনি বলেছিলেন, "ম্যয় কায়সে ইয়কীন করু লুঁ কী আপ বংগালী হ্যায়।" অর্থাৎ "আমি কি করে বিশ্বাস করব যে আপনি বাঙালী!"

একথা শুনে আমি যে খুবই আপ্লুত বোধ করেছিলাম সেটা বলাই বাহুল্য।

এবার কিছু অবান্তর কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। আমার এই ধারাবাহিক লেখা পড়ে যেমন নাকি প্রচুর প্রশংসাও পাচ্ছি তেমনি আবার কিছু পরিমাণে এ-জাতীয় নিন্দাবাদও আমাকে শুনতে হচ্ছে যে এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার 'আমিত্ব'-টাই নাকি বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। কথাটা বাহ্যিকভাবে অনস্বীকার্য। কিন্তু যাঁরা লেখা পড়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাঁরা যদি দয়া করে Prejudice-টা বাদ দিয়ে একটু ভেবে দেখেন যে আমার অতুলদাকে আমি যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে দেখেছি সেটাই হল আমার লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়। আমার আমিত্বটাকে যদি আমি ভণ্ডামী করে বাদ দিই তাহলে এ লেখার ছবিটাই ঝাপসা হয়ে যাবে। কারণ আমার এ লেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে, যে বয়সে মিস্টার সেনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম এবং কালক্রমে যেভাবে তিনি আমার কাছে "আমার অতুলদা" হয়ে উঠেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাটুকুর প্রকাশ।

আর একটা কথা লিখতে আমি এত-টুকুও সংকোচ বোধ করছি না যে এমন কজন মানুষ পৃথিবীতে আছেন যিনি নিজের আমিত্বটুকু বাদ দিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছেন? সাধক, সন্ন্যাসী এঁদের কথা অবশ্য বাদ দেওয়া যায়। আমি সাধকও নই, সন্ন্যাসীও নই, নিছক দোষ-ত্রুটি-গুণ-অপরাধ মিলিয়ে মিশিয়ে একজন মানুষ। কাজেই আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে 'আমিত্ব'-টা উঁকি মারলেও সেটা ক্ষমার চোখেই দেখতে অনুরোধ করি।

যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে আসা যাক। সেই মুসলমান ভদ্রলোকটি মিস্টার এ পি সেনকে বললেন—অবশ্য উর্দু ইংরিজি মিলিয়ে—"এই ছেলেটির গান একটু শুনলে কেমন হয়?"

মিস্টার সেন আমার দিকে তাকিয়ে গান গাইতে বললেন। এমনভাবে বললেন যে, মনে হল মিস্টার সেনের সেই মনটা আবার যেন খুঁজে পেয়েছি। কারণ এর আগেও আমাকে দু-চারবার বিভিন্ন লোকের সামনে গান করতে বলা হলেও সে বলার মধ্যে মিস্টার সেনের উৎসাহ তেমন প্রকাশ পায়নি। আজ যেন মনে হল মিস্টার সেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমায় গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমিও পরম উৎসাহে রাজী হয়ে গান গাইতে আরম্ভ করলাম। কিছু হিন্দী ভজন, কিছু উর্দু গজল।

এর পরে যে বাঙালী ভদ্রলোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা উসখুস করে-বলে উঠলেন, "সেনমশায়, শুনেছি আপনার কাছ থেকে ছেলেটি গান শেখে। আপনার রচিত দু-একখানা বাংলা গান শুনলে খুশি হব।"

আমিও বোধহয় মনেপ্রাণে সেটাই চাইছিলাম। মিস্টার সেন অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন, কাজেই কেমন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাব করে বললেন, "পাহাড়ীর যদি ইচ্ছে হয়—গাক।"

সেদিন যেভাবে মিস্টার সেনের গান আমি গেয়েছিলাম ঠিক তেমন ভাবে আজও পর্যন্ত কোন সময়েই তাঁর গান আমি গাইতে সক্ষম হইনি। আমি নিজে গেয়ে নিজেই আনন্দ অনুভব করেছিলাম। ততদিনে যে পাঁচ-ছ'খানি গান আমি মিস্টার সেনের কাছে শিখেছিলাম তার সব কটিই গেয়ে ফেললাম। এবং মাঝে মাঝে মিস্টার সেনের মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম, "বাঃ বাঃ, চমৎকার!"

গানগুলি গাওয়া শেষ হলে বাঙালী

ভদ্রলোকেরা এতই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যে আমি সত্যিই অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে, সেদিন পর্যন্ত মিস্টার সেন যেভাবে তাঁর গান আমার কাছ থেকে শুনতে চাইতেন ঠিক সেভাবে আমি মেরে উঠতে পারিনি। সেই সন্ধ্যায় তাই আমার মনটাও এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠেছিল।

আড্ডা ভাঙল। সকলে একে একে চলে গেলেন। এরই মধ্যে মিস্টার সেন একবার আস্তে করে বললেন, "তুমি চলে যেওনা যেন।"

সকলে চলে যাবার পর তিনি কেমন যেন ধরা-ধরা গলায় আমাকে বললেন, "আমার শেখানো গানগুলো আজ তুমি কি সুন্দর করে গেয়েছ পাহাড়ী।"

ওই উক্তির পর আমার আনন্দটা ধরে রাখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ছ-সাত মাস ধরে যে গান শেখার পালা চলেছিল, আর আমাদের দুজনের মনের মধ্যে যে বিরক্তিকর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, সেটা সেই এক মুহূর্তেই কেমন সৌন্দর্যময় হয়ে উঠল।

ওস্তাদদের কাছ থেকে আমার গান শেখার কালে একটা কথা প্রায়ই শুনতে পেতাম তাঁদের মুখে যে, "রাগ, রসোই, পাগড়ী কবহু কবহু বন যাত।" রাগ অর্থাৎ সংগীত, রসোই অর্থাৎ রান্না, আর পাগড়ীটা যে কি তা আপনারা সকলেই জানেন—কখনো সখনোই উত্‌রে যায়। জীবনে চলার পথে এই বচনটির তাৎপর্য বোধহয় সেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম। সত্যিই তো, কেউ কোনদিন জোর গলায় এ কথা বলতে পারে না যে আমি আজ ভাল গান গেয়ে শোনাব, ভাল রান্না করে খাওয়াব, ভাল পাগড়ী বেঁধে দেখাব। এই তিনটির জন্যে একটা Sub-Conscious mental attunement-এর দরকার হয়। সেটা কখন যে ঘটে আর কেন যে ঘটে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া ভুল।

তবে একটা কথা সেই সন্ধ্যায় বুঝতে পেরেছিলাম যে, যেভাবে অতুলপ্রসাদের গানগুলি সেদিন আমি গাইতে পেরেছিলাম সেটা কিছুটা বোধ হয় মিস্টার সেনের পছন্দমত হয়েছিল। মিস্টার সেনের সুখ্যাতি শুনে মনে হয়েছিল তিনি যেন আমাকে আশীর্বাদ করে তাঁর মনটাকে আমায় দেখতে দিতে চাইছিলেন।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে কি আনন্দে যে বিভোর ছিলাম তা শুধু আমিই জানি। কিন্তু এর ফলে একটা বিপদও ঘটল। মিস্টার সেনের কাছ যেতে কেমন যেন সংকোচ বোধ হতে লাগল। কেন, সেটা পাঠকদের বোঝানো বড় শক্ত, কিন্তু তার একটা দিক সম্ভবত ছিল ভয়। যদি আর তেমন করে মিস্টার সেনকে গান গেয়ে আনন্দ দিতে না পারি? তাই আসা-যাওয়ার মাত্রাটা হ্রাস পেল। মাঝে মাঝে যেতে থাকলাম বটে, গানও শিখতে লাগলাম, কিন্তু সব সময় আমার মনে যেন কেমন একটা অস্বস্তি।

গোড়ার দিকে যেমন তাড়াতাড়ি গানটা তুলে নিতে পারতাম, এখন তুলতে গিয়ে, তার থেকে অনেক বেশি দেরি হতে আরম্ভ করল। তেমন সহজ প্রাণখোলা ভাবে আর যেন মিস্টার সেনকে গান শোনাতে পারছিলাম না। কিন্তু মিস্টার সেনের দিক থেকে কোনরকম বৈলক্ষণ্য আসেনি। তিনি যেমন শেখাচ্ছিলেন তেমনই শেখাতে লাগলেন। বরং তাঁর শেখানোর উৎসাহটা যেন আর একটু বেড়েছে বলে মনে হল।

এইভাবে যখন চলছিল তখন একদিন আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আমি আমার ক্লাসিক্যাল গানের রিয়াজ করছি। হঠাৎ দেখি দরজার সামনে একটি অত্যন্ত সুন্দর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি গানে নিবিষ্ট থাকার দরুন তিনি কখন এসেছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে তাঁকে দেখে বেশ ভাল লেগেছিল এটা মনে আছে।

আমি তাঁকে দেখে যখন ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েছি তখন তিনি মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে আসব?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। আসুন, আসুন।"

আমি ফরাসে বসে যেখানে রিয়াজ করেছিলাম তিনি এসে সেখানেই বসে পড়লেন। বললেন, "রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গানের শব্দ শুনে ভেতরে ঢুকে এসেছি। আমার গান-বাজনায় খুব শখ—খুবই ভালবাসি। তোমার গলাটি শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। তুমি রিয়াজ কর। আমি বসে শুনলে কি তোমার আপত্তি আছে?"

আমি বেশ ভীতুকণ্ঠে বললাম, "না, না, আপত্তি আর কিসের! কিন্তু আমি সবে শিখছি, তেমন কিছুই জানি না।"

তারপরেই ভদ্রলোক একটি অদ্ভুত কথা আমাকে বললেন। বললেন, "আমিও তো শিখছি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনি গান শেখেন?"

তিনি হেসে বললেন, "শেখা আর হয়ে উঠল কই। তবে সমঝদারিটা করতে শিখেছি বটে।"

আমি অবাক হয়ে শুধু শুনলাম, কিন্তু কিছুই প্রণিধান করতে পারলাম না। উসখুস করছি আর ভাবছি কি করব।

তিনি বললেন, "গাও ভাই, গাও।"

তখন আমি খুব নার্ভাস হয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম। ঠিক কি রাগ বা কি গান গেয়েছিলাম মনে নেই, শুধু এইটুকুই মনে আছে যে প্রায় দশ-পনের মিনিট গেয়ে যখন থামলাম তখন আমার দিকে উদ্ভাসিত হাসি হেসে চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তিনি। সুখ্যাতিও করলেন না, অখ্যাতিও করলেন না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কার কাছে গান শিখছ?"

আমি বললাম, "আমার ওস্তাদ মহম্মদ হুসেন খাঁ।"

তখন তিনি বললেন, "তোমার গলাটি ভারি সুরেলা। ভাল করে শেখ। আর যত পার রিয়াজ কর।" তারপর বললেন, "আচ্ছা, এবার আমি উঠি। আবার আসব।" উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "আমাকে তো তুমি চেন না। আমি এখানকার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। আমার নাম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জী। আমি তোমার বাড়ির খুব কাছেই থাকি।"

আমার তখন বাক্‌শক্তি রহিত। নামটুকু শুনলাম আর কিছুই বুঝলাম না। পরে বুঝেছিলাম, কি রত্নের সন্ধান আমি পেয়েছি। [ক্রমশ]

যুগোস্লাভিয়ার একালে কেমন গল্প কবিতা লেখা হচ্ছে তার খবর আমরা তেমন রাখি না। গত যুদ্ধের আগের লেখা সম্বন্ধেও আমাদের খুব আগ্রহ ছিল না। আমরা শুধু জানতাম, একজন যুগোস্লাভ লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেই নামটিও আমরা সব সময় মনে রাখি নি। অথচ তাঁর এবং আরো অনেকের লেখার ইংরেজি অনুবাদ ছিল। এখন ওই দেশের একালের লেখকদের গল্প কবিতার একটি বড়সড় সংকলন হাতে এল। প্রথম কয়েকটি লেখা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেশ চমক লাগে, আরো পড়বার আগ্রহ তীব্র হয়। মনে হয়, এতদিন এসব কেন পড়িনি! অর্থাৎ যুগোস্লাভিয়ার তরুণ লেখকদের লেখা আমাদের ভাল লাগে। এই ভাল লাগার প্রধান কারণ হয়ত একালের বাংলা লেখার সঙ্গে ওই সব লেখার মেজাজের মিল।

মেজাজের মিলের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, গত পঁচিশ বছরে যুগোস্লাভ সাহিত্য অনেক নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করে এসেছে, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সাহিত্যের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি। লেখালিখির ব্যাপারে এই স্বাধীনতা ওই দেশের লেখকরা রাতারাতি পেয়ে যান নি, অর্জন করতে হয়েছে। সাহিত্যের ওপর পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাওয়ার পরও, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গোঁড়া তাত্ত্বিকদের সঙ্গে উদারপন্থী তরুণ লেখকদের বিতর্কের ঝড় চলেছে, বেলগ্রেড থেকে প্রকাশিত ওই সময়ের সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে তার অন্তত কিছু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। ষাটের দশকের শুরু থেকে তরুণ লেখকরা

NEW WRITING IN YUGOSLAVIA.
Edited by Bernard Johnson.
Penguin.

নিজেদের খুশিমতন লিখতে পারছেন। নিষেধের তর্জনী মোটেই উঁচিয়ে নেই এমন কথা বলা যায় না, নিষেধ না মানায় লেখক শাস্তি পেয়েছেন তা-ও আমরা জানি, তবু পরিবেশ যে খোলামেলা তার অজস্র নজির রয়েছে এই সংকলনটিতে।

সংকলনের অনেক গল্পের মধ্যে একটির পটভূমি একটি রেল স্টেশন। স্টেশনটায় গিসগিস করছে চাষাভুষো গ্রাম্য মানুষ, জোয়ান, বুড়ো, শিশু, নারী—সব। ট্রেন আসছে না, কখন আসবে ঠিক নেই। একটা ট্রেন এসে চলে গেছে, শুধু সৈন্য বোঝাই। স্টেশনের কাছে একটা ফুটো তেলের গাড়ি

গ্রন্থ প্রচ্ছদ
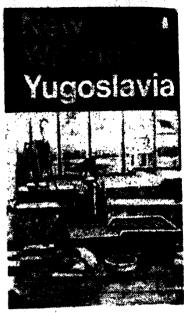
পেয়ে গাঁয়ে অনেকে ট্রেনের কথা ভুলে তেল চুরির হিড়িকে মেতে উঠল। সৈন্যদের তাড়া খেয়ে তারা আবার ফিরে এল স্টেশনে। ইতিমধ্যে গুজব চাউর হয়ে গেল—পঞ্চম বাহিনীর লোকদের কারসাজিতে ট্রেন আসছে না। তখন পঞ্চম বাহিনীর খোঁজে সবাই গোয়েন্দা। এক বেচারী খবর কাগজের রিপোর্টার একটু আলাদা-আলাদা থাকছিল, তার চেহারা পোশাক আশাকও একটু অন্যরকম। গোয়েন্দারা বুঝতে পারল, সে পঞ্চম বাহিনীর লোক। স্টেশন বাড়ির দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে সৈন্যরা তাকে গুলি করে খতম করল, তারপর লাশ টেনে নিয়ে গেল। লোকটার বউ তার বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে স্টেশনে স্বামীর খোঁজে এলে কেউ তাকে একটি কথাও বলতে পারল না, সেই প্রচণ্ড ভিড় থেকে কিছুক্ষণ নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু উৎসারিত হল না। ট্রেন এল। তখন একটা লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে বউটাকে জানাল, তার স্বামীকে আগের ট্রেনে চলে যেতে হয়েছে। বউটাকে আর তার মেয়েকে টেনে ট্রেনে তোলা হল। কামরায় তাদের জন্যে ভাল জায়গা করে দেওয়া হল। ট্রেন ছেড়ে গেলে স্টেশন শূন্য। এতক্ষণ স্টেশন বাড়ির দোতলার জানলায় ছবির মতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে স্টেশন মাস্টারের বউ এইসব দেখছিল; এবারে সে জানলা বন্ধ করল।

গল্পটির মেজাজ গত যুদ্ধের ঠিক পরে লেখা অনেক বাংলা গল্পের মেজাজের সঙ্গে মিলে যায়।

সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ একটি ছেলে অন্য একটি সার্থক গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যৌবনের প্রথম আঘাতে ছেলেটি অস্থির। শরীর মনের তৃপ্তির দরজা খুলতে না পেরে সে স্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও একটা মদ চোলাইয়ের কারখানা বোমা মেরে উড়িয়ে দিল। তারপর দৌড়ে পালানোর উত্তেজনার সুখ চাখতে-চাখতে সে শূন্য ঘর থেকে সেই মেয়েটির কাছে পৌঁছে গেল যার চুল ছোট করে ছাটা, যার মুখ চোখ সব সময় তাকে অনুসরণ করে। তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার নগ্ন শরীর দেখে ছেলেটি বুঝতে পারল, মেয়েটি এখনো নারী হয়নি। মেয়েটির গালে প্রচণ্ড একটা চড় মেরে ছেলেটি দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে ভাবল, সে পৃথিবীর কোনো দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল।

গল্পটি খুব ছোট, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ থেকে উৎসারিত একটা তাপ ছড়িয়ে গিয়ে কেমন বিচিত্র ব্যাপ্তি আনে। ঘটনা সংস্থাপনে অথবা পরিবেশ রচনায় মিল হয়ত আছে, তথাপি একালের অনেক বাংলা গল্পে এই তাপ স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

যুগোস্লাভিয়ার অনেক ভাষা, এক-একটি এলাকার সাহিত্যের উপর আঞ্চলিকতার ছাপ খুব স্পষ্ট। এই কারণে শুধু বৈচিত্র্য নয়, আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও বড় বেশী এসে যাবার কথা এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবে যুগোস্লাভ সাহিত্য গড়ে নিছু গড়ে ওঠা সহজ ছিল না। তবু সম্ভবত বড় শহরগুলিকে ঘিরে প্রধানত তরুণ উদারপন্থী লেখকদের এক-যুগ-বোধের আলোয় পুরো দেশের সাহিত্যে একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এসেছে। সংকলিত গল্প-গুলির কোনোটি বৃত্তের মতো, কোনোটি সরলরেখায় শেষ, কোনোটিতে স্পষ্ট জোরালো, কোনোটিতে শুধু একটি বিশেষ আবেগ অথবা বিশেষ আবেগ—তথাপি এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঠিকই ধরা পড়ে।

এই সংকলন গ্রন্থের কবিতাগুলিও সমান আগ্রহে পড়তে হবে। মাঝে মাঝেই এক-একটি পঙ্‌ক্তি বারবার পড়বার জন্যে থামতে হবে। অজস্র নতুন এবং তাজা চিত্রকল্প কবিতাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। যৌন প্রতীকের নিপুণ এবং অত্যন্ত সংযত প্রয়োগ রয়েছে কয়েকটি কবিতায়। জোরালো ভাবালো কবিতাও পড়তে ভাল লাগে। যেমন : 'ঘুমিও না, প্রেমিকের মতন স্বপ্ন দেখো না অন্ধকারের ছবির তোমার চোখ খুঁজে ফিরছে।' অবশ্য এমন কয়েকটি কবিতা রয়েছে যা আমরা স্কুলের পাঠ্য বইয়ে দেখতে অভ্যস্ত, এমন কবিতা যা দেখলেই তার সম্প্রসারণের ইচ্ছে হয়। যেমন : পাথরের কান্না। অবশ্য এর পরেই হঠাৎ এমন একটি কবিতা চমক দেবে যার শুরু—'নৈঃশব্দ্যকে একটা শরীর দাও।'

নির্দ্বিধায় বলা যায়, কবিতাগুলি পুরোপুরি খোলামেলা আবহাওয়ায় লেখা; কবিদের অবচেতনেও কোনো নিষেধের পাঁচিলের অস্তিত্ব ছিল না।

সংকলন গ্রন্থটির গল্প কবিতা পড়ে মনে হয়, গল্পকার ও কবিদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক অথবা সম্পর্কহীনতা বিবেচিত হয়নি; কবিতা ও গল্পগুলির সাহিত্য-মূল্যই ছিল নির্বাচনের নিরিখ।

সুধাংশু ঘোষ

সমাজ ও ইতিহাস

বাঁকুড়া পরিক্রমা। অনুকূলচন্দ্র সেন। বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে বাঁকুড়া জেলার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এই জেলার সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত জনজীবনের বিচিত্রবিন্যাস, বহুবিধ কর্মোদ্যোগ এবং শিল্পসংস্কৃতির বিকাশ সংস্কৃতি প্রেমিক বাঙালীর কাছে এক পরম কৌতূহলের বিষয়। এদিক থেকে 'বাঁকুড়া পরিক্রমা' গ্রন্থখানি একটি বিশ্বস্ত জেলা-গুরাড়ি গেজেটিয়ারের মর্যাদা পেতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর, ধর্মসংস্কৃতির বিবর্তন, প্রকৃতি-পরিবেশ, জাতি পরিচয়, জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য, শিল্পনিদর্শন উৎসব-মেলা, কৃষিপণ্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য জন-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মনীষী পরিচয়—এক কথায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগে পর্যন্ত ছোট বড় কোন প্রসঙ্গই লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। এবং প্রতিটি প্রসঙ্গের আলোচনায় 'তথ্যপ্রাচুর্য' এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট। লেখক দীর্ঘকাল সরকারী কার্য উপলক্ষে বাঁকুড়ার ব্যাপক অঞ্চল পরিভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে গ্রন্থখানিতে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে

অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটায় রচনাধারা সর্বত্র উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নিছক সন্ধিৎসু গবেষকের কাছে নয়, সাধারণ পাঠকের কাছেও বাঁকুড়া জেলাবিষয়ক একখানি নির্ভরযোগ্য গাইড বুক হিসেবে বইটি আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে। ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় আয়তনের তুলনায় অল্প দামে পাঠক সাধারণ বইখানি সংগ্রহ করবার সুযোগ পাবেন। বইয়ের শুরুতে বাঁকুড়ার বিখ্যাত শিল্প-স্থাপত্যের কয়েকখানি চিত্রনিদর্শন সংলগ্ন হয়েছে—যা গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। ১১৮/৭০

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ সংগ্রহ ঊনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি। ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত। মূল্য ৬ টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে স্বাধীনোত্তর ভারতে গবেষণা শুরু হয়েছে। ফলে কয়েকখানা জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ আমরা গবেষকদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থের লেখক নিজে একজন ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও রাজনীতির আলোচনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রবন্ধ সংগ্রহ হলেও লেখক যথাসাধ্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। "ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা, 'বাঙালী সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি' 'বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার' 'বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর', 'ঊনিশ শতকের বাংলায় চড়কপূজা', 'বাংলাদেশে নরবলি', 'ধর্মসংস্কারক রামমোহন', 'হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন', 'আর্য সমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী', 'ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ','বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান', 'বালগঙ্গাধর তিলক ও ঊনিশ শতকের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের সূচনা' ও 'ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত সীমারেখা' প্রভৃতি বিষয় লেখক আলোচনা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে লেখকের পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় মেলে।

BSC
Manufactured by
BATA SHOE CO PRIVATE LIMITED

ক্রীড়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে অর্ডিনান্সের দাবী

ক্রীড়া প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য রাজস্থান ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিনায়ক হিম্মৎসিংকা বহুদিন থেকে এককভাবে চেষ্টা করে গেছেন। এই ব্যাপারে সম্প্রতি তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং রাষ্ট্রপতি ডাঃ গিরির কাছে কয়েকটি স্মারকপত্র পেশ করেছেন। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগতভাবে দিল্লীতে গিয়ে তিনি দেখা করেছেন রাষ্ট্রপতি ডঃ গিরি, শিল্পমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলী আমেদ, ভগবৎ ঝা আজাদ, এম সি চাগলা, আর এন মির্ধা এবং বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, দেশের খেলাধুলোর ব্যাপার যাঁর গণ্ডির মধ্যে, তাঁর সঙ্গে দেখা একাধিকবার।

ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীচক্রের প্রভাবে কলুষপূর্ণ ক্রীড়া সংস্থাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্সের দ্বারা বাতিল করার দাবি জানিয়ে শ্রীহিম্মৎসিংকা স্মারকলিপিতে বলেছেন, আজ সরকার অর্ডিনান্সের দ্বারা শিল্পসংস্থা দখল করছেন, বিশ্বভারতী বাতিল করছেন। অবশ্যই শিল্প সংস্থার এবং বিশ্বভারতীতে অব্যবস্থার জন্য। কিন্তু অব্যবস্থার জন্য তাঁরা কি ক্রীড়া সংস্থাকে বাতিল করতে পারেন না?

স্মারকলিপিতে ক্রীড়া সংস্থার দুর্নীতির বহু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন :

(১) নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সনদ লঙ্ঘন করে একাধিক ব্যক্তি সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংস্থায় একাধিক কর্মকর্তার পদ অধিকার করে বসে আছেন, এবং অনেকে কুড়ি, পঁচিশ বছর ধরে পদ আঁকড়ে আছেন। অথচ অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব স্পোর্টসের সনদে পরিষ্কার করে বলা আছে : কোন ব্যক্তি সর্বভারতীয় ক্রীড়া-প্রশাসনের দুটি সংস্থায় কর্মকর্তা থাকতে পারবে না এবং একটি সংস্থায় থাকতে পারবে না তিন বছর করে দুটি টার্মে মোট ৬ বছরের বেশী।

(২) কলকাতার ইডেন উদ্যানে ক্রিকেটের গোলযোগকারী সম্পর্কে সেন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কোন কাজ হয়নি এবং আই এফ এর তহবিল তছরূপ সম্পর্কে রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন তদন্ত করা হয়নি।

(৩) ১৯৬৯ সালে টোকিও যাবার সময় নামডাকের দুজন ফুটবল খেলোয়াড়ের বিদেশী মুদ্রা আইন লঙ্ঘন এবং ১৯৬৮ সালে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে আসার সময় শুল্ক আইন
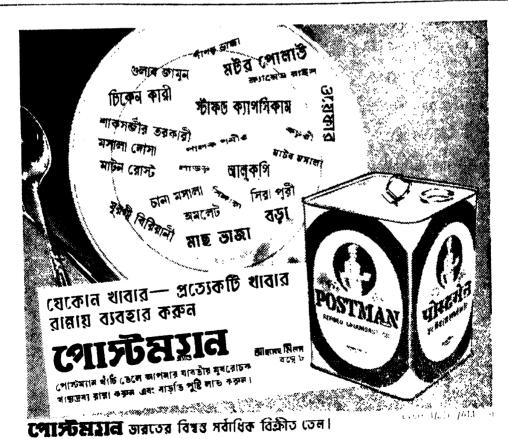
লঙ্ঘন করে ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিদেশ থেকে বিলাস সামগ্রী আনার ব্যাপার ধামা-চাপা দেওয়া হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। অথচ ওই বছর মারডেকায় যে দলটি গিয়েছিল তার সংগে ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক স্বয়ং কে জিয়াউদ্দিন। ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯-এর দুর্নীতিপরায়ণ খেলোয়াড়রা শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার পরেও শুল্ক আইন ফাঁকি দেবার প্রমাণ মিলেছে এবং এ ব্যাপারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংলণ্ডে আমাদের 'রাবার' বিজয়ী ক্রিকেট খেলোয়াড়রাও বাদ যায়নি।

(৪) ফুটবলে আজ অ্যামেচারের নামে প্রোফেশনালিজম এবং কালোবাজারে খেলোয়াড়দের বিকিকিনি। তাছাড়া টাকা দিয়ে খেলার ফলাফল 'গড়াপেটা' করার রেওয়াজ তো রয়েছেই বহুদিন থেকে। অথচ ফুটবলে পেশাদার প্রথা প্রবর্তন করে ফুটবলকে পরিষ্কার করার এবং খেলোয়াড়দের রুজি রোজগারে উৎসাহ দেবার কোন পরিকল্পনা নেই।

স্মারকলিপিতে অনিয়ম স্বেচ্ছাচার এবং দুর্নীতির আরও উদাহরণ দিয়ে পরিশেষে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি শ্রীআভেরি ব্রাণ্ডেজ ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন ৬০ কোটি মানুষের এই বিরাট দেশে খেলাধুলোর উন্নতি না হবার কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : খেলাধুলোর ব্যাপারে মাত্র কয়েকজনের হাতে এবং মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় আর ক্ষমতার অধিকারীদের উপর সাধারণের আস্থা না থাকাই ভারতের খেলাধুলোর উন্নতির অন্তরায়।

শ্রীহিম্মৎসিংকা স্মারকলিপিতে সরকারের সামনে যে সব তথ্য তুলে ধরেছেন এ সব যে সরকার জানেন না তা নয়। খেলাধুলোর উন্নতির জন্য সরকার পক্ষ থেকে গালভরা আশ্বাসেরও অন্ত নেই। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ক্রিকেট কিছুটা উন্নতি ছাড়া খেলাধুলোর সর্বক্ষেত্রে আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়ছে। ক্রীড়া প্রশাসনেরও অন্তর্কোন্দলের অন্ত নেই। স্বয়ংশাসিত কোন সংস্থার বিরুদ্ধে সহসা কিছু করা হয়তো সঙ্গত নয়। কিন্তু যেখানে স্বয়ংশাসনের অর্থ স্বেচ্ছাচার, যেন তেন প্রকারেণ পদ আঁকড়ে থেকে গোষ্ঠীচক্র বজায় রাখা, সেখানে সরকারের কিছু করা উচিত। আমি বলছি না অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ক্রীড়াসংস্থা বাতিলই একমাত্র পথ। কিন্তু একটা কিছু করা অবশ্যই সরকার যাতে দেশের খেলাধুলোর উন্নতি হয়, ক্রীড়া সংস্থাগুলি হয় কলুষমুক্ত।

হকির ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ

বার্সিলোনায় বিশ্ব হকির সেমি-ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ভারতের পরাজয়ের পর হকি বিশারদ ও কর্মকর্তাদের বিবৃতির বান ডেকেছে। কেউ বলেছেন গোল করার পর আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়াধারাই ভারতের পরাজয়ের কারণ। কেউ বলেছেন ভারত ভাল খেলতে পারেনি। গোষ্ঠি-চক্রের প্রভাবে মন রেখে মুখ চেয়ে দল গঠন করা হয়েছে। কেউ বা বলেছেন সব চেয়ে বড় ভুল হয়েছে দলে অভিজ্ঞতাহীন তরুণের আধিক্যে। অলিম্পিক বা বিশ্ব প্রতিযোগিতা এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান নয়। ওখানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কুশলী খেলোয়াড়দের নিয়ে শ্রেষ্ঠ দল গঠন করাই সঙ্গত। কেউ কেউ আবার ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারের অভিযোগ তুলে সরকারকে প্রকৃত ব্যাপারের তদন্ত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই সব বিবৃতি ও অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছু করবেন কিনা জানি না। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে ফেডারেশনের সভায় যে অনাস্থা প্রস্তাব তোলা হবে বলে কথা শোনা যাচ্ছে তার কি হবে সে সম্পর্কেও সাধারণের খুব মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু সরকার তথা সাধারণের মাথা ব্যথার কারণ দেখা দিয়েছে বার্সিলোনায় ভারতীয় দলের ম্যানেজার বলবীর সিং-এর বিবৃতির পর।

ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক হকি অধিনায়ক বলবীর সিং ভারতীয় হকি ফেডারেশনের নির্বাচক সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জিমি নাগরওয়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন, বার্সিলোনার ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করতে যারা সক্ষম এই ধরনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজসে ভারতকে পরাজিত করার জন্য নাগরওয়ালা ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিলেন। বিশ্ব হকির টেকনিক্যাল সমিতির সদস্য হিসাবেই নাগরওয়ালা গিয়েছিলেন বার্সিলোনায়। এবং খবর হকি ফেডারেশনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাঁর যাত্রার ব্যাপারেও আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সরকারের অনুমতি পেয়ে নাগরওয়ালাই বার্সিলোনায় গেলেন।

বলবীরের অভিযোগ, বিশ্ব হকি সংস্থার টেকনিক্যাল কমিটির সমস্ত সভায় উপস্থিত থেকে নাগরওয়ালা ভারতের পরাজয়ের জন্য চক্রান্ত করেছেন।

আগেই বলেছি, অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। দেশদ্রোহিতার অভিযোগেরই মত। এবং অভিযোগ রাম শ্যাম যদু মধুরে নয়, দলের ম্যানেজার এবং প্রাক্তন অধিনায়কের। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনিও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এখন কথা হচ্ছে, অন্য কোন ব্যাপারের তদন্ত না হলেও এই গুরুতর অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত। সরকারের সামনে সমস্যা এবং করণীয় কাজের অন্ত নেই। কিন্তু খেলাধুলোর ব্যাপার হলেও জাতীয় প্রয়োজনেই এই তদন্ত যে সরকারের অবশ্য করণীয় কাজ আশা করি উপর মহল সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

কলকাতার ক্রিকেট শুরু

কলকাতার ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে একটি প্রদর্শনী খেলাও হয়ে গেছে বালীগঞ্জে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে। দুদিনব্যাপী এই খেলাটিতে সি এ বি'র সভাপতির একাদশ ৭ উইকেটে ক্যালকাটা ক্রিকেট এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের সম্মিলিত একাদশকে পরাজিত করে কার্লটন ট্রফি পেয়েছে। ট্রফি পাওয়া বা খেলার ফলাফল নিতান্তই গৌণ। খেলাটি ছিল হাল্কা মেজাজের আনন্দদায়ক খেলা। দুই দলে বাংলার কৃতী খেলোয়াড় তো ছিলেনই, তাছাড়া সর্বভারতীয় কয়েকজন খেলোয়াড়ও যোগ দিয়ে খেলাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছিলেন। যেমন, গায়েকোয়াড়, বিশ্বনাথ, গোবিন্দরাজ, জিলানী, রমেশ সাকসেনা, আনন্দ শুকলা প্রভৃতি। বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক এবং সি এ বি দলের অধিনায়ক পংকজ রায়ের ৪০, পঙ্কজের ভ্রাতুষ্পুত্র অম্বর রায়ের ৫২, আনন্দ শুক্লার ৫৪, রণবীর সেনের ৫৮ রান অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে। সবচেয়ে উল্লেখের বিষয় হয় দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাউণ্ডারী ও ওভার বাউণ্ডারীর ছড়াছড়ি। গোবিন্দরাজ ও অম্বর রায় ৩টি করে এবং আনন্দ শুক্লা দুটি বাউণ্ডারী মেরে দর্শকদের আনন্দ দেন।

বাংলার টেস্ট খেলোয়াড় পরলোকগত পি সেনের স্মৃতিতে আয়োজিত নক-আউটের খেলাও এগিয়ে চলেছে। সেই সংগেই চলছে লীগের খেলা। কিন্তু ক্রিকেটের আমেজে ময়দানের এবারও মেতে ওঠার সম্ভাবনা নেই। নেই বাইরের দলের সফরের ব্যবস্থা। রণজির খেলা এবং যদি বাংলা দেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় টেস্ট দল ও অবশিষ্ট দলের বিশেষ প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয় তবে সেই খেলা দেখেই কলকাতার ক্রিকেট ক্রীড়ামোদিদের দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে।

একলব্য

পরলোকে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রীদেবকীকুমার বসু

বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীদেবকীকুমার বসু পরলোকে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রের এক গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান হল। তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ ছবি "সাগর সঙ্গমে" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পুরস্কারে ভূষিত। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি ছবি তৈরির কাজে ব্যাপৃত না থাকলেও চলচ্চিত্রলোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কখনই ছিন্ন হয়নি। চলচ্চিত্র জগতের নানা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার জন্য তিনি আসতেন। যে-কোন সমস্যায় শ্রীবসুর উপদেশ ও পরামর্শের জন্য চলচ্চিত্রসেবীরা তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। নবীন পরিচালকরা ছবি তৈরির কাজে হাত দেবার আগে শ্রীবসুর আশীর্বাদ চেয়ে নিতেন। শ্রীবসুর মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প আজ অভিভাবকহীন।

বাংলা সিনেমাকে শ্রীদেবকীকুমার বসু যা দিয়ে গেলেন তা লেখা থাকবে বাংলা ছবির ইতিহাসে। "চণ্ডীদাস" থেকে "সাগর সঙ্গমে" পর্যন্ত তিনি চল্লিশটির কাছাকাছি কাহিনী-চিত্র তৈরি করেছেন। চলচ্চিত্রে শ্রীবসু ছিলেন রসের কারবারী। রসসৃষ্টিই ছিল তাঁর সকল ছবির প্রধান আকর্ষণ। যে-কারণে "চণ্ডীদাস" "সীতা" "সোনার সংসার" "সাপুড়ে" "বিদ্যাপতি", "পথিক", "রত্নদীপ", "কবি", "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য", "সাগর সঙ্গমে" প্রভৃতি ছবিগুলির কথা দর্শকরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। বাংলা ছবির এক গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। স্বর্গত শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার মত তিনিও নিজেই ছিলেন এক "ইন্সটিটিউশন"। তাঁর মৃত্যু বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে ইন্দ্রপতন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩। হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে আকস্মিক, গত সতেরোই নভেম্বর, রাত্রি সাড়ে এগারোটায়। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে চলচ্চিত্র-জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও চলচ্চিত্র-সেবীরা শ্রীবসুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। মৃত্যুকালে শ্রীবসু তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও ছয় কন্যা রেখে যান। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীদিলীপকুমার বসু চিকিৎসক। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদেব-কুমার বসু একজন চলচ্চিত্রকার। বৃহস্পতি-বার কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীবসুর মৃত্যুতে ওইদিন কলকাতার স্টুডিওগুলি বন্ধ রাখা হয়। শুটিংও বন্ধ থাকে।

পদ্মশ্রীতে ভূষিত শ্রীদেবকীকুমার বসুর জন্ম ১৮৮৯ সনের ২৫ নভেম্বর। বর্ধমানের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা স্বর্গত মধুসূদন বসু ছিলেন অ্যাডভোকেট।

বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ির সংস্পর্শে আসেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন ছাত্রজীবনেই। বর্ধমান কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র "শক্তি" পত্রিকার সম্পাদনার ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৮ সনে

চলচ্চিত্রের জগতে তাঁকে আসতে হয় আকস্মিক ভাবে। নির্বাক যুগে শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী (ডি-জি) তাঁকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসেন। প্রথমে তিনি কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখলেন। পরে নির্বাক ছবিটির নায়কের চরিত্রে অভিনয়ও করলেন। নায়িকা ছিলেন শ্রীধীরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী। এরপর শ্রীবসু "পঞ্চশর" নামে একটি নির্বাক চিত্র তৈরি করেন। কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা তাঁরই। ওই সময়ে লখনৌতে তিনি "শ্যাডোজ অব দি ডেড" নামে একটি ছবি করেন। পরে কলকাতায় ফিরে এসে বড়ুয়া ফিল্মসের হয়ে "অপরাধী" ছবিটি

নিউ থিয়েটার্স-এর তিন প্রধান পরিচালক : শ্রীহেমচন্দ্র, শ্রীদেবকীকুমার বসু ও শ্রীনীতীন বসু। ছবিটি চল্লিশ দশকে তোলা।

চলচ্চিত্রলোকের একটি অনুষ্ঠানে শ্রীদেবকীকুমার বসুর সঙ্গে সুচিত্রা সেন। ফটো—দেশ

তৈরি করেন। এই সব ছবিই নির্বাক। নিউ থিয়েটার্সের হয়ে সবাক চিত্র "চণ্ডীদাস" (১৯২৩) তৈরির পরই শ্রীবসুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। "চণ্ডীদাস" এবং "পুরণ ভকত" ছবি দুটির মাধ্যমে শ্রীবসু প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

দুই চিত্রপরিচালক—শ্রীদেবকীকুমার বসু ও শ্রীসত্যজিৎ রায়—চলচ্চিত্রজগতের এক অনুষ্ঠানে। ফটো—দেশ

ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্মের হয়ে তাঁর তৈরি হিন্দী "সীতা" কাহিনী-চিত্র হিসাবে ১৯৩৫ সালে ভেনাস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। ছবিটি 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' লাভ করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ছবির এটাই প্রথম সম্মান। একই সঙ্গে বাংলা এবং হিন্দী ছবি তৈরির প্রয়াসও শ্রীবসু প্রথম করেন "সোনার সংসার" ছবিতে। ছবিটি উভয় ভাষায় তোলা হয়। দেবকীবাবু এই পর্যায়ে যতগুলি ছবি করেছেন তার তালিকা মোটামুটি এই রকম: 'মীরাবাঈ' 'রাজরাণী মীরা', 'বিদ্যাপতি' 'নর্তকী' সাপুড়ে, 'কৃষ্ণলীলা' এবং 'চন্দ্রশেখর'। উভয় ভাষাতেই ছবিগুলি জনপ্রিয় হয়।

শ্রীদেবকী বসু সমীপে অভিনেতা দিলীপ-কুমার। ফটো—দেশ

সমকালীন বিষয়ের ভিত্তিতে তাঁর তৈরি 'আকটার দ্য আরথকোয়েক' বিহার ভূমি-কম্পের পর বিহারের দুর্ঘটনার পটভূমিতে তোলা এই ছবি উল্লেখযোগ্য। ছবিটি হিন্দীতে তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে আরো দুটি ছবির নাম উল্লেখযোগ্য 'লাইফ ইজ এ স্টেজ' এবং 'আপনা ঘর' দুটিই হিন্দীতে তোলা।

১৯৪৯ সালে দেবকীবাবু পরিচালনার সঙ্গে প্রযোজনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর পরিচালিত ছবিগুলির তালিকা হচ্ছে কবি, রত্নদীপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পথিক, ভালবাসা নবজন্ম, চিরকুমার সভা এবং সাগর সঙ্গমে। চিত্র পরিচালক হিসাবে শ্রীবসুর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সব সময়েই "থীম"-এর প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন। রসোত্তীর্ণ কাহিনী নিয়েই তিনি ছবি করতেন। আজকাল বক্স-অফিসের তাগিদে অনেক সময় প্রমোদ-উপকরণবিশিষ্ট কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি হয়। শ্রীবসু কখনই তা করতেন না। যে-কারণে তাঁর ছবির প্রতি বিদগ্ধ দর্শকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত। চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধই ছিল শ্রীবসুর বিশেষ দান।

"ছদ্মবেশী" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার। ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে।

গুড্ডি

রূপম চিত্র

ফিল্ম স্টার ধর্মেন্দ্র "গুড্ডী"-তে চিত্রতারকা ধর্মেন্দ্র রূপেই উপস্থিত। তাও আবার অতিথি শিল্পী হিসাবে একবার শুধু চেহারা দেখানো নয়, একটি ভূমিকাও তাঁর রয়েছে। এটাই ছবিটির একমাত্র নতুনত্ব নয়, হৃষীকেশ মুখার্জির "গুড্ডী" কাহিনী ও ট্রিটমেন্ট-এর দিক থেকেও ভিন্ন ধরনের। ফিল্মের ইলিউশন কিছুটা ভাঙতে চেয়েছেন পরিচালক এ-ছবিতে। "গুড্ডী"-তে অশোককুমার, রাজেশ খান্না, প্রাণ, ওমপ্রকাশ, ডিমি প্রভৃতি শিল্পীদের স্টুডিওতে শুটিংয়ে দেখা গেছে। ছবিতে শিল্পীদের আমরা যেমন দেখি আসলে তাঁরা যে তা নয় তা-ই পরিচালক দেখিয়েছেন। অভিনেতা প্রাণ ছবিতে সদা ভিলেনের পার্ট করলেও ব্যক্তিগত জীবনে যে তিনি কত সজ্জন সেটা দেখিয়েছেন পরিচালক। ওমপ্রকাশ কৃপণের চরিত্রে অভিনয় করলেও একজন স্টুডিও-কর্মীর বিপদ দেখে মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে দেন। ব্যক্তিগত জীবনে সত্যিই যে তাঁরা এত ভাল সেটা অস্বীকার করা যায় না। তবে ঘটনাগুলো যে সাজানো মনে হয়, ফিল্মের মতই, তা-ই বা অস্বীকার করি কেমন করে? শুটিংয়ের কাজকর্ম ও শিল্পীদের অভিনয় বিশেষ-ভাবে দেখানো হয়েছে ছবিতে। সেই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে, বাইরে থেকে দর্শকরা শিল্পীদের অভিনয় ও গ্ল্যামার দেখে মুগ্ধ হন কিন্তু গ্ল্যামারের পিছনে কলাকুশলী, লেখক ও চিত্রনাট্যকারের দান যে কতখানি সে-খবর কি দর্শকরা রাখেন? কথাগুলি বলেছেন ধর্মেন্দ্র। ফিল্ম জগত ও শিল্পীদের জীবনের ট্র্যাজেডির কথাও তাঁর মুখে উচ্চারিত। বিমল রায় যে স্টুডিওতে অনেক ভাল ভাল ছবি তৈরি করেছেন তা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। সে-দিকে তাকিয়ে ধর্মেন্দ্র ছবির নায়ক নবীনকে (সমিত ভঞ্জ) বলেছেন, বিমলদার "বন্দিনী"-তে আমি কাজ করেছি। কত চমৎকার ফ্লোরই না বিমলদা তৈরি করেছেন এখানে। আজ দেখ কী দশা এই জায়গার। এটাই ফিল্ম জগতের রীতি। ফিল্মের ইলিউশন ও রিয়্যালিটি-তে মেশানো "গুড্ডী", একদিক থেকে, ফিল্ম জগতের প্রতি হৃষীকেশ মুখার্জির ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য বলা যেতে পারে।

ধর্মেন্দ্র যে ছবিতে ধর্মেন্দ্র রূপেই রয়েছেন তার কারণ ছবির নায়িকা গুড্ডী, যার ভাল নাম কুসুম (জয়া ভাদুড়ি), অন্ধ স্টার-ভক্ত। তার আইডল হলেন ধর্মেন্দ্র। স্টার-ভজনা এমন চরমে গিয়ে পৌঁছয় যে কুসুম বিয়ে করবে না বলেই মনস্থির করে ফেলে। স্কুলের মেয়ে কুসুমের কল্পনায় ধর্মেন্দ্র মহৎ, বীর, অতিমানুষ। নির্বাচিত পাত্র নবীনের গলায় বরমাল্য দেওয়া কুসুমের পক্ষে অসম্ভব। পরিচালক কুসুমের আইডল-উপাসনার রূপটা খুব চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। এবং সেটা খুবই বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে। ধর্মেন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে নিশ্চয়ই পরোপকারী এবং উদার। তবে এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে-ভাবে কুসুমের মোহ ভাঙাবার জন্য একটার পর একটা এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন এবং নানা চেষ্টাচরিত্র করেছেন সেটা কিছু অন্যান্য ফিল্মের গল্পই মনে হয়। কুসুমের অভিভাবকের অনুরোধে ধর্মেন্দ্র তাঁর ফ্যানকে বার বার স্টুডিওতে শুটিংয়ের সময় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। স্টার-জীবনে কী আসল আর কী নকল সেটা কুসুমকে দেখাবার জন্যই ধর্মেন্দ্রর আমন্ত্রণ। কুসুমের জীবনে যে স্টার ইমেজ গড়ে

উঠেছিল সেটাই ভেঙে দিলেন ধর্মেন্দ্র। এই পর্বে বেশ মজার মজার ঘটনা আছে। দর্শকরাও ফিল্ম স্টুডিওর ব্যাপারগুলো দেখে আনন্দ পাবেন। শেষ পর্যন্ত কুসুম মোহমুক্ত হয়ে নবীনকেই ভালবেসেছে। এইখানেই ধর্মেন্দ্রর পরম আত্মতৃপ্তি। দুটি জীবন তাঁর জন্য বরবাদ হল না।

"গুড্ডী"-র কাহিনী (গুলজার রচিত) ও তার বিন্যাসে যেমন চমক তেমনি শিল্পী নির্বাচনেও বৈশিষ্ট্য। নায়িকা চরিত্রকে এমন স্বাভাবিক ও জীবন্ত করে তোলার কাজটি জয়া ভাদুড়ি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হত কিনা বলা কঠিন। অসাধারণ তাঁর অভিনয়। হিন্দীচিত্রে সমিত ভঞ্জর অভিনয়ও বেশ লাগল। নায়কের মামা হয়েছেন উৎপল দত্ত, যিনি বিপদে পড়ে ধর্মেন্দ্রর স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্র-চিত্রণও স্বাভাবিক। গুড্ডীর ভাবী হয়েছেন সুমিতা সান্যাল। বেশ স্বচ্ছন্দ তাঁর অভিনয়। ছবির শেষের দিকে এত সব কাণ্ড হল, কিন্তু নায়িকার মাতৃসমা ভাবীকে একবারও দেখা গেল না। এটা অস্বাভাবিক। নায়িকার দাদার চরিত্রে বিজয় শর্মার অভিনয় চরিত্রোচিত।

প্রধান চরিত্রে পরিচালক অতি পরিচিত শিল্পীদের নেননি বলে ছবিতে বাস্তবের আভাস পাওয়া গেছে। ছবির গানেও বাস্তবতা। সংগীত পরিচালনা করেছেন বসন্ত দেশাই। গানের দিক থেকে ছবিটি কেন চিত্তাকর্ষক সে কথা এখানে ফাঁস না করলে দর্শকও ছবিটি দেখে আরও বেশি মজা পাবেন। সব মিলিয়ে খুবই উপভোগ্য ছবি "গুড্ডী"।

বোম্বাই বিচিত্র

'যে মানুষের নাম নেই, তার সাধারণত কেউ বদনাম করে না।' একথা মোটামুটি সব সময়ে, সমস্ত পরিবেশেই প্রযোজ্য। তবু নিন্দুকেরা নিন্দা করে আনন্দ পায় এবং যার নিন্দা করা হয় সেও অযথা চটে যায় এবং কখনো কখনো চটে গিয়ে সত্যি সত্যি কিছু নিন্দনীয় কাজও করে ফেলে। আমাদের ফিল্মের সংসারটা একটা ভয়ংকর অশান্তিতে ভরা একপাল অসম অশান্ত চরিত্রের জটপাকানো যৌথ পরিবার। কোঁদল লেগেই আছে। আজ রামের প্রশংসায় শ্যাম পঞ্চমুখ। আবার কালই হয়তো দেখবেন রামের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার না করে শ্যাম জলগ্রহণ করছে না। হঠাৎ কোনো পরিবেশে যদু এবং মধুর শত্রুতা দেখে আপনি হয়তো অবাক হয়ে গেলেন; তারপর কিছুদিন পরেই যদু এবং মধুর মধুর সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ কোনো সিনেমা পত্রিকায় পাঠ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই ফিল্মের সংসারে 'সবই হয়, সব সত্যি'। এ সংসারে সব সত্যি মিথ্যে, আবার সব মিথ্যেই সত্যি। অর্থাৎ কিছুই সত্যি নয় এবং কিছুই মিথ্যে নয়। এক কথায় কিছুই কিছু নয়।

একজন লেখক-চিত্রনাট্যকার এবং আরেকজন চিত্রনির্মাতার জোট বেশ সাফল্যের সঙ্গেই চলছিলো বেশ কয়েক বছর। কিছুদিন হল সে গাঁটছড়া ছিঁড়ে গেছে। তার 'ফলম ফলৌ, ফলাঃ' বুঝেছেই পারছেন! কথাটা রাষ্ট্র হওয়ায় নানান কথা রটতে শুরু করেছে। চিত্রনির্মাতা বলছেন ঐ লেখক চিত্রনাট্যকার নাকি 'নাথিং মোর দ্যান এ স্টেনো টাইপিস্ট!' আর উক্ত চিত্রনির্মাতা সম্পর্কে সেই স্টেনোটাইপিস্ট লেখক-চিত্রনাট্যকার যা বললেন সেটা ভারী মজার। সেদিন কোনো এক চিত্র-সাংবাদিক উক্ত লেখক-চিত্রনাট্যকারকে আলোচ্য চিত্র-নির্মাতার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে ভদ্রলোক বললেন যে, উক্ত চিত্র-নির্মাতা খুব ভাল দাবা খেলেন, জোরে চিন্তে এমন সব চাল চালেন যে মহা চালিয়াৎও টের পায় না সে কোথায় কাৎ হয়ে যাচ্ছে। সরল চিত্র-সাংবাদিক উত্তরের তির্যকতা না বুঝে ফের প্রশ্ন করে, "না না আমি ও'র চিত্রনির্মাণ ক্ষমতার কথা জিগ্যেস করছিলাম।" একটুকু বিব্রত না হয়ে লেখক-চিত্রনাট্যকার আবার বলেন, "উক্ত চিত্রনির্মাতা কুকুর পুষতে খুব ভাল-বাসেন।" সরল চিত্র-সাংবাদিক এবার চটে যায়, "দূর মশাই, ও'র কুকুর-প্রেম এবং দাবা খেলায় পারদর্শিতার কথা আমি জানি। এসবের ওপর বেশ কয়েকবার লিখেছিও। উনি ছবি কেমন করেন সেকথা বলুন?" এতক্ষণ আমি চুপচাপ শুনছিলাম, এবার বললাম, "উনি ছবি কেমন করেন সেটা আপনি এ'র কাছ থেকে জানতে চাইছেন কেন? আপনি ও'র ছবি দেখেন না?" আমার পাল্টা প্রশ্নে চিত্রসাংবাদিক একটু অবাক হলেন, বললেন, "দেখি আবার দেখিও না। ও'র ছবির প্রেস শোর আগে বা পরে খুব ভাল পার্টি হয় কিনা, তাই সেই পার্টির চোখেই দেখতে হয় ছবি!"

সরল শর্মা

'বিরাজ বৌ" (পরিচালনা : মানু সেন) ছবিতে উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী

শুটিংয়ের খবর

নায়ক উত্তমকুমারকে নিয়ে অগ্রদূতের পরিচালনায় সরকার ফিল্মস-এর সোনার খাঁচা-র ছয় দিনের শুটিং সম্পন্ন হয়েছে এ-সপ্তাহে। সংগীতবহুল এই ছবির নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। এছাড়া বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন নির্মলকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বীরেশ্বর সরকার ছবির কাহিনীকার ও

সংগীত পরিচালক। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মিহির সেন।

শ্যাম পিকচার্স-এর প্রেম ও অপ্রেম ছবিটির দ্বিতীয় পর্যায়ের শুটিং এ সপ্তাহের প্রথমভাগে আরম্ভ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন বিমল ভৌমিক। মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য শ্রীভৌমিকেরই রচনা। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, উৎপল দত্ত এবং স্বপন রায়। শ্যামল মিত্র ছবির সংগীত পরিচালক।

চিৎপুর-চিত্র

মহেঞ্জোদড়ো

ভারতে আর্য সভ্যতার প্রথম পদচিহ্ন কবে পড়েছিল, কেন পড়েছিল এবং কী করেই বা—তার চুলচেরা বিচারের কথা না তুলে কেবল যদি পালাকার শম্ভু বাগ এবং প্রযোজক যাত্রাগোষ্ঠী তরুণ অপেরার মতের সঙ্গে সায় দেওয়া যায় তো গোটা ব্যাপারটাই খুব মজার বলে মনে হবে। এবং উপভোগেরও। নাচ গান, হই-হল্লা, যুদ্ধ ও বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি আছে তীব্র পরকীয়া প্রেম। পূর্ব আর অন্তরঙ্গের অংশটুকু যদি না থাকত, তবে জোর গলায় বলা যেতো যাত্রার আসরে এমন উত্তেজক রসের পালা আগে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

পালার নাম 'মহেঞ্জোদড়ো'। কাহিনীতে বলা হয়েছে, আদ্যিকালের ভারতে, অর্থাৎ আর্যরা আসার আগে এখানে অনেক উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল (একমত)। পোশাক পরিচ্ছদ শিক্ষাদীক্ষা সকল দিক থেকে উন্নত এই ভারত ছিল পর্বতবাসী আর্যদের লোভের বস্তু। পালার মূল বক্তব্য তাই চিহ্নিত আর্য-অনার্য সংঘর্ষে। বলাই বাহুল্য পরিণতিতে আর্যদের জয়ধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে আসর। কিন্তু অস্বীকার করব না, নান্দুরের (মহেঞ্জোদড়ো) রাজা শম্বর, তার রানী অজাঝিন্তা, সেকালের রূপোপজীবিনী কুন্দরী এবং তামাম ভারতীয়ের জন্য তীব্র বেদনা মনের উপর অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের জন্য, ভারতীয়ের জন্য এই যে বেদনাবোধের সঞ্চার, অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায় সেটুকুই এ-পালার মহৎ উপাদান।

শিল্পাঙ্গ যেখানে ব্যবসায়ভিত্তিক, সেখানে জন মনোরঞ্জনকে নিশ্চয় প্রাধান্য দিতে হয়। আর্যরা সত্যি বাইরে থেকে এসেছিল, নাকি, ভারত থেকেই বাইরে গিয়েছিল তারা—সে প্রশ্ন সুতরাং এখানে না তুলে এর প্রমোদ-উপকরণের কথাই যদি বলা যায়, তবে বলি, গত এক দশকে প্রযোজিত যাত্রাপালার মধ্যে এর সমতুল্য কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিচালক অমর ঘোষের প্রয়োগভাবনায় সর্বরসের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে—যদিও শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য কিছু বেশি। এবং তা দর্শককে গভীর প্রভাবিত করতেও দেখেছি।

যাযাবর আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃ ও প্রেম বিষয়ক দ্বন্দ্ব যেমন উপস্থিত তেমনি তীব্র সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে রাজা শম্বর এবং সেকালীন বাহুবল আক্রমণকারীদের মধ্যে। উপলক্ষ ঠিক কুন্দরী নয়; অজন্তা। এই দ্বন্দ্ব পরিণতিতে আসতে না আসতেই ভারতের ওপর আর্যদের হামলা এসে পড়েছিল। ওরা নারকীয় হত্যাকাণ্ড করেই ক্ষান্ত হয় নি, সিন্ধুর বাঁধ কেটে দিয়ে ভারতের নিজস্ব সভ্যতাকে কবর দিয়েছিল পলিমাটির তলায়। মধ্যরঙ্গের প্রথম দৃশ্য থেকে তাই পালা কাহিনীকে নিখুঁত নিটোল নাট্যমুহূর্তের মালায় গাঁথা হয়েছে। ঘটনার ঘনঘটা আছেই এবং তা নানা রসের জারকে জারিত। শম্বর-পত্নী সন্দিগ্ধচিত্তহ অজাঝিন্তার সৌন্দর্য এবং তার নৃত্য ও গীত বলাই বাহুল্য হাজার হাজার দর্শককে আগাগোড়া মুগ্ধ করে রেখেছিল। এই কাহিনীর সঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে না জড়ালেই বিষয়টি শোভন এবং যুক্তিসহ হতে পারত। এ-যেন এক টুকরো স্বপ্নমায়া, রাখালদাসের চোখে দেখা। প্রযোজক, পরিচালক এবং পালাকার তা হলে কি বলতে চাইছেন তাঁদের বলা কাহিনীটুকু মিথ্যা?

অভিনয়ের সুনাম তরুণ অপেরার আছেই, এক্ষেত্রেও অপূর্ব এক দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন। দলনায়ক শান্তিগোপাল যথাক্রমে রাখালদাস ও শম্বরের ভূমিকায় স্রষ্টা। প্রথম চরিত্রটি, আগেও বলেছি অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হওয়ায় ওখানে শান্তিগোপালের কিছু করবার ছিল না। কিন্তু শম্বরের চরিত্রাভিনয়ে তিনি অসামান্য দক্ষতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। শম্বর জানতেন তার স্ত্রী জনৈক আর্য পুরুষের রূপে মুগ্ধ। এই কঠিন চরিত্রটিকে অনুপম উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে দিয়েছেন স্বর্ণালী ব্যানারজি। ওঁর কয়েকটি নাচ এবং দুটি গানের মুহূর্ত কিছুতে ভোলবার নয়। অজাঝিন্তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং গভীর প্রেমকে রেখায়িত করেছেন শিশির মণ্ডল। ভারতীয়দের মধ্যে আক্ককেরা, পোমানে, চক্লেন ও আপ আপ্পোনা চরিত্রের সার্থক রূপকার যথাক্রমে অজিত দত্ত, নরেন দে, পঞ্চানন ব্যানারজি ও ব্রজগোপাল দে। হাস্যার্ণব শিব ভট্টাচার্যের পুষ্কল আগাগোড়া রিলিফের কাজ করেছে। পুষ্কল ছাড়া আর্য তরফের প্রধান কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ্য রূপ আসরে উপস্থিত করেন অনুপকুমার (সৌবীর), অতীন সরকার (পুরন্দর), সত্যেন মুখার্জি (দিবোদাস), অসীমকুমার, সুদর্শন সেন প্রভৃতি। গীতশ্রী দাস, মিতা তালুকদার, গুণসিন্ধু মণ্ডল, বাবলু চৌধুরীর অভিনয়ও আসরে প্রশংসা পেয়েছে।

সংগীতাংশ 'মহেঞ্জোদড়ো' পালার বিশিষ্ট সম্পদ। দুর্গা সেন সুরারোপিত কয়েকটি গান ভোলবার নয়।

সূত্রধার

অরণ্যদেব লী ফক

'এত ধনরত্ন পাঠিয়েও অরণ্যদেবকে আনানো গেল না দেখে পাহাড়ী ডাইনী তো রেগে আগুন...'
তবু এল না?
বড্ড একগুঁয়ে মানুষ!

'বেশ, এমন লোভ এবারে দেখাব যে, আসতে তাকে হবেই!'

'আবার তাঁকে উপহার পাঠাল ডাইনী। উটের পিঠে গেল সেই উপহার.....'
এবারে না-এসে পারবে না।

আমাদের রানী তাঁর ভালবাসা জানাবার জন্যে এইসব উপহার পাঠিয়েছেন।
কী পাঠিয়েছে সেই ডাইনী?
4/4

'রূপসী মেয়েদের সে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। কিন্তু অরণ্যদেবের সেই একই উত্তর : না।'
!

'না' বলে ভালই করেছিলেন। আসলে তো তারা রূপসী মেয়ে নয়, অরণ্যদেব 'না' বলতেই তাদের আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়ল।
তারা তাহলে কী?
কী?

'তারাও সব দৈত্য-দানো!'

সব শুনে পাহাড়ী ডাইনীর চোখ থেকে তো আগুন বেরোতে লাগল!
বলো কী!
অরণ্যদেব যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে জঙ্গলের সব রাজার বড় ছেলেকে আমি মারব!
৮

সংসদের উভয় সভায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। "বাঙলাদেশের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ আশাকে অস্বীকার করা এবং পদদলিত করা যাবে না।" ১৫ নভেম্বর সংসদের উভয় সভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সদ্যসমাপ্ত বিদেশ সফর সম্পর্কে এক বিবৃতিদানের সময় এই মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের জানান, তাঁর এই সফরে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের, যাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তাঁদের একথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁরা হয় এককভাবে না হয় যৌথভাবে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রকে যেন একথা বোঝান যে, তরবারি ঘুরিয়ে বা ভারতের উপর সামরিক সংঘর্ষ চাপিয়ে দিয়ে কোন কল্যাণ হবে না। তাঁর এই সফর সেই অর্থে ফলদায়ী হয়েছে—বিবৃতিতে এই মন্তব্য করে তিনি দেশকে শান্ত থাকার আবেদন জানান। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, অধিকাংশ দেশ একথাও অনুভব করছে যে, শেখ মুজিবর রহমানের অবিলম্বে মুক্তি হওয়া দরকার এবং পাকিস্তানের সামরিক সরকারের ওপর এ-ব্যাপারে তারা চাপ সৃষ্টি করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও পশ্চিম জারমানী সফর করেছেন।

দেশী সংবাদ

১৫ নভেম্বর—আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পনেরটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত যে কর্মসূচী তৈরি করেছেন তদনুসারে রাজ্য বিধান সভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ১৫ ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হবে এবং ফেব্রুয়ারিতে তা শেষ হবে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

আজ (সোমবার) থেকে সারা ভারতে শরণার্থীদের জন্য লেভি চালু হলো। পোস্টকার্ড বাদে পোস্ট অফিসে প্রতি জিনিসে অতিরিক্ত পাঁচ পয়সা এবং রেল ও আভ্যন্তরীণ বিমানযাত্রীদের শতকরা পাঁচ টাকা বেশী দিতে হবে। এ ছাড়া রেভেনিউ স্ট্যাম্পের দাম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

১৬ নভেম্বর—আমদানী ওষুধের লেবেল জাল ওষুধ তৈরির কারখানায় সরবরাহ করার অভিযোগে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিস আজ ভোরে বড়তলা থানার হরি ঘোষ স্ট্রীটে একটি ছাপাখানায় হানা দিয়ে এরূপ ৫০ হাজার লেবেল উদ্ধার করে।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট আজ আদেশ দেন যে, ৭ নম্বর মস্কর রোডের বিতর্কিত এ আই সি সি অফিসটি অবিলম্বে তালাবন্ধ করে দেওয়া হোক। মালিকানার বিরোধ নিয়ে সেখানে উত্তেজনা বিদ্যমান—পুলিসের কাছ থেকে এই রিপোর্ট পেয়ে সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এই নির্দেশ পাঠান।

১৭ নভেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন : সর্বোচ্চ স্তরে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত বন্ধ কল-কারখানা খোলা হবে। এজন্য আইনগত কিছু ক্ষমতার জন্য সরকার অপেক্ষা করছিলেন। সেই ক্ষমতা এখন পাওয়া গিয়েছে।

সরকারী হিসাব কমিটি এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে, লনডনে ভারতীয় হাই-কমিশন প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জায়গা নিয়ে রেখেছেন এবং এইভাবে করদাতাদের অর্থের অপব্যয় করছেন। কমিটি বলেছেন যে, হাই-কমিশনের কর্মচারীর সংখ্যা ১৫৮ জন—অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা সুপারিশ করেন।

১৯ নভেম্বর—বাংলা দেশ সমস্যা পর্যালোচনা করে দেখার জন্য আমেরিকা ভারতে একটি কমিশন পাঠানোর প্রস্তাব করেছে বলে খবর বের হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং রাজ্যসভায় তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, এখানে অনুসন্ধান করে দেখার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করার অধিকার কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আছে বলে আমরা স্বীকার করিনা।

অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চবন লোকসভায় বলেন, সরকারী কাজে ব্যয় বৃদ্ধি এবং পরিণামে নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থার ফলেই সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার বার্ষিক রিপোর্টে মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা সম্পর্কে যে হুঁশিয়ারি ছিল সে সম্পর্কের উল্লেখ করে শ্রীচবন বলেন, সরকার এ সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

২১ নভেম্বর—তিনটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যুক্তভাবে দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বন্ধ কারখানা সম্পর্কিত অরডিন্যান্সের এবং বোনাস আইনের ত্রুটিগুলির সংশোধনের ও গ্র্যাচুয়িটি আইন কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সম্প্রতি ইনটারনাল অডিট চালু হওয়ার পর অনেক দুর্নীতি ও কারচুপি ধরা পড়েছে। ওই সংস্থাসূত্রে প্রকাশ : কর্মচারিদের টিফিনের জন্য কুপন দানের ব্যাপারে বেক ডিপোর জনৈক কর্মীকে কর্তৃপক্ষ সাময়িক বরখাস্ত করেছে। সংস্থার এক শ্রেণীর কর্মী ১৫ টাকার কুপন দশ টাকায় কিনতে পারেন। বাকী ৫ টাকা ক্যানটিন মালিককে পরিবহণ সংস্থা থেকে দেওয়া হয়। আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষায় দেখা যায় বেক ডিপোতে বিভিন্ন উপায়ে কুপন অনেক বেশী ইস্যু করা হয়েছে।

২২ নভেম্বর—এ বছর জুলাই থেকে ভারতের ৮টি রাজ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভারড্রাফট গ্রহণ করেছে। মোট ওভারড্রাফটের পরিমাণ ১৬৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৪টি রাজ্য ৭০ শতাংশ ওভারড্রাফট গ্রহণ করেছে। এই রাজ্যে চারটির ওভারড্রাফট পরিমাণ ১২০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

কলকাতা পৌরসভা নির্বাচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী পৌরকর্মীদের চাকরির বয়স ৬০ থেকে ৬৫ করার সিদ্ধান্ত নেয় ও রাজ্য সরকার তা অনুমোদন করে। একাধিক পৌরকর্মী এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁদের পদোন্নতি ব্যাহত হবে বলে আদালতে সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। আদালত থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকার জন্য অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৫ নভেম্বর—মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন নাকি শরণার্থী সমস্যা সমীক্ষার জন্য ভারত ও পাকিস্তানে একটি মিশন পাঠাতে চান। ওই মিশনে সদস্য থাকবেন চারজন। খবরটি উৎস রোক সাকসেস। ভারত সরকার সরকারীভাবে এ সম্পর্কে কোন বিজ্ঞপ্তি পাননি।

১৬ নভেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় দূত শ্রীসমর সেন গতকাল সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, ভারতই প্রথম ১৯৫০ সালে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেছিল। কাজেই রাষ্ট্রপুঞ্জে তাঁদের উপস্থিতি আমাদের পক্ষে বিশেষ সন্তোষের কারণ।

১৭ নভেম্বর—তাইল্যানডের শাসক বিপ্লবী দলের প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মারশাল থানম কিত্তিকাচরণ আজ রাত্রে কার্যত সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছেন। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন, সংবিধান বাতিল করেছেন। তাই বেতার একথা ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯ নভেম্বর—ঈদ-উল ফেতরের প্রাক্কালে পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ এক ভাষণে বলেছেন যে, ভারত তাঁর বন্ধুত্ব গ্রহণ করুক এবং সংপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের এক নবযুগের সূচনা করুক। অকারণ বিবাদে দুই দেশের শক্তি-সম্পদ অপচারিত হচ্ছে এবং জনগণ স্বাধীনতার প্রকৃত সুফললাভে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তিনি আক্ষেপ করেন।

২১ নভেম্বর—ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান উত্তেজনার জন্য ভারতকে পুরোপুরি দায়ী করে গতকাল জাতিসংঘের সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক কমিটিতে চীনা প্রতিনিধি এক কড়া বক্তৃতা দিয়েছেন। চীনা প্রতিনিধি ফু হাও তাঁর বক্তৃতায় ভারতের নাম করেন নি, তবে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, "চীনা সরকার ও জনগণ সর্বদাই মনে করে, কোন দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যাকে সেই দেশের জনগণের সমাধান করা উচিত।

২২ নভেম্বর— যশোহর, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে মুক্তি বাহিনী আজ পাক-ফৌজের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নেমেছে। যশোর ক্যান্টনমেন্টের উপর মুক্তিবাহিনী যে প্রবল আক্রমণ শুরু করে তা অব্যাহত আছে বলে জানা গেছে। ঢাকা রেডিয়ো এই আক্রমণকে পাকিস্তান সৈন্যের তিনটি ব্রিগেডের আক্রমণ বলে ওই সংবাদের পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়েছে।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীস্বপন চৌধুরী

বাচ্চার জন্যে মায়ের কামনা...
ও যেন পায় সুখস্বপ্ন
অসীম ভালবাসা—
টুকটুকে গাল, তুলতুলে পা
যা কিছু মোর আশা
অস্টারমিল্কই দেব ওকে—
যা সবচাইতে ভালো বেঁচে
থাক সোনা
আমার
ঘরটি
ক'রে আলো!
আপনার মত বিচক্ষণ মায়েরা
তাদের শিশুদের খাওয়ান অস্টারমিল্ক
অস্টারমিল্ক
সারা দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিল্ক ফুড
Creative Unit-204

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫
শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
Saturday 4 December 1971

বাংলাদেশের লড়াই

পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটে নি; কিন্তু গত কয়েক দিনের ঘটনা এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যাতে অনেকেরই ধারণা হচ্ছে, যুদ্ধ বুঝি লেগে গেল। এটা কতটা যথার্থ, ভেবে দেখতে হবে। আমরা জানি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবার পর থেকেই পাকিস্তান ভারতকে তার একমাত্র শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। সে তার সেনাবাহিনীকে সরাসরি সীমান্তে এনে হাজির করেছে, যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে, তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিচ্ছে, আর জগতের কাছে এটা প্রচার করবার চেষ্টা করছে যে, বাংলাদেশ কিছুই নয় ভারতই তার দেশের ওপর আক্রমণ চালাবার জন্যে প্রস্তুত। পাকিস্তান এমন কথাও হালে বলতে শুরু করেছে, ভারত তার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। ভারতের এই ধরনের কোনো অভিসন্ধি যদি থাকত তবে পাকিস্তান আজ সাত আট মাস ধরে যে ধরনের যুদ্ধের উসকানি দিচ্ছে তাতে হয়ত রণক্ষেত্র সৃষ্টি হতে বিলম্ব হত না। এক কোটি মানুষকে যারা অস্ত্রের জোরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শরণার্থী করে বিতাড়িত করতে পারে তাদের মানবিক ন্যায় নীতি-বোধ যে কতটা উঁচু দরের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। শুধু এবারের শরণার্থী কেন, দেশ ভাগ হবার পর থেকে দফায় দফায় দু চার বছর অন্তর অন্তর পাকিস্তান তার পূর্বাঞ্চলে কী নির্মম নরমেধ যজ্ঞ করে ভারতের সীমানায় লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাঠিয়ে দিয়েছে তাও তো কারও অবিদিত নয়। পাকিস্তান যা করেছে সবই পরিকল্পিত ভাবে, যা করছে তাও যথেষ্ট ভেবেচিন্তে।

তা হলে, আজ হঠাৎ এত যুদ্ধ-যুদ্ধ আবহাওয়া কেন? এর প্রথম জবাব, বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী শীত শুরুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর প্রচণ্ডভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গত সাত মাসে মুক্তিবাহিনী তার শক্তি বাড়িয়েছে, রণশাস্ত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষিত করেছে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে, আর শীতের শুরু থেকেই পাক সামরিক বাহিনীকে বড় বড় আঘাত হানার জন্যে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে। তাতে আশাতীত সাফল্যও লাভ করেছে। মুক্তি বাহিনীর দখলে আজ বাংলাদেশের অনেকটা মাটি, গুরুত্বের দিক থেকে তার মূল্য ইয়াহিয়া বাহিনীর দখলের চেয়ে তেমন কম নয়। মুক্তিবাহিনী ক্রমাগত নানা জায়গায় চাপ দিচ্ছে, বিশেষ সামরিক ঘাঁটিগুলি দখলের চেষ্টা করছে। পাক সৈন্যের এখনকার অবস্থা ভাল নয়। তারা বিভিন্ন স্থান থেকে পিছু হঠে যাচ্ছে, পোড়ামাটি নীতি নিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে আজকের যা অবস্থা তাতে পাক সামরিক শক্তিকে এক একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে উপায় নেই। তার কাছে স্থলপথ প্রায় বন্ধ, জলপথও অগম্য, মুক্তিবাহিনী জাহাজ ঘায়েল করে দিচ্ছে। একমাত্র পথ আকাশ। শুধুমাত্র বিমানের ভরসায় থেকে সর্বত্র দখল রাখা নিশ্চয় সম্ভব নয়। পাকিস্তান যখন থেকে বুঝেছে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে তার সামরিক সাফল্য নিশ্চিত নয় তখন থেকেই ভারত বিরোধিতা আরও জোরদার করেছে, প্রাণপণে প্রচার করবার চেষ্টা করছে যে ভারত তার বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে নেমেছে। ভারত যুদ্ধে নামে নি। তবে সে তার দেশরক্ষার প্রস্তুতি শিথিল করে নি, আরও সতর্ক ও সাবধানী হয়ে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। তার এই সতর্কতার প্রমাণ হল পাকিস্তানের কয়েকটি বিমান, যা ভারতের সীমানায় ঢুকে পড়েছিল, তাকে ঘায়েল করা এবং কিছু সাঁজোয়া গাড়িকে অক্ষম করে দেওয়া। পাকিস্তানকে লড়তে হচ্ছে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে নয়।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪৯

সরকারী আবেদনে সাড়া

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (তথ্য ও বেতার) শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী সংবাদপত্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন: দ্রব্যমূল্যের প্রশ্ন স্থগিত রাখুন, শুধু উৎপাদন শুল্কের দুই পয়সা দাম বাড়ান। তাঁর আশা, সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ সরকারের এই আবেদনে সাড়া দেবেন এবং শুধু উৎপাদন শুল্ক অতিরিক্ত নিয়ে অধিকাংশ আগেকার দামেই সংবাদপত্র প্রকাশন শুরু করবেন। সংকটে শ্রীমতী সৎপথী বলেছেন, সীমান্ত, বিশেষ করে পূর্বখণ্ডের অবস্থা গুরুতর। সংবাদপত্র না থাকলে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ ও সঠিক সংবাদের জন্য সংবাদপত্রের প্রকাশ প্রয়োজন।

আমরা তাই এই আবেদনে সাড়া দিয়ে দ্রব্যমূল্যের প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রাখছি। এবং পুরোনো দামের (৬০ পয়সা) সঙ্গে শুল্কের দুই পয়সা অতিরিক্ত নিয়েই (মোট ৬২ পয়সা) সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দু-মুখো চীন
ভারত

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পরিস্থিতিটা এখন এত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে যে সাতদিন আগে এ সম্পর্কে কিছু লিখে রাখা অত্যন্ত কঠিন। আজ যখন লিখছি তখন পরিস্থিতিটা একরকম। সাতদিন পরে যখন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তখন হয়ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় এসে গিয়েছে। তাই এখন ঘটনা-প্রবাহ খুব দ্রুত এগোচ্ছে। একদিকে এগোচ্ছে লড়াই, আর একদিকে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা। লড়াইটা যত বাড়ছে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের আক্রমণ যত প্রবল হয়ে উঠছে, বিশ্বের বোবা-নেতৃত্ব ততই সরব হয়ে উঠছেন। একদা যারা বাংলাদেশ পরিস্থিতিটাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে কোনও মন্তব্য করতে চান নি, আজ সেইসব রাষ্ট্রই বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছেন।

মুক্তি সংগ্রামীরা এখন গোটা বাংলাদেশের ভেতরে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছেন। জলে স্থলে সর্বত্র যুদ্ধ চলছে। গোটা বাংলাদেশে পাকিস্তানী যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। কলকারখানা বন্ধ। কতকগুলি বিমানবন্দরও বিধ্বস্ত। চালনা নৌ-বন্দর সম্পূর্ণ অচল হয়ে গিয়েছে। মুক্তিবাহিনী মাইন পেতে চালনা বন্দরকে বেশ কিছুদিনের মত বন্ধ করে দিতে পেরেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থাও শোচনীয়। গত রবিবার রাত্রে বি বি সির সংবাদদাতা ঢাকা থেকে জানিয়েছেন : যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু ঢাকার চতুর্দিকে সতেরোটা ব্রিজ মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ধ্বংস করে দিয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের ভেতরেই এই অবস্থা। জলপথেও মুক্তিবাহিনী সক্রিয়। ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-বরিশাল জলপথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা কখন স্টীমার বা লঞ্চের ওপর আক্রমণ করে এই ভয়ে গোটা বাংলাদেশে বহু স্টীমার চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মুক্তিবাহিনী এখন চতুর্দিক থেকে পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করেছে। চতুর্দিকের আক্রমণ এলে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও সামরিক বাহিনীর পক্ষেই আত্মরক্ষা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে পাক সামরিক বাহিনীরও সেই সেই অবস্থাই হয়েছে। আগামী তিন চার-দিনে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ আরও জোরদার হবে।

পাক সেনাবাহিনী আবার সেই পুরনো রণকৌশল নিয়েছে। তারা গ্রামাঞ্চল ও সামরিক দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি ছেড়ে ক্যান্টনমেন্ট এবং গ্যারিসন-

গুলিতে আশ্রয় নিচ্ছে। উদ্দেশ্য, গোটা বাংলা দেশটা হাত ছাড়া হয়ে গেলেও যেন গ্যারিসন এবং ক্যান্টনমেন্টগুলি কিছুদিন দখলে রাখা যায়। আর ওই গ্যারিসন ও ক্যান্টনমেন্টগুলিকে দেখিয়ে যেন বিশ্ববাসীকে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলায় পাক কর্তৃপক্ষের দখল অটুট।

পাকিস্তানীরা এটা মানে যে শুধু মুক্তি-বাহিনীর পক্ষে গ্যারিসন ও ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট করে তাদের উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাতে প্রচুর সময় লাগবে। গ্যারিসন ও ক্যান্টনমেন্টগুলি থেকে চট করে পাক বাহিনীকে উচ্ছেদ করতে হলে মুক্তিবাহিনীর প্রকাশ্য ও বড় দরের ভারতীয় সাহায্য চাই। পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ আরও মনে করে যে পুরোদমে যুদ্ধ না লাগলে ভারতীয় সেনা-বাহিনী পূর্ব বাংলার ক্যান্টনমেন্ট বা গ্যারিসনগুলির উপর সরাসরি আক্রমণ করতে এগিয়ে যাবে না। তাই পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ আপাততঃ প্রধানত গ্যারিসন ও ক্যান্টনমেন্টগুলি রক্ষা করতে চাইছে।'

তাদের আশা, ইতিমধ্যে ভারতীয় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তারা রাষ্ট্রসংঘ বা বৃহৎ শক্তিবর্গকে নিয়ে একটা কিছু করাতে পারবে।

✻

বৃহৎ শক্তিবর্গ ইতিমধ্যেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। যাঁরা পাক সেনাদের হাতে অন্ততঃ দশ লক্ষ বাঙালীর হত্যাকাণ্ডের পরও ব্যাপারটাকে নেহাতই পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে চুপচাপ থেকে গিয়েছেন, তাঁরাই এখন ভারত-পাক সীমান্ত সংঘর্ষের আশংকায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন! ইতিমধ্যেই কয়েক দফা

আলোচনা হয়ে গিয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইতিমধ্যেই নানাভাবে সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক ডাকার চেষ্টা তদবির চলছে। বেলজিয়ামকে দিয়ে একটা প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। আর একটা প্রস্তাব দিয়েছে মিশর। আগামী দু-চার দিনের মধ্যে আরও প্রস্তাব আসবে।

এখনও এদের সকলেরই মূল বক্তব্য হল, ভারত-পাক [illegible] যে কোনও ভাবে এড়াতে হবে। [illegible] বেতে কিন্তু এখনও এরা [illegible] নন। বাংলাদেশের উপর পাক [illegible] চক্র যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, [illegible] পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে [illegible] ভাবে রাখার চেষ্টা করছে সে সম্পর্কে [illegible]ও সকলেই চুপচাপ। এখনও তাঁরা পূর্ব [illegible]র মূল ব্যাপারটা অর্থাৎ বাংলাদেশের [illegible]ধীনতা আন্দোলনটা মানতে রাজি নন। বৃহৎ শক্তিবর্গ এখনও সে সম্পর্কে চুপচাপ। এখনও তাঁরা কেউই প্রকাশ্যে ইয়াহিয়াকে বলতে রাজি নন : শেখ মুজিবকে ছাড়তেই হবে, এবং বাংলাদেশের [illegible] একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসতেই হবে। এটা পৃথিবীর সবাই জানে [illegible] আজ যদি বৃহৎ শক্তিগুলি একযোগে পাক সামরিক চক্রকে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চাপ দেন তাহলে তার পক্ষে সেই চাপ মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না।

কিন্তু সে চাপ তাঁরা দিচ্ছেন না। দেবেনও না। এতদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলত, পাকিস্তানকে চাপ দেওয়া মুশকিল, তাহলে সে পুরোপুরিভাবে চীনের দিকে চলে যাবে। এখন দেখা যাচ্ছে, আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পাকিস্তানের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তোলার গোপন আলোচনা চালাচ্ছিল। এখন পাকিস্তানের মাধ্যমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে এশিয়া সম্পর্কে একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা পাকা করে নিতে চাইছে। মার্কিনরা ভাবেন, পৃথিবীর সবাই বোকা, শুধু তাঁরাই চালাক। এটা পৃথিবীর শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই বোঝেন যে আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া একযোগে শেখ মুজিবুরকে ছাড়ার জন্য ও বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছবার জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ দেয় তাহলে পাক শাসক চক্র শুধু চীনের ভরসায় তা কিছুতেই অমান্য করতে পারে না। এখনও পাকিস্তানের মত একটা রাষ্ট্রের বোঝা বইবার মত ক্ষমতাই চীনের হয় নি।

আসলে কোনও বৃহৎ শক্তিই মনেপ্রাণে স্বাধীন বাংলাদেশ চান না। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা কোনও সাহায্য করতে নারাজ। বরং স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পায় সেইজন্যই তাঁরা নানাভাবে সক্রিয়।

এমন কি রাশিয়াও স্বাধীন বাংলাদেশ চায় না। কিন্তু চীনা ও মার্কিন রাজনীতির ধাক্কায় রাশিয়া আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে পড়েছে যে ভারতকে তার সঙ্গে চাই-ই। বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়া যা বলছে বা করছে সেটা মূলত ভারত সরকার ও ভারতীয় জনমতকে হাতে রাখার জন্যই। রাশিয়া যদি স্বাধীন বাংলাকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারত তাহলে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান আরও দ্রুততর হত।

বৃহৎ শক্তিগুলি বাংলাদেশ সম্পর্কে যত না ভীত, তার চেয়ে বেশি ভীত ভারত সম্পর্কে। তাদের প্রায় সকলেরই আশংকা, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে পাকিস্তান ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ভারত খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। মূলত এই আশংকাতেই তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশ মানতে রাজি নন।

*

তাই স্বাধীন বাংলাদেশ যত বাস্তব হয়ে উঠবে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যত প্রবল হয়ে উঠবে এবং ভারত সরকার যতই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন ততই বৃহৎ শক্তি মহলে চাঞ্চল্য বাড়বে। ততই রাজনৈতিক সমাধানের নামে গোঁজামিল দিতে তাঁরা আগ্রহী হয়ে উঠবেন। যাতে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাকে আটকানো যায়, যাতে পাকিস্তানের মধ্যেই বাংলাদেশকে রাখার কোনও একটা ব্যবস্থা করা যায়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ এটা জানেন যে পাকিস্তান যদি আজ পুরোদমে ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে তাহলে তার ফলে গোটা পাকিস্তানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বৃহৎ শক্তিবর্গ এখন এটা বুঝেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী কিছুতেই মুক্তিসেনাদের সাহায্যদান বন্ধ করবেন না। তাঁরা এও বুঝেছেন যে পাকিস্তান যদি ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু করেও দেয় তাহলেও চট করে কোনও আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় ভারতকে রাজি করিয়ে সে যুদ্ধ থামানো যাবে না। সে যুদ্ধ বেশ কিছুদিন চলবে এবং তাতে পাকিস্তানই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

আর সে যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আরও ত্বরান্বিত হবে। পাকিস্তানী নেতারা যতই বড়াই করুন, চীন যতই সীমান্তে সৈন্য পাঠাবার হুমকি দিক, লড়াই যদি পুরোদমে শুরু হয় তাহলে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তি সেনারা একযোগে পূর্ব বাংলাকে পুরোপুরি পাকিস্তানী কবলমুক্ত করে দেবেন।

তারপরও পশ্চিমের লড়াই চলতে থাকতে পারে. তারপরও ভারত-পাকিস্তানের লড়াই থামাবার জন্য নানা মধ্যস্থতা হতে পারে এবং তারপরও নিশ্চয়ই রাষ্ট্রসংঘ নানাভাবে যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তারপরও কি আর কেউ বাংলাদেশে পাকিস্তানী রাজ পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে পারবেন? বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার ঢাকায় পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রসংঘ বা বৃহৎ শক্তির কোনও চাপ কি আর পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের থলের ভেতর ঢোকাতে পারবে?

এই পরিস্থিতিটা বৃহৎ শক্তিবর্গও জানেন, জানে পাকিস্তানের সমর নায়করাও। তাই ইয়াহিয়া এখনও ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু করতে সাহস পাচ্ছে না। তাই বৃহৎ শক্তিবর্গও লড়াই শুরু হলে হস্তক্ষেপ করে সব মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস ভরসা পাকিস্তানকে দিতে পারছেন না। বরং এখনও তাঁরা প্রাণপণে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এখন কি আর তা সম্ভব? যাঁরা চরম খুঁতখুঁতে, যাঁরা এই সেদিনও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে একটা সাময়িক উচ্ছ্বাসের ব্যাপার বলে মনে করতেন এখন তাঁরাও ঢোক গিলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠার দিন খুব দূরে নয়।

২৮।১১।৭১।

নবারুণ গুপ্ত

দেশ
বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮

পুনর্মিলনের মরীচিকা

রঞ্জন

রামের জন্মের পূর্বে রামায়ণ রচনার আস্পর্ধা আমার আদৌ নেই। কাল-জমির লংকাভাগে আমার উৎসাহ আরো সামান্য। তবু বাঙলা দেশের মুক্তিবাহিনীর সাম্প্রতিক সাফল্যে আমার উল্লাস অপ্রকাশিত রাখবার সংগত কোনো কারণ দেখিনে। পঁচিশে মার্চের আকস্মিক পাকিস্তানী বর্বরতার প্রাথমিক পর্যায়ে যা মনে হয়েছিল ভাবালু বাঙালীর স্বাভাবিক আর একান্তই সাময়িক বিস্ফোরণ আজ তার আকৃতি একেবারেই আলাদা। প্রকৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। ইসলামাবাদ আর ঢাকা থেকে ফেরা এক বিদেশী সাংবাদিক সেদিন আমাকে স্পষ্টই বললেন, মুক্তিবাহিনীর অভ্যুত্থানের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ আমার বুদ্ধির অগম্য, কিন্তু পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের পুনরন্তর্ভুক্তি আমার কাছে একেবারেই অবিশ্বাস্য। বলা বাহুল্য, এমন উক্তি আমার চক্ষু সিক্ত করেনি। পাঞ্জাবী মুসলমান বাঙালী মুসলমানকে কখনো মনুষ্য বলে গণ্য করেনি। সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য।

তবু এই আশার ছলনে ভুলি বহু ভারতীয়ের বিশাল চিন্তাভ্রান্তি ঘটেছে বলে আশংকা করি। এ-দেশের হিন্দুদের বাসনার বিপুলতায় পাকিস্তান যদি বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয়, যে সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সাবধানে সন্দেহী এবং নয়াদিল্লিও নয় পুরোপুরি ভীতিশূন্য, তারপর বাঙলা দেশ কী রূপ নেবে? দ্রুতপর্যটক ক্ষীণদৃষ্টি সাংবাদিকদের কাছে শুনি যে, এপার বাঙলা ওপার বাঙলা আবার এক হতে চাইবে, এপারে কেকা মুখর হলে ওপারে কুহু নীরব থাকবে না। এপারে মুখরতার অন্ত নেই। ওপারও প্রত্যহই সোচ্চার। তবু আমার মন মানে না। বিবিধ আন্তর্জাতিক জটিলতার সহজদৃশ্য সুনিশ্চয়তাই আমার অনিশ্চয়তার একমাত্র হেতু নয়। বঙ্গ-বিচ্ছেদের দায়ী হতে পারেন কর্জন ও মাউন্টব্যাটেন; দায়িত্ব অন্যত্র। বিচ্ছেদ ছিল গভীরতর, অন্তর্নিহিত, বহিরাগত শাসক তার সুযোগ নিয়েছে কিন্তু স্বীয় বৈফল্য অস্বীকার করব কী করে? আজকের পুনর্বিবাহের প্রস্তাব তাই সাড়ম্বরে গ্রহণ করলে বিলম্বিত অবসরে তা অনুতাপের উৎস হতে পারে।

*

পাঞ্জাবী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলমানের বিদ্রোহ নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে অন্যান্য বাঙালীর কাছ থেকে। তবু সমর্থকদের উপায় নেই স্মরণ না করে যে, আধুনিক ইতিহাসেই তুলনীয় অবিচারের দৃষ্টান্ত—যদিও তাতে পাশবিক বর্বরতার প্রকাশ ছিল প্রচ্ছন্ন—ঠিক অজ্ঞাত ছিল না। আজকের হৃততেজ বাঙালী হিন্দুর স্বীকার করা উচিত যে, একদা ইংরেজী শিক্ষার ময়ূরপুচ্ছ পরিধান করে সে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক শাসনযন্ত্রের প্রধান বাহন হয়ে বিরাজ করেছিল তখন ইংরেজ সূর্যের চাইতে বাঙালী বালুর তাপ ছিল কিছু বেশী। সেদিনের উদ্ধত অশ্রদ্ধা সবাই বিস্মৃত হয়নি। আহত অভিমান ছিল বাঙালী মুসলমানেরও। তা নইলে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দুস্তর ব্যবধান রচিত হতে পারত না। অবিচারের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে উপশাসক মুসলমানদের হস্ত একেবারে রক্তমুক্ত ছিল না এবং হিন্দু স্মৃতির অংশগ্রহণ এই সত্য যে, মোগল রাজত্বে ধর্ম-স্বাধীন সুবিচারের স্থান কদাচ ছিল অতি-বিস্তারিত। সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত আসন্ন হলে বঙ্গবিভাগ হয়ে উঠল অপরিহার্য। (আমি আজ আর এমন মতের শরিক নই যে, বিদায়ী ব্রিটেনের প্রতিহিংসাবৃত্তি আর আমাদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের ক্ষমতালোলুপতা প্রশমিত থাকলে দেশবিভাগ পরিহার্য ছিল।) দৈনন্দিন সংকীর্ণ হানাহানির চাইতে অনেক ভালো স্বীকৃত বিচ্ছেদের উদারতা। পরিসংখ্যানে নেই সকল সুস্থবুদ্ধিবর্জিত ব্যাপক প্রাণনাশের গ্রাহ্য খতিয়ান; কিন্তু সম্মুখসমরে ভারত ও পাকিস্তানের নিহতের সংখ্যা কত, কাশ্মীরে এবং অন্যত্র কি ছাড়িয়ে গেছে স্বাধীনতার পূর্বাহ্নের দ্বৈপাক্ষিক নৃশংসতার বলি?

ভারত আর পাকিস্তানের পৃথক অস্তিত্ব বহুলাংশে অবাস্তব। অর্থহীন। দুই দেশেরই পারস্পরিক স্বার্থের অপূরণীয় ক্ষতি ঘটেছে। জমাখরচের খাতায় তবু লাভ আর লোকসানের সমতানুযায়ী সাম্য বা অসাম্যের প্রকৃত প্রকৃতিনির্ণয় হতে পারে না খাতার উভয় প্রান্তে নিরাবেগ দৃষ্টিপাত না করলে। সোজা কথা, পশ্চিমবঙ্গে আমরা বাঙলা দেশের মাছ আর দুধ পাইনে। ঢাকাকে যেতে হয় অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লা কিনতে বা পাট বেচতে। তবু বাঙলা দেশের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি যে, ওপারের লোকেদের মধ্যে একটা নতুন আত্মপ্রত্যয় জন্মগ্রহণ করেছে যা কয়েক বছর আগেও ছিল একান্তই অপ্রত্যাশিত। পূর্ববঙ্গের মুসলমান আজ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সমানে নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাণী বলে মনে করে না। এটা কি সামান্য লাভ? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুও আজ বাঙলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে শংকার চক্ষে দেখে না। এটা কি অসামান্য ক্ষতি?

তবু চাই চিন্তার ভারসাম্য—মানবীয় মস্তিষ্কের অন্তিম প্রয়াস। মানবীয় হৃদয়ের দৈনিক ব্যর্থতা। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী দৌরাত্ম্যের অন্তের তারিখ আমি জানিনে। আমার জিজ্ঞাসা তাই : অতঃ কিম্? এর পর কী? লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা পশ্চাতে পরিহার করে পাঞ্জাবী শাসককুলকে একদিন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে যেতেই হবে। তারপর? প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর স্বাভাবিক অশালীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীন বাঙলা দেশ জন্মগ্রহণ করলে শুধু পাকিস্তানের সমাধি রচিত হবে না, ভারতীয় ঐক্যেও ভাঙন ধরবে। ("এই রমণীটা—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—কি এই সহজ সত্যটাও এখনো বুঝতে শেখেনি?") শেখ মুজিবুর রহমান নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের সর্বকালীন একচ্ছত্র নেতা হতে পারেন না; অন্যতর, তীব্রতর নেতৃত্বের বার্তা শুনি নানা মুখে। আবার, আমার মন মানে না।

বাঙলা দেশের একান্ত সংগত স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতীয় ভূমিকা অস্বীকার করা বৃথা। পরোক্ষ হলেও তার পরিমাণ অবহেলা নয়। কেন হবে? পরবর্তী প্রশ্ন স্বাধীন বাঙলা আর ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক কী রূপ নেবে? এমন সরল বিশ্বাসে আমি সায় দিতে পারিনে যে, পাঞ্জাবী ক্রূর শাসন থেকে মুক্ত হলেই পূর্ববঙ্গ পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে একত্রিত হতে চাইবে বা পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু বাঙালী মুসলমানের আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে চাইবে।

*

আমি কই এমন সাক্ষ্য তো দেখতে পাইনে যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুত ভারতকে প্রত্যাখ্যান করে পদ্মাপারের বাঙালীদের সঙ্গে আগামীকল্য ভাই-ভাই হতে। ওপার অনেকাংশে মোহমুক্ত; ঐসলামিক ঐক্যের সেতু অতি ভঙ্গুর। কিন্তু ভাষার সেতুর নির্ভরশীলতায়ও আমি সম্প্রতি সন্দিহান। বাঙালী হিন্দুর আজ স্মরণে রাখতেই হয় যে, নয়া সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র ঘাঁটি নয় ইসলামাবাদ। নয়াদিল্লিতেই ঠাঁই আছে তুলনীয় আগ্রাসী গোষ্ঠীর।

তবু দেশবিভাগের স্তূপীকৃত ভস্ম থেকে অখণ্ড বাঙলার ফিনিক্স-সদৃশ সুন্দরীকে আমি এখনো দেখতে পাইনে। আমার দৃষ্টিক্ষীণতা তার একমাত্র কারণ না হতে পারে। বর্তমান সৌহার্দ্যের ভিত্তি প্রধানত সাময়িক জ্ঞান করি, কেননা আদিম বিভেদের মূল গূঢ়তর। তার সন্ধান আজো শুরু হয়নি। সন্ধানী চাই পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে। রাষ্ট্রসংঘের অপরিসীম অকর্মণ্যতার পূর্ণতর সমালোচনার স্থান নেই এই কঠিন পৃষ্ঠার কঠোর শয্যায়।
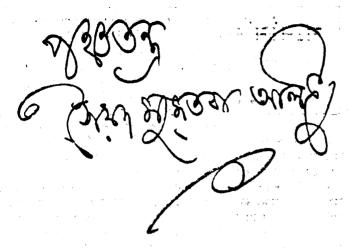
বিদেশে (৩২)

জর্মন কবি গ্যোটেকে নিয়ে যত গবেষণা আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তার শতাংশের একাংশ হয়েছে কি না সন্দেহ। অথচ জর্মন সাহিত্যে গ্যোটে ছাড়াও এমন সব কবি রয়েছেন যাঁদের দু-চারজনকে পেলে আমাদের সাহিত্য বর্তে যেত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাই অল্প বয়সেই জর্মন কবি হাইনের গুটি কয়েক কবিতার বাঙলা অনুবাদ করেন। লোকে বলে গ্যোটে সম্বন্ধে জর্মনে তথা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতে এত বেশী আলোচনা-টীকাটিপ্পনী করা হয়ে গিয়েছে যে আজ নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এক ছোকরা গবেষক তার ডক্টরেটের জন্য অন্য কোনো সবজেকট্ না পেয়ে থিসিস লেখে "গ্যোটে ও দন্তশূল" বিষয়ের উপর। তার বক্তব্য ছিল গ্যোটে কাব্যে যে-সব বিষাদময় নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক অনুভূতি আমরা পাই, তার অধিকাংশই কবি রচনা করেছেন যখন তিনি দাঁতের কনকনানিতে কাতর, কিংবা কাতর না হলেও সেটা তাঁকে স্বস্তিতে আপন রুচি অনুযায়ী (কলকাত্তাই হিন্দীতে যে-রকম বলে "আপ রুচি খানা") কবিতা রচনা করতে দিত না। দন্তরুচি অনুযায়ী, অর্থাৎ দাঁতের যা রুচি, সেই অনুযায়ী লিখতে বাধ্য হতেন, অর্থাৎ "পররুচি" খেতেন—এখানে আমি অবশ্য "দন্তরুচি" প্রচলিত "দাঁতের সৌন্দর্য" অর্থে ব্যবহার করিনি। এবং দাঁতের রুচি যে কি হতে পারে সেটা ভুক্তভোগী পাঠক নিশ্চয়ই আমার নিবেদন শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই দন্তরুচি বিকশিত করে সহাস্য আস্যে অনুমান করে নিয়েছেন।

এসব অবশ্য বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, নদী এবং প্রধানত পদ্মাই—রবীন্দ্রনাথের জীবনের কতখানি বৃহৎ অংশ অধিকার করে তাঁকে সুখে দুঃখে সঙ্গ দিয়েছে। এমন কি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনা করার পর থেকে পদ্মার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্ষীণতর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যজগতে "সে বিরাট নদী/ চলে নিরবধি।" ক্ষীণস্রোতা তো হয়ই নি, বরঞ্চ সে মৃন্ময়ী নদী তখন চিন্ময়রূপ ধারণ করে তাঁর জীবনদর্শনে প্রধানতম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। তাই বৈতরণীর সম্মুখীন হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি গেয়েছেন:

> "ওরে দেখ্, সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
> তরণী কাঁপিছে থরথর।...

তিনি চললেন

> মহাস্রোতে
> পশ্চাতের কোলাহল হতে
> অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

নদী তরণীর তেজ "বাঙলাদেশে" সে শুভদিন প্রত্যাসন্ন যেদিন এ বাঙলা-দেশের ভাবী পদ্মাসন্তান "রবীন্দ্রনাথ-পদ্মা-তরণী" রচনা করে বাঙলাদেশের চিন্তাজগৎকে আলোকিত করবেন।

*

পদ্মার জলে স্নান করেছি, সাঁতার কেটেছি বিস্তর। কিন্তু নৌকো ক্যাপ্সাইজ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কখনো নাকানিচোবানি খাইনি। একদা মিস্ মেয়ো যখন তাঁর ড্রেন-ইনিসপেক্টর-রিপোর্টে ভারতবাসীর নোংরা স্বভাবের-ত্রুটির নিন্দা করেন তখন তদুত্তরে প্রাতঃস্মরণীয় লালা হরকিষণলালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কানহাইয়ালাল গাওবা তাঁর "আংকল শ্যাম" (Uncle Sham—ঝুটো চাচা বা "ঠক চাচা"ও বলতে পারেন) পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে মার্কিন-দের স্বপ্নলোক ফ্রান্সভূমি—মার্কিন প্রবাদে আছে "অশেষ পুণ্যবান আমেরিকান পরজন্মে ফ্রান্স ভূমিতে জন্মলাভ করে"—তথা তথাকার জনসাধারণের বদখদ নোংরা স্বভাব সম্বন্ধে বক্রোক্তি করেন, "সেই ফরাসী দেশ—যেখানকার আপামর জনসাধারণ নিতান্ত জাহাজডুবি ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থাতেই স্নান করে না"। কিন্তু আমি এমন কি পাপ করেছি যে এই যাতদুপুরে নৌকোডুবির ব্যবস্থা করে বরুণদেব আমাকে স্নান করাবেন—আমি তো হে, প্রভো, নিত্য প্রভাতে দিব্য স্নান করি। তদুপরি যে-দুর্ভাবনা আমার মনের ভিতর চড়াৎ করে নেচে গেল সেটি শুনলে লেডি-কিলার

আছেই আমাকে বর্বরস্য বর্বর ভিন্ন অন্য কোনো উপাধি দেবেন না—লটে সাঁতার জানে তো, আমি তো ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী নটবর মিঃ প্রফ্যুমো নই যে মাঝ রাতে রাইন নদীতে লটের সঙ্গে জলকেলি করবো। ছন্দঃ—

নদীর জলে স্নান করাটা,
বলেন গুণী, স্বাস্থ্যকর।
প্রাণটা আগে বাঁচাই, দাদা,
জলকেলিটা তাহার পর॥

কিন্তু উলটো বুঝলি রাম; লটে চেঁচিয়ে শুধোলো, "সায়েড্, তুমি সাঁতার জানো তো?"

বাঁচালে। কারণ যে সুরে প্রশ্নটা শুধলো, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, লটে সাঁতার জানে, তার দুশ্চিন্তা আমাকে নিয়ে। বদরপীর, সোনাগাছির জন্মদাতা সোনা গাজী দুজনাই পানির পীর, এবং মাঝি-মাল্লার ত্রাণকর্তা। এতক্ষণ মনে মনে উভয়কে স্মরণ করছিলুম; এখন বিস্তর শুকুরিয়া জানালুম।

কিন্তু কোনো পীর কোনো বরুণ দেবের শরণ না নিলেও চলতো। লটে দেখি খোলামকুচিখানা খাসা সামলে নিয়েছে। কিন্তু ধাক্কা লেগেছিল কিসে? কোনো বয়া-তে নাকি? কিন্তু লটে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা বিলকুল বেকার মনে করে শুধলো, "ভয় পেয়েছিলে নাকি?"

"না।"

লটে তাচ্ছিল্য ভরে বললে, "এ-রকম তো আকছারই হয়। আর ছোট নৌকা তো বড় জাহাজের চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ। নইলে বিরাট জাহাজ ডুবে গেলে মানুষ কুদে লাইফ-বোটে ওঠে কেন? তা চলে আগেভাগে ছোট নৌকো চড়লেই হয়। কিন্তু এ-যুক্তিটা আমার আবিষ্কার নয়। কে যেন এক মিনি-নৌকো-পাগলা দুঁদে আটলান্টিক শিকারী, বলতে গেলে ডিমের খোসায় চড়ে স্পেন থেকে পানামা না কোথায় যেন পৌঁছয়। সেখানে কেউ ওকে না থামালে হয় তো তার পর লেগে যেত প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে! তাকে নাকি হিটলার প্রশ্নটা শুধিয়েছিল। হয়তো লোকটার কথাই ঠিক। আমি কিন্তু ওরকম সাগর পাড়ি দিতে হলে একা-একা পারবো না।"

"কেন, মেয়েরা একা কোনো কাজ করতে ভয় পায় তাই?"

"কিচ্ছু জানো না তুমি সায়েড। একা-একা বিস্তর কাজ করে থাকে মেয়েরা। কিন্তু ভয় পায় একা থা ক তে। শারীরিক মানসিক দুই অবস্থাতেই ভয় পায় একা থাকতে। এই যে ছোঁড়াছুঁড়িরা ধেই ধেই করে নৃত্য করছে, তাদের তিন কোয়ার্টার শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আরেকটা একা থাকা সত্যই রীতিমত বিপজ্জনক। আমাদের বাড়িটা দেখেছ তো—চতুর্দিক নির্জন। যে কোনো রাত্রে এমন কি দিনের বেলাও যে-কোনো মহাপ্রভু মার্কিন স্টাইলে বাড়ি হানা দিতে পারেন—হাতে পিস্তল চোখের উপর দুটো ফুটোওলা পট্টী। এবং মেয়েরাও কম যান না। পিস্তল ব্যবহার করতে মোটেই বাধে না। ব্যাঙ্, ব্যাঙ্, ব্যাঙ্। ব্যস্ হয়ে গেল। তুমি দু' ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে—না, দড়াম করে নয়, চুবশে-যাওয়া বেলুনটার মত ধীরে ধীরে কার্পেটের উপর গুটিয়ে পড়বে। তারপর রক্তগঙ্গা—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "লটে, তুমি বড্ড বেশী মার্কিনী ক্রীমী পড়েছো (ক্রাইম-নভেল, ক্রাইম-টেলিভিজনের মার্কিনী এই শব্দটি জর্মনরা গোগ্রাসে গ্রহণ করেছে)। আমাদের দেশের লোক একটুখানি অলংকার চাপিয়ে এ স্থলে বলে, 'ঘামের ফোঁটায় কুমির দেখছো'।"

"কথাটা তো চমৎকার। মনের খাতায় টুকে রাখলুম। কিন্তু তোমাকে যা বলছি সেটা একদম সত্যি। আচ্ছা, সব-কিছু বাদ দিয়ে তোমাকে শুধোই, তুমি কখনো 'বাডার-মাইন্‌হফ্‌-গ্রুপ'-এর নাম শুনেছ?'

"না। পলিটিকাল পার্টি নাকি?"

"না। তাই এখনো নিজেদের 'গ্রুপ' বলে। এই তো তোমার এলেম। কথায় কথায় তুমি যে আমাকে 'মার্কিনী মার্কিনী' খেতাবটা দাও, যেন আমি মার্কিন বেরালের জর্মন ন্যাজ, তুমি বরঞ্চ মার্কিন রিপ্ ভান্ উইন্‌কল্‌কে হার মানাতে পারো। সে ঘুমিয়েছিল কুল্লে কুড়িটি বছর, তুমি ঝাড়া চল্লিশটি বছর। এরকম—"

"আহা! চল্লিশটি বছরে আমার কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি, আর পাঁচটা দেশের তুলনায় জর্মনি যে অনেকখানি বদলে গেছে তার কোনো খবর রাখিনে—এই তো?"

"উঁ"

"সে-ই তো ভালো। তাই তোমাকে দেখামাত্রই চিনে ফেললুম,

তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে
চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি"॥

এইবারে বলো, চল্লিশ বছরে আর পাঁচজন যে-রকম বদলে গেছে আমার বেলা তাই হলে কি ভালো হত।"

খুশী মুখে লটে বললে, "শুনতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু এই ভালোবাসার ব্যাপারেই যে তুমি কি দারুণ অগা সেটা আমি তোমাকে না শুধিয়েই বুঝতে পেরেছি। এবং যৌন সম্পর্ক ব্যাপারে আজ জর্মনি কোন্ জায়গায় এসে পৌঁচেছে তার কোনো খবরই রাখো না। আচ্ছা বলো তো, তোমার কি মনে হয়, এদেশের ইস্কুলের ছেলে-মেয়েদের শতকরা ক'জনের ইস্কুলে থাকতে থাকতেই যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে যায়?"

"কি করে বলবো, বলো। খুব অল্পই। ধর্তব্যের মধ্যে নয় নিশ্চয়ই।"

খানিকক্ষণ চুপ থেকে লটে বললে, "তাহলে শোনো, এবং ভির্মি খেয়ো না। ষোল-সতেরো বছর বয়স হতে না হতেই শতকরা পঁইত্রিশটি ছেলের ও ত্রিশটি মেয়ের পরিপূর্ণ যৌন-অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। পনেরো বছর বয়সেই যথাক্রমে শতকরা চোদ্দ/পনেরো ও দশ। এবং চোদ্দ বছর বয়সেই একশটার ভিতর জনা পাঁচেক।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধোলুম, "এ-সব কি সত্যি? আর তুমি জানলেই বা কি করে?"

"জানতে হয়, তাই জেনেছি। আমি যে একটা ইস্কুলে আমার বান্ধবীর হয়ে মাঝে মাঝে পড়াতে যাই। হালেই তো একখানা প্রামাণিক বই বেরিয়েছে। আমি তোমাকে শুধোচ্ছিলুম, তোমাদের দেশে পরিস্থিতিটা কিরকম, তার খবর নিয়ে তুলনা করে দেখতে। জানো, আমার নিজের বিশ্বাস যে-দেশের লোক অল্পবয়সেই যৌন অভিজ্ঞতা পেয়ে যায় তারা উন্নতিশীল প্রোগ্রেসিভ হয় না। এসব কথা এখন থাক্। তোমাকে সেই স্টাটিস্টিক্স্ ভর্তি বইখানা দেব। তুমি সেটা পড়ে নিলে আলোচনার সুবিধে হবে। কিন্তু হাতের কাছে ভিরমি ভাঙবার জন্য স্মেলিং সল্টস্ রেখো।...ঐ দেখো, আমরা জর্মন রাইখের প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছে পৌঁছে গিয়েছি।"

ঊনত্রিশ

সুহাস এসে বসল। হাতে চায়ের কাপ। সকালে অফিস যাবার তাড়ার মধ্যেও সে খানিকটা সময় আমার ঘরে এসে কাটিয়ে যায়। চা খেতে খেতে কথা বলে, খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নেয়।

ঘরে এসেই সুহাস বলল, "কাল একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, শচিদা। তোমার জন্য একটা ওষুধ ছিল, রাত্রে খাবার কথা শোবার আগে। ওষুধটা এনেও আমি পকেটে রেখে দিয়েই একেবারে ভুলে গেছি বলতে। যখন মনে পড়ল অনেকটা রাত; তুমি শুয়ে পড়েছ, আর তোমায় ওঠাতে ইচ্ছে হল না। আজ থেকে শুরু করে দাও, ভাতটাত খেয়ে একটা খাবে, আর রাত্রে শোবার আগে আগে। আয়নাকে বলে দিয়েছি।"

কলকাতায় এসে পর্যন্ত সুহাসকে যা দেখছি তাতে আমার মনে হচ্ছে ওর অবস্থাটাই সবচেয়ে কাহিল, বিরক্তিকর। ছেলেবেলা থেকেই ও পরের হাতে গুছোনো। যখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে তখনও নিজের হাতে বড় একটা খেত না, জ্যাঠাইমা খাইয়ে দিতেন; ওকে জামা কাপড় জুতো মোজা তাও হয় জ্যাঠাইমা না হয় কাকিমা পরিয়ে দিতেন. মনু হিংসে করে বলত, 'রাজপুত্তুর রে'। সেই সুহাস বড় হয়েও অন্যের হাতে তার বারো আনা ছাড়া দিয়েছিল। বেচারীর স্বভাবটাই হয়ে গিয়েছে ওই রকম, পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতায় ও অনেককাল ধরে আছে, কিন্তু ওর থাকাটা অন্যের ওপর যতটা নির্ভর করে নিজের ওপর ততটা বোধ হয় নয়। আমি সুহাসকে দেখি আর ভাবি, কী ঝঞ্ঝাটেই না জড়িয়ে পড়েছে বেচারী। আমার জন্যেই ওর কত ছোটাছুটি। অস্বস্তি হয়। বলতে পারি না। বলতে গেলে দুঃখ পাবে।

"আজ কেমন লাগছে তোমার?" সুহাস জিজ্ঞেস করল।

"ভাল না", আস্তে করে বললাম।

"ভাল না—" সুহাস আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"তোরা আমায় ধরে বেঁধে কলকাতায় নিয়ে এলি। আমার মনটাই বসছে না, শরীরটাতে জুত পাব কী করে?"

"তুমি খানিকটা মন বসাবার চেষ্টা করো", সুহাস একটু হেসে বলল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, হাসিটা পরিষ্কার নয়, ঝরঝরে নয়; আমায় যেন ভোলাবার চেষ্টা করছে।

আমি বললাম, "কলকাতা আমার ভাল লাগে না, তুই জানিস।"

"তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে যাচ্ছ শচিদা, জ্যাঠামশাই ও-সব বললে মানায়, তোমার ভাল লাগে না বললে হয় না। যাকগে, একটু বুসিয়ে নাও। ও দু'চার দিন আরও থাকতে থাকতে ঠিক হয়ে যাবে।"

ওর কথা বলার ধরন থেকে মনে হল, কলকাতায় আমার অন্নজলের দিন ফুরিয়ে আসার কোনো লক্ষণ আপাতত নেই। কথাটা আমি নিজে যে না ধরতে পেরেছি তা নয়, কলকাতায় আসার আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি। সুহাসরা ভাবে, আমি বুঝিনি। আমায় হালকা করে কথা বলে ভুলোতে চায়। কিন্তু ওটা যে মিথ্যে এটা ধরতে কোনো অসুবিধে হয় না।

চায়ের পেয়ালা সরিয়ে রেখে সুহাস বলল, "আজকের কাগজ দেখেছ?"

"না।"

"কাগজটা আনাই।" সুহাস আয়নাকে ডাকতে লাগল।

আমি বললাম, "আজ তোদের কী রিপোর্ট আনার কথা আছে ডাক্তারের কাছ থেকে?"

সুহাস আমার চোখের দিকে তাকাল। "হ্যাঁ, আজ বিকেলে যাব। কেন?"

"জ্যাঠামশাই বলছিলেন।"

"যতীনের ডাক্তার, মানে আমাদের ডক্টর সামন্ত আজ দেখা করতে বলেছেন। কালকের ব্লাড রিপোর্টটা আজ সকালে উনি পেয়ে যাবেন। অফিস থেকে বেরিয়ে আমি আর অবিন ওঁর চেম্বারে চলে যাব।"

আয়না ঘরে এল।

"কাগজটা কোথায় রে?"

"আনো নি? টেবিলে পড়ে ছিল।"

"দিয়ে যা।"

আয়না কাগজ আনতে গেল।

আমি সুহাসকে দেখছিলাম। কাগজটা একে সে মুখ আড়াল করতে পারবে।

"সুহাস।"

"বলো।"

"আজ ডাক্তারের রিপোর্ট পাবার পর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে তো?"

সুহাস কেমন শঙ্কিত হয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল। সে ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। "হেস্তনেস্ত—। মানে?"

"আমার অসুখটার একটা হদিশ পাওয়া যাবে কিনা বলছি?"

সুহাস খানিকটা থমকে গেল। তারপর বলল, "তুমি শচিদা দিনদিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ। সামান্য একটা টাইফয়েড রোগ ধরতে এখনও ডাক্তারদের পাঁচসাত দিন কেটে যায়, আর এটা সবচেয়ে ডিফিকাল্ট জায়গার ব্যাপার। পেটফেটের রোগ ধরাই পড়তে চায় না। এই তো সেদিনও আমাদের অফিসের এক কোলিগ্, বছর খানেক ভোগার পর ট্রপিক্যালে ভর্তি হয়েছে। মাসখানেক থাকতে হবে। একটা কোলাইটিসেই মাসখানেক, আর তুমি এক হপ্তার মধ্যেই এরকম একটা কমপ্লিকেটেড কেসের ডায়াগনসিস চাও।"

আয়না কাগজ নিয়ে এল। সুহাস কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ নামাল।

জানলার দিকে তাকাল আয়না; রোদ ঘরে এসে পড়ছে।

"শচিদা, তোমার ওষুধটা দিয়ে যাই।"

আমার পায়ের দিকের জানলা দিয়ে তাকালে দূরে একটা পুরোনো বাড়ির মাথার গম্বুজ দেখতে পাই। তার চারপাশে অনেক পায়রা ওড়ে সারাটা সকাল। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কদিন। বর্ষায় ওরা যেন মন খুলে উড়তে পারছিল না; আজ আবার দেখছি ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করেছে।

ওষুধটা খাওয়া হয়ে গেলে আমি সুহাসের দিকে তাকালাম। সে কাগজ দেখছে।

"জীবনবাবু আজ আসবেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুহাস মুখ না তুলেই বলল, আসার তো কথা, আসবে নিশ্চয়।

সুহাস আর মুখ তুলবে না সহজে। আমি বিছানায় আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম।

বেলা হয়ে গেল অনেকটা। সুহাস অফিস চলে গেছে। জ্যাঠামশাই সকালে চিঠিপত্র লিখছিলেন। চিঠি লেখা শেষ করে ফিরিয়ে স্নান করতে গেছেন। আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে তন্দ্রার মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙার পর জেগে আছি, রোদটা আমার বিছানার পায়ের তলা দিয়ে সরে যাচ্ছে। পা জ্বালা করছিল। আষাঢ়ের রোদ তাত রয়েছে বেশ। পাখাটা ধীরে ধীরে চলছে। দুটো মাছি উড়ে এসেছে বিছানায়। ঘরদোর পরিষ্কার করার পর হয়ত কোনো কোণা থেকে উঠে এসেছে।

পা টেনে নিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, শরীরটা এখন ভালই লাগছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যেমন লাগছিল তেমন আর নয়। বোধ হয় সকালের স্বপ্নটাই আমায় কেমন দুর্বল করে তুলেছিল। এরকম স্বপ্ন আগে আমি আর দেখিনি। অন্যভাবে কখনো মেজকাকি, কখনো বাবা কিংবা ছোটকাকাকে, মা আর কাউকে স্বপ্নে দেখেছি। কিন্তু এমন নয়। আমার খুড়তুতো বোন শান্তাকে কিছুদিন আগেই একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম শান্তা স্নান করে উঠোনে দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছে। শান্তাকে আমি খুব ভালবাসতাম। শান্তা আর আমার মধ্যে বয়েসের তফাত ছিল কম। বছর চারেকের। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা ভাই-বোনেরও বেশী—বন্ধুর মতন ছিল; পরস্পরকে আমরা সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসের পাত্র করে নিয়েছিলাম। যে পরিবারে সবই অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে, যখন সর্বনাশের মতন মৃত্যু এসে এক এক করে একজনকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা একটি পরিবারের দুটি ছেলেমেয়ে যে পরস্পরকে

অবলম্বন করব এটা স্বাভাবিক। শান্তা একটা ভাল কথা বলত। বলত: 'দেখ্ দাদা, আমরা হলাম এক জোড়া ইঁদুর; এ বাড়িটায় প্লেগ লেগেছে, ধাড়িগুলো সব মরে গেল; এবার তোর আর আমার পালা; নেংটি দুটো ভয়ে ছোটাছুটি করছি।' শান্তা ঠিকই বলত। আমরা তখন জোড় বেঁধে থাকতাম, জোড় বেঁধে ছোটাছুটি করতাম।

শান্তার গড়ন ভাল ছিল না। বড় রোগা ছিল। রঙ ছিল কালো। মাথাতেও বেশ লম্বা। কিন্তু তার মুখটি ছিল বড় সুন্দর। অমন প্রতিমার মতন চেরা-চেরা চোখ আমি আর অন্য কোনো মেয়ের দেখি নি। বাবার আত্মহত্যার পর শান্তার মাথায় কি যেন বাতিক ঢুকল, সে খুব ছটফট করতে লাগল। আমায় বলত 'আর নয়; চল্ আমরা পালিয়ে যাই।'

আমি বুঝতে পারতাম না আমরা কোথায় পালিয়ে যাব! শান্তার খুব বিশ্বাস ছিল, আমাদের ঘরবাড়ি, শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলে আমরা বেঁচে যেতে পারব। সে আমায় লক্ষ বার বলেছে, এখানে আর থাকিস না, চল পালাই।' সে আমায় অনেক করে বুঝিয়েছে, এইভাবে বসে থাকলে আমরা মরব। আমি জানতাম না, কোথায় পালাব। মেজকাকি তখনও বেঁচে, ছোটকাকি পাগল। আমার পালাবার পথ কোথায়।

শেষে শান্তা একদিন বলল, তুই মানুর জন্যে পালাতে পারছিস না। তা হলে থাক বসে, দেখব কেমন তোর মানু তোকে বাঁচায়।

ভূপতি বলে একজন আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। সম্পর্কে আত্মীয়। শান্তার সঙ্গে তার আড়ালে কিছু মেলামেশা হত। শান্তাই বোধ হয় গা করেছিল। তারপর ওদের বিয়ে হয়ে গেল। আমার বরাবর ধারণা, শান্তা এ বাড়ি থেকে পালাবার জন্যে এমন পাগল হয়ে উঠেছিল যে কোনো বাদবিচার করে নি। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে সে বিয়ে করে ভূপতির সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে গেল, তার গোত্র বদল হল, কিন্তু ভাগ্য নয়, বেচারী ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল। শান্তা মারা যাবার পর আমি স্বপ্ন দেখতাম, দুটো ইঁদুর সারাবাড়ি ভয়ে ছুটোছুটি করতে করতে একটা ইঁদুর সদর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে অথচ তার পালানো হল না, একটা বেড়াল এসে খপ করে ধরে ফেলল।

শান্তার একটা কথা হয়ত ঠিক। আমার কাছে মানুর তখন খুব মূল্য। মানুকে আমি ভালবাসতাম। আমার চারপাশে যখন অত অপঘাত আর মৃত্যু, তখন সেই আতঙ্ক থেকে নিজেকে ভোলাবার ওই একটি স্বপ্নই দেখতে পারতাম। কতদিন আমি ঘরের মধ্যে জানলা খুলে বসে বসে

ভেবেছি, আমার অত ভয়ের কী আছে—মানু আমায় বাঁচাবে। সাবিত্রীর মতন। মানু আর আমি ঠাট্টা তামাশা করে সাবিত্রী সত্যবানের কথাও বলেছি কতবার। মানু—মোহিন হেসে বলত: 'তোমার অত হাসতে হবে না, যখন সাবিত্রীর দরকার হবে, দেখতে পাবে।' আমার যে কোনো জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, তা নয়, সংসারে অনেক অবিশ্বাস্যই মানুষ এক এক সময় বিশ্বাস করে নিতে চায়। আমার আবার নানারকম বিশ্বাস ছিল। মানু আমায় হয়ত বাঁচাতে পারবে—এমন বিশ্বাসও আমার ছিল।

পরে যখন বুঝতে পারলাম, মানুদের বাড়িতে কেউ আর মানুকে সাবিত্রী সাজাতে রাজী নয়, তখন আমার দুঃখও যত হয়েছিল গ্লানিও ততটা করেছিল। এ এক অন্যরকম গ্লানি। মানুর সংগে আমার বিয়ের পর আমি যদি মরে যেতাম, খাপ্পা যেমন গেল, তখন কী হত মানুর? তাকে বিধবা হয়ে থাকতে হত। আমাদের পরিবারে এসে তার ভাগ্যেও কী ঘটত কে বলতে পারে!

একদিকে আমি যেমন মানুর আশা করতাম, অন্যদিকে আমার ভয়ও ছিল, মানুর আমি ক্ষতি করব। এই টানাপোড়েনের জন্যে আমার কোনো জোর ছিল না। আমি দুর্বল হয়েই থাকতাম। মনুর সংগে আমার সম্পর্কটা ভেঙে গেল।

মানুকে আমি জন্ম থেকে জানি। তার আমি নিন্দে করতে পারি না। ভগবান তাকে যতটা দিয়েছেন তার বেশীই বোধ হয় ফেরত নিয়েছেন। তার রূপে কোনো খুঁত আমার চোখে পড়েনি, সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী, তার স্বভাবে ছেলেমানুষীর চেয়ে গাম্ভীর্য বরাবরই বেশী, তার সাহসের অভাব নেই, ধৈর্যস্থৈর্যও যথেষ্ট; তবু বলি, মানুকে দেখে দেখে আমি তাকে চিনতে শিখেছি। সে হল সাগরের তলায় ডোবা বরফ-পাহাড়ের মতন। বাইরে থেকে তাকে যতটা দেখা যায়, আড়ালে তার বহুগুণ লুকোনো থাকে। মানুকে সেখানে দেখা যায় না। তার চরিত্রের যেটা লুকোনো জায়গা, সেখানে সে বড় বিচিত্র। মানু যে কতটা অহংকারী বাইরে থেকে ধরা যাবে না। তার বারো আনা অহংকার আর আমিত্বে ভরা। নিজেকে সে এত বেশী দাম দিয়েছে যাতে তার অভিমান গিয়েছে বেড়ে, অকারণে। সে নিজের মর্যাদা বাঁচাতে খুব ব্যস্ত, যেন নিজে না বাঁচালে ওটা বাঁচবে না। মানুর আরও অনেক দোষ আছে যা আমার চোখে লাগে। কিন্তু আজ আর তার ফিরিস্তি করে কী লাভ! আমি তাকে ছোট বয়েস থেকে দেখছি।

মানু যত বয়েসে বেড়েছে ততই তার লুকোনো চরিত্রটা বড় হয়েছে। তাকে ধরা-ছোঁওয়া একটা বয়স পর্যন্ত সম্ভব ছিল, পরে সে কোন্ মোহিন হয়ে গেল আমি আর বুঝতে পারি নি।

শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে চলে আসার অনেক পরে একদিন কথায় কথায় আমি মানুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এবার তুমি কী করবে?"

"কেন?"

"তোমার নিজের জন্যে কিছুই চাও না?"

"জানি না।"

"তুমি আজকাল বড় রুক্ষ [illegible] করে কথা বলো, মানু।"

"ভাল না লাগলে কথা বলো না।"

কী ভেবে আমি হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম, "তুমি এইভাবে চলে না এলেও পারতে।"

"মানে?"

"মানুষের অনেক মোহ এক সময় কেটে যায়। ভুলটাও হয়ত শুধরে নেয় তখন। সেই সুযোগ আর থাকল না।"

মানুর চোখমুখ রাগে টকটকে হয়ে উঠেছিল। বলল, "কার কী কাটবে, কে কবে ভুল শুধরে সাধু হয়ে যাবে তার জন্যে বসে থাকতে আমি জন্মাই নি। আমি যা করেছি ভাল বুঝেই করেছি। তুমি ভাবছ, একটা কুষ্ঠ রোগী ঝোলা করে পিঠে বয়ে বেড়াতে পারলেই মেয়েজন্ম সার্থক হয়। আমায় ওসব কথা আর বলো না।"

আমি আর কিছু বলি নি। আমার সংগে মানুর বিয়ে হলেও তো মানু বলতে পারত, একটা মরা মানুষকে বাঁচাতে আমি আসি নি। আমার ওপরে যে তার একটা রাগ আছে এটা ধরা যেত; সেদিনও ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারি নি। মানু কী নিজে খুব সতর্ক, সাবধানী ছিল না? সে তো তেমন করে কোনোদিন আমায় বলেনি, আমার দুর্ভাগ্যের সংগে তার ভাগ্য জড়াবার জন্যে সে সত্যি সত্যি সব কিছু ছাড়তে পারে! মানু সেটা পারত না। তার বাইরের চার আনা বলত, সে পারে; ভেতরের বারো

আর জানতে পারে না।

সেই পুরোনো মানু অবশ্য এখন আর নেই। তার কত কী বদলে গেছে। কিন্তু মানুর মনে মনে যা ঘটেছে আমি তা বুঝতে পেরেছি। সে আর পেরে উঠছে না।

হঠাৎ বাইরে থেকে আয়নার ডাক শোনা গেল। তারপর সে ঘরে এসে দাঁড়াল।

"ছোটকা, স্নান করতে যাও।"

"ক'টা বাজল রে?"

"প্রায় এগারো।"

আয়নার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে মনে হল, তার চোখমুখ কেমন চকচক করছে। হাসির কিছু ঘটছে নাকি?

"কী হয়েছে রে?"

"কিসের?"

"হাসছিস যেন।"

আয়না একটু হেসে বলল, "দিদির চিঠি এসেছে। পড়ছিলাম। দিদির আর ভাল লাগছে না একলা।"

বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললাম, "কলকাতায় আসতে লিখে দে।"

"কলকাতায়! কেন, আমরা বুঝি আর ফিরব না?"

"না।" বলেই আমি আয়নার দিকে

তাকালাম। অসাবধানে কথাটা আমার মুখে এসেছিল। শুধরে নিয়ে বললাম, "তোরা ফিরবি। আমি আর ফিরব না।"

সারাটা দুপুর আমার মাথার মধ্যে এই কথাটা ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল : আমি আর ফিরব না, আমি আর ফিরব না। দুপুরটা কোন্ দূরে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমার খেয়াল নেই। রোদের তাত আটকাবার জন্য জানলা ভেজানো, ঘরের মধ্যে ঝাপসা হয়ে আছে, পাখাটা মাথার ওপর চলছে, একটা শব্দ ক্রমাগতই মাথার ওপর টিকটিক করছে, পাখার আওয়াজ, ঘরের ক্যালেন্ডারটা মুখোসের মতন দুলছে, নীচে সাড়াশব্দ কম, আয়মা পুন্নাসের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে আছে, জ্যাঠামশাই শুয়ে আছেন নিজের বিছানায়। আমার পায়ের তলায় ঘাম জমছিল, হাতের চেটো ভিজে যাচ্ছিল। আর এই দুপুরবেলায় স্তব্ধ, আঁধার-করা ঘরে আমার মাথার কাছে প্রকাণ্ড একটা ভোমরা যেন উড়ে উড়ে এই গুঞ্জনটা শুনিয়ে যাচ্ছে—আমি আর ফিরব না, আমি আর ফিরব না। এমন আশ্চর্য-ভাবে ওটা গুনগুন করছিল যে আমি ভোর রাতের স্বপ্নটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর সেই স্বপ্নের ধ্বনির সঙ্গে 'আমি ফিরব না' গুঞ্জনটা কেমন মিশে যাচ্ছিল।

ছেলেবেলায় আমি খুব ঘুম কাতুরে ছিলাম। ঠেলাঠেলি করেও সহজে কেউ আমায় জাগাতে পারত না, খানিকটা বেলা করে উঠে চোখমুখ ধুয়ে যখন মার কাছে যেতাম, মা বলত : "তুই এত বেলা করে উঠলি, সবাই কখন উঠে গেছে!" আমার মনে হল, মা যেন এখনও অনেকটা সেই একইভাবে বলছে, "তুই এখনও পড়ে আছিস, সবাই কখন এসে গেছে!" মার একথা বলা সাজে। আমাদের যে যেখানে ছিল সবাই চলে গেছে, শুধু আমি পড়ে আছি। আমার এত দেরী সাজে না।

কোনো কোনো অঘটন সংসারে ঘটে যায়। কেন ঘটে যায় কেউ জানে না। আমাদের পরিবারের যতগুলো অঘটন ঘটেছে তার সঙ্গে আমার এই বেঁচে থাকাটাও অঘটন। আমার এতদিন বেঁচে থাকার কথা ছিল না। আমি আশা করি নি ভগবান আমায় এতটা আয়ু দিতে পারেন। কেন যে দিয়েছেন তাও জানি না।

এবার যখন অসুখ করে, তিনমূর্তির হাসপাতালে পড়েছিলাম অনেক দিন, তখন যারা আমার সাধ্যাতীত যত্ন করেছে তার মধ্যে রামপ্রকাশ আমার পুরোনো বন্ধু। তার ডাক্তারি বিদ্যেটা মোটামুটি ভালই জানা। পাটনা থেকে পাশ করে সরকারী হাসপাতালে কাজ করছে অনেকদিন। রামপ্রকাশ আমার দেখাশোনার ভার দিয়েছিল মায়াবতীর ওপর। মায়াবতী আমার সেবাশুশ্রূষা করত। ও ঠিক বাঙালী নয়, বেহারী বলেও মনে হত না। ওর বাবা ছিল বাঙালী ছিল, মা ছিল আদিবাসী। রাঁচির দিকে মিশনারীদের কাজ করত বাবা, মা ছিল মিশনারী মেয়ে স্কুলের আয়া। দুজনেই কবে মারা গেছে। মায়াবতী কিশোরী বয়স থেকেই হাসপাতালে ঢুকেছে। তারপর আজ সে বড় নার্স।

হাসপাতালে মায়াবতীর নাম ছিল মায়া। আমিও তাকে মায়া বলতাম। তার চেহারাটা ছিল শক্ত, গায়ের রঙ ছিল কালো, মুখ ছোট আর গোল মতন, মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। বছর বত্রিশ বয়েস হয়েছিল মায়ার।

আমার সঙ্গে মায়ার খুব ভাব হয়েছিল। সে তার নিজের কথা বলত, আমি আমার কথা। আমরা পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা বন্ধুর মতন শুনতাম।

আমি মায়াকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে আমি আমাদের গোটা পরিবারের মধ্যে এখনও বেঁচে রয়েছি এটা কেমন করে সম্ভব হল? কেন হল? এই জীবনের দাম কী?

মায়া আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনে সহজভাবেই বলল, ভাইয়া, বীজ যেমন মাটির আন্দারে থাকে উতনা দিন সে মালুম করতে পারে না মাটির উপার কিছুটা আলো। তুমি ভাইয়া আন্দারে আছ।"

মায়া আরও বলেছিল : তুমি মাটি ফুঁড়ে চারা হয়ে গাছ হয়ে শুধু উঠে পড়, তখন তোমার মালুম হবে মাটির ওপর কত আলো, জল, বাতাস।

আমি ভেবেছিলাম, মায়া আমাকে ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলছে। সে কৃশ্চান। আমি যে ঈশ্বর বিশ্বাসী মায়াকে সে কথাটা বললাম।

মায়া বলল, ভাইয়া তুমি ভয় পেয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছ। তোমার কাছে ভয় বড়, ঈশ্বর ছোট। তোমার যখন ভালবাসা আসবে, তখন তোমার মালুম হবে।

হাসপাতাল থেকে চলে আসার পর আমি মায়াকে বলে এসেছিলাম আমি আবার আসব। তুমি দেখে রেখো আমায়।

কিন্তু এ কী হল? ভোমরার কালো কাছে সেই গুনগুন তো যাচ্ছে না। কালো ভোমরাটা যেন আরও বড় বড় হয়ে গুনগুন করে গাইছে : আমি আর ফিরব না, ফিরব না।

(ক্রমশ)

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ আটত্রিশ ॥

আমার ধারণায় সাহিত্যের সঙ্গে দায়িত্ব জড়িত আছে...।

জনাব সাহেবের দরবারে আমার জবানবন্দী শুরু করি: 'সমাজ আর সময়ের সহিত গেলেই তার হয় না। তার থেকে এগিয়েও যেতে হয় তাকে। শুধু পথের সঙ্গী হওয়াই নয়, পথ দেখাতেও হয় আবার। সাহিত্য কথাটায় সহিত-এর ওপরেই জোরটা বেশি দেওয়া বটে, কিন্তু তার জের এখানেই মেটে না। সহিতের মধ্যে যতটা সহ-তা ততখানিই কি হিত-ও নেই আবার? তৎকালীন সমাজ কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শুধু তাকে প্রতিবিম্বিত করেই তার দায় খালাস হয় না। ভাবীকালের দাবিও মিটিয়ে যেতে হয় সেই সাথেই।...

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, যথার্থ সাহিত্যিক, আমার ধারণায়, তাঁর নয়া সাহিত্য সৃজনের সাথে নতুন সমাজও সৃষ্টি করে থাকেন, সমাজব্যবস্থা পালটে দেন, সময়ের ধারা বদলে দিয়ে যান। যেমন রুশো, ভলটেয়ার, গোর্কি, সিনক্লেয়ার, ইবসেন ইত্যাদি। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল আর সুকান্ত।'

'এক নিশ্বাসে পাঁচটা নাম উচ্চারণ করলেন?'

'পাঁচজন অবশ্যি পাঁচ ধারা—সেকথা সত্যি। ধার এবং ধারণাও তাঁদের পাঁচ রকমের কিন্তু তাঁদের স্বতন্ত্র সৃষ্টিপ্রয়াস উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে অভিন্নই। সামাজিক গতিমুক্তির উদ্দেশ্যেই সেই প্রয়াস। আর, সেই দিক দিয়েই তাঁদের ঐক্য আর সার্থকতা।'

'বিশদে বলুন।'

'বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই পথিকৃৎ, তাঁর সম্বন্ধে দ্বিরুক্তির অবকাশ নেই। তা হলেও তাঁর সমকালীন প্রায় সকলেই বিপ্লবী। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ—নিজের নিজের পথে কে নন? নিজের নিজের খাতে শক্তিমানের উৎখাতে সকলেই উচ্ছ্বসিত নবযুগ নিয়ে এসেছেন। খতিয়ে দেখলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক ভগীরথের সন্ধান মিলবে।...'

'আমরা এখানে সাহিত্যক্ষেত্রেরই আলোচনা করছি।' জনাব সাহেব আমায় মনে করিয়ে দেন। আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গান্তরে যেতে তিনি নারাজ।

'সাহিত্যের কথাই কইছি তো। শরৎচন্দ্রকেই ধরুন না। তিনিও কি তাঁর লেখার ধারে সমাজের রূপরেখা বদলে দেননি? তাঁর কালের পল্লীসমাজের অরক্ষণীয়ারা কি আছে এখনো? তাঁর পথের দাবী কি সমসাময়িক যুগবিপ্লবের প্রয়োজন মেটায়নি? পথ দেখায়নি সেকালের বিপ্লবীদের? অথচ তিনি আমাদের সমাজব্যবস্থা পালটে দিয়ে গেছেন সকলের অগোচরে, তাঁর শিল্পকলার একটুখানিও ক্ষুণ্ণ না করে, তাঁর রচনার কোথাও একটুও সোচ্চার না হয়ে। কত বড়ো আর কী নিপুণ শিল্পী দেখুন। একেই আমি সত্যিকারের সাহিত্যিক আর যথার্থ সাহিত্য-সাধনা বলব—যা নাকি সমাজের দাবী সময়ের দাবী সেই সাথে ভাবীকালের দাবী মেটায়।'

'কথাটা ঠিক।' মানতে তিনি রাজি।

'আর, রবীন্দ্রনাথের কথা তো বলাই বাহুল্য! তিনি তো সব দিক দিয়েই আমাদের জাতির ধারা পালটে দিয়ে গেছেন তাঁর নানান সাংস্কৃতিক উদ্ভাবনায় আর শিল্পসাধনায়—যা নাকি দস্তুরমতই বৈপ্লবিক। রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র দুজনে মিলে আমাদের হৃদয় মন মথিত করে নয়া মানসিকতায় উন্মথিত উদ্বর্তিত আনকোরা আরেক জাতের মানুষদের নিয়ে এসেছেন এদেশে। নিজের সাহিত্য-শিল্পের দাবী আর নিজের যুগের সঙ্গে যুগোত্তর দাবী দুই-ই তাঁরা মিটিয়েছেন যুগপৎ।

'আর নজরুল ও সুকান্ত? তাঁরাও কি তাই?'

'তাই নাকি? তাঁদের কাজ সবজনকে নিয়ে হয়ত নয়, কেবল তাঁদের কালের বৈপ্লবিক উদ্বোধনে—বিপ্লবীজনদের জন্যেই। তাহলেও নজরুল নিজেকে 'যুগের নন হুজুগের কবি' বলে গাইলেও সত্যিকারের যুগের দাবীও তিনি মিটিয়ে গেছেন—তাঁর গানেই তাঁর কালের বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আর সুকান্তও তেমনি, তাঁর অনুসরণেই একালের বিপ্লবপথিকরা এসেছে সব, দল

বোধ এগুচ্ছে তারাই—এ যুগের বিপ্লব-চেতনা যুগিয়ে গেছে সে-ই তো!'

"কিন্তু যুগের দাবী মেটানো ছাড়া কি সাহিত্যের আর কোনো দায় থাকতে পারে না? সাহিত্যিকের নিজের কোনো দাবী থাকতে নেই?'

'হ্যাঁ, আছে বইকি। তার আত্মপ্রকাশের দাবী। তাও আছে। মনের রূপই ত সাহিত্য: সেই মনোরূপের কলাসম্মত অপরূপ প্রকাশ—ব্যক্তিগত সেই দাবীও সাহিত্যিকের থাকতে পারে বইকি। —সে দায়ও তাকে বইতে হবে অবশ্যই। যুগের নয়, জাতির নয়, নিছক নিজের গরজে 'নিজের জনাই সাহিত্য. হ্যাঁ, তাও আছে। কেউ কলা বাঁচিয়ে যুগের সঙ্গে নিজের দায় দুই মেটায়, দুই পারে; কেউ শুধু একটাই বজায় রাখে, একটাই পারে। জাতির এবং সমাজের কথা না ধরে কেবল সাহিত্যের দিক দিয়ে ধরলে কেউই এদের ফ্যালনা নয়। তবে যে কলাও বাঁচায় আবার রথও চালায়, আমার বিবেচনায় সেই বড়ো। একাধারে রথী এবং সারথি যে—সে-ই যুগন্ধর।

তবে কথা কী জানেন? একটা হল

শুধুই রূপশিল্প, আরেকটা জীবনশিল্প। তবে উভয়েরই শিল্পরূপসম্মত হওয়া চাই। একজন কেবল নিজের জীবনকেই টেনে বুনে দেখায়, অপরজন সবার জীবনকে গড়ে দিয়ে যায়—তাদের অজ্ঞাতসারে। পার্থক্য এইখানে। একজন শুধুই সাহিত্য সৃষ্টি করে, আরেকজন সাহিত্যের সঙ্গে নয়া-সমাজও তৈরি করে দেয়। কোথাও আমাদেরই বদলে দিয়ে নতুন করে বানায় কোথাও বা নব প্রজন্মে আনকোরা নয়া আমদানির পথ গড়ে যায়। আসে নবীন জাতি, অভিনব জাতীয়তার। যেমন গান্ধীজী চলতি মানুষদের বদলে নিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন; আর রবীন্দ্রনাথ নতুন মানুষদের গড়ে দিয়ে গেছেন—সাংস্কৃতিক মানকে দুদিক দিয়েই।'

'আর আপনার ক্ষেত্রে? এটা যদিও একটু ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা, মাপ করবেন।'

'মাপ করব বই কি, আপনাকে আমাকে দুজনকেই। আমাকে আমার মাপাই আছে। যারা নিজের দায় আর যুগের দায় এক সঙ্গে মেটায় সেই মহৎ স্রষ্টা মহারথী-দের সগোত্র আমি নই। আমার কোনও কোনো দায় নেই—নিছক আদায়। আমার ভাগ্যে দায়ভাগ ন্যস্ত, আছে কেবল আদায় ভাগ। দায়সারা কাজে নিজের আদায় সারা। আর কলাকারের দিক দিয়ে? আদায় কাঁচকলা!

তারপরে হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল আমাদের, সত্যিকারের সাহিত্যিকদের নিয়ে...দেখা যায়, তাঁদের সাহিত্যসাধনার একদিকে দেখি রূপ-শিল্প, অপর দিকে কেবল শিল্পরূপ। বিভূতিভূষণ প্রথম সারির, তাঁর রচনায় পল্লীরূপ, প্রকৃতিরূপ, প্রাকৃতির অনুষঙ্গী নিজের মনোরূপ—তারই আশ্চর্য প্রকাশ; দ্বিতীয় সারিতে আছেন প্রমথ চৌধুরী যাঁর কাছে শিল্পরূপটাই সার। একের লক্ষ্য কী বলব; আরেকের কেমন করে বলব; একজনের কলা বজায় রেখে বলা, অপরের বলাটাই হচ্ছে কলা।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় এই দুই ধারারই অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখি আমরা। তিনি তো সব সময়ই সবাইকে টেক্কা দিয়ে গিয়েছেন—সর্বকালের জন্যই।

বঙ্কিমের কালেও এমনটা দেখা যায়। তারক গাঙ্গুলির স্বর্ণলতায় (এই একটি বইয়েই সমকালীন সবাইকে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছেন) অপরূপ শিল্প সুষমায় সেকালের সমাজের নিখুঁত রূপচিত্রণ দেখা যায়, কিন্তু তার পাশাপাশি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন আর সধবার একাদশী দেখুন, সেখানে পাবেন সামাজিক রূপ আর চেহারা দেখাবার সঙ্গে সেটা বদলাবার বৈপ্লবিক প্রয়াস।

এমনি ধারাই চলছে সাহিত্যে; চলেছে, চলবে বরাবর : শ্রেয়ঃ আর প্রেয়-র দুটি ধারাই পাশাপাশি। আবার কোথাও বা এই দুয়ের সংমিশ্রণের সঙ্গে তৃতীয় এক সারস্বত ধারা—সরস্বতী নদীর মতই যা অপ্রকাশিত থেকে উভয়ের সঙ্গে ওতো-প্রোতো—সম্মিলিত হয়ে পরমাশ্চর্য এক ত্রিবেণীসংগম!

'গ্রন্থকারদের কথা থাক, গ্রন্থের কথায় আসা যাক।' প্রসঙ্গের গ্রন্থিমোচনের প্রয়াস পান জনাব : 'লিখিয়েদের ছেড়ে পড়ুয়াদের কথায় আসি বরং। কল্লোল গোষ্ঠীর আপনার বন্ধুদের... কার কেমন পড়ার ঝোঁক ছিল বলুন এবার। সেটাই আমি জানতে চাই আপনার কাছে।'

'বন্ধুদের ভেতর? অচিন্ত্যকে দেখতাম প্রায়ই সে নামজাদা কোনো না কোনো লেখকের নামকরা বইয়ের আনকোরা আম-দানি হাতে করে আনত—আসত যখন কল্লোলে। তার হাতেই আমি হামশুনকে প্রথম দেখি...কী বইটা মনে নেই। প্যান্-এর
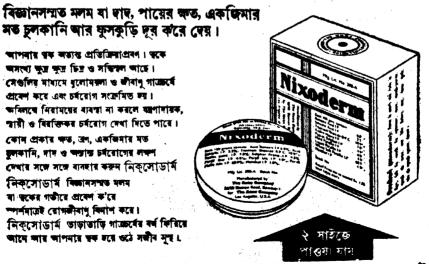
সে অনুবাদ করেছিল। চমৎকার রচনা! পড়েছিলাম আমি বইটা, মূলে এবং অনুবাদে। আমাদের পানসে প্রেমের প্যানপ্যানানি নেই প্যানে—অদ্ভুত বই। অভিনব হামসুন!'

'পবিত্র গাঙ্গুলী হামসুনের হাংগার অনুবাদ করেছিলেন না? পড়েছিলেন?'

'অনুবাদে নয় অরিজিনালে পড়েছি। সেটাও দারুণ। বইটা আমায় স্পর্শ করেছিল আরো এই কারণে যে হামসুনের হাংগার হজম করার কালে আমার নিজের হাংগারই হজম করতে হতো আমায় একেক সময়—ক্ষুধাতুর হয়ে কতোদিন না কাটিয়েছি! তবে আমার মতন অমন অবস্থায় এদেশের প্রায় সব লেখককেই বোধ করি পড়তে হয়, না খেয়ে কাটাতে হয়, হয়েছে কোনো না কোনো সময়। তবে হাংগারের ওই হামসুনী চেহারা আমার জানা ছিল না—জানতেও হয়নি। একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে তার মধ্যেই।...'

অচিন্ত্য ছাড়া আর কে কে বই পড়ুয়া ছিল—শুধোচ্ছেন? নৃপেনের মুখে প্রায়ই নানা বিদেশী বইয়ের উল্লেখ শোনা যেত, কালিদাস ভবভূতি আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়ানো বাই ছিল তার। উদ্ধৃতি দিত শেলি ব্রাউনিং কীটস-এরও। নৃপেন এক গ্রন্থকীট ছিল আমার ধারণা।

হ্যাঁ, নৃপেনও একাধিক বইয়ের অনুবাদ করেছিল। গোর্কির মাদার তারই অবদান। কিশোর সাহিত্যে তো তার বিস্তার বিস্তর। তার লেখার হাত এমন মিঠে ছিল যে বলবার নয়, শিশু-সাহিত্যে ওর তুলনা হয় না।...

প্রেমেনের ঘরোয়া বুক কেসের কথা তো বলেছি আগেই, তারপর ওই অচিন্ত্য আর নৃপেন, ওদের কাছেই যা দেখেছি আর শুনেছি। তার বাইরে এ বিষয়ে আর কোথাও আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের সুযোগ ঘটেনি। তবে হ্যাঁ, বিষ্ণু দে মশাই একবার নিয়ে গেছলেন আমায় তখনকার তাঁর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায়, আমাদের মতন তাঁরও তখন তরুণ বয়স। সেই বয়সেই তাঁর পড়াশোনা অবাক হবার মতই। তাঁর বাড়ি আমি আলমারি আলমারি ঠাসা বই দেখেছি ...ভারী ভারী বই সব।'

'নিয়ে গেছলেন আপনাকে উনি ওঁর বাসায়?...আপনায় সঙ্গে খুব ভাব ছিল বোধ করি?'

'এমন কিছু না। কল্লোল কার্যালয়ে উনি আসতেন খুব কমই—হয়ত বা আসতেন, আমার চোখে পড়েনি তেমনটা—আমিও তো কমই যেতাম। কল্লোল গোষ্ঠীর উনি কতটা অন্তরংগ ছিলেন বলা আমার পক্ষে সম্ভব না, তবে আমার সংগে তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও, তবুও যে উনি আমায় ডেকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেছলেন সেটা বোধ হয় তাঁর অহেতুক করুণাই। আমার ন্যায় মুখ্যসুখ্য একজন পড়াশুনা না করে নেহাত গবেট থেকে যাচ্ছে, তাই শিক্ষাদীক্ষার দিকে আমার চোখ ফোটানোর ঝোঁকেই হয়ত সেটা হবে। নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা নিরসনের পর অপরকে জ্ঞানদান করতে পাগল হয় না মানুষ? ...জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ উপলখণ্ড কুড়োবার পর তার একাধখানা ছুঁড়ে অপরকে মার লাগাবার সাধ যায় না?'

'হোলো আপনার জ্ঞান? ওঁর বইয়ের স্তূপাকার দেখে চোখ ফুটলো আপনার? প্রেরণা পেলেন বই পড়ার? ওঁর বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখার উৎসাহ হয়েছিল? দেখেছিলেন?'

'নাড়ব কি মশাই, দেখেই আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। বললাম না, ভারী ভারী বই সব। বিদেশী পণ্ডিতদের লেখা ইয়াহু মোটা লম্বা চৌড়া ইলাহী ব্যাপার! সারগর্ভ ভারগর্ভ বই যতো! শ', রাসেল, নীটসে, বার্গ সঁ, রোলাঁ, লরেন্স ইত্যাদির! উনি এই বয়সেই ওই সব পড়ে শেষ করেছেন, আমি একশ জন্ম ধরেও নড়ে উঠতে পারব কি না সন্দেহ!'

'তা হলেও এক-আধখানা হাতে নিয়ে দেখতে হয়েছিল কী!'

'দেখব কি মশাই, অদূরে দাঁড়িয়েই যা আঁচ পাচ্ছিলাম তাতেই আমার হয়ে গেছল! তাঁর বইয়ের দরবারী আমে গিয়ে আমজনতার আমি কী আরাম পাব? সেই আঁচেই মনে ফোস্‌কা পড়ার যোগাড়! তার বেশী ছোঁয়াচে যায় আর? বৈশ্বানরের আঁচড়ে যেমন ঝলসে দেয় বিশ্বনরের পুঞ্জীভূত ঐ চিন্তানল তার চেয়ে কিছু কম নয় মশাই! জতুগৃহের অগ্নিকুণ্ডে কি খাণ্ডবদাহনের দাবদাহে সাধ করে সেঁধিয়ে বিদগ্ধ হবার বাসনা কোনদিনই আমার নেই। তবে

া, সেই কালেই বিষ্ণুবাবুর ঝলসানো চহারা দেখে আমার মনে হয়েছিল তখনি হ্যাঁ, উনি রীতিমতই বৈদগ্ধ্য লাভ রেছেন বটে ? ...

'তারপর আর আপনারা পরস্পর স্পর্শে আসেননি কখনো ?'

'আর না। আমিও তাঁর বৈদগ্ধ্যের আঁচড় াবার ভয়ে এগুইনি আর এবং তিনিও বুঝি ার ভালো ভালো বইয়ের প্রতি আমার ঐ াচরণ দেখে মনে মনে চটেছিলেন বেশ। রপর কখনো আর আমার ত্রিসীমানায় াষেননি। বুঝেছিলেন যে, সব জীবের দ্ধার নেই, সব অধমকে তারণ করা যায় । বিশেষ করে আমার মতন এই সর্বাধমকে, জের বাবাও যাকে ধমকে একটুও মানুষ রতে পারেননি। তারপর...তারপরে কেমন র আমরা যেন পরস্পরের থেকে নিরুদ্দেশ য় গেলাম।...দুজনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ধ হয়।'

'অদ্ভুত আচরণ আপনার! অমন চমক- র চটকদার চমৎকার বই সব হাতে পেয়েও ' কী ভাষায় নিজের বিস্ময় ব্যক্ত করবেন নি ভেবে পান না।

'হাতিয়ে নিয়ে বাজারে এনে ঝেড়ে দিলে হত না নেহাৎ ? দু-পাঁচ টাকা হাতে স যেত! তখন ওটা আমার মাথায় লেনি কিন্তুক!'

মাথায় হাত দিয়ে এখন আমি আপসোস র। যদিও পোস্তার বাজার পার হয়ে স পস্তানির কোনো মানে হয় না।

'না, না, ওকথা আমি বলেছি কি ? ছি কী ?'

'বলতে হয় না, বোঝাই যায়। শোনাও য বই কি! কানে তো আসেই যে নাদেরই কেউ কেউ প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় ডিত লোকের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁদের দুর্লভ গারকে দুর্লভতর করে দিয়েছেন...এখন সুদুর্লভ!'

'কি রকম ? কি রকম ??' তারপরই তাঁর —কবে—কেন—কোথায়-কাহার ? ইত্যাকার নালার উৎসার হতে থাকে।

কিন্তু আমি উৎসের খবর রাখি না, র উৎসাহ মেটাই কি করে ?—'আমাকে সন্দেহ করবেন না মশাই! শ্রীচৌধুরীর সীমানায় যাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি নো।' এইটুকুই শুধু বলতে পারি। আর ন যে, 'কাজটার মধ্যে আমি তো নিন্দনীয় ছু দেখি না। নগদ নারায়ণ সর্বদাই স, তা ছাড়াও, এর দ্বারা সমাজবাদী চ লক্ষ্মীলাভের সমভাগ্য সবাইকে দিতে পারলেও এটায় প্রায় সমভাগেই সরস্বতীর বণ্টন হয়ে যায়। যায় না ? সেটা মন্দ —বলুন ?'

'সে কথা আমি কইছি না। নতুন বই ত পেলে...না না, বউয়ের কথা নয়, কারও য়র বিষয়ে বলছিনে, বইয়ের কথাই

ঐ শুঁকে দেখা পর্যন্তই বই-এর জ্ঞান আমার,.....

যাচ্ছে। নতুন বই হাতে এলে কে না একটু নেড়েচেড়ে দ্যাখে! অদ্ভুত লোক আপনি। সেই কৌতূহলটুকুও হলো না আপনার! নতুন বই তো আজকাল শুঁকেও দেখে থাকে অনেকে, আমি শুঁকেছি। তার ঘ্রাণ নাকি ভারী চমৎকার!'

'আমিও কি শুঁকিনে নাকি? সত্যি বলতে, ঐ শুঁকে দেখা পর্যন্তই বইয়ের জ্ঞান আমার। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন হয়ে যায়, গোটা বইটা গোগ্রাসে গেলার দরকার করে না। ও ছাড়াও কি বই আমি পড়িনে নাকি? মস্ত মস্ত বইও পড়ি। আগাপাশতলাই পড়ে ফেলি একরকম। হস্তগত হলেই তার প্রথম প্যারা আর শেষ প্যারাটা পড়ে দেখি এক-বার—চোখ বুলিয়ে নিই বেশ করে—তাতেই আমার আদ্যোপান্ত পড়া হয়ে যায়। তখন আগাগোড়াই বইটা আমার পড়া যে, সে কথা জানাতেও বাধা থাকে না কোথাও, মিথ্যেও বলা হয় না বিশেষ। আমার বিদ্যের দৌড় বইয়ের ঐ প্রথম আর শেষ প্যারা। পড়ার ব্যাপারে আমার প্যারালাল আপনি পাবেন না!'

তার কোনো জবাব না দিয়ে শ্রী জানান, 'আচ্ছা, বিষ্ণু দে-র কবিতা আপনার কেমন লাগে বলুন দেখি?' রগ ঘেঁষে গুলি করার মতই রগরগে প্রশ্নটা তিনি ছুঁড়ে বসলেন হঠাৎ!

ভাবিত হতে হলো। আমাদের কালে সামাদ যেমন তালের মাথায় পায়ে বল পেলে কোণের থেকে টুক করে তা গোলের মুখে ফেলে দিত, তেমনি ইনিও যেন এই প্রশ্নটায় আমায় একেবারে কর্নার করলেন! কোণঠাসা করে আমাকে কোনো গোলের মধ্যে ফেলার মতলবেই কি না কে জানে, উনি তো অব-লীলায় এই প্রশ্নটা পাশিয়ে বসেছেন—এখন এর ফলে কোনো গোল না বাধলেই হয়। স্বভাবতই আমি গোলমাল কিছুর মধ্যে যেতে চাই না।

'গ্রীক ল্যাটিনে লেখা ও'র কবিতার আমি বুঝবো কী মশাই? আমি তো ও সব ভাষা জানিনে।' সবিনয়ে জানাই।

'গ্রীক ল্যাটিন! বলছেন কী মশাই? বাংলা ভাষায় লেখা যে?'

'বাংলা হরফে লেখা হলেই কি বাংলা হয়? বাঙালী পাঠকের বোধগম্য হওয়া চাইনে? সংস্কৃত যদি আমি বাংলা বর্ণ-মালায় লিখি তা হলেই কি তা আর সংস্কৃত থাকবে না? ও'র লেখা সব সংস্কৃতের সগোত্রই—ক্লাসিক নয় কি?'

'ক্লাসিক অবশ্যই এবং ফার্স্ট ক্লাসও বটে।' একটু থেমেই ও'র পুনরনুযোগ: 'দেখুন, আপনার ছোঁয়াচে এসে আপনার বাকভঙ্গীর ব্যারাম আমাকেও পাকড়াচ্ছে... কিন্তু মাপ করবেন, আপনার কথাটা আমি মেনে নিতে পারলুম না। বেশ, সুধীন দত্তর কবিতা সম্বন্ধে আপনার কী মত?'

'অভিন্ন মত। উনিও পুরোদস্তুর—ঐ ক্লাসের। মানে, ঐ ক্লাসিকই।' বলার পর আমারও পুনশ্চ যোগ: 'হ্যাঁ, ঐ সুধীন দত্তই। উনিই বিষ্ণুবাবুর কবিতার সমঝদার হতে পারতেন। আর, সেটা হতো সমান পাল্লার, এ গ্রীক মীটিং এ গ্রীক!'

'মানতে পারছি না ঠিক। আচ্ছা, বিষ্ণু দে-র এখনকার কবিতা আপনার কেমন লাগে?'

'এখনকার কবিতা? মহাকবি মাইকেলের মতন উনিও এখন শেষে স্বদেশে পৌঁছে-ছেন। নিজের মাতৃভাষায় ফিরে এসেছেন। বলতে হয় ও'র বেশ অবনতি ঘটেছে সম্প্রতি। পাঠকদের পৈঁঠায় নামিয়ে এনেছেন

টুক করে গোলের মুখে,......

নিজেকে। ভালোই করেছেন। এখন ও'র কবিতা আর আগের মতন অস্বচ্ছ নয়। প্রায় মোটামুটি বোঝা যায়। এমনকি, আমিও এক-আধটু বুঝতে পারি।'

'আর ও'র আগেকার কবিতা...'

'আমার কী মনে হয় জানেন?' বাধা দিয়ে আমার মনের কথাটা বলে নিই: 'মানে না হলেও সে সব লেখা অতিশয় উচ্চ মানের। ওগুলি বাংলায় অনূদিত হলে আমাদের সাহিত্যের সম্পদ বাড়বে যে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহই।'

[ক্রমশ]

নিউট্রিন এলো বঙ্গে,
টফিলজেন্স সঙ্গে
চাকুম-চাকুম রকম রকম
খাওরে সবাই রঙ্গে
হ্যাঁ। সকলের মুখে মুখে যার নাম—আমি সেই শ্রী শ্রী কুটুর-কুটুর
নিউট্রিন থানি...। দক্ষিণদেশে ছেলেমেয়েরা আমাকে বিলক্ষণ
চেনে। একবার আমার নাম করলে হয়—অমনি তাদের জিভে জল এসে
যাবে। নিউট্রিন বলতে টফি লজেন্সের হরেকরকমবা—ল্যাক্টো বনবন, ল্যাক্টো
মন্টেলিট, কোকোনাট বনবন, অরেঞ্জ ক্যান্ডি, পাইনঅ্যাপল টফি রোল, মোগল টফি,
ক্রানচ কিউব আর এমনি শতেক ধরনের টফি লজেন্স।
আর কি। এবার আমাকে পরিবেশন করার ভার নিয়েছে ভল্টাস। এবার এখানে
আমি নিউট্রিন দিয়ে সবাইকে মাত করব।
কই, ছেলে পুলেরা সব কোথায়
ছুটে চলে এসো!
আজই মুঠো মুঠো কিনে
বাড়ি নিয়ে যাও।
nutrine
নিউট্রিন
শতাধিক রকমের মুখরোচক
টফি লজেন্স
nutrine চকুস-চকুস খাসা, মিষ্টি দিয়ে ঠাসা।
নিউট্রিন কনফেকশনারি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, চিত্তুর (অন্ধ্র প্রদেশ)

॥ ৩ ॥

প্রশ্নের কেউই উত্তর দিলো না। চারদিকে অন্ধকার। ওদিকে বিয়ে-বাড়ির আলোর পশ্চিম দিকটা ঝলমল করছে। পূর্ব-উত্তর কোণাকুণি দিকটাতেই অন্ধকার বেশি। চণ্ডীমণ্ডপটা পূর্বদিক ঘেঁষা। নরনারায়ণ চৌধুরী যখন নবাবগঞ্জে জমিদারির পত্তন করেছিলেন তখন হাতে অনেক কাঁচা টাকা আসতে লাগলো। কিন্তু টাকা এলে কী হবে, মানুষটার ব্যবহার সেই আগেকার মতই রয়ে গেল। একদিন যখন কালীগঞ্জে গোমস্তার কাজ করেছেন, তখনও যেমন জমিদারির পত্তনের পরও তেমনি। এই নবাবগঞ্জ একদিন কালীগঞ্জের পত্তনের মধ্যেই ছিলো। তখন নরনারায়ণ চৌধুরী এইখানে বসে একটা একতলা বাড়ির বৈঠকখানার মধ্যে থেকে গোমস্তাগিরি করতেন। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে নবাবগঞ্জের সেই একতলা বাড়িটার সামনে একটা বিরাট দু'মহলা দোতলা বাড়ি উঠলো। তখন আগেকার সেই একতলা বাড়িটা হয়ে গেল চণ্ডীমণ্ডপ। তার আধখানায় চণ্ডীমণ্ডপের কাজ চলতে লাগলো। আর আধখানার হলো চোর-কুঠরি। সে আধখানা প্রায়ই ব্যবহার হতো না। বছরের বেশির ভাগ সময় তার দরজায় তালা-চাবি দেওয়া পড়ে থাকতো। একটা ঝাঁকড়া মাথা পেয়ারা গাছ সে ঘরখানাকে দিনের বেলায় অন্ধকার করে রাখতো। আর রাত্তিরে তার চেহারা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেত।

লোকটা তখন সামনে এসে পড়েছে একেবারে।

সদানন্দ মুখখানা একেবারে লোকটার মুখের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

বললে—কে? কে রে তুই? কথা বলছিস নে কেন?

—আজ্ঞে আমি!

এবার গলার আওয়াজে চিনতে পারলে সদানন্দ। বংশী ঢালী।

—বংশী ঢালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ খোকাবাবু?

—তা তুই এই অন্ধকারে এখানে একলা কী করছিস, এখন? খেয়েছিস?

বংশী ঢালী বললে—কাঁচা-ফলার খেইচি, একটু পরে পাকা-ফলার খাবো।

তা বটে। কর্তাবাবুর বাড়ির কাজ, সবাই তিন-চারদিন ধরে চারবেলা পেট ভরে খাবে। এটাই রেওয়াজ। জমি-জমার দখল নিয়ে যখন কোথাও কোনও গণ্ডগোল বাধে তখন বংশী ঢালীরই ডিউটি পড়ে। বদমাইশ প্রজাকে টিট করতেও বংশী ঢালীর ডিউটি পড়ে।

—তা পাকা-ফলারের পাতা তো পড়েছে, খেতে যা—

সে কথার উত্তর না দিয়ে বংশী ঢালী অন্য কথায় চলে গেল। এক গাল হাসি হেসে বললে—আপনার বউ খুব সুন্দর হয়েছে খোকাবাবু, একেবারে মা-দুগ্গার মত—

কিন্তু বংশী ঢালীর হাসিতে সদানন্দর মন ভুললো না। বললে—হবে, তুই খেয়ে নিগে যা—

বংশী ঢালী চলে গেল বটে, কিন্তু সদানন্দর মনের সন্দেহ গেল না। বংশী ঢালী চলে যেতেই সদানন্দ চোর-কুঠুরিটার দিকে আরো এগিয়ে গেল। বাইরে থেকে চোর-কুঠুরির দরজায় তালা ঝুলোছে তখনও। তাহলে আর্তনাদটা কোন দিক থেকে এলো? কে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো?

মানুষের ইতিহাসে এই রকম করে কতবার কত বংশী ঢালী নিঃশব্দে কত জমিদারের চোর-কুঠুরিতে ঢুকেছে, আর নিষ্কলুষ মুখোস নিয়ে চোর-কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে এসেছে কতবার তা কোনও ভাষার ইতিহাসে লেখা থাকতে নেই। কিন্তু

হিসেবের কড়ি বাঘে খেয়েছে এমন কথা যেমন কোথাও লেখা নেই, আসল আসামী ধরা পড়েছে এমন নজিরও কোনও আদালতের নথি-পত্রে নেই। কারণ আসল আসামীরা ধরা পড়ে না। নকল আসামীদের সামনে এগিয়ে দিয়ে আসল আসামীরা আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাদের কোনও শাস্তি হতে নেই। তারা রায়-বাহাদুর হয়, রায়-সাহেব হয়, তারা শ্বেত-পাথরের মূর্তি হয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে শহরের শোভা বাড়ায়। হয়তো একদিন হরতো নবাবগঞ্জের নর-নারায়ণ চৌধুরীও এমনি শোভা হয়ে উঠতো, রায়-বাহাদুর হতো, রায়-সাহেব হতো, পদ্মভূষণ হতো, পদ্মশ্রী হতো। হবার চেষ্টাও হয়ত করতো। কিন্তু অদৃষ্ট দেবতার কোন এক দুর্লঙ্ঘ্য আইনে আসামী একদিন হঠাৎ ধরা পড়লো। আর ধরা পড়লো বলেই রাত জেগে জেগে তার বংশধরকে নিয়ে এই উপন্যাস লেখবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠলো।

কিন্তু সন্দেহটা দৃঢ় হলো আরো অনেক পরে। উত্তর-পূব দিক দিয়ে ঘুরে আবার পূব দিকে ভেতর-বাড়িতে আসবার কথা। কাল এই সারা বাড়ি অতিথি-অভ্যাগতে ভরে উঠবে। গতকাল থেকেই ভিড় শুরু হয়েছে। মাঝখানে একটা দিন শুধু কালরাত্রি। তারপরেই ফুলশয্যা।

গৌরী পিসী হঠাৎ সদানন্দকে দেখতে পেয়েছে। বললে—হ্যাঁ রে, তুই এখানে, আর ওদিকে সবাই খুঁজছে। রাত-বিরেতে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? গাব গাছের তলায় কী করছিলি?

ছেলে হরনারায়ণ কর্তাবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

—বউমা কেমন হয়েছে?

কর্তাবাবু বললেন—ওসব কথা এখন থাক, তোমার নতুন বেয়াই-বেয়ানকে আনতে যাবে কে?

ছেলে বললে—প্রকাশকে বলেছি—

—প্রকাশ? প্রকাশ কে?

—আমার সম্বন্ধী।

—তোমার সম্বন্ধী? তোমার সম্বন্ধী আবার কবে হলো। তোমার তো সম্বন্ধী ছিল না। বউমা তো বেয়াই মশাই-এর একই সন্তান।

নরনারায়ণ বললে—আজ্ঞে, আমার আপন সম্বন্ধী নয়, আপনার বউমার মাসীমার ছেলে। আপনার বউমার মাসতুতো ভাই—

—ও—

যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কর্তাবাবু। ছেলের সম্বন্ধীর কথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন। তা চমকে ওঠবারই কথা। এত ভেবে চিন্তে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্যটা হলো বাড়িতে শুধু যেন বউই না আসে।

তার সঙ্গে যেন অর্ধেক রাজত্বও আছে। না, অর্ধেক রাজত্ব কথাটা ভুল। কর্তাবাবু যখন ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তখন এটা জেনেশুনেই দিয়েছিলেন যে ছেলে অনেক সম্পত্তি পাবে।

—চক্রবর্তী মশাই কখন আসছেন?

—কাল সকালে আসবার কথা। রজবআলীকে বলেছি রেল-বাজারে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতে—

ভাগলপুরে বউমার বাপের যে সম্পত্তি আছে তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচ ছ' লাখ টাকার মতন। তার ওপর কর্তাবাবুর নবাবগঞ্জের নিজের সম্পত্তি। একুনে সব মিলিয়ে আরো কয়েক লাখ। তিনি যখন এ সংসার থেকে বিদায় নেবেন তখন এই ভেবেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে তাঁর বংশধারা আর তাঁর বংশের ঐশ্বর্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ অক্ষয় অব্যয় অম্লান হয়ে থাকবে। তারপর যখন তাঁর ছেলেও থাকবে না, তখন নাতি রইলো। সেই নাতিই নরনারায়ণ চৌধুরীর বংশের জয়ধ্বজা চিরকাল আকাশে উঁচু করে তুলে রাখবে।

দোতলার একটা ঘরের মধ্যে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকলে কী হবে, তাঁর নজর সব দিকে। একদিন এক জমিদার বাড়িতে সামান্য গোমস্তার কাজ করে প্রথম জীবন কাটিয়েছেন। তখন থেকেই বুঝেছেন কাকে বলে পয়সা। পয়সার যে কী মূল্য তা তখন থেকেই জানতে শিখেছিলেন তিনি। তখনই বুঝেছিলেন যে প্রচুর পয়সার মালিক না হলে আর বেঁচে থেকে কোনও সুখ নেই। তাই তখন থেকেই পয়সার সাধনাতেই মন দিলেন তিনি। এমন করে মন দিলেন যে লোকে বুঝতে পারলো যে হ্যাঁ সাধক বটে। শেষে একদিন যখন সিদ্ধি লাভ করলেন তখনই পেছনে লাগলো শনি। অত পয়সা করেও তাঁর শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। যখন পয়সার পাহাড়ের ওপর বসে আছেন, যখন আত্মীয়-স্বজন, পাইক-লাঠিয়াল-বরকন্দাজ নিয়ে নবাবগঞ্জের সকলের মাথায় উঠেছেন তখনও মনে শান্তি নেই। হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই, একদিন দীনু কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মুখের চেহারা দেখেই কর্তাবাবু বুঝতে পারেন কী হয়েছে।

তবু জিজ্ঞেস করেন—কী রে, কী হয়েছে?

দীনু মুখ নিচু করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলে—আজ্ঞে আবার কালিগঞ্জের বউ এসেছে—

রেগে যেতেন কর্তাবাবু। গলা চড়িয়ে বলতেন—তা বলা-নেই কওয়া-নেই অমনি হুট করে এলেই হলো? হঠাৎ আবার এলো কেন? আমি টাকা কোথায় পাবো? আমার কি টাকার গাছ আছে? আমি টাকার চাষ করি? আমি এখন কী করবো? তুই গিয়ে বল, এখন দেখা হবে না—আমার শরীর ভালো নেই—

দীনু বলতো—আজ্ঞে আমি সব বলেছি আপনি ভালো আছেন?

—কেন বললি ভালো আছি? আমি ভালো আছি না খারাপ আছি তুই জানলি কী করে? তুই কি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলি?

বড়ো মানুষ দীনু লোকটা। ফাই-ফরমাস খাটাই তার কাজ। সে এত মতলব-ধান্দা ফন্দি-ফিকির কিছু বোঝে না।

বললে—না আজ্ঞে, আপনাকে তা জিজ্ঞেস করিনি—

—তাহলে? তাহলে কী করে বুঝলি যে আমার শরীর ভালো আছে?

—আজ্ঞে আমার ভুল হয়েছিল। আমি সেই কথা গিয়ে বলে আসি যে আমার ভুল হয়েছিল। কর্তাবাবুর শরীর ভালো নেই। তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না—

—হ্যাঁ, তাই বলে আয়।

দীনু চলে যাচ্ছিল। কর্তাবাবুর আবার কী মনে হলো। ডাকলেন। বললেন—দীনু, ওকথা বলতে হবে না, তুই ডেকে নিয়ে আয়—

এমনি কতবার। কোথায় সেই ইছামতী পেরিয়ে কালিগঞ্জ। আর কোথায় এই নবাবগঞ্জ। পাকা প্রায় পঁচিশ ক্রোশ রাস্তা। তার মধ্যে আবার ইছামতী। কথায় বলে একা নদী বিশ ক্রোশ। এই এতখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে আসতো সেই কালিগঞ্জের বউ। আর এসেই সেই টাকা। টাকার তাগাদা। যেন কর্তাবাবুর কানে স্মরণ করিয়ে দিতে আসতো যে তুমি জমিদারই হও আর যে-ই হও আসলে তুমি গোমস্তা। আমার অনুগত কর্মচারী। ভৃত্য।

আর সদা এসে ঠিক তখনই দাঁড়াতো সেখানে। তখন খুব ছোট সে। পাশের সিন্দুকটা খুলতেই দেখতে পেতো ভেতরে কত সোনা, কত মোহর, কত টাকা, কত নোট। দেখতে দেখতে সেই ছোটবেলাতেই সদানন্দর চোখ দুটো পাথর হয়ে যেত। যত লোক আসে দাদুর কাছে তাদের সকলের যথাসর্বস্ব এনে ওইখানে ঢেলে দেয়। সেসব জমা হয়ে ক্রমে ক্রমে সিন্দুকের ভেতরে পাহাড় হয়ে ওঠে। আর দাদু তত বলে—আমার টাকা কোথায়? টাকা কোথায় আমার? আমার কি টাকার গাছ আছে? আমি কি টাকার চাষ করি?

কালিগঞ্জের বউ বলে—কিন্তু আমার যে পাওনা টাকা!

—তা পাওনা টাকা বললেই কি হুট বলতে টাকা দিতে হবে।

—কিন্তু তুমি যে আমাকে আসতে বলেছিলে আজ?

—তখন আসতে বলেছিলুম, ভেবেছিলুম টাকা থাকবে আমার কাছে। কিন্তু এখন দেখছি টাকা নেই আমার—

হঠাৎ পাশ থেকে সদানন্দ বলে উঠলো—না দাদু, তোমার টাকা আছে, আমি দেখেছি তোমার সিন্দুকের ভেতর অনেক টাকা আছে—

কর্তাবাবু হঠাৎ পাশের দিকে নজর দিয়ে দেখেন নাতিটা কোন্ ফাঁকে সেখানে এসে বসে বসে এতক্ষণ তাদের কথা শুনছিল।

বললেন—ওরে, ও দীনু, কোথায় গেলি তুই, ও দীনু, একে এখানে আসতে দিলি কেন? ও দীনু—

দীনু তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে সদাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু সদা যেতে চাইত না। দীনুর টানাটানিতে ঘর থেকে যেতেও যেতেও চিৎকার করে বলতো—তুমি মিথ্যেকথা বলছো দাদু, তুমি মিথ্যেবাদী—তুমি মিথ্যেবাদী—

তারপর এক সময় কালিগঞ্জের বউ আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলে যেত।

সদানন্দ পালকীটার পেছন পেছন ছুটতো—ও কালিগঞ্জের বউ, কালিগঞ্জের বউ, আমার দাদু মিথ্যেবাদী, দাদু তোমায় মিথ্যে কথা বলেছে, দাদুর অনেক টাকা আছে, সিন্দুকের ভেতর দাদুর অনেক টাকা আছে—

কিন্তু ছুটতে ছুটতে বেশি দূর এগোতে পারতো না। দীনু এসে সদাকে ধরে নিয়ে অন্দর মহলে চলে যেত। আর পালকিটা রাস্তায় নেমে খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে চলতো। তারপর খেয়া পেরিয়ে একেবারে পঁচিশ ক্রোশ দূরে একেবারে সোজা কালিগঞ্জ—

এসব অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর মাইনর ইস্কুল থেকে পাশ করে সদানন্দ কেষ্টগঞ্জের রেলবাজারের ইস্কুলে পড়তে গেছে। সে ইস্কুল থেকে পাশও করেছে। তারপরে তার বিয়ে হয়েছে। এ সেই বিয়ের পরের দিনেরই কাণ্ড।

গৌরী পিসী বললে—সবাই ওদিকে আনন্দ করছে, বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, আর তুই কি না এখানে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—আর আর এদিকে আয়—

বলে টানতে টানতে কেওড়া-বাড়ির উঠোনের দিকে নিয়ে চললো। তখন সত্যিই সেখানে বাজি-বাড়ির ধুম চলেছে। আলোর আলো হয়ে গেছে জায়গাটা। পাকা-ফলার খেতে বসেছে এ-গ্রাম- সে-গ্রামের মুনিষরা। তাদেরই তো আসল আনন্দ। কর্তাবাবুর একমাত্র নাতির বিয়ে তো তাদেরই উৎসব। তারা ক'দিন ধরেই খাবে। তাদের নিজেদের বাড়িতে রান্না-খাওয়ার পাট আজ ক'দিন ধরে বন্ধ থাকবে। সকাল বেলা খাবে আবার রাত্তিরেও খাবে। প্রকাশ মামা নিজে দই-এর হাঁড়ি নিয়ে সবাইকে দই দিচ্ছে। কাঁধে তোয়ালে কোমরে গামছা। মুখে খই ফুটছে। বলছে—খা খা খা, পেট ভরে খা সবাই—

হঠাৎ সদানন্দর দিকে নজর পড়তেই বলে উঠলো—আরে, রক্ত কীসের? রক্ত কেন তোমার গেঞ্জিতে?

—রক্ত?

আরো সবাই চেয়ে দেখলো সেদিকে। বললে—সত্যিই তো, রক্ত এল কোত্থেকে? এত রক্ত।

সদানন্দ চেয়ে দেখলে তার গেঞ্জিতে সত্যিই রক্ত লেগে রয়েছে। এত রক্ত এল কোত্থেকে। তার হাতেও রক্ত।

গৌরী পিসীও এতক্ষণে নজর করে দেখলে —এ কী রে, কীসের রক্ত।

হঠাৎ যেন চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠলো—রক্ত! এ কীসের রক্ত! আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ সব জায়গা থেকে একসঙ্গে ঝড়ের মত প্রশ্ন আসতে লাগলো—রক্ত রক্ত। দোতলা থেকে নরনারায়ণ চৌধুরী প্রশ্ন করলেন—রক্ত! রক্ত! হরনারায়ণ চৌধুরীও পাশে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন। বললেন—আরে, এত রক্ত এল কোত্থেকে? দীনু দৌড়ে এল—এ কী খোকাবাবু, এ কীসের রক্ত? কৈলাশ গোমস্তাও ভাল করে নজর করে দেখলে—তাই তো, রক্ত কীসের? রজব আলী পাকা ফলার খাচ্ছিল একমনে। সেও বলে উঠলো—রক্ত! সদানন্দর অতীত জিজ্ঞেস করলে—রক্ত! সদানন্দর বর্তমান জিজ্ঞেস করলে—রক্ত! সদানন্দর ভবিষ্যৎও জিজ্ঞেস করলে—রক্ত! সদানন্দর শিক্ষা-দীক্ষা-অভিজ্ঞতাও প্রশ্ন করলে —রক্ত! ইতিহাস ভূগোল সমাজ—সমস্ত উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, অধস্তন উত্তরপুরুষ একসঙ্গে সবাই প্রশ্নের ঝড় বইয়ে দিলে—রক্ত রক্ত রক্ত!!!

✻

গণেশ হঠাৎ মাস্টার মশাইকে দেখতে পেয়েছে।

—আরে মাস্টার-মশাই, আপনি এখেনে? আর ইনি আপনার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। আপনি একে ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছেন—

সদানন্দ ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন। এতক্ষণে যেন সব মনে পড়লো আবার।

বললেন—আমি আপনার জন্যে জল আনতে এসেছিলুম, কিন্তু গেলাস খুঁজে পাচ্ছি না—

গণেশ বললে—আপনি গেলাস খুঁজে পাবেন কী করে? আপনি কি কখনও নিজের হাতে জল গড়িয়ে খেয়েছেন? যান, আপনি ঘরে যান, আমি জল এনে দিচ্ছি—

যে-গেলাস খুঁজতে সদানন্দবাবুর রাত পুইয়ে গিয়েছিল সেই গেলাস খুঁজে জল এনে দিতে গণেশের এক মিনিটও লাগলো না।

জল খেয়ে ভদ্রলোক যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। বললে—যাক্‌ গে, এবার আর দেরি নয় মশাই, চলুন। এখন পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হবে, বেলাবেলি বেরিয়ে পড়ুন—

সদানন্দবাবু বললেন—আজকেই যেতে হবে?

ভদ্রলোক বললে—তা যেতে হবে না? আপনার নামে হুলিয়া রয়েছে আমার কাছে আজ কুড়ি বছর ধরে আর আপনি বলছেন আজকেই যেতে হবে কিনা? শেষকালে থানা-পুলিসকে খবর দিলে যে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে তারা, তখন কি ভালো দেখাবে? তার চেয়ে ভালোয়-ভালোয় আমার সঙ্গে চলুন, বেশি ঝামেলা করবেন না। আমি বাজে ঝামেলা পছন্দ করি না—

সদানন্দবাবু বললেন—কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি যে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছে? বাদী কে?

ভদ্রলোক বললে—বাদী কে আবার পুলিস!

—আর আমার অপরাধ?

ভদ্রলোক বললে—অপরাধ? অপরাধের কথা বলছেন? হরনারায়ণ চৌধুরীর নাম শুনেছেন?

—তিনি তো আমার বাবা!

—আপনি ওঁকে খুন করেন নি?

—খুন? আমি? আমার বাবাকে খুন করেছি?

—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ. আর শুধু কি তাই! আপনি দশ লাখ টাকা তহবিল তছরূপ করেছেন, তারও প্রমাণ আছে কোর্টের কাছে—

—দশ লাখ টাকার তহবিল তছরূপ! বলছেন কী আপনি?

—আর নয়নতারা? নয়নতারাকে চেনেন?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললে—তার সর্বনাশ কে করেছে?

—তার সর্বনাশ হয়েছে? কে সর্বনাশ করেছে তাঁর? কী সর্বনাশ হয়েছে?

ভদ্রলোক বললে—আপনি ভালো মানুষ

সেজে থাকলে কী হবে, এক গেলাস জল পর্যন্ত নিজে গড়িয়ে খেতে পারেন না, কিন্তু আপনার শয়তানি জানতে কোর্টের বাকি নেই মশাই। আজ কুড়ি বছর ধরে আপনার নামে হুলিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর আপনি এখানে সাধু সেজে লুকিয়ে বসে আছেন! কী কাণ্ড বলুন দিকিনি!

ব্রহ্মানন্দবাবু হতবাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর মুখ দিয়ে যেন আর কোনও কথা বেরোতে নেই।

বললেন—তাহলে আমি আসামী?

ভদ্রলোক বললে—আসামী না হলে আপনার নামে হুলিয়া বেরোল কেন? কই, আর কারো নামে তো হুলিয়া বেরোচ্ছে না! আপনি ভেবেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ করবেন আর কেউ তা জানতে পারবে না। তাহলে মশাই আজ কোর্ট-কাছারির সৃষ্টি হয়েছে কেন? আর তা ছাড়া এখন হয়েছে কী! এখন তো সবে 'মহড়া'—

—'মহড়া' মানে?

ভদ্রলোক বললে—কবির গান শোনেন নি? প্রথমে 'মহড়া' দিয়ে শুরু হবে, তারপরেই 'চিতেন'। ওই 'চিতেনে'ই তো যত মজা। এখন মুনসিফের কোর্টে শুরু হবে

মামলা, তারপরে যখন মামলা বড়-আদালতে যাবে তখনই তো মজা।

সদানন্দবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—একটা কথা রাখবেন আমার?

—কী কথা!

—আমাকে দু'দিন সময় দেবেন?

—দু'দিন?

—হ্যাঁ, আমি দেখে আসবো একবার ভাগলপুরে গিয়ে যে সত্যিই আমি হরনারায়ণ চৌধুরীকে খুন করেছি কি না। দেখে আসবো আমি দশ লাখ টাকা তছরূপ করেছি কি না। আর নয়নতারার কথা বললেন? কিন্তু আমি তো তার কোনও সর্বনাশ করিনি। আমি তো বরাবর তার ভালো করবারই চেষ্টা করেছি। তাকেও আমি একবার দেখতে যাবো নৈহাটিতে। তারপর একবার যাবো নবাবগঞ্জে!

—আর আমি? আমি কি এখানে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো নাকি? আপনি যদি মশাই পালিয়ে যান? আপনাকে আর আমার বিশ্বাস নেই—

সদানন্দবাবু বললেন—পালালে তো আগেই পালাতে পারতুম। আর এই তো আমি সংসার ছেড়ে চৌবেড়িয়াতে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু জীবনের যন্ত্রণা থেকে কি রেহাই পেয়েছি! এও তো এক জেলখানা। এই জীবনই তো আমার কাছে জেলখানা। এই জেলখানা থেকে না-হয় আর একটা জেলখানাতে গিয়ে ঢুকবো। জেলখানাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু আমি জানতে চাই আমি কী অন্যায় করেছি। বুঝতে চাই আমি কী পাপ করেছি। দেখতে চাই আমি কার কী ক্ষতি করেছি, কার কী সর্বনাশ করেছি! নিজের চোখে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই আমার এত চেষ্টা, এত অধ্যবসায়, এত ত্যাগ কেন এমন করে মিথ্যে হয়ে গেল, কে আমার সব ইচ্ছেকে এমন করে পণ্ড করে দিলে। এর কারণটা কী।

—আর আমি?

—আপনিও চলুন আমার সঙ্গে। আজ কুড়ি বছর আমার পেছনে নষ্ট করেছেন, এবার আর দুটো দিন নষ্ট করতে পারবেন না?

সঙ্গে নেবার মত কিছুই ছিল না। তবু টুকিটাকি কিছু নিতে হলো। সদানন্দবাবু বেরোলেন। পেছনে ভদ্রলোকও সঙ্গে চলতে লাগলো। বললে—দুগ্গা, দুগ্গা, এ কী এক ঝামেলায় ফেললেন মশাই আমাকে, চলুন চলুন, পা চালিয়ে চলুন—

গণেশ দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল।

বললে—কোথায় যাচ্ছেন মাস্টার মশাই? যাচ্ছেন কোথায়?

সদানন্দবাবু বললেন—তুমি হেডমাস্টার মশাইকে বলে দিও গণেশ যে কদিনের জন্যে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি—

—দু'দিন পরে আবার আসছেন তো?

সদানন্দবাবু বললেন—তা কি বলা যায় কিছু। সারা জীবন এত হিসেব করে চলেও যখন একদিন সব হিসেব বেহিসেব হয়ে গেল তখন ঠিক করে কিছুই আর বলতে ভরসা হয় না। তবে এলে তো তোমরা দেখতেই পাবে—

বলে কেষ্টগঞ্জের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন। চলতে চলতে তাঁর মনে হতে লাগলো যেন আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষ সব একসঙ্গে ঝড়ের মত প্রশ্ন করে চলেছে—এ কাঁসের রক্ত! দোতলা থেকে নরনারায়ণ চৌধুরী প্রশ্ন করছেন, প্রশ্ন করছে হরনারায়ণ চৌধুরী। প্রশ্ন করছে দীনু, কৈলাশ গোমস্তা, গৌরী পিসী, রজব আলী সবাই। সদানন্দবাবুর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎও যেন একই প্রশ্ন করে চলেছে। একই প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর শিক্ষা-দীক্ষা-অস্তিত্ব। প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর ইতিহাস-ভূগোল-সমাজ। প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ, প্রশ্ন করে চলেছে সদানন্দবাবুর অধস্তন উত্তরপুরুষ। এক যোগে সকলের প্রশ্ন সদানন্দবাবুর মনে ঝড় বইয়ে দিচ্ছে—এ কাঁসের রক্ত!

আর তাদের সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন নয়নতারাও সদানন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করে চলেছে—এ কাঁসের রক্ত!

॥ মহড়া সমাপ্ত ॥

(ক্রমশ)

সূর্যের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রোটন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি কণিকার যে ঝড় সবেগে সৌরমণ্ডলের দিকে এগিয়ে যায়, তার সামান্য একটি অংশই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। ছবিটি তুলেছিল অরবিটিং সোলার ল্যাবোরেটরি-৭। স্বনিয়ন্ত্রিত এই মহাকাশযানটি ২৯ সেপ্টেম্বর কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষেপ করা হয়। মহাকাশে পৌঁছনর অব্যবহিত পর সূর্য, সৌরমণ্ডল এবং দূরাকাশের নক্ষত্র জগতের উপর শ্যেনদৃষ্টি মেলে সে তার পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করে। তারই ফাঁকে এক সময়ে এই ঐতিহাসিক ছবিটি তুলতে সমর্থ হয়। মহাকাশ যান থেকে এই ধরনের ছবি এই প্রথম তোলা হল। ছবি তোলার সময় লেন্সের সামান্য ছোট্ট একটি কালো চাকতি রেখে সূর্যের কেন্দ্রাংশটি ঢেকে রাখা হয়। ছবিতে সৌরচ্ছটার তিনটি প্রবাহ এতে ধরা পড়ে। কীভাবে এই স্রোত সূর্যের পরিমণ্ডল ছেড়ে অগ্রসর হচ্ছিল, নিচের ডানপাশের ছবিটিতে তা দেখান হল।

সেই ভৌতিক মেঘ/ এ রহস্য প্রায় এক'শ বছরের

ব্যাপারটি প্রথম ধরা পড়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিটোল্ড জেরাস্কির চোখে। সময় ১৮৮৫। নাম নকটিলুসেণ্ট ক্লাউডস বা নিশিদীপ্ত মেঘ। আবিষ্কার মুহূর্তেই এই মেঘ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে প্রচণ্ড কৌতূহল সৃষ্টি করে। কিন্তু আজও, দীর্ঘ ছিয়াশি বছর পর, সমাধান তো দূরের কথা, বরং রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। সম্প্রতি মস্কোয় অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক জিওডেসি' বা ভূ-পরিমিতি বিজ্ঞান এবং ভূপদার্থ বিজ্ঞান সমন্বয় সংস্থার সাধারণ সভায় বিষয়টি নতুনভাবে পর্যালোচনা করা হয়। কারো কারো মত, এ মেঘ পৃথিবীর নয়, মহাকাশ থেকে ভেসে আসা বিশেষ কোন আগন্তুক।

সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অথবা সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে আকাশ যখন প্রত্যুষ অথবা সন্ধ্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে থাকে, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'টোয়াইলাইট' তখন এরই প্রভার মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত রুপোলী মেঘের আবির্ভাব ঘটে। মনে হয় অপূর্ব মসৃণ খণ্ড খণ্ড হাল্কা মসলিনের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে। এবং শুধু হাল্কাই নয়, যথেষ্ট স্বচ্ছও। ইচ্ছে করলে তার ভেতর দিয়ে অনায়াসে আপনি গ্রহ নক্ষত্রের উপর পর্যবেক্ষণ চালাতে পারেন। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, দিন এবং রাতের সন্ধিক্ষণে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সে অদৃশ্য হয়ে যায়। আকাশের বুকে তখন তার অস্তিত্ব খুঁজে বের করা শক্ত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ভিটোল্ড জেরাস্কি যখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি নৈসর্গিক ঘটনার উপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন, ঐ সময় ব্যাপারটা আচমকাই তাঁর চোখে পড়ে গেল। তিনি দেখলেন, দিগন্ত রেখার নিচে সূর্য যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল, পশ্চিম আকাশের বুকে সন্ধ্যালোকের প্রভা দীপ্ত হয়ে উঠল, ঠিক তখন, একখণ্ড অনৈসর্গিক রুপোলি মেঘ হাল্কা কুয়াশার মত ভেসে উঠল। শুধু ভেসে ওঠাই নয়, একটা স্নিগ্ধ আভায় উপর সমস্ত অংশ অপূর্ব সৌন্দর্যে ভরে গেল। ঐ বছরেই ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশিদীপ্ত মেঘ কত দূরে অবস্থান করে বিশেষজ্ঞরা সেটাও বের করে ফেললেন। জানা গেল, পৃথিবীর বুক থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ওদের দূরত্ব পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডলের ঐ অংশের নাম মেসোস্ফিয়ার বা মধ্যস্তর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভূপৃষ্ঠের ঠিক ওপরের বাতাসের স্তরকে বলা হয় ট্রপো-স্ফিয়ার বা উষ্ণস্তর। পৃথিবীর দুই মেরুর কাছে এই স্তরের উচ্চতা প্রায় পাঁচ মাইল। কিন্তু নিরক্ষ অঞ্চলে দশ মাইলের মত। উক্ত বায়ুস্তরের ওপরে আছে কিছুটা হাল্কা বায়ুর আরও একটি স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। উক্ত স্তরের উপরে প্রায় চল্লিশ মাইলের মত বিস্তৃত। অতঃপর মেসোস্ফিয়ার। ঊর্ধ্বাকাশে এত দূরে থাকার দরুন নিশিদীপ্ত মেঘ যে সাধারণ শুভ্র-ধূসর মেঘ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা সহজেই সেটা বুঝতে পারলেন। কারণ, সকলেই জানেন, জলীয় বাষ্পের মেঘ সচরাচর পনের কিলোমিটারের উপরে তেমন আর চোখে পড়ে না। ফলে আবিষ্কারের পরমুহূর্তে দুটি প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠল। এক, আবহাওয়া মণ্ডলের অত ঊর্ধ্বে অমন অদ্ভুত দর্শন রুপোলি মেঘের উৎস কী? দুই, বাতাসের ঠিক ঐ ধরনের স্তরেই বা তারা কী করে এলো? এ প্রশ্ন তাৎক্ষণিক। তারপর দীর্ঘ ছিয়াশি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সমাধান এখনও দূর অস্ত। অবশ্য কিছু কিছু বিজ্ঞানী সম্প্রতি মন্তব্য করছেন, বিচিত্র ঐ মেঘের সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী নয়। সম্ভবত মহাশূন্যের ভিন্ন কোন অঞ্চল থেকে স্তরে স্তরে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে ঢুকে প্রবেশ করে। এবং অজ্ঞাত কোন কারণে সেখানেই বাস করতে থাকে।

পৃথিবীর বুকে যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালে আরও একটি ঘটনা বিশেষ ধরনের এই মেঘ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট কৌতূহলী করে তোলে। ঐ বছর ৩০ জুন সকাল প্রায় সাতটায় অতিকায় একটি আগুনের গোলা বিরাট এক স্ফুলিঙ্গের মত বায়ু স্তর ভেদ করে ঠিকরে এসে পড়ল সাইবেরিয়ার টুংগুস্কা উপত্যকার অরণ্য অঞ্চলে। ঠিকরে পড়ার পরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণে আশপাশের সমস্ত গাছপালা লক্ষলক্ষ উপড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং বিস্ফোরণের মূল কেন্দ্র থেকে চারপাশে প্রায় পঁচিশ মাইল ব্যাস জুড়ে সমস্ত অঞ্চল একেবারে সমভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। আড়াই শ' মাইল দূরে থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুচাপমান যন্ত্র এবং ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্রে তার কম্পন ধরা পড়েছিল। আর তার পরেই সারা ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তরাংশের রাতের আকাশ পর পর কয়েক দিন উজ্জ্বল রুপোলি মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে প্রায় তিরিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। রাতের অন্ধকার তখন হাল্কা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এমন আলোকিত অবস্থা যে, জনৈক ফটোগ্রাফার ঐ সময় নিশিদীপ্ত মেঘের আলোয় একটি গির্জার ছবি তুলতেও সমর্থ হন। অতএব পুরনো সেই প্রশ্ন আবার সরব হয়ে উঠল।

এই যে মেঘ, জেরাস্কির চোখে কুয়াশার মত যে মেঘ একদিন ধরা পড়েছিল, তার সঙ্গে এমন একটি মিল, এটা কি নেহাৎ কোন কাকতালীয় ঘটনা? না কি, ঐ আগুনের গোলার বিস্ফোরণের সময় যে ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হয়, সেই ধূলির মত সূক্ষ্মতম কণা মেঘের মত কিস্তৃত হয়ে সারা আকাশ আচ্ছন্ন করেছিল? অবশ্য দ্বিতীয় এই প্রশ্নটির স্বপক্ষেও জোরাল যুক্তি ছিল। কারণ যেখানটায় বিস্ফারণ ঘটে সত্যিই সেখানে অদ্ভুত সূক্ষ্মাকার বস্তুকণা ছড়িয়ে থাকে। দেখতে কাচের মত। অত্যন্ত হাল্কা। কিন্তু মুশকিল হল, টুংগুস্কার সেই অগ্নিগোলক সম্পর্কেও সঠিক কোন তথ্য অথবা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য কোন তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাগালের বাইরেই থেকে গেছে।

তবে প্রকল্প তৈরি হয়েছে একের পর এক। কতকগুলি বিশেষ তথ্যের উপর নির্ভর করে যেমন কোন মহলে ঐ ধরনের মেঘ সৃষ্টির ব্যাপারে উল্কাস্রোতের উপরই জোর দিচ্ছেন বেশি। ওঁরা মনে করছেন, উল্কা প্রচণ্ড বেগে বাতাসের স্তরে প্রবেশ করার পর যখন জ্বলতে শুরু করে তখন তার ভস্মীভূত অবশেষ সূক্ষ্ম ধূলি কণার মত ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। তারাই সৃষ্টি করে বসে নিশিদীপ্ত মেঘ। এ ধরনের মতবাদ আরও আছে। কিন্তু সব চাইতে বড় প্রশ্ন, তাই যদি হবে, তাহলে আকাশে নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে নিশিদীপ্ত মেঘ দেখা যায় না কেন। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, একমাত্র গ্রীষ্মেই বিশেষ ধরনের এই মেঘ ভাস্বর হয়ে ওঠে। তখন তাকে দেখা যায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর ডিগ্রি উত্তর এবং চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে। আর সব চাইতে লক্ষণীয়, বছরের অন্যান্য সময়ের মত তখন উল্কা-বর্ষণের পরিমাণও কমে যায়।

এ মেঘ ঠিক যেন মরসুমী পাখি। বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দূরাঞ্চলের বিশেষ কোন কোন পাখি যেমন বিশেষ একটি জায়গায় এসে ভিড় করে, অতঃপর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, ঠিক তেমনই এর চরিত্র। এদের সঠিক স্থিতিকাল, পরিমাণ এবং উপাদান কী, সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বের করার জন্য

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নিয়মিত গবেষণা করে চলেছেন। এর মধ্যে মোট দু'শটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রও বসান হয়েছে। তাদের সবগুলিই বসান হয়েছে প'য়তাল্লিশ থেকে সত্তর ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। ১৯৫৭ সাল থেকে সোভিয়েত দেশের জল-আবহাওয়া বিষয়ক বিজ্ঞান দপ্তর নিয়মিত অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। কেউ কেউ ভাবছেন, হতেও বা পারে, উল্কার ভস্মীভূত অবশেষই ঐ মেঘের অন্যতম কারণ। মহাজাগতিক সেই ধূলিকণা অত্যন্ত হাল্কা বাতাসের স্তরে ভাসমান জলকণা অথবা বরফের কুচির সঙ্গে মিশে ওদের সৃষ্টি করে।

এই মতবাদের স্বপক্ষে নিজস্ব একটি মতবাদ তৈরি করেছেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আইভান খভোস্তিকোভ। একমাত্র গ্রীষ্মের আকাশেই বা ঐ ধরনের মেঘ দেখা যায় কেন? অধ্যাপক খভোস্তিকোভের বক্তব্য, যে অঞ্চলে ঐ মেঘ দেখা যায়, গরমের সময় সেখানকার তাপমাত্রা শীতকালীন তাপমাত্রার চেয়ে অনেক নিচে থাকে। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের প্রায় এক শ' চল্লিশ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড নিচে। অথচ জানুয়ারি নাগাদ শূন্যের নিচে দশ ডিগ্রির কাছাকাছি উঠে আসে। অর্থাৎ ও'র কথামত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম : গরমের সময় জলীয় বাষ্প স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ভেদ করে মেসোস্ফিয়ারে এসে উপস্থিত হয়। সেখানকার চাপ যথেষ্ট কম হলেও অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ঐ বাষ্প ভাসমান ধূলিকণার সাহায্যে মেঘের স্তর সৃষ্টি করে। কিন্তু অন্য সময়ে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত মেঘ আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। যে ধূলিকণার কথা বলা হল তা ভস্মীভূত উল্কা পিণ্ডের অবশেষ হওয়াও অসম্ভব নয়?

তবু সেই মৌলিক প্রশ্নের কোন সমাধান এ ধরনের মতবাদ জুগিয়ে উঠতে পারল না। জলীয় বাষ্প না হয় ঐভাবে মেঘ সৃষ্টি করল? কিন্তু শুধু বিশেষ অঞ্চলে কেন? আকাশের অন্যত্রও তো এ ধরনের ঘটনার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণ নেই?

এ প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষের যুক্তি যথেষ্ট জোরালো। কারণ, অত উঁচুতে বাতাসের স্তরে জলকণার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অতএব বরফের থাকা না থাকার প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি, কয়েক বছর আগে বেলুনের সাহায্যে অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র পাঠিয়ে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছিল তাতে দেখা যায়, আকাশের ঐ অঞ্চলে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দুই ভাগ মাত্র।

দ্বন্দ্বের মাঝখানে সমাধানের কিছুটা আভাস আনলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

পশ্চিম জার্মানির ডালসারকুয়ারটিয়ের বর্ডারে জনৈক শুল্ক পুলিশ রাস্তার পাশে বসান বিশেষ আধার থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করছে। শুল্ক কর্তৃপক্ষ দৈনিক প্রায় ২৮০০০ গাড়ি এখানে দাঁড় করান। ঐ সমস্ত গাড়ির গ্যাস নিয়মিত নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে পুলিশদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। নতুন নিয়মে কর্মরত পুলিশরা মাঝে মাঝে ঐ আধার থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেই অসুবিধেটি দূর করতে পারবেন।

কয়েক বছর আগে সুইডেনের আকাশ অঞ্চলে রকেটের সাহায্যে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে নিশিদীপ্ত মেঘের উপর তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালান। ও'দের রকেটটি নিশিদীপ্ত মেঘের কিছুটা নমুনা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। নমুনার বিশ্লেষণ করার পর যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া গেল সেসব দেখে বিজ্ঞানীরা চমকে উঠলেন। সংগৃহীত মেঘের মধ্যে ও'রা নানারকম বস্তু কণা আবিষ্কার করে বসলেন। যাদের মধ্যে লোহা, বরফের কেলাস দুই-ই ছিল। এর অর্থ মেসোস্ফিয়ারেও জল আছে। তবে সেই জলের উৎস পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর বা হ্রদ নয়, কেউ কেউ বললেন সূর্য। ও'রা বললেন, প্রতি মুহূর্তে সূর্য থেকে যে প্রোটন কণা মহাশূন্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তারাই পৃথিবীর ঊর্ধ্বাঞ্চলের বায়ুস্তরে যে ইলেকট্রন কণা বিচরণ করে, অবশ্য দূরাগত রশ্মির সঙ্গেও ইলেকট্রন সেখানে আসে—তাদের সঙ্গে তারা মিলিত হয়। তৈরি হয় পারমাণবিক হাইড্রোজেন। ঐ হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরি করে জলের অণু। এরই নাম 'সোলার রেইন বা সৌর বৃষ্টি।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী ভীক্তর মার্তিকোচিক এই তত্ত্বের স্বপক্ষে জোরালো

মতামত প্রকাশ করেছেন। সৌর শক্তির অকৃপণায় ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরে একটি শৃংখল বিক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে প্রোটন শেষ পর্যন্ত জলীয় বাষ্প উৎপাদনে সাহায্য করে সে ব্যাপারে তাত্ত্বিক যুক্তিও তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, নিশিদীপ্ত মেঘের দিপ্তীর সঙ্গে মেরুপ্রভারও সম্পর্ক রয়েছে। সেখানেও সূর্যের প্রোটন কণার অবারিত বর্ষণ বায়ুস্তরে স্বদীপ্ত মেঘের স্তর তৈরি করে। একথাও অনেকে জানেন, পৃথিবীর মেরু অঞ্চলেই প্রোটন কণিকার সমাবেশ সবচাইতে বেশি। অতএব প্রশ্ন, এর জন্যেই কি নিশিদীপ্ত মেঘ নিরক্ষ অঞ্চল থেকে অতদূরে ভিড় করে থাকে? কারণ, আগেই বলেছি, ওদের দেখা যায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর ডিগ্রি উত্তরে এবং চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে। এবং হিসেব মত ঐ ঐ অঞ্চল মেরুর কাছাকাছি অবস্থিত। প্রোটন কণিকার প্রাবল্য সেখানেই বেশি করে থাকা সম্ভব। যদিও একই সঙ্গে এ কথাও কেউ কেউ বলছেন, বায়ু-প্রবাহের তোড়ে পৃথিবীর সাগর মহা-সাগরের জলীয় বাষ্পও সেখানে গিয়ে হাজির হতে পারে। ইতিমধ্যে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মস্কোর বায়ুবিজ্ঞান বিষয়ক কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা বাতাসের ভাসমান ধূলিকণা কীভাবে নিশিদীপ্ত মেঘ তৈরি করতে সাহায্য করে সে সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী রকেট পাঠিয়ে ওঁরা দেখেছেন আশি থেকে পঁচাশি কিলোমিটার বাতাসের স্তরে ধূলিকণা কেন্দ্রীভূত হয়। অবশ্য স্তরের সব সময় অমনটি ঘটে কী না, সেসম্পর্কে কিছুটা সংশয়ও আছে। মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম বিজ্ঞানী নিকোলাই গ্রিসিন নিশিদীপ্ত মেঘকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এই বিভক্তিকরণ আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। তিনিই সর্ব-প্রথম ধীরগতি ফিল্ম-এর সাহায্যে এই মেঘের বিভিন্ন সময়কালীন ছবিও তোলেন। কীভাবে এই মেঘ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে, গ্রিসিনের ছবি দেখে তা অনায়াসেই অনুমান করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যথাযথ বিশ্লেষণ করে ঐ সমস্ত ছবি থেকে আবহাওয়া মণ্ডলের অনেক রহস্যই আমরা উদ্ঘাটন করতে পারব। এবং যা থেকে ভবিষ্যতে আগাম আবহাওয়া সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারটিকে আরও নির্ভর-যোগ্য করে তোলা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, এই ধরনের মেঘ মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহের পরিমণ্ডলেও দেখা গেছে।

আপাতত বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মহাকাশই নিশিদীপ্ত মেঘের প্রকৃত সূতিকাগার। সেখান থেকে ভেসে আসা প্রোটন কণিকা আবহাওয়া মণ্ডলে প্রবেশ করে যে জলীয় বাষ্প তৈরি করে, তা-ই পরে মেঘরূপে বিরাজ করে। আর সেই মেঘ সৃষ্টিতে সাহায্য করে মহাকাশের ধূলিকণা। যার সৃষ্টি উল্কাগুর দেহাবশেষ থেকে।

এবং সিদ্ধান্ত এখনও পর্যন্ত এটুকুই। কিন্তু কেন বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং আকাশের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই তাদের দেখা যায়, সে রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত। এছাড়াও প্রোটনের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, দেখা দরকার ঐ মেঘের প্রাচুর্য মাঝে মাঝে বাড়ে কী না। কারণ, মাঝে মাঝে, বিশেষ করে প্রতি এগার বছর অন্তর সূর্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন ঘটে, তার দরুণ অনেক বেশি পরিমাণ প্রোটন পৃথিবীর বায়ুস্তরে উপস্থিত হওয়ার কথা। পরি-শেষে আরও একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। প্রতি বছর সূর্যের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে যদি সত্যিই জলীয় বাষ্প তৈরি হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই জলীয় বাষ্প যায় কোথায়? আমাদের পরিচিত মেঘ সম্পর্কে আমরা জানি, পৃথিবীর বুকে তারা ঝড়-জল-কুয়াশা ডেকে আনে। সমুদ্রের জল থেকে মেঘ। মেঘ থেকে জল। এই চক্রাকার দেহান্তর, বরং বলি, অবস্থার রূপান্তর, একথা নিশিদীপ্ত মেঘের ক্ষেত্রেও কি খাটে?

কলকাতার রাস্তায়/ যাঁরা কাজ করেন

বিশেষ করে সেই সমস্ত অঞ্চলে যেখানে শহরের ভিড় কেন্দ্রীভূত হয়, নানা রকম যানবাহনে দিনের বেশির ভাগ সময় জমজমাট। কলকাতার সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনসটিটিউটের আঞ্চলিক অফিস বেশ কিছুকাল ধরে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বায়ু দূষিত' করণের উপর যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, দিল্লি, কানপুর এবং বোম্বাই—এই তিনটি শহরের তুলনায় এই শহরের বাতাস অনেক বেশি দূষিত। আঞ্চলিক এই গবেষণা কেন্দ্র সম্প্রতি ব্রেবর্ন রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু, চৌরঙ্গী এবং হাওড়া ব্রিজ-এ (রবীন্দ্র সেতু) ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে লক্ষ করেছেন, ঐ সমস্ত অঞ্চলের বাতাসে শুধু কার্বন মনোকসাইডের মাত্রাই গড়ে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে পঁয়ত্রিশ ভাগের মত। অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষ পাউণ্ডে বিপজ্জনক এই গ্যাসের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। এ ব্যাপারে নিউইয়র্ক, শিকাগো, লস আঞ্জেলেস এবং ওয়াশিংটনের স্থান অনেকটা নিচে। ঐ সমস্ত শহরের বাতাসে কার্বন মনোকসাইড পাওয়া গেছে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ বাতাসে সাতাশ ভাগের মত। তবে লণ্ডনের আসন কলকাতার উপরে। লণ্ডনের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে চল্লিশের মত। পেট্রোল চালিত মোটর গাড়ি থেকে কার্বন মনোকসাইড ছাড়াও বেরিয়ে আসে সিসে, বেরিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি। এগুলি গুণগত উৎকর্ষ রক্ষার জন্যে পেট্রোলের সঙ্গে মেশান হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রত্যেকটিই যথেষ্ট ক্ষতিকর। এরা শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি, দৈহিক ক্ষমতা এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত করে। ডিজেল চালিত গাড়ি থেকে কার্বন মনোকসাইডের চেয়ে বরং বেশি বের হয় কার্বন কণা এবং আরও কিছু কিছু দূষিত সামগ্রী। মোদ্দা কথা, কলকাতার রাস্তায় বিচরণত গাড়িগুলি বাতাস দূষিত করে। পথচারীদের ফুসফুসে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। তাঁদের শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন আদান প্রদানের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে। এ ছাড়া শীতকালে কলকাতার বাতাস এমনিতেই থিতিয়ে থাকে। ফলে ঐ সমস্ত সামগ্রী, বিশেষ করে কার্বন এবং ধূলিকণা বাতাসের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থেকে ধোঁয়াশার প্রাণ কেন্দ্রস্বরূপ কাজ করে। শহরের বুকে তখন নেমে আসে পুরু ধোঁয়াশার স্তর। এতে করে পথচারীরা চোখের রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। সেই সঙ্গে ফুসফুসজনিত জটিল রোগেও। পথের মোড়ে মোড়ে যে সমস্ত পুলিস যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন, ওঁদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ এক নাগাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার দরুন হাজার হাজার গাড়ির বিষাক্ত গ্যাস ওঁদের ফুসফুসের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করে। ফলে ওঁদের রক্তে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের আদান-প্রদান ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে গাড়ির ভিড় বেশি। কখনও কখনও একাধিক মিনিট ধরে তারা সেখানে ক্রমাগত বিষাক্ত জ্বালানি গ্যাস ছাড়তে থাকে। বিশেষ করে সিগন্যাল পাওয়ার পর ঐ সমস্ত গাড়ি যখন চলতে শুরু করে তখন, মুহূর্তের জন্যে ধোঁয়া এবং বিষাক্ত গ্যাসের কুণ্ডলী চারপাশটা আচ্ছন্ন করে দেয়। তখন কর্মরত পুলিস এবং অপেক্ষমান পথচারীর নিশ্বাসে ঐ সমস্ত ক্ষতিকর সামগ্রীর মাত্রা দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা কেন্দ্রের আঞ্চলিক দপ্তরের সায়েন্টিস্ট ইনচার্জ ডঃ অজিত-কুমার বসু বললেন, একটু তৎপর হলে এ ধরণের বায়ু দূষিতকরণ সমস্যাটি কমিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্যে যা করতে হবে, তা হল: গাড়ির মালিকরা তাঁদের গাড়ির ওপর একটু নজর দিন। গাড়িগুলির যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হলে জ্বালানি নিসৃত ক্ষতিকর সামগ্রীর পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে। ইনসটিটিউটের অন্যতম বিজ্ঞানী শ্রী সি এস জি রাও সম্প্রতি বিনয়-বাদল-দীনেশ স্কোয়ারে একটি সমীক্ষা চালিয়ে লক্ষ করেছেন, সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতিরিক্ত গাড়ি আনাগোনার দরুন ঐ অঞ্চলে কার্বন কণার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এর সঠিক মাত্রাটি জানার ব্যাপারে ওঁরা এখন অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

সমরজিৎ কর

॥ ২৩ ॥

শিকারপুরে

'দেবী চৌধুরাণী' যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সে কথা বলবার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, বইখানির ষষ্ঠ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন—"দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুড়্‌ল্যাড় সাহেব, লেফটেনান্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। অর দেবীর নৌকায় বাস,

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।"

আচার্য যদুনাথ সরকার কিন্তু অন্যত্র এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভূমিকায় বলেছেন—"হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন।... মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসন-পদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই যুগের সন্ধিস্থল; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক। আর স্থান, সীমান্ত প্রদেশ; 'আনন্দমঠে' বন্য ঝাড়খণ্ডের প্রবেশদ্বার বীরভূম জেলা, 'সীতারামে' সমুদ্রের প্রায় ধারে ভূষণা পরগণা, আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে রঙ্গপুর জেলা।"
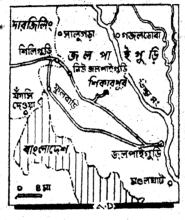
'দেবী চৌধুরাণী'র নায়িকা স্বামী-পরিত্যক্তা প্রফুল্লকে বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনাচক্রে ডাকাত দলের নেতৃত্বে উন্নীত করে আবার তাকে শান্ত গার্হস্থ্যজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই মূল কাহিনী সে সময়কার রংপুর জেলার উত্তর অংশের পটভূমিতে রচিত। সময় মোটামুটিভাবে, ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০) অব্যবহিত পরে। আজকের জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগে, এ জেলার প্রায় সবটাই রংপুর জেলার অধীন ছিল। রংপুর জেলা গেজেটিয়ার (১৯১১) থেকে দেখছি, সে জেলার উত্তর-সীমান্ত তখন নেপাল, ভুটান ও কোচবিহার রাজ্যকে স্পর্শ করত। ডাকাতদলের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল ও গভীর জঙ্গল এখন জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে হলেও তখন ছিল রংপুর জেলায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে স্বীকার না করলেও, বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থে স্থান, কাল, পাত্র সম্বন্ধে কি বলেছেন তা আর একবার ভাল করে দেখা যাক। বইটির বিভিন্ন অংশে লেখকের উক্তি—"বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ি; প্রফুল্লের পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। [ভূতনাথ নামটি কল্পনিক মনে হয়]। তখন দেশ অরাজক, মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কতক হইল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা। [অত্যাচারী ইজারাদার দেবী সিংহের ভয়াবহ নির্যাতনের কাহিনী সুবিদিত।] ...গুড়্‌ল্যাড সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারী তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহী ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু সিপাহীরা কিছুই করিতে পারিল না।" অন্যত্র—"ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান।" আর এক জায়গায় দেবী চৌধুরাণীকে

দরবার (পাইকারী হারে দানধ্যান) করবার অনুরোধ করে ভবানী পাঠক বলছেন—"ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচ শত সিপাহী লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরকার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে হইবে প্রচার করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহী যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে।" এ পুস্তকের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ভিত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আর বিশেষ কিছু বলেন নি।

এবার সরকারী কাগজপত্রে উল্লেখিত ইতিহাস ও ভূগোল প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ জে-এ-ভাস রচিত রংপুর জেলা গেজেটিয়ারের সংশ্লিষ্ট অংশের বাংলা তর্জমা এই রকম:

"১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, দলছুট সেপাই সৈন্য ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ডাকাতের দল—কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যায় তারা পঞ্চাশ হাজারের মতোও হত—গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করছিল বা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। রংপুর ও দিনাজপুরের দক্ষিণে ও বগুড়া জেলার পশ্চিমে গঙ্গাভিমুখী অঞ্চলে, শাসন কেন্দ্র থেকে
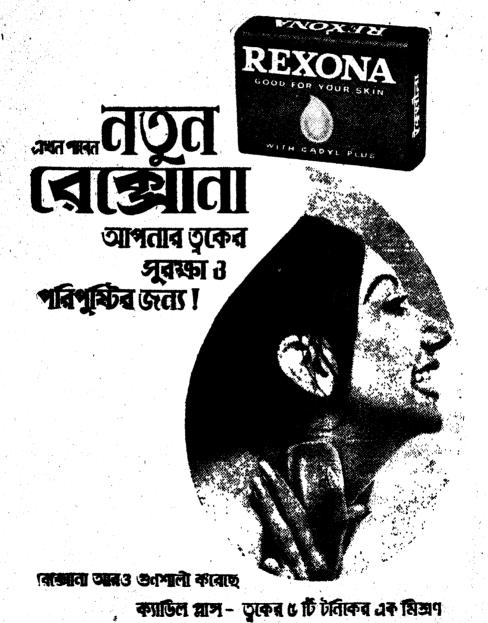
বহু দূরে, তাদের দৌরাত্ম্য ছিল সর্বাধিক। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, এই এলাকার বিখ্যাত দস্যু দলপতি ভবানী পাঠককে দমন করবার জন্য লেফটেনান্ট ব্রেনানকে নিয়োগ করা হয়। তিনি ডাকাত দলের সন্ধানে একজন দেশী অফিসারের অধীনে চব্বিশ জন সিপাই পাঠান। তারা ভবানী পাঠক ও তার বাউন্ন নৌকারোহী সঙ্গীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে। যুদ্ধে দলনেতা ও তার তিনজন অনুচর নিহত ও আটজন আহত হন, বন্দী হয় বিয়াল্লিশ জন। পাঠক ছিল বাজপুরের অধিবাসী। গঙ্গার দক্ষিণবর্তী অঞ্চল থেকে মজনু শা নামে যে আর এক কুখ্যাত দস্যু প্রতি বছরই উত্তরের এই অঞ্চলে অভিযান করত, তার সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল। লেফটেনান্টের রিপোর্টে দেবী চৌধুরানী নামে আর একজন স্ত্রী-ডাকাতের উল্লেখ পাওয়া যায়; সেও ভবানী পাঠকের দলে ছিল। সে বজরায় বাস করত। তার অধীনে বহুসংখ্যক সশস্ত্র বরকন্দাজ ছিল যাদের সাহায্যে সে নিজেই ডাকাতি করত আবার পাঠকের লাভের অংশও পেত। চৌধুরানী উপাধি থেকে মনে হয় সে হয়ত ছোটখাট এক জমিদার ছিল। কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে হয়ে—সর্বদা নৌকায় বাস করতে হত।... ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের এক রিপোর্টে দেখা যায় জেলার (রংপুর জেলার) উত্তর প্রান্তে, পাহাড়ের পাদদেশে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে এক বিরাট ডাকাতের দল আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে নানা দিকে অভিযান চালাতে থাকে। লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন এই ঘন অরণ্যে কেবল সংকীর্ণ বনপথ দিয়েই প্রবেশ করা যেত যার হদিস শুধু ডাকাতরাই জানত। কালেক্টর দু'শ বরকন্দাজ সংগ্রহ করে জঙ্গলের প্রবেশ পথগুলি প্রথমে বন্ধ করলেন। এখানে-সেখানে হাতাহাতি লড়াই কিছু হল কিন্তু কয়েক মাস গত হলেও জয়-পরাজয়ের কোন নিশ্চিত মীমাংসা হল না। তখন রসদ বন্ধ করে লুটেরাদের অনাহারে মারবার ব্যবস্থা করা হল। কিছু ডাকাত নেপাল ও ভুটানে পালিয়ে গেল কিন্তু তাদের দলপতি ও প্রধান কয়েকজন সর্দারেরা ধরা পড়ল। বারো মাসের মধ্যে জেলার এই অঞ্চলে ও অন্যান্য এলাকায় ৫৪৯ জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করে কালেক্টর তাদের রাজদরবারে হাজির করলেন।"

এই বিবরণে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও তাঁদের সহযোগীদের স্পষ্ট-ভাবেই ডাকাত, দস্যু, লুটেরা প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। নিছক ধন-লাভের আশাতেই যে তাঁরা দলবদ্ধভাবে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতেন সে কথা বলতেও কোন কার্পণ্য করা হয়নি। বঙ্কিম কিন্তু ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীকে রবিন হুডের থেকেও মহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের এক জায়গায় দেবী রানীর দরবারের বর্ণনা আছে। দরবার বসছে, ধনী বা অত্যাচারী-দের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পত্তি অকাতরে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ। আর ভবানী পাঠকের ঋজু চরিত্রটিকে তিনি "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" এই নীতির উপর অবিচল রেখেছেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, আইন শৃঙ্খলা যখন মোটামুটি ফিরে এল তখন ভবানী পাঠক বুঝলেন দস্যুবৃত্তি এবার তাঁকে ছাড়তে হবে, কেননা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য এবার পৃথক এক শক্তি আবির্ভূত হয়েছে। গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র সেজন্য লিখেছেন—"ইংরেজ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল।...সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল। তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, 'আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন' এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।' ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।"

সন্ন্যাসীবাবার মন্দির : শিকারপুর

ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকা হয়তো বা কিছুটা রোমান্টিক; তিনি নিজেও তাঁদের হুবহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে দাবি করেননি। অন্যদিকে সরকারী বর্ণনায় তাঁরা যে সাধারণ লুটেরা বা ঠ্যাঙাড়ে হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন তাতেও অতিরঞ্জনের ছাপ স্পষ্ট। এই পরস্পরবিরোধী বিবরণের বিচার করতে বসলে, ভারত-ইতিহাসের আর এক বিতর্কমূলক চরিত্র, শিবাজির কথা ও রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজি-উৎসব' নামের বিখ্যাত কবিতাটির কথা সহজেই মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন—

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর
একধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের
অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে
অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে
শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর মূর্তি

সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক,
হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম।

গৈরিক পতাকা তব কোথায়, ধূলায়
হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে
পরিহাস
অট্টহাস্য রবে—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল
প্রয়াস,
এই জানে সবে॥
আজি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো
মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ
লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে
চাপা দিবে—
তব ব্যঙ্গ বাণী।
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা
দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি॥

মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্ত কথার মুখর ভাষণ যখন স্তব্ধ করা যায় না তখন সর্বত্রই জনমানসে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বলহীন অসহায়ের প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবার সেইটিই একমাত্র পথ। ব্যঙ্গবাণী ও অট্টহাসিতে যেসব মহনীয় চরিত্রকে হনন করবার চক্রান্ত করা হয়ে থাকে, জনসাধারণ তাদের মহত্ত্বের উচ্চাসনে বসিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে পূজা করে। সাধারণ চোর বা 'পাহাড়ী ইঁদুর' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত শিবাজী আজ মারাঠি-জগতে প্রায় দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত। জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের স্মৃতির

উদ্দেশে আজও সেখানে পাঞ্জাবের গ্রাম-গ্রামান্তরের সাধারণ লোক ফুল দিয়ে যায়, সন্ধ্যায় হয়ত বা একটি প্রদীপ। লোক-হিতৈষী ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিদেশীর ইতিবৃত্ত তাঁদের দস্যু বলে চিহ্নিত করেও সফল হয়নি। লোক-কল্পনায় এখন তাঁরা দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত।

শিলিগুড়ি (বা নিউ জলপাইগুড়ি) থেকে যে পিচের সড়ক গেছে জলপাইগুড়ির দিকে, তাতে ন'দশ মাইল গিয়ে বাঁ-হাতি এক কাঁচা রাস্তায় মাইল দুয়েক দূরে সন্ন্যাসীর হাট নামে এক জায়গায় পৌঁছনো যায়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার শিকারপুর মৌজায় অবস্থিত এ গ্রামে বুধ ও শনিবার যে বিরাট হাট বসে তাতে গরু-বাছুর, ছাগল মুর্গি ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিপণ্যও বিক্রী হয়ে থাকে। কাছেই শিকারপুর টি এস্টেটের বিস্তৃত চা-বাগান। সমস্ত এলাকাটাই আগে অব্যবহিত উত্তরের বৈকুণ্ঠপুর-জঙ্গলের শামিল ছিল। আনুমানিক সত্তর-আশি বছর পূর্বে সে জঙ্গল হাসিল করে চা-বাগিচার পত্তন হয়। সন্ন্যাসীর হাট নামের একটু তাৎপর্য আছে। হাটের সীমানার বাইরে, এক ইউক্যালিপটাস-কুঞ্জের মধ্যে, নেপালী প্যাগোডা গড়নের, টিনের চালাযুক্ত এক কাঠের মন্দির আছে যার বিগ্রহ—বিস্ময়করভাবে—ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর দুটি পূর্ণাবয়ব কাঠের মূর্তি। ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসীবাবা বা সন্ন্যাসী ঠাকুর নামটি এ অঞ্চলে বহুদিন প্রচলিত। সে নাম থেকেই গ্রামের নামের উৎপত্তি। বিদেশীর ইতিবৃত্তে দস্যু বলে বর্ণিত এই পরহিতব্রতী সাধক-সাধিকা এখানে দেবত্বের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

ভবানী পাঠক বা দেবী চৌধুরানী ঠিক এই জায়গাতেই কখনো বাস করেছিলেন এমন নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। ভবানী পাঠক যে ক্রমাগত বাসস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন আর দেবী চৌধুরানী যে সাধারণত বজরায় বাস করতেন একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কিন্তু আজকের সন্ন্যাসীর হাট ও তার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা যে দু'শ বছর আগে বৈকুণ্ঠপুরের বিশাল অরণ্যের অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে জঙ্গলের বিভিন্ন ঘাঁটির মধ্যে একটি এখানে থেকেও থাকতে পারে। সন্ন্যাসীবাবার মন্দিরের (মন্দিরটি এই নামেই সাধারণের কাছে পরিচিত) প্রাঙ্গণে তিন-চারটি বেশ বড় বড় পাথরের টুকরো দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি কখনো কোন ইমারতের অংশ ছিল বলে মনে হয় না। অতএব আগে এখানে কোন মন্দির ছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে, শিকারপুর টি এস্টেট পত্তনের সময় প্রথম ম্যানেজার 'হ্যাচিং সাহেব' গরুর গাড়ি করেই যাতায়াত করতেন। একবার নাকি বিরাট দুই বাঘ পিছন ও সামনে থেকে তাঁর গাড়ি ঘেরাও করে এই মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। বাঘছাল-পরা ভবানী পাঠকের মূর্তিটি মহাদেব-মূর্তির আদলে কল্পিত ও উচ্চতায় প্রায় সাড়ে-পাঁচ ফুট। দেবী চৌধুরানীরটি প্রায় সাড়ে-তিন ফুট উঁচু। দু'টিই বেশ উগ্র রঙে রঞ্জিত। এ ছাড়া প্রমাণ আকৃতির দু'জন সশস্ত্র পাইক, সন্ন্যাসীবেশী একজন অনুচর, ভবানী পাঠকের উপবিষ্ট গুরুদেব, দেবী রানীর দুই সখী ও একটি বাঘের মূর্তিও আছে। সব ক'টিই কাঠের তৈরী ও রঙ-করা। কারিগরি খুবই নিরেস।

উত্তরবঙ্গের এ অঞ্চলে যে হাওড়া-হুগলী জেলার মতো ভাল কাঠের কারিগর দুর্লভ এ মূর্তিগুলিই তার প্রমাণ।

কিন্তু শুধুমাত্র কারিগরির বিচারে এ বিগ্রহগুলির মূল্য নিরূপণ করা যায় না। এদের মর্যাদা নির্ণয় করা উচিত জন-মানসের প্রকাশের মাপকাঠিতে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে, গরীবের বন্ধু এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী প্রবলতর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিহত হন। তাঁদের গুণগ্রাহী দেশবাসী সে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবিধান করতে পারেনি বলেই আজ তাঁদের দেবতার আসনে বসিয়ে পূজো করছে। এ রকম আশ্চর্য মন্দির, এরকম অভিনব বিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।
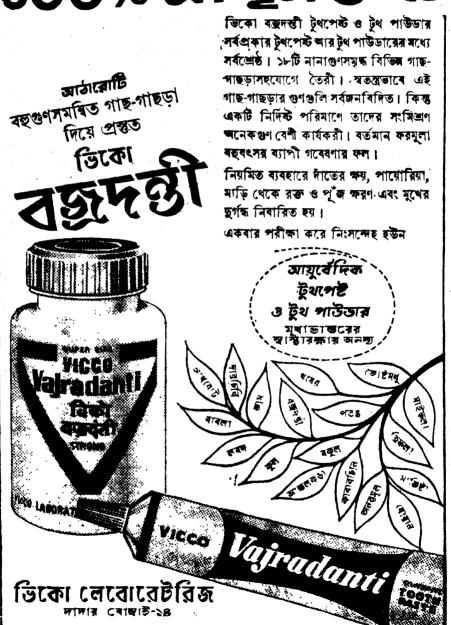
(ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

॥ ৪২ ॥

এটা কি অক্ষয়ের বাড়ির কাছের সেই খাল? খালের জলের তো এই রং না।

রামানন্দ আবার চোখ বুজল। চোখে-মুখে রোদ লাগছে। চোখ বুজে থেকে অক্ষয়দের খালের চেহারাটা সে মনে আনতে চেষ্টা করল। টকটক করছে জল, সাদা সাদা হাঁস সাঁতার কাটছে, এখানে-ওখানে কচুরি-পানা কলমীর দাম, জলের বুকে আকাশের ঝকঝকে নীল ছায়া।

সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দর চোখ দুটো আবার খুলে গেল। এই জল ঘোলাটে, সবুজ, বিবর্ণ। হাঁসের ঝাঁক নেই, কচুরি-পানা কলমীদাম নেই। রবারের টুপি পরে কান-মাথা ঢেকে হাত-পা ছুঁড়ে কটা ফ্যাকাশে চেহারার মেয়ে সাঁতার কাটছে। তার বিস্ময়ের ভাবটা কাটছিল না। মিটি-মিটি চোখ, যেহেতু কপালে রোদ লাগছে ভাল করে তাকাতে পারছে না, জলের দিকে চেয়ে দু কান খাড়া করে রাখল। উঁহু, পাখির কিচির-মিচির শুনছে না, অক্ষয়ের ঘরের পিছনে মাদার ঝোপে শালিক-বুলবুলির খেলা। কেবল গাড়ির-ঘোড়ার শব্দ, ট্রামের ঘণ্টা, বাসের ঝরঝর, রিকশার ঠুনঠুন। শোয়া ছেড়ে রীতিমত লাফিয়ে উঠে বসল সে। কী কাণ্ড! এটা গোল-দীঘি, কলেজ স্কোয়ার। লাঠি হাতে বুড়োর দল সকালে বেড়ান সেরে রোদ মাথায় ঘরে ফিরছে, খবরকাগজ নিয়ে হকারদের ছুটো-ছুটি।

রাত্রের সব কিছু মনে পড়ল তার।

তবে কি রিকশাওয়ালাটা শেষ পর্যন্ত দয়া করে তাকে গোলদীঘির পার্কের এই বেঞ্চের ওপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিল?

বড় অদ্ভুত তো! ফুটপাথে কোথাও যে ফেলে রেখে যায়নি! পকেটে হাত ঢুকিয়ে রামানন্দ দেখল কাগজের নোট ক'টা গেছে, খুচরো কিছু পয়সা হাতে উঠে এল। সন্ধ্যেবেলা বেলেঘাটা পর্যন্ত ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বারো-তেরো টাকার মতন ছিল না? তারপর তার এক পয়সা খরচ হয়নি। সেই কলম বেচার টাকা।

না না, রিকশাওয়ালাটা এমন কাজ করবে না, হয়তো তার যা ভাড়া পাওনা হয়েছিল, কম রাস্তা তো নয়, কোথায় টালিগঞ্জ, কোথায় কলেজ স্ট্রীট—দু'-চারটে টাকা সে নিতে পারে, তা বলে সব টাকা—

উঁহু, রামানন্দ এত বেইমান নয়। মাতালকে রাত্রে রিকশাওয়ালা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই সাহস পায় নি। তাই এখানে, তা-ও যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে যাওয়া নয়, যত্ন করে বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, বোঝা যায় লোকটার প্রাণ আছে—কাজেই এমন মানুষ সম্পর্কে পকেট থেকে সব টাকা তুলে নেওয়ার ধারণাটা রামানন্দ একেবারেই আমল দিল না। সুযোগ পেয়ে মাতালের পকেট ফাঁক করে দেবার মতন ঢের মাস্তান এই শহরে, কি দিন কি রাত, হরদম ঘোরাফেরা করছে। যাক গে, টাকার কথা ভাবতে বসে নি সে এখন।

অনুশোচনায় তার বুক ভরে উঠল। রাগে দুঃখ, হুঁ, সবটাই নিজের ওপর, কাউকে দায়ী করছে না সে, হাত-পা কামড়াতে ইচ্ছা করল। কোথায় কাল সন্ধ্যায় তার হাসপাতালে ফিরে আসার কথা—আর এখন? মহাবোধি সোসাইটি হল-এর মাথার ওপর সূর্য উঠে গেছে—

লোকে শুনলে তার মুখে থুথু ছিটোবে না? এই জন্যই খুব কম মানুষই কবিটবি জাতের লোকগুলিকে পছন্দ করে—পাগল-ছাগলের সঙ্গে যে তুলনা দেয় তাও বাজে কথা নয়।

নিজের ওপর ঘেন্নায় রামানন্দর মুখের ভিতরটা বিস্বাদ ঠেকল। পার্ক থেকে বেরিয়ে সে রীতিমত ছুটতে লাগল। বলে কিনা এখান থেকে দু' মিনিটের রাস্তাও না মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল—আর এই পর্যন্ত এসেও সে সারাটা রাত কিনা ঘুমিয়ে কাটাল।

নেশা ভাঙ যে কত দিক দিয়ে মানুষের সর্বনাশ করে, মানুষকে কত নিচে টেনে নিয়ে যায়, মানুষকে কেমন পশু করে ছেড়ে দেয়—আজ রামানন্দ টের পেল।

ছি ছি ছি! অক্ষয়ের আর আছে কে! সে ছাড়া কে আর ওই বেচারাকে দেখছিল। প্রথম থেকে রামানন্দই তো হাসপাতালে ছুটে ছুটে আসছে। খুবই নিরীহ গোবেচারা ধরনের একটি মানুষ। মনটা ভাল, কোনরকম ভাঁজ নেই। স্কুল-কলেজের দরজা কোনোদিন দেখে নি। আজে

ছিল মায়ের চৌকি, এখন হাঁস-মুর্গির কারবার—সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাওয়া জীবন। কিন্তু ওই যে—মন, অক্ষয়ের নির্মল আত্মার মাধুর্য, যা রামানন্দকে প্রথম থেকে মুগ্ধ করেছিল, যে জন্য নিজে সে এত লেখাপড়া জানা মানুষ হয়েও অক্ষয় সমাদ্দারের সঙ্গে এত মিশতে পেরেছিল। সেই অক্ষয়কে কিনা এমন একটা সংকটজনক অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে—

খুবই দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিল বটে শিক্ষিত সভ্যসমাজের মানুষ রামানন্দ সেন!

যদি অক্ষয় শোনে, নিশ্চয় এখন তার সেন্স ফিরে এসেছে, হয়তো রাত্রেই ফিরেছে —হুঁ, যদি নার্সদের মুখে সে জানতে পারে যে, তার অকৃত্রিম সুহৃদটি অর্থাৎ মাস্টার সন্ধ্যা থেকেই পলাতক তো তার মনের অবস্থাটা কেমন হবে! রামানন্দই বা কি করে তাকে মুখ দেখাবে।

এতক্ষণ সে ছুটছিল, কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কের গা ঘেঁষে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার সময় তার পা দুটো আটকে যাচ্ছিল, ভয়ে নয়, ভয় কিছুটা থাকলেও, লজ্জা অনুশোচনা আত্মগ্লানির ভাবটাই তাকে বেশি বাধা দিচ্ছিল। অন্য দিনের মতন বুকে

টান করে মুখে হাসি নিয়ে অক্ষয়ের সামনে ছুটে যেতে পারছিল না।

দোতলার করিডোর পার হবার সময় জেনারেল ওয়ার্ডের রুগীদের চোখে পড়ল। বোঝা গেল, তাদের মুখ-হাত ধোয়া, গরম-জল দিয়ে গা স্পঞ্জ করার ভারি ভারি কাজগুলি অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়েছে। যেন ওষুধও খাওয়া হয়ে গেছে। নার্সরা ঘরে ঘরে এক-একটা বেড-এর কাছে গিয়ে টেম্পারেচার নিচ্ছে ইনজেকশন দিচ্ছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছে। যেমন রোজ করে—বেলা তো কম হয় নি। এই বেড-এ, সেই বেড-এ গালগল্পও চলছিল।

করিডোরের শেষ মাথায় পৌঁছে রামানন্দ থমকে দাঁড়ায়। কোথায়, অক্ষয়ের ভেজা লুঙি গামছা তো দেখা যাচ্ছে না। এই সময় অক্ষয়েরও গা মোছা মাথাটাথা ধোয়া শেষ হয়ে যায়। জমাদারটা তার লুঙি গামছা ধুয়ে পরিষ্কার করে কেবিনের সামনে বারান্দার রেলিঙের গায়ে রোদ্রে ছড়িয়ে দেয়।

রামানন্দ দেখল, খালি রেলিঙের মাথায় একটা ধাড়ি কাক চুপ করে বসে আছে, খরখরে গলায় ডাকছে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। হৃৎপিণ্ড মোচড় দিয়ে উঠল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে তার গলাটলা শুকিয়ে কাঠ হবার উপক্রম। অবশ্য তখনি সে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। অক্ষয়ের যে অপারেশন হয়েছে সে ভুলে যাচ্ছে কেন। এখনও হয়তো রক্ত, স্যালাইন-ট্যালাইন চলেছে। এই অবস্থায় কিসের মাথা ধোয়ান গা স্পঞ্জ করান! নির্জীব ক্লান্ত হয়ে পেসেণ্ট এখনও বিছানায় শোয়া। বারান্দার এক কোণায় জমাদারটা বসে বিড়ি টানছে। রামানন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। অল্প বয়সের ছোকরা, রামানন্দর সামনে বিড়িটিড়ি বড় একটা খায় না, এই জন্যই বোধ করি সুখনলাল চট্‌ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল, রামানন্দ চিন্তা করল।

ভিতরে ঢুকল সে। কেউ নেই। কেবিন ফাঁকা। অবাক হল সে। অক্ষয়ের খাট? যদি পেসেণ্টকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার বিছানাটা তো থাকবে!

কিন্তু দু এক সেকেণ্ড পরেই রামানন্দর ভুল ভাঙল। বাইরের আলো থেকে সে এসেছে, অক্ষয়ের কেবিনের ভিতরটা দিনের বেলায়ও একটু অন্ধকার অন্ধকার—যে জন্য অধিকাংশ সময় আলো জেলে রাখতে হয়—আলোটা এখন নেবান, কাজেই অন্ধকারটা চোখে সয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল খাটের জায়গায় খাট ঠিকই রয়েছে—শুধু পার্টিশন দিয়ে সেটা ঘিরে রাখা হয়েছে।

রামানন্দ [illegible]

রইল, স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে থেকে লাল পর্দা ঘেরা বিছানাটা যেমন দেখছিল দেখতে লাগল।

পুরো এক মিনিট এভাবে কাটল। দোরের কাছে পায়ের শব্দ হতে সে চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল। ওয়ার্ড-বয় ঢুকেছে।

'দেখুন স্যার, আপনাকে এখনি লাস বের করে নিতে হবে। মিস্টার অমানক তাড়া দিচ্ছে।' ওয়ার্ড-বয় আলোটা জেলে দিল।

লাস! অক্ষয়ের মৃতদেহ! রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'ললিত!' গম্ভীর গলায় সে ডাকল। ওয়ার্ড-বয়ের নাম ললিত। কিন্তু ললিত তার দিকে তাকাল না, ভিতরে ঢুকেই কোণার দিকের কেবিনটা গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হুঁ, যে কেবিনে সোহিনী বসে, তরলা বসে, ফুলরেণু বসত।

'ললিত!' রামানন্দ আবার ডাকল।

'কি বলছেন আপনি?' এবার ললিত এমন চোখ মুখ করে তাকাল যেন রামানন্দকে সে চেনে না, অথবা রামানন্দ এভাবে চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে খুব বিরক্তিবোধ করছে। অথচ যখনই রামানন্দ এখানে এসেছে ললিতের হাসিমুখ ছাড়া একদিনও সে দেখত না। মাস্টারবাবুকে ভিতরের প্যান্ট্রি থেকে চা তৈরী করে এনে খাওয়াতে ললিত ব্যস্ত হয়ে পড়ত। রামানন্দ অক্ষয়ের সঙ্গে গল্প করত, ললিতও কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকে অক্ষয়ের বেড-এর কাছে ছুটে এসে গল্প করেছে। বিশেষ করে অক্ষয়বাবুর বন্ধু এম-এ পাস শুনে তার ওপর এই ওয়ার্ড-বয়টির ভক্তি শ্রদ্ধার যেন আর শেষ ছিল না। কেননা, সে নিজে স্কুল ফাইনাল ফেল। টাকা-পয়সার অভাবে আর পড়া হয়নি। ঘরে বিধবা বুড়ি মা আছে, বিয়ের উপযুক্ত একটা বোন আছে, তার ওপর বছর দুই আগে সে বিয়ে করেছে—মাথার ওপর খুব বেশি চাপ—তা হলেও ললিতের ইচ্ছে আর একেবারে প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে, পাশ করতে পারলে হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দেবে—কত গল্প। রামানন্দ বিশ্বাস করতে পারছিল না এই সেই ললিত।

আর একটা শব্দ হতে রামানন্দ দরজার দিকে চোখ ফেরাল। সোহিনী ভিতরে ঢুকল। পোশাকে চেহারায় আজ যেন আরও বেশি সুন্দর জমকালো লাগছে মেয়েটিকে।

কিন্তু রামানন্দর দিকে তাকাল না। জুতোর খটখটে শব্দ করে দরজা ফকিরটার কাছে সরে গেল।

'কি হল ললিত, ডেডবডি কখন সরান হচ্ছে?'

'আমি ভদ্রলোককে তাই বলছিলাম দিদিমণি। সিস্টার রাগারাগি করছে। এদিকে—'

ললিতের কথা শেষ হবার আগেই সোহিনী রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। ভুরু কোঁচকাল।

'দেখুন, আপনাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে লাস বের করে নিতে হবে। বেডটা ভর্তি হয়ে গেছে। এখনি নতুন পেসেন্ট আসবে।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।' রামানন্দ ঘাড় কাত করল। 'কিন্তু আমাকে তো সময় দিতে হবে সিস্টার। লোকজন জোগাড় হবে, তবে তো মড়া এখান থেকে নিয়ে যেতে পারব। একা আমার পক্ষে কি—মানে বলছিলাম, মানুষটাকে তো শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহটাহ করতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা তো করবেনই, সবাই করে, মড়া নিয়ে কি আর বাড়িতে ভিতরে রাখে কেউ।' কালকের মতন যুবতীর চোখ মুখের চেহারা কদর্য হয়ে উঠল। 'ও ঘণ্টা হতে চলল ডেডবডি পড়ে আছে—আর তো আমরা কেবিনে রাখতে পারি না, একটু পরেই মর্গে চলে যাবে। ডেথ-সার্টিফিকেট এখানে রয়েছে। এক্ষনি আপনি বডি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন।'

স্থির স্তব্ধ হয়ে রামানন্দ দাঁড়িয়ে থেকে শুনল। সোহিনী তৎক্ষণাৎ ললিতের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ললিতের চেহারা হাসিখুশি হয়ে উঠেছে। যেন সেই আগের ললিত। সোহিনীরও আর কুঁচকোন ভুরু, কুঁচকোনো কপাল নেই। দেখতে দেখতে চমৎকার হাসির গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। কত সহজে না মানুষের চেহারা বদলায়, রামানন্দ চিন্তা করল।

'দিদিমণির কাঁধের সেফ্টিপিনটা আজ সোজা করে লাগান হয়নি।' ললিত বলছিল।

'তাই নাকি।' সোহিনী চোখ বেঁকিয়ে নিজের কাঁধ দেখছিল। 'যা তাড়াহুড়ো করে ডিউটিতে ছুটে আসতে হয়।'

'নাইট ওয়ার্ড' বলছিল কাল তরলা-দিদিমণির খুব কষ্ট হয়েছে।'

'কষ্ট তো হবেই। ঐ তো ছিটেফোঁটা চেহারা মেয়ের। তার ওপর এমন পেশেন্ট!' আড়চোখে লাল পর্দা-ঘেরা খাটটা একবার দেখল সোহিনী, তারপর আবার ললিতের দিকে চোখ দুটো ঘুরিয়ে ধরল। 'আমি তো ভেবেছিলাম কাল বিকেল চারটে নাগাদই শেষ হয়ে যাবে।'

'এক একটা পেসেন্ট এমন ভোগায় দিদিমণি।' হেসে ললিতও আড়চোখে পর্দা-ঘেরা খাটটা দেখল। খুলে দাইটে

ওয়ার্ডবয়ের মুখে শুনলাম, সন্ধ্যার রাত নেওয়া ডিসচার্জ গেছে।'

'হুঃ, ডিসচার্জ দেশে।' মোহিনী কাঁধের স্টেথোস্কোপ সোজা করে আটকায়। 'ওদিকের জানালাটা খুলে দে তো ললিত।'

জানালা খুলতে খুলতে ললিত বলল, 'তবুও দিব্যি বেঁচে গেছে, আর যদি আবার সারারাত জেগে খাড়া ধরে এক পায়ের দাঁড়িয়ে থেকে এভাবে স্যালাইন ধরিয়ে দিতে হত—'

'আশ্চর্য, আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন!' আচমকা এদিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল মোহিনী, রামানন্দ কেঁপে উঠল, এমন বিশ্রী চোখ মুখের চেহারা করল লাবণ্যে ঢলঢল সুন্দর চেহারার মেয়ে যে রামানন্দ ভয় পেল। 'এখানে দাঁড়িয়ে কী শুনছেন, কী দেখছেন?'

'না না, আমি যাচ্ছি, আমাকে লোক-জন জোগাড় করতে হবে।' বিড়বিড় করে রামানন্দ কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

'উজবুক।' ললিতের উঁচু গলার হাসি রামানন্দর কানে এল। 'এমন এক একটা মাল মাঝে মাঝে হাসপাতালে এসে জোটে—'

হাসপাতাল একটা চিড়িয়াখানা—জানিস

দেখব, কত রকমের জীবজন্তু আমাদের চোখে দেখতে হবে।' মোহিনী মোহিনীর মধ্যেকার কথার হদিসও রামানন্দর কানে এল।

না, এই জন্য সে মন খারাপ করল না। এসব আঘাত আর কি, অতি তুচ্ছ। বরং কিনা কাল সন্ধ্যা থেকে কতবড় এক একটা শেলের মত তার বুকে এসে বিঁধছে—তবু এখনো চমৎকার মাথা ঠিক রাখতে পারছে, সে, আর এখন কিনা মার্গ ওয়ার্ডবয়ের একটা দুটো অপমানের কথা শুনে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে!

নিচে রাস্তায় এসে রামানন্দর প্রথম চিন্তা হল টাকা। অক্ষয়কে নিমতলা নিয়ে যাক কি কেওড়াতলা—শ্মশান ঘাটের একটা বেশ ভাল খরচ আছে, রামানন্দর পকেটে আনা দশ বারোর বেশি নেই। হুঁ, তার পরের চিন্তা হল লোকজন। অক্ষয়কে কাঁধে করে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্তত চার পাঁচজন না হলে চলবে না, রামানন্দ একজন আছে—কিন্তু আর চারজন? অন্তত আরও তিনটি মানুষের তো দরকার বটেই।

রামানন্দর কপাল ঘামতে লাগল। গ্রীষ্মের রোদ মিনিটে মিনিটে চড়ছে। এখন বেলা ন'টা বাজে। ওদিকে দেরি করলেও চলবে না। অক্ষয়কে ঠাণ্ডা ঘরে মড়ার গাদার মধ্যে ঠেলে দেবে—রামানন্দ এই জিনিস চায় না।

কাজেই এখন সকলের আগে যেটার দরকার—টাকা। একে ওকে বলে কয়ে শ্মশানবন্ধু হয়তো জোগাড় করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মড়া পোড়াবার জন্য পকেট থেকে কেউ টাকা বের করে দেবে না।

বরং তারা কষ্ট করে মড়া কাঁধে বয়ে নিয়ে যাবে, উল্টে তাদের চা জলখাবার বাবদ কমবেশি যা হোক খরচ করতে হবে। তা না হলে মুখ থাকে না।

না না না, কথাটা মনে এলে হবে কি, টাকার জন্য রামানন্দ অক্ষয়গিন্নীর কাছে যাবে না, কিছুতেই না, যদি অক্ষয়ের লাস সাতদিনও মর্গে পড়ে থেকে পচে, তবু না। টাকা অবশ্য অক্ষয়েরই, কিন্তু ঐ মেয়ের হাত ছুঁয়ে তো টাকাটা আসছে। অনেক কিছুর বিশ্বাস রামানন্দর ভেঙেছে। কিন্তু তার এই বিশ্বাস এখনও অটুট অম্লান আছে। মাধুরীর হাতের স্পর্শ যে-টাকায় লাগবে তা দিয়ে দাহ করলে অক্ষয়ের আত্মার সদ্‌গতি হবে না—হতে পারে না।

তবে? কে এমন বন্ধু আছে যে এখন চাওয়া মাত্র কুড়ি পঁচিশ টাকা বের করে দেবে।

নন্দদুলালকে মনে পড়ল রামানন্দর। বড়লোকের ছেলে। কুড়ি পঁচিশ টাকা তার কাছে কিছু না। কিন্তু নন্দর বাড়ির ঠিকানা রামানন্দ জানে কি? জানে না। তাই তো লোকে বলে এবং নিজেও সে এখন চিন্তা করে, কত দিক দিয়ে যে রামানন্দ সেনের বাস্তববুদ্ধির অভাব। কেবল পাড়ায় না, ক'দিনই নন্দদুলালের সঙ্গে বসে সে রামটিও খেল, অথচ একটা দিন তার বাড়ির ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করে জেনে রাখল না। কত কিছু ব্যাপারে লোকটাকে তার দরকার হতে পারে। কেননা, সবচেয়ে যেটা বড় কথা, পয়সাওয়ালা মানুষের ছেলে।

না, নন্দর ঠিকানা তার জানা নেই। তবে আর কার কাছে যাওয়া যেতে পারে?

নন্দর পরেই আর একটা মুখ রামানন্দর চোখের সামনে ভেসে উঠল। জগত মণ্ডল। হুঁ, জগতের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম তার জানা আছে। এই একটা মানুষ যার মধ্যে কোনোরকম ভেজাল নেই। খাঁটি সোনা। চোখ বুজে যে-কোনো সাহায্যের জন্য এই মানুষের কাছে ছুটে যাওয়া চলে।

তবে এর মধ্যে কথা আছে। জগত মণ্ডলের চেহারা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ আশ্বস্ত হল ঠিকই। কিন্তু তার সম্পর্কে হতাশ হবারও কারণ ছিল। মানুষটির তেমন রুজিরোজগার নেই। চাইলেই যে এতগুলো টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তাছাড়া, মণ্ডলকে গিয়ে যে বাড়িতে পাওয়া যাবে তারও খুব একটা নিশ্চয়তা নেই। ঐ যে পরশু রাত্রে রু-কফে বসে নন্দু ও রেখা বলল, আফ্রিকায় চাকরি নিয়ে চলে যাবার জন্য মণ্ডল উঠে পড়ে লেগেছে। রাতদিন সরকারের এই মহলে সেই মহলে ধরনা দিয়ে ফিরছে। তাহলে, এখন কি করা যায়, কার কাছে সে যেতে পারে। বন্ধুত্ব দূরে থাক, এদিকে কারো সঙ্গে সে পরিচয় পর্যন্ত রাখেনি। সব দিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে লবণ-হ্রদে গিয়ে কোন্ এক অক্ষয় সমাদ্দারের ডেরায় আস্তানা গেড়েছিল।

রামানন্দ ভাবতে লাগল। তার কপাল ঘামছিল, সেই সঙ্গে মাথাও কম গরম হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত জগতের কাছে যাওয়াই সে ঠিক করল। একবার তো চেষ্টা করতে হবে। হয়তো, কপাল ভাল থাকলে বাড়িতে গিয়ে আর্টিস্টকে পেয়েও যেতে পারে।

এটা সত্য কথা, রামানন্দ এই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত, যদি মণ্ডলের নিজের কাছে টাকা না-ও থাকে, এই বিপদের কথা শুনলে অন্তত কারো কাছ থেকে চেয়ে হলেও মোটামুটি শ্মশানঘাটের খরচটা যাতে রামানন্দর হাতে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করবে। মণ্ডলের এই চেষ্টার মধ্যে কোনোরকম কৃত্রিমতা থাকবে না।

তাছাড়া, দু' চার পাঁচটি শ্মশানযাত্রী জোগাড় করাও মণ্ডলের পক্ষে মোটেই কষ্ট হবে না। অনেকদিন নাকি ও-পাড়ায় আছে। ডাকলে চার পাঁচটি ছেলে যে এগিয়ে না আসবে সে একটা কথাই নয়।

আর একটা বিষয়েও রামানন্দ নিশ্চিন্ত ছিল। নন্দদুলালের ঠিকানা জগত মণ্ডল জানবেই। ওরা এক বন্ধু যে দুজনের। কাজেই টাকাটা যদি মণ্ডল জোগাড় করতে না-ও পারে, রামানন্দকে নিয়ে নির্ঘাৎ নন্দর কাছে ছুটবে। রামানন্দকে কিছুতেই এমন একটা বিপদের মধ্যে ফেলে রাখবে না।

একটা বাস এসে দাঁড়াতে রামানন্দ লাফিয়ে উঠে পড়ল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিতে সঙ্গীত

সঙ্গীত আজকাল কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে এটা বোধ করি অনেকের কাছেই আশা এবং আনন্দের বিষয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত তো বলতে গেলে প্রাধান্যই স্থাপন করেছে, যদিও সেটা "অর্নামেন্টাল" মাত্র, কেননা আসলে কোন কাজ সেখানেও হয়নি। কিন্তু যাঁরা এই সঙ্গীত বিভাগগুলির পরিচালনা করেন অথবা যাঁরা শিক্ষালাভ করেন তাঁরা কি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করেন যে তাঁদের বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অপরাপর শাখার মতই একটি পূর্ণাঙ্গ সম্মানিত শাখা? আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও কি এই ধারণা পোষণ করেন যে সঙ্গীত বিভাগ তাঁদের পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপানো কাগজে প্রশ্নপত্র ছাপা হচ্ছে, পরীক্ষাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে হচ্ছে, সার্টিফিকেট ডিগ্রী সবই হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট ফর্মে পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু তথাপি যাঁরা এর ভিতরে আছেন তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে সঙ্গীত এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও অপাংক্তেয়—একটা তুচ্ছ বাড়তি সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিভাগের তথাকথিত প্রিন্সিপাল, অধ্যাপকসমূহ খুব ভাল করেই জানেন যে তাঁদের মান মর্যাদা অপরাপর বিভাগীয় প্রধানদের বা অধ্যাপকদের মত নয়। একটা বিভাগ খোলা হয়েছে, রাখতে হবে এই কারণেই তাঁদের অস্তিত্ব নতুবা তাঁদের কোনও গুরুত্ব নেই। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। লোক দেখানো একটা সঙ্গীতশিক্ষা ছাড়া সেখানে আর কোনও যাথার্থ্য অ্যাকাডেমিক কাজে সাফল্য অর্জিত হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি ইউনিভার্সিটির সঙ্গীত বিভাগের প্রিন্সিপালকে নাকি একজিকিউটিভ কমিটি তাঁর স্ট্যাটাস ডিফাইন করতে বলেছেন, অথচ সেই স্ট্যাটাস যে কি তা গভর্মেণ্ট অর্ডারে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করা আছে। সেই গভর্মেণ্ট অর্ডার তাঁরা দেখেননি। ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলছিলেন—"আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে অবস্থান করছি তা জানি না, কিভাবে যে আমি চলব তাও বুঝতে পারছি না।" বোঝা গেল তিনি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। অতএব সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের আশা ভরসাটা খুব একটা আলোকোজ্জ্বল নয়, কারণ দূরে স্থানীর পক্ষে সুদিনের সম্ভাবনা পোষণ করা বৃথা।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি জন্য সঙ্গীত বিভাগগুলিকে জীইয়ে রেখেছেন? কি উদ্দেশ্যেই বা তাঁরা এই বিভাগটি খুলেছিলেন? যদি তাঁরা এই বিভাগকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তবে কেনই বা তাঁরা এর উন্নতিকল্পে কোনও চেষ্টা করবেন না? একটা কোর্সকে মধ্যবর্তী অবস্থায় রাখার যে কি অসুবিধা তা কি তাঁরা উপলব্ধি করেন না? সঙ্গীতে গ্র্যাজুয়েট হলে অন্য কোনও বিভাগে পথ খোলা নেই। একমাত্র রবীন্দ্র ইউনিভার্সিটিতে উক্ত বিষয়ে এম্-এ পড়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা যদি সুযোগ না দেন অথবা ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ করে নিতে না পারে তাহলে এইসব গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষার আর কোনও উপায় নেই। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে বি-মিউজ আছে, বিশ্বভারতীতেও আছে, কিন্তু এম-মিউজ এ দুটির কোথাও নেই বলেই জানি। বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে বোধ করি সার্টিফিকেট ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় না। এই যে একটা অবস্থা, এর প্রতিকার সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটিগুলি কিছুই চিন্তা করতে নারাজ অথচ একটি বিভাগকে সম্পূর্ণ করে তোলবার দায়িত্ব কি সম্পূর্ণভাবে তাঁদেরই নয়?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সঙ্গীত সম্বন্ধে কি ভাবেন সেটা আমাদের গোচরে যে আসে [illegible] তা নয়, বহু সংবাদ এমন ব্যক্তিরা আমাদের জানিয়ে আসছেন যাঁরা শ্রদ্ধেয় এবং অভিজ্ঞ। তাঁদের কথাগুলি উড়িয়ে দেবার মত নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের ধারণা সঙ্গীত বিভাগে যাঁরা আছেন শিক্ষার দিক দিয়ে তাঁদের যোগ্যতা অকিঞ্চিৎকর। সঙ্গীতজগতে এম-এ পাশ কজন আছেন? সুতরাং এই সব ব্যক্তি [illegible] করেন তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা যুক্ত এবং তাঁদের অধ্যাপকের মর্যাদা দেওয়াটাও বোধ করি বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁরা গানবাজনা জানেন, ওইটুকুই করে যান, আর বেশী চাইতে আসেন তাঁরা কোন সাহসে? অপর পক্ষে যাঁরা ডিগ্রী, ডিপ্লোমা নিয়ে [illegible] পণ্ডিত ব্যক্তির চুল পেকে যার যাঁদের হচ্ছে তাদের কাছে এঁরা! এঁদের সঙ্গে এক [illegible] তাঁদের দেখা কোনমতেই চলতে পারে না। সুতরাং এঁদের মর্যাদা প্রদান করতে গেলে অপর বিভাগগুলির বুকে জ্বলা ধরে, নানারকম আপত্তি ওঠে, ফলে সঙ্গীত বিভাগের উন্নতি আর ঘটে ওঠে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সঙ্গীত জগতের এমন সব ব্যক্তিকে সরকারী বড় বড় খেতাব দেওয়া হয়েছে, ফেলো নির্বাচন করা হয়েছে যাঁদের একমাত্র শিল্পীসুলভ কারিগরী দক্ষতা

ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন কিন্তু এসব প্রশ্ন ওঠেনি।

হিংস্রা যেখানে ষোল আনা আছে সেখানে উদারতা যদি চার আনাও থাকত তাহলে চিন্তাটা এপথে যেত না। যা জানি তা তাকে ছোট করেই দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তার পোটেনশিয়ালিটি কত সেটা বুঝব কি করে? আমরা যখন কলেজে বাংলা পড়ি তখন অধ্যাপক একদিন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটা নোট নিতে বলেছিলেন। ইংরেজি অনার্সের একটি ছাত্র তখন স্বগতোক্তি করেছিল—"এই রে—আবার বাংলায় নোট? এর পরে তো বাংলাতেও অনার্স হবে দেখছি!" বাংলায় অনার্স তখন ধারণার বাইরে ছিল, যদিচ আশু মুখুজ্যে মশাই এম-এতে বাংলার পথ খুলে দিয়েছিলেন অনেক আগেই। সেই বাংলাতেও অনার্স হয়েছে। যে বাংলার ক্লাশে এম-এতে আমাদের সময় ছাত্র হত না, এখন সেখানে প্রবেশ লাভ করাই মুশকিল শুনে থাকি। বিষয় হিসাবে বাংলার চেয়ে সঙ্গীত নিশ্চিতভাবেই কম ব্যাপক নয়, কারণ বহু বিষয়ের জ্ঞান এই সঙ্গীতে মিলিত হয়েছে। একদিন আশা করি এ সম্বন্ধে কিন্ত-

বিদ্যালয়সমূহের ধারণা স্পষ্ট হবে যখন এটি পরিপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।

সংগীত জগতে হয়ত খুব একটা উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রীওলা ব্যক্তি নেই, কিন্তু তাঁরা কি দাবী করছেন, যে তাঁরা রিটায়ার করবেন না? তাঁরা যে চেষ্টা করছেন তা তো পরের জেনারেশনের জন্যই। উচ্চশিক্ষার একটা সোপানই তো তাঁরা প্রস্তুত করে দিতে চাইছেন যা পরবর্তীকালের আচার্যেরা আরও উঁচু করে গড়ে তুলবেন। আপাতত যাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাঁদের দিয়েই তো সংগঠনের কাজ আরম্ভ করতে হবে। তাঁদের সাহায্য করতে যদি আর কেউ অগ্রসর না হন তাহলে তাঁরাই বা অগ্রসর হবেন কিভাবে? সঙ্গীত জগতে আশানুরূপ ভাল ছেলেমেয়ে আসে না, সেটা হয়ত নৈরাশ্যজনক হতে পারে, কিন্তু এটাও তো ভেবে দেখতে হবে, সংগীতে পাশ করে তারা কোথায় ভাল চাকরি পাবে? সংগীতকে প্রোফেশন করে এখনও তেমনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় না। সংগীতবিষয়ে একটা টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ ছিল। সেখান থেকে পাশ করে বেরুলে কিছু চাকরি পাওয়া যেত, কয়েক বৎসর হল সেটিকেও তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা প্রতিকার করতে না পারলেই কোনও একটি সংস্থাকে উঠিয়ে দিই, কিন্তু প্রবর্তন করবার মত ধৈর্য, আস্থা, মনোবল ও সামর্থ্য আমাদের নেই। অতএব ভাল ছেলেমেয়ে সংগীতে ডিগ্রী নিতে আসবে কেন বলুন? যদি সেরকম স্কোপ থাকত তা হলে মোটামুটি ভাল ছাত্রছাত্রী সংগীতেও আসত ঠিক। সেই স্কোপের ব্যবস্থাটা করবে কে? শিক্ষাই তো ইউনিভার্সিটির হাতে মার খেয়ে যাচ্ছে। এই সেদিনের "লাইব্রেরিয়ানশিপ" আজ উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু, চেষ্টা করে তাকে গঠন করতে হয়েছে। এগ্রিকালচারের জন্য আজ একটি আলাদা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকলেই এ সব সাবজেক্টের প্রয়োজনীয়তা বোঝেন। কিন্তু মিউজিক আজও অপাংক্তেয়, তার স্বীকৃতি আজও হল না, কেননা তার "এণ্টারটেনমেণ্ট ভ্যালু" ছাড়া আর কোনও ভ্যালু আছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মনে হয় না।

আসলে সংগীত সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপরতলার মহলে একটা সম্যক ধারণা নেই। সংগীতের তত্ত্ব সম্বন্ধে সিলেবাস নির্ণয় করতে এঁরা অসমর্থ। সংগীতের পরিধি যে কত ব্যাপক তার একটা উদাহরণ দিই। সামগান সম্বন্ধে আজকে একটা বিরাট গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু সেটি করতে গেলে সংগীতশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতিগান বা ঐ যুগের গানগুলির স্বরূপ না বোঝা যায়। আমি বিশ্বাস করি না, কোনও পণ্ডিত পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ বা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ বৈদিক সংগীতকে উপলব্ধি না করে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। হয়ত তাঁরা গোটা বইটা অনুবাদ করতে পারবেন কিন্তু মন্ত্রগুলির গেয় বস্তু না অনুধাবন করতে পারলে জানার অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আসলে এটি সংগীতের আওতায় পড়ে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সাহিত্যকে বুঝতেও সংগীতের দরকার হয়। ক্রমে ক্রমে সংগীত সম্বন্ধে শিক্ষার যখন প্রসার ঘটবে তখনই এ সব বিষয় পরিষ্কার হতে থাকবে। সংগীত কেবল তিন-তাল এক ফাঁকে গাওয়া ছোট খেয়াল, বড় খেয়াল নয় বা কতকগুলি লিরিকের সুর কণ্ঠস্থ করা নয়, তার বড় বড় চিন্তার দিক রয়েছে। সেগুলি উদ্‌ঘাটন করতে পারলে নানা বিষয়ের জটিল সূত্র উন্মুক্ত হতে পারে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব—এই সব নানা দিক থেকে স্টাডি করবার বস্তু সংগীতে আছে; তাই সংগীতকে একটা বৃহৎ সাবজেক্ট হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানে বিচার করা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংগীত যে একটা অবহেলার বস্তু হয়ে উঠেছে এর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এঁদের ভাইস-চ্যান্সেলারগণ। এঁদের ইনিশিয়েটিভ যদি থাকত তা হলে প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-মিউজিক পর্যন্ত কোর্স হতে পারত, উত্তম সিলেবাস নির্ণীত হত, অধ্যাপক ও অধ্যাপনার দিক থেকেও কোনও অসুবিধা হত না এবং ছাত্রছাত্রীরা মিউজিককে অবলম্বন করবার জন্য এমন পরিতাপও করত না। এঁদের নিজস্ব কোনও চিন্তা নেই, সব বিষয়েই এঁরা কয়েকটি কমিটির ওপর নির্ভর করেন, যেখান থেকে সদুপদেশ পাওয়া দুর্লভ, কেননা ঈর্ষাকাতর কমিটিগুলি আদৌ হিতসাধনে প্রবৃত্ত নয়। কোনও উপাচার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি দায়িত্ব স্বীকার করে তাকে সম্পূর্ণ করেছেন এমন সংবাদ এযুগে শোনা যায়নি। নিজেদের একটা বিভাগকেই তাঁরা সবরকমভাবে খাটো করে রেখেছেন—এ লজ্জা একান্তভাবেই তাঁদের। উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই এ সব কোনও যুক্তি নয়। তাঁরা মাথা খাটিয়ে পরিশ্রম করে একটা শিক্ষাসূচী গঠন করে দেখুন, দরকার হলে বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করুন, নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করুন, দেখবেন কয়েক বৎসর পরে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়ে বেরুচ্ছে, যাদের স্বল্পশিক্ষিত বলে গণ্য করতে হবে না। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা প্রস্তুতিপর্ব আছে। সংগীতেরও সেই প্রস্তুতিপর্ব শেষ করুন, দেখবেন সংগীত একটা বিরাট সাবজেক্ট হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইউনিভার্সিটিকে গৌরব প্রদান করছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মত পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি যদি এযুগের কোনও ইউনিভার্সিটিতে থাকতেন তা হলে তিনি এইরকম একটি দুরূহ কাজ নিজের উদ্যোগে সম্পূর্ণ করতে পারতেন, কিন্তু নিরুদ্যম ভ্যানিটি এবং কমিটিসর্বস্ব এই উপাচার্যের দল টার্ম কাবার করতেই আসেন। যাবার সময় রেখে যান উক্ত কমিটিগুলির গ্রথিত গ্রন্থির সমারোহ, যা একমাত্র মহাকালই উন্মোচন করতে পারে।

শার্ঙ্গদেব

খেয়ে দেখুন কী সুন্দর কফির স্বাদ!

বাংলার গুণীদের নিয়ে "সংগীত আসর"

রবীন্দ্র সদনের কার্যনির্ধারক সমিতি গত ১৯ই নভেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী একটি অভিনব সংগীত আসরের আয়োজন করে বাংলার সুধীসমাজের মন রক্ষা করেছেন। আসরটি অভিনব, কারণ এর উদ্দেশ্য বাংলার মানুষকে তাদের সংগীত-কৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। তাই আসরের প্রথম দিনেই ছিল পুরনো বাংলা গানের সম্ভার। এবং সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে বাংলা গানের কমবেশী ছ'শ বছরের ইতিহাসের একটি বিবৃতি শোনার সুযোগও আমাদের দিয়েছিলেন। অতি সংক্ষেপে, অথচ যত্ন, দরদ এবং স্নিগ্ধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে শ্রীঠাকুর আমাদের শোনালেন সেই ক্রমবিবর্তনের কথা। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পরিবেশিত বৌদ্ধ সহজিয়াদের চর্যাগীতি থেকে শুরু করে কি মহিমায় বাংলার গান রবীন্দ্র-সংগীতে এসে নিমজ্জিত হল সে ইতিহাস শ্রীঠাকুরের মুখে শোনা গানের মতই সুখশ্রাব্য।

আসরের প্রথম শিল্পী দিলীপ মুখোপাধ্যায় বেশ ভাবসম্পৃক্ত দিয়ে গেয়েছিলেন রসিক রায়ের গান "কি হবে কি হবে।" রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গাইলেন প্রাচীন কোন অজ্ঞাত শিল্পীর রচনা "চল মন কাশীধামে" এবং পরে "সবারে নিয়ে নন্দিনী মধু-কাননে"। শেষোক্ত গানের রসমাধুর্য, মূর্ছনাচক্র এবং সুরসংহতি অনুধাবন-যোগ্য। প্রাচীন ধ্রুপদ ভেঙেই যে আজকের ঠুংরীর সৃষ্টি তা এই ধরনের পরিবেশনা থেকে আঁচ করা যায়। তবে এই আসরে সবচেয়ে বেশী দরাজ কণ্ঠে আনন্দ বিতরণ করলেন প্রবীণা শিল্পী শ্রীমতী আঙুরবালা। ওঁর উদাত্ত কণ্ঠে শ্যামাসংগীত শুনলাম "আমি ঐ নাম বড় ভালবাসি"। কিছুটা কীর্তনের রেশ আছে এই গানের প্রথম পংক্তির পুনরাবৃত্তিতে। কীর্তনের সেই ভাববিহ্বলতা এই গানের মুখ্য অঙ্গ ছিল। এবং এই ভাবুকতা এক নতুন ভাবনায় প্রবেশ করল যখন আঙুরবালা তাঁর গুরু নজরুল ইসলামের রচনা "গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে" ধরলেন। নজরুলের এই গানটি হচ্ছে আদত বাংলা ঠুংরী। অবশ্য বৈয়াকরণদের প্রজ্ঞায় আদত ঠুংরী কি হওয়া উচিত সে তর্কে না প্রবেশ করেই বলা যায় যে, যে সৌকুমার্য ও স্বাধীনতা নিয়ে ঠুংরী সাধকেরা গান ধরেন যে মানসিক প্রস্তুতি

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

আঙুরবালার যথাযথ আছে। বোল, পুকার, কীর্তনাঙ্গের আখরাই শিহরণ এবং সুর-লাবণ্য—এ সবই আঙুরবালার গানে আমরা পেয়েছি। এবং আর যা পেয়েছি তা হল "পিয়ালা কেন আনিলে মিছে" এবং "কুলের ঐ ঘরগুলোন" গানে গলার কাজের চিকণতা।

পরের শিল্পী গোপাল চট্টোপাধ্যায় "কে তোমারে শিখায়েছে প্রেমছলনা" এবং "ওগো দরদী" গান দুটিতে পুরনো বাংলা গানের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং সেদিনের শেষ গায়ক সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় সংযত আকারে পর পর পাঁচটি গান গেয়ে আমাদের মুগ্ধ করলেন। তাঁর প্রথম গান ছিল 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'—যেটি কারো কারো মতে নিধুবাবুর টপ্পা এবং যা এখন মোটামুটি-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীধর কথকের অবদান হিসেবে। আশ্চর্য হতে হয় এই প্রাচীন গানটির নিবিড় ভাবপ্রতিক্রিয়া। কাজেই গানটির রসের এক্সপেরিমেণ্ট নিরন্তর চলেছে; এবং সিদ্ধেশ্বরবাবু তাতান্ত সংহত পরিবেশনার মাধ্যমে এর মূর্তিরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। বস্তুত আবেগ এবং সংযম—এই দুয়ের আত্মীয়তায় টপ্পার লাবণ্য ভাস্বর হয়। সেই প্রমাণ রাখলেন সিদ্ধেশ্বর সোহিনিতে টপ্পা "সে যাতনা যতনে" গেয়ে। পরে আগমনী বিজয়া "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী" এবং হাম্বীর রাগে শ্যামাসংগীত "এত করে ডাকি শ্যামা মা" গেয়ে তিনি রসবেত্তাদের মন জয় করেছিলেন।

হতাশ হতে হয়েছিল আসরের দ্বিতীয় দিনে। যতটা আশা করে গিয়েছিলাম সে আশা মেটেনি। বরং আসরের সরোদ, সেতার এবং বেহালার সঙ্গে তবলার সঙ্গতকেই রসোত্তীর্ণ হতে দেখেছিলাম। শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় বাজিয়েছিলেন ইমন তাঁর সাবেকী ঢঙে। তাঁর সরোদের সঙ্গে কেরামত খাঁর তবলার বোঝাপড়া মোটামুটি ভালই ছিল। তবে শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের সেতারে রাগ সুর্যমুখী শুনে যতটা খুশী হলে খুশী হতাম তা হইনি। বাজনা খারাপ বলছি না। তবে আমি শ্রীমতী রায়ের কাছে আরো বেশী আশা করি কারণ ওঁর প্রতিশ্রুতি অনেক। ওঁর সঙ্গে তবলায়

আলাপচারী, বাজিয়ে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছিলেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। মনন-শীলতা হল জ্ঞানবাবুর তবলায় বিশিষ্টতা এবং সে-মনীষা তাঁর সংগতে মূর্ত ছিল। এবং পরে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কানাই দত্ত শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরীর সঙ্গে তবলায় বসে ঐ ঘরানার তবলার ওস্তাদী বজায় রেখেছিলেন। সেদিনের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী শিশিরকণা ভারী সুন্দর মেজাজে আলাপ জমিয়েছিলেন। বাজানোর সময় তাঁর কয়েকটি তেহাই ও তান মনে বেশ দাগ কেটেছিল। এবং সব শেষে একটি মনোগ্রাহী ঠুংরি বাজিয়ে তিনি আসরের প্রথম ভাগের অনেক অপূর্ণতাকে ভরে দিয়েছিলেন।

সংগীত আসরের তৃতীয় দিনের আয়োজন বহু লোকের কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাঁচ পাঁচটি শক্তিমান শিল্পীর পাঁচ ধরনের মনোভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী সেদিনের সমস্ত গানগুলিকেই আস্বাদে, অনুভবে এবং আন্তরিকতায় অসামান্য করে তুলেছিল। ভাল খারাপ বিচারের সুযোগ শ্রোতারা বিশেষ একটা পাননি, কারণ গান-গুলির স্টাইল, ঐতিহ্য এবং আনুগত্যের ফারাক অনেক। মোটামুটি না বাড়িয়েই

বলা চলে যে সেদিনের প্রায় প্রতিটি শিল্পীই ছিলেন স্বরাজ্যে স্বরাট। শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমন রাগের খেয়াল ও পরের ঠুংরী তাঁর সুনামের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেছে। মীরা দেবীর গুছিয়ে গাইবার পদ্ধতি ও রাগের কিতাবের শিষ্টাচার সেদিন পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেদিনের আসরের দ্বিতীয় শিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী গেয়েছিলেন রাগ রজনী কল্যাণ। রাগটি ভারী মিষ্টি এবং চিন্ময়বাবুর গাওয়ার গুণে এই মিষ্টত্ব কখনই শ্রোতাদের মনে একঘেয়ে লাগেনি। প্রথমত আলাপের দ্বাদশ অঙ্গের সুষ্ঠু অথচ পরিমিত ব্যবহার করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে আলাপে যথাযথ আনন্দমীমাংসা বজায় রাখতে হলে শুধু দৈর্ঘ্যের উপর মনোনিবেশ করলেই হয় না। পরে সুষ্ঠু তানকর্তব এবং টুকরোর কাজে চিন্ময়বাবু তাঁর নিজের স্টাইলের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। খেয়াল শেষ করে তিনি গাইলেন "ছোড় ছোড় শ্যাম মোরে বঁইয়া" এই ঠুংরীর সময় তাঁর সহকারী দুজনের গলার মিষ্টত্ব আমরা নজর করেছি।

তবে সমস্ত ভাব ছাপিয়ে কেন জানিনা এই আলোচনা লেখার সময় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের বসন্ত খেয়ালের স্মৃতিই মনকে উতলা করছে। নবীনদের কাছে ভীষ্মদেব বিগত যুগের সংগীতকলার একটা জীবন্ত স্মৃতিবিশেষ। যে সংগীত কৃষ্টির (বিশেষ করে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসংগীতের) থেকে আজকের সমাজ বিচ্যুত হয়ে পড়েছে সেই কৃষ্টির একজন মুখ্য কর্ণধার হলেন ভীষ্মদেব। যে অসাধারণ আঙ্গিক-শিক্ষা নিয়ে সে যুগের শিল্পীরা গাইতেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ রাখলেন ভীষ্মদেব তাঁর বসন্তে। সত্যি বলতে কি, এত খোলা গলা, এত পরিষ্কার উচ্চারণসমেত দ্রুত তান এবং এত চমৎকার লয়ের হিসেব মানুষকে অবাক না করে পারে না। যে সাবলীলতার সঙ্গে তিনি অবরোহী তানগুলি পেশ করলেন এবং যে আশ্চর্য গতি ও ছন্দে সোমে ফিরছিলেন তাতে শ্রোতারা বারংবার বিস্মিত হয়েছেন। বসন্ত শেষ করে ভীষ্মদেব গাইলেন পরজ যাকে রবীন্দ্রনাথ 'অলস রাত্রি শেষের নিদ্রাবিহ্বলতা' বলে অভিহিত করেছেন। ঘুম ভাঙার গানে যে উদাসীনতা ও বেদনা থাকে তা পরজে নেই কারণ পরজ তার মাদকতার এবং কল্পনা-লতার আবেশে মুগ্ধ। ভীষ্মদেবের প্রচন্ড দ্রুত লয়ের পরিবেশনায়ও সেই অবসন্ন চৈতন্যের দ্যুতি উজ্জ্বল ছিল।

ভীষ্মদেববাবুর গানের সঙ্গে সঙ্গে যে গাম্ভীর্য এল আসরে সেই চিন্তার পটটিকে প্রসারিত করলেন পরের শিল্পী শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কৌশিকী কানাড়ায়। প্রসূনবাবুর স্বর অত্যন্ত সুন্দর; মেজাজটাও

সুনন্দা পট্টনায়ক

গভীর। দুয়ে মিলে তাঁর কৌশিকী কানাড়ার চরিত্রটুকু মনোহর করেছিল। আলাপে স্থায়ীর মেজাজ ছিল ধীর এবং সে সময়ে কৌশিকী কানাড়ার মালকোষ অঙ্গের লাবণ্যরক্ষায় প্রসূনবাবুকে নিবিষ্ট দেখে-ছিলাম। ক্রমশ দরবারী মালকোষের যুগল-মিলনে প্রসূনবাবু তাঁর রাগের পূর্ণতা এনেছিলেন। বার বার মনে হয়েছিল সে সময়ে যে প্রসূনবাবুর মত একজন ষোল আনা শিল্পী খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এত আদরের সঙ্গে এবং এত রোম্যান্টিকতার সঙ্গে খুব কম শিল্পীই খেয়াল গাইতে পারেন। তবে এরকম একজন কমপ্লীট আর্টিস্টের পক্ষে দ্রুত অংশে আরও তৈরী কাজ দেখান বাঞ্ছনীয়। ক্বচিৎ মনে হয়েছে যে যতটা তিনি গলা খুলতে পারেন ততটা খুলছেন না। এটুকু সমালোচনা একজন অনুরাগীর সমালোচনা যে খানিকটা বুঝতে পারে প্রসূনবাবু কি জাতের শিল্পী।

আসরের শেষ হল শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়কের রায়েশা কানাড়া ও 'ভজগোবিন্দম' দিয়ে। বোধ হয় এক ধরনের একঘেয়েমী এসে গেছে আমার আলোচনায় এত লোকের প্রশংসায়; তবুও এই প্রশংসা বিস্তৃত না করে উপায় নেই। সুনন্দার অসামান্য গলার কাজ, রেওয়াজী ওস্তাদী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করা দুষ্ট সমালোচনা। ছোট ছোট পদগ্রন্থনায় সুনন্দা কিছুটা ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের ভঙ্গীতে আলাপ বিস্তৃত করেছিলেন। ক্ষুদ্র অংশগুলির উপর খেয়ালী নজর একধরণের 'ডিটেল কনসাসনেসের' পরিচয়। এই অতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদ্ধতি মানুষের মন জয় করবেই। শুধু গতি দিয়েই সুনন্দার তান তৈরী নয়; এতে আছে নিবিড় চিন্তার বৈদ্যুতিক উন্মোচন। যে ঢঙে আচমকা মানুষ শুধু রেওয়াজী বিশেষত্ব দেখবে তাতে আছে একটি বিবর্ধমান ব্যক্তিত্বের নিষ্ঠার পরিচয়। যদিও শিল্পীর অসুবিধেটা বুঝি, তবুও বলব যে সুনন্দা দেবী যেন তাঁর অসামান্য গায়কীর পরিচর্যায় কোন ধরনের 'এক্জিবিশনানিজ্‌ম' বা বাহ্যিকতার স্থান না দেন। সুতীক্ষ্ণ কাজের সময় বাড়তি ওস্তাদী প্রয়োজন হবেই, তবে যেন সেক্ষেত্রে শিল্পী তাঁর আন্তরিক গুরুত্বকে বিস্মৃত না হন। আমার মনে হয় আজকের গায়কী দুনিয়াতে সুনন্দার মতন ওস্তাদী পরিশীলন একটা বড় আশার লক্ষণ। সুনন্দার ভজন আমার স্তবপাঠের মতন সুন্দর লেগেছে। যে আধ্যাত্মিকতা ভজনের প্রাণ সেই প্রাণে সুনন্দা ছোঁয়া দেন।

শেষ করার আগে ওস্তাদ কেরামৎ খাঁর তবলা সঙ্গতের কথা বলে নিই। প্রসূন এবং সুনন্দার সঙ্গে কেরামৎ সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ পটুতা দেখিয়েছেন। ওঁর মিঠে ঠেকা, মাপা হিসেবের লয়কারী ও চক্রধর নৈপুণ্য মনে রাখার মতন। আর একথাও বলা দরকার যে রবীন্দ্র সদনের কর্তৃপক্ষের ন্যায় অন্যান্য সংগীতগোষ্ঠীরাও যদি বাঙ্গালী শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন তবে বাংলার গান, বাংলার বাজনা, বাংলার মান সহজে বিলীন হবে না। এ ধরনের আরো আসর আমরা চাই।

সংগীত সমালোচক

শরীর দুর্বল থাকলে সর্দিকাশি সারতে চায় না

আপনার শরীরের প্রতিরোধশক্তি যখন কমে যায়, তখনই আপনি সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হন। সর্দিকাশি সেরে যাবার পরেও আপনার শরীরের দুর্বলতা দূর হয় না, বরং আরও বেড়ে যায়।
ফলে, আপনি আবার সহজেই সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হন। বারবার হতেই থাকে।
কিন্তু ঘরের কাজ তো আর ফেলে রাখা যায় না! গৃহিণীর কি আর অসুখ হলে চলে? তাই সর্দিকাশি প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধশক্তিও গড়ে তোলা চাই। একমাত্র ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেলই এ দুই কাজ একসঙ্গে করে।

এতে দুরকমের উপাদান আছে:
প্রথম উপাদান হ'ল—"ক্রিয়োজোট" এবং "গুয়াকল" যা সর্দিকাশি সারায়, এবং দ্বিতীয় উপাদান হ'ল এর অদ্বিতীয় টনিকের গুণ—যা আপনার শরীরকে সবল ক'রে তোলে, ফিরে আনে সব উদ্যম এবং গড়ে তোলে অপ্রতিহত প্রতিরোধ শক্তি
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড লাল লেবেল ব্যবহার করুন—সর্দিকাশি চিরকালের মত বিদায় হবে।

এখন ২ রকম সাইজে পাওয়া যায়।

সুস্থ এবং সবল থাকার জন্য...

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড

লাল লেবেল

পরিবারের সকলের জন্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য টনিক।

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট'এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

॥ ২১ ॥

অভিনয় শিল্পের দক্ষতা গগনের সহজাত। মনে হয় জন্মেই ছিলেন ওই গুণ নিয়ে। এ'দের পরিবারের নাট্যশিল্পের প্রতি স্বভাবজাত প্রীতি ঠাকুরদার সময় থেকে চলে আসছে। ঠাকুরদা গিরীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয় তো করতেনই, নাট্য রচনাতেও ভালো হাত ছিল। পিতা গুণেন্দ্রনাথ এবং জ্যেষ্ঠতাত গণেন্দ্রনাথ বেশ ভালোরকমই অভিনয়দক্ষ ছিলেন। এ'দের আমলে ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই শখের দলের নাট্যাসর বসত। এই ঐতিহ্যে মানুষ গগন-সমর-অবন। পূর্বপুরুষদের কালে তাঁদের সময়কার নাট্যকারদের নাটক অথবা বিদেশী নাট্য-রচয়িতার অনুবাদ অভিনয় হত। গগনের সময়ে আকাশে রবীন্দ্র উদিত হয়েছেন; তাঁর এবং তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পড়েছিলেন ওঁরা তিন ভাই।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই গগন সেজেছেন। নাট্যে রাজার পার্ট থাকলে গগনকেই তা দেওয়া হত। মানাতোও তাঁকে রাজার পার্টে ভালো। গগনেন্দ্রের প্রথম অভিনয় বোধ হয় 'রাজা ও রাণী' নাটকে। তিনি সেজেছিলেন রাজা এবং তাঁরই সহধর্মিণী প্রমোদকুমারী রানী। দুজনকেই ঠিক রাজা ও রানীর মতই মানিয়েছিল।

বাড়ির সকলকে এক করে গগনেন্দ্র প্রায়ই নাটক পড়ে শোনাতেন। বাংলা নাট্য পড়তেন, বিদেশী নাট্য পড়তেন। মলিয়ের-এর নাট্য ছিল গগনের খুবই প্রিয়। সেগুলি প্রায়ই পড়তেন ও পড়ে শোনাতেন। এ ছাড়া ছেলেদের এবং ভাইপোদের নাট্য-শিক্ষা দিতেন, বাড়িতে নাট্য করার উৎসাহ দিতেন। এমনি শখের দলের কত নাট্য যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়েছে, যার নেতা এবং শিক্ষক ছিলেন গগন, তার হিসেব নেই।

আমরা, নাতিরা, যখন বড় হচ্ছি তখন আর বড় দাদামশায়কে ওই কাজের মধ্যে দেখিনি। আমরা বরং তাঁকে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনেতা হিসেবে।

আমরা যখন খুব ছোট তখন 'বাল্মীকি-প্রতিভা' হয়। রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা—এ'রা সব সেজেছিলেন; দেখেছি কি দেখিনি তা-ও মনে পড়ে না। তবে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখে বড়দাদামশায় এক পুতুলের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' করেছিলেন, সেটা আমাদের দেখা। এবং আমাদের চোখে তা এমনই অপূর্ব লেগেছিল যে, আজও ভুলিনি। বেশ বড়সড় একখানি স্টেজ বানিয়েছিলেন। তাতে সাজানো,—কোথা থেকে সে সব পুতুল সংগ্রহ করেছিলেন জানি না,—কিন্তু অবিকল বনদেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ডাকাতের দল—সব ছিল। সেই পুতুলের স্টেজ সামনে রেখে আমরা যখন 'বাল্মীকি-

ডাকঘর নাটকে বাঁ দিকে উপবিষ্ট গগনেন্দ্রনাথ, দক্ষিণে অবনীন্দ্র নাথ ও রবীন্দ্রনাথ

প্রতিভা'র গান শুনতুম তখন পুতুলগুলিকে জীবন্তই মনে হত। 'বাল্মীকি প্রতিভা'র পুরোপুরি অভিনয় দেখা হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই তো রাজা আছেন—গগনেন্দ্র তা-ই সাজতেন। যখন রাজার পার্ট পাওয়া যেত না অথচ গগনকে নামাতে হবে তখনই ,হত রবীন্দ্রনাথের মুশকিল। যেমন একবার হয়েছিল 'শারদোৎসব' নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনের দলবল নিয়ে জোড়াসাঁকোয় এসেছেন 'শারদোৎসব' অভিনয় করতে। এসে মনে পড়েছে ভাইপোদের কথা। গগনকে 'শারদোৎসব'-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। 'শারদোৎসব'-এ একজন রাজচক্রবর্তী আছেন বটে, কিন্তু তিনি তো আছেন ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী সেজে। ওতে গগনকে মানাবে না। কাজেই লিখতে হল এক আসল রাজার পার্ট। 'শারদোৎসব'-এর সংগে সেটা জুড়ে দেওয়া হল। গগন সাজলেন রাজা, সমর মন্ত্রী।

স্টেজে নেমে গগনেন্দ্রনাথ সত্যিকারের রাজা হয়ে যেতেন। সাজে, পোশাকে, চেহারায়, গলার স্বরে, দেহবিক্ষেপে, বাহু-ভংগীতে কী যে হয়ে যেতেন, আমরা আর চিনতে পারতুম না। অভিনয় ছিল সংযত, স্বাভাবিক। মনেই হত না অভিনয় করছেন। হাত-পা ছুঁড়ে গলা কাঁপিয়ে দর্শকদের মর্ম স্পর্শ করে কত বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীই তো অভিনয় করে যান দেখি, কিন্তু সেই ছেলেবেলায় দেখা গগনেন্দ্রের রাজার পার্ট যেমন মনের মধ্যে গেঁথে আছে এমন তো কোনোটি হল না।

কিন্তু এর চেয়েও মনের মধ্যে জাগ্রত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে গগনেন্দ্রের পিসেমশায়ের পার্ট। 'ডাকঘর'-এর পিসেমশায়। বিচিত্রা হলে 'ডাকঘর'-এর স্টেজ সাজিয়েছিলেন গগনেন্দ্র আর অবনীন্দ্র। নন্দলালও ছিলেন। তিনি তখন ছেলেমানুষ। তাঁর তখন এই দুই মহাশিল্পীর কাছে স্টেজ সাজানোর হাতেখড়ি হচ্ছে। অমন করে এর আগে কেউ স্টেজ সাজায় নি। এর আগে স্টেজ সাজানো

হত সিন্ পেণ্টিং করে। দৃশ্যগুলি পটের গায়ে এঁকে স্টেজে সাজিয়ে দেওয়া হত। 'ডাকঘর'-এর বেলায় হল অনাড়ম্বরের চূড়ান্ত। সামনের দিকটা শুধু একটা খড়ের চালের সম্মুখভাগ। সত্যিকারের খড়—কাপড়ের উপর আঁকা নয়। পিছনে শুধু নীল। দৃশ্যবদল বলে কিছু ছিল না। শেষ দৃশ্যে শুধু সেই নীলে কিছু তারা ফুটেছিল। স্টেজের সামনে সাজানো ছিল গুচ্ছে গুচ্ছে রজনীগন্ধা। রজনীগন্ধা সেই বোধ হয় প্রথম জাতে উঠল—আজকাল যা প্রতি সভামণ্ডপে, মিটিং-এ, কনফারেন্সে দেখা যায়। তখনকার দিনে 'ডাকঘর'-এর সেই প্রথম অভিনয় দ্রষ্টাদের মনে কি গভীর রেখাপাত করেছিল তা তো সবাই জানেন।

আর আমাদের মনে জেগে ছিল পিসেমশায় আর অমল। পিসেমশায় বলতে আমরা বুঝতুম বড়দাদামশায় আর অমল বলতে আশামুকুল। সারা দুনিয়ার পিসেমশায় আর সারা জগতের অমল হয়ে এঁরা দুজনে আমাদের অন্তরে চিরদিন জেগে রইলেন। এর পর যত ভালো ভালো 'ডাকঘর'-এর অভিনয়ই দেখে থাকি না কেন, কই অমনটি তো আর কখনও দেখলুম না? 'ডাকঘর'-এর অভিনয় শেষ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাদের চোখ জলে ভরে যেত। আমরা জানতুম, বড়দাদামশায়ের অমন আশ্চর্য অভিনয়-সাফল্যের মূলে ছিল এক গভীর পারিবারিক শোক। 'ডাকঘর' অভিনয়ের কিছুদিন আগেই তিনি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার মধ্যে হারিয়েছিলেন তাঁর ছোট ছেলেকে—অমলেরই বয়সী।

বড় ভালোবাসতেন রূপকথার বই। নানা দেশের, নানা প্রদেশের রূপকথার যা বই বেরুতো কিনতেন। সাজিয়ে রাখতেন লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরির একটা অংশ ভরে গিয়েছিল রূপকথা আর লোককথার বই-এ। বইগুলি বার করে করে পড়তেন। বারবার পড়তেন। কল্পলোকের রাঙন আলোর ফুলঝুরিতে আর স্বপ্নপুরীর ছবিতে ঠাসা ছিল গগনের চোখ আর মন। যে চোখ, যে মন দিয়ে তিনি তাঁর চার পাশের জগৎকে দেখতেন তাকে বাইরে থেকে চেনা যেত না। যেত যখন কাগজ আর তুলি তুলে নিতেন। এর শত শত পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁর ছবিতে, বিশেষ করে কিউবিস্ট ছবিগুলিতে। রূপকথার বহু চরিত্র, যা একমাত্র গগনের চোখ দিয়েই দেখা যায় তা ফুটে আছে তাঁর ছবির পটে। আর ফুটে আছে তাঁর একমাত্র সাহিত্যকীর্তিতে, যার প্রথম নাম ছিল 'দাদাভায়ের দেয়ালা', পরে বই হয়ে বার হয় 'ভোঁদড় বাহাদুর' নামে।

"বুড়ো বলতে লাগল, রাত বারোটায় আহারাদি করে আমার তাল-বেতাল-সিদ্ধি লাঠি ঘাড়ে বাড়ির আলসের চারদিকে আজও

রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথ

বেড়াচ্ছিলুম, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়ালের মতো জানোয়ার তোমাদের আঁতুড়ঘর থেকে একটি কচি ছেলে চুরি করে পালাচ্ছে। এই দেখে আমি লাঠি ঘুরিয়ে হার-রে-রে-রে করে হাঁকডাক ছেড়ে ছুটে গিয়ে যেমন তার পিঠে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছি, অমনি সে খোকাকে টপ করে আলসেতে ফেলে দিয়ে টিকটিকির রূপ ধরে সরসর করে ছাতে উঠে গেল। তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মায়ের কাছে শুইয়ে রেখে এক লাফ মেরে ছাতে গিয়ে দেখি, আমার ছেলে নিচুয়া চিৎকার করে বলছে, বাবা, অন্ধকারে তুমি এই জানোয়ারকে

চিনতে পারনি? ও আমাদের চিরকালের শত্রু। সেই চুটিপাল্লু বনের দু-মুখো রাক্কস, এখন বেড়ালের রূপ ধরে শহরে উৎপাত করতে এসেছে। নিচুয়ার কথা শুনে রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আমার লাঠির কানে কানে বললুম, লাঠিভায়া, দুষ্টু রাক্কসকে একবার তোমার তাল-বেতালী কারদানিটা বেশ ভালো করে দেখিয়ে চট করে আমার হাতে ফিরে এসো। লাঠি অমনি আমার হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে দু-চারটে ডিগবাজি খেয়ে তাল ঠুকে রাক্কসের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। তারপর নিচুয়াকে এক ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে যেমনি রাক্কসের চার দিকে ঘুরতে আরম্ভ করলে অমনি তার মাথা দিয়ে লাল-নীল-সবুজ রঙের আগুন দপ্‌দপিয়ে জ্বলে উঠল। এইরকম রাক্কসের চারদিকে এক আগুনের বেড়াজাল সৃষ্টি করে তার পালাবার পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সে রাক্কসকে নাস্তানাবুদ করে তুললে। আর খানিকটা সময় পেলে রাক্কসকে পুড়িয়ে ছাই করে আকাশে উড়িয়ে দিত; কিন্তু ঠিক সেই সময় হল কি, দৈবাৎ লাঠির পায়ে একগাছা ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে

গেল। বেচারা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রাক্ষস মাঝে উলটে পড়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি ছুটে গিয়ে তার পায়ে-জড়ানো সুতো খুলে দিচ্ছি, এই সুযোগে রাক্ষস নিচুয়াকে বগলদাবা করে এক লাফ দিয়ে তোমাদের তেঁতুলগাছের উপর পড়ল—তারপর সেখান থেকে বিকট রকম চিৎকার করে হাসতে হাসতে আরেক লাফে গঙ্গা পার হয়ে কোন্ দিকে যে চলে গেল—আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি, তাকে আর ধরতে পারলুম না।"

তারপর এই গল্পেরই শেষের দিকে—"বেড়াল একগাল হাসি হেসে বললে ঘরের চারিদিকে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে তোমাদের কে বললে? ওই সিঁড়ির ধাপে বসে সোনার কৌটোয় একবার ফুঁ দিয়ে দেখ দেখি কি হয়। এই বলে বেড়াল কোন্ দিকে চলে গেল।

"আমি সিঁড়ির ধাপে বসে যেমন কৌটোতে ফুঁ দিয়েছি, অমনি তার ডালা আপনি খুলে গেল, আর তার ভিতর থেকে একটি ছোট নীল রঙের পাখি ফড় ফড় করে উড়ে সেই সোনার দাঁড়ে গিয়ে বসে শিস দিতে লাগল। তার একটু পরে ছোটে বুড়ীমা কি জানি কোথা থেকে এসে সিংহাসনে বসলেন। বুড়ীমার আজকের সাজ দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলুম।

"তাঁর পরনে একখানি জুঁই ফুলের শাড়ি, তাতে চন্দ্রমল্লিকার পাড় বসানো। গলায় শিউলি ফুলের সাত-লহর। মাথায় নব-দূর্বাদলের চমৎকার একটি মুকুট, তাতে ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ে হীরের মতো চিক চিক করছে। তাঁর দুই কানে সদা-সোহাগিনী ফুলের ঝুমকো—আর কপালে জ্বলজ্বল করছিল সন্ধ্যাতারার একটি টিপ।

"এই সাজে ছোট বুড়ীমা সিংহাসনে বসতেই সমস্ত ঘর একটা নতুন রকমের আলোয় ভরে গেল।

"আমরা তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে জোড় হাতে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম।

"বুড়ীমা আমাদের আশীর্বাদ করে বলতে লাগলেন, মহারাজ, তোমার ছেলে নিচুয়া ভাল আছে। সে সাত দিন সাত রাত দুশমন রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই করে রাক্ষসকে বধ করে তার দুটো জিভ কেটে নিয়ে আমার বেড়ালকে খাইয়েছে। তার সাহস দেখে খুশী হয়ে তাকে ছুটুপালুদ্বীপের রাজা করে দিয়েছি। এখন সে সোনার সিংহাসনে বসে রাজছত্র মাথায় দিয়ে সুখে রাজত্ব করছে। টিয়ে সায়েব তোমার ছেলের খুব সাহস দেখিয়েছে—সে রাক্ষসের নিচুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল, আমি তাকে নিচুয়া-মহারাজের

'আলমগীর' অভিনয়ে তিন ভাই সমরেন্দ্রনাথ। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ

মন্ত্রী করে দিয়েছি। এখন তোমরা আহারাদি করে আজ রাত্তিরে আমার এখানে থাক। কাল সকালে আমার পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে তোমাদের ছুটুপালু বনে নিচুয়া মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে রেখে আসব।

"এই বলে বুড়ীমা অন্তর্ধান হলেন।"

আমাদের ছেলেবেলায় আমরা একটি হাতে-লেখা পত্রিকা বার করতুম। তার নাম ছিল 'দেয়ালা'। ছোট-বড় বাড়ির সবাইয়ের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করতুম আমরা 'দেয়ালা'র জন্যে। গগনেন্দ্রনাথকে অনেক বলেও তাঁর কাছ থেকে কোনো লেখা পাইনি। তিনি ছবি দিতে রাজী হলেন: লেখার কথা বললে বলতেন, আমি কি আর লিখতে পারি। অবন পারে। ছবি আমরা নিইনি, কারণ আমাদের সেই হাতে-লেখা পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথের ছবি তুলোর আঠা দিয়ে সেঁটে দিলে সে ছবির আর কোনো পদার্থ থাকবে না বলে আমরা জানতুম। তারপর গগনেন্দ্রনাথের নাতি খোকন একবার খুব অসুখ হয় এবং জ্বর ছেড়ে গেলে শরীর সারাবার জন্য খোকনকে নিয়ে তার বাবা-মা রাঁচিতে যান। চিঠির মধ্যে দিয়ে খোকনকে গল্প শোনাবার জন্যে গগনেন্দ্রনাথ এই রূপকথাটি লিখতে আরম্ভ করেন। লেখা হয়ে গেলে নাম দেন 'দাদাভায়ের দেয়ালা'। বলেন—তোদের

দেয়ালা'য় ছেপে দে, আর কপি করে পাঠিয়ে দে খেন্দুকে। জানতেন না যে, আমাদের 'দেয়ালা' ততদিনে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

যাই হোক, সেই চিঠি আরও ঘষে-মেজে খেন্দুর কাছে পাঠিয়েছিলেন, আর সেইটিই পরে 'শারদীয়া বসুমতী'তে এবং তারও অনেক দিন পরে বই হিসেবে 'ভোঁদড় বাহাদুর' নামে প্রকাশিত হয়।

গগনেন্দ্রনাথকে এর পরে আরও লিখতে বলা হয়েছিল। হয়তো লিখতেনও, কিন্তু আকস্মিক ব্যাধির ঝটকায় তাঁর কথা বলার এবং হাত নাড়ানোর ক্ষমতা একই সঙ্গে লোপ পায়। লেখা তো আর হলই না, ছবির স্রোতও বন্ধ হয়ে গেল।

এমন একটা সময় তাঁর সৃজনীশক্তিতে ছেদ আসে যখন লোকে তাঁর শিল্পক্ষমতা সম্বন্ধে সবে সচেতন হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক সেই সময় থেকেই লোকে তাঁকে ভুলতে শুরু করেছিল।

সমাপ্ত

[স্বর্গত মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনা যে পর্যন্ত লিখে যেতে পেরেছিলেন সেখানেই আমরা সমাপ্তি দিয়েছি। কিন্তু এই মহান শিল্পীর জীবনের শেষ পরিণতি পাঠকবর্গকে জানাবার জন্যে আমরা শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত 'নায়ক গগনেন্দ্রনাথ' পুস্তিকা থেকে শেষ পরিচ্ছেদটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করলাম।
—সম্পাদক]

শেষ অধ্যায়

১৯৩০ সাল, ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে সবাই তাড়াতাড়ি এলেন মাটির থেকে তোলবার জন্য, তখন দেখা গেল তাঁর শরীরের বাঁ দিকটা অবশ ও বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেছে। তখনকার দিনে কলকাতার সব বড় বড় ডাক্তারদের দেখানো হল, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। অনেকদিন শুয়ে থাকার পর একটু একটু চলতে পারতেন কিন্তু কথা আর বলতে পারলেন না। গগনেন্দ্রনাথ এত স্নেহপরায়ণ ছিলেন যে, এইরকম শারীরিক অবস্থাতেও মেয়েদের বাড়ি এসে দেখা করে যেতেন, মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে না পারার দুঃখে চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ত। ১৯৩৬ সালে পুত্রাধিক বড় জামাই প্রভাতনাথের মৃত্যুতে তিনি বিশেষ-রকম শোক পেলেন এবং এর পর থেকে একরকম শয্যাশায়ীই হয়ে গেলেন।

সেদিনটা ছিল ১৩৪৪ সালের ২রা ফাল্গুন, ইং ১৯৩৮ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার, মাঘী পূর্ণিমার রাত্রি ১১-৩০ মিঃ, জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি দেবী সেজেছেন নতুন সাজে, মনে হচ্ছে যেন এই মহাপ্রাণ শিল্পী ও ভাবীকালের শিল্পকলার পথ-প্রদর্শকের শেষ যাত্রার পথ আলোকিত করাই উদ্দেশ্য। অবনীন্দ্রনাথ ছোট ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "ওরে আজ ত্রিধারার একটা ধারা শুকিয়ে গেল।" সমরেন্দ্রনাথ সারা জীবন নীরবে ছিলেন, এ ব্যথাও নীরবেই বুক পেতে নিলেন।

বহুদিন পরে তাঁর একটি চিঠি পেলুম। তাতে তিনি লিখছেন—

"দাদা চলে গেলেন। তাঁর প্রতিদিনের যন্ত্রণার অবসান হল। কী কষ্টে এই আট-ন' বছর কেটেছিল তাঁর, তোমরা তা দেখেছ। কিন্তু এক দিনের জন্যেও তাঁর মুখে কষ্টের চিহ্ন কেউ দেখেনি। সদা প্রফুল্ল মুখ তাঁর যেন পদ্মের মত ফুটে থাকত মনের দুঃখের পঙ্কের উপর।......

"আজ দাদাকে হারিয়ে সব শূন্য মনে হচ্ছে, দাদা বলতে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে আমার আর কেউ রইল না। আজন্মের বন্ধন ছিন্ন হল বটে, তবু তাঁর প্রতিভার প্রকাশ রয়ে গেল। তিনি দিয়ে গেলেন অনেক কিছু আমাদের সকলকে।......তিনি সেইরকম লোক ছিলেন, যে এখানে এসে আলো জ্বালায়।"

রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ স্মরণে লিখলেন—

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার,
অরূপ ছবির রহস্যমাঝে
অমল শুভ্রতার।

ইকো —প্রশান্ত রায়

ছোট ও মাঝারী আকারের নানা ছবি, সবই জলরঙে আঁকা। নীরব নিশীথে পাহাড়ের গা বেয়ে ঋজুরেখায় ক্ষীণ জলধারা ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে, কোথাও সাধারণ একটি কাঠের সেতুর ওপরে পথচারী দাঁড়িয়ে আছে—নীচে অভিমানক্ষুব্ধ ছোট ছেলের জলভরা দুটি চোখের মত জল টলটল করছে, কোথাও বিপুল জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসে শিলাখণ্ডের ওপর সহস্রধারায় আছড়ে পড়ছে, আবার কোথাও হয়ত শিশু-নদীধারা আঁকাবাঁকা রেখায় উপত্যকা-পথে এগিয়ে চলেছে—এক কথায় প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের নিত্য নানা বিকাশ। বাস্তবিক, অ্যাকাডেমি গ্যালারিতে আয়োজিত শিল্পী প্রশান্ত রায়ের প্রদর্শনীকক্ষটি যতবার পরিক্রমা করেছি ততবারই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। প্রশান্ত রায় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শিষ্য, বয়সে প্রবীণ। দুটি কক্ষে তাঁর বিরাট শিল্পসম্ভার দেখে প্রথমেই প্রশ্ন জেগেছিল, আজকালকার প্রচারের যুগে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন কেন? তাঁর শিল্পনিদর্শন দেখে বুঝলাম, তিনি নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে—শান্তিনিকেতনে থেকে তিনি আপনার মনে শিল্পসাধনা করেন, তাতেই তাঁর আনন্দ ও সার্থকতা।

নমস্কার করে বললাম, এই বয়সেও এত চমৎকার আঁকেন—অপূর্ব আপনার হাত। সরল, সাদাসিধে ছোটখাটো মানুষ, সহাস্যে প্রশান্ত রায় প্রতিনমস্কার করলেন। বুঝলাম, মতামতে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হননি। গুরুর প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে করতে বললেন: তাঁর একটি অদ্ভুত গুণ ছিল, একটি ছবির ওপরে পর পর ছ'-সাতটি রঙ লাগাবার পরে ছ'টিতে যে কোন্ বিশেষ রঙ ফুটে উঠবে তা তিনি আগে থেকেই জানতে পারতেন। একটু থেমে আবার বললেন—ঠিক হাতে-কলমে তিনি কাউকেই শেখান নি। তিনি আঁকতেন, আমরা বসে বসে দেখতাম, আঁকতাম। কিন্তু কোনও প্রদর্শনীর সময়ে ছবি বিচারের মাপ ছিল খুবই উঁচু। তাঁর শিষ্যবর্গ বিষয়ে উল্লেখ করায় তিনি বললেন—দেখুন, অনেকেই আজ তাঁর শিষ্যরূপে নিজেদের পরিচয় দেন, কিন্তু ঠিক তাঁর প্রবর্তিত রীতি অনুসরণ করেছেন অল্প কয়েকজন মাত্র। দেওয়ালে ঝোলানো একটি ছবির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন—একটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন: মেঘ সাদা, চুল সাদা, বক সাদা, শাঁখা সাদা—এই সব সাদাই এঁকে দেখাও দেখি? ভাবলাম এ-যুগের উদীয়মান ক'জন শিল্পীই বা আজ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন?

প্রদর্শনীতে চার শ্রেণীর রচনানিদর্শন দেখা যায়—বাস্তবানুগ নিসর্গ দৃশ্য, তারতীয় ধারার চিত্র, চতুষ্কোণভিত্তিক নিদর্শন ও পৌত্রের উদ্দেশ্যে পাঠানো নানা পোস্টকার্ড চিত্রাবলী। সূক্ষ্ম রেখাবৈচিত্র্য, রঙ নির্বাচন ও ব্যবহারপ্রণালী (উইনসর নিউটন, রিভস ও রেওয়ার তৈরি বিশেষ আর্ট কালার) ও বিশেষ করে রঙের বিভিন্ন

ভাইব্রেশন ইন মার্বল —সুবল পাল

স্তরভেদের মধ্য দিয়ে শিল্প। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন: কেসেপেস্তো, উডেন ব্রিজ, ওয়াটারফল, মুনশাইন, এ হার্ট অ্যাণ্ড সলিচ্যুড ও বিশেষ করে পল্লী। অনেকের কাছে হয়ত এ-জাতীয় নিদর্শনাদি দুর্বোধ্য মনে হবে না। কিন্তু সে ধারণা অযথার্থ। যিনি রূপসী, তাঁকে যে বেশেই সাজানো হোক না কেন, তাঁর নিজস্ব স্বাভাবিক রূপ চোখে পড়বেই। বাস্তব বা বিমূর্ত যে কোনও রীতিতেই শিল্পী আঁকুন না কেন, দর্শকের চিত্ত অভিভূত হয় তখনই, যখন শিল্পী ছবিতে রসসঞ্চার করতে পারেন। এই রসসৃষ্টিই হল ছবি আঁকার মূল উদ্দেশ্য, রসোত্তীর্ণ হলেই ছবি দর্শকের মনের মণিকোঠায় গাঁথা থাকে, তা বাস্তববাদীই হোক বা প্রগতিবাদীই হোক। চতুষ্কোণপ্রধান রচনাগুলি আধুনিক শিল্পের গণ্ডীতে পড়ে। গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও, মনে হয়, শিল্পী এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছেন ও পরিকল্পনা, পরিপ্রেক্ষিত ও বিশেষ অঙ্কন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এ শ্রেণীর ছবিতে আরম্ভনিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। কোথাও শিল্পী পর পর চতুষ্কোণের মালা রচনা করেছেন, আবার কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ স্থানে চতুষ্কোণ ব্যবহার করে বাকী অংশ শূন্য রেখেছেন। তার ওপর আছে আলোক ও আঁধারের লুকোচুরি ও রঙের মায়াজাল। বিশেষ করে নীল, কালো ও বেগুনি রঙের বিভিন্ন স্তরভেদ সৃষ্টি করে এক-একটিতে কল্পলোকের মায়াপুরীর রূপদান করেছেন। রেখা ও রঙের মায়াজালে শিল্পী যেন স্বপ্নলোকের স্ফটিকস্বচ্ছ সাতমহলা প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। (ইকো, প্রিন্স অব দি ফেয়ারী ল্যাণ্ড, মাই কিং)। পোস্টকার্ড চিত্রমালায় শিল্পী সুন্দর ও সহজভাবে অপরূপ কৌশলে নানা কাহিনী বর্ণনা করেছেন—ক্যালিগ্রাফিক জাতীয় কয়েকটি নিদর্শন (জলের মধ্যে মাছ) ও বিশেষ করে একটি প্যানেলের বিভিন্ন অংশে একটি গ্রাম ও প্রান্তরকে কেন্দ্র করে আসন্ন বর্ষার মেঘসমারোহ, বৃষ্টিপাত ও বৃষ্টিস্নাত গ্রামের ধূসর রূপের যে আলেখ্য এঁকেছেন তা বোধ হয় অতুলনীয়। এই শিল্পীর শিল্পনিদর্শন দেখার সুযোগদান করে উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করে শিল্পীর শিল্পী-জামাতা রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের ধন্যবাদভাজন হলেন।

*

শিল্পী সুবল পাল অন্য জগতের মানুষ। তিনি বিমূর্ত শিল্পী—বহির্জগতের সমস্ত দৃশ্যই তিনি শিল্পীসুলভ চোখে দেখেন, মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ও সেই প্রতিক্রিয়ার রূপই তিনি তেলরঙের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এ শিল্পীর কাছে রেখার চেয়ে রঙের মূল্য অধিক, তাই মুখ্যত নানা বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে তিনি রঙীন ইমেজারির সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন নিদর্শন দেখেই বোঝা যায় যে, রঙ নির্বাচন ও ব্যবহার, উভয় বিষয়েই এই শিল্পী সিদ্ধহস্ত। শিল্পী যেন মায়াজগতের মাঝখানে বিচরণ করেন, অবলীলাক্রমে নির্বাচিত কয়েকটি রঙের আঁচড় টানেন, প্রয়োজনবোধে একের ওপর আর একটি রঙ চাপান—ফলে এক এক ক্ষেত্রে যেন এক-একটি নতুন রঙীন জগতের সৃষ্টি হয়। ব্রাশের চেয়ে তিনি প্যালেট নাইফ ব্যবহার করেন বেশী আরামে, ফলে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন আঁচড়ের টানের ফলে স্বতঃস্ফূর্ত আকার গ্রহণ করে এক-একটি ছবি যেন সজীব হয়ে ওঠে। যাঁরা ইতিপূর্বে এই শিল্পীর প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, এককালে ধূসর রঙের প্রতি শিল্পীর মমতা ছিল। সাম্প্রতিক রচনায় প্রাধান্য দেখা যায় ইণ্ডিয়ান রেড, নীল, সবুজ ও বেগুনী রঙের। প্যালেট নাইফের এক একটি টানেই তিনি এক একটি, বিশেষ করে নীল ও সাদা রঙের বিভিন্ন স্তরভেদ সৃষ্টি করে রচনা ক্ষেত্রে স্ফটিকের মত স্বচ্ছতা প্রকাশে বৈশিষ্ট্য এনেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ভাইব্রেশন ইন মার্বল-এর নাম করা যায়। সমগ্র রচনাক্ষেত্রটি গভীর নীলরঙে ভরে ফেলে মধ্যস্থলে আড়াআড়িভাবে প্যালেট নাইফের বিভিন্ন টানে নীল ও সাদা উল্লেখ্য। দু'এক স্থলে তাঁর রচনায় যেন শূন্যে ভাসমান একটি কাচের স্বপ্নপুরী বলে ভ্রম হয়। ফ্লেম অব ফ্লেশ ও প্যাস্টোরালও উল্লেখ্য। দু'এক স্থলে তাঁর রচনায় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেসনিজম-এর আভাস মেলে—যেমন পেলাস টটারস। ইণ্ডিয়ান রেড প্রধান রচনা ক্ষেত্রের ওপর একদিকে জমানো হলুদ রঙের ইমেজ ও অপর দিকে ঝরিয়ে দেওয়া সাদা রঙের প্রতীকমূলক আকার লক্ষণীয়। এই শিল্পীর আর একটি গুণ পরিচ্ছন্নতা। রঙ নির্বাচন প্রায় নির্ভুল। এঁর হাতে ব্রাশ ও প্যালেট নাইফ দুই-ই যেন কলমের কালির মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে। রঙের ওপর সম্পূর্ণ দখল না থাকলে রঙ প্রধান রচনা সৃষ্টি করার অনেক বিপদ—পুনরুক্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুখের বিষয় এই শিল্পীর কোনও রচনাতেই এ দোষ চোখে পড়ে না। অন্যান্য ছবির মধ্যে কম্পোজিশন, গার্ডিয়ান ও বিশেষ করে হারমনি ইন গ্রীন-এর নাম করা যায়। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় ছবি একান্ত অনুভূতির বস্তু, এক একটি নিদর্শন দেখে আনন্দ ও তৃপ্তিতে বুক ভরে ওঠে—অর্থের সন্ধান করতে যাওয়া নিরর্থক। প্রায় একই সময়ে ও একই গ্যালারীর পাশাপাশি কক্ষে ভিন্নধর্মী দু'জন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিদর্শন দেখে রসিকদর্শক যে আনন্দলাভ করলেন তা সহজে ভোলা যাবে না।

চিত্রপ্রিয়

নিকানামাহ্ সই করছেন বিবাহের পাত্রী

ইসলাম আইনে নারীর অধিকার

ইসলাম বিবাহকে ধর্মগত সংস্কার অথবা sacrament গণ্য করেন না। বিবাহ তাঁদের civil contract অর্থাৎ আইনের আওতায় এক চুক্তি। বিবাহে ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই। দুটি মাত্র সাক্ষী হলেই চলবে। কন্যার তরফে তার এক "ভকিল" অর্থাৎ উকীল থাকে। সাধারণত কন্যার পিতা বা কোন নিকট আত্মীয় এই কাজটি করে থাকেন। তাঁর কর্তব্য পাত্রীর স্বার্থ ও মঙ্গল রক্ষা করা। তবে কন্যার পিতা সর্বদাই কন্যাকে পাত্রে সম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত হতে চান। বিবাহকালে কন্যার ভবিষ্যৎ সমুচিত চিন্তা করার সেটি এক বিশেষ অন্তরায়। "মুহের" অর্থাৎ চুক্তিকালে পাত্র যে অর্থাদির প্রতিশ্রুতি দেন তাতে তার উত্তরকালের সংশ্লেষ সম্যক পরীক্ষা হয় না কোন কোন ক্ষেত্রে।

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে 'সারিয়াত্' সংজ্ঞা ইংরাজরাও দিয়েছেন। সারিয়াতের ভারতে আগমনের একটু ইতিহাস আছে। তুর্কী আফগান শাসনের পত্তন হয় পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর। তখনকার শাসন ঠিক মুঘল সাম্রাজ্য তো ছিল না। আইন-কানুন বিধি, ব্যবস্থা সবই অতি সাবধানে চালাতে হতো 'সাল্তানেত্'-এর শাসন-কর্তাদের। মুসলমান "উলেমা" দিতেন আরব কানুনের ভারতীয় অনুশাসন। কাজী করতেন বিচার। দুজনেরই প্রতাপ ছিল অখণ্ড। সুলতান তাঁদের সসম্মানে মেনে নিতেন। ভারতে এসে শারিয়াতের সামান্য অদলবদল ছিল অনিবার্য। সেই শারিয়াত্ আজও ঠিক কোরান শরিফের ব্যাখ্যায় নয়। যেমন ব্রিটিশ আইনের ফ্রেমে আঁটা আইন ভারতের আর সকল ক্ষেত্রে সময়ের গতি অনুযায়ী নয়, তেমনই প্রগতিসম্পন্ন মুসলমান সমাজ মনে করেন আইনে অর্থাৎ ব্যক্তিগত আইনে কিছু বদল হবার কাল এসে গেছে। বিশেষ করে মেয়েরা এখন আর গৃহধর্মচারিণী মাত্র নন, পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবেও তাঁরা আর থাকতে চান না।

ইসলাম আইনে বলে মুহের অর্থাৎ কন্যাপণের এক অংশ নববধূ স্বামীসহবাসের আগে পাবেন। কন্যাপণটি কাজেই দু ভাগ ভাগ করা। বর্তমান আইনের ভাষায় prompt এবং deferred. deferred পণটি হচ্ছে মুলতুবি রাখা অংশ। স্বামীর মৃত্যু অথবা বিবাহবিচ্ছেদ হলে পাবার কথা। নিকাহ্ নামা বা বিবাহের দলিলটি সই করা হয় যেভাবে নারী অনেক সময় তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও পান না। ক্ষেত্রবিশেষে আদালতের শরণ হয়তো মেয়েরা নেন। কিন্তু আদালতের জজসাহেব যা বিচার করবেন সেটা তাঁর কাছে আইনের ব্যাখ্যা যে রূপ গ্রহণ করবে সেই অনুসারে।

বিবাহবিচ্ছেদের সময় পুরুষ যত সহজে তালাক দিতে পারে মেয়েরা তা পারে না। "মুবারৎ"-এর ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি থাকে। অথচ কোরান শরিফে লেখা আছে নির্দোষ স্বামীকেও যদি স্ত্রী কোন বিশেষ কারণে ত্যাগ করতে চান এবং কারণ যদি ন্যায়সঙ্গত হয় তবে "খুলা" অর্থাৎ dissolution (পীতিপত্রের বা চুক্তির অবসান) হতে পারে। চুক্তি পুরুষকে যতটা অধিকার দেয়, মেয়েকে তা দেয় না। সামাজিক কারণে ভারতবর্ষে সমস্ত নারীসমাজ আজও সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত ও স্বাধীন কর্মধারার অধিকারী নন। কন্যা-পণের কানুনেও পুরুষ অনেক সময় ইচ্ছা

মত সেই নারীকে দিয়েই বদল করে নিতে পারেন। । ।

প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ কেরালা হাইকোর্টের একটি রায়কে অবলম্বন করে তাঁদের সমর্থনমূলক আলোচনা করছেন। বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার নূতন করে কোরান শরিফের ব্যাখ্যা তাঁর রায়-এ সংযুক্ত করেছেন। সোরাম্মার বিবাহ হয়েছিল ১৯৬২ সালে ইউসুফের সংগে। সোরাম্মার বয়স ছিল ১৫ আর ইউসুফের তার দ্বিগুণ। কিছুদিন মাত্র সে স্বামীর ঘর করে চলে যায় ও আলাদা থাকে। সোরাম্মা কয়েক বছর পরে বিবাহবিচ্ছেদের দাবী করে, কারণ "স্বামী তার খোরপোষ দেয় নি"। মুসলিম আইনে তার বিধান আছে। স্বামী আপত্তি করে। সোরাম্মার আচরণ গর্হিত হয়েছে এবং বিচ্ছেদের কারণ সে যা দেখিয়েছে তা এ গর্হিত আচরণে প্রাপ্য ছিল না। কৃষ্ণ আইয়ার বিচারে বললেন ইসলামের যে আইন এদেশে প্রচলিত তার চেয়ে আদি ইসলাম বিধি ব্যবস্থায় মেয়ের স্বাধীনতা ও অধিকার অনেক গুণ বেশী। civil contract-এ উভয়পক্ষের ইচ্ছার মূল্য বিচার করে চলার বিধানে বাধা নেই। প্রকৃত প্রাচীন ইসলামিক আইনে আধুনিক বিবাহব্যবস্থার বহু হদিশ পাওয়া যায়। প্রগতিশীল দেশের সিভিল ম্যারেজ আইন এবং আমাদের দেশের ১৯৫৪ সালের স্পেশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট চুক্তিতে উভয়পক্ষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে সেই স্বাধীনতার রেশ সেকালের মুসলিম আইনে নিহিত আছে। তফাৎ হয়েছে সমাজের ব্যবস্থার এবং আইনের গঠনে বিদেশী শাসনের ত্রুটিতে। বলাবাহুল্য তিনি সোরাম্মার দাবীই মানলেন। কিন্তু সোরাম্মা তো একটি মানুষ। সামাজিক ভাবে এবং আইনের মাঝে যা চলছে তার পরিবর্তন ওঁরা চান। প্রতিবাদও আসছে। রক্ষণশীল দল সব সময়ই পরিবর্তন বিরোধী।

আমাদের কলকাতা হাইকোর্টেও "হিজানত্" অর্থাৎ পুত্রকন্যার অভিভাবকত্ব নিয়ে বহু মামলা হয় এবং হয়েছে। বহু মজার মজার চুক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয়েছে। ১৮৭৪ সালে পুন্নুবিবির মামলা রুজু হয়। চুক্তিপত্রের অভিনবত্বে অসম্ভব এক অবস্থা দেখুন। পুন্নুবিবির স্বামীর চুক্তি ছিল : "That I shall never give you troubles in feeding and clothing you; that I shall make over to you and to nobody else besides you whatever money I shall draw from employment, that I shall never exercise any violence on you; that I shall not take you anywhere away from your home, that I shall not marry or make any nikah without your permission; that I shall not prevent those men from visiting you who have any relation to you or come to you for conducuing law suits ..., that I shall do nothing without your permission. শেষ লাইনটি সাংঘাতিক। পত্নীর অনুমতি ভিন্ন কিছুই করবো না। কাজেই পুন্নুবিবি একদিন দেখলেন প্রতিজ্ঞায় কোন ভাঙন ধরেছে। বিবাহ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ব্যবস্থা হলে দুদিক থেকেই লাভ। এই কারণে standardise করা বা প্রামিত করাও দরকার। বিবাহে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি নেহাৎ বিশেষ কারণ না হলে নিয়মবদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

পরিকল্পিত পরিবর্তনে প্রথম শর্ত একাধিক বিবাহ কোন পুরুষ করতে পারবে না। দ্বিতীয়—মেয়েরা স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করতে পারবেন। তৃতীয়—কোর্টে না গিয়ে বিচ্ছেদ পাবেন। বিবাহ বিচ্ছেদে সমান অধিকার থাকবে স্বামী ও স্ত্রীর। আরও অনেক পরিবর্তনের মুসাবিদা হয়েছে। তবে বিলটি কবে উপস্থাপিত হবে ঠিক হয় নি।

শ্রীমতী
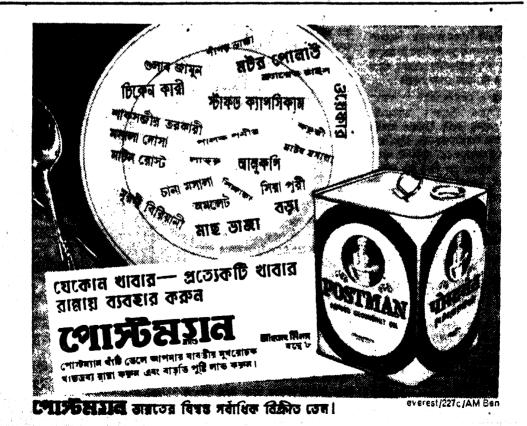
১৯৭১-৭২ সালের ব্যস্ত ঋতুতে রিজার্ভ ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার ঋণদান নীতি

গত নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার গভর্নর শ্রীএস্ জগন্নাথন বড় বড় ব্যাংকগুলির চেয়ারম্যান, তত্ত্বাবধায়ক (custodians) এবং প্রধান অফিসারদের সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হয়ে বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা ও মূল্য-স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১-৭২ সালের ব্যস্ত ঋতুতে (Busy Season) রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণদান নীতির সম্ভাব্য রূপ নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সকলেই একমত হন যে বর্তমান ঋণদান নীতি নির্ধারণে খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া দরকার। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালের ব্যস্ত ঋতুতে (Busy Season) সিডিউল্ড বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মোট আমানতের পরিমাণ বেড়েছিল যথাক্রমে ৩২১ কোটি টাকা এবং ৪৩২ কোটি টাকা। ১৯৭১-৭২ সালের ব্যস্ত ঋতুতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানত ৪৭৫ কোটি টাকা থেকে ৫০০ কোটি টাকা বাড়বে বলে অনুমিত হয়েছে। অপরদিকে ঋণদানের পরিমাণও অনুরূপ বাড়বে বলে অনুমিত হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে ঋণ সম্প্রসারণের পরিমাণ হয়েছিল যথাক্রমে ৫৬২ কোটি টাকা এবং ৩৯০ কোটি টাকা; ১৯৭১-৭২ সালের ব্যস্ত ঋতুতে ঋণ সম্প্রসারণের পরিমাণ প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা থেকে ৫০০ কোটি টাকার ভিতর থাকবে বলে অনুমিত

হয়েছে। এই পরিমাণ ঋণ সম্প্রসারিত হলে চিরাচরিত ঋণ গ্রহণকারীদের জন্য এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে; তাছাড়া অগ্রাধিকার প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে (Priority Sectors) প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করাও সম্ভব হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী আমানতের রিজার্ভ রাখার পর এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাংক রেট অথবা তাহা অপেক্ষা কম সুদে পুনঃ অর্থসংস্থানের সুবিধা (refinance facilities) পাবার পরেও ঋণ প্রদান করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে থাকবে বলে অনুমিত হয়েছে। তবুও রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর ঋণ প্রদানের পরিমাণ সীমিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উচিত, কোন উপায়ান্তর না থাকলেই শেষ পর্যায়ের কর্জদাতা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে পুনঃ অর্থ সংস্থানের জন্য স্বারস্থ হওয়া। শ্রীজগন্নাথন ব্যাংকগুলিকে বলেছেন, ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের শেষে তাদের দেওয়া ঋণের পরিমাণ যেন ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষে দেওয়া ঋণের চেয়ে বেশী না হয় (১৯১ কোটি টাকা)। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের পরিমাণ তাদের আমানতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে শ্রীজগন্নাথন মনে করেন। ব্যাংকগুলিকে জানানো হয়েছে যে (১) কৃষি ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী প্রত্যক্ষ ঋণ, (২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ, (৩) নির্বাচিত জেলাসমূহে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ প্রদান, এবং (৪) রপ্তানির অর্থসংস্থান, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ১৯৭০-৭১ সালে তারা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে যে পুনঃ ঋণ সরবরাহের সুবিধা ভোগ করত, এ বছরেও সেই শর্তগুলিই বজায় থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির (Selective Credit Controls) পরিবর্তন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে শিল্প ইউনিটগুলি যাতে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থসাহায্য পায় তার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে ঋণ দিয়ে থাকে তার পুনঃ অর্থসংস্থান করার জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের নীতি হল, ১৯৭১ সালের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এই ধরনের প্রদত্ত অগ্রিমের ৭৫ শতাংশ, আগস্ট মাস পর্যন্ত ৬০ শতাংশ এবং তার পর থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আবার অগ্রিম প্রদান করা।

বর্তমানে যে হারে টাকার যোগান বেড়েছে সেই হারে উৎপাদন বাড়ছে না; জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি খুব কঠোরভাবে কার্যকরী করা দরকার। অগ্রাধিকার প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলি যাতে প্রয়োজনীয় ঋণ পায় তা দেখা যেমন রিজার্ভ ব্যাংকের অন্যতম কর্তব্য, সেই প্রকার সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং মূল্যস্তরের ক্রমবর্ধমান হার প্রতিহত করাও রিজার্ভ ব্যাংকের অন্যতম কর্তব্য। 'স্থিতিশীলতার সঙ্গে উন্নয়ন,' চতুর্থ যোজনার এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই রিজার্ভ ব্যাংকের ঋণদান নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত।

উন্নতিকামী দেশগুলির জন্য সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানোর সুপারিশ

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (F A O) ডিরেক্টর জেনারেল সম্প্রতি এই সুপারিশ প্রদান করেছেন যে উন্নতিকামী দেশ-

আপনার খাঁটি রূপের জলুস ফুটিয়ে তুলুন— মাত্র ৭ দিনে

ফুটফুটে, কোমল, লাবণ্যময়…
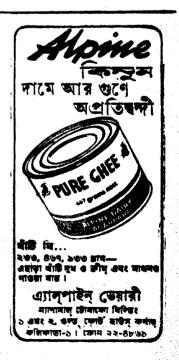
কিছু ঝামেলা নেই। পণ্ডস কোল্ড ক্রীম ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

আজ থেকেই রোজ রাতে দুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম ৭-দিন ধরে মাখুন।

দ্বিতীয়বার মাখলেই রূপের সাড়া জাগে।

আবার ক্রীম মাখুন। এই দ্বিতীয়বারেই রূপের সাড়া জাগে। কেননা পণ্ডস কোল্ড ক্রীম এবার ত্বকের গভীরে লুকনো সব ময়লা বার ক'রে আনে — যা সাবানজলেও করা যায় না। মুখশ্রী হয়ে ওঠে ফুটফুটে নির্মল।

আটদিনের দিন রাত পোহালেই দেখবেন, মুখখানি কেমন ফুটফুটে, লাবণ্যময়!

আপনার এই আসল মুখশ্রী দিনদিন অম্লান রাখতে হ'লে রোজ রাতে দুবার করে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখতে ভুলবেন না।

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম

মুখশ্রী নির্মলকারী এই ক্রীমের বিক্রীই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী

চীজব্রো-পণ্ডস্ ইনকরপোরেটেড

P6161A

...ক শিল্পোন্নত দেশগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ...র পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া ...ত। এখন পর্যন্ত উন্নত দেশগুলি অনগ্রসর বা উন্নতিকামী দেশগুলিকে তাদের জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ আর্থিক সাহায্য হিসাবে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে, এবং এখনও কয়েকটি উন্নত দেশ তাদের জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ সাহায্য হিসাবে উন্নতি-কামী দেশগুলিকে দিচ্ছে না। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল মনে করেন, শিল্পোন্নত দেশগুলির উচিত জাতীয় আয়ের ১ শতাংশের পরিবর্তে ২ শতাংশ সাহায্য হিসাবে অনগ্রসর বা উন্নতিকামী দেশগুলিকে দেওয়া। বিখ্যাত লাতিন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক প্রেবিশ (Prebisch) এই যুক্তির প্রধান প্রবক্তা। অধ্যাপক প্রেবিশ দেখিয়েছেন, অনগ্রসর দেশগুলি যে জিনিস উৎপাদন করে, বিশেষ করে কাঁচামাল, সেগুলির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়-সংবেদন-শীলতা (income-elasticity) হল ০·৬৬; অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎ-পাদিত শিল্প-সামগ্রীর জন্য লাতিন আমেরিকার অনগ্রসর দেশগুলির আয় সংবেদনশীলতা হল ১·৫৮, কিন্তু অন-গ্রসর দেশগুলির আমদানি করার ক্ষমতা সীমিত এবং তাদের সম্পত্তির পরিমাণও খুবই কম। উন্নত দেশগুলি অনগ্রসর দেশগুলির জিনিস আমদানি করার জন্য খুব আগ্রহী নয়। যদিও অনগ্রসর দেশ-গুলির কাঁচামাল উন্নত দেশগুলিতে চলে যায় তবুও সেই অনুপাতে অনগ্রসর দেশ-গুলি অনেক বেশি জিনিস উন্নত দেশ-গুলির কাছ থেকে আমদানি করে থাকে। সেজন্য উন্নত দেশগুলির উচিত আরও বেশি করে অনগ্রসর দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া। অধ্যাপক প্রেবিশ দ্বিতীয় ইউ এন সি টি এ ডি সম্মেলনে খুব জোরালো ভাষায় এই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। উন্নতিকামী দেশগুলি যখন দ্রুত রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে না, তখন উন্নত দেশগুলির যে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত সে বিষয়ে বহু অর্থনীতিবিদ অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বের সর্বপ্রধান শিল্পোন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক সাহায্য দেওয়ার কর্মসূচী পরিবর্তন করে দেয় সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সাম্প্রতিক 'সাহায্য প্রদান হ্রাস করার নীতি'র পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেলের সুপারিশ বিশেষভাবে সমর্থন-যোগ্য।

সুব্রত গুপ্ত

প্রতিটি পদক্ষেপ
আনন্দের...
বাটা সিতারা
হালকা আর হাওয়া খেলানো. বাটার এই স্যান্ডাল পায়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক আশ্চর্য পরিতৃপ্তি। বাটা সিতারার ছিমছাম ও কোমল গড়ন দেখে বোঝা যায়. এদের নির্মাণ ও নকশার প্রধান লক্ষ্য সারাদিনের স্নিগ্ধ আরাম। লাবণ্যময় সিতারা সব সাজেই মানানসই। এখানে তারই কয়েকটি নকশা যেগুলি এখন বাটার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। আজই আসুন পছন্দমতো একজোড়া বেছে নিন।
Bata

পাহাড়ী সান্ন্যাল

মানুষ অতুলপ্রসাদ

॥ নয় ॥

ধূর্জটিপ্রসাদ যখন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় আমার সেজদাও (ধীরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল) বাড়ির বাইরে বেরুচ্ছিলেন। তিনি ওই মানুষটিকে দেখে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ হে পাহাড়ী; ধূর্জটিবাবু বেরিয়ে গেলেন না?" তাঁর কথায় যেন মানুষটির প্রতি বিরাট সম্মানের ইঙ্গিত।

সম্মানের কথা বলতে গিয়ে আবার একটু অপ্রাসঙ্গিকতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। এই যে আমার সেজদা ধীরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, ইনি একটি অতি অদ্ভুত মানুষ। যেমন বা কড়া মেজাজ এবং স্ট্রিক্‌ট ডিসিপ্লিনারিয়ান, তেমনি নরম তাঁর মনটি। লখনৌয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে তিনি ধীরুদা। আমার নিজের কথা বলতে গেলে, এতখানি সম্মান আমি জীবনে বোধহয় খুব কম মানুষকেই দিয়েছি। আর তাঁর দিক থেকে যে অপার স্নেহ পেয়েছি তা বলে বোঝাবার নয়। আমার সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে যেভাবে সকল রকমে উৎসাহ পেয়েছিলাম সেটা আমার কাছে চিরস্মরণীয়। তিনি যেমন বা আমার উপর কড়া ছিলেন তেমনি আমি যখন যা চেয়েছি, যত টাকাই চেয়েছি, প্রশ্ন না করে তখনি তা দিয়েছেন। কারণ মনে মনে তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন। এই যে মিস্টার সেনের বাড়ি যে কোন সময়ে যাবার অনুমতি, সেটা আমার সেজদারই ইচ্ছা অনুযায়ী। কারণ, বাড়িতে সেজদার ওপরে কথা বলবার সাহস কারো কোনদিন হয় নি। সে তাঁর থেকে বড়ই হোন আর ছোটই হোক।

এহেন সেজদার মনে যে মিস্টার এ পি সেনের প্রতি কত বড় শ্রদ্ধা ছিল সেটা আমার তাঁর কাছে যাওয়ার অবাধ অনুমোদন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেজদা আমার থেকে বয়সে অনেক বড়, কাজেই তিনি মিস্টার এ পি সেনের মান বুঝতে পেরেছিলেন।

যাই হোক, আবার দিন যায়। আমিও আমার দাম্ভিক মন নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। কিংবা হয়তো বলা যেতে পারে, পৌছিয়ে যেতে থাকি। এরই মধ্যে একদিন আবার ধূর্জটিপ্রসাদের আবির্ভাব। এসেই বললেন, "ইউনিভার্সিটিতে আজকে কাজ নেই। তাই চলে এলাম এখানে। একটু গান শোনাও।" এবং খুব সরলভাবেই বললেন "এক পেয়ালা চা পেলে মন্দ হত না।"

বুদ্ধি মানুষকে কতখানি সহজ করে সেটা ক্রমে তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি আস্তে করে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। আর আমিও সেদিন খুব

নির্ভীক হয়ে তাঁর কাছে গান গাইতে লাগলাম।

গানের পর্ব শেষ হল। ধূর্জটিবাবু আমাকে বললেন, "আজ বিকেলে এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। যাবে আমার সঙ্গে।"

হঠাৎ সেজদার কড়া মেজাজের কথা মনে হল। তাঁর নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্ত নানা রকম নিষেধের কথা মনে উঁকিঝুঁকি দিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার এ কথাও মনে হল, যখন প্রথম দিন ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে, সেদিন তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় সেজদার উক্তির মধ্যে সম্মানেরই পরিচয় পেয়েছিলাম। কাজেই অবলীলাক্রমেই ধূর্জটিবাবুকে জানিয়ে দিলাম, "নিশ্চয় যাব।"

এই নিশ্চয়টা বলার পরেও সেজদার কড়া শাসনের ভয় কিছুটা মনের মধ্যে থেকেই গেল।

যাই হোক, বিকেল বেলা ধূর্জটি-প্রসাদের সঙ্গে নিয়ে একটি টাঙ্গায় করে আমরা দুজনে মিলে রওনা হলাম। গন্তব্য স্থান আমার জানা নেই।

গাড়ি যখন উইাম রোডের একটা বাড়িতে ঢুকল (তখন মিস্টার সেন কাএসরবাগের বাড়ি থেকে উইাম রোডে উঠে গেছেন, আর তাঁর নিজস্ব বাড়ি তখন এ পি সেন রোডে প্রস্তুতির পথে) তখন আমি কেমন একটা আনন্দে চমকে উঠলাম। এটা ভাল বাংলা হল কি না জানি না, কিন্তু তখনকার চমকটা যে আনন্দেরই ছিল এটা জানি। আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, "আরে! এটা তো মিস্টার সেনের বাড়ি!"

ধূর্জটিপ্রসাদ আমার কথা শুনে বোধ হয় কিছুটা থমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মিস্টার সেনকে চেন নাকি?"

আমি বললাম, "একটু একটু।"

এটা বলে মনে মনে খুব মজা পেলাম কিন্তু। কারণ, এ বিশ্বাসটা আমার ছিল যে মিস্টার এ পি সেন আর আমার পরিচয় 'একটু একটু'র থেকে কিছুটা বেশি।

এ কথাগুলো লিখতে যতটা সময় লাগল তার অনেক আগেই টাঙ্গাটা মিস্টার সেনের বাড়ির পোর্টিকোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ক' ধাপ সিঁড়ি উঠেই বাড়ির ল্যানডিং। তার পরেই ড্রইংরুম। মিস্টার সেন আরও অনেকের সঙ্গে ড্রইংরুমে উপস্থিত। আমায় দেখে বললেন, "আরে পাহাড়ী, তুমি এসে পড়েছ!"

ধূর্জটিপ্রসাদ উজ্জ্বল হাসি হেসে বললেন, "অতুলদা, এই ছেলেটি আমায় ঠকিয়েছে। এ আমায় বলেনি যে আপনাকে চেনে।"

আমিও অপ্রস্তুত না হয়েই বললাম, "আপনিও তো আমায় কোন সময় বলেননি

ধূর্জটিবাবু যে কোথায় নিয়ে আসছেন। শুধু বলেছিলেন, এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।"

অতুলপ্রসাদ উজ্জ্বল হাসি হেসে এই ঠকাঠকির ব্যাপারের রসগ্রহণ করে বললেন, "আরে, পাহাড়ীকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ও আমার কাছে গান শেখে।"

ধূর্জটিপ্রসাদ এটা শুনে খুব আনন্দিত বোধ করলেন বলে মনে হল।

এর পর মিস্টার এ পি সেন আমাকে বললেন, "এসো পাহাড়ী, এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।"

যে সব মানুষগুলির সঙ্গে আমার একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার সেন, তাঁরা সব নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক-একজন দিক্‌পাল। যেমন রাধাকমল মুখার্জী, রাধাকুমুদ মুখার্জী, বিনয় দাশগুপ্ত, নির্মল সিদ্ধান্ত—আরও যেন কারা ছিলেন আমার এখন আর মনে নেই। সকলের সঙ্গে পরিচয় করাবার সময় মিস্টার সেন আমাকে আস্তে করে বলে দিয়েছিলেন, "এঁদের প্রণাম কোরো।"

সকলকে প্রণাম করবার পর ধূর্জটিপ্রসাদের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, ইস্, একে তো গোড়ার দিকে প্রণাম করা হয় নি। মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন যে, "আর কিন্তু ধূর্জটিবাবু নয়। এবার থেকে শুধুই ধূর্জটিদা ডাকবে।"

মিস্টার সেন তখন হেসে বলে উঠলেন, "আমি পাহাড়ীকে এতদিন চিনি, কিন্তু ও এখনও আমাকে পর পর ভেবে মিস্টার সেন বলে ডাকে।"

আমি অনেকখানি অপ্রস্তুত হলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। কিন্তু এটুকু মনে আছে যে, সেইদিন থেকে আমি তাঁকে 'অতুলদা' বলেই ডাকতে আরম্ভ করলাম।

ধূর্জটিদা এবং আমি মিস্টার সেনের ওখানে গিয়ে পৌঁছানোর আগে হয়তো বা যেসব গূঢ় তত্ত্বকথার আলোচনা হচ্ছিল সেটা কেমন ধামাচাপা পড়ে গেল। অতুলদা হঠাৎ বলে উঠলেন, "তাহলে আজ আলোচনা থামিয়ে একটু গান-বাজনা করা যাক।"

এতে করে আসরের রসভঙ্গ হল কিংবা নতুন রসের সন্ধানে বসা গেল জানি না, কিন্তু আমার বেশ ভালই লাগল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম এই ভেবে যে হাঁ করে বসে বসে গুরুগম্ভীর আলোচনা শোনার হাত থেকে রেহাই পেলাম (এটা কি বাচালতার মত শোনাল?)। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলে হই-হই করে বললেন, "সেনমশাই, আপনার গান হোক।"

যথারীতি অতুলদার মুখে অপ্রস্তুতের হাসি। লজ্জার চাঞ্চল্য। আমি ধরে বসলাম, "অতুলদা, তোমার কাছে গান শিখি বটে, (এই প্রথম মিস্টার সেনকে 'অতুলদা' এবং 'তুমি' সম্বোধন করলাম) কিন্তু মন দিয়ে যে তোমার গান একটু শুনতে পাব সেটা এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। কাজেই সে সুযোগটুকু আমাকে দাও।"

অতুলদা খুব উঁচু গলায় অথচ অত্যন্ত মধুর হাসি হেসে বললেন, "আরে, আমি কি গাইব! আমি কি গাইতে পারি! বরং তুমি গাও। তোমার গান শুনতে আমার ভারি ভাল লাগে।"

আমি কিন্তু তখন নাছোড়বান্দা। আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও তদ্রূপ। কাজেই অতুলদা অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত অবস্থাতেই আমাকে হারমোনিয়ামে সুর টিপতে বললেন। আমার মনে হল, সত্যিই তো, আজও পর্যন্ত এরকম লোকজনের সামনে অতুলদার গান শোনার সুযোগ আমার ঘটেনি। এই পরিবেশে তাঁর গান শুনব এ কথাটা ভেবে ভারি রোমাঞ্চিত হলাম। আমি হারমোনিয়ামে সুর টিপলাম। উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম এই ভেবে, দেখি কি গান অতুলদা শুরু করেন।

যে গানখানি অতুলদা গাইতে আরম্ভ করলেন সেটি আজও আমার খুব ভাল করে মনে আছে। কারণ, গানটি শুনে এতই অভিভূত হয়েছিলাম যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শেখার কাজটা হয়ে এসেছিল। পারলে সেই সন্ধ্যাতেই পুরোপুরি ভাবে গানটি শিখে নিতাম, কিন্তু সেটা যে তখন আসর। তবে পরের দিনই অতুলদার ওখানে গিয়ে গানটি তাঁর কাছ থেকে আবার ভাল করে শিখে নিয়েছিলাম।

গানখানির প্রথম ছত্র হল : 'জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী/শূন্য করি লইবে মম চিত্তখানি'। আজও এ গান গেয়ে যে কি সুখ পাই তা আমিই জানি। শুনে কিন্তু তেমন সুখ পাই না।

এইবার অতুলদা আমায় বললে, "তুমি এবার গান গেয়ে আমায় গুরুদক্ষিণা দাও।"

আমি গানের সুরে তখন এতই মজে গেছি যে গান যেন নিজে হতেই গলা থেকে বেরুতে লাগল। গোড়াতে দু-একখানি হিন্দী গান করলাম, তারপর একের পর এক অতুলপ্রসাদ গেয়ে চললুম। সে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। যাঁরা শ্রোতা তাঁরা এমন ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন আমাকে সেই সন্ধ্যায় যে আমার মনে হয়েছিল, আজ বুঝি আর আমাকে চেষ্টা করে গাইতে হচ্ছে না।

একেই বোধহয় বলে পরম মুহূর্ত।

(ক্রমশ)

"দেশ" পত্রিকার সমালোচনা

কোনো পত্র পত্রিকা বা পূজো সংখ্যা হাতে পেয়ে একজন পাঠক কোন্ লেখাটা আগে পড়বে, সেটা দেখে পাঠকের রুচি ও লেখকের কৃতিত্বের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "দেশ" পত্রিকা হাতে পেয়ে আমি কোন্ লেখাটা আগে পড়ি? আচ্ছা, গোড়া থেকেই শুরু করা যাক।

প্রতি শনিবার সকালে এই পত্রিকাটি বাড়িতে আসে। কোনো শনিবার না এলে মনটা খুব আনচান করে। ভোরবেলা রাস্তা থেকে হকার পত্রিকাটা ছুঁড়ে দেয় আমাদের তিনতলার বারান্দায়, ধপ করে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনেই আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বারান্দায় যাই। কিছুকাল আগে পর্যন্ত পত্রিকাটি আমাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হতো, এখন বিনা পয়সায় পাই। বিনা পয়সায় পাওয়া জিনিসপত্র সম্পর্কে সাধারণত আগ্রহ থাকে না, যেমন বিনা পয়সার উপদেশ ও ওষুধ, তেমনই অনেক পত্র পত্রিকা কিংবা বই পেয়েও অনেক সময় পুরোটা পড়তে ইচ্ছে করে না—এই একটি মাত্র বিনা পয়সার জিনিস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ি।

পত্রিকাটা হাতে পেয়েই প্রথম কাজ হচ্ছে সবগুলো পাতা একবার করে উল্টে যাওয়া। মাঝে মাঝে নানা জায়গায় চোখ আটকে যায়। এই ফাঁকেই দেখা হয়ে যায় অরণ্যদেবের পাতাটা। বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলোতেও চোখ বুলোই—এর থেকে সাহিত্য জগতের নানান ওঠা পড়ার ছবি পাওয়া যায়—কখন কোন ধরনের কু সাহিত্য বাজার দখল করছে তাও বুঝতে পারি। যেমন "ঐতিহাসিক উপন্যাসের" বন্যার পর মাঝখানে কিছুদিন এসেছিল "চাঁদ সাহিত্য", এখন আবার "রাজনৈতিক উপন্যাস" ও "বাংলাদেশ রোমাঞ্চ"।

একবার সম্পূর্ণ পত্রিকাটা ওল্টানো হয়ে গেলে তারপর পড়তে শুরু করা। কোন্ লেখাটা প্রথম পড়বো—এ সম্পর্কে আমার কোনো বাঁধাধরা সিদ্ধান্ত নেই। তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রথমেই পড়তাম কাদার নাতিয়েনেব "ডায়েরির ছেঁড়াপাতা"। কোনো একটা সংখ্যাতেও নিরাশ হইনি। যেমন, আরও আগে, প্রথমেই আমার মন টেনে নিত, সৈয়দ মুজতবা আলীর "পঞ্চতন্ত্র"। আলী সাহেবের এখনকার পঞ্চতন্ত্রগুলি আমার মত পাঠকের পক্ষে একটু বেশী জটিল বলে মনে হয়।

সাধারণত গল্প উপন্যাস পড়া শুরু করার আগে আমার পড়তে ইচ্ছে করে "আলোচনা" বিভাগে পাঠকদের চিঠিপত্রগুলি। কত দূর দূর জায়গা থেকে অজানা অচেনা পাঠক

কী রকম বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় চিঠি লেখেন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই পত্রিকায় কারুর কোনো ভুল তথ্য চালিয়ে দেবার উপায় নেই—তাহলেই পান্ডুরং কিংবা ঝাঁঝা কিংবা রাজভাতখাওয়া থেকে কোনো পাঠক চিঠি লিখে সম্পাদককে সেটি জানিয়ে দেবেন। ঐ ধরনের জায়গাগুলিতে বাঘা বাঘা সমলোচকরা বসে আছেন।

এর পরেই তো রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য না পড়ে উপায় নেই। সংবাদভাষ্যের পর নবারুণ গুপ্তের দৃশ্যপট। এই ভদ্রলোকটি কে জানি না—কিন্তু লেখার ভঙ্গি দেখলে, মনে হয় পশ্চিম ব্যংলায় রাজনীতির সব খবর এঁর নখদর্পণে। লোকটি নিশ্চয়ই খুব রোগা—অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় তো। তারপর একে একে অন্য ফিচারগুলি পড়ে শেষ করি। দেবরাজের বৈদেশিকী, শ্রীমতীর ঘরে বাইরে, সমরজিৎ করের বিশ্ববিজ্ঞান, শার্ঙ্গদেবের গানের আসর, চিত্রপ্রিয়র চিত্র প্রদর্শনী। একটা কথা বিশেষ উল্লেখ করার মতন, এই পত্রিকার প্রত্যেকটি ফিচারই অত্যন্ত সুলিখিত। যে-যার বিষয়ে অভিজ্ঞ তো বটেই, ভাষা ব্যবহারও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এমন কি খেলার পাতা বা সিনেমার পাতার লেখকরাও ঝরঝরে সুন্দর বাংলা লেখেন। নইলে শ্রীমতীর 'ঘরে বাইরে' বিভাগটি তো আমার পড়ার কোনো কারণ নেই, ত্বকের সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় আমার না জানলেও চলে, তবু পড়ি, সুখপাঠ্য এই জন্য। সেই রকমই বোম্বাইয়ের সিনেমা জগৎ সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই—কিন্তু সরল শর্মা নামের ভদ্রলোক এমন বুদ্ধিমানের মতন লেখেন যে না পড়ে পারা যায় না। একমাত্র অর্থনীতির বিভাগটি একটু কষ্ট করে

পড়তে হয়—লেখার দোষে নয় আমার মেধার দোষে। ফিচারগুলির জন্য ঠিক ঠিক যোগ্য লেখককে খুঁজে বার করার উচিত সম্পাদকের।

দেশ পত্রিকার একটা কড়া সমালোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এ পত্রিকার ছাপা এত খারাপ কেন? এরকম বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকার ছাপা অনেক উন্নত হওয়া উচিত ছিল না? কি উন্নত হওয়া দূরে থাক—মাঝে মাঝে অনেক অংশ তো পড়াই যায় না। আর একটি অভিযোগ, পুস্তক সমালোচনা বিভাগটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যার এত কৃপণতা কেন? এই রকম একটি পত্রিকায় বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য বইগুলির বিস্তৃত পরিচয় অবশ্যই থাকা উচিত।

প্রথম পাতা ওল্টাবার সময়েই কবিতাগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে যাই। ফিচারগুলি শেষ করে কবিতায় আবার ফিরে আসি। ইদানীং অনেক নতুন নতুন কবির দেখা পাচ্ছি। ছোট গল্পও নতুন লেখকদেরই বেশী। তবে ইদানীংকার গল্প ও কবিতায় কেমন যেন একটা মন-মরা ভাব। তাঁর আমন্দের বা প্রচণ্ড বিদ্রোহের সুর খুব কম লেখাতেই উপস্থিত। শিবরাম চক্রবর্তীর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা' প্রতি সংখ্যা পড়ি আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি পরবর্তী সংখ্যার জন্য। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেখা হয় নাই" চমৎকার রচনা। শুধু পশ্চিম বাংলার কথাই নয়, বেশ বাঙালী ধরনের ভ্রমণ কাহিনী। প্রথমে ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতে ঐ সব জায়গায় যাবার জন্য এই লেখাগুলো কেটে জমিয়ে রাখবো—তারপর মনে হলো, বই নিশ্চয়ই বেরুবে—তখন কোনো ধনবান বন্ধুকে দিয়ে বইটি কিনিয়ে তারপর মেরে দেবে। দেব।

আর আখতার-এর "পদ্মা মেঘনা যমুনা"ও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে ইতিহাস বিবরণের বদলে (যে ইতিহাস এখন অনেকটাই জানা) যেখানে যেখানে ব্যক্তিগত কথাবার্তা থাকে সেখানেই বেশী ভালো লাগে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাটি অসমাপ্ত—একথা আগেই জেনেছি। তাই প্রতি সংখ্যা "গগনেন্দ্রনাথ" পড়তে পড়তে আশঙ্কা হয়, শীগগিরই থেমে না যায়!

ধারাবাহিক উপন্যাস সাধারণত মেয়েদের খাদ্য, যেমন সম্পাদকীয় প্রধানত পড়েন বুড়োরা। আমি ধারাবাহিক উপন্যাসে মাত স্থির রাখতে পারি না—এর আগে পড়েছি শুধু সতীনাথ ভাদুড়ির "দিগভ্রান্ত" এবং সন্তোষকুমার ঘোষের "শেষ নমস্কার"। কিন্তু বর্তমানে চলতি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও বিমল করের উপন্যাস দুটির আকর্ষণ এড়াতে পারছি না—সপ্তাহের পর সপ্তাহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও সব মনে থাকছে।

সকাল সাড়ে ন'টা পৌনে দশটার মধ্যে পুরো দেশটি আমার পড়া হয়ে যায়।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আমি এতক্ষণ আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলেছি। আসলে আমি নিজের লেখাটাই প্রথমে পড়েছি, সব লেখকই তাই করে। অন্য লেখকদের কথা জানি না, আমি কিন্তু নিজের লেখা একেবারেই পছন্দ করি না। এমন কি নির্জন ঘরে বসেও নিজের লেখা পড়তে লজ্জা করে। তবু "দেশ"-এর অন্য সব কিছু পড়া হয়ে গেলে "সাহিত্য সংবাদ" বিভাগটিতে চোখ রাখি—কোনো ভুল আছে কিনা দেখবার জন্য। পড়ার পর প্রত্যেকবারেই বিষম উপলব্ধি হয়, যা লিখতে চাই তা কিছুতেই ঠিক মতন লিখতে পারি না।

সনাতন পাঠক

সাহিত্য ও ধর্ম

Imagery in the **MAHABHARATA**
—Dr. Sudhisankar Bhattacharya
(Sanskrit Pustak Bhandar, 38, Bidhan Sarani, Calcutta-6; 1971, Price Rs. 15.00)

মহাভারতের কাব্যিক ধারণা এবং কল্পনা-প্রসূত শব্দালংকার নিয়ে মৌলিক গবেষণার একটি অনুপম নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই। ডক্টর ভট্টাচার্য ছয়টি অধ্যায়ে এই আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে মহাকাব্যে কাব্যিক ধারণার ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই কাব্যের সংজ্ঞা কী হতে পারে তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, যদিও এক কথায় কাব্যের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন আনন্দবর্ধন। তাঁর মতে বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি চূড়ান্ত পর্যায়ে বিলীন হয় রসধ্বনির মধ্যে। আলংকারিকদের মতে অলংকার 'রস'কে সাহায্য করে। ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে কাব্যিক ধারণা বা ভাব-মূর্তির (Poetic image) ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুন্দরকে নিঃশেষে উপভোগ করার যে আকুতি মানুষের মনে বাসা বেঁধে থাকে—মহাকাব্যের কাব্যিক ভাব-মূর্তি তা-ই জাগ্রত করে এবং কাব্যরসাস্বাদন মানুষকে এমন এক অধ্যাত্মলোকে উন্নীত করে যেখানে অনির্বচনীয় লোকোত্তর আনন্দের আস্বাদনে সঞ্জীবিত হবার সুযোগ ঘটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থকার এই কাব্যিক ভাবমূর্তির প্রয়োগরীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত কাব্য-সমালোচনার ধারা অনুযায়ী কবি হচ্ছেন সত্যদ্রষ্টা—সত্যকে জানা, গ্রহণ করা এবং প্রচার করার ক্ষমতা তাঁর থাকে। কাব্যিক-কলার প্রথম সুষমা-মণ্ডিত নিদর্শন রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি যেভাবে কাব্যিক ভাবমূর্তির উপস্থাপনা করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় প্রতিটি চরিত্রের চোখ দিয়ে নিজে বাল্মীকি প্রকৃতিকে দেখেছেন—ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে মিলন হয়েছে বাল্মীকির সত্যোপলব্ধির। আনন্দ-বর্ধনের মতে 'রস' হল সৃজনশীল কলার প্রধান নীতি—তাঁর উপদেশ হল, কবিকে দেখতে হবে, যুক্তি যেন কাব্যিক ধারণাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে না যায় যেখানে আবেগের প্রভাব ক্ষুন্ন হয়। কাব্যিক সুষমা সার্থক হয় যখন কাব্যের মধ্যে সাহিত্য-রস এবং প্রতীকের প্রয়োগ উভয়ই থাকে। প্রসংগত গ্রন্থকার মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতে'র কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকারের মূল বক্তব্যের সংগে আমরা পরিচিত হই তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে তিনি মহাভারত কতটা সাহিত্যানুগ কলার নিদর্শন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাচ্যের সমালোচকগণ মনে করেন, মহাভারত হল অর্থনৈতিক, রাষ্ট্র-নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক রীতিনীতির একটি উজ্জ্বলতম উৎস-গ্রন্থ। পাশ্চাত্যের সমালো-চকরা মনে করেন মহাভারত হল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতিপয় ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ; তাঁদের মতে মহাভারত একটি কাব্য-সৃষ্টি নয়, —মহাভারত হল, কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে

...র একটি কালজয়ী সাহিত্য। আনন্দবর্ধন মহাভারতকে একটি অভিনব কাব্য-সৃষ্টি হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন,—তাঁর মতে এই মহাকাব্যের আদি, মধ্য ও অন্ত সবই আছে। এই মহাকাব্যের চরিত্রগুলির চিত্রায়নে চূড়ান্ত উৎকর্ষ দেখিয়েছেন মহাকবি ব্যাসদেব। এ-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মহাভারতের 'কর্ণ' চরিত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। বীর শ্রেষ্ঠ কর্ণ ছিলেন কুন্তীর পুত্র। কিন্তু ভাগ্যদোষে অবস্থার বলি হিসেবে কর্ণ চরিত্র হয়েছে দুঃখ-বেদনা ও বঞ্চনায় অভিশপ্ত। অবস্থার বলি হয়েছিলেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও। মহাভারত যে কাব্যিক ভাবমূর্তির অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন,—মহাভারতের রচয়িতা যে একদিকে অনাসক্ত ও প্রশান্ত মনে অধ্যাত্ম সাধনায় পূর্ণতা লাভ করার মতবাদ প্রচার, এবং অপরদিকে কাব্যিক ভাবমূর্তির উপস্থাপনা ও মানবিক আবেদনসহ চরিত্র চিত্রায়নে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন গ্রন্থকার বিভিন্ন উদাহরণযোগে তা-ই পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে রামায়ণের কাব্যিক ভাবমূর্তি এবং মহাভারতের কাব্যিক ভাবমূর্তি একটি তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থটির মর্যাদা

নটিয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মহাকাব্যে ভাব-মূর্তির রূপান্তর এবং প্রকৃতির মনোহর রূপের বর্ণনা সম্পর্কে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকারের মতে মহাভারতে যে কবিক ভাবমূর্তি আমরা দেখতে পাই তার সদ্ব্যবহার করেছেন মহাকবি কালিদাস সহ পরবর্তী কালের কবিগণ। সমুদ্র, বনরাজি, তরুবীথিকা, পর্বতমালা সব কিছুরই সৌন্দর্য নিখুঁতভাবে মহাভারতে চিত্রিত হয়েছে। মানুষের চিরন্তন বৃত্তিগুলির নিখুঁত বিশ্লেষণও যে মহাভারতের রচয়িতার আরেকটি নৈপুণ্য গ্রন্থকার তা আলোচনা করেছেন গ্রন্থটির ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অতুলচন্দ্র সেন। অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি, ২৪০ যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৩১। মূল্য : পনেরো টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেদান্তদর্শনের সার বিধৃত। হিন্দুসমাজে এবং ভারতীয় জীবনে গীতার স্থান কোথায় তা-নিয়ে নতুন করে আলোচনা করার প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর-সাধনার জন্য যেমন গীতা ছাড়া চলে না, তেমনি যে-কোন আদর্শবাদীর জীবনেও গীতার প্রেরণা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় রয়েছে গীতাতে। তাই গীতা আধ্যাত্মিক সাধনা ও বেদান্তচর্চার জন্য যেমন অপরি-হার্য তেমনি ঈশ্বরবিশ্বাসী যে-কোন ব্যক্তির শান্তি ও শক্তিলাভের একমাত্র আশ্রয়। গীতার সর্বজনীন প্রভাব এই কারণেই অতুলনীয়।

একালেও বহু সাধক ও মনীষী গীতা-ভাষ্য রচনা করেছেন। গীতাকে সর্ব-সাধারণের বোধগম্য করার আর একটি সংপ্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র সেন —ব্যক্তিগত জীবনে যিনি গীতারই নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে অনুসরণ করে গেছেন। ফলে তাঁর গীতা-ব্যাখ্যা হয়েছে উপলব্ধি-জাত। এখানে শুষ্ক পান্ডিত্য নেই। তিনি তাঁর গীতা-ভাষ্যে মৌলিক কথা হয়ত বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু যা বলেছেন তা অনুভূতির গভীরতায় মৌলিক হয়ে উঠেছে। শ্রীসেনের ব্যাখ্যার ধরনটি সহজ, ভাষা প্রাঞ্জল। সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি গীতা আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যায় সাধনার ইঙ্গিতও আছে। নবম অধ্যায়ে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা..." শ্লোকের ব্যাখ্যার কথাই ধরা যাক। ব্যাখ্যাতা বলছেন, "ভক্তি ঠিক যেন পরশপাথর—যাহা স্পর্শ করে তাহাই সোনা হইয়া যায়।...জগাই মাধাই অতি পাষণ্ড ছিল; ভক্ত নিত্যানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা সাধু ও ভক্ত হইয়া গেল।...কিন্তু কথা হইতে পারে পাপীর চিত্ত তো সর্বদা ঈশ্বরবিমুখ। সে ভক্তি লাভ করিবে কি প্রকারে? ইহার প্রধান উপায় হইল সাধুসঙ্গ"। ব্যাখ্যার সঙ্গে ধর্মজীবন গঠনের ইঙ্গিত ও নির্দেশ প্রতি শ্লোকের আলোচনায় এমনিভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাই শ্রীসেনের গীতাভাষ্য যে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

গীতা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে এতে তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে। যথা, গীতার দার্শনিক চিন্তা—হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতাভাষ্য পরিক্রমা—শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী এবং প্রতীচ্যে গীতাচর্চা—অমলেন্দু বসু। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি গীতাতত্ত্ব এবং গীতার জনপ্রিয়তার উপর বিশেষ আলোকপাত করেছে। সব দিক থেকে বিচার করলে এই গীতা-ভাষ্য বাঙালীর ঘরে ঘরে আদৃত হবার উপযুক্ত!

টেবল টেনিসে উদীয়মান

পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি মাথায় উঁচু। মাথার লম্বা চুলের গোছা মুখের উপর এসে পড়ছে। সেই কালো চুলের আড়ালে দেখা যাচ্ছে ছেলেটির মুখের হাসি। আবার হাসির সঙ্গেই রয়েছে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে খেলাটা ওর কাছে নিছকই খেলা। কিন্তু ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে খেলা ওর কাছে জীবন-সাধনা, পরাজয় মানতে নারাজ।

হ্যাঁ, এই নভেম্বরের গোড়ার দিকে সেন্ট্রাল ওয়াই এম সি এ টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে সতেরো বছর বয়সী উঠতি খেলোয়াড় দিলীপ সিংহের দুটি খেলা দেখে সেই কথাই মনে হয়েছে। একটি খেলায় দিলীপ হারাল বাংলার প্রাক্তন র‍্যাঙ্কিং খেলোয়াড় রথীন মুখার্জীকে পুরুষদের প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে। আর একটি খেলায়—জুনিয়রদের সেমিফাইনাল খেলায় বাংলার দুই নম্বর জুনিয়র টি পি রায়কে হারিয়ে দিলীপ ফাইনালে উঠল।

বাংলার টেবল টেনিসে 'দিলীপ' উঠতি নাম। সুতরাং রথীন মুখার্জীর সঙ্গে ও কেমন খেলে তা দেখার স্বভাবতই আকর্ষণ ছিল। প্রথম গেম নিল রথীন ২১—১৭ পয়েন্টে। দিলীপ যেন হাসতে হাসতেই হেরে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয়ে দিলীপ রথীনকে ১২ পয়েন্টের বেশী অর্জন করতে দিল না। দিলীপ গেম পেল ২১—১২ পয়েন্টে। এবার মীমাংসাসূচক তৃতীয় গেম। দিলীপের দৃঢ়তা সত্ত্বেও রথীন এগিয়ে গেল ১৮—১২ পয়েন্টে। কিন্তু দিলীপ কি অত সহজে পরাভব স্বীকার করবে? হলই বা রথীন অনেক অভিজ্ঞ এবং নামকরা প্রতিদ্বন্দ্বী। দেখা গেল দিলীপের গভীর মনঃসংযোগ আর নিশ্ছিদ্র আত্মরক্ষার কৌশল। ফলে দিলীপের আর ৯ পয়েন্ট অর্জনের মধ্যে রথীন পেল মাত্র ১টি পয়েন্ট। ২১—১৯ পয়েন্টে গেম ও ম্যাচ জিতল দিলীপ সিংহ। হাতে হাতে তালি বেজে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-র ছোট্ট হল সরগরম হয়ে উঠল।

টি পি রায়ের সঙ্গে জুনিয়রের সেমিফাইনাল মীমাংসিত হল পাঁচ গেমে। মীমাংসাসূচক শেষ গেমে টি পি ২০—১৬ পয়েন্টে এগিয়ে। দিলীপের হার অনিবার্য। কিন্তু এবারও খেলার একই চেহারা। দিলীপ পর পর ৪টি পয়েন্ট নেবার পর ২০—২০ পয়েন্টে ডিউস হল। শেষ পর্যন্ত গেম ও ম্যাচ জিতল দিলীপ ২৪—২২ পয়েন্টে।

পুরুষদের সিঙ্গলসে বাংলার এক নম্বর খেলোয়াড় অজিত বসুকেও পাঁচ গেমে টেনে নিয়ে দিলীপ হেরে যায়। দিলীপের মুক্তকণ্ঠ স্বীকৃতি, সেন্ট্রাল ওয়াই এম সি এ-র ৩টি খেলা ওর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় খেলা।

'—জীবন তো বলতে গেলে শুরুই হয়নি এর মধ্যেই জীবনের স্মরণীয় খেলা!'

—এই আকস্মিক প্রশ্নে দিলীপ হাসল। খুব সাদা সরল হাসি। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, তবু যতগুলি খেলেছি তার মধ্যে।

সত্যি কমও তো খেলেনি এই এক বছরে। ১৯৭০-এ যে ছেলেটি আনরেজিস্টার্ড টুর্নামেন্টে ছাড়া কোন রেজিস্টার্ড টুর্নামেন্টে বিশেষ পাত্তা পায়নি, ১৯৭১-এ

দিলীপ সিংহ

তার সাফল্য সত্যিই চমকপ্রদ। এই এক বছরে দিলীপ বাংলার যে ৯টি র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় খেলেছে তার মধ্যে ৮টিতেই ফাইনালে উঠেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঁচটিতে, তিনটিতে রানার্স। শুধু বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে হেরে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে বাঁ-হাতি খেলোয়াড় বি বিক্কর কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে।

বাংলার এই নয়টি প্রতিযোগিতা ছাড়া ভারতের দুটি র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টেও দিলীপ যোগ দেয়। দুটিতেই রানার্সের সম্মান। ইডেনে ইস্ট ইন্ডিয়া রিজিওনাল টুর্নামেন্টের ফাইনালে পরাজিত হয়েছে দিল্লির এক নম্বর জুনিয়র খেলোয়াড় নবীন সচদেবের কাছে, সম্প্রতি জলন্ধরে নর্থ ইন্ডিয়া রিজিওনাল টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পরাজিত সচদেবের কাছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই বছর এ পর্যন্ত ১১টি প্রতিযোগিতার মধ্যে দিলীপ ৫টিতে চ্যাম্পিয়ন, ৫টিতে রানার্স। চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে কাস্টমস রিক্রিয়েশন, কাশিমবাজার, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, ওয়াই এম সি এ কলেজ ব্রাঞ্চ ও সেন্ট্রাল ওয়াই এম সি এ প্রতিযোগিতায়। আর রানার্স হয়েছে দার্জিলিং, বি বি এ সি এবং ত্রিবেণীর টুর্নামেন্টে। বলবার কথা তিনটি হারই বাংলার এক নম্বর জুনিয়র জ্ঞান মল্লিকের কাছে। আবার ৩টি ফাইনালে জ্ঞানের বিরুদ্ধেই জয়ের সম্মান। জ্ঞান ছাড়া বাংলার আর কোন জুনিয়র খেলোয়াড়ের কাছে এখনো পরাজয় স্বীকার করেনি দিলীপ সিংহ। উপরন্তু বহু প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে অর্থাৎ সিনিয়র ইভেন্টে কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়কে দিলীপের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। তা ছাড়া ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসেরও কিছু কিছু পুরস্কার রয়েছে ওর দখলে।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরার ছেলে দিলীপ সিংহ। বছর পাঁচ-ছয় আগে কলকাতায় এসেছে। খেলা আরম্ভ করেছে মাত্র দু'তিন বছর। তাও কোন বড় ক্লাবে নয়। পূর্ব কলকাতার নারকেলডাঙ্গা সাধারণ সমিতিতে যে সমিতিতে আছে মাত্র একটি টেবল টেনিস বোর্ড। তাও শাল কাঠ দিয়ে ছেলেদের হাতে তৈরি করা। পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশে ওখানেই খেলা শুরু। সম্প্রতি অবশ্য ওয়াই এম সি এ-তে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এখনো কোন ভাল গুরুর তালিম পায়নি। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে প্রকৃতির পাঠশালায় পড়েই দিলীপের যা কিছু বিদ্যার্জন। প্রথম দিকে ভাল হাতিয়ারও জোটেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের সময় পাঞ্জাব অ্যাসোসিয়েশনের জাপানী কোচ টি কোয়ায়াসি ওর আগ্রহ দেখে একটি রাবারের স্যান্ডউইচ দিয়ে গেছে। অবশ্যই কিছু দাম নিয়ে। ওই স্যান্ডউইচ পেয়ে দিলীপের আগ্রহ যেমন বেড়েছে তেমন খেলারও উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। সেই সঙ্গে আছে দিলীপের দাদা ও মার উৎসাহ। সিটি কলেজের প্রি-ইউনিভার্সিটির ছাত্র দিলীপের লেখা-পড়া ও খেলার দিকে মার সমান দৃষ্টি।

দিলীপ মুখ্যত ডিফেন্সিভ প্লেয়ার। অবশ্য ওর ব্যাকহ্যান্ড ফ্লিক এবং ফোরহ্যান্ড লুপে পাকা খেলোয়াড়ের মত। ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জি জগন্নাথ দিলীপের আদর্শ খেলোয়াড়। তার ছবি ও নিজের ঘরে বাঁধিয়ে রেখেছে। তার মতই খেলতে চেষ্টা করে।

জুনিয়র খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ এই বছরই ওর শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগামী ডিসেম্বরে হায়দরাবাদের জাতীয় আসরে দিলীপকে বাংলার সিনিয়র দলেও খেলতে দেখা যাবে। আর ওই আসরে জুনিয়র ইভেন্টে কিছুটা ভাল করতে পারলে ভারতের ক্রমপর্যায়ে উঁচু স্থান অবশ্যম্ভাবী। বাংলার ক্রমপর্যায়ের জন্য চিন্তা নেই। সেখানে ও 'র‍্যাংকিং নাম্বার ওয়ান'।

মুকুল

ভারতের ফুটবল দল কি ম্যানিখ যেতে পারবে ?

১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত অলিম্পিক ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় ভারত ৮টি ম্যাচ খেলেছে। এর মধ্যে জিতেছে মাত্র একটি ম্যাচে, মেলবোর্ন অলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৮-র অলিম্পিকে ভারত মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পায়নি। ১৯৭২-এর অলিম্পিকে কি করবে? প্রাথমিক পর্যায়ের বেড়া ডিঙিয়ে ভারতের ফুটবল দল কি ম্যানিখ যেতে পারবে?

ফুটবলের বর্তমান মান অনুযায়ী মনে হয় ভারতের পক্ষে ম্যানিখ যাওয়া শক্ত। গত আগস্টে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের ফলাফল মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ১২টি দেশের প্রতিযোগিতায় ভারত পেয়েছিল দশম স্থান। শুধু তাই নয়, গ্রুপ লীগে বরমার কাছে ৯—১ গোলে পরাজয় ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসের এক লজ্জাজনক ফলাফল। হংকং এবং ইন্দোনেশিয়ার কাছেও ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। তার আগে ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে ভারত ফুটবলে তৃতীয় স্থান দখল করলেও হার হয়েছিল জাপান ও বরমার কাছে। অলিম্পিকের প্রাথমিক প্রতিযোগিতায়—সেই বরমা এবং ইন্দোনেশিয়া ভারতের দুই শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। সিংহল, তাইল্যান্ড এবং ইজরাইলও রয়েছে ভারতের গ্রুপে। ২০ মার্চ থেকে রেঙ্গুনে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভের কথা।

সন্দেহ নেই বরমা এবং ইন্দোনেশিয়া আধুনিক ফুটবলে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কিন্তু মারডেকা ফুটবলে ইন্দোনেশিয়ার কাছে ভারত ২—১ গোলে পরাজিত হলেও কয়েকমাস আগে এশিয়ান গেমসের ফুটবলে ওই ইন্দোনেশিয়াকেই ভারতের কাছে ৩—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সুতরাং সাম্প্রতিক ফলাফল উৎসাহ ব্যঞ্জক না হলেও ভারত যদি পরিকল্পনা মত প্রস্তুতি সেরে রেঙ্গুনে যেতে পারে তবে ভাল না খেলারও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কেননা, এশিয়ান ফুটবলে কলানৈপুণ্যের দিক দিয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা এখনো শ্রেষ্ঠ। অভাব শুধু শারীরিক পটুতার। যার ফলে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে গোলে শট করার অক্ষমতা এবং সারা খেলায় প্রাধান্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পরাজয়। এই ত্রুটি শুধরে নিতে পারলে ভারতের সম্ভাবনা অবশ্যই উজ্জ্বল হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে ত্রুটি শুধরে নেওয়া যায় তার প্রমাণ দিয়েছে এশিয়ারই অপর একটি দেশ মালয়েশিয়া

সর্বপ্রথম ম্যানিখ অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার অর্জন করে। এশিয়া অঞ্চলের এক নম্বর গ্রুপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হিসাবে মালয়েশিয়া ম্যানিখ যাচ্ছে। অথচ নিজেদের দেশের প্রতিযোগিতা অর্থাৎ মারডেকা ফুটবলেই মালয়েশিয়া পেয়েছিল পঞ্চম স্থান। জার্মান কোচ ডেটমার ক্রেমারের কোচিংয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়েছে।

১৯৭০-এর ডিসেম্বরে যে বরমা এশিয়ান গেমসে ২—০ গোলে ভারতকে পরাজিত করেছিল, ৮ মাস পরে মারডেকায় ভারতের বিরুদ্ধে সেই বরমা ৯টি গোল করবে ভারতের ফুটবল মান কি এত নীচুতে নেমে গেছে? কিংবা বর্মার মান কি এত উঁচুতে উঠেছে? মনে হয় না। মনে হয় কোথায় যেন কি গলদ ছিল। বরমার কাছে ওই পরাজয়ের ফলে তদন্তের দাবী উঠেছে। কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমানে ওই তদন্তে কোন লাভ হবে না। বরং প্রস্তুতিতে বাধা পড়বে।

এই সপ্তাহ থেকে বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা আরম্ভ হল। রোভার্স শেষ হতে না হতে আরম্ভ হবে দিল্লিতে ডুরাণ্ড কাপের খেলা। প্রথমে ঠিক ছিল রোভার্সের খেলার পর প্রাক অলিম্পিকের কোচিং ক্যাম্প খোলা হবে। কিন্তু ডুরাণ্ডের খেলা এগিয়ে আসার ফলে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সময়ও হাতে বেশী নেই। মার্চ মাসের ২০ তারিখ থেকে যদি রেঙ্গুনে প্রাক অলিম্পিকের খেলা আরম্ভ হয়, তবে ভারতকে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে।

কোন অঞ্চল থেকে কটি দেশ ম্যানিখ অলিম্পিকে খেলার অধিকার পাবে এবং নভেম্বর পর্যন্ত অলিম্পিক ফুটবলের অবস্থা কেমন নীচে তার তালিকা দেওয়া হল:

আফ্রিকা অঞ্চল

এক নম্বর গ্রুপ—টিউনিসিয়া, মরোক্কো ও মালি;

দুই নম্বর গ্রুপ—ঘানা, টোগো, সেনেগাল ও ক্যামেরুনস;

তিন নম্বর গ্রুপ — ম্যাডাগাসকার, ইথিওপিয়া ও সুদান;

(প্রতি গ্রুপের বিজয়ী ম্যানিখ অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবে।

এশিয়ান অঞ্চল

এক নম্বর গ্রুপ—জাপান, কোরিয়া রিপাবলিক, ফিলিপিনস, তাইওয়াম ও মালয়েশিয়া;

(এশিয়ান অঞ্চলের এক নম্বর গ্রুপ থেকে মালয়েশিয়া ম্যানিখ অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার পেয়েছে। মালয়েশিয়া পরাজিত করেছে জাপানকে ৩—০ ও ০—০, কোরিয়া রিপাবলিককে ১—০ ও ০—০, তাইওয়ানকে ৩—০ ও ফিলিপিনসকে ৫—০ ও ৩—০ গোলে।)

দুই নম্বর গ্রুপ—বরমা, তাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, সিংহল ও ইজরাইল।

(দুই নম্বর গ্রুপ থেকে বিজয়ী দল ম্যানিখে খেলবে। খেলাগুলি হবে মার্চ মাসে রেঙ্গুনে।)

তিন নম্বর গ্রুপ—দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে ইরাক, কোরিয়া ডি পি আর, ইরান ও কোয়ায়েৎ।

(তিন নম্বর গ্রুপ থেকে একটি দল ম্যানিখ যাবে। ইরাক ও কোরিয়ার প্রথম ও ফিরতি খেলার বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ইরান ও কোয়ায়েতের প্রথম ও ফিরতি খেলার বিজয়ীর সঙ্গে। মীমাংসামূলক ওই খেলাটিও হবে দুবার দুই দেশে। ডিসেম্বরের মধ্যে খেলাগুলি শেষ করতে হবে।)

কনকাকাফ অঞ্চল

মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, আমেরিকা ও জামাইকা দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে। প্রতি দেশের সঙ্গে প্রতি দেশের দুবার করে খেলা হবে। একবার দেশের মাটিতে, একবার প্রতিদ্বন্দ্বীর দেশে। এই গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থানীয় দুটি দল ম্যানিখ যাবে।

ইউরোপ—দ্বিতীয় রাউণ্ড

এক নম্বর গ্রুপ—ফ্রান্স, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া;

দুই নম্বর গ্রুপ—পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া ও স্পেন;

তিন নম্বর গ্রুপ—যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানি;

চার নম্বর গ্রুপ—রুমানিয়া ও ডেনমার্ক;

(প্রতি গ্রুপের বিজয়ী দল ম্যুনিখ যাবে।)

দক্ষিণ আমেরিকা

এক নম্বর গ্রুপ—ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, বলিভিয়া ও আর্জেন্টিনা;

দুই নম্বর গ্রুপ—কলম্বিয়া, উরুগুয়ে-পেরু, প্যারাগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা;

(দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের প্রতি গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দুটি দল আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ম্যুনিখ যাবার অধিকার অর্জনের জন্য।)

তাহলে দাঁড়াচ্ছে আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে তিনটি করে ছ'টি দল, কনকাকাফ অঞ্চল থেকে দুটি দল, ইউরোপ অঞ্চল থেকে চারটি দল, দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে দুটি দল অর্থাৎ মোট ১৪টি দল ম্যুনিখ অলিম্পিকে যাবে। এ ছাড়া মেক্সিকো অলিম্পিকের বিজয়ী হাঙ্গেরী এবং অলিম্পিকের আয়োজনকারী দেশ পশ্চিম জার্মানি তো ম্যুনিখের মূল প্রতিযোগিতায় খেলারই অধিকারী।

তাজ ক্লাবের হ্যাটট্রিক

যদিও ভারতের প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে চিহ্নিত, তবু দিল্লির ডি সি এম ফুটবল প্রতিযোগিতা এখন পর্যন্ত মর্যাদায় আই এফ এ শীল্ড বা রোভার্স টুর্নামেন্টের সমপর্যায়ে আসেনি। আবার এ কথাও সত্যি কয়েক বছর ধরে আই এফ এ শীল্ডের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, নামকরা বাইরের দলগুলি যেভাবে দূরে সরে থাকছে, সে হিসাবে ডি সি এম ফুটবলে শক্তিশালী দলগুলির অংশ গ্রহণ অনেক বেশী। সেই ডি সি এম ট্রফি কিন্তু তিন বছর ধরে ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তেহেরানের তাজ ক্লাব যারা ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে ডি সি এম ট্রফি জয় করেছিল, তারা এবারও ডি সি এম জয় করে হ্যাটট্রিক করেছে। তাজ ক্লাব ফাইনালে পরাজিত করেছে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে ১—০ গোলে।

তার আগে রাজস্থান আর্মড কনস্টবুলারির দলকে ৪—০ গোলে, গোয়ার ভাস্কো ক্লাবকে ৪—২ গোলে এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে ১—০ গোলে পরাজিত করে তাজ ক্লাব ফাইনালে ওঠে। অপর দিক থেকে লীডার্স ক্লাব ফাইনালে ওঠে মফংলাল গ্রুপ মিলস, শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার ও কলকাতার শক্তিশালী ইস্ট বেঙ্গলকে পরাজিত করে।

লীডার্স ক্লাবের কাছে সেমিফাইনালে ইস্ট বেঙ্গলের ১—০ গোলে পরাজয় এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে না খেলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় অপ্রত্যাশিত। ইস্ট বেঙ্গল অবশ্য একটি আত্মঘাতী গোল খেয়ে এবং প্রচুর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও গোল করতে না পেরে হেরে গেছে। কিন্তু আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিদায় দুঃখজনক। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংই বর্ডার সিকিউরিটির বিরুদ্ধে একটি গোল করে এগিয়ে যায়। কিন্তু বর্ডার সিকিউরিটির খেলোয়াড়রা ওই গোলের প্রতিবাদে খেলতে অস্বীকার করে। মাঠের মধ্যে ইট পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ হয়। ফলে রেফারি খেলাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। রেফারি কিন্তু মহমেডানের গোল নাকচ করেন না। এই ক্ষেত্রে বর্ডার সিকিউরিটি দলকেই স্ক্র্যাচ করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা কমিটি দুই দলকে আবার খেলার নির্দেশ দেন। মহমেডান স্পোর্টিং আর খেলতে আসে না। ওয়াক ওভার পেয়ে বর্ডার সিকিউরিটি সেমি-ফাইনালে ওঠে।

ভারতীয় দলগুলির বিরুদ্ধে প্রাধান্যের পরিচয়ে তেহেরানের তাজ ক্লাবের পর পর ৩ বছর ডি সি এম ট্রফি জয় অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচয়। তবু তাজ ক্লাব ১৯৬৯ বা ১৯৭০-এর ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেনি। প্রধানত তাদের স্ট্রাইকার মাজলমির একক কৃতিত্বেই এবারকার ডি সি এম জয়। রাজস্থান আর্মড কনস্টবুলারির বিরুদ্ধে চারটি গোলের মধ্যে মাজলমি করেছে দুটি গোল। গোয়ার ভাসকো ক্লাবের বিরুদ্ধে চারটি গোলের মধ্যে চারটিই করেছে মাজলমি। তাছাড়া সেমিফাইনালে বর্ডার সিকিউরিটির বিরুদ্ধে মাজলমির গোলেই তাজ ক্লাবের ফাইনালে খেলার অধিকার এবং মাজলমির গোলেই লীডার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে ফাইনালে জয়।

একলব্য

কলকাতায় পোলিশ ছবি

ওয়াইদার "এভরিথিং ফর সেল"
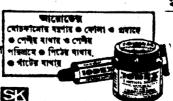
ফিল্ম-বোদ্ধা যাঁরা এখানে রয়েছেন অথবা ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা কোন না কোন সূত্রে জড়িত, তাঁদের মুখে মুংক, ওয়াইদা, পোলানস্কি প্রমুখ বিশিষ্ট পোলিশ চিত্র পরিচালকদের ছবির কথা প্রায়ই শোনা যায়। নানা পত্র-পত্রিকায় পোলিশ ছবি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এখানকার সাধারণ দর্শকদের সঙ্গেও পোলিশ চিত্রের পরিচয় নতুন নয়। এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হবে এবারকার পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে। ফেস্টিভ্যালের ছবিগুলির নাম ঘোষিত হবার পর দেখা গেছে, ফিল্ম ক্লাব সদস্যদের ওয়াইদার ছবি সম্পর্কেই আগ্রহ বেশি। বাইরের বোদ্ধা দর্শকেরও প্রিয় পরিচালক আঁদ্রে ওয়াইদা। এই ফেস্টিভ্যালে ওয়াইদার দুটি ছবি এসেছিল—এভরিথিং ফর সেল এবং অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস। এভরিথিং ফর সেল" এর আগে কলকাতায় আসেনি। "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস" আগে দেখানো হয়েছে।

ওয়াইদার "এভরিথিং ফর সেল" জটিল ছবি। ট্রিটমেন্ট-এর দিক থেকে তো বটেই, বিষয়ের দিক থেকেও। সকল সময় কালো চশমা-পরা অভিনেতা চিবুলস্কি ওয়াইদা-চিত্রে সশরীরে নেই, কিন্তু পরলোকগত অভিনেতার উপস্থিতি ছবিতে দর্শকরা সব সময়েই অনুভব করবেন। ছবির গোড়ায় অবশ্য বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিবিশেষের বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে এর যোগ নেই। তবু মনে হয়, রিয়ালিটি ও ইলিউশন একত্র করে নিয়ে এই ছবিতে একটি ফিল্ম ডোরর যে বিষয়বস্তু রয়েছে তাতে ওয়াইদা যেন চিবুলস্কিকে খুঁজেছেন সারাক্ষণ। ফিল্ম ইউনিট একটা ছবি তুলছে, একটা দুর্ঘটনার শট নেওয়া হচ্ছে। দৌড়বার সময় এক ব্যক্তি একটি চলন্ত ট্রেনের চাকার তলায় পড়বেন। অভিনেতা শুটিংয়ে আসেন নি। তাই পরিচালক নিজেই শিল্পীর ভাবনা-এর অভিনয় করে ফেললেন। অভিনেতা নিখোঁজ। তার স্ত্রী এলজবিয়েতা এবং পূর্ব-প্রণয়িনী বিয়েতা, যিনি এখন চিত্রপরিচালকের স্ত্রী, অভিনেতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ছবিতে তাঁদের বাস্তবজীবনেরই ভূমিকা — একজন স্ত্রী, অপরজন পূর্বপ্রণয়িনী।

বাস্তবের ঘটনা এবং ফিল্মের দৃশ্যের ঘটনা চলছে পাশাপাশি। এলজবিয়েতা ও বিয়েতা ফিল্মের শুটিংয়ে যা বলছেন ও করছেন তা যেন তাঁদের বাস্তব জীবনের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি—সেই নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণা। নিঃসঙ্গতার বোঝা বেশি বইতে হচ্ছে এলজবিয়েতাকে। বিয়েতা ও চিত্র পরিচালকের বিবাহিত জীবনের ম্যাল-অ্যাডজাস্টমেন্ট চিত্র-বস্তুর অন্য দিক। একদিন তাঁরা জানতে পারেন নিখোঁজ অভিনেতা দুর্ঘটনায় নিহত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিবুলস্কি বরাবরই ট্রেনে লাফিয়ে উঠতেন। তাতেই নাকি তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরিচালক ছবি তৈরির পরিকল্পনা তাই বলে ছেড়ে দেননি। হিরোর জায়গায় তিনি ড্যানিয়েলকে বেছে নিলেন। ড্যানিয়েল তাঁর একদা-সহকর্মীর বিকল্প সাজতে রাজী নন। যদিও বা শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন তবুও তাঁকে দিয়ে ছবির শট তোলা গেল না। চলন্ত ট্রেনের চাকার নিচের ওই দুর্ঘটনার শট আর নেওয়া হল না। শুটিংয়ের সময় ড্যানিয়েল দেখে লোকেশানের কাছাকাছি একটি ফার্মের ঘোড়াগুলি ছুটছে। ওই গতির নেশা যেন পেয়ে বসে ড্যানিয়েলকে। তিনিও ঘোড়াগুলির সঙ্গে ছুটতে লাগলেন। ঘোড়া ছুটছে, ড্যানিয়েল ছুটছেন। তারই মধ্যে ওয়াইদার ছবির সমাপ্তি। এক প্রচণ্ড জীবনবাসনার প্রতীক ড্যানিয়েল। পরিচালক হয়ত এই "প্যাশন"-এর প্রতীককে মধ্যেই তাঁর মৃত হিরোকে খুঁজে পেলেন। পরিচালক তাঁর ক্যামেরাম্যানকে বাধা দিলেন না, ঘোড়াগুলির সঙ্গে ড্যানিয়েল বল্গাহীনের মত ছুটতে থাকেন। এখানেই ছবি শেষ।

এ-ছবিতে অভিনীত চরিত্র শিল্পীর নিজের চরিত্র। শিল্পীর নিজের নামেই চরিত্রের নাম। বাস্তব ও কল্পনা মিলে-মিশে রয়েছে ছবির চিত্রপটে। শুটিং সেট থেকে ঘটনা চলে আসছে শিল্পীর সত্যিকারের জীবনে, আবার জীবন থেকে সেটে। শেষ পর্যন্ত ইলিউশন কিছুই থাকে না, সবটাই সত্যিকারের জীবনে পর্যবসিত। এবং তারই মধ্যে পরিচালক ও শিল্পীদের প্রকৃত অস্তিত্বের পরিচয়, যেখানে তাঁরা অস্থির, নিঃসঙ্গ অথচ প্রাণবন্ত।

ওয়াইদার এই ছবি একটা অসাধারণ এক্সপেরিমেন্ট। শুটিংয়ের সিকোয়েন্স এবং বাস্তব জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্যে তিনি কয়েকটি ব্যক্তির জীবন ও মনের গভীরে চলে গিয়েছেন। গতানুগতিক চিত্রপট বা ট্রিটমেন্ট তাঁর এই বিশ্লেষণের বিষয়কে প্রকাশ করতে পারত না। ফর্ম এবং কনটেন্ট—একটি অপরটির পরিপূরক। ট্রিটমেন্ট-এর দুরেকটি দিক ফরাসী নুভেল ভাগের কথা দর্শককে মনে করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ছবি শেষ হবার পর ওয়াইদার এক নতুন পরীক্ষার প্রভাবই দর্শকের মন ও বুদ্ধির উপর থেকে যায়। এবং সেটা ভাবায়।

পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন হয়েছে গত ২৬ নভেম্বর জ্যোতি সিনেমায়। ভারত সরকারের কালচারাল এক্সচেঞ্জ কর্মসূচী অনুযায়ী এই ফেস্টিভ্যালের ব্যবস্থা হয়। চিত্র-সূচীতে অন্যতম আকর্ষণ ওয়াইদার দুটি ছবি আছে। সে সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে।

ছদ্মবেশী

চলচ্চিত্র-ভারতী

উ[illegible] কমেডি "ছদ্মবেশী" যে আবার রিলিজ হল সে-কারণে দর্শকরা নিশ্চয়ই খুশী হবেন। তাঁরা আরও খুশী হবেন বাকপ্রকাশ গৌরহরি ড্রাইভারের বেশে উত্তমকুমারকে দেখে। কমেডি রোল-এ অভিনয়ের একটা সহজাত ক্ষমতা যে উত্তমকুমারের আছে সেটা এই ছবিতে বিশেষভাবে আবিষ্কার করা যেতে পারে। গৌরহরির কথাগুলি, প্রথম "ছদ্মবেশী" রিলিজ হবার পর, লোকের মুখে মুখে ফিরত। এখনকার দর্শকের অভিজ্ঞতা আরও বেশি, তাঁরা দেখেছেন অনেক কিছু। তাই তাঁদের খাতিরে রাখাটা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "ছদ্মবেশী"-র কৌতুকরঙ্গ এবং ডায়ালগ এমন মজার যে অন্তত প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল উঠবেই। এবং ছবি চলাকালে হাসির ধুম যে লেগেই থাকে হাসির আওয়াজে অনেক কথা যে শোনা যায় না, তার মূলে অনেকটা রয়েছে ড্রাইভারের বেশে উত্তমকুমারের বলার ধরন, কখনও বোকা বোকা ভাব, সরলতা ও বিনয়ের ভান ইত্যাদি। উত্তমকুমার গৌরহরি হয়েছেন বলেই ছবির অর্ধেক মজা। তাঁর স্ত্রী সুলেখা হয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী। নতুন বিয়ের পর স্বামীকে চোখের সামনে সুলেখা দেখছে ড্রাইভার হিসাবে। তার সঙ্গে মেলামেশার উপায় নেই, কথা বলার জো নেই। সুলেখার এই ফ্যাসাদে পড়ার ব্যাপারটা মাধবী চক্রবর্তী তাঁর হাব-ভাবে ও আচরণে সুন্দর প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ওই অবস্থায়ও নববিবাহিত জীবনের মধুর মুহূর্ত তারা রচনা করতে পেরেছে, তবে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। ওই সব রোমান্টিক মুহূর্তে মাধবী চক্রবর্তীর স্বাভাবিক অভিনয়ের ক্ষমতা, কখনও ভালো কখনও লাগে, দেখবার মত। সফিস্টিকেটেড ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তীর চরিত্রচিত্রণ খুবই পরিণত ও স্বচ্ছন্দ। এই রোমান্টিক জুটিকে আবার ছবিতে পেয়ে দর্শকরা খুবই খুশী হবেন বলা নিষ্প্রয়োজন।

ছবির আসল রঙ্গকাণ্ড শুরু হয়েছে যখন ডঃ অবনীশ মিত্র তার স্ত্রী সুলেখার দিদি-জামাইবাবুর এলাহাবাদের বাড়িতে ড্রাইভার সেজে এসেছে শ্যালিকা ও শ্যালিকাপতির সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল রসিকতার উদ্দেশ্যে। এখানেই ছবির আরম্ভ বলা যেতে পারে। ছবিটা সরাসরি এইভাবে আরম্ভ না করে, শুরুতে দর্শকের জন্য কিছুটা সাসপেনস রেখে আরও কিছু চমক দেওয়া যেত কি না কিংবা অবনীশ-সুলেখার বিষয় আর একটু থাকলে কেমন হত সে-প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে এলাহাবাদের পটভূমিতে কাহিনী শুরু হবার পর পরিচালক অগ্রদূত দর্শকের আনন্দ-উপভোগের দিক থেকে

কোন ত্রুটি রাখেননি। খুব স্বাভাবিক ভাবে তিনি ছবিটি টেনে নিয়ে গেছেন। এলাহাবাদ লোকেশানের চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছেন, পারিবারিক ঘটনার বাস্তবতার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন এবং সর্বোপরি দর্শকের সুখবিধানের জন্য প্রেম ও কৌতুকের পরিস্থিতিগুলিও সযত্নে সাজিয়েছেন। দর্শকের চিত্তবিনোদনের প্রতিশ্রুতি ছবিতে পূর্ণ, চিত্রপরিচালনাও সুষ্ঠু। গান বেশি আছে বলে তেমন ক্ষতি হয়নি। সুধীন দাশগুপ্ত গানের সুর দিয়েছেন চমৎকার। মান্না দে'র গাওয়া গানের সঙ্গে উত্তমকুমারের অঙ্গভঙ্গি বেশ রসপূর্ণ। মান্না ও আশা ভোঁসলে গানগুলি গেয়েছেন খুবই সুন্দর। অবাঙালীর মুখে হিন্দী গান গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল। এই গানটিও মন্দ নয়। ওই অবাঙালী তির হল মোসায়েব। জহর রায় এই চরিত্রের শিল্পী। তাঁকে নিয়েও কৌতুক হয়েছে এবং জহর রায়ও দর্শকদের যথেষ্ট হাসিয়েছেন।

অনেকটা কমিক ঢঙে অভিনয় করতে হয়েছে মোটামুটি সকলকেই। সুলেখার দাদাবাবু ও দিদির চরিত্রে বিকাশ রায় ও ছায়া দেবী ঘোষ এই ধরনের অভিনয়ের বিশেষ ক্ষমতা রাখেন। তাঁরা রীতিমত জমিয়ে দিয়েছেন ছবির কয়েকটি পর্ব। ছবির যেকে অবনীশ সেজে এসেছে তারই বন্ধু বিমল। সুবিমল ও বসুধার প্রেমপর্ব সংক্ষিপ্ত। এতেও কমেডির উপকরণ রয়েছে। সুবিমল কিছুতেই বসুধাকে বাঁধি পড়াতে পারছে না, কারণ সে তো আর সত্যিই বটানিতে ডক্টরেট পাওয়া অবনীশ নয়। এই সংকটে সুবিমলবেশী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের কমেডি-ধাঁচের অভিনয় বেশ উপভোগ্য। বসুধাকে অবশ্য পরে সুবিমল আত্মপরিচয় গোপনে দিয়েই ফেলেছে। ওই মুহূর্তেই বসুধা সুবিমলের প্রতি প্রণয়াসক্ত। প্রণয়ের ভাবটি সুনন্দা বিশ্বাস ভালই ফুটিয়েছেন। বস্তুত সুবিমলকে তখনও অবনীশ বলেই জানে বসুধার বৌদি। বৌদির এই অজ্ঞানিত এবং পরপুরুষের প্রতি ননদের আসক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অভিনয়ের দিক থেকে কোন ত্রুটি রাখেননি শমিতা বিশ্বাস। আসল রহস্য জানে হরিপদ (সুলেখার দাদা) ও বিনয় (অবনীশের বন্ধু —বসুধার দাদা)। মজাটা যে তারা কপট অজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বেশ উপভোগ করেছে সেটা অশোক মিত্র (হরিপদ) ও রেণুকুমারের অভিনয়ে পরিস্ফুট।

সুবিমল ও বসুধার মিলন উপলক্ষেই গৌরহরির ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে হয়। এ রঙ্গরসের ভিতর দিয়ে ছবিটি চলছিল সেটাকে ক্রমশ চড়িয়ে চড়িয়ে ক্লাইম্যাক্সে একটা হাসির বিস্ফোরণ ঘটানো যেত। কিন্তু ক্লাইম্যাক্স কেমন যেন হঠাৎ এসে গেল। একটা প্রচণ্ড রঙ্গপরিণতির জন্য দর্শকের প্রতীক্ষা ছিল, সেটা ঘটল না। ছবির এই অন্তিম পর্বের দিক বাদ দিলে চিত্রনাট্যটি (সুবীর হাজরা রচিত) এমনিতে সুগঠিত। তবে চিত্রনাট্যে আবার বিভাগ আছে, যখন সুবিমল ও বসুধার গল্প চলছে তখন পলাতক গৌরহরি ও সুলেখা কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য। চিত্রনাট্যের গঠনে যদি দুই উপাখ্যানেরই সহাবস্থান থাকত, শট ডিভিশনে দুই গল্পের নায়ক-নায়িকাদের দেখা যেত, তবে চিত্রনাট্যটি আরও ঘনবদ্ধ হতে পারত। অবশ্য আদ্যন্ত কমেডি দেখার কালে, যেখানে কেবলই হাসির উপকরণ, কোথাও কম কোথাও বেশি, এই অব্যবস্থার দিকে নজর দেবার অবকাশ দর্শকের থাকে না।

রাজ কাপুর প্রযোজিত "কাল আজ ঔর কাল" (পরিচালনা : রণধীর কাপুর) ছবিতে রণধীর কাপুর ও ববিতা

বোম্বাই বিচিত্রা

সেদিন এক সান্ধ্য বৈঠকে 'শিল্পে আধুনিকতা' বা 'আধুনিক শিল্প' নিয়ে হঠাৎ দুই দলে যুদ্ধ লেগে গেল। বৈঠকটি জমেছিল কোন এক বিত্তবান বুদ্ধিজীবীর বৈঠকখানায়। কিন্তু আসর জমিয়ে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই সরল শর্মার মত মধ্যবিত্ত। আজকাল এক বিশেষ মহলের মতে সিনেমাই হল সত্যিকারের আধুনিক শিল্প, সুতরাং শিল্পালোচনা মানেই সিনেমালোচনা। কাজেই কাফির গরমে জিভ গরম হতে না হতেই এককজন চশমার কাচ মুছতে মুছতে শুরু করলেন!

প্রথমবক্তার বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, তিনি যে দলের লোক সে দল আজকাল সত্যজিৎ রায়কে কনডেমনেশনাল ফিল্ম মেকার বলে গণ্য করছে। তাঁর মতে মণি কাউল, ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতি ছাড়া ভারতবর্ষে ফিল্ম মেকার নেই। ভদ্রলোক তাঁর মতকে সমর্থন করতে সিনেমা সংস্কারের নানা মুনির নানান মত উদ্ধৃত করলেন। ক্ষণে ক্ষণে শ্রোতারা অবাক হচ্ছিল বক্তার স্মৃতিশক্তির নমুনা দেখে।

প্রথম বক্তা একাই প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বকলেন। তারপর এল দ্বিতীয় বক্তার পালা। দ্বিতীয় বক্তার মতও প্রায় প্রথম বক্তারই অনুরূপ, কিন্তু তিনি সুবক্তা নন বলে তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত হল মিনিট পনেরর মাথায়।

তৃতীয় বক্তার স্বরটি বড়ই মধুর। কিন্তু সিনেমা সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা কম বলে তিনি সবিনয়ে বক্তব্য আরম্ভ করলেন, "দেখুন আপনারা সকলে পণ্ডিত লোক, আপনারা অনায়াসে কোন্ ছবি ভাল এবং কোন্ ছবি মন্দ তার বিচার করতে পারেন। আমি সাধারণ দর্শক। আমি শুধু বলতে পারি আমার কোন্ ছবি ভাল লাগল এবং কোন্ ছবি লাগল না। যে ছবি বুঝতে বই পড়তে হয়, সে ছবি দেখে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। এবং যেসব ছবিতে ছবির পরিচালক গায়ের জোরে প্রত্যেক ফ্রেমে উপস্থিত থাকতে চান সে সব ছবিও আমার ভাল লাগে না। আমার সত্যজিৎ রায় ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে যদি জানতে চান

...তে এবং বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আপনারা কেউ-ই' উসকী রোটী যেমন ভাল ছবি সে কথা বলতে পারবেন না, শুধু বলছেন উসকী রোটী ইন্টেলিজেন্ট। আমার মতে কেবল ভিন্ন ধরনের কোনো বিশেষ গুণ নয়। আমার মনে এই ছবি খুব কষ্টকল্পিত ছবি বলে মনে হয়েছে আর সেই জন্যেই ভালো লাগে নি।"

তৃতীয় বক্তার কথায় প্রথম বক্তা তো চটে লাল। তিনি বললেন, "আপনি কনভেনশনাল দর্শক আপনার কথায় কারুর কান দেওয়া উচিত নয়। আপনি জেনোর ছবি দেখেন নি আপনি উসকী রোটী বোঝেন না। আপনি দ্যুকোর তত্ত্ব জানেন না, শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি আপনার কোনো সহানুভূতি নেই, 'এলিয়েনেশন' তত্ত্ব সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই। সত্যজিৎ রায় আপনারা বোঝেন কারণ ছবির মাধ্যমে তিনি এখনও সাহিত্য পরিবেশন করেন।"

এইবার তৃতীয় বক্তার স্বর একটু কর্কশ হল! তিনি বললেন, "উসকী রোটীর ওরিজিন্যাল গল্পটা আমি পড়েছি। সুতরাং আপনার মণি কাউলও সিনেমায় সাহিত্য পরিবেশনই করছেন। কেবল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পার্থক্য এইটুকুই যে, সত্যজিৎ রায় যখন সাহিত্যকে সিনেমায় পরিবেশন করছেন তখন আমরা সেই সাহিত্যের ওপর আরো কিছু পাচ্ছি। আমাদের ভাল লাগছে। কিন্তু উসকী রোটীর মূল কাহিনী পাঠে যে আনন্দ পেয়েছি উসকী রোটী দেখে সেটুকুও পাইনি।"

"অপর্ণা" (পরিচালনা ঃ সলিল সেন) ছবিতে তনুজা

প্রথম বক্তা তবু নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, "এ সব কথা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর, আপনারা যাঁরা মণি কাউলকে মিট করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন, উনি কত মাইডিয়ার এবং কত স্বাভাবিক, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মত দাম্ভিক লোককে কেউ কখনো এ যুগ-যন্ত্রণার শিল্পী হিসেবে স্বীকার করতেই পারে না।"

উত্তর দিতে তৃতীয় বক্তা তৈরি কিন্তু বাদ সাধলেন বিত্তবান বুদ্ধিজীবী যাঁর বৈঠকখানায় সেদিন আসর জমেছিল। তিনি হঠাৎ প্রথম বক্তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি সত্যজিৎ রায়কে মিট করেছেন?"

প্রথম বক্তা বললেন, "—কিন্তু..."

"ব্যস" প্রথম বক্তাকে থামিয়ে দিলেন বিত্তবান বুদ্ধিজীবী। তারপর প্রায় বিজ্ঞের মত শুরু করলেন তিনি। বললেন, "শিল্পীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিল্প বিচারের মত মূর্খামি আর নেই। ছবির প্রদর্শন এবং দর্শকের দর্শন এই মিলে যদি ছবির টোটাল এফেক্ট না হয় তা হলে বুঝতে হবে কোথাও একটা গলদ আছে। আপনাদের একটা কথা বলি, সৌভাগ্যই বলুন কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন আর বা অন্য কোনো কারণেই নয়, আমি বেশ কয়েকবার পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছি, এবং আজকালকার নামকরা প্রায় সকলের ছবি দেখেছি। কারুর কারুর ছবি ভাল লেগেছে, আবার অনেক ছবি দেখে বাইরে বেরিয়েই আনাসিন খেয়েছি। আমরা এখানে বসে যে ধরনের আলোচনা করছি, এ ধরনের অনেক আলোচনাতেও যোগ দিয়েছি দেশের বাইরে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে, এ ধরনের আলাপ-আলোচনা এক ধরনের আত্মরতি, এক ধরনের মানসিক রোগ। সকলেই আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে দল গড়তে চাই। গল্পকে নির্বাসন দিতে গিয়ে নতুন গল্প ফেঁদে বসি। এই দেখুন না, সেদিন যেন কোন কাগজে পড়লাম, কোনো এক নতুন পরিচালক বলেছে, "মাই ফিল্মস আর নট ফর মাসেস"। বেশ কথা। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে শুধু যা ইচ্ছে তাই নয় যাচ্ছেতাই করারও অধিকার আছে সকলের। কিন্তু যে সাধারণ দর্শকের জন্য ছবি করে না, সে সাধারণ পাঠকের জন্য ইন্টারভিউ দেয় কেন? আর তাকে নিয়ে আমরাই বা এত মাতামাতি করব কেন? এই যে আপনারা আজ একেবারে মাথায় রক্ত উঠিয়ে যে সব ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করছেন, সেই সব ব্যক্তিদের সম্পর্কে আপনারা প্রায় কেউই কিছুই জানেন না। সত্যি কথা বলতে কি জানার দরকারই বা কতটুকু। আমার মনে হয় এবার থেকে আমাদের আলোচনা হওয়া উচিত ছবির ওপর। আজ এখানেই সভা সাঙ্গ হোক।

সরল শর্মা

ব্রেখট সংগীতশিল্পী ভেরা ওলফ্রেগেল

কলকাতায় পূর্ব জার্মানীর বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ভেরা ওলফেগেল ব্রেখটের গান শুনিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠান হয়েছিল ২৫ নভেম্বর, য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। এর আগে ভেরা ওলফেগেল দিল্লি ও পাটনায় গান গেয়েছেন। ভেরা ওলফেগেল তাঁর দেশে ফিল্ম এবং টেলিভিশনের অভিনেত্রী হিসাবেও বিখ্যাত। তবে গানই তাঁর প্রথম প্রেম। ১৯৬৬ সনে তিনি "এনসেম্বল ৬৬" প্রতিষ্ঠা করেন। এতে পূর্ব জার্মানীর বিশিষ্ট যন্ত্রশিল্পীরা যোগ দেন। ভেরা ওলফেগেল অন্যান্য কবিদের গানও গেয়ে থাকেন। কিন্তু কলকাতায় ব্রেখটের কদর বেশি, তাই তিনি এখানকার অনুষ্ঠানে ব্রেখটের গানই গেয়েছিলেন। ব্রেখটের নাটকের বিভিন্ন গান শ্রোতাদের প্রভূত আনন্দ দেয়। ব্রেখটের "থ্রি পেনি অপেরা", "ম্যাদার কারেজ", "দি মাদার", "দি

ভেরা ওলশ্লেগান

ডেজ অব দি কমিউন" প্রভৃতি রচনার গান অনুষ্ঠানে ছিল। ব্রেখট-সন্ধ্যার গান এখানকার শ্রোতাদের অনেকদিন মনে থাকবে।

চিৎপুর-চিত্র

'বিষ্ণুপ্রিয়া'

বহু যাত্রামোদীর অভিযোগ ছিল 'যাত্রাগান' এখন গান বর্জিত, কেবল যাত্রায় পরিণত। এর জন্যে দর্শকদেরও দোষী সাব্যস্ত করা হত। যেহেতু তাঁরা, অভিযোগকারীদের মতে, এই 'অনাচারকে' প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। আসলে কিন্তু দোষী কেউই নন। গান বা অভিনয়, যে শিল্প-মাধ্যমেই হোক, তার পরিমিত প্রয়োগ যদি রসসৃষ্টিতে সমর্থ হয় তো তাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা আসার কথাই উঠতে পারে না। এই কথাটি যে কত বড় সত্য তা দেখলাম আসানসোলের এক যাত্রার আসরে। বারো থেকে পনেরো হাজার দর্শক সেদিন বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন আসরের দিকে। আরম্ভেই 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র গান। স্থান গঙ্গাতীর। কাঞ্চনে আর বিষ্ণুপ্রিয়ায় গানে গানে কথা। অবাক হয়ে দেখলাম ভক্তিরসের এই গানগুলি দর্শকদের যেন মন্ত্রাবিষ্ট করে ফেলেছিল।

পালার নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া', প্রযোজনা নিউ রয়েল বীণাপানি অপেরার। প্রায় পৌনে চার ঘণ্টা এর অভিনয়-কাল। এর মধ্যে দৃশ্যে দৃশ্যে দর্শকসারি থেকে অসংখ্য মহিলা-কণ্ঠ উলুধ্বনি দিয়ে উঠেছেন। 'জয় গৌর, জয় নিতাই' বলে হাজার হাজার কণ্ঠের চিৎকার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে। আবার দেখেছি, অনেকের চোখে অশ্রুর অবিরল ধারা। ধর্ম তথা ভক্তিরস এ-কালে মানুষকে এমন আবিষ্ট করে ফেলতে পারে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া' না দেখলে তা বিশ্বাস করতে পারতাম না কিছুতেই।

আসলে মূল কথা সেই রস। নিউ রয়েল বীণাপানির নিখুঁতপূর্ব প্রয়োগ, শিল্পীদের অসামান্য অভিনয়, গান ও তার সুরের গভীর আবেদন এবং পরিচালক সন্তোষ সিংহ সৃষ্ট কয়েকটি অতুলনীয় নাট্যমুহূর্ত সব মিলেমিশে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'কে অনুপম করে তুলেছে। নইলে ভাবা যায় না, ছোট বড় প্রায় ত্রিশখানা গানের ব্যবহার সত্ত্বেও কোথাও আমরা ক্লান্তি বোধ করি নি। দেখিনি কোনো দর্শক এক সেকেণ্ডের জন্যেও তাঁর আসন ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়া দূরে থাক, যাওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। কেন? কারণ সুরকার অমিয় ভট্টাচার্য-কৃত প্রত্যেকটি গানের সুরে ছিল চমৎকার বৈচিত্র্য। গান আর নাটক এখানে আলাদা করা যাবে না। এক দুর্বল হলে অন্য মিথ্যা। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পালার এই যে রসসৃষ্টি তাই দর্শককে আকুল, রসোন্মত্ত করে তোলে। বহুক্ষেত্রে অতীতের কৃষ্ণযাত্রার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

পালাকার নরেশ চক্রবর্তীর রচনা সম্পর্কে অতঃপর বোধ হয় প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। ষোলোটি দৃশ্যের এই নাটকে তিনি আশ্চর্য এক গতিবেগ সৃষ্টি করেছেন—যার উপস্থাপনা দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। তবু কয়েকটি প্রশ্ন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কথাটি বারংবার উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও শাক্তধর্মের প্রতি কি তিনি যথেষ্ট সুবিচার করেছেন? সমগ্র নাটকটিতে এই ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করার প্রবণতা বর্জিত হলে বোধ হয় নিরপেক্ষতা বজায় থাকতে পারত। সংলাপ সুন্দর। কিন্তু কোথাও কোথাও অঘোর কাব্যশাস্ত্রী এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর কথা কি বড় বেশি করে মনে করায় না? নিত্যানন্দ চরিত্রটি কি স্বচ্ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত? সর্বত্র ইতিহাসসম্মত হয়ে উঠেছে কী?

নাম ভূমিকায় নবাগতা তারা পাল অসম্ভব অভিনয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যের গাওয়া গান থেকে সেই যে তিনি দর্শকচিত্তে প্রবল রেখাপাত করেন, ষোলোটি দৃশ্যের কোথাও তা ফিকে হয়ে যেতে দেখি নি। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, বাচনপ্রতীক মুখভঙ্গি এবং বিস্ময়কর মাত্রাবোধ ও সংযম আগাগোড়া তাঁকে ভাস্বর করে রেখেছিল। পালায় তিনি একাই গেয়েছেন দশখানা গান। সখী কাঞ্চন রূপী শেফালী দে অনেকদিন পরে এক অপূর্ব চরিত্রসৃষ্টি উপহার দিয়েছেন। ওঁর গান এবং অভিনয় দুইই এ-পালাকে ব্যঞ্জনাময় করতে সাহায্য করেছে। 'নিমাই' চরিত্রে স্বিজু ভাওয়ালকে অপূর্ব মানিয়েছিল। যতবার তিনি আসরে এসেছেন, দর্শক মহলে মৃদু উচ্ছ্বাসের গুঞ্জরণ উঠেছে ততবার। এ-চরিত্রের ভাবরূপকে

"জনতার আদালত" (পরিচালনা : মধুকর) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

তিনি শিল্পীর উপলব্ধিতে রেখায়িত করেছেন। তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে পনেরো হাজার দর্শকচিত্ত তরঙ্গায়িত হতে দেখেছি। কিন্তু যতদূর শুনেছি, মহাপ্রভুর নৃত্যরীতি এখানে হুবহু ব্যবহৃত নয়। 'নিতাই' চরিত্রে 'জলদকুমার' সার্থক। বাচনিক অভিনয়ের তুলনায় সংগীতাভিনয়েই তাঁর কৃতিত্ব বেশি। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী রূপায়িত 'অদ্বৈত আচার্য' এ-পালার একটি বিশিষ্ট চরিত্রায়ণ। পালাকারের প্রবল উপেক্ষা সত্ত্বেও, কেবল অভিনয়ে এ-চরিত্রটিকে সকল দর্শকের হৃদয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। এখানে ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট কাজ করেছে। এবং ভাবও। জগাই ও মাধাই চরিত্রে যথাক্রমে হরিশকুমার ও অনিল রায় অনবদ্য। অজিত সাহার 'কাজী' প্রবল ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। চরিত্রটির স্বল্প তিনি সার্থকভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। ছবিরানীর 'শচীমাতা' বহুকাল মনে থাকবে। বিভূতি পাণ্ডে, পাঁচু মুখার্জি, তারা ভট্টাচার্য এবং মনোজকুমারের চরিত্রায়ণও উল্লেখযোগ্য। জনার্দন নন্দীর 'হরিদাস' রূপসজ্জায়, গানে অভিনয়ে স্মরণযোগ্য।

সর্বশেষে বলি, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণী তবে কি ফলতে চলেছে? অর্থাৎ যাত্রায় আবার পৌরাণিক, ধর্মমূলক এবং ঐতিহাসিক পালার কাল কি সত্যিই ফিরে এলো?
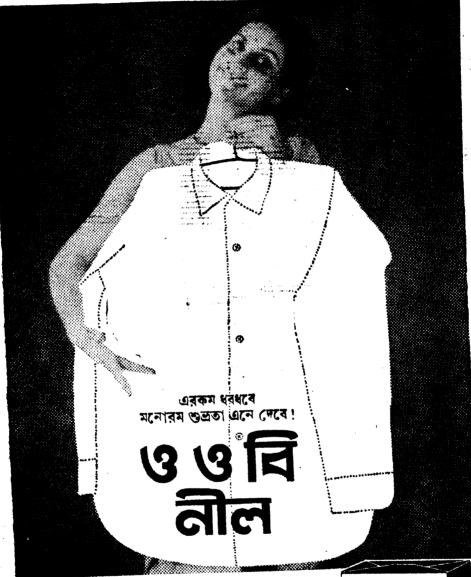
—সূত্রধার

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

'ধনরত্ন আর সুন্দরী মেয়ের লোভ দেখিয়েও অরণ্যদেবকে যখন টলানো গেল না, পাহাড়ী ডাইনী তখন রেগে গিয়ে অভিশাপ দিল.....'

জঙ্গলের প্রতিটি রাজ্যের যুবরাজ মারা যাক!

ধোঁয়া-পাহাড়ে চলো। নয়তো জঙ্গলের প্রতিটি রাজ্যের যুবরাজকে মারা পড়তে হবে।
আমি যাব না, দেখি কী হয়।
4/11

'কিন্তু সত্যিই দেখা গেল, রাজ্যে রাজ্যে যুবরাজেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'
!!

!
অরণ্যদেব, পাহাড়ী-ডাইনীর ক্রোধ থেকে আমাদের ছেলেদের আপনি বাঁচান!

'তখন আর কী করবেন অরণ্যদেব, পাহাড়ী ডাইনীর উপর ভীষণ রেগে গিয়ে ধোঁয়া পাহাড়ের দিকে তিনি ঘোড়া ছোটালেন...'

'খানিক বাদেই ধোঁয়া-পাহাড়ের দুর্গের সামনে পৌঁছে গেলেন তিনি।'

এসো, অরণ্যদেব। শ্রেষ্ঠ পুরুষ তুমি; তাই তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।
!?
৯

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সীমান্ত অতিক্রম বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমে সৈন্যবাহিনীর প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছিল সীমান্ত অতিক্রম করো না কিন্তু গত ২১ নবেম্বর ২৪ পরগনার বয়ড়ার যুদ্ধ এবং ২২ নবেম্বর সোমবার বিমান যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আত্মরক্ষার্থে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সীমান্ত অতিক্রম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে. বিমান যুদ্ধে পাকিস্তান তিনটি স্যাবার জেট বিমান হারিয়েছে এবং ইসলামাবাদের মতে পাকিস্তান জেট দুটি ভারতীয় নাট বিমানকে ঘায়েল করেছে। ভূপাতিত দুটি পাক বিমানের দুজন পাক বৈমানিক ধরা পড়েছে। যশোর খণ্ডে ভারতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনী ১৩টি পাক ট্যাঙ্ক খতম করে দেয়। ভারত একটি ট্যাঙ্কও হারায়নি। ২৫ নবেম্বর হিলিতে উভয় পক্ষের ট্যাঙ্ক লড়াইতে ৮০জন পাক সেনা সাবাড় হয়েছে এবং খতম হয়েছে একটি সাফে ট্যাঙ্ক।

দেশী সংবাদ

১২ **নবেম্বর**—কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ গতকাল রাত্রে আনন্দ শুক্লা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এবং শরণার্থীদের নাম করে সাহায্যের জন্য নেওয়া ৬টি ট্রাক, ৩০০ ব্যাগ দুধ ও শিশুখাদ্য উদ্ধার করেছে। শ্রীশুক্লা বর্তমানে নানা উদ্বাস্তু শিবিরে ত্রাণকার্যে নিযুক্ত রয়েছেন বলে প্রকাশ।

লোকসভায় আজ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টের উপর আলোচনার উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনুরুল হাসান আজ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁর আস্থাহীনতার কথা প্রকাশ করেছেন।

২৩ **নবেম্বর**—গতকাল ২৪ পরগনার বয়ড়ার কাছে ভারতের আকাশসীমার অনুপ্রবেশকারী তিনটি পাকিস্তানী স্যাবার জেট বিমানকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর চারটি নাট বিমান গুলি করে নামিয়েছে। ভূপাতিত দুটি বিমানের দুজন পাক বৈমানিক ধরা পড়েছে।

নব কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংবিধানের ২৫তম সংশোধন বিল ব্যাখ্যাকালে আইনমন্ত্রী শ্রী এইচ আর গোখেল বলেন, বিলটি গৃহীত হবার পরেও জাতীয় স্বার্থে সিলিংভুক্ত জমি সরকারকে গ্রহণ করতে হলে বাজারদর দিয়ে নিতে হবে।

২৪ **নবেম্বর**—জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক লক্ষ এন সি সি-কে প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে তোলার জন্যই এই ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের এন সি সি দফতর রাজ্য সরকারকে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানত পাক চরদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, চব্বিশ পরগনা এবং দার্জিলিং—এই আটটি সীমান্ত জেলার সীমান্ত অঞ্চলে সন্ধ্যার পর থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়েছে।

২৫ **নবেম্বর**—কলকাতা হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলা বাদে পশ্চিম বাংলার অন্যত্র নতুন শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে। এই শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যকারী সংস্থার মারফত কেন্দ্রের কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে অর্থ সাহায্য পাওয়া যাবে।

পণ্য প্রবেশ কর বা চুঙ্গি (অকট্রোয়) আদায়ের সূচনা থেকে গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যূন আট কোটি একান্ন লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। সংগৃহীত এই অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ

অর্থাৎ প্রায় চার কোটি টাকা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়ের জন্য সি এম ডি এ-কে দেওয়া হয়।

২৬ **নবেম্বর**—আজ সকালে আলিপুর সেনট্রাল জেলের ভিতর উগ্রপন্থী বন্দী এবং ওয়ারডারদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষে ৬ জন বিচারাধীন বন্দী নিহত হন। আহতও হন প্রায় ২০০ বন্দী। এ ছাড়া জেলারকে নিয়ে ৩৫ জনের মত কারারক্ষীও আহত।

ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার বিপজ্জনক পথ পরিহার করে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটা আপস মীমাংসায় আসার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কটগিরি আজ পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের আহ্বান জানান।

২৭ **নবেম্বর**—বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানে আসুন এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিন। পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁর উদ্দেশে এই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। পাক প্রেসিডেনটকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের ওপর এক অসহনীয় ভার হয়েছে।

আলিপুর সেনট্রাল জেলের ঘটনা সম্পর্কে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রী বি সি মিত্রকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত আজ সাংবাদিকদের এই কথা জানান।

২৮ **নবেম্বর**—সি পি এম-এর শক্ত ঘাঁটি বর্ধমান — সেই বর্ধমানের পৌর-সভার নির্বাচনে নব কংগ্রেস বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে। সি পি এম প্রার্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। ২৫টি আসনের মধ্যে নব কংগ্রেস প্রভাবিত দল পেয়েছে ১৮টি। সি পি এম-এর গণতান্ত্রিক ফ্রনট জয়ী হয়েছে ৩টি আসনে। বাকী ৪ জন নির্দল প্রার্থী।

আজ রাত্রে ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনের চার কিলোমিটার দক্ষিণে ডাউন পুরী হাওড়া একসপ্রেস লাইনচ্যুত হয়ে পড়লে ৩০ জন আহত হন। এর মধ্যে ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিহত হওয়ার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বিদেশী সংবাদ

২২ **নবেম্বর**—আজ নিউইয়রক টাইমস জাতিসঙ্ঘকে এই বলে সমালোচনা করেছে যে, পূর্ববাংলা সমস্যার যেটা হচ্ছে মৌলিক সমস্যা এবং যা হচ্ছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট—জাতি-সঙ্ঘ যেখানে আঘাত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৩ **নবেম্বর**—বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তি[illegible]র সাফল্যে আতঙ্কিত পাক সামরিক চ[illegible] ইয়াহিয়া খান সমগ্র পাকিস্তানে জরু[illegible] ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে [illegible] বি বি সি'র সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ঢাকার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ আসন্ন।

১৪ **নবেম্বর**—যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরে—বাংলাদেশের এই চার জেলার ৮০ ভাগ এলাকাই আজ মুক্তিবাহিনীর দখলে এসেছে। মুক্তিবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ কিশোরগঞ্জ, শ্রীহট্ট ও যশোর শহরে শত্রু সেনাদের ঘিরে ফেলেছে। ঢাকার মুনসিগঞ্জ শহর ও সন্নিহিত এলাকা এখন মুক্ত।

২৫ **নবেম্বর**—আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানাবেন বলে মনস্থ করেছেন। পূর্ববঙ্গের সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা চালাবার বিষয়ও তিনি ভাবছেন। নিউইয়রক টাইমস বিশ্বাসযোগ্য মহল থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন।

২৬ **নবেম্বর**—গোটা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারি করার ঠিক তিন দিন পর আজ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় আওয়ামী পারটির (ন্যাপ) সমস্ত শাখাকেই বেআইনী ঘোষণা করেছেন। আজ কয়েকজন ন্যাপ নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। [illegible] পশ্চিম পাকিস্তানের বালুচিস্তান এবং অ[illegible] সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক ক[illegible] কলাপ চালাচ্ছিলেন।

২৭ **নবেম্বর**—হিলি রক্ষার মরণপণ সংগ্রা[illegible] পাক সামরিক বাহিনী আরও ট্যাঙ্ক হারিয়েছে। হিলি-বালুরঘাট অঞ্চলে জোড় লড়াই চলছে। পাক সেনাবাহিনী খোদ হিলি থেকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে লড়াই চালাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মুক্তি ফৌজ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কামানের গোলায় কটা পাক ট্যাঙ্ক ঘায়েল হয়েছে অধিক রাত পর্যন্ত তা জানা যায়নি।

১৮ **নবেম্বর**—আজ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী পাকিস্তানী গোলন্দাজ বাহিনীকে বাংলাদেশের হিলি থেকে পিছু হটিয়ে দেন। ওদিকে মুক্তিবাহিনী তুমুল লড়াই-এর পর হিলির দশ মাইল ভিতরে জয়পুরহাট শহরটিও মুক্ত করে নিয়েছেন। মুক্তিবাহিনীর হাতে সেখানে ৪টি পাক ট্যাংক ঘায়েল হয়েছে।

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

Clinic Shampoo

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

'ক্লিনিক' [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

*০'১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাত্র এক চামচ-
একাই একশো!
MINADEX
ভালো চোখের দৃষ্টি
এর জন্যে চাই ভিটামিন এ। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, চোখের দৃষ্টি ভালো রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ।
সুস্থ রক্ত
এর জন্যে চাই আয়রণ। অধিকাংশ ভারতবাসীর আহারে আয়রণের অভাব থাকে। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এর আয়রণ এই অভাব পূরণ করে।
মজবুত হাড়
এর জন্যে চাই ভিটামিন ডি। এক চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, হাড় মজবুত রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি।
মনে রাখবেন, প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ মিনাডেক্স আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করে, আর এর কমলালেবুর স্বাদগন্ধ—বাচ্চার ভালো লাগবেই।
সিরাপ
মিনাডেক্স
মাত্র একচামচ—তিনগুণের এক টনিক
গ্ল্যাক্সো

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল দাশ

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৬
শনিবার, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
Saturday 11 December 1971

পাক-ভারত যুদ্ধ

যা ছিল আশঙ্কা, এখন তা সত্য: পাকিস্তান একটি সর্বাত্মক যুদ্ধ ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। পাকি-স্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর বদেশকে অন্য কিছু দিতে পারুন মার না পারুন—একটি যুদ্ধ উপহার দবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সেই ুদ্ধ তিনি দিয়েছেন, পূর্ব আর পশ্চিম ুই অঞ্চলেই। তাঁর সামরিক অনুচররা য়াহিয়াকে থামতে শেখায় নি। ারতের পূর্ব সীমান্তে কামানের ালাগুলি ক্রমশই যখন বেড়ে উঠছিল খন পাক বিমানের হঠাৎ উদয় অশুভ চনাকে আরও ইঙ্গিতবহ করে তোলে। ায় তার পর পরই আগরতলায় বিমান াক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আগরতলার র পাক বিমান হানা দেয় শ্রীনগর, মৃতসর, পাঠানকোট, আগ্রা ও অন্যান্য ায়গায়। পাকিস্তানের সামরিক অভি-ন কোন লক্ষ্যে চলেছে এখন আর তা ঝতে বাকি থাকে না। পাকিস্তান যুদ্ধ াষণা না করেই যখন ভারতের মাটিতে মান হানা শুরু করে দিয়েছিল তখন দ্ধ ঘোষিত হতে আর দেরী ছিল না। ই যুদ্ধ ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত াষণাও করেছেন। আমরা এক াত্মক যুদ্ধের মধ্যে এসে পড়েছি। এখান থেকে ফেরার উপায় আর নেই।

ভারত সরকারও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। ভারতরক্ষা বিধানও চালু হয়েছে। সরকারী এই নির্দেশ দেশরক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যুদ্ধ কোথায়, কেন, কী উদ্দেশ্যে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। বলে রাখা ভাল, পাকি-স্তানের সঙ্গে ভারত যুদ্ধ চায় নি; পাকিস্তানের চূড়ান্ত বর্বরতা, নির্মমতা সে ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করেছে। সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশকে সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বার বার বলেছে, সৈন্য সরানো হোক। পাকিস্তান সৈন্য সরায় নি, রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকরা বোবা হয়ে থেকেছেন। শ্রীমতী গান্ধী বিদেশে গিয়েছেন বড় ছোট বহু রাষ্ট্রকে এই সংকটময় অবস্থাটিকে বুঝিয়ে বলতে। তিনি সর্বত্রই একটি মূল্যবান কথা বলেছেন: আমরা সংঘর্ষ চাই না, যুদ্ধ চাই না। ওই এক কোটি শরণার্থী, যারা নিপীড়িত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সসম্মানে ও নিরাপদে দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন। বাংলাদেশ থেকে পাক ফৌজ চলে যাক। শ্রীমতী গান্ধীর এই অনুরোধ অরণ্যে রোদনের মতন হয়েছে। উপরন্তু তাঁকে বলা হয়েছে, সীমান্ত থেকে ভারতীয় ফৌজ সরে আসুক। এ বড় বিচিত্র যুক্তি। কিন্তু এই যুক্তিই তো পাক-দরদীদের থাকার কথা। এখানে মানবিকতার প্রশ্ন নেই, ন্যায় নীতির প্রশ্ন নেই। আমেরিকা বৃটেনের মতন দেশগুলি, চীনের মতন ভারত-বিদ্বেষী, পাক সামরিক-শাসকের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠ-পোষকেরা কোন্ উদ্দেশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করে যাচ্ছে বুঝতে কারও অসুবিধে হয় না।

আজ, যখন ভারত এক সর্বাত্মক যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের বান্ধব সংখ্যা সীমিত। কথাটা আমাদের বিশেষ করেই মনে রাখতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, আমরা মানবতার জন্যে এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছি। আমাদের সামর্থ্য কয়েকটি বিরাট রাষ্ট্রের তুলনায় নিশ্চয় কম, কিন্তু পাকিস্তানের চেয়ে নিশ্চয় কম নয়। কম যে নয় তার প্রমাণ, যুদ্ধ শুরুর তিনদিনের মধ্যেই পূর্বাঞ্চ-লের পাক ফৌজ ক্রমশই পিছু হটে চলেছে, তাদের বিমান ও স্থলবাহিনী পর্যুদস্ত। পশ্চিমাঞ্চলেও ভারত পাকি-স্তানকে কোণ-ঠাসা করে ফেলেছে। আমাদের জয় সুনিশ্চিত। প্রসঙ্গত বলতে হয়, শেষ মুহূর্তে যথাসময়ে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এও আমাদের গৌরব।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩
২৩-৮৫৪১

সরকারী আবেদনে সাড়া

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (তথ্য ও বেতার) শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথি সংবাদ-পত্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন: মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন স্থগিত রাখুন, শুধু উৎপাদন শুল্কের দুই পয়সা দাম বাড়ান। তাঁর আশা, সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ সরকারের এই আবেদনে সাড়া দেবেন এবং শুধু উৎপাদন শুল্ক অতিরিক্ত নিয়ে অবিলম্বে আগেকার দামেই সংবাদপত্র প্রকাশন শুরু করবেন। সংসদে শ্রীমতী সৎপথি বলেছেন, সীমান্ত, বিশেষ করে পূর্বখণ্ডের অবস্থা গুরুতর। সংবাদপত্র না থাকলে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ ও সঠিক সংবাদের জন্য সংবাদপত্রের প্রকাশ প্রয়োজন।

আমরা তাই এই আবেদনে সাড়া দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রাখছি। এবং পুরানো দামের (৬০ পয়সা) সঙ্গে শুল্কের দুই পয়সা অতিরিক্ত নিয়েই (মোট ৬২ পয়সা) সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আর ভয় পাবার কিছু নেই

ভারত-পাক যুদ্ধ

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলই। এটা অবশ্য অভাবনীয় কিছু নয়। কারণ, অনেকেই আশংকা করেছিলেন, পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যখন যুদ্ধে বাংলাদেশ আর নিজেদের দখলে রাখতে পারছে না, তখন তারা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবেই। এবং ওইভাবে পাকিস্তানের রক্ষায় ও বাংলাদেশকে নিজেদের দখলে রাখার শেষ চেষ্টা করবেই।

তাই হল।

এরপরেও যা যা হবে বলে আশংকা করা গিয়েছিল, তাও সব হয়েছে। আশংকা করা হয়েছিল এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরই পাকিস্তান গোটা ব্যাপারটাকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলাবে এবং তার বন্ধুরাষ্ট্রকে প্রস্তাব পাস করাতে চাইবে যে, ভারত-পাক সংঘর্ষের বিরতি ঘটুক, পূর্ব-বাংলার দুই দিকে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিরা বসুক এবং পূর্ববাংলার শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক। অর্থাৎ পাকিস্তান অটুট থাকুক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বানচাল হোক।

পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বন্ধু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথারীতি এই রকম একটা প্রস্তাব সিকিউরিটি কাউন্সিলে তুলেছিল। মূল লক্ষ্যটা ছিল বিপন্ন পাকিস্তানকে রক্ষা করা এবং বাংলাদেশও যাতে পাক দখলে বজায় থাকে, সেই রকম একটা ব্যবস্থা করা। কিন্তু পাকিস্তান এবং পাক বন্ধুদের সেই লক্ষ্য পূর্ণ হয়নি। রাশিয়া ভেটো দিয়ে প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছে।

এখন দেখার, পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পাক বন্ধুরা কীভাবে অগ্রসর হয়— আর কী কী ব্যবস্থা নেয়?

চীন অবশ্য বার বার ঘোষণা করছে, তারা পাকিস্তানকে পূর্ণ সমর্থন জানাবে এবং তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। চীন যে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে সেটা সর্বজনবিদিত। চীন সম্প্রতি পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের পরিমাণও বাড়িয়েছে। কিন্তু চীন কি সৈন্যসামন্ত নিয়েও পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আসবে? অথবা, চীন কি

ভারতের উত্তর সীমান্তে চাপ দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে চাইবে?

চীনের গতিগতি ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। যে চীন রাশিয়াকে শোধনবাদী আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রবক্তা বলে গালি-গালাজ করে সেই চীনই পাকিস্তানের সমর-নায়কদের সমর্থক! সেই চীনই পারস্যের শাহের জন্মতিথিতে বিরাট বাণী পাঠিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি কামনা করে! এবং সেই চীনই পারস্য সাম্রাজ্যের সহস্র বর্ষ উদযাপনের উৎসবে প্রতিনিধি পাঠায়!

রাশিয়া বহুদিন থেকেই এ সব জিনিস করছিল। এবং সেইজন্যই চীন তাকে বহু গালিগালাজও দিয়েছে। কিন্তু চীনও আজ একপথেই চলেছে। আজ চীন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে পাক সামরিক নেতাদের সমর্থক। চীন ভারতকে গালি-গালাজ দেবে, তার না হয় অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু চীনের ইয়াহিয়া-প্রেমের কোনও মার্কসীয় ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন নয় কি?

কিন্তু তবু আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করছেন না, চীন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে আসবে। কারু কারু অবশ্য ধারণা, যদি বেশিদিন ভারত-পাকিস্তান লড়াই চলে তাহলে চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে চাপ দিতে পারে।

তবে তার আগে নিশ্চয়ই চীনকেও তার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথা ভাবতে হবে। সেখানে রাশিয়ার প্রায় পঞ্চাশ ডিভিসন সৈন্য রয়েছে। রাশিয়া যে নানা কারণে এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে ভারতের পক্ষে চীন তা জানে। এবং সেইজন্যই পাকিস্তানের সমর্থনে ভারতের বিরুদ্ধে চীন কোনও ব্যবস্থা নিতে

নয়া দিল্লি : নয়া ছদ্মবেশী

রঞ্জন

মাঝে মাঝে আধো সভয়ে ও আধো সানন্দে স্মরণ করি আমাদের সেই আধা শহরের বহুরূপীকে। সে আসতো সন্ধ্যার পরে, গাঢ়বর্ণ শাড়ি পরিধান সত্ত্বেও বোঝা যেতো যে, আচ্ছাদিত আগন্তুক আর যাই হোন রমণী নন। তবু বাড়ির দরজা খুলতেই দেখতাম সেই ব্যক্তিটি প্রস্তুত তার প্রদর্শনী নিয়ে। নাকের উপর ঝোলানো একটা অবৃহৎ কিন্তু ক্রিয়াশীল পর্দা। সেটাকে এক দিকে সরালে দেখা যেতো এক অপরূপ সুন্দরীর মুখাবয়ব; অপর দিকে ছিল ভীষণা এক ভয়ংকরা মূর্তি। উল্লাস ও আতংকের এই যুগল পরিবেশনের পরে লোকটি চাইতো মাত্র এক পয়সা। তখন এক পয়সার ক্রয়-ক্ষমতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। এই দুমুখো বহুরূপীর কথা আমার বারবার মনে হয়েছে দেশবিভাগের পর থেকে। কখনো মনে হয়েছে সেই পরাস্ত পূর্ববঙ্গই আজো আমার চোখে বহুরূপীর মুখের সেই অবিস্মরণীয় আধখানা আর পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে তার কদর্য অপরার্ধ। পঁচিশে মার্চের পাকিস্তানী আক্রমণের পরে মনে হয়েছে বহুরূপী আবার তার নাসিকাসীন পর্দা সরিয়েছে এধার থেকে ওধারে। আমাদের বহুরূপীর কদর্যতা আর সৌন্দর্য দুই-ই ছিল মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য। অঙ্গাসজ্জাব যমজ সন্তান। দ্বিবিধ বিস্ময় আজ চক্ষীভূত বিষাদস্মশানে।

পূর্ববঙ্গের দুর্ভাগ্যের তবু অন্য রূপ আছে তার দুর্জয় প্রতিবাদে। তুলনীয় বজ্রকণ্ঠ শুনতে পাইনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তারও আছে ইসলামাবাদ, কিনীতভর নামে। নয়া দিল্লির সোহাগী স্বরূপ, আমার বহু-রূপীর মুখের একার্ধ, ভাসাভাসিভাবে সন্দেহ করেছি বহুদিন। বাঙালীর সাম্প্রতিক সর্ব খর্বতার জন্য নয়া দিল্লিকে দোষ দিতে আমার বাধে, যেমন আমাদের স্বাধীনতাপূর্ব জাতীয় অসামান্যতার জন্য ইংরেজ শাসকদের আমি অবাধে পূর্ণদোষী সাব্যস্ত করতে পারিনি। সহসা হাতে এলো এক সাংবাদিকের প্রবন্ধসংগ্রহ। রণজিৎ রায়ের The Agony of West Bengal পূর্ববঙ্গের নির্মম শোষণ ও অপশাসনের জন্য অশ্রুবর্ষণ সমস্ত ভারতীয়ের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু অনুরূপ অন্যায়, সামান্য পর্যায়ভেদে, অন্যত্র ধারা-বাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হলে সার্বিক নীরবতার সঙ্গতি আমার বুদ্ধির অগম্য। দীর্ঘ দিল্লিপ্রবাস সত্ত্বেও রণজিৎ রায় অপরিশোধ্য বঙ্গসন্তান। তাঁর বক্তব্য শুধু ক্রন্দনই অশ্রুস্বেদ হতে পারে না। প্রমাণ-পুষ্ট প্রবন্ধদশককে রণজিৎ রায় নয়া দিল্লির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন এমিল জোলার অনুসরণে তার নাম অনায়াসেই হতে পারতো J'Accuse. নয়া দিল্লি, তুমি অপরাধী। তোমার পূর্বসূরী ইংরেজরাও এত অপরাধ করেনি ভাগ্যহীনা বাঙলার বিরুদ্ধে।

✻

বাঙালীর অন্তর্জাত রাজনীতিক বিরূপতা তো ইতিহাসের অংশ। তার সাহেবিয়ানার পর্ব শেষ হলে সে মোসাহেবি করতে রাজী হয়নি। অবিলম্বেই অবশ্যম্ভাবী ফসল ফলল ইংরেজদের সোচ্চার বাঙালীবিতৃষ্ণায়। হায় রে হায়, ১৯৫৭ সালে ভারতদর্শনের পরে ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি নাকি লিখে-ছিলেন, "বঙ্গভঙ্গের পর বাঙালীর আর পাখা নাহি উড়িবার। সে মেনে নিক যে, ভাগ্য তার রাহুগ্রস্ত।" অবমাননার উপর শারীর আঘাত। টয়েনবি লিখেছেন, "মোগল রাজত্বের অবসানে যেমন হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত ঘটলে ঠিক তাই হলো : ক্ষীণতেজ ক্ষমতার অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা...বিংশ শতাব্দীর জয়ী গুজরাটের ধূর্ত বৈশিক।" গুজরাটী মহাত্মা তখন মৃত। টয়েনবি কার কথা ভাবছিলেন? রণজিৎ রায় অন্যতর গুর্জরসন্তান মোরারজি দেশাই-এর অকুণ্ঠ অনুরাগী নন। বস্তুত তার বস্তুসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, এই ভদ্রলোকের কুপরিকল্পিত নীতির কল্যাণেই পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক অকল্যাণের প্রধান প্রসূতি রচিত হয়। আমি লেখককে অনৃতভাষণের অপবাদ দিতে পারিনে।

হিমালয়সদৃশ অপচয়—বা পুকুরচুরি—সত্ত্বেও ভারতের নানা খণ্ডে আপেক্ষিক আর্থনীতিক উন্নতি অনস্বীকার্য। পাঞ্জাব-দিল্লি-গুজরাট-মারাঠায় তার সাক্ষ্য প্রায় অশ্লীলভাবে প্রত্যক্ষ। খণ্ডিত বাঙলার ভাগ্যে কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্যের কণামাত্র পড়েনি বলে অভিযোগ একেবারে অসংগত নয়। রণজিৎ রায় বাঙালীর মজ্জাগত কর্মবিমুখ-তার নালিশ পুরোপুরি অস্বীকার করেন কিনা জানিনে, কিন্তু দেশবিভাগের পরে পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু স্বীয় বাহুবলে স্বাবলম্বী হয়েছে আর বিতাড়িত বাঙালী উদ্বাস্তু শিবিরে অকর্মণ্য ভিক্ষুক মাত্র, কৃপার পাত্র, এমন চিত্র তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নানা অপাঠ্য সরকারী রিপোর্ট অনন্ত অধ্যবসায় দিয়ে অনুধাবন করে তিনি দেখিয়েছেন যে, গত সিকি শতাব্দী ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে পশ্চিমী উদ্বাস্তুদের উপর। পাঞ্জাব থেকে দিল্লি দূরে অন্তু নয়, তাই পশ্চিমাগত শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সহানুভূতি ছিল তাৎক্ষণিক ও উদার। পূব থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ক্রন্দন দিল্লিতে পৌঁছোতে সময় লাগে, এমন কি পঁচিশ বছরও যথেষ্ট নয়। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু তাই পলাতক মুসলমানের ভারতীয় সম্পত্তি পেয়েছে অবিলম্বে, ক্ষতিপূরণ পেয়েছে আপন হৃত সম্পত্তির জন্য। ভিটেছাড়া বাঙালীর ভাগ্যে জোটেনি কোনো জমি বা নব ব্যবসায়ের উপযুক্ত মূলধন। সামান্য ঋণ বা দিনমজুরি, যাকে ভিক্ষার আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত, তা প্রত্যহ অর্পিত হয়েছে দৈনন্দিন, উপবাস-এড়ানো অসহ্য অস্তিত্বে।

এই সীমাহীন অবহেলা নিষ্ঠুর দেশ-বিভাগের পূর্বে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতির নির্লজ্জ প্রত্যাখ্যান। কিন্তু রণজিৎ রায়ের প্রতিপাদ্য এই যে, স্বাধীনতার পরেও বাঙালীর আর্থনীতিক নিষ্পেষণ অব্যাহত আছে। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সোনার বাঙলাকে ভালোবেসে কেউ এদিকে আসেনি। কলকাতার কয়েকটি অমূল্য স্বাভাবিক সম্পদ ছিল: তার বন্দর, হাতের কাছে কয়লা আর ইস্পাত। ব্রিটিশ বাণিজ্য এখানে ঘর করে-ছিল একান্তই টাকা-আনা-পয়সার হিসাবে। স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেই এই সমস্ত সুযোগ নস্যাৎ করে দেওয়া হলো দিল্লির ফরমানে। সর্বভারতীয় উন্নয়নের নামে কয়লা আর ইস্পাতের দাম হলো সারা দেশে সমান। কলকাতা আর হাওড়ার দুর্ভিক্ষ তো অবহেলনীয় আঞ্চলিক সমস্যা মাত্র। দক্ষিণ ভারতের কয়লাতৃষ্ণা আর পশ্চিম ভারতের ইস্পাতক্ষুধা মেটাতে হবে বাঙলাকে, জাতীয় স্বার্থের নামে।

রণজিৎ রায়ের মতো আমিও আপাতত আত্মোৎসর্গে কিঞ্চিৎ অনুৎসাহী। ভারতীয়ত্বের পাঠ আমি নেব না কৃষ্ণমাচারী বা মোরারজি দেশাই বা আর কারো কাছ থেকে। আমি বাঙালিয়ানা কখনো করিনি আমার প্রধান মূলধন। তবু সর্বভারতীয়-তার নামে আঞ্চলিক অবিচার আমি অপ্রতিবাদে মেনে নিতে পারিনে। পূর্ব ভারত কেন ব্যবহৃত হবে দেশের অন্যাংশের উপনিবেশ হিসাবে? বাংলা দেশে বর্তমান বীভৎসতার মৌল উৎস যদি হয়ে থাকে ইসলামাবাদের ঔপনিবেশিক ঔদ্ধত্য, তবে অন্যান্য রাজধানীরও সতর্ক হবার কারণ থাকতে পারে। যথা নয়া দিল্লি। পশ্চিম-বঙ্গের দুর্গত অবক্ষয়ের দায়িত্ব একা পশ্চিম-বঙ্গের নয়, যদিও বাঙালীর পরিপূর্ণ নির্দোষিতা আমি মেনে নিতে পারিনে। আমি নিজে যে অংশত দোষী। কিন্তু কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত জাতি।
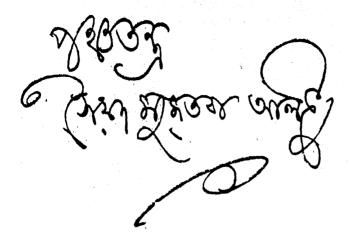
বিদেশে (৩৩)

না দেশে, এ-দেশে কেন পৃথিবীর সর্বত্রই এ-যুগে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এত বেশী আলোচনা, নাটক, ফিল্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত তৈরী হচ্ছে যে, আমরা এই হট্টগোলের মাঝখানে প্রায়ই ভুলে যাই যে, এই ভারতেই রতি বা কাম সম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক রচিত হয়। এই সর্বপ্রথম পুস্তক বহু যুগ ধরে সম্মানিত হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-যুগে পৃথিবীর সর্বত্র এ-বই এমনই সিংহাসনে আসন পাচ্ছে, শুধু তাই নয়, এমনই জনপ্রিয় হয়েছে যে, একে এখন অক্লেশে ইওরো-আমেরিকার অন্যতম বেস্ট-সেলার বলা যেতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি, এক নাতিবৃদ্ধ জ্যাঠামশাইকে তাঁর ভাইঝি একখানা অতি মনোরম দা-লুক্‌স্ বই উপহার দেয়—তাঁর জন্মদিনে। এই ভদ্রজন পুস্তক সঞ্চয়নে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং এ-রকম মরক্কো চামড়ার বাঁধাই, সোনালী চারুকার্যে ঝলমলিয়া কেতাব যে তিনি একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, মেয়েটি সে-আশা নিশ্চয়ই করেছিল। জ্যাঠামশাই সে-রকম কিছু করলেন না বটে, কিন্তু দেখা গেল, তিনি অতিশয় সযত্নে তাঁর আপন ডেস্ককে আর পাঁচটা দামী জিনিসের সঙ্গে সেটি তালাবন্ধ করলেন। তার পর বহু বৎসর কেটে গেল, সামান্য এই ঘটনাটি কেই বা মনে রাখে। তাঁর মৃত্যুর পর (যতদূর মনে পড়ছে তাঁর অন্য এক ভাইঝি) তাঁর ঘরদোর গোছগাছ করতে গিয়ে ডেস্কের ভিতর আবিষ্কার করলো সেই প্রাচীন দিনের বইখানি। ততদিনে ইয়োরোপ নানা বিষয়ে মুক্তমনা হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভাইঝি বইখানা দেখে স্তম্ভিত। সেই সে-আমলে কোনো ভদ্র পরিবারের মেয়ে তাঁর শান্তশিষ্ট বয়স্ক জ্যাঠামশাইকে "কামসূত্র" উপহার দেবে, এ তো একেবারেই অবিশ্বাস্য। আসলে মেয়েটি দোকানে গিয়ে নিশ্চয়ই চেয়েছিল, কোনো একখানা বেস্ট্-সেলার এবং তার চেয়েও বড় কথা, সেটার বাঁধাই যেন অসাধারণ চাকচিক্য ধরে। জ্যাঠামশাই সব জাতের বইয়ের খবর রাখতেন। রঙিন মোড়ক খুলে এক নজর তাকাতেই বুঝে ফেলেছিলেন, ব্যাপারটা কি,

বিলেতে প্রেম এক প্রকারের জিমন্যাস্টিক্

কিন্তু মেয়েটি যাতে লজ্জা না পায় তাই তিনি ঐ পন্থা অবলম্বন করেন।

এর থেকেই পাঠক অনায়াসে বুঝে যাবেন যে, ঘটনাটি ঘটেছিল মান্ধাতার আমলে; নিদেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণযুগে এবং খুব সম্ভব তাঁরই পূতপবিত্র আপন দেশে। কারণ বহু বহু কন্টিনেন্টাল গুণী-জ্ঞানীর দৃঢ় প্রত্যয়, কুল্লে ইয়োরোপের একমাত্র বিলেত-দেশেই যৌনজীবন নামক কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, কস্মিনকালেও ছিল না—অন্তত ফরাসীদের গলা কেটে ফেললেও তারা এ-বিশ্বাস কিছুতেই ত্যাগ করবে না। অবশ্য দেশকালপাত্র হিসেবে নিয়ে ইংরেজের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে সে তার মতবাদের অতি সামান্য কিছুটা অতি অবরে-সবরে সামান্য রূপবদল করতে পারে। যেমন, একদা ইংরেজ সম্বন্ধে ফরাসীদের মধ্যে সুপ্রচলিত প্রবাদ ছিল, "কাণ্টিনেণ্টের আর-সর্বত্র নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকে, ইংরেজের থাকে গরম জলের বোতল।"(১) কিন্তু ইতিমধ্যে এই পৃথিবীতে, তার সর্বোত্তম গৌরবময় যুগে, মানুষ কলকব্জা যন্ত্রপাতি, এক কথায় টেকনিকাল সর্ব বাবদে এমনই উন্নতি করেছে যে, এস্তেক ফরাসীও সেটাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। বংশবৃদ্ধি বংশ-নিরোধ আরো মেলা আশকথা পাশকথা তার কানে এসেছে। তাই বিস্তর ঘাড় চুলকে অনেক ভেবেচিন্তে তার পূর্বেকার প্রবাদটি বছর দশেক পরে পরিবর্তিত করে সর্বাধুনিক পরিমার্জিত সংস্করণ ছাড়লে, "এখন তারা ইলেকট্রিক কারেণ্টে গরম-করা লেপ ব্যবহার করে।"

এসব বিষয়ে অধুনা এক অতিশয় খানদানী ডিউক একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা রচনা করেছেন। এ পুস্তিকা রচনা করার হক্ক তাঁর নসিবে, প্লাস্ "শরণার্থী সহায়তা" কী লীয়ে পাঁচ নয়ে পয়সে। বললুম বটে কিন্তু বক্ষ্যমান "জান্" (কোম্পানি আমলের বানান) সায়েব যখন রাজসিক চাকচিক্যময় ডিউকত্ব লাভ করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে লাভ করলেন মহারানীর রাজত্ব বাঁচাবার জন্য, সহায়তা কী লীয়ে, চার মিলিয়ন পৌণ্ডের চেয়েও বেশী মৃত্যু-কর, বা ডেথ ডিউটি। ফরেন এক্‌স্‌চেন্‌জ্ নিয়ে কালোবাজার করার মত কিস্মৎ কপালে লেখা ছিল না বলে সেই পাঁচ পয়সী ডাকঘর যিনি নিরিখ বেঁধে মৃন্ময় টাকাকে 'হিরন্ময়' পৌণ্ডে পরিণত করেন সে-অর্থ নির্দেশ দিয়ে বলে মোটামুটি ১০০০০০০০০ (দশ কোটি) টাকা—যদি খেসারতী চার মিলিয়নের উপরে ধরা হয়—; নইলে কত আর?—এই ধরুন কোটি সাত আষ্টেক।

---

(১) এ-দেশেও বলে, "শীত কাটাতে হলে হয় দুই, নয় রুই (তুলোর লেপ)।" ইংলণ্ডের কাঠফাটা শীতে তুলোতে কিছু হয় না বলে হট-ওয়াটার-বট্‌ল্‌কে সে শয্যাসঙ্গিনী করে। ইংরেজের চাচাতো ভাই ডাচ্‌দের সম্বন্ধে বলা হয়—যদিও বিলেতের মত ও-দেশেও যৌন-জীবন নেই, এ-কথা কেউ কখনো বলেনি—"অন্য দেশের পুরুষ যৌবনে বিয়ে করে, হল্যাণ্ডের লোক পাশ-বালিশ কেনে।" এটা চালু হয় ডাচ্‌দের কিপ্‌টেমি বোঝাবার জন্যে।

এ-ভদ্রলোক বলছেন, "যৌন সম্পর্ক ব্যাপারটা নিছক কণ্টিনেণ্টের একচেটে আবিষ্কার নয়। কণ্টিনেণ্টের বাসিন্দারা তাঁদের 'কমন মার্কেটে' আমাদের পাত্ত পাড়তে না দিয়ে সে-সুখ থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারেন কিন্তু প্রেম করার সুখ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন না। তফাৎটা তবে কোথায়? ওনারা তাঁদের যৌনজীবন নিয়ে বিস্তর ঢাকঢোল বাজিয়ে বেহদ্দ চেল্লা-চেল্লি করেন, এন্তের বড়ফাট্টাই মারেন, ঐ নিয়ে অষ্টপ্রহর ভ্যাচর ভ্যাচর করেন। আমরা করিনে। আমাদের বিবেচনা-বোধ আছে, আমরা পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসি। এর থেকে কি স্পষ্টই ধরা পড়ে না যে, নিজেদের উপর ওদের প্রত্যয় নেই, আমরা ওদের চেয়ে সরেস? (ডোক বোধ হয় বলতে চেয়েছেন, ইংরেজ জাতটা 'নীরব কর্মী'!—লেখক) আর এইটেই হল সব কথার নির্যাস। পৃথিবীর আর সর্বত্র যা ঘটে থাকে এ-দেশেও তাই ঘটে। শুধু আমরা আমাদের যৌন-জীবন নিয়ে বড় একটা কথা বলিনে। হয়তো বা, প্রকৃতিদেবীই এই প্রবৃত্তিটি দিয়ে আমাদের গড়েছেন। পুরুষানুক্রমে হয়তো বা আমরা নীতিবাগীশ—ঐটে পেয়েছি উত্তরাধিকারে। কিংবা হয়তো এও হতে পারে যে, এ-খেলাটার আইনকানুন আমাদের দেশে অন্য এক ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে; আর সবাই জানে স্পোর্টের আইনকানুন মেনে চলাতে আমরা পয়লা নম্বরী এবং তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী কেরদানী আছে, আমাদের ভণ্ডামিতে।"

এই এতক্ষণে আমাদের মাই লর্ড ভিক্টর-প্রবর হাটের মধ্যিখানে হাঁড়িটি ফাটালেন—ইংরিজীতে বলা হয়, কার্পেটের হ্যান্ডব্যাগ থেকে লুকনো বেরালটা বের হবার মওকা পেয়ে এক লম্ফে কেলেঙ্কারিটা ফাঁস করে দিলে। কিন্তু এ-স্থলে শ্রীযুক্ত জন্-এর প্রতি সুবিচারের খাতিরে অবশ্যই বলতে হয়, তিনি সজ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গুঁড়া দুষ্টবুদ্ধিও ধরেন। ইংরেজের নষ্টামি ভণ্ডামির চিচিং ফাঁক করে দিতে পারলে উনি সদাই নির্বিষ বিমলানন্দ উপভোগ করেন। তার একটা কারণ হয়তো এই যে, তৎপুরুষের (আসলে ইনি গোষ্ঠীর ...দশ পুরুষ) ভিটের উপর খাড়া প্রাচীন কেল্লাটি বাঁচাতে হলে তাঁকে সরকারের ...গা অষ্ট কোটি টাকার ট্যাক্সোটা দিতে ...রোক্কা নগদানগদী, এবং সে-রেস্তটা ...রিবাড়ির ছেঁদো তহবিলে বাড়ন্ত। ...বহু পূর্বেই নিবেদন করেছি, এ-...ন আমাদের উলটো "উপীন" যেন তেন ...রেণ কাসুন্দিটি খুলে দিলেন পষ্ট-...র করে। "ধলাকো দর্শনীর কাড়ি মাখো ...!" বলে কি! বিলেতের খানদানী ...রের কেউ কস্মিনকালেও এ-হেন ...ষ্ট কম্মো" করেননি। নবাব সায়েবরা যে কি পরিমাণ চটেছিলেন তার জরিপ এ-স্থলে অবান্তর। বরঞ্চ জন মিঞার দাদ নেবার কায়দাটি বড়ই মুখরোচক—তিনি ওনাদের যাবতীয় ধূর্তামি নষ্টামি বের করে দিলেন দুখানি বইয়ে—এবং ইহসংসারে ভিলেজ ইডিয়টটা পর্যন্ত বিলক্ষণ অবগত আছে ভণ্ডামির গণ্ডা গণ্ডা ভাণ্ড চিরকালই যৌনরসে টৈটম্বুর।

এই বৃদ্ধ বয়সে আমি যে ইয়োরোপের কাম-কাণ্ড নিয়ে অল্পবিস্তর গবেষণা করছি তার জন্য কোনো প্রকারের কৈফিয়ৎ দেবার বা সাফাই গাইবার প্রয়োজন আমার পাপ বিবেক রত্তিভর অনুভব করছে না। আমার অকরুণতম পাঠক এমন কি এদানির যে-সব রুচিবাগীশ মার্কামারা পর্দাপিসীর পাল এসব "ঢলাঢলি" না করে খট্টাঙ্গপুরাণ বা এরণ্ডমোলার নবনির্ঘণ্ট নির্মাণ করতে মাস্তামস ঝাড়েন তাঁদের স্মরণে আনছি যে, ঝাড়া বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমি ভারত ইয়োরোপ আফ্রিকায় মাকু মারছি, ক্রনিক মৈলিগনেন্ট বেকারি ব্যামো থেকে ভুগছি বলে গত বাইশ বছর ধরে মাঝেসাঝে সেই মাকু মারার বয়ান লিখে পথিার হাঁড়ি চড়িয়েছি, তার পূর্বেকার অর্থাৎ ভ্রমণারম্ভের প্রথম কুড়ি বছরের কাহিনী কাবলী-ওলার বোয়াল মাছের মত চোখ-রাঙানি সত্ত্বেও মা সরস্বতীর কাছ থেকে ভিক্ষে চাইনি। সে সব কথা এখন থাক। আমি শুধু শুধোচ্ছি, অর্ধসিদ্ধ অর্ধপক্ক যা-সব লিখেছি তাতে কি পাঠকের মনে কখনো সন্দেহ জেগেছে যে, আমি যৌন-কেচ্ছার সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার পিঠের উপর ডাকটিকিটের মত সেঁটে গিয়েছি? বরঞ্চ বলবো, ও-বাবদে আমার উৎসাহ ছিল অত্যল্প। তার প্রধান কারণ, আমার ধারণা জন্মেছিল, যদিও ইয়োরোপের যৌন-জীবন, প্রেমের হুড়োহুড়ি প্রাচ্যভূমির তুলনায় অনেকখানি বে-আব্রু তবু তাদের ঐতিহ্য বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে তাদের আচরণের খতেন মেলালে সামঞ্জস্যটাই চোখে পড়ে বেশী। (বরঞ্চ মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, কামসূত্র, কুট্টনীমতম্, চৌরপঞ্চাশিকা, এমন কি অর্বাচীন কালে বিদ্যাসুন্দর লেখার পর আমরা কেমন যেন ঈষৎ বেরসিক হয়ে গিয়েছি। সে কথা থাক্।) মাত্র দশ বছর পূর্বেও ইয়োরোপে যে বাড়াবাড়ি দেখেছি তাতেও মনে হয়নি যে, ঐ নিয়ে কাউকে অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে। তবে খুব সম্ভব দু-এক জায়গায় আধা-সাদা অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেছি। এবারে যা দেখলুম, শুনলুম, পড়লুম, বিশেষ করে লণ্ডে যে-সব কথা বললো তার থেকে মনে প্রশ্ন জাগলো; প্রতীচ্যের বহু দেশে অত্যধিক মদ্যপান যেমন এই শতাব্দীর গোড়ার থেকে একটা কঠিন সমস্যার দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি এদের যৌন আচরণ যে-স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে, যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, বিশেষ করে ইস্কুলের পনেরো ষোল সতেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের উপর এটা যে-ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তার পরিণতি কোথায়? ব্যক্তিগতভাবে আমার মাত্র একটি বিষয়ে কৌতূহল আছে: ব্রহ্মচর্য, সেক্স্ স্টার্ভেশন্ কি মহত্তর কর্মে সাহায্য দেয়, উচ্চতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে? দু হাজার বছর ধরে ক্যাথলিক পাদ্রিরা ব্রহ্মচারী জীবন-যাপন করার পর আজ বহুতর ব্রহ্মচারী এবং গৃহীর মনে ঐ নিয়ে সন্দেহ জেগেছে—বৌদ্ধদের ভিতর এ সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা এখনো আমার কানে এসে পৌঁছয়নি।...পাঠকদের মধ্যে যাদের বয়স কম তাদের মনে নিশ্চয়ই আরেকটা চিন্তার উদয় হবে: আজ ইয়োরোপে যা হচ্ছে কাল সেটা এ-দেশে দেখা দেবে না তো? এবং দিলে দু দিনের মধ্যে যে তার ভেজাল রূপ দেখা দেবেই দেবে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

খবরদার পাঠক! এ-কচকচানিতে তুমি যদি কিঞ্চিৎ চঞ্চলিত হয়ে থাকো, তবে আমি মাফ চাইছি। ভবিষ্যতে আর কক্খনো এমন গুনা করবো না—এ-এরাদা করলে অধর্ম হবে, তবে চেষ্টা দেব, পরশুরামী ভাষায় তোমায় "মন যেন হিল্লোলিত হয়: চিত্তে চুলবুল লাগে।"

তার জন্য ঐ জন্ সাহেবটির সরেস মন্তব্য যেন মন্তব্যমণ্ডলীর সায়েব।

পাঠক, ফরাসী দেশে তুমি যদি কোনো ফিল্ম-স্টার বা অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম জমাতে পারো তবে আর পাঁচজনের চোখে ফুটে উঠবে সম্ভ্রম; মুখে ফুটবে সপ্রশংস "ও! লা লা!" বুকে ফুটবে কাঁটা—কিন্তু সেটি অতিশয় বেবি সাইজের, দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ ফরাসী জাতটা মোটেই হিংসুটে নয়। "কিন্তু", জন্ বলছেন, "এমন কর্মটি লণ্ডনে করতে যেয়ো না। এতে করে তোমার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বাড়বে তো না-ই বরঞ্চ তোমার পক্ষে রীতিমত খতরনাক্ হতে পারে—বিশেষ করে তুমি যদি এ লাইনে এমেচার হও। এমন কি মেয়ে আর্টিস্টের পাল্লায় পেলেও ঐ একই হাল। আর্টের সঙ্গে প্রেম মোটেই ম্যাচ করে না। ও দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই। ফরাসীরা অবশ্য প্রেমটাকে আর্টের উচ্চাসনে বসায় (গুরুচণ্ডালী!—বলবো আমরা) এবং ওটাকে একটা অত্যন্ত প্রকৃষ্ট আপন কৈলিন্যপূর্ণ আর্ট বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আমরা ইংরেজ জাতি, স্পোর্টসের নেশন; এ দেশে প্রেমকে এক বিশেষ ধরনের ডনকসরত (জিমনাস্টিক্) বলে স্বীকৃত হয়।"

আবু সয়ীদ আইয়ুব

'এ দুর্লভ প্রেম'

॥ এক ॥

"সব বুঝতে পারা মানে সব ক্ষমা করা।" ব্যতিক্রম অনেক পাওয়া যাবে, কোনোমতেই ক্ষমার যোগ্য নয় এমন মানুষের বা কর্মের নজীর সংবাদপত্র থেকে, ইতিহাস থেকে, উপন্যাস থেকে খুঁজে বার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। তবু ফরাসী প্রবাদবাক্যটি অন্য সব প্রবাদবাক্যের মতনই আপন নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সত্য। উলটোটাও কম সত্য নয়; যাদের স্বভাবে ক্ষমা কম, অতশত বুঝে দেখবার ধৈর্য তাদের থাকে না; জীবনকে একটি সরল রেখা দিয়ে তারা সোজাসুজি ভাগ করে ফেলে—সাদা সাদাই, কালো কালোই। বজ্রসেন সেই জাতের মানুষ।

উত্তীয় যখন শ্যামাকে বলে "ন্যায়-অন্যায় জানি নে, শুধু তোমারে জানি", সে কোনো গভীর জ্ঞানের কথা বলতে চায় নি, বলতে পারার মতো বয়স তার হয় নি; শ্যামার জন্য সব কিছু করতে, সব কিছু হারাতে সে প্রস্তুত—এইটুকু জানাতে চেয়েছিল তার তরুণ কিন্তু পূর্ণবিকশিত প্রেম। নাটকীয় প্রসঙ্গক্রমে কথিত এই পংক্তিটি কিন্তু ওর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে কোনো অবিস্মরণীয় লিরিকের মতো সৃষ্টির মতো আমাদের নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী হয়ে ওঠে, আপন সীমিত অর্থ ছাড়িয়ে দূর দূরান্তরে টেনে নিয়ে যায় আমাদের জীবন-ভাবনাকে। মনে হয় এই নীতিগর্ভ অথচ নীতিপারের নাটকে মানব-জীবনের অতি দুর্বোধ্য জটিলতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ আটাত্তর বৎসরের বহুবিচিত্র বেদনায় দগ্ধবিদগ্ধ রবীন্দ্রনাথও যেন বলতে চাইছেন : মানুষকে হৃদয় দিয়ে বোঝো, ছককাটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যেয়ো না, রাসায়নিক নিক্তিতে ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য ওজন করতে চেয়ো না। অথচ পাপ-পুণ্যের প্রশ্নটা পদে পদেই কণ্টকিত হয়ে ওঠে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। প্রথম পর্বে, হয় নগর-কোটালের আকস্মিক অথচ সাংঘাতিক অন্যায় অপবাদে, চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছয় নায়িকার আপাত অক্ষমার্হ অপরাধ-স্বীকারে, শেষ হয় নায়কের ক্ষমাহীনতার আত্মগ্লানিতে।

জনৈক যুবক, একটি তরুণ এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণবয়স্কা এক নারী (তাদের বয়ঃক্রম কি পঁচিশ, ষোলো এবং বত্রিশ?), এই তিনটি প্রেমিক-হৃদয়ের উপাদানে গীতি-নাট্য 'শ্যামা' রচিত। নৃত্যনাট্য না বলে গীতিনাট্য কেন বলছি তার কৈফিয়ৎ শেষ পৃষ্ঠার পাদটীকায় পাওয়া যাবে। তিন-জনকে এক নিদারুণ অন্তিম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন নাট্যকার—তাদের নৈতিক প্রতিক্রিয়া কিংবা চরিত্র যাচাই করবার জন্য নয়, বহিরাচরণের বালুকায় ঢাকা আভ্যন্তরীণ ফল্গুধারার গতিবিধির স্বরূপ খানিকটা উন্মোচন করবার জন্য। হৃদয়মনের এতটা গভীরে জ্ঞানের আলো অবশ্য পৌঁছয় না। কবির রসদৃষ্টি (যা রসসৃষ্টি থেকে অভিন্ন) তবু হাল ছাড়ে না, অন্ধকারে-প্রদোষান্ধ-কারে পথ খুঁজে বেড়ায়; তমসার পরপারে অথবা তমসার মধ্যেই কিছু হয় তো দেখতে পায়, নইলে কবিতা কবিতাই হত না। 'অন্তিম পরিস্থিতি' (extreme situation) কথাটা চালু করেছেন যাসপার্স; বলছেন, জীবনমৃত্যু একাকার হয়ে যায় এমন দুঃসহ যন্ত্রণাময়, অপার সংকটঘন অবস্থায় না পড়লে আমরা জীবনের তথা জগতের সীমাহীনতা এবং দৈনন্দিনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারি না।

জাতকের শ্যামা ছিল অগ্রগণিকা, সাজ-বদলের মতো প্রেমিক-বদলও তার হামেশাই ঘটত। যার প্রতি সে সাময়িক ভাবে আসক্ত হতো তাকে বশীভূত করা এই অপরূপ সুন্দরীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না মোটেই; দরকার হলে কোনো অবাঞ্ছিত প্রেমিককে জন্মের মতো সরিয়ে ফেলার ছল-কৌশলও তার অভ্যাসসিদ্ধ ছিল। বজ্রসেনের রূপ দেখে সে মুগ্ধ হল, কিন্তু ঐ মন-কাড়া যুবকটি তখন নগরকোটালের হাতে বন্দী, প্রাণনাশ তার আসন্ন। কাজেই "চেটিকে ডাকিয়া রাজপুরুষদের নিকট পাঠাইয়া বলিল—তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দিয়ো। রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইল। শ্যামার গৃহে উত্তীয় নামক এক শ্রেষ্ঠীপুত্র বাস করিত। শ্যামা ছল পূর্বক তাহাকে ভোজনপাত্রসহ শ্মশানস্থিত বজ্রসেনের নিকট পাঠাইল। রক্ষীগণ শ্যামার ইঙ্গিত অনুসারে উত্তীয়কে হত্যা করিয়া বজ্রসেনকে মুক্তি দিল।"

রবীন্দ্রনাথের শ্যামা ভিন্ন জাতের, শুধু ভিন্ন জাতের নয় ভিন্ন যুগের মানুষ। রাজনটী সে, নৃত্যগীতে অসাধারণ গুণবতী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আমাদের কালের চিত্রতারকা-দের মতোই লক্ষ প্রাণের পুত্তলী। তবু আমোদ-প্রমোদে ভোগবিলাসে আত্মবিস্মৃতা নয় সে, বরং খুবই আত্মসচেতন। সখীরা তাকে "গরবিনী" বলে কিন্তু তারাও বোঝে যে এ গর্ব রূপের নয়, ধনের নয়, মানের নয়। কিসের তবে? সখীদের অবশ্য বুঝবার কথা নয় যে এ গর্ব তার প্রেমিক হৃদয়ের অভিজাত রুচির। রাজা তার চোখে নগণ্য, নগরশ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপুত্রেরা তুচ্ছ। যৌবন চলে গেলে "কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা, হে বিরহিণী"—গায় সখীরা। আন্দাজে বোঝা যায়, যৌবনের প্রান্তে এসেও সে বিরহিণী, কারণ যাকে পেলে তার "পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা" মিটত তাকে সে পায় নি, দেখাই পায় নি তার। কামনার তৃপ্তিতে কোনো তৃপ্তি নেই এই জন্মরোমান্টিকের গভীরতর তৃষ্ণার। নিজেই সে বলে তার যৌবন অসুন্দর, তার মন বিষাদের কুহেলিকায় ঢাকা।

এই সংরাগরক্ত কিন্তু সন্ধ্যারক্তিম শ্যামার সঙ্গে একদিকে যেমন জাতকের স্থূলকায়া

শ্যামার আকাশ পাতাল প্রভেদ চোখে পড়ে, অন্য দিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথেরই প্রায় ষাট বছর পূর্বে রচিত অন্য এক গীতিনাট্যের ('মায়ার খেলা') আত্মপ্রমত্তা নায়িকার প্রতিতুলনা লক্ষণীয়। দু জনই নাটকের প্রারম্ভে পুরুষ প্রার্থীদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, দুজনকেই সখীরা একই ভাষায় পরামর্শ দেয়, "জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, হে গরবিনী"। কিন্তু তাদের মানসিক পটভূমি ও প্রতিক্রিয়া একেবারে বিপরীত। প্রমদার মনে হয় প্রেম ব্যাপারটাই বড়ো বাজে, মিছেমিছি একটা ঝামেলা পাকানো। সে জীবনে অবিমিশ্র সুখ চায়, অথচ সে শুনেছে যে প্রেমে অনেক ঝক্কি, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা :

> পরের মুখের হাসির লাগিয়া
> অশ্রুসাগরে ভাসা,
> জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
> জীবনের সুখ নাশা—

জেনে শুনে এই ফাঁদে পা দেবার মতো মেয়ে সে নয়। আর সব চেয়ে গোড়ার কথা হচ্ছে যে সে নিজেরই প্রেমে পড়েছে, তার মনের গড়নটা হচ্ছে আজকালকার ভাষায় যাকে বলে নার্সিসিস্ট্। এবং এটা বুঝবার মতো আত্মবিশ্লেষণী বুদ্ধি তার আছে :

> আমি আপনার মাঝে আপনি হারা
> আপন সৌরভে সারা,
> যেন আপনার মন
> আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।

অনেক যাচনা অনেক সাধ্যসাধনার পর অবশেষে প্রমদা প্রেমে পড়ল। কিন্তু একেই কি বলে প্রেম? প্রার্থনা মঞ্জুর করা দেবীকে মানায়, মানবীকে নয়। তার হৃদয়মন প্রেমের জন্য এতই অপ্রস্তুত, এতই অনাতিথেয় ছিল যে সে নিজের প্রেম ঠিক বুঝতেও পারল না, বোঝাতেও পারল না। প্রেম বন্যার মতো এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না, কুয়াশার মতো অলক্ষ্যে এসে অলক্ষ্যে মিলিয়ে গেল। অমরের মনে জেগেছিল মোহ, কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে গেল। প্রমদার মন ছিল আত্মাভিমানে ভরা, প্রেম চায় আত্মদান; সুর মিলল না।

পক্ষান্তরে শ্যামার ব্যক্তিত্বের কাঠামো প্রেমের উপাদানে গড়া, এবং সে প্রেম আত্ম-প্রেম মোটেই নয়। তার আত্মমর্যাদাবোধের মধ্যে আত্মপ্রেম খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজেকে দিতেই চায় সে। প্রেমের অশেষ দুঃখ সে বোঝে, এবং ঐ তিক্তমধুর দুঃখের জন্য সে শুধু প্রস্তুত নয়, ব্যাকুল। 'পরিশোধ' নামক নাট্যগীতির (এটি 'পরিশোধ' কাহিনীকাব্য ও 'শ্যামা' গীতিনাট্যের মধ্যপদ) উদ্বোধন সংগীতে শ্যামা গাইছে :

> চরণ সেবার সাধনা আনো,
> সকল দেবার বেদনা আনো,
> নবীন প্রাণের জাগরণমন্ত্র কানে কানে বোলো।

প্রথম যৌবন থেকে শ্যামা খুঁজছে সেই 'উন্নতদর্শন' 'দেবকান্তি' পুরুষকে যার হাতে শুধু দেহ নয় সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করা যায়, যার কানে কানে বলা যায়, "আমার সব-সুখদুখমন্থন-ধন"। সকল দেবার বেদনা নিয়েই সে বেঁচে আছে এতদিন শূন্য পথের দিকে চেয়ে। পথ চাওয়া তার সার্থক হল একদিন আক্ষরিক অর্থে। বাড়ির সামনে পথে যেতেই সে প্রথম দেখেছিল তুলনাহীনকে। কিন্তু কী নিদারুণ সে সার্থকতা। বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, জাতক-কাহিনী দু' হাজার বছর পার হয়ে একেবারে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক পর্বে এসে পৌঁছেছে অন্তত শ্যামার চরিত্রকল্পনায়।

উদ্দেশে বিশেষণগুলি লক্ষণীয়। "উন্নত দর্শন" বলতে শুধু রূপবান বোঝায় না, বোঝায় এমন মানুষকে যার মুখশ্রীতে অন্তরের সৌন্দর্য ও চারিত্র্যের আভিজাত্য পরিস্ফুট। শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ং; শ্যামা হৃদয়দান করতে চেয়েছিল শ্রদ্ধার সঙ্গে, শ্রদ্ধার পাত্রকে। সেটাই হল কাল। নিজে যারা শ্রদ্ধেয়, অন্যের কাছে—অন্তত প্রিয়জনের কাছে—তাদের দাবী বড়ো খাটো নয়: ত্রুটিবিচ্যুতি তারা সহজে ক্ষমা করতে পারে না। বজ্রসেন ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি শুদ্ধান্তঃকরণ, ন্যায়নীতিপরায়ণ, সদাজাগ্রত-বিবেক। প্রথম দর্শনেই শ্যামা বুঝতে পারল যাকে সে দেখছে সে শুধু সুদর্শন নয়, শ্রদ্ধেয়; তার মনের তারগুলি ঝংকার দিয়ে বেজে উঠল—এই, একমাত্র এই মানুষটিই নবযুগের জাগরণমন্ত্রে আমার শুষ্ক যৌবনকে সুন্দর করে তুলবে। স্বভাবতই তার এতকালের পিপাসাক্লিষ্ট হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা সে একমুহূর্তে ঢেলে দিল এই "মহেন্দ্রনিন্দিত-কান্তি উন্নত-দর্শন"-এর চরণে। শ্যামার দেহমনের প্রত্যেকটি অনুপরমাণু বজ্রসেনের প্রেমে হয়ে উঠল "মত্ত অধীর"। পরে কী করুণ শোনায় যখন উত্তীয়ের শান্ত ধীর উদাত্ত প্রেমের কথা বলতে গিয়ে সে বলে—"বালক-কিশোর উত্তীয় তার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।"

তাই বলে উত্তীয়ের প্রেমকে একেবারে "কামগন্ধহীন" ভাবার যথেষ্ট ইঙ্গিত নাটকে আছে, যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। উত্তীয় এমন কিছু বালক নয়— শ্যামা তাকে স্নেহকরুণায় এবং অন্যান্য বয়স্ক প্রার্থীর তুলনায় "বালক কিশোর" বলে উল্লেখ করলেও। আহা বেচারী বড়ো ছেলেমানুষ—ভাবটা এই রকম কিছু। গানে আমরা তাকে যতটা চিনি তাতে তো মনে হয় অন্য দুই নাট্য-চরিত্রের অপেক্ষা উত্তীয় পরিণতবুদ্ধি, স্থিরহৃদয়। সখীরা জানে সে "বিফল বাসনা" বহন করছে, সেই বাসনার অব্যক্ত বেদনা "বিরহ প্রদীপে শিখারই মতো/নয়নে তোমার উঠিতেছে জ্বলিয়া," তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—হতাশ হোয়ো না সখা, তোমার তাপস প্রেমের জয় হবেই। শ্যামা জানে এই তরুণটি তার প্রেমে "মত্ত অধীর"। সে ধারণা খানিকটা ভ্রান্ত হলেও, নিত্যদিনের সাহচর্যে সে উত্তীয়কে যেমন বুঝেছে তার নারীসুলভ অনুভূতি দিয়ে তা একেবারে ভিত্তিহীন হবে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। আর কামবর্জিত প্রেমকে কোন অর্থেই "মত্ত অধীর" বলা যায় না। উত্তীয়ের প্রেম কামগন্ধহীন না হলেও তা পারিজাতগন্ধবহ। এই প্রেমের আলোয় আমরা শুধু উত্তীয়কে চিনি না, শ্যামাকেও চিনি। উত্তীয়ের হৃদয়ে এ অপূর্ব, প্রায় অপার্থিব সুন্দর প্রেম তো নিরালম্বভাবে জাগেনি, শ্যামাই জাগিয়েছিল। এমন প্রেম

কোনো নারী শুধু রূপ দিয়ে জাগাতে পারে না, সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপ দিয়েই পারে। সে ব্যক্তিস্বরূপ জাতকের শ্যামার ছিল না, রবীন্দ্রনাথের শ্যামার ছিল।

উত্তীয়ের আত্মাহুতির মধ্যে বরঞ্চ বীরোচিত হিতৈষণায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কোনো আভাস নেই, নাম-গন্ধ নেই। সখীরা যখন বলে "সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে / ঘুচাবে কে! কে!" তখন সে উক্তির শেষে প্রশ্নচিহ্ন নেই, নিরুপায় হতাশার চিহ্নই সুস্পষ্ট। সখীদের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন এই হতাশ বেদনা প্রকাশ করেছেন, তখন নিজের কণ্ঠও কি তাতে যোগ করেন নি? একটু পরেই তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভুবনকে বর্ণনা করেছেন "অকরুণ নির্মম" বলে। সখীরা যখন গায়—"প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে" তখন তারা ভাবতেই পারে না যে এ কাজ উত্তীয়ের দ্বারা সম্ভব। শ্যামা যখন নিরুপায় যন্ত্রণায় চারিদিকে ছোটে আর চিৎকার ক'রে গেয়ে ওঠে—

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে,

তখন তার কল্পনাতেও ছিল না যে সে বীর উত্তীয় হতে পারে। বাস্তবেও সে বীর উত্তীয় নয়।

শ্যামার ডাক শুনে উত্তীয় ছুটে আসে অবশ্য, কিন্তু এসে বলে না যে একজন নির্দোষকে এমন অবিচারের ফাঁদে আমি জড়াতে দেব না, প্রাণের মূল্যেও তাকে বাঁচাবই। বলে—"ন্যায়-অন্যায় জানি নে, শুধু তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী।" তুমি যদি প্রাণ দিতে বল তবে এখনি দেব তোমার চরণে; কোন্ ন্যায়সংগত বা অন্যায় উদ্দেশ্যে তুমি আমার প্রাণ চাও তা তুমিই জানো, আমি বিচারক নই, আমি প্রেমিক। উত্তীয়ের একটা প্রেমিক-সুলভ স্বার্থও আছে এই আত্মদানে। সে বেশ ভালো করে জানে কোনো দিনই শ্যামার বক্ষলগ্ন হওয়া তার ভবিতব্যে নেই, কারণ ঐ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাকে সামান্য প্রশ্রয় দিলেও একটুও ভালোবাসে না। কিন্তু হতাশ অথচ ব্যাকুল কল্পনার চোখে সে একটি মরণোত্তর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে—তোমার যে-প্রাণপ্রিয়কে বাঁচাতে চাও আমার "প্রাণঋণ" নিয়েঃ

তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন মরণ ডোরে
কেমনে ছাড়িবে মোরে,
ছাড়িবে মোরে ওগো সুন্দরী।

নিরাশ প্রার্থনার এত বড়ো উত্তর উত্তীয়ের কাছ থেকে পেয়ে শ্যামা হঠাৎ ছোটো হয়ে গেল নিজের চোখে। যাকে সে কখনো কিছু দেয়নি, যে কিছুই চায়নি মুখ ফুটে ('এতদিন তুমি, সখী, চাহনি কিছু / নীরবে ছিলে করি নয়ন নীচু"), আজ সে তাকে দিতে এসেছে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে চূড়ান্ত দান যা সম্ভব প্রতিদানে,শ্যামা তো প্রেম দিতে পারে না। তব জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উত্তীয় পেল তা মানস সুন্দরীর কাছ থেকে অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা; যে তাকে এতদিন শু করুণামিশ্রিত হাস্যপরিহাসই করে এসে আজ সে তার চরণে প্রণাম জানাল। এ অপ্রেমযুক্ত প্রণতি পেয়ে উত্তীয় যে-শেষ গা গেয়ে গেল ("আমার জীবন পাত্র উচ্ছলি মাধুরী করেছো দান") তা অবিস্মরণী তবু তার শেষ পংক্তিটি উদ্ধৃত করতে চাই "যারে জানো নাই / তার গোপন ব্যথা নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।" এ

নাজুক কিন্তু উচ্চারিতজনার প্রেমিকের আত্ম-দানে কি ব্যর্থ হতাশ প্রেমিকের আত্মহত্যার আমেজ ছিল না স্বল্প পরিমাণেও? গোপন ব্যথার (গোপন বক্ষে আরও তীব্র তার জ্বালা) নীরব রাত্রি (প্রেমিক-প্রেমিকার মুদ্গুঞ্জরিত বিস্রব্ধালাপপূর্ণ রাত্রি) অবসান হোক—একথা কি আজ প্রথম তার মনে উদয় হল? "মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান" সে যদি আগেও ভেবে থাকে তবে এমন মহান মৃত্যুর সুযোগ পেয়ে সে সুখীই হয়েছিল বোধ করি। তার পক্ষে ভাবা খুবই স্বাভাবিক :

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

প্রেমে পরিপূর্ণতা যদি না হয় তবে মরণেই হোক। অমলের কাছে কিংবা রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু আর ভগবানে ভেদ ছিল না এমন কথা কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন: আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু উত্তীয়ের কাছে মৃত্যু আর শ্যামা একাকার হয়ে গিয়েছিল।

উত্তীয়ের নিরাশ প্রেমের দুর্নিবার পরিণাম তার আত্মাহুতি। একে চূড়ান্ত ব্যর্থতাও বলা যেতে পারে, আবার চূড়ান্ত সার্থকতাও ভাবা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দুই দিক থেকে দেখাতে চেয়েছেন এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে। দুই দিক প্রায় বিপরীত অথচ পরস্পরকে নাকচ করে দেয় না, নইলে সেই একই সখীদের গানে দুটো রূপ উদ্ঘাটিত হত না। একটি দিক মানবিক, সাধারণ মানুষের, বিশেষত যারা উত্তীয়ের প্রতি দরদী তাদের মনে হতেই পারে উত্তীয় তার তরুণ জীবন "নিষ্কারণে" দিল। সখীরা জানে যে-মধুর স্বপ্নাভ প্রত্যাশায় উত্তীয় বুক বেঁধেছিল তা তো আশার ছলনা মাত্র। জীবনকালে যার হৃদয়ে স্থান হল না, মৃত্যুর পরে—হোক না সে যত মহৎ মৃত্যু—তার হৃদয়ে স্থান হবে, উত্তীয় যদি তাই ভেবে থাকে তবে সে নিষ্কারণেই মৃত্যু-বরণ করেছে। শ্যামার বুকে যে-বস্তুটি বাকি জীবন গেঁথে থাকবে তা উত্তীয়ের সুন্দর উদার প্রেম নয়, তার যন্ত্রণাদায়ক বিবেকদংশক স্মৃতি, এবং সেই সঙ্গে নিজের প্রতি ধিক্কার। তাই সখীদের বিলাপ স্বাভাবিক :

মধুর মুকুলিত যৌবনধন ব্যর্থ করিলি
কোন অকালে
পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমধুর পারে,
ওরে সখা।

এই গানের অব্যবহিত পরেই রাজপ্রহরী উত্তীয়কে বধ করে বজ্রসেনকে কারামুক্ত করে। তখন সখীরা গেয়ে উঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের গান; মনে হয় এ সুর রবীন্দ্র-নাথের আপন মনেরই সুর। সখীদের কণ্ঠে এ ধরনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যক্ত ক'রে নিশ্চয়ই তিনি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব অন্তত অল্পকালের জন্য এমন এক নান্দনিক (মিস্টিক?) স্তরে ওঠা যেখান থেকে অতি মর্মন্তুদ মৃত্যুর কালো গর্ভের ভিতর থেকেও এক অপরূপ আলো দেখা যায়। এই আলো রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের প্রচণ্ডতম শোকের পরেও দেখে-ছিলেন, দেখে তাঁর "মনের মধ্যে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল"। সেই আলোরই গান শোনা যায় সখীদের কণ্ঠে :

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি
দুর্দিন দুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।

অকরুণ নির্মম ভুবনে
দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাসি।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গেছেন অন্তত 'নৈবেদ্য'-এর পর থেকে; প্রচলিত অর্থে মানবাত্মার অমরতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না তিনি। তবু

মৃত্যু সম্পর্কে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টি তাঁর ছিল বলে তাঁর হাতে বিয়োগান্ত নাটক ('প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'রাজা ও রানী', এবং সর্বোপরি 'শ্যামা') ট্র্যাজেডির খুব কাছ ঘেঁসেও ঠিক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না: এমন এক দুঃখস্নাত বৈরাগ্যস্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করে থাকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না।

'শ্যামা' শেষের দিকে, কিন্তু শেষে নয়, সিরেট ট্র্যাজেডির রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক গলদ ও গ্লানির পর শ্যামা যখন ভাবে বজ্রসেনের সঙ্গে তার মিলন পরিপূর্ণ হয়েছে, বজ্রসেন ব'লে ওঠে "দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য", দুজনে পূর্ব জীবনের সমস্ত জঞ্জাল পিছনে ফেলে নৌকার পাল তুলে দিয়ে গান ধরে :

প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও, দাও—

ঠিক তখনই সখীরা বুঝতে পারে যে প্রেমের তরী অচিরে খান খান হয়ে যাবে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় পড়ে। প্রেমিক-প্রেমিকার অপমৃত্যুর চেয়ে প্রেমের অপমৃত্যুর ট্র্যাজেডি তীব্রতর।

প্রেমের স্বাভাবিক মৃত্যুও কম ট্র্যাজিক নয়। তারি বিষাদঘন ছায়া দেখা যায় মানসীর অনেক কবিতায়—'ভুল', 'ভুলভাঙা', "বিচ্ছেদের শান্তি", "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি" ইত্যাদিতে। কিন্তু সব চেয়ে মর্মস্পর্শী কাব্যরূপ ধারণ করেছে প্রেমের স্বাভাবিক জরা ও মৃত্যুর বিষণ্ণতা সেই মিতবাক চতুষ্পদীতে যা গানের আকারেই আমাদের অনেক বেশি পরিচিত, অথচ সুরের ঐশ্বর্য লাভ করবার জন্য কবিতাকে কিছু দৈন্য স্বীকার করতে হয়েছিল। সনেটের প্রথম চারটি অবিস্মরণীয় পংক্তি রূপান্তরিত গানের মধ্যেও আমরা ভুলতে পারি না :

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলি।
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি—
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

পুরাতন প্রেম নব প্রেমজালে ঢাকা পড়ে যায়—প্রেমের এই অপঘাত সাহিত্যে ও জীবনে আমাদের খুবেই পরিচিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়ে না দিলে কি আমরা পুরানো প্রেমের নব নব জীবনের জালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার বেদনাটা এমন করে বুঝতাম? মানুষের মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ দিয়েছে বেশি।

অদৃষ্টের ডোরে বাঁধা ঘটনার জালে ফেলে শ্যামার দুর্লভ, আক্ষরিক অর্থে অতি দুর্লভ প্রেমের নিঃশ্বাসরোধ করল যে নির্মম ব্যাধ তার প্রতিকৃতি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সখীরা নব দম্পতির নৌকায় উঠে ভরপুরে আনন্দের গান গেয়ে পাল তুলে দেওয়ার পরমুহূর্তেই :

হায়, হায়রে, হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে
মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি॥

বিধাতাকে নির্মম ব্যাধের আকৃতিতে দেখা, দৈবী বাণীর মধ্যে সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি শোনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভূতপূর্ব, "they kill us for their sport"-এর চেয়েও জোরালো তার ব্যঞ্জনা। অথচ এই গানে বা তার নাটকীয় বিস্তারে নাটক শেষ হয় না; হলে হয়ত শেকসপীয়রীয় মহিমা লাভ করত, কিন্তু রাবীন্দ্রিক সুষমা হারাত। শেষ হয় যে গানে তাতে সর্বংসহ ঈশ্বরের ক্ষমার কাছে বিবেকী মানুষের ক্ষমাহীনতা লজ্জিত।

উত্তীয় যদিও হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে স্বর্গের আলো আনল অবিচারে-অত্যাচারে অন্ধকার পৃথিবীতে, তবু ভোলা উচিত নয় যে উত্তীয়কে আদর্শ মানুষ রূপে চিত্রিত করার কোনো অভিপ্রায় ছিল না রবীন্দ্রনাথের; তাকে এঁকেছেন আদর্শ প্রেমিক করে। মানসীর অর্থাৎ মনের মতো প্রেমাস্পদার সন্ধান করেছিলেন তিনি মানসী নামক কাব্যগ্রন্থে। উত্তীয় হচ্ছে সেই মানস প্রতিমার সুযোগ্য প্রেমিক—যার কোনো দাবী নেই, শুধু দেবার আছে। আদর্শ মানুষ হতে হলে একজনকে নয়, অনেকজনকে ভালোবাসতে হয় প্রাণ তুচ্ছ করে। বুদ্ধের সর্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণা, যীশুর love thy neighbour as thyself নরোত্তমতার পথনির্দেশক। এ

নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের বাণী উত্তীয়ের কানে পৌছয় নি, অন্তত তার কোনো আভাস নেই নাটকে। রোমান্টিক প্রেমের চরমমূল্য অকাতরে দিয়ে গেল সে; মানবপ্রেম সে জানে না। জানলে ন্যায়-অন্যায় কাকে বলে তাও অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করত, প্রেমের ডাকে সাড়া দেওয়ার আগে ন্যায়ের ডাকে সাড়া দিত। ব্যক্তিপ্রেম ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ ভুলে যেতে পারে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হলে; মানবপ্রেম ন্যায়-অন্যায়ের সুদৃঢ় ভিত্তি। ন্যায়নীতির ভিত বিচারবুদ্ধির উপর (reason-এর উপর) গাড়া হবে কি অনুভূতির উপর—সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। তবে এটা ঠিক যে অনেক মহাপুরুষ, গৌতম বুদ্ধ থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত, প্রেমের উপরই জোর দিয়েছেন। গান্ধীজী অবশ্য অহিংসার কথা বলেছেন বেশি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন 'অহিংসা' নঞর্থক শব্দ, তার সদর্থ বা উলটো পিঠ হচ্ছে প্রেম—যে প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন যীশু খৃষ্ট।

উত্তীয়ের প্রেম যতই নিঃস্বার্থ হোক তবু তা ভগবদগীতার অর্থে নিষ্কাম নয়, কোনো অর্থেই নিষ্কাম নয়। কামের একটি কদর্য দিক আছে যা সর্বগ্রাসী এবং আগ্রাসী। কিন্তু এই সংরাগ-বর্ণালির অন্য প্রান্তটি শুভ্রসুন্দর স্নিগ্ধমধুর। সেই প্রান্তে প্রেমের উদ্ভব। উত্তীয়, শ্যামা এবং বজ্রসেন তিনজনই প্রেমিক। 'শ্যামা'-তে প্রেমের ত্রিমূর্তি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রেমের রূপ অসংখ্য : 'চিত্রাঙ্গদা'য়, 'চণ্ডালিকা'য়, 'শাপমোচন'-এ ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখি আমরা।

শ্যামার প্রেম প্রেমের পরাকাষ্ঠা নয়, জ্বলন্ত কাঠি—"যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে।" প্রেমের বেদীতে উত্তীয়ের আত্মবলিদানের কাছে শ্যামার আত্মনিবেদন ছোটো হয়ে গেছে, তার স্বার্থই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সেও কিছু কম ত্যাগ স্বীকার করেনি সর্বাত্মক প্রেমের ডাকে। রূপে গুণে অনন্যা এই প্রেমসাধিকা সমস্ত রাজপুরীর, সম্ভবত সমস্ত রাজ্যের স্বপ্নস্পৃহাপ্রীতি ত্যাগ করল বিনা দ্বিধায়; ত্যাগ করল রাজার রাজকীয় অনুগ্রহ ও অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ধনমান—"রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে এল আমাদের সখী"। আমরা ভুলে যাই যে শ্যামা ছিল উঁচু দরের নৃত্যশিল্পী। চোখে পড়বার মতো সুন্দরী নর্তকী রাজার চোখে পড়তেই পারে, হারেমেও স্থান পেতে পারে; কিন্তু রাজনটী' পদ, পোয়েট লরিয়েটের সঙ্গে তুলনীয়, সর্বসাধারণ্যে বিঘোষিত রাষ্ট্রীয় সম্মান পেতে হলে অসাধারণ গুণ থাকা দরকার। কোনো কৃতার্থ শিল্পীর পক্ষে এত বড়ো প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ করা অল্প কথা নয়। "তোমার সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি" বলে সাত-পাঁচ ভেবে চলে যাওয়া ছোটোখাটো ত্যাগ নয়।

প্রেমতপস্বিনী অতঃপর সব ছেড়ে নিজেকে নিবেদন করেছে "জীবনে মরণে প্রভু"র চরণে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে হতে চায় পতিপ্রাণা। পাপ তার অন্তরকে কলঙ্কিত করে না, করে তোলে সমুদ্রের মত গম্ভীর। এই ভাগ্যহতার অতি নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত প্রেমের, সকল অর্থ খুঁজে পেয়ে সকল অর্থ হারিয়ে ফেলা জীবনের সম্মুখে আমরা মাথা নত করে দাঁড়াই, বিচারকের দণ্ড হাত থেকে খসে পড়ে। খসে পড়ে আরো এই কারণে যে যার চরণে সে সব কিছু সমর্পণ করল, ন্যায়-অন্যায়-বিবেক পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিল, তারই শক্ত হাতে বিচারের দণ্ড বড়ো বেশি উদ্যত। নেপথ্যে কণ্ঠসংগীত শোনা যায়—নিঃসন্দেহে তাতে কবির কণ্ঠও মিলেছে, আমাদের কণ্ঠও মিলতে চায় :

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা।
/ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।

আর একটা কথা আমরা (পাঠকরা, শ্রোতারা, দর্শকরা) ভুলে যাই—উত্তীয়ের প্রাণনাশের জন্য শ্যামা খুব বেশি দায়ী নয়। শেষ মুহূর্তে সে যখন ছুটে গিয়ে নগর-কোটালের কাছে স্বীকারোক্তি করল যে এ সব তারি ছলনা, উত্তীয় নির্দোষ, তখন কোটাল তাতে কর্ণপাতই করল না। বজ্রসেনকে ছেড়ে দিয়ে সে উত্তীয়কে আসামী ঠাউরেছে; তাকেও আবার ছেড়ে দিলে চলবে কেন, "চোর চাই, হোক না সে যে কোনো লোক/নহিলে মোদের যাবে মান।" তবু বজ্রসেন তার কারামুক্তির উপায় জানবার জন্য অধীর হয়ে উঠলে, সব দায়িত্ব, সব দোষ শ্যামা নিজের স্কন্ধেই টেনে নিল, বলল—এ কারাপ্রাচীরের কোনো শিলা তার হৃদয়ের চেয়ে কঠিন নয়। সমস্ত শুনে বজ্রসেন যখন নিষ্করুণ কণ্ঠে তাকে পাপিষ্ঠা, কলঙ্কিনী বলে ধিক্কার দিল তখন শ্যামার মর্মাহত মিনতি কথায় ও সুরে এই অতুলনীয় নাটকের বোধ করি শ্রেষ্ঠ অংশ—যদিও কোনো শিল্পরচনার অঙ্গব্যবচ্ছেদ পাপ :

হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো,
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।

তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়,
তিনি করিবেন রোষ—সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া—
সবে না, সবে না, সবে না।

বজ্রসেন কিন্তু ক্ষমা করতে পারল না, একটু আগেই বেশ উদার কণ্ঠে বলেছিল বটে যে প্রেম সব পাপ ক্ষমা ক'রে প্রেমের ঋণ শোধ করে, "কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে"; কিন্তু সেটা তার অন্তরের কথা নয়। অথবা স্বভাবতই সে ভেবেছিল যে শ্যামার পাপ যাই হোক তা ছোটোখাটো আকারেরই হবে, সে যে এত বড়ো পাপের পঙ্কে ডুবে আছে তা বজ্রসেন ভাবতেই পারেনি। যখন জানল তখন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। মুহূর্তকাল একটু করুণাই হল পাপিষ্ঠার প্রতি, "কাঁদতে হবে, জীবনে পাবি না শান্তি।" শ্যামাকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আত্মধিক্কার জাগল তার মনে—সেও তো মহাপাপভাগী, পাপ মূল্যে কেনা তার জীবন। এবার ক্রোধে ভরে উঠল তার মন। ক্ষমার একটুকু জায়গা হল না এই প্রেমিকের বিবেক-পীড়িত ন্যায়-নীতিপূর্ণ হৃদয়ে। প্রেমের চরম শাস্তি দিতে সে উদ্যত হল—শ্যামাকে প্রত্যাখ্যান করল। শ্যামা কিন্তু পিছনে পিছনে চলল; সব কিছু ছেড়ে এসেছে সে, বজ্রসেনকে ছাড়বে না। প্রেমিক-বিচারকের দণ্ড তখন আরো চরমে উঠল—সে চরম দণ্ড আজকের দিনে অনেক সভ্য দেশে জঘন্যতম খুনীকেও দেওয়া হয় না। বজ্রসেন শ্যামাকে হত্যা করল—যেমন অথেলো ডেসডিমোনাকে হত্যা করেছিল তাকে পাপিষ্ঠা জেনে। শ্যামা মরেনি, কিন্তু বজ্রসেন তার বুকে মৃত্যু-আঘাতই হেনেছিল; তার লুণ্ঠিত দেহকে মৃত জেনেই সেখান থেকে সে প্রস্থান করে।

পাপিষ্ঠাকে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে তার নিজের জীবনকে পাপ-ঋণ থেকে মুক্ত করবে—মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়তো তাই ভেবেছিল বজ্রসেন। কিন্তু প্রেমিকের অক্ষমার দ্বারা তো প্রিয়ার পাপক্ষয় হয় না, উভয়ের যন্ত্রণাই বাড়ে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল বজ্রসেন পথে পথে, মাঠে মাঠে, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে আবার

করে। তার কোলাহীন অন্তর্দাহের মধ্যে শান্তি কোথায় খুঁজে পাবে সে?

> এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়
> তুমি কি পথভ্রান্ত?
> দুই চক্ষুতে এ কি দাহ—
> জানিনে, জানিনে কী যে চাহ

গায় সখীরা। শ্যামার বিরহে—শোকেই বলা উচিত—বিচারক আবার ব্যাকুল প্রেমিকে পরিণত হল, তার উদ্বেল প্রেম বুকের পাঁজরে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মতো। পরলোকের উদ্দেশে সে চিৎকার করে উঠল:

> এসো, এসো, এসো প্রিয়ে
>
> মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে।

এ আর্ত চিৎকার আহত কিন্তু এখনো জীবিত শ্যামার কানে পৌঁছল, নতুন নয়, পুরোনো প্রাণ নিয়েই সে ফিরে এসে সামনে দাঁড়াল। কিন্তু রক্তমাংসের শ্যামাকে দেখে বজ্রসেনের মন আবার কঠিন হয়ে গেল, প্রেমের স্থানে পাপবোধই জেগে উঠল প্রখরতর হয়ে। শ্যামাকে সে চলে যেতে আদেশ করল।

> কাঁদিল ফিরায়ে মুখ, 'যাও যাও ফিরে,
> মোরে ছেড়ে চলে যাও।' নারী নতশিরে
> ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
> ভূতলে রাখিয়া জানু বন্দুর চরণে
> প্রণমিল, তারপর নামি নদীতীরে,
> আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে।

এইখানে কাহিনী-কাব্যের সমাপ্তি। নাটকে কিছুক্ষণ রঙ্গমঞ্চে গোরস্থানের নীরবতা বিরাজ করবে, তারপরে গান শোনা যাবে—যে গান একমাত্র শান্তিদেব ঘোষই গাইতে পারেন, যে-গান শুনে আমরা বুঝতে পারি বজ্রসেনের উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের গভীরে প্রেমিক সত্তা আর নৈতিক সত্তা পরস্পরকে অবিরাম আঘাতের পর আঘাত করে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে।

এই সমাপ্তি-সংগীতে বজ্রসেন আপন প্রেমের বলহীনতার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। অথচ ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে গিয়েই তার প্রেম দীনতা স্বীকার করল। পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রেমকে সফল করা—সে তো অধর্ম, ঐশী বিধান তা হতেই পারে না। প্রেম তার দুর্বল ছিল কিন্তু ধর্মাধর্ম-জ্ঞান খুবই বলিষ্ঠ। ঘোরতর পাপের পঙ্কিল পথে প্রিয়া তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে; গ্রহণ করলে সেও যে পাপী হবে। পাপিষ্ঠাকে সে ক্ষমা করতে পারল না। তবে সে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করল যে এই অভাগিনী পাপিষ্ঠাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন, কিন্তু ক্ষমা করবেন না তার ক্ষমাহীনতা। ঈশ্বরের আদেশ কি তবে এই যে মানব তার ন্যায়নীতিবোধকে ক্ষুণ্ণ করেও প্রেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে? মানবজীবনে প্রেমের মহৎ মূল্য অনস্বীকার্য; কিন্তু তার স্থান কি ন্যায়নীতিরও ঊর্ধ্বে?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তিরিশ

জানলার ওপর ঝুঁকে পড়ে আয়না রাস্তা দেখছিল। তার লম্বা বিনুনিটা পিঠের ওপর দুলছে। আমি ছিলাম বিছানায় বসে। সামান্য আগে সন্ধ্যে হয়েছে, ঘরের বাতিটা এখনও মিটমিটে, তেমন করে অন্ধকার দূর হতে পারেনি এখনও। জ্যাঠামশাই কাছাকাছি কোথাও হাঁটাচলা করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে আমার কাছে বসে ছিলেন অল্পক্ষণ, তারপর জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করতে নিজের ঘরে চলে গেছেন। আয়না আমার কাছে অনেকক্ষণ আছে। নানা রকম গল্প করছিল। একবার উঠে গিয়ে সুহাসের ঘরে রেডিয়ো খুলে দিয়ে এল। আবার পরে গিয়ে বন্ধ করে দিল।

আমার ঘরে একসঙ্গে গোটা ছয়েক ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছে আয়না। পাখার বাতাসে ধোঁয়া সারা ঘরে ছড়িয়ে গিয়ে গন্ধ উঠেছে। গুনগুন করে গান গাইছিল আয়না। গেয়ে গেয়ে থেমে যাচ্ছিল, আবার গাইছিল।

হঠাৎ আয়না বলল, "দাদা আর অবিনদা আসছে।" বলে জানলার ওপর আরও ঝুঁকে পড়ল।

সুহাসরা আসছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি হল। মাথার মধ্যে আচমকা কোনো স্নায়ু বা উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাবার মতন হয়ে যন্ত্রণাদায়ক এক ঝিমঝিমে অনুভূতি সৃষ্টি করল কয়েক মুহূর্ত, চোখ বুজে এল। ঘরের আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না— আমি বুঝতে পারলাম না।

আয়না জানলা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল, বলার পর সে যখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আস্তে আস্তে আমি তার মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম।

"কী হল, শচিদা?"

"না, কিছু না, চোখটা কেমন করে উঠেছিল।"

"তাই বলো। আমি ভাবলাম তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে।"

"না না। ...আজ বিকেলে একটু বেশী গরম গরম লাগছে, না রে?"

"বেশ গরম।"

"আমারও ঘাম হচ্ছে। একটু জল দে তো।"

আয়না জল গড়িয়ে আনল। "তোমার মুখটা বেশ ঘেমেছে, শচিদা। পাখাটা বাড়িয়ে দি?"

জল নিয়ে খাবার সময় মনে হল, আমার অন্ননালী বেশ শক্ত হয়ে রয়েছে। কষ্ট হল খানিকটা। আস্তে আস্তে জল খেলাম।

আয়না হঠাৎ তার শাড়ির আঁচলটা আমার মুখের সামনে এনে বলল, "দেখি, তোমার মুখটা মুছিয়ে দি।"

মুখ মুছিয়ে আঁচল সরাতে গিয়ে আয়না দেখল, আমার দু' চোখে জল ভরে উঠেছে। সে বুঝতে পারল না, আমার কী হয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। আমার কী হয়েছিল—সে যে আমিও বুঝিনি। হঠাৎ জড়ানো কেমন এক শব্দ শুনে বুঝলাম, মেয়েটাও কেঁদে ফেলেছে। কেঁদে ফেলে আয়না আর দাঁড়াল না, পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

চোখ মুছে দেখি, আমার ঘর ফাঁকা। আলোটা সামান্য উজ্জ্বল হয়েছে। পাখার শব্দ বেড়েছে, সমস্ত ঘরের মধ্যে কেমন এক স্তব্ধ ভাব ফুটে আছে। আমার কানের চারপাশে যে ভোমরাটা সারা দুপুর আর বিকেল ধরে গুনগুন করছিল সে এখন আমায় আর উত্যক্ত করছে না। মনের মধ্যে কোথাও সে বসে পড়েছে। এ ঘরের কোথাও আমার মন ছিল না, চেয়ে আছি তো আছিই। মনে হচ্ছিল, শীতকালের দুপুরের মাঠে রোদের মধ্যে যেমন [illegible] ওড়ে—সেই রকম পোকা উড়ছে [illegible] ঘরের মধ্যে।

সিঁড়িতে সুহাস আর অবিনের পায়ের শব্দ আমার কানে আসেনি, হঠাৎ দেখলাম ওরা আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

সুহাস চৌকাঠ থেকেই আমায় দেখতে দেখতে বলল, "শচিদা, অবিন এসেছে। ও বসুক; আমি ধরাচুড়ো ছেড়ে আসছি।"

দরজা থেকেই সুহাস চলে গেল। সে বোধ হয় ঘরে ঢোকার ভরসা পেল না। অবিন আমায় লক্ষ করছিলেন, আস্তে আস্তে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

"কী মশাই, কেমন আছেন আজ?" অবিন এগিয়ে এসে বললেন।

আমি তাঁকে দেখছিলাম। কলকাতায় আসার পর থেকে অবিন আমার সঙ্গে

বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়েছেন। প্রায়ই আসেন। বসে বসে গল্প করেন। জীবনের একটা অফুরন্ত শক্তি যেন মানুষটির মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে। কথা বলেন উঁচু গলায়, হাসেন হোহো করে, বুদ্ধিটাকে এমন করে ফাঁস পাকিয়ে ছোঁড়েন আমার কথা আটকে যায়। আবেগ এলে চোখ দুটি ফুলকির মতন জ্বলতে থাকে। ওঁকে অন্যদিন যতটা স্বতঃস্ফূর্ত, নিশ্চিন্ত দেখাত আজ তার তারতম্য ঘটেছে কিনা দেখবার চেষ্টা করছিলাম।

"বসুন।"

"বসছি, বসছি। আপনার খবর কী বলুন?"

"এই তো।"

অবিন বসবার জন্যে চেয়ারটা টেনে নিলেন। "কেন? এই তো কেন? কী হল?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। অবিনের স্বাভাবিকতা আমার কাছে সন্দেহজনক হয়ে উঠছিল। ধুলোবালির মধ্যে ঘুরে বেড়ালে যেমন মুখে চোখে একটা পাতলা কালচে দাগ ধরে যায়, অবিনের মুখে সেই রকম কোনো অদৃশ্য দাগ ধরে আছে। অবিনের কথা বলায় মৃদু ধরনটিও আমার কানে লাগছিল।

"আপনি গিয়েছিলেন?" আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম।

"কোথায়?"

"ডাক্তারের কাছে।"

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে আর অজ্ঞ হবার চেষ্টা করলেন না। বললেন, "গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই ফিরছি। সুহাস ছিল।"

আমি অবিনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ডাক্তার কী বললেন জানতে চাইছিলাম। অবিনের কোনো ব্যগ্রতা নেই। যেন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সঙ্গে আমার আগ্রহের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছেন না।

অবিনও আমায় দেখছিলেন। আমার স্পষ্টই মনে হল, অবিনের মুখে খুব পাতলা করে যে উদ্বেগের আবটা মাখানো ছিল তা গাঢ় হয়েছে। ওঁর চোখ দুটি নিশ্চিন্ত নয়। একবার পাখার দিকে তাকালেন, পাখাটা কত জোরে চলছে দেখলেন যেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। "সারাদিন আপনি বুঝি খুব দুর্ভাবনায় কাটাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। কী বললেন উনি?"

অবিন সহজ গলায় কৌতুক করে বললেন, "ডাক্তাররা মেয়েদের চেয়েও অস্পষ্ট করে কথা বলে। মারাত্মক কিছু বললেন না অবশ্য। আপনাকে আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকতে হবে।"

আমার কপালের ঘাম ভুরুর কাছে গড়িয়ে পড়ছিল। গলাটা শক্ত। বুকের তলায় নিশ্বাস জমে যাচ্ছিল। কয়েকটি মুহূর্ত কেমন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। শেষে অবিনের দিকে তাকালাম। ওঁর মিথ্যেটা আমার কাছে ধরা পড়ছিল।

"দাশগুপ্তবাবু?" অবিন হঠাৎ অন্যরকম ভাবে বললেন।

"বলুন।"

"আপনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন কেন?"

"না, না; আমি আর ব্যস্ত হচ্ছি না।" আমার গলার স্বর হঠাৎ ভেঙে যাবার মতন শোনাল। গলা পরিষ্কারের চেষ্টা করেও স্বর উঠল না কিছুক্ষণ।

অবিন কোনো রকম সাড়াশব্দ করলেন না। নীরব। আমি মুখের ঘাম মুছে নিলাম। হাত কাঁপছিল। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল: ভোরবেলার স্বপ্নের শাঁড়ের মতন এবার আমায় সকলের মাঝখানে উঠে দাঁড়াতে হবে। কোথাও যেন আমার জন্যে খুব মৃদু করে খোল করতাল বাজতে শুরু করে দিয়েছে।

"অবিনবাবু—" আমি বললাম, "আমার একটু ভুল হয়ে গেল।"

অবিন আমায় দেখছিলেন।

"কলকাতায় আসার আগেই আমায় ডিমুরি যাওয়া উচিত ছিল।"

"ডিমুরি?"

"আমি ভেবেছিলাম, কলকাতা থেকে ফেরে ডিমুরি যেতে পারব।"

"যাবেন; পরে যাবেন—" অবিন বললেন।

"না।"

"কেন?"

"আমি আর ফিরে যাব না।"

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর চোখের পাতা ছোট হয়ে এসেছিল। আমার চোখে চোখে তাকাতে তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল।

"আপনি একটু ভরসা করুন," অবিন মৃদুস্বরে বললেন।

"না। আমি আশা-ভরসা করব না।"

দু মুহূর্ত নীরব থেকে অবিন বললেন, "আশা ছাড়া আপনি কী করতে পারেন!"

"আমি কিছু করতে পারি না। কে পারে?"

"আপনি যা অনুমান করছেন তা নাও হতে পারে।"

"হবে। আমি জানি।"

অবিন থেমে গেলেন। তিনি জোর করে কিছু বলতে পারলেন না। আমার অবাক লাগছিল। এই অবিনকে কথায় থামানো আমার সাধ্য নেই। কিন্তু আজ তিনি কথা বলার জোর হারিয়ে ফেলেছেন। আমার বুঝতে কষ্ট হল না, ডাক্তারের কাছ থেকে কোনো সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে নি সুহাসরা।

বারান্দায় আয়নার গলা শোনা যাচ্ছিল। সুহাস সেই যে জামা কাপড় ছাড়ার নাম করে চলে গেছে এখনও ফিরে এল না। বোধ হয় স্নান করতে গেছে। কিংবা জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আড়ালে কথা বলছে। জ্যাঠামশাই ওদের ফেরার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসেছিলেন। সুহাস কী তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ কথা না বলে পারবে!

অবিনকে আমি ধরে ফেলতে পেরেছি। সুহাস আমার চোখের আড়ালে থাকলেও আমার অপেক্ষা করার কারণ ছিল না।

খুব আচমকাভাবে আমি বললাম, "ডিমুরি হাসপাতালে আমার এক বন্ধু ছিল, রামপ্রকাশ; সে আমায় বলেছিল—আমার এই অসুখটা চলতে থাকলে শেষে কী হতে পারে।"

অবিন যেন চমকে উঠলেন। তাঁর চোখ হঠাৎ উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে গেল।

আমি বললাম, "আমার তখন থেকেই সন্দেহ ছিল, রামপ্রকাশ আমায় সত্যি কথাটা বলতে চায় নি তখন।...বললেই পারত।"

এমন সময় আয়না এল। অবিনের জন্যে চা এনেছে।

"আয়না, সুহাস কোথায় রে?"

"এই তো বাথরুম থেকে বেরুলো।"

"জ্যাঠামশাই ঘরে?"

"ছাদে গিয়েছেন।" বলে আয়না চলে যেতে যেতে আমার দিকে তাকাল, "তোমার জন্যে হরলিকস আনছি।"

আমরা চুপচাপ। অবিন চা খেতে লাগলেন।

আমি বললাম, "অবিনবাবু, আমার একটা কথা মনে পড়ছে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে পুরোনো কুয়োটা একবার শুকিয়ে গেল। গরমকালে বালতি ডুবত না। বাবা তখন বেঁচে, সবাই বেঁচে, বাবা আর-একটা নতুন কুয়ো খোঁড়াতে বসলেন। তিন চারটে জায়গায় চেষ্টা হল, হাত কয়েক খোঁড়ার পরই বড় বড় পাথরের চাই। শেষে বাড়ির বাইরের দিকে একটা কুয়ো খোঁড়া হল। আপনি সেটা দেখেছেন। পুরোনোটায় ততদিনে আবার জল আসতে শুরু করেছে, পাথর চাপা দিয়ে সেটা তখন বোজানো হল। আমার হল সেই অবস্থা। আমি আমার পুরোনোটাকে পাথর চাপা দিলাম, নতুনটা আমার কাজে আসবে না।"

অবিন অন্যমনস্ক ছিলেন। তাকালেন। "আপনার পুরোনোটা কী?"

"আমি আমার ভাগ্য স্বীকার করে নিয়ে-

ছিলাম। যা ঘটেছে সেটা আমার জানা ছিল বলে আমি ভেবেছিলাম, যে ক'টা দিন সুযোগ পাই কিছু একটা নিয়ে থাকব। মায়াকে বলে এসেছিলাম, আমি ফিরে যাব, ভয়-ভাবনা ফেলে রেখেই আসব। আমার আর যাওয়া হল না।"

অবিন যেন আমার হাহাকারটা অনুভব করবার চেষ্টা করলেন। কিছু ভাবছিলেন। পরে বললেন, "আপনি মৃত্যু নিয়ে সারাটা জীবন ভাবলেন, জীবন নিয়ে ভাবলেন না কেন?"

আমি অবিনের চোখের দিকে তাকালাম। প্রশ্নটা আমার কাছে নতুন নয়। বললাম, "মানুষের মতি একরকম নয়। আমাদের সংসারে যেভাবে সব ঘটে গেল তাতে আমার মন স্বাভাবিক থাকতে পারল না। মৃত্যুর চিন্তাই আমায় টানল।"

"অন্যদিকে টানলে কিছু পেতেন।"

"কী পেতাম?"

"কিছু পেতেন না?

সামান্য চুপ করে থেকে আমি বললাম, "হয়ত অল্পস্বল্প কিছু পাওয়া যেত। সে তো এদিকেও পেয়েছি।"

"কী পেয়েছেন?"

"কী পেয়েছি—! জ্যাঠামশাই, আয়না, সুহাস, আপনাদের সহানুভূতি। বন্ধুত্ব। যদি বলেন আরও কী—তাহলে বলব, আমার বন্ধু রামপ্রসাদ, মায়া..."

অবিন আমার চোখে চোখে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, "মোহিনী?"

আমি অবিনের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখ দুটি উজ্জ্বল শিখার মত জ্বলছে। সমস্ত দিনের বেদনার তলায় এই একটি গভীর, সুপ্ত অভিমান মন কেমন করে চাপা ছিল আমার। সেটি যে এত দুঃখদায়ক আমি জানতাম না।

মাথা নেড়ে বললাম, না পাইনি। মুখ ফুটে কথাটি আমার বলা হল না।

দুজনে মুখোমুখি নীরব হয়ে বসে রইছি। অবিন মৃদুস্বরে বললেন, "আপনি ভাগ্যহীন।"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অবিন একটা সিগারেট ধরালেন। জ্যাঠামশাই ছাদে আছেন জেনেই বোধ হয় সিগারেটটা ধরিয়ে ছিলেন। সামান্য সময় আস্তে আস্তে সিগারেট খেলেন। তারপর বললেন, "শচিবাবু, আমায় একটা কথা বলুন।"

"কী কথা?"

"মৃত্যু কী?"

"জানি না। মানুষের জন্ম অজ্ঞেয়, মৃত্যু অজ্ঞেয়।"

"যা অজ্ঞেয় তার কোনো পরিচয় নেই। আপনি তার পরিচয়ের জন্যে এত অধীর হন কেন?"

"জানি না। ভগবানও অজ্ঞেয়। তবু আমরা তাঁর জন্যে অধীর হই।"

"আপনার ভগবানকে আমি আঘাত করতে চাই না। কিন্তু মানুষ মিথ্যার বেলায় যত অধীর হয়, সত্যের বেলায় হয় না।"

"বিশ্বাস মানুষকে অধীর করে। জগতে বিশ্বাসের জন্যে কত জীবন দুঃখ সয়েছে সেটা আপনার অজানা নয়।"

"আর জীবন?"

"শাস্ত্রে জীবনকে জ্ঞেয় বলা হয়েছে।"

"শাস্ত্রের কথা থাক; আপনার কথা বলুন।"

আমার বলার কথা ছিল না। ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম। জীবনকে আমি যতটুকু জেনেছি যতটুকু সে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। মায়ার কথা আমার মনে পড়ল। আমি তো তাই, মাটির তলায় চাপা পড়ে আছি, আমার না হল অঙ্কুর হয়ে ফুটে ওঠা, না জানলাম বাইরের আলো বাতাস সংসারকে কেমন করে সজীব করে রেখেছে।

"জীবনও আমি ঠিক জানি না, অবিন-বাবু। সে আমার শরীরে ছিল, মনে ছিল না।"

সুহাস ঘরে এল। স্নান করে এসেছে। তার গায়ের পাঞ্জাবির বুকটা খোলা। বোতাম নেই। ঘরে এসে সে অবিনের দিকে তাকাল প্রথমে, তারপর আমার দিকে।

সুহাস এসে আমার বিছানার একপাশে বসল। আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। এখনও তার সেই ছেলেমানুষী, নিজের কথা অবিনকে দিয়ে বলাতে চায়, তার চোখ বার বার অবিনের দিকে সরে যাচ্ছিল। একেবারেই এলোমেলো ক'টা কথা বলল সুহাস: আজকের গরম, জলে ক্লোরিনের গন্ধ, তারপর থেমে গেল।

আয়না আমার হরলিকস নিয়ে এসেছিল। সুহাসকে চা দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকল।

অবিন দু চারটে হাসিঠাট্টার কথা বললেন আয়নাকে। আয়না হাসতে হাসতে চলে গেল। তার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই সন্ধ্যেবেলায় ওই মেয়ে কান্না সামলাতে সামলাতে পালিয়ে গিয়েছিল এখান থেকে।

অবিনই কথা শুরু করলেন, যেন আমাদের আগের কথাবার্তার জের টেনেই। অবিন হেসে হেসে বললেন, "বুঝলে সুহাস, ছেলেবেলায় সেই যে একটা পদ্য পড়তাম—নাহি কিরে সুখ, নাহি কিরে সুখ- শচিপতিবাবু ছেলেবেলা থেকেই সেই পদ্যটা সার জেনে নিয়েছেন। এই ধরণীটা ও'র কাছে কেবল বিষাদময়।"

সুহাস আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, "সংসারে অনেকের কাছে জগৎ যে সুখময় হয়ে ওঠে না।"

অবিন বললেন, "না জিনিসটাকে আপনি এমন করে আঁকড়ে ধরেছেন যে তাকে হাঁ করানো মুশকিল। দু রকম মানুষ থাকে, একদল চায় আজকের জন্যে বাঁচতে, অন্যদল চায় কালকের জন্যে। প্রথমটাই দলে ভারী। আপনি না আজ, না কাল..."

সুহাস বলল, "শচিদা, তুমি মাথা থেকে এসব ভাবনা নামিয়ে ফেল। কী হবে, না হবে—এসব আগে থেকে ভেবে ভেবে মর কেন? যা হবার হবে, যখন হবে তখন হবে। কে কবে মরবে সেটা ভেবে যদি বসে থাকতে যায় তবে তার কোনো কাজটাই হয় না।"

আমি বললাম, "আমার কাজটা কী এবার বল?"

সুহাস চমকে উঠল। তার হাতের চায়ের কাপ বোধ হয় সামান্য কাঁপল। অবিনের দিকে তাকাল সুহাস।

অবিন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা যতটা বুঝলাম তাতে মনে হল, ডাক্তার চাইছেন, আপাতত আপনাকে কলকাতায় থাকতে হবে।"

"জানি।" আমার মাথা সামান্য নড়ল।

সুহাস ভাঙা-ভাঙাভাবে বলল, "বাড়িতে ঠিক হচ্ছে না, বুঝলে শচিদা। বাড়িতে সব পারা যায় না, ফেসিলিটিস নেই। হাসপাতালে কিছুদিন অবজারভেশানে না রাখলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। খুব সিরিআস কিছু নয়, তবু..."

আমি সুহাস বা অবিনের দিকে তাকালাম না; দরকার নেই।

অবিন বললেন, "মাস খানেক হয়ত থাকতে হবে।"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। সুহাস আস্তে আস্তে চাটুকু শেষ করল। অবিন নীরব। ঘরের মধ্যেটা একেবারে স্তব্ধ, কান পাতলে আমাদের তিনজনের নিশ্বাসের শব্দও শোনা যায় হয়ত। রাস্তা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গর্জন চলে যাচ্ছে, কোনো বিশাল লরি যাচ্ছে বোধ হয়। বাড়ির ভিত কাঁপছিল।

বাড়ির ভিত, নাকি আমি কাঁপছিলাম। আমার সমস্ত দেহ ভেতরে কোথাও কেঁপে উঠছিল। এ যেন আজ ভোরবেলায় দেখা স্বপ্নের শেষ। আমায় জোর করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার গান গাওয়ার পালা শুরু হল। সকলেই স্তব্ধ হয়ে আমায় দেখছে।

কখন দেখি সেই কাঁপুনি কমে এসে আমার শরীর অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। আমি নিজেকে অনুভব করতে পারছি।

সুহাসের দিকে চোখ পড়ল আমার। উদ্বিগ্ন মুখ করে বসে আছে। অবিনকে দেখলাম, তাঁর নিবিষ্ট চোখ, উদ্বিগ্ন মুখ।

সুহাসের দিকে তাকিয়ে আমি আস্তে করে বললাম, "হাসপাতালে কবে যেতে হবে?"

"যত তাড়াতাড়ি হয়।"

"ঠিক করেছিস?"

"হাসপাতাল!...হ্যাঁ, মানে ইন্দুমতীদের হাসপাতাল...। ওটা ভাল হবে। ইন্দুমতী রয়েছে।"

"বেশ। তাই হবে।"

সুহাস বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, "আসছি।"

অবিন আমার সামনে বসে থাকলেন।

আমরা মুখোমুখি পরস্পরকে লক্ষ না করেই অনেকক্ষণ বসে থাকলাম।

শেষে অবিন বললেন, "আপনি ভয় পাবেন না।"

"না। আমি পাই নি।"

"মৃত্যুও কখনো কখনো সুন্দর হয়, জীবনের চেয়ে উজ্জ্বল হয়। হয় না? আপনি জানেন।" অবিন সামান্য বসে থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দায় জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনি আসছেন। অবিনকে আর দেখলাম না।

(ক্রমশ)

আমি ক্রুদ্ধ হ'লে

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

আমি ক্রুদ্ধ হলে
পাহাড়ের পাদদেশে ডিনামাইটে আগুন জ্বালবো
তারপর মহানন্দে জলযোগ সেরে
সেখানে চালিয়ে দেবো শক্তিমান ট্রাক্টর
আমার বিপ্লবের রং সর্বদা সবুজ।
বৃথা শুধু বাক্যব্যয় নয়
কিংবা শহরের জীবন পঙ্গু করে,
ল্যাম্পপোস্টের বালবে রঙিন কাগজ মুড়ে নয়
কিংবা শহর-সৌষ্ঠব সুদৃশ্য প্রাসাদে প্রাচীরে
রঙ-বেরঙের ছড়ায় ছবিতে
আমার বিপ্লব হবে আত্মস্থ বিচার।
আমি ক্রুদ্ধ হ'লে
পেশল জোয়াল কাঁধে তুলে নেবো
খবরের কাগজের হকারদের সাথে
সূর্য-টিপ ভোরে বেরিয়ে যাবো ক্ষেত্রমুখী রাস্তায়
আমার বিপ্লবের রং হবে সবুজ।
আমি ক্রুদ্ধ হ'লে
রাস্তায় প্রকাশ্য ভিড়ে বিনা রক্তপাতে সবাই দেখবে
আমি গ্রাম্য যুবার মতো ভয়ানক জেদে চলেছি
পরুষ মাটিতে পড়ছে পৌরুষের অঙ্গীকার,
ধ্বংসসাৎ নয়—
আমি ক্রুদ্ধ হ'লে
ঘর্মাক্ত শরীরে সোচ্চারে চাইবো এক কমলালেবুর সম।

যুদ্ধক্ষেত্রে ঘর

কামাল মাহবুব

বারুদের পোড়া গন্ধ রজনীগন্ধা বলে ভ্রম হয়
রাইফেলের বাঁট পিতামহের হাতের যষ্টির মতো
আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব আওয়াজ বিয়েবাড়ির বাদ্য
প্রত্যেকটি শত্রুর সেনা দেখতে অবিকল রক্তচোষা।

উঠোনে পটকা ফুটালে বাবা কান মুচড়ে দিতেন
এখন গ্রেনেড ছুঁড়ি, মা'র চোখে তিল তিল আনন্দ।

বাড়ি বিমুখ ছিলাম : ওরা ঘরগুলো করেছে ধুলো
পুড়েছে নীলুর চিঠি, বাবুলের মস্ত ঘুড়িটা,
স্বাতীর খেলনা পুতুল নিহত কিংবা আহত বোমায়
দেয়ালে মুজিবের ছবি জায়নামাজের মত পবিত্র।

একটা সংসার ধ্বংস করতে ওদের লাগে উড়োজাহাজ
একটা সংসার গড়ে তুলতে আমাদের লাগে রক্ত।

ঘর পোড়া ছাই এখন আমার চোখে দিব্য সুর্মা
দু চোখ স্বপ্নে ভরে যায়, সাজানো সংসার দেখি নিত্য,
বোনের তিনটে শাড়ি, সেলফে এক খণ্ড রবীন্দ্রনাথ
কল্পনা করে ভাবতে হয়, সাজানো সংসার তছনছ।

যারা ঘর ভালবাসত : তারা সবাই ঘরছাড়া
চিরকাল রাস্তায় থেকে আমি ঘর বাঁধছি যুদ্ধক্ষেত্রে।

যুদ্ধের বিভ্রান্ত বন্দী

নির্মলেন্দু গুণ

আমি এখন কোথায় যাবো? দুটো কানেই ডাক শুনছি
'এদিকে এসো', 'এদিকে শোনো'—দুটো কানেই অষ্ট প্রহর
দু দিকে ডাকে দুটি মানুষ আমি এখন কোথায় যাবো?

একটি লোক রাত দুপুরে দুটো লোকের ডাক শুনছে
'এদিকে এসো', 'এদিকে শোনো'—আমি এখন আঁধার রাতে
পথ হারানো একটি পাখি অথবা কোনো ঘরের মধ্যে
আটকে রাখা যুদ্ধবন্দী। দুটো সৈনিক দু দিক থেকে
যমের মতো ডাকছে যেন 'এদিকে এসো', 'এদিকে শোনো'

আমি এখন কোথায় যাবো? দুটো কানেই ডাক শুনছি।
—একটি লোক দু দিকে যাবে?

যাদুঘর

শিশির ভট্টাচার্য

সেখানে নিপুণ রাখা
মেঘ কিংবা বৃষ্টেভেজা রোদের নরম
কিছু হাসি অনির্বাণ তারুণ্যের শিখা;
যেন কোন ফেলে-আসা স্টেশনের ছায়া-নাম লেখা
ফোঁটা কয় সুনিবিড় জল
ঘাসের আগায় টলোমল।
এবং ঝড়ের চিহ্ন, তাও থাকে যন্ত্রণার মতো—
সুগভীর ক্ষত।
তবু দেখো,
হিরণ্যসময় ব্যেপে অনন্তকালের কিছু কথা
বিচ্ছুরিত হয় কোন দূরান্তের স্মৃতিসত্তা থেকে
স্বপ্নে লেখা নাম কিংবা
বিশ্বাসের মতন পাহাড়
ফিরে দেয় মাটি পদতলে।

চিত্তেন

॥৪॥

রেল-বাজার থেকে নবাবগঞ্জ পাঁচ ক্রোশ রাস্তা। পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হলে কী হবে, ওইটুকু লোকে হেঁটেই মেরে দেয়। এখন অবশ্য বাস হয়েছে। কুড়িটা নয়া দিলে একেবারে নবাবগঞ্জের আগের গ্রামে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে ওই দেড় মাইলটাক রাস্তা হেঁটে চলে যাও। একেবারে সোজা নবাবগঞ্জে পৌঁছে যাবে।

তা সেই রেলবাজারের ইস্টিশানে ট্রেন থেকে একদিন একজন ভদ্রলোক নামলো। বেশ ধোপ্-দুরস্ত চেহারা। হাতে একটা ছোট সুটকেস। সুটকেসের গায়ে সাদা রং দিয়ে ইংরিজি অক্ষরে লেখা রয়েছে—পি সি চক্রবর্তী। ট্রেনটা চলে যাবার পর ভদ্রলোক কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা বাজারের রাস্তায় পড়লো। তারপর বাঁয়ে ঘুরে একটা মিষ্টির দোকানে। দোকানী এগিয়ে এল।

—কী দেব বলুন!

ভদ্রলোক বললে—সন্দেশ কত করে?

—সাড়ে সাত টাকা!

—ওরে বাবাঃ, একেবারে সাড়ে সাত টাকা? গলা-কাটা দর করে দিলেন যে! আগে আপনাদের দোকানে কত সন্দেশ-রসগোল্লা-রাজভোগ খেয়েছি, তখন তো আড়াই টাকা করে সের ছিল।

দোকানদার সবিনয়ে বললে—সে-সব দিনের কথা ছেড়ে দিন। তখন সাত টাকা মন দুধ পাওয়া যেত।

ভদ্রলোকের এ-সব কথা ভালো লাগলো না। বললে—না মশাই, এ একেবারে গলা-কাটা দর করে দিয়েছেন! তা সিঙাড়া কত করে?

—তিন আনা পিস্—

ভদ্রলোক বলে উঠলো—তা সিঙাড়া তো আর দুধের খাবার নয় মশাই, সিঙাড়ার এত দাম করেছেন কেন? আমি কি ভেবেছেন নতুন এসেছি এখেনে—আজ কুড়ি তিরিশ বছর ধরে আসছি। এককালে আপনাদের দোকানে আমি একটাকা সের সন্দেশ খেয়েছি, তাও আমার মনে আছে—

এতক্ষণে দোকানদারের যেন মন ভিজলো। জিজ্ঞেস করলে—আপনার দেশ কি এখেনে?

ভদ্রলোক বললে—আমার নিজের দেশ নয়, আমার জামাইবাবু নবাবগঞ্জের জমিদার—

—নবাবগঞ্জের জমিদার?

—আরে হ্যাঁ মশাই, ছোটবেলা থেকে দিদির বাড়ি আসতুম, আর এইখান থেকে কাঁচা-গোল্লা কিনে নিয়ে যেতুম। এককালে এখানে রোজ আসতুম।

—আপনার দেশ?

—ভাগলপুর। এখানে নবাবগঞ্জে আমার ভগ্নিপতির বাড়ি। জমিদার, হরনারায়ণ চৌধুরীর নাম শুনেছেন? তিনিই ছিলেন আমার ভগ্নিপতি।

—তা তিনি তো নবাবগঞ্জ থেকে জমি-জমা বেচে চলে গিয়েছেন! ভাগলপুরে আছেন এখন—

ভদ্রলোক বললে—তাহলে তো সবই জানেন দেখছি। সেই ভগ্নিপতিই এখন মারা গেছেন।

—মারা গেছেন?

ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, সে এক ভীষণ কাণ্ড! সেই ব্যাপারেই আমরা সব বিব্রত। এখন যাচ্ছি নবাবগঞ্জে আমার ভাগ্নের খবর দিতে—

—ভাগ্নে মানে? সেই সদা! সদানন্দ।

—হ্যাঁ, এদিকে দেখেছেন নাকি? তাকে খুঁজতেই তো যাচ্ছি! যা'হোক, তাহলে মশাই আপনার সন্দেশ খাওয়া আর হলো না। সাড়ে সাত টাকা সেরের সন্দেশ খাবার ক্ষমতা নেই আমার—

দোকানদার বললে—তাহলে সিঙাড়া খান—তিন আনার চেয়ে সস্তা দেওয়া যায় না, আলুর যা দাম বাড়ছে—

—তা দু' আনা করে হোক না—

দোকানদারের কী মনে হলো। বললে—ঠিক আছে, আপনি চা খাবেন তো? দু' আনায় এক কাপ চা। চা খেলে একখানা সিঙাড়া দু'আনায় দিতে পারি। আপনি

আমাদের পুরোনো লোক—দেশের লোক, অনেকদিন পরে এসেছেন। ওরে, বাবুকে এক কাপ চা আর একটা গরম সিঙ্গাড়া দে—

তা তাই-ই সই। বেশী দরাদরি করা ঠিক নয়। সন্দেশটা সস্তা করে দিলেই ভালো হতো অবশ্য। শেষ পর্যন্ত একখানা সিঙ্গাড়া দিয়ে এক কাপ চা-ই নিলে ভদ্রলোক। বললে—তাহলে চায়ে একটু বেশি করে চিনি দেবেন মশাই, আমি আবার চিনি একটু বেশী খাই—

চা আর সিঙ্গাড়া খেয়ে দাম চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক উঠলো। ভোর বেলা ট্রেন থেকে নেমেছে। এবার একটু রোদ উঠেছে। এখনও পাঁচ ক্রোশ রাস্তা ঠেঙ্গাতে হবে। রেল-বাজারের রাস্তায় তখন মানুষের রীতিমত আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে—

তারপর রাস্তায় নামবার আগে দোকানদারকে লক্ষ্য করে বললে—ফেরবার সময় আবার আসছি, তখন কিন্তু একটু কন্‌সেশন করতে হবে, বুঝলেন—

তা এই-ই হলো প্রকাশ চক্রবর্তী। সদানন্দ চৌধুরীর প্রকাশ মামা। আপন মামা ঠিক নয়। তা না হোক, আপন মামার চাইতেও বড়। মা'র দূর সম্পর্কের এক মামার ছেলে। ছোট বেলা থেকে নবাবগঞ্জে আনাগোনা করতো। বড়লোক ভগ্নিপতি। দূর সম্পর্কের ভগ্নিপতি হলেও ভগ্নিপতি তো! একটা সম্পর্ক তো আছে, তা সে যত ক্ষীণ সম্পর্কই হোক। সেই ক্ষীণ সম্পর্কটাকে ঘন-ঘন দেখা-সাক্ষাৎ আসা-যাওয়া দিয়ে সে রীতিমত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত করে তুলেছিল। বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ-হঠাৎ এসে উদয় হতো প্রকাশ। বড়লোক দিদি। থাকা-খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। প্রকাশ এলেই নবাবগঞ্জের লোকরা বলতো—ওই চৌধুরী মশাইএর শালা এসেছে—

অনেকে আবার আদর করে শালাবাবু বলতো।

শালাবাবু এলে নবাবগঞ্জের লোক ধরে বসতো—শালাবাবু, আমাদের বারোয়ারি-তলায় যাত্রা হবে চাঁদা দিন—

তা চাঁদা দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি শালাবাবু। বলতো—বেশ তো, কত চাঁদা দিতে হবে আমাকে, বলো—

—দশ টাকা চাই আপনার কাছে—

তা দশ টাকা দিতে আপত্তিও করতো না শালাবাবু। নবাবগঞ্জের জমিদারের শালা, সুতরাং সারা গ্রামের লোকেরই শালা। তার মতন লোকের কাছে দশ টাকা চাঁদা চাইবার হক আছে বইকি গ্রামের লোকের। শালাবাবুর ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, আর ঢেউ খেলানো তেড়ি, এ-সব দেখে যে-কোনও লোকই বুঝতে পারতো শালাবাবু পয়সাওয়ালা লোক। আসলে কিন্তু এ পয়সা যোগান দিত দিদি। শালাবাবু এসেই বলতো—দিদি, এবার আর তোমার ইজ্জৎ থাকবে না—

দিদি বুঝতে পারতো না। বলতো—কেন রে, কী হলো?

—নবাবগঞ্জের ক্লাবের ছেলেরা আবার চাঁদা চাইছে! একেবারে পাঁচ টাকা চাঁদা ধরেছে আমার নামে।

দিদি বলতো—কেন, আবার চাঁদা কীসের? এই তো সেদিন যাত্রার জন্যে তুই দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে গেলি। এরই মধ্যে আবার চাঁদা কীসের?

শালাবাবু বলতো—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করলুম আবার চাঁদা কীসের? তা ওরা বললে এবার বারোয়ারিতলায় কবির গান লাগাবে—

—কবির গান? ওদের খুঁটি কার জন্য

কিছু নেই, কেবল যাত্রা থিয়েটার আর গান।

শালাবাবু বললে—দিয়ে দাও পাঁচটা টাকা। পাঁচটা টাকা তোমার কাছে কিছুই না, কিন্তু ওরা আমাকে শালাবাবু বলে এখনও মান্য-গণ্য করে তো, টাকা না দিলে সেটাও আর করবে না, তখন তোমারও ইজ্জৎ নষ্ট, বলবে চৌধুরীমশাই কিপ্‌টে লোক—চৌধুরীমশাই-এর বউও কিপ্‌টে, তার শালাটাও কিপ্‌টে।

দিদি ভাই-এর কথায় হেসে ফেলতো। বলতো—তোর বুদ্ধি তো খুব প্রকাশ—

প্রকাশ দিদির কাছে তারিফ পেয়ে অহংকারে আরো ফুলে উঠতো। বলতো—তুমি আর আমার বুদ্ধির কতটুকু দেখলে দিদি! জানো, এই যে এতবার ভাগলপুরে থেকে এখানে আসি, তুমি কি ভেবেছো আমি রেলের টিকিট কাটি নাকি?

—টিকিট কাটিস না?

প্রকাশ গর্বে বুক ফুলিয়ে দিদির দিকে চেয়ে বলে—না। টিকিট কাটতে যাবো কোন দুঃখে বলতো তো? আমি গাড়িতে চড়লেও রেল চলবে, না-চড়লেও রেল চলবে। আমি চড়ি বলে কি আর রেলের ইঞ্জিনের কয়লা বেশি পোড়ে?

দিদি অবাক। বলে তাহলে তুই যে আমার কাছ থেকে টিকিটের টাকা নিস্?

প্রকাশ বলে—তোমার দেখছি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নেই। তোমার কাছ থেকে টিকিটের টাকা নিই বলে সত্যি সত্যি রেলের টিকিট কাটতে হবে? তুমি বলছো কী? ওই রকম বোকা হলেই হয়েছে আর কী! পৃথিবীতে লোকের সঙ্গে একটু জানাশোনা রাখিস করেছ কি সব্বাই তোমায় পিষে-গুঁড়িয়ে-চেপ্‌টে মেরে ফেলে দেবে! তুমি তো দেশের মানুষগুলোকে এখনও চিনলে না তাই ওই কথা বলছো! খবরদার খবরদার, ওই বোকামিটি কখ্‌খনো কোর না, রেলে চড়লে কখ্‌খনো টিকিট কাটবে না। রেলগাড়ি মানে কী জানো?

—কী?

—জোচ্চোরের বাড়ির ফলার! পেলে ছাড়তে নেই।

—তা তুই সে-টাকাগুলো নিয়ে কী করিস?

প্রকাশ বলে—খাওয়াই—

—খাওয়াই মানে? কাকে খাওয়াস?

প্রকাশ বলে—ওই টিকিট-চেকারদের। এক-একদিন যখন ধরে ফেলে তখন চা-সিগ্রেট খাওয়াতে হবে না? সবাই তো আর আমার বউ-এর ভাই নয় যে আমার মুখ দেখে ছেড়ে দেবে, দু' একটা আবার ধর্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির আছে, তারা মিষ্টি কথাতেও ভুলবে না, চা-সিগ্রেটও খাবে না, আবার ঘুষও নেবে না। সেই সব বেয়াড়া লোক-গুলোকে নিয়েই মুশকিল।

—তখন কী করিস?

—তখন কী আর করবো? গাঁট-গচ্চা দিতে হয়—

কথাগুলো বলবার সময় দিদিও যত হাসে প্রকাশও তত হাসে। ভাইএর বাহাদুরিতে দিদি অবাকও হয়ে যায়। যখন প্রকাশ নবাবগঞ্জে আসে তখন অনেক সময় রেলবাজারের মিষ্টির দোকান থেকে এক হাঁড়ি কাঁচাগোল্লা নিয়ে আসে। দিদি বলে—এ কী রে, তুই আবার কুটুম লোকের মত মিষ্টি নিয়ে আসিস কেন? তুই কি কুটুম-বাড়ি আসছিস নাকি?

প্রকাশ বলতো—না, দিদি, তুমি কাঁচা-গোল্লা খেতে ভালোবাসো তাই আনলুম। তিন টাকা সের, বেটারা গলা-কাটা দাম রেখেছে—

দিদি সন্দেশটা নেয় বটে, কিন্তু ভাইএর দেওয়া জিনিসের দামও সঙ্গে সঙ্গে শোধ করে দেয়। আর প্রকাশ টাকা পাবেই বা কোথায়? তার তো আর নিজের টাকাও জমিদারি নেই ভগ্নিপতির মত যে দিদিকে রোজ-রোজ এক সের করে কাঁচাগোল্লা খাওয়াবে। আর প্রকাশও জানতো যে সেই কাঁচাগোল্লা দিদি নিজে যতগুলো খাবে তার চেয়ে বেশি খাবে প্রকাশ নিজে।

ওই সদা যখন হলো তখন ওর ভাতের সময় করা-কর্মা যা কিছু সবই করেছিল ওই প্রকাশ। অবশ্য তখন প্রকাশ নিজেও ছোট। সেই ছোটবেলা থেকে বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সব কাজেই প্রকাশ। জমিদারবাড়ির একমাত্র ছেলে, আদর করবার লোকেরও অভাব যেমন নেই, ছেলের সাধ-আহ্লাদ-শখ মেটাবার জন্যে টাকারও তেমনি অভাব নেই। যত ইচ্ছে খরচ করো না তুমি, ছেলে যদি তাতে সুখী হয় তো আমার কোনও আপত্তি নেই। আরো টাকা নাও। নবাব-গঞ্জের চৌধুরী বংশের কুলতিলক, তার জন্যে নরনারায়ণ চৌধুরীর কোনও কার্পণ্য নেই।

যেদিন সদানন্দ জন্মালো নরনারায়ণ চৌধুরী তখন রাণাঘাটের সদরে মামলার তদ্বির করতে গেছেন। সদরে তাঁর নিজের বাড়ি ছিল। মামলা-মকদ্দমার জন্যে তাঁকে যেতেই হতো। ওখানে গেলে কিছুদিন ওই বাড়িতেই কাটাতেন। লোকজন ছিল তাঁর। কাছারি-বাড়ির কাজ হতো ওইখানে। তাঁর

তেমনি লোক-লশকর সব কিছুর ব্যবস্থা ছিল।

সেদিন উকীল-মুহুরি নিয়ে কাছারি ঘরে খুবই ব্যতিব্যস্ত। নগদই হাজার টাকার একটা বিলের মামলায় ডিক্রী হয়েছে। তাই নিয়ে সাক্ষী-সাবুদের ঝামেলায় একেবারে জেরবার, তখন হঠাৎ নবাবগঞ্জ থেকে দীনু লোকতে দৌড়তে গিয়ে খবর দিলে—

বউমার ছেলে হয়েছে—

প্রথমটায় যেন মনে হলো ভুল শুনছেন। তারপর উকীল-মুহুরির দিক থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কী বললি?

—আজ্ঞে বউমার ছেলে হয়েছে।

তবু যেন কর্তা মশাইএর বিশ্বাস হলো না। বললেন—ছেলে, না মেয়ে?

—আজ্ঞে ছেলে।

—তুই ঠিক জানিস—ছেলে?

দীনু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মশলা তাই দিয়ে আমাকে বলেছে। দাদাবাবু তাই আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিলে।

কথাটা শুনে কর্তামশাই প্রথমে কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তারপর কৈলাশকে ডাকলেন। কৈলাশ গোমস্তা যে তাঁর পাশেই বসে আছে উত্তেজনায় সে-খেয়ালও তাঁর ছিল না। আবার ডাকলেন—কৈলাশ, কৈলাশের টিকি দেখতে পাচ্ছি নে কেন, সে যায় কোথায়?

পাশ থেকে কৈলাশ বলে উঠলো—আজ্ঞে এই তো আমি—

—ও তুমি পাশেই রয়েছ, তা আমি যে এত চেঁচিয়ে মরছি তুমি রা কাড়ছো না কেন? তোমরা কি সব কানে তুলো দিয়ে রেখেছ? তোমাদের কি সব সময় ফাঁকি। ফাঁকি দেওয়া তোমাদের স্বভাব হয়ে গিয়েছে—

এক গাদা নথি-পত্র নিয়ে কৈলাশ তখন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। তিন দিন তিন রাত্তি ধরে সেই সব নথি-পত্র নিয়েই কেটেছে সকলের। একবার কাছারি আর একবার কোর্ট করেছে। জমিদারী-সেরেস্তার কাজে তার মত বিচক্ষণ লোক পাওয়াও কর্তামশাইএর একটা ভাগ্য। কিন্তু তবু তার বকুনি খাওয়ার কপাল।

কর্তামশাই বললেন—ওসব নথিপত্র এখন রাখো,—

কৈলাশ গোমস্তা বললে—আজ্ঞে, কাল যে মুনসিফের কোর্টে এ-মামলার শুনানী আছে—

কর্তামশাই বললেন—রাখো তোমার শুনানী! জীবনে অনেক মামলা করেছি, তুমি আমাকে আর কোর্ট দেখিও না। আমি কি কোর্ট-এর নাম শুনলে ভয় পাবো? না-হয় ও বিলটা যাবে। জীবনে অনেক দেখেছি, আবার অনেক সম্পত্তি গিয়েছেও আমার। আর আমি যদি বেঁচে থাকি অমন বিল আমি আরো দশটা নীলামে ডেকে নেব। এখন ও-সব থাক্, শুনেছো নাতি হয়েছে আমার, তুমি এখন আমাকে কোর্ট শোনাচ্ছো। যাও, ও-সব রাখো। আমি আজকেই নবাবগঞ্জে ফিরে যাবো, তার ব্যবস্থা করো—

—এখুনি যাবেন?

—এখুনি যাবো না তো কি একদিন পরে যাবো? পরে গেলে দেরি হবে না? এ কি দেরি করার কাজ? যাও, গাড়ির বন্দোবস্ত করো, আর আমার বাক্স-বিছানা সব দীনুকে নিয়ে গুছিয়ে ফেল। রজব আলীকে ডেকে গাড়িতে গরু জুততে বলো—

এর ওপর আর কথা বলা চলে না। কৈলাশ গোমস্তা বাইরে যাচ্ছিল সব বন্দোবস্ত করতে।

কর্তামশাই আবার ডাকলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা, তার আগে আর একটা কাজ করো দিকিনি। বাজারের কপিল স্যাকরাকে চেনো তো, তাকে গিয়ে বলো দশ ভরির সোনার হার যদি একটা তৈরি থাকে তো সেটা নিয়ে যেন এখুনি একবার আমার কাছে আসে—

তা সেইদিনই কর্তামশাই সেই দশভরির সোনার হার নিয়ে রজব আলীর গাড়িতে চড়ে গ্রামের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। খাওয়া-ঘুমনো-মামলা সব কিছু মাথায় রইলো। সব কিছু ফেলে কর্তামশাই নবাবগঞ্জে এসে ওই দশ ভরির সোনার হার দিয়ে নাতির মুখ দেখেছিলেন। এ নাতি যে তাঁর কত আদিখ্যেতার নাতি তা আর কেউ না জানুক, কর্তামশাইএর অজানা ছিল না। ছেলের বিয়ে তিনি অল্প বয়েসেই দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি নাতি-নাতনীতে ভরে যাবে। তাঁর সংসার বিলাস-বৈভবে ঐশ্বর্যে-জাঁক-জমকে জম্-জমাট হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হলো না। তিনি অনেক খুঁজে-পেতে জানলন্দের জমিদার কীর্তিপদ মুখুজ্যের একমাত্র সন্তানকে নিজের ছেলের পাত্রী হিসেবে পছন্দ করে বউ করে নিজের বাড়িতে এনেছিলেন।

কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন কেটে গেল,

তবু সন্তানাদি কিছু হলো না দেখে বড় মুষড়ে পড়েছিলেন।

সেই প্রকাশ তখন সবে হয়েছে। বাপ-মা মারা যাবার পর, পিসীমার কাছেই থাকতো। পিসেমশাই কীর্তিপদ মুখুজ্জের ছেলে ছিল না বলে আদর যত্ন পেত ছেলের মত। তারপর যখন প্রীতিলতার বিয়ে হয়ে নবাবগঞ্জে চলে গেল তখন ছোট ছেলের মত দিদির সঙ্গে দিদির শ্বশুর-বাড়িতেও এল।

কিন্তু এ-সব জটিল-কুটিল বংশ তালিকার খুঁটিনাটি বর্ণনা না দেওয়াই ভালো। তাতে গল্প দানা বাঁধতে পারে না। গল্প আত্মীয়স্বজনের ডাল-পালায় ঘা লেগে হোঁচট খেয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তার চেয়ে প্রকাশের যে পরিচয় দিচ্ছিলাম তাই দেওয়াই ভালো। কারণ এ উপন্যাস যাঁরা পড়ছেন তাঁদের এখন থেকেই জানিয়ে দেওয়া ভালো যে প্রকাশ রায় ভবিষ্যতে এ উপন্যাসে আরো অনেকবার উদয় হবে। পাঠক-পাঠিকারা এই চরিত্রটির সম্বন্ধে যেন একটু বিশেষ অবহিত থাকেন।

এদিকে সদানন্দ যখন বড় হলো তখন প্রকাশ রায় এ-বাড়িতে রীতিমত আসর জমিয়ে বসেছে। এখনো একবার আসে, একমাস-দুমাস থাকে, আর দিদির কাছ থেকে কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে আবার কিছুদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যখন নবাবগঞ্জে থাকে তখন সদানন্দকে নিয়ে ঘোরে। কোথায় যাত্রা হচ্ছে, কোথায় কবির লড়াই হচ্ছে, পাঁচালী হচ্ছে সেখানে ভাগ্নেকে সঙ্গে করে তার নিয়ে যাওয়া চাই।

নরনারায়ণ চৌধুরী হাজার কাজের মধ্যেও নাতির খবর নেন। বলেন—খোকা কোথায় গেল, খোকা? খোকাকে দেখছি নে যে?

কৈলাশ গোমস্তা বলে—আজ্ঞে, খোকা-বাবু শালাবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছে—

জিনিসটা কর্তামশাইএর পছন্দ হয় না। কিন্তু কিছু বলতেও পারেন না। বউমার ভাই। কুটুম্ব মানুষ। শুধু বলেন—তোমাদের শালাবাবু লোকটা সুবিধের নয়, সিগ্রেট-টিগ্রেট খেতে দেখেছি—

কিন্তু প্রকাশের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। স্টেশন থেকে সোজা এসেই একেবারে কর্তামশাইএর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায়।

কর্তামশাই [illegible] [illegible] যান।

বলেন—কে?

—আজ্ঞে আমি প্রকাশ।

প্রকাশ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারেন না। [illegible] [illegible] [illegible] খারাপ দেখায়। তাই বলেন—বেয়াই মশাই

কেমন আছেন? বেয়ান? সবাই ভালো আছেন তো?

তারপরে আর কর্তামশাইএর সঙ্গে দেখা করা দরকার মনে করে না। সোজা চলে যায় দিদির কাছে। একেবারে অন্দর-মহলে গিয়ে বলে—দিদি এলুম—

এক একদিন হাসতে হাসতে ঢোকে দিদির ঘরে। বলে—জানো দিদি, তোমার ছেলে খুব ইনটেলিজেন্ট হয়েছে—

দিদি বলে—কী রকম?

প্রকাশ বলে—ওকেই জিজ্ঞেস করো না—

দিদি খোকার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—কী হয়েছে খোকন?

খোকন বলে—আমি গান শিখেছি মা—

—ওমা তাই নাকি? কই গাও দিকি?

প্রকাশও উৎসাহ দিলে ভাগ্নেকে। বললে—গাও [illegible] [illegible] গেয়ে শোনাও—

খোকন দুহাত তুলে এঁকে বেঁকে নাচতে শুরু করে দিলে। তারপর গান গাইতে আরম্ভ করলে—

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম।
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম॥

গান শুনে ভেতর-বাড়ি থেকে আরো অনেকে দৌড়ে এসেছিল। গৌরী পিসী ছেলের বুদ্ধি দেখে আর থাকতে পারলে না। একেবারে দুই হাতে খোকনকে কোলে

ফুলে মুখময় চুমু খেতে লাগলো। বললে—ওমা, কী চমৎকার গলা খোকন-মণির, খোকন আমাদের বড় গাইয়ে হবে বউদি—

আরো যারা দেখছিল তারাও সবাই এক বাক্যে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো।

অন্ধকারে তখন শালাবাবুর বুক দশ হাত হয়ে গেছে। এবার সেই গানখানা গাও তো খোকন, সেই যেখানা আমি শিখিয়েছি—

—কোন্ গানটা?

—সেই যে—আর নারীরে করিনে প্রত্যয়—

খোকন গাইতে লাগল—

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়
নারীর নাই কো কিছু ধর্মভয়
নারী মিলতে যেমন ভুলতে তেমন
দুই দিকে তৎপর
মজিয়ে পরে চায় না ফিরে
আপনি হয় অন্তর—

শালাবাবু নিজেই গানের তারিফ করতে লাগলো। বললে—বাঃ বাঃ বাঃ—কিন্তু হঠাৎ হরনারায়ণ ঘরে ঢুকলেন বললে—কে গান গাইছিল, খোকা না? শালাবাবু বললে—হ্যাঁ জামাইবাবু,—আপনি আর একবার

শুনবেন গানটা? হরনারায়ণ বললেন—না, ও-সব গান ওকে কে শিখিয়েছে?

শালাবাবু বললে—কবির গান শুনতে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেখানে শিখেছে। কী ইনটেলিজেন্ট্ হয়েছে খোকন, দেখেছেন? একবার মাত্তোর গানটা শুনেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সুরটা মুখস্থ করে ফেলেছে। আমি তো জামাইবাবু আমার বাপের জন্মে এমন ইনটেলিজেন্ট্ ছেলে দেখিনি, ভেরি ভেরি ইনটেলিজেন্ট্ বয়—

প্রকাশের সামনে হরনারায়ণ কিছু বললেন না বটে, কিন্তু রাত্রে শোবার ঘরে এসে স্ত্রীর কাছে মুখ খুললেন। বললেন—খোকনকে কি তুমি প্রকাশের সঙ্গে কবির লড়াই শুনতে পাঠিয়েছিলে?

প্রীতিলতা প্রশ্নটা শুনে একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন বলো তো?

—না, তাই জিজ্ঞেস করছি। যে-সব গানগুলো খোকন গাইছিল ওগুলো তো খুব ভালো গান নয়। বাবা শুনলে রাগ করবেন। খোকনকে অমন যার-তার সঙ্গে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া ঠিক নয়। অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে—

প্রীতিলতা বললে—কীসের অভ্যেস?

—ওই সব বাজে গান গাওয়ার অভ্যেস!

প্রীতিলতা বললে—ছেলেমানুষ গান শুনেছে আর শিখে ফেলেছে, এতে অভ্যেস খারাপ হবার কী আছে? তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। ছেলেমানুষ একটু গান গাইলেই দোষ?

হরনারায়ণ এর পরে আর ও-বিষয়ে কোনও কথা বললেন না। আর তা ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত বেশি সময়ও ছিল না তাঁর। কিন্তু মনে মনে কেমন যেন চিন্তিত হলেন।

সেদিন খোকনের আর একটা বুদ্ধির অকাট্য প্রমাণ দিলে প্রকাশ। দিদির কাছে খোকনকে নিয়ে এসে বললে—উঃ, তোমার কী বলবো দিদি, খোকন একটা জিনিয়াস হবে নির্ঘাৎ, দেখে নিও—

দিদি বুঝতে পারলে না। বললে—জিনিয়াস? তার মানে?

—মানে একটা [illegible] প্রতিভা।

—কেন, আবার কী করেছে?

—আরে [illegible] গোমস্তার হুঁকোটা ছিল চণ্ডীমণ্ডপে, কলকেতে তখনও আগুন জ্বলছে। ও একটানে হুঁকো থেকে ধোঁয়া টেনে নাক দিয়ে [illegible] ছেড়েছে—

দিদিও [illegible] ছেলের বুদ্ধির বহর দেখে। বললে—তাই নাকি?

—হ্যাঁ দিদি, [illegible] তো অবাক। [illegible] দিদি, এ ছেলে তোমাদের বংশের নাম রাখবে, এমন বুদ্ধি আমি [illegible] জন্মে আর দেখিনি, সত্যি—

দিদি খোকনের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ রে খোকন, তোর কাশি হলো না?

খোকন ঘাড় নাড়লে। বললে—না—

—বলিস কী? একটুও কাশি হলো না?

খোকন গর্বের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে আবার বললে—না—

গৌরী পিসীও এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও শুনে বললে—মা বউদি, আমি তোমাকে বলেছিলুম এ ছেলে তোমার একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হয়ে যায় না—

রাত্রে হরনারায়ণ ঘরে আসতেই প্রীতি বললে—ওগো, খোকনের কী বুদ্ধি জানো?

হরনারায়ণ বললেন—কী?

—আজকে গোমস্তা মশাইএর হুঁকো টেনে নাক দিয়ে গল্-গল্ করে ধোঁয়া ছেড়েছে, একটুও কাশেনি!

খোকন পাশেই ছিল। সেও বাবার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি একটুও কাশিনি—

হরনারায়ণ কথাটা শুনে কিন্তু হাসতে পারলেন না। আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কে ওকে হুঁকোয় মুখ দিতে বলেছিল?

স্ত্রী বললে—কে আবার বলবে, ও নিজেই মুখ দিয়েছে।

—কিন্তু ওর সঙ্গে কেউ ছিল?

স্ত্রী বললে—হ্যাঁ, প্রকাশ সঙ্গে ছিল, সে সাক্ষী আছে, সে নিজের চোখে দেখেছে—

হরনারায়ণ এ-কথার কোনও উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলেন না। তবে আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরের দিনই কেষ্ট-গঞ্জের স্কুলের হেড-মাস্টার মশাইকে বাড়িতে ডেকে পাঠালেন।

*

এই সেই প্রকাশ রায়। এককালে এই প্রকাশ রায় যখন-তখন হুট্ করে এই নবাবগঞ্জে আসতো। আসতো আর নবাব-গঞ্জের মানুষজনদের কাছে রাজা-উজির মারতো। ভাগ্নেকে নিয়ে যাত্রা শুনতে যেত, কবির গান শুনে তারিফ করতো। ভাগ্নেকে গান শেখাতো, তামাক খেতে তালিম দিত। তা সে-সব অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর সেই নরনারায়ণ চৌধুরী মারা গেলেন, সেই দিদিও আর নেই। আর সেই ভাগ্নে সদানন্দও তখন নেই। ছিল মাত্র এক জামাইবাবু, এবার সেই জামাইবাবুও চলে গেল। প্রকাশ রায়ের সময় এখন খারাপ পড়ছে। সেই খারাপ সময়ে [illegible] করতেই প্রকাশ রায় আবার [illegible]-বাজারে।

সামনেই বাস দাঁড়িয়ে ছিল। [illegible] এই রাস্তাটুকু বরাবর হেঁটেই মেরে [illegible] সে। কিন্তু এখন বয়েস হয়েছে। এখন গতরও আগের চেয়ে অনেক ভারি হয়েছে। সোজা বাসের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—নবাবগঞ্জে যাবে ভাই, নবাবগঞ্জে?

—নবাবগঞ্জে যাবে না। মবারকপুর থেকে হাঁসখালি চলে যাবে—

—মবারকপুর কত ভাড়া?

—কুড়ি পয়সা।

কুড়ি পয়সা! কুড়ি পয়সা এক কাপ চা, আর দুটো সিগারেটও হয়ে যেত! যাক গে, কপালে আছে, কে খণ্ডাবে! ঠিক আছে, মবারকপুরেই নেমে যাবে সে। প্রকাশ রায় সুটকেসটা নিয়ে বাসে উঠে পড়লো।

([illegible])

হলোগ্রাফিক **পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরির কলাকৌশল আবি**ষ্কার এবং তার **উত্তোরত্তর সংস্কার** সাধনের জন্যে অধ্যাপক ডেনিস গাবোরকে এ **বছর** নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল। একাত্তর বছর বয়স্ক **এই বিজ্ঞানী বর্তমানে** লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অভ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো এবং প্রোফেসর ইমেরিটাস।

পদার্থ বিজ্ঞানে
নোবেল পুরস্কার ঃ ১৯৭৯

তত্ত্বের দিক দিয়ে ত্রিমাত্রিক ছবি সম্পর্কে অধ্যাপক গাবর প্রথম সরব হয়ে উঠেছিলেন ১৯৪৮। ইম্পিরিয়েল কলেজে ইলেকট্রন **মাইক্রোসকোপের** কতকগুলি জটিল সমস্যা নিয়ে তখন তিনি ব্যস্ত। অনেকেই জানেন সাধারণ মাইক্রোসকোপের তুলনায় ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের দৃষ্টিশক্তি অনেক বেশি

অধ্যাপক ডেনিস গাবর
—বিশেষ টেলিচিত্র

প্রখর। এরই সাহায্যে বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার প্রতিবিম্বকে বহুগুণে বিবর্ধিত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এরই কল্যাণে আণবিক জগৎ আজ আগের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্টতর। উদ্ভিদের সূক্ষ্মতম অংশকে এখন দেখছি অতিকায় প্রবর্ধিত রূপে। প্রাণী বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পদার্থ, রসায়ন, এমন কি আবহাওয়া বিজ্ঞানেও ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের এখন অবাধ গতি।

তবু আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে সম্ভাব্য কতকগুলি ঘটনা গাবরের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। একটি মাত্র

চিন্তা ঃ ধরুন, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের বিবর্ধন ক্ষমতা না হয় আরও বহুগুণ বাড়ান গেল। ধরুন, আধুনিকতম সেই যন্ত্রটি নিয়ে কোন গবেষক জটিল কোন জীবন্ত প্রাণীকোষের মধ্যে কী ধরনের কাজকর্ম চলছে, সেটা দেখতে বসলেন। কোষের বিশেষ অংশে মাইক্রোসকোপটি যখন ফোকাস করা গেল অর্থাৎ অনুবীক্ষণের দৃষ্টিটি যখন সেই অংশে কেন্দ্রীভূত হল; ভদ্রলোক নিশ্চয় সেই জায়গাটির ছবি স্পষ্ট করেই দেখতে পাবেন? যদি ওই একই সময়ে কোষটির অন্য কোন জায়গা দেখার ইচ্ছে হয়, মনে করুন কোষটির গভীরে বিশেষ কোন অংশে, তখন অনুবীক্ষণের ফোকাস বিন্দুকে ওই জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। কারণ এ কথাও সকলে জানেন,

কোন জায়গা ভালভাবে দেখতে গেলে জায়গাটিকে ফোকাসের মধ্যে আনতে হবে। নইলে স্পষ্টভাবে তাকে দেখা যায় না। অতএব যুগপৎ কোষের বিভিন্ন অংশ একই সময়ে অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়।

এবার মনে করুন ভদ্রলোকটির ইচ্ছে হল কোষটির সামনের দিকটা যখন তিনি দেখছেন তখন তার পেছনের অংশে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চলছে সেটা দেখেন।... এক্ষেত্রে তাঁকে অসুবিধেয় পড়তে হবে। কারণ মাইক্রোসকোপে যে ছবি ফুটে ওঠে, সেটা দ্বিতলীয় ছবি, সাধারণ ক্যামেরায় যে ধরনের ছবি আপনারা তোলেন, ঠিক সেই রকম। তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ, দুইই আছে, কিন্তু বেধ নেই।

প্রাণীকোষের এই হলোগ্রাফিক ছবিটি তুলেছিলেন অ্যামেরিকান অপটিকেল কোম্পানির রাউল এফ ফ্যান লিগটেন। ত্রিমাত্রিক এই ছবির মধ্যে কোষের প্রতিটি অংশ স্বাভাবিকের মতই স্পষ্ট।

আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। ধরুন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে প্রায় এক শ ফুট দূরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। হলটিকে আপনার পেছনে রেখে কেউ আপনার ছবি তুলল। ছবিটিতে আপনি কী দেখবেন? দেখবেন দর্পণ তলের উপর আপনার মুখ। পেছনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। অ্যামেরিকানদের অসাবধানতাবশত অজান্তে হয়তো একটি পাঁচিলও তার মধ্যে ধরা পড়েছে। কিন্তু আপনারা সকলেই বিরাজ করছেন একটি তলের উপর। ওই ছবি দেখে নিশ্চয়

ঘূর্ণায়মান একটি টারবাইনের হলোগ্রাফিক ছবি। ছবিতে এর প্রতিটি ছন্দ কত নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে, লক্ষ করুন।

আপনার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ছবিটির দূরত্ব ঠিক কতটা। অথবা আর যারা এই ছবিতে ধরা পড়েছে আপনাকে কেন্দ্র করে তাদের কৌণিক গতিই বা কোন দিকে। আপনার কাছে এটা হয়ত বড় রকমের কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তাঁরা, যাঁরা আণুবীক্ষণিক জগৎ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁদের কাছে এটা মস্ত বড় একটি প্রতিবন্ধক।

ধরুন, জনৈক আবহাওয়া বিজ্ঞানী শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে বাতাসে ভাসমান কণিকার ছবি তুলতে গেলেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে তিনি যে ছবি তুললেন তা দেখে কোন কণা কত দূরে অবস্থান করছে, সেটা নি… জানা সম্ভব নয়। অথচ পরে গবেষণ… প্রয়োজনে ঠিক যে অবস্থায় আণুবীক্ষণিক… তোলার দিনে নিজের চোখে ঐ কণিকাদের … যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, আবা… ত্রৈমাত্রিক ভাবে তাদের ছবি দেখতে চান ওই …

...না কাজেই আসবে না। এবং এই একই কথা বলা চলে শারীর অথবা জীবরসায়ন বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও। আসল কথা, এমন একটা ছবি চাই, যার মধ্যে ফুটে উঠবে কোন বস্তুর পরিমাপীয় অবস্থা, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান প্রভৃতি। অর্থাৎ এই ছবিতে যখন কোন বস্তুতে দেখবেন, আপনার পরিষ্কার বুঝে ওঠা চাই, বস্তুটি চেপটা না গোল, আশপাশের অন্যান্য সমস্ত সামগ্রীর দূরত্ব তার থেকে কতটা এবং ইত্যাদি। তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বেধ। খালি চোখে দেখলে যেমনটি মনে হয় ছবিতে তার ভাবটি যেন পুরোপুরি ফুটে ওঠে। এরই নাম ত্রিমাত্রিক ছবি। সাধারণ ক্যামেরায় যে ছবি কখনই আপনি পেতে পারেন না।

১নং ছবি

২নং ছবি

অভিনব একটি কৌশলের কথা ভাবলেন অধ্যাপক গাবর। নতুন একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন তিনি আলোর দুটি মৌলিক নিয়মের সাহায্যে। একটি ইনটারফেয়ারেন্স অব লাইট বা আলোর প্রতিবন্ধকতার নিয়ম। অপরটি ডিফ্রাকশন অব লাইট বা আলোর বিচ্ছুরণ। প্রথম নিয়মটি এই রকম : ধরুন একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দুটি আলোক রশ্মি কোন বস্তু কণার উপর এসে পড়ল। পড়ার সময় যদি এমন হয়, উভয় রশ্মির দুটি তরঙ্গ সমপর্যায়ের অর্থাৎ দুটি তরঙ্গেরই কুঞ্জ বা উপর দিকের ঢেউ খেলান অংশ পুরোপুরি সমান, এবং সমগতিভিত্তিক তাহলে ঐ দুটি তরঙ্গ পরস্পর মিলিত হয়ে ওই জায়গাটিকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে। কিন্তু এর উল্টোটি ঘটলেই জায়গাটি পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিপরীত পর্যায়ের তরঙ্গ মিলিত হলে সেখানে আর কোন আলো দেখা যাবে না। এরই নাম আলোর প্রতিবন্ধকতার নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়মটি হল : আলোক রশ্মি কোন সূক্ষ্ম বাধা অতিক্রম করার সময় আংশিক পাশ বরাবর বেঁকে যায়, যাকে বলা হয় ডিফ্রাকশন। এই দুটি নিয়মের সাহায্যে গাবর তাঁর ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব গঠনের পদ্ধতিটি তাত্ত্বিকভাবে দাঁড় করালেন। যার নাম রাখা হল হলোগ্রাফি এবং যে ফিল্মের উপর বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রোথিত করা হল তাকে বলা হল হলোগ্রাম। অর্থ পরিপূর্ণ সংকেত গ্রাহক। সংকেত বলতে এখানে অবশ্য মুখ্যত আলোর সংকেতের কথাই বলা হয়েছে।

অভিনবত্বের দিক দিয়ে গাবরের কৌশল নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু আবিষ্কারের মুহূর্তে অসুবিধের পড়লেন গাবর। অঙ্ক তো তৈরি হল, তাকে কাজে লাগান যায় কী করে? কারণ তাঁর এই পদ্ধতিতে ছবি তুলতে হলে যে আলো চাই তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব সময় সমান হতে হবে। এবং সেই তরঙ্গ সমান তালে কম্পিত হবে। সাধারণ আলোর সাহায্যে এটা সম্ভব নয়। কারণ সকলেই জানেন, সাধারণ আলো বা সাদা আলো বলতে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে আছে নানা বর্ণের আলো। তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ ভিন্ন ভিন্ন, কম্পাঙ্কও পৃথক।

অতএব আবিষ্কারের বাস্তব সাফল্য চোখে দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হল ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। ওই সময় আবিষ্কৃত হল পদার্থ বিজ্ঞানের আরও এক যুগান্তকারী পদ্ধতি। নাম লেজার। লেজারের সাহায্যে বিশুদ্ধ আলোকরশ্মি তৈরি করা সম্ভব হল। এই রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান। তারা সমপর্যায়ে কম্পিত হয়। ওই বছরেই মিশিগানের কয়েকজন বিজ্ঞানী লেজার রশ্মির সাহায্যে নিখুঁত হলোগ্রাম তৈরি করতে সমর্থ হন।

❋

হলোগ্রাম তৈরির মূল পদ্ধতিটি ১নং ছবির সাহায্যে দেখান হল। মনে করুন, ক একটি লেজার যন্ত্র। লেজার থেকে রশ্মি খ গিয়ে পড়ল একটি ঘোড়ার মূর্তির উপর, যার আপনি হলোগ্রাম তৈরি করতে চান। মূর্তিটির গায়ে ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এসে পড়বে ফটোগ্রাফিক প্লেট গ এর উপর। ধরুন ওই একই সময়ে লেজার রশ্মি ঘ-কে একটি আয়নার সাহায্যে প্রতিফলিত করে গ প্লেটটির উপর নিক্ষেপ করা হল। প্লেটের ওপর মূর্তির গা এবং দর্পন থেকে প্রতিফলিত রশ্মি পরস্পর মিলিত হয়ে যে ইনটার ফয়ারেন্স সৃষ্টি করবে সেটা লিপিবদ্ধ হবে ঐ ফটোগ্রাফিক প্লেটে। এটিকে পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্ফুটিত করা হয়। এরই নাম হলোগ্রাম। সাধারণ চোখে দেখলে ওই প্লেটে মূর্তিটির কোন আভাসই আপনি ধরতে পারবেন না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় ঠিক গ্রামাফোনের রেকর্ডের মত। রেকর্ডের উপরকার দাগ দেখে ঠিক কী ধরনের গান সেখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেটা যেমন বলা যায় না, তেমনি হলোগ্রামের এলোপাথারি চিহ্ন দেখে সত্যিই তার মধ্যে কী ধরনের প্রতিবিম্ব গ্রোথিত রয়েছে, বলা শক্ত।

হলোগ্রামের ছবি পুনোরুদ্ধার করার পদ্ধতিটি ২নং ছবির সাহায্যে দেখান হল। এবারও সেই লেজার রশ্মির সাহায্য নিতে

হবে। এবং ঠিক যে ধরনের রশ্মি হলোগ্রাম তৈরির করার জন্যে কাজে লাগান হয়েছিল এবারকার রশ্মি তারই অনুরূপ। প্লেটটির যে দিকে হলোগ্রাম করা হয়েছে মনে করুন একজন দর্শক সে দিকে চেয়ে আছে। এবার হলোগ্রামের বিপরীত দিক থেকে নিক্ষেপ করা হল লেজার রশ্মি খ। হলোগ্রামে প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ ঘটবে। বিচ্ছুরিত রশ্মি লোকটির চোখে গিয়ে পড়লেই সে ঘোড়ার ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বটি দেখতে পাবে।

এই পদ্ধতিতে আরও একটি সুবিধে আছে। সাধারণ ছবির একটু অংশ ছিঁড়ে ফেললে ছবিটি যেমন অকেজো হয়ে যায়, এক্ষেত্রে তেমন কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। হলোগ্রামের কিছু অংশ যদি নষ্টও হয়ে যায়, তাহলেও বিশে- পদ্ধতির সাহায্যে লেজার রশ্মি নিক্ষে- করে পুরো ছবিটিকেই পুনরুদ্ধার কর- সম্ভব হবে। গবেষকদের কাছে এটাও বড় একটা সুবিধে। সম্প্রতি বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একাধিক লেজার রশ্মির সাহায্যে এই একই পদ্ধতিতে রঙিন ত্রিমাত্রিক ছবিও তোলা হচ্ছে। এ ছাড়াও নানা ক্ষেত্রের

সাহায্যেও হলোগ্রাম তৈরির ব্যাপারে গবেষণা চলছে। এ ধরনের হলোগ্রাম মানুষের শরীরের ভেতরকার টিউমার পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। সামুদ্রিক গবেষণাতেও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী। ভবিষ্যতে সিনেমার ছবি তোলার ব্যাপারেও অভিনব এই পদ্ধতির কথা চিন্তা করছেন। অদ্ভুত সেই ছবি। সে ছবি তোলার জন্যে ক্যামেরার দরকার হয় না, লেন্স লাগে না। অথচ ছবি যখন দেখবেন, তখন মনে হবে সম্পূর্ণ বাস্তব পরিবেশেই যেন আপনি বসে রয়েছেন। এবং যা কিছু ঘটছে তা একান্তই বাস্তব অভিজ্ঞতা। ১৯৬১র পর অধ্যাপক গাবর লেজার রশ্মির সাহায্যে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটির অভূতপূর্ব সংস্কার সাধন করেছেন।

*

অধ্যাপক গাবর মূলত হাঙ্গেরির অধিবাসী। বৃটেনে স্থায়ীভাবে বাস করতে এসে পরে সেখানকার তিনি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। জন্ম ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, বুদাপেস্টে। ছেলেবেলা থেকেই ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা তাঁর পিতা স্বয়ং। এই ভদ্রলোক পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তবে প্রযুক্তি বিষয়ক উদ্ভাবনায় তিনি নিজেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

স্কুলের পর প্রথম পর্যায়ের পড়াশুনো বুদাপেস্টেরই টেকনিকেল ইউনিভার্সিটিতে। পরে বার্লিনের Technische Hochule at Charlottenburg এ। এখানেই তাঁর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা লাভ। পরে ডক্টোরেট। প্রথম দিকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহকারী গবেষকরূপে যোগ দেন এবং যুগপৎ জার্মান গবেষণা সংস্থায় উচ্চতর তড়িৎ বিভব যন্ত্রের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজেও অংশ গ্রহণ করেন।

বার্লিন তখন তরুণ বিজ্ঞানীদের তীর্থক্ষেত্র। সেখানকার বিজ্ঞান জগৎ তখন ভাস্বর হয়ে রয়েছেন আইনস্টাইন, প্ল্যাংক, শ্রোডিঙ্গার, ফন লাউয়ে প্রভৃতি। গাবর এঁদের প্রত্যেকের সংস্পর্শেই এসেছিলেন। [illegible] জীবনের স্বার্থক গবেষণা [illegible] অসিলোগ্রাফের [illegible] এই যন্ত্রটির [illegible] চমৎকারকম সংস্কার করেন এবং দীর্ঘকাল তা আদর্শ যন্ত্ররূপে বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সমাদর পায়। গ্যাসের তড়িৎ মোক্ষণ এবং প্লাজমার উপরও তিনি যথেষ্ট মৌলিক কাজকর্ম করেন।

[illegible] নাৎসিদের অত্যাচারে জার্মানের বিশেষ সমাজে তখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। শান্ত এবং নির্বিরোধী গাবর [illegible] শান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে চলে গেলেন হাঙ্গেরিতে। পরের বছর সেখান থেকে বৃটেনে এসে বৃটিশ টমসন-হিউস্টন কোম্পানির রাগবি কেন্দ্রে গবেষক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ গ্রহণ করেন। এখানে প্রথম দিকে তিনি গ্যাসের তড়িৎ মোক্ষণ নিয়েই কাজ চালান। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর শুরু করেন ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ এবং হলোগ্রাফির উপর গবেষণা।

১৯৪৮ সালে ঐ সংস্থাটির কাজ ছেড়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পিরিয়াল কলেজে ইলেকট্রনিক বিভাগের রীডারের পদে আসীন হন। ১৯৫৮-তে ফলিত বৈদ্যুতিক পদার্থ বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক পদ লাভ। ১৯৬০ সালে তিনি তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের উপর গবেষণা শুরু করেন। ১৯৬৭-তে অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ। এবং তারপর থেকেই এখনও পর্যন্ত ঐ কলেজের তিনি প্রোফেসার ইমেরিটাস এবং সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো।

১৯৩৬ সালে রাগবিতে কাজ করার সময় মারজোরি লুইসে বাটলারের সঙ্গে প্রথম মিলন, পরে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। মধুর স্বভাবের এই মানুষটি দেশ বিদেশের সম্মানও পেয়েছেন অনেক। যেমন হাঙ্গেরির সায়েন্স আকাদেমির অবৈতনিক সদস্য, টমাস ইয়ং মেডেল লাভ, জেনোয়ার ক্রিস্তোফারো কলোম্বো পুরস্কার, রয়্যাল সোসাইটির রামফোর্ড মেডেল, ফ্রাঙ্কলিন সোসাইটির মাইকেলসন মেডেল, কম্যান্ডার অব দ্য অরডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার এবং ইত্যাদি।

তবে ভবিষ্যৎ মানুষ সম্পর্কে গাবর শঙ্কিত। তাঁর ধারণা আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ক্রমে মানুষের কর্মময় দৈনন্দিন জীবন সীমিত করে [illegible]। যখন কলকব্জা মানুষের বেশির ভাগ কাজই সেরে দেবে, তখন তার অবসরও নিশ্চয় বাড়বে। তাঁর প্রশ্ন, অনাবিল সেই অবসর মুহূর্তগুলি কীভাবে সে কাটাবে, সেটাই আজ বড় রকমের সমস্যা। এ ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ নিজেদের এখনও প্রস্তুত করে নিতে পারেনি। বিপদ এখানেই। ১৯৬৩তে এ ধরনের প্রশ্ন এবং পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করেই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইনভেন্টিং দ্য ফিউচার'। বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালের মানবিক সমস্যাবলী নিয়ে রচিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০-এ. নাম 'ইনোভেশন, সায়েন্টিফিক, টেকনোলজিকাল অ্যান্ড সোসিয়াল।'

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কোন কোন মহলে প্রশ্ন উঠেছে : গাবর বিজ্ঞানী হিসেবে কেমন? পদার্থ বিজ্ঞানের বেশির ভাগ নোবেল বিজ্ঞানীর মধ্যে যে মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের কথা চিন্তা করলে গাবরকে বলা চলে—মূলত তিনি একজন 'এক্সপেরিমেন্টালিস্ট,' ফান্ডামেন্টালিস্ট নন।

এ কথা বলে গাবরের অবদানকে খাটো করা যায় না। কারণ এ দিকে উদাহরণও কিছু আছে, যেমন [illegible] এবং স্যার ওয়ালটন। এঁরাও মূলত এক্সপেরিমেন্টালিস্ট হলেও এঁদের উদ্ভাবন পরমাণুকেন্দ্রক বিজ্ঞানকে আজ এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। তেমনি গাবরের আবিষ্কার শুধু ফটোগ্রাফি নয়, জড় এবং জীব বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় যে অনেক সাহায্য করবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

[illegible]

লুকোনো ময়লা আপনার রূপের আড়াল।

Anne French
DEEP CLEANSING MILK

এ আড়াল সরিয়ে দেবে অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক —আরো তরল বলে আরো গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করে

মুখের ওপর সবসময় ময়লা জমে, যে ময়লা গভীরে বসে গিয়ে চেহারার জৌলুষ নষ্ট করে, বুড়িয়ে দেয়, কুৎসিত দাগে ভরে তোলে,—এক কথায় আপনার রূপকে আড়াল করে রাখে। অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক দিয়ে এ আড়াল সরিয়ে দিন কারণ অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক যে কোনো ক্রীম বা ক্লেনজারের চেয়ে তরল।

ক্লেনজিং মিল্ক যত তরল হয় তত ভেতর পর্য্যন্ত পরিষ্কার করতে পারে। দুধের মত টলটলে তরল অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্ক হল একমাত্র ক্লেনজার যা ত্বকের ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছে সমস্ত লুকোনো ময়লা বার করে আনতে পারে। কারণ এই কাজের জন্যেই এ বিশেষভাবে তৈরী। এ ময়লা ধুয়ে যায় না, ক্রীম জাতীয় ক্লেনজার দিয়েও সাফ করা যায় না কারণ অন্য ক্লেনজার ত্বকের ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

যাচাই করে দেখুন: মুখ ধুয়ে আসুন। এবার একটু তুলো অ্যান ফ্রেঞ্চ ডীপ ক্লেনজিং মিল্কে ভিজিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে মুখে আর গলায় ঘষুন। তুলোতে কত লুকোনো ময়লা বেরিয়ে এল দেখলেন তো? এই ময়লাই এতদিন আপনার রূপের আড়াল হয়েছিলো।

ব্যবস্থাকারী ; জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ

॥ ৪৩ ॥

কেবল বাড়ির নম্বর না, 'বুদ্ধু ওস্তাগার লেনে ঢুকেই বাঁ-হাতি একটা পুরোনো ভাঙ্গা মতন মসজিদ, মসজিদের উল্টোদিকে 'মহামায়া কেবিন' অর্থাৎ একটা চায়ের দোকান,—চায়ের দোকানের সঙ্গেই দেখবেন একটা দর্জি-দোকান, দর্জি-দোকানের গা-ঘেঁষে একটা খুব সরু রাস্তা পাবেন, 'এক পাশে টিউব-ওয়েল—টিউব-ওয়েল পার হয়ে গুনে ঠিক পাঁচটা স্টেপ এগিয়ে গেলেই আমার বাড়ি। পুরোনো বাড়ি, কাঠের গেট। সদরের কড়া ধরে নাড়লেই আমি বেরিয়ে আসব।' একদিন না, দু'দিনই জগত তার বুদ্ধু ওস্তাগার লেনের আস্তানাটা যাতে সহজে খুঁজে বের করা যায় তার একটা জীবন্ত মানচিত্র রামানন্দর চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

কাজেই রামানন্দ অতি সহজেই সরু গলির ভিতরের সেই টিউবওয়েল-এর পাশ কাটিয়ে পাঁচ পা এগোতেই কাঠের গেট-ওয়ালা পুরোনো বাড়ি দেখতে পেল। কিন্তু বাড়ির সামনে একটা ভিড় জমে আছে কেন! মনে হয় যেন সবই প্রায় পাড়ার মানুষ, পরনে লুঙ্গি কালো পায়জামা, খালি গা খালি পা গেঞ্জি গায়ে কতজনকে রামানন্দর চোখে পড়ল। কাঠের গেটু-এর সামনে জড় জড়ো হয়েছে। গুজগুজ করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। কি ব্যাপার! কি হয়েছে ওখানে! ঠিক বুঝতে পারল না রামানন্দ। থমকে দাঁড়াল। 'কি হয়েছে দাদা?'

'আপনি কোথা থেকে এয়েছেন?' বড় বড় চোখ করে একজন রামানন্দর মুখটা দেখল।

'আমি এখান থেকে এসেছি' রামানন্দ ঢোক গিলল, 'মানে কলকাতায় থাকি আমি।'

'কাকে খুঁজছেন আপনি?'

'আর্টিস্ট জগত মণ্ডলকে!'

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেখানে এসে উঁকি দিল।

'কি ব্যাপার, কি চাইছেন দাদা?'

'আমি জগত মণ্ডলের কাছে এসেছিলাম।'

'জগত মণ্ডল কি আর আছে।'

লোকটা এমন একটা ভঙ্গি করে মাথা ঝাঁকাল, রামানন্দ বিরক্ত হল।

'কোথায় গেছেন তিনি।' রুষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ প্রশ্ন করল।

'কোথাও যাননি তিনি, ঘরেই আছেন।' আগের লোকটি আঙুল দিয়ে কাঠের গেট-ওয়ালা বাড়িটা দেখিয়ে বড় বড় চোখ করে আর একবার রামানন্দকে দেখল। 'কি দরকারে তাকে খুঁজছিলেন জানতে পারি কি?'

আচ্ছা ঝামেলা তো! এই অবস্থায় কার না মেজাজ খারাপ হয়। দরকারটা কি আমি এখানে এদের কাছে বলব?

'হুঁ, দরকার আছে বইকি, একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁর কাছে এসেছি।' রামানন্দ গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর করল।

'তিনি যে দাদা স্বর্গে চলে গেছেন, তিনি আর এই জগতে নেই, বুঝেছেন, দেখাটা করবেন আপনি কার সঙ্গে?' লোকটা কাঠার মতন চেহারা করল দ্বিতীয় লোকটি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল রামানন্দ। তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। হাঁ করে তাকিয়ে থেকে দুজনকে দেখতে লাগল।

'তাই বলছিলাম দাদা', চোখ বড় করে তাকান প্রথম লোকটি হাত নেড়ে রামানন্দকে বোঝাল, 'যদি আপনার জরুরী দরকারটা জানা যেত, মণ্ডলের বাড়িতে, মানে তার পরিবারকে না হয় খবরটা পাঠিয়ে দেওয়া যেত।'

'কি হয়েছিল জগতবাবুর?' রামানন্দ অতি কষ্টে একটা ঢোক গিলতে পারল।

'কিছুই হয় নি',—দ্বিতীয় লোকটি আবার চেহারাটা বিকৃত করল। 'কাল রাত্তিরে তিনি গলায় দড়ি দিয়েছেন, তাই তো বলছিলাম, তিনি এখনো ঘরেই আছেন, মানে দেহখানা কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে—তবে কিনা আপনার সঙ্গে কথা বলার মতন অবস্থায় নেই।'

'হঠাৎ তিনি এমন করলেন—' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। তা হলেও তার কথা তাদের কানে গেল।

'সংসারে অভাব অনটন চলতে থাকলে যা হয়', ভাবভাবে চোখ দুটো আকাশের দিকে তুলে দিয়ে প্রথম লোকটি বুক করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'অভাবের জন্যে অশান্তি—পরিবারের সঙ্গে খিটিমিটি ঝগড়াঝাটি—এর রেজাল্ট কি আর ভাল হতে পারে মশাই!'

'তবে যে শুনেছিলাম জগতবাবু আফ্রিকায় একটা চাকরির চেষ্টা করছিলেন—খুবই উঠে পড়ে লেগেছিলেন।'

'আরে মশাই উঠে পড়ে চাকরির জন্য চেষ্টা করা আর চাকরি পাওয়া কি এক

কথা হল—আচ্ছা মজার লোক তো আপনি।' দ্বিতীয় লোকটি এবার বড় করে রামানন্দকে ভেংচি কাটল। 'না, সেই চাকরি মণ্ডলের হয় নি, কালই খবরটা পেয়েছে—কোন্ এক মিনিস্টারের শালা আর্টিস্ট নাকি সিলেকটেড হয়েছে, ঐ খবর পেয়েই তো ঘরে এসে রাত্তিরে এই কুকম্মটা করল।'

'কি হে সতীশ, কি হে বিমল—' বলতে বলতে বেশ মোটাসোটা। উঁচু শরীরের ভাল পোশাকটোশাক পরা একটি মানুষ জুতোয় মসমস শব্দ করে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সেখানে এসে দাঁড়াল। রামানন্দর দিকে একবার তাকাল। 'ইনি কে?'

'ইনি অন্য পাড়া থেকে এসেছেন—জগন্ত মণ্ডলকে খুঁজছিলেন।' দুজনের একজন উত্তর করল।

'আর জগন্ত মণ্ডল!' ছড়িটা মাটিতে ঠুকে ভদ্রলোক নাকের একটা শব্দ করল।

'হ্যা হ্যা—কি একটা কেলেঙ্কারী করে গেল লোকটা পাড়ার ভেতর, তোমরা বল দিকিনি।' বলল বিমল সতীশের দিকে চোখ রাখল।

'হবে না!' যেন ভিতরে অনেক রাগ জমা হয়ে আছে, এতক্ষণ প্রকাশ করার

সুযোগ [illegible] না, প্রথম ব্যক্তি হাত দুটো শূন্যে নাচিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝাঁকাল। 'কতদিন বলেছি, জগত ভাই: আর্টফার্ট করে কিছু হবে না—একটা কিছুতে লেগে পড় —এভাবে উপোস থেকে—'

'আমি বলি কি?' দ্বিতীয় ব্যক্তিও শূন্যে হাত নাচাল। 'অনেকদিন বলেছি, মণ্ডল, ধাপা থেকে বেগুন এনে ফুলকপি এনে [illegible] বাজারে ছাতুবাবুর বাজারে বিক্রী কর এবং তাতে দুটো পয়সার মুখ দেখবে কিন্তু ঐ এক গোঁ, তুলিটি তিনি [illegible] ছাড়বেন না, যার ফলে—'

'তা-ই হয়।' হাতের ছড়ি শূন্যে তুলে ধরে দামী পোশাক-পরা ভারি চেহারার মানুষটি দার্শনিকের মতন হাসল। 'মানুষের ঘাড়ে যখন শনি চাপে ভূত চাপে, তখন কারো উপদেশ কোনোরকম সৎপরামর্শ সে কানে তোলে না—কত দেখলাম।'

রামানন্দ আর দাঁড়াল না। পা পা করে সেখান থেকে সরে এসে বড় রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়াল।

তারপর রামানন্দ! সবশুদ্ধ কটা পেরেক, [illegible] গজাল, তোমার বুকের [illegible] চমৎকার একটা ফাঁকা বাস পেয়ে আরাম করে পা ছড়িয়ে গদিতে বসে রামানন্দ চোখ বুজে হিসাব করল। সব মিলিয়ে চারটে। একটা গজাল কাল সন্ধ্যেবেলা লবণ হ্রদে অক্ষয়ের টালির বাড়িতে মাধুরী ঠুকেছে, একটা ঠুকেছে রাত্রে আর একজন টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে, একটা আজ সকালে হাসপাতালে অক্ষয় ঠুকে দিল, আর একটা ঠুকল এখন বন্ধু ওস্তাগার লেনের [illegible]। হ্যাঁ, চারটে বড় বড় গজাল [illegible] ফুসফুসের চার কোণায় ঠোকা হয়ে যাবার পর ফুসফুসটা কেমন টানটান হয়ে উঠেছে না? অনেকটা সিনেমার পর্দার মতন। পর্দার চার কোণায় চারটে গজাল দিতে পর্দাটাকে আর হাওয়ায় গোটেই উড়তে দেবে না কাঁপতে দেবে না, এতটুকু [illegible] কোথাও, যেন সেখানে এখন অনেক মুখ [illegible], অনেক ইমেজ খেলা [illegible] হবে না। [illegible] থাকবে না। ভাল, মন্দ কি, [illegible] নিজের মনে হাসল। অমূল্য [illegible]?

যখন রামানন্দ স্কুলে পড়ায়, তাদের [illegible] একদিন [illegible] বুকের ফটোটা রামানন্দকে এনে দিয়েছিল। কদিন প্লুরিসিতে ভোগার [illegible] ডাক্তারের পরামর্শ মতন এক্স-রে ক্লিনিকে [illegible] ছবিটা সে তুলিয়ে আনে। এই দেখনে [illegible], আঙুল দিয়ে ফুসফুসের [illegible] অমূল্য বলেছিল, ডাক্তার [illegible] একটা দাগ পড়েছে সেখানে, [illegible] এত বড় ফুসফুসের বাকি [illegible] কিন্তু এখনও পরিষ্কার রয়েছে, একটা আঁচড় পড়ে নি—কাজেই যক্ষ্মারোগে মরতে আমার ঢের ঢের দেরি। বলে অমূল্য বীরদর্পে আবার মদ ধরেছিল, শরীরের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল।

তেমনি রামানন্দও আজ ঘাবড়াল না। মোটে চার-কোণায় তো চারটে পেরেক পোঁতা হয়েছে, তার এত বড় ফুসফুসটা এখনও পুরোদমে রক্ত চালাচালি করছে, হাওয়া টানতে পারছে—এখনি ভয় পাবার থেমে যাওয়ার হয়েছে কি।

কলেজ স্ট্রীটে বাস ধরাতে সে নেমে পড়ল। তার এখনও অনেক কাজ বাকি। তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় কাজ আগের কাজ, তা হল টাকা জোগাড় করে কজন শ্মশানবন্ধু জুটিয়ে অক্ষরকে নিয়ে শ্মশানঘাটে যাওয়া।

একটা দোকানের ঘড়ি দেখে সে চমকে উঠল। দশটা বেজে গেছে। কিন্তু করার কিছু নেই। অক্ষয়ের লাস এতক্ষণে ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে। তাতেও বলার কিছু নেই। ঠাণ্ডা হয়ে জমে গেলেও মড়া পোড়াতে হবে এবং পুড়বেও, কখানা কাঠ বেশি লাগবে এই যা।

হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীট জংশন পার হয়ে রামানন্দ মোহন রেস্টুরেন্টের দিকে ছুটল। এখন তার একমাত্র ভরসা মোহন পাল, একমাত্র বন্ধু মোহন রেস্টুরেন্টের মোহনবাবু।

কিন্তু কোথায় সেই চায়ের দোকান? থমকে দাঁড়াল রামানন্দ। ভারি মজা তো! এতকালের চেনা জায়গায় এসে একটা চেনা দোকান খুঁজে বের করতে পারছে না? দোকানে রাস্তায় গোলমাল করে ফেলছে? তাই বা কি করে সে বিশ্বাস করে। ওই তো ওদিকে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, এদিকটায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট—হুঁ, এটাই কলেজ রো —একটু এগিয়ে গেলেই তুমি নবীন কুণ্ডু লেন পাচ্ছ, আর একটু এগোলে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট পাবে। তবে?

চোখ দুটো হাত দিয়ে রগড়ে নিল রামানন্দ। না না, ভুল হবার কথা নয়। মোহনবাবুর দোকান থেকে ডাস্টবিনটা চোখে পড়ত, রাস্তার এপাশে সেটাও রামানন্দ পরিষ্কার দেখতে পেল। পরিবর্তনের মধ্যে ড্রামটা একটু বেশি দুমড়ে গেছে, ঢাকার দিকটা ভেঙে গেছে, ফলে

মিছে ছাইপাঁশ আবর্জনা, কটা চিংড়ির খোলা ডিমের খোসা রাস্তায় অ্যাসফাল্টের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

না না, ভুল হবে কেন, ঐ তো ওপাশে জিলিপি গজার দোকান, এপাশে মুদি দোকান, হালুইকরের দোকানটার পাশেই ইলেকট্রিক গুড্‌স-এর দোকানটা যেমন ছিল ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। মুদিখানার গা ঘেঁষে মনোহারী দোকানটাও রামানন্দর চোখে পড়ল।

কিন্তু মোহন পালের সেই বিখ্যাত মোহন রেস্টুরেন্ট! উড়ে গেল? কেমন যেন ভয় পেল রামানন্দ, ঘাবড়ে গেল, বুকে এত বড় চারটে ঘাই নিয়ে সে যতটা কাবু হয় নি, দুর্বলবোধ করে নি, এখন মোহন পালের চায়ের দোকানটা দেখতে না পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়ার অবস্থা হল তার, মুখটা শুকিয়ে গেল, গলার ভিতরটা শুকনো ঠেকল।

কাউকে জিজ্ঞেস করবে? কি জিজ্ঞেস করবে? একটা দোকান উড়ে গেল? *দোকানের পাখা আছে নাকি মশাই যে উড়ে যাবে—দোকান নেই, দোকান ঘরটা তো থাকবে। আচ্ছা লোক তো আপনি।*

তাই বলো, রামানন্দ এখন ঘরটা দেখতে পেল। মোহনবাবুর চায়ের দোকানের সেই চমৎকার ঘর। কিন্তু ভিতরের ভাঙা চেয়ার, চায়ের দাগধরা মাছি ভনভন ময়লা টেবিলগুলো কি হল, লড়বড় পাখাটাও তো দেখা যাচ্ছে না। পদাবলী গোষ্ঠীর কবির দলই বা গেল কোথায়! বিকাশ না হয় চাকরি করতে আসাম চলে গেছে, কিন্তু শুভেন্দু, অমলেন্দু, উৎপল, নবকিশোর, অরুণাভ, রজত রাকেশ, পলাশ—এরা তো চেয়ার জুড়ে বসে থেকে কবিতা নিয়ে কাব্য নিয়ে গরম গরম আলোচনা করবে। কেউ নেই। বেশ তো, না থাক, ওরা হয়তো এখনো এসে পৌঁছায়নি, কিন্তু এই গরমেও রোঁয়া-ওঠা ময়লা পশমী চাদর গলায় হিসাবের খাতা সামনে নিয়ে মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় টাক, সেই আদি ও অকৃত্রিম মোহন পালের মূর্তিটা রামানন্দর চোখে পড়ছে না কেন! দোকানের অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে চেহারাটা গেল কোথায়। মোহনবাবুর কর্মচারী রমেশের কি হল?

একেবারে বেকুব বনে গিয়ে পুরো দু মিনিট দোকানঘরটার দিকে সে চেয়ে রইল। ভিতরে আলমারী শো-কেস ঝকঝক করছে। দেওয়ালের কলি ফেরান হয়েছে, নতুন রং লাগান হয়েছে, একটার জায়গায় চারটে চকচকে পাখা এক ফোঁটা শব্দ না করে বনবন ঘুরছে।

তাই বলো, দোকানের মাথায় ঝুলোন রংদার অক্ষরে লেখা জমকালো সাইনবোর্ডটাই সব গোলমাল করে দিয়েছিল। মোহন বস্ত্রালয়। সকল প্রকার সিল্ক, তাঁত, পশমী ও সুতী বস্ত্র সুলভ মূল্যে এখানে পাবেন।

হুঁ, ঐ তো মোহনবাবু। দাড়ি গোঁফ কামান, মুখটা চকচক করছে। একথা বিশ্বাস করবে কেউ? মোহন পালের গায়ে ময়লা পশমি আলোয়ানটা নেই, খাটো শার্ট ও হাঁটুতক ধুতির বদলে সুটবুট পরে আছে।

শুকনো গলা ভিজিয়ে এবার রামানন্দ চেষ্টা করে পর পর দুটো [illegible] গিলল। তারপর এক পা দু-পা করে [illegible] বস্ত্রালয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

'নমস্কার মোহনবাবু!'

'কে আপনি?'

'দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।'

'ও হ্যাঁ, রামানন্দবাবু না? কি ব্যা[illegible] কি খবর?' তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে [illegible] জোড়া চশমা তুলে মোহন নাকে প[illegible] 'মুশকিল, এটা ছাড়া চোখে এখন সব [illegible] ঝাপসা দেখি।'

'বয়েস হচ্ছে তো।' রামানন্দ হা[illegible] চেষ্টা করল।

'হুঁ, তা হচ্ছে, কিন্তু আপনি দেখছি মশাই আমার চেয়েও আগে বুড়ি[illegible] গেলেন। সেদিন যা দেখলাম, আজ যে[illegible] আরো বেশি বুড়ো বুড়ো ঠেকছে।'

'হুঁ, মন শরীর দুটোই খারাপ।'

'কেন, কি হল আপনার মনের, শরীর[illegible] বা খারাপ হবে কেন, আপনি কবি শিল্পী[illegible] আপনার তো শরীর মন খারাপ হলে চল[illegible] না মশাই।'

রামানন্দ চুপ করে রইল। কাউন্টার[illegible] দাঁড়িয়ে মোহন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে[illegible] রামানন্দ দাঁড়িয়ে রইল। শো-কেস [illegible] মোহন খদ্দেরকে জামা-কাপড় দেখাচ্ছে।

'কি হল রামানন্দবাবু!' মোহন প[illegible] ফিরে এল। 'কিছু কেনাকাটা করার ইচ্ছে[illegible] আছে নাকি। ভাল তাঁতের ধুতি এসেছে[illegible]'

'না না।' রামানন্দ সজোরে মা[illegible] নাড়ল। 'এই মাত্র আমি হাসপাতাল থেকে[illegible] এসেছি।'

'কেন, চোখ দেখাতে কান দেখাতে[illegible] আউটডোরে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'উঁহু, আমার একটি বন্ধু মারা গেছে[illegible] গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগছিল, দু মাসের[illegible] বেশি মেডিকেল কলেজে থাকার পর কা[illegible] অপারেশন হয়—টিঁকল না।'

'আপনার কোথাকার বন্ধু মশাই? কবি[illegible] শিল্পী কেউ?' মোহন পাল ভুরু[illegible] কুঁচকোল। 'আমি দেখেছি কি?'

'না, না, আপনি দেখবেন কোথা থেকে[illegible] আমার সল্ট লেকের বন্ধু, পোলট্রি মানে[illegible] হাঁস-মুরগির কারবার করত।'

মোহন পাল সরে গিয়ে একটা পাখা[illegible] বন্ধ করে দিল। কাউন্টার ফাঁকা। আপাতত[illegible] খদ্দের কেউ নেই।

'হুঁ, তা হলে ঐ বন্ধুর ব্যাপারে[illegible] ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে[illegible] আপনাকে?'

'এখনো ছুটোছুটি করতে হচ্ছে মোহন[illegible] বাবু, কিছু টাকার দরকার, সাকরুল[illegible] জোগাড় করা যাচ্ছে না, ডেডবডি হাসপাতালে[illegible] পড়ে আছে, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াবার[illegible] ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আপনিও তো আচ্ছা লোক মশাই—রবাড়িতে খবর দেন নি? হাসপাতাল কে ওরা খবর পাঠায় নি?'

রামানন্দ মাথা নাড়ল।

'বাড়িতে কেউ নেই, মানে কাঁধে করে শানে বয়ে নিয়ে যাবার মতন কেউ নেই, পোড়াবার টাকাও কেউ দেবে না—এখানে সেই সব, বন্ধুর সব দায়িত্ব আমি ঘাড়ে নিয়েছি।'

'আপনি আমাকে অবাক করছেন রামানন্দবাবু, আপনি কবি, কবিতা লিখবেন, আপনি কেন এসব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন, শিল্পী, আজেবাজে ব্যাপারে মাথা ঘামানো তো আপনার কথা নয়।'

বড় বড় চোখ করে রামানন্দ মোহনকে দেখছিল। মোহন মিটিমিটি হাসছে। যেন দাঁতের কোণ দিয়ে কেটে কেটে কথা বলছে। মোহন রেস্টুরেন্টের মোহন আর মোহন বস্ত্রালয়ের মোহনে অনেক তফাৎ। আগের সেই গালভরা হাসি সেই গালভরা কথা নেই। মানুষটা এখন অনেক বেশি মাজাঘষা, বুদ্ধিমান।

'ঠিক কথা বলছি কিনা বলুন।' রামানন্দ চুপ করে আছে দেখে মোহন মাথা ঝাঁকাল। খদ্দের ঢুকেছে। মোহন আবার কাউন্টারে চলে গেল।

'কি হল দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ঠিক বলছি কিনা, আপনি কবি, শিল্পী।' খদ্দের বিদেয় করে মোহন পাশে ফিরে এল।

'না, আপনি ঠিক বলেন নি।' রামানন্দ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'অক্ষয় কেমন মানুষ ছিল, কত সুন্দর মন কত মহৎ আত্মা ছিল আমার বন্ধুটির, যদি আপনি জানতেন, তাকে দেখতেন, এমন কথা আমাকে কক্খনো বলতেন না।'

'আস্তে রামানন্দবাবু, এত চেঁচাবেন না।' উত্তেজিত হয়ে রামানন্দ চেঁচিয়ে কথা বলছিল। মোহন চোখ টিপল। 'এটা আপনাদের সেই চায়ের দোকান না, বুঝতেই পারছেন।'

'না থাক চায়ের দোকান, আপনি তো মোহনবাবু রয়েছেন, আপনার ওপর আমার দাবি আছে, কিছু টাকা দিন, আর—আর আপনার ঐ কর্মচারীদের কাউকে বলুন দু'চারজন শ্মশানবন্ধু জোগাড় করে দিক —বন্ধুর সৎকারটা সেরে আসি।'

'আমি টাকা দেব!' চোখ গোল করে মোহন পান আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা করল। 'আমার হাতে টাকা কোথায় —দেশের জমিজমা বেচে এবং ধারকর্জ করে এই দোকান স্টার্ট দিয়েছি—এখন কি কাউকে আমার এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করার সময়।'

'না না ওকথা বলবেন না, খুবই বিপদে পড়ে গেছি, এমন আর একটি লোক আমার জানাশোনা নেই, যার কাছে গিয়ে টাকা চাইতে পারি—খুব একটা আশা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

'আপনিও যেমন পাগল—' মোহন হাতের তেলো শূন্যে ঘুরিয়ে আবছা শব্দ করে হাসল। 'টাকা নেই লোকজন নেই— সৎকার সমিতিকে একটা ফোন করে দিন— এক্ষুণি গাড়ি এসে আপনার বন্ধুকে নিমতলা নিয়ে যাবে—তারাই পোড়াবার ব্যবস্থা করবে।'

'না না, তা কি হয় কখনো মোহনবাবু—' রামানন্দ জোরে মাথা নাড়ল। 'সৎকার সমিতির গাড়ি এসে অক্ষয়ের মড়া শ্মশানে নিয়ে যাবে, আর—আর তাদের মাইনে করা ডোম দিয়ে তাকে পোড়াবে এ জিনিস আমি হতে দেব কেন—এটা খুবই দুঃখের খুবই বেদনার বিষয় হবে।'

'ঐ তো মশাই আপনার দোষ।' মোহন আবার দাঁতে কেটে কথা আরম্ভ করল। 'সব বেদনা সব দুঃখের ঊর্ধ্বে আপনাকে থাকতে হবে— বলেছি আপনি কবি শিল্পী —সংসারে আমাদের চারদিকে প্রতি মুহূর্তে কতরকম দুঃখ বেদনা পরিতাপের ব্যাপার ঘটছে—আমরা সাধারণ লোক কাতর হব বিচলিত হব মাথা গরম করব—কিন্তু আপনাকে চোখ বুজে থাকতে হবে। আপনাকে তো কাতর হলে অস্থির হলে চলবে না, আপনি শুধু আপনার সৃষ্টির কথা ভাববেন, কবিতার কথা চিন্তা করবেন—'

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন মোহনবাবু?'

রামানন্দর চোখ লাল হয়ে উঠল। 'এবার কথা অনেক শোনা হয়েছে—আপাতত ক্যাশ-বাক্সটা খুলে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিন—একটা খাট কিনতে হবে ফুল কিনতে হবে, কিছু ধূপ চন্দনও চাই—কবি শিল্পী বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনিয়ে আমাকে বিদায় করলে চলবে না—'

'এসব কথা তো আপনাদের মুখ থেকেই শোনা রামানন্দবাবু, আপনাদের কবিদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছি—না হলে লেখাপড়া শিখিনি, আমার সাধ্য কি এত সুন্দর করে গুছিয়ে এসব ভাল ভাল কথা বলি—এ কি, আপনি আমার ক্যাশের দিকে এগোচ্ছেন কি—' মোহন ক্যাশবাক্স আগলে দাঁড়াল।

'কিছু টাকা আমাকে দিতেই হবে—আপনার ওপর আমার রাইট আছে—আপনি আমার অনেক দিনের জানাশোনা পরিচিত মানুষ—আপনি আমার বন্ধু—'

'দেখুন রামানন্দবাবু, এভাবে আমাকে বিরক্ত করবেন না।' মোহনের ভাবভঙ্গিতে ফোলা ফোলা চোখ ছোট হয়ে গেল। 'আপনাদের অনেক অত্যাচার উপদ্রব আমি সহ্য করেছি—যে জন্য এত বড় চায়ের দোকানটা আমার ফেল পড়ল—আপনি বান—আমার ক্যাশে একটা আধলাও নেই—'

'আছে, আছে—এইমাত্র একটা লাল শাড়ী পরে একটা একশ টাকার নোট আপনি ক্যাশবাক্সে ঢুকিয়েছেন—দিন তো চাবিটা'—যেন মরীয়া হয়ে ক্যাশবাক্সের দিকে ঝুঁকেছিল রামানন্দ, মোহন পাল ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল ও সেই সঙ্গে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল : 'সনাতন অনুকূল!'

মোহনের দুই কর্মচারী ওদিক থেকে ছুটে এল। 'কি হচ্ছে মশাই, আপনি করছেন কি!' তারা আস্তিন গুটিয়ে ফেলল।

'আপনাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে না—মোহনবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলছি, মোহনবাবুর কাছে আমি টাকা চাইছি।'

'না, হবে না এখান থেকে বেরিয়ে যান।'

'টাকা না নিয়ে আমি বেরোব না—আমার বন্ধুর ডেডবডি হাসপাতালে পড়ে আছে—তাকে পোড়াবার—' রামানন্দ কথা শেষ করার আগে অনুকূল নামের ছেলেটি জোরে ধাক্কা দিতে রামানন্দ চৌকাঠের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়ল। তার ঠোঁট কেটে গেল। 'মোহনবাবু!' বাঁ-হাতের পিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে রামানন্দ আবার ক্যাশবাক্সের দিকে এগোতে চেষ্টা করল।

'দুজনে ধরে দোকান থেকে একে বের করে দাও না।' মোহন পাল উত্তেজনায় কাঁপছিল ঘামছিল। এবার অনুকূল ও সনাতন এক সঙ্গে রামানন্দর গলা ধরে তাকে ফুটপাথের দিকে ঠেলে দিল। রামানন্দ বাইরে সিমেন্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার কপাল কেটে গেল, রাস্তার লোক জমে গেল। কপালের রক্ত মুছতে মুছতে রামানন্দ উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল তার চোখে জল এসে গেছে। চোখে জল ও ঠোঁটে কপালে রক্ত নিয়ে সে মোহন বসুদের কাউন্টারে দাঁড়ান মোহনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'মোহনবাবু আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন—অথচ সেদিন রাজাবাজারে একটা চায়ের দোকানে বসিয়ে আমাকে পেট ভরে চা খাবার খাওয়ালেন।' করুণ কাতর গলায় রামানন্দ বলল।

'হুঁ, খাইয়েছিলাম বইকি, কবি রামানন্দ সেনকে খাইয়েছিলাম।' মোহন পাল পকেট থেকে রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছছিল। 'পাগল রামানন্দকে নয়—আবার আপনি কবিতা লিখুন—আবার কাব্যভাবনা নিয়ে মেতে থাকুন—পেট ভরে আপনাকে খাওয়াব—'

রামানন্দ আর মোহনের দিকে তাকাল না। চোখে জল নিয়ে ঠোঁটে কপালে রক্ত নিয়ে রাস্তার ভিড়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'হুঁ, কবিতা লিখব, স্যার আপনার কাছে একটা পেন আছে—দিন—ও কি দিলেন না, স্যার আপনার কাছে আছে, নেই? আমার একটা পেনের দরকার—এই যে মশাই আপনার কলমটা দিন—দেবেন না? একটা চমৎকার কবিতা আমি এখনি লিখে ফেলব—চারটে পাজাকে বুকে নিয়ে আমি হাসি, এখন আর একটা চরণ, হল পাঁচটা—হা-হা—তাতে কি, বাইরের সূর্য নিবে গেছে, আমার অন্তর আলোকিত—স্যার আপনার পেনটা দিন—আপনারটা দিন—কেউ দিলেন না, আমার একটা পেন ছিল, খুব দামী পেন, বিলিতি জিনিস—ঐ ঐ লোকটা নিয়ে গেছে, মুখে খটখটে বসন্তের দাগ, মাথায় বাবরি—ঐ যে শালা আমার কলম নিয়ে পালাচ্ছে—হেই হেই—' হ্যারিসন রোড ধার হয়ে মোহন কলেজ স্ট্রীট ধরে ছুটতে লাগল—

'পাগল, পাগল নাকি লোকটা?' রাস্তায় ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বলল।

'মনে হয় যেন কবি, কবিতার কথা বলছে, শুনলেন না?' একজন উত্তর করল।

'ঐ একই কথা, কবিই পাগল, পাগলই কবি।'

দু' হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে নন্দদুলাল রামানন্দর পথ আটকাল, তাকে ধরে ফেলল। 'রামানন্দবাবু, কোথায় ছুটছেন?'

যেন রামানন্দ নন্দদুলালকে চিনতে পারেন নি, হাঁপাচ্ছে, তার কপালে রক্ত ঠোঁটে রক্ত, চোখ দুটো পাষাণের মতন স্থির করে নন্দর দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে কথা নেই।

'তুমি ওঁকে গাড়িতে নিয়ে এস—' রেখা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিল।

আজ রেখার জন্মদিন। তাকে একটা ভাল উপহার কিনে দেবে বলে নন্দ গাড়ি করে রেখাকে নিয়ে বউবাজারে একটা জুয়েলারী দোকানে এসেছিল। বউবাজারের রাস্তা ধরে পাগলের মতন রামানন্দ ছুটে আসছে দেখে নন্দ চট্ করে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে দু' হাত ছড়িয়ে রামানন্দকে ধরে ফেলে।

'রামানন্দবাবু, কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি?' রেখার চোখে মুখে উদ্বেগ। 'ইস, ঠোঁটে রক্ত কপালে রক্ত, কি হয়েছে আপনার বলুন তো?'

রেখার পাশে বসে রামানন্দ স্থির চোখে তাকে দেখল, তারপর রেখার কোলে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল, কান্নাভরা গলায় সব বলল।

'তুমি এক্ষুণি গাড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে চলো।' রেখা নন্দর দিকে তাকাল।

নন্দ ঘাড় কাত করে স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল।

'আমি সব ব্যবস্থা করব রামানন্দবাবু, খুব ভাল করে আপনার বন্ধুর সৎকারের ব্যবস্থা করছি, আপনি একটুও ভাববেন না।' হাতের ছোট্ট নীল রুমাল দিয়ে রেখা রামানন্দর কপালের রক্ত ঠোঁটের রক্ত মুছে দিল। গাড়ি চলতে লাগল।

'কবি রামানন্দ সেনকে নিয়ে আমি একটা গল্প লিখব।' ওপাশ থেকে নন্দ এক সময় বলল।

'হুঁ', রেখা বলল, 'রামানন্দ সেনের কবিতার মতই সুন্দর করে গল্পটা লিখবে।'

'ভাল গল্প কবিতার মতোই সুন্দর।' নন্দ বলল।

ক্লান্ত নিস্তেজ শরীরটা পিছনের দিকে এলিয়ে দিয়ে রামানন্দ চোখ বুজে রইল, কথা বলল না।

॥ ২৪ ॥

মংপু

রবীন্দ্রনাথকে আমি একবার মাত্র দেখেছি। তাও দূরে থেকে। কিন্তু বহুদিন আগেকার সে স্মৃতিটা আমার মানসলোকে এখনও এতই উজ্জ্বল যে চোখ বুজে স্থির হয়ে বসলেই তাঁকে দেখতে পাই। বয়স তখন পনের-ষোলো: প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণীর ছাত্র। কৈশোর থেকে যৌবন উত্তরণের মুখোমুখি সে সময়টায় হৃদয়-বৃত্তিগুলো এতই প্রখর যে ভালো লাগবার মতো কিছু দেখলেই তা একেবারে মনের গভীরে গিয়ে দাগ কেটে বসে। কলেজের ছাত্র-সংস্থা 'রবীন্দ্র পরিষদ'-এর আমন্ত্রণে

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি এসেন। সে যেন আশা নয় আবির্ভাব। আমাদের ফিজিকস থিয়েটারে শুভ্র এক বেদীর উপর তাঁর আসন পাতা হল। সামনের ক্রমোন্নত গ্যালারিগুলোয়, পাশের যাতায়াতের পথে, হলের আনাচে-কানাচে তিল ধারণের স্থান নেই। কবির বয়স তখন সত্তরের উপরে। রেশমের মতো সাদা চুলদাড়ি ধবধবে সাদা। আর সেই আলোর পরিমণ্ডলের মধ্যে অপরূপ মুখশ্রী। কিছুক্ষণ ছিলেন আমাদের মধ্যে। কিছু বলেছিলেন আমাদের। সঙ্গে ছিলেন অল্পবয়সী এক ভদ্রমহিলা। একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সেই দীপ্ত, সুন্দর চেহারাই শুধু নয় সমস্ত পরিবেশটাই দিনটি এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথকে আর চাক্ষুষ দেখিনি, সেই শেষ দেখা। কিন্তু তাঁর অকৃপণ দানে জীবন তো আমার ভরাই, ভরে গেছে। সাহিত্যে বার্তায়, আনন্দ বেদনায়, সর্বদাই তিনি কাছে কাছে আছেন।

নিঃসঙ্গতম চিন্তাভাবনার তিনিই সাক্ষী; গভীরতম প্রকাশবেদনার তিনিই ধাত্রী। সেই যে দূর অতীতে একদা তাঁকে একটি নমস্কার করবার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার পরে তাঁর সৃষ্টির কূলপ্লাবী স্রোতে এমনই ভেসে গিয়েছি যে অদর্শনের জন্য মনে আর কোন খেদ নেই।

তবু—স্বীকার করি—একটা দুর্বলতা জয় করতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত স্থানগুলি দেখবার জন্য ছুটে গেছি দূরদূরান্তরে। জোড়াসাঁকোর কথা না হয় বাদই দিলাম। শান্তিনিকেতনে সব বীথিকা-দর্শনের সুযোগও মিলেছে আর পাঁচজনের মতো। সেজন্য তাও বক্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের অন্তরলোকে প্রবেশ করবার এক বিরল সুযোগ পেয়েছিলাম বহুকাল আগে। তখন প্রবোধচন্দ্র বাগচী তখন ভাইস-চ্যান্সেলার ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় মহাশয় রেজিস্ট্রার। আমাকে তাঁরা স্মরণ করলেন, বিশ্বভারতীর

নানাবিধ প্রকাশনে ব্যবহারের জন্য প্রথম কিছু ছবি তুলে দেবার ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত নানাবিধ জিনিস—আসবাবপত্র, পোশাক-আশাক, কালি-কলম, রং-তুলি, বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত তাঁর রচনাসম্ভার, রাশি রাশি চিঠিপত্র, পাণ্ডুলিপি ও হাতে-আঁকা ছবি, মায় সুইডিস ভাষায় লেখা তাঁর নোবেল পুরস্কার-পত্র ও মেডেল প্রভৃতির ফোটোগ্রাফ নিয়েছিলাম সে সময়ে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচায়ক এই নেগেটিভগুলি আমার বিস্তৃত সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ মূল্যবান। আর একবার গিয়েছিলাম, সিংহলের হোরানায়। সেখানে কলম্বো থেকে কুড়ি মাইল দূরে তিনি শ্রীপল্লী নামে (সিংহলীরা বলেন, শ্রীপালি) এক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠালিপিটির ছবি তুলতে অল্পই সময় লেগেছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ বসে ছিলাম সেখানে। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আবার এসেছি কালিম্পং-এর গৌরীপুর ভবনে। তাঁর স্মৃতিপূত

মংপুর বাড়ির সাধারণ দৃশ্য

কিছু জিনিসপত্র এখনও সেখানে রাখা আছে আর একটি মর্মরফলকে লেখা আছে—"এই ভবনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেন এবং ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৫ সনে 'জন্মদিন' কবিতা আকাশবাণীর মাধ্যমে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।" ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এখানেই তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও সে মাসের ২৮শে তারিখে তাঁকে অচেতন অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে আর এক বছরও তিনি বাঁচেননি। গৌরীপুর ভবনের যে ঘরে তিনি থাকতেন, মনে আছে, তার এক কোণে চুপ ক'রে বসে-ছিলাম বেশ খানিকক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সৌরভে বুক ভরিয়ে নিতে, তাঁর অবর্তমানেও তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দু'দণ্ড বসতে আমার আগ্রহের অবধি নেই। গৃহগত, অক্ষম তীর্থকামীর মতো আশায় বুক বেঁধে এখনও বসে আছি—কবে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে—কবে পতিসর, শাজাদপুর, শিলাইদহে যেতে পারব। কবিগুরুর কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন আজ আর হয়ত সেখানে নেই। কাছাকাছি গ্রামগুলিও নিশ্চয়ই 'জনহীন রাজশাসনে'। সকাল-সন্ধ্যায় গাঁয়ের মেয়েরা নদীর ঘাটে জল নিতে আসে না। তবু একদা তিনি সেখানে ছিলেন; অজস্র সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন থেকে বহুকাল কাটিয়ে গেছেন সেসব জায়গায়! আজও হয়ত আছেন অদৃশ্যলোকে। আর আছে সর্বংসহা প্রকৃতি—প্রত্যূষ থেকে রাত্রিশেষ অবধি একই রকম রূপসজ্জায় যার কোন ক্লান্তি নেই, বিরতি নেই। অতএব আমার কাছে তারা তীর্থস্বরূপ।

এই অভিনব তীর্থযাত্রায় দু'বার গিয়েছি

মংপুর বাড়ির সম্মুখভাগ

মংপুতে। সেখানকার সিংকোনা আবাদ ও কুইনিন ফ্যাক্টরীর কর্মীদের নিয়েই গ্রাম। শিলিগুড়ি-কালিম্পং সড়কে, সেভক পার হয়ে পাহাড়ী রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে, রম্বি বাজার গ্রামের আগে রম্বিখোলা নদীর সেতুর পাশ দিয়ে এক বাঁহাতি রাস্তায় ছমাইল দূরে মংপু। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ও তাঁর স্বামী ডঃ মনোমোহন সেনের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চারবার গিয়েছিলেন মংপুতে। বলা বাহুল্য, নিসর্গদৃশ্য ও আতিথেয়তা দুয়েরই জন্যই জায়গাটা তাঁর ভাল লেগেছিল। মংপু পাহাড়ের উপরের দিকে সুরেল-এর বাংলো বলে যে পুরাতন বাড়িটি পরিচিত, সেখানে থেকেছেন কিছুদিন; তবে বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর কেটেছে, পাহাড়ের গায়ে অনেকটা নীচে, সেন-দম্পতির জন্য নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত নতুন কোয়ার্টারে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সে বাড়ির ঘরদোরের বর্ণনা দিই। পাঠকমাত্রেই জানেন, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি আলাপচারী [illegible] কথা। সুরেল-এর বাংলো থেকে যেদিন নীচের বাড়িতে আসা হল, সেদিন চারি-দিকে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন—"এ তো চমৎকার বাড়ি। তুমি কেন আপত্তি করেছিলে?—কি সুন্দর এই সামনের ঢালু পাহাড়টি, আকাশের কোল থেকে সবুজ বলা নেমে এসেছে। এই সামনের মাঠটিও তোমার ভালো: আমি মাটির কাছাকাছিই থাকতে চাই। চক্ষুলজ্জা ... এসেছে: মাটির স্পর্শ চোখ দিয়েই ... মিটিয়ে নিতে হয়। চল তা'হলে, তোমার বাড়ির জিয়োগ্রাফীটা জেনে আসি। ...এই কাচের ঘরটি বুঝি আমার লেখবার? এতো খুবই ভালো, একেবারে উত্তম বলা যেতে পারে। এই চৌকিতে সকাল বেলা বসব আর রোদ্দুর এসে পড়বে কাচের ভেতর দিয়ে। তোমার ঐ বুড়োকায় বনস্পতির পাতার ফাঁক দিয়ে শতধারায় ঝরে পড়বে সকাল বেলার আলো, ভোরের সেই রৌদ্রস্নানটি আমার কত সুন্দর হবে।...বাঃ, এ চানের ঘরও তোমার ওপরের বাড়ির চাইতে ঢের ভালো। এই পাশের ঘরেই বুঝি তোমরা থাকবে—সে তো আরো সুবিধে, রাত্রে হঠাৎ মূর্ছা যাবার দরকার হ'লে ফস ক'রে তোমায় খবর দিয়ে মূর্ছা যাব। আর আমার সাঙ্গোপাঙ্গরা থাকবে কোথায়? ওদিকটায় বুঝি? আমরাই করেছ ওদের একটু দূরে দিয়েছ—ওরা একটু সিগারেট খায়, হো হা করে, বেশী কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে না।"

এ তো গেল বাড়ির ভিতরের 'জিয়োগ্রাফী'। পাঁচ-ছ'খানা কামরাওয়ালা উত্তরমুখী কাঠের এ বাংলো-বাড়িটির সামনে একটু জমি আছে, তারপরেই ঢালু পাহাড় নেমে গেছে বহুদূর অবধি। পূর্বদিকে অনেকখানি খোলা জায়গা, তার পূব প্রান্তে সেই 'বুড়োকায় বনস্পতি' যার উল্লেখ আছে উপরের উদ্ধৃতিতে। এ প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত প্রথম ছবিটি সেই গাছতলা থেকেই তোলা; ছবির উপরের অংশে গাছটির ছড়ানো ডালপালার কিছু দেখা যায়। বাড়ির উত্তর-পূব কোণে, খাদের ধারে, কয়েক থাক গোল চাকা-চাকা

ছাউনি-ঘর ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়আসন

রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত শয্যা
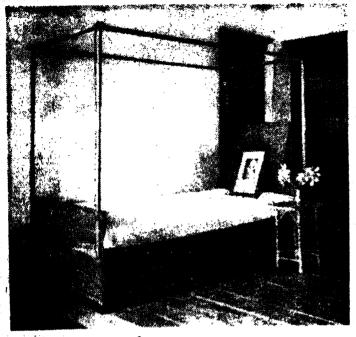
এক বসবার জায়গা। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারেই এটি বানানো হয়েছিল। এ বিশ্রাম স্থানটি তাঁর খুব ভাল লাগত; প্রায়ই এসে বসতেন সেখানে। তার পাশেই এক সেগো-পাম গাছ, অনেক উঁচুতে পাতার নীচ থেকে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে রাশিরাশি মালার মতো। এটিও তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

এই পরিবেশে চারিদিকের নিসর্গদৃশ্য কেমন লাগত রবীন্দ্রনাথের? সে কথা বলতে হলে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আবার ধার করা ছাড়া উপায় নেই। মংপুতে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার, তাঁর কাছা-কাছি থাকবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে; আমার হয়নি। প্রথমবার মংপুতে পৌঁছে বলেছিলেন—"পথে আমার কোনো কষ্ট হয়নি। এমন সুন্দর অরণ্যপথ। তোমাদের এই বনটি কিন্তু অপূর্ব। লম্বা লম্বা সব গাছ সোজা ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার—একেই তো বলে অরণ্য।" কিংবা অন্যত্র—"সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় একটা চৌকিতে বসতেন, সামনের পাহাড়ের গায়ে একটি একটি ক'রে আলো জ্বলে উঠত। এইটি ও'র ভারী ভালো লাগত দেখতে। অন্ধকারে সমস্ত ঢেকে গেছে। একাকার হ'য়ে গেছে আকাশ আর পাহাড়। শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট দীপবর্তিকা দূর অদৃশ্য জীবনের বার্তা বহন ক'রে আনছে। বলতেন—'আশ্চর্য লাগে ভাবতে ওখানেও মানুষের জীবনযাত্রা চলছে! এই রকম ছোট ছোট তাদের ঘর; কী রকম তারা মানুষ, কী রকম তাদের জীবনযাত্রা, কিছুই

জীবনে শুধু গভীর অন্ধকারের মধ্যে একটুকু এতটুকু আলো, প্রাণের আলো।"

সে প্রাণের আলো আজও আছে মংপু পাহাড়ে, আশপাশের পাহাড়ে। তাদেরই কল্যাণ কামনায় ও প্রধানত তাদেরই উদ্যোগে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল লেবার ওয়েলফেয়ার সেণ্টার। সিংকোনা ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের জন্যই এ ব্যবস্থা। পশ্চিম দিকের একটি ঘরে কাজ করে এক 'এক্স-রে ইউনিট', আরেকটিতে আছে এক 'এরিয়া লাইব্রেরী'। আর আছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির নীচে এক তাম্রলিপি যাতে বাংলা, ইংরেজী ও নেপালী ভাষায় এ বাড়ির সঙ্গে কবিগুরুর সম্পর্ক ও এ প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ। সম্প্রতি পাশের মাঠের দূর প্রান্তে এক প্রেক্ষাগৃহও নির্মিত হয়েছে। বাড়ির পূর্বদিকের দুটি ঘর রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেখানেই তিনি থাকতেন। এ দুটি কক্ষে এখনও তাঁর ব্যবহৃত সোফা, খাট ও অন্যান্য সামগ্রী রক্ষিত আছে। সিংকোনা বাগানের কর্মীরা প্রত্যহ সেখানে ধূপ জ্বেলে দিয়ে যান, ফুল রেখে যান নির্মাল্যরূপে।

এই ঘর দুটিতে ব'সে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যচর্চা করে গেছেন, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর বইতে। বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে আমি এখানে মাত্র একটি কবিতারই উল্লেখ করতে পারি। সেটি মংপু সম্বন্ধেই লেখা।

"কুজ্ঝটি জাল যেই সরে গেল মংপুর—
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রংপুর।
বহুকেলে যাদুকর খেলা বহুদিন তার
আর কোনো দায় নেই লেশ নেই চিন্তার
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর—
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এলো গেল ম'লো এরি মধ্যে
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে
কত মাথা কাটাকাটি সভ্যে অসভ্যে
কত মাথা ফাটাফাটি সনাতনে নব্যে।
ওই গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ওই ঢালু গিরিমালা রুক্ষ ও বন্ধ্যা
দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা
নিচে রেখা দেখা যায় ওই নদী তিস্তার—
কঠোরের স্বপনে ও মধুরের বিস্তার।
হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে
টানা পাখা চলা সেই সেকালের বিশ্বে—
রবি ঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর
আজ তো বয়স তার কেবল আটাত্তর
সাতের পিঠের কাছে এক ফোঁটা শূন্য
শত শত বরষের ওদের তারুণ্য!
ছোট আয়ু মানুষের তবু একি কাণ্ড
এটুকু সীমায় গড়া মনো-ব্রহ্মাণ্ড—

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত আরামকেদারা

কত সুখে দুখে গাঁথা ইষ্টে অনিষ্টে
সুন্দরে, কুৎসিতে তিক্তে ও মিষ্টে,
কত গৃহ উৎসবে কত সভা সজ্জায়
কত রসে মজ্জিত অস্থি ও মজ্জায়
ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলব্ধি
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তারা স্তব্ধি।"

*

রবীন্দ্রনাথকে একবার মাত্র দেখেছি কিন্তু তাঁর অজস্র সৃষ্টির সরোবরে অবগাহন ক'রে জীবন যে ধন্য হয়েছে, প্রবন্ধের শুরুতে সে কথা বলবার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু কত অক্ষম সে ভাষা। যা বলতে চেয়েছিলাম তার কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পেরেছি। প্রবন্ধের শেষে এসে বুঝতে পারছি, সেই লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে মনের গভীরে যা ছিল, তা—

"ভাষার নাগাল ছাড়া কত উপলব্ধি
ধেয়ানের মন্দিরে আছে তারা স্তব্ধি।"

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান কী জিনিস পেয়েছি, একথা কেউ যদি আমায় জিজ্ঞেস করেন, তাহলে যে যাই বলুক, আমি বলব—আমাদের বোবা মুখে তিনি ভাষা দিয়েছেন।

[এ প্রবন্ধ রচনায় জন্য শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ও ভূতপূর্ব ডিরেক্টর অব সিংকোনা শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি।]

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

(ক্রমশ)

বেতের চেয়ার

কেতকী সেন গৃহসজ্জাবিশারদ্। এটা বিশেষজ্ঞের যুগ। সব ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে গবেষণা করবার মত বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কেতকীর চাটাই, চিক, চট আর চাঁচাড়ি দিয়ে স্বল্পমূল্যের সৌন্দর্য ও যুগোপযোগী আসবাবের আলোচনা আমরা একবার করেছি। এবার তাঁর কাছে বেতের গৃহসজ্জার রূপ দেখে আবার আপনাদের জানাবার বাসনা হয়েছে।

এককালে বেতের চেয়ার টেবিলের আভিজাত্য ছিল বাগানে বা বারান্দায়। ঘরের মধ্যে সে অকুলীন। কিন্তু গৃহসজ্জাও ক্রমশ সাধারণের জন্য সেজে উঠছে। কাজেই চাই স্বল্পমূল্যের সামগ্রীর ব্যবহার, চাই আয়তনে এবং ওজনে হাল্‌কা। ইচ্ছামত সরানো সাজানো যেন যায়। যুগধর্মী আসবাব যদি বলি তবে বর্তমান যুগের Period Furniture হয়তো চিক চাঁচাড়ি বা বেত।

আসবাবের ইতিহাস আলোচনা করে দেখুন কবে কোথায় আর আমসাধারণ খাট-পালং পেয়েছে। সামান্য যা কিছু গৃহ-সজ্জার আদিমতম নিদর্শন মেলে তাতে মিসরের মানুষ যে কাঠের আসন বা এলিয়ে বসার আরাম-কেদারার কদর করতেন তার কিছু সমাধিতে মিলেছে। তবে সে তো ফেরাউনের ঐশ্বর্য। অপরূপ তার খচিত কারুকার্য, অদ্ভুত সব নকশা। সাধারণ মানুষ যদি বা আসবাব সামান্য ব্যবহার করতেন, তার কোন চিহ্ন আর পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে আসবাব ছিল বটে কিন্তু সেও সেই মানী ও বিত্তবানের ব্যবহারের জন্য। ইংলণ্ডের প্রথম আসবাব সরকারী-ভাবে কায়েম হয় রোমান বিজয়ের উত্তরকালে। মধ্যযুগে ভারী এবং নানা নকশায় খচিত অভিষেক সিংহাসন তৈরী হয়েছিল রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের জন্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এসব আসবাবের প্রথম পত্তন হয় ওক কাঠ দিয়ে। ক্রমে কাঠ ও ভিন্ন ভিন্ন রকম উপাদানের ব্যবহার হয়। একসময় মেহগনি কাঠ খুব আদরের হয়েছিল। তবু সবই ছিল অভিজাত ও বিশেষ মানুষের জন্য। চেয়ার শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ফরাসী "Chayre", "Cheyre" বা Cayre থেকে। মানে হচ্ছে seat of honour অর্থাৎ সম্মানের আসন। সম্পন্ন ঘরে সম্মানের আসনটি হতো গৃহ-

বেতের চেয়ার
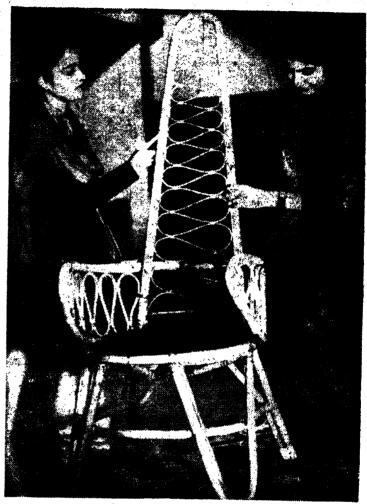
বেত সেট টেবিল সহ

কন্ডার। কাঠ ভিন্ন অন্যান্য আসবাব আধুনিককালের অবদান। অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম প্লেটকরা চেয়ার টেবিল পেটা লোহার গৃহসজ্জা ইত্যাদি কিছু জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু মূল্য তার সাধারণের নাগালের বাইরে। দড়ি বা নেয়ার আর বেত দিয়ে নানা ধরণের গৃহসজ্জার আয়োজন সর্বাধুনিক অথচ ঐতিহ্যের পাশ্বায় স্থান দিতে পারা যায়।

বেতের ডিভান বা চেয়ার টেবিল ইত্যাদি রং করে তার নূতন রূপ দিয়ে নূতনত্ব আনা যায়। যেভাবে ইচ্ছা একই আসবাব স্থানান্তরিত করা চলে। উপরে কোন ছোট গালিচা বা শতরঞ্চি বিছিয়ে দিলে আরামও কম হবে না। বেতের ফাঁক ফাঁক বোনা টেবিল দেখুন ছবিতে। ইচ্ছা হলে ঘন বুনট দিয়ে নিতে পারেন। ছোট বসবার ব্যবস্থায় এর সঙ্গে দুটি মোড়া বা চৌকি হলে চমৎকার চলে যায়। যেখানে আলাদা একটি বসবার ঘরের আয়োজন সম্ভব নয় সেখানে bed sitting অর্থাৎ শোবার বসবার ঘরে এককোণে ডিভান এবং বেতের চেয়ার অন্য দিকে দেওয়া যায়। ছবিতে যেরকম উঁচু পিঠদাঁড়া দেওয়া চেয়ার আছে, স্থানাভাব না থাকলে ঐরকম একটি দুটির

সঙ্গে খাবার জন্য ছোট টেবিল রাখা চলে। টেবিলটি দরকারের সময় যোগ করে নেওয়া যায়। যখন দরকার নেই এদিকে ওদিকে করে রাখলে ঘরে অন্য কাজে লাগতে পারে। প্লেতের সুবিধা হলো যে জলে-সাবানে যখন ইচ্ছা ধোওয়ার কোন অসুবিধা নেই। যতদিন স্বাভাবিক রং সুন্দর থাকে, রং করবার দরকার নেই। তবে আরশোলা থেকে সাবধান। একবার হলে আর রক্ষা নাই।

*

যাঁরা কুকুর বেড়াল পোষেন তাঁরা তো বটেই এবং সাধারণভাবে সকলেরই জলাতঙ্ক রোগের সম্বন্ধে কিছু জানা বাঞ্ছনীয়। রোগগ্রস্ত জন্তু থেকে মানুষের শরীরে বিষ যায়। সাধারণত কামড়ালেই সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। পথের কুকুর যদি যত্ন করে রাখা যায় তবেই রাখা উচিত। যত্নের বিশেষ অঙ্গ তাকে নিয়মিত জলাতঙ্ক প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া। তাতে তার সম্বন্ধে ভয় কমবে এবং বাড়িতে অন্যলোকের নিশ্চিন্ত থাকার উপায় হবে। জলাতঙ্ক সাংঘাতিক রোগ। পাঁচ হাজার বছর আগেও জলাতঙ্ক সম্বন্ধে সবাই খবর রাখতো। গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন অপারেশন দ্বারা ক্ষতস্থান থেকে জলাতঙ্কের বিষ নষ্ট করার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হতো না। সেটা করেছেন লুই পাস্তুর। ১৮৮৯ সালে তিনি টিকা আবিষ্কার করেন ও রোগগ্রস্ত জন্তুর দংশন হলে টিকা দিয়ে তার সংক্রমণ নিবারণ করে পরীক্ষা হয় ১৮৮৫ সালে। জলাতঙ্ক দংশনের দীর্ঘদিন পরও দেখা দিতে পারে। তবুও দংশনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব টিকা নেওয়া দরকার। আগে টিকার জন্য অনেক কষ্ট করে কসৌলি পাহাড়ে গিয়ে নিতে হতো। এখন জলাতঙ্কের টিকা সর্বত্র হয় এবং বিন্দুমাত্র সন্দেহ ক্ষেত্রে টিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতভাবে শ্রেয়ঃ।

টুকিটাকি

পথ চলবার সময় যদি বিমান আক্রমণ হয় এবং কাছাকাছি উপযুক্ত আশ্রয় না মেলে তবে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বেন। বুক যেন মাটি থেকে একটু উঠে থাকে। ভিজে মাটিতে ভয় করা থাকলে অসুবিধা নেই না। কান দুটি ও ঘাড় হাত দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

জিভ যাতে হঠাৎ কেটে না যায় সেজন্য বস্ত্রখণ্ড বা রবারের দুই পাটি দাঁতের মধ্যে চেপে রাখবেন।

যাঁদের বাড়িতে ছোট শিশু আছে তাঁরা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিছু হাতের কাছে রাখবেন। শীতকাল হলে গরম জামা ভুলবেন না।

জামাকাপড়ে আগুন ধরে গেলে মাটিতে গড়াগড়ি দেবেন। যদি দোকান উঁচু বাড়িতে আগুন ধরে তবে অগ্নিশিখা থেকে উদ্ধার করবার কাজ উপর থেকে নীচের দিকে করবেন। আক্রমণ আশঙ্কা হলে প্রত্যেক বাড়িতে বালির বস্তা, সঞ্চিত জল, হোজ পাইপ রাখবেন। কিছু শুকনো খাবার এবং পানীয় জল মজুদ রাখবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার সামান্য সরঞ্জাম সহজে মেলে যেন।

কানে দেবার তুলো এবং টর্চ, মোমবাতি কিছু সংগ্রহ করে রাখা দরকার।

প্রত্যেক রাত্রে অথবা বাইরে যাবার সময় যদি বাড়ি খালি থাকে তবে যেন সমস্ত আলো বন্ধ থাকে। সহজ দাহ্য পদার্থ সাবধানে রাখবেন এবং যত কম থাকে ততই ভাল।

ছোট ছেলেমেয়েকে একা রাখবেন না। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কারও তত্ত্বাবধান সর্বদা দরকার। বিমান আক্রমণের যদি কোন ভয় হয় কখনও তবে ছোটদের জন্য অপরিচিততর খেলনা, ছবির বই ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখবেন। ঘরে আবদ্ধ থাকতে যেন তারা আপত্তি না করে। মনে রাখবেন আগুন নেবাতে দরকার জল এবং বালি। গায়ে লাগলে কম্বল বা মোটা বস্তা। সবার উপর দরকার মনোবল এবং শান্ত বিচারবুদ্ধি।

শ্রীমতী

॥ উনচল্লিশ ॥

এই কাগজফেরি করার কাজে রবিবারটা ছিল আমার আকালের। সেদিন দুর্ভিক্ষপীড়িত দশায় কাটতে হত আমায়।

রবিবারের স্কুল কলেজ বন্ধ সেদিন। ...-ভাইদের কারোই দর্শন নেই। তাই ...দিনের মত ইস্কুল-কলেজ শুরুর আগে ...ধ ঘণ্টার ফাঁকেই পাঁচশো কাগজ কেটে ...র কোনো অর্থোদয় যোগ ছিল না ...দিন।

...েশনের কিনারে দাঁড়িয়ে হেসারেংউল্লা ...র মতন রাজত্ব করার কোনো মানে ছিল ...সেদিন। চারধারই সেদিন খাঁ খাঁ।

রবিবার তাই অল্প কাগজ আনতাম, ...শকের বেশি নয় কখনই। কিন্তু তাই ...েই হিমসিম খেতে হত আমায়।

সেদিন তাই চলে যেতাম সিনেমা-...য়। হাতিবাগানের এলাকায়। সিনেমা ...সের সামনেই যা কাগজ বেচার জো ছিল ...বার।

আমার সেই দেড় শো কাগজ কাটাতেই ...মার তিনটে শো লাগত। তিনটে, ছ'টা, ...য় গিয়ে খতম হত যত কাগজ।

তিনটের শো শুরুর আগেই দাঁড়াতাম ... হাউসের সামনে। গোড়াতেই নিজের ...না চার আনা দামের ফোর্থ ক্লাস ...ট কিনে রাখতাম। তারপর আমার ... বেচবার পালা।

...হার আর ওষুধ সেদিন এক যোগেই ...: সিনেমা দেখা আর কাগজবেচা— ...থার মেলায় গিয়ে কলা দেখানোর ...কে টেক্কা দিয়ে।

...কালে ঐ হাউসগুলির নাম ছিল বুঝি ...য়ালস থিয়েটার আর ক্রাউন সিনেমা, ...ন্সে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়ে এখন যা উত্তরা আর শ্রী-তে দাঁড়িয়েছে।

...পুর গড়িয়ে বিকেল সন্ধ্যের দিকে খবর কাগজের ঝোঁক থাকার কথা নয়, ...র পড়ুয়াদের সেই প্রাত সকালেই ...পড়ে দুনিয়ার সব খবর জেনে

কাগজ কিনেই তীর বেগে হাউসের ভেতর সেঁধোচ্ছে

নেওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া, সিনেমা হলের অন্ধকারে বসে কাগজ পড়াও যায় না। সেখানে ছবি দেখতেই যাওয়া, কাগজ পড়তে নয়—তা হলেও তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে আকস্মিক কাগজ কেনার ধুম পড়ে যেত—আর কাগজের গাদা খতম হত আমার তখনই। ছুইকোড় পাঠকদের তাগাদায়।

দেখতাম যারা খানিক আগেও আমার কাগজের আবেদনে কর্ণপাত করেনি, অবহেলায় নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আমার দিকে, সিনেমা শুরু হবার একটু বাদেই তারাই আবার হাউসের থেকে ক্ষিপ্তভাবে বেরুচ্ছে—কে যেন ধরে ধরে সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত করছে তাদের।—আর চট করে আমার কাছ থেকে কিছু বাছবিচার না করেই দু পয়সার যে কোনো একটা কাগজ কিনেই না তীর বেগে ফের হাউসের ভেতর ফিরে যাচ্ছে।

সিনেমার টিকিট পকেটে রেখেও তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে কাগজ বেচে চলেছি।

সিনেমার আসল বই, (বেশির ভাগই সিরিয়াল ছবি ছিল সেকালে, পার্ট বাই পার্ট দেখানো হত হপ্তায় হপ্তায়)। শুরু হবার গোড়ায় বিদেশী নিউজ রীল কি দু রীলের কমিক ছবি কিছু দেখানো হত তখন—তারপর মিনিট পনের বাদেই আরম্ভ হত আসল বইটা। তার পর কাউকে আর তীর বেগে বাহির হতে দেখা যেত না, আমিও তখন হলের ভেতরে ঢুকে একটা জায়গা দখল করে বসতাম।

বেশির ভাগ কাগজ তিনটে ছটায় কাটত, বাকী যা থাকত তা নটার শো শুরু হবার পরই শেষ হয়ে যেত—শুধু একটা বাদে। সেই একখানা কাগজ আমি কিছুতেই বেচতাম না, তিন গুণ দাম দিলেও নয়। সেটা আমার নিজের কাজেই লাগত।

সিনেমা হলের বিশেষ করে চার আনার সিটে যা ছারপোকাদের গুলজারি তখন! মহামারি কাণ্ড বাধত যেন। তখন এক গণ্ডার ছাড়া এক দণ্ড বসে থাকে সাধ্য কার! সিনেমা হল অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথে আমার গণ্ডা গণ্ডা কাগজ মুহূর্তের মধ্যে ফরসা হয়ে যেত।

ভেবে দেখলে এ দেশে সংবাদপত্র-প্রচারে, আর এই সূত্রে শিক্ষার প্রসারেও, ছারপোকার অবদান নেহাত কম নয়। এমনকি আমি রিকশাওয়ালাকেও বাংলা কাগজ কিনতে দেখেছি, বাংলার ব-বোঝারও যার ক্ষমতা ছিল না। এইভাবে আমি কীর্তিমান জ্যোতিষবাবুর ঢের আগেই লোকসমাজে বাংলা ভাষার বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছি বলতে পারি। ৫

আর, সত্যি বলতে আমার জীবনে ছারপোকার পৃষ্ঠপোষকতা কিছু কম ছিল না। কেবল যে তারা প্রথম জীবনেই দাঁড় করিয়েছে তাই নয়, সারা জীবন ধরেই আমায় খাড়া রেখেছে...বরাত খারাপ হতে দেয়নি কখনো। যেমন কাগজ কাটাতে তেমনি অবাঞ্ছিত অনাহূত আমার আত্মীয়-সংকটের ফাঁড়া কাটিয়ে দিতেও তাদের

জোড় নেই আমি বলব। ছারপোকারা এবং এই ছার জীবনের অঙ্গীভূত যে কেউ আমাকে কখনই নচ্ছার বলতে পারে না। তেমন কটূক্তি কেউ করলে তা আমি অত্যুক্তি বলেই উড়িয়ে দেব।

রবিবারটায় একশো সোয়া শো কাগজ বেচে যা পেতাম তার লভ্য কমিশনের ষোল আনাই তিনটে সিনেমার শো আর চিনে-বাদামেই ফুঁকে যেত। শো দেখা আর শোয়া ছাড়া কোনো ধান্দা ছিল না। রাজেন মল্লিকের বাড়ি দুপুরেই সেই যা খেয়েছি, বিকেলের দিকে তারা আর খাওয়ায় না। আর, সেদিন শোয়ার জন্য ঠনঠনের সেই আমার বেলওয়ালীর চত্বরে গিয়ে হাজিরা দেওয়ারও কোনো গরজ নেইকো।

এখনকার কালে সপ্তাহে কাগজ বেরোয় মাত্র ছ'দিন। রবিবার ছুটি থাকত খবর কাগজের কার্যালয়ে তাই সোমবারটা কোনো কাগজ বেরুত না একদম। কাজেই সে রাত্তিরে ভোর চারটেয় উঠে কাগজের লাইনে গিয়ে খাড়া হবার কোনো তাড়া ছিল না। চারটে পাঁচটা ছ'টা পার করে সাত সকালে উঠলেও চলত সেদিন।

রাত্তিরে সেদিন হরিমটর। হরিনাম বলেই মটর-আস্বাদ। এক পেট খিদে নিয়ে উদরে হেঁটে শোবার জন্যে সেই কালী-বাড়িতে সেদিন কে যায়? চতুর্থ প্রহরে সাধ করে নিজের সাধের ঘুমটি ভাঙাতে যাবে কে? সেই ঘটঘটি ভোরে সজাগ হবার কোনো দায়ই ছিল না আমার সেদিন। মা কালীও সেদিন আমার অতি ভক্তির প্রাতঃপ্রণাম আদায় করতে পারতেন না!

পয়সা চারেকের চানাচুর চিবিয়ে সিনেমা হলের কাছে পিঠে ফুটপাথের ওপর কোথাও তখন গড়িয়ে পড়লেই হল আমার।

অনেককে দেখেছি রাস্তায় শুতে হলেও শোবার আগে চারধারের ধুলোবালি সব ঝেড়ে ঝুড়ে নেয়, হয়ত গায়ের ওড়না দিয়ে ঝাঁটাতে গিয়ে সেটাকেই ময়লা করে বসে রাস্তা সাফ করার প্রেরণায়। কিন্তু তার কি কোনো মানে হয়? সমুদ্রে শয্যা পাততে গিয়ে শিশিরবিন্দুতে সন্তাপ? হাজার ঝাঁটিয়েও কলকাতার রাস্তাকে কখনো পরিষ্কার করতে পারে কেউ?

রাস্তায় শুলে ধুলোকে ত ধূলিজ্ঞান করাই উচিত। দুনিয়ার আবর্জনা কি কেউ কখনো সম্মার্জনায় শেষ করতে পারে? এক জায়গার দুঃখ আরেক জায়গায় জমা করে কেবল।

না, আমার ওসব ঝামেলা পোষায় না। পড়ে বসলাম কি পড়লাম, আর, পড়লাম কি ঘুমোলাম।

বেশ ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময় কে যেন এসে ঠেলে তুলল আমাকে: এই! এই! এখানে ঘুমিয়ে কে?

ঠেলা খেয়ে উঠে বলতে হল—আমি!

ছোটলোকদের সঙ্গে রাস্তায় শোয় নাকি?'

নিদ্রাভঙ্গের স্বরে জবাব দিয়েছি। 'আমি! আমি তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখানে শুয়ে কেন?' ভদ্রলোক শুধান।

'কোথায় শোবো তা হলে?' চোখ মুছতে মুছতে বলি।

'ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোকদের সঙ্গে রাস্তায় শোয় নাকি? ওঠো ওঠো। এসো আমার সঙ্গে।'

ঘুমিয়ে ছিলাম বেশ ছিলাম। ঠেলার চোটে ঘুম ভাঙার পর এখন পেটের খবর টের পাওয়াচ্ছিল। খিদের চোটে অস্থির হয়ে উঠতে হল।

সামনে সমানে দুর্ভিক্ষ। কাল দুপুরে মল্লিক বাড়ির সেই অন্নছত্রে। তার আগে কোথাও কিচ্ছুটি নেই।

কাগজও পাচ্ছিনে কাল সকালে যে তাই বেচে কিছু নগদ পাব, কিনে খাবটাব তখন।

এই নিরন্ন মুহূর্তে এই ভদ্রলোক ঈশ্বর প্রেরিত দেবদূতের মতই এসে যেন দেখা দিলেন! পিছু পিছু যেতে যেতে ভাবি। ওঁর বাড়িতে বোধ হয় ঠাঁই হবে আজ আমার। খাওয়াবেন তো বটেই, কোনো কাজও দেবেন নিশ্চয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে কারো কারো বাড়িতে থাকা-খাওয়ার কাজ পাওয়া যায় কলকাতায়। পড়ুয়া ছেলেরাই পেয়ে থাকে, সেই হকার ছেলেটি জানিয়েছিল আমাকে। তেমনি একটা কাজ হয়ত আমার জুটে যাবে এঁর কৃপায়। তাই যদি পাই তো বর্তে যাই—বেশ হয় তা হলে। কাগজ বেচার ওপর এই উপরি-পাওনাটা হলে মন্দ কি? তা হলে আর আমায় কি সোমবার এই উপোস পোয়াতে হয় না। পোষ মাস এসে যায় নগদ। খুলে যায় আমার বরাত—কেটে যায় ধরাশায়ী হবার রাত।

ভদ্রলোকের পিছনে ভাবতে ভাবতে চলেছি আমি। আর কিছু না হোক, আজ রাত্তিরের মত খাওয়া থাকার ব্যবস্থাটা তো হবে।

কদ্দুরে চলেছেন ভদ্রলোক? চলেছেন তো চলেছেনই যে! খিদে পেটে কি হাঁটতে ভাল্লো লাগে কারু?

হেঁটে হেঁটে বিডন স্ট্রীট মোড়ের চৌমাথা পার হলাম আমরা।—'এটা হেদো। জানো তো?'

'জানি বইকি।' ঘাড় নাড়লাম আমার। হেদো জানব না? এই এলাকায় আমার রাজত্ব! রোজ সকালে রাজ্যের খবর কাগজ বগলে আমার বিরাজত্ব এইখানেই।

হেদোর প্রথম গেটের পাশ দিয়ে যেতে তিনি বললেন—এটা দেখছি বন্ধ।

তারপর মাঝখানের মেইন গেটের মাঝামাঝি গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

'ওমা! এখানেও যে তালা মেরে দিয়েছে দেখছি!'

তাঁর এই বেতালা কথায় কোনো তাল পাওয়া যায় না।

'রাত্তিরে পার্কটা বন্ধ করে দেয় বুঝি?' এমনি শুধোই।

'হ্যাঁ। যত গুণ্ডা বদমাসরা ভেতরে গিয়ে গুলতানি করে কিনা। জটলা পাকায় রাতভোর। পার্কগুলো রাত্রে তাই বন্ধ করে রাখে।'

'ও!'

'যাক, লাফিয়েই যেতে হবে তা হলে। কী আর করা যাবে?' অগত্যার মতন তিনি কন—'লাফাতে পারবে তো?'

আমি ইতস্তত করি। এই ক্ষুধিত ক্লান্ত দেহে আপাদমস্তক ঘুম নিয়ে লাফিয়ে ওই রেলিং পেরুতে হবে? হাই জাম্পের কসরতে কোনদিনই আমি পোক্ত ছিলাম না, হ্যাঁ, সতীশ হলে পারত বটে অনায়াসেই। স্পোর্টস-এ সে প্রায় অদ্বিতীয়। এক হাই জাম্প-এই ঐ রেলিং পার হওয়া তার পক্ষে কিছু না!

'ডিঙিয়ে যেতে পারি।' আমি বলি—'ডিঙবো কেন বলুন তো?'

তার জবাব না দিয়ে তিনি বলেন—'তা হলে ডিঙোও। ওঠো তা হলে।'

রেলিং ধরে উঠি।

'ধরতে হবে? ধরব তোমায়? ধরে নামিয়ে দেব ওধারে?'

'না না, ধরতে হবে না আপনাকে।' বলা হবার আগেই আমি নিজেকে উধাও করেছি। খাড়া হয়েছি রেলিং-এর মাথায়।

'বেশ! আর কী? লাফিয়ে পড় এবার। বেশ এবার, সামনেই ঐ বেঞ্চি দেখছ তো সব দীঘিটার চার ধারেই রয়েছে। সকালে বিকেলে হাওয়া খেতে এসে বসে এখেনে লোকেরা। এখন সব ফাঁকা। ওর একটায় গিয়ে শুয়ে পড় স্বচ্ছন্দে। নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কেউ কিচ্ছুটি বলবে না।'

বলে আর দ্বিরুক্তি না করে তিনি নিজের পথ ধরেছেন। দেখতে না দেখতে নিরুদ্দেশ।

আমিও আর কী করব? রাত্রের আহার অনুসন্ধানের দুরাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে খিদে তেষ্টা মেটাতে সিধে হেদোর ঘাটে গিয়ে অঞ্জলি ভরে জল খেলাম। এক পেট জল ঠেসে এক পিঠ বেঞ্চির তক্তায় গড়িয়ে পড়লাম এসে। নিমেষের মধ্যে আমিও নিরুদ্দেশ!

(ক্রমশ)

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ১৪ ॥

বহু রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়ার পর পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন হলো। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান যে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে একদিন 'ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুকুর' বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনিই পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গদিতে বসলেন। আর এম এ জিন্নার মুসলীম লীগ ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করলো। পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিটের ক্ষমতা থেকেও মুসলীম লীগ এর আগেই বিতাড়িত হয়েছে। পাকিস্তান অর্জিত হবার মাত্র দশ বছরের মধ্যেই ধর্মীয় জিগিরের ভিত্তিতে গঠিত মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠান জনসমর্থন হীন অবস্থায় মৃতপ্রায় হয়ে উঠলো। পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কিছু সংখ্যক মুসলীম লীগ নেতা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার রিপাবলিকান পার্টির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিলেন। অনেকের মতে মুসলীম লীগ হচ্ছে ধর্মীয় নেতা ও ভূস্বামী সামন্ত-প্রভুদের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় রাতারাতি গজিয়ে ওঠা শিল্পপতি-ব্যবসায়ীর দল মুসলীম লীগের নেতৃত্ব দখলে ব্যর্থ হয়ে ইস্কান্দার মীর্জাকে শিখণ্ডী হিসেবে দাঁড় করিয়ে মার্কিনী অনুগ্রহ-পুষ্ট এই রিপাবলিকান পার্টি গড়ে তোলে। এঁদের বিশ্বাস ছিলো, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে যখন আওয়ামী লীগের মাত্র তেরো জন সদস্য রয়েছে, তখন রিপাবলিকান পারটির সমর্থনের উপর ভিত্তিশীল সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে পীড়নক হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কতটা সম্ভব হয়েছিলো, ইতিহাসই তার বিচার করবে।

প্রধানমন্ত্রীর আসনে উপবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। অথচ মাস কয়েক আগেও এই সব সংবাদপত্র সোহরাওয়ার্দীকে 'ভারতীয় এজেন্ট' 'যুক্ত বাংলার প্রবক্তা' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হিসেবে সমালোচনা করেছে। কিন্তু যেই মুহূর্তে সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হলেন, সেই মুহূর্ত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলোর সুর একেবারে পালটে গেলো। করাচীর ইংরেজী পত্রিকা 'ডন' তার প্রধান সম্পাদকীয় স্তম্ভে সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্ঠা ও দেশপ্রেমিক বলে উল্লেখ করলো। আর শুরু হলো চারদিক থেকে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন জানানোর পালা। বিরাট ডামাডোলের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর মতো ঝানু রাজনীতিবিদও খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন বই কী।

পাকিস্তানের রাজনীতির সবচেয়ে সাফল্য-জনক বিরোধী দলীয় পার্লামেণ্টারী রাজ-নৈতিক নেতা ক্ষমতাসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে সবার অজান্তেই ধীরে ধীরে প্রাসাদ চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়লেন। প্রধান-মন্ত্রী হয়েই জনাব সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন 'পূর্ববর্তী সরকার যখন এক ইউনিট কার্যকরী করেছেন, তখন ব্যাপারটা কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত হতে দোষটা কী?' পরোক্ষভাবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে গণ-বিরোধী এক ইউনিটের প্রতি সমর্থন দান করলেন। ক্ষমতাসীন অংগদল রিপাবলিকান পার্টিকে সন্তুষ্ট করতে যেয়ে প্রধানমন্ত্রী পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী ছাড়াও পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল মহলের বিরাগভাজন হলেন। এমন কী আওয়ামী লীগের মধ্যেও দ্বিমত দেখা দিলো। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রকাশ্যেই এর বিরোধিতা করলেন। সীমান্তের আব্দুল গফফর খান ও বেলুচি-স্থানের আব্দুস সামাদ আচাকজাই-এর মতো এক ইউনিট বিরোধী নেতাদের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর কার্যকরী যোগসূত্র গঠিত হলো।

এদিকে জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র সফর করে এলেন। তিনি বগুড়ার মোহম্মদ আলী স্বাক্ষরিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ছাড়াও 'সিয়াটো' ও 'বাগদাদ প্যাক্ট'-এর (পরবর্তীকালে সেণ্টো চুক্তি)

হতো [illegible] চুক্তির সমর্থনে প্রকাশ্যে বিবৃতিদান করলেন। ফলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো সোহরাওয়ার্দীর জয়গানে মুখরিত হলো। কিন্তু পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা যেন কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হলো। ছাত্র-সমাজ দ্রুত প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শে সোহরাওয়ার্দী সাহেব পূর্ব বাংলা সফরে এসে হেলিকপ্টারে কাগমারীতে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করতে দৌড়ালেন। সেদিন এই দুই নেতার মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিলো তা সবার অজানাই রয়ে গেলো।

কাগমারী থেকে প্রত্যাবর্তন প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ছাত্রাবাস মুসলীম হলে অবতীর্ণ হলেন। প্রশ্নোত্তরের সভায় তিনি অজস্র সম্মুখীন হলেন। ধীর-স্থিরভাবে পুরের সন্তান হোসেন শহীদ সোহ সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দিলেন।

প্রাচ্যের একটা প্রশ্নের জবাবে মসুদ হেজেছিলেন, 'জিরো প্লাস, জিরো প্লাস, জিরো প্লাস জিরো হচ্ছে জিরো, সেক্ষেত্রে আপনারাই বিচার করে দেখুন পাকিস্তানের কর্তব্য।'

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে গণচীনের সঙ্গে পাকিস্তানের কার্যকরী যোগসূত্র স্থাপন। এটা এমন একটা সময় ছিলো, যখন মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে এবং গণচীনের সরকার 'মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের লেলিয়ে দেয়া কুকুর বলে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের সাথে এক নিঃশ্বাসে পাকিস্তান সরকারের নাম উচ্চারণ করছে। তবুও প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চীন সফরে গমন করলেন। তিনি বার বার বললেন, "পাকিস্তান সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তির সদস্য-রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও মহান প্রতিবেশী গণচীনের সংগে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী। বিভিন্ন প্রতিরক্ষা চুক্তি পাক-চীন বন্ধুত্বের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।" গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা এবং জনগণের অভিব্যক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে চৌ এন লাই ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের শেষার্ধে ও ১৯৫৭ সালের জানুয়ারীর প্রথমার্ধে পাকিস্তান সফরে হাজির হলেন।

পূর্ব বাংলার আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আমন্ত্রিত অতিথি চৌ এন লাইয়ের সম্বর্ধনার আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পশ্চিম পাকিস্তান সফরের পর চীনা প্রধানমন্ত্রী যখন পূর্ব বাংলায় এসে হাজির হলেন, তখন ঢাকা এক উৎসব মুখরিত নগরীতে পরিণত হয়েছে।

তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে ঢাকা শহর পর্যন্ত পুরো তিন মাইল এলাকায় লাখ লাখ বাঙ্গালী সেদিন তাঁদের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানালো। কেননা বাঙ্গালী মাত্রই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনের সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন, চীনা জনসাধারণের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন শেখ মুজিবুর রহমান ও মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে সঙ্গে করে নারায়ণগঞ্জের শীতলাক্ষ্যা নদীতে অতিথি চৌ এন লাই-এর সঙ্গে নৌ-বিহারের জন্য 'মৈত্রী জাহাজে' মিলিত হলেন, তখন নদীর উভয় তীরে অনেক লাখ নরনারী বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব রসিকতা করে বললেন, "মাননীয় অতিথি আপনি বাঙ্গালীদের মধ্যে যেরকম জনপ্রিয় দেখছি, তাতে এখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আপনার হাতে আমার পরাজয় সুনিশ্চিত।" সেদিন চীনা প্রধানমন্ত্রী কথা কটা শুনে চমকে উঠেছিলেন। আর বাইরে নদীর দুই তীরে উদ্বেল জনতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "নিজের জনতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখাটাই সবচেয়ে বড় কথা।" জটিল অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী সাহেব যা করতে পারেননি তাঁরই উত্তরসূরী শেখ মুজিবুর রহমানকে দিয়ে তা সম্ভব হয়েছে। তিনি এখন বাংলার নয়নমণি— সাড়ে সাত কোটী আদম-সন্তানের মণি-কোঠায় সযত্নে রক্ষিত রত্ন—তিনি বঙ্গবন্ধু। কিন্তু মহাচীনের সেদিনের সরকার তো আজও গদিনশীন রয়েছে—সেদিনের চৌ এন লাই তো এখনও প্রধানমন্ত্রী। তবুও কোথায় যেন একটা বিরাট ছন্দ-পতন ঘটে রয়েছে। এর কী সংশোধন হবে না?

সোহরাওয়ার্দী সাহেব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে বেশ কিছুদিন পরে উপলব্ধি করলেন, নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে হবে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিধি বাড়াতে হবে। বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকাকালীন আওয়ামী লীগ এই ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ মন্ত্রী আবুল মনসুর আহম্মদ হাজির হলেন নয়াদিল্লীর বুকে। সঙ্গে তাঁদের সুন্দরবনের এক হাড়ি মধু। বিমানবন্দরে নেমেই জনাব আহম্মদ ঘোষণা করলেন "দুই দেশের সম্পর্ক মধুময় করাটাই এই সফরের উদ্দেশ্য আর তারই প্রতীক হিসেবে এই মধু আনা হয়েছে।"

পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের আঁতে ঘা পড়লো। তাঁরা দারুণভাবে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। এতোদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলাকে বাজার হিসেবে তাঁরা যেভাবে ব্যবহার করে এসেছেন, তার পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে দেখে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক-চক্র প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠলো। সেখানকার সংবাদপত্রগুলো আবুল মনসুর ও শেখ মুজিবের ভারত সফরের তীব্র সমালোচনা করলো। শুধু তাই-ই নয়, এরা পরিষ্কার ভাষায় লিখলো, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাক-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিধি বাড়ানো অসম্ভব। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান সরকারের গতানুগতিক ধারায় কাশ্মীর সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়ে অনেক কষ্টে গদি ঠিক রাখলেন। আবুল মনসুর ও শেখ মুজিবের দিল্লী সফর সংক্রান্ত রিপোর্ট ফাইল-চাপা পড়লো।

ঠিক এমনি এক সময়ে ১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্বীয় গ্রাম টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলেন। আজকের চরম বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া-সমর্থক ওয়ালী আহাদ পর্যন্ত সবাই তখন আওয়ামী লীগের সদস্য। এঁদের চাপে পড়েই মওলানা ভাসানী পার্টীর পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত প্রশ্নটি আলোচ্য বিষয় করে এই কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলেন। সবার অলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হবার বীজ তখন বিরাট মহীরুহ আকার ধারণ করে বসে আছে। (ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নে নয় দফা সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য আগেই ষোল দফা কর্মসূচী তৈরী হয়েছিল; কিন্তু দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার অবনতিই বেশি হয়েছে। কলকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলা ছাড়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ একটি অনগ্রসর রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রধান কর্মসূচী হল হলদিয়া বন্দরের কাজ সম্পূর্ণ করা এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিল্পোন্নয়ন যাতে দ্রুত হয় তার ব্যবস্থা করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের জন্য নয় দফা সুবিধা দানের কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। এই সুবিধাগুলি হল : (১) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় শিল্পের উৎপাদন ক্রয়, (২) রাজস্ব হ্রাস দ্বারা সহায়তা, (৩) জমি ইজারার ব্যাপারে সুবিধাদান, (৪) সম্ভাব্যতা নিরূপণের ব্যাপারে অনুসন্ধান বাবদ খরচের অংশ বহন, (৫) বিদ্যুৎ ব্যবহার ও বাসস্থান প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা, (৬) ঋণদান, (৭) জল ব্যবহার বাবদ কর হতে অব্যাহতি, (৮) কাঁচামাল আমদানির ব্যাপারে ব্যাঙ্কের নিকট জামিনদান, এবং (৯) অনগ্রসর এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার (Industrial Development Bank of India) পরিকল্পনা অনুযায়ী ঋণ দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প মূলধন সরবরাহ কর্পোরেশনকে (State Finance Corporation of West Bengal) সাহায্যদান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, এই উৎসাহদান কর্মসূচী চালু হলেই যে সব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা রয়েছে সেখানে সরকার পণ্য-কর (octroi) ব্যাপারে এবং মূল্যের ব্যাপারে শতকরা পনেরো ভাগ অগ্রাধিকার দেবেন। আরও বলা হয়েছে, উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় অঞ্চলেই যে-সব চালু শিল্প রয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নতুন প্রকল্প গ্রহণ করবে অথবা যাদের ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭২-এর মধ্যে প্রকৃত সম্প্রসারণ ঘটবে তাদের আর্থিক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ শিল্প মূলধন সরবরাহ কর্পোরেশনের কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত হলে এবং বৎসরে তাদের বিক্রয়কর (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য) এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে হলে, তাদের বিনা জামিনে এবং বিনা সুদে ধার দেওয়া হবে। কোন নতুন প্রতিষ্ঠান বা প্রকৃতপক্ষে সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্ঠান ১লা এপ্রিল, ১৯৭০ তারিখে বা তার পর কোনও নতুন কাঁচামাল বা মূলধন যন্ত্রপাতির উপর

পণ্য প্রবেশ কর (octroi) দিয়ে থাকলে তা ফেরত দেওয়া হবে। এই সুযোগ পাঁচ বৎসরের জন্য বহাল থাকবে। অনগ্রসর এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্পে সস্তা হারে আর্থিক সুবিধাদানের জন্য ভারতের শিল্প-ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India) ওই এলাকাগুলিতে ঋণদানের যে ব্যবস্থাদি করেছে তার মাধ্যমে কুড়ি লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ফিন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনে শতকরা ১ টাকা হারে সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছেন।

শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছেন সেগুলি আরও আগেই করা উচিত ছিল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি (Labour intensive technique of Production) গ্রহণ করা দরকার যাতে সেগুলিতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য হলদিয়া বন্দরের কাজ দ্রুত সমাধা করা, শ্রম-নিবিড় উৎপাদন বা শ্রমিকদের দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করা, গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতুর কাজ দ্রুত আরম্ভ করে দ্রুত সম্পন্ন করা (কারণ, হিসাব করে দেখা গেছে গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণকালে ২০০০ ইঞ্জিনিয়ার ও ৮০০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং তাদের কার্যকাল থাকবে চার বছর), কলকাতা মহানগরীতে পাতাল-রেল নির্মাণের কাজ দ্রুত সমাধা করা, উত্তরবঙ্গের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নে ঠিকভাবে কাজে লাগানো, বন্ধ কারখানাগুলি সরকারের নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া এবং শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আরও উন্নত করা। এই ব্যবস্থাগুলি তাড়াতাড়ি গৃহীত না হলে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের কোন আশা নেই।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত দুর্মূল্য ভাতা

জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ব্যবস্থায় প্রতি বছর ৪০ কোটি টাকা করে সরকারের খরচ বাড়বে এবং চলতি আর্থিক বছরের অবশিষ্ট মাসগুলিতে (সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ করে) ২০ কোটি টাকা খরচ হবে। খবরটি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের পক্ষে শুভ। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে শুভ হবে কি না তা-ই বিচার্য। প্রথমত জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় এই ভাতা বাড়ানো হয়েছে; কিন্তু এই ভাতা বেড়ে যাওয়ায় জিনিসপত্রের দাম আরও ঊর্ধমুখী হবে। যে ৪০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত খরচ করবেন, তার বিনিময়ে উৎপাদন বাড়বে না। এই অর্থ খরচ

করা হয়ে ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক হিসাব থাকে—বিনিয়োগের হিসাব অনুযায়ী মূল্য-সূচক তা-ই নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণ এই সুবিধা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজ্য সরকারগুলির কর্মচারিগণও অনুরূপ বর্ধিত ভাতা দাবী করতে পারেন এবং সেই দাবি মেটাবার ক্ষমতা অধিকাংশ রাজ্য সরকারের নেই। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে ওভারড্র্যাফট নিয়ে বসে আছেন। গত অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকারগুলির অর্থমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়েছিল তাতেই বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার কর্মচারীদের বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দেন তবে তার চাপ এসে পড়ে রাজ্য সরকারের উপর। তখন রাজ্য সরকারগুলির এমন ক্ষমতা নেই যে, অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করে সেই দাবি মেটানো যায়। রাজ্য সরকারগুলির কর ধার্যের ক্ষমতা সীমিত; নতুন নোট ছেপে ঘাটতি দূর করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার অসুবিধা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদেরই হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের পথে এক পা পিছিয়ে এসেছেন। বরং যাতে দুর্মূল্য ভাতা দিতে না হয় এবং জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী থেকে অধোমুখী করা যায় সেই চেষ্টা আরও জোরদার করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারিগণও এই ব্যবস্থায় যে চূড়ান্ত পর্যায়ে লাভবান হবেন তা নয়। যে কয়টি টাকা তাঁরা দুর্মূল্য ভাতা হিসাবে বেশি পাবেন তা খরচ হয়ে যাবে বেশি দাম দিয়ে জিনিস কেনার জন্য। অথচ তাঁদের জন্য এই কিঞ্চিৎ সুবিধা দেওয়ার অর্থ হল সাধারণ গরীব মানুষদের কাছে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া। রাজ্য সরকারগুলি এখন কি করবেন? বেসরকারী বাণিজ্য সংস্থাগুলিই বা এখন কি করবেন? তাঁরাও কি এখন তাঁদের কর্মচারীদের দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী গতিকে সুদৃঢ় করবেন? তার চেয়ে যদি সরকার দ্রব্যমূল্য হ্রাস করার জন্য একটি জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ করতেন, উৎপাদনের হার আরও বাড়াবার চেষ্টা করতেন এবং সাময়িকভাবে দুর্মূল্য ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া বন্ধ রাখতেন তবে হয়ত দেশের সাধারণ মানুষের উপকার আরও বেশি হত। তবুও এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের নিজস্ব কর্মচারীদের মুদ্রাস্ফীতিজনিত অসুবিধার কথা চিন্তা করেছেন; কিন্তু এই দাক্ষিণ্য যদি দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি সম্প্রসারিত হত, তবে আনন্দ আরও বেশি হত।

সুব্রত গুপ্ত

ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস-এর প্রেক্ষাগৃহে একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ভাস্কর শিল্পী মাধব ভট্টাচার্য, বিপিন গোস্বামী, শঙ্কর ঘোষ, শর্বরী রায় চৌধুরী, উমা সিদ্ধান্ত ও সমরেশ চৌধুরীর মোট ১৬টি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়। এগুলি, কাঠ, প্লাস্টার অব প্যারিস, লোহা ও তামার পাত, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি মিশ্র মাধ্যমে তৈরি।

যাঁরা এই প্রেক্ষাগৃহে পাঁচ মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত আমেরিকার ছোট ভাস্কর্য প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, এই প্রদর্শনীর নিদর্শনগুলিতেও, বিশেষ করে আকারের দিক থেকে, এবং কয়েক ক্ষেত্রে গঠনরীতি বিষয়েও, সেই প্রদর্শনীর বিশেষ প্রভাব পড়েছে। প্রদর্শনীটি পরিচ্ছন্ন এবং নিদর্শনগুলি যে সুনির্বাচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খোলা জায়গায় রাখার মত বৃহৎ ভাস্কর্যকর্মের চাহিদা সব সময়ে আমাদের দেশে থাকে না। তা ছাড়া ও জাতীয় নিদর্শন প্রদর্শনী-স্থানে পাঠানোও ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং যুগের চাহিদা অনুযায়ী যে ছোট ছোট ভাস্কর্য-কর্মের ওপর সকলে প্রাধান্য দেবেন, তা হবে স্বাভাবিক। আর একটি সুবিধা, এগুলি গৃহসজ্জার উপযোগী। প্রদর্শনীর অধিকাংশ নিদর্শনই বিমূর্ত ও প্রতীকধর্মী, এবং তাদের মধ্য দিয়ে সমকালীন চিন্তাধারা ও গঠনপদ্ধতির পরিচয় মেলে। এখানে ঢালাইয়ের চেয়ে খোদাই ও কম্পোজিশনের সংখ্যাই অধিক। প্রথমেই চোখে পড়ে শর্বরী রায়চৌধুরীর দুটি নিদর্শন। বড়ে গোলাম আলি খাঁর হেড অর্থাৎ মুখমণ্ডল ভাস্কর্য-কর্মের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই ছোট ব্রঞ্জের কাজটির মধ্য দিয়ে ভাস্কর কেবল [illegible] সঙ্গীতশিল্পীর মুখমণ্ডলের অবিকল রূপ ফুটিয়ে তোলেন নি, উপরন্তু এটিতে তাঁর আলাপরত বিশেষ ভঙ্গীমা, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে। পরিকল্পনা ও সংস্থাপনার দিক থেকে সরল আয়তক্ষেত্র প্রধান অ্যানিম্যাল উল্লেখ্য। মাধব ভট্টাচার্যের কাজে আমেরিকার সম-কালীন চিন্তাধারা ও গঠনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। নরম কাঠ খোদাই করে তিনি বড় নানা আকারের বিভিন্ন বস্তু সুসম্বন্ধ-ভাবে রেখে বিমূর্ত ও প্রতীকমূলক কয়েকটি আকার সৃষ্টি করেছেন ও প্রয়োজনমত ছোট আকার সৃষ্টি করেছেন। একটি, গতিসম্পন্ন (mobile) পরিকল্পনার দিক থেকে এটি আধুনিক। এই প্রসঙ্গে মিউজিসিয়ান ২ ও ১ নং-এর নাম করা যায়। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠনরীতির দিক থেকে বিপিন গোস্বামীর একটি নিদর্শন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—রিক্লাইনিং ফিগার। ভাস্কর্য-শিল্পের অতি-পরিচিত অর্ধশায়িত ভঙ্গীই ভাস্কর নতুন-ভাবে প্রকাশিত করেছেন। উমা সিদ্ধান্তের দুটি কাজই লম্বমান রেখাপ্রধান, এবং একটি ওপরের দিকে ঈষৎ ও অপরটি পরিমিতভাবে কয়েক স্থলে বাঁকিয়ে দিয়ে ভাস্কর একটা সাবলীল ছন্দ সৃষ্টি করেছেন (কম্পোজিশন ১ ও ২)। দেখতে ভালই লাগে, তবে নতুনত্ব নেই। শঙ্কর ঘোষের দুটি কাজ উল্লেখ্য—টর্সো ও রিদ্‌ম। প্রথমটিতে শিল্পী যেন মোড়া পাত ও দ্বিতীয়টিতে মোড়া পাতের মধ্যেই হলো বা গর্ত সৃষ্টি করে দুটিতেই বিশিষ্ট পরি-কল্পনা ও গঠনরীতির পরিচয় দিয়েছেন। সমরেশ চৌধুরীর ভাস্কর্যেও আধুনিক রীতির সন্ধান মেলে। প্রথমটি বৃত্তপ্রধান, দ্বিতীয়টিতে কয়েকটি আকারবিশিষ্ট পাত সমান্তরালভাবে সাজিয়ে রেখে ভাস্কর একটি সুসম্বন্ধ আকার সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। তবে এ জাতীয় ভাস্কর্য নিদর্শন এখানে না দেখা গেলেও দিল্লীতে বহুপূর্বে দেখা গেছে।

বড়ে গোলাম আলি —শর্বরী রায়চৌধুরী

*

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা কিভাবে ছবি আঁকে তার পরিচয় পাওয়া গেল কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দুটি প্রদর্শনীতে। একটি চেকোশ্লোভাকিয়ার

ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী, ইন্দো-চেকোশ্লোভাক কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে, অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত; অপরটি বিড়লা অ্যাকাডেমির স্টুডিওর ছেলেমেয়েদের আঁকা, অনুষ্ঠিত হয় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। যাঁদের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শঙ্কর প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক ছেলেমেয়েদের প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ হয়েছে তাঁরা জানেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে নানা রঙই প্রধান আকর্ষণ। সোচ্চার লাল, নীল, হলুদ ও সবুজ রঙ তারা অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে যেন এক-একটি রঙের মায়াপুরী সৃষ্টি করতে চায়। ছবি দেখে মনে হয় তারা বুঝি রঙের রাজ্যেই বাস করে। বস্তুত ঠিকমত রেখা ব্যবহার বা ড্রয়িং-এর ওপর তারা আদৌ প্রাধান্য দেয় না। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রদর্শনীতেও সেই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। শিশুসুলভ কল্পনা অনুযায়ী ও-দেশের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি এঁকেছে—খেলার সাথী থেকে শুরু করে, রাজকুমারী, রেলগাড়ি, জন্তু-জানোয়ার, স্টিল লাইফ, রাস্তাঘাট ও কম্পোজিশনও প্রদর্শনীতে দেখা যায়। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ও-দেশের

ছেলেমেয়েদের গ্রা ফি ক শি ল্প প্রী তি। বাস্তবিকই কয়েকটি গ্রাফিক-প্রিন্ট উল্লেখযোগ্য —ছেলেমেয়েদের বয়সের তুলনায় ত বটেই। যাদের রচনা চোখে পড়ে যায় তাদের মধ্যে ডানা স্তেভলিকোভা (৮ বৎসর, দি ক্যাট, গ্রাফিক), জিরিনা ক্রুমপারাস্তো (বঃ ১৬, কম্পোজিশন, গ্রাফিক), রুডলফ কুচার (বঃ ১০, গেস, গ্রাফিক), টিবর কুকা (বঃ ৮, হাইড অ্যান্ড সীক, জলরঙ), আইভান হ্যানজেল (বঃ ৮, জিরাফ অ্যাট দি জু, জলরঙ), পিটার জেমান্যেক (বঃ ৮, নাইট-মেয়ার, জলরঙ) ও বিশেষ করে ব্লাঙ্কা স্তুহালোভা (বঃ ৮, ড্যান্স অ্যান্ড মিউজিক, গ্রাফিক ও কালিকলম)র নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন ছেলেমেয়ের সমবেত-ভাবে করা কয়েকটি মুখমণ্ডলের গ্রাফিক কাজের প্যানেলেরও নাম করা যায়।

*

পাশ্চাত্ত্য দেশের ছেলেমেয়েরা যেখানে রঙের ওপর প্রাধান্য দেয় এদেশের ছেলে-মেয়েরা সেখানে সুষ্ঠু রেখা ব্যবহার ও ড্রয়িং-এর ওপর লক্ষ্য দেয় অধিক। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও রঙের পক্ষপাতী, তবে প্রাথমিক অঙ্কনপদ্ধতিটুকু তারা উপেক্ষা করে না। তাই এ দেশের ছেলেমেয়েদের কাজে যেন একটি সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে। বিড়লা আকাডেমির ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবিতেও এই বিশেষ গুণটি ধরা পড়ে। একদিকে তারা যেমন খ্যাতনামা শিল্পীদের শিল্পকর্ম বা দেশের অতীত ভাস্কর্য নিদর্শন যথাযথভাবে নকল করেছে। অন্যদিকে আবার অনেকে স্বাধীনভাবে আপন আপন কল্পনা ও চিন্তাধারা অনুযায়ী নানা জাতীয় ছবি এঁকেছে জলরঙ, প্যাস্টেল ও তেলরঙে। ছোট ও বড় দুই বিভাগের ছেলেমেয়েদের শিল্পকর্ম নিদর্শন দেখে জানা যায় যে, তারা ঠিকমত শিক্ষালাভ করে স্বাধীনভাবেই কাজ করার সুবিধা পায়। ছোটদের বিভাগে কয়েকটি স্টিল লাইফ অনেকের চোখে পড়ে। যেমন ফ্লাওয়ার (রেণু জয়েস), ফ্লাওয়ার স্টাডি (শেখর মেহতা) ও অন্য জাতীয় একটি ছবি, মাই লাভ (রণিতা বল)। বলা বাহুল্য, বড়দের বিভাগে

জিরাফ —আইভান হ্যানজেল

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি চোখে পড়ে। এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণও জল এবং তেলরঙে কাজ করেছেন এবং এখানে বাস্তবধর্মী ও বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি প্রতিকৃতি নিদর্শনও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। দুজনের রচনা প্রথমেই সকলের চোখে পড়ে—বিজয় মেনন ও বিশ্বনাথ মান্না। প্রথমজনের গার্ল উইথ লিফ কম্পোজিশন ও চতুষ্কোণ প্রধান নিদর্শন হিসাবে প্রশংসা দাবি করে। কমলা রঙ প্রধান ল্যাইলিং অটাম-এ সুন্দর কারুকার্য সৃষ্টি করার জন্য বিশ্বনাথ মান্না অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেবাংশু মিত্রের বিমূর্ত দুটি রচনার মধ্যে প্রথমটি রেখাজালে আকৃষ্ট দেখায়, দ্বিতীয়টি আকার সুন্দর হলেও উচিতমত রঙ নির্বাচনের অভাবে ঠিকমত ফুটে ওঠেনি। স্কেচ ও ড্রয়িং-এ বাসবদত্ত দাশগুপ্তের হাত আছে (স্কেচ, ড্রয়িং)। পোর্ট্রেটও মন্দ লাগেনি। প্রচেষ্টা হিসাবে রঙগাব্যামীর মিশ্র উপাদানে রচিত মহাবলী-পুরম-এর নাম করা চলে। এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত সাহার ড্রেসিং টেবলও উল্লেখ্য, যদিও রচনা-ক্ষেত্র বিভাজনের বিষয়ে তাঁর অধিক সচেতন হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে শামসুল হক-এর কটেজ, শহীদ খাঁ-র বোট ও প্রতিলিপি অঙ্কনের জন্য বীণা মাথুর (ভ্যান গ), চন্দ্রপ্রভা মান্না (নিদর্শ দৃশ্য) ও গোপা বিশ্বাস (রেখা)-এর নাম করা চলে।

*

প্রতি বছরের মত এবারেও দিল্লীতে শঙ্কর প্রবর্তিত ছেলেমেয়েদের আন্তর্জাতিক চিত্র ও রচনা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হবে। যারা ১৯৫৬ সালের পয়লা জানুয়ারী বা পরে জন্মগ্রহণ করেছে তারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে। ছবি বা ইংরাজী রচনা পাঠাবার সময়ে নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, জাতি, ছেলে বা মেয়ে এবং বিষয়-বস্তুর বিবরণ দিয়ে এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে:—

Shankars International
Childrens' Competition
4, Baahadur Shah Zafar
Marg, New Delhi-1

ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের পরে কোনও ছবি বা রচনা গৃহীত হবে না।

চিত্রপ্রিয়

পাহাড়ী সান্যাল

মানুষ অতুলপ্রসাদ

॥ দশ ॥

যে পরম মুহূর্তের কথা বললাম এরকম মুহূর্ত আরও এসেছে আমার জীবনে। অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে তো এসেইছে, এক-একদিন একাকী বসে শুধু অতুলদার গান শুনে সেই সব মুহূর্তের চেহারা আবার দেখতে পেয়েছি। এছাড়া জীবনে যখনই কোন মনীষীর সংস্পর্শে এসেছি তখনই এ-ধরনের আনন্দঘন অনেক মুহূর্ত আমার জীবনে এসেছে। আর সেই সব মুহূর্তগুলি আমার চলার পথে হয়ে উঠেছে পরম সঞ্চয়। যার ফলে আজ এই বয়সে নিজের মনের সন্ধান যেমন করতে শিখেছি, তেমনি অপরের মনগুলিকে খুঁজে পাবার আগ্রহটাও বেড়েই চলেছে। অত্যন্ত দুঃখ অথবা দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েও তাই বোধ হয় আমার জীবনটা কোনদিন ভেঙে পড়েনি। এটাও নিশ্চয় অতুলদার জীবন-দর্শনেরই প্রভাব। তাঁর দুঃখ, ব্যথা, মানসিক বেদনা—এ সব জিনিসের চেহারা আমি দেখেছি। তাঁকে ব্যথা পেতে দেখেছি, দুঃখ পেতে দেখেছি, কিন্তু ভেঙে পড়তে কখনও দেখিনি। তবে অভিমানভরে ভেঙে পড়তে নিশ্চয় দেখেছি।

আমার অতুলদা ছিলেন আশাবাদী মানুষ। যখন তিনি প্রগাঢ় বেদনা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তখনও তার মধ্যে তিনি কোনদিন আশাকে ছাড়েন নি। যার জন্যই তিনি বলতে পেরেছেন "দুঃখেরে আমি ডরিব না আর/কণ্টক হবে কণ্ঠের হার/জানি তুমি মোরে করিবে অমল/যতই অনলে দহিবে।" দুঃখের মধ্যেও, ব্যথার মধ্যেও, প্রেমের ব্যথার মধ্যেও তাঁর নিবিড় আগ্রহ তিনি কোনদিন বর্জন করতে পারেননি।

তার কারণ অতুলদা ছিলেন সত্যিকারের প্রেমিক। প্রেম তাঁর কাছে ছিল ভগবানের প্রতীক। একজন মানুষ যে এত ভালবাসতে পারে, এত ভাবে ভালবাসতে পারে, তা যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন। আমি তখনকার দিনে এটা consciously না বুঝলেও ইঙ্গিত তার পেয়েছিলাম। আজ যখনই অতুলদার কথা ভাবতে বসি, যখনই তাঁর গানের মর্ম ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করি, তখন তাঁর ঐশ্বরিক প্রেম, মানুষকে ভালবাসার, ভগবানের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার আকৃতিগুলি চিনতে পারি। সে প্রেম-ভালবাসার প্রকৃতির ইঙ্গিতও যেন আজ আমার কাছে অনেক বেশি স্পষ্ট। এ কথাটি তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বুঝেছিলেন যে মানুষকে ভাল না বাসলে ভগবানকে ভালবাসার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না।

রূপ যৌবন বেশবাসে অপরূপ হয়ে আছে বসে।

এখানে হয়তো একটা ঘটনার অবতারণা করলে তাঁর প্রেম ভালবাসার অসামান্যতার একটা দিক দেখতে পাওয়া যাবে।

অনেকেই হয়তো এটা জানেন যে, অতুলদা এবং মিসেস এ পি সেনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার ফলে ও'রা দ্'জনে একত্রে বাস করতেন না। যে সময়কার কথা আমি বলছি সে সময় মিসেস এ পি সেন দেরাদ্নে বসবাস করছেন। আমি অতুলদার উট্রাম রোডের বাড়িতে যেমন যাতায়াত করবার তেমনই করছি।

একদিন সন্ধ্যায় অতুলদার বাড়িতে একটা গানের আসর বসবার কথা। আমার যতদ্র মনে হয় সে সময় মণ্টুদাও লখনোতে ছিলেন এবং যতদ্র মনে পড়ছে বোধ হয় তিনি অতুলদার বাড়িতেই ছিলেন। অবশ্য অনেক দিনের কথা বলে এটা হয়তো আমার ভুলও হতে পারে। যাই হোক, আমি যথারীতি গানের আসরে ভাগ নেবার জন্য অতুলদার বাড়িতে গিয়েছি। গিয়ে শ্নলাম অতুলদা লখনোতে নেই। বাড়ির লোকদের কাছে জানতে পারলাম যে, দেরাদ্ন থেকে একটি টেলিগ্রাম পাবার পর হঠাৎ তিনি সেখানেই চলে গেছেন। আমার তখনই মনে পড়ল যে মিসেস এ পি সেন তো দেরাদ্নেই থাকেন, তবে কি তাঁর টেলিগ্রাম পেয়েই অতুলদা দেরাদ্ন চলে গেছেন? তখনই আবার মনে হল যে, অতুলদার সঙ্গে তো মিসেস এ পি সেনের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই!

এই সব ভাবতে ভাবতে কোন্ সময় ফিরে এসেছি। পরে জানতে পারলাম, মিসেস এ পি সেনের একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। সেই দ্ঃসংবাদের টেলিগ্রাম পেয়েই অতুলদা ছ্টে গেছেন দেরাদ্নে।

তখন ছেলেমান্ষ ছিলাম, অতটা তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা তখনও আমার হয়নি, তবে এটা মনে আছে যে, অতুলদা মিসেস এ পি সেনের কাছে গেছেন জেনে মনটা আমার খ্শিতে ভরে উঠেছিল। এর আগে মিসেস এ পি সেনকে কোনদিন চোখে দেখিনি, কিন্তু একথা জেনেছিলাম যে, তাঁদের মধ্যে এই বিচ্ছেদ প্রগাঢ় ভালবাসার মধ্যেই ঘটেছিল। তাই, আবার সেই দ্'জন কাছাকাছি এসেছেন—এটা ভেবে খ্বই ভাল লাগল।

অতুলদার দেরাদ্ন চলে যাবার পরে কিছুদিন আর আমি তাঁর বাড়িতে যাইনি। তাঁর আর কোন খবর জানতাম না। কদিন পরে ঠিক মনে নেই, অতুলদার একটি স্লিপ পেলাম যে তিনি ফিরে এসেছেন এবং আমাকে সেই সন্ধ্যায় যেতে বলেছেন। গেলাম। মনে হল যেন সারা বাড়িটার চেহারাই ব্ঝি বদলে গেছে। অতুলদার বন্ধ্বান্ধব সেখানে সে সময় উপস্থিত ছিলেন। অতুলদাকে দেখে মনে হল যে এ

অতুলপ্রসাদের সহধর্মিণী শ্রীমতী হেমকুস্ম সেন

মান্ষটার চেহারাও ব্ঝি একেবারেই বদলে গেছে। বেদনার লেশমাত্র নেই কোথাও। উদ্ভাসিত ম্খে বলে উঠলেন, "এস পাহাড়ী এস।"

এই "এস" সম্ভাষণে যেন নতুন করে অতুলদার কণ্ঠে এক আনন্দময় আহ্বান উপলব্ধি করলাম। তাঁর তখনকার চেহারা দেখে সেই বয়সেও ব্ঝতে পেরেছিলাম যে অতুলদার মনে আবার যেন আনন্দের জোয়ার এসেছে। তিনি যেন পৃথিবীটাকে আরও স্ন্দর করে দেখছেন।

অথচ কিছ্দিন আগে পর্যন্ত অতুলদার মতন এক সদানন্দময় মান্ষের মনে কোথায় যেন একটা চাপা ব্যথা ছিল। সেটা আমার ওই অল্প বয়সেও অন্ভব করতে পারতাম। তাঁর ওই সময়কার রচিত গানগ্লিতেও একটা ব্যথার ভাব ছড়ানো থাকত। দৃষ্টান্ত-স্বর্প একটি গানের কথা বলা যায়, যার প্রথম ছত্র হল "তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানিনি।" এতে স্পষ্টই ব্ঝতে পারা যায় তিনি কত ব্যথা পেয়েছিলেন। যে অন্তরকে তিনি নিজের কাছে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, নিবিড় করে যাকে নিজের আলিঙ্গনের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন, সেই অন্তরের সাড়া তিনি যখন পেলেন না, যখন তাঁর কাম্য অন্তরঙ্গতাকে তিনি হারালেন তখনই ব্যথা পেয়ে সম্ভবত ওই গানটি তিনি রচনা করেছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন্ অন্তরঙ্গতা অথবা কার অন্তরঙ্গতার কথা আমি বলছি। যাকে অন্তরঙ্গ করে পাবার জন্য তিনি আত্মীয়, সমাজ সব বর্জন করতে পেরে-ছিলেন এবং মধ্র স্বর্গ রচনা করবার জন্য যাঁকে তিনি কাছে এনেছিলেন তাঁর সে অন্তরঙ্গতা না পাবার ফলে কি এই ছত্রগর্লি লেখা যায় না?

যখন তিনি নিবিড়ভাবে নীড় বাঁধতে চেয়েছেন, সে নীড় গেছে ভেঙে। তাই তিনি যাঁকে নিজের চিরসাথী বলে মনে করে-ছিলেন তার কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করছেন, "মধ্রাতে ফ্ল হাতে গান কি মোর শোননি/তবে কেন রাকা চাঁদে ঢাকা ওগো অভিমানিনী"।

স্বতই তাঁর মনে এক সময় এই ভাব জেগেছে যে, তাঁর প্রিয়া ব্ঝি অভিমান করেছে। তাই তার মানভঞ্জন করে নতুন করে ফিরে পেতে চেয়েছেন তাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর আশা...

আগেই বলেছি—সেই মন তখন গেয়ে উঠেছে, "ধরা দেবে দিবে এসে ওগো অনুরাগিণী/তবে কেন যাও হেন ওগো বনহরিণী।" ব্যথা, অভিমান এবং আশার এমন দৃষ্টান্ত কটি পাওয়া যাবে।

যাক, যে কথা বলছিলাম সেই কথাতেই আবার ফিরে আসি। অতুলদার এখনকার চেহারা দেখে মনে হল যেন তিনি তাঁর সেই বনহরিণীর সন্ধানই বুঝি পেয়েছেন বা। আমার দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন, "একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি এসো।"

বুঝলাম নিয়ে যাচ্ছেন মিসেস এ পি সেনের কাছে। তিনি তখন অসুস্থ, কিন্তু বিপদ কেটে গেছে। তিনি উঠতে বসতে পারছেন না বটে, কিন্তু চেহারায় রোগের কোন প্লানি নেই। কী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। চলতি বাংলায় যাকে বলা চলে জ্বল-জ্বল করছে। আমি কাছে গিয়ে প্রণাম করবার পর তিনি মৃদু হেসে বললেন, "এই বুঝি পাহাড়ী?"

আমার কি ভাল যে লেগেছিল তা কি করে বোঝাব। আর সেই বয়সে নিজেও যখন খুব প্রেম নিয়ে নাড়াচাড়া করি তখন ভাবতেও আনন্দ হল যে, অতুলদা তাঁর ভালবাসার মানুষকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন।

এর পর মিসেস এ পি সেনকে হেম-কুসুমদি বলে ডাকতে শিখেছিলাম। এবং তাঁর কাছ থেকে স্নেহও যথেষ্ট পেয়েছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় অতুলদার বাড়িতে যেন একটা আনন্দের ফোয়ারা বয়ে গিয়েছিল। অতুলদার স্বাভাবিক সাবলীল ভঙ্গী যেন আরও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল। মনে আছে সেদিন বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল।

অতুলদার প্রগাঢ় ভালবাসার যে দৃষ্টান্ত সেই সন্ধ্যায় আমার চোখে ধরা দিয়েছিল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু পৃথিবীর আর সব জিনিস যেমন ক্ষণভঙ্গুর, অতুলদার হেমকুসুমদিকে ফিরে পাওয়াও হয়েছিল তেমনই ক্ষণভঙ্গুর তবে এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম।

আজ এত সব কথা বলতে পারছি বটে কিন্তু তখনকার দিনে আবার যখন হেমকুসুমদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন তখন সত্যিই দুঃখ পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এই দুজন মানুষ মাত্র মাইল দেড়েকের দূরত্বে থেকে যেন হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছেন।

এর পর কতবার হেমকুসুমদির বাড়ি সামনে সাইকেলে করে যেতে যেতে দেখেছি তিনি তাঁর ছোট্ট বাংলো বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন। ওই অ্যাকসিডেন্টের ফলে ভালো করে নড়াচড়ার ক্ষমতা তখন হারিয়েছেন। আমি তাঁকে দেখতে পেয়ে কতবার সাইকেল থামিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর ব্যক্তিত্বকে চিনতে শিখেছি, তাঁর হৃদয়জোড়া আকুলতার ইঙ্গিতও পেয়েছি।

[ক্রমশ

গগনেন্দ্রনাথ

দেশের ৫৭ পাতায় গগনেন্দ্রর হাতে লেখা একটা চিঠির ছাপানো প্রতিলিপির নীচে টীকার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের ভাষায় আত্মীয় বোঝাতে যত শব্দ আছে ইংরেজীতে তত নেই। ইংরেজীতে "কজ" (coz) কাজিন (cousin) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। সম্বোধনে ব্যবহার হয়। বর্তমানে অপ্রচলিত। কাজিন শব্দ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় অর্থে চলে। ব্যাপক অর্থে জ্ঞাতি ও অন্যান্য আত্মীয় বোঝায়।

গগনেন্দ্র খুড়তুতো ভাইকে 'কজ' বলে ডাকাতে কোন ঠাট্টার ইঙ্গিত নেই। বিদেশী শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও ইংরেজী ভাষার উপর অগাধ দখলের প্রমাণ। এর জন্য কোন সাক্ষ্য ও প্রমাণ অপ্রয়োজন। খুব সম্ভব সেক্সপীয়র (Shakespeare) থেকে তিনি কথাটি চয়ন করেছিলেন। ম্যাকবেথের (Macbeth) চতুর্থ অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে রস (Ross) লেডী ম্যাকডফ্‌কে (Lady Macduff) "My dearest coz" বলে সম্বোধন করে পরের মুহূর্তে "My pretty cousin" বলছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৫৫

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় ১৬-১০-৭১ তারিখের ১০০২ পৃষ্ঠায় এবং ১০০৩ পৃষ্ঠায় আলিপুর জেলে কানাই দত্তের কাছে রিভলবার যাওয়া প্রসঙ্গে যা লেখা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য জানাচ্ছি যে,

"....The first important act of Chandarnagore revolutionaries was the supply of two revolvers to the Alipore jail at the request of Kanailal Datta for the object of ending life of Narendra Nath Gossain, the approver.

Motilal Roy, on being supplied two revolvers by Srish Chandra Ghose at Chandarnagore, deposited them at Basanta Kumar Banerjee's house in Calcutta, and they were delivered in due course to Kanailal Datta and Upendra Nath Banerjee in the jail by Srish Chandra Ghose and Basanta Kumar Banerjee respectively. The intended object of killing Naren Gossain was carried through successfully in the Alipore Jail Hospital. (August 31, 1908) by Kanai Lal Datta of Chandarnagore and Satyendra Nath Bose of Midnapore. Both of them were hanged eventually on charge of murder, vide "Two Great Indian Revolutionaries," by Uma Mukherjee, Page 39.

এ ছাড়া আমার আর একটি কথা হলো যে, শ্রীমোহনলাল, বিপ্লবীদের কথা বলতে গিয়ে যেন তাদের 'সন্ত্রাসবাদী' না বলেন। কারণ, ওটা ইংরেজ শাসকদের দেয়া বদনাম। উদ্দেশ্য ছিল "বিপ্লবীদের" লোকচক্ষুতে হেয় করা।

আশাকরি আমার কথাটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন। এতে পাঠকরা সত্য কথা জানতে পারবেন।

শ্রীলোকেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত
কলি-১৯

দেখা হয় নাই

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দেখা হয় নাই" শীর্ষক প্রবন্ধে পটুয়াদের ও "পট" সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে এক শ্রেণীর পটুয়ার কথা প্রকাশ হয়েছে। অর্থাৎ যাঁরা নিজের আঁকা বা পরের আঁকা পটচিত্র দেখিয়ে ছড়া বা গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে ভিক্ষা বা কিছু রোজগার করতেন। কিন্তু বাংলাদেশে তিন শ্রেণীর পটুয়া ছিল। এবং তাঁদের কাজের ধারাও ভিন্ন ছিল। যেমন প্রথমেই কালীঘাটের পটুয়াদের কথা

বলা যায়। যে সকল পটুয়ার "চিত্রকর" পদবী ছিল তাঁদের আচার-ব্যবহার হিন্দু, মুসলমান ধর্ম মিলিয়ে অর্থাৎ হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম কোনটাই পুরোপুরি পালন করতেন না। আমার প্রথম চিত্রাঙ্কন শিক্ষক কালনার বিহারী চিত্রকরের পরিবারের এই-রকম মিলিত ধর্মাচরণ ছিল। এক সময় কালনার "পাটোবেড়ে"তে বা পটোপাড়াতে বহু পটুয়ার বাস ছিল। শেষ দুই পটুয়া ছিলেন বিহারীলাল চিত্রকর ও সতীশচন্দ্র চিত্রকর। পূর্বে এ'দের যজমান ছিল অনেক। বাগবাজার বোসেদের বাড়ি এ'রা দু' ভাই দুর্গাপ্রতিমার অঙ্গরাগ ও চালচিত্র করতে যেতেন। কিন্তু পরে এই ব্যবসা না চলায় এই পরিবার তালপাতার পাখা তৈয়ারির কাজ করে সংসার চালাতেন।

যে সকল পটুয়াদের দাস, মিস্ত্রি, পাল পদবী ছিল তাঁরা অনেকেই পুরোপুরি হিন্দু-ধর্ম মানতেন। অনেকে বৈষ্ণবও ছিলেন। এই সকল পটুয়ারা রাজা-মহারাজাদের বা ধনীসম্প্রদায়ের রথ, পাল্কী ও গৃহসজ্জার জন্য চিত্রাঙ্কন করতেন। সাধারণত এ'দের শিল্পকাজের বিষয়বস্তু ছিল দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে। অঙ্কনপদ্ধতিতেও এ'দের কাজে ভিন্নরূপ ছিল। অলংকরণ ও বর্ণপ্রয়োগের দক্ষতায় এই সকল শিল্পীর কাজ এক সময় বাংলার শিল্পরসিক সমাজে খুবই প্রশংসা পেয়েছিল। এই সকল শিল্পী তাঁর নিজ গৃহে বসেই কাজ করতেন।

বর্ধমান জেলায় কালনা মহকুমায় গুপ্তি-পুর গ্রামে অনেক পটুয়া ছিল। এক শত বৎসর পূর্বে আঁকা আনন্দ মিস্ত্রির কালী-মূর্তি আজও আছে। হুগলী জেলায় দিগসুই গ্রামের ক্ষেত্র দাস একজন উচ্চশ্রেণীর পটচিত্রকর ছিলেন। তাঁর কাজ কালনা রাজ-বাড়িতে "নতুন সমাজে" ছিল। (এখন নাই, এই বাড়িতে বিদ্যালয় হয়েছে।) শান্তিপুরে রাসের সময় "পটেশ্বরী" পূজা এখনও হয়। বহু বৎসর পূর্বে এই পূজা আরম্ভ। মাটির মূর্তির পরিবর্তে কালীর চিত্র পূজা হয়। এই চিত্র বিভিন্ন শিল্পী এ'কেছেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের বিখ্যাত শিল্পী বক্রেশ্বর পাল এই চিত্র অঙ্কন করতেন। এই সকল শিল্পী "যমপট" বা "চক্ষুপট" এ সব আঁকতেন না। এ'দের কাজে প্রকৃত শিল্পীর সৃষ্ট রূপ ও রস পাওয়া যেত। অবশ্য কালের পরিবর্তনে আজ চিত্রাঙ্কনধারার বহু পরিবর্তন হয়েছে।

মহীতোষ বিশ্বাস
কালনা, বর্ধমান

॥ ২ ॥

বোড়াল সম্বন্ধে অমিয়কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের (দেশ, সংখ্যা ৩৯) লেখাটি পড়লাম। তাঁর প্রবন্ধ অনেক কিংবদন্তী কথায় অকারণ স্ফীত হয়েছে। ত্রিপুর-সুন্দরীর হাতের তাল্লু সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা আদৌ ঠিক নয়। হাতের তালুটি অষ্টধাতুর নয়। এটি চকচকে পেতলের তৈরি। যাঁরা এটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পূজো করেছেন সেরকম দু'-একজন প্রাচীন ব্যক্তি এখনও বেঁচে আছেন। তাঁরা বলেছেন, এই হাতের তালুর ন্যায় যন্ত্রমূর্তিতে ত্রিপুর-সুন্দরীর কোন ধ্যান খোদিত ছিল না।

শঙ্করাচার্যের ঃ
বালার্ক মণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাং
পাশাঙ্কুশ শরাং শ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাংশ্রয়ে
(সংক্ষিপ্ত...)

এই ধ্যান থেকে পরে ত্রিপুরসুন্দরীর অষ্টধাতুর মূর্তি গড়া হয়। এটি সতীর দেহাংশ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে। কারণ, ইতিমধ্যেই সতীর ৫১টি পীঠের দেহাংশের কথা জানা গেছে। ৫২ পীঠের কোন উল্লেখ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তবে ধরে নিলে অন্যতম কথা। হাতের তালুর ন্যায় অংশটির পুরো নকশা আমার কাছে আছে। যে কথাগুলি লেখা আছে তা হল : হুঁ, ক্লীং, হ্রীং, শ্রীং, ঐং।

শাঁখারির কথা যেখানে লিখেছেন, সেখানে তখনকার পূজারীর উল্লেখ আছে দক্ষিণপাড়ার রামহরি মুখুজ্জে। উনি রামহরি মুখুজ্জে নন, জয়হরি মুখোপাধ্যায়।

মধু বসু
বোড়াল, ২৪ পরগণা

॥ ৩ ॥

গত ২৩শে অক্টোবরের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা 'দেখা হয় নাই'-এর 'ধামতোড়' শীর্ষক নিবন্ধে মন্দির-'টেরাকোটা' শিল্পের আনুমানিক অবলুপ্তির কাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিবিধ 'টেরাকোটা'-মন্দিরের উল্লেখ ক'রে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতক আরম্ভ হবার আগেই এ শিল্পটি লুপ্ত হয়েছিল. শ্রীবিনয় ও শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের এ অভিমত নয়। তাঁর যুক্তির সমর্থনে আমি আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা' দেবালয়ের উল্লেখ করতে চাই যেগুলি উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়েই নির্মিত হয়েছিল। এগুলির প্রতিষ্ঠালিপিতে উৎকীর্ণ শকাব্দ বা বঙ্গাব্দের সমার্থক খ্রীষ্টীয় সাল বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে :

(১) মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার নাড়াজোল গ্রামের বোষ্টমপাড়ায় বালিয়াল পরিবারের বাঁকা রায় (জগন্নাথ) মন্দির (১৮০১)

(২) হুগলী জেলার হরিপাল থানার বড়-খাজুরিয়া গ্রামের মণ্ডলপাড়ার শিবমন্দির (১৮০৩)

(৩) বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার তারাপীঠের তারা মায়ের মন্দির (১৮১৮)

(৪) মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আনাসোল গ্রামের রাজেশ্বরনাথ শিব-মন্দির (১৮৩৭)

(৫) ঐ মন্দিরেরই 'টেরাকোটা'-অলঙ্কৃত ভোগগৃহ (১৮৫১)

(৬) বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার বাঁকাদহ গ্রামের তাঁতি-পরিবারের রাধা-দামোদর মন্দির (১৮৪৬)

(৭) বীরভূম জেলার ইলামবাজারের

অরেঙ্গাবাদের জনার্দন মন্দির (১৮৪৬)

(৮) মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার গোবিন্দনগর গ্রামের ভুবনেশ্বর শিবমন্দির (১৮৫০)

(৯) মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের জানা পরিবারের রাধাদামোদর মন্দির (১৮৫৪)

(১০) হুগলী জেলার আরামবাগ থানার ডিহি বয়রা গ্রামের শ্বরূপনারায়ণ (ধর্মরাজ) মন্দির (১৮৫৮)

(১১) বীরভূম জেলার বোলপুর থানার সুরুল গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় শিবমন্দির (১৮৬১)

(১২) ঐ একই জেলা ও থানার চন্দনপুর গ্রামের নমোপাড়ায় মুখোপাধ্যায় পরিবারের শিবমন্দির (১৮৬৪)।

অতএব উক্ত লেখকের যে ধারণা 'টেরাকোটা' শিল্পটি বীরভূমের সজীব ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সময়কে নির্দিষ্ট এ জাতীয় কোন মন্দির এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি।

উমাপতি উপাধ্যায়
কলিকাতা-১১

বাংলাদেশ বিষয়ে

'বাংলাদেশ'-এর সৃষ্টির পর অসংখ্য কবিতা ও গদ্য রচিত হয়েছে, বেরিয়েছে অনেকগুলি সংকলন। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কিছুটা ভাবাবেগ, কিছুটা খাঁটি অন্তর স্পন্দনে এই বিষয়ে সাহিত্য রচিত হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া, আর কোনো যুদ্ধে একটি জাতির সাংস্কৃতিক সঙ্কটের প্রশ্নটি এমনভাবে জড়িত হয়নি এবং বাঙালীরা যে একটু বেশী কবিতাপ্রবণ সে কথা তো কারুর আর অজানা নেই।

সংকলন বেরিয়েছে অনেকগুলি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিয়ে এই সংখ্যায় আলোচনা করছি।

শান্তনু দাসের সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'বাংলার মুখ'—এটির চরিত্র অভিনব, এটি বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনবদ্য ছড়ার সংকলন—প্রচলিত এবং আধুনিক ছড়া। এবং বাংলাদেশ বলতে এখানে পূর্ব-পশ্চিম মিলিত অখণ্ড বাংলা।

পাখি পাখি পাখি
সাত সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যাক
আমি ঘাট-এ বসে দেখি।

এই ছড়ায় এক সময়কার বাংলার যে বিষণ্ণ চিত্রটি পাওয়া যায় তেমনি সাম্প্রতিক কালের কথা পাওয়া যায় অমিতাভ চৌধুরীর ছড়ায় :

ওরে ঈশ্বর, ওরে আল্লা
হলি নাকি কানে কালা।
দিন দুনিয়া পাল্লাপাল্লা
শুনতে পাসনে, কানে তালা।
ঝড় তুফানে মাখামাল্লা
চিল্লা চিল্লা।

আধুনিক কালের ছড়ায় সেই সরলতার স্বাদটা তেমন পাওয়া যায় না। ছড়ার গতি বা বক্তব্য নির্দিষ্ট না করে অনেকের পক্ষেই লেখা শক্ত। তা ছাড়া, সাম্প্রতিক হাঙ্গামা উপলক্ষে রচিত বলে বেশির ভাগ ছড়াতেই যথেষ্ট রাগারাগির ব্যাপার আছে—ছড়ার যা লক্ষণ নয়। তবু, অধিকাংশ রচনাই বেশ উপভোগ্য। যেমন প্রভাস সেন লিখেছেন :

...ইলিশ মাছের পেটি ভালো
কৈ মাগুরের ঝোল
কিন্তু সবার চাইতে ভালো
বাংলা মায়ের কোল।

এবং শেষ ছড়াটি, আসাদ চৌধুরীর, মর্মস্পর্শী,

ছড়া ছড়া ছড়া
লিখছি যখন পায়ের তলায়
পনেরো লাখ মড়া।
ছড়া ছড়া ছড়া
রক্ত দিয়ে ছিঁড়তে হচ্ছে
জিন্নার গাঁট-ছড়া।

শিশির ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংকলনটির নাম 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা'। এই সংকলনটির বৈশিষ্ট্য এই, এতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার কবিদের রচনা ছাড়াও অন্য

ভারতীয় ভাষার কবিদের বাংলাদেশ বিষয়ক কবিতাও সংযুক্ত হয়েছে। বাঙালী কবিদের কবিতাগুলি অনেকের কাছে পরিচিত, কিন্তু অন্য ভাষার কবিতাগুলির সংগ্রহ মূল্যবান। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এর মধ্যে উর্দু কবি ক্যায়ফি আজমির আন্তরিক কণ্ঠস্বর। তাঁর 'বাংলাদেশ' নামের কবিতার আরম্ভ এই রকম :

আমি কোনো দেশ নই যে তোমরা
আমায় জ্বালিয়ে দেবে
কোনো দেওয়াল নই আমি যে
আমায় তোমরা ভেঙে ফেলবে
অথবা সীমান্তও নই যে
মুছে ফেলবে তোমরা!...
...মানুষ যখন মানুষের রক্ত শোষে,
লুণ্ঠন যখন সীমা ছাড়ায়,
অত্যাচার যখন সহ্যের অতীত হয় তখন হঠাৎ কোন্ একটি কোণায় কোন একটি হৃদয় থেকে উঠে আসতে দেখবে তোমরা আমাকে।...

(শিশির ভট্টাচার্য অনূদিত)

প্রীতীশ নন্দী ইংরেজিতে বাংলাদেশের কবিতার দুটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশ করেছেন। 'পোয়েমস ফ্রম বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ—আ ভয়েসে অফ আ নিউ নেশান।' সংকলন দুটি সুমুদ্রিত ও সুপ্রযুক্ত; অনুবাদ বেশ জোরালো। উদাহরণ হিসেবে শামসুর রহমানের 'দ্য ফ্লেম' কবিতার শুরুটুকু উদ্ধৃত করি :

I came to know
What it burns down cities and
villages,
The camps of enemies and th
homes of friends
It burns with equal fury.
Who knows want the work
losses without knowing—

কবি সম্মেলন

চৌরঙ্গীর ওপর জীবনদীপ নামে যে মস্ত বড় নতুন বাড়িটি, তার তিন তলায় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এক হলঘরে একটি কবি সম্মেলন হয়ে গেল গত ২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যেবেলা, গঙ্গোত্রীর উদ্যোগে। প্রথমে যন্ত্র সংগীতের কনসার্ট, তারপর ব্রহ্ম সংগীত তারপর কবিতা পাঠ, একটি সুসজ্জিত সুশ্রী মেয়ে নাম ঘোষণা করছে, একটিও চেয়ার খালি নেই, শ্রোতারা নির্বাক, নো নড়ন-চড়ন। মুভি ক্যামেরায় ছবি উঠছে টেপ রেকর্ডার চলছে নিঃশব্দে। প্রথমে বেশ ভয় হয়েছিল, কবিতাকে এই রকম ফ্যাশনেবল পর্যায়ে এনে আড়ষ্ট এক শোক-সভা করে তোলা হচ্ছে বুঝি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতার প্রাণশক্তিতেই কাব্যসভা জমে যায়—কবিতা পড়লেন দুই বাংলার বেশ কিছু সংখ্যক কবি, মধ্যমণি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সনাতন পাঠক

প্রবন্ধ

এশিয়ার সাহিত্য। শ্রীনিখিল সেন প্রণীত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ. ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড। ১৯৭১। মূল্য ২৮ টাকা।

একদিন এশিয়া মহাদেশ ছিল মানব সভ্যতার বেলাভূমি। পৃথিবীর সব কয়টি ধর্মের উন্মেষও ঘটেছিল এখানেই। কালক্রমে এ মহাদেশ আপন সচলতা হারিয়ে ফেলল। তবে সব দিন তো আর সকলের সমান যায় না। যুদ্ধোত্তর এশিয়ায় ঘটেছে নবজাগরণের অভ্যুদয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও চন্দ্রলোকে মানুষের অবতরণের মতই বিংশ শতকের এক স্মরণীয় ঘটনা।

নবজাগ্রত এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা সীমিত। আশার কথা এই যে আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানে 'প্রাচ্যবিদ্যার্ণব' স্থাপিত হয়েছে। ভারতীয়দের পক্ষে ও এশিয়ার সমস্ত দেশের ভাষা ও সাহিত্যের রস সরাসরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইংরেজীর মাধ্যমেই সেটা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান গ্রন্থটি এশিয়ার বিভিন্ন সাহিত্যের রূপরেখা। লেখক অনেক আয়াসে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-ইতিহাস আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে যে কয়টি অধ্যায় বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হচ্ছে 'চীন সাহিত্য', 'জাপানী সাহিত্য', 'ইন্দোনেশীয় সাহিত্য', 'ইরানী সাহিত্য', 'আরবী সাহিত্য', 'নেপালী সাহিত্য', 'সিংহলী সাহিত্য' 'বাঙালী সাহিত্য', 'আদিবাসী সাহিত্য ও পাকিস্তানের সাহিত্য' প্রভৃতি অধ্যায়।

গ্রন্থটি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে এ ধরনের বই বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে লেখা হয়নি। শুধু বাংলা কেন অন্য

কোন ভাষাতে হয়েছে বলেও জানা নেই। লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় মেলে গ্রন্থটিতে।

জীবনী

সুভাষচন্দ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ। জয়শ্রী প্রকাশন ২৫১এ।৩২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড কলকাতা-৪৭। মূল্য ১২ টাকা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী ও জীবন-দর্শন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন খণ্ডে লিখে যাচ্ছেন শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ। "সুভাষচন্দ্র" বইটির প্রথম খণ্ড পাঠকদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের প্রথম কারাবরণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় সুভাষচন্দ্রের যে দার্শনিক প্রত্যয় লাভ হয়েছিল—তার সার কথা হল মনুষ্যত্বের বিকাশ। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন মুক্তির জন্যে সুভাষচন্দ্র যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তার মূলেও ছিল তাঁর পূর্বসূরীদের কাছে লব্ধ দার্শনিক প্রত্যয়। মানুষই ছিল সুভাষচন্দ্রের কাছে দেবতা, মনুষ্যত্বকে তিনি কখনও কলঙ্কিত করতে চাননি বলেই তাঁর সংগ্রাম ছিল আপসহীন। লেখক প্রথমেই সুভাষচন্দ্রের মানবতান্ত্রিক প্রত্যয় নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। প্রেসি-

ডেন্সী কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন, ডিবেটিং-এ সুভাষের অসামান্য দক্ষতা, ছাত্র-ইউনিয়ন গড়ে তোলায় তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশে তাঁর অবদান, ওটেন সাহেবের সংগে সুভাষ ও তাঁর অনুবর্তীদের সংঘাত সবই বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। হয়তো এই আলোচনার কিছু অংশ অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি এমনভাবে এই ঘটনাবলী পরিবেশন করেছেন যা পাঠককে সুভাষ-চন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত না করে পারে না। এই সংগে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে সুভাষচন্দ্রের মনে অধ্যাত্মবোধ দানা বাঁধতে থাকে: সন্ন্যাসী হবার নেশা যে সুভাষ-চন্দ্রকে পেয়েছিল তারও উল্লেখ আছে এই বইয়ে। রোগী ও আর্তের সেবা এবং সেই সঙ্গে জাতিগঠনের চিন্তা, এ নিয়েই সুভাষচন্দ্রের অনেকটা সময় কাটতো। শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছায় আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। ইংলণ্ডে সুভাষচন্দ্র কিভাবে দিন কাটাতেন, তাঁর মানসিকতার কী পরিবর্তন হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কেন তিনি সিভিল সার্ভিসে যোগদান করলেন না সে বিষয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা আমরা এই বইয়ে দেখতে পাই। দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসার পর থেকে কিভাবে সুভাষচন্দ্রের জীবনে পরিবর্তন আরম্ভ হয়, —কিভাবে সুভাষচন্দ্রের নাম সমগ্র বাংলা-দেশে ছড়িয়ে পড়লো এবং সুভাষচন্দ্রকে কী অবস্থায় কারাবরণ করতে হল সে সম্পর্কে বহু জিনিস অনেকেরই জানা আছে। কিন্তু পবিত্রবাবু এমন অনেক তথ্যের অবতারণা করেছেন যেগুলির সাহায্যে শুধু ঘটনার গ্রন্থনই সুন্দর হয়নি, চরিত্র চিত্রণও সার্থক হয়েছে; এক্ষেত্রেই তাঁর কৃতিত্ব। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য যাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদের স্মৃতিকথা এবং সুভাষচন্দ্রের বন্ধুদের বিভিন্ন লেখা থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র এই বইয়ে সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। লেখক সুভাষচন্দ্রের জীবনকাহিনী বর্ণনায় আমাদের জাতীয়জীবনের সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার উপরেও আলোকপাত করেছেন। এ জন্য বইটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

ভারতীয় ভলিবলে বাংলার পঞ্চদশী

উনিশ শো সত্তর সালে মহিলাদের ভারত-সিংহল ভলিবল টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলে একটি বাঙালী মেয়ের নাম দেখে যতখানি উৎফুল্ল হয়েছিলাম, বাঙালী মেয়েটির খেলা দেখে কিন্তু ততখানি উৎফুল্ল হতে পারিনি।

খেলার পর আমাকে জানানো হল মেয়েটি আসর দেখে ঘাবড়ে গেছে। বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। জীবনের প্রথম বড় আসর, প্রথম প্রতিনিধিমূলক খেলা। তারপর মফঃস্বলের মেয়ে। মাত্র দু' বছর আগে খেলা শুরু করেছে। শুধু খেলা শুরুই নয়, দু' বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬৮-তে ইডেনে যখন জাতীয় ভলিবল খেলা হয় তখন নৈহাটি থেকে স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে এসে মেয়েটি প্রথম ভলিবল খেলা দেখে। দেখেই ভাল লেগে যায়। নৈহাটিতে ফিরে গিয়ে আরম্ভ করে খেলা। দু' বছরের মধ্যে তপতী মণ্ডল নামে নৈহাটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের ওই ১৪ বছরের মেয়েটি ভারতের টেস্ট দলে নিজের জায়গা করে নেয়।

মাত্র দু' বছরের অনুশীলন ও শিক্ষায় যে ভারত দলে স্থান করে নেয় অবশ্যই সে সহজাত নৈপুণ্য ও কলাকৌশলের অধিকারিণী। তবে শিক্ষারও গুণ আছে বইকি। নৈহাটি অ্যাথলেটিক ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা এবং পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশনের কমিটি মেম্বার শক্তি দাসের হাতে গড়া মেয়ে তপতী মণ্ডল। শক্তিবাবুই শুরু থেকে ওকে কোচ করেছেন, ভুল ত্রুটি শুধরে দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় সুপটু করে গড়ে তুলেছেন। ফলে শুধু ভারত-সিংহল টেস্ট খেলাতেই নয়, ১৯৭০-এ ভারত সফরকারী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার পেয়েছে তপতী মণ্ডল। বাংলার একমাত্র মেয়ে যে এই সম্মানের অধিকারিণী। এবং ভলিবল খেলায় বাংলার একমাত্র মেয়ে হিসাবেই ১৯৭০-৭১-এ মাসিক ৫০ টাকা জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে।

তপতী নৈহাটি পি সি সেন গার্লস হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী। শক্তিবাবুর কাছে তো বটেই, ভলিবল খেলার সুযোগ-সুবিধা করে দেবার জন্য তপতী স্কুলের হেড মিস্ট্রেস শ্রীমঞ্জু গুহরায়ের কাছেও ঋণী। প্রধান শিক্ষিকাই নাকি প্রথম দিকে খেলার জন্য বল নেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, নৈহাটিতে আন্তঃ স্কুল ভলিবল প্রতিযোগিতার প্রচলন করেছেন।

১৯৬৯ থেকেই তপতী জাতীয় ভলিবলে বাংলা দলে খেলার সুযোগ পায় এবং ওই বছর চারটি দল নিয়ে মহিলাদের যে প্রথম ভলিবল লীগ খেলা হয়, সেই লীগে তপতীর অধিনায়কত্বে নৈহাটি অ্যাথলেটিক হয় রানার্স। মহিলাদের আন্তঃ জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতার (১৯৭০-৭১) দ্বিতীয় বছরে ২৪ পরগণা হয় চ্যাম্পিয়ন। বলা বাহুল্য, এ দলের অধিনায়িকাও ছিল তপতী মণ্ডল। এই বছর দিল্লিতে মহিলাদের সর্বভারতীয় হরবনস কাউর প্রতিযোগিতায়

কুমারী তপতী মণ্ডল

বিজয়ী টালিগঞ্জ সুভাষ সঙ্ঘ দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিল তপতী, শেষ পর্যন্ত যার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ।

ভারতীয় ভলিবলে বাংলার স্থান খুব উঁচু নয়। না হলে যেখানে ভলিবল খেলায় পাঞ্জাবের ৭ জন, রাজস্থানের ৪ জন এবং অন্ধের দুইজন জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে সেখানে বাংলার বৃত্তিপ্রাপ্ত একমাত্র মেয়ে তপতী মণ্ডল। তবু ভাবতে ভাল লাগে এই পঞ্চদশী কন্যাই ভলিবলে বাংলার মুখ রেখেছে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে জামসেদপুরে জাতীয় ভলিবলের আসর বসছে। আশা করা যায়, তপতী ওখানেও তার সুনামের প্রতি সুবিচার করে দর্শকদের আনন্দ দেবে।

কি ছেলেদের, কি মেয়েদের খেলা, আধুনিক কালের ভলিবলে প্রতি খেলোয়াড়কে খেলার সময় টেকনিক ও ট্যাকটিকস অর্থাৎ প্রথা-প্রকরণ সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। যেমন আপারহ্যাণ্ড পাস, আণ্ডারহ্যাণ্ড পাস, স্ম্যাশ, ব্লক ইত্যাদি। কোন কিছুতে কমজোরী হলে দলের মধ্যে নিকৃষ্ট হিসাবে চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা। আর আধুনিক ভলিবলে খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম কিনতে হলে তো সব-কিছুতে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। সার্ভিস ও স্ম্যাশিং হবে শক্তিশালী, পাস ও ব্লক হবে নিখুঁত। স্ম্যাশ তুলে দেবার জন্য যথাসময়ে যথাস্থানে অবস্থান এবং সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোর্টে চলাফেরা করার ক্ষমতাও অপরিহার্য।

তপতীর সব কিছুই আছে। জোরালো সার্ভিস, জোরালো স্ম্যাশ, সাইড রোল ও ব্যাক রোলের সঙ্গে ভাল ডিফেন্স, হাতের সুইং এবং বল চালনা করার কৌশল প্রায় নির্ভুল। সাধারণত মেয়েদের খেলার মধ্যে এসব দেখা যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, তপতীর আছে বিগ গেম টেম্পারামেণ্ট। বড় খেলায় সাধারণত ও ভাল খেলে। দলের আর সবাই যখন ভুল করতে শুরু করে ও ঠাণ্ডা মাথায় তখন নির্ভুলভাবে খেলতে চেষ্টা করে। সম্ভবত এই কারণেই এ বছর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া হরবনস কাউর ভলিবল টুর্নামেণ্টে বেস্ট প্লেয়ারের প্রাইজ পেয়েছে।

অথচ ওই প্রতিযোগিতায় দিল্লির মডার্ন কলেজ, খালসা কলেজ, জলন্ধর জেলা দলে যে সব মেয়ে খেলেছে তপতীর চেয়ে সবাই মাথায় অনেক উঁচু, স্বাস্থ্যসম্পদেও সম্পদশালিনী। এবং কে না জানে, স্বাস্থ্য এবং দেহের উচ্চতা ভলিবলে কতখানি বাড়তি সুবিধা দেয়। তপতী মাথায় মাত্র পাঁচ ফুট দেড় ইঞ্চি। আর একটু উঁচু হলে ব্লক করার সুবিধা হত। আধুনিক ভলিবলে ভাল ব্লকিং পয়েণ্ট পাবার বড় হাতিয়ার।

তবে তপতীর দোহারা দেহের গড়ন ভাল খেলার অন্তরায় নয়। বরং তাতে ওর সুবিধাই হয়েছে বেশি। রীতিমত আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলল, সিংহল দলই বলুন, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় দলই বলুন আর পাঞ্জাবের মেয়েদের বিরুদ্ধে খেলাই বলুন —কোন দলের সঙ্গে খেলার সময়ই শ্রমকাতরতা বোধ করিনি। স্ট্যামিনায় আমাকে কেউ কাবু করতে পারেনি। এই স্ট্যামিনার মূলে রয়েছে নিয়মিত ব্যায়াম, স্কিপিং এবং খেলার রেওয়াজ। তপতী রোজ খুব সকালে স্কিপিং করে, ব্যায়াম করে। তারপর পড়তে বসে। পড়ার পর স্নানাহার সেরে স্কুল। স্কুলের পর খেলা সেরে আবার পড়তে বসা। এর মধ্যে আবার সময় করে একটু নাচ-গানের চর্চা আছে।

তাই বলে কি ঘর-সংসারেরও কিছু কিছু কাজ করে না তপতী? নিশ্চয়ই করে। তপতীর কোচ শান্তিবাবু জানালেন, ওর বাবা ছা-পোষা মানুষ, সামান্য আয় তাঁর। বলতে গেলে ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রাম করেই তপতী ভলিবল খেলায় সুনাম অর্জন করেছে। স্কলারশিপের ওই ৫০ টাকা না পেলে ওর পড়াশুনো হয়তো বন্ধ হত না—কিন্তু পড়া চালানো কণ্টকর হত। ক্রীড়াগুণেই তপতীর বিদ্যার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

তপতীর বয়স সবে পনেরো। সুতরাং ওর জন্য আরও সুনাম ও সম্মান অপেক্ষা করছে। শান্তিবাবু বললেন, মফঃস্বলের পরিবেশ, অনুশীলন ও শিক্ষার অন্তরায় না হলে তপতী আরও পটু হয়ে উঠতে পারত। খোলা মাঠে শর্ট স্কার্ট পরে একদল পুরুষের উৎসুক দৃষ্টির সামনে অনুশীলন করতে মেয়েদের যে মানসিক জড়তা আছে সেটা এখনো সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবে আগের চেয়ে তপতী এখন অনেক সহজ ও সাবলীল। খেলার কায়দাকানুনও অনেক উন্নত। দিল্লিতে সাংবাদিক ও দর্শকরা ওর খেলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। প্যাট্রিয়ট পত্রিকা লিখেছে, হরবনস কাউরের এবারকার আসর মাৎ করেছে ক্যালকাটার 'টিন টজ' তপতী মণ্ডল তার উন্নত কলাকুশলতায়।

মুকুল

যুদ্ধের মধ্যে ও খেলাধুলো

ভারত ও পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধের ফলে জীবনযাত্রা কোথাও স্তব্ধ হয়নি, খেলাধুলোও না। ভারতের সর্বত্রই যথারীতি খেলাধুলো চলছে। এর মধ্যেই দিল্লিতে নেহরু হকি প্রতিযোগিতার খেলা হয়ে গেল। ব্যাংগালোরে শেষ হল দক্ষিণাঞ্চল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। বারনপুরে একাদশ ইসপাত অ্যাথলেটিকস ও সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপও আটকে থাকেনি। বোম্বাইতে যথারীতি চলছে রোভার্স কাপের খেলা। তা ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় রেস, রেসলিং, টেনিস, অ্যাথলেটিকস, ক্রিকেটের আসর তো চলছেই।

আবার মৃত্যুর সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়ছে সেই ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা গলাগলি ধরে ক্রিকেট খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব একাদশের হয়ে। এর থেকেই প্রমাণ মেলে খেলার মাঠ মহামিলনের পীঠস্থান। এখানে শত্রুর সঙ্গে গলাগলি করেই মানুষ আনন্দের উপকরণ খোঁজে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এর ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলেছে। যদিও বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালের বিশ্ব-অলিম্পিক হতে পারেনি, বিশ্ব ফুটবল, টেস্ট ক্রিকেট, উইম্বলডন টেনিস প্রভৃতি বড় বড় খেলার আসর বন্ধ ছিল, তবু খেলার আঞ্চলিক আসর কিন্তু বন্ধ থাকেনি। এমন কি অলিম্পিক কংগ্রেসের অধিবেশনও হয়েছে যথারীতি, যেখানে জার্মান, রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিও যোগ দিয়েছেন। ক্রীড়া আসরের মধ্যে সবাই খুঁজেছেন সাম্য মৈত্রীর বাণী।

কিন্তু পাকিস্তানের কথা স্বতন্ত্র। যখন যুদ্ধের কোন উত্তেজনা ছিল না, বাংলা দেশ সমস্যারও উদ্ভব হয়নি তখনই পাকিস্তানের পিপলস পার্টির কর্মকর্তারা ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বসল। ঘোষণা করল, আগে কাশ্মীর পরে হকি। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে ভারতের

খেলোয়াড়দের তারা পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে দেবে না। তাই প্রথম বিশ্ব হকি কাপের যে খেলা গত ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে হবার কথা ছিল বিশ্ব হকি সংস্থাকে তা স্থগিত রাখতে হল। পরে সেই খেলা হল স্পেনের বার্সিলোনা শহরে।

খেলার ব্যাপারে পাকিস্তানের নষ্টামির আরও প্রমাণ আছে। বার্সিলোনায় বিশ্ব কাপের খেলার পরই খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি রাজ্য সভাতেও প্রশ্নটি উঠেছে।

ব্যাপারটি আর কিছুই নয় হকি খেলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের কুমতলব। বিশ্ব হকি কাপটি তৈরি করার ভার পেয়েছিল পাকিস্তান। বহু অর্থ ব্যয় করে এবং আকর্ষণীয় করেই পাকিস্তান ট্রফিটি তৈরি করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে এক রাজনৈতিক চাল। ট্রফিটির পাদপীঠে যে বিশ্ব প্রতীকটি রয়েছে তার মানচিত্রে কাশ্মীরকে দেখানো হয়েছে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে। বার্সিলোনায় ভারতীয় হকি ফেডারেশনের প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার কাছে এই কুমতলবের যথারীতি প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ট্রফিটি তখন পাকিস্তানের দখলে চলে যায় সেহেতু মানচিত্রের ওই ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। রাজ্য সভায় শ্রী কে সি পান্ডার একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্র পাল সিং জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা এই বলে ভারতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে ট্রফিটি তাদের দপ্তরে ফিরে এলে মানচিত্রের ওই ত্রুটি সংশোধন করা হবে। সম্ভব হলে আগেও সংশোধন করা হতে পারে। এজন্য নাকি পাকিস্তানকে অনুরোধও জানানো হয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তান কি সে অনুরোধে সাড়া দেবে? অস্বীকার করার উপায় নেই, পাকিস্তান কাশ্মীরের খানিকটা অংশ জোর করে দখল করে রয়েছে। আমি ভাবছি বিশ্ব হকি কাপের মানচিত্রে ওই অংশটুকুও কি পাকিস্তানের বজায় থাকবে? না যুদ্ধের ফলে পুরো কাশ্মীরটাই ভারতের দখলে আসবে? আগে কাশ্মীর পরে হকি যাদের ছিল মুখের বুলি বিশ্ব হকি কাপের মানচিত্র হতে পুরো কাশ্মীরটাই তাদের উবে যাবার উপক্রম।

এয়ারলাইনস নেহরু হকি বিজয়ী

ব্রিটেনকে ২—০ গোলে ফাইনালে পরাজিত করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস দল নেহরু হকি প্রতিযোগিতা জয় করেছে। এর আগে ১৯৬৮ সালে নিখিল ভারত পুলিস দলের সঙ্গে এয়ারলাইনস দল যুগ্মভাবে নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়।

এয়ারলাইনস একদিক দিয়ে শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে ১—০ গোলে, গতবারের বিজয়ী নিখিল ভারত পুলিস দলকে ১—০ গোলে এবং একদিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করার পর ওয়েস্টার্ন রেলকে টাই ব্রেকার নিয়মে ৪—২ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপর দিক দিয়ে ব্রিটেন ফাইনালে ওঠে রাজস্থানকে ২—০ গোলে, মহীশুরকে ৫—১ গোলে এবং জলন্ধরের কোর অফ সিগন্যালকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় এবারকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ব্রিটেন এবং মালয়েশিয়া দলের অংশগ্রহণ। মিউনিখ অলিম্পিকে যাবার প্রস্তুতি হিসাবেই ব্রিটেনের হকি দল ভারত সফরে আসে। ভারতের সঙ্গে চারটি বেসরকারী টেস্ট খেলায় তারা পরাজিত হলেও নেহরু

হতে মন্দ খেলেনি। বিশেষ করে যে প্রতিযোগিতায় ভারতের সমস্ত শক্তিশালী হকি দল অংশ গ্রহণ করেছিল সেই প্রতিযোগিতায় রানার্সের সম্মান লাভ তাদের কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। তবে মহীশূর এবং কোর অফ সিগন্যালের সঙ্গে ব্রিটিশ দল ভাল খেললেও ফাইনালে এয়ারলাইনসের খেলোয়াড়দের উন্নত কলাচাতুর্যের বিরুদ্ধে তাদের দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলতে দেখা যায়। এয়ারলাইনসের পক্ষে দুটি গোলই করে ইনাম-উর-রহমান।

একটু আগেই যুদ্ধের মধ্যে খেলাধূলোর কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। এয়ারলাইনস ও ব্রিটিশ একাদশের ফাইনাল খেলার সময়ই দিল্লীতে বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি বেজে ওঠে। ফলে ২ মিনিট খেলা বন্ধ রাখতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিমান আক্রমণ হয়নি, খেলাও বন্ধ থাকেনি। যাই হোক, নেহরু হকিতে অংশ গ্রহণকারী অপর বিদেশী দল মালয়েশিয়া বেশ শক্তিশালী দল হিসাবেই পরিচিত। খেলার প্রথা-প্রকরণ সবই ভারতের মত। ভারতীয় কোচের কাছ থেকে খেলা শিখেই তারা হাত পাকিয়েছে। কিন্তু ভারতের মাটিতে এসে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম খেলায় বারাণসীর ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস দলকে তারা ২—০ গোলে পরাজিত করতে সমর্থ হলেও কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্টার্ন রেলের কাছে ২—০ গোলে পরাজিত হয়।

কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের রানার্স নর্দার্ন রেল এবং কোর অফ সিগনালের খেলাটি ছিল প্রতিযোগিতার সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ও আকর্ষণীয় খেলা। খেলাটি দুই দিন অমীমাংসিত থাকার পর তৃতীয় দিন টাই ব্রেকার নিয়মে সিগনাল দল ৪—৩ গোলে বিজয়ী হয়। বহু উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে গড়া নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় দলের মহীশূরের কাছে পরাজয় প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

বেসরকারী টেস্ট

আমন্ত্রণকারী অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড অবশ্য বেসরকারী টেস্ট বলতে নারাজ। তারা অস্ট্রেলিয়া ও বাছাই বিশ্ব একাদশের এই বিশেষ খেলাকে বলছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। যাই হোক, সারা বিশ্ব একে বেসরকারী টেস্ট হিসাবেই গণ্য করছে। ব্রিসবেনে প্রথম খেলাটির ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। খেলাটির উল্লেখযোগ্য ঘটনা বোলারদের উপর ব্যাটসম্যানদের বিশেষ আধিপত্য বৃষ্টিভেজা পিচেও। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য কয়েকবার খেলায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলা আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হয় নির্ধারিত সময়ের ১১১ মিনিট

গ্রেট ব্রিটেনের দূর পাল্লার দৌড়পটিয়সী রিটা রিডলে সম্প্রতি লণ্ডনের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসের এক দৌড় প্রতিযোগিতায় ১৫০০ মিটারে নতুন ব্রিটিশ রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে

পরে। শুধু তৃতীয় এবং পঞ্চম দিন পুরো সময় খেলা হয়েছে।

তবে আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়াই যদি ক্রিকেট খেলার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তবে সেদিক দিয়ে ব্রিসবেনের এই প্রথম বেসরকারী টেস্টকে সার্থক বলা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যাকপোল, চ্যাপেল, ওয়াল্টার্স যেমন ব্যাটের বিক্রমে বোলারদের ম্রিয়মাণ করে রেখেছেন, তেমন বিশ্ব একাদশের একারম্যান ও রোহন কানহাই বোলারদের মেরেছেন হাত খুলে। সবচেয়ে সফল ভূমিকা অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলের যিনি দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন। প্রথম ইনিংসে চ্যাপেল ও স্ট্যাকপোলের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ১৪৯ মিনিটে ১৬০ রান যোগ প্রাণবন্ত উজ্জ্বল ক্রিকেটের নিদর্শন। বিষেণ সিং বেদীর বলে দুটি ওভার বাউণ্ডারি ও মোট ১৭টি বাউণ্ডারি মেরে স্ট্যাকপোল ১৩২ রান করেন। চ্যাপেলের ১৫৪ রানের মধ্যে ছিল ১৮টি বাউণ্ডারি।

বৃষ্টিভেজা পিচে বোলাররা সফল হবেন এই আশায় বিশ্ব একাদশের অধিনায়ক গ্যারি সোবার্স টসে জিতেও অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে দেন। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। অস্ট্রেলিয়া প্রথম দিন ৩ উইকেটে ২২২ রান তোলে। তৃতীয় দিন (দ্বিতীয় দিন খেলা হয়নি) ৪ উইকেটে ৩৮৯ রান তুলে তারা ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে বিশ্ব একাদশ দিনের শেষে করে ১ উইকেটে ১৬২ রান। কিন্তু চতুর্থ দিন ৪ উইকেটে ২৮৫ রান তুলে, অস্ট্রেলিয়ার রানের চেয়ে ১০৪ রান পিছিয়ে থেকেও সোবার্স ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই ২৮৫-র মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার একারম্যান এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কানহাইয়ের সেঞ্চুরি উল্লেখের দাবি রাখে।

শেষ দিন অস্ট্রেলিয়া দল ৩ উইকেটে ২২০ রান তুলে যখন দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তখন খেলার উপর যবনিকা পড়ার বাকি ছিল মাত্র ১৫৩ মিনিট, বাছাই একাদশের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩২৫ রান। সুতরাং ফলাফলের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। খেলার ফলাফল থাকে অমীমাংসিত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৪ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড ৩৮৯ (কিথ স্ট্যাকপোল ১৩২, ইয়ান চ্যাপেল ১৪৫, ডাগ ওয়াল্টার্স নট আউট ৭৫)

বাছাই বিশ্ব একাদশ—প্রথম ইনিংস ৪ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড ২৮৫ (একারম্যান ১১২, রোহন কানহাই ১০১, সুনীল গাভাসকার ২২)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড ২২০ (ইয়ান চ্যাপেল ১০৬, ইয়ান রেডপাথ নট আউট ৫৬, কিথ স্ট্যাকপোল ৩৯)

বাছাই বিশ্ব একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—৪ উইঃ ১০৮ (জাহিদ আব্বাস ৩২; লিলি ৩৮ রানে ২ উইকেট)

একলব্য

জাতীয় পুরস্কার

কানাড়া-চিত্র "সংস্কার" ১৯৭০ সনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পেয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র সত্যজিৎ রায়-কৃত বাংলা ছবি "প্রতিদ্বন্দ্বী"।

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার প্রবর্তনের পর এ নিয়ে শ্রীরায় তিনবার ওই পুরস্কারটি পেলেন। যেবার পাননি সেবার তাঁর ছবিও ছিল না।

মান্না দে শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের পুরস্কার পেয়েছেন (নিশিপদ্ম)। উল্লেখ করা যেতে পারে এ-যাবত কোন শিল্পী দুবার এই পুরস্কার লাভ করেন নি।

মান্না দে—শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের পুরস্কার দুবার

শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকার পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (জয়-জয়ন্তী)।

ভরত ও উর্বশী পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে "দস্তক" চিত্রের নায়ক-নায়িকা সঞ্জীবকুমার ও রেহানা সুলতান। ওই ছবিরই সংগীত পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন মদনমোহন। শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন ঋষি কাপুর (মেরা নাম জোকার)। শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রের পুরস্কার পেয়েছেন সাদা-কালো ছবিতে কে কে মহাজন, রঙীন ছবিতে রাধু কর্মকার। জাতীয় সংহতির জন্য মালয়ালম ছবি "থুরাখাথা ভাথিল" পুরস্কার পেয়েছে।

ফেস্টিভ্যালের ছবি

পোলিশ চিত্রে প্রেমের কাহিনী এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রেমেরই গল্প য়োভিতা, এ-ছাড়া কিছু নয়। পরিচালক জানুজ মরগেনস্টার্ন য়োভিতা-র গল্পে অবশ্যই আধুনিক পোলাণ্ড সমাজজীবনের আভাস দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মূল বিশ্লেষণের বস্তু নর-নারীর প্রেম। ছবির নায়ক মারেক (ডানিয়েল অলব্রিক্রিস্কি) একজন বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান। ভাস্করের কাজও সে করে। নিজের পেশার দিকে তার মন নেই, সে সার্থক প্রেমের স্বপ্ন দেখে। একজন প্লেবয়ের মনে ভালবাসার জন্ম—এটাই কাহিনীর মূল বিষয়। মারেক ড্রেস-বল থেকে রোজই একজন শয্যাসঙ্গিনী নিয়ে আসে। একদিন সে নিজেও বুঝি ক্লান্ত, সে চায় সত্যিকারের ভালবাসা। ড্রেস-বলেই রহস্যময়ী য়োভিতার সঙ্গে তার দেখা। য়োভিতার দুই চোখই সে দেখেছে, চেহারা নয়। সেই থেকে মারেক য়োভিতাকে খুঁজে বেড়ায়। ইতিমধ্যে এগনিয়েজকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এগনিয়েজকা বলেই দিয়েছে—আমি ওই ধরনের মেয়ে নয় যাদের তুমি ড্রেস-বল থেকে নিয়ে আস।

সত্যজিৎ রায়—শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার তিনবার

মারেক এগনিয়েজকাকে ভালবেসেছে। কিন্তু এগনিয়েজকা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে অন্য একজনকে। পরিশেষে মারেক জানতে পারে, এগনিয়েজকাই য়োভিতা হয়ে তাকে দেখা দিয়েছিল। এগনিয়েজকা বলেছে মারেককে, তোমার গভীর ভালবাসার ভার আমি বইতে পারব না তাই অন্যকে বিয়ে করেছি। গল্পটা মিলনান্ত হলে পরিচালকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না, মারেকের ফ্রাস্ট্রেশন ও তিক্ততা বোঝানো যেত না। মারেক ভালবাসা না পেয়ে রীতিমত ক্ষেপে ওঠে। সে মারতে যায় এমন এক মহিলাকে যে

পোল্যাণ্ডের ছবি "য়োভিতা"

অগ্রদূত পরিচালিত "সোনার খাঁচা" ছবিতে অপর্ণা সেন
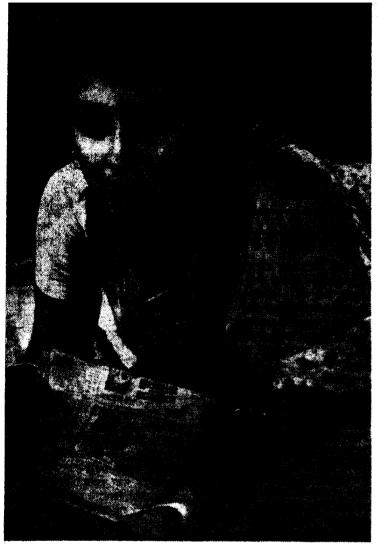
বঞ্চনা করেছিল মারেকেরই এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে। শেষে আত্মশুদ্ধির জন্য তৈরি হয় মারেক। রেস্তোরাঁয় ওই মহিলাকে আক্রমণ করার পর সে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। জেলেই তার সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করে এগনিয়েজকা।

জানুজ মরগেনস্টারন স্পষ্টতই এক অতৃপ্ত ও অশান্ত জীবনের পরিচয় দিতে চেয়েছেন তাঁর ছবিতে। তবে শেষে নায়কের আত্মশুদ্ধির স্পৃহা বা নতুন করে জীবন আরম্ভ করার সংকল্প অথবা তার উত্তরণের মধ্যে অতৃপ্তি বা যন্ত্রণা স্বভাবতই স্তব্ধ হয়ে গেছে। জটিলতার জায়গায় সরলীকরণ দেখা গেল। মরগেনস্টারনের পরিচালনায় কাজ আধুনিক, ক্যামেরা ও এডিটিংয়ের মধ্য দিয়ে তিনি দৃশ্যত অনেক কিছু দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

সম্প্রতি ভারত সরকার আয়োজিত পোলিশ চলচ্চিত্র উৎসবে মরগেনস্টারনের আর একটি ছবি "অ্যান্ড অল উইল বি কোয়ায়েট' তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এই যুদ্ধবিরোধী চিত্রে ১৯৪৪ সনের পোলাণ্ডকে দেখানো হয়েছে। ওই সময়ে পোলাণ্ডের বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল দুই শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই দেখানো হয়েছে। শেষের বক্তব্য—পোলাণ্ডের জার্মান প্রতিরোধের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা।

একই সময়ের পটভূমিতে তোলা ফেস্টিভ্যালের অপর একটি ছবি, এ ফোর্ড পরিচালিত 'দ্য ফার্স্ট ডে অব ফ্রিডম"-এ বরং একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গল্পের আমেজ আছে। এ ছবিতে একজন পোলিশ অফিসর শুধুই মানবিক বোধে পরিচালিত হয়ে এক জার্মান পরিবারের উপকার করতে চেয়েছে। পরিচালক অবশ্য শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছেন, অন্ধ গোঁড়ামি মানুষের মহত্ত্বকেও জানতে বুঝতে পারে না। জার্মান ডাক্তারের বড় মেয়ে তার পূর্ব প্রণয়ীকে ছাড়তে পারে না। অথচ পোলিশ অফিসরের আশ্রয় ছেড়ে প্রণয়ীর কাছে এসেও সে যে মর্যাদা পেয়েছে তা নয়। পোলিশদের আক্রমণ করতে গিয়ে তাকে প্রাণও দিতে হল।

একজনের স্বাধীনতালাভ অপরের স্বাধীনতা হরণ করে—এই বক্তব্যটা ছবিতে স্পষ্ট করে তুলেছেন পরিচালক। তাঁর বিচার পক্ষপাতশূন্য। স্বাধীনতার প্রথম দিনে জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে সদ্যোমুক্ত যে-কয়েকটি ব্যক্তির আচরণে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গেছে তারা পোলাণ্ডেরই। অন্যদিকে জার্মান পরিবারের রক্ষায় অনেক বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে এসেছে একজন পোলিশ অফিসর। ছবির প্রধান চরিত্র জার্মান ডাক্তারের বড় মেয়ে ইংগা। ইংগার ট্রাজেডি ছবিতে গল্পের আস্বাদ নিয়ে এসেছে। সে একবার ধর্ষিতা হবার পর পোলাণ্ডকে হয়ত আর বিশ্বাস করতে পারেনি। সে চলে গেছে স্বজাতি অটোর কাছে। অটোর কাছেও ইংগা ধর্ষিতা, ইংগার সেই একই আর্তনাদ। অটো মারা যাবার আগে অস্ত্র তুলে দিয়ে যায় ইংগার হাতে। ইংগা মরেছে সেই পোলিশ অফিসারের হাতে যে তাকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। এইখানেই ইংগার ট্রাজেডি, এইখানেই ফোর্ডের ছবির কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য।

"অর্চনা"-র মুক্তি আসন্ন

সাহা ফিল্মসের "অর্চনা" ছবিটি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। এখন মুক্তির প্রতীক্ষায়। সুখেন দাসের চিত্রনাট্য অবলম্বনে (মূল কাহিনী : হিরণাভ সেনগুপ্ত) ছবিটি পরিচালনা করেছেন পীযূষ গাঙ্গুলি। মাধবী চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অনুভা ঘোষ, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুবীর সাহা প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন অজয় দাস।

মুক্তি প্রতীক্ষায় "সংসার"

নর্মদা পিকচার্সের "সংসার" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। মঞ্চসফল নাটক "স্বীকৃতি"-র এই চিত্ররূপ পরিচালনা করেছেন সলিল সেন। কাহিনী তাঁরই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বসন্ত চৌধুরী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, দমিতা বিশ্বাস, জহর রায় প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই বিচিত্রা

যাদের কপাল ভাল, তাঁরা এ জগতে একাই-এক-শাল। আমাদের এই চিত্র-জগতে যাঁরা বিচিত্রভাবে সফল এবং সার্থক তাঁরা সকলেই শেষ পর্যন্ত ভাগ্যবাদী অর্থাৎ কপালে বিশ্বাসী। এই কপালের বিশ্বাস মানুষকে কিভাবে নিজের যোগ্যতার ওপর আস্থাহীন এবং ভাগ্যে বিশ্বাসী করে তোলে তার একটা উদাহরণ আপনাদের শোনাই। শুনেই যা পড়তে গল্পোগাল্প বা আজব লাগতে পারে, কিন্তু আসলে ঘটনাটা "প্রতি সপ্তাহে যেন প্রকাশিত হয়" এই ঘটনার মত সত্য।

ঘটনাটা ঘটেছে একজন নামকরা নায়ককে কেন্দ্র করে। আপনারা, যাঁরা নিয়মিত হিন্দী ছবি দেখেন, তাঁরা জানেন, আমাদের নায়ক-দের চুল কখনো ছোট বড় হয় না! অর্থাৎ যে-কোনো অবস্থাতেই নায়কদের কেশসজ্জা যেমনটি দিয়ে শুরু হয়, তেমনটিই থাকে। অর্থাৎ এক-নাগাড়ে দিন পর দিন দাড়ি কামান নায়কেরা এক-নাগাড়ে দিন অন্তর চুলও ছেঁটে থাকেন। অর্থাৎ কোনো এক কেশ-কর্তক বা কেশশিল্পী (নাপিত নয়) সপ্তাহে তিন-চার বার নামকরা হিরোর মাথা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে থাকেন। বলাই বাহুল্য যে বিশেষ নামকরা নায়কের কেশশিল্পী অন্য কারুর কেশস্পর্শ করেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব কেশশিল্পীরা প্রযোজকদের পয়সা-পালিত হন। কিন্তু ঐ নামকরা নায়ক ছাড়া এই কেশশিল্পীরাও অন্য কারুর তোয়াক্কা করেন না। করার দরকারও হয় না। কারণ প্রযোজক যদি নিয়মিত পয়সা না দেন, তা-হলে নামকরা নায়ক শুটিং-এ অনুপস্থিত থেকে জানাবেন কেশ নিয়ে তো আর শুটিং করা যায় না! সুতরাং যথা সময়ে হিরোর কিস্তির সঙ্গে সঙ্গে কেশশিল্পীর কিস্তিও খুব প্রয়োজনীয়, নইলে কাজের ব্যাঘাত হয়।

কয়েক মাস আগে এই ধরনের একজন কেশশিল্পী একটি ছবি প্রডিউস করবেন ঠিক করেন। বলাই বাহুল্য যে, সে ছবির নায়ক হবেন সেই নামকরা নায়ক যার কেশ উক্ত কেশশিল্পীর হাতে লালিত পালিত। কিন্তু যথাসময়ে উক্ত নামকরা নায়ক আলোচ্য কেশশিল্পী প্রযোজকের ছবিতে কাজ করতে অস্বীকার করেন। ফলে কেশশিল্পী ঐ নামকরা নায়কের কেশ কর্তন করতে নারাজ হন। এই নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ হয় এবং শেষ অবধি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সংবাদ শুনে সকলে হায় হায় করে ওঠে। সকলেই কেশশিল্পীকে উপদেশ দিতে চায়। 'এমন মজার চাকরি,' 'সপ্তাহে দু ঘণ্টা কাজ, মাসে তিন-চার হাজার রোজগার', 'এমন লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠ্যালে!'

কিন্তু কেশশিল্পী নির্বিকার। সে বললো, "ঐ নামকরা নায়ক এতকাল আমার কপালে করে খাচ্ছিলো, আর আমি যখন ছবি করতে চাইলাম, তখন আমাকেই না বললো—! এমন অকৃতজ্ঞের সঙ্গে কেউ কাজ করে? দেখি, এখন নিজের কপালে কি হয়!"

কথাটা কানাকানি হতে হতে পরিষ্কার হল। জানা গেল যে, ঐ নামকরা নায়ক যে ছবি করে প্রথম নাম করে, সেই ছবির শুরু থেকেই আলোচ্য কেশ-শিল্পী ঐ নামকরা নায়কের কেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন এবং সেই সুবাদে তিনি ভাবছেন যে, ঐ নামকরা নায়কের উন্নতির পেছনে এই কেশশিল্পীর কপাল জড়িত। কিন্তু নায়ক সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। একটি ছবি ঐ কেশশিল্পী ছাড়াই হল। এল নতুন কেশশিল্পী। তারপর সেই ছবি রিলিজ হল। এবং প্রাক্তন কেশশিল্পীর কপালগুণে আমাদের নামকরা নায়কের ছবিটি হয়ে গেল ফ্লপ্। যেই এ সংবাদ পাওয়া অমনি সঙ্গে আমাদের কেশশিল্পী সপরিবারে কাশ্মীর ভ্রমণে চলে গেলেন। ছবি ফ্লপ্ হওয়া এবং কেশশিল্পীর কাশ্মীর ভ্রমণে যাওয়ার কথা হু হু করে রটে গেল বাজারে। নামকরা নায়কের যে ছবিটি ফ্লপ হয়েছে, সেটি প্রথম রিলিজ হয়েছিল বোম্বাইয়ের বাইরে এবং নায়ক সেই প্রিমিয়ার অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরলেন, তখন ফিল্মিমহল বোম্বাইয়ে কেশশিল্পীর কপাল সম্পর্কিত গুজব থৈ থৈ করছে। নামকরা নায়ক শুনলেন যে, তাঁর প্রাক্তন কেশশিল্পীকে হাত করতে বেশ কয়েকজন ফ্লপ নায়ক এবং দু-একজন উঠতি নায়ক ইতিমধ্যেই কাশ্মীর রওনা হয়ে গেছেন! একথা কর্ণগোচর হওয়া মাত্র নামকরা নায়কের সঙ্গে কয়েকজনের চামচা বিচ্ছেদ হয়ে গেল! কারণ এই চামচারা কেশশিল্পীকে হটানোর সময় নামকরা নায়কের সমর্থন করেছিলেন (একজন মাদ্রাজী চামচা নেপথ্যে বললেন, আমরা তখন একমত না হলে, বিচ্ছেদটা তখনই হত)।

কেশশিল্পী এবং তার কপালকে কেন্দ্র করে যা ঘটলো, তাকে শুধু আবার 'সংকট' বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। অনেক-গুলি শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। অনেক চামচা বেকার হয়ে গেল। অনেক উপদেশদাতা উপ-দেশ দিতে ভুলে গেল। শেষ অবধি নামকরা

আই এস জোহরের "জয় বাংলাদেশ" ছবির একটি দৃশ্য। ছবিটি এখন চলছে

"ম্যায় তেরা তু মেরা" (পরিচালনা : বি আর ইশরা) ছবিতে শত্রুঘ্ন সিন্‌হা ও উর্বশী পুরস্কারে ভূষিতা রেহানা সুলতান

নায়ক কয়েকজন প্রযোজক এবং খাস সেক্রেটারী সমেত কাশ্মীর চলে গেলেন।

কিছুদিন বাদে কেশশিল্পী (কপাল সমেত) ফিরে এলেন। আবার 'যথাপূর্বম্' কজ আরম্ভ হল। কেশশিল্পীর কদর আরও বাড়ল। সে এখন আবার ছবি প্রডিউস করতে তৎপর। তার কপালের কাহিনী শুনে ফাইনানসাররা নাকি সকাল বিকেল তার চামচাগিরি করছে। শোনা গেল ডিস্ট্রিবিউটার মহলেও নাকি এ খবরটা পৌঁছেছে। সেই খবর শুনে নামকরা নায়ক নিজস্ব খরচায় বিরাট এয়ারকণ্ডিশন অফিস তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন কেশশিল্পী প্রডিউসারের জন্য। শোনা গেল কেশশিল্পী প্রডিউসার কয়েকজন পরিচালককে তাদের অযত্ন লালিত কেশ বিন্যাসের জন্য বাতিল করেছেন। এ খবর শোনার পর নানান ডিপার্টমেন্টের লোকের ভিড়ে স্টুডিও অঞ্চলের সেলুনগুলিতে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। সবই কপাল!

সরল শর্মা

শুটিং শুরু

অসীম পালের প্রযোজনা ও পরিচালনায় "বিনয় বাদল দীনেশ" ছবির কাজ সম্প্রতি সংগীত গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। অসীমা ভট্টাচার্যের সংগীত পরিচালনায় মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছবির গান করেন। মহরৎ অনুষ্ঠানে প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় উপস্থিত ছিলেন।

বাদল পিকচার্সের আলোয় ফেরা ছবি শুটিং এগিয়ে চলেছে। অজিত গাঙ্গু ছবির কাহিনীকার-পরিচালক। সৌমি চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণ তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, হাসু ব্যানার্জি বিদ্যা রাও, প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রভৃতি ছব বিশিষ্ট শিল্পী। নচিকেতা ঘোষ সংগী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বেবী ফ্লুন প্রোডাকসন-এর স্ত্রী ছবি গান রেকর্ড করা হয়েছে। নচিকেতা ঘোষে সুরে ছবিতে প্রধানত মান্না দে ও হেম মুখোপাধ্যায়ের গান থাকবে। বিমল মিত্র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছে সলিল দত্ত। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যা ও আরতি ভট্টাচার্য ছবির তিন প্রধা শিল্পী।

শিল্পীর লোকান্তর

শ্রীমতী দেবারতি সেন (৪৪) গত ২০ নভেম্বর অল্পকাল রোগভোগের পর সে সুখলাল করনানি হাসপাতালে মার গেছেন। তিনি ফিল্মে অভিনয় করেছেন। "ছুটি" ও "জাদু" ছবিতে। তাঁর অভিনয় দর্শকদে প্রশংসা অর্জন করে দুটি মু প্রতীক্ষিত ছবিতে —"অপর্ণা" "প্রতিবিম্ব" ছবিতে

দেখা যাবে। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সংগী পরিচালক কালিপদ সেনের স্ত্রী।

চিৎপুর-চিত্র

আমি মুজিব বলছি

দুই চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্যে অবাক হয়ে দেখবার মতন। মুখের আদল হুবহু এক, মাথায় ব্যাকব্রাশ করা সেই সাদাকালো ঘন চুল, কাঁচাপাকা গোঁফ, গালে আঁচিল এবং পোশাকে আশাকেও বাস্তবের মুজিবুর রহমান ও যাত্রার আসরের মুজিবের মধ্যে বাস্তবিক কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। সাজঘর থেকে তাই যতবার 'আমি মুজিব বলছি'র মুজিব আসরে প্রবেশ করেছে, অমনি দর্শকমহলে শুরু হয়েছে গুঞ্জরণ। প্রচণ্ড আবেগে ফেটে পড়তেও দেখেছি দর্শকদের। অতএব নিউ প্রভাস অপেরার এই নতুন পালাটির বিশেষ আবেদন ও তার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আর প্রশ্ন ওঠবার কথা নয়।

কিন্তু 'আমি মুজিব বলছি' কেবল মুজিবের ব্যক্তিগত কাহিনী নয়। প্রযোজক সংস্থা বলেছেন 'মুজিবের মুখের কথায় মুক্তির কাহিনী'। অতটা না বলে বলা যেত: মুজিবের মুখের কথায় বীর বাঙালী জাতির কাহিনী। পালায় আমরা শান্ত মুজিবকে দেখেছি, উত্তেজিত মুজিবুর এবং তার অশান্ত রূপও ক্ষণিকের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। সর্বত্রই কিন্তু এই মানুষটির মুখে একই কথা ছিল। সে কথা বাংলা-ভাষার কথা, বাঙালী জাতির স্বাধীনতার কথা। সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশের মানুষের উদ্দেশ্যে ওই কণ্ঠে যতবার উচ্চারিত হয়েছে: শোনো ভাই সব, শোনো বাঙালী, আমি মুজিব বলছি—ততবার হাজার হাজার দর্শক সোল্লাসে সাড়া দিয়েছে।

কেবল মুজিবুর নন, পালাকার পরিচালক অরুণ রায় ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশের ঘটনাকে এমন কৌশলে সাজিয়েছেন যে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশের অবস্থার প্রেক্ষাপটে দুই দেশের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেই এসেছে ইয়াহিয়া, টিক্কা খান প্রভৃতি। এখানে আয়ুবশাহী খতমের একটি চক্রান্ত-দৃশ্য প্রতিষ্ঠিত। ওই সঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল ইয়াহিয়া ও টিক্কা চরিত্রের আসল রূপের। পালাকাহিনী এগোলে, ক্রমশ ওই দুটি চরিত্রের নারকীয় রূপ প্রকাশ পেয়েছে। দর্শক এখানে প্রবল ঘৃণায় মুখ বিকৃত করেছেন সত্যি, কিন্তু সমগ্র পালাটির আক্ষন সব ক্রিয়াকাণ্ড আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করার উন্মাদনায় ভাটা পড়তে দেখিনি। এটা নিশ্চয়ই প্রযোজনার গুণ। এবং অভিনয়েরও। বলতে দ্বিধা নেই পাকা সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে

"শেষ পর্ব" (পরিচালনা : চিত্ত বসু) ছবিতে মিঠু মুখোপাধ্যায়

দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখার এই দুর্লভ যাদু নিউ প্রভাস অপেরার শিল্পীদের করায়ত্ত।

অভিনয় প্রযোজনা ও তার প্রয়োগ উদ্বোধনেই সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। এখানে অত আবেগ, বাঙালীদের ওপর অত নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচারের দৃশ্য দিয়ে ভোলানো সত্ত্বেও মনে হয় কাহিনীর ক্যানভাস এত বড় না হলেই বোধ হয় ভাল হত। নাট্য প্রযোজনায় বোধ হয় একটা অলিখিত শর্ত থাকে: কারও কথা উল্লিখিত হলে বা ক্ষণিকের জন্য মঞ্চে কেউ এলে তার পরিণতি দেখানোর দায়িত্ব। অরুণবাবু কৌশলে তা অস্বীকার করতে চাইলেও দর্শকমনের ফাঁকটুকু ভরিয়ে দিতে পারলেন না। আবহ যদি আরও জীবন্ত ও সরব হত তবে, প্রয়োগের দিকটি আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারত। ছোটখাটো এ ধরনের ত্রুটি আছে, এবং তা সংশোধনযোগ্যও। এ প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, পালার প্রথম অভিনয় নিশ্চয় সব দোষত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। নির্দেশকের প্রতি অনুরোধ সংশোধনকালে তিনি যেন এর সংগীতাংশের সুসংযোজনের কথাও ভাবেন।

মূল অর্থাৎ মুজিব চরিত্রের সফল রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে আগে। ওই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজকুমার (ওঁর কথায় একটু পূর্ববঙ্গীয় টান রাখলে কি ক্ষতি হত?)। এই শিল্পীর অভিনয়ে আবেগের প্রাধান্য। যাত্রাগানে কিন্তু 'আবেগ' একদা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে পরিগণিত হত। এই অতি আবেগে কোথাও কোথাও শিল্পীকে ক্লান্ত মনে হবে। তবু 'মুজিব' চরিত্রকে প্রাণবন্ত করতে তার আপ্রাণ চেষ্টা আগাগোড়াই কাজ করে গেছে। পালায় হিন্দু-মুসলমানের য ক্ষো কা য [illegible]

বাংলাদেশের ছবি "জীবন থেকে নেয়া" (পরিচালনা : জহির রায়হান) ছবিতে রজ্জাক

সাধনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে অমূল্য ভট্টাচার্যের 'ভার্গব', মুকুন্দ ঘোষের 'মৌলবী', জয়ন্তকুমারের 'হোসান', অনাদি চক্রবর্তীর 'প্রলয়' বিস্ময়কর দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে। ইয়াহিয়া ও টিক্কা চরিত্রে রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় দে ও সাধন দাশগুপ্ত। ব্যক্তিত্বের চাইতে বাঙ্গই যেন এখানে প্রকট। এবং তা দর্শক উপভোগও করেছেন। জঙ্গীশাহীর তাঁবেদার 'রহমৎ' চরিত্রটি ডর্ক। এই খলনায়ক রূপে অভয় হালদার প্রায় তুলনারহিত। রাধারমণ পালের 'ইয়াকুব'-এর রিলিফ অংশের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। কল্যাণী ভট্টাচার্যের 'রোশেনারা', রীতা সেনের 'বাণী', প্রতিমা ভট্টাচার্যের 'নূরন্নেসা' ও কামনা দত্তর 'জবেদা' সুচিত্রিত। ফাদার-সাহেব চরিত্রে ননী ভট্টর সংযত অভিনয় মনে রাখার মতন।

—সূত্রধার

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

লোকায়ন-গোষ্ঠী অবনীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অবন-মহলে "ভুত-পত্রীর যাত্রা" অভিনয় করছেন আগামী ১৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। অরুণ রায় নাটক পরিচালনা করছেন।

* * *

নবগঠিত নাট্য সংস্থা টোটাল থিয়েটার ১২ ডিসেম্বর সকালে মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় করছেন অমৃতলাল বসুর চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে। রথীন সাহা নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

টেকনিক স্কুল অব মিউজিক তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবের আয়োজন করেছেন আগামী ১৬ ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে। উৎসবে অন্যান্য নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একক নজরুলগীতি গান ও পিন্টু ভট্টাচার্যের আধুনিক গানের আয়োজন করা হয়েছে।

* * *

মহিলা সমিতি বৈঠকী তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে (রবীন্দ্র সদন, ১৪ নভেম্বর) পরিবেষণ করেন পিপলস লিটল থিয়েটারের নাটকাভিনয় "টিনের তলোয়ার"। ওই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যে এক হাজার টাকা দান করা হয়।

* * *

শ্রীনাট্যমের পরিচালনায় সুভাষ-মঞ্চের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে শিশির একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে। যোগদানের শেষ তারিখ ২৫ ডিসেম্বর। যোগাযোগের জন্য ঠিকানা : কালীশ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস অব ইন্ডিয়া, ৮৯ বিধান সরণি, কলিকাতা-৪।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলা নাট্যশালার একশত বৎসর পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে সভাপতি করে এই উদ্দেশ্যে এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে। উৎসবের যে কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে তার প্রথম অনুষ্ঠান প্রাক্‌শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে মিনার্ভা রঙ্গম রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কু সর্বস্য" নাটক অভিনয়। পরবর্তী অনুষ্ঠান এক বছর পরে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর আপার চীৎপুরের মল্লিক ভব যেখানে ঠিক একশো বছর আগে এ দিনটিতে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম নাট্যশা স্থাপন করেন। ওই দিন "নীলদর্পণ" নাট অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হবে এ কলকাতার ময়দানে এক মাসব্যাপী বিরাট প্রদর্শনী, সভা, সম্মেলন নাট্যাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হ যার মধ্য দিয়ে একশো বছরের বাং নাটক সম্পর্কে পূর্ণ পরিচিতি লাভ ক যাবে। উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করবার জ উৎসব-কমিটি সর্বসাধারণের সহযোগি কামনা করেছেন এবং যাঁদের কাছে পুরো দিনের স্মারক-সামগ্রী আছে তাঁদের উৎস সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়—৩৯।১।এ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭—এ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলেছেন।

বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎস প্রসঙ্গে স্টেজ অ্যান্ড স্ক্রীন সাপোর্টার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন দ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, এই উৎসব বর্ষে বাংলার নাট্যরসিকদের প্রধান দাবি একটি জাতীয় নাট্যশালা স্থাপন এবং নট গুরু গিরিশচন্দ্রের নামে ওই নাট্যশালা নামকরণ। এই উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহে নিমিত্ত রবীন্দ্র সদন ও মহাজাতি সদ বিভিন্ন বিশিষ্ট নাট্যসংস্থাকে নিয়মি অভিনয়-আয়োজনের অনুরোধ তিনি কর ছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে শ্রীদত্ত অনুরো করেছেন।

হারানো নূপুর

কলামন্দিরে কৈশোরক সংস্থা সম্প্রতি আয়োজন করলেন দেশী পোশাকে একটি জনপ্রিয় বিদেশী রূপকথার রূপান্তর। নৃত্যনাট্য "হারানো নূপুর"। বাংলা ভাবা রূপকথা বিশেষত নৃত্যনাট্যরূপে পেতে গেলে মন আগেই তৈরী থাকে যে রবীন্দ্র-নাথের স্পর্শ সহজেই অনুভব করব। "হারানো নূপুর"-এর সর্বত্র রবীন্দ্র-ভাবনারই অনুসরণ। কাহিনীর ক্ষেত্রেও সিনডারেলার অনুবাদ পাইনি, যতটা পেয়েছি বাংলার অজস্র রূপকথার স্পর্শ।

নাচে অসংবদ্ধতা বেশি চোখে পড়েছে। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম : প্রধান শিল্পী লালী গুপ্ত। কুমারী লালী গুপ্তের নাচে যেমন পরিশীলিত নৃত্যছন্দের স্বাভাবিক ভঙ্গী তেমনি কোমল লাবণ্যময় অভিব্যক্তি। নাম ভূমিকায় এই শিল্পীর সাফল্য সেদিনের সন্ধ্যায় তৃপ্তির রেশ এনে দিয়েছি নিঃসন্দেহে।

অরণ্যদেব লী ফক

ধোঁয়া-পাহাড়ের চুড়োয় অরণ্যদেব তো ডাইনীর দুর্গের মধ্যে ঢুকলেন।
তার পর? তার পর কী হল?

এসো, অরণ্যদেব। এতদিন ধরে তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।
?!

পাহাড়ী ডাইনীর কাহিনী ----
অরণ্যদেব তখন একেবারে পাহাড়ী ডাইনীর মুখোমুখি!
ডাইনীর চেহারা কেমন, মজ?

কী, আমার চেহারা কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?
পাহাড়ী ডাইনী, যা আমি ভেবেছিলাম, তা তো তুমি নও।

অরণ্যদেব দেখলেন য়, এক পরমাসুন্দরী নারীর সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।'
এত রূপ তুমি পেলে কোথায়?

'সোনার বরণ তার চুল, চোখের মধ্যে যেন আকাশের তারা জ্বলছে -----'
যাক এখানে এসে তাহলে তুমি ভালই করেছ, কেমন?
আমি এসেছি যুবরাজদের প্রাণ বাঁচাতে। তোমার অভিশাপ তুমি ফিরিয়ে নাও।

বেশ, আমি বলছি, এবারে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে।

তার পর?
আর সত্যিই তারপর দেখতে-দেখতে যুবরাজরা সবাই সুস্থ হয়ে উঠল।
৪/১৪
১০

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধ এবং সারা ভারতে আপদকালীন অবস্থা ঘোষণা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ২ ডিসেম্বর দুপুরে পাক বিমান হঠাৎ আগরতলা বিমানঘাটি এলাকায় বোমা বর্ষণ শুরু করে। এই দিনই অধিক রাত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতি পাক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতে আপদকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান কয়েকদিন আগেই নিজের দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পাকিস্তান এদিন অপরাহ্নে শ্রীনগর, অমৃতসর, পাঠানকোট, আগ্রা, আম্বালা এবং যোধপুর ও আগরতলায় বোমা বর্ষণ করে। অন্যদিকে ভারতীয় সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনী বাংলাদেশে দখলদার বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, করাচি—শত্রু ঘাটিতে বোমা বর্ষণ করে। ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার পাকবাহিনী তিনবার কলকাতা আক্রমণের চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর পাক বিমান আগ্রা সিটি ও আগ্রা বিমান ঘাটির উপর ৬ বার আক্রমণ চালায়। ভারতীয় বাহিনী করাচি ও চট্টগ্রাম বন্দরে অবিরাম গোলা বর্ষণ করে।

দেশী সংবাদ

২৯ নভেম্বর—জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন : ভারতীয় সৈন্য পশ্চিম দিনাজপুরে সংলগ্ন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়ে গিয়েছে। দেশের নিরাপত্তার খাতিরেই ওরা আসেনি। ভারতীয় ফৌজ পাক সৈন্যের প্রচণ্ড গোলাগুলির মুখে পাল্টা মার দিয়ে বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে যায়।

তৃতীয় বেতন কমিশন ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের অতিরিক্ত অন্তর্বর্তী সাহায্য দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশমত বেতন অনুযায়ী মাসে আট টাকা থেকে কুড়ি টাকা পর্যন্ত সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে।

৩০ নভেম্বর—খাদ্যশস্য, কেরোসিন ও অন্যান্য জ্বালানি, মোটা কাপড়, খাবার তেল এবং চিনি এই পাঁচটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবার জন্য পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি একটি নোট আজ নব-কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের কাছে বিলি করেন।

২৫তম সংবিধান সংশোধন বিলের উপর যে সরকারী সংশোধন আনা হয়েছিল, দলের সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে নব কংগ্রেস সংসদীয় দলের কর্মসমিতি আজ তা প্রত্যাহার করে নেন। রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়—এই ভেবেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১ ডিসেম্বর—পূর্ত ও গৃহনির্মাণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী আই কে গুজরাল আজ লোকসভায় বলেন, কলকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বস্তিবাসীদের জন্য ৬০০০ গৃহনির্মাণের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। চতুর্থ যোজনার শেষে এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করেন।

আজ লোকসভায় 'ঐতিহাসিক' সংবিধান (২৫তম সংশোধন) বিলটি গৃহীত হয়। পক্ষে পড়ে ৩৫৩টি এবং বিপক্ষে মাত্র ২০টি ভোট। সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আমূল পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যেই এই বিলটি লোকসভায় উত্থাপিত হয়েছিল।

২ ডিসেম্বর—বিভিন্ন শিবিরে শরণার্থীদের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি সরবরাহের নামে প্রায় কুড়ি লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিস আজ উত্তর ও মধ্য কলকাতার তিনটি জায়গায় হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

আজ দুর্গাপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল সশস্ত্র ডাকাত মাইনিং অ্যানড অ্যালায়েড মেশিনারী করপোরেশনের মোটর চড়াও হয়ে চার লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। ডাকাতির সময় দুর্বৃত্তরা গুলি চালায় ও বোমা ছোড়ে। পরে পুলিস নিকটবর্তী একটি গ্রাম থেকে বেশির ভাগ টাকা উদ্ধার করে।

৩ ডিসেম্বর—সংসদের পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটিতে আজ কয়েকজন বিরোধী সদস্য আগামী বছরের প্রথম দিকে এই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। ব্যতিক্রম শ্রীসমর গুহ ও শ্রীপ্রণব মুখার্জি। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেননি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বিকাল সাড়ে চারটায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভায় বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দীতে চুয়াল্লিশ মিনিট বক্তৃতা করেন। এর মধ্যে এখানে আগরতলায় পাক বাহিনীর দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ, পাঠানকোট, অমৃতসর ও শ্রীনগরে পাক আক্রমণের খবর এসে পৌঁছয়।

৪ ডিসেম্বর—ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা এবং ভারতে আপৎকালীন অবস্থা বলবৎ করার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা মহানগরী এবং সীমান্তবর্তী জেলা সদরগুলিতে আজ সন্ধ্যা থেকেই অপ্রদীপের সরকারী নির্দেশ চালু হয়েছে পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপ্রদীপ চলবে।

ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের ৭টি অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একযোগে পাক সৈন্যের মোকাবিলা করছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ সংসদের উভয় সভায় এই ঘোষণা করেন।

৫ ডিসেম্বর—ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী কে সি লাল আজ বলেন : একটি পৃথক দেশ হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা ভারত সরকার এবং ভারতবাসীরা বস্তুত স্বীকার করেই নিয়েছেন। এখন যে প্রশ্নের উত্তর বাকি রয়েছে তা হচ্ছে অস্থায়ী সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা? শীঘ্রই তার জবাব পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষের প্রতিনিধিরা আজ এক সভায় সর্বসম্মত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করেন যে, উৎপাদন বজায় রাখার এবং সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নত করার জন্য ও দেশের প্রতিরক্ষার চেষ্টাকে জোরদার করার জন্য তাঁরা সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জানাবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯ নভেম্বর—পাক সরকার শেখ মুজিবর রহমানের বিচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করায় আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সামরিক ট্রাইব্যুনাল শেখকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তাঁকে মকুব করার জন্য কমিশন এক তারবার্তায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

৩০ নভেম্বর—বাংলাদেশে পাক ফৌজ দখলদাররা ঢাকাকে ঘিরে অনেক গ্রাম নিশ্চিহ্ন করেছে। গ্রামবাসীদের হত্যা করেছে আগুনে পুড়িয়ে, বোমা মেরে এবং গুলি করে। হিন্দুদের বাড়িগুলি ছিল তাদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য। এখানে পাক ফৌজের হাতে তিন শতাধিক লোক নিহত হয়েছে।

১ ডিসেম্বর—চীনের কাছে অনেক কিছু আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে—চীন ভারতের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হয়ে উঠছে। এই প্রথম চীন স্পষ্ট ভাষায় বলল, ভারত উপমহাদেশে আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নীতি দিকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের অবস্থা চীনের বৈদেশিক নীতি নিয়ামকদের মাথাব্যথার মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২ ডিসেম্বর—পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ রুশ নেতাদের কাছে পাঠানো একটি নোটে ২২ নভেম্বর থেকে পূর্ব বাংলায় ভারতের অঘোষিত যুদ্ধের বিস্তারিত এক বিবরণ দিয়েছেন। পাক বেতার আজ কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের উক্তি উদ্ধৃত করে এই খবর প্রচার করে।

৩ ডিসেম্বর—পাঠানকোট, অমৃতসর শ্রীনগরে পাক বাহিনীর বিমান আক্রমণের খবর শুনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রী কোসিগিন ডেনিস প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা বাতিল করে দিয়েছেন। হয়ত তিনি তাঁর ডেনমারক সফর সংক্ষিপ্ত করতে পারেন।

৪ ডিসেম্বর—ভারত পাকিস্তান নিয়ে আলোচনার জন্য আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী বৈঠক হয়েছে। বৈঠক ডাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরও দেশ। বৈঠক বসছে শেষ রাত সাড়ে তিন

৫ ডিসেম্বর—রাশিয়ার ভেটোতে নিরাপত্তা পরিষদে আজ বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি বরবাদ হয়ে যায়। ওই প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সেনা অপসারণের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজয় গুপ্ত

সবচেয়ে কম দামের ডেটারজেন্টের টুকরো -যা আপনাকে

এ হল বোনাস...শ্রীমতী, আপনারই জন্যে

বোনাস ব্যবহার করে সত্যিকারের লাভ করুন! এতে ঠাসা আছে ধোলাইয়ের শক্তি। কম বোনাস লাগিয়ে, কম মেহনত করে অনেক বেশি কাপড়, অনেক বেশি ঝকঝকে পরিষ্কার, ধবধবে সাদা করে ধুয়ে ফেলুন। বোনাসে অঢেল ফেনা হয়—যেকোনো জলে। কারণ, এ হল সেরা ধোলাইয়ের ডেটারজেন্ট, সাবান নয়!

বোনাস থেকে পুরো লাভ পেতে হলে, কাপড় ভালো করে জলে ভিজিয়ে নিন। আর, ব্যবহারের পর বোনাস শুকনো রাখুন।

এখন থেকে সেরা ধোলাইয়ের জন্যে সেরা ধোলাইয়ের ডেটারজেন্ট

ব্যবহার করুন

CMTB-9-244 BEN

নিয়তিঃ
কেন বাধ্যতে!
মানুষের নিয়তির কথা কে বলতে পারে? যে যাবার সে
চলে যায়—রেখে যায় অসহায় বিধবা স্ত্রী,
আর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে···
এরকম অভিশাপ কার জীবনে কখন যে আসে, কে বলতে
পারে? এর থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র জীবন বীমা।
সময় থাকতে জীবন বীমা করালে আর ভাবনা থাকে না।
আপনার জীবদ্দশায় জীবন বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে—
পুরো টাকা আপনার হাতে আসবে। আর, যদি আপনার
কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাকা
আপনার পরিবার পাবেন। ফলে, আপনার অবর্তমানে
আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের আর্থিক
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবেন।
বিস্তারিত বিবরণের জন্যে নিকটতম বীমা
এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
জীবন বীমা করান
জীবন সুখী করুন।
লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের প্রথম পর্ব

পাকিস্তান যে অজুহাত নিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকুক তার গোড়ায় গলদ ঘটেছে। যদি ধরে নেওয়া যায়, অতর্কিতে ভারতের সীমানায় হামলা করে কিছু সুযোগ আদায় করে নেবার মতলব সে করেছিল, তবে সে-উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে। বিশেষ করে পাক বিমানবাহিনীর আচমকা আক্রমণে ভারতের বিমানঘাঁটি ও বিমান নষ্ট করার পরিকল্পনা যদি তার থেকে থাকে —তবে পাকিস্তান তার ভুল নিশ্চয় বুঝতে পারছে। পাকিস্তান হয়ত আশা করেছিল, সবল ভারতীয় বাহিনীকে আকস্মিক আক্রমণে বিব্রত করে সে কিছু লাভ আদায় করে নেবে। তারপর তাকে মদত দেবার জন্যে যেসব বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্র রয়েছে তাদের কল্যাণে একটা যুদ্ধবিরতি হয়ে গেলে তার কর্মসিদ্ধি ঘটবে। পাকিস্তানের এই আশা কিংবা ইচ্ছা পূরণ হয়নি। প্রথমত, ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত সতর্ক ছিল, দ্বিতীয়ত তার রণকৌশল যে কত উঁচু দরের তার প্রমাণ দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে নি। পাকিস্তান বিমান আক্রমণ শুরু করলেও ভারত পালটা বিমান হানা দিয়ে মাত্র দু তিন দিনের মধ্যে পাক-বিমানের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। পূর্ব প্রান্তে, বাংলাদেশের আকাশে একটি পাক বিমানও আর নেই যা ওড়ার সামর্থ্য রাখে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক শহর ও ঘাঁটি এখন ভারতীয় বাহিনীর হাতে। মুক্তি বাহিনীও ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় নানা জায়গা অধিকার করে ফেলছেন। যশোরের পতন হয়েছে, ঢাকাও যায় যায়। ভারতীয় নৌ-বাহিনী অসাধারণ তৎপরতার সঙ্গে পাকিস্তানের বন্দরের মুখগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন। উপরন্তু পাক নৌ-বাহিনীর প্রসিদ্ধ যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন, গানবোট ইত্যাদি ঘায়েল হয়েছে। কিছু কিছু জাহাজও আটক করা হয়েছে। করাচীর মতন বন্দরও আজ ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কামানের মুখে। আমাদের বিমান ও নৌ-বাহিনী যখন পর পর সাফল্যে আমাদের চমৎকৃত করছেন তখন স্থল-বাহিনীও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের চারদিক থেকে আক্রমণের পর আক্রমণ করে আজ হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা তাঁরা মুক্ত করে নিয়েছেন। অজস্র পাক সামরিক সম্ভার তাঁদের হাতে ধরা পড়েছে। পাক ফৌজ পালাচ্ছে, পিছু হটছে। বাংলাদেশের যুদ্ধ শেষ হতে আর বিলম্ব নেই। পাক ফৌজ এখন পর্যন্ত কোনো বড় প্রতিরোধ এখানে সৃষ্টি করতে পারে নি।

পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তান তার সামরিক শক্তিকে অবশ্যই দৃঢ় করে রেখেছিল। তাদের ঘাঁটিগুলি এখানে অনেক সুরক্ষিত। তবু ভারতীয় বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি প্রভূত। অনেকগুলি ঘাঁটি পাকিস্তানকে হারাতে হয়েছে। ভারতের পিছু হটার প্রশ্ন মাত্র একটি জায়গায়, ছাম্ব এলাকায়। তাও সামরিক সুবিধার জন্যে সে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সরে এসেছে। অন্যান্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি রোধ করা পাকিস্তান বাহিনীর সাধ্যাতীত।

পাকিস্তান তার পরাজয় সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়ে এখন তার মুরুব্বিদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার একমাত্র আশা, যদি যুদ্ধবিরতি হয়ে যায়, সে বাঁচে। অমন যে ভুট্টোসাহেব—

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৭
শনিবার, ২ পৌষ ১৩৭৮
Saturday 18 December 1971

যাঁর বাহুবলের চেয়ে বাক্যবল বেশী সেই ভুট্টোসাহেবও এখন নাকি বলতে শুরু করেছেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাঁরা রাজী। ইনি ভারতের সঙ্গে হাজার বছরের যুদ্ধের বাগাড়ম্বর করলেও ভেতরে ভেতরে ভীত হয়ে আলোচনায় বসতে রাজী হচ্ছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলোচনার কিছু নেই। ভুট্টোসাহেব কে? ইয়াহিয়া তাঁকে রাতারাতি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর টুপি মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন বলে শুনেছি। তাতে ইয়াহিয়া বন্ধুকৃত্য করেছেন মাত্র। ভারতের একটিই মাত্র কথা : স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিয়ে পাক ফৌজকে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারত অন্যত্র তার বিজিত ঘাঁটি বা এলাকা ছাড়বে না। পাক ফৌজকে সীমান্ত থেকে একেবারে সরিয়ে নিতে হবে। তারপর যুদ্ধবিরতির কথা, তার আগে এ-সব কথা অবান্তর মাত্র।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
শীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক ... টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৪৫.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ৪২.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১৪.৭৬

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক ... টাঃ ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ [illegible]

আমেরিকান পজিশন

দারুন অনেস্ট সিস্টারস অব ইন্ডিয়া!

আপনাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্লিজ আপনারা আমাদের মহামান্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন দেব বাহাদুরকে ভুল বুঝবেন না। আমাদের মহামান্য, সরি মহামান্য নয়, আমাদের তো ডিমোক্রেটিক কানট্রি তার উপর রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট, তিনি তো আর সামন্তবাদী স্টাইলে পরম ভট্টারক মহীপাল, কি শাহেন শাহ, কি জাহাংগীর হতে পারেন না, এমন কি কমিউনিস্ট স্টাইলে মহান নেতা বা মহামান্য শিক্ষকও হতে পারেন না. (শুরুতে এটরনিগিরিই ছিল ও'য়ার অসটেনসিবল মিন্‌স্‌ অব্‌ লাইভ্‌লিহুড. এখনকার যেমন প্রেসিডেন্টগিরি), তাই আমরা ও'য়াকে বলি মিঃ প্রেসিডেন্ট, হাঁ যা বলছিলাম, আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন দেব বাহাদুরকে আপনারা কিনা ভারতবিরোধী ভেবে বসে আছেন! আরে ছি ছি রাম রাম, বলো না হে বলো না। উনি সে পাত্তরই নন।

ইদানীং আপনাদের দেশে আমাদের নানা—সরি মিঃ প্রেসিডেন্ট, দেখুন আমাদের মানে আমি হোয়াইট হাউসের মিঃ প্রেসিডেন্টের খাস সেরেস্তার আমলাদের কথা বলছি আর কি, আমাদের এখনকার নয়া একটা উপস্থিত হয়েছে। জানেন তো, আমাদের আমেরিকান পিপলদের মিঃ বলে সম্বোধন করাই জন্মগত অভ্যেস, তাই দিয়েই আমরা এতকাল মহাজনী কারবার দিব্যি চালিয়ে আসছিলাম। কিন্তু এখনকার আমাদের ইয়ে মিঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন দেব বাহাদুর চীন, সরি মহান চীনের সঙ্গে একটু এই মনে মাখামাখি করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই আমাদের এখন প্রোটোকলের নতুন পাঠ নিতে হচ্ছে। তাই মুখ দিয়ে মহান, মহামান্য এই সব মুখস্থ করা কথাগুলো ছটফট বেরিয়ে পড়ছে। পিপলস ডিমোক্রেসির নেতারা এতই স্পর্শকাতর যে, মহান, মহামান্য না বললে ও'য়াদের মানহানি হয়। দেখুন আমাদের হল গিয়ে বর্তমানে রিপাবলিক্যান ডিমক্রেসি আর ও'য়াদের অর্থাৎ মহান চীনাদের হল গিয়ে পিপলস ডিমোক্রেসি। এখানেই, লক্ষ করে দেখবেন, আমাদের উভয় দেশের সাদৃশ্য কত নিকট, মারামারি শুধু রিপাবলিক আর পিপল নিয়ে, এই তো? তা দেখুন পিপল থেকেই তো রিপাবলিক, যেমন ডিম থেকে ছানা, অবিশ্যি আপনাদের শিবরামী মতে দুধ থেকেও ছানা হয়। তা যাই হোক, ছানা তা ডিম থেকেই হোক, আর দুধ থেকেই হোক, এদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ তা আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন দেব বাহাদুর আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

এবং আমাদের রিপাবলিকান ডিমোক্রেসি এবং চীনের, সরি মহান চীনের পিপলস ডিমোক্রেসির মধ্যকার এই অস্ফুট সম্পর্কটাকে একটু মাখো-মাখো করে তোলার জন্য আমাদের উনি একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমরা ও'য়ার খাস সেরেস্তার আমলা-মুনশিরা আমাদের উনি আর ওনাদের উনির মধ্যে পাকা-দেখার ব্যাপারটা পাকিয়ে এনেছি, ঠিক সেই মোমেন্টে আপনারা কিনা আমাদের ম্যাচ-মেকার পাকিস্তানকে এমনই বিপাকে ফেলে দিলেন যে, সে এখন গভীর গাড্ডায় নিপতিত হয়ে হাঁক-পাঁক করছে। পাকিস্তানের জাঁদরেল খান যে আপনাদের হাতে হঠাৎ এই রকম একটা আপমান খাবেন তা আমরা কেউ ধারণা করতে পারিনি। আর আপনারাও যে সত্যি সত্যিই এতখানি ডেঁপো হয়ে উঠবেন, তাও বুঝতে পারিনি। তাই আমাদের মহামা—সরি মিঃ প্রেসিডেন্ট বাহাদুর আপনাদের উপর আচমকা একটু খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। আর ও'য়ার মাথায় রাগ উঠে গেলে উনি একটু এদিক ওদিক বলে ফেলেন। তাই উনি মুখ ফসকে, আপনাদেরকে একবার আক্রমণকারী বলে ফেলেছিলেন। কিন্তু উনি যে ওটা মিন্‌ করেন নি, এটা আপনাদের বোঝা উচিত ছিল না কি বলুন? আমরা তো ও'য়াকে কতদিন ধরে দেখছি, ও'য়ার স্বভাবই হচ্ছে, ও'য়ার মুখের ভাষা আর মনের ভাষা বরাবরই আলাদা। আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন দেব বাহাদুরের জন্মকালীন একটা হিস্ট্রি আছে। আপনারা তো জানেন মিঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন দেব বাহাদুর আমেরিকার অধিষ্ঠাত্রী মাতৃ লিবার্টির বেশী বয়সের সন্তান। প্রসূতির যাকে নরম্যাল ডেলিভারি বলে, ও'য়ার তা হয়নি, আবার সিজারিয়ানও নয়। দু দুবার অ্যাবরটিভ অ্যাটেম্পটের পর রিপাবলিকান পার্টির গাইনি ও অবসটেট্রিক্‌স বিশারদগণ থারড টাইমে ও'য়াকে ফরসেপ ডেলিভারি করান। সেই থেকে, জানেন, ও'য়ার সিসটেমটায় স্লাইট্‌ টাল খেয়ে গিয়েছে। এবং সেই কারণেই ও'য়ার মুখের কথায় আর মনের ভাবে কখনও সখনও অ্যাডজাসটমেন্ট-এর হেরফের হয়ে যায়। এই যেমন ধরুন, আপনাদের গ্রেট পোয়েট যেমন বলেছেন, "দূরকে করেছ নিকট বন্ধু", আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্টও সেই নীতি ফলো করে মহান চীনকে বন্ধু হিসেবে দূর থেকে নিকটে আনতে যাচ্ছেন, ফলে তাই-ওয়ান চীনকে, অর্থাৎ যে ছিল একদিন নিকটের বন্ধু,—দূরে করে দিলেন। আচ্ছা বলুন তো, এমন লোকের উপর আপনাদের রাগ করা কি উচিত?

তা ছাড়া, আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্ট এখন বেশ করে খতিয়ে দেখছেন, উনি সত্যিই ভারতের উপর গুস্‌সা করেছিলেন কিনা। এ বিষয়ে আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্টের খাস সেরেস্তার কাবিল এক্‌স্‌পারটদের লেটেস্ট পজিশন হচ্ছে এই যে, আমরা ভারতের উপর অফিসিয়ালি রাগ করিনি। আর ওই যে আপনাদের অ্যাগ্রেসর বলা হয়েছিল বলে আপনারা যা শুনেছিলেন, ওটা একেবারে আপনাদের শোনার ভুল। কথাটা 'অ্যাগ্রেসর' নয়, কথাটা 'আজ্ঞে সার' বিশুদ্ধ 'আজ্ঞে সার'। আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্ট বাহাদুরের প্রশাসনিক সিসটেমে স্লাইট টাল থাকার দরুন ও'য়ার জিভটা, উচ্চারণদোষে মাঝে মাঝে জড়িয়ে যায়, অতএব 'আজ্ঞে সার' কথাটা 'অ্যাগ্রেসর'-এর মত শোনাতে পারে। তজ্জন্য আমরা আন্‌-অফিসিয়ালি এবং কনফিডেনসিয়ালি সরি।

আর একটা কথা। পাকিস্তানের মিলিটারি মস্তান জাঁদরেল খানের সঙ্গে আপনারা আমাদের রিপাবলিকান ডেমোক্রাটিক শিরোমণি মিঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন বাহাদুরের যে মাখো-মাখো ভাবটা দেখছেন, ওটা একটা অহেতুকী আত্মীয়ভাব। কামগন্ধ নাহি তায়। আসলে কি জানেন, আমাদের মিঃ প্রেসিডেন্ট একটি রসিক। অর্থাৎ আপনাদের সঞ্জীবচন্দ্র যে টাইপের রসিককে পালামৌ পাহাড়ে দেখেছিলেন, (বড় বড় রসিক। পাষাণের বুকে শিকড় ঢুকিয়ে সে রস টেনে বার করে—এই কথাটাই কি একটা বলেছিলেন না—) আমাদের উনিও সেই টাইপের। উনিও ইয়াহিয়ারূপী পাষাণের বুকে প্রেমের পাইপ ঢুকিয়ে মানবতারূপী রস সুড়সুড় করে বের করে আনার তালে আছেন।

এমন রসিকের বুকে বাধা দিতে আপনারা উদ্যত হয়েছেন! ছিঃ! না না, ছিঃ নয়, ওটা হাঁচি। সরি। প্লিজ ভুল বুঝবেন না। ইতি **বাধ্যবাধিত ইওরস্‌ হোয়াইট হাউসের খাস সেরেস্তার জনৈক কাবিল মুনশি** (প্রোটোকলে বাধে তাই নাম প্রকাশ করছি নে, ত্রুটি মার্জনীয়)।

বাংলাদেশ

যদি মারকিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও বড় রকমের বাধা না দিয়ে থাকে তাহলে এতদিন ঢাকা মুক্ত হয়ে গিয়েছে—বাংলাদেশের রাজধানীতে বাংলার স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই লেখা যখন পড়ছেন তখন নিশ্চয়ই আপনারা ঢাকায় স্বাধীন বাংলা সরকার প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে গিয়েছেন।

পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত তার একটা উদ্দেশ্যও সফল করতে পারে নি। ওরা ভেবেছিল, লড়াই শুরু হলে পূর্ব বাংলাকেও দখলে রাখতে পারবে এবং পশ্চিম খণ্ডেও বেশ কিছুটা ভারতীয় জমি নতুন করে দখল করা সম্ভব হবে। ওরা ভেবেছিল, আচমকা পশ্চিমে আঘাত হানবে, ভারতের কিছুটা জমি দখল করে নেবে এবং ততদিন ভারতীয় বাহিনীকে যশোর-সিলেট-হিলির কাছাকাছি আটকে রাখতে পারবে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ হবে। ফলে পূর্ব-বাংলায়ও দখল বজায় রাখতে পারবে এবং পশ্চিম দিকেও ভারতকে জব্দ করা সম্ভব হবে।

সম্ভবত সেইজন্যই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই পাকিস্তানী সেনানায়করা পূর্ববাংলা থেকে বহু সৈন্য পশ্চিমে নিয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম দিকে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী শক্তি প্রায় সমান সমান ছিল। পাকিস্তান পূর্ববাংলা থেকে প্রায় দু'ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের শক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীর চেয়ে বেশি করতে চেয়েছিল। এবং বাড়তি সৈন্যটা নিয়ে জমা করেছিল ছাম অঞ্চলে। যাতে ওই অঞ্চলটায় এগিয়ে এসে জম্মুর সঙ্গে স্থলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। তারপর তারা ভেবেছিল কাশ্মীরের ওপরে ধাক্কা দেবে। কাশ্মীর অংশে ভারতীয় সেনাবাহিনী স্থলপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তখন কাশ্মীর দখলের অভিযানে নামতে পাক সেনাবাহিনীর সুবিধা হত।

হায়, এর একটা পরিকল্পনাও সফল হল না! প্রথমত, পূর্ব বাংলায় তাদের ধাপ্পা যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় চারদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। যশোর পতনের পরই ভারতীয় সেনাবাহিনী বুঝে নিতে পারল পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের কত সেনা থাকতে পারে। সেইটা বোঝার পরই ভারতীয় সেনাবাহিনী বিমানে এবং বিশেষ ট্রেনে বহু সৈন্য পশ্চিমে সরিয়ে নিল। এদিকে প্রথম ধাক্কাতেই পূর্ব বাংলায় পাক বিমান বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়ও ভারতীয় বাহিনীর সুবিধা হয়ে যায়। পূর্বের লড়াইর জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর যত বিমান রাখা হয়েছিল তার একটা বিরাট অংশকে পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়া হল।

প্রথম ধাক্কায়ই পশ্চিমের যুদ্ধে বিরাট সাফল্য অর্জনের যে স্বপ্ন পাক সমর নায়করা দেখেছিলেন তাও সামান্যও সফল হল না। ছামে তারা কিছুটা এগোলো। কিন্তু সে কিছুটা মাত্র। মূল লক্ষ্য কাশ্মীরের সড়ক পথে তারা পৌঁছতে পারল না। এখন ওখানেও পিছু হটার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। আরো উত্তরে কাশ্মীরে তারা এগোতে তো পারলই না, বরং তাদের অধিকৃত-কাশ্মীরের কিছুটা অঞ্চল থেকেই সরে যেতে হল। রাজস্থানেও সেই অবস্থা। তাদের করাচী বন্দরও প্রায় ধ্বংস। ইতিমধ্যে পশ্চিমের যুদ্ধে পূর্বাঞ্চল থেকেও বহু ভারতীয় সৈন্য ও বিমান গিয়ে পৌঁছেছে। এখন পশ্চিমের প্রত্যেক সেকটর থেকেই পাকিস্তানী সেনাদের হটতে হবে।

অন্যদিকে ভারতীয় বাহিনী এবং পূর্ব-বাংলার বীর মুক্তি সেনারা ঢাকার দ্বারপ্রান্তে।

*

পাকিস্তানের বন্ধুরাও আন্তর্জাতিক চাপ দেওয়ার ব্যাপারে তেমন সুবিধা করতে পারে নি। তারা চেষ্টা করে নি তেমন নয়। চেষ্টা ঠিকই করেছিল কিন্তু পারেনি। সিকিউরিটি কাউন্সিলে প্রস্তাব এনেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন। কিন্তু রাশিয়ার ভেটোতে তা বাতিল হয়ে গেল। তারপরে তারা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠক ডাকল। সেখানে বিপুল গরিষ্ঠতায় যুদ্ধ বিরতি এবং সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবও পাশ হল। কিন্তু ভারত যে সে প্রস্তাব অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল না এবং সৈন্য সরিয়ে নিল না। পাকিস্তান তা দেখেছে। দেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনও। তারপরও তারা কিছু করতে পারেনি।
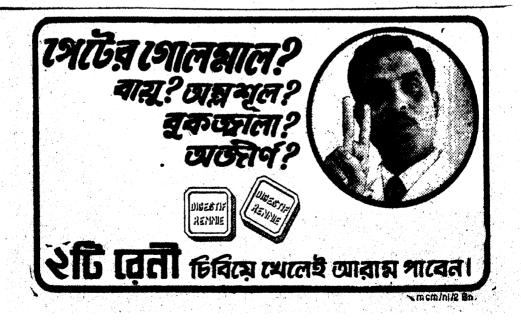
কিন্তু আমার মনে হয় না তারা এখানেই ছেড়ে দেবে। ঢাকা মুক্ত হওয়ার আগেই মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন কোনও না কোনও ভাবে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী দখলী অধিকার রাখার একটা কোনও বড় চেষ্টা করবে। সেজন্য তারা আবার সিকিউরিটি কাউনসিল ডাকতে পারে, আবার জেনারেল কাউনসিলে প্রস্তাব নিতে পারে এবং তাতেও না হলে সরাসরি ভারতকে হুমকিও দিতে পারে।

অবশ্য তাতেই যে কাজ হবে তা নয়। ভারত ঢাকা মুক্ত করার আগে থামতে পারে না। ঢাকা মুক্ত হওয়ার পর ভারত আর যুদ্ধ চালাবে মনে হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনও অঞ্চল দখল ভারতের লক্ষ্য নয়। এমনকি এই লড়াইয়ের সুযোগে ভারত অধিকৃত-কাশ্মীর মুক্ত করার চেষ্টা করবে তাও মনে হয় না। ভারতের লক্ষ্য শুধু ঢাকা এবং বাংলাদেশকে মুক্ত করা। বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারকে স্বাধীন বাংলা শাসনের সুযোগ করে দেওয়া।

সেই লক্ষ্য পূর্ণ হলেই ভারত যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়ে যাবে।

*

বিশ্ব জনমত কী বস্তু এতদিনে ভারতবাসী মাত্রই নিশ্চয়ই তা বুঝেছে। আসলে বিশ্বজনমতকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিচালকরা কোনও গুরুত্ব দেয় না। যে জিনিসের উপর তাদের সবকিছু নির্ভর করে সেটা হল নিজ নিজ স্বার্থ—অর্থাৎ নিজ নিজ দেশের স্বার্থ। নিজের দেশের স্বার্থ, নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ কী ভাবে রক্ষা করা যায় সেইটাই তাদের আসল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অনুসারেই তারা কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও তাই করছে। সেইজন্যেই ভারত বন্ধু বলে পরিচিত বহু রাষ্ট্র এবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

এরাই কিন্তু পূর্ববঙ্গে পাক সৈন্যের অমানুষিক অত্যাচারের সময় তেমন কিছুই বলেনি। পাকিস্তানের উপর কোনও চাপ দেয়নি। পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ফলে যখন ভারতের ঘাড়ে এক কোটি শরণার্থীর বোঝা চাপল তখন এরা অনেকেই চুপ করে থেকেছে। কেউ কেউ আবার শরণার্থী ত্রাণে দু-এক কোটি টাকা সাহায্য দিয়ে ভারতকে উপদেশ দিয়েছে—শান্ত থাক, শান্ত!

এ ব্যাপারে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র। যারা গণতন্ত্রের পূজারী বলে পৃথিবীব্যাপী দাপিয়ে বেড়ায় তাদের আসল রূপটা এবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা এখন ভারতকে ভয় দেখাচ্ছে। চাপ দিচ্ছে। লড়াইয়ে পাকিস্তানের পরিস্থিতি আরও কাহিল হলে হয়ত মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আলটিমেটামও দেবে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য পাকিস্তানকে জিইয়ে রাখা এবং ভারতের দুপাশে এমন ভাবে পাকিস্তানের চাপ বজায় রাখা যাতে ভারত সব সময় তা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সেই লক্ষ্যে এখনও কাজ করে যাচ্ছে। এই লড়াই চলা কালে আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দেয় তাহলেও আমি আশ্চর্য হব না।

অথচ এই মারকিন যুক্তরাষ্ট্রই কিন্তু গত আট মাস যাবত বাংলা দেশের ব্যাপারে রফা করার জন্য পাকিস্তানের উপর তেমন কোনও চাপ দেয়নি।

বৃহৎ শক্তিবর্গ, বিশেষ করে আমেরিকা যদি সময় মত পাকিস্তানের উপর যথেষ্ট চাপ দিত তাহলে কিন্তু এ লড়াই হত না। তারা দীর্ঘ আট মাস সময় পেয়েছিল বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের। কিন্তু কিছুই করেনি। পাকিস্তানের উপর কোনও চাপ দেওয়া তো দূরের কথা, বরং বিভিন্ন ভাবে পাকিস্তানকে উসকে দিয়েছে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সোজাসুজি এবং বিভিন্ন মধ্যপ্রাচ্যের দেশের মাধ্যমে পাকিস্তানকে জঙ্গী বিমান এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে।

এখন যখন লড়াই হচ্ছে, লড়াইয়ে পাক সেনাবাহিনী পরাজিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশ তো গেছেই যখন গোটা পাকিস্তানই যেতে বসেছে তখন আমেরিকা চীনকে সঙ্গে নিয়ে আসরে নেমেছে। লক্ষ্য ভারতকে ভয় দেখানো, পাকিস্তানকে বশ করা এবং স্বাধীন বাংলা দেশের জন্মে বাধা দেওয়া।

এই মারকিন নীতি। এই রকম নীতি অবলম্বন করে চলেছে বলেই আমেরিকা পৃথিবীতে আজ এত ঘৃণিত।

১২-১২-৭১।

নবারুণ গুপ্ত

পাঠ্যপুস্তক পেরিয়ে

রঞ্জন

ইস্কুলে আমাদের একদা সোৎসাহে না হলেও সবলে, কখনো সবেত্রে, শেখানো হোতো যে ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য একান্তই নিরতপ্রসরমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বলিষ্ঠ সন্তান। এটাকে একেবারে অসত্য-শিক্ষণ বলে অগ্রাহ্য করা শক্ত। কিন্তু একমাত্র পরশাসনের পদতলে নির্বীর্য অসহায়তা সীমিত ঐক্যেরও ধাত্রী হতে পারতো না। ভারতবর্ষের অন্ততঃ অংশবিশেষে অন্যান্য নাড়ীর টান ছিল। সে হতে পারে হিন্দু ধর্ম, গীতা, রামায়ণ-মহাভারত। হতে পারে আদিম অনার্য আত্মীয়তা। অপরিসীম অনুমিতির এই অগাধ পান্ডিত্যসাগরে নিমজ্জিত হবার বাসনা আমার সামান্যই, সামর্থ্য সামান্যতর। অর্ধশতাব্দীর অতি অগভীর বিশ্ববীক্ষণের শেষে মাত্র এই উপসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি যে ঐক্য নয় প্রবৃত্তির অমোঘ নিয়ম। সত্য বলতে কি, বিচ্ছেদই আজ মনে হয় আরো স্বাভাবিক। আমারই চোখের সামনে ভারত দ্বিধা হোলো অশ্লীল সাবলীলতায়। মিশর আর সীরিয়া মিলিত হোলো শুধু বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। ঘানা আর গিনির মৈত্রী স্থিরাগমন দেখে নি নক্রুমার নির্বাসনের আগেও। ভাঙা জার্মানি, ভাঙা কোরিয়া, ভাঙা ভিয়েৎনাম। আমরা সবাই যেন হেলান দিয়ে আছি এক বিশাল বিভিন্ন বিবাদের গগনস্পর্শী ভগ্নস্তূপের উপর।

আমার এক শিক্ষক, তিনি সাংবাদিকও ছিলেন, একবার লিখেছিলেন : To divide is to multiply. গুণ-ভাগের অংক একদিন যা পাঠশালায় শিখেছিলাম আজ তা প্রায় পুরোপুরি ভুলে গেছি, এমন দাবি আমি করতে পারি। তবু আজই প্রত্যক্ষ যে মাত্র পঁচিশ বছর আগে যে পাকিস্তান জন্ম নিল এক ভারত থেকে, তা আজ দুয়ে পরিণত। মিলনবিরহের গাণিতিক সূত্র তো এই যে দুই প্রথম এক হতে চায়, পরে সেই এককে দুই হতে হয়। সেখানেও ভাঙন আবার থামে না যে। বাঙলাদেশ তালাক দিলেও খাড়ারী রাজত্ব এমন কি পশ্চিমেও একান্নবর্তী থাকবে এমন সম্ভাবনাও সন্দেহমুক্ত নয়! পাখতুনিস্তান, বেলুচিস্তান এবং অন্যান্য অঞ্চলেও নাকি পাঞ্জাবীপ্রীতি দ্রুত ক্ষীয়মান। কবি য়েটসের কথায়, সব কিছু ভেঙে পড়ে, খসে পড়ে; কেন্দ্রের কোলের টান সহজেই খসে পড়ে। পাকিস্তান বহু দৃষ্টান্তের একটিমাত্র।

তবু বিচ্ছেদবাসনা যদি মানবচরিত্রে বা জাতিচরিত্রে দুর্দম হয় তাহলে তারই সঙ্গে সহাবস্থান করে পরস্পরবিরোধী এক অদম্য ঐক্যকামনা। বহু শতাব্দীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামান্তে তদবধি পরাক্রান্ত য়ুরোপ প্রতিষ্ঠা করল লীগ অব নেশনস। জেনিভায় হবে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধের সম্যক সমাধি। উত্তম প্রস্তাব। পরিমিত ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের অনুমোদিত পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষুদ্রায়তন মিতব্যয়ী বিশ্বসংস্থার সাধ্যানুযায়ী সাফল্য আদৌ অবহেলার বস্তু ছিল না, যদিও আজ ইটালির আবিসিনিয়া ধর্ষণ ও ও জাপানের মাঞ্চুরিয়ার প্রতি লোলুপ বাহুপ্রসরণের বিরুদ্ধে লীগের ক্লীব প্রতিবাদ একান্তই প্রাহসনিক বলে মনে হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য প্রভুত্বের গৃহীত অপরিহার্যতাই ছিল তৎকালীন ক্ষুদ্রায়তন জেনিভাস্থিত বিশ্বসংস্থার প্রাণবায়ু। ক্ষীণ-প্রাণ লীগের সাধ্য ছিল না বিশ্বযুদ্ধবাহিত হাওয়া বদলের সম্মুখীন হবার। লীগ অব নেশনসের অকালমৃত্যু ছিল প্রায় অবধারিত। জন্মলগ্নেই মার্কিনী অনুপস্থিতি এবং পরবর্তী কালে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ঔদ্ধত্যে একের পর এক অন্যান্য সদস্যের বহিষ্কার বা অন্তর্ধান ক্ষীণবীর্য বিশ্বসংস্থার সমাধি রচনা করল আর মঞ্চ তখন প্রস্তুত দ্বিতীয় মহাসমরের জন্য।

সব যুদ্ধেরই থামতে হয় শমে এসে। (হাজার বছুরী যুদ্ধের কথা ভুট্টো লক্ষবার বললেও সত্য হয় না।) তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও শেষ হোলো। এবার জন্ম নিল রাষ্ট্রসংঘ, বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৩১। অধিষ্ঠান ক্ষুদ্র জেনিভায় নয়; মহানাম নিউ ইয়র্ক শহরে। আমেরিকা এবার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; তাই সব কিছুই কিং সাইজ। প্রতিষ্ঠাতারা জানতেন যে এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের স্বাধীনতা আসন্ন। তাদের জন্য খোলা রইল সাধারণ পরিষদের দ্বার। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা পনেরো। কিন্তু সেখানেও জাতিভেদ আছে; ভিটোর কৌলীন্য আছে শুধু পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের। ভারত-পাকি-স্তানের বর্তমান বিরোধে আমরা ধিকৃত হতাম যদি রাশিয়া তার ভিটোর ছাতার তলায় আমাদের আশ্রয় না দিতো। সাধারণ পরিষদেও দেখা গেল ভারতের সুহৃদসংখ্যা অতিপরিমিত। ভাগ্য ভালো, সাধারণ পরিষদ নখদন্তহীন। উহার হাতে নাই ভুবনের ভার যদিও ওর বিরুদ্ধ প্রস্তাব সুস্বাদু নয়।

তবু এই প্রস্তাব নিয়ে আমাদের আর্তনাদ কিঞ্চিৎ অতিকৃত বলে মনে করি। মনে রাখা দরকার যে এই একই রাষ্ট্রসংঘে ভারত বহুবার বহু জাতির বিরুদ্ধে ভোট দিতে দ্বিধা করেনি। অদ্য কেন আমরা আশা করব সবায়ের অনুকূল সমর্থন? নেহরু আর কৃষ্ণ মেনন একদিন বিশ্বের সকল জাতির উদ্দেশে এমন অবিশ্রাম উপদেশ বর্ষণ করেছেন যে আজ তার কিছুটা ফিরে পেলে অভিযোগ করা বৃথা। ক্রন্দন নিষ্ফল নিক্সন বা কিসিংগারের বিরুদ্ধে আক্রোশ আদৌ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ডেমক্র্যাটদের সঙ্গে আমাদের সখ্য ছিল বেশি, যেমন ছিল ইংল্যান্ডে লেবার পার্টির সঙ্গে। শুনেছি যে নিক্সনের পায়ের তলায় আমরা লাল গালিচা বিছিয়ে দিইনি; কিসিংগারকে ইন্দিরা গান্ধী চুম্বন করেননি। জাতীয় আতিথেয়তার সামান্যতা নিশ্চয়ই বিশ্বশক্তি আমেরিকার রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হওয়া উচিত নয়; কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে বৃহৎ গণতন্ত্রেরও প্রধান হতে পারেন নিম্নবুদ্ধি ক্ষুদ্রমনা চতুর ব্যক্তি যাঁর ধূর্ত আবেদন জাতির নিম্নতম প্রবৃত্তির প্রতি। গণতন্ত্রের মূল সূত্রই তো এই যে মেধা নয় ক্ষমতার শীর্ষাসনাধিকারের প্রথম প্রয়োজন। চাই অনুমোদন। অর্থাৎ ভোটাধিক্য। ভারতের সংবিধানও মূলতঃ বিভিন্ন নয়। নেহরু, শাস্ত্রী বা ইন্দিরাকে কোনো বিশেষ গুণের প্রমাণ দিতে হয়নি, হয়নি কোনো পরীক্ষা পাশ করতে দর্শনে বা গণিতে। তবু নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার আধিপত্য আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে একমাত্র তার প্রায়শ যুক্তিশূন্য ও আবেগসর্বস্ব অপ-সিদ্ধান্তের জন্য। গণতান্ত্রিক জীবনে মতভেদ মূল্য অসীম।

রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে ভারতকে আজ হতে হবে স্থিতধী। উত্তেজনা বা উন্মাদনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। বেদনাজর্জরিত দীর্ঘ আট মাসের পরেও বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র স্বীকার করতে রাজি নয় যে ভারতের অস্ত্রধারণ অপরিহার্য ছিল। বেশ, তবে তাই, তবে তাই। তাই বলে অস্ত্র আমার হস্তচ্যুত হবে না। তোমরা যখন এক কোটি উদ্বাস্তু গ্রহণ না করেও ভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা করেছিলে তখন আমরা অনুনয় করেছিলাম যে এমন হৃদয়হীন অন্যায় বন্ধ করো। কই, আমার কথা তো তোমরা শোনোনি, শোনোনি ভিয়েৎনাম বা অন্যত্র। আচ্ছা আজ আমরা স্থির করেছি বধির হতে, কেননা আমরা অন্ধ থাকতে পারিনে সাড়ে সাত কোটি প্রতিবেশীর পরিকল্পিত নির্মম নির্যাতনের প্রতি। রাষ্ট্র-সংঘকে শুধু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে গাজা বা কঙ্গোয় বিশ্বসংস্থা যেদিন বাগোত্তর কর্মে অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তার একমাত্র সশস্ত্র সাথী ছিল ভারতবর্ষ। আজ আমার চাইনে তোমার সমর্থন। তোমার বিরুদ্ধতার জন্যও জায়গা আছে আমার বাজে কাগজের ঝুড়িতে। ক্ষমাহীন অজ্ঞতা ও তদধিক অসাধুতা সত্ত্বেও ভারতরাষ্ট্র আজ অনায়াসে রাষ্ট্রসংঘকে বলতে পারে, তুমি আমাকে না চাইলে আমিও তোমাকে চাইনে।

বিদেশে (৩৪)

স্বখাত সলিলে আমি ডুবিনি, তোমাকেও ডোবাইনি। পাঠক নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। আর ডুবলেই বা কি? কবিগুরু বাউলের গীত উদ্ধৃত করে বলেছেন, "মন-জল ডুবলো, সখী, তার কি আছে বাকি গো" অবশ্য পাতকোতে নয়, "রসের সাগরে", "অমিয়া সায়রে"। কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজের আপন দেশের চতুর্দিকে গভীর জলের সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও সে ডোবাডুবির প্রস্তাব বড় একটা পাড়ে না। তাই ডুক জন্ সেটা লক্ষ্য করে বলেছেন, অন্য দেশের লোক প্রেমকে আর্টের পর্যায়ে ফেলুক, (কিংবা ঈশ্বরোপলব্ধির প্রথম সোপান বলে গণনা করুক—লেখক) ইংরেজের কাছে প্রেম এক প্রকারের জিমনাস্টিক। কৌতূহলী মন জানতে চাইলো, সেটা কোন্ প্রকারের জিমনাস্টিক? তখন, ও হরি, আবিষ্কার করলুম ইংরেজের আরেকপ্রস্থ ভণ্ডামি। মার্কিন জাতের পুণ্যভূমি যেরকম প্যারিস বিলাতের ভণ্ড এবং সৎ—দুজনার মধ্যে যে একটা ফারাক আছে তা নয়—দুজনারই মোক্ষক্ষেত্র অক্সফর্ড। সেই অক্সফর্ডে আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ইংরেজ মোকাবেমোকায় হামেশাই কভু বা কনে বউয়ের মত ফিসফিসিয়ে কভু বা বাঘা জমিদারের মত গলা ফাটিয়ে মহারাণীর যে রাজত্বে সূর্য কখনো অস্তমিত হন না সে-রাজত্বে এবং তারই কাছে-পিঠে ইন্ডিয়ানের যে দুবিঘে জমি আছে সেসব জায়গাকেও জানিয়ে দেয় অক্সফর্ডের মত বিদ্যায়তন ত্রিসংসারে আর কোথাও নেই, এবং এ সব ব্যাপারে ইংরেজের ন্যাজ মার্কিন জনসাধারণ সর্বাঙ্গ ঘন ঘন আন্দোলিত করে সম্মতিসূচক মুদ্রা মারে। সেই বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় একখানা রাজভাষার অভিধান।১ অভিধানটি উত্তম কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্নবারিতে ভর্তি। সেই কোষ খুলে দেখতে গেলুম, "টু মেক্ লাভ" বলতে কি বোঝায়? "প্রেমে পড়া" সে তো খুব সম্ভব বিলেতের "টু ফল ইন্ লাভ" থেকে কবে, কোন্-কালে পালতোলা জাহাজে করে সরাসরি এদেশে চলে এসেছে। দেখি, "টু পে অ্যামরাস অ্যাটেন্শনস্ টু—"। তবেই তো ফেলল মুশকিলে। ইংরেজ কী ধুরন্ধর জাত! যেখানে টাকাকড়ির ব্যাপার নয় সেখানে চট করে ঋণ স্বীকার করতে ভারি চটপটে। তদুপরি দায়টা ফরাসীর ঘাড়ে ফেলে দিয়ে নিজে চট্‌সে সরে পড়লো—প্রেমট্রেম ও তো, বাবা, জানে ওরাই। কথাটা এসেছে ফরাসী ভাষা থেকে; "আমুর" শব্দের অর্থ "প্রেম"। (মূলত অবশ্য এসেছে লাতিন "আমরস্" থেকে) কিন্তু ফরাসীরা "আমুর" বলতে প্রেম, কাম সবই বোঝে। ওদিকে ইংরেজ "অ্যামরাস" বলতে বোঝে নিছক প্রেম—সে প্রায় আমাদের "রজকিনী প্রেম/নিকষিত হেম/কামগন্ধ নাহি তায়"...তাহলে আমাদের মহাখানদানী অক্সফর্ড অভিধানের মতানুযায়ী "টু মেক্ লাভ" কথাটার অর্থ "বল্লভার প্রতি সপ্রেম মনোযোগ দেওয়া, তার মন [illegible]"। এখানে বলে রাখা ভালো "লাভ" শব্দের "সেক্স্" জাতীয় কোনো প্রকারের যোগাযোগ নেই একথাটা পষ্টাপষ্টি বলবার বুকের দুঃসাহস অক্সফর্ডের নেই। তাই অতি অনিচ্ছায় (আমার মনে হয়) স্বীকার করেছেন, "সেক্সুয়াল অ্যাফেক্শন্, ডিজায়ার" ইত্যাদি। পুনরপি বলছেন "রিলেশন" বিটুইন সুইটহার্টস।—এইবারে পাঠক নিশ্চয়ই ঠাহর করে নিয়েছে ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে। "সুইটহার্টস"—একে অন্যের প্রতি অনুরাগী জনের সম্পর্ক তো হাজারো রকমের হতে পারে। এখানে যদি অক্সফর্ড সাহস খাটিয়ে পাণ্ডিত্য কায়ক্লেশে লিখতেন "স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক" তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

এইবারে আইস, নিষ্কনাসিক পাঠক, অন্য একখানা অভিধানের শরণাপন্ন হই। যে "কন্সাইস্ অক্সফর্ড ডিকশনারি" নিয়ে এতক্ষণ নাড়াচাড়া করছিলুম, যাঁর নাম শ্রবণেই শ্রীরাধার ন্যায় উন্নাসিকজনের "কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে" তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে; পক্ষান্তরে আমি যে অন্য কোষের শরণাপন্ন হচ্ছি সে-কোষ প্রথম যে রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় সেটি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অক্সফর্ডের প্রায় এক শ' বছর পূর্বে। তার অর্থ, গত এক শ' বছর ধরে এ অভিধানের ঐতিহ্য। একে সচরাচর ওয়েবস্টার বলা হয় এবং উপস্থিত "Webster's Seventh New Collegiate Dictionary" নাম নিয়ে কলকাতার রাস্তাঘাটে জলের দরে বিক্রী হচ্ছে—আমার হিসেবে যার দাম হওয়া উচিত ৬০/৭০ টাকা, বিক্রী হচ্ছে সেটি দশ টাকায়—চেষ্টা-চরিত্র করলে পাবেন আট টাকায়। এ-অভিধান অবহেলা করার মত কেতাব নয়। এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা বলেন, "অভিধানের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এ-অভিধানের উল্লেখ না করলে সে-বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যায়" এবং "কনসাইজ অকসফর্ড" যে পাঠখানি "বেসট্ মডার্ন ডিকশনারির" কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন

১। ইংরেজ জাতটার প্রাণ পুরুষ যে বেনে সেটা বোঝাবার জন্য বহু জ্ঞানী বহুতর যুক্তিতর্ক উদাহরণ-হদীস পেশ করেন। সেগুলো নিতান্তই কাটা পড়ুয়ার সেই হুঁকির মত ডাস্টবিন মার্কা : "গুরু-মশাই, আমি ঘুমুচ্ছিলুম, কে যেন আমার হাতে দিয়ে তামাক খেয়ে গেছে।" আসল মোক্ষম যুক্তি, কামারের এক ঘায়ের মত, এই বিপুলা বসুন্ধরায় লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে একই গোয়ালে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কে, কোথায়? ইংরেজ—অক্সফর্ডে। পেত্যয় না হয় তো যান সেই বিগ্রহ-পাণ্ডার যুগল-মিলন দেখতে সেখানে। এই বিদ্যায়তন এন্তের কেতাবাদি ছাপে, প্রকাশ করে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, লাভ করে। কন্টিনেণ্ট বা ভারতের বিদ্যায়তনদের লাভ করা মাথায় থাকুন, গচ্চা দিতে দিতে দিতে কণ্ঠশ্বাস। অর্থশাস্ত্রের মহাজনরা বলেন, ১৯৩০-৩২ যখন বিশ্বময় ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন্মৃত তখন যে প্রতিষ্ঠান রেকর্ড মুনাফা করেন তিনি অক্সফর্ড। অস্মদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইষ্টমন্ত্র "Advancement of Learning এই কাষ্ঠরসিকতা শুনে এক ইংরেজ বলেছিল "সেকি! একশ বছর হয়ে গেল, তোমরা এখনো ফালতো "L" অক্ষরটি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের মত "Advancement of Earning" করতে পারোনি!"

তার মধ্যে ওয়েবস্টার-রচিত কোষ অন্যতম। এইবারে দেখি ইনি কি বলেন। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, ইনি ঈষৎ ধর্মভীরু, কারণ "লাভ্" শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, "পিতার ন্যায় ঈশ্বর মানবসন্তানের জন্য যে মঙ্গল-চিন্তা করেন ('উদ্বেগ ধরেন'ও বলা যায়, কারণ ইংরিজিতে আছে "ফাদরলি কনসার্ন")। অকসফর্ডে ভগবান নেই—না, না—আমি বলতে চাই, অকসফর্ড অভিধানে "লাভ্" শব্দ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সঙ্কলনকারী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের, কিংবা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি কিংবা এই "কুসংস্কারে" বিশ্বাস করেননি। তা সে যাই হোক, সেই ধর্মভীরু ওয়েবস্টার "লাভ্" শব্দের নানা অর্থ দিতে গিয়ে (কেউ কেউ যে ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে "লাভ" ব্যবহার করেন সেটাও বলেছেন) লিখছেন "যৌন আলিঙ্গন" এবং সেটা বেঝাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিটাল অক্ষরে লিখছেন, "COPULATION" অর্থাৎ "মৈথুন", "যৌন সঙ্গম"। এবং যে "টু মেক লাভ" নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলুম তার বেলা ইংরেজের মত বিস্তর ধানাই পানাই না করে, আশকথাপাশকথা (বীট অ্যাবাউট দি বুশ) না ঝেড়ে, এর ঘাড়ে ওর কাঁধে আপন বোঝা না চাপিয়ে একদম এক ঘায়ে সোজা-সুজি উত্তর দিচ্ছেন: "টু এনগেজ ইন সেক্সুয়েল ইন্টারকর্স"।

অবশ্য বলতে পারেন, ওয়েবস্টার অভিধান মূলত মার্কিন অভিধান। এর উত্তরে নিবেদন ১) এ-অভিধান আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই এর বিলিতি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এখনো যে সব ইংরেজ উন্নাসিকতা অপছন্দ করেন (আমি, নেটিব, ঘৃণা করি) তাঁরা এ-অভিধানই ব্যবহার করে থাকেন; ২) কনসাইজ অকসফর্ড বহুস্থলে বিশেষ বিশেষ ইংরিজি শব্দ মার্কিন মুলুকে যে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখ করেন; এ-স্থলেও করতে পারতেন; ৩) আমি ঝুরি ঝুরি ইংরেজ লিখিত গল্প উপন্যাসে এর ব্যবহার পেয়েছি (কিন্তু "স্কুল" পাইনি, এবং ওয়েবস্টারেও শব্দটা নেই কারণ শব্দটা এখনো গ্রাম্য; ৪) এবং সর্বশেষে বক্তব্য, ওয়েবস্টার মার্কিন দেশজাত বলে যদি তাকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করতে হয় তবে এ-অভিধানখানি এ-দেশের গুণীজনের আশীর্বাদ লাভ করলো কি প্রকারে? কারণ গ্রন্থপরিচিতিতে স্পষ্ট ছাপা আছে

"Published with the assistance of Joint Indian-American Text Book program."

এ-বিষয়ে এতখানি লেখবার কারণ কি? গত সপ্তাহে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, কচর কচর আর করবো না, কিন্তু আমার কপাল মন্দ, তার দুদিন পরেই এক সদ্য বিলেত-ফেরতা তরুণের সঙ্গে মোলাকাৎ। ছেলেটি ভালো, কিন্তু বিলিতি মোহ ঝেড়ে ফেলতে এখনো তার ঢের সময় লাগবে। তখন হঠাৎ আমাকে স্ট্রাইক করলো, কে যেন বলেছিল, বিলিতি স্নবারি স্বরাজলাভের পর আদৌ কমেনি, বরঞ্চ বেড়েছে। যে-সব ছেলে-ছোকরারা আমার লেখা পড়ে আমাকে সম্মানিত করে অন্তত তারা যেন অকসফর্ড বলতে ভিরমি না যায়, রকবাজি গুলমারার সময় খোদার-খামোখা বিলিতি স্নবারির "চরিত্র গার্ড" না হয় তাই এত সব বলতে হল। অন্যান্য—যথা "বিদেশের" বর্তমান অনুচ্ছেদ প্রধানত সেক্স্ নিয়ে—সেগুলো পূর্বেই নিবেদন করেছি। অভিধান নিয়ে আলোচনা করে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইংরেজ ডাক্ত ঝিক্তে, বলে পটল।

ডাক অব বেডফর্ড জন্ ভণ্ডামি সম্বন্ধে যা বলেছেন তার অনেকখানি সর্ব-দেশে সর্বকালেই থাকে—তবে কোনো কোনো দেশে চক্ষুলজ্জাটার বাড়াবাড়ি, কোনো কোনো দেশে কম। কোনো ফরাসী যখন সমাজে সম্মানিতা কোনো মহিলাকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সেটা গোপন রাখার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না, কিন্তু বিলেতে ঠিক তার উল্টো—অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্জনীয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ তার 'ভাবভালোবাসাটা' এমনই নিরন্ধ্র গোপন রাখতে সক্ষম হয় যে মহিলাটিও তার ডবল সুযোগ নেবার পথটা নিজের থেকেই দেখতে পান। জন্ সায়েব একটি সত্য ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একটি প্রখ্যাতা মহিলা (এই গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে) সমাজের অতি উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত দু' দুজন অভিজাত জনের সঙ্গে একই সময়ে প্রণয়-লীলা চালালেন। কথায় বলে, ডান হাতের কারবার বাঁ হাত জানে না—নটবরদ্বয়ের একজনও জানতেন না, মহিলাটি দুজনার এজমালি রক্ষিতা। মহিলাটি যে সব কেনা-কাটা করতেন, তাঁর খরচাপাতি যা হত তার প্রত্যেকটি বিল তিনি দোকানীর কাছ থেকে ডুপ্লিকেটে চেয়ে নিতেন এবং আমাদের চৌকশ শেয়ালের একই কুমির-ছানা দু-দুবার দেখাবার কায়দায় দুই মহাশয়ের সামনে পেশ করতেন। মাগ্গি ভাড়ায় ছিমছাম যে-বাড়িটিতে বাস করতেন তার ভাড়াও গুনতেন দুই হুজুরই। বলা বাহুল্য, হাফাহাফি নয়, পুরোপুরিই—কারণ প্রেমের বখরাদার আছে সে তথ্যটি না জানলে ভাড়ার বখরাদার জুটবে কোত্থেকে? কিন্তু তাবৎ কেচ্ছার মধ্যে সব চেয়ে রোমাঞ্চকর রোমান্টিক ব্যাপার: বেশ অনেক বৎসর ধরে উভয়েই কাচ্চাবাচ্চাগুলোর জনকরূপে গণ্য হতেন।

এখানে আমি পড়েছি বিপদে। কার কাছে গণ্য হতেন? ধরে নিচ্ছি সায়েবদ্বয় মহিলাটি সম্বন্ধে দুই প্রস্থ বন্ধুবান্ধব রেখে নিয়েছিলেন যাদের এক প্রস্থ অন্য প্রস্থকে চিনতেন না। দুই প্রস্থকে দুই নাগরের নাম দিতেন। কিংবা হয়তো ডাকের চিন্তাধারা আদৌ সেদিকে যায়নি। তিনি বলতে চেয়েছেন, দুজনাই ভাবতেন, বাচ্চাগুলো তাঁরই। কিন্তু তবু শেষ প্রশ্ন থেকে যায়, বাচ্চাগুলো ভাবতো কি? তারা ঠিক যে রকম জানে, এক জোড়া জুতোতে দুটো জুতো থাকে ঠিক সেই রকম মেনে নিয়েছে একই বাড়িতে দুটো বাপ আনাগোনা করে। পাঠক জানেন, আমার কল্পনাশক্তি বড়ই অনুর্বরা। আপনারাই না হয় এ-সমস্যাটি সমাধান করে নেবেন।

এবং সর্বশেষে জন বলেছেন, দু' দুজন নাগরের কাছ থেকে প্রেম, আত্মনিবেদন, প্রশস্তিগীতি আসঙ্গসুখ লাভ করে, সমাজের দু' দুটো হোমরাও সিং চোমরাও খানকে আস্ত দুটো খোকা ম্যাড়ার মত আঙ্গিনার খুঁটিতে বেঁধে রেখে তিনি যে তাঁর আত্মশ্লাঘা বাড়াতে চেয়েছিলেন তা নয়, তিনি সব-কিছু করেছিলেন সুন্দর পৌণ্ড শিলিং পেন্সের জন্য।

ফ্রান্সে তো এসব নিত্যদিনের ডাল ভাত। রীতিমত একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, জন্ও আমাদের বলছেন, পৃথিবীর আর সর্বত্র যা ঘটে থাকে, বিলেতে তাই ঘটে, তবে সায়েবরা এ সব বাবদে উচ্চবাচ্য করেন না।

কিন্তু জন্ যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিলেত তথা তাবৎ কন্টিনেন্টের কার্য-কলাপ পর্যবেক্ষণ করে আপন মতামত প্রকাশ করেন, কিংবা যখন নীরব থাকেন, অথবা কোনো প্রকারের উপদেশ দেওয়া থেকে নিরস্ত থাকেন, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। তারই একটা পরিস্থিতির উল্লেখ তিনি করেছেন বড় বে-আব্রু ভাষায়। আমি সেটা মামুলী ঢঙে পেশ করি। বলছেন, "কোনো হাউস পার্টিতে (অর্থাৎ যেখানে উইক এণ্ড কাটাতে হয়) যদি তুমি সুযোগ পেয়ে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে কিংবা কোনো বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে মাত্রাধিক প্রেম করে ফেলো তবে সে গেরো থেকে বেরবে আসবার চেষ্টা করো—অবশ্য যতখানি পারো ভদ্রতা বজায় রেখে। বলা বাহুল্য, অতিশয় চতুরতাসহ। কারণ কোনো মহিলারই হৃদয়ানুভূতিতে আঘাত হানা অনুচিত। কিন্তু হায়, ইহসংসারে সব গেরো তো আর এড়াতে পারা যায় না।"

এ স্থলে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, পরিস্থিতিটা জন্-এর মনঃপূত নয়। কিন্তু তিনি তাঁর দেশবাসীর তথা বিশ্বজনের মনোবৃত্তি ভালো করেই জানেন বলে লম্বা লেকচার ঝেড়ে সদুপদেশ দেন নি। তাঁর নীরবতা এস্থলে ক্ষেত্রই হিরণ্ময়।

॥ দুই ॥

মূল্যের সঙ্গে মূল্যের সংঘাত (conflict of values) যখন ঘটে তখন কোনো সহজ সর্বগ্রাহ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। ভালোর সঙ্গে মন্দের কিংবা শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের (আকাঙ্ক্ষিতের) সংঘাতের চেয়ে এ সংঘাত দারুণতর, মানুষের জীবনকে ছারখার করে দেয়; অধিকাংশ ট্র্যাজেডির উৎস এইখানে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর প্রারম্ভে রয়েছে সেই বিখ্যাত শ্লোক: "শ্রেয় এবং প্রেয় ভিন্ন, এ দুই লক্ষ্যবস্তু বিভিন্নভাবে মানুষকে বাঁধে। যারা শ্রেয়কে বরণ করে তাদের মঙ্গল হয়, আর যারা প্রেয়কে বরণ করে তারা মনুষ্যত্বের সত্য অর্থ থেকে চ্যুত হয়।" কিন্তু শ্রেয় বা নিঃশ্রেয়স (ultimate good), যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ নয়, একাধিক। প্রেম নিশ্চয়ই তার অন্যতম। ঋষিরা তার আস্বাদ পেয়েছিলেন বলে তো মনে হয় না। তাঁরা নারী-পুরুষ সম্বন্ধে কামকেই বড় করে দেখেছেন। এই সম্বন্ধের যে উন্নীত স্তরকে আমরা প্রেম বলি তার কথা প্রাচীন সাহিত্যে খুব একটা পাওয়া যায় কি? প্লেটো যদি বা প্রেমের আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত কথোপকথনে, প্রেমপাত্র করেছেন কম-বয়সী প্রিয়দর্শন যুবককে, নারীকে রাখতে চেয়েছেন কক্ষভুক্ত, গৃহকর্ম ও সেবার কাজে। সাফোর কবিতা উচ্চস্তরের প্রেমের কবিতা, কিন্তু তাতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিধৃত হয় নি: প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদ দুটি-ই নারী। মেঘদূত-এর বিরহী যক্ষ কামার্ত, তার কাণ্ডজ্ঞানহীন কামুকের মানসিকতা, প্রেমিকের নয়। তপোবনবাসিনী শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখে কামার্তা হয়েছিল প্রেমাকুলা নয়। বজ্রসেনকে দেখে শ্যামার মনে যে ভাব জেগেছিল ("কে এই পুরুষ দেবকান্তি") তার সঙ্গে তুলনীয় নয় শকুন্তলার কম্পিত বক্ষের, স্বেদবিন্দু-শোভিত মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনা—যদিও শ্যামা রাজনটী, কোনো মুনিঋষির সংশিক্ষায় ও মহৎ দৃষ্টান্তে তার মন গড়ে ওঠে নি। পরবর্তী অঙ্কে অবশ্য শকুন্তলার মনে শুদ্ধ পাতিব্রত্যের উন্মেষ দেখা যায়; কিন্তু প্রথম দর্শনে শ্যামা প্রেমে পড়েছিল, শকুন্তলা কামবিদ্ধ হয়েছিল।

প্রাচীন শাস্ত্রে যখন অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষকে চতুর্বিধ পুরুষার্থ বলা হয়েছিল, তখন ঠিক কী অর্থে বলা হয়েছিল সেটা খুব স্পষ্ট নয় আমার কাছে। ধর্ম ও মোক্ষ যে অর্থে পুরুষার্থ, অর্থ ও কাম তো ঠিক সেই অর্থে পুরুষার্থ হতে পারে না। বোধ হয় সাইকলজিক্যাল অর্থে তাঁরা ধনলাভ ও কামপূরণকে পুরুষার্থ বলেছিলেন। অর্থাৎ অধিকাংশ সংখ্যক লোকের মনে এই লক্ষ্যগুলির আকর্ষণ দুর্নিবার; তারা প্রবলভাবে ধন এবং নারীসঙ্গ চায়; চাওয়া উচিত কিনা সে প্রশ্ন আলাদা। পুরুষার্থের অন্য অর্থ এথিক্যাল: পুরুষার্থ হচ্ছে সেই লক্ষ্যবস্তু যা না চাইলেও চাওয়া উচিত, যার আকর্ষণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেকের মনে ক্ষীণ হলেও যা আমাদের সকলের জীবনসাধনার সম্যক যোগ্য আদর্শ। পুরুষার্থের মধ্যে যখন অর্থ ও কামকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তখন এই দ্বিতীয় অর্থে পুরুষার্থ-এর বদলে নিঃশ্রেয়স শব্দটা ব্যবহার করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা কম থাকে।

কেবল কামের তৃপ্তি নিঃশ্রেয়স বলে গণ্য হতে পারে না, কিন্তু প্রেমের সার্থকতা হতে পারে। মানবজীবনের গভীরতম ও মহত্তম আনন্দের অন্যতম উৎস প্রেম। প্রেমকে কামগন্ধহীন হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু কামনার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, গভীর ও পরিব্যাপ্ত প্রেমানুভূতি। নগ্ন কামনা শ্রীহীন, কিন্তু প্রেমের মধ্যে যখন কামনা স্থান নেয় তখন তার রূপ আলাদা, প্রিয়ার দেহ তখন কোনো সুদক্ষ শিল্পীর হাতে-গড়া মূর্তির সুষমা লাভ করে। নিবিড় প্রেমের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়সুখ অন্য এক পর্যায়ে উঠে যায়, তার সঙ্গে শিল্পকর্মসঞ্জাত রসানন্দের তুলনা অসমীচীন নয়।

প্রেমের সঙ্গে সুনীতির (মরালিটির) যদি বিরোধ বাধে তবে কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে রাখব আমরা? সুনীতিই কি নির্বিচারে বরেণ্য? মনে রাখা ভাল যে, সুনীতির কোনো বিধানই সব সময় অলঙ্ঘনীয় নয়। নরহত্যা পাপ, কিন্তু বিচারপতি যখন ফাঁসির হুকুম দেন, সেনাপতি যখন শহরের উপর বোমা ফেলতে

আদেশ করেন, তখন নরহত্যা, নিরস্ত্র নাগরিক-হত্যাও পাপ নয়। নিষ্ঠুরতা পাপ, কিন্তু মা যখন তাঁর একমাত্র পুত্রকে জড়িয়ে ধরে বলে—তোকে আমি কিছুতেই শত্রুর কামানের মুখে যেতে দেব না, তখন দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ পুত্র নিষ্ঠুরভাবে মায়ের হাত ছাড়িয়ে সীমান্তগামী ট্রেন ধরতে চলে যায় এবং আমাদের সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এক হিসাবে অবশ্য সুনীতি যৌগিক, কারণ সুনীতির উপরই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর সমাজের ভিৎ যদি টলে তা হলে ব্যক্তি-জীবনও বিপর্যস্ত হয়, সব সাধনাই পণ্ড হয়ে যায়। তবে কিনা সমাজরক্ষা করতে গিয়ে যদি ব্যক্তিকে এমন নিয়মনীতি বিধিনিষেধের জালে জড়িয়ে ফেলা হয় যে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই লোপ পায়, তা হলে সে সমাজ নিয়েই বা আমরা করব কী? ব্র্যাডলি বড় সুন্দর বলেছিলেন : "মানুষ মানুষই নয় যদি সে সামাজিক না হয়, তবে সে পশুর চেয়ে খুব একটা উর্দ্ধে ওঠে না যদি সামাজিকের চেয়ে বেশি কিছু না হয়।" সুনীতির মূল্য সম্পূর্ণরূপে সামাজিক; তার একমাত্র লক্ষ্য সমাজের কল্যাণ। কল্যাণ বলতে ঠিক কী বোঝায় তা অবশ্য একটা জটিল প্রশ্ন। যাই বোঝাক, সুনীতির লক্ষ্য সার্বিক কল্যাণ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের কল্যাণ নয়।

শিল্প ও জ্ঞানের মূল্য সামাজিক ব্যক্তিক বলা একটু শক্ত। এটা ঠিক যে জ্ঞা (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না) শিল্পীর সাধনা—তপস্যাই বলা উচিত পরোপকারার্থে নয়, তিনি নিজের তৃষ্ণা মে যার জন্যই আলো বা রূপের সন্ধান করে কিন্তু যাতে তাঁর নিজের তৃষ্ণা মেটে তা অন্যেরও, সুধী ও রসিক জনেরও, তৃ মেটে। তাই তিনি প্রত্যক্ষত না চাইলে পরোক্ষত পরোপকারী, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দি না পারলেও গভীরতর আনন্দ দানে সক্ষম একজন প্রখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ (নিকলা হার্টম্যান) এঁদের চরিত্রে যে সদ্গুণ দেখ পেয়েছেন তাকে "প্রভাকর পুণ্য" ("radian virtue") আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ এঁ লোকহিতৈষী না হয়েও লোকহিত সাধ করেন স্বভাবগুণে, প্রদীপ যেমন স্বগুণে আলো বিকীরণ করে, মানুষকে পথ দেখা বরঞ্চ যিনি চতুর্থ পুরুষার্থ, অপবর্গ বা মোক্ষের সাধক, তিনি অসামাজিক মানুষ, কারণ তিনি পর্বতগুহায় ধ্যানস্থ বসে কঠোর তপস্যার ফলে ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করলে কার কী এসে যায়। অবশ্য তিনি যদি মহাযান বৌদ্ধদের মতো পরিনির্বাণের দরজা থেকে ফিরে আসেন জনসাধারণ যারা তাদের সকলকে তাঁর আবিষ্কৃত পথ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তবে অন্য কথা।

স্বীকার করতেই হবে যে প্রেমের মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের মতো কবিপ্রেমিকের কথা আলাদা; তাঁরা সহৃদয় পাঠকের মনেও প্রেমের অনুভূতিকে গভীর এবং সূক্ষ্ম করে তোলেন, এই রূপরসাস্বাদ-সহোদর আনন্দ বিষয়ে তাদের চিত্তবৃত্তি মূল্য-বোধকে জাগ্রত করে তোলেন। কিন্তু অকবি প্রেমিক যে চরম মূল্যের সাধনা করছেন, তাতে তাঁর নিজের জীবনই ধন্য হবে, অন্যের হবে বলে তো মনে হয় না। এই প্রেমিক তাঁর প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য যদি কোনো অসামাজিক অসৎ আচরণ করে বসেন, তবে তাঁকে আমরা সহজে ক্ষমা করতে পারি না।

বরঞ্চ জ্ঞানী ও শিল্পীকে পারি, কারণ তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য যদি এক দিক দিয়ে সমাজের ক্ষতি করেনও, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ করে দেন। তবু কোনো অভাবগ্রস্ত ভাস্কর যদি বিধবা বৃদ্ধাকে গলা টিপে মেরে ফেলে তার গয়নাগাটি হস্তগত করে সেই টাকা দিয়ে মহার্ঘ প্রস্তরখণ্ড কিনে এক অসাধারণ সুন্দর মূর্তি গড়েন, তা হলে আমাদের বিচার কী হবে? তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেও তাঁকে ক্ষমা করতে পারব না বোধ করি। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা তেমনি আমাদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে; নাট্যকারেরও ধাঁধার কোলে ছিল নিশ্চয়ই। পাপের পথে প্রেমের সাফল্য চেয়েছিল এই দুর্ভাগা-বতী সাধিকা। বিধাতার কথা বিধাতাই জানেন, কিন্তু আমরা কি তাকে ক্ষমা করতে পারি? বজ্রসেনের মতো আমরাও এই পাপিষ্ঠাকে ভালো না-বেসে পারি না, কিন্তু পাপের মার্জনা তাতে হয় না। হয় কি?

বজ্রসেনের বিচারে শ্যামা পাপিষ্ঠা। বিচার শুনে শ্যামা কেঁদে বলে—আমি পাপ করেছি, কিন্তু তোমার কাছে আমি দোষী নই, দোষী আমি বিধাতার চরণে। কথাটা শোনায় বড় মধুর এবং করুণ, কিন্তু এইভাবে কি পাপের শ্রেণীভেদ করা যায়? মানুষকে খুন করানো যদি পাপ হয়, তবে বিধাতার চোখেই কেন হবে, মানুষ মাত্রের চোখে তা পাপ. প্রেমিকও তো এত বড় জ্বলন্ত সত্যের দিকে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। শ্যামা অবশ্য নরঘাতিনী নয়। কোনো সন্দেহ নেই যে আসলে এবং প্রত্যক্ষভাবে খুনী কোটাল; তার জানতে বাকি ছিল না যে, বজ্রসেন এবং উত্তীয় দুজনেই নির্দোষ। পরোক্ষ খুনী খামখেয়ালী অত্যাচারী রাজা। ("প্রভুদের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে")।

শ্যামার প্রাণাধিক এবং অকপটে নির্দোষ বজ্রসেনকে তার চোখের সামনে দিয়ে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে কোটাল। এই দৃশ্য দেখে সে প্রায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়; বিশেষ করে উত্তীয়কে নয়, অনির্দিষ্ট-ভাবে সাহায্যের উদ্দেশ্যেই অস্ফুটস্বরে ডেকে ওঠে—এই নির্দোষ বিদেশীর প্রাণরক্ষা করতে পারে এমন বীর কী কেউ নেই কোথাও? যেমন করে হোক—ছলেবলেকৌশলে—কেউ এসে তার প্রাণপ্রিয়ের প্রাণরক্ষা করুক, এইটুকুই সে চেয়েছিল। তার ডাকে সাড়া দিল কোনো বীরপুরুষ নয়, ভীরু বিনম্র নতচক্ষু প্রেমিক উত্তীয়। এমন শক্তিমান সে নয় যে বলপ্রয়োগ করে কোটালের হাত থেকে তার নিরপরাধ বন্দীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে। এমন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সে নয় যে, কোটালকে বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে কার্যোদ্ধার করবে। এক্ষেত্রে যে-উপায়ে শ্যামার প্রিয়তমকে মুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব তাও বীরোচিত, কিন্তু বিপরীত অর্থে—প্রবল অত্যাচারীকে পরাভূত করে নয়, চুরির অপবাদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে প্রবলের তলোয়ারের সামনে ঘাড় পেতে দিয়ে। সেই প্রস্তাব সে করল শ্যামার কাছে। শ্যামা সম্মত হল, বিদায়মুহূর্তে তার হাত ধরে ঠেকাতে গিয়েও পারল না। অপরাধ নিশ্চয়ই, নিন্দনীয় নিঃসন্দেহে; কিন্তু একেবারে অমার্জনীয় কি?

সম্প্রতিকালের একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একটু খুলে বলা দরকার।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস নামক এক হিন্দু ভদ্রলোক মহম্মদসিংহের পার্শ্ববর্তী মুসলিমপ্রধান গ্রামে বাস করতেন স্ত্রী এবং পনের বছরের কন্যাকে নিয়ে। যদিও হাইস্কুল পর্যন্ত বিদ্যা ছিল, তবু তিনি সাইকেল রিকশাই চালাতেন—তাঁর পৈতৃক ব্যবসা। স্বভাব ব্যবহার কথাবার্তা মার্জিত বলে গ্রামের অনেকেই তাঁকে ভালোবাসতেন, শহরেও অনেকে পছন্দ করতেন তাঁকে, তাঁর রিকশা পেলে অন্য কোনো রিকশায় উঠতেন না। এমন সময় বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী বিভীষিকা নামল। গ্রামের অন্য দুচার ঘর হিন্দু যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আস্তে আস্তে সরে পড়লেন, সম্ভবত সীমান্ত পার হয়ে চলে গেলেন ভারতে। মনোরঞ্জনেরও চলে যাওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু পনের বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এতখানি পথ পাড়ি দিতেও সাহস হয় না। তাছাড়া গ্রামের কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক এসে বললেন, আমাদের কপালে যা আছে, আপনার কপালে তার চেয়ে বেশি কোনো বিপদ আসবে না; আপনারা যে মুসলমান, আমাদের আপন লোক—আমরা সবাই সে কথা বলব।

যথাসময়ে খান সেনারা শহরে এসে

পৌঁছল: গ্রামে খাওয়া না করলেও চারি-দিকে থমথমে ভাব; মনোজের মনে বড় ভয়। মুক্তি ফৌজের ছেলেরা শহরে হঠাৎ হঠাৎ আসে আবার উধাও হয়। একদিন সন্ধ্যার পর দুটি মুক্তি ফৌজের ছেলেকে চিনতে পেরে মনোজ অনুনয় করে বললেন, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি আমাদের তিন-জনকে বর্ডার পার করে দাও, আমার বড়ো ভয় করছে। তারা বলল, এবার তাদের হাতে কয়েকটা কাজ রয়েছে, পরের বার তারা যখন আসবে, তখন নিয়ে যাবে ঠিক। আজ রাত্তিরের মতো কি মনোজ তাদের আশ্রয় দিতে পারেন, ভোর না হতেই তারা সরে পড়বে? মনোজ তাদের নিয়ে এলেন বাড়িতে।

এদিকে গ্রামের এক আধ-বখাটে মুসল-মান তরুণ বড়ো ঘন ঘন তাঁর বাড়িতে আসা-যাওয়া করছিল কিছুকাল ধরে, কন্যাটির প্রতি সে আসক্ত। কন্যা বিরক্ত হতো। এক-দিন মনোজ ছেলেটিকে বললেন — তুমি এমন করছ কেন, তোমার আর একটু বয়স হোক রোজগেরে হোক, তখন আমার মেয়ে যদি রাজি থাকে, আমি বিয়ে দিতে আপত্তি করব না। কিন্তু এমন করে তাকে যখন তখন উত্যক্ত কোরো না। তুমি ভদ্রঘরের ছেলে, এ তোমার কী রকম ব্যবহার! তরুণটি অপমানিত বোধ করল, রাগ চেপে রাখল। বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করা কিন্তু সে ছাড়েনি। স্বভাবতই সে টের পেয়ে গেল যে, মনোজ দুটি অচেনা ছেলেকে এক রাতের মতো বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। অজ্ঞান মিলিয়ে সে ঠিকই বুঝতে পারল যে, ওরা মুক্তি ফৌজের ছেলে। অপমানিত প্রেমিক প্রতি-শোধের এত বড়ো সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন। সকালেই শহরের মিলিটারী দফতরে খবরটা জানিয়ে এল।

অবিলম্বে মেজর এল চারজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে; মনোজকে গ্রেপ্তার করল। ঘরে পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার পাশবিক লালসা দুর্দম্য হয়ে উঠল। খান সেনাদের অমানুষ মনে করবার কোনো কারণ নেই; তবে সে মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে নিরেট পশু হয়ে তারা নেমেছিল বাংলাদেশের মাটিতে। কয়েদীকে সেপাইদের হাতে সমর্পণ করে মেজর ফিরে এল, বাড়িতে ঢুকে মেয়েটির হাত তার পাঞ্জাবী মুঠোয় চেপে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ভিতরের ঘরের দিকে। মা মেয়েটিকে সবলে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দিল মাটিতে। মা তখন দরজার কাছে এসে চিৎকার করতে লাগলেন—আমার মেয়ের সর্ব-নাশ করছে, তাকে বাঁচাও, তাকে বাঁচাও, তোমরা কি কেউ তাকে বাঁচাতে পার না।

পাশের বাড়ির ভন ভুক্তি করা বাজিতে মুসলমান যুবক ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল —কোথায় আপনার মেয়ে। মা ভিতরের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন। যুবক রাখা দরকার যে মা দেখেছিলেন মেজরের কোমরের পিস্তল—তাঁর ভয় হয়েছিল ঐ পিস্তল দেখিয়ে জানোয়ারটা তাঁর মেয়েকে কাবু করবে। যুবকেরও না জানার কথা নয় যে, আর্মি অফিসারদের বেল্টে সব সময় রিভলবার থাকে। তবু সে সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে ক্রন্দনরতা মায়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। প্রবল বেগে ধাক্কা মেরে খিল-দেওয়া দরজা খুলে ফেলল। ঘরে ঢুকতেই মেজর তার বুকে গুলি করল। তার সঙ্গে দেহের গোঙানি শুনে মেজরের ধর্ষণ-স্পৃহা তখনকার মতো স্তিমিত হল। পিস্তল হাতে সে বেরিয়ে চলে গেল শহরের দিকে। মেয়েটি রক্ষা পেল। বীর যুবক যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল, তখন মা মেয়ের হাত ধরে পিছন দিককার উঠোন পার হয়ে ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে পালালেন।

স্বভাবতই তাঁর ভয় হয়েছিল যে, একটু পরে সেপাইরা এসে তাঁর মেয়েকে ধরে নিয়ে মেজরের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেবে। বেশ কিছুকাল পর অবশেষে মা আর মেয়ে ত্রিপুরার এক শিবিরে আশ্রয় পেয়ে নব-জীবন লাভ করলেন। পথে তাঁদের দুঃখ-কষ্ট কম হয়নি, কিন্তু কারো "সর্বনাশ" ঘটেনি। বাংলাদেশে যা ঘটেছে এবং ঘটছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সামান্যই। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ।

মা কি পাপিষ্ঠা, কলঙ্কিনী? তিনি তো জেনেশুনেই প্রতিবেশী বীর যুবকটিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছিলেন, যেমন পাঠিয়েছিল পার্থ প্রেমিক উত্তরকে। দরজা থেকে ভিতরের ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেও তিনি ছুটে গিয়ে যুবকটির হাত ধরে বলতে পারতেন—না বাবা, তুমি যাও

ফিরে যাও, আমার মেয়ের কপালে যা আছে তাই হবে; তুমি কেন মিছে প্রাণ দেবে? তোমার মায়ের কাছে আমি কেমন করে মুখ দেখাব? কিন্তু তিনি নিশ্চল নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শ্যামাও উত্তীয়কে বলতে পারত— না, তুমি তোমার তরুণ প্রাণ দিয়ে কেন আমার প্রাণপ্রিয়কে বাঁচাতে যাবে; আমার কপাল ভেঙেছে ভাঙুক; কিন্তু তোমার জীবন গেলে যে আমি নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে অপরাধিনী হব। কিন্তু এসব কিছু না বলে সে কেবল উত্তীয়ের চরণে প্রণাম জানাল। অবশ্য পরের দিন সে গিয়ে নগর কোটালকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলেছিল, বলেছিল— "বেঁধে নিয়ে যা মোরে রাজার চরণে।" তবু অনেক পাঠক, সব মা-ই ভাববেন—শ্যামা পাপিষ্ঠা, কিন্তু পূর্বোক্ত ইতিবৃত্তের মা কিছুমাত্র পাপ করেননি, যা করলেন তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অমন সংকটে পড়লে যে কোনো মা তাই করত। উপরন্তু তাঁরা বলবেন মাতৃস্নেহের স্বর্গীয় গরিমার কথা, অতুলনীয় পবিত্রতার কথা; বলবেন—তার সঙ্গে প্রেমিকার তুলনা হয় না কোনো দিক দিয়ে।

মাতৃস্নেহ আর প্রেম ভিন্ন জাতের অনুভূতি অবশ্যই। কিন্তু মর্যাদাভেদের কথা মানতে আমি প্রস্তুত নই, বলতে পারব না একটা পবিত্র, অন্যটা অপবিত্র। যেমন সাহিত্য আর সংগীত ভিন্ন জাতের শিল্প, কিন্তু কোনটার মর্যাদা বেশি কে বলে দেবে? আমার কাছে প্রথমটার কদর বেশি, কিন্তু সেতো আমার ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার, তাতে অপরের সম্মতি আমি দাবী করতে পারি না। মাতৃস্নেহ আমরা পেয়েছি আমাদের আদিম চতুষ্পদ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে, রোমান্টিক প্রেম সভ্য সংস্কৃতিবান মানুষের সৃষ্টি। তাই বলে মাতৃস্নেহের মর্যাদা কিছুমাত্র খাটো হয়ে যায় না। বাড়েও না অবশ্য; কারণ ঐতিহ্যের প্রাচীনতার উপর মর্যাদার উচ্চতা নির্ভর করত যে যুগে, সে যুগ আজ গত। অনুভূতির আভিজাত্য না হোক, মাত্রাধিক্যের ওজুহাতে কি মাতৃস্নেহ বিশেষ কোনো গৌরব বা গুরুত্ব দাবী করতে পারে না, অন্তত বিশেষ একটি কৈফিয়ৎ হয়ে দাঁড়ায় না? এটা ঠিক যে মায়ের মমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই প্রবল হয়, এবং সর্বত্র প্রায় একই ডিগ্রীতে প্রবল। তুলনায়, জনে জনে অথবা একই মনে বিভিন্ন সময়ে প্রেমের তারতম্য অনেক বেশি দেখা যায়: নিবিড়তম প্রেম থেকে তরলতম প্রেমের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কিন্তু শ্যামার প্রেমে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ঊর্ধ্বতম মাত্রা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন; বজ্রসেনের প্রেমের "বলহীনতা"-র সঙ্গে তা প্রতিতুলনীয়।

মা বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাঁর কন্যাকে সর্বনাশের হাত থেকে; শ্যামা বাঁচাতে চেয়েছিল তার দয়িতকে মৃত্যুর হাত থেকে। বাঁচাতে গিয়ে দুজনেই অন্য একজনের মহৎ আত্মবলিদানের কারণ হলেন। আমাদের শ্যামার পাপ অবশ্য জাতকের শ্যামার পাপের মতো জঘন্য নয় মোটেই। তবু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিষ্পাপ করে আঁকতে চাননি; চাইলে নাটক অর্থহীন হয়ে যেত। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন শ্যামার পাপ যত বড়োই হোক, তার প্রেম আরও বড়ো। উপরন্তু যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিভূ বলে পৃথিবীময় খ্যাত, এবং যাঁর প্রতি হালের কোনো কোনো বাঙালী সমালোচক সুনীতি-বায়ুগ্রস্ত পিউরিটান ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করেন, সেই রবীন্দ্রনাথ আজ তাঁর আটাত্তর বছর বয়সে আমাদের অবাক করে দিচ্ছেন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের শেষ গানে জানিয়ে দিয়ে যে এত বড়ো পাপও বিধাতার চোখে, অর্থাৎ শাশ্বত ন্যায়নীতির চোখে ক্ষমার্হ।

বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার মনে প্রথম দর্শনে যে ভাব জাগল তাকে মোহ (infatuation) মনে করা যেতেও পারে, কারণ প্রথম দর্শনে মানুষ রূপ ছাড়া আর কী দেখে, এবং

রূপের প্রতি মোহ ছাড়া আর কী জন্মাতে পারে। আমি অবশ্য ইঙ্গিতপূর্বে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, শ্যামা বজ্রসেনের শুধু রূপে দেখেনি, রূপের মধ্যে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ঝলক দেখেছিল, এবং তার মনের মধ্যে যে প্রবল আকর্ষণ জন্মেছিল সেটা শুধু রূপের প্রতি জাগেনি, জেগেছিল সমগ্র মানুষের প্রতি। আমরা কখনো কখনো এমন লোককে দেখি, যাকে দেখে চমকে উঠে বলি, কী আশ্চর্য মুখশ্রী! এই আশ্চর্যানুভূতি কেবল মুখের রঙে রেখায় গড়নে জাগে না, জাগে চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের আভাসে বিভাসে। অবশ্য ভুল করতেও পারি আমরা, পরে হয়তো শুধরে নিয়ে বলতে হয় প্রথম দর্শনে যা ভেবেছিলাম মেয়েটি (বা পুরুষটি) মোটেই সে রকম নয়। শুধু প্রথম দর্শনে কেন, দু-এক বছর চিনবার পরেও কোনো কোন ক্ষেত্রে আমাদের বলতেই হয়—ভুল চিনেছিলাম, লোকটির হৃদয়মনের অনেক কিছুই ধরা দেয় নি এত দিনকার পরিচয়ে আজ বুঝলাম এতো আমার ভালোবাসার যোগ্য নয়। যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে শ্যামা বজ্রসেনকে দেখে তেমনি চমকে উঠেছিল।

তবু যদি পাঠক বা দর্শকের ভুল হয়ে থাকে যে বজ্রসেনের প্রতি সত্যিকার প্রেম জাগে নি শ্যামার মনে, সে শুধু তার রূপে দেখেই মজেছিল, তবে সে ভুল ভেঙে যায় শ্যামাকে যখন বজ্রসেন চূড়ান্ত অপমান এবং নির্মমভাবে আঘাত করে পরিত্যাগ করে। এর পর কোনো প্রকার মোহই টিকতে পারে না; কিন্তু সত্যিকার প্রেম আরো সত্য, আরো গভীর হতে পারে। ছেড়ে যাওয়ার পর উদ্‌ভ্রান্ত বজ্রসেন যখন তাকে ডাকে :

এসো এসো, এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে,

তখন শ্যামা মান অপমান অভিমান অভিযোগ সব ভুলে গিয়ে ফিরে আসে সেই প্রেমিকের কাছে যে একটু আগে তাকে কলঙ্কিনী বলে ধিক্কার দিয়েছিল, নিজের নীতিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য তাকে মেরে ফেলতে পর্যন্ত চেয়েছিল। ফিরে আসে মুখে কোনো নালিশ, চোখে কোনো কান্না নিয়ে নয়। "এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম হে মোরে ক্ষম" —এ ছাড়া আর কিছু চাইবার বা বলবার নেই তার। আবার সে কুড়ায় শুধু লাঞ্ছনাই এবং লাঞ্ছনাকারীর পদধূলি নিয়ে চলে যায় বনের অন্ধকারে, চিরকালের মতো। শেষ অংকের শেষ গানের পর আমাদের মনে সন্দেহ থাকে না যে এই সর্বংসহা সর্বত্যাগিনী সর্বসুখবঞ্চিতা প্রেমিকার ঐকান্তিক প্রেম মূল্য হারানো দুরের কথা, শাশ্বত কালের রসিক হৃদয়ে অকুণ্ঠিত না হোক বেদনার্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ন্যায়নীতিতে সুদৃঢ়, বিবেকদংশনে জর্জরিত বজ্রসেনের চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের মতো শুদ্ধচিত্ত কবির মনে সহানুভূতির অভাব থাকার কথা নয়। আমরা নাট্যামোদীরা মানুষ হিসেবে বজ্রসেনকে শ্রদ্ধা করি, প্রেমিক হিসাবে নিন্দা করি; অথচ জানি যে মনুষ্যত্বের মূল্য রক্ষা করতে গিয়েই সে প্রেমের অমর্যাদা ঘটালো। "পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি"—ঠিক বুঝে উঠতে পারি না এ কি তার তীব্র মানসিক যন্ত্রণারই প্রকাশ, নাকি তার স্থিরবুদ্ধি আত্মবিচার। সে কি সত্যিই ভাবছে যে পাপ এড়াতে গিয়ে সে পাপী হল? শ্যামাকে ত্যাগ করে বজ্রসেন অশেষ দুঃখ পেল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বিবেকপীড়া কি উপশমিত হয়েছিল? তার নৈতিক দৃঢ়তা কি প্রেমের বলহীনতার কাছে লজ্জিত হয়েই থাকবে, চরিত্রবানের আত্মসন্তোষ প্রেমিকের হৃদয়যন্ত্রণাকে লাঘব করতে পারবে না? যে অন্তিম পরিস্থিতিতে পড়ে বজ্রসেন "এই দারুণ রৌদ্রে এই তপ্ত বালুকায়" উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দির ভিতর থেকে বেরুবার কোনো সোজা রাস্তা বা সুড়ঙ্গ পথ বজ্রসেনের জানা নেই; আমাদেরও জানা নেই। এত বড়ো পাপকে সহজ মনে ক্ষমা করতে পারলেও তো সে নিজেকে পাপী ভাবত, সে ভাবনায় আমাদের মন সায় দিত। পাপিষ্ঠাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তই বজ্রসেন গ্রহণ করল; সে সিদ্ধান্তের ফলে দুটি জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারায় নি, কিন্তু সার্থকতা হারালো। সুনীতি কি রক্ষা পেল? শ্যামার নৈতিক বলহীনতার গ্লানি মৃত্যুদিন পর্যন্ত তার মর্মপীড়ার কারণ হবে; প্রেমের বলহীনতা বজ্রসেনকে লজ্জা দেবে। শ্যামা প্রেমকে বলি দিয়ে ধর্মরক্ষা করতে পারত, কিন্তু প্রেমও কি শ্যামার মতো জন্ম-রোমান্টিকের ধর্ম নয়? বজ্রসেন প্রেমকে বলি দিয়েই তার ধর্মরক্ষা করল। তবে সে নিজেকে পাপী জ্ঞান করছে কেন? অনেক প্রশ্নই ভাবিয়ে তোলে আমাদের রসাভিষিক্ত মনকেও; নাট্যকারের মনে যদি বা কোনো উত্তর জেগে থাকে এসব প্রশ্নের, সে উত্তর তিনি স্পষ্ট করে তোলেননি নাটকে। অবশ্য কাব্যে প্রদোষের আলো-আঁধারিই মানায়, প্রখর দিবালোক নয়।

আমরা জানি বজ্রসেনের বুকে যে

[illegible] শেষ দিন অবধি বিঁধে থাকবে তা শ্যামার মতো প্রেমিকাকে পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা শুধু নয়, শ্যামার মতো পাপীকে ক্ষমা করতে না পারার সন্তাপ। ভিন্ন অর্থে দুজনই পাপী। কিন্তু গান শেষ হয় কবি ও শ্রোতার একাত্ম এই তুলনামূলক উপলব্ধিতে যে পাপিষ্ঠা শ্যামাকে ভগবান তবু ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু ক্ষমাহীন বজ্রসেন ক্ষমার পাত্র নয়। তবে কি পুণ্যের চেয়ে প্রেম বড়ো? আধুনিক রবীন্দ্রনাথ কি তাই বলতে চেয়েছেন এই সাহসিক নাটকে? নাকি সমাপ্তি সংগীত শুধু নাটকীয় প্রয়োজন সাধন করছে, নাট্যকারের মন তাতে একটুও ধরা দেয় নি? হয়তো ধর্মদার্শনিক সমাজ-চেতন রবীন্দ্রনাথের সায় ছিল না প্রেমের এমন চূড়ান্ত জয়গানে। "এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো কলঙ্কে অসম্মানে"—সম্ভবত এটাই সেই রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের, আমাদের রবীন্দ্রনাথের হৃদয় মিলেছে বজ্রসেনের হৃদয়ের সঙ্গে শেষ গানে। আমরা কেমন করে ভুলব যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের অনুরণন ট্র্যাজিক হলেও তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সুরটি রোমান্টিক। এবং রোমান্টিক কবির চোখে রোমান্টিক প্রেমের চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু নেই; ন্যায়নীতি, ধর্মসাধনা, কর্মযোগ—সকলের উপর প্রেম সত্য। মনে হয় 'শ্যামা' রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে: ধর্মভাবনার সঙ্গে কবির অনুভূতিকে মেলাতে পারেননি। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নাটক কিন্তু খণ্ডিত হয়নি, নাটকীয় মূল্যে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

এত সূক্ষ্ম, অনুভূতির গভীরতায় বিস্তারে ও বিবর্তনে এমন ঐশ্বর্যবান, ভালোমন্দের বর্ণযোজনায় এবং টানাপোড়েনে এমন নিগূঢ় দুটি মানব চরিত্র (তিনটিই বলা উচিত, কারণ উত্তীয়ের সঙ্গে পরিচয় ক্ষণিক হলেও সেই ক্ষণকালের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে যায় সে আমাদের মানসপটে) মাত্র কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে ফুটিয়ে তুললেন—ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে কথা ও সুরের যুগ্মসৃষ্টি 'শ্যামা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলতে যে কতখানি বোঝায় তা আমার মনই জানে। এই গীতিনাট্যের প্রথম কাব্যরূপ কাহিনী-কাব্য 'পরিশোধ'-ও একটি অসাধারণ কবিতা। শেষ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা যেমন, আমার মতে 'শিশুতীর্থ', প্রথম পর্বের (কল্পনা-পূর্ববর্তী পর্বের) শ্রেষ্ঠ কবিতা তেমনি 'পরিশোধ'।

সমাপ্ত

'শ্যামা'কে নৃত্যনাট্য বলছি না শুধু এই কারণে যে কাব্যে ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভা এবং আঙ্গিক-সিদ্ধি যেমন অনন্য ছিল, তার তুলনায় শতাংশের একাংশও নৃত্যকলাবিৎ ছিলেন না তিনি। 'শ্যামা'তে কথা ও সুরের সংযোগ মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে, কিন্তু নৃত্যকে মনে হয় অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। রংগমঞ্চে যতবার 'শ্যামা' দেখেছি, আমার মনে হয়েছে নৃত্যের অংশটা বাদ দিলেই ভাল হত। বিশেষত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শ্যামার গানগুলি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে অনবদ্য আঙ্গিকে গেয়ে যান তখন দুঃখের সঙ্গে ভাবি সেই গীতমাধুরীকে নৃত্যরূপ দান করতে পারেন এমন নৃত্যশিল্পী কোথায়। ইন্দ্রাণী রহমান হয়তো পারতেন: শ্যামার মতনই রূপে যেমন অনন্যা তিনি, নৃত্যকলাসিদ্ধিতেও তেমনি। কিন্তু স্বামী বাঙালী হলে কী হবে, বাংলা জানেন না ইন্দ্রাণী, শিখতে চান না, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর মনে। যতদিন না রবীন্দ্রকাব্যে সহৃদয়া অথচ নৃত্যকলায় পূর্ণসিদ্ধা কোনো শিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে এপার বা ওপার বাংলায়, ততদিন নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র নৃত্য অংশটা রসিকবৃন্দের কল্পনাতেই প্রতীক্ষমান থাকবে। বিশেষ করে 'শ্যামা'র, কারণ শ্যামা যে রাজনটী; সাধারণ কোনো নৃত্য-সাধিকা তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন দেখলে না-ভেবে পারি না যে ভারসাম্য বা রসসাম্য রক্ষা পায়নি। তাছাড়া 'শ্যামা'-র মতো অসামান্য সৃষ্টির রূপায়ণে সামান্য ত্রুটি ঘটলেও মনে হয় যেন দেবমূর্তি অসম্মানিত হয়েছে।

কবিতাগুলি আশুপ্রকাশিতব্য একটি কাব্যসংকলনের অন্তর্ভুক্ত। সংকলন গ্রন্থটি গত আট মাসকাল যাবৎ পাকিস্তানী সামরিক বর্গের অকথ্য নিষ্পেষণের মধ্যে রচিত। কোথাও খোলাখুলি কোথাও আভাসে-ইঙ্গিতে এমন ক্রোধ ধিক্কার বিক্ষোভ বেদনা ব্যক্ত হয়েছে যে লেখকের স্বনামে প্রকাশ করে বাংলাদেশে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। মজলুম আদীব (অর্থ নির্যাতিত লেখক) যাঁর ছদ্মনাম তিনি বাংলা দেশের একজন স্বনামধন্য কবি, এখনো স্বদেশেই আছেন। পাণ্ডুলিপি মুক্তিফৌজের এক তরুণ ছাত্রের হাতে পাঠিয়েছেন কলকাতায়। —সম্পাদক

বন্দীশিবির থেকে

"মজলুম আদীব"

ঈর্ষাতুর নই, তবু আমি
তোমাদের আজ বড়ো ঈর্ষা করি। তোমরা সুন্দর
জামা পরো, পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে আলাপ জমাও,
কখনো সেজন্যে নয়। ভালো খাও দাও,
ফূর্তি করো সবান্ধব, সেজন্যেও নয়।

বন্ধুরা তোমরা যারা কবি,
স্বাধীন দেশের কবি তাদের সৌভাগ্যে
আমি বড়ো ঈর্ষান্বিত আজ।
যখন যা খুশি
মনের মতন শব্দ কী সহজে করো ব্যবহার
তোমরা সবাই।
যখন যে-শব্দ চাও, এসে গেলে সাজাও পয়ারে,
কখনো অমিত্রাক্ষরে, ক্ষিপ্র মাত্রাবৃত্তে কখনো-বা।
সে সব কবিতাবলী, যেন রাজহাঁস,
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় মানুষের
অত্যন্ত নিকটে যায়, কুড়ায় আদর।

অথচ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ
এ বন্দী শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।

প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তারস্বরে চাঁদ, ফুল, পাখি,
এমন কি "নারী" ইত্যাকার শব্দাবলী
করি উচ্চারণ, কেউ করবে না বারণ কখনো।
কিন্তু কিছু শব্দকে করেছে
বেআইনী ওরা
ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।

স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ ক'রে বারবার
তৃপ্তি পেতে চাই। শহরের আনাচে কানাচে
প্রতিটি রাস্তায়
অলিতে গলিতে
রঙিন সাইন বোর্ডে, প্রত্যেক বাড়িতে
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
লিখে দিতে চাই
বিশাল অক্ষরে।
স্বাধীনতা শব্দ এতো প্রিয় যে আমার
কখনো জানিনি আগে। উঁচিয়ে বন্দুক
স্বাধীনতা, বাংলা দেশ—এই মতো শব্দ থেকে ওরা
আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে সর্বদা।

অথচ জানে না ওরা কেউ
গাছের পাতায়, ফুটপাতে
পাখির পালকে কিংবা নারীর দুচোখে
পথের ধুলায়,
বস্তির দুরন্ত ছেলেটার
হাতের মুঠোয়
সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি।

২১-৭-৭১

কাক

"মজলুম আদীব"

গ্রামপথে পদচিহ্ন নেই, গোঠে গরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
আল খাঁ খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক।
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।
১২-৭-৭১

একত্রিশ

জ্যাঠামশাই একটু আগে উঠে গেলেন। তাঁর শুতে যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে এসে তিনি অনেকক্ষণ আমার কাছে বসে ছিলেন। কথাবার্তা কমই বলেছেন, যেটুকু বলেছেন তাতে বোঝা যায়, তিনি নিজেই যেন বিমূঢ়। আমার মনে ভরসা জোগাবার জন্যে তিনি কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না।

সুহাসকে আমি আর দেখি নি। অখিল যাবার মুখেমুখে সেই যে 'আসছি' বলে পালিয়ে গেল, আর এল না। তার সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি ভাবছিলাম, সুহাস পাশের ফ্ল্যাটে অশ্রুবাবুর কাছে গিয়ে বসে আছে। পরে আয়নার মুখে শুনলাম ও ইন্দুমতী-দের বাড়ি গিয়েছে।

ইন্দুমতীকে আমি দেখেছি। আমরা কলকাতায় আসার পর একদিন সে এসেছিল। সুহাসই বোধ হয় আসতে বলেছিল। আজ সুহাসদের ইন্দুমতীকে খুব দরকার। আমি বুঝতে পারছিলাম, হাসপাতালে ভরতির কথাবার্তা বলতে সুহাস ও-বাড়ি গিয়েছে।

খানিকটা আগে আবার সুহাসের গলা পেলাম। সে বাড়ি ফিরে এসেছে। আমার ঘরে আর আসে নি। নিজের ঘরে চলে গেছে।

এ-বাড়ির সাড়াশব্দ এবার থেমে আসছে। আয়না এসে আমায় শেষ ওষুধটা খাইয়ে চলে গেল। জ্যাঠামশাই নিজের ঘরে। সুহাস তার ঘরে শুয়ে পড়েছে। আয়না আমার ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাবার পর খানিকটা সময় কেটে গেল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করার কোনো দরকার করে না, ভেজানোই থাকে।

বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে আরও খানিকটা রাত হল। বাড়িটা নিস্তব্ধ। বারান্দার দিকে কোথাও আর আলো জ্বলছে না। অন্ধকার।

আজ কোন্ পক্ষ, কী তিথি আমি জানি না। পায়ের দিকের খোলা জানলাটার দিকে তাকালে অন্ধকার বেশ ঘন দেখাচ্ছিল। হয়ত কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যা কাছাকাছি এসে গেছে।

আমি জানি না, মানুষের মধ্যে কোন্ বিচিত্র প্রকৃতি কাজ করে যাতে এক সময়ে যা তার সহ্যাতীত মনে হয়, অন্য সময়ে তা সহ্য হয়ে যায়, যা দুঃখ হয়ে বিরাজ করছিল হঠাৎ তা স্বাভাবিক হয়ে আসে। কলকাতায় আসার আগে থেকে আমার যত উদ্বেগ, আশঙ্কা, সন্দেহ, ভয়—এখন তার অশান্তি যে কোথাও আছে আমি আর অনুভব করছিলাম না। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার মন যেমন ব্যাকুল, শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এখন তার অনুভূতি আমার নেই। আমি আর উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বোধ করছি না। আমার হাসপাতালে যেতে হবে জানার পর থেকে আমার সমস্ত ব্যাকুলতা হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে গেছে। যা সত্য আমি তা গ্রহণ করে নিয়েছি।

এখন মন্ময় বলে নিজের জীবনের দিকে ফিরে তাকালে আমার মনে হয়, আমি এক অন্য শচিকে দেখছি। সে আমার বড় নিজের অথচ তার সঙ্গে আমার একটা পার্থক্যও যেন রয়েছে। কেমন পার্থক্য আমি বলতে পারব না। ওই তো দেখছি সেই শচিকে যে বছরে ছোট, বড় বড় চুল মাথায়, বোকার মতন চোখ, শীতকালের সকালে কিছুতেই লেপ ছেড়ে উঠতে চাইছে না, হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে, বেলা বাড়ছে—বাড়ছে, রোদ এসেছে ঘরে, তবু জেগে জেগে শুয়ে শুয়ে তার মার্বেলের হিসেব, লাটুর রেজিস্তের কথা ভাবছে। মেজকাকি এসে লেপ টেনে উঠিয়ে দিল। 'ওঠ, ওঠ, কত বেলা হয়ে গেল, ছেলের আর চোখের পাতা খোলে না।' আমি কী ছাই উঠি! মেজকাকি আমায় ঠেলে উঠিয়ে গায়ে জামাটে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। মেজকাকির সেই মস্ত বড় মুখের গন্ধ, বুকের গন্ধ যেন আমার নাকে লেগে থাকল।

গরম জামাটামা পরিয়ে ঢেকেঢুকে মেজকাকি আমায় মুখ খোয়াতে বাইরে নিয়ে এল। আমাদের বাড়ির ভেতর বারান্দা তখন রোদে ভরে গেছে, মা রান্নাঘরের কাছে উঁচু বারান্দায় মাথায় কাপড় দিয়ে একপাশ হেলে বসে, ছোটকাকি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে, ছোটকাকির পায়ে রুপোর তোড়া, ডুরে কাটা রঙীন শাড়ি, মাথায় কাপড়, নতুন বউয়ের চেহারাটা তখনও মুছে

হয় নি। আমার বাবাকে দেখছি না। অন্দরমহলে বাবা বড় একটা আসতে পারতেন না। মেজকাকা কাজেকর্মে বেরিয়ে যাবার আগে 'মেজবউ মেজবউ' করে বার দুই ডাকল, মেজকাকির সাড়া দেবারও সময় নেই যেন। আমার মুখ মুছিয়ে মেজকাকি আমাকে মার দিকে ঠেলে দিয়ে চলে গেল। মার পাশে মোটা করে কম্বল পাতা, শান্তা তার ওপর বসে বসে খেলা করছে রাঙতায় কাঠের পুতুল নিয়ে। বাচ্চা মেয়ে, মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুল। মা আমায় বলল, 'এমন মজাকাড়ুরে ছেলে আর আমি দেখি নি। তুই কত ঘুমোতে পারিস রে? মেজো তোকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠিয়েছে। আহ্লাদের পুতুল!' মা কী বলছে না বলছে আমার তাতে কান দেওয়ার দরকার নেই। ছোটকাকি আমার খাবার আনছে কিনা দেখবার জন্যে আমি রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে আছি।

এই আমার শৈশব। বাড়ির মধ্যে একটি-মাত্র পুত্রসন্তান। শান্তা আছে। তবু আমার অধিকার খর্ব করার উপায় তার ছিল না। বাবা, মেজকাকা, ছোটকাকা—এই তিনটি মানুষের বংশধারা আমি রক্ষা করছি এই বোধটুকু যেন আমার বেশ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার এই হাস্যকর ধারণার মধ্যেও একটা সত্য ছিল। আমি সংসারে অকৃপণ স্নেহমায়া পেয়েছি। বাবার অভ্যাস ছিল সন্ধেবেলায় একবার অন্তত আমায় ডাকতেন: তাঁর কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাকতে হবে। বাবা আমায় মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলতেন, মাঝে মাঝে পদ্য করে। কাশীরামটাম তাঁর মাঝে মাঝেই মুখস্থ ছিল। বাবার গলা ছিল বড় সুন্দর। ভরাট, উঁচু, মধুর। আমার মেজকাকা ছিল কর্মঠ মানুষ। পরিশ্রম করতে পারত, কাঠের কারবারে একাই প্রায় খেটে বেড়াত, জঙ্গলে জঙ্গলে এত বেশী ঘুরত যে মেজকাকি ঠাট্টা করে বলত, তোর 'জংলীকাকা'। মেজকাকার বেশবাস ছিল একেবারে সাধারণ, কাকাকে দেখলে আমাদের বেহারীদের মতনই মনে হত, দেড়জোড়া এক গোঁফ রেখেছিল কাকা। শখের মধ্যে ছিল, কাকা মাঝে মাঝে মাছ ধরতে যেত, আর যেত শিকার করতে। কাকা আমায় চার-পাঁচ রকমের পাখি এনে দিয়েছিল জঙ্গল থেকে। আমার খাঁচা ছিল পাখি রাখার। একটা পাখি ছিল খুব ছোট, চড়ুই পাখির চেয়েও ছোট, গায়ের রঙ ছিল কমলালেবুর মতন, একটু একটু সবুজ ছিল বুকের কাছটায়। কী নাম পাখিটার জানি না। আমি নাম দিয়েছিলাম 'টুনি'। পাখিটা ডাকত চিক্ চিক্ করে। ও কখনো চুপ করে থাকত না, খাঁচার মধ্যে সারাক্ষণ ফরফর করে উড়ত।

ছোটকাকা খানিকটা শৌখিন ছিল। চেহারাটাও ছিল ভাল। গান গাইতে পারত।

ছোটকাকা কিছুদিন-প্রাইভেটে কী সব কাজ-কর্ম করেছিল। তারপর বনিবনা না হওয়ায় বাড়িতে এসে আমাদের ব্যবসাপত্র নিয়েই থাকত। মধ্যে বাবা আর ছোটকাকার মধ্যে একবার ব্যবসাগত ব্যাপার নিয়ে মনো-মালিন্য হয়। আমি ঠিক জানি না কী হয়েছিল। বাবা ছোটকাকে খুব ধমকে ধমকে দেয়। বাবা বলেছিল, 'খবরদার, মহেশকাকার ছেলেদের সঙ্গে তুমি জীবনেও গোলমাল করবে না। আমাদের যদি সব যায়, তবু ভি আচ্ছা। আমরা না খেয়ে মরব, তবু মহেশকাকার ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করব না। মহেশকাকা আমাদের বাবাকে মরার মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।"

আমার শৈশব-বাল্য যেভাবে কেটেছে তাকে কুসুমাচ্ছাদিত বলা যায়। আমাদের বরুণস্যার ওই কথাটা বলতেন আমাকে। আর পাণ্ডেস্যার বলতেন, শচিদুলাল। সেই থেকে বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করে বলত শচি-দুলাল। আমার সেই বালককে আজ আমার নিজেরই কেমন অচেনা লাগে। মনে হয় আমি, আজকের শচিপতি অনেক দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত এক মাঠে একটি প্রাণী পরম আলস্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। সে জানে না তার নিয়তি দূরে কোথাও অপেক্ষা করছে। সংসারের সেই নিবিড় স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসার জগতে প্রথম যে বজ্রাঘাত ঘটে গেল তাতে আমার ছোটকাকা মারা গেল। কাকা গিয়েছিল পাটনার দিকে, সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে ডেহ্‌রি অন সোন্। কাজ সেরে ফেরার পথে কাকা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। মাঝ রাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, কাকা তখন নিজের জায়গায় ঘুমিয়ে। মাটিতে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত মারা গিয়েছিল। হার্ট ফেল বলে শুনেছি।

কাকার তখনও সন্তানাদি হয় নি, ছোট কাকি পুরোনো বউ হয়ে গিয়েছিল, তবু তার কোল ছিল খালি। ছোটকাকা মারা যাবার পর একদিকে কাকিমা অন্যদিকে বাবাকে সামলানো খুব মুশকিল হয়ে পড়েছিল। বাবা শুধু হাউমাউ করে কাঁদতেন, মেয়েদের মতন করে; আর কাকিকে দেখতাম ডানাছেঁড়া পাখির মতন সন্ধ্যা বাড়িময় ঝটপট ঝটপট করে বেড়াত. না পারত দাঁড়াতে না পারত দু' দণ্ড কোথাও স্থির হয়ে থাকতে। আমার ছোটকাকির নাম ছিল প্রতিমা। কাকি দেখতে বড় সুন্দর ছিল। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বউ। কাকির সেই রূপ দুঃখশোকে পুড়ে দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল। কাকির মাথার গোলমাল শুরু হল তারপর। মেজকাকা আর মেজকাকি শক্ত মানুষ। দুজনে শক্ত হাতেই দুজনকে ধরে রেখেছিল—আমার বাবা আর আমার ছোটকাকিকে। আমার মা বাবার মতন অত অধীর মানুষ না হলেও কাকার অভাবটা কেঁদেকেটেই মেটাত। মা শ্বশুরবাড়িতে আসার পর ছোটকাকাকে নাকি স্নান করিয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে। মার এটা নিত্যকর্ম ছিল। ছোটকাকাকে গালমন্দ করলেও আমি মাকে দেখেছি।

ছোটকাকার মৃত্যু হয়ত আমাদের সংসারে ক্রমে ক্রমে সহ্য হয়ে আসত। যে দুঃখটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল তখন, আস্তে আস্তে হয়ত তা নিবেও আসত। কিন্তু ভগবান অন্য দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। কোথাও কিছু নেই, মেজকাকা ঝড়বাদলার মধ্যে বজ্রাঘাতে মারা গেলেন। ছোটকাকা মারা যাবার পর বছর দুই কেটেছে সবে, আবার আমাদের সংসারে আকাশ ভেঙে পড়ল। কী শান্তভাবে সব হয়ে গেল। তখন বর্ষা চলছে। মাঝামাঝি বর্ষা। রোজই দু-এক পশলা করে বৃষ্টি আসে যায়। মেজকাকা সকাল বেলায় সাইকেল নিয়ে কাজেকর্মে বেরিয়েছিল। কথা ছিল, ফিরে এসে খেয়েদেয়ে আমায় নিয়ে মণ্ডলদের পুকুরে মাছ ধরতে যাবে। আমি সেই লোভে স্কুলে যাই নি। চার তৈরী করে আমার জন্যে ছোট ছিপ সাজাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম মেজকাকা নেই। তখন আমার বিশ্বাসই হয় নি। জন্মকাল থেকে দেখে আসছি—কত ঝড়বৃষ্টি হয়, কত বিদ্যুৎ ঝলকায়, বিশাল বিশাল বাজ পড়ে। কিন্তু সাধারণ একটা বাজ পড়ে মেজকাকা মারা যাবে এ কী বিশ্বাস হবার কথা! কিন্তু বিশ্বাস না হলেই বা কী, যা হবার তা হয়ে গেছে। কোনো রকম ঢাকঢোল না পিটিয়ে মৃত্যু এসেছিল, মেজকাকাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মেজকাকা চলে যাবার পর আমাদের সংসারের পিঠ গেল ভেঙে। কাকার পিঠ শক্ত ছিল বলে আমরা ঝড়-ঝাপটায় বেঁচে গেছি। আমার বাবা একদিক থেকে অপদার্থ, অকেজো মানুষ। বাইরের ঝাপটা এবার গায়ে আসতে লাগল। মেজকাকা আর নেই, বাবাকে সামলাবারও কেউ থাকল না। বাবা পর পর দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে দিশেহারা। মেজকাকি একা আর কদিক সামলাবে! আমরা ভাঙতে লাগলাম।

ছোটকাকি তখন বেশ পাগল হয়ে গেছে। কাকিকে সামলানো মুশকিল। কত দিন এমন হয়েছে, জ্যোৎস্না উঠলে কাকি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে গেছে, গিয়ে জোরে জোরে ছোটকাকার সঙ্গেই যেন কথা

কাউকে এমনভাবে কথা বলেছে। ছোটকাকা একটু দুষ্টু ছিল। জ্যোৎস্না-টোৎস্না উঠলে কাকিকে চুপিসাড়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে মজা করত। কাকা নেই, তবু কাকির কাছে সেই ভাবটুকু কেন ছিল। কাকির জন্য সিঁড়ির ঘরে তালা পড়ে গেল তারপর। কাকির শোবার ঘরেও মাঝে মাঝে তালা পড়ত। শেষে কাকি ফাঁক পেলে নিজের কাপড়জামায় আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল। বাবারও যেন এই সব দেখেশুনে কেমন হয়ে গেল। মাও তখন শয্যাশায়ী। শুয়ে থাকতে থাকতেই এক অষ্টমী পুজোয় মা মারা গেল।

আমি জানি না বাবা কেন আত্মহত্যা করলেন। শোকতাপে অধীর হয়ে নিশ্চয়। কিন্তু বাড়িতে দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূ, একজন অসুস্থ, আমার আর শান্তার মতন দুটি ছেলেমেয়েকে রেখে বাবা কোন বুদ্ধিতে আত্মহত্যা করতে গেলেন। আমি কোনোদিন এটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু বাবার মতন মানুষের পক্ষে হয়ত এটাই স্বাভাবিক, বুদ্ধি বিবেচনা আশা করা তাঁর মতন লোকের কাছে বোধ হয় যায় না। বাবা আত্মহত্যাও করেছিলেন আচমকা। একদিন শান্তার সঙ্গে

অনেকক্ষণ গল্পটল্প করার পর বাবা নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় পালটে নিলেন। বাইরে যাবার পোশাক পরে বাবা বেরোচ্ছেন দেখলাম। আমরা জানি বাবা বাইরে কোথাও গেছেন। হঠাৎ দুপুরবেলায় আমাদের বাগানের সবচেয়ে ভাল পেয়ারা গাছটার তলায় গলায় দড়ি দিয়ে বাবা ঝুলছে শুনে আমরা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম। গিয়ে দেখি, সবে ফুল ধরা পেয়ারা গাছের ঘন পাতার তলায় বাবা কুয়োর জল-তোলা দড়িটা খুব মিচু ডালে বেঁধে ঝুলেছেন। বাবার পা মাটি থেকে হাত দেড়েক মাত্র উঁচুতে। মাটিতে পা ঠেকে যাবার সম্ভাবনা খোলো আনাই ছিল। তবু ঠেকেনি। এই আত্মহত্যাটা বড় অদ্ভুত, বিশ্বাস করা মুশকিল।

আমাদের ভরাট সংসার এইভাবে ফাঁকা হয়ে এল। যেন বাড়ির একটা থাম যেই ভেঙে পড়ল, অন্যগুলোও একে একে ভেঙে পড়তে লাগল। বাবা গেল, ছোটকাকিকে বাঁচি পাঠাতে হল, শান্তা আর আমি ছিলাম, শান্তা গেল, থাকলাম শুধু মেজকাকি আর আমি।

মেজকাকি আমাকে নিয়ে বড় বাড়ির আওতার বাইরে ছোট করে একটা বাড়ি করাল। দুটো মাত্র ঘর; মাথায় টালির ছাউনি, একটু রান্নাঘর। বেড়া দিয়ে কিছু চারাটারা পুঁতে দিলাম ফলগাছের। আমাকে সেই বাড়িতে বসিয়ে, মাস দুই তিন কাকি থাকল। তারপর বলল, 'শচি, এবার আমায় যেতে দে। শেষ বয়সে ভগবানের সঙ্গে আমার ঝগড়াটুকু সেরে নেব।'

আমি হেসে বললাম, 'কাকি, তুমি তো কখনো ঝগড়া করোনি। কী করে করবে?'

'সে আমি করব। তোর কাকাকে চিতায় তোলার সময় আমি পা ছুঁয়ে বলে দিয়েছিলাম, তুমি এসো, আমি আসছি; আসবার আগে বিধাতা পুরুষের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা সেরে আসব।'

'কী ঝগড়া তুমি করবে?'

'সে আছে। তুই বুঝবি না।'

'তুমি মাঝে মাঝে চলে আসবে।'

'না বাবা, আর নয়। তুই বরং মাঝে মাঝে চলে যাস। আমি যতদিন বেঁচে আছি তোর মাথায় যেন খাঁড়া না পড়ে।...শোন শচি, একটা কথা তোকে বলি, আমাদের এত যে ছারখার হল এর জন্যে আমি ভগবানকে দোষ দিই না। এ আমাদের কর্মফল। আসছে জন্মে এমনটি যেন আর না হয়।'

'তুমি আসছে জন্ম বিশ্বাস করো?'

'ও মা, বিশ্বাস করব না!'

'কেন করো?'

'কেন কিরে! বিশ্বাস না করলে শান্তি পাব কি করে?'

মেজকাকি কাশী চলে যাবার পর আমি একা। কাকি থাকতে থাকতেই আমি বাউণ্ডুলে হয়ে পড়েছিলাম, বাড়ি ছেড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, নানা ধরনের কাজকর্ম করেছি, সবচেয়ে মজার কাজ করেছি নড়াইলে। সেখানে মহেশ্বরজীর খামার ছিল মস্ত বড়, আমায় সেই খামারের ম্যানেজারি গোছের কাজ করতে হত। কোথাও আমি বসতাম না, দু-তিন মাস থাকতাম, তারপর পালিয়ে যেতাম। মহেশ্বরজীর কাছে কিছুদিন বেশীই ছিলাম, প্রায় মাস ছয়। না থেকে উপায় ছিল না। মহেশ্বরজী খুব অসুখে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমি যেখানেই থাকি, মেজকাকি যতদিন ছিল, মাস খানেক অন্তর বাড়ি আসতাম। কাকি কাশী চলে যাবার পর আমার আর গরজ রইল না। শুধু মন খারাপ হলে এক আধবার কাশী যেতাম কাকিকে দেখতে। মাঝে মাঝে ছোটকাকির খবর নিতে রাঁচি ছুটতে হত। ছোটকাকি তখনও আমায় অল্প অল্প চিনতে পারত, তারপর একেবারেই ভুলে গেল।

রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে যে মানুষ জেগে থাকে, জেগে থাকতে থাকতে পেটা ঘড়িতে রাত বেড়ে ওঠার একটা দুটো তিনটে করে শব্দ শোনে—তার প্রত্যেকটি ঘণ্টার শব্দ তাকে যেমন আরও উতলা করে তোলে আমারি জীবনেও সেই রকম এক একটি মৃত্যু আমার উতলা করে তুলেছিল। মেজকাকি গেল সবচেয়ে শেষে। মেজকাকির যাওয়া তবু স্বাভাবিক, মাথার চুল পাকিয়ে খানিকটা বয়সকালে গিয়েছিল। কাকির তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। মেজকাকি যে এতদিন বেঁচে ছিল তার একটা কারণ বোধ হয় এই, কাকির বেলায় যেমন করেই হোক, মৃত্যুর ফাঁসটা আলগা হয়ে গিয়েছিল। নয়ত কাকির আরও আগে যাবার কথা।

আমি আমার যৌবন বয়স থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলাম, নিয়তি আমার আশেপাশে ঘুরছে, যে কোনো সময়ে আঁচড় দেবে। আমি তখন প্রায়ই একটা কালো ভয়ংকর ভালুকের স্বপ্ন দেখতুম।

নিশ্চয় করে জানা আর অনিশ্চিত ভয়ে থাকার মধ্যে তফাত আছে। আজ আমি নিশ্চয় করে জানলাম আমার আয়ুর পুঁজি ফুরিয়ে গেল।

সংসারের সঙ্গে, নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে নেই। অনেক আগেই যা হতে পারত, এতদিন পরে সেটা ঘটছে।

কতটা রাত হল আমি বুঝতে পারছিলাম না। অন্ধকার কী নিবিড় হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে কোথাও সাড়া নেই। রাস্তা থেকে একটিও শব্দ ভেসে আসছে না। আমি শুধু নিজের নিশ্বাসের শব্দটুকু শুনতে পাচ্ছি। এই নিশ্বাসই শুধু বলছে, আমি আছি।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি, সেই যে কবে আমি এসেছিলাম, আর এতকাল পরে যাবার জন্যে উঠে বসেছি—এর মধ্যে আমার জীবনটা আলাদা করে আমার কাছে কোথাও ধরা পড়েছে কি না! আমার মনে হল না, পড়েছে। আমি এখানে আলাদা করে কোথাও যেন ছিলাম না, নদীর জলে আর পাঁচ রকম জঞ্জালের মতন অনেকের সঙ্গে ভেসে গিয়েছি।

অথচ এ-রকম ভাবতে আমার ভাল লাগছিল না। এত শূন্য, অর্থহীন জীবনের এতখানি পথ আসারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। শান্তার মতন আমিও আরও আগে চলে গেলে পারতাম। কেন গেলাম না!

নিজের গোপন করা সঞ্চয় খুলে আমি যখন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজি আমার কী আছে—, দেখি, তার মধ্যে এমন কিছু নেই। যা আমার কাছে সুখ সান্ত্বনা মূল্যবান হবে। সংসারের যা সাধারণ প্রাপ্য, আমার তাও তেমন কিছু নেই। যা আরও বড় সান্ত্বনা, তাও নয়। তবু আমি মনে মনে মানি, আমি এই সংসারে অনাত্মীয় বহুজনের প্রীতি স্নেহ মমতা পেয়েছি। মানুষের কাছে এই পাওয়াটুকু বড় সত্য।

মানুকে আমি একদিন বলেছিলাম, 'মানু, তোমার জোর আছে; তুমি তবু একটা কিছু ধরে রাখতে পারলে; আমি কিছুই পারলাম না।'

মানু বলেছিল, 'তুমি পারবার মানুষ নও।'

আমি ভাবি, আমার কী কোনো ক্ষমতা ছিল না, না ইচ্ছে ছিল না? আমি কী উদাসীন হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, না নিজের অক্ষমতা ও ভয়ের দরুন তফাতে তফাতে ছিলাম? আমি জানি না, আমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, না বাঁচতে চেয়েছিলাম।

আচমকা আমার মনে হল, আমি কিছু ছিলাম না, কিছু থাকব না। মানু যা বলেছিল সেটাই সত্যি। আমায় যেন কেউ পরম অবজ্ঞায় কোথাও ছুঁড়ে দিয়েছিল, আমি একটা প্রাণহীন বীজের মতন মাটির তলায় পড়ে নষ্ট হয়ে গেলাম, মাটি সরিয়ে আর উঠতে পারলাম না।

না পারার এই দুঃখ আজ আমায় আর কাঁদাচ্ছে না। যে ছিল না, যে থাকবে না—তার জন্যে আমার কাঁদার কী কিছু আছে!

(ক্রমশ)

জাপানে রবীন্দ্রসন্ধ্যা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। 'এশিয়া সেন্টার অব জাপান'-এর চারতলায় উঠে, ঘরে ঢুকে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে, সদ্য শয্যা নিয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

বুঝতে পারলুম না, এত রাত্রে কে আমাকে ডাকছেন। টোকিয়োয় তো এক বিকাশ বিশ্বাস ছাড়া কেউ আমাকে চেনে না। কিন্তু বিকাশ তো এই একটু আগেই এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে এই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে, 'কাল সকালের আগে আর দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে না' বলে, বিদায় নিয়ে গেল। এখন তাহলে আবার কে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?

স্পষ্ট বাংলায় উত্তর ভেসে এল, "আমি কাজুও আজুমা।"

সাড়ে তিন বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন, সুবোধবয়সী বঙ্গভাষী এই জাপানী অধ্যাপকের নাম এ-দেশে অনেকেই শুনে থাকবেন। 'দেশ' পত্রিকায় কিছুকাল আগে জাপানী ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতার যে রচনা বেরিয়েছিল, তার তর্জমাকার হিসেবে অমিত্র-সূদনের সঙ্গে কাজুও আজুমারও নাম দেখেছিলুম; তা ছাড়া শান্তিনিকেতন, দূর থেকে, তাঁকে লক্ষ করেছি। কিন্তু তিনি যে আমাকে চেনেন, তা আমি জানতুম না।

অনুযোগ করে বললেন, "হোটেলে উঠেছেন কেন? অনর্থক পয়সা-খর্চা। আমার এখানে থাকতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?"

সত্যি বলতে কী, হোটেলে থাকতেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিঃসঙ্গতার কষ্ট। খর্চাটা ধর্তব্য নয়; অবিশ্বাস্য রকমের অল্প মূল্যে দিব্যি একটা ঘর পেয়েছি, জানালার পর্দা সরিয়ে দিলেই নির্জনবাড়ির-আলোয়-ঝলমল ছোট্ট একটা বাগান চোখে পড়ে; বিকাশ বলেছে, সকালে ওই জানালা দিয়ে রোদ্দুর এসে ঘর ভাসিয়ে দেবে; উপরন্তু এই জরুরী তথ্যটাও ইতিমধ্যে আমার কর্ণগোচর হয়েছিল যে, এখানকার খাবার-দাবার নেহাত খারাপ নয়, দামেও শস্তা, ডাইনিং হল্-এ গিয়ে আড়াইশো ইয়েন গুনে দিলেই মুরগীর ঝোল আর ভাত মিলবে। এই সবই খুব উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার। তবু স্বীকার করি, থাকা আর খাওয়ার এমন চমৎকার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছিলুম না। পর্যটনের এই অন্ত্য অধ্যায়ে অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতার বোধ আমাকে একটু-একটু করে গ্রাস করে নিচ্ছিল।

নিঃসঙ্গতা বলা যায়, অবসাদ বললেও ভুল হয় না। প্রায় দু মাস হল দেশ ছেড়েছি, ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিদেশ থেকে বিদেশে, এক শহরের হোটেল থেকে, নিষ্ক্রান্ত হয়ে— যেন-বা যন্ত্রচালিতের মতো —আর-এক শহরের হোটেলবাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকছি। প্রথমে টের পাওয়া যায় না, বরং ব্যাপারটা বেশ ভালই লাগে; কিন্তু একই রুটিনের এই যে পৌনঃপুনিকতা, একটা সময়ে মনের উপরে এর চাপ পড়তে থাকে, এবং সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় দিনাবসানে, সারাটা দিন কাজেকর্মে কাটিয়ে তারপর পর্যটক যখন হোটেলে ফেরেন, তখন তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের উপরে অনির্দেশ্য এক অবসাদের ছায়া প্রলম্বিত হয়ে যায়।

অবসাদের অন্যতম কারণ হয়ত হোটেল-জীবনেরই বৈচিত্র্যহীনতা। কে না জানে, হোটেলে-হোটেলে একালে আর বিশেষ ফারাক নেই। বিশেষ করে, পাইকারী হারে পর্যটক গিলবার জন্যে একালে যে-সব জাম্বো-হোটেল তৈরী হয়েছে, এবং যাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, বহিরঙ্গে আলাদা হয়েও চরিত্রে তারা অভিন্ন। বিখ্যাত এক বাঙালী লেখক তাঁর এক লেখার মধ্যে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইনটারন্যাশনাল এয়ারপোর্টগুলোর নিজস্ব কোনও চরিত্র নেই, অন্তত তার লাউঞ্জে কিংবা কাস্টমস-এনক্লোজারে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে বুঝবার উপায় নেই যে, আমি অমুক দেশে আছি, সর্বদেশের সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দর যেন একই ছাঁচে ঢালা। কথাটা বোধ হয় ত্রিঅঙ্কিক এই হোটেলগুলোর সম্পর্কেও খাটে। একই রকমের উদাসীন দক্ষতা, একই রকমের নিষ্প্রাণ নৈপুণ্য। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও তফাত বোঝা যায় না; বস্তুত, নতুন

ভাদুর্বীশির শেষে মেইজি মন্দির

কোনও হোটেলে এসে, ঘরের মধ্যে না-ঢুকেও বলে দেওয়া যায় যে, তার বাথরুমে কটা সাবান আছে, বেসিনের উপরকার তাকে কটা গেলাস, কিংবা আলনায় কটা তোয়ালে। ব্যাপারটা প্রায় ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মতো, পর্যটককে যা কিনা ধীরে-ধীরে অবসন্ন করে তুলতে থাকে। তাঁর মনে হতে থাকে, আর নয়, এবারে ঘরে ফিরলেই বাঁচি।

'এশিয়া সেন্টার অব জাপান' অবশ্যই পাঁচতারা এইসব অতিথিশালাদের পর্যায়ে পড়ে না। তবু, বাইরে দূরে অনেক ঘুরে আমারও তখন মনে হচ্ছিল, আর নয়, এখন ঘর চলো নিজ নিকেতনে। কিংবা, নিজের নিকেতনে যখন একান্তই যাওয়া যাচ্ছে না, তখন অন্য কারও নিকেতনে। হোটেল-বাড়ি, আর যা-ই হোক, নিকেতন বলা যায় না।

কিন্তু এই হোটেল এখন আমি ছাড়বই বা কী করে?

'চেক ইন' করবার সময়ে লিখিতভাবে জানিয়েছি যে, একত্রিশে অক্টোবর সকালের আগে আমার বিদায় নেবার সম্ভাবনা নেই; ছাব্বিশ থেকে তিরিশ—মোট পাঁচটা দিন এই আস্তানায় আমি কাটাব। হঠাৎ আগে বিদায় চাইলে কি কথার খেলাপ হবে না? বিদায় মিলবে না, এমন নয়, কিন্তু শর্তভঙ্গের দণ্ড না দিয়ে মিলবে কিনা, সেটা সন্দেহের ব্যাপার।

আজুমা সানকে—সান আমাদের 'বাবু'র পর্যায়ে পড়ে—আমার সমস্যার কথা বলতে তিনি উত্তর দিলেন, "তা হলে একটা দরকার জানা যাক। অন্তত শেষের তিনটে আমাদের সঙ্গে থাকুন। তিরিশ তারিখ সকালে আমি হোটেল থেকে আপনাকে নিয়ে আসব, তারপর একত্রিশের সকালে আপনাকে পৌঁছে দেব হানেডা এয়ারপোর্টে। রাজী?"

"কিন্তু তিরিশ তারিখেই বা এরা বিনা-দণ্ডে আমাকে ছাড়বে কেন?"

"যাতে ছাড়ে, তার ব্যবস্থা আমি করব।"

✻

ঊনত্রিশ তারিখের রাত্রে যখন হোটেলে ফিরি, আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। তিরিশ তারিখে সকালে জেগে উঠে দেখলুম, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। সাত-সকালেই শহর জুড়ে বাদল-আঁধার নেমেছে. বৃষ্টি আর বাতাসের দাপটে জানালার সার্সি থরথর করে কাঁপছে,—এমন তুমুল বর্ষণ এই বঙ্গভূমির বাইরে আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি। আজুমা সানের আসবার কথা সকাল নটায়। ভয় হল, তিনি আসতে পারবেন না।

তা হলে এখন কী করি? 'এশিয়া সেন্টার'-এ থাকবার উপায় নেই. তার কারণ, আগের রাত্রেই আজুমা সান এখানকার ম্যানেজারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিশাবসানেই আমি হোটেল থেকে বিদায় নেব। সুতরাং?

সুতরাং নিকাশাকে একটা ফোন করে দেখা যাক, সে কী বলে। কলকাতা থেকে যত বন্ধুরা জাপানে আসেন নিকাশা-দম্পতি অর্থাৎ নিকাশা আর মালাই এই প্রবাসে তাঁদের বন্ধু ও ত্রাণকর্তা। তারা কি এখন এই বিপদে মধুসূদন হয়ে একটা কিছু সমাধান আমাকে বাতলে দেবে না?

মালা ফোন ধরেছিল। আমার সমস্যার কথা শুনে সে অভয় দিয়ে বলল, "কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না, নীরেনদা। আজুমা সানকে আপনি চেনেন না; বৃষ্টি তো বৃষ্টি, প্লাবন কিংবা ভূমিকম্প হলেও তাঁর কথার নড়চড় হবে না. নটায় যখন বলেছেন তখন নটা বেজে এক-মিনিট হবার জো নেই, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নটায় তিনি হোটেলে হাজিরা দেবেন।"

ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। চটপট সুটকেস গুছিয়ে, স্নান সেরে, পোশাক পালটে নীচে নামলুম। নেমে দেখি, আজুমা সান লবিতে বসে কাগজ পড়ছেন। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন "দোমো আরিগাতো। যান, কাউন্টারে দাম মিটিয়ে দিন, আমি ট্যাক্সি ডেকে আনছি।"

✻

সমানে বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা মাথায় আজুমা সান রাস্তার দিকে এগোলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে জিজ্ঞেস করলুম, "তা হলে এখন আমরা ইচিকাওয়ায় যাচ্ছি তো?"

আজুমা সান বললেন, "না। ইচিকাওয়ায় আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবার আগে এই টোকিয়ো শহরেই আপনার সঙ্গে একটু ঘুরতে চাই। সর্বাগ্রে যাব টোকিয়ো রেল-স্টেশনে। সেখানে আপনার স্যুটকেশটা জমা রেখে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসব। কী জানেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

কী কথা, সেটা রেস্তোরাঁয় বসে জানা গেল।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কাজুও আজুমা বললেন, "দেখুন, আমি যে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলুম, সেটা নেহাত চাকরি করতে নয়। গিয়েছিলুম এইজন্যে যে, আপনাদের দেশকে আমি ভালবাসি। শুধু আমি বলেই বা কথা কী, জাপানে আপনি এমন মানুষ বিস্তর পাবেন, শাক্যমুনির ভারতবর্ষ সম্পর্কে যাঁদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসার অন্ত নেই। শাক্যমুনি আমাদের আত্মিক ক্ষুধার খোরাক জুগিয়েছিলেন। একালে আর-একজন মহামানব সেই সুধার সন্ধান দিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্য আমি পাঠ করেছি। না, তর্জমায় নয়, তাঁরই আপন ভাষায়। তাঁকে ভালবেসে তাঁর ভাষাকেও আমি ভালবেসেছি।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন আজুমা সান। তারপর বললেন, "জানেন, এই টোকিয়ো শহরেই এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত অল্প নয়, গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল। তাঁদের অনেকে শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন। কেউ পড়তে, কেউ পড়াতে। তা ছাড়া, তরুণ কিছু রবীন্দ্রভক্তেরও আমরা দেখা পাচ্ছি। প্রবীণ আর নবীনদের নিয়ে একটা সমিতিও গড়ে তুলেছি আমরা। তার নাম দিয়েছি 'ভারত-জাপান ঠাকুর সমিতি।' উদ্দেশ্য: রবীন্দ্রচর্চা। ফী মাসে আমাদের সভা হয়, তাতে রবীন্দ্রসাহিত্য আর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আলোচনা নেহাত কম হয় না।"

বললুম, "দেশে থাকতে শুনেছিলুম, শান্তিনিকেতনে যাতে একটা জাপান-ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়, তার জন্যে আপনারা চেষ্টা চালাচ্ছেন।"

আজুমা সান বললেন, "বিলক্ষণ। জাপান আর ভারতবর্ষকে যে প্রীতির ডোরে বেঁধে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে আমরা আরও দৃঢ় করে তুলতে চাই। নিপ্পন-ভবন সেই প্রীতির প্রতীক হয়ে থাকবে।"

শুনলুম, বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এই বিষয়ে একখানা চিঠিও ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে। তাতে এঁরা

উজ্জ্বল মন্দিরে। "আয়ুনের শরণার্থ..."

জানিয়েছেন যে, নিপ্পন-ভবনের প্রতিষ্ঠায় যা খরচ হবে, সে-টাকা জাপানের এই রবীন্দ্রভক্তেরাই জোগাড় করে দেবেন।

কফির পাত্রে শেষ চুমুক দিয়ে আজুমা সান বললেন, "আমাদের সমিতির কথা তো শুনলেন, তা আজই আমাদের মাসিক বৈঠকের দিন। কোমিয়োজি মন্দিরে বিকেল তিনটের সভা বসবে। চলুন, আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

*

বৃষ্টি, বৃষ্টি বৃষ্টি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারায় টোকিও সেদিন ভেসে যাচ্ছিল। দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই, শুধু অনবরত বৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। তারই মধ্যে ছাতা মুড়ি দিয়ে আমরা দৌড়োদৌড়ি করতে থাকি। কখনো ট্যাক্সিতে উঠি। কখনো ট্রেনে। কখনো এস্কেলেটরে দাঁড়িয়ে দাইমারু-বিপণির পাঁচতলায় উঠে যাই; কখনো ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে টোকিও শহরের তলায় নেমে আলোয়-ঝলমল পাতালপুরীতে ঢুকি। আজুমা সান বলেন, "জনসংখ্যার হিসেবে টোকিয়ো এখন নিউ ইয়র্ককেও টেক্কা দিয়েছে। দিনের বেলায় এখানকার জনসংখ্যা কত, জানেন? প্রায় দু কোটি। সর্বত্র ভিড়ে

ভিক্টোরিয়া; শান্তিনিকেতনের সেন্ট্রাল একাডেমি রয়েছে, ওয়েস্টার্ন, এ যে লাইনবন্দী দিশপত্রের সারি চলেছে। লোক, লোক আর লোক। এত লোক, অথচ জায়গা সেই তুলনায় কত কম। মাটির উপরে তো এই শহরের ভোহিন্দি আর বাড়ানো যাচ্ছে না, তাই কী আর করা, মাটির তলায় গিয়ে ঢুকতে হয়েছে।"

আমার চোখ ইতিমধ্যে একটা রেস্তোরাঁর শো-কেসের উপরে আটকে গিয়েছিল। কাঁচের শো-কেসে প্লাসটিকের রেকাবিতে প্লাসটিকের ভাত আর প্লাসটিকের চিকেন-কারি। দেখে অবশ্য নকল বলে বোঝা যায় না, আসল বস্তু বলেই ভ্রম হয়। আমার দৃষ্টি আর সেদিক থেকে নড়ছে না দেখে আজুমা সান বললেন, "বেশ তো, আজকের দুপুরের খাওয়াটা না হয় এইখানেই সারব। কিন্তু তার আগে শুনুন, দোকানের ওই সাইনবোর্ডের উপরে জাপানী ভাষায় কী লেখা রয়েছে।" দোকানী জানাচ্ছেন : ভারতীয় চিকেন-কারির কাছে আমরা হার মানব না, হার মানব না।"

শুনেছেন, ওসাকায় এক্সপো-৭০ প্রদর্শনীতে ভারতীয় চিকেন-কারির খুব সমাদর হয়েছিল। এবং বিস্তর জাপানী তার পর থেকে হঠাৎ 'রাইস অ্যান্ড চিকেন-কারি'র ভক্ত হয়ে পড়েছেন। উপরন্তু, ভারতীয় খাবার সেই অপূর্ব স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে তো, যা-হোক কোনও প্রকারে কারি বানিয়ে তাঁদের আর খুশী করা যাচ্ছে না। তাঁদের সাফ কথা, কারিটা একেবারে ভারতীয় পাকপ্রণালী-সম্মত হওয়া চাই।

পাতালপুরীতে মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করে আমরা আবার মাটির উপরে, বড়রাস্তার রাজ্যপাটে ফিরে আসি। তখনো সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা হাঁটতে থাকি। ঠিক তখুনি অবশ্য সভা-স্থলে যাই না। আজুমা সান আমাকে প্রথমে নিয়ে যান গিনজো এলাকায়। সেখানে খানিকক্ষণের জন্যে আমরা দোকানে-দোকানে বিজ্ঞাপনের বাহার দেখি। তারপরে যাই মেইজি মন্দিরে। বৃষ্টির তোড়ে আমাদের জামা, কাপড়, জুতো, মোজা সবই ইতিমধ্যেই ভিজে একশা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আর ছাতা খুলে মাথবার কোনও দরকারই আমাদের হয় না। মন্দিরের প্রবেশ-পথের দু পাশে সারি সারি দীর্ঘ গাছ। তার পত্রপল্লব থেকে মোটা ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে আমাদের মাথার উপরে। কিন্তু তাতে আর আমাদের কোনও অস্বস্তি হয় না। বরং বেশ মজাই লাগতে থাকে। আমরা ভুলে যাই যে, যে-সরস্ক ফ্লু, কিংবা নিউমোনিয়া কাউকে ভয় দেখাতে পারে না, সেই বয়সকে আমরা দুজনেই অনেক দূরে ফেলে এসেছি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা হাসতে থাকি, এবং শিন্‌টো মন্দিরের বিশাল চত্বরে সিক্ত, সুখী, অবাধ্য দুই বালকের মতো আমরা ঘুরে বেড়াই।

তারপর, সেখান থেকে বেরিয়ে, বিশ্ব পাভালিয়নে কোরাকোজি মন্দিরে গিয়ে পৌঁছই, তখন ঠিক তিনটে বাজে।

✻

কোরাকোজি বললে আর আলাদা করে মন্দির বলবার দরকার হয় না; কেননা 'জি' কথাটার মানেই হচ্ছে মন্দির। আর 'কোরাকো' মানে উজ্জ্বল।

উজ্জ্বল মন্দিরের সেই সভার কথা কখনও আমি ভুলব না। গিয়ে দেখলাম, জনা পঞ্চাশেক রবীন্দ্রভক্ত—ভয়ংকর সেই দুর্যোগের মধ্যেও—যথাসময়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। বেদীর সামনে, মেঝের উপরে পুরু গালিচা। সেই গালিচার উপর শান্ত হয়ে বসে আছেন। তাঁদের কারও বয়স পঁচিশের নীচে, কারও বয়স ষাটের কাছাকাছি। তাঁরা সকলেই যে টোকিয়োর বাসিন্দা, তা নয়। কেউ-কেউ এসেছেন কিয়োটো কিংবা অন্য-কোনও দূর-দূরান্তর

।বড় আর বৃষ্টি তাঁদের আটকে
পারেনি।
আজুমা সান একে-একে তাঁদের সঙ্গে
পরিচয় করিয়ে দিলেন।
ইনি শ্রীযুক্ত ৎসুংশো বিয়োদো। পণ্ডিত
। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে
শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে
প্রায় দু বছর। সেই সময়ে শাস্ত্রী-
কাছে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ
ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত তোসিমাসা
। মাত্রই তিন বছর আগে শান্তি-
কেতন থেকে ঘুরে এসেছেন। আজকের
ইনি পৌরোহিত্য করবেন। ইনি
কিমিকো ওহানি। এখানকার
বড় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান পরি-
কন্যা। দক্ষিণ ভারতে দু বছর থেকে
ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করেছেন। শান্তি
নিকেতনেও ছিলেন কিছুদিন। ইনি শ্রীযুক্ত
সাকাকিবারা। ১৯৫৩ সালে শান্তি-
নিকেতনে যান। সেখানে নৃত্যের পাঠ
নিয়েছিলেন। ভারতীয় নৃত্যকে জাপানে
পরিচিত করিয়ে দেবার ব্যাপারে ইনি যা
করেছেন, তার তুলনা হয় না। 'এশিয়ার
নাচ' নামে এঁর একখানা বই আছে।
বই।

এক-এক সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়
। সেই বৃদ্ধাকেও দেখি, ইনিই না অর্থাৎ
... শেখাবার জন্যে স্বয়ং রবীন্দ্র-
যাঁকে পরম সমাদরে শান্তিনিকেতনে
... গিয়েছিলেন। পরিচয় ঘটে অধ্যাপক
... সঙ্গে। গৃহস্থঘরের বধূ ও
... সঙ্গে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও
... মানুষের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথকে
... ভালবাসেন। সেই ভালবাসার সূত্রে
... এখানে এসে মিলেছেন।

... আর মাসাও সেদিন উজ্জ্বল
... এসেছিল। তারা জাপানী ভাষা
...। আমি বুঝি না। আজুমা সান
বললেন, "তার জন্যে ভাবনা নেই,
দোভাষীর কাজ করতে আমার ভালই লাগে,
... আর সাকাকিবারার বক্তৃতা আমি
... তর্জমা করে বুঝিয়ে দেব।"

... বললেন রবীন্দ্র-সাধনার
...। আর সাকাকিবারার বিষয় ছিল
ভারতীয় নৃত্যকলা। প্রসঙ্গত দু জনেই
বললেন যে, যেমন ব্যক্তি তেমনি প্রতিটি জন-
সমাজকেও সেই আত্মিক সম্পদের সন্ধান
পেতে হয়, যা থাকলে তবেই সমাজের জীবন
... ভারসাম্য পায়, এবং যা না থাকলে
... অনাবিল প্রতিষ্ঠা কোনও সত্যকারের
... পায় না। দু জনেই বললেন, সেই
আত্মিক সম্পদের সন্ধানেই আজ জাপান
আবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের দিকে চোখ
ফিরিয়েছে; তাঁর আদর্শ ও সাধনাকে আরও
... করে বুঝতে চাইছে।

বক্তৃতার আগে শ্রীমতী ওহানি ভারতীয়

উজ্জ্বল মন্দিরে। রবীন্দ্র ভক্ত-সমাবেশের একাংশ

নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। সাকাকিবারা
সেই নৃত্যকে ব্যাখ্যা করলেন। বলে দিলেন
কোন্ মুদ্রার কী অর্থ।

বক্তৃতার পরে ছিল গান। সেই গান
গাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।
সমবেত কণ্ঠে পর পর তিনটি রবীন্দ্রসংগীত
তাঁরা শোনালেন। "আগুনের পরশমণি",
"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ" আর
"পুরানো সেই দিনের কথা।" জোরালো গলা,
নিখুঁত স্পষ্ট উচ্চারণ। শুনতে শুনতে
আমার ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল। বুঝতে
পারছিলুম না, কোথায় বসে আমি গান
শুনছি। টোকিয়োয়, না কলকাতার কোনও
অনুষ্ঠানে।

গান শেষ হল। মিঃসানের আমরা মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম। রাত হয়েছে। টোকিয়োর রাস্তায় আলো জ্বলছে। কিন্তু বৃষ্টি তখনও থামেনি। বিকাশ আর মালশ্রীর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা স্টেশনে ঢুকলুম। ইচিকাওয়ার ট্রেন আসতে আর দেরি নেই।

*

এদিকে টোকিয়ো, ওদিকে ইচিকাওয়া। মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে খরস্রোতা, চওড়া একটা নদী। এদো।

আজুমা সান ইচিকাওয়ায় ঘর বেঁধেছেন। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাইরে-বাইরেই কাটে। তিন-তিনটে শহর জুড়ে তাঁর রাজ্যপাট। তিনি অধ্যাপনা করেন ইয়োকোহামায়, সঙ্গীতসাধনা করেন টোকিয়োয়, আর দিন ফুরালে রাত্রিকালে তিনি ইচিকাওয়ায় তাঁর কাঠের বাড়িতে ফিরে আসেন।

ভারী সুন্দর সেই কাঠের বাড়ি। সামনে এক-টুকরো বাগান থাকায় তার বাহার আরও খুলেছে।

বাগান পেরিয়ে আমরা বাড়িতে ঢুকলুম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীমতী আজুমা। মাথা হেলিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, "দোয়ো আরিগাতো গোজাই মাস্তা।" তারপর মাথা তুলে, আমাদের অবস্থা দেখে, তাঁর চক্ষুঃস্থির। তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দু প্রস্থ শুকনো পোশাক নিয়ে এলেন তিনি। পোশাক মানে ঢোলা-হাতা জাপানী ঝুল-কোর্তা। সেই কোর্তা দুটিকে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন "চটপট পোশাক পালটে নিন, নইলে নির্ঘাত অসুখ বাধিয়ে বসবেন।"

এতক্ষণে বুঝলুম, হোটেলে যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, তার আসল কারণ কী। নিঃস্পৃহ সেবা, নিষ্প্রাণ নৈপুণ্য ইত্যাদি সব জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বুঝলেই হত যে, হোটেলের পরিচর্যার আর যা-ই মিলুক, মমতার ছোঁয়া মেলে না।

শ্রীমতী আজুমা বললেন, "যান, এবারে ভিতরে গিয়ে বসুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাইরে থেকেই আন্দাজ করা গিয়েছিল, এবারে ভিতরে ঢুকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে পাশ্চাত্ত্য রুচি এই বাড়িকে এখনও গ্রাস করতে পারেনি। রান্নাঘরে হাল-ফ্যাশানের কুকিং রেনজ রয়েছে বটে, কিন্তু বৈঠকখানা শয়নকক্ষ ইত্যাদি সবই পরিপাটি জাপানী কায়দায় সাজানো। গায়ে পুরু জাপানী কুর্তা, পায়ে হালকা জাপানী চটি; সদর থেকে আমরা অন্দরে গিয়ে ঢুকলুম। শুনেছিলুম, জাপানীরা আসবাবপত্রের আড়ম্বর ভালবাসেন না; এখন স্বচক্ষে দেখলুম যে সেটা ষোল-আনা সত্যি কথা। বৈঠকখানায় সোফা-কৌচের আড়ম্বর ছিল না; শয়নকক্ষেও খাট-পালঙ্কের ঝঞ্ঝাট নেই। নিরহংকার, নিরলংকার গৃহরুচি। কাঠের মেঝে। সেই মেঝে জুড়ে মিহি জাপানী মাদুর পাতা। তার উপরে পাশাপাশি দুটি শয্যা রচনা করা হয়েছে।

আজুমা সান বললেন, "ওইখানে আপনি শোবেন, এইখানে আমি। লক্ষ করুন, আপনার বিছানা পাতা হয়েছে গৃহদেবতার বেদীর কাছে। এইটেই আমাদের সাবেক কালের প্রথা।"

জিজ্ঞেস করলুম, "সাবেক কালের প্রথা আপনি মানেন?"

এক গাল হেসে আজুমা সান বললেন, "তা মানি বই কী। কোট-প্যান্টালুন পরি বটে, কিন্তু সে তো বাইরের ব্যাপার, বাড়ির মধ্যে আমি আঠারো-আনা জাপানী। এই দেখুন না, আমাদের বাক্স-প্যাটরা-আলমারি-দেরাজে তালা একটা থাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে চাবি লাগাবার নিয়ম নেই। বাইরের লোকের কথা ছেড়েই দিন, বাড়ির লোকের সামনেও আমরা বাক্স-প্যাটরায় চাবি লাগাইনে। এও সাবেকী প্রথা। প্রথা বলছে, কারও সামনে চাবি লাগালে সে হয়ত ভাবতে পারে যে, তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। অতএব খবর্দার এ-কাজ কক্ষনো করবে না, ওটা অসৌজন্য। বাস, আমরাও সেই বাক্যকে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছি। চাবির তোড়া যে নেই তা নয়, কিন্তু কাজে লাগে না তো, দু দিন বাদেই হারিয়ে যায়। মুশকিল হয় সবাই মিলে কোথাও যাবার সময়। বাড়িতে তালা লাগাতে হবে, কিন্তু কোথায় চাবি? চাবির তোড়া খুঁজতেই প্রাণান্ত।"

দুই শয্যার মধ্যবর্তী স্থানটা একটু উঁচু। তার উপরে পুরু কাপড় বিছানো। ঘর গরম রাখবার জন্যে তলায় একটা হিটার জেলে রাখা হয়েছে, আর উপরের দিকটায় টেবিলের কাজ দিব্যি চলে। টেবিল না বলে চৌকি বললেই ঠিক হয়। আমরা তারই দু দিকে যে যার বিছানায় জোড়াসন হয়ে বসে, চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে জমিয়ে গল্প করছিলুম। ও-তরফা সন্দেশ তা। এখা বলেন ওচা। 'ও'র প্রয়োগটা সম্মানসূচক। যেমন মিজু, অর্থাৎ জলকে অনেকেই সমীহ করে বলেন ওমিজু।

চায়ের পরে এল স্যালাড। তারপরে এল ভাত, সব্জি, মাছ, মাংস, মিষ্টি। আজুমা সান বললেন, "দেশে থাকতে শুনেছেন নিশ্চয়

জাপানীরা কাঁচা মাছ খায়। বললেন তো আপনাকেও একটু খাইয়ে দিতে পারি।" সস মাখিয়ে খেতে হয়. চাকলা চাকলা কাঁচা মাছের স্বাদ যে মোটেই খারাপ তা স্বর বলা যায় না।

মুশকিল বাধল কাঠির ব্যবহার নিয়ে। ওঁরা পশ্চিমী কেতার পক্ষপাতী নন, তাই কাঁটা-চামচ ব্যবহার করেন না, তার বদলে কাঠ কিংবা বাঁশের তৈরী জোড়া কাঠি। তার উপরে আজ আবার ভারতীয় অতিথির সম্মানার্থে তোরঙ্গ থেকে আমদানি-করা হাতির দাঁতের কাঠি বার করা হয়েছিল। আমি যে ঘোর অস্বস্তিতে পড়েছি, আজুমা সানের বুঝতে তা সেটা লক্ষ করে থাকবেন। কাছে এসে হেসে বললেন, "ইচ্ছে হলে স্বচ্ছন্দে তুমি হাত দিয়ে খেতে পারো। তবে কিনা, আমাদের দেশে এসেছ. তখন কাঠির জোড়া হাতে নিয়ে খাবার চেষ্টা করে দেখতে তো আর ক্ষতি নেই। এই নাও, কীভাবে ধরতে হয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কাঠির জোড়া হাতে নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি, ব্যাপার দেখে আজুমা-দম্পতির দুটি মেয়ে—য়োসেকো আর সোনোকো—তো হেসেই কুটিপাটি।

এ বাড়িতে বাংলা ভাষার ছড়াছড়ি। আজুমা-দম্পতির তো কথাই নেই, প্রায় বাঙালীর মতই বাংলা বলেন, ছয় আর তিন বছরের এই শিশু দুটিও কম যায় না। কিন্তু তারা নাজুক নাজুক হাসতে পারে, এবং য়োসেকো দেখলুম গানও গায় চমৎকার। শান্তিনিকেতনে যখন ছিল, তখন তার বাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এই মেয়েটিও বিস্তর গান গলায় তুলে নিয়েছে।

শ্রীমতী আজুমা এতক্ষণ কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মৃদু গলায় রবীন্দ্রসংগীত গাইছিলেন, খাওয়ার পাট চুকে যাবার পরে আমাদের ঘরে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা হল। শান্তিনিকেতনের গল্প, আর তার গল্প, গল্পের আর শেষ নেই। ওঁদের কাছেই শুনলুম যে, একবার জাপানে রবীন্দ্রনাথ একটি কোতো-যন্ত্র উপহার পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে সেই বাদ্যযন্ত্র বাজাবার কৌশল নাকি কারও জানা ছিল না। দীর্ঘদিন সেটি সঙ্গীতভবনে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। শ্রীমতী আজুমা সে কথা জানতে পারেন, এবং জীর্ণ যন্ত্রটিকে মেরামত করে নিয়ে সবাইকে বাজিয়ে শোনান।

শোবার আগে সমবেত গলায় গান হল: আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো...। গান শেষ হবার পরে কন্যা দুটিকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নিলেন শ্রীমতী আজুমা। যাবার আগে বলে গেলেন, "আর নয়, এবারে শুয়ে পড়ুন। কাল খুব ভোরে আপনাদের জাগিয়ে দেব। নইলে সময়মত এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরতে পারবেন না।"

এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে সকাল আটটায়। কিন্তু হানেডা এই ইচিকাওয়া থেকে অনেক দূরে। তাই অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে রওনা হওয়া দরকার। আলো নিবিয়ে, লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

মাঝরাত্তিরে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, বাড়িটা যেন থরথর করে বারকয় কেঁপে উঠল। কাঁচের গ্লাসও যেন শুনেছিলুম। কিন্তু সেই দারুণ শীতে বিছানা ছেড়ে উঠিনি। পাশ ফিরে যে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি, আমার মনে নেই।

*

ঘুম ভাঙল শ্রীমতী আজুমার ডাকে। ঘড়িতে তখন পাঁচটা। চটপট উঠে বাইরে এসে দেখি, আকাশ পরিষ্কার। কাল যে এত দুর্যোগ গেছে, আজকের এই টলটলে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কথা ঘুণাক্ষরেও বোঝা যাবে না। লেশমাত্র মেঘের মালিন্য কোথাও নেই।

আজুমা সান বললেন, "মুখহাত ধুয়ে নিন। ওচা তৈরী।"

শুধু চা কেন, শেষরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে সাতজ্যের খাবার-দাবার তৈরী করে রেখেছেন শ্রীমতী আজুমা।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললুম, "সময়মত এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পারব তো?"

আজুমা সান বললেন, "কিচ্ছু ভয় নেই। ট্রেন এখানে কাঁটায় কাঁটায় চলে।"

ট্রেনের জানলা থেকেই ফুজিয়ামাকে দেখতে পেয়েছিলুম। আকণ্ঠমস্তক তুষারে ঢাকা আগ্নেয় পাহাড়, দূর দিগন্তে আকাশের গায়ে লগ্ন হয়ে আছে।

আজুমা সান বললেন, "আপনার কপাল ভাল। কাল সকাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছুই দেখলেন। ঝড় দেখলেন, ফুজিয়ামা দেখলেন, কাল মাঝরাত্তিরে আবার ছোটখাটো একটা ভূমিকম্পও হয়ে গেল। টের পেয়েছিলেন?"

বললুম, "বাড়িটা একটু কাঁপছে বলে মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা যে বসুন্ধরার কাঁপুনি তা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

ট্রেন পালটে, টোকিয়ো স্টেশনে নেমে, স্যুটকেশটা উদ্ধার করে, ট্যাক্সি নিয়ে যখন হানেডায় পৌঁছলুম, তখন ঠিক আটটাই বাজে।

বিকাশও হাজির হয়েছিল এয়ারপোর্টে। ওদের কাছে বিদায় নিয়ে ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আজুমা সান হঠাৎ বললেন, "এই দেখুন, একটা জরুরী কথাই আপনাকে বলা হয়নি। জনা কুড়ি রবীন্দ্রভক্তকে নিয়ে এই ডিসেম্বরেই আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। আপনাদের শান্তিনিকেতন তাঁদের স্বপ্নের দেশ। সেই স্বপ্নলোক তাঁদের দেখিয়ে আনব।"

বললুম, "শান্তিনিকেতন শুধু আমাদের বুঝি?"

হো-হো করে হেসে উঠলেন কাজুও আজুমা। বললেন, "না না, শুধু আপনাদের কেন, আমাদের সকলের।" তারপর এয়ারপোর্টের সেই ভিড়ের মধ্যেই গুন গুন করে গেয়ে উঠলেন, "আমাদের শান্তিনিকেতন...।"

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ১৯ ॥

ঢাকা থেকে কাগমারীর দূরত্ব মাত্র মাইল পঞ্চাশেকের মতো। টাঙ্গাইলের কাগমারী হচ্ছে পিতল-কাঁসার বাসন তৈরীর বিখ্যাত স্থান। এছাড়া এখানে রয়েছে এককালের সন্তোষের মহারাজার জমিদার-বাড়ি। কাছেই মির্জাপুরে রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহার টাকায় তৈরী পাকিস্তানের অন্যতম সর্বাধুনিক হাসপাতাল, এবং মেয়েদের আবাসিক স্কুল ও কলেজ। কাগমারীতেই হচ্ছে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আবাসস্থল।

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানী এই কাগমারীতেই আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ও কাউনসিলের অধিবেশন আহ্বান করে বসলেন। এ ছাড়া মওলানা সাহেব কৃষাণ র‍্যালী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন। চারদিকে সাজো-সাজো রব পড়ে গেল। আওয়ামী লীগ ও প্রগতিশীল কর্মীরা ছাড়াও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় লালিত এক শ্রেণীর যুবক কার্ল মার্ক্সের বই বগলে পিকনিক বা 'আউটিং'-এর আশায় কাগমারীতে এসে হাজির হলেন। এ সময় ঢাকা-মির্জাপুর-টাঙ্গাইল রাস্তা তৈরী প্রায় সম্পূর্ণ হলেও অনেকগুলো ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ হয়নি। তাই পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান অচিরেই এইসব কাজ সম্পূর্ণ করবার নির্দেশ দিলেন। টাংগাইল-কাগমারীর গরুর গাড়ি চলার রাস্তাটা প্রায় রাতারাতি মোটর চলাচলের উপযোগী করা হলো। ঢাকা-টাংগাইল রাস্তায় অনেক কটা 'ডাইভারশন' রাস্তা তৈরী করে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুগম করা হলো। মেহমানদের থাকবার সুবিধার জন্য ই. পি. আর হেড কোয়ার্টার থেকে তাঁবু সংগ্রহ করা হলো। হেলথ ডিপার্টমেণ্ট তাদের স্টোর থেকে লোহার খাট, তোশক ও কম্বল পাঠালেন। হোটেল শাহবাগ থেকে বাবুর্চিদের সঙ্গে কোমরে তকমা-আঁটা বেয়ারার দল কাগমারীতে হাজির হলো। বিদেশী দূতাবাসের লোকজন জোর ছুটাছুটি করে প্রচারকার্যের জন্য স্টল বসালেন; ভ্রমণকারী ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা করলেন।

মওলানার মুরীদ ও শিষ্যের দল হা... করে নিয়ে এলেন চাল-ডাল, খাসী, গ... মুরগী, মাছ। টাঙ্গাইল-মির্জাপু... চতুষ্পার্শ্বের ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ... কাগমারীতে স্থাপন করলেন চা-মিষ্টি... পানের দোকান। এক কথায় সে এক এলা... ব্যাপার। এদিকে মওলানা সাহেব কাগমা... সম্মেলন উপলক্ষে বাঙ্গালী জাতীয়... যাদের দান রয়েছে উদ্দেশ্যে দুটো ক... ভাগে বসলেন। কাগমারীর রাস্তায় ক... গুরু রবীন্দ্রনাথ, সূর্য সেন, নেতা... সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ... কি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামে প... তোরণ নির্মাণ করলেন। হঠাৎ ক... ব্যাপারটা চোখে ধরা না পড়ে সেজন্য মা... সভ্যতার গৌরব মহাকবি সেক্সপীয়... বিপ্লবী লেনিন ও আব্রাহাম লিংক... নামেও নির্মিত তোরণ সম্মেলনের শো... বর্ধন করল। অবশ্য এম এ জিন্নাহ... কবি ইকবালের নামেও দুটো তো... বানানো হয়েছিল।

এর সাথে সাথে মওলানা ভাসানী পশ্চি... বাংলা থেকে জনাব হুমায়ুন কবী... নেতৃত্বে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিনি... দলকেও আমন্ত্রণ জানালেন। প্রখ্যাত ... সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ক... আবদুল ওদুদ, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যা... শ্রীনরেন দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ... প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের চীফ রিপোর্টা... হিসেবে রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সা... 'ল্যান্ডরোভারে' যখন কাগমারীতে ... পৌঁছালাম তখন বিকেলের পড়ন্ত সূ... রশ্মি এসে সন্তোষের মহারাজার ভেঙ্গে ... বাড়িটার উপর পড়েছে। চারদিকে ... একেবারে গমগম করছে। খোঁজ ... জানলাম এই ভাঙ্গা রাজবাড়ির এক গো... কক্ষে রাত দশটা থেকে আওয়ামী ... ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসবে। এর ম... পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব সো... সোহরাওয়ার্দী থেকে শুরু করে বহু ... উপনেতার 'পদক্ষেপে' কাগমারী ... হয়েছে। আওয়ামী লীগ ... দুটো উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর... প্রকাশ্যে জোর লবী করতে শুরু করে... হঠাৎ একটা ছোট প্রচারপত্র হাতে ... পড়লো। লেখা রয়েছে 'এখন ... দৈনিক সংবাদ আর মুসলিম লীগের প... মত—এটা সংগ্রামী জনতার মুখ... অনেক কষ্টে এক কপি 'সংবাদ' ... সংগ্রহ করে দেখলাম সম্পাদকীয় ... উপরে মওলানা ভাসানীর বাণী ...

করে। কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রকের নামের কোনই পরিবর্তন হয় নাই। তবে কী মুসলিম লীগের ভরাডুবি দেখে এ'রা রাতারাতি ভোল পাল্টালেন নাকি?

অবশ্য বছর কয়েকের মধ্যে এই পত্রিকা মওলানা ভাসানীর কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলো। জানি না ঘন ঘন মত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কী প্রগতিশীলতার পরীক্ষা দিতে হয়? অথচ মওলানা ভাসানী তো' এখনও বাংলার মুক্তি সংগ্রামীদের এক কাতারেই রয়েছেন। একথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, নুরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকারের আমলে যে পত্রিকা দেশপ্রেমিকদের বিনা বিচারে গ্রেপ্তার সমর্থন করেছিল, সেই পত্রিকা অফিসেই আবু হোসেন মন্ত্রিসভার আমলে মুক্ত রাজবন্দীদের সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। বোধ হয় এটাও এক ধরনের রাজনীতি!

যাক যা' বলছিলাম। রাত দশটার দিক তুহীন শীতে গোটা কয়েক মোম বাতি ধরিয়ে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির গোপন বৈঠক শুরু হল। এক বন্ধু সাংবাদিককে নিয়ে আমি প্রায় সমস্ত রাত ধরে খোলা ধরা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এই গোপন বৈঠকের অনেক কথাবার্তাই শুনলাম। প্রথম দিকে জনা তিনেক সদস্য প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পশ্চিমা-ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করে বললেন এই পররাষ্ট্রনীতি আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মনসুর আহম্মদ এবং জহীরউদ্দীন আহম্মদ কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্রনীতির সপক্ষে নানা ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু দুজনেই আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি প্রথমে আওয়ামী লীগের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা উল্লেখ করে বললেন, একথা মনে রাখা দরকার যে কেন্দ্রে এখন কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত নেই। সেখানে যে সরকার রয়েছে, সেটা হচ্ছে রিপাবলিকান ও আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন সরকার। উপরন্তু কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে কেবলমাত্র তেরজন সদস্য আওয়ামী লীগ দলীয় হওয়ার দরুন এই কোয়ালিশন সরকারে আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘু অংশীদার হিসেবে রয়েছে, তাই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু অংশীদার রিপাবলিকান দলের বক্তব্যের গুরুত্ব অনেক বেশী। আর যদি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আপোস অসম্ভব তবে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে আমাদের পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নাই। এই ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার পূর্বে একটা চিন্তা করা দরকার যে কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন থেকে আওয়ামী লীগের বেরিয়ে আসার অর্থ হবে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসনের দাবী ও যুক্ত নির্বাচনের ইস্যুকে জলাঞ্জলি দেয়া। দেশের আভ্যন্তরীণ বিশেষ করে পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই ওয়ার্কিং কমিটীকে তার মতামত ব্যক্ত করতে হবে। কেননা কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন থেকে আওয়ামী লীগ সদস্যরা পদত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্কান্দার মীর্জার রিপাবলিকান দল মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মন্ত্রিসভা গঠন করবে। সেক্ষেত্রে মার্কিনী-ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি অব্যাহত ছাড়াও পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু এবং শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এ' ধরনের যুক্তির পর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটীর অধিকাংশ সদস্যই আর কোন যুক্তির অবতারণা করলেন না। শুধুমাত্র সভাপতি মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষায় পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করবো। কবরের মধ্যে এক পা রেখেও চীৎকার করে বলবো, আমি এই সর্বনাশা সামরিক চুক্তি মানি না। কিন্তু শহীদের (সোহরাওয়ার্দীর) অবস্থা খুবই নাজুক।

এরপর প্রায় সমস্ত রাত ধরেই এই পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে বাক-বিতণ্ডা হলো। শেষ পর্যন্ত এই মর্মে সিদ্ধান্ত হলো যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পার্টির নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কথা উল্লেখ করলেও এ ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাকে বিশেষ চাপ দেবে না। পরদিন আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হলো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘু অংশীদার বলেই একটা জোড়াতালির ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু আওয়ামী লীগের একটা বামপন্থী উপদল এতো বড় 'একটা সুযোগ' হাতছাড়া হলো দেখে মনক্ষুণ্ণ হলো। আবার দলের চরম দক্ষিণপন্থী উপদল প্রকাশ্যে এ'দের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

এদিকে মওলানা ভাসানী বক্তৃতাদানকালে বললেন, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না দিয়ে যদি পূর্ব বাংলার উপর কেন্দ্রীয় সরকার তার শোষণ অব্যাহত রাখে তা হলে আমি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আস্‌সালামু-আলায়কুম' অর্থাৎ 'বিদায় পশ্চিম পাকিস্তান, বিদায়' বলতে বাধ্য হবো। তাই কাগমারী সম্মেলন সমাপ্ত হবার পর আওয়ামী লীগের দু'টো উপদলের কোন্দল চরমে উঠল। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে উদারপন্থী আওয়ামী লীগরা পার্টিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, আজ চৌদ্দ বছর পর আওয়ামী লীগ বহু

গণে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও সেদিনের চরম দক্ষিণ ও বামপন্থী আওয়ামী লীগ-ওয়ালারা অনেক আগেই পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হলো। এর মধ্যে চরম বামপন্থী আওয়ামী লীগাররা পার্টির গঠনতন্ত্রের একটি বিশেষ ধারা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানীকে বোঝালেন যে শেখ মুজিবের বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী বিধায় পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করে রাখতে পারেন না। যে কোন একটা পদ থেকে শেখ সাহেবকে পদত্যাগ করতে হবে। মওলানা ভাসানীর কাছ থেকে শেখ মুজিব এই কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে হতবাক করে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে বসলেন। তিনি বললেন 'আমার কাছে মন্ত্রিত্বের চেয়ে পার্টির দায়িত্ব অনেক বড়। মন্ত্রিত্ব না থাকলে কিছুই যায় আসে না—কিন্তু আওয়ামী লীগ পার্টি ছাড়া আমি কিছুই চিন্তা করতে পারি না।'

(ক্রমশ)

॥ ৫ ॥

ব্যারাকপুরে বাস থেকে নেমে, ভদ্রলোক যখন নবাবগঞ্জে এল তখন অনেক বেলা হয়েছে। নবাবগঞ্জে সেদিন হাট-বার। কিন্তু হাট বসতে বসতে সেই যার নাম বেলা দেড়টা। সকাল বেলার দিকে তেমন লোকজন থাকে না। কিন্তু যত বেলা বাড়ে তত চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ থেকে ব্যাপারী-চাষী-খদ্দের এসে জোটে। আর আসে ফেলডাবরা। কলকাতার কোলে-মার্কেট থেকে সোজা চলে আসে কেষ্টগঞ্জে। কেউ-কেউ নামে মদনপুরে, কেউ আড়ংঘাটায়, আবার কেউ বগুলায়। বেগুন মুলো পটল কপি, কিম্বা আম-কাঁটাল কিনে ঝুড়ি ভর্তি করে ট্রেনে চাপিয়ে সোজা শেয়ালদা। সেখান থেকে কোলে-মার্কেট।

তখন হাটে আসে ডাক-পিওন। আসে ব্যারাকপুরের ডাক্তার কার্তিকবাবু। আসে কেষ্টগঞ্জ ইস্কুলের হেড-মাস্টার। কেউ আসে সাইকেলে চড়ে, কেউ চলে আসে হেঁটে, আবার কেউ বা বাসে চড়ে। এক হপ্তার বাজারটা হয়ে যায় নবাবগঞ্জের হাট থেকে।

সপ্তাহের ওই দিনটা হাট করার দিন নয় শুধু, পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করবার দিনও বটে। এ সেই নরনারায়ণ চৌধুরীর আদি আমল থেকেই এমনি চলে আসছিল। বলতে গেলে তিনিই এই হাট বসান এখানে। আগে নবাবগঞ্জের লোকজন বড়-হাট করতে যেত সেই কেষ্টগঞ্জে আর নয় তো বাঁকুড়-পুরে। অবশ্য হাট করার রেওয়াজ তখন এত ছিল না। আলুটা রেল-বাজার থেকে নিয়ে এলেই হতো। আলু আর কেরাসিন। বাকি শাক-পাতা-মাছ এই নবাবগঞ্জের ঘরে বসেই মিলতো সকলের। মালো-পাড়া থেকে আসতো মাছ বিক্রি করতে। আর যার যার বাড়ির উঠোনো গজাতো শাক-পাতা-কলা-মুলো। তখন কর্তাবাবু নতুন করে বাড়ি করেছেন। পাকা দোতলা বাড়ি। কৃষাণ খাতক ব্যাপারী মহাজন দর্শনার্থী প্রার্থী নানা লোকের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। নবাব-গঞ্জের নাম ধাম হয়েছে এ দিগরে। তিনি বললেন—এ কী কথা, নবাবগঞ্জে হাট নেই, এটা তো ভালো কথা নয়। দশটা গ্রামে ঢাঁড়া পিটিয়ে জানান দিয়ে দিলেন যে, এবার থেকে প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবারে নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলায় হাট বসবে। ব্যাপারীরা যারা হাটে বেচা-কেনা করতে আসবে জমিদার তাদের কাছ থেকেও কোনও তোলা নেবেন না। ব্যাপারীদের কাজ-কারবারে সব রকমের সুবিধা দেওয়া হবে।

যতদিন কর্তাবাবু ছিলেন ততদিন তিনি দেখে গেছেন নবাবগঞ্জের শনি-মঙ্গলবারের হাট বেশ জমজমাট হয়ে চলছে। তারপর কর্তাবাবুর ছেলে হরনারায়ণের আমলেও হাট রমারম হয়ে উঠেছে। হাটে আরো ব্যাপারী আরো খদ্দের আরো দূরে-দূরে দেশ থেকে এসে জড়ো হয়েছে। সেই কর্তাবাবু আজ নেই, সেই কর্তাবাবুর ছেলে হরনারায়ণ চৌধুরীও আজ আর নেই। এমন কি হরনারায়ণ চৌধুরীর অত যে আদরের ছেলে, সেও আর নবাবগঞ্জে নেই। ওই হাটের দিন সদানন্দ আসতো দীনুর সঙ্গে, কৈলাস গোমস্তাও আসতো এক-একদিন। কৈলাস গোমস্তা আসা মানেই স্বয়ং হরনারায়ণ চৌধুরীর আসা। কৈলাশ গোমস্তা হাটে এলে কারো কোনও জিনিসের জন্যে দর-দস্তুরের প্রয়োজন হতো না। অনেক সময় সঙ্গে কর্তাবাবুর নাতি। সদানন্দ আবদার করতো—কৈলাশ কাকা, আমি বেলুন নেব—

কেষ্টগঞ্জ থেকে রবারের বেলুন নিয়ে এসে বেচছিল কপিল পায়রাপোড়া। আবদারের কথা শুনেই সে বললে—এই ন্যান্ গোমস্তা মশাই, খোকাবাবুর জন্যে বেলুন ন্যান্—

কৈলাশ গোমস্তা বেলুন নিলে।

জিজ্ঞেস করলে—কত দাম রে কপিল?

কপিল পায়রাপোড়া বললে—দামের কথা বলে লজ্জা দেবেন না গোমস্তা মশাই, আমি খোকাবাবুকে এমনিই খেলতে দিলুম—

—খেলতে দিলুম মানে? খোকাবাবু তোর কাছে ভিক্ষে নেবে নাকি? খোকাবাবুর পয়সার অভাব?

কপিল পায়রাপোড়া বললে—আজ্ঞে, বাবুদের খেয়ে পরেই তো আমরা বেঁচে আছি. খোকাবাবু খেলতে চেয়েছেন তাই দিলুম ওনাকে—

বেলুন পেয়ে মহাখুশী সে। দীনুমামা আর কৈলাশ কাকার সঙ্গে সারা হাট ঘুরতে লাগলো বেলুন নিয়ে। সদানন্দ যেখানে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনও মাথার ওপর চলতে থাকে। সেই বেলুন নিয়েই কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বাড়ির ভেতরে মাকে গিয়ে বেলুন দেখালে, চণ্ডীমণ্ডপে বাবাকে গিয়ে দেখালে। কাছারি বাড়িতে দাদুকে গিয়ে দেখালে। যেন এক মহা সম্পত্তি পেয়েছে সে। বাড়িময় তার বেলুন নিয়ে খেলা। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখলে সেটা চুপসে গেছে। তখন শুরু হলো নাতির কান্না।

কর্তাবাবুর কানে কান্না যেতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—খোকা কাঁদে কেন রে? কী হয়েছে? মেরেছে নাকি কেউ?

দীনু বললে—আজ্ঞে, খোকাবাবুর বেলুন চুপসে গেছে—

শেষ জীবনে কর্তাবাবু নাতি-অন্ত প্রাণ

হয়ে গিয়েছিলেন। যে বায়না ধরতো তাই-ই যোগান দিতেন। কখনও বেলুন, কখনও পাখি, কখনও ঘুড়ি, কখনও সাইকেল। সুদখোর মানুষ, কারো সুদের একটা পয়সা ছাড়তেন না। কিন্তু নাতির জন্যে যত টাকাই হোক তাঁর খরচ হওয়াটাকে খরচ বলে কখনও মনে করতেন না।

বলতেন—আহা, ছোট ছেলে, আবদার ধরেছে, দাও না ওকে কিনে—

বাবা বলতো—আদর দিয়ে দিয়ে বাবাই খোকার সর্বনাশ করবেন দেখছি—তা কান্নাকাটির কারণ শুনে কর্তাবাবু তখনই লোক পাঠালেন রেল-বাজারে। দীনু গেল সেখানে। নাতির আবদার রাখবার জন্যে একটা লোক পাঁচ ক্রোশ হেঁটে দু-পয়সায় একটা বেলুন কিনে নিয়ে এল। তখন নাতি ঠাণ্ডা। তখন আবার তার মুখ দিয়ে হাসি বেরোল। তখন আবার সেই বেলুন নিয়ে সারা বাড়িময় মাতামাতি চললো।

কর্তাবাবুর কাছে দীনু আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন—এনেছিস—বেলুন এনেছিস?

দীনু বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—খোকাকে দিয়েছিস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দিয়েছি—

—কত দাম নিলে?

—আজ্ঞে দু' পয়সা।

—দু' পয়সা?

দু' পয়সা দাম শুনেই চমকে উঠলেন কর্তাবাবু। বললেন—সেদিন কপিল পায়রা-পোড়া যে কৈলাশের কাছে চার পয়সা নিয়েছিল।

তবু সন্দেহ হলো। হিসেবের খাতাটা বার করে দেখে মিলেন। হাটে যা কিছু কেনা-কাটা হতো তার হিসেব দিতে হতো কর্তাবাবুর কাছে। তিনি সেগুলো নিজের হাতে লিখে সিন্দুকের মধ্যে খাতাটা রেখে দিতেন। হিসেবের খাতায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে কপিল পায়রাপোড়ার কাছে চার পয়সা দিয়ে খোকার জন্যে বেলুন কেনা হয়েছে। ডাকলেন—কৈলাশ? কৈলাশ কোথায় গেল?

কৈলাশ গোমস্তা এল। কর্তাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কৈলাশ, সেদিন কপিল পায়রাপোড়ার কাছে তুমি বেলুন কিনেছিলে ক'পয়সা দিয়ে?

—আজ্ঞে, আপনাকে তো আমি খরচের হিসেব দিয়েছি।

কর্তাবাবু বললেন—তুমি বলেছ চার পয়সা। আমার খাতাতেও তাই-ই লেখা রয়েছে। কিন্তু অজদীনু রেল-বাজার থেকে খোকার জন্যে আর একটা বেলুন কিনে এনেছে—সেটা দু'পয়সা নিয়েছে। কপিল পায়রাপোড়া লোকটা তো চোর। আমাকে দু' পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছে। এ কি মগের মুলুক পেয়েছে সে! আমার পয়সা কি সস্তা পেয়েছে সে!

কৈলাশ গোমস্তা সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে হুজুর, কী আর বলবো, আজকাল পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস নেই, সব বেটা চোর।

কর্তাবাবু বললেন—তা চোর বললে তো আমি শুনবো না, চুরি করতে হয় অন্য কারো বাড়িতে সিঁধ কাটো, তা বলে আমার কাছে? সে পেয়েছে কী? ভেবেছে আমি ধরতে পারবো না? আমি খোকা? আর আমার পয়সা বুঝি পয়সা নয়? আমাকে বুঝি মুখে রক্ত উঠিয়ে টাকা উপায় করতে হয়নি?

তারপর একটু থেমে বললেন—ওর কাছে জমি-জমা কী আছে আমার?

কৈলাশের হিসেব সবই মুখস্থ থাকে। বললে, বিলের ধারে এক লপ্তে তিন বিঘে ওর ভাগে আছে, আর ওর কাকার ভাগে বাকি সাত বিঘে—

—ওর আর কী-কী সম্পত্তি আছে?

—সম্পত্তি বলতে ওই আমাদের তিন বিঘে জমিই ওর ভরসা। ওতে ওর সারা বছর চলে না। মা ষষ্ঠীর কৃপায় আবার ওর সংসারও অনেক বড়। একটা বউ মরে যাবার পর আবার নতুন করে একটা বিয়েও করেছে। ও-পক্ষের তেরটা অ্যাণ্ডা-গ্যাণ্ডা, তার ওপর এ পক্ষেরও একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি—

কর্তাবাবু বললেন—তাহলে তো খুব কায়ক্লেশে চালায়। খাজনা ঠিক সন্-সন্ দিয়ে যাচ্ছে তো?

—আজ্ঞে, দিতে পারবে কী করে? দু'এক সন মাঝে-মাঝে বাকি পড়েও যায়। খুব ধমক-টমক দিলে তখন গরু-বাছুর বেচে জমিদারের পাওনা শোধ করে কোনও রকমে লোকজনের তো হাট-বাজারে কখনও বেলুন কখনও বিস্কুট-ল্যাবেনচুষ বিক্রি করে তাতে যা দু'পয়সা হয়—

কর্তাবাবু বললেন—তা বলে আমাকে ঠকাবে? আমারটা খাবে পরবে আবার

আমাকেই ঠকাবে? এ তো ভালো কথা নয়। তুমি ওর জমি খাস্ করে নাও—

—খাস করে নেব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ খাস করে নেবে। আমি অত দয়ার অবতার হতে পারবো না। আমার অত পয়সা নেই। আজই খাস করে নেবে—বুঝলে?

তা সেইদিনই খবর গেল কপিল পায়রাপোড়ার কাছে। সে তখন সারা দিনের খাটুনির পর তার বাড়ির চাতলায় ভাত খেতে বসেছে। খবরটা শুনেই খাওয়া তার মাথায় উঠলো। খাওয়া ফেলে তখনই ছুটলো কাছারিতে। কৈলাশ গোমস্তা তাকে বললে—তা আমি কী করবো বাপু, আমার কি জমি? যার জমি তিনি যদি হুকুম করেন তো আমি কী করতে পারি? তুই কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে তোর আর্জি পেশ কর গে—

কপিলের তখন মাথায় বজ্রাঘাত। বললে—আপনিই সব গোমস্তা মশাই, আপনি বললে কর্তাবাবু জমি ফিরিয়ে দেবেন। ওই জমিটুকু চলে গেলে আমি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে খাবো কী? আর সংসার চলবে কী করে?

একটা পাঁচ ফুট লম্বা পুরুষ-মানুষ যে অত গলা ফাটিয়ে হাউ-হাউ করে কান্নাকাটি করতে পারে তা না দেখলে সদানন্দ কল্পনাও করতে পারতো না। বাড়ি সুদ্ধ লোক সবাই জানতে পারলো কপিল পায়রাপোড়ার জমি কর্তাবাবু খাস করে নিচ্ছেন। কিন্তু কেন খাস করে নিচ্ছেন তা কেউ জিজ্ঞেস করলে না। সবার কাছেই যেন জিনিসটা স্বাভাবিক। এ তো হবারই কথা। জমিদারের হক্ আছে জমি খাস করে নেবার। তা সে অন্যায় করুক আর না-করুক। খাজনা দিক আর না-দিক। আমার মর্জি হয়েছিল তাই তোমায় জমি চাষ করতে দিয়েছিলুম। আবার এখন মর্জি হয়েছে তোমার কাছ থেকে জমি কেড়ে নেব। জমির মালিক তুমি, না আমি?

সদানন্দ দীনুমামার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—দীনুমামা, কপিলকে মারছে কেন দাদু?

দীনুমামা বললে—মারবে না? কপিল যে কর্তাবাবুকে ঠকিয়েছে!

—ঠকিয়েছে? কী করে ঠকালো?

—দু' পয়সার বেগুন কেন চার পয়সায় সে বিক্রি করেছে? সেই একই বেগুন আমি রেলবাজার থেকে যে দু' পয়সায় কিনে এনেছি—

সদানন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে—কই, বেগুন তো কপিল বেচেনি। আমি বেগুন নেব বলে আবদার ধরেছিলুম বলে ও তো মাগনা দিয়ে দিলে। পয়সা তো নেয়নি ও। আমি নিজের চোখে যে দেখেছি, আমি তো তখন হাটে ছিলুম—

কিন্তু দীনুর কাছ থেকে কোনও প্রতিকার পাবে না জেনে আর সেখানে অপেক্ষা করলে না। একেবারে সোজা দাদুর ঘরে গিয়ে

পৌঁছোল। সেখানে তখন বীভৎস কাণ্ড চলছে। ঘরের মধ্যে দাদু নিজের লোহার সিন্দুকটার পাশে বসে আছে আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কৈলাশ কাকা। আর তাদের সামনে বংশী ঢালী কপিল পায়রা-পোড়ার মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে আছে। আর বলছে—বল্, কর্তাবাবুকে কেন ঠকালি বল্—

কিন্তু কপিল বলবে কী? তাকে কথা বলবার ফুরসুৎই দিচ্ছে না বংশী ঢালী। এক হাতে চুলের ঝুঁটি ধরে অন্য হাতে পটাপট্ মুখে ঘুষি মেরে চলেছে—। আর দাদু বংশীকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে—মার মার বেটাকে, মেরে ফেল্, আমার সঙ্গে শয়তানি, আরো মার—

সদানন্দ আর থাকতে পারলে না। একেবারে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো দাদুর সামনে। বললে—দাদু, ওকে মারছো কেন? ও তো বেলুনের দাম নেয়নি, অমনি দিয়েছে। ওই তো কৈলাশ কাকা জানে, কৈলাশ কাকাকে জিজ্ঞেস করো না—ও কৈলাশ কাকা, তুমি কথা বলছো না কেন, ও কৈলাশ কাকা—

কিন্তু দাদু বিরক্ত হয়ে উঠলো নাতির কথায়। প্রথমটায় তিনি যেন একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে উঠলেন—আরে, এখানে তুই এলি কেন? ও দীনু, দীনু কোথায় গেলি? ও দীনু, খোকাকে এখানে আসতে দিলি কেন, ওরে দীনু, ওকে নিয়ে যা এখেন থেকে—

সদানন্দ না-ছোড়-বান্দা। বললে—আমি যাবো না এখান থেকে, আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও—

সদানন্দও যাবে না, কর্তাবাবুও ছাড়বে না। ততক্ষণে দীনু এসে গেছে। এসে জোর করে হাত ধরে টানতে টানতে চ্যাংদোলা করে সদানন্দকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। কিন্তু তখনও ঘরের ভেতর থেকে কপিলের কান্নার আওয়াজ তার কানে আসছিল।

এ-সব কতকালকার আগেকার কথা। তবু সদানন্দর যেমন মনে আছে, নবাবগঞ্জের সেকালের যারা আজো বেঁচে আছে তাদেরও মনে আছে। মনে আছে শেষকালে ছেলে-মেয়ে-বউকে খেতে না দিতে পেরে সেই কপিল পায়রাপোড়া একদিন নবাবগঞ্জ থেকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেউ টের পেলে না। কপিল পায়রাপোড়ার কাকা প্রথমে কিছুদিন তার ছেলে-মেয়েদের দেখেছিল। তারপর জানা গেল একদিন ওই বারোয়ারিতলার গাছের ডালে কপিলের ধড়টা ঝুলছে। গরু বাঁধা দড়ি দিয়ে গলাটা বেঁধে হয়ত ঝুলে পড়েছিল কেউ দেখতে পায়নি।

তারপর পুলিস-থানা-দারোগা-কোর্ট-কাছারি অনেক কিছু হলো তাই নিয়ে। তারপর একদিন সে-ঘটনার ঢেউ থেমেও গেল। কিন্তু সদানন্দর মন থেকে তা আর মুছলো না।

এ-সব ছোট-খাটো ঘটনা। কিন্তু ছোট-খাটো ঘটনাগুলোই সদানন্দর মনের ভেতরে জমে-জমে পাহাড় হয়ে উঠতে লাগলো। প্রকাশ মামা জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে, তুই কী ভাবিস রে এত?

তখন সদানন্দ একটু বড় হয়েছে। বলতো—আচ্ছা মামা, তোমার এই সব ভালো লাগে?

প্রকাশ মামা তো অবাক। সে শুধু জানে ফুর্তি করা আর খাওয়া-দাওয়া হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে দেওয়া। ভালো খাও ভালো পরো, দু'হাতে টাকা উপায় করো আবার দুই হাতে সেই টাকা খরচ করো। ভাগ্নের কথা শুনে বললে—কী ভালো লাগে?

সদানন্দ বললে—এই তুমি যা করো সারাদিন?

—আমি সারাদিন কী করি?

—এই আরাম করে খাও, বারোয়ারিতলায় গিয়ে আড্ডা দাও, তাস খেলো, তারপরে গাণ্ডে-পিণ্ডে-খাও; খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও, তারপরে ঘুম থেকে উঠে সন্ধেবেলা এ-গাঁ ও-গাঁ করে বেড়াও; আর তারপর রাত্তিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ো।

প্রকাশ মামা বললে—আমি যা করি এ তো সবাই করে। কেন দোষটা কী? আমি চুরিও করছি না কারো। বাটপাড়িও করছি না। আমার বাপ-কাকা-জ্যাঠা চোদ্দ পুরুষ চিরকাল এই জিনিস করে এসেছে, আবার আমিও তাই করবো। আবার তুইও যখন বড় হবি তখন তুইও তাই করবি। এই-ই তো নিয়ম রে—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার যে ও-সব করতে ভালো লাগে না মামা। জানো, কপিল পায়রাপোড়াকে তুমি চিনতে?

—কপিলকে? সেই শয়তানটাকে? চিনবো না। ব্যাটা এক নম্বরের আহাম্মক ছিল একটা। শেষকালে তাই অপঘাতে মরতে হলো। যেমন কর্ম তেমনি ফল?

সদানন্দ বললে—দেখ প্রকাশমামা, আজকাল সবাই তার কথা ভুলে গেছে। আমার বাবা-মা কারোরই হয়ত মনে নেই। আমার দাদুরও হয়ত মনে নেই তার কথা। ওই বারোয়ারী-তলায় যখন সে আত্মঘাতী হলো সবাই-ই তা দেখেছে। দেখে সবাই-ই শিউরে উঠেছে। কিন্তু আজকে কারো সে-কথা মনে নেই, জানো—

প্রকাশ মামা হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই তো দেখছি একটা আস্ত পাগল রে, অত কথা মনে রাখতে গেলে মানুষের চলে! সংসারে একদিন তো সবাই মরবে। সকলেরই বাবা মরবে, ঠাকুর্দাদা মরবে, মা মরবে। প্রথম প্রথম লোকে সে-জন্যে একদিন কাঁদবে। কিন্তু তারপর? তারপর বেশি কান্নাকাটি চালিয়ে গেলে সংসার চলে? আমার তো বাবা-মা মারা যাবার পর খুব কেঁদেছিলাম, তা এখন কি কাঁদছি? আমায় কাঁদতে দেখেছিস কখনও সে-জন্যে? তুই যে আমাকে অবাক করলি সদা!

সদানন্দ বললে—কিন্তু মামা, আমি কেন কিছুই ভুলতে পারি না? আমার কেন সব মনে থাকে। কপিল পায়রাপোড়ার কথা আমার সব সময় যে মনে পড়ে। রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে ভাবি, দিনের বেলা ইস্কুলে পড়তে পড়তে ভাবি, ভাত খেতে খেতে ভাবি........

প্রকাশ মামা তার চেপে গেল। বললে—এই রে, খেয়েছে...

সদানন্দ বললে—কেন? কী করলুম আমি?

—তোর তো দেখছি মাথা-খারাপের লক্ষণ! এ তো ভালো কথা নয়। ডাক্তার দেখাতে হয়—

সদানন্দ বললে—কিন্তু সে তো কোনও দোষ করেনি মামা। তাকে যে দাদু মিছি-মিছি মারলে। বংশী ঢালীকে দিয়ে বেকসুর অপমান করলে। সে তো কিচ্ছু করেনি—

প্রকাশ মামা যেন সব ভেবে চিন্তে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এসেছে। বললে—না, এবার জামাইবাবুকে তোর বিয়ের কথা বলতে হবে?

—বিয়ে? বিয়ে আমি করবো না মামা!

—সে কী রে? তুই ঠাকুর্দার সাত-রাজার ধন নাতি, বাপের চোখের মণি একমাত্র ছেলে। বিয়ে করবি না? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? জানিস, তোর মতন পাত্তোর পেলে মেয়ের বাপরা লুফে নেবে?

সদানন্দর ও-সব কথা ভালো লাগতো না। বিকেল বেলা যখন ইস্কুল থেকে হেঁটে-হেঁটে আসতো, এক-একদিন শীতের দিনে বাড়ি আসতে আসতে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসতো। তখন মনে হতো কে যেন তার পেছন-পেছন আসছে। শুকনো পাতার ওপর হাঁটলে যেমন মড়-মড় শব্দ হয় তেমনি শব্দ করতে করতে তার পিছু-পিছু আসছে। অনেক দিন মনে হয়েছে গাঁয়েরই কোনও লোক ক্ষেত-খামার থেকে ফিরছে। কিংবা কোনও বাড়ির বউ গাঙ্ থেকে জল নিয়ে ফিরছে। না, তা নয়, অনেক সময় রাস্তায় আশে-পাশে-সামনে-পেছনে-কাছে-দূরে কেউ-ই থাকে না, অথচ কে যেন তার পেছন-পেছন হাঁটে।

একদিন ধরে ফেলেছিল। লোকটা একেবারে আসতে আসতে তার গায়ে এসে পড়েছিল। সদানন্দ চমকে উঠেই চেঁচিয়ে উঠেছে—কে?

—আমি!

'আমি' কথাটা কেউ বললে কিনা বুঝতে পারলে না সে। কিংবা হয়ত তার নিজের মনের আতঙ্কটাই শব্দ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। এক মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সেই অদৃশ্য হওয়ার আগেই যেটুকু দেখতে পেলে তাতে মনে হলো সে আর কেউ নয়, সে হলো কপিল পায়রাপোড়া!

ঘটনাটা প্রকাশ মামাকে বলতেই প্রকাশ মামা আর দেরি করলে না। সোজা জামাই-বাবুর কাছে চণ্ডীমণ্ডপে চলে গেল। বললে—জামাইবাবু, সদার বিয়ে দিতে হবে—

বিয়ে! জামাইবাবু কথাটা শুনে প্রথমে

অবাক হয়ে গিয়েছিল। দিদিও তেমনি। বিয়ে তো সদার দিতেই হবে। তা বলে এখনি? এত তাড়াতাড়ি? প্রকাশ বললে—বিয়ে না দিলে তোমার ছেলে শেষকালে সন্নিসী হয়ে বনে চলে যাবে, তখন ঠ্যালা বুঝবে—

তা প্রকাশের কথায় প্রথমে কেউ কান দেয়নি। গরীবের কথায় প্রথমে কেউ কান দেয়ও না তেমন। তাই কথায় আছে গরীবের কথা বাসি হলে তবে লোকে তার দাম দেয়। শেষকালে কর্তাবাবু যখন কথাটা তুললেন তখন সকলের টনক নড়লো। আর কর্তাবাবুর তখন দুটো পা-ই পড়ে গেছে। একেবারে পঙ্গু। সিন্দুকটার কাছে শুয়ে শুয়েই দৈনন্দিন কাজ কর্ম চালান। তাঁর ইচ্ছে চোখ বোজবার আগে তিনি নাতির ছেলের মুখ দেখে যেতে চান। দেখে যেতে চান যে তাঁর বংশের ধারা অক্ষয় হয়ে রইল।

কথাটা শালাবাবুর কানে যেতেই তুড়ে লাফিয়ে উঠেছে। দিদির টাকায় সে বসে বসে খায় আর তার বদলে একটু কিছু উপকারও করতে পারবে না? দিদির উপকার করবার সুযোগ পেয়ে সে লাফিয়ে উঠলো।

বললে—কুছ পরোয়া নেই. কী রকম পাত্রী চাই সেইটে শুধু আমায় বলে দাও—

কর্তাবাবুর হুকুম পাত্রী হবে ডানা-কাটা পরী। ডানা-কাটা পরী মানে পরীর মতন দেখতে শুনতে বলতে কইতে হওয়া চাই, শুধু পরীদের যে ডানা থাকে সেটা থাকবে না।

—আর?

—আর পরীর মতন উড়লে চলবে না।

প্রকাশ বললে—তা ডানাই যদি না থাকে তো উড়বে কেমন করে? আর যদি উড়তে চায় তো তুমি না-হয় শেকল লাগিয়ে দিও।

দিদি হাসতে লাগলো। বললে—আজকালকার মেয়ে কি শেকল মানবে ভাই? [illegible] শ্বশুর-শাশুড়িকেই মানতে চাইবে না। সে তো আর আমাদের কাল নয়। আমার [illegible] বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, তখন [illegible] থেকে কাপড়ের কষি খুলে যেত, শাড়ি তাই শেষকালে গেরো দিয়ে বেঁধে [illegible] তবে লজ্জা রক্ষে হতো—

প্রকাশ বললে—তাহলে সেই রকম দশ [illegible] বছরের মেয়েই এনে দেব—তুমি যেমন অর্ডার দেবে, তেমনি বউ পাবে—

দিদি বললে—তাই যে ভাই, নইলে কর্তাবাবু আবার কবে [illegible] করে নেই. একটু শিগগির শিগগির কর তুই—তা শেষ [illegible] সেই রকম মেয়েই পাওয়া গেল। [illegible] কম, দেখতেও ডানা-কাটা-পরী। [illegible] একটু বয়েস কম হলে অবশ্য ভালো [illegible]। কিন্তু ঠিক তোমার অর্ডার-মাফিক পাত্রী কোথায় পাবো? তাহলে তো কুমোরকে ডেকে ফরমায়েস করতে হয়। কৃষ্ণনগরের কাছে বাড়ি। বাপ পণ্ডিত। সংস্কৃত শাস্ত্র জানা মানুষ। স্বামী আর স্ত্রী, আর সংসার বলতে ওই একটি মেয়ে। সেকালে পূর্ব-পুরুষকে দেওয়া রাজাদের দুশো বিঘের মত জমি-জমা আছে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার। নগদ কিছু দিতে পারবো না। যদি মেয়ে পছন্দ হয় তো রাঙা সুতো হাতে দিয়ে নিয়ে যান। তারপর মেয়ের ভাগ্য আর ঈশ্বরের ইচ্ছে।

এই-ই হলো নয়নতারা। এ গল্পের আসামী সদানন্দ চৌধুরীর স্ত্রী। আমাদের নায়িকা।

প্রকাশ রায় এই নতুন বিয়ের কনে নয়নতারাকে নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই একদিন নবাবগঞ্জে এসেছিল। নবাবগঞ্জের জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি যেতে গেলে এই বারোয়ারিতলায় হাটের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। এই রাস্তা দিয়েই একদিন নয়নতারা চৌধুরী বাড়ির বউ হয়ে এসেছিল, আবার ঠিক সেই বধূ বেশেই এই রাস্তা দিয়েই চলে গিয়েছিল। এই রাস্তা দিয়েই একদিন সেকালের এক সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী পরিবারের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি এসে উদয় হয়েছিল, আবার নয়নতারার সঙ্গে সঙ্গে এই রাস্তা দিয়েই তা অস্ত গিয়েছিল চিরকালের মত। এই-ই সেই চিরকালের উদয়-অস্তের শাশ্বত পথ, এই রেলবাজার থেকে নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলার হাট পর্যন্ত। সেই ঘটনার কতকাল পরে প্রকাশ চক্রবর্তী আবার উদয় হলো এই নবাবগঞ্জে—মোবারকপুরে বাস থেকে নেমে পায়ে হাঁটা পথে। এখন আর আগেকার সেই মোবারকপুর নেই। সেই মোবারকপুরে কেন, সেই নবাবগঞ্জও নেই। নবাবগঞ্জে চৌধুরীদের সেই বাড়িটও আর চৌধুরীদের নেই। নরনারায়ণ, হরনারায়ণ, চৌধুরীবাড়ির গিন্নি, প্রকাশ চক্রবর্তীর দিদিও কেউ-ই নেই। একদিন অম্বিকা ঘোষের ছেলে দুলাল ঘোষ জলের দরে অত বড় তিন মহলা বাড়িটা কিনে নিলে। কিন্তু দুলাল ঘোষও তা রাখতে পারলে না। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি, বিশেষ করে বসত-বাড়ি কিনতে নেই। এমন কি জলের দরে পেলেও না। কিন্তু দুলাল ঘোষ শুনলে না। ভাবলে ভারি লাভ করলুম। কিন্তু এখন? সেই দুলাল ঘোষও একদিন জন্মাষ্টমীর দিন সাপের কামড়ে অপঘাতে মরলো। তার পর থেকে সেই চৌধুরী বাড়ি এখন ভূতের বাড়ি হয়ে খাঁ খাঁ করছে। দিনের বেলাতেও লোকে সেদিকে মাড়াতে ভয় পায়। বলে—ও-বাড়িতে ব্রহ্মদৈত্যির অভিশাপ আছে, ওদিক মাড়িও না—

পাশের দোকান-ঘর থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো—মশাই-এর কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

প্রকাশ রায় সুটকেসটা নিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। বললে—আমি আসছি ভাগলপুর থেকে, এই নবাবগঞ্জে এসেছি একটা কাজে—

—এখানে কার বাড়িতে যাওয়া হবে?

প্রকাশ রায় বললে—কারো বাড়িতে যাবো না, আমি এসেছি সদানন্দর খোঁজে, সদানন্দ চৌধুরী—

সদানন্দ চৌধুরীর নামটা উচ্চারণ করতেই দোকানের আশে-পাশে যারা ছিল তারা কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। এ কোথাকার লোক! কী এর পরিচয়। সদানন্দ চৌধুরীর খোঁজ করে! এ তো সাধারণ লোক নয় হে। সেই সদা একদিন এখানে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে পেট চালিয়েছে। দু' বেলা দু' মুঠো ভাতের জন্যে অজাত-কুজাতের বাড়িতে পাত পর্যন্ত পেতেছে। চৌধুরী-কর্তা চলে যাবার পর নবাবগঞ্জে কেউ তো সদানন্দ বেঁচে আছে কিনা, খেতে পাচ্ছে কি না সে-খোঁজও কখনও নেয়নি। এইখানে এই বারোয়ারিতলায় আটচালাটার ওপর একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুতো আর উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়া পুবপাড়া যেখানে পারে গিয়ে বলতো—দুটো ভাত দেবে মা-ঠাকরুণ, বড্ড খিদে পেয়েছে—। চৌধুরী-বাড়ির একমাত্র ছেলে পাড়ায় পাড়ায় ভাত ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্যও নবাবগঞ্জের লোককে চোখ মেলে দেখতে হয়েছে।

—তা আপনি এতদিন পরে সদার খোঁজ করছেন কেন?

—জিজ্ঞেস করতে এসেছি সে কোথায় আছে আপনারা জানেন কিনা। আমাকে তার সন্ধান দিতে পারেন কি না। তাকে আমার বড় দরকার—

পরমেশ মৌলিক এতক্ষণ একমনে হুঁকো টানছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন। বললেন—আপনার নিবাস?

প্রকাশ বললে—ভাগলপুর। আমি হচ্ছি সদানন্দর মামা—

—প্রকাশ-মামা? শালাবাবু? তাই বলুন, এতক্ষণ বলেন নি কেন? বসুন বসুন, তা এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? চুল পেকে গেছে। ওঃ, কতকাল পরে দেখা হলো। তা চৌধুরী-কর্তা কেমন আছেন?

চৌধুরী কর্তা মানে হরনারায়ণ চৌধুরী। প্রকাশ রায় বললে—জামাইবাবু' গেল হপ্তায় মারা গেছেন।

মারা যাওয়ার খবর শুনেই সবাই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—মারা গেছেন?

(ক্রমশ)

থিন অ্যারারুট বিস্কুটকে
মুচমুচে, পুষ্টিকর,
সুস্বাদু ক'রে
তৈরী করি আমরা

আর আপনাদের
ভালো লাগে ব'লেই
এই বিস্কুট আজ
ভারতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়

আজকের কথা নয়। প্রথম যখন ১৯১৮ সালে আমরা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বাজারে বের করি তখনই এ বিস্কুট সবার মন জয় ক'রে নিয়েছিল। আর আজকাল তো বেশীর ভাগ বাড়ীতেই অন্য কোনো বিস্কুটের চেয়ে ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুটই সবাই ভালোবাসে।

এর কারণ আর কিছুই নয়, এই বিস্কুট স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, পুষ্টিকর, সহজে হজম হয়, আর তাই সারা পরিবারের উপযোগী একটি চমৎকার খাদ্য। তাছাড়া, এর স্বাদ এমন লোভনীয় যে আর কোনো থিন অ্যারারুট বিস্কুটই ব্রিটানিয়ার কাছে লাগে না।

বাড়ীতে এক প্যাকেট সব সময় রাখা চাই।

ব্রিটানিয়া
থিন অ্যারারুট বিস্কুট

ভারতের সেরা বিস্কুট ব্রিটানিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে গভর্নর যে প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, এ শিক্ষার সূচনা কিভাবে প্রবর্তিত হবে, এর প্রয়োগের দিকটা কতখানি থাকবে, আর তত্ত্বের দিকটাই বা কতখানি থাকবে। নিছক সাঙ্গীতিক তত্ত্ব ছাড়া আরও বহু একাডেমিক তত্ত্ব সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত;—সেইগুলিই বা কিভাবে এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সঙ্গীতশিক্ষার পূর্বে শিক্ষার্থীর সঙ্গীত ও সাধারণ শিক্ষার একটা ভিত্তি থাকা দরকার। তাকে উচ্চমাধ্যমিকের মান পর্যন্ত পড়াশোনা করতেই হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতে মোটামুটি জ্ঞান তাকে অর্জন করতেই হবে। এর পরে আসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে প্রযুক্ত বিদ্যার প্রাধান্য থাকবে এটা নিশ্চয় কেননা শিক্ষার্থীর পক্ষে শিল্পে দক্ষতা অর্জন করাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এছাড়া তার সুর-রচনা বা কম্পোজ করবার যোগ্যতা অর্জন করাও দরকার। আমাদের সঙ্গীতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। ছেলেমেয়েরা যাতে এই সব কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে সেই জন্য তাদের চিন্তার স্বকীয়তা এবং স্বাবলম্বিতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, এই কোর্সকে অযথা প্রলম্বিত করবার প্রয়োজন নেই। কারণ তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে একটা বেসিক আইডিয়া নিয়ে। পরের ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাসসাপেক্ষ। একটা রাগ শিখতেই বহু বৎসর কেটে যায় —এই জাতীয় ওস্তাদ সুলভ ধারণা পরিহার করাই কর্তব্য। তবে, তাদের দক্ষতার মান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সর্বতোভাবে উপযুক্ত কিনা সেটা সম্যক বিচার করেই তাদের ডিগ্রী প্রদান করা কর্তব্য।

প্রশ্নটা জটিল হচ্ছে যখন আমরা তত্ত্বের দিকে আসি। সঙ্গীতে বিজ্ঞানের দিকটাও কম প্রধান নয়। সায়েন্সের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের একটি 'কোর্স' নির্ধারণ করাও দরকার। আমরা এই দিকটায় বিষম পেছিয়ে আছি। যারা বিজ্ঞানে প্রবেশিকা পাশ করেছে এবং সঙ্গীতেও জ্ঞান অর্জন করেছে তারা সাধারণ সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হতে পারে। তখন তাদের বি এস-সি (মিউজিক) ডিগ্রী দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতকলায় যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের সংস্কৃত জানাটা দরকার। এর কারণ ভারতীয় সাহিত্য বলতে সংস্কৃতকেই বোঝায় এবং পূর্বে যা কিছু চিন্তা হয়েছে তা সংস্কৃত সাহিত্যেই রয়েছে। অতএব সংস্কৃত-সাহিত্যে মিউজিকলজি সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ আছে

তার একটা সিলেকশন প্রণয়ন করা দরকার। আর সেই সঙ্গে বৈদিকসঙ্গীত সম্বন্ধেও অনুরূপ সিলেকশন প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ বিষয়টি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছেও খুব সুগম নয়। বাংলায় বৈদিক সঙ্গীতের কোনও ট্র্যাডিশন না থাকায় কাজটা আরও কঠিন হয়েছে। এক পক্ষে এটা ভাল হয়েছে, কেননা যেখানে ট্র্যাডিশন আছে সেটা কতখানি শুদ্ধ সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। এই সব ট্র্যাডিশন অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক শিক্ষা, ব্রাহ্মণ বা প্রাতিশাখ্যের নির্দেশের সঙ্গে মেলে না। শাস্ত্রীয় মতে তথাকথিত বৈদিক সঙ্গীতের স্বরূপ কি হওয়া উচিত সেটাই নির্ণয় করা আবশ্যক।

এর সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করাও দরকার, তা না হলে সঙ্গীতকে সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে না।

সঙ্গীত বিষয়টি এত ব্যাপক যে এটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও কিছুটা যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন বাংলা সাহিত্যে অনেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন। লোকসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে লোকসঙ্গীত স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে

অধ্যাপকগণও সঙ্গীতকে তাঁদের বিশেষ আলোচনার বস্তু করতে পারেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন দিক থেকে সাঙ্গীতিক আলোচনা উত্থাপন করা যায়। সঙ্গীতের কোর্সে এত অধিক বিষয়বস্তু যোগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যাতে এই ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে যার যেদিকে কৌতূহল সে সেদিকে কাজ করতে পারবে।

অনেক সময় অন্য ডিসিপ্লিনে অধ্যয়নকারী কোনও ব্যক্তি এমন কোনও আলোচনা বা গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন যা প্রধানত সাঙ্গীতিক। সেই সময় আমার মনে হয় তাঁরা ইউনিভার্সিটির সাঙ্গীতিক বিভাগ থেকেও সাহায্য নিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গীতে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা সেটা যাচাই করে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে তাঁরা সঙ্গীতের একটা বিধিবদ্ধ কোর্সে ট্রেনিংও নিতে পারেন। এইরকম ব্যবস্থা থাকা দরকার। এইরকম আদানপ্রদান না হলে সঙ্গীতের কোর্স ঠিক কিভাবে প্রবর্তন করা দরকার সেটা বোঝা যাবে না; আর সঙ্গীত বিভাগে এইরূপ নানা বিষয়ের

উচ্চতর স্টাডির সুযোগ থাকলে সংগীতও সাবজেক্ট হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করবে।

সংগীতের মত মিশ্র বিদ্যা সম্পর্কে সিলেবাস নির্ধারণ করা খুব কঠিন। এই জাতীয় আরও বহু বিদ্যাতেও এইরকম সমস্যা দেখা দেয়। কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে দেখা যায় অনেক সময় এই বিভাগের অনেক কাজ কেমিস্ট্রি বটানি প্রভৃতি বিভাগে করা হচ্ছে। এই সব বিভাগগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সংগীতের ক্ষেত্রেও এইরকম ঘটে এবং সংগীতবিভাগের অনেক কাজও অন্যবিভাগে হতে দেখা যায়। অথচ তাতে সাবজেক্ট হিসাবে সংগীতের গুরুত্ব কমে না।

এই সব নানান দিক ভেবে সংগীতকে আজ একটি যথার্থ সম্মানিত বিদ্যা হিসাবেই ইউনিভার্সিটিগুলির বিচার করা কর্তব্য। বোধ করি সংগীত সম্বন্ধে এইটা তলিয়ে দেখবার মত চিন্তা ইউনিভার্সিটির চিন্তা-নায়কদের মাথায় এ যাবৎ প্রবেশ করেনি।

আচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস অনুষ্ঠান

গত ১৩ই নভেম্বর সংগীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ৬২তম জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি মনোরম সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। অনুষ্ঠানের সূচনা করে শ্রীযামিনী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, ভীষ্মদেব ভারতের সংগীত জগতে একটি বিরল প্রতিভা এবং তাঁর যোগ্য সমাদর হওয়া উচিত। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ভীষ্মদেবের সুরকার হিসাবে একটি বিশিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তৎকালীন ফিল্ম জগতে ভীষ্মদেবের সুরসংযোজিত বহু গান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মানুষ ভীষ্মদেবের শিল্পীসুলভ আচরণও সবাইকার মনে সমানভাবে রেখাপাত করেছিল। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, ভীষ্মদেবের সঙ্গে যখন তিনি তবলাসংগত করতেন, তখন তাঁর গানে আত্মবিস্মৃতি ঘটায় অনেক সময় তাঁর তবলাই থেমে যেত। অনুষ্ঠানে শ্রী এ কানন, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীমতী অনিতা মজুমদার ও উত্তমা ভুঁইয়া, জনাব বাহাদুর খাঁ ও শ্রীমতী কল্যাণী রায় গান ও যন্ত্রের মাধ্যমে ভীষ্মদেবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। দীর্ঘ আট ঘন্টা ধরে ভীষ্মদেব তাঁর সব সময়ের সঙ্গী পানের ডিবে ও সুরঞ্জিত জরদার কৌটো পাশে রেখে নীরবে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ ও উপভোগ করেন। সব শেষে তিনি গাইলেন বসন্ত রাগে খেয়াল—"কুদরৎ কি নিশানি"। এই রাগটি গাইবার সময় তিনি পরজ, ললিতাগৌরী, ভৈরো রাগসমূহের আবির্ভাব ঘটিয়ে আবার বসন্তে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, বসন্ত রাগের সঙ্গে অপরাপর রাগের মিশ্রণ তিনি কি উদ্দেশ্যে এবং কোন প্রয়োগ অনুসারে করেন। উত্তরে তিনি বলেন যে, বসন্তরাগ তিনি পূর্বে বহুবারই সাধারণভাবে গেয়েছেন, কিন্তু আজকাল এর সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ রাগ মিলিয়ে মিশিয়ে গাইতে তাঁর ভাল লাগে। নির্ধারিত পদ্ধতিতে গান তো বহু যুগ থেকেই চলে আসছে এখন তিনি চান তাঁর গান তাঁর নিজের মত করে গাইতে। শ্রোতাদের অনুরোধে তিনি দ্রুত একতালে বসন্তরাগে "ফোরি এইলি এইলি গেইলি গেইলি" গানটি, একটি ঠুংরী এবং তাঁর বিখ্যাত বাংলা গান—"যদি মনে পড়ে", "ফুলের দিন" গেয়ে শোনান। তারপরে হারমোনিয়ামেও সুরের ঝঙ্কার তুলে আসরে তিনি আনন্দসঞ্চার করেছিলেন।

বিবেকানন্দ মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস

৫ ডিসেম্বর কলামন্দিরে বিবেকানন্দ মহিলা কলেজ তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরশুরামের বাহাত্তুরে নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন মঞ্চস্থ করেছিলেন। তাঁরা আর একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান করেছিলেন—"বৈদিক গুরুকুল।" এই অনুষ্ঠানে বেদগান করা হয়। গানগুলি সুগীত, কিন্তু ঋকপাঠে বা সামগানে সুরের একটা সুন্দর ওঠানামা আছে, যা স্বরগুলির সন্নিবেশে লঘুগুরু ছন্দ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই রীতি পরিস্ফুট হয়নি। তা ছাড়া সামের গ্রামগেয় গানে যে ছটি সুরের প্রয়োগ হত তারও তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না। যাগ যজ্ঞের বিস্তৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগেয় পদ্ধতিতেই সাম প্রযুক্ত হত। কিন্তু এগুলি গাওয়া হত তার স্বরলিপি গ্রন্থেই পাওয়া যায়, এমনকি "নিধ... সমেত। সেটি অনুসরণ করতে পার... এই গান গাইতে অসুবিধা হয় ... যজুর্বেদীয় মতে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠি... হলেও গেয় মন্ত্রগুলি সা... রীতিতেই প্রযুক্ত হত। যাই হোক, বিশে... ভিন্ন এই রীতিগুলি প্রদর্শন করা সম... নয়। তথাপি বিবেকানন্দ মহিলা কলেজ ... সংস্কৃত গানকে প্রাধান্য দিয়েছেন এর জ... তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করি। আশা ক... অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে উৎসা... হবেন।

শার্ঙ্গদে...

নেস্‌কাফে

৫ সেকেণ্ডে তৈরী হয়
NESCAFE
instant
coffee
HCE 6372

বংশীহারী : বৈরহাটা

॥ ২৫ ॥
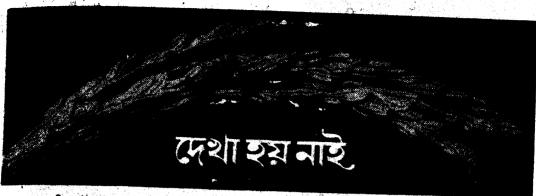
পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় কোন্ ডাকবাংলোটি সবচেয়ে শ্রান্তিহর, সবচেয়ে নয়নাভিরাম? সেখানে চাকরি করেছেন এমন সরকারী কর্মচারীদের জনে জনে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে দেখেছি। তাঁদের মতে, রায়গঞ্জের রোডস ডিপার্টমেণ্টের ডাকবাংলোটি ছিমছাম ও আধুনিক সন্দেহ নেই, সে শহরের বাইরে, কিছু দূরে, কুলিক ডাকবাংলোটিও বেশ নিরিবিলি বটে, কিন্তু নিরালা বিরামস্থান হিসেবে, এ জেলায় বংশীহারী ডাকবাংলোর তুলনা হয় না। পশ্চিম দিনাজপুরে খুব ঘুরেছি, একথা বলতে পারি না; অদ্যাবধি মাত্র গুটি চাল্লিশেক জায়গার কভারেজ করতে পেরেছি। ডাকবাংলোও সব দেখা হয়নি। তবে যতগুলি দেখেছি, তার ভিত্তিতে আমার ভিন্ন মত পোষণ করবার কোন কারণ নেই। বাগান-ঘেরা বংশীহারী ডাকবাংলোর একেবারে গা ঘেঁষে ছোট্ট নদী টাঙ্গান-এর স্রোত সদা-প্রবাহিত। সিমেণ্ট-বাঁধানো সোপানশ্রেণী

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নেমে গেছে নদীর জলে। পাড়ে অতি প্রাচীন এক অশ্বত্থ গাছ। তার ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর উপর, একতলা ডাকবাংলোর ছাদের উপর। প্রতি সন্ধ্যায় হাজারো পাখি ফিরে আসে তার প্রসারিত বাহুর আশ্রয়ে। তাদের মিশ্রিত কূজনে ওই একটুকু সময় চারিদিকের নির্জন পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে। নীচে টাঙ্গান-এর রূপোলী স্রোত দিন-শেষের আলোয় মলিন হতে থাকে। ঠিক তখন এই জনহীন নদীর ঘাটে তরতরে জলধারার দিকে তাকিয়ে অন্যমনে বসে থাকা এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। আবার, আবছা কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করে, ওপারের ঘুমন্ত গাছপালার ভিতর দিয়ে যখন সূর্যোদয় হয়, সে দৃশ্যেরই বা তুলনা

অর্ধেন্দু দত্ত

কোথায়! জলের ওপর থেকে হাল্কা বাষ্প ওঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে, অপ্সরীর উত্তরীয়ের মতো কুয়াশার দীর্ঘ আস্তরণ চুপ ক'রে শুয়ে থাকে ওপারের প্রান্তরে। নদী বেগবতী কিন্তু ছোট। এত ছোট সে ঢিল ছুঁড়লে ওপারে গিয়ে পড়ে। হঠাৎ ভয় পেয়ে কাদা-খোঁচা পাখি ডানা মেলে উড়ে যায়। আবার গিয়ে বসে একটু দূরে। লেজ নাচায়। খাবার খুঁটে খায়। টাঙ্গান-এর জলস্রোত ব'য়ে চলে অবিরাম। ফেনা ভেসে যায়, ভেসে যায় ছোট ছোট কুচরিপানার ঝাড়, পুজোর ফুল। সূর্য আর একটু উপরে উঠলে, নদীতে নেমে অবগাহন স্নানে যে কী অপরিসীম তৃপ্তি তা কি ক'রে বোঝাই! সভ্যতার বিরাট ক্ষত এই কলকাতা মহানগরের জঠর থেকে দু' দিনের মেয়াদে ছাড়া পেয়ে সে যেন বন্ধনমুক্তির এক মহোল্লাস। আক্ষেপ এই যে, এত মনোরম এক বিরামস্থানেও কাজের বোঝা কাঁধে ক'রে গিয়েছি দু' দুবার; কোনবারই হাত-পা ছড়িয়ে দু' দণ্ড বিশ্রাম করবার অবকাশ পাইনি।

আমি না পেলেও অন্যে হয়ত পেতে পারেন। তাঁরা যেন একবার এসে থেকে য[ান] বংশীহারী ডাকবাংলোয়। ইলেকট্রিসি[টি] নেই; প্রাঙ্গণের টিউবওয়েলে জলের থে[কে] বালিই ওঠে বেশী। তবু নিমন্ত্রণ জানা[তে] আমার সংকোচ নেই। কেননা, কাঞ্চনমূল্য অভিজাতরা বা নবনীতকোমল ইনটেলে[ক]চুয়ালরা আমার লক্ষ্য নয়। কলকাতার [দি]ক থেকে যদি তাঁরা আসেন, তবে কলকা[তা-]বালুরঘাট দৈনিক বাস-সার্ভিসে, কলকা[তার] শহীদ মিনারের কাছ থেকে ভোর বেলা র[ওনা] হয়ে বিকেল নাগাদ বংশীহারী বাজ[ারে] পৌঁছতে পারেন। বাজারের ফার্লং দুই অ[াগে] টাঙ্গন-এর উপর এক সেতু পার [হয়ে] আসতে হয়। সেখানকার চেক-পোস্টে [বাস] কিছুক্ষণ থামে। কণ্ডাকটরকে বলে [রাখলে] সেখানেই নামতে পারেন, তবে পথের [এক] পাশেই ডাকবাংলো; নয়ত বাজার [থেকে]

বিষ্ণুমূর্তি : বংশীহারী

কু পথ হেঁটে বা সাইকেল-রিকশায় যা যায়। আসবার আগে রায়গঞ্জে অবস্থিত ডবলিউ ডি-র একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ডাকবাংলোকে কেন্দ্র ক'রে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশের বংশীহারী, গঙ্গারামপুর, কুশমণ্ডি ও ইটাহার থানার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি দু'বার। এই এলাকার বা জেলার অন্যত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ইমারত তেমন কিছু নেই, কিন্তু পাল-সেন যুগের যে অগণিত ভাস্কর্য গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো আছে তার সংখ্যা একটি থানাতেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী। তার পরে তপন, বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ থানার এ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও রায়গঞ্জ থানায়। জেলার উত্তর অংশে গোটা ইসলামপুর মহকুমায় পুরাকীর্তির সংখ্যা নগণ্য।

আমাদের খবর ছিল, বংশীহারী ডাকবাংলোর অদূরে, টাঙ্গন-এর জাটির দিকে, এক গাছতলায় নাকি পনের-কুড়িটি পাথরের মূর্তি জড়ো করে রাখা আছে। নদীর ধারের কোন মন্দির থেকে সেগুলি সম্ভবত সংগৃহীত। এত বড় রত্নভাণ্ডারের সন্ধান সচরাচর পাওয়া যায় না। বংশীহারী পৌঁছেই আমরা তার উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লাম। ডাকবাংলোর সংলগ্ন দক্ষিণে একখণ্ড পতিত জমিতে উদ্বাস্তু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থেকে এসে বসবাস করছেন। তাঁর সংগ্রহে যে মূর্তিগুলি আছে, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসছি; আগে তাঁর কুটিরের দক্ষিণে, এক ঢিবির উপর প্রাচীন এক মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তার বর্ণনা দিয়ে নিই। ঢিবিটি বেশ বিস্তৃত ও আশপাশের জমি থেকে তার বর্তমান উচ্চতা দশ ফুটের কম নয়। সেখানে ইতস্তত ছড়ানো বহু সাইজ-ক'রে-কাটা পাথরের টুকরোর মধ্যে দরজার বাজুর অংশ, বিগ্রহের পাদপীঠ ও এক ভগ্ন যোনিপট্ট দেখে সন্দেহ থাকে না যে এখানে একদা এক পাথরের মন্দির ছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, আগে পাথরের টুকরোর সংখ্যা শুধু অনেক

বিষ্ণুমূর্তি : বংশীহারী

কোনটাই ছিল না, বেশ কিছু অলংকৃত নিদর্শনও ছিল তাদের মধ্যে। ঢিবির পশ্চিম পাশ দিয়ে এখন এক গভীর নালার সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপারে, একই ঢিবির বিস্তারের উপরে, অনুরূপ বহু পাথরের টুকরো ছাড়াও কষ্টিপাথরের দুটি বড় কীর্তিমুখ দেখা যায়—তার একটি ক্ষয়িত কিন্তু অন্যটি ভাল অবস্থাতেই আছে। এরাও যে লুপ্ত মন্দিরটির অংশ এমন মনে করাই স্বাভাবিক। পাল-সেন আমলের অসংখ্য মূর্তি-ভাস্কর্য অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হলেও সে সময়ের খুব কম মন্দিরই উত্তরকালের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সে সব অগণিত বিনষ্ট মন্দিরের মধ্যে এটিও একটি। কি গড়নের বা কোন্ বিগ্রহের উপাসনার জন্য এ দেবালয়টি নির্মিত হয়েছিল, সেকথা আজ আর সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীজিতেন পাল মশায়ের বাড়ির পূবে, নদীর ঘাটের কাছে এক গাছতলায় যে একটি ক্ষয়িত উমা-মহেশ্বর ও আর কয়েকটি ভগ্ন মূর্তি আছে, তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তাঁর গৃহে উপাসিত, অভগ্ন নারায়ণ মূর্তিটির মতো সুন্দর বিগ্রহ (প্রথম ছবি) ব্যক্তিগত সংগ্রহে কমই দেখা যায়। উচ্চতায় ৩১ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৫ ইঞ্চি। এ ভাস্কর্য-নিদর্শনটির কারিগরি দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয়। পাল মশায় বলেন, মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার এক দীঘির পঙ্কোদ্ধারের সময় এটি পাওয়া যায়। এ উক্তি কতদূর নির্ভুল বলা যায় না। কেননা, বংশীহারীর একাধিক গৃহস্থের ঘরে বেশ কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি এখনও রক্ষিত আছে।

তাঁরা সকলেই, সেগুলি পেয়েছেন লুপ্ত মন্দিরটির কাছাকাছি জায়গা থেকে। সেক্ষেত্রে, বহু দূরের কালিয়াচক থেকে পাল মশায় কেন যে এই সুন্দর বিগ্রহটি এতদূর বয়ে নিয়ে আসবেন তা সহজবোধ্য নয়।

ডাকবাংলোর সামনেই, টাঙ্গন-এর অপর পাড়ে, বংশীহারী থানা। সেতু পার হয়ে ডানহাতি ঢালু রাস্তায় নেমে গেলেই সেখানে পৌঁছনো যায়। থানা কম্পাউণ্ডের পিছনে (দক্ষিণে) কয়েক ঘর গৃহস্থের বাস। তাঁদের মধ্যে শ্রীশান্তিময় সেনগুপ্ত, শ্রীবিমল সরকার ও শ্রীভুবনচন্দ্র সরকারের সংগৃহীত বিষ্ণুমূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির (দ্বিতীয় ছবি) ভাস্কর্য-নৈপুণ্য খুবই উচ্চ শ্রেণীর। অন্যগুলি অত ভাল না হলেও, মন্দ নয়। এ সবগুলিই পাওয়া গেছে লুপ্ত মন্দিরটির কাছাকাছি নদীর ধার থেকে। শ্রীসেনগুপ্তের বাড়িতে ছোট একটি উমা-মহেশ্বর মূর্তিও আছে। এখন কিছুটা ক্ষয়িত ও শ্রীহীন হলেও এ নিদর্শনটি উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে পাল-সেন যুগের হর-পার্বতী বা উমা-মহেশ্বর মূর্তি সে যুগের বিষ্ণুমূর্তির থেকে অনেক কম সংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে। বংশীহারীর বিভিন্ন স্থানে আরও কিছু [illegible] ও [illegible] ভাস্কর্য দেখা যায়। কিন্তু সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে, এবার [illegible] সবিস্তারে যাওয়া গেল না।

কুশমণ্ডি থানার অন্তর্গত [illegible] পিচ-রাস্তার উপর অবস্থিত এ অঞ্চলের সুপরিচিত গ্রাম [illegible] থেকে [illegible] রাস্তায় প্রায় চার মাইল পথ গেলে সেখানে পৌঁছনো যায়। এখানকার পাশাপাশি দুটি বড় ঢিবি (তার একটিতে এক পাথরের মন্দিরের অনাবৃত-অংশ দেখা যায়) ও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পাল-ভাস্কর্যের জন্য এ গ্রাম সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃতভাবে লেখাই সমীচীন মনে করি। শুধু একটি মূর্তির উল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধে করব যা থেকে বোঝা যাবে পাল-সেন যুগের কত অমূল্য নিদর্শন অনাদৃত ও প্রায় অজানিত অবস্থায় এখনও পশ্চিম দিনাজপুরের যত্রতত্র পড়ে আছে। গ্রামের হাটতলার অদূরে [illegible] বর্মণের (রাজবংশী) বাড়িতে যে অপূর্ব উমা-মহেশ্বর মূর্তিটি (তৃতীয় ছবি) আছে, আমি তার কথাই বলছি। এ বিগ্রহের বর্তমান মালিক সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং খেত-মজুর। বছর কুড়ি আগে, স্থানীয় এক পুষ্করিণীর

উমা-মহেশ্বর মূর্তি : [illegible]

শিবমূর্তি : বৈরহাট্টা

পঞ্চাশ সালের সময় তিনি নাকি এটি পেয়েছিলেন। আমার পরিদর্শনের সময় উঠোনের তুলসীতলায় এটিকে পড়ে থাকতে দেখি, যদিও পরিবারের লোকেরা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, এটি নিত্য-উপাসিত ও তুলসীতলায় ওই অবস্থাতেই তার পুজো হয়। উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৯ ইঞ্চি এই বিরল ও সুন্দর ভাস্কর্যটি যে-কোনোদিন চুরি হয়ে কলকাতার কালোবাজারে হাজির হতে পারে; ইতিমধ্যেই হয়েছে কি না জানি না।

পথপ্রদর্শক বন্ধুটির সঙ্গে এ সব ব্যক্তিগত সংগ্রহের কথা তুলতেই তিনি বললেন, —সরণার মাইল চারেক দক্ষিণে, বংশীহারী থানার অন্তর্গত বৈরহাট্টা গ্রামের যতীশচন্দ্র শর্মার (দেশী ক্ষত্রিয়) সংগ্রহটি এ অঞ্চলে সবচেয়ে মূল্যবান। একে-একে বিলিয়েও নাকি ডজনখানেক উৎকৃষ্ট মূর্তি এখনও তাঁর হেপাজতে আছে। শর্মা মশায়ের বাড়িতে হাজির হতে আমি আর দেরী করিনি। তিনি সম্পন্ন গৃহস্থ, স্থানীয় অঞ্চল-প্রধান—অন্ততঃ, বছর খানেক আগে তাই ছিলেন। সব ক'টি মূর্তি তিনি দেখিয়েছিলেন কিনা জানি না—আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, দুটি ছোট বিষ্ণুমূর্তি, দুটি অল্পাধিক ক্ষুণ্ণ মাঝারি সাইজের সূর্যমূর্তি ও একটি অতি-বিরল দশভুজ, পঞ্চমুখ, নৃত্যরত শিবমূর্তি (চতুর্থ ছবি)। মোটামুটি অক্ষত এ বিগ্রহের পাদপীঠ ও পশ্চাদফলক সমেত উচ্চতা ৪০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৮ ইঞ্চি। কারিগরি নৈপুণ্য এতই উচ্চ শ্রেণীর যে এ রকম সুন্দর ভাস্কর্য আমাদের মিউজিয়মগুলিতেও অল্পই আছে।

মূর্তিটির মুখমণ্ডলের যে ভাবানুভূতির প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত তার তুলনা মেলা ভার। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভাস্করের বিরল প্রেরণাপ্রসূত এ ভাস্কর্যটি পৃথিবীর যে-কোনো সংগ্রহশালারই গৌরবের কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, পাদপীঠে খোদাই-করা এক পংক্তির যে দীর্ঘ লিপিটি আছে তাতেও এর মূল্য বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে আমি এই অতি-দুষ্প্রাপ্য পুরোবস্তুটি সংগ্রহ করবার জন্য লিখেছি। কেননা, শ্রীশর্মার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, ক্রেতা সম্বন্ধে বাছবিচার না ক'রে মনোমত মূল্য পেলে তিনি এটি হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। সেক্ষেত্রে, কোন ধনীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থানলাভ ক'রে এই অসাধারণ শিল্পকীর্তিটি গবেষকদের অগোচরে মুষ্টিমেয় বন্ধুবান্ধবের অশিক্ষিত প্রশংসা আহরণ করবে মাত্র অথবা কোনো কালোবাজারীদের হাত-ফেরত হয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে। শ্রীশর্মা যে এটির গুরুত্ব কিছুই বোঝেন না, তার প্রমাণ তাঁর বাড়িতে ঢোকবার মুখে যে গোয়ালঘর তারই দেওয়ালে এটি হেলান দেওয়া রয়েছে। অথচ তুলনায় অনেক নিরেস সাধারণ বিষ্ণুমূর্তিগুলিকে তিনি হয় তুলসীমঞ্চের গায়ে সিমেণ্ট দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন, নয় ঘরে তুলে রেখেছেন। এ মূর্তির যে ফোটোটি সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধ লিখছি, মিউজ-প্রিণ্টের কল্যাণে ও দানবসদৃশ রোটারি মুদ্রাযন্ত্রের প্রহারে তার গুণাগুণের সামান্যই হয়ত অবশিষ্ট থাকবে মুদ্রিত প্রতিলিপিতে। সেজন্য আরও কিছু খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধভাবে বলাই ভাল। সামনের পূর্ণাঙ্গ মুখমণ্ডলের দু পাশে দুটি করে প্রোফাইল মুখ আছে; প্রতিটির উপরেই জটা-মুকুট। শায়িত অসুরের উপর দণ্ডায়মান মূর্তিটি স্থূলোদর। ডানহাতের প্রথমটিতে বুকের-কাছে-ধরা কপাল (ভিক্ষাপাত্র), তারপর, বামাবর্তে দ্বিতীয়টিতে [illegible], তৃতীয়টিতে শক্তি, চতুর্থটিতে বাণ ও পঞ্চমটিতে খড়্গ। বাঁ হাতের (ওপর থেকে নীচে) প্রথমটিতে ঢাল, দ্বিতীয়টিতে ধনু, তৃতীয়টিতে মনে হয় কোন মুদ্রা, চতুর্থটিতে সাপ ও পঞ্চমটিতে করোটিযুক্ত ত্রিশূল। কুণ্ডলীকৃত দাড়ি ও সূক্ষ্ম একজোড়া গোঁফও আছে। গলায় সর্পবেষ্টনী ও মুক্তাহার। প্রতি মণিবন্ধে বলয় ও ঊর্ধ্ববাহুতে বাজুবন্ধ। সব মিলিয়ে, এমন অভিনব ও উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য খুবই বিরল। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রামে গ্রামে এ রকম আরও কত মূর্তি যে আবিষ্কারের অপেক্ষায় পড়ে আছে তা কে বলবে! পুরাতত্ত্বের গবেষকরা যতদিন না সংগ্রহশালাগুলির বাইরে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন, ততদিন তারা হয়ত সাধারণের অগোচরেই থেকে যাবে। (ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

পরমাণুশক্তি কমিশন ১৯৬৩ সালে উচ্চাকাশ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে কাশ্মীরের গুলমার্গে এই গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন। জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৭০০ মিটার উঁচুতে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা নিয়মিত এখানে বসে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন

সংবাদ ভাষ্য

ভারতে নতুন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রসঙ্গে

আমাদের পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ ১৯৭৮-৭৯ সালে শেষ হবে। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনায় বিশেষ নজর দেওয়া হবে দেশের কৃষি উৎপাদন, ছোট বড় মিলিয়ে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সম্প্রসারণ এবং কিছু কিছু নতুন শিল্পোদ্যোগের রূপায়ণে। একথা ঠিক, বিগত পরিকল্পনার ব্যাপারে শুধু শহর অঞ্চলেই নয়, গ্রামাঞ্চলেও ভারত আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। তবু বলা চলে বর্তমান দশকের শেষে এদেশের জনসংখ্যা আরও কিছুটা বাড়বেই। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ, অর্থনৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক দিক থেকে শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যতদূর সম্ভব একটা সমতা স্থাপন করা। অর্থাৎ সোজা কথায় অঞ্চল নির্বিশেষে দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য চাই আরও বেশি স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বসিয়ে গ্রামের কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের অর্থনৈতিক এবং পেশাগত যোগ্যতার যথাযথ পুনর্বাসন যোগান, কুটির শিল্প-গুলি সঞ্জীব করে তোলা এবং ইত্যাদি। এর ফলে শহরের উপর হয়ত কিছুটা চাপ কমবে এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে একটা ভারসাম্য অবস্থা বজায় রাখা যাবে।

জনবসতের চাহিদার কথা ভেবে পরি-কল্পনা কমিশন ইতিমধ্যে দেশে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন বাড়ানর জন্যে আরও কয়েকটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কথা ভাবছেন। শুধু শিল্প বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, সুষ্ঠু এবং জীবন-যাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্যে সম্ভাব্য গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে যদি অনুভেদায়িনী এই শক্তিটিকে পৌঁছে দিতে হয় তাহলে ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৮-১৯৭৯-এর মধ্যে ন্যূনতম অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি বৃদ্ধির পরিমাণ হওয়া উচিত ২৭০০ মেগাওয়াট এবং এর সবটাই উৎপাদন করতে হবে পারমাণবিক শক্তি থেকে। এর সংগে অবশ্য যুগপৎ কাজে লাগান হবে জল এবং তাপবিদ্যুৎ। তারাপুরে এখন পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। রাণাপ্রতাপ সাগর এবং কলপাক্কমের দুটি কেন্দ্রের স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এদের উৎপাদন শুরু হলে আমাদের দেশে মোট পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে ১২০০ মেগাওয়াটের মত। অর্থাৎ নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় আমাদের চাই আরও অতিরিক্ত ১৫০০ মেগাওয়াট পরিমাণ শক্তি। ভারতের শক্তি এবং সেচ মন্ত্রণালয় অবশ্য আরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন। ওঁদের বক্তব্য, ১৯৮১ সালের মধ্যে যে করেই হোক আমাদের পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ ৪২০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বাড়াতেই হবে। উল্লেখ্য, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর লক্ষ রাখতে হবে। এক, এ ধরনের কেন্দ্র এমন জায়গায় স্থাপন করা দরকার যেখানে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন সম্ভাবনা নেই। তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। কারণ কয়লার খনি অঞ্চল থেকে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যত দূরে থাকবে, কয়লা নিয়ে যাওয়ার খরচ সেই হারে বাড়বে। তাছাড়া জ্বালানি ছাড়া কয়লার অন্যান্য মূল্যবান ব্যবহারিক দিকের কথা এবং তুলনামূলক-ভাবে মূল্যবান এই বস্তুটির পরিমাণ যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে সে কথা ভেবে শুধু বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে কয়লার খরচ যত সীমিত হয় ততই ভাল। দুই, যত্রতত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সময় লক্ষ রাখা দরকার আশপাশে যাতে কোন জনবহুল অঞ্চল না থাকে।

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বসান যায় সে সম্পর্কে সমীক্ষা চালানর জন্যে পরমাণু শক্তি কমিশন ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর মাসে যে স্থান নির্বাচন কমিটি তৈরি করেছিলেন, সম্প্রতি সেই কমিটি উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের সমীক্ষার কাজ শেষ করেছেন। এবার ওঁরা সমীক্ষা চালাবেন পশ্চিম এবং দক্ষিণ অঞ্চলে। সমীক্ষার আওতা থেকে ওঁরা পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বাদ দিয়েছেন। স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে এই কমিটি মুখ্যত প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক দিকের উপর লক্ষ রাখছেন।

বলা হয়েছে, এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব দেশে নতুন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের উপযুক্ত জায়গাগুলির একটি তালিকা তৈরি করা। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে এবং কোথায় কোন্ কেন্দ্রটি বসান হবে সেটি পরিকল্পনার চাহিদা অনুযায়ী স্থির করবেন সরকারী কর্তৃপক্ষ।

দেশের উত্তরাঞ্চলে এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপনের অসুবিধে প্রসঙ্গে কমিটির বক্তব্য : এই অঞ্চলের ভূ-স্তরের বেশির ভাগ অংশই পাললমাটি, নুড়ি এবং অসংলগ্ন

পাথরের চাই, পারমাণবিক চুল্লি বসাতে গেলে যতটা কঠিন হওয়া দরকার, ততটা নয়। বিকল্প করে বর্ষায় গঙ্গা এবং যমুনা দুটীর প্রভাবে ব্যাপক অঞ্চল পলি মাটিতে উর্বরা হয় বলে ভূস্তর বেশির ভাগ সময় জলমগ্ন হয়ে থাকে এবং ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে সব সময়ই চলেছে নিরন্তর ভূ-কম্পন। ব্যাপারটি রুড়কীর ভূ-কম্পন গবেষণা কেন্দ্র এবং পরমাণু কমিশনের নিজস্ব গবেষকরাও সমর্থন করেছেন। অতএব উত্তরাঞ্চলে পারমাণবিক চুল্লি বসান যুক্তিযুক্ত হবে না।

আদর্শ জায়গা হিসেবে কমিটি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সৌরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত এই অঞ্চল কয়লাখনি থেকে অনেক দূরে। দিউ-এর কাছাকাছি কোট ভিতর থেকে শুরু করে ওখার মাইয়ানি পর্যন্ত উপকূলে বরাবর প্রায় ২৭৫ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে ওঁরা মন্তব্য করেছেন, ওই অঞ্চলে একটি অথবা দরকার হলে দুটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বসান যেতে পারে। উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্যে ওঁরা গুজরাটেও আরও একটি জায়গার উপর অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এই সঙ্গে তারাপুরের পারমাণবিক চুল্লির সম্প্রসারণের কথাও ভাবছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারতীয় কুশলীরা এখন যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছেন। আমাদের পূর্ব উপকূলে কলপক্কমে যে পরমাণু কেন্দ্রটি বসান হচ্ছে তার মূল পরিকল্পনা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের। এবং কেন্দ্রটি তৈরি হবে শতকরা আশি ভাগ ভারতীয় কাঁচামালে। এ ছাড়া পারমাণবিক জ্বালানির ব্যাপারেও দুশ্চিন্তার তেমন কারণ নেই। পরমাণু শক্তি কমিশন তার নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে যদি কাজ চালিয়ে যান এবং অভাবিত কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে, তাহলে আশা করা যায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৮০র মধ্যে তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারবেন।

বেকার ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মসংস্থান

বিজ্ঞান এবং কারিগরি নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেছেন, তাঁদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যাপারটা এখন বড় রকমের একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। শুধু ব্রিটেনেই একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ঐ দেশে শুধু বিজ্ঞানের স্নাতকদের মধ্যেই ১৯৬৬ সালে মোট বেকার ছিলেন শতকরা ২·৩ ভাগ। ১৯৬৯-এ এই হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪·২-এ, ১৯৭০ সালে ৫·৪ এবং ১৯৭১ এবং ১০ শতাংশ। স্নাতক বলতে এখানে বি এস সি, এম এস সি এবং ডক্টরেটদেরও ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও কিছু কিছু স্নাতক আছেন যাঁরা যে ধরনের শিক্ষার বা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অনুযায়ী কাজ পান নি, কেউ কেউ আংশিক সময়কালীন কাজে লিপ্ত রয়েছেন। ব্যাপক অর্থে এঁরাও এক ধরনের বেকার। এবং এ ধরনের বেকারের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দিন দিন বেড়ে চলেছে। সাধারণ স্নাতকই নন, যাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক, ইদানীং তাঁদের মধ্যেও বেকারের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধির দিকে।

তুলনায় আমাদের অবস্থা অবশ্য আরও শোচনীয়। যাঁরা বিজ্ঞানে সাধারণ স্নাতক বৈজ্ঞানিক বৃত্তি জীবনে তাঁদের বেশির ভাগই বর্তমানে অচল। এমন কি যাঁরা অনার্স বা এম এস সি তাঁরাও শিক্ষাগত ত্রুটির দরুন বৃত্তি নির্বাচন বা বৃত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে বেশির ভাগই অসমর্থ হচ্ছেন। অবশ্য একমাত্র শিক্ষকতা ছাড়া। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতকদের কেন এমন হাল কেন হলো?. শুধু কর্মসংস্থান হিসেবে পশ্চিমবঙ্গেই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা পাওয়া বেকারের সংখ্যা কয়েক হাজারের মত। ঐ হিসেবের বাইরেও এমন কয়েক হাজার বেকার পাওয়া যাবে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর বেশ কিছু সময় ধরে বসে রয়েছেন, অথবা আংশিক সময়ের জন্যে এমন কিছু কিছু কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন যা তাঁদের নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার অভিজ্ঞতার বাইরে। সম্প্রতি এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে, কেউ কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক

হয়েও ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ নিতে বাধ্য হয়েছেন। এ'রা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এমন কাজ করছেন, যার সঙ্গে প্রযুক্তি বিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই।

দেশের সম্ভাব্য ব্যাপক কর্মযজ্ঞের কথা ভেবে স্বাধীনতার পর একের পর এক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুখের কথা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা দেশের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছেন। এ পর্যন্ত সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত শিল্প বা প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, মিরাজ-মাফিক তাঁরা সেখানে কাজ পেয়েছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেকেই তাঁদের যোগ্যতার পরিচয়ও দিয়েছেন। ফলে গোড়ায় ইঞ্জিনিয়ার-বেকারের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে।

পরে, বিশেষ করে ষাটের দশকের শেষে দেখা গেল, পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প-কারিগরি ক্ষেত্রে যতটা প্রসার ঘটানর কথা ছিল, তা আর হল না। শিল্পপতিরা বললেন, সরকারী নিয়ম কানুনে, কাঁচামাল প্রভৃতির অভাবে সম্প্রসারণ করায় বাধা হচ্ছে। বিশেষ করে যে সমস্ত কাঁচামালের জন্য আমদানি এবং রপ্তানি লাইসেন্সের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের যথাযথ বন্টনের অভাবে তাঁরা বেশ কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিল্প এবং কারিগরি বিষয়ক গবেষণা সংস্থা পরিপূরকের মত কাজ করেছেন এবং দেশের শিল্প উদ্ভাবনায় যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্যবস্থাপনার ত্রুটির দরুন বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গে তাঁদের যথাযথ সমন্বয়ে বাধাও পড়েছে। এর পর আছে শ্রমিক অসন্তোষ। কারণ যাই থাকুক, এই অসন্তোষ যে শুধু নতুন শিল্প উদ্যোগকে গড়ে তুলতেই বাধা দিয়েছে তা নয়, চালু শিল্প এবং কারিগরি সংস্থাগুলির কাজেও প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল, বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বা স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে সাধারণভাবে অনেক ইঞ্জিনিয়ারই আজ বেকার। এবং অনুমান করা শক্ত নয়, ব্যাপারটা যদি এইভাবেই চলে, ভবিষ্যতে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে।

ইঞ্জিনিয়ার বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সম্প্রতি সরকার একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ইঞ্জিনিয়াররা এখন সমবেতভাবে বা এককভাবে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের ব্যবসা শুরু করতে পারবেন। নিজেদের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং সঙ্গে আত্মনির্ভর হওয়ার ব্যাপারে এ ধরনের সাহায্য নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সরকার অথবা যাঁরা সাহায্য দিতে এগিয়ে আসছেন, কতটুকু ভেবেছেন অথবা আদৌ ভেবেছেন কিনা জানি না। এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে কয়েকটি কথা বিবেচনার জন্যে এখানে উল্লেখ করছি।

এক, আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতির বিড়ম্বনার দরুন, বলা চলে যাঁরা এখনও

পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক হয়ে আসছেন (মাস্টার বা ডক্টরেট নন) তাঁদের বেশির ভাগ অভিজ্ঞতাই পদ্ধিগত, বৃত্তির জন্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়। দুর্ভাগ্য, এখনও পর্যন্ত পাঠ্য-জীবনে এই ধরনের অভিজ্ঞতা যোগানর বিশেষ কোন ব্যবস্থাই বিশেষজ্ঞরা করেন নি। ফলে একজন মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (স্নাতক) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে কতটা প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবেন, এ সম্পর্কে সন্দেহ করা যেতে পারে। অথচ তত্ত্বের দিক দিয়ে ওই ব্যাপারে অনেক প্রযুক্তিগত খবরই তিনি রাখেন। তিনি জানেন কীভাবে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করতে হয়, কীভাবে বিশেষ বিশেষ ধাতু সংকর তৈরি করতে হয়। কিন্তু মুশকিল হল, এই সমস্ত কাজ যাঁরা সাধারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে করে থাকেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিশেষভাবে শিক্ষিত। ওই শিক্ষার পেছনে আবার 'ট্রেডসিক্রেট' নামক গুপ্ত মন্ত্রও কাজ করে, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সম্পত্তি। তাদের যদি আয়ত্ত করা না যায়, তাহলে উৎপাদনে উৎকর্ষ লাভ

সম্ভব নয়। নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক এবং সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের ওই ধরনের 'ট্রেড সিক্রেট' জানার কথা নয়। ফলে মেটালারজির ঐ ছেলেটি কী ধরনের উদ্যোগ শুরু করতে পারে? এবং শুধু মেটালারজিই নয়, আজকের দিনে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষই পণ্যের একমাত্র মানদণ্ড। যার জন্যে অনেক সময় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আজ পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয়। বরং এমন যদি ব্যবস্থা করা যেত, এঁরা কাজের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা যাতে পান সরকারী এবং বেসরকারী শিল্প এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এঁদের তা যোগাতে সাহায্য করেন এবং তারপর ঋণ দেবার ব্যবস্থা করে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করতে সাহায্য করেন, হয়ত অনেকটা উপকার হতে পারে।

দুই, বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর যখন ওই ইঞ্জিনিয়াররা কাজে নামবেন তখন সরকার মনোনীত বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত তাঁদের সাহায্য করুন। অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। এর ফলে এঁরা কাজে কোন কোন ভুল করলেন কী না, বা কীভাবে কাজ করলে আরও সাফল্য অর্জন করা যায় ওই ইঞ্জিনিয়াররা তা জানতে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে শোধরানরও সুযোগ হবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়াররাই যে শুধু উপকৃত হবেন, তা নয় সরকারী ঋণও নিরাপদ হতে পারবে। আমার মনে হয়, বিশেষজ্ঞের ভূমিকা কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ক সংস্থার বিজ্ঞানীরাও গ্রহণ করতে পারেন। যাতে এই বিজ্ঞানীরাও সব সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। অন্তত 'সি এস আই আর'-এর ওরাটার টাইট কম্পার্টমেন্ট অনেকটা সম্প্রসারিত হবে।

তিন, শিল্প এবং গবেষণামূলক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা বাণিজ্যিক সহ) বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করুন। যার কাজ হবে, যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ঋণ নেবেন তাঁদের গুণগত যোগ্যতা বিচার করা, তাঁরা কে কতটা উদ্যোগী তা নির্ধারণ করা এবং কী ধরনের উদ্যোগ তাঁদের নেয়া উচিত সে সম্পর্কে লালফিতের মারপ্যাঁচ বাঁচিয়ে সাহায্য করা।

চার, এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে সব চাইতে কঠিন যে পরীক্ষা অর্থাৎ 'এক্সপ্লয়টেশন অভ বিজনেস' সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ওই ব্যবসায়ীদের সতর্ক এবং সাহায্য করতে হবে। উপযুক্ত মানের হলে তাঁদের পণ্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত যাতে কেনে সে সম্পর্কে, দরকার হলে আইনের মারফৎ তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই সমস্ত খুদে ব্যবসায়ীদের পক্ষে তৈরি করার পর প্রচুর বিজ্ঞাপনের ধাক্কা প্রভৃতি সামলিয়ে ঐ সমস্ত বস্তুকে বাজারে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়। বরং আরও ভাল হয়, সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার নিজেই যদি তাঁদের উৎপাদনের ক্রেতা হন। পরে ঐ পণ্য লটারির মাধ্যমে বিক্রি করে সরকারও অনেক লাভ করতে পারেন। অথচ ইঞ্জিনিয়াররাও উপযুক্ত মূল্য পেলেন। এক সময়ে জাপানে এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আসল কথা এ ব্যাপারে সরকার এবং ইঞ্জিনিয়ার উৎপাদকরা যা করবেন একটা সুষ্ঠু এবং সুদূরপ্রসারী দিকের দিকে চেয়ে করুন। নইলে নতুন এই পরিকল্পনা কতটা সাফল্য অর্জন করবে বলা শক্ত।

বিজ্ঞান আলোচনা চক্র

৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ 'খাদ্য ও পুষ্টি'র উপর একটি ঘরোয়া আলোচনা-সভার আয়োজন করেছিলেন। অভূতপূর্ব সমাবেশই বলব। কারণ ব্ল্যাক আউট উপেক্ষা করেও ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেভাবে এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে 'পুষ্টি' এবং খাদ্য'-র উপর বহুমুখী আলোচনা চালান, তা বিজ্ঞানের উপর তাঁদের অনুরাগেরই পরিচয় পাই। আলোচনায় ডঃ সুবোধ মুখোপাধ্যায় আমাদের পরিচিত খাদ্যসামগ্রীগুলি সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ার জন্যে সকলের কাছে আবেদন জানান। অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুষ্টিবিষয়ক অফিসার ডাঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, আশিস সিংহ, অমল রায়চৌধুরী, প্রণব খান প্রভৃতি। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, অঞ্চল বিশেষে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পুষ্টি এবং খাদ্যের উপর এ ধরনের আলোচনা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার। এতে করে পুষ্টি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝিটা অনেক কমবে। বিশেষ অতিথিরূপে বক্তৃতা করেন নরওয়ের পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডঃ কে আরল্ড। ইনি মুখ্যত অতিরিক্ত খাবারের দরুন অতিপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'ভারতের উচিত পুষ্টিকর খাদ্যের বিনিময়ে পণ্য আমদানি না করা। অতি মূল্যবান পুষ্টিকর খাদ্য বাদাম আপনারা পাঠান আমাদের দেশে গুঁড়ো দুধের বিনিময়ে। সে বাদাম আমরা গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করি। এটা আপনাদের পক্ষে একটা অপচয়। উল্লেখ্য, বয়াফ্রায় শরণার্থীদের পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যাপারে ইনি কাজ করেছিলেন। পরিষদ এই সঙ্গে একটি লোক-বিজ্ঞান পুস্তকের প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন। তবে ভবিষ্যতে আমরা আশা করব, এ ধরনের আলোচনা চক্রে সর্বসাধারণের বহুল উপস্থিতির দিকে কর্তৃপক্ষরা আর একটু বেশি নজর দিন।

সমরজিৎ কর

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ চল্লিশ ॥

...কজনের ঠেলায় পড়ে এখানে এসে ঐ পড়েছি, আরেকজনের ঠেলায় চোটে উঠে বসতে হলো এখন।

চোখ মেলে দেখি এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের চোটপাট আমার ওপর।

'আজকালকার ছেলেরা যেন কী! কখন ঐ পাঁচটায় ভোর হয়েছে, ছটা বাজে প্রায়। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে! দেখো না। সেই কোন্ প্রত্যুষে আমি উঠেছি—উঠে বেড়াতে বেরিয়েছি, ওর মধ্যে এই দীঘিটায় আমার সাত পাক ঘোরা হয়ে গেল, আর এখনো পড়ে পড়ে ঘুম বাপুর! আশ্চর্য! ওঠো হে! এটা নাক ডাকাবার জায়গা না, লোকজনের বসবার জন্য। জোয়ান ছেলে, শরীর ভালো করতে হলে তো উঠে পড়ো চটপট। উঠে দৌড়াও দেখি—দীঘির চার ধারে চার চক্কোর লাগাও গে... চক্রবর্তিকে চক্কোরবর্তী করার তাঁর অপপ্রয়াস।

চোখ মেলে তাঁর হিতোপদেশ শুনেছি, তন্দ্রা আমার ভাঙেনি তখনো। আমার পিঠের ওপর তাঁর ছড়ির এক টোক্কর লাগিয়ে সেটা তিনি ভাঙিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ।

'উঠে সামনের ঘাটে মুখ হাত ধোও গে! দাঁড়াতে বলছি না তোমায়? আমি... কখন সেই প্রত্যুষে উঠেছি, উঠে আমার প্রাতঃভ্রমণ সেরেই না...'

'এখানে এসে পরের পশ্চাদ্ধাবনে লেগেছেন!' ধড়মড় করে উঠে বললাম তাঁর ছড়ির খোঁচায়। আমেজ যাওয়ার ও মেজাজ দেখা দিয়েছে আমার।

পাঁজরার খোঁচাটা যেন পেটের মধ্যেও খোঁচাতে লাগল—যেমন কানের গোড়ায় তেমনি যেন আমার প্রাণের গর্তেও খচখচানি শুরু হয়ে গেল কেমন!

কোনো কোনো রাক্কোসের যেমন ভোমরার মধ্যে প্রাণ লুকোনো থাকে, কথায় শোনা গেছে, আমার অন্তরাত্মা তেমনি যেন আমার পেটের অন্তরালে। ঘুম

এই তুমি করছো কী?

ভাঙার সাথে সাথেই তিনি খিদের জ্বালায় জ্বলে উঠেছেন।

না, উঠতেই হয় এবার। উঠে ঘাটের পৈঁঠেয় গিয়ে আবার এক পেট জল না...

রাজেন মল্লিকদের মহাপ্রসাদ তো সেই বারোটা বাজিয়ে তারপরেই না!

ততক্ষণ বুঝতে হলে...সারা কলকাতা খুঁজতে গিয়ে ঐ দীঘিটাই নজরে পড়ে!

ঘাটের থেকে এক আধ আঁজলা মুখে তুলেছি কি না, অমনি সেখানেও ফের আরেক ঠোক্কর!

'আরে আরে! এই! তুমি করছো কী!'

আমার সমবয়সী একজন পৈঁঠায় বসে দাঁতন করছিল, সে-ই বাধা দিয়েছে: 'এই জল খাচ্ছো যে?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'পুকুরের জল কি খেতে আছে নাকি?'

'খিদে তেষ্টা পেলে কী করবে তাহলে? খালি পেটে থাকলে পিত্তি পড়ে না? সেই পিত্তি পড়ার দায়েই—পেটে কিছু দিতে হয়। জল পখিা করে তাই খাচ্ছিলাম। তোমার তাতে আপত্তি কিসের?'

'জল খাও না কেন, আমি কি বাধা দিতে গেছি। শুধু এই পুকুরের জলটা খেতেই মানা করছি তোমায়। বাইরে রাস্তায় ফুটপাথের ওপর জলের কল আছে—কলের জল খাও না গিয়ে। কলের জলই তো খায় সবাই, পুকুরের জল কেউ খায় না কখনো!'

'বলেছে তোমাকে। দেশ পাড়াগাঁয়

পুকুরের জল খেয়েই বাঁচে মানুষ। সেখানে কল কোথায় গো? কল তো তোমার এই কলকাতাতেই কেবল। কিন্তু দেশে? সেই অজপাড়া গাঁয়?

'দেশে কি ওই পুকুর ছাড়া কিছুই নেই আর?'

'কোথাও কোথাও নদীও আছে বই কি! তারা নদীর জলই খায়। কারও কারও বাড়ি কুপও রয়েছে আবার। আমাদের বাড়ি ইঁদারা আছে একটা—সেই কোন্ সাবেক আমলের। অতি প্রাচীন ইঁদারা। তার জল ভারী মিষ্টি। যেমন মিষ্টি তেমনি হজমি।'

'আমাদের কলকাতায় ইঁদারা তুমি পাবে না কোথাও। প্রাচীন ইঁদারা তো নয়ই।'

'ইঁদারা না থাক, ইঁদুর আছে তোমাদের। বেশ ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর—বেড়ে ইঁদুর সব! লক্ষ করলে তেমন প্রাচীন ইঁদুরও চোখে পড়ে বই কি!'

'দেখেছ তুমি?'

'বিস্তর। তুমি দ্যাখোনি বুঝি? রাস্তায় শোওনি বোধ হয় কখনো?'

'রাস্তায়? রাস্তায় শোব কেন? শুতে যাব কেন? রাস্তায় কি শোয় নাকি কেউ? সেটা কি শোবার জায়গা? খাটের ওপর গদি পাতা বিছানায় মশারি খাটিয়েই তো শোয় সবাই—কিম্বা, চৌকিতেও তোশক পেড়ে শোয় কেউ কেউ। রাস্তায় কেউ শুতে যায় নাকি?'

'কিন্তু যার বাড়ি নেই ঘর নেই খাট নেই পালঙ্ক নেই, এমন কি খাটিয়াও নেই একখানা—মশারি খাটিয়ে সোয়া তো দূরস্থান...সে কোথায় শোবে শুনি তবে?'

'তুমি শুয়েছ কখনো রাস্তায়?'

'আকছার। রাস্তাই তো আমার শোবার জায়গা হে! নইলে তোমাদের ওসব প্রাচীন ইঁদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল কি করে?'

'রাস্তায় শোয়া কখনই ভালো নয়। নিরাপদও নয় ভাই! রাত্তিরে অবশ্যি ট্রাম চলে না, তা সত্যি, কিন্তু লরি মোটর এসব তো যায়—যদি তোমার ওপর দিয়ে চলে যায় একখানা? আচমকা চাপা পড়ে যাও যদি?'

'আহা, রাস্তার মাঝখানে কি আর? আশে-পাশে। ফুটপাথের ওপর। সেখান দিয়ে কি গাড়িফাড়ি যায় নাকি? আর, রাত একটু গভীর হলেই ফুটপাথে যত ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুররা জড়ো হয়—তাদের যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। তারা কাউকে গেরাহ্যিই করে না। গায়ের ওপর দিয়েও চলে যায় কখনো কখনো। রাস্তায় শোয়ার ভাগ্যি করোনি বলে সে-দেখার সুযোগ তোমার কোনোদিন হবে না।'

ছেলেটি সে কথার জবাব না দিয়ে তার দাঁতনের গোছার থেকে একটা কাঠি আমার দিকে এগিয়ে দেয়—নাও, দাঁতন করো।'

'বাঃ! এ যে নিমের দাঁতন দেখছি! কোথায় পেলে? কলকাতায় এত ঘুরেছি কিন্তু কোনো রাস্তায় নিমগাছ তো কই চোখে পড়েনি আমার!'

'রাস্তার নিমগাছ নয় হে! জেলখানার।'

'জেলখানার!' দস্তুরমত অবাক হতে হয় ওর কথায়: 'জেলখানায় তো ঘানিগাছ আছে জানি, সেই ঘানির তেল বিক্রি হয় বাজারে। কিন্তু নিমগাছের দাঁতনও যে সেখান থেকে যুগিয়ে থাকে শুনিনি তো!'

'আহা! তারা যোগাতে যাবে কেন গো। সেখেন থেকে নিয়ে এসেছি যে! এক গোছা নিয়ে এসেছি বের বার সময়।'

'জেল থেকে নিয়ে এসেছো? জেল কি চিড়িয়াখানার মতই নাকি? ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় সেখানে? দেখেশুনে বেড়িয়ে টেড়িয়ে ফিরে আসা যায় আবার?'

'মোটেই তা নয়। জেলে যাওয়া ভারী

[illegible] বাপার। গেলে পরে বেরুনো [illegible] বজ্র আঁটুনি।' সে জানায় ঃ 'সহজে [illegible] ঢুকতে দেয় না। সেখান থেকে বেরুনোও সহজ নয়।'

'তাহলে তুমি জেলের ভেতর গেলে কি করে?'

'কেন, পিকেটিং করে? রোজ রোজ শত শত ছেলে যে পিকেটিং করে জেলে যাচ্ছে তুমি কি কোনো খোঁজ রাখো না তার? খবরের কাগজ পড়ো না বুঝি?'

'পড়ব না কেন? শত শত কাগজ পড়তে হয় রোজ আমায়।'

'শত শত?' ছেলেটি আবার হতবাক্ ঃ 'অতগুলো কাগজই নেই আমাদের। কাগজ তো মোটে এই কখানা—আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, বসুমতী আর স্টেটস্‌ম্যান।'

'আরে, কাগজ কেবল পড়া কেন, কাগজ [illegible] যে আমার কাজ হে! কাগজের [illegible] কী কবি হে! পাঁচশো কাগজ বেচতে হয় [illegible] রোজ।' আমি বিশদ হই ঃ '[illegible] কাগজে শুয়ে বসে ধীরে সুস্থে [illegible] করে আগাগোড়া পড়ব যে, তার [illegible] পাই কী! একটুখানি পড়তে না পড়তেই [illegible] হয়ে গেল, তখন আরেকখানা [illegible] পড়লুম। ফের সেখানাও আবার... [illegible] হাতে থাকে ততক্ষণই যা পড়ি... [illegible] করে একটু, একটু পড়ে পড়ে [illegible] জানতে আমার সাধ উঁহুরে [illegible]'

'[illegible] কী করো?' সে কাগজখানাও [illegible]

'[illegible] বসি তার পরে। [illegible] কী [illegible] ভাই, [illegible] ঐ সিনেমায়। পেছে না বসলে [illegible] দেখতে দেয় না [illegible] বোঝা যায় না কিছুই।'

[illegible] হাসতে থাকে সে।

'[illegible] দেখতে ইচ্ছে করে না [illegible]?' আমি শুধাই ঃ 'যাবে তুমি আজ? [illegible] বলো, তাহলে দুখানা কাগজ [illegible] বেচব না আজকে। দুজনের [illegible] রাখব তাহলে।'

'[illegible] ইচ্ছে করে কিন্তু এই কি [illegible] করার সময় ভাই? [illegible] সঙ্গে লড়াই চলছে না আমাদের? আমি জেলে যাব যে। হয়ত আজই; [illegible] কাল। কাল তো নিশ্চয়ই।'

'[illegible] আবার? কালই আবার ফিরে [illegible]?'

'[illegible]। কাল বিকেলে মীর্জাপুরে [illegible] সভা আছে না? আইন অমান্যের [illegible] হবে সেখানে, যোগ দেবে সেই [illegible] পাকড়াবে পুলিশ। [illegible] বলা হয়েছে। সভা টভা করার [illegible] আছে না এখন? একশো [illegible] ধারা জারি করা সব জায়গায়।

ছেলেরা সব ডাল ভেঙে দাঁতন করতে লাগে

আইন ভাঙলেই ধরে নিয়ে যাবে থানায়, সেখান থেকে একবার আদালত ঘুরিয়ে সটান সেই জেলে চালান দিয়ে দেবে।'

'তাই বুঝি?'

'তাই। তোমার জেলে যেতে ইচ্ছে করে না? করছে না?'

'এক আধটু করে—একেক সময়। বেশ নয়! গেলে পরে সেই নিমগাছটা দেখতে পাব বোধ হয়?'

'পাবে। তবে তেমনটি পাবে না। সেই নিমগাছ আর সে রকমটি নেই কো।'

'গেল কোথায় তাহলে? যদ্দুর জানি, নিমগাছেরা তো চলা ফেরা করতে পারে না। পাদপ বলা হলেও ওদের কোনো পা নেই আদপে। হাঁটতে পারে না একদম।'

'আহা, হাঁটতে যাবে কেন হে? একটি তো নিমগাছ মোটে। আর চারি হাজার ছেলে আমরা জেলখানায়। সারা জেল ছেলেয় ছেলেয় ভর্তি। স্বরাজের আন্দোলনে টইটম্বুর। আমাদের জন্যে এবার আরেকখানা জেল খাড়া হয়েছে তা জানো। সেই খিদিরপুর ডকেই।'

'তা হলই বা অতো ছেলে, তা তোমার নিমগাছের কী! লড়াই তো আমাদের ইংরেজের সঙ্গে। নিম গাছের সঙ্গে নয়।'

'সকাল হলেই আমরা সবাই নিমগাছটার ডালে উঠে বসি। ছেলেরা যতো সব ডাল ভেঙে দাঁতন করতে লাগে...।'

'কেউ কিছু বলে না?'

'কে বলবে? বলবার কেউ নেইকো। আমরাই জেলে থাকি কেবল—তিন চার হাজার ছেলে।' আমি হাঁ করে ওর কথাগুলো গিলি—'সেই জেলে আগে যে সব চোর ডাকাত খুনী বদমায়েস থাকত, জেল খালি করে তাদের সব মফস্বলের জেলে ঠেলে দিয়েছে—এখন কেবল কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার তারাই থাকে।'

'এখন ঐ নিমের ডালে দাঁত বসাচ্ছো, তারপরে দাঁত শানিয়ে ইংরেজের ঘাড়ে গিয়ে বসাবে তাই না?' বলেই আমার অনুযোগ ঃ 'খায় নাম মরন কামড়?'

'যা বলেছো!' সে হাসে ঃ 'সকালে ঘুম ভাঙলেই সবাই আমরা সেই নিম গাছটায় উঠে বসি...মুখ ধুতে হবে না আমাদের? কেউ কিছু বলে না—বলবেটা কী?'

'আর নিম গাছটা?'

'সে আবার কী বলবে? তার মুখে কোনো ভাষা আছে?'

'ভেঙে পড়ে না সে? তোমাদের অত্তজনের ভারে?'

'চার হাজার কি একসঙ্গে পারে ধরে? ক্ষেপে ক্ষেপে ওঠে। নিমগাছটা কিন্তু ক্ষেপে ওঠে না। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। ক্ষেপেও ওঠে না, জ্বলেও ওঠে না দপ্ করে। তোমার ঐ পাদপ হওয়া সত্ত্বেও। কিম্বা সেইজন্যেই বোধ হয়। সব সময় এক পায় খাড়া। আমাদের জন্যেই...'

'অসহায় একলা পেয়ে তার ওপর তোমরা বেজায় অত্যাচার করছ কিন্তু।'

'সে কথা আর বলবার নয়, আস্ত নিমগাছটাই দাঁতন করে খতম্ করে দিয়েছি বলতে গেলে।'

'বল কি হে? একটা গোটা নিমগাছ সবাই মিলে দাঁতন করে ফেললে?'

'ফেলব না? চার হাজার লোক দাঁতন করলে একটা নিম গাছ কদিন টেঁকে আর?'

'ভারী আশ্চর্য তো!' একটু ভাবতে গিয়েই আমার সংশয় জাগে—'তার শাখা প্রশাখা সব সমেত?'

'না না! বড় বড় শাখা প্রশাখা কী তার? ছোট শাখা প্রশাখা। তোমার ওই গুঁড়িটাও বাদ।'

(ক্রমশ)

ইমেজ ১৪

—সুনীল দাস

ম্যাক্স মুলার ভবন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ম্যাক্স মুলার ভবনে শিল্পী সুনীল দাসের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর সাম্প্রতিক কাজের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায়।

এদেশে অল্প বয়সেই যে কয়জন শিল্পী সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে সুনীল দাস অন্যতম। ইতিপূর্বে এই উদীয়মান শিল্পীর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছি, সুতরাং পুনরুল্লেখের প্রয়োজন দেখি না। তা সত্ত্বেও দুটি বিষয় আবার বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত, ১৯৫৯ সালে, অর্থাৎ মাত্র ২০ বছর বয়সে এই শিল্পী ললিত কলা আকাডেমির জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। দ্বিতীয়ত, পরের বছরেই দেশের আট স্থানে অনুষ্ঠিত আটটি প্রদর্শনীতেই আটটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। ইতিপূর্বে এত অল্প বয়সে কোনও শিল্পী এত সম্মানের অধিকারী হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। যাঁরা এই শিল্পীর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন যে প্রথমে তিনি বল ও শক্তির প্রতীক ঘোড়ার নানা রূপ এঁকে রসিকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পী স্বল্পকালীন বিভিন্ন রীতিতে আত্মপ্রকাশ করে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। গত কয়েক বছর যাবত ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র, লোকচিত্র ও লৌকিক আচার অবলম্বনে তিনি নানা প্রতীকমূলক ছবি আঁকছেন। সেই সঙ্গে এ দেশের ঐতিহ্যকেই হিসাবে লাল, বিশেষ করে সিঁদুর রঙ, ব্যবহার করছেন। শিল্পীর ছবিগুলি আকারে বড়। বিরাট রচনাক্ষেত্রটি অধিকাংশ স্থলে শূন্য রেখে নানা উপাদান সাহায্যে তিনি কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন ও সেই সঙ্গে প্রয়োজনমত সমতা রক্ষা করে তিনি দেশীয় নানা প্রতীক নানাভাবে সংস্থাপন করেছেন। তার ওপর আছে সুনির্বাচিত রঙ ব্যবহার।

শিল্পীর পূর্বকালীন রচনায় চাপা রঙ দেখা যেত বেশী, সাম্প্রতিক নিদর্শনগুলিতে গভীর, বিশেষ করে কালো, নীল, সিঁদুর ও ছাই রঙের প্রাধান্য চোখে পড়ে। কয়েক ক্ষেত্রে কারুকার্যখচিত রচনা ক্ষেত্রের ওপর সূক্ষ্ম, জ্যামিতিক নানা ক্ষেত্র এঁকে দেশীয় প্রতীক চিহ্নগুলি সুসংস্থাপন করে শিল্পী মিশ্র রীতিতে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১১নং ছবির নাম করা যায়। রচনাক্ষেত্রটি নীল-কালো রঙে ভরে ফেলে মধ্যস্থলে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত মোটা লাল রঙ রেখার মধ্যে একটি চোখের তারা এঁকে ছবিটিতে একটি তাৎপর্যময় রূপদান করেছেন। শূন্য স্থান বিভাজন ও প্রতীক ব্যবহারের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ১৮নং ছবি। প্যানেল প্রধান একটি ছবিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বাঁদিক শূন্য রেখে ডান দিক শিল্পী গভীর সবুজ রঙে ভরে ফেলেছেন ও তার ওপর মাছ ও লোকাচার প্রধান কয়েকটি প্রতীক সংস্থাপন করে সুন্দর কম্পোজিশন সৃষ্টি করেছেন—বিশেষত্ব এই, বালির রঙে ভরা বাঁদিকটি শূন্য থাকায় বৈষম্যের মধ্য দিয়েও শিল্পী সঙ্গতির আভাস দিয়েছেন। ছোট ছোট ঝিনুক, লোহার চাকতি ইত্যাদি নানা উপাদানে রচনাক্ষেত্রে কারুকার্য সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সবুজ ও লাল রঙ ব্যবহার করে শিল্পী কয়েক ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে ৮নং ছবির নাম করা চলে। প্রতীক ও চিহ্ন মাধ্যমে দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য ও রচনাক্ষেত্রে কারুকার্য সৃষ্টিই এই শিল্পীর সাম্প্রতিক রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য। কারুকার্যের দিক থেকে বিচার করলে দু' একটি রিলিভো (relievo) পর্যায়ে পড়ে। এ জাতীয় রচনায় চমক আছে, কয়েকটি যে বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে এগুলিতে শিল্পী ঠিক নতুনত্বের পরিচয় দেননি, অর্থাৎ ইতিপূর্বেও এ জাতীয় রচনা নিদর্শন আমরা এই শিল্পীরই কাজে দেখেছি। এই শিল্পী প্রতিভাবান, সকলেই এঁর কাজে নতুন আঙ্গিক তথা দৃষ্টিভঙ্গী দেখার আশা করেন। আশা করি ভবিষ্যতে শিল্পীর চিন্তাধারা তথা রচনারীতিতে নতুনতর দিগন্তরেখার সন্ধান পাব।

শিল্পী বিজন সামন্ত, অশোক দত্ত ●

গৌতম দাসগুপ্ত কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তিন জনই তরুণ, ১৯৬৮ সালের সরকারী আর্ট কলেজে শিক্ষাশেষ করেন। প্রদর্শনীটি সাধারণ মানের, অধিকাংশ নিদর্শনই শিক্ষার্থীসুলভ। সকলেই কমবেশী ভারতীয় রীতিতে, জলরঙে ও টেম্পারায় কাজ করেছেন, একজনের রচনায় গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায়। গৌতম দাসগুপ্তের ছবিগুলি ছোট, রঙ ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। বারোটি ছবির মধ্যে মিসটিক নাইট, সায়াহ্ন মুকুর ও শৈলবিহার মন্দ লাগেনি। বিজন সামন্তর ছবিগুলি মিনিয়েচার জাতীয়। কয়েকটি স্কেচও ছিল, তবে উল্লেখ্য নয়— যেমন উইনটার। স্কেচ হিসাবে দুর্বল। গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও রঙ ব্যবহারের দিক থেকে রেড ব্যলকনি ও ভ্যালি অব সিম্বলজ অনেকের চোখে পড়ে। আর একটি ছবিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য— ডেথ। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে অশোক দত্তর ছবিতে পাকা হাতের পরিচয় মেলে। স্কেচ বা স্টাডিজ তাঁর রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন দামোদর ও পূজারিণী। সুন্দর রঙ ব্যবহার বিশেষ করে সুকৌশল তুলির টানের জন্য হেমন্ত সকলের চোখে পড়ে।

*

সোসাইটি ফর দি ডেফ-এর উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে বধির শিল্পীদের ষষ্ঠ বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ছবি ছাড়া বাটিকের স্টোল, রুমাল, ছোট থলি ও ছবি ও সেই সঙ্গে হাতে তৈরী কাগজমণ্ডের পুতুল, চিঠি লেখার প্যাড ইত্যাদি দেখা যায়। জন্ম থেকেই বা পরে ভাগ্যবিপাকে যাঁরা মূক, বধির বা অন্ধ হয়ে যান তাঁদের ভাগ্যহত জীবনের কোনও সন্ধানই আমরা নিই না। অথচ দেখা গেছে যে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই একটি বিশেষ কোনও শিল্প তথা কলার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে এবং উৎসাহ ও সাহায্য পেলে তাঁরা এ বিষয়ে উন্নতিলাভ করতে পারেন। বলা বাহুল্য, সোসাইটি ফর দি ডেফ এ জাতীয় বধিরদের জন্য স্বাভাবিক বৃত্তির অনুশীলন করার জন্য নানাভাবে সাহায্যদান করে চলেছেন এবং শুধু তাই নয়, তাঁদের যত্ন ও উৎসাহে বধির নারী ও পুরুষ কিভাবে নানা শিল্পকর্ম করছেন তার পরিচয় দেবার জন্য গত পাঁচ বছর যাবত একটি বার্ষিক প্রদর্শনীরও আয়োজন করে আসছেন। বলা বাহুল্য, মূক, বধির ও অন্ধ নরনারী আজ সমাজের একটি পৃথক শ্রেণী, সুতরাং তাঁদের বিড়ম্বিত জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা কি কি কাজ করছেন সুস্থ মানবসমাজের সকলেরই তা জানা উচিত এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রচারকার্যের প্রয়োজন। সোসাইটি ফর দি ডেফ এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে জনসাধারণকে মূক ও বধির নরনারীর শিল্প প্রচেষ্টা দেখার যে সুযোগ দিলেন সেজন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদার্হ। বলতে বাধা নেই, অল্প হলেও কয়েকটি ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষ করে গ্রাফিক ও প্রতিকৃতি রচনায় দু-একটি সুন্দর নিদর্শন আমার চোখে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শান্তনু ভট্টাচার্যের গ্রাফিক প্রিন্ট-এর নাম করা যায়। সুবিমল ব্যানার্জির একটি ছবিটিও সুন্দর। পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতিটির জন্য শিল্পী অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারেন। দুঃখের বিষয় শিল্পীর নাম জানতে পারিনি। উদ্যোক্তাদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন বার্ষিক বিবরণীর মধ্যে অন্ততঃ একটি পাতায় শিল্পীদের আঁকা ছবি ও শিল্পীদের নাম প্রকাশিত করেন—না হলে শিল্পীদের প্রতি অবিচার করা হবে। বাটিকের বহু নিদর্শনের মধ্যে দু-একটি ছবি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রদর্শনীর এক পাশে মূক বধির বিদ্যার্থীদের ছাত্র-দের আঁকা ছবি, ও বিশেষ করে হাতে তৈরী কাগজমণ্ডের কয়েকটি পুতুল অনেকের চোখে পড়ে যায়। পরিকল্পনা, ডিজাইন ও রঙ ব্যবহারের দিক থেকে এগুলি বেশ আকর্ষণীয়—ছেলেমেয়েদের কাছে তো বটেই এমন কি গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে এগুলি যে কোনও গৃহের শোভাবর্ধন করতে পারে। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। এ জাতীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি, হাতে তৈরি নানা সামগ্রী অধিকতর ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

চিত্রক

জন্মের শুভক্ষণে

আনন্দমুখর লোকসভায় ৬ই ডিসেম্বর, ১৯শে অগ্রহায়ণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন স্বীকৃতি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশকে আমরা বরণ করলাম বন্ধু প্রতিবেশী রাজ্যরূপে। বরণের পথ সহজ করে দিয়েছেন ইয়াহিয়া খাঁ স্বয়ং। ৩রা ডিসেম্বর, পশ্চিম সীমানায় আক্রমণ করেছেন তিনি ভারতবর্ষকে। আর তো দ্বিধার প্রশ্ন রইল না। যে সংযম ভারত দেখিয়েছে তার তুলনা নেই। সংযমের বল্গা শিথিল হয়নি কারণ নেতৃত্বের আসনে আছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। ন্যায়ের মর্যাদার সঙ্গে এক আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে ভরা রাজনীতি পরিচালনা করে আজ বিশ্বসভায় তাঁর তুলনা নেই। জগতে যত কারসাজি থাকুক না কেন, যে কোন কূটকৌশলকে চূর্ণ করে দেবার শক্তিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনগণমনের একচ্ছত্র অধিকারিণী

কিছুদিন আগে শুনেছিলাম বাংলাদেশের মোতিয়া চৌধুরীর মুখে দেশ পত্রিকা পড়বার জন্য কি আকুল আগ্রহে বাংলাদেশের প্রতি ঘরে ঘরে মানুষ পথ চেয়ে থাকে। পাঁচ টাকা সাত টাকা মূল্য দিয়ে একটি সংখ্যার এক কপি কিনতে পারলেও তাঁরা আত্মপ্রসাদ পেতেন। চেক পোস্ট পার করার নাকি এক কৌশল ছিল দেশের একটি কপি। চেকচৌকির বাঙ্গালী অফিসার একখানা দেশের বদলে ছেড়ে দিতেন নির্বিঘ্নে

মূল। ঢাকাই শাড়ি যদি চৌকি পার করে চালান আনতে হতো তবে দেশখানা রেখে আসতে হতো। বিশেষ সংখ্যার বেলায় পাঁচশ তিশ টাকা দিতেও আপত্তি হতো না বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের। তাই আশা করছি দেশ পৌঁছোবে সোনার বাংলার বহু সংসারে। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের অভিনন্দন পৌঁছে দিতে চাই। সকল সংকটে দুঃখের বোঝা মেয়েরা বয় অনেক বেশী। ইয়াহিয়া সাহেবের শাহী কানুনেও মেয়েদের উপর চলেছে অত্যাচারের চরম তাণ্ডব। তারা বলি দিয়েছে মান ইজ্জত সন্তান সম্বল সব কিছু। সজল আবাহনে আজ নূতনের পত্তন হলো। আগামীতে লেখা থাকবে অসীম আত্মদানের অনেক কাহিনী।

নূতন দিল্লিস্থ বাংলাদেশ মিশনের মুখ্যাধিকারী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী মেহ্‌জবীন-এর ঘরে বসে সেদিন এই একই আলোচনা হচ্ছিল। ৬ই ডিসেম্বর তিনি বঙ্গবন্ধুর ছবির গলায় মালা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন

"It is a proud privilege and a great occasion for all the people of Bangladesh. Particularly I am proud that I am able to garland the photograph of the Father of the Nation, Bangabandhu Shaikh Mujibur Rahman in our Mission in a great country i.e., India, which has earned the coveted position by being the first country to recognise the Sovereign and Independent State of Bangladesh. On this Joyous occasion let me congratulate the great people of India and their dynamic Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi and the Govt. of India. We also today remember and salute the martyrs who have laid down their lives for the freedom of the motherland."

মেহ্‌জবীন চৌধুরী

(বাংলাদেশের সকল মানুষের পক্ষে আজ পরমক্ষণ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ফটোতে মালা দিতে আমি ধন্য। ভারতের মত মহান দেশের মিশনে বসে মালা দিলাম মুজিবুর রহমানের কণ্ঠে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা সরকার তাঁদের কাছে পেল প্রথম স্বীকৃতি। ভারত সরকার, ভারতের মানুষ এবং তাদের প্রগতিশীল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমার অভিনন্দন জানাই। আজ যে শহীদ আপন জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের স্মৃতিকে জানাই প্রণাম।)

শহীদ যারা বিশ্বাসের বেদিতে প্রাণ দেয় তারা মহান সন্দেহ নেই কিন্তু যারা বিশ্বাসের জন্য তিলে তিলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে যায় তাদের পথও কম কঠিন নয়। সোনার বাংলার নূতন যুগের মানুষ সত্যকে সম্বল করেছে, পড়ে আছে সামনে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা। সেই

গড়তে সোনার বাংলার মেয়েরা এগিয়ে এসেছে যোগ দিতে। দেশবিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে দেখেছিলাম মেয়েরা পুরুষের সহধর্মী কিন্তু সহকর্মী নয়। এখন তারা দাসীও নয় দেবীও নয়। পাশে পাশে আছে। দেশবিভাগের অল্প পরে লক্ষ করেছিলাম বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানকে ব্রিটিশ শাসক সমাজের স্থানে বসিয়েছে। কলকাতায় যেসব বন্ধুবান্ধবকে মাঝে মধ্যে ঢাকা বা খুলনা থেকে আসতে দেখেছি, তারা যেন ঠিক স্বাধীন দেশের নাগরিক নয়। তারা লাহোরে ছেলে পড়তে পাঠায়, মেয়ের বিয়ে

"Boundary is not merely a line on map or a series of monuments on the ground..... It determines few millions of people the language and ideas which children shall be taught at school, the books and newspapers which people will be able to buy and read, the kind of money they shall use, the markets in which they must buy and sell, and perhaps even the kinds of food they may be permitted to eat. It determines the national culture with which they shall be identified."

বলেছিলেন Whittemore Boggs.

(সীমারেখা মানচিত্রের লাইনমাত্র নয়, ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি ঐতিহাসিক সৌধও নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সীমানার মানে তার বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে যে ভাবধারা ও ভাষা শিখবে, যে বই বা সংবাদপত্র সাধারণ মানুষ কিনতে ও পড়তে পারবে, যে মুদ্রা সে ব্যবহার করবে, যে বাজারে সে বেচাকেনা করবে এমনকি সে যে খাদ্য খেতে পারবে। সীমারেখা তার জাতীয় কৃষ্টির সঙ্গে এক করে মিশে যাবে।)

পাঞ্জাবী ঘরে দিতে ধন্য হয়ে যায়। উর্দু বলে। তারপর এল নবযুগের নূতন জোয়ার। বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের জন্য জান কবুল করেছে। তারা গড়বে নূতন দেশ। আমরা প্রতিবেশী। প্রাণ ভরে দেখবো সোনার বাংলার সোনার মেয়েদের নূতন ভূমিকা।

টুকিটাকি

অসামরিক প্রতিরক্ষার সরকারী ব্যবস্থা থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক গৃহিণীর প্রচুর দায়িত্ব রয়েছে। বিগত বিশ্ব মহাযুদ্ধেই প্রথম মেয়েরা প্রতিরক্ষার কাজে নেমেছিলেন। আমাদের দেশে যুদ্ধের কারণে তত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি কিন্তু ইউরোপের বহু দেশে মেয়েদের সামলেছেন অনেক কিছু।

আপৎকালে পুরুষ যখন ঘরের বাইরে কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকে তখন গৃহধর্মচারিণীদের বহু দায়িত্ব আপন হাতে তুলে নেবার সময় আসে। সবচেয়ে ভাল হয় প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মিলে ছোট ছোট প্রতিরক্ষা দল গড়ে তোলা। কলকাতা বা অন্য বড় শহরে যেখানে মানুষ ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করেন তাঁরা দল গড়ে নিজেদের মধ্যে অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলে সকলের পক্ষে সুবিধা। অসামরিক প্রতিরক্ষার যে সরকারী ব্যবস্থা তার সহায়তায় সংগঠন অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাজ চালাতে পারেন।

ছোট ছোট দল হলে যুক্তভাবে বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার ব্যবস্থা পাকাভাবে করা যায়। সে আশ্রয়ে কিছু খাবার, ছোট ছেলেমেয়ের জন্য খেলনা, পড়বার জন্য বই বা পত্রপত্রিকা, খাবার জল, শিশুর মা থাকলে শিশুর খাদ্য, কিছু কম্বল, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, কানে দেবার তুলো, শুকনো খাবার, যেমন বিস্কুট, মুড়ি ইত্যাদি মজুত রাখবেন। টর্চ, মোমবাতি, দেশলাই হাতের কাছে যেন পাওয়া যায়।

আশ্রয়ে টেলিফোন ব্যবস্থা দরকার। তবে টেলিফোন যদি কাজ না করে তবে যেন খবর পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা থাকে। একাধিক লোকের নিকটতম সিভিল ডিফেন্স পোস্ট, হাসপাতাল, পুলিস চৌকি ইত্যাদির সহজতম পথ জেনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।

উপদল বা group-এ মোটামুটিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা জানা দু'-চারজন থাকা দরকার।

শ্রীমতী

এই যুদ্ধ এবং আমাদের অর্থনীতি

যে কোন দেশেই যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় অর্থনৈতিক নীতি ঢেলে সাজাতে হয়। প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সরকারকে নতুন কর ধার্য করতে হয়, অথবা নতুন মুদ্রা ছেপে বাজেটের ঘাটতি দূর করতে হয়। তা ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে জনসাধারণের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (Compulsory Saving) অথবা বাধ্যতামূলক আমানত প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার অতিরিক্ত অর্থ আহরণ করতে পারেন। ১৯৬২ সালে ভারতে চীন আক্রমণের পর ভারত সরকার আরও সম্পদ আহরণ করার জন্য প্রথমে বাধ্যতামূলক আমানত (Compulsery Deposit) কর্মসূচী এবং পরে বার্ষিক আমানত কর্মসূচীর (Annuity Deposit Scheme) প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নীতিও *(Gold Control Policy) প্রবর্তিত হয়। পরে অবশ্য বার্ষিক আমানত কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হয় এবং স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নীতিরও যথেষ্ট সংস্কার করা হয়।* বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তার ব্যয় সংকুলানের জন্য সরকার এখনও কোন বাড়তি কর ধার্য করেননি। ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট অনুমোদিত হওয়ার পর পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনের কিছু দিন আগে সরকার একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে কতিপয় অতিরিক্ত লেভি ধার্য করে ৭০ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন এবং সেই অর্ডিন্যান্স পার্লামেন্ট কর্তৃক আইনে পরিণত হয়। বর্তমান যুদ্ধ যদি স্থায়ী হয় তবে আমাদের অর্থনীতির উপর তার

প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। যদি বর্তমান যুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী না হয়, তবুও যুদ্ধ মিটে যাবার পর আমাদের অর্থনীতির উপর দারুণ চাপ পড়বে।

বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে অর্থসংস্থান করা হয়, তা করা হয় সাধারণত অতিরিক্ত কর ধার্য করে অথবা জোর করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করে অথবা নতুন মুদ্রার সৃষ্টি করে। ভারতে বর্তমানে নতুন কর ধার্য করার এবং অতিরিক্ত হারে, বর্তমান করগুলির সংস্কার করার যৌক্তিকতা কতটা আছে তা বিশেষভাবে বিচার্য। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে এখনও করব্যবস্থার সংস্কার করার সুযোগ রয়ে গেছে এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন রাজ্য সরকারগুলি। কৃষিগত আয়করের সংস্কার সাধন করা এখন খুবই জরুরী প্রয়োজন এবং রাজ্য সরকারগুলিকে এ বিষয়ে দ্রুত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে; তা না হলে প্রতিরক্ষার ব্যয়নির্বাহের চাপে চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যেই বাংলা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছে; সরকারী হিসাব অনুযায়ী দৈনিক ব্যয়ের মাত্রা প্রায় ২ কোটি টাকা। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের খুব অল্প পরিমাণই বিদেশ থেকে সাহায্য হিসাবে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া বর্তমান যুদ্ধে ভারত সরকারের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। শুধু কৃষিগত আয়করই নয়—প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন অথবা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে যে সব ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে মুনাফা লুটে যাচ্ছে, তাদের উপর অতিরিক্ত মুনাফা-কর (Excess Profits Tax) ধার্য করা যেতে পারে। ভারত সরকার এখনই কোন নতুন কর ধার্য করছেন বলে মনে হচ্ছে না; তবে এটা *সুনিশ্চিত ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিনটিতে অর্থমন্ত্রী যখন লোকসভায় ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করবেন* তখন বর্তমান কর-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাবে।

বর্তমান যুদ্ধ কিভাবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে? প্রথমেই দেখা যাক, এই যুদ্ধের ফলে আমাদের প্রাপ্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কতটা কমবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, ভারতকে সর্বপ্রকার বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হল। এই হুমকিতে ভারত নত হয়নি। ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালের মধ্যে অনেক পার্থক্য—এ কথা প্রধানমন্ত্রী আরও আগেই বলেছেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়ে ভারতে ছিল নিদারুণ খাদ্যসংকট। কিন্তু ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে আমরা 'সবুজ বিপ্লবের' পথে এগিয়েছি। খাদ্যশস্যের জন্য আমাদের আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণস্থ হতে হবে না। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও কয়েকটি দেশ হয়তো সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। ভারতের চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার উপর তার প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। যুদ্ধের পর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরায় সুসংগঠিত করার জন্য এবং চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার কাজ পূর্বকর্মসূচী অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভারত সরকারকে বাধ্য হয়েই আরও নতুন মুদ্রা ছাপতে হবে; ইতিমধ্যেই ভারত সরকার শরণার্থীদের ত্রাণকার্যের জন্য ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যুদ্ধের প্রভাব এবং ঘাটতি অর্থসংস্থানের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যাবে। ভারত সরকারকে এখন থেকেই

কালোবাজারি এবং মজুতদারি প্রতিরোধ করার জন্য সর্বাত্মক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুদ্ধকালীন সরকারী ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ অনুৎপাদনমূলক সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম উৎপাদনের পরিমাণ তখন বেড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে কিছু নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়। বেকার সমস্যার তীব্রতা তার ফলে কিছুটা প্রশমিত হলেও ভারতের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রতিরক্ষা-ব্যয় সবটাই অনুৎপাদনমূলক হয়; অন্তত নতুন ধরনের প্রতিরক্ষা-সামগ্রীর উৎপাদন দেশের উৎপাদন পদ্ধতির কলা-কৌশলকে উন্নত করে এবং যুদ্ধ মিটে গেলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজে লাগে।

যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকেও মুদ্রানিয়ন্ত্রণ নীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্যকারী নীতি সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই যুদ্ধ শেষ হলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হবে তার প্রস্তুতি এখন থেকেই করা দরকার এবং এজন্য জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কর্মসূচীকে সর্বাগ্রে ঠিকভাবে কার্যকরী করা দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

কমলে
আননকে
কোমল ক'রে
তুলুন...
রূপচর্যার দুর্লভ
তেলের সমন্বয়,—
ল্যাকমে
কোল্ড ক্রীম দিয়ে
Lakmé
COLD CREAM
ল্যাকমে
কোল্ড ক্রীম
ASP/L-34

পাহাড়ী সান্যাল

মানুষ অতুলপ্রসাদ

॥ এগারো ॥
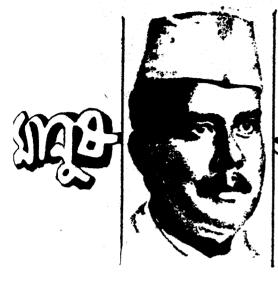
একদিন সকালের দিকে সাইকেলে করে হেমকুসমুদির বাড়ি যে রাস্তায় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কি সব হয়তো ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম। হেমকুসমুদির বাড়ির কথাটা তেমন খেয়াল হয়নি। হঠাৎ শুনলাম, "এই ছ্যামড়া, শুইন্যা যা—"

হেমকুসমুদির বাড়িটার কথা নিশ্চয় অবচেতন মনেই ছিল, কাজেই ওঁর গলার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠে দেখলাম, তাঁর বাড়ির গেটটা প্রায় পার হয়ে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়লাম। বারান্দায় বসা হেমকুসমুদির কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন উনি বললেন, "হ্যাঁ, আমাকে আর দেখতে পাবে কেন! এখানে তোমার অতুলদা বসে থাকলে কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে পারতে না।"

আমি আমতা আমতা করে কী সব যেন মিথ্যে অজুহাত দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম বটে, এবং শেষ কথাটা বলেছিলাম এই ধরনের যে, একটা কথা ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম, তাই অন্যমনস্ক হয়েছিলাম।

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তা তো বটেই। তোমার অতুলদার কথাই ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলে নিশ্চয়।"

ওই বয়সেও হেমকুসমুদির চেহারায় যে লালিত্য ছিল এবং যে ব্যক্তিত্ব ছিল তাতে কোথায় যেন স্নেহ, অভিমান, ভালবাসা, দুঃখ ইত্যাদি সব কিছুই মেশানো ছিল। তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল যে, এই মানুষটাকেও তো আমার খুব ভাল লাগছে।

মিসেস সেনকে আমি অত্যন্ত অল্পই চিনতাম, তাই তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলতে পারব না। কিন্তু এটুকু আমার খুব ভাল করে মনে আছে যে অত সংযত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মিসেস সেনের কথাবার্তার মধ্যে কোথায় যেন প্রগাঢ় অভিমান উঁকি মারত।

আজ আমার মনে হয় দুজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের একজন আর একজনকে নিবিড় করে পাবার বিভোরতা সত্ত্বেও সেটা যে ব্যর্থ হয় তার কারণ ভুল বোঝাবুঝি, ভুল দেওয়া-নেওয়া, যার ফলে প্রতিবন্ধক হয় অভিমান—প্রগাঢ় অভিমান। এর থেকে বড় ব্যথা বুঝি আর কিছু নেই। আরও ব্যথা পাই এই কথা ভেবে যে, অতুলদা তাঁর মনের শূন্যতাটা ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর এক ভাবে—পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। নিজের মনের সংগোপনে যে ব্যথিত সত্তাটি

তাঁর ছিল তাকে ভুলে থাকবার জন্য তিনি নানান মানুষের সাহচর্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু হেমকুসুমদির তো সে সামর্থ্য ছিল না। তিনি তখন পঙ্গু। কাজেই বহির্জগতের কাছ থেকে যে তিনি রূপ রস রঙ আহরণ করে নেবেন তাও ছিল তাঁর নাগালের বাইরে।

যদিও আমি অতুলদাময় মানুষ, তবুও অতি অল্প আলাপের মধ্যে দিয়েও আমার হেমকুসুমদিকে বড় ভাল লেগেছিল। তাই আজকের দিনে ভাবতে গিয়ে হয়তো তাঁর ব্যথার, তাঁর নিষ্ফলতার কিছু কিছু সন্ধান করতে পারি।

আমার মনে কোথায় একটা বিশ্বাস আছে যে পৃথিবীর যত বড় বড় দার্শনিক, যত বড় বড় সাহিত্যিক নিজেদের চিন্তাধারার ছাপ মানুষের কাছে রেখে যেতে পেরেছেন তাঁদের জীবনদর্শন ঘটেছিল এই ধরনের মানুষ এবং এই রকম প্রেমের ভিত্তিতেই। তাই বুঝি পৃথিবীটা এত দুঃখময়, আর সেই দুঃখের উপরেই বিরাজ করছে সৌন্দর্য, সুখ। একেই বোধ হয় বলে আলো আর ছায়া।

আবার অন্যদিকে এই আলো আর ...ছায়ার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম অতুলদার কাছে। ...তিনি হয়তো কোন সময় জানতে পেরেছেন ...আমি হেমকুসুমদির বাড়ি গিয়েছি (কিভাবে ...তিনি জানতে পেরেছিলেন আমি জানি না), ...তাই অতুলদার কাছে যাতায়াতের মধ্যে কোন ...এক সময় হয়তো আমাকে এক ধরনের অদ্ভুত ...অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞেস করেছেন, "তুমি কি ...র মধ্যে ও-বাড়ি গিয়েছিলে নাকি?"

ও-বাড়ি বলতে কোন্ বাড়ির কথা ...লছেন অতুলদা সেটা আমার বুঝতে ...অসুবিধা হত না। আমি কেমন যেন ...অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলেছি, "হ্যাঁ, ...গিয়েছিলাম তো!"

তিনি কেমন যেন নিজেকে আরও অন্য-...মনস্ক করতে চেষ্টা করে আলতোভাবে ...জিজ্ঞেস করেছেন, "কেমন আছে-টাছে?"

আমি হয়তো উত্তর দিয়েছি, "এমনিতে ...তো ভালই আছেন—"

খানিকক্ষণ উনিও চুপচাপ, আমিও চুপ-...চাপ। তারপর আবার একটু গলা খাকারি ...দিয়ে যেন খুব নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসা করে-...ছেন "তোমার ও'কেও খুব ভাল লাগে, না?"

আমি খুব স্পষ্টভাবেই তাঁকে বলেছি, "হ্যাঁ খুব ভাল লাগে।"

একথা শুনে ও'র চোখে কেমন যেন ...একটা ব্যথাভরা স্বস্তি অনুভব করেছি।

এই দুজনের কথা ভেবে তখনকার ...দিনে আমার শুধু অদ্ভুতই লেগেছে। আজ ...স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে এই দুজন ...মানুষ সারা জীবন ধরে শুধু ছলনার খেলাই ...খেলে গেলেন। কিন্তু এই ছলনার মধ্যেও ...কখনও যেন ও'রা দুজন একটা ব্যথাভরা ...আনন্দ নিশ্চয় অনুভব করেছেন। কারণ ...হেমকুসুমদিকে যতটুকুই চিনে থাকি না ...কেন তাঁর কথার মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে ...অতুলদাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করতে গিয়েও ...কখন যেন নিজের কাছেই ধরা পড়ে যেতেন ...তিনি। অভিমানভরে যে রাগ প্রকাশ করার ...চেষ্টা তিনি করতেন তাতে রাগটা বোধ হয় ...ছল ছিল মাত্র, শুধু অভিমানভরেই অমন ...করে ছটফট করে উঠতেন।

যেমন একদিন আমাকে মিসেস সেন ...এই ধরনের কথা বলেছিলেন যে, "জানিস ...ছুঁড়ী, আমিও নেহাত নিরেট নই। ...গানটাকে শিল্পকে আমিও ভালবেসে-...ছিলাম। কিন্তু সেটাকে আর প্রশ্রয় দিতে ...ইচ্ছে করেনি। কি লাভ? তোর অতুলদার ...গান শুনে লোকে পাগল হয়। আমার যেন ...কিছুই ভাল লাগে না। গান-বাজনা-শিল্প ...কেমন যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে সব।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছেন, "...একটু গান শোনাবি—"

আমি কিছু হিন্দী গান-টান গেয়ে শুনিয়েছি তাঁকে। তিনি হয়তো বলেছেন, "বাংলা গান গা না।"

আমি তখন বাংলা গান গেয়েছি। অতুলপ্রসাদের। কিছুক্ষণ শুনে তিনি কেমন যেন ছটফট করে বলে উঠেছেন, "শরীরটা আজ ভাল লাগছে না। একটু বিশ্রাম কইরা লই।"

আমি যখন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা নিয়ে উঠে চলে যাচ্ছি তখন হঠাৎ তিনি বলে উঠেছেন, "আমাকে নিশ্চয় তোর ভাল লাগে না। আমি তো আর তোর অতুলদার মত করে মানুষকে ধরে রাখতে পারি না। আমি হয়তো শুধু অসৎ ব্যবহার করতেই শিখেছি। যাক, আবার যদি তোর হেমকুসুমদির কথা মনে পড়ে—আসিস।"

এ কথাগুলোর মধ্যে দিয়ে উনি হয়তো শ্লেষই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কি সত্যি তিনি সফল হতে পেরে-ছিলেন?

আবার অন্যদিকে এক-একদিন অতুলদা যখন আমাকে গান শেখাতেন তখন কোন কোন সময় হঠাৎ হঠাৎ বলে উঠতেন, কেমন যেন একটু কর্কশভাবেই বলতেন, "তোর হেমকুসুমদি তোর কাছে গান শুনতে চায় না?"

আমি ও'র কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গিয়ে বলেছি, "হ্যাঁ। তোমার গান তাঁকে শুনিয়েছি—"

উনি আরও গম্ভীর হয়ে বলতেন, "ওর গান-বাজনায় খুব শখ ছিল এক সময়ে। She could have become a great artist if she wanted to."

তারপর ঝপ করেই বলতেন, "এ গানের যতটুকু শিখিয়েছি একবার গাও তো—"

অতুলদার এ ধরনের কথা শুনে তখন শুধু মানসিক অসুবিধাই বোধ করেছিলাম। আজকের দিনে তাঁর ওই ধরনের কথাবার্তা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু আবার এ কথা ভেবেও দুঃখ পাই যে, আজকের দিনের মানুষ হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবনের এই পরম ভিত্তিটাকে খুঁজে পায় না। আমার কেমন যেন মনে হয় প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাস বুঝি মানুষের মন থেকে মুছে গেছে। আজকে যা দেখি তাতে মনে হয়, প্রেম বলতে শুধু অবিশ্বাস ভরা উঞ্ছবৃত্তি।

আমার নিজের জীবনে চলার পথে সময়কে কোনদিন এগিয়ে যেতে দিই নি। তার সঙ্গে সমানভাবে দৃঢ় পদক্ষেপেই চলবার চেষ্টা করেছি। কাজেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে

কেমন করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে তাও প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য করেছি। আর সেই পরিবর্তনের কারণগুলো বুঝতে পেরে মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছি। আজ বার বার অতুলদার ভাষায় জানতে ইচ্ছে করে "ওহে জগৎকারণ এ কী নিয়ম তব"?

অতুলপ্রসাদ এই কথাগুলি লিখেছিলেন দুটি হৃদয়ের মিলনের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। আজ কিন্তু সেই জগৎকারণকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সে মিলনের আনন্দ গেল কোথায়? যার আনন্দে অতুল-প্রসাদ লিখেছিলেন, "এ কি মহোৎসব, এ কি মিলন নব/গ্রহ ডাকিছে গ্রহে মিলন মাগে/অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে/হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম সোহাগে/অখিল নিখিল ভরা এ কি আহ্বান রব......"

তবে কি আজকের পৃথিবীর মানুষের চেতনায় সেই গ্রহনক্ষত্র সব বিলীন হয়ে গেছে? তাই কি অণু অণুকে চির অনুরাগে ডাকতে রাজী হচ্ছে না! তাই বুঝি একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়কে প্রেম সোহাগে ডাকছে না! অখিল নিখিল ভরা সেই আহ্বানের রবই বা গেল কোথায়?

[ক্রমশ]

ঐ অন্দরে

গত বছর পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি সময়ে আমরা এই বিভাগে লিখেছিলাম, আগামী বছর বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচণ্ড উদ্দীপনায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হবে। কোনো সিপাহী-শান্ত্রী সঙ্গীন উঁচিয়ে বাধা দিতে আসবে না। আমাদের সেই আশা সত্য হতে চলেছে। গত বছর বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হতে পারে নি, শিলাইদহে কবির স্মৃতিচিহ্ন মণ্ডিত কুঠিবাড়ি ধ্বংসের খবর এসেছিল, ২৫শে মার্চের পর থেকে চলছিল নারকীয় তাণ্ডব। সেই সময় আমরা আগামী বৎসর সম্পর্কে ঐরকম আশা প্রকাশ করেছিলাম বলে আমাদের কোনো কোনো নৈরাশ্যবাদী বন্ধু আমাদের বিদ্রূপ করেছিলেন। আমরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নই, ভবিষ্যদ্বক্তা নই, সময় পর্যবেক্ষক নই—আমরা শুধু আন্তরিক আশা করেছিলাম—সেই আশা সার্থক হতে চলেছে বলেই আমাদের আনন্দ। সেই সব নৈরাশ্যবাদী বন্ধুরাও নিশ্চয়ই এখন পরাজিত হয়ে আনন্দিত।

সাত দিনের মধ্যে আরও কত কিছু ঘটে যায়। এক শনিবার সকালে আমি এখন লিখছি, পরের শনিবার দেশ বেরুবার সময় অনেক কিছুই পুরোনো হয়ে যাবে। এখন আমার পাশেই রেডিও সর্বক্ষণ খোলা, মাঝে মাঝেই কান রাখছি সংবাদের দিকে। অন্ত এখন পর্যন্ত ঢাকা নগরী অবরুদ্ধ, হেলিকপ্টারে ভারতীয় সৈনারা পার হয়েছে মেঘনা নদী। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত করতে। আগামী শনিবার এতক্ষণে হয়তো থেমে গেছে সব যুদ্ধ, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। কে জানে, আমিও হয়তো অত ঢাকায় উপস্থিত হয়েছি বাংলাদেশ সরকারের বিজয় উৎসবে যোগ দিতে।

দু'তিনখানা নতুন বই পড়েছি, সে সম্পর্কে সাহিত্য সংবাদে লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন আর অন্য কোনো লেখায় মন বসানো যায় না। এখন, যুদ্ধের অগ্রগতি ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কৌতূহল নেই। যদিও আমি মনে মনে জানি, যুদ্ধ সম্পর্কে বেশি আগ্রহ না রাখাই ভালো। যুদ্ধ সম্পর্কে বেশী উৎসাহ থাকা, আসলে অপরিপক্কতার লক্ষণ। দু'পক্ষের পেশাদার সৈন্যদের লড়িয়ে দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া অস্বাভাবিক। অতি সূক্ষ্ম চিন্তায় যে-কোনো ধরনের রক্তপাতের বিরুদ্ধে। অনেক আদর্শের নামে পৃথিবীতে রক্তপাত হয়—দু'চার বছর বাদে সেই আদর্শ বা পথ ভুল প্রমাণিতও হয়—কিন্তু সব নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটে গেলে তার ক্ষতিপূরণ কে করে? ইতিহাসে বারবার দেখা

গেছে, একজন বা পাঁচজন মানুষের খেয়ালে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না। এটা আত্মরক্ষার শেষ উপায়। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য শান্তিপূর্ণ সব কটি পথ পরীক্ষা করে দেখেছে। শাসক চক্রের সঙ্গে অসহযোগিতা, সত্যাগ্রহও বাদ যায় নি। এমন কি গণতান্ত্রিক ভোটাভুটি—যা অনেক সময়ই সঠিক ছবি তুলে ধরতে পারে না—সেই উপায়েও দেখা গেল বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে গেল একটি আদর্শের ভিত্তিতে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ব্যাপার অচিন্তনীয়।

তবু শাসকবর্গ মানলো না জনতার দাবি। আলাপ-আলোচনার মাঝপথে মধ্যরাত্রে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সৈন্যবাহিনী। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, নিরীহ অধ্যাপক কেউই বাদ যায় নি—নিহত হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ, এক কোটি মানুষ দেশ ছাড়া। পরিচিত তথ্য, তবু আবার মনে করিয়ে দিতে দোষ নেই। একথা ভুললে চলবে না, এত অল্প সময়ে এত মানুষ হত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো হয় নি—হলাকু-তৈমুরলং-এর আমলে নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নয়, ভিয়েৎনামেও নয়। একসঙ্গে এত মানুষ গৃহছাড়া হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেবারও কোনো নজীর নেই। এর পরেও যাদের বিবেক জাগ্রত হয় না—তাদের বিবেক বা আত্মা বাঁধাকপির ভেতরের বস্তুটির মতন।

ভারতের মতন গরীব দেশের পক্ষে যুদ্ধ একটা মহার্ঘ বিলাসিতা। এই যুদ্ধ এড়াবার জন্য আমরা ন' মাস অপেক্ষা করেছি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সারা দেশ জুড়ে দাবি উঠেছিল, তবু ইন্দিরা গান্ধী অপেক্ষা করছিলেন—কারণ এক্ষেত্রে ভারতের স্বীকৃতি দেওয়া মানেই যুদ্ধ। বিশ্বশক্তি নামে পরিচিত পৃথিবীর বড় বড় অন্ধ বধির দেশগুলির দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, বারবার বুঝিয়ে বলতে চেয়েছেন এই জটিল সমস্যার কথা। রাশিয়া ছাড়া শেষ পর্যন্ত কেউ সাড়া দিল না। এখন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে আমরা যুদ্ধে যোগ না দিলে অপরাধী হয়ে থাকতাম। এটা যুদ্ধ-বিরোধী যুদ্ধ।

এক দেশের বিরুদ্ধে আর এক দেশ কখনো যুদ্ধ করে না। এক দেশের শাসকবর্গ দেশের কিছু নিরীহ লোককে সৈনিক

বাহিনীকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আপপাবাজ প্রচার যন্ত্রগুলো সমস্বরে চ্যাঁচামেচি করে বোঝাতে শুরু করে, যে এতে দেশের সব মানুষের স্বার্থ বা নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। এর সঙ্গে একটু ধর্মের আফিম মিশিয়ে দিলে তো কথাই নেই। যুদ্ধের উত্তেজনার সময় আমরা এখন পাকিস্তানী সৈনিকদের বর্বর, নরপশু, ইত্যাদি অনেক কিছু বলছি। কিন্তু, পাঞ্জাব বা বেলুচিস্তানের নিরীহ চাষীদের সঙ্গে বাংলাদেশ বা ভারতের সাধারণ মানুষের কোনো শত্রুতা নেই। সেই সব চাষী পরিবারের ছেলেদের এনে সৈনিক নামক যন্ত্র বানানো হয়েছে, তাদের মগজ ধোলাই করে হত্যাকারী বানানো হয়েছে। আট ন' মাস ধরে ওরা পশুর মতনই খুন করেছে নিরীহ মানুষকে। এখন ওরা তাড়া-খাওয়া পশুর মতনই মরছে। শুধু জয়ের উল্লাস নয়, পাঞ্জাব-বেলুচিস্তানের ঐ সব নিরীহ চাষী পরিবারের প্রতি কিছু দুঃখবোধও আমাদের থাকা উচিত। এই যুদ্ধের জন্য যারা মূল দায়ী, সেই পাকিস্তানী সামরিক চক্রের কর্মকর্তাদের শেষ পর্যন্ত কি হবে? কোন্ শাস্তি পাবে? কি শাস্তি পেয়েছে আয়ুব খাঁ? যুদ্ধে হেরে গেলেও ইয়াহিয়া, টিক্কা খাঁ, নিয়াজীরা পিঠটান দেবে অন্য দেশে—সুইস ব্যাঙ্কে ওদের টাকা জমানো থাকে এবং ওদের আশ্রয় দেবার জন্যও দেশের অভাব হয় না। চীন কিংবা মার্কিন দেশের দরজা তো খোলাই আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সে দেশের সরকারের কর্মসূচী কি হবে, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক কি হবে—এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে। এসব বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। আমার শুধু আকাঙ্ক্ষা, জনম দুঃখিনী এই বাংলাদেশ এবার একটু শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখুক।

সনাতন পাঠক

রাজনীতি ও সমাজনীতি

রক্তাক্ত বাংলা (সংকলন)। মুক্তধারা। ১, এ্যান্টনিবাগান লেন, কলকাতা-৯। দাম পনেরো টাকা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যা নিয়ে লিখিত উনিশটি প্রবন্ধের সংকলন এটি। কেমন করে পাকিস্তানী মানসিকতা কাটিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বাঙালী হল, চৌদ্দজন লেখক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা পর্যালোচনা করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। প্রকাশক সমেত লেখকদের সকলেই বাংলাদেশের অধিবাসী এবং মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পরেই তাঁরা দেশ ছেড়েছেন। ফলে সূচীপত্র দেখে যে আশার সৃষ্টি হয়েছিল, সংকলনের রচনাগুলি সে-আশা পূরণ করতে পারেনি। মতিলাল পালের "বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" এবং আবদুল হাফিজের "বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক-ঐতিহ্যের চর্চা" রচনা দুটি সুলিখিত এবং তথ্যপূর্ণ। তবে কৃষি-প্রধান পূর্ব বাংলার বদলে পশ্চিম পাকিস্তান কী করে গমের সঙ্গে ধানেও উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হল, পূর্ব বাংলার উন্নয়ন কর্মসূচী অনুমোদনের ব্যাপারে কী কী অসুবিধা ভোগ করতে হয়, তার কোনও বিবরণ শ্রীপালের প্রবন্ধে নেই। একাফে রিপোর্টগুলি এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের বই দুটি থেকেই ঐ তথ্য পাওয়া যেত। আবদুল হাফিজ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের জিগির তুলে বাঙালীর লৌকিক ও আধুনিক সংস্কৃতিকে হত্যা করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আসলে উর্দু-ভাষী মুসলমানেরা খিলাফত আন্দোলনের পর থেকে সারা ভারতেই এটা করে আসছে। বাঙালী-মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা রাখার বিরুদ্ধে জেহাদ কোন নতুন ঘটনা নয়। ভারতের মুসলিম সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার এই ধারাটির কথা জহির রায়হান (পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ) ডঃ আনিসুজ্জামান (রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক), মুজিবুল ওসমান (বাংলাদেশ পরিস্থিতি: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ), শওকত ওসমান (বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন), সৈয়দ আলী আহসান (বাংলাদেশ আন্দোলন: সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র), অনুপম সেন (বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি)—কারও জানা নেই। ভারতের সেকুলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী হামিদ দালোয়াই (মুসলিম পলিটিকস ইন ইণ্ডিয়া) ডঃ মইন শাকির (ফ্রম খিলাফত টু পার্টিসান) প্রভৃতির লেখা পড়ার পর পাঠকের মনে হবে যে সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বাংলাদেশের লেখকদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট।

ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল তাঁরা প্রধানত উর্দু-ভাষী ছিলেন। ইংরেজ-আমলে চাকরি ও ক্ষমতাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তাঁরা সুবিধা ভোগ করতেন। সেই সুবিধা বজায় রাখার জন্যই তাঁরা সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। হাণ্টারের বইটিতে (যা বাংলা একাডেমি বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন) মুসলমানদের আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা প্রধানত বাঙালী মুসলমানদের সম্পর্কেই কিছুটা প্রযোজ্য। হিন্দুরা জমিদার ও অবস্থাপন্ন আর মুসলমান মাত্রেই গরিব ছিল, এ প্রচারের তথ্যগত কোন ভিত্তি নেই। কারণ তা হলে মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালেই জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদের দাবি মেনে নিত। ফজলুল হকের ঋণ-সালিশী বোর্ডের ফলে গরিব মুসলমানই উপকৃত হয়েছে (পৃঃ ৩৬৩) এটাও ঠিক নয়, গরিব হিন্দুর সংখ্যাও নিতান্ত কম

ছিল না এবং সেজন্য হক সাহেব বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেরই প্রিয় ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সত্য হলো ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে জমিদার-জোতদার, গরিব চাষীর পরিসংখ্যান পাওয়া গে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান বইটিতে তা একেবারেই নেই।

আসাদ চৌধুরীর "সংস্কৃতির বিকাশ-ধারা" রচনাটি তথ্যবহুল এবং সুলিখিত। স্বল্পপরিসরে তিনি পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানও যে ঢাকায় পরিবেশিত হত, এ মূল্য তথ্যটি তিনি সরবরাহ করেছেন। তবে মুসলমান মেয়ে ১৯৫৪ সালে প্রথম মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে, (পৃঃ ৩০০) এ-তথ্য ঠিক নয়। মফঃস্বল শহরে ১৯৪৮ সালেই মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। আসাদ চৌধুরী ঢাকাকেই বাংলাদেশ ভেবে ভুল করেছেন।

আবদুল মতিনের "পাকিস্তানের সাংবাদিকতা" সুলিখিত। শ্রীসন্তোষ গুপ্ত "মুক্তিযোদ্ধা প্রাক্কালে ও সংবাদপত্রের অস্বাধীনতা সংগ্রাম" প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের উপর সরকারী হামলার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এ প্রবন্ধেও ইত্তেফাকের উপর সরকারী হামলার সব বিবরণ নেই। সরকারী নির্দেশ ও সম্পাদকদের পরামর্শদাতা বোর্ডের মাধ্যমে সংবাদ চেপে যাওয়া এবং কলকাতার সংবাদপত্রকে ১৯৪৮ সাল থেকে বার বার এবং ১৯৬৫ সাল থেকে সম্পূর্ণভাবে পূর্ববাংলায় নিষিদ্ধ করে যেভাবে দেশের লোককে অজ্ঞতার মধ্যে রাখতে চেয়েছেন, তার কোন বিবরণ বর্তমান প্রবন্ধে অনুপস্থিত।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর "দ্বিজাতি-তত্ত্বের অপঘাত মৃত্যু" প্রবন্ধটির পরিসর খুবই বিরাট। অন্যান্য দেশের মুসলমান-দের জাতীয়তাবাদী হওয়ার কথা পড়বার সময় মৌলানা আজাদের কথা মনে পড়ে। তিনি ঠিক ওই কারণেই মুসলিম লীগে নাম লেখাননি। "মধ্যযুগেও ভারতে মুসলমানদের মধ্যে এই ধর্মগত জাতীয়তার প্রাবল্য দেখা যায়নি" (পৃঃ ২৪২) এই মন্তব্য ঐতিহাসিক সত্য নয়। ঐ সময়ে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা মুসলমান হিসাবে মর্যাদা পেতেন না ঠিকই। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে ধর্মীয় নেতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ এদেশে ইসলাম রক্ষার জন্যই আহমদ শাহ আবদালিকে ভারত আক্রমণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বাগদাদের খলিফা এবং বিদেশী জামালুদ্দিন আফগানি এদেশে প্যান-ইসলামের জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্য বহির্মুখী প্রবণতার জন্য (পৃঃ ২৫০) নবদীক্ষিত ভারতীয় মুসলমানদের উদ্যোগী হতে হয়নি। "ভারতীয় বামপন্থীরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগে পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছেন" (পৃঃ ২৬৬), এ মন্তব্য অর্ধ-সত্য। কারণ কম্যুনিস্টরা ছাড়া আর কেউ পাকিস্তান সমর্থন করেনি। বামপন্থীদের মধ্যে তৎকালীন সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রীরা বরাবর দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরোধিতা করে এসেছে, অন্যান্য বামপন্থী দল সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

শ্রীরমেশ দাশগুপ্ত "পূর্ব-বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতি-প্রকৃতি" প্রবন্ধে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক মানসিকতা ও আন্দোলনের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তিনি একটি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে প্রবন্ধটিকে অপাঠ্য করে তুলেছেন এবং সত্যকেও বিকৃত করতে চেয়েছেন। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীদাশগুপ্তের ব্যাখ্যা সত্য হলে

বাংলাদেশের আন্দোলনের নেতৃত্ব কম্যুনিস্ট-দেরই হাতে থাকত, অ-কম্যুনিস্ট শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের একচ্ছত্র নেতা হতে পারতেন না। কেমন করে শেখ মুজিব জয় বাংলা আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হলেন, এবং রুশপন্থীরা জাতীয় পরিষদে ১৮ এবং ভাসানীপন্থীরা ১৩টির বেশী প্রার্থী দিতে পারেনি, শ্রীদাশগুপ্তের রচনায় তার কোন বিশ্লেষণ নেই। লেখক পূর্ব-বাংলার দুর্গতির জন্য সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ জোটকে দায়ী করেছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও পূর্ববাংলাকে শোষণের ফলভোগী তা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। জিনিসপত্রের দামের দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের গরিব মানুষও সুবিধা পেত, কৃষকেরাও ঋণ ও ঋণের ব্যাপারে, যুবকেরা সেনা-বাহিনীতে ও অন্যান্য শিল্পসংস্থায় কাজের সুযোগের সুবিধা পেত।

মার্কিন সরকার পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থচক্রকে গণতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সমর্থন জানিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমেরিকার ভারত-বিরোধিতাই যে পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্যের প্রধান কারণ, সে কথা শ্রীদাশগুপ্ত কোথাও উল্লেখ করেন নি। পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্রকে ১৯৬৩ সাল থেকে কম্যুনিস্ট চীন এবং ১৯৬৭ সাল থেকে রাশিয়াও সাহায্য করেছে। কিন্তু এ সব কথাও ওই প্রবন্ধে স্থান পায়নি। ভূমিকাতে ... ন' গান্ধীজী ও গুরেভারা পন্থীতত্ত্বে

আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। নাসেরের সঙ্গে শেখ মুজিবুরের তুলনা হাসির খোরাক যোগাবে। শেখ মুজিবের "ছয়-দফা কর্মসূচী" সংকলনের একটি বড় আকর্ষণ।

(২৮০/৭১)

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্যপ্রভাব। ডঃ হংস-নারায়ণ ভট্টাচার্য। ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। বারো টাকা॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের আদর্শে এবং কবিচেতনায় প্রাচীন ভারতীয় দর্শন-সাধনার প্রভাব সুগভীর। বস্তুত, রবীন্দ্রায়ণ কখনই পূর্ণ হয়ে ওঠে না,—যদি কবির জীবন এবং সৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা- চেতনার বহুবর্ণরঞ্জিত সূত্রটিকে আবিষ্কার করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে ডঃ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-দর্শনের এই প্রেক্ষাপট এবং তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার রহস্য উন্মোচনে তৎপর হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টিতে প্রতি-ফলিত বেদ এবং উপনিষদের বিচিত্র স্পন্দন গুলিকে চিন্তাসূত্রে গ্রথিত করেছেন সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব, রবীন্দ্রকাব্যে ঔপ-নিষদিক চেতনা, কবির প্রকৃতি-চিন্তায় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তরাধিকার, জন্মান্তর-চেতনা, সীমা-অসীম তত্ত্ব, জীবন-দেবতাবিষয়ক প্রশ্ন, গতিতত্ত্ব, আনন্দবাদ, সৌন্দর্যতত্ত্ব, মৃত্যুচেতনা, ধর্ম-কর্মযোগ-জ্ঞানযোগ, ভোগ-সীমাবিষয়ক ধারণা, রামায়ণ ও মহাভারতের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে গ্রন্থটিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি আলোচনা ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতিসহ হওয়ায় আলোচিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হয় না। বিচারপদ্ধতিও মনীষা এবং পাণ্ডিত্যের মেলবন্ধনে গভীরতা পেয়েছে।

২৮।৭।৭১

ভ্রমণ

তখন আমি প্যারিসে। নবশঙ্কর রায়-চৌধুরী। উত্তর প্রকাশন, ৯ কলেজ রো, কলকাতা—৯। মূল্য ঃ ছয় টাকা।

ধরে নেওয়া যায়, বইটি লেখকের আত্মকাহিনী। এক সময় তিনি প্যারিস গিয়েছিলেন এবং প্যারিস তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেই মুগ্ধবোধ-ই এই বই। আত্মকাহিনী লেখার দুটি উদ্দেশ্য সাধারণত থাকে। এক, লেখা হিসেবে সেটি অসাধারণ। দুই, যিনি লিখছেন, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা যদি মূল্যবান হয়। সেই অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পৌঁছে দেবার এক বিশেষ গুরুত্ব থাকে। যদিও বইটির পিছনের মলাটে লেখকের পরিচিতি এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি সাংবাদিক এবং ফিল্ম-টেলিভিশন-এর নাট্যকার হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন। রোবের্তো রোসেলিনির সহকারীরূপে চিত্রপরিচালনার কাজও করেছেন। কিন্তু বইটিতে তাঁর সেই সব কর্মিষ্ঠ ভূমিকার কোন পরিচয় নেই। বরং বই পড়ে মনে হবে, তিনি কর্মহীন, খোলা-মেলা জীবন-ই ভালোবাসেন। একের পর এক মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ার বৃত্তান্ত এই বই। লেখকের নিঃসঙ্গতা এবং উপর্যুপরি প্রেমে ব্যর্থতায় মমতা ও সহানুভূতি আসা উচিত। রচনার গুণ-ও অন্যান্য খামতিকে লেখক ঢেকে দিতে পারেন নি। তবে আত্মকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে পিছন দিকে আলো ফেলার প্রয়াসটি ভালো। এতে করে পাঠকরা শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি বিষয়ে অনেক খবর পেতে পারেন। ল্যুভ্‌-র কিউরেটার যে নন্দলাল বসু-র একখানি ছবি দয়া করে গুদামঘরে রাখতে চেয়েছিলেন, এ-সংবাদে অনেকে মজা পাবেন। এটা ঠিক যে, বইটি বেশ ঝরঝরে করে পড়া যায়।

সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস ক্রীড়াবিদ

চৌকস স্পোর্টসম্যান বলতে আমরা বুঝি যার সব খেলাধুলোতেই কিছু কিছু দখল আছে। নানা রকমের খেলাধুলোয় কিছু কিছু দখল অবশ্য অনেকেরই থাকে। ফুটবলে কিছুটা সুনামের সঙ্গে—ক্রিকেট ও হকিতে ভাল হাত, আথলেটিকসে খানিকটা দৌড়ঝাঁপ করা, আবার তারই সঙ্গে—একটু আধটু টেনিস বা টেবল টেনিস কিংবা ব্যাডমিন্টন অনেকেই খেলেছেন বা খেলছেন। কিন্তু প্রতি বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে পাঁচ রকমের খেলাধুলোয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এমন খেলোয়াড় আছেন কজন? কিংবা একজন মানুষের পক্ষে কত রকমের খেলাধুলোয় পারদর্শী হওয়া সম্ভব? দুই রকম? তিন রকম? বড় জোর চার রকম। তার বেশী খেলাধুলোয় যদি কেউ পারদর্শী হয়ে থাকেন, তিনি ক্রীড়া-জগতের ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, সত্যিই ক্রীড়া-জগতের ব্যতিক্রম বাংলার বলাই চ্যাটার্জি, সংক্ষেপে বি ডি চ্যাটার্জি অর ক্রীড়ামহলে শুধু বি ডি নামে যিনি পরিচিত।

বি ডি চ্যাটার্জীকে খেলাধুলোর কোন পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত বলব? স্বনামধন্য একজন ফুটবল খেলোয়াড়? নাকি একজন নাম-করা হকি খেলোয়াড়? না, ছক্কা মারে বিশেষজ্ঞ একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়?

এই তিনটি প্রধান খেলাতেই বলাই চ্যাটার্জীর প্রায় সমান দক্ষতা ছিল, যদিও জনপ্রিয় খেলা বলে ফুটবলার হিসাবেই খ্যাতি বেশী।

[illegible] বলাই চ্যাটার্জির মত অ্যাথলীট কজন পাওয়া যায়? আথলেটিকসের আবার একটি নটি বিষয়ে নয় দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট, শটপাট, ডিসকাস, হ্যামার, হার্ডলস প্রভৃতি সব বিষয়ে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর এবং বিশ দশকে বহু বিষয়ে বাংলার রেকর্ডের অধিকারী।

বলাই চ্যাটার্জীর মত বাস্কেটবল খেলোয়াড়ও কি তখনকার দিনে বেশী মিলেছে? বি ডি-র অধিনায়কত্বেই ১৯২৮ সনে ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠানে (জাতীয় খেলাধুলোর তখনকার নামকরণ ছিল ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠান এবং আথলেটিকসের সঙ্গেই অন্যান্য খেলাধুলো হত) বাংলার বাস্কেটবল দলের বিজয়ীর সম্মান।

বক্সার হিসাবেও বলাই চ্যাটার্জীর নাম সর্বজনবিদিত। বাঙালীর মুষ্টিযুদ্ধের জনক পি এল রায়ের পর বক্সার হিসাবে সবাই বি ডি এবং জে কে-কেই (পরলোকগত জে কে শীল) জানত। বলাই চ্যাটার্জি মিডলওয়েট বক্সার ছিলেন। তবে আর পাঁচ রকমের খেলার চাপে বক্সিং-এ খুব বেশী লড়াইয়ে নামতে পারেননি। ১৯২৪ সনে কলকাতায় কিংস কার্নিভাল স্টেডিয়ামে সার্জেন্ট ডোক নক-আউট করা ওঁর মুষ্টিযুদ্ধের বড় সাফল্য।

ফুটবল মাঠে 'তুম ভি মিলিটারি তো হাম ভি মিলিটারি' মন্ত্রের মহাগুরু বি ডি চ্যাটার্জী, গোরা সাহেবদের গা-জোয়ারী খেলার বিরুদ্ধে যাঁর বলবীর্য ও দুঃসাহসের কথা কিংবদন্তীতে পৌঁছেছে, স্বাভাবিক

বি ডি চ্যাটার্জি ক্রিকেট ব্যাট ধরা শেখাচ্ছেন তাঁর নাতি পিলুকে

কারণেই তাঁর অন্য খেলাধুলোর কৃতিত্বের কথা চাপা পড়ে গেছে। আজকের যারা তরুণ তাদের অনেকেই হয়তো জানে না এই সর্ববিদ্যাবিশারদ ক্রীড়াবিদের বহুমুখী কৃতিত্বের কথা। কারো মনে বা সন্দেহ উঁকি মারতে পারে। কিন্তু সন্দেহের কণামাত্র কারণ নেই। বরং আমি খতিয়ে দেখছি কৃতিত্বের কথা কিছু বাদ গেল কিনা।

হ্যাঁ, বাদ গিয়েছে বইকি। একটু-আধটু টেনিস বা ভলিবল খেলার কথা বলছি না। ভারতে অপ্রচলিত খেলা বেসবলের কথা বলছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈনিকরা যখন কলকাতায় মাঝে মাঝে বেসবল খেলত তখন বলাই চ্যাটার্জী নিজেই একটি বেসবল দল গঠন করেছিলেন। খেলতেন ক্যালকাটা মাঠে, পুলিস মাঠে। তা ছাড়া জাতীয় খেলাধুলো হাডু-ডুডুতেও বলাইদাকে নামতে দেখেছি।

অল-রাউণ্ডার সম্পর্কে এক ঘরোয়া আলোচনায় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রবীণ ক্রীড়াবিদ শ্রী এম দত্ত রায় বলছিলেন, তোমরা অল-রাউন্ডার বলে অনেককেই চিহ্নিত কর। কিন্তু সাহেবদের মধ্যে ক্যালকাটা ক্লাবের হোসী (পরলোকগত) আর ভারতীয়দের মধ্যে বলাই চ্যাটার্জীর মত অল-রাউন্ডার কজন মেলে? কোন খেলায় বলাইয়ের কৃতিত্ব কম?

সত্যিই তাই। বলাই চ্যাটার্জী ফুটবল খেলেছেন প্রথমে ওয়াই এম সি এ ও এরিয়ান ক্লাবে, পরে মোহনবাগানে। প্রথম দিকে লেফট ব্যাকে পরে সেন্টার হাফে। তখনকার দিনে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল (১৯২৩ সালে) খেলেছেন। রোভার্স, ডুরাণ্ডে খেলেছেন, খেলেছেন ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় দলের আন্তর্জাতিক ম্যাচে। সফর করেছেন জাভায় আই এফ এ দলের সঙ্গে। হকিতে মোহনবাগানের অধিনায়কত্ব করেছেন ১৯২৮ সনে। তখনকার প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট ভারতীয় স্কুল বনাম ইউরোপীয় স্কুলের খেলায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভারতীয় স্কুল দলের। বাস্কেটবল এবং বক্সিং-এর কথা আগেই বলেছি। বলা হয়নি অ্যাথলেটিকসে সর্বভারতীয় দক্ষতার কথা। ১৯২৪-এর বিশ্ব অলিম্পিকের ট্রায়ালের জন্য দিল্লীতে ডাক পড়ে বি ডি চ্যাটার্জীর। হাই জাম্প, লং জাম্প ও হার্ডলস—তিনটি বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। কোনো বিষয়ে প্রথম না হওয়ায় অলিম্পিক দলে স্থান পান না। মাদ্রাজ ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের ডিরেক্টর বাক সাহেব অল-রাউন্ডার হিসাবে বি ডি চ্যাটার্জীকে দলভুক্ত করার চেষ্টা করেও বিফল হন। সেখানেই বাক সাহেব বি ডিকে পরামর্শ দেন তাঁর কলেজে যোগদান করতে। পরে বি ডি ওই কলেজে যোগ দিয়ে ফিজিক্যাল ট্রেনিং সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

চৌকস ক্রীড়াবিদ বি ডি চ্যাটার্জির বড় অবদান খেলাধুলোর কলাকৌশল এবং গুণপনা নিজের মধ্যেই ধরে রাখেন নি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, এখনো চেষ্টা করে চলেছেন।

আমরা জানি, স্বনামধন্য চুনি গোস্বামী বি ডি চ্যাটার্জীর হাতে গড়া খেলোয়াড়। আরও বহু ফুটবলার, ক্রিকেটার, বক্সার ও অ্যাথলীট বি ডি-র হাতে তৈরী হয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বি ডি-র উপর মোহনবাগান, আই এফ এ ও ভারতীয় ফুটবল দলের কোচিং-এর ভার পড়েছে। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন

রেক্স জেলি ক্রিস্টালস্
ছ'টি মনোরম ফলের গন্ধে পাবেন। খুব দ্রুত আর সহজেই তৈরি করা যায়। ছোট বড় সবারই ভাল লাগবে।
REX
JELLY CRYSTALS LEMON
বি এণ্ড পি কাস্টার্ড পাউডার
আরো মোলায়েম, আরো স্বাদের আরো ক্রীমে ভরা। ডিমের কোন অংশ নেই। এ দিয়ে চমৎকার ফিরনী, আইসক্রীম, ক্ষীর প্রভৃতি তৈরি করা যায়। জেলি, ফলের স্যালাডের সঙ্গে মিশিয়ে খেতেও খুব ভাল লাগবে।
Brown & Polson
Custard
রেক্স বেকিং পাউডার
কেক, বিস্কুট, প্যানকেক, পুরী, গোলাপজাম ইত্যাদিতে ব্যবহার করুন। অল্প একটু মেশালেই বেশ হাল্কা হয়ে উঠবে।
REX
BAKING POWDER
ব্যঞ্জনকে চমৎকার বানাবার উপযোগী পদার্থ
ব্রাউন এণ্ড পলসন
এবং
রেক্স
অনেক রকম উৎকৃষ্ট উৎপাদন
মিষ্টি খাবারের জন্য বি এণ্ড পি ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার
পাঁচটি গন্ধে। দুধের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশিয়ে লোভনীয় মিষ্টি খাবার ও হালুয়া তৈরি করা যায়।
Brown & Polson
Flavoured Cornflour For Blancmanges
বি এণ্ড পি পেটেন্ট কর্নফ্লাওয়ার
স্যুপ, ঝোল ঘন করে তুলবে। ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা যাবে— মচমচে পাতলা খাবার, সিঙ্গাড়া আর প্যাটিস্। ছোটদের আর অসুস্থদের পক্ষেও ভাল।
Brown & Polson
Patent Cornflour
বি এণ্ড পি ভ্যারাইটি কাস্টার্ড পাউডার
পাবেন ছয়রকম মনোরম গন্ধে। এ দিয়ে তৈরি করা যায় নানারকম পুডিং ও মিষ্টি খাবার।
Brown & Polson
VARIETY CUSTARD POWDERS
SHB/7353-BEN
খাসা জিনিসে খাসা হয় যে খাবার,
রান্না আপনার সেই ত' সেরা সবার!
কর্ন প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রী নিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি.আর।

...লিম্পিকে গিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসাবে। ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকে গিয়েছিলেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলের ম্যানেজার হিসাবে। তা ছাড়া প্রথম এশিয়ান গেমসে ভারতীয় অ্যাথলেটিক দলের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বি ডি চ্যাটার্জি একটাই ক্যাম্প পরিচালনা করেন, যে ক্যাম্পের বহু সদস্য অলিম্পিকের দিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

বি ডি চ্যাটার্জির বয়স এখন ৭১ বছর। কিন্তু এখনো শিক্ষাদানে এতটুকু শৈথিল্য নেই। রোজ ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে যান ময়দানের দিকে। সি টি সি মাঠে নিয়মিত চলে অ্যাথলেটিক, ফুটবল ও হকি-র শিক্ষাদান। বিশেষভাবে মেয়েদের ফুটবল ট্রেনিংও আরম্ভ হয়েছে।

দেখিয়ে ৬৫-তম বছরে পা দিয়েছেন। বলাইদার কণ্ঠস্বর শোনা গেল "আমাকে তো বাড়িতে দেখা হবে না ভাই, আমি তো সকালে মাঠে থাকব"। মাঠের ট্রেনিং নিতে নিতেই শোনা গেল। ফুটবলের কোচিং, মল্লযুদ্ধ, অ্যাথলেটিকস এবং অন্যান্য খেলাধুলোয় জাজ এবং আম্পায়ার হিসাবেও বলাইদার খ্যাতি কম নয়।

মোটের উপর ক্রীড়াক্ষেত্রের বিরাট পুরুষ বলাই চ্যাটার্জী। সব দিক দিয়েই। দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি। খেলোয়াড়-জীবনে দেহের ওজন ছিল ১১ স্টোন, এখন ১৮ স্টোন।

দেখলাম ওঁর পার্শ্ববর্তী স্পোর্টসের বাড়িতে ক্রীড়াঙ্গন থেকে সংগৃহীত পুরস্কারগুলির প্রদর্শনী। রাশি রাশি কাপ, মেডেল, শীল্ড। একটি ছবি অবাক করার মত। ছবিতে দাঁড়িয়ে আছে ২৫ বছর বয়সের বলাই চ্যাটার্জি আর তার চারিপাশে থরে থরে সাজানো পুরস্কারসামগ্রী—গোটা আটেক চ্যালেঞ্জ শীল্ড, গোটা তিরিশ কাপ আর শখানেক মেডেল। মাত্র এক বছরের সংগ্রহ অর্থাৎ ১৯২৪ সনের। বলাইদা বললেন, "অনেক কাপ-মেডেল এদিক-ওদিক চলে গেছে আর সত্যিকার সোনার মেডেলগুলো ভেঙে তোর বউদির গয়নাগাটি করে দিয়েছি।" বলাইদার মুখে তখন সুন্দর হাসি, হাসির ফাঁকে সোনার দাঁতটা চকচক করছে। সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস ক্রীড়াবিদ বি ডি চ্যাটার্জি'র ক্রীড়া-কীর্তির কথা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মত।

ক্ষেত্রনাথ

বাংলা এবার রনজি জিততে কি করবে?

রনজি প্রতিযোগিতার দীর্ঘ ৩৭ বছরের ইতিহাসে যে বাংলা দল একবার ছাড়া জয়ী হতে পারেনি তারা এবার কি করবে? কটকে রনজি প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলীয় লীগে ওড়িশা ও আসামের খেলা এবং ওড়িশা ও বাংলার খেলা আরম্ভের স্বভাবতই এ প্রশ্ন মনে আসে।

এ লেখা পাঠকদের হাতে পড়বার অনেক আগেই ওড়িশা ও বাংলার খেলার ফলাফল জানা হয়ে যাবে, ততদিনে ইডেনে আসামের সঙ্গে বাংলার পরের খেলাও আরম্ভ হয়ে যাবে। তারপর বিহারে জামশেদপুরে বিহার বনাম বাংলার খেলা।

ভারতীয় ক্রিকেটে বাংলার স্থান অবশ্যই নগণ্য নয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ রনজি প্রতিযোগিতার পঞ্চম বছরে দক্ষিণ পাঞ্জাবকে ফাইনালে পরাজিত করে বাংলার যে দল রনজি ট্রফি পেয়েছিল সে দলেও ছিল ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের আধিক্য। তারপর বাংলা আর কোনবার রনজি ট্রফি জিততে পারেনি, যদিও পাঁচবার ফাইনালে উঠেছে। এই পাঁচবারের মধ্যে একবার করে পরাজিত হয়েছে পশ্চিম ভারত ও হোলকারের কাছে, শেষের তিনবার শক্তিশালী বোম্বাইয়ের কাছে। বলা বাহুল্য একবার ছাড়া প্রতিবারই বাংলাকে ফাইনালে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। শুধু ১৯৫২-৫৩ সালে ইডেনে সি কে নাইডুর হোলকার দলের বিরুদ্ধে পি সেনের অধিনায়কত্বে দক্ষতার এবং দুর্ভাগ্যের ফলে বাংলা জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও হেরে গেছে। রনজি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ওই ফাইনাল খেলাটাই সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ

শ্বাসরোধকারী খেলা যে খেলার শেষে বিজয়ী অধিনায়ক সি কে নাইডু পরাজিত অধিনায়ক পি সেনের বারবার পিঠ চাপড়ে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। সি কে নাইডু ও পি সেন দুজনই আজ পরলোকে। পি সেনের স্মৃতিতে আয়োজিত নক আউট প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে এবং রনজি প্রতিযোগিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বারবার সেই খেলাটির কথাই মনে আসছে। সে কথা থাক। দেখা যাক রনজি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের গতবারের ভূমিকা কি?

গতবার ইডেনে ওড়িশাকে এবং নওগাঁয় আসামকে ইনিংসে হারিয়ে বাংলা পূর্বাঞ্চলীয় লীগের শেষ খেলা ইডেনে বিহারের কাছে হেরে যায় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে। রনজি ট্রফির ইতিহাসে বিহারের কাছে বাংলার পরাজয়ের এটি দ্বিতীয় ঘটনা, ইডেনে বিহারের কাছে পরাজয় সর্বপ্রথম। তবু রনজি প্রতিযোগিতার নতুন নিয়মে আঞ্চলিক লীগের রানার্স দলও নক-আউটে খেলার সুযোগ পায়। ফলে রনজির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা বিদর্ভের সঙ্গে খেলার সুযোগ পায়। ইডেনে বিদর্ভকে প্রথম ইনিংসের ফলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে বোম্বাইয়ের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। বাংলা-বোম্বাই খেলাটিও হয় ইডেনে। কিন্তু বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা সব খেলোয়াড় ভারতীয় দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গেলেও বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় দল বাংলাকে পরাজিত করে প্রথম ইনিংসের ফলে।

নামে প্রথম ইনিংসের ফলে পরাজিত। আসলে কিন্তু বোম্বাইয়ের ওই দ্বিতীয় দলও বাংলার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয় দেয়। বাংলাকে ফলো-অন করতে হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংসে শ্যামসুন্দর মিত্রের দৃঢ়তাপূর্ণ ১৩০ (নট আউট) রান এবং চুনি গোস্বামীর ৪০ রানের জন্য ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

শ্যামসুন্দর মিত্রের ওই সেঞ্চুরি ছাড়া ওড়িশার বিরুদ্ধে নট আউট থাকার কৃতিত্ব সমেত ৯৯ রানও উল্লেখ্য। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রকাশ পোদ্দারের আসামের বিরুদ্ধে ৯৯ ও বিদর্ভের বিরুদ্ধে ১১৯ রান প্রশংসার দাবি রাখে। উল্লেখের দাবি রাখে বিদর্ভের বিরুদ্ধে দেবু মিত্রের ৯০ রানও। বোলারদের মধ্যে সুব্রত গুহ এবং দিলীপ দোশী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। ওড়িশার বিরুদ্ধে মাত্র ৪৯ রানে সুব্রতর ১২টি উইকেট লাভ জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং কৃতিত্ব। দিলীপ দোশী পান আসামের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ২৯ রানে ৭টি ও বিহারের বিরুদ্ধে ৮০ রানে ৭টি উইকেট।

গতবারের তুলনায় এবারকার বাংলা দল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। যেমন রেলের দীপঙ্কর সরকার এবং রাজা মুখার্জী এবার বাংলা দলে খেলবেন। তাছাড়া টেস্ট

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে বিদ্যাসাগর উইমেনস কলেজের ছবি হাজরা হাইজাম্পে রেকর্ড করছেন

খেলোয়াড় অশোক গান্ডোত্রা এবার এসেছেন বাংলায়, যদিও ওড়িশার বিরুদ্ধে তাঁকে দল-ভুক্ত করা হয়নি। পরে হয়তো দলভুক্ত হতে পারেন।

বাংলা ক্রিকেটের নতুন অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ফুটবলে খ্যাত চুনি গোস্বামী। তাই বলে কি ক্রিকেটেও খ্যাতি নেই? অবশ্যই আছে। ব্যাটে বলে ওঁর সমান দক্ষতা। অবশ্যই চুনি ফুটবলের মত ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠিত নন, সিরিয়াস ক্রিকেট আরম্ভও করেছেন অনেক দেরীতে ফুটবল থেকে সরে যাবার মুখে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, চুনি গোস্বামীই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটি প্রধান খেলায় বাংলার অধিনায়কের সম্মান পেলেন। দেখা যাক চুনির অধিনায়কত্বে বাংলার ক্রিকেট দল এবার কি করে।

ক্রিকেটের আলোচনা প্রসঙ্গে ইডেনে অনুষ্ঠিতব্য 'রাবার' বিজয়ী ভারতীয় দল ও অবশিষ্ট ভারতীয় দলের খেলাটির কথা বলা যেতে পারে। বাংলা দেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য এই চার দিনব্যাপী বিশেষ খেলাটি ইডেনে ৩০ ডিসেম্বর থেকে আরম্ভের কথা। এইটিই এবারকার ক্রিকেট মরসুমে কলকাতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে খেলাটি বাংলার ক্রীড়ামোদিদের হাল্কা আনন্দের খোরাক যোগাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ বাংলা বলতে আমি পশ্চিম বাংলার ক্রীড়ামোদিদেরই বোঝাতে চাইছি। বাংলা দল অর্থে পশ্চিম বাংলার দল। দেশ বিভাগের পর কিছুকাল বাংলাকে পশ্চিম বাংলা দল হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তারপর বাংলা নাম থেকে 'পশ্চিম' লেজুড়টি প্রায় খসে পড়েছে। এখন আবার নাম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে বাংলা দেশ (প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হওয়ায়। স্বভাবতই স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলোর যোগাযোগ থাকবে। আমাদের খেলাধুলোর নানা প্রতিযোগিতায় ওদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে। এমনকি আমাদের জাতীয় কোনো কোনো ক্রীড়া অনুষ্ঠানেও ওদের অংশ গ্রহণের কল্পনা অবাস্তব নয়। সিংহল পৃথক দেশ হওয়া সত্ত্বেও তো ভারতীয় টেবল টেনিস ফেডা-রেশনের সদস্য ছিল। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশের দলের সঙ্গে আমাদের পশ্চিম বাংলার পার্থক্য বুঝাতে এর পর হয়তো পশ্চিম বাংলার দলকে শুধু 'বাংলা দল' এবং বাংলাদেশের দলকে 'বাংলাদেশ' দল নামে অভিহিত করতে হবে।

অন্তর্কোন্দলের শিকার খেলোয়াড়

ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশাসনে অন্তর্কোন্দলের অন্ত নেই। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনীকুমারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের আয়োজন এবং হকি ফেডারেশনের বার্ষিক সভার স্থান নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যুদ্ধের ডামাডোলে সভা স্থগিত হওয়ার আপাতত সেটা ধামাচাপা পড়েছে, কিন্তু অন্তর্কোন্দলের এক নতুন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে জাতীয় টেবল টেনিসে বাংলার দল গঠনকে কেন্দ্র করে।

বাংলার টেবল টেনিস প্রশাসনে আগেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, এখনো আছে। কিন্তু জাতীয় আসরের দল গঠনে সেই দ্বন্দ্বের চেহারাটা ফুটে উঠেছে দুটি কাণ্ডের মধ্যে। খেলোয়াড়রা হয়েছেন কোন্দলের শিকার।

আশ্চর্যের কথা বাংলা দলে তরুণের প্রাধান্যের যুক্তিতে দল থেকে বাদ পড়েছেন বাংলার এক নম্বর ও দুই নম্বর খেলোয়াড় অজিত বসু ও দীপক চ্যাটার্জি। শুধু তাই নয় অমৃত খোসলা, এস এস বসু, ডি বর্মা এবং প্রমোদ নারায়ণের মত নাম করা খেলোয়াড়দেরও দলে নেওয়া হয়নি। আবার তরুণের উপর জোর দিয়েই যদি দল গড়া হয়ে থাকে তবে মাইকেল মারের মত উদীয়মান খেলোয়াড় দল থেকে বাদ গেলেন কেন?

আসল কথা রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার কর্মকর্তাদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণই ওই খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের দল থেকে ছেঁটে বাদ দেবার কারণ। ওই প্রতিযোগিতাটি কিন্তু রাজ্যের র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতারই অন্তর্ভুক্ত।

আমরা জানি টেবল টেনিস খেলার উন্নতির জন্য রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থা কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, কিছু কিছু কোচিং ক্যাম্প খুলেছেন। কিন্তু খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের উপর ক্রোধের খড়্গ তুলে তাঁরা যেভাবে দল থেকে তাঁদের জবাই করলেন সেটা কোনমতেই সমর্থনীয় নয়। নিয়ম কানুনের বাঁধাধরা পথে বিদ্রোহীকে অবশ্যই তাঁরা শাস্তি দিতে পারেন যদি সত্যি সত্যিই প্রশাসনের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কেউ বিদ্রোহ করে থাকেন, কিন্তু নিয়মানুগ র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অজুহাতে খেলোয়াড়দের শাস্তি দিতে পারেন না।

একলব্য

"বিরাজ বৌ" (পরিচালনা : মানু সেন) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার

লণ্ডনে "অরণ্যের দিনরাত্রি"

সত্যজিৎ রায়ের "অরণ্যের দিনরাত্রি" ছবিটি লণ্ডনে মুক্তি পাবার পর দর্শক ও সমালোচক মহলে খুবই সাড়া জাগিয়েছে। কলকাতায় "অরণ্যের দিনরাত্রি"-কে যে যাই বলে থাকুন, বিদেশের সমালোচকেরা কিন্তু বলছেন, এই ছবি শ্রী রায়ের "অপু ট্রিলজি"-র মতই অসাধারণ। বিদেশের সমালোচকদের বিচারে "অরণ্যের দিনরাত্রি" যে হেডলাইন পেয়েছে তার কয়েকটি হল : 'Fine Indian Film in a Chekhov vein", "Just as good as his great early trilogy", "New departure for Ray." ইত্যাদি।

শেষের হেডলাইনটিই সমালোচকদের আলোচনার মূল বিষয়। এই ছবিতে তাঁরা এক নতুন সত্যজিৎকে খুঁজে পেয়েছেন। অনেক সমালোচক বলেছেন Satyajit Ray continues rewardingly to widen his range, moving from the romantic to the realistic. ...সে ওই সমালোচক "প্রতিদ্বন্দ্বী" দেখে ...খ হয়েছিলেন। তারপর তিনি "অরণ্যের দিনরাত্রি" দেখে বলেছেন, ...w with **Days and Nights in the** Forest, he provides a realistic contemporary comedy that seems to be quite as bitter as funny.

"দি গার্ডিয়ান" কাগজের সমালোচনা ...। সমালোচক স্পষ্টতই বলেছেন, ...র ট্রিলজির মত চমৎকার ...সত্যজিৎ রায় আর করতে পারলেন না একথা সবাই বলেন। আমি তা মানি না। সমালোচক ডেরেক ম্যালকমের কথায়— ...has never, one hears it said, ...ne anything as fine as the early ...logy. I disagree. "Days and Nights" bears me out."

শ্রী রায় গ্রামজীবনের গল্পেই তুষ্ট থাকতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের জীবনের কাছাকাছি চলে এলেন। এবং এই জীবনের সংকট ...লেন। "অরণ্যের দিনরাত্রি" দেখাবার আগে বাংলাদেশের উপর একটি ডকুমেণ্টারি ছবি দেখানো হয়েছিল। তার উল্লেখ করে সমালোচক বলেছেন, "Yet there is no doubt which is the profounder document of a society in crisis : it is Ray's.

"সান ফ্রান্সিসকো এগজামিনার" পত্রিকার সমালোচক অন্যান্যের মত "অরণ্যের দিনরাত্রি"-তে অভিনবত্ব দেখেছেন। তিনি বলেছেন, His new movie is as subtle and thoughtful as anything India's foremost director has done, though it's rather different from his previous work in that it's distinctly Chekhovian in mood and acting."

প্রায় সব কাগজের সমালোচনাতেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকো এগজামিনার বলেছেন—
Ray based his script on a story by Sunil Ganguly and it's a languid, almost uneventful contemporary tale about four young men.

বিদেশের কাগজের বিভিন্ন সমালোচনা পড়ে মনে হয়, সমালোচকরা শ্রী রায়ের এই ছবিকে তাঁর একটি প্রধান চলচ্চিত্রকর্ম ('মেজর ওয়ার্ক') হিসাবেই মর্যাদা দিয়েছেন। ওই সব সমালোচনার আলোকে "অরণ্যের দিনরাত্রি"-র নতুন মূল্যায়ন এখানেও হতে পারে।

সংগীত গ্রহণ

দীনেশ চিত্রম নিবেদিত "বহুরূপী" (পরিচালনা : নবজাতক) ছবির কাজ সম্প্রতি সংগীত গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অজয় দাসের সংগীত পরিচালনায় এ ছবির কণ্ঠশিল্পী হলেন : মৃণাল চক্রবর্তী, বনশ্রী সেনগুপ্তা ও নবাগতা মীনা মুখোপাধ্যায়। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং নবাগতা মণিকা এ ছবির প্রধান শিল্পী। প্রণব রায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

*

মুনলাইট ফিল্মস-এর প্রথম প্রয়াস "নয়া মিছিল" (কাহিনী : সুখেন দাস) ছবির কাজও সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সংগীত গ্রহণ মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এ ছবিরও সংগীত পরিচালক অজয় দাস। পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পী হলেন অনুপকুমার, সুখেন দাস, চন্দ্রাবতী দেবী, শমিত্র বিশ্বাস, শ্যামল ঘোষাল।

॥ নাটক ॥

ক্যাপটেন হুররা

মঞ্চক

নক্ষত্র-গোষ্ঠীর নাটক প্রযোজনা "ক্যাপটেন হুররা" অনেক দর্শকেরই দেখা হয়ে গেছে। নাটকটি এখন বহু-আলোচিত, বিশেষ করে অভিনয় ও প্রযোজনার গুণের জন্য। "ক্যাপটেন হুররা" দেখতে বসে এক মুহূর্তের জন্যও মঞ্চ থেকে চোখ ফেরানো যায় না। পূর্ণেন্দু পত্রী-কৃত মঞ্চ-অলংকরণ (এর জন্য শিল্পী আগেই পুরস্কৃত) প্রথমত চোখ আকর্ষণ করে রাখে। মঞ্চে অনেক কিছু রেখেছেন তিনি যার তাৎপর্য খুঁজতে হয় না। শ্রী পত্রীর মঞ্চ-পরিকল্পনা ও নন্দেন্দু সেনের মঞ্চস্থাপত্যের সঙ্গে যোগ রয়েছে স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোকপাত। নাটকের সঙ্গে এই ত্রিমূর্তির সম্পদের যোগ

গভীর, একটি অপরটির পরিপূরক বলা যেতে পারে। নাটকটি (মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত) নিয়মলিক বলেই এতে মঞ্চ-পরিকল্পনার ভূমিকা খুব বড়।

নাটকের শুরুতে ক্যাপটেন হুররাকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে এক নির্মম ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হয়। সাসপেন্স কেটে যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই, যখন চৌধুরীর সঙ্গে কালো চশমাপরা জ্যাঠামণি প্রবেশ করেন। ক্যাপটেন হুররার অদ্ভুত জাহাজে নবদম্পতি সুনীল-ইরা রীতিমত বন্দী। তারা তখনো অন্ধকারে, কে সৎ কে শঠ বুঝতে পারছে না।

"সংসার" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে নন্দিনী মালিয়া, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি ম্যাপের জন্য দুই পক্ষই অস্থির—জ্যাঠামণি এবং ক্যাপটেন হুররা। শেষ সময়ে দুই পক্ষেরই স্বরূপ স্পষ্ট। জ্যাঠামণি ওই পক্ষে যারা নতুন পথে মানুষের যাত্রা অবরোধ করে রাখতে চায়। যাদের চালচাতুরি অতি জঘন্য। নাটকে ম্যাপটা আসলে ওই নতুন পথের, নতুন জগতের সন্ধান। সুনীল-ইরার কাছে নাকি ওই ম্যাপটি আছে—তাই তাদের উপর কড়া নজর জ্যাঠামণির, কড়া নজর ক্যাপটেন হুররা-র। সুনীল-ইরার কাছ থেকেই শেষ অবধি নতুন দুনিয়ার পথচিহ্ন পাওয়া গেল। বান্দদশা থেকে হঠাৎ জেগে উঠল সুনীল-ইরা, আর সকলকে ডেকে নতুন পথের সন্ধান দিল। কোন ম্যাপ তাদের ছিল না ঠিকই, কিন্তু নতুন পথে চলবার প্রেরণা তাদের মধ্যেই সুপ্ত ছিল। সেটা জাগবার পর জানা গেল, ক্যাপটেন হুররাও ওই পথের সন্ধানেই ঘুরছেন জাহাজ ভাসিয়েছেন ওই সুন্দর দেশের উদ্দেশ্যে।

নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেশাত্মবোধের ভাবনা, মাতৃভূমির কথা, স্বদেশী গানের সুরও বাজানো হয়েছে। এই ক্লাইম্যাক্স নতুন। নতুবা শুরু থেকেই সন্দেহ জাগে নাটকটি বুঝি ওই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি যাতে একপক্ষ বরাবরই অতিশয় শয়তান অপরপক্ষ সকল অবস্থায় অতিশয় সাধু, যা শোষণ মঞ্চে নিরন্তর শোনা যায়। নাটকটি মূলত অবশ্য ওই একই বক্তব্যাশ্রয়ী, তবে শেষ মুহূর্তে যে দেশবন্দনার কথা শোনা গেল সেখানেই তৃপ্তি।

সুষ্ঠু পরিচালনার (শ্যামল ঘোষ-কৃত) জন্য নাটকটি গতিসম্পন্ন, কৌতূহলোদ্দীপক। কৌতুকরসও নাটকে রেখে দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে। যে-কারণে "ক্যাপটেন হুররা" আগাগোড়া উপভোগ্য।

তা-ছাড়া অভিনয় প্রায় সকলেরই উঁচু মানের। শিল্পীরা হলেন শ্যামলবরণ ঘোষ (সুনীল), শর্মিষ্ঠা ঘোষ (ইরা), তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্যাপটেন হুররা), অমল চক্রবর্তী (গুগলু), শ্যামল চক্রবর্তী (যুবক), নিতাই দে চৌধুরী, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত (ফান্টুস) এবং জহর দাশগুপ্ত (জ্যাঠামণি)। ক্যাপটেন হুররা, গুগলু ও জনৈক যুবকের চরিত্র অভিনয়ের পারদর্শিতার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিচিত্রা

ছবি রিলিজের সবচেয়ে ভাল মরসুম এইটেই। দেওয়ালী, ক্রীসমাস, স্কুল-কলেজের ছুটি ঈদ ইত্যাদি আসে পর পর। তার ওপর বর্ষা বাদল নেই। গরমের ঘামটাও কম। এই সময়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দামও একটু কম থাকে। সুতরাং সব প্রযোজক এবং পরিবেশকই চান তাঁদের ছবি এই সময়ে রিলিজ হোক। যখন বোম্বাই-এর মত বড় শহরে ছবি রিলিজের ধুম ওঠে, সেই সময়ে চিত্র-সাংবাদিকদের বাজারদরও একটু বেড়ে যায়। হিন্দী ছবির রিলিজ-উত্তর প্রভাবের দিক থেকে বোম্বাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রদর্শন-ক্ষেত্র। কারণ চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বভারতীয়

পত্রপত্রিকগুলির কেন্দ্রস্থল বোম্বাই। কোলকাতা বা দিল্লিতে আগে ছবি রিলিজ হলে তার প্রভাব সর্বভারতীয় জনমানসে ছড়াতে সময় লাগে, কিন্তু ছবি যদি প্রথম বোম্বাইয়ে রিলিজ হয় তা হলে নানা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির খবর ছড়িয়ে পড়ে ভারতময়। বোম্বাই-এ প্রথমে ছবি রিলিজ হলে ছবির নির্মাতাদের সুবিধা হয়, একথা সারা ভারতের প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা এবং চিত্র-পরিবেশকরা খুব ভালভাবেই জানেন। সেই কারণে ও অঞ্চলে ছবি রিলিজ করার মত প্রেক্ষাগৃহ আর নেই। প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের চাহিদার অন্ত নেই, চিত্র-সাংবাদিকরাও নানা রকম আবদার করতে ছাড়েন না।

কয়েকদিন আগে এক পাবলিসিটি ম্যানেজারের দুর্দশা দেখে আমার বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। ভদ্রলোক নেহাৎ-ই পেটের দায়ে বা ব্যবসার খাতিরে বেশ কয়েকটি বড় চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের পাবলিসিটির কাজ করেন। ছবি রিলিজের আগের সমস্ত ধকল এই পাবলিসিটি ম্যানেজারের। কয়েক সপ্তাহ পরে একই দিনে দুটি ছবি রিলিজ হবে। এই দুটি ছবিরই পাবলিসিটির কাজ করছেন একই ব্যক্তি। মহাধুমধাম করে প্রিমিয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে দুটি ছবিরই। দুটি ছবির জন্যই নিমন্ত্রিত স্থানীয় চিত্র-সাংবাদিকরা! চিত্র-সাংবাদিকদের বিশেষ ভাবে আপ্যায়ন করবার জন্য দুই প্রতিষ্ঠানই, ককটেল এবং ডিনারের বন্দোবস্ত করছেন। এবং দুই দলই চাইছেন একটি বিশেষ দিন, বিশেষ একটি সময়। কিন্তু একই দিনে, একই সময়ে দুটি ছবি দেখা, দুটি ডিনার এবং ককটেল অ্যাটেন্ড করা একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং পাবলিসিটি ম্যানেজার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছেন। ভদ্রলোকের বিচক্ষণ সহকারী বুদ্ধি দিলেন, একজনের অ্যাকাউন্টে ককটেল হোক, আরেকজনের অ্যাকাউন্টে হোক ডিনার। ছবি রিলিজের আগেই দেখিয়ে দাও। আর ছবি করা পাবলিককে এনটারটেন করতে, কিন্তু চিত্র-সাংবাদিকদের শুধু ছবি দেখিয়ে এনটারটেন করা যায় না, সুতরাং ককটেল এবং ডিনারকে আলাদাভাবে কাজে লাগাও। প্রডিউসররাও খুশ, সাংবাদিকরাও খুশ।

টেলিফোনে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে বকর বকর করে নির্মাতাদের জানালেন পাবলিসিটি ম্যানেজার। তারপর নেমন্তন্নের লিস্ট নিয়ে বসলেন। মধ্যে মাত্র তিনটে দিন সময়। এই অল্প সময়ে সব ঠিক করে ফেলতে হবে। সুতরাং নেমন্তন্ন সব হ্যান্ড ডেলিভারি হবে। ডাকের ওপর ভরসা করা যায় না।

তিনজন টাইপিস্ট ফটাফট খাম টাইপ করে ফেললেন। আমরা তখন কফি খাচ্ছি। দুজন পিওন খামগুলো নিয়ে রওনা হবে এমন সময় বন্ধুবর পাবলিসিটি ম্যানেজার হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। পিওনদের ডাকলেন কাছে। তারপর বললেন, "দ্যাখো, যাদের নেমন্তন্নর চিঠি দিচ্ছো তাদের সকলের কাছ থেকে তাদের স্বহস্তে লেখা বাড়ির ঠিকানা নিয়ে আসবে। যে বাড়ির ঠিকানা দেবে না, তাকে নেমন্তন্নর চিঠি দেবে না। বুঝলে!" 'ঠিক আছে' বলে পিওন চলে গেল। ভদ্রলোক শান্ত হয়ে বসলেন। আমি জিগ্যেস করলাম, "এটা ক্যামন ধারা ব্যাপার হোল?" ভদ্রলোক বললেন, "আর বলবেন না মশাই, এই সব ককটেল ডিনার যখন শেষ হয় তখন অন্তত পাঁচ-সাতজন এমন অবস্থায় থাকে যে নিজের বাড়ি চিনতে পারে না। তখন আমাদের নাকালের অন্ত থাকে না। এই গত সপ্তাহেই, ঐ রকম একজনকে আন্দাজে বাড়ি পৌঁছাতে গিয়ে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি। এই অভিজ্ঞতার পর ঠিক করেছি, নো বাড়ির ঠিকানা—নো ককটেল-ইনভিটেশন।" বুঝলাম। হাসি পেল আবার পেলও না। ভদ্রলোক বললেন, "সবই কপাল মশাই, যখন এ কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল কাজটা বেশ, এখন মনে হয়, এরকম কাজ করার চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও ঢের ভাল।" মন্তব্য করলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে লাগবে ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কফির কাপে চুমুক দিলাম।

সরল শর্মা

চিৎপুর-চিত্র

সাধক বামাক্ষ্যাপা

রস হিসাবে ভক্তিরস, চরিত্র হিসাবে 'বামাক্ষ্যাপা'—সকল বাঙালীর মনের মণিকোঠায় এ-দুইয়ের জানাই বুঝি কিছু ঠাই করা রয়েছে। না থাকলে তারাপীঠের

এলিট সিনেমায় এই সপ্তাহের ছবি "আনা কারেনিনা"-র একটি দৃশ্য

অলৌকিক কাহিনীর পটে আঁকা 'সাধক বামাক্ষ্যাপার' অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অগণিত দর্শকের এত আত্মার যোগ কেন থাকবে? কেন এই চরিত্রটির আনন্দকালে ও'রা উৎফুল্ল হবে, বিপদে ও দুঃখে কেঁদে ভাসাবে, যন্ত্রণায় আশ্চর্য, ঠিক যেন বামাক্ষ্যাপার কণ্ঠে কঁকিয়ে উঠবে! নিউ গণেশ অপেরার 'সাধক বামাক্ষ্যাপা'র প্রয়োজনা সত্যিকারের মন কেড়ে না নিতে পারলে নিশ্চয় দর্শক এমন করে রেসপন্স করতে পারত না। অবাক হয়ে দেখেছি, তারাপীঠের পাগল ঠাকুররূপে খ্যাতনামা অভিনেতা গোপাল চাটুজ্জে মশাই যখনই যাত্রার আসরে এসেছেন তখনই দর্শকমহলে মৃদু গুঞ্জন উঠেছে।

'সাধক বামাক্ষ্যাপা' পালার কাহিনী শুরু হয়েছে বামাচরণের যৌবনকাল থেকে। তারাপীঠের কাছারিতে তখন নাটোর রাজবাড়ির অন্যতম নায়েব ভবতু মৈত্র আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। তার বয়স ষাটের কাছে অথচ ঘরে ষোড়শী বধু। মৈত্র মহাশয়ের অতি চালাকির প্রথম শিকার হয়েছিলেন বামাচরণ। কাছারিবাড়ির যাবতীয় কর্মচারী এবং তারাপীঠের পাণ্ডাদের নিয়ে তিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন যাতে নাটোরের রানী তাঁর স্বপ্নাদেশ মতন তারাপীঠের প্রধান পুরোহিতরূপে বামাচরণকে নিয়োগ না করতে পারে। এই নিয়ে নাটকের দ্বন্দ্বজাল গড়ে উঠেছে। এবং সেই দ্বন্দ্ব ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে এমন একটি নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করেছে, যা স্বচক্ষে না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করাই কঠিন।

নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর এই পালায় বামাচরণের সংসারের দৈন্যকে বড় করে দেখানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু মানুষটির চৈতন্য নেই। সে বিশ্বাস করতে

তার কল্পিত মা সত্যিই সংসারের অভাব মোচন করবে। প্রয়োগে সত্যিই সেই দেবী মানবীরূপে আসরে এসেছে, এবং তাঁর সাধের সন্তান 'বামার' সকল ইচ্ছাই তিনি পূর্ণ করেন। কালো রঙের ওই মেয়েটিই তারাদেবীর মানবীরূপ। আসরে সে যতবার এসেছে—কথা কইতে কইতে কি গান গাইতে গাইতে, অমনি সকল দর্শকের মতন আমার দু' চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে পারে নি। এ কৃতিত্ব পালাকারের একার নয়, প্রয়োগকর্তার একার নয়, দুয়ের ভক্তি ও বিশ্বাসেই এই জাদুমুহূর্তগুলি রচিত হতে পেরেছে, যা মানুষকে, আমাকেও স্ব-অস্তিত্বের কথা ভুলিয়ে দিতে পেরেছে।

পালার প্রযোজনা অত্যন্ত সুচিন্তিত। ভক্তি এবং আবেগ দুই রসই প্রধান। এবং তাকে যথাযথ কাজে লাগাবার জন্যে আশ্চর্য কয়েকটি নাটকীয় এবং বিস্ময়কর অলৌকিক মুহূর্ত রচিত হয়েছে। জনমনে এই টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া যেন ম্যাজিকের মতনই কাজ করে। আলো অন্ধকারে সেই কালো মেয়েটা হঠাৎ কালী হয়ে গেল কী কৌশলে, কী সাধনায় বামা তারামায়ের এত করুণা পেল—এ-সবই বলিষ্ঠ অভিনয় এবং সুস্থ প্রয়োগচিন্তার মাধ্যমে উপস্থিত। ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস যাঁরা নাও করেন, তেমন এক ব্যক্তি আমার পাশে বসেই হাপুস নয়নে কাঁদছিলেন। সুতরাং নিউ গণেশ অপেরার এই পালা-উপহারের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বুঝি আর প্রশ্নই ওঠে না।

অভিনয় সম্পর্কে আগে বলেছি, আবার বলছি, এর সাফল্যের মূলে রয়েছে অসম্ভব শক্তিশালী দলগত অভিনয়। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি শিল্পী সুচিহ্নিত হবার উপযুক্ত। বিশেষ করে গোপাল চাটুজ্জে মশায়ের বোধ হয় তুলনাই হয় না। এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিনয় বলা যেতে পারে। এখানে তিনি নেচেছেন, গান গেয়েছেন এবং মধুর ও উদাত্তকণ্ঠে বাস্তবিক 'বামা' চরিত্রটি যেন তিনি সৃষ্টি করেছেন। ওঁর পাশাপাশি ছিলেন মিত্রা চ্যাটারজি। এই শিল্পীর 'তারা মা'ও অপূর্ব সৃষ্টি। কয়েকটি আশ্চর্য মুহূর্তকে তিনি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠের গান দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। অভিনয়েও তিনি অপূর্ব। মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'সাধন' সার্থক। ভাবা যায় নি এই শিল্পী এমন একটি রঙ্গরসের চরিত্রকে এত নিখুঁতভাবে আঁকতে পারবেন। মোহিত বিশ্বাসের 'ব্রজবাসী' ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। এ চরিত্রের ভাবাবেগ সংযত—যেন যেখানে যতটুকু আবেগ দেওয়া দরকার তার একবিন্দু অধিক তিনি ব্যবহার করেন নি। আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গাদাস' সুচিত্রিত। গোকুল দে (ভরত মৈত্র) খলনায়ক হিসাবে চমৎকার। পৃথ্বীশ রায়, সুধীর অধিকারী, অনিল দাস, দাশরথি শেঠ, আরতি দত্ত, দীপ্তি দাস ও বীথিকা বাগচী অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন।

পঞ্চানন মিত্রের দেওয়া সুরে পালার প্রত্যেকটি গানই সুগীত হতে পেরেছে।

—সূত্রধার

সোনাল মানসিংহের নৃত্যানুষ্ঠান

কলামন্দিরে (৩রা ডিসেম্বর) শ্রীমতী সোনাল মানসিংহের ভারত নাট্যম ও ওড়িশী নাচ দেখার সময় বারংবার মনে হয়েছে এই বন্দেধর বাজারে নাচগান কি বিলাসিতা নয়? কিন্তু উত্তর মিলেছে ঐ নাচের মধ্যেই যার সারমর্ম মোটামুটি মনীষী রোম্যা রোলাঁই তাঁর শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লেখা একটি চিঠিতে বুঝিয়েছেন। রোল্যাঁ বলছেন, the more downtrodden a community, the greater its spiritual need of art. The more grinding the miseries from without, the more fortifying the consolation from within."

খানিক পরে রোলাঁ আবার বলছেন, The more you try to crush the spirit of a people, the more they turn back to their inner resources of which art is an outflowing". তাই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নৃত্যব্যাখায় শ্রীমতী মানসিংহ যখন 'ভাও' দিচ্ছিলেন তখন যুদ্ধসন্ত্রস্ত যে কোন নগরবাসীই এক ধরনের স্পিরিচুয়াল রেজিসট্যানস-এর সহানুভূতিতে ভরে উঠেছেন। হয়ত মনে মনে একথাও স্বীকার করেছেন যে, যে কোন পরিস্থিতির মধ্যেই সংগীতকলার একটা বিশেষ প্রয়োগ রয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগে শ্রীমতী মানসিংহ নেচেছিলেন ওড়িশী নাচ। তাঁর এই নাচের সূচীতে ছিল মঙ্গলাচরণ, পল্লবী, অষ্টপদী, এবং বৈদেহীশ বিলাস। এই নাচগুলির প্রধান সম্পদ একটি বিশেষ কাব্যিকতা। ছন্দ, লাস্য, ভাব এবং সর্বোপরি মুদ্রাকল্পনা হল ওড়িশী নাচের মৌলিক অলংকরণ। এবং কলিঙ্গদেশের প্রস্তর-শিল্পের মধ্যেই সেই অঙ্গগুলি ভাস্বর। সোনাল মানসিংহের নাচের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তাঁর লয় ও অভিনয়ের প্রস্তুতিতে সেই শিল্পকার্যের প্রতি সুচারু আনুগত্য। কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিমায় তাঁকে জীবন্ত কোনারক মনে হয়েছে। এবং ওড়িশী নাচের প্রশংসায় এর থেকে বেশী কিছু বলার অবকাশ নেই। প্রায়শ মনে হয়েছে সোনালের নাচগুলি বেশ তৈরী। তবে কতকগুলি মুদ্রায় সামান্য সামান্য জড়তাও নজরে পড়েছে। অর্থাৎ যে শ্রেণীর কল্পনা বা ডিজাইন বা তাৎপর্য নিয়ে তিনি কাজ করেন তার জন্য আরও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা দরকার। এবং সে ব্যাখ্যা তৈরী হবে আরও প্রগতিশীল ভাবের ব্যাখ্যা। শ্রীমতী মানসিংহকে সমালোচনা করা দুষ্কর কারণ তাঁর নাচের স্বপক্ষে এত কথা বলার আছে যে গোটাকয়েক ভাবের হেরফেরে তাঁর নাচ মোটেই ব্যতিব্যস্ত নয়। যে বিষয়গুলি শ্রীমতী মানসিংহ নেচেছেন সেগুলি প্রায়ই আমরা অন্যের নাচে দেখেছি। কিন্তু যে সোহাগে সোনাল সেগুলিকে মূর্ত করেছেন সে স্টাইল অবশ্যই প্রশংসনীয়। আর একটি কথা বলে রাখি। ওড়িশী নাচে যে দর্শন আছে তার মূর্তির জন্য সংযম প্রয়োজন। ফলে লয়ের হিসেব জানাও মানা দরকার। শ্রীমতী মানসিংহকে খুব সংযমী, বিদুষী ও কলাবতী মনে হয়েছে তাঁর নাচের সময়। এটাই ওড়িশী নাচের আদত মুড্।

ভারত নাট্যমে শ্রীমতী মানসিংহ আরও খোলা মেজাজে নেচেছেন। তাঁর নাচে ছিল তিল্লানা, শব্দম্, পদম্ ও মন্দাদরী শব্দম্। ভারত নাট্যমও ভাবপ্রধান। ভাব এবং ব্যাকরণ দুটোই সোনাল বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছেন তাঁর অনুশীলনে। ভারত নাট্যমের চরিত্রসৃষ্টিতে সোনাল সেদিন কোন খেলাপ করেননি। বরং তিল্লানার সময় অঙ্গবিচারের নিপুণতায় দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। বিরতির পূর্বের ওড়িশী ও পরের ভারত নাট্যমের কলাপ্রকরণের বিভেদচিহ্নগুলি সহজেই দর্শকদের চক্ষুগোচর হয়েছে কারণ শ্রীমতী মানসিংহ বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গেই দু-দুটি নাচের পরিপ্রেক্ষিতগুলি শুদ্ধ রেখেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার জন্য ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের ছাত্র সংসদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

নৃত্য-সমালোচক

নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান

ন্যাশনাল কোম্পানী স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের চতুর্থ বার্ষিকী সাংস্কৃতিক উৎসব গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে সুসম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে "বহ্নিশিখা" (রচনা : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত) নাটক অভিনীত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচী ছিল বিচিত্রানুষ্ঠান। নাটকটির সাফল্যের কৃতিত্ব নাট্য পরিচালক বিশিষ্ট অভিনেতা নিমু ভৌমিকের প্রাপ্য। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে প্রশংসাযোগ্য। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ভট্টাচার্য, আর কে আগরওয়ালা, মিঃ বক্সীতরা, যূথিকা ভট্টাচার্য, মীরা চক্রবর্তী, শান্তশ্রী রায়, শম্ভু মণ্ডল, গীতা নাগ, অজয় সেনগুপ্ত, অনিল মজুমদার ও নিমু ভৌমিক।

বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, সুপ্রকাশ চকী, বুবাই বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, কণিকা ধর চৌধুরী, বলরাম দাস প্রাক্তণী মজুমদার এবং জহর রায়।

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

অভিশাপ ফিরিয়ে নিল পাহাড়ী ডাইনী ....
যুবরাজরা ভাল হয়ে উঠুক।

'তাই হল। শুনেছি, একজন যুবরাজ তার কবরের ভিতর থেকে উঠে এসেছিল।'

পাহাড়ী ডাইনী, যুবরাজরা যে সত্যিই সুস্থ হয়েছে, তা আমি বুঝব কী করে?
বাইরে এলেই বুঝতে পারবে

হ্যাঁ অরণ্যদেব, আমাদের ছেলেরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

তাহলে এবারে আমি যেতে পারি।
সে কী! তুমি এখানে থাকবে না? আমার রূপ দেখে কি তুমি তাহলে খুশী হওনি?

বেশ, আমি তাহলে ফরাসী-দেশের রানী হলাম। এখন তুমি খুশী তো?
!
4/25

নাকি আমাকে ক্লিওপেট্রার চেহারায় দেখলে তুমি খুশী হও?
!

নাকি তোমাকে এখানে ধরে রাখবার জন্যে আমাকে ট্রয়ের হেলেনের চেহারা নিতে হবে?
?!

বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের স্বীকৃতিদান এই সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। গত ৬ ডিসেম্বর সোমবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন : ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ওই সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন : সতর্কতার সহিত বিচার-বিবেচনা করার পর ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের নতুন সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বলে অভিহীত হবে। শ্রীমতী গান্ধী আরও জানান, বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন তাঁদের রাষ্ট্রনীতির মূল কথা হবে: গণতন্ত্র, সমাজবাদ এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমসমাজের প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া তাঁরা গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি এবং ঔপনিবেশিকবাদ, বর্ণ-বিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করবেন। বাংলাদেশ সরকার আরও জানিয়েছেন, তাঁরা যথাসম্ভব দ্রুত শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে চান।

দেশী সংবাদ

৬ ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় ভারতরক্ষা আইনের বিধিগুলি পেশ করা হয়। এই বিধি অনুযায়ী সরকার যে কোন দ্রব্যের উৎপাদন, নির্মাণ, সরবরাহ, বণ্টন এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ করতে প্যারবেন। তা ছাড়া যে কোন রকম দুর্নীতিমূলক কাজ অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার ক্ষমতাও সরকারের থাকবে।

পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত ডাক, তার ও টেলিফোন যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকেই ওই ব্যবস্থা কার্যকর হবে। ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল জনসাধারণকে পাকিস্তানে কোন চিঠি, পারসেল, টেলিগ্রাম বা মনিঅরডার না পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছেন।

৭ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের যে বিমানটিকে ভারতের পক্ষ থেকে নিরাপদে অবতরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আজ ঢাকা বিমান-বন্দরে অবতরণ করার চেষ্টা করলে এই বিমানটি আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে ভারত সরকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

৮ ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় ১৮১-২৪ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। স্বতন্ত্র ও জনসংঘ সদস্যরা বিল নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন মহাবীর ত্যাগী, শ্রী বি চিনাই ও সি ডি পাণ্ডে (এঁরা তিনজনই আদি কংগ্রেস সদস্য।)

ভারতের স্থলবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আজ নয়াদিল্লীতে মন্তব্য করেন : মাঝপথে থামিয়ে না দিলে পাকিস্তানের সমর যন্ত্র গুঁড়িয়ে দিব। ১৯৬৫ সালেও তাই করতাম কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেল।

৯ ডিসেম্বর—ভারতীয় বিমানবাহিনী আজ পর্যন্ত ৭৩টি পাকিস্তানী বিমান ধ্বংস করেছে। ভারত হারিয়েছে ৩১টি বিমান। ভারত পাকি-স্তানী জলযান ডুবিয়েছে ১৪টি। এর মধ্যে আছে তিনটি ডুবজাহাজ ৯টি গানবোট এবং দুটি সাবমেরিন। ভারতীয় নৌবাহিনী কিছুই হারায়নি। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের ধ্বংস হয়েছে ১২৪ খানি ট্যাঙ্ক আর ভারত হারিয়েছে ৪৯ খানি।

ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত বাংলাদেশের শরণার্থী-দের আবার নিজ নিজ ভিটেমাটিতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারী পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শরণার্থীদের

পাঠানো শুরু হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, বাংলাদেশ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে এক বৈঠকে ওই পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয়েছে।

১০ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে অসামরিক ও পুলিশ প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সবরকম সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধেই এই ব্যবস্থা বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র জানান।

ঢাকা থেকে বিদেশীদের অপসারণে বিদেশী বিমানের নিরাপদে অবতরণ সম্পর্কে ভারতের পক্ষ থেকে যে শর্ত আরোপ করা হয়েছিল জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ তা শিথিল করার সংবাদ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমরা এই শর্ত শিথিল করতে পারি না। কারণ তা হলে নিরাপদ অবতরণের গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়।

১১ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের অপ্রদীপ অঞ্চলে পূর্ণ অপ্রদীপ ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকবে। রাস্তার আলোতে ঠুলি পরানো হলেও আলো জ্বলবে না। রাজ্য সরকার চান, জরুরী অবস্থা যেন কোন রকম শিথিল না হয়।

আজ নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বিরোধী নেতারা সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার নাকি প্রস্তাব করেছেন। এই নির্বাচন হওয়ার কথা ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে। অধিকাংশ নেতাই চান নির্বাচন এক বছর পিছিয়ে দিতে।

১২ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস দল নব কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাংলা কংগ্রেস কর্ম-সমিতির এক বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রস্তাব গ্রহণ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্ম-সমিতির কয়েক-জন সদস্য গোড়া থেকেই নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বর্তমান ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সাবধান করে দিয়েছেন যে, পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক চুক্তি কাজে লাগাবার যেন চেষ্টা না করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

৬ ডিসেম্বর—পূর্ববঙ্গে হিংসাত্মক কার্য-কলাপ বন্ধের জন্য পাকিস্তানী বাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, গতকাল রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদ তা বাতিল করে দেন।

৭ ডিসেম্বর—যেভাবে যশোরের পতন ঘটেছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর মাত্র দুটি লক্ষ্য, ভারতীয় বাহিনীকে ধাপ্পা দিয়ে তার অগ্রগতি মন্থর করে দেওয়া এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য, যতদিন পারা যায় ঢাকার দখল বজায় রাখা।

৮ ডিসেম্বর—আমাদের জওয়ানরা ও মুক্তিবাহিনী এখন চারদিক থেকে ঢাকাকে ঘিরে ফেলেছেন। সেখানে আতঙ্কগ্রস্ত পাকবাহিনী এখন দিশাহারা। ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে, এই খবর পেয়ে মৃত্যু বাংলাদেশের পাক সেনাপতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানী বিমানে চড়ে ঢাকা থেকে চম্পট দিয়েছেন।

৯ ডিসেম্বর—নেপালের রাজা মহেন্দ্র রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং শান্তি স্থাপনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

১০ ডিসেম্বর—ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডওয়ারড হীথ আজ বলেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান ঘটাবার জন্য বৃটেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী সব কিছুই করছে। লনডনের কাছে রক্ষণশীল দলের এক বৈঠকে শ্রীহীথ ওই কথা বলেন।

১১ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ বলেন, তাঁর সরকার বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দলকে বে-আইনী ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই চারটি দল হল : মুসলিম লীগ, নুরুল আমিনের পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দল, জামাতে ইসলাম ও নিজাম ইসলাম। তিনি মনে করেন, এগুলি সাম্প্রদায়িক দল।

১২ ডিসেম্বর—ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং শ্রীস্বর্ণ সিং রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থানটের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের বলেন : ঢাকা এবং তার আশপাশের ছোট এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচী

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীস্বপন চৌধুরী

মাত্র এক চামচ-
একাই একশো!
MINADEX
ভালো চোখের দৃষ্টি
এর জন্যে চাই ভিটামিন এ। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, চোখের দৃষ্টি ভালো রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ।
সুস্থ রক্ত
এর জন্যে চাই আয়রণ। অধিকাংশ ভারতবাসীর আহারে আয়রণের অভাব থাকে। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এর আয়রণ এই অভাব পূরণ করে।
মজবুত হাড়
এর জন্যে চাই ভিটামিন ডি। এক চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, হাড় মজবুত রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি।
মনে রাখবেন, প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ মিনাডেক্স আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করে, আর এর কমলালেবুর স্বাদগন্ধ—বাচ্চার ভালো লাগবেই।
সিরাপ
মিনাডেক্স®
মাত্র একচামচ— তিনগুণের এক টনিক
গ্ল্যাক্সো
CMGM-4.244Ben

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮
শনিবার, ৯ পৌষ, ১৩৭৮
Saturday 25 December, 1971

বাংলাদেশ : পাক-ভারত যুদ্ধ : সমাপ্তি পর্ব

বাংলাদেশের মানুষের জয় হল। এ জয় অপ্রত্যাশিত নয়; স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের যে সংগ্রাম বাংলাদেশের মানুষ শুরু করেছিলেন তার একটি ইতিহাস আছে, গত আট নয় মাসের ঘটনা সেই ইতিহাসের শেষ পর্ব, আদি পর্ব নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম উল্লাস কেটে যাবার পর পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে ক্রমেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ধর্মের নাম করে যে রাষ্ট্র তাদের গড়ে উঠেছে তার মূল লক্ষ্য পূর্ব বাংলার মানুষকে শাসন আর শোষণ করা, তার সংস্কৃতিকে বিকৃত করা ও তার মাতৃভাষাকে স্তব্ধ করা। পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রথমাবধি পূর্ব পাকিস্তানকে বিশ্বাস করেনি, আত্মীয় হিসেবে গ্রহণও করে নি; উপনিবেশের মতন হাতে রেখে নিরন্তর শোষণ করেছে। এই সত্য যখন প্রকট হয়ে দেখা দিল তখন থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষের সংগ্রাম হল শুরু।

তারপর ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে সেই সংগ্রামের শেষ পর্ব এল এগিয়ে, বঙ্গবন্ধু মুজিব ঘোষণা করলেন স্বাধীন বাংলা দেশের। বাংলাদেশের ভূমিকা হল বটে কিন্তু তার অধিকার থাকল অনর্জিত। সেই অধিকার অর্জনের [illegible] সংগ্রাম শুরু করলেন মুক্তিবাহিনী ও বাংলাদেশের মানুষ। আজ আট ন মাস অনেক রক্ত বাংলার মাটিতে উৎসর্গ করে তবে এল সেই মহামূল্য জয়, যার জন্যে বাংলাদেশ ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও দুঃখের এক অবিস্মরণীয় আদর্শ হয়ে থাকল।

বাংলাদেশের এই জয়ের সঙ্গে ভারতের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মানবাধিকার অর্জনের যে সংগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী শুরু করেছিলেন ভারত প্রথমাবধি তাকে সমর্থন করেছে, সাহায্য করেছে, আর এক কোটি শরণার্থীর বোঝা বয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান ভারতের এই সমর্থনকে শত্রুতা বলে ধরে নিয়েছে। অনেক উত্তেজনার পর সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ভারতের বিরুদ্ধে, ভারতের ভূখণ্ড আক্রমণ করেছে স্থলে ও অন্তরীক্ষে। ভারতকে বাধ্য হয়েই পালটা যুদ্ধে নামতে হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমানায় যুদ্ধ করতে নেমে মাত্র চোদ্দ পনেরো দিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনী ঢাকার পতন ঘটিয়েছে। পূর্ব প্রান্তে পাক বাহিনীর অধিনায়করা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন বিনা শর্তে। বাংলাদেশের বাস্তব সাফল্যও সূচিত হয়েছে সেই দিনটিতে। আজ বাংলাদেশের ভৌগলিক ও রাষ্ট্রিক উপস্থিতি অস্বীকার করার পথ আর নেই। যেসব দেশ এতকাল চোখ বুজে ছিলেন, ভাবতেন ওটা বুঝি নিতান্তই ছায়া, আজ তাঁরা কায়াটা লক্ষ করছেন নিশ্চয়। আশা করা যায়, নিজেদের মূঢ়তা সম্পর্কে তাঁদের চেতনা হবে।

ভারতকে বাধ্য হয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত পশ্চিম প্রান্তেও একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে পাকিস্তানকে যুদ্ধ থামাবার আহ্বান জানিয়েছিল। পাকিস্তান সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। শুভ বুদ্ধি বলতে হবে।

বাংলাদেশের সাফল্য বলি, জয় বলি—যাই বলি না কেন—একটা কথা সত্য যে, বাংলাদেশের যিনি জন্মদাতা সেই শেখ মুজিবুর রহমান বিনা এ জয়ের বারো আনা বেদনা দিয়ে ভরা। আজও পাক সরকারের হাতে তিনি বন্দী। পাকিস্তানের যুদ্ধ-সাধ যখন মিটে গেছে, তখন আমরা আশা করব, পাক সরকার এবার শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবেন। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিলে পাকিস্তানের অসংখ্য ও অপরিমিত অন্যায় সত্ত্বেও বাংলাদেশ হয়ত পাকিস্তানকে মার্জনা করবে।

প্রসঙ্গত স্বীকার করা কর্তব্য, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের সবচেয়ে বড় উদ্দীপনা। তাঁর নেতৃত্ব ও তৎপরতা আমাদের গৌরবান্বিত করেছে। সোভিয়েট মৈত্রীর কথাও এক্ষেত্রে ভোলবার নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ও সোভিয়েটের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হোক—এমন কামনা করি।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮০৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক ... টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৯.৭৬

[illegible]
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৪৫.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১৪.৭৬

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক ... টাঃ ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৩৮.৭৬

যুগল-বন্ধু!
মুক্তি বাহিনী

নবজীবনের প্রাতে

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ঢাকার ইনটারকনটিনেনটাল হোটেল থেকে প্রেরিত)

১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ঢাকা শহরে পৌঁছলাম। ততক্ষণে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু তখনও ঢাকার সব মানুষ সে খবর জানেন না। দীর্ঘ ন' মাসের খান-সেনাদের অমানুষিক অত্যাচারের যে এতদিনে শেষ হয়েছে, সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বপ্ন সার্থক হয়ে এশিয়া খণ্ডে জন্ম নিতে চলেছে এক নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র—অনেকের কাছেই তা তখনও অজানা।

'নিরপেক্ষ এলাকা' বলে ঘোষিত ঢাকার ইনটারকনটিনেনটাল হোটেল তখন রেড ক্রসের আওতায়। তাঁদেরই সাহায্যে সেখানে আমরা আশ্রয় পেলাম। সেখানে দেখি প্রচুর বিদেশী নাগরিক এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী, তার সঙ্গে কিছু ব্যবসায়ীও রয়েছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই সব পাক কর্মচারী কথায় কথায় এই হোটেলের কর্মচারীদের শাসাতেন—যেহেতু তাঁরা বাঙালী; আর, আজ তাঁরাই তাঁদের আশ্রয়ে এবং পরিচর্যায়—অনুগ্রহে বললেই বা দোষ কী—নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাইছেন।

হোটেলের এগার তলায় আমাদের জায়গা হল। সারা রাত সেখান থেকে শুনলাম একটা নতুন জাতির জন্মলগ্নের উৎসবধ্বনি, তার সঙ্গে রাইফেল, স্টেনগান এবং গুলি-গোলার অসংখ্য আওয়াজ।

পরের দিন ১৭ই ডিসেম্বর সকালেই আমরা কয়েকজন সাংবাদিক দুখানি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ঢাকা শহরের আনন্দ-উৎসব দেখতে। প্রথমেই গেলাম শেখ মুজিবরের বাড়ি—ধানমণ্ডিতে। মুজিবরের বাড়ির গেটকে দেখলাম শেখ সাহেবের দুখানি ফটো ঝুলেছে—তাতে ফুলের মালা পরানো। অদূরে একজন বাঙালী আকাশের দিকে হাত তুলে শেখ সাহেবের মুক্তির জন্য আল্লার কাছে দোয়া মাগছেন।

শেখ সাহেবের স্ত্রী বেগম মুজিবর কোথায় আছেন আমরা জানতাম না। ঢাকার একজন লোকের কাছে শুনলাম তাঁকে অন্য একটি বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এবং সবচেয়ে অবাক লাগল শুনে যে, তখনও পর্যন্ত তিনি পাক সেনাদের হাতে বন্দিনী। কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মুক্ত বাঙলাদেশের আকাশ-বাতাস যখন নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় স্বাধীনতা-পাগল লোকেদের ভিড়ে ভিড়, মুক্তি-ফৌজের আকাশমুখী আগ্নেয়াস্ত্রের ফাঁকা আওয়াজে নবজাত রাষ্ট্রের জয়ধ্বনি, তখনও, সেই শুভ-লগ্নেও, জাতির জনকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রমুখ স্বজনরা এই ঢাকা শহরেই বন্দী হয়ে রয়েছেন।

রাস্তায় পথচলতি লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে অবশেষে বেগম মুজিবরের কয়েদখানার হদিশ পেলাম। ১৮ নম্বর রাস্তার ১১৩ নম্বর বাড়ি। সেখানে হাজির হয়ে দেখি বাড়িটির সামনে কয়েকটি ক্ষতবিক্ষত গাড়ি এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে—তার মধ্যে আবার একটা রেড ক্রসের গাড়িও আছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটির দিকে যাচ্ছি, পাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন মহিলা চিৎকার করে ওদিকে যেতে আমাদের বারণ করলেন। আমরা একটু হকচকিয়ে গেলেও, সাহস করে খানিকটা এগোলাম। দেখি, ১১৩ নম্বর বাড়ির ছাদে সুরক্ষিত বাংকার-এর মধ্য থেকে জনাকয় সৈন্য মেশিনগান তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবলাম, বোধ হয় আমাদের ভারতীয় জওয়ান।

ফটো তোলার জন্যে ক্যামেরা তুলেছি, তাদের হুঙ্কার ভেসে এল—'ফটো মাত্ উঠাও, গোলি মার দুঙ্গা।' সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা নামিয়ে নিলাম। ওদিকে পিছন থেকে তখন চিৎকার শুনেছি—'ফিরে আসুন! ওরা কালকেও দু'জনকে এখানে গুলি করে মেরেছে!'

পিছিয়ে এলাম। এসে, পাশের বাড়ির মেয়েদের আহ্বানে তাঁদের গেটের মধ্যে ঢুকলাম। সেখান থেকে ভাল করে ১১৩ নম্বর বাড়ির দিকে তাকাতে দেখলাম তখনও একটা নারকেল গাছের পাশে একটা লাঠির আগায় বাঁধা পাকিস্তানী পতাকা পত্-পত্ করে উড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে জীপে করে কয়েকজন ভারতীয় জওয়ানকে দেখলাম ওখানে এসে নামতে। তাঁদের নির্দেশে আমাদের গাড়ি-গুলি দূরে সরিয়ে নিতে হল। তারপরই আমাদের জওয়ানরা চটপট ১১৩ নম্বর বাড়িটিকে ঘিরে চারিদিকে মেশিনগান এবং অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে 'পজিশন' নিয়ে শুয়ে পড়লেন। আশেপাশের লোকজন ভাবল এখনই বুঝি এক খণ্ডযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। তারা পালাতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে।

ভারতীয় জওয়ানদের মধ্য থেকে তখন মেজর অশোককুমার তারা ও একজন অ্যাম্বু-লেন্স অপারেটর ১১৩ নম্বর বাড়ির সামনে এগিয়ে গিয়ে পাক সৈন্যদের আত্মসমর্পণের খবর জানিয়ে তাদেরও আত্মসমর্পণ করতে বললেন। তারা সে খবর বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুতরাং আত্মসমর্পণে রাজীও হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে ওরা কি ভেবে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করল।

অতঃপর আমরা ১১৩ নম্বর বাড়ির ভেতর ঢুকতে পেলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি বেগম মুজিব কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। আমাদের মেজর যতই তাঁকে আশ্বাস দেন, আর কোনও ভয় নেই জানান, ততই যেন তিনি আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। শেখ সাহেবের দুই মেয়ে—বড় মেয়ে হাসিনা ও ছোট মেয়ে রেহানা এবং ছোট ছেলে রাসেল (দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নামে যার নাম রেখেছিলেন শেখ সাহেব) মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের চোখও শুকনো নয়।

বেগম মুজিব বড় মেয়ের ক' মাসের বাচ্চা মেয়ে 'জয়'কে কোলে তুলে নিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'এর নাম রেখেছিলাম জয়। আজ আমাদের জয়—বাংলাদেশের জয়, কিন্তু...'। গলা তাঁর কান্না এবং আবেগে আবার রুদ্ধ হয়ে এলো।

বড় মেয়ে হাসিনা ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর থেকে শেখ সাহেবের একখানা ছবি এনে মায়ের কোলে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

বাইরে তখন জনতার উন্মাদ উল্লাসে ঢাকা শহর উত্তাল—জয় বাংলা ... জয় বাংলা ... শেখ মুজিবুর জিন্দাবাদ ...!

শেখ মুজিবের ছবি হাতে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন হাসিনা। বেগম মুজিব আর ছোট বোন রেহানাও অশ্রুভারাক্রান্ত।
(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া

রঞ্জন

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে। গত সপ্তাহে কাউকে নির্দেশ দিতে হয়নি। বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে যখন খবর এলো যে, পূর্ববঙ্গের পশ্চিমী শাসকদের আত্মসমর্পণ অত্যাসন্ন তখন সমগ্র কলকাতায় উচ্ছ্বাস প্রায় আতিশয্যের আকারধারণে উদ্যত। কলকাতার আবেগপ্রবণতা আমার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা রকমের প্রেয় প্রাণচাঞ্চল্য আনে। অন্তহীন অনাহার নির্বিরাম প্রবাহ থেকে সে যে কী বিষম নিষ্কৃতি তা আপাতত অপ্রকাশ্য। তবু পূর্ববঙ্গের পুনর্লব্ধ স্বাধীনতার প্রত্যূষে কয়েকটা সন্দেহের নিহিত কণ্টক আমি উপেক্ষা করতে পারিনে। একটা ভাষার যুগল ব্যবহারে নেই ঐক্যের অমোঘ সূত্র। স্বাধীন বাঙলার উত্থানে স্বভাবতই আমি উল্লসিত। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিবেশীর কাছে স্বাধীনতা নয় নিতান্ত সহজগ্রাহ্য পদার্থ। পশ্চিমবঙ্গ আর নবজাত বাঙলাদেশের সম্পর্ক আজো আলোচনাসাপেক্ষ। শারীর সান্নিধ্য আর ভাষাগত ঐক্যবোধ হতে পারে হার্দিক্য রিক্ততেই মাত্র ভঙ্গুর। আমার চাইতে কেউ বেশী খুশী হবে না আমার এই আশংকা অসত্য হলে যে, বর্তমানের উষ্ণ বাঙালী আলিঙ্গনে নিহিত থাকতে পারে কোন এক অবিশ্বাস্য শীতল বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছেদের অপ্রীতিকর সম্ভাবনার স্বাভাবিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও আমি একে অপরিহার্য বলে মানতে পারিনে। অক্লান্ত আলোচনায় উদ্‌গীর্ণ হতে পারে আমাদের অকথ্য বিরোধের উৎস। বিতর্কে মিলায় ঐক্য ; বিশ্বাস বিরূপ।

বাঙালীত্ব বলে একটা বস্তু নিশ্চয়ই আছে ; পঁচিশ বছরের বিভেদের পরেও। কিন্তু এটাকে নিয়ে পদ্মার এপারে বা ওপারে বাড়াবাড়ি হলে অচিরেই নৈরাশ্য হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী, বাঙালীত্বের ভিত্তির উপর গঠিত যে-কোনো সম্পর্কই দু' পক্ষের অন্তরে এমন পর্বতপ্রমাণ প্রত্যাশার সঞ্চার করবে যার পূরণ হবে অসম্ভব। আমরা চাইব ওদের চিরকালীন কৃতজ্ঞতা, কেননা আমরা ওদের সাহায্য করেছি পাঞ্জাবী নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেতে। ওরা দাবি করবে ওদের সার্বভৌমত্বের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। আমরা চাইব বৃহত্তর বাজারের পূর্ণ সুযোগ নিতে। ক্রমে পূর্ববাংলা অনুভবে তিক্ততা ও প্রতিরোধ। আমরা যত চাইব ওরা তত দিতে রাজী হবে না। ওরা যত আদর প্রত্যাশা করবে তত আমরা দিতে পারবো না। শীঘ্রই শুরু হবে দরাদরি, পরে মন কষাকষি—যার একমাত্র পরিণতি হতে পারে পুনর্বিরোধ। প্রতি পক্ষই যদি নিজ নিজ প্রত্যাশা সীমায়িত রাখে তা হলে সেই অনুপাতে নৈরাশ্যের পরিমাণ সীমিত হতে পারে।

✻

বর্তমান উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে আমার বিনীত পরামর্শ অতিসাবধানী বলে মনে হতে পারে। তবু আমি চাইনে অতীত বিরোধের সূত্রগুলোর পুনরাবির্ভাব। আমাদের দু' পক্ষের মধ্যে যে মিলগুলি আছে সেগুলির উৎসাহদান নিশ্চয় একান্তই কাম্য। সেই সঙ্গে স্বীকার করা ভাল যে, অনেকগুলি অমিল আছে দুই বাঙলার মধ্যে। কেবলমাত্র আশা করলেই বৈসাদৃশ্যগুলি হাওয়ায় মিলিয়ে যায় না। এমন কি, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কোন পক্ষ অপর পক্ষের ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করবে না। আর্থনীতিক সংযোগ নিশ্চয়ই উভয় পক্ষেরই অসীম দারিদ্র্য লাঘব করতে পারে। কিন্তু কোন পক্ষই সহ্য করবে না অপরের অতিরিক্ত অর্থলোলুপতা। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাতে থাকবে নয়াদিল্লীর বিশাল ক্ষমতা। অন্তত আপাতত বাঙলাদেশকে ছাড়া হবে প্রায় নির্বান্ধব। তাই বলে ঢাকা মেনে নেবে না কলকাতার প্রবল অতিকত আত্মম্ভরিতা। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে প্রাচীন বিরোধের অবসান হবে না ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নামাবলী পরিধান করলেই। বাঙলাদেশের নতুন সরকার কী রূপ পরিগ্রহ করবে তাও বর্তমানে অজ্ঞাত। মুজিবনগরের ঐক্য ঢাকায় অক্ষুণ্ণ না থাকতে পারে। মৌল রাষ্ট্রনীতিতে সাম্যবাদ উল্লিখিত হয়েছে এবং শুনতে পাই কোন কোন অঞ্চলে শেখ মুজিবর রহমান ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া বলে বর্ণিত এবং বর্জিত। গণতন্ত্রে এই প্রকার বিরোধগুলি তর্ক দ্বারা মীমাংসিত হতে পারে কিন্তু পূর্ববঙ্গে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য আজো সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়নি পাকিস্তানের জন্মলাভের পর থেকে। পশ্চিমবঙ্গে তো অতি সাম্প্রতিক কালে দেখা গেছে তথাকথিত গণতান্ত্রিক দলগুলির বিবাদ কি হিংস্র ও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। আমার উল্লাস তাই সঞ্চিত থাকবে ভবিষ্যতের জন্যে।

পশ্চিমী নির্যাতন সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের চিন্তাধারায় বেশ কিছু নতুন উদ্যমের উন্মেষ হয়েছে গত কয়েক বৎসরে। পূর্ববঙ্গ ছোটখাট একটি চলচ্চিত্রশিল্প উদ্ভাবন করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য অঞ্চলে সাহিত্যপ্রচেষ্টা আর একেবারে কলকাতার মুখাপেক্ষী নয়। এই আঞ্চলিক উদ্যম যেন উৎসাদিত না হয় বিশাল কলকাতার চাপে। এমন আরও অসংখ্য সমস্যার উদ্ভব অপরিহার্য। কলকাতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক মহলে যেন এমন অপধারণার অপজন্ম না হয় যে, বাঙলাদেশের সৃষ্টির অর্থই যে ওদের বাজার আরো ব্যাপক হল। আমাদের যেমন দিতে হবে তেমনি নিতে হবে। এই মনোভাব দ্রুত পুষ্টি না পেলে পুনর্বিরোধ ঠেকান যাবে না।

✱

বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়কেই অগ্রসর হতে হবে ধীরে, অতি ধীরে। পঁচিশ বছরের পাঞ্জাবী শাসনের মধ্যে পূর্ববঙ্গে কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি এমন ধারণা একেবারেই অলীক। উর্দু সাহিত্য কি কিছুমাত্র প্রভাব বিস্তার করেনি পূর্ববঙ্গের সাহিত্যচিন্তার উপর ? এই প্রভাব যে একেবারেই অশুভ এবং পুরোপুরি নিন্দনীয় যোগ্য, এমন কথাই বা ধরে নেব কেন ? বহু বাঙালী বাঙলা না ভুলেও উর্দু শিখেছে, এটাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করবার কারণ দেখি না। মোদ্দা কথা এই যে, পূর্ববঙ্গ ফিরে পাবে না পঁচিশ বছর আগেকার পশ্চিমবঙ্গকে যেমন পশ্চিমবঙ্গ ফিরে পাবে না পঁচিশ বছর আগেকার পূর্ববঙ্গকে। বাঙলা ভাষা সত্ত্বেও দু'জনের দু'জনকে নতুন করে চিনতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। পুরোনো সম্পর্কের পুনরুজ্জীবন অভাবনীয় এবং বোধ হয় পুরোপুরি বাঞ্ছনীয়ও নয়।

গত সংখ্যায় মজলুম আদীব এই ছদ্মনামে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার কারণ তখনও তিনি হানাদার দখলীকৃত বাংলাদেশের ভেতর থেকেই তাঁর কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। আজ আর সে দিন নেই বলে তিনি এ সংখ্যায় স্বনামে কবিতা লিখেছেন। মজলুম আদীবই বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমান।—সম্পাদক

পথের কুকুর

শামসুর রাহমান

পেশা সে পথের কুকুর। সারাদিন
এদিক ওদিক ছোটে, কখনো-বা ডাস্টবিন খোঁটে
জুড়োয় জঠরজ্বালা, কখনো আবার প্রেমিকার
মন রঞ্জনের জন্যে দেয় লাফ হরেক রকম।
হাড় নিয়ে মুখে বসে গাছের ছায়ায়,
লেজ নাড়ে মাঝে-মধ্যে, ফুর্তিবাজ প্রহরে কখনো
ধুলোয় গড়ায়। কখনো সে
জ্যোৎস্নাকে সাজায় চিৎকারে।

আমি বন্দী নিজ ঘরে। শুধু
নিজের নিশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠায় বসে আছি
সেই কবে থেকে। আমি, মানে
একজন ভয়ার্ত পুরুষ,
সে, অর্থাৎ একজন সন্ত্রস্ত মহিলা,
ওরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক বালিকা-
আমরা ক'জন
কবরে স্তব্ধতা নিয়ে ব'সে আছি। নড়ি না চড়ি না
একটুকু, এমন কি দেয়ালবিহারী টিকটিকি
চকিতে উঠলে ডেকে, তাকেও থামিয়ে দিতে চাই,
পাছে কেউ শব্দ শুনে ঢুকে পড়ে ফালি ফালি চিরে মধ্যবিত্ত
নিরাপত্তা আমাদের। সমস্ত শহরে
সৈন্যেরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র। মরছে মানুষ
পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর,

আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠায় বসে আছি
সেই কবে থেকে। অকস্মাৎ কুকুরের
শাণিত চিৎকার
কানে আসে, যাই জানালার কাছে, ছায়াপ্রায়। সেই
পথের কুকুর দেখি বারংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাই রঙ
একটি জীপের দিকে, জীপে
সশস্ত্র সৈনিক কতিপয়। ভাবি, যদি
অন্তত হতাম পথের কুকুর।

২১।৭।৭১

প্রতিশ্রুতি

শামসুর রাহমান

কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই যাবো, গেলে
তুমি খুশী হবে খুব, মেলে
দেবে ধীরে অনাবিল আপন গহন সত্তা। আজ
আমাকে ডেকো না বৃথা! তোমার সলাজ
সান্নিধ্যে যাওয়ার মতো মন নেই। শহুরে বাগান
রাখুক দরজা খুলে, তোমার ত্বকের মৃদু ঘ্রাণ
পারবো না নিতে। যখন সময় হবে, দিচ্ছি কথা,
অঞ্জলিতে নেবো তুলে মুখ হে রঙিন কোমলতা।

আমাদের বুকে জ্বলে টকটকে ক্ষত
অনেকে নিহত আর বিষম আহত
অনেকেই। প্রেমালাপ সাজে না বাগানে
বর্তমানে আমাদের। ভ্রমরের গানে
কান পেতে থাকাও ভীষণ বেমানান
আজকাল। সৈন্যদল অদূরেই দাগছে কামান।

আমাদের ক্ষত সেরে গেলে
কোনো এক বিনম্র বিকেলে
তোমার কাছেই যাবো হে আমার সবচেয়ে আপন গোলাপ,
করবো না কথার খেলাপ।
আমি প্রারম্ভে, ভাই তুমি করো শেষ
দুর্ভাগা, তোমার আমার একই স্বদেশ।

২৯।৭।৭১

নিজবাসভূমে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমি আমার ডানদিকে তাকিয়ে
আল মাহমুদকে দেখতে পাই।
কিন্তু বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে
শামসুর রাহমানকে খুঁজে পাই না।

আমি পূর্বাস্য হয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি,
শামসুর, তুমি কোথায়?
কিন্তু সীমান্তের ওপার থেকে, কোনও কবির কণ্ঠ নয়,
শুধু গুলির শব্দ ভেসে আসে।

আজ ন মাস বাদে তোমার কবিতা পড়লুম, শামসুর।
পড়ে বুঝতে পারলুম,
আল মাহমুদ যখন এদিক থেকে লড়েছে,
তখন তুমি লড়েছ ওদিক থেকে।

শামসুর,
তুমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছ যে,
শুধু তোমার নামটাই ওরা কাড়তে পেরেছিল,
তোমার কলম ওরা কাড়তে পারেনি।

তুমি জানিয়েছ,
কবিকে তার নিজবাসভূমে যখন পরবাসী হয়ে দিন কাটাতে হয়েছে,
তখনও তার বুকের মধ্যে উড়ছিল
বাংলাদেশের পতাকা।

সার্টিফায়েড দ্যাট', তাতে লেখা, 'কেরামৎ আলি s/o লেট মেহের আলিখান, ভিলেজ—মুসুরিয়া, পোস্ট—দেহেরগাটি, পি এস—বাবুগঞ্জ, ডিস্ট্রিক্ট—বরিশাল, কেম টু মাই ক্যাম্প উইথ সিক্সটি--ফোর হাবিলদার্স অ্যাজ এ গ্রুপ-লীডার অ্যান্ড আফটার ট্রেনিং হ্যাজ বীন ডিউলি প্রোমোটেড টু দা র‍্যাঙ্ক অব প্লেটুন-কম্যান্ডার। হী ইজ এ বোনাফাইডে ফ্রীডম-ফাইটার। অল কনসার্নড আর রিকোয়ার্ড টু হেল্প অ্যান্ড কো-অপারেট।' সীলমোহর। স্বাঃ ক্যাপ্টেন আবদুল বারি। ক্যাম্প-ইন-চার্জ। ধলচিতা।

আরে! শবনমও উঠেছে যে, ঠাসা ভিড়ের মধ্যে দেখতেই পাইনি ওকে। ওদিকে দরজার পাশে বসেছে। "এতক্ষণ দেখনি!" উচ্চারণ করে আমি আমাকে বলি। পাশে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই ওর দাদা। এপারে ইটিন্ডায় পৌঁছে শবনম আমাকে বলেছিল, ও অপেক্ষা করছে দাদার জন্যে।

দাদার বগলে ওটা কী। দাদার হাতের নাগাল না পেয়ে ও কিসের বাঁট ধরে আছে শবনম?

আজ ভোরবেলা, ইছামতীর ওপর মাঝ-বরাবর আমরা তখন, কুয়াসার ভেতর থেকে সহসা বেরিয়ে একটা নৌকা হুশ করে আমাদের পিছনে রেখে কুয়াসার ভেতর ঢুকে যায়। নৌকাটি ছিল আরোহীবিহীন, নৌকায় একটা রিক্‌শ ছাড়া ঘন কুয়াসার মধ্যে আমি প্রথমত কিছুই দেখতে পাইনি। এ সময় কুয়াসা ভেঙে রোদ এসে পড়লে রিক্‌শার কারুকাজ থেকে টিন চকচক করে ওঠে ও, যেন সিংহাসনে, না রিক্‌শার ওপর, একটি ফুটফুটে কিশোরী বসে আসছে দেখতে পাই। এবং সেই তার সঙ্গে প্রথম চোখাচোখি। এবং সেই তার প্রথম হেসে ফেলা।

ভিড়ের ভেতর থেকে শবনমের চোখ দুটো খুঁজে বের করি। ওই স্বভাব মেয়েটার। এমনিতে ভীষণ গম্ভীর, কিছুতেই চোখের দিকে তাকাবে না, খালি ফাঁকি দেবে। এবং চোখাচোখি না হলে কিছুতেই হাসবে না। ফিক করে হেসে বাসের একমাত্র মহিলাযাত্রী গম্ভীরমুখে আবার বাইরে তাকায়।

দাদাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে আসে। ওর নাম সিরাজুল। সাতক্ষীরা টাউন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। ওরা বাড়ি যাচ্ছে। আব্বা আর আম্মা ফিরেছেন পরশু।

"ওটা কী?"

"এস-এম-জী।"

"অ্যাঁ!"

"শর্ট মেসিন-গান।"

"শর্ট? মেসিন? গান?"

"জী।"

"সাদা পোষাকে ইণ্ডিয়ান আর্মি নাকি তুমি সিরাজুল?" আমি হেসে জানতে চাইলুম। সবাই হাসি থামালে তারপর সিরাজুল একা হাসল, "জী না। আমি সিরাজুল। সিরাজুল ইসলাম।" মুক্ত সাতক্ষীরায় আজ বড় মীটিং, সে জানে। কিন্তু তার যাওয়া হবে না। বোনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই সে ক্যাম্পে রিপোর্ট করবে।

"গাঁয়ে একটা কচুগাছ থাকলে তার আড়ালে আমি লড়তে পারি। ওরা পারবে?" তার কথা শুনে চমকে উঠি। আল মাহমুদও তো তাই বলতে চেয়েছিল। আল মাহমুদের সদ্যপ্রকাশিত 'ক্যামোফ্লাজ' কবিতাটি আমার স্বতঃই মনে পড়ে যায়, যেখানে, পরিখার ভেতর থেকে একটি আস্ত বনানী সহ জেগে উঠছে একজন মুক্তি-সেনানীর সতর্ক হেলমেট! কথা শেষ করে সিরাজুল এতক্ষণে হাসে, "হাঃ হাঃ।" ঐ স্বভাব সিরাজুলের।

"ভিয়েৎনামে ৮ বছরে যা পারেনি, আমরা ৮-মাসে তাই পেরেছি। মুক্তিফৌজ পিছু হটতে জানে না।" বললে সিরাজুল। সিরাজুলের অপরাজিত মুখশ্রীকে তুলে ধরার জন্য সিরাজুলের ঘাড়ের পেশী ফুলে উঠতে আমি দেখি।

মামুদপুরে একটি মিলিটারী ট্রাক ঢালে পড়ে গেছে। সেটিকে রাস্তায় তুলে দেবার জন্যে বাসটির সাহায্য চাইলেন আর্মির একজন অফিসার। বাস খালি করে আমরা নেমে পড়লুম। অপেক্ষা না করে মুক্তিফৌজ মার্চ করে বেরিয়ে যায়। মুক্তিফৌজ অপেক্ষা করতে জানে না।

এই অবসরে জাল ফেলে জল থেকে উঠে এল মামুদপুরের শোভান আলি (২৫)। সে প্রায় জোর করে গাঁয়ের ভেতর আমাদের ডেকে নিয়ে যায়। গাঁয়ের প্রান্তে প্রবহমান খালের ধারে একটা লম্বাপানা গর্তের চারিদিকে ইতস্তত নরকংকাল, হাড় ও খুলি পড়ে আছে। মাটির সঙ্গে পচা মাংস মিশে আছে। একটি ভাঙা চশমা আমরা সকলেই দেখেছি। গর্তের মধ্যে কিছু নেই। একটা সাড়ে-চার ফিট কেউটের খোলস পড়ে আছে। কেউটেটা নেই।

শোভান আলীর কোমর পর্যন্ত ভিজে গায়ে ফতুয়া। শীতে কাঁপতে কাঁপতে গর্ত দেখিয়ে শোভান আমাদের বলল "এইখানডা।" এইখানে একজনকে গুইয়ে গুলি করেছে, আর একজনকে তুলতে বলেছে। তারপর তাকে বলেছে গুতে। "এইরকমভাবে গেল হপ্তায় ২০।২৫ জনকে মেরে ফেলতে আমরা দেখেছি। গন্ধে এদিক গরু আসত না।" গত ৮-মাসে এদিক-সেদিক থেকে এনে অন্তত ১২০০ লোক এক এই মামুদপুরেই মারা হয়, বেশির ভাগ বেয়নেট চার্জ করে। কেউ কেউ দেড় থেকে দু'হাজারও বলেছেন। সাতক্ষীরা রোডের দিকে ফেরার পথে একজন গ্রামবাসী একান্তে আমাকে একটি কথা বলে, যা প্রকাশ করার সব পাপ আমার, যে জন্যে আমি তার কাছে পুনঃপুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, সত্যের খাতিরেই আমাকে এটা করতে হচ্ছে। "আমাদের গাঁয়ে ওরা মেয়েছেলে পায় নাই। শেষ রাতে পুকুর থেকে দাসী গোসল করে উঠছে—কী কব বাবু—বলা যায় না—" সে আমাকে বলেছিল। বলতে বলতে বুকের ওপর কেঁদে পড়েছিল তার যুবাবয়সী মুণ্ডু। যেতে যেতে মামুদপুর গাঁয়ে ৩-টে ছই-ঢাকা গরুর গাড়ি ঢোকে, পুরুষেরা ক্ষেপটে যাচ্ছে। পুকুরে জাল পড়ছে। ওদিক দিয়ে অনেকগুলো হাঁস জলে নেমে পড়ে।

মামুদপুরের পর ভাজাবেড়ে। ভাজা-বেড়েতে ফেলে-আসা বাসটিকে আমরা পেয়ে যাই ও ছেড়ে দিই। মানুষজনের 'জয় বাঙলা' ধ্বনিতে পূর্ববৎ ফেটে পড়ছিল বাসটি। আজ সাতক্ষীরায় আঞ্চলিক প্রশাসনের উদ্বোধন, বিকেলে সভা, ওরা যাচ্ছে সেখানে। আলিপুর বাজার গাঁয়ে জলের জন্যে বাস দাঁড়ায়। এখানে একটি বড়সড় হাইস্কুল রয়েছে। চা ও পানবিড়ির দোকানে বেশ কিছু লোকে। ট্রানজিস্টরে ৯টা ২৫-এর ভারতীয় খবর শুনছে। এখান থেকে একটা ভারতীয় আধুলি দিয়ে ঢাকায় তৈরী এক প্যাকেট পূর্ণিমার মূলসূত্র সিগারেট কিনে ফেলি। নাম—কুমারী। নামটি ছিল বাঙলা অক্ষরে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সুদীর্ঘভাবে কালীগঞ্জ রোড এখানে

গিয়েছে। দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায়। ১৫।২০টি গরুর গাড়ি আসছে।

আলিপুরের পর তীরেরআহনা। তারপর বাকালপোল, যা পালাবার আগে পাক সেনারা গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। গ্রামের লোকে স্বানন্দে পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছে। ধ্বংস থেকে নির্মাণের ব্যবধান মাত্র ২ দিন!

তারপর পটাগাছা। ইটাগাছায় এনায়েৎ খানের (৮১) বাড়ি থেকে পাঞ্জাবী সেনারা ঘড়ি, বন্দুক, ট্রানজিসটর সব নিয়ে গেছে। গরু-ছাগল টেনে নিয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা এখনো ফেরেননি। বৃদ্ধের দেখাশোনার জন্য শুধু একটি দাসী ছিল। ডাক্তারী মতে সে তখনো রমণী হয়নি, যখন ৪ জন পাঠান সৈন্য তাকে ধরে নিয়ে যায়। সাতক্ষীরার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এখন মেয়েটির চিকিৎসা করছেন। মুসলিম মেয়েদের নাম কি মিষ্টি হয়! এর নাম সাবিহা, মানে নাকি ভোরের হাওয়া। আশা করি বসন্তের? ওঃ, ভাবা যায়!

শোনা গেল, পাশেই কার্তিক বোসের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। "ও! কার্তিক বোস? আই নো।"

"ক্রিকেটার নাকি?"

"অরে না মশায়", বৃদ্ধ মহম্মদ আলির সামনে তারাপদ রায় আমাকে চাপা ধমক দেয়, "আচ্ছা খটিতো আপনি, এ-সব বাঙালে কাণ্ডোয় আপনি ঢুকে পড়েছেন কী করতে। কার্তিক বোসের ল্যাবরেটরির, নাম শোনেননি? আপনার বাবার পায়ে কড়া হয়নি? কর্ন-হীলার লাগাতে দেখেননি? টাঙ্গাইলে থাকতে আমার বাবার পায়ে কড়া হয়েছিল।"

বাড়িটি ধূলিসাৎ; কিন্তু একতলা ছিল শুনে আমি একটু খুঁটিসংলগ্ন গোয়েন্দাগিরি না করে পারি না। ক্রিকেটার অবশ্যই নয়, কিন্তু ফার্মাকোলজিস্টও না। ইটাগাছার সয়ীদুল ইসলাম (২৫) আমাকে জানালেন সাতক্ষীরা বাজারে কার্তিক বোসের একটি কাপড়ের 'টহল' (স্টল) ছিল। একটা ছোট সংসার ছিল। এক ভাই ছিল। স্ত্রী ও বাচ্চা ছিল দুটি। এখন নেই। কিছু নেই। কেউ নেই। ইটাগাছার কার্তিকচন্দ্র বোস, বয়স ২৫, দোহারা, কালো বেঁটেখাটো। ডান গালে মস্ত আঁচিল। আপনার বন্ধু ও পাশের বাড়ির ইটাগাছার সয়ীদুল ইসলাম জানাচ্ছেন, আপনি যেখানেই থাকুন সপরিবারে ফিরে আসুন। আপনার ছোট্ট ধানের গোলাটি আশ্চর্যজনকভাবে আজো অক্ষত থেকে গেছে। একটি সীমগাছ অনেকটা হলুদ ফুলসহ বেড় দিয়ে জড়িয়ে উঠে গোলাটি এখনো আপনার জন্যে রক্ষা করছে।

বেলা দুটো। সাতক্ষীরা এখান থেকে ১ মাইল। একজন সাইকেল আরোহীকে লিফট দিতে বলি। বাকি রাস্তা আমিই চালিয়ে নিয়ে যাই। বন্ধুরা একটু পিছিয়ে পড়লেন, সঙ্গে পদব্রজে বহু মানুষজন, সাইকেল অন্তত ৩০টি, সকলেই তাঁর মহার্ঘতম পোশাকটি পরে বেরিয়ে পড়েছেন। সকলেই চলেছি সাতক্ষীরার মীটিং-এ। আর্মির একটি জীপ আসতে দেখে আমি নেমে সরে দাঁড়াবার প্রস্তাব দিই। "না-না, ওরাই পাশ দেবে, সরে যাবে", আবদুস সবুর (১৭) উদ্ভাসিত মুখে জানায়, "আজ ৮ মাস পরে সাইকেল চাপছি!" বৃদ্ধ এনায়েৎ খানও তাই বলেছিলেন, "এরা বন্ধুর মত ব্যবহার করছে।" অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান আর্মি। ফেরার সময় বিকেলবেলা রিক্সা চালক গফুরও (৩৫) একটি আর্মার্ড কার আসতে দেখে গতি কমায়নি। রাতদুপুরে তার বাড়িতে পাঠান সেনার মাতাল পদাঘাত, "ইধর দুশমন আয়া?" সাইকেলের রড বসে আবদুস সবুরও অনুরূপ কাহিনী শোনায়। সে আসছে ভাডোখালি থেকে।

সাতক্ষীরা পৌঁছলুম ২॥টা নাগাদ। রোদ উঠেছে ভালোই, উত্তরের উপভোগ্য হাওয়ায় বাড়িতে বাড়িতে বাঙলাদেশের পতাকা থেকে উড়ছে ঘনসবুজ ও লাল-সোনালী। অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে। এক জায়গায় আহারাদির পর বাড়ির সামনে

(কনিষ্ঠতম সদস্য—২৪), ফজলুল হক (শ্যামনগর), আব্দুর রহমান (বাগেরহাট), কামাল বখৎ ও আবদুর রব সেরনিয়াবৎ—শেষোক্ত দুজন এম এন এ অর্থাৎ আমাদের এম পি, শেখ আবদুল আজিজ এম এন এ ও খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেণ্ট। বক্তৃতা আমি কখনো শুনি না। কিন্তু ছাত্র লীগের অভিতরুণ নেতা নসীম ময়না (১৮) আমাকে বাধ্য করেছিল শুনতে। যখন সে একটা রাইফেল তুলে ধরে, বক্তৃতা নয়, চিৎকার করেছিল, "ভায়েরা আমার! আমি আর কিছু জানি না। আমার আর কিছু বলার নেই! শুধু বলছি ২৫শে মার্চ যুদ্ধ শুরু করেছি—এখনো যুদ্ধ করছি এবং সরকার হয়ে সারা জীবন যুদ্ধ করব, ইনসাল্লা। একটা জাতির পিতা মুজিবের কাছে আমি ওয়াদাবদ্ধ।" লাউডস্পিকারের মাইকটি অকারণেই তার সামনে রাখা হয়েছিল, এত চিৎকার করে, শির ফুলিয়ে, সে কথাগুলো বলে। দীর্ঘতম সময় জুড়ে করতালি ও উল্লাস সে-ই পেয়েছিল। আমি 'কোট' করেছি তার বাক্যগুলো।

পার্কের কাছে রিকশার হুড়োহুড়ি। সভা থেকে বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে গ্যারেজ রোড পেরিয়ে আমি খান শাহজাদা চলে যাই। হসপিটাল রোডের দুধারে সারি সারি দোকান—সাখাওয়াৎ মেডিক্যাল স্টোর্স, মমতাজ হোটেল, হ্যানিম্যান হোমিও ফার্মেসী, সাইকেলের দোকান, ঘড়ির দোকান, বস্ত্র—সব খোলা। একটি জীপ আসছিল। রিকশাঅলার মন্তব্যের কথা আগে বলেছি। দুজন জওয়ান জীপ থামিয়ে একটা স্টেশনারি দোকানে ঢুকে আনাচারেকের মত চানাচুর কিনল। রিকশা দাঁড় করিয়ে আমি স্বচক্ষে দেখলুম।

মিটিং-এ ফিরে এলুম। এখন সভা ভাঙার মুখে। নীরেনদা আমাকে কাছে ডাকলেন। হেসে বললেন, "ওদিকে এতক্ষণ কী দেখছিস?" আমি মুখ খোলার আগেই বললেন, "চুপ", তারপর অদূরে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, "ঐ দ্যাখ, পাড়ে বগলিগুলো এসেছে।" এবং তার পেছনে এই এত বড় মিটিংকে কুছপরোয়া জ্ঞানে ছেলে-মেয়েরা পার্কের এক দিকে স্লিপ খাচ্ছে, দোলনা দুলছে—স্কিপিং করছে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। পাখিদের মতই, সন্ধ্যা হলে, ছেলে-পিলেদের চ্যাঁচামেচি বেড়ে যায়। আকাশে ছেঁড়া মেঘ। দীঘির পাড়ে সারি সারি বাবলাপাতা থরথর করে কাঁপছে—গোধূলির এরকম আলোতেই নিশ্চয়—হাওয়া তো নেই! একটা সাপ ঐ দীঘির মাঝ বরাবর পৌঁছে গেল আমি দেখি, খেলা নয়, ওপার অবধি যাবে মনে হয়। কলকাতায় ফিরে আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখলে?', আমি বলব, হাওয়া-বিনা বাবলা-পাতার ঐ কাঁপনের মতই কিছুটা আশ্চর্য-জনক স্বাভাবিক জীবন এখানে।

সভা ভেঙে গেছে। সব লাইট-পোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাকআউট-ফাউট নেই, বাড়িগুলোতে ও দোকানপাটেও জ্বলছে—আজকের মধ্যেই জ্বলার কথা ছিল। ল্যাণ্ডরোভারে ওঠার আগে একজন বৃদ্ধ—শুধু এঁর নাম ও বয়সই আমার জানা হয়নি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সোয়েটারের হাতা চেপে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়তে চান না। সাশ্রুনয়নে উনি কেবলই বল-ছিলেন, "বাবা, এই তো গেল-হপ্তায় ঠিক এমনি মিটিং হয়েছিল...লোকজনও এসে-ছিল। সেখানেও বক্তৃতা হয়েছিল। এমনি কোরান পড়েছিল। ঠিক এমনি হয়েছিল বাবারা!"

আমাকে একটা কথা বলতে দিন। আমি কোনো রাজনৈতিক দলে নেই, এখনো নেই। যে-কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী যারা সুবাতাস ও সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, তবু, একটি নির্বিবন্ধ রাজনীতি আমি করি, যা এখন প্রকাশ করছি। গত ১০ বছর ধরে কলকাতার প্রায় প্রতিটি বড় জনসভার মঞ্চের পিছনে একা দাঁড়িয়ে পশ্চাৎদেশ থেকে, মহিলা নেত্রী-সহ ছোট বড় মেজো সকল নেতাকে আমি দেখেছি। রুদ্ধে আমার মনে হয়েছে, যারা সামনে বসে থাকে তাদের প্রত্যেকের উচিত পশ্চাৎদেশ থেকে মঞ্চটিকে একবার দেখা।

BRU
UNSCREW THIS WAY
Brooke Bond
BRU
INSTANT
COFFEE CHICORY BLEND

মোহিনী

বত্রিশ

টোপরের হাঁকডাক শুনে বাইরে এসে দেখি, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বুলো আসছে। বিকেল শেষ হতে চলল, মেঘে মেঘে আঁধার ঘনিয়ে আছে, বৃষ্টি এসেছে সাঁ । করে, বাগানের গাছপালা ভিজে মরছে, মাটিতে জল দাঁড়াচ্ছিল, ওরই মধ্যে বুলো আসছে। আমি অবাক হয়ে বুলোকে দেখতে লাগলাম। তার হাতে একটা বড় ছাতা, জলের তোড়ে ছাতা সামলানো তার সাধ্যে কুলোচ্ছে না, সর্বাঙ্গ ভিজে মরেছে মেয়েটা। এভাবে বৃষ্টির মধ্যে, এই অসময়ে ভিজতে ভিজতে ও কেন আসছে আমি বুঝতে পারলাম না। কোনো আপদ-বিপদ ঘটল নাকি।

বুলো সিঁড়িতে উঠতেই আমি অবাক হয়ে বললাম, "কিরে?"

বুলো ছাতাটা মাথার পাশ থেকে সরিয়ে বলল, "আর বলো না, আচ্ছা বিপদে পড়লুম এক।"

টোপর কাছে এসে চেঁচামেচি করছিল। আয়নারা চলে যাবার পর থেকে এই এক বিশ্রী অভ্যেস হয়েছে টোপরের, ফটক খোলার আওয়াজ পেলেই চেঁচাতে শুরু করে। হয় ভাবে তার মনিব আসছে, হাঁকডাক শুরু করে, না হয় তার মনিব কেন আসছে না এটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানাতে চায়।

ধমক দিতেই টোপর সরে গেল। আমি বললাম, "আয়নারা চলে যাবার পর থেকে ওই কুকুরটা আমায় জ্বালিয়ে মারছে।"

বুলো [illegible] ছাতাটা গুটিয়ে একপাশে রেখে দিল। ছাতা দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে যেন।

"তুই তো ভিজে চান করে গিয়েছিস। রাম রাম, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও তোর শুকনো নেই। আয় আয়, আগে কাপড় ছাড়বি আয়।"

বুলো তার পায়ের দিকের শাড়ির কোঁচ নিঙড়ে নিঙড়ে জল ঝরাচ্ছিল। এত ভিজে গিয়েছে ও যে জল ঝরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। গায়ের কাপড় ভিজেছে, আঁচল ভিজেছে, মাথার চুলও ভেজা।

"এইভাবে কেউ আসে? আয় আয়, কাপড় জামা ছেড়ে নে আগে।" বুলোকে ডেকে নিয়ে আমি ঘরের দিকে এগুতে লাগলাম।

বুলো বলল, "মাসীদি, আমি কলঘরে গিয়ে কাপড়জামাগুলো নিঙড়ে নিই, তা হলেই হবে।"

বুলোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি বললাম, "কেন, আমাদের বাড়িতে কি তোকে পরতে দেবার শাড়ি নেই?"

ধমক খেয়ে বুলো চুপ করে গেল।

"এই বৃষ্টির মধ্যে তুই হঠাৎ এলি কেন?" আমি শুধোলাম।

"মনোরমামাসিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। মা পাঠিয়েছিল, দরকার ছিল খুব। ফেরবার পথে বৃষ্টি নামল। ওরা একটা ছাতা দিয়েছিল ভাগ্যিস। তবু আসতে আসতে ভিজে গেলাম। বৃষ্টিও এল এমন জোরে...! পড়িমরি করে এখানে পালিয়ে এলাম।"

"তুই কলঘরে যা, আমি কাপড় আনছি।"

ঘরে এসে আলমারি খুলে একটা শাড়ি বের করলাম। আমার শাড়িগুলো এমন যে বুলোকে ঠিক মানায় না। তাতে আর কী হবে! কিন্তু জামা নিয়েই মুশকিল। আমার গায়ের জামা ওর হয় নাকি! অথচ মেয়েটা তো খালি গায়ে থাকতে পারে না। ভাবলাম, আয়নার ঘরে গিয়ে একটা জামা নিই।

যাবার সময় আয়না তার আলমারির চাবিটা আমায় দিয়ে যায় নি। ঘরে তার জামটামা পড়ে থাকতে আমি দেখেছি। তা ছাড়া ধোপার বাড়ির কাচা কাপড়ের মধ্যেও তো ওর জামা ছিল।

মানুষ না থাকলে ঘরগুলো কেমন যেন হয়ে যায়। জ্যাঠামশাইরা চলে যাবার পর থেকে প্রত্যেকটি ঘর সকাল বিকেল খোলা, ধোয়ামোছা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়, সন্ধের দিকে একটু আধটু বাতিও জ্বলে—তবু ঘরগুলোতে পা দিলে মনে হয় তার কোনো সাড় নেই। কোথায় যেন ফাঁকা রয়েছে। আয়নার ঘরটাও সেই রকম; সবাই আছে, অথচ তার মধ্যে কেমন এক নিঃসাড় ভাব। বর্ষাবাদলার জন্যে ভ্যাপসা গন্ধও হয়েছে।

আয়নার একটা জামা পাওয়া গেল। ধোপার বাড়ির কাচা কাপড় থেকেই। শাড়িও ছিল। আয়নার শাড়ি বুলোকে ভালই মানাত। তবু শাড়ি আর নিলাম না, আমারটাই হাতে ছিল।

কলঘরের সামনে গিয়ে ডাকলাম, "বুলো"।

দরজা ভেজানো ছিল। বুলো বোধ হয় জলকালায় পা ধুয়ে নিচ্ছে, শব্দ হচ্ছিল জল পড়ার।

দরজা ফাঁক করে বুলো আমার হাত থেকে শাড়ি, জামা নিল।

"গ মোহার কিছু পাস নি?" বুলাকে এই আধো অন্ধকারে, ভিজে কাপড়ে দেখতে দেখতে আমি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। এত ম্লান, করুণ, দেখাচ্ছিল যে মনে হল, ওর সমস্ত লাবণ্য ময়ে গেছে।

"আছে। কলঘরেই আছে।" বুলা বলল।

"তুই আয় তা হলে, আমি আমার ঘরে আছি।"

ঘরে ফিরে আসার আগে বারান্দায় একটু দাঁড়িয়ে থাকলাম। বৃষ্টির চেহারা দেখে মনে হয়, শীঘ্র তো নয়ই কতক্ষণে বৃষ্টি থামবে বলা যায় না। এত মেঘ, এমন বৃষ্টি যে দেখতে দেখতে বিকেল মরে সন্ধ্যের মতন অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার মাথার চুলে চিরুনিটা গোঁজা ছিল, চুল বাঁধতে বসেছিলাম, বাঁধা হয় নি, আলস্য লাগছিল, বার কয়েক আঁচড়াবার পর তোপরের চেঁচামেচি শুনে বাইরে এসেছিলাম, তারপর দেখলাম বুলাকে।

বুলাকে আমি এতকাল ধরে দেখে আসছি, তার অনেক কিছুই আমার জানা; কিন্তু আজ বুলাকে একটু আগে কলঘরের দরজায় দেখার পর থেকে আমার যে কেমন এক ভয় হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না।

কমলার পায়ের শব্দ শুনে তাকালাম। কমলা কোনো কাজে যাচ্ছিল। এখনও চা খাওয়া হয় নি আমার। কমলাকে তাড়াতাড়ি চা করতে বললাম।

"বুলা এসেছে। ভিজে একসা। কলঘরে জামা কাপড় বদলাচ্ছে। ওর ছাড়া কাপড় চোপড়গুলো কেচে মেলে দিও।"

কমলা চলে গেল।

ঘরে এসে দেখি বেশ অন্ধকার। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট তেমন আসছে না, পুব দিকে ছাট রয়েছে। আমার ঘরের জানলা-গুলো দক্ষিণ ঘেঁষে। বাতি জ্বালবার মতন অবস্থা হয়ে এল ক্রমশ।

বুলা এমন অসময়ে এসে পড়েছে যে, ওকে একা একা বাড়ি পাঠানোও যায় না। একটুনি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঘুটঘুট করবে অন্ধকার। এই বৃষ্টিবাদলা। বাড়িটাও কাছে নয় বুলাদের। আধ মাইলটাক তো হবেই। কি করে মেয়েটাকে বাড়ি পাঠাই কে জানে!

ততক্ষণে বুলা এসে গিয়েছে। "মানুদি?"

বুলার দিকে তাকালাম।

"আমার ভিজে কাপড়জামাগুলো ওপাশের বারান্দায় মেলে দেব?"

"তুই কি সব কেচেকুচে এলি নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তুই কেন কাচতে গেলি? আমি

কমলাকে বলে দিয়েছি। সত্যি, তুই একটা মেয়ে!"

"যা, আমার কাপড় আমি কাচব না!"

"থাক, ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। কমলা যা করার করবে।"

শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বুলা আমার কাছে এসে বসল।

"ভাল করে মাথা মুছেছিস?"

"মুছেছি।"

"এই রকম বৃষ্টি দেখে কেউ বেরোয়, বোকা।"

"যখন বেরোই তখন বুঝতে পারি নি এত জোরে বৃষ্টি এসে পড়বে।" বলে বুলা একটু থেমে আমার হাত থেকে চিরুনিটা টেনে নিল। "দাও, আমি চুল বেঁধে দিচ্ছি।"

আমি জানলার দিকে মুখ করে বসলাম, বুলা আমার চুল বাঁধতে বসল। বললাম, "এই একটু আঁচড়ে একটা এলো খোঁপা করে দে।"

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বুলা বলল, "তোমার কী চুল, মানুদি!"

"হিংসে করছে তোর?"

হেসে ফেলে বুলা বলল, "তোমায় হিংসে করতে হলে আমরা মরে যাব।"

"তা হলে তোর মরে কাজ নেই।"

চুল জড়াতে জড়াতে বুলা বলল, "এত বড় ফাঁকা বাড়িতে তুমি কি করে যে আছ মানুদি, আমি হলে ভয়ে মরে যেতাম।"

"তুই এসে থাক্ না। সেদিন অত ক'রে বললাম, থাকলি?"

বুলা লজ্জা পেয়ে বলল, "বাড়িতে আমি না থাকলে মার বড় কষ্ট হয়, মানুদি। মার শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাবলা তো দিনের বেলায় বাড়িতেই থাকে না, রাত্রে ফিরতে ফিরতে আটটা নটা বেজে যায়।"

"খুব চাকরি করেছে বুঝি?"

"নিজেই খাটছে। কী করবে বলো। বাস-অফিসের প্রায় সব কাজই এখন ও করে।"

আরও দু পাঁচটা কথা হতে হতে কমলা চা নিয়ে এল।

"নে, চা খা; বৃষ্টিতে যা ভিজেছিস..."

"নে, চা খা; বৃষ্টিতে যা ভিজেছিস..." আলো জেলে দিয়ে যাও না, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জানলাটাও দেখে নাও তো, ছাট এলে ভেজিয়ে দাও।"

কমলা জানলার খানিকটা ভেজিয়ে আলো আনতে গেল।

বুলা বলল, "জ্যাঠামশাইয়ের আর কোনো খবর পেলে মানুদি?"

আমার হাতে চায়ের পেয়ালা ছিল, নামিয়ে রেখে বললাম, "আজই চিঠি পেয়েছি।"

"খবর কী?"

"ভাল নয়।"

বুলা আমার খোঁপাটায় কাঁটা গুঁজে দিতে দিতে বলল, "শচিদার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ, ওকে হাসপাতালে ভরতি করে দিতে হয়েছে।"

বুলা একটু চুপ করে থেকে বলল, "শচিদার অসুখটা ভাল নয়।"

আমি মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। কমলা আলো দিতে এসেছিল।

কমলা চলে গেলে আমি বুলার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুই কি করে জানলি?"

বুলা সে কথার কোনো স্পষ্ট জবাব দিল না, বলল, "শুনেছি।"

আমার চা খাওয়া শেষ হল। বুলা আস্তে আস্তে চা খাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ থামে নি। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।

"বুলা?"

"উঁ!"

"আজ আর তুই বাড়ি ফিরতে পারবি না।"

উদ্বেগের গলায় বুলা বলল, "সত্যি মানুদি, বৃষ্টিটা এখনও থামছে না।"

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। পূর্বদিগন্তে আজ নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ভারতের ভূমিকা অতুলনীয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র নিজের আদর্শের সত্যিকারের পূজারী বলেই নবতম গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে ও সাদরে কাছে টেনে নিয়েছে। রাজনৈতিক সমঝোতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সম্পর্ক। অর্থনৈতিক সহযোগিতা যে এই দুই দেশের মধ্যে নিবিড় হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে দুই বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। গত ২৩ বছরের সম্পর্ক আজ ধুয়ে মুছে গেছে; শুরু হয়েছে নতুন সম্পর্ক। এই নতুন সম্পর্কের মাধ্যমেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রগতির পথে পা বাড়াবে; তার ফলে উপকৃত হবে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই। হয়তো এটাই পাশ্চাত্যের তথাকথিত গণতন্ত্রী দেশগুলির পক্ষে হজম করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের আয়তন হল ৫৫,১৯৫ বর্গমাইল, জনসংখ্যা হল সাড়ে সাত কোটি। বসতি-ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে এক হাজারেরও বেশি। পূর্বতন অবিভক্ত পাকিস্তানের রপ্তানি-কাঠামো বিচার করলে দেখা যায় ১৯৬৯ সালের রপ্তানি সামগ্রীগুলির রপ্তানির মূল্য ছিল ১৮৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; তার মধ্যে পূর্ববাংলা থেকে কাঁচা পাট রপ্তানি ও চটজাত সামগ্রী রপ্তানির মূল্য ছিল যথাক্রমে ৮০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া পূর্ববাংলার চা-রপ্তানির মূল্য ছিল ১ কোটি টাকা ও চাল রপ্তানির মূল্য ছিল ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এ জিনিসগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু জিনিস (যেমন, তামাক, মাছ) রপ্তানি হত—যেগুলির প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছিল পূর্ববাংলা। পূর্বতন পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উপায় ছিল পাট রপ্তানি, আর পাট রপ্তানি এককভাবে উৎপাদন হত পূর্ববাংলায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীগণ পূর্ববাংলা থেকে এতদিন এমনভাবে অর্থোপার্জনের সুযোগ পেয়েছেন যে, পূর্বতন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের এই প্রদেশটিকে তাঁরা একটি উপনিবেশ

হিসেবেই গণ্য করতেন। এই শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ।

আজ স্বাধীন গণতন্ত্রী বাংলাদেশকে চিন্তা করে দেখতে হবে কিভাবে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতার গণ্ডী সম্প্রসারিত করে এই নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করা যায়। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ইসপাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন গুরুভার শিল্প (Heavy industries) গড়ে ওঠেনি। কয়েকটি পাটকল ও চিনি কল, এবং খুলনা জাহাজ কারখানা ও খুলনা নিউজপ্রিণ্ট মিল ছাড়া উল্লেখ করার মত শিল্প-কারখানা বাংলাদেশে বিশেষ নেই। অথচ বাংলাদেশে অনেক নদী থাকায় মাল চলাচলের যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে। চট্টগ্রাম ও চালনা, এই দুটি বড় বন্দরের সুবিধাও বাংলাদেশ পাচ্ছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বিশেষ উন্নতির পথে এতদিন এগোতে পারেনি। বন্যায় কবলিত বাংলাদেশ বার বার শুধু অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিয়েছে—বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থায়ী ব্যবস্থা করার আগ্রহ এতদিন জঙ্গীশাহী দেখায়নি। জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে যে সোনার বাংলা আজ প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে—তার স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হলে দরকার একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশের আশু প্রয়োজন হল প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা, এবং এ ব্যাপারে ভারতের দিক থেকে মিত্রসুলভ অকৃত্রিম সহযোগিতা বাংলাদেশ পাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান প্রয়োজন হল যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবস্থা, জলসেচ ব্যবস্থা ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরী করে তাদের গণ্ডী সম্প্রসারিত করা। ভারত এক্ষেত্রে নানাভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে। শীঘ্রই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রেলওয়ে ও অসামরিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়। বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, জলসেচের ও বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থার জন্য ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে এবং বাংলাদেশও ভারতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের চল্লিশ মাইল দূরে কাপাটি জলবিদ্যুৎ স্টেশন এবং অন্যান্য থার্মেল (Thermel) স্টেশন ধরলে বিদ্যুৎ সরবরাহের মোট ক্ষমতা হল প্রায় দুই লক্ষ কিলোওয়াট। বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ আরও অনেক বাড়ানো দরকার।

দেশ পুনর্গঠনের কাজে প্রয়োজন হল কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাত, লোহা, কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সার, ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতির। এই জিনিসগুলি বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে আমদানি করতে পারে। অপরদিকে ভারত বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট, তামাক, মাছ প্রভৃতি আমদানি করতে পারে। ভারতের পাটকলগুলির অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা রয়ে গেছে; এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানি করে। ভারতে বর্তমানে যে সবুজ-বিপ্লবের সুফল ক্ষেত্রবিশেষে পাওয়া যাচ্ছে তার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় হবে। বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। সর্বাগ্রে কৃষির উন্নয়নই এই দেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাওয়া উচিত। কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চলবে শিল্পোন্নয়ন। অচিরেই সুজলা সুফলা বাংলাদেশ শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠতে পারে যদি দ্রুত কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচী (যেমনটি ভারত গ্রহণ করেছে) গ্রহণ করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশের [illegible] মিলিয়ন একর জমির মধ্যে মাত্র প্রায় [illegible] মিলিয়ন একর জমিতে দুইবারের বেশি চাষ করা হয়। কুমিল্লার অ্যাকাডেমি অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য বিশেষ করে সমবায়ভিত্তিক গ্রামীণ সমবায় সংস্থা গঠন করার জন্য চেষ্টা করছেন। তাছাড়া কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকও এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি-বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য এই সংস্থাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীন গণতন্ত্রী বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্র স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যপদ প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ভারতীয় মুদ্রার উপরেই নির্ভর করতে হবে। টাকা ও তার বিনিময়কে সুনির্দিষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। তাই এই দুই দেশের স্বার্থেই আজ প্রয়োজন সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক সহযোগিতার গণ্ডী সম্প্রসারিত করা। যে রাজনৈতিক সম্পর্ক এখন এই দুই দেশের মধ্যে বর্তমান—তা শুধু বন্ধুত্বের সম্পর্কই নয়, তার চেয়েও বেশি। মনের দিক দিয়ে দুই দেশের মানুষ আজ একান্ত কাছাকাছি। তাঁরা একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই আজ প্রয়োজন হল মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্কের মাধ্যমে এই দুই দেশকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করা। অচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন অচ্ছেদ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতার।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ৬ ॥

পরমেশ মৌলিক হরনারায়ণ চৌধুরীর কাছারিতেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। খবরটা শুনে তিনি সকলের চেয়ে বেশি চমকে উঠলেন। বললেন—সে কী? মারা গিয়েছেন? শেষকালে কী হয়েছিল?

প্রকাশ রায় বললে—তেমন কিছুই হয়নি, বেশ ভালোই ছিলেন। ক'দিন ধরে দেখছিলুম তিনি বাইরে বেরোচ্ছিলেন না, একদিন ঘরের দরজা খুলে দেখি তিনি মরে পড়ে আছেন। কেউ জানতেও পারিনি আমরা...

নতুন লোকের আমদানি দেখে ততক্ষণে আরো কিছু লোক এসে জড়ো হয়েছিল। হরনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যুর খবর শুনে অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেললে। অনেকেই তাঁকে দেখেছে। যারা দেখেনি তারা নাম শুনেছে। চৌধুরী-বংশের কাহিনী শুনেছে। সেই হরনারায়ণ চৌধুরীর মর্মান্তিক পরিণতির বর্ণনা শুনে সবার মুখ দিয়েই অজান্তে একটা 'আহা' শব্দ বেরিয়ে এল। এমনিই হয় গো। যত বড়লোকই হও সকলের পরিণতিই ওই মৃত্যুতে। ওর থেকে কারোর মুক্তি নেই। এই পুরোন কথাটাই যেন আবার সকলের নতুন করে মনে পড়ে গেল।

প্রকাশ রায় বললে—তা এখন সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমি এসেছি সদাকে খুঁজতে। কোথায় গেলে তাকে পাই বলতে পারেন? নৈহাটিতে গিয়েছিলাম, সেখানে তারাও তার কোনও সন্ধান জানে না, তাই নবাবগঞ্জে এলুম, এখন এর পরে কোথায় গেলে তাকে পাবো তাও বুঝতে পারছি না—

পরমেশ মৌলিক বললেন—সদা কি আর বেঁচে আছে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। শেষকালের দিকে তার অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল—

—কেন?

নিতাই হালদার পাশেই দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে আর থাকতে পারলে না। বললে—কেন ভালো থাকবে? আপনারা কি তার কোনও খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন? নিজের বাপ যাকে দেখতো না, নিজের বউ যাকে দেখতে পেলে তাড়িয়ে দিত, সে কী করে ভালো থাকবে? তাকে কি কেউ খেতে পরতে দিত? গায়ে দেবার মত একটা গেঞ্জি কি জামা পর্যন্ত ছিল না তার তা জানেন? এখন তার বাপ মারা গেছে, তাই সম্পত্তির লোভে তার খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন আপনারা। কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন?

পরমেশ মৌলিকও তাই বললেন—হ্যাঁ বাবা, সত্যিই শেষকালের দিকে সদার বড় কষ্টে দিন কেটেছে—অত বড় বংশের ছেলে, সে কিনা এখানে ভিখিরির মত থাকতো! শেষকালে একটা যাত্রার দল এসেছিল গাঁয়ে, তাদের পেছন পেছন সে চলে গেল—

প্রকাশ রায় যেন এতক্ষণে খানিকটা সুরাহা পেলে। বললে—যাত্রার দলের সঙ্গে? কোথায় গেল তাদের সঙ্গে?

—তা কি ছাই দেখেছি? যাত্রার দল কি আর এক জায়গায় বসে থাকে শালাবাবু? তারা তো ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। আজ আছে হুগলী, কালই হয়ত আবার চলে গেল আসামের দিকে—

—তবু একটা আপিস তো আছে তাদের কোথাও। যাত্রা দলের নামটা জানতে পারলে না হয় তাদের হেড-অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে পারি—

পরমেশ মৌলিক বললেন—কত যাত্রার দলই তো আসে। ও যাদের সঙ্গে গিয়েছিল তাদের নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।

তারপর অন্য যারা আশেপাশে ছিল তাদের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা জানো নাকি হে কেউ নামটা?

নিতাই হালদার পাশেই ছিল। সে আর থাকতে পারলে না। বললে—তা এতদিন কোথায় ছিলেন আপনারা শালাবাবু? এতদিন তো আপনারা একবারও তার খোঁজ নিতে আসেননি? এখন চৌধুরী মশাই মারা গেছেন তাই তাঁর অগাধ টাকার ওয়ারিশানকে খুঁজে বার করতে এসেছেন। আমরা সব বুঝতে পেরেছি—

প্রকাশ রায় কথাগুলো শুনে যেন কেমন চুপসে গেল।

নিতাই হালদার তবু থামলো না। বলতে লাগলো—চৌধুরী মশাই-এর লাখ লাখ

টাকা এখন সবাই তো পাবে সদানন্দ, তাই তার জন্যে এখন আপনাদের যত দরদ উথলে উঠেছে, না? তাই এখন খোঁজ পড়েছে তার। ভেবেছেন পাগল ভাগ্নেকে সামনে খাড়া করে টাকাগুলো নিজেদের পেটে পুরবেন। তা মতলোব আপনাদের খুবই ভালো শালাবাবু। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি, সদানন্দর যা হয় হোক, এতে আপনাদেরও কিন্তু, কিছু ভালো হবে না। আপনাদের এ টাকা ভোগে আসবে না। কারণ এখনও আকাশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে, ভুলে যাবেন না মাথার ওপর ভগবান বলে এখনও একজন আছেন—

পরমেশ মৌলিক নিতাই হালদারকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—নিতাই, তুই থাম—

নিতাই মুখফোঁড় ছেলে বরাবর। বললে —কেন থামবো খুড়োমশাই? আমি কি কিছু অন্যায় কথা বলেছি? এখানে তো আরো দশজন গাঁয়ের লোক আছে। সদানন্দকে কে না দেখেছে? সবাই জানে কত নাকাল হয়েছে সে আত্মীয়-স্বজনের কাছে। নিজের বাপ যখন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, এক মুঠো ভাত দিয়ে ছেলেকে বাঁচায়নি, তখন এই মামা তো এসে তাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দেয়নি। যতদিন দিদি ছিল, যত দিন দিদি টাকা জুগিয়েছে ততদিন খুব খাতির, ততদিন শালাবাবু ঘরের লোক, আর যেই দিদি মারা গেল আর উধাও—

প্রকাশ রায়ের কথাগুলো ভালো লাগলো না। সুটকেসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে—আমি তাহলে উঠি—

নিতাই হালদার বললে—আমাদের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে না কি না তাই উঠে যাচ্ছেন। অপ্রিয় কথা কারই বা শুনতে ভালো লাগে, বলুন?

প্রকাশ রায় আমতা, আমতা করে বলতে লাগলো—না, মানে, সদানন্দকে খুঁজতেই তো আমি এখানে এসেছিলাম, তা সে যখন এখানে নেই, তখন অন্য কোথাও চেষ্টা করে দেখি গে—

নিতাই বললে—হ্যাঁ, অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করুন, খুঁজে বার করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলুন, তুলে জামাই-আদরে রেখে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে দিয়ে একটা যা-তা কাগজে সই করিয়ে নিন, তারপর তাকে লাথি-ঝাঁটা মেরে দূর করে দিন গে, কেউ কিছু জানতে পারবে না, মাঝখান থেকে আশীর্বাদ করে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি আপনাদের হাতে এসে যাবে—

সেদিন গ্রামের লোক যে কথাগুলো বললে তার একটাও কিন্তু মিথ্যে নয়। সবাই জানতো হরনারায়ণ চৌধুরী শ্বশুরেরও অনেক টাকা পেয়েছিলেন। নবাবগঞ্জের সব সম্পত্তি সব কিছু বিক্রি করে যা পেয়েছিলেন সব নিয়ে গিয়ে ভাগলপুরে উঠেছিলেন। সদানন্দের ঠাকুর্দা, মা, সবাই তখন মারা গেছে। নয়নতারাও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে তখন কেষ্টনগরে তার বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সমস্ত বাড়িটা যেন তখন রাতারাতি শ্মশান হয়ে গেছে। চৌধুরী মশাই এই নবাবগঞ্জে তখন সারা বাড়িতে একলাই কাটাতেন। আর সদানন্দ থাকতো এই বারোয়ারিতলায়।

প্রথম প্রথম অনেকেই ক্ষেপাতো সদানন্দকে। বলতো—হ্যাঁ গো ছোটবাবু, তোমার বউ কোথায় গেল?

নয়নতারা যে কোথায় গিয়েছে তা সবাই জানতো। বেশ ভালো করেই জানতো। তবু মজা করবার লোভ সামলাতে পারতো না কেউ। এই পরমেশ মৌলিক যেখানে বসে

আছেন, এই বারোয়ারিতলার মাটির ওপর সদানন্দ অনেক দিন অনেক রাত কাটিয়েছে।

নিতাই হালদার জিজ্ঞেস করতো—ছোট-বাবু, আপনি বাড়ি যাবেন না? রাত যে অনেক হলো!

তখন হরনারায়ণ চৌধুরী মশাই সমস্ত বাড়িটাতে একলা থাকতেন। নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলা থেকে দেখা যেত চৌধুরীদের বাড়িটা। সারা বাড়িতে অসংখ্য ঘর। চার মহলা বাড়ি। দক্ষিণ দিকে সেই পুকুরটা। একেবারে বাড়ির লাগোয়া। পুকুর থেকে উঠতেই পাড়ের ওপর সার সার ধান চাল ডালের মরাই। পুকুর আর মরাই-এর মাঝখানে অনেকখানি লম্বা জায়গা জুড়ে শাক-সব্জির বাগান। লাউ-কুমড়ো-উচ্ছের মাচা। কয়েকটা পেঁপে গাছ, বেগুনের ক্ষেত। যখন চৌধুরী বাড়ি জম-জমাট ছিল তখন ওইখানে বাড়ির মেয়েদের শাড়ি শুকোতো সার সার। শুকোবার পর গৌরী পিসী এসে আবার বিকেলের দিকে সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে ভেতর বাড়িতে যার যার ঘরে সাজিয়ে রেখে দিত। যখন রাত হতো তখন ও জায়গাটায় আর যেতে পারা যেত না। ভয় করতো। কিন্তু তার পাশেই ছিল গোয়াল ঘর। সেই রাত্তির বেলা অনেকদিন সদানন্দ ওই পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটের ওপর চুপ করে বসে থাকতো। তার মনে হতো পুকুরের জলের মধ্যে থেকে যেন কারা দল বেঁধে উঠে আসছে তার দিকে। মানুষের মত চেহারা তাদের, কিন্তু ঠিক যেন আবার মানুষও নয়।

কাছে আসতেই সদানন্দ ভয় পেয়ে যেত। চেঁচিয়ে বলে উঠতো—কে তোমরা? কারা তোমরা?

লোকগুলো হাসতো। বলতো—আমাদের তোমরা চিনতে পারবে না গো, আমাদের চিনবে না তুমি—

সদানন্দ বলতো—কিন্তু তোমরা এখানে কী করতে এসেছো? বাড়ির ভেতরে যাবে নাকি?

লোকগুলো আরো হেসে উঠতো। বলতো—আমরা সব জায়গায় যেতে পারি—

—কিন্তু তোমরা এখানে কী করতে এসেছ?

—দেখতে।

—কী দেখতে?

—দেখতে এসেছি তোমরা কেমন আছো। দেখতে এসেছি নবাবগঞ্জের সব মানুষ কেমন আছে।

—তোমাদের বাড়ি কোথায়?

—এই নবাবগঞ্জেই আমাদের বাড়ি ছিল একদিন। কিন্তু এখন আর আমাদের কোনও বাড়ি নেই। এখন সব জায়গাতেই আমাদের বাড়ি, এখন আমরা সব জায়গাতেই যেতে পারি।

—তবে কি তোমরা ভূত?

লোকগুলো সদানন্দর প্রশ্ন শুনে হেসে উঠতো। বলতো—ভয় পাচ্ছো বুঝি? ভয় পেয়ো না। আমরা রোজ রোজ এখানে আসি, আমরা রোজ রোজ এখানে আসবো। আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। এখানে আগে তো আসতে পারতুম না। আমরা চৌধুরী মশাই-এর কাছারি বাড়িতে এসে এককালে তার সামনে হাত-জোড় করে বসে থাকতুম। খাজনা মকুব করতে বলতুম। আগে আমরা ছিলুম কালিগঞ্জের জমিদারবাবুর প্রজা, পরে আমরা হলুম চৌধুরী মশাই-এর প্রজা। আমরা খরার সময় খাজনা দিতে পারিনি। যেবার ঝড়ে আমাদের বাড়ি পড়ে গিয়েছিল আমরা চৌধুরী মশাই-এর ঝাড় থেকে বাঁশ কেটেছিলুম, তার জন্যে আমাদের নামে সদরের কাছারিতে ফৌজদারি মামলা হয়েছিল।

—তারপর?

—তারপর আমাদের জমি খাস হয়ে গিয়েছে, আমাদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। এই দেখ, এর দিকে চেয়ে দেখ, এর গলার কীসের দাগ দেখছো?

—কীসের দাগ?

সদানন্দ সেই অন্ধকারের মধ্যেই লোকটার গলার কাছে তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখলে। অস্পষ্ট ছায়া সব। তবু মনে হলো সেখানকার ছায়াটা যেন আরো ঘন, আরো গভীর হয়ে উঠেছে।

—এ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।

কথাটা শুনেই সদানন্দ আঁতকে উঠলো। গলায় দড়ি দিয়েছিল?

—হ্যাঁ, বারোয়ারিতলার বটগাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল।

—এর নাম কী?

—কপিল পায়রাপোড়া।

নামটা কানে যেতেই সদানন্দ একটা আর্তনাদ করে সেই ইঁট-বাঁধানো পৈঁঠের ওপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। কিন্তু কেউ তা টের পেলে না। সন্ধ্যেবেলা যখন হরিহরবাবু ছাত্রকে পড়াতে এসেছেন তখন খোঁজ পড়লো খোকাবাবু নেই। খুঁজে বার করো সদানন্দকে। হরিহরবাবু সেই তিন ক্রোশ দূর থেকে সাইকেল ঠেঙিয়ে রোজ নবাবগঞ্জে পড়াতে আসেন। সকলেরই সে-কথা জানা। বাড়িময় খোঁজ পড়লো। বড় অন্যমনস্ক ছেলে। খেয়ালী কল্পনের মানুষ। অনেক সময় ইস্কুল থেকে আসতে আসতেই কারো বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাদের ঘানি-গাছে চড়ে বসতো। তখন আর বাড়ির কথা ক্ষিধের কথা মনে পড়তো না। সেদিন সব জায়গায় খোঁজা হলো। চণ্ডীমণ্ডপে চৌধুরী-মশাই প্রজা-পাঠকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি বললেন—কই, আমি তো দেখিনি তাকে। আমার কাছে তো কই আসেনি সে। তবে সে ইস্কুল থেকে এসেছিল তো? গৌরী পিসী নিজের হাতে তাকে মুড়ি-বাতাসা আর সন্দেশ খেতে দিয়েছে। তাহলে সে যাবে কোথায়?
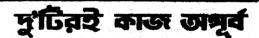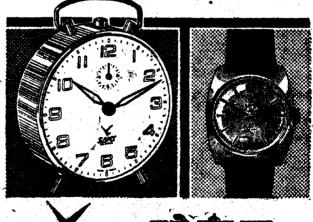
দীনুও ছুটলো বারোয়ারিতলায়, সেখানেও নেই। প্রকাশ মামা দিদির কাছে এসেছিল। কোথায় ঘুরেছিল। বাড়িতে এসেই শুনলো ভাগ্নেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার দৌড়লো বাইরে। যাবে কোথায় সে? উড়ে তো যেতে পারে না। দিদিকে বললে—কিছু টাকা দাও—

দিদি বললে—টাকা কী হবে রে?

প্রকাশ বললে—নানান জায়গায় যেতে হবে, টাকা হাতে থাকা ভালো, বুঝলে? সব সময় কিছু টাকা হাতে রেখে দিও, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সব সুরাহা হয়ে গেছে।

টাকা নিয়ে প্রকাশ রায় বেরোল। কিন্তু আসলে খুঁজে বার করলে গৌরী পিসী। গৌরী পিসী গোয়াল-ঘরের দিকে যাচ্ছিল খুঁটে আনতে। হঠাৎ চাঁদের আলোয় দেখতে পেলে কে যেন ঘাটের পৈঁঠের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। একবার যেন কীরকম সন্দেহ হলো। তারপর বললে—কে রে? কে রে ওখানে শুয়ে আছিস? কে তুই?

উত্তর না পেয়ে পায়ে-পায়ে কাছে গিয়ে দেখে খোকা। খোকাকে ওই অবস্থায় দেখে আর সেখানে দাঁড়ালো না। দৌড়তে দৌড়তে বাড়ির মধ্যে এসে খবর দিতেই সবাই দৌড়ে গেছে। চৌধুরী-মশাইও চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে এলেন। প্রজা-পাঠক যারা ছিল তারাও এলো। সবাই ধরাধরি করে নিয়ে এসে তুললো ভেতর বাড়িতে। তারপর ডাক্তার-বদ্যি আসার পর যখন তার জ্ঞান হলো তখন সবাই জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছিল তোর? সন্ধ্যেবেলা ওখানে গিয়েছিলি কী করতে? ভয় পেয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—কে ভয় দেখিয়েছিল?

সদানন্দ বললে—কপিল পায়রাপোড়া।

এ-সব সদানন্দর জীবনের ছোট বেলাকার ঘটনা। প্রকাশ মামা যখন কেষ্টনগরে সদানন্দর পাত্রী দেখতে গিয়েছিল তখনই এইসব কথাই উঠেছিল। বেয়াই মশাই সরল সাদাসিধে মানুষ। নবাবগঞ্জের চৌধুরী বাড়ির একমাত্র ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন। সারা জীবন ইস্কুলে ছাত্রদের সংস্কৃত শিখিয়েছেন। কাকে বলে ধাতুরূপ তা জানেন। কাকে বলে ব্যাকরণ আর কাকে বলে অলঙ্কার তাও জানেন। খাওয়া পরার কিছু ভাবনা যেমন ছিল না, তেমনি অভাবও ছিল না কিছু। তিনি বলতেন—অভাব বললেই অভাব। নইলে কোনও অভাব নেই আমার। আমি যদি কিছু না-চাই তো আমার অভাব থাকবে কী করে? আমার তো ওই একটা মেয়ে, নয়নতারা। নয়নতারাকে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে। নয়নতারার বিয়ের জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

গৃহিণী বলতেন—কিন্তু তা বলে বিয়ের চেষ্টা তো করতে হবে—

ব্যাকরণতীর্থ পণ্ডিত মানুষ এই কালীকান্ত ভট্টাচার্য। তিনি বলতেন—চেষ্টা করবার আমি কে বলো তো? তিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তাঁর যা মনোবাঞ্ছা তাই-ই হবে।

প্রকাশ মামা যখন নিজে সম্বন্ধটা নিয়ে গিয়েছিল তখন কালীকান্ত ভট্টাচার্যও তাকে সেই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমি কে বলুন? আর আপনিই বা কে? আমরা কেউ-ই কিছু নই। নিমিত্ত মাত্র। নয়নতারার মা আমাকে তাগিদ দেয়, বলে—মেয়ের বিয়ের জন্যে তুমি কিছু ভাবো না। আমি বলি—মেয়ের বিয়ের ভাবনা আমি ভাববার কে? যিনি ওকে আমার সংসারে পাঠিয়েছেন তিনিই ভাবছেন... তা দেখুন, কোথায় ছিলেন আপনি আর আমি কোথায় ছিলাম, হঠাৎ আপনি নয়নতারার সম্বন্ধ নিয়ে এলেন—আর এমন পাত্র পাওয়া তো আমার পক্ষে ভাগ্যের কথা রায় মশাই—

তারপর থেমে আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—তা আপনি হলেন পাত্রের কে?

—মামা!

—হরনারায়ণ চৌধুরী মশাই-এর আপন শ্যালক আপনি?

—আজ্ঞে না। আমি হলাম চৌধুরী মশাই-এর গৃহিণীর মামার ছেলে। অর্থাৎ মামাতো ভাই। তবে আসলে বলতে গেলে নিজের ভাই-এর মতই। ছোটবেলা থেকে চৌধুরী মশাই-এর শ্বশুর [illegible] মুখোপাধ্যায়ের কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় আমি তাঁর বাড়িতে ছেলের মতই মানুষ হয়েছি। তাই থেকেই এই ঘনিষ্ঠতা। তিনি [illegible] আমার ভাগ্নের জন্যে একজন জানা-কাটা-

পরীর মত পাত্রী চাই। তা অনেক খুঁজেছি। প্রায় শ'খানেক মেয়ে দেখেছি এ পর্যন্ত। আমার ভগ্নিপতির তো টাকার প্রয়োজন নেই, টাকা তাঁর অনেক আছে, কিন্তু তাঁর একমাত্র বাসনা পুত্রবধূটি যেন ডানা-কাটা-পরী হয়, আর কিছু নয়—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—তা আমার মেয়েকে কেমন দেখলেন?

প্রকাশ মামা বললে—ওই যে এক-কথার বলনায় ডানা-কাটা পরী—

—তাহলে আপনার পছন্দ হয়েছে?

প্রকাশ বললে—আপনার মেয়েকে যার অপছন্দ হবে সে হয় কানা আর নয়তো মিথ্যেবাদী।

কালীকান্ত ভট্টাচার্যের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। তিনি কী করবেন বুঝতে না পেরে বলে উঠলেন—আপনি আর দু'টো সরভাজা নিন্ বেয়াই মশাই—

—তা দিন। খেতে আমার আপত্তি নেই। একবার সম্বন্ধটা হয়ে যাক তখন দেখবো আপনি আমাকে কত সরপুরিয়া সরভাজা খাওয়াতে পারেন—

কথাটা বলে প্রকাশও যত হাসতে লাগলো ভট্টাচার্য মশাইও তত। সঙ্গে সঙ্গে আরো সরপুরিয়া এলো, আরো সরভাজা। আরো কথা হলো, আরো হাসি। প্রথম দিনেই প্রকাশমামা হাসিতে গল্পে পাত্রীর বাবার মন ভিজিয়ে দিলে। সেখান থেকে বেরিয়েই সোজা ট্রেনে উঠে একেবারে রেল-বাজারে নামলো। বারোয়ারিতলায় আসতেই লোকজন ধরলে। কী শালাবাবু, কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

শালাবাবু বললে—ওহে, তোমাদের সব বলে রাখি আসছে অঘ্রাণে সদার বিয়ে, এই পাত্রী পছন্দ করে এলুম। তোমরা সব যাবে, তোমাদের সব নেমন্তন্ন রইলো—

কথা শুনে সবাই অবাক। সদানন্দর বিয়ে। চৌধুরী-মশাইএর একমাত্র ছেলের বিয়ে।

—নেমন্তন্ন হবে সক্কলের, যাওয়া চাই কিন্তু—

কোথায় বিয়ে, কবে কোন্ তারিখে বিয়ে, তার ঠিক নেই, শুধু পাত্রী দেখলুম আর বিয়ে হয়ে গেল! বিয়ে কি অত সহজে হয়? আর তা ছাড়া যার বিয়ে সেই চৌধুরী মশাইএর ছেলেই তো বলে বিয়ে করবে না সে। রাস্তায় ঘাটে কত লোক সদানন্দকে দেখেছে। সকলের সঙ্গে নদীতে চান করবার সময়ও অনেকে জিজ্ঞেস করেছে—কীরে সদা কাল কোথায় ছিলি তুই? সবাই যে তোর খোঁজাখুঁজি করছিল! কোথায় গিয়েছিলি?

সদানন্দ বলেছে—কালিগঞ্জে—

—কালিগঞ্জে? কালিগঞ্জে কী করতে?

—বেড়াতে।

কালিগঞ্জে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। আর বেড়াবার জায়গা পেলে না সদানন্দ, বেড়াতে গেল কি না কালিগঞ্জে! তার চেয়ে বারোয়ারিতলায় নিতাই হালদারের দোকানের সামনের মাচায় তাস খেলতে এলেই হয়। কিম্বা 'নল-দময়ন্তী' থিয়েটার করছে ক্লাবের ছেলেরা সেখানে গিয়ে মহড়া শুনলেই হয়। তা নয় একলা-একলা ক্ষেতে-খামারে ঘুরে বেড়ানো!

একজন বললে—এবার চৌধুরী-মশাইকে বলবো তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে, তখন বাড়িতে মন বসবে তোর—

সদানন্দ বলেছে—আমি বিয়ে করবো না—

—বিয়ে করবি না তো এই এত জমি-জমা, এত টাকা-কড়ি কে খাবে?

—আমার দাদু খাবে, আমার বাবা খাবে।

—কিন্তু যখন তোর ঠাকুর্দা থাকবে না, তোর বাবা-মা কেউ থাকবে না, যখন তুইও থাকবি না, তখন কে খাবে?

সদানন্দ বললে—তাহলে তোমরা আছো কী করতে? তোমরা খাবে!

আমরা? আমরা খাবো? আমাদের কি অমন কপাল! অমন কপাল হলে তো আমরাও বড়লোকের বাড়িতেই জন্মাতুম রে! লোকে হাসতো। চৌধুরী-মশাইএর ছেলের কাণ্ড দেখে সবাই হাসতো। বলতো—ছোটবেলায় অমন সবাই বলে হে! তারপর দেখবে যখন বড় হবে, বিয়ে হবে, সংসার হবে, তখন ওর বাপ ঠাকুর্দার মত বাকি খাজনার দায়ে আমাদের নামে আবার কাছারিতে গিয়ে নালিশ ঠুকে দেবে! ও-রকম অনেক দেখা আছে হে। অনেক দেখা আছে—

কিন্তু ক্রমে সেই সদানন্দর বয়েস হয়েছে, যাকে বলে সাবালক তাই-ই হয়েছে, স্কুল থেকে পাশ করে কলেজে পড়তে গেছে, কিন্তু তখনও সেই একই রকম। আগেও যা ছিল পরেও তাই। তা সেই সদার এখন বিয়ে। বারোয়ারিতলার আড্ডায় রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। হরনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ির বিয়ে নয় তো যেন নবাবগঞ্জের সমস্ত লোকেরই বাড়ির বিয়ে। গ্রাম সুদ্ধ লোকই কোমর বেঁধে লেগে গেল আলোচনা করতে। কোথা থেকে মিষ্টি আসছে, কোন্ গয়লা-বাড়িতে দইএর বরাত গেছে, কোন কুমোর বাড়িতে হাঁড়ি-কলসী-জালার বায়না গেছে,

কোন সদর থেকে গোরা-বাজনার দল আসছে সব খবর মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। তাক্ লেগে গেল শশালাবাবুর গরম মেজাজ দেখে। পাত্রী পছন্দ করানো থেকে শুরু করে নুন-কলাপাতাটুকু পর্যন্ত সবই যেন তার দায়। নরনারায়ণ চৌধুরী ভেতর দোতলায় বসে বসে হুকুম জারি করেই খালাস। নাতির বিয়ে হবে, সে-বিয়ে তিনি দেখে যেতে পারবেন, তাঁর কাছে তার চেয়ে বেশি আনন্দ আর কিছু নেই। ছেলে হর-নারায়ণ নিজে গিয়ে কন্যাকে হীরের মুকুট দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছে। ওদিক থেকে কালিকান্ত ভট্টাচার্য মশাইও নিজের সাধ্যমত একটা সোনার বোতামের সেট দিয়ে পাত্রকে আশীর্বাদ করে গেছেন। তাঁর নিজের অবস্থার চেয়ে হাজার গুণ বড় অবস্থার বংশের সঙ্গে কুটুম্বিতে করছেন সেটা তাঁর পক্ষেও মহা আনন্দের ঘটনা। দুপক্ষই খুশী। আর দুপক্ষের মাঝখানে যোগসূত্রের মত প্রকাশমামা একবার কেষ্ট-নগর আর একবার নবাবগঞ্জ করছে। ছেলে-মেয়ে-বউ সবাইকে নিয়ে এসে তুলেছে এখানে। নরনারায়ণ চৌধুরীর বেয়াই কীর্তিপদ মুখোপাধ্যায়ও ভাগলপুর থেকে

অসুস্থ শরীর নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। কিন্তু সব কিছুর দায়িত্ব বলতে গেলে যেন নারায়ণেরই একলার। একবার ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে হাজির হয় আর একবার দিদির কাছে। বলে—আর শ'পাঁচেক টাকা দাও তো দিদি—

দিদি টাকা দিতে দিতে শুধু মাত্র জিজ্ঞেস করে—আবার পাঁচশো টাকা কী হবে? তোর জামাইবাবুর কাছেই চাইলে পারতিস—

টাকাগুলো পকেটে পুরতে পুরতে নারায়ণ বলে—জামাইবাবুকে এখন কোথায় খুঁজে পাই বলো দিকিনি—! আমারই বা অত সময় কোথায়! তোমাকে শেষকালে সব হিসেব দিলেই তো হলো—

বলে হন্-হন্ করে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই কোথায় উধাও হয়ে যায়। নাইবার খাবারও সময় নেই তার। নরনারায়ণ চৌধুরী এক-একবার জিজ্ঞেস করেন—কৈলাস, সব কাজ-কর্ম ওদিকে ঠিক চলছে তো?

কৈলাশ গোমস্তা বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু, প্রকাশমামা আছেন, তিনি সব করছেন—

নরনারায়ণ চৌধুরী চিনতে পারেন না। জিজ্ঞেস করেন—প্রকাশমামা? সে আবার কে?

—আজ্ঞে আমাদের বৌমার ভাই—

—বৌমার ভাই মানে? নারায়ণের শালা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তা বেয়াইমশাইএর তো পুত্রসন্তান ছিল না। শালা কোত্থেকে এল?

—আজ্ঞে বৌমার মামাতো ভাই, আমাদের বেয়াই মশাইএর কাছেই মানুষ, ছেলেবেলাতেই বাবা-মা মারা গিয়েছিল কিনা—

—ও—বলে তিনি চুপ করলেন। অনেকবার শুনেছেন তিনি কথাটা, তবু শেষের দিকে অনেক কিছুই তিনি ভুলে যেতেন।

যখন বিয়ে বাড়ি এমনি জম্-জমাট, চৌধুরী বাড়িতে লোক-জন গম্-গম্ করছে, তখন গ্রামের লোকের কানে গেল শাঁখ বাজার শব্দ। লোকজন সবাই ভিড় করে এল। গায়ে-হলুদ এসেছে। গায়ে-হলুদ এসেছে। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও! গায়ে-হলুদের দলের সঙ্গে এসেছে অনেক লোক। এসেছে সকাল আটটার আগেই। পুরুত-মশাই পাঁজি দেখে সময় বলে দিয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে ছেলের গায়ে-হলুদ না হলে ওদিকে মেয়ের গায়ে-হলুদও হবে না। এদিকে টাইম দেওয়া হয়েছে সকাল আটটা, আর ওদিকে সেই হিসেব করে মেয়ের গায়ে হলুদ হবে সকাল ন'টার সময়। হিন্দুর বিয়ে বলে কথা। এর নড়-চড় হবার উপায় নেই। হলে অকল্যাণ হবে। অকল্যাণ হবে বর-কনের। অকল্যাণ হবে চৌধুরী বংশের, অকল্যাণ হবে ব্যাকরণতীর্থ কালিকান্ত ভট্টাচার্যের বংশেরও।

কৃষ্ণনগর থেকে নবাবগঞ্জ। মাঝখানে রাণাঘাটে একবার ট্রেন বদল করতে হয়। সময়ও লাগে অনেক। তারপর আছে রেল-বাজার থেকে এতখানি রাস্তা।

গায়ে-হলুদের দল যখন কেষ্টনগরে ফিরলো তখন বিকেল পুইয়ে গেছে। সামনের রাস্তার দিকে হা-পিত্যেশ করে চেয়ে ছিলেন ভট্টাচার্যি মশাই। বাড়ির ভেতরেও সকলের উদ্বেগ ছিল। কুটুমবাড়ি থেকে ঘুরে আসছে, ওদের মুখ থেকে অনেক খবর শোনা যাবে।

—কি গো বিপিন, গায়ে-হলুদ হলো? কী-রকম খাতির করলেন বেয়াই-মশাইরা?

বিপিনের মুখটা যেন কেমন গম্ভীর-গম্ভীর।

—কই কথা বলছো না যে কিছু?

বিপিন বললে—আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, খাতির খুব ভালোই পেয়েছি, পেট ভরে খেয়েছি সবাই আমরা, কিন্তু......

কী বলতে গিয়ে বিপিন যেন থেমে গেল।

পণ্ডিত মশাই বুঝতে পারলেন না। বললেন—কিন্তু কী......

—আজ্ঞে গায়ে হলুদ হয়নি।

—গায়ে-হলুদ হয়নি মানে? ওদিকে নয়নতারার যে গায়ে-হলুদ হয়ে গেল সকাল ন'টার সময়। ওদিকে আটটার সময় ছেলের গায়ে-হলুদ হবার কথা, সেই হিসেব করে আমরাও যে মেয়ের গায়ে-হলুদ দিয়ে দিয়েছি। সেই রকম ব্যবস্থাই তো করা ছিল—

বিপিন মুখ কাচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে, বরকে পাওয়া গেল না—

—পাওয়া গেল না মানে?

বিপিন বললে—আগের রাত্তির থেকেই বর কোথায় বেরিয়ে গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না—

—শেষ পর্যন্ত? শেষ পর্যন্ত কী হলো তাই বলো। শেষ পর্যন্ত বরকে পাওয়া গেল?

—আজ্ঞে না, পাওয়া গেল না। আমরা আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবো, তাই আমরা চলে এলুম—

খবরটা কানে যেতেই ভট্টাচার্যি গৃহিণীও ছুটে বাইরে এলেন। বললেন—কী হলো গো? গায়ে-হলুদ হয়নি? এদিকে যে নয়নতারার গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে। তাহলে কি বর আসবে না নাকি?

বলে বিপিনের দিকে চাইলেন তিনি।

ভেতরের একটা ঘরে নয়নতারা তখন চুপ করে বসেছিল। তার কানেও গেল কথাটা। কানে যেতেই সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে এল। বর আসবে না!

(ক্রমশ)

॥ ২৬ ॥

বাজারবেড়িয়া

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোরী কর্মকারের খবর অনেকদিন পাইনি। বছর তিনেক আগে তার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখনই তার বয়েস ষাটের উপর। অনেকক্ষণ তার কুঁড়ে-ঘরের দাওয়ায় বসেছিলাম; অনেক কথা হয়েছিল তার সঙ্গে। যখন চলে আসি, আবার যেতে বলেছিল। তা আর হয়ে ওঠেনি। ভগবান তাকে দীর্ঘজীবী করুন, কর্মক্ষম রাখুন। ছেলেরা তার বড় হয়েছে, রোজগারপাতি করছে। বার্ধক্যে শরীর যদি একেবারে ভেঙে না পড়ে, তা হলে আর্থিক বা সাংসারিক কষ্ট তাকে হয়ত পেতে হবে না। আমার বড় সাধ সে এখনও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকুক। না হলে, গ্রাম-বাংলার একটি সুকুমার কুটিরশিল্প তার একজন একনিষ্ঠ সাধককে হারাবে।

বাজারবেড়িয়ার কথা, কিশোরী কর্মকারের কথা আমি প্রথম শুনি জয়নগর-মজিলপুরের নিবাসী শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের কাছে, যিনি 'বাংলার লৌকিক দেবতা' নামের উৎকৃষ্ট বইখানি লিখে কয়েক বছর আগে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন। তাঁরও বয়স ষাটের উপর। কিন্তু এখনও কয়েকটা টাকা ও আরেক প্রস্থ ধুতি-পাঞ্জাবি সম্বল করে এবং নামমাত্র এক বেডিং ও তাঁর চির-সহচর ছাতাটি বগলে নিয়ে দীর্ঘ গ্রাম-পরিক্রমায় তিনি যে কোন সময়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন অনায়াসে। তাঁর মতো সৎ, নিরলস ও আত্মপ্রচারবিমুখ আরও কিছু 'ফিল্ড-ওয়ার্কার' পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় নানাবিধ সরজমিন অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ভরসা হয়, লাইব্রেরীতে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় এমন তথ্য ছাড়াও বাঙালীর বহুমুখী জীবনচর্যা সম্বন্ধে আরও নতুন নতুন তথ্য তাঁদের দ্বারাই সংগৃহীত হবে।

গোপেনবাবুই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বাজারবেড়িয়ায়। সেখানকার এক অভিনব অথচ ক্ষয়িষ্ণু কুটিরশিল্পের কতারেজ হোক, দেশের লোক জানতে পারুক এইটুকু শুধু তাঁর অভিপ্রায়। কলকাতার গড়িয়া থেকে জয়নগর-মজিলপুরগামী বাসে চেপে বেশ সকাল-সকালই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তারপর জয়নগর-ডায়মণ্ডহারবার রুটের বাসে করে মাইল ছয়েক দূরের বাজারবেড়িয়ার মোড়ে নেমে শেষ আধ মাইলটাক পথ পায়ে হেঁটে উপস্থিত হয়েছিলাম কিশোরী কর্মকারের বাড়িতে। সামনের চালার নীচ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার পথ; তার দু' পাশে গোবর-নিকানো উঁচু মাটির দাওয়া। তার একটাতে বসে, এক কাঁচা কাঠের গুঁড়ির উপরকার ছাল তুলে ফেলছিল কিশোরী কর্মকার। আমাদের দেখে, কাঁধে গামছা ফেলে, দাওয়া থেকে নেমে এল সসম্ভ্রমে। তার কুটিরে শহরে লোকের পায়ের ধুলো কদাচিৎ পড়ে। বললে সে কথা। তার পরে, আমাদের উদ্দেশ্য শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেল। তার শিল্পীজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে, ফটো তুলতে, কলকাতার কোন বাবু যে মেহনত করে এত দূরে আসতে পারে সে কথা যেন সহসা বুঝতে পারল না। তৎক্ষণে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এসে জড়ো হয়েছে—কিশোরীর নাতি-নাতনি বোধ হয়। বাড়ির ভিতর থেকে মাদুর এনে তারা চটপট বিছিয়ে ফেলল দাওয়ার উপর। গাছ থেকে ডাব পাড়বার

জন্য মহা হাঁকডাক শুরু করে দিল কিশোরী। তার কাজের কথা, ফটো তোলার কথা, সব পরে হবে—আগে একটু জিরিয়ে নিই—কত কষ্ট করে কত দূর পথ এসেছি আমরা। নগর-সভ্যতার বাইরে আতিথেয়তার এই সহজ সরল ধারাটি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে দূরের গ্রামগুলিতে। সামান্য উপচারে অপরিচিত আগন্তুককেও কাছে টেনে নেবার মধ্যে অমায়িকতা এতই স্পষ্ট যে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। ডাবের জল খেয়ে, দাওয়ার মাদুরের ওপর দুজনে গিয়ে বসলাম গুছিয়ে। তারপরে নোটবই হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

এ গ্রামে কিশোরীদের বসবাস বহুকালের। বাংলা ১১৯০ সালের পুরনো জমির কাগজপত্র নাকি এখনও তার কাছে আছে। সে সব দলিল সহসা আমাদের দেখাতে না পারলেও তার এ উক্তি অসত্য নাও হতে পারে। এ গ্রামের দু'তিন মাইলের মধ্যে মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বর শিবমন্দির এবং আটচালা মন্দিরটি, উৎসর্গলিপি অনুসারে, ১১৫৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কাছাকাছি হাউড়ি-হাটেও একাধিক প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ দেখা যায়। দু'শ বছর আগে ২৪ পরগনা জেলার এ অঞ্চলে সুন্দরবনের বিস্তার অনেক বেশী থাকলেও এগুলি বড় বড় দেবালয়ের নজিরে প্রমাণ হয় যে ঠিক এই এলাকাটিতে রীতিমতো লোকবসতি ছিল। সেই স্বয়ংনির্ভর গ্রামীণ সমাজের এক পাশে এই কর্মকার পরিবারের হয়ত স্থান হয়েছিল। কিশোরীর আদি পুরুষেরা ঠিক কি ধরনের কাজ করতেন সে কথা [illegible] আর কেউ সঠিক বলতে পারে না। তবে গত দু'তিন পুরুষ ধরে এ পরিবার প্রধানত কাঠ-খোদাই শিল্পী। রথের কাঠামো ও বিবিধ মূর্তি, দেবদেবীর কাঠের বিগ্রহ, বৃষকাষ্ঠ ও পুতুলনাচের কাঠের পুতুল বানানোই তাদের পৈতৃক পেশা। আগে এমন পরিবার আরও কয়েকঘর ছিল এ গ্রামে। এখন কিশোরীই 'শিবরাত্রির সলতে'। বৃষকাষ্ঠ ছাড়া অন্য জিনিসের অর্ডার বড় একটা পায় না বলে পুতুলনাচের পুতুল তৈরি করাই তার বর্তমান পেশা। বাজারবেড়িয়া থেকে মাইল দেড়েক দূরে চৈতন্যপুর গ্রামে এ শিল্পের আর একজন কুশলী কারিগর আছেন—সতীশচন্দ্র হালদার। তিনিও বয়সে প্রবীণ। এ দুজন গত হলে এই অভিনব কুটিরশিল্পটি এ অঞ্চল থেকে লোপ পাবে।

প্রসঙ্গত, এই এলাকার কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামে যে নানারকম কুটিরশিল্পীর সমাবেশ দেখা যায় সে এক আশ্চর্য ঘটনা। চৈতন্যপুরে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পীও আছেন যাঁরা মাটির খেলনা-পুতুল ও প্রতিমা নির্মাণ করেন। পটের কাজেও তাঁদের দক্ষতা আছে শুনেছি। বাজারবেড়িয়ায় এক

বাজারবেড়িয়ায় কিশোরী কর্মকার

মাইল দক্ষিণে, মহেশপুরে শোলা-শিল্পী পরিবারের সংখ্যা চল্লিশের কম নয়। দেড় মাইল উত্তরের সরদনায় তের-চোদ্দ ঘর 'মুসলমান' পটুয়ার বাস। আর দু' মাইল দক্ষিণ-পূবে গোপালনগর তো কুম্ভকার ও মৃৎশিল্পীদের জন্য বিখ্যাত।

গ্রামীণ কারুশিল্পের এই পরিবেশের মধ্যে কিশোরী তার পৈতৃক পেশায় নিযুক্ত আছে সারা জীবন। ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার কাছে সেই যে হাতুড়ি-বাটালি ধরতে শিখেছিল, আজও তাতে বিরাম নেই। রথ তৈরির মতো বড় কাজ, দক্ষতাসাপেক্ষ কাজ আজকাল আর পাওয়া যায় না। পুরনো রথ মেরামতির কাজও কদাচিৎ আসে। এলে, রথের কাঠামো সারাই করা ছাড়াও কাঠ খোদাই করে ঘোড়া, সারথি, পরী প্রভৃতির নিরেট মূর্তি তৈরি করতে হয় বলে দক্ষতা দেখাবার কিছু অবকাশ পাওয়া যায়। কাছে-

নাচ-পুতুলের কাঠামো
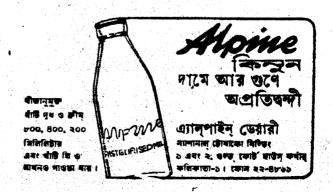
নিচে: চৈতন্যপুর, ভবানীপুর ও জয়নগর-মজিলপুরের তৌলিপাড়ার কাঠের মুখগুলি কিশোরী ও তার সহকর্মীদের তৈরি। এহেন শিল্পসৃষ্টির সুযোগ জীবনে আর হয়ত হবে না বলে সেগুলির উপর কিশোরীর মমত্ববোধ যে কত গভীর তা কথায় কথায় বেশ বোঝা যায়। এখন শেষ জীবনে তাকে এমন পথ ধরতে হয়েছে যেখানে ধনী লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও চলতে পারে। কিশোরী তাই বাড়িতে বসে পুতুলনাচের কাঠের পুতুল বানায়, নানা রঙের সাজপোশাক পরিয়ে তাদের পালাগানের এক-একটি চরিত্রে পরিণত করে, তার পরে দু'চারজন সাগরেদ সঙ্গে নিয়ে উৎসব পার্বণের জমায়েতে নাচ দেখাতে বেরিয়ে পড়ে।

২৪ পরগণার এ অঞ্চলে দক্ষ পুতুল-নাচিয়ে হিসেবে বেশ খ্যাতি আছে কিশোরীর। কোন কোন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা প্রতি বছরই তার দলকে ডাকেন। জয়নগর-মজিলপুরের কার্তিক মাসের রাস-মেলা, সেখান থেকে দু' মাইল দূরে তুলসী-ঘাটার মণ্ডলদের বৈশাখ মাসের গোষ্ঠ-মেলা, দেড় মাইল উত্তরের বহড়ুর বসুদের রাস-মেলা, মজবজের ঘোষ-পরিবারের দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে কিশোরীর উপস্থিতি নিয়মিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রামীণ সংস্কৃতি সম্মেলন থেকেও সে মাঝে মধ্যে আমন্ত্রিত হয়েছে। এ ছাড়া বায়না পেলে অন্যত্রও যায়।

তার এত সমাদর কিন্তু প্রধানত প্রাচীন-পন্থীদের কাছে যাঁরা গ্রাম-বাংলার এই শিল্প-নাট্যটিকে সনাতন রূপেই দেখতে চান। আধুনিক "পাপেট্-শো"-র সঙ্গে তার তুলনা করতে যাওয়াটাই ভুল। প্রথমত, দু' ফুট—আড়াই ফুট উচ্চতার কাঠের পুতুলগুলির কোমরের নীচের অংশ খোদাই করা হয় না বলে তাদের পা থাকে না; পা ফেলে হেঁটে চলে বেড়ানোও তাদের দিয়ে দেখানো যায় না। কেবলমাত্র গলা, কোমর, কাঁধ ও কনুই-এর কাছে জোড় থাকে বলে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনই শুধু দেখানো যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঁ হাতের কনুই-এ জোড়া লাগানো হয় না; সে জন্য ডান হাতটিই শুধু ঘোরাফেরা করতে পারে। "পাপেট্-শো"-র পুতুলের মতো চোখের পাতা ফেলতে পারে না, মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে না, সাজপোশাকও অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই আধুনিক প্রতিযোগীর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কিশোরীর শিল্পসৃষ্টির চটক কম, বাহার অল্প। তবু পল্লীগ্রামের দর্শকদের কাছে তা মনোহারী এই জন্য যে নাচের পালাগুলি কালজয়ী রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে আহৃত। গ্রামীণ জনতার কাছে এসব কাহিনীর আকর্ষণ এখনও যে কত গভীর তা শহরের ফুলবাবু ছাড়া আর সকলেই জানেন। পুতুলগুলির অঙ্গভঙ্গি অপেক্ষাকৃত সীমিত হলেও সঙ্গে সঙ্গে পালাগান চলতে থাকে বলে দর্শকদের রসগ্রহণে বিশেষ বাধা হয় না।

পুতুলের নিম্নাঙ্গ যে বাদ দিয়েই তৈরি হয় সে কথা আগেই বলেছি। মাথা, ধড়,

পরিবারের জাতিগত বৃত্তি তাই তারা ছাড়ে নি; শুধু তার অর্থকরী দিকটার চর্চা করে বর্তমান দুর্দিনে সংসার রক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র। শল্যচিকিৎসার এসব যন্ত্রপাতি বারুইপুরের সরকারী কারখানা থেকে ইলেকট্রোপ্লেটিং করিয়ে নিয়ে তারা ভাল দামে কলকাতার বাজারে বিক্রি করে। স্বীকার করতে বাধা নেই, তাদের আমি দোষী করতে প্যারি নি, বিমর্ষ কিশোরীকেও সান্ত্বনা দিতে পারি নি। এ সেই অমোঘ আর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য যার কবলে পড়ে আমাদের আরও অনেক গ্রামীণ চারু-শিল্প হয় ইতিপূর্বেই লোপ পেয়েছে নয়ত অন্তিম দিনগুলি গুণছে। পরাজিতের মনোভাব নিয়েই আমি সে জন্য চাই কিশোরী কর্মকার আরও অনেক দিন বেঁচে থাকুক। কিন্তু চিরজীবী সে কখনই হতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাজারবেড়িয়ার পুতুল-নাচের ইতিকথায় যে ছেদ পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

(ক্রমশ

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

পায়রা

কোনো কালে হয়তো এ নদীটা ছিল মাতাল, যার অন্য নাম মাতোয়ালা। তার থেকেই তার এ কালের এই নামটা হয়েছে কিনা—ঠিক জানিনে। এখন দেখছি, নদীটার আচরণ বেশ ভদ্র, কোনো-রকম বাড়াবাড়ি নেই, কোনোরকম ইতরতাও নেই; ঢেউ নিয়ে তর্জন গর্জন নেই, স্রোত নিয়ে এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি নেই। অথচ তার নামটা রয়ে গেছে, বদনামের দাগ গা থেকে তোলা বড় শক্ত।

নদীর নাম মাতলা।

স্রোত একই ভাবে বয়ে চলে, কিন্তু কিছুদূর অন্তরই তার নতুন নাম হয়। মাতলায়ও বয়ে যেতে-যেতে হয়ে গিয়েছে বিদ্যাধরী, তার পর রায়মঙ্গল, তার পর ইছামতী।

কিন্তু আমাদের গতি ওদিকে নয়, আমরা বিপরীত পথের যাত্রী। আমরা যেতে চাই রাঙাবেলিয়ায়।

লঞ্চে চেপে যেতে হবে আমাদের। আমরা গভীর রাতের ট্রেনে চেপে এসেছি। ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছি লঞ্চ-ঘাটে।

ঘাটেই দাঁড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু ঘাট থেকে জল অনেক দূরে সরে গিয়েছে। অনেক দূর পর্যন্ত কাদা থিকথিক করছে দেখা যাচ্ছে। এ দৃশ্য আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে বোধ হচ্ছে; কিন্তু এতে নাকি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রোজই নাকি এমন হয়। ভাটার টানে জল নেমে যায়। আবার জোয়ার এলে জল উঠে আসবে নাকি। জল যখন আসবে, লঞ্চও আসবে তখন।

কর্দমাক্ত ঘাটের কিনারে একটা খুঁটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মোহন বলল, "আমাদের ঘাট হয়েছে। জলের খবর না নিয়ে জলপথে যাত্রার এই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয়নি।"

সিগারেট ধরাবে কি ধরাবে-না এই রকম একটা দ্বিধার মধ্যে যেন নিজেকে পাক খাওয়াচ্ছে বিকাশ। অল্প-একটু শুকনো ডাঙায় সে অকারণে জুতোর গোড়ালির

সুশীল রায়

মদন সরকার

উপর ভর দিয়ে পাক খাচ্ছে। পাক খেতে-খেতেই সে মোহনের মন্তব্য শুনে তার দিকে একটু তাকাল।

মোহন কবিতা লেখে। বিকাশ কবিতা লেখে না, কিন্তু মোহনের কবিতা শোনে। যেমন, এখনো সে একটু শুনল। ঘাটে দাঁড়িয়ে সে নিজেদের ঘাটের কথা বলল।

বিকাশ বলল, "এখন কবিতা ভালো লাগছে না, মোহন। পেটে এখন আগুন জ্বলছে। সিগারেটে ফায়ার দিতেই তাই ইচ্ছে করছে না।"

মোহন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল, বলল, "কবিতা কোথায় পেলি তুই?" সোজা হয়ে দাঁড়াল মোহন।

"ওই-যে ঘাটে দাঁড়িয়ে ঘাট হয়েছে বলছিস। ওটা বুঝি কবিতা না?"

মোহন হাসতে লাগল। বিকাশ বলল, "কি জানি ভাই, কোন্‌টা তোমাদের কবিতা, কোন্‌টাই বা কবিতা না।"

সেই ভোর থেকে তারা অপেক্ষা করছে, বেলা এখন অনেক হয়ে গেল, রোদও তেতে উঠেছে। ওরা কী করবে তা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না। রাত্রেও ঘুম হল না, ভোর থেকে কিছু খাওয়াও হল না।

মোহন আবার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কৌতুকভাবেই বলল, "বিকাশ, বৃথন আজ আসিবে জোয়ার?"

"চোর!" চোখ-দুটো একটু বড়-বড় করে এগিয়ে এসে বিকাশ বলল, "এটা নিশ্চয় কবিতা। খুব জানা লাইন। কোত্থেকে চুরি করে এখন কবি সাজা হচ্ছে হে!"

মোহন বলল, "আর সাজা দিস্ নে ভাই। এখন সত্যি চোর হয়ে গেছি। কী কুক্ষণেই এলাম! খিদেয় নাড়ি জ্বলছে।"

বিকাশ চটপট উত্তর দিল, বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে কাদা দেখে কাজ নেই। লঞ্চ যখন আসবার আসুক, চলো, আমরা লাঞ্চ সেরে আসি।"

মোহন বলল, "আরে, তুইও কবি হয়ে গেলি?"

"গেলাম। বাধ্য হয়ে হতে হল। চলো, স্টেশনের কাছে দোকান নিশ্চয় পাব।"

আমি ওদেরই সঙ্গী ও সহযাত্রী, কিন্তু ওরা আমার সম্বন্ধে কেমন যেন উদাসীন। হয়তো আমার স্বাস্থ্যের জন্যে। ওদের সঙ্গে সব সময় পাল্লা দিতে পারিনে। ওদের কোনো কথার মধ্যে ফোড়ন দেওয়াও আমার সাধ্য নয়। তবু, আমাকে যে ওরা সঙ্গে নিয়েছে তার কারণ অবশ্য আছে। দুইজনে সঙ্গী হওয়া যায়, কিন্তু তাতে সঙ্গটা তেমন নাকি জমে না, এইজন্যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি সঙ্গে রাখা নাকি দরকার। কমা, সেমিকোলন বা হাইফেন—যে নামই দেওয়া যাক, তৃতীয় ব্যক্তিটি তাই। দুটো শব্দ যোগ করে দিতে কিংবা থামিয়ে দিতে এসব নাকি কাজে লাগে।

মোহন আর বিকাশ সব সময় শব্দ করেই চলেছে, সুতরাং—

কিন্তু সে কথা অন্য।

বিকাশের কথা অনুসারে স্টেশনের লাগোয়া দোকান থেকে পুরি-তরকারি খেয়ে পেট একটু ঠাণ্ডা করা গেল। মাথার উপরে পাখা ঘুরছিল, তাতে মাথাও একটু ঠাণ্ডা হল। সেইখানে বসেই কিছুক্ষণ সময় কাটানোও গেল।

যেই দোকানে আসছে তার সঙ্গে আলাপ করছে বিকাশ। এ-তল্লাটের হাল-চাল জেনে নেবার চেষ্টা করছে। বোকা সেজে থাকার অসাধারণ প্রতিভা নাকি আছে বিকাশের—এ কথা মোহন মাঝেমাঝেই বলে। কথাটা বোধ হয় ঠিক। এখনও বিকাশ বেশ বোকা সেজে আছে। নির্বোধের মতই নানা-রকম প্রশ্ন করে চলেছে। তার কথা শুনে আমাদেরই রাগ হচ্ছে, কিন্তু যাদের কাছে সে ঐসব প্রশ্ন করছে, তারা একটুও রাগছে না, বেশ অন্তরঙ্গভাবেই ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে।

হঠাৎ বিকাশ বলে উঠল, "শুনলি মোহন। উনি নাকি আসছেন।"

মোহন বুঝতে পারল না, বলল, "কে?"

"জোয়ার।" গেলাসের জলটুকু এক-চুমুকে খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল বিকাশ।

আমার পিঠে একটা থাবা দিয়ে বলল, "চলুন মন্থরবাবু, আপনার বন্ধু এসে গেছেন।"

আমরা তিন জনে রওনা হলাম নদীর ঘাটের দিকে। মনে এখন আমাদের চাপা উল্লাস। যার প্রতীক্ষায় আমরা ভোর থেকে পথের দিকে চেয়ে বসে আছি, সে নাকি এখন আসছে।

মোহন আর বিকাশ আগে-আগে হাঁটছিল। মোহন পিছন ফিরে চেয়ে বলল, "কি রে মন্মথ, পিছিয়ে পড়লি কেন। জলদি আয়।"

বিকাশ বলল, "মানুষের উপর পীড়ন করিস নে ভাই, মোহন। উনি যে আসছেন, এইটেই আমাদের সৌভাগ্য। উনি যে আসছেন এবং তার সঙ্গে তিনি যে আসছেন—এ কি কম ভাগ্যের কথা।"

পিছন থেকেই বললাম, "কানে-কানে কী মন্তর দেওয়া হচ্ছে?"

"বা, বা," বিকাশ বলতে লাগল, "শরীর কাহিল, পা অবশ, কিন্তু কান-দুটি বেশ তাজা। সব কথা শোনা হচ্ছে বুঝি?"

ওদের কথা শুনে পা চালালাম, লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওদের ছাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম আগে-আগে।

বিকাশ বলছে শুনতে পেলাম, "ওর নাম পালটে মন্থরবাবু বলায় নিশ্চয় ও চটেছে। তাই লম্বা পা ফেলে চলেছে। জোয়ারের বন্ধুই বটে ও। দুজনে সমানে জবুথবু, নড়তে চড়তেই ছয় মাস।"

মোহন বলল, "কান-দুটো তাজা বলেছ, তবু তো লম্বকর্ণ বলোই নি—অতদূরে থেকে শুনতে পেল কথা।"

"লম্বকর্ণ মানে কী রে?" বিকাশ জানতে চাইল।

"এর মানে জানিস নে?"

"না তো!"

মোহন বলল, "তুই একটা গাধা।"

আমি পিছন ফিরে চেয়ে মৃদু হেসে মোহনকে একটু তারিফ জানালাম।

মোহন হাত তুলে তা গ্রহণ করল।

ঘাটে এসে দেখি, সত্যিই জোয়ার

আসছে। সম্মুখে কাদার কদাকার প্রান্তর পড়ে ছিল, এখন তা জলে ডুবছে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার মত নৌকোর তলা থেকে সরে গিয়েছিল জল, কাদায় বসে গিয়েছিল তারা। এখন জলের সাড়া পেয়ে তারা কাঁপ ঠেলে-ঠেলে মাটি থেকে নিজেদের আলগা করে জলে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে।

"এই তো জীবন, মোহনদা," উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল বিকাশ। বলল, "বেঁচে-ওঠার জন্যে, জেগে-ওঠার জন্যে এই যে কাঁপ-ঠেলা, এইটেই তো প্রাণ।"

"আর, ঘাটে এই যে লঞ্চের জন্যে হন্যে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এর নাম কি?"

"মরণ।"

গলা চিনতে না পেরে চমকে তাকালাম, ঝুড়ি মাথায় এক মেছুনি, কাদায় পা গেঁথে গেছে তার, তাই তার গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ঐ শব্দ।

বিকাশ হেসে বলল, "আমাকে আর দিতে হল না উত্তর। মাগনা পেয়ে গেলে উত্তরটা।"

খুব হাসাহাসি করলাম আমরা।

বিকাশ এগিয়ে গিয়ে মেছুনিকে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবে গো?"

"পাঠানখালি। তোমরা?"

"রাঙাবেলিয়া। যাবে কিসে—লঞ্চে?"

"হ্যাঁ গো। নইলে কি সাঁতার কাটব—সাঁৎরে যাব?"

বিকাশ জিভ কাটল, বলল, "ছি ছি, তা কি হয়? কিন্তু লঞ্চ কই। আসে না কেন!"

"এসবে। এসবে। এলেই তো ফুরিয়ে গেল, যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই তো আশা।"

চোখ ঘুরিয়ে কেমন করে যেন হাসল সেই মৎস্যগন্ধা নারী। বিকাশের মাথা ঘুরে গেল।

বিকাশ সরে এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "মাথা ঘুরছে কিন্তু।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাঁ পাকে, না ডান পাকে—ক্লক ওয়াইজ, না অ্যান্টি—"

"তামাশা রাখো হে মন্থর। কী মন্তর দিয়ে গেল ও আমার কানে?"

মোহন এগিয়ে এসে বলল, "মরমে একেবারে ঢুকে গেছে বুঝি"

উদাসভাবে দাঁড়িয়ে বিকাশ বলল, "ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

কিন্তু এবার ওরা বুঝতে পারল যে, লঞ্চ আসছে। নৌকোরাও সব ভেসে উঠছে। লঞ্চও আসছে ভাসতে ভাসতে। কিন্তু, যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই নাকি আশা? তবে, এত সহজেই তার এই আসা কেন।

জোয়ারের জলে থইথই করছে চারধার। মাতলার চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। জলের যে একটা রূপ আছে তা যেন এতক্ষণে বোঝা গেল।

বিকাশ একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে মোহনকে বলল, "আচ্ছা বলো, মিল কী হবে বল্। প্রথম লাইন হল—মৎস্যগন্ধা নারী। পরের লাইন বল্।"

"বলিহারি, বলিহারি।" উল্লাস করে উঠল বিকাশ, "পাত পড়ে গেছে বসে যাও, পাটাতন পড়ে গেছে উঠে এস।"

লঞ্চে উঠে এলাম আমরা। আ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।

একতলাটা ইতিমধ্যেই ভরে গেল। বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে ঢুকে পড়েছে ভেণ্ডাররা। হাঁসমুরগীর ঝুড়ি, আনাজের ঝুড়ি, মাছের ঝুড়ি।

আমরা দোতলায় উঠলাম। সারেঙের পিছনে ছোট শেড। দু লাইন বেঞ্চ—ছয়জনের আসন।

আমরা প্রথম লাইনে তিনজন পাশাপাশি বসলাম। কিন্তু ওখানে 'তিনজন বসলে নাকি হবে না, একটা জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। সেটা নাকি রিজার্ভ' করা আছে। "ডাক্তারবাবুর জন্যে রেজার্ভ।"

অগত্যা, বিকাশকে আর মোহনকে ওখানে রেখে আমি দ্বিতীয় লাইনে চলে এলাম। দেরি করলে পাছে তাও হারাই।

কিন্তু কে এই ডাক্তারবাবু? আমরা এত ক্লেশ এত কষ্ট এত শ্রম এত সাধনা করে কোনোরকমে যোগাড় করলাম একটু বসবার জায়গা, আর তিনি কে, যার জন্যে এত সমীহ, এত সম্মান।

ওই আসনে কেউ বসতে গেলেই তাকে বাধা দিয়ে বলা হচ্ছে 'রেজার্ভ'।

একজন প্রবীণ গুরুগম্ভীর রাশভারী

লোক এলেন, তাঁকে আমিই জিজ্ঞেসা করলাম, "আপনি কি ডাক্তারবাবু?"

তিনিও না। তবে কে সেই মান্য লোকটি, কি রকম তাঁর চেহারা। মোহন আর বিকাশও সামনের সীটে বসে জল্পনা-কল্পনা করে চলেছে, পিছনের সীটে বসে আমিও ভাবনাবেদনা নিয়ে আছি।

আমার বেঞ্চে ও ইতিমধ্যে আরও দুজন এসে গেছেন। সামনে ওরা দুজন বসে কী সব আজেবাজে কথা বলছে, তা ওরাই জানে। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রোটিন জাতীয় জিনিস নাকি দরকার, এর মধ্যে মাছ বেশি উপকারী, না, মাংস—এখন তাদের গবেষণার ও হাসাহাসির বিষয় দাঁড়িয়েছে এইটিই। মৎস্য জীবিনীর শরীর বেশ মাংসবহুল ছিল বলেই তাদের এত কথা কি না কে জানে।

আরও অনেকে উঠে আসছেন উপরে, প্রত্যেককেই আমরা ডাক্তারবাবু মনে করছি, কিন্তু 'রজাভ' শুনে তাঁরা যখন নেমে যাচ্ছেন তখন বুঝতে পারছি তিনিও না।

পাশের লঞ্চের চালে দাঁড়িয়ে একজন আক খাচ্ছেন। ফিকে সবুজ—অর্থাৎ যাকে বোধ হয় বটল্ গ্রীন বলে, এরকম রঙের কোট প্যাণ্ট তাঁর পরনে। বয়স চল্লিশের মত।

কোনো কাজ নেই, তাই একদৃষ্টে চেয়ে ভদ্রলোকের আক খাওয়া দেখছি। মোটা আক নয়, কালচে রঙের একরকম সরু আক আছে, ছড়ির মতন করে সেই আক ধ'রে এখনো তিনি দাঁড়িয়ে চারদিক নিরীক্ষণ করছেন, আবার দাঁত দিয়ে আকের ছাল ছাড়িয়ে দাঁতের চাপে টুকরো-টুকরো ভেঙে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে রস শুষে নিচ্ছেন, তারপর ফু দিয়ে ফেলে দিচ্ছেন ছিবড়ে ওই জোয়ারের জলে।

ভদ্রলোকের এই রস-গ্রহণের ঘটা দেখে তাঁকে বেশ রসিক পুরুষ বলে মনে হল।

বিকাশের আর মোহনের ওদিকে দৃষ্টি নেই। তারা কী নিয়ে যে রসিকতা করে চলেছে, তা তারাই জানে।

লঞ্চ সিটি দিল। রোমাঞ্চে সিরসির করে উঠল সারা শরীর। পাখির আলয় দেখতে চলেছি আমরা। দুনিয়ার যাবতীয় পাখি এসে ভিড় করে সুন্দরবনের যে সীমান্তে, আমরা চলেছি সেখানে। রাঙাবেলিয়ায় নেমে আমরা পদব্রজে চলে যাব ফরেস্টারের বাংলোয়।

সিটি হল, কিন্তু লঞ্চ নড়ে না। বোধ হয় ডাক্তারবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

তা নাকি নয়, ওটা ফার্স্ট হুইসল। প্যাসেঞ্জারদের নাকি ডাকছে। নীচে তো গাদাগাদি ভীড় দেখে এসেছি সেই কখন, এখনো সেখানে জায়গা তাহলে আছে? মুরগী আর মানুষ—অল্প জায়গায় এরা নাকি অনেক ধরে, এদের জান্ নাকি খুব শক্ত।

তা বোধ হয় সত্যি। আমরাও তো সেই রাত থেকে এখন অবধি কম সহ্য করছিনে।

দ্বিতীয় হুইসল বাজল। অমনি ঝিকঝিক করে উঠল লঞ্চ। তার ইঞ্জিন চালু হয়েছে।

কিন্তু ডাক্তারবাবুর আসন ফাঁকাই পড়ে রইল। নীচে পাটাতন তোলা হচ্ছে, তারও শব্দ পেলাম।

এমন সময় দেখি, ছড়ি-হাতে সেই বটল্ গ্রীন ভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন।

উনি আসতেই বিকাশ ও মোহন সরে বসে বলল, "এই যে, আসুন ডাক্তারবাবু।"

তিনি বসলেন, আকের দণ্ডটি দু হাঁটুর ফাঁকে রাখলেন, ওদের দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "চেনেন নাকি আমাকে।"

বিকাশ বলল, "নামে চিনি। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম আপনাকে। ভালো আছেন?"

ডাক্তারবাবু বিগলিত হয়ে বললেন, "ধন্যবাদ।"

অনেক রকম কথা ব'লে বিকাশ আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু নির্বিকার। তিনি কী যেন চিন্তায় বিভোর।

বিকাশ বলল, "একে বুঝি যষ্টিমধু বলে? এই যে আপনার হাঁটুর ফাঁকে।"

তিনি মাথা নাড়লেন।

"তবে এটা কী ডাক্তারবাবু?"

সংক্ষেপে তিনি বললেন, "সুগার-কেন্।"

বিকাশ বলল, "আমিও তো বাংলায় ঐ কথাই বললাম। কেন্ মানে বেত মানে লাঠি, শুগার মানে চিনি মানে মধু।"

ডাক্তারবাবু কোনো উত্তর দিলেন না দেখে মোহনের কোমরে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বিকাশ ডাক্তারবাবুকে বলল, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শরীরের পক্ষে প্রোটিন অর্থাৎ মাছ বা মাংস বেশি উপকারী, না ইক্ষুর রস?"

ডাক্তারবাবু এবার উত্তর দিলেন, বললেন, "শরীরের কনডিশনের উপর নির্ভর করে।"

"ধরুন, আমার শরীরের যা কনডিশন।"

ঘাড় ঈষৎ কাত করে তিনি বললেন, "প্রোটিন"

"এগ্‌জ্যাক্টলি।" বিকাশ বলল, "আমার এই বন্ধুকে এতক্ষণ ধ'রে বোঝাতে পারছিলাম না।"

ডাক্তারবাবুকে আর কিছুতেই ওরা কথা বলাতে পারল না।

লঞ্চ চলেছে ঝিকঝিক করে। একবার এপার, একবার ওপার করতে করতে, যাত্রী নামাতে-নামাতে, যাত্রী তুলতে তুলতে চলেছে এই জলের হাওয়াগাড়ি।

সেই স্টেশনটার নাম কি যেন! পাঠান-খালি। ওইখানে কে যেন নামবে? তার মামাটা অন্তত উঁকি দিয়ে দেখতে হবে এখান থেকে। কিন্তু সে ঘাট আসতে কত দেরি, কে জানে। এলেই তো ফুরিয়ে গেল, যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই তো আশা।

সেই আশা নিয়ে বসে রইল বিকাশ, বসে রইল মোহন। পিছনের সীটের এই মন্মথর মনেও যে একটু আকাঙ্ক্ষা না জন্মেছে, এমন নয়।

ডাক্তারবাবু তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট রসদণ্ডটি পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা বাঁধানো খাতা খুলে বিড়বিড় ক'রে কী যেন পড়ে চলেছেন। বিকাশ বার-কয়েক আড়াচোখে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। ভদ্রলোকটি এক মনে পড়ছেন দেখে তাঁকে বিরক্ত করল না। মোহনের দিকে একটু কাৎ হয়ে তাকে কী যেন বলল। মোহন হাসল।

পিছন থেকে আমি ওদের লক্ষ করতে লাগলাম। ওরা আবার ঝগড়া বাঁধিয়ে না দেয়, এ রকম ভয়ও হল।

হঠাৎ বিকাশ উল্লাস ক'রে প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, "এ কি ডাক্তারবাবু, আপনি একজন পোয়েট। একা-একা চুরি ক'রে পোয়েট্রি পড়া হচ্ছে? তা হবে না। আমরা শুনব। জোরে জোরে পড়তে হবে আপনাকে।"

ডাক্তারবাবু একটু লজ্জিত হলেন, একটু গর্বিতও হলেন বোধ হয়। একটু হাসলেন মাত্র।

বিকাশ বলল, "ওটা আপনারই প্রতীক, ওই যে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আপনিও একটা ইক্ষুদণ্ড, বাইরেটা দেখে বোঝা শক্ত, কিন্তু ছাল ছাড়ালেই রস—রসের বন্যা। পড়ুন, স্যার পড়ুন, জোরে জোরে পড়ুন। আপনি নিশ্চয় একজন গ্রেট পোয়েট।"

ডাক্তারবাবু বিনীতভাবে বললেন, "না। তেমন কিছু না। কিন্তু কবিতা লিখি' রোজ লিখি। না লিখে পারিনে। যে কথা বলতে চাই সে কথা প্রকাশ করতে পারলে কত আরাম বলুন তো!"

"বলতে পারব না। কোনোদিন কিছুই প্রকাশ করবার চেষ্টা করিনি, ডাক্তারবাবু।" বিকাশ ডাক্তারবাবুর দিকে ঝুঁকল।

ডাক্তারবাবু এদের আগ্রহ দেখে বেশ জোরে জোরেই পড়ে যেতে লাগলেন। ওরা দুজন একেবারে ঝুঁকে বসে সাগ্রহে তা শুনতে লাগল। ইঞ্জিনের শব্দে তাঁর অনেক ছত্র মার খেয়ে যাচ্ছিল, আমি তেমন শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যেটুকু শুনতে পেলাম তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কোনো কথারই মানে ধরা যাচ্ছে না।

কিন্তু বিকাশের উৎসাহের শেষ নেই। কোনো কোনো লাইন সে ডাক্তারবাবুকে আবার পড়তে বলছে। এবং দুজনে মাঝে মাঝে 'আহা' 'উঁহু' শব্দ করছে।

বিকাশ বলে উঠল, "মাস্টার পীস। কিন্তু ওই জায়গাটার মানে খুব পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না। কবিতার মনে বোঝা চাট্টিখানি কথা নয়, তা জানি।"

"কোন্ খানটা?"

বিকাশ পাতা উল্টে দেখাল, বলল, "এই যে আপনি লিখেছেন—সিংহ-সিংহী নন্দী-ভৃঙ্গী।"

ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু, বললেন, "এ [illegible] মধ্যে সিংহ আর সিংহী খুব মত্ত হয়ে আছে। কী রকম মত্ত? না, নন্দীভৃঙ্গী। ভৃঙ্গ মানে তো জানেন—মৌমাছি। ভৃঙ্গী হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ মেয়ে-মৌমাছি। সেই ভৃঙ্গী যেমন নন্দী অর্থাৎ আনন্দে পাগল। সেই আনন্দে মেয়ে-মৌমাছির মতন বনের [illegible] সিংহ আর সিংহী যেমন বাস করে আর [illegible]"

বিকাশ বলে উঠল, "চমৎকার। [illegible] অল্প কথায় কত কথাই প্রকাশ [illegible] একেবারে যেন কনডেন্সড্ [illegible] নিটোল [illegible] একটা ছোট কৌটোয় [illegible]"

"[illegible] খুশি হলেই কবির [illegible]" ডাক্তারবাবু মৃদু [illegible]

বিকাশ বলল, "[illegible] আমরা [illegible] নন্দীভৃঙ্গী। [illegible]"

[illegible] পড়ে যেতে লাগলেন [illegible] পারলেন না। [illegible] এক [illegible] পড়ে চলেছেন। [illegible] খুব তারিফ ক'রে উঠছে [illegible] করছে মোহন। [illegible] 'উঁহু' শব্দ করেও উঠছে।

আমার পাশের প্রবীণ ভদ্রলোক [illegible] মোহিত। তিনি আমারই মত [illegible] শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু বিকাশের আর মোহনের উচ্ছ্বাস দেখে তিনি বেশ বুঝতে পারছেন যে, অতি উচ্চশ্রেণীর [illegible] হয়েছে এই রচনা।

ডাক্তারবাবু নাকি বিলেত-ফেরত। [illegible] দুই ছিলেন ওদেশে। মসজিদবাটীর [illegible] উনি। ওঁর বাবা ছিলেন খুব বড় [illegible] এই লঞ্চ মসজিদবাটী হয়েই যাবে। [illegible] উনি এখন চলেছেন নিশ্চয় [illegible] সেখানে তাঁর ডিসপেন্সারি আছে। এই সারা এলাকা জুড়ে খুব খাতির [illegible] সবাই মান্য করে। কেন করবে না? বিলেত-ফেরত তো। কলকাতাতেও দুটো ডিসপেন্সারি নাকি আছে। উনি প্রায়ই যাতায়াত করেন।

এই বৃত্তান্ত শুনে আমারও বেশ [illegible] করতে ইচ্ছে হল ডাক্তারবাবুকে।

আমি কবির জীবনকাহিনী শুনে চলেছি পিছনের এই বেঞ্চে বসে, আর ওরা শুনে চলেছে কবির কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত কাব্য।

এর মধ্যে কে যে বেশি লাভবান হচ্ছে বলা শক্ত।

পড়াশ্নায় নাকি খ্ব ভালো ছিলেন এই ...ার। কলকাতার কলেজে পড়তেন। ...রপর বিনা নোটিশে একদিন বিয়ে হয়ে ...ল। যেমন-তেমন বিয়ে না। এক মারাঠী ...য়ের সঙ্গে বিয়ে হল। মস্ত কারবারি ...কের মেয়ে। সেই মেয়ের দৌলতেই ...কি যান বিলেতে, সেই মেয়ের বাপের ...কার।

...মার আরও বেশি সমীহ করার ইচ্ছে ...ল।

প্রবীণ ভদ্রলোকটি বললেন, "তারপর কি ...স বিয়েও ভেঙে গেল।"

...মি চমকে উঠলাম, বললাম, "সে কী। ...ক ঘটল ওদের। সে মেয়ে এখন কোথায়?"

...া নাকি কেউ জানে না। এও ফিরে ...ল বিলেত থেকে, তাকেও তার বাবা ...ঠিয়ে দিল বিদেশে—কোন্ দেশে তা কেউ ...নে না। এ সব ব্যাপার নিয়ে তো আর ...লোচনা হতে পারে না; তাই জানার ...পায়ও নাকি নেই।

বললাম, "ঠিক।"

বিকাশ বলে উঠল, "না, চমৎকার। ওই ...টা আবার পড়ুন।"

ডাক্তারবাবু জোর গলায় পড়লেন, ...মার মৃদুল তন্বী, রয়েছ তাহার ...না।"

"বা, অদ্ভুত মিল। এখানে ঐ 'তন্বী' ...নেই কি যেন।" বিকাশ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তারবাবু হাত নেড়ে বললেন, "তন্বী, ...বী—বুঝলেন না। তন্বী মানে শরীর।"

মোহন বলে উঠল, "সত্যিই সুন্দর। ...দ্ভুত মানে করেছেন বটে।"

ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, ...বিতা জিনিসটা কখনো ব্যাখ্যার জিনিস ...। হৃদয়ঙ্গম করার জিনিস।"

মোহন বলল, "হৃদয় বটে। আপনার মত ...ন হৃদয় কয়জনের থাকে।"

ওরা কবির কাব্যই শুনেছে, কাব্যবিচারই ...ছে ওরা। ওরা কবির জীবনবৃত্তান্ত ...নল না। তা যদি জানত, তাহলে হৃদয় ...থা অমনভাবে বলত না নিশ্চয়।

এখন ওদের সব জানানো যাবে না। ...ঙাবেলিয়ায় নেমে সব বলব ঠিক করলাম।

ডাক্তারবাবু ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা চলেছেন কোথায়?"

"রাঙাবেলিয়া। সেখান থেকে পাখির ...লয়।"

"ও, পাখিরালা? সংক্ষেপে এই নামই ...লে সবাই। পাখি দেখতে যাচ্ছেন বুঝি? ...খি দেখেন নি কখনো?"

আমি এবার মুখকে বললাম ডাক্তারবাবুর ...থা শোনার জন্যে। দুটো পাখা দিয়ে যারা ওড়ে তারাই পাখি। হয়তো অনেক রকম সাইজ, অনেক রকম রং, অনেক রকম বুলি। ওর মধ্যে দেখার নাকি কিছু নেই। দেখতে হলে দেখতে হয় মানুষ। দু-পায়ে তারা চলে, কিন্তু তাদের কত রকম চরিত্র।

রাঙাবেলিয়ায় যখন যাচ্ছি আমরা তখন আমাদের নাকি উচিত সেখানকার সেই মস্ত মানুষকে দেখে আসা। তাঁর নাম গোবিন্দ পায়রা।

বিকাশ বলল, "এও তো পাখি। পায়রা পাখি না?"

ডাক্তার বললেন, "কিন্তু এ পায়রা সে পায়রা নয়—ইনি একজন সাধক, একজন কবি। আমার গুরু।"

হাত তুলে তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করলেন ডাক্তারবাবু।

এক সময় নাকি টাকা জাল করতেন গোবিন্দ পায়রা। ধরাও নাকি পড়েছিলেন। কিন্তু তা দিয়ে মানুষের নাকি বিচার হয় না, মানুষের বিচার হয় তার মন দিয়ে। এখন তিনি বৃদ্ধ, এখন তিনি কবি। এখন ঋষিও বটে।

বাসন্তী নামে যে ঘাটটা আমরা একটু আগে পেরিয়ে এলাম, সেখানে নাকি থাকত মস্ত জমিদার জনার্দন। তার মেয়ে নয়নতারা। অনেক কাল আগের কথা। গোবিন্দ পায়রা নাকি প্রেমে পড়ে ওই মেয়েটার। কিন্তু অত বড় টাকার কুমির মেয়ের বিয়ে দেবে কেন সামান্য জোতদারের ঐ ছেলের সঙ্গে—তাঁর চোখে যে নাকি ব্যাঙাচি। টাকা-ওলা ছেলে চাই, চাই তাঁর কুমিরের বাচ্চা। টাকা করার চেষ্টা করেছিল গোবিন্দ পায়রা। চেষ্টা করতে গিয়ে জেলে গেল।

গোবিন্দ পায়রা এখনো বেঁচে আছেন। একটা পাকা ঘর বানিয়েছেন, সেখানে থাকেন একা। মস্ত ঘরটা, কিন্তু তাতে জানলা নেই একটাও। দুটো মাত্র দরজা। দরজায় উপরের দিকে ছোট্ট দুটি পাল্লা। হাওয়ার দরকার হলে ঐ পাল্লা একটু ফাঁক হয়। তখন সেখান দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যাবে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। লিখছেন। লিখছেন বলা ভুল—ভাবছেন। কলম হাতে নিয়ে সারাদিন বসে ছিলেন শেষে হয়তো পেলেন দুটি শব্দ। তাই লিখলেন। সেইটেই তাঁর কবিতা। সারা জীবনের এই সাধনায় অনেক শব্দ তিনি যোগাড় করেছেন, অজস্র খাতায় তা লিখে রেখেছেন, লিখে রাখছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওঁরই আদেশে আমি এ লাইনে এসেছি। কবিতা লেখা আরম্ভ করেছি। উনি বলেছেন, শান্তি চাস তো কলম ধর। তাই আমি ধরেছি কলম। বেশ আছি কিন্তু।"

বিকাশ বলল, "তা ঠিক। দেখতেই পাচ্ছি, বেশ আছেন।"

ওরা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে মেতে আছে, ওরা যেন্নো কখন যে বিকাশের সেই সাধের পাঠ্যানখানি পেরিয়ে গেছে তা তারা জানেন না। যখন খেয়াল হবে তখন বিকাশের জীবন আবার খালি-খালি ঠেকবে না তো? জীবনের প্রোটিন ফসকে গেল বলে তার জীবনধারণ কঠিন হয়ে উঠবে না তো? সেও আবার ধরতে চাইবে না তো কলম?

আমি ভাবতে পারলাম না আর।

ডাক্তারবাবু ডবল উৎসাহে পড়তে লাগলেন তাঁর কবিতা, ওরা দ্বিগুণ আনন্দে তা শুনতে লাগল।

ঝিকঝিক-ঝিকঝিক করে চলতে লাগল জলের গাড়ি।

জোলো হাওয়ায় তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি।

ওদের ডাকাডাকিতে জেগে উঠলাম। আমরা এসে গেছি নাকি।

ডাক্তারবাবুকে রেখে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নেমে পড়লাম।

উনি যাবেন পরের স্টেশনে—গোসাবায়

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সকলের অলক্ষ্যে নানা কারিগর বিভিন্ন উপাদানে হাতে যে সুন্দর জিনিস তৈরী করেন তাদের নিদর্শন দেখা যায় নানাস্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় ও কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীতে। বলা বাহুল্য, কলকাতা শহরে এ জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করার সার্থকতা আছে, কারণ এই শ্রেণীর প্রদর্শনীতে জনসাধারণ যেমন একদিকে বঙ্গদেশের শিল্পচেতনা তথা নানা কুটীর শিল্প প্রচেষ্টার নিদর্শন দেখতে পান অন্যদিকে তেমন তাঁরা উপযুক্ত মূল্যে নানা জিনিস কিনে আপন আপন গৃহের

ওয়াল ল্যাম্প

শোভাবর্ধন ও পরোক্ষে কারিগরদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করেন। সম্প্রতি ডিজাইন সেণ্টারে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উদ্যোগে ও নিখিল ভারত হস্ত-শিল্প সংস্থার সহযোগিতায় একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এবারেও প্রদর্শনীতে বিশেষ আকর্ষণীয় কয়েকটি নিদর্শন চোখে পড়ে, যেগুলি পত্র পত্রিকার মাধ্যম ছাড়া বহির্বঙ্গের জনসাধারণের জানা সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ এগুলির প্রচারকার্য বিষয়ে বিশেষ সচেতন বলে মনে হয় না। আশা করি এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সচেতন হবেন।

প্রদর্শনীতে শোলা, বাঁশ ও বেত, ঢোকরা, মোষের শিং, ঝিনুক, সূচিশিল্প, চামড়া ও কাঠের তৈরী নানা নিদর্শন দেখা যায়। এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আধুনিক পরিকল্পনা ও ডিজাইন। সংস্থা নিয়োজিত সুযোগ্য শিল্পীবৃন্দের পরি-কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা ও উৎ-

পাদন কেন্দ্রের কারিগরগণ বিভিন্ন উপা-দানে নানা জিনিস তৈরী করেন। ফলে একদিকে যেমন এই নিদর্শনগুলিতে দেশের প্রাচীন শিল্প প্রচেষ্টার আভাষ মেলে অন্যদিকে আবার যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন আকার ও কারু-কার্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই শোলার কয়েকটি কাজ চোখে পড়ে ও এই প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দুশেখর রায়ের ঐরাবত ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের দুর্গার নাম করা চলে। দুটিই গৃহশোভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কাঠ খোদাইয়ের চমৎকার নিদর্শন হিসাবে শম্ভুনাথ ভাস্কর (নতুনগ্রাম)-এর কলী ও দুর্গা অনেকের চোখে পড়ে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ঢোকরার সরস্বতী মূর্তি (হারাধন কর্মকার, দারিয়াপুর, বর্ধমান), সরা অঙ্কন প্রণালী (ডি এন সরকার, বর্ধ-মান), বাঁশের তৈরী সরস্বতী মূর্তি (অমল করক) ও মোষের শিং ও ঝিনুকে তৈরী কয়েকটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দু একটি বালুচর শাড়ির অপূর্ব কারুকার্য, বিশেষ করে আঁচলার অপূর্ব পরিকল্পনা ও বুনন পদ্ধতি দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। এই সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বীরেন পালের মাটির পুতুল ভিকটিম অব পাকি-স্তানী অ্যাট্রোসিটি, মহম্মদ মৈজুদ্দিন মোমিনের কাঁথা ও বিশেষ করে কালিমপঙ কারিগরদের তৈরী মহিলাদের ব্যবহার উপযোগী কয়েকটি হ্যাণ্ডব্যাগ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

✻

রেমুলেড্ গ্যালারীতে শিল্পী বসন্ত পণ্ডিত তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙ ও টেম্পারায় আঁকা ৪৬টি নিদর্শন দেখা যায়।

শিল্পী হিসাবে এই মহারাষ্ট্রীয় যুবক ঠিক অপরিচিত নন। ইতিপূর্বে কল-কাতায় তিনি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন এবং বিভিন্ন যৌথ প্রদর্শনীতেও তাঁর শিল্পনিদর্শন দেখা গেছে। সাম্প্রতিক রচনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় রঙ ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে নীল লাল সবুজ ও বেগুনী। এর সঙ্গে আছে রঙের স্তরভেদ ও রেখা বৈচিত্র্য। ফলে অনেক স্থলেই একটি বিশেষ কারুকার্যের সৃষ্টি

হয়েছে। রেখা ও পরিমিত রঙ ব্যবহারের ফলে কয়েকটিতে ভাস্কর্য গুণ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন ডালকেসেড ইমিগ্র্যাণ্টস, হুইসপারস অব দি জাংগল ও ডে ব্রেক। রেখা ও রঙের সুকৌশল ব্যবহারের জন্যই এগুলিতে প্রধানত ভাস্কর্য তথা রিলিফের

বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। শিল্পীর কয়েকটি রচনা নিসর্গ বিষয়ক। কেবলমাত্র বিভিন্ন রঙের তারতম্য মাধ্যমে শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সেণ্টিনেলস-এর নাম করা যায়। পুরোভাগে কয়েকটি গাছের ডালপালার মধ্য দিয়ে দূরে নীল দিগন্তরেখা চোখে পড়ছে—মনে হয় বুঝি বাতায়ন পথের মধ্য দিয়ে দূরের নীল আকাশের অংশটুকু চোখে পড়ছে। গভীর খয়েরী ও নীল রঙ ও সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে সাদা রঙের পরিমিত ব্যবহার করে শিল্পী বিষয়বস্তুটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত করেছেন। শিল্পীর কয়েকটি রচনা ইংরেজারী শ্রেণীর। বিভিন্ন রঙ গভীরভাবে কাগজে ব্যবহার করে পরে নানা কৌশলে, সম্ভবত রচনা ক্ষেত্রের কয়েকটি অংশ জলে ভিজিয়ে রেখে, বিশেষ কারুকার্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি পরীক্ষামূলক, সুতরাং শিল্পীর এ প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে সফল হয়নি। তবে কয়েক স্থলে তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সবুজ রঙ প্রধান ভ্যারিইং গ্রীন অব দি জাংগল-এর নাম করা চলে। দি ইমিগ্র্যাণ্টসও অনেকের চোখে পড়ে। লাল, বেগুনী ও সবুজ রঙের স্বচ্ছ অবরণের মধ্য দিয়ে শিল্পী এখানে পাহাড়, জঙ্গল ও কয়েকটি মূর্তির অবতারণা করেছেন। বিশেষ পদ্ধতিতে রঙ ব্যবহার করার ফলে কয়েকটিতে গ্রাফিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যেমন সাদা ও বিশেষ করে নীল রঙ বিন্দু ভিত্তিক দি ওয়াটার প্ল্যাণ্ট। অন্যান্য ছবির মধ্যে নীলরঙের সুন্দর স্তরভেদপ্রধান নিদর্শন ব্লু হরাইজন ও দি রিভার বিটুইন উল্লেখযোগ্য। নির্বাচন ব্যাপারে শিল্পী যদি সচেতন হতেন তা হলে প্রদর্শনীর মান যে আরও উন্নত হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

※

An Indian Sketch-book by Horilal, Published by Oxford and IBH Publishing Co., 17 Park Street, Calcutta-16, Pp. 40, Price Rs. 10.00.

সমাজে বাস করে প্রত্যেকেই আপন আপন শিক্ষাদীক্ষা ও সামর্থ্য অনুযায়ী নানাভাবে জীবিকা অর্জন করে সংসার প্রতিপালন ও সেই সঙ্গে নানা কর্তব্য পালন করে থাকেন। তা সত্ত্বেও অবসর সময়টুকু কাটবার জন্য প্রায় প্রত্যেকেরই একটি না একটি শখ থাকে। কেউ বা পড়াশোনা করেন, কেউ হয়ত তাস খেলেন, কেউ বা আবার ছবি তোলেন, আবার কেউ হয়ত স্কেচ করেন বা ছবি আঁকেন। উদ্দেশ্য কিন্তু একই, অর্থাৎ অনাবিল আনন্দলাভ। এই ছবি আঁকার শখ কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। পরলোকগত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবও শখের শিল্পী বা Sunday painter হিসাবে পরিচিত ছিলেন, এবং আমাদের দেশেও জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল শ্রীভগবান সহায়েরও শখের শিল্পী ও ভাস্কর হিসাবে নাম আছে। ইণ্ডিয়ান স্কেচ বুক তাঁদের জন্যেই লেখা, যাঁরা শখ হিসাবে স্কেচ করা বা ছবি আঁকা শিখতে চান। লেখক হোরিলাল একজন তরুণ পরিচিত শিল্পী। দেশের নানা স্থানের মন্দির-মসজিদ-গীর্জা তথা বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দৃশ্য এঁকে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন এবং কয়েকটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছেন। এ বইটিতে স্কেচ করার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি তিনি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ও সেই সঙ্গে নিজের আঁকা কয়েকটি স্কেচের নিদর্শনও প্রকাশিত করেছেন। বইখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, যাঁরা একেবারেই নতুন অর্থাৎ স্কেচ করার বিষয়ে যাঁদের কোনও ধারণাই নেই তাঁরাও বইখানি পড়ে সহজভাবে স্কেচ করার পদ্ধতিগুলি জানতে পারবেন। পেনসিল ও কালি-কলম ব্যবহার, বিভিন্ন বিষয়বস্তু স্কেচ করার পন্থা, রেখা ব্যবহারের তারতম্য, পরিপ্রেক্ষিতবোধ—এক কথায় প্রাথমিক ও ক্রমিক পন্থাগুলি তিনি নানা নিদর্শনসমেত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষার্থীদের পক্ষে বইখানি খুবই উপযোগী এবং যাঁরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে স্কেচ করতে পারেন না, তাঁরা এই বইখানি পড়ে উপকৃত হবেন। ছাপা ও বাঁধাই মনোমত।

চিত্রপ্রিয়

অতঃপর মঙ্গল !

বহু জিজ্ঞাসা, দীর্ঘতম প্রতীক্ষা এবং জল্পনার পর ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মানব-আরোহীহীন সোভিয়েত আন্তর্গ্রহযান মার্স-৩ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী মঙ্গলের বুকে অবতরণ করে পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম সেতুবন্ধন রচনা করেছে। মহাকাশ-প্রযুক্তি বিজ্ঞানে এ এক নজিরহীন সাফল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, চিররহস্যাবৃত এই গ্রহটি সম্পর্কে মানুষের চিরায়ত জল্পনা এই প্রথম বাস্তবতার মুখোমুখি এসে উপনীত হন।

সংবাদঃ মঙ্গলের অভিকর্ষ সীমার মধ্যে নিরাপদে পৌঁছনোর পর মার্স-৩ গ্রহটিকে বেষ্টন করে প্রথমে উপগ্রহের মত প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। এবং যথাসময়ে পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে তার সাময়িক কক্ষপথ থেকে সরে এসে মঙ্গলের হাল্কা বায়ুস্তর ভেদ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য-বিন্দুর দিকে নেমে যায়। পরে প্যারাশ্যুটের সাহায্যে গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধে এসে পদার্পণ করে। মঙ্গলের বুকে পৃথিবীর মানুষের পাঠানো মহাকাশযানের অবতরণের ঘটনা এই প্রথম। এবং সে কৃতিত্বের জয়মাল্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাই অর্জন করলেন। এর আগে ১৩ নভেম্বর, ১৯৭১ মার্কিন আন্তর্গ্রহযান মেরিনার ৯-কে মঙ্গলের চার-পাশের একটি কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। মার্স-৩-এর আগে সোভিয়েট দেশ মার্স-২ নামে আরও একটি আন্তর্গ্রহ যানকে মঙ্গলের উদ্দেশে পাঠিয়েছিলেন। বলা হয়েছে, উভয় দেশের তিনটি স্বয়ংক্রিয় যানের যন্ত্রমগজ সাফল্যের সঙ্গে মানুষের চিরকল্পনার সেই লোহিত গ্রহটির উপর স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই এ ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

১৩ নভেম্বর, মঙ্গলযান মেরিনার-৯ থেকে পাঠানো সংবাদ : ওই দিন এই যানটি মঙ্গলের যে অঞ্চলটির উপর দিয়ে বিচরণ করছিল, সেখানকার দিনের তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে আরও তেত্রিশ ডিগ্রি নিচে। রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় শূন্যের তিয়াত্তর ডিগ্রি নিচে। এ ছাড়া এই সময় সেখানকার আকাশ পিঙ্গল-ধূলি-ঝঞ্ঝায় আচ্ছন্ন ছিল। এবং চমকপ্রদ তথ্যঃ মেরিনার-৯ পাঠানো আলোকচিত্রে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের নিরক্ষরেখা বরাবর

১৩ নভেম্বর ১৯৭১ মেরিনার-৯ মঙ্গলের বুকে প্রচণ্ড ধূলি ঝড়ের এই ছবিটি তুলে পৃথিবীর গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেয়। ছবিটি মঙ্গল গ্রহের মাত্র ১০০০ কিলোমিটার দূর থেকে তোলা হয়েছিল। ছবিতে একটি জলাধারমুখ এবং বালিয়াড়ির মত দীর্ঘ রেখা লক্ষ করুন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন সম্ভবত এই বালিয়াড়িকেই কেউ কেউ একদিন 'খাল' বলে ভুল করে এসেছেন। এবং পিঙ্গল মেঘ বলতে ওই ধূলিঝড়কেই বুঝিয়েছেন

বিরাট একটি শকীতি লক্ষ করেছেন। যার অর্থ মঙ্গলের ওই অঞ্চলে হয়ত উঁচু কোন পর্বতমালা বিরাজ করছে। অথবা এমনও হতে পারে, এই গ্রহটির আকৃতি পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র।

মেরিনার-৯কে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশে উৎক্ষেপ করা হয় ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি থেকে ৩০ মে তারিখে। গ্রহটির চারপাশে উপগ্রহরূপে এর বিচরণের শুরু ১৩ নভেম্বর। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি যেতে সময় লেগেছে প্রায় ছয় মাস। সোভিয়েট আন্তগ্রহযান মার্স-২ এবং মার্স-৩কে ওই একই উদ্দেশে উৎক্ষেপ করা হয় যথাক্রমে ১৮ মে এবং ১৯ মে। মার্স-৩ মঙ্গলের বুকে গিয়ে অবতরণ করে ৭ ডিসেম্বর তারিখে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সময় লেগেছে প্রায় সাত মাসের মত। অতিরিক্ত এই সময় কেন লাগল, সে সম্পর্কে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মন্তব্য, তাঁদের এই আন্তর্গ্রহযানটিকে খানিকটা ঘুর পথে মঙ্গলের অভিমুখে পাঠানো হয়েছিল। এর যাত্রাপথকে ও'রা তিন ভাগে ভাগ করে নেন। প্রথম পর্যায়ে মার্স-২ এবং ৩, উৎক্ষেপের পর পৃথিবীর নিজস্ব মহাকর্ষবলের অধীন অবস্থায় পৃথিবীকে বেষ্টন করে পরিক্রমণ করতে করতে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। অবশেষে পৃথিবী থেকে ৯৪০,০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর পৃথিবীর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের সক্রিয় প্রভাব

থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর এসে পড়ে সূর্যের নিজস্ব আভকর্ষ-বলের প্রত্যক্ষ প্রভাব। শুরু হয় আন্তগ্রহ-যান দুটোর দ্বিতীয় পর্যায়ের সঞ্চরণ। এই সময় তারা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানে গ্রহের মত সূর্যকেই কেন্দ্র করে নতুন একটি কক্ষপথ ধরে এগিয়ে যেতে শুরু করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের সক্রিয় প্রভাবের মধ্যে তারা বিচরণ করেছিল মাত্র তিন দিন। কিন্তু সূর্য-কেন্দ্রিক কক্ষপথে সঞ্চরণ করেছিল ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে। এবং এইভাবে চলতে গিয়ে এক সময়ে তারা মঙ্গলগ্রহের সক্রিয় মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে উপনীত হয়। শুরু হল তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের যাত্রা। এবার মঙ্গলেরই আকর্ষণে মার্স-৩ ক্রমেই এগিয়ে যেতে লাগল গ্রহটির নিকটতম অঞ্চলের উদ্দেশে। অবশেষে যখন সে গ্রহটির কাছাকাছি এল, পৃথিবীর পরিচালন কেন্দ্র থেকে সংকেত বার্তা পাঠিয়ে তাকে ধীরগতিতে অবতরণ করতে সাহায্য করা হল। মার্স-২ মঙ্গলের চারপাশে উপগ্রহের মত বিচরণ শুরু করে ২৭ নভেম্বর তারিখে। বিচরণের সময় গ্রহটির কাছাকাছি একটি অঞ্চলে উপস্থিত হলে ওই যানটি থেকে এক খন্ড ধাতুপিন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহটির বুকে নেমে যায়। অবশ্য এই বিচ্ছিন্ন ঘটানোর ব্যাপারেও কাজ করেছিল পৃথিবীর সংকেত। ধাতুখন্ডটির উপর লেখা 'সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

বলা হয়েছে, মেরিনার-৯ এর ওজন প্রায় এক টন। এটি মঙ্গলকে ঘিরে দিনে দুবার করে পরিক্রমণ করবে এবং পরিক্রমণের সময় মঙ্গল থেকে এর ন্যূনতম দূরত্ব দাঁড়াবে ১২০০ কিলোমিটার। মোট তিন মাস ধরে এটি নিয়মিত ওই গ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তুলে পাঠাবে। আশা করা যায় এভাবে মোট ৫০০০টি ছবি সংগ্রহ করা হবে। তবে নির্দেশিত কাজকর্ম শেষ করার পরেও এই আন্তগ্রহ যান আগামী পঁচাত্তর বছর মঙ্গলের উপগ্রহরূপে বিরাজ করবে। অন্যদিকে সোভিয়েট যান মার্স-২ এবং ৩-এর ওজন যথাক্রমে পাঁচ টন। সম্ভবত যাত্রার পথে গতিসাম্যের সুযোগের জন্যই এদের অত বেশি, ভারী করে তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছিল। এবং শুধু মঙ্গলই নয়, সূর্যের গ্রহরূপে বিচরণ করার সময় সূর্য সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক তথ্য অনুসন্ধানের দায়িত্বও ওদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এর মধ্যে বিশিষ্টতম গবেষণা বা পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন দিক থেকে সূর্যের তাপ এবং অন্যান্য বিকিরণ সম্পর্কিত প্রবাহ-গুলিকে যথাযথ নির্ধারণ করা এ কাজটি পৃথিবী থেকেও অবশ্য করা যায়। কিন্তু একটি বড় রকমের অসুবিধে হল, পৃথিবীর কোন মানমন্দির থেকে যখন আমরা

দূরবীণের চোখের উপর নির্ভর করে মঙ্গলের এই প্রাচীন পট এঁকেছিলেন আনতোনিয়াদি

সূর্যের দিকে দৃষ্টি বুলোয়, সূর্যকে তখন আমরা দেখি সামনাসামনিভাবে। মুখো-মুখি। ওই একই সময়ে তার অন্য দিক বরাবর বিকিরণগত কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। মার্স আন্তগ্রহযান এই অসুবিধেটি অতিক্রম করে ছয় মাসেরও বেশি সময় সূর্যের চারপাশের চৌম্বক, উত্তাপ, রেডিও তরঙ্গ প্রভৃতির উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য পৃথিবীর গবেষণাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা ওই সমস্ত তথ্যের তাৎপর্যগুলি আপাতত পরীক্ষা করে দেখছেন।

এবারকার মঙ্গলযাত্রার আরও একটি বড় তাৎপর্য উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করার সময় মঙ্গল এ বছর পৃথিবীর নিকটতম অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই দূরত্ব পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ কিলো-মিটারে এসে দাঁড়ায় গত অগাস্ট মাসে। এ ধরনের ঘটনা প্রায় পনের থেকে সতের বছর অন্তর একবারই ঘটে। ফলে মঙ্গলে পাড়ি দেবার জন্যে মহাকাশযানগুলিকে অনেক কম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ওদের সকলেরই দৃষ্টি এখন মুখ্যত ওই গ্রহটির দক্ষিণ গোলার্ধটিকে ঘিরে। এটা মঙ্গলের সেই চিরপরিচিত অথচ অস্পষ্ট পরিবেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষে যাকে প্রত্যক্ষ করে আসছে, যাকে ঘিরে শতেক গল্প, হাজারো কাল্পনিক বিশ্লেষণ রচিত হয়েছে। শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর মানুষ মঙ্গলের বুকে তার সজীবের সন্ধানে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে। হয়ত বর্তমান সাফল্য সেই অনুসন্ধানের কাজটি সহজতর এবং আরও বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

*

হ্যাঁ, কতকটা আশাবাদীর মত ঠিক এই মুহূর্তে এটুকু আকাঙ্ক্ষাই সম্ভবত প্রকাশ করা চলে। কারণ আজ থেকে মাত্র দু বছর আগে মানব আরোহীহীন মার্কিন আন্তগ্রহযান মেরিনার-৬ এবং ৭ যে ধরনের তথ্য পরিবেশন করেছিল তাকে অস্বীকার করার মত ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি। মঙ্গলের পরিমণ্ডল থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সেদিন যে সংবাদ আমরা পেয়ে-ছিলাম তার সার কথা: মঙ্গল চাঁদেরই মত কতকগুলি গহ্বরে ভরা। তার বুকে অবস্থিত কোন খালের অস্তিত্ব ওই দুটি যান খুঁজে বের করতে অসমর্থ হয়েছে। সেখানে অক্সিজেন নেই। সম্ভবত নাইট্রোজেনও। এতদিন যাদের আমরা সাগর বলে চিহ্নিত করে এসেছি সেখানে এক বিন্দু জলেরও অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি। এমন কি মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের শুভ্র মেঘের মত যে ছায়াকে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে জল-কণার সমাবেশ বলে ঘোষণা করে এসেছেন, তারও মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল মেরিনার-৭। ৫ অগাস্ট, ১৯৬৯ ওই আন্তগ্রহযানটি

সেখানকার দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জমে থাকা যে মেঘের ছবি পাঠিয়েছিল মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট লাইটন তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ শেষ করে মন্তব্য করেন, এ মেঘ অসংখ্য সূক্ষ্ম বরফকুঁচি দিয়ে তৈরি। তবে সে বরফ জলের নয়, কার্বন ডাই অক্সাইডের। অর্থাৎ এক কথায় মঙ্গল সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশাটিকে মেরিনার-৭ পুরোপুরির সৌধন ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে, মঙ্গলের ভূ-প্রকৃতি পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝামাঝি কোন পর্যায়ে বিরাজ করছে।

শুধু বলা চলে, এটা আংশিক সিদ্ধান্ত-মাত্র। সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

বিন্দু রেখা মার্স-২ এবং ৩-এর সঞ্চারপথ

দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী স্পেন্সার জোন্স তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'লাইফ ইন আদার ওয়ার্লডস'-এ মন্তব্য করেছিলেনঃ মঙ্গল গ্রহে যে উদ্ভিদ জগৎ আছেই, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। আমার বিশ্বাস যখন ওই গ্রহটিতে গিয়ে আমরা উপস্থিত হব তখন দেখব, সেখানকার জৈবিক সভ্যতা ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশে পড়ে খাবি খাচ্ছে। অর্থাৎ জোন্সের মন্তব্যটি পড়ে মনে হয়, পৃথিবীতে যখন সবে জীবনস্পন্দনের শুরু, সেই আদিকাল, অর্থাৎ তিন শ' কোটি বছর আগেই সে দেশে উন্নত ধরনের জীবসভ্যতা বিরাজ করেছে। অবশেষে কালের মন্দিরায় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তারা এখন অন্তিম মুহূর্তের প্রান্তে উপনীত। মঙ্গল এখন যদি এতটুকু জীবনের অস্তিত্ব বর্তমান থাকেও, তা হলে এখন তা শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মত। যবনিকায় আর দেরি নেই।

কিন্তু স্পেন্সার জোন্সের এটা নিছক কল্পনা। কারণ মঙ্গলের প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠে নি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল ইটালির জ্যোতি-বিজ্ঞানী গিওভানীন সিয়াপেরেল্লির চমক-প্রদ খবর। ২১ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীণের সাহায্যে মিলান শহরের স্বচ্ছ আকাশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন, মঙ্গলের বুকে তিনি কতকগুলি সরল রেখা দেখতে পেয়েছেন। যা সেখানকার লালচে মরুভূমির উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাশাপাশি সাগরের মত দুটি অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রেখা দুটির সূক্ষ্ম গড়ন দেখে তাঁর মনে হয় ওগুলি খাল, যা মঙ্গলের কোন সভ্য প্রাণী কেটে থাকবে। কিন্তু ভৌতিক সেই খাল শেষ পর্যন্ত কোথায় যেন উবে গেল। কারণ পরবর্তী নয় বছর উন্নত ধরনের দূরবীণের সাহায্য নিয়েও ঐ খাল আর কেউ দেখতে পেলেন না।

পরে আবার ১৮৮৬ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এস উইলিয়ামস সিয়াপেরেল্লিকে সমর্থন করে জানালেন, তিনিও নাকি মঙ্গলের বুকে 'খাল' দেখতে পেয়েছেন। এবং সবচাইতে মজার ব্যাপার, ওই সময়ে লাপলাসের 'কসমোজেনিক ল' বা ব্রহ্মাণ্ডের গঠনতত্ত্বটিকে সকলেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। যাতে বলা হয়, গ্রহ হিসেবে মঙ্গল পৃথিবীর থেকে পুরনো এবং সেখানে মানুষের চেয়েও উন্নততর কোন সভ্যতা বিরাজ করছে। ফলে তথাকথিত ওই খাল সর্বসাধারণের মনে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। পি লাওয়েল নামে জনৈক মার্কিন কূটনীতিবিদ এ ব্যাপারে সিয়াপেরেল্লির সঙ্গে পত্রালাপ করে দাবি জানান, অ্যারিজোনার ফ্লাগ স্টাফ মানমন্দির থেকে ৬০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীণের সাহায্যে তিনিও নাকি মঙ্গলের বুকে খালের সন্ধান পেয়েছেন।

১৯০৯ সাল থেকে সোভিয়েট জ্যোতি-বিজ্ঞানী জি তিখফ পুলকুভো মানমন্দিরে এবং এক পাহাড়ে কয়েক বছর ধরে মঙ্গলের প্রাকৃতিক উপর অনুসন্ধান চালান। ওই সময় তিনি সেখানে পৃথিবীর মত ঋতুচক্রেরও অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে, মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের শুভ্রতা যখন হ্রাস পেতে থাকে তখন তার চারপাশে অন্ধকার একটি বেষ্টনী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে ছায়ার মত ওই অংশটি বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে যায় বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে এবং কখনও বা তা বিষুবীয় অঞ্চল অতিক্রম করে আরও কিছুটা এগিয়ে যায়। এ থেকে কেউ কেউ ধারণা করেন, মেরুর কাছে জমে থাকা শুভ্র অংশ হয়ত মেঘের স্তূপ অথবা জমাট বরফের আস্তরণ। গ্রীষ্মের আগমনে ওই বরফ গলে জল হয়। এবং বরফ-গলা জলই মেরু থেকে জমাট অন্ধকার জায়গার মত মনে হয়। আর অন্ধকারের বিস্তৃতিকে বরফ-গলা জলের প্রবাহরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এ কথাও অনেকে বলেছেন, ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের বুকে এমন গাছপালা গজানও অসম্ভব নয়। তাই বর্ষার পর সেখানকার বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে গাছপালা জন্মানোর ফলে অনেকটা জায়গা অন্ধকার-কালো মনে হয়?

ইতিমধ্যে বি ল্যায়ট নামে জনৈক জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলপস-এর চূড়ায় প্রায় দুই হাজার মিটার উঁচুতে অবস্থিত পিক দু মিদি থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মন্তব্য করেন, মঙ্গলের সেই 'খাল' মোটেই সরল নয়, বরং এবড়ো খেবড়ো। ১৯৬০ পর্যন্ত মঙ্গল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে দেখা যায় ঃ এই গ্রহটির বুকে পাঁচ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত যে বেগুনী রঙের স্তরের দেখা যায় তার বেশির ভাগই জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইডের কেলাস। মেরুতে জমার বরফ সম্পর্কে সকলেই এখন নিঃসন্দেহ। মাঝে মাঝে সেখানে পিঙ্গল বর্ণের যে মেঘ দেখা যায়, আসলে তা ধূলি-ঝড় ছাড়া আর কিছু নয়। যার মূলে উপাদান লাইমোনাইট নামে এক ধরনের মাটি। যা পৃথিবীতে পাওয়া ব্রাউন হিমাটাইট, বা লোহার অক্সাইডের অনুরূপ। কেউ কেউ অবশ্য ওই মেঘকে নাইট্রোজেন অক্সাইডের কুণ্ডলী বলেও বর্ণনা করেছেন। এবং তা আগ্নেয় গিরি থেকে নির্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। উল্লেখ্য, মঙ্গলে জীবিত আগ্নেয়গিরির সম্পর্কে একটি নাটকীয় তথ্য পরিবেশন করেছিলেন জাপানের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টি সাহেকি ১৯৫০-৫২ সালে। ওই সময় মঙ্গলের আকাশে উনি নাকি পিঙ্গল মেঘের সঙ্গে কিছু কিছু ধূসর রঙের বস্তুকণা ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। কণাগুলি মাঝে মাঝে অদৃশ্যও হয়ে যায়। ওঁর ধারণা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় হয়ত তারা গ্রহটির গহ্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

গত চল্লিশ বছরের হিসেবঃ মঙ্গলের ভূস্তরের ওপর বাতাসের চাপ মাত্র ৬৫ কিলোমিটার পারদস্তম্ভের সমান। অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুচাপের দশ ভাগেরও কম। এর আবহাওয়ার মূল উপাদান কার্বন ডাই অক্সাইড। পরিমাণে পৃথিবীর দ্বিগুণ। সেখানে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম বা নিয়নের মত কোন গ্যাস ধরা পড়ে নি। যৎসামান্য আর্গন থাকতে পারে। কিছুটা নাইট্রোজেন থাকাও অসম্ভব নয়।

এ ছাড়া পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের তাপমাত্রা গড়ে তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা দশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি নিচে। সেখানে দিন এবং রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য পঞ্চাশ ডিগ্রির মত। উত্তর মেরুতে এই পার্থক্য গড়ে এক শ' ডিগ্রি, দক্ষিণ মেরুতে এক শ' কুড়ি ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। মঙ্গলের মাটির নিচেও জল আছে কী না, জানা যায় নি। এত শুকনো পরিবেশে জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা কতকটা কষ্ট কল্পনারই মত।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী ডঃ এন লোজিনা-লোজিনস্কির অভিমত ঃ মঙ্গলে প্রোটিন বা নিউক্লেয়িক অ্যাসিড তৈরির মত কোন পরিবেশ নেই। অতএব পৃথিবীর মত কোন প্রাণী সেখানে থাকতে পারে না। অবশ্য পৃথিবীর গবেষণাগারে মঙ্গলের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে দেখা গেছে, কোন কোন ব্যাকটেরিয়া অমন পরিবেশে বেঁচে থাকতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। উদাহরণ নাইট্রিক ব্যাকটেরিয়াম। এরা নাইট্রোজেনের আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া লোহার অক্সাইড থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করেও বেঁচে থাকার ক্ষমতা রাখে। 'ইনফিউসোরিকন কোলপোড়া' নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আবার তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে শূন্যের নিচে একশ' ছিয়ানব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রার ব্যবধানেও বেঁচে থাকতে পারে। যেহেতু মঙ্গলে দিন এবং রাতের অথবা ঋতুপার্থক্যে তাপমাত্রার পরিবর্তন অনেক বেশি বলা যেতে পারে। সেখানে ওই ধরনের জীবকোষ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর মত উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী সম্পর্কে অনেকেই তেমন আর আশাবাদী নন।

*

১৯৬৩র ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত দেশ মঙ্গল দর্শনে পাঠালেন মার্স-১ আন্তর্গ্রহযান। ১৯৬৪র ২৮ নভেম্বর মার্কিন দেশ পাঠালেন মঙ্গল সন্ধানে। এবং মঙ্গল সম্পর্কে যাঁরা আশাবাদী এবার তাঁরাও বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়লেন। কারণ, জানা গেল, মঙ্গলের বুকে এমন কিছু কিছু অঞ্চল রয়েছে, যেখানে গত দু শ' থেকে পাঁচশ' কোটি বছর কোন রকম প্রাকৃতিক অবক্ষয়ই নাকি ঘটে নি।

মেরিনার-৪ এর আবিষ্কার ঃ পৃথিবীর মত মঙ্গলের ঊর্ধাকাশে 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট'-এর মত কোন আচ্ছাদন নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অভ্যন্তরে লোহা, নিকেল প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ উত্তপ্ত এবং তরল অবস্থায় রয়েছে পৃথিবীর আবর্তনে তারা প্রতি মুহূর্তে দারুণভাবে আলোড়িত হচ্ছে। ফলে নিয়ত সেখানে চলেছে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ প্রবাহ। এই প্রবাহ তৈরি করে চৌম্বক ক্ষেত্র। অনেকের ধারণা এর জন্যে আমাদের পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এর প্রভাব ঊর্ধাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পৃথিবীকে একটি আবরণের মত ঘিরে রেখেছে। সূর্য বা সুদূরে নক্ষত্র থেকে যে সমস্ত শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি, যার মূল উপাদান প্রোটন বা পরমাণুকেন্দ্রিক কণা, নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই বন্দী হয়ে যায় ঊর্ধাকাশের ওই চুম্বক ক্ষেত্রে বা 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট'-এর মধ্যে। ফলে তাদের ক্ষতিকর আঘাতের হাত থেকে আমাদের জীবজগৎ রক্ষা পাচ্ছে। কারণ মহাজাগতিক রশ্মি প্রাণীকোষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এ ছাড়াও, মঙ্গলের আকাশে পৃথিবীর মত 'ওজোন' গ্যাসেরও স্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি। অথচ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এই স্তর বিদ্যমান। ওজোনের স্তর সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করার ব্যাপারে কাজ করে। অতএব মঙ্গলের বুকে এই রশ্মিটির অবাধ বর্ষণ চলেছে। উদ্ভিদ কোষের পক্ষে এই রশ্মি প্রচণ্ড ক্ষতিকর। অতএব কী প্রাণী, কী উদ্ভিদ, কারোরই পক্ষে মঙ্গলের এমন একটি পরিবেশে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠেছিল, তা হলে সেই খালের কী হল? মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের সেই শুভ্রতা অথবা পিঙ্গল মেঘ, এ সবের অর্থ কী? বিশেষজ্ঞরা তখন বলেছিলেন, 'খাল' আসলে দৃষ্টিভ্রম। আসলে মঙ্গল থেকে আগত আলোক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুস্তরে আন্দোলিত হওয়ার ফলে ছবিতে অমন সরু দাগ দেখা গিয়েছিল।

হয়ত এ প্রশ্নের এবার সমাধান পাওয়া যাবে। কারণ মেরিনার-৯ সম্প্রতি যে ছবি পাঠিয়েছে, সেটি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন ছবিটি যখন তোলা হয় মঙ্গলের বুকে তখন প্রবল ধূলিঝঞ্ঝা চলছিল। ওই ঝড়ের সময় ধুলোর মেঘের

নিচে লম্বা লম্বা বালিয়াড়ির মত কতকগুলি আঁচড় ধরা পড়েছে, যাদের দূরে থেকে দেখতে খালেরই মত। এবং আরও চমকপ্রদ ব্যাপার, ধূলিঝড়ের রঙও বাদামী।

অতএব নতুন করে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক: তা হলে ওই বালিয়াড়িগুলিকেই কি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এতদিন 'খাল' বলে ভুল করে এসেছেন? শিপ্যালি মেঘ বলতে তাঁরা যা বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা কি ওই বাদামী রঙের ধূলি ঝড়? হয়ত এমনও হতে পারে, ঝড়ের সঙ্গে যখন তাঁরা বালিয়াড়ি দেখেছেন, তখন তাকে 'খাল' বলে ভুল করেছেন। পরে যখন বালিয়াড়ি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তাদের চোখে 'খাল'ও অদৃশ্য হয়ে যায়।

সম্ভবত এ ধরনের অনেক ভুল বোঝা-বুঝিরই এবার অবসানের পালা। বিশ করে সোভিয়েট যান মার্স-৩ মঙ্গলের প্রকৃতি, প্রাণী জগৎ, অবশ্য যদি কিছু থা অথবা জলহাওয়া সম্পর্কে এই প্রথম অ বিশদ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সমররজিৎ ক

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ২০ ॥

প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আর এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু। এর আগে গণপরিষদে নয়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার সময় নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার আমলে করুণ প্রতিকূল অবস্থার মাঝ দিয়ে পাকিস্তান পার্লামেন্টে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় তা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারের পিছনে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট অবদান রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্নে ওয়াদাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য এটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে কায়েম করবার পিছনে যে ক'জন নেতা 'লড়াই' করেছিলেন, তার মধ্যে অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অন্যতম ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান অর্জিত হবার পর বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রতিটি আন্দোলনের মাঝে পূর্ব বাংলার যুব শক্তির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ দেখে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসলেন, তখন শেখ মুজিবুর রহমান পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের দাবি জানালো। এই প্রশ্ন নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে ঢাকায় পাকিস্তান পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা হলো।

যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে ধর্মের জিগির তুলে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে জামাতে ইসলামী দল ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা আহ্বান করে বসলো। লাহোর থেকে জামাতে ইসলামীর প্রধান মওলানা মওদুদী এই জনসভায় ভাষণ দানের জন্য এলেন। সে এক রাজসিক ব্যাপার। বিরাট সভামঞ্চ তৈরি করে মোটা গালিচা পাতা হলো। মওলানা সাহেবদের বসবার জন্য মঞ্চে সোফাসেটের ব্যবস্থা হলো। বিরাট শামিয়ানা ও কয়েক শ' মাইকের সমাবেশ মাঠের শোভাবর্ধন করলো।

দৈনিক ইত্তেফাকের চীফ রিপোর্টারের পরিচয় গোপন করে সভার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম সভামঞ্চের নীচে কয়েক হাজার বাঁশের লাঠি ও ছোরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপরন্তু এ সবের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ঠাঠারী বাজারের কিছু অবাঙ্গালী কসাই শ্রেণীর লোককে ভাড়া করা হয়েছে। এ ছাড়া জামাতে ইসলামী পার্টির ভলান্টিয়ার নামধারী গুণ্ডাবাহিনী তো রয়েছেই। জানতে পারলাম "ভারতের অর্থপুষ্ট যে সব চরেরা কাফের, হায়! যুক্ত নির্বাচনের ধুয়া তুলেছে তাদের শায়েস্তা করবার জন্য এই বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সভায় সাংবাদিকদের জন্য রক্ষিত বেষ্টনীর মধ্যে আসন গ্রহণ করতে সাহসী হলাম না। অদূরে জিন্না অ্যাভেনুতে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু অ্যাভেনু) জনতার মাঝে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

যা' আশংকা করেছিলাম তাই-ই হলো। মওলানা মওদুদী বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চীৎকার উঠলো 'বাংলায় বলুন বাংলায় বলুন।' পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত 'ইসলামের তাবিজ কচলানো' নেতৃবৃন্দের একজনেরও বাংলায় বক্তৃতা দেয়ার ক্ষমতা নাই। তাই মুহূর্তে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেলো। হঠাৎ করে জামাতে ইসলামের গুণ্ডাবাহিনী ছোরা-লাঠি নিয়ে জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জনতাও পাল্টা মারের জন্য রুখে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ খণ্ড যুদ্ধ হবার পর সশস্ত্র পুলিসের দল সভামঞ্চ ঘেরাও করলো। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা শিলাবৃষ্টির মতো ইট নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এই ইষ্টক-বৃষ্টির মুখে টিঁকে থাকা অসম্ভব। তাই বিধ্বস্ত, আহত ও রণক্লান্ত নেতৃবৃন্দ সশস্ত্র পুলিসের সহযোগিতায় অনেক কাষ্ঠে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। এরপর জামাতে প্রধান মওলানা মওদুদী ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে আর একবার ঢাকায় জনসভা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। সেবার এর চেয়েও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। জামাতে

ইস্লামীর সমর্থক দুইজন গুন্ডা নিহত ও ১০৮ জন স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়েছিল। এরপর মওলানা মওদুদী আর ঢাকায় আগমনের প্রচেষ্টা করেন নি। যাক্ যা বলছিলাম।

প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকা শহরের কাকরাইলে অবস্থিত সেণ্ট্রাল সার্কিট হাউসে আস্তানা গেড়েছেন। আমরা জনাকয়েক সাংবাদিক সময়-অসময়ে এখান দিয়েই ঘুর ঘুর করছি—মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীর কামরাতেও যাতায়াত করছি। কেউ সুপারিশ কেউ তদ্বির, কেউ চাকুরির আর কেউ বা পার্লামেণ্টারী রাজনীতির পরামর্শ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসেছেন। বিকেলের দিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব আওয়ামী লীগ দলীয় ১৩জন পার্লামেণ্টারী পার্টির সদস্যদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তিনি সরাসরি বললেন, 'আপনারা যে আমাকে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি সমর্থন করার জন্য চাপ দিচ্ছেন, তার পিছনে কী কী কারণ রয়েছে তা বলতে হবে।' শেখ মুজিব বলতে শুরু করলেন, 'স্যার, বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশে পৃথক নির্বাচনের অস্তিত্ব নাই—সকল দেশেই যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে। পৃথক নির্বাচনের অর্থই হচ্ছে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা। এ ছাড়া পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজের এলাকার ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের আস্থাভাজন বলে দাবি করতে পারে না। পৃথক নির্বাচনের অর্থই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিষকে জিইয়ে রাখা।' চোখ দুটো বন্ধ করে জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর শিষ্যের বক্তব্য শুনছিলেন। শেখ মুজিব একটু থামতেই তিনি বললেন, 'মুজিব তুমি থামলে কেনো?' আবার শেখ সাহেব শুরু করলেন, 'স্যার পৃথক নির্বাচন চালু হলে যে কোন মুহূর্তে পশ্চিম পাকিস্তানীরা দাবি করতে পারে যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। পৃথক নির্বাচনে এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল অমুসলীম নেতার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ'রা সংকীর্ণ স্বার্থে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাঙ্গালীদের অসুবিধায় ফেলতে পারে। যুক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত অমুসলীম সদস্যদের সংখ্যা কম হবে বটে, কিন্তু যেসব অমুসলীম নেতা যুক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন তাঁরা উদার মনোভাবাপন্ন ও প্রগতিশীল হতে বাধ্য।

এছাড়া উদার মনোভাবাপন্ন মুসলীম প্রার্থী ছাড়া অমুসলীমদের ভোট পাওয়া সম্ভব নয় বলে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম নেতৃত্বের অবসান ঘটবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের বাঙ্গালী হিসাবে গড়তে হলে এই মুহূর্তে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা অপরিহার্য। এতে করে আমাদের সমাজের ঘুণে ধরা নেতৃত্বের অবসান ঘটবে আর বাঙ্গালী যুব শক্তির নতুন নেতৃত্ব স্বীয় আসন দখল করতে সক্ষম হবে।' শেখ সাহেবের বক্তব্যের পর আওয়ামী লীগের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁকে সমর্থন জানালেন। হঠাৎ করে সোহরাওয়ার্দী সাহেব চীৎকার করে উঠলেন, 'ইয়েস, জয়েণ্ট ইলেক্টোরেট সিস্টেম চালু হবে।' সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অপরাপর রিপাবলিকান পার্টির কাছে খবর পাঠালেন। আবার যুক্ত পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠক বসলো। ইস্কান্দার মীর্জার রিপাবলিকান পার্টি এক ইউনিট সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নিশ্চুপ থাকবে এই ওয়াদায় যুক্ত নির্বাচন সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন।

রাতে পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসলে যুক্ত নির্বাচন প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক শুরু হলো। পক্ষে ও বিপক্ষে বহু সদস্যের বক্তৃতার পর প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় প্রায় চার ঘণ্টা ধরে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিলেন তা পাকিস্তানের পার্লামেণ্টের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর ভোর পাঁচটায় সমগ্র বিলের উপর ভোট গ্রহণ করা হলে তা বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হয়ে গেলো। সমগ্র পূর্ব বাংলায় আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো। পূর্ব বাংলার যুবশক্তি আবার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করলো।

(ক্রমশ)

বিদেশে (৩৫)

যু দ্ধ ব্যাপারটা কি তার সঙ্গে আমাদের সমানা কিছু কিছু পরিচয় হচ্ছে। ...ছেই। না হলে অবশ্য আরো ভালো হত। ভবিষ্যতে, কথনো, কস্মিনকালেও হবে না সে-ভরসা যদি কেউ দিতেন তবে হত সবচেয়ে ভালো। কিন্তু চতুর্দিকে ...এ সব দেখছি তাতে তো মনে হয়, বর্তমান যুদ্ধটা ঝটপট শেষ হোক বা রয়ে-সয়েই শেষ হোক, এটাই শেষ যুদ্ধ নয়। আরেকটা যে অচিরে লাগবে। কবে লাগবে? ঠিক কেউই বলতে পারবেন না, তবে কোনো দস্যু যদি আমার কানের উপর পিস্তল বসিয়ে "না বললে নিষ্কৃতি নেই" বলে হুংকার ছাড়ে তবে বলবো, বছর ...দশকের ভিতর। কেন কাত্তে কাতে, এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দেব না। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি করে রাখলুম এবং আজ-দিনের যে-সব নবালক নিতান্ত অর-...বয়স না পেয়ে আমার এ-লেখাটি পড়ছে তারা যেন সেদিন আমাকে স্মরণে আনে— ...প্রাণভয়ে অভিসম্পাত দিতে দিতে। ...তদ্দিনে আমি ইহলোকের ডাঙাকে ...কাঁধ মেরে পরলোকের ...কয় বসে ...গান তুলে বৈতরণীর ওপারে।

...যুদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি উত্তম এ-কথা কোনো ...ব্যক্তি বলেছেন বলে শুনিনি, বরঞ্চ ...বহু বিজয়ী বীর যুদ্ধের অজস্র নিন্দা ...করে গেছেন। তবে একটা বিষয়ে যুদ্ধের ...শত্রু কি মিত্র সকলেই অকুণ্ঠ প্রশংসা ...করে গেছেন। যুদ্ধের সময় অতি সাধারণ ...জনও প্রায়ই এমন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ...ত্যাগ, দেহদণ্ড, পরোপকার করে ...পরের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করে ...পর্যন্ত বরণ করে নেয় যে তার সামনে ...যুগের বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন-সম্প্রদায় ...অবনত মস্তকে স্বীকার করেন যে ঐ সাধারণ জনের অসাধারণ কীর্তির কাছে তাঁদের লক্ষ রণজয় তুচ্ছ।

তারই একটি উদাহরণ লটে আমার সামনে পেশ করেছিল; তার উল্লেখ প্রকাশিত প্রবন্ধ বা পুস্তকে কোথাও আমি পাইনি, লটেও পায়নি।১ কাহিনীটি পড়া সমাপ্ত করে পাঠক হয়তো কিছুটা নিরাশ হবেন। ইংরেজ এ স্থলেই বলে থাকে : "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট"—"চিঠি লিখে বাড়িতে জানাবার মত এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।" আমি কিন্তু তবু জানাচ্ছি, তার কারণ প্রথমত দুশমন ইংরেজ যা করে না করে তার উল্টোটা করতে পারলে আমার জানটা বড় খুশ হয়। দ্বিতীয়ত ঘটনাটির নায়ক আমার পরিচিত। নাতিদীর্ঘ আট বছরের পরিচয়—সেটা দীর্ঘতর হবার সুযোগ কেন পেল না সেইটেই আমি "রাইটিং হোম এবাউট"।

লটে বললে, "উইলিকে তো চিনতে, নিশ্চয়ই ভালো করে চিনতে; তোমাদের সেমিনারের হাউসমাস্টার?"

আমি বললুম, "বন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিচারিকা চিনতেন না তাকে? এস্তেক সেমিনারের বড়কর্তা প্রফেসর ডক্টর পাউল কালে পর্যন্ত উইলির থাকা ধোঁক চট করে থামাবার চেষ্টা করতেন না।"

এ স্থলে কাহিনীর প্রথম অংশটা আমাকেই বলতে হবে। উইলির সঙ্গে লটের পরিচয়—স্মরণ রাখা উচিত ফ্রাউ উইলির সঙ্গে লটের পরিচয় হয় অনেক পরে। বিশেষত, অন্তত দু'টি বছর তার সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হতে হত প্রতিদিন পাঁচ সাতবার। তার পদবী ছিল "হাউস মাইস্টার"। "মাইস্টার" শব্দের অর্থ জর্মনে যদিও "মাস্টার" তবু "হাউস-মাইস্টার" বলতে "হাউস মাস্টার" বা বোর্ডিং স্কুলের শিক্ষক বোঝায় না। হাউস-মাইস্টার কোনো বাড়ি বা অফিসের দেখ-ভাল করে। একে দরওয়ান বলা চলে না। বরঞ্চ ইংরিজিতে 'হাউস কীপার' বলা চলে, ফরাসিতে ইনিই "কঁসিয়েজ" নামে পরিচিত।

উইলি তো না থাকলে ছিলেনই, সেমিনার-বাড়িটা ফটফাট ছিমছাম থাকত সে-কথাটার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেন্ট্রাল হীটিঙে উনিশ বিশ, মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ফোটোস্টাট করার জন্য ডার্ক রুমের পর্দা থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতিতে এক কণা ধুলো পড়ে থাকতে কেউ কখনো দেখেনি। কোনো একটা ট্যাপের ওয়াশার বিগড়ে যাওয়াতে সেটার থেকে পিটির পিটির জলের ফোঁটা ঝরছে, এহেন গাফিলতী কেউ কখনো দেখাতে পারলে, হাউস-মাইস্টার উইলি যে তন্মুহূর্তেই এক ছুটে রাইন ব্রিজের উপরে পৌঁছে সেখান থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতো সে-সত্য সম্বন্ধে আমাদের কারো মনে ধূলিপরিমাণ সন্দেহ ছিল না।

সেমিনার বাড়ির পাশে ছোটো একটি দোতলা বাড়ির উপরের তলায় ছিল মাইস্টার

---

১ অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে।"

গ্রে'র কবিতা থেকে এই অংশানুবাদ বছর চল্লিশ পূর্বে এতই মুখে মুখে প্রচারিত ছিল যে কেউ সেটা কপচালে পাঠক-সম্প্রদায় বিরক্তিভরে অবজ্ঞাও প্রকাশ করতো না। আজ সে যুগের পাঠক, বৃদ্ধরা পুরোনো দিনের স্মরণে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন, তরুণেরা হয়তো পড়বেনই না— আরো "প্রমাণ" নয়।

উইলির কোয়ার্টার। সেখানে সর্বাধিকারিণী ছিলেন তার বীবী। গাব্দাগোব্দা শরীর, হাসিভরা মুখ—নার্সিকে টিপিকাল জর্মন হাউস-ফ্রাউ। বয়স চল্লিশের মত হবে, কিন্তু উইলিকে দেখে ঠাহর করা যেত না তার বয়স কত হতে পারে। সোমনাথের সব চেয়ে পুরনো কর্মী বলতেন, পনরো বছর ধরে তাকে ঐ একই চেহারায় দেখেছেন। সর্বাঙ্গে সর্বত্র অনেকগুলো ছোট ছোট সাইজের মাস্‌ল্‌ ছড়ানো; ছোট ছোট সাইজের কারণ আর পাঁচটা জর্মনের তুলনায় উইলি ছিল রীতিমত বেঁটে।

সেমিনারে পূর্ণসিদ্ধ অর্ধসিদ্ধ পণ্ডিত পণ্ডিতে ভর্তি, আর জনা পাঁচেক সুপ্রাচীন অর্ধ প্রাচীন অধ্যাপক। সর্বশেষে ডক্টরেট থিসিস লেখাতে ব্যস্ত আমরা কয়েকজন ছিলুমই। আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগতো, এত সব পণ্ডিত আর এদের নিয়ে

পর দিন একটানা বিদ্যাচর্চা—দিনে দশ ঘণ্টা খাটা সেমিনারের ডাল-ভাত—এসব দেখে দেখে পাণ্ডিত্যের প্রতি উইলির মনোভাবটা ছিল কি? কাউকে যে বড্ড বেশী একটা সমীহ করে চলতো, উইলির ধরনধারন দেখে সেটা তো মনে হত না। তাকে কোনো দিন খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তে দেখিনি। আমি তার কোয়ার্টারে বহুবার গিয়েছি কারণ আশপাশের কাফের তুলনায় উইলির বউ আমাদের জন্য কফি বানিয়ে দিত ঢের সস্তায়। আমাদের সময়াভাব তাই তার রিংস-সার্ভিস উপেক্ষা করে খুদ কাফেতে যাওয়াটা আমরা নিছক থার্ডক্লাস ফ্লবারি-চালিয়াতি বলে মনে করতুম। সেমিনারের জানলা দিয়ে ফ্রাউ উইলিকে শুধু আঙুল তুলে দেখাতে হত ক' কাপ ক' পট কফি চাই। রেকর্ড টাইমের ভিতর ফ্রাউ উইলি ডাইনে বাঁয়ে দুলতে দুলতে দৌড়ে করে কফি নিয়ে উপস্থিত। আমি কিন্তু সোজা ওদের ঘরে গিয়ে কফি খেতুম—কি হবে এই ফুল স্লিম (গোবদাগোবদার ভদ্র ইংরিজি প্রতিবাক্য) ফ্রাউকে সিঁড়ি ভাঙতে দিয়ে। সেখানে একদিন লক্ষ্য করলুম, ঘরে মাত্র একখানা বই—বাইবেল। বহু ব্যবহৃত। আমি জানতুম, ক্যাথলিক জনসাধারণ সচরাচর বাইবেল বড় একটা পড়ে না—তারা তাদের "উপাসনা পুস্তিকা" নিয়েই সন্তুষ্ট, গির্জেয় যাবার সময় ঐ বই-ই সঙ্গে নিয়ে যায়। কথায় কথায় শুধলুম বাইবেলখানা পড়ে কে? উইলি। এবং ঐ একখানা বই ছাড়া অন্য কোনো কেতাব ছোঁয় না। তাই তা' সমস্যাটা একটু তলিয়ে দেখতে হয়।

সেমিনার খোলা থাকতো সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি। জবরদস্ত গবেষকরাও রাত আটটার সময় বাড়ি গিয়ে আর বড় একটা ফিরতেন না। কিন্তু আমার যেন "গৃহীত্বৈব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ" মৃত্যু যেন তোমার চুল পাকড়ে ধরে আছেন এই ভাবে ধর্মের আচরণ করবে।" ধর্ম মাথায় থাকুন, মাথার উপরকার কেশ পাকড়ে ধরে আছেন আমার টাঁক। সোজা বাঙলায় কইতে গেলে, ইংরেজ যে সাত্য বেনের জাত সেটা সপ্রমাণ করলো আমার শেষ কপ্পীন-খানা কেড়ে নিয়ে একদিন, বিলকুল মিন নাটিশ—গোলড স্ট্যান্ডার্ড বর্জন করে। মাদাজল খেয়ে যে কড়ি কটি জমিয়েছিলুম তারো ছ'টি মাস জর্মনিতে বাস করে রয়ে-ছে আমার "গব্বযন্তনা" থীসিসখানা আমার ব'লে তাদের উপর বমিং হয়ে গেছে। গোলড স্ট্যান্ডার্ড নাকচ হওয়ার ফলস্বরূপ হঠাৎ একদিন দেখি আমার ট্যাঁকের তিন-কড়ি চট্টোপাধ্যায় চট্‌সে দুকড়ি চাটুয্যেতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছেন। অতএব আর মাত্র দু'টি মাসের ভিতর যদি সেই লক্ষ্মী-ছাড়া থীসিসটা শেষ করে, তিন তিনটি চাট্টা পরীক্ষা পাশ না করতে পারি তবে জিনং মরতত্র ভে.জনং হট্টমন্দিরে—তা-হ বা-ঙ্কি করে হয়, এই পাথরফাটা শীতের দেশে যত্রতত্র শয়ন করলে মৃত্যু অনিবার্য এবং বন্ শহরের হাটবাজারে ভিখিরিকে দিনান্তে খয়রাতি এক পেলেট সুপ দেবার ব্যবস্থাও নেই—ফুয়ার হিটলার ভিয়েত্‌না তে যার বরাতে একদিন যমরাজকে ফাঁকি দিতে পেরে অন্য "পুণ্যভূমিতে" পরজন্ম লাভ করলেন। তাই তখন প্রাণপণ রেস দিচ্ছি টাইমের সঙ্গে। সকাল বিকেল পাঁচ পাঁচ দশ ঘণ্টা কাজ করার পরও মাঝে মাঝে আলুসেদ্ধ মাখম-রুটি দিয়ে "ব্যানকুয়েট" সেরে রাত সাড়ে আটটায় আরেক প্রস্ত সেমিনার যেতুম। কিন্তু আমার ওয়াটারলু ছিল অন্যত্র। সেটা এতক্ষণ পেশ করিনি, কারণ আমার অধিকাংশ শ্যানা পাঠকই সেটা আমার লেখক-জীবনের প্রথম প্রভাতেই জেনে গিয়েছেন; নিতান্ত যাঁরা জানেন না তাঁদের বলি, লেখাপড়ায় আমি চিরকালই ছিলুম বিংশ শতাব্দীর এক নব-কালিদাস যিনি মা সরস্বতীর কৃপালাভ কস্মিনকালেও কামনা করেননি এবং দেবীও অহেতুক তাঁকে দর্শন দেননি। সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে কেতাবপত্র দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসতো, ইস্কুলবাড়িটা আমার কাছে শ্মশানমশানের লাগোয়া ওয়েটিংরুমের মত মনে হত এবং কুয়েশ্চেন্ পেপারের উপর চোখ বুলতে না বুলতেই পরীক্ষার হলে কতবার যে ভির্মি গিয়েছি সেটা আমাদের শহরের এমবুলেন্‌স্ তাদের রেকর্ডরূপে সযত্নে লোহার সিন্দুকে পুরে রেখেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কি করে, কোন্ দুষ্টগ্রহের তাড়নায় যে আমি বন্ শহরে ডক্টরেট নেবার জন্য এসেছিলুম সেটা গোপন রাখতে চাই—পাঠক অযথা খোঁচাবেন না।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় মাইসটার উইলি এসে আমাকে হুনো লাগিয়ে একখানা লেকচার ঝাড়তো। রাইনল্যাণ্ডের গাইয়া ডাএলেক্টে। সে-ভাষা বোঝে কার সাধ্যি? সেমিনারের নমস্য পণ্ডিতগণ তো কানে ডবল আঙুল পুরতেন। আমি যে অক্লেশে বুঝতে পারতুম তার একমাত্র কারণ আমার দিনযামিনী কাটতো—এই শেষের ক' মাস ছাড়া—শহরের বেকার, ফোকটে পয়সা মারায় তালেবর, ঘাঘরাপল্টনের তাঁবেদার মস্তানদের সঙ্গে। তারা গ্যেটে শিলারের ভাষায় কথা কয় না। কিন্তু থাক্ সে পুরনো কাসুন্দো।

সে লেকচারের সারাংশঃ শঙ্কি হবে, হে, ছোকরা অত নেকাপড়া করে? দুটো প্যাখ্‌না গজাবে বুঝি? ঢের ঢের বাঘাবাঘা পণ্ডিতকে তো এই হাতের চেটোতে চটাকালুমে, বাওয়া আদ্দিন ধরে! কি পেলুম, ক' দিন্নি, তবে বুঝি তোর পেটে কত এলেম। বলি—কান পেতে শোন, আখেরে ফয়দা হবে, তাই ভাঙিয়ে খাবি। এই যে হেথায় কেতাবে কেতাবে চতুর্দিক ছয়লাপ ওদেরই মত ওরা খসখসে শুকনো—বুঝলি, শুকনো। রসকষের নামগন্ধো নেই। বাড়ি যা, বাওয়া, বাপের সুপুত্তুর—দু' গেলাস বিয়ার স্যাটস্যাট করে মেরে দে। গায়ে গত্তি লাগবে। জানটা তর্-র্-র্-র্ হয়ে যাবে, চোখের সামনে গুল-ই-বাকওয়ালীর প্যাল ফটফট করে ফুটে উঠবে—"

আমি পকেট থেকে একটা সস্তার চেয়েও সস্তা সিগার বের করলুম। ওদেশে সেটাকে 'রেট্ কিলার' 'মূষিক নিরোধ' খেতাব দেওয়া হয়। কিচ্ছু না, রান্নাঘরে ওরই এক টুকরো রেখে দিন। আর দেখতে হবে না—পরের দিন গণ্ডাখানেক মড়া ইঁদুর ঘরে বাইরে পেয়ে যাবেন। ঐ "সিগারে" বার দুই ঠোক্কর মেরেই ওরা লাভ করেছেন। এই সোনার শহর কলকাতাতেও বিড়িওলার কুটুরিতে ব্রেক-

আজকের প্রতিযোগিতায়ও সে দিব্যি মূর্তিমান। আমার এক মিত্র আকস্মাৎই ঐ ম.ল আমাকে বুদ্দের কেস থেকে বের করে পাঞ্জাবের প্রেজেন্ট করে—জানিনে কোন্ প্রয়োজনে।

উইলির দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়াস গলায় বললুম, "পাকা আর্কিওলজি লেকেলের জিনিস। বহুকষ্টে তোমার জন্য পাচার করিয়েছি। নাও, হলো তো?"

উইলি পুনরায় সেই দুবো ধরে ঠিক যে হয় সেকোপড়া করে"—বিড়বিড় করতে করতে চলে যেত এক পণ্ডিতের কামরায়। সেখানে লেকচার না ছেড়ে চাপির গোল্লাটা শুধু ঝমকাতো।

উইলি- আর ঘণ্টা তেজটাক আড্ডা দিতে আসতো না।

কে বলে শাধু অর্বাক মানুষকে দুবের

মত্ত শারদীকরেন্ট, অন্যবধ?

তবে হ্যাঁ, ওকে রাখা ভালো, উইলি সিগারেটের প্রত্যাহ প্রতিবারে নিত না। নিজে ও আমার ম্যাগ বাড়াতো, নিশ্চিন্তাই।(২)

২ আগামী সংখ্যায় "উইলি পর্বের" সমাপ্তি

যশোহর-রাজের যশোধারা

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শোর নগরের রাজা প্রতাপাদিত্যের নাম বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্বাঙ্গে শুরুরও আগে থেকে জড়িয়ে আছে। ভারতচন্দ্র বেঁচে ...কুন, যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নামের সেই রাজার কাহিনী কারো অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণনায় ফাঁকে বিদ্যাসুন্দরের সরস কাহিনী স্রষ্টা প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সমর' শুনিয়েছেন।

এর পর প্রতাপাদিত্যের কথা শোনাতে এলেন তাঁর স্বশ্রেণীর স্বজাত রামরাম বসু —যাঁকে আমরা কেরী সাহেবের মুনশি বলেই বেশী চিনি। বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালীর লেখা প্রথম মৌলিক গদ্যের বই হিসেবে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গুরুত্ব-পূর্ণ। ১৮০১ সালে জুলাই মাসে কেরী সাহেবের নির্দেশে প্রকাশিত এই বইতে আবার আমরা জানতে পারলাম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কথা। ১৮০৫ সালে বইটি মরাঠী ভাষাতে অনূদিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মারাঠী বিভাগের প্রধান পণ্ডিত বৈদ্যনাথ তিনশ' টাকা পারিশ্রমিকে এই অনুবাদ করেন।

এর পর প্রতাপাদিত্যের কথা পেলাম একটি 'নভেল' বা উপন্যাসে। বাঙালীর লেখা প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থের মত এ ক্ষেত্রে 'প্রথম' হবার কোন কৃতিত্ব পায়নি বইটা। তবে অন্যান্য কৃতিত্বে উপন্যাসটি ...। ক্যালকাটা রিভিয়্যুতে জনৈক বিদ্যার্থী এর সমালোচনায় জানিয়েছিলেন উপন্যাসটি ...কে বিলিতী উপন্যাসের সমকক্ষ। কিন্তু সে কথা নয়, ১৮৬৯ সালে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাস (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই সময় বাংলা উপন্যাসের বাজারে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র তাঁকে অস্বীকার করেছেন। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' স্কটের আইভান হো ... উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে। অজার ... একদা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু স্কটের ...বে পড়েছিলেন সবচেয়ে বেশি—তাঁকে ইণ্ডিয়ান স্কট বলেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে এড়াতে গিয়েও প্রতাপচন্দ্র বেশি দূর যেতে পারেন নি। প্রতাপচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন গবেষণার নিরপেক্ষতায়। প্রসঙ্গক্রমে একটি তথ্য বলা দরকার—প্রতাপচন্দ্র নাকি উপন্যাসটির 'বঙ্গেশ্বরবিজয়' নাম দিয়ে প্রেসে পাঠিয়ে-ছিলেন, কিন্তু প্রেসে তখন ঐ নামেই অন্য এক লেখকের একটি উপন্যাস দু ফরমা ছাপানো হয়ে গেছে। তাই তিনি নাম পালটে বঙ্গাধিপ পরাজয় করলেন। তখন হুতোম পেঁচার নকশা প্রকাশিত ও জনপ্রিয়। বঙ্গাধিপ পরাজয়ে নকশার বর্ণনাভঙ্গি নিবিড়ভাবে প্রভাব ফেলেছে। গম্ভীর ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই বর্ণনাভঙ্গী আকর্ষণীয় হবার কথা নয়, কিন্তু তবুও গুণে পাঠকেরা মজেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপের কালেও বঙ্গাধিপ পরাজয় উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত অন্দরমহলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন উপন্যাসের সম্রাট। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির 'নতুন বউ' কাদম্বরী দেবী এরই উদাহরণ। অলস দুপুরে শীতের নরম রোদে পিঠ মেলে নতুন বউঠান উপন্যাস পড়তেন না, শুনতেন। পড়তেন কিশোর দেবর রবীন্দ্র-নাথ। কিশোরের মনে এই বর্ণনাত্মক ঐতিহাসিক উপন্যাসটি দাগ কেটেছিল।

বিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তখন নতুনদা ও নতুন বউঠানের সঙ্গে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে। তিনি লিখতে বসলেন উপন্যাস বউঠাকুরানীর হাট। এর আগে কেবলমাত্র করুণা উপন্যাস তিনি লিখেছেন বটে, কিন্তু তাকে সার্থক বলা চলে না বোধ হয়। বঙ্গাধিপ পরাজয় প্রথমে যখন প্রকাশিত হয়েছিল—'দুর্গাখণ্ড' (!) অনুযায়ী লেখকের নাম ছিল না। বিপিনচন্দ্র পাল মশাই অনুমান করেছিলেন, মনোমোহন বসুর রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গাধিপ পরাজয়ের প্রভাবে পড়েছিলেন এ বিষয়ে

সবাই নিঃসন্দেহ। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "প্রতাপচন্দ্র ঘোষের প্রথম খণ্ড 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯) রবীন্দ্রনাথকে বউঠাকুরানীর হাটের বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছিল মনে হয়।" রবীন্দ্রজীবনীকার বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ হইতে তাঁহার প্রেরণা পান সেটি হইতেছে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কৃত 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। তিনি আরও বলেছেন, সমসাময়িকপত্রে জানা যায় 'the talented author of Bauthakuranir Hat followed out the different incidents of the same story'. রবীন্দ্রজীবনীকার সম্ভবত লক্ষ করেন নি যে, ঐ মন্তব্যটি কোন সাময়িকপত্রের নয়, প্রকাশকেরই বিজ্ঞাপনের ভাষা—সমগ্র পঙ্‌ক্তিটা পড়লে বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়. 'He (writer) has been first to build a story on this singular episode in the history of Bengal, and since publication of his first volume others notably the talented author of Bauthakuranir Hat had followed out the different incidents of the same story'.

সবচেয়ে বড় কথা, ঐতিহাসিক উপন্যাসে নিছক কাহিনীগত মিলটাকে প্রভাব বলা যায় কিনা সন্দেহ। আজ সিরাজদ্দৌলা

নিয়ে নাটক রচনা করলে তা কি পূর্বসূরী কোন নাট্যকারের প্রভাব বলা যায়! প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথেরই রসিকতা স্মরণীয়: 'ইনি পরের ভাব অনায়াসেই নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন, এ ক শ্ল লে... বলিয়াছেন জন্মিলেই মরিতে হয়'—এই চমৎকার ভাবটি যদি গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের গ্রন্থ হইতে চুরি না করিতেন তবে লেখকের মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম।' 'প্রভাবে'র ভূত যাদের কাঁধে চেপেছে সেই মৌলিকতা-অভিমানী-দের প্রতি কবিদের এই সতর্কবাণী।

উপরন্তু তথ্যের দিক থেকেও বউ-ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে নিছক পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের অনুসরণ নেই। বস্তুত কবির স্বভাবই তা নয়—সর্বত্র তিনি আকর সূত্র থেকে মৌলিক তথ্য সন্ধান করতেন। 'আমি সে সময় তাঁর (প্রতাপাদিত্যের) সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মত অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।' বস্তুত এতদিন বাংলার শেষ বীর রাজা বলেই প্রতাপাদিত্যকে আঁকা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ সে তথ্য পুরোপুরি প্রমাণিত হতে দেখেন নি। রবীন্দ্রজীবনীকারও বলেছেন, 'বঙ্গাধিপের কতকগুলি চরিত্র রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নতুন রূপ লইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ যখন এই উপন্যাস লেখেন তখন তিনি গবেষণাকারীর মত ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন, কোন দেশাভিমানের মোহ তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। পরবর্তী কালে এই প্রশ্ন উঠতে যে তীব্র তীক্ষ্ণ মতবিরোধ ঘটেছিল সে কথা পরে বলছি।

তথ্যগত আঙ্গিকে তো বটেই, রচনার পারিপাট্যেও সুবিশাল পার্থক্য। প্রতাপচন্দ্র সর্বদাই প্রতাপাদিত্যের বিরাটত্ব বর্ণনা করতে বর্ণনাত্মক ভঙ্গী নিয়েছেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ কবিতার লাবণ্য নিয়ে জীবনের রসে ভিজিয়েছেন এই উপন্যাসটিকে। কবির কথায় তখন তার প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তাঁর লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে।' জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি বাল্য বয়সের বন্ধু বন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ থেকে আঁকলেন বসন্ত রায় চরিত্রকে। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায় ও পদকর্তা বসন্ত রায় চরিত্র মিশিয়ে তিনি এই রাজর্ষি চরিত্র এঁকেছেন। এবং এ চরিত্র তাঁর বহু রচনায় বারবার ফিরে এসেছে। বসন্ত রায়-উদয়াদিত্য-বিভা সম্পর্কে 'রবীন্দ্রনাথের নিজের বাল্যকথাই অধিকন্তু'। ডঃ সেন আরও বলেছেন,

শৈশবে তুতাপালিত হইয়া মাতৃবিয়োগের আগে ও পরে কিছু স্নেহ লালন পাইয়াছিলেন জ্যেষ্ঠ ভগিনী সৌদামিনী দেবীর কাছে। বউঠাকুরানীর হাটের কাহিনীতে এমনি স্নিগ্ধ সৌভ্রাত্রেরই আস্তা।' বইটি উৎসর্গও করা হয়েছে সোদামিনী দেবীকে।

বউঠাকুরানীর হাট জনপ্রিয় হল। সব চেয়ে বড় কথা, 'এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটা অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজী ভাষায় লেখা। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে।' শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিম প্রসঙ্গে লিখছেন, রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরানীর হাট সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "স্থানে স্থানে অতি সুন্দর অতি উচ্চদরের লেখা আছে। আমার বোধ হয় রবি বেশ পিকটেড কিন্তু 'পকোসাস'।"

পুস্ত দেশপ্রেমের উত্তেজনায় এই জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ হল, 'রাজা বসন্ত রায়'। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহযোগী কেদার চৌধুরীর রাজা বসন্ত রায় আগেই বলেছি সরস গাইয়ে চরিত্র। রাধামাধব কর এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকের অভিনয় হয় ১৮৮৬ সালের তেসরা জুলাই। ১৯০১ সালের ৬ এপ্রিল মিনারভা থিয়েটারেও অভিনীত হয়। ডঃ সুকুমার সেন বলেন, বসন্ত রায়ের গানগুলো রবীন্দ্রনাথেরই রচনা।

বউঠাকুরানীর হাট থেকে বসন্ত রায় চরিত্র কবির অন্যান্য রচনায় বারবার ফিরে এসেছে। ১৯০৯ সালে এই প্লট নিয়েই কবি প্রায়শ্চিত্ত নাটক রচনা করেন। ১৯২২ সালে প্রায়শ্চিত্ত ভেঙে মুক্তধারা নাটক রচনা করেন। ১৯২৯ সালে রচনা করেন পরিত্রাণ। হয়ত কবি এই কাহিনীকে কোন দিনই সুযোগ পেলে নতুন করে লিখতে ছাড়েন নি।

আগেই বলেছি, মূলে প্রতাপাদিত্য চরিত্র সম্পর্কে কোন অগ্রিম বিশ্বাসকে কবি প্রশ্রয় দেন নি। নির্দ্বিধায় নতুন তথ্যের সন্ধান করেছেন মৌলিক বিশ্লেষণে। তাই তাঁর আঁকা চরিত্রগুলো 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' আঁকা চরিত্রের সঙ্গে সর্বদা মেলে নি। কিন্তু কবি যা একদা নির্দ্বিধায় করেছেন পরে তা সবাই মানে নি—কারণ, স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল।' বীরপূজা বীরাষ্টমী শিবাজী প্রতাপাদিত্য উৎসবের নায়িকা ছিলেন কবিরই স্নেহের ভাগ্নী সরলা দেবী। ডন পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ভবানীপুরে তাঁর পরিচালনায় একটি সাহিত্য সমিতির সাংবৎসরিক উৎসবের সভানেতৃত্ব করার জন্য সরলা দেবীকে নিমন্ত্রণ জানালেন। এই সময় সারা দেশে স্বদেশপ্রেমের বন্যা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন গুপ্তভাবে ধিকিধিক সংহত হচ্ছে। সরলা দেবী বুঝেছেন শক্তির জবাবে শান্তিতন্ত্র বুকনি কখনও সমস্যা সমাধান করে না। শক্তির বদলে চাই শক্তি। তিনি তাই উৎসবের অপেক্ষা করছিলেন; কারণ, বার মাসে তের পার্বণের দেশে যে, কোন ব্রত শুরু করতে চাইলে উৎসবের যোগাযোগ করাতেই হবে। সরলা দেবী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেতৃত্ব করতে যাব—এটিকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাংবৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব কর আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না, সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালী ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর—আর আমি তাদের এক একটি বিষয়ে এক একটি মেডেল দেব। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে—সে তোমাদের সাহিত্যসভার সাংবৎসরিক রিপোর্ট নয়—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও, পড় তাঁর জীবনী। তার সার শোনাও সভায়।'

পুস্ত দেশপ্রেমের চাপা আগুনে ঘৃতাহুতি দিলেন সরলা দেবী। সারা দেশে বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সরলা দেবী নিষ্কম্প নেত্রী হয়ে উঠলেন। সঞ্জীবনী পত্রিকা লিখলেন, 'কলিকাতার বুকের উপর যুবকসভায় একটি মহিলা সভানেতৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।' সে এক নিবিড় উত্তেজনায় শিহরিত হয়ে উঠল দেশবাসী। ব্যস, শুরু হয়ে গেল প্রতাপাদিত্য উৎসব। কুস্তি বক্সিং লাঠি খেলা। সভা হল। বঙ্গবাণী লিখলেন 'মরি মরি, কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তৃতা নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গযুবকদের কঠিন হস্তে পুরস্কার বিতরণ।' বিপিন পাল Young India-তে লিখলেন, 'As necessity to the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Protapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal".

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র জানতেন। তিনি বললেন, সরলা এক খুনীকে নিয়ে মাতামাতি করছে। দীনেশচন্দ্র সেন একদিন কবির দূত হয়ে সরলা দেবীকে জানালেন, 'আপনি তাঁর বউঠাকুরানীর হাটে চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপরূপ করে অন্য এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির heroworship-এর যোগ্য হতে পারে না। সরলা দেবী জানালেন, তিনি মানুষ প্রতাপাদিত্যকে সকলের আদর্শ করতে চান নি—বসন্ত রায় হত্যা সমর্থন করি নি। তিনি যে Politically great বাংলার শিবাজী, মোগল বাদশার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একলা একা হিন্দু জমিদার, সেই সাহসিকতার প্রতিষ্ঠা করছি।

অতএব বাংলাদেশে প্রতাপাদিত্যের বীর-পুজো শুরু হল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁর প্রতাপাদিত্য নাটক প্রকাশ করলেন। এই নাটকের অভিনয় জনপ্রিয় হতেই স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্র দত্তও প্রতাপাদিত্য নাটক শুরু করলেন। এর পর সরলা দেবী শুরু করলেন উদয়াদিত্য উৎসব। প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য চরিত্র চিত্রণে কবি একদা নিজেকে আরোপ করেছিলেন। সে যাক, উদয়াদিত্য উৎসবের আগে বেঙ্গলি পত্রিকা জানালেন, 'সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন Surprise Spring করছেন—আর আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়—"অতঃ কিম?" সরলা দেবী বলছেন, নজর পড়েছিল আমরা যে রাজপুত বীরবালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালীরা অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালীর ঘরের ছেলে উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখসমরে দেহপাত করেছিলেন—তার খবর কিছুই রাখিনে। তার স্মৃতি বাঙালী যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়া দরকার।'

উদয়াদিত্য উৎসবের আয়োজন করা হল। উদয়াদিত্যের ছবি নেই তাই এক খাপখোলা তলোয়ার পুজার আয়োজন হল। হল আপত্তি করলো। অন্যত্র আয়োজন হল তখন। এই উৎসব দিয়ে সরলা দেবী যেন বীর বাঙালীকে আবার নতুন যুদ্ধের মুখে নিয়ে গেলেন। সরলা দেবীকে দেশের লোকে রণদেবী বলে বরণ করে নিলেন। সারা দেশ তাঁর সঙ্গে গেয়ে উঠলেন:

'গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!
হর হর হর জয় হিন্দুস্থান
সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান।'

এই বীরত্বের গান শোনাতে সরলা দেবী সাহায্য নিয়েছিলেন যাঁর তিনি প্রতাপাদিত্য ও তার পুত্র উদয়াদিত্য। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের স্রোত বয়ে চলেছে। যশোরের এই রাজাটিকে তাই ভোলা শক্ত।

॥ একচল্লিশ ॥

গুঁড়িটাও বাদ, আর বড় বড় শাখা প্রশাখারাও। 'ছেলেটির আরো অনু-যোগ : 'আমরা ওর ছোট ছোট শাখা প্রশাখাগুলো ভেঙেই দাঁতন করেছি কেবল।'

'গোড়ায় দাঁত বসাতে পারোনি তাহলে? গোড়াতেই গলদ।'

'হ্যাঁ, গলদ নিয়ে তেমনি খাড়াই রয়েছে গাছটা তবে একেবারে ন্যাড়া করে রেখে এসেছি। কিছু আর নেই তার। যেয়ো না জেলে, দেখবে তখন। চেহারাটা তার দেখতে পাবে গেলে।'

'যাব তো। কিন্তু কবে যাই কিছু কি তার ঠিক আছে!'

'মীর্জাপুর স্কোয়ারে এসো না পরশু-বিকেলে, আইন অমান্য করার সভা হবে সেদিন। সেদিন ফের আমি জেলে ফিরে যাব এঁচে রেখেছি।'

সেই গাছটাকে দেখতে আবার? আমি জিগেস করি : 'তাকে না দেখে থাকতে পারছো না বুঝি? মন কেমন করছে তোমার?'

আমি অবাক হয়ে ভাবি, গাছের জন্যে এমন টান কারো হতে পারে নাকি কখনো! গাছের আবার দেখবার কী আছে? সে তো একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়। তাছাড়া, এ গাছটার ত রূপ যৌবন বলতে কিছুই আর নেইকো। সবটাই প্রায় তার দাঁতন হয়ে গেছে।

'আহা, গাছ কেন গো! সেখানে একজন রয়েছে যে আমাদের। তাকে দেখতেই যাব তো আমি।'

'তোমার কোনো বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ, বন্ধুও বলা যায় বইকি! শুধু আমার নয় সবাইকার। তবে বন্ধু বলতে যা বোঝায়, সমবয়সী ইয়ার, ঠিক তা নয় অবশ্যি।'

'তবে? একজন মানুষমাত্রই। তোমার যদি প্রাণের বন্ধু না হয় তবে শুধু একজন মানুষকে দেখতে ফের আবার জেলে যাবার মানে? মানে হয়?' অতীব দুঃখি (?) 'মরদের মত একটা মানুষকেও তো একবার দেখলেই ফুরিয়ে যায়।'

'সব মানুষ কি ফুরোয়? সবাই কি ফুরিয়ে যায়? একেক জন এমন মানুষ থাকে না যে নাকি অফুরন্ত, ফুরোবার নয়। কখনো ফুরোয় না? যাকে যায় বার বার দেখতে ইচ্ছে করে, দেখে দেখে আশ মেটে না, দেখলে পরে চোখ জুড়োয়; মন ভরে যায়?'

'কে শুনি না মানুষটা?'

'যে সে মানুষ নয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ঐ জেলেই আছেন এখন। তিনি কারাবরণ করেছেন তুমি জানতে না?'

'জানব না কেন, কিন্তু ঐ জেলেই যে রয়েছেন তা আমি জানতুম না।'

'দেখেছ কখনো দেশবন্ধু দাশকে?'

'কতো বার! খুব ভালো করেই দেখেছি।'

'কোথায় দেখলে? তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করা তো ভারী মুশকিল। মানে, তোমার আমার পক্ষে। আর সভায় টভায় সেই দূর থেকেই দেখা যায়। কিন্তু খুব কাছাকাছি পেতে হলে তোমায় যেতে হবে ওই জেলে।'

'আমি খুব কাছাকাছিই তাঁকে দেখেছি।'

'কি করে দেখলে শুনি? দেখলে কোথায়?'

'আমাদের জেলায়। কিছুদিন আগে

তিনি বাংলাদেশের শহরে শহরে সভা করতে বেরিয়েছিলেন না? সেই সময়।'

ও, সেই দেখা! জেলায় দেখা আর জেলে দেখা এক দেখা নয়। তুমি দাড়িওলা সি আর দাশ দেখেছো?'

'না।' আমি কই', 'আমি দেখেছি বেশ চাঁছাছোলা সি আর দাশ।'

'জেলে গিয়ে উনি দাড়ি রেখেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে তবে কামাবেন—ওঁর নিজের নাপিতের কাছে।' সে জানায়ঃ জেলে না গেলে এ সি আর দাশকে তুমি আর দেখতে পেলে না। তোমার এ জীবনে নয়।'

ভাবিত হতে হয়। চাঁছাছোলা দেশ-বন্ধুর গালে চাচাওলা দাড়ি কেমনটা দাঁড়িয়েছে ভেবে আমি ঠাওর পাই না।

'গাছ পালা নদী নালা খাল বিল একবার দেখলেই হয়, দেখবার সাথে সাথেই ফুরোয় মানি, কিন্তু গঙ্গা?' সে বলে যায় গঙ্গা কি ফুরোয় না ফুরোবার? গঙ্গা অফুরন্ত। গঙ্গার দিকে তুমি অনন্ত কাল তাকিয়ে থাকতে পারো। দেখেচ তুমি গঙ্গা?'

'কে না দেখেছে?' তার প্রশ্নটাই আমায় অবাক করে।

'সে তো হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে? যেতে আসতেই?' তার কথাঃ 'তার কিনারে বসে তাকিয়ে থেকেছো তার দিকে?'

'কতো দিন! দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাসের পর মাস।'

'কোথায় দেখলে? তোমাদের গাঁয়ে গঙ্গা আছে?'

'না। সেখানে মহানন্দা। বর্ষাকালেই তার আনন্দটা দেখা যায়—তখন নৌকো যায় তার ওপর দিয়ে। কিন্তু অন্য সময় শুধু তার হাড়পাঁজরা।'

'তা হলে দেখলে কোথায় অমন করে? ভারী তোমার হিংসে হচ্ছে আমার।'

'কেন, এই কলকাতাতেই। কাশীপুরে। বরানগরের পাশ দিয়ে যখনি গঙ্গা?'

'সেখানে তোমাদের কেউ থাকে বুঝি?'

কেউ থাকে না। খালি পড়ে থাকে বাড়িটা। প্রকাণ্ড বাড়ি। অট্টালিকাই বলা যায়।' আমি জানাই ঃ 'অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড এক বাগানের মধ্যে বাড়িটা।'

'বাগানবাড়ি বুঝি?'

'হ্যাঁ, বাগানবাড়িই তো। বাগানের ভেতর বাড়িটা, গঙ্গার ঠিক ওপরেই। ছোটখাট বাঁধানো ঘাট রয়েছে আবার। সেখানে বসে দ্যাখো না কেন গঙ্গা—যত খুশি। কেউ দেখবার নেই। আমি তো তাই দেখতাম।'

'বাগানবাড়ি ভারী খারাপ।' তার মন্তব্য। —'খারাপ বলে সবাই।'

'কেন, খারাপ কিসের? বাড়িটাও খারাপ নয়, বাগানটাও বেশ ভালো। কতো আম গাছ লিচু গাছ নারকেল গাছ আছে বাগানে। কী মিষ্টি আম সব। কতো বড়ো বড়ো লিচু। ডাব ধরে রয়েছে এন্তার। পাড়ো আর খাও। আর ফুল গাছ তোমার কতো রকমের যে! সৌরভে মন ভরে যায়—চাঁপার গন্ধ তো পাগল করে দেয়? আমাদের দেশের সোনালি রঙের চাঁপা নয় কিন্তু এগুলো, যাকে বলে কি না কনকচাঁপা

—এগুলোর নাম হচ্ছে কাঁঠালি চাঁপা
কিন্তু গন্ধ দুর্দান্ত।......ফুলবাগানটার কেয়ারি করা রাস্তা আছে কেমন—ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো দুধারে। ছোট লা সুরকির রাস্তা সব—কী চমৎকার!'

'তোমাদের বাড়ি?'

'না, আমার এক কাকার।'

'তোমরা খুব বড়লোক তা হলে?'

'কাকারা বড়লোক। মেজোর বড়লোক।.. কাকা বড়লোক তো আমার কী!'

'তোমরা হচ্ছো রাজা গজা, বুঝেছি।'

'ঐ কাকা ভদ্রলোককে বলতে পারো রাজা খেতাব আছে তাঁর—যুদ্ধের সময় ব লাখ টাকা দিয়ে নাকি সরকার থে খেতাবটা পেয়েছেন। আর গজা নিশ্চয়ই। পিলখানায় হাতী পিল পি করছে—অতিকায় হাতী সব—একটার না তাদের মোহনপ্রসাদ! এত বড়ো তার দাঁ

'ঐ হলো! কাকা যদি রাজা হ ভাইপোও কিছু কম নয়। একই ঝাড়ের তুমিও ঐ রাজা গজাই।...বুঝলাম!' আম প্রতি সে উপেক্ষার কটাক্ষ করে।

'কাকস্য পরিবেদনা! কী সম্পর্কের কাকা আমি জানিও না তা ঠিক। ত রাজা না হলেও গজা তুমি বলতে পা আমায় অবশ্যি। জিবে গজা। সেই জি গজাই আমি। যা ময়রার দোকানে গজা জিভে যার সোয়াদ পাই। কিন্তু তাই সব সময় পাচ্ছি কোথায়!'

'বোঝা গেছে।' আমার প্রতি তাঁর কে একটা নিস্পৃহ ভাব দেখা যায়। —'রা গজা না হলেও তুমিও প্রায় তার কা কাছি।'

'তা হ্যাঁ, তার কাছাকাছি গেছি ব আমি কয়েকবার। হ্যারিংটন স্ট্রী বাড়িতেও তার থেকে এসেছি বার কয়ে বাড়ির থেকে পালিয়ে কলকাতায় চ আসতাম তো প্রায়ই, তখনই কিছুদিন ব কাটিয়েছি...সেখানে...'

'হ্যারিংটন স্ট্রীটেও তার বাড়ি অ আবার? বরানগরের গঙ্গার ধারে এত ব একখানা থাকতেও?'

হ্যাঁ, দশ নম্বর হ্যারিংটন স্ট্রী আর কাশীপুরে রতনবাবু রোড ধরে গে গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িটার কাছেই রত বাবুর ঘাট। নড়াজোলের রাজা রতন রায়, শুনেছ? তাদের ঘাটের পাশেই ম পোড়ানোর জায়গা। ছোটখাট শ্মশা মতই। মাঝে মাঝেই সেখানে মড়া পোড়ে আর এমন বিচ্ছিরি গন্ধ বার হয় অসহ্য। সেই গন্ধ বাতাসে ভেসে কাশীপু বাড়িটার আসে। সেই কারণেই উনি থা না সেখানে, কখনো থাকেন নি। থা পড়ে আছে এমনি অত বড় বাড়ি।

'তুমি থাকো না একেবারে!'

…দুজন থাকে এক দারোয়ান আর এক …লী। দারোয়ানটার নাম সীতারাম। বুড়ো …রোয়ান। তার সঙ্গে যা ভাব হয়েছিল …মার না!—সেই ছোটবেলায়! রোজ তাকে …খানা করে চিঠি লিখতাম আমি—বেশ …লম্বা চিঠি।'

'কী লিখতে?'

'কে জানে! মনেই পড়ে না এখন। যা মনে আসত যা খুশি তাই লিখতাম। লিখে লিখে দিয়ে আসতাম। সে তো আর বাংলা জানে না। বলতে জানে পড়তে পারে না তো। তাই আবার তাকে পড়ে শুনিয়ে দিতে হত আমায়। চিঠিগুলো সব সে যত্ন করে জমিয়ে রেখেছে। বাড়ি নিয়ে যাবে, তার নাতিকে বাংলা শেখাবে বলেছে —সে তখন তাকে পড়ে শোনাবে আবার। দুঃখ করে বলত, তার তো ওই বাংলা শেখার বয়েস নেই আর।'

'বা রে সীতারাম!' ছেলেটি উচ্ছ্বসিত হয়। 'লেখা পড়া না জানলেও, লেখানোর পড়ানোর দিকে ঝোঁক আছে তার।'

'আর বাগানের মালী ছিল রহিম। শেখ রহিম। তার সঙ্গেও আমার ভাব ছিল খুব। তার দুর্দিন ছিল একেবারে। কতো

মুর্গির ডিম যে খাইয়েছে সে আমার। বাগানের এক কোণে তার ছোট একখানা ঘর ছিল। সেখানে গেলেই সে ডিম ভেজে দিত। বাজারে যেতো না, যেতে হতও না তাকে, মুর্গির কাছ থেকে মোটা যেতনই পেত সে বোধ হয়। আর নারকোল গাছের থেকে কচি ডাব পেড়ে এনে কেটে খেতে দিত আমায়। ওরকম ডাবের জল আমি কখনো খাইনি।'

'সেই জন্যই ভাব হয়েছিল তোমাদের। ভাব পাতিয়ে ডাব।' বলে সে হাসে।

'ডাবের জন্য না ডিম!'

'রহিমের ভালোবাসাকে তুমি ডিম বলে উড়িয়ে দিচ্ছো?' তাকে যেন একটু ক্ষুণ্ণ দেখতে পাই।

'মোটেই তা দিচ্ছি না। বলছি যে ভাবটা হয়েছিল তার ওই ডিম ভাজার জন্যেই— গাছের পাড়া ডাব আর মুর্গির পাড়া ডিম—দুয়ের জন্যই।'

'তাই বলো! যাই হোক, তোমার কথায় দুটি হয়েছিল মন্দ না। দারোয়ান সীতারাম আর বাগানের মালী শেখ রহিম।'

'ছোটবেলায় ঐ বয়সে এমন বন্ধু পাওয়া যায়? তুমিই বলো!'

'একেবারে স্বদেশী গানের মতই মিলে গেছল তোমার বরাতে। সেই যে, গানটার আছে না—আমরা কতো গেয়েছি তো! ঐ গান গেয়েই জেলে গেছে কতো ছেলে!'

'কী গানটা? বন্দেমাতরম্? নাকি, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা? নাকি, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়......?'

'সেই যে, রাম রহিম না জুদা করো ভাই। দিলকো সাচ্চা রাখো জী। হাঁ জী হাঁ জী করতে রাহো, দুনিয়াদারির দেখো জী। তাই করেছো তোমরা, রাম আর রহিমকে আলাদা করো নি—এক জায়গায় এনে রেখেছো।'

'আমি নাকি? এই ধন্যবাদ সেই কাকার প্রাপ্য। তিনিই তাঁর বাগান মন্দিরে ওদের দুজনকে এনে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করে সে যেমন ধন্য তেমনি তার, যে পূজারী সেও কিছু কম নয়।'

'পূজারীটি আবার কে?'

'তুমিই তো! তুমিও কিছু নগণ্য নও।

'আমার তো নিজের পেটপুজো। আমার যা ভালোবাসা আর ভাব হলো ওই ডিম আর ডাব।'

'তাহলেও, যে কারণেই হোক, ভালোবাসাই তো? ভালোবাসা কি আর অকারণ হয়? আর রবি ঠাকুর বলেছেন না, ক... নাম ভালোবাসা তারই নাম পূজা—এ... রকম কী একটা কথা বলেছেন যে... কোথায়!'

'মোটেই বলেননি। আমার কা... তুমি রবিঠাকুর কপচাতে এসো না! গ... বাজতে এসো না আমার কাছে। রবিঠাকু... আমার গুরুদেব খাওয়া। তিনি বলেছে... মোটা ধরণীর নয়, কথা পাবো কোথা... দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা॥ এ... কথাই বলেছেন তিনি।'

কচ ও দেবযানীতে ওদের দুজনের মা... এই কচকচিটা আছে তার মনে করিয়ে দিই

'ওই হলো। একই দাঁড়ালো কথা ......এখন শুনি তাব জমিয়ে তুমি কা... হাজার ডিম আর ডাব সাবাড় করেছি... তার, তাই কও।'

'হাজার হাজার। আমি কি গু... রেখেছি? পেটের মধ্যে গিয়ে জমেছে। অ... পেট হচ্ছে গিয়ে খাবারের যমালয়, জা... তো? এমন একটা জায়গা যা বা... তাই হজম। আমার পেট অনন্ত। ... বলে আমি নাকি একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস।'

'বলেন নাকি তোমার মা?'

'বলবেন না? আমি যে কী—আ... নিজেই কি আর জানিনে? গোপালে... ন্যায় সুবোধ বালকের মত যাহা পাই তা... তো খাই-ই, তা ছাড়া যা আমার খাও... উচিত নয়, হয়ত উচিত নয়...এমন ... জিনিসও আমি খেয়েছি।'

'কী রকম? কী রকম?'

'এমন একটা জিনিস যা নাকি খে... পাওয়া যায় আর পেলেই খাওয়া উচিত...'

'আহা, শুনিই না জিনিসটা।'

'শুনলে তোমার পিলে চমকে যা... —সে জিনিস সাত জন্মেও তুমি কল্প... করতে পারো না। তোমার বয়সের কো... ছেলে সে খাবার খেতে পায় না বা কদা... কোথাও কেউ হয়ত খেয়ে থাক... পারে...যদি কেউ তাকে কখনো খাই... থাকে...

'কী জিনিসটা শুনিই না!'

'সে জিনিস হচ্ছে রিনির। বুঝে... এইতেই!'

'জিনিসটা আবার কে? রিনির আবার জিনিস?'

'ওই তো! ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ শোনো না? যে তা খায় সে তো ঋণীই হয়ে থাকে। হয় না? সেই ঋণীইর থেকে খাওয়া.....'

'ঘি খাওয়ার কথা বলছো তো? সে আর কে না খেয়েছে ভাই!'

'ঘি বলো, মধু বলো, পঞ্চগব্য বলো। যা বলো তাই বলো। মোটের ওপর অমৃত। খেয়েছো অমৃত?'

'আলবৎ খেয়েছি, অমৃতি তো? মোটা মোটা সেই জিলিপি—রসে টইটম্বুর! সেই জিনিস! তা অমৃতির দোকানদার অমনি দিলে কে না খায়? আমাদের পাড়ার দোকানদারটা ধারে দেয় না যে! ধার চাইলে ধরে মারতে আসে। তার ধারেকাছে ঘেঁষতেই দেয় না।'

'যাক গে ওকথা। তুমি গঙ্গার কথা বলছিলে না? আমি যেমন করে গঙ্গা দেখেছি তুমি তার একশো ভাগের এক-ভাগও দ্যাখোনি ভাই। ওই রহিম না? গঙ্গার বুকে আমায় নিয়ে বজরা চালিয়েছে—বুঝলে?'

'বলো কি? বজরাও চালিয়েছো তুমি রহিমের সঙ্গে?' শুনে তো সে রীতিমতই অবাক: 'আটা না ছাতু?'

'আটা না ছাতু—তার মানে?' আমিও কম অবাক হই না—'বজরাই তো। আটা ছাতুর কথা আসছে কেন?'

'বজরার আটাও হয়, ছাতুও হয় আবার। কোনটা চালিয়েছিলে তোমরা? অবাক করলে ভাই! বাঙালীর ছেলে ডাল ভাত চালাতেই হন্দ হয়ে যায়, হিমশিম খায় তাই হজম করতেই। আর তুমি কিনা বজরাও চালিয়েছ তার ওপর। তোমার মা মিথ্যে কন না! সত্যিই তুমি নমস্য। হে মামা দণ্ডবৎ! তোমার ক্ষুরে ক্ষুরেই।' সে আমায় নমস্কার করে।

'আহা, সে বজরা কেন গো!' আমি যেন বজ্রাহত হই, বজ্রাহতর মতই কই—'তুমি কী হে! বজরা কাকে বলে তাও তুমি জানো না? দেবী চৌধুরাণী পড়োনি তুমি? বঙ্কিমবাবুর লেখা? তুমি কী একটা!'

'বঙ্কিমবাবু এখানে আসছে কোত্থেকে!' সে বঙ্কিম নেত্রে তাকায় আমার দিকে—'হচ্ছে গিয়ে বজরার কথা।'

'দেবী চৌধুরাণীর বজরা ছিল। গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িওয়ালা বড়লোক মাত্রই থাকে। সেই বজরায় চেপে তারা গঙ্গার বুকে বেড়ায়। হাওয়া খায়। আমার কাকারও কাশীপুরের ঘাটে একটা বজরা বাঁধা আছে। বড়োসড়ো নৌকোর মতই হচ্ছে বজরা—তবে নৌকো ঠিক নয়কো। ছাদওয়ালা দু-তিনখানা ঘর আছে তার। ছোটখাট বাড়ির মতই বলা যায়। ভাসমান বাড়ি। রহিম সেই বজরায় আমায় নিয়ে বেড়াত গঙ্গায়। সেই কথাই বলছিলাম। বলছিলাম যে আমি যেমনতর গঙ্গা দেখেছি তা তুমি দ্যাখোনি। বলছিলাম তাই।'

'যাক, দেখেছো গঙ্গা? তাহলেই হলো। জন্ম সার্থক হয়েছে তোমার।' সে বলে: 'আমিও-সেই গঙ্গা দেখতে যাবো পরশুদিন—আমার জন্ম সার্থক করতেই।'

'এই যে বললে পরশুদিন তুমি জেলে যাচ্ছো আবার?'

'আহা, জেলেই এখন গঙ্গা হে! সেখান দিয়েই গঙ্গা বইছে যে!'

'ও, গঙ্গার ধারেই বুঝি এই জেলখানাটা? সেখান থেকেই গঙ্গা দেখা যায় বেশ?'

'আহা, কী সে গঙ্গা' কী মহিমা তার! কেমন তার রূপ? আর কতো তার ঢেউ যে...! পাড়ে বসে ঢেউ গোনো—ঢেউয়ের পর ঢেউ—গুনে পাও না। আর কিনারায় তোমার পা ডুবিয়ে ঢেউ খাও তার! গঙ্গায় যদি ডুব দিতে হয়, দেশের জন্যে জেলে যাবার এই সময়।'

'আহা, জেল তো তোমার পড়েই রয়েছে, গঙ্গাও কিছু পালাচ্ছে না। দেশও পালিয়ে যাচ্ছে না কোথাও। যেতে চাও তো যাবে, গেলেই হোলো এক সময়। তার চেয়ে বরং পরশু বিকেলে চলো আমরা কোনো সিনেমায় যাই। এখন তাড়াটা কিসের জেলে যাবার?'

'তাড়া নেই? তুমি বলো কী? কখন তিনি ছাড়া পান, চলে যান তার কিছু ঠিক আছে? শুনেছি সরকার বাহাদুর যে কোনো মুহূর্তে তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন।... চলে গেলে তো আর দেখা পাব না এ জীবনে। এমনটা করে পাব না তো!'

'কী সব আবোল তাবোল বকছো গো! দেশের জন্যে জেলে যাবে তো কী হয়েছে...!'

'দেশের জন্যে কতোখানি যাচ্ছি আমি জানি না। আমার জেলে যাওয়া দেশের জন্য নয়, দাশের জনই। সি আর দাশকে দেখতেই। সি আর দাশই সেই গঙ্গা ভাই!'

(ক্রমশ)

সে লড়াই বাঁচার লড়াই

এই প্রবন্ধ রচনাটির সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলতে চাই বিষয়টি আরো ভালভাবে বোঝবার জন্য।

লেখকের সমগ্র রচনাটি কয়েকটি বিশেষ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেগুলি তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছেন—যেগুলো তর্কাতীত না হলে তাঁর কোন সিদ্ধান্তই নিঃসংশয় হয় না।

তাঁর প্রথম তত্ত্ব বা ধারণা—"আমরা অধিকাংশ লোকই নির্বোধ জন্মগ্রহণ করি। বুদ্ধি অর্থাৎ সমস্যা কী এবং সমাধান কোথায় তা স্পষ্ট বোঝবার নিজস্ব প্রবণতা থাকে না।" প্রথম কথা বুদ্ধি বা Intelligence একটা মানসিক ক্ষমতা—এটা শুধুমাত্র সহজাত নয়, অর্জিতও বটে। কতটা সহজাত এবং কতটা অর্জিত সে পরিমাপ অনির্ণেয়। বুদ্ধিবৃত্তি বা Intellect যেটা সহজাত, তার প্রয়োগের ক্ষমতাই বুদ্ধি বা Intelligence, এবং বুদ্ধির চরিত্র বিশ্লেষণে এর ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে—পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা। এবং অধিকাংশ আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকা সাধারণ মানুষ যে এ ক্ষমতার অধিকারী একথা প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য।

এখন যদি লেখকের সঙ্গে একমত হয়ে মেনে নেওয়া যায় যে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের বুদ্ধি অর্থাৎ সমস্যা কী এবং সমাধান কোথায় তা নিজে নিজে বোঝবার ক্ষমতা নেই এবং যার ফলে কোনগুলো নিছক আপাতিক অসুবিধা এবং কোনগুলো অবিচ্ছেদ্য অজেয় দুর্ভাগ্য তা বোঝবার জেদ বা চেষ্টা থাকে না, তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায়—বিশেষ বিশেষ যুগে যেসব অবিচারগুলো আপাতিক মনে হয়েছে এবং তা দূর করে অবিচ্ছেদ্য দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা হয়েছে—সে সব কি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হয়নি? হতে পারে সমস্যা ও সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে কয়েকজন চাঞ্চল্যকর জননেতা। কিন্তু এটাও সত্য যে সেই সমস্যাগুলোকে স্বরূপে বুঝে এবং সমাধানের পদ্ধতির যথার্থতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই অধিকাংশ সাধারণ মানুষ জননেতার আদেশ পালন করেছে। বলা যেতে পারে তাদের বুঝে নেওয়াটা নিজস্ব প্রবণতা থেকে হয়নি। যেমন বোঝান হয়েছে তারা তেমন বুঝেছে।

এখন প্রশ্ন—স্বাধীন চিন্তা—স্বাধীন ইচ্ছা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব কিনা? প্রতিনিয়তই কি আমার চিন্তা আমার ইচ্ছা পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা, অপরের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত বা পুনর্গঠিত হচ্ছে না? 'Will' কি আমার ওপর enforce করা হচ্ছে না?

লেখক আপাতিক অসুবিধা এবং অবিচ্ছেদ্য দুঃখের আপেক্ষিকতা স্বীকার করেছেন। বলেছেন 'যুগে যুগে এদের ধারণা পাল্টায়।' সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে শুধুমাত্র Relative to time নয়, একই যুগে Relative to individuals। একই যুগে একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে (বা শ্রেণীর পক্ষে) এদের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। এবং তা যদি সত্য হয় তাহলে এও সত্য যে প্রতি যুগে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন "বৃহত্তর স্বার্থ" (এই শব্দের দ্বারা লেখক সঠিক কী বোঝাতে চাইছেন পরিষ্কার নয়; তবে ধারণা করা যেতে পারে নির্দিষ্ট যুগে আপাতিক অবিচার দূর করে অবিচ্ছেদ্য দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়ানো-কে বোঝাতে চাইছেন) বুঝে থাকে। আজকের যুগে নিজের বিশেষ কোন বৃহত্তর স্বার্থের ধারণা নিয়ে অন্য কোন যুগে ভিন্ন মানসিকতায় গঠিত বৃহত্তর স্বার্থের ধারণার Value judge করা নিতান্তই নিরর্থক। সুতরাং "আমরা বেশির ভাগ লোকই দৈহিক-ভাবে অক্ষম কী ভালো কে ক্ষতিকারক এ সমস্যা নিজে নিজে বুঝতে"—এ মন্তব্য করার অর্থ আমার ধারণায় যা বৃহত্তর স্বার্থ সেটাই বৃহত্তর স্বার্থের শাশ্বত এবং একমাত্র সত্যরূপ। (প্রাসঙ্গিক-ভাবে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল যে বুদ্ধি জিনিসটা দৈহিক প্রক্রিয়া এই ওয়াটসনি মতবাদ বহুদিন হল ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে)

তরুণ দত্তের রচনাটির দ্বিতীয় পর্বে গত শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক নবজন্মের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে লেখকের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান নকশালী আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণে এবং এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাঁর চিন্তার দৈন্য স্বাভাবিক-ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'কোন ছেড়ে দিলেই নকশালীরা আবার পোষা থাকবে'—এটা তাঁর ধারণা মাত্র। তাঁর এ ধারণা সৎ হলেও যে বিভিন্ন উপাদান এই ধারণা গঠনে সাহায্য করেছে তারা সৎ নাও হতে পারে। লেখকের রচনার এই পর্ব সম্পর্কে আমার বক্তব্য—good approach কিন্তু bad prophecy. লেজারস্ট্রীজ দেখা তাঁর [illegible] হয়নি, এবং সেই কারণেই নকশালদের চিত্রণ সত্যরূপ পায়নি।

বন্দনা সেনগুপ্ত
গোয়ালাটুলি, হুগলী।

কেন এই অরাজকতা

শ্রীঅশোক রুদ্র একাধিক পর্যায়ে দেশের পৃষ্ঠা মারফত তাঁর সমালোচকদের প্রশ্ন করেছেন—তাঁর ভুল কোথায়? সেই প্রশ্নগুলির জবাবে এই পত্রের অবতারণা।

প্রথমত বীরত্ব প্রসঙ্গে। বীরত্ব এবং বেপরোয়া মরিয়াভাব—এই দুটি প্রায় বিপরীতধর্মী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ভঙ্গীতে আপাত সাদৃশ্য সব সময়েই দেখা যায়; যেমন দানশীলতা ও কার্পণ্য উভয়েরই বহিঃপ্রকাশ কৃচ্ছ্রসাধনে,—সারল্য এবং কপটতা, উভয়ের প্রকাশ বিনীত ভঙ্গীর মাধ্যমে। প্রকাশ ভঙ্গীর এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উভয়ের মৌলিক ও গুণগত পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করা শ্রীরুদ্রের প্রথম ভুল বলা চলে। এই প্রসঙ্গে Hemingway-র একটা সংজ্ঞা আমার খুব পছন্দ—Courage is Grace under pressure. Grace কথাটি যতোই 'বুর্জোয়াগন্ধী' হোক না কেন, courage-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। আর এই grace তখনি আসা সম্ভব যখন সামনে একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ থাকে। মুমূর্ষু রামেশ্বর-মনোরঞ্জনের মুখে এই grace-এর ছাপ এবং জনতার-হাতে-ধৃত স্কুলে অগ্নিসংযোগকারী বিপ্লবীর মুখে এই grace-এর অনুপস্থিতির কথাই আমি আগের আলোচনায় বোঝাতে চেয়েছিলাম। শ্রীরুদ্রের এক অভিযোগের উত্তরে জানাই যে এই বিপ্লবীদের আদর্শ বিন্দুমাত্র অনুমোদন না করেও এদের সাহসী বলতে আমার কোনো আপত্তি থাকতো না (ক্যাসাবিয়াংকার বিচারবুদ্ধির ওপর কোনো আস্থা না থাকলেও তার পিতৃভক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে কি?), যদি দেখতাম এরা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ীই 'শ্রেণীশত্রু'র সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন দেখি যে যতজন তথা-কথিত 'শ্রেণীশত্রু' নিহত হয়েছে, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশী সংখ্যক কিশোর ছাত্র (যাদের অপরাধ ভিন্ন রাজনীতি বা ভিন্ন পন্থার বিপ্লবে বিশ্বাস করা) রিকশাওয়ালা, ফুচকাওয়ালা অশীতিপর বৃদ্ধ (যারা গুটি পাঁচেক স্থানীয় বিপ্লবীর বিচারে CIA বা পুলিসের গুপ্তচর।) এই বীরত্বের বলি হয়েছে, তখন কি ভাবে মেনে নি যে এর পেছনে কোনো একটা "আদর্শ" —যেটা আমার মতে যতোই ভ্রান্ত হোক না কেন—আছে বা থাকতে পারে? [illegible] আদর্শবিহীন [illegible] [illegible] [illegible]

সন্ত্রাসবিরোধিতায় কোনো ক্ষেত্রেই মৌলিক পার্থক্য নেই।

সুতরাং অগ্নিযুগের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এদের মৌলিক পার্থক্য আছে দুটি: প্রথমত অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের লক্ষ্য স্থির ছিলো—সুরক্ষিত সশস্ত্র বিদেশী রাজপুরুষ ও তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যকারীদের ওপর। শুধু terroise করার জন্যে বা যারা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে না তাদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নির্বিচার হত্যা তাদের 'আদর্শে'র মধ্যে ছিলো না। দ্বিতীয়ত, তারা কখনোই নিরস্ত্র অসহায় একক পথচারীকে দল বেঁধে অকস্মাৎ আক্রমণ করে হত্যা করেনি। "কেবল খতম অভিযান চালিয়েই আমরা দেশের সব সমস্যার সমাধান করবো"—দেওয়ালে দেওয়ালে এই শ্লোগানটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

শ্রীরুদ্রের দ্বিতীয় ভুল পরিবেশিত তথ্যে। কয়েকটি উদাহরণ দিই: (১) "যারা ট্রেন ডাকাতি (বা রেলের সম্পত্তি চুরি করে) তারা তো আর সশস্ত্র নয়" (মূল প্রবন্ধ)। —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। (২) "বৈপ্লবিক আদর্শে যারা লড়ছে তার কোনো দিন কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে বলে তো কোন খবর কাগজ বা পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় না" (দেশ ৩০শে অক্টোবর, পৃঃ ১২৫৬) —কলকাতায় ও অন্যান্য শহরে পাড়ায় পাড়ায় যাঁরা একাধিক বৈপ্লবিক পার্টির কর্মীদের নিয়মিত Protection money দিয়ে থাকেন তাঁরা শ্রীরুদ্রের এই চমকপ্রদ তথ্যে কতটা আশ্বস্ত হবেন জানি না। (৩) "শত শত খবরে পড়া গেছে ব্যাংক চড়াও করে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু একটি পয়সাও ছোঁয়া হয় নি" (ঐ)। খবর কাগজের 'কাটিংস' রাখা আমার অভ্যেস। গত দু' বছরের কাটিংস ঘেঁটে প্রায় ঐ ধরনের খবর—শত শত দূরে থাক্—গুটি পাঁচেক এর বেশী পেলাম না। এবং ঐ পাঁচটি ক্ষেত্রেও 'একটি পয়সাও না ছোঁওয়া'র কারণ যে অর্থের প্রতি অনীহা (সুযোগ ও সময়ের অভাব নয়)—সে কথাও প্রমাণসাপেক্ষ। (৪) "সাঁতাকরের যারা গুণ্ডা শ্রেণীর লোক তাদের সঙ্গে পুলিসের সংঘর্ষের প্রশ্নই ওঠে না (ঐ পৃঃ ১২৫৬)। —তাহলে রেলইয়ার্ডে পুলিসের গুলিতে যারা প্রায়ই মারা যায় তারা কি গুণ্ডা শ্রেণীর লোক নয়? তবে কারা?

শ্রীরুদ্রের তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল আজকের পশ্চিম বাংলার সামাজিক পটভূমিকায় নির্ভেজাল আদর্শ বিপ্লবী ও তাদের "পাশে-পাশে" অবস্থিত সমাজ বিরোধীদের কার্যকলাপকে আলাদা করে দেখা ও দেখানোর অবাস্তব শিশুসুলভ সারল্যপূর্ণ প্রয়াস। "যারা স্কুল কলেজ ছেড়ে বন্দুক হাতে গ্রামে চলে গেছে", "যারা বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে নিজের টাকা-পয়সা ছোঁয় না," তাদের সংখ্যা—শ্রীরুদ্র খোঁজ নিলে জানতে পারবেন—আজ পশ্চিম বাংলায় দু' দুই এর বেশী নয়। কিন্তু ঠিক "এদেরই পাশে পাশে (লক্ষণীয় যে শ্রীরুদ্র 'সাথে সাথে' কথাটির ব্যবহার সযত্নে এড়িয়ে গেছেন।—কতখানি "পাশে পাশে" চললে 'সাথে সাথে' চলা হয়?) যারা টাকার জন্যে খুন-খারাপি করছে" তাদের সংখ্যা এতই বিপুল যে এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন 'আদর্শবাদী' সেই ভীড়ের স্রোতে সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে গেছে।—তাদের পৃথগীকরণ আজ আর সম্ভব নয়। যে ছেলেটি নতুন-পাওয়া চাকরীর সুখবর দিদিকে দেওয়ার জন্যে বেপাড়ায় গিয়ে গুটি কয়েক যুবকের আক্রমণে প্রাণ হারালো, সে যে প্রকৃত বিপ্লবীদের হাতে নয়, তাদের 'আশে-পাশে-ঘুরে-বেড়ানো' গুণ্ডাদের হাতেই নিহত হয়েছে—শ্রীরুদ্রের এই ললিত আশ্বাস বাণী কাউকেই কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে বলে মনে হয় না।

অশোক মুখোপাধ্যায়
খড়াপুর

দেখা হয় নাই

আপনাদের পত্রিকায় ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১ সংখ্যায় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেখা হয় নাই" শীর্ষক রচনায় মনোজ্ঞ রচনাভঙ্গিতে ও আলোকচিত্রের গুণে বিশেষ ভাল লাগলেও দু' জায়গায় একটু বিসংগতিপূর্ণ মনে হল।

লেখকের মতে, 'তিস্তা ও ছোট রংগীত নদীর মিলনস্থলের কাছে সিংলাবাজার" (পৃঃ ৩৭৮)। বস্তুতঃ সিংলা বাজার বোধ হয় ছোট রংগীত ও বড় রংগীত নদীর সংগমস্থলে: ছোট রংগীতের সঙ্গে তিস্তার সংগম নেই।

৩৮০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন, প্রবন্ধের "দ্বিতীয় ছবিটিতে তিস্তার ওপারে যে খাড়া পাহাড় দেখা যায় তারই পিছনের গা বয়ে গ্যাংটকের রাস্তা এসেছে গিয়েলখোলা থেকে রংপো অবধি"—জলনা ডাকবাংলো থেকে ছবিটি তোলা হলে একথা ঠিক হয় কী করে? আমি যতদূর জানি ঐ ছবির এপারেই পাহাড়ের গায়ে গিয়েলখোলা-রংপো রাস্তা হবে।

দীপক ভট্টাচার্য
রাজপুর

গগনেন্দ্রনাথ

১১ অগ্রহায়ণের দেশ পত্রিকায় মোহনলালের 'গগনেন্দ্রনাথ'এ কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল। তিনি লিখেছেন যে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ছিলেন খুবই উঁচুদরের খাদ্য রসিক—ফরাসী ভাষায় যাকে বলে গুরমেঁ—কথাটি হবে গুরমে। তারপরে লিখেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়, এণ্ডরুজ সাহেব তাঁর সঙ্গে আসেন তাঁকে সেবা ও দেখাশোনা করবার জন্য এবং এণ্ডরুজের সেবায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সেরে উঠলেন। এণ্ডরুজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে এসে বসতেন, তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন ও খবরের কাগজ পড়ে শোনাতেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ পরিচর্যার ভার ছিল তাঁর পুত্রবধূদের, পরিজনবর্গের ও তাঁর প্রিয় পরিচারক মুনীশ্বরের উপরে। মোহনলাল লিখেছেন—দ্বিজেন্দ্রনাথের অসুখের সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিল তার খবর তাঁকে রোজ এণ্ডরুজ শোনাতেন এবং বোয়াররা জিতলে ও ইংরেজরা হারলে দ্বিজেন্দ্রনাথের আনন্দ প্রকাশ করা, তিনি সুস্থ হলে ডাক্তাররা তাঁকে পথ্য করতে বলায় এবং সেই সময়ে বোয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ও বোয়ারদের জেতা উপলক্ষে আপেলটার্ট খেয়ে তা সেলিব্রেট করা—এসব কথা একেবারেই অসম্ভব, কারণ এণ্ডরুজের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় শান্তিনিকেতনে ১৯১২ সালে আর বোয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৯৯ সালে ও তার শেষ হয় ১৯০২ সালে।

শ্রীঅজীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলকাতা-৪০

অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে

কার্ত্তিক সংখ্যায় শ্রীপার্থকুমার রায় মহাশয় আপনাদের পত্রিকায় "কবি অতুলপ্রসাদ সেন" শীর্ষক একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেছেন।

অন্য কোনও বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই, কিন্তু একটি ভুল তথ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সবিনয়ে আকর্ষণ করতে চাই। ১০৯৪ পৃষ্ঠার মাঝামাঝি তিনি লিখেছেন, "অসতর্ক শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'মন পথে এলো বনহরিণী' গানের 'বনস্থালিনী' শব্দটির উল্লেখ করা যায়।"

অতুলপ্রসাদের কাছে সাক্ষাৎ যাঁরা আমার মত এ গানখানি শিখেছেন—তাঁরা হলপ করে বলতে পারবেন যে ঐ অসতর্ক বনস্থালিনীর জন্য তিনি আদৌ দায়ী নন। আমরা শিখেছি—

কোথা যুথ তব কোথা সে বনস্থলী
আইলে হেথায় জেনে কি পথ ভুলি

এবং কবির কাছে এইটেই আশা করা যায়। শব্দকোষ বহির্ভূত 'বনস্থালিনী' শব্দটি কোন ক্ষতিকারী ওস্তাদ প্রক্ষিপ্ত করেছেন এবং এটাও আমরা জানি যে অতুলদার জীবিতকাল এ গানটি মুদ্রিত হয় নি।

দ্বিজেন্দ্র সান্যাল
—[illegible]

বিশ্ববিজ্ঞান

গত ২৩শে অক্টোবর, ১৯৭১ সংখ্যায় সমরজিৎ কর মহাশয় 'বিশ্ব-বিজ্ঞানে সংবাদ এবং মানুষের মন' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধটিতে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার এক বিরাট সাফল্যের পরিচয় বহন করে সংবাদপত্র, টেলিভিসন ও রেডিও। বস্তুত আধুনিক পৃথিবী অনেকাংশেই উপরোক্ত মাধ্যমগুলির ওপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবেই সমরজিৎবাবু সমাজ-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু মৌল প্রশ্ন তুলেছেন।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সংবাদের আদানপ্রদানও সে হেতু জনমানসের ওপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে নিস্পৃহ দর্শক নন। কেননা সমাজবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হলো ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের গূঢ় রহস্যের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিকে আবিষ্কার করা। কোঁত, দুর্খাইম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা মূলত ব্যক্তি ও সমষ্টির এই অন্তর্দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে আর কখনও মানুষ ঠিক আজকের মত নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। কেননা প্রযুক্তি বিদ্যার সাফল্য ও তার সামাজিক প্রভাব বিংশ শতাব্দীর আগে মৌল সমস্যা ছিল না। সমর-জিৎবাবু যে সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। আধুনিক সংবাদের মাধ্যম-গুলির চরিত্র মূলত এক বিশেষ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। যেগুলিকে আমরা সচরাচর mass media বলে থাকি সেগুলি বহু ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক অসম অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সৃষ্টি। রাষ্ট্র-নীতির অনেক ক্ষেত্রে এই সমস্ত মাধ্যমগুলির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। অসম সমাজব্যবস্থার ফলে অসম জন-মানসিকতার সৃষ্টি হয়। আর সেই কারণেই অবাঞ্ছিত উত্তেজনা ও অস্থিরতা। যে মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করলে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই মাধ্যমগুলি আজ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রচারমূলক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যার মৌল উদ্দেশ্য থেকে বিপথে চালিত করেছে। ফলে সত্য উদ্ঘাটনের চেয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধি এই সমস্ত মাধ্যমের মূল নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।

যে মানুষ শিল্পবিপ্লবের পরে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে পাথেয় করে নতুন জগত সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিল, সেই মানুষই আজ সেই স্ব-সৃষ্ট যন্ত্রদানবের কাছে অসহায়, অস্থির। কোয়েস্টলারের Robot আজ অনেক মানুষের মনেই এক ধরনের nostalgia জাগাচ্ছে। তার মূল কারণ হলো যাঁরা এই মাধ্যমগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা মনে করেন উত্তেজনা, প্রমোদ, লোমহর্ষক ঘটনা, স্টাণ্টজাতীয় ঘটনা প্রভৃতি আধুনিক মানুষের চিন্তাজগতের উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু জনমানসের মৌলিক চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি এই জাতীয় Communication-এ সম্ভবপর নয়। স্নায়ুগুলিও সর্বক্ষণ অসুস্থ উত্তেজনা গ্রহণ করতে অপারগ। এই ব্যাপক নৈরাজ্য সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এক অসম জনমানসিকতার আভাস। প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, man is the measure of all things। সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে, স্টাণ্টসর্বস্ব জীবনকে আদর্শ হিসাবে পরিত্যাগ করে যদি চিন্তাবিদেরা বা কর্ণধারেরা এই সমস্ত সংবাদের সরবরাহ-কারী মাধ্যমগুলিকে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করেন, তা হলে জনমানসেও অনুরূপভাবে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। নচেৎ সংবাদের এই আধুনিকতম মাধ্যমগুলি অদূর ভবিষ্যতে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। এর সমাধান প্রসঙ্গে বিস্তর বক্তব্য আছে, কিন্তু সে কথা এই স্বল্পায়তন লেখার মধ্যে সম্ভব-পর নয়। ইতি—

সূর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৩

চা-চরিত্র'

৩০শে অক্টোবর '৭১ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকুমার চক্রবর্তীর লেখা উপর্যুক্ত রচনাটি পাঠ করলাম। এ সম্পর্কে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত Tea Taster হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য আছে। শ্রীচক্রবর্তী সুলেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কতক-গুলি অসঙ্গতি দেখা গেছে। তাঁর সংগৃহীত Tasting termগুলিও সব জায়গায় সুপ্রযুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ 'Raw' শব্দ-termটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উনি infused leaf (ভেজা পাতা) ও infusion (বা liquor)-এর ক্ষেত্রে উভয় স্থানেই ঐ term ব্যবহার করেছেন। infused leaf-এর বিভাগে Glossary of Tea Tasting Terms-এ 'Raw'-এর উল্লেখ নেই কোনও চা-পুস্তকে। যদিও liquor-এর description-এর বেলায় 'Raw' প্রচলিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-জেলার নামোল্লেখের মধ্যে সিলেটের অনুপ্রবেশ বিসদৃশ। সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত। অথচ ত্রিপুরার কোনও উল্লেখ নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। Tea Tasting-এর বর্ণনাও তেমন হুবহু নয়। সশব্দে (Loud Sucking Tone-এ) প্রত্যেকটি নমুনা চাখতে হয়। খুব গরম 'লিকার' বা একেবারে ঠাণ্ডা (জুড়িয়ে যাওয়া) লিকারও 'টি-টেস্টিং' (Testing নয়—Tasting)-এর পক্ষে অনুপযুক্ত। গরম 'লিকার' একটু Cool down করালেই চাখা শুরু করতে হয়। 'চাখনদার' (Taster) কখনও 'লিকার' গিলে ফেলেন না। Spittoon (পিকদানি)-এ মুখনিঃসৃত 'লিকার' ফেলে দেন। বড় চামচের সাহায্যে 'লিকার' তুলে অথবা সরাসরি Tasting Cup-এ মুখ লাগিয়ে, সশব্দে liquor মুখাভ্যন্তরে টেনে নিয়ে, মুখের মধ্যে roll করে, নিশ্চিতভাবে স্বাদ গ্রহণের পর Spittoon-এ ফেলতে হয়। দীর্ঘজীবীদের মধ্যে অনেকেই "চা-চাখনদার" —লেখক বর্ণিত এই সমীক্ষাটিও বেশ তাৎপর্যহীন; তাই সমর্থনযোগ্যও নয়। আমার পরিচিত কয়েকজন অভিজ্ঞ Tea Taster অপরিণত বয়সেও নানা রোগভোগে মারা গেছেন। তাই আমার মনে হয় ওগুলি নিতান্তই যুক্তিহীন। "চচুপি", "সুইটি" কি Printers devil (মুদ্রণ-রাক্ষস)-এর কারসাজি? Choppy (চপি), Sweet বা Sweetish হল সঠিক টার্ম বা শব্দ। আমেরিকান 'টি-টেস্টার'রা যে পৃথকভাবে infused leaf বা liquor পরীক্ষা করেন না, একত্রে করেন, একথারও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। Blending সম্বন্ধেও প্রায় উল্লেখ নেই-ই বলা চলে। তা ছাড়া Broker firm কখনও Blending-এর নির্দেশ দেন না। প্রয়োজনানুযায়ী Buyerরা Blending করে থাকেন। অনেক "Taster" Infused leaf-এর জায়গায় Infusionও লেখেন। লেখক 'পিণ্ট' না লিখে 'পাইণ্ট' (Pint) লিখলে ভাল করতেন। যা হোক, লেখক আর একটু সতর্ক ও যত্নবান হলে তাঁর 'চা-চরিত্র' সর্বাঙ্গসুন্দর রচনা হত।

শ্রীমুকুল চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৬

বেদগান

গত ২২শে আশ্বিনের দেশে 'গানের আসর' পর্যায় শার্ঙ্গদেব লিখিত 'বেদগান' বিষয়ক প্রবন্ধটি ভালই লাগল।

এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্মের মাধ্যমেই প্রথমে বেদ ও উপনিষদগীতি, কিছু কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত সংস্কৃতে গাওয়া হত ব্রহ্মোপাসনার সময়। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ব্রাহ্মধর্ম পুস্তকে কয়েকটি বেদগান সংযোজিত করেন। সেই সব গান ও তার বাঙলা তর্জমা 'শতগান',

...মূলক স্বরলিপিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে—

১। "ওঁ পিতা নোহসি, পিতা নো বোধি।"

২। "য আত্মদা বলদা, যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ"

৩। "যর্নেম প্রস্ফুরন্তিব পর্ণিতং ধন্যাতো অদ্রিবঃ মৃড়া, সুক্ষত্র, মৃড়য়।"

৪। "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।"

৫। "শৃন্বন্তু বিশ্বেহমৃতস্য পুত্রা।"

ঋগ্বেদ।

৬। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি সংস্কৃত সংগীতও সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহর্ষির জীবিতকালে ও তাঁর মৃত্যুর পরে আচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময়ে অনেক প্রখ্যাত গীতিকারের ও সংগীতজ্ঞের রচিত বহু অপূর্ব সংগীত ব্রহ্মোপাসনায় পরিবেশিত হ'ত। এইসব সংগীতের ভিতরে অনেকগুলি বেদ ও উপনিষদের সংস্কৃত সংগীতের বাংলা ভাবগীতি। এই সব সংগীত শুধু সংগীত হিসাবে নয়, বাংলা সাহিত্যে ও কাব্যে অপূর্ব সম্পদ।

প্রখ্যাত গীতিকার ও সংগীতজ্ঞ হিসাবে যাঁরা তখন সারা বাংলা তথা ভারতে এক নব উদ্দীপনা ও নব জাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

১। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, ৫। চণ্ডীচরণ গুহ, ৬। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ৭। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, ৯। মনোমোহন চক্রবর্তী, ১০। কাশীচন্দ্র ঘোষাল, ১১। কালীনাথ ঘোষ, ১২। শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৩। বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, ১৪। কুঞ্জবিহারী দেব, ১৫। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ১৬। কালীনারায়ণ গুপ্ত, ১৭। স্বর্ণকুমারী দেবী, ১৮। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ১৯। রজনীকান্ত সেন, ২০। অতুলপ্রসাদ সেন, ২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি অনেকে। এঁদের রচিত বেশীর ভাগ সংগীতের স্বরলিপি না থাকায় এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। অবশ্য রাগ রাগিণীর ও তালের উল্লেখ প্রায় সব সংগীতের রয়েছে। চেষ্টা করলে সেগুলো পুনরায় উদ্ধার করা সম্ভব। এর মধ্যে যে সকল সংগীত বংশপরম্পরায় মুখে মুখে গীত হ'য়ে আসছে সেই সকল সংগীত ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠানে ও উৎসবে পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে এই সকল সংগীতের প্রচার অতিশয় নগণ্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই অপূর্ব সংগীত ধারা ও এদের কাব্যরস ও ভক্তিরস ও সর্বোপরি সংগীতরসের মধুর আস্বাদন থেকে বাংলার সুধীজন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছেন। এ বিষয় আমি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কৃতকার্য হই নি।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে রাজা রামমোহন রায়ের আগত দ্বিশত বার্ষিক অনুষ্ঠানে ওই সকল সংগীতজ্ঞের রচিত সংগীতের একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের কাজে হাত দেওয়া হ'য়েছে। আমি আশা করি সেইরূপ পরিবেশনের দ্বারা, যে সব সুধীজন উক্ত সংগীত বিষয়ে আগ্রহশীল তাঁদের কথঞ্চিত আনন্দ বিতরণ করা সম্ভব হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার আশা রইল।

সংগ্রাম সিংহ তালুকদার
(সম্পাদক নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কয়ার কমিটি।
কলিকাতা—২১

দরবার নটী কলাবন্ত

২৭ কার্তিক ১৩৭৮ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় দরবার নটী কলাবন্তের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে তিনটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করি।

প্রথম পত্রলেখক শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বসু আমার রাণা হাম্মির মুহম্মদ বিন্ তুঘলক প্রসংগটিকে বলেছেন যে, 'তা ইতিহাস মতে সম্পূর্ণ ভুল।' কিন্তু পত্রলেখকের প্রধান নির্ভর যে মেহদী হোসেন প্রভৃতির গবেষণা, তারাও বিপরীত মতকে সর্বস্বীকৃত ও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, বিষয়টি বিতর্কিত। আমার উক্তির ভিত্তি শুধু গৌরীশংকর ওঝার গ্রন্থ নয়। উদয়পুরের ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়মের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শোভনলাল শাস্ত্রী। ('Muhammad Tughluq, then Sultan of Delhi, hearing the news, marched against Mewar and met the army of Hemir Singh near Singoli. A fearful fight took place in which the Sultan was made prisoner, kept for three months at Chitor and was set free after he had paid a handsome ransom'—P. 16, Chittorgarh), রাজপুতানা গেজেটিয়ারের Erskine (....Hamir Singh brought down 'Mohammed Tughluq with a large army but he was defeated and taken prisoner at Songoli, close to the eastern border of Mewar and was not liberated till he had paid a large ransom. . . . . .'—Rajputana Gazeteer 11, A, p. 5) প্রমুখও উল্লেখনীয়। পত্রলেখক বিবেচনা করে দেখবেন— —The rise and fall of Muhammed Bin Tughluq— প্রণেতা আগা মেহদি হুসায়েন যে পণ্ডিত গৌরীশংকর ওঝার মতামত মানেননি তার অন্যতম কারণ

'Mr. G. S. Ojha's statement is not confirmed by Muslim sources' মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস চর্চায় সমসাময়িক Muslim sources যে সর্বদা সত্য নির্ধারক নয় তার বহু নিদর্শন আছে, একথাও প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা কর্তব্য। সে যুগের যুদ্ধবাজ বিজেতাদের ... উত্তরসাধক ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষীয় সরকারী ইতিবৃত্ত-লেখকদের বিবৃতিগুলি কি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা তুল্য নয়?

দ্বিতীয় পত্রলেখক শ্রীকালীপদ ... মতে 'দিলীপবাবু লিখিয়াছেন, 'মৌলবী ... মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর সংগীতসভার তবলাবাদক ছিলেন। ইহাও ঠিক নয়। তিনি ছিলেন রাজা জগৎকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ... জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর ... বাদক।' কিন্তু ঘটনা এই যে, মৌলবীরাম মিশ্র যখন মুক্তাগাছার দরবারে নিযুক্ত হন তখন রাজা জগৎকিশোর কর্তারূপে ... ছিলেন। কয়েক বছর পরে জগৎকিশোরের অবর্তমানেও মৌলবীরাম মুক্তাগাছায় নিযুক্ত থাকেন এবং তখন জিতেন্দ্রকিশোরের আমল। সুতরাং, মৌলবীরাম যে রাজা জগৎকিশোরের সংগীতসভায় ছিলেন, আমার এই বিবৃতি মিথ্যা হয়ে যায় না। এবং ... 'তথ্যগত কিছু ভুল'-ও নয়।

তৃতীয় পত্রলেখিকা শ্রীমতী ... সান্যাল হাম্বীর রাগের ধ্রুপদটির যে ... রূপ বাংলায় দিয়েছেন তা সঠিক ... পারে। তবে আমি গানের যে ভাষা দিয়েছি তা ধ্রুপদী-রবাবী মহম্মদ আলী খাঁর নিকট প্রাপ্ত তাঁর এক বিশিষ্ট শিষ্যের সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃত। গানের ভাষা অনেক সময় ...দের মুখে মুখে এবং উচ্চারণ ... কিছু পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া সম্ভব। ... এ ক্ষেত্রে ছাপার ভুলও কিছু থেকে ...

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২...

'মেয়েদের পত্রপত্রিকার জন্য লেখা'—সেমিনার

মেয়েদের জন্য লেখা

নভেম্বর মাসের ২৯, ৩০ আর ডিসেম্বর পয়লা এই তিনদিন ধরে প্রেস ইনস্টিটিউট অফ্ ইণ্ডিয়া একটি আলোচনা-বৈঠক বা সেমিনার করেছিলেন। এর ঠিক পরেই পাকিস্তানের হঠাৎ আক্রমণে আমাদের মনোযোগ বিষয়ান্তরে চলে যায়। বাংলাদেশের স্বীকৃতি সঙ্গে সঙ্গে এনে দিল আনন্দ উদ্‌যাপনের পালা। কিন্তু সেমিনারের বিষয়টি একেবারে বাদ দেবার মত নয় বলে দেরীতে হ'লেও সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা করতে চাই। Writing for women's journals ছিল বিষয় মেয়েদের জন্য লেখা অর্থাৎ মেয়েদের পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা নিয়ে কথা বললেন অনেকেই। তার মধ্যে উল্লেখ করছি দু'চারটি নাম। পুরুষ ছিলেন পাঁচ জন, বাকী সব মহিলা সাংবাদিক এবং বিষয়ে অংশ গ্রহণের যে দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছেন প্রেস ইনস্টিটিউট তাতে দেখা যায় অনেকেই রাজধানীবাসিনী এবং তাঁদের লেখার ভাষা ইংরাজী। আমেদাবাদ প্রভৃতি থেকে কেউ কেউ ছিলেন। ইনস্টিটিউটের কি অসুবিধা ছিল জানি না। তবে কিন্তু মনে করি দেশের দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার লেখনী-ধারিণীদের কিছু প্রতিনিধি আনতে পারলে ভালই হত। সেই গতানুগতিক রাজধানীর প্রাধান্য আর তথাকথিত উচ্চবর্গের জন্য পরিবেশন কিঞ্চিৎ হতাশাজনক। দর্শক হিসাবে উপস্থিত হ'য়ে প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রকাশ করছি না। এ আমাদের নিজস্ব এবং নিরপেক্ষ মত। এ মত বহুদিন থেকে পোষণ করে আসছি।

সভাপতির ভূমিকায় ছিলেন বোম্বাই-এর ইভস্ উইকলি সম্পাদিকা শ্রীমতী বিমলা এডুইং, ফেমিনার সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী বিমলা পাটিল ইত্যাদি। পুরুষদের মধ্যে ব্রিটেনের বিখ্যাত টমসন ফাউণ্ডেশনের ডোনাল্ড্ উইন্টারস্‌গিল, ভারত সরকারের ফিল্ড্ পাবলিসিটি বিভাগের শ্রীএকাম্বরম প্রমুখ দু'চারজন ছিলেন।

সবগুলি বৈঠকে যাবার সুযোগ হয়নি। ডাঃ বীণা রায়, তাঁর কথা একবার আমরা 'ঘরে বাইরে'-তে উল্লেখ করেছি, তিনি বললেন মেয়েদের রাজবিধিগত এবং আইনের আওতায় যে অধিকার আছে সে বিষয়ে তাদের নিজেদের সচেতনতার কথা। বীণা রায় তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে পেশ করলেন। তাঁর মতে মেয়েদের আপন অধিকারের দাবি অর্জন করা সবার আগে দরকার। দাবি আর দায়িত্ব একযোগে না হলে স্বত্ব বা অধিকার অর্থহীন হ'য়ে যায়। ন্যায্য প্রাপ্য লাভ করার প্রথম প্রয়াস হবে অধিকারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা নিজেকে। মহিলা পত্র-পত্রিকার জন্য যাঁরা লেখেন তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন।

গুলেসন এডুইং মহিলাদের সাংবাদিকতা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন। ভারতবর্ষে ৬৮টি মহিলা পত্র-পত্রিকা আছে। তার পাঠকসংখ্যার হিসাব দিয়েছেন ৩,৮৩,০০০। তার মধ্যে ২·১২ লাখ ইংরাজী ভাষার পাঠিকা। ১৯৬৮ সালে ২৫৬২ জন সাংবাদিক অর্থাৎ working journalist এর মধ্যে মাত্র ১৬টি মহিলা ছিলেন। পরের বছর ২৮০৯-এর মধ্যে হয়েছিলেন ২৯। ১৯৭০ সালের হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। আন্দাজ করা যায় ৪০-এর বেশী হবে না। সমগ্র দেশের পক্ষে এ সংখ্যা অতি সামান্য। তবে একথা সত্য যে বহু মহিলা মহিলা পত্রিকা বা ছোটদের কাগজের জন্য লেখেন যাঁদের নাম ঐ তালিকায় তোলা সম্ভব নয়।

মেয়েদের জন্য লেখার ধাঁচও প্রচুর বদলেছে। বহু দিনের পছন্দ রান্নাবান্না, ফ্যাশন, শিশুপালন ইত্যাদি রয়েছে বটে কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, নারী প্রগতির নূতন পদক্ষেপে মেয়েদের জন্য লেখার বিষয় আকাশের মতই অসীম।

শ্রীমতী এডুইং ২১ বছরের সাংবাদিক জীবনে ১১ বছর women's journalism করেছেন অর্থাৎ মেয়েদের জন্য লিখেছেন। তাঁর মতে মেয়েদের লেখার মানের এখন বিশেষ উন্নতি হয়েছে। quality বা সহজাত বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতায় তাঁদের লেখনী কারও চেয়ে কম নয়। ভাসা ভাসা এবং উপরিগত সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা নেই তা নয় তবে তথ্যপূর্ণ লেখার পরিমাণ বেড়েছে যথেষ্ট। বিদেশী পত্র-পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকে লেখা আজও মেলে কিন্তু কঠিন প্রতিযোগিতায় তা অনেক সময়ই বাতিল হয়ে যায়।

সাংবাদিকই হন আর সাহিত্যিক হ'ন সৎ প্রত্যয় ও প্রীতি বলে কিছু মানা কি মহিলা কি পুরুষ সকলের পক্ষেই সমান দরকার। কোন বিদেশী সাংবাদিক বলে-ছিলেন "I believe that no one should write as a journalist what he would not say as a gentleman." শিষ্টাচার, দায়িত্বজ্ঞান, আন্তরিকতা, সত্য-

নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা এবং যথাযথ বর্ণন লেখনীকে পরিচালনা করবে, তবেই লেখনী সার্থক।

মহিলাসমাজে প্রয়োজন উন্নততর জীবন যাত্রার ব্যাকুল বাসনা, এক কথায় ambition বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ভোটাধিকারের তুমুল হৈ চৈ আর আন্দোলনের পরই পশ্চাত্ত্যে মহিলা সমাজ কেমন যেন ঝিমিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁদের 'Lib' নিয়ে এত মাতামাতি। কুমারী কেট মিলেট তাঁর বই "Sexual Politics"এ বলবার চেষ্টা করেছেন ভোট অধিকার দেবার পরই পুরুষ শাসিত সমাজ যেন চমকে গেল। বললাম কি? এবার স্বখাত সলিলে ডুবতে হবে। তাই নানা বাহানা দিয়ে নারীকে তারা ঠেলে দিল সেই পুরোনো ভূমিকায়। শ্রীমতী মিলেটের বইখানা একটু তালগোল পাকানো বটে কিন্তু এ অভিযোগ সত্য।

আমাদের দেশে মেয়েদের সমস্যা ভিন্ন। দরিদ্র বা অজ্ঞ পল্লীসমাজে পুরোনো নিয়মের জের টানা বন্ধ হয়নি কিন্তু শহরে শিক্ষিত সমাজে নারীর মর্যাদা আর মাথা ঘামাবার বিষয় নয়। নিক্সন মন্ত্রিমণ্ডলে একটি মহিলাও নেই। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র সেজন্যই সম্ভবত কোন পরিস্থিতির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেনেটে প্রতি ১০০ মেম্বরে একটি মাত্র মহিলা। অথচ পথে ঘাটে তারা মারমুখো Lib আন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে হৈ চৈ করছেন। ভারতবর্ষ আজ আলোকের ঝরনাধারায় ডুব দিয়ে উঠে নূতন সাধনার পথে। নারী পুরুষের মিলিত শক্তিতে দেশের অগ্রগতি সম্পূর্ণ হবে। সাংবাদিকতায় যদি সাধারণের উপর কোনও প্রভাব হয়, তবে মহিলার যা দায়িত্ব, পুরুষেরও তাই। অভিযোগ অনেক আছে। লেখা যাঁদের পেশা, ভারতবর্ষে আজও তাঁদের আর্থিক দিকটা বড় দুর্বল। মেয়েরা সে সমস্যার বাইরে নন। কোন সংবাদপত্রে যাঁরা দপ্তরের অংশ বা কর্মচারী তাঁদের জন্য আইন কানুন অল্পবিস্তর আছে। কিন্তু যাঁরা বাইরে থেকে লেখা দেন অর্থাৎ Free Lance তাঁদের বেলায় পারিশ্রমিক সামান্য। কোনো রীতি বা ধারা নেই। রবিবারের ম্যাগাজিনে যাঁরা লেখেন তাঁরা জানেন একই ধরনের ও একই কাগজে লেখার পারিশ্রমিক ভিন্ন ভিন্ন দিনে কত ভিন্ন হয়! অন্যান্য সকল সমস্যার সঙ্গে এটিও বড় সমস্যা। quality বা মান তখনই আশা করা যায় যখন পারিশ্রমিক নিরাশ করে না দেয়। অভিজাত ধনী ঘরের বিলাসিতা হিসাবে কলমের আঁচড় বা তুলির প্রলেপ দেবার সময় বা সুযোগ আর কোন্ মেয়ের আছে?

শ্রীমতী

বাঙালীর ইতিহাস

এক নিঃশ্বাসে [illegible] বইখানা শেষ করে উঠলাম। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস। [illegible] আজ বিস্মৃত [illegible] মনে হলো আমাদের প্রথম ছাত্র বয়সে বইখানি যখন নতুন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন মন দিয়ে পড়িনি। পঁচিশ টাকা দাম, সে সময়ে কেনার প্রশ্নই উঠতো না, লাইব্রেরী থেকে দু' তিনবার এনেও চাঞ্চল্যবশতঃ সম্পূর্ণ পড়া হয়ে ওঠেনি একবারও। এখন বইখানি দেখে মনে পড়লো, জীবনে বড় কাজ বাকি থেকে গেছে। বন্ধুপত্নীর সামান্য আপত্তি সত্ত্বেও বইখানা ধার নিয়ে চলে এলাম।

বাঙালী জাতির এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বাঙালীর সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করার চেয়ে বড় কাজ আর কি থাকতে পারে! নীহাররঞ্জনের রচনা যদিও বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্ব মাত্র, তবু এই বৃহদায়তন গ্রন্থটিতে এমন সামগ্রিক ভাবে আমাদের জাতি ও সংস্কৃতির মিশ্র রূপটির কথা বলা হয়েছে যাতে নিজেদের চিনতে আর অসুবিধা হবার কথা নয়। পৃথিবীর যে-কোনো দেশে, যে-কোনো ভাষায় এ রকম একটি ইতিহাস [illegible] গর্ব করার মতো।

নীহাররঞ্জন 'বাংলার ইতিহাস' লেখেননি, লিখেছেন 'বাঙালীর ইতিহাস'। এই প্রভেদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাস বলতে [illegible] রাজা-রাজড়ার [illegible] কাহিনীটিই আমরা বুঝতাম। এ যাবৎ অন্যান্য যে সমস্ত [illegible] ইতিহাস বেরিয়েছে, তাতে ঐ অংশ [illegible] প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ রাজা বা রাষ্ট্র ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কখনো একান্ত হয়ে ওঠেনি। দু'শো বছর আগে পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন ছিল একান্ত ভাবেই সমাজ-কেন্দ্রিক। রাজবংশের উত্থান পতনে কিছু কিছু বিপর্যয় এসেছে মাত্র, আমাদের জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়নি। ভৌগোলিক ভাবেও বাংলাদেশ বা বঙ্গভূমি বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংকুচিত হয়েছে বা প্রসারিত হয়েছে— কিন্তু সে ইতিহাসকে বাঙালী জাতির রূপ বলা যায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও রীতির মেল-মেশার কালে এই ভূমির সর্বসাধারণ মানুষের যে ইতিহাস, সেটাই প্রকৃত ইতিহাস। [illegible] অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে কিছু কিছু সামাজিক অবস্থার কথাও যখন বলা হয়েছে, তখন সে শুধু বর্ণাশ্রমবদ্ধ সমাজ। অথচ ব্রাহ্মণ বা উচ্চতর বর্ণের সামাজিক রীতিনীতি—সমগ্র ভাবে বাঙালীর জীবনে যার স্থান অত্যন্ত সীমিত। ধর্ম বা শিল্প সাহিত্যের যে পরিচয় আমরা এতকাল পেয়েছি তাও রাজসভা আশ্রিত [illegible] বণিকের তৈরী—বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে যার সম্পর্ক খুব কম। লোকধর্ম, লোকশিল্প, লোক-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের সম্পর্ক যাচাই করে নীহাররঞ্জন লিখেছেন বাঙালী জাতির সেই ব্যাপক সামাজিক ইতিহাস। তাই এই বইয়ের এক অধ্যায়ে রাজবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাকি [illegible] স্থান পেয়েছে বর্ণবিন্যাস, শ্রেণী বিন্যাস, গ্রাম ও নগর বিন্যাস, দৈনন্দিন জীবন, ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলা প্রভৃতি। এ এক নতুন ধরনের ইতিহাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক কাল আগে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসও একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তারও আগে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন বাংলার ইতিহাস। পরবর্তী কালে বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বই। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের বইটির তথ্যসম্ভার যেমন বিপুল ও বিস্ময়কর, তেমনই এর প্রসাদ গুণ। বইখানি সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য রসাশ্রিত। এত সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি তথ্য ও তার বিচার বিশ্লেষণ যে এমন সাহিত্যগুণ ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তা না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না। ভূমিকায় যদুনাথ সরকার সেই কথাই বলেছেন, "ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া, ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতেও সমগ্র

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে ইহা একটি অনন্যপূর্ব গ্রন্থ। ইতিহাস-বিষয়েই শুধু নয়, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইহার পূর্বে কেহই লেখেন নাই।" এই বিশাল গ্রন্থটি রচনার কারণ হিসেবে লেখক বলেছেন : "জ্ঞানস্পৃহা আমাকে এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত করে নাই। প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে এবং স্বদেশপ্রেমের দুর্দম নেশায় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায় এই দেশের এবং এই দেশের মানুষের একটি রূপ আমি দেখিয়াছিলাম এবং তাহাকে ভালোবাসিয়াছিলাম।...এই ভালোবাসার প্রেরণাতেই আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—ভালোবাসাকে জ্ঞানের বস্তুভিত্তিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে...।" এবং এই বইয়ের রচনা শুরু হয়েছিল দেশ বিভাগের আগে, এখন আমাদের ও বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে সমান ভাবে আকর্ষণীয়।

লোকমুখে শুনতে পেলাম, এই বই এখন ছাপা নেই, পাওয়া যায় না। এটা একটা অবিশ্বাস্য অন্যায় ঘটনা। এই দায় কার, লেখক না প্রকাশক বা সরকারের তা জানি না। এক সময় এই বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরী করেছিলেন জ্যোৎস্না সিংহ রায় এবং ছোটদের জন্য একটি সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেগুলোও পাওয়া যায় কিনা বলতে পারছি না।

নয় শত পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থে বাঙালীর শুধু আদি পর্বের কথা আছে। ভূমিকায় যদুনাথ সরকার "নীহাররঞ্জন অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আশীর্বাদ করি, ভগবান তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দান করুন, যাহার বলে তিনি বাকি দুই যুগের (মুসলিম ও ইংরাজ যুগ) ইতিহাসও এমনই সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধরূপে রচনা করিতে পারেন।" নীহাররঞ্জন কিন্তু গুরুর এই আশা রক্ষা করেন নি। বাকি দুটি পর্ব তিনি রচনা করেন নি। তিনি এখন কি করেন আমি জানি না, শুনেছি দিল্লি প্রবাসী হয়ে ভারত সরকারের কি সব বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। আমাদের অনুরোধ, সে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তিনি বাংলা ভাষায় বাঙালী জাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ করুন। নীহাররঞ্জন যদি স্বেচ্ছায় লিখতে না চান, তবুও তাঁকে দিয়ে জোর করে লেখাবার একটি উপায় আছে। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : একবার তিনি রাজরোষে কারারুদ্ধ হন। জেলখানার সেই নির্বাধ অবসরে তিনি এই বইয়ের মূল কাঠামোর দশটি অধ্যায় লিখেছিলেন। তাহলে, এখন, যে কোনো ছল ছুতোয় নীহাররঞ্জন রায়কে আবার কারারুদ্ধ করা উচিত।

সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

আপনার 'কবিতা ও ছন্দ' শীর্ষক আলোচনা পড়লাম। বড় ভালো লাগলো। এধেনে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি যে-চিন্তায় আলোড়িত হচ্ছিলাম সেটা হলো—"আধুনিক কবিতা মিল বর্জিত হবে এটা এক ধরনের গোঁড়ামি" (আপনারও সেই মত)। আগেকার কালে বাঙলা-কবিতায় সেকেলে বনেদী-চীনা-পরিবারের মেয়েদের কচি পায়ে লোহার জুতো পরানোর মত ছন্দবন্ধতার গোঁড়ামি ছিল। আর ইদানীংকালে এসেছে ছন্দ-বর্জনের গোঁড়ামি। বিগত যুগের কথা থাক। একালের বহু পাঠকের আক্ষেপ, যে-ফসল ফলতে পারতো আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়তায় ও স্ব-ভাবে—তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বৈজ্ঞানিকতার গোঁড়ামিতে। ফর্ম সম্পর্কে একটা আরোপিত বিশ্বাস বা গোষ্ঠীগত গোঁড়ামি প্রকাশরীতির মধ্যে আনছে আড়ষ্টতা। ফলে অনেক কবি-প্রতিভার ঘটছে অপমৃত্যু।

অনেক আধুনিক-কবি এই ধরনের আক্ষেপকে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রবীণ-পাঠকের রক্ষণ-শীলতা বলে উড়িয়ে দিতে চান। এটা ঠিক নয়। সত্যি কথা সে-যুগে ছিল মিল, শুধু মিল; এমনকি গোনা-অক্ষরের ছাঁচে-ফেলা ছন্দ।' দুলে দুলে সুর করে পড়া। আপনা-থেকেই পদ্য মুখস্থ হয়ে যেতো। কাব্য হিসাবে কতখানি রসোত্তীর্ণ তা বিচার করার অপেক্ষা না রেখেই অভ্যাসবশে আবৃত্তি করে আনন্দ পাওয়া ছিল সে-যুগের রেওয়াজ। কানটা আর প্রাণটা ঐ রকমই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এর জন্য যাঁরা দায়ী তার মধ্যে শেষ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের নামও পড়ে।

কিন্তু তিনিই দেখিয়েছেন গদ্যকবিতার পথ। যুগ-যুগান্তের বন্দিত্ব থেকে দিয়েছেন কবিতাকে মুক্তি। মুক্তিটা কিন্তু ছন্দ থেকে নয়। 'তরু'র সঙ্গে 'মেরু' মেলা-বার রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তি। গদ্য শব্দটার ব্যবহারিক অর্থটা অন্যায়ভাবে ছন্দহীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে গদ্য যে তা নয় রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরেও অনেকে সার্থকভাবে তা দেখিয়েছেন। সুতরাং সমৃদ্ধ হয়েছে। গদ্য কবিতার আবির্ভাব সেদিক দিয়ে মঙ্গলময়। কিন্তু গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতায় মত্ত একদল কবি-সম্প্রদায়ের গদ্য-কবিতা সম্পর্কে গোঁড়ামি অনেক কবির স্ব-ভাবকে বিনষ্ট করছে। অনেক কবিতার অপমৃত্যু ঘটছে বলে আমাদের ধারণা।

সরিৎশেখর মজুমদার
কলিকাতা

॥ ২ ॥

একটা কথা মনে পড়ছে। মোহিতলাল বলেছিলেন, "এই অতি আধুনিক কবিতা নব-নবীনের সম্পত্তি, তাহারাই উহা উপভোগ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই একাধারে লেখক ও পাঠক; এ কবিতা প্রকৃত কাব্যরসিক বাঙালী সমাজের কবিতা নহে।"

অপরপক্ষে, এই সংখ্যাতেই আলোচনা কলমে সলিল ঘোষের চিঠিটিও লক্ষণীয়।

ব্যাপারটা নিয়ে একটা বিস্তৃত দীর্ঘ গভীর আলোচনা করা সম্ভব। ধরা যাক পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক কবিতার কথা—প্রাণ থেকে জাত কবিতা প্রাণেই গিয়ে পৌঁছয়। আর শুধু বুদ্ধির কথা? কিন্তু হৃদয় ও বুদ্ধির যোগেই তো আসল সৃষ্টি। যেমন রবীন্দ্রনাথ। অকবির পক্ষে কবিতা ব্যাপারটা কি? কেউ কেউ কবি, সবাই কবি নয়। অথচ 'মাস কালচারে' কবিতার স্বরূপটা কি? যুগের পরিবর্তনে কবিতার নতুন মানদণ্ড তৈরী হবে? কিন্তু সেটা তো বিষয়বস্তুতে; আঙ্গিকে কতখানি? আবার ছন্দ মিল বাদ দিয়ে, না তাকে নিয়ে মিলিয়ে দিয়ে? এ সব প্রশ্ন ওঠেই, কম বা বেশী।

অবশ্য শেষ সিদ্ধান্তে আসার কথা নয়। কেননা পৃথিবীটা আজও চলছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ছন্দ ও মিলকে রাতারাতি বিদেয় করে দেওয়ার মধ্যে কি যুক্তি থাকতে পারে?

দেবপ্রসাদ সিংহ
কলিকাতা

॥ ৩ ॥

'সংখ্যা ৫'-এ আপনার লেখা 'দেশ' পত্রিকার সমালোচনাটি... পড়লাম। 'দেশে'র একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমি আপনার বক্তব্যের সঙ্গে একমত। তবে, আপনি কিন্তু পত্রিকাটির একটি বড়ো অংশের কথা বাদ রেখেছেন। সেটা এই পত্রিকার প্রচ্ছদপট। সত্যিই, পত্রিকাটি হাতে নিলে খানিক সময় প্রথমেই ঐ 'প্রচ্ছদ' দেখতেই চলে যায়।

চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]

অরণ্যদেব ★ লী ফক

'মুহুর্মুহু নিজের চেহারা পাল্টাতে লাগল পাহাড়ী ডাইনী। অরণ্যদেবকে সে আর ফিরতে দিতে চায় না।'

'পাহাড়ী ডাইনী তো টুয়ের ছেলেদের চেহারায় অরণ্যদেবের সামনে দেখা দিয়েছে .....'
কী, তাহলে এখানে থাকতে তুমি রাজী তো?

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অরণ্যদেব, কিন্তু তারই মধ্যে একটা চিন্তা হঠাৎ তাঁর মাথায় খেলে গেল .... '
?!

আমি তোমার আসল রূপ দেখতে চাই। তোমার এই মায়া-আয়নার সামনে একবার এসো।
না!
5/2

এসো। তোমার আয়না কখনো মিথ্যে বলে না!

না!
না!

[illegible] লেখক, সমালোচক ও সাংবাদিক জর্জ অরওয়েল ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যে-সব ছোট প্রবন্ধ, চিঠি, পুস্তক-সমালোচনা লিখেছিলেন ও সাংবাদিক মতামত প্রকাশ করেছিলেন, তা সংকলনের এই শেষ দুই খণ্ডে ছাপা হয়েছে। অরওয়েল "অ্যানিম্যাল ফার্ম" বইটি লেখার জন্য ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে বি-বি-সির চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাংবাদিক হন। বামপন্থী সাপ্তাহিক 'ট্রিবিউন'-এর সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সময়ে তিনি ঐ পত্রিকায় "অ্যাজ আই প্লিজ" শিরোনামায় নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতেন। তাঁর মতামত প্রায়ই পত্রিকার রাজনৈতিক মতামতের বিরোধী ছিল। তাঁর রচনার জন্যই একমাত্র ট্রিবিউন পত্রিকাতেই সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সব ধরনের এক-নায়কত্ব-বিরোধী রচনা ছাপা হত। অরওয়েল একই সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনা ও আমেরিকার 'পার্টিজান রিভিউ' পত্রিকাতে নিয়মিত লিখতেন। ১৯৪৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' বইটি লেখা শেষ হয়। ঐ বছরের জুন মাসে অরওয়েল ও তাঁর স্ত্রী একটি পালিত পুত্র গ্রহণ করেন এবং তার কয়েক-দিন পরে তাঁদের লণ্ডন ফ্ল্যাটের উপর বোমা পড়লে তাঁরা অল্পের জন্য বেঁচে যান। রাজনৈতিক কারণে ইংলণ্ডের তিনটি প্রকাশক অ্যানিম্যাল ফার্ম ছাপাতে অস্বীকার করে। আঠারো মাস চেষ্টার পরে বইটি ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রকাশক পাওয়ার পরেই অরওয়েল ট্রিবিউন ছেড়ে 'অবজারভার'-এর সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে ইউরোপে যান। ১৯৪৫ সালে মার্চ মাসে স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এসে কিছুদিন অবজারভারের রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে ফ্রিডম ডিফেন্স কমিটির সহ-সভাপতি হিসাবে অরওয়েলকে দেখা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্ত-ক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যই এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পালিত শিশুপুত্রকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেও তিনি এই ছেলেকে ত্যাগ করতে রাজী হন না। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে সাংবাদিকতা থেকে ছয় মাস ছুটি নিয়ে তিনি লেখক হিসাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। আগস্ট মাসে নিউইয়র্কে 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' প্রকাশিত হলে অতি অল্পদিনের মধ্যে ৫ লক্ষ কপি বিক্রি হয় এবং সেই থেকে অরওয়েলের আর্থিক দৈন্য ঘুচে যায়। এই সময়েই তিনি '১৯৮৪' লিখতে আরম্ভ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে লেখা]

শেষ হয়। পরের বছর জুন মাসে বইটি একই সঙ্গে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গুরুতর

The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell. Volume 3, As I Please—1943-1945. Volume 4, In Front of your Nose, 1945-1950. Penguine Books. 10, Shillings each.

অসুস্থ হয়ে অরওয়েল হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ৪৬ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মারা যান।

এই ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যেই অরওয়েল উপন্যাস, সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে সমালোচনা, পুস্তক-সমালোচনা ও অজস্র চিঠি লিখেছেন। বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লিখিত ৫৬টি 'অ্যাজ আই প্লিজ', ২০টি চিঠি, ৯ পুস্তক-সমালোচনা, পার্টিজান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত ৬টি রচনা এবং অ্যানিম্যাল ফার্মের ইউক্রেনীয় সংস্করণের ভূমিকা সমেত ১৬টি প্রবন্ধ আছে। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত লিখিত ৯৭টি চিঠি, ১৭টি অ্যাজ আই প্লিজ, ১৫টি পুস্তক-সমালোচনা, দুটি বইয়ের জন্য লিখিত ভূমিকা এবং ৩২টি প্রবন্ধ চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। দুই খণ্ডের ১০৪১ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক আমাদের পরিচিত প্রায় প্রতিটি সমস্যা ও ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইংরেজের জাতীয় চরিত্রে স্ব-বিরোধিতা, বর্ণ-বিদ্বেষ ও বর্ণ-বৈষম্য, ভারতের স্বাধীনতা, ব্রহ্ম-দেশের সমস্যা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রকৃত তথ্য চেপে যাওয়া, বিকৃত সংবাদ পরিবেশন, সত্য প্রকাশের ব্যাপারে অসুবিধা, ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার গোঁড়ামি, ইংরেজী সাহিত্যকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার ব্যাপারে বিদেশীদের অবদান প্রভৃতি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শিল্পোন্নত দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের বদলে একটি সামগ্রিক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অরওয়েল দেখতে পেয়েছেন যে, বর্তমান পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার রাজনীতি উদ্ভব

হওয়ায় জাতি হিসাবে টিকে থাকাই সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। সে জন্য ধনতান্ত্রিক শ্রেণীও পরিকল্পিত অর্থনীতি মেনে নিয়েছে। অরওয়েলের মতে, ইংরেজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে 'নন-কনফরমিস্ট' চিন্তাধারা কার্যত বিদায় নিয়েছে। তাই কনার্ড, হেনরি জেমস, বার্নার্ড শ, জয়েস, ইয়েটস, পাউন্ড, এলিয়ট, আর্থার কোসলারের মতো বিদেশীদের সাহায্যে ইংরেজ সাহিত্যের গতিশীলতা বজায় রাখতে হয়েছে। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঝুঁকি নেওয়ার মনোভাব একেবারেই অনুপস্থিত। তাই ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের একনায়কত্ব শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারীরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের কোন ভূমিকা নেই। সিলোন, মালরো, সালভেমিনি, বোরকেনাউ, ভিক্টর সার্জ, কোসলার উপন্যাস, আত্মজীবনী ও রিপোর্টাজ-জাতীয় বই লিখে সমসাময়িক ঘটনাকে বইয়ের মধ্যে ধরে রেখেছেন, এগুলি এক দিক থেকে বেসরকারী ইতিহাস। এক অরওয়েল ছাড়া আর কোন ইংরেজ বুদ্ধিজীবী একনায়কত্ব শাসন ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে দেখার চেষ্টা করেনি (আর্থার কোসলার তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭০—২৮২)। লেফট বুক ক্লাবও এই জাতীয় বই বের করেনি। কোসলার নিজের মাতৃভাষা হাঙ্গেরিয়ানে না লিখে ইংরেজীকে সাহিত্য-রচনার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়ায়, ইংরেজী সাহিত্যে সমসাময়িক ঘটনা কিছুটা স্থান পেয়েছে। অরওয়েলের মতে, ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা ১৯৩৩ সাল থেকে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী হলে একনায়কত্ব বিরোধী হননি। তাই স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় কম্যুনিস্টরা প্রথমে ফ্রাঙ্কোকে আসল শত্রু মনে না করে অ্যানার্কিস্ট, সোশালিস্ট ও ট্রটস্কি-পন্থীদের হত্যা ও বন্দী করলে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীরা তার কোন প্রতিবাদ করেনি, ইংলণ্ডের কাগজে ঐ সব সংবাদ ছাপতেও দেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একই ব্যাপার ঘটে। এক ট্রিবিউন ছাড়া ইংলণ্ডের কোন পত্র-পত্রিকায় রাশিয়া বা কম্যুনিস্টদের সমালোচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যুগোশ্লাভ কম্যুনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দখলের জন্য অ-কম্যুনিস্ট নেতা মিহাইলোভিচকে হত্যা করলে ইংলণ্ডের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা চোখ বুজে থাকে। রাশিয়াকে খুশি করার জন্য মার্কিন সরকার যুদ্ধের সময়ে ট্রটস্কি-লিখিত স্ট্যালিনের জীবনীর প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং ঐ ঘটনা মার্কিন ও ইংরেজ মন্ত্রককে প্রকাশও করা হয় না। মার্কিন সরকার অ্যানিম্যাল ফার্মের ইউক্রেনীয় সংস্করণও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের নাম করে একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করলে সমাজের কতটা ক্ষতি হবে, অরওয়েল তা আশঙ্কা করেই "অ্যানিম্যাল ফার্ম" ও "১৯৮৪" লিখেছিলেন। তাঁর এই বই দুটি ধনতান্ত্রিকেরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সমাজতন্ত্রকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন বলেই সমাজতন্ত্রের নামে ইতিহাসের বিকৃতি সহ্য করতে পারেন নি।

অরওয়েল সর্বদাই রাজনৈতিক-লেখক ও প্রচার-পুস্তিকাকে করুণার চোখে দেখতেন। তিনি বিভিন্ন দলের বই, এমন কি অধ্যাপক লাস্কির রচনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ওগুলি নিকৃষ্ট ভাষায় রচিত এবং ব্যাকরণ-সম্মতও নয়। এ ব্যাপারে শান্তিবাদী, কম্যুনিস্ট, ক্যাথলিক, অ্যানার্কিস্ট, সোশালিস্ট, ট্রটস্কিপন্থী—কেউই বাদ যান না। রাজনৈতিক মতবাদ কীভাবে প্রভাব বিস্তারের কাজে লাগানো যায় অরওয়েল সুইফটের গ্যালিভারস ট্রাভেলস বিশ্লেষণ করে তা দেখিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ঐ বইটিই তাঁকে অ্যানিম্যাল ফার্ম লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বই দুটির বিভিন্ন স্থানে ভারতের কথা ছড়িয়ে আছে। যুদ্ধের মধ্যেও সুভাষচন্দ্র বসু যে একদল ইংরেজের নিকট দেশের মুক্তি-দাতা হিসাবে গণ্য হতেন, তা আমাদের জানা ছিল না। যুদ্ধের পরে আট্‌লি-মরিসন যে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হবে, তা তিনিও ভাবতে পারেন নি। যুদ্ধের সময়ে নাৎসী-রেডিয়োতে প্রচারকার্যে নিযুক্ত ভারতীয়দের কুইসলিং হিসাবে এক ইংরেজ দৈনিক অভিহিত করলে অরওয়েল ট্রিবিউনেই তার প্রতিবাদ করেছিলেন। কারণ ভারতীয়েরা এক দখলদারির বিরুদ্ধে আর এক শক্তিকে সাহায্য করছে—দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কাজেই ভারতীয়-দের জার্মান-সহযোগিতাকে কখনও দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া যায় না, তারা পৃথক রেডিয়োতে নিজেদের কথাই বলেছে, জার্মানদের হয়ে কোন দালালি করেনি (চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ৩১১)। গান্ধীজী সম্পর্কিত রচনায় (পৃঃ ৫২৩-৫৩১) তাঁর একই সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন কংগ্রেস নেতার ইউরোপীয়-বিরোধী মন্তব্য কীভাবে বিদেশী সাংবাদিক-দের ইংরেজ-সমর্থকে পরিণত করেছে, অরওয়েল তারও উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৩ সালে লিখিত ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ১১ পৃষ্ঠার রচনার বেশীর ভাগ ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং সেজন্য খুশিই হয়েছিলেন। ব্রহ্মদেশের রাজনীতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আজও যথার্থ মনে হয়। অরওয়েল ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যে মতের কথাটি বলেছেন, এদেশের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। যেমন "বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক-কৃষককে যতই আপনজন ভাবে ততই তাদের ভাষাকে নিন্দা করবে।" এদেশেও শ্রমিক-কৃষকের ভাষা কোন বইয়ে স্থান পেলে বইটি নিশ্চিতভাবে অশ্লীল আখ্যা পাবে। অরওয়েল দেখিয়েছেন ইংলণ্ডের অধিবাসীদের বিদেশী-বিদ্বেষ কেমন করে বর্ণ-বিদ্বেষে পরিণত হল। মার্কিন সৈন্য ও পর্যটকেরা ইংলণ্ডের ও প্যারিসের হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও নাইট ক্লাবেও বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী-বিদ্বেষের জন্যই স্পেনের শরণার্থীরা ইংলণ্ডে আশ্রয় পায়নি, অন্য শরণার্থীদেরও ওদেশে স্থান হয়নি। টলস্টয় কর্তৃক সেকসপীয়রের সমালোচনা, পলিটিক্স অ্যান্ড দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ, প্রিভেনশান অব স্টারভেশান, দি প্রিভেনশান অব লিটারেচার, পলিটিকস ভারসাস লিটারেচার, দি ইংলিশ পিপল প্রভৃতি প্রবন্ধে অরওয়েলের নিজস্ব চিন্তাধারার সাক্ষর মেলে।

অরওয়েল ইংরেজী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কারণ অন্য কোন লেখক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাহিত্যকে এত বেশী যুক্ত করেন নি। এই লেখক সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আস্থাবান এবং একনায়ক শাসন ব্যবস্থা ও সব ধরনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক বিরামহীন সৈনিক। এদেশেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অরওয়েলের গোঁড়ামি-মুক্ত সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সহায়ক হতে পারে।

—নিরঞ্জন হালদার

উপন্যাস

ভেলা। মানসী দাশগুপ্ত।। পথিকৃৎ, ২৪ পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা—২৯। মূল্য : ছ' টাকা।

অনুচ্চারিত। ডাঃ নবগোপাল দাস। শ্রীমতী উমা দাস, ৪ জুবিলী পার্ক, কলকাতা-৩৩। মূল্য : ছ' টাকা।

ভিন্ন হলেও দুটি উপন্যাসে চরিত্রগত মিল রয়েছে। যদিও 'ভেলা' সময়ের দিক থেকে অনেক সাম্প্রতিক। ভাষা, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, চরিত্রদের মানসিকতা—সবই ভীষণভাবে [illegible]। অথচ 'অনুচ্চারিত' [illegible] উপন্যাস হলেও, তাতে [illegible] লক্ষণ ধরা পড়ে না। প্রথমত, [illegible] পরিবেশিত, দ্বিতীয়ত, [illegible] মানসিক গড়নের সঙ্গে, তাদের [illegible] সঙ্গে একটা যোগাযোগ [illegible]। সেই মূল কাহিনীর দোষ [illegible] এখনো ঘটে, যথা সম্ভব। কিন্তু এর প্রকাশপদ্ধতি, বিন্যাস বিশ্লেষণ [illegible] হবে না। এই উপন্যাস [illegible] আধুনিক উপন্যাস বলে গণ্য হতে পারত। কিন্তু প্রত্যেক কালের নিজস্ব একটি প্রকৃতি থাকে, [illegible] প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে [illegible]। সেদিক থেকে উপন্যাসটি [illegible] পুরনো ধাঁচের। ডাঃ নবগোপাল দাস, [illegible] বিদগ্ধ লোক। কিন্তু ইংরেজী [illegible] তিনি যত সহজে ও সফলভাবে [illegible] করতে পারেন, বাংলায় ঠিক [illegible]।

দুটি উপন্যাসের মধ্যে মিল এই যে, 'ভেলা'য় একটি নারীকে ঘিরে একাধিক পুরুষের আবর্ত তৈরী হয়েছে; অন্য দিকে 'অনুচ্চারিত'য় কেন্দ্রবিন্দু পুরুষ এবং তাকে ঘিরে একাধিক নারী। দুটি উপন্যাসেই প্রচলিত অর্থে ভালোবাসাবাসি নেই, কিন্তু নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, দ্বন্দ্ব, [illegible], যন্ত্রণা এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো [illegible] ভেসে যাওয়া ইত্যাদি [illegible] যৌন বিষয় এবং বস্তু [illegible] আচ্ছন্ন করে থাকে এবং হয়তো [illegible] সত্য পৌঁছে দেয়, তাকে বাস্তব [illegible] দুটি উপন্যাসের লক্ষ্য। অবশ্যই সেদিক থেকে 'ভেলা' অনেক অগ্রণী এবং সফল। [illegible] ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মনের প্রবাহ, কথা-[illegible] স্বাভাবিক, আদৌ গতানুগতিক নয় [illegible]। সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা এই যে, লেখিকা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নারী-চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করেছেন যা একান্তভাবে [illegible] নিজস্ব, কিন্তু তাই বলে মেয়েলি নয়। মেয়েলি সাহিত্যিক বলে একটা অদ্ভুত কথা চালু আছে আমাদের দেশে। এই [illegible] ও বলা যাচ্ছে না, কেন না তাঁর [illegible] বেশ অল্প। [illegible]

বুদ্ধদেব বসু-র কথা মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু এইরকম অসংলগ্ন লাইনও বইতে আছে! 'কলকাতায় ফিরে পৌঁছাবো, আর কলকাতায় ফিরে পৌঁছালুম এ দুয়ের মাঝখানে তফাত কত সামান্য, অথচ কী দুস্তর!' ওই ফিরে পৌঁছাবো ইত্যাদি কথাগুলো ভালো বাংলা নয়; পড়তেও ভুল হতে পারে। যেমন, কলকাতায়/ফিরে পৌঁছাবো না পড়ে কেউ কলকাতায় ফিরে/পৌঁছাবো ইত্যাদি পড়ে মনে মনে অস্বস্তি পেতে পারেন। আবার, সাতষট্টি পাতার এক জায়গায় রয়েছে : 'আমাকেও বসায় ডাকাডাকি করে।' বসায় ডাকাডাকি কেন? হওয়া উচিত, বসবার জন্যে ডাকাডাকি অথবা বসতে বলে। বসায় ডাকা, খোপায় দেওয়া ইত্যাদি বাংলার প্রয়োগ অত্যন্ত শ্রুতিকটু। মনে রাখতে হবে, ভাষার ঐশ্বর্য শুধু প্রাচুর্যে নয়, ধ্বনি-মাধুর্যের বটে। তবু, 'ভেলা' - উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বইতে আগাগোড়া বুদ্ধির ছাপ এবং প্রগাঢ় ভাব। অথচ 'অনুচ্চারিত'-য় সব ব্যাপারটি যেন বাইরে থেকে বানিয়ে তোলা। লেখকের অভিজ্ঞতা পাঠকের মনে কার্যকরী হয় না।

১৫৫।৭১

কবিতা

কুন্দ কদলী কৃষ্ণচূড়া। সাধনা মুখোপাধ্যায়। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

তাঁর এই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে সাধনা মুখোপাধ্যায় শব্দের অন্তর্গত রহস্যকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তিনি জেনেছেন : 'কবিতার খরচ বড় খরচ। সমস্ত জীবন যেন সহ্য করতে পারি।.....মাথার মধ্যে এক অবিরাম ভাবনার গাড়ি। গমগম্ করে যেন শব্দের ব্রীজ পার হয়।' (শব্দের

রীজ)। কিংবা দুশ্যান্তে কবিতায় : 'শব্দের মণির জন্য/আমি শুধু অজাগর শক্তির শরীর গড়োই।' কারণ তিনি জানেন যে এতকাল 'তীরে বসে শুধু হল ছন্দের ঢেউ গোনাগুনি/বিবিধ পয়ার আর মন্দাক্রান্তা ভুজঙ্গপ্রয়াত/শব্দ-নিথর সমুদ্রে মাত্রাহীন চারুতায় মজে/দেওয়াই হল না আজও সফল ও দুর্নিবার ঝাঁপ।' (আড় বাঁশি)

তাঁর এই দ্বিধাম্বিত অস্বীকারোক্তির সঙ্গে পাঠক অবশ্য একমত হবেন না। কারণ আন্তরিকতা, পরিচ্ছন্ন ভাবনা এবং ছন্দ ও ভাষার নিপুণ ব্যবহারের গুণে সাধনা মুখোপাধ্যায় অন্যতম মহিলা কবি রূপে ইতিমধ্যেই তাঁর প্রাপ্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'কুন্দ কদলী কৃষ্ণচূড়া' তাঁর পরিণতি ও বিবর্তনের নির্ভুল সাক্ষ্য হিসেবে নিশ্চয়ই চিহ্নিত হবে।

গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর, কিন্তু ছাপার ভুল এত বেশী কেন?

অনুবাদ

ডিরোজিওর কবিতা। অনুবাদ ও সম্পাদনা : পল্লব সেনগুপ্ত। শুকসারী প্রকাশক, ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা ১৪। তিন টাকা।

মাত্র বাইশ বছরের জীবনকে চিরস্থায়ী করে তোলার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। ডিরোজিওর জীবন সেই ব্যতিক্রমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও নব্য বাংলার অন্যতম চিন্তানায়ক ডিরোজিওর ইংরেজী ভাষায় রচিত কবিতাগুলি মনন ও দেশপ্রেমের জন্যই শুধু স্মরণীয় নয়, তাঁর কাব্য-পরিধিতে উনিশ শতকের একটি বিশেষ সামাজিক সংস্কারের পটভূমি চিরকালের মতো বিধৃত।

পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও অনূদিত এই কাব্যগ্রন্থে ডিরোজিওর কিছু বিখ্যাত এবং কিছু দুষ্প্রাপ্য কবিতা সংকলিত হয়েছে। মূল কবিতা ও তার অনুবাদ পাশাপাশি তুলে ধরেছেন শ্রী সেনগুপ্ত। পরিশেষে স্বল্প পরিসরে কবিতাগুলির পরিচিতিও রয়েছে। শ্রী সেনগুপ্তের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সাধু এবং অনুবাদকর্মও বেশ কিছু ক্ষেত্রে সফল। তবু মূল কবিতা পাশে থাকার জন্য দু-একটি ক্ষেত্রে তাঁর অসতর্কতার পরিচয়ও চোখে পড়ে যায়। যেমন, 'বীণা-ভারতী' কবিতায় মূলের চতুর্থ পংক্তি অনুবাদে অনুপস্থিত। 'জীবনের গান' কবিতা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। 'উপেক্ষিতা' কবিতায় 'ইন্দ্রধনুর রঙের মতন আশারা চাঁকতে হারা' 'আশারা ইন্দ্রধনুর রঙের মতন চাঁকতে হারা' হলে মূলানুগ হত। কিন্তু সব মিলিয়ে, ডিরোজিওর কবিতার কেন্দ্রীয় সুরটিকে পাঠকের মনে পৌঁছে দেবার কাজে অনুবাদকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

স্বাস্থ্য

সিফিলিস। গোবিন্দ বিশ্বাস। ত্রয়ী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ১৫·০০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় ডাঃ অজিতকুমার দত্ত যে-তথ্য শুনিয়েছেন তা যেমন চমকপ্রদ তেমনই ভয়ঙ্কর। তিনি লিখেছেন, "আধুনিককালে সমাজে যৌন-রোগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা আশাবাদী মত অনেকে পোষণ করেন। তাঁদের মতে যৌনরোগ হল অতীত দিনের গল্প—আজকের সমাজে তার কোনো গুরুত্ব নেই। এঁদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন মনে করি যে, আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার অন্তর্ধানের পরে বর্তমান সংক্রামক রোগের তালিকায় যৌনরোগের স্থানই কিন্তু সর্বশীর্ষে।...সমগ্র জনসংখ্যার তিন থেকে পাঁচ শতাংশ লোক ভুগছেন শুধু সিফিলিসে।"

জনসংখ্যায় এক গরিষ্ঠ অংশ যে-নিষ্ঠুর ব্যাধির শিকার, সেই রোগ সম্পর্কে জনসাধারণ সহজে ওয়াকিফহাল হতে পারেন এমন কিছু ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী কিংবা বেসরকারী উদ্যোগে এ-সম্পর্কে কিছু করা হয়েছে বলে মনেই পড়ে না। কোনো বিগত অতীতে একটি চলচ্চিত্র হয়তো এ-বিষয়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু তার নিয়মিত প্রদর্শিত হবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। অথচ এ-জাতীয় রোগের আক্রমণের সঙ্গে সামাজিক সংস্কার, লোকলজ্জা ও [illegible] এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, উপযুক্ত চেতনা ও শিক্ষার অভাব সমাজকে [illegible] গোপন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বহু কাল। সেদিক থেকে গোবিন্দ বিশ্বাস এক বিরল মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এই গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হয়ে।

কিন্তু কাজটা যেখানে পরিব্যাপ্ত, সেখানে উদ্যোগ শুধু নির্ধারিত [illegible] মধ্যে আবদ্ধ থাকে না—এ-কথা সহজেই অনুমেয়। যে-কারণে বাংলা ভাষায় টেকনিক্যাল গ্রন্থাদি রচিত হয় না বলালেই চলে সেই পরিভাষার অভাব তাঁর উদ্যোগকে [illegible] করতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি। সাধারণ মানুষের মনে সিফিলিস রোগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা সঞ্চার করা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে-দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি পালন করেছেন নিশ্চয়ই, [illegible] কি, এই রোগতত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা [illegible] জানায় আগ্রহী তাঁদের পক্ষেও গ্রন্থটি [illegible] সহায়কের কাজ করবে—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শ্রী বিশ্বাস নিজে চিকিৎসক মানুষ নন। তা-সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে এমন একটি জটিল বিষয় নিয়ে এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বই রচনা কী করে সম্ভব হল ভাবতে অবাক লাগে। সাধারণ পাঠকের মনে [illegible] ধরনের প্রশ্ন সচরাচর জাগতে পারে [illegible] অনুসারে গ্রন্থটির অধ্যায়-বিন্যাস করেছেন তিনি। কোনো প্রসঙ্গই বাদ দেননি। দৃষ্টান্ত হিসেবে যে-কাহিনীগুলি উপস্থাপন করেছেন সেগুলি আমাদের পরিচিত পরিবেশের বলেই আরও বেশী করে মনে দাগ কাটে। এ ছাড়া, বেশ কিছু ছবিও সন্নিবেশিত করেছেন তিনি। সেগুলি গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। শ্রী বিশ্বাসের বইটি সমাদৃত হলেই তাঁর বিরল নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় পুরস্কৃত হবে।

অ্যাথলীটের নিষ্ঠার নজির

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় বা অ্যাথলীটকে শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে তালিম দিয়ে সুপটু করে গড়ে তোলবার ব্যাপারে একটা প্রচলিত কথা আছে—'কাচ দেম ইয়ং।' অর্থাৎ ছোট থেকেই তাদের ধরে শিক্ষা দাও। কিন্তু ছোট বেলা থেকে শিক্ষা দিলেই কি সবাই ক্রীড়াক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পারে? পারে না। তারাই পারে যারা সহজাত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।

কোন দিন দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামেনি সমবয়সী এমন দশটি ছেলেকে যদি ৫০ গজ বা ১০০ গজ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া যায় তবে দশটি ছেলের দশ রকম সময় হবে। তাদের মধ্যে যে প্রথম হবে সে নিশ্চয়ই আর নয়জনের চেয়ে কিছুটা গতি ও শক্তির অধিকারী। ১০০ জনের প্রতিযোগিতায় বা কোন প্রতিনিধিমূলক প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবে তার ক্ষমতা আরও বেশী। এই ধরনের ছেলেদের বেছে বেছে শিক্ষা দিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার এমনই দৈন্য যে, সম্ভাবনাময় সোনার ছেলেদের চোখের সামনে দেখেও আমরা চুপ করে থাকি। উনিশশো পঁয়ষট্টিতে মনোরঞ্জন পোড়েল নামে যে ছেলেটি লম্বা ছন্দের যে ছেলেটি রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করেছিল কে এগিয়ে এসেছিল তার শিক্ষার ভার নিতে? যদি কেউ তাকে তালিম দিত, তার ভুল ত্রুটি শুধরে দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে উন্নততর পথের নিশানা দিত তবে মনোরঞ্জন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গন থেকে ভারতের জন্য অনেক সম্মান বয়ে আনতে পারত। একেবারে আনেনি তা নয়। এই বছরই ইরানে আয়োজিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক মিট থেকে একটি সোনা, একটি রূপো ও একটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে এসেছে। আন্তঃকলেজ স্পোর্টস এবং জাতীয় অ্যাথলেটিকসেও কিছু কিছু কৃতিত্বের ছাপ রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আসরে, বিশেষ এশিয়ান গেমসে যার ছিল স্বর্ণ সম্ভাবনা তার সাধ ও সাধ্যের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার ত্রুটি।

শুধু বাংলা ও ভারতের অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে মনোরঞ্জন পোড়েলের যেটুকু সুনাম সেটুকু ওর অনুশীলন, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পুরস্কার। এমন নিষ্ঠার নজির বেশী নেই।

সাবর এঞ্জিন নামে খ্যাত দূর-পাল্লার দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেক বলেছেন, দৌড় সুনামের অধিকারী হতে হলে দৌড়কে ভালবাসতে হবে। কঠিন অনুশীলন করতে হবে। স্বপনে, শয়নে, জাগরণে দৌড়ই হবে ধ্যান জ্ঞান চিন্তা। মনোরঞ্জন সেই মতে বিশ্বাসী। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, রোদ্র বৃষ্টি নেই—সব কিছু উপেক্ষা করে প্রতিদিন সাড়ে তিন ঘণ্টা করে ওর অনুশীলন করা চাই-ই। কর্ম-কোলাহল মুখর কলকাতা থেকে ২৫ মাইল দূরে হুগলী

একা একা দৌড়ের অনুশীলন করে চলেছে মনোরঞ্জন পোড়েল

জেলার ডানলপ স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে প্রতিদিন দেখা যাবে মাইনাস পাওয়ারের পুরু লেন্সের চশমা পরে প্রায় ৬ ফুট মাথায় উঁচু ছেলেটি লম্বা-লম্বা পা ফেলে একা একা দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছে। সারা বছরের একই ছবি।

অ্যাথলেটিকসে মনোরঞ্জনের মানসিক দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠার অনেক নজির আছে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। কটকের জাতীয় অ্যাথলেটিকসে মনোরঞ্জন বাংলা দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে। কটক যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে কর্মকর্তাদের ঘিরে বাদানুবাদ। দলের যাত্রা সম্পর্কেই সংশয়। সহকর্মী সাংবাদিক বন্ধু চিরঞ্জীব স্টেশনে গিয়েছিল বাংলার অ্যাথলীটদের শুভেচ্ছা জানাতে। ব্যাপার দেখে সে হতভম্ব। মনোরঞ্জন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল: ভাববেন না, কটক আমরা যাবই, প্রাইজ নিয়েও ফিরে আসব। গিয়েছিল এবং প্রাইজও এনেছিল।

নিষ্ঠার সবচেয়ে বড় নজির তার আগে ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে। ১২ দিনের মধ্যে ভারতের তিনটি কেন্দ্রে তিনটি অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মনোরঞ্জনের অংশ গ্রহণের সে ঘটনা একক অভিযানের উপাখ্যানের মত।

তিনটিই ওর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা। মনোরঞ্জন তখন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। কলকাতায় আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ডিসেম্বরের ১৮ থেকে ২১ পর্যন্ত। ২০ থেকে ২১ ডিসেম্বর আজমীরে অল ইণ্ডিয়া ওপেন মিট। ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আসর বরোদায়। তিন জায়গাতেই মনোরঞ্জনের পদক প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কিন্তু ১২ দিনের মধ্যে কলকাতা—আজমীর বরোদায় যাতায়াতের ধকল সহ্য করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা দুরূহ ব্যাপার। মনোরঞ্জন আন্তঃকলেজ বাদ দিয়ে আজমীর ও বরোদায় যেতে পারত। কিন্তু যেহেতু আন্তঃকলেজে না নামলে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনয়ন মিলবে না সেহেতু কলকাতায়ও নামতে হল। তবে শেষ দু'দিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারল না। ১০০ মিটারের ফাইনালও বাকি রইল। ১৯ তারিখে ২০০ মিটারের ফাইনাল শেষ করেই ছুটল দমদমে বিমান ধরতে। আজমীরের ওপেন মিট আরম্ভ পরের দিন। এদিকে আজমীরের জন্য নির্বাচিত বাংলার ৪ জনের মধ্যে তিনজনই ঘরে বসে রয়েছে টাকার অভাবে। বাংলার অ্যাথলেটিকসের কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য ক্রীড়া পরিষদ টাকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। মনোরঞ্জন পোড়েলের খরচ দিয়েছে ওর কলেজ। একা একা মনোরঞ্জন রাত্রিতে দিল্লী পৌঁছে আর এক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ল। দুশ্চিন্তা সকালের ফ্লাইটে জয়পুরে যাবার অনিশ্চয়তায়। নানা চিন্তায় রাত্রে ঘুম হল না। সকালের প্লেনে অবশ্য সিট মিলল। কিন্তু জয়পুরে পৌঁছে আর এক সমস্যা। সেখান থেকে আজমীর যাওয়ার তখন কোন ট্রেন নেই। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সি যেতে নারাজ। ট্যাক্সি চালককে সব কথা এবং মনের অবস্থা বুঝিয়ে কোনভাবে রাজী করালো। ৯০ টাকার ট্যাক্সি ভাড়া করে ছুটল আজমীরে। কোচ নেই, ম্যানেজার নেই, নিঃসঙ্গ অ্যাথলীট। আজমীরে আসেওনি কোনদিন। ১৯ তারিখের রাত্রের পর পেটেও দানাপানি পড়েনি। কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে কিছুই জানা নেই। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। ও যখন স্টেডিয়ামে পৌঁছল তখন ওর ইভেন্ট আরম্ভ হতে ঘণ্টা দুই বাকি।

কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অনিদ্রা, ক্ষুধা, ক্লান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্যে মনোরঞ্জন প্রায় ভেঙে পড়েছে। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। ওই অবস্থার মধ্যে পোশাক বদল করে হিটে নামল। দ্বিতীয় হয়ে ফাইনালে উঠল। ফাইনালে পেল চতুর্থ স্থান। পরের দিন ২০০ মিটার দৌড়েও একই পজিশন। কিন্তু কলকাতা থেকে ছুটে এসে মনোরঞ্জনের প্রতিযোগিতায় নামার ঘটনা শুনে সবাই অবাক।

২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরে এসে আবার বরোদায় যাত্রা। এবার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস। স্পোর্টস আরম্ভের একদিন আগে ওদের বরোদা পৌঁছবার কথা। কিন্তু হিসাবের ভুলে বরোদায় পৌঁছেই শোনে ওই দিনই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো ট্যাক্সি করে যখন ওরা মাঠে পৌঁছল তখন বিকেল চারটা। তার আগে পাঁচটি ইভেন্ট শেষ হয়ে গেছে। মনোরঞ্জনের যে ইভেন্টে প্রথম হওয়ার কথা সেই ১০০ মিটার দৌড়ও শেষ। তবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাল ছাড়ল না। দ্বিতীয় দিন ৪×৪০০ মিটার দৌড়ে প্রধানত মনোরঞ্জনের জন্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম হল। ২০০ মিটার দৌড়েও সোনা এল মনোরঞ্জনের হাতে। আরও কয়েকজনের সাফল্যে কলকাতার হাতে যখন ২৩ পয়েন্ট তখন মধ্য প্রদেশের জিওলজি বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদুরা বিশ্ববিদ্যালয় ওদের চেয়ে পয়েন্টে বেশ এগিয়ে। হিসেব করে দেখল চ্যাম্পিয়নশিপ পেতে হলে ৪×১০০ মিটার রিলেতে ওদের প্রথম হতেই হবে। 'করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গের' প্রতিজ্ঞায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবং বলা বাহুল্য, প্রধানত মনোরঞ্জনের প্রতিজ্ঞায়। দলের শেষ প্রতিযোগী হিসাবে অগ্রবর্তী দুইজনকে পর পর অতিক্রম করে প্রথম ফিতে ছিঁড়েছিল পোড়েল। ফলে কলকাতার ১০ পয়েন্ট যোগ এবং ৩৩ পয়েন্টে দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান। ত্রিশ বছরের মধ্যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপ। মনোরঞ্জনের নিষ্ঠার পুরস্কার।

জলন্ধরের জাতীয় আসর থেকে মনোরঞ্জন দুটি ব্রোঞ্জ ও একটি সোনা, কটক থেকে দুটি ব্রোঞ্জ ও একটি রুপো এনেছে। ৭১-এ এশিয়ান গেমস ট্রায়ালের ১০০ মিটারে ১০·৬ সেকেণ্ডে দ্বিতীয় হয়েছে। ইরানের এশিয়ান মিট থেকে এনেছে একটি সোনা, একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জের মেডেল।

কিন্তু মনোরঞ্জন যা পেতে পারত তা পায়নি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অ্যাথলেটিক কোচ কে ও বোসেন ওর দৌড় ও নিষ্ঠা দেখে বলেছেন, শুরু থেকে যোগ্য কোচের অধীনে থেকে কোচিং পেলে এবং ঘন ঘন বড় প্রতিযোগিতায় ওর অংশগ্রহণের সুযোগ থাকলে ও বড় অ্যাথলীট হতে পারত। বড় হবার বাসনা অবশ্য এখনো হারায়নি মনোরঞ্জন পোড়েল। দৌড়ই ওর একমাত্র নেশা। দৌড়েই ওর আনন্দ।

মুকুল

যুদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে খেলোয়াড়ী মনোভাব

সম্ভবত পাক-ভারত যুদ্ধ এবং জাতির জরুরী অবস্থার জন্য খেলাধুলার ব্যাপারে মানুষের তেমন আগ্রহ ছিল না। কিছু কিছু ক্রীড়ানুষ্ঠানও স্থগিত রাখা হয়েছিল। তার যুদ্ধের মধ্যেই নানা কেন্দ্রে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি খেলা চলেছে যথারীতি। তবু তার মধ্যে যেন সাধারণের সায় মেলেনি। খেলাধুলো জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জীবনধারা সহজ করবার প্রয়োজনেও খেলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যুদ্ধ অবসানের পর এখন আশা করা যায় ভারতের খেলাধুলার মাঠ আবার সজীব হয়ে উঠবে। সামরিক বাহিনীর যুদ্ধক্লান্ত ক্রীড়াবিদরাও যথারীতি খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে। জীবন যুদ্ধের পর মেতে উঠবে ক্রীড়াঙ্গনের আনন্দ যুদ্ধে।

হ্যাঁ খেলার মাঠও তো এক রকমের যুদ্ধাঙ্গন। দুই অঙ্গনেই শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব ও চাতুর্যের পরিচয়। পার্থক্য যুদ্ধাঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পাঞ্জা কষায় জীবনহানির আশঙ্কা, ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাণের রসদ সংগ্রহ।

আবার যুদ্ধ থেকে ক্রীড়াবিদদের শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছু সম্পদ মেলে। সব চেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হল খেলোয়াড়-

সুলভ মনোবৃত্তি। কোন কবির লেখা মনে পড়ছে না। খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির কথায় তিনি বলেছেন, 'পরাজিত হয়ে যেন দাঁড়িয়ে পথের পাশে/জয়ধ্বনি দিতে পারি জয়ীর উদ্দেশে।

বাংলা দেশে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? অত্যাচার, গণহত্যা এবং নৃশংসতায় যাদের কুকীর্তি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কমলিন অধ্যায় তারাই এখন ভারতীয় আতিথেয়তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভারতীয় বাহিনীও তাদের দেখছেন ক্ষমাসুন্দর চোখে, সর্বক্ষেত্রে সদয় ব্যবহার করছেন। একেই বোধ হয় বলে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি। পরাজিত দানবীয় শক্তির এই প্রশংসাটুকুই বোধ হয় জয়ীর উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি।

খবরে দেখছি আত্মসমর্পণকারী ও বন্দী পাক সেনাদের মধ্যে কয়েকজন অলিম্পিয়ান খেলোয়াড় রয়েছে। একজন বন্দী অ্যাথলীট তো ভারতীয় অ্যাথলীটদের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের স্মৃতিচারণ করেছে। ১৯৬২-র জাকার্তা এশিয়ান গেমে ওই অ্যাথলীট নাকি ভারতীয়দের কাছের হরদম মেলামেশা করেছে। কুমিল্লা থেকে বন্দী একজন পাক অলিম্পিক হকি খেলোয়াড়ও কিছু কিছু কথা শুনিয়েছে যার মধ্যে প্রীতি ও আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট হতে পারে। বিপাকে পড়ে আজ পাক বাহিনীর ক্রীড়াবিদরা বন্ধুত্বের কথা আওড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষের মধ্যেও যে দেবত্বের ছিটেফোঁটা অংশ থাকে না তা অবিশ্বাস করি না। খেলাধুলো এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি এই দেবত্ব অর্জনের এক বড় সহায়ক।

আমরা জানি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথের বল ভারতীয় অধিনায়ক নরী কন্ট্রাক্টরের মাথায় খুঁজতে লেগে যখন কন্ট্রাক্টরের জীবন সংশয় হয়েছিল তখন রক্ত দেবার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। আজ দেখছি পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধে আহত এক মুমূর্ষু পাক সৈনিকের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছে ভারতের একটি কলেজ ছাত্রী। পাক সেনার প্রাণ রক্ষার জন্য যে গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন ওই ছাত্রীটির মধ্যেই তা পাওয়া গিয়েছে।

ত্রীটি যদি খেলোয়াড় না হয়, কোন
ধুলো নাও করে তবু তার এই ঔদার্য
খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয়।

অস্বীকার করব না প্রকৃত ক্রীড়াঙ্গণে
ক্ষেত্রে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের
প্রাণ মেলে। ভারতের খেলোয়াড়কুল যদি
জয়ে জাতির গৌরব লগ্নে পরাজিতের
তি বিজেতার আচরণের শিক্ষা গ্রহণ করে
র ভারতের খেলাধুলো উপকৃত হবে,
খেলার মাঠ হবে প্রকৃতই আনন্দের অঙ্গন।

বিশ্ব একাদশের বিপর্যয়

ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্ব একাদশের
থম বে-সরকারী টেস্ট অমীমাংসিতভাবে
ষ হবার পর পার্থের দ্বিতীয় টেস্টে বিশ্ব
কাদশকে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক ইনিংস ও
১ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।
র পরের খবর এডিলেডে দক্ষিণ
স্ট্রেলিয়া দলের কাছেও বিশ্ব একাদশ
নিংসে হেরে গেছে। দুটি খেলায় এই
ক ইনিংস পরাজয়ই শুধু বড় খবর নয়।
র চেয়েও বড় খবর দ্বিতীয় টেস্টে
লাফল মীমাংসিত হয়েছে আড়াই দিন
তে থাকতে। এডিলেডে ৪ দিন ব্যাপী
খেলার উপর যবনিকা পড়েছে দুই দিনের
শেষে। এডিলেডে অবশ্য লয়েড ও
কানহাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় দ্বিতীয়
ইনিংসে ব্যাট করতে পারেননি। তবু এইভাবে
পরাজয় অপ্রত্যাশিত।

টেস্টের কথা বলা যাক। প্রথম টেস্টে
অস্ট্রেলিয়ার স্ট্যাকপোলের সেঞ্চুরি এবং
অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলের দুটি সেঞ্চুরির
উত্তরে বিশ্ব দলের হিল্টন একারম্যান ও
রোহন কানহাই একটি করে সেঞ্চুরি
করেছিলেন। দ্বিতীয় টেস্টে অসুস্থ
থাকায় একারম্যান খেলতে পারেননি। তবে
প্রথম ইনিংসে ডাগ ওয়াল্টার্সের সেঞ্চুরির
উত্তরে কানহাইও একটি সেঞ্চুরি করেছেন
দ্বিতীয় ইনিংসে ভরাডুবির মুখে। কিন্তু
বিশ্ব দলের আর সবারই প্রায় ব্যর্থ
ভূমিকা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা
অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৪৩৯ রানের
উত্তরে মাত্র ৫৯ রানে ওদের প্রথম ইনিংস
শেষ। মাত্র ৪ জন খেলোয়াড়ের নামের
পাশে দুই সংখ্যার (কুড়ির নীচে) রান।
৪ জনের নামের পাশে শূন্য।

বিশ্ব দলের এই বিপর্যয়ের মূলে
অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলির
মারাত্মক বোলিং। লিলি মাত্র ৭.১ ওভার
বল করে ২৯ রানের বিনিময়ে ৮টি উইকেট।
তরুণ বোলারের জীবনের শ্রেষ্ঠ
অ্যাক্সারেজ। তাছাড়া তার ওই দিনের
কৃতিত্বকে বিশ্ব রেকর্ডের সম্মান দেওয়া
হয়েছে একদিক দিয়ে। এক সময়ে তিনি
১৪টি বলের মধ্যে একটি রানও না দিয়ে
৬টি উইকেট দখল করেন। ফলো-অনের
পর বিশ্ব একাদশের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু
হলে পান আরও একটি উইকেট। ফলে
একটি সেশনে ৪১ রানে পান ৯টি উইকেট।
এক সেশনে এইভাবে উইকেট পাওয়াকেই
বিশ্ব রেকর্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৪৯
রানের উত্তরে দ্বিতীয়দিন লাঞ্চের আগেই
বিশ্ব একাদশের ইনিংস ৫৯ রানে শেষ
হওয়ায় ফলো-অন করে দ্বিতীয় দিনের
শেষে তারা সংগ্রহ করে ৫ উইকেটে ২১৭
রান। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতির
সময়ই ২৭৯ রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস
শেষ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ১১ রানে
বিজয়ী হয়। ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি
দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টি উইকেট পেয়ে মোট
৯২ রানে পায় ১২টি উইকেট। পার্থ মাঠে
প্রথম শ্রেণীর খেলায় বোলিং কৃতিত্বের
সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন।

খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৩৪৯ (ডাগ
ওয়াল্টার্স ১২৫, ইয়ান চ্যাপেল ৫৬, কিথ
স্ট্যাকপোল ৫৫; টনি গ্রেগ ৯৪ রানে ৪
উইকেট, গ্যারি সোবার্স ৬৯ রানে ২
উইকেট)

বিশ্ব একাদশ—প্রথম ইনিংস—৫৯
(ক্লাইভ লয়েড ১৪, জাহির আব্বাস ১৪,
ফারুক এঞ্জিনিয়ার ১৩; লিলি ২৯ রানে ৮
উইকেট)

বিশ্ব একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৯
(রোহন কানহাই ১১৮, জাহিদ অব্বাস ৫১,
গ্যারি সোবার্স ৩৩, ক্লাইভ লয়েড ৩২,
সুনীল গাভাসকার ২১; লিলি ৬৩ রানে
৪ উইকেট, ম্যাকেঞ্জি ৬৬ রানে ৪ উইকেট)
(বিশ্ব একাদশ ইনিংস ও ১১ রানে
পরাজিত)।

দুই অধিনায়ক—

ইডেনে রণজি ট্রফির খেলায় বাংলার
কাছে আসামের হারার মুখে হাতে কলম
নিয়ে বসেছি। আগেই লিখেছি যুদ্ধের
পরিপ্রেক্ষিতে খেলাধুলায় সাধারণ ক্রীড়া-
মোদির যেন কোন সায় নেই। না হলে
রনজি ট্রফিতে বাংলা ও আসামের খেলা
হয় প্রায় ফাঁকা মাঠে? নাকি জাতীয়
ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য ইডেনে
অনুষ্ঠিতব্য যাবার বিজয়ী ভারতীয় দল ও
অবশিষ্ট দলের খেলা দেখার আগ্রহ নিয়ে
সবাই বসে আছে। মনে হয় ও খেলাতেও
মাতামাতি কম হবে। অন্তত টেস্ট খেলার
আসরের আমেজ থাকবে অনুপস্থিত।

যাই হোক আসামের বিরুদ্ধে বাংলা
জিতেছে ইনিংস ও ১৭ রানে। তার আগে
ওড়িশাকে হারিয়েছে ৭ উইকেটে। বাংলা ও
বিহার দুটি খেলা থেকে ১৬ পয়েন্ট করে
পেয়েছে। আঞ্চলিক লীগে বাকি থাকছে
বিহারের সঙ্গে খেলা। সে খেলা ইডেনে
বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার পরে।

প্রায় দর্শক শূন্য ইডেনে বাংলা ও
আসামের খেলায় যে দুটি চেহারা কতিপয়
দর্শকের সামনে বেশী করে ফুটে উঠেছে
সেটা হচ্ছে দুই রাজ্যের দুই অধিনায়কের
ভাবমূর্তি। বাংলার প্রাক্তন ফুটবল
অধিনায়ক চুনী গোস্বামীই যে বাংলার
একমাত্র খেলোয়াড় যিনি ফুটবল ও ক্রিকেট
দুটি বড় খেলায় রাজ্যের অধিনায়কের
সম্মান পেয়েছেন এ কথা আগের সপ্তাহেই
লিখেছি। তখন আসাম অধিনায়ক এ
হাজারিকার কথা মনে পড়েনি। হাজারিকাও
আসামের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ক। এখন
ক্রিকেটেও অধিনায়কের সম্মান পেয়েছেন।
ক্রিকেট ও ফুটবলে সমদক্ষতার পরিচয়
অনেকেই দিয়েছেন। সবচেয়ে গালভরা নাম
ডেনিস কম্পটন। কিন্তু আমাদের এই
বাংলার পংকজ রায়, নির্মল চ্যাটার্জির
খ্যাতি তো কম নয়। পংকজ ও নির্মলের
ক্রিকেট খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ফুটবলে
পংকজের মত ইন এবং নির্মলের মত রাইট
আউট কি আজ কেউ খুঁজে পাওয়া যায়?

একলব্য

বাংলাদেশের প্রথম ছবি "জীবন থেকে নেয়া"-র (পরিচালনা : জহির রায়হান) একটি দৃশ্যে সুচন্দা, রোজি এবং আনোয়ার। ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সিনেমা

অপ্রদীপ ও আপৎকালীন অবস্থার জন্য কলকাতায় কয়েকটি ছবি রিলিজ স্থগিত ছিল। এ-সপ্তাহে আবার নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা স্বভাবতই এ-বছরে কিছু কম হবে। তা-ছাড়া ভারতী প্রেক্ষাগৃহে অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি বাংলা ছবির রিলিজও পিছিয়ে গেল। অগ্নিকাণ্ড না ঘটলে ছবিটি হয়ত অপ্রদীপের পর মুক্তি পেত। বাংলা চিত্রপ্রদর্শনীর ক্ষেত্রে সম্প্রতি কিছুটা অসুবিধা হয়ত হয়েছে। কিন্তু চিত্রপ্রযোজনার ক্ষেত্রটি অপ্রদীপ এবং যুদ্ধের সময়কালেও বেশ সরগরম ছিল। কয়েকটি নতুন বাংলা ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধের মধ্যেই।

এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চলচ্চিত্র মহলে নতুন আশা ও উদ্দীপনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অনেকেরই বিশ্বাস, বাংলা ছবির প্রদর্শন-সীমা হয়ত এবার বাড়তে পারে। এ-সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা এখনই চলছে। ভবিষ্যতে কী হবে না হবে সেটা পরে দেখা যাবে। এর মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয়, কলকাতা এবং বাংলাদেশের সিনেমা জগৎ ইতিমধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে। বাংলাদেশে পাক জঙ্গীশাহীর অত্যাচার শুরু হবার পর চলচ্চিত্র জগতের অনেকেই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। বাংলাদেশের চিত্র পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে অল্পকালের মধ্যেই এখানকার চলচ্চিত্র মহলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। ওখানকার শিল্পী ও কলাকুশলীরা হয়ত এখন নিজেদের কর্মক্ষেত্রেই ফিরে যাবেন। তাঁরা স্বদেশে ফিরবেন একটা মধুর বন্ধুত্বের স্মৃতি নিয়ে। পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রলোকের যে আতিথেয়তা বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীরা পেয়েছেন সেটা তাঁরা কোনদিনই ভুলবেন না। ই-আই-এম-পি-এ এখানে তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করেছেন। যে সময়ে বাংলাদেশের কলাকুশলী শিল্পীরা কলকাতায় এসেছেন তখন এখানকার চলচ্চিত্রেরও খুব সংকট। তাই অতিথিদের জন্য অনেক কিছুই হয়ত করা সম্ভব হয়নি। তবু সহানুভূতির অভাব ছিল না। বিভিন্ন সংস্থা কোন কোন শিল্পীর জন্য কিছু না কিছু করেছেন। কলকাতায় বাংলা ছবির কাজে বাংলাদেশের একাধিক কলাকুশলীকে নিযুক্ত দেখেছি।

বাংলা ছবির দুই প্রযোজনা-কেন্দ্রের, দুই দেশের চলচ্চিত্রলোকের এই যে হৃদ্যতা গড়ে-উঠেছে অল্পকালের মধ্যে এর সুফল উভয় দেশেই দেখা যাবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে দুই দেশই সমান লাভবান হবেন এটা আশা করা যেতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগেই ওখানকার "জীবন থেকে নেয়া" ছবিটির মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছে কলকাতায়। আমরা বাংলাদেশের ছবি এখন থেকে নিয়মিত দেখতে পাব বলে আশা করছি। আশা করি, এখানকার বাংলা ছবিও বাংলাদেশের দর্শকরা নিয়মিত দেখতে পাবেন। দুই দেশের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবধান ছিল না। তবে মিলনের বাধা ছিল। এখন তা দূরীভূত। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর এই অভ্যুদয়কালে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রলোকের সম্পর্ক যে আরও ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হবে তাতে সংশয় নেই।

নতুন বাংলা ছবির মহরৎ

মুভ প্রোডাকসন্স-এর জবান (পরিচালনা : পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবির মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে গত সপ্তাহে। সমিত ভঞ্জ, জয়া ভাদুড়ি, চিন্ময় রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, ভাস্কর চৌধুরী, রবি ঘোষ, অনুভা ঘোষ প্রমুখ শিল্পীরা ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবেন। অতিথি শিল্পী হিসাবে ছবিতে থাকছেন ধর্মেন্দ্র, শত্রুঘ্ন সিনহা, রেখা, অমিতাভ বচ্চন, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত সংগীত পরিচালক।

মৌসুমী পিকচার্স-এর আঁধার পেরিয়ে ছবিটিরও মহরৎ গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ নিয়েছেন অশোককুমার দাস। সমিত ভঞ্জ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নবাগতা গীতা মৈত্র প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। নচিকেতা ঘোষ সুরকার।

জাতীয় পুরস্কার

অজয় কর পরিচালিত [illegible] মাল্যদান '৭০ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসাবে আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়েছে।

ফিল্ম-ও-পাব সংস্থা প্রযোজিত [illegible]দৈর্ঘ্যের ছবি লেটেস্ট (পরিচালনা : [illegible] রায়চৌধুরী) শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রামাণিক ছবি হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

চিৎপুর-চিত্র

কান্না ঘাম রক্ত

সত্যম্বর অপেরা

নিত্যদিনের ছোট বড় ব্যর্থতা, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে মানুষের গলদঘর্ম পরিশ্রম এবং অস্তিত্বরক্ষার জন্য যে কঠিন সংগ্রাম—সত্যম্বর অপেরার 'কান্না ঘাম রক্ত' তারই উজ্জ্বল পালারূপ। আজকের পৃথিবীতে অতি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাটাই যে কঠিন প্রশ্নের মতন, পালাকার ভৈরব গাঙ্গুলীর রচনায় সেই সত্যই উচ্চারিত। এবং সেই বলা কথা ও কাহিনীর দৃশ্যরূপ, বলতে দ্বিধা নেই, টানা সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় করে রেখেছিল।

'কান্না ঘাম রক্ত' পালা প্রযোজনার পরিমিতিবোধ এবং মাত্রাজ্ঞান আমাদের অভিভূত করেছে। লক্ষ্য করেছি একটি কাব্যিক ছন্দের মতন না-ভীরু, না-দ্রুত কাহিনীর অগ্রগতি। শেষ হলে বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয়। ভাবি সত্যিই এই পৃথিবী এত মগ্ন।

দুঃখ? হ্যাঁ গভীর বিষাদে মন বিষণ্ণ হয়। এই যে হৃদয়বিদ্ধকারী বিষণ্ণ করুণার বিস্তার সেটাই প্রয়োগ-সাফল্যের প্রধান কথা। কাহিনীতে দেখি আজকের পৃথিবীর তিন স্তরের মানুষই উপস্থিত। পালাকার শ্রীগাঙ্গুলী বলেছেন : এদেশে অট্টালিকার পাশেই বস্তী, বস্তীর কাছেই কারখানা—সুতরাং বিত্তশালীর জন্মদিনে পুত্রশোকাতুর পিতাকে কান্না চেপে সকালের প্রতীক্ষা করতে হয়; মধ্যবিত্তের ভয়ংকর অবক্ষয় পারিবারিক শুচিতা রক্ষার অন্তরায়। এই বাস্তব-সত্য নিয়ে বৈপ্লবিক পালা রচনার প্রয়াস এক দুঃসাহসিক কাজ। ততোধিক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন সত্যম্বর অপেরা এটি আসরস্থ করে। এখানে বলে রাখি পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত ওঁদের জয়ই সূচিত। প্রয়োগ ও প্রয়োজনা দশহাজারী আসরের সকল দর্শককে কঠিন বাঁধনে বেঁধে রেখেছিল।

আজকের যে-কোনো আধুনিক নাটকের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে, 'কান্না ঘাম রক্ত' তার ফর্ম, কনটেন্টের দিক থেকেই কেবল নয়, বক্তব্য এবং পরীক্ষা-মূলক প্রয়াসের দিক থেকেও তার আবেদন, কল্পনা ও বিন্যাস একালীন সর্বাধুনিক নাটকের ধর্মকেই স্মরণ করায়। প্রয়োগে দেখলাম সত্যম্বরও আধুনিক-রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। কোনো

রাজ কাপুরের "কাল আজ ঔর কাল" (পরিচালনা : রণধীর কাপুর) ছবিতে ববিটা

কোনো দৃশ্যের উপস্থাপনাও অভিনব। ক্যাবারে নাচ, বিদেশী ঢঙে গাওয়া বাংলা গানের পাশেই রাখা হয়েছে দারিদ্র্যের রূঢ় বাস্তব রূপ এবং বেদনার কান্না। পালার মূল দ্বন্দ্বকে এর মধ্যেই বিধিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শেষ অবধি অর্থাৎ পরিণতিতে কিন্তু যাত্রার সেই শেষ কথাই উচ্চারিত—সত্য ও ধর্মের নয়, অধর্মের পরাজয়।

কাহিনী সম্পর্কে আগে কিছু আঁচ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োগে সম্পদ, প্রতীক এবং বাস্তবতাকে এক সারিতে দাঁড়

নিউ এম্পায়ারের ছবি 'দি প্রিস্টস্ ওয়াইফ'-এ মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানী এবং সোফিয়া লোরেন

অনুষ্ঠান। কয়েকটি শিশু সংস্থাও এই সপ্তাহের অনুষ্ঠানে যোগদান করবে। "রূপ-কথা" নামক ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠানটি এই দের শিশু রংমহলের কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য। সংযুক্তা পাণিগ্রাহী এই সপ্তাহের উৎসবে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করবেন।

দেবযানীর মণিপুরী নাচ

এই সেদিন, ৪ঠা ডিসেম্বর, শ্রীমতী দেবযানী চালিহা মণিপুরী নাচের একটা সুন্দর আসর জমিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্র-সদনে। আসরের চমৎকারিত্ব ছিল তার বৈচিত্র্য। কৃষ্ণ অভিসার, লাস্য ভণিতা, ... রস ইত্যাদি ভারতীয় নৃত্যকলার ... চিরাচরিত বিষয়ের সঙ্গে দেবযানী ... একসূত্রে বেঁধেছিলেন মণিপুরের ... নিজস্ব আচারের লাই হারাওবা, ... চোলম্, অসমীয়া শিল্পদর্শনের ... । এছাড়া দুটি রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গেও দেবযানী মণিপুরী নাচ নেচে-ছিলেন। পারতপক্ষে ভারতের সমস্ত নাচের মধ্যেই একটা আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র আছে সেটা সহজেই অনুমেয় দেবযানীর মণিপুরী নাচে। শুদ্ধ আচারকে শুদ্ধ রেখেও তাতে প্রগতিশীল বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করাই হল মেধাবী নাচিয়েদের বিশেষত্ব। দেবযানীর নাচে সেইরকমের 'গতি' আছে। এই প্রকল্পেই তার নাচ চরিতার্থ।

সেদিনের নাচে দেবযানী প্রায় প্রতিটি বিষয়েই কোন না কোন তাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সবকটিই যে আবেদনে পুষ্ট তা নয়। আবার শৈল্পিক বিচারেও যে সবকটিই সুন্দর তাও বলব না। তবে যা না বললে নয় তা হল সে, যে সততা, কৌতূহল ও সদিচ্ছা নিয়ে নাচগুলির বৈচিত্র্যের উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে তা সেদিনের গ্রন্থণায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। আঙ্গিকের সঙ্গে অনুভূতি, রূপের সঙ্গে চরিত্র, ভাবের সঙ্গে দর্শনকে মেলাবার একটা চেষ্টা বলে কিছু সেদিন আমরা দেখেছি। মাঝে মধ্যে দেবযানীর সহশিল্পী একজন পুরুষ নর্তক তাঁর মৃদঙ্গ সাহচর্যে নাচ দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তালের দুরূহ বয়নের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিমার উৎকর্ষ ছিল সেই পুং চোলমের আবেদন।

কোঙ্করা নাচে পায়ের কাজ তা রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে মুদ্রাকল্পনা, শ্রীকৃষ্ণ বন্দনার সঙ্গে ভাব মাধুর্য, এবং বরগীতের সঙ্গে আঙ্গিকনিষ্ঠা দেবযানীর সেদিনের নাচের উল্লেখ্য উপচার। নাচগুলি ছাড়াও মনে থাকবে যে সমস্ত গান পরিবেশিত হয়েছিল নাচের সাথী হিসেবে। এখনও সে সুরগুলি মনে পড়ে দেবযানীর 'ভাও'-এর কথা ভাবলে।

—নৃত্য-সমালোচক

দেবযানী চালিহা

ঢাকায় পাক ফৌজের আত্মসমর্পণ বর্তমান সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনানায়ক নিয়াজি ভারতের সেনানায়ক জেনারেল মানেকশ সমীপে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পেশ করেন। জেনারেল মানেকশ সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরে বলেন : আত্মসমর্পণ করুন। ১৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পাক জেনারেল নিয়াজি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন অস্ত্র ও ফৌজসহ জেনারেল আরোরার কাছে। এই আত্মসমর্পণের শর্তের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের সমস্ত পাকিস্তানী সৈন্য—স্থল নৌ ও বিমানবাহিনীর। তা ছাড়া আছে আধা সামরিক ও অসামরিক সশস্ত্র বাহিনীগুলি। এদিনই আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত নথিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তানী যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি জেনিভা চুক্তি অনুসারে মানবিকতাপূর্ণ আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যায় যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বেচ্ছায় এককভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনেও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। জঙ্গীশাহীর প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং ১৭ ডিসেম্বর রাত্রি আটটা থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেওয়া হয়।

দেশী সংবাদ

১৩ ডিসেম্বর—ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন: এক বছরে ১৩৫ কোটি টাকার নতুন কর ধার্য করা হবে এবং সরকার বাজারে নতুন করে জাতীয় প্রতিরক্ষা ঋণপত্র ছাড়বেন। তিনি আশা করেন জনগণ এতে সাড়া দেবেন এবং অন্তত একশ কোটি টাকার ঋণ পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত অন্তর্বর্তী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চবন আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন। বেতনের হার ভেদে সাহায্যের পরিমাণ ৭ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বাড়ছে।

১৪ ডিসেম্বর—ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু কিছু শরণার্থী পরিবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে শুরু করেছে। তবে সরকারের হাতে এখন পর্যন্ত কোন পরিসংখ্যান নেই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যপাল রাজ্য ত্রাণ দফতরের কাছে ওই পরিসংখ্যান চেয়ে পাঠিয়েছেন। বনগাঁ ও বসিরহাটে চেক পোস্ট খোলা হয়েছে।

ঢাকার পতন আসন্ন হয়ে ওঠায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি উর্ধতন অসামরিক অফিসারদের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ সরকারকেও অনুরোধ করেছেন। এতদ্বারা আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্ব কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন।

১৫ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী বছর গোড়ার দিকে এই সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল।

বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শ্রীনজরুল ইসলাম এবং পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল শ্রীডায়াসের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার-কালে প্রধানত বাংলাদেশের শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে অসামরিক প্রশাসন চালু করার ব্যাপারে সহযোগিতা নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয় বলে জানা গিয়েছে।

১৬ ডিসেম্বর—বাংলাদেশে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর পরাজয়ের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্ভবত শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির জন্য সচেষ্ট হবেন। সংসদে বাংলাদেশে পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী এই আশা প্রকাশ করেন যে, নতুন জাতির জনক নিজেকে দেশের জনগণের মধ্যে তাঁর ন্যায়সংগত আসন গ্রহণ করে জাতিকে শান্তি প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

১৭ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা

গান্ধী দীর্ঘজীবী হোন, একথা বলতে সি পি এম এবং তাঁর সঙ্গী কয়েকটি বামপন্থী দলের আপত্তি। এমন কি ওই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধের সাফল্যের জন্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় জওয়ানদের জন্য গর্ব প্রকাশ করতেও কুণ্ঠা। শেষ ক্ষেত্রে এ আপত্তি প্রধানত আর এস পি'র। এই নিয়ে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটায় আজ কলকাতার পৌর সংসদের একটি প্রস্তাবিত মিছিল পণ্ড হয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বলেন: পাকিস্তান ভারতের এক তরফা যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। তবে এতে স্থায়ী শান্তি আসবে কিনা তিনি তা বলতে পারেন না। তাই প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। কংগ্রেস সংসদ দলের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী ওই বক্তব্য রাখেন।

১৮ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে : কারো দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে নয় ভারত তার নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। তিনি আরও বলেন সীমিত উদ্দেশ্য নিয়েই যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে তা ভারত ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছে।

সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বিধবা স্ত্রী নিহতদের পোষ্যবর্গ এবং যুদ্ধের ফলে বিকলাঙ্গদের তত্ত্বাবধানের জন্য আইন প্রণয়ন সহ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভায় ঘোষণা করেন।

১৯ ডিসেম্বর—ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ব্যবস্থা চালু হয়...

জন্য বাংলাদেশ সরকার যে প্রস্তাব দিয়েছেন ভারত সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তা বিবেচনা করে দেখছেন। এই উদ্দেশ্যে উভয় সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুক্তভাবে সমীক্ষা চালানোর বিষয়টিও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

ডলারের অবমূল্যায়ন এবং মারক, ইয়েন ও অপর কয়েকটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে টাকার অবমূল্যায়ন অথবা যা আছে তাই রাখা—এর মধ্যে কোনটা ভারতের পক্ষে লাভজনক—অর্থ-মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞরা তা বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৩ ডিসেম্বর—ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার আলেক হিউম আজ ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধ সত্ত্বেও ব্রিটেন চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে সামরিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে যাবে। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, যে সমস্ত জিনিস দেওয়া হবে, তা ভাল করে দেখেই দেওয়া হবে।

১৪ ডিসেম্বর—নিরাপত্তা পরিষদে আরও একটি মার্কিন প্রস্তাবের সমর্থন হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতির জন্য প্রস্তাবটি আনা হয়েছিল কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ভেটো দিয়ে প্রস্তাবটি খতম করে দেয়। এই নিয়ে নিয়ে রাশিয়া তিনবার ভেটো প্রয়োগ করল।

১৫ ডিসেম্বর—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো আজ নাটকীয়ভাবে সব কটি খসড়া প্রস্তাব ছিঁড়ে ফেলে সদলবলে নিরাপত্তা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যান। পূর্বে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : এটা বোধ হয় আমার শেষ বক্তৃতা। এখানে আমরা আত্মসমর্পণ করতে আসিনি।

১৬ ডিসেম্বর—নিক্সন প্রশাসনের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আজ বলেন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্বে পাকিস্তানকে ভারতের হাতে দিয়ে রেখেছে—পশ্চিম পাকিস্তানের অনুরূপ যাতে তেমন ব্যাপার না ঘটে, সেজন্যই মার্কিন সরকার এখন চেষ্টা করে চলেছেন।

১৭ ডিসেম্বর—মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ কাল রাতে ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকা পূর্ব পাকিস্তানকে বড় রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত তবে একথাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মর্যাদা সম্পর্কে আমেরিকা কোন ভূমিকা নিচ্ছে না।

১৮ ডিসেম্বর—ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইয়াহিয়ার বিদায় আসন্ন হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। লাহোর, পেশোয়ার—বড় বড় শহরে প্রবল বিক্ষোভ। ওদিকে ভুট্টোকে অবিলম্বে দেশে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। জরুরী তলব পাঠিয়েছেন পাক প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়াহিয়ার নাম কোথাও নেই।

১৯ ডিসেম্বর—পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর বিরুদ্ধে যখন সারা পশ্চিম পাকিস্তান প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে তখন পাক বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়: ইয়াহিয়া আগামীকাল পদত্যাগ করছেন। পাক বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মারশাল ইয়াহিয়া খানের প্রকাশ্যে বিচার দাবি করেছেন। খান সাহেব যাতে দেশ থেকে পালাতে না পারেন সেজন্য তাঁকে কোন বিমান না দিতে তিনি পাক বিমান বাহিনীর কম্যানডারকে অনুরোধও করেছেন।

শ্রেষ্ঠ রচনা ॥ শ্রেষ্ঠ লেখক

মিত্র ও ঘোষের বাংলা পকেট বই

তৃতীয় দফার সাতখানি বই

প্রকাশিত হল

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

হিন্দী উইদাউট টিয়ার্স

(কৌতুকমধুর উপন্যাস)

॥ পরিমল গোস্বামী ॥

বেনামী চিঠি ও হীরের আংটি

(রহস্যোপন্যাস)

॥ লীলা মজুমদার ॥

ফেরারী

(রহস্য উপন্যাস)

॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥

অপার্থিব (নাটক)

॥ বিমল কর ॥

স্বপ্নের নবীন ও সে

(উপন্যাস)

॥ শঙ্কু মহারাজ ॥

কেঁদুলীর মেলায়

(ভ্রমণ কাহিনী)

॥ ডাঃ এন, আর, গুপ্ত ॥ **কন্যা কেশবতী** (রূপচর্চা ও কেশচর্চা) প্রত্যেকটি বই ২৲

গ্রাহকরা শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন পাবেন। অর্থাৎ অগ্রিম পাঠানো দু'টাকা বাদে আর ৯·২০ টাকা দিলেই সাতখানি বই পাবেন। চতুর্থ দফার অগ্রিম টাকা জমা শুরু হয়েছে।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
নূতন উপন্যাস

পাও নাই পরিচয় ৪৲

শংকরের
অসামান্য উপন্যাস

সীমাবদ্ধ ৬৲

নবম মুদ্রণ

॥ জরাসন্ধ ॥ **নিঃসঙ্গ পথিক**

॥ প্রমথনাথ বিশী ॥ **পূর্ণাবতার**

॥ সত্যজিৎ রায় ॥ **কাঞ্চনজঙ্ঘা**

॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ **কলকাতার কাছেই**

॥ মহাত্মা গান্ধী ॥ **সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার**

॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ॥

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

বিভূতি রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

॥ চৌদ্দ টাকা ॥

প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ

॥ ষোল টাকা ॥

॥ বিমল মিত্র ॥

আমি ৮৲ স্ত্রী ৭৲

তারাশংকরের সর্বশেষ রচনা **১৯৭১** —রক্তাক্ত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায়

মাত্র একুশ দিনে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল—৬৲

তারাশংকর রচনাবলী

তারাশংকরের সমস্ত প্রধান রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

অগ্রিম ১০৲ জমা দিয়ে গ্রাহক হ'লে শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন বাদ পাবেন।

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোনঃ ৩৪-৩৪৯২
৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

কালকূট

ছদ্মনামে যে ব্যক্তিটি সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন, আসল নাম তাঁর যা-ই হোক, বর্তমান কালের তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান সাহিত্যিক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ স্বাদ থাকে, এবং সৌরভ,—যা খানিকটা বা মিস্টিসিজম, খানিকটা বা ইন্দ্রিয়াতীততার মিশ্রণে সৃষ্ট এক নবতর রসসৃষ্টি,—তা অন্যত্র দুর্লভ। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে' প্রভৃতি উপন্যাসই তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। সেই স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবার লিখেছেন আর একখানি অসাধারণ উপন্যাস :

অমৃত বিষের পাত্রে

সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপেই বিশ্ব-বন্দিত। সংগীত-পরিচালক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিও তাঁর কম নয়। কিন্তু তিনি যে একজন কৃতবিদ্য চিত্রীও—সে খবর অনেকেরই অজানা। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর অঙ্কনগুরু। এবারের 'বিনোদন সংখ্যা'য় সত্যজিৎবাবু তাঁর অঙ্কনগুরু সম্পর্কে একটি অতি অন্তরঙ্গ রচনা উপহার দিচ্ছেন 'দেশ'-এর পাঠকদের—যেটির শিরোনাম :

বিনোদদা'

বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮

খেলাধুলা

সুঁটে ব্যানার্জি : ফাস্ট বোলার চাই! শিক্ষার্থী কই? ॥ **প্রদীপ ব্যানার্জি** : জিততেই হবে ॥ **রাজন বালা** : ভারত উন্নত, না বিশ্ব-ক্রিকেট অবনত? ॥ **চিরঞ্জীব** : ঢাল নেই, তরোয়াল নেই...... ॥ **মুকুল দত্ত** : দুই দশকের হকি ॥ **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** : বাস্কেট, খো-খো, ভলি গড়ের মাঠেই বন্দী ॥ **শ্রীধর কুণ্ডু** : মুষ্টিযুদ্ধ প্রস্তুত হচ্ছে ॥ **অর্জুন মণ্ডল** : কেন এত পরাজয়?

ফ্যাশন

শ্রীমতী : অভিযান ॥ **সিদ্ধার্থ সরকার** : আপনিই কি বিশ্বসুন্দরী?

সংগীত

তিমিরবরণ : আজও মনে পড়ে ॥ **রাধাকান্ত নন্দী** : তবলার বোল, তবলিয়ার বুলি ॥

যাত্রা

ব্রজেন্দ্রকুমার দে : পেশাদার যাত্রার চল্লিশ বছর ॥ **সূত্রধার** : মাটি আর মানুষের কাছাকাছি ॥

নাট্য

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-শিশির প্রতিভা ॥ **তৃপ্তি মিত্র** : ফ্ল্যাশ-ব্যাক ॥ **বাদল সরকার** : থিয়েটারী থিয়েটার : অঙ্গন-মঞ্চ ॥ **অমিতাভ দাশগুপ্ত** : আমেরিকায় শিশিরকুমার—সতু সেন প্রসঙ্গে ॥ **নারায়ণ দত্ত** : একটি বড়দিনের নাটক ও তার উপসংহার ॥

চলচ্চিত্র

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : সিনেমা সংকীর্তন **সুভাষ দত্ত** : ছাপ ॥ **বাসু ভট্টাচার্য** : হিন্দি চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ ও তার সমস্যা ॥ **পূর্ণেন্দু পত্রী** : ক্লোজ-আপ ॥ **সমর বন্দ্যোপাধ্যায়** চলচ্চিত্রে যুগ-প্রভাব ॥

শ্রীদিলিপকুমার রায়

নিজে একজন সাধক ও ভক্ত—সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞও। তাঁর মত বহুপ্রতিভাধর শিল্পী খুব কমই দেখা যায়। কবি অতুলপ্রসাদও ছিলেন একজন ভক্ত শিল্পী। তাঁর ঈশ্বরভক্তির গানগুলি, সংগীতপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, তুলনাবিহীন। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীদিলীপকুমার তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে মানুষ কবি ও ভক্ত হিসেবে অতুল-প্রসাদের এমন একটি পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন। যেটি শুধু অপূর্বই নয়, অনুপমও। প্রবন্ধটির নাম :

অতুলপ্রসাদ — মানুষ, কবি, ভক্ত

মান্না দে

আজকের চলচ্চিত্র-জগতের সব চেয়ে জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। মান্নাবাবুর সংগীতগুরু ছিলেন তাঁর নিজেরই পিতৃব্য বিখ্যাত অন্ধগায়ক, বাংলাদেশের সংগীত-ক্ষেত্রের এককালীন দিকপাল কৃষ্ণচন্দ্র দে। অতীতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ করেছেন বর্তমানের খ্যাতনামা সংগীত-শিল্পী, স্নেহভাজন শিষ্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রও, মান্না দে তাঁর এই সুদীর্ঘ রচনায়—

'সুরের সূর্য কৃষ্ণচন্দ্র'য়

সন্তোষকুমার ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

'কানুর গীত' ও 'সিনেমা সম্পর্কে কয়েকটি চিন্তা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা বিধৃত করেছেন।

প্রকাশিত হয়েছে

দাম : টাকা ৪.০০ ॥ এবং অন্তঃশুল্ক ২ পয়সা ॥ রেজিস্ট্রি ডাকে টাকা ৫.১৭

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মুস্তাফা মনোয়ার

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯

শনিবার, ১৬ পৌষ, ১৩৭৮

Saturday 1 January, 1972

বাংলাদেশ সরকারের কর্মভার

বাংলাদেশ সরকার রাজধানী ঢাকায় তাঁদের কর্মারম্ভ করেছেন। পাকিস্তানের সামরিক প্রভুরা এবং ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতারা যদি নির্বোধ না হতেন, কিছুমাত্র দূরদর্শিতা থাকত তবে যে কাজ আজ শুরু হল অনেক আগেই তার সূচনা হতে পারত। শত সহস্র মানুষের রক্ত, অশ্রুজল ও অভিশাপ নিয়ে ইয়াহিয়া বিদায় নিয়েছেন, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে দাবি জানিয়েছিল তা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জন করে নিয়েছে। বীরের এই রক্তস্রোত অবশ্যই বৃথা হয় নি। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে মূল্য বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে তার বেদনাও কম নয়। সেই বেদনা ও ত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ সরকারের যাত্রা সূচিত হল।

প্রকৃতপক্ষে আগে যা ছিল তার হিসেব না করাই ভাল, বাংলাদেশ সরকারকে সব কাজই নতুন করে শুরু করতে হবে। স্বভাবতই তাঁদের কাজের পরিধিও যেমন বিস্তৃত, দায়িত্বও প্রচুর। সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি দেশকে গড়ে তোলার সব রকম দায়-দায়িত্ব তাঁদের হাতে। প্রথমত যা, তা হল ন্যায়, মানবাধিকার ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শে একটি জন-কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যটি হবে সর্বজনের আর্থিক ও আত্মিক স্বাধীনতা।

বাংলাদেশ সরকার তাঁদের কর্মভার গ্রহণ করার পর প্রথমেই যেদিকে নজর দিতে চেয়েছেন—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা—আমরা তার গুরুত্বও বুঝতে পারি। যে বিশৃঙ্খল অবস্থা, অরাজকতা, নৃশংসতার মধ্যে গত আট ন' মাস বাংলাদেশের মানুষকে বসবাস করতে হয়েছে তার অবশ্যই একটা প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই প্রতিক্রিয়া যদি সংযত ও শৃঙ্খলা-পূর্ণ না হয় তবে বাংলাদেশের সরকারের হাতে যে অসংখ্য কর্মভার রয়েছে তার ক্ষতি হবে, তাতে জনসাধারণের ক্লেশ ও দুর্গতি কমবে না।

বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় কাজ হল, যে এক কোটি শরণার্থী এই কয় মাসে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের যত শীঘ্র সম্ভব স্বদেশে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে, এই শরণার্থীরা ভারতের উদ্বেগ বিশেষ। ভারতের আর্থিক সংগতির ওপরও একটি বড় চাপ। বাংলাদেশ সরকার খুব দ্রুত যদি শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিশ্চিন্ত একটি আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারেন আগামী দু তিন মাসের মধ্যে সমস্ত শরণার্থী ফিরে যেতে পারেন। এমন কি সাম্প্রতিক শরণার্থীরা ছাড়াও কিছু আগে যাঁরা স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন, যাঁরা বাংলাদেশেরই মানুষ, তাঁরাও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে পারেন।

গত আট ন মাসে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মুখের অন্ন ও মাথার আশ্রয় কেমন করে জুটেছে আমরা জানি না। অনুমান করি সহজে নয়, স্বচ্ছন্দে সঙ্গে নয়। এই মানুষগুলিকে আজ পেশা ও কর্মে নিযুক্ত করতে হবে। তার জন্যে কলকারখানা চালু করা, বাজার-হাট খোলা ও স্বাভাবিক বেচাকেনা শুরু করার ব্যবস্থা চাই। মোট কথা রুজি রোজগারের প্রত্যেকটি ব্যবস্থাকেই অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে। ভাঙা অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়।

স্কুল-কলেজ আবার খুলুক, আইন-আদালত সরকারী অফিসের কাজকর্ম শুরু হোক, কলকারখানায় ধোঁয়া উঠুক, রাস্তায় ঘাটে দোকান পশার বসুক—অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলতে যা বোঝায় তার লক্ষণ যত বেশী করে দেখা দেবে ততই মানুষের নিশ্চিন্ততা বাড়বে।

বাংলাদেশ সরকারের হাতে অগুনতি কাজ, কোনোটাই একেবারে সহজসাধ্য নয়, তবু যে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সততা নিয়ে কর্মারম্ভ হয়েছে আমরা কামনা করব সমস্ত বিঘ্ন থেকে যেন তাঁরা উদ্ধার পান।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা
মোট : ৬২ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা—১ থেকে সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক ... টাঃ ৩২.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৩৭.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৪৫.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৮৪.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৫৭.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১৪.৭৬

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক ... টাঃ ১৫৪.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৩৮.৭৬

নতুন বছরের উপহার

দোহাই কমরেড, বলুন

মার্কুবাদী কমিউনিসট পারটির হে মহান নেতা, কমরেড জ্যোতি বোসদা! দোহাই আপনার, বলুন, এবার আমরা, আপনার অন্ধ অনুগত ফলোয়াররা, এবার কী লাইন নেব? বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ইন্দিরা গান্ধীর ভারত যে ভূমিকা নিয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের লেটেস্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী? মার্কুবাদী তত্ত্বদর্শী কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদা! আমরা আপনার দিব্যলোক বাণী শোনবার জন্য আপনার চুরুট-ফোঁকা মুখের দিকে চেয়ে দিবানিশি ঠাকিয়ে যে বসে আছি বড়দা! বলুন, বলুন।

ইলেকশন এসে গেল। লোককে আমরা এবার কী বলব? আচ্ছা, লাইনটা ঠিক করে নেবার জন্য কয়েকটা প্রশ্নের বখেড়া গোড়া থেকেই ঢুকিয়ে রাখা যাক, কেমন? বেশ। আমাদের প্রথম প্রশ্ন : বাংলাদেশের এই যে স্বাধীনতা, এটাকে আমরা মুক্তি-সংগ্রাম বলছি তো?—যেমন ভিয়েতনামের যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলছি। এটা যদি মুক্তি-যুদ্ধ বলে স্বীকার করে নিই, তা হলে এ-কথাও মেনে নেব তো যে কমিউনিসট নেতৃত্ব না হলেও মুক্তিযুদ্ধ চলতে পারে? শুধু যে চলতে পারে তা নয়, জাতীয় নেতৃত্বে যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়, তাতে তো দেখা গেল ক্ষেত্র-বিশেষে দেশের স্বাধীনতা তাড়াতাড়িই আসে, নয় কি বড়দা? দাদা, মাত্র ন-মাসের মধ্যে বাঙলাদেশের খেল খতম হয়ে গেল! এ কী! অ্যাঁ? বেশ, এটা মুক্তি-যুদ্ধই। আপনারা সকলেই যখন বলছেন, তখন না হয় তা মেনে নিলাম। তা হলে দাদা, শ্লোগান কী লিখব? কমিউনিসট নেতৃত্বে ভিয়েতনামের যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে, আমরাও কমিউনিসট, তাই আমরা মানানসই আওয়াজ ছেড়েছিলাম : **"তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।"** কিন্তু বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ফতে হল অকমিউনিসট নেতৃত্বে। **ওতে আমাদের কোনও রোলই** ছিল না। তাই মানে মিলিয়ে শ্লোগান দিতে গেলে আওয়াজ ছাড়তে হয় : **"ওদের বেশ, মোদের শেষ, বাঙলাদেশ বাঙলাদেশ।"** নয় কী দাদা?
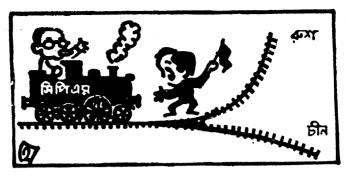
এবার আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন : বাঙলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের ভূমিকা কী? মুক্তি-সংগ্রামের হোতা? দ্বিতীয় যুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত রুশী সরকারের যে ভূমিকা ছিল, তাই? না-কী ফাশিসত্-আগ্রাসক? ভারতের ভূমিকা যদি 'ফাশিবাদী' হয় তবে আমাদের আওয়াজ হবে : "ইন্দিরা-ইয়াহিয়া এক হ্যায়, ইন্দিরা-নিকসন এক হ্যায়, ভুলো মৎ ভুলো মৎ।" এখন কী সে কথা পাবলিককে বলা যাবে বড়দা? বলুন, প্রিয় কমরেড জ্যোতি বোসদা, বলুন? বলুন বাংলার (থুড়ি পশ্চিম বাংলার) মার্কুবাদী আয়রনম্যান কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তদা, জবাব দিন? আপনাদের বাণী অনুসারে এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় 'পলিত-বুড়ো'র সুচিন্তিত লাইন অনুসারে আমরা বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়েছি, বাঙলাদেশের বীর মুক্তিফৌজকে মুক্তকণ্ঠ হয়ে প্রশংসা করেছি, আর সাধুবাদ দিয়েছি সোভিয়েত রুশকে, কেননা সে ভেটো প্রয়োগ করে চীন-মার্কিন আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রান্তকে বার বার ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু দাদা, লোকে বলছে, ভারতের নৌ-সেনা, বায়ু-সেনা এবং স্থল-সেনা সম্পর্কে আমরা কোনও উচ্চবাচ্য করছিনে কেন? আরে বাবা, আমরা সাধ করে কি সে-কথা চেপে যাচ্ছি। কাগজে তোমরাও যা পড়েছ, আমরাও তাই পড়েছি। কিন্তু দাদারা যতক্ষণ "ওসব কথা বিশ্বাস কর" বলে লাইন না দিচ্ছেন ততক্ষণ আমাদের কোনও কিছু বিশ্বাস করা বারণ। বাবা মারকুসের দিব্যি।

হ্যাঁ দাদা, এবার একটু ঝেড়ে কাসেন তো। ভারতীয় ফৌজ কি মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছে? যদি করে থাকে তো আমরা তাদের প্রশংসা করছিনে কেন? না কি ভারতীয় ফৌজ লড়াই করেইনি? যদি লড়াই না করে থাকে তবে আবার ভারতীয় ফৌজ বাঙলাদেশে গেল কী করে? কবে গেল? কেন গেল? নেমন্তন্ন খেতে? বাঙলাদেশে ভারতীয় ফৌজ গিয়েছে বলেই না আমাদের 'পলিত-বুড়ো' তাদের তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেছে। কোন্ দিকে যাই? হিসেবে কী করে গণ্ডায় অন্ডা মেলাই? দোহাই কমরেড, বলে দিন?

একটা লাইন বাতলে দিন, কমরেড, জলদি জলদি লাইনটা আমাদের ধরিয়ে দিন! ইলেকশন যে এসে গেল বড়দা! কী নিয়ে এবার লড়ব? আমেরিকার ষড়যন্ত্র? এবার বড়দা, ও ব্যাপারটার সোল এজেনসি আর আমাদের কবজায় রইল না। ওটা এবার এমনই বারোয়ারি ব্যাপার হয়ে গেল না, যে স্বতন্ত্র পারটিও চেঁচাবে "চীন-মারকিন-পাকিস্তান তফাৎ যান তফাৎ যান।" জনসঙ্ঘ তো ওই ধ্বনি মুখে নিয়ে মাঠে নেবেই পড়েছে।

আর যে ইন্দিরা নিজেই ইলেকশন চাইছেন, তাঁর রাজত্বে 'স্বাধীনতা নেই' কথাটা কেউ খাবে কী, বড়দা?

চীন সম্পর্কে আমাদের লাইন কী হবে? কমিউনিসট চীন প্রগতিবাদী নাকি প্রতিক্রিয়াশীল? চীন সিংহলে বিপ্লববাদীদের ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করতে বন্দরনায়েককে ভালভাবেই মদত দিয়েছে। এবার বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করতে নিকসন সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্যেই হাত মিলিয়েছে জনগণতান্ত্রিক চীন? প্রিয় কমরেড জ্যোতি বোসদা, ক্লাস-স্ট্রাগল তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের একটি মহাশক্তিধর কমিউনিসট দেশ মহান চীনের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মার্কুবাদী ব্যাখ্যাটি কী, জানাবেন? কমিউনিসট চীন এবং কমিউনিসট সোভিয়েত রাশিয়া কোন শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার কারণে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে পাঁয়তারা মারছে? প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী-স্বার্থের প্রকৃত গারজেন কে, কমরেড প্রমোদদা? নিকসন বন্ধু চীন, না চীনের শত্রু সোভিয়েত রাশিয়া? দোহাই কমরেড, বলুন? কী বললেন?

"জীবনের এই তো ফোয়ারা
রা রা রা রা রা রা?"

ভারত-বাংলা দেশ সম্পর্ক

বাংলাদেশের মানুষ এখন ভারতের প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ সেটা বাংলাদেশে না গেলে বোঝা যায় না। প্রত্যেকটি মানুষের চোখেমুখে, আচার-আচরণে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। প্রত্যেকটি মানুষ ভারতবাসী দেখলেই সেই কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র যে অভিনন্দন পেয়েছেন তার তুলনা নেই।

প্রথম প্রথম অর্থাৎ এবার যখন প্রথম পাক সেনাবাহিনীর পিছু হটা শুরু হল তখন কিন্তু এই জিনিস দেখা যায়নি। যখন কালিগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়েছি তখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এতটা উৎসাহ দেখতে পাইনি। ঢাকার পথে যখন হালুয়াঘাট, ময়মনসিং, মুক্তাগাছা প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়েছি তখন দেখেছি সাধারণ মানুষ একটু কেমন যেন রিজার্ভড। তাঁরা "জয়বাংলা" ধ্বনি দিয়েছেন, কিন্তু যেন তেমন প্রাণখোলা ধ্বনি নয়। তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, কিন্তু তাতেও যেন প্রাণের আবেগ কেমন কম ছিল। মারচ মাসে যে জিনিস, যে উৎসাহ, জয়বাংলা ধ্বনিতে যে প্রাণখোলা উদারতা দেখেছি এবার অর্থাৎ মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশে ঢুকে তা দেখতে পাইনি।

আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ব্যাপারটা কী? তাঁরা দুটো কারণ দেখিয়েছিলেন। প্রথম কারণ, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এর আগের বার অর্থাৎ মারচ মাসে যখন পাক সেনাবাহিনী পিছু হটল, যখন বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল স্বাধীন হল তখন প্রত্যেকটি গ্রামে, প্রত্যেকটি শহরে সকল বাঙালী আনন্দে অধীর হয়ে জয়বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে নেমে এলেন। দিন দশ পনেরোর মধ্যেই কিন্তু তাঁরা দেখলেন, ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। মুক্তিবাহিনী পারলো না। পাক বাহিনী আবার শহরে, গ্রামে সর্বত্র ছুটে এল। প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু হল। যাঁরা জয়বাংলা বলেছিলেন, যাঁরা অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন, যাঁরা মুক্তি-বাহিনীতে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হল। খুঁজে খুঁজে বের করে খুন করা হল। ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হল। বাড়ির মেয়েদের উপরও অত্যাচার চলল। যাকেই পাক বাহিনী সন্দেহ করেছে জয়বাংলার লোক তার উপরই অকথ্য অত্যাচার করেছে।

ফলে এবার অনেকেই প্রথম দিকে একটু রিজার্ভড ছিলেন। বিশেষ করে গ্রামের সাধারণ মানুষ। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না, এবারই বা ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এবারও তাঁদের প্রথম দিকে ভয় ছিল, আবার বুঝি সেই মারচ এপরিলের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

দ্বিতীয় কারণ ছিল সেনাবাহিনী সম্পর্কে একটা সাধারণ ভীতি। বাংলাদেশের মানুষ গত নয় মাস পাক সেনাবাহিনীকে দেখেছেন। দেখতে দেখতে তাঁদের মনে একটা অদ্ভুত ভয়ের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, সৈন্য মাত্রই পশু। যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকলেন তখন গ্রামের মানুষ আশংকা করলেন, এরাই বা কেমন হবে। প্রথম প্রথম সীমান্তের মানুষের তাই ভারতীয় সেনা-বাহিনী সম্পর্কেও একটা রিজার্ভড ভাব ছিল।

কিন্তু অল্প কয়েকদিনেই তাঁদের এই দুটো আশংকাই কেটে গেল। তাঁরা দেখলেন, পাক বাহিনী সব ঘাঁটি ছেড়েই পালাচ্ছে। দ্রুত পালাচ্ছে। যত এরা পালাল, সাধারণ বাঙালীর মনে তত বল বাড়ল। তারপর তাঁরা যখন শুনলেন, পাক বাহিনী গোটা বাংলাদেশেই আত্মসমর্পণ করেছে, ঢাকা পর্যন্ত মুক্ত—তখন তাঁদের সব ভয় কেটে গেল। এক-আধজন বিশেষ সতর্ক শিক্ষিত মানুষের মনে এখনও একটু আতংকের ভাব আছে—কিন্তু সাধারণ মানুষ এবার নির্ভয়। তাঁরা বুঝেছেন, আর পাক বাহিনী আসতে পারবে না। জয়বাংলা যে সত্যিই স্বাধীন বাংলা, মারচ-এপরিলের পুনরাবৃত্তি ঘটার যে কোনও আশংকা নেই এ জিনিসটা সাধারণ মানুষ খুব ভালভাবে বুঝেছেন। তাই এখন তাঁরা নির্ভয়। তাঁরা এবার প্রাণ-খুলে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। ভয় রিজার্ভড চলে গিয়েছিলেন। আনন্দে ... মাত্র আনন্দে পাগল হয়েছেন। তাঁরা ... বুঝেছেন, পাক বাহিনী পাকাপাকিভাবে বিতাড়িত। তাঁরা বুঝেছেন, বাংলাদেশ এখন পুরোপুরি স্বাধীন। তাঁরা আরও বুঝেছেন, এই স্বাধীনতার পেছনে ভারতের এবং ভারতীয় সেনা বাহিনীর অবদান কতটা। তাই তাঁরা আনন্দে পাগল। তাই তাঁরা ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ। এবং কৃতজ্ঞতা প্রত্যেকটি স্বাধীন বাঙালীর চোখমুখে আচার-আচরণে পরিষ্কার।

আমরা যত এলাকায় গিয়েছি, দেখেছি এই কৃতজ্ঞতার ভাব। ঢাকার ইনটারকনটি-নেনটাল হোটেল সাহেবদের ব্যাপার। সেখানের বাঙালী কর্মীরা সবাই সাহেবদের না সার্ভ করে আমাদের সার্ভ করেছেন—কারণ আমরা ভারতীয় সাংবাদিক। কোনও দোকানে ছোট কিছু কিনলে দোকানী দাম নিতে রাজি নয়—কারণ আমরা ভারতীয়। ভারতীয় দেখলেই সাধারণ মানুষ বুকে জড়িয়ে ধরেছে। প্রত্যেক আচরণে একটা অসাধারণ কৃতজ্ঞতার ভাব।

আমি একটা মাত্র উদাহরণ দেব। আমরা ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল যাচ্ছি। পথে একটি ছেলে হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। টাঙ্গাইল যাবে। বলল, আমাকে একটু নিয়ে যান—বাস আসছে না। কলেজে পড়ে ছেলেটি। বছর কুড়ি বয়স। ওর বাবা পাটের ব্যবসা করেন। পাট কেনা বেচা। গাড়িতে ওঠার পর ছেলেটির সংগে বিস্তারিত কথা বললাম। আমাদের প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরল। বলল: কী উপকার যে আপনারা আমাদের করেছেন তার তুলনা নেই। খানসেনারা আমাদের শেষ করে দিত। আমাদের মা-বোন কারু ইজ্জত আর থাকত না। ছেলেটি নিজেও টাঙ্গাইলের মুক্তি বাহিনীতে ছিল। বলল: আমরা লড়াই করছিলাম ঠিকই। কিন্তু আমরা কী লড়াই করে পারতাম ওদের হটাতে! একা আমরা পারতাম না। পারলেও বছরের পর বছর লাগত। ওরা তার মধ্যেই আমাদের সবাইকে শেষ করে দিত। আপনারা এতবড় ঝুঁকি নিয়ে, চীন-আমেরিকার লাল চোখকে অবজ্ঞা করে এইভাবে আমাদের সাহায্যে না এলে ওরা আমাদের শেষ করে দিত। আপনারা যে উপকার করলেন, জীবনে আমরা তা ভুলব না।

ঠিক এই ভাষায় না হলেও বাংলাদেশের সর্বত্র আমি এই কৃতজ্ঞতার ভাব দেখেছি।

*

অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দ্বিতীয় আশংকাটিও কেটে গিয়েছে। তাঁরা দেখেছেন, ভারতীয় সেনা-বাহিনী আর পাক সেনাবাহিনীতে বিরাট তফাৎ। ভারতীয় সেনাবাহিনী গোটা বাংলা-দেশে যে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা নেই।

কোথাও সাধারণ মানুষের উপর দুর্ব্যবহারের কোনও নজির পাওয়া যায়নি। বিদেশীরা যাঁরা সদাসর্বদা ভারতের দোষ খুঁজে বেড়াতে ব্যস্ত তাঁরাও এখনও পর্যন্ত একটাও খারাপ নজির দেখাতে পারেননি। বরং, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যবহার দেখে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন।

এর ফলে হাজারে হাজারে সাধারণ বাঙালী ছুটে এসেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি অফিসারের মুখে শুনেছি স্থানীয় লোকের কাছে এত সহযোগিতা না পেলে আমরা কিছুতেই এই লড়াই এত তাড়াতাড়ি জিততে পারতাম না। যেখানেই আমাদের অসুবিধা হয়েছে, ওরা এগিয়ে এসেছেন। মালপত্র কামান-বন্দুক সব কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছেন। পারলে আমাদেরও কাঁধে করেই নদী পার করিয়ে দিতেন। ঢাকা শহরে, ঢাকার পথে সর্বত্র যে অভিনন্দন ভারতীয় সেনাবাহিনী পেয়েছেন তার তুলনা নেই। দু' একজন অভিজ্ঞ বিদেশী সাংবাদিকের কাছে শুনেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এত অভিনন্দন ইউরোপে কোনও মুক্তিবাহিনীও পায়নি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের ভয় সেই—বরং শ্রদ্ধা আছে। কারণ, তাঁরা প্রবল অত্যাচারী পাক বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হয়েছিল পাক সেনাবাহিনীর বিরাট শক্তি, তাদের কেউ হারাতে পারবে না। এবার যখন তাঁরা দেখলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই পাক বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা বেড়েছে।

আর দেখছে, সেই শক্তিশালী সেনাবাহিনী কিন্তু সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে না। একটা উদাহরণ দেই। ময়মনসিং খেয়া ঘাট পার হচ্ছি, পর পর তিনটা ভারতীয় মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। একটা স্থানীয় গাড়ি এল। তার পেছনে এল একটা বাংলাদেশের গাড়ি। এক ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছেন। সঙ্গে বাচ্চা রয়েছে। দু'-তিনজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও। ভারতীয় জওয়ানরা তাকে আগে খেয়া পার হতে দিলেন। ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

পাক মিলিটারির ধারে কাছে কোনও বাঙালী যেতে সাহস পেত না। তাদের দেখলে লোকে পালাত। কাউকে একটু অপছন্দ হলেই ওরা চড় চাপড় লাথি মারত। আর সন্দেহ হলেই খুন। সেই সেনাবাহিনী আর এই সেনাবাহিনীতে এত তফাৎ দেখে বাংলার সাধারণ মানুষ আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় অভিভূত।

★

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে প্রত্যেকটি ভারতীয়েরই বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্ব রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর, ভারতীয় অফিসারদের এবং প্রত্যেকটি ভারতীয়ের। তাদের আচরণের উপর নির্ভর করবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ।

গোটা বাংলাদেশ ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তা বলে কেউ যদি এই কৃতজ্ঞতার সুযোগ নিতে যান তাহলে আজ না হোক কাল সম্পর্ক খারাপ হতে বাধ্য। ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোথাও যেন কেউ সুযোগ নিতে না যান।

আমাদের বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে আর একটি কারণে। বহু বিদেশী রাষ্ট্র এখন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তিক্ত করার জন্য সচেষ্ট। ওরা নানাভাবে এখন থেকেই এই কাজে নেমে পড়েছে। আমরা কেউ যদি সামান্য ভুল করি তা হলে তারা সেই সুযোগটা সবচেয়ে বেশি করে নেবে।

এই জন্য ভারত সরকারকে এখনই বিশেষ সতর্ক হতে হবে।

প্রথমত, যাকে তাকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, যে ভারতীয়—সে অফিসারই হোক, সেনাই হোক, সাধারণ নাগরিকই হোক—বাংলাদেশে গিয়ে কোনও খারাপ আচরণ করবে তাকে অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের কোথাও কোনও ভারতীয় ব্যবসায়ীকে বা শিল্পপতিকে ঘাঁটি গাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভুললে চলবে না যে, ভারতের সঙ্গে নেপালের তিক্ত সম্পর্কের একটা বড় কারণ হল, নেপালে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আচরণ।

এবং চতুর্থত, কোনও ভারতীয়ের আচার আচরণে যেন এই ভাব না দেখা দেয় যে, ভারত বাংলাদেশের বড় ভাই। বাংলাদেশও একটি রাষ্ট্র। ভারতও একটি রাষ্ট্র। দুজনেই সমান। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যা কিছু করেছে তার প্রতিদানে সে কিছু চায়—এটা মনে করার কোনও সুযোগ কোনও বাঙালী যেন না পান।

ভারত-বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ সম্পর্কের উপর পৃথিবীর এই অঞ্চলে ভারতের ভবিষ্যৎও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যদি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তিক্ত হয়—তাহলে ভারতেরও ক্ষতি, বাংলাদেশেরও ক্ষতি।

২৬-১২-৭১

বরুণ গাঙ্গুলী

বিসমিল্লায় গলদ

চার্চিল যখন জাঁক করে বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে তোলবার জন্যে তিনি বিলেতের প্রধানমন্ত্রী হন-নি বিধাতাপুরুষ তখন একটু মুচকে হেসে-ছিলেন। তেমনি হাসি তিনি বুঝি হেসে-ছিলেন যখন পাকিস্তানী জংগীশাহীর জবরদস্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ তড়পে-ছিলেন যে "ওই মেয়েটাকে" তিনি দেখে নেবেন। "মেয়েটাকে" দেখে নিতে আর তাঁর হয়নি, সেই তাঁকে চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছেড়েছে। মান খুইয়ে পুরুষ সিংহ এখন ঢুকেছেন শেয়ালের গর্তে জান বাঁচাবার জন্যে। তাও বাঁচবে কিনা ভগবানই জানেন। তবে স্বস্তি তিনি হারিয়েছেন চিরদিনের মতো। কে জানে হয়তো বা শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই তাঁকে দাঁড়াতে হবে গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায়, জবাবদিহি করতে হবে দুনিয়ার লোকের কাছে কেন তাঁর বিরাট জংগী বেলুনটা চোদ্দ দিনেই ভারতীয় জওয়ানদের চাপে চুপসে গেল। মুজিবরের বেলা মামলাটা ছিল সাজানো—একটা ধাপ্পা-বাজি। শেষ পর্যন্ত দু'বারই ইয়াহিয়া খাঁ তাঁকে সাজা দিতে ভরসা পাননি। কিন্তু তাঁর নিজের মামলা তো আর প্রহসন নয়। তার দায় তিনি এড়াবেন কী করে?

মামলা যদি সত্যিই হয় আর কোনও মতে আইনের কারচুপিতে জাল কেটে ইয়াহিয়া খাঁ যদি বেরিয়ে আসতেও পারেন পাকিস্তানে তিনি আর টিঁকতে পারবেন কি না সন্দেহ। যে পথে গিয়েছেন পাকি-স্তানের জংগী নায়কেরা সেই পথেই যেতে হবে তাঁকেও ইস্কান্দার মির্জা আর আয়ুব খাঁর পায়ের দাগ অনুসরণ করে। তিনি লণ্ডনে সরাইখানা খুলবেন নাকি মার্কিন মুল্লুকে, কিংবা ইরানে গোলাপ ফেরি করে বেড়াবেন নাকি জর্ডানে তা অবশ্য তিনি নিজেই এখনও জানেন না। কিন্তু যে তর্কী নাচন তাঁকে নাচিয়েছেন কূটনীতির দরবারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যাঁর নাম মুখে আনতেও তাঁর ঘেন্না হতো, আর লড়ায়ের মাঠে জেনারেল সাম মানেকশ যাঁর সাগরেদ ছিলেন ইংরেজ আমলে ভারতীয় বাহিনীতে ইয়াহিয়া খাঁ, যে তাঁর রাজনীতির সাধ আর লড়ায়ের শখ দুই-ই মিটে গেছে। তবে কমলি তিনি ছাড়তে চাইলেও কমলি কী তাঁকে সহজে ছেড়ে দেবে? পাকিস্তানের যে হাল করে তিনি ছেড়েছেন তাতে দেশের লোক তাঁকে ক্ষমা কী আর করবে? কথার কারসাজিতে এবারের যুদ্ধে চূড়ান্ত হারকে তো আর জিত বলে চালানো যাবে না যা করা হয়েছিল ১৯৬৫ সনে।

নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছেন ইয়াহিয়া খাঁ, সংগে সংগে পাকিস্তানেরও। অথচ তিনি যদি একটু বুঝে সুঝে চলতেন, ঠাণ্ডা

দেবরাজ

মাথায় সব দিক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন তা হলে হয়তো তাঁরও ভরাডুবি হতো না, পাকিস্তানেরও নয়। ১৯৭০য়ের ডিসেম্বরের নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে তিনি যদি আওয়ামি লীগের হাতে দেশের ভাগ্য সঁপে দিতেন তা হলে শেষ জীবনটা তাঁর সুখেই কাটতো, অন্ততে কলংকের ডালি মাথায় নিয়ে তাঁকে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে হতো না। চাই কী মুজিবের আমলে তিনি পাকিস্তানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিও হতে পারতেন। পারলেন না নিজের বুদ্ধির দোষে আর খানিকটা পশ্চিম পাকিস্তানী কুচক্রের চাপে। একজন বাঙালীর হাতে গোটা পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দিতে তাঁর ছিল ঘোর আপত্তি, সে আপত্তি তাঁর একার নয়, পাকিস্তানের হার্ট অর্থাৎ হৃদয় যে পাঞ্জাব তার প্রত্যেকটি নেতার, ব্যবসায়ীর, ফৌজী পাণ্ডার। তাদের দাবি মেনে নিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরলেন মরিয়া হয়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলা দেশে। তাঁকে মদত দিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টো নির্বাচনে যাঁর দল হয়েছিল দু' নম্বর।

ইয়াহিয়া খাঁ চেয়েছিলেন নিজের শুধু নয় পাকিস্তানের পশ্চিমী এলাকার লোকে-দের প্রতিপত্তি চিরদিনের জন্য কায়েম রাখতে। তাই তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন পূব অঞ্চলের বিরুদ্ধে। ১৯৭১র ২৫ মার্চ রাত্রে তাঁর হুকুমে পাকিস্তানী ফৌজ ঢাকায় শুরু করলো এক পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞ। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে, বে-আইনী করা হলো তাঁর আওয়ামি লীগকে, নির্বাচনে যার হয়েছিল জয়জয়কার। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ইয়াহিয়া খাঁ যখন তাঁর ফৌজী ক্ষ্যাপা কুকুরদের লেলিয়ে দেন নিরীহ বাঙালীদের ওপর তখনও তিনি কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন আপসের জন্যে মুজিবের সংগে। বাংলা দেশ অখণ্ড পাকি-স্তান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা রাষ্ট্র হয়ে থাকার দাবি তোলেনি। বাঙালীদের মনে আলাদা রাষ্ট্র গড়বার ইচ্ছে জাগিয়ে তুলে-ছিল ইয়াহিয়ার ফৌজের বর্বর অত্যাচার। তাঁর অমানুষিক নির্যাতনে দশ লাখ বাঙালী যদি শহীদ না হতো তা হলে আজও বাংলা দেশ পাকিস্তানের পূব অঞ্চল হয়েই হয়তো থাকতো যদিও তার জন্যে পাকিস্তানি সংবিধানের খোল নলচে দুই-ই বদলে ফেলতে হতো।

যা করবেন না বলে ইয়াহিয়া খাঁ পণ করেছিলেন এমনই তাঁর বরাতের ফের যে তাঁকেই তা করতে হলো। তবে সান্ত্বনা তাঁর নেই যে তা নয়। পাকিস্তান দু টুকরো হওয়ার ব্যাপারে তিনি তো নিমিত্ত মাত্র—ও রাষ্ট্রের ভিত ধসে পড়েছে একটু একটু করে তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে। তাঁর ধাক্কায় ওই নড়বড়ে ইমারতই ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলেও তিনিই ওটাকে খতম করেছেন এ কথা বলা ঠিক হবে না। ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল ষোড়শ লুইয়ের আমলে। সে অভ্যুত্থান কিন্তু তাঁর অত্যাচারের অবিচারের প্রতিবাদে খালি নয়। ঘুণ ধরেছিল ফরাসী সমাজ ব্যবস্থায় অনেক কাল আগেই, তার কাল পূর্ণ হয়েছিল ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বের সময়। পাকিস্তানের কাঠামোতেও ঘুণ লেগে-ছিল তার পত্তনের সময়েই। তেইশ-চব্বিশ বছরে সেটা এমনই ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল যে আওয়ামি লীগের একটি ঘায়েই তা ভেংগে খান খান হয়ে গেছে। যে উৎপীড়ন বাঙালী-দের ওপর পাকিস্তান করেছে তার কোনও নজির ইতিহাসে নেই।

ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন বাঙালীরা কেন বাগীশ বই তো নয়। ইংরেজরা বাঙালীদের অসামরিক জাত বলে যে মিথ্যে কলংক রটিয়েছিল তা তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন মার দেখলেই বাঙালীদের পলিটিকস্ করার শখ মিটে যাবে, শেখ সাহেব আর তাঁর দলবল পথে আসবেন। তিনি ভুলেও ভাবেননি যে বাংলা দেশে ফৌজী তাণ্ডব দিন সাতেকের বেশী চালাতে হবে কিংবা ঢাকার বাইরেও সে শ্রাদ্ধ গড়াবে। আওয়ামি লীগ আর মুক্তিবাহিনী প্রমাণ করেছে ইয়াহিয়া খাঁ বিসমিল্লায় গলদ করেছিলেন, অংক তাঁর তাই মিললো না। বাঙালীরা শুধু বক্তাবাজ নয় তারা লড়তেও জানে এ কথাটা মুক্তিবাহিনী প্রমাণ করেছে জান দিয়ে কেবল নয়, জান নিয়েও। ভারতীয় বাহিনীর কাছে প্রচণ্ড মার খেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ তোবা তোবা বলে লড়ায়ে ইস্তফা দিয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু মুক্তি-বাহিনীর হাতেও তারা কম নাকাল হয়নি। মুক্তিবাহিনীর আঘাতে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল। তাতে ভারতীয় বাহিনীর জয়লাভ সহজ হয়েছে, লোকসান আর লোকক্ষয়ও হয়েছে অনেক কম।

বিদেশে (৩৬)

অধিকাংশ বহু মার্কিন যে-একটিমাত্র জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কথা শুনেছে সেটি বন্ শহরে প্রতিষ্ঠিত। এবং সে-খ্যাতির জন্য চোদ্দ আনা শিরোপা পায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-বিভাগ তেরো-চোদ্দো ভাষা শেখায়—প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, বৈদিক সংস্কৃত থেকে আরম্ভ করে আদ্যদিনের মডার্ন জাপানী পর্যন্ত—তার নাম ওরিয়েন্টাল সেমিনার। এখানে দুনিয়ার কুল্লে রকমের ঝোপ থেকে নানান রঙের চিড়িয়া আসে হরেক রকমের বুলি শেখার তরে এবং মাঝে মধ্যে অধ্যাপকরা যখন সেমিনারে অনুপস্থিত, তখন যা কিচিরমিচির লাগায় তাতে ধ্বনিশাস্ত্রের জানা-অজানা কোনো আওয়াজই বাদ যায় না। ওদিকে মার্কিন দেশের বাসিন্দাদের জাত আগাপাশতলা নানান জাতের জগাখিচুড়ি দিয়ে তৈরী। তাই তারা আসে বন্ শহরে, আর অনেকেই জর্মন দেশের সেরা সেই সেমিনারে বসে পড়ে আপন আপন মাতৃভাষায় খবরের কাগজ। অনেকটা সেই কারণেই সেমিনারের কাছেই ছিল একটি খবরের কাগজের হরবোলা কিয়োস্ক্। আমরা উইলিমাস্টারকে কাছে পেলে তার হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে বলতুম, "ফেরার সময় আমার জন্য সেই খবরের কাগজটা এনে দেবে তো?" "সেই" বলার কারণ ওস্তাদ উইলি পৃথিবীর তাবৎ ভাষা উচ্চারণ করতো তার আপন নিজস্ব মৌলিক গাইয়া রাইন উচ্চারণে। আমি স্বকর্ণে শুনেছি, সেমিনারের সর্বাধিকারী খাস ডিরেকটর সায়েব উইলিকে বললেন একখানা "টাইম্স্" নিয়ে আসতে। উইলি এক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, "ও! 'টে টিমস্'?" THE TIMES-এর THE জর্মন ভাষার আইনানুযায়ী উচ্চারিত হয় 'টে' এবং TIMES উচ্চারিত হবে 'টিমস্'। ধ্বনিতত্ত্বের বাঘা পণ্ডিত অধ্যাপক মেনজেরাটের গুরুরও সাধ্য নেই যে লাতিন অক্ষরে লেখা শব্দ, তা সে জর্মন হোক, ইংরিজি হোক বা সাঁওতালীই হোক, জর্মন উচ্চারণে যদি পড়াতে হয় তবে মাস্টার উইলির উচ্চারণে খুঁৎ ধরেন। ভূরি ভূরি উদাহরণ দিয়ে ভাষা বাবদে আমার মত মুখ্যুও সপ্রমাণ করতে পারবে যে মাইস্টার উইলি আমাদের সেমিনারের লেকচারার হ্যার ৎসিগেনশ্পেকের (নামটা শুনুন, স্যর! শব্দার্থ 'ছাগলের চর্বি') যখন অতিশয় খোপ-দুরস্ত সুমধুর উচ্চারণ সহ 'রাজসিক' জর্মন বলতেন তখন উইলি উপস্থিত থাকলে তার মুখে স্পষ্ট দেখা যেত সে যেন প্রচ্ছন্ন কৌতুক অনুভব করছে। এমন কি যখন প্যারিস, ভিয়েনা, অকসফর্ড, হারভার্ডের ইয়া বড়া-বড়া দাড়িওলা বাঘা বাঘা প্রফেসর পণ্ডিতেরা আমাদের সেমিনারে এসে এ-দেশের সিঙমার্কা বিদ্যেবাগীশদের সঙ্গে "একটি একটি কথা যেন সদ্য-দাগা কামান" ছেড়ে যে তুমুল বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি করতেন আর উইলি মেস্টার একপ্রান্তে ভুরভুরে খুশবাইয়ের ম-ম-মারা কফি সাজাতো তখন তার চেহারা দেখে দিবান্ধ-জনও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতো, উইলি একটি সাক্ষাৎ পরমহংস : মিঞা-মৌলানাদের বাক্যবর্ষণের ঝরঝর বারিধারা তার রাজহাঁসের পালকের উপর পড়ামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে ঝরে যেতো। পাঠকমাত্রই অবশ্য এসব শুনে বলবেন, বড় বড় পণ্ডিতদের বুদ্ধিতর্কে ভরা আলাপ-আলোচনা উইলি বুঝবে কি করে? কাজেই তার পক্ষে ঐ প্রতিক্রিয়াই তো স্বাভাবিক। উত্তরে বলি, প্রবাদ আছে "কাজীর বাড়ির বাঁদীও দু'কলম জানে।" তা জানুক আর না-ই জানুক, এ-সব ক্ষেত্রে বহুলোক দু'পাঁচটা লবজো কুড়িয়ে নিয়ে অন্যের ন্যায় বিদ্যে জাহির করে। কিন্তু এই বাহ্য : স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণে এনে তাঁরই আপ্তবাক্যের পুনরাবৃত্তি করি : প্রকৃত সত্যজ্ঞান উপলব্ধির জন্য বিস্তর লেখাপড়া করতে হয় না, কেতাবপত্র ঘাঁটতে হয় না।......এই যে সৌদিন কুষ্টিয়া অঞ্চল রাহুমুক্ত হ'ল সেই অঞ্চলের গাইয়া লালন ফকিরের গীত নিয়ে কবিগুরু থেকে আরম্ভ করে যে-সব তত্ত্বান্বেষী সজ্জন আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের আপ্তবাক্যটিকে বার বার নমস্কার জানিয়েছেন।

সে-কথা থাক্। আমার মনে কিন্তু একটা ধোঁকা ছিল। উইলি যদি সত্যই পাণ্ডিত্য বাবদে এতই উদাসীন হয় তবে সে আমাদের জন্য বই যোগাড় করার বেলা এত তুলকালাম কাণ্ড করে কেন? প্রয়োজনমত আমরা তাকে সকালবেলা যে-সব পুস্তক ধার চাই তার একটা ফর্দ দিতুম। সেইটেই নিয়ে সে যেত বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে। এবং ফিরে এসে করিডরে ঢুকতে না ঢুকতে প্রায়ই শোনা যেত তার উচ্চ কণ্ঠস্বর;—অর্থ, কয়েকখানা বই সে পায়নি। আমাদের কেউ কেউ তাকে কখনো সখনো বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সব সময় সব বই পাওয়া যায় হেন লাইব্রেরি ইহসংসারে নেই। আমি স্বয়ং একদিন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলুম, "ও-বই না পেলেও আমার কাজ আটকাবে না।" উইলি মাস্টার গরগর করে বলেছিল, "আটকাবে কেন? বই না হলে কি সংসার চলে না। বই লেখা না হওয়ার আগে কি সংসার চলে নি? ইত্যাদি ইত্যাদি।"

১৯৩২-এ পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরলুম। ১৯৩৪-এ ফের বন্ শহরের সেমিনারে উইলির সঙ্গে দেখা। এবারে আমাকে সেখানে তিনবেলা খেটে মরতে হত না। কিন্তু উইলিকে প্রাচীন দিনের কায়দা অনুযায়ী মাঝে মাঝে একটা সিগার দিতুম। হিটলার তখন দেশের কর্ণধার। তার চেলা-চামুণ্ডারা গরম গরম বুলি কপচাচ্ছে। প্রধান বুলি, যুদ্ধং দেহি। কিন্তু আজ এই বঙ্গ-দেশে এখনো বারুদের গন্ধ যায়নি। ও-কথা থাক!

১৯৩৮-এ গরমের ছুটিতে বন্ শহরে পৌঁছেই গেলুম সেমিনারে—প্রথমেই উইলির সঙ্গে দেখা। ততদিনে নাৎসি আদেশে প্রায় সবাই একে অন্যকে "হাইল হিটলার" বলে নমস্কার জানায়। "গুটেন মর্গেন", "গুটেন আবেন্ট্" উঠে যাওয়ার উপক্রম। অনেকটা যেন অভ্যাসবশত উইলিকে "হাইল হিটলার" বলে প্রীতি-অভিবাদন জানালুম। চার বছর পরে দেখা। উইলি সানন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে, কাছে এসে কেমন যেন বিষাদভরা গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "তুমি তো, বাপু, বিদেশী। তুমি আবার 'হাইল হিটলার' করছো কেন?" কথাটা সত্য। বিদেশীর পক্ষে এ-আইন প্রযোজ্য ছিল না।

বুঝলুম,—অবশ্য আগেই অনুমান করেছিলুম—উইলি প্রচ্ছন্ন হিটলারবৈরী।

*

এইবারে লাটে যেন আমার কাহিনীর খেই ধরিয়ে দিয়ে বললে, ইউলি রাজনীতির বড় একটা ধার ধারতো না। কিন্তু যুদ্ধ লেগে যাবার পর তখন আর কোথায় রাজনীতি কোথায় কি? গোড়ার দিকে জয়ের পর জয়। চতুর্দিকে হর্ষধ্বনি। বুদ্ধেরা হিসেব করে দেখালেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এ-যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নগণ্য। তাই সই। কিন্তু তখন ক'জন জানতো জঙ্গল থেকে পুরোপুরি বেরুবার পূর্বেই আনন্দধ্বনি ছাড়তে নেই: আরম্ভ হল জর্মনির উপর বোমাবর্ষণ। প্রথমটায় বড় বড় শহরের উপর। ওই সময় একদিন ব্ল্যাক-আউটের ঠেলায় আশ্রয় নিতে হল উইলি-পরিবারে। স্বয়ং উইলির তখন দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। হেথা হোথা ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে, বাংকার বানাচ্ছে এবং তার সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেমিনার বাড়িটাকে যেন হিটলারের আবাসভূমি কিংবা বাকিংহাম প্রাসাদের চেয়েও সুরক্ষিত জিব্রলটর্-দুর্গে পরিণত করে ফেলতে পারে—সে একা, তার দু'খানা হাত দিয়ে। স্বয়ং লর্ড মেয়র থেকে আরম্ভ করে 'ভারা' রেক্টর্ হয়ে, সেমিনারে সেই একটিমাত্র মাংস লেকচারার প্রোফেসর এদের সে সকলের সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া কান্নাকাটি করে যোগাড় করেছে সেমিনারের বরাদ্দানুযায়ী প্রাপ্যের চেয়ে তিন ডবল মালমশলা; অষ্ট-প্রহর বয়ে বেড়াচ্ছে বালির বস্তা, ইঁট সেমেন্টের স্তূপ।

লাটে বললে, হ্যার উইলি ঘরে ঢুকলে মজুরের এপ্রন গায়ে। সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত কর্দমাক্ত। কথায় কথায় আমি বললুম, "মার্কিনরা যত বুদ্ধুই হোক, ওরা তো জানে, বন্ য়ুনিভার্সিটি-টাউন, এখানে বন্দুক কামানের কারবার নেই বললেও চলে। এখানে বোমা ফেলে ওদের কি লাভ?"

উইলি একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, "মার্কিনরা বন্ শহরটাকে ভালো করেই চেনে। এই সেমিনারেই কত মার্কিন এল গেল। ডক্টরেট পাশ করলো বাইবেল নিয়ে কাজ করে। আমিই তো অন্তত জন-তিরিশেক চিনি। ওরাই আমাকে বলেছে, তাবৎ মার্কিন মুলুকে সবচেয়ে বেশী করে নাম-করা এই বন্-এর য়ুনিভার্সিটি। কিন্তু লড়াইয়ের ব্যাপারে ওরা আকাট। আকাশ থেকে বন্ শহরটাকে শনাক্ত করবে, প্যারিস বলে, ভিয়েনাকে ভাববে ইস্তাম্বুল। আর তাদের তাগ তো জানো। দুনিয়ার সব-কিছু একেবারে চাঁদমারীর মধ্যিখানের বুলস্-আইয়ের মত বেধড়ক হিট করতে পারে—সব হিট করতে পারে, শুধু যেটাকে হিট করতে চায় সেটাকে তাগ করলে সেইটে ছাড়া। তাগ করবে বার্লিনের রাইখস্টাগ, বোমা পড়বে বন্-এর সেমিনারের উপর।"

লাটে বললে, আমি জানতুম না উইলি দুরবস্থা দূরদৃষ্টি দিয়েও পটকারি করতে পারে। কিন্তু তার কথাই ফললো। ভগবান যে কখন কার মুখ দিয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়ে নেন কে জানে। এবং এখনো জানিনে, কোন নিশানা তাগ করতে গিয়ে তারা লাগিয়ে দেয় সেমিনারের পাশের বাড়িতে আগুন।

উইলি তো প্রথম আপ্রাণ চেষ্টা দিল আগুনটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে। যুদ্ধের শেষের দিক—শক্ত জোয়ানমোমর্থ মুসলমানের কোথায় যে তাকে সাহায্য করবে? আগুন পৌঁছে গেল সেমিনার বাড়িতে।

তখনকার দিনের সেই ছেঁড়াখোঁড়া সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে অনেক আগেই উইলি বিস্তর মূল্যবান পুঁথিপত্র পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেমিনারের নিত্যদিনের গবেষণাকর্ম পঠন-পাঠন সীলমোহর সেঁটে তো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায় না—বিশেষ করে ছাত্রদের অসম্পূর্ণ ডক্টরেটের থিসিস, অধ্যাপকদের পুস্তক। উইলি পাগলের মত দোতলা তেতলা উঠছে নামছে আর দু' হাতে জড়িয়ে ধরে সে-সব সেমিনারের দোরের গোড়ায় নামাচ্ছে। তার বউ সেগুলো দূরের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

সেমিনার বাড়ি তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সব-কিছু পুঁথিপত্র কেতাব কাগজের ব্যাপার। পুরনো কেতাবে আবার আর্দ্রতা একেবারেই থাকে না। বারুদ পেট্রলের পরেই বোধ হয় তারা পুড়ে মরতে জানে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে।

উইলি তখনো ওঠানামা করছে।

উইলির বউ প্রতিবার স্বামীকে উপরে যেতে বারণ করছে। সেও প্রতিবার বলে, 'এই শেষবার, বউ। আর যাব না।'

কি আর বলবো।

উইলির বউ বলেছিল, হঠাৎ বাড়িটা যেন একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল।

*

লাটে রুমাল বের করে চোখের জল মুছল।

বললে "জানো, সায়েড, উইলির বউ আমাকে দুঃখ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, শেষবারের মত উইলি যখন তার বউকে বলে, এই তার শেষ ক্ষেপ, আর উপরে যাবে না, তখন তার গলায় এমন কিছু ছিল যার থেকে বউ বিশ্বাস করেছিল, এর পর আর সে উপরে যাবে না। সে তার কথা রেখেছিল—না? উপরে সে যায়নি—নাবেইনি যখন।

আরেকটা কথা আমার মনে বড় দাগ কেটেছে। উইলির বউ যেসব পাণ্ডুলিপি নিরাপদ জায়গায় এক ডাঁইয়ের উপর আরেক ডাঁই ডাম্প করেছিল সেগুলো পরে সরাবার সময় ধরা পড়লো উইলি 'ফার্স্ট প্রেফারেন্স' দিয়ে সকলের পয়লা উদ্ধার করেছিল, ছাত্রদের অসমাপ্ত অসম্পূর্ণ থিসিস—তারপর অধ্যাপকদের পাণ্ডুলিপি...তোমাদের, আই মীন, ছাত্রদের সে ধ্রুব ভালোবাসতো। না? বোধ হয় জানতো, প্রথম বাচ্চা প্রসব করার মত স্টুডেন্টদের প্রথম বই—ডক্টরেট থীসিস—বিয়োনোটা শক্ত ব্যাপার। আবার সেই বাচ্চা, আই মীন, ওই অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিও যদি পুড়ে গিয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। সে তো মারাত্মক গর্ভপাত। প্রফেসরদের তো সে ভাবনা নেই। তাঁদের কেউ কেউ তো শুনেছি, বছর-বিয়েনী—বছরের এ-মাথায় একখানা কেতাব ওই মোড়ে আরেকখানা।"

*

জ্বলন্ত কেতাব পুঁথির আগুনে পুড়ে মারা গেল উইলি।

আমার মনে পড়ে গেল আরব পণ্ডিত বহুর্ উল্ জাহিজের কথা।(১)

মৃত্যুর তিন চার দিন পূর্বে তাঁর স্বাস্থ্যের একটুখানি উন্নতি দেখা দেওয়াতে তিনি তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ করেন, তাঁকে যেন ধরে তার কাজ করার তক্তপোশে নিয়ে যান। স্ত্রী আপত্তি জানালে তিনি অনুনয় করে বলেন যে, তাঁর বইখানার আর মাত্র কয়েকখানি পাতা লিখলেই বইটি সমাপ্ত হয়।

জাহিজ যে জায়গায় বসে কাজ করতেন তার চতুর্দিকে থাকত দু'চার গজ উঁচু বইয়ের 'মিনার।' (২) তারই নিচের একখানা টেনে বের করার চেষ্টাতে সে মিনার ভেঙে পড়লই, তার ধাক্কাতে অন্য মিনারের বিস্তর বইয়ের তলায় চাপা পড়লেন জাহিজ। বই সরানো হলে দেখা গেল বইখানা সমাপ্ত করতে গিয়ে তিনি জীবন খতম করে দিয়েছেন।

তাঁর জীবনীকার বলেছেন, "পণ্ডিতের পক্ষে পুস্তকস্তূপের নিচে গোর পাওয়ার চেয়ে শ্লাঘনীয় সমাধি আর কি হতে পারে।"

উইলি পণ্ডিত ছিল না। কিন্তু পণ্ডিতের সেবক, পুস্তক সংরক্ষণের একনিষ্ঠ সাধক পুস্তক সংরক্ষণে সমাধি লাভ করলে এর চেয়ে শ্লাঘনীয় শেষকৃত্য আর কি হতে পারে।

---

(১) যাঁরা এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার নামে অজ্ঞান, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন, সে কেতাবে তাঁর মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৮৬৯। আসলে তাঁর মৃত্যু ৮৬৯ খৃষ্টাব্দে।

(২) "বঙ্গীয় শব্দকোষের" লেখক ঈশ্বর হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পদ্ধতিতে কাজ করতেন। তাঁর পাণ্ডুলিপির এক বৃহৎ অংশ তিনি তাঁর কাঁচা ঘরে রেখে নিজ পাড়ায় যান। ঘরে আগুন লাগলে তিনি অর্ধোন্মাদ উইলির মত জ্বলন্ত গৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পান। হরিচরণের নিয়তি—অন্তত উপরের দুই বিষয়ে ছিলেন। তাঁর কর্মকালে উইলির মত হয়নি। তিনি অন্ধ হয়ে যান।

অতিজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মজবানি

রঞ্জন

গত সপ্তাহে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে সাম্প্রতিক ইন্দো-পাকিস্তান সংঘর্ষ নিয়ে এমন কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যেগুলি অনুপাদেয় হলেও অনুপেক্ষণীয়। আমি এত বয়ঃকনিষ্ঠ নই যে, জ্যেষ্ঠদের গাত্রে কারণে অকারণে থুথু বিতরণ করেই আনন্দে আত্মহারা হতে পারি। তবু জ্যাঠামিরও থাকা উচিত কিঞ্চিৎ মাত্রাজ্ঞান, কিছুটা পরিমিতি-বোধ (হ্যাঁ, ইংরেজী *a sense of proportion* উক্তির এইটেই আমার স্তিমিত ও স্বকীয় যুক্তাক্ষরবর্জিত পরিভাষা।) চৌধুরী সাহেবের আধুনিক নিবন্ধে এই গুণটি অনধিক বলে বিবেচনা করি, যদিও মুহূর্তমাত্রের জন্যও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য বা ব্যক্তিগত সাধুতা সম্বন্ধে আমার আজো সামান্যতম সন্দেহ নেই। তবে মুনিদেরও মতিভ্রম সম্ভব। কনিষ্ঠের কর্তব্য সেই ভ্রান্তির বিনীত উদ্ঘাটন। অতীতের আত্মীয়তা চাই বর্তমানকে বুঝতে, অনাগতের আস্বাদনের প্রস্তুতির জন্য। অতীত সম্বন্ধে নীরদ চৌধুরী একান্তই অবহিত। সার্থক ছাত্র তিনি ইতিহাসের। বর্তমান তবু দাবি করে অতীতের অতিক্রম: ভবিষ্যৎ হবে না ঠিক পুনর্গতের পুনরাবৃত্তি। তা ছাড়া মনে রাখতে হয়, আমরা কেউ অমর নই। বিধি সদয় হলে আমরা শুধু হস্তান্তরিত সমস্যারই সাময়িক সমাধান সন্ধান করতে পারি। অত্যাশার অপর নাম ঔদ্ধত্য।

গত মার্চ বা এপ্রিল মাসেই নীরদ চৌধুরী লণ্ডনে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের প্রতিবাদ একেবারেই নিষ্ফল। এর সোচ্চার সমর্থকরা প্রত্যেকেই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, কেননা ইয়াহিয়া খানের সুগঠিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সম্মুখে এমন সংগীতসর্বস্ব প্রতিবাদ ব্যর্থ হতে বাধ্য। লাভ কোথায় এতগুলি প্রাণ আহুতি দিয়ে? ঠিক কথা। নীরদবাবু একদা মিলিটারি অ্যাকাউণ্টসে কাজ করতেন। কিন্তু বেহিসেবী বাঙালগুলো তবু এগিয়ে চলল, সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী। এই আস্পর্ধাও ক্ষমণীয় হতে পারতো। কিন্তু ক্ষম্য নয় জয়ের অপরাধ। নীরদবাবুর প্রধান অভিযোগ এই যে, প্রত্যক্ষ সমরে আজ পাকিস্তান পরাভূত ও অবমানিত হয়েছে এবং তাই নিয়ে ভারতের উল্লাস একাধারে অশ্লীল ও অসমীচীন।

✻

এই পাতার স্বল্পসংখ্যক পাঠকবর্গের অজানা নেই যে, মুক্তি বাহিনীর সবান্ধব বঙ্গবিজয়ের অভিনন্দনে আমার কণ্ঠ কখনোই অতিমুখর ছিল না। নানা সন্দেহ ব্যক্ত করেছি বিনা দ্বিধায়। তবু হেয় জ্ঞান করি চৌধুরী সাহেবের (জুতো থেকে সব কিছু বিলিতী না হলে তাঁর পরিধেয় নয়, শুধু হৃদয়টা রয়ে গেছে বাঙালা, বাঙাল বা মাত্র কিশোরগঞ্জী) প্রকাশিত অভিমত যে, আধুনিক সংঘর্ষের মূলে ছিল হিন্দুর অবিনশ্বর মুসলিমবিদ্বেষ। বিদ্বেষ না হলেও বিমুখতা আদৌ অস্বীকার করব না। কিন্তু এটা কখনোই য়ুনিল্যাটেরল বা একমুখিন ছিল না। ঐতিহাসিক চৌধুরী সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রে আবিষ্কার করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী হিন্দু ইণ্টেলেকচুয়ল। বেশ তো। বঙ্কিমচন্দ্রকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, দ্বেষের শুরু কোথায়। নীরদবাবু তাঁর আত্মজীবনীতে "আনন্দ মঠ" থেকে যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন তাতে সমর্থন মেলে না তাঁর সাম্প্রতিক দ্বেষ-বণ্টনের। আমি শ্বেতপদ্ম নই। কিন্তু কীট ছিল পার্শ্ববর্তী পদ্মেও। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, বিশেষ করে তা যদি একান্তই একদেশদর্শী হয়, তাকে আমি সময়সঙ্গত বলে জ্ঞান করতে পারিনে। হয়তো ঐতিহাসিকের দায় নেই সাময়িকতার দাবির কাছে। কিন্তু সাংবাদিক নীরদ চৌধুরীর কিছু দায়িত্ব আছে তাঁর হতভাগ্য দেশের কাছে, কেননা টাইমস পত্রিকায় তিনি প্রচারিত ভারতীয় হিন্দু আর বঙ্গসন্তান বলে। বিদেশী পাঠকরা কেউ জানবেই না যে, নীরদবাবুর বক্তব্য পুরোপুরোই তাঁর কথা; দ্বিতীয় কারো নয়।

বিদেশে বা কোনো বিদেশীর উপস্থিতিতে সরকারবিরোধী মন্তব্য দেশ-দ্রোহিতার নামান্তর, এমন যুক্তি আমার কাছে অগ্রাহ্য। সত্য কখনো মানবে না কোনো সীমান্ত। অর্ধসত্যের গতিস্বাধীনতা তেমন অপরিসীম হতে পারে না, যদিও নিকটবর্তী থানায় আমি এখনো টেলিফোন করিনি শ্রীচৌধুরীর বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, ভারত নাকি দেশবিভাগ কখনো সর্বান্তঃ-করণে গ্রহণ করেনি। পাকিস্তান করেছে? নীরদবাবু করেছেন? আমরা সবাই কাঁচের ঘরের বাসিন্দা। আমাদের প্রস্তরক্ষেপণের পূর্বে সঙ্গত কিছু সতর্কতা। ভারতখণ্ডন যজ্ঞে আমরা যোগ দিয়েছিলেম সবাই গান্ধীও। নীরদবাবুও। আমিও। পঁচিশ বছর আগে অন্য পন্থা ছিল না। ইতিহাসের বৃহত্তম হত্যাকাণ্ড যখন ঘটল ১৯৪৬ সালে নীরদবাবু তখন দিল্লিতে আর আমি কল-কাতায়। আজ তিনি লণ্ডনে আর আমি আজও কলকাতায়। শারীর সান্নিধ্যই সব নয় সত্যসন্ধানে কিন্তু দূরে থেকে কাছ রচনারও আমি আর অসন্দেহী অনুরাগী নই। নীরদ চৌধুরী আমাকে নিরাশ করেছেন তাঁর সাম্প্রতিক ভারতীয় ঘটনা-বলীর প্রতি অসীম ঔদাসীন্য নিয়ে। পঞ্চাশ বছর আগে হফম্যান কী লিখেছিলেন বা আলবেরুনি কী লিখেছিলেন তারও আগে তা নিশ্চয়ই স্মর্তব্য কিন্তু স্বাধীন বাঙলা-দেশের অভ্যুদয় আমি অতীতের কোনো ঐতিহাসিক কোঠায় ফেলতে পারিনে। নীরদ চৌধুরীর ভাষ্য তাই অগ্রহণীয়, কেননা বর্তমানের সঙ্গে এর সংযোগ অতি-সামান্য।

✻

নীরদবাবুর সরাসরি অভিযোগ এই যে, পাকিস্তানী আক্রমণের যোগ্য ও সফল প্রত্যুত্তর দিয়ে ভারত সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে। এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? সারা জীবন যিনি Realpolitik ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করেননি আজ তিনি সহসা এমন বৈষ্ণব হয়ে উঠলেন কী করে? দীর্ঘ ন' মাস ধরে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে নিরন্তর নির্যাতিত কোটি-প্রমাণ উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছে, কই তখন তো আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষীণতম অঙ্গুলিহেলনের খবর পাইনি। বিশ্ববিবেক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শুধু তখনই যখন ভারত অস্ত্রধারণ করল এক নির্মম সশস্ত্র সরকারের নিয়মিত ও সুপরিকল্পিত গণহত্যার বিরুদ্ধে। নীরদবাবুর প্রতিবাদও তখন শুনেছি বলে স্মরণ করতে পারিনে—যদিও তার ব্যবহারিক মূল্য হতো সামান্যই কিন্তু তবু লিখিত উক্তি বা কথিত নির্যাস সম্পূর্ণ মর্যাদাহীন হয় না যদি সত্যের প্রতি থাকে ন্যূনতম সম্মান। আধুনিক ইন্দো-পাকিস্তান বিরোধ নিয়ে একাধিক বক্তব্য সহজেই বিচার্য। সর্বথা স্বীকার্য এই সত্য যে, দুই দেশের মধ্যে এই প্রথম বিরোধ যাতে প্রথাগত হিন্দু-মুসলিম দ্বেষ এতটুকু প্রশ্রয় পায়নি। পরে কী হবে জানিনে—ভবিষ্যদ্বাণী নীরদবাবুর জমিদারি যেখানে দু' বিঘে জমি আমি চাইনে—কিন্তু ঠিক এই সময়ে অন্তহীন হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি কার উপকার করেছেন আমি জানিনে। জুলফিকর ভুট্টো অবশ্য খুশী হতে পারেন। আর কে? বাঙলাদেশে গণহত্যার বিলম্বিত নিরোধ বুঝি কিছু নয়?

কাশ্মীর নিয়ে বিতর্কে আমার অরুচি। নীরদবাবু আজ দেশবিভাগের লজিকের প্রশ্ন তুলছেন। তা হলে তো বহু কোটি হিন্দুস্থানী মুসলমানকে কালই পাকিস্তানে যেতে হবে। তিনি কি তাই চান? ভারতীয় লোকরাষ্ট্রে ত্রুটি অসংখ্য কিন্তু তাই বলে এর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অপ্রশংসনীয় নয় নিশ্চয়ই। একে-বারেই হাস্যকর নীরদ চৌধুরীর কপট রাশভীতি—আসে যদি রুশিয়া তাড়াইব ঘুষিয়া। কিপলিঙের ভূত কি কখনো যাবে না আমাদের সমৃদ্ধতম মনীষা থেকেও?

একলা বাড়ি

সময় আছে, অনেক আছে সময়
চেয়ে দেখার বোবা হবার হেরে যাবার
শহর জুড়ে চলে যখন জোর তামাশা,
ঘরে কারো মন টেঁকে না, একলা বাড়ি
সারা দুপুর পাখির ডাকে নিঝুম।

কখনো দিন স্মৃতির মতো মেঘলা,
দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি;
কখনো দিন রৌদ্রে অফুরান
ঘণ্টা বাজায় শব্দহীন ধবল,
হাওয়ায় ভাসে বুনো ফুলের গন্ধ,
হাওয়ায় ওড়ে সমুদ্রের লবণ,
পুরোনো শোক আস্তে খ'সে পড়ে
শুকনো পাতার মতো।

বৃষ্টি, রোদ, হাওয়ার লুটোপুটি—
ফাঁকে-ফাঁকে জীবন বাঁধে নতুন বাসা,
কোথাও কোনো হৃদয় যেন কথা বলে
ঝরা পাতার নরম গলায়, আস্তে।
ঘণ্টা বাজে শব্দহীন ধবল।

কিন্তু কারো মন টেঁকে না ঘরে
শহর জুড়ে চলে যখন জোর তামাশা
ক্যালেণ্ডারে কালো তারিখ একটিও নেই;
মহোচ্ছবে কথার ভুসি শাপটে খেয়ে
ছেলেরা হয় জোয়ান, এবং বাপ-জ্যাঠারা
গ্যাস-ভর্তি বেলুন ওড়ান রং-বেরঙের;

আরো মুখর জিভ খুলে দেয় জিনের বোতল
চোখের জল আর দু-চার ফোঁটা রক্তে মি
ব্যাধের বাণ, বাল্মীকির ক্রৌঞ্চ—
তাও হ'য়ে যায় শস্তা রসিকতা,
তাও হ'য়ে ব্যাবসাদারির পুঁজি…

তখনই ঠিক বোবা হবার সময়।

সারা দুপুর একলা বাড়ি নিঝুম
মাঠের মধ্যে, শহর থেকে দূরে,
দরজা ভাঙা, শ্যাওলা-পড়া বাগান,
দেয়াল বেয়ে লম্বা লতা ঝোলে
পথ এঁকে দেয় শুকনো পশুমল—

পোড়ো বাড়ি? বাসিন্দা কেউ নেই?

কিন্তু আছে আকাশ জুড়ে জানলা খোলা
মহল্লা-পার দূরান্তরের ঝাপট—
বাতাস, রোদ, বৃষ্টি ঝিরিঝিরি—
সিঁড়ির বাঁকে হঠাৎ কারো নরম গলা
হঠাৎ যেন দাবির মতো চোখের ঝলক
মিলিয়ে যায় শূন্যতায়, আস্তে…
গর্তে কোণে লুকিয়ে-থাকা কোনো হৃদয়
হয়তো ভাবে, 'আমার সময় হবে কখন?'
হয়তো কোনো ছোট্ট চিলেকোঠায়
আলো-ছায়ার নীরবতায় মগ্ন
এখনো কেউ স্বপ্নে দ্যাখে রাজার মেয়ে।

আমার আঙুল

আল মাহমুদ

তোমার জন্যে লোকালয়
হেঁটে এসে আজো কড়া নাড়ি
তোমার জন্যে করি জয়
অভাবের ক্ষিপ্র তরবারি।

তুমি আছো—এই সম্মোহনে
খুলতে যাই মৃত্যুর তামস,
অবারিত চুম্বনে, গুঞ্জনে
ধরে থাকি তোমাকে অবশ

সবুজ গন্ধের এক গাছ
যেন আমি; স্ফটিকের ঘর
কাচের আধারে কালো মাছ
মুখে নেয় সোনালী পাথর।

অ্যাকুরিয়ামের মত ছোটো
স্বচ্ছ সাদা সংসার আমার
কে মৎস্যিনী দীপ্ত হয়ে ওঠো
ছলকে নীল জলের আধার?

ক্ষুধার্ত এ-মুখ তুলে যত
বাতাসের বিন্দু আনা যায়
এ-মহার্ঘ্য বুদ্বুদ কহ তো
রাখবে কোন শৈবালের গায়?

হঠাৎ এই ভুরভুরি গতি
হয়ে যায় আনন্দের ফুল
খায় এক মাছের যুবতী
ঠুকরে খায়, আমার আঙুল।

আসে না আর

আল মাহমুদ

পাহাড়পুরের পাথর রেখে বামে
পরিয়ে খাল পুরনো গড়খাই
এগোলে কেউ আসে না ঘরে
এই কথা তো জানতে, তবু কেন
হাটের মাঝে আসতে দিয়েছিলে?

তোমার শিকেয় রং মাখাতো যারা
তোমায় এনে দিতো মোরগ ফুল
তাদের হাত ফেরালে একবার
কখনো তারা আসে না আর গাঁয়ে
এই কথা তো জানাই ছিল তবু
বানের জলে ভাসতে দিয়েছিলে।

তোমায় যারা বলতো জাদুকরী
তোমায় যারা ডাকতো কালো সাপ
যাদের দেখে ভাঙে কাঁখের ঘড়া
যাদের ভয়ে মুখ লুকোতে জলে,
দীঘির পাড়ের অন্ধ জনরবে
তখন কেন হাসতে দিয়েছিলে।

কেয়া আমি এবং জারমান মেজর

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

আমি তখন ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করছিলাম। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বাজল। শব্দটা যেন সন্ধ্যার ধূপের ধোঁয়া। কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করল আমার চোখে দেখার এবং চিন্তা করার ক্ষমতা। এই অশরীরী শব্দটা ছিল মাত্র। রিসিভার তুললে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যেত না। হঠাৎ সেই মৃত শব্দটা (না শব্দপুঞ্জ?) পুনর্জীবন পেতেই অশরীরী প্রেতের মত মনে হল শব্দটাকে। ধোঁয়া থেকে যেন শরীর ধারণ করছে। একটা ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পরিবেশ ঘরটায়। উত্তরের জানালাটা খোলা। লাইট পোস্টের সঙ্গে একটা ফেস্টুন তখনও ঝুলছে। এপ্রিলের বাতাসে এখনও শীতের ছোঁয়া। হঠাৎ মেঘ গর্জন। মনসুনও বুঝি এবার আগেই শুরু হবে।

টেলিফোন তখনও বাজছে। চোখের শব্দে দেখার এবং চিন্তা করার ক্ষমতাটা ফিরে এল। কেয়া বাইরের ঘরে আলো জ্বালাতে দেবে না। শাড়ির খসখসানি শুনে বুঝলাম কাছেই আছে। মাথার চুলে সুগন্ধী তেলের ঘ্রাণ। একমাস আগে

সঙ্গে একটা মিলিটারি লরী এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে।

'তারপর?' কেয়ার গলা নয়, আমার গলাই এবার কেঁপে উঠল।

'ওরা কাউকে মারেনি। কাউকে কিছু বলেনি। লরীতে একজন মেজর ছিল সে কেবল সোনিয়াকে নিয়ে গেছে।'

'সোনিয়াকে। হায় আল্লা!' আমি টেলিফোনের শাদা ধাতব বস্তুটার উপর ভর করে শরীরের ব্যালান্স ঠিক রাখার চেষ্টা করি। কেয়ার মুখটা দেখা যায় না। কেয়া এখন অপার্থিব, অলৌকিক জগৎ থেকে যেন টেলিফোনে কথা বলছে। ওর গলার সেই ভয়ের শিহর থির থির কাঁপছে শরীরে। ওর ভয় নেই। অন্ধকার ওর চরকে আবৃত করে রেখেছে।

সোনিয়াকে আমি চিনি। লেক সারকাসের মেয়ে। পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্রী কেয়াই। আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। লেক সারকাসের বাঙ্গালা আপার মেয়ে। সয়েল সায়েন্সে ডিগ্রি নিয়েছে। সামনের বছর স্টেটসে যাবে গবেষণার জন্যে। তাছাড়া...

আমার কনুইয়ে আলতো করে একটা চাঁটি কেটেছিল কেয়া; 'ওর হবু স্বামী টি টেকনোলজিসট্, ডাণ্ডিতে আছে। ওকে সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে ভালবাসা। ওগো কি লম্বা চিঠি লেখে সেই পাট-বিশেষজ্ঞ। তুমি দেখলেও হাসবে।'

সোনিয়া তার রঙ করা ঠোঁট ফাঁক করে মার্বেলের মত ঝকঝকে দাঁতে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বলেছিল, 'মাঝে মাঝে ওটিও বড় বেশি বোর ফিল করি।'

সেই সোনিয়া! সেই সোনিয়া গেল মেজরের সঙ্গে?

'কি করবে ও? কি করতে পারতো ও?' কেয়ার গলা এবার তীক্ষ্ণ, অথচ উত্তেজনা নেই। 'ধরো এখনই যদি ওদের কেউ এসে তোমার বুকে বন্দুক ধরে আমাকে ওদের টার্ম শোনায়। কি করতে পারি আমি?'

'কি করতে পারি মানে?' আমার গলা যেন টাইম বোমার মত বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরিত হয়েই থেমে গেল। আমার কথাগুলোই যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ভাঙা কাঁচের মত নিমিষে চূর্ণ হয়ে গেল। অণুরেণু হয়ে ধুলোর মিশে গেল। আমার আর বলার কথা—ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার মত কিছু রইল না।

অন্ধকারে কেয়ার শ্বাসপতনের শব্দ শুনলাম। চেয়ারটার উপর গুটিয়ে বসেছে ও। নীল বুটিতোলা সবুজ পাড়ের সাদা শাড়ি তার পরনে। কুয়াশার ভোরে নদীর পারে চোখ ফেরালে যেমন দেখায়—আলো নয়, অথচ অন্ধকারও নয়, ধূসরও নয়, একটা অস্পষ্ট প্রতিভাস। কেয়ার শাড়ি-ঘরের অন্ধকারে সেই প্রতিভাস। আমি সেই প্রতিভাস লক্ষ্য করে এবার সহজ গলায় বললাম, 'সোনিয়া আর বাড়ি ফেরেনি?'

'ফিরেছে। রোজ সকালে ফিরে আসে। মিলিটারি জীপে। বাবাকে বলেছে, ওর বড় ভাইয়ের আর ভয় নেই ওর বড় ভাই পলিটিকস্ করতো। এখন ফেরার। মেজর আশ্বাস দিয়েছে, ধরা পড়লে অ্যারেস্ট করবে। মারবে না।'

'পাড়ার বাসিন্দারা কিভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা?'

'সহজভাবে। সহজভাবে নিতে তারা বাধ্য। কি করতে পারে ওরা? তাদের কারো ঘরে ব্যাপারটা ঘটতে পারতো। ঘটেনি এজন্যে সোনিয়ার কাছে তারা কৃতজ্ঞ। ওরা জানে, সোনিয়া রোজ সন্ধ্যায় চলে যায়, সকালে ফিরে আসে।'

কোথাও মেঘ গর্জাল। মেঘ অথবা মর্টার দুয়ের শব্দই হতে পারে। কেয়া চট করে চেয়ার ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়াল। ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওরা কোথাও গোলা ছুঁড়লো।'

'গোলা ছুঁড়বে কেন?'

'মানুষ মারার জন্যে।'

মৃত্যু এত সহজ হয়ে উঠবে আমাদের জীবনে কোনদিন ভাবিনি। কেয়ার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিলাম। মৃত্যুকে পরাস্ত করে বেঁচে ওঠার প্রয়াসের মত এই স্পর্শ। কেয়ার হাত নরম এবং ঠাণ্ডা। ফিস্‌ফিসিয়ে বললাম, 'আমি ভাবছি সোনিয়ার কথা। আচ্ছা, ওরা যদি আমাকে সোনিয়ার মত ধরে নিয়ে যায়, নেয়াটা যেখানে এমন বেশি কিছু নয়, তাহলে তুমি কি করবে?'

'আমি?' প্রশ্নের আকস্মিকতায় আমি বিব্রত। মেয়েরা বিব্রত মুহূর্তে এমন বিভ্রান্ত করে দিতে পারে প্রশ্নের আঘাতে. আমি ভাবি।

কেয়া বলল, 'হ্যাঁ, তুমি। বাচ্চা দুটোর জন্য এখন ভাবি না। এটা আল্লার মেহেরবানি, ওরা গণ্ডগোল শুরু হওয়ার আগেই গ্রামে নানীর কাছে চলে গেছে। ওদের নিয়ে আপাতত আমি ভাবি না। কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবি। কাল রাতেই নাকি দুটো ট্যাঙ্ক এসে ঘুরে গেছে এ পাড়ায়। উপরের ফ্ল্যাটের খালেক সাহেব তার ফ্যামিলি পাঠিয়েছেন গ্রামে। পাড়া বলতে গেলে খালি হয়ে গেছে। তুমি তো নড়তে চাও না। এবং আমিও না। কোন কোন গ্রামে এর চেয়েও অঘটন ঘটেছে। ধরো, সোনিয়ার মত অঘটন যদি আমার জীবনেও ঘটে? কি করবে তুমি?'

জবাব নেই একথার। আর থাকলেও এই মুহূর্তে আমার জানা নেই। আমার হাতের মুঠো শিথিল হল। শিথিল মুঠো থেকে কেয়ার হাতটা ঝরে পড়তে চাইল। অন্ধকার অসহ্য মনে হল। বললাম, 'কেয়া, এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও আলোটা একটু জ্বালবে।'

'বেশ, সুইচটা অন করে দাও।' ঠাণ্ডা ভিজেভিজে গলা কেয়ার।

কিন্তু সুইচটা অন করতে হল না। তার আগেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

'খবরদার, ওটাকে ছুঁয়ো না।' কেয়ার গলা বড় ক্রুর মনে হল আমার কাছে। দু'পা পিছিয়ে গেলাম। টেলিফোন বেজে চলেছে। স্বৈরিণী শব্দ যদি এখন শরীরিণী হয়ে উঠতে পারতো, তাহলে কেয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতো, 'কেন, তুমি আমায় ছুঁতে দিচ্ছো না?' কেয়াও আমার কাছে এখন শব্দ। অন্ধকারে তার শরীর দেখা যায় না। একদিকে কেয়ার কণ্ঠে নিষেধ। অন্যদিকে টেলিফোনের ধাতব কণ্ঠে আমন্ত্রণ। কিছুক্ষণ ভেবে দ্বিধা জয় করলাম। কেয়ার কথা-ই রইল। টেলিফোনটা বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থামল।

বললাম, 'কেয়া, এবার ভেতরে আলো জেবলে যেতে দাও। লোডশেডিং লো ভল্যুম অন করবে নাকি?'

'না। হুকোমে মারশাল ল' শোনার ইচ্ছে আমার নেই। আমি ভেতরে যাচ্ছি।'

এবার দরজায় মৃদু অথচ স্পষ্ট টোকা। থেমে থেমে একবার, দু'বার তিনবার। আমরা নিশ্চয়ই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছি। আমি আর কেয়া। কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাকে দেখলাম না।

আবার টোকা। আরও স্পষ্ট। আমি, দরজার দিকে এগুলাম। কেয়া ফিসফিসিয়ে বলল, আমি ওঘরে যাচ্ছি। তুমি নাম জিগ্যেস করো।

•

দরজার হাতলে হাত রেখে বললাম, 'কে?' আমার গলা কেঁপে গেল। এবার ভারী গলায় উর্দু কথা এবং ভারী বুটপরা পায়ের শব্দ আশংকা করলাম। তার বদলে আমারই মত কম্পিত গলার সাড়া পাওয়া গেল, 'সলেমান সাহেব ঘরে আছেন?'

'কে?'

'আমি উপরের ফ্ল্যাটের রহমান। হবস এণ্ড রব কোমপানির ম্যানেজার।' আমি ঝটিতি দরজা খুলে দিলাম, 'আরে আসুন আসুন রহমান সাহেব। আলো জ্বালা বারণ, মারশাল ল' অথরিটির নয়, স্ত্রীর। কমপ্লিট ব্ল্যাক-আউট।'

রহমান বললেন, 'আমারও তাই। কিন্তু এইমাত্র একটা মিলিটারি লরী কি অর্ডার প্রচার করে গেল জানেন?'

কেয়া কখন ফের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে জানি না। সেই বলল, 'কি অরডার বলুন তো? আমরা নীচের তলায় থাকি। অনেক সময় মাইকের ঘোষণাও শুনি না।'

রহমান অন্ধকারেই হাতড়ে একটা চেয়ার টেনে নিলেন। বললেন, 'ঘরে আলো নেবানো চলবে না। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার বাজাতে হবে। অর্থাৎ কমপ্লিট নরম্যালসি দেখাতে হবে।'

কেয়া বলল, 'যদি হুকুম মানা না হয়।'

রহমান বললেন, 'মিলিটারির হুকুমে যদি বলে কিছু নেই। হিটলার প্যারিস দখল করার পর যা করেছেন, ইয়াহিয়াও তাই করতে চান ঢাকা দখলের পর।'

'হিটলার কি করেছেন প্যারিসে?' কেয়ার গলাটা কেঁপে উঠল, আমার মনে হল।

রহমান সশব্দে একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরালেন। বললেন, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে একটা সিগারেট ধরাচ্ছি। গলাটা অনেকক্ষণ থেকে খসখসে হয়ে আছে।'

অনেকক্ষণ পর নিবু নিবু আলোয় দেখলাম কেয়াকে। আলোর উদ্ভাসেও কেয়ার পাথুরে মুখাচ্ছ যেন। শীর্ণ চোয়াল। চোখ জ্বলছে। শীতের নদীর দূর থেকে বাঁক ঘোরার আলোর সংকেত যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে কেয়ার দু'চোখের মণি। শাড়ির নীল বাটি আর সবুজ পাড় এখন এক। কেয়া বলল, 'আপনারা ভেতরে বেড-রুমে বসে গল্প করুন। আমি দু'কাপ চা করে দিচ্ছি।' রহমান বললেন, 'আমি চা খেতে আসিনি। নতুন মারশাল ল' অরডার শুনে ভাবলাম, আপনারা কি ভাবছেন শুনি? বার দুই টেলিফোনে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। আমার টেলিফোনটা আজই সেনসেটোর করে দিয়েছে। আপনার সেটা?'

সত্য কথাই বললাম, 'দিয়েছে। কিন্তু কল রিসিভ করছি না। কেয়া লেক সারকাসের যে কাহিনী শোনাল, তাতে টেলিফোন বাজলেও রিসিভার তোলার ভরসা পাচ্ছি না।'

রহমান বললেন, 'লেক সারকাসের কাহিনী তাহলে আপনারাও শুনেছেন। ওটা আমার স্ত্রীর ভাই—মানে মেজো শ্যালক বহন করে এনেছে। ও-ই লেক সারকাসে থাকতো কিনা!'

কেয়ার দিকে তাকিয়ে রহমান বললেন, 'আপনি আবার শুনেছেন আমার স্ত্রীর কাছে, তাই না?'

ছোট্ট দমদেয়া পুতুলের মত কেয়া মাথা নাড়ল। রহমানের হাতে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিবে গেল। অন্ধকারে আমরা তিনজনেই মুছে গেলাম। আমার সেই ছেলেবেলার শ্লেটে লিখে লিখে মুছে ফেলার খেলার কথা মনে পড়লো। কালো শ্লেটে পেনসিলের দাগ বুলোলেই সাদা সাদা লেখা। মুছে ফেললেই আবার কালো শ্লেট। আমরা যেন এতক্ষণ তিনটি অন্ধকারের কালো শ্লেটে তিনটি সাদা দাগ। এইমাত্র কেউ আমাদের মুছে ফেলল। পেনসিলের মত কালো সুইচ টিপলেই আমরা আবার ফুটে উঠবো।

কেয়া এবার সত্যি সত্যি সুইচ টিপল। উত্তরের জানালাটা বন্ধ করে দিল। উদ্ভাসিত আলোয় আমরা অনেক দূর থেকে পরস্পরের যেন অনেক কাছাকাছি এলাম। রহমান বললেন, 'আলোটা জ্বেলে ভালোই হল। না জ্বেলেও বাঁচোয়া নেই। ওদের মেথোড বড় ক্রুয়েল। এই যে বেঁচে আছি এটাই বিস্ময়, বেঁচে না থাকাটা নয়।'

দূরে কোথাও টা-টা-টা শব্দ হল। আমি আড়চোখে কেয়ার দিকে তাকালাম। সেই সাদা মার্বেলের মত চোখ। কেয়া যেন অনেকক্ষণ আগে প্রস্তরীভূতা হয়ে গেছে। রহমান কেয়ার উপস্থিতি গায়ে মাখলেন না। বললেন, 'আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, এল এম জি'র শব্দ। চাইনিজ মেড এল এম জি। ভেরি পাওয়ারফুল। মিনিটে নাকি দুশো। লোক মারতে পারে।'

'নিরস্ত্র লোক মেরে লাভ?' আমি বলার কথা কিছু না পেয়ে বোকার মত বলে ফেললাম।

'কোথায় বোমা দিলে ধর্মিত পুড়বার লাভ?' [illegible] জবাব দিলেন [illegible] পাকিস্তানের [illegible] [illegible] নিকসন [illegible] [illegible] ম্যাক মাওকে। কি জানি। তারা পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়েছেন? আমার তো [illegible]

হয়, পারলে চেয়ারম্যানকে থেকে নিয়ে আসি ঢাকায়। সবরকমই আর খাওয়ার পার্টির মৃতদেহগুলো দেখাই; বাজি, কমরেড, এগুলো কি বুর্জোয়া আর পাতি-বুর্জোয়ার মৃতদেহ, না বাঙলা দেশের গরীব রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, বস্তির ভিখিরিদের—মৃতদেহ? কাদের মারছে ইয়াহিয়া কম্যুনিস্ট অন্যে?"

এবার সত্যি সত্যি মেঘ গর্জাল। বিদ্যুৎ চমকাল আকাশে। দরজার কপাটের ফাঁকে আলোর রেখার চমক খেলে গেল। বললাম, 'আজ বৃষ্টি হবে।'

রহমান বললেন, 'হোকগে। তাতে সমস্যার সমাধান নেই। আমি এলাম পরামর্শ করতে। কি ঠিক করলেন? আজ নীচেই থাকবেন, না উপরে আমাদের ফ্ল্যাটে আসবেন?'

'উপরে গিয়ে লাভ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'লাভ কিছু নেই। সান্ত্বনা।' রহমান হাসলেন, 'ওই মারশাল ল' অর্ডার শুনে আমার স্ত্রী বললেন, ওদের গিয়ে জিগ্যেস করো, ওরা উপরে আসতে চান, না আমরা নীচে যাব? এক সঙ্গে থাকলে ভয়টা অন্তত কমে।'

এতক্ষণে কেয়া মুখ খুলল। এই প্রশ্নের জবাব দেয়াটা ওর জুরিসডিকশনের মধ্যে। বলল, 'আপনারাই বরং আসুন। বাচ্চাদের বেডরুমটা ছেড়ে দেব। অসুবিধে নেই। এটাচড্ বাথ আছে। তাছাড়া সুবিধের দিকটা ভেবে দেখুন......'

হঠাৎ থেমে গেল কেয়া। তার মুখের ভাব দেখে আমার মনে হল একটা সচল ছবি যেন হঠাৎ স্থির ছবি হয়ে গেল। রহমান তার শেষের কথাটা ধরলেন, 'হ্যাঁ, সুবিধের দিকটা বলুন।'

কেয়া আমার দিকে তাকাল। বলবে কি বলবে না এই প্রশ্ন তার চোখে। 'অবশ্য ভয় করে বলল, 'আমরা আজকাল পেছনের প্যাসেজের গেট খোলা রেখে ঘুমুই। কারফিউর রাত। চোর ডাকাতের ভয় নেই।'

'তারপর?' রহমান সাগ্রহে ঝুঁকে বসলেন।

'ধরুন রাতে যদি সামনের দরজায় টোকা পড়ে......' কেয়ার কথা এবার সত্যি সত্যি আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'দরজায় টোকা পড়বে?' রহমান বিচলিত হলেন। কথাটা বুঝতে পারলেন না। কেয়া কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল, 'বলছিলাম, সোনিয়াদের বাড়ির মত ঘটনা তো এখন ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় ঘটছে। তাই পেছনের প্যাসেজের দরজা খোলা রেখে ঘুমুই। ওরা যদি আসেই সামনের গেট দিয়ে আসবে। পেছনের সরু গলিপথে নিশ্চয়ই আসবে না। তেমন বিপদের আশঙ্কা কিছু দেখলে পেছনের গলিপথে পালাতে পারব। উপরের ফ্ল্যাটে থাকলে তা হবে না।'

রহমান গম্ভীর হলেন, বললেন, 'প্ল্যানটা ভালো। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন, ওদের অপারেশন বড় ক্রুয়েল। ওরা ঠিক আপনার মতো দরজায় এসে নক্ করবে না।'

'সোনিয়াদের বাড়িতে কিন্তু ওরা তা-ই করেছিল।' কেয়া বলল।

রহমান বললেন, 'আপনার কথা সত্যি। কিন্তু সবটা নয়। সোনিয়াদের বাড়ির দরজায় নক করার আগে ওরা গোটা পাড়া এনসারকেল করে ফেলেছিল। ওটাই ওদের মেথড। তারপর অপারেশন।'

'তাহলে?' কেয়ার চোখে মুখে এবার স্পষ্ট ভীতির আভাস।

তাহলে এখানেই থাকুন মনের জোর নিয়ে থাকতে হবে। আমি মহিলাদের সামনে এসব আলোচনা সাধারণত করি না। আপনাদের লাভের খবর আমার জানা আছে। তবে এখন করি। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও খোলাখুলি আলোচনা করি। রিয়ালিটি ইজ রিয়ালিটি। এখন বাস্তবকে স্বীকার করে বাঁচতে হবে প্রয়োজনে মরতে হবে। ভয় পেয়ে লাভ নেই। আপনি হিটলারের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন না?'

কেয়া আবার দম দেয়া পুতুলের মত ঘাড় নাড়লো, 'হ্যাঁ।'

'শুনুন।' রহমান এশট্রেয় সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন। বাইফোকাল লেন্সের চশমাটি নাকের ডগায় ঠিক করে বসালেন। বললেন 'হিটলার প্যারিস দখল করলেন। ক্ষমতায় বসালেন এক বৃদ্ধ ফরাসী মারশালকে। নাম মারশাল পেতাঁ। তারপর- বিজয়ী মারশাল পেতাঁ। ওর নাম নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। হ্যাঁ, এই ফাঁকে বলে রাখছি ইয়াহিয়া যদি—পূর্ব বাঙলা কব্জা করতে পারেন, তাহলে এখানে ক্ষমতায় বসানোর জন্য এক বুড়ো বাঙালীকে খুঁজে বের করবেন। বাঙালীদের মধ্যে তো আনার মারশাল টারশাল নেই। এর রিটায়ারড সিভিল সারভেন্ট নয় বুড়ো হাবড়া পলিটিসিয়ান, এদের মধ্য থেকেই পাপেট গভরনমেন্টের একজন হেড বেছে নিতে হবে।'

'কেন নুরুল আমিন, সবুর খাঁ তো আছেনই।' আমি বললাম।

'আমি সে ডিবেটে যাচ্ছি না।' রহমান বললেন।

'হিটলারের কথা বলুন।' কেয়া নরম করে বলল।

রহমান আরেকটা সিগারেট ধরালেন, 'আমি সে কথাই বলছি। হিটলার প্যারিস দখল করলেন। সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেয়া হল শহর। ভয়ে ছোট বড়ো মেয়ে সবাই পালালো। যারা পালাতে পারলো না তারা আমাদেরই মত ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা, জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে বাঁচার নাম নিয়ে পড়ে রইল ঘরে। জারমান সৈন্যেরা ঢুকল দলে দলে বারে, থিয়েটারে, অপেরায়, একটি যুবতী মেয়ে নেই কোথাও। এক পানশালায় ঢুকে প্রৌঢ় জারমান মেজর হুকুম দিলেন পাড়া সারচ করে যত মেয়ে আছে ধরে নিয়ে এসো। আজ এখানে ডান্স হবে পানভোজন ফুর্তি হবে। পাড়া সারচ করতেই ডজন দুই মেয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে সুন্দরীটি আবার যুবতী এবং সুন্দরী। সারা রাত নাচল ফরাসী মেয়েরা। কেউ কেউ মদ খেল। কেউ কেউ ভিরমি খেল। হট্টগোল আর হই হল্লায় কারো কারো কান্না চাপা পড়ে গেল। প্রৌঢ় মেজর সবচে' সুন্দরী এবং বিদুষী মেয়েটিকে বেছে নিয়েছিলেন। শেষ রাতে স্খলিত কণ্ঠে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, সুন্দরী, তোমার এপারটমেনটে যাব। আপত্তি আছে? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, না নেই। মেজর খুশি হলেন। কোমরে রিভলবার গুঁজে নিলেন। ইউনিফরম ঠিক করে নিলেন শরীরে। মেয়েটির কাঁধে ভর রেখে বেরিয়ে গেলেন আলোকিত নাচঘর ছেড়ে। পেছনে তখনও চলছে অশ্লীল চিৎকার হইচই। মেয়েকে অত রাত্রে ফিরতে দেখে ফরাসী মা খুশি হলেন। বাবা বললেন, ফিরেছিস? পেছনে জারমান মেজরকে দেখে তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মেয়ে বলল, তোমরা ঘরে যাও। আমার জরুরি কাজ রয়েছে। কেউ আমাকে আজ ডিসটারব কর না। বলেই সে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। মেজর ফরাসী ভাষা জানেন না, বললেন, কি বললো তোমার মা বাবা? মেয়ে বিশুদ্ধ জারমান ভাষায় বলল, ওরা তোমাকে দেখে খুশি হয়েছে। প্রৌঢ় মেজর আনন্দে গোঁফ চুমড়ে নিলেন। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মেজরের কণ্ঠলগ্না হয়ে ফরাসী মেয়ে বলল, এতক্ষণ ভারী কষ্ট পাচ্ছিলাম। তোমার ওই খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের জন্যে। কামিয়ে শেভ কর না? মেজর বললেন, আজ তিনদিন। প্যারিস ফতে করার পর এই তিনদিন তো তোমাদের নিয়েই মেতে আছি। শেভ করবো কখন? মেয়েটি মেজরের বুকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আহ্লাদি গলায় বলল, উঁহু, সেটি হবে না। আমি নিজে তোমার শেভ করিয়ে দেবো। তারপর চান করে আসো বাথরুম থেকে। আমি ততক্ষণে দু'টো 'হাইবল' রেডি করবো। মেজর খুশিতে বাগবাগ। বললেন আমি তোমার হাতে শুধু শেভ হওয়া নয়, মরতে পারি। মেয়েটি বলল বেশ। তার বাবার ঘর থেকে ক্ষুর সেভ সাবান নিয়ে এল সে। সাবান ঘষল অনেকক্ষণ মেজরের গালে এবং গলায়। মেজর আবেশে চোখ মুদে রইলেন। সে চোখ আর খোলার অবকাশ হল না। সাবান মাখা গলায় ধারালো ক্ষুরটা অনেকখানি ঢুকে তখন কণ্ঠনালি ছিন্ন করছে। গলগল করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। প্রৌঢ় জারমান মেজরের ভারী শরীরটা চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।'

গল্প শেষ করে রহমান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কেয়ার দিকে চেয়ে বললেন, 'কেমন লাগল গল্পটা?'

কেয়া বলল, 'বেড দিয়ে মানুষ খুন। এটা তো গল্পই।'

'হ্যাঁ গল্প। সেকেনড ওয়ারলড ওয়ারের উপর লেখা গল্প। কিন্তু আমাদের জীবনে এই গল্প যে কোন সময় সত্য হয়ে উঠতে পারে।' রহমান বললেন।

'তা পারে।' আমি সায় দিলাম। অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরে আমরা যেন অনেকক্ষণ হয় নিজেদের মধ্যে ফিরে এসেছি। অন্ধকারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম নিজেদের থেকেই। এই উপলব্ধিটা সহসা আমাকে সাহস দিল। বললাম, 'রহমান সাহেব, সব গল্পেরই একটা শেষ কথা থাকে। এই গল্পেরও শেষ কথা আছে। আমরা যেন ভয় না পাই। আমরা শুধু মরতে পারি না। মারতেও পারি। তাই না? রহমান কি বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। কেয়া এবার নিষেধ করল না। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললাম। হ্যালো বলে এক সেকেন্ড কথা শুনে রিসিভারটা বাড়িয়ে দিলাম রহমানের দিকে, আপনার স্ত্রী। কথা বলতে চান।

রহমান উঠে দু'মিনিট কথা বললেন। রিসিভার রেখে বললেন, 'ব্যাড নিউজ, সোনিয়া আজ দু'দিন বাড়ি ফিরছে না।'

'খবরটা কে দিল?'

'আমার সেই শালা। তবে খবর এটা নয়, আরেকটা। দুটো ট্রাক বোঝাই মিলিটারি আসছে এদিকে। ওদের মুভমেন্ট রহস্যজনক। কেউ বলছে নারায়ণগঞ্জ যাবে কেউ বলছে টারগেট এদিককার কোন পাড়াই।' কেয়ার মুখে ভাবান্তর নেই। শক্ত হাতে চেয়ারটা চেপে ধরেছে কেবল। এখন ওই চেয়ার চেপে ধরার মধ্যেই তার মনের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। রহমান বললেন, 'আমার স্ত্রী ভয় পেয়েছিল। বললেন, তোমরা কি করবে? উপরে আসবে, না নীচে যাব?'

বললাম, 'কেয়া, কি বলছো?'

কেয়া কথা বলল না। হয়ত বলতে পারল না। তার চোয়াল শক্ত হয়ে রয়েছে। ওর মুখের সতেজ লাবণ্যটুকু শুষে যেন ঘরে বিজলির আলো জ্বলছে। রহমান কেয়ার মুখের দিকে তাকালেন। হয়ত ওকে বুঝতে পারলেন। বললেন, 'আমরাই বরং নীচে আসি। একটা বেডরুম খালি রয়েছে। তাছাড়া আমাদের তো একটা বাচ্চা। অসুবিধে হবে না।'

নিজের হাতে দরজা খুলে বেরোতে যাচ্ছিলেন রহমান। দোরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাস দুই আগে ট্রাপ বাড়ির সেভেন ছবিটা দেখেছি। তখনও বুঝিনি, ট্রাপ কাকে বলে! এখন এই বাড়িটা ট্রাপ বাড়ি কাইন্ড না হলেই হয়। না, না ভয় পাবেন না। যতক্ষণ বেঁচে আছি, একটু ঠাট্টা তামাশাও করবো না?'

রহমানের গলা নিস্কম্প আত্মগত শোকবাণীর মত। আমার বুঝতে বাকি রইল

না, রহমান ঘাটি করছেন না, নিজেরাই নিজ সাহস যোগাচ্ছেন।

দরজা বন্ধ করে ঘরে দাঁড়ালাম। কেয়া নেই। খাবার ঘরে পেয়ালা পিরিচের টুংটাং আওয়াজ পেলাম। হঠাৎ মনে সাহস এলো। ওই টুংটাং আওয়াজ যেন কোন বড় ওস্তাদের হাতে মধ্যরাতের বাজনা। দরবারি কানাড়ার মত থেমে থেমে বাজছে। এখনও সুর করে ওঠেনি। কেয়া যেন এই মধ্যরাতের দরবারি।

পর্দা ঠেলে খাবার ঘরে ঢুকলাম। টুংটাং আওয়াজ থেমে গেল। কেয়া চোখ তুলে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে, সকল আলোময় করে একটা ভয়াবহ শব্দ হয়ে গেল। কেয়ার শক্ত চোয়াল ধীরে ধীরে নরম হল। দুর্বোধ্য ঠোঁট ফাঁক হল। বলল, 'বোম?'

বললাম, 'সম্ভবত।' সেই মধ্যরাতের দরবারি মূর্ছনা তখন আমার মনে নেই। স্পষ্ট দেখলাম, কেয়ার চোখে অবিশ্বাস। আমরা দুজনেই দুজনের কাছ থেকে মনের ভয় লুকোচ্ছি।

এ রাতে আমরা খেলাম ফ্রিজে রাখা ঠাণ্ডা মাংস, পাউরুটির শুকনো স্লাইস। ... পালিয়েছে। ঝিটা আসছে না ... মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। বেঁচে আছে কিনা জানি না। কেয়া হিটারে ... চাপিয়ে দুকাপ ওভালটিন তৈরি করল।

রহমান তার ঘরের দরজা বন্ধ করেছেন অনেকক্ষণ হল। শুভরাত্রি জানাবার সময় বার বার বলেছেন, 'দেখবেন, তেমন বিপদের আশঙ্কা কিছু দেখলে দরজায় টোকা দেবেন।' ইচ্ছে হয়েছিল রহমানকে সেই সোনালি মেয়ের গল্পটা শুনিয়ে দি', যে তার মাকে বলেছিল, মা বাঘটা শিরোবার সময় হলে আমাকে জাগিয়ে দিও। মা বলেছিল, আমাকে জাগাতে হবে না বাছা, তুমিই সকলকে জাগাবে! কিন্তু রহমানের মুখের দিকে তাকিয়ে গল্পটা বলিনি। আমার মনের একটা ঠাট্টার লোভ সম্বরণ করেছি। কেয়া কেমন ফুলে আছে। ফুঁসে আছে। কিন্তু ফুঁসছে না। আমি ঝড়ের আগে নদী দেখেছি। বৃষ্টির আগে নদী দেখেছি। তখন নদীর জল বড় শান্ত। বড় উদাস। কিন্তু কেমন যেন ফুলে ফুঁসে থাকে। ঔদাস্যের সঙ্গে ফুলে থাকাটা বেমানান। আর বেমানান সেই আমার চোখে বাজে বেশি। নদী আর নারী। আমি এই দুয়ের কোন অমিল দেখিনি কখনও।

বিছানায় বসতেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখলাম। খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। রোজ এখন শেভ করি না। এখন অফুরন্ত সময়। হাতও চলে না। গায়ের জামা ভাঁজ নষ্ট হয়ে চিকে আছে। অফিসে যাই না আজ কতদিন! ততদিন জামা বদলও হয়নি।

আয়না থেকে মুখ ফেরাতেই দেখি, কেয়া কেমন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার কালো চোখের তারায় জলের শিহর। অথবা সেই ফুলে ফুঁসে ওঠা ভাবটা বাড়ছে। বললাম, কি দেখছো?

কেয়া হঠাৎ আমার কাছ থেকে সরে গেল। একটা বালিশ আঁকড়ে ধরল দুহাতে। আমি তার পিঠে সস্নেহে হাত রাখলাম। সে হাতটা সরিয়ে দিল।

'ভয় পেয়েছো?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'না।' কেয়া আরেকটু দূরে সরে গেল। বালিশে মুখ গুঁজল, 'আয়নায় নিজের চেহারা দেখেছো?' আমার মনে হল, কেয়া হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল।

'ও, এই কথা।' আমি হাসতে চাইলাম। 'আয়না যখন ঘরেই রয়েছে তখন দেখব না কেন? কিন্তু তা নিয়ে অমন করার কি আছে?'

'তো-মা-কে, তো-মা-কে', কান্নার আবেগে কেয়া থেমে থেমে বলল, 'তোমাকে জানোয়ার জেব্রার মত দেখাচ্ছে।'

'কার মত, কার মত দেখাচ্ছে বললে?' আমি বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম। যেন ওই একটি কথাই দ্বিতীয়বার না শুনলে আমার বিশ্বাস হবে না যে, কেয়া বলছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও ভারত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যোজনা কমিশনের সভায় ঘোষণা করেছেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি পরস্পরের পরিপূরক হবে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; যে পরিমাণ সাহায্য চাই না কেন, ভারত বাংলাদেশকে তা দিয়ে যাবে এবং এজন্য ভারতের ওপর যে চাপ পড়বে তাতে কোন সংকটের সৃষ্টি হবে না। কেননা, ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিপূরক ও বিনিময়ের অনেক কিছু আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে পরস্পরের সংগে গভীরভাবে জড়িত তার মূল্যায়ন ঠিকই করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং এজন্যই তাঁর ছয়দফা দাবির মধ্যে বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বাধিকার অন্যতম বিশেষ দাবি ছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন ভারত বাংলাদেশে কয়লা পাঠাতে পারে এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আসামের সংগে জলপথে ভারতের অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ গড়ে উঠলে পরিবহণ বাবদ ভারতেরও খরচ কমবে এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভারতীয় মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে নানা রকম সবজি, মাছ, নিউজপ্রিন্ট ও কাঁচা পাট এদেশে রপ্তানি হলে পশ্চিমবাংলায় এ-সব জিনিসের দাম কমবে। বাংলাদেশের সংগে ভারতের অর্থনৈতিক সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজনীয় এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। এখন দেখা যাক, বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব হতে পারে এবং ভারত এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কতটা সাহায্য করতে পারে।

বাংলাদেশের আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পশ্চিমবাংলায় শরণার্থী হিসাবে যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে অর্থনৈতিক-পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এজন্য প্রায় ২০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে; তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে অন্তত ৭০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। পাক-বাহিনী আত্মসমর্পণ করার আগে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের কোষাগার থেকে সব টাকা লুট করে নিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানী মুদ্রার সরবরাহ এখন বাংলাদেশে খুবই কম। বাংলাদেশ সরকার

শীঘ্রই নিজেদের মুদ্রা চালু করবেন বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অনেক অর্থের প্রয়োজন; ভারত নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে যে ৪২টি পাটকল আছে সেগুলি যদি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে একটি কর্পোরেশনের আওতায় আনেন তবে পাট রপ্তানি করেই বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। গত ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশের পাট রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল, তার অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের কল্যাণের জন্য; সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানীগণ একটি উপনিবেশ বলেই গণ্য করতেন। বাংলাদেশ সরকার যদি একটি স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন গঠন করে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন তবে বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। সোনার বাংলায় ধানের অভাব হবে না।

এ বছর জংগীশাহীর অত্যাচারে ধানক্ষেত পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে সুজলা সুফলা বাংলাদেশের মাটি শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঘরে যদি খাবারের অভাব না থাকে তবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। তবে এ বছর ভারতকে কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। ভারতে বর্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে ক্রমবর্ধমান হার দেখা যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে বাংলাদেশকে চাল ও গম দিয়ে সাময়িকভাবে সাহায্য করতে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। কিন্তু বাংলাদেশের আরও প্রয়োজন আছে; বিশেষ করে কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর প্রয়োজন খুবই বেশি—যেমন কেরোসিন, দেশলাই, কাপড় প্রভৃতি। ভারতের পক্ষে এ জিনিসগুলি সরবরাহ করা সম্ভব।

সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। পূর্বতন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছিল। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার এতকাল যে বৈদেশিক সাহায্য পেয়ে এসেছে তার শতকরা ৫৬ ভাগ বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা উচিত ছিল; কিন্তু তা করা হয়নি। যদিও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পূর্ব-অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ সরকারের আছে, তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, স্বাধীন সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নতুনভাবে তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চান। যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি অধিবাসী কৃষিজীবী সে-দেশকে কৃষির উন্নতিকে অগ্রাধিকার দিয়েই উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরি করতে হবে। কিন্তু একজন্য শিল্পোন্নয়নের আশু প্রয়োজনের কথা উপেক্ষা করলে চলবে না। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের যোগান বাংলাদেশে প্রচুর আছে। জনবলও সে দেশে যথেষ্ট। গুরুভার শিল্প ও মৌলিক শিল্পের উন্নয়ন না হলেও এবং শিল্প-শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতার মান উন্নত না হলেও বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা মন্থর গতিতে এগোবে না; কেননা ভারত একাজে বাংলাদেশের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ভারতেরও উন্নতি—বাংলাদেশেরও উন্নতি। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, তার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে। বহির্বিশ্বের সংগে বাংলাদেশের যোগাযোগ রাখা খুবই সহজ। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জিনিসপত্র সহজে বিদেশে পাঠাতে পারবে। বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত সামগ্রীর প্রধান ক্রেতা হবে ভারত এবং এজন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি এখনই হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মসূচী এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে বৈদেশিক বাণিজ্য, শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক মূলধন প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারের একটি সুস্পষ্ট নীতি ঘোষিত হয় এবং সেভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়। সেই সংগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

অর্জন করার জন্য, বিশেষ করে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শীঘ্রই বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হবে এবং সরকারের আয়-ব্যয় নীতিও নিরূপিত হবে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে এমনভাবে সম্পদ আহরণের কর্মসূচী তৈরি হবে আশা করা যায় যাতে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসৃত হবে। বাংলাদেশ সরকার তার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রা-সম্পর্কিত নীতিও উন্নয়নমুখী ('গ্রোথ-ওরিয়েণ্টেড') করবেন বলে আশা করা যায়। বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন এই নবজাত রাষ্ট্রের দিকে। বিশ্বের ইতিহাসে এভাবে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষ লক্ষ বাঙালীর রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হল তার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে কত তৎপর আমরা তা দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, দেশ থেকে অতি দ্রুত নিরক্ষরতা দূর করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। সেই সঙ্গে প্রয়োজন কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করা। একটি নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচী প্রণয়ন করে তার যথাযথ রূপায়ণ করা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু একদিকে বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং অপর দিকে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে এই বিশ্বাস আমরা রাখি।

সুব্রত গুপ্ত

কানভাস আর্টিস্টস্ সার্কল-এর উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ভাস্কর-শিল্পী মানিক তালুকদারের একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে ২০টি ভাস্কর্য-নিদর্শন দেখা যায়।

গত কয়েক বছর যাবৎ এই তরুণ ভাস্করের বহু ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখে আসছি এবং বলতে বাধা নেই যে, তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে সফলতার পথে এগিয়ে চলেছেন। মানিক তালুকদার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের একজন কৃতী ছাত্র, ছয় বছর আগে তিনি ভাস্কর্যশিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করে ডিপ্লোমা লাভ করেন। পরে বহু প্রদর্শনীতে নানা পুরস্কার লাভ করেন ও আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে পরে সুনাম অর্জন করেন। এই ভাস্কর বর্তমানে ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করে শান্তিনিকেতন কলাভবনে সুপরিচিত ভাস্কর-শিল্পী শ্রীশর্বরী রায়চৌধুরীর কাছে উচ্চতর শিক্ষালাভ করছেন। মানিক তালুকদারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমকালীন বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করলেও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যধারা তিনি ভোলেন নি। অর্থাৎ ভারতের পুরানো ও প্রচলিত শিল্পধারাকে কেন্দ্র করেই তিনি আধুনিক রীতিতে বিভিন্ন ভাস্কর্য নিদর্শন সৃষ্টি করেন। সুতরাং দেশের আদর্শধারা ও সমকালীন রীতির সংমিশ্রণ করে তিনি নতুনতর যুগের উপযোগী ভাস্কর্যশিল্প সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। মাধ্যম হিসাবে তিনি প্লাস্টার অব প্যারিস, সিমেণ্ট ও কাঠ ব্যবহার করেছেন, তা ছাড়া ব্রঞ্জ ঢালাই কাজও করেছেন। বহিঃস্থান (space) ও আকারের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন এবং এই নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করে তিনি আকারের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে, প্রায় প্রত্যেক নিদর্শনেই একটি সাবলীল ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে—বিশেষ করে টর্সো নিদর্শনমালার কয়েকটিতে—যেমন ১৭ ও ১৮নং (কাঠ)। দু-একটিতে ইঙ্গিত ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ১৩নং-এর (সিমেণ্ট) উল্লেখ করা যায়। পাখি নিদর্শনমালার কয়েকটি কাজ সম্পূর্ণ আকারভিত্তিক। চিন্তাধারা ও গঠনরীতির দিক থেকে এগুলি প্রশংসা দাবি করতে পারে, যেমন ৪ ও ৭নং (প্লাস্টার)। প্রাচীন লোকচিত্র অবলম্বনে গঠিত কয়েকটি নিদর্শন অনেকেরই চোখে পড়ে—বিশেষ করে এমব্রেসড ও থ্রি ফিগারস (প্লাস্টার)। একটি কাঠখণ্ডকেই ওপর দিকে খোদাই করে শিল্পী ইঙ্গিতে দুটি মূর্তির অবতারণা করে দুটিতেই একটি একটি ছোট গর্তের সৃষ্টি করে প্রথমটিতে আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি মূর্তিরই একাত্মক রূপ প্রকাশ করেছেন। সহজ অথচ সুন্দর খোদাই-কাজটি সকলের ভাল লাগে। দ্বিতীয়টি লোকচিত্র অবলম্বনে খোদিত রিলিফ-জাতীয় নিদর্শন—এটির নিছক সরলতা দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি নিদর্শনের নাম করা উচিত মনে করি—গপ্লে। দেশের পুরানো পুতুলভিত্তিক এই নিদর্শনটিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে পরিকল্পনা ও কারুকার্যের জন্য ফিশ-এর নাম করা চলে। শিল্পীর সাম্প্রতিক ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে লোকচিত্র ও পুতুলভিত্তিক কাজগুলিই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আশা করি ভবিষ্যতে এই ভাস্করের এ-জাতীয় রচনার নতুনতর নিদর্শন দেখার সুযোগ পাব।

❊

নানা রঙের ও বিভিন্ন শ্রেণীর সুনির্বাচিত কয়েকটি সদ্য-ফোটা ফুল, শুকনো গাছের কয়েকটি পাতা ও ছোট ছোট ডাল, হালকা থার্মোকোলের কয়েকটি পাত ও সেই সঙ্গে উপযুক্ত পৃষ্ঠভূমি সৃষ্টি করে কি অপরূপ পরিবেশের

—শ্রীমতী উমা দেবী

বৈষম্য ও সহাবস্থান
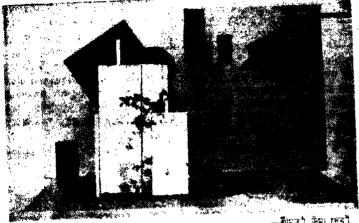
অবতারণা করা যায় তার পরিচয় পাওয়া গেল কুসুমিকার উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে আয়োজিত 'ক্যালকাটা থ্রু ফ্লাওয়ারস' প্রদর্শনীতে। সত্যিই, বিষয়বস্তু, উপস্থাপন ও সজ্জাপ্রণালীর দিক থেকে এই প্রদর্শনীটি যে অভিনব তা যাঁরা প্রদর্শনীটি দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। কুসুমিকার পরিচালিকা শ্রীমতী উমা বসু ইতিপূর্বে ফুলসজ্জার বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করে সুনাম অর্জন করেছেন। নানাজাতীয় ফুল ও লতাপাতা রুচিসম্মতভাবে ব্যবহার তথা সংস্থাপন করে আমাদের আপন আপন বাসগৃহের রূপ কত বিচিত্র, সুন্দর ও মধুময় করে তুলতে পারি, বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও তিনি তার আভাস দিয়েছেন। বহির্বাংলা তথা বিদেশে আমাদের আপন শহর কলকাতা আজ নিন্দিত, ঘৃণ্য, অপাঙ্‌ক্তেয়- সকলেরই ধারণা কলকাতা শহর নাকি আজ বসবাসের অযোগ্য। শ্রীমতী উমা বসু ও কুসুমিকার কয়েকজন ছাত্রী এই বহুজনিন্দিত কলকাতা শহরেরই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নানা ফুল-লতাপাতার সজ্জা-মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নিদর্শনগুলিকে ঠিক সজ্জাপ্রণালীর অঙ্গ হিসাবে দেখা ভুল—এর এক একটি নিদর্শনই এক একটি সুপরিকল্পিত কমপোজিশন। শুধু তাই নয়—এক দিকে যেমন শ্রীমতী বসু শিল্পীসুলভ অনুসন্ধানী চোখে শহরটিকে দেখে তার দর্শনীয় স্থানগুলির বৈশিষ্ট্য কমপোজিশনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, অন্য দিকে আবার তিনি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শহরের কদর্য দিকগুলিও শ্লেষাত্মক কটাক্ষপাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন: কমপোজিশনগুলির মধ্যে প্রথমেই শ্রীমতী উমা বসুর হাওড়ার পুল, বৈষম্য ও সহাবস্থান ও মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুই প্রতীক, মাধ্যমে প্রকাশিত। দু দিকে দুটি গাছের মোটা ডাল রেখে তাদেরই প্রসারিত ডালপালা সাজিয়ে তিনি হাওড়া পুলের আকার সৃষ্টি করেছেন ও মধ্যে দীর্ঘাকার একটি কাচ রেখে নীচে পুতুলজাতীয় মাছ রেখে গঙ্গার গভীর জল ও ইলিশ মাছের ইঙ্গিত দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি কমপোজিশন হিসাবে অপূর্ব। দু দিকে ছোট ছোট পাইপের কয়েকটি টুকরা রেখে মধ্যস্থলে ধ্বনি-কোলের লম্বমান কয়েকটি পাত সংস্থাপন করে তিনি কলকাতা শহরের আকাশচুম্বী ইমারত ও সেই সঙ্গে বস্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল টিমের ফুটবল প্রতিযোগিতা কলকাতা শহরের একটি চিরপরিচিত বিশিষ্ট ঘটনা। সুকল্পিত একটি কমপোজিশনে এক-দিকে পুতুলজাতীয় কয়েকটি চিংড়ি মাছ ও অপর দিকে ইলিশ মাছ সংস্থাপন করে সুন্দর দুটি প্রতীকের মধ্য দিয়েই এই দুটি টিমের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করেছেন। শ্লেষাত্মক রচনাগুলির মধ্যে ভাঁড়ু মা ভবানী এক অপরূপ সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ও বিশেষ করে নাইট ক্লাবের ক্যাবারে নর্তকী অবলম্বনে রচিত 'কত ধন যায় এক প্রমোদে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশ-ফুল, নারকেল গাছের পাটা ও নানাজাতীয় শুকনো লতাপাতা মাধ্যমে রচিত ক্যাবারে নর্তকী দুটির মূর্তি অনেকের চোখে পড়ে। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে স্বর্ণ-যুগের সন্ধানে (নারায়ণ কর্মকার), রবীন্দ্র সরোবর (শ্রীমতী গোপা ঘোষ দস্তিদার), মোহিনী (শ্রীমতী সুস্মিতা সেনগুপ্ত) ও কালীক্ষেত্র কলিকাতা (শ্রীমতী অঞ্জলি রায়-চৌধুরী)-র নাম করা চলে। রঙিন চিত্রপটের পশ্চাদ্ভূমি রচনার জন্য শিল্পী আদিত্য বসুও প্রশংসা দাবি করতে পারেন, বিশেষ করে বৈষম্য ও সহাবস্থান-এর পশ্চাৎপট অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিত্রপ্রিয়

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা

এম. আর. আখতার

॥ ২১ ॥

প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা দ্রুত বুঝতে পারলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তিনি যেভাবে পুতুল-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতে চান এবং পাকিস্তানের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করতে চান সেটা সম্ভব নয়। কেননা বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দেশ শাসন ও নীতি নির্ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন। ফলে যা আশংকা করা হয়েছিল তাই-ই বাস্তবে পরিণত হলো। প্রেসিডেণ্ট মীর্জা তাঁর রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করলেন। বিদেশ সফরান্তে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিমান বন্দরে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের দস্তখতে পদচ্যুতি-পত্র লাভ করলেন। ক্ষণিকের তরে তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। পদচ্যুতি-পত্রে লেখা রয়েছে, 'প্রেসিডেণ্ট জানতে পেরেছেন এবং পরিষ্কার প্রমাণ পেয়েছেন যে, পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নাই, সেই হেতু তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদচ্যুত করা হলো।' সোহরাওয়ার্দী সাহেব ব্যাকুলভাবে পার্লামেণ্টে মোকাবেলার আবেদন জানালেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রেসিডেণ্ট মীর্জা এই আবেদন নামঞ্জুর করলেন।

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে তেরজন সদস্য-বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তেরো সদস্যের মন্ত্রিসভা তেরো মাস কাল ক্ষমতাসীন থাকার পর পদচ্যুত হলেন। তাই পরবর্তীকালে অনেকেই সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে 'আনলাকী থার্টিন' বলে ঠাট্টা করলেন।

করাচীতে আবার কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো। এবারে রূপ হলো মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান, কৃষক শ্রমিক পার্টি। বোম্বাই থেকে আগত মোহাজের এবং অবিভক্ত ভারতের অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ও মুসলিম লীগের পাণ্ডা ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড় নূতন প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হলেন। প্রাক্তন মুসলিম লীগারদের সমন্বয়ে গঠিত রিপাব-

লিকান পার্টি, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুন্দ্রীগড়কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। জনাব চুন্দ্রীগড় ক্ষমতাসীন হয়েই পার্লামেন্টে পৃথক নির্বাচনের বিল পাশ করিয়ে নিলেন। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিশ্চিত্য করবার জন্য যে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। সমগ্র পাকিস্তানের বিভিন্ন ছাপাখানায় তখন যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা ছাপা হচ্ছিলো। রাতারাতি টেলিগ্রাম ও টেলেক্স করে নতুনভাবে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা ছাপার নির্দেশ দেওয়া হলো। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে নয়া শাসনতন্ত্র মোতাবেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা হয়েছিল। তাই জনাব আই আই চুন্দ্রীগড় পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। কেননা তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু থাকলে পূর্ব বাংলা থেকে ধর্মীয় জিগির তুলে মুসলিম লীগের পক্ষে গোটা কয়েক আসন দখল সম্ভব। কিন্তু তাঁর সে আশা আর পূরণ হয়নি। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন দলের মধ্যে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ভুমুল বিরোধ দেখা দিলে রিপাবলিকান দল মন্ত্রিসভার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে বসলেন। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আবার পতন হলো।

এইবার জনাব সোহরাওয়ার্দী নতুন চাল দিলেন। তিনি রিপাবলিকান দলীয় নেতা পূর্ব বাংলার প্রাক্তন গভর্নর স্যার ফিরোজ খান নুনকে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুরোধ করে আওয়ামী লীগের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানালেন। তবে তার একটাই মাত্র শর্ত। সেটা হচ্ছে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। নুন সাহেব দেখলেন রিপাবলিকান পার্টির অস্তিত্ব পূর্ব বাংলায় নাই বলেই এই শর্তে তাঁর দলীয় স্বার্থ বিশেষ বিঘ্নিত হচ্ছে না। তাই তিনি এই শর্তে আর এক দফা আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করলেন। এদিকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও শেখ মুজিবুর রহমান দলীয় সদস্যদের সেই মর্মে বুঝালেন যে, এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাসীন থাকা প্রয়োজন এবং নির্বাচন অভিযানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ ব্যবহারের তীব্র সমালোচনার সুযোগের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবুও নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে প্রথমে আওয়ামী লীগ সদস্যরা ফিরোজ খান নুন মন্ত্রিসভায় যোগদান * করেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পর্দার পিছনে মুসলিম লীগ দল রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করলো। বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যাপারটা আঁচ করে এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন, 'আওয়ামী লীগ নুন মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলেও রিপাবলিকান পার্টির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে।' ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর বিকেলের দিকে ফিরোজ খান নুনের রিপাবলিকান মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করলো। সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা করাচীতে নিজের সরকারী বাসভবনে এক ককটেল পার্টির আয়োজন করলেন। যখন সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা ককটেল পার্টিতে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন, তখন রাতের অন্ধকারে করাচী শহরে সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল আয়ুব খানের নির্দেশে 'আর্মি' জোয়ানরা 'পজিশন' নিতে শুরু করেছে। নগরীর উপকণ্ঠে সামরিক বাহিনীর ট্যাংক ও সাঁজোয়া বাহিনী আস্তানা গেড়েছে। শুধু করাচী কেন, সমগ্র দেশের বড় বড় শহরগুলোতে একইভাবে সৈন্যবাহিনী চূড়ান্ত নির্দেশের প্রতীক্ষায় ঘেরাও করেছে। এর অ গেই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য নির্দেশ জারী করে স্বয়ং ককটেল পার্টিতে মদের গ্লাস হাতে রাজনীতিবিদদের সঙ্গদান করছেন। এ কথাগুলো দিন কয়েক পরে প্রেসিডেন্ট মীর্জা 'গউজ' করে বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

ঢাকার এক নম্বর রামকৃষ্ণ মিশন রোডে ইত্তেফাক অফিসের বার্তা বিভাগের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। করাচী থেকে মুজিব ভাইয়ের টেলিফোন। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক ভাইকে চাইলেন। আমি বললাম, উনি এখন বাইরে, [illegible] মানিক ভাই আপনাকে আবার টেলিফোন করবে।' মুজিব ভাই করাচীর রাজনৈতিক ডামাডোলের খবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে গেলেন। আমি যন্দুর পারলাম নোট নিলাম। এরপর দৈনিক ইত্তেফাকের করাচী অফিস থেকে এই সূত্র দিয়ে কাগজের লাইন-মতো রিপোর্ট লিখতে শুরু করলাম। মোটামুটিভাবে আওয়ামী লীগ সদস্যরা নুন মন্ত্রিসভার সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এর অন্তর্ভুক্ত কেন হলেন না, তারই ফিরিস্তি।

রিপোর্টটা লেখা প্রায় শেষ করে এনেছি, এমন সময় রাত এগারোটার দিকে পত্রিকার বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেন ও প্রবীণ সাংবাদিক খোন্দকার আবু তালেব অফিসে এলেন। দুজনে একই বাসায় থাকেন। তাই দিনে না হলেও রাতে একই রিকশায় অফিসে আসেন। তালেব সাহেব অফিসে এসে তার স্বভাব অনুযায়ী সকলের সঙ্গেই ইয়ার্কী মারছেন। কাজের অসুবিধা হচ্ছে দেখে বার্তা সম্পাদক কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বিরাট টাকওয়ালা তালেব ভাই সেটা গ্রাহ্যই করলেন না। মিনিট কয়েক পরেই তিনি টেলিপ্রিন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে দিব্বি তাঁর ইয়ার্কী মস্করা, গলায় টেলিপ্রিন্টারের কাছে 'সিরাজ, ও সিরাজ, আমার মনে হয় তোমরা এখন আর নিউজ তৈরি করা বন্ধ করতে পারো। যা কিছু সমস্ত দিন ধরে কম্পোজ করেছো, সমস্ত বাতিল বলেই মনে হচ্ছে। অন্যরা যথারীতি কাজ করে যেতে লাগলেন— কেউই তালেব ভাইয়ের কথা আমলই দিলাম না। তিনি বললেন, 'বেশ তোমরা যখন আমায় কোন পাত্তাই দিচ্ছো না, তখন টেলিপ্রিন্টারে এসে দেখে গেলেই পারো। প্রথমে বার্তা সম্পাদক সিরাজ সাহেব নিজেই উঠে গেলেন। তারপর চীৎকার করে উঠলেন, 'পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মীর্জা শাসনতন্ত্র বাতিল ও রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী ঘোষণা করেছেন। মন্ত্রিসভা বরখাস্ত—সামরিক প্রধান মেজর জেনারেল আইয়ুব খান নয়া প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।' পাকিস্তান নামে দেশটা একনায়কত্বের অক্টোপাশে বাঁধা পড়লো। সেই একনায়কত্বের সাথে সাথে শিকারের মধ্যে সিরাজউদ্দীন হোসেন ও খোন্দকার আবু তালেব অন্যতম। জনাব হোসেনকে গত ১০ই ডিসেম্বর ঢাকার মোহাম্মদপুরে পাকিস্তানী নরপশুরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আর খোন্দকার আবু তালেব বাংলাদেশের সামরিক হামলার শুরুতেই সপুত্রক ঢাকার মীরপুরের দুষ্কৃতিকারীদের ছোরায় নিহত হয়েছেন।

[ক্রমশ]

আমনা

তেত্রিশ

আজ বিকেলে শচিদাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম; গিয়ে এক কাণ্ডই হল। শচিদা হাসপাতালে গিয়েছে দিন পনেরোর বেশী। সবাই শচিদাকে দেখতে যায়, আমারই শুধু যাওয়া হচ্ছিল না। আমার কেমন ভয় ভয় করত। আজ যখন কাঠামশাই যাচ্ছিলেন, আমি জোর করেই তাঁর সঙ্গে গেলাম। হাসপাতালে ঢোকবার সময়ই আমার বুক কাঁপছিল। ভেতরে শচিদার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। আমি কখনও হাসপাতাল দেখি নি; এই প্রথম দেখলাম। হাসপাতাল শুনেছেই আমার ভয়, দেখার পর ভয়টা যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দিল। তার ওপর শচিদার ঘরে গিয়ে দেখি—মস্ত ঘর, সার সার বিছানা পাতা, বড় বড় জানলা, অনেক উঁচু থেকে পাখা ঝুলছে, বাতি ঝুলছে, নানা বয়সের রোগী, নার্সরা আসা-যাওয়া করছে, সমস্ত ঘরটা যেন ঠাণ্ডা, কেমন এক উৎকট ওষুধের গন্ধ ঘরের বাতাসে, নিশ্বাস নেওয়া যায় না, একজন খুব জোরে জোরে কাতরাচ্ছিল, দূরে কার যেন নাকে একটা নল ঢোকানো, লোকজন রোগী দেখতে এসেছে। শচিদা বিছানায় শুয়ে ছিল। সাদা চাদর। গায়ে একটা ঢাকা। কী রোগা দেখতে হয়ে গেছে শচিদাকে। মুখটার দিকে আর তাকানো যায় না, নাক চোখ সব যেন বসে গেছে, মুখে শুকনো হাসি, গালে ভরতি দাড়ি। দেখতে দেখতে আমার মাথা ঘুরে গেল, হাত পা ঠাণ্ডা, বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। শচিদার সঙ্গে আমি দুটো কথাও বলতে পারি নি, ধপ করে বিছানার পাশে বসে পড়লাম।

দাদা তখনও এসে পৌঁছোয় নি। অবিনদা ছিল। ইন্দুদিও তখন এসেছে। ইন্দুদিদেরই হাসপাতাল। কাঠামশাই শচিদার মাথার দিকে টুলে বসে। আমার বমি বমি লাগছিল। ইন্দুদি আমার অবস্থা দেখে কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গে অবিনদা এসে আমার হাত ধরে টানল।

কী যে হল আমি পরিষ্কার বুঝলাম না। সিঁড়ি, ঘর, বারান্দা, আবার সিঁড়ি—এই ভাবে কোথা থেকে কোথা দিয়ে শেষে হাসপাতালের নীচের রাস্তায়, তারপর আস্তে আস্তে একেবারে ফটকের কাছে। তখনও আমার হাত পা থর থর করে কাঁপছে, জিব শুকিয়ে গিয়েছে, ঠোঁট টান ধরছে, গা গুলিয়ে উঠছিল।

অবিনদা একটা রিকশা পেয়ে আমায় হাত ধরে তুলে দিল। নিজেও উঠল।

রিকশায় বসে অবিনদা শুধু বলল, "তুমি আচ্ছা ভীতু তো! একটা কেলেংকারি করতে আজ।"

রিকশায় বসে আস্তে আস্তে আমার যেন হুঁশ এল। এক এক করে আমি স্পষ্ট করে সব দেখতে পাচ্ছিলাম। মানুষজন হাঁটছে, গাড়িঘোড়া চলছে, বিকেল বলে আর কিছু নেই, চারপাশে ধুলো, কতকগুলো ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে একটা মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার কেমন কান্না এল। মুখ ঘুরিয়ে চোখের জল মুছলাম।

অনেকটা এসে অবিনদা রিকশা থামাল। আমরা নামলাম। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে অবিনদা আমাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকান, সাজানো গোছানো। অবিনদা আমাকে চোখ মুখ ধুয়ে আসতে বলল।

চোখেমুখে জল দিয়ে এসে আমি কি যেন খেলাম, সোডা-আইসক্রিম বোধ হয়। বেশ মিষ্টি ছিল।

খানিকটা বসে থাকার পর অবিনদা বলল, "কেমন লাগছে?"

"ভাল।"

আমার তখন ভালই লাগছিল। গলা আর শুকিয়ে নেই, ঠোঁট টান ধরছে না। বমি বমি ভাবটাও গিয়েছে।

"এবার এক কাপ চা খাও, সব ঠিক হয়ে যাবে", অবিনদা হেসে বলল।

চা খেতে আমারও ইচ্ছে করছিল।

সামান্য পরে চা এল। অবিনদা মজা করে করে একটা দুটো কথা বলছিল। আমার নিজেরই এখন কেমন লজ্জা করছে।

চা খেতে খেতে অবিনদা বলল, "এবার তাহলে কোথায় যাবে?"

"বাড়ি।"

"বাড়ি?"

"আপনি তো আর কোথাও নিয়ে যাবেন না?" কথাটা এমনিই বললাম। তারপর মনে পড়ল, কলকাতায় আসার পর থেকে আমার

বাইরে বেরনো একেবারেই হয় নি। এক আধদিন বেড়াতে বেরিয়েছি, ওই যা। শচিদাকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত রয়েছে যে কোথাও আর যাওয়া হয় না। অবিনদা আমায় অনেকবার বলেছে, তোমায় গোটা কলকাতা চক্কর মেরে দেখিয়ে দেব। কিন্তু দেখাতে পারে নি। শচিদা, বৃষ্টিবাদলা— এ-সবের জন্যে আর হয়ে ওঠে নি।

আমার দিকে তাকিয়ে অবিনদা হাসিমুখে বলল, "কোথায় যাবে, বলো?"

"যেখানে হোক।"

"যদি আবার মাথা বনবন করে?"

"করবে না।...আমি কখনও হাসপাতাল দেখি নি। হাসপাতাল শুনলে আমার ভয় করে। কলকাতার হাসপাতাল কী বড়।"

"বেশ, তা হলে চলো—তোমায় খানিকটা টাটকা হাওয়া খাইয়ে আনি। গঙ্গার দিকে যাবে?"

"আমি গঙ্গাটঙ্গা চিনি না। আপনি নিয়ে গেলেই যাব।"

অবিনদা চা শেষ করে সিগারেট ধরাল। আমারও চা খাওয়া শেষ হল।

বাইরে বেরিয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অবিনদা ট্যাক্সি পেল। আজ আকাশে মেঘ নেই। সারা দিন কাঠ ফাটা রোদ ছিল। গুমোটও গিয়েছে। আষাঢ় মাস শেষ হয়ে শ্রাবণ সবেই পড়েছে বুঝি। আমি ঠিক জানি না। কার মুখে যেন শুনেছিলাম। কোথাও যদি মেঘলা জমে থাকে বোঝার কোনো উপায় নেই, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এমনিতেই সব ঝাপসা, তার ওপর কলকাতার বাড়ি-ঘরের আড়াল থেকে আকাশটাও দেখা যায় না পুরোপুরি।

ট্যাক্সিতে বসে অবিনদা হালকা কয়েকটা কথা বলল। আমি হাসলাম। আমার সত্যি সত্যি এখন আর শরীর খারাপ লাগছিল না।

কলকাতার রাস্তা, বাড়ি, মানুষজন, দোকান পসার দেখতে দেখতে আমরা খানিকটা ফাঁকায় এসে পড়লাম, তারপর মাঠ, হুহু করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, চওড়া চওড়া রাস্তা, গাছ; আকাশটা অনেকখানি দেখা গেল, প্রায় অন্ধকারের মধ্যে একটা কালো মেঘ উটের মতন গলা উঁচু করে যেন মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

গঙ্গার ঘাটে ভিড় মন্দ নয়। অবিনদা আমায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত ফাঁকা একটা জায়গায় এসে বসল। মাথার ওপর ফাঁকা, পাশে গাছ, সামনে নদী, পায়ের দিকে পাতাবাহারের ঝাড়। নদীর ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল।

অবিনদা হেসে বলল, "কী, কেমন লাগছে?"

"খুব সুন্দর। কলকাতায় খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে তো?"

"তা আছে দু চারটে। তবে বেশীদিন আর থাকবে না।"

"কেন?"

অবিনদা কোনো জবাব দিল না। হাসল।

গঙ্গা দেখতে দেখতে আমি জলের শব্দ শুনছিলাম। ওপারটা একেবারে কালো। জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে দুটো না তিনটে। আমি হাঁ করে জাহাজ দেখছিলাম নদীতে একসার নৌকো। সারাক্ষণ দুলছে। দু চারটে করে কথা বলছিলাম। আমিই জিজ্ঞেস করছিলাম, অবিনদা জবাব দিচ্ছিল। তারপর আমি কখন চুপ করে গেলাম।

নদীর দিকে তাকিয়ে আছি তো আছিই। সমস্ত জল একেবারে কালো হয়ে গেছে। আকাশটাও অন্ধকার। ওপারে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মেঘ হয়ে আছে। শচিদার কথা আমার মনে পড়ছিল। আহা রে! বেচারী শচিদা!

আমার নিশ্বাসের শব্দ শুনে অবিনদা বলল, "কী হল?"

একটু চুপ করে থেকে বললাম, "শচিদার কথা ভাবছি।"

অবিনদা অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল।

"শচিদা কেমন দেখতে হয়ে গেছে, না?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ," অবিনদা আস্তে করে শব্দ করল।

"বাড়িতেও শচিদা এরকম দেখতে ছিল না। হাসপাতালে এসে দেখতে দেখতে কেমন হয়ে গেল।"

"তাই দেখছি।"

"শচিদা আর বাঁচবে না, অবিনদা?"

অবিনদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর বলল, "তোমাদের শচিদা কি কোনো কালে বেঁচে ছিল?"

আমি ভাল বুঝলাম না কথাটা; আবার একেবারে না বুঝলাম তাও নয়। শচিদার জন্যে আমাদের সকলেরই খুব কষ্ট হয়। আগে এতটা আমার হত না। কলকাতায় এসে শচিদার কাছাকাছি থাকতে থাকতে আমার কষ্টটা যেন বেড়ে গেছে। হাস-পাতালের আসবার দিন শচিদা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'দেখ তো কাণ্ড, আমি ভেবেছিলাম, তোর বিয়ের খাওয়াটা খেয়ে তবে যাব, তার আগেই যেতে হচ্ছে রে। পাওনা থেকে গেল।' আমি তখন কেঁদে মরছি, বললাম, 'বিয়ের খাওয়া পরে হবে, তুমি আগে সেরে এস।' সেই দিনই দিদির চিঠি এসেছিল শচিদার নামে। চিঠিটা আমি শচিদাকে দিলাম।

এ-সব কথা ভাবলে আমার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। আমি যে কেন কল-কাতায় এলাম কে জানে। আসার পরের দিন থেকে বাড়িতে শুধু ডাক্তার আসছে, কত রকমের ডাক্তারই এল। দাদা আর জ্যাঠামশাই নিজেদের মধ্যে রোজ কত কী বলাবলি করতেন আস্তে আস্তে। জ্যাঠামশাই সব সময়েই আকাশ পাতাল ভাবছেন, দাদার মতন মানুষের মুখেও তেমন একটা হাসি-খুশী দেখতাম না, বড় ব্যস্ত; অবিনদা আসত প্রায় রোজই, অবিনদা এলে একটু আধটু হইচই করতাম, তারপর আবার সব আগের মতন। কলকাতায় আমি কী এই জন্যে আসতে চেয়েছিলাম? না। কিন্তু আমার কপালে যা আছে তার বেশী আর কি হবে!

আমি বললাম, "কলকাতায় এসে আমার যা হল। ভাল লাগে না আর।"

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছু যেন ভাবল। সিগারেটে শব্দ করে টান দিল। তারপর মজা করে বলল, "সত্যি, তোমার দিকটায় কেউ আর তাকাচ্ছে না।"

"মানে?"

"তোমার কোনো ব্যবস্থা-টাবস্থা—"

"ধ্যাত্—! আমি কী তাই বলেছি! আপনি যেন কী!"

"আমি ভাই স্পষ্টবাদী।"

"স্পষ্টবাদী না মিথ্যেবাদী। আপনি আমায় কত বলেছিলেন কলকাতায় এলে আমায় নিয়ে চষে বেড়াবেন। কত বেড়ালেন আহা!"

অবিনদা হোহো করে হেসে উঠল। টোকা দিল আঙুলে, সিগারেটের টুকরোটা ফুলকির মতন সামনে গিয়ে পড়ল।

খানিকটা চুপচাপ, তারপর অবিনদা বলল, "আয়না, তোমায় একটা গুরুতর কথা জিজ্ঞেস করি কি বলো?"

আমি অবিনদার দিকে তাকালাম। আমাদের পেছন দিয়ে মাঝে মাঝে লোকজন বেড়াতে বেড়াতে চলে যাচ্ছে। কারা যেন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল। তার মধ্যে মেয়েদের গলাও আছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম।

অবিনদা বলল, "কলকাতায় আসার সময় তুমি জানতে না কেন আসছ?"

আমার লজ্জা করছিল, চুপ করে থেকে আমি বললাম, "আমি কেমন করে জানব!"

"খুব জানতে," অবিনদা হেসে বলল, "চালাকি করো না।"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "শুনেছি।"

"কলকাতায় এসে আর কিছু শোনো নি তো?"

"না।"

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আস্তে করে বলল, "আয়না, তোমায় একটা কথা বলি। তুমি তোমাদের বাড়ির সবচেয়ে আদরের, তোমার জন্য ভাববার লোক সবাই। তবে তোমার নিজেরও ভাববার বয়েস হয়েছে। বাড়ির যারা ভাবছে

[illegible] তুমি নিজেও এবার [illegible] কর।"

আমি অবাক হয়ে অবিনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। অবিনদা কি হাসি ঠাট্টা করে কথা বলছে, না সত্যি সত্যি কিছু বলতে চাইছে।

"সুহাস যে বিয়ের সম্বন্ধটা করেছিল সেটার কথা শুনেছ?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"ওটা তো ভেঙে গেছে।"

"জানি।"

"কী করে জানলে?"

"[illegible] হয়।"

"কেউ বলেনি তো?"

"না।"

"আমায় কেউ কোনো কথা বলুক না বলুক আমি নিজেই অনেক কিছু বুঝতে পারি। কলকাতায় আমরা এসেছি কম দিন হল না। [illegible] নিয়ে সবাই ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন যে [illegible] ঠিক হবে, আমার বিয়ের কথা কলকাতা আসার আগে যদি প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসে থাকে তবে কলকাতায় আসার পর এতগুলো দিন কেটে গেল, কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করছে না—এ থেকেই তো বোঝা যায় কোথাও কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে আমি জানি না। তবে আমার জানতে ইচ্ছে করে। বিয়ে ভেঙে গিয়েছে [illegible] ঠিক নয়, কেন গেল সেটা তো জানতে [illegible] করে।"

[illegible] আমি অবিনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে, অবিনদা?"

"তোমার বিয়ের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।"

অবিনদা একটু চুপ করে থেকে হাসির গলায় বলল, "তোমার দিদি শাশুড়ী হতেন তাঁর বোধ হয় শেষ পর্যন্ত মনে ধরল না।"

নদীর দিকে চোখ ফিরিয়ে আমি বললাম। "না ধরুক।"

অবিনদা হেসে উঠল। "তাঁর বোধ হয় মনে হল, তোমার মতন ছোট আয়নায় তাঁর [illegible]টা ভাল করে দেখা যাবে না।"

আমার বেশ রাগই হচ্ছিল। কোথাকার কোন ছেলে তার কিসের এমন জেল্লা যে [illegible] মন ভরছে না! বেশী বেশী। কলকাতার [illegible] পাত্রী চাই। পছন্দ হচ্ছে না—তো এত পরে বলার দরকার কিসের? আগে বললে ক্ষতি ছিল? আমিই কি তোমাদের পছন্দ করেছি! কলকাতার ছেলে বিয়ে করার জন্যে আমিও কেঁদে মরছি না। [illegible] কেমন আমার জানা আছে। দিদিকে দেখেই বুঝতে পারি, তোমরা কত ভাল।

"আয়না?"

"বললে।"

"আগেকার দিনের মতন তুমি একটা স্বয়ংবর সভা করো—" অবিনদা মজা করে বলল, "আমি রাজপুত্রদের খবর দিয়ে আসব।"

আমি হেসে বললাম, "তাই করব।"

তারপর দুজনেই চুপচাপ। অবিনদা আবার একটা সিগারেট ধরাল। গঙ্গার জোলো ঠাণ্ডা বাতাস, এই ঝিরঝিরি ঘাট, অন্ধকার, গাছপালা, নদীর কালো জল—সব যেন কেমন এক আবেশ সৃষ্টি করছিল। আমার যেন কিসের এক দুঃখ মনে মনে কতদিন ধরে চাপা রয়েছে, বলতে পারি না। তপুর কথা আমার বার বার মনে পড়ছিল। কলকাতায় আসার আগে তপু একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাকে তাড়িয়ে দিই নি; কথাবার্তাও বেশী কিছু বলি নি। দিদির সঙ্গে গল্পগুজব করে সে ফিরে গেছে। বিনু আমায় একটা চিঠি লিখেছিল কলকাতায় আসার পর। বিনু আর বাপের বাড়িতে নেই। তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে। বিনুর চিঠি থেকে জানতে পেরেছিলাম, সে তপুকে নাকি অনেক কিছু বলেছে। কী যে বলেছে বিনু লেখেনি, তবে বুঝতে পারি। তপুর কথা কলকাতায় আসার পর থেকে আমার যেন আরও বেশী করে মনে পড়ে। ওর ওপর আমার অনেক রাগ, তবু ওকে ভুলতে পারি না।

একটা ভোঁ বাজল কোথায়। নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছে। নৌকো-গুলোর ওপর রাখা লণ্ঠনের আলোগুলো দুলছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল, অবিনদাকে সব আমি কথাটা বলতে পারি। আগে কত বার আমার মনে হয়েছে, বলার মতন কেউ যদি থাকে তবে অবিনদা। অবিনদা আমার কথা শুনবে। বুঝবে। অবিনদাকে বলা যায়।

বলব কি বলব না করে কিছুক্ষণ কাটল। লজ্জা হচ্ছিল, আবার ইচ্ছেও করছিল ভীষণ। অবিনদা যদি ঠাট্টা করে স্বয়ংবর সভার কথা বলতে পারে তবে আমার বলতে আটকাচ্ছে কিসের!

"অবিনদা," আমি এমন করে বললাম যে আমার গলাই উঠল না।

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"আমাদের বাড়িতে আর বিয়েটিয়ে হবে না।"

"হবে না। কে বলল?"

"কেমন করে হবে। দিদি—" মুখ ফসকে বলে ফেলে আমি চুপ করে গেলাম।

অবিনদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নাড়ল আস্তে করে। "জানি।"

"আপনি শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"দিদির ওই। দাদাও তো—"

"অহীন বিয়ে করবে না?"

"কই আর!" বলে আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। "বুলাদিকে আপনার মনে আছে?"

"কে বলো?"

"সেই যে বুলাদি, আমাদের বাড়িতে আসত। মুখটা বেশ সুন্দর দেখতে।"

"ও! বুঝেছি।"

"দাদা বিয়ে করলে বুলাদিকেই করতে পারত।"

"ইন্দুদিকেও করতে পারে," অবিনদা ঠাট্টা করে বলল।

"যাঃ! অসম্ভব। ইন্দুদিরা কৃশ্চান, আপনি জানেন?"

"কৃশ্চানদের বিয়ে হয় না?"

"হবে না কেন! দাদা করবে না। তা ছাড়া দাদা যদি বিয়ে করে তবে বুলাদি কী দোষ করল! এক, বাড়ির জন্যে। আমাদের বাড়িটা কেমন যেন অবিনদা, আমার সব ভাল লাগে না।"

অবিনদা সিগারেটটা ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়ে বসে থাকল। তারপর আচমকা বলল, "আর তুমি?"

"আমি?"

অবিনদা যেন বুঝতে পেরেছিল। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে আমার পিঠের ওপর রাখল।

আমি চুপ। আমার ভয় করছিল, লজ্জা করছিল, অথচ বলার জন্যে আমার বুকের মধ্যে ছটফট করছিল।

শেষ পর্যন্ত আমি বললাম। তপুর কথা। আমার কথা। সব বলা হল না। তাই কী বলা যায়!

আমি বড় ছেলেমানুষ। তপুর কথা বললাম তো বললাম—কিন্তু আমার অমন করে কাঁদার কি ছিল। কতক্ষণ শুধু কাঁদলাম।

নিজেরই যখন খেয়াল হল, চোখ মুছতে মুছতে মরি।

অবিনদা হেসে বলল, "উঠে পড়ো। এমনিতেই বোধ হয় গঙ্গায় জোয়ার আসছে, তার ওপর এত নাকের জল চোখের জল গড়ালে কি আর রক্ষে থাকবে!"

মুখ মুছে আমি উঠে পড়লাম।

অবিনদাও উঠে দাঁড়াল।

"অবিনদা আপনি কিন্তু দাদাকে..."

"দাদা দিদি তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। ওটা আমার হাতে। আমি তোমার দাদার মতন বাজে ঘটক নই।"

"না অবিনদা, লক্ষ্মীটি। আমাদের বাড়ি তো আপনি জানেন।...আমাদের মানমর্যাদা খুব। সকলেই শক্ত ধরনের। না হলে দিদি...। যাকগে, আমি কাউকে কিছু বলতে চাই না। আমার জন্যে বাড়িতে অশান্তি হোক আমি চাই না।"

"তোমাদের বাড়িতে একটা ভীষণ রকমের অশান্তিই এখন দরকার।"

অবিনদার দিকে আমি তাকালাম। সোজা পিঠে খুব সহজভাবে হেঁটে যাচ্ছে। যেন কোনো কিছুই গ্রাহ্য করছে না। আমার সঙ্গে অবিনদা ঠাট্টা করল কিনা বুঝতে পারলাম না।

সরু বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে কানে এল আবার কোথাও জোরে করে ভোঁ বাজছে। সারা নদী জুড়ে কেমন এক মত্ত হাওয়া উঠেছে। গাছপালা কেঁপে উঠছিল।

অবিনদা বলল, "তোমাদের বাড়িটা একটা যাদুঘর। যত পুরোনো আর মরা জিনিস সাজিয়ে রাখতে গিয়ে নিজেরাও মরছ। যক্ষের ধন কী তোমাদের আছে জানি না, ভাই। কতটুকু আছে তার চেয়ে বেশী টাই যে নেই—এটা তোমাদের বোঝানো যাবে না। যাক্ গে, একবার কোথাও একটা বড় ধরনের ভাঙন লাগুক। তারপর দেখব।"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "আমায় নিয়ে ভাঙবেন?"

অবিনদা বলল, "না। তোমায় নিয়ে নয়। তুমি অনেক ছোটো; অবিন ছোটো নিয়ে ভাঙে না। আমি ভাঙব বড় জায়গায়।"

কিছু বুঝতে না পেরে আমি অবিনদার জামা টেনে ধরলাম।

অবিনদা আমার মুখ দেখে হেসে ফেলল। তারপর বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই। আমি অভয় দিচ্ছি।"

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। ট্যাক্সি আর পাই না। আকাশ যেন বড় বেশী কালো হয়ে এসেছে। মেঘ হয়ে এল নাকি!

অবিনদা আমায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে ছলনা করার মতন গলা করে বলল, "আয়না রে, এবার আমি ভয়ংকর কাণ্ড করব। ভাঙব, চুরবো, তছনছ করব। আমি ভাঙিব পাষাণ কারা।" বলে জোরে জোরে হাসতে লাগল।

(ক্রমশ)

মনে এল

ইন্দ্রজিৎ

দুপ্রহর রাতে এক প্রহরের দেখা। অনেকটা যেন রবীন্দ্রনাথের **ঐ 'হঠাৎ দেখা'** কবিতাটার মতো। রেলের কামরায় নয়, দেখা হয়েছিল ইস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। অবশ্য ঐ হঠাৎ দেখাটুকুর সঙ্গেই মিল নইলে ঘটনাটার সঙ্গে আর কোথাও কোন মিল নেই। কবিতাটি আপনাদের সকলেরই জানা আছে। মধুরের সঙ্গে একটি আর্দ্র ভাব মিলে তার একটি মনোরম আবেগের সৃষ্টি হয়েছে রোমান্টিক কবিতার যেমন স্বভাব। কিন্তু আমি যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি তার মধ্যে মধুরের আভাস যদিবা একটু ছিল, আর্দ্রতার লেশমাত্র ছিল না এবং সে কারণেই ব্যাপারটা রোমান্টিক হতে গিয়েও ঠিক রোমান্টিক হয়নি। শেষ পর্যন্ত যা হয়েছে তাকে বরং একটি কৌতুক বলা যেতে পারে। অবশ্য একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে রোমান্টিকের সঙ্গে কৌতুকের কোন বিরোধ নেই। বিরোধ তো নেই-ই, একটু বরং কুটুম্বিতার ভাবই আছে। বয়সকালে যে জিনিসটাতে রং এর ছোপ লাগে, দেখা যায় কালের ব্যবধানে রং ফিকে হয়ে গিয়ে তাতে একটু যেন কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে। কাঁচা বয়সের অনেক ধ্যান ধারণা পরিণত বুদ্ধির পাক খেয়ে ক্রমে শোধন হয়ে আসে। যাক্, এ আলোচনা না হয় পরেও করা যাবে। আগে ঘটনাটা বলে নিই।

আজকের কথা নয়, অনেক দিন আগের ঘটনা। বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিলাম। এই সেদিন কলকাতায় আসবার পথে যখন হঠাৎ সেই একটা স্টেশনে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম তখন বহুকাল আগের সেই বিস্মৃত-প্রায় ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়ে অনিশ্চিতের সময়টা এক রকম ভালই কেটে গিয়েছিল। আজকের দিনে ট্রেন বিভ্রাট নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পাঁজিকায় বলে যাত্রা শুভ কিন্তু স্টেশনে এসে দেখা যায় যাত্রা নাস্তি। ট্রেন-এর দেখা নেই। যে সময়ের কথা বলছি তখন রেলযাত্রা অল্পবিস্তর অনিশ্চিত হলেও এতখানি অনিশ্চিত ছিল না। তবে ব্যস্ততা ছিল কম এবং মনের অধৈর্য সেই পরিমাণে বেশি। এখন বয়সের ভারে এবং অবস্থার ফেরে সব ব্যাপারে যথেষ্ট ধৈর্য অবলম্বন করতে শিখেছি।

রাত দুপুরে গাড়ি ধরা এমনিতেই বিরক্তিকর ব্যাপার; তার উপরে যখন জানা গেল রাস্তায় একটা মালগাড়ির অধঃপতনে আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গতি রোধ হয়েছে এবং তিন ঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছচ্ছে তখন বাংলা ইডিয়মে যাকে বলে পথে বসা,

সময় কাটাবার জন্যে—রেল কর্মচারীদের ধরে প্রহার

অবস্থাটা ঠিক তাই হল। একবার ভাবলাম, দূর ছাই কাজ নেই কলকাতায় গিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাই। কিন্তু অত রাত্তিরে ফিরে যাওয়াটাও বড় আরামদায়ক নয়—'returning were as tedious as go o'er.' এরূপ অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিতের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকাই ভালো। আজকাল অবশ্য সময় কাটাবার জন্যে স্টেশনের আসবাবপত্রে অগ্নি সংযোগ, রেল কর্মচারী-দের ধরে প্রহার ইত্যাদি অধিকতর উপভোগ্য উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক সমাজের এসব সুসভ্য রীতি তখনও প্রবর্তিত হয়নি। আপাতত সেকেণ্ড ক্লাশ ওয়েটিং রুম থেকে একটি চেয়ার দরজার কাছে টেনে নিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে বসলুম। যাত্রীরা অনেকেই বিলম্বিত ট্রেনের অপেক্ষায় সংক্ষিপ্ত বিছানা পেতে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে। এখানে-ওখানে দু' চার জন ঘেঁষাঘেঁষি বসে বিড়ি সিগারেট টানছে, গল্প করছে। কথাবার্তার টুকরো-টাকরা যেটুকু কানে আসছে তাতে মনে হল আমার চাইতে এরা ঢের বেশি বিজ্ঞ ব্যক্তি। মনে কোন রকম অধৈর্য নেই, এসব ব্যাপারকে তারা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে। একজন বলছে, ভাইরে, জীবনে কোন্ জিনিসটাই বা নিজের ইচ্ছামত হয়েছে? সবই তো পরের মর্জি মত চলছে। ট্রেনের মর্জিটাকেও মেনে নিতে হবে। ব্যস মনটাকে এ রকম একটু দার্শনিক ভাবাপন্ন করে নিতে পারলে দুনিয়ার অনেক ল্যাঠা চুকে যায়। যাহোক, এদের কপাল-ঠোকা ফিলজফিতে বিশ্বাস করি বা না করি এটা অন্তত জানি যে একটু রসবোধ থাকলে মানুষ কোন অবস্থাতেই খুব একটা নিরুপায় বোধ করে না। এ কথা মানতেই হবে যে এও এক নতুন অভিজ্ঞতা এবং এর মধ্যেও অনেক-

খানি কৌতুক আছে। ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে—নিজের মনেই হাসি পেয়ে গেল—দুপুর রাতে কে ডেকে নেয় তারে। একদা ক্লান্ত-বর্ষণ মধ্যাহ্নে গ্রাম্য এক পোস্ট মাস্টারের মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল ট্রেন-অপেক্ষা-রত সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে তেমনি একটি ভাবনা আমারও মনে এসেছিল—এই সময়ে একটি নিতান্ত আপনার জন যদি কাছে থাকত, 'হৃদয়ের সংগে একান্ত সংলগ্ন একটি মানব-মূর্তি।' সে ভাবনার সংগে বিশেষ কোন মুখ চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল কিনা ঠিক মনে নেই কিন্তু চোখে বোধকরি একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। ঘুমিয়েই পড়তাম, হঠাৎ অনতি-দূরে একাধিক ব্যক্তির কলকণ্ঠ আবির্ভাবে চমকে উঠে দেখি দুটি মহিলা সমেত এক ভদ্রলোক পাশে প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করছেন। কুলির মাথায় মালপত্র। চোখ মেলে এক ঝিলিকে যেটুকু দেখলাম

ঘরেও নহে পারেও নহে

তাতে মহিলাদের একজনকে কেমন চেনা চেনা মনে হল। মিনিট কয়েক পরে তিন জনেই যখন ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন তখন দেখলুম এক নিমেষের দৃষ্টিতেও কিছু ভুল দেখিনি, খুবই চেনা মানুষ। তবে চেনাটা এক তরফা হলে সে চেনার কোন মূল্য থাকে না; সেজন্যে যেমন বসেছিলাম তেমনি বসেই রইলাম। আড়চোখে একবার তাকিয়ে মনে হল মহিলাটিরও এদিকে নজর পড়েছে এবং ঘাড় ফিরিয়ে তিনিও বার বার এদিকে তাকাচ্ছেন। দু' মিনিট যেতে না যেতেই মহিলাটি এদিকেই এগিয়ে এলেন। মৃদু হাস্যে বললেন, আমি এক নজর দেখেই চিনেছি। তুমি চিনতে পারনি এমন হতেই পারে না, কিন্তু চিনতে চাওনি।

বললাম, চিনতে চাইনি এমন ধরে নিচ্ছ কেন? তবে খটকা একটু ছিল। তোমাকে আমি চিনতে পারবই এ বিষয়ে তুমি যতখানি সুনিশ্চিত, তোমার দিক থেকে আমাকে চেনা না চেনা সম্পর্কে আমি ততখানি নিশ্চিত ছিলাম না।

তুমি দেখছি দেখা হতে না হতেই একটা ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা করছ। ঝগড়াটা আপাতত মুলতুবি থাক। আগে তোমার খবর শুনি। আমি তো জানতাম তুমি কলকাতার কোন কলেজে কাজ করছ।

তাই করছিলাম, বছর দুই হল এখানকার একটা কলেজে চলে এসেছি। যাক আমার কথা থাক। শুনেছিলাম তুমি স্বামীর অনু-গামিনী হয়ে বিদেশে গমন করেছ। দেশের মাটিতে আবার তোমার সংগে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

ঠিকই শুনেছ। ঈষৎ হেসে বলল, সেকালে পতিব্রতারা স্বামীর সংগে বনবাসে যেতেন, একালের পতিপ্রাণারা স্বামীর সংগে প্রবাসে যাবেন না?

যাবেন বইকি। তবে বনবাসে গিয়েও স্বর্ণমৃগের লোভে শেষটায় লংকাকাণ্ড বেঁধে যায়। এযুগে দেশে বিদেশে স্বর্ণমৃগ আরোই সুলভ। লংকাকাণ্ড বাধা কিছুই বিচিত্র নয়। আশা করছি সেরকম কিছু—

কাণ্ডজ্ঞান থাকলে লংকাকাণ্ড নাও ঘটতে পারে। যাই বল ফাঁড়া কাটিয়ে কুশলে বল, কৌশলে বল ফিরে তো এসেছি। স্বর্ণলংকা থেকে স্বামীটিকেও উদ্ধার করে এনেছি। একটু থেমে বলল, এই সম্প্রতি ফিরেছি। এখন আমরা আছি দিল্লীতে। কলকাতায় এসেছিলাম সকলের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে। ছোট বোন থাকে এখানে। দাঁড়াও তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দিই। এই রুমা শোন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই এগিয়ে এলেন। এই যে, তোদের সংগে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—আমার কলেজের বন্ধু ইন্দ্রজিৎ দত্ত, এখানকার কলেজের অধ্যাপক। আর এঁরা হলেন আমার বোন রুমা, ওর স্বামী রণেশ গুপ্ত, এখানকার অ্যাডিশানেল ম্যাজিস্ট্রেট। কনিষ্ঠা ভগিনী খিলখিল করে হেসে উঠে স্বামীকে উদ্দেশ করে বলল, দিদি সকলের কাছে তোমার যে পরিচয়টা দেয় সেটা ইংরেজি ভাষায় বেশ জাঁকালো শোনায় কিন্তু আমাদের খবরের কাগজে যখন বাংলা করে বলে অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর মান থাকে না। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে তিরস্কার করে বলল, তোর কথায় কথায় খোঁচা দেওয়ার স্বভাব গেল না। বেচারীকে ভালো মানুষ পেয়ে মানী লোকের সামনে ওর মান খুইয়ে দিচ্ছিস। স্বল্পভাষী সুদর্শন রণেশ গুপ্ত এতক্ষণ হাসিমুখে চুপ করেই ছিলেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, মানী লোকেরা কার কতখানি মান ভালো করেই জানেন। আমরা যে শুধু সংখ্যায় অতিরিক্ত এমন নয়, ক্ষমতার দিক থেকেও অতিমাত্রায় কিছু। খবরের কাগজওয়ালারা রহস্য জানেন বলেই অতিরিক্ত আখ্যাটি ব্যবহার করেছেন। রসবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। বুঝলাম রণেশ গুপ্ত লোকটিরও রসবোধ আছে। ঐটুকু সময়েই মানুষটিকে ভালো লেগে গেল। রুমা বললে, দিদি তো একদিনের দেখা দিয়েই চলে যাচ্ছ। তবু ভালো অচেনা জায়গায় একজন চেনা মানুষ আমাদের দিয়ে গেলে। রণেশ গুপ্ত সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, পরিচয় যখন হল তখন আসবেন মাঝে মাঝে, আমাদের ভালো লাগবে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী বললেন, এককালে তো কাব্য সাহিত্যে তোমার অনুরাগ ছিল, কবিতা টবিতা লিখতে, এখন ছেড়ে দিয়েছ নাকি? রণেশেরও সাহিত্যে খুব ইন্টারেস্ট, ওর সংগে তোমার সাহিত্যালোচনা খুব জমবে। আচ্ছা রুমা, আমি তো ভালো একজন সংগী পেয়ে গেলাম, তোদের আর ট্রেন আসা অবধি অপেক্ষা করবার দরকার কি? তোরা বরং চলেই যা, ট্রেন কখন আসবে তার কি কোন ঠিক আছে? আমি বললুম, গল্প করতে চান সে আলাদা কথা, নইলে গাড়িতে তুলে দেবার জন্যে থাকবার কোন

প্রয়োজন দেখি না। জ্যেষ্ঠা ভগিনী আবার বললেন, হ্যাঁ, সেই ভালো, মিছিমিছি রাত জাগবি, আমার ভালো লাগছে না। স্বামী স্ত্রী দুজনেই বললেন—আচ্ছা, তা হলে আমরা চলি। রমেশ গুপ্ত আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আচ্ছা, তা হলে প্রফেসর দত্ত, আপনার উপরেই ভার রইল। আমি বললুম, ভার কিছুই নয়। উনি সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন, এখানে এই শক্ত ডাঙ্গায় কোন বিপদ ঘটবার আশঙ্কা দেখি না। আপদ্ধর্মে উনিই বরং আমার ভার নিতে পারবেন। সহাস্য নমস্কার বিনিময়ের পর গুপ্ত-দম্পতি বিদায় নিয়ে রওনা হলেন।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা চলছিল। এবার ঘর থেকে আর একটি চেয়ার টেনে নিয়ে পাশাপাশি বসা গেল। ভাল কথা, নতুনদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, সৌজন্য বিনিময় ইত্যাদির ভিড়ে রুমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নামটা বলাই হয়নি। ওর নাম উত্তমা; এককালে আমি বলতাম তিলোত্তমা। রসিক পাঠক বুঝতে পারবেন—যে এর মধ্যেই কিঞ্চিৎ ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। ও তখন ভয়ানক লজ্জা পেত, আপত্তি জানাত। আমি বলতুম, একটু বাড়িয়ে বলতে দোষ কি? চেয়ারে স্থির হয়ে বসে শ্রীমতী বললেন, এবার বল, তোমার খবর শুনি। বললুম, মাস্টার মানুষ, মাস্টারি করছি, এর বেশি আর কোন খবর নেই।

হ্যাঁ, দেখেই বুঝেছি তুমি খুব বদলে গিয়েছ। আগে কথায় কথায় হাসি তামাশা রসিকতা করতে, এখন পুরোপুরি মাস্টার বনে গিয়েছ। এখন আর রস নেই। আচ্ছা, আমাকে কেমন দেখছ, আমিও কি বদলে গিয়েছি?

বললুম, মানুষ কি আর চিরকাল আদি এবং অকৃত্রিম থাকে? তবে রূপলাবণ্যের কথা যদি বল তা হলে বলব, তিলোত্তমার রূপ এক তিলও কমেনি।

উত্তমা সশব্দে হেসে উঠল, বলল, দেখছি রস একেবারে উবে যায়নি। সে সব দিনের কথা তা হলে এখনও মনে আছে?

বললুম, আমার নাম ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রিয়-জিৎ যদি হতাম তা হলে অনেক কথা ভোলা সম্ভব হত।

কি ভেবে খানিকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। পরে বলল, হ্যাঁ সে সব দিনের কথা মনে পড়লে মন্দ লাগে না। হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটাও এক বিচিত্র ব্যাপার, কি বল?

বললুম, স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় রীতিমতো রোমাঞ্চকর বলতে হবে। নিশীথ রাত্রে, নির্জন পরিবেশে—বলতে গিয়ে চুপ করে গেলাম। সেও তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না। একটু পরে বলল, আচ্ছা কলকাতায় গেলে এখনও সেই ওল্ড বুক শপ-এ তুমি ঘুরে বেড়াও? বললাম, হ্যাঁ কলকাতায় ওটাই আমার সব চাইতে বড় আকর্ষণ। এখনও? হ্যাঁ, এখনও। জিজ্ঞেস করবার হেতু আছে। ইয়ুনিভার্সিটির বাইরে ঐ সব পুরোনো বই-এর দোকানেই ও এসে আমার সঙ্গে মিলিত হত। যখনকার কথা বলছি তখন ইয়ুনিভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আজকের মতো অতটা মেলামেশা ছিল না। ক্লাশে মেয়েদের সংখ্যাও ছিল সামান্য। কোন মেয়ে কোন ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, গল্প করছে দেখলে নানা মহলে নানা কল্পনার সৃষ্টি হত। ও ছিল যেমন লাজুক তেমনি ভীরু। সিঁড়িতে কিম্বা করিডরে দেখা হলে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে যেত; রাস্তায় দেখা হলে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারদিক একবার দেখে নিয়ে তবে কথা বলত। চেনা জানা কেউ কাছে পিছে থাকলে এমন ভাব দেখাত যেন আমাকে চেনেই না। একটু আগে আমার পরিহাস

রসিকতার কথা বলছিল,—তেমন রসিকতা করবার কি জো ছিল? কিছু বলতে না বলতেই চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত। ভাবছিলাম সেই মেয়ের সঙ্গে আজকের এই মেয়ের মিল কোথায়? সেদিনের অঙ্গনাটি আজ বীরাঙ্গনা হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিন যার মুখে কথা জোগাত না, আজ তার চোখে-মুখে কথা। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, গত দশ বছরের ইতিহাস মনে হচ্ছে এক সিটিং-এই শেষ করে যাবে। আমি যে হুঁ হাঁ এবং মাথা নেড়েই বাক্যালাপ সমাধা করছি সেদিকে তার খেয়ালও নেই। এক সময়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললুম, তাই তো, তিনটে প্রায় বাজে, কই গাড়ির তো দেখা নেই। দাঁড়াও, আমি ওদিকটায় গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে আসি। খবর নিতে গিয়ে জানলুম, সময় আরো পিছিয়ে গেছে। আরো ঘণ্টাখানেক তো বটেই, বেশিও হতে পারে অর্থাৎ কিনা গাড়ি আসতে আসতে এক রকম ভোরই হয়ে যাবে। ফিরে এসে সঙ্গিনীকে খবরটা দিলাম। তিনি খুব একটা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না, বললেন, হোক না দেরি, গল্প করে বেশ তো কাটছে। স্বামী-সোহাগিনীর একতরফা কথা শুনে শুনে আমি যে কতটা ক্লান্ত বোধ করছি সে দিকে নজর দেবার তার চোখও ছিল না, মনও ছিল না। স্বামীর গুণকীর্তন, তার বিদ্যাবত্তা, কার্যদক্ষতা, দ্রুত পদোন্নতির কাহিনী সবিস্তারে শুনতে হল।

কথার জালে ও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, আমিও কথার জঞ্জালের মধ্যে ওকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। অপ্রত্যাশিত স্থানে এমন অকস্মাৎ সাক্ষাতে যদি ওর মুখে বাক্যস্ফূর্তি না হত, যদি বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে তাকাত তা হলেও পূর্বপরিচিতার কিছু আজ ফিরে পেতাম। কিন্তু কথার ঝাড়ন দিয়ে একদিন যা দিয়েছিল তাও ঝেড়ে মুছে সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে। বসে বসে এসব কথাই ভাবছিলাম, ওর কথা কিছু বা আমার কানে যাচ্ছে কিছু যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ কাব্যকলা আর চিত্রকলার তুলনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, কথা 'মুখরা', মুখরার মন পাওয়া ভার। সে তুলনায় রেখা 'অপ্রগলভা'। সে লাজুক, মুখে কথাটি নেই। তার মনের কথা বুঝি বা না বুঝি তাকে আপনার বলে মনে হয়, তাকে ভালোবাসা সহজ। আর কিছু না হোক রং নিয়েও মন ভোলাতে পারে। এই নারী-মূর্তিটির কথাই ভাবুন, যখন ওর মুখে কথা ছিল না কিন্তু কথায় কথায় মুখ রাঙা হয়ে উঠত তখন ওকে বোঝা অনেক সহজ ছিল।

ইতিমধ্যে রাত্রিশেষের আভাস দিয়েছে, ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঘুমন্ত যাত্রীরা এক একে উঠে বসছে, যাত্রীদের মধ্যে একটা ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। দেখে মনে হল, ট্রেন আসবার সময় হয়েছে। কুলি এসে সঙ্গিনীর মালপত্র নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। বললুম, ট্রেন এত দেরি করে এল, আজ আর কলকাতায় গিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। আমার আবার আজকেই ফিরে আসবার কথা ছিল। সেটা সম্ভব হবে না, কাজেই ভাবছি আজকে আর যাব না। ও ব্যস্ত হয়ে বলল, সে কি, তোমাকে মিছিমিছি রাত জাগিয়ে বসিয়ে রাখলাম। হেসে বললাম, মিছিমিছি কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হল, গল্প হল, তোমাকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হল, সেও তো একটা মস্ত বড় কাজ। আজকের দিনে সী-অফ্ করাটা একটা মস্ত বড় রিচুয়েল। বলতে বলতে বহু বিলম্বিত ট্রেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখা দিল। ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি শোরগোলের মধ্যে তিলোত্তমা দেবীকে ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় উত্তমরূপে বসিয়ে দিলাম। উত্তমা এতক্ষণে একটু করুণ মুখ করে বলল, নিজের কথাই এক কাহন করে বললাম, তোমার কথা কিছুই শোনা হল না। বললাম, এক কাহন না হলে কাহিনী হয় না। আর আমার কথা বলছ? শোনাবার মতো কিছু থাকলে নিজের গরজেই তোমাকে শোনাতাম। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছি। কাকে? উত্তমাকে না আমারই জীবনের একটি আখ্যায়িকাকে?

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কেন জানি না ইংরেজ সাহিত্যিকের লেখা 'Seeing off' নামে একটি রম্য-রচনার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক বিদেশিনীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে এক ভদ্রলোক একেবারে কেঁদেই ফেলেছিলেন। মানুষ যে কত রকমের অভিনয় করতে জানে! যাই বলুন, আমরা দুজনের কেউ অভিনয় করিনি, খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করেছি। জোর করে পুরোনো দিনের সেই মন-ভোলানো খেলা খেলতে গেলে সেটা অভিনয় হতে পারত; কিন্তু ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হত। স্বাভাবিক হতে গিয়ে একটু ক্লান্তিকর হয়েছে এই যা।

ক্লান্তিকর হলেও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি কৌতুক আছে। যৌবনকালে যে সব ব্যাপার আমাদের মনে মোহের সঞ্চার করে, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে মনকে আন্দোলিত করে উত্তরকালে মন যখন নির্মোহ হয় তখন উপরকার ফেনাটুকু কেটে গিয়ে সেই জিনিসই স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট আকারে দেখা দেয়। এক সময়ে যাকে নিয়ে কাব্য করা যেত, গল্প উপন্যাস লেখা যেত এখন হাস্যে পরিহাসে কৌতুকে বিলাসে তাকে নিয়ে রম্যরচনা লেখা যেতে পারে। তাতে এর রসমূল্য কমে যাবে এমন নয়। বরং রসের সঙ্গে সত্যের মিশ্রণে মূল্য আরো বাড়বে। সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, আনন্দ বেদনার অভিজ্ঞতা যখন কালের শোধনক্রিয়ায় ফিলটার্ড হয়ে নির্মল আভায় দেখা দেয় তখন তার কৌতুক রসটি সমস্ত জিনিসকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে। জীবন মানুষকে নিয়ে অনেক কৌতুকের খেলা খেলে। সে কৌতুকের মধ্যে আঘাত আছে; কিন্তু রসবোধ থাকলে তাও উপভোগ্য। যে নারী আমাদের জীবনে অনেকখানি সৌন্দর্য মাধুর্য দিয়েছে সেই নারীকে আমরা বলেছি ছলনাময়ী। মিথ্যা বলিনি। ছলনা করতে জানে বলেই সে অতখানি মাধুর্যের সঞ্চার করতে পারে। মনে পড়ছে এর আগেও কোথায় যেন বলেছি নারী যদি ছলনাময়ী না হত তবে সে ভালোবাসার অযোগ্য হত। রমণীর রমণীয়তা যেমন তার ছলনার মধ্যে, জীবনের রস মাধুর্যও তেমনি তার নানা ছলনার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ এককালে যার পোশাকী নাম দিয়েছিলেন জীবনদেবতা, পরে তাকে বলেছেন কৌতুকময়ী, আবার জীবনের শেষ বাকে শেষ কবিতায় তাকেই বলেছেন ছলনাময়ী। ছলাকলা ছলনার মধ্যেই জীবনের সকল রস, সকল রহস্য, সকল মাধুর্য।

আসামী হাজির

বিমল মিত্র

॥ ৭ ॥

কে জানতো যে পণ্ডিত কালিকান্ত ভট্টাচার্যের পূর্ব-পুরুষের বহু পুণ্য ছিল, তাই তাঁর কন্যার বিয়েতে কোনও অঘটন ঘটলো না। কিংবা বিপর্যয়টা ...কালে না ঘটলেও হয়ত অদূর ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবি রইল। জীবনে ... যখন আসে তখন আপাতত তার ... দেখে অনেক সময় মনে হয় ... উদয় হলো। কিন্তু ঝড় ... অনেক আগে থেকে ঝড়ের ... চালে যখন আগুন লাগে, ... যে তার কত আগে ... হাওয়ার নেশার তাগিদে, ... তার খোঁজ রাখি না।

...ভট্টাচার্য মশাই স্বস্তির ... ফেলে বাঁচলেন। একেবারে শেষ ... বর এসে পৌঁছুলো। বিপিন ... এসে খবর দিয়ে গেল পণ্ডিত ...কে। পণ্ডিতমশাই আবার খবর দিলেন ...। বিয়ে বাড়িতে তখন চাপা-... উঠেছিল। সুখবর পেয়ে সেই ... গমগম করে উঠলো। আবার ... উঠলো সবার মুখে। কে যেন ... উঠলো—ওরে শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা, ... উলু দে—বর এসেছে—

হ্যাঁ, কালিকান্ত ভট্টাচার্যির বাড়িতে ... এসেছে। নয়নতারার বর এসেছে—

...প্ল্যাটফরমে প্রকাশমামা তখন ... আগলে আগলে আসছে। ... আবার না পালায়। পাশে হরনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন। তিনিই বরকর্তা। পেছনে ... নাপিত।

প্রকাশমামা বললে—আপনি কিছু ভাববেন না জামাইবাবু, আমি সদাকে ... আছি—

প্ল্যাটফরমে কিছু লোক বর দেখতে ভিড় করেছিল। প্রকাশমামা তাদের দিকে চেয়ে তেড়ে গেল। বললে—আপনারা কী দেখছেন মশাই? আপনারা কি বর দেখেন নি কখনও? একটু রাস্তা দিন, রাস্তা দিন আমাদের—সরুন—

কিন্তু সদানন্দর তখন অন্য চিন্তা। প্রকাশমামা তার দিকে চেয়ে বললে—কিছু ভাবিস নি তুই! বিয়ে করতে ভয় কীসের? আমি তো আছি। এই দ্যাখ্ না, বিয়ে কে না করেছে। আমি বিয়ে করেছি, তোর বাবা বিয়ে করেছে, তোর ঠাকুর্দা বিয়ে করেছে, তোর ঠাকুর্দার বাবাও একদিন বিয়ে করেছিল। বিয়ে করতে ভয়ের কিছু নেই। এই আমার কথাই ধর না, আমি তো একবার বিয়ে করেছি, এর পর যদি দরকার হয় আরো দশবার বিয়ে করবার হিম্মত্ রাখি, আমি কাউকে পরোয়া করি না—

সেদিন প্রকাশমামার কথায় মনে মনে হেসেছিল সদানন্দ। প্রকাশমামাও তো একজন মানুষ। কেউ তাকে মানুষ ছাড়া জানোয়ার বলবে না। মানুষের মত দুটো হাত, পা, চোখ, কান। মানুষেরই মতন মুখের ভাষা। সংসারে ও-রকম লোককে সবাই মানুষ বলেই জানে। অথচ প্রকাশ মামা কি সত্যিই মানুষ! কতদিন সদানন্দকে সিগারেট খাইয়েছে, তামাক খাইয়েছে, বিড়ি খাইয়েছে। যাত্রা, থিয়েটার শুনতে কত দূরে দূরে গ্রামে নিয়ে গিয়েছে। তারপর অন্য গ্রামে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। বাড়ি আসবার আগে ভাগ্নেকে সাবধান করে দিয়েছে। বলেছে—খবরদার, কাউকে যেন বলিস নি এসব কথা—

সদানন্দ তখন ছোট। মামার কথা ঠিক বুঝতে পারতো না। জিজ্ঞেস করতো—কী সব কথা?

প্রকাশমামা বলতো—এই কার ঘরে রাত কাটিয়েছিস—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করত—কেন? বললে কী হয়েছে?

প্রকাশমামা বকতো। বলতো—দূর হাঁদা। মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটালে কাউকে বলতে নেই—

—কেন? মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটালে দোষ কী? ও মেয়েমানুষটা কে?

প্রকাশমামা বলতো—দূর, তুই দেখছি সত্যিই একটা হাঁদা-গঙ্গারাম। দেখলি না ওটা একটা বাজারের মেয়েমানুষ।

—বাজারের মেয়েমানুষ মানে?

প্রকাশমামা অধৈর্য হয়ে উঠতো। বলতো—আরে, তোকে নিয়ে দেখছি মহা-মুশকিলে পড়া গেল। বাজারের মেয়েমানুষ কাকে বলে তাও এত বড় ছেলেকে বুঝিয়ে বলতে হবে। দেখলি নে মাগীর কী রকম ঠাট্?

—ঠাট মানে?

প্রকাশমামা বলতো—নাঃ, তোকে দেখছি আর মানুষ করতে পারলুম না। তুই বড় হয়ে যে কী করবি তা বুঝতে পারছি না। শেষকালে তুই কেলেঙ্কারী না বাধিয়ে বসিস। যখন তোর বাবা মারা যাবার পর লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক হবি, তখন দেখছি সবাই তোকে সব ঠকিয়ে নেবে—

সদানন্দ ছোটবেলায় প্রকাশমামার কথা শুনে অনেক জিনিস জানতে পারতো। সে জানতে পারতো যে, তাদের অনেক টাকা। তার ঠাকুর্দা আর তার বাবা মারা যাবার পরই সে নাকি লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে যাবে। তখন তার বয়েস পনেরো কি ষোল সেই সময়েই সে এই সব কথা শুনলো। রাণাঘাটের বাজারের একটা বাড়িতে তখন তাকে নিয়ে গেছে প্রকাশ মামা। সারা রাত যাত্রা শুনেছে মামার সঙ্গে। যাত্রা যখন শেষ হয়েছে তখন মাঝ রাত। ঘড়িতে বোধ হয় রাত তখন দুটো। সেই অত রাত্রে সদানন্দর খুব ঘুম পেয়েছে। প্রকাশমামা জিজ্ঞেস করলে—কী রে, খুব ঘুম পেয়েছে?

সদানন্দ বললে—হ্যাঁ।

—তা হলে চল্ তোকে বিছানায় শুইয়ে দিই গে। চল্ আমার সঙ্গে—

বলে বাজারের গলির ভেতরে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকলে—রাধা, রাধা ও রাধা—

অনেক ডাকাডাকির পর একজন মেয়েমানুষ চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে দরজা

খুলে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—এ কী, এত রাত্তিরে? এ কে?

প্রকাশমামার হাব-ভাব দেখে মনে হলো যেন মেয়েমানুষটা তার খুব চেনা। কথা বলতে বলতে একেবারে তার বিছানায় গিয়ে বসে পড়লো। সদানন্দ তখনও মেয়েমানুষটার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। যাত্রা শুনতে শুনতে যে তখন তার অত ঘুম পাচ্ছিল, সেখানে সেই মেয়েমানুষটার বাড়িতে গিয়ে সে-সব যেন কোথায় হাওয়ায় উড়ে গেল।

—কী রে, রাধার দিকে চেয়ে অমন করে দেখছিস কী?

প্রকাশমামা হাসতে হাসতে সদানন্দকে কথাটা বলতেই সে মাথা নিচু করে নিয়েছিল। তার সেই ওই অল্প বয়েসেই মনে হয়েছিল যে, অমন করে কোনও অ মেয়েমানুষের দিকে চেয়ে থাকতে নেই

তারপর প্রকাশমামার কথাতেই যেন আবার জ্ঞান ফিরে এলো। প্রকা তখন মেয়েমানুষটার দিকে চেয়ে চলেছে সদানন্দর কথা। লাখ লাখ ট জমিদার এর বাবা। বাবার এক বুঝলে? বাপ মারা গেলে এই ছেলেই

...টাকার সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হবে।

—তা ওকে নিয়ে আমার এখানে কেন ...সেছ? ওর বাবা-মা জানতে পারলে কিছু ...বে না?

প্রকাশমামা হেসে উঠলো। বললে—...কেন, তোমাদের এখেনে আসা কি খারাপ?

রাধা বললে—না, তোমার কথা বলছি ...। তুমি তো এ-লাইনে পাকা ঘুঘু। ...কলে ভাগ্নেকেও এ-লাইনে নিয়ে এলে, ...ই বলছি—

প্রকাশমামা সদানন্দর দিকে চাইলে। ...লে—এ লাইনে এলে ক্ষতি কী! তোমারও ...ত, আমারও লাভ—

—তোমার কীসের লাভ?

—লাভ নয়? এত টাকা এ একলা খেতে ...রবে? পরের গলায় গামছা দিয়ে টাকা ...রেছে এর ঠাকুর্দা। কালিগঞ্জে এর ঠাকুর্দা ...নেরো টাকা মাইনেতে গোমস্তার চাকরি ...রতো। মাত্তোর পনেরো টাকা। ...লোকে বললে খারাপ শোনাতো বলে ...ই এর ঠাকুর্দাকে নায়েবমশাই বলে ...ডাকতো। সেই পনেরো টাকায় শুরু ...র আজ পনেরো লাখ টাকার জমিদারির ...মালিক তিনি। আর এই নাতিই হলো ...র সেই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্তোর ...ধিকারী।

...থেকে যেমন রাধার কাছে বিস্ময়কর, ...সেই ছোটবেলায় সদানন্দর কাছেও ...নি প্রকাশমামার সেই সেদিনকার ...তেই সে প্রথম জানতে পারলো যে, ...র অনেক টাকা। সে কত বড়লোক।

রাধা বললে—কিন্তু তুমি এই বয়েসেই ...র এই লাইনে নিয়ে এলে? ও তো বয়েস ...র এড়াবে—

—সে গুড়ে বালি? বুঝলে গো, টাকা ...র কারোর হাত দিয়ে গলে না।

রাধা বললে—তাই নাকি?

—হাঁ, তাই তো আমি আমার দিদির ...থেকে যা পারি হাতিয়ে নিই। এর ... আমার জামাইবাবু এক-পয়সার ...দার। সেই জন্যেই তো এই ...কে এ লাইনে এনে একটু ...র করবার চেষ্টা করছি। দেখি, এখন ...র হাতযশ আর এর কপাল—

সদানন্দ তখনও রাধার দিকে একদৃষ্টে ...আছে। তার মনে হলো ...মানুষটার মধ্যে কিছু যেন অস্বাভাবি-...রয়েছে একটা। তাদের নবাবগঞ্জের ...মেয়েমানুষদের মত নয় যেন। শেষ ...সেদিন আর ঘুমনোই হয়নি ...। ওই রকম জায়গায় কারো ঘুম ...নাকি?

...মনে আছে বাড়িতে ফিরে আসতেই মা ...জ্ঞেস করলে—কীরে, সমস্ত রাত কোথায় ...? ঘুম হয়েছিল তোর?

প্রকাশমামা বললে—ঘুম হবে কী করে? সাধুদের আশ্রমে কি ঘুম হয় কারো? সবাই কেবল খোল-কর্তাল বাজাচ্ছিল—

—সাধুদের আশ্রমে? সাধুদের আশ্রমে মানে?

প্রকাশমামা বললে—যাত্রা তো শেষ হয়ে গেল রাত দুটোর সময়, তখন কোথায় যাই? সদা বললে ওর ঘুম পেয়েছে। তাই ওকে নিয়ে রাণাঘাটের একটা সাধুদের আশ্রমে গেলুম। কিন্তু সেখানে সবাই এমন চেঁচিয়ে গলায় 'রাধা-কৃষ্ণ' 'রাধা-কৃষ্ণ' করতে লাগলো যে, বাপ-বাপ্ বলে আমাদের ঘুম পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো—

দিদি হাসতে লাগলো। বললে—তা আমাদের সদরের উকিলবাবুর বাড়ি থাকতে সাধুদের আশ্রমে তোরা গেলিই বা কেন?

প্রকাশ মামা বললে—গেলুম সদাকে দেখাতে। যখন বড় হয়ে হাতে ওর অনেক টাকা আসবে তখন যাতে না ঠকে তাই এখন থেকে জোচ্চোরদের চিনিয়ে রাখছি—

কথাটা শুনে দিদিও হাসতে লাগলো, প্রকাশ মামা নিজেও হাসতে লাগলো। কিন্তু সদানন্দ সেদিন হাসতে পারেনি প্রকাশমামার কথা শুনে। তখনও সেই রাণাঘাটের বাজারের মেয়েমানুষটার কথা মনে পড়ছিল তার।

হঠাৎ প্রকাশমামা জিজ্ঞেস করলে—জামাইবাবুকে তুমি আমাদের যাত্রা শুনতে যাওয়ার কথা বলোনি তো?

সত্যিই তখনকার দিনে কেউ-ই জানতো না প্রকাশমামার সঙ্গে বাড়ির বাইরে সে কোথায় কোথায় যেত। চৌধুরী বংশের কুলতিলকের পক্ষে যেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ সেখানেও যে সেই বয়েসেই গিয়ে সে সব-কিছু বিধি-নিষেধ অমান্য করে বসে আছে—এ-কথা গুরুজনদের কারোরই তখন গোচরে আসেনি। জীবন দেখা কি এতই সোজা! প্রকাশমামা না হলে কি জীবনের উল্টো-পিঠটা সে দেখতে পেত? একদিকে নরনারায়ণ চৌধুরীর অর্থ-লালসা, আর তার বাবার বৈষয়িক কূট-কৌশলী বুদ্ধি, আর অন্য দিকে প্রকাশমামার বেপরোয়া জীবন-ভোগ। একদিকে কালিগঞ্জের বৌ এসে পাল্কি থেকে নামতো আর দাদুর কাছে গিয়ে টাকা চাইতো, আর একদিকে সেই টাকাই প্রকাশমামার হাতের ফুটো দিয়ে রাণাঘাটের বাজারের চালাঘরে গিয়ে নিঃশেষ হতো। মানুষের জীবনের এই অঙ্কটা সে কিছুতেই কষতে পারতো না।

এক-একদিন মাকে জিজ্ঞেস করতো—মা, ও বউটা কে পাল্কী করে আসে আমাদের বাড়িতে? কেবল দাদুর কাছে টাকা চায় কেন?

মা বলতো—ও কালিগঞ্জের বউ।

—কালিগঞ্জের বউ কালিগঞ্জে থাকে না কেন? আমাদের নবাবগঞ্জে কেন জ্বালাতে আসে?

মা তাড়াতাড়ি ছেলেকে চুপ করিয়ে দিত। বলতো—চুপ, চুপ, ও-কথা বলতে নেই, দাদু শুনতে পেলে রাগ করবেন।

সদানন্দ বলতো—তা কালিগঞ্জের বৌ-এর পাওনা টাকা দিয়ে দিলেই হয়। যখনই কালিগঞ্জের বউ টাকা চায় তখনই দাদু বলে টাকা নেই। দাদু কেন মিথ্যে কথা বলে? দাদুর তো অনেক টাকা আছে, আমি দেখেছি—

এ-সব কথার কোনও উত্তর তার মা দিতে পারেনি।

প্রকাশমামাকেও সে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে—তুমি কেন ওখানে যাও মামা?

প্রকাশমামা ভাগ্নের কাছে এমন প্রশ্নের আশা করতো না। বলতো—তুই কী বুঝবি কেন যাই। তুই যখন বড় হবি তখন তুইও যাবি—

সেই ছোটবেলায় যখন রাধার বাড়িতে প্রথম গিয়েছিল সে তখন সেই গানটা শুনিয়েছিল সে। সেই গানটা—আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম।

আসবার সময় রাস্তায় প্রকাশমামা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—কী রে, কী-রকম গান শুনলি?

সদানন্দ বলেছিল—ভালো—

—ভালো তো বুঝলুম, কিন্তু, কী রকম ভালো তাই বল না—

সদানন্দ বলেছিল—খুব ভালো—

প্রকাশমামা বলেছিল—তা দ্যাখ, দিদি যদি তোকে জিজ্ঞেস করে কোথায় রাত কাটিয়েছিলি তাহলে কিন্তু রাধার কথা বলিস নি, বুঝলি? তোর বাবাকেও বলবি না, তোর দাদুকেও বলবি না।

সদানন্দ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু তুমি কেন ওখানে যাও মামা?

প্রকাশমামা বলেছিল—জীবনকে ভোগ করতে।

—ভোগ করতে মানে?

প্রকাশমামা বলেছিল—ওই তো তোর দোষ। বলছি তুই বড় হলে সব বুঝতে পারবি। তবু বার-বার সেই এক কথা! তোর ভালোর জন্যেই তোকে এসব শেখাচ্ছি। নইলে তোর হাতে যখন টাকা আসবে তখন তুই খরচ করবি কী করে?

সদানন্দ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? টাকা খরচ করা কি শক্ত?

প্রকাশমামা বলেছিল—নিশ্চয়ই, টাকা খরচ করা কি সোজা নাকি। তোর দাদুর তো অত টাকা, তাহলে কালিগঞ্জের বৌকে তার পাওনা টাকা দেয় না কেন বল্?

সদানন্দ বলেছিল—সত্যিই বলো তো, কালিগঞ্জের বৌকে দাদু টাকা দেয় না কেন?

একটা হাসির শব্দে হঠাৎ যেন সদানন্দর সম্বিৎ ফিরে এলো। চারদিকে অনেক লোক, অনেক আলো। অনেক বাজনা। ঢোল-কাঁসির আওয়াজে জায়গাটা তখন সরগরম হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে আছে শাঁখ আর উলুর শব্দ।

—বেয়াই মশাই, আমি তো খুব ভয় পেয়েছিলাম।

প্রকাশমামা এগিয়ে এল ভট্টাচার্যি মশাই-এর দিকে। বললে—কেন, ভয় পেয়েছিলেন কেন?

ভট্টাচার্য মশাই বললে—আমাদের বিপিন গিয়েছিল, তার মুখেই শুনলাম বাবাজীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না সকাল থেকে—

কথাটা শুনে হো-হো করে হেসে উড়িয়ে দিলে, প্রকাশমামা। জামাইবাবুর দিকে চেয়ে বললে—শুনুন জামাইবাবু, বেয়াই-মশাই এর কথা শুনুন, বরকে যদি পাওয়াই না যাবে তাহলে এখন এল কী করে?

কালিকান্ত ভট্টাচার্য মশাই বললে—না, বুঝতেই তো পারছেন, আমি হলুম মেয়ের বাপ, আমার তো একটা দুশ্চিন্তা থাকে—তা গায়ে-হলুদ নির্বিঘ্নেই হয়েছিল তো শেষ পর্যন্ত? বরকর্তা চৌধুরী মশাই সাধারণত বেশি কথা বলেন না। গায়ে-হলুদের কথা শুনে মুখ খুললেন। বললেন—গায়ে-হলুদ না হলে বিয়ে হবে কী করে বেয়াই মশাই? অশাস্ত্রীয় ব্যাপার তো আমাদের বংশে হবে না—

নিরঞ্জন পরামাণিক বরের সঙ্গে গিয়েছিল। কনের বাড়ির পরামাণিক বিপিন এসে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলে—শুনছিলাম কী নাকি হয়েছিল আপনাদের ওখানে—?

—কীসের কী?

—আমি তো গায়ে হলুদ নিয়ে গিয়েছিলুম নবাবগঞ্জে, তখন তো বরকে পাওয়া যাচ্ছিল না, তারপর কখন পাওয়া গেল?

নিরঞ্জন বললে—আরে খোকাবাবু তো খেয়ালী মানুষ, হঠাৎ কালিগঞ্জে চলে গিয়েছিল—

—কালিগঞ্জে? তা বিয়ের দিন পাত্র কালিগঞ্জে চলে গিয়েছিলই বা কেন?

কেন যে সদানন্দ সেদিন কালিগঞ্জে চলে গিয়েছিল তা কি সদানন্দ নিজেই জানতো? এ এক বিচিত্র মানসিকতা। আগের দিনও সে জানতো না যে, সে কালিগঞ্জে যাবে। প্রকাশমামা তাকে সব জায়গাতেই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই সে মামার সঙ্গে কত জায়গাতেই তো গেছে। কালিগঞ্জেও গেছে। রেলবাজার থেকে নবাবগঞ্জে এসে আরো তিন ক্রোশ দক্ষিণে যাও তবে কালিগঞ্জ পড়বে। কালিগঞ্জে পোস্টাফিস আছে, থানা আছে, বাঁধা বাজার আছে। বলতে গেলে নবাবগঞ্জের চেয়ে কালিগঞ্জ আরো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সদানন্দ জানতো ওইখান থেকেই কালিগঞ্জের বউ তার দাদুর কাছে আসতো। জানতো দাদুর কাছে এসে কালিগঞ্জের বউ টাকা চাইতো, আর যতবার টাকা চাইতো ততবার দাদু বলতো টাকা নেই। কেন যে বউ টাকা চাইতো আর কীসের টাকা, তা সদানন্দ জানতো না। কাউকে জিজ্ঞেস করলেও কেউ স্পষ্ট জবাব দিত না।

বিয়ে বাড়িতে তখন লোকজনের ভিড় হয়েছে খুব। ভাগলপুর থেকে দাদামশাই এসেছে। তাঁর নাতির বিয়ে। বুড়ো মানুষ। বেশি নড়া-চড়া করতে পারেন না। তিনি বললেন—কই, খোকাকে তো দেখতে পাচ্ছিনে—

দীনু ডেকে নিয়ে এল খোকাকে। দাদু শুয়ে ছিলেন সামনে। বললেন—দাদুকে প্রণাম করো—

—থাক থাক—বলে কীর্তিপদবাবু পা-জোড়া সামনের দিকে একটু এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—বেঁচে থাকো বাবা, আশীর্বাদ করি সুখী হও—

সদানন্দ তখনও সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কীর্তিপদবাবু আবার বলতে লাগলেন—এসে পর্যন্ত তোমাকে দেখতেই পাইনি মোটে, খুবই ব্যস্ত বুঝি—

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—না, ও আবার ব্যস্ত কীসের! ও তো বরাবরই ওই রকম। আমিই বলে আজকাল দেখতে পাইনে ওকে, অথচ একই বাড়ির মধ্যে থাকি। ওকে কেউই দেখতে পায় না—

কীর্তিপদবাবু বললেন—তা তো পাবেই না, এখন ওদের বয়েস হয়েছে, বুড়োদের সঙ্গে থাকতে ওদের আর ভালো লাগবে কেন? যাও, যাও, তোমার নিজের কাজে যাও। বাবা, কাল তোমার বিয়ে, আর কোথাও বেরিও না—

সদানন্দ ছাড়া পেয়ে বেঁচে গেল যেন। সে চলে যাবার পর কীর্তিপদবাবু বললেন—অনেকদিন পরে দেখলাম খোকাকে, খুব বড় হয়ে গেছে—আর চেনা যায় না—

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—বড় হলে কী হবে, বৈষয়িক বুদ্ধি-টুদ্ধি তেমন হয়নি—

কীর্তিপদবাবু বললেন—এইবার বিয়ে হচ্ছে, কাঁধে জোয়াল চাপলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ছোট বয়েসে সবাই ওরকম একটু হয়েই থাকে—পরে দেখবেন তখন ও-ই আপনাকে শেখাবে। আমি যখন ছোট ছিলুম তখন আমিই কি জমিদারীর কিছু বুঝতুম—

দুই বেয়াই-এর বহুদিন পরে দেখা। দু'জনেরই অনেক সম্পত্তি। একদিন এই দু'জনের সব সম্পত্তিরই মালিক হয়ে বসবে সদানন্দ। কীর্তিপদবাবুর একমাত্র সন্তান এই সদানন্দর মা। আর নরনারায়ণ চৌধুরীরও একমাত্র সন্তান এই সদানন্দর বাবা। সদানন্দ নিজেও হরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। সুতরাং দুই বেয়াই-এরই একমাত্র ভরসা এই সদানন্দ। তাই দু'জনেরই এক কামনা। দু'জনেরই কামনা সদানন্দ দীর্ঘজীবী হোক, সদানন্দ সুখী হোক, সদানন্দ সংসারী হোক, বৈষয়িক হোক।

কিন্তু হায় রে মানুষের জীবন আর মানুষের জীবনের ইতিহাস। নইলে সেদিন নবাবগঞ্জ আর ভাগলপুরের সেই দুই দুর্ধর্ষ জমিদার-পুঙ্গব কি কল্পনা করা[illegible] পেরেছিলেন যে, তাঁদের একমাত্র উত্তরাধি[illegible] শ্রীমান সদানন্দ চৌধুরী লক্ষ লক্ষ টা[illegible] মালিক হওয়া সত্ত্বেও কপর্দকশূন্য অব[illegible] এক অখ্যাত চৌবেড়িয়া গ্রামের রসিক পা[illegible] অতিথিশালায় অন্নদাস হিসেবে [illegible] জীবনটা কাটাবে! নইলে ঠিক বিয়ের আ[illegible] দিনই কেউ নিজের বাড়ি ছেড়ে পালায়, নরনারায়ণ চৌধুরীর শেষ জীবনের চরম[illegible] কালিগঞ্জের বৌ-এর কাছে গিয়ে আশ্রয় [illegible]

কালিগঞ্জের বৌ-এরও তখন চরম অব[illegible] নিঃসন্তান বিধবা মানুষ তিনি। একক[illegible] স্বামীর জীবিতাবস্থায় তিনি অনেক [illegible] অনেক ঐশ্বর্য দেখেছেন। দুটি ছে[illegible] হয়েছিল তাঁর। তারাও তখন আর [illegible] কালিগঞ্জে যেবার কলেরা মহামারী হয়ে [illegible] দিয়েছিল সেবার দুই ছেলেই [illegible] চোখের সামনেই মারা গিয়েছ[illegible] স্বামীর মৃত্যু দুই ছেলের মৃ[illegible] সবই তিনি সহ্য করেছেন বুকে পা[illegible] বেঁধে। তখন ওই নরনারায়ণ চৌধুরীই [illegible] কালিগঞ্জের জমিদারের নায়েব। তাঁর হা[illegible] সব কিছুর ভার দিয়ে কালিগঞ্জের বউ [illegible] নিশ্চিন্ত ছিলেন। পনেরো টাকা [illegible] পেতেন তখন নরনারায়ণ চৌধু[illegible] সামান্য নায়েব মাত্র। [illegible] সাচ্ছে সংসার চলতো তাঁর কিন্তু স[illegible] হারা বিধবার হাতে জমিদা[illegible] ভার পড়ার পর থেকেই নরনারায়ণ চৌধু[illegible] অবস্থা ফিরতে লাগলো। তিনি [illegible] করেন কালিগঞ্জে কিন্তু একখানা ছো[illegible] বাড়ি করলেন নবাবগঞ্জে, নিজের [illegible] মাসে পনেরো টাকা মাইনে পাওয়া নায়ে[illegible] কোঠা বাড়ি করবার সামর্থ্য হয় কী ক[illegible] সে প্রশ্ন জমিদারির বিধবা মা[illegible] কালিগঞ্জের বৌ-এর মাথায় আসেনি। [illegible] আর নরনারায়ণ চৌধুরী আজ এত বড়[illegible] হতে পারতেন না। আর তখন [illegible] উঠলে আজকের এই আসামী সদা[illegible] চৌধুরীকে নিয়ে উপন্যাস লেখ[illegible] প্রয়োজনও এমন করে অনিবার্য [illegible] উঠতো না।

তা সেদিন সেই সদানন্দ চৌধুরীর [illegible] আগের দিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ কালিগ[illegible] বৌ সদানন্দকে তার বাড়িতে দেখে অ[illegible] হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি মানুষ, ভালো [illegible] তখন চোখেও দেখতে পায় না। বিরাট বা[illegible] কিন্তু ওই বিরাট বাড়িটাই শুধু [illegible] তখন। আর কিছু নেই। সব ঘরগুলো[illegible] ভালো করে ঝাটও পড়ে না। আগেকার [illegible] সব লোক-লস্করও নেই আর তখন। [illegible] ঝি শুধু হাতের কাজগুলো করে [illegible] আগে গোয়াল-ভরা গরু ছিল, বলদ [illegible] চাষ-বাসের। আর কিছু লোকজন, [illegible] এককালে কর্তাদের নিমক খেয়েছে [illegible] কৃতজ্ঞতার তাগিদে বাড়ির আনাচে কা[illegible]

কোনও রকমে তখনও বাসা বেঁধে আছে। দরকার হলে পালকীটায় করে গিন্নীমাকে এখান-ওখানে নিয়ে যায়। তাও পালকীটার এখন রং চটে গেছে, একটা পায়া ভেঙে গেছে। কোনও রকমে মেরামত করে করে সেটা একটু চলে আছে।

—তুমি কে বাবা?

সদানন্দ একেবারে নিচু হয়ে বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে।

—আমি সদানন্দ। আমি নবাবগঞ্জের নরনারায়ণ চৌধুরীর নাতি, আর হরনারায়ণ চৌধুরী আমার বাবা!

কালিগঞ্জের বৌ তখন বিস্ময়ে হতবাক। যেন কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না বুড়ির।

বললে—তা আমার কাছে যে তুমি হঠাৎ? নায়েবমশাই কি তোমার হাত দিয়ে আমাকে টাকা পাঠিয়েছে?

সদানন্দ বললে—না—

—তাহলে তুমি কী করতে এয়েছ?

—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি কালিগঞ্জের বৌ! আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি, আমার কালকে বিয়ে, এবার থেকে আমি তোমার কাছেই থাকবো।

কালিগঞ্জের বৌ কথাগুলো শুনে কেমন যেন আকাশ থেকে পড়লো। কী করবে বুঝতে পারলে না। তখনও আহ্নিক সারা হয়নি তার। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এবার বসে পড়লো বুড়ি। বললে—তোমার বিয়ে? কাল?

—হ্যাঁ—

—তা কাল তোমার বিয়ে যদি হয় তো আজকে আমার বাড়িতে এলে কেন? কাল সকালেই তো তোমার গায়ে-হলুদ হবে, এখন তো তোমার খোঁজ পড়বে। তখন তো আমার নামেই দোষ পড়বে যে, আমি তোমাকে আমার কাছে আটকে রেখেছি! তা নায়েব মশাই জানেন যে, তুমি আমার কাছে এসেছ?

সদানন্দ বললে—না। আমি কাউকে বলিনি এখানে আসার কথা। কাউকে আর বলবোও না। আমি আর ও-বাড়িতে যাবোও না।

কালিগঞ্জের বৌ বললে—তোমার হলো কী বাবা? তুমি কি বাড়ির সঙ্গে রাগারাগি করেছ?

—না, কালিগঞ্জের বৌ, আমি তোমার এখানে থাকবো বলেই এসেছি। এবার থেকে আমি বরাবর তোমার এখানেই থাকবো। নবাবগঞ্জে আর যাবো না।

কালিগঞ্জের বৌ বললে—তুমি দেখছি ছেলেমানুষ আছো এখনও, আমার এখানে তুমি থাকবে যে, তা খাবে কী? তুমি বড়লোকের বাড়ির ছেলে, আমি গরীব মানুষ, আমি কি তোমাকে খাওয়াতে পারবো বাবা? তুমি ছেলেমানুষি কোর না, বাড়ি চলে যাও—। একে তো তোমার দাদু আমাকে দেখতে পারে না, এর পরে যদি তোমাকে আমার এখানে দেখতে পায় তো আমাকে আর আস্ত রাখবে না, আমাকে আর তোমাদের বাড়িতেও ঢুকতে দেবে না—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি দাদুর কাছে যাও কেন? কেন তুমি দাদুর কাছে ভিক্ষে করতে যাও? ভিক্ষে করতে তোমার লজ্জা করে না?

কালিগঞ্জের বৌ বললে—কিন্তু আমার পাওনা টাকা চাইতে যাওয়াও ভিক্ষে? তোমার দাদু তো আমার সর্বস্ব নিয়েছে। আমার জমি-জমা কিছুই আর বাকি রাখেনি। কেবল এই ভিটেটুকু ছাড়া আর আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। আমার লাখ-লাখ টাকার সম্পত্তি সব তোমার দাদু নিয়েছে, তাই শেষকালে আমি অনেক কান্নাকাটি করাতে তোমার দাদু বলেছিল আমাকে হাজার দশেক টাকা দেবে। তাই শুনে আমি মামলা তুলে নিয়েছিলুম। তা এখন সেই টাকাটা চাওয়াও নাকি আমার অন্যায়। আমি তো আর দু'দিন পরে মরে যাবো, তখন টাকা দিলে আমার কী লাভ হবে বলো বাবা? সে টাকা কি আমার শ্রাদ্ধে খরচ হবে?

সদানন্দ বললে—তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি—

—তুমি সব জানো বাবা? সব জানো তুমি? বুড়ির যেন আনন্দে গলা বন্ধ হয়ে এলো।

সদানন্দ বললে—সব জানি বলেই তো আমি এসেছি—

—কী করে জানলে তুমি? কে বললে তোমাকে? কে আমার এমন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে বাবা? আমি জানতুম আমার কেউ নেই। কর্তা গেছেন, নিজের পেটের দুটো ছেলে থাকলেও আজ আমার এই দুর্দশা হতো না। তাই ভাবি, মানুষ এমনি করেই মানুষের সব্বোনাশ করে? কই, তোমার দাদুর তো কোনও ক্ষতি হয়নি। তাঁর তো ছেলে বেঁচে রয়েছে। তুমি তাঁর নাতি, তোমারও তো কাল বিয়ে হবে, তারপর একদিন তোমারও ছেলে পুলে হবে, ঘর-সংসার ভরে উঠবে তোমাদের। তখন তো একবার কেউই ভাববে না কার টাকায় এ-সব হলো, কার সব্বোনাশ করে তোমাদের এত বাড়-বাড়ন্ত হলো! কিন্তু আমার কী হলো? আমি তোমার দাদুর কাছে কী অপরাধ করেছি যে তিনি আমার এত বড় সব্বোনাশটা করলেন। দেখ বাবা, আমি তাই তাঁকে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে এসেছি—

—শাপ দিয়ে এসেছেন? কাকে?

—তোমার দাদুকে। রাগের মাথায় শাপ দিয়েছিলুম। শাপ দিয়ে বলেছিলুম যে আপনি নির্বংশ হবেনই, বামুনের শাপ নিষ্ফল হবে না। তা রাগ হলে কি মানুষের জ্ঞান থাকে বাবা? আমিও তাই রাগের মাথায় ওই কথা বলে ফেলেছিলুম। তাই আমার ওপর তোমার দাদুর অত রাগ। এখন বলছেন আর টাকা দেবেন না—

সদানন্দ বললে— আমি তোমার টাকা সব মিটিয়ে দেবো—আমি তোমাকে তো সেই বলতেই এসেছি—

—তুমি আমার টাকা মিটিয়ে দেবে? তা আমি মরে গেলে আমার টাকা মিটিয়ে দিলে আমার কী লাভ? বেঁচে থেকেই যদি খেতে না পেলুম তো আমি মারা গেলে সে টাকা কে খাবে? ভূতে খাবে?

হঠাৎ একটা শব্দে সদানন্দর যেন চমক ভাঙলো। হঠাৎ বাইরে কে যেন বলে উঠলো ওরে বাজনা বাজা—বাজনা বাজা—

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বেজে উঠলো বাইরে। তখন সম্প্রদান হচ্ছে। পুরুত-মশাই মন্ত্র পড়তে শুরু করেছেন—

যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম

নয়নতারার হাতের পাতাটা ধরে আছে সদানন্দ আর পুরুত-মশাই নিজের মনেই গড় গড় করে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। কিন্তু

একটা কথাও যেন তার তখন কানে যাচ্ছে না। তার তখন মনে পড়ছে সেই রাধার গাওয়া গানটা। প্রাণাঘাটের বাজারের রাধা।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতাম
শ্যামের পীরিত গরল মিশ্রিত
কারো মুখে যদি শুনিতাম।
কুলবতী বালা হইয়া সরলা
তবে কি ও বিষ ভখিতাম।

সদানন্দর মনে হলো প্রকাশ মামার রাধা সেদিন গানটা ঠিক গায়নি। 'শ্যামের পীরিত' নয়, ওটা হবে 'টাকার পীরিত'। 'টাকার পীরিত গরল মিশ্রিত' বললেই যেন ঠিক হতো। টাকার জন্যেই তো আজ তার দাদু বড়লোক, টাকার জন্যেই তো তারা জমিদার, টাকার জন্যেই তো আজ এই সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। অথচ এ টাকা তারও নয়, তার বাবারও নয়, তার দা... নয়। এই সমস্ত যা কিছু, তাদের সু... সব তো কালিগঞ্জের বৌ-এর।

পুরুত-মশাই তখনও মন্ত্র প... চলেছে—যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃ... মম, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং....

(ক্র...

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৷৷ ২৭ ৷৷

চড়িদা

পশ্চিমবঙ্গের লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় কুটির শিল্পগুলির কথা বাদ দিলেও ...গুলির অনুশীলনে এখনও তেমন ...টা পড়েনি তাদের সংখ্যা অনায়াসেই ...অধিক হবে। উৎপন্ন সামগ্রীর ...নান্দনিকত্ব বা তাদের নির্মাণ কৌশলের ...বৈচিত্র্যও অসীম। পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানার ব্যাপক সূত্রপাত খুব বেশী ...দিনের নয়। তা ছাড়া স্থানীয় অধি-বাসীদের প্রায় সত্তর ভাগ এখনও পল্লী-...। নাগরিক সমাজবিন্যাস বা ...আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থা অদ্যাবধি ...তাঁদের বিশেষ স্পর্শও করেনি। অতএব ...দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রামীণ ...কুটিরশিল্পের সংখ্যা এখানে যে বেশ বেশী ...হবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য ...তা হল—এত অগণিত সুকুমারশিল্পের ...পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমেত ভালো বই ...বাংলা ভাষায় এখনও বিশেষ লেখা হয়নি। ...চিত্র পুস্তক তো আরও দুষ্প্রাপ্য। ...বিচ্ছিন্নভাবে প্রবন্ধাদি যা প্রকাশিত ...হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তাও অনেক ...কম বলেই মনে হয়। সেগুলিও সব ক্ষেত্রে ...চিত্রসংবলিত নয়। অথচ এ জাতীয় বিষয় পাঠক সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করতে হলে শুধু লিখিত বিবরণই যথেষ্ট হতে পারে না: সঙ্গে হাতে আঁকা ছবি বা আলোকচিত্র থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কেননা, বিষয়বস্তু এক্ষেত্রে যতটা না বুদ্ধিগ্রাহ্য তার চেয়ে বেশী দৃষ্টিগ্রাহ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের প্রতিমানির্মাণ-শিল্প যতই কেননা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হোক, নির্মাণ প্রণালী ও সৃষ্ট বস্তুর ছবির অভাবে তা নীরস এমন কি দুর্বোধ্য হওয়া খুবই সম্ভব। অথচ মূলত দৃষ্টিগ্রাহ্য এমন বহু বিষয়ের গবেষক মহলে ছবি আঁকতে বা ফটো তুলতে না জানাটা এতই নিত্য ও ব্যাপক যে তাঁদের অনেকেই এসব দক্ষতা অর্জনকে অপ্রয়োজনীয় এমন কি হেয় জ্ঞান করেন বলে শুনেছি। তাঁদের একমুখী পাণ্ডিত্যকে আমি বিন্দুমাত্র ঈর্ষা করি না। কিন্তু সাধারণ বাঙালী পাঠক হিসেবে আমার খেদ এই যে বঙ্গকৃষ্টির ধারক ও বাহকদের কাছে আমাদের যতখানি প্রত্যাশা তার সামান্যই তারা পূরণ ক'রে থাকেন। আমাদের সংস্কৃতি সম্পদ সম্বন্ধে বাঙালী জনসাধারণ এখনও যে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত বা উৎসাহী নন তার পাঁচটা কারণের মধ্যে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের অভিনিবেশ আকর্ষণ করবার মতো ক'রে বাঙালীর কৃষ্টিসম্ভারের কথা আমরা আজও ব্যাপক-ভাবে উপস্থিত করতে পারিনি। ফলে জাতিগতভাবে আমাদের সংস্কৃতিবৈভবের নানা উপাদান সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবহিত নই বলে সে বিষয়ে উৎসাহীও নই। পরিস্থিতিটা অবশ্যই পরিতাপের। কিন্তু তার জন্য মুখ্যত দায়ী যে আমরাই —অর্থাৎ কৃষ্টি-প্রবক্তা সম্প্রদায়—তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। অধমের এই খেদোক্তিতে কেউ যেন রুষ্ট না হন। কেননা,

"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।"

চড়িদা গ্রাম

ছো নাচের মুখোশ নির্মাণ

পুরুলিয়া জেলার ছো নাচের মুখোশ-শিল্প বিষয়ে লিখতে বসে এই চোখের জলেই বারবার অভিভূত হচ্ছি। এ প্রবন্ধের সঙ্গে রঙিন ছবি ব্যবহার করাই হয়ত উচিত ছিল কেননা আলোচ্য কুটির-শিল্পটির মতো বর্ণাঢ্য গ্রামীণ কারুকলা পশ্চিমবঙ্গে বেশী নেই। এটা সম্ভব হ'লে পাঠক সাধারণের কাছে এ শিল্পের সূক্ষ্মতা ও মনোহারিত্ব আরও প্রাঞ্জলভাবে পেশ করতে পারতাম। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় যেহেতু রঙিন ছবি ব্যবহৃত হয় না সেজন্য পাঠকের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া আর উপায় নেই। আয়োজন ও ইচ্ছা থাকলেও যে অনেক সময় নিজের বক্তব্য মনোমতভাবে সাধারণ্যে উপস্থিত করা যায় না এ তার এক নিদর্শন।

পুরুলিয়া জেলায় ছো নাচের প্রচলন খুবই ব্যাপক। অনেকের ধারণা, সেখানে কম পক্ষে আড়াই শ' ছো নাচের দল আছে। এ খবর সত্য হ'লে, গড়ে তিন-চারটি গ্রাম পিছু এক-একটি দল থাকবার কথা। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোন আদমশুমার না হয়ে থাকলেও ছো নাচের জনপ্রিয়তার কাছাকাছি আসতে পারে এমন কোন নাচ যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র নেই সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। পত্র-পত্রিকায় এ নাচ সম্বন্ধে নিতান্ত কম লেখা হয়নি। সঙ্গীত নাটক একাডেমীর আমন্ত্রণে দিল্লীতে ও কলকাতার কোন কোন প্রেক্ষাগৃহে এ নাচ একাধিকবার দেখানো হয়েছে বলে পুরুলিয়া জেলার বাইরেও অনেকে এ নাচের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু যে অপরূপ মুখোশগুলি এ নাচের প্রাণ, তাদের সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

পুরুলিয়ার মাত্র দু'টি গ্রামের কারিগরেরা এই সুকুমার শিল্পটির চর্চা করেন বলে তার অভিনবত্ব আরও বেশী। বাঘমুণ্ডি থানার চাঁড়দা ও জয়পুর থানার ডুমুরডিহি গ্রাম দু'টির মধ্যে প্রথমটির গুরুত্বই সর্বাধিক, কেননা সেখানে শিল্পীর সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশ ঘর আর ডুমুরডিহিতে [illegible] চার-পাঁচ ঘর। তাছাড়া ডুমুরডিহি [illegible] প্রধান কারিগর, মধু রায়, গোকুল রা[illegible] প্রভৃতিদেরও পৈতৃক নিবাস চাঁড়দা[illegible] বর্তমান পুরুষেই তাঁরা উঠে এসে ডুমু[illegible] ডিহিতে বসতি করেছেন। [illegible] ঐতিহ্যগত এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য দুই কেন্দ্রের শিল্পীদের মধ্যে কারিগ[illegible] পদ্ধতিতে কোনই পার্থক্য নেই।

মাত্র দু'টি গ্রামের মুখোশশিল্পী[illegible] প্রায় আড়াই শ' ছো নাচের দলের চাহি[illegible] কি ক'রে মেটান সে এক সঙ্গত প্র[illegible] উত্তরে বলা যায়, এ মুখোশগু[illegible] এমনিতেই বা সামান্য পরিচর্যায় বহু[illegible] পর্যন্ত চলে। দ্বিতীয়ত, এগুলির [illegible] বেশ বেশী বলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত [illegible] গুলিকে (অধিকাংশই তাই) তাদের চাহি[illegible] খুব সীমিত রাখতে হয়। [illegible] মুখোশের দাম, প্রতিটি [illegible] নাচের জন্য এত [illegible] উপযোগী বলে [illegible] বা পুতি, পালক [illegible] মুখোশের দাম, প্রতিটি [illegible] টাকার কম নয়। আর [illegible] গুরুত্ব অনুযায়ী, সব [illegible] পুরো সেট হাজার-বার শ' [illegible] পড়তে পারে।

ছো নাচের মুখোশ : সিংহ

শিল্পীরা এত চড়া দামও যে ঘরে বসেই পান তার অন্যতম কারণ হল তাঁদের গ্রাম দুটিতে সহজেই পৌঁছনো যায় যেদিক দিয়ে খরিদ্দারদের কোন অসুবিধা হয় না। ডুমুরডিহি তো পুরুলিয়া-রাঁচি সড়কের সংলগ্ন গ্রাম, পুরুলিয়া থেকে দশ-বারো মাইল দূরে; আর চড়িদা (স্থানীয় উচ্চারণে 'চোড়দ্যা') পুরুলিয়ার প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা-কেন্দ্র বাঘমুণ্ডি থেকে কাঁচা রাস্তায় মাইল দেড়েক পশ্চিমে। পুরুলিয়া শহর থেকে বাঘমুণ্ডি অবধি নিয়মিত বাস সার্ভিস আছে। সে রুটের বাস বলরামপুর ও মাঠা হয়ে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে যাত্রীদের বাঘমুণ্ডি পৌঁছে দেয়। বাকি কাঁচা রাস্তাটুকু আসলে বাঘমুণ্ডি-ঝালদা রোডের অংশ; শীত-গ্রীষ্মে ধুলো ও বর্ষায় কাদা হলেও মোটেই অগম্য নয়।

এই দূর পল্লীতে এহেন এক কুশলী শিল্পী সম্প্রদায় কোথা থেকে, কিভাবে এলেন? এ বিষয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতটি প্রণিধানযোগ। তাঁর অধীনে গ্রাম-সমীক্ষার একটি দল ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এ অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে—"চারিদিককার আদিবাসী এবং অর্ধ-আদিবাসী সংস্কৃতির মাঝখানে এই গ্রামের অবস্থান বিস্ময়কর। কারণ ৪০টি অভিজাত শিল্পীর পরিবার এই গ্রামে বাস করে; ইহারা প্রধানত মৃৎশিল্পী হইলেও কাষ্ঠশিল্পও ইহাদের অনুশীলনের বিষয়। অভিনব পদ্ধতিতে ছৌ-নাচের মুখোশ নির্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ছৌ-নাচের বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারত। ইহাদের বিষয়গত মর্যাদা-রক্ষায় শিল্পীদিগের সতর্কতা দেখিয়া মনে হয় ইহারা অভিজাত সমাজের শিল্পী।... এই অঞ্চলের আদিবাসী সামন্ত রাজগণ যখন হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তখন হিন্দু পদ্ধতিতে প্রতিমা পূজা করিতে গিয়া বাংলাদেশ হইতে মৃৎশিল্পীদিগকে লইয়া গিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করাইয়া থাকিবেন।...শিল্পিগণ বাঙ্গালী কায়স্থের পদবীধারী এবং বাংলাদেশের সংগে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ। স্থানীয় সামন্তরাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বে ইহারা গিয়া সেই অঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখোশ নির্মাণের পদ্ধতি বাঙ্গালী শিল্পীরই একটি বিশিষ্ট কলা-কৌশল।" ('লোকশ্রুতি' : আশ্বিন ১৩৭৫। পৃঃ ২৪৯—৫০)।

চড়িদার মুখোশ শিল্পীদের আদি-পুরুষরা যে বাঙ্গালী ছিলেন তার আরও প্রমাণ এঁরা নিজেদের জাতিতে সূত্রধর বলে বলেন; এদের পদবী পাল, শীল দত্ত।

ছো নাচের মুখোশ : শুয়োর

শেষ-মধ্যযুগীয় বাংলায় 'সূত্রধর' শিল্পীদের বহুমুখী অবদানের কথা বর্তমান সিরিজের অন্যান্য নিবন্ধে ইতিপূর্বে বলেছি। তা ছাড়া উপরের উপাধিগুলি যে খাঁটি বাঙালী উপাধি তাতেও সন্দেহ নেই। তাঁদের প্রধান উপাস্য দেবদেবী—দুর্গা, কালী, গণেশ, বিশ্বকর্মা, ভাদু, টুসু প্রভৃতি। নিরামিশ নৈবেদ্য সহযোগে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে এসব পূজা অনুষ্ঠিত হয়; বলিদানের প্রথা নেই। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বরপণ প্রথা প্রচলিত। মৃতদেহ দাহ করাই রীতি। পাঠক লক্ষ করবেন, শুধু শক্তিপূজায় বলিদান না দেওয়া ছাড়া অন্যান্য সামাজিক বিধি হুবহু বাঙালীদের মত। ডক্টর তুষার চট্টোপাধ্যায় 'লোকশ্রুতি' পত্রিকার একই সংখ্যার অন্যত্র বলেছেন—"বিভিন্ন অনুসন্ধানের উত্তর বিশ্লেষণ ক'রে অনুমান হয়, চোড়দা গ্রামের সূত্রধরগণ সম্ভবত বর্ধমান জিলার কোন স্থান থেকে বহু পুরুষ আগে এখানে স্থায়ীভাবে চলে আসেন।...বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানের সমগোত্রীয় সূত্রধরদের গোত্র-পরিচয় ও শিল্পকর্মের তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে।" এঁদের কথ্য ভাষাও যে পুরোপুরি বাংলা এবং কুশলী শিল্পীদের সুচাঁদ, মধু, গোকুল, মহেশ, সতীশ, হীরালাল, অসীম প্রভৃতি নামও যে খাঁটি বাঙালী নাম সে কথাও উল্লেখযোগ্য। বাঙালী কায়স্থ সমাজে বিভিন্ন পদবী ধারীদের মধ্যে বিবাহে যেমন কোন বাধা নেই, এখানকার পাল, শীল ও দত্তদের মধ্যেও তেমনি বিবাহ প্রচলিত।

গ্রাম বৃদ্ধদের মতে, এ সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দারা সম্ভবত কাষ্ঠশিল্পী ও মৃৎশিল্পী ছিলেন। ছো নাচের মুখোশ নির্মাণে দক্ষতা তাঁরা সম্ভবত পরে অর্জন করেন। এখন মুখোশ তৈরি প্রধান পেশা হলেও নানাবিধ প্রতিমা গড়া ও দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, পালঙ্ক, চাকি, বেলুন, বারকোশ প্রভৃতি কাঠের সামগ্রী ও মেলার বিক্রির জন্য সনাতন-ধাঁচের কাঠের মা-পুতুলও তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি ক'রে থাকেন। প্রধানত, রাঁচি জেলার বিখ্যাত সতী মেলা ও বড়-কাগড়ের রথের মেলা, সিংভূমের ছাতা-পুকুর মেলা, বাঘমুণ্ডির ঝাবড়ি মেলা ও টাটানগরের মেলায় কাঠের ছোট জিনিস-গুলি ও পুতুল বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মুখোশ তৈরির মরসুম [illegible];

মাঘ-ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ অবধি চলে বলে বছরের বাকি সময়টা তাঁরা ওসব বিকল্প কাজ নিয়ে থাকবার অবকাশ পান।

চৈত্র-সংক্রান্তির শিবের গাজন-উৎসবের মধ্য দিয়েই প্রতি বছর ছো নাচের উদ্বোধন হয় পুরুলিয়ায়। তখন শিবের মন্দির বা থানে পুজো দিয়ে বৈশাখের প্রথম থেকেই বিভিন্ন দল তাঁদের নাচ শুরু করেন নিজেদের গ্রামে বা আমন্ত্রণ পেলে অন্য স্থানেও। এই গণনৃত্য পুরোদমে চলে জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি। মুখোশ শিল্পীদের প্রস্তুতি কিছু আগেই শুরু হয়—মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁদের ফুরসৎ থাকে না।

রামায়ণ-মহাভারতের এক-একটি কাহিনী অবলম্বন করেই যে ছো নাচের পালাগুলি রচিত হয় সে কথা আগেই বলেছি। সেজন্য রাম, সীতা, হনুমান, রাবণ ; ভীম; অর্জুন; অভিমন্যু, দুর্যোধন প্রভৃতি প্রধান চরিত্র ছাড়াও আরও অগণিত উপ-চরিত্রের মুখোশ তৈরি হয়ে থাকে। এ ছাড়া পৌরাণিক কাহিনীর পাত্রপাত্রী ও দুর্গা, কালী, শিব, মনসা প্রভৃতি পৌরাণিক দেব-দেবীর মুখোশও প্রয়োজন হয়। জীবজন্তুও

বাদ যায় না—সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, শুয়োর, হরিণ, ময়ূর ইত্যাদির মুখোশও খুব সমাদৃত।

প্রথমে, মাটি দিয়ে অভীষ্ট মূর্তির একটি নিরেট মডেল বানিয়ে নেওয়া হয়। একে বলে 'মাটি গড়া।' মৃৎশিল্পের বংশগত অভিজ্ঞতা এই কাজে কারিগরদের খুব সাহায্য করে। রোদ্দুরে শুখনো পর মডেলটিকে পণ বা ভাটিতে পুড়িয়ে শক্ত ক'রে নেওয়া হয়। তারপরে মডেলের গায়ে পাতলা করে ছাই মাখিয়ে নিয়ে (যাতে মুখোশটি পরে ছাড়িয়ে আনতে অসুবিধা না হয়), ময়দার আঠা মাখানো পুরনো খবরের কাগজ চার-পাঁচ পুরু ক'রে মডেলে, নকশা অনুযায়ী তার ওপর আঙুল দিয়ে চেপে চেপে মসৃণ ক'রে লাগানো হয়। একে বলে 'কাগজ চিটানো'। কাগজের আবরণটি শুখালে, সেটি ছাড়িয়ে নিয়ে গঙ্গামাটির মিহি কাদার প্রলেপ লাগানো হয় তার উপর। এর নাম 'ফাবিজ-লেপা'। তারপর এই কাদার আস্তরণের উপর এক প্রস্থ পুরনো কাপড় লাগিয়ে নেওয়া হয় যাকে বলে 'কাপড় সেটানো'। এর পরে খুব ছোট একরকম পোড়ামাটির কর্নিক দিয়ে জমির পালিশ করা হয় যার নাম 'খর্পি পালিশ'। পালিশ-করা মুখোশটি রোদে শুখালে, প্রথমে তার ওপর এক প্রস্থ খড়িমাটির গোলা লাগিয়ে শুখিয়ে নিয়ে রংতুলির সাহায্যে চোখ, মুখ, চুল, গোঁফ ইত্যাদি এঁকে নেওয়া হয়। তারপরে আসে তারের কাঠি, পাখির পালক, ময়ূর-পাখা, রাংতা, পুঁতি, 'কিরণপোখরি' 'জরিপোতা', সলমা-চুমকি, নানা রঙের চীন-কাগজ, শণ, পাট প্রভৃতির সমবায়ে শিরোভূষণ নির্মাণ, কারিগররা যাকে বলেন 'মুখোশ সাজানো'। এ কাজটি খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও ছো নাচের মুখোশের প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলির জন্যই এদের শিরোভূষণ নির্মিত হয়। এই শ্রেণীর মুখোশের মধ্যে যেগুলি বিশেষ আড়ম্বরবহুল তাদের নাম 'পঞ্চখিলান'।

উপকরণের দিক থেকে, মাটি, খবরের কাগজ, পুরনো কাপড় বা ময়দার আঠা সহজেই সংগ্রহ হয় কিন্তু মুকুট সাজানোর নানাবিধ উপাদান শিল্পীদের বেশ দাম দিয়ে কিনতে হয় বাজার থেকে। উদ্ভিজ্জ রং কখনও ব্যবহৃত হত কিনা তা বর্তমান শিল্পীরা বলতে পারেন না। তাঁরা বরাবরই কেনা রং ও 'কোপাল ভার্নিস' (কারিগরদের ভাষায় 'গোপাল বার্নিস') ব্যবহার ক'রে আসছেন। তবে মুখোশের চুল পাকানো'র (রাঙানোর) জন্য হীরাকষ ও হরিতকী একত্র সিদ্ধ ক'রে তার ক্কাথে পাট বা শণের ফেঁসো চুবিয়ে রেখে রং ক'রে নেওয়া হয়।

চড়িদার কারিগররা বলেন, তাঁদের

ছো নাচের 'পঞ্চখিলান' মুখোশ

আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। উপাদানের উচ্চ মূল্য এর অন্যতম কারণ। তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'চারটি পরিবারের সামান্য চাষের জমি আছে; অন্যান্যদের ক্ষেত্রে শিল্পীর পেশাই একমাত্র নির্ভর। বাঘমুণ্ডির ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের মতে কিন্তু তাঁদের অবস্থা খুব খারাপ নয়। কেননা ৭।৮ বছর আগে ১৭ জন সভ্যকে নিয়ে যে সমবায় সমিতিটি গঠিত হয়েছিল, তা ২।৩ বছর চলেই ভেঙে যায়। আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হলে সমবায়ের মাধ্যমে যে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য তাঁরা পাচ্ছিলেন তা এভাবে পায়ে ঠেলতেন না। অবশ্য সমবায় সমিতি ভেঙে যাবার অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে ছো নাচের মুখোশের বিপুল চাহিদা যখন সীমিত সংখ্যক কয়েকটি পরিবার মিটিয়ে থাকেন তখন তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন না হওয়ারই কথা। তা ছাড়া চড়িদার অধিকাংশ শিল্পী পরিবার প্রতিমা নির্মাণ ও কাঠের মিস্ত্রীর কাজও ক'রে থাকেন এবং বায়না পেলে সেসব কাজ বাইরে গিয়েও ক'রে দিয়ে আসেন। পুরুষদের বিভিন্ন কারিগরি কাজে মেয়েরা যে অংশ গ্রহণ করেন না, তাও এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। আমাদের কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সহযোগিতা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। চড়িয়ায় ছেলেরা দশ-বারো বছর বয়স থেকে শিক্ষানবিসী শুরু করে কিন্তু মেয়েরা কোন বয়সেই করে না। আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হ'লে এসব শিল্পী পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা হয়ত তাঁদের বাড়তি অবসর সময়টুকু উপার্জনের জন্য নিয়োগ করতেন।

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

[ক্রমশ]

আমি ভাবছি ?!!?

আমার গল্পের গল্প গেল কোথায়

শিশির চট্টোপাধ্যায়

গল্প বলতে আমি কথাসাহিত্যের গল্পের কথা ভাবছি। বিশেষ করে উপন্যাস জাতীয় কথাসাহিত্য, জীবনের নয়। এমন একদিন ছিল যখন গল্পই ছিল সাহিত্যের প্রাণ। গল্পের গতি ছিল অপ্রতিহত, ক্ষমতা প্রচণ্ড তা সে গদ্যেই হোক বা পদ্যেই হোক। তারও আগের দিনের আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা যখন শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর সদাশঙ্কিত চিত্তে গিরিগহ্বরে বাস করতেন তখন মানুষ ছিল, যাকে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, As much a hunter as the hunted। সেই আদিম যুগে মাৎস্যন্যায়ই ছিল একমাত্র ন্যায়। বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টাতেই মানুষের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত। সেই অস্পষ্ট আদিম যুগে হয়তো কোনো এক শুভ মুহূর্তে অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বসে নিজের শিকারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে প্রথম কথাকোবিদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। জাগতিক বা মানবিক অন্য অনেক কিছুর মতোই এই আত্মপ্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তব জীবনের রসসম্পৃক্ত। হয়তো সেই প্রথম শুভদিনে আমাদের সেই প্রথম দিনের নাম-না-জানা কথাকোবিদ শুধুই তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার সত্য বিবরণ পেশ করেছিলেন আগ্রহী শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে। কিন্তু সেই সত্যকথন কখনোই সম্পূর্ণ কথন হয় নি। কেননা বাস্তবসত্য যখন কল্পনার নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে এক পূর্ণতর সত্যের প্রকাশকে সম্ভব করে তখনই তা হয়ে ওঠে কথা। সেই যাই হোক-না কেন, সেই আদিম যুগে দেখা গেল কেউ কেউ গুছিয়ে বেশ রসিয়ে গল্প বলতে পারেন, আবার অনেকে চির-জীবনই থেকে যান শ্রোতা। এই কথক ও শ্রোতার মধ্যে সেতু রূপে যা ক্রমশই নিজেকে নিকট থেকে দূরে প্রসারিত করে নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে—কখনো বা অতিকথনে, কখনো বা সরলীকরণে, কখনো-বা গলার স্বরকে উঁচু-নিচু পর্দায় নামিয়ে উঠিয়ে ঘটনার সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দের মনকে একই বাঁধনে বেঁধে দেন তখন বুঝব কথাকোবিদ তাঁর আর্টকে আয়ত্তে এনেছেন। বলতে কি, তখনই সাহিত্যের সত্যকার সূত্রপাত ঘটে।

আদিম যুগের এই প্রারম্ভিক ব্যবস্থা-পনার কথা তুললাম কেন তা একটু বিশদভাবে বিবেচনা করা দরকার। গল্পের যেমন একটা বহিরাবয়ব আছে তেমন তার একটা অন্তরাত্মাও আছে। গল্পের আবেদন তাই নানাভাবে প্রকাশিত হয় এবং নানা স্তরে একই গল্প বিভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে। এর কারণ খুঁজতে খুব বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন দেখি না—যাঁরা আধুনিক গান ভালোবাসেন তাঁরা মার্গ সংগীতের অনুষ্ঠান শুরু হলে হয় ঘর ছেড়ে চলে যান নয়তো রেডিওটা বন্ধ করে দেন। আবার যাঁদের রুচি মার্গসংগীতের দিকে তাঁরা আবার মনে করেন আধুনিক গান শুধুই কান্না অথবা আওয়াজ অথবা এই দুইয়ের এক বীভৎস সমাহার। অথচ এই দু রকম সংগীতের শ্রোতার সংখ্যাই প্রচুর। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিচার আমার মনে হয় অবান্তর এবং একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব প্রায়শই হয়ে থাকে। কিন্তু তা হলেও কোনটা ভালো কোনটা মন্দ—সে সম্পর্কে যেমন এক যুগের মধ্যে বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচকের মধ্যে ঐকমত্য ঘটে আবার যুগান্তে তেমন আর একদল একেবারে পূর্বের বিপরীত মত প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। যাকে বলে সাহিত্যিক পপুলারিটি তা যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। তার ওঠা-নামা খুবই নৈমিত্তিক ব্যাপার। শুধু তাই নয় কোনো-এক যুগে যে লেখককে, যে লেখককে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেওয়া হল বা সাহিত্য আসনে বসিয়ে পুষ্প মাল্যে ভূষিত করে অর্চন করা হল, পরবর্তী যুগে তিনিই নির্দ্বিধায় ফতোয়া দিতে পারেন যে পূর্ব-বর্তী যুগের ঐ সিদ্ধান্ত শুধু ভ্রান্তই নয়, বরং মূর্খতার পরিচায়ক। যাক, আমাদের এ-সব কথা স্বীকার করে নিয়েও মানতে বাধা নেই যে এই ভালো লাগা না-লাগার ক্রমিক ওঠা-নামা সত্ত্বেও কতকগুলি মৌলিক গুণের অধিকারী হতে পারলে কথাশিল্প
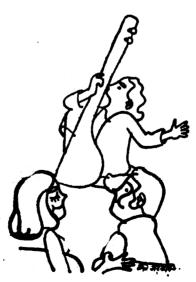
মার্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুরু হলে ঘর ছেড়ে চলে যান

কথাসাহিত্য হয়ে ওঠে। যুগের বা যুগোত্তের নিন্দাস্তুতি অসূয়া বা অবহেলা মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বকে আসনচ্যুত করতে পারে না। তাই সাহিত্য সমালোচকের অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হচ্ছে এই যে মৌল উপাদানগুলিকে খুঁজে বার করে তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা। বিদগ্ধ সমালোচক গোর্কি'র ভাষায় শুধুমাত্র Creature of his time নন, তিনি তার Creatore।

উপন্যাসের সর্বপ্রধান উপাদান গল্প বা কাহিনী। Aristotle একেই fable আখ্যা দিয়েছেন। শৈল্পিক প্রয়োজনে গল্প বা কাহিনী যে বিস্তৃত রূপে পরিগ্রহ করে আমরা তাকে plot আখ্যা দিতে পারি। আরো বলতে পারি, বিধৃত কাহিনীর এক বিশেষ পরিকল্পিত রূপ। ধরা যাক, যাদব নামক এক ব্যক্তি একটি কোনো বিশেষ দিনে জন্মগ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে সময় ও কাল অতিক্রম করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে কোনো একটি বিশেষ দিনে দেহত্যাগ করেন—এই দুটির মধ্যবর্তী কাল ও ঘটনাবলী হচ্ছে কাহিনীর স্থূল অংশ। কিন্তু এই কাল ও ঘটনাবলীকে যদি এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করে ও বিশেষভাবে গ্রন্থিত করে কথাকোবিদ তাঁর মূল বক্তব্যকে উদ্ঘাটিত করতে প্রয়াসী হন তা হলে তাঁকে তাঁর শৈল্পিক প্রয়োজনমত অনেক-কিছুকে বাদ দিতে হবে, আবার অনেক-কিছুকে আরো ব্যাপকতর রূপে দিয়ে কখনো জীবনের উপরের তলাকে বা কখনো জীবনের গভীরতাকে যথোচিত প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ কাহিনীর উপরে শৈল্পিক প্রয়োজনে সাহিত্যিক যে মুনশিয়ানা চাপিয়ে দেন ও যে কৌশল অবলম্বন করেন গল্প বা কাহিনীকে ঘনীভূত করে নিজের বিশেষ বক্তব্যকে শ্রোতা-পাঠকের সামনে তুলে ধরেন তাকেই আমরা প্লট বলি। এখানে মনে রাখা দরকার, প্লট কাহিনী-অতিরিক্ত কিছু নয়। বরং বলা চলে, প্লট-সৃষ্টি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীজাত কাহিনী পরিবেশন-রীতি। এই রীতিকে কোনো সহজ সরল নিয়মের মধ্যে বাঁধা যায় না, উচিতও বোধ হয় নয়। কেননা প্রত্যেক কুশলী সাহিত্যিকেরই আছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, নিজস্ব জীবনবেদ ও নিজস্ব শৈল্পিক রীতি। এই রীতি কী হওয়া উচিত বা উচিত নয়—এই বিচার অনেকটা post-mortem পরীক্ষার মতো। আলংকারিকেরা যাই বলুন না কেন, টোল পাঠশালায় বা আকাডেমিতে বক্তৃতা দিয়ে কোনো মাস্টারমশায়েরই এটা ছাত্রদের শেখানো সম্ভবপর নয়। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' এই দিক দিয়ে খুবই একটা স্পষ্ট উচ্চারণ।

এমন একদিন ছিল—বলতে গেলে সেদিন আজও সম্পূর্ণরূপে আমরা পেরিয়ে যাইনি। যখন গল্প ও উপন্যাস লেখা হত তখন সোজা ও সরলভাবে সময় ও কালের ক্রমকে একান্তভাবে অনুসরণ করে আর তারই মধ্যে দিয়ে কয়েকটি চরিত্রকে গুণে বা গুণহীনতায়, শৌর্যে বীর্যে বা কাপুরুষতায়, প্রেমে ভালোবাসায় বা ঘৃণায় উজ্জীবিত করে সাহিত্যিক চরিত্র-রূপায়ন সম্পন্ন হত। চরিত্র-রূপায়ণের যে শৈল্পিক problem তা নিয়ে আপাতত আমাদের ভাববার কোনো দরকার নেই। কিন্তু একথা ভুললেও চলবে না যে কাহিনী-বিন্যাস বা প্লট-সৃষ্টি চরিত্র-রূপায়ণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। একেকে বাদ দিয়ে অন্যের কথা ভাবাই যায় না। সে যাই হোক না কেন, আমরা আপাতত গল্পের দিকটাই বিচার করে দেখি, গল্পের গতি ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ করি।

কাহিনী-বিন্যাসের মূলে আছে একটা পারম্পর্য বা ক্রমের ধারণা। এই ধারণা সময়ের বা কালের horizontal গতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। কাল নিরবধি প্রবাহিত। সেই প্রবাহের অজস্রতার মাপ থেকে খণ্ড-বিখণ্ড করে লেখক কয়েকটি বিশেষ অংশকে তাঁর গল্পে কাজে লাগান। ছোট গল্পের বেলায় এই কালকে কেন্দ্রীভূত করে একটি বিন্দুর মধ্যে সমগ্রতার প্রকাশ ঘটে। কাজেই ছোট গল্প-লেখকের কাছে সময়কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার একটা বড়োরকমের কোনো প্রয়োজন দেখা যায় না। কেননা, ছোট গল্প স্বভাবতই স্বল্পপরেখ অর্থপূর্ণতার দ্যোতক। উপন্যাসের বেলায় লেখকের কাছে ব্যাপারটা আরো অনেকটা জটিলরূপে দেখা দেয়। যেহেতু উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃততর এবং মানব-জীবনের মতোই অজস্র অপরিমেয় ব্যাপক রহস্যময়। জীবন যখন মানুষের সোজা ছিল তখন গল্প বলার ধরণও ছিল সোজা। সোজা একটানা গল্প বলে গেলেই ঔপন্যাসিকের কর্ম সমাধা হত। মাঝে মাঝে একটু এদিক ওদিক হলে এমন একটা কিছু অঘটন ঘটত না। কিন্তু মানব-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে জীবনস্রোত শুধুমাত্র horizontal ধারায়ই প্রবাহিত হয় না। এই ধারা বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। তার পর এল মনঃসমীক্ষণের যুগ—এল ফ্রয়েড, অ্যাডলার, ইয়ুং-প্রবর্তিত ও পরবর্তী কালের অন্যান্য সমীক্ষকদের দ্বারা পরিশীলিত মনোবিজ্ঞান। আর দেখা গেল যে মানবমনটাই সবচেয়ে বড়ো রহস্য। আরো বোঝা গেল, মানব-চেতনার যে অংশটির সঙ্গে আমরা সাধারণত পরিচিত, সেটি সামগ্রিক চেতনায় এক অতি ক্ষুদ্র বহিপ্রকাশ মাত্র। মানবচেতনার অতলান্তিক রাজ্য থেকে সদাসর্বদা কোটি কোটি চিন্তার বুদ্বুদ উপরে ভাসমান অংশে গিয়ে প্রকটিত হতে চাইছে। আমাদের সামাজিক ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় অনুশাসন ও সংস্কৃতির অনুভূতি—এই অসংখ্য বুদ্বুদের মাত্র কয়েকটিকে বেছে নিয়ে চেতনার উপর-তলায় মানুষের জাগ্রত কর্মে ও চিন্তায় প্রকাশিতব্য বলে মনে করছে। আর বাকি যারা তাদের ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে চেতনার এমন এক জায়গায় যেখানে তারা অন্ধকারে ওৎ পেতে বসে থাকছে সুযোগ-সুবিধে বুঝে প্রকাশিত হবে বলে। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার প্রাবল্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়ে বহু লেখকের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাহিত্যের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হল—এটা সত্য কথা, কিন্তু পরবর্তীকালে একে আশ্রয় করেই যতরকমের মনোবিকৃতি, রীতিবিকৃতি ও সেক্স-অধ্যুষিত সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটল। এটা ভালো হল কি মন্দ হল একথা বিচার করার কোনো প্রয়োজন দেখি নে। কিন্তু এর পরে উপন্যাসে কাহিনী

নিয়মসপদ্ধতি একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে নিজের গতিধারা পরিবর্তিত করতে বাধ্য হল এবং বলা যেতে পারে এর মধ্যে দিয়ে সে আত্মবিলুপ্তির পথে পা বাড়াল। অর্থাৎ গল্পটা গেল হারিয়ে।

পরবর্তীকালে নতুন যে কলাকৃতির আবির্ভাব ঘটল তার মূলে কয়েকটি কথা আলোচনা করা যাক। আগেই বলেছি, উপন্যাসের গল্প বা কাহিনী ক্রম-অনুসারী ও প্রবাহিত কাল-অনুগামী। প্রথম ধাক্কাটা গিয়ে লাগল এর গায়ে। নতুন লেখকরা বললেন যে, আজ-কাল-পরশুর ক্রমটা বোধ হয় বাস্তবজীবনে সত্য। এক নিমেষ, একদিন বা এক বছর কেটে গেলে একজন মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট সমগ্রতার থেকে কিছু সময় নিশ্চয়ই কমে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকা মানে নিশ্বাস নেওয়াই নয়। শুধু কালযাপনও নয়। বেঁচে থাকা মানে জীবনকে চেতনার মধ্যে দিয়ে আত্তীকরণ। হয়তো জীবনের পঁচিশ বছরে এমন কিছুই ঘটল না যার কোনো বিশেষ অর্থ আছে। কাজেই সেই পঁচিশ বছরের গল্প বা কাহিনী হবে নেহাৎই তেল-নুন-লকড়ির কাহিনী কিন্তু এই পঁচিশ বছর পরে কোনো একটি বা দুটি মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে জীবনবোধের তীব্রতায় বা অনুভূতির রসঘন মূর্ততায় এমন একটি অর্থপূর্ণ সামগ্রিকতা লাভ করে যে পঁচিশ বছরের শুধু বেঁচে থাকাকে কবির ভাষায় 'শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অতএব নতুন ঔপন্যাসিক বললেন—ছাড়ো এই সময়ের পারম্পর্য, দূর করো কাল ও ক্রম অনুসারী জীবনের গতানুগতিকতাকে আর খুঁজে বার করো চেতনার রঙে রাঙা সেই সব বিশিষ্ট অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলিকে যার পরিচয়েই মানবজীবনের সম্পূর্ণ পরিচয়।

দ্বিতীয় আপত্তি যা উঠল তা হচ্ছে সাজিয়ে গুছিয়ে একটানাভাবে নিভাঁজ গল্প বলার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। কেননা এই সব গল্পে আদি মধ্য অন্ত্য বজায় রেখে যে কাহিনী বিবৃত হয় তা সবই বেশ সাজানো-গোছানো মসৃণ এবং চতুরভাবে মিথ্যাভাষণ। নতুন ঔপন্যাসিক প্রশ্ন করলেন, মানুষের বাস্তবজীবন কি এমনি সাজানো-গোছানো? বাস্তবে মানুষের জীবনে সব অঙ্কই কি মিলে যায় নির্ভুলভাবে? গল্পে কাহিনীতে যেভাবে গোঁজামিল দেওয়া হয়, জীবনে তা দেওয়া কি সম্ভব? না উচিত? এই প্রশ্নগুলিই নিজেদের জবাব। কেননা নতুন ঔপন্যাসিক তাঁর গল্প বলার কৌশলের মধ্যে দিয়ে এইগুলিকে কাজে লাগালেন। ইচ্ছে করেই জীবনের অঙ্কে বার বার ভুল হতে লাগল। গোঁজামিল দেওয়া নিয়ম করে বন্ধ হয়ে গেল। মসৃণ নিভাঁজ জীবনের আলেখ্য উপন্যাস অপাঙক্তেয় বলে ঘোষিত হল।

তার পরে যে বিষয়টিকে নিয়ে বিদ্রোহ ঘনীভূত হল সেটা হচ্ছে মূলত বিষয়বস্তু নিয়ে—কিন্তু তবু তার সঙ্গে গল্প বলার রীতিরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। সাধারণভাবে যদি আমরা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের লেখা উপন্যাসগুলি দেখি তা হলে দেখব, উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এক বা একাধিক গল্পের মধ্যে দিয়ে এক মহনীয় বা অতি-কমনীয় বা যে কোনো দিক দিয়ে 'অতিশয় কিছু' রূপে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে যে দুরাত্মা সেও এই অতিশয়-কিছুর দলভুক্ত।
আমার বক্তব্য, উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ইচ্ছে করেই গল্পের প্রয়োজনে স্বাভাবিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন ও অস্বাভাবিকতায় উত্তরণ ঘটানো হয়। ক্লাসিকাল ট্রাজেডি, এমন কি এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডিতে নায়ক বা নায়িকাকে বাধ্যতামূলকভাবে অভিজাত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হত। এই অলিখিত নির্দেশ উপন্যাসের কাহিনীকারও মেনে চলতেন। কিন্তু কেন? নতুন ঔপন্যাসিক বললেন এটা কৃত্রিম—এটা অবাস্তব এবং এটাও এক অতি নিকৃষ্ট ধরনের মিথ্যাভাষণ। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই সাধারণ—যেমন রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁর মালতী জর্মান জানে না—ফ্রেঞ্চ জানে না—কিন্তু কাঁদতে জানে। প্রশ্ন উঠল, এই কাঁদতে জানাটাই কি যথেষ্ট নয়—জর্মান ফ্রেঞ্চ না জানলে কি নায়িকা হওয়া যায় না? অতএব যেখানে নায়ক বা নায়িকাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, অতিশয়োক্তি করা বা অতিরঞ্জিত করা উপন্যাসের ছিল সাধারণ ধর্ম, সেখানে আবির্ভূত হল প্রতি নায়ক বা অ-নায়ক। এক অতি সাধারণ মানুষ যে কোনোমতে দিন গুজরান করে তাকে টেনে এনে বসানো হল গল্পের সিংহাসনে। তার জীবনের কান্না হাসির তুচ্ছতার দীনতা পঙ্কিলতা আবার তারই মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগা দু-একটা টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন আলোকবর্তিকার মতো জ্বলজ্বলে মুহূর্ত।

পুরাতনপন্থী উপন্যাসে নিরেট গল্প-বলার পদ্ধতির মধ্যে অ্যারিস্টটল নির্দিষ্ট আদি মধ্য ও অন্ত্য বহুদিন নিরঙ্কুশ রাজত্ব চালিয়েছিল। উপন্যাসের নূতন যুগের ভোরে এই নির্দেশ অমান্য করার প্রথা বলবৎ হল। যুক্তি ওই একই। মানুষের জীবনের কি ওই রকম ছক-কাটা আদি মধ্য অন্ত্য থাকে? যদি তা না থাকে তা হলে বাস্তবানুগ উপন্যাসেই বা থাকবে কেন? থাকলে উপন্যাসের স্বধর্মচ্যুতি ঘটে। কাজেই নতুন ঔপন্যাসিক তাঁর গল্পের শুরু করেন হঠাৎ যে কোনো একটা জায়গা থেকে—তার পর সময় কাল ও ক্রম অস্বীকার করে সিনেমা-টেকনিকের পথ ধরে অতীত ভবিষ্যৎকে বর্তমানের মাঝে এনে হাজির করেন, আবার পরমুহূর্তেই ওই অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানকে একসূত্রে গ্রথিত করে তাঁর খুশিমতো গল্পের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। একজন প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক পঞ্চাঙ্ক নাটকের উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করলেন যে পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে যবনিকা-পতনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগের উপন্যাসে যদি পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত যাই তা হলে ষষ্ঠ বা সপ্তমাই বা দোষ করলে কী? আর তা ছাড়া যবনিকা পতনই যে নাটকের পরিসমাপ্তি তাই-বা কে বললে? যবনিকা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেও তো পরিসমাপ্তি ঘোষিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আর-একজন লেখক আরো এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে, আমরা সম্পূর্ণ একটি Sentence লিখে উপন্যাসের আরম্ভ করি এবং শেষও করি সেই রকমভাবে। তিনি দার্শনিক Vico-র মতানুযায়ী এবং সমগ্র জীবনকে এক অখণ্ড বৃত্তাকারে দেখতে অভ্যস্ত। তাই বললেন, জীবন যদি বৃত্তধর্মী হয় তা হলে উপন্যাসেরই বা তা হতে বাধা কোথায়? তাই তাঁর একটি বিপুলায়তন উপন্যাস আরম্ভ হচ্ছে একটি Sentence-এর মাঝখান থেকে এবং এই Sentence-টির গোড়ার দিকের অংশটি আছে তাঁর উপন্যাসের শেষ ছত্রে। বলা বাহুল্য, তার না শুরুতে না শেষে কোনোরকম বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।

কাজেই আমার গল্পটা গেল হারিয়ে—যে গল্পটাকে আমি চিনতাম, যে গল্পের সঙ্গে আমার আশৈশব পরিচয়—তাকে আর বিশেষ কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে। গল্পটা তা হলে হারিয়েই গেল।

অ্যাসপিরিন ঃ জ্বরে
অ্যাসপিরিন ঃ মাথা ধরা, শারীরিক, বেদনায়......
অ্যাসপিরিন ঃ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভ-পাত নিরোধেও ?

হিসেব ঃ ভারতে প্রতি বছর উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঠিক কী পরিমাণ অ্যাসপিরিন বা অ্যাসপিরিন ঘটিত বড়ি বিক্রি হয়ে থাকে, সেটা অনুমান করা শক্ত। কারণ এখনও পর্যন্ত এদেশে প্রচুর অ-অনুমোদিত দোকান থেকে যে কেউ ইচ্ছে করলেই এ ধরনের ওষুধ কিনতে পারেন এবং নিজের খুশিমত ব্যবহার করতে পারেন। ইউরোপে অ্যাসপিরিনের চল অনেক বেশি। বলা হয়েছে, শুধু ব্রিটেনেই প্রতি বছর অ্যাসপিরিন বড়ি বিক্রি হয় মোট ৪০০০০০০০০০০টি। সারা পৃথিবীতে এই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে কয়েক বিলিয়নে।

অথচ ওষুধ ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, অ্যাসপিরিনের আবিষ্কার আগে না ঘটে যদি এখন ঘটত, তাহলে এর পক্ষে বাজারে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া শক্ত হত। এবং সব চাইতে মজার ব্যাপার বিংশ শতাব্দীর এ যাবৎ কাল মানুষ কথায় কথায় কত সংখ্যক অ্যাসপিরিন বড়ি নিঃশেষ করে এসেছেন তার সঠিক হিসেব যোগান যেমন শক্ত, কারণ মাথা ধরা, সর্দি, জ্বর অথবা নানা রকম ব্যথা বেদনা উপশমের সর্ব-রোগ হর'র মত এর চল আজ সব চাইতে বেশি, ঠিক তেমনি ঠিক কীভাবে এবং কেন এর যথাযথ ভূমিকাটি কার্যকর হয় সে সম্পর্কেও চিকিৎসা বিজ্ঞানী মহলে আজও মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে গেছে। মোদ্দা কথা জনসাধারণ গোগ্রাসে অ্যাসপিরিন গিলছেন। অথচ শরীরের বিপাকীয় পদ্ধতিতে কী ভাবে এ কাজ করে এখনও পর্যন্ত তার সঠিক উত্তরটি যোগান সম্ভব হয়নি। তবে অতি সম্প্রতি 'নেচার নিউ বাইওলজি'তে প্রকাশিত তিনটি গবেষণা পত্রে লন্ডনের রয়েল কলেজ অব সারজনস-এর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন, তাঁরা নাকি অ্যাসপিরিন বা অ্যাসপিরিন সম্পর্কীয় সামগ্রীর সঙ্গে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনস-এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের ধারণা এর উপর যথাযথ অনুসন্ধান হয়ত শ্লেষ্মা বা বাতজনিত জ্বরের চিকিৎসার ব্যাপারটিকে স্বতন্ত্র করা সহজতর করবে। সেই সঙ্গে জানা যাবে বহু বিতর্কিত প্রোস্টাগ্ল্যাণ্ডিনস-এর সত্যিকারের ভূমিকা। বিশেষ জাতীয় এই রাসায়নিক যৌগলগুলি সম্পর্কে আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কোন খবরই রাখতেন না। ১৯৩০ সালে সর্বপ্রথম নিউইয়র্কের দু'জন ডাক্তার জানান, প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ডের নির্যাস শরীরের পেশীর সংকোচন এবং সম্প্রসারণে সাহায্য করে। এই আবিষ্কারের সাতাশ বছর পর সুইডেনের বিজ্ঞানীরা প্রোস্টেট গ্লাণ্ড থেকে বিশুদ্ধ প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনস পৃথক করতে সমর্থ হন। এবং অদ্ভুত এই রাসায়নিক যৌগগুলি

সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। অনেকের ধারণা শরীরে এদের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে রক্তচাপ কমান, পেপটিক আলসার বা দেহের পরিপাক যন্ত্রের ক্ষত, থ্রম্বোসিস প্রতিরোধের ব্যাপারেও কাজে লাগান যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই ধরনের এক বা একাধিক যৌগ প্রত্যেক মানুষের শরীরে সমস্ত যন্ত্রপাতির মধ্যেই আছে। কোনটির কাজ পেশীর উত্তেজনক হিসেবে কাজ করা, কোনটি পেশীকোষ, স্নায়ু, রক্ত সংবহন প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে। এমন কি গর্ভপাত বা গর্ভরোধেও এই বস্তুগুলির কিছু কিছু কার্যকারিতার কথাও জানা গেছে।

বস্তুত অ্যাসপিরিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রথম সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল ২ জুন, ১৭৬৩। ওই দিন চিপিং নরটন-এর জনৈক ধর্মযাজক এডোয়ার্ড স্টোনকে তাঁর নিজস্ব একটি গবেষণা পত্র পড়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'অ্যান অ্যাকাউন্ট অব দ্য সাকসেস অব দ্য বার্ক অব দ্য উইলো ইন দ্য কিউওর অব অ্যাগিউজ।' অর্থাৎ হাড় কাঁপা জ্বর নিরাময়ে উইলো গাছের বাকলের সাফল্য। অবশ্য পরে কেউ কেউ বলেছেন হাড়কাঁপা জ্বর বলতে স্টোন যা বোঝাতে চেয়েছিলেন আসলে তা ম্যালেরিয়া জ্বর। স্টোনের বক্তব্য, উইলো গাছের বাকলের নির্যাস খাইয়ে তিনি নাকি ওই ধরনের রোগীদের নিরাময় করে তুলতে সমর্থ হন। এই ঘটনার প্রায় এক শতাব্দী পর জনৈক স্কচ চিকিৎসক ওই একই পদ্ধতিতে শ্লেষ্মা এবং বাত জাতীয় জ্বর সারানর জন্যে বিধিব্যবস্থা করেছিলেন এবং স্টোনের মত তিনিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। পরে জৈব-রসায়নবিদরা উইলো গাছের বাকল এবং আরও কিছু কিছু উদ্ভিদ থেকে বিশেষ করে 'মেডোও সুইট' বা ঘাসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা উপজাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদের গোলাপী ফুল থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করলেন স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। আর এর পরই বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফেলিকস হফম্যান সংশ্লেষণ করে বসলেন অ্যাসেটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড—অ্যাসপিরিন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে অ্যাসপিরিনের প্রথম প্রবেশ ঘটান দু'জন জার্মান ডাক্তার কুর্ট ডিথর এবং জুলিয়াস ভোহলগেমুট। ১৮৯৯ সালে শ্লেষ্মাঘটিত অথবা বেতো-জ্বরের নিরাময়ের ব্যাপারে তাঁরা এর কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করেন। তার পরের বছরই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি হতে লাগল অ্যাসপিরিন বড়ি। দামে সস্তা, ব্যথা-বেদনা নিরাময়ে অভাবিত ফলপ্রসূ হওয়ায় বড়িটি পৃথিবীর সর্বত্র ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে বর্তমান শতাব্দীতে অ্যাসপিরিন এবং অ্যাসপিরিন সংক্রান্ত নানা রকম বড়িতে বাজার ছেয়ে গেল। এবং যে সমস্ত ব্যাধিকে কেন্দ্র করে মুখ্যত এদের জনপ্রিয়তা বাড়ল, তারা হল ঃ জ্বর অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা কমান বা অ্যাণ্টিপাইরেসিস, শরীরে বাতের জন্যে ফুলে ওঠা জায়গাগুলির ফোলা বা ব্যথা সারান, প্রভৃতি। বিশেষ করে এই দ্বিতীয় উপসর্গটি সস্তা এবং সহজে কমিয়ে আনার ব্যাপারে এর অসামান্য কার্যকারিতা খুব কম সময়ের মধ্যেই সর্বসাধারণের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। যদিও, এই শেষোক্ত নিরাময়ের ঘটনা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে কতকটা যেন হেঁয়ালির মতই মনে হল। গবেষণাগারে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও ব্যথা-বেদনা কমান এবং অন্যান্য অস্বস্তিকর উপসর্গ দূর করার ব্যাপারে ঠিক কী ভাবে অ্যাস্পিরিন কাজ করে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছিন সম্ভব হয়নি। অবশ্য 'রয়েল কলেজ অভ সারজেনস'-এর গবেষকরা সম্প্রতি যা বলতে চেয়েছেন, বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন সঠিক কীভাবে কাজ করে সেটার যথাযথ ব্যাখ্যা যোগানর ব্যাপারে তা কতখানি সাহায্য করবে সেটাও এই মুহূর্তে বুঝে ওঠা শক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শেষোক্ত এই দলটির আগে অ্যাসপিরিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হ্যারি কোলিয়ার। ইনি এখন মাইলস গবেষণাগারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। ১৯৬০-এর গোড়ার দিকে কোলিয়ার মন্তব্য করেন, শরীরে অ্যাসপিরিনের ভূমিকা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলিকে সংযত রাখা। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য, শরীরে বিভিন্ন রোগের প্রতিবিধান করার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত হঠাৎ যাতে তারা অতি উৎসাহীর মত তৎপর হয়ে না ওঠে সে সম্পর্কে তৎপরতা চালান। গত কয়েক বছরে শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনের নানা রকম কার্যকারিতা সম্পর্কে বলা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাধি এবং শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে বিশেষ ধরনের এই হরমোনগুলির সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে কেউ কেউ আশাবাদীও বটেন। অনেকের ধারণা এদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যতে বহু দুরারোগ্য রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা তেমন কিছু অসম্ভব হবে না। রয়েল কলেজ অব সারজেনস-এর ডঃ ভেন এবং তাঁর সতীর্থরা লক্ষ করেছেন অ্যাসপিরিন শরীরে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনস সংশ্লেষণে বাধা দেয়। অতএব বলা চলে, কোলিয়ার এই বস্তুটি সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা খেটে যাচ্ছে?

ভেন এবং প্রিসসিলা পাইপার কাজ শুরু করেছিলেন কয়েক বছর আগেই। বাতের দরুন স্ফীতির মত এক ধরনের রোগে কী কী ধরনের জীব-রাসায়নিক যৌগ নির্গত হয়ে রোগটির ব্যাপারে সক্রিয় হয় ওটা সেটা লক্ষ করতে গিয়ে ধরা পড়ল, ওই সময় শরীরের মধ্যে হিসটেমাইন প্রভৃতি যৌগ বের হচ্ছেই শুধু দেখা গেল না, ওই সঙ্গে আরও তিনটি নতুন ধরনের সামগ্রী ওঁদের চোখে পড়ল। এদের মধ্যে প্রথম দুটি যথাক্রমে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনস। যাদের সাংকেতিক নাম E2 এবং F2-আলফা। কিন্তু তৃতীয় বস্তুটিকে ঠিকমত চিহ্নিত করা গেল না। এবং এখনও পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি।

অজ্ঞাত এই তিন নম্বর বস্তুটিই রীতিমত উৎসাহিত করে তুলল ভেন এবং পাইপারকে। ওঁরা দেখলেন অ্যাসপিরিন এবং তার সমগোত্রীয় সামগ্রী শরীরের মধ্যে এই বস্তুটির নির্গত হওয়ার ব্যাপারে বাধা দেয়। চমকপ্রদ এই সামগ্রীটির ওঁরা নাম রাখলেন RCP। এখানেই শেষ নয়, পরে দেখা গেল প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রেও অ্যাসপিরিন বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পরে ভেন ব্যাপারটা আরও একটু পরিষ্কার করার জন্যে বলেন, প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন নির্গত হওয়া বলতে বলা হচ্ছে : প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন সংশ্লেষণ এবং পরে তার নির্গত হওয়া। শেষোক্ত এই বক্তব্যটি পরে তিনি প্রমাণ করেন গিনি-পিগের ফুসফুসের ওপর। তিনি লক্ষ করেন ফুসফুসের কোষে অ্যাসপিরিন বা তার সমগোত্রীয় কোন সামগ্রীর উপস্থিতি অ্যারাসাইডোনিক অ্যাসিডকে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনে রূপান্তরিত হতে বাধা দেয়। এবং এই বাধা কতটুকুতে গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নির্ভর করবে অ্যাসপিরিনের পরিমাণের ওপর। পরে কুকুরের শরীরে পরীক্ষা করেও দেখা গেছে অ্যাসপিরিন প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্বর অথবা বাত বা অনুরূপ কারণে শরীরে কোন জায়গা ফুলে উঠলে তা সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

এখন প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, জ্বর এবং ফোলা সারার কারণটি না হয় জানা গেল, কিন্তু তৃতীয় উপসর্গ ব্যথা নিরাময়ে অ্যাসপিরিন কীভাবে কাজ করে? নতুন কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। হয়ত এমনও হতে পারে অচিহ্নিত RCS-এর হাতও এতে থাকতে পারে। কারণ অ্যাসপিরিন এবং তার সমগোত্রীয় সামগ্রী RCS-এর নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও বাধা দেয়?

ভেন তার গবেষণার সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এক, অ্যাসপিরিন অথবা অনুরূপ কোন ওষুধ শরীরে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন সংশ্লেষণ ব্যাহত করার ব্যাপারটা শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিনের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। দুই, অ্যাসপিরিন সম্পর্কিত আরও নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করে আরও উন্নত ধরনের "অ্যাসপিরিনের মত" ওষুধ তৈরি করা। যেমন ধরুন, ভবিষ্যতে এমন ওষুধ হয়ত তৈরি করা যাবে যা শরীরের ত্বকে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন নিঃশরণে বাধা দেবে অথচ পাকস্থলীর কোষকলায় ওই ধরনের কোন বাধা দানে বিরত থাকবে। এতে অন্ত্র-অন্ত্রের রোগ সারান যাবে। অথচ ওষুধের আর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া যেমন আলসার প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবং কেউ কেউ এমনও ভাবছেন ধরার এই 'সর্বরোগ হর' ওষুধ অ্যাসপি... শেষ পর্যন্ত হয়ত স্ত্রী অথবা পুরুষ... জনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অথবা ... ব্যাপারেও কাজে লাগান সম্ভব হতে পা... কারণ অনেকেই জানেন স্ত্রী এবং পু... উভয়েরই জননবিষয়ক কাজকর্মে প্রোস... গ্লাণ্ডিনের ভূমিকা অসাধারণ। ... গর্ভপাত করানর ব্যাপারেও প্রোস... গ্লাণ্ডিনকে কাজে লাগান ... ভবিষ্যতে শরীরে অ্যাসপিরিনের ... এই বস্তুটির নিঃশরণ নিয়ন্ত্রিত ... অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভপাত রোধ ... হতে পারে? এমন কি অ্যাসপিরিন... সাহায্যে প্রোস্টাগ্লাণ্ডিন নিয়ন্ত্রিত ... ভবিষ্যতে কেউ কেউ গর্ভসঞ্চার ... দেওয়ার কাজেও মাথা ঘামাচ্ছেন। ... বিভিন্ন রকমের রোগ নিয়ন্ত্রণেও।

অবশ্য এ সমস্ত জল্পনা। জীবরসা... বিদদের কাছে অ্যাসপিরিন এখনও পর্য... রহস্যের আবর্তেই রয়ে গেছে।

গ্যানিমীদ

জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানীদের প্রচণ্ড ... গতি বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনীকার... কলমে আরও একটি কুঠারাঘাত করে বস... ভেবে দেখুন, একদা পৃথিবীর এক... সঙ্গী চাঁদকে নিয়েই না কত রসাল গ... তাঁরা রচনা করেছিলেন। অদ্ভুত অ... চেহারার প্রাণী অথবা আপেনা... পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ... ফুটবলের মত গোল এমন সব জীব ... আরও হাজারো রকমের কল্পনা। ... সমস্তই এখন রূপকথার গল্প। চাঁদ ... সমস্ত কাহিনীকারদের নিরাশ করেছে।

ওঁরা মঙ্গল গ্রহ নিয়েও নানান র... গল্প ফেঁদেছেন। সোভিয়েত আন্তর্গ্র... যান মার্স-৩ শেষ পর্যন্ত ওঁদের জন্যে ... খবর পাঠায় তার জন্যে আপাতত প্র... কিন্তু গ্যানিমীদ? বৃহস্পতির ... চারটে উপগ্রহের অন্যতম উপ... গ্যানিমীদও কি শেষ পর্যন্ত ওঁদের নি... করবে? উল্লেখ্য, কারোর কারোর ... বিশাল এই উপগ্রহে জীবজগতের অ... হয়ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সম্প্রতি ... উপগ্রহটির উপর অবলোহিত ... সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালান হয়েছিল। ক... বছর আগে অনুরূপ পর্যবেক্ষণ ... বলা হয়েছিল গ্যানিমীদ এবং চাঁদ উ... উপগ্রহের ভূস্তরের তাপ পরিবহণ ক...

ক্ষমতা সমান। কিন্তু এবার ওই উপগ্রহটি থেকে বিকীর্ণ কুড়ি মাইক্রোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা হয়েছে : গ্যানিমীদের ভূস্তর আমাদের চাঁদেরই অনুরূপ। তারও বুকে পাথরের টুকরো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা গেছে। বায়ুচাপ এক মিলিবার। সেখানে হয়ত কিছুটা বরফ কুচিও জমে থাকতে পারে। গ্যানিমীদের বর্ণালীচিত্র পরীক্ষা করে কেউ কেউ বলছেন সেখানে ঘন তুষারও থাকা সম্ভব। তবে সেই তুষার জল নয়, অ্যামোনিয়ার বরফকুচিতে তৈরি। এবং তার পরিবেশ চাঁদেরই মত প্রাণহীন জগৎ। অতএব কল্পকাহিনীকারেরা যতই গল্প ফাঁদুন বৃহস্পতির গ্যানিমীদস্থ তাঁদের বাস করবে। আসল কথা সেখানেও জীব সত্তার কোন লক্ষণ এখনও পর্যন্ত ধরা পড়ে নি।

চুম্বক
এবং
জীবজগৎ, বার্ধক্য

বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উদ্ভিদ এবং প্রাণী পৃথিবীর ভূ-চুম্বকের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু মুশকিল হল নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্ষমতা মোটামুটি নির্দিষ্ট এবং সাধারণভাবে ওই ক্ষমতার পরিবর্তন তেমন কিছু ঘটে না বললেই চলে। যদি তা ঘটত অর্থাৎ প্রাণী এবং উদ্ভিদ যে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বাস করছে, তার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে বা দারুণভাবে কমে যেত তাহলে স্বাভাবিক জীবন অবশ্যই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

প্রাণী এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে চুম্বকের সত্যিকারের কোন ভূমিকা আছে কিনা সেটা জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত গবেষণা চালিয়ে আসছেন। প্রথম দিকে যন্ত্রপাতি না থাকায় এ ধরনের গবেষণা ব্যাহত হয়। পরে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের আবিষ্কারের পর মানুষ ক্রমে অণুবীক্ষণিক জগতের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করার সুযোগ পেল। এবং এরই সাহায্যে জীবকোষের উপর চৌম্বক শক্তির সূক্ষ্মতম প্রভাবও ধরা পড়ল।

অদ্ভুত ব্যাপার। ডগলাস ডানলপ এবং বারবারা এল স্মিডট সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখেছেন, শক্তিশালী চুম্বকের পাশে যদি কোন গাছকে বাড়তে দেওয়া যায় তাহলে গাছটির বার্ধক্য আরও ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ শৈশবকাল থেকে বার্ধক্যে উপনীত হতে সময় লাগে অনেক কম।

এক একটি কাচের জারে ওরা গাছের টব পরের জারগুলি রেখে দেন অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের মাঝ বরাবর। তারপর বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে উচ্চতর চৌম্বক শক্তি সৃষ্টি করার পর দেখলেন, চারাগুলির কোষ-বিভাজন দারুণভাবে কমে এসেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি কোষ থেকে যতগুলি কোষ সৃষ্টি হতে পারত, এক্ষেত্রে তার সংখ্যা অনেক কম। এমন কি অল্প সময়ের মধ্যে কোষ-বিভাজনের কাজও থেমে গেছে। যেন মৃত্যু আসন্ন অথবা উপস্থিত। ও'রা এমনও দেখলেন উচ্চতর চৌম্বক শক্তির প্রভাবে পড়ে কোন কোন কোষের বাইরে পুরু কোষ-প্রাচীর তৈরি হয়ে গেল। আবার কোন কোন কোষ তার শৈশব অবস্থার পর অন্তর্বর্তীকালীন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সরাসরি বাড়িয়ে গেছে। এ ছাড়াও অতিমাত্রার চৌম্বক প্রভাবে উদ্ভিদ কোষে নানা রকম বিকৃতিও দেখা যায়, এবং চৌম্বক শক্তির মাত্রা কম হলে ওই বিকৃতি ঠিক কতটা দাঁড়াল, বুঝে ওঠাও শক্ত।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শুধু উদ্ভিদই নয়, মানুষের মত উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রভাব কতটা কাজ করে সে সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করা দরকার। আমরা জানি, অতিরিক্ত চৌম্বক শক্তি রক্ত-প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এবং আরও সূক্ষ্মতার সঙ্গে চিন্তা করুন। আমাদের দেহ কোষের সর্বত্র সব সময়ই কোন না কোন রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে চলেছে। আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী যেখানেই রাসায়নিক বিক্রিয়া সেখানেই বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিবর্তন। বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্ক অতি নিকটের। অতএব আমাদের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের যদি পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত আমাদের কোষের ক্রিয়াকর্মের ওপরে গিয়ে বর্তাবে। আজকের দিনে এটা একটা গুরুত্বের সমস্যা। কারণ অনেকেই আছেন যাঁদের শক্তিশালী চুম্বক বা বৈদ্যুতিক শক্তির কাছাকাছি থেকে কাজ করতে হয়। পৃথিবীর চুম্বকের নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে তাঁদের দেহ কোষ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেও ওই ধরনের পরিবেশে কিছুটা পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। এই পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত তাঁদের দৈহিক এবং মানসিক ভারসাম্যে আঘাত ঘটায় কি না সেটাও বুঝে ওঠা দরকার।

সংবাদ

ই ই ডি এফ স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ অভূতপূর্ব উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিবেদন : ১৯৬৯ সালে শুধু কলকাতা শহরেই অনাবাসিক রোগীর সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৬৫৮৬৫ এবং রাজ্যের বিভিন্ন মফঃস্বল সহরে ৫৯৪৮০। কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থার অভাবে কলকাতার অনাবাসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন দৈনিক গড়ে ১৮২৯৩ জন মাত্র। এবং মফঃস্বল কেন্দ্রগুলিতে ৭৮৮৯। কারণটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য পরবর্তী দশকে হাসপাতাল বা জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ওই সময়ের মধ্যে অনাবাসিক রোগীর চাপও বেড়েছে বহুগুণ। যার ফলে যে কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহির্বিভাগে গিয়ে চিকিৎসার সুযোগ নেয়া এখনও পর্যন্ত সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে নি। সম্প্রতি সি এম পি ও-র একটি হিসেবে বলা হয়েছে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা আরও বাড়বে। এবং ওঁদের অনুমান ১৯৮৬ সালের মধ্যেই কলকাতায় দৈনিক অনাবাসিক রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৯৩১৫০ জনের মত, অবশিষ্ট মেট্রোপলিটান এলাকায় ১৬৪৪৩০।

অথচ, বললেন শ্রীসাধন দত্ত, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রেরও একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে। যার পর তার পক্ষে অতিরিক্ত রোগীর চাপ সহ্য করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। এদিকে যাঁদের সঙ্গতি অত্যন্ত সীমিত তাঁদের পক্ষেও সব সময় ব্যক্তিগত চিকিৎসক অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে নিয়মিত চিকিৎসা চালান কঠিন। মূলত এই সমস্যাটিকেই সম্মুখে রেখে মাত্র কয়েক মাস আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইকোনমিক এণ্ট্রাপ্র্যানারশিপ ডেভালপমেণ্ট ফাউণ্ডেশন

ই ই ডি এফ-এর জনৈক চিকিৎসক বস্তিবাসী একটি শিশুকে পরীক্ষা করে দেখছেন। শিশুটি অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত। এ ধরনের রোগীর সংখ্যা শহর কলকাতায় কত, তার সঠিক হিসেব যোগান শক্ত। এদেরকে উপেক্ষা করার অর্থ ভবিষ্যতের জন্যে একটি পঙ্গু সমাজের পথ প্রশস্ত করা।

...া সংক্ষেপে ই ই ডি এফ-এর নিজস্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কলকাতা, ৩১-৭১ নম্বর ...পুর পার্কে। শ্রীদত্ত এই কেন্দ্রটির অন্যতম পুরোধা।

শ্রীদত্ত বললেন, আপাতত ও'দের উদ্দেশ্য দুটি। এক, জনসেবা। দুই, যাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছেন মোটামুটি-ভাবে তাঁদেরও স্বার্থের দিকে লক্ষ রাখা। এখানে তরুণ এবং প্রবীণ মিলিয়ে সব সময়ের জন্যে রোগী দেখছেন মোট ছয়জন চিকিৎসক। এই সঙ্গে আছেন সেবিকা এবং সহকারী। শহর কলকাতার এগারজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ নিয়মিত ও'দের সাহায্য করছেন। প্রস্রাব, রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করছেন নিজেদেরই ছোট্ট বিশ্লেষণাগারে। সম্ভাব্য ওষুধপত্র তৈরি করছেন ও'দের নিজস্ব কেমিস্ট। চোখ পরীক্ষা থেকে শুরু করে বুক পরীক্ষা সবই করছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা। অর্থাৎ এক কথায় অনাবাসিক রোগীদের চিকিৎসা-গত ব্যাপার ওঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন কৃপাদৃষ্ট অন্তঃকরদণ নিয়ে নয়, বলিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে।

হ্যাঁ, মাঝে ও'দের স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ঘুরে এলাম। সকালে। দেখলাম, অনাবাসিক চিকিৎসার সুযোগ নিতে অনেকেই এখানে এসেছেন। পরিপাটি পরিবেশে অভিনব উদ্দীপনা, রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের মধ্যেই। শুনলাম যে কোন অর্থ-নৈতিক সঙ্গতি সম্পন্ন লোকই এখানে চিকিৎসা করাতে পারেন। নামমাত্র খরচের বিনিময়ে। যাঁরা দুস্থ তাঁদেরও ও'রা দেখছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণও করা হচ্ছে। জনৈক তরুণ চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটা কী করে আপনাদের পক্ষে করা সম্ভব? উত্তর : নমুনা হিসেবে যে সমস্ত ওষুধ-পত্র আমরা পাই এইভাবে সেগুলি আমরা ব্যবহার করছি। তাছাড়া যে সমস্ত ওষুধ নিজে হাতে ও'রা তৈরি করে দেন তার খরচও কম। যেমন? উত্তর দিলেন আর একজন তরুণ চিকিৎসক : যেমন ধরুন আমরা যে প্রেসক্রিপশন করি, তার ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে গেলে যেখানে খরচ পড়ে ছ' টাকা, এখানে দু টাকা। রোগী বা তাঁর অভিভাবকের ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে সেই অনুপাতে ও'রা কিছু কিছু ন্যূনতম দক্ষিণার ব্যবস্থা করেছেন। এবং এ থেকে কেন্দ্রটির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ খরচ মেটান সম্ভব হয়েছে। শিশুদেরও ও'রা বিশেষভাবে যত্ন নিচ্ছেন। এ ছাড়া একই সঙ্গে ও'রা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ভ্রাম্যমাণ একটি চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্যে মুখ্যত বস্তি এবং দুস্থ এলাকায়। একটা জিনিস দেখে ভাল লাগল। ও'দের স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবার জন্যেই উন্মুক্ত। ধনী অথবা দরিদ্র সমান যত্ন এখানে পাচ্ছেন। প্রশ্ন করেছিলাম, জটিল কোন রোগের ব্যাপারে আপনারা কী করছেন? উত্তর : তেমন কোন রোগ ধরা পড়লেই বড় বড় হাসপাতালে রোগীরা যাতে চিকিৎসার সুযোগ পান সে ব্যাপারে আমরা যোগাযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করি।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, শহরের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বিশেষ করে গ্রামেও এই ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে ও'রা পরি-কল্পনা করেছেন। এবং সব সময় দুটি আদর্শের দিকে ও'রা দৃষ্টি রাখবেন। এক যথেষ্ট কম খরচে যে কোন স্তরের মানুষ যাতে সহজে চিকিৎসার সুযোগ পান, সেটা দেখা। দুই, তরুণ চিকিৎসক, বিশেষ করে যাঁরা নতুন পাশ করে আসছেন অর্থনৈতিক এবং পেশাগতভাবে তাঁরা যাতে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

এমন একটি প্রচেষ্টা অবশ্যই অভি-নন্দনীয়।

সমরজিৎ কর

বাংলাদেশে মুসলিম মানসিকতার বিবর্তন

আলী আনোয়ার

বাংলা দেশের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ও স্বাধীনতা লাভ সমস্ত বিশ্বকে হতচকিত করে দিয়েছে। পশ্চিম বাংলা প্রাক বিস্ফোরণ পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে যতটা নিস্পৃহ থাকতে পেরেছিল বিস্ফোরণোত্তর পর্যায়ে তাকে ততটাই জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। পশ্চিম বাংলা আজ বাংলাদেশের ভাগ্য পরীক্ষার আশা-আকাঙ্ক্ষায়, বেদনায় তিতিক্ষায়, অস্তিত্ব রক্ষার নির্মম সংগ্রামে অংশভাগীই শুধু নয়, সহযাত্রী। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রকৃতি ও তার অভীপ্সা তাই এর রাজনৈতিক জিজ্ঞাসার কেন্দ্রভূমিতে।

মাত্র চব্বিশ বছর আগে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান নিজেদের ধর্মপরিচয়কে মুখ্য করে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়িত করেছিল। বাঙালী হিন্দু সমাজ যেমন একদিকে বাঙালী মুসলমানকে নিছকই মুসলমান এবং অন্ত্যজ বলে ঠেলে দিয়ে নিজের বিবেককে চোখ ঠেরেছিল, বাঙালী মুসলমানও তেমনি অবমানিতের অভিমানবোধে মুসলমানীর স্বাতন্ত্র্যবোধকে পাথেয় করে দূর প্রদেশের স্বধর্মীয় লোকের সংগে আত্মীয়তা খুঁজেছিল। পরবর্তীকালে দেশ ভাগাভাগির সান্ত্বনাহীন বেদনা ও তিক্ততা ছিল দুই সম্প্রদায়েরই স্মৃতিতে কিন্তু ঘরভাঙার পাপবোধ ছিল না কারোরই। এই স্মৃতিকে অতিক্রম করে আজকের বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব এক অভাবিত ঘটনা যা পশ্চিম বাংলাকেও আত্ম-সমীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমরা আশা করি।

ভাষা আন্দোলনের মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত সুরটি ধ্বনিত হয়। বাহান্নর আন্দোলনে মাতৃভাষার জন্য বাঙালী মুসলমানের রক্তঅর্পণ তাই পশ্চিম বাংলাকে সচকিত করেছে। যে বাঙালী মুসলমান মাত্র পাঁচ বছর আগেও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধে প্রবুদ্ধ তারা, সেই একই জনগণ—বাংলা ভাষার জন্য আত্মীয়তাবোধ করতে পারে, ভাষাকে ব্যক্তিগত জীবনের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারে এ এক আবিষ্কার যা পশ্চিম বাংলার রাজনীতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীদের আবেগে উদ্বেলিত করেছে। বাঙালী মুসলিম সমাজের একাংশের বাংলাদেশের বাইরে স্বধর্ম আত্মীয়তা সন্ধান সমগ্র মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে এই ভুল বিশ্বাস বা সংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকবে যে, বাঙালী মুসলমান গোপনে উর্দুপ্রেমিক এবং যথেষ্ট 'বাঙালী' নয়। পশ্চিম বাংলা তাই ১৯৫২তে ওপারের ঘটনায় সচকিত হলেও ভাষা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে পারে নি। পূর্ব বাংলাই কি পেরেছিল?

বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার এই ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত। আপাতভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও ভাষার প্রশ্ন যেমন তৎপরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তেমনি বাংলাদেশ আন্দোলনও বাহ্যত রাজনৈতিক সংগ্রাম হলেও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবোধই এই রাজনৈতিক চেতনাকে জোরদার করেছে এবং নতুন বাঙালী জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু কোন্ স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং কোন্ জাতীয়তা? বাঙালী জাতীয়তাবাদ শব্দটির সংগে আমরা হিন্দুমেলার সময় থেকে পরিচিত এবং বাঙালী মুসলমান হিন্দুমেলার সংগে কোন একাত্মতা বোধ করতে পারে নি। ভাষা আন্দোলন তা হলে কি ধরনের জাতীয়তাবাদের জন্ম দিল? এবং কখন থেকে এর শুরু?

ভাষা আন্দোলন উনিশশো বাহান্ন সনে আরম্ভ হয় নি, উনিশশো আটচল্লিশ সনেই শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রের কাঠামোতে যখন রূপারোপ হচ্ছিল তখন থেকেই। বাঙালী মুসলমান তার ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের সংগে বাংলা ভাষার কোন বিরোধ কখনো কল্পনা করে নি বরং পাকিস্তানী কাঠামোর সম্প্রদায়গত নিরাপত্তার মধ্যে সে আপন সাংস্কৃতিক বিকাশকেই বাধামুক্ত করতে পারবে এমন স্বপ্ন তাকে উদ্বেলিত করেছিল। বিভাগপূর্ব পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত কলহ তাকে সাম্প্রতিককালে নিজ ভাষায় যেন পরবাসী করে রেখেছিল। শিক্ষাগত তুলনামূলক অনগ্রসরতা যেমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মুসলিম সাহিত্যিক জন্ম দিতে পারে নি, যারা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সংগে প্রথম সারিতে বসতে পারেন। অন্য দিকে তেমনি আধুনিক বাংলার সাহিত্যে শিল্পে আত্মমুগ্ধ হিন্দু নেতৃত্ব মুসলমান জনসংখ্যাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁদের রচিত কবিতায়, উপন্যাসে, রাজনৈতিক বক্তৃতায় মুসলমানকে কেবলই পরবাসী, লুণ্ঠক, প্রতারক ও রাষ্ট্রীয় শত্রু বলে অথবা স্বধর্মত্যাগী অন্ত্যজ, সভ্যতা সংস্পর্শবিরহিত অনার্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল। ভবিষ্যৎ মুক্তির যে স্বপ্ন এঁরা চয়ন করেছিলেন এবং যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যপদ্ধতি এঁরা পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে ধর্মীয় আবহ এত সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল যে, বাঙালী মুসলমান আত্মসম্মানের সংগে আপোস না করে সে আন্দোলনে শরিক হতে পারত না। জাতীয় ঐতিহ্যের উজ্জীবন ও পুনর্নির্মাণের নামে হিন্দু সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনি মুসলিম মানসিকতাকে পীড়িত করেছে। একই ভাষাভাষী হয়েও তাই সেও আপন সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের অহমিকার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। ফলত, ভাষার মিলন ও সুদীর্ঘকালের জীবনযাত্রার নৈকট্য সম্প্রদায়গত বিরোধকে জয় করতে পারে নি। আপাতবিরোধী শোনালেও এটা বিসংগতভাবে সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাঙালী মুসলমান যেন তার স্বভাষায় ও তার দেশজ সংস্কৃতিতে অধিকারের সম্মান ফিরে পেল। রাষ্ট্রভাষার নামেই হোক আর ঐশলামিক সংহতির অজুহাতেই হোক, সেই ফিরে পাওয়া অধিকার সে আবার হারাতে রাজী ছিল না। প্রাক-আজাদী পর্বের এই সাম্প্রদায়িক মন-ভাঙাভাঙি এবং আজাদী-উত্তরপর্বে বাঙালী সংস্কৃতির কোটিতে মুসলমানদের স্বাধিষ্ঠান ও গর্ববোধের পেছনে দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক সূত্রাবলী কাজ করছিল। কিন্তু যে কোন জনগোষ্ঠীর মানসিক বিবর্তনে ভাষা, প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কৃতি যে নিজস্ব বেগ সঞ্চার করে ও দিক নির্দেশ দেয় জাতীয়তাবাদের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে এই সত্যটাই আবার উচ্চারিত হল।

এই রূপান্তরের পেছনে আরেকটি সামাজিক বিবর্তনেরও ভূমিকা ছিল যার উল্লেখ প্রয়োজন। বিভাগপূর্ব পর্যায়ে বাঙালী মুসলিম নেতৃত্ব মূলত ভূম্যধিকারী

দের হাতে ছিল—এ'রাই মুসলিম লীগের পত্তন করেছিলেন। এই সব নওয়াব জমিদার শ্রেণীর প্রতিভূরা আপন কৌলিন্য ও বংশমর্যাদাকে মুসলিম জনসাধারণ থেকে যতটা সম্ভব দূরে স্থাপন করেছিলেন। বাংলার বাইরের অভিজাত ঘরানার সঙ্গে আত্মীয়তা ও সামাজিকতার প্রয়োজনে উর্দু ফারসীর চর্চা এ'দের মধ্যে অব্যাহত চলে এসেছিল। ব্রিটিশ আগমনের পরে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন যতই এই শ্রেণীকে কোণঠাসা ও নির্বীর্য করে আনছিল ততই এই সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তাঁদের পরাভবকে আভিজাত্যের স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য ও অহমিকার ভান দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলেন। উর্দু ফারসীর চর্চা এই আভিজাত্যের একটা মাপকাঠিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। কাজেই যতই তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল ততই তাঁরা একদা সমৃদ্ধির স্মারক উর্দু ভাষাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন। ভাষা আন্দোলনের বহু আগে থেকে—বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকে এ'রা এবং এ'দের প্রভাবমণ্ডলে আভিজাত্যলোভী মধ্যস্বত্বভোগীরা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উর্দুর প্রসার কামনা করে এসেছেন। পাকিস্তানকামী হলেও মুসলিম জনতার সঙ্গে এ'দের কোন হার্দ্য যোগাযোগ ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সমাজে হৃত ভূমিকা ফিরে পাবেন এই আশায় এ'রা পাকিস্তান আন্দোলনে সোৎসাহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাংলার বাইরের, বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় মুসলিম আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে, বাঙালী মুসলমানের সাময়িক আত্মীয়তাবোধ এই শ্রেণীর মাধ্যমেই হয়েছিল। এই সুদূর 'কল্পনিক সংযোগ' স্থাপনে দেওবন্দ ও আলিগড়ে উর্দু মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী মোল্লা মৌলবীদেরও কিছু অবদান ছিল। স্বাধীনতার পরে নির্মীয়মান বাঙালী সমাজে ভূম্যধিকারী শ্রেণীটি মোটামুটি ক্ষমতার আসনগুলি অধিকার করে থাকলেও চাকরিতে, ব্যবসায়ে, শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে মধ্যবিত্তের প্রভাবপ্রতিপত্তি বাড়ছিল এবং পত্র-পত্রিকা শিক্ষায়তন প্রভৃতির মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী নেতৃত্বের জন্ম হচ্ছিল। এই বুদ্ধিজীবীদের সহোদরেরাই আবার আমলাতন্ত্রনির্ভর এই নতুন সমাজে পরোক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করছিল এবং আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার আস্বাদ পাচ্ছিল। এই ক্ষমতার ক্ষেত্র প্রসারণে এ'দের উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক প্রভৃতি সর্বময় ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। এই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মূলে প্রোথিত ছিল গ্রামীণ সমাজে—এ'দের চিন্তাভাবনা, আশা-নিরাশা এ'রা সহজেই অলক্ষ্যে গ্রামীণ পরিবেশে সঞ্চারিত করে দিচ্ছিলেন। গ্রামভিত্তিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে গ্রামের আপন সমাজে মাটিতে যেন আবেগগত নিরাপত্তা ও পরিপুষ্টিও খুঁজেছেন সংকটে, সংক্ষোভে গ্রীক পুরাণের অ্যান্টিয়াসের মত। আভিজাত্যের দম্ভস্ফীত অধিকতর ক্ষমতাবান ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এমন সংকট খুব অপ্রতুলও ছিল না। অভিজাত শ্রেণী পরিপোষিত কৃত্রিম উর্দু সংস্কৃতির প্রতি বিরোধিতার মধ্যে দিয়েও এই শ্রেণীবিরোধ রূপ পেয়েছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, শিক্ষাব্যবস্থায়, রাজনীতিতে বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এতদ্‌সংক্রান্ত আন্দোলনগুলিতে বাঙালীদের

চেতনাটিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ভাষা-আন্দোলন বাঙালী নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও আত্ম-নির্ভরতার প্রথম ঘোষণা।

যেহেতু এই নির্মীয়মান এবং ক্রম-প্রসারমান শিক্ষিত শ্রেণীর মূল গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে ছড়িয়েছিল তাই বাংলা ভাষা অপসারণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গ্রামবাসীকেও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা এত সহজ হয়েছিল, যদিও তেমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব ও আধা-নাগরিক মধ্যবিত্তের সমর্থনে ভাষা আন্দোলনেই শেষ হয়ে গেল না। অথচ অতীতের দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয় যে, উনবিংশ শতকের শেষপাদে নওয়াব আবদুল লতিফ যখন মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে উর্দু ভাষা প্রসারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিলেন তখন এর রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে গ্রামের মুসলমান মাথা ঘামায় নি। নওয়াব আবদুল লতিফের যুক্তি ছিল ভদ্র মুসলমান মাত্রেরই ভাষা উর্দু অতএব মুসলমান সমাজকে শিক্ষিত ও ভদ্র করে তুলবার জন্য মাদ্রাসার মাধ্যমে উর্দু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে—ইংরাজি স্কুল অপেক্ষাও মুসলমানদের না হলেও চলবে। ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন-এর খাতিরে এবং উঠতি শ্রেণীতে আভিজাত্যের প্রতি দুর্বলতার (!) জন্য কেউ এর প্রতিবাদ করেন নি।

ভাষা আন্দোলনের সময়ও ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন-এর জিগির তোলা হয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তিত সাম্প্রদায়িক অবস্থা ও সমাজ সংস্থানের জন্য লোকে তাতে কান দিল না। সরকারী পত্রপত্রিকা, প্রচারযন্ত্র বক্তৃতা মারফৎ বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতি নিষিক্ত এতদ্‌জাতীয় প্রচারের প্রবলতা সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষা চর্চা দ্বারা তার ধর্মবিশ্বাস বিপন্ন হতে পারে এমন মনে করার কারণ খুঁজে পেল না। এবং উর্দু ভাষাকে ইসলাম প্রীতির খাতিরেও গ্রহণ করায় অনুপ্রাণিত বোধ করল না। দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্ম হল একই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে: ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারার ইচ্ছা ও ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ তথা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ হল। তবে এই চেতনা বিকশিত হতে দীর্ঘ সময় নিয়েছে।

বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমানদের আত্মীয়তাবোধ সম্পর্কে সচেতনতার জন্ম হল।

রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে ধর্মের দোহাই তার প্রাসঙ্গিকতা হারাল। বাঙালী মুসলমান স্বধর্মীয়দের কাছ থেকে প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করল সে মুসলমান হলেও সে বাঙালী—এবং এই বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু মুসলমানীত্বের মোহে সে পশ্চিমের স্বধর্মীয়দের সঙ্গেও আপোস করতে রাজী নয়।

ভাষার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি আবিষ্কারের পর্যায় ভেদগুলি রোমাঞ্চকর। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান চলে আসছিল গোড়া থেকেই পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে। এই অনুসন্ধান বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সংযোগ ও আদান-প্রদানের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধেও প্রচুর তথ্য উদ্ঘাটিত করে যেমন মুসলিম আত্ম-বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট করেছিল তেমনি এ সাহিত্যে তার সম্পৃক্ততার (involvement আনন্দকর বোধকেও জাগিয়েছিল। বাংলা সাহিত্য পাঠের মধ্যেও ভাষা আন্দোলন-জনিত আবেগ নতুনতর বিস্ময়কর অচিন্ত্য-পূর্ব উপলব্ধিসমূহের জন্ম দিচ্ছিল। ভাষা তো শুধু ভাবপ্রকাশের সংকেতমাত্র নয়, ভাষার ইতিহাসে একটি গোষ্ঠীর জীবন পদ্ধতির বিবর্তনের চিহ্নও বিধৃত থাকে, তার আবেগ, আশা, নিরাশা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, বিরোধ, দুর্বলতা—এক কথায় তার মানসিকতা, সবই ভাষায় আদল পায়, ভাষায় প্রকাশিত হয় তথা নিয়ন্ত্রিতও হয়। তাই ভাষার ইতিহাসকে উপেক্ষা করে, তার প্রবহমান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেও আর ভাষাকে আপন বলে অধিকার করে নেওয়া যায় না। কাজেই ভাষা চেতনার সুবাদে বাঙালী জীবনপদ্ধতির ধারাবাহিকতার প্রতি একটা নতুন মমত্ববোধ ভাষা প্রেমের সহযাত্রী হিসেবে মুসলমান চেতনায় উদ্ভাসিত হল যেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিভেদ গৌণ হয়ে গেল। 'একটি বাংলা অক্ষর। একটি বাঙালী জীবন' প্রভৃতি উৎকীর্ণ বাংলাদেশের লোকসংগীত, শিল্প, শ্লোগানের অতিশয়োক্তির মধ্যে এই উপলব্ধির সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে বাঙালী জীবন কল্পনা করা যায় না। কিংবদন্তী, বিশ্বাস ও সংস্কার, উৎসব, পালপার্বণ যার অনেকটাই ঐতিহ্যের অন্বেষণ করতে গিয়ে আবিষ্কৃত, সংকলিত ও আলোচিত হয়েছিল তাই-ই পর্যায়ান্তরে এক সামগ্রীক তাৎপর্য নিয়ে মুসলিম মানসিকতাকে নাড়া দিল। রূপ বিভঙ্গে বিচিত্র, উৎসবে আচারে আশ্লিষ্ট বাংলাদেশ যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হল। বৃহৎ লৌকিক প্রথা রীতি ও আচার পূর্ব বাংলায় পয়লা বৈশাখ, পয়লা ফাল্গুন, উৎসবাদির মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। 'ঐকতান', 'ছায়া-নট', 'সংস্কৃতি-সংসদ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দেশজ ঐতিহ্যাশ্রয়ী অনুষ্ঠানে, একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে শহীদ মিনারের চত্বরে আলপনায়, উৎসব উপলক্ষে গৃহ-সজ্জায় এর নানা উদাহরণ ছড়ানো। এর মধ্যে সরকারী সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ভঙ্গী ছিল। সেন্টিমেন্টালিজম ছিল, আতিশয্যও ছিল এবং এর সবটুকুই জনসাধারণ গ্রহণ নাও করতে পারে কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার পরিচয় ধর্মীয় গন্ডীকে অতিক্রম করে সমগ্র জনপদকে ধারণ করে আছে। মুসলিম ঐতিহ্যের আবিষ্কারকল্পে যে অন্বেষণ শুরু হয়েছিল তা এবার কেন্দ্রীভূত হল—একই সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মধ্যে বিরোধের চারিত্র্য নির্ণয়ে।

কিন্তু চিন্তার ও অনুভবের এই উদার-পন্থী বিবর্তন উনিশশো সাতচল্লিশের পরেই আকস্মিকভাবে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের আবিষ্ট করেছিল এমন মনে করলে ভুল ভাবা হবে। সাতচল্লিশের পর থেকে যেটা হচ্ছিল সেটি হল যে, বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবমণ্ডল ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল এবং গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই মধ্যবিত্তের যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সাতচল্লিশের অনেক আগে থেকেই বস্তুতপক্ষে উনবিংশ শতক থেকেই মুসলিম বুদ্ধিচর্চার একটা ধারা ছিল যা বিভাগোত্তরকালে নতুন বাঙালী জাতীয়তাবাদে উপনীত হতে সাহায্য করেছে।

উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখের লেখায় ধর্মীয় চেতনাকে সম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে আলাদা করে দেখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এয়াকুব আলি চৌধুরী, মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ডঃ লুৎফর রহমান এঁরা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়েও এঁদের সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালী মুসলমানের বাঙালীত্ব নিয়ে দ্বিধা, কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করার চাইতে গৌরববোধই বরং প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আত্মনিয়োগ করার মধ্যে দিয়ে এঁদের এই আবেগের সততা প্রতিফলিত হয়েছে।

মওলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী বাংলা ১৩২২ সনে 'আল-এসলাম' পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর লিখতে গিয়ে মন্তব্য করেন: "হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার যুগল সন্তান। তাহারাই দেশের প্রধান অধিবাসী। মাতৃভূমির প্রকৃত সুখ সম্পদ ও সমৃদ্ধি গৌরব যে এই উভয়ের সমবেত চেষ্টা পরস্পর একতা ও সম্প্রীতির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল জ্ঞানীলোকমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন।...ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সংসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও

মাতৃভাষা বর্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্যসেবকগণের প্রধান কর্তব্য।"

একই সময়ে এয়াকুব আলী চৌধুরী কোহিনুর পত্রিকায় বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন "বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা, ইহা দিনের আলোর মত সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তা সৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।...সুতরাং, জনসমাজকে উর্দু শিক্ষা হইতে নিষ্কৃতি দিলে নিশ্চয়ই জাতীয়তা-বৃদ্ধির অনিষ্ট হইবে না।...ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন।"

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাঙালী মুসলিম ধর্ম ও সমাজ চিন্তায় 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অবদান। উনিশশো ছাব্বিশ সনে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা কাজী আবদুল ওদুদ ও আবদুল হোসেনের নেতৃত্বে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন শুরু করেছিলেন ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি ও সম্প্রদায়গত সংস্কার প্রভৃতি সাম্প্রতিক সমস্যাকে আবেগ-নিরপেক্ষ বুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা করার ব্রত নিয়ে কলম ধরেছিলেন এবং এ'দের সত্য ভাষণের সাহস ও ক্ষমতা এ'দের বহু সিদ্ধান্তের আপাত অপ্রিয়তা সত্ত্বেও মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজে গভীর আলোড়ন এনেছিল। উদাহরণত উনিশশো চব্বিশ সনেই খিলাফত আন্দোলনের বিপুল জনসমর্থন সত্ত্বেও আবদুল ওদুদ রাজনৈতিক ব্যবসায়বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে বলতে পেরেছিলেন যে:

"...বাস্তবিক আধুনিক মুসলমানের জন্য অতি অপ্রয়োজনীয় এবং রাজনীতির দিক দিয়ে অতি অনিষ্টকর এই খেলাফত-জঞ্জাল সবলে দূরে করে দিয়ে মুসলমানের ইতিহাসে তথা মানুষের ইতিহাসে কি অসাধারণ বীররূপে কামাল যে নিজকে পরিচিত করেছেন...নানা সংস্কারজর্জরিত দীন ক্ষীণ তামসিক জীবনযাত্রার পরিবর্তে এই যে তিনি প্রচলিত করলেন সর্বপ্রকারে মুক্ত, সুন্দর, সরল জাগতিক জীবন, জীবনের উপরে প্রাচীন শাস্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তার স্থানে এই যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন মানববুদ্ধির ঈশ্বরত্ব, মুসলমান সমাজে সত্যকার আধ্যাত্মিক জীবনের স্থায়িত্ব আর পরিপুষ্টি এরই থেকে সম্ভবপর হবে।"

কামালকে 'মুসলমানে'র চাইতে 'মানুষ' হিসেবে দেখার ইচ্ছা ও 'বুদ্ধির ঈশ্বরত্বে'র ওপরে বিশেষ ঝোঁকটা লক্ষণীয়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে যোগদানকারী আবদুল হোসেনের 'আদেশের নিগ্রহ', কাজী মোতাহার হোসেনের 'আনন্দ ও মুসলমান সমাজ', আবদুল গণির 'পর্দাপ্রথা', মুসলিম খাঁর 'একেই কি বলে ইসলাম', কাজী আবদুল ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রভৃতি প্রবন্ধের নামকরণ থেকেই এই বীক্ষণের ক্ষেত্র কতটা ব্যাপ্ত হয়েছিল তা বোঝা যাবে। কাজী নজরুল ইসলাম এই সময় মুসলমান ধর্ম ও সমাজের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন:

"...পথপার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয়দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথার পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস একা তরুণেরই।"

'শিখা' ও তৎপরবর্তী 'সওগাত'কে কেন্দ্র করে এই উদারপন্থী মুসলিম আত্ম-সমীক্ষার ধারা চলতে থাকে।। এতে যোগ দেন আবুল ফজল, আবদুল কাদের, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, রেজাউল করিম, ওয়াজেদ আলি প্রভৃতি। বাঙালী সমাজে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দিকটি এ'দের লেখায় বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ'দের সকলের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এটা প্রমাণ করা যায়।

কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীবৃন্দ প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছিলেন। সামাজিক পরিবেশ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং হিন্দু ও মুসলমান দুই দলের রাজনীতিকরাই একে চতুরভাবে ব্যবহারও করেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বুদ্ধিজীবীদের হাতে ছিল না। সংস্কার ও আবেগভারাক্রান্ত এই সমস্যা রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ নিলে পরে ভারতে সংখ্যালঘু হিসেবে অনিশ্চয়তার চাইতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব মুসলমানদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মোহরম, পুজো, কোরবানী, গো-মাংস ভক্ষণ রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হওয়ায় ধর্মকেই বিরোধের একমাত্র কারণ বলে মনে করা হয়েছে এবং সাময়িকভাবে ধর্মরক্ষার আবেগ পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছিল। একই ধর্মাবলম্বী হিসেবে পৃথকীকৃত ও নিগৃহীত হওয়ার স্মৃতি থেকে যতখানি জাতীয়তাবোধ সম্ভবপর ঠিক ততটুকুই ছিল বা কল্পনা করা হয়েছিল পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীবৃন্দ যে সমীক্ষার ও নিষ্করুণ বুদ্ধিচর্চার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই দায়িত্ব নেওয়ার মত শিক্ষাগত প্রস্তুতি বৃহত্তর মুসলিম সমাজের ছিল না এবং বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর রাজনীতির দ্রুত পটপরিবর্তনের মধ্যে সেই ঝুঁকি নেওয়ার মত মানসিক স্থৈর্য বা নিরাপত্তাবোধও কম লোকেরই ছিল। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশও যে এই জাতীয় নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছিলেন তা আকরাম খান পরিচালিত 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ। শেখ আবদুর রহিম, রিয়াজুদ্দিন আহমদ মাশহাদী প্রমুখ এই ধারার প্রবক্তা। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনাকাঙ্ক্ষী লেখকবৃন্দের মধ্যেও বিক্ষোভের সুর অনুপস্থিত ছিল না। যথা শেখ হাবিবুর রহমান আল সেলাম পত্রিকায় লিখেছিলেন: "হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি কেবল নিজ নিজ স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া উভয় জাতি মিশিয়া যাহাতে একটি বিরাট জাতীয়তার পত্তন হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য"। কিন্তু কে চাঁদ ঐ পত্রিকাতে ঐ বছরই দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে: "আজও পর্যন্ত হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া অনেক কথা লিখিতেছেন। বহুকাল তো লিখিয়া আসিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত লিখিতে ছাড়িতেছেন না। আজকাল সাহিত্যিক মিলন, রাজনৈতিক মিলন, জাতীয় মিলন প্রভৃতি মিলন যুগে ঐরূপ লিখিত হয়, তাহা হইলে মিলন সুদূরপরাহত।"

কিন্তু পাকিস্তান আমলের গোড়া থেকেই যে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিকেই ইসলাম রক্ষার অজুহাতে দমন করার চেষ্টায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের তথাকথিত ইসলামপ্রীতির তাৎপর্য সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে ধর্মীয় আওতার বাইরে সংস্থিত করতে উৎসাহিত করে। ধর্মমাত্রিক চিন্তার সামাজিক উপযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের সূত্রপাত হয়। উনিশশো আটচল্লিশ সনে পাকিস্তানোত্তর প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে ঘোষণা করলেন তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এই নব পর্যায়ের শুরু। তিনি বললেন:

"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই।"

সম্ভবত উর্দু বা অন্য কোন বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পাকিস্তানী বাঙালীর

সম্পর্ক কি হবে এই প্রশ্নটি মনে রেখে তিনি বললেন:

"...স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য।...এই সাহিত্য হবে মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারে নি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধর্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যেরও চর্চা করেছিল। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়ে নি।"

ইসলামের ইতিহাস থেকে সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের এই উদাহরণটি বক্তার পূর্বোদ্ধৃত অংশের মতই গোঁড়া-ইসলামপন্থীদের ভাল লাগে নি এবং বক্তৃতা মঞ্চেই বিতর্ক প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু তরুণদলের সমর্থন ছিল শহীদুল্লাহর বক্তব্যে। শহীদুল্লাহ সাহেবের উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে স্পষ্ট ও সাহসিক প্রকাশ হয়েছিল হরফ সংক্রান্ত মন্তব্যে:

"...স্বাধীন পূর্ব বাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউবা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকত আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত তবে অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীণ হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।"

করাচী থেকে নিয়ন্ত্রিত সরকারী সাংস্কৃতিক নীতি সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে এবং ক্রমে বিক্ষোভ ও সংগঠিত বিরোধিতার জন্ম দেয়। তরুণ লেখক, শিল্পী ও সংগীতজ্ঞরা উনিশশো বাহান্নোর কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দ্বিধাহীন অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখেন। ঢাকার প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘভুক্ত লেখক ও শিল্পীরা অগত্যা গোষ্ঠী ও চট্টগ্রামের সীমান্ত গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ এবং অন্যান্য চিত্রশিল্পী ও সংগীতজ্ঞ যাঁরা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন তাঁরাই আজকের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পশ্চিম বাংলার সাহিত্যধারার প্রতি পূর্ব বাংলার শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা-বোধের কার্যকরী প্রকাশ ঘটেছিল উনিশশো চুয়ান্নর ঢাকা সাহিত্য সম্মেলনে ও ছাপান্নর কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের লেখক-দের আমন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে।

এপার বাংলা থেকে যারা অংশগ্রহণ করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মনোজ বসু, নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, প্রবোধ সান্যাল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, জনসাধারণ এই জাতীয়তাবাদের আহ্বানেই এরকম সাড়া দিল কেন? ধর্মের কি কোন আবেদন তাহলে বাঙালী মুসলিম মানসে নেই? ব্যক্তিগত ভূয়োদর্শন ও আবেগগত আশ্রয় হিসেবে ধর্মের আবেদন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মের আর কোন স্থান নেই। সম্প্রদায়গত বিভেদের প্রশ্ন তুলে কোন রাজনৈতিক কার্যক্রমে বোধ হয় আর তাকে প্ররোচিত করা যাবে না। এর কারণ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে খানিকটা বোঝা যাবে। তবু প্রাসঙ্গিক বোধে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা এ সম্বন্ধে কি ভাবে ভেবেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আব্দুল গনি হাজারী উনিশশো তেষট্টিতে লিখছেন

"...ধর্মকে সুযোগ দিলে কল্যাণ হত কী না, সেকথা না তুলে এটা বলা যায় যে, ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে নিয়ামক হিসেবে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা আর এই যুগে ফিরে আসবে না। যেহেতু ইউরোপের মত (প্রাক শিল্প-বিপ্লব যুগের) এদেশে ধর্মীয় নেতা-দের হাতে কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর নেতৃত্ব

নেই, এবং যেহেতু মানুষের জাগতিক কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের কোন বস্তুনির্ভর প্রতিশ্রুতি নেই, গত সত্তর বছর ধরে যে সামাজিক বিবর্তন হয়ে আসছে আমাদের প্রায় অগোচরে, তাতে বাধা দেবার শক্তি পর্যন্ত তাদের ছিল না। ধর্মকে বেঁচে থাকতে হলে আজ পুঁজিবাদীদের সঙ্গে আপোস করে বাঁচতে হবে। আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি চলছে এখন।

"আজ যে সোস্যালিজম কথাটা ইসলামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে একদিকে...বিবেকের তাড়না.—অন্যদিকে বুর্জোয়া নীতির প্রতি আপোসের মনোভাব।...যারা সত্তর বছর আগে ভেবেছিলেন ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব নিয়ন্তা হবে, তাঁদের স্বপ্ন আজ তাঁদের চোখের ওপরই ধূলিসাৎ হয়েছে।"

"...আমাদের রাষ্ট্রনিয়ন্তারা গত সত্তর বৎসর ধরেই দুটি বিপরীতধর্মী নীতির মধ্যে দোদুল্যমান থেকেছেন—ধর্ম ও ধার্মিকতাকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন.. ধর্মহীন আধুনিক পুঁজিবাদের ভিত্তি শক্ত করে।"

"...টেকনলজির যে যুগে এখন আমরা বাস করছি (তা) ধর্ম নিরপেক্ষ। পুঁজিপতির হাতে থাকলে তা কার্যত ধর্মবিরোধী এবং রাষ্ট্রের হাতে থাকলে ধর্মের সাহায্য ছাড়াই তা অধিকতর ডিনামিক বলে, ধর্মের প্রতি উপেক্ষাশীল।"

"...আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : একটি 'জিজ্ঞাসা'" প্রবন্ধে আবুল ফজল আবার একই পরিস্থিতিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেছেন কিন্তু সে বিচারেও ধর্মের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। তিনি লিখছেন :

"...আমাদের সংজ্ঞা কি? আমরা কারা? কাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার? আমাদের অনেক পরিচয়—আমরা পাকিস্তানী, আমরা পূর্ব পাকিস্তানী, আমরা মুসলমান, সবার উপরে আমরা আধুনিক মানুষ অর্থাৎ.., আধুনিক বিশ্বের বাসিন্দা।"

"...আধুনিক মানুষে মানুষে যে মিল—ধর্ম, রাষ্ট্র, আর ভৌগোলিক বাধাবিঘ্ন ডিঙিয়ে তা দিনদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে এ মিল যেমন হবে প্রত্যক্ষতর তেমনি হবে ব্যাপকতর।"

"...উত্তরাধিকার কথাটারও সীমা আজ আর আগের মত সীমিত হয়ে নেই, নেই আগের মত গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা ভূগোলে আবদ্ধ হয়ে। কোন উত্তরাধিকারকেই আর আজ ওভাবে বেঁধে রাখা যাবে না। বেঁধে রাখতে গেলে কূপমণ্ডূকতাই হবে পরিণতি।"

"...আগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে এমনকি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল—যার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনেও একটা বিশিষ্টতা ফুটে উঠত এখন তা আর নেই। তেমন বিচ্ছিন্ন জীবন এখন আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।"

—সমকাল/৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা/
কার্তিক, ১৩৭১/২৪৯-২৫১

ফলকথা সমাজ কাঠামোর বিবর্তন ও আধুনিক মূল্যবোধের অভিঘাত এই ধর্মীয় বন্ধন ছেদনে সহায়ক হয়েছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদে আকর্ষণও এই বিবর্তনের সূত্র ধরেই এসেছিল। বিভাগোত্তর সমাজের সামনে ইসলাম, ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ সবকটি আদর্শই পর্যায়ক্রমে এসেছে। সবকটিতে সে একই ভাবে সাড়া দেয় নি। আপন প্রয়োজন, প্রবণতা ও ঐ সমস্ত আদর্শের প্রবক্তাদের নেতৃত্বের ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় সাড়া দিয়েছে। ধর্মীয় জিগীর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছিল সবচেয়ে আগে। গণতন্ত্রের আদর্শ কখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার সুযোগই পাওয়া গেল না। জাতীয়তাবাদ এসেছিল ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করতে গিয়েই। বাংলাদেশে ইতিহাস এখনও নির্মীয়মান। গত চব্বিশ বছরের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ঐতিহাসিক পশ্চাৎ-দৃষ্টি প্রয়োগ করে এখন মনে হচ্ছে বা-য়ান্নর ভাষা আন্দোলনের এইই ছিল অনিবার্য নিয়তি।

একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই মহৎ পরিণতির জনক হতে পারল, কারণ ভাষার ওপর আক্রমণ করে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালী অস্তিত্বের গভীরে আঘাত করেছিল। একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় তার বিশ্বাস, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলিত রূপ মাত্র নয়—তার অস্তিত্বের অর্থ বা তাৎপর্যও বহন করে। এই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করে, নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিম্বিত দেখে মুগ্ধ হয়, আনন্দে তন্ময়, উজ্জীবিত হয়। কি ব্যক্তিমানুষের কি গোষ্ঠী মানুষের অস্তিত্বের এই স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধকে বিঘ্নিত না করে তার সংস্কৃতির ওপর বলপূর্বক কোন সংযোজন বা বিয়োজন করা যায় না। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজে যেখানে বিবিধ বিরোধী সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কাজ করতে থাকে অথবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থানগুলি আলোড়িত-বিলোড়িত হতে থাকে সেখানে সমাজে একটা সর্বব্যাপ্ত অনিশ্চয়তাবোধ, সংশয় ও অস্থৈর্য দেখা দেয় এবং এই পরিস্থিতিতে নতুন কোন আবিষ্কার বা ব্যবস্থা এমন কি মঙ্গলকর ও কাম্য হলেও কখনো কখনো অনীহা, বিরূপতা বা প্রত্যক্ষ বিরোধের সম্মুখীন হতে পারে বাংলাদেশের ভাষাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, বাংলা হরফ বদলে দেয়ার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে জীবন থেকে অপসৃত করার চেষ্টা করে, শিক্ষা-সংস্কারের নামে আরবী-উর্দু ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাবে শেখানোর চেষ্টা করে, ইসলামী ঐতিহ্যের নামে বাংলা ভাষায় উদ্ভট আরবী-ফারসী শব্দ চয়ন করে—মুসলিম শিক্ষিত সমাজের স্বস্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই উত্থিত শ্রেণীর মূল যেহেতু গ্রামীণ সমাজে ব্যাপ্ত হয়েছিল

...লের অনিশ্চয়তার মধ্যে, আবার এই ... বিপন্নতা ও অস্থিরতা বৃহত্তর সমাজে ...রিত হয়ে গিয়েছিল। বিক্ষোভ ও ...তেজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ...ভূমি নির্মিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক ...না রাজনৈতিক চেতনাকে স্পষ্ট করেছিল। ...বিন্দু শুধু মাত্র অর্থনৈতিক বঞ্চনা জন...কে বিপ্লবের পথে উদ্বোধিত করে না। ...দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের প্রশ্ন তাই এত ...গুরুত্বপূর্ণ। বহু বিপ্লব বিপথে চালিত ...হয়েছে, বহু মঙ্গলময় সংস্কার সমস্ত যুক্তি-...র্থন সমর্থন সত্ত্বেও জনসাধারণ কর্তৃক ...ত্যাত হয়েছে। জনসাধারণের মানসিক ...প্রস্তুতির তাই প্রয়োজন আছে, তাদের ...উদ্বোধনের দায়িত্ব আছে। বুদ্ধিজীবীর ক্ষেত্র ...এইখানেই।

...আন্দোলনের পাশাপাশি অন্যান্য ...সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও রাজনৈতিক ...আন্দোলনে রূপান্তরের মধ্যে এই সূত্র-...ত্রের পুনরাবর্তন দেখতে পাই। বাংলা-...দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক পদক্ষেপের ...পেছনে এই সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের প্রশ্নটি ...ঘুরে ফিরে এসেছে। এবং এই সমস্ত ...আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রায় কোন সময়েই ...কোন এক দলের হাতে ছিল না। কোন ...কোন সাংস্কৃতিক উপলক্ষকে আশ্রয় করে ...যেমন আন্দোলন দানা বেঁধেছে এবং ...সমস্ত রাজনৈতিক দলকে পাশ ...কাটিয়ে গণবিক্ষোভের আকারে ফেটে ...পড়েছে প্রায় সব কটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ-...নৈতিক আন্দোলনেই বাংলাদেশের জন-...সাধারণ ...পদ সুবিধা ভোগ ছাড়া শ্রেণী-...নিরপেক্ষভাবে শরিক হয়েছে—এবং এ-...সমস্ত আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপান্তরিত ...হয়েছে। বাংলা হরফ সংস্কারকে কেন্দ্র করে ...দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বিতর্ক ও উত্তেজনা, ...উনিশ শো একষট্টির রবীন্দ্রশতবার্ষিকী কেন্দ্র ...করে দেশময় উচ্ছ্বাস ও উৎসবের জোয়ার, ...বাষট্টির শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র ...করে আন্দোলন, রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত ...নিষিদ্ধকরণ নিয়ে উদ্বেগ, সাগরদাঁড়িতে ...মাইকেল শতবার্ষিকীকে জনউৎসবে রূপান্তর, ...উনসত্তরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি ...প্রবর্তনের দাবি নিয়ে আলোড়ন, এ সবই ...পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্পর্শকাতরতার ...প্রমাণ। এর অনেকটাই রাজনৈতিক বিক্ষোভে ...ইন্ধন জুগিয়েছিল বা রূপান্তরিত হয়ে-...ছিল। এ সবের ওপরে একুশে ফেব্রুয়ারীর ...বাৎসরিক সমাবর্তন গানের ধুয়ার মতো ...ঘুরে ঘুরে এসেছে। তার সুবাদে বৎসরান্তিক ...রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খতিয়ান নিতে ...গিয়ে বাঙালীদের চেতনাটি স্পষ্টতর ও ...উজ্জ্বলতর হয়েছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ...উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ...ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজনৈতিক দলসমূহের নেতারা সব সময় এই সাংস্কৃতিক চেতনার বিবর্তন থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহকে আহরণ করতে পারেন নি বা ভয় পেয়েছেন। শেখ মুজিবের সাফল্য এই প্রবণতাকে বুঝতে পারায় এবং তার নেতৃত্ব দেয়ার মধ্যে। উনিশ শো' ছেষট্টি সনে তিনি বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিকে ছয় দফার মাধ্যমে পার্টির রাজনৈতিক কর্ম-সূচীর কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবির মধ্যে দিয়েই যে শ্রেণী-নিরপেক্ষ বাংলার মানুষকে সংহত করে বিদেশী (পশ্চিম পাকিস্তানী) শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সবচেয়ে ব্যাপক ও জোরদার হবে এই বোধ অন্যান্য দলে বিলম্বিত হয়েছে, কোন কোন রাজনৈতিক দলের এসেছে এমনকি মার্চের পরে। বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলতে কি বোঝায় তা অবশ্য শেখ মুজিবের আগে বা পরে কেউ এত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন নি। কিন্তু ছেষট্টি থেকে উনসত্তরের গণবিক্ষোভের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মুজিব কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ছিলেন। উনিশ শো' বাষট্টির শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে যে ছাত্র-আন্দোলন অচিরাৎ গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল তারও নেতৃত্ব শেখ মুজিবুরের হাতে ছিল না। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের হাতে ত ছিলই না।

আসলে আয়ুবীর একনায়কত্বের আব-হাওয়ায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছিল এবং যে সুবিধাবাদ, আপোস ও আত্মোদরপরায়ণতার অবক্ষয়ী পরিবেশ সামরিকভাবে দেশে সৃষ্ট হয়েছিল রাজনৈতিক দলগুলিও তার থেকে মুক্ত ছিল না। এমনকি বহু বামপন্থী দল ও কর্মী, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এই সুবিধাবাদের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে চীনের সঙ্গে হৃদ্য কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বামপন্থীদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকবে এবং আপোসের পথ প্রশস্ত করেছিল। বাংলাদেশের জনসাধারণের রাজ-নৈতিক প্রবণতাকে বুঝতে না পারা বা তার নেতৃত্বদানের অক্ষমতাকে তাই অনিবার্যভাবে এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির বিচার-ক্ষমতা অথবা বিবেকের সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা ছাড়া উপায় নেই।

সাংগঠনিক দুর্বলতা আওয়ামী লীগের ছিল সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে শেখ মুজিবুরের গ্রেফতার ও উপর্যুপরি অন্তহীন মামলায় তাঁকে গ্রথিত ও অভিযুক্ত আসামী করে ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিশীল জনমনে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল—যার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেল তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়। সারা বাংলাদেশ রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই মামলার প্রতিটি মুহূর্ত গণনা করেছে। সেই সন্ত্রাসের পরিবেশে সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগ আহত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও তখন সাবধানতার পথই অবলম্বন করেছে—জনগণের আস্থার অপসারণের মধ্যে দিয়ে তার মূল্য দিতে হয়েছে পরবর্তী-কালে। এই আস্থাকে আবার জনগণের সান্নিধ্য, সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন করে অর্জন করতে হবে যদি জনগণের ভাগ্য নির্ণয়ে এদের অংশ গ্রহণ করতে হয়।

জনগণের বিক্ষোভ অতীতে দেখেছি দলীয় নেতৃত্বের অপেক্ষায় বসে থাকেনি—স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারে বরং নেতৃত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেগ-প্রবণতা বাংলাদেশের সমস্ত প্রধান রাজ-নৈতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য পঞ্চাশোধিক

বৎসর ধরে। বুদ্ধিপ্রভাব নেতৃত্বের সুষ্ঠু পরিকল্পনার ও ধারাবাহিকতার অভাবে এই সমস্ত জনউচ্ছ্বাস ক্ষণিক আলোড়ন তুলে মিলিয়ে গেছে—কোন মহৎপ্রাপ্তিতে সব-সময় উত্তীর্ণ হয়নি। বহু ছাত্র, কর্মী, বুদ্ধিজীবীর আত্মদান বৃথা গেছে। উনিশশো চুয়ান্ন, বাষট্টি ও পঁয়ষট্টির গণঅভ্যুত্থান এর প্রমাণ। অবশ্য এ সমস্ত আন্দোলনে কিছুই অর্জিত হয়নি বলা ঠিক হবে না, কারণ উপর্যুপরি গণবিক্ষোভ যা উনসত্তর-এর পর্যায়ে পেরিয়ে একাত্তরের মার্চে চূড়ান্ত রূপ পেল। তার ক্রমান্বয়ী অভিঘাতের ফলেই পাকিস্তানতন্ত্র ভেঙে পড়েছে—বাংলাদেশের আন্দোলন বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়েছে।

বাংলাদেশের আন্দোলনসমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলেও এর প্রেরণা ও পরিচালনায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশমাত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রভূমি প্র করেছিলেন, ছাত্ররা প্রতিরোধের ডাক দি ছিল। বাংলাদেশ আন্দোলনে যে সংস্কৃতির রণক্ষেত্রই বারবার প্রাধান্য পে —ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বও তাই বা প্রাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত।

গানের আসরে আজ বোধ হয় গানের প্রসঙ্গ কিছুটা গৌণ হয়ে পড়বে কারণ যাকে আমরা আজ বাংলাদেশ বলছি, যার স্মৃতি আজ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মনে উদ্ভাসিত, তার চিত্র আমার মনেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আজ পাঁচটি বিগত দশকের ওপারে সেই দেশের বহু কথাই আমার মনকেও আলোড়িত, মথিত করছে। আজ যে সেই কথা বলবার কিঞ্চিৎ অবকাশ আমাকে এই বিশেষ মুহূর্তে দেওয়া হয় তার জন্যে সম্পাদক মহাশয়ের মহানুভবতার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি থাকবে না।

পূর্ববঙ্গের লোক পশ্চিমবঙ্গে মানুষ হয়েছেন—এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশী। তাঁরা ওপার বাংলার লোকদের বাঙাল বলতে দ্বিধা বোধ করেন না। কিন্তু আজ থেকে অর্ধ-শতাব্দীরও পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের লোক পূর্ব-বঙ্গের প্রত্যন্ত প্রদেশে মানুষ হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বোধ করি বিরল। সেই স্বল্পজনের মধ্যে আমি অন্যতম। আমার দেশ পশ্চিম-বঙ্গ, পূর্ববঙ্গে আমার কোনও আত্মীয়-স্বজনও ছিল না, কিন্তু জন্মাবধি জীবনের প্রথম তেইশটি বৎসর কাটিয়েছি পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গ অর্থে যে সে পূর্ববঙ্গ নয় একেবারে তার পূর্বতম প্রান্তে আসামের সীমানার কাছে একটি স্থানে। যে "আখাউড়া" নামক জায়গাটা নিয়ে তুমুল লড়াই হয়ে গেল, সেইটেই ছিল আমাদের রেল ইস্টিশান। সেকালে তিতাস নদীর পারে অবস্থিত এই ইস্টিশন বলতে আমি দেখেছি একটি বড় খড়ের ঘর মাত্র। পরে অবশ্য এটি একটি বিরাট ইস্টিশনে পরিণত হয়। এই ইস্টিশন থেকে পাকা ছ' মাইল পূর্বে ছিল আগরতলা—যা আমার জন্মভূমি। সেই আগরতলা যে আজ এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হবে তা সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। প্রকৃতপক্ষে আগরতলা যদি আজ ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হত তা হলে আজ পূর্ববঙ্গ দখল করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। আগরতলার স্ট্র্যাটেজিক ভূমিকা অসাধারণ। আজ এটি একটি ঐতিহাসিক শহর। কিন্তু আজ থেকে অর্ধশতাব্দী পূর্বে এটি ছিল অতি সাধারণ একটি জায়গা। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া—এর চেয়ে অনেক বেশী পরিচিত ছিল। সেকালে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্বর্তী পূর্ববঙ্গের বড় বড় শহরগুলিতে এই ধারণাই প্রবল ছিল যে দেশীয় রাজ্য পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অত্যন্ত "ব্যাকওয়ার্ড" জায়গা—ওখানকার লোকেরা সম্পূর্ণ বাঙালী তথা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ধারা বহন করে একেবারেই এনাক্রনিজম-এর সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেই আনসফিস্টিকেটেড স্থানটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই কারণ

সেখান থেকেই আমি প্রকৃত বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষকে চিনতে শিখেছিলুম, বাংলা গান ও ভারতীয় সংগীতের মহত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম এবং উৎসবাদিতে পরিশীলিত আনন্দ যে কি জিনিস—তার অনুভূতি লাভ করেছিলুম। কলকাতা যখন গ্রামোফোন কোম্পানীর পেশাদারী গানে মুখরিত সেই সময় আমরা উক্ত সুদূর স্থানে রবীন্দ্রসংগীতে দীক্ষা গ্রহণ করি, মণিপুরী নাচ যখন বাইরে একটুও খ্যাতিলাভ করেনি তখন আমরা এই নৃত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলুম। বিভিন্ন উৎসব বাংলার অপরাপর স্থানে যখন হই-হুল্লোড়ের মধ্যে উদযাপিত হত তখন আমরা তাকে সংগীতে, বৈচিত্র্যে মনোরমভাবে সম্পাদন করতুম। আজকের আগরতলা সেসব কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, আজ সে ভারতের অপরাপর শহরের মতই একটি শহরমাত্র। আজ সে সীমান্ত-বর্তী একটি ঘাঁটি হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করেছে, কিন্তু তার কৌলীন্যকে সে বোধ করি সম্পূর্ণভাবেই বিস্মৃত হয়েছে।

কলকাতা থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে পূর্ববঙ্গের বিশাল ভূখণ্ড এবং জলপথ দেখা যেত দু' দিক থেকে—একটি গোয়ালন্দ, চাঁদপুর হয়ে অপরটি সিরাজগঞ্জ, জগন্নাথ-গঞ্জ ঘুরে মৈমনসিংহ হয়ে আখাউড়া পর্যন্ত বিস্তৃত পথে। কলকাতা থেকে ভোরবেলা আমরা বেরুতুম, গোয়ালন্দোয় পৌঁছোতুম দ্বিপ্রহরে—তারপর দীর্ঘ এবং বিস্তৃততম পদ্মা। সে পদ্মার তুলনা হয় না। সিরাজগঞ্জ থেকে জগন্নাথগঞ্জের যমুনা নদী তার কাছে তুলনীয় নয় এমন কি ভৈরববাজারের মেঘনাও। চাঁদপুরে পৌঁছোতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যেত। এখানকার বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে স্টীমারে করে যাওয়া এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসে জেলেদের যে চিত্র এঁকেছেন তা প্রত্যক্ষ করা যেত এ অঞ্চলে;—বিরাট বিরাট ইলিশের জাল, আর ছোট ছোট নৌকোগুলো যেন স্টীমারের ঢেউ লেগে তলিয়েই যেত। চাঁদপুরের কাছাকাছি এসে সূর্যাস্ত দেখেছি, আবার কলকাতায় যাবার সময় চাঁদপুরেই সূর্যোদয় দেখেছি। দুটিই মহান দৃশ্য। অগুন্তিবার এপথে যাওয়া আসা করেছি, কিন্তু পদ্মার এই বিস্তৃত বুকে ভাটিয়ালীর গান শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হয়ত এত বাইরে দিয়ে ভাটিয়ালী গেয়ে যাবার পথ কারুর হত না। চাঁদপুর থেকে সুর্মা মেলযোগে লাকসাম, তারপর কুমিল্লা এবং তারওপরে আখাউড়া। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যেত। কপাল ভাল থাকলে নানা দুর্দৈব কাটিয়ে রাত আড়াইটে তিনটে নাগাদ নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত, শান্ত আগরতলায় প্রবেশ ঘটত।

মৈমনসিংহ ঘুরে যে পথটা পরবর্তী-কালে খোলা হয়েছিল সেটা কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে অনেক জীবন্ত এবং বিচিত্র ছিল। এদিকে অনেক পল্লীগায়কের দল ট্রেনে চেপে যাতায়াত করত। এদের কেউ কেউ চমৎকার সারিন্দা বাজাতে পারত। ভৈরববাজারের ওপর যখন একটি চমৎকার ব্রিজ (বোধ করি এটাই আশুগঞ্জ ব্রীজ) তৈরি হল তখন ঢাকা যাওয়া আমাদের পক্ষে সুগম হল। মনে আছে ১৯৩৮ সালে ঢাকায় যখন প্রথম বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল, তখন এই মেঘনার ব্রীজ পেরিয়ে কম্পিত বক্ষে একটি গানের প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিলুম। বেতারে গান করা সেই আমার প্রথম এবং সেইটিই শেষ। আজও মনে আছে কনট্রাক্টে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট ছিল পাঁচ টাকা। এই উৎসাহের কথা স্মরণ করলে আজ হাসিও পায়, লজ্জাও হয়। এই মেঘনার পারে বহু উৎকৃষ্ট পল্লীগায়ক বসবাস করতেন। গিরীন চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে বলেছিলেন, তিনি এখানে বহু পল্লীগায়কের খবর জানতেন, একজনকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে গ্রামোফোনে রেকর্ডও করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সিলেট-মৈমনসিংহের অঞ্চল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা ময়নামতী—পূর্ববঙ্গের এই অঞ্চল-সমূহ বোধ করি তখন লোকসঙ্গীতে মুখরিত ছিল। কুমিল্লায় কাব্যসঙ্গীতের চর্চাও প্রচুর হত। আমার কৈশোরেই কুমিল্লায় হিমাংশু দত্ত, শচীন দেববর্মণ, অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, জ্ঞান দত্ত প্রভৃতি গায়ক, সুরকার এবং গীতিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কুমিল্লার যেন একটা বিশেষ সঙ্গীতচিন্তা ছিল। নজরুলও তখন কুমিল্লার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। ঢাকা বা আগরতলায় তখনও ওস্তাদি গানের কদর ছিল। আগরতলার গায়ক বাদকেরা বাইরে বেরুতেন না কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে, এসরাজ এবং তবলায় তাঁদের অসামান্য দক্ষতা ছিল; বিশেষ করে এসরাজ। আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের প্রবীণ শিল্পী

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ তাঁর পরিবারের (যাঁ আমরা উজীর বাড়ি বলে জানতুম) এসরাজ চর্চা সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারবেন। আগরতলার আর একটি বৈশিষ্ট্য ব্রজবুলিতে সঙ্গীত রচনা। দুঃখের বিষয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের গানগুলির বহু স্বরলিপি পাওয়া যায় না। বাল্যকালে তাঁর কিছু কিছু গান আমরা শিখেছি। এর মধ্যে "মন্দ মন্দ বহত পবন" গানটিতে যেন যদুভট্টের প্রভাব পাওয়া যায়। সে যুগের বহু হোলীর গানও আছে; উদাহরণস্বরূপ—"ব্রজের পথে কিবা রাঙা ধূলি" (মদনমোহন মিত্রের রচনা?) সিন্দুড়ারাগে রচিত এই গানটি ভারি সুন্দর লাগত। এসব গান যখন রচিত হয় তখন কাসেম আলী রবাবী এবং যদুভট্ট ত্রিপুরার রাজসভায় ছিলেন। আর একটি অতুলনীয় ভজন আমরা শিখেছিলাম; এই অপূর্ব গানটি উদ্ধৃত করি। সুরটি ইমন ভূপালী বলে মনে হয়।

শ্যামল শ্যামল (অতি) কোমল অমল
নবদুরবাদল জিনি তনুরাগ
নবজলধর মেঘ পটলপর
লটপট নটবর চারু রাগ
বিকচ পুলিনে শারদ যামিনী
জোছনা মুরছি পড়ি জনু
শরমে শিহরি সলাজ শিথিল
সে মুখনলিনে নেহারে ব্রজকানু
চুয়াচন্দন তিল তিল অংকন

মুখরাগ পূর্ণিমা পাঁতি পাঁতি তারা
মুখকাঁতি কমল নিরমল নেহারে
স্নাততনু রবিকর ধারা
শিরিষ সুঠাম ললাম লালিমা
অধরে মধু উষা হাসি রাঙা জাগে
মাধব মোহন আবিরে গাহন
চিরতরুণ চির অরুণিমা ফাগে।

হয়ত উদ্ধৃতিতে কিছু ভুল হয়ে থাকবে। বহুদিনকার স্মৃতি ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। গানটি কার আমি জানি না। ত্রিপুরার কোন কবির বা অপর কারুর রচনা—যদি কেউ জানান তাহলে বাধিত হই। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও প্রিয় গানও আগরতলায় প্রচলিত ছিল কারণ পুরোনো লোকদের মধ্যে সেখানকার অনেকেই ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের রচিত "রাজ অধিরাজ তবে ভালে জয় মালা" গানটি প্রায়ই গাওয়া হতে শুনেছি। সুরটি কতটা ঠিক ছিল জানি না, তবে আমরা যেটা শিখেছিলাম সেটা যতদূর মনে হয় খাম্বাজ। কলকাতায় এ গানটি আমি কাউকেই গাইতে শুনিনি। খুব অল্প বয়সে আগরতলায় আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখি। আমাদের ইকুলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন লালু কর্তা (আজও তিনি বর্তমান)। মনে আছে পরমবিস্ময়ে আমি বিচিত্র বেশী অপূর্ব সুন্দর মূর্তিকে দেখতে দেখতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম—এমন সময় প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। রেণু সাহেব (মহিম কর্ণেল সাহেবের পুত্র পরলোকগত সোমেন্দ্র দেববর্মণ) যতদিন বেঁচে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন; আর রেখেছিলেন পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা)। ত্রিপুরা থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভারতভাস্কর উপাধি প্রদান করতে ইনিই শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন আমাদের পূজনীয় শিক্ষক। কত ভাবেই না ইনি রবীন্দ্রনাথের বিবিধ চিন্তা এবং শান্তিনিকেতনের তৎকালীন কর্মোদ্যমের বিবিধ বার্তা আমাদের গোচর করতেন।

কিন্তু আগরতলার নিজস্ব সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টা ছাড়াও এখানে বিবিধ অঞ্চল থেকে পল্লী গায়ক আসত অর্থ সংগ্রহ ও ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। এটি হিন্দুরাষ্ট্রের কেন্দ্র হলেও বহু মুসলমান সাধু সন্তও এখানে সমান সমাদর পেতেন। তাঁদের অনেকের কাছ থেকে আমি অনেক কাহিনী শুনেছি। বিশেষ করে এই সময়টা নানা পল্লীগায়কের আসবার পক্ষে প্রশস্ত সময় ছিল। ধান কাটা হয়ে যেত হাতেও তখন আর কোনও বিশেষ কাজ থাকত না। দোতারায় এদের অনেকের দক্ষতা ছিল অপূর্ব। এখনকার তরফদার দোতারা নয়, নেহাৎই সাধাসিধে দোতারা। দোতারার একটা অসামান্য আকর্ষণ আছে। এ যেন প্রকৃতিরই একটি স্বাভাবিক সৃষ্টি। সকালবেলায় শীতের মিষ্টি রৌদ্রে এরা যখন দোতারায় ঝঙ্কার তুলত মনে হত ফুলের চার পাশে মধুপগুঞ্জনের মত এও যেন স্বাভাবিক, এও যেন আলো বাতাস, ফুলের গন্ধ, পাতাঝরার মত প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে আছে। কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের বারমাসীই এই দোতারায় কী অপূর্ব লাগত। বহু গান তখন কণ্ঠস্থ ছিল আজ আর মনে নেই। কিছু কিছু মোহন্ত শ্রেণীর লোক আসত, ভিক্ষাটা যাদের সাধনার অঙ্গ মাত্র ছিল। বড় হয়ে এদের সাধনার অনেক চমকপ্রদ বিবরণ শুনেছি। ময়নামতীতে আমি কখনো যাইনি, কিন্তু শুনেছিলাম উক্ত অঞ্চলে নাকি অনেক বাউল ধরণের সাধু সন্ত বাস করতেন। তাঁরা যখন আসতেন তখন নানারকমের গান শোনা যেত। এঁদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ছিল না, এঁরা কেবলমাত্র গুরু নির্দিষ্ট পথে চলতেন। এঁদের গানে নানারকম ইঙ্গিতপূর্ব শব্দ থাকত, যা একমাত্র সাধকদের কাছেই বোধগম্য ছিল। যেমন একটি গানের প্রথম লাইন মনে আছে—"জোর করি নানিও জলে, কুম্ভীর নি ধরে"। এই ছত্রে "কুম্ভীর" শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। আর একটি বাউল ধরনের গান শুনেতুম—" "আগে দেহের স্বভাব ছাড়, ষড়রিপুর জংলা কেটে ভাবের নূতন দেহ ধর" এইসব গানের ঢঙ ঠিক পশ্চিমবঙ্গের বাউলের মত না হলেও শ্রেণী বিভাগ করতে গেলে এগুলি বাউলের মধ্যেই পড়ে। ত্রিপুরায় এক রকম একতারা দেখতুম তাকে বলা হত রসমঞ্জরী। এর সঙ্গে খঞ্জ বাজানো হত। ত্রিপুরায় যে পল্লী গানের আসর দেখেছি তা সারারাত্রি ধরে অনুষ্ঠিত হত, সঙ্গে অবশ্য গঞ্জিকার প্রবল সমারোহ থাকত। ত্রিনাথের পাঁচালী যখন বসত তখনও গঞ্জিকাসেবনের প্রাবল্য দেখা যেত। এরা প্রথমে আরম্ভ করত গুরু ভজন দিয়ে। এর প্রায় সব গানেই "গুরু" শব্দটির উল্লেখ থাকত। এরপর আসত মনঃশিক্ষা, অতঃপর দেহতত্ত্ব;—সবশেষে মধুরতম পর্যায় ছিল মিলন-বিরহের গান। কয়েকটি গানে মহাজন পদাবলীর কথা মনে পড়ত। অনেক সময় একই গান গাইত মৈমনসিংহ, সিলেট অঞ্চল থেকে চাঁদপুর অঞ্চলের লোকেরা। এইসব গানের উৎস ঠিক কোথায় বলা কঠিন, একমাত্র বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলতে পারেন।

এই সব কথার প্রসঙ্গে আগরতলার কথা বিশেষভাবে তুললাম এই কারণে যে আগরতলা ছিল সে সময় সবচেয়ে নির্বিরোধী শান্ত শহর। এখানে এমন একটি পরিবেশ

...ল যা ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ...ান ছিল না। এখানে একধারে যাঁরা ...সতেন তাঁরা অনেকদিন থেকে যেতেন। ...কুন্দ দাস তাঁর দলবল নিয়ে বৎসরাধিক ...ল এখানে বিপুল সমাদরে কাটিয়ে গেছেন। স্বাদেশিকতার প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিলেন তিনি কিন্তু দেশীয় রাজ্যের শাসক হিসাবে আগরতলার কর্তৃপক্ষ তাঁকে এতটুকু বাধা দেননি। তাঁর বহু বিখ্যাত গান ...দের কণ্ঠস্থ ছিল। ভাল ভাল ঢপ-...দল আগরতলায় বিপুলভাবে সমাদৃত ...য়েছে। এখন এই ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান ...র হয় না। একদিকে ওস্তাদি গান ...অন্যদিকে জনগণের সঙ্গীত এই দুই ...রের সংগীতই আগরতলায় বিশেষ পৃষ্ঠ-...পোষকতা পেয়ে এসেছিল। আজও আগরতলা ...ই গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই অধিষ্ঠিত। নব-...প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সবচেয়ে কাছে এই ...শহরটি অবস্থিত। সাংস্কৃতিক আদান ...প্রদানের প্রথম পটভূমিকা এইখানেই রচিত ...হওয়া সম্ভব, বিশেষ করে লোকসংগীতে।

...আজকের বাংলাদেশ আর পঞ্চাশ বৎসর ...আগেকার পূর্ববঙ্গ এক নয়। এই কালের ...মধ্যে গ্রাম্য সংস্কৃতি প্রচুর পরিমাণে নাগরিক সংস্কৃতিতে বিলীন হয়েছে, পল্লী সংস্কৃতির ...অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। তবু ...ওদেশের কি চেহারা দেখতে ইচ্ছে করে, ...জানতে ইচ্ছে করে। বাংলাদেশ তাদের ...দেশীয় সংস্কৃতির মূল্যায়নে কিভাবে অগ্রসর ...হবে জানি না। কিন্তু যথার্থ কর্মধারা ...আগামী দশকেই নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ...বাংলার এবং সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত ...করবার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত পাকিস্তান করেছিল ...তার বিভীষিকা বোধ করি চিরতরে বিলুপ্ত ...হয়েছে। দুই বাংলার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ...এক অখণ্ড সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং ...মূল্যায়নের সময় বিধাতার নির্দেশেই ...সমাগত। এই আশার আলোতেই কয়েক ...দশক পূর্বের হারিয়ে যাওয়া অতীতকে স্মৃতি-...পটে পর্যবেক্ষণ করলুম।

অতুলপ্রসাদের একটি গান

সম্প্রতি বিশিষ্ট সেতার শিল্পী শ্রীনিতাই বসু মহাশয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র-নাথ মিত্রের বাড়িতে আলাপ আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি নটমল্লার রাগের ...প্রসঙ্গ তুললেন। এই রাগে অতুলপ্রসাদের একাধিক গান আছে। এগুলির মধ্যে "...র যাবনা যাবনা ঘরে" গানটি বিশেষ পরিচিত। এ গানটি শুনে তিনি ঠিক একই রীতিতে বাঁধা একটি রাগাঙ্গের বন্দেসী ঠুংরী শোনালেন। গানটি নাকি লখনউ অঞ্চলে খুবই প্রচলিত ছিল। গানটির সঙ্গে অতুলপ্রসাদের উপরোক্ত গানটির বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। গানটি তিনি সংগ্রহ

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

করেছেন গয়ার রামু মিশিরজীর একজন শিষ্যের কাছ থেকে। গানটি উদ্ধৃত করছি:—

পিয়াসে সন্দেশ মোরা কহিও যায়
কাগা রে (কাক) যারে যারে—
ইয়াদ পড়ত যব উনকি বাতিয়া
উন বিনা কল না পড়ত
জিয়া যায় রে—

অতুলপ্রসাদ এই গানটি থেকে "যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে" গানটি রচনা করেছিলেন কিনা জানি না। যদি কেউ এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন তাহলে উপকৃত হই।

শাংর্গদেব

তানসেন, সুন্দর তানসেন

সংগীতপ্রেমী বাঙ্গালীর কাছে তানসেন সংগীত সম্মেলনের একটা স্বতন্ত্র আবেদন আছে। বছর বছর তানসেনের তানসেনী মেজাজ স্মৃতির মণিকোঠায় নতুনতর বেদনা গচ্ছিত করে যায় এবং সেই বেদনাই নিয়ত আবেদনে পর্যবসিত হয়। এ বছরও নতুন সম্ভারে তানসেন এসেছিল মহাজাতি সদনে। অনেক আগ্রহ অনেক পিপাসা জমেও উঠেছিল। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে, নিষ্প্র-দীপের মহড়ায় সব দিন হাজিরা দেওয়া হয়নি। তবু শেষের রাত্রিতে ওস্তাদ আমজাদ আলীর কোমল রেখাব আশাবরী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরবারী ও শ্রদ্ধেয় শিল্পী আমীর খাঁ সাহেবের চন্দ্রমধু শুনে অনেক দুঃখ ভুলেছি। আমার ধারণা, তান-সেনের শ্রোতৃবর্গের প্রতিক্রিয়াও মোটামুটি অনুরূপ। এ ছাড়া সেদিন সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়ের ও আলী হোসেনের ঠুংরীও তো বড় মিষ্টি করে বেজে উঠেছিল কানে। ...পাশ্চাত্ত্য সংগীতের তানসেন, বেটোফেনের শেষ কথা, "Plaudite, amili, Comaedia finita est (বন্ধুরা জয়ধ্বনি কর, কমেডি শেষ হয়ে গেল!) যেমন বেটোফেনের সংগীতের শেষ বোঝায় না বরং নতুন ভাবনার উদ্রেক করে তানসেন সংগীত সম্মেলনের শেষ রাত্রির আসর একটা নতুন চেতনার আলোড়ন সৃষ্টি করে সাত দিনের আসরের ইতি বোঝায় না।

এখনও কানে বাজছে আলী হোসেনের পিলু ঠুংরী। এখনও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের খাম্বাজ-পিলু জড়ান ঠুংরী 'দেখে বিনে বেচৈন' মনে পড়ছে। বিশেষ করে সন্ধ্যা দেবীর দরদে গড়া কতকগুলি মিঠে কাজ ভুলতে পারছি না। ওঁর কথাগুলি বলার মধ্যেই মধু ছড়িয়ে ছিল, ঠুংরীর করুণ মূর্তি বলে যদি কিছু থাকে তবে তা বড় বেশী করেই ছিল সন্ধ্যার গানে। ঠুংরীর আগেই সন্ধ্যা শঙ্করা

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগের খেয়ালে তানের মাধুর্য, আলাপের প্রজ্ঞা ও রাগবিস্তারের নিষ্ঠা আমাদের দেখিয়েছিলেন। সেটাও ভোলার কথা নয়।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরবারীর আলাপ আমার মনে হয় সেতার অনুরাগীদের চিত্তে না অক্ষয় হয়ে থাকবে। বহুদিন এত সুন্দর সেতার শুনিনি। যে রসকে সেতারবাদনের "je ne sais quoi" বা "অনির্বচনীয় কিছু একটা" বলা যায় তা সেদিন নিখিলবাবু অকাতরে বিলিয়েছেন। কানাড়া গোষ্ঠীর সমস্ত রাগের যে প্রধান বিশেষত্ব এবং দরবারী কানাড়ায় স্পষ্টভাবে প্রকট, অর্থাৎ কোমল গান্ধারের আন্দোলন এবং কোমল নিষাদ এবং পঞ্চমের সংযুক্তি সেই বিশিষ্টতাকে সুষ্ঠু ব্যাকরণ বুদ্ধি দিয়ে নিখিলবাবু অনবদ্য করে তুলেছিলেন তাঁর বাজনায়। দরবারীর গম্ভীর চলন, এবং তার দার্শনিক স্বরূপ যেটি যথাযথ মন্দ্র সপ্তকে ভাস্বর নিখিলবাবুর সেতারে সেদিন প্রাণ পেয়েছিল।

দরবারীর আলাপ শেষে নিখিলবাবু হেমন্তের গত ধরেছিলেন। কতকগুলি তেহাইতে, গতিক্রমেক তানে ও ঝালার কিয়দংশে ওঁর বাজনা বেশ মনোগ্রাহী ছিল। নিখিলবাবু সেতার শেষ করলে ওস্তাদ আমীর খাঁ খেয়াল ধরলেন। শ্রোতৃবর্গের লগ্নে তখন বৃহস্পতি। হেমন্তের রেশ তখন কেটেছে কি কাটেনি আমীর খাঁ শুরু করলেন তাঁর একান্ত নিজের চন্দ্রমধু। তারপর একে একে আর তিন তিনটি রাগ। সেগুলির মধ্যে রজনী কল্যাণ রাগটি তো অসাধারণ। চন্দ্রমধুর আলাপে আমীর খাঁ ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। রজনী কল্যাণের তানে যেন তানসেন। বেশ

মনে পড়ছিল "বৈজু বাওরা" চলচ্চিত্রটিতে তানসেনের প্লে-ব্যাকে খাঁ সাহেব দরবারীতে গেয়েছিলেন। কনসেপশন এবং কম্প্রেশন, অর্থাৎ চিন্তা ও পরিবেশনা, এই দুইয়ের মাঝখানে যে শৈল্পিক নিষ্ঠার প্রয়োজন সেই নিষ্ঠাই খাঁ সাহেবের গানের মূলে উপচার। সরল তান, কূট তান, চক্র তান; স্থায়ীর মেজাজ, অন্তরার আন্তরিকতা এবং আর একাধিক খেয়ালী পরিশীলনের মাধ্যমে আমীর খাঁ সেদিন শ্রোতার শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলেন। অবশেষে অনুরাগীদের মন রাখতে তিনি শোনালেন টোড়ী, সেটি তাঁর একান্ত অনুরাগের রাগ। টোড়ীটি আমীর খাঁ সাহেবের প্রণয়নের অনাহত।

আসরের শেষ শিল্পী ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ তাঁর কোমল রেখাব আশাবরী দিয়ে আশার বাণী "ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি" গেঁথে দিলেন মনে। এই নিয়ে বহুবার শুনেছি এই প্রতিভাধর তরুণ শিল্পীকে। কিন্তু যতই শুনি ততই যেন নতুন করে

আমীর খাঁ

নেশা পাকিয়ে ওঠে। বড় ভালবেসে ফেলেছি ওঁর সরোদের সুন্দর স্বরটাকে। ওঁর প্রগতিশীল ভাবধারা বার বার আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। যে কোন রাগের উপরই যেন ওঁর স্বাভাবিক দখল। আর এছাড়া অত মনোগ্রাহী করে সরোদ বাজান কি কণ্ঠসাধা রেওয়াজের পরিণতি তা আশা করি প্রায় সব শ্রোতাই কিছুটা কিছুটা বোঝেন।

আশাবরী ও ভৈরবী মেলের পার্থক্য শুধু সেখানে। আশাবরীতে তীব্র রি ও ভৈরবীতে

আমজাদ আলী খাঁ

কোমল সুতরাং দুই ঋষভযুক্ত রাগের শুদ্ধ ও কোমলের মাঝামাঝি যেন এক প্রকার দুর্বোধ্য কোমল রি যুক্ত আশাবরী। ঋষভের পার্থক্য মানের উপর বেশী চাপ দেয় এবং এর প্রভাব গভীর। তাই দুই প্রকার মেলের পর্যায়ে এদের অবস্থান। আমজাদ আলী সেদিনের আশাবরী ও পরে ভৈরবীতে সেই পরিচ্ছন্নতা ও পরিমিতির নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। শেষে তিনি ভৈরবী বাজিয়েছিলেন ঠুংরী করে। তবে যে কোন কমপ্লিট আর্টিস্টকেই এই রাগ চর্চার আভ্যন্তরীণ গতিবিধি সম্বন্ধে সচেতন হয়েই শ্রোতার মন রাখতে হয়।

আমজাদ আলীর বাজনার মূল সুরটি ভোলার নয়। যত্ন সহকারে যে আলাপ তিনি গড়ে তুলেছিলেন তার চমৎকার পরিণতি দেখলাম ওঁর গতে এবং ঝালায়। ধ্রুপদাঙ্গের আলাপের সঙ্গে খেয়াল অঙ্গের মণিকাঞ্চন যোগ দেখলাম আমজাদের বাজনায়। শেষাংশের তীব্র গতির তান এবং তেহাইগুলি বাজনার মান অনেক উন্নত করে তুলেছিল।

আলোচনা শেষ হবে না যদি তবলিয়াদের কথাটা এড়িয়ে যাই। আমজাদ আলী ও সন্ধ্যা দেবীর সঙ্গে ওস্তাদ কেরামৎ খাঁ ভারী সুন্দর সংগতের কাজ দেখিয়েছিলেন। এছাড়া নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারের সঙ্গে শ্রীকানাই দত্তের তবলা বেশ খাপ খেয়ে মিশে গিয়েছিল। যে সংযম আজকাল তাঁর তবলায় একটু কমই দেখা যায় সেটা থাকাতেই সংগত সেদিন ভাল লাগল। তবে আমীর খাঁর সঙ্গে সংগতে মহাপুরুষ মিশ্র আড়ষ্ট ছিলেন।

—সঙ্গীত সমালোচক

বিশ্ব শেকস্‌পিয়র কংগ্রেসের দিনগুলি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। শত শত পেলিক্যান পাখি সমুদ্রসৈকতে, অদূরে অন্তহীন নীলাম্বু প্রশান্ত মহাসাগর এবং অগণিত ঢেউ যার শীর্ষে দুলছে অসংখ্য সিন্ধুসারস। শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকে যে কল্পিত কমনওয়েলথ-য়ের বর্ণনা আছে যেন তারই কাছাকাছি কোথাও এসে পড়েছি। সন্দেহ নেই প্রথম বিশ্ব শেক্সপিয়র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পক্ষে এরকম একটি পরিবেশ খুবই চমৎকার। শেক্সপিয়র কংগ্রেস উপলক্ষে কানাডার পশ্চিমপ্রান্তে এই ভ্যাঙ্কুভার শহরে না এলে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে উড়ে আসা দীর্ঘচঞ্চু হঠাৎ-পাখিদের দেখা ঘটে উঠতো না, এবং দেখা হত না আমেরিকা মহাদেশের বিখ্যাত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নিসর্গ-শোভা।

সারা বিশ্বের পাঁচশো শেক্সপিয়রবিদদের নিয়ে এই মহাসম্মেলন। শেক্সপিয়র জন্মের চার শতাব্দীর মধ্যে যা সম্ভব হয়নি—এমনকি শেক্সপিয়রের চতুঃশত জন্ম-বার্ষিকীতেও নয় — সেই অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল এখানে—এই ভ্যাঙ্কুভারে; শেক্স-পিয়রের জন্মভূমি ইংলণ্ড নয়, এমনকি ধনকুবের আমেরিকা বা জ্ঞানকুবের জার্মানীতেও নয়, এখানে কানাডার এক মনোরম নন্দীপোপম বন্দরনগরীতে যেখানে, শেক্সপিয়র পড়া থাকলে, আপনি কল্পনায় সহজেই প্রসপারোর মায়াবী দ্বীপের পুন-নির্মাণ করতে পারবেন। অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ন'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল এই কংগ্রেস যার সংযুক্ত উদ্যোক্তা হলেন সাইমন ফ্রেজার ও ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডা কাউন্সিল। সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারোনিশট-য়ের মাথায় পাঁচ বছর ধরে ঘুরছিল এরকম একটা বিশ্বসম্মেলনের আইডিয়া, এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁর বিদগ্ধ মস্তিষ্কপ্রসূত এই কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবার মতো আইডিয়া-পাগল বিদ্বানও তিনি কিছু পেয়েছিলেন সঙ্গী হিসাবে। সব চেয়ে আশ্চর্য, কানাডা কাউন্সিলের সদস্যদের মতো হিসাবনিকাশী বিষয়ী মানুষেরাও এতে সায় দিয়েছেন এবং প্রচুর অর্থ ঢালতে অসুখী হননি। সাইমন ফ্রেজারের ছাত্রছাত্রীরা এই কংগ্রেসের কথা শুনে এর একটা বিকল্প নাম দিয়েছিল—'রুডির স্বপ্ন', রুডি অর্থাৎ রুডল্ফ হ্যারোনিশট। খুব সুন্দর নাম। অবশ্য রুডির স্বপ্নটিও কম সুন্দর নয়। কিন্তু বিগত ২০ অগস্ট সূর্যের আলোয় তিনটি দেশের পতাকা উড়িয়ে যখন কংগ্রেস সত্যিই শুরু হল তখন একে আর স্বপ্ন বা দিবা-স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া চললো না।

টোকিও থেকে কানাডিয়ান প্যাসিফিক এয়ারওয়েজের বিমান যখন ছোঁ মেরে আমাকে আকাশে তুলে নিয়েছিল তখন ধারণাই করতে পারিনি যে এমন চমৎকার এক পরি-বেশের মধ্যে অচিরেই আমাকে ছেড়ে ফেলা হবে। টোকিও থেকে সন্ধ্যায় রওনা হয়ে সারারাত ধরে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার পরও দেখলাম, কী এক আশ্চর্য ম্যাজিকের বলে, সেইদিনই সকালে এসে পৌঁছেছি ভ্যাঙ্কুভারে। সব ঘড়ি ও ক্যালেণ্ডারকে বোকা বানিয়ে সময়কে যে এমন থামিয়ে রাখা যায়, এমনকি পিছু হটানো যায়, তা এই প্রথম বুঝতে পারলাম। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ভৌতিক পাল্লাতে বুঝলাম 'সময়' একটা সংস্কার বা অভ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ভ্যাঙ্কুভার বিমানবন্দরে অনেক আকাশের অনেক বিদ্বান পাখি—শেক্সপিয়র মহাসম্মেলনের ডেলিগেটরা দু'দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এলেন, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে তাঁদের প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু টোটেম পার্কে। আসবার সময় দেখলাম উপকূল বরাবর আঁকাবাঁকা তরুশ্রেণী পাহারা দিচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। একটা বদ্বীপ বা দ্বীপ সমুদ্র হতে হতে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে

গেছে; সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক উপরে তাকান, দেখবেন বারান্দা পর্যন্ত যার ওপর আধুনিক ও প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্য রীতির সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়। তরঙ্গোত্তী মসৃণ পথ বেয়ে আসতে আসতে দেহক্লান্তির কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। টোটেম পার্কে পৌঁছে দেখি পাঁচতলার ওপর এক কক্ষোক একক প্রকোষ্ঠ আমার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে। দরজা খুলবার মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজার দিকে চোখ পড়লো, ডেলিগেটের নাম ঝুলছে—গ্রিগরি কোজিনৎসেভ। নিঃসন্দেহে ইনিই সেই লেনিনগ্রাদের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক যাঁর রুশ ছায়াছবি 'হ্যামলেট' আমরা বেশ কয়েকবার কলকাতায় দেখেছি। কিন্তু স্বয়ং কোজিনৎসেভকে দেখবার সুযোগ ঘটবে, তা আগে কখনো ভাবিনি।

বিদ্বানদের সম্মেলন হলেও কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে আড়ম্বর ও জাঁকজমকের কিছু কমতি ছিল না। সাইমন ফ্রেজার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ হলের বর্ণাঢ্য মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে এসে এক এক বক্তৃতা দিলেন শেক্সপিয়র অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী ডোনাল্ড হাইড, ইংলণ্ডের শেক্সপিয়র ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক টি জে বি স্পেন্সার, গ্রীসের জাতীয় থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার শ্রীদিমিত্রি মালান্ডডাস, শেক্সপিয়র কংগ্রেসের ডিরেক্টর অধ্যাপক রুডল্‌ফ হ্যাবেনিশট্‌ এবং আরো অনেকে। প্রতিদিনই মধ্যাহ্নভোজনের আগে ও পরে দুটি কক্ষে অধিবেশন বসতো এবং প্রত্যেক অধিবেশনেই নির্দিষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করা হয়ে গেলে অন্যান্য ডেলিগেটরা তার ওপর আলোচনা ও বিতর্কের অবতারণা করতেন। কখনো বিদগ্ধ সংশয়, কখনো তীক্ষ্ণধার আক্রমণ, কখনো বা বিশ্লেষণী সূচিমুখ উত্তর প্রত্যুত্তরে সভাগৃহ শেষ পর্যন্ত চঞ্চল ও উৎসুক থাকতো। অপ্রত্যাশিত আক্রমণ আসতো এমন সব লাবণ্যময়ী কোমলাঙ্গী বিদুষীদের কাছ থেকে—যেমন ধরুন সারাটোগা স্প্রিংয়ের শ্রীমতী ফেইম্যান অথবা রাজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগ্রো অধ্যাপিকা কুমারী বেইটপ—যাঁদের চোখেমুখে মমতা ও নম্রতা ছাড়া কোনো আক্রামক অভিসন্ধির আভাসও পাওয়া যায়নি। আলোচনার পর আলোচনা, প্রত্যুত্তরের পর প্রত্যুত্তর, হ্যামলেটের বিখ্যাত উক্তি মনে পড়তো—'কথা, কথা, কথা।' এত কথা কানে শুনে কেউই মনে রাখতে পারে না। আর কথার পৃষ্ঠে আরো-কথাগুলিও যদি সেই সঙ্গে যোগ করা যায় তবে যোগফল হবে এক প্রকাণ্ড মহাভারত। সুখের বিষয় সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যান্ত্রিক উপায়ে এই কথাসরিৎসাগরটিকে অবিকৃত ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নয়দিন ধরে যত পণ্ডিত-কথা রচিত বা উচ্চারিত হয়েছে সবই কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ স্বয়ংচালিত টেপে রেকর্ড করা হয়েছে; পরে এগুলি একসঙ্গে সম্পাদনা ক'রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হবে।

প্রবন্ধপাঠের পর যে-আলোচনা হয়, ঘটনাক্রমে প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনেই তার সূত্রপাত করেন উপস্থিত একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি। এইদিন শেক্সপিয়র যুগে রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার' এ বিষয়ে এক মনোগ্রাহী আলোচনা বহুক্ষণ ধরে চলে এবং পরে ভারতীয় প্রতিনিধির মতো আরো অনেকেই প্রবন্ধকারের সঙ্গে মতপার্থক্য ঘোষণা করেন। অপরাহ্নিক অধিবেশনে 'শেক্সপিয়রের সহযোগীবৃন্দ' ও 'শেক্সপিয়র নাটকের সঠিক পাঠ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ব্রাডব্রুক ও কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিনম্যান, এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ফ্রেডসন বাওয়ার্স (ভার্জিনিয়া), আলফ্রেড হার্বেজ (হার্ভার্ড) ও ই শ্যানৎসার (মুনিখ)। মধ্যাহ্নভোজের সময় ষোড়শ শতকের কনসার্ট পরিবেশন করেন স্থানীয় অর্কেস্ট্রা এবং নৈশভোজের পর প্রতিনিধিদের একাংশ বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ রুকিংটন নির্দেশিত 'চিত্র ও আলোকচিত্রে হ্যামলেট' বিশেষভাবে উপভোগ করেন, এবং আরেক অংশ দেখেন ম্যাক্স রাইনহার্ড পরিচালিত পুরোনো মার্কিন শেক্সপিয়র-চলচ্চিত্র 'মিডসামার নাইট্‌স ড্রিম' (১৯৩৫); এরই সঙ্গে দেখানো হয় মিঃ ব্যারিমোর কর্তৃক গৃহীত কিছু মূক ফিল্ম যেগুলি তিনি পরিকল্পিত 'হ্যামলেট' চলচ্চিত্রে ব্যবহার করবেন বলে তুলেছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই সম্পূর্ণ করেননি।

শুধু প্রথম দিন নয়, প্রতিদিনই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা প্রোগ্রাম ঠাসা থাকতো। শেকসপিয়র শিল্পের হেন দিক নেই যা কোনো না কোনো প্রবন্ধে আলোচিত না হয়েছে। শেকসপিয়র নাটকের সম্পাদনার সমস্যা থেকে 'মনঃসমীক্ষণ ও শেকসপিয়র', 'শেকসপিয়র অনুবাদের জটিলতা', 'শেকসপিয়রচর্চায় কম্পিউটারের ব্যবহার' এবং 'শেক্সপিয়র ফিল্‌ম' সব কিছু আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধপাঠকদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক র‍্যাবকিন (বার্কলে), স্পেনসার (বার্মিংহাম), বেভিংটন (শিকাগো), ক্লেমেন (মুনিখ), কিটো (ব্রিস্টল), হুবাইমান (হুমবল্ট, পূর্ব বার্লিন), জ্যাকো (প্যারিস), রাসেল-ব্রাউন (বার্মিংহাম), বেট্‌সন (অক্সফোর্ড), জে চক্রবর্তী (যাদবপুর, ভারতবর্ষ), শ্যাবলার (মুনিখ), ওইয়ামা (টোকিও), কোজিনৎসেভ (লেনিনগ্রাদ); এবং আলোচকদের মধ্যে অধ্যাপক ক্লিফর্ড লীচ (টরন্টো), মেলচিওরি (রোম), মুয়্যো (এডিনবরা), কেনেথ মুইর (লিভারপুল), এংগেলসফেল্ড জাগ্রেভ, (যুগোস্লাভিয়া), বিয়াসাশভিলি (থবিলিসি, সোভিয়েত রাশিয়া) ও স্ট্রিব্‌নি (প্রাগ, চেকোশ্লোভাকিয়া)। প্রবন্ধ ও আলোচনা ছাড়াও প্রতিদিনই কোনো না কোনো নাটক বা চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে। যে সব 'হ্যামলেট' ফিল্ম দেখানো হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—টোনি রিচার্ডসন পরিচালিত ও নিকল উইলিয়ামসন অভিনীত 'হ্যামলেট' (ব্রিটেন, ১৯৬৯), গ্রিগরি কোজিনৎসেভ পরিচালিত 'হ্যামলেট' (সোভিয়েত রাশিয়া, ১৯৬৪), লরেন্স অলিভিয়ার পরিচালিত 'হ্যামলেট' (ব্রিটেন ১৯৪৮) আস্তা নিলসন অভিনীত 'হ্যামলেট' (ডেনমার্ক, ১৯২০) ইত্যাদি। ক্যালগারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগ বেন জনসনের 'এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার' নাটকটি খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে রচিত চলচ্চিত্র 'থ্রোন অব ব্লাড'-ও (জাপান, ১৯৫৭) ডেলিগেটদের দেখানো হয়। কংগ্রেসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র [illegible] কোজিনৎসেভ পরিচালিত 'লীয়র'। [illegible] 'হ্যামলেট' ফিল্মটি আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু 'লীয়র' ফিল্মটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে এর আগে কোথাও দেখানো হয়নি। কোজিনৎসেভ সম্মেলনে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন সেটির বিষয় ছিল 'হ্যামলেট' [illegible] কিং লীয়র—মঞ্চ ও চলচ্চিত্র'। এই প্রবন্ধে তিনি দেখান যে, চলচ্চিত্রের পরিচালক নাটকের অন্তর্গত কাব্যাংশগুলিকে দৃশ্য চিত্রের পৃথক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তিত করে নেন। উপন্যাস বা নাটকে ল্যান্ডস্কেপ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় ফিল্ম-পরিচালক তা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যে ল্যান্ডস্কেপ ব্যবহার করে থাকেন। ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে অ্যাকশনের বীজ এবং নায়কের চরিত্র সংকেতও তিনি স্থাপন করেন। দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেণ্ট' উপন্যাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, হত্যাকারী র‍্যাশকল্‌নিকফের বিক্ষুব্ধ আত্মা গ্রীষ্ম পীড়িত, দগ্ধ সেন্টপিটার্সবুর্গ নগর ইমেজের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কোজিনৎসেভের 'লীয়র' ফিল্মেও [illegible] প্রথম ও শেষ দৃশ্য ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে রচিত। প্রথম দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নির্বাক। [illegible] অশক্ত, দরিদ্র প্রজারা মাঠঘাট ভেঙে কাতারে কাতারে চলেছে রাজপ্রাসাদের দিকে, যেখানে লীয়র তাঁর রাজ্যবণ্টনের কথা ঘোষণা করবেন। এই দৃশ্যের তীব্রতা ও সংহতি অসাধারণ, এবং যে রীতিতে শেক্সপিয়রের নাটককে ফিল্মে রূপান্তরিত করা হয়েছে তার মূল কথাটিও এখানেই পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্রের ল্যান্ডস্কেপেই অবশ্য আমরা তুষ্ট ছিলাম না। পশ্চিম তীরের অসাধারণ জীবন্ত ল্যান্ডস্কেপের টানে আমি ও আরো কয়েকজন কানাডীয় ও মার্কিন অধ্যাপক বন্ধু কনফারেন্সের ফাঁকে ফাঁকে বে[illegible]

প্রান্তরে। কানাডার অন্তহীন পথপ্রান্তর আমাদের নিঃশব্দে ডেকে নিচ্ছে যেন সেই সব আশ্চর্য আশ্চর্য পাহাড়ে ও সমতলে, যেখানে মনে হবে সর্বদাই ছুটির ঘণ্টা বাজছে। আমার কানাডীয় বন্ধু একদিন আমাকে ও মার্কিন বন্ধুটিকে প্রায় জোর করেই তাঁর গাড়িতে টেনে নিলেন এবং তারপর সোজা কয়েক শো কিলোমিটার পার হয়ে চলে এলেন। মনে হচ্ছিল, আমরা ত্রিমূর্তি অন্য এক জগতে এসে পড়েছি। আকাশমুখী দেবদারু গাছ, যেন সারি সারি কানাডার জাতীয় পত্রাবলাঞ্ছিত বৃক্ষস্তম্ভ, অসংখ্য দীর্ঘগ্রীব পাখি এবং প্রাচীন শিলারাজি। ভিক্টোরিয়া অঞ্চলের খোদাই-করা চিত্রিত টোটেম দণ্ড স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল দ্রুত বিলীয়মান আদিম রেডইণ্ডিয়ানদের প্রাগ্-ইতিহাস। যেখানে সমুদ্র ও ভূখণ্ড আলিঙ্গনবদ্ধ চিরমিথুন, সেখানে স্যামন মাছ ও সমুদ্রপাখিদের হুটোপুটি উল্লম্ফন দেখবার মতো, যেন তারাও সৃষ্টিসুখে উল্লাসী। আমরা গেলাম স্ট্যানলি পার্কে; পার হলাম কাপিলানো নদীর উপর দীর্ঘ সরু ঝুলন্ত দোলনা-সেতু যার ওপর উঠলে মনে হবে বুঝি এই পৃথিবীর আগের কোনো পৃথিবীতে এসে পড়েছি, যেখানে বর্তমান বলে কোনো কাল নেই। ফ্রেজার নদীর গতিপথ ধরে আমরা গ্রাউজ পর্বতে এলাম এবং সেখানে চড়লাম আকাশ-ট্রামে, যার নাম দেওয়া হয়েছে নরকের দ্বার ('হেলস্ গেইট'); পথের টানে পার হয়ে এলাম সিমিকামীন ও ওকানাগান উপত্যকা, পার হলাম ক্যুটিনে— কী সব অদ্ভুত নাম; ইরোকোয়া-ইণ্ডিয়ানদের স্মৃতিবাহী এই নামগুলির যেন যাদু আছে—পার হয়ে এলাম একের পর এক গ্রাম বা খামার। এই ক্যারিবু নামক অঞ্চলটিতে রয়েছে উইলিয়ম হ্রদ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কপালে ছোট্ট সাদা শাঁখের মতো জনপদ 'বেলাকুলা'। আরো উত্তরে ষোলো নম্বর হাইওয়ে—আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে মন-টানা অল্পসংখ্যক পথের মধ্যে একটি। তৈল-মসৃণ দ্রুতগামী পথের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে উত্তরাঞ্চলের ঈগল ও হংসবলাকা, যেন পক্ষশালী আকাশী ক্যারাভান। এবার কিন্তু আমাদের থামতেই হবে। কারণ, একবার পথের ইন্দ্রজালে বাঁধা পড়লে তো সহজে ত্রাণ পাওয়া যাবে না। বন্ধুটি অবশ্য রাত্রিযাপনের সম্ভাবনায় মোটেলের নিশানাগুলি পড়তে পড়তে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু আসবার আগে আমরা যে শেকসপিয়রকে কথা দিয়ে এসেছি পরদিন সকালে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্র মিলিত হবো! বন্ধুবরকে বললাম, 'কাল সকালের কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেলেন? এবার ফিরে চলুন।' উত্তর হল 'ও হো, কাল তো আবার আপনার পেপার পড়া আছে, তাই না? আচ্ছা তবে ফেরাই যাক।'

বিশ্বের সব ক'টি মহাদেশ থেকে মোট পাঁচশো প্রতিনিধি এসেছেন এই বিশ্ব শেকসপিয়র মহাসম্মেলনে। শেকসপিয়রের স্বদেশ থেকে বহুদূরে এবং ইংরেজী-ভাষী নয় এমন বহু দেশ থেকে এসে মিলিত হয়েছেন শেকসপিয়র-প্রেমী বিশেষজ্ঞরা। শেকসপিয়র আলোচনায় নিবেদিত এত বড় একটা বিদগ্ধ সম্মেলনের সাফল্য প্রমাণ করে যে, রাজনীতি-বিভক্ত বিশ্বে সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার চত্বরটিতে এখনো পুরোপুরি কাঁটা তারের বেড়া পড়েনি। শিল্পসাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের এই মুক্ত অঙ্গনই ভাবী মানবসমাজের আশা ও ভরসাস্থল। একটি সামান্য উদাহরণ দিই। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধিরা আলাদা আলাদা ব্লকে আসন নিয়েছিলেন কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই সব ব্লক একাকার হয়ে গেল এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই পুনর্মিলনের স্বাদ পেয়ে মেতে গেলেন। পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক রুডলফ স্টাম তাঁর ভাষণে দুঃখ করে বললেন যে, জার্মান-ভাষী শেকসপিয়র অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা বর্তমানে একের বদলে দুই। তবু ভালো, আজ অন্তত এই দুটি আলাদা মুখ-দেখাদেখি-বন্ধ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা একই সভায় একই আলোচনার অংশভাক্ হতে পেরেছেন। পূর্ব বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেনার্ট বললেন, "এ পর্যন্ত শেকসপিয়রের নামে যেখানে যতো সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে সাফল্য-মণ্ডিত শেকসপিয়র কংগ্রেস এটিই।" সম্মেলনে আগত জার্মান প্রতিনিধিদের কেউ কেউ প্রায় পঁচিশ বছর পর পূব-পশ্চিমের বেড়া ডিঙিয়ে আবার তাঁদের পূর্ব পরিচয় ও সখ্য ঝালিয়ে নিতে সক্ষম হলেন। আমি বাঙালী, বিভক্ত বাংলার সীমারেখায় নিষ্ঠুর, অমানুষিক বেড়ার দুঃখ তো আমি জানি। তাই জার্মান-বন্ধুদের এই পুনর্মিলনের দৃশ্য আমার চোখে সহজেই বাষ্প এনে দিয়েছিল। সম্মেলনের মধ্যে লাঞ্চ-ডিনারের সময় তো বটেই, অন্য সময়েও সিঁড়িতে, বারান্দায়, লনে, কফির টেবিলে, পথে অনেকের সঙ্গেই অনেক বিষয়ে আলাপ হয়েছে। দেখেছি বাংলাদেশ সম্পর্কে অধিকাংশেরই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মতো।

শেকসপিয়র আজ আর ইংরেজদের খাস দখলে নেই, তিনি সত্যিই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছেন। পাঁচ মহাদেশের বহু মানুষের মনোভূমিতে বিগত চার শতাব্দীকাল ধরে আরেকটি নতুন মহাদেশ বেড়ে উঠেছে, যার নাম শেকসপিয়র মহাদেশ। এই মহাদেশের বাসিন্দাদের শেকসপিয়র-অনুরাগ ছাড়া পৃথক কোনো পাসপোর্ট নেই, দরকারও হয় না। এই কংগ্রেসে শেকসপিয়র অনুবাদের সমস্যা নিয়ে যেদিন বিশেষ আলোচনাসভা বসে সেদিন নানা দেশের উৎসুক প্রতিনিধি হলঘরে আগেভাগে এসে বসে থাকেন। তবে উল্লেখ্য অনুপস্থিত ছিল ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদের। মূলে শেকসপিয়রই তাঁরা উপভোগ করেন, কাজেই অনুবাদের সমস্যা তাঁদের কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু মার্কিনী ও কানাডীয় প্রতিনিধিরা অনেকেই এসেছিলেন, যদিও তাঁরাও ইংরেজী-ভাষী। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ছাড়া আরো যে তিনজন বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করেন তাঁরা অধ্যাপক গ্যাবলার (মুনিখ), অধ্যাপক স্প্রিরে (বার্দো) ও অধ্যাপক ওইয়ামা (টোকিও)। তিন ঘণ্টার ওপর শেকসপিয়র অনুবাদের নানা দিক নিয়ে আলোচনা চলে এবং একক অনুবাদ বনাম যৌথ অনুবাদ ও অনুবাদে কম্পিউটারের সম্ভাব্য সাহায্য নিয়েও চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, ঐকমত প্রতিষ্ঠা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল না, বহুমতের সহযোগিতা ও নৈকট্যবিধানই ছিল এর লক্ষ্য। সেদিক থেকে ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও এইদিনের আলোচনা বিশ্ব শেকসপিয়র কংগ্রেসের একটি প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল।

নয় দিনের এই বিশ্ব শেকসপিয়র কংগ্রেসের শেষ দিনের বিদায়ী অধিবেশনে সকালের মনেই প্রশ্ন — দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেস হবে তো? হলে, কবে? এবং কোথায়? 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতা' বিষয়ক কমিটি আগেই সুপারিশ করেছেন যে, শেকসপিয়র কংগ্রেসটি কোনো না কোনো আকারে চালু থাকুক এবং পরবর্তী কংগ্রেসের সম্ভাব্যতা খুঁটিয়ে বিচার করুক। প্রতিনিধিদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্লেনারি সেশনে অধ্যাপক জন রাসেল ব্রাউন যখন প্রস্তাব করলেন যে, সর্বাগ্রে একটি 'বিশ্ব শেকসপিয়র অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং এরকম অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হলে তার ওপরই পরবর্তী কংগ্রেসের দায়দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোক, তখন প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। সকলেই খুশি হয়েছেন এজন্য যে, শেকসপিয়র কংগ্রেস কেবল পুঞ্জীভূত অতীত পাণ্ডিত্যের বোঝা নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি, এর দৃষ্টি প্রথম থেকেই ছিল ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। তাই ফিল্ম, কম্পিউটার, নব্য সমালোচনারীতি এ সব বিষয়েও উদারভাবে আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক র‍্যাবকিন তো কয়েক দিন আগে তাঁর প্রব[ন্ধে] বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, "শেকসপি[য়র] সমালোচনা বর্তমানে বেশ মুশকিলে পড়েছে। প্রচলিত সমালোচনারীতি ও তত্ত্ব আঁচরে না বদলালে আমরা, পূর্বে য[ে] সমালোচকরা যেমন নায়িকাদের কৈশো[র] বালিকা বয়সের গবেষণায় পণ্ডশ্রম করে[ছেন] তেমনি বা তার চেয়েও বড়ো বড়ো ভ্রান্তি[র] মধ্যে ঠেকে থাকবো।" না, শুধু অতীত[ের] বাঁধা সড়কেই নয়, মুক্তমনে ভবিষ্যৎ[ের] অ-মানচিত্রিত আকাশে যাত্রা করার জন্য শেকসপিয়র পণ্ডিতদের প্রস্তুত থাক[তে] হবে। মঞ্চ-ব্যবসায়ীরাও গবেষকদের স[ঙ্গে] হাত মেলাবেন এবং সারা বি[শ্বের] সহযোগিতায় শেকসপিয়র সাহিত্য [...] জ্ঞানের সাধারণ সম্পত্তি হয়ে উঠবে। [...] সাবেগ আমন্ত্রণেই ধ্বনিত হল বিশ্ব শেক[স]পিয়র কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশনের [...] থেকে।

এর পর ভোলিগেটদের দৃষ্টি স[...] আকাশের দিকে ধাবিত হল — ভবিষ্য[ৎ] শেকসপিয়র সমালোচনার আকাশ [...] একেবারে বাস্তব আকাশ-পথ। দেশে [ফেরার] বিমান ধরতে হবে, এয়ারলাইনস[...] থেকে 'ও-কে' অর্থাৎ 'সব ঠিক আছে' [...] বুকিং-সম্পর্কিত পাকা অনুমোদন [...] যাত্রীদের সুবিধার্থে এবার কানাড[া ...] ডব্লিউ-এ প্রভৃতি নানা এয়ারলাইন[স] অস্থায়ী অফিস বসে গিয়েছে [...] পার্কের নিচের তলায়। আমরা [...] যাত্রাকালীন খুঁটিনাটি নির্দেশগুলো [...] নিলাম এবং তারপর শেকসপিয়র কংগ্রেস [...] বিপুল রঙ্গমঞ্চ থেকে একে একে নিষ্ক্রা[ন্ত] হলাম। কয়েক ঘণ্টার পর যখন সানফ্রা[ন]সিসকোগামী বিমানে উঠে বসেছি, তখ[ন] মনের মধ্যে প্রশ্ন হচ্ছিল আবার শেকসপি[য়র] কংগ্রেস কবে? কোথায়?

গীতগোবিন্দের ভারত-পরিক্রমণ ও মেবার-পতি কুম্ভ

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বাগ্দেবতা-চরিত-চিত্রিত-চিত্ত-সদ্মা
পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেব-রতিকেলি-কথা-সমেত—
মেতং করোতি জয়দেব-কবিঃ প্রবন্ধম্॥
যদি হরিস্মরণে সরসং মনো।
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

লীলাময়ী বীণাপাণি যাঁর হৃদয়ে, পদ্মাবতীর চরণ চালনার যিনি অধিকারী, সেই কবি জয়দেব শ্রীবাসুদেবের মিলন-লীলা কীর্তনের এই প্রবন্ধটি রচনা করলেন। যদি হরিচিন্তায় চিত্ত সরস করতে চাও, যদি বিলাসকলায় কুতূহল থাকে, তা হলে শোনো জয়দেব প্রণীত এই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী।

দ্বাদশ শতকের শেষার্ধের ভারতবর্ষ। পূর্বভাগের প্রভাবশালী রাজ্য গৌড়। তার নৃপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি, সংগীতাচার্য ও নৃত্যবিদ্ জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গে এই নিবেদন করেছিলেন।

কি অপূর্ব সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছিল কৃষ্ণভক্ত সংগীতবিদ্-কবির সেই আকাঙ্ক্ষা। কি অনুরাগে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ সেই ললিত পদগীত মাধুরী শুনেছিল, পরম তৃপ্তিতে আস্বাদন করেছিল! শতাব্দের পর শতাব্দ। ভারতের প্রদেশ থেকে প্রদেশে, সুদূর অঞ্চলে অঞ্চলে ধ্বনিত হয় গীতগোবিন্দ পদগান। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের অন্তর্গত উড়িষ্যা। সেজন্যে জয়দেবের কালেই পুরীর মন্দিরে তাঁর পদাবলী নৃত্য-সহযোগে অনুষ্ঠিত হত। আনন্দতীর্থ (দ্বৈত সিদ্ধান্তের এক শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—জয়দেবের সমকালীন অথবা অব্যবহিত পরবর্তী) গৌড়ের ঘরে ঘরে গীতগোবিন্দের প্রচলন দেখেছিলেন।...

জয়দেব-পদাবলীর ভারত-পরিক্রমা এক চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত-সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ। প্রথমে গৌড়ের সন্নিহিত উড়িষ্যা গীত-গোবিন্দের কোমল কান্ত অষ্টপদীগুলি আপন করে নেয়। এই মধুর পদগান আসন পাতে মিথিলাবাসীর হৃদয়ে। মেবার আদি রাজপুতানার রাজ্যে। অন্ধ্র দেশনিবাসী তার রসাস্বাদন করে। তামিল অঞ্চলেও তার অনুরণন। তেমনি কর্ণাট ও কেরলবাসীর অন্তরে। ওদিকে পূর্ব প্রান্তে মণিপুরীর মনের মণি-কোঠায়।

এইভাবে উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণতম রাজ্য, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তের ভারতবর্ষে গীত গোবিন্দের সমাদর। ভারতের দিকে দিকে এক ভাবাবেগের ঐক্যসূত্র গ্রথিত করেছে জয়দেবের কালজয়ী সৃষ্টি। রাধা-কৃষ্ণ অনুধ্যানের সঙ্গে অনুপম পদলালিত্য ও ঝংকার, ছন্দোহিল্লোল ও রসানুসারী ব্যঞ্জনা এই মহাদেশের তাবৎ প্রদেশের জন-চিত্তে এমন আবেদন জাগিয়েছে।

আরো এক লক্ষণীয় বিষয়। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকেও আপন জন মনে করেছে একাধিক অঞ্চল। রাঢ় ভূমির অজয় নদী তীরের জয়দেবকে উড়িষ্যার সন্তান (পুরীর নিকটে কেন্দুবিল্ব গ্রামনিবাসী) বলে দাবি করা হয়েছে। দাবি উঠেছে মিথিলারও (ত্রিহুত জেলার কেন্দোলির) অধিবাসী বলে। জয়দেবের জীবনসঙ্গিনী তথা সঙ্গীতে সহযোগিনী, নৃত্যপটিয়সী পদ্মাবতী দাক্ষিণাত্য কন্যা, এমন জনশ্রুতিও আছে।......

ভারতের অঞ্চলে অঞ্চলে সঙ্গীত-সাংস্কৃতিতে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে গীতগোবিন্দ, মেবারের মহারাণা কুম্ভ পঞ্চদশ শতকে তার কেমন নব রূপায়ণের প্রয়াস করেন ? সব আলোচনার আগে সংক্ষেপে বাংলায় জয়দেব-পদগানের প্রসঙ্গ।

রাগ ও তালে গঠিত চর্যাগানের কাল নবম-দশম-একাদশ শতক। তার পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসের বিষয় অবলম্বনে ভারতীয় সঙ্গীতধারায় বাংলার অবিস্মরণীয় দান গীত গোবিন্দ। তার দ্বাদশ সর্গে সন্নিবিষ্ট ২৪টি গান জয়দেব-কথিত 'প্রবন্ধ'। অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ, ছ'টি অঙ্গে নিবদ্ধ তৎকাল প্রচলিত প্রবন্ধ সংগীত। অষ্টপদী নামে প্রবন্ধগুলি পরিচিত, কারণ প্রত্যেকটিতে ৮টি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। তার মধ্যে প্রথম দুই পঙক্তি 'ধ্রুব' অর্থাৎ প্রতি পদের পরে পুনরাবৃত্ত হয় মুক্ত সংগীত স্বরূপ। বিষয়-বস্তুতে গৌড়দেশে এই প্রথম উল্লেখ্য রাধা কৃষ্ণলীলা রসের সৃষ্টি।

গীত গোবিন্দের দু-তিন শতাব্দ পরে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' রচনা। বাংলা ভাষায় প্রথম রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে সংগীত বা কাব্য বা গীতিনাট্য 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।' মূল চরিত্র সৃজনে, পালার উৎস সন্ধানে ও প্রবন্ধ সংগীতে বড়ু চণ্ডীদাস গীত-গোবিন্দের দৃষ্টান্ত অনুসারী।

তারপর ১৬-১৭-১৮ শতকের গৌরবময় সৃষ্টি মহাজন পদাবলীর পটভূমিরূপেও আছে জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদগান। পদাবলী কীর্তনের মাধুর্য রসাস্বাদন, নায়ক নায়িকারূপে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ভজন, মান দান খণ্ডিতা মাথুর রাস প্রভৃতি বিষয়ের আদর্শ স্বরূপ গীতগোবিন্দ বিরাজমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য পরম ভক্তিভরে যাঁর পদাবলীকে গ্রহণ করেছিলেন সেই জয়দেবের গৌড়ীয় মহাজনগণ আদি পদকর্তা ও বৈষ্ণব সাধক ভক্তরূপে মান্য করেছেন। নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাভাবে গীতগোবিন্দের সর্গ-গুলি যেমন (সামোদ দামোদরঃ, অক্লেশ কেশবঃ, মুগ্ধ মধুসূদনঃ, স্নিগ্ধ মধুসূদনঃ ইত্যাদি) পরিকল্পিত তেমনি পদাবলী কীর্তনের পদ ও পালা গানেও সেই ধারার অনুসরণ। তবে এ সবই বিষয়বস্তুর কথা।

গীতগোবিন্দের নিজস্ব সাঙ্গীতিক রূপ কিন্তু বাংলাদেশে রক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যরূপে গীত-গোবিন্দ পদাবলী গানের সামগ্রিক অনুষ্ঠান। জয়দেবের কালে তাঁর অষ্টপদী পরিবেশিত হত তাল-লয়-যুক্ত গীত, শাস্ত্রীয় পদ্ধতির নৃত্য ও অভিনয় সহযোগে—এই প্রসিদ্ধি। (জয়দেবের শিক্ষায় গঠিত পদ্মাবতীর নাট্য-শাস্ত্রানুসারী নৃত্য? জয়দেবের প্রিয়বন্ধু পরাশরের কণ্ঠে পদাবলী গান? স্বয়ং জয়দেব কর্তৃক মৃদঙ্গবাদনে তালরক্ষা?) শাস্ত্রসম্মত নৃত্য ভাবযুক্ত অভিনয় ও সংগীতের যোগে জয়দেব পদাবলী পরি-বেশনের ঐতিহ্য অনুসৃত হয়ে এসেছে উড়িষ্যায় ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানের এই সামগ্রিক রূপ কিন্তু বাংলাতেই লুপ্ত হয়ে যায়।

আনন্দতীর্থ গৌড়ের ঘরে ঘরে যে গীত-গোবিন্দ প্রচলিত দেখেছিলেন তা লোপ পায়

কি রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের ফলে, মধ্যযুগে তুর্ক-আফগান শক্তির আক্রমণে রাজ্যের স্বতন্ত্রতার সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বিদ্বৎ সভা ও জাতীয় সম্পদের অনেক কিছুই উৎসন্ন হয়। সংস্কৃতিহীন বিধর্মীয় সামগ্রিক-সামরিক শাসন-তাড়নে নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জাতীয় জীবনধারা। নিষ্প্রদীপ সাংস্কৃতিক বর্তিকা। ভাস্কর্য, স্থাপত্যকারুর সঙ্গে কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য আদি ললিত শিল্প কলার সাধনা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অন্ধ যুগের অন্ধকারে চিরবিদায় নেয় পদ্মাবতী, বিদ্যুৎপ্রভা, শশিকলার উত্তরসাধিকা। জয়দেবের উত্তরসূরী অসম্ভব সেই পরিস্থিতিতে। প্রায় তিন শতাব্দব্যাপী আচ্ছন্ন তমসা। তারপর শ্রীচৈতন্যের কল্যাণে জাতীয় চৈতন্য জাগরিত হল। কিন্তু মধ্যবর্তী দীর্ঘকালে জাতীয় সংস্কৃতির নানা অঙ্গের সঙ্গে গন্ধর্ব বিদ্যার অপূরণীয় ক্ষতি সংঘটিত হয়ে গেছে। নৃত্য ও সঙ্গীত ক্ষেত্র থেকে মহিলা শিল্পীর অন্তর্ধান তার অন্যতম।

শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের প্রায় এক শতক আগে বাংলার কাব্য ও সঙ্গীতজগতে একমাত্র উল্লেখ্য সৃজন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।' গৌরাঙ্গের প্রভাবে জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণস্পন্দন। অন্যদিকে, তাঁর দেহত্যাগের ৫০ বছর পরে তাঁর ভাব-প্রেরণায় খেতুরীর বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী কীর্তন প্রবর্তন—বাংলার সঙ্গীতজগতে চিরস্মরণীয় কীর্তি। ভারতীয় ঐতিহ্যগত রাগাভিত্তিক সঙ্গীত-ধারা অনুসারী হয়েও পদাবলী কীর্তন বাংলার ভাবাবেগে মাধুর্য-মণ্ডিত নিজস্ব দান, চৈতন্য ধর্ম যেমন ভারতীয় ভক্তিসাধনার অনুগামী হয়েও বাংলা-মাটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কীর্তন সঙ্গীত বাংলার প্রাণের প্রিয়। তার মধ্যে মাথুর গান বাঙ্গালীর চিত্ত সব চেয়ে বেশি অধিকার করেছিল, বাংলার এক সমাজ-বিজ্ঞানী পণ্ডিত একথা বলেছেন। হিন্দু রাজত্ব অবসানের পর বাঙ্গালীর যে নানা বাহ্য ঐশ্বর্যের সঙ্গে আন্তর ললিত সম্পদ, আত্মসম্মান সম্ভ্রম ও মর্যাদা সর্বস্বান্ত হয়েছে সেই চরম রিক্ততার বেদনা মাথুর গানের সকরুণ আবেদনে স্পন্দমান। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেছেন, তাই ব্রজবাসীদের জীবনের সমস্ত আনন্দ নিঃশেষ। বৃন্দাবন অন্ধকার। বাংলার জীবনেও সর্বস্ব হারিয়ে শুধু হাহাকার। তাই মাথুরের বিধুরতা সেযুগে এত প্রাণ-স্পর্শী হয়েছিল। মাথুর গানে মুখর হয় তৎকালীন বাঙ্গালীর সেই রিক্ত অন্তরের আর্তি, মর্মক্রন্দনের রোল।......

সেই অন্ধকার মধ্যযুগে গীতগোবিন্দ পদাবলী ধারা-চ্যুত হয়ে যায়। হারিয়ে যায় তার নৃত্য-সঙ্গীত-নাট্য সম্বন্ধ সামগ্রিক রূপ। বিচ্ছিন্নভাবে তার দু'একটি মাত্র অষ্টপদী কোন কোন কীর্তনীয়ার আসরে পরিবেশিত হয়েছে, যথা: 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী'। বাংলাদেশে গীতগোবিন্দ কিন্তু তার সম্পূর্ণ সঙ্গীত রূপ হারিয়ে শুধু কাব্য রূপে পরবর্তী-কালে উপনীত হয়েছে।

একেবারে উনিশ শতকে দেখা যায়, বিষ্ণুপুর ধ্রুপদ সম্প্রদায়ের গুণী ক্ষেত্র-মোহন গোস্বামী নতুন রাগ প্রয়োগের সদৃষ্টান্ত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'গীত-গোবিন্দের স্বরলিপি' পুস্তক (১৮৭১ খৃঃ) জয়দেবের সেই পদাবলী তিনি লাভ করেন তাঁর সঙ্গীতগুরু বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে, যা রামশঙ্কর তাঁর মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চল নিবাসী বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্যের নিকট থেকে সম্ভবত ১৭৮১-৮২ খৃঃ শিক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ ক্ষেত্রমোহন অধীত গীতগোবিন্দ পদাবলী বিষ্ণুপুরে রক্ষিত প্রাচীন ধারা নয়, তা ব্রজমণ্ডলের ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত।

সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য রূপে জয়দেবের অষ্টপদী সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ধারা রক্ষা পায় ও অনুসৃত হয় উড়িষ্যায়, অন্ধ্র ভাগে, তামিলনাদে, কর্ণাট দেশে, কেরল রাজ্যে—অর্থাৎ যে অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘকাল যাবৎ বিধ্বংসী বিজাতীয় শাসনের করাল গ্রাস পড়েনি। এমন কি রাণা কুম্ভের যে মেবারে গীতগোবিন্দ নবরূপে অনুশীলিত হয়, তাও উত্তরাপথের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি রক্ষণে সমর্থ ছিল বহুদিন।

গীতগোবিন্দ পদগানের উত্তর ভারতে গবেষণা ও প্রচলনের ক্ষেত্রে রাণা কুম্ভের দান সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর প্রসঙ্গ এ নিবন্ধের শেষে আলোচ্য। তার আগে অন্যান্য অঞ্চলের স্বীকৃতি উল্লেখনীয়।

নাভাজীর 'ভক্তমাল' গ্রন্থে (১৬ শতকের শেষার্ধ) জয়দেব সুরের ভাণ্ডার ও অবতার রূপে উক্ত হয়েছেন। শিখদের গুরু গ্রন্থ সাহেবের অন্তর্গত 'ভগত রত্নাবলী'-তে জয়দেবের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন। চন্দ্রদত্তের 'ভক্তমাল' পুস্তকে জয়দেব পদ্মাবতীর বিস্ময়কর সঙ্গীতকৃতির কথা স্বীকৃত। 'শেক শুভোদয়া'য় বুড়ণ মিশ্র প্রসঙ্গেও জয়দেব পদ্মাবতীর অনুরূপ কৃতিত্বের বর্ণনা স্মরণীয়। মিথিলার লোচন কবির রাগ তরঙ্গিণীতেও জয়দেবের সঙ্গীত ঐতিহ্য বর্ণিত। কোন কোন মতে, জয়দেব পদাবলীর যথার্থ সুররূপ লোচনের রাগ-তরঙ্গিণী ও হৃদয়নারায়ণ দেবের 'হৃদয় কৌতুক' ও 'হৃদয় প্রকাশ' অনুসরণে পাওয়া যেতে পারে।

উড়িষ্যার প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য যে, কলিঙ্গ সম্রাট প্রতাপরুদ্রের উদ্যোগে ১৫ শতকে পুরীর মন্দিরে নিয়মিত গীত-গোবিন্দ পদাবলী অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়।

গীতগোবিন্দের ভারত পরিক্রমার পথে দাক্ষিণাত্যে উপনীত হবার এক পর্ব আনন্দ-তীর্থের বৃত্তান্তে লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের সমসাময়িক আনন্দতীর্থ বাংলা দেশে গীত-গোবিন্দ নৃত্যগীতের ব্যাপক প্রচলন দেখবার পর ভ্রমণ করেন উড়িষ্যা। কলিঙ্গের সম্রাট তখন বিদ্বান সংস্কৃতিবান নরসিংহদেব, কোণার্ক সূর্যমন্দিরের নির্মাণকর্তা। তাঁর সময় থেকেই কৃষ্ণানদীতীরে অন্ধ্র রাজ্য শ্রীকাকুলমে উড়িষ্যার গঙ্গবংশের প্রভাব। নরসিংহদেবের পরবর্তী নৃপতি ভানুদেবের মন্ত্রী হন উক্ত আনন্দ তীর্থের শিষ্য নারায়ণতীর্থ। কলিঙ্গ গঙ্গ রাজাদের শ্রীকাকুলমে প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য নারায়ণ তীর্থ ১০/১২ বছর অবস্থান করেন এখানে। তিনিই শ্রীকাকুলম অঞ্চলে কৃষ্ণভক্তি ও দ্বৈতদর্শন প্রচার করেন বলে প্রকাশ। তাঁর প্রচারের ফলেই এই অঞ্চলে গীতগোবিন্দের অনুষ্ঠান প্রথম জনপ্রিয় হয়। গীতগোবিন্দ নৃত্যে পরিবেশিত হতে থাকে মন্দিরে মন্দিরে, মন্দির-নৃত্যশিল্পী-দের মাধ্যমে। (শ্রীকাকুলম জেলার বংশধরা নদীতীরের শ্রীকাকুলম নয়। এই শ্রীকাকুলম কৃষ্ণা নদীতীরের কৃষ্ণা জেলার শ্রীকাকুলম, অন্ধ্র শাতবাহন রাজাদের রাজধানী, বিজয়-ওয়াড়ার ২০ ক্রোশ দূরবর্তী।) বিজয়ওয়াড়া থেকে ৩ ক্রোশ দূরে কুচিপুড়ি গ্রাম যে পরবর্তীকালে নৃত্যচর্চার জন্যে স্বনামধন্য হয়)। ক্রমে গীতগোবিন্দ নৃত্যানুষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে শ্রীকাকুলম এবং ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় এখানে। গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণভক্তি ও দ্বৈতবাদ একযোগে শ্রীকাকুলম অঞ্চলে অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। নারায়ণ তীর্থের দু শতক পরে গীত-গোবিন্দের আদর্শ অনুসরণে সিদ্ধেন্দ্র যোগী রচনা করেন 'ভামা কলাপম্'। জয়-দেবের পদাবলীর নায়িকা যেমন রাধা, ভামা কলাপম্-এর তেমনি সত্যভামা। বিষয়বস্তু মূলত এক এবং গীতগোবিন্দের ঐকান্তিক প্রেরণাতেই সিদ্ধেন্দ্র যোগীর 'ভামা কলাপম্' রচিত। আরো কথা এই যে প্রথম অষ্টপদী 'দশাবতার স্তোত্র' ও কুচিপুড়িতে অভূতপূর্ব জনচিত্তহারী হয়। সার্থকভাবে নৃত্য-অনুষ্ঠানের জন্যে 'অভিনয়দর্পণ' থেকে বিশুদ্ধ মুদ্রা গ্রহণ করা হয় 'অবতার'দের প্রদর্শনের জন্যে। জয়দেবের এই অষ্টপদীটি প্রায় তাবৎ মন্দির-নৃত্যশিল্পী ও কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যানুষ্ঠান করতে থাকেন। এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় সাধারণের অসুবিধা দেখে তেলুগু ভাষায় পেদপাটি-ভারত্বু রঙ্গদাস কর্তৃক 'দশাবতার শবদম্' রচিত হয় গীতগোবিন্দের দশাবতার অষ্টপদীর আদর্শে। কুচিপুড়ি ভাগবতার শিল্পীরা এমনিভাবে গীতগোবিন্দকে ভক্তি-

গাথারূপেই একান্তভাবে অন্তরের স্থান দিয়েছেন, নৃত্য সাধনার বিষয় করেছেন। সমগ্র কুচিপুড়ি নৃত্যধারার প্রেরণার উৎস হয়েছে গীতগোবিন্দ—এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

জয়দেব পদাবলীর প্রথম প্রচারস্থল গৌড়, দ্বিতীয় উড়িষ্যা, তৃতীয় অন্ধ্রদেশের কুচিপুড়ি। তার অব্যবহিত পরেই কেরল।

দাক্ষিণাত্যের সুদূরতম রাজ্য কেরলে গীতগোবিন্দের প্রচলন আরম্ভ হয় রাজা রবি বর্মার (১৩ শতক) কাল থেকে। বেনাদের নৃপতিরা ও কোজিখোড়ের জামোরিন মন্দিরে উপাসনার সময় অষ্টপদীগুলি অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন এবং জয়দেবের পদাবলী বিপুল বিস্তার লাভ করে। ফলে, সমগ্র কেরলে সংগীত ও নৃত্যের উপাদান হয়ে ওঠে গীতগোবিন্দ। তারপর ১৪/১৫ শতকে গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার কারণে এই অঞ্চলে সংগীতের লক্ষণীয়ভাবে নব রূপায়ণ ঘটে। ১৬৫৪ সালে গীতগোবিন্দের আদর্শে কোজিখোড়ের মানবেদন রচনা করেন 'কৃষ্ণণ অট্টম'। সংস্কৃত পদম্ সমন্বয়ে গঠিত নৃত্যনাট্য 'কৃষ্ণণ আট্টম' চর্চাকারীরই পরিচালনায় মন্দিরে মন্দিরে প্রাসাদে প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৭ শতকে কথাকলির স্রষ্টা কোট্টরকারা রাজ্যের নরপতি বীর কেরল বর্মার 'রামনাট্টম' নামে সুপরিচিত রামায়ণ নৃত্যনাট্যের পদাবলী অষ্টপদীর প্রভাবের পরিচায়ক। তা ভিন্ন কার্তিক তিরুনাল, উন্নায়ি ওয়ারিয়র, ইরায়িম্মান তাম্পি প্রভৃতি মহান কথাকলি রচয়িতারাও গীতগোবিন্দের কাব্য ও সংগীতের নিকট সবিশেষ ঋণী, এ কথা কেরলের বিশেষজ্ঞগণই প্রকাশ করেছেন।

মালাবারের এক জামোরিনের রচনা 'কৃষ্ণ নাটকম্', যা বর্তমানে গুরুভায়ুরের 'কৃষ্ণাট্টম্' নৃত্যপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ, গীতগোবিন্দকে অনুসরণ করেছে আদর্শরূপে।

কেরলে অষ্টপদী গীতানুষ্ঠানের ধারা আজও অব্যাহত আছে বহু মন্দিরে। কেরল ও তামিলনাদে প্রচলিত গীতগোবিন্দে প্রযুক্ত রাগও অনেকাংশে অনেকাংশে অভিন্ন। কর্ণাটকী সংগীতে অষ্টপদীগুলির প্রয়োগ এমন বিস্ময়করভাবে সাবলীল ও সুসমঞ্জস যে, মনে হয় যেন দক্ষিণেই তাদের উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্য সংগীতের অন্যতম নবরূপদাতা ত্যাগরাজ তাঁর 'প্রহ্লাদ ভক্তি বিজয়ম'-এর সূচনায় অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়েছেন জয়দেবকে। এই প্রশস্তি থেকেও ধারণা করা যায়, দাক্ষিণাত্যে গীতগোবিন্দ-রচনাকারের আসন কোথায়।

কর্ণাটকী সংগীতে গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানের এই এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে অষ্টপদীগুলি

রাণা কুম্ভ

ভিন্ন ভিন্ন রাগে ও তালে গীত হলেও দক্ষিণে এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহ্য রক্ষিত হয়েছে। কারণ এই সব রাগ ও তাল কর্ণাটকী পদ্ধতি অনুসারী। অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাট ও কেরলের ধারাকে তা সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছে, তাদের সৃষ্টির প্রেরণাকে দিয়েছে নতুন শক্তি।

তামিলনাদে বর্তমান প্রচলিত গীতগোবিন্দ সংগীতানুষ্ঠানের প্রবর্তক ছিলেন তিরু নাগাই রাজন পাট্টিনের গুণী রামডু ভাগবতার। ১৭ শতকে তৎকালীন কাঞ্চি কামকোটি পীঠমের জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের আশীর্বাদ নিয়ে রামডু ভাগবতারের এই প্রবর্তনা।

কুচিপুড়ি নৃত্যধারা যেমন তেমনি তামিলনাদের নৃত্যপদ্ধতিতেও গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানের প্রভাব স্বীকৃত আছে। এই সূত্রে, তাঞ্জোর জেলায় রচিত 'শিবাষ্টপদী'ও গীতগোবিন্দের আদর্শে গঠিত। কথাকলি নাট্যাভিনয়ে পদম্ বা গানের মুখবন্ধস্বরূপ যে উদ্বোধনী শ্লোকগুলি অনুষ্ঠানের রীতি তাও গীতগোবিন্দের দৃষ্টান্তে। দক্ষিণ দেশে এই ঐতিহ্য আছে যে, জয়দেব নাট্যাচার্যও, তিনি নৃত্যপটীয়সী পদ্মাবতীকে অষ্টপদীগুলি রূপায়ণে শিক্ষা দিয়েছিলেন। জয়দেবের সংগীত ও নৃত্যকে উত্তরের অপেক্ষা দক্ষিণী বলেই দাক্ষিণাত্যবাসীর ধারণা। উপাসনার জন্যে এবং সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান রূপে গীতগোবিন্দ বিগত প্রায় তিন শতক যাবৎ একটি নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত পদ্ধতিতে গীত হয়ে এসেছে। এই রূপরীতির প্রচলনকর্তারূপে কীর্তিত আছেন সদ্‌গুরু স্বামী নামে পরিচিত শ্রীবেঙ্কট রামস্বামী। তাঁরও একশ বছর পূর্ববর্তী, কাঞ্চি কামকোটি পীঠমের বোধেন্দ্র স্বামীন বর্তমান প্রচলিত ভজন পদ্ধতির স্রষ্টাস্বরূপ কথিত। সদ্‌গুরু স্বামীর ভজনে অষ্টপদীগুলিকে কেন্দ্রীয় স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর কালে যে রাগে, তালে ও পদ্ধতিতে অষ্টপদী গীত হত, ঐতিহ্য অনুসারী উপাসনা ও ভজনে আজও তা প্রচলিত। সদ্‌গুরু স্বামীর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল কুম্বকোনমের নিকটস্থ মরুদানাল্লুরে। তিনি বোধেন্দ্র স্বামীর মতানুগামী ছিলেন। সদ্‌গুরু স্বামীর মাতৃভাষা তেলুগু হলেও তিনি উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন তামিলভাষী কল্যাণ-রামস্বামীকে। (কর্ণাটকী সংগীত পদ্ধতিতে তেলুগু, তামিল, কানাড়ী ও মালয়ালী এই চার ভাষার সংস্থান সত্ত্বেও সাঙ্গীতিক বিভেদ বা অসুবিধা কিছু নেই, এই প্রসঙ্গে সে কথা স্মরণীয়)। উক্ত কল্যাণ রামস্বামীর সমনাম্নী পৌত্র ভজন সংগীতে অষ্টপদীগুলি গাইতেন। দ্বিতীয় কল্যাণ রামস্বামীর পুত্র পেরিয়াকুলথ্তাই ('হরিকথা কালক্ষেপম্' গীতির বিখ্যাত প্রবক্তা)-এর শিষ্য ও সংগীত-সহকারীরূপে সাধনা করে পরে প্রসিদ্ধ হন ব্রহ্মশ্রী পাপনাশন শিবন। তিন বছর মারুন্দাপুরে মঠে কল্যাণরামস্বামীর (২) কাছে অবস্থান করে পাপনাশন শিবন তাঁর অপূর্ব ভক্তি-সংগীতের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে প্রকাশ। দাক্ষিণাত্যে সংগীতে অভিজ্ঞ অনেকের অভিমত এই যে, জয়দেবের পরবর্তী বেশ কিছুকাল যাবৎ উত্তর ও দক্ষিণী পদ্ধতির সংগীতে বর্তমানের তুল্য এই দূরত্ব ছিল না, যদিও জয়দেব নির্দিষ্ট রাগগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য দক্ষিণে প্রচলিত ধারার মধ্যে নেই।......

দাক্ষিণাত্য পদ্ধতির নৃত্যধারায় ● সংগীতে গীতগোবিন্দের প্রভাব বিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই পর্যন্ত অঙ্কিত হল। এখন ভারতের পূর্বসীমান্তে, মণিপুরী নৃত্যে ও সংগীতে জয়দেব পদাবলীর প্রভাবের প্রসঙ্গ।

মণিপুরের নাটকীর্তনের মূলে ● অষ্টপদী কোন্ সময় থেকে মণিপুরী মন্দিরে গীত হতে আরম্ভ করে, এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সঠিকভাবে জানান নি। তবে মণিপুরে প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানের সম্বন্ধ সম্ভবত আছে।

রাজর্ষি ভা গ্য চ ন্দ্রে র রাজ্যকালে (১৭৬৪-১৭৯৮) মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় রাসলীলায়। ভাগ্যচন্দ্র তাঁর প্রভু কৃষ্ণকে তিনটি উৎসর্গ করেছিলেন : রাজ্য মণিপুর, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং কন্যা, যিনি মণিপুরী মীরা হয়ে আজীবন কৃষ্ণ-পরিণীতা থাকেন।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র অন্তত আংশিকভাবে

মণিপুরে গীতগোবিন্দ প্রচলিত করেন ধ্রুব প্রবন্ধ সংগীতের ভিত্তিতে, পদাবলী কীর্তন রূপে। এই রাজ্যে বৈষ্ণব প্রার্থনার অন্যতম পূর্ণ পল্লবিত রূপ রাসলীলা। সেই রাসলীলা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কীর্তন পদাবলী ও সংস্কৃত পদ গান হয়, নৃত্য হয়, আবৃত্তি হয়—মধ্য রাত্রে আরম্ভ হয়ে সমস্ত রাত্রিব্যাপী। তার মধ্যে 'বৃন্দাবন বর্ণন' পর্যায়ে 'গোপীরা' বৃন্দাবনের সৌন্দর্য বর্ণনায় পরিবেশন করেন 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে'। তিন তালে সেই নৃত্যের অনুষ্ঠান। হোলি নাট্যের শেষে নৃত্য সহযোগে পরিবেশিত হয় 'হরিরিহ মুগ্ধ বধূ নিকরে বিলাসিনী বিলসতি কেলি পরে'। আরো কয়েকটি পদের পরে বিখ্যাত অষ্টপদী 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী' অনুষ্ঠানের শেষে কৃষ্ণ রাধার সামনে সাষ্টাঙ্গে হন : 'স্মর গরল খণ্ডনং—মম শিরসি মণ্ডনং—দেহি পদ পল্লবমুদারম'। এই পর্যায়ে ভক্ত মণিপুরী বৈষ্ণবরা ক্রন্দন করে উন্মত্ত আবেগে রাসধারী ও সূত্রধারীদের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে থাকেন এমন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়।

রাজপ্রাসাদের মন্দিরে চৈত্র পূর্ণিমার রাতে বার্ষিক বসন্ত রাসলীলা অনুষ্ঠান। তাতেও জয়দেবের দুটি অষ্টপদী পরিবেশিত হয়। 'নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং গতয়া' এবং কামপি চুম্বতি কামপি' গীত ও নৃত্য করেন গোপীরা এবং শুধু আবৃত্তি করা হয় 'কামশরীরপি সংসার বসন'। কৃষ্ণ ও রাধার অংশস্বরূপ মন্দিরের বিগ্রহ দুটিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে দুজন মাত্র সূত্রধারী আবৃত্তি, গান ইত্যাদি সহযোগে সমস্ত অংশ পূরণ করেন।

পাঁচ দিনের হোলি উৎসব মণিপুরীরা পালন করেন বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে। নৃত্যগীতের বিভিন্ন গোষ্ঠী বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে রাজকীয় মন্দিরে সমবেত হন। গীতাভিনয় অনুষ্ঠান হয় সহস্র সহস্র দর্শকের উপস্থিতিতে। সেই সব হোলি গানের মধ্যে অন্যান্য সময়োপযোগী গান ভিন্ন জয়দেবের 'ললিত লবঙ্গলতা' এবং 'হরিরিহ মুগ্ধ বধূ' তাঁরা নৃত্য ও অভিনয় করেন, বিশেষ যন্ত্র দফত ও ঢোলক বাদিত হয়। সে এক উদ্দীপনাময় দৃশ্য। শত শত অংশগ্রহণকারী দেখা যায়, কখনো কখনো রাজা স্বয়ং অংশ নেন বাদকরূপে। হোলির শেষদিনে (হলনকার) সেই বিরাট উৎসব ইম্ফলের গোবিন্দজী ও বিজয় গোবিন্দজীর মন্দিরে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

মণিপুরী নটকীর্তন বা পালা সংকীর্তনও ঐতিহ্য অনুসারী এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত। মণিপুরের এই পালা সংকীর্তন সর্বপ্রকার পারিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ (যথা: উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বার্ষিক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি) উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই সংকীর্তন অনুষ্ঠানেও কয়েকটি অষ্টপদী নৃত্য ও গীত হয় অপরূপ চলন গতিচ্ছন্দে। যেমন—'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালি' ও 'সব বিরহে তব দীন।'

মণিপুরে যে রথযাত্রা উৎসব রাত্রির পর রাত্রি মহাসমারোহে প্রবীণ ও নবীনরা একযোগে নৃত্যগীতে পালন করে তারও সূত্রপাত জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র গানের সঙ্গে হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম' এবং উপসংহারে 'মঙ্গলম্ উজ্জ্বলং গীতি জয় জয় দেব হরে'। এটি জয়দেব নামেই মণিপুরে পরিচিত। এই স্তোত্র গান অনুষ্ঠানের সঙ্গে আসামের প্রাচীন ধর্মসংগীত 'বড়গীতি'র সাদৃশ্য আছে, যদিও এই যোগাযোগের কাল সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে এখনো জানা যায়নি।

উনিশ শতকের আগে থেকেই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মণিপুরের গায়কদের মধ্যে অষ্টপদীগুলি গাইবার একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। এই গান অনুষ্ঠিত হয় একটি বিশিষ্ট কীর্তনের ঢঙে, মধ্যে মধ্যে ধ্রুপদের ধরনে। খোল ও পাখোয়াজ, কখনও বেহালা, সেতার, তবলা, বাঁশির যোগে এই অনুষ্ঠানে গুরুরাও অংশ গ্রহণ করেন।

মহারাজা চন্দ্রকীর্তির সময়ে (উনিশ শতকের মধ্য ভাগে) জয়দেবের অষ্টপদীগুলি প্রতি একাদশী তিথিতে গীত হত। কোন কোন ভক্ত বৈষ্ণব সংকল্প করে সমগ্র গীতগোবিন্দ গান শুনে থাকেন প্রায় চার দিনের নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানে।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা থেকেও ধারণা করা যায়, মণিপুরে জয়দেব পদাবলীর চর্চা ও সমাদর কতখানি।...

পশ্চিম ভারতের রাজপুতানার দক্ষিণ অঞ্চলে মেবার রাজ্য। সেখানে গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ অতি বিচিত্র। রাণা মেবারপতি কুম্ভ প্রতিভাদীপ্ত সংগীতমনীষায় জয়দেব পদাবলীর নব রূপায়ণ করেছিলেন। জয়দেবের দেহত্যাগের পর, ক্রমে গীতগোবিন্দ পদগানের মূল রূপ লুপ্ত হয়ে যায় উত্তর ভারতে। রাণা কুম্ভ তখন সেই সঙ্গীতসম্পদকে উদ্ধার ও নতুনরূপে প্রচলনের প্রয়াস পান রাগে, তালে নবভাবে গঠিত করে। 'রসিকপ্রিয়া' নামে গীতগোবিন্দের বিশদ টীকা রচনা করে তিনি জয়দেব প্রয়াণের প্রায় ২০০ বছর পরে তাঁর অনুপম সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানালেন।

শুধু গীতগোবিন্দ পদাবলীর উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়নের জন্যেই নয়, উত্তর ভারতে সংগীততাত্ত্বিক গবেষকরূপেও স্মরণীয় হয়ে আছেন রাণা কুম্ভ। তেমনি রাজপুতানার ইতিহাসেও এক মহান নরপতি স্বরূপে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সংগীতশাস্ত্রী, বীণাবাদক এবং গীতগোবিন্দের অনুরাগী উত্তরসাধক কুম্ভের কথা আলোচনা করবার আগে তাঁর অন্যান্য পরিচয় উল্লেখনীয়। এমন বহুমুখী প্রতিভার আধার ও বিচিত্র-কীর্তি পুরুষ শুধু রাজপুতানায় নয়, সেকালের সমগ্র ভারতবর্ষেও দুর্লভ ছিলেন, বলা যায়।

তিনি একাধারে সুশাসক ভূপতি ও বীর সেনাপতি, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও স্থাপত্য বিশারদ, সুপণ্ডিত গ্রন্থ রচয়িতা ও কবি, সংগীততাত্ত্বিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ বীণকার। 'একলিঙ্গ মাহাত্ম্য' পুস্তকের (শেষাংশ তাঁর রাজ্যকালে রচিত) বিবৃতি অনুসারে, মহারাণা কুম্ভ বেদ, মীমাংসা উপনিষদ, নাট্যশাস্ত্র, রাজনীতি, গণিত প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ভিন্ন তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল প্রাকৃত এবং কর্ণাটকী, মহারাষ্ট্রী ইত্যাদি কয়েকটি ভাষায়।

সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক তাঁর রচিত 'সংগীতরাজ', 'সংগীত মীমাংসা', 'সুপ্রবন্ধ', 'রসিকপ্রিয়া', প্রভৃতি গ্রন্থাবলী। সংগীতশাস্ত্রে তিনি সর্বমান্য অধিকারী ছিলেন এবং সেজন্য তাঁর উপাধি ছিল

...ভিনব ভরতাচার্য'। অর্থাৎ তিনি ...ভিনব বা নতুন 'ভরত' ছিলেন; প্রাচীন ...রতের নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা ভরতের সঙ্গে ...তুলনা সূচক তাঁর এই বিশেষণ।

...দেবীর স্তুতিবাচক নানা কবিতাও ...তিনি রচনা করেন এবং সেগুলি বিভিন্ন ...রাগ ও তালেও গঠনে তাঁর নির্দেশ পাওয়া ...যায় 'একলিঙ্গ মাহাত্ম্য' পুস্তকে।

চণ্ডী শতকের টীকাও তাঁর আর ...একখানি গ্রন্থ।

রাণা কুম্ভ স্বয়ং যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি বিদ্বৎসঙ্গও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। কবি, গুণী, বিদ্বান ও সঙ্গীতজ্ঞগণ অলংকৃত করে থাকতেন ...কালীন মেবার দরবার। তাঁর রাজসভার ...প্রধান দুই কবি ছিলেন অত্রি ও মহেশ।

স্থাপত্য কারুতেও যে মহারাণার গভীর অনুরাগ ও জ্ঞান ছিল তার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর কীর্তিগুলি মেবার রাজ্যে আজো বিদ্যমান। চিতোর, আবু, কুম্ভলগড়, রণপুর প্রভৃতি স্থানে তাঁর প্রেরণায় গঠিত নানা দুর্গ, মন্দির, তোরণ ইত্যাদি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল ...অবদান। তাদের মধ্যে চিতোর জয় স্তম্ভ ও কুম্ভলগড় রাণা কুম্ভের নামকে চিরস্মরণীয় করেছে। মালবের সুলতান মহম্মদ খিলজির (১ম) সঙ্গে যুদ্ধে (১৪৩৮ ...) বিপক্ষে বিজয়লাভের স্মারকরূপে নির্মিত হয় চিতোরের এই জয়স্তম্ভ বা কীর্তিস্তম্ভ। স্থাপত্য-বিশেষজ্ঞ ফার্গুসন ...এই স্তম্ভ সম্পর্কে মন্তব্য করেন : ...রোমের ট্রাজানের তুল্য বিজয়ের স্তম্ভ, ...ভারতীয় স্থাপত্য নিদর্শন-রূপে তার চেয়ে ...অনেকে উৎকৃষ্ট রুচিসম্মত।' তার কুম্ভলগড় বা কুম্ভলমেড় দুর্গ বিশালতায় ও প্রকৃতিতে, সামরিক গুরুত্বে ও ...রাণার নিরাপত্তা রক্ষার বিস্ময়কর সৃষ্টি। ...প্রধান স্থপতি মন্দন (১৪৪৩ থেকে ১৪৫৮) ১৫ বছরে এই কুম্ভলগড় নির্মাণ করেছিলেন। আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিম দিকে এক সুউচ্চ পর্বতে, উদয়পুরের ৩০ ক্রোশ উত্তরে প্রতিষ্ঠিত এই মহা দুর্গ ...পরবর্তী মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার ইতিহাস ...সহ কীর্তির অধিকারী হয়ে আছে। ...যখনই উদয়পুরের বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, ...যখন হয়েছে চিতোর রক্ষা, তখনই মহারাণাদের দৃষ্টি পড়েছে কুম্ভলগড়ে। যখনই ...মোগল সাম্রাজ্যের তাবৎ শক্তি মেবার ধ্বংসের জন্য নিয়োজিত হয়েছে, তখনই উদয় সিংহ (কুম্ভের জ্যেষ্ঠ পুত্র) থেকে রাজসিংহ পর্যন্ত সকল রাণারাই রাজকীয় পরিবারবর্গকে এই দুর্গের আশ্রয়ে প্রেরণ করেছেন। আকবরের চাতুর্য ও মানসিংহ এবং মাড়ওয়ার, বিকানের প্রভৃতি রাজ্যের ...রাজপুতদের সহায়তায় প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একবার মাত্র পতন হয় কুম্ভলমেড়ের। কিন্তু অচিরেই তা পুনরুদ্ধার করেন রাণা প্রতাপ।

— আবুপর্বতে রাণা কুম্ভ নির্মিত কুম্ভস্বামী মন্দিরও মেবারের এক দর্শনীয় বস্তু। তা ভিন্ন একলিঙ্গ মন্দিরের অপরূপ

কুম্ভমণ্ডপ ও তোরণ, চিতোরের রাম কুণ্ড, চিতোর দুর্গের রামপোল (শাহ্জাহান্ কর্তৃক আংশিক বিনষ্ট) প্রভৃতি সাতটি তোরণ ইত্যাদিও তাঁর নির্দেশে গঠিত।

মহারাণারই উদ্যোগে ও প্রেরণায় তাঁর স্থপতি মন্দন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিষয়ে আটখানি গ্রন্থ (দেবতা মূর্তি প্রকরণ, প্রাসাদমণ্ডন, বাস্তুশাস্ত্র, রূপাবতার প্রভৃতি) প্রণয়ন করেছিলেন।...

মেবারের এই সর্ব গুণালঙ্কৃত (১৪৩৩ থেকে ১৪৬৮) রাণা যে ৩৫ বছর রাজত্ব করেন তা রাজ্যের ইতিহাসে যেমন সমৃদ্ধ তেমনি গৌরবময় ছিল। উদয়পুরের শ্রেষ্ঠ রাণাদের তিনি অন্যতম। রাণা মোকল এবং পরমার বংশীয়া রাণী সৌভাগ্য দেবীর পুত্র কুম্ভকর্ণ বা কুম্ভ নিজের জীবনে এই দুই রাজবংশের গুণাবলীর সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। গুহিলোট বংশের বীরত্ব এবং পরমার বংশের সংস্কৃতি। কুম্ভ ছিলেন রাণা হাম্বীরের পৌত্রের পৌত্র। বীরত্বে ও সুশাসনে তিনি হাম্বীরের অতি যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং সংস্কৃতি-চর্চায়, বিশেষ সংগীত জীবনে তিনি মহান পূর্বপুরুষকে বহুদূর অতিক্রম করে যান। কারণ রাণা কুম্ভ একাধারে ক্রিয়াসিদ্ধ সংগীতশিল্পী এবং সংগীত পণ্ডিত গ্রন্থকার। তিনি বাদন-নিপুণ বীণ্‌কার ছিলেন এবং এমন ঘনিষ্ঠভাবে গীতগোবিন্দ পদাবলীতে রাগ তাল যোজনা করেন যে কণ্ঠসংগীতেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল মনে হয়। এ অনুমানও সত্য হওয়া সম্ভব যে, মেবার দরবারে গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান হত তাঁর প্রদত্ত সুরে ছন্দে গঠিত হয়ে। জয়দেব পদাবলীর প্রতি রাণার যে সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পায় এবং যেমন গভীরভাবে তিনি গানগুলির নব রূপায়ণ করেন তাতে তাঁর দরবারে গীত-গোবিন্দ অনুষ্ঠানের খুবই সম্ভাবনা। কারণ জয়দেবের প্রবন্ধগুলি ক্রিয়াসাপেক্ষ সংগীত।

গীতগোবিন্দের 'রসিকপ্রিয়া' নামে টীকা রচনার প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে রাণা কুম্ভের ব্যক্তিজীবনের একটি কথা উল্লেখ্য। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, বিশিষ্ট ধারার ভজন সংগীত রচয়িত্রী এবং কৃষ্ণগত-প্রাণা সাধিকা মীরাবাই ছিলেন রাণা কুম্ভের পত্নী। কিন্তু রাণা কুম্ভের স্বীকৃত ইতিহাসে তথা জীবন প্রসঙ্গে মীরাবাইয়ের নাম অজ্ঞাত। এমন স্বনামপ্রসিদ্ধা তাঁর রানী হলে কি সেকথা সমসাময়িক ইতিহাসে স্থান পেত না? চিতোর কীর্তিস্তম্ভে তাঁর দুই রাণীর নাম পাওয়া যায়—কুম্ভলদেবী ও অপূর্বদেবী। মীরাবাই যে (রাণা কুম্ভের প্রায় একশ বছর পরে) শ্রীচৈতন্য শিষ্য রূপ ও সনাতনের সমকালে বৃন্দাবনে সমাগতা হন একথাই সত্য মনে হয়। তিনি রাণা কুম্ভের পত্নী একথা অ[...] কিংবদন্তী মাত্র।...

গীতগোবিন্দ সম্পর্কে রাণার [...] স্মরণীয় দান যে, জয়দেবের পদাব[...] পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি উত্তর ভার[...] নতুন রূপে প্রচলন করেছিলেন। গীত[...] গোবিন্দের পদকর্তার মৃত্যুর পরে [...] লোপ পায় তার মূল সংগীতরূপ। জয়দে[...] তাঁর ২৪টি পদগানে যে ১২টি রাগ (মাল[...] মালবগৌড়, গুর্জরী, বসন্ত, রামকি[...] কর্ণাট, 'দেশাখ, দেশবরাড়ী, গোণ্ডকি[...] ভৈরবী, বরাড়ী, বিভাষ) প্রয়োগ করেছিলে[...] তাদের স্বররূপ না থাকায় পরবর্তীকা[...] বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রূপে অষ্টপদীগু[...] অনুষ্ঠিত হতে থাকে। রাণা কুম্ভ ১[...] শতকের মধ্যভাগে গীতগোবিন্দ পদগান[...] পর্যালোচনা করেন ভরত, মতঙ্গ প্রভৃ[...] মুনি রচিত সংগীতশাস্ত্র অনুসরণ করে[...] এবং আপন সাংগীতিক প্রবণতা ও প্রত[...] অনুযায়ী প্রবন্ধগুলিতে নতুন রাগ ও তাল[...] সন্নিবিষ্ট করেন, এইসব রাগ অনে[...] জয়দেবের সময়েও প্রচলিত ছিল। যেমন[...] প্রথম অষ্টপদী 'প্রলয় পয়োধি জলে' জয়দে[...] প্রদত্ত মালব রাগের পরিবর্তে রাণা কুম্ভ[...] গঠিত করেন মধ্যমাদি বা মধুমাধবী রাগে[...] কুম্ভকর্ণ তারপর পদাবলীতে ললিত, বসন্ত[...] গুর্জরী, ধানসী ভৈরব, গোণ্ডকৃতি দেশাখ[...] মালবশ্রী, কেদার প্রভৃতি রাগের প্রয়ো[...] করেন। কোন কোন অষ্টপদীকে তি[...] বিভিন্ন রাগেও গঠন করেন—যথা 'বদ[...] যদি কিঞ্চিদপি'-তে ১৮ রাগ, '[...] চাটুবচন'-এ ১৩টি। তাঁর প্রবৃত্ত [...] রূপগুলি থেকে ১৫ শতকে প্রচলিত প্র[...] সংগীতের কিছু নিদর্শন লাভ করা য[...] তাঁর প্রচেষ্টায় এবং রাজপৃষ্ঠপোষক[...] লাভের ফলে উত্তর ভারতীয় পর্যা[...] জয়দেবের অষ্টপদী গীত হতে থাকে নতু[...] প্রেরণা পেয়ে।

রাণা কুম্ভ 'কুম্ভ 'সংগীতরাজ' পুস্তকে[...] যেভাবে গীতগোবিন্দের রাগ বিশ্লেষ[...] করেছেন, 'রসিকপ্রিয়া' টীকাগ্রন্থে যে[...] রাগ ও তালের সমাবেশ করেছেন তাতে তাঁ[...] অতি বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞমন এবং যথা[...] সংগীতশিল্পীর প্রাণ সুপ্রকাশ। সেই স[...] জয়দেবের পদাবলী যে কি গভীর অনু[...] ও প্রেমে রাণার মানসলোকে আসন পেয়ে[...] ছিল, তারও পরিচয় তাঁর রচনা[...] সুপরিস্ফুট। গীতগোবিন্দের সাংগীতি[...] বিষয়েই তিনি সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলে[...] তাই জয়দেবের মর্ম-বাণী 'যদি হরি স্মর[...] সরসংমনো যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্, মেবারপতিও এমন মধুরভাবে প্রতিধ্বনি করেছিলেন : 'যদি কৌতুকিনো গা[...] সংগীতে চাতুরী যদি, রসিকাঃ কুম্ভকর্ণ[...] শৃণ্বন্ত বুধসও মাঃ!' হে সুধিবৃন্দ, [...] সংগীত বিদ্যার নৈপুণ্যে কৌতুহল থা[...] তাহলে রসিক কুম্ভকর্ণকে শ্রবণ করো।...

অশান্ত সিংহলে

যতীন ভৌমিক

বিকেল সাড়ে চারটে।
কলম্বো এয়ারপোর্ট।

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কার্ভালে উড়ে গড়িয়ে এসে থামলো ঠিক মেইন বিল্ডিং-এর সামনে।

কোটটা কাঁধে ফেলে, গলার বোতাম খুলে টাইটা ঢিলে করে দিলাম। ভীষণ গরম। মাত্র দশ বারোজন যাত্রী। সবাই একে একে নামছে। আমিও লাইনে। হাতে ছোট্ট একটা ব্রিফ্‌কেস। সান্তাক্রুজ এয়ার-পোর্টে পুলিস ডিপার্টমেণ্টের লোক হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"পিস্তল নেই তো আপনার ব্রিফ্‌কেসে?"

—"পিস্তল থাকলে ব্রিফ্‌কেসে রাখবো কেন?" আমিও জবাব দিয়েছিলাম।

সিঁড়ির সামনে এয়ার হোস্টেস। তামিল মেয়ে। আমার সামান্য কেয়ারলেস ভাব দেখে এবং তামিলিয়ান মনে করে বেশ একটা চমৎকার হাসি হাসলো। খুশীই হলাম। নট্ ব্যাড্!

ঢুকতেই একটি সীলোনীজ মেয়ে এসে দু'তিনটে ফর্ম ধরিয়ে দিলো। সব ভরতে হবে। এলাহী ব্যাপার।

একটা বেঞ্চে বসলাম।

তাকিয়ে দেখলাম সবাই ফর্ম ভরতে ব্যস্ত। মেয়েটি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো,—"আর ইউ সীলোনীজ?"

—"নো! আই অ্যাম ইণ্ডিয়ান।"

মনে হলো সামান্য আহত। চলে গেল। আবার জাহাজের কাপ্তানও এসেছেন আমার সাথে স্ত্রী সহ। স্ত্রী হলেন আবার দক্ষিণ আমেরিকার।

দু'জনের ফর্ম ভরতে, সে আরেক ঝামেলা! চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা। চমৎকার মিউজিক। ঝকঝকে তকতকে।... কিন্তু লোকজন নেই একেবারে। সামান্য আশ্চর্য হলাম। পরে অবশ্য আমাদের এজেণ্ট গাড়িতে যেতে যেতে বলেছিল :

—"এখন এখানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত কার্ফু। তাই সবাই দু'টোর মধ্যেই বাড়ি ফিরে যেতে চায়। সমস্ত শহর খালি।"

সীলোনের চে গুয়েভারা দলের জন্য আতঙ্কিত সবাই।

এয়ারপোর্ট থেকে শহর পঁচিশ মাইল দূরে। দু পাশে তাল, নারকেল আর অন্যান্য গাছগাছালির সবুজলী। এক ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে এলো আমাদের খলিল রহমান। এককালে নাকি মোটর রেসিং করতো।

বালি থেকে চিনি নিয়ে এসেছে জাহাজ। বেশ কয়েকদিন লাগবে সব ডিসচার্জ করতে। সারাদিন ইঞ্জিনরুমে থেকে ভিজে তারপর কার্ফুর ভয় নিয়ে আর বেরোনো হয় না। এর মধ্যেই একদিন সকালের কাগজে দেখলাম—"কার্ফু রাত দশটা থেকে চারটে।"

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বেরোলাম। কোর্ট এরিয়া, সমুদ্র তীর, বাজার সব ঘুরলাম। কলম্বো আসা আমার প্রথম নয়। এর আগেও তিন চারবার এসেছি। কত তফাত। অনেক দালান হয়েছে, আধুনিকতা এসেছে। কিন্তু রাস্তায় সন্ধ্যার পরে লোকজনের দেখা নেই।

কার্ফু!

ঘুরতে ঘুরতে এক হোটেলের বারে গিয়ে বসলাম। দু'একজন লোক ছাড়া কেউ নেই। সন্ধ্যা সাতটা তখন। বারম্যানকে বীয়ার আনতে বললাম। টেবিলের ওপর বেনসন্ হেজেস-এর প্যাকেটটা রেখে-ছিলাম।

বারম্যান বীয়ার ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞাসা করে—"একটা সিগারেট নিতে পারি?"

বললাম—"সিওর।" নিয়ে পকেটে রেখে দিল। একগাল হেসে বললো—"পরে খাবো।" চলে যায় ও। অন্য একটা টেবিল থেকে আমি একটা খবরের কাগজ উঠিয়ে নিয়ে আসি। সীলোনের ইভ্‌নিং নিউজ্। নাম সীলোন অবজার্ভার।

বড় বড় হেডিং-এ দেখলাম, কলকাতায় কলেরার প্রকোপ। মস্কো, ওয়াশিংটন রিফিউজিদের বিনা পয়সায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এয়ার লিফট দেবে। তার পাশেই ছোট করে ছাপানো—"সীলোনে, ভারতীয় এবং পাকিস্তানীদের ভালোভাবে চেক করা হবে, যাতে কলেরা ছড়িয়ে না পড়ে এ দেশে।" সম্পাদকের কাছে লেখা একটা চিঠিও চোখে পড়লো। সেটার উদ্ধৃতি না দিয়ে থাকতে পারলাম না।

ভদ্রলোক লিখেছেন—"পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার অধিবাসীরা সবাই বাঙালী। তাদের চেহারা সবই একরকম। কাজেই পশ্চিম বাংলার লোকেরাই যে রিফিউজি সেজে পাকিস্তানের বদনাম করছে না তার কি প্রমাণ আছে..." শুধু তাই নয়। ভদ্রলোক আরেকটু এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন "শুনতে পাই, ভারতীয় পাঞ্জাবী সৈন্যরা পাকিস্তানী আর্মির পোশাকে পূর্ববাংলায় ঢুকে অত্যাচার করছে যাতে পাকিস্তানী—পাঞ্জাবী আর্মিদের নাম খারাপ হয়... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভেবে দেখুন একবার ব্যাপারটা!

চিঠিটা পড়ে তো চক্ষু আমার চড়ক গাছ। দিবাস্বপ্ন দেখতে আমিও ভালবাসি। কিন্তু এ কি?

রাজনীতি আমি জানি না, জানতেও চাই না। তবুও মজা হলো সীলোনের জনসাধারণ যেন বাইরের জ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই নিরক্ষর এবং নিজের দেশের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে নির্বিকার। আর

পলিটিক্যাল কনস্যাস্‌নেস? আমার মনে হয় কলকাতার ময়দানের এক চীনেবাদাম-ওয়ালাও বোধ হয় রাজনীতি শেখাতে পারে এদের। সাধে কি আর চে গুয়েভারার দল তৈরি হয় এ সব দেশে! নয়তো এ রকম চিঠি লেখেই বা কি করে আর ছাপানোই বা হয় কেন? চিঠিটা পড়ে এত কথা মনে হত না যদি না আমি বনগাঁ আর পেট্রাপোল ঘুরে আসতাম।

সাত পাঁচ ভাবছিলাম। বারে আমি একলা। গ্লাসে চুমুক দিতে ভুলে গেছি অনেকক্ষণ।

বারম্যান এসে দাঁড়ায় সামনে। বললাম—"সিট্ ডাউন প্লীজ।"

বসে পড়লো সামনের চেয়ারে। বসেই বললো—"আটটার সময় আমি বার বন্ধ করব। আমাকে অনেক দূরে যেতে হয়, আপনার যদি আর কিছু দরকার হয় নিতে পারেন।"

—"না আমার আর প্রয়োজন হবে না।" বলেই ওকে আমি বীয়ার অফার করলাম।

—"নো থ্যাংক ইউ! আমি খাই না।"

কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"দশটার সময় তো কার্ফু। এত তাড়াতাড়ি যাবার কি দরকার?"

—"ওরে বাপ্‌রে। আমার বাসা হলো এখান থেকে এক ঘন্টার রাস্তা। বাস বন্ধ হয়ে যায় অনেক আগে। বাড়িতে পৌঁছুতেই পারব না।"

টেপ-রেকর্ডারে একটা মিউজিক চলছে। বার খালি। শুধু বারম্যান আর আমি। ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে সাতটা। জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা তোমার নাম কি?"

—"মাই নেম?"

—"ইয়েস।"

—"মাই নেম ইজ জয়সিংহে।" সামান্য হাসে বারম্যান।

আমার এর পরের প্রশ্ন—"আচ্ছা এই যে কাগজে কাগজে চে-গুয়েভারার দল সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে...এটা এক্স্যাক্‌টলি কি ব্যাপার বলতে পার?" বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকায় জয়সিংহে আমার মুখের দিকে—তারপর জিজ্ঞাসা করে—"ইউ পাকিস্তানী?"

বহু বছর বিদেশে ঘুরেছি—আমার বন্ধুবান্ধবেরাও ঘুরেছে। সব জায়গাতেই বিদেশীরা আমাদের প্রথমে জিজ্ঞাসা করে "আমরা পাকিস্তানী কি না?" ভারত সরকারের মাইনে হুকুম করানেওয়ালা ফরেন ডিপার্টমেন্ট যে কতটা নিজের দেশের নাম ছড়াতে পারেন তার প্রমাণ আমরা হাতে-নাতে দিতে পারি। লজ্জা লাগে সে সব কথা লিখতে। অথচ আন্তর্জাতিক এই লোকগুলোকেই আত্মীয়তা সূত্রে ভারত সরকার মৌজে রাখছে বিদেশে। মিথ্যের প্রচার স্বদেশে।

সময় বড় কম! ক্ষণিকের চিন্তায় নিজেকে ব্যস্ত রেখে, সাধারণভাবে জবাব দিলাম—"নো। আই অ্যাম ইণ্ডিয়ান।" জয়সিংহে নিরুত্তাপ কণ্ঠে মেসিনের মত বলল—"ইণ্ডিয়া আমাদের দুটো হেলিকপ্টার দিয়েছে—ওঁদের খোঁজবার জন্যে। তোমাদের নেভিও সাহায্য করছে।"

বয়স খুব বেশী হবে না জয়সিংহের। পঁচিশ থেকে আটাশের মধ্যে। চুল ওল্টানো। চোখ টানা টানা। সাদা শার্ট আর একটা সাদা লুংগি। গায়ের রং মাজা। হঠাৎ বলল—"আমি আজ চলি। আমার বউ, ছেলে, মেয়ে ভীষণ চিন্তা করবে।" তারপর হেসেই বলে—"কার্ফু কি না তাই তুমিও তাড়াতাড়ি চলে যাও। অন্যদিন কথা হবে। একটু তাড়াতাড়ি এসো।"

আমিও হোটেলের সিঁড়ি থেকে নামি জনমানবহীন আলোকিত রাস্তায়। মাঝে মাঝে শুধু ট্যাক্সি আর গাড়ি চলে যায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। রাত মাত্র সাড়ে আটটা। দশটায় কার্ফু।

দু'একদিন পরেই আবার গেলাম জয়সিংহের বারে। সন্ধ্যে ছ'টার সময়ই পৌঁছে গেলাম সেদিন। লোকজন বেশী নেই, সেদিনকার মতই। আমাকে দেখে জয়সিংহে একগাল হেসে অভ্যর্থনা জানালো। কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম।

বীয়ারের সাথে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে বসে পড়লাম। ছবিগুলো দেখে অন্তত সময় কাটানো যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ ঝমঝম বৃষ্টি। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালাম। জনশূন্যে ফোর্ট এরিয়ার পিচের রাস্তাগুলো চকচক করছে। বৃষ্টির ছাট হাওয়ায় উড়ে রাস্তার বাতিগুলোকে মাঝে মাঝে কুয়াশার পর্দা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। বার খালি। একটা ওয়াল্টজ-এর সুরে বাজছে টেপ-রেকর্ডারে। জয়সিংহে পাশে এসে দাঁড়ায়, বলে—"এ বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকবে না।"

আমি চুপ করে থাকি।

দুজনেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে। বাইরের নির্জনতা, ভিতরের ওয়াল্টজ আর রাতের বৃষ্টি আমাদের দুজনকেই সাময়িকভাবে আনমনা করে দিয়েছিল। রাস্তার দিকে তাকিয়েই জয়সিংহে জিজ্ঞাসা করে—"জানো?" এই চে'র দলের লিডার কে?"

—"না, আমি জানি না" স্বীকার করি।

—"ছেলেটির নাম বিজয়বীরা। মাত্র আটাশ বছর বয়েস। ধারণা করতে পার?"

আমি চুপ। জয়সিংহে আরো বলুক আমি চাই। প্রশ্ন করি না।

"বিজয়বীরা কিন্তু খুব গরীবের ছেলে। সীলোনের দক্ষিণে ওর বাড়ি। একজন সায়েন্টিস্ট। আমাদের এখা এডুকেশন তো সম্পূর্ণ ফ্রি কিনা। গিয়েছিল মস্কোর লুমুম্বা ইউনি ভার্সিটিতে।...তারপর ফিরে এসেই তো সব করেছে।"

এবার আমি বলি—"কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম সীলোনের চে-র দলের লিডা দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে এসেছে।"

—"অতটা আমি জানি না, তবে এটু আমি বলতে পারি—বিজয়বীরাও অ্যাকচুয়েল লিডার নয়। ওকে তো অ্যারেস্ট করা হয়েছে। খালি বক্তৃতা দিত।"

—"তবে লিডার কে?" আমি জিজ্ঞাসা করি। জয়সিংহে সামান্য সময় নিয়ে বলে:

—"নিশ্চয়ই অন্য কেউ। আমরা জানি না।" কিছুক্ষণ থেমে, জানালা থেকে সরে গিয়ে বলে—"বাট দেয়ার দিজ আর নো গুড।"

—"হোয়াট নো গুড?"

—"এই যে, কথা নেই বার্তা নেই মানুষে খুন করা। ...আমি পছন্দ করি না। নিশ্চয়ই অন্য রাস্তা আছে।"

জয়সিংহে সাধারণ মানুষ। রাজনীতি বোঝে না। বাইরের খবর রাখে না। দুজনে ফিরে এসে টেবিলে বসলাম আবার। একটা সিগারেট দিলাম ওকে।

বাইরে তখনো অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে। জয়সিংহে বাইরের দিকে তাকিয়ে হয়তো বাড়ির কথা ভাবছে। বৃষ্টি না থামলে বেশ অসুবিধায় পড়বে ও। সাড়ে আটটায় বাস বন্ধ হয়ে যায়। ঘড়ি ন'টা সাড়ে ন'টা।

আমিই শুরু করি আবার।

—"আচ্ছা, ওরা তো জঙ্গলে জঙ্গলে থাকে। বৃষ্টির মধ্যে কি করে?"

—"কিছু হয় না। ওরা জেনারেলি বড় বড় পাথরের আশ্রয়ে থাকে। ছেলেমেয়ে সব একসাথে।"

—"জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই? আর খাওয়াদাওয়া?"

—"সে ভয় ওদের নেই। ওদের কাছে স্নাইপার, রাইফেল, গ্রেনেড সব আছে। আর খাওয়া? আম, আনারস, পেঁপে তো আছেই।"

একটা সিগারেট অফার করলাম। সিগারেটটা ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললো—"শুধু মশাকে বাগ মানাতে পারছে না ওরা। ম্যালেরিয়া ধরছে।"

চুপ করে জয়সিংহে। ঘড়ির দিকে তাকায়।

আমি বলি—"যারা একটা আদর্শের জন্য মরতে ভয় পায় না—তাদের রীতিমত সাহস আছে বলতে পার।"

—"কি লাভ?" নিরুৎসাহ কণ্ঠস্বর। ও যোগ করে, "লং ডিসটেন্সে যে সব ট্রাক মাল নিয়ে যায়, সে সব ড্রাইভারদের মেরে মাল নিয়ে নিচ্ছে। ড্রাইভাররা কি দোষ

করেছে বলতে পার?" চুপ করে থাকি আমি।

বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজতে চলেছে।

—"কে যে রাইট, আর কে যে রং, কিছুই বোঝা যায় না।" বলেই উঠে দাঁড়ায় জয়সিংহে। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার জাহাজ আর ক'দিন আছে?"

—"দু দিন।"

—"আবার আসবে তো?"

"দেখি"। বলে আমিও উঠি। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া ভালো। আবার যদি বৃষ্টি নামে।"

পরদিন বিকেল বেলা, জাহাজের মাল যখন নামানো হচ্ছে উইনচ আর ক্রেন দিয়ে তখন কথা হলো কার্গো সুপারভাইজার ফার্নান্ডোর সঙ্গে। সিলোনীজই তবে ডাচ অরিজিন। বললো—"মন দিয়ে কেউ কাজ করতে চায় না। আর করবেই বা কেন? ফ্রি রাইস, ফ্রি এডুকেশন, ফ্রি মেডিক্যাল।"

—"ফ্রি রাইস মানে?"

—"মানে সিলোনে প্রত্যেকে এক কিলো করে চাল পায় প্রতি সপ্তাহে।"

—"ভালোই তো", আমি বলি।

—"নো গুড। চাল আমদানি করি বার্মা থেকে চীন থেকে। সরকারের সব টাকা খরচা হয়ে যায় ফ্রি বন্দোবস্ত করতেই। অন্য নতুন ডেভেলপমেন্ট হবে কোত্থেকে? অন্য উপায়ও নেই। বন্ধ করলেই এই সরকার আর থাকবে না।"

কার্গো ... দিকে চলে যায়। বলে—"সী ইউ লেটার।"

—সন্ধ্যাবেলা জয়সিংহের বারে যাই আবার। চারজন জার্মান নাবিক টেবিলে ভিউ কার্ডে ঠিকানা লিখছে বাড়ির। কারোর গার্লফ্রেণ্ড নয়তো বউ আর নয়তো ছোট ভাইবোনকে পাঠাচ্ছে। আর আগের বন্দরের লোভিনকা লারলাকে হয়তো লিখছে—"আবার আমি আসব। অপেক্ষা করো।"

বারের সামনে দাঁড়িয়েই জয়সিংহের সাথে কথা বলি—"তুমি জানো, বিজয়সিংহ ওয়াজ এ বেঙ্গলী? আমিও বেঙ্গলী।"

—"ওহ, দ্যাট! দ্যাট ইজ লোন লোন ইয়ারস ব্যাক। নাউ অল মিক্সড। নো বাউণ্ডারিস!" জয়সিংহের কথার মধ্যে কোন প্রাণ নেই, কোনো উত্তেজনা নেই। যেন ওর সব সময়েই ঘুম পাচ্ছে। খালি হাই তোলে না, তুড়ি বাজায় না এই যা!"

আমি ছাড়ি না। —"অনেকে নিশ্চয়ই বলে।"

—"সে আমিও শুনেছি। বিজয়া ওয়াজ ভেরী ব্যাড বয়। হি ইউজ টু প্রবলম এভরিবডি। নেইবারস কমপ্লেনড টু হিজ ফাদার হু ওয়াজ এ কিংগ। সো, ফাদার অর্ডারড হিম টু গেট আউট অব দি হাউস—

অ্যাণ্ড বিজয়া কেম টু সীলোন।...অ্যাম আই রাইট?"

—"ইয়েস ইউ আর রাইট।" কিন্তু ইতিহাসের ব্যাখ্যান ওর ভাষায় শুনে আমি তো থ!

জয়সিংহে সার্ভ করতে চলে যায়। আবার ফিরে আসে।

জিজ্ঞাসা করি—"কলম্বোতে তো কোন গোলমাল নেই—"

"না এখানে কিছু হয় না। সব অনুরাধাপুরা, সাউথে আর ক্যাণ্ডিতে। তাও হেলিকপ্টার দিয়ে রোজ জঙ্গল সার্চ করা হচ্ছে।"

এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় দু পাশের জঙ্গলের দৃশ্য মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে ১৯৫৭র অনুরাধাপুরা। তখন ত্রিংকোমালিতে এসেছিলাম। সেখান থেকে বাসে অনুরাধাপুরা। জঙ্গল ঘেরা ছোট শহর। বুদ্ধের নিদর্শন বহু। উঁচু প্রাঙ্গণও খুব বিখ্যাত। সেইখানেই আজ আগুন! সব বদলে যাচ্ছে।

—"এই তো সেদিন আমাদের বাড়ির পাশ থেকেই আটজন ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল আর্মি। তার মধ্যে একটি ছেলে ছিল যার এক বছর হলো কলেজে ঢুকেছে। ওর শরীরে বুলেট উণ্ডও শুকোয় নি তখন।"

বলেই জয়সিংহে চলে যায় অন্য অন্য টেবিলে। আমার আর কিছুই বলার নেই। কিই বা বলার? কোনটা রাইট আর কোনটা রং সে কি আমিই জানি? জয়সিংহে ফিরে এলে, বলি—"আরেকটা বীয়ার দও। কালকেই তো চলে যাবো।" সামান্য হাসে ও। বীয়ার এনে ঢেলে দেয়। একটা বড় চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করি—"আচ্ছা, ওরা তো সবাই বিজয়বীরার মতো গরীব। তাই না?"

—"নো! নো! সাম্ ভেরী রিচ। অনেক পয়সাওলা লোক আছে।...কেন? কলম্বোর মধ্যেই পুলিসে, আর্মিতে, বড় অফিসে, ব্যাংকে ওদের লোক আছে। অথচ কিছু করতে পারে না। কারণ সবু শহরে সব একলা—একলা—আলাদা। আণ্ডারগ্রাউণ্ড।"

—"ইয়েস", বলি আমি।

আরেকটা সিগারেট ধরাই। প্যাকেটে তখন বোধ হয় দশ বারোটা সিগারেট ছিল। প্যাকেটটা জয়সিংহের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলি—"দিস ফর ইউ।" নিয়ে সাথে সাথে "থ্যাংক ইউ" বলে একটা সিগারেট আমার হাতে তুলে দিল।

—"টেক ওয়ান ফর দি রোড।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে—"তোমার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় তুমি সেইলর নও। কেননা, বহু সেইলরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

—"কি করে মনে করলে?"

—"বললাম তো, কথাবার্তায়।"

এবার আমি ওর আধবোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলি—"বিশ্বাস কর আর নাই কর আমি একুশ বছর ধরে সমুদ্রে আছি এবং সীলোনে বহুবার এসেছি। আর অনেক বন্ধুও আছে আমার।" মনে হলো বীয়ারের ঝোঁকে একটু বেশীই বললাম বোধ হয়। চট করে চুপ করে গেলাম।

কিন্তু অবাক হতে হলো জয়সিংহের কথায়। তখন শুধু আমি আর জয়সিংহে। বার খালি। টেপ-রেকর্ডারে মিউজিক চলছে।

—"আমি তোমাকে যখন দেখেছিলাম, বেঙ্গলী বলে ভাবতেই পারিনি। ভেবেছিলাম সাউথ থেকে এসেছ।"

আমার কিছু বলার নেই। পৃথিবীতে যেখানেই যাই সেখানেই আমাকে ভারত ছাড়া অন্য দেশের লোক মনে করে। প্রথমে আহত হতাম। পরে কৌতুকবোধে আনন্দ আসে। আরো বিভ্রান্ত করি লোকদের। এমন কি নিজের স্টেট থেকেও আমি অন্য স্টেটের লোক বলে গণ্য হই। তাই জয়সিংহের কথায় আশ্চর্য হই না। হাসি।

ও বলে—"তোমাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমি বিয়ে করিনি। ছেলেমেয়েও নেই। সব বাজে কথা। যাকগে সে সব কথা। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি ইউ কুড বি এ বেঙ্গলী। ও কে, গুড নাইট অ্যাণ্ড গুড লাক।"

"গুড নাইট!" আমিও বলি।

সন্ধ্যাবেলার মতো নীচে নেমে আসি। জাহাজ কালই সকালে। হেঁটেই যাওয়া যাবে। জয়সিংহে অনেক দূরে চলে গেল।

মানুষ অতুলপ্রসাদ

পাহাড়ী সান্যাল

॥ বারো ॥

আজ পাঠকদের কাছে একটা কথা স্বীকার করি। সেটা হল যে, আমার লেখার মধ্যে অনেক ঘটনাবলী আগুপিছু হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কারণ পাঠকেরা আমার এ কথা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে আমি যা কিছু লিখছি সবটাই স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ে। কাজেই ঠিক কোনটার পর কোনটা ঘটেছিল তা হয়তো সব সময় লিখে উঠতে পারব না। কিন্তু এই স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াতে বড় ভাল লাগছে। তাই যা যা যেমন যেমন মনে পড়ছে সেইভাবেই লিখে চলেছি।

আমার মত মানুষের পক্ষে দিন-ক্ষণ-তারিখ মনে রাখা মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার অতুলদার সম্পর্কে কিছু লিখবার সৌভাগ্য কোনদিন আমার ঘটবে। তাই ফেলে আসা বছরগুলোর অনেক কথা হয়তো বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। কিন্তু মন দিয়ে নিগূঢ়ভাবে ভাবতে ভাবতে যে সব কথা সুন্দর ছবির মত আমার মনে ফুটে উঠছে সেইগুলো আপনাদের সামনে ধরে দিচ্ছি। কাজেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি কথাই শুধু বলতে চাই যে দিন-ক্ষণগুলো উল্টোপাল্টা হওয়ার ভ্রমে দুষ্ট হলেও ঘটনাগুলি অতি সত্য। কেবল ব্যঞ্জনার মাধ্যমে কিছুটা রঞ্জিত হয়েছে নিশ্চয়।

অতুলদা এবং হেমকুসুমদির কথা লিখতে গিয়ে কোথায় যেন আমার নিজের জীবনের কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। অতুলদার সঙ্গে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা আরও অন্তরঙ্গ হয়েছে সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৫ কি ১৯২৬ সালে লখনৌ শহরে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর উদ্যোগে স্যার উইলিয়ম ম্যারিস কলেজ অফ হিন্দুস্থানী মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হল।

এই কলেজটির কথা লিখতে গিয়ে আর একটি তথ্য পাঠকদের জানিয়ে রাখা বোধ হয় অবান্তর হবে না। বাংলাদেশে লখনৌয়ের ওই মিউজিক কলেজের নামটি ভুলভাবে উচ্চারিত এবং লিখিত হয়। এই কলেজটির যখন স্থাপনা হয় তখন স্যার উইলিয়ম ম্যারিস ছিলেন ইউনাইটেড প্রভিন্সের গভর্নর। তিনি এই মিউজিক কলেজের ভিত্ স্থাপনা করেন যার ফলে এই কলেজটির নাম রাখা হয় Sir William Marris College of Hindusthani Music. কাজেই কলেজটির নাম কোনদিনই মরিস কলেজ (Morris College) ছিল না—ছিল Marris College.

যাই হোক, খুবই ঘটা করে কাএসর বাগের একটি বাংলো বাড়িতে এই কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন হল। এবং বহু মান্যগণ্য লোকের সমাবেশ হল সেখানে।

অবশ্য আমি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম না এবং আমার কোন ভূমিকাও ছিল না সে ব্যাপারে।

ভাল কথা, আর একটি জিনিস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে ১৯২৪ সালে যখন লখনৌ শহরে ফোর্‌থ অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হয় সেইখানে গুণী-সমাজের গান বিদগ্ধ জনেরা এই কলেজটি খোলবার পরিকল্পনা করেছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন রায় রাজেশ্বরবলী, তাঁর ছোট ভাই রায় উমানাথবলী, ঠাকুর নবাব আলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আর অতুলপ্রসাদ ছিলেন এঁদের এই ব্যাপারে একজন বিরাট উৎসাহী।

কলেজ তো খোলা হল, ক্লাসও আরম্ভ হল। এর মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী এক সন্ধ্যায় আমার গান শুনলেন ঠাকুর নবাব আলীর বাড়িতে। (এই ঠাকুর নবাব আলী সাহেবকে গুণীসমাজে রাজা নবাব আলী বলে জানে। তিনি ছিলেন আকবরপুরের বিরাট তালুকদার এবং সেই সূত্রে রাজা খেতাব তিনি সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন)।

গান শুনে ভাতখণ্ডেজী আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন মিউজিক কলেজে যোগ দিতে ছাত্র হিসেবে। আমি কিন্তু তখন ওস্তাদপন্থী শিক্ষার্থী। বহু মুসলমান ওস্তাদের কাছে আমার গান শেখা চলেছে। কাজেই স্কুল-কলেজ করে গান শেখা যায় এ কথাটাতে আমার মন সায় দেয়নি। আমি অতুলদাকে গিয়ে ব্যাপারটা বলি। তিনি আমাকে খুব উৎসাহিত করেন এবং এই ধরনের কথা বলেন যে, "তোমারই তো মিউজিক কলেজে জয়েন করা উচিত। কারণ, গান গাইতে যেমন শিখছ তেমনি তার বিশ্লেষণ এবং আঙ্গিক সম্বন্ধেও তোমার জানা বিশেষ প্রয়োজন।"

অতুলদার কথায় খুব বেশি উৎসাহিত বোধ না করলেও কলেজে যোগদান করলাম। তখন প্রায় মাসতিনেক ধরে ক্লাস চলছে। আমার হিন্দু গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকারজী আমাকে গাইতে বললেন এবং এমন কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন—অবশ্য সংগীতের আঙ্গিক সম্বন্ধে—যা আমার বোধগম্যই হল না তো তার উত্তর দেব কি! কাজেই চুপ করেই রইলাম। ফলে রতনজনকারজী তাঁর অত্যন্ত দুষ্টু চোখের মিষ্টি হাসি হেসে বললেন,

"It is all right Mr. Sanyal. You will know the answers as you become acquainted with all the grades of music. Of course we shall help you."

এই সময় একটা কথা বলে রাখি এটা সম্বন্ধে পরে সবিস্তারে লিখবার চেষ্টা করব। শুধু ইংগিত হিসেবে এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, যে মিউজিক কলেজে প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বে শিক্ষার্থী হিসেবে যোগদান করেছিলাম অতুলদার উৎসাহে, সেই মিউজিক কলেজের জন্যই একসময় অতুলদারই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান সত্ত্বেও আমার পক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাস করা সম্ভব হয় নি। নিয়তি কে ন বাধ্যতে। যাক, সে কথা পরে।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মিউজিক কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়াকালীন আমি সাইকেলে করে যাতায়াত করতাম আর প্রায়ই দেখতাম একটি কালোমতন মেয়ে টাঙ্গা থেকে নেমে মিউজিক কলেজে ঢুকত। চোখে পড়বার মত চেহারা তার মোটেই ছিল না। কাজেই ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্বও দিইনি। চেহারা দেখে শুধু মনে হত যে হয়তো বা বাঙালী।

এর মধ্যে একদিন মিউজিক কলেজের সাপ্তাহিক স্টুডেন্টস ডেমনস্ট্রেশনের দিন দেখি ওই মেয়েটিই গান করতে বসেছে। গান শুনে তার কণ্ঠটি অসামান্য মধুর বলে মনে হল। অ্যানাউন্সমেণ্টের মাধ্যমে নাম জানতে পারলাম—কুমারী প্রতিভা সেনগুপ্ত।

আবার বলছি মেয়েটির চেহারায় আকৃষ্ট হবার মত কিছু ছিল না।...আজ মনে হয় ভগবানের সঙ্গে দাবা খেলতে বসলে আমাকে পরাজিত করবার জন্য তাঁর ঘুঁটি যে কোনদিক দিয়ে চালান তা আমার পক্ষে, শুধু আমার পক্ষেই বা কেন, যে কোন মানুষের পক্ষেই বোঝা অসম্ভব।

এই ঘটনার দশ-পনের দিনের মধ্যে জানতে পারলাম যে ওই ভদ্রমহিলা আমারই একটি অত্যন্ত পরিচিত মানুষের বাড়িতে থাকেন। সে বাড়িতে আমার অবাধ আনাগোনা ছিল। তাই একদিন সে-বাড়িতে গিয়ে দেখি যে ওই মেয়েটি সেই বাড়িতে একেবারে বাড়ির মেয়ের মতই ঘোরাফেরা

করছে। দেখে বিস্মিত হলাম। মনে মনে ভাবলাম, কই এর আগে তো কোনদিন এ'কে এ বাড়িতে দেখিনি।

এই বাড়িটা হল তদানীন্তন কালের একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের। তাঁর নাম ডক্টর জি সি দাস। প্রতিভা সেনগুপ্ত মেয়েটি তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্রে এই বাড়িতে থাকেন। ডক্টর জি সি দাসের স্ত্রী হেমদির কাছ থেকে জানতে পারলাম যে মেয়েটি লখনৌয়ের একটি হাইস্কুলে হিস্ট্রির শিক্ষয়িত্রী।

হেমদি মেয়েটিকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি নির্লিপ্ত ভংগীতে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলাম। কেবল এইটুকু তাঁকে বললাম যে, 'আপনার কণ্ঠটি অত্যন্ত মধুর এবং আপনার হিন্দী উচ্চারণও প্রশংসনীয়।'

মেয়েটি অত্যন্ত লাজুক হওয়া সত্ত্বেও কথায়-বার্তায় বেশ সপ্রতিভ। কাজেই উত্তরে সে বলল 'আপনার গানও আমি শুনেছি কলেজের উইকলি ডেমনস্ট্রেশনে। কাজেই আপনার গলার সঙ্গে আমার গলার তুলনা করলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হব।'

কথাগুলি আমার এক কান দিয়ে প্রবেশ করে আর-এক কান দিয়ে নিশ্চয় বেরিয়ে গিয়েছিল। এ-ধরনের কথা শোনা আমার কাছে কিছু নতুন ছিল না। কাজেই ও-কথা শুনে আমার বিশেষ উল্লসিত হবার কোন কারণ দেখিনি।

তার পরই হেমদি বললেন, 'প্রতিভা যাও, পাহাড়ীর জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।'

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলাম এবং মেয়েটির কথা মনেও রইল না। তারপর মাঝেসাঝে যখন ডক্টর দাসের বাড়িতে গেছি, তখন মেয়েটির সঙ্গে কখনো-সখনো দেখা হয়েছে এবং উভয় তরফ থেকে একটু হাসি আর দু-চারটে নিতান্তই লোক-দেখানো কথা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

এরকমভাবে আরও তিন-চার মাস কেটে যাবার পর আবার একদিন উইকলি ডেমনস্ট্রেশনের সময় নাম পড়া হল—কুমারী প্রতিভা সেনগুপ্ত গাইবেন। মেয়েটি দুখানি গান গাইল—মেটা ফার্স্ট ইয়ারের ধারা অনুযায়ী শেখানো হয়েছিল। লক্ষ্য করলাম মেয়েটি ইতিমধ্যে প্রচুর উন্নতি করেছে। তার কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে চেহারাটা একটু খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। দেখে শুধু হতাশই হতে হল।

মানুষের অদৃষ্ট অদৃষ্টই। নইলে সেদিন সেখান থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে বোধহয় পালিয়ে যেতাম। যাই হোক, মেয়েটির গানে আকৃষ্ট হয়ে বোধ হয় আর-একটু ঘন ঘন ডক্টর দাসের বাড়ি যেতে আরম্ভ করেছিলাম। আর গেলেই তাকে বলতাম 'দেখি, আপনার গানের শিক্ষা কেমন চলছে একটু শোনান তো—'

আমার খুব ভাল করে মনে আছে, যেদিন প্রথম ডক্টর দাসের বাড়িতে তার গান শুনি সেদিন সে তার প্রাথমিক শিক্ষার ধারা অনুসারে একটি খাম্বাজ এবং একটি কাফী রাগে গান গেয়ে শুনিয়েছিল। ওই গান দুটি তখন আমিও শিখেছি কলেজে—অবশ্য আমি আলাদা সেকশনে শিখতাম আর সে আলাদা সেকশনে শিখত। গান দুটি আমার জানা বলেই বোধ হয় ওর গলায় শুনতে খুব ভাল লেগেছিল।

এর পরে হেমদি বললেন, 'পাহাড়ী তুমি একটু গাও না এবার। তবে তুমি রূপদ ও ক্ল্যাসিক্যাল গেও না। ওসব আমি বুঝি না। তুমি বরং বাংলা গান গাও।'

আমি বললাম, 'না, আজ আমি শু মিস সেনগুপ্তর গান শুনব। আমার গ আর একদিন হবে।'

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করে ভাল লেগেছিল যে মেয়েটিকে গান কর বললে সে ন্যাকামোর জালের আ দেখার চেষ্টা করত না।

বাংলা গান তার মুখে শুনলাম। স্ব প্রবাসের মানুষ, লখনৌয়ে বসবাস। কাচে তেমন করে রবীন্দ্র সংগীত শোন সৌভাগ্য আমার তখনও খুব ঘটেনি। আগে একমাত্র ঝুনুদির অর্থাৎ শ্রীম চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগ শুনে অভিভূত হয়েছিলাম। আপ্লুত করেছিলাম। সে কথা পরে বলব।

এ মেয়েটিও রবীন্দ্র সংগীতই গাই এবং সত্যিই খুব ভাল গাইল। বাংলা বলতে আমি কিন্তু তখন শুধু অতুল গানই বুঝতাম। তাই রবীন্দ্র সংগী বিরাটত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন ধারণাই ছি না। তবে এই রকম কিছু কিছু গান কণ্ঠে শুনে রবীন্দ্র সংগীতের বিব সম্বন্ধে ইংগিত পেতে আরম্ভ করেছিলা

এর পর মেয়েটি আমাকে ধরে ক গান গাইবার জন্য। আমিও বাংলা গ গাইলাম। অতুলপ্রসাদের গান। শু হেমদির হুকুম বলেই নয়, অতুলপ্রস শোনাব বলে।

মেয়েটি বোধ হয় তখনও অতুলপ্রসা গান সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিল ন শুনে সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, 'আম অতুলপ্রসাদের দু-একখানা গান শিখ দেবেন?'

প্রতিদানে মজুরি হিসাবে আমিও ত কাছে রবীন্দ্র সংগীত শেখবার প্রস্ জানালাম। মোট কথা রফা হল, আ দুজন দুজনকে গান শেখাব।

সেদিন রাত্রে যখন বাড়ি ফিরলাম আম মনটা তখন কেমন যেন এক অজা আনন্দে ভরপুর।

(ক্রম

পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণের প্রতি-শ্রুতি" প্রসঙ্গে

৬-১১-৭১ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় নের আসর" বিভাগে "পশ্চিম বাংলা করণের প্রতিশ্রুতি" শীর্ষক লেখাটি র্কে 'দেশ' পত্রিকার সহৃদয় পাঠক-ঠিকাগণের অবগতির জন্য প্রকৃত তথ্য না প্রয়োজন মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ াগ বিগত ডিসেম্বর মাসে বাংলার ক-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি আলোচনা র আয়োজন করেন। সমবেত প্রয়াসের মে এ ধরনের একটি পূর্ণাঙ্গ লোচনা-চক্র বাংলার লোক-সংস্কৃতি ায়নের ক্ষেত্রে প্রথম এবং একটি গুরুত্ব-র্ণ পদক্ষেপ। এ ধরনের নতুন উদ্যোগে ভ্রান্তির বাধ্যজনোচিত সমালোচনা কাম্য। ঃ অনভিপ্রেত ত্রুটির মার্জনা সুধীজনের '।

আলোচনা-চক্রের প্রবন্ধ রচয়িতাদের ১৫০ া হিসাবে পারিশ্রমিক দেওয়ার বিষয়টি রকদিন হয় অর্থ বিভাগের মঞ্জুরী লাভ রছে। একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ন্ধ রচয়িতাদের হাতে উপহার স্বরূপ সজ্জাচক্রে টাকাটি তুলে দেওয়ার ধান্তও ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। ন্ধগুলি ছাপানোর কাজও যথেষ্ট অগ্রসর রছে। আশা করা যায়, অনতিবিলম্বে াশনের কাজ সম্পূর্ণ হবে।

প্রকাশিত সংবাদে শার্ঙ্গদেব উল্লিখিত শ্চিমবঙ্গ সরকার ইচ্ছা করেই বিস্মৃত রছেন", "বিশ্বজ্জনের প্রতি এই ধরনের

নিকৃষ্ট এবং অধম ব্যবহার' ইত্যাদি মন্তব্য-গুলি তথ্যানির্ভরও নয়।

মানিক সরকার
পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও জনসংযোগ অধিকার

গগনেন্দ্রনাথ

দেশ পত্রিকায়—শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮, সংখ্যা ৫—'মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'গগনেন্দ্রনাথ' ৪৯৩ পৃষ্ঠায়—'রাজার ভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথ' বলে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, তাহা কোনও কারণে ভুল করে ছাপা হয়েছে—এটি রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময়—শাপমোচন নাটকে রাজার ভূমিকায় শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আমারই তোলা ছবি—আমার কাছে এখনও আছে। ভবিষ্যতে ভুল ধারণা থেকে যেতে পারে আশঙ্কায় সকলের অবগতির জন্য জানালাম।

প্রশান্ত রায়
শান্তিনিকেতন।

দেখা হয় নাই

'দেশের' ১৬ই অক্টোবর, '৭১ সংখ্যায় (সংখ্যা ৪৯) শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মীরপুরে' সম্বন্ধে লেখাটির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। লেখাটি চিত্তাকর্ষক হলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে যে কয়েকটি তথ্যগত ভুল ঘটে গেছে, তা মীরপুর গ্রামে এলে 'দেশের' পাঠক-পাঠিকার সহজেই চোখে পড়বে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ গবেষকের পক্ষে এ ধরনের ত্রুটি আমাকে বিস্মিত করেছে। বর্তমান আলোচনার অবতারণা সেই কারণেই।

জানিনা "ক্বচিৎ-আগত" আগন্তুক হয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কত দিন আগে মীরপুরে গিয়েছিলেন। কয়েক মাস আগে আমার ওই গ্রামে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। অবশ্য নিছক বেড়াবার তাগিদে নয়। নৃতত্ত্বের একজন ছাত্র হিসাবে আমি মীরপুর গ্রামের পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত খৃষ্টান সমাজে গত দশ বছরে যে সকল পরিবর্তন ঘটেছে, তা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলাম। এই অনুসন্ধানে মীরপুর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল Census 1961, West Bengal, Midnapore, Vol. 11, pp. 33-37)। সম্প্রতি নানাসূত্রে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। "দেখা হয় নাই" পর্যায়ে মীরপুর, তাই আমার কাছে সময়োপযোগী একটি অনন্য উপহার।

লেখকের মতে, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের "গীর্জা দুটি খড়ে-ছাওয়া কুটির"। এ প্রসঙ্গে মীরপুর গ্রামের একটি গীর্জার ছবিও প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে (পৃঃ ১০১৫)।

বাস্তবে ক্যাথলিকদের এই গীর্জাটির চাল টিনের (corrugated iron sheet)। প্রোটেস্টাণ্টদের গীর্জাটিও "খড়ে-ছাওয়া" নয়, টালির। এই গীর্জা দুটিকে সাধারণ-ভাবে "কুটির" বললেও ভুল করা হবে। "প্রোটেস্টাণ্টরা বৈঠকখানার চার্চকে তাঁদের প্রধান গীর্জা বলে মানেন"—এ কথা ঠিক নয়। তাঁরা চৌরঙ্গীর সেণ্টপলস ক্যাথিড্রেল চার্চকেই, কলিকাতা-১৬, "প্রধান গীর্জা" বলে উল্লেখ করেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "উৎসবে-পার্বণে সেখান থেকেই তাঁদের পাদরীরা আসেন।" কিন্তু বাস্তবে ক্যাথলিক ফাদার বা পুরোহিত ("পাদরী" কথাটি এ'রা সচরাচর ব্যবহার করেন না) নিয়মিতভাবে প্রতি ইংরেজী মাসের তৃতীয় শনিবারে ও প্রোটেস্টাণ্ট ফাদার বা পুরোহিত চতুর্থ শনিবারে মীরপুর গ্রামে আসেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পাপ-স্বীকার অনুষ্ঠানের নিয়ম আছে, তাতে ফাদার ছাড়া অন্য কারো অধিকার নেই। অবশ্য প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে পাপ-স্বীকার অনুষ্ঠানটি বাধ্যতামূলক নয়। ফাদার গ্রামে না থাকার কারণে তাঁর নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধি বা সরকার স্বতন্ত্রভাবে গীর্জা দুটি দেখাশুনা ও রবিবার সকালে প্রার্থনা পরিচালনা করেন। এ'রা উভয়েই পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত। ফাদার উপস্থিত থাকলে, সরকার একজন সাধারণ ভক্ত হিসেবেই প্রার্থনায় যোগ দেন। সমবেত ভক্তেরা গীর্জার ভেতরে মাদুরে বসেন। খোল, করতাল, ঘণ্টা, ডুগি-তবলা ও হারমোনিয়ম সহযোগে প্রার্থনা-সংগীত গাওয়া হয়। গ্রাম-বাংলার নিভৃত পল্লীতে এই দুটি গীর্জার ভেতরে দেখবার ও জানবার মত অনেক তথ্য আছে যা 'দেশের' পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দ দেবে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, ক্যাথলিকদের গীর্জায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা আছে, তাতে প্রোটেস্টাণ্ট ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনা করে। সম্প্রতি এই গ্রামে একটি নতুন প্রাইমারী স্কুলও হয়েছে। মনে হয়, সময় অভাবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এগুলি দেখা হয় নাই।

লেখক হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে কেবলমাত্র পর্তুগীজ মূল নামগুলির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। ফলে, এই গ্রামের পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত পুরুষ ও মহিলাদের বাঙালী-ঘেঁষা মূল নামগুলি তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত বিজয়, বসন্ত, নিশিকান্ত, তরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, শচীন্দ্র, বিমান, ভূষণ, নিখিলেশ, হিমাংশু, সুধীর, সুশীল, নির্মল, সুবিমল ও মেয়েদের মধ্যে তরঙ্গিনী, নয়নবালা প্রভৃতি নামগুলি পরোক্ষভাবে বাঙালী-সমাজের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ও ভালবাসা প্রকাশ করে। মনে হয়, একটু সতর্ক হলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেন না যে, "...এই 'অপর গোষ্ঠী'র এখন আর কোন বংশগত স্বাতন্ত্র্য নেই; পার্থক্য যা তা শুধু তাঁদের নামে।" আমার মতে নামে নয়, পদবীতে। তবে "কোন বংশগত স্বাতন্ত্র্য নেই" এই পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। এ'দের "লাভ-ম্যারেজ"র কথা বলতে গিয়ে লেখক নিজেই তো "পর্তুগীজ ঐতিহ্যের" প্রশ্নটি তুলেছেন।

মীরপুরে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট এই দুই শ্রেণীর "আনুমানিক সংখ্যা যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমার হিসেবে ক্যাথলিক ২২৬ ও প্রোটেস্টাণ্ট ১৫৮। এ'দের "সাহেবিয়ানার" চিহ্ন হিসাবে লেখক বলেছেন, "টালি-ছাওয়া কুটিরের সংখ্যাই বেশী।" বাস্তবে, ক্যাথলিকদের ৩৫টি বাড়ির মধ্যে টালি-ছাওয়া ১৮ ও খড়ে-ছাওয়া ১৭। একইভাবে, প্রোটেস্টাণ্টদের ২১টি বাড়ির মধ্যে টালি-ছাওয়া ৯ ও খড়ে-ছাওয়া ১২। এ-পাড়ার চারটি মাটির দোতলা বাড়িও কি "কুটির"? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মোট ৫৬টি বাড়ির মধ্যে ৪৭টিরই মুখ দক্ষিণে। হয়ত স্থানীয় হিন্দুদের অনুকরণে কালক্রমে এ'রাও দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিদগ্ধ গবেষকের এ কথা অজানা নয় যে, "গৃহস্বামীকে অনেক-ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে" সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। অথবা, পরস্পরবিরোধী মুখের কথা "টুকে" নেওয়া ছাড়াও সম্ভব হলে সব কিছু দেখাই ভাল—যদি পাঠক ও গবেষকদের পথনির্দেশের ইচ্ছা থাকে।

লেখক "সম্পন্ন গৃহস্থঘরে" গৃহসজ্জার উপকরণের যে ফর্দ দিয়েছেন, তা এ'দের মত শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ও নিম্নবিত্ত গৃহস্থের সঠিক চিত্র প্রকাশে সহায়তা করেছে বলে মনে করি না। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে "সম্পন্ন গৃহস্থের" বা "সাহেবিয়ানার" মাপকাঠি কি তা জানলে উপকৃত হব। তবে তাঁর লেখা থেকে জেনেছি যে, "যাঁদের ভূসম্পত্তি বেশী, তাঁরা প্রধানত কৃষিনির্ভর, কিন্তু এ হেন গৃহস্থের সংখ্যা কম বলে অনেককেই বাইরের চাকুরিতে যার হতে হয়েছে।" এ অবস্থায় "...বিস্কুট, কেক পাউরুটির প্রতি আসক্তি কিছু বেশী" হলেও, "অমিতব্যয়িতার" প্রশ্নটি সুযোগ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখতে হবে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "পর্তুগী... উৎস থেকে শুরু করে বাঙালীয়ানার সড়... এ সম্প্রদায় বহুদূরে অগ্রসর হয়ে এসেছে। কিন্তু এ অগ্রগতির মাপকাঠি কি... "...আনুমানিক আট পুরুষে এ অঞ্চলে... অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের 'মিশ্রণ' কে... হিন্দু লোকাচার ও দেশাচারের প্রতি... পর্তুগীজ বংশোদ্ভূতদের আকৃষ্ট করেছে, ... নিঃসন্দেহে এখনও গবেষণার বিষয়... মীরপুরের পর্তুগীজ-খ্রীষ্টানদের মধ্যে... ব্যাপ্‌টিজম বা নামকরণ (এ'রা বলে... বাপতিস্ম), অন্নপ্রাশন, গায়ে-হলুদ, শাঁখা-সিঁদুর পরা ইত্যাদি হিন্দু আচার... অনুষ্ঠানের প্রচলন থাকলেও, সর্বক্ষেত্রে... খ্রীষ্টান ও হিন্দুমতের মধ্যে সমন্ব... ঘটেছে। এই অনুষ্ঠানগুলি বিস্তারিতভাবে... আলোচনা করলে লেখক আমার সঙ্গে... একমত হতেন যে, অন্নপ্রাশনের প্রথাটি... "ঠিক হিন্দু রীতি অনুসারেই পালিত হয়... না। অথবা এগুলির ধর্মবিহিত তাৎপর্য... এক নয়।

যদি আমরা মনে করি যে, মীরপুরে... পর্তুগীজ বংশোদ্ভূতদের মধ্যে কেবলমাত্র... হিন্দুদের বাছাই-করা কয়েকটি সামাজিক... প্রথা ও ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তবে... একটি দুঃখজনক ভুল করা হবে। উচ্চবর্ণের... হিন্দুদের অনুকরণে বিশেষ করে এখানকার... ক্যাথলিক সম্প্রদায়, বরপণ প্রথাটি গ্রহণ... করেছেন। শুধু তাই নয়, এ'দের মধ্যেও... পণপ্রথা একটি জটিল সামাজিক সমস্যারূপে... গণ্য হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে "বরপণ... বা কন্যাপণের রেওয়াজ নেই" বললে সত্যকে... কিছুটা অস্বীকার করা হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, মীরপুরের... পর্তুগীজ-খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাঁদের সমাজ-... জীবনে হিন্দুয়ানীর প্রতীক অনুষ্ঠানগুলির... সমঝদার হয়ে শাঁখা-সিঁদুর, আলতা, ঘুনসি,... ঘোমটা, মাদুলি, তেল, হলুদ ও বিয়েতে... ঘটকের সহযোগিতার রেওয়াজ করলেও,... জানি না স্থানীয় জনজীবনে, বিশেষত থাক-... বন্দী হিন্দু-সমাজে, কতটুকু স্বীকৃতিলাভ... করতে পেরেছেন। অপর পক্ষে, পর্তুগীজ... ঐতিহ্যের প্রতিও এ'রা কিন্তু কম সচেতন... নন। ফলে, বিশেষভাবে পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত-... দের জটিল মানসিক দ্বন্দ্বের বুঝি শেষ নেই।... ঐতিহাসিক কারণে ছিটকে-পড়া পর্তুগীজ-... জলদসুদের জীবননাট্যের ইতিবৃত্ত, মীরপুরে... এসে ভারতবর্ষের বাইরে ভা... দের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

পরিশেষে, আপনার বহুল প্রচারিত ও প্রশংসিত 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও মন্তব্য প্রত্যাশা করি।

তারাশিস্ মুখোপাধ্যায়
তমলুক

আঁদ্রে মালরো-র চিঠি

প্রখ্যাত ফরাসী লেখক ও মনীষী আঁদ্রে মালরো আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে ল্য ফিগারো পত্রিকায়। মানুষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে এই চিঠিখানি স্বর্ণাক্ষরে উদ্ধৃত হবার যোগ্য। নিকসনকে লেখা তাঁর চিঠিখানি এই রকম:

"[illegible] হলো, মিঃ প্রেসিডেন্ট বাংলার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যখন আবার হয়তো স্বদেশে ফিরতে শুরু করেছে, তখনও আপনি ভারতকে চিঠি দিয়ে জানালেন যে আপনার দেশ, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটি, পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ। আপনার দেশের সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে এ খবর জানলাম। সেই সূত্রে একথাও জানা গিয়েছিল যে, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরের দিকে গেছে।

"জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যদি আপনার এতই গভীর সম্পর্ক, তা হলে আগে তাঁকে কিছু উপদেশ দেননি কেন? আমি আপনার দেশ সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। আপনার দেশের মানুষ নির্বাচনে জয়ী কোনো ব্যক্তিকে (এমন কি নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিকেও) কারাগারে নিক্ষেপ করা পছন্দ করে না। তারা তাদের কোনো বন্ধু দেশের কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এক কোটি উদ্বাস্তু ঠেলে দেওয়াও পছন্দ করে না। কিছু আসে যায় না আপনারা দানধ্যানে। মৃত ব্যক্তিকেও আপনি দয়া করতে পারেন।

"যদিও আপনার নৌবহর কলকাতাবাসীদের ভয় দেখিয়েছে—তবু কি আমেরিকা লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু মানুষের বিরুদ্ধে সত্যিই যুদ্ধ করতে পারে? তা ছাড়া বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী, অর্থাৎ আপনার সেনাবাহিনী ভিয়েতনামের পাদুকাহীন চাষীদেরও যুদ্ধে হারাতে পারেনি। এখনও কি আপনি মনে করেন, ইসলামাবাদ তার দেশের ১৯০০ কিলোমিটার দূরের যে অংশ স্বাধীনতার জন্য প্রজ্বলিত হয়েছে, তাকে আবার যুদ্ধ করে দখল করতে পারবে?...

"আপনার জানা দরকার ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগে (প্রসঙ্গত আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভারতের আটটি বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণের পরই ভারতবর্ষ যুদ্ধ শুরু করেছে) আমরা এখান থেকে কয়েকজন স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে যুদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমরা প্রায় দেড়শো জন অভিজ্ঞ অফিসার। সংখ্যাটা খুব কম নয়। ক্যানটনিজ কৌশল অবলম্বন করে [illegible] এই সংখ্যা এক বছরেই এক হাজার হয়ে উঠতে পারতো। ১৫ই নভেম্বর আমাদের যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু কোনো খবর পাইনি। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রয়োজন হয়নি। আমি একথা

বলতে চাই না যে, একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদেশের একটি প্রতিনিধিদলের শক্তির কোনো তুলনা চলে—কিন্তু যতদিন পাকিস্তান ভারতকে যুদ্ধে বাধ্য করেনি—ততদিন স্বাধীন বাংলার জন্য আমরা যতটুকু সমর্থন জানাতে পারতাম—তারও একটা মূল্য ছিল। আমরা ছাড়া, আর কে সাহায্য করতে চেয়েছে?

"আপনি যখন চুক্তির কথা (পাকিস্তানের সঙ্গে) বলছেন, তখন সময় থাকতে থাকতে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। চীন এবং রাশিয়া এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার আগে, এমন কি আপনারাও জড়িত হবার আগে, ওখানে সত্যি সত্যি কি ঘটেছে?

"বাংলাদেশে নির্বাচন হলো। পাকিস্তানীরা জেতার আশা করেছিল, কিন্তু দেখা গেল, বিরোধীরা ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিই জিতে নিয়েছে। তার ফল কি হলো, ওরা বিরোধী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে ভরলো। শেখ মুজিব অনেকটাই অহিংসপন্থী, ধৈর্য ধরে পাকিস্তানীদের জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলেন,—তিনি জানতেন ওরা এসে তাঁকে গ্রেফতার করবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দেখাবে। এরকম ঘটেনি? হ্যাঁ কি না বলুন! এটা ঠিক, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে একজন পরাজিত প্রার্থী একজন জয়ী প্রার্থীকে জেলে ভরার মতন ঘটনা নয়? তখন এর প্রতিকারের জন্য কি করেছিলেন? এই মানুষটিকে জেলে ভরার ঘটনা আপনারা নীরবে দেখলেন—এবং, যদি আমি ভুল না করে থাকি, তা হলে এখনও আপনারা দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেই যাচ্ছেন। ভারী ধৈর্যশীল চুক্তি আপনাদের।

"ধৈর্য ধরেছিলেন তখনও, যখন এক কোটি শরণার্থী ক্ষুধা ও নৈরাশ্যে বিধ্বস্ত অবস্থায় ও-দেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছিল। পাকিস্তানীরা বিরোধী নেতাদের ধরে ধরে খুন করতে লাগলো—তার ফলে বাংলার আর্ত ভীত হিন্দুরা এবং কিছু মুসলমানও—পালাতে লাগলো দেশ ছেড়ে। আপনারা বলতে শুরু করলেন, 'এটা একটা যুদ্ধ'—কিন্তু আসল ব্যাপার এই, তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি।

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, একথা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে ভারত পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত এক কোটি অসহায় উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু ভারত থেকে, এমন কি, কাশ্মীর অঞ্চল থেকেও একটি মুসলমানকেও পাকিস্তানের আশ্রয় নিতে হয়নি।

"আমি আশা করবো, প্রত্যেকটি আমেরিকান প্রশ্ন তুলবে, কিসের জন্য আমরা যুদ্ধ করবো? আমাদের যুদ্ধ করার কি কারণ ঘটেছে? পাকিস্তানী বাংলায় যদি সব কিছুই স্বাভাবিক—তা হলে, বেলজিয়ামের জনসংখ্যার চেয়েও বেশী সংখ্যক মানুষ কেন দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়? অনেকে বলে, শ্রীমতী গান্ধীর যুক্তিগুলো ঠিক নয়। ও'র রিফিউজি ক্যাম্পেও তো মানুষ মরে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তো ভারতের কোনো জেলে আবদ্ধ নন! (প্রসঙ্গত, আপনার বন্ধুদের কি বলবেন, ওঁকে এখন মুক্তি দিতে?)

"সেনাপতি দ্য গলের সঙ্গে আমাদের আলোচনার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। আপনি তখন সদ্য ক্ষমতা পেয়েছেন, এবং আপনি আমার সঙ্গে মার্কিন নীতি আলোচনা করে আমাকে সম্মানিত করেছিলেন। আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমেরিকাই প্রথম দেশ যে ইচ্ছে না করেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আলেকজান্দার চেয়েছিলেন আলেকজান্দার হতে, সীজার হতে চেয়েছিলেন সীজার—কিন্তু আপনারা তো বিশ্বের প্রভু হতে চাননি। কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বিশ্বের প্রভু থাকা যায় না।

"বিশ্বের ভাগ্য যখন বিপন্ন তখন বঙ্গোপসাগরে কয়েকটি বিমানবাহী জাহাজ পাঠানো কোনো নীতিই নয়। এটা অতীতের জের টানা। কুড়ি বছর ধরে এড়িয়ে যাবার পর—আজ আপনারা চীনের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করতে চলেছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের সঙ্গে দরিদ্রতম দেশের পুরানো হয়ে যাওয়া আলোচনা। স্বাধীন বাংলার ক্ষেত্রে—আবার যেন এটা বুঝতে আপনার কুড়ি বছর না লাগে যে ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স যে দেশে হয়েছিল সেই দেশ কখনও আর একটি দরিদ্র দেশের স্বাধীনতার লড়াই দমন করতে পারে না।

"আমি একথা বিশ্বাসই করতে পারি না যে, আপনাদের বিখ্যাত স্ট্যাচু অব লিবার্টি টেলিভিশনের পর্দায় লক্ষ লক্ষ মানুষের এই দুর্দশার দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছে। কোনো এক সময় মনে পড়বে, তাকে এক সময় স্বাধীনতা বলা হতো। স্ট্যাচু নয়—আমি আসলে আপনার কথাই বোঝাচ্ছি।"

সনাতন পাঠক

এ কজন সাহিত্যিকের সঠিক জীবনী, তাঁর সাহিত্য। গভীর অর্থে কথাটা মানার বা না-মানারও হয়ত যুক্তি আছে। কিন্তু যিনি একান্তভাবে অন্তর্মুখিন, আত্মজীবন যাঁর রচনার বিষয়, এবং প্রায় গল্পেই যাঁর নায়ক এক অন্তরঙ্গ 'আমি' তাঁর লেখাকে অন্তর্জীবনের ইতিহাস বলতে বাধা কোথায়। সিজার পাভেসির গল্প সংকলন প্রসঙ্গে প্রশ্নটা আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে। কারণ, আত্মমগ্ন এই ইতালীয় লেখকের জীবন তাঁর গল্পের চেয়েও অব্যক্ত এবং আকস্মিক। পাভেসির তখন পরিণত যৌবন, প্রতিভার স্বীকৃতি দেশ-বিদেশে, শিক্ষকতা ছেড়ে সাহিত্য-

Told in confidence : Cesare Pavese. Peter Owen. London. £2.00.

প্রেমিক লেখক তখন এক অভিজাত প্রকাশনা সংস্থার সম্পাদক—সম্মান ও সমৃদ্ধির মসৃণ সড়ক তাঁর নাগালের মধ্যে, ঠিক তখনি একদিন হঠাৎ ঘরে বসে আত্মহত্যা করলেন তিনি। কিন্তু কেন তিনি এমন করতে গেলেন? সে সম্পর্কে তাঁর পরিচয়দাতারা নিরুত্তর। হয়ত বাইরে থেকে এই স্বভাবগোপন লোকটি সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। হয়ত আত্মহননের গূঢ় কারণ নিহিত ছিল তাঁর স্বপ্নচৈতন্যে, বোধের গভীরে। পাভেসির গল্পগুলোর মধ্যে যে বোধ আর বেদনার ছায়া বিন্যস্ত। আত্মচিন্তার খসড়ার মত টুকরো টুকরো দশটি লেখা। কিন্তু টুকরোগুলো জুড়লে ভেসে ওঠে একখানা অসহায় বিমর্ষ মুখ। এক স্মৃতিভারাতুর দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণ। আশ্চর্য লাগে না, যে মোরাভিয়ার সমকালীন পাভেসির জনপ্রিয়তা এত সীমিত।

মৃত লেখকের ঘর থেকে বেরিয়েছিল অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। এই সংকলনের গল্পগুলোও সেখান থেকে পাওয়া। গল্পগুলোর রচনাকাল তাঁর মৃত্যুর অনেক আগের। তবু এর মধ্যেই ছড়ানো তাঁর জীবন সম্পর্কে এক বিষণ্ণ রিক্ততা বোধ। বিশ্বাস রাখবার মত সব অবলম্বন যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছে একে একে। লেখক কেবলই কামনা করছেন এক নিভৃত নির্জনতার বিশ্বাসী আশ্রয়। মহাযুদ্ধের আঘাতে ক্ষুব্ধ ইতালির আর্তনাদ যেন সেই নির্জনতাকামী অস্তিত্বকে আরো দূরে পরবাসে ঠেলে দেয় দিনে দিনে। তাই তিনি তাঁর গল্পের নাম দেন 'Told in Confidence' ডায়েরির পরিচয় হল 'This Business of Living' আর [illegible] বলেন, 'A Mania for Solitude'।

শুধু নামেই নয়, গল্পের বিষয় এবং রচনাভঙ্গির মধ্যেও আছে তাঁর নিস্তব্ধতার সাধনা। শৈশবজীবন আর প্রকৃতিমগ্নতার আশ্চর্য উদাহরণ। 'Nudism' গল্পটির মধ্যে দেখি, গল্পের 'আমি' প্রতিদিন পাহাড়ের নিচের নির্জন ঝরনার জলে মগ্ন

সিজার পাভেসি

হয়ে সাঁতার কাটে। জলকাদা মাখা শরীরটা তার তারপর সারাদিন মাটির ওপর পড়ে থাকে। চারদিকে গাছগাছালি, মেঘের ছায়া, মাটির গভীর থেকে পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ করে, কানে আসে প্রজাপতির ডানার শব্দ, নাকে ভেসে উদ্ভিদের ঘ্রাণ। তার যেন মনে হয়, সে এখন গাছের শিকড়ের মত, আকাশের মত, একটি শিশুর মত নগ্ন। সহসা প্রলোভন হয় এই আশ্চর্য অনুভূতির সঙ্গে সুররিয়ালিস্টদের তুলনা করতে। জীবনানন্দের কথাও মনে পড়ে। কিন্তু না, এর মধ্যেও পাভেসির পুরো পরিচয়টা নেই। এটা তাঁর জটিল মানসিকতার একটা অংশ মাত্র। প্রকৃতি ও শৈশব জীবনের আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর অন্য এক গভীরতর অসুখের কারণ। যে অসুখ [illegible] জীবনভাবনায়।

'The End of August' গল্পে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর মনের মধ্যে দুটি সত্তার অস্তিত্ব: একটি তাঁর শৈশব, অন্যটি বর্তমানের যুবক সত্তা। এই দুয়ের নিয়ে সংঘর্ষে আসে এক গোপন অপরাধবোধ, অস্বের আত্মগ্লানি। অগাস্টের এক নির্জন সন্ধ্যায় বান্ধবীর সঙ্গ উপভোগ করছেন তিনি। নারী-শরীরের নিবিড় উষ্ণতা, অনুরাগভরা চুম্বন যখন তাঁকে দেহকামনায় উন্মুখ করে তুলছে, ঠিক তখনি কোথা থেকে এক ঝলক মৃদু হাওয়ার স্পর্শ লাগে তাঁর কপালে: ফর ফর করে কোথায় যেন উড়ে যায় একটা শুকনো পাতা। এই শব্দ বা হাওয়ার স্পর্শই যেন হঠাৎ সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় তাঁর শৈশবকে। বান্ধবীর নিবিড় আলিঙ্গন তখন তাঁর আর একটুও ভাল লাগে না। সেই উষ্ণ উন্মুখ দেহটার উপস্থিতিই যেন তাঁর স্নিগ্ধ শৈশবস্মৃতির পথে এক কুৎসিত প্রতিবন্ধক। শেষ পর্যন্ত এই অদ্ভুত মানসিক যন্ত্রণার চাপে তাঁর নিরুপায় কল্পনা বেছে নেয় এক স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিলোপের সাধনা।

ফলে নারীপ্রেমেও কোন তৃপ্তিকর আশ্রয় নেই তাঁর। এক দিকে তীব্র ঘৃণা, অন্য দিকে যৌবনের উগ্র আকাঙ্ক্ষা—এর মধ্যে পড়ে প্রেম সম্পর্কে ধারণাটাই বড় বিষাক্ত হয়ে যায়। তাঁর গল্পের নারী মাত্রই ব্যভিচারিণী।—এক বান্ধবীর এই অভিযোগের উত্তরে লেখক তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন: এ রকম না হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। সংকলনের একটা গল্পে দেখি, নারীদেহের সঙ্গে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের তুলনা দিতেও দ্বিধা হয় না তাঁর। একটা সিগারেট টানার মতই নাকি সস্তা এবং ক্ষণস্থায়ী সুখ ভালবাসায়। এর সীমা বাড়তে গেলে আগুনটা হাতে এসে লাগে, তাই প্রয়োজন মিটলেই সিগারেটের টুকরোর মত বাতিল কর দেহটাকে। কী বলব এই দৃষ্টিভঙ্গীকে? মরবিড? কিন্তু যাই বলি না কেন, যুদ্ধমথিত ইতালির যৌনজীবনের ভূমিকাকেও এর নেপথ্য থেকে বাদ দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে অন্তত মোরাভিয়া আমাদের কিছু সাহায্য করবেন।

বলা বাহুল্য, জীবন সম্পর্কে এই নিরাশ্রিত অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম বড় ভয়ঙ্কর। মগ্ন স্মৃতির নির্জনতায় বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেও এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। শৈশব নস্টালজিয়া ত অন্য এক জন্মের স্মৃতি। তার মধ্যে ডুবে কে কবে বর্তমানের আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণার দায় এড়াতে পেরেছে। একদিকে জন্মান্তরের স্মৃতির আকর্ষণ অন্য দিকে বর্তমানের দুর্বহ আত্মিক সংঘর্ষ—কে জানে, এর মধ্যে থেকে পরিত্রাণের একটা পথই হয়ত খোলা পেয়েছিলেন পাভেসি। অন্তত তাঁর চিন্তাপ্রবাহে, জীবনভাবনায় যে এর সম্ভাবনা ছিল সে কথা কে অস্বীকার করবে।

বিভূতি রায়

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী। আরাশংকর ন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য ফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা ৯। দাম সাড়ে র টাকা।

এই বইটি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেন্দ্রচন্দ্র-স্মৃতি বক্তৃতামালা। বক্তৃতাটি বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে প্রদত্ত হয়েছিল। সাহিত্য সংসদ এই বক্তৃতামালাটি তারাশংকরের মৃত্যুর মুহূর্তে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করে এক সময়োপযোগী কর্তব্য করেছেন।

ঔপন্যাসিক তারাশংকর প্রারম্ভিক নিবেদনে যথাসম্ভব বিনম্রভাবে তাঁর অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার অভাব জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিবলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এমন একটি দিককে তিনি আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন, যে বিষয়ে তাঁর মতো যোগ্যতা খুব কম শিল্পীরই আছে বলে মনে করি।

আঠার-শ নব্বুই থেকে উনিশ-শ সাল পর্যন্ত—এই দশ বছরের রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীজীবন ও প্রকৃতির ভূমিকাই তাঁর আলোচনার বিষয়। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঘোটে ঘুরে জমিদারি দেখছেন, বৃহত্তর গ্রামবাংলার পরিচয় তিনি পাচ্ছেন, জাতীয়তার চেতনা চতুর্দিকে স্পষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল প্রতাপ তখন। রাজপুতনার ঐশ্বর্যময় ইতিহাস-রোমান্সের রঙীন আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত। আঠারো-শ তিরানব্বুই-তে বৃহত্তম কলেবরে সংশোধিত 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়েছে। এই রস-সংস্কারে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠকের কাছে সামান্য মানুষের প্রাত্যহিক পরিচয় প্রকাশ নেহাতই ছিল আকর্ষণহীন। দরিদ্র জীবনের উপকরণ নিয়ে গল্প রচনা করে পাঠকের মনজয় করা সহজ ছিল না তখন। অথচ ছিন্নপত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশী চাকচিক্য ছেড়ে দেশের মাটির প্রতি অকৃত্রিম মমতাই প্রকাশ করেছিলেন। তারাশংকরের মতে রবীন্দ্রনাথের গভীর দেশপ্রেম—মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি নিবিড় টানই পদ্মার চরে চরে নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মাতিয়েছিল। এ যুগের প্রায় পঞ্চাশটি গল্পে বাংলার গ্রামজীবনের অফুরন্ত ছবি ফুটে উঠেছে।

তারাশংকর ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষের ব্যক্তিত্বকে কখনোই নিঃসঙ্গ একক মনে করতেন না। মানুষকে তিনি তার সামাজিক পরিবেশে ও জাতীয় সংস্কারের ভেতর দিয়েই দেখেছেন। অথচ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ শিল্পীর কল্পনাশক্তিতে সেই সব মানুষ সামাজিক ও জাতীয় সংস্কার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে স্মরণীয় সাহিত্যিক চরিত্র' হয়েছে, দেশ-কালের গণ্ডি

ছাড়িয়ে গেছে। তারাশংকর রবীন্দ্র গল্পসাহিত্যের এই মহৎ সার্থকতার দিকটিকে প্রচুর উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের এই মর্যাদা যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি রয়েছে আভিজাত্য ও শিক্ষাভিমানকেও কঠোরভাবে আঘাত করার প্রমাণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণ ভূমি-নির্ভর মানুষের যে ছবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন, সমসাময়িক কালে আর কোনো শিল্পীই এই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন না। তারাশংকরের সমালোচনা এই পর্যায়ে সহানুভূতির মিশ্রণে অদ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে। 'শাস্তি' গল্পের তাৎপর্যকে তিনি নতুন করে প্রকাশ করেছেন।

পল্লীসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রধারণাকে তারাশংকর খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে সব সময় গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতো না বা হওয়া উচিত নয় এ মন্তব্য করতেও তিনি সাহসী হয়েছেন। এ বিষয়ে আমরাও একমত যে, চিরন্তন আদর্শকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবোধে সর্বতোভাবে গ্রহণ করা যায় না।

সাহিত্যে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে দেখবার দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। একটা দৈনন্দিন সংগ্রামী কর্মজীবনের বাস্তবতা। আর একটা, সেই প্রাণচাঞ্চল্যের ভিতরকার আধ্যাত্মিক বাস্তবতার জগৎ। এই দুটি মিলে সামগ্রিক বাস্তবতা। প্রথমটির শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টির শিল্পী বিভূতিভূষণ কিংবা জীবনানন্দ। আর রবীন্দ্রনাথ এই দুই জগতের মিলনে যে সামগ্রিক বাস্তবতা তারই শিল্পী। তারাশংকরের এই সিদ্ধান্ত হয়তো অনেকের মনঃপূত নাও হতে পারে। কিন্তু বিভূতিভূষণ বা জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণায় বিতর্কের অবকাশ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মত বোধ হয় সর্বগ্রাহ্য।

শেষ প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ' বইটির মূল সুরের সঙ্গে না মিললেও সমসাময়িক দেশ-কালের ঘনিষ্ঠ কবি যে কোথায় দেশ-কালের অনাদ্যন্ত চেতনাকে স্পর্শ করেছেন তারই বিনম্র ব্যাখ্যা। এই প্রবন্ধটি যেন পূর্ব প্রবন্ধগুলিকে চমৎকার সুর-সামঞ্জস্যে ও ব্যাপকতায় ধরবার চেষ্টা।

৩১৩।৭৯

গল্পগ্রন্থ

বল্লভপুরের মাঠ। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ছয় টাকা।

প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী যে বঙ্গভাষার একজন সুদক্ষ গদ্য লেখক একথা একালের পাঠকের কাছে বোধ করি ততটা সুবিদিত নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'বল্লভপুরের মাঠ' গল্পগ্রন্থখানির নব সংস্করণে সেই দুর্লভ পরিচয় বাঙালী পাঠকের সামনে নতুন করে উপস্থিত হবার সুযোগ পেল। বইটিতে মোট দশটি গল্প স্থান

পেয়েছে। যার অধিকাংশ গল্পই একদা গল্পরসিক পাঠকসমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেকটি গল্পের গদ্যভঙ্গী অত্যন্ত ঋজু। মাঝে মাঝে একজাতীয় পরিহাস-রসিকতা রয়েছে যা পাঠককে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। কথা এবং বর্ণনা কিভাবে সাজিয়ে পাঠকের কৌ... আকর্ষণ করতে হয় তা শ্রীযুক্ত রায়চৌধু... ভাল করেই জানেন। কোন কোন গল্পে ডিটেলস্-এর ব্যবহার এবং প্রসঙ্গটিকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা তিনি করতে পারেন—যা একালের গল্প-লেখকদের কাছেও দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হবার স্পর্ধা রাখে।

গল্পগুলির প্রধান আকর্ষণ গদ্যরীতির চেয়েও বিষয়বস্তুর ওপর অধিকতর নির্ভরশীল। এ বিচারে প্রত্যেকটি গল্পের কিছু কিছু প্রাতিশ্বিক মহিমা রয়েছে। 'বল্লভপুরের মাঠ' গল্পটি অনেকটা রোমাঞ্চ-জাতীয় লেখা। তার সঙ্গে রহস্যময়তার ভিয়েন চড়ানোর লেখাটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। ঘটনাক্রমও উত্তেজক। ঠিক তার পরের গল্প 'ডাস্টবিন' আবার অন্য স্বাদের। খানিকটা অতিনাটকীয়তার স্পর্শ থাকলেও ব্যর্থ শিল্পীজীবনের অভাবিত আত্মানুসন্ধানে গল্পটি মনে রাখার মতন। 'মাতাল' গল্পে লেখক আবার এক-রকম চপলতার স্তরে নেমে আসতে পারেন। 'মুক্তি', 'প্রতীক্ষা' জোড়াসাঁকো বার বার পড়েও ক্লান্তিকর ঠেকে না। সব মিলিয়ে একালের পাঠক বইটিকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করবেন—এ বিষয় আমরা স্থির-নিশ্চয়।

শিকার কাহিনী

অশান্ত অরণ্যে। বিশ্বনাথ বসু। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম ছয় টাকা।

'অশান্ত অরণ্যে' শিকার কাহিনী। কিন্তু অন্যান্য শিকার কাহিনীর সঙ্গে এই বইটির একটি বড় রকমের পার্থক্য আছে। এ যাবত আমাদের পঠিত শিকার কাহিনীগুলি প্রায় সবই শিকারীর নিজের উক্তি, তাঁদের ডায়েরী অথবা রচিত কাহিনী। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি শিকারীর শ্রুতিলিখন। লেখক বিভিন্ন শিকারীর অভিজ্ঞতা কাহিনী শুনেছেন, এবং পরে নিজের মত করে সেগুলি লিখেছেন। তবে অরণ্য এবং অরণ্যচারীদের সঙ্গে লেখকের মুখ দেখাদেখি নেই তা নয়, শিকার চর্চায় তিনি অনধিকারী নন কারণ তিনি নিজেও সাধ্যমত শিকারী।

এই বইয়ে মোট কাহিনী আছে সাতটি। তার মধ্যে কোনো কোনোটি রীতিমত ...কর। লেখকের ভাষা সাবলীল ... এবং ... জঙ্গলে এবং জংলী মানুষের সম্পর্কে বিশ্বনাথবাবুর নিজস্ব অভিজ্ঞতাও গভীর। মানুষের প্রতি দরদ এবং জঙ্গলের প্রতি নিবিড় কৌতূহল তাঁর লেখাকে আরও অন্তরঙ্গ করেছে। 'বন অভিসারে' এবং 'অশান্ত অরণ্যে' নামক রচনা দুটিতে লেখক যদি অ... একটু সংযত হতেন, মিতভাষী হতেন এবং আবেগপ্রবণতাকে অতিক্রম করতে পারতেন তাহলে রচনা দুটি আরও উপভোগ্য হতো। শিকারীর সমস্ত লক্ষ্য যেমন শিকারের ওপরেই নিবদ্ধ থাকে, শিকারকর্মে যেমন শিকারীকে সতর্ক এবং নিঃশব্দ হতে হয়, শিকারকাহিনীর ক্ষেত্রেও তাই। বন্দুকের নলের মতই তাঁর লেখনী একটি লক্ষ্যেই উদ্যত থাকবে। অবান্তর কথা, অনাবশ্যক দৃষ্টিপাতে অবকাশ সেখানে কোথায়। সাতটি পাতা জোড়া রেখাচিত্র এবং ঝরঝরে ছাপা গল্পগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শিকারকাহিনীর পাঠকদের গ্রন্থটি আনন্দ দিতে পারবে আশা করি।

বাংলাদেশের সংগ্রাম

আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলা দেশ। ধনঞ্জয় দাশ। মুক্তধারা। ১ এ্যান্টনিবাগান লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

বাঙলাদেশ-সংক্রান্ত অসংখ্য গ্রন্থ গত এপ্রিল মাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ধনঞ্জয় দাশ লিখিত 'আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' এই স্ফীত তালিকায় নিছক একটি সংযোজন নয়। গ্রন্থটিকে চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাঙলার গণআন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। লেখক ব্যক্তিগত-ভাবে বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তরকালের পূর্ব বাঙলার একজন রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন। তাঁর কারাজীবনের স্মৃতি যে খাতাগুলিতে তিনি এক সময় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেগুলিকেই এখানে গ্রন্থের অবয়ব দান করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে অকপটে পূর্ব বাঙলার সাম্যবাদী আন্দোলনের দোষগুণ সমেত প্রকৃত রূপটিকে লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে ঐ আন্দোলনের সামগ্রিক চেহারার জায়গায় নেতৃস্থানীয় কর্মীদের ব্যক্তিগত পরিচয়ই গ্রন্থে অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পূর্ব বাঙলার বিখ্যাত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির দলিল সম্ভবত সুদীর্ঘ বিশ বছর পর এই প্রথম প্রকাশিত হল। ১৯৫৩-৫৪ সালে ঢাকা জেলে রাজবন্দী-... চিত্রটি বর্ণময় হয়ে এখানে ধরা পড়েছে। পূর্ব বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের প্র... রূপটিকেও লেখক যথার্থ সমালোচ... দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করার ... করেছেন। ১৯৫৩ সালের নির্বাচনের পটভূ... নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানার কৃষক-সংগ্রাম পূর্ব বাঙলার স্বৈরতান্ত্রিক শাস... বিরুদ্ধে গণ-জাগরণের ধারাবাহিক ... গ্রন্থটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রচনাভ... সাবলীলতা পাঠককে যথেষ্ট আকৃষ্ট কর... আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

অভিধান

English-Sanskrit Dictionary ... Anundoram Borooah, Public... tion Board, Assam. Rs. 75.00.

অভিধানটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছি... ১৮৭৭-১৮৮০ সালে তিন খণ্ডে। বর্তমা... সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আসাম পাবলিকেশনস বোর্ডের তত্ত্বাবধানে। ... কাজের জন্য পাবলিকেশনস বোর্ড বিশ... কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। অভিধ... সংকলক শ্রীঅনুন্দোরাম বড়ুয়া শু... ইংরেজী শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, ইংরেজী শব্দের অর্থ, সংস্কৃ... প্রতিশব্দ এবং বিভিন্ন গ্রন্থে কিভাবে ব্যবহৃ... হয়েছে তারও উল্লেখ অভিধানটিতে আ... অভিধানটি সংস্কৃত ভাষা চর্চাকারী... বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। কোন কে... সংস্কৃত ভাষা গবেষকের মতে অভিধান... কোন কোন বিষয়ে মনিয়েয় উইলিয়মস্‌ ... অভিধানের চেয়েও ভালো।

অভিধানটির ছাপা ও কাগজ চমৎকা... সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুদ্রিত অন্য... গ্রন্থের মত নয়। সরকারী অনুরূপ অন্যা... গ্রন্থের তুলনায় অভিধানটির দাম এক... বেশী।

পত্রিকা

সত্তর দশক। সম্পাদক জিতেশ গঙ্গো... পাধ্যায় ও বিজন সেন। ৭৮/২ বীরেন ... রোড ওয়েস্ট থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

"সত্তর দশক" একটি নতুন ত্রৈমাসি... পত্রিকা, কয়েকদিন আগে তার প্রথম সং... আমরা দেখেছি। অনেক পত্রিকার ... চোখে পড়বার মতো জলুস পত্রিকা... প্রধান গুণ সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ... আছে কিছু কিছু সম্ভাবনাময় ও সু... রচনা। পত্রিকায় গল্প, কবিতা ... প্রবন্ধ সবই রয়েছে।

গদ্য রচনা পর্যায়ের লেখাগুলির ... পাঠকরা কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন ... মনে হয়। পত্রিকায় দুটি নাটকও ... প্রথমটি অনুবাদ-নাটক। অনুবাদক ... প্রসাদ সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় নাটকে... রচয়িতা প্রতুল দত্ত।

ক্রিকেটার কমল ভট্টাচার্য

যারা বেতারে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী শুনতে অভ্যস্ত তাঁরা ...ল ভট্টাচার্যের কণ্ঠ ও ভাষার সঙ্গে ভাল-...ই পরিচিত। কিন্তু কমল ভট্টাচার্যের ...ট খেলা এবং ক্রিকেটার হিসাবে তাঁর ...ত্বের সঙ্গে অনেকেই অপরিচিত, ...ষ করে যারা বয়সে তরুণ।

আমরা জানি, রনজি প্রতিযোগিতার ...র ৩৮ বছরের ইতিহাসে বাংলা দল ...বারই মাত্র বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। ...রপারের থার্ট সাহেব এবং সাগরের ...পারের ভেজাল সাহেবে ভর্তি রনজি ট্রফি ...য়ী বাংলা দলের অন্যতম বাঙালী কমল ...চার্য কত বড় ক্রিকেট খেলোয়াড় ...লেন?

...কোনো প্রতিবাদের ভয় না রেখেই বলা ...—একজন চমৎকার চৌকস খেলোয়াড়। ...ল ভট্টাচার্যের কীর্তির মুখে কলকাতার ...রা যেমন সাহেব খেলোয়াড়দের প্রাধান্য ...ন তেমন ভারতীয় ক্রিকেটে বাংলা ছিল ...কেজো। নিজের যোগ্যতাবলেই কমল ...চার্য বাংলা দলে এবং তখনকার প্রায় ...কে প্রতিনিধিমূলক খেলায় স্থায়ী স্থান ...রে নিয়েছেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ...লেছেন জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলিয়া দলের ...রুদ্ধে বাংলার পক্ষে। ১৯৩৮ সালে ...ন্দ্রজিৎ দলের সঙ্গে ইংলন্ড সফর ...রেছেন। ব্যাট করেছেন ইনিংসের শুরুতে, ...ঝে এবং শেষে—যখন যেখানে প্রয়োজন ...রেছে। স্লিপে দাঁড়িয়ে এমন সব দুরূহ ...চ ধরেছেন যাতে দলের ও বোলারের ...য়ের সম্ভাবনা বাড়ে, প্রতিপক্ষের ...নের কমে। এবং কব্জি ও আঙ্গুলের ...চে এমনভাবে বল করেছেন যা বিপক্ষ ...সম্যানের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। কমল ...চার্যই প্রথম বাঙালী যিনি রনজি ট্রফিতে ...উইকেট পেয়েছেন।

কিন্তু যিনি টেস্ট খেলার সুযোগ ...নি, রেকর্ড-বইয়ে যাঁর নাম খুঁজে ...ওয়া শক্ত, বড় ক্রিকেটার বলে তাঁকে ...কার করাও তো সহজ নয়, যদিও ...কেটের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে রেকর্ড-...য়ের বড় বদনাম। ওই বইয়ে লেখা থাকে ...নেক কিছু। আবার অনেক কিছুই লেখা ...কে না। যা লেখা থাকে না তা হচ্ছে ...লার রূপ-রঙ। কালো কালি সব রঙ ...বে নিকষ রেখায় কতগুলি ব্যবসায়িক ...খ্যা লিখে রাখে—কে কত রান করেছে, ...কগুলি উইকেট পেয়েছে, সর্বোচ্চ রান কত ...মন সব পরিসংখ্যান।

পরিসংখ্যানের দ্বারা কমল ভট্টাচার্যকে ...পরিমাপ করতে গেলে আমরা ভুল করব। একবার টেস্ট-নেটে ডাকা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট অন্তরজ বাংলার চৌকস খেলোয়াড় কমল ভট্টাচার্যকে। কিন্তু নেটে অমর সিং ...ও মহম্মদ নিসারের বলের গোলায় প্রমাণ ...হয়ে গেল বাংলার ক্রিকেটার ভাল ব্যাটসম্যান

নন। এবং যেহেতু ভাল ব্যাটসম্যান নন সেহেতু বোলার হিসাবেও কমল ভট্টাচার্য দলে আসতে পারেন না—এ কথা নির্বাচকরা প্রমাণ করে দিলেন অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিত বোলারদের দলে নিয়ে।

কিন্তু ভারতের অমর ক্রিকেটারদের অন্যতম অলরাউন্ডার অমর সিংই স্বীকার করেছিলেন—কমল ভট্টাচার্যের হাতে ব্যাটস-ম্যানের 'মারণ-অস্ত্র' আছে। ১৯৩৬-৩৭ সালের কথা। বোম্বাইয়ের রনজি প্রতি-যোগিতার ফাইনাল খেলা বাংলা ও নবনগর দলের মধ্যে। উঠতি ক্রিকেটার কমল ভট্টাচার্যের জীবনেরও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলা। নবনগর দলের নাম-করা খেলোয়াড়দের

মুস্তাক আলীর সঙ্গে কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় কমল ভট্টাচার্য (বাঁদিকে)

মধ্যে অমর সিং অদ্বিতীয়। কিন্তু কমল ভট্টাচার্যেরই বলে দুই ইনিংসে অমর সিং আউট হয়ে গেলেন। খেলার শেষে অমর সিং কমল ভট্টাচার্যকে বিস্মিত চোখে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কি আমাকে অফ-ব্রেক বল দিয়েছিলে?' কমল বললেন—'না, আমি আউটসুইং দিয়েছিলাম।'

অমর সিং রীতিমত চিন্তায় পড়লেন। বললেন, 'দেখ ভট্টা, আমি তোমার হাত দেখে আউটসুইং-ই খেলেছিলাম, কিন্তু ওই বল চট করে কিভাবে যে অফ ব্রেক হল বুঝতে পারলাম না।' কমল বললেন, 'দেখ মিঃ সিং, আমি নিজেও জানি না কেমন করে ওই সুইং দেওয়া বল অফ্ ব্রেক করে ভেতরে ঢোকে।'

কমল ভট্টাচার্যের কথা শুনে অমর সিং যেন উল্লসিত হয়ে উঠলেন। গলার স্বর নরম করে চুপিচুপি বললেন, 'কোনদিন জানতে চেয়ো না ওই সুইং বল কি করে অফ ব্রেক হয়। জানতে চেয়ো না কি করে ওই বল তুমি দিচ্ছ। যেদিন জানতে চেষ্টা করবে সেদিনই হারাবে ওই গোপন অস্ত্র। ওর নাম অজ্ঞানের দিব্যজ্ঞান। যত বড় ব্যাটস-ম্যানই হোক, ওই 'মারণ-অস্ত্রে' বধ না হলেও বিভ্রান্ত হতে বাধ্য।

সেদিনও কমল ভট্টাচার্য জানালেন, মহা খেলোয়াড় অমর সিংয়ের উপদেশ তিনি চিরদিন মনে রেখেছেন। আজও তিনি জানবার চেষ্টা করেননি কিভাবে ওই বল হত। ইচ্ছে করলেই অবশ্য ওই ধরনের বল তিনি দিতে পারতেন না। হাতের ও আঙ্গুলের কোন এক মোচড়ের প্রক্রিয়ায় ওটা হয়ে যেত। অথচ কারণ থাকত অজ্ঞাত এবং অবোধ্য।

প্রক্রিয়াটাকে প্রকৃতির মহাদানও বলা যেতে পারে। আকৃতি, প্রকৃতি এবং সহজাত শক্তিতে একজন পরিপূর্ণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন কমল ভট্টাচার্য। পরিণত বয়সেও ক্রিকেটের মধ্যে ডুবে আছেন প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা নিয়ে বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক। এরিয়ান ক্লাবের খেলোয়াড়-জীবনের পর এরিয়ানেরই ক্রিকেট সম্পাদক। এখন সি এ বি-র নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান।

বড়দিনের ছুটির সকালে কমলদার মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। ক্রিকেটের কত কথা। ওই অমর সিংয়ের কথা। ছোট আর বড়য় মিশিয়ে আউটসুইং, যেটা ছিল অমর সিংয়ের মোক্ষম অস্ত্র, ইনসুইংয়ে পরিমার্জন আনতে গিয়ে সেই মোক্ষম অস্ত্রের ধার ভোঁতা হয়ে যাওয়ায় অমর সিংয়ের আক্ষেপের কথা। হোসী, ল্যাংডেন, সি কে নাইডু, মুস্তাক আলী প্রভৃতির কত গল্প। তারই মাঝে আমার অনুরোধে কমলদা তাঁর খেলা দেখার কথা বলতে বলতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। ছোটবেলার দিন-

গুলির স্বপ্ন-রঙীন আলোচনায় মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠারই কথা। কিন্তু কমলদার ধরা গলা, বেদনাময় ভাষা।

"খেলাধুলোর নেশা ঢুকেছিল আমাদের বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকেই। পাশেই ছিল ধীরেন বসুর বাড়িতে এরিয়ান ক্লাবের অনুশীলনের মাঠ। সব বড় বড় খেলোয়াড়রা আসতেন। কালী মিত্র, হীরু বসু, বিধু মুখার্জী, কালীধন মিত্র, কাঙালী পাল—সবাই। খেলার আলোচনা ছাড়া অন্য কোন আলোচনা হত না। তখন বয়স কত হবে? এই সাত-আট। তারপর যখন রামধন মিত্র লেনে আমরা উঠে এলাম তখন কাঠের তক্তা দিয়ে ব্যাট, ক্যাম্বিসের বল দিয়ে ক্রিকেট বল, আর ইট দিয়ে উইকেট তৈরি করে সমবয়সীদের সঙ্গে একটা ফাঁকা জায়গায় খেলতে আরম্ভ করলাম। দুঃখীরামবাবুকে আগে থেকেই জানতাম। ওই রাস্তায় তাঁর বাড়ি। জানতাম বড় ক্রিকেটার কালীধন মুখার্জীকেও। লক্ষ করতাম, 'স্যার' সাইকেল চেপে যাবার সময় আমাদের ওই খেলা, ক্রিকেট-ক্রিকেট খেলা লক্ষ করছেন। অথচ তাঁর কাছে যেতে সাহস পেতাম না এমনই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন খেলোয়াড় গড়ার ওই কারিগর। আর দেখতাম 'স্যার' কোনদিন ফল কোনদিন দুধ নিয়ে যাচ্ছেন সাইকেলে চেপে। শুনতাম অসুখবিসুখে বিছানায় শুয়ে থাকা এরিয়ানের খেলোয়াড়দের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন।'

"একদিন সকালে দেখি কালীধনবাবু এবং স্যার দুজনই কাঁদছেন। প্রায় ছেলে-মানুষের মত। শুনলাম এ কান্না কোন আত্মীয় বা বন্ধু বিয়োগের জন্য নয়, এরিয়ানের খেলোয়াড় হারানোর জন্য ব্যথার কান্না। কে যেন বলল, ওই ফকির মুখার্জীর জন্য স্যার দু বেলা দুধ ফল বয়ে নিয়ে গেছেন আর সে এরিয়ান ছেড়ে মোহনবাগানে চলে গেল।'

"কান্না থামিয়ে সহসা স্যার যেন জ্বলে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন, যাক ফকির মোহনবাগানে, আমি ওর চেয়েও বড় খেলোয়াড় তৈরি করব। কালীধনবাবু বললেন, কাকে?

" 'এই—একে'—বলে আমার দিকে আঙ্গুল তুলে ধরলেন। আমি ত ভয়ে সরে গেলাম। কিন্তু যেন একটা আনন্দের বন্যা বয়ে গেল সারা দেহে।"

এই পর্যন্ত বলার পর দেখি কমলদা কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। বললেন, "স্যারের কথা বলতে গেলে চোখের জল রাখতে পারি না। তাঁর কাছ থেকে যেটুকু শিক্ষা পেয়েছি সেটাই আমার জীবন-পথের পাথেয়।"

তারপর শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বললেন, "দীর্ঘ দেড় বছর ধরে দেশবন্ধু পার্কে স্যার আমাকে নেটে শুধু বল করতে দিয়েছেন। একদিনও ব্যাট করতে দেননি। পরীক্ষা করে দেখেছেন আমার নিষ্ঠা কতখানি। একদিন নেট প্র্যাকটিসে নেমেছি। পাশেই ইস্ট ক্লাবের নেট পড়েছে। সেখানে ব্যাট করছেন সুশীল বসুর (প্রাক্তন ক্রিকেটার) কাকা মোহিত বসু। আমাদের নেটে শ্যামসুন্দর মিত্রের কাকা ভুবন মিত্র। মোহিতবাবুর একটা জোরালো হিট এসে লাগল আমার পায়ে। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। স্যার ছুটে এলেন। ব্যথা ভোলাবার জন্যই বোধ হয় বললেন, তুই ব্যাট করবি? সেইদিন প্রথম হাতে ব্যাট পেলাম। তারপর থেকে কিভাবে আমাকে তৈরি করেছেন ভাবলে ওঁর উদ্দেশে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। বোলারদের বলে দিতেন কমলকে বোল্ড আউট করতে পারলে পয়সা করে পাবি। এক পয়সা থেকে শুরু করায় পুরস্কার উঠেছিল তখনকার দিনে এক টাকায়। প্রথম দিকে বোল্ড আউট করার পুরস্কার, শেষের দিকে যে-কোনভাবে আউট করার পুরস্কার। এইভাবে আমাকে প্র্যাকটিস দিয়েছেন। সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে গিয়ে বড় বড় খেলোয়াড়দের ব্যাটিং দেখিয়ে বলেছেন দেখ, এটা ও ভুল মারল, ও বলটা ওর ও ভাবে মারা উচিত ছিল। তবু কিন্তু স্যার দলে খেলার চান্স পাইনি। দুঃখ পাবার পর বেশী দিন পাইনি তাঁর উপদেশ ও শিক্ষা। বছর দেড়েকের মধ্যে স্যার দেহ ত্যাগ করেছিলেন।"

এখনকার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা সম্পর্কে নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান বললেন, "এই যে বিহারের সঙ্গে রণজি ট্রফির গুরুত্বপূর্ণ খেলার জন্য বাংলার ... জনকে নেটে ডেকেছি কাজেন নেটে এসেছে মাত্র ১১/১২ জন। অনুশীলনের জন্য ... টোস্ট দুধ মাখনের ব্যবস্থা রয়েছে। তবু ওদের এত অনীহা। আর আমরা ... থেকে হেঁটে মাঠে গিয়েছি, দুই পয়সার মুড়ি খেয়ে আবার ময়দান থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরে এসেছি।"

অতীত দিনের কথা কেউ ভোলে না কেউ ভোলে। কমল ভট্টাচার্য ভোলেননি ও'র ক্রীড়াগুরু 'স্যার' দুঃখীরাম মজুমদারের কথা। ভোলেননি ক্রিকেটারের আচরণ ও ক্রিকেটারদের কথা।

মুকুল

প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ক্রিকেট ও সরকারী মনোভাব

জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য আয়োজিত যে প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা এখন ইডেনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আশা করি তা থেকে ভাল অর্থই সংগৃহীত হবে। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় ওই অর্থ সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত। তবু উদ্দেশ্য মহৎ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু ওই খেলার ব্যাপারে সরকারী ভাবের প্রশংসা করতে পারছি না। জানি না শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ইডেনের মাঠের ভাগ ছেড়েছেন কিনা, কিংবা কলকাতার কালেক্টর খেলার টিকিট থেকে প্রমোদকর ছাড় দিয়ে ওই অর্থ প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দেবার সম্মতি জানিয়েছেন কিনা।

প্রথমে কিন্তু কেউই টাকা ছাড় দিতে রাজি হননি। সি এ বি-র অনুরোধ সত্ত্বেও। রাজ্য সরকার খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের ২০ ভাগ পাবার জিদও বজায় রেখেছিলেন, কালেক্টরও প্রমোদ করের প্রাপ্যে অবিচল ছিলেন। কিন্তু কেন এই অযৌক্তিক জিদ? যে খেলা দেখার জন্য সি এ বি-র কর্মকর্তারাও টিকিট কিনেছেন, সদস্যরা দান হিসাবে অর্থ দিয়েছেন সেখানে সরকার কি কিছুটা উদার হতে পারতেন না? ইতি-মধ্যে যদি সরকারের মত বদল হয়ে থাকে ভাল কথা। না হলে আমাদের অনুরোধ অন্তত এই খেলা সম্পর্কে সরকার তার প্রাপ্য অর্থের জিদ ছেড়ে দেবেন যাতে সি এ বি একটা ভাল রকমের টাকা প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে দিতে পারেন।

মেম্বারদের দুঃখ

এই খেলা দেখার জন্য দান হিসাবে কিছু অর্থ দেবার ব্যাপারে সি এ বি-র এক-জন অ্যাসোসিয়েট মেম্বার দুঃখ করে বল-ছিলেন ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ১২০ টাকা জমা দিয়ে ত' তিনি সি এ বি-র সদস্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 'রাবার' জয়ী ভারতের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকার

...হয়েছে। জুলাইতে আবার তাকে দিতে ... বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা। এর মধ্যে ... খেলা দেখার সুযোগ মেলেনি। এই খেলাটি দেখার জন্য আবার তাঁকে দাম ... দিতে হচ্ছে। তাহলে একটি ... খেলা দেখার জন্য তাঁর টিকিটের জনাই খরচ হচ্ছে ... টাকা। তবু তাঁর দুঃখ নেই। ... খেলোয়াড়রা যখন দেশের জন্য ... জীবন দিচ্ছে তখন আমরা ... পাঁচ দশ টাকা দিতে ... ১৯৭২-এর জুলাইতে ... ৫০ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে ... বিনিময়ে পাবেন ইংলণ্ডের ... টেস্ট খেলার একখানা টিকিট, ... করলে যার দাম গিয়ে দাঁড়াবে ২২৫ টাকা। তাও এম সি সি আসবে কিনা অনিশ্চয়।

...প্রশ্ন: টেস্ট খেলা দেখার একখানা টিকিট দেবার ব্যাপারে সি এ বি-র এই ব্যবস্থা কি প্রকারান্তরে ব্ল্যাক মার্কেটিং ... মেম্বারদের কিন্তু ভোটাধিকার নেই। ... অর্থের উপরও নেই প্রমোদ কর ব্যবস্থা। সরকার এ ব্যাপারে যদি ... হতে পারেন তবে জাতীয় প্রতি-ষ্ঠার ব্যাপারে তাঁদের এমন জিদ কেন?

ক্রিকেট খেলায় হামলা

গত সপ্তাহেই যুদ্ধ পরিপ্রেক্ষিতে খেলোয়াড়ী মনোভাবের কথা আলোচনা করেছি। আর এই সপ্তাহেই কলকাতার ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ার নিগ্রহের ঘটনা ঘটে গেল।

...দুঃখজনক ঘটনা। প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা হচ্ছিল মহমেডান স্পোর্টিং ও তপন মেমোরিয়াল ক্লাবের মধ্যে। মহমেডান ... ইনিংস ৮০ রানে শেষ হতেই সমর্থকরা আম্পায়ারদের উপর খাপ্পা। তাদের দলের ৪ জন খেলোয়াড়কে অন্যায় ভাবে এল বি ডব্লিউ আউট দেওয়া হয়েছে এই অভি-যোগে তারা আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে কটূক্তি বর্ষণ করতে আরম্ভ করে। তারপর তপন মেমোরিয়ালের জেতবার মুখে তারা মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে আম্পায়ার রথীন বসু এবং মুকুল মুখার্জীর উপর হামলা চালায়। কয়েকটা চড় ঘুষিও চালানো হয়। খেলা সাময়িক বন্ধ থাকে। আম্পায়ারদের উপর হামলার খবর পেয়ে সি এ বি-র কয়েকজন কর্মকর্তা ইডেন উদ্যানের অফিস মাঠে ছুটে আসেন। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কর্মকর্তা-দের হস্তক্ষেপে অবশ্য অবস্থা আয়ত্তে আসে। তপন মেমোরিয়াল খেলায় জেতে ৪ উইকেটে। কিন্তু মহমেডান সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং হামলার ফলে আম্পায়াররা এমন নার্ভাস হয়ে পড়েন যে অফিসিয়াল স্কোর বইয়ে ফলাফল লেখার সময় লিখে ফেলেন মহমেডান জিতেছে ৪ উইকেটে।

খেলা পরিচালনা করতে গিয়ে যেখানে এমন দৈহিক নির্যাতন সেখানে নার্ভাস হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু কেন এই হামলা। যদি ধরেও নিই কোন ঘটনায় আম্পায়ার ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাহলেও কি সমর্থকদের এই আচরণ খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয়?

ক্রিকেট খেলা শুধু খেলাই নয়। ক্রিকেট একটি আচরণের পরিভাষাও। মর্যাদাপূর্ণ আচরণ। 'ইট ইজ নট ক্রিকেট' বলে যে কথাটি আছে তার অর্থই হল ন্যায়নীতি না মেনে চলা। অন্যায় এবং দুর্নীতিকে ধিক্কার দেবার অপর নামই হচ্ছে ইট ইজ নট ক্রিকেট। আশা করব খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদিরা সর্ব-ক্ষেত্রে ন্যায় নীতি মেনে চলবেন। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অখেলোয়াড়ী আচরণকে প্রশ্রয় দেবেন না।

টেবল টেনিসে বাংলার দল সম্পর্কে

এক থেকে উনিশ জানুয়ারি পর্যন্ত হায়দরাবাদে জাতীয় টেবল টেনিসের খেলা আরম্ভ হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলার দল নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেটা মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। দল থেকে বাদ পড়া প্রথম সারির কয়েকজন খেলোয়াড় বলছেন, দল নির্বাচনে যোগ্যতার মূল্যায়ন করা হয়নি তার বদলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও নেপথ্য রাজনীতির প্রভাবে অযোগ্যদের দলে নেওয়া হয়েছে। বেঙ্গল টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ বলছেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণদের নিয়ে দল গড়েছেন ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে। জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতায় এ যাবৎ যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন তাঁদের ভূমিকা উল্লেখ করবার মত নয়। তাঁদের বয়সটাই বেশী। তাই তাঁদের বাতিল করে সম্ভাবনা-পূর্ণ খেলোয়াড়দের নিয়ে তাঁরা দল গড়েছেন। এতে এখনই হাতে নাতে ফল না পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে ফল পাবার সম্ভাবনা।

ওভাল টেস্টে জয়ের নায়ক চন্দ্রশেখরের বল করবার বিশেষ ভঙ্গি

কর্তৃপক্ষের কথার মধ্যে অবশ্যই যুক্তি আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত যাঁরা এই বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেননি—তাঁদের সহসা তরুণের প্রতি এত জোর দেওয়া কি নিছক ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে? নাকি সত্যি সত্যিই এর মধ্যে দলীয় কোন্দলের প্রভাব আছে? প্রথম সারির খেলোয়াড়, বিশেষ করে ক্রমপর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়ের যোগ্যতা সংশয়াতীত। তরুণদের সঙ্গে তাদেরও কি দলে নেওয়া যেত না। এ সম্পর্কে এর আগে দেশ-এর পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। এ সপ্তাহে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যও তুলে ধরা হল। সব শোনার পর এই সিদ্ধান্তেই আসতে হচ্ছে যে বাংলার টেবল টেনিস রাজনীতির মধ্যে আরও জড়িয়ে পড়ছে।

একলব্য

অরণ্যদেব

লী ফক

'মায়া-আয়নার মধ্যে পাহাড়ী ডাইনীর আসল চেহারা দেখতে পেলেন অরণ্যদেব।'
মারো-ওকে মারো!

চতুর্দিক থেকে এখন ভূত-প্রেত ছুটে এল! প্রবল ঝড়ে গোটা অরণ্য কাঁপতে লাগল।
!!

'সেই ঝড়ের মধ্যেই পাহাড়ী ডাইনীর দুর্গ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন অরণ্যদেব ....।'
মারো! ওকে মেরে ফ্যালো!

'ঘোড়ায় চড়ে নিমেষে তিনি উধাও।'
ফিরে এসো! ফিরে এসো!

'যেন মন্ত্রবলে হঠাৎ মিলিয়ে গেল সেই দুর্গ!'
!

লোকে বলে, ধোঁয়া পাহাড়ে বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে সেই দুর্গকে আবার দেখা যায়—
'অরণ্যদেবের খোঁজে সেই ডাইনী আজও ফিরে আসে!'

ঘুমুতে যাও, ছেলেরা।
!!

বেশ ভাল করে ঘুম দাও।
আমার কথাটা শুনলে।
আগামী সপ্তাহে : নতুন কাহিনী (১৩)

জীবন থেকে নেয়া

(বাংলাদেশের ছবি)

চলচ্চিত্র যদি জনজীবনের প্রতিবিম্ব হয়, তাহলে 'জীবন থেকে নেয়া' দেখে আমরা বুঝতে পারব বাংলাদেশের মানুষ কত গভীরভাবে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসেছেন। ছবির প্রধান চরিত্র দেশপ্রেমিক আনোয়ার, যার ঘরের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বড় ছবি। আনোয়ার গ্রামে গিয়ে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গেয়েছে, আনোয়ারের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে তারা দুই বোন সাথী ও বীথি। পরিচালক জহির রায়হান ওই গানের দৃশ্যটি তুলেছেন চমৎকার। ছবির ছিছু সংলাপেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। তা-ছাড়া বাংলাদেশের জন-জাগরণের প্রভাব এই ছবিতে। অমর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত-ফেরি দিয়ে ছবির আরম্ভ। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন চিত্রকাহিনীর (পরিচালক জহির রায়হান রচিত) আবহ রচনা করেছে।

জীবন থেকে নেয়া ওই পর্যন্তই। জানি না, ঢাকার রাজপথের মিছিলে 'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই' কিংবা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ইত্যাদি যে-সব শ্লোগান শোনা গেছে তা বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনারই লক্ষণ কি না। দূর থেকে এ-সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন। তবে আমরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে-কথা জেনেছি কিংবা সেখানকার সাংস্কৃতিক জাগরণের যে-পরিচয় পেয়েছি তার সঙ্গে ওই সব শ্লোগানের যোগসূত্র কোথায় বা কতখানি, তা আমাদের অজ্ঞাত। ছবির নায়ক আনোয়ারকে কোন কোন সময় শ্রমিক আন্দোলনের নেতা মনে হয়েছে। ছবিটি অবশ্য ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতেই তোলা। যদিও ওই আন্দোলন [illegible]

"স্ত্রী" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য

প্রামাণিক ঘটনার মধ্যে রয়েছে সম্ভবত ওই প্রভাত-ফেরি এবং রাজপথের মিছিল, পাক পুলিশের গুলি, কারফু, গ্রেপ্তার। ছবির মূল কাহিনীর সঙ্গে ওই সব ঘটনার সংযোগ কেবলই আনোয়ারকে ঘিরে। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের আর কোন প্রামাণিক ঘটনা বা তথ্য ছবিতে বিশেষ নেই।

এর প্রয়োজনও হয়ত ছিল না। কারণ ছবিটি, অর্থাৎ ছবির কাহিনী মূলত নাটক। পরিচালক অবশ্য একটি রূপকাশ্রয়ী বক্তব্যবাহী নাট্য-কাহিনীই দর্শকের কাছে উপস্থিত করেছেন। একটি সংসারের কাহিনী, যেখানে [illegible] ক্ষমতার বা একনায়কত্বের প্রতীক। ওই সংসারেই বিয়ে হয়েছে আনোয়ারের দুই বোন সাথী ও বীথির। ছবির [illegible] ডিক্টেটরশিপের প্রতীক ভাবলে ক্ষতি নেই, না ভাবলেও চলে। কারণ একের পর এক যা ঘটে [illegible] ওই সংসারে তা পুরো-দস্তুর [illegible] নাট্যমার শর্তে নিয়ন্ত্রিত। [illegible] সংসারের [illegible] এক [illegible] যেভাবে [illegible] অত্যাচার চালিয়েছে [illegible] উপর তার মধ্যে পরিচালক আয়ুবশাহী ও ইয়াহিয়াশাহীর একনায়কত্বের উপমা হয়ত খুঁজে নিয়েছেন। দর্শকরা কিন্তু এ [illegible] পাবেন কিছু [illegible] [illegible]

দুই ভাই এবং পরে দুই ভ্রাতৃবধূ সাথী ও বীথিকে যন্ত্রণা দিয়েছে. তাতে একটি মামুলি নাটকের উপকরণ আছে। এবং ভিলেনির। গৃহকর্তার অত্যাচার বাড়ির তিনটি পুরুষ এই মহিলার নির্যাতন সহ্য করেছে, সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

"জবান" (পরিচালনা : পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে সমিত ভঞ্জ ও চিন্ময় রায় ফটো—

তবে গৃহকর্তার দুর্দশার মুহূর্তগুলি কৌতুককর উপাদানে গঠিত—এই যা মজা।

ওই সংসারের কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত বিষপ্রয়োগও দেখা গেছে। এবং তা নিয়ে নাটকীয় টেনশন ও কোর্ট-রুম ড্রামা তৈরি হয়েছে। বীথিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে সাথী। পরে সাথীকে বাঁচিয়েছে মোক্তার—গৃহস্বামী কোর্টে প্রমাণ করেছে তার স্ত্রীই প্রকৃত অপরাধী। ওই আদালতেই জেরার সময় বাড়ির কর্তাকে স্ত্রীর সঙ্গে সাহস ও দাপটের সঙ্গে প্রথম কথা বলতে দেখা গেল। এটাও কম মজার বিষয় নয়। সেই সঙ্গে কাহিনীর ভিলেনের পতনের ব্যবস্থা, যাতে দর্শক আরও খুশি। নাটকটি ক্লাইম্যাক্স আসবার আগে সাথী-বীথির আরও ঘটনা নিয়ে নাটক জমানো হয়েছে। নাট্যসৃষ্টির জন্য ভুল-বোঝাবুঝির দরকার। সেটাও রাখা হয়েছে সুকৌশলে। সাথী জানত না তার কোলের সন্তানের গর্ভধা[illegible] আসলে বীথি। একই সময়ে ওরা মা[illegible] হোয়ে। তখনই বীথির সদ্যোজাত সন্তান সাথীর কাছে রেখে দেওয়া হ[illegible] ঘটনাগুলি সব কেমন যেন সাজা[illegible] জীবনানুগ নয়। দিদিকে বাঁচা[illegible] জন্য বীথি কি বিরাট আত্ম[illegible] করেছে, তা সাথী জেনেছে পরে। ছ[illegible] শেষে দর্শকের মনোরঞ্জনের প্রতি[illegible] পূর্ণ। সাথী-বীথির দাদা জেল থে[illegible] মুক্তি পেয়ে বোনদের সঙ্গে মি[illegible] হয়েছে। তখন সকলেই সুখী, দর্শকও।

এনটারটেনমেনট-এর দিক থেকে ছবি দর্শকদের কাছে আদরণীয় হবে। কা[illegible] এতে নাটকের রস ছাড়াও আ[illegible] প্রমোদের নানা উপকরণ। কৌতুক তা[illegible] মধ্যে প্রধান। অভিনয়ের মান স[illegible] জনক। রোজী (সাথী), সুচন্দা (বীথি[illegible] রজ্জাক, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ শিল্পী[illegible] তাঁদের অভিনীত চরিত্রসৃষ্টিতে কো[illegible]

...পারেননি। মোস্তারের ভূমিকার ...তাঁর অভিনয় খুবই সুন্দর। ...প্রায় সবক্ষেত্রে ফেক-আপাই ...যদিও প্রথম দিকে সুচন্দার ...কথা, বং চুলিটকাটু জেগেছে ...আদর্শবাদীর বোন হিসাবে) ...আদর্শবাদী আনোয়ারের গানের ...প্রধানগুণ। গানের সুর ভাল। ...('এ খাঁচা ভাঙ্গবো আমি কেমন ...) মোস্তার-সাহেব কিছুতেই শেষ ...তে পারেননি. সেটির সুর চমৎকার। সংগীত পরিচালনা (খান আতাউর রহমান-...) আগাগোড়াই ভাল।

ছবিটির টেকনিক্যাল কাজের মান যদিও খুব উঁচুদরের নয়, তবু চিত্র-সম্পাদনার গুণে ছবিটি গতিসম্পন্ন হয়েছে। পরিচালক জীরারহান ছবির অনেক জায়গায় ফ্রিজ শট ব্যবহার করেছেন। এই প্রয়োগ-কৌশল মন্দ লাগে না। ছবিটির দোষ-ত্রুটি যাই থাকুক জীবন থেকে নেয়া' তবু এদেশের দর্শকের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। নতুন মুখ, নতুন পরিবেশ, নতুন জীবনধারা দেখতে ভাল লাগে। একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ যেন একটা নতুন স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

কাল, আজ আওর কাল

আর-কে ফিল্মস

তিন পুরুষের গল্প অবলম্বনে তৈরি 'কাল আজ আওর কাল' ছবিতে পৃথ্বীরাজ কাপুর, রাজ কাপুর ও রণধীর কাপুর তাঁদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন। ছবিতেও এ'রা যথাক্রমে পিতা, পুত্র ও পৌত্র। এমন কী, রণধীর কাপুরের সঙ্গে যে ছবিতে বিয়ে হয়েছে ববিতার, সেখানেও বাস্তব সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি—শিল্পীরা বাস্তব জীবনে এখন স্বামী-স্ত্রী।

এতৎসত্ত্বেও ছবিটিকে খুব বাস্তব-ভিত্তিক মনে করার কারণ নেই। অন্তত তৃতীয় জেনারেশনের প্রেম-কাহিনী তো, রণধীর-ববিতা যেখানে রোমান্টিক জুটি, একেবারেই হিন্দী চিত্রের ফরমুলা-মাফিক।

চিত্র-পরিচালনার দায়িত্ব এ-ছবিতে তৃতীয় জেনারেশনের হাতেই। অর্থাৎ রণধীর কাপুরই ছবির পরিচালক। তিনি তিন পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কার ও বিশ্বাসের সংঘাত ছবিতে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ওই সংঘাতের গভীরতা যদি কোথাও দেখা দিয়ে থাকে, তবে তা মধ্যম পুরুষ রাজ কাপুরের অসাধারণ অভিনয়ে। তাঁর অভিনয়ের

কে এন কাপুর প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি "শ্রীমান পৃথ্বীরাজ"-এর সংগীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে তোলা ছবিতে—বাঁ দিক থেকে বিনোদ কাপুর, অনুপকুমার, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বীরেন্দ্রনাথ মালহোত্রা ও পরিচালক তরুণ মজুমদার

মনমোহন ফিল্মস-এর "নয়া মিছিল" ছবির সংগীত গ্রহণের সময় ছবিতে—বাঁ দিক থেকে শ্যামল মিত্র, পরিচালক পীযূষ গাঙ্গুলী, সুখেন দাস, সংগীত পরিচালক অজয় দাস ও শ্রী মুরারকী

মধ্যে একটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও একাকিত্ব আমরা বেশ অনুভব করতে পারি। তবে রাজ কাপুর যে-ভাবে তিন পুরুষের মধ্যে অ্যাডজাস্টমেনট নিয়ে এলেন, সেই প্রক্রিয়াটি একেবারেই সিনেমাসুলভ তথা অবাস্তব। সচ্চরিত্র রাজ কাপুর শেষ পর্যন্ত মদ্যপ ও দুশ্চরিত্রের অভিনয় করে তাঁর পিতা ও পুত্রের মধ্যে দুঃখ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করালেন, যার ফলে দাদু ও নাতি একই ব্যথার অংশীদার হিসাবে পরস্পরের দৃষ্টিকোণ সহৃদয়তার সঙ্গে জানবার ও গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত। অবশ্য ছবির ক্লাইম্যাক্স আসতে আরও বিলম্ব হয়েছে। ফ্যাসাদ আরও ছিল। সবই সময়মত দূর হয়েছে। পরিচালক ছবিতে চতুর্থ জেনারেশনকেও দেখিয়ে দিয়েছেন—নায়ক রাজেশ (রণধীর) ও নায়িকা মণিকার (ববিতা) সদ্যোজাত সন্তান।

দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারের সংঘর্ষ মূলত দেখানো হয়েছে ঠাকুরদা ও নাতির মধ্যে। তবে ঘটনাগুলি খুবই মামুলি। তার মধ্যে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার যেমন আছে তেমনি রয়েছে নাতির নিজের পছন্দ করা মেয়েকে

"জনতার আদালত" (পরিচালনা : মধুকর গোষ্ঠী) ছবিতে অসিতবরণ ও অনিলকুমার

বিয়ে করা নিয়ে গণ্ডগোল। শেষের ব্যাপারটি হিন্দী ছবিতে কাল, আজ অথবা কালের সমস্যা ছাড়াও হামেশাই ঘটে। ছবির আসল উপভোগ্যতা নাটকীয়তায় ও শংকর-জয়কিষণ সুরারোপিত গানে। যদিও গুরুত্ব বা সময়কেই ছবির নায়ক ভেবে নেওয়া হয়েছে যে সব সমস্যার সমাধান ঘটায় সময়মত, আসলে ছবির ঘটনারাজী দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত। তাই ছবিটি দর্শকদের নিরাশ করবে না, নিরাশ করবে না পৃথ্বীরাজ কাপুরের অভিনয় এবং রণধীর ও ববিতার রোমান্টিক পর্ব। রাজ কাপুরের অভিনয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে যিনি দুই পুরুষের মাঝখানে থেকে ছবিটিকে নানা মুহূর্তে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

মেহবুব-কী মেহেন্দী

রাহুল থিয়েটার্স (ইণ্ডিয়া

লখনৌর খানদানী মুসলমান পরিবারে 'মেহবুব-কী মেহেন্দী'র মূল নাট্যভাগ বিস্তৃত। প্রেম-কাহিনীর পটভূমিও লখনৌ। ইয়ুসুফ (রাজেশ খান্না) ও শাবানা (লীনা চন্দ্রবারকার) এই প্রেমোপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা। তাদের প্রেমঘটিত ব্যাপারগুলি যথাসম্ভব খানদানী রীতিতে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন প্রযোজক-পরিচালক এইচ এস রাওয়াল। তবে ইয়ুসুফের বাড়িতে শাবানার গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেবার পর ইয়ুসুফ ও তার রোমান্স যে-ভাবে এগিয়েছে, তাতে আধুনিকতা তথা হিন্দীচিত্রের প্রথানুগ রোমান্টিক উপাখ্যানের লক্ষণই বেশী। ওদের মাঝখানে রয়েছে শাবানার ছাত্র, ইয়ুসুফের ভাগ্নে। এই শিশুর অকালপক্কতা ইয়ুসুফ-শাবানার মিলনে অনেকটা সহায়ক হয়েছে।

তাদের মিলন কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি মোটেই। তবে শাবানা যা ভেবেছিল তেমনটি ঘটেনি। শাবানার আসল পরিচয় পেয়ে, সে যে বাঈজির মেয়ে ও তার পিতা যে নিখোঁজ একথা জেনে ইয়ুসুফের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলেই সে আশংকা করেছিল। কিন্তু কোর্ট-রুমে দেখা গেল ইয়ুসুফ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শাবানার অতীতের সব কথাই একের পর এক বলে দিয়েছে। এবং শাবানাকেও জানিয়ে দিয়েছে কে তার পিতা। শাবানার পিতা আদালতেই ছিলেন। সকলেই তাকে জানত অন্য পরিচয়ে, ইয়ুসুফের বাড়ির গৃহভৃত্য হিসাবে। যদিও শাবানা এই শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধের (প্রদীপকুমার) প্রতি কী-রকম যেন একটা আকর্ষণ বোধ করত। বৃদ্ধ শাবানাকে ডাকত বেটী বলে। ইয়ুসুফের এই তৎপরতা বেশ মজার, চট করে কাহিনীর জাল গুটনোর কাজে মদৎ দিয়েছে পরিচালককে। এমন গোঁজামিল অবশ্য চিত্র-কাহিনীতে আরও আছে।

হত্যাকাণ্ড ছবিতে একটি অদ্ভুত রকম আদালত-দৃশ্যও রয়েছে। শাবানা খুন করেছে সেই শয়তানকে যে দুষ্টগ্রহের মতই এসেছিল তার জীবনে। আইনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পরে শাবানা তার পিতা ও প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত।

খানদানী পরিবারের শিক্ষিত আধুনিক যুবক হিসাবে রাজেশ খান্নাকে বেশ ভালই লেগেছে। রোমান্টিক নায়ক হিসাবেও তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এ ছবিতে। লীনা চন্দ্রবারকরের সম্পর্কে তার চমৎকার। তবে ছবিতে যেমন কিছুটা এগোবার পর তাঁর লক্ষ্যের ভাব কেটেছে। প্রদীপকুমারকে ছবিতে বেশ লাগল, খুবই সংযত তাঁর অভিনয়। ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সুরারোপিত গান। প্রকৃতপক্ষে ছবির কাহিনীতে উপভোগ্যতার প্রাচুর্য তেমন নেই যেমন রয়েছে গানে ও অভিনয়ে।

'মৌসুমী গ্রন' (পরিচালনা : অমর চৌধুরী) ছবিতে শিবানী বসু

বোম্বাই বিচিত্রা

ধাঁধানো মারকিউরী এবং নিয়নের আলোর গণ্ডির ভিতরে দুর্বল ...কে শহর বোম্বাই নাচাতে থাকে অঙ্গ-তরঙ্গে। গত একযুগ যাবৎ রঙ-রঙীন আলোর খেলা দেখতে ...তে স্বাভাবিক অন্ধকার দেখার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা বুঝলাম ...দিন, যুদ্ধারম্ভের প্রথম দিনে যখন ...র সাগরের লোনা ডোবায় সূর্য ডুবল ...তু মেরিন ড্রাইভের 'কুইনস নেকলেস' ...লোর হীরেয় ঝলমল করে উঠলো না, ...কে ভূতের নাচ নাচাতে নিয়নে ...নে বিজ্ঞাপনের বেলেল্লাপনা শুরু ...লো না, উদ্ধত হেডলাইটের রাঙা চোখে ...লাগলো, ঊর্ধ্বশ্বাস চক্রযানের গতি ...মন্থর, আসন্ন সন্ধ্যার শিষ কানে এলো ...করছে চারিধার। আলোর চোখে ...লো ঠুলি।

...রৈ করে বেশ কয়েকটি ছবি রিলিজ ...ছিল। অগ্রিম বুকিং চলছিল রৈ-রৈ ...। হঠাৎ সব বন্ধ। প্রযোজক, পরিবেশক, ...ক সকলের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। ...খবরের কাগজ পড়বার সময় পেত না ...আজকাল প্রতিদিনের কাগজ তাদের মুখস্থ- ...। সিনেমা মহলে সংবাদপত্রের তেমন ...কদর নেই। সপ্তাহে একদিন, যেদিন ...র জন্য একটি পৃষ্ঠা খরচ করে ...সংবাদপত্রগুলি, সেইদিন শুধু সেই পৃষ্ঠায় ...রকমে চোখ বুলিয়েই সংবাদপত্রের ...সম্বন্ধ চুকিয়ে দেয় লাইনের লোকেরা। ...কিন্তু আজকাল ব্যাপারটা তেমন নয়।

"ছিন্নপত্র" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী

"বনপলাশীর পদাবলী" (পরিচালনা: উত্তমকুমার) ছবিতে মালনা দেবী

সকলেই খবরের কাগজ পড়ছে। রেডিওর খবর শুনছে।

গতকাল এক বন্ধু এলেন। তাঁর এক হিরোর বাড়িতে যাবার কথা। আমাকে বললেন সঙ্গে যেতে। আমাদের সকলের বাড়িই খুব কাছাকাছি। কিন্তু সন্ধ্যার সময় লাইনের লোকের বাড়িতে যাতায়াতটা আমি খুব পছন্দ করি না। কারণ সারাদিন পরিশ্রম করে এসে ঐ সময়টায় সকলেই একটু তরল হতে চায়। আর সেই সময় সরল শর্মাকে প্রায় কেউ-ই খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু বন্ধু বললেন, 'না, আজকাল কেউ-ই খুব একটা তরল হচ্ছেন না। প্রাণের ভয়ে প্রায় সকলেই নেশা এবং পেশা দুটোর থেকেই দূরে। এখন শুধু সজাগ হয়ে জেগে থাকা। ইমারজেনসি তো আর ছেলেখেলা নয়।' সুতরাং বন্ধুকে সঙ্গ দিতে হিরোর বাড়ির দিকে রওনা হওয়া গেল। রাস্তায় 'বাংলাদেশের' যে-কোনো গ্রামের অন্ধকার। পার্থক্য শুধু এ অন্ধকারে জোনাকির অনুপস্থিতি। হিরোর বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম সৌখিন মোমবাতির স্তিমিত আলোয় তিনি সপরিবার এবং স-সভাসদ আসর জমিয়েছেন। আমরা পৌঁছোতেই নতুন খবরের খোঁজ হল। তারপর বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা চললো নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। সকলেই আপন আপন বক্তব্য পেশ করতে ব্যস্ত। হঠাৎ নজর গিয়ে পড়লো এক ভদ্রলোকের ওপর। দেখলাম তিনি মন দিয়ে কি যেন পড়ছেন। ঔৎসুক্য বাড়ল। দেখলাম একটি বাংলা সাপ্তাহিক। নাম 'সোনার বাংলা'। আগ্রহ হল। এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের পাশে বসলাম এবং শেষ অবধি কাগজটি হাতে এলো। প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'সোনার বাংলা' ওরফে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। মজলিশের আবহ আলোচনা চলছে। আমি 'সোনার বাংলা' পাঠ করছি। বিভিন্ন অঞ্চলের খবর ভিন্ন ঢঙে পরিবেশিত। পুরাতন উদ্ধৃতি এবং নতুন সমস্যার সমাহার। সুদূর বোম্বাই-এ বসে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনে প্রকাশিত 'সোনার বাংলা' পড়তে পড়তে এক বিচিত্র রোমাঞ্চ হল। তারপর হঠাৎ যখন একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি নজরে এলো তখন তো আনন্দে নেচে উঠলো মন। 'সোনার বাংলা' বিনামূল্যে বিতরিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। সাবাস বাংলাদেশ। সাবাস বাঙালী। এত দারিদ্র্য তবু দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। সহানুভূতির শেষ নেই। 'সোনার বাংলা, বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা, সব মিলে বাঙালী'। 'জন গণ মন

...র্বে গড়ে তোলেন "মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী ...ষ্ঠী" সুর ও ছন্দ দিয়ে দেশের মানুষকে ...পথে উদ্দীপ্ত করাই ছিল, যাঁদের উদ্দেশ্য।

...১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্টের পর এবারের ...-সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই "বিক্ষুব্ধ ..." (রচনা : দিলীপ সোম)। ফেবরু-...রে ভাষা আন্দোলন, আগরতলা ...ন্ত মামলায় মুজিবুর, পাক-...রিক শক্তির বাংলা সংস্কৃতি তথা ...ন্দ্র-সংগীত বিরোধিতার পটভূমিকায় ...ন এবং কথায় পরিবেশিত এই ...ত-আলেখ্যটি অনেক দিন মনে ...বে। সমবেত কণ্ঠে "বাঁধ ভেঙে দাও", ...ড় সাত কোটি মানুষের", "ধন ধান্যে ...প ভরা", "এবার উঠেছে মহাঝড় ...ড়ে", "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ...শে ফেবরুয়ারি" প্রভৃতি গান এই ...লেখ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুপো খান, ...পাল মেহমুদ, আবদুল জব্বার, অজিত ... ও অন্যান্য শিল্পী একটি করে গান ...লেন।

...সেশনে রবীন্দ্রনাথের দুটি গানে ...ষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। গান দুটি হল : ...মার সোনার বাংলা" ও "জন গণ মন"।

—বিশেষ প্রতিনিধি

দেশাত্মবোধক সংগীতের রেকর্ড উপহার

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী ...জিবনগর থেকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার ...ন আগে (২২শে ডিসেম্বর) মুজিবনগরে ...ষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে গ্রামো-...ন কোম্পানীর ডিরেক্টর শ্রী টি পি ...রাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ...ন্দকার মোস্তাক আহমদের হাতে "আমার ...নার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" ...বং অন্যান্য দেশাত্মবোধক সংগীতের রেকর্ড ...পহার দেন। অন্যান্য রেকর্ডের সঙ্গে ...রুলের 'বাংলাদেশ' এবং অচিন্ত্যকুমার ...গুপ্তের 'পূব-পশ্চিম' আর রবিশঙ্কর ও ...লি আকবরের বিখ্যাত রেকর্ড 'জয় বাংলা' ...ন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলা গানের ধারা : একক আসর

...য় মাস আগে শ্রীহিমঘ্ন রায়চৌধুরী ... একক-সংগীতের এক অভিনব আসরে ...ধুবাবু থেকে নজরুল পর্যন্ত বিভিন্ন ...গীতিকারের বাংলা গান শুনিয়েছিলেন। ...বাংলা গানের প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ...প্রবহমান ধারার একটি পরিচয় তুলে ধরা ...ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অনুরূপ আর একটি ...অনুষ্ঠান শ্রী রায়চৌধুরী সম্প্রতি রবীন্দ্র-...সদন উপহার দিলেন।

এবারের পরিধি আরও ব্যাপক। রবীন্দ্র-

মুজিবনগরে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব খোন্দকার মোস্তাক আহমদের হাতে গ্রামোফোন কোমপানির সাম্প্রতিক প্রকাশনা দেশাত্মবোধক রেকর্ড-গুলি উপহার দিচ্ছেন কোমপানির ডিরেক্টর শ্রী অঘোরাম। ছবিতে শ্রী এ সি সেন ও শ্রী টি পি রায়চৌধুরীও রয়েছেন

নাথের দুটি পুরনো গান দিয়ে তিনি শুরু করেন। অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী আমরা কখনও শুনলাম নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, দাশরথি রায়, গোপাল উড়ে, রসিকচন্দ্রের টপ্পা অঙ্গের গীত; কখনও গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীন-

চন্দ্রের গান; কখনও রবীন্দ্র-সংগীত; কখনও রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ, নজরুলের গান। বিভিন্ন রচয়িতার গানে কোথাও ভাষাগত, কোথাও ভাবগত, কোথাও-বা সুর-ভিত্তিক যে-মিল আছে, আবার ওই মিলের মধ্যেও আছে যে-স্বাতন্ত্র্য, সেই ব্যাপারটিকে চিহ্নিত করবার কল্পনায় এই চয়নের গানগুলিকে চোদ্দটি স্তবকে ভাগ করা হয়। সেইভাবেই সেগুলি পরিবেষিত। রচনার কালক্রমের ধারাবাহিকতাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যা মন্তব্য, তারই প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, শ্রোতারা মিল কোথায়, কী পরিমাণে পেয়েছেন সেটা এখানে বড় কথা নয়। বরং বাংলা গানের বিচিত্র সম্পদের রূপরস, সুদীর্ঘকালব্যাপী সেই সাংগীতিক ধারার যে-পরিচয় তাঁরা পেলেন, রসিক শ্রোতাদের কাছে তা-ই পরম লাভ।

সেই সঙ্গে তাঁরা নতুন করে আবিষ্কার করেছেন গায়ক হিমঘ্ন রায়চৌধুরীকে, অরূপ শিল্পিগোষ্ঠী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সাহসী পরিকল্পনা যাঁর। একাসনে বসে সতেজ, সুরেলা কণ্ঠে তিনি প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে গাইলেন তেত্রিশটি গান। নানা রাগে নিবদ্ধ, তাল লয়ে গায়কীর ঢঙে বিচিত্র এই সব গানের সঙ্গে কখনও শোনা গেল ওস্তাদ কেরামত খাঁর তবলা-সঙ্গত, কখনও বাজল খোল (রামদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়), মন্দিরা (রবীন গঙ্গোপাধ্যায়), পাখোয়াজ (হরেন মান্না)। আবার কখনও, বিশেষ কিছু ভাবের গানের বেলায়, গায়ক বিনা সঙ্গতে শুধু হারমোনিয়ামের সামান্য সুর ছুঁয়েই গেয়েছেন। শ্রী রায়চৌধুরী প্রত্যেকটি গান নিখুঁত সুরে এবং সুন্দর মেজাজে পরিবেষণ করেন। সুরের মজা আর মোচড়ের দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। টপ্পা অঙ্গের গানগুলিতে জমজমার অলংকরণ হয়ত কিছু পরিমিত, সূক্ষ্ম তানগুলি কিন্তু চমৎকার আদায় হয়েছে; স্বরক্ষেপও তেমনই বলিষ্ঠ এবং লাবণ্যযুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : নিধুবাবুর 'প্রণয় পরম নিধি', 'কেন মিছে কর অভিমান' 'সোহাগে মৃণাল ভুজে'; দাশরথি রায়ের 'ননদিনী বোল নাগরে'; রসিকচন্দ্রের ভক্তি-গীতি 'আয় মা সাধন সমরে।' এ-ছাড়া বিশেষ করে ভাল লাগল : 'আমার এ সাধের বীণে' (গিরিশচন্দ্র), 'কি আর চাহিব বল' (অতুলপ্রসাদ), 'ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়' (রজনীকান্ত), 'মলয় আসিয়া কয়ে গেল' (দ্বিজেন্দ্রলাল)—এবং 'সুখে আমায় রাখবে কেন', 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে'-সহ বেশ কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীত। 'নানা বন্দরে ঘুরে ফিরে', শ্রী রায়চৌধুরী বলেছেন, শেষে রবীন্দ্র-সংগীত আশ্রয় করে 'বুঝলুম এর মধ্যে সব আছে'। অনুষ্ঠান-সূচীর তেত্রিশটি গানের মধ্যে দশখানিই ছিল তাই রবীন্দ্র-সংগীত, শিল্পীর তন্ময় পরিবেষণে যা রসোত্তীর্ণ।

—সংগীতপ্রিয়

ইয়াহিয়ার বিদায় : ভুট্টো প্রেসিডেন্ট বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তান হারাবার ফলে জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর উপর জনরোষের চাপ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টোকে জরুরী তলব করে এনে গত ২০ ডিসেম্বর তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। শ্রী ভুট্টো এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। ভুট্টো রাওয়ালপিনডিতে কড়া সামরিক প্রহরী পরিবেষ্টিত বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বাড়িতেই শপথ গ্রহণ করেন। ক্ষমতা লাভের পর জাতির উদ্দেশে এক বেতার-ভাষণে জোরের সঙ্গেই অঙ্গীকার করেন যে, ভারত যে অপমানের বোঝা চাপিয়েছে পাকিস্তান তার বদলা নেবেই। সামরিক প্রশাসকদের ত্রুটিবিচ্যুতি "ক্ষমা করতে ও ভুলে যেতে" বাংলাদেশের জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক সমাধানের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন একই পাকিস্তানের কাঠামোয় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একটা ঢিলেঢালা ব্যবস্থা চলতে পারে। ভুট্টো এখন মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসনের চূড়ায় এসে বসেছেন। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে রেখেছেন প্রেসিডেন্টের বাসভবন সংলগ্ন একটি আবাসে। তাঁর সঙ্গে শ্রী ভুট্টোর আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে।

দেশী সংবাদ

২০ ডিসেম্বর—*দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন পূর্ব নির্দিষ্ট সময়সূচী মত ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গ ও ১৯৭১ সালে যে সব রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হয় সেই সব রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনও ওই সময় হতে পারে।*

জনসাধারণ যাতে ন্যায্য দামে সংবাদপত্র পান, সেজন্য সরকার আজ লোকসভায় একটি বিল এনেছেন। বিলটির নাম সংবাদপত্র (মূল্য নিয়ন্ত্রণ) বিল। আইন হলে এটি দু বছরের জন্য বলবৎ হবে। বিলটি সভায় পেশ করেন তথ্য ও বেতার দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী।

২১ ডিসেম্বর—অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র নিয়ে মুনাফা শিকার বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার এক আদেশ জারি করেছেন। মজুতের পরিমাণ বা স্টক ও তার দর লিখে নিজ নিজ ব্যবসাস্থানে টাঙিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অন্যথায় মজুত পণ্য আটক করা হবে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকার একথা জানিয়েছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ বলেন যে, অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে বাংলা দেশ সরকারকে সাহায্য দিতে ভারত প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। যে পরিমাণ সাহায্য চাই না কেন তা দেওয়া হবে। কেননা ভারত ও বাংলা দেশের অর্থনৈতিক পরিপূরক ও বিনিময়ের অনেক কিছু আছে।

২১ ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী আজ লোকসভায় সংবিধানের ২৮তম সংশোধন বিলটি পেশ করেছেন। বিলে রাষ্ট্রপতিকে এই মর্মে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, প্রয়োজনে তিনি দেশের যে-কোন অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। বিরোধী পক্ষ থেকে শেম শেম ধ্বনি তুলে বিলটির উত্থাপনে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২৪৮—৭৬ ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপনের জন্য অনুমতি পায়।

বাংলা কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তবে নব কংগ্রেসের সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হয়নি। দলের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এখন ধাড়াপন্থী বাংলা কংগ্রেস দলই রইল।

২৩ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গেও আগামী মার্চ মাসেই অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাবনা। প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের

নব কংগ্রেস এম পি-দের নাকি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যদি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গেই নির্বাচন চান, তাহলে তিনি সেই অভিমত মেনে নেবেন। কলকাতায় নব কংগ্রেস নেতৃত্বও একই সঙ্গে নির্বাচনের পক্ষে।

সরকার ঠিক করেছেন যে, ২৮তম সংবিধান বিলটি সংসদের এই অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য আর চেষ্টা করা হবে না। গতকাল লোকসভায় এই বিলটি পেশ করা হয়েছিল বিলটির উদ্দেশ্য ছিল: দেশের অংশ বিশেষে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা। লোকসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

২৪ ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ জনগণকে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। কারণ এখন যে শান্তি বিরাজ করছে, সেটা প্রকৃত শান্তি না কেবল দম নেবার সময়, তা তিনি বলতে পারেন না।

ভারত-বাংলা দেশ যাতায়াত সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে কিছু ঠিক হয়নি। যাঁরা এখন ভারত থেকে বাংলা দেশে যাচ্ছেন, তারা নিজ দায়িত্বেই যাচ্ছেন এবং তাতে ঝুঁকিও থাকছে। এই যাতায়াত আইনসম্মত নয়। বস্তুত বাংলা দেশে ঢোকার মুখে ভারতীয় চেক পোস্টগুলিতে বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদও শুরু হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস চায় অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এখানেও বিধানসভার নির্বাচন মার্চেই হোক। আপাতত ঠিক হয়েছে, নির্বাচনী সমঝোতার জন্য কংগ্রেস সি পি আই-এর সঙ্গে আলোচনা চালাবে। দলের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনার সময় বলেছেন, জানুয়ারি মধ্যে প্রার্থীতালিকা দিল্লিতে পাঠাতে হবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম পা[illegible]স্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার [illegible] ভুট্টোকে কড়া শাসিয়েছেন, নিজেদের পরাজ[illegible] প্রতিশোধ তুলতে তিনি যদি তাঁর দুর্বুদ্ধি[illegible] কাজ করার চেষ্টা করেন, তা হলে পাকিস্ত[illegible] কপালে রয়েছে অনেক দুর্ভোগ—এবারকার [illegible] বেশি, অনেক খারাপ।

২৬ ডিসেম্বর—১৯৭২ সালের ৩১ মা[illegible] মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ পাঁচটি বেসরকারী [illegible] কল সরকারের পরিচালনায় আবার খোলা [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বৈদেশিক [illegible] মন্ত্রকের মধ্যে আলোচনার পর এই সি[illegible] নেওয়া হয়।

বাংলা দেশের পুনর্গঠনের জন্য [illegible] জানুয়ারি মাস নাগাদ বাংলা দেশ সরকারকে [illegible] চার শ কোটি টাকা দিবে। বাংলা দেশ সরকার [illegible] ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে [illegible] আলোচনার পর মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত নে[illegible] হয়।

বিদেশী সংবাদ

২১ ডিসেম্বর—বাংলা দেশের [illegible] আগামীকাল মুজিবনগর থেকে [illegible] স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। গত ১৭ এপ্রিল [illegible] মুজিবনগরে অস্থায়ী রাজধানী ছিল। [illegible] রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, [illegible] শ্রীতাজউদ্দিন আমেদ ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর স[illegible] গণও এদিন ঢাকা রওনা হচ্ছেন।

২২ ডিসেম্বর—শেখ মুজিবর রহ[illegible] পশ্চিম পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত [illegible] হয়েছে। কিন্তু তিনি এখন গৃহবন্দী। [illegible] রাতে নয়া পাক প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, [illegible] লায়ালপুর কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে [illegible] করে রাখা হবে। মুজিবকে কোথায় রাখা হ[illegible] তা এখনও বলা হয়নি।

২৩ ডিসেম্বর—আজ [illegible] প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিরু[illegible] যে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, [illegible] লাহোরের একটি আদালত ২৫ ডিসে[illegible] সিদ্ধান্ত নেবেন। স্থানীয় একজন [illegible] জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও অন্য [illegible] সরকারী কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে এই পিটি[illegible] দাখিল করেন।

২৪ ডিসেম্বর—আজ [illegible] পাওয়া খবরে জানা যায়, গতকাল প্রেসিডে[illegible] ভুট্টো এবং শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে আ[illegible] আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্টের [illegible] সংলগ্ন একটি আবাসে এই বৈঠক [illegible] শেখ মুজিবকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

২৫ ডিসেম্বর—বাংলা দেশের গণহত্যার [illegible] দায়ী পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর প্রাক্তন গভ[illegible] ডাঃ এ এম মালিক এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষ[illegible] সদস্যদের দেশের আইন অনুসারে অপরা[illegible] হিসাবে বিচার করা হবে। বাংলা দেশের স্বরা[illegible] মন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন।

২৬ ডিসেম্বর—ইয়াহিয়া চক্রকে ঢাল [illegible] সাহায্য করার পর নিকসন প্রশাসন যেমন [illegible] দিকে প্রকাশ্যে ভুট্টো সরকারকে সমর্থন [illegible] চলেছেন তেমনি আবার বাংলা দেশের প্রতি[illegible] এবং তাঁদের পরিচিত বিদেশী বন্ধুদের সা[illegible] যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। নিকসন প্রশা[illegible] এখন বাংলা দেশের সঙ্গে [illegible] রক্ষা করতে সচেষ্ট, এবং এর জন্য বাংলা দে[illegible] আইনসম্মত স্বীকৃতিও দেওয়া হতে পারে।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সূর্য তপস্যা ১০ সেই মরুপ্রান্তে ১১ শঙ্খবলয় ৬ স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯ কাজললতা ৬ কিরীটী রায় ১১ ঝড় ১০ অপারেশন ৭॥০ অরণ্য ৬॥০ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥০ ধূসর গোধূলি ৫ উত্তর-ফাল্গুনী ৭ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৮ কালো ভ্রমর ৬॥০ ঐ ৬ কালোহাত ৬॥০ ঘুম নেই ৫॥০ কন্যাকুমারী ৬ লালুভুলু ৫ নিরালা প্রহর ২ বেলাভূমি ১০ মধুমিতা ৫॥০ রতিবিলাপ ৫॥০ মুখোশ ৬ মায়ামৃগ ৬ রাতের রজনীগন্ধা ৫ হীরা চুনি পান্না ৫॥০ ছিন্ন-পত্র ৫ বহুত মিনতি ১০ বাদশা ৫ বহ্নিশিখা ৮

প্রবোধকুমার সান্যাল

অগ্নিকন্যা ৪ এক চামচ গঙ্গা ৪ নগরে অনেক রাত ৪॥০ মহাপ্রস্থানের পথে ৬ আঁকাবাঁকা ৫॥০ আগ্নেয়-গিরি ২॥০ উত্তরকাল ৫ জলকল্লোল ৫॥০ তুচ্ছ ৪॥০ নদ ও নদী ৬ বন্যাসঙ্গিনী ৩॥০ বিবাগী ভ্রমর ৮ বেলোয়ারী ৭ ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ৪ উত্তর হিমালয় চরিত ১১ মনে রেখো ৮

প্রমথনাথ বিশী

সাহিত্যচিন্তা ৮ বিপুলা সুদূর তুমি যে ২॥০ প্রাচীন পারসীক হইতে ৫॥০ লালকেল্লা ১৮ রবীন্দ্র সরণী ১০ অনেক আগে অনেক দূরে ৪॥০ কেরী সাহেবের মুন্সী ১০ গল্পপঞ্চাশৎ ৯ মাইকেল মধুসূদন ৪॥০ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ১০ চিত্রচরিত্র ৬ বিচিত্র উপল ৪ হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স ২ প্রাচীন আসামী হইতে ৪

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

অদৃষ্ট রহস্য ৩॥০ তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ১ম—৮, ২য়—৮ অবধূত ও যোগিসঙ্গ ৯ যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ ৫

প্রফুল্ল রায়

পূর্বপার্বতী ১১ বাতাসে প্রতিধ্বনি ৭॥০ অন্য ভুবন ৪॥০ প্রথম তারার আলো ১০
কিন্নরী ৪॥০ আলোছায়াময় ৮॥০ মুক্তো ৫

প্রশান্ত চৌধুরী

কান পেতে শুনি ৫ নদী থেকে সাগরে ৮ ঘণ্টাফটক ৪ ডাকো নতুন নামে ৪ আলোকের বন্দরে ৪॥০ সেই মেয়ে সুজাতা ৭

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫ পূর্বাচল ১১ চন্দনবাঈ ৫॥০ তরঙ্গের পর ৫ উপকূল ৩ অন্য দেশ অন্য দাহ ১৫ নায়িকার মন ৪॥০ ক্লান্ত বিহঙ্গী ১১ শহরে বন্দরে ৪॥০ স্বর্ণ চাঁপার দিন ২

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥০ স্বপ্নতনু ৪॥০ অমলতাস ৫

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বর্গাদপীগরীয়সী ১ম ৬ ২য়—৫॥০ ৩য়—৬ দোল-গোবিন্দের কড়চা ৬ কথাচিত্র ৩ কবি ও অকবি ৩।০ ক্ষণ অন্তঃপুরিকা ২॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৯ নয়ান বৌ ৬ মিলনান্তক ৪॥০ আর এক সাবিত্রী ৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালী ৬॥০ অপরাজিত ১০ ইছামতী ৯ বিভূতি-বিচিত্রা ১২॥০ আরণ্যক ৭ অভিযাত্রিক ৫॥০ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৬ ঐ নাটক ২॥০ উৎকর্ণ ৪ কিন্নর দল ৩ কুশলপাহাড়ী ৫ গল্পপঞ্চাশৎ ৯ দেবযান ৭ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩।০ মেঘমল্লার ৫॥০ যাত্রাবদল ২॥০ শ্রেষ্ঠগল্প ৬॥০ অরণ্য মর্মর ৭॥০ অশনি সংকেত ৫ বিভূতি রচনাবলী, ১ম—১৬ বাকী প্রতি খণ্ড ১৪, অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত বেরিয়েছে।

বিমল কর

সীমারেখা ৪॥০ খোয়াই ৩ জীবনায়ন ৫ পরবাস ৪॥০ যাদুকর ৫॥০ স্বপ্নের নবীন ও সে ২

বিমল মিত্র

কলকাতা থেকে বলছি ৬ তিন ছয় নয় ৬॥০ একক দশক শতক ১৪ বেনারসী ৬ কড়ি দিয়ে কিনলাম ৩৪ শ্রেষ্ঠগল্প ৫॥০ সখী সমাচার ৬ ফুলফুটুক ২

মনোজ বসু

বন কেটে বসত ১০ গল্পপঞ্চাশৎ ১০ সাজবদল ৫॥০

মহাশ্বেতা দেবী

সুভগা বসন্ত ৪ বায়স্কোপের বাক্স ৬ সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥০ অজানা ৪॥০ আঁধার মানিক ১২॥০

শঙ্কু মহারাজ

গঙ্গাসাগর ৮ কেঁদুলীর মেলায় ২ উত্তরস্যাং দিশি ১০ নীলদুর্গম ৬॥০ পঞ্চপ্রয়াগ ৫ বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৮॥০ গহন গিরি কন্দরে ৬ গিরি কান্তার ৯

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান শ্রীমতী ৭ নিবেদনমিদং ৭

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

সময় তুলে নিন
হাতের 'পরে-
দেখুন কেমন সে
পড়ছে ঝ'রে
আপনার জীবনসাথী ক'রে নিন
এচ. এম. টি. ঘড়ি
নুতন
সোনার পাতে মোড়া। স্টেনলেস স্টীলের
পশ্চাদ্ভাগ। শক্ প্রুফ।
১২৮ টাকা। স্থানীয় কর স্বতন্ত্র
সোনা
সোনার পাতে মোড়া।
ধুলাময়লা ঢুকতে পারে না।
১৭টি জুয়েল। শক্ প্রুফ।
চুম্বক প্রতিরোধী। মেনস্প্রিং
ভেঙ্গে যায় না। ১২০ টাকা
স্থানীয় কর স্বতন্ত্র।
hmt
এইচ. এম. টি.
ওয়াচ ফ্যাক্টরী
বাঙ্গালোর-৩১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীমিলন মুখার্জি

পাতে অত খাবার কারা ফেলে গেল ?

রাস্তার নেড়ী কুকুরকে দেবার জন্যে নাকি !
তা নয় তো থালায় অত খাবার পড়ে থাকে কেন ?
যদি আমরা খিদে আর পেট অনুযায়ী পাতে নিই তাহলে বাড়ীর মেয়েরা ঠিক পরিমাণ মতো রাঁধতে পারেন।

তলিয়ে দেখতে গেলে খাবার দাবারের অপচয় নানা দিকের অপচয়।
বিশ্বাস না হয় তো বাড়ীর গিন্নীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

davp 71/137

বাচ্চার জন্যে মায়ের কামনা...
ও যেন পায় সুখস্বপ্ন
অসীম ভালবাসা—
টুকটুকে গাল, তুলতুলে পা
যা কিছু মোর আশা
অস্টারমিল্কই
দেব ওকে—
যা সবচাইতে ভালো বেঁচে
থাক সোনা
আমার
ঘরটি
ক'রে আলো!
OSTERMILK
আপনার মত বিচক্ষণ মায়েরা
তাঁদের শিশুদের খাওয়ান অস্টারমিল্ক
অস্টারমিল্ক
সারা দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিল্ক ফুড

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০
শনিবার ২৩ পৌষ ১৩৭৮
SATURDAY, JANUARY 8, 1972

নির্বাচনের সম্ভাবনা

এই নতুন বছরটি—১৯৭২ সাল. ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের বছর। মোটামুটি এটা ঠিকই ছিল, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবার পর যে জরুরী অবস্থা দাঁড়ায় তাতে এ-বছরে নির্বাচন না হবারই কথা হয়; পরে—যুদ্ধ থেমে যাবার পর দেশের বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থায় নির্বাচন হতে পারে ভেবে আগামী মার্চ মাসে বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে। সব কয়েকটি রাজ্যেই নির্বাচন হবে কিনা তা এখন থেকে বলা যায় না, তবে বেশীর ভাগ রাজ্যেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে নির্বাচন আছে কি নেই আপাতত সেটি জানা যায় নি. তবে রাজনৈতিক মহলের আশা. হয়ত আগামী মার্চেই এই রাজ্যেও নির্বাচন হয়ে যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে পাঁচ বছর আগে. ১৯৬৭ সালে। তারপর '৬৯ সালে ও ৭১ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়ে গেছে। এই ক বছরে দু' দুবার যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় এসেছেন, একবার ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হয়েছে. আর শেষবার ক্ষমতায় এসেছিলেন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার। দফায় দফায় রাষ্ট্রপতির শাসনও এসেছে এই রাজ্যে। মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে. গত পাঁচ বছর ধরে তিনবার নির্বাচন অনুষ্ঠান হলেও পশ্চিমবঙ্গে কোনো স্থায়ী সরকার গড়ে উঠতে পারে নি। শুধু যে স্থায়ী সরকার গড়ে ওঠে নি তা নয়—পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের রাজনীতি এই সময়ের মধ্যে দেখা গেছে তা অভূতপূর্ব। এখানে বামপন্থী দলগুলির ক্ষমতা অক্ষমতা সম্পর্কেও মানুষের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণ এক সময়ে কংগ্রেসের ওপর বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলিকে শাসন ক্ষমতায় আসার যে সুযোগ দিয়েছিলেন সেই সুযোগ বামপন্থী দলগুলি নষ্ট করেছেন। ক্ষমতায় এসে এ'রা যতটুকু না ভাল করতে পেরেছেন তার বেশী করেছেন মন্দ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র একটা অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল এ'দেরই কল্যাণে। এ'দের আমলেই খুনখারাপি, লুঠতরাজ, হিংসা, উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে নির্বিবাদে, নিজ স্বার্থে। এই অবস্থা আরও কিছুকাল একটানা চলতে থাকলে আমরা কোন্ অবস্থায় পৌঁছতাম বলা যায় না। সে-অবস্থার উন্নতি নিশ্চয় হয়েছে, অন্তত সাধারণ মানুষ তা স্বীকার করেন।

নব কংগ্রেস. এই রাজ্যে যাঁরা অল্প কিছুদিন হল রীতিমত শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছেন তাঁদের মধ্যেও পূর্বতন রাজনীতির প্রভাব একেবারেই পড়ে নি এমন কথা বলা যায় না। যে পথে বামপন্থী রাজনীতি নিজের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করেছেন, নব কংগ্রেস নিশ্চয় সে পথ ধরে এগতে চাইবেন না। তেমন চেষ্টা মারাত্মক হবে। অথচ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী মার্চে নির্বাচন হবে মোটামুটি অনুমান করে নিয়ে নব কংগ্রেস তার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। বামপন্থী দলগুলিও চুপ করে বসে নেই. তাঁরাও নির্বাচনের রণকৌশল খুঁজে বার করার জন্যে ব্যস্ত। আর ইতিমধ্যেই কলকাতা ও বাইরের কয়েকটি জায়গায় কিছু দলীয় সংঘর্ষও ঘটে যাচ্ছে। নির্বাচনের মুখে বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এবারে ইতিমধ্যেই যে ধরনের সংঘর্ষ ঘটছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমরা উদ্বেগ বোধ করছি। বর্ধমান, চব্বিশ পরগনায় নানা জায়গায় সি পি এম তার প্রভাব হারাচ্ছে এই ভয়ে ভীত হয়ে বিরোধী দলকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। আর নব কংগ্রেস কিছু এলাকা উদ্ধারের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। ফলে কোনো কোনো সংঘর্ষ বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। আমরা আশা করব, সরকার এ-ব্যাপারে সতর্ক, কঠিন, নিরপেক্ষ হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া এখন নব কংগ্রেসের অনুকূল—এরকম অনুমান অনেকেই করেছেন। সে হিসেবে এই রাজ্যের নেতারা চাইলে নির্বাচন হয়ত মার্চেই হতে পারে। তবে স্থায়ী কোনো সরকার গড়ার সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে নিছক নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কিছু হবে না।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক ... টাঃ ৩২.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৩৭.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৪৫.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৮৪.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৫৭.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১৪.৭৬

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক ... টাঃ ১৫৪.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৩৮.৭৬

যাঁহার প্রভায় প্রভা
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস (নব)
এখনই
নির্বাচন

নাম অবশিষ্ট একাদশ

কটি ক্রীড়া সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনী খেলাটি একদিনের টেস্ট পর্যায়ের হবে, এবার তা শুরুতেই ইন্দিরা একাদশ বনাম অবশিষ্ট একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলাতেই দাঁড়িয়ে যাবে বলে এই রাজ্যের ধুরন্ধর রাজনৈতিক ক্রীড়া সমালোচকগণ মনে করছেন। যাঁরা এই রাজ্যের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে গোপন খবরাখবর রাখেন, তাঁদের মহলের জোর খবর, এবার অবশিষ্ট একাদশের দল বাছাইতে বেশ অসুবিধা দেখা দেবে। প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হবে এই যে, এই দলে নতুন মুখ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল হয়ে উঠেছে। নতুন খেলোয়াড় এদিকে বেশি ভিড়ছে না।

এই দলের যাঁরা মেরুদণ্ড তাঁদের মত নিষ্ঠাবান পলিটিক্যাল খেলোয়াড় আজকাল খুবই কম দেখা যায়। তাঁরা বহু প্রথম শ্রেণীর খেলায় নিজেদের নৈপুণ্য দেখিয়ে আসর মাত করেছেন। এমন কি কয়েকজন তো প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, তাঁদের বয়স হয়েছে এবং প্রতি বছর বয়স বেড়ে যাচ্ছে। এঁরা এখন যে সব রাজনৈতিক মার মারেন তাতে আর আগের তেজ থাকে না তেমন। নতুনত্বও না। তবে বড় খেলার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা তো এঁদের আছে। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা আর মেজাজ সম্বল করেই তাই আজও ওঁরা ওঁদের ব্যক্তিগত সুনামটুকু কোনও মতে বজায় রেখে চলেছেন। আসন্ন নির্বাচনী প্রদর্শনী খেলায় অবশিষ্ট একাদশ যে এই সব ভেটারানদের নিয়েই মূল দলটি গঠন করবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আর একটা খবর, ইন্দিরা একাদশের বিরুদ্ধে এবার যে দলটি খেলবে তার নাম আর আগের বারের মত বামপন্থী বাছাই একাদশ যে থাকছে না, তা একেবারে অবধারিত। কারণ বামপন্থী দলের কয়েক জন কুশলী খেলোয়াড় এবার সাইড বদলিয়ে ইন্দিরা একাদশে আমন্ত্রিত বা অতিথি খেলোয়াড়রূপে ভিড়ে যাচ্ছেন। কাজেই এর পরও যদি টিমের নাম ওঁরা বামপন্থী একাদশ দিতে চান, তবে তা সাঁত্যি সাঁত্যই হাস্যকর হয়ে উঠবে এবং বামপন্থী নামটাই গুড্‌উইল হারাবে। ইন্দিরা একাদশের বিরুদ্ধে খেলবার জন্য খেলোয়াড় বাছাই, দল গঠন এবং ক্যাপ্টেন নিয়োগের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর নীতিনির্ধারণ সাব কমিটির যে মিটিং হয় তাতে নাকি দলের

নাম নির্ধারণের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তুমুল তর্কবিতর্কের পর সাব কমিটির সদস্যগণ মাত্র দুটি বিষয়ে একমত হন বলে প্রকাশ। প্রথম সিদ্ধান্তঃ যাঁরা এতদিন ধরে বামপন্থী দলে খেলে আজ আখের গুছিয়ে নেবার তালে ইন্দিরা একাদশের সাইডে গিয়ে ভিড়ছেন তাঁদের

বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তঃ বিতর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে খোলা মনে আলোচনার জন্য সদস্যগণের মধ্যে এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

নির্বাচকমণ্ডলীর নীতি নির্ধারণ সাব কমিটির চেয়ারম্যান কমরেড দাশগুপ্ত (তিনি অবশিষ্ট দলের ম্যানেজারও বটেন) সাংবাদিকদের কাছে এক ছোট্ট বিবৃতি মারফত উক্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চাইছিলেন। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেনঃ কমরেড দাশগুপ্ত, আপনাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের অর্থ কী?

কমরেড দাশগুপ্ত ঃ কেন, বাংলা বোঝেন না, না কী। যা লেখা আছে, ওর মানেও তাই।

আর একজন সাংবাদিক ঃ এর মানে সরল বাংলায় এই দাঁড়ায় যে, এই মিটিং-এ দারুণ গণ্ডগোল হয়েছে এবং সদস্যরা পরস্পরকে খিস্তি করেছেন।

কমরেড দাশগুপ্ত ঃ অ্যাঁ! আরে না না। আমাদের মধ্যে বেশ হাসি মশকরা হয়েছে। বুঝলেন। আমরা হাসতে হাসতে ফটোও তুলেছি। কমরেড দাশগুপ্ত অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও বিশ্বস্তসূত্রে এটা জানা যায় যে, মিটিং-এ দারুণ গোলমাল দেখা দেয়। কমরেড দাশগুপ্তের মার্কসবাদী পলিটিক্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের বড়দাসুলভ আচরণে অনেক ছোট ক্লাব আপত্তি জানায়। এমন কি দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে ভেটারান পলিটিক্যাল ক্যাপ্টেন কমরেড জ্যোতি বোসদার নাম প্রস্তাবিত হলে কয়েকটি ছোট ক্লাব তার প্রবল বিরুদ্ধতা করেন। এতে ঘনিষ্ঠ মহলে একটা হতবুদ্ধির ভাব ছড়িয়ে পড়ে। কারণ সকলেই জানে এই পোস্টটা কমরেড জ্যোতি বোসদার একচেটিয়া। এতে যে কারো আপত্তি উঠতে পারে, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু সাব-কমিটির মিটিং-এ কয়েকটি ছোট্ট দল এই নিয়ে খুব হইচই বাধিয়ে দেন। তাঁরা নাকি স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর হারু ক্যাপটেনের অধীনে নতুন দলকে খেলাতে রাজী নয়। এতে অবশিষ্ট একাদশের বৃহত্তম ক্লাবটির প্রেসটিজে খুবই চোট লেগেছে।

ওই বৃহত্তর দলের অর্থাৎ মার্কসবাদী পলিটিক্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের জনৈক মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, ছোট ক্লাবগুলোর এই ধরনের অসার স্পর্ধায় তাঁরা রীতিমত বিস্মিত। গত নির্বাচনী টেস্টেও বাছাই বামপন্থী একাদশের অধিনায়ক কমরেড জ্যোতি বোসদার ব্যক্তিগত ১০১ রানের জন্যই গোটা টিমের ইজ্জৎ বেঁচে যায়। যদিও এবার তাঁরা গদি পান নি। কিন্তু আর যারা ব্যাট ধরেছিলেন, তাঁদের রান তো চোখেই পড়ে না। কমরেড জ্যোতি বোসদা ছাড়া অধিনায়ক হবার যোগ্যতা আর কার আছে?

ছোট দলগুলোর জনৈক মুখপাত্র বলেন, জ্যোতিবাবু উইকেট ভাল চেনেন না। ফিল্ড ভাল সাজাতে পারেন না। বোলারদেরও ভাল কাজে লাগাতে পারেন না। শুধু পিটিয়ে কিছু রান তুলতে পারেন। এবারের ট্রিকি উইকেটে জ্যোতিবাবু পেটাতে গেলেই ইন্দিরা একাদশের বোলাররা তাঁর কাপ ছটকে দেবেন। ব্যাটে বলে এবার তাঁর দারুণ জোর। তার উপর আন্তর্জাতিক খেলায় পাকিস্তানকে গো হারান হারিয়ে রাবার নিয়ে সদ্য ফিরেছেন। ওঁদের মরাল খুবই হাই। সেই কারণেই টিম নির্বাচনে এবার আমরা সতর্ক হতে চাইছি। এটা মনে রাখা দরকার যে, ইন্দিরার এবার একাদশে বৃহস্পতি।

চাঁওতা

জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোর অনেক অনেক দিনের আশা এতদিনে পূর্ণ হয়েছে, ২০ ডিসেম্বর তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তাঁর হাতে ক্ষমতা আর বিস্তর ঝামেলা তুলে দিয়েছেন জংগীশাহীর হর্তাকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ। নতুন রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করিয়েছেন পুরোনো রাষ্ট্রপতি নিজেই তাঁর সরকারী প্রাসাদের একটা অন্দরের ঘরে একরকম পর্দার আড়ালে। জাঁকজমক করতে চান নি ইয়াহিয়া খাঁ সম্ভবত এই ভয়ে যে লোকের সামনে গেলে তাঁকে তারা হয়তো রাগে ক্ষেপে গিয়ে মেরেই বসবে। শুভ-কর্মটি শেষ করে ইয়াহিয়া খাঁ মুখ কালো করে লুকিয়ে বেরিয়ে গেছেন রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে আপাতত অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু কোন অধিকারে তিনি নিজের উত্তরাধিকারী বাছাই করে তাঁর হাতে রাজত্ব সঁপে দিলেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে পাকিস্তানে সংবিধান বলে তো কিছু নেই, আইনের বালাইও নেই। সেখানে তেরো বছর ধরে ইস্কান্দার মির্জার আমল থেকে চলছে নিরঙ্কুশ ফৌজী রাজত্ব।

রাষ্ট্রপতির প্রস্থান ও প্রবেশ সবই পাকিস্তানে খেয়ালখুশির ব্যাপার। ভুট্টো সাহেব যতই গলাবাজি করুন না কেন গণতন্ত্রের নামগন্ধ ইসলামাবাদে পালাবদলে নেই। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তাঁর পিপলস পার্টি জাতীয় পরিষদে ছিল দু নম্বর দল, এক নম্বর ছিল আওয়ামি লীগ। গণতন্ত্র মানতে গেলে তাঁর আর প্রধানমন্ত্রী হওয়া চলে না, রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা তো ওঠেই না। বড় জোর তিনি হতে পারতেন লীডার অব দি অপোজিশন অর্থাৎ বিরোধী দলের নেতা। ইয়াহিয়া খাঁরও ইচ্ছে ছিল না ভুট্টোকে প্রধানমন্ত্রী করার, প্রেসিডেন্ট বানানো তো দূরের কথা। লড়ায়ের মাঠে পূবে-পশ্চিম অমন ল্যাজে গোবরে না হলে আজও তিনি থাকতেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি, নূরুল আমিন হতেন তাঁর বশংবদ প্রধানমন্ত্রী আর জুলফিকার আলি ভুট্টো "শো বয়" উপ-প্রধানমন্ত্রী। সব পালটে দিলে যুদ্ধের হার। ভুট্টোকে প্রধান-মন্ত্রী করলে রাষ্ট্রপতি কাকে করা যায় ভেবে ভেবে কুল পেলেন না ইয়াহিয়া খাঁ। মুখে কালি পড়েছে সব জঙ্গীনায়কদেরই। রাষ্ট্রপতির কাঁটার আসনে বসতে কেউ রাজী নন। তাই ডাক পড়লো ভুট্টোর। তিনি তখন নিউইয়র্কে।

সেখান থেকে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তিনি রীতিমত "হিরো" বনে গিয়েছেন। তাঁর গরম গরম বুলি, বিশেষ করে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জেহাদের জিগীর শুনে পাকিস্তানিরা ঠাওরালে

দেবরাজ

তিনি তাদের পরিত্রাতা। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পিপলস পার্টির সংগঠন খুব জোরদার। তারা তাঁর এমন একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে যে ফিক্তর লোকের ধারণা হয়েছে তিনি শক্ত হাতে হাল ধরলে পাকিস্তানি নৌকো তরতর করে উজান বেয়ে চলবে, ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে সে ভিড়বে গিয়ে শান্তি-সমৃদ্ধি-সম্মানের ঘাটে। ভুট্টো ছাড়া পাকিস্তানে দ্বিতীয় নেতা নেই যাঁর লোকসমাজে কিছু প্রতিপত্তি আছে। তাই তাঁকেই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ইয়াহিয়া খাঁ আর তাঁর জঙ্গী-দোস্তরা। ভুট্টোও ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন—প্রধানমন্ত্রী না হয়ে, হয়ে বসেছেন এক লাফে রাষ্ট্রপতি যাতে ফৌজী কোনও পাণ্ডা "হেড অব দি স্টেটের" গদিটি না চুপিসাড়ে দখল করে বসতে পারেন। নিরুপায় হয়ে তাতেই সায় দিয়েছেন ফৌজী নেতারা।

তাঁরা রাজীও হয়েছেন ভুট্টোকে রাষ্ট্রপতি আর সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে মেনে নিতে। যে জিনিস জঙ্গী নায়কদের সম্মতি নিয়ে পাকিস্তানে ভুট্টো সাহেব চালিয়েছেন তা সোনার পাথরবাটির মতোই এক আজব চীজ। তিনি গলা ফাটিয়ে বলছেন গণতান্ত্রিক অসামরিক শাসন তিনি চালু করেছেন পাকিস্তানে। তা হলে সামরিক আইন সেখানে বজায় থাকে কেমন করে? কেমন করেই বা রাষ্ট্রপতি হন মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ সামরিক আইন প্রশাসক? এককালে নির্বাচনে তিনি জিতেছেন বটে, কিন্তু তাতে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁর হয়নি। রাষ্ট্রপতির পদের জন্য নির্বাচন পাকিস্তানে হয়ওনি, তাতে হারা জেতার প্রশ্নই তাই ওঠে না। ভুট্টো চেয়েছেন গণতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র নয়—ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা পাওয়ার সুযোগ যখন এলো তখন তিনি কোনও রফায় রাজী হলেন না—চাইলেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। পেয়েছেনও তাই। আর যা খুশি তাই করার অধিকারের সাফাই হিসেবে রেখে দিয়েছেন সামরিক আইন যার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না, চলে না আপীল।

গণতন্ত্রের দোহাই মুখে দিলেও ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের বৈঠক তিনি ডাকেন নি, কোনও দিন ডাকবেন কি না সন্দেহ। কৈফিয়ত তাঁর অবশ্য একটা আছে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচন যখন হয়েছিল তখন পাকিস্তান ছিল অখণ্ড। এখন বৈঠক ডাকলে তাতে যোগ দেবেন কেবল পশ্চিমী এলাকার প্রতিনিধিরা। সেটা তাঁর মতে ঠিক হবে না, কেননা তা হলে বাংলাদেশের ওপর ইসলামাবাদের কর্তৃত্ব যে আর নেই, সে দেশ যে স্বাধীন হয়ে গিয়েছে সে কথা মেনে নেওয়া হবে। তা তিনি চান না। কাজেই জাতীয় পরিষদকে আপাতত শিকেয় তুলে রেখে তিনি তাঁর ক্ষমতার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, এমন কী দেশের কল্যাণও নয়। তাঁর উদ্দেশ্য নিজের ক্ষমতা কায়েম করা যাতে বেঁচে থাকতে তাঁকে মসনদ থেকে কেউ সরাতে না পারে। ভুট্টো গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মুখেই, আসলে তিনি একটি ক্ষুদে ডিকটেটার।

ভুট্টো চান প্রমাণ করতে তিনি একজন বামপন্থী, প্রগতিশীল নেতা। ফৌজী স্বৈরাচারের তিনি ঘোর বিরোধী। সমাজের ওপর তলার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে তাদের নিচের তলার সঙ্গে সমান করে দিতে চান, মোটা মাইনে পান যে সব আমলা তাদের খপ্পর থেকে প্রশাসনকে মুক্ত করাই তাঁর ইচ্ছে, মুনাফাবাজদের শায়েস্তা করাই তাঁর পণ, দুর্নীতি দূর করাও তাঁর লক্ষ্য। চটপট চারজন মিলিটারি গভর্নরকে সরিয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন অসামরিক প্রশাসন চালু করাই তাঁর সাধ। তবে যা তিনি করছেন তার মধ্যে ভাঁওতাই বেশী। ২২টা ধনী পরিবারের পাসপোর্ট তিনি আটক করেছেন। কিন্তু তার বাস্তব মূল্য কতটুকু? বিনা হুকুমে পাকিস্তানের বাইরে যাবার অধিকার তো জঙ্গীশাহীর আমল থেকেই নেই। আর ধনী পরিবার তো ৩৫টা, বাকী ১৩টা রেহাই পেল কেন? আত্মীয়পোষণ বন্ধ করার হুমকি ভুট্টো দিলে কী হয় নতুন গভর্নরদের মধ্যে একজন তো তাঁর ভাই। মিলিটারি গভর্নর সরিয়ে যাঁদের তিনি তখতে বসিয়েছেন তাঁরা তো তাঁর নিজের পিপলস পার্টির ধুরন্ধর নেতা। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে হুঙ্কারও ফাঁকা আওয়াজ। নিজের ক্ষমতার বুনিয়াদ মজবুত করার জনাই তিনি কথার প্যাঁচে লোককে ভোলাতে চেষ্টা করছেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

বাংলাদেশ সম্পর্কে এখনও নানা প্রশ্ন শোনা যায়। যতদিন বাংলাদেশ পাকিস্তানের দখলে ছিল ততদিন শোনা যেত এক ধরনের প্রশ্ন। এখন যখন বাংলাদেশ বাস্তব তখন শোনা যায় আর এক ধরনের প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন হল, বাংলাদেশ কি টিঁকবে? কিছু বিদেশীর কাছে এটা বেশ একটা মজার প্রশ্ন। প্রশ্ন শুনেই বোঝা যায়, ওরা চান না বাংলাদেশ টিকুক। কিছু ভারতীয়ও এই প্রশ্ন করেন। এটা অবশ্য প্রশ্নের [illegible]। আমাদের কারু কারু মনে [illegible] বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশ শংকা আছে।

[illegible] বাংলাদেশ না টেঁকার কী আছে? বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য। সেখানে [illegible] সরকার প্রতিষ্ঠিত। সেই সরকারের পেছনে দেশের সাধারণ মানুষের [illegible] সমর্থন রয়েছে। সেই সরকার [illegible] প্রশাসন ব্যবস্থাও চালু [illegible]। ধীরে ধীরে দেশের অর্থনীতির উপরও সরকার তাঁর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে [illegible]। তা হলে এই দেশ টিঁকবে না কেন?

[illegible] কথা অবশ্য কেউ কেউ বলেন, [illegible] তো মণ্ডাই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক [illegible] পায় নি—এখনও পর্যন্ত তো [illegible] এবং ভুটান ছাড়া পৃথিবীর [illegible] কোনও রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি [illegible]।

[illegible] সত্যি। কিন্তু তা বলে [illegible] কেউ আশা করেন যে, আজ [illegible] যে সব রাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে [illegible] সরকারকে স্বীকৃতি দেন নি তাঁরা [illegible] বাংলাদেশে দখল ফিরিয়ে পাওয়ার [illegible] সরকারকে সমর্থন করবেন? মনে [illegible] অনেকেই বাংলাদেশের আবির্ভাবে [illegible] নন। কিন্তু এখন বাংলাদেশকে [illegible] পাকিস্তান করা যে সম্ভব নয় সেটা [illegible] সবাই বুঝেছেন। এবং বুঝেছেন [illegible] অনেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক [illegible] করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে [illegible]। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যাবে [illegible] বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য। এ [illegible] বেশি দিন কেউই অস্বীকার করে [illegible] পারবেন না। যদি কেউ তা করেনও [illegible] বাস্তব সত্যটা পাল্টানো যাবে [illegible] বাংলাদেশকে না [illegible] বাংলাদেশ থাকবেই। কেউ যদি তা পারতেন [illegible] লড়াইয়ের সময়ই হস্তক্ষেপ করে

বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা আটকাতেন। তখন যা পারেন নি এখন তো তা আরও পারবেন না।

❋

দ্বিতীয় প্রশ্নটা উঠছে ভুট্টো-মুজিব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। ভুট্টো সাহেব বলে বেড়াচ্ছেন, তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখবেনই—অর্থাৎ খুব "আলগা ভাবে" হলেও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মধ্যে রাখবেনই। তিনি আরও বলে বেড়াচ্ছেন এই ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও তাঁর কথা হচ্ছে। খবরটা ইসলামাবাদ থেকে এমনভাবে রটানো হচ্ছে যেন শেখ মুজিবরও ভুট্টোর সঙ্গে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজি হয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে কি ভুট্টো শেখসাহেবের মুক্তির বিনিময়ে বাংলাদেশকে আবার যে কোনও ভাবে পাকিস্তানের মধ্যে নিতে চান?

আমার মনে হয়, ভুট্টো শেখসাহেবের নামে যে কথা বলছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের মধ্যে নেওয়ার কোনও প্রস্তাব নিয়ে কারু সঙ্গে আলোচনা করতে শেখ মুজিবর রাজি হয়েছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি না। শেখ মুজিবর রহমান—যিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে এতদিন নেতৃত্ব দিলেন, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করলেন তিনি বাংলাদেশকে আবার পরাধীন করার আলোচনায় যোগ দেবেন বলে বিশ্বাসই হয় না। যেভাবেই করার চেষ্টা হোক যত আলগাভাবেই বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের মধ্যে ঢোকাবার প্রস্তাব আসুক, শেখসাহেবের পক্ষে তা মানা সম্ভব নয়। ২৫ মার্চের আগে ছয় দফার প্রশ্ন ছিল, তখন আলগা-কনফেডারেশনের প্রস্তাব অনেকেই মানতেন, কিন্তু এখন সে প্রশ্নই ওঠে না। ২৫ মার্চের পরও একটা রফার কথা হলেও হতে পারত। কিন্তু ১৫
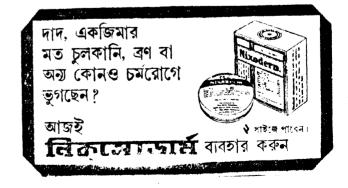
ডিসেম্বরের পর সে সব প্রশ্ন বাতিল হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ এখন স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন—আজ আবার তাকে নতুন করে কোনও বন্ধনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ধরেই না হয় নিলাম শেখসাহেবকে দিয়ে ভুট্টো বলালেন যে তিনি চান বাংলাদেশ পাক কনফেডারেশনের মধ্যে থাকুক। যদি শেখ সাহেব তা বলেনও, বাংলাদেশ তা মেনে নেবে? আমি বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না শেখ মুজিবর রহমান তা বলতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি না শেখ মুজিবর তা বললেও বাংলাদেশ আজ আর তা মানবে। ব্রিটেনের সঙ্গে এত তিক্ততার পর ভারত স্বাধীনতা পায় নি—চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের পর অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর যদি গান্ধীজী বলতেন আমরা আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হব তা হলে কোনও ভারতবাসী সেই নির্দেশ মানতেন?

যে তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বাঙালী স্বাধীন হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে এখন বাংলাদেশের কারু পক্ষে আর পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও কনফেডারেশন বা ওই ধরনের কোনও সমঝোতায় পৌঁছনোর প্রস্তাব তোলাই সম্ভব নয়। যদি কেউ এখন সে কথা বলেনও (কেউ বলবেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না) গোটা বাংলাদেশের মানুষ তাকে বাতিল করে দেবে।

*

তৃতীয় প্রশ্ন, যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা কি সরকার চালাতে পারবেন? এই প্রশ্নটা বিদেশীরা খুব করেন। ১৯৪৭ সনে ভারত সম্পর্কেও এমন প্রশ্ন বহু সাহেব করতেন। নেহরুর মৃত্যুর পরেও করেছিলেন। করেছিলেন ১৯৭০ সনেও। কিন্তু ভারত সরকার এখনও চলছে। যাঁরা বাংলাদেশ সরকার করেছেন তাঁরাই বা তা হলে দেশ চালাতে পারবেন না কেন?

বাংলাদেশে গত কুড়ি বছরে বহু বাঙালী রাষ্ট্রপরিচালনায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদের কাজও চালিয়েছেন। তাঁদের অনেকের বিদেশী ট্রেনিংও রয়েছে। সুতরাং তাঁরা নিজেদের দেশটা চালাতে পারবেন না কেন?

ভাল করে দেশ চালাতে পারবেন কিনা সেইটা প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু কিছু দেখাব আগেই কেন রায় দিতে হবে যে বাংলাদেশের সরকার, বাংলাদেশের শিক্ষিত দেশপ্রেমী যুবকরা বাংলাদেশ চালাতে পারবেন না?

যদি নেতারা ঠিক মত নেতৃত্ব দিতে পারেন তা হলে সাধারণ মানুষ তার সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং তা হলে বাংলাদেশ চালানো বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কঠিনও হবে না।

এর বিশেষ কারণ, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মূলত ভাল, শান্তিপ্রিয় এবং আইন মেনে চলায় আগ্রহী। গোটা ভারতীয় উপমহাদেশেরই অবস্থা তাই। শতকরা নব্বই জন মানুষ শান্তিপ্রিয়, নিরীহ এবং নিজে থেকেই আইন মেনে চলেন। গণ্ডগোল করেন এবং করতে পারেন বড় জোর শতকরা দশজন মানুষ। এই শতকরা দশজনকে শাসনাধীন করতে পারলেই সমস্যা মিটে যায়।

*

চতুর্থ প্রশ্ন, অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ টিঁকবে? অতটুকু রাজ্য, অত লোক, অত সমস্যা—ওই রাজ্য অর্থনৈতিকভাবে টিঁকতে পারে?

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমস্যা আছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র অচল হয়ে যাওয়ার মত কিছু নয়।

বাংলাদেশের খাদ্য যা প্রয়োজন এখন তার শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ বাইরে থেকে আনতে হয়। নিবিড় চাষের মাধ্যমে এই ঘাটতি মেটানো খুব কঠিন নয়। বাংলাদেশের মোট বাৎসরিক রফতানির পরিমাণ দাঁড়াবে ২০০ কোটি টাকা। এই রফতানি পাঁচ বছরের মধ্যে ৩০০ কোটিতে নিয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন নয়। প্রথমত, পাট ও চা-এর রফতানি বাড়াবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট রফতানিও অনেক বাড়ানো যায়। তৃতীয়ত, মাছ, মাংস প্রভৃতি ভারতে রফতানি করারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

এই ব্যাপারেও মূল প্রশ্ন, রাষ্ট্রের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালাতে পারবেন কিনা। যদি পারেন তা হলে বলতেই হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আর এখন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের চাহিদা খুবই সামান্য। এই চাহিদা মেটানো কঠিন নয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্য এখন খুব বেশী—বছরে শতকরা ৩ জন করে লোক বাড়ছে। এই হারে বাড়লে ১৯৮০ সনে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ১০ কোটি। কিন্তু ঢাকায় আমি অর্থনীতিবিদদের কাছে খবর নিয়ে দেখেছি, পরিবার পরিকল্পনার সরকারী প্রোগ্রামে দেশের সাধারণ মানুষও খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার দ্রুত অগ্রসর হলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়ে আনা কঠিন হবে না।

মূল কথা হল সদিচ্ছা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নবলব্ধ স্বাধীনতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে অত্যন্ত আগ্রহী। যদি নেতারা ঠিক মত এগোতে পারেন তা হলে বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন—বাংলাদেশের অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে।

১-১-৭২

নবারুণ গুপ্ত

বিশ্ব জনমতের ডাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিনাশর্তে মুক্ত

"আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে?"

সংস্কৃতির দ্বিভাজন

রঞ্জন

বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারে আমাকে "সম্পূর্ণ নিরক্ষর" আখ্যাই সাজে। একটা সিগারেট লাইটার নিষ্কর্মা হলে আমার ক্ষমতা নেই তাকে বিপরীত অগ্নিবীমা দেবার। আমার টাইপরাইটার সামান্য অসুস্থ হলে আমি অন্য চিকিৎসকের নিরুপায় শরণার্থী। রবীন্দ্রনাথের আকৈশোর বিস্ময় ছিল বিশ্ব নিয়ে; প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহজাত অনুভূতি তাঁর কাছে পর্যাপ্ত ছিল না। অনাদিশিক্ষিত অনুসন্ধিৎসা তাঁকে নিকট করেছিল আইনস্টিন তথা সত্যেন বসু বা জগদানন্দ রায়ের কাছে। সত্যেনবাবু সুহৃদ ছিলেন ধূর্জটি মুখুজ্যে আর সুধীন দত্তর। জগদীশ বসু বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সামান্য সাহিত্যিক ছিলেন না। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বা কলাশিল্পের এই সুমধুর পরশন যে করে সহসা অন্তর্হিত হলো তা আমি সঠিক জানিনে। কারণ বোধ হয় অন্তর্নিহিত ছিল আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে আর্টস পেল ব্রাহ্মণ্য আর সায়েন্স নির্বাসিত হলো ল্যাবরেটরিতে। ব্রিটেনের সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক দ্বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সি পি স্নো। কই, এ-দেশে তো এমন আলোচনা চোখে পড়ে না। গত সপ্তাহে বিক্রম সরাভাইর অসাময়িক ও একান্ত অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে নানা অসংলগ্ন চিন্তা প্রকাশ্য পুনর্বিবেচনা দাবি করছে।

আমার বিনীত বক্তব্য অতিশয় সামান্য। বিজ্ঞান বা কলাসাধনার মধ্যে আধুনিক বিরোধ একান্তই কৃত্রিম এবং দ্রুত পরিহার্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি য়ুরোপে যখন রেনেশাঁস বা বিদ্যার পুনর্জীবন ঘটল তখন সরস্বতীর অঙ্গনে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বা কলাসৃষ্টির মধ্যে আত্মঘাতী দ্বৈতবাদী পাকিস্তানী মনোবৃত্তি মাথা তোলেনি। লেওনার্দো দা ভিঞ্চি শুধু ছবি আঁকেননি পরবর্তী কালের বিজ্ঞানের বহু বিস্ময় প্রথম প্রসূত তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে। জ্ঞানের জগতে বিশেষজ্ঞতার স্থান নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এর অখণ্ডতাও নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে দেখিয়েছেন যে কাব্যরচনাই কবির একমাত্র করণীয় নয়। চাষের উন্নয়নও তাঁর এলাকার বাইরে নয়। বিক্রম সরাভাইর পূর্বসূরী জে এচ ভাবা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনকে এমন একটি অসংকীর্ণ ও সর্বগ্রাহী প্রতিষ্ঠানরূপে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যেখানে গবেষণা নিশ্চয়ই হবে প্রথম প্রয়াস, কিন্তু সুযোগ থাকবে, সময় থাকবে ছবির জন্য, সংগীতের জন্য, একটা সার্বিক সংস্কৃতির অনুশীলনের জন্য। ভাবা মারা গেলেন আল্পসের শ্বেতশীতল অসীম তুষারে যখন তাঁর বিমানের আয়ু ফুরিয়ে গেল কোনো অজ্ঞাত কারণে। সরাভাইর অনুপ্রেরণা ছিল ভাবারই অনুসারী। তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হলো সুপ্তাবস্থায় কোন দক্ষিণ ভারতীয় ট্যুরিস্ট হোটেলে। বয়স সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছিল।

★

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে এমন বিপর্যস্ত যে, এ থেকে সুস্থ বা সমাহিত কিছু আশা করাই শক্ত। সারা বছরে ইস্কুলগুলি খোলা থাকে কত দিন? কলেজে কলহ নাকি নিত্যকার নৃশংস টিফিন। ব্যাঙের ছাতার মতো প্রজনন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, যেখানে শুনি মহড়া চলছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। গুজবে যদি কান দিই, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীও ব্যতিক্রম নয়। বহির্বিশ্ব বা নিকট পারিপার্শ্বিকের ঘটনাবলী নিয়ে শিক্ষক বা ছাত্রসমাজ আন্দোলিত হবেন না এমন ধারণা একান্তই অবাস্তব। কিন্তু আন্দোলনেরও স্তরভেদ কয়েক দশক আগেও অজ্ঞাত ছিল না। অবিচারের প্রতি শিক্ষিতের প্রতিবাদ অশিক্ষিত ছিল না। আজকের রাজনীতিক কোলাহলে প্রচুর শুনি হ য ব র ল, শুনিনে শুধু অ আ ক খ। এই অশিক্ষার বিকিরণ আমি ভয়াবহ জ্ঞান করি।

বর্তমান পরিবেশ দৃশ্যতই অশান্ত। অশান্তির সূত্রগুলিও একেবারে অদৃশ্য নয়। ব্যাপক অশান্তি কিন্তু লাভজনক ব্যবসা হতে পারে এবং এর রাজনীতিক ডিভিডেন্ডে কোনো দলেরই বিশেষ অরুচি আছে বলে মনে হচ্ছে না। তখন এত ব্রেনগান ছিল না, পিস্তল ছিল না, কুটীর শিল্প প্রস্তুত হাতবোমা ছিল না, কিন্তু আজকের মতোই একটা ব্যাপক অরাজকতা এদেশে এনেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ শিহরিত হয়ে তার প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি। একটা সমগ্র প্রজন্ম ইস্কুল কলেজ ছাড়লে জাতির ভবিষ্যৎ কী? গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনেরও একটা সাংগঠনিক দিক ছিল আর সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রনাথের সোচ্চার হুঁশিয়ারি। আজ অরাজকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নেই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ। নেই স্বদেশী আন্দোলনের সাথী সাহিত্য আর কলাচর্চা। আজকের বন্ধ্যা রাজনীতিতে না মেলে আসন্ন মুক্তির আস্বাদ না পরশাসনের আইন ও শৃংখলার প্রচ্ছন্ন প্রলেপ। বর্তমান শাসকদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা শুধু বিদেশী শাসনের সেবার জন্য কেরানী সৃষ্টি করেনি। ওই একই পদ্ধতির সন্তান নানা পণ্ডিত, নানা কবি, নানা শিল্পী এবং অনুশীলনীর নানা সংগ্রামী যাঁদের বিবিধ প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর এবং তৎপরবর্তী কালে পারমাণবিক পদক্ষেপ। ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ছিল বিস্তর ও তীব্র। কিন্তু শিক্ষার সর্বাগ্রগণ্যতা তিনি বিস্মৃত হননি কখনো। আপন হাতে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু মূল কথা ছিল শিক্ষা, আর সব বাহ্য। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে শিক্ষার মানদণ্ড দেখা দিল প্রাদেশিকতার রাজদণ্ডরূপে। বিদ্যা উপেক্ষিত।

★

ইংরেজশাসিত ভারতে শিক্ষকের স্থান ছিল প্রায় নগণ্য। স্বীয় সীমিত সাম্রাজ্যে, অর্থাৎ ছাত্রজগতে, তাঁর সম্মান ছিল প্রশ্নের অতীত। জমিদার বা ঠিকেদার তখনো জানতো তাদের সামাজিক সম্ভ্রমের সীমানা। আরোগ্যাতীত ক্ষমতাসক্তি সত্ত্বেও জবাহরলাল নেহরু ছিলেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নিবিড় অনুরাগী। প্রশাসনে কেন স্থান হবে না শিক্ষকের, কবির, শিল্পীর? সংগত প্রশ্ন। কিন্তু আজও আমি স্থির করতে পারি নে সরকারী জালে শিক্ষক বা শিক্ষাবিদদের টেনে নিয়ে তিনি প্রশাসনের বিশেষ উন্নতিবিধান করেছিলেন কিনা শিক্ষাজগতের বিশেষ ক্ষতি। গত বিশ বা পঁচিশ বছরে নানা শিক্ষক অতি উচ্চ রাষ্ট্রমর্যাদা লাভ করেছেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তো রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এবং বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্তি হলেও বানপ্রস্থে তাঁর আগ্রহ ছিল সামান্যই। প্রশাসনে তাঁর দানের পরিমাণ আমার অজানা কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটে গেছে এক বৃহৎ পরিবর্তন। কেউ আর মাস্টার মশাই থাকতে রাজী নয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস তো উচ্চাভিলাষী পূর্বতন অধ্যাপকে ভরা।

ভাবা ও সরাভাই কি ল্যাবরেটরি ছেড়ে, গবেষণা ভুলে, অত্যুচ্চপদস্থ কেরানী অর্থাৎ ফাইলসহিকারীতে পরিণত হয়েছিলেন? বোধ হয় না। ক্ষমতার আসনে অভিষিক্ত হয়েও এই দুজন বোধ হয় তাঁদের প্রথম সাধনা বিস্মৃত হননি, পুজো দেননি রাজনীতির ক্ষণিক মসনদে বা মন্দিরে। স্বাধীনতা-দিবসে রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে জবাহরলাল কি কবিকে আমন্ত্রণ জানাতেন রাষ্ট্রপতি হতে? আমার এই যদির জগতে ভাবতে ভালো লাগে যে, রবীন্দ্রনাথ নেহরুর পত্রের উত্তর দিতেন শালীন, অনুত্তেজিত কিন্তু অস্পষ্টতাশূন্য দৃঢ়তায়: তুমি শাসন করো তোমার বিশাল সাম্রাজ্য। রাষ্ট্রপতিভবনে নিয়ে যাওয়া যাবে না আমার শ্যামলী বা উত্তরায়ণকে। আমার স্থান এইখানে, শান্তিনিকেতনে, দিল্লিতে নয়। আমার সাম্রাজ্য, সে তো একটি বা দুটি শিশুমন যেখানে ফোটাতে চাই একটি অতসী, এক বৃন্তে দুটি ফুল, কলা ও বিজ্ঞান।

ফেরা যায় না, তবু যেতে চাই

সন্তোষকুমার ঘোষ
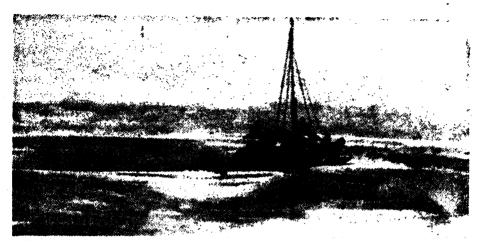
তিন প্রৌঢ় মিলে যা করতে পারে তাই করছিল, পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটছিল। অর্থাৎ জাবর কাটছিল সেকালের। শৈশবের সে কত সুখস্মৃতি, বাল্যের চাপল্য, কৈশোরের কষ্ট আর যৌবনের দুঃসাহস। হঠাৎ টেবিল থাপড়ে একজন বলে উঠল: "তোকে যদি হঠাৎ কেউ বর দেয়, যা চাও তাই পাবে—শিশু হতে চাও তো শিশু, যুবক হতে চাও তো যুবক, তুই কোন্‌টা নিবি? শৈশব আর যৌবন, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টাকে চাইবি?"

একজন বলল, বেশ হয় আবার বাচ্চা হয়ে যেতে পারলে। তাহলে হয়তো ম্যাট্রিকের ইংরেজিতে আরও বেশি নম্বর তুলতাম। আর একজন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "কিন্তু অঙ্ক? আরও একবার পরীক্ষা দিতে হতো যে!" অন্যজন তখন কোন উত্তর দিল না।

আসলে দ্বিতীয় জনই বেশি স্থিতধী। সে জানে, যা আছি তাই বেশ আছি, কতকটা ব্রাউনিং-এর সেই বুড়ো রাবির মতো পরিমিত, পরিমিত প্রজ্ঞা। পিছনের দিকে তাকানো আসলে নস্‌টালজিয়া। তার মতে আমাদের স্মৃতিতে একটা করে ফিল্‌টার লেন্স পরানো থাকে, যাহা চাই তাহাই তুলে রাখি, তা-ই ফেলে দিই যাহা চাই না।

কথাটা হয়তো সত্য। প্রথম প্রৌঢ় সেই থেকে মনে মনে ভাবছে। অল্প বয়সটাও এমন কিছু আহা মরি ছিল না। অনেক অবহেলা, অনেক নিগ্রহ, আর সেই মফস্বল জীবনে অনেক মশা-মাছি, কেরোসিনের কালি, সন্ধ্যা হতেই সব শিয়ালের এক রা, ভুতুম পেঁচা আর রাত্রি জুড়ে ভূত নামানো অন্ধকার। সাপ ছিল, চোর ছিল, আর ছিল সকাল হতেই কী করে আজ হাঁড়ি চড়বে, চাল নিয়ে সেই চমৎকার চিন্তা।

ভরাবাদর আর মাহ ভাদরে বাড়ির পাশের ডোবাটা তো ডোবা, দাওয়া আর উঠোন সব ভেসে যেতো। তক্তপোশের পায়া জড়িয়ে জড়িয়ে উঠতো শোভাযাত্রী সব পোকামাকড়, আর সেই শোবার ঘরেই একটু দূরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি জড়িয়ে শরণার্থী সব গোখরো। শরণার্থী কিন্তু বিষধর।

চৈত্রের আকাশ মাঝে মাঝে লালে লাল হয়ে যেতো। না, পলাশের নেশায় নয়, কৃষ্ণচূড়াগুলো মজার এক হোলিতে মেতেছে বলেও না—স্রেফ এক একটা পাড়ায় দারুণ আগুন লাগতো বলে। খড় বা ছনের দো-চালা, তিনচালাগুলো ছারেখারে যেতো : বালতি ঘটি কলসী হাঁড়ি নিয়ে ছুটছে ভয়ার্ত প্রতিবেশীর দল, কিন্তু গ্রীষ্মকাল, তাই সব পুকুর ঠনঠন—তখন উঠোনে বাক্স-বিছানা তৈজস সব পেড়ে পেড়ে নামানো। কেননা কোথা থেকে কী হয়, বলা যায় না, পাড়ার আগুন উগ্রমতবাদের চেয়েও, কলেরা বসন্তের চেয়েও, ছোঁয়াচে। মহামারক।

তেমন আগুন আজকাল আর লাগে কি না সে জানে না। হয়তো লাগে না—কারণ কালগুণে বেশির ভাগ বাড়িই হয়তো পাকা, নতুবা টিনের। কিংবা হয়তো লাগে, সে আর সে সব দেখতে পায় না। দেখতে চায় না বলেই তো একদিন সে বা তারা সে সব দৃশ্য থেকে অন্তরিত হয়ে এসেছিল। অন্তর্হিত হবার আগেও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতো, কবে হে ভগবান, কবে এ সব থেকে একেবারে ছিঁড়ে

ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারবো?

তখন তাদের চোখের সামনে কলকাতা নামে একটা কাম, কলকাতা নামে একটা ক্রোধ আর মোহ—সব ছিল। ঈশ্বর প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন। কলকাতায়, সে কলকাতা যে কলকাতাই হোক, তারা পৌঁছে গিয়েছিল।

ছেড়ে আসা জীবনের স্মৃতি বড়ই কটু-কষায়, আর তিক্ত বলে, তারা যত তাড়াতাড়ি পারে শহুরে হয়ে যেতে চাইল। সেই মফস্বলের দিকে পিছন ফিরে আর তাকায়ওনি। যদিও পাকিস্তান পয়দা হতে তখনও দশ-এগারো বছর দেরি। তবু কেন ফের সেই দুঃস্বপ্নের বেড়াজালে কে জড়াতে চায়?

পিছুটান এলো, সেই পরিত্যক্ত প্রাণ যখন পরের হয়ে গেল তখনই। নিষিদ্ধ ফলের দিকে উদ্বাহু হাত যেমন আপনা থেকেই উঠে আসে। আজ এ সব কথা সোজা-সুজি লিখে দেবার সময় এসেছে, যখন বাংলা-দেশ নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম সত্য এবং সে, তারা, এবং তাদের মতো আরও অনেকে বাঙালী হয়েও সেই দেশের চৌহদ্দির বাইরে পড়ে গেছে।

একের সঙ্গে অনেককে সে মিলিয়ে ফেলছে সেনাপতি অরোরার সাম্প্রতিক একটি উক্তির কারণে। রোজ বিকালে কিছুকাল আগে উনি রিপোর্টারদের লড়াইয়ের হাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতেন। সামনে টাঙানো থাকতো বাংলাদেশের একটি ম্যাপ। যখন তিনি আঙুল দিয়ে অবস্থিতি পরি-স্থিতি এ সব বোঝাচ্ছেন, তখন এক একজন সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন, "আরে ও যে আমার দেশ।" কেউ বলতেন, "আরে ওখানে যে আমি জন্মেছি।" শোনা যায়, সেনাপতি একদিন নাকি অবাক হয়ে বলেন, "কুড ইউ টেল মি হু ইজ এ ওয়েস্ট বেঙ্গলী ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল?"

উত্তরে কেউ যদি বলতেন, "নান্, নট ওয়ান্, নান্," তাহলে খানিকটা অতিশয়োক্তি অবশ্যই হতো, কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যা হতো না। আজ এই বাগানে যাদের দেখি, তাদের একটা বড় অংশই অন্য মূলের মানুষ, অন্য মাটির গাছ।

২· কিন্তু এখন ফিরে যাওয়ার জন্য ভিতরটা কাঁকিয়ে ওঠে কেন। তার চেয়েও সোজা প্রশ্ন—ফিরে যাওয়া সম্ভব কিনা। জীবনের মোহানার কাছে এসে উৎসের দিকে আস্য ফেরানো একটী পবিত্র প্রার্থনা হতে পারে, কিন্তু কতটা সম্ভব, বাস্তবই বা কতটা? স্বর্গে বা নরকে অনন্তকাল পরে যেখানেই উপনীত হই না কেন, মরার আগে গরীয়সী জন্মভূমিকে একবার দেখে যাওয়া—স্বাভাবিক বাসনা এবং এইজন্যেই তাকে পবিত্র বলেছি। অতীত এইভাবেই বুঝি

ভাব দেখাচ্ছেন তেমনই ন ভূতো ন ভবিষ্যতি? ইচ্ছে করে নজিরগুলো ভুলে থাকলে আমি নাচার। আমরা নিজেদের সুডেটেন জার্মান ভাববই বা কেন। অস্ট্রিয়ানরাও তো আছেন, যারা মাঝের কয়েকটা বছর বাদ দিলে জার্মান-ভাষী হয়েও দীর্ঘকাল স্বরাষ্ট্রে স্বরাট। এখনও জলজ্যান্ত নমুনা এই জার্মানি। সুডেটেন বা 'দক্ষিণী' জার্মানদের হীনম্মন্যতা ভর করেছিল, তদুপরি তারা সেদিন পা দিয়েছিল নাৎসীদের পাতা ধূর্ত প্রচারের ফাঁদে, ফলে মিউনিখের কালীদহে স্বদেশেরই অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছিল।

চতুর কোনও ফাঁদে আমরা যেন পা না দিই। যেন হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত না হই। হীনম্মন্যতার প্রতিষেধক একমাত্র টিকা—আত্মসম্মান, আত্ম-উপলব্ধি। এই উপলব্ধি দিতে পারে সংস্কৃতি। যার জোরে সংখ্যালপ হয়েও, আত্মহননে রক্তাক্ত হয়েও আমরা আজ নিখিল ভারতে সসম্মানে বেঁচে আছি। এত ভঙ্গ এই বঙ্গ, তবু এ-ও ঠিক আজও বোধ হয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয় এখানেই। বারে বারে সেরা ফিল্মের শিরোপা পায় পশ্চিম বাংলা। লেখায়, রেখায়, অভিনয়ে সারাদেশের স্বতঃ-উৎসারিত স্বীকৃতি আর সাধুবাদ আজও কুড়িয়ে থাকি।

এই প্রাধান্য এখনও থাকবে—এই সাংস্কৃতিক সঞ্জীবনী আমাদের নিশ্চিন্ত রাখবে, সংখ্যার হিসাবে আমরা এই বাঙালীরা ছোট শরিক হলেই বা! ওই বাংলা বা বাংলাদেশ এই সৃজনী-সম্পদ রাতারাতি হরণ করতে পারছে না। করতে ওরা হয়তো চাইবেও না। বরং শ্রদ্ধায় প্রীতিতে হাত বাড়িয়ে দেবে। আমরা দেব। আমরা নেবোও—সৃষ্টিশীল প্রয়াসের দৈর্ঘ্য-মাত্রা-স্তর বিস্তারের জন্য যতখানি প্রয়োজন ততটাই।

আসল কথা অতএব আত্মপ্রত্যয় আর প্রতীতি। আবার একটা নজির দিচ্ছি। এই প্রত্যয়ের জোরেই এখনও ছোট্ট ব্রিটিশ ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ জাতি। তারা অ্যাংলো-স্যাকশন। মূলত অ্যাংলো-স্যাকশন আমেরিকাও। বেশ কিছুকাল ধরেই বৈষয়িক দৌড়ে ব্রিটেন যে আর-একটা অ্যাংলো-স্যাকশন জাতির চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে, দিব্য বুঝতে পেরেছিল ব্রিটেনবাসী। এমন কি ইংরাজেরাই আজ ইংরাজী-ভাষীদের মধ্যে সংখ্যালঘু। ইংরাজী রচনার পরিমাণও অতলান্তিকের ওপারেই ভূরি ভূরি এবং অবশ্যই বেশি।

তবু ইংরাজেরা হীনতার ভারে পীড়িত হয়নি। তার কারণ—ওই যে, তাদের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। উপন্যাসে ততটা না হোক, তারা নিজেদের নিশান উঁচিয়ে রাখছে কাব্য নাটক ইত্যাদিতে। আর কিছু না হোক আর-একটা শেকসপীয়র তো অদ্যাবধি কেউ বার করতে পারেনি! ওই একশচন্দ্রো সব পরাভব আর নিরাশার তমো হন্তি।

বাইরে নিষ্প্রভ লণ্ডনের ইতিহাসের পাতায় পাতায়, তার পাড়ায় পাড়ায় ভিতরের যে-দ্যুতি, তা হঠাৎ-লায়েক নিউইয়র্ক কোথায় পাবে? ইংরাজ এ-ও জানে, বহুর পক্ষে গ্রহণীয় একটি রাষ্ট্রবিধান দুনিয়ায় বিতরণ করেছে সে-ই। পার্লামেন্টের মাতৃশালয় তাদেরই দেশে।

সংখ্যায় বা আকারে কিছু যায় না। সত্যকার নিরিখ হল ভিতরটাও দেউলে হয়ে গিয়েছে কি না। আমাদের হয়নি। যতদিন না হয়, ততদিন আমরা নির্ভয়—সবল বিশ্বাসে এই কথাটা উচ্চারণ করতে পারি। ব্রিটেনের দৃষ্টান্তকে সমান্তর নমুনা হিসাবে পেশ করেছি সেই কারণে। আমাদের আত্ম-বল বাড়বে।

তা ছাড়া ওপার বাংলার অলঙ্ঘ্য টানের কথাটাই বা আমাদের কেউ কেউ ক্রমাগত আউড়ে চলেছেন কেন। এঁরা কি তাঁরা, যাঁরা প্রথমে বাংলাদেশে একটি অসংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছাত্রসমাজ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহসী উত্থানকে মানতে চাননি? কেউ ধুয়ো তুলেছেন "ওরা সবাই সাধু নয়" —যেন একটা গোটা জাতি কোনও দেশে কোনও কালে সাধু হয়ে থাকে বা হতে পারে! ওই যুক্তিটাই অসাধু। একটি পরিচ্ছন্ন, সাহসী মুক্তিকামী জনশ্রেণীর উন্মেষ ঘটেছিল, প্রকৃত সত্য এইটাই, এবং জগতে সর্বত্রই মাত্র একটি দীপ্ত অগ্রভাগই নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। সমগ্র সমাজ রাতারাতি বা অলৌকিক কোনও জাদুতে নীরোগ হয় না। মানুষের দোষ ত্রুটি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, লোভ থাকেই আবার সেই মানুষেরই একটা ভাগ ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণও হয়। হতে চায়। এই তার সংগ্রাম। এই সংগ্রামী চিত্তকেই হত্যা করতে চেয়েছিল ইয়াহিয়া-সম্প্রদায়।

এখনকার ছিদ্রসন্ধানীদের আর-একটা ধুয়া ছিল ঃ ওখানকার মুক্তিকামনা একটা পাতি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত আন্দোলন বই কিছু না। নিছক তত্ত্বের দাস হলে এই হালই হয়। ঝুলি থেকে হাতড়ে হাতড়ে বের করতে হয় শেখানো বুলি। না-হলে যে, হায়, হিসাবে মেলে না। মহান নায়কের একটি ইঙ্গিতে কোটি মৃত প্রাণে স্পন্দন শুরু—দেশ-বিদেশের ইতিহাসে তার অনেক উদাহরণ; এঁরাও তা জানেন, কিন্তু মুজিবের সম্পর্কে সেই বিশ্বাস, সেই স্বীকৃতি দিতে চাননি। কারণ মুজিব যে মুজিব—হাতের কাছের মানুষ এবং যেহেতু এঁদের অনুমোদিত কোনও 'স্কুলের' ভিতর দিয়ে আসেননি, তাই পাশের গাঁয়ের যোগীকে ভিখটুকু দিতেও হাত সরেনি। তবু যখন নদীমাতৃক ওই বাংলা উথলে উঠল, তখন এঁরা থতমত এবং অবশ্যই বিস্মিত, তা-সত্ত্বেও কোট আর ঘোট ছাড়েননি। —"ওদের পিছনে আলবত আমেরিকা আছে, নইলে এত সাহস হয়!"—তখনও এই বলাবলি আর সি-আই-এর নাম জড়িয়ে চতুর চোখ-টেপাটেপি আর কানা-কানি!

কিন্তু হায়, তাতেও পরে হিসাবে মেলেনি। মারকিন ব্যাপার-স্যাপার দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। বাঁধা দেওয়া মন আর অতিবুদ্ধির এইভাবেই হয় গলায় দড়ি।

অগত্যা এখন—এবং এখনও—কেউ কেউ কপচাচ্ছেন, "এখন ওদের ভোল বদলালে কী হয়, পার্টিশন বা পাকিস্তান একদিন তো ওরাই চেয়েছিল!" ঠিক যেন ঈশপের গল্পের সেই নাছোড় নেকড়ে। পিতৃকৃত দোষ পুত্রের উপর চাপানোর অছিলা। পার্টিশনের দায় বাংলাদেশের তাজা আর তরুণ এই প্রজন্মের উপর চাপানো অন্যায়—আত্মপ্রতারণাও। সে-দিনের সেই বিভাগের জন্যে আমরাও কি কম দায়ী!

জ্বলন্ত জয়ের পরে সব মুক্তির তূণ যখন খালি, তখন নতুন খেলা—এই দিক থেকে মরীয়া আর হন্যে হয়ে এই দিকে তাকানো। জুজুর ভয় দেখানো। এপারের আমরা নাকি ওপারের মোহে পড়ে যাবো। খালি বাঙালী বাঙালী বলে ভাবা আর ভাবানো থেকেই এই ভ্রান্তি। প্রথমত সম্প্রীতি আর ঢলে পড়া এক জিনিস নয়। আকর্ষণ বা আত্মীয়তা নিশ্চয়ই সত্য। বোধ করব। কিন্তু অন্য সত্যটাকেই বা দেখছি না কেন। মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তো এদিকেও আছে, আমাদেরও। এক, তো আগেই বলেছি, সাংস্কৃতিক। দ্বিতীয়ত সমগ্রভাবে ভারতের কথা ধরলে এই দিকটাই ভারী হবে পাল্লা—প্রবল সবল প্রাণবান বিরাট এই দেশ। বাংলাদেশের, তিন দিক ঘিরে। তার প্রতি নবজাত একটি জাতি স্বভাবতই সবিশ্বাসে আকর্ষণ বোধ করবে। কেননা ভূমণ্ডলের এই ভাগে ভারতের মতো তার নির্ভরযোগ্য মিত্র আর কে? রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীনতা যতটা সত্য, তেমনই সত্য ভাব-মানসে অবিভাজ্য এই উপমহাদেশ। রাষ্ট্রিক ভাঙা-গড়া তার আবহমান কালের অন্তর্লীন আপনবোধকে খণ্ড করতে পারেনি। নতুন ইতিহাসে নতুন করে স্পন্দিত হবে সেই অনুভব।

আমি তাই সদর্থক দিকটাই বড় করে দেখছি, দেখাতেও চাইছি। নইলে নঞর্থক দিক তো কতই—অজস্র আবিষ্কার করা যায়। হিসাব মেলানোর চেয়ে না মিলিয়ে এলোমেলো করে ফেলে রাখাই তো ঢের বেশী সহজ।

ভাষার ভিতর দিয়ে একটি জাতি নিজেকে খুঁজে পেল, ছাড়িয়ে নিল, এ সোজা কথা নাকি? বিশেষ করে সেই ভাষা, যার বৃহদংশ ওঁদের সৃষ্টি কীর্তি কিংবা নির্মাণ নয়। বরং গত দুশো দেড়শো

বছরের হিসেব খতিয়ে দেখতে গেলে এই ভাষা ও সাহিত্যের গরব আর গৌরব প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ভাগেরই। তবু, ওঁরা লড়েছেন। এই লেখাকে চোখের জলে বুকের রুধিরে নিজের করে নিয়েছেন। স্বত্ব তাই আজ ওঁদেরও। একদিন ওঁদের বেশিও হতে পারে। তা নিয়ে খেদ নেই, কলহ নেই, যেহেতু এই জিনিসটি হল যৌথ ভূমি। আরও সঠিক করে বলতে গেলে এমন ধন— যা কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে।

৪. কিন্তু ঠিক এইভাবে এই খাতে এ লেখাটা যে ঢুকে যাবে, আগে ভাবিনি। এ নিজের খেয়ালে নিজের মতো বয়ে চলেছে, আমি যে মাঝি, হাল ধরে বসে আছি, আমাকে মানতে চাইছে না।

অথচ দূরের দৃশ্য যেভাবে আঁকে, এই লেখাটাকে সেই ছাঁপে ছাপিয়ে দেব ভেবেছিলাম। নোট-বইয়ের পাতায় পাতায় ছোট ছোট স্কেচের মতো। যে "ইয়ারো" আমার নয়, যাকে অনেক দিন দেখিনি তাকে সাধের সাজে প্রাণভরে সাজিয়েছি। শুধু এখন নয়, এবার নয়, এই সব ছবি আমার লেখায় ফিরে এসেছে বারে বারে—একটার পর একটা উপন্যাসে অনেক পাতা জুড়ে ছড়িয়ে বসেছে। নস্টালজিয়া? হতে পারে। অতীতের প্রতিশোধ? হোক।

আচ্ছা যেতে চাইছি যে, সেখানে গিয়ে চেনা বা পুরোনো কিছু কি দেখতে পাব? নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই, কিংবা তার চেয়েও যা বাস্তব সত্য—আমার কল্পনায় আমিও ছবিগুলোকে বানিয়ে নিয়েছি, বদলে দিয়েছি। সত্য মিথ্যা মিলে শীতের সকালের মতো ঝাপসা হয়ে গেছে।

সেই মিশন কম্পাউন্ড—যেখানে হ্যাজাক জ্বলতো। মাস্টারস সাহেব, পিটার সাহেব বড়দিনের বাবা সেজে খেলনা আর উলের পোশাক অকাতরে বিলিয়ে যেত। বলডুইন সাহেব আমাকে "আ রে পাখি, যা রে পাখি, জংলী পাখি রে!" গানটা শিখিয়েছিলেন। তাঁর মেমসাহেব আমাদের স্কুলের সরস্বতী পুজোয় দু টাকা চাঁদা দেন—মিশনারি হয়েও ওঁদের বাধেনি। আমার দিদির বিয়েতে হাজির ছিলেন যেন কোন্ সাহেব? নামটা এখন মনে পড়ছে না। মিশনটাই পরে শুনেছি একটা ড্রাই আইস ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে।

পেস্টনজি নামে পার্শি সাহেবের বাংলোটাও নেই সম্ভবত। সাহেব নিজের ডায়নামো বসিয়ে সেই আটাশ উনত্রিশ সালেই ওই মফস্বলে বিজলী আলো জ্বালাতেন। আবার কালীপুজোয় ওই বাংলোতেই বাজি পুড়তো। সাহেব এক সুন্দরী দো-আঁশলা আদিমা মেয়েকে বিবি করেন। সেই বিবির কবরের চারপাশে যত্ন করে খুব পাতাবাহারের গাছ লাগানো হয়েছিল। পরে তৈরী হয়ে যায় অন্তত একটা পার্ক।

ডানলপ নামে এক সাহেবের নামে রাখা হলঘর, যেখানে প্রথম থিয়েটার দেখি। উডহেড সাহেবের নামাঙ্কিত পাবলিক লাইব্রেরি—যে আমাকে একই সংগে পাঠক আর লেখক হতে ফুসলেছিল।

বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ছে তো পড়ছেই। চুঁইয়ে পড়ছে ঝকঝকে ইলিশের সারি সারি সাজানো চুপড়ির উপরে। পড়ছে বিজয়ার বাইচ খেলার অস্থির জেলা শহরের খালের জলে। আর আমাদের টাউনে রেললাইনের ধারের যে নয়ানজুলি, সেখানে কি রবি আর বৃহস্পতিবারে এখনও কি হাটুরেদের নৌকো লাগে? আচ্ছা, রেল স্টেশনের ধারের সেই বাবরি চুল ফুলন্ত গাছটা এখনও আছে? এক একটা ফলের গাছের আয়ু কত, ওরা কতদিন বাঁচে? পলকে লাল পলকে সবুজ সিগনালটা তখন বড় বিস্ময়ের ঘোর লাগিয়ে দিত। ওভারব্রিজটার উপরে দাঁড়ালে দুর্বল এক বালক হৃদয় দুরু দুরু করত। ধোঁয়ায় সব ধোঁয়াক্কার—বুকে হাত চেপে সে নুয়ে পড়ে তবু গুনে যেতো, রেল ট্রেনটায় কটা কামরা।

রেলগাড়ি, রেলগাড়ি। তার আগে পরে বিস্তর চড়েছি, কিন্তু সজাগভাবে। আমার একটা অসফলতার কথা কখনও লেখা হয়নি। স্বপ্নে আমি কোনও দিন রেল গাড়ি ধরতে পারিনি। এখনও পারি না। ছুটে যাই বারে বারে, হাত বাড়াই হাতল ধরবো বলে, অথচ সেই ট্রেন বরাবর আমাকে ফেলে যায়।

দীর্ঘকাল ধরে এই স্বপ্ন আর তার ট্রেন মিস করার নিষ্ঠুর খেলা ফিরে ফিরে আসছে। কী বুঝিয়ে দিতে চাইছে আমাকে? হয়তো এই কথাটা যে, আছে সেই স্টেশনটা, যাকে প্রায় চার দশক আগে শেষবারের মতো ফেলে আসি। কিন্তু সেখানে আমার ফেরা হবে না। আবার, ঠিক সেই স্টেশনটা নেই, এও হতে পারে। তবু যেতে হবে, যেহেতু এই ছানিপড়া সময়ে জীবনের দুটি টান, দুই বিপরীত দিকে ধ্রুব গতি অনুভব করি। একটি দিক সোজা, সটান চলে গেছে মরণের ইস্টিশনে। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে হলে প্রস্তুতিও যে চাই; প্রয়োজন নিজেকে শুদ্ধ করে নেওয়া—স্নান করে আসতে হবে পিছু ফিরে শৈশবের নিষ্পাপ জলে। জন্মস্থানে অন্তত একটিবারের জন্য ফেরা। একবার তাকে দেখে আসার আর্তি সেই আর্তি সম্পূর্ণ জীবন-শর্তের, জীবন-বৃত্তের অংগ। তাকে পাই বা না-পাই, তাকে ঠিক তেমনটি দেখি বা না-দেখি।

আর কিছু থাক বা না-থাক, সেই নদীটি তো আছে! একবার তার পাড় ধরে বাড়ি ফিরছি, মনে পড়ে। বালি ছড়িয়ে, লতানো গড়ানো তরমুজের ক্ষেত চিরে চিরে রক্তাক্ত করে তুলছি, এমন সময় নদীর পারে। হঠাৎ তৃতীয়া কি চতুর্থীর একটা চাঁদ আকাশে যেন খেলনাঘুড়ির মতো ফুটল। একটা পিঙ্গল ভয় যেন বিগড়িবে কেঁপে পাঁছে দিয়ে গেল। সেই দিন ওই নদীটিকে বড় ভয়ংকরী ঠেকেছিল। ঢেঁপাখোলার একবার নাইতে গিয়ে ওই নদীরই একটা চোরা স্রোতে ডুবতে বসেছিলাম, সেই স্মৃতিটা গলায় নতুন করে ফাঁস পরিয়ে দিচ্ছিল। এবার হয়তো মনে পড়লেও ভয় পাব না। কারণ অনেক ঘুরে ঘুরে এতদিনে জেনে গিয়েছি কিনা যে, নদী খালি ডোবায় না, পথও দেখায়—যেহেতু অন্ধকারে তার নিশ্চিত প্রবাহটি পাশে পাশে থাকে।

এখন "ডুবতে রাজী আছি", বড়াই করে এতদূর আর বলছি না, তবু ওই চিরপ্রবাহটি আবার পথ দেখাক, চিনিয়ে চিনিয়ে আমাকে সেখানে নিয়ে যাক। যেতে হবেই, যেহেতু সেখানে একটি পাপী-তাপী মন খুঁজবে একটি শিশুকে, একটি বালককে আর এক কিশোরকে। হাতড়ে হাতড়ে বলবে, "এখানে আমার প্রথম শোক, প্রথম কান্না, হা-হুতাশে ভরা অপটু প্রথম লেখা সব ক্ষতবিক্ষত মনের যত বেদনা-বাসনা সব গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম যে! কোথায় গেল?" নুয়ে পড়লেও আজ বাসী ঠোঁটে সেদিনের ভিজে ছাপ আর ছোঁয়া তুলে কি নিতে পারব?

অবিন

চৌত্রিশ

অফিসে আমার কাছাকাছি বসে নলিনাক্ষ। রোগাসোগা নরম ধাতের চেহারা, বিস্তর লেখাপড়া করা ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েলারীর কারবারে সে ছোট মাপের রত্ন। আমরা ওকে পণ্ডিত বলে তামাশা করলেও তার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। নিজের সরকারী চেয়ার ছেড়ে সে দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই আমাদের ঘরে বসে ধুলো ঘাঁটে। কী অপরিমিত ধৈর্য নিয়ে সে প্রাচীনের ধুলো ঘাঁটত দেখলে আমার মায়া হত। কথাবার্তায় ব্যবহারে চমৎকার ছেলে, শুধু ওই যে—ইতিহাসের ঠেলাগাড়ি টানতে টানতে বেঁকে পিঠ নুইয়ে ফেলেছে এটা আমার ভাল লাগত না। নলিনাক্ষর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল, সে আমাদের এক কালের বন্ধুর ছোট ভাই—সেই সুবাদে তার সঙ্গে হাসিতামাশা করতাম।

সেই নলিনাক্ষ সেদিন আড়ালে আমার একটা হলুদ ছোঁয়ানো, লাল কালিতে অবিন-চন্দ্রের নাম লেখা একটা খাম দিল। বলল, "দাদা, আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।"

নলিনাক্ষর বিয়ে। ছাপানো চিঠিটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। পাত্রীর নাম দেখি, প্রকৃতি। আমি হেসে বললাম, "নলিন, এবার থেকে তোমার প্রকৃত পাঠ শুরু হল। তোমার প্রকৃতি পরিচয় সুখের হোক, আমি যাৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হব।"

নলিনাক্ষ লাজুক মুখ করে হাসতে লাগল।

জানলার বাইরে তখন প্রকৃতি পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। মেঘলা এত গাঢ় হয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল, মেঘের দল আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছে। কলকাতার মাথার ওপর বড় রকমের এক বৃষ্টিবাদলা জড় হয়ে যাচ্ছে বলে আমার মনে হল। আজ আমার হাসপাতালে যেতেই হবে, পর পর দু দিন যেতে পারিনি। বৃষ্টি এসে গেলে আর যাওয়া হবে না। আমি বললাম, "নলিন, বাইরে মেঘৈমেদুরম্বরম......; তুমি ভাই প্রকৃতি চিন্তা করো, আজ আমায় ছুটি দাও; একটু হাসপাতালে যাব। এখন যদি না পালাই আজ আর হাসপাতালে যাওয়া হবে না।"

নলিন বলল, "আপনি প্রায়ই হাসপাতালে যান। কে আছেন?"

আমি বললাম, "আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক। অবস্থা ভাল নয়।"

আর কথা না বাড়িয়ে অফিস থেকে পালালাম। ঘড়িতে তখন তিনটেও বাজেনি। এত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাওয়া যায় না, যতটা সম্ভব হাসপাতালের দিকে এগিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে আমি একটা গাড়িঘোড়ার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, তিন দিকের কালোয় পশ্চিমের হালকা ছায়ার ভাবটাও কালচে হয়ে এল। পাখিটাখি কোথাও আর চোখে পড়ে না, আকাশ ছেড়ে সব যেন পালিয়ে গেছে; মাঠের গাছগুলো শেকড় ডালপালা শক্ত করে দাঁড়িয়ে—বৃষ্টির প্রথম দমকটা সহ্য করার শক্তি সংগ্রহ করছে বোধ হয়। একটু একটু ধুলো উড়তে শুরু করল। ট্রাম পালাচ্ছে মাঠের গা ধরে। কয়েক পা দৌড়ে একটা বাস ধরতে পারলাম।

বৃষ্টি আসার মুখে মুখে আমি হাসপাতালের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। তারপর বৃষ্টি এল। একটা চায়ের দোকানে উঠে মাথা বাঁচাই।

প্রথম পশলাটা শেষ হতে অন্তত আধ ঘণ্টা। চারটে বেজে গেছে ততক্ষণে। রাস্তার একপাশে জল বইতে শুরু করেছে। মাথা বাঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে হাসপাতাল।

শচিপতি একলা ছিলেন।

দিন তিনেক হয়ে গেল শচিপতিকে একটা কেবিনে আনা গেছে। হাত কয়েকের ঘর, বাইরের দিকে একটা সরু জানলা। বৃষ্টির দরুণ জানলা বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলো জ্বালানো সত্ত্বেও ঘর অস্পষ্ট হয়ে আছে। কেবিনঘরের বিছানাটা একটু উঁচু, মাথার দিকে একটা মিটশেফ। কাঠের একটা টুল ছিল মাথার পাশে। আরও কিছু টুকটাক।

শচিপতি আমায় দেখে বোধ হয় অবাকই হলেন, ম্লান করে হাসলেন।

রুমালে মাথা মুখ মুছতে মুছতে আমি বললাম, "ভীষণ বৃষ্টি; আজ কলকাতা ভেসে যাবে।"

"হ্যাঁ; জোরেই বৃষ্টি নামল......" শচিপতি বললেন, "আপনি ভিজতে ভিজতে এলেন?"

"সামান্য; অফিস থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি।"

"বসুন।"

নিজের ভেজা জামাটা সামলে নিয়ে বসলাম। "দু দিন আর আসতে পারলাম না।"

"আর কত আসবেন?"

শচিপতির মুখের দিকে তাকালাম। গত কয়েক দিনের তুলনায় তাঁকে ভাল না মন্দ দেখাচ্ছে আমি বুঝতে পারলাম না। দাড়ির জন্যে গাল কতটা বসে গেছে বোঝা যায় না। চোখ আরও নীচে নেমেছে। কপালের রঙ হলুদের মতন দেখাচ্ছিল, চিবুকের তলায় গলার চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। হাত দুটি শুকনো, জিরজির করছে।

"কেবিনে এসে কেমন লাগছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আলাদা আর কি! একা একা থাকি।

এখানে মানুষজনের চেহারা দেখতে পেতাম।"

আমি কিছু বললাম না। শচিপতিকে এখানে করে নিয়ে আসার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, শীঘ্র হয়ত ওঁর একটা অপারেশন হবে। অন্য কারণ, অনেক রোগীর মধ্যে থেকে থাকতে শচিপতি নিজের অসুখ সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়ে আসছিলেন। যে-কোনো কারণেই হোক এটা আমরা চাইনি। ইন্দু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, তদ্বির করে এই কেবিনটার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি চেষ্টা না করলে হত না।

বাইরে আবার বৃষ্টি এসে গেছে। তুমুল বৃষ্টি। খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বাইরের বারান্দায় জলের ঝাপটা এসে পড়ছে। মেঘ ডাকছে হুঙ্কার করে; হাসপাতালের অস্বাভাবিক আবহাওয়াটা আরও নির্জীব বিষণ্ণ হয়ে এসেছে।

আমি বললাম, "আজ আর সুহাসরা আসতে পারছে না।"

শচিপতি বললেন, "কেমন করে আসবে।" বলে একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুহাসকে আমি বারণ করেছি, বলেছি—তুই রোজ রোজ আমায় আর দেখতে আসিস না। জ্যাঠামশাইকেও বলেছি, আপনি এভাবে কেন আসেন, আপনার কষ্ট হয়, আমারও খারাপ লাগে।"

আমি অবাক হচ্ছিলাম। শচিপতির গলার স্বর বেশ ভাঙা। আগের দিনও আমার কানে এটা ধরা পড়েনি।

"অমিতবাবু—"

"বলুন?"

"জ্যাঠামশাইকে আপনারা ফেরত পাঠাতে পারছেন না?"

"বলেছি। উনি যেতে চান না।"

"কলকাতায় ওঁর খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আপনার কাছে আসেন, বসেন; ভাল লাগে ওঁর......"

"আমার খারাপ লাগে। আমি ওঁকে রোজই বলি, আপনি আর আসবেন না। কী দরকার ছোটাছুটি করে!"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। জ্যাঠামশাইকে কলকাতায় রাখতে সুহাসও আর চাইছে না। দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল; জ্যাঠামশাই অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। বাড়িতে মোহিনী একা। সুহাস ব্যস্তই হয়ে উঠছে। আমিও তাঁকে অনেক বলেছি, আপনি ফিরে যান, কতদিন কলকাতায় বসে থেকে থেকে কষ্ট পাবেন। তিনি আজকাল অবশ্য বলতে শুরু করেছেন, হাঁ যাব; এইবার যাব। কবে যাবেন আমি জানি না।

শচিপতির শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সামান্য কথা হল। তারপর আবার সুহাস আয়নার কথা। শেষে আমরা চুপ করে গেলাম।

এমন সময় ইন্দু এলেন। তাঁর হাসপাতালের ডিউটি শেষ হয়ে গিয়েছে। রোজই কিছুক্ষণ শচিপতির খোঁজ খবর করে যান। আজ ঘরে এসে আমায় দেখে অবাক হয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন?"

আমি বললাম, "কোনো রকমে—।"

ইন্দু আমার হাসপাতালে আসার বিবরণ শুনলেন। বললেন, "ফিরবেন কি করে?"

আমি হেসে বললাম, "সাঁতার কাটতে কাটতে।"

ইন্দুও হাসি মুখে জবাব দিলেন, "আপনি সাঁতার জানেন, আমি তাও জানি না।"

"তাহলে?"

"দেখুন কি হয়। এখন পাঁচটা বাজছে। দু তিন ঘণ্টার আগে কিছুই করা যাবে না।"

শচিপতি ইন্দুকে বসতে বললেন।

ইন্দু বসলেন না; তাঁর ডিউটি শেষ হয়েছে, তবু কিছু কাজকর্ম ছিল হয়ত নিজের, বললেন, "আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসব।"

ইন্দু চলে গেলেন। বৃষ্টি বাড়ছে, না কমছে—কিছুই বোঝা যায় না। একই রকম শব্দ শুনছি, জলের তোড় বয়ে যাচ্ছে যেন। বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। চারদিক থেকে অদ্ভুত এক আর্দ্রতা জমে এসেছে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে ঘরে বাইরে। প্যাসেজের আলো

টিমটিম করছে, ঘরের আলো চোখে পড়ার মতন হয়ে উঠল। একজন সিস্টার এসেছিলেন ঘরে, শচিপতির তদারকি করে চলে গেলেন।

আমরা দু জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ। আজ সুহাসদের আসার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি যতক্ষণ আছে, যদি বা বৃষ্টি এখন থেমেও যায় তবু আমার পক্ষে আপাতত এখানে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

চুপচাপ বসে থাকাও অসহ্য। শচিপতি ক্রমশই কথাবার্তা কমিয়ে আনছেন। দুর্বলতা বোধ করেন, ইচ্ছাও হয়ত অনুভব করেন না।

নীরবতার মধ্যে শচিপতিই হঠাৎ বললেন, "আজ দুপুরে শুয়ে থাকতে থাকতে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম।"

আমি শচিপতির মুখের দিকে তাকালাম।

শচিপতি বললেন, "ছোটকাকি বাঁচি থেকে আমায় দেখতে এসেছে। স্বপ্নের মধ্যেই আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছি, বিশ্বাসই করতে পারছি না ছোটকাকি ভাল হয়ে কলকাতায় আসতে পারে।"

"স্বপ্ন তো—!"

"স্বপ্নই। তবু ছোটকাকি ভাল হয়ে গিয়েছে ভাবতে আমার বড় আনন্দ হচ্ছিল।" বলে শচিপতি একটু থেমে গিয়ে কি ভেবে আবার বললেন, "আমার সঙ্গে আজ বছর দেড়েক ছোটকাকির আর কোনো যোগাযোগ নেই। আমি খোঁজ নিইনি। নিয়ে লাভ ছিল না। চিনতেই পারে না একেবারে।... কলকাতায় আসার আগে একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।"

একটু থেমে আচমকা কেমন ছেলে-মানুষের মতন গলায় বললেন, "ছোটকাকি ভাল হয়ে যাক—এ আমি কতবার চেয়েছি। সত্যি যদি ভাল হত কাকি!"

আমি একটু হেসে বললাম, "আপনার ছোটকাকির এখন আর ভাল হয়ে লাভ নেই। আপনি ভাল হয়ে উঠুন, আমরা খুশী হব।"

শচিপতি আমার চোখের দিকে তাকালেন, আমাকে দেখছিলেন, অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বেশ; পরে বললেন, "ভগবান আপনাদের খুশী করতে চান না।"

"আপনিও কি চান না?"

"আমার চাওয়ায় কিছু নির্ভর করে না", শচিপতি বললেন; মাথার বালিশটা উঁচু করে নিলেন সামান্য। তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। মানুষটি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। পাঁচ সাত কি দশদিনের মধ্যে যদি অপারেশান হয়, আমি জানি না উনি কেমন করে ধকলটা সামলাবেন।

দুর্বলতা সামলে নিয়ে শচিপতি বললেন, "জীবনবাবু, আমার তো এখন করার কিছু নেই, হাঁটাচলাও বারণ হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে আমি অনেক কিছু ভাবি, মাঝে মাঝে একটু বই পড়ার চেষ্টা করি, পেরে উঠি না। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে আমার একটা কথা মনে হয়, মানুষের জীবনটা তার নিজের হাতে এ অভিমান করে লাভ নেই। আমাদের কতটুকু নিজের তাও আমি বুঝতে পারি না। বরং আমি দেখলাম, আমার জীবনের বারো আনাই হল অদৃষ্টের হাতে। সে অনেক বড়, তার সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। আমি কী চাই, আপনি কী চান—তার ওপর আমার আপনার যতই মায়া থাক, আমাদের ভাগ্যকর্তার কিছু আসে যায় না।"

আমি বললাম, "আপনি খুব সহজ করে কথা বলছেন। এত সহজ করে কথা বললে জীবনটাকে নিয়ে সমস্যা থাকে না।"

শচিপতি বললেন, "আমার নিজের আর কোনো সমস্যা নেই।"

"কোনো সমস্যা নেই?"

"না। ক'দিন আগেও আমার মনে কিছু দুঃখ ছিল। আমার কিছু সাধ হয়েছিল। আমার সে-দুঃখ নেই, সাধ মিটল না বলে আফসোস নেই। আমার যেখানে শেষ হলে ভাল হয়, আমি সেখানেই শেষ হব।"

শচিপতির সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে আমার হল না। মৃতপ্রায় এই মানুষটির সঙ্গে তর্ক করার জায়গা এটা নয়, সময়ও নয়। তাছাড়া শচিপতি এখন যেন সমস্ত বিশ্বাস আশ্চর্যভাবে হারিয়ে ফেলেছেন।

আমি শুধু হেসে বললাম, "আপনি কোথায় শেষ হবেন আমি তো জানি না।"

শচিপতি কোনো জবাব দিলেন না। চোখ বুজে শুয়ে থাকলেন।

বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সন্ধ্যের মুহূর্তটি গাঢ় হয়ে অনেকটা রাত হয়ে যাবার মতন মনে হচ্ছিল। আচমকা দেখি শচিপতির ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বারান্দাও ঘুটঘুটে করে উঠল। হাসপাতালের এ-পাশটা অন্ধকার। বড় ঘর থেকে যেন অনেকগুলো গলার বিভ্রান্ত স্বর ভেসে এল। আলো নিবে গেছে। ভীষণ এক অন্ধকারের মধ্যে আমি আর শচিপতি। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের মধ্যে বাদলার ঠাণ্ডা। বৃষ্টির শব্দ মিহি হয়ে এসে ঝিঁঝির ডাকের মতন শোনাচ্ছে, বোধ হয় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এখনও।

"শচিপতিবাবু—" আমি ডাকলাম।

শচিপতি সাড়া দিলেন না। তাঁর নিশ্বাসের শব্দও আমার কানে আসছিল না। আচমকা আমার কেমন মনে হল, শচিপতি যেন এই ঘরে নেই, অন্ধকারের মধ্যে কোথাও চলে গেছেন। তাঁর থাকা আর না-থাকার মধ্যে কোনটা সত্য আমি যেন সেই বিভ্রমে পড়ে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম। কেমন অস্বাভাবিক উদ্বেগ বোধ করে আমার ডাকলাম, "শচিপতিবাবু—।"

শচিপতি এবার সাড়া দিলেন।

আমি বললাম, "হাসপাতালের এদিক-কার আলো নিবে গেছে।"

"আগেও একদিন গিয়েছিল," শচিপতি বললেন। তারপর সামান্য নীরব থেকে ধীরে ধীরে আবার বললেন, "এই অন্ধকার আমার এখন চোখ-সওয়া।"

শচিপতি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। উনি আগের মতনই শুয়ে আছেন, ডান হাতটা বুকের কাছে।

প্রায় সংগে সংগে ইন্দু এসে পড়লেন। এসেই বললেন, তাঁর কোন রোগীর একটা গাড়ি হাসপাতালে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে, আমরা সেই গাড়িটায় ফিরতে পারি।

আমায় উঠতে হল।

ইন্দু সিস্টারকে ডেকে শচিপতির সম্পর্কে কথাবার্তা বলে নিলেন।

চলে আসার সময় শচিপতি হঠাৎ বললেন, "অবিনবাবু, আমার একটা চিঠি আছে। কাল যদি পোস্ট করে দেন—"

মাথার পাশে বইয়ের মধ্যে গোঁজা একটা খাম হাতড়ে শচিপতি আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, খামের ওপর মায়াবতীর ঠিকানা।

হোটেলে আমার ঘরের একটা মস্ত সুবিধে হল, নীচের হট্টগোলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। হোটেলে ফিরে দেখি দোতলায় একটা কুরুক্ষেত্র বেঁধেছে। কারণটা যে মামুলি, কিন্তু ঘটনাটা এতদূর গড়িয়েছে যে দু পক্ষই যেন সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধের জন্যে হুঙ্কার দিচ্ছে।

আমার ঘরের বিছানাপত্র বিশেষ একটা ভেজেনি। জানালা বন্ধই ছিল। দরজার সামনেটাতেই যত জল, পাল্লার ফাঁক দিয়ে হু হু করে জল ঢুকে মেঝেটা ভিজিয়ে দিয়েছে। জল মোছার জন্যে হাঁকডাক শুরু করতেই কেউ ছুটে এল।

হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বসবার সময় সামান্য ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। বাইরে বৃষ্টি নেই, বাদলা বাতাসের দমকা আছে, একনাগাড়ে দু-তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে কলকাতা যেন ভিজে ফুলে গিয়েছে। মেঘ তখনও ডাকছিল। চা খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরাম করে সিগারেট খাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, অফিসে মোহিনীকে চিঠি লেখার যেটুকু খসড়া করেছিলাম মনে মনে সেটুকু এখন আর আমার তেমন পছন্দ হচ্ছে না। মোহিনী আমায় হালে যে চিঠি দিয়েছেন, তার জবাব আমার দেওয়া হয়নি। চিঠিটা এসে দিন তিনেক পড়ে আছে। জবাবটা দেওয়া দরকার।

মেয়েদের স্বভাব হল, তারা যখন হার মানে, তখন লোক জড় করবার জন্যে প্রয়োজনের বেশী চেঁচামেচি করে। মোহিনীর চিঠিটা অনেকটা সেই ধরনের। তিনি যতটুকু মুখ খুললে তাঁকে মানাত, তার বেশী চেঁচামেচি করেছেন। এটা তাঁর স্বভাব নয়, কিন্তু স্বভাবকে তিনি আর বোধ হয় সামলাতে পারছেন না।

মোহিনী আমার রূঢ় করে লিখেছেন : সংসারে সকলকেই একই ধরনের পাওনা-গণ্ডার হিসেব করতে হবে তা তিনি মনে করেন না। তাঁর যদি কখনো মনে হয়, কী তাঁর জমা হল সংসারের কাছে—তিনি সে হিসেব করে নিতে পারবেন।

মোহিনী ভেবেছেন, আমি তাঁকে লোকজনের হিসেবটা ধরিয়ে দিয়ে বিপন্ন করতে চেয়েছি। আমার সে উদ্দেশ্য একেবারে ছিল না এমন কথা বলি না। কিন্তু সেটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যতটুকু বুদ্ধি থাকলে মানুষ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা বুঝতে পারে, মোহিনীর সে-বুদ্ধির অভাব নেই। তিনি বুদ্ধিমতী, কিন্তু তাঁর মর্যাদাবোধ সাধারণ সত্যটাকে মানতে চাইছে না।

আমি মোহিনীকে একাদিক্রমে এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছি, আপনি চারদিক থেকে আবদ্ধ হয়ে আছেন, আপনি ভাবছেন, আপনার ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ রাখলেই আপনি নিস্তার পাবেন। বাইরের ঝড়ঝাপটা এসে কোথাও কিছু তছনছ করবে না, ঘরের যেখানে যা আছে অবিকল তা সাজানো থাকবে। হয়ত তা থাকবে। কিন্তু ঘরের বাতাসটা যে সুস্থ কিংবা স্বাভাবিক থাকবে না এটা না বোঝার কারণ নেই।

মোহিনী ভাবেন, তিনি সংসারে যে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এই মূর্তির অশেষ মহিমা। আমি বলি, এর কোনো মহিমা নেই। মানুষ যদি মাটির গড়া মূর্তি হত তার একটা মহিমা হিন্দু সমাজে গড়ে তোলা যেত। মোহিনী তো মাটিতে গড়া মূর্তি নন। তাঁর মধ্যে যে রক্তমাংসের বেদনা আছে আমি তা না লক্ষ্য করার মতন অন্ধ নয়।

মোহিনী আমায় লিখেছেন : মেয়েদের চরিত্র হল, তারা দেউলেপনার নেশায় মাতে না। যারা মাতে তারা মরে। আমি তো মরবার সাধ নিয়ে জন্মাইনি। সংসারে আমার

জ্ঞানবুদ্ধি যখন থেকে ভালমন্দ বুঝতে শেখাল, তখন থেকেই আমার চারপাশে যাদের দেখেছি, তারা আমায় যে শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষাই আমার যথেষ্ট। অন্য শিক্ষায় আমার প্রয়োজন নেই। যে মাটিতে আমি বেড়ে উঠেছি, তার মধ্যেই আমার শেকড়।

এই ধরনের কথাবার্তা, মোহিনী আমায় যা লিখেছেন, দু একবার পড়লেই বোঝা যায়, তিনি স্পষ্ট করে সংক্ষেপে যা বলতে পারতেন—সেটা মেয়েলী করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অস্পষ্ট করেই বলেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর ভর্ৎসনাও আছে। আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, আমি মাত্রা মেনে চলতে পারছি না।

অবিনের স্বভাব হল, সে যখন কিছু মানতে চায়, তখন প্রথম থেকেই মেনে নেয়। মাঝামাঝি এসে মানতে চায় না। আমি যদি মাত্রা মানতুম, মোহিনীকে প্রথম দর্শনেই মেনে নিতাম। আমি সে মাত্রা মানিনি।

আমি অফিসে বসে মনে মনে চিঠির যে খসড়াটা ভাবছিলাম তাতে খানিকটা হাসি রগড়ের ভাব ছিল প্রথমটায়। এখন আর আমার সেটা পছন্দ হচ্ছিল না। মোহিনীকে কিছু রূঢ় কথা আমারও লেখার আছে।

সুহাসদের সংসারে মোহিনীর একটি স্বার্থপর ভূমিকা আছে। কোনো দিনই তাঁর মনে হয়নি যে, তিনি বিগ্রহ হয়ে যেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে তাঁর আধিপত্যটাই বড়।

রতন এসে এই সময় ডাকল। বলল, খাবেন চলুন।

নীচে কুরুক্ষেত্র থেমেছে কি না জিজ্ঞেস করতে রতন বলল, অনেকক্ষণ থেমে গেছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে একবার ভাবলাম, মোহিনীকে চিঠিটা লিখে ফেলি। কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসেও আর বসা হল না। ঘুম পাচ্ছিল।

বাতি নিবিয়ে বাকি সিগারেটটুকু শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে থাকতে থাকতে দেখি মোহিনী এসেছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, দেবী কুপিতা হয়েছেন।

আমি হেসে বললাম, আপনার চিঠির জবাব ভাবছি।

মোহিনী আমার হাসিটা লক্ষ করে বিরক্ত হবার মতন চোখ করলেন।

আমি বললাম, দেখুন মেয়েদের একটা অভ্যেস থাকে তারা কারণে অকারণে ধুলো উড়োতে ভালবাসে। আপনি যতটা ধুলো উড়িয়েছেন তাতে আমার চোখের ঝাপসা ভাবটা এখনও কাটেনি।

মোহিনী বললেন, মেয়েরা যখন ধুলো উড়োয়, তখন ঘরের মধ্যে কোথাও কিছু ময়লা নিশ্চয় থাকে। সেটা তাদের পছন্দ নয়।

আমি ও'র রাগের বহর দেখে হেসে ফেললাম, জীবনে কি আপনার সবই অপছন্দ?

মানে?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, আপনি শাড়ি-পাড়কে অপছন্দ করেছেন, স্বামীকেও পছন্দ করেননি—তার আগেই যেন মোহিনী আমার কথাটা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললেন, আমার জীবনটা আমারই থাক, ও নিয়ে অন্যের ভাবনা আমার সহ্য হয় না।

আমি বললাম, আপনার জীবনটা আমার নয় এটা খাঁটি কথা। কিন্তু আমার জীবন আপনি যে যোগিনী নন এটাও বড় মিথ্যে কথা নয়। আপনার জীবন আমার নাগালের বাইরে বলেই আমার এত আফসোস।

মোহিনী বললেন, আফসোসটা থাক।

আমি হেসে উঠে বললাম, না না, ওটা রাখব না বলেই তো আমার এই জেদ। আপনি নিজেকে যে খুঁটিতে বেঁধে রেখেছেন সেই খুঁটি আমি ভাঙব।

মোহিনী আমায় আড়চোখে দেখলেন।

আমি বললাম, আপনার সঙ্গে মকদ্দমা লড়তে হলে আমি কোনো উকিল রাখতাম না, জজ সাহেবকে শুধু বলতাম, হুজুর আমার যিনি বিরোধীপক্ষ তাকে শুধু বলুন, তিনি যেন একটা কথা ভেবে দেখেন। টাকার মতন মানুষের একটা সোজা পিঠ, অন্যটা উলটো। উনি ভাবছেন, দুটো পিঠেরই সমান দাম। কিন্তু মানুষের বেলায় সেটা ঠিক নয়।

মোহিনী বললেন, ঠিক নয় কেন?

আমি বললাম, তাতে পাওনা মেটানো যায়, শান্তি থাকে না।

মোহিনী মাথা নেড়ে বললেন, আমার শান্তি আছে।

আমি বললাম, না। আপনার শান্তি নেই।

(ক্রমশ)

পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

পরাধীন ভারতে ষাট বৎসর অতিক্রম করে স্বাধীন ভারতে প্রবন্ধকারের জীবনকালের সম্প্রতি চব্বিশ বৎসর কেটে গেল। এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। গোড়াতেই বলে রাখি, এটা কোন ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী নয়। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থায় কি লাভ লোকসান ঘটেছে, এই উভয় যুগে দেশের ও দশের কি প্রগতি বা অগতি দেখা দিয়েছে, তারও একটি হিসাব নিকাশ বা খতিয়ান দেওয়াই হচ্ছে এই লেখার প্রধান অঙ্গ।

এ কথা হয়তো সবাই স্বীকার করবেন যে, দেশের উন্নতির একটি প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে জীবনযাত্রার একান্ত আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য বা উৎপাদনের পরিমাণ। দৃষ্টান্ত হিসাবে খাদ্যসামগ্রীর বা কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মধ্যে আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যবস্তু চাল বা গমের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। পরাধীন ভারতে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির দরুন উৎপাদনের ক্ষতি না হলে চালের অভাব বড় হতো না। দ্রব্যের মূল্যের সংগে তার প্রাচুর্যের বা অভাবের একটা সহজ সম্বন্ধ সাধারণত দেখা যায়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কাল অবধি চালের মূল্য মণ প্রতি তিন চার টাকার থেকে ক্রমশ বেড়ে উঠেছিল সাত থেকে আট টাকায়। অবশ্য দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার উপরও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সংগে জীবনযাত্রার অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রীর মূল্যেরও নিকট সম্বন্ধ মানতে হয়। এখানে বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। পরিধেয় বস্ত্র ও গৃহনির্মাণের যাবতীয় সাজসরঞ্জামের মূল্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সংগে বিশেষভাবে জড়িত থাকে। তাই কৃষিজাত পদার্থের মূল্যবৃদ্ধির সংগে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যও বেড়ে যায়; এবং এই কারণে কারখানার শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির জন্য দাবির আন্দোলন দেখা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটলে দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষের গড়া দুর্ভিক্ষের সময় দেশবাসীর প্রধান খাদ্য চালের মূল্য হঠাৎ বেড়ে যায় মণ প্রতি চল্লিশ টাকায়। যুদ্ধান্তে উহা কমে আসে মণ প্রতি পনের ষোল টাকায়। স্বাধীনতা লাভের পর এই মূল্যের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান হয়েছে আশি থেকে নব্বই টাকা। কর্তৃপক্ষের মতে ইহা দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির নিদর্শন বলে গণ্য করা হয় কারণ শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন স্বাধীন ভারতে বহু গুণ বেড়ে গেছে এবং সাধারণ দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানও সংগে সংগে বেড়ে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তথাপি দেশব্যাপী অশান্তি ও শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ বেড়ে উঠে স্বাধীন ভারতের একটি অপরিহার্য অংগ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের সংগে শ্রমিকের ও অন্যান্য কর্মীদের বেতনের হারের সামঞ্জস্য ঘটেনি। পরাধীন ভারতে আমাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য চালের দামের তুলনায় স্বাধীন ভারতে বর্তমান চালের মূল্য অন্ততঃ দশ গুণ বেশী। সে পরিমাণে সকল কর্মীদের উপার্জন বেড়েছে বলা চলে না।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সর্বাংগীণ উন্নতির জন্য দেশের মন্ত্রিবর্গ ও শাসন পরিষদ অকাতরে অর্থব্যয় করছেন এ কথা কারও অজানা নয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকায় বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; বহু বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগার সৃষ্টি হয়েছে, বেকার সমস্যা সমাধানের বহু প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, দেশের চারিদিকে অশান্তি ও উপদ্রব এ স্বাধীনতার যুগে ক্রমশ বেড়ে উঠে এখন তা চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের এই বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা এক প্রকার নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। দেশের যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ওলটপালট ও বিপর্যস্ত। সর্বত্র রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ নিয়ে শিক্ষকদের এবং ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর হানাহানি। ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তার সর্বত্র অভাব। কলিকাতা ও বাংলাদেশের অন্যান্য শহর অঞ্চলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অহরহ ধর্মঘট, অবরোধ এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের যে কোন মুহূর্তে ঘেরাও প্রভৃতি অবৈধ উপায়ে বিপন্ন হওয়া, খুন, জখম, হরতাল, বন্ধ, শোভাযাত্রা, আন্দোলন ট্রাম বাস ইত্যাদি যানবাহন এবং অন্যান্য সরকারী সম্পত্তিতে যখন-তখন অগ্নিসংযোগ, রেল চলাচলের সময় অসময়ে যে কোন কারণে বা অকারণে বাধা দেওয়া, ঘন ঘন ব্যাংক লুঠ, রাস্তায় ও ট্রেনে রাহাজানি ইত্যাদি উপদ্রব ও অত্যাচার মানুষের জীবনযাত্রার দৈনিক অংগ হিসাবে গড়ে উঠেছে। অরাজকতার বা যথেচ্ছাচারিতার সমস্ত লক্ষণ এতে পরিস্ফুট বলা চলে। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সকল বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শন লুপ্ত করবার একটা আত্মঘাতী উন্মত্ত প্রয়াস বিশেষত কতিপয় তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে। শান্তিপ্রিয় সর্বসাধারণ ভীত, ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে জীবন যাপন করছে। পরাধীন ভারতের শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার সংগে স্বাধীন ভারতের এই ভয়াবহ অশান্ত ও বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রীয় অবস্থার আকাশপাতাল তফাত অতিশয়োক্তি হবে না। দেশের সাধারণ মানুষ (শতকরা নব্বই) চায় শান্তির সংগে জীবিকা অর্জন করে দিন কাটাতে; কারা মন্ত্রী হলো, কাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়লো এ নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার অবসরও নেই এবং আবশ্যকতাও নেই। মুষ্টিমেয় তথাকথিত আদর্শ সমাজবাদী ও সাম্যবাদী দেশের ও দশের উপকারের দোহাই দিয়ে নানা দলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের উপর এই যথেচ্ছ নির্যাতন ও অত্যাচারে উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এই দৃশ্যের সংগে নেপোলিয়নের আবির্ভাবের পূর্বে বিপ্লববিক্ষুব্ধ ফরাসী দেশের, মুসোলিনীর আগমনের পূর্বে বিশৃঙ্খল

পারলে দেশের কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নেই। যে গাছে আরোহণ করে তার উচ্চ শাখায় বসে আমরা মানুষ হয়েছি এবং জগৎসভায় শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৌরব করবার অধিকার লাভ করেছি, সেই গাছেরই গোড়া কাটা যে প্রথম দরকার (জনকল্যাণের জন্য), এইরূপে আদর্শবাদ যে ঘোরতর অস্বাভাবিক ও সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধিভ্রংশের পরিচায়ক এ কথা বলা বাহুল্য। একেই পূর্বে বলা হয়েছে তামসিক বুদ্ধি, যা পরিণামে বিনষ্টির পথ উন্মুক্ত করে।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটি অভিনব ভাবাবেশের সৃষ্টি দেখা যায়। দেবদেবীর প্রতি এদের ভক্তি হঠাৎ উগ্রভাবে বেড়ে গেছে। তাই বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবদেবীর বারোয়ারী পূজার অনুষ্ঠান নিয়ে প্রবল উৎসাহ এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। এর জন্য জনসাধারণকে উৎকোচের মতন চাঁদা দিতে হয়, নইলে তারা নানাভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। কলিকাতার সর্বত্র অলিতে গলিতে দুর্গাপূজা, কালীপূজো ও সরস্বতী পূজার ধূম দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক দেবভক্তিও শান্তি নিরুপদ্রব নয়। দেবদেবীর বিসর্জন উপলক্ষে শোভাযাত্রায় বিভিন্ন দলের মধ্যে অনেক সময় হানাহানি, এমনকি রক্তারক্তিরও সৃষ্টি হয়েছে বলে শুনা যায়। আগে বলেছি ইহা ধর্মের নামে অধর্মের আচরণ, অর্থাৎ তামসিক বুদ্ধির লক্ষণ। আসলে পূজার উপলক্ষ করে উদ্দাম আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান।

আজ স্বাধীন ভারতে ব্যক্তিগত, দলগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত, প্রদেশগত ও ভাষাগত ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষ এবং বিক্ষোভ চলেছে। এরা সবাই নিজ নিজ স্বার্থ এবং সুখ অন্বেষণে ছুটোছুটি করছে। তাই দেশ থেকে সুখ উধাও হয়েছে; আর শান্তির কথা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা ও শান্তির মূর্তিমান প্রতীক মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে তাঁর চিতাভস্মের সঙ্গে শান্তিকে আমরা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়েছি।

দেশের অনেক উগ্রপন্থী দল তাই নিজেকে বিপ্লবপন্থী এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি নামে অভিহিত করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন। ডারউইনের বিবর্তনবাদের (evolution theory) দ্বিতীয় ধাপটির অর্থাৎ অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের (struggle for existence) অবস্থা এখনও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। সুতরাং আমাদের পক্ষে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের, অর্থাৎ মনুষ্য ধর্মের, অভিব্যক্তির এখনও অনেক দেরি আছে বলতে হবে। অপর কথায় আমরা এখনও বন্য-জন্তুর মত স্বজাতীয় হিংসাবিদ্বেষে তামসিকতায় নিমগ্ন হয়ে জাতি হিসাবে নিম্নস্তরে অবস্থান করছি। আজ আমাদের দেশের সকল কর্মক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি, কর্মবিমুখতা, স্বার্থান্ধতা এবং যেন তেন প্রকারেণ অর্থাহরণের প্রচেষ্টায় কলুষিত বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। জনকল্যাণের নামে এইরূপ জন-অকল্যাণকর আচরণের দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সভ্য-দেশে বিরল। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যুগে এই জাতীয় চরিত্রহীনতার দৃষ্টান্তের যে অভাব ছিল তা নয়, কিন্তু এর বিরুদ্ধে কঠোর শাসনবিধির প্রয়োগে এদের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। নীতির বিধান, সমাজের ও রাষ্ট্রের বিধি-বিধান লঙ্ঘনে সবারই ভয় ছিল। মোটের উপর পরাধীন যুগে সবাই সাধু না হলেও সাধু ও সৎলোকের উপর তাদের শ্রদ্ধা ছিল। স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ (secular) রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও আমরা বর্জন করেছি। ফলে, আজ আমাদের দেশের সন্তান সন্ততিগণ, (বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার) অধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে প্রচার করতে এবং অধাচরণে গর্ববোধ করতে কোন দ্বিধা বোধ করে না—একথা পূর্বেই বলেছি।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, স্বাধীনতা লাভের এরূপ পরিণামের কারণ কি। প্রথমে বলতে হয়, স্বাধীন হবার জন্য যোগ্য না হয়েও এবং তার জন্য উচিত মূল্য (ত্যাগ ও তপস্যা) না দিয়েও আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট অনুকূল অবস্থার সমাবেশে অপেক্ষাকৃত সহজে স্বাধীনতা লাভ করেছি। শুধু কয়েকটি মস্তক শ্রেণীর মনীষী ও প্রতিভাবান মহাপুরুষের চরিত্রে ও কর্মের মাহাত্ম্যে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন হলেও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় না; তাই আজ স্বাধীন ভারতের এই দুরবস্থা। ইংরাজের প্রতি আমাদের বিজাতীয় হিংসাবিদ্বেষের পরিণতি ঘটেছে বর্তমান স্বজাতীয় হিংসা-

বিশেষে। একথা সবাইকে মানতে হবে যে, জাতি গঠনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে চরিত্রবান, উদ্যমশীল, ত্যাগী ও সেবাপরায়ণ কর্মীর দল। স্বাধীন ভারতে এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্বাধীনতা লাভ করে এরূপ প্রকৃত যোগ্য কর্মী মানুষের সৃষ্টির দিকে আমরা নজর করিনি। পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু অর্থব্যয় করে (প্রধানত পৃথিবীর প্রায় সকল অর্থশালী রাষ্ট্রগুলি হতে ঋণ ও ভিক্ষা করে) আমরা শুধু মালমশলা, যন্ত্রপাতি ও দালানকুঠির ইঁট পাটকেল যোগাড় করেছি। যোগ্য কর্মীর অভাবে বহু অযোগ্য ব্যক্তিকে বিবিধ শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে ও আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের কাজে নিয়োগ করেছি। কর্মীদের বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্র ও ঐকান্তিকতাই যে অর্থাহরণ ও উৎপাদনের প্রধান ভিত্তি, এই সত্যটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারিনি, এবং বিদেশ হতে বহু ব্যয়ে বিশেষজ্ঞ আমদানী করে এর অভাব পূরণে ব্যর্থ প্রয়াস করেছি। অপর কথায়, বিপরীতভাবে খাড়া করে পিরামিড গড়বার মতন অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় বহু শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ না দিয়ে আমরা প্রথমে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার নির্মাণ করেছি। বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্যশস্য উৎপত্তি ও কৃষির উন্নতির জন্য প্রথমে চেষ্টা না করে আমরা গড়ে তুলেছি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান (ইস্পাত ও সারের কারখানা ও আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি)। ফলে প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বিদেশ থেকে আমাদের খাদ্যসামগ্রী আমদানী করতে হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্তৃপক্ষ এর প্রতিকার কল্পে শষ্য উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন, এবং তাতে সুফলও ফলেছে যথেষ্ট। সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, বর্তমানে ভারতরাষ্ট্রে খাদ্যসামগ্রীর কোন ঘাটতি নাই।

আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে অস্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, তারও কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের শিক্ষাকে প্রকৃত জ্ঞান আহরণের বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ ও চরিত্র গঠনের উপায় হিসাবে অবলম্বন না করে, তাকে শুধু যে-কোন উপায়ে জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে সীমিত করে রেখেছি। জীবিকা অর্জনই যে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সেই সহজ ও সত্য কথাটি শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারিনি। জীবিকা অর্জনে পশু ও মানুষে কোন প্রভেদ নেই—উভয়েরই বেঁচে থাকার জন্য এর প্রয়োজন আছে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন তাই এ হতে অন্য কিছু, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। এখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা। ফলে, আমরা মানুষ না গড়ে আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে সৃষ্টি করেছি কতকগুলি যেনতেন প্রকারেণ জীবিকা অর্জনের বিচারমূঢ়, উদ্ভাবনী শক্তিহীন, অপটু, শ্রমকাতর, কর্তব্যবিমুখ কলের পুতুল বা তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত মূর্খ। তাই শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের বেশীর ভাগ পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা একপ্রকার ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

স্বাধীন ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে আমাদের দেশের একজন বরেণ্য মনীষী চিন্তানায়কের উক্তি মনে পড়ে। তিনি তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন—বেদের যুগে আমাদের দেশ ছিল ঋষিপ্রধান, মনুর সময় ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান, ব্যাসের সময়ে ছিল ক্ষত্রিয়প্রধান, শ্রীমন্ত সদাগরের সময়ে ছিল বৈশ্যপ্রধান এবং মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বকালে ছিল শূদ্রপ্রধান। এই উক্তিটির সঙ্গে এখন জুড়ে দিতে হয় যে স্বাধীন ভারতে আমরা হয়েছি অসুর বা বর্বরপ্রধান। অনেকেই জানেন যে, আর্যদের ভারতে প্রবেশ কালে তাঁদের সঙ্গে অসুরেরা বা দস্যু নামক অনার্য জাতির সংঘর্ষ ঘটেছিল। সুতরাং এদের আর্যসমাজের গণ্ডির বহির্ভূত শূদ্রেরও অন্ত্যজ বলা যায়; অপর কথায় আমাদের আচরণ আসুরিক মনোবৃত্তির অনুযায়ী। এই আসুরিক মনোবৃত্তি বললে কি-বুঝায় তা যদি কেউ বিস্তারিতভাবে জানতে চান, তবে তিনি গীতার দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়টি পাঠ করতে পারেন। এখানে আমি অধ্যায়টি হতে একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি :

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥"

ইহার অর্থ; "হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানই হচ্ছে আসুরিক সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোবৃত্তি।

আজ স্বাধীন ভারতে, বিশেষত পশ্চিম বাংলায়, যে সব পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদপন্থী বা তান্ত্রিক দল জনকল্যাণের নামে সমবুদ্ধির দোহাই দিয়ে মহাকলরবে শুধু ভেদবুদ্ধির প্রচার করছেন, তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে হিংসা, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি আত্মঘাতী তামসিক মনোবৃত্তি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের দেহমনকে রোগের বীজাণুর মত ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। একমাত্র যাঁরা আপনার স্বার্থের ও পরের স্বার্থের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন না, অর্থাৎ যাঁরা নিজের কল্যাণকে সকলের কল্যাণ বলে এবং সকলের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ বলে মনে করেন, তাঁরাই একমাত্র জনকল্যাণ কার্যের উপযোগী। আজ আমাদের দেশে এরূপ নেতারই প্রয়োজন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এক কথায়, স্বার্থের সঙ্গে যখন পরার্থের প্রত্যাশা করতে পারি। সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের ইহাই একমাত্র পথ।

নামটা শুনে শেখর একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলো। কী মুশকিল, ছাত্রীকে মিতা বলে ডাকতে হবে? কিন্তু সে নিজের থেকেই বলেছে—আমায় সবাই মিতু ডাকে, আপনিও আমাকে মিতু বলেই ডাকবেন। শেখর ভাবলো, এ নাম মন্দ না, অনেকটা আটপৌরে, মনে হবে একটা ছোটো বাচ্চাকে ডাকছি, যাই হোক তিন মাসের মামলা, সাড়ে চারশো টাকা মোট পাওয়া যাবে, পরীক্ষার পরে অসংখ্য পুরোনো আবছা চেহারার মধ্যে এর চেহারাও মিলিয়ে যাবে। সুপ্রভাকে মিতা বলে ডাকতাম—হঠাৎ শেখরের মনে পড়ে গেল—ছোটো বারান্দায় দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। দুপুর বেলা। একটু দূরে উঁচু নারকোল গাছটির ওপারে একটি চিল উড়ছিলো। সে অনেক বছর, দশ কি এগারো, না আরো বেশী, হ্যাঁ বারো তো বটেই, সবে ভর্তি হয়েছি ইউনিভার্সিটিতে। সে বছরই বিয়ে হয়ে মীরাট চলে গেল। মারো গুলি। হ্যাঁ মিতু, বলো, কোন পেপারটা দিয়ে আরম্ভ করবো। না, না, বই খুলতে হবে না। আমার টেকনিক অন্য রকম। এই তিন মাসে তোমার প্রত্যেক পেপারে পনেরোটা কোশ্চেন তৈরি করে দেব। তা হলেই—

বলতে বলতেই আবার মিতুর পোশাকের উপর চোখ পড়লো। মিতুর বাবা যখন শেখরকে প্রথম সঙ্গে করে এ ঘরে নিয়ে এসেছিলো, তখনই প্রথম নজরে পড়েছিলো মিতুর পোশাক—বেল বটম আর চিকনের পাঞ্জাবি।

ইনি প্রফেসর শেখর মিত্র, তোমায় পড়াবেন—বলেছিলো মিতুর বাবা।

টেবিলের ওধারে মিতু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো। পোশাকের দিকে তাকিয়ে শেখরের ভুরু দুটি কুঁচকে গিয়েছিলো। তখন কিছু বলে নি। কিন্তু এবার ভাবলো, বলা উচিত কারণ বার বার পোশাকের এখানে সেখানে চোখ পড়ছে।

শোনো মিতু, তুমি যখন আমার কাছে পড়বে, তখন শাড়ি পরে বসবে।

মিতু খুব সহজভাবেই ঘাড় নেড়েছিলো। বলেছিলো—আচ্ছা, আমি চট করে বদলে আসছি।

আজ থাক, এর পরদিন শাড়ি পরবে।

আপনার কি মশাই—পরদিন [illegible] প্রফেসর সেনগুপ্ত বলেছিলো—বেল বটম পরুক, ঘাগরা পরুক, বোরখা পরুক, যা খুশী পরুক। আপনি পড়িয়ে মাসের শেষে মাইনে নিয়ে চলে আসবেন।

ওসব বেয়াড়া পোশাক আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগবে মশাই, ভালো লাগবে। একটা বিয়ে করুন, সে বউ দশ বছরের পুরোনো হোক, তখন দেখবেন পথেঘাটে চলন্ত বয়সী মেয়েদের সব রকম পোশাকই ভালো লাগছে, যদিও মুখে আপনাকে বলতে হবে কি সব পোশাকের ছিরি হয়েছে আজকাল, চোখ তুলে তাকানো যায় না।

নতুন টিউশানিটা ঠিক করে দিয়েছিলো প্রফেসর সেনগুপ্তই। মিতার বাবা প্রফেসর সেনগুপ্তের দাদার বন্ধু। শুধু একটা সাবজেক্ট পড়াতে হবে। এটাতে মিতা খুব

প্রথম পাঠ

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কাঁচা। কোনো ভাবনা নেই। প্রফেসার শেখর মিত্র আছে। কাঁচাদের তিন মাস পড়িয়ে পরীক্ষা পাশ করিয়ে দিতে ওর জুড়ি নেই। টিউশানির বাজারে দারুণ চাহিদা।

কখন পড়াবো? —বলেছিলো শেখর—এক মিনিট সময় নেই।

সে আপনি সময় করে নেবেন যে করেই হোক। মিস্টার রায় আমায় খুব ধরে পড়েছেন। আপনাকে পড়াতেই হবে।

শেখর রাজী হোলো।

একে নিয়ে কজন? —জিজ্ঞেস করেছিলো পাশের টেবিলের প্রফেসার মুখার্জি।

এগারো।

মশাই, কি করে পারেন আপনি? একটি কলেজে হোল টাইম, একটি কলেজে পার্ট-টাইম, তারপর এগারোটা পি-টি?

না করে উপায় কি ভাই? মাইনে যা পাই তাতে তো শুধু উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া যায়। বাদবাকী যা কিছু প্রয়োজন তারও ব্যবস্থা করতে হবে তো।

মশাই, আপনি ভেল্কি জানেন।

তা একটু জানি বই কি।

প্রফেসার সেনগুপ্ত বলে—ওর ভাবনা কি? এখন পর্যন্ত বিয়ে থা করলো না, সকালে বাজারে যেতে হয় না, ছুটির দিনে বউকে নিয়ে সিনেমায় যেতে হয় না, এক সঙ্গে এগারোটা পি-টি ও করবে না তো কি আমরা করবো?

শেখর একটু হাসলো। ট্রেড সিক্রেট সবাইকে বলা যায় না। একসঙ্গে এগারোটা প্রাইভেট টিউশানি করা সত্যিই শক্ত। কিন্তু অসম্ভব নয়। সময় চুরি করার কায়দা জানতে হয়। একদিন কলেজের একটা ক্লাস সে নিলো না। আরেকদিন মর্নিং কলেজ বাদ পড়লো। তারপর একদিন এই ছাত্রের কাছে গেল না, আরেকদিন আরেকজনের কাছে গেল না, দশ বারো দিনে একদিন বাদ পড়লে কেউ কিছু মনে করে না, বিশেষ করে পরীক্ষা পাশ করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যখন সুনাম আছে। কিন্তু এভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা সময় বার করে নিলে মোট যে সময়টা পাওয়া যায় তাতে আরো দুটো ছাত্রকে ম্যানেজ করা যায়।

ভালো লাগে না। বিবেকে বাধে। কিন্তু উপায় নেই। টাকা চাই, টাকা। কাঁচা টাকা, কড়কড়ে টাকা। শেখর ভালো ছাত্র এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস। সবাই বললো রিসার্চ করো, ডক্টরেট করো। শেখর করলো না। কি হবে ডক্টরেট করে? গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসার কিংবা কোনো নতুন ইউনিভার্সিটির রীডার। সে মাইনে থেকে বাঁচিয়ে টাকা জমিয়ে বাড়ি গাড়ি করতে করতে মাথার চুল সব সাদা হয়ে যাবে। তাছাড়া অপেক্ষা করার সময় নেই, ধৈর্যও নেই। ইউনিভার্সিটিতে একটা পার্ট টাইম লেকচারারের কাজ পেলে টিউশানির বাজার আরো ভালো হয়। এবার তো আর হলো না। আগামী বছর উঠে-পড়ে লাগতে হবে। ইতিমধ্যে নোট বইটা লিখে ফেলতে হবে। লেগে যাবে বলে মনে হয়। প্ল্যান স্যাংশান করিয়ে নেওয়া আছে। প্রথম সংস্করণের টাকাটা পেলে ভিতটা শুরু করা যাবে।

মশাই, আপনিই দেখিয়ে দিলেন—প্রফেসর ঘোষ বলে উঠলেন টেবিলের ওধার থেকে—টিউশানি করে চার কাঠা জমি করে ফেললেন এরই মধ্যে, আমরা তো ভাবতেই পারি না।

ও কেন করবে না?—বললো প্রফেসার সেনগুপ্ত—বিয়ে থা করেনি দশ বছর ধরে পড়াচ্ছে, চার কাঠা জমি কিনতে পারবে না?

এ কথা শুনে শেখর ম্লান একটু হেসেছিলো কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলো।

হকে দুটি আইবুড়ো বোনের বিয়ে দিতে হয়েছে, ভাইকে পড়াতে হয়েছে। রিসার্চ, বিয়ে, সব কিছু মাথায় উঠেছে। এখন শুধু একটি ভাবনা, একটি চিন্তা, একটি অঙ্ক—টাকা।

নতুন ছাত্রী পড়াশুনো করছে কি রকম? মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে প্রফেসার সেনগুপ্ত।

ভালো।—সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে হাজিরা খাতা তুলে ক্লাসের দিকে চলে যায় অধ্যাপক শেখর মিত্র।

কিন্তু সত্যিই কি রকম পড়াশুনো করছে শেখর জানে না। তার জানার ফুরসত নেই, প্রয়োজনও নেই। সে মিতুকে পাশ করিয়ে দেওয়ার টেকনিকে পড়িয়ে যাচ্ছে, মিতু অন্ততঃ এ সাবজেক্টে ঠিক পাশ করে যাবে। এটুকুই তার দায়িত্ব। বিনিময়ে মাসে দেড়শো টাকা। শেখর ঘড়ি ধরে যাচ্ছে। ঠিক এক ঘণ্টা পড়াচ্ছে। ঘড়ি ধরে উঠে পড়ছে। মাঝখানে তার জন্যে চা আসছে। চায়ের সঙ্গে এক প্লেট আরো কিছু আসছে। কি আসছে খেয়াল নেই। পথে নেমে হয়তো একবার ভাবছে, তাই তো, কি খেলাম তা তো ভুলে গেছি, কী আশ্চর্য। হাত তুলে ঘড়ি দেখছে। এখন যেতে হবে নিউ আলিপুরে। আরেকটি ছাত্র। হাতে কুড়ি মিনিট সময়। ট্যাকসি নেবো? না থাক, পয়সা নষ্ট করে কি হবে। একটা স্টেটবাস আসছে।

পড়াতে পড়াতে শেখরের এক সময় মনে হলো। মিতু তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কি হলো?

মিতু মাথা নাড়লো।

বুঝতে না পারলে বলো। আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি।

না—মিতু বললো—বুঝতে পেরেছি।

আচ্ছা, এবার থার্ড পয়েন্টটা বলছি, লিখে নাও।

মিতু কলমটা তুললো—আচ্ছা স্যর, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

শেখর চোখ তুলে তাকালো।

আপনি সব সময় কি এত ভাবেন?

হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনে শেখর অবাক হলো। হ্যাঁ, পড়াতে পড়াতে সে সব সময় নিজের চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকে। কিন্তু কারো তো সে কথা বুঝতে পারার কথা নয়। নিজের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ছাত্র পড়াতে তার কোনো অসুবিধে হয় না। সে তো নিজেকে নিজে নাম দিয়েছে রেকর্ড প্লেয়ার। পড়িয়ে পড়িয়ে এমন হয়ে গেছে যে, ক্লাসে কিংবা ছাত্রের বাড়িতে বসে শুধু একবার জিজ্ঞেস করে, আজ কি পড়াচ্ছি? হ্যাঁ, টেক ডাউন—। এক একটা বিষয় যেন এক একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড, যেটা দরকার সেটা চাপিয়ে দিলে চালিয়ে দিলেই হলো। রেকর্ড নিজের মতো বেজে যাবে। মুখটা সাউণ্ড বকস। কিন্তু মন ফাঁকা। সেখানে কতো রকম চিন্তা। কতো রকম অংক। বাড়িটা আরম্ভ করার আগে এল-আই-সি থেকে লোন নিতে হবে। বইয়ের প্রথম সংস্করণ থেকে দু হাজার টাকা আসবে। ওদিকে ছোটো ভায়ের জব ভাউচার এসে যাবে ব্রিটিশ হাই কমিশন থেকে। কো-অপারেটিভ থেকে কিছু টাকা নিতে হবে। ছোটো ভায়ের বিলেতের প্লেনের টিকিট হয়ে যাবে।

আপনি সব সময় কি এত ভাবেন?

দুটি শার্ট করাতে হবে। রেডিয়োতে যে টক পেয়েছি তাতে পাব পঁচিশ টাকা। আরো পঁচিশ টাকা চাই। দেখি অপূর্বকে বলতে হবে যদি ওদের কাগজের রোববারের পাতায় আমার একটি প্রবন্ধ ছাপে। পঞ্চাশ দেবে নিশ্চয়ই। তা হলে চারটে গেঞ্জি হয়ে যাবে।

আপনি সব সময় কি এত ভাবেন?

প্রিন্সিপ্যাল রিটায়ার করছে মাস ছয়েক পরে। তার মানে ইভনিং-এর ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের চাকরিটা খালি হবে। আমার

তো দশ বছর সার্ভিস হলো। পাড়ার নববর্ষের ফাংশনে কলেজের সেক্রেটারিকে চীফ গেস্ট করে আনলে কেমন হয়?

আপনি সব সময় কি এত ভাবেন?

শেখর অবাক হয়ে তাকালো। এ পর্যন্ত কোনো ছাত্র তাকে এভাবে প্রশ্ন করেনি। শেখর একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলো। স্যার কি বাপু, যা বলছি চুপচাপ লিখে নে—। এ কথা ভাবলো, কিন্তু বলতে আর পারলো না। হঠাৎ মনে মনে একটা ক্লান্তি অনুভব করলো। তাকে তো কোনো দিন কেউ জিজ্ঞেস করেনি একথা।

সামনে চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। পাশের প্লেটে আধখানা কচুরি। খাচ্ছিলাম নাকি এতক্ষণ?—শেখর ভাবলো। চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিলো। একটু হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো—ভাবছি? তুমি কি করে বুঝলে?

মিতুও একটু হাসলো। কলমটা তুলে বললো—হ্যাঁ, বলুন।

শেখর তখন গম্ভীর হয়ে আবার অধ্যাপক হয়ে গেল।

-হ্যাঁ, টেক ডাউন—।

কতো মিতুর বয়েস? —প্রশ্নের তৈরি উত্তর ডিকটেশান দিতে দিতে শেখর ভাবলো—আঠারো, উনিশ, কুড়ি, একুশ? হ্যাঁ, কুড়ি। কুড়ির বেশী নয়। আর আমি? তেইশ বছর বয়েসে কলেজের চাকরিতে ঢুকেছি। দশ বছর সার্ভিস। এখন তেত্রিশ। এমন কিছু নয়।

আপনার ছাত্রী মিতা পড়াশুনো কি রকম করছে?—প্রফেসার সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করলো। প্রায়ই করে।

আমার সাবজেক্টে পাশ করে যাবে।

পাশের চেয়ারে বসেছিলো প্রফেসার গাঙ্গুলী। জিজ্ঞেস করলো—আপনার ছাত্রীর নাম মিতা?

শেখর একটু হাসলো। উত্তর দিলো—আমি ওকে মিতু বলে ডাকি। ওটা ওর ডাক নাম।

—সে আপনাকে স্যার বলে, না শেখরদা বলে?

শেখর গম্ভীর হয়ে ভুরু কোঁচকালো। তার প্রকৃতিটাই এরকম। ঠাট্টা তামাশা পছন্দ করে না। স্টাফ রুমের বড়ো টেবিলটার দু পাশে বসে প্রফেসারেরা যখন নানা রকম হালকা আলাপ আলোচনা করে, শেখর নিজের মনে সামনে ফুলস্ক্যাপ কাগজ রেখে ডটপেন দিয়ে তার বইটির একটি নতুন পরিচ্ছেদ লেখে। প্রথম সংস্করণে পাবে দু হাজার টাকা। কুড়িটি পরিচ্ছেদ। প্রতি পরিচ্ছেদে একশো টাকা। এক একটা পরিচ্ছেদ গড়ে কুড়ি পাতা। তার মানে ফুলস্ক্যাপের এক পাতা লিখলে পাঁচ টাকা। এক ঘণ্টা অফ্ পিরিয়ডে তিন পাতা লেখা যায়। তার মানে পনেরো টাকা। বাজে মা গেঁজিয়ে পনেরো টাকা রোজগার করা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয়।

—প্রফেসার মিত্র, শুনেছেন প্রফেসার ঘোষ কি বলছে আপনাকে?

কথাটা যে শেখরের কানে যায় নি তা নয়। মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলো—আপনারা কি কলেজের অধ্যাপক, না ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

—আরে মশাই, প্রফেসারি করি বলে কি জীবনের রসটস সব শুকিয়ে গেছে নাকি?

—ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি পছন্দ করি না।

—ছাত্রকে নিয়ে তো কিছু বলা হচ্ছে না। ছাত্রীকে নিয়েই বলছি। কতো গল্প কতো উপন্যাস লেখা হলো অধ্যাপককে নায়ক আর ছাত্রীকে নায়িকা করে।

—যতো সব রাবিশ। ওসব গল্প উপন্যাসেই হয়।

—সে কি কথা মশাই? ওই আপনার সামনে বসে আছে প্রফেসার গুহ......

—আমাদের পাড়ার প্রফেসার চাটার্জি...

—প্রফেসার মজুমদার...

—প্রফেসার রায়চোধুরী...

কাগজপত্র গুটিয়ে শেখর উঠে পড়লো।

প্রফেসর দত্ত বললো—না, আপনারা এভাবে ওঁর পেছনে লাগবেন না। উনি যখন পছন্দ করেন না—। কিন্তু শেখরবাবু, আপনিও বা কদ্দিন শুধু ছাত্রীকেই মিতা মিতা বলে ডাকবেন? এবার একটি সত্যিকারের মিতা যোগাড় করুন।

প্রফেসার বাগচি বললো—আরে মশাই শুনুন। আমার এক ছাত্রী ছিলো, তার নাম প্রিয়া। একদিন কথায় কথায় গিন্নীকে বললাম। এদের মাইরী সেন্স অফ হিউমারের এত অভাব, বলে কিনা—কি? ওকে তুমি সব সময় ও নাম ধরে ডাকো? ওকে আর পড়াতে হবে না। ছেড়ে দাও ওই টিউশানি। বোঝালেও বোঝে না। কি আর বলবো। গিন্নীর হুকুম। ছাড়তে হলো। একশোটা করে টাকা পেতাম মাসে মাসে। সেটা গেল।

—টেক ডাউন।

হ্যাঁ, বলুন—কলম তুলে মিতু বললো।

রেকর্ড প্লেয়ার নোট দিতে শুরু করলো। শেখরের মন হাত পা ছড়িয়ে বসলো। মিতুর দিকে তাকালো। ভাবলো—আজ কি মিতু জিজ্ঞেস করবে সব সময় এত কি ভাবেন?

কি ভাবি সে কথা কুড়ি বছরের এই বাচ্চা মেয়েটিকে কি বলা যাবে? যাকে আমি দু মাস আগে চিনতাম না, এক মাস পরে হয়তো আর চিনবো না? যার কাছ থেকে আমি তিনশো টাকা পেয়েছি। যার কাছ থেকে আর দেড়শো টাকা পাবো? একে কি কোনোদিন বলা যাবে বারো বছর আগে এরই বয়েসী একটি মেয়েকে।

আমি বলেছিলাম, তোমায় আমি মিতা বলে ডাকবো। বেশী দিন ডাকি নি। যতো সব অল্প বয়েসের ছেলেমানুষি।

মিতু কিছুক্ষণ লিখে গেল, তারপর চোখ তুলে তাকালো। মাথা নাড়লো। সে বুঝতে পারেনি। তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলো শেখর।

হঠাৎ মুখ তুলে মিতু বললো—আচ্ছা, আপনি এত জানেন, আপনি একটা ডক্টরেট করে নিচ্ছেন না কেন?

শেখর একটু অস্বস্তি অনুভব করলো। মেয়েটি তাকে মাঝে মাঝে এ রকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে কেন? দু দিন আগে তাকে জিজ্ঞেস করেছে বাড়িতে কে কে আছেন। এ সব কথার উত্তর দিতে শেখরের ভালো লাগে না, তবু না বলে পারেনি।

—ও, আপনি বিয়ে করেন নি।

শেখর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।

আজ জিজ্ঞেস করছে ডক্টরেট করেন নি কেন। হ্যাঁ, ডক্টরেট তাকে করতে হবে। তবে তার আগে ইউনিভার্সিটিতে একটা পার্ট-টাইম পেলে ভালো হয়। ডক্টরেট করার খরচা আছে। তার নিজের অতো সময় নেই। দুজন ছাত্রকে মাইনে দিয়ে রিসার্চ অ্যাসিসটান্ট রাখতে হবে। ওরা তার নির্দেশ অনুযায়ী লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে দেবে, তারপর সে সমস্ত মেটিরিয়াল বেছে এবং সাজিয়ে থিসিস তৈরি করবে। তার আগে একটি টাইপ মেশিন চাই। এবং ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে যে টাকা পাবে সে টাকা দিয়ে একটি টাইপ মেশিন কিনতে হবে। একটু তদবির করে ইভনিং সেকশানের ভাইস প্রিনসিপ্যালের কাজটা পেয়ে যাবে হয়তো কিন্তু পরে কোথাও প্রিনসিপ্যালের কাজ পেতে হলে ডক্টরেট থাকলে ভালো হয়।

কিন্তু অতো কথা কি বলা যায় এই মিতুকে?

শেখর বললো—সময় পাচ্ছি না। করে নেব কোনো এক সময়। কোনো তাড়া নেই। নাও লেখো। এখনো অনেকটা বাকী আছে।

একটা টেলিফোন এলো। মিতু উঠে গিয়ে ফোন ধরলো।

হ্যাঁ, মিতু বলছি। —ভাট। —হঃ, সে হবে নাকি? —এখন আমি পড়ছি আমার প্রফেসারের কাছে। —কি? ইভনিং শো? না, আজ বাবা সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন। —আমার বয়ে গেছে। —কি? —হ্যাঁ। —না। —হ্যাঁ। হ্যাঁ। —না। কাল বলবো। —এখন বলা যাবে না। —পরে বলবো। —কি? কখন?...

শেখর ঘড়ি দেখলো। ফোন রেখে মিতু যখন ফিরে এলো আবার ঘড়ি দেখলো। মিতুর মুখটা একটু লালচে। চোখেমুখে একটা দ্যুতির আভা।

আমরা যখন পড়াশুনো করি তখন তোমার কোনো ফোন না এলেই ভালো—শেখর গম্ভীর হয়ে বললো।

ও যদি ফোন করে আমি কি করবো?

ও? ও আবার কে? শেখরের জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলো। কিন্তু করলো না। শুধু বললো—বলবে, তুমি এখন ব্যস্ত। এই বলে ফোন রেখে দেবে।

ছাত্রীর পড়া কি রকম চলছে? —প্রফেসার সেনগুপ্তের পুরোনো প্রশ্ন।

ভালোই চলছে। পাশ করে যাবে।

তিন মাস শেষ হয়ে এলো। সামনে পরীক্ষা। বেশ মন দিয়ে পড়াচ্ছিলো শেখর। এমন সময় একটি ছেলে এলো। পঁচিশ বছর। এলোমেলো চুল। পায়জামা পাঞ্জাবি। সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মিতু!—

শেখর গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকালো। কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপ করলো না।

মিতু!—

মায়ের কাছে গিয়ে বোসো। আমি এখন পড়ছি।

এখন পড়ে আর কি হবে? মাসীমাকে বলেছি তোমায় নিয়ে কাজলদের বাড়ি যাবো। ওখানে সবিতা অতনু তিমির পার্থ ঋতা এরা সবাই আসছে।

পড়া হয়ে যাক, তারপর। তুমি ভেতরে যাও।

সে শেখরের দিকে একবার তাকালো। তারপর চলে গেল সেখান থেকে।

শেখর ভুরু কুঁচকে বসেছিলো। জিজ্ঞেস করলো—ছেলেটি কে?

—তমাল।

কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম আজকালকার ছেলেদের—শেখর ভাবলো। বললো—আজ এ পর্যন্তই থাক তাহলে?

—না। আরেকটি কোশ্চেন অন্তত পড়িয়ে দিন।

আরো আধ ঘণ্টা পড়িয়ে শেখর উঠে পড়লো। যখন চলে আসছিলো মিতু হঠাৎ বললো—তমাল খুব ভালো ছেলে। তবে বড্ড ছেলেমানুষি করে এখনো।

শেখর একটি দেড় সেণ্টিমিটার হাসি দেখিয়ে বেরিয়ে এলো।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা ক্লান্তি অনুভব করলো। বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু উপায় নেই। পার্ক সার্কাসে একটি ছাত্র আছে। তারও সামনে পরীক্ষা।

ছাত্রীর পরীক্ষা কেমন হলো?—জিজ্ঞেস করলো প্রফেসার সেনগুপ্ত।

ভালোই।

গিয়েছিলেন ওদের ওখানে?

হ্যাঁ। কাল।

তাহলে এখন আপনার ছুটি?

আপাতত।

যে কথা প্রফেসার সেনগুপ্তকে বলা গেল না,—আজ বিকেলে পার্ক স্ট্রীট আর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে মিতুর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে শেখরকে।

শেখরের ইচ্ছে ছিলো না। এ রকম একটা আমন্ত্রণের জন্যে সে প্রস্তুতও ছিলো না। কাল মিতু হঠাৎ বললো—আমি মাকে বলেছি আমার সঙ্গে আপনি কাল পার্ক স্ট্রীটে কোথাও চা খাবেন। শেখর আপত্তি জানিয়ে বলেছিলো, বাইরে কেন? চা খেতে হয় বাড়িতেই খাবো। মিতু বলেছিলো—না, আমার বাইরে খেতে ইচ্ছে করছে। মিতুর মাও অনুরোধ করলো, তখন শেখর রাজী হলো। জিজ্ঞেস করলো,—খাওয়াটা কিসের? মিতু বলেছিলো,—পরীক্ষা পাশ করলে তো খাওয়াতে হতো। কিন্তু তখন আর হয়ে উঠবে না। তাই আগেই খাইয়ে দিচ্ছি।

একথা শুনে শেখর অবাক হয়েছিলো। মিতুর দিকে দু' মিনিট হাঁ করে তাকিয়েছিলো। তখন মিতু হেসে ফেলেছিলো।

পার্ক স্ট্রীট আর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে মিতু যখন এলো, তখন শেখর আরো অবাক, কারণ মিতু একা।

—তোমার মা কোথায়?

—মা? ওঁর তো আসার কথা ছিলো না। শুধু আপনি আর আমি।

ও—। শেখর মিতুর আপাদমস্তক তাকালো। ওর পরনে কালো আঁট স্ট্রেইট স্ল্যাকস আর খাটো জামা। একটু অস্বস্তি লাগলো। চারদিকে তাকালো। প্রফেসার সেনগুপ্ত মাঝে মাঝে এশিয়াটিক সোসাইটিতে আসে। এদিকে এদের এভাবে দেখে ফেললে কি জানি কি ভাববে। শেখর ভয়ে ভয়ে আবার চারদিকে তাকালো। তারপর চলতে লাগলো মিতুর পাশে পাশে। মিতু দরজা ঠেলে একটি জমকালো রেস্তরাঁয় ঢুকলো। শেখর এলো পেছন পেছন। একটি টেবিলে সামনের চেয়ারটা টেনে বসতে যাচ্ছিলো। মিতু তাকে নরম সোফায় নিজের পাশে বসতে বললো।

শেখর চারদিকে তাকালো। পরিবেশ, মেজাজ সব কিছুই নতুন মনে হলো। আর মনে হলো, একটি সন্ধ্যা একটু অন্য রকম, বেশ ভালোই লাগছে।

—পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর পরে কেন খাওয়াতে পারবো না জানেন? ও সময় আমার বিয়ে হবে।

এত সহজভাবে বললো যে শেখর অবাক হয়ে তাকালো। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলো,—তমালের সঙ্গে?

মিতুও হাসলো। বললো,—হ্যাঁ। আমি জানি যে আপনি সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন।

চা এলো। পেসট্রি এলো। প্যাটিস এলো। দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। মিতু চা তৈরি করে দিলো। তারপর বললো—আপনাকে স্যার বলতে আর ভালো লাগছে না। আজ শেখরদা বলবো, পরে যদি কখনো দেখা হয়, তখনও শেখরদা বলবো।

শেখর হাসলো—বেশ, তাই বলো।

—আচ্ছা শেখরদা, আপনি বিয়ে করেননি কেন?

শেখর এ প্রশ্নে হঠাৎ একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর উত্তর দিলে—আমার বা

রোজগার তাতে এখন বিয়ে করা চলে না।

—কেন আপনি তো খুব ভালো রোজগার করেন শুনেছি।

সব কথা তো এই মেয়েটিকে বলা যায় না—শেখর ভাবলো। তার মনে মনে অনেক অঙ্ক। বাড়িটি আরম্ভ করে দিতে হবে। তিনদিনে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের চাকরিটি পেয়ে গেলে ভালো হয়, তা না হয় তো অন্তত ইউনিভার্সিটিতে একটি পার্ট টাইম। তখন নিজের সুবিধে মতো একটি মেয়ের খোঁজ করানো যাবে। পণ নেওয়া যাবে না আজকালকার দিনে, তবে মেয়েটির যদি শ'-পাঁচেক টাকার একটি চাকরি থাকে তো ভালোই হয়। মাসে পাঁচশো টাকা মানে ব্যাঙ্কে প্রায় এক লাখ টাকার ডিপোজিটের সুদ। সেই টাকার থেকে বাড়ির ট্যাক্স আর বউয়ের খরচা উঠে আসবে।

মিতু তাকিয়ে আছে শেখরের দিকে। শেখর জিজ্ঞেস করলো,—তমাল কি করে?

এদ্দিন তো কিছু করতো না। সম্প্রতি একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছে।

বাস, তাইতেই সে ভরসা করে বিয়ে করছে তোমায়?—শেখর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আমাদের চলে যাবে,—মিতু উত্তর দিলো।

একটু চুপ করে থেকে শেখর বললো,—তোমার মা বাবা আপত্তি করেননি?

আপত্তি করবেন কেন?—মিতু যেন একটু অবাক হলো,—ওঁরা খুব খুশী হয়েছেন।—তারপর হেসে বললো, একটা কথা বলবো আপনাকে? খুব প্রাইভেট। আমার মা বাবাও এমনি করেই বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের আগে আমার বাবা ছিলেন মায়ের প্রাইভেট টিউটার।

ও—। হঠাৎ শেখরের মনে হলো কেউ যেন তার বুকের পর হাতুড়ি দিয়ে মারলো।

কিন্তু কেন এরকম হলো এ কথাই সে ভাবছিলো তার পরদিন সকালেও। বুঝতে পারলো না।

প্রফেসার সেনগুপ্ত বললেন, কি ব্যাপার? আজ যেন একটু বেশী রকম গম্ভীর মনে হচ্ছে?

—এমনি।

—ভালো কথা। একটি মেয়েকে পড়াবেন? কালও ওর দাদা এসে আমায় বলেছে আপনাকে বলতে। ও মেয়েটিও আমার খুব চেনা।

শেখর একটু হালকা হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, কি রকম দেখতে?

—ও, আপনার তাহলে বেশ উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এই মেয়েটি বেশ ভালো দেখতে, সুন্দরী বলা চলে। পড়াবেন ওকে?

না,—শেখর মাথা নাড়লো।

কেন?—প্রফেসার সেনগুপ্ত এবার অবাক হলো।

—কোনো মেয়েকে পড়াবো না। ভালো লাগে না।

চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো প্রফেসার সেনগুপ্ত। তারপর বললো,—হপ্তায় তিন দিন। মাসে দুশো টাকা দেবে বলছে।

দুশো? —শেখর চোখ বুজে একটু ভাবলো। তারপর চোখ খুলে উত্তর দিলো,—বেশ, তাহলে ওদের বলে দেবেন কবে তারিখ থেকে আরম্ভ করা যাবে। থাকে কোন পাড়ায়?

॥ ২৮ ॥

সামতাবেড়

এখন যাঁদের বয়স অনধিক ৩৪ বছর, তাঁরা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে জন্মেছেন। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের লেখার জনপ্রিয়তা কতদূর সেকথা জানতে বড় ইচ্ছে করে। গ্রাম-বাংলার সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারকে প্রতিহত করতে, অবহেলিত বঞ্চিত নারী সমাজকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁর লেখনী খড়্গের মতো বাংলা সাহিত্যের আকাশকে কয়েক দশক ধরে উদ্ভাসিত রেখেছিল—সেই শরৎচন্দ্র। 'অমরদরদী কথাশিল্পী' এই

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষণটি প্রয়োগ না করে যাঁর নাম সে সময়ে উচ্চারিত হত না—সেই শরৎচন্দ্র। যিনি লিখেছিলেন—"দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে আছেন, সেই পল্লীগ্রামেই আমার জন্ম। তাদের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে, অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি"—সেই শরৎচন্দ্র। যিনি লিখেছিলেন—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই...এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে"—সেই শরৎচন্দ্র।

গত তিন-চার দশকে আমাদের গ্রামীণ সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের মহিলারাও অনেক বেশী মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন সত্য। কিন্তু শোষণ নিপীড়নের শেষ হয়নি—ক্ষেত্র বদল হয়েছে মাত্র। আজকের নবীনদের অভিনিবেশ যে সেই নবতর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে প্রধানত নিবদ্ধ হবে এমনই স্বাভাবিক। কিন্তু ফেলে-আসা আর এক রণভূমিতে যিনি দীর্ঘকাল, প্রায় একাকী, একই আদর্শের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, শত বাধা বিপত্তিতেও হার মানেন নি, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া অন্যায়, তাঁকে বিস্মৃত হওয়া পাপ। আরও অন্যায় এইজন্য যে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি তাঁর হৃদয়ের একেবারে উৎসমূলে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল, হাল আমলের মত রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজীর অন্যতম কৌশল মাত্র ছিল না। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোস-হীন সংগ্রামের এমন খাঁটি সৈনিক, হায়, এ দুর্ভাগা দেশে আজ কত বিরল! তাঁর স্মৃতিচারণ করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

✻

শরৎচন্দ্রের চারিত্রিক প্রবণতা ও হৃদয়-বৃত্তির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে কেবল মাত্র সামতাবেড়-এর পরিবেশেই তা সম্ভব। ভাগলপুরে বা দেবানন্দপুরে তিনি অনভিজ্ঞ কিশোর মাত্র; রেঙ্গুনে, শিবপুরে বা অন্যান্য বহু স্থানে তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবন; কিন্তু সামতাবেড়-এ তিনি অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে প্রবীণ, জীবন দর্শনের প্রণিধান ও ব্যাখ্যার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আজ থেকে ছেচল্লিশ বছর আগে, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, শরৎচন্দ্র যখন সামতাবেড়-এ এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন সে গ্রাম যে কত পশ্চাৎপদ ছিল তা এখনও সেখানে গেলে অনুভব করা যায়। পাশের গ্রাম গোবিন্দপুরে তাঁর দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত উপলক্ষে তিনি এ অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হন সত্য। কিন্তু শেষ জীবনের সবটাই এখানে কাটানোর সিদ্ধান্ত যে এই ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এমন মনে হয় না। যে কুসংস্কার, যে কূপ-মণ্ডূকতা, যে সামাজিক হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন, এখানে তার সর্বাঙ্গীণ উপস্থিতি তাঁকে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে থাকবে। তাই একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন—"ইহার ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, ইহার জলাভাব, ইহার দোষগুণগুলি দশ-দিক দিয়া যা কিছু বল, বাস্তবিকই আমি ভালবাসিয়াছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। মানুষকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির হয়, তখন তাহার দোষ ত্রুটিতে সহানুভূতি না করিয়া থাকা যায় না।" আর আকর্ষণের কারণ ছিল, ধীরগতি রূপ-নারায়ণের উদার প্রসার আর তার কূলে শ্যামল বনচ্ছায়ায় ঢাকা এখানকার শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। সেজন্য অন্যত্র তিনি লিখেছেন—"পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ি আর রূপনারায়ণ নদ—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশীদিন কোথাও থাকতে পারিনে।"

শরৎচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর অবর্তমানে সে টালিছাওয়া দোতলা মাটির বাড়িটি ও সামনের ফলফুলের বাগান আজ শ্রীহীন। তবু, শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত অনেক কিছু এখনও এখানে সংরক্ষিত আছে। দর্শনার্থীর বিরাম নেই। হাওড়া-খড়্গপুর রেলপথে বাগনানের পরের স্টেশন দেউলটিতে নেমে (হাওড়া থেকে দূরত্ব প্রায়

শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন : সামতাবেড়

৩২ মাইল: ট্রেন জার্নির সময় ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট), সাইকেল রিকশায় দু' মাইল পিচের রাস্তা অতিক্রম করে, রূপনারায়ণের বাঁধ-বরাবর ডানদিকে (উত্তর দিকে) দু' ফার্লং হাঁটাপথে গিয়ে বাঁধের বাঁ পাশে (পশ্চিম দিকে) নীচু জমিতে শরৎচন্দ্রের এই পল্লী-ভবনে পৌঁছানো যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হতে দু' ঘণ্টার বেশী লাগবার কথা নয়। সেজন্য, কলকাতার দিক থেকে যাঁরা যেতে চান, তাঁরা যে কোন একটা ছুটির দিনে অনায়াসেই সামতাবেড় ঘুরে আসতে পারেন।

শরৎচন্দ্রের বাড়িটি দোতলা হলেও যে মাটির তৈরি সে কথা আগেই বলেছি। হাওড়া জেলার ঘরামিরা এ জাতীয় বাড়ি তৈরি করতে ও কাঁচামাটির অলংকরণে তা সজ্জিত করতে যে কতদূর দক্ষ, বারান্তরে সে বিষয়ে লিখব। এখানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এ বাড়ির মেঝে সিমেন্টবাঁধানো ও মাটির দেওয়াল চুনকামকরা বলে দর্শকদের অনেকেই সেটিকে পাকা বাড়ি মনে করতে পারেন। প্রাচীরঘেরা ভবনের প্রবেশপথের উপরে গুচ্ছ গুচ্ছ বোগেনভিলিয়ার সমারোহ: সামনেই টলটলে জলের এক ঘাট-বাঁধানো পুকুর। তার তীর বরাবর নারিকেলের সারি—শরৎচন্দ্রেরই নিজের হাতে লাগানো। প্রাচীরের ভিতরে, বাগানের মধ্য দিয়ে পথ গিয়ে শেষ হয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত একতলার প্রশস্ত বারান্দায়। তারই পশ্চিম প্রান্তে, শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার জন্য ব্যবহৃত খুব ছোট একটি ঘর—দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ছ' সাত ফুটের বেশি হবে না। পশ্চিমে রূপনারায়ণের দিকে ও দক্ষিণে বাগানের দিকে দুটি কাঁচের জানলা আছে সে ঘরে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, লেখার ফাঁকে ফাঁকে বাইরে দূরে অনেকক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে রেখে আবার তাঁর লেখায় ফিরে আসতেন শরৎচন্দ্র। সবুজ বনাতমোড়া ছোট একটি লেখবার টেবিল—তার ঠিক মাঝখানের একখণ্ড তক্তা টেনে তুলে পিছনের পায়ার ভর দিয়ে তাকে ঢালুভাবে রাখা যায়। হাতলযুক্ত চেয়ার একটি। একটি পশিআঁটা কোট—তার উপরে শরৎচন্দ্রের সুপরিচিত ফটো ও হিরন্ময়ী দেবীর মৃত্যুর পরে তোলা একটি ছবি সযত্নে স্থাপিত। কাঠের শেলফ একটি; তার পাশে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ছড়ি। কোণের দিকে এক তাকের উপরে একজোড়া চটি ও পুরনো এক গড়গড়ার কাঠের অংশ। এই ছোট ঘরটিতে, এই সামান্য আসবাবে, জীবনের শেষ বারো বছরের বহু বিখ্যাত উপন্যাস লিখেছেন শরৎচন্দ্র। গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে, দরজা ভেজিয়ে যখন তিনি লিখতেন তখন তামাকের কলকে বদলানো ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কারও এঘরে প্রবেশ করা নিষেধ ছিল। কোন অজুহাতেই সে সময় তাঁকে বিরক্ত করা যেত না। আজও এ ঘরের নীরবতায় কিছুক্ষণ কাটালে শরৎচন্দ্রের সেই আত্মমগ্ন সান্নিধ্য যেন উপলব্ধি করা যায়।

লেখবার ঘরের পূবে, একতলার টানা বারান্দার পাশে, দুটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘর। প্রথমটিতে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত একটি সাধারণ পালংক, এক আলমারি বই, একটি রিভলভিং বুককেস, খুব পুরনো ধরণের একটি [illegible] ও সামান্য কিছু আসবাব। পাশের ঘরের প্রধান দ্রষ্টব্য তিন-চার আলমারি বই। শরৎচন্দ্রের সংগৃহীত বই-এর কি পরিমাণ অংশ ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে তা বলা যায় না। তবে অবশিষ্ট পুস্তকগুলির কীটদষ্ট অবস্থা থেকে বোঝা যায় সেগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজ আর কেউ নেই। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য" পুস্তকে শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় এ ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর যে সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকা প্রকাশিত করেছেন, গবেষকদের কাছে তা মূল্যবান। তা থেকে দেখা যায়, সাহিত্য, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, জীবনী, জীব-বিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের নানা বইয়ের মধ্যে ইংরেজী বইয়ের সংখ্যাই বেশী। সে সংগ্রহে ডিকেন্স, টলস্টয়, গোর্কি, আলেকজাণ্ডার ডুমা, আনাতোল ফ্রাঁস, নাট হ্যামসুন, কার্ল মার্ক্স, ট্রটস্কি, ক্রপটকিন, ডারউইন, বারট্রাণ্ড রাসেল, কীটস, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র রায়, পরশুরাম, দিলীপকুমার রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা ইংরেজী ও বাংলা বহু বই স্থান পেয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, সাঁতরা মহাশয়ের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি মাত্র বইয়ের উল্লেখ আছে, তাও ইংরেজীতে, নাম—'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'। 'ডেথ ইন অল এজেস অ্যাণ্ড অল কান্ট্রিজ' [illegible] মালার সাতটি খণ্ডও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নারীদরদী শরৎচন্দ্রের সংগ্রহে [illegible] বিশেষ মূল্য ছিল।

একতলার বারান্দার পূব প্রান্তে [illegible] উঠবার সিঁড়ি। নীচের লেখবার ঘরের উপরে দোতলায় কোন ঘর নেই। [illegible] দোতলার রেলিং-ঘেরা খোলা [illegible] দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ঘুরে [illegible] এ বারান্দা থেকে রূপনারায়ণের দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে দেয়। অর্শের প্রকোপে এক সময় শরৎচন্দ্র যখন বসে লিখতে পারতেন না তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখবার জন্য এক উঁচু ডেস্ক বানিয়ে দোতলার এ বারান্দায় রেখেছিলেন। ওপরের দুটি ঘরের একটিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছ থেকে পাওয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি ছিল শরৎচন্দ্রের শয়নকক্ষ।

শরৎচন্দ্রের কালে বাগানের বাহার নাকি দেখবার মতো ছিল। অনাদর অবহেলায় আজ তা নিতান্তই শ্রীহীন। বাগানের পশ্চিম দিকের প্রাচীরের পাশে একখণ্ড ডাঙা জমিতে পাকা গাঁথনির দুটি সমতল বেদী। তাদের শিয়রে দুটি মর্মর ফলকে শরৎচন্দ্র ও স্বামী বেদানন্দের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ উৎকীর্ণ আছে। স্বামী বেদানন্দ (প্রভাসচন্দ্র) ছিলেন শরৎচন্দ্রের মেজ ভাই; ছোট ভাই এর নাম ছিল প্রকাশচন্দ্র। প্রভাসচন্দ্র অল্প বয়সে

স্বামী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। বহুদিন পরে ফিরে এসে তিনি নাকি বলেন সাত দিনের বেশী থাকতে পারবেন না। ... তাঁর মৃত্যু হয়। পাশাপাশি, দুটি বেদীর নীচে এক গৃহত্যাগী স্বামী ও এক জন্ম-ভবঘুরে দুই ... চিতাভস্ম রক্ষিত।

শরৎচন্দ্রের পল্লীভবনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী এখানে একাদিক্রমে বাস করে গেছেন প্রায় ২৩ বছর। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি দেহরক্ষা করেন। এ-বাড়িকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবার জন্য এ নিঃসন্তান দম্পতির আর কেউ জীবিত রইলেন না। বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে মানসপুত্রের স্মৃতিবিজড়িত এ-ভবনটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত। হাওড়া জেলা শরৎচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ... স্থানীয় এক জনসভায় বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলেছিলেন। কিন্তু ... নানা কারণে এ বিষয়ে আর কিছু হয়নি।

※

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-সন্ধানে সামতাবেড়, গোবিন্দপুর ... কাছাকাছি গ্রামে ... একাধিকবার। পানিত্রাস গ্রন্থাগারে ... আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় ... সংগৃহীত যে-সব পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য সামগ্রী রক্ষিত আছে তা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু সে সমস্তই নিষ্প্রাণ ... নির্জীব নিদর্শন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ... খবর দিতে পারে এমন এক জীবন্ত সাক্ষীর সন্ধান পেলাম একবার সামতাবেড় ... এসে। কে যেন বললে, সামতাবেড়-এ প্রায় আগাগোড়াই শরৎচন্দ্রের ভৃত্য ছিল গোপাল হাজরা; সে থাকে পাশের পল্লী গোবিন্দপুরে। ডেকে পাঠাতেই সে এসে হাজির হল শরৎচন্দ্রের বাড়ির সেই একতলার বারান্দায়। ছোটখাট চেহারা, ... কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, মাথার চুল ... বাস। পরণে ময়লা ফতুয়ার উপর ... ময়লা চাদর; খাটো ধুতি উঁচু করে পরা; বয়স পঁয়ষট্টির কাছাকাছি। গোবিন্দপুরে তিন পুরুষের বাস, জাতিতে ... এখন সামান্য জমিজমার আয়ে ... চলে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দু-চার কথাতেই মুখ খুলে গেল তার। একটানা ... ঘণ্টা প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝেই এই প্রত্যক্ষদর্শী যে-সব মণিমুক্তা ছড়াতে লাগল, আমার নোটবইতে তা সযত্নে লেখা আছে। বর্তমান নিবন্ধে তার সবটুকু হয়ত দেওয়া যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর খাস ভৃত্য বনমালীর

শরৎচন্দ্রের চিতাভস্মের উপর রচিত সমাধি

জন্য বঙ্গসাহিত্যের আঙিনার একপাশে একটু স্থান করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দীর্ঘকালের আর-একটি ভৃত্য সাধুর তেমন সৌভাগ্য হয়নি। বিশ্বভারতীর এক ফোটোগ্রাফিক কভারেজের* সূত্রে, ... তার সঙ্গে একাদিক্রমে কয়েকদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমাকে। তার চোখে দেখা খুব কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক গল্প, অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী সে আমায় বলেছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। সে নোটগুলি আমার মূল্যবান সঞ্চয়। কেননা, রবীন্দ্র-গবেষকেরা এই প্রত্যক্ষদর্শীদের অজস্র অভিজ্ঞতাকে তেমন মূল্য দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। দিলে তার যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রিত বিবরণ হয়ত দেখতে পেতাম। সাংবাদিকেরাও এই হরিজনদের তেমন পাত্তা দেননি, কেননা সংবাদ সংগ্রহের সহজতম ক্ষেত্র সাধারণত ভি আই পি মহলে। ফল হয়েছে এই যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত এমন অনেক উৎকৃষ্ট কাহিনী, উপাদেয় স্মৃতিকথা থেকে আমরা, সাধারণ পাঠকেরা, বঞ্চিত হয়েছি।

যাক সে কথা। গোপাল বললে—এ বাড়ি হবার আগে তো এখানে ঘোর ঝোপজঙ্গল ছিল। 'বাবু' (শরৎচন্দ্র) আসেন প্রথমে; বাড়ি তৈরি হবার বেশ কিছুদিন পরে আনেন বড়-মাকে (হিরন্ময়ী দেবী)। গ্রামের চাষাভুষোদের খুব স্নেহ করলেও 'বাবু' তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কখনো আসর জমিয়ে বসতেন না। তাঁদের রোগে শোকে আপদে বিপদে সর্বদা পাশে পাশে থাকলেও, ব্যক্তিগত মেলামেশার ক্ষেত্রে 'বাবু' একটা দূরত্ব রেখে চলতেন। তবে বাড়িতে কেউ এলে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি পেত। অত্যধিক ধূমপান ছাড়া অন্য কোন নেশায় 'বাবু'র আসক্তি গোপাল দেখেনি। আড়াই পোয়া করে তামাক লাগত রোজ; চুরুটও সেই পরিমাণে। লেখবার সময় বা ধূমপানের যখন খুব ইচ্ছে হয়েছে, তখন অবিলম্বে 'সাজা' গড়গড়া না পেলে খাপ্পা হয়ে উঠতেন। একদিন পাশের বাড়িতে গোপাল তাস খেলছে। এদিকে লিখতে লিখতে 'বাবু'র গড়গড়া গেছে নিভে। প্রচণ্ড হাঁক-ডাক শুনে শৈল ঝি এসে সামনে দাঁড়াল। সে বেচারা তামাক সাজতে জানত না। গোপালকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে 'বাবু'কে সেকথা বলতেই তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন। পায়ের চটি এমন জোরে ছুঁড়ে মারলেন যে সেটা বাগানের ধারের পাঁচিলের কাছে গিয়ে পড়ল। গোপাল ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ছুটে এসে তামাক সেজে ফেলেছে। ধূমায়িত কল্কে হাতে নিয়ে যেই তার প্রবেশ, অমনি 'বাবু'র রাগ একেবারে জল। একবার শুধু বললেন—হতভাগা থাকিস্ কোথায়? তারপরেই নল মুখে দিয়ে লেখা শুরু করলেন।

শরৎচন্দ্রের অপর ভৃত্য যামিনী ধাড়া অনেক সময় 'বাবু'র মন রেখে কথা বলত। শরৎচন্দ্রের চিকিৎসাধীন এক গ্রামবাসী কেমন আছে 'বাবু' সেকথা জানতে চাইলে তাঁকে খুশি করবার জন্য খোঁজ না নিয়েই সে বললে—আজ্ঞা বেশ ভালই আছে; জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। কেমন যেন সন্দেহ হল শরৎচন্দ্রের। চিকিৎসাধীন এক গ্রামবাসী ... পাঠালেন। গোপাল গিয়ে দেখে তখন মুমূর্ষু অবস্থা। বাড়ি ফিরে সে খবর

শরৎচন্দ্রের ভৃত্য গোপাল হাজরা

দিতেই মিছে কথা বলবার জন্য যামিনীর উপর একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চটিতে পা গলাচ্ছেন, চাদর রাখছেন কাঁধে। অন্যান্য ডাক্তার-বদ্যি ডাকিয়ে, কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে যখন অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরলেন তখন যামিনীর উপর রাগ পড়ে গেছে। শুধু বললেন— বেঁচে যাবে; তবে তুই ব্যাটা ঠিক খবরটা দিলে আরও আগে চিকিৎসা আরম্ভ করা যেত।

একবার হয়েছে কি 'বাবু'র হঠাৎ পঞ্চাশটা টাকার খুব দরকার পড়ল। 'বড় মা'কে ডেকে বললেন—বড় বউ! (ওই নামেই ডাকতেন) টাকাটা এখুনি না পেলে তো চলে না; আমি সব জায়গায় খুঁজে দেখলুম আমার কাছে কিছুই নেই। 'বড় মা' সংসার খরচ থেকে একটু-একটু করে বাঁচানো এক রাশ রেজগি এনে হাজির করলেন। 'বাবু'র অবস্থা তখন এতই নিরুপায় যে সেই রেজগির স্তূপ থেকে গুনে গুনে, থাক দিয়ে সাজিয়ে পঞ্চাশ টাকা করলেন। তারপরে মনের আনন্দে চুরুটের বাক্স খুলতেই দেখা গেল, কখন তার ভেতরে তিনটে দশ টাকার নোট রেখেছিলেন। হাসাহাসির রোল পড়ে গেল। 'বড় মা' ত্রিশ টাকার খুচরো ফেরত নিয়ে গেলেন।

সাংসারিক খরচপত্রের দিকে কোন দৃষ্টি না দিলেও শরৎচন্দ্র তাঁর একপাল পোষা পশুপাখির জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তাঁর ছিল তিনটে গরু; তারা শুধু থাকত ও খেত, কখনো দুধ দিত না। বড় বড় খাসি ছিল দুটি; তারা প্রত্যেকে আড়াই পো করে ছোলা খেত রোজ। অন্যান্য আহার তো ছিলই। আর ছিল তিনটি দেশী কুকুর, একটি ময়ূর, একটি চন্দনা ও একটি কাকাতুয়া। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে এদের পরিচর্যা করতেন, খাওয়াতেন।

লেখাপড়ার সময়ের ব্যাপারে 'বাবু'র কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। দিনে বা রাতে সব সময়েই লেখাপড়া চলত, তবে রাত বারোটার বেশি বড় একটা জাগতেন না। দিনমানে বাগানের কাজ, পশুপাখির কাজ করেও হাতে অনেক সময় থাকত। বিকেলের দিকে ভগ্নীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বা পরম সুহৃদ হরিদাস শাস্ত্রী ও রায়বাহাদুর হুদের সাকিরার আড্ডায় গিয়ে একটু না বসলেও চলত না। তারপরে বাড়ি এসেই লিখতে বসতেন।

'বড় মা'র কথা গোপালের স্মৃতিতে খুব উজ্জ্বল। সংসারের সব ঝক্কি পুইয়ে তিনি যে 'বাবু'কে একমনে লেখাপড়া করবার সুবিধে করে দিতেন সেকথা গোপালও বোঝে। আর দয়া দাক্ষিণ্যে, স্নেহে অনুকম্পায় যেন ছিলেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী। গোপাল যখন গরুর জাবনা মাখছে তখন কতদিন হয়ত ডেকে বলেছেন—বাবা গোপাল, এই মিষ্টিটুকু খেয়ে যা। গোপাল বলেছে—এখন হাত নোংরা রয়েছে মা, পরে খাব। 'বড় মা' সেকথা শোনেন নি, কাছে এসে, হাঁ করিয়ে মুখে সন্দেশ গুঁজে দিয়ে গিয়েছেন।

একবার নিজের পরিবারে রাগারাগি করে গোপাল বাড়ির অন্নজল ত্যাগ করেছে; দোকান থেকে চিঁড়ে কিনে খায়। এভাবে সাত দিন কেটে গেলে, গোপালের মা বড় মা'কে এসে ধরে পড়ল। 'বাবু'র কানে কথাটা উঠল। তিনি গোপালকে ডেকে বললেন—তুই এমন করছিস কেন, কী চাস তোর? দুষ্টুমি করে গোপাল বললে, চাই আর এমন কি! দু' বেলার খোরাক আর পরণের কাপড় চাই। 'বাবু' তখন তাকে তাঁর বালটানা মাইনের খাতাটা আনতে বললেন; তাতে তার মাইনে ও যাবতীয় পাওনাগণ্ডার হিসেব লেখা থাকত। সেখানে খস খস করে কি যেন সব লিখে 'বাবু' বললেন—যা, তোর খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে দিলাম। গোপালের স্থির বিশ্বাস, তার জন্যে কাঠা উইলজাতীয় একটা কিছু 'বাবু' সে খাতায় লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর গোপাল আর সে খাতাখানা পায়নি।

'বাবু'র শেষ অসুখের সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হল, তখন চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে। একদিন নানারকম ফুল গাছের চারা কিনিয়ে গোপালকে দিয়ে সামতাবেড়-এ পাঠালেন—কোথায় কোনটা পুঁততে হবে বলে দিলেন সবিস্তারে। 'বাবু'র সঙ্গে গোপালের সেই শেষ দেখা। তিনি যে এত শিগগির চলে যাবেন গোপাল তা ভাবতে পারেনি। কয়েক দিন পরে সামতাবেড়ে খবর এল—'বাবু' আর নেই।

দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল গোপালের দু' গাল বেয়ে... অনেকক্ষণ পরে চাদরের খুঁটে চোখ মুছে ধরা ধরা গলায় বললে—বড্ড ভাল লোক ছিলেন বাবু, সাক্ষাৎ দেবতা একেবারে।

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

॥ ৮ ॥

কোথা দিয়ে যে সেদিন কী ঘটে গেল তা সদানন্দ জানতেও পারলো না। কিম্বা হয়ত জানতে চাইলোও না। সব সময় প্রকাশ-মামা পাশে দাঁড়িয়ে। কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলো, কী রে, অমন গোমড়া মুখ করে আছিস কেন? কী হয়েছে তোর? আত্মীয় কত মেয়েছেলে রয়েছে চারদিকে একটু চেয়ে দেখ!

চৌধুরী মশাই ভোরের ট্রেনেই চলে গেলেন। আসবার সময় প্রকাশকে কাছে ডাকলেন। প্রকাশ সারা রাত জেগেছে। বিয়ের লগ্ন থেকে শুরু করে একেবারে বাসর-ঘর পর্যন্ত। নিরঞ্জন পরামাণিকও ছিল সঙ্গে। নিরঞ্জনের ঘুমোলে চলবে না। একেবারে বাসর-ঘরের দরজার সামনেই কাছাকাছি কোথাও থাকতে হবে। যেন সে নজর রাখে একটু। যেন সদানন্দ পাগলামি না করে।

প্রকাশ বলেছিল—আমিও তো আছি জামাইবাবু, আমি রাত্তিরে ঘুমোব না।

তা নিরঞ্জন আর প্রকাশমামা দু'জনের ভরসাতেই চৌধুরী মশাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বেয়াই মশাই বরকর্তা চৌধুরী মশাই-এর জন্যে ব্যবস্থা বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি রাখেন নি। পাকা বন্দোবস্ত একেবারে। নিজে আলাদা বসিয়ে তাঁকে খাইয়েছেন। চৌধুরী মশাই যে নিজে আসবেন এটা কালীকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে কল্পনার বাইরে। অত বড় রাশভারি মানুষটাকে নেহাৎ বেকায়দায় পড়েই ছেলের বরকর্তা হয়ে এত দূরে আসতে হয়েছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগেও জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আমি শুতে যাই প্রকাশ?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি শুতে যান জামাইবাবু। আপনি কী-করতে জেগে থাকবেন? আমি তো আছি, আমি আছি নিরঞ্জন আছে—

তবু যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না চৌধুরী মশাই। বললেন—দেখো প্রকাশ, যেন আবার কেলেঙ্কারী না হয়।

প্রকাশ বললে—কেলেঙ্কারী? আমি থাকতে কী কেলেঙ্কারী হবে?

চৌধুরী মশাই বললেন—মানে আবার যদি খোকা পালিয়ে যায় সেই কথাই বলছি—

—আর পালাবে না।

চৌধুরী মশাই বললেন—কীসে বুঝলে?

প্রকাশ একটু ইঙ্গিত-পূর্ণ হাসি হাসলো। বললে—বুঝি জামাইবাবু, আমি বুঝি—

—খুলে বলো না কীসে বুঝলে?

প্রকাশ বললে—সদার বউ পছন্দ হয়েছে—

—তাই নাকি? খোকা তোমায় বললে?

প্রকাশ বিশেষজ্ঞের মত ভঙ্গি করে বলে উঠলো—ও কি আর মুখে বলবার জিনিস জামাইবাবু? ও বুঝে নিতে হয়।

চৌধুরী মশাই বললেন—তাহলে তো আর কোনও ভাবনাই নেই—

প্রকাশ বললে—না, কোনও ভাবনা নেই, আপনি নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে যান।

এর পরে চৌধুরী মশাই-এর আর কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। তারপর সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যাবার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যাবার আগে আবার ডেকে পাঠালেন প্রকাশকে। শুধু প্রকাশ নয়, তার সঙ্গে নিরঞ্জন পরামাণিকও এলো।

তাদের জন্যেই চৌধুরী মশাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন—কী খবর প্রকাশ?

প্রকাশ বললে—যা বলেছিলুম তাই—

—তার মানে?

প্রকাশ বললে—তার মানে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, জিজ্ঞেস করুন এই নিরঞ্জনকে—একে বাসর-ঘরের কাছেই একটা বারান্দায় শুতে বলেছিলুম। ও শুয়ে শুয়ে সব শুনেছে—

চৌধুরী মশাই নিরঞ্জনের দিকে চাইলেন।

নিরঞ্জন বললে—হ্যাঁ বড়বাবু, শালাবাবু

যা বলছেন ঠিক বলছেন। খোকাবাবু কাল বাসর-ঘরে কথা বলেছেন।

—কী কথা ?

—আজ্ঞে বাসর-ঘরে কাল রাত্তিরে মেয়েরা গান গাইছিলেন তো, আমি বারান্দা থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলাম। গানের পর মেয়েরা বরকে জিজ্ঞেস করলেন—গান কেমন লাগলো।

—তা খোকা কী উত্তর দিলে ?

—খোকাবাবু মনে হলো খুব খুশী। খোকাবাবুর গলা শুনতে পেলুম। খোকাবাবু বললেন—খুব ভালো।

যাক, সুখবরটা শুনে চৌধুরী মশাই খুশী হলেন। তাহলে আর ভয় নেই।

প্রকাশ বললে—আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম জামাইবাবু, ও কনের মুখ দেখলে সদার সব পাগলামি বাপ্ বাপ্ বলে পালিয়ে যাবে। অমন ডানা কাটা পরী দেখলে মুনি-ঋষিদের ধ্যান পর্যন্ত ভেঙে যায় তো আমাদের সদা তো কোন্ ছার—

ততক্ষণে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী মশাই আর থাকতে পারলেন না। ট্রেনে ওঠবার আগে প্রকাশ চৌধুরী মশাই-এর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললে—একটা কথা ছিল জামাইবাবু—

—কী ?

—কিছু টাকার দরকার ছিল। আজ তো আবার বর-কনেকে নিয়ে যেতে হবে। অনেক খরচ হবে। মেয়েদের শয্যা-তুলুনি আছে, ওদের পরামাণিককে কিছু টাকা দিতে হবে। তারপর...

চৌধুরী মশাই বললেন—কিন্তু তোমার হাতে যে কাল তিনশো টাকা দিলুম—

—আজ্ঞে তিনশো টাকায় কী হবে ? সে টাকা তো আছে। তবু হাতে একটু বেশি টাকা থাকলে বুকে বল-ভরসা হয়—

চৌধুরী মশাই জামার ভেতরের পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বার করলেন। করে এক এক করে গুনতে লাগলেন। বার বার গুনে বললেন—এই নাও—

প্রকাশ টাকাটা নিয়ে বললে—কত ?

—আরো একশো দিলাম।

—একশো মোটে ? একশো তে কী হবে ?

চৌধুরী মশাই বললেন—তা এত টাকা তোমার কীসে লাগবে ? রজব আলী তো ইস্টিশানে এসে হাজির থাকবে, তারপর পালকী-ভাড়া বর-কনে বাড়ি পৌঁছুলে দিয়ে দেব—

তা তাই-ই সই। নোট ক'খানা গুনে প্রকাশ সেগুলো পকেটে পুরে ফেললে। টাকা নিয়ে বেশি ছেঁড়াছিঁড়ি করতে নেই তা প্রকাশ জানে। তাতে কাজ হাঁসিল হয় না।

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিলে।

এসব কবেকার ঘটনা। আজ এতদিন পরে অতীতের সমস্ত পথগুলো পরিক্রমা করতে গিয়ে সেদিনকার সব কিছু খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগলো সদানন্দ চৌধুরীর। সেদিনকার সেই ছেলেটাকে যেন চেষ্টা করলে এখনও চেনা যায়। চেনা যায় তার ছোটখাটো কথা আর মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ঘটনাগুলো। অথচ কেউই তাকে চিনতে পারেনি। তার দাদু, তার বাবা, মা, প্রকাশ মামা, সবাই তাকে তাদের প্রচলিত নিয়মের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা পৃথিবী থেকে নির্বাসন দিয়েছিল। নির্বাসন দিয়ে তার মাথার ওপর শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত দায় থেকে নিজেদের বিবেককে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। তারা ভেবেছিল তাদের ছাঁচে সদানন্দকে ঢালাই করে শুধু বংশ বৃদ্ধির প্রয়োজনে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে। সদানন্দ তাদের প্রতিনিধি হয়ে দিনের পর দিন সেই একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি করে যাবে, যে-নিয়মের পুনরাবৃত্তি করে এসেছেন সমস্ত মানুষ জাতের পূর্বপুরুষ। সদানন্দ সেই দিন থেকেই ভেবেছিল এতদিনকার সেই নিয়ম সে ভাঙবে। সে ভেবেছিল সে বলবে আমি তোমাদের কেউ নই। তোমাদের পাপের ভাগীদার যেমন আমি নই, তেমনি তোমাদের পুণ্যের ভাগীদারও নই আমি। তোমাদের সমস্ত পাপ-পুণ্যের দুষ্কৃতি-সুকৃতি নিয়ে তোমরা সুখে থাকো, শুধু আমাকে মুক্তি দাও তোমরা। আমি যেমন তোমাদের সাহায্য চাই না তেমনি চাই না তোমাদের উত্তরাধিকারের অধিকারও।

অথচ সমস্ত অপরাধ থেকে দায়মুক্ত হয়েও আজ সে একজন আসামী। ভাগ্যের বোধ হয় এও এক বিচিত্র পরিহাস।

*

ভদ্রলোক পাশে পাশে আসছিল।

ভদ্রলোক সারাজীবন আসামী আর ফরিয়াদী নিয়ে জীবন কাটিয়েছে। অনেক আসামী দেখেছে আবার অনেক ফরিয়াদীও দেখেছে। কিন্তু এমন আসামী আর দেখেনি।

বললে—একটু পা চালিয়ে চলুন—পা চালিয়ে চলুন—

সদানন্দবাবু হাসলেন। যেন পা-চালিয়ে চললেই বেশি এগিয়ে যাওয়া যায়? তার দাদু, তার বাবা, তার মা তার প্রকাশমামা তার দাদামশাই, সবাই তো সংসারে একটু পা-চালিয়েই চলতে চেয়েছিল। তারা সবাই-ই ভেবেছিল পা-চালিয়ে চললেই বুঝি তারা আরো একটু এগিয়ে যেতে পারবে। ভেবেছিল আরো টাকা, আরো ক্ষমতা, আরো আয়ু পাবে আর একটু পা-চালিয়ে চললেই। তারা পা-চালিয়েই চলতে চেয়েছিল, কিন্তু থেমে থেমে এগিয়ে যাওয়ার প্রজ্ঞা তাদের আসেনি। তারা জানতো না যে যারা থেমে থাকে তারাই চলা-লোকদের হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়।

আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল তাদের। তাদের সকলের।

সদানন্দর মনে আছে রসিক পালের বাড়িতে যেমন আজকে কাছারির পেয়াদা এসে হাজির হয়েছে সমন নিয়ে, ঠিক তেমনই একদিন ওই প্রকাশমামা তার কাছে এসে হঠাৎ হাজির হয়েছিল। সদানন্দ তখনও এখনকার মত নিঃস্ব, নিঃসহায়। কলকাতার এক ধর্মশালায় তখন অন্নদাস হয়ে জীবন কাটছে তার।

প্রকাশমামা তাকে দেখে অবাক। বললে—আমি তো তোকে খুঁজতেই বেরিয়েছি রে। তুই এখানে রয়েছিস?

সদানন্দ বললে—কেন? আমার সঙ্গে আবার তোমার কী দরকার?

প্রকাশমামা বললে—তোর জন্যে কোথায় কোথায় গিয়েছি জানিস? ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে গিয়েছি নৈহাটিতে—

নৈহাটিতে?

—হ্যাঁ, তোর বউ-এর কাছে। ভাবলুম সেখানে যদি তোর কিছু খবর পাই। কিন্তু নয়নতারা আমার মুখই দেখতে চাইলে না। এত গরম তার, জানিস। অথচ আমিই একদিন নিজে পছন্দ করে ওই মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম। কপাল রে সদা, কপাল। তোর বিয়ের রাতে বাসরঘরে মেয়েদের গান-বাজনা শুনে ভেবেছিলুম মেয়েটা ভালো। আমি আর নিরঞ্জন পরামাণিক বাসরঘরের পাশের বারান্দায় আড়ি পেতে সব শুনে-ছিলুম। আশ্চর্য, সেই নয়নতারাকে আমিই বিয়ে দিয়ে দিদির বাড়িতে বউ করে নিয়ে এসেছিলুম....

সদানন্দ বিরক্ত হয়ে উঠলো প্রকাশমামার ওপর। বললে—ও-সব কথা থাক, তুমি আমার খোঁজ করছো কেন তাই বলো—

প্রকাশমামা বললে—কেন, তোর এত

ছাড়া কিসের? আমি তো তোর ভালোর জন্যেই এসেছি, আমার নিজের তো কিছুই না—

সদানন্দ বললে—আমার তুমি অনেক ভালো করেছ মামা, আর আমার ভালোর দরকার নেই। তুমি আমার ভালোর জন্যেই আমার বিয়ে দিয়েছিলে, আমার ভালোর জন্যেই তোমরা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তোমরা আমার ভালোর জন্যেই কপিল পায়রাপাড়াকে ভিটে-মাটি ছাড়া করেছিলে, আমার ভালোর জন্যেই তোমরা কালিগঞ্জের বউ-এর সর্বনাশ করেছিলে আবার আমার ভালোর জন্যেই তোমরা সেই বংশী ঢালীকে দিয়ে তাকে খুনও করিয়েছিলে। দয়া করে তোমরা আর ভালো করতে চেয়ো না মামা। আমার যথেষ্ট ভালো করেছ, আর ভালো করতে হবে না—

কথাগুলো প্রকাশমামার ভালো লাগলো না। বললে—তুই তো বেশ কথা বলতে শিখেছিস, অথচ জামাইবাবু বলতো—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন তো বেশ সেয়ানা মানুষের মত কথা বলছিস তুই।

সদানন্দর বেশী কথা বলতে সেদিন ভালো লাগেনি।

বললে—তুমি কী করতে আমার কাছে এসেছ তাই আগে বলো—

প্রকাশমামা হঠাৎ বলে উঠলো—তোর বাবা মারা গেছে—

খবরটা শুনে সদানন্দর চমকে যাওয়া উচিত ছিল। অন্তত কিছুটা হতবাক হওয়া। কিন্তু সেদিন কিছুই হয়নি তার। সে শুধু প্রকাশমামার মুখের দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল। আর যেন কিছু করবার ছিল না তখন তার।

প্রকাশমামা বললে—আমি এখন নবাবগঞ্জ থেকে আসছি। সেখানেও তোকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। শেষকালে এলুম কলকাতায়। ভাবলুম এখানে তোকে কোথাও পাবো। তা এখেনেও অনেক জায়গায় খুঁজেছি। শেষে ভাগ্যি ভালো তাই হঠাৎ পেয়ে গেলুম। তা এখন চলু আমার সঙ্গে—

—কোথায়?

—ভাগলপুরে। তোর মামার বাড়িতে।

—সেখানে গিয়ে কী হবে? আমার কেউ নেই, আমি কোথাও যাবো না।

প্রকাশমামা বললে—কেউ না-ই বা থাকলো, কিন্তু তোর বাবার সম্পত্তি তো আছে। অত লাখ টাকার সম্পত্তি তুই ছেড়ে দিবি! সে-সম্পত্তি তো সবই তোর, তুই তো বাবার একমাত্র ছেলে, একমাত্র ওয়ারিশন—

—কিন্তু টাকা নিয়ে কী করবো? আমার টাকার দরকার নেই—

কিন্তু সদানন্দ ছাড়তে চাইলেও প্রকাশমামা ছাড়বার লোক নয়। বললে—তুই টাকা না নিলে কে নেবে সে টাকা? এত টাকার সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে তুই ধর্মশালায় বসে বসে ভ্যারেন্ডা ভাজবি? আর টাকা যদি তুই না নিস তো আর কাউকে দানপত্র করে দে! আমি গরীব লোক, তোর টাকার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো টাকার দরকার আছে, আমি তো আর তোর মত সন্নিসী হয়ে যাইনি! তোর না হয় মাগ ছেলে কেউ নেই, কিন্তু আমার তো আছে!

এতক্ষণে সদানন্দ বুঝলো কিসের তাগিদে প্রকাশমামা তার খোঁজে সেই ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে নৈহাটি গেছে। নৈহাটি থেকে গেছে নবাবগঞ্জে। তারপরে নবাবগঞ্জ থেকে তার খোঁজে কলকাতার ধর্মশালায় ধর্মশালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কলকাতা কি ছোট জায়গা! কলকাতার মত জায়গায় কি কাউকে খুঁজে বার করা সহজ? যতদিন মা বেঁচে ছিল ততদিন প্রকাশমামার টাকার অভাব হয়নি। দিদির কাছে হাত পেতেছে আর টাকা নিয়ে পকেটে পুরেছে আর রাণাঘাটের রাধার বাড়িতে গিয়ে ফুর্তি করেছে। সারা জীবনটাই ফুর্তি করে বেড়িয়েছে প্রকাশমামা! এখন যখন তার জামাইবাবু মারা গেছে এখন এসেছে ভাগ্নের খোঁজে। এখন ভাগ্নের জন্যে দরদ উথলে উঠেছে। অথচ যখন নবাবগঞ্জের বারোয়ারিতলায় সে সকালের উম্মেদার হয়ে বাস করেছে ততদিন ওই প্রকাশমামা একবার খবর নেবার কথা স্বীকার করতেও রাজী হয়নি। ততদিন একবার জানবার চেষ্টাও করেনি তার ভাগ্নের পেট কী রকম করে চলছে। কিম্বা কে তাকে খেতে দিচ্ছে। অথচ তখন তার চরম দুরবস্থার দিন। মা ততদিনে মারা গেছে, দাদু মারা গেছে। সমস্ত বাড়িটা তখন যেন শ্মশান হয়ে গেছে। অত বড় যে বাড়িটা, সে বাড়িটার ভেতরে একদিন কত আত্মীয়-অনাত্মীয় লোকের আনাগোনা চলতো সেটা তখন বলতে গেলে ভূতের বাড়িতে পরিণত হয়েছে। একা চৌধুরী মশাই অত বড় বাড়িতে শ্মশান জাগিয়ে বেঁচে আছে মরে

ওই নোংগঞ্জের বারোয়ারিতলায় ধুলোর মধ্যে সদানন্দ এসে আশ্রয় তৈরী করে নিয়েছে।

তখন সবাই ঠাট্টা করতো তাকে। জিজ্ঞেস করতো—কী রে সদা, তোর বউ পালিয়ে গেল কেন? তোকে বুঝি মনে ধরেনি?

আবার কেউ-কেউ বলতো—আরে সদার বউ পালাবে না তো কী? বেশ করেছে পালিয়েছে! বউ পুষতে গেলে হিম্মৎ চাই, সদার সে হিম্মৎই আছে নাকি যে বউ ঘরে থাকবে—

এ-রকম কত কথা শুনতে হতো তাকে। সে সব দিন যে তার কেমন গেছে সে কেবল সে-ই জানে। সেই জন্যেই তো অনেকদিন আগে সে ভেবেছিল যে সে তার জীবন কাহিনীটা লিখে যাবে। লিখে যাবে যে, সে পাগল নয়। পাগল তোমরা। যে পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে সেখানে কেবল কপিল পায়রাপোড়াদের গেলে পাড়ু দিতে সাহায্য করে, যে-দেশ কেবল কালীগঞ্জের বউদের বঞ্চনা করে নিজের পাঁজিপাটা বাড়ায় সেই মানুষ পাগল না হয়ে পাগল হয় কিনা সদানন্দ!

সদানন্দ বলেছিল—তা হলে চলো—

প্রকাশমামা সেদিন আদর করে সদানন্দকে ভাগলপুরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কি প্রকাশমামা জানতো যে তার জামাইবাবুর সমস্ত সম্পত্তি নয়নতারার ভোগে লাগবে।

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক্। সে-সব অনেক পরের কথা। তখন নয়নতারারও অনেক বয়েস হয়েছে। নয়নতারারও তখন নতুন করে সংসার হয়েছে। সে-সব কথা বলবার সময় পরে অনেক পাবো। এখন আজকের কথা বলি। এই নয়নতারার বিয়ের কথা।

এই নয়নতারার বিয়ের দিনে সে-সব বিপর্যয়ের কথা ভাবতে নেই। সে-সব অকল্যাণের কথা এই শুভদিনে বুঝি ভাবতে নেই। আজ শুধু আনন্দ করো তোমরা সবাই। আজ শাঁখ বাজাও, আজ উলু দাও, আজ বলো—যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব...

আজ কালীকান্ত ভট্টাচার্যের একমাত্র সন্তানের বিয়ে। যে-নয়নতারার রূপ দেখে লোকের চোখে পাতা পড়তে চাইতো না, যে-মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে পণ্ডিত-মশাই আর তার গৃহিণীর রাত্রে ঘুম হতো না, সেই নয়নতারারই আজ বিয়ে। সেই বিয়েতে তোমরা আজ এসো, এসে নয়নতারাকে আশীর্বাদ করো। বলো—তুমি জন্ম-জন্ম স্বামীসোহাগিনী হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে অক্ষয় পুণ্য অর্জন করো মা। আশীর্বাদ করো—আমার নয়নতারা যেন সুখী হয়, আমার নয়নতারা যেন স্বামী-সোহাগিনী হয়। আশীর্বাদ করো—আমার নয়নতারা যেন সিঁথির সিঁদুর নিয়ে জন্ম-জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে কাটায়—

তখন বেলা বেড়েছে।

প্রকাশমামা বেয়াই-মশাইকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। বললে—কোথায় বেয়াই মশাই কোথায়?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য কদিন থেকেই ব্যতিব্যস্ত। তাঁর বিশ্রাম নেই, তাঁর দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। কোন্ দিক দেখবেন ঠিক করতে পারছেন না। প্রকাশমামার কাছে আসতেই প্রকাশমামা একেবারে ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন—কী বেয়াইমশাই, এখন জামাই পেয়ে যে আমাকে একেবারে চিনতেই পারছেন না দেখছি—আমি খেলুম কি খেলুম না, কিছুই দেখছেন না আর—

—না না, সে কী কথা বেয়াইমশাই, আপনিই তো সব। আপনি না থাকলে কি এ বিয়ে হতো?

প্রকাশমামা বললে—তা কেমন জামাই হলো বলুন? পছন্দ হয়েছে তো?

—আপনিই বলুন আপনার বৌমা কেমন হলো?

—আপনি বেয়াইমশাই কেবল আপনার নিজের মেয়ের গুণই গেলেন। কেন, আমাদের ছেলে কি ফ্যালনা?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—না না, তা কেন বলবো। আমার নয়নতারার অনেক পুণ্যফল ছিল তাই অমন স্বামী পেয়েছে। আমাদের কেষ্টনগরের সবাই একবাক্যে বরের প্রশংসা করে গেছেন।

প্রকাশমামা বললে—তা হলে যাত্রার সময়টা কখন?

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—পুরুত-মশাই তো পাঁজি দেখে সময় ধার্য করে দিয়েছেন।

—দেখবেন যেন বেশী দেরি না হয়, ওদিকে আবার রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদল করতে হবে। সে ট্রেন মিস্ করলেই মুশকিল—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য বললেন—না সে দিকে কোনও গোলযোগ হবে না। আমি আমার লোক দিয়ে ট্রেন ধরিয়ে দেব—

তারপর হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেল। বললেন—আপনি সিগারেট-টিগারেট ঠিক পাচ্ছেন তো?

—কোথায় আর পাচ্ছি? আপনি জামাই পেয়ে গেছেন, এখন আর আমাকে কে দেখবে, আমি তো এখন পর হয়ে গেছি—

কালীকান্ত ভট্টাচার্য মশাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ওরে, কে আছিস? ও নিতাই, ও কেষ্টধন, কে যে ওদিকে? বেয়াইমশাইকে সিগারেট দেয়নি কেউ? যেদিকে আমি দেখবো না সেই দিকেই গাফিলতি, ওরে কেষ্টধন......

বলতে বলতে ভেতর-বাড়ির দিকে সিগারেটের সন্ধানে চলে গেলেন।

নিরঞ্জন এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এতক্ষণে কাছে এল। বললে—শালাবাবু, এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে—

—কান্ড? কীসের কী কান্ড?

নিরঞ্জন বললে—তেমন কিছু কান্ড নয়। ছোটবাবু এয়োদের সব বলে দিয়েছে—

—কী বলে দিয়েছে সদা?

—বলে দিয়েছে যে, পরশু ছোটবাবু কালিগঞ্জের বউ-এর কাছে গিয়েছিল সেই জন্যে গায়ে হলুদের সময় বাড়ি ছিল না।

প্রকাশমামা অবাক হয়ে গেল সদার বোকামি দেখে। বললে—সে কী রে? বলে দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তুই জানলি কী করে?

—আমাকে ওদের নাপিত বিপিন জিজ্ঞেস করছিল। ছোটবাবুকে নাকি বাসর-ঘরে মেয়েরা জিজ্ঞেস করেছিল—গায়ে-হলুদের সময় তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তা ছোটবাবু নাকি বলেছে—কালিগঞ্জের বউ-এর কাছে। তাই মেয়ে-মহলে কানাঘুষো হয়েছে। তাই বিপিন জানতে চাইছিল আমার কাছে কালিগঞ্জের বউ কে? কালিগঞ্জের বউ-এর বয়েস কত, এই সব......

—তা তুই কী বললি?

নিরঞ্জন বললে—আমি আর কী বলবো। আমি শুধু বললুম সে এক বাড়ি থুত্থুড়ে মেয়েমানুষ।

—তা জিজ্ঞেস করলে না বর কেন গিয়েছিল সেখানে?

—না, তা জিজ্ঞেস করেনি। আর জিজ্ঞেস করলেও তো আমি কিছু বলতে পারতুম না। আমি বলতুম বর কালিগঞ্জের বউ-এর কাছে কেন গিয়েছিল তা আমি নাপিত মানুষ কী করে জানবো?

প্রকাশমামা কথাটা শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। নিরঞ্জনকে সেখানে ছেড়ে ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটলো। ভেতরে তখন অনেক মেয়ে-পুরুষের ভিড়। প্রকাশমামা সেই দিকে যেতেই মেয়েরা মাথায় ঘোমটা টেনে দিলে।

কে একজন দৌড়ে এসে প্রকাশমামার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিলে। বললে—নিন সিগারেট নিন—

সিগারেটটা নিয়ে প্রকাশমামা বললে—সিগারেট নিচ্ছি, কিন্তু বর কোথায় গো তোমাদের? একবার ডেকে দাও তো আমার কাছে—কী করছে এখন বর?

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে রাস্তা হয়ে গেল বেয়াইমশাইয়ের জন্যে। বরকর্তা বরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একটু জায়গা ছাড়ো গো, রাস্তা দাও। ও রাঙাদিদি, একটু নড়ে বোস, একটু গতর ওঠাও। বরকর্তা বরের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে—

চারদিকে বাসি লুচি আর তরকারির গন্ধ। ছোট বাড়িতে লোক বেশি হলে যা হয় সেই অবস্থা। শেষকালে বরের ঘরে যেতেই দেখলে সদানন্দ একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। সারা রাত ঘুম না হলে যেমন হয় সেই রকম চেহারা। উস্কো-খুস্কো চুল। ম্রিয়মাণ হয়ে বসে ছিল সে, আর সামনে অনেকগুলো মহিলা।

—সদা!

প্রকাশমামার গলা শুনে যেন অকূলে কূল পেলে সদানন্দ। মুখ তুলে চাইলে। বললে—কী?

প্রকাশমামা বললে—একবার আমার সঙ্গে এদিকে আয় তো—

সদানন্দ সমস্ত রাত একটুকু ঘুমোয়নি। সমস্ত রাতই মেয়েরা বিরক্ত করেছে, কথা বলেছে। গান গাইবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে। এক-একবার তার মনে হয়েছে এখান থেকে উঠে সে অন্য কোথাও চলে যায়। কিন্তু কেমন করে যাবে! এবার এত-গুলো অচেনা লোকের মধ্যে কাটিয়ে খুব আড়ষ্ট হয়ে ছিল। এবার প্রকাশমামাকে দেখে যেন একটু সহজ হলো।

প্রকাশমামা আগে আগে চলতে লাগলো। সদানন্দও তার পেছন-পেছন।

প্রকাশমামা চলতে চলতে পেছন না ফিরেই জিজ্ঞেস করলে—রাত্তিরে তোর ঘুম হয়েছিল রে?

সদানন্দ বললে—না

—ঘুম হয়নি ভালোই হয়েছে। আমার বিয়ের সময় আমারও বাসর-ঘরে ঘুম হয়নি। ওর জন্যে ভাবিসনি। কেমন বউ দেখলি? পছন্দ হয়েছে তো?

বাসর-ঘরের মধ্যে একজন কে বলে উঠলো—ও লো, ও লোকটা বরের কে লো?

কনের এক মাসী বললে—ওই তো হলো আসল কর্তা গো, বরকর্তা, বরের মামা। ওই মামাই তো এই বিয়ের সম্বন্ধটা করেছে—

প্রকাশমামা সদানন্দকে নিয়ে তখন বার-বাড়ির একটা ঘরের একান্তে এসে দাঁড়ালো। আশে-পাশে কেউ নেই দেখে প্রকাশমামা বললে—আয় বোস, এখানটা একটু নিরি-বিলি মতন আছে—

*

কালিগঞ্জের জমিদার গৌরীনাথ চক্রবর্তী প্রায়ই গৃহিণীকে বলতেন—তোমার ভাবনা কী, দুই ছেলে রইলো, তারাই তোমাকে দেখবে—

চক্রবর্তী মশাই-এর একবার শরীর ভেঙে গিয়েছিল। প্রায় যায়-যায় অবস্থা। তখন গৃহিণী বড় মুষড়ে পড়ে-ছিলেন। তখন থেকেই কেমন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জমিদারীই থাক আর টাকা-কড়িই থাক মানুষের জীবন এই আছে এই নেই। বুঝতে পেরেছিলেন এই এত শক্ত-সমর্থ মানুষটা এ ক'দিনের অসুখেই যদি এমন কাতর হয়ে পড়লেন তা হলে আসল হচ্ছে স্বাস্থ্য, আসল হচ্ছে পরমায়ু। আর সবচেয়ে আসল সত্য হচ্ছে ভগবান। তাই তখন থেকেই চক্রবর্তী-গৃহিণী পুজো-পাঠ নিয়ে মেতে উঠলেন।

অসুখ মানুষের হয় বটে, কিন্তু আবার সেরেও ওঠে একদিন। সেই মানুষ গৃহিণীর কাতরতা দেখে অভয় দিতেন। বলতেন—তোমার ভাবনা কী, আমি না-ই বা থাকলুম, তোমার দুই ছেলে তো রইল, ওরাই তোমাকে দেখবে—

গৃহিণী বলতেন—ওরা আর কত বড়, ওরা কী-ই বা বোঝে—

চক্রবর্তী মশাই বলতেন—যতদিন ওরা বড় না হয় ততদিন নারায়ণ আছে, আমার নায়েবমশাই আছে—

চক্রবর্তী মশাই নরনারায়ণকে নারায়ণ বলে ডাকতেন।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন, আর আশ্চর্য মানুষের বিশ্বাস। মানুষের জীবনেরও যেমন স্থিরতা নেই, মানুষের বিশ্বাসেরও তেমনি কি কোনও স্থিরতা থাকতে নেই! সত্যিই কত না বিশ্বাস করতেন তিনি নায়েব মশাইকে। আর নিজের নায়েবকেই যদি বিশ্বাস না করতে পারবো তো কাজ-কর্মই বা চলবে কেমন করে?

আর নরনারায়ণও ছিলেন তেমনি বিশ্বস্ত নায়েব। হিসেবের একটা পয়সা যেন তার এদিক ওদিক হতে নেই। নিজের ছেলেকেও বোধ হয় অমন করে বিশ্বাস করা যায় না যতখানি বিশ্বাস করা যেত নর-নারায়ণ চৌধুরীকে। সেই পনেরো টাকা মাইনের কর্মচারী সেদিন যে শুধু বিশ্বাসী ছিলেন তাই-ই নয়, পিতার মতন ভক্তি-শ্রদ্ধাও করতেন চক্রবর্তী মশাইকে।

যখন সেই চক্রবর্তী মশাই একদিন হঠাৎ মারা গেলেন তখন তাঁর গৃহিণীর মাথায় আকাশ থেকে একেবারে বাজ ভেঙে পড়লো। দুটি মাত্র নাবালক ছেলে তখন তাঁর। কিন্তু তারা জমি-জমার কাজ-কর্ম কিছুই বোঝে না। ওই নরনারায়ণই তখন একমাত্র ভরসা। ওই নরনারায়ণই তখন গৃহিণীর কাছে এসে সান্ত্বনা দিয়েছিল। বলেছিল—আপনি কাঁদবেন না মা, আমি তো আছি, আপনার ভাবনা কী! আমি আপনার ছেলের মতন—

তাই সেদিন রাত্রে যখন সেই নায়েব-মশাইয়ের নাতিই তাঁর কাছে এসে হাজির হলো তখন তাঁর মনে পড়তে লাগলো সেই দিনকার কথাগুলো। সেই কথাগুলো যেন তখনও তাঁর কানে বাজছে—আপনি কাঁদবেন না মা, আমি তো আছি, আপনার ভাবনা কী, আমি আপনার ছেলের মতন—

(ক্রমশ)

মারিজুয়ানা, আপনার সন্তান এবং আপনি

মারিজুয়ানা বিদেশী নাম। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এর পরিচয় ক্যানাবিস স্যাটিভা। বাংলায় গাঁজা। এর শুকনো পাতা এবং মুকুল, বিড়ি সিগারেটের মত পাকিয়ে অথবা পাইপ বা কল্কেয় পুরে তামাকের মত ধূমপানের প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। যদিও অভ্যাসটি নিন্দজনক। এই বস্তুটি চারের দশকে পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে, বিশেষ করে আটলান্টিকের ওপারে তথাকথিত স্বর্গরাজ্যের তরুণ সমাজে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ওদের বক্তব্য অদ্ভুত এই নেশা স্থূলবস্তু জগৎ থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে অনৈসর্গিক এবং অনির্বচনীয় এক স্বপ্নজগৎ-এর আস্বাদ যোগায়। ক্রমে একে একে চলা শুরু হল হেরোইন, বার্বাচ্যুরেটস, এল এস ডি প্রভৃতির মত আরও বেশি শক্তিসম্পন্ন উত্তেজক বস্তু সামগ্রীর। ইউরোপের কিছু কিছু শহর এবং মার্কিন দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের একটি ব্যাপক অংশ ষাটদশকের শেষে এই সমস্ত নেশায় বুঁদ হয়ে ভেঙে পড়ার মত হল। এবং দুর্ভাগ্য, তার ঢেউ আমাদের তরুণ সমাজের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। বিশেষ করে সেই সমস্ত তরুণ, যারা পশ্চিমী আধুনিকতার আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত। সংবাদঃ রাজধানী দিল্লি মারিজুয়ানার এখন তীর্থভূমি।

আজ্ঞে না, মারিজুয়ানায় যারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে একটু লক্ষ করলে আপনার চোখেও তারা ধরা পড়ে যাবে। ঠোঁটের কোণে ভাব লেশহীন হাসি, সারা মুখে বিহ্বলতার ছাপ, চোখ দুটি চিকচিক করছে, সময় এবং পরিস্থিতি বা পরিবেশ সম্পর্কে সূক্ষ্মতর বিচারবোধ বা ভাবনা যথেষ্ট কম, নিয়মিত

আপনার পুত্র-কন্যা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করছে কী না একটু লক্ষ রাখলেই আপনি ধরতে পারবেন। এর জন্যে এই সংকেতগুলির প্রতি শুধু একটু নজর রাখুন ঃ

১ হঠাৎ ব্যক্তিগত চালচলনে পরিবর্তন। যেমন হঠাৎ খেলাধুলো বা অনুরূপ কোন কাজকর্মে অনাসক্তি, স্কুল-কলেজ পালান, লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগের অভাব।

২ মেয়েদের প্রতি ছেলেদের অথবা ছেলেদের প্রতি মেয়েদের কৌতূহলের অভাব।

৩ অতিরিক্ত খেয়ালী।

৪ মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে দূরে অনির্দিষ্ট কোন কিছুর দিকে চেয়ে থাকা। সাধারণত হেরোইন অথবা বারবাচুরেটস-এ অভ্যাস ঘটলে এমনটি হতে পারে।

৫ হঠাৎ নিজের পোশাক-আশাক বা চেহারা সম্পর্কে অনীহা। বারবাচুরেটস এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে।

৬ ঝিমুনি স্বভাব এবং মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্নতা।

৭ অতিরিক্ত হাস্যপ্রবণতা। কখনও কখনও হাসির কোন কারণ না ঘটলেও হাসিতে ভেঙে পড়া। অর্থহীন বাক্যালাপ, অদ্ভুত কাজকর্ম, ইত্যাদি। কখন, কোথায় এবং কেন কী ধরনের আচরণ করা উচিৎ সে সম্পর্কে উদাসীন। এসব দেখে বলা যেতে পারে, সে একটু বেশি মাত্রায় মেরিজুয়ানায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

৮ চালচলন এবং চেহারার মধ্যে মাতলামী ভাব, অথচ পাশ দিয়ে হাঁটার সময় মদের গন্ধ নেই। বুঝতে হবে সে মেরিজুয়ানা অথবা বারবাচুরেটস খেয়েছে। যদি মেরিজুয়ানা ধূমপান করে থাকে তাহলে তাকে অতিমাত্রায় হাসিখুশি বলে মনে হবে। অতিরিক্ত মাত্রায় বারবাচ্যুরেটস খেলে তাকে মনে হবে সে অদ্ভুত একটা জড়বুদ্ধি স্বভাবের

মানুষ, অতিরিক্ত নিশ্চল, চালচলন অস্বাভাবিক মন্থর। সদ্য মেরিজুয়ানা খেয়ে পাশ দিয়ে হাঁটলে তার নিশ্বাসে সুকনো পোড়া ঘেষো গন্ধ পাবেন।

৯ চেহারার মধ্যে ভড়বড়ে ভাব। এর মূল কারণ বারবাচুরেটস, অ্যামফিটামিনস এবং সম্ভবত মেরিজুয়ানা।

১০ সব সময় নতুন নতুন সংগীর সংগে ঘোরা। মাঝে মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে সমাবেশ বিশেষ করে যেখানে প্রচুর পরিমাণে মেরিজুয়ানা পোড়ান হয়। বেশির ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকা এবং প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যাবার মত উত্তর দেওয়া।

১১ কথাবার্তায় অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার, যার বেশির ভাগই গোপনচারীদের মুখে শোনা যায়। এ থেকে পরিষ্কার ধরে নেয়া চলে যে অসামাজিক ব্যক্তিদের সংগে ওঠা-বসা করছে।

১২ বন্ধুবান্ধবদের সংগে বেশির ভাগ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ে কথাবার্তা চালান এবং ঐ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ বা বইপত্রে অস্বাভাবিক অনুরাগ।

১৩ খাওয়ার ব্যাপারে অহেতুক অনিচ্ছা, দৈহিক ওজন হ্রাস।

১৪ অথবা সব সময় খাই খাই স্বভাব। অনেক সময় চুরি করে খাওয়া। সাধারণত মেরিজুয়ানা সেবনকারীদের মধ্যেই এটা বেশি দেখা যায়।

১৫ চোখের তারা অহেতুক বড় হওয়া আলোর তীব্রতা ছাড়াই। হেরোইন বা আফিমঘটিত মাদক দ্রব্যে যারা অভ্যস্ত তাদের চোখের তারা সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে।

১৬ অতিরিক্ত সময় নিঃসংগ অবস্থায় থাকার চেষ্টা। তরুণেরা এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় বাথরুম বা শোবার ঘরে ভেতর থেকে খিল এঁটে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়।

৬৭ টাকা-পয়সা সংগ্রহের ব্যাপারে বেপরোয়া ভাব। এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে মাদক দ্রব্যে সে অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

১৮ বন্ধক দেওয়া যেতে পারে এমন সব সামগ্রী হঠাৎ ঘর থেকে উধাও হয়ে যেতে থাকবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্ত সামগ্রী পরিবারের কারোর না কারোর সম্পত্তি। তবে অন্যদেরও হতে পারে। যদি সে নিজে না অজ্ঞাত কোন বাড়ির সম্পদ চুরি করে, বুঝতে হবে ওই চুরির মালপত্র বিক্রির টাকা-পয়সা নেশার পেছনে সে খরচ করছে।

খাবারদাবারের ব্যাপারে অনীহা। মারিজুয়ানা সেবনকারী আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে অদ্ভুত একটি গন্ধও আপনি পেতে পারেন। বিশেষ ধরনের এই গন্ধে আপনার গা গুলিয়ে উঠতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত এই সেবনকারী যদি আপনারই কোন আত্মজ হয়, তাহলে একটু খোঁজখবর নিলেই তার ঘরের কোণে কোন এক জায়গায় সিগারেট তৈরির কাগজ, পাইপ অথবা কল্কেও আপনার চোখে ধরা পড়তে পারে। কারণ, জীবন এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরা এত বেশি নিস্পৃহ এবং উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে এদের মনে বিশেষ কোন সংরক্ষণশীলতার ছাপ থাকে না বললেই চলে।

নিজের পরিবারে এমন কোন অঘটন ঘটলে ভয় পাওয়ারই কথা। এবং তাৎক্ষণিক-ভাবে যে প্রশ্নটি আপনাকে বিশেষভাবে চিন্তিত করবে, তা হল মারিজুয়ানা সত্যিই কি তেমন ক্ষতিকর সামগ্রী? মদের চেয়েও এ বস্তুটির নেশা কি আরও বেশি ক্ষতিকর? মুহূর্তের জন্যে এ ধরনের প্রশ্ন আপনাকে খানিকটা বিমূঢ় করে তুললেও, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বিপদ নিশ্চয় আছে। তবে যতটা ভয় আপনি পাচ্ছেন, ততটা না পেলেও চলবে।

সামাজিক শৈথিল্য অথবা যে কারণেই হোক তিরিশ এবং চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে নিউ ইয়র্কের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মারিজুয়ানার অভ্যাস ভয়াবহভাবে বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে ব্যাপারটার উপর বিশদ অনুসন্ধান চালানোর জন্যে নিউ ইয়র্ক আকাদেমি অব মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই ওঁরা কয়েক হাজার স্কুল এবং কলেজের ছেলেমেয়েদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যে প্রতিবেদন দাঁড় করান, তাতে বলা হয়, সাধারণভাবে বলতে গেলে নেশা হিসেবে মারিজুয়ানার প্রতিক্রিয়া বরং মাঝারি ধরনের। তবে বিড়ি সিগারেটের মত কেউ যদি এই বস্তুটির ধূম পান করে শরীর এবং মনের ওপর তখন এর প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক। প্রতি-বেদনে বলা হয়:

এক, মারিজুয়ানা মানুষের নিজস্ব সংযম বোধকে আলগা করে দেয়, নৈতিক রীতিনীতি সম্পর্কে উদাস করে তোলে। একটা সম্মোহিতভাব তার আচার আচরণের মধ্যে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে বিকশিত হতে শুরু করে অদ্ভুত এক ধরনের দুষ্টুমি স্বভাব অথবা কৌতুক-প্রবণতা। যা শেষ পর্যন্ত তাদের বিপজ্জনক ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেয় এবং অবশেষে অপরাধী করে তোলে।

দুই, বস্তুটি মানুষের ভাবপ্রবণ অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভীষণভাবে জাগিয়ে তোলে। বিশেষ করে মূলত যারা কঠিন মানসিক রোগে ভোগে মারিজুয়ানা তাদের ওই রোগকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দেয়। এবং শেষ পর্যন্ত উন্মাদও করে তুলতে পারে। দেখা গেছে নিয়মিত মারিজুয়ানার ধূমপান করার দরুণ অনেকের মধ্যে অহেতুক আত্ম-হত্যা করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। এই সংগে বিচিত্র ধরনের সামাজিক অপরাধ এবং খুন করার প্রবৃত্তি। অবশ্য মারিজুয়ানা সেবন করলেই যে একজন হত্যাকারী বনে যেতে পারে একথা কেউ বলতে চান না। ওঁদের বক্তব্য, বস্তুটি খুন করার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

তিন, মারিজুয়ানা মানুষের উপস্থিত-বুদ্ধির লোপ ঘটায়। ফলে বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্যে যথাযথ বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। আকাদেমির বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন, মারিজুয়ানার ধূমপান করার পরমুহূর্তে মানসিক ভারসাম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। শরীর এবং হাতপা কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়ে, দিন এবং রাতের পারস্পরিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্যিকারের বোধ অন্তর্হিত হয়। সেই সঙ্গে মনে হয় পৃথিবী এবং তার পরিবেশে যা কিছু বিরাজ করছে, সব কিছুই তার যেন অদ্ভুত এক স্থিতিশীলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সময় গেছে থেমে। সমস্ত কিছুই গতিহীন। চলছে, চলছে, চলছে। যাবতীয় সব কিছু অনড়। অভূত-পূর্ব এক আবেগের মধ্যে গোটা পারিপার্শ্বিক যেন এক অপরিবর্তনীয় দশার মধ্যে উপস্থিত।

কিন্তু এ ধরনের মানসিক সাম্যভাবের কারণ কী? বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি মারিজুয়ানা বিশ্লেষণ করে টেট্রাহাইড্রো-কেন্নাবিনোল বা সংক্ষেপে টি এইচ সি নামে এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। ওঁরা মনে করছেন বিশেষ এই বস্তুটিই অনর্থের মূলে কাজ করে। ১৯৬৮ সালে ডঃ ডোনাল্ড জার্ভিস মানসিক জনৈক রোগীর উপর এই বস্তুটি প্রয়োগ করে লক্ষ্য করেছেন, এর প্রতিক্রিয়ায় ওই রোগীর দেহ এবং মনে অদ্ভুত এক আবেশের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। চোখের ওপর ফুটে ওঠে রঙবেরঙী আলোর সমারোহ। শারীরিক অনুভূতি ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলে, স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং বিচারক্ষমতা লোপ পায়, শরীরের পেশী অনাবশ্যক অনমনীয় হয়ে ওঠে এবং সেই সংগে ফুটে ওঠে আত্মসমাহিত ভাব। পরে ওই রোগীটি স্বীকার করে, তৎক্ষণ সে ওই রাসায়নিক যৌগটির কবলিত অবস্থায় ছিল তার মনে হয়েছে, নিজের দেহ থেকে তার আত্মা যেন বিচ্ছিন্ন এবং নিজের পুতুলের মত কুণ্ঠিত, খর্ব। নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিজেই প্রত্যক্ষ করছে।

চার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মারিজুয়ানার পর তরুণতরুণীরা হেরোইনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে। শেষোক্ত এই মাদক বস্তুটি আরও বেশি উত্তেজক এবং তৃপ্তিকারী। অর্থাৎ নিয়মিত মারিজুয়ানা সেবনের পর যখন তাতে আর তেমন স্বর্গীয় নেশা জাগে না, তখন পরবর্তী জোরাল নেশার ভূমিকা গ্রহণ করে হিরোইন। ও'রা দেখেছেন, যারা মারিজুয়ানায় অভ্যস্ত তারা যে শেষ পর্যন্ত হিরোইনে গিয়ে বর্তাবেই, এমন কোন কথা নেই। তবে যারা হিরোইনের অভ্যাস রপ্ত করেছে, মাদকদ্রব্য সেবনের ব্যাপারে মেরিজুয়ানা দিয়েই তাদের হাতে-খড়ি।

বিশিষ্ট মাদকদ্রব্য বিশেষজ্ঞ চার্লস উইনিক তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'মারিজুয়ানা ইউস বাই ইয়ং পিপল্'-এ মন্তব্য করেছেন, যে সমস্ত ছেলেমেয়ের বয়েস কুড়ির নিচে, মারিজুয়ানায় অভ্যস্ত হওয়ার আগে মাদক-দ্রব্যে তাদের প্রথম হাতে খড়ি হয় অ্যাকিম-[illegible] মাদকদ্রব্যের মাধ্যমে। এবং পরবর্তী পর্যায় মারিজুয়ানা। যে সমস্ত তরুণ নিজেদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশে প্রায়শ অসমর্থ, তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বস্তুটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। মারিজুয়ানার ধূমপান করে নিজেদের সবল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করে, দেখা গেছে সামাজিক [illegible] যোগ দেবার আগে ওই সমস্ত তরুণ [illegible] মেজাজ এবং পাঁচজনের মধ্যে নিজেদের জাহির করার মত মানসিকতা [illegible] জন্যে এ ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে [illegible]। যদিও শেষ পর্যন্ত তাদের সমস্ত [illegible] নিতান্ত হতাশাতেই পর্যবসিত হয়।

পাঁচ। শরীরের দিক দিয়েই হেরোইন বা [illegible]-এর মত মারিজুয়ানা অবশ্য [illegible] বেশি ক্ষতিকর নয়। তবে এর নিয়মিত [illegible] ব্যক্তিবিশেষকে মনের দিক দিয়ে বড় [illegible] পরনির্ভরশীল করে তোলে। দৈনন্দিন [illegible] সমস্যাকে সে ভয় পায়। [illegible] উদ্যম বা আকাঙ্ক্ষার উপর আস্থা [illegible] ফেলে। এক কথায় পৃথিবীকে সে [illegible] চেতনায় গ্রহণ করতে শুরু করে। [illegible] অন্তর্মুখীভাব এবং পলায়ন মনো-[illegible] তাকে ক্রমে গ্রাস করতে থাকে। আর এ [illegible] পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় দিন দিন [illegible] মাত্রাও বেড়ে যায়।

ছয়। এবং অবশেষে পার্থিব জীবন থেকে [illegible] সে গুটিয়ে নেয়। সম্ভবত এটাই [illegible] সেবনের সবচাইতে মারাত্মক [illegible]। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে আরও [illegible] মারাত্মক। কারণ এর ফলে অনেক কম [illegible] বাস্তবতাকে তারা এড়িয়ে চলতে [illegible] করে। আত্মনির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে [illegible] বিচ্ছিন্ন করার দিকে প্রবণতা [illegible]। বাস্তব জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সত্যিকারের চেষ্টা বা পরিশ্রম করা থেকে সে নিবৃত্ত হয়।

অর্থাৎ বলা চলে, এমন একটি সম্ভাবনা যখন দেখা দেয়, কোন অভিভাবকের পক্ষেই তখন আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব কর্তব্য বা দায়িত্ব আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। বিশেষ করে এ ধরনের সমস্যা যদি আপনার নিজের ঘরেই দানা বেঁধে ওঠে।

সম্প্রতি হারমান ডব্লু ল্যান্ড তাঁর একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন: এমন কোন পরি-স্থিতির উদ্ভব হলে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনাকে প্রথমেই যা করতে হবে, তা হল, মারিজুয়ানায় অভ্যস্ত আপনার ছেলে বা মেয়ে, যেই হোক, তার সঙ্গে মুখোমুখি আপনি কথা বলুন। বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশে এর কুফলগুলি তাকে বুঝিয়ে বলুন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন, এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যও নিতে পারেন। তাঁর সাহায্যে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করুন।

নিউইয়র্ক স্টেট মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উপাধ্যক্ষ ডঃ হেনরী ব্রিল-এর বক্তব্য: মানব সমাজে মারিজুয়ানার অনু-প্রবেশ দীর্ঘকালের। যদিও মানুষ এই বস্তুটিকে সামাজিক স্বীকৃতি দানে সব সময়ই বিরত থেকেছে। নেশা হিসেবে মারিজুয়ানা মদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। অভি-ভাবকদের কর্তব্য এই বিশেষ দিকগুলি আসক্ত ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বলা।

জনৈক পত্রিকাসম্পাদক তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেছেন, হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, আমার ষোল বছরের ছেলে তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মারিজুয়ানার ধূমপান করে চলেছে। ওর নিজের শোবার ঘরেও ওই বস্তুটির ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম। মনে হল দিন দিন ও কেমন যেন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওকে মদ্যপ বলে মনে হচ্ছিল। অদ্ভুত উজ্জ্বল চোখ, কাচের মত

স্বচ্ছ। কখনও কখনও দেখতাম ঘরের জানালা হাট করে খুলেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ তখন ওইভাবে জানালা খুলে রাখার কথা নয়। বন্ধুবান্ধবরা তার সঙ্গে যা আলোচনা করত তার বেশিভাগেরই বিষয়বস্তু মাদকদ্রব্য। এবং লক্ষ্য করলাম, মাদকদ্রব্যবিষয়ক যে-কোন বই পেলেই সে গোগ্রাসে গিলে চলেছে। হঠাৎ অসময়ে একদিন বাড়ি ফিরে আমি এবং আমার স্ত্রী আবিষ্কার করলাম, তার মুখে মারিজুয়ানার সিগারেট।...... ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলতে গেলে দেখলাম, সে আমাদের সঙ্গে রীতিমত মুখোমুখি শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে সরাসরি বললাম, ভবিষ্যতে এ রকমটি ঘটলে কোন রকম অর্থনৈতিক সাহায্য সে আর পাবে না। এবং শাস্তি পেতে হবে।...... আমার ছেলে জানত, কথার আমি কখনও খেলাপ করি না। সম্ভবত পরিস্থিতিটা সে উপলব্ধি করতে পারল।......আমার ধারণা তারপর থেকে আর কখনও সে মারিজুয়ানা স্পর্শ করেনি।

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, আসলে সম্পাদক ভদ্রলোকটির ছেলের পরিবর্তন ঠিক তাঁর জেহাদ ঘোষণার জন্যে কতটা ঘটেছিল এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা শক্ত। সম্ভবত এ ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্বব্যঞ্জক অভিব্যক্তিই বরং অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন, ওই বয়েসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরিসীম একটি কৌতূহল সব সময়ই কাজ করে চলে। তারা তখন যা কিছু করে, তার মূলে থাকে অজ্ঞাত কোন কিছুকে আবিষ্কার করার চেষ্টা। অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াস। এই অভিজ্ঞতা বিপরীত ধর্মীও হতে পারে। এবং সত্যিসত্যিই যখন অমন একটা কিছু হয় বা ঘটে তখন তারা চায় তাদের বাবা মা অথবা অভিভাবকস্থানীয় কেউ, যে তাদের স্নেহ করে, আন্তরিকতার সঙ্গে মঙ্গল কামনা করে, তাঁদের কেউ স্নেহজড়িত কর্তৃত্বের সুরে তাদের অন্যায়ের পথে বাধা দিন। অবশ্য বাবা মা'র মধ্যেও সেক্ষেত্রে সততা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সদিচ্ছা থাকা দরকার। সেই সঙ্গে বাস্তবযুক্তি। এমন ধরনের কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তবেই ছেলেমেয়েরা তাদের ইচ্ছেকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সম্পাদক ভদ্রলোকটির মধ্যে এ ধরনের ব্যক্তিত্ব জাগরুক থাকায় কাজটা সহজতর হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাবা মা'র সঙ্গে সন্তানসন্ততির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অবশ্যই থাকা উচিত। তবে তার অর্থ এই নয়, উভয়েই সমান। কারণ সন্তানরা চায়, তাদের বাবা মা'র মধ্যে একটা যথাযথ কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। এবং এমন বাবা মা'র কাছ থেকে যখন কোন নিষেধাজ্ঞা আসে তাকে উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার, দীর্ঘকাল মারিজুয়ানা বা অনুরূপ কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করার ফলে মানসিক বা শারীরিক কোন অসুস্থতার লক্ষণ ধরা পড়লে নিশ্চয় আপনি উপযুক্ত চিকিৎসক বা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেবেন। এই সঙ্গে আপনার লক্ষ্য রাখা দরকার, আপনার তরুণ পুত্র-কন্যার বন্ধুবান্ধবদের যথাযথ পরিচয় কী? লক্ষ্য রাখা দরকার পুত্র-কন্যার দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং চালচলনের ওপর। ওদের মাদকদ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারটা গোড়ার দিকে ধরা পড়লে অনিবার্য অনর্থের হাত থেকে ওদের রক্ষা করা হয়ত আপনার পক্ষে তেমন কোন কঠিন কাজ হবে না।

সংবাদ

২৫ ডিসেম্বর গোবরডাঙ্গা যুব বিজ্ঞান পরিষদ তাঁদের বাৎসরিক মিলন উৎসব পালন করলেন। সারাদিনব্যাপী এই উৎসবে স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে এবং বড়রা গ্রামীণ পরিবেশে বিজ্ঞানসংস্থাগুলির কাজকর্ম এবং উদ্দেশ্য কী ধরনের হওয়া উচিৎ তার উপর বিশদ আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, এই সংস্থার বয়েস প্রায় তিন বছর। ইতিমধ্যে ওঁরা তৈরি করেছেন একটি বিজ্ঞান-গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান সংগ্রহশালা এবং কৃষিবিজ্ঞানের উপর অনুসন্ধান চালানোর জন্যে ছোট্ট একটি দল। বিজ্ঞানচর্চাকে বাস্তবমুখী করে তোলার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মনি দাশগুপ্ত, দীপক দাঁ, রঞ্জন মান্না, তপন দাস, নন্দদুলাল সরকার এবং আরও অনেকে। মনে হয় এ ধরনের সংস্থা সরকার এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেলে অনেক বেশি সংগঠনমূলক হতে পারবে।

সমরজিৎ কর

॥ একচল্লিশ ॥

দেশবন্ধু গঙ্গাই, বলেছিল ছেলেটা। আর সেই গঙ্গা এখন ওই জেলের ভিতর দিয়েই প্রবাহিত।

পরের দিন বিকেলে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে আনন্দবাজার-বিক্রির টাকাটা জমা দেবার পর মির্জাপুর স্ট্রীট হয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম কথাটা তার।

মির্জাপুর পার্কে লোক জমেছিল বেশ। পার্কের ভেতরে বাইরে—দু ধারেই। মাঝখানে পাঁচ দেড়েকের মত লোক—বেশির ভাগ ছেলেছোকরা, চরকালাঞ্ছিত সদ্যপ্রোথিত তিন রঙা একটা পতাকা ঘিরে। আর পার্কের চার ধার বেষ্টন করে বেটন হাতে পুলিস পাহারোলা অগুনতি।

আইন অমান্য সভাটা শুরু হবার তখনো বেশ কিছুটা দেরি, ধারঘেঁষে যাবার সময় একজনকে শুধিয়ে জানতে পারলাম।

সেই ছেলেটা এই সভাতেই আইন ভেঙে ফের সেই জেলে যাবে বলেছিল আমাকে। এই ঘাটে ডুব দিয়ে সে ফের সেই গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে ভেসে উঠবে আবার। ভাসবে, সাঁতরাবে, ঢেউ খাবে মাঝ গঙ্গায়। কী মজা! পার্কের পাশ কাটিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে বসুমতীর দপ্তরে যাবার পথে ভাবছিলাম কথাটা।

সেধেছিল সে আমায়, 'তুমিও এসো না ভাই! দুজনে একসঙ্গে যাব ফুর্তি হবে খুব।'

'খুব ভিড় হবে তো সভাটায়, যেতে পারি, কিন্তু তার ভেতরে তোমার খোঁজ আমি পাব কি করে?'

'আমার নাম, দেবেন। দেবেন দে। নাম ধরে ডেকো না তুমি আমাকে।'

'দেবেন! দেবেন তো একটা কমন্ নাম হে! কমল গোপাল সুবোধের মতই কমন। সব বাড়িতেই একটা করে তারা থাকে। কতো লোক তখন সাড়া দেবে আমার ডাকে।'

'তারা আবার সাড়া দিতে যাবে কেন?'

'দেবে না? দেবেন দেবেন বলে চেঁচালে চার ধার থেকেই দেব দেব বলে রব উঠবে। তখন কাকে ছেড়ে কার কথা রাখব?'

'দেবেন দে বলে ডেকো তাহলে। দেবেন হলেও সবাই কিছু দে নয় তারা, চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে গাঙ্গুলি, ঘোষ, বোস, মিত্তির হতে পারে। আর সাড়া যেই দিক না, তোমার ডাকে এগিয়ে আসবে এই শর্মাই!' বলে সে হাসতে থাকে—'আরে ভাই, দিতে চায়তো সব্বাই। কিন্তু লাখ জনের মধ্যে দাতা হয় একজনাই। যেমন কি না তোমার ঐ দেশবন্ধু। তাঁর মতন দাতা আর আছে?' যেমন দেহি দেহি এই এই সংসারে দাতা ওই দেশবন্ধুই, তেমনি দে-দের দুনিয়ায় দেবেন দে এই একজনাই—এই কথা বলেছিল সে। সেই আমার বেশ বন্ধুটি।

বলেছিল বেশ। হেসে হেসে এমন চমৎকার কথা বলে সে! আর এমনধারা মিষ্টি হাসে যে!

গঙ্গাস্নান করে ওঠার ফলেই বোধ হয় মানুষের চেহারা বদলে যায় এমন!

সেদিন কথাটা তার শুনিয়েছিল কবিতার মতই। উপকথার মতন যেন কথাটা। আরব্য উপন্যাসের হারুণ অল রসিদের কীর্তি-কাহিনীই যেন।

আজ জীবনপথের উপান্তে এসে মনে হয়—সেকালের সেই উপকথা ইতিমধ্যে ইতিহাস হয়ে উপস্থিত।

তখন ছিল সেটা বাঙালীর নতুন ইতিহাসের উপক্রমণিকাই।

দেশবন্ধু সেদিন না এলে, সর্বস্ব বিলিয়ে সেইভাবে দেখা না দিলে আজকের

এই বাঙালীকে আমরা বুঝি দেখতে পেতুম না।

দেখতে পেতুম না সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্র নজরুল আর শিশির ভাদুড়িকে। বাঙালীর বিদ্রোহের, সাহিত্যের, সঙ্গীতের, সংস্কৃতির এই রূপ—এই রূপান্তর আমাদের অপরিচিত থেকে যেত। উত্তরকালে তাকে এভাবে প্রকাশিত হতে দেখতুম না। যেমন নাকি দেখতে পাচ্ছি আজ ওই ওপার বাংলায়।

নতুন কবিতায়, নবীন নাট্যলীলায়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নিত্যনব উদ্ভাবনায় সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত উচ্ছলিত বাংলা—বাঙালীর! এ-ই রূপ!

গঙ্গা যেমন দেশের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে তার সারা দেহকে সঞ্জীবিত সরস রেখেছে, দেশবন্ধুরও ছিল সেই সঞ্জীবনী। কতো লোককে কত রকমে যে তিনি প্রেরণা দিয়ে নয়া বানিয়ে গেছেন! বিধান রায় কুমুদ-শঙ্করের ন্যায় অনেকেরই বিরাট কর্মৈষণার মূলে তিনি। সুভাষচন্দ্রের মত বহুজনের মহাপৌরুষ-সঞ্চারের গোড়ায় কে আর? তাঁর আত্মাহুতি যজ্ঞের আদর্শে কতজন না আত্ম-দানব্রতী। তাঁর প্রোজ্জ্বল বহ্নির অনলে কত জীবন প্রজ্জ্বলিত। তাঁর দীপশিখার থেকে

প্রদীপ্ত কতজনা। তাঁর স্পর্শমণির ছোঁয়ায় এসে কত শক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়ে মহীরুহ, কত প্রতিভা যে প্রতিভাত হোলো!

শিশির ভাদুড়িই কি শিশির ভাদুড়ি হতে পারতেন তাঁর আনুকূল্য না থাকলে? আর শরৎচন্দ্র ঐ শরৎচন্দ্র?

আত্মপ্রকাশের কালে শরৎচন্দ্রকে যখন সংগ্রামী দশায় তাঁর প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টির সমুজ্জ্বল ফসল, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলের মতন অসাধান্য বই, সর্বস্বত্বসমেত সামান্য কয়েক শ' টাকার বিনিময়ে বেচতে হয়েছে, সেই-কালে প্রধানত তাঁর সংস্থাপনের হেতুই যাতে তিনি তাঁর সৃজনকর্মের উপযোগী স্বাচ্ছন্দ্য আর পরিবেশ পান তাই ভেবেই নিজের ভারতজোড়া রাজনীতি কাজের হাজার ব্যস্ততার মাঝেও নারায়ণ পত্রিকা বার করে-ছিলেন। সম্পাদনার ভার দিয়েছিলেন তাঁর ওপরে।

এমনকি সামান্য আমার জন্যও (এবং আমার মতন অনেকের জন্যেই। তাঁর মনের কোণে একটুখানি ভাবনা থাকত হয়ত বা। এমন অভাবিতভাবে তার পরিচয় পেয়েছিলাম একবার— এই প্রসঙ্গে যার উল্লেখ হয়ত একেবারে অবান্তর হবে না। দেশবন্ধু যখন কর্পোরেশনের মেয়র আর সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্মসচিব, সেইকালে রাজরোষে পড়ে উপেন্দ্রনাথকে অন্তরীণ হতে হয়। বারীনদার 'বিজলী' পত্রিকার পাশাপাশি উপেনদার সাপ্তাহিক আত্মশক্তি প্রকাশিত হত, উপেনদা জেলে গেলে পত্রিকা-পরিচালনার ভার সুভাষ-চন্দ্রের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে।

উপেন্দ্রনাথের তুলনাহীন সম্পাদনার পরে সেই দায় কার ওপরে দেওয়া যায়? দেশবন্ধুর নির্দেশে আমার মত অর্বাচীনকেই (তখন আর আমি কী এমন লিখেছি) তিনি নির্বাচিত করেন। প্রাবন্ধিকরূপে প্রকাশ-লাভের সেই সুযোগটা (যার পরিণামে আমার মস্কো বনাম পণ্ডিচেরীর বইয়ের লেখাগুলি) কত যে আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়ে-ছিল তা বলবার নয়!

শুধু কি তাই? যখনই অসুবিধায় পড়ে তাঁর কাছে গেছি, মুখ ফুটে কিছু কইতে হয়নি, সম্মুখীন হতেই তিনি বুঝে নিয়ে-ছেন, যা তাঁর পকেটে থাকত উজাড় করে দিয়ে-ছেন অকাতরে। দুশো পাঁচশো পেয়ে গেছি এক এক সময়।

আর সে কি শুধু এই আমাকেই? আমার মতো কতো নিঃস্ব আর নিঃসহায়ই না কত রকমে তাঁর সাহায্যে উদ্ধার লাভ করেছে! এটা তাঁর একটা লীলাই ছিল যেন! কারো কারো খেলা যেমন অপরের মৃত্যুর কারণ হয়, তাঁর এই অবলীলায় কতোজনা যে আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে নবজীবনের অমৃতত্বে উদ্ধারিত হয়েছে।

বর্ষার মেঘপুঞ্জ যেমন বারিবর্ষণে দায়-মুক্ত হয়ে উদ্ধার পেতে চায়, তিনিও বুঝি তেমনি নিজের অর্থভার লাঘব করে হালকা হবার স্বস্তি বোধ করতেন! আপনার যা কিছু, সবাইকে এমনি করে বিলিয়ে দিয়ে বিদায় করেই কিসের দায় থেকে যে বাঁচতেন তিনি তা তিনিই জানেন! তাঁর এই অবলীলামাহাত্ম্য আমার একমুখ বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, কতজনের পঞ্চমুখেই না তা ব্যক্ত হয়েছে!

আমার দুঃখ হয় ওই মানিকের জন্য। বড় মাপের ঐ বিরাট লেখক, যার জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও আমার মতন লেখকের নেই, তাকে কি না সপরিবার দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত দশায় সেই দুঃখ ভোলার নিমিত্ত নিয়ত বিষপানে নিঃশেষ হতে হয়েছে। তার কালে হায়, এই দেশবন্ধু জীবিত ছিলেন না।

একদা বিদ্যাসাগর মশাই যে কীর্তি করে গেছেন পরবর্তী কালে সেই কীর্তিনই দেশবন্ধুর!! মধুসূদনের বিপত্তিতে যেমন বিদ্যাসাগর, তেমনি অনেকের বিপদেই দেশ-বন্ধু শ্রীমধুসূদন! তাঁর স্মরণ মাত্র, শরণ নিতেই না সমূহ বিনষ্টির থেকে সদ্য উত্তরণ!

দুঃখ হয় এমনকি আমার ওই শিশির-কুমারের জন্যও। যদিও তিনি সরকারি প্রতিভার স্বত্বাধিকারের স্বীকৃতিক সারণায় অপরের একসূপেলয়েটে অনেকাংশে তার উচিত প্রাপ্য বঞ্চিত করেছিলেন, এমনকি আমাকেও যৎকিঞ্চিৎ, তাহলেও তাঁর ন্যায্য পাওনাও তিনি পেয়ে-ছিলেন কী! তৎকালের রঙ্গমঞ্চে তাঁর যে যুগান্তকারী অবদান তার জন্য সংগঠিত স্বীকৃতি তিনি পাননি। অপরকে বঞ্চনার হেতু রহস্যময়ী প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় নিজেও আবার এক সময় প্রবঞ্চিত হতে হয়, সেই অলংঘ্য নিয়তির নিয়ম নিগড়েই এটা ঘট-ছিল কি না আমি জানি না, কিন্তু তাহলেও তাঁর জীবদ্দশায় দেশবন্ধু জীবিত থাকলে তাঁর সাধনা হয়ত অসম্পূর্ণ থাকত না, যে জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন তিনি দেখে গেছেন, নিত্যকাল তাঁর চিত্তলোকে লালন করেছেন, যা নাকি তাঁর অপূর্ণই থেকে গেছে, চিত্ত-রঞ্জনের সৌজন্যে যথাকালে তাকে সর্বাঙ্গীনরূপে সার্থক দেখে যেতে তিনি পারতেন!

এবং ষোড়শীঘটিত সেই সামান্য বঞ্চনার দাগ যে আমায় তেমন লাগায়নি তার কারণও ঐ দেশবন্ধুই! সেই চিত্ত সাগরের স্নিগ্ধ কূলে শয্যা বিস্তৃত ছিল বলেই ওই শিশির সম্পাতের দুঃখ আমার

তাড়া করে আসছে সোয়ারী পুলিস...

স্পর্শ করেনি। বলতে কি! সেই সাগর সঙ্গীতের কলকল্লোলে ধুয়েমুছে গেছে সব।

যথার্থ বলতে, জীবনভোরই আমি দেশবন্ধু আর বিদ্যাসাগরের দেখা পেয়ে এসেছি, অমন রাজসংস্করণ বা দরাজ সংস্করণে না হলেও পকেট ভরবার মতন পকেটের এডিশনে তো বটেই! যথাকালে সাহায্যের দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে তাঁরা এগিয়ে না এলে কলকাতার ফুটপাথে যার নাকি জীবনযাত্রার শুরু হয়েছিল একদা, সেই রাজপথের পাশের নর্দমাতেই করে তার অবশ্যম্ভাবী দুর্গতি সম্পূর্ণ হয়ে যেত!

দেশবন্ধু সেই দুর্গতি হতে দেননি আমার, আর আমার মতন এমন অনেকেরই। হিমালয়োৎসারিত হয়ে তার মহাসাগরসঙ্গমে যাবার কালে প্রাণসুধার দানছত্রে যাত্রাপথের দুধার শ্যামল সজীব সমুজ্জ্বল করে দিয়ে গঙ্গা যেমন আমাদের সারা দেশের বন্ধু, দেশবন্ধুও তেমনি সেই গঙ্গাই। এই কথাই ছেলেটি বলেছিল আমায়—আর সত্যি বলতে কি, তার প্রতি আমার বেশ ঈর্ষাই হয়েছিল তাকে সে কাছের থেকে দেখতে পেয়েছে বলে নয়, সেই গঙ্গায় সে নেয়েছে বলেই।

সেই গঙ্গার সন্নিকটে যাবার সুযোগ আমার হয়েছিল একদিন। সেই ইংরেজবাজারের প্ল্যাটফর্মে। তার তটে দাঁড়িয়েছিলামও খানিক। তারধারে সেদিন ঘুরেও বেড়িয়েছি কিছুক্ষণ। কিন্তু ওই ছেলেটির মতন সেই গঙ্গায় সাঁতার কাটা তো হয়নি আমার। ঢেউ খাইনি তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশে বসে লহরীলীলা দেখিনি। সেই গঙ্গায় আমার ডুব দেওয়া হয়নি এখনো।

ডুব দিতে হলে যেতে হবে আজ ওই মীর্জাপুরের ঘাটেই—পা নামাতে হবে জলে।

বসুমতী থেকে ফেরার পথে এই সব ভাবতে ভাবতে আসছি, পার্কটার কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখি—কী ব্যাপার! যাবার সময় যেখানে নামমাত্র জনতা দেখে গেছি এই এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে এখন উত্তাল জনসমুদ্র! চার ধার লালপাগড়িতে ছেয়ে গেছে—লালমুখো গোরা সার্জেণ্ট কতো না! আর কী ভিড়! কী ভিড়!

সেই ভিড় হটাতে তার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তার বেগে তাড়া করে আসছে সোয়ারী পুলিস—এই পুলিসরা এর আগে আমার চোখে পড়েনি কখনো।

অশ্বতাড়িত হয়ে আমার বয়সী একটি ছেলে প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে আর কি।

দুজনের ধাক্কায় কঁকিয়ে উঠেছি দুজনাই —উঃ! ইস্!

'ইস্! কী কাণ্ড ভাই?'

'দেখতে পাচ্ছো না? মাউণ্টেড পুলিস তাড়া করছে সবাইকে।'

'তা তো দেখছি। এমন ঘোড়া আমি এর আগে দেখিনি আর, উচ্চতায় প্রায় হাতীর মতই! এই সব হাতীমার্কা ঘোড়া কি পুলিসের নাকি?'

'হাতীর মতো? উটের মতন উঁচু বলো।'

'উট তো দেখিনি কখনো, তবে হাতী আমার দেখা। উট নাকি চিড়িয়াখানায় আছে, আমার এক বন্ধু সেখানে নিয়ে যাবে বলেছিল আমাকে, কিন্তু তার পাত্তাই পাচ্ছিনে আমি আর। তা, ওরা এমন করে তাড়া করছে কেন আমাদের? কী করেছি আমরা?' আমি জানতে চাই।

'পার্কে আইনভঙ্গের সভা হচ্ছে না? তার ধারে তাই ঘেঁষতে দিচ্ছে না কাউকেই।'

'কেমন করে আইন ভাঙছে সব?'

'বক্তৃতা করে। সিডিশাস বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ না?'

'জানি তো নিষিদ্ধ। খবর কাগজেই পড়েছি, কিন্তু......কিন্তু সে যে এত কাণ্ড করে ভাঙতে হয় তা আমি জানতুম না। তুমি কি আইন ভাঙতেই এ ধারে এসেছিলে নাকি?'

'সেজন্যেই তো। কিন্তু ভাঙব কি, পার্কের ভেতরে সেঁধুতে পারলে তো—ঢুকতেই দিচ্ছে না যে। ঢুকব কি, ধারে কাছে পৌঁছুতেই দিচ্ছে না। যা সব ঘোড়া না!'

'তা তো দেখছি। আইন অমান্য করা যায়, কিন্তু ঘোড়াকে অমান্য করা যায় না তার আইনকানুন আলাদা। তাই না?'

'হাড়গোড় ভাঙা আইন তার ভাই!' এক-বাক্যে সে সায় দেয়।

'যা বলেছো। আইন ভাঙা সোজা, কিন্তু ঘোড়াকে ভাঙা শক্ত ব্যাপার। সে ভগ্নপুর নয়। তাকে ভাঙবে কি, উলটে সেই তোমাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।'

সেও আমার পিছু নিয়েছে.....

'সেইেই তো। আমি দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু ঘোড়ার জন্য তো পারিনে।'

'পারিইনে তো। ঘোড়ার সঙ্গে কি পারবার জো আছে।'

কথায় কথায় আমরা পার্কের কাছাকাছি গেছি, উট মার্কা একটা ঘোড়া তার সোয়ারী সার্জেণ্টকে পিঠে বেঁধে ছুটতে ছুটতে প্রায় আমাদের দুজনের ওপরে এসে পড়ে।

পড়েই না, সে ছিটকে গেছে এক ধারে, আমি ছিটকে পড়েছি আরেক দিকে।

পাঁইকপাটি না লাগলেও মাটির থেকে উঠেই না ডিগবাজি করে আমি ডিঙিয়ে দিয়েছি ঘোড়াটাকে।

তার পরে সে, আমি নেহাত নিজীব নই দেখেই হয়ত, আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে সে আমার পেছনেই লাগে, আমাকেই তাড়া করে আসে। পড়ি কি মরি করে আমিও, ছুট লাগাই তক্ষুনি।

সেও আমার পিছু নিয়েছে! নাছোড়বান্দার মতই প্রায়।

সেকালে অশ্বমেধের ঘোড়ারা কেমন ছুটত আমার জানা নেই কিন্তু অশ্বক্ষুরলাঞ্ছিত হয়ে নিজের অশ্বমেধ হয়ে যাবার ভয়ে সেদিন যা ছুট লাগিয়েছিলাম তেমন ছোটাছুটি সারাজীবনে আমি করিনি। আমার জীবনের সেই প্রথম আন্দোলনে।

ছুটতে ছুটতে একটা বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে আমি ঢুকে পড়েছি তার ভেতর। ঢুকেই দেখি, সামনেই একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছি সোজা উপরে—দোতলায়।

উঠে হাঁপ ছেড়েছি এতক্ষণ বাদ। উটকো ঘোড়াটা ছুটতে যতই ওস্তাদ হোক, এই ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে এখানে এসে উঠতে পারবে না নিশ্চয়! (ক্রমশ)

জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নকীর্তি

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙলার ইতিহাসে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন তথা বরেন্দ্রভূমির গুরুত্ব আজ অবশ্যই স্বীকৃত। উদীচ্য বাঙলার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা ও গৌরব যে ভারত-সভ্যতার উত্তরণ-পথের এক বিশিষ্ট অভিজ্ঞান সন্দেহ নেই। মহাভারতে পৌণ্ড্ররাজের উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবগণের পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই মহাসমরের পর মধ্যম পাণ্ডব ভীম কর্তৃক পৌণ্ড্রদেশ আক্রান্ত হয়।

উত্তরবঙ্গের বিলুপ্ত নগরী ও জনপদগুলির ঐশ্বর্য যেমন তাৎপর্যময় তেমন এখানে উদ্বুদ্ধ শিল্পচেতনার ফলশ্রুতি একান্ত রমণীয়। প্রকৃতপক্ষে, হিমালয়ের সানুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো পুরাকীর্তিগুলির আবিষ্কার ও মূল্যায়ন এক বিশিষ্ট দিগন্তকে আভাসিত করে। এই গুরুত্বকেই বর্ধিত করে জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান এবং হিমালয় ও উদীচ্যের উচ্চ-ভূমির প্রতি তার সামীপ্য। তুষারকিরীট পর্বতমালায় লালিত প্রাচীন জনপদগুলির সঙ্গে তার সংযোগ প্রতিফলিত গিরিনদীকুলবিধৌত এক নিবিড় অরণ্যের পটভূমিকায়। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত হয়েছে, বিদেঘ মাথব ও তাঁর পুরোহিত গোতম রাহুগণ অগ্নিকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হিমালয়ে উৎপন্ন সদানীরার পূর্ব-তীরে আগমন করেন। অমরকোষের বর্ণনানুযায়ী এই সদানীরা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদী করতোয়া অভিন্ন। অকর্ষিত ও জলাভূমিময় এই স্থানটিকেই মহাভারতে 'জল্লোদ্ভব' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বিভিন্ন মতানুসারে একদা কোশল ও বিদেহ রাজ্যদ্বয়ের অন্তর্বর্তী সীমান্ত জ্ঞাপক সদানীরা অধুনা বিহারে প্রবাহিত গণ্ডক অথবা রাপ্তীরই প্রাচীন নাম। সদানীরার প্রকৃত পরিচয় যেমনই হোক্ না কেন শতপথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচ্য-ভারতে হিমালয়ের সানুদেশে প্রসারিত তরাইভূমি ও তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহকে। সুদূর অতীতে উদীচ্য বাঙলার নদী-উপত্যকাগুলি ও প্রান্তরভূমি যে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার-প্রসঙ্গে এক সবিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে, জলপাইগুড়ি জেলার পরিচয় নিহিত তার ভৌগোলিক অবস্থানে এবং বিভিন্ন পুরাণ-কাহিনী ও কিংবদন্তীতে। ক্রমান্বয়ভাবে অতীত পৌণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের ইতিহাসের সঙ্গেই যে বিজড়িত এখানকার

জল্পেশ মন্দির

জটিলেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান দ্বারপাল। মধ্যযুগ। পূর্বদহ। জলপাইগুড়ি জেলা

ইতিবৃত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মৌর্য-শুঙ্গ কালে যে উত্তর-বঙ্গে আর্যাবর্তীয় সভ্যতা পরিব্যাপ্ত ছিল তা' প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন উৎখনন ও আবিষ্কারের দ্বারা। যথাক্রমে বগুড়া জেলা ও পশ্চিম-দিনাজপুরে অবস্থিত মহাস্থানগড় ও বাণ-গড়ের প্রত্নতত্ত্বীয় ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত "অবদান কল্পলতা"র অন্তর্ভুক্ত সুমাগধাবদানে বর্ণিত হয়েছে একদা জিনেন্দ্র গৌতম বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন। তথ্যাদি ও কাহিনী সমূহের ঐতি-হাসিক গুরুত্ব যেমনই হোক্ না কেন উত্তর-বঙ্গের বিপুল পুরাতত্ত্বীয় সম্পদাদির মূল্যায়ন এখনও অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরাকীর্তিগুলি, অদ্যাপি অবহেলিত অথবা পূর্ণ আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষমান। এই জেলার পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ি নগরীর অদূরে অবস্থিত জোড়দীঘির ধ্বংসাবশেষ। এখানে দৃশ্যমান দু'টি প্রাচীন ঢিবির অস্তিত্ব পুরাতন সেটেলমেন্ট মানচিত্রেও সামান্যভাবে চিহ্নিত আছে। এই ঢিবিদ্বয়ের আকৃতি ও তাদের চারপাশে ছড়ানো ধ্বংসাবশেষগুলি নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য দেয় অতীতের এক দেবায়তন ও তৎসংলগ্ন হর্ম্যাদির। স্বভাবতঃই জোড়দীঘির সমাধিস্থ কীর্তি একাধিকবার কৌতূহলী ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিংবদন্তী বিজড়িত এক প্রাচীন প্রান্তর ভূমিতে নিঃসঙ্গ পরিমণ্ডলে দণ্ডায়মান এই ঢিবিদ্বয়ে ১৯৬৬ সালে সর্বপ্রথম এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও উৎখনন পরিচালিত হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের উদ্যোগে। এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-মূলক উৎখননের দ্বারা অবিসংবাদী ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যে, এখানে আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারী একটি দেবায়তন নির্মিত হয়েছিল। এখানকার প্রাচীন ঢিবিদ্বয়ের গাত্রে ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ধ্বংসাবশেষের যে চিহ্নাদি সুস্পষ্ট তাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ্য কোন স্তূপ অথবা দেবায়তনের 'রথ' জ্ঞাপক ভিত্তিপ্রস্তর ও সংশ্লিষ্ট পাষাণ অবয়বের ভগ্ন নিদর্শনসমূহ। স্থাপত্যের ভিত্তি-প্রস্তর ও অপরাপর অংশগুলি দেখে অনুমান করা যায় তার নির্মাণকাল আদি-মধ্য যুগে, হয়ত খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে। জোড়দীঘির বৃহত্তর ঢিবিটি কতকটা বিনাশপ্রাপ্ত হলেও স্বভাবতই এর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে এই প্রাচীন হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ। পাশের ছোট ধ্বংস-স্তূপটিতে সামান্য উৎখনন পরিচালিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে যার দ্বারা উন্মোচিত হয়েছে মৃন্ময় বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত গোলা-কার গৃহতল। ইষ্টকনির্মিত এই মেঝেটি কোন বৌদ্ধস্তূপের চিহ্ন কিনা তা' অনু-সন্ধানযোগ্য। দূরে দিগন্তে প্রসারিত হিমা-লয়ের পটভূমিকায় জোড়দীঘির অবস্থান প্রকৃতই রমণীয়। এখানে অবশ্যই স্মরণ করা যেতে পারে, সীমান্তপারে অবস্থিত ভিতর-গড় অঞ্চল থেকে জোড়দীঘির দূরত্ব প্রায় বারো-তেরো কিলোমিটার। ভিতরগড় দুর্গের মূল নির্মাণকালও সম্ভবত আদি-মধ্যযুগে।

জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত অন্যান্য পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম তিস্তার পূর্বপারে ময়নাগুড়ির অদূরে অবস্থিত বটেশ্বর দেউলের বিপুল ধ্বংসাবশেষ। এই ধ্বংসাবশেষটি পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক একাধিকবার পর্যবেক্ষিত হয়। ১৯৬০ সালে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী হিসাবে বর্তমান লেখক সর্বপ্রথম প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই অনন্যসাধারণ দেব-দেউলের প্রতি। প্রস্তরনির্মিত বটেশ্বর দেউলের ভিত্তি-কল্পনা বাহু-সমন্বিত চতুষ্কোণের ন্যায় এবং তার অবয়বে প্রদর্শিত শিল্পসৌকর্য গুপ্তযুগের শেষার্ধে প্রচলিত রীতি ও আঙ্গিকের অনুরূপ। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত দেওগড়ে গুপ্তযুগে নির্মিত সুবিখ্যাত দশাবতার মন্দিরের ভিত্তি-কল্পনাও কতকটা অনুরূপভাবে ক্রুশচিহ্নের মত। এছাড়া, বিপুলকায় কীর্তিমুখ, 'গবাক্ষ' চিত্রণ, পূর্ণ-ঘট, কুবেরমূর্তি ও পদ্মমালাশোভিত স্তম্ভাদিও এক বিশিষ্ট প্রাচীনত্ব দাবি করে। ভগ্নচূড় বটেশ্বর মন্দির কোন অতীত ভূকম্পন অথবা কোন ঝঞ্ঝাবাত্যা কিংবা জাতীয় সংঘর্ষের পরিচয় দেয় কিনা তা' নির্ণয় করা দুষ্কর। একজন বিশিষ্ট পুরা-তাত্ত্বিক এই দেবায়তনকে গৌহাটির নিকট-বর্তী কামাখ্যা মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করলেও স্থাপত্যে প্রদর্শিত শাস্ত্রসম্মত উত্তর-ভারতীয় বিন্যাসকে স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরি-চালিত সমীক্ষার দ্বারা অবশ্যই এমন এক বিস্তৃত তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা'রদ্বারা এই পুরাকীর্তিকে অন্তত পাল-পর্বের আদিযুগে নির্দেশ করা যায়।

ময়নাগুড়ির অদূরে অবস্থিত আরেকটি উল্লেখ্য পুরাকীর্তি জল্পেশ্বর শিবের মন্দির। কিংবদন্তী বিজড়িত এই শৈব পীঠের মাহাত্ম্য ও প্রাচীনত্ব আর্য ও অনার্য সভ্যতার পারস্পরিক সংঘর্ষের পটভূমিকায় স্বভাবতঃই গুরুত্বপূর্ণ। কালিকা পুরাণে

বর্ণিত জল্পীশ লিঙ্গ পূজার প্রবর্তন-কাহিনীটি তাৎপর্যময়। এই পুরাণে উল্লেখ মহারাজ সগরকে সম্বোধনপূর্বক বলেছেন,

"পূর্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতক-গুলি ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিল। তাহারা জল্পীশদেবের সেবা করিত সর্বদা ম্লেচ্ছ ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া এবং আর্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া জল্পীশদেবকে গোপন করিয়া রাখে। হে মহারাজ! তাহারা জল্পীশ দেবের গণস্বরূপ হইয়াছে, অতএব তাহা-দিগের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্পীশ-দেবের পূজা করিবে।"

(বঙ্গবাসী সংস্করণ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত)

অপরপক্ষে, শিবশতনাম স্তোত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, একদা এতদঞ্চল কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই স্তোত্রে দেবাদিদেবের উক্তি "অহং কোচবধূ-পুরে জল্পেশ্বর ইতিরীতিঃ" অবশ্যই তাৎপর্যময়। বিভিন্ন কারণে জল্পেশ্বর পীঠের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। একটি প্রবাদ অনুসারে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অনাদি শিবলিঙ্গ সুদূর অতীতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা জল্পেশ্বর কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। এই শিবলিঙ্গের সন্ধান মেলে এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে। প্রথম মন্দিরটি নাকি তাঁরই কীর্তির পরিচায়ক। এবং বর্তমান মন্দিরের নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কোচবিহারের তৎকালীন রাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে। এই মন্দিরটি একাধিক গম্বুজবিশিষ্ট ছিল বলে এখানে ইসলামীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য-গুলি এমন প্রতীত হতে পারে। কিন্তু এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভুটান-সীমান্তের অদূরে প্রচলিত এই গোম্বুজা-কৃতি 'চূড়া' অথবা 'রত্ন' বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায়ও মর্যাদাজ্ঞাপক হতে পারে। পরবর্তী-কালে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত মধ্যের নলা-কৃতি (cylindrical) গম্বুজটি স্তূপ-স্তম্ভের প্রসারণের সাক্ষ্য দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একদা আদি-মধ্যযুগে বাঙলায় প্রচলিত বৌদ্ধস্তূপ-স্থাপত্য প্রভাবিত করেছে তিব্বতের স্তূপ-পরি-কল্পনাকে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন কোচবিহার ও ভুটান রাজ্যদ্বয়ের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত জল্পেশ্বর পীঠে একটি সুপ্রাচীন দেবায়তনের প্রায় অবলুপ্ত ধ্বংসাবশেষ এবং কতিপয় প্রস্তর-খোদিত বিগ্রহ প্রমাণিত করে এখানকার অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যকে। শিল্পগত বিচারে এই পুরাকীর্তিগুলি পালপর্বের নিপুণ সৌকর্যের সাক্ষ্যস্বরূপ।

জলপাইগুড়ি জেলায় ছড়ানো পাল-যুগের (আদি-মধ্যযুগ) অন্যান্য নিদর্শন-সমূহও উল্লেখ্য। ময়নাগুড়ির সমীপবর্তী সোদরখইয়ে অবস্থিত প্রাচীন দেবায়তনের

জটিলেশ্বর অথবা জটেশ্বর দেউলের প্রাচীন ভিত্তি। উপরের শ্বেত অংশ জীর্ণোদ্ধারের ফলে নির্মিত।

পুর্বদহ, জলপাইগুড়ি জেলা

ধ্বংসাবশেষ উঁচা বাংলার এক বিশিষ্ট সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। প্রস্তর নির্মিত এই মন্দিরের কুলুঙ্গি-সমন্বিত গর্ভগৃহ, তৎসংলগ্ন বারান্দা অথবা 'অন্তরাল' এবং মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে রাজ্যের পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষাকালে। অনুমিত হয় একদা এই মন্দিরেই অথবা তার পরিমণ্ডলে পূজিত হয়েছে নিকটবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত এক সুবৃহৎ চামুণ্ডা-মূর্তি। পাল যুগে খোদিত চামুণ্ডার কটি-সংলগ্ন বৃশ্চিক-চিহ্ন রীতি অনুসারী। অস্থিচর্মসার দেবী স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট 'পেটকাটি মা' নামে পরিচিত।

সোদরখইয়ের দেবায়তনটি হয়ত একদা শৈব ধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক নির্মিত হয়ে-ছিল। মন্দিরের গঠন ও ভিত্তি-পরিকল্পনা অবশ্যই আদি-মধ্যযুগীয় স্থাপত্য-বিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। একমাত্র উৎখনন ও প্রক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষসমূহ (Debris) অপসারণের দ্বারাই এই স্থাপত্য কর্মটির পূর্ণ চিত্র উদ্ধার করা সম্ভব।

জল্পেশ্বরের অদূরে অবস্থিত একটি বিশিষ্ট প্রত্নকীর্তি পূর্বদহের ধ্বংসাবশেষ। এখানে দণ্ডায়মান জটিলেশ্বর অথবা জটেশ্বর শিবের মন্দিরটি নিঃসংশয়ে একটি দর্শনীয় স্থাপত্য। স্থানে স্থানে ভাস্কর্য ও কারুকার্যখোদিত মন্দিরের প্রস্তরনির্মিত নিম্নাংশ যেমন এক প্রাচীন রীতি ও শৈলীর সাক্ষ্য দেয় দেউলের ঊর্ধ্বাংশ তেমন নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক পুনর্নির্মাণের দ্বারা পরিবর্তিত। দীর্ঘদেহ দ্বারপালশোভিত এই দেবালয় যেন কোচ-শিল্পের আদি-পর্বকে প্রতিফলিত করে। জটিলেশ্বর শিব-মন্দিরের চারপাশে বিপুল ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে উল্লেখনীয় একটি প্রাচীনতর প্রস্তরনির্মিত দেবায়তনের বিভিন্ন অংশ এবং ইষ্টকনির্মিত হর্ম্যাদির ভগ্ন-স্তূপ। বিভিন্ন প্রস্তরখণ্ডে খোদিত গবাক্ষ-চিহ্ন দেখে অনুমান করা যায়, প্রাচীনতর দেবালয়টির নির্মাণকাল সম্ভবত পালযুগে। পূর্বদহের ভূগর্ভেও সম্ভবত এক বিপুল ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কিংবদন্তীবিজড়িত পার্শ্ববর্তী পুষ্করিণীটির বারিগর্ভে হয়ত নিহিত আছে অতীতের ঐশ্বর্য।

হিমালয়ের সানুদেশে প্রসারিত চিলা-

নলরাজার গড়ের দক্ষিণ প্রাকারের সুদৃঢ় ভিত্তি। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্ন-তত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত উৎখননকালে গৃহীত চিত্র

চুল্লি-সদৃশ কুলুঙ্গি সমন্বিত পশ্চিম প্রাকারের অংশ। নলরাজার গড়। চিলাপাতা অরণ্য। জলপাইগুড়ি জেলা

পাতা অরণ্যের গভীরে বিরাজিত নল-রাজার গড়ের বিশাল ধ্বংসাবশেষ একদিকে যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরদিকে তেমন দর্শনীয় ও রহস্যময়। জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্য মধ্যে অবস্থিত এই প্রাচীন দুর্গ যে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেকার এক সাংগঠনিক প্রতিরোধ ও সীমান্ত-নীতিকে প্রতিফলিত করে সন্দেহ নেই। গুপ্ত-পালযুগের এই অসামান্য কীর্তি আয়ত পূর্ব জায়তে একক। চতুষ্কোণ ভিত্তি-রেখায় গঠিত নলরাজার গড়ের সুদীর্ঘ ও সমুন্নত প্রাকার এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খিলান, বুরুজ, প্রবেশ-কক্ষ, আভ্যন্তরীণ প্রণালী ও বেষ্টনকারী পরিখা স্বভাবতই এক বিপুল রাজশক্তির সামরিক প্রতিভা ও মর্যাদা-দ্যোতক। উপরের অজ্ঞাত-সংখ্যক ইঁটের সারি বিনষ্ট হলেও এখনও দুর্গপ্রাকার স্থানে স্থানে চার থেকে পাঁচ মিটার উঁচু। উৎখননের ফলে দেখা গেছে এক স্থানে দক্ষিণ প্রাকার পাষাণ-খণ্ডসমন্বিত ভিত্তি-মূল থেকে উচ্চতায় ৭·৫ মিটার (প্রায় ২৩ ফিট)। দুর্গের আভ্যন্তরীণ প্রণালীটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। এই সুবিস্তৃত প্রবাহপথের দুই ধার ঢালুভাবে ইটে বাঁধানো। সিঁড়ি-সমন্বিত এই প্রণালীর দুই ধার ক্রম-অগ্রসারী খাঁজের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। বালুকাগর্ভ প্রণালীটি নিকটবর্তী স্রোতস্বতী বানিয়ার সঙ্গে যুক্ত। স্বভাবতই অনুমান করা যায়, নল-রাজার গড়ে এই আভ্যন্তরীণ প্রণালী অথবা পরিখাটি নাব্য ছিল। নৌকার নিরাপদ অবস্থানের জন্য নির্মিত দুইটি সুরক্ষিত ঘাটও দেখা যায়। একাধারে। এ ছাড়া, দুর্গের পশ্চিম প্রাকারে এক সারি সনল কুলুঙ্গি দেখা যায়। চিমনির ন্যায় নলগুলির গঠন-ভঙ্গি দেখে মনে হয় কুলুঙ্গিগুলি খুব সম্ভব একদা চুল্লি হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিরোধ প্রাকারাদির নির্মাণে লৌহ তিলক সমন্বিত ভারী প্রস্তর-খণ্ডের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এক ব্যাপকতর অনুসন্ধানকার্য ও উৎখননের দ্বারা এখানে হয়ত লৌহ অস্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

নলরাজার গড়ের ইতিহাস অদ্যাবধি রহস্যে আচ্ছন্ন, যদিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে দুর্গের প্রথম নির্মাণকাল গুপ্তযুগে (চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী) হয়ত যখন হূণ ও 'ম্লেচ্ছ' আক্রমণের ফলে একটি সতর্ক ও বলিষ্ঠ সীমান্ত-নীতি প্রবর্তিত হয়। দুর্গ নির্মাণে
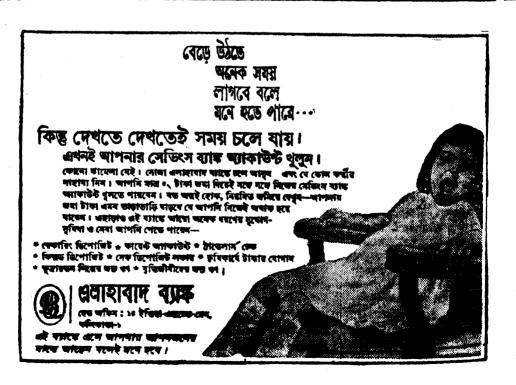
যে বৃহদাকৃতি ইঁট ব্যবহৃত হয় তার প্রচলন অপরাপর স্থানসমূহের মধ্যে ইতিপূর্বে দেখা গেছে পশ্চিম দিনাজপুরে অবস্থিত বাণগড়ে গুপ্তযুগের অধিবসতিস্তরে। এ ছাড়া, নলরাজার গড়ের পূর্ব-প্রাকারের সান্নিধ্যে আবিষ্কৃত একাধিক দেবায়তনের প্রস্তরখোদিত অবয়বসমূহও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক নলরাজার গড়ে ও তার সন্নিহিত বনাঞ্চলে পরিচালিত ব্যাপক অনুসন্ধানকালে প্রস্তর গঠিত একাধিক মন্দিরের ভূলুণ্ঠিত স্তম্ভ, প্রাচীর ও শিখরাদি পর্যবেক্ষিত হয়। অন্যান্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে চিত্রার্ধ রীতিতে প্রদর্শিত কুণ্ডলিত লতাপাশে সঞ্চারিত বিহঙ্গ, বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক 'গবাক্ষ' সমন্বিত প্রস্তরখণ্ড এবং একটি 'ভূমি-আমলক' স্বভাবতই গুপ্ত-পালযুগের প্রতীকবাদ ও কারুচিন্তার সাক্ষ্য দেয়।

নল-রাজার গড়ের প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। একদা-পরিত্যক্ত প্রতিরক্ষা-স্থাপত্যের প্রাকারসমূহে যে সব বিপুল অবয়ব ও সউচ্চ তরুরাজি বিদ্যমান তাদেরও প্রাচীনত্ব স্বীকৃত। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এই প্রতিরক্ষা-স্থাপত্যের প্রথম নির্মাণকাল গুপ্তযুগে হলেও পরবর্তী পর্বসমূহে প্রথমে পালযুগে ও কোচ-সম্রাজ্যের বিস্তারকালেও দুর্গটি যথাযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে শ্রীঅদীশ ব্যানার্জি কর্তৃক নল-রাজার গড়ের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষিত হয়। দুর্গের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শ্রীব্যানার্জি'র (কলকাতার ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্তর্গত পূর্ব-চক্রের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট) মন্তব্য নিম্নরূপ:

"About the builders and the age we still have no evidence, but it might have been the fortified residence of the local mareschal appointed to guard the forest tracts below the foothills of Bhutan, then called Kambojas from 4th century A.D. to 12th century A.D. In the last stage the local Mech people occupied it."

অপর পক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের ধারণায়, দুর্গের গঠন-রীতি, সুবিন্যস্ত বুরুজসমূহ ও প্রবেশ-কক্ষাদির অবস্থান এবং অভ্যন্তরভাগে আনীত নদী-প্রবাহ স্মরণ করিয়ে দেয় চীনদেশে শেনসি প্রদেশে অবস্থিত সুবিখ্যাত চাং আন নগরীর প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনাকে। এখানে জানা যে, চাং আন্-এর বৌদ্ধ শিল্প একদা ভারতীয় শৈলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

বহু শতাব্দীর বর্ষণ ও প্লাবন এবং নিম্ন-হিমালয় ও তৎসংলগ্ন তরাইভূমির পরিবর্তনশীল ভূতত্ত্বীয় বিন্যাস সত্ত্বেও পরিখাবেষ্টিত নল-রাজার গড়ের যে বিপুল আকৃতি আজ বিদ্যমান তা সমগ্র ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ঐশ্বর্যস্বরূপ। ইঁটনির্মিত এমন একটি সুপ্রাচীন ও বিপুলায়তন প্রতিরক্ষা-স্থাপত্য অবশিষ্ট পূর্ব-ভারতীয় ভূখণ্ডে একক। মধ্যযুগে বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক পরিচালিত তিব্বত-অভিযান এবং চীন সম্রাট কুব্লাই খান প্রেরিত মোঙ্গোল সেনা-বাহিনী কর্তৃক বঙ্গ (বাংলা) ও 'মিয়েন' (ব্রহ্মদেশ) আক্রমণের ইতিহাসের সঙ্গে বিজড়িত পূর্ব-হিমালয় পরিমণ্ডলের গুরুত্ব নিঃসংশয়ে অসাধারণ।

বিভিন্ন নদ-নদীবিধৌত এবং স্থানে স্থানে নিবিড় বনানীর দ্বারা আবৃত জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তিসমূহ আজও অবহেলিত কিংবা অরণ্যের গভীরে অথবা ভূগর্ভে বিলীন। ব্রিটিশের শাসন-কালে ও তার অব্যবহিতকাল পরে সমগ্র ভারতে যখন প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা অগ্রসরমান তখনও এতদঞ্চলে কোনও বিশিষ্ট প্রকল্প গৃহীত হয়নি। উপরে বর্ণিত পুরাকীর্তি-সমূহ ছাড়া এই জেলার আরও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত অথবা পর্যবেক্ষিত হয়েছে অতীতের নানা ধ্বংসাবশেষ ও বিশিষ্ট শিল্প-নিদর্শন। ঐতিহাসিকগণের ক্রমান্বয় প্রচেষ্টায় ও বিশেষত রাজ্যের পুরাতত্ত্ব অধিকারের উদ্যোগে পরিচালিত অনুসন্ধানসমূহের দ্বারা অতীতের যে
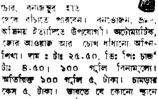
আলেখ্য আজ উদ্ঘাটিত তার পূর্ণতর রূপে আবিষ্কৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠপুর ও চিলাপাতা অরণ্যের রহস্য এবং তিস্তা, মহানন্দা, তোর্শা, কালজানি, রাইডাক ইত্যাদি নদীসমূহের দুই তীরে প্রসারিত উদার প্রান্তর ভূমিগুলির ঐতিহ্য প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহলকে জাগ্রত করবে সন্দেহ নেই। পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত অরণ্য ও শৈলাঞ্চলেও আবিষ্কৃত হয়েছে একটি উল্লেখ্য পাল-ভাস্কর্য ও প্রাচীন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পাল-শৈলীতে খোদিত ভাস্কর্যটি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সাহচর্যে দণ্ডায়মান বিষ্ণুর। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত এই মূর্তির পদতলে কোন এক "শ্রীযশকুমার"-এর নাম উল্লিখিত আছে। এই নিদর্শনটি আবিষ্কৃত হয় দেওমাণি কৃষ্ণপুরে। অপর পক্ষে, পূর্বোল্লিখিত স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষটি আবিষ্কৃত হয়েছে ভীমপাহাড়ের অরণ্যাবৃত শিখরে। হয়ত এই ধরনের বিভিন্ন জনহীন স্থানে নিহিত আছে বিগত কালের আরোও হারানো ঐশ্বর্য ও স্মৃতি-চিহ্ন।

ড্যান্সিং ফ্লাওয়ারস —মাধব ভট্টাচার্য

(২৫৩) ও পৃথ্বীশ শিকদারের পেণ্টিং ২ (২৯৭)-এর নাম করা যায়।

বহিরাগত শিল্পীদের রচনা নিদর্শন রাখা হয়েছে দক্ষিণ দিকের গ্যালারীতে। রঙের দিক থেকে এগুলি উজ্জ্বলতর, রীতির দিক থেকে আধুনিক, যদিও দু'একটি নিদর্শন ঠিক রসোত্তীর্ণ নয়। এখানকার কয়েকটি গ্রাফিক প্রিণ্ট ও বিশেষ করে প্রতীকমূলক কয়েকটি ছবি চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে এম সেনাপতির সিমবলস (২৮৮), ডি দেবরাজের জুন ৭০ ২ ও শ্যাম শর্মার কমপোজিশন-বি (২৯৪)-এর নাম প্রথমেই করা উচিত। প্রথমটির প্রতীক অবলম্বনে রচিত সুসম্বদ্ধ কমপোজিশন ও কারুকার্য, দ্বিতীয়টির বিমূর্ত আকার ও পরিকল্পনা এবং তৃতীয়টির (উডকাট) প্রতীকপ্রধান আকার লক্ষণীয়। পরিকল্পনা ও রঙ ব্যবহার কৌশলের জন্য শৈল চোয়াল-এর পরোনী বতনও অনেকের ভাল লাগবে। অপরাপর ছবির মধ্যে ৩০৪, ১৮১, ২৫০ ও বিশেষ করে ১৭৫নং উল্লেখ্য। মধ্যকার গ্যালারীতে প্রবীণ খ্যাতনামা শিল্পী অতুল বসুর আঁকা প্রতিকৃতি, কয়েকটি স্টাডি ও নিসর্গ দৃশ্য, গ্রাফিক প্রিণ্ট ও বিমূর্ত ছবি দেখা যায়। সুতরাং এখানকার নিদর্শনগুলি মিশ্র জাতীয়। প্রথমেই পরলোকগত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের দুটি বড় ড্রয়িং—বিশেষ করে বুল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বলিষ্ঠ অনন্য নিদর্শনটি দেখে পরলোকগত শিল্পীর আপন প্রতিভার পরিচয় মেলে। এর পরেই চোখে পড়ে মৃন্ময় মুখার্জির ড্রয়িং-এ, পি টি রেড্ডির রচনাধারার কিছু সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এটি বলিষ্ঠ কাজ। এই সঙ্গে আরও দুটি, ৭২ ও ১৭৩ নং কালিকলমের ড্রয়িং-এর নাম করা যায়। কমপোজিশন হিসাবে অপূর্ব সাহুর গসিপ অন দি টি টেবল-এর নাম করা উচিত মনে করি। গ্রাফিকের মধ্যে শর্মিলা রায়ের নীল রঙ ও আকার প্রধান উডকাট (২৬৮) ও গোপাল দে-র ওল্ড অ্যান্ড ব্লাইণ্ড (লিথোগ্রাফ, ১১৮) উল্লেখ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে ২২০, ১৭৫, ১৩৩, ৫৭ ও ৫৮ নং ছবির নাম করা যায়। দক্ষিণ দিকের নতুন গ্যালারীতে ভারতীয় রীতিতে আঁকা অনেক নিদর্শন দেখা যায়। দুটি প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঞ্জয় সেনগুপ্তের সোনার বাংলা (২৮৭) ও শৈল চোয়ালের হুই পধারেগা (৮২)। নীল ও সবুজ রঙ প্রধান প্রথম রচনাটি কারুজাতীয়—ছোট ছোট চির-শ্যামল লতাপাতা, পায়রা, ফুল ও ছোট্ট মেয়ের কচি মুখ অবলম্বনে রচিত প্রতীক-মূলক ছবির মধ্য দিয়ে শিল্পী সোনার বাংলার চিরপরিচিত শাশ্বত শ্যামসুন্দর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয়টিতে শিল্পী নতুন পদ্ধতিতে মিনিয়েচর ধারার সঙ্গে আধুনিক কমপোজিশন রীতির অপরূপ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রশান্ত রায়ের দুটি নিদর্শন চমৎকার—ইতিপূর্বে অনেকেই দেখে থাকবেন। রামানন্দ ব্যানার্জীর দুটি নিদর্শনের মধ্যে লোকচিত্র ভিত্তিক পটুয়া জাতীয় টাইম অ্যান্ড দি লিসনার অনেকের ভাল লাগে—অপরটি স্বরভেদ রীতির বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। আর একটি ছবিরও নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়—বঙ্কিম ব্যানার্জীর ফ্রুট অ্যান্ড এলিয়েনেশন (২২)। অন্যান্য ছবির মধ্যে ইন্দু দুগারের মহাবলীপুরম (১৩০), ৪৪, ৬০ ও ১০৭ নং বাটিক রচনা উল্লেখ্য।

ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির মধ্যে বৃহদাকার কোনও নিদর্শন চোখে পড়েনি। প্রায় সকলেই সমকালীন গঠনপদ্ধতি অবলম্বনে কাজ করেছেন—দু'-একটি নিদর্শন বিশেষ-ভাবে চোখে পড়ে যায়—যেমন, ফুলচাঁদ পাইনের হেড (২৪৫) ও মাধব ভট্টাচার্যের ডান্সিং ফ্লাওয়ারস (৪০)। প্রথমটি পরি-কল্পনা, ও বিশেষভাবে পজিটিভ ও নেগেটিভ ফর্মের সমন্বয়সাধনের দিক থেকে উল্লেখ্য সৃষ্টি। দ্বিতীয়টি রেখা ও ছন্দ-প্রধান। সরু বাঁকানো লোহার রড ও ছোট ছোট বাটির আকারে তৈরি বিশেষ বস্তু সুকৌশলে-ভাবে সাজিয়ে ভাস্কর শিল্পী এটিতে সাবলীল একটি গতিবেগ সৃষ্টি করেছেন। ইণ্টারলকিং ফর্মের দিক থেকে মিলন ভট্টাচার্যের জয় বাংলা অনেকের চোখে পড়ে। কুণাল সাহার জিরো (২৭২) ও একটি সুন্দর সৃষ্টি, বিশেষ করে নিম্নাংশের ছিদ্র সৃষ্টি করে ভাস্কর চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। মিলন ভট্টাচার্যের মাস্ক অ্যান্ড এ বল-ও পরিকল্পনার দিক থেকে উল্লেখ্য। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে অতুল বড়ুয়ার টুইন ব্রাদারস (২৩), অনিলা জ্যাকবের উডম্যান (১৫৭) নরেন পালের মেটাল স্টিলস (২২৫), টি রামালিঙ্গমের ইনটিউশন (২৪৯) টি স্বামীনাথানের মিউটিলেশন (৩০৫) ও বিশেষ করে এস নন্দগোপালের ক্লাইডার (মেটালসীট—২১৮) উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীটি ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত খোলা থাকবে।

চিত্রপ্রিয়

হেড —ফুলচাঁদ পাইন

শ্রীমতী প্রেম ভাটনগর
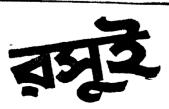
বাণিজ্যে

তটা আশা করিনি। নারী নিত্যনতুন ভূমিকায় সার্থকতা লাভ করছেন। তবু দিন কয়েকের যে দিকটা বহির্বাণিজ্য export সে ক্ষেত্রেও মেয়েরা এমন আত্ম-প্রত্যয়ে এগিয়ে এসেছেন। দিন কতক আগে ইন্সটিটিউট অব ফরেন ট্রেডের একটি orientation course-এ এসেছিলেন যাদের হস্তশিল্প রপ্তানীর ব্যবসায়ী তাঁরা। তাঁরা দেশের ভাগেই নতুন যুগের এক। ঝকঝকে দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতবর্ষের অঞ্চলের হস্তশিল্প নিয়ে এক দিন আলোচনা হলো। আমরা পূর্বাঞ্চলের লোক। তাই গিয়েছিলাম সেই বিশেষ দিনে। মেয়েরা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল দেখে যে, মেয়েরা কেমন সপ্রতিভ সমাসীন সে সভায়। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিলেন শ্রীমতী প্রেম ভাটনগর। লক্ষ্ণৌ-এর হজরৎগঞ্জে মস্ত তাঁর পুতুলের দোকান। রপ্তানী শুরু করছেন ধীরে ধীরে। ভারতীয় পুতুলের বাজার বাইরে বেশ আছে। আর একটি মেয়েকে দেখলাম। কটক থেকে। লীলা দাস। লীলা কাজ করেন সেখানকার সরকারী এম্পো-রিয়ামে। এবার রপ্তানী ব্যবসায়ে নামবেন। হস্তশিল্প রপ্তানি।

রপ্তানি ব্যবসায়, বিশেষ হস্তশিল্প রপ্তানীতে মেয়েরা আগ্রহশীল অনেক দিন থেকে। তবে অত্যন্ত অল্প। এ-কোণে ও-কোণে এককভাবে কাজ করতেন। তাকে মেয়েদের সফলতার বা গোষ্ঠীর নিদর্শনস্বরূপ বলা চলে না। শ্রীমতী রেণু মল্লিক এলাহা-বাদের অভিজাত সংসারের মেয়ে। তিনি এখন বড় এক হস্তশিল্প ব্যবসায়ের export ম্যানেজার। দু-চারজন মহিলা সম্পূর্ণ নিজের ব্যবসায়ে বেশ সাফল্য লাভ করেছেন। তবু ওই এক কথাই বলব। আজকের লক্ষণ নতুন, আজকের পরিবেশ ভিন্ন। হস্তশিল্প রপ্তানীতে মেয়েরা আনন্দও পাবেন প্রচুর।

হস্তশিল্প যন্ত্রদানবের তাণ্ডব নয়, মানুষের প্রাণের আবেদন। সে আবেদনেও মেয়েরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে প্রাণের সাড়া আসে তাঁদেরও হাত থেকে।

হস্তশিল্প কি? ভারত সরকার কাজের সুবিধা হিসাব করে হয়তো হস্তশিল্প বা handicrafts এবং তন্তুশিল্প বা hand-loom-কে আলাদা দপ্তরভুক্ত করেছেন। কিন্তু হস্তশিল্প সবই। হাত দুখানা দিয়ে যা সৃষ্টি হয়, যে শিল্পকৌশল ধরা দেয় কারিগরী রচনায় তাই তো হস্তশিল্প। আমাদের আলোচনার জন্য হস্তশিল্পের ব্যাপক অর্থই ধরে নিলাম। রপ্তানীর কাজে রেশম থেকে নিয়ে ঢোকরা পুতুল, মধুবনী

বামে শ্রীমতী লীলা দাস

চিত্র থেকে আরম্ভ করে খাদির হাতে বোনা সবই হস্তকলা। যন্ত্র যেখানে যায় না, অন্তত দানবীয়তায় গ্রাস করে না মানুষের অন্তরকে, হাতের নিপুণতায় গড়ে ওঠে রূপ এবং তার ব্যবহার তাই handicraft।

ভারতবর্ষের হস্তকলা জগতের পরম আদরের জিনিস। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যান্ত্রিক সভ্যতার যাতনায় জর্জরিত পাশ্চাত্ত্য-সমাজ হাত পেতেছে আজ ভারতের কাছে। দরিদ্র ভারত, বিপর্যস্ত, সমস্যাসংকুল ভারত এখনও ঐতিহ্যে ভরা। কি সে ঐতিহ্য। আত্মিক চৈতন্যময় সত্তার সমাদর ভারতে এখনও মানুষ ভোলেনি। হিপির দল যে হাত বাড়িয়েছে তা নয়, সবাই চায় সত্তার স্পর্শ। দেখুন, ফ্যাশনের দুনিয়া পর্যন্ত মেতে উঠেছে হস্তশিল্পের কোমল স্পর্শের লোভে। এই এক মস্ত সুযোগ। ফ্যাশনের হাওয়া কবে কোন্ দিকে বয় বলা যায় না। এখনই হস্তশিল্পকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াসের পর্ব সমাধা করার শুভক্ষণ।

বিদেশে রপ্তানীর বাজারের হিসাব হয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের হারে। গত দশ বছরের তালিকায় হস্তশিল্পের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বেড়েছে দ্রুততালে। ১৯৬০ সালে সাত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ১৯৭০-৭১ সালে হয়েছে ৮০·৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। ১৯৬৯-৭০ সালে আরও বেশী ছিল, ৮৩·২৯ কোটি টাকা। এ নিম্নগতি রোধ করা বাঞ্ছনীয়। সেখানেও মেয়েদের প্রকাশ শত সম্ভাবনাময়। হস্তশিল্পের ক্রেতা বিদেশেও মেয়েরাই বেশী। তাঁদের পছন্দ কোথায় তাও সন্ধানী নজরে মেয়েরাই সহজে বুঝতে পারবেন। বিদেশে বিদেশী মাত্র নয়, ভারতীয় বন্ধু

দেশে ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের কেনাকাটায় ভারতীয়তা আজও ভরে আছে। ফিজি থেকে মরিসাস্, ট্রিনিড্যাড্ থেকে নাইরোবি সর্বত্র ভারতীয় মেয়ে শাড়ি থেকে নিয়ে কাঁসার থালা-বাটি পর্যন্ত কিনবার জন্য ব্যাকুল। সেখানেও আমাদের মেয়েরা ভাল বুঝবেন তাঁরা কি চান। ঘর সাজাবার জিনিস বা সাজসজ্জার সরঞ্জাম, গজদন্তের বাহার বা কার্পেটের কদর আমাদের মেয়েরা জানেন কোথায় কোথায় ধরা দেয়। প্রয়োজন তাঁদের ব্যবসায়ের নিয়মগুলি আয়ত্ত করা। এক দিকে হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট বোর্ড ইত্যাদি, অপর দিকে রপ্তানীর শিক্ষালাভের জন্য নানা প্রতিষ্ঠান তো আছেই, তার উপর আছে আপন অধ্যবসায়। সরল রেখাই সবচেয়ে হ্রস্ব রেখা। বাজারে বা উৎপাদনক্ষেত্রে সর্বত্র ব্যক্তিগত যোগাযোগ যদি ব্যবসায়ে অগ্রণী শিল্পীরা রাখতে পারেন তবে কুফল হবেনাই। গলদ সেখানেই বাধে বেশী। মধ্যস্থ বা 'মিডিলম্যান' মারফত ব্যবসায়ের যুগ চলে গেছে। আমাদের হস্তকলার শিল্পীরাও একান্তভাবে পল্লীর মানুষ। ব্যবসায়ের হের-ফেরের কাছে হার মেনে কত শিল্পী হয়রান হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য জীবিকায় সরে গেছেন। শুনেছি, ঢোকরা পুতুল যে আদি-বাসীর শিল্প, তারা বাংলা থেকে ওড়িশা হয়ে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। শিল্পকে তারা সম্মান করে কিন্তু অভাবের তাড়নায় কখনও বা রিক্‌শা টানে, কখনও চোর-ডাকাতের প্রলোভনে বিপথে যায়। এমন যে শিল্প, তার তিং মেয়েরা করতে পারেন।

শুনেছি ওড়িশার জালির কাজের অলংকার একদিন আরব ব্যাপারীর দৌলতে ইউরোপের দরবারে হাজির হয়েছিল। অনুকরণের ধুম পড়ে গেল। ফলে জালির কাজের অনুরূপ নমুনা ছেয়ে নরওয়ে বা সুইডেনে মেলে। কিন্তু ওড়িশার জালির কাজে ছোট্ট ছেলেরা যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রূপসৃষ্টি করে, সে হাতের স্পর্শ না পেয়ে অনুকরণ, কাশ্মীরী শালের অনুকরণে যেমন পেইজলী শাল ইউরোপকে সান্ত্বনা দিয়েছিল, তাই দাঁড়ালো। শ্রীমতী লীলা দাসের সঙ্গে সে কথাই হচ্ছিল। ক্রেতা যখন বিদেশী, তখন তারা চাইবে ভারতীয়তা। টেক্‌নলজির টেক্কা নয়। অনু-করণের বাতুলতাও নয়।

একটি নিবেদন ব্যক্তিগতভাবে করতে চাই। ব্যাপারী মেয়েই হন আর পুরুষই হন, যখন মাল যাবে বাইরে তখন পণ্যের মান যেন খাটো না হয়। আমাদের ইজ্জতের প্রশ্ন তো আছেই তার উপর আছে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যাবার ভয়। পয়সা-ওয়ালা খদ্দের সর্বদাই খুঁতখুঁতে বেশী। তারা চট্ করে যেমন কিনতেও পারে, তেমনি সন্দেহ হলে একেবারে বিরূপ হতেও পারে। আমাদের মাল সম্বন্ধে এ মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রে শুনেছি। আমরা মান খোয়া ফেলি। এমনিতেই হস্তশিল্প Folk Art বা লোককলা। যন্ত্রের একত্রীভূত উৎপাদন নয়। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র-ভাবে রচনা করবার জন্য অনেক ধৈর্য, অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। তার উপর যেন রাতা-রাতি বড়লোক হবার বাসনায় পথভ্রষ্ট কেউ না হয়। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, কারণ বাজার এখানে বিশ্বব্যাপী, খদ্দের প্রভেদ উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখেন এবং প্রতি-যোগীর অভাব নেই। মেয়েদের পক্ষে নতুন কর্মক্ষেত্র। সজীব করে তুলুন নিষ্ঠা দিয়ে।

শ্রীমতী

সেই বহতা নদীর ধারে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এই লোকটাকে ঠিক কবে থেকে গুরুজী বলে শুরু করি, মনে পড়ে না। হয়তো আমি নিজেই এই সম্বোধনের শব্দটি খুঁজে বের করিনি। অন্য কেউ করেছিল। হয়তো আমার খেলাসঙ্গী কোন রাখাল কবে বলে উঠেছিল, ওই তুমার গুরুজী যেছে ... তখন হয়তো সে অদূরে বিলের বাঁওড়ে ছিপ আর মাছ রাখা 'খালুই' হাতে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিল, মাছ ধরার জোর [illegible] দিন তার, কার্তিকের হলুদ মাঠের ওপর তখনও সেই সকালে নীলচে কুয়াশা দুলছে, বিলের জলকে উথালপাথাল করছিল ঝাঁকে ঝাঁকে জলহাঁস, এবং কখনও বন্দুকের শব্দ, হাওয়ায় কিছুক্ষণ বারুদের পোড়া গন্ধ, সিংহীবাড়ির বড় ছেলে মটরসাইকেলে দৌড়ুতে দেখা যাচ্ছিল, তখন সে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবছিল বিলের জলে আহত জলপাখি নির্ঘাৎ লুকিয়ে থাকবে—বস্তুত সেই যেন একটা দারুণ আশা-আকাঙ্ক্ষার সময় সেই পাড়াগাঁয়ের আদিম পৃথিবীতে, আর আমি বন্দুকের শব্দ জলহাঁসের চিৎকার হলুদ মাঠের কুয়াশার ভিতর কী আবেগে ডেকে উঠেছিলাম, গুরুজী—হে-ই...ই...ই!

নাকি এই সম্পর্কদ্যোতক চমৎকার আর সম্ভ্রান্ত শব্দটির জন্যে দায়ী আমার আম্মা। মৌলানাপত্নী এই বৃদ্ধা মহিলা কতবার আমার পিঠ বাঁচাতে মিথ্যে বলতেন ইস্কুল নেই। স্কুলে যাবার ছলে সারাটা দিন এই লোকটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। দূরের বিলে কখনও তো ছুটির ঘণ্টা বাজেনি, আজও বাজে না—কিন্তু সেখান থেকেই সতর্ক কানে শুনে নিতাম গ্রামপ্রান্তের অমলধবল স্কুল দালানে বানাইদা বেয়ারা ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ঢং ঢং ঢং। লোকটাকে ছেড়ে এক্ষুনি চলে যেতে হচ্ছে বলে আমার বড় কষ্ট হত। জল ছুঁই-ছুঁই ফাঁড় ঘাসের ধারে দাঁড়িয়ে সে প্রাজ্ঞ কথকের মতো ধূসর চোখে আমার দিকে তাকাত। তার ঠোঁটে থাকত সামান্য হাসি। সে বলত, চলে যেছ? হুঁ, যাও। কী করবে—ভদ্দলোকের ছেলা। এবং এ কথায় আমার কষ্টটা বেড়ে যেত। কেন আমি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে জন্মেছি? কেন আমি নিরবধিকাল মাঠ-বিল-জল-জঙ্গলের সনাতন দুনিয়ায় তার মতো অবাধ ঘুরে বেড়ানোর ছাড়পত্র পাইনি? ফাঁড়ঘাসের ডগায় ওই সব ধীরগতি সতর্ক শামুক, জলের দামে নীল কানকুটোরি পোকারা, বাবলা ডালের বাঁশপাতা পাখিটা, দূরের টিটি পাখি—যার জোড়াটাকে মটরবাবু মেরে ফেলেছিলেন বলে কদিন থেকে টিঁ টিঁ করে সারাক্ষণ উড়ে-উড়ে কাঁদছিল, সবাই কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। অন্তত আমার মনে হয়েছে তাই। মনে হয়েছে, বড্ড কিছু, এবং কাদের সব ছেড়ে

যেতে হচ্ছে—অতঃপর ভদ্রলোকের জগতে আমাকে ঢুকে পড়তে হবে, সামনে-পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি বই মাসিকপত্রিকা, আসবাবপত্র, রান্নাবান্নার সতেজ গন্ধ, কোরান পাঠরতা ঠাকমার পুণ্যের খতায় ফের একটি ঢ্যারা দ্যায় 'ফেরেশতা' (দেবদূত)—যেহেতু মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে তিনি মৌন হাসেন এবং বেগতিক দেখলে মিথ্যা বলতে প্রস্তুত হোন... আঃ জঘন্য, জঘন্য! বাবা হঠাৎ চাপা গর্জে ওঠেন, স্কুলে ছিলি মিথ্যুক কোথাকার? রবি সেখের ছেলে এইমাত্র বলে গেল তুই ওই শয়তানটার সাথে বিলে ঘুরছিলি। ঠাকমা বলেন, না—না। আমি তো দেখলাম স্কুলের মাঠ থেকে বাড়ি আসছে—খিড়কিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম না? তারপর ঘোর তর্কাতর্কি ওঁদের। রাত-দুপুরে ঠাকমা কানে কানে বলছিলেন, কী পাস লোকটার সঙ্গে বেড়িয়ে? কেন ওর সাথে ঘুরিস বাছা? আমি ন্যাকা সেজে বলি, কার সাথে? নাকি তখনই ঠাকমা বলেছিলেন, কেন—তোর গুরুজী নাকি লোকটা? কী মন্তর দিয়েছে রে কানে? ......

রাঢ় বাংলার দারুণ গ্রীষ্মের বিকেলে পশ্চিমের আকাশ কালো করে ঝাঁপিয়ে এসেছে কালবোশেখি। বিলপ্রান্তে অপার তৃণভূমির কাশকুশব্যানার ভিতর দুজনে দৌড়চ্ছি একটা বটগাছের দিকে। মাঝপথে এসে পড়ল ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। তাল-পাতার ছোট্ট ছাতিটা পিঠের দিকে ঠেলে হুমড়ি খেয়ে সে বসল ঘাসের ভিতর। আমি তার বুকের কাছে থরথর করে কাঁপছি। চার-পাশে যেন হাজার হাজার সোনালী মোষ গাঁক গাঁক করে শিঙ নাড়তে নাড়তে দৌড়ে যাচ্ছে। তাদের ক্ষিপ্ত ক্ষুরের আঘাতে, শব্দে, আলোড়নে ভেঙে পড়ছে তৃণভূমির আদিম পৃথিবীটা। বিধ্বস্ত নিসর্গের বুকের ওপর, এর পর যখন সন্ধ্যা নেমে এল, বিষণ্ণ শান্তি পান্ডুর আলোয় চারপাশে থমথম করতে থাকল, লোকটা আঙুল তুলে দেখাল ঠিক কী কী ঘটেছে। সে করুণ ক্লান্ত চোখে মহাভারতের ভীষ্মের মতো তাকাচ্ছিল: কুরুক্ষেত্রের মাঝখানে যেন সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখতাম, কোথাও একটা মরা খেঁকশিয়াল, আহত হট্টিটি পাখি, কোথাও ভাঙা ডিম, ছেঁড়াখোঁড়া বাসা, ভিজে সাপের খোলস....কত কিছু। মাটি থেকে, ঘাসখড় থেকে, গাছপালা থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ উঠত। সব আলো মুছে গেলে বিশাল আবাদী মাঠের পথে আসতে আসতে হঠাৎ পিছনে ঘুরে সে একবার দেখে নিত তৃণভূমিটা। দূরধূসর দুর্গম আর রহস্যময় কালো রঙের সেই ব্যাপকতায় যেন কিছু ফেলে এল সে। আমিও কি ফেলে এলাম না? তা না হলে কেন এই বিষণ্ণতা!

তা হলে বলা যায়, লোকটা সত্যি সত্যি আমার কানে গুরুমন্ত্র দিয়েছিল। তার, বস্তুত সেই ছিল আদিম নিসর্গসঞ্চারী আবহমান জগতের একটি ছোট্ট পাঠশালায় আমার গুরুমশায়। আমি ছিলাম এক নিবিষ্টমনা পড়ুয়া। সে আমাকে শিখিয়েছিল, মানুষে আর প্রাণীতে আসলে কোন ভেদ নেই। সে বলেছিল, ওই গাছটারও ভাষা আছে। সে বলত, এই মাঠটো—মাঠটো যেন কথকঠাকুর। খরা বর্ষা শীত—বারো মাস সে বারো রকম গপ্প বলে। কান থাকে তো শুনে লিও হে!

কার্তিকে দ্বারকা নদীর জল পাড় ছুঁয়ে ছলছল বয়ে গেছে। মধ্যরাতে বাঁশবনের শীর্ষে সবে উঠে এসেছে ভাঙা চাঁদ। ফিকে জ্যোৎস্নায় দীর্ঘ বিশাল শরীর তার ছায়ার মতো আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কোথাও রাতচরা পাখিরা ডেকেছে। বাঁওড়ের দিকে শেয়ালেরা চিৎকার করেছে। সেই নির্জন ছমছমে স্তব্ধতার ওপর হঠাৎ কিছু চকিত নখের আঁচড়, ফের অগাধ শান্তি, কথা বলতে ইচ্ছে করে না তখন, বাঁশপাতা থেকে শিশির ঝরছে ধারাবাহিক, আস্তে আস্তে সে নিঃশব্দে হেঁটে গেছে নদীর দিকে, আমিও অনুসরণ করেছি তাকে, ছলছল জলে এখানে ওখানে বোয়ালধরা বঁড়শিতে বেঁধা চ্যাং-মাছগুলোর যন্ত্রণায় ছটফটানি সমানে শোনা যাচ্ছে, সে একটু কেসে বলছে—ধ্যুৎ! কী হবে! ইটো পাপ।

প্রশ্ন করেছি, কী পাপ গুরুজী?

সে একটু হেসেছে। নরম জ্যোৎস্নায় তার দাঁত চকচক করেছে। সে বলেছে, জানের (প্রাণের) কোন ফারাক নাই। সব্বাই সোমান।

বুঝতে পেরেছি, সে টোপের মাছ-গুলোর কথা বলছে। হ্যাঁ, এমনি স্পর্শকাতর তীব্র অনুভূতিশীল ইন্দ্রিয়ের অধিকারী ছিল সে। তবু সে মাছ ধরতে বেরোত। ফাঁদ পেতে পাখিও ধরত। কারণস্বরূপে সে তার থ্যাবড়া হাতে প্রকান্ড রোমশ পেটটা খামচে বলত, ইটো বড় শয়তান হে! আমাকে মানুষ হতে দিলে না!

তখন আমি বালক, সে ছিল যুবক। আজ সে প্রৌঢ়ত্ব পেরোচ্ছে, আর আমার জীবনে মধ্যযৌবনের খর সূর্য সুতীব্র জ্বলছে। তার দাহিকাশক্তির প্রদাহে, নাকি সেই 'ভদ্রলোকের জগতে' এক ভয়ংকর সময়ের শ্বাসরোধকারী চাপে আমি হাঁসফাঁস করছি! আমার গুরুজী সারা ছেলে-বেলা যে জীবনমৃত্যুময় অবাধ বহতা নদীর ধারে-ধারে সাথে নিয়ে ঘুরেছিল, তার কোন তাৎপর্যই স্পষ্টতঃ আর ছিল না। আজ আমার কাছে জীবন আর মৃত্যুর ফারাক খুব স্পষ্ট। এখন আমার কাছে আদিমতা আর সভ্যতার সীমান্তরেখাও ভীষণ উজ্জ্বল।

আর সেই হেতু গুরুজী কালে [illegible] একেবারে [illegible]. সে আমার কাছে এখন নিতান্ত নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে একটি লোক—কিছু পরিমাণে আহম্মক, জড়বুদ্ধি। সত্যি বলতে কী, আগের মতো তার সাথে নিবিড়-ভাবে কথা বলাও আমার পক্ষে অসম্ভব—অতীত দুষ্কর্মের জীবন্ত স্মৃতি যেন সে। শহর থেকে গ্রামে গিয়ে অনেকবার তার সাথে দেখা হয়েছে। তাকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছি। নেহাৎ বলেছি, এই যে, কী খবর? ভালো আছো তো? সে পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার সেই চিরকেলে ধূসর চোখ দুটোয় অবিকল প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছি আমার ছেলেবেলার আদিম আকাশ, ছলছল নদী, কার্তিকের ক্ষয়া-ভাঙা চাঁদ, পাখির পালক, ডিমের খোলস, জলহাঁসের পায়ে পাখনায় জলভাঙার কলকল ধ্বনিপুঞ্জ। দেখেছি সেই সব মনে-পড়া মুহূর্তগুলো—অনেক অনেক জন্মের জীবনযাপনের টুকরোটাকরা স্মৃতি, কোটি বছরের বহমান প্রাণধারার এক সমান্তরিতে আমি... অথচ শামুকের খোলের মতো নিটোল সোনালী আর মসৃণ আমার মধ্য-যৌবনের নাগরিক জীবন আমাকে [illegible] তেমনি একটি পলকে টেনে গুটিয়ে ফেলেছে নিজের মধ্যে। সেখানে আজ ভিন্ন [illegible]। গড়ে উঠছে দিকপ্রসারী নগর ও বন্দর, সুউচ্চ স্কাইস্ক্র্যাপারের শীর্ষে নকল নক্ষত্র-পুঞ্জ, জটিলতম যন্ত্রলোকে [illegible] বহু শক্তিরশ্মি, রোবোটেরা লম্বা পা ফেলে ঘোরে, নভশ্চর যাত্রা করে গ্রহকণিকাদের উদ্দেশে এবং আমার পোশাকআসাকে একটা নিপুণ দূরত্বের আভাস, শরীরের চামড়ায় আর ঘাম জাগে না। আমার কণ্ঠস্বরেও [illegible] মার্জনার পরিচয়। আমি তাকে [illegible] চাইনে। সে হাত ধরবার চেষ্টা করে বলে, কথা আছে—অনেক কথা। আমি বলি, বেশ তো। সময় করে শুনব'খন।

চলে আসার দিন বাসের অপেক্ষায় হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ [illegible] সে হনহন করে আসছে। বাসটাও ঠিক সময়ে এসে পড়ে। সে দৌড়ে [illegible] পাদানিতে পা রেখে মুখ ফিরিয়ে দেখি তার ধূসর চোখ দুটো ফের প্রতিবিম্বিত করছে আমার অতীতকালকে। বলি, সময় হল না—ফের আসব তখন......

সে বলেছে, চিঠিতে সব বলা যে যায় না। নৈলে চিঠিই লেখাতাম।

টের পেয়েছি, সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে একইভাবে। তার দাবির বোঝা এসময় হয়তো ক্লান্ত করবে তাকে। সে আক্ষেপ করে বলবে, ছেলেটা—এই ছেলেটা কেমন চলে গেল হে!

কিন্তু কী কথা থাকতে পারে তার? ভেবে দেখেছি। হয়তো কিছু টাকা চাইবে। বয়স হয়েছে। ক্ষিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। এ সময় মানুষের পক্ষে টাকাটা ভারি জরুরী। তাই তো! কিছু টাকা দিয়ে এলেও পারতাম... পরে ঠিক করে নিই এরপর তাই করব। বরং,

উঠত। আহা, বেচারা বড় কষ্ট পাচ্ছে ওখানে।

এর কিছুদিন পরে মা এলেন আমার খোঁজে। যাবার আগে চুপিচুপি মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললাম, টাকাটা আমার গুরুজীকে পৌঁছে দিও। বেচারা সেদিন আসবার সময় কান্নাকাটি করছিল।

মায়ের চোখে ভর্ৎসনা ফুটে উঠল। বললেন, ওকে তুই টাকা দিচ্ছিস। দুদিনেই তো গাঁজা খেয়ে ফুঁকে দেবে।

সে একটা পাঁড় গাঁজাখোর আমি জানি। সত্যি বলতে কী, এ ব্যাপারেও সে আমাকে দীক্ষা দিয়েছিল যথারীতি। শীতের শেষে বিল শুকিয়ে গেলে সেখানে নানান গাঁয়ের ভূমিহীন লোকেরা বোরোধানের চাষ করত। গ্রীষ্মে সেই ধান কাটার মরশুম। দিনে রোদের তাপ চড়া বলে রাতে দল বেঁধে তারা ধান কাটতে নামত। আমার গুরুজীও ছিল তাদের একজন। আর, সেইসব চমৎকার রাতে কাটা ধানের পাঁজার ওপর শুয়ে আমি নির্মল আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতাম। ধানকাটার খস খস শব্দ হত অন্ধকারে। শনশন করে বাতাস বইত। অস্পষ্ট ভেসে আসত ধানকাটা লোকগুলোর কথা-বার্তা। কখনও ওরা গান গাইত। কখনও রূপকথা বলত কেউ। তারপর কিছুক্ষণ ওদের জোত অর্থাৎ বিশ্রামের পালা। সেই-সব সময় গুরুজীর পায়ের শব্দের প্রতীক্ষায় থাকতাম। মাথার কাছে অন্ধকার নিঃশ্বাস ফেলে এসে চাপা গলায় ডাকত—ঘুমোলে নাকি? গা তোল—বাঁশিতে ফুঁ দেওয়া যাক। ওর ছোট্ট ঝুলিটি আমার কাছে থাকত। তার ভিতর কলকে, নারকেল ছোবড়া, একটা আধপোড়া শোলা, চকমকি পাথর, দেশলাইও, কিছু বিড়ি আর দু-একটা সিগারেট কাগজের মোড়কে সুরক্ষিত এবং লুকিয়ে পুরিয়া।

কিছুটা উঁচুতে—দূরে গ্রাম থেকে ধাপে ধাপে নেমে এসে শস্যশূন্য মাঠ মিশেছে সেই নিচু শুকনো জলায়। সেখানে নরম খড়ের ওপর শুয়ে একটা করে অনেকানেক অলৌকিক রাত আমি যাপন করেছি। নিরালম্ব ভাসমান এক বালক—শরীর দুলে দুলে উঠছে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে—পারলৌকিক আস্বাদের সাথে অবাঙমনসোগোচর দৃশ্যাবলী ও রশ্মিজালে, শ্রুতিপারের ধ্বনি-পুঞ্জ এবং ভোরের আগে টলতে টলতে নিষ্ঠুর পৃথিবীর দিকে তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে।

সেইসব ঘটনার চিহ্ন গালের চামড়ার চোখের নিচে দৃষ্টি থেকে মুছে যেতে পারে—পারীর একটা যৌবন চলে যাবার কথা। কারুর হাজার টাকার ক্রিম বা লোশনেও কি কিছু হবার? এই তো আয়নায় দেখছি,

আমার চোখের পাতায় রক্তের ছিটে, ফ্যাকাসে শুকনো দুটো তারা, উঁচু হাড়টুমাটিম চোয়াল, ঝাঁঝরা গাল, নাকের দুপাশে কালির ছোপ। খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবার মতো একটা ছেলেবেলা আমার মধ্যে এখনও টিঁকে থাকার জায়গা খুঁজছে।

তা মায়ের কথা শুনে আমি একটু চুপ করে থাকলাম। কথাটা মিথ্যে নয়। লোকটা কত বিচিত্র পেশা না অবলম্বন করেছে এত-দিন, তবু তো ওর দারিদ্র ঘোচেনি। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একটি মাত্র মেয়ে—হাবাগোবা জড়ভরত মেয়েটি—আর সে নিজে, এই দুটি মাত্র মানুষ। এখনও সে খাটতে পারে প্রচুর। এবছরও মাঠে ফসল পাহারা বা 'জাগালে'র কাজ নিয়েছে শুনেছিলাম। তাহলে কেন ওকে টাকা দেব? নীতিবোধ আজও আমাকে সতর্ক রাখে উত্তরোত্তর। আমি বললাম, ঠিক আছে। বরং ওর মেয়ের জন্যে একটা শাড়িটাড়ি......

বাধা দিয়ে মা কেমন হাসলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, আরে, সে এক কান্ড! তোমাকে বলাই হয়নি। চুকচুকি এক কীর্তি করে বসেছে! চুকচুকির বাচ্চা হয়েছে!... মা মুখ ফিরিয়ে হাসতে থাকলেন।

চুকচুকি গুরুজীর হাবা মেয়েটির নাম। নির্লজ্জ বললাম, তাই বুঝি! কোথায় বিয়ে হয়েছে ওর?

তখনও ব্যাপারটা আঁচ করিনি। ভাবছিলাম, একটা হাবাগোবা মেয়ের বাচ্চা হওয়াতে মায়ের হয়তো অবাক লেগেছে। হারে! প্রাণীদেহের বাহ্যিক প্রত্যঙ্গাদি ঠিকঠাক থাকলে প্রাকৃতিক নিয়মেই যে বংশ-বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে—এতে অবাক হবার কী আছে!...কিন্তু আমাকে স্তম্ভিত করে মা জবাব দিলেন, তাহলে আর হাসছি কেন বাবা? চুকচুকির মতো মেয়েকে কে বিয়ে করবে! ওর বিয়েই হয়নি আদতে—এদিকে সেদিন বাচ্চা হয়ে বসল। কুনাইপাড়া থেকে প্রীতিমতো দাইও এসেছিল নাকি। অনেক রাতের কান্ড। সকালে সব রটে গেল। ছি ছি, এ কি গালেকালি কান্ড দ্যাখো!... মা কথা বলতে শুরু করলে সম্পর্ক ভুলে যান এবং সেকারণে অনেক সময় লজ্জাও পান। কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলতে থাকলেন—অবশ্য গোড়া থেকেই সবাই টের পেয়েছিল। লোকটা প্রথম প্রথম নাকি মেয়েকে মারধোরও করেছিল খুব। হাবাবোবা মেয়ে কিছুই বলতে পারেনি—কেমন করে হল, বা কে এ পাপ করল! ওকে একরকম ঘরবন্দী করে রেখেছিল শেষটা। এদিকে পেটের পোকাটা নষ্ট করতে বাপের চোখে ঘুম নেই। ঠিক কী কী চেষ্টা করেছিল, আমি জানিনে বাপু। ওসব ছোটলোকের কীর্তি আমাদের জানতে নেই—চোখকান বন্ধ করে থাকতে হয়।...তারপর তো দেখা গেল, বাচ্চা হয়েছে। এখন লোকে বলছে, আসলে পেটের পোকাটা নষ্ট করতেই চায়নি ওর বাবা। আশ্চর্য বাপ বটে, বাবা! কেউ বলছে, নাকি মেয়েটাকে কোনমতে ওষুধ খাওয়ানো যায়নি। আবার এও শুনেছি, মেয়ে নাকি বলেছে—যার নাম বলেছে, সেও নাকি বিয়েতে রাজী—দেখা যাক। ঘোর কলিতে আরও কত কী হবে! হজরত বলে-ছেন—সব উল্টো হয়ে যাবে। সেই তো ধ্বংসের শুরু।

মা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি শুধু বললাম, কলিতে কেন—দ্বাপরেও এমন হয়েছিল। কুন্তীপুত্র কর্ণ। কুমারী মায়ের সন্তান।...আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম।

চুকচুকির স্মৃতি আমার কাছে খুব উজ্জ্বল নয়। কেন নয়, এর ব্যাখ্যা নেই। ওর বাবার সঙ্গে সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে—হয়তো সেই গভীরতায় তার মেয়ে বা স্ত্রী নিঃশেষে তলিয়ে থেকেছে। লোকটি ছিল আমার রাজ্যের একক সম্রাট। তার সিংহাসনারূঢ় মূর্তিটি সামনেই আমার ছিল বিচরণ। তার অন্তঃপুরের দিকে আমার কোন মনোযোগ ছিল না।

আর, একটা বিশাল গাছের ডালে কত-রকম পাখি তো বাসা বাঁধে। বাস করে কত প্রাণীও। আমার স্মৃতিতে শুধু ওই গাছটাই পরিপূর্ণ আর স্পষ্টতম—বাকি যা কিছু, অপ্রাসঙ্গিক—অস্পষ্ট।

মায়ের কাছে শোনা এই অত্যাদ্ভুত ঘটনা আমাকে চুকচুকির দিকে আকৃষ্ট করেনি একটুও। করল গুরুজীর দিকে। কুমারী কন্যার সন্তানকে কি সত্যিসত্যি মেনে নিয়েছে? কেন নিয়েছে? ভদ্রলোকের দুনিয়ায় এ ঘটনা সম্ভব হতে পারে—ভিতরের নীতিবোধ, মানবতা, কত কিছু রক্ষা করার জন্যে তৈরী রয়েছে কুমারী মায়ের সন্তানকে। কিন্তু ওরা যেখানে বাস করে, সেই প্রায়-আদিম সমাজে, অনেক নিরক্ষর চাষাভুষো মানুষের মধ্যে এ এক অসম্ভব ব্যাপার। ওরা যেমন সরল, তেমনি নীতি-বোধও ওদের বড় কড়া—এদিকে ওরা প্রচন্ড জেদী। তাহলে?

গিয়ে দেখলাম, গুরুজী ওদের সমাজে ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একঘরে হয়ে গেছে যথারীতি। এইটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাতে কী? আজীবন লোকটা তো কতকটা সমাজের বাইরে বাইরেই বাস করেছে! কোন-দিন ওকে ধর্মকর্মে ব্রতী দেখিনি। দেখিনি কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে। মাঠ নদী বিল জঙ্গল নিয়েই তার জীবনযাপন। নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ একটা অদ্ভুত মানুষ সে। মাথায় সন্ন্যাসীদের মতো লম্বা চুল। তেমনি দাড়ি-গোঁফ। ধূসর দুটো চোখ। তার বাদামী চামড়ায় প্রকৃতির অজস্র প্রহারের চিহ্ন। সে খুব সহজেই বলে উঠতে পারে, অনেক রোদ-জল ঝড় অনেক শীত আমি দেখেছি।

উঠানে বসে সে একটা জাল মেরামত করছিল। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। তারপর শান্ত কিন্তু ভাঙা স্বরে বলল, আসুন।

আসলে অনেক আবেগ নিয়ে আমি হাজির হয়েছিলাম তার কাছে। মনে মনে শেষ অবধি মেনে নিয়েছিলাম, এ একটা মহত্ত্ব। আশ্চর্য মানবতা। এই তো স্বাভাবিক ছিল গুরুজীর মতো লোকের কাছে, যে বরা-বর বলেছে, আহা, জানের কোন ছোট বড় ফারাক নেই। সব 'সোমান'—কী পোকামাকড় কী মানুষ কী গাছপালা। হাঁ, গাছেরও ব্যথা আছে—যন্ত্রণা আছে হে! সে কী আফশোষে বলত, আহা হা রে মানবজন্মো! এবং কতবার মানুষের জন্মের ও জীবনের কথা বলতে গিয়ে সে চুপ করে যেত। চোখ দুটি ধূসর-তর হয়ে উঠত। তাকিয়ে থাকত দিগন্তের দিকে।...আর, এই পাড়াগেঁয়ে চাষা মানুষটিই তো বলেছিল একদা—দেবদেবী দুটি ভাই, সমানে মায়ের ওপরে বাড়ে। তারা কি না বাপের বিন্দুটি পড়ল, গেল মায়ের জঠরে, জন্মো নিলে তুমি—শুধু তুমি নয়, আরেকজন—তুমার মরণ হে, মরণ! তাপরে দ্যাখো, দু ভায়ে লুকোচুরি খেলা, রগড় মারামারি—চলছে তো চলেইছে!... সে খিক-খিক করে হেসে উঠত। আমার কিশোর বয়সকে ভয় পাইয়ে দিত। তার কতকাল পরে দেখি, এই মেঠো নিরক্ষরের বিশ্বাসের সাথে দূর গ্রীসের এক প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিসের বিশ্বাসের কোন ফারাক নেই। অবাক হয়ে ভাবতাম, কে ওই লোকটিকে জ্ঞানকুম্ভের বহতা নদীর ধারে সে পৌঁছতে পেরেছিল। পেরেছিল! প্রকৃতিলোকের দার্শনিক কোন সহচরী তার হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছিল সেখানে।

এসবের কারণে একটা আবেগ ছিল থাকবে মনে। আর সেই আবেগকে তার ওই কণ্ঠস্বর পলকে চুপ করিয়ে দিল। আমি শুধু বললাম, ভালো আছো গুরুজী?

সে একটু হাসল। বলল, আর কে কর গুরু!...অ চুকচুকি, চুকচুকি রে! মানুষটি আসন দে।

ছোট্টঘরের দরজাটা খোলা। তার ভিতরে অন্ধকার—দিন-দুপুরেও। এই সব মাটির ঘরে ওরা জানালা রাখে না। কারণ ঘর ওদের খাদ্য রাখার জায়গা মাত্র। ঘরে ওরা শোয় না—শোয় দাওয়ায়। ঝড়জল বা শীতের রাতে একটা তালাই টাঙিয়ে দেয় মাত্র। গ্রীষ্ম-কালটা উঠানে খোলা আকাশের নিচে ঘুমোতে ওদের আরাম। দেখলাম, ঘরের ভিতর অন্ধকারে আবছা কী নড়াচড়া করছে।

সে গলা চড়িয়ে ফের বলল, কই, দিলি? অ—লজ্জা! আমার লজ্জাবতী রে, খাটটি নিয়ে যাঁর। ইটা আমার পানের সাথী রে

হারামজাদী, ইটা আমার ছেলার সোমান। লৌয়ার আর পিগগিরি।

পরক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ...নিজেকে যদি নিজের লজ্জা না করে, জগৎ সংসারকে লজ্জা করে কী ফল বাবা? ...চুকচুকি, রে লজ্জাখাকি, আসবি তো ছ্যাতে (সামনে)?

কোন সাড়া এল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে লাফ দিয়ে উঠল। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের অন্ধকারে একটা চাপা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনছিলাম। আর সতর্ক চোখে খুঁজছিলাম সেই পাপের ফসলটিকে। দেখলাম দাওয়ায় একটা দড়ির দোলনা ঝুলছে—সেটা পুরো কাপড়ে ঢাকা। দুলছে। আমার গা শিরশির করল। ওটাকে ঘিরে সহসা তীব্র কৌতূহল নড়ে উঠল মনের ভিতর। কোন কুমারীর সন্তান আমি দেখিনি। আর চুকচুকির সন্তানের মুখে কার আদল খুঁজে পাব, এ নিয়ে আমি আশান্বিত। [illegible] প্রায় সব যুবকেরই তো আমি [illegible] প্রৌঢ় আর বৃদ্ধদেরও আরো বেশি [illegible] উৎকণ্ঠায় ঘামছিলাম।

সেই সময় চুকচুকির গলায় হাত দিয়ে টানতে টানতে বাইরে আনল সে। ওর মুখটা জোর করে তুলে ধরে চাপা গর্জাল।...তাকা! প্যাটপ্যাট তাকা ওনার চোখের দিকে। লয় তো চোখ গেলে দেব একেবারে। কিসের লজ্জা তোর হারামজাদী, হ্যাঁ? নাক ফুলিয়ে মুখ তুলে বল দুনিয়াটাকে, যা করেছি, বেশ করেছি! আর তা না যদি পারিস, এক্ষুনি ওই দড়াটো লে—আমার ডাগরের গলায় দিয়ে ঝুলে পড়! লে, দেরী করিস না!

অবোধ মেয়েটির গাল ভাসিয়ে চোখের জল নামছিল। আমার খুব খারাপ লাগল। বললাম, আঃ, কী হচ্ছে গুরুজী! ছেড়ে দাও।

জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ফের বললাম, ওর কি দোষ আছে? আর শোন—এমনও হতে পারে, ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ ওর ওপর অত্যাচার করেছিল, ও বলতে পারেনি লজ্জায়। এদিকে তুমিও দিনরাত্তির মাঠে ঘাটে থেকো—একা উঠন্ত বয়সের মেয়ে ঘরে থাকে...

হিসহিস করে উঠল সে—মিথ্যে, ভুল। তা লয়।

আমি দাওয়ার নগ্ন মাটিতেই বসে পড়লাম। বললাম, তাহলে কি তুমি জানো না?

হঠাৎ কি কেঁপে উঠল লোকটা? ঘড় ঘড় অস্ফুট কী আওয়াজ উঠল তার গলার ভিতরে, কী যেন বলতে চেষ্টা করল —পারল না। আস্তে আস্তে বসল আমার পাশাপাশি।

কী? ফের প্রশ্ন করলাম।...বলতে বাধা আছে কিছু? আমার কাছে কোনদিন তো কিছু লুকোওনি গুরুজী!

আমার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ নামাল সে। খুব আস্তে বলল, কোনদিন তা বলা যাবে না বাবা। যা জানি, তা নিজের কাছে নিজেও কি বলতে পারছি? পারি না। আঃ, আমার বড় জ্বালা হে!

আমি জেদের সাথে বলে উঠলাম, কেন গুরুজী, কেন? কে সে? সে যেই হোক, আমি এর ফয়সালা করে দেব। তুমি জানো, আমি তা পারি।

হাসল একটু।......হুঁ, পারো। তুমি বড়বাড়ির মানুষ, দ্যাশে দ্যাশে তুমার রবরবা —সিটাও জানি। হঁ্যাগো, তুমি তা পারো। কিন্তুক—ক্যানে?

বারে!......আমিও হাসলাম।......একটা মানুষ এলো, তার কোন বাপের পরিচয় থাকবে না? তাকে যে জন্ম দিয়েছে, তার দায়িত্ব তো তাকেই নিতে হবে! তা না হলে ওই বাচ্চাটার জীবন—তোমার মেয়ের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে না?

বেথা......হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাহা করে হেসে উঠল সে।......কোন জেবনই বেথা যায় না বাছা, বুঝলে কথাটো? যায় না—হঁ্যা, আমি বলছি, যায় না। যদি বলো—সে কিরূপে? আমি বলি, যে জীব জন্মায়, যতক্ষণ থাকে—ততক্ষণই তার যা কাজ, সেরে ফেলে। ওই জন্মোটাও বেথা যাবে না।

ভুয়ো দার্শনিকতা আমার সহ্য হল না। রূষ্টভাবে বললাম, তাহলে যা খুশি করো। আমার খারাপ লাগছে, তাই বলছি।

আমার তো খারাপ লাগে না।......কান থেকে আধপোড়া একটা বিড়ি বের করে সেটার দিকে তাকিয়ে বলল সে।......না, লাগে না। জানো বাছা, আমার মোনে একটা সাধ ছিল অনেক দিনের। মাঠবিলচরা মানুষ আমি—যত সুখ আমার, সবই ওই বাইরে। আমার ঘরে শুধু হু হু আঁধার। দুঃখের সোঁত বহে দিনেরেতে। তো কী সাধ ছিল আমার মোনে?

তাকে চুপ করতে দেখে প্রশ্ন করলাম, কী সাধ ছিল গুরুজী?

কিছুক্ষণ পরে মুখ খুলল।......তুমি বড় হলেন, চলে গেলেন নিজের জায়গায়। তুমি কি না ভদ্দরলোকের ছেলা। আপনার জনোতে অপিক্ষা করে আছে কত মানুষ, কতরকম দরা, কতই বা দ্যাশ! আর আমি? তুচ্ছ একটো বেক্তি। আমার কথা যদি কেউ ভাবে, সে ওই বিলধারের গাছটো! লদীর বুকে ভরা বর্ষায়—আমাকে না দেখলে পবন মাঝি বলতে পারে বটে, আহা, সি লোকটো তো এল না—বেঁচেবত্তে আছে তো? আর কে বলে? কে তাকায়? ইদিকে তুমি তো চলে গেলেন—আমার যে মোন মানে না বাছা! পিছু ফিরে বারে বারে তাকাই, আমার ছেঁয়াটি কোথা গেল হে! ভুল করে ডাকতে যাই—মোনের ভরম। মাঠের বাগে পেন্টুলজামা পরে ইন্দিরবাবুর নাতি আসছে একদিন। বুকে উঠল ফুলে। দৌড়ে গেলাম মাঠখানি দাপিয়ে। হা আমার পোড়া দিষ্টি-খানা—সে কই?

চমকে উঠে বললাম, তুমি—তুমি কাঁদছ? কেন?

না, কাঁদিনি। ইটা আমার মোনের সাধের কথা। সেই আশ্চর্য ধূসর চোখ দুটিতে প্রবল কী চাপে প্রতিবিম্বিত হতে লেগেছে আমার সারা ছেলেবেলা। সে বলতে থাকল, হুঁ—এই যন্তনা দিয়ে গেলে তুমি। তুমার দোষ নাই। তুমি বড় জায়গায় গেলে। যেতে হয়। কিন্তুক আমি? আমি যে একলা বাজ-পড়া তালগাছটি হয়ে থাকলাম। হা রে মোন, তোর ছেঁয়াটি কোথা? ছেঁয়া কই? কত সাথী এল গেল—তবু মোনটি আর ভরল না। তখন মোনে সাধ হল—আমার যদি একটো নিজের ছেলা থাকত!

তার উদ্ভট দুঃখবোধকে হালকা করতে আমি সকৌতুকে বললাম, তাকেও কি তোমার মতো গাঁজা খাওয়া শেখাতে নাকি? খরার দিনে দুপুরবেলায় তাড়ির কলসী সামনে নিয়ে......

হাত তুলে বাধা দিল সে। কৌতুকটা নিল না।......দোষ দেখি না। দুনিয়ায় এসেছি যখন, ভালমন্দ সবই দেখে যেতে হয়, চেখে স্বোয়াদ পরখ করতে হয়। উতে দোষ নাই। হুঁ—যা বলছিলাম। তারপর একদিন দেখি হুইখানে বসে দুহাতে মাথা চেপে মেয়েটো ওয়াক তুলছে! বুকে পাথর ছুঁড়ে মারলে শয়তান। কিন্তক চেপে গেলাম। দিন যায় ক্রিমেক্রিমে। ক্রিমেক্রিমে সব পষ্ট হয়। আমি তবু চেপে যাই। ক্যানে চেপে যাই?

......কেন?

......আমার মুখ চেপে ধরে থাকে কেউ। তাকে আমি চিনি না—কিন্তুক চেনাচেনা লাগে বটে। আধেক রেতে বিছানায় আমি চেঁচিয়ে উঠি—হুঁশিয়ার শালো! মেয়েটো ডরে জড়সড় হয়ে লুকিয়ে পড়ে কোণার দিকে। আধেক রেতে মাথার জ্বালায় লাফিয়ে উঠে ধারালো হেঁসো বার করি—পারি না। আমার হাত চেপে ধরে সেইজনা। একবার মরীয়া হলাম। ঈশানপুরে ধম্মরাজের মেলা বসেছে। মেয়েটোকে বললাম, আয়—মেলা দেখে আসি। থমথমে রাত। সমসাম মাঠ। মাঠের পথে আমরা দুটো মানুষে। শনশন করে হাওয়া বইছে। ডাকলে কারো সাড়া মিলবে না। সামনে বিল দেখে মেয়েটো তরাস পেলে। ইদিকে—তার তখন কিনা মায়ের মোন—বেরোনের পর থেকেই উসখুস করছিল, না-না ভাবভঙ্গী, চমকে উঠছিল যেতে-যেতে। এবারে সে চেঁচিয়ে উঠলে। অবোলা জানোয়ার যেমন চেঁচায়। চেঁচিয়ে উঠে সে দিশেহারা হয়ে দৌড় লাগালে। যত বলি, না রে মা—না—মিথ্যে ডর করিস না,

সে থামে না। হেসো ছ্ঁড়ে ফেললাম জামার ভিতর থেকে বিলবাগে। দ্ হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমাকে বিশ্বেস কর মা—আমি মান্ষ বটে। আমি তো মান্ষই বটে হে।

......তারপর?

......হল না। মোনে-মোনে বললাম, তুই বেঁচে থাক। তোর পেটের প্কেড়াটো বাঁচুক। সে যদি একদিন আমার পিছ্তে ছেঁড়া হয়ে ঘরে বেড়ায়, তো তাকে আমি একটা-একটা-করে শিখিয়ে দোব, ইটো মাঠ, উটো গাছ—ইটো কি না ঘর, উটো কি না নদী......

*

এক্ষেত্রে একটা ব্যাপারে খ্বই অবাক হয়েছিলাম। কী কাণ্ড! আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন আমার সতর্ক বাবা আমাকে তাঁর কর্মস্থানে নিয়ে তুলেছিলেন। সেখানেই বাকি পড়াশোনাটা হয়ে যায়। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে গিয়ে কোনদিন কোন ম্হ্তের্তও তো ওই লোকটির কথা ভাবিনি! কোন কষ্টও পাইনি তার বিচ্ছেদে। এখন

তো সত্যি যে বরাবর আমি ছিলাম তার ছায়াস্বরূপ। সুতরাং যথার্থ একটা বিচ্ছেদ তো ঘটেছিলই।

তার দিকটা ভাবা উচিত ছিল আমার। সে তো খুবই স্পর্শকাতর, তীব্র অনুভূতি-শীল জেদী মানুষ ছিল! এতদিনে জানা গেল, তার জীবনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছিলাম আমি! সেই আদিম প্রকৃতিজগতে আমার মতো একনিষ্ঠ পড়ুয়া আর একটিও তার পাবার কথা নয়! সেখানে যারা থাকে, তাদের অনেকেই—যত কমবয়সী হোক, গাছপালা পোকামাকড় পশুপাখি প্রজাপতি-দের সব খবরই জানা। যারা জানে না—তাদের কাছে ওসব ভীষণ অপ্রয়োজনীয়। রোদের রঙ কেমন হলে ফুলঝোপের প্রজাপতিগুলো খুশি হয়ে বেরিয়ে পড়ে, শামুকগুলোর খোলের রঙ কেন বদলায়, হট্টিটি পাখিরা কখন [illegible] বাঁধে—এ সব দিয়ে জীবতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর কৌতূহল স্বাভাবিক— আর কার [illegible]—প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে সেই চিরকালের বহতা নদীর মুখোমুখি গিয়ে পড়া। সেটাই আমার হয়তো একটা বাড়তি চমৎকার লাভ হয়েছিল।

এরপর মাঝে মাঝে গ্রামে গেছি। দেখেছি, বাচ্চাটা কোলে বা কাঁধে নিয়ে লোকটা ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে। কখনও পুকুরের ধারে, কখনও বিলের জলে, হাইওয়ের শিরিস গাছের তলায় ওদের দেখা গেছে। এদিকে দিন যায় দিন যায়, মাস ঋতু বছরের নানারঙা [illegible] আর আকাশ ছুঁয়ে ঘর ঘর ঘোরে। পৃথিবীও আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে সভ্যতা [illegible] ভাঙার দিকে হাঁটতে থাকে—[illegible] জন্য মানুষদের রক্ত ও ঘামক্ষরণ [illegible] বাড়তে থাকে।

একদিন কার্তিকে পুজোর ছুটি কাটাচ্ছি [illegible] আদর্শ [illegible] আমার প্রৌঢ়া মা, চুপি চুপি বললেন, [illegible]? চুকচুকি—তোর গুরুজীর মেয়ে [illegible] আমাদের বাড়ি এল। ছেঁড়া কাপড় [illegible] এল। বলেছি তো দিয়েছি, তাই এল।

[illegible] মায়ের কথা বলার ভঙ্গী। [illegible], তো হলটা কী?

মা ফিস ফিস করে বললেন, বরাবর ওকে চুপেচুপে ধরেছি—বল্ না মুখপুড়ি, কে এ পাপ করেছে? বলেনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে। কাল কিন্তু যেই ফের চেপে ধরা, ছুঁড়ি আচমকা হু হু করে কেঁদে ফেললে। কান্না আর থামে না। সেই কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে জানা গেল, রাত্রিবেলা একা দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কে এসে ওকে ধরে ফেলে। ও চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ চুপ করে যায়। ওকে চেনা লাগে।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, কে, কে সে?

মা কণ্ঠস্বর আরও চেপে, এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, যে লোকটা ওকে ধরেছিল—তার মাথা......

ব্যাস! হঠাৎ মা হন্তদন্ত হয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন, অ পিন্টু! ফের—ফের গাছে চড়েছিস? কলকাতার ছেলে তোরা, অভ্যেস নেই, এক্ষুনি পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে! ইস্! উঠেছে কোথায় দেখছ? নাম্, নাম্ শিগগির! অ বউবিবি, এদিকে এসে ছেলে সামলাও বাপু!

বাড়ির সবাই 'কলকাতার ছেলে' আমার পিন্টুকে নিয়ে পেয়ারাতলায় যা হইচই লাগাল, বাকি কথাটা জেনে নেবার সুযোগই পেলাম না।......

এই কার্তিকের বিকেলগুলোর শুরুতে দুপুরের উৎকট গরমের ঝাঁঝ অনেকখানি থেকে যায়। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে সূর্য যা রোদ ছড়ায়, তার রঙ যেমন ঝকঝকে তাপও তেমনি কড়া। মুখ ফিরিয়ে বসেছিলাম লোকটার উঠোনে। পুবের মাঠের শিমুল গাছটা দেখছিলাম। তার পাতাগুলো দ্রুত হলদে হয়ে যাচ্ছে। আগের মতই একদঙ্গল শকুন সেখানে চুপচাপ বসে আছে। নিচের ভাগাড়ে সকালের দিকে নিশ্চয় কোন মহা-ভোজ হয়ে গেছে। ভাবছিলাম, এই শকুন-গুলো আমার ছেলেবেলার সেই শকুনগুলোর ছেলে, নাকি নাতি, নাকি নাতিরও ছেলে-পুলেরা?

লোকটা মাঠের কথা বলছিল। ওকে খুব প্রফুল্ল আর সহাস্য দেখাচ্ছিল। অনর্গল সে তার পাড়াগেঁয়ে জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে বকবক করছিল। আড়চোখে চুকচুকিকেও আমি দেখছিলাম। সে ফিকে সবুজ ছেঁড়া-ফাটা শাড়ি পরে অনেকখানি ঘোমটা টেনে উনুন ধরাচ্ছিল। তার ঘোমটা টানার কারণ—আমি একজন মানুষ এসেছি তাদের বাড়ি। এবং মানুষের সামনে তাইতো মেয়েকেও ঘোমটা টানতে হয়। ষোলসতেরো বছরের এক বালিকা—সুশ্রী না হলেও কুশ্রী নয় অবশ্যই, বোবা এই কালান্তক শব্দের মত যৌবনকে ঠিক কী চোখে সে দেখে, যে-যৌবন আজ তার কাছে সংশয় বা বহনের প্রাকৃতিক চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয় মূলত, যার ভিন্ন তাৎপর্য সে হয়তো আর টের পাবে না?

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, মেয়েটির কী নাম রেখেছ গুরুজী?

হেসে ফেলল। বলল, আঁধারী।

আঁধারী!... কেমন খটকা লাগল, তাই নামটা উচ্চারণ করে ফেললাম।

সে বলল, হাঁ—আঁধারী।......তারপর কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

আঁ—ধা—রী! শব্দটা বার বার মনের সামনে ধরে থাকলাম। কেন আঁধারী? আঁধারে ঘুমন্ত একটি সদ্যযৌবনা অরক্ষিতা মেয়ে——এবং চুপিচুপি সে আঁধারে আরেক আঁধার এল, যেন চেনা ঠেকল তাকে, চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ চুপ করে গেল......ঠিক, ঠিক। তাই **আঁধারী। তার জন্মের বৃত্তান্ত রহস্যময়—** যেহেতু অন্ধকারে আছে—সেই হেতুই আঁধারী। চমৎকার নাম! লোকটার বুদ্ধি আছে বটে। কিন্তু অন্ধকারের প্রতীক সেই আধোচেনা মানুষটি—তার মা......

মায়ের অসমাপ্ত শব্দটা কী হতে পারে? আচমকা আমি বললাম, কই, কোথায় তোমার আঁধারী?

লোকটা ডাকল—অ আঁধারী, আঁধারী রে! ইদিকে আয়—মানুষে ডাকছে বাছা!

যেদিকে গনগনে ভয়ংকর সূর্য, সেদিক থেকে পেন্টুলপরা উদোম গা একটা ফরসা বছর চার-পাঁচ বয়সের ছেলে ভয়ে-ভয়ে একটু সরে বেশ খানিকটা তফাতে দাঁড়াল। ঝকমকে রোদ তার মুখের একটা দিক উজ্জ্বল করল, অন্যদিকে ছায়া পড়ল। তাহলেও আমি শিউরে উঠলাম। কে ও—ও কে? আমি কি চিনি ওকে? চিনতে পেরেছি? আমার চার-পাশে ওর জন্মরাতের সেই ঘন অন্ধকার এসে পড়ছে মুহুর্মুহু।

'যে লোকটা ওকে ধরেছিল তার মাথা—...

'তার মাথায়?'

'তার মাথায়—'

'কী ছিল তার মাথায়? কী ছিল? তার মাথায় কী ছিল?'

'বলতে নেই, চুপ চুপ!'

'তার মাথায় কি লম্বা চুল ছিল?'

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ভিতরে ওই ছেলেটির জন্মরাতের অন্ধকার গল গল করে ঢুকে যেতে থাকল, এবং সম্ভবত ওই আদিম নিঃসঙ্গ মাঠচরা লোকটির অমানুষিক আর ভয়ংকর গর্জন শুনলাম, হুঁশিয়ার শালো!

জীবনস্রোতময় সেই প্রাচীন বহতা নদীর ধারে যে একবার গিয়ে পড়েছে, সে সত্যি ভারি অসহায়।

একাত্তরের অভিজ্ঞতা

১৯৭১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা খুবই বিচিত্র। বছরের গোড়ায় মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন ও শ্রীমতী গান্ধীর বিরাট সাফল্য—মার্চ মাসের শেষে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হলে, ব্যাপক গণহত্যা ও জঙ্গীশাহীর বর্বর অত্যাচারে এক কোটি শরণার্থীর এদেশে আগমন—মে মাসে ১৯৭১-৭২ সালের বাজেট—শরণার্থী পুনর্বাসনে অতিরিক্ত ব্যয় ও অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নতুন করের প্রবর্তন—পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, সব মিলিয়ে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনেও একটি নতুন ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদের পরিপূরক একথা সুবিদিত। ১৯৭২ সালেই ভারত মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রাথমিক দায়িত্ব বহন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে; তার আগে প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ত্রাণ সমস্যার জন্যও ভারতীয় অর্থনীতির উপর নতুন চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী "গরিবী হটাও" শ্লোগানের সৃষ্টি করেছিলেন, যদিও অর্থনৈতিক নিশ্চলতা ও বেকার সমস্যার সমাধান ভারত সরকারের অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে একাত্তরের গোড়ায় প্রাধান্য লাভ করেছিল, তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে এক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য অর্জন করতে না পারার কারণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব নয়;—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি হিসেবে ভারতের উপর যে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার আবর্তে কোন সরকারের পক্ষেই দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং বেকার সমস্যার উপযুক্ত মোকাবিলা করা সম্ভব হত না। তবুও ১৯৭১ সালে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের নিদর্শন নিতান্ত কম নয়। গত বছরেই খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারত প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যশস্য আমদানী করাও বন্ধ হয়ে গেছে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পূর্বাপেক্ষা উন্নতি বেশি হয়েছে। এমন কি দুই সপ্তাহের পাক-ভারত যুদ্ধে জিনিসপত্রের দাম যতটা বাড়বে বলে আশংকা করা হয়েছিল, সেই অনুপাতে অর্থাৎ যুদ্ধ-কালীন পরিপ্রেক্ষিতে ততটা বাড়েনি। তবুও ১৯৭১ সালে মুদ্রাস্ফীতি যত তীব্রতর হয়েছিল, তত আর কোন বছরেই হয়নি। সরকার প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকার ঘাটতি অর্থসংস্থান (Deficit Financing) করায় একাত্তর সালে সামগ্রিকভাবে জিনিস-

পত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য জরুরী কর্মসূচী গৃহীত হলেও, সমস্যাটির সমাধানকল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার কাজ খুব এগোয়নি। বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও গত বছরেই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা এখনও অব্যাহত আছে। পাক-ভারত যুদ্ধের শুরুতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সর্ব-প্রকার অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য না পেলেও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরলস প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। ১৯৭১ সালে যে-সব উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা ছিল, সেগুলি নেওয়া হয়েছে। ফলে আরও বেশী করে জাতীয় সঞ্চয় বাড়ানো এবং নতুন সম্পদ আহরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যুদ্ধে সম্পদেরও বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলি পূরণ করাও খুব সহজ কাজ নয়। তবে সুখের কথা, বর্তমান জরুরী অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার খুব আশাপ্রদ নয়। ১৯৭১ সালে সরকার বহু কয়লা-খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করেছেন;—সাধারণ বীমা কোম্পানিগুলিও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। বহু বন্ধ কল-কারখানা এবং সুতী-কল বর্তমানে সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন।

একাত্তরের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হল বাংলাদেশের পুনর্গঠন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি সুদৃঢ় আস্থার সৃষ্টি। আমাদের অর্থনীতি এখনও উন্নত হয়নি। কিন্তু যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাক-ভারত যুদ্ধের মোকাবিলা করেছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে এবং সেই দেশ সম্পর্কে আমাদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণেও অনুরূপ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। বাহাত্তরের শুরুতে এই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় খুবই প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় উন্নয়ন দশক প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় উন্নয়ন দশক (Second Development Decade) সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, এ বছর থেকে উন্নতিকামী দেশগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত ধনী ও গরীবের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান ফাঁক দেখা যায় তা কমিয়ে ফেলা। চরম দারিদ্র্য, প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিকল্পনা এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি,—এগুলি হচ্ছে এশিয়ার অধিকাংশ

উন্নতিকামী দেশগুলির বৈশিষ্ট্য। আয় ও ধনের বৈষম্য যে সামাজিক অস্থিরতার প্রধান কারণ তা সব দেশই বুঝতে পেরেছে—তবুও গত দশকের অর্থাৎ প্রথম উন্নয়ন দশকের অন্যতম ব্যর্থতা ছিল ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে না পারা। পঞ্চাশের দশক অপেক্ষা ষাটের দশকে এশিয়ার বিভিন্ন অনগ্রসর দেশের উন্নয়ন হার দ্রুততর হলেও অধিকাংশ দেশেই সমাজের একটি বড় অংশ উন্নয়নের যতটা সুফল ভোগ করা উচিত ছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কয়েকটি দেশে যে সামাজিক বিশৃংখলা ও অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে তার কারণ হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আয়-বৈষম্যের বৃদ্ধি, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, জীবন ধারণের চরম দুরবস্থা এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সুযোগের অভাব—এগুলিই সব বিশৃংখলা ও অসন্তোষের জন্য দায়ী। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কাছ থেকে উন্নতিকামী দেশগুলির অনেক কিছু শেখার আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পূর্ণ কর্মসংস্থান কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের লাভ অর্জন করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করেনি—এটা নির্ভর করেছে উন্নয়ন-হারের দ্রুত বৃদ্ধি ও কয়েকটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপর। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের অনুপাতে ভারতে আয় ও ধনের বৈষম্য কম। পাকিস্তান, থাইল্যান্ড বা ফিলিপাইনসে আয় ও ধনের বৈষম্য—বিশেষ করে, গ্রামবাসী ও শহরাঞ্চলের অধিবাসীর মধ্যে এই বৈষম্য খুবই বেশি। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে যে 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনা হয়েছে তার প্রভাবে গ্রামবাসীদের আয় এবং সঞ্চয় করার ক্ষমতা যে বাড়ছে, রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে তার উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নত দেশগুলির মধ্যে জাপানে দেখা যায়, শহরাঞ্চলের আয়ের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের আয় বেশি। তাইওয়ানে গ্রামবাসী ও শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আয় বৈষম্য খুবই নগণ্য। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে যে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা যে খুব সময়োপযোগী সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু আয়-বৈষম্য কমাবার জন্য প্রধান প্রয়োজন হল গরীবদের আয় বাড়ানো। দারিদ্র্য-মোচন না হলে দেশের উন্নতি নিরর্থক; দেশবাসীর মনে দেশের উন্নতি তখন কোন রেখাপাত করবে না। দেশ যত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে ততই সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল যাতে সমভাবে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হয় সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার; তা না হলে সেই উন্নয়ন সামাজিক অশান্তির কারণ হয়।

সুব্রত গুপ্ত

বর্ণপরিচয়
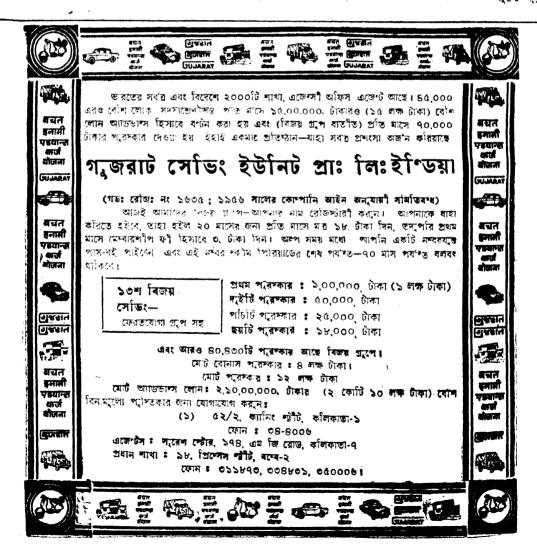
রত্নেশ্বর হাজরা

[illegible]র গেলেই একটা ফাঁকা। আমি ফাঁকার মধ্যে দাঁড়িয়ে
[illegible] থেকে প ছুঁড়ে দিই। প থেকে পৃথিবী এবং প্রশ্ন
[illegible]তিবাদ প্রতিশোধ এবং প্রেম ছড়িয়ে পড়ে—পড়তে পড়তে
[illegible]র চলে যায়——

[illegible] শব্দে প্রভুর চেয়ে প্রেমিকা সহজ—যেহেতু প্রেম
[illegible] কবচকুণ্ডল সহজাত মৃত্যুবোধের সমান
[illegible] চেনার ঢের আগে আমাকে ম নামক অক্ষর
[illegible] রয়েছে
ম থেকে মধু মধু নাতা ঋতায়াতে
[illegible] মৃত্যু—আমি মৃত্যুকে দেখি কিন্তু চিনতে পারি না—

[illegible] চ অক্ষর শিখতে শিখতে কেউ চাঁদ হয় কেউ চন্দন
[illegible] হয়ে উড়ে যেতাম চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন একা—
[illegible] উপর জাহাজ ভাসতো নদী পেরিয়ে সমুদ্রে
[illegible] জল চিনতাম
জল চিনতে চিনতে জন্ম
জন্ম চিনতে চিনতে
[illegible] মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
বিন্দুর মতো চিহ্ন থেকে চিহ্নহীন—

রতন মাঝির বাংলাদেশ

ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার

যা কিছু হারাল, তারও বেশী
পেয়েছে মানায়। মনে মনে রতন মাঝির
বড় ভয় ছিল। অবেলায়
অচেনা গ্রামের গঞ্জে চাল নুন তেলের সওদায়
পাজী দোকানীর কাছে শেষে কি এ নতুন পয়সায়
ঠকে যেতে হয়। স্মৃতি থেকে ছিঁড়ে
শরীর বাঁচিয়ে এনে জল্লাদের চোখের আড়ালে
বসা কালি, হাড ও চামড়ার
পঞ্চাশ বছর নীচে ডুবে যাওয়া মনের খবর
মনেই পড়ল না।

মনে পড়ল রাত্রিবেলা। জোৎস্না এলে, বুকের কানাচে
ঢেউ উঠল। ঘুমের ভিতর থেকে নৌকার গলুই বেয়ে বেয়ে
অবশ মাঝির হাতে উঠে এল রূপালী ইলিশ,
খড়ের চালের নীচে গুঁজে রাখা মৃত সন্তানের শেষ চিঠি—
করিমপুরের ঘাটে দশ বছর আগেকার
গোলাপীর অনড় শরীর,—

রতন মাঝির বাংলা দেশ।

ভ্রাম্যমাণ সেই ছায়াটি

সুব্রত রুদ্র

[illegible] প্রতিক্রিয়াশীল; ফিকে থেকে ঘোর লাল
লাল আলজিভ পুড়তে পুড়তে সাদা।
জীবনকোষেরা যেন উত্তেজক বস্তুর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে
বাড়ন্ত চুল—সূক্ষ্ম অনুভূতি হয়ে
কবিতার মতো সহজেই ঝরে যেতে পারে।

কবিতার মতো সহজেই ঝরে যেতে পারে
কেননা পাতাল থেকে পাতাল
ভ্রাম্যমাণ সেই ছায়াটি
স্নায়ুর গ্রন্থির ঘরে ঘরে পিয়নের মত
যেন সেই ছায়াটি আণব পরিবর্তনের স্নায়ক শক্তি,
[illegible], কষ্টে দ্রুত ঐ যায়—যেতে থাকে
বহিস্থ কোষের নির্জনে, নির্জনে।

আমি নক্ষত্রের পরমাণু কণা দেখে যুদ্ধে যাবো

নষ্ট শিরার মধ্যে আলো

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিরার মধ্যে লক্ষ কৃমি প্রজনন-উৎসবে রত হলে —
হে সূর্য তোমার পদপাত আমার বুকের মধ্যে রেখে যেও

ঘর ভাঙলেও আমার উঠোন আছে উঠোন ভাঙলেও
আদিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আমাকে ডাক দেয়
অনাথ শিশুর দল রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে
আমার ছেঁড়া আস্তিনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে
রক্তের মধ্যে যে বিষাক্ত কীট তার নখর আঙুলে হাত বাড়ায়
বিশাল শস্যের দিনে তোমার ঘুম ভাঙতে দেখলে
সে আহত রক্তের ভিতর মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে

নষ্ট শিরার মধ্যে ভরে ওঠে সূর্যের দৃঢ় পদপাত

অবলীলাক্রমে তুলে নিল সে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ। তাই সেদিনকার মত গান শেখানো স্থগিত রাখলাম।

বললাম, "আবার যেদিন আসব সেদিন হবে।"

হেমদি বলে উঠলেন, "সে কি! পুরো গানটা তো শিখিয়ে গেলেই পারতে। কে জানে আবার কবে তোমার এ-বাড়িতে আসার মর্জি হবে। ততদিনে হয়তো যে কটা লাইন শিখেছে তাও ভুলে যাবে প্রতিভা।"

মেয়েটি বলে উঠল, "না। আমি স্বর-লিপি করে রেখে দেব।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজাজ গেল বিগড়ে।

বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েই বলে উঠলাম, "মিউজিক কলেজে গান শিখছেন বলেই ভাববেন না যে, স্বরলিপি তুলে নিলেই গান শেখা হয়। একটি ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করে দিই। পুরো গানখানি না শিখে যদি স্বরলিপি তোলেন তা হলে কিন্তু আমি শেখাতে রাজী হব না। কারণ, গোড়াতেই যদি স্বরলিপির বেড়াজালে ধরা পড়েন তা হলে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে গানটা শিখে উঠতে পারবেন না। স্বরলিপি আপনি নিশ্চয় করবেন, কিন্তু তারও আগে গানের কথা ও সুর ভাল করে অনুভব করে শিখে নিন, সাবলীলভাবে গাইতে আরম্ভ করুন, তারপর স্বরলিপি করবেন। তা হলেই সেটা উচিত কাজ হবে।"

আমার কথা শুনে মেয়েটি কেমন থতমত খেয়ে গেল। মুখটি কাঁচুমাচু করে বললে, "না না, আমি সে কথা মোটেই বলিনি। আমি ভাবলাম আবার কবে আপনার দেখা পাব তার তো ঠিক নেই, কাজেই স্বরলিপিটা লিখে রাখলে আমার মনে রাখার সুবিধা হবে।"

আমি বললাম, "না। স্বরলিপি তুলে রাখতে গেলে গানের অসল মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে। গানটা ভাল করে শিখে নেবার পর তবে স্বরলিপি করবেন।"

মেয়েটি প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, "আপনি না বললে আমি আর কোনদিনই স্বরলিপি করবার চেষ্টা করব না।"

বাড়ি ফিরে এলাম। বুঝলাম মনটা কেমন যেন খিঁচড়ে গেছে।

কেন যে মনের এমন অবস্থা হল তা সেদিন জানতে পারিনি। আজ জানি। যেটা আজ জানি সেটা পাঠকদেরও জানাই। সেদিন মেয়েটি যখন উৎসাহিত হয়ে বলে উঠেছিল যে, না, আমি স্বরলিপি তুলে রাখব—তার পরিবর্তে যে ভর্ৎসনা আমি তাকে করেছিলাম শেখার দিক থেকে সেটা ঠিকই করেছিলাম। আঙ্গিকের দিক থেকে সেটা ঠিকই ছিল। কিন্তু মনটা কেন হয় এই কথাই ভেবেছিল যে, ও—তাহলে বোধ হয় আমার এখন কিছুদিন না এলেও ওর চলবে। তাই বোধ হয় ভ্যানিটিতে ঘা লাগার দরুণ ওই রকম রূঢ় হয়ে উঠেছিলাম। ফলে মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল।

মনের নাগাল পাওয়া কি সহজ কথা!

সহজ যে নয় সেটা আর কিছুদিনের মধ্যেই খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলাম।

[ক্রমশঃ]

বিনোদন সংখ্যা

দারুণ ফলার, "দেশ"-এর বিনোদন সংখ্যা, কিংবা বলা যায় বড়দিনের ভেট। যদি কোনও জিজ্ঞাসু পড়ুয়া জানতে চান, এক অঙ্গে এত রূপ আর কোথায়, একই সঙ্গে কোন্ পত্রিকায় এত পাঠ্য, প্রসাদগুণ-সম্পন্ন আর চিত্তাকর্ষক রচনার সমাহার মেলে; তৎক্ষণাৎ অনায়াসে বলা যেতে পারবে, "সে এইখানে, সে এইখানে"—এই সংখ্যাটির দুটি মলাটের মাঝখানে। সত্যজিৎ রায়ের "বিনোদদা", তৃপ্তি মিত্রের "ফ্ল্যাশ ব্যাক", তিমিরবরণের "আজও মনে পড়ে", রাধাকান্ত নন্দীর "তবলার বোল, তবলিয়ার বুলি" ইত্যাদি তো বটেই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "সিনেমা সম্পর্কে কয়েকটি চিন্তা" আর গোটা সংখ্যাটারই অলংকারক পূর্ণেন্দু পত্রীর "ক্লোজ আপ" সমেত অনেক লেখাকেই হিসাবের বাইরে রাখা যায় না—তবু বিনোদন সংখ্যার সেরা সম্পদ বোধহয় "সুরের সূর্য কৃষ্ণচন্দ্র", অন্ধ গায়কের ভ্রাতুষ্পুত্রী মান্না দে-র স্মৃতিচারণা। এমন আন্তরিক বিবরণ আর মুগ্ধ নিবেদনের তুলনা কমই পেয়েছি।

শুধু একটি ক্ষেত্রে শ্রীমান্না দে-র লুপ্ত স্মৃতিকে আমার ক্ষীণ স্মৃতি দিয়ে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছি—বালতি নামিয়ে কুয়ো থেকে হারানো জিনিস যেমন তুলে আনে।—"চোখ বুজলে যদি তোমার দর্শন পাই, তবে আমার দৃষ্টিশক্তি হরণ করে...দাও প্রভু!" বৈষ্ণবের গাওয়া এই গান, যেটা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ছিল যেন গোপন গায়ত্রীমন্ত্র, সান্ত্বনার খোরাক বা আরাধনার সমান, সেটি মান্নাবাবু ঠিক ঠিক মনে আনতে পারেননি।

কিন্তু আমি যেন পারছি, এবং আমার সময়কার অনেকেই বোধহয় মর্মস্পর্শী সেই কথা ও সুরটিকে সনাক্ত করতে পারবেন। গানটি মূলে কার ঠিক ধরতে পারছি না (কান্তকবির ?), তবে তখনকার বৈষ্ণবদের মুখে হাটে মাঠে শোনা যেত। আমার কানে এখনও বাজছে। এই সঙ্গীতের শুরুর কথাগুলি ছিল এই : "নয়ন মুদিলে যদি দেখা পাই/অন্ধ করিয়া দাও গো..." বাকীটা এখন মনে নেই। ধরতর স্মৃতিধর কোনও কোনও শ্রোতা নিশ্চয়ই এখনও সবটা পূরণ

করে আমাদের পিপাসা মেটাতে পারবেন?

অন্ধকারের অন্তরে অশ্রুবাদল ঝরানো আরও অনেক গানই তখন প্রচলিত ছিল—এখনও আছে। শ্রীমান্না দে নিজেই তার কয়েকটির উল্লেখ করেছেন। এই মুহূর্তে আমার কানে ভাসছে দুটি কলি: "বাসনা যখন বিপুল ধূলায়..." আর "রেখো না আঁধারে আমায় দেখতে দাও।" দুটিই রবীন্দ্রসঙ্গীত। অর্থে ঠিক এক না হলেও প্রার্থনা একই।

সন্তোষকুমার ঘোষ
কলকাতা।

'বাঙালীর ইতিহাস' প্রসঙ্গে

দেশ পত্রিকার (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭১) 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে সনাতন পাঠক নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি নতুন করে আকর্ষণ করেছেন। 'বাঙালী জাতির এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে' আত্মবিস্মৃত পাঠকদের ঐতিহাসিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা অবশ্যই সময়োচিত। কিন্তু অনুরাগের আগ্রহে সনাতন পাঠক এমন দু-একটি ক্ষিপ্র মন্তব্য করেছেন, যা কিঞ্চিৎ আলোকপাতের অপেক্ষা রাখে।

'বাঙালীর ইতিহাস'-এর মূল সংস্করণ দীর্ঘদিন ছাপা নেই, কথাটি সত্য; কিন্তু ঘটনাটি অবিশ্বাস্য বা অন্যায় নয়, এবং লেখক, প্রকাশক বা সরকার কেউ তার জন্য দায়ীও নন। মূল সংস্করণ প্রকাশের পর গত দুই দশকে বাঙালীর ইতিহাসের আদি পর্ব সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে; পূর্ববঙ্গে (এখন বাংলাদেশ) কয়েকটি নতুন পটুলিপিও পাওয়া গিয়েছে। নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক হিসাবে সংযোজন ও সংশোধন ছাড়া নীহাররঞ্জন স্বভাবতই মূল সংস্করণটি পূর্ববৎ প্রকাশ করার অনুমতি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। অনেক প্রকাশকের হাপিত্যেশ এজন্য নিষ্ফল হয়েছে শুনেছি।

নীহাররঞ্জনেরই অনুমতিক্রমে রদবদলের প্রয়োজন নেই এমনভাবে 'বাঙালীর ইতিহাস'এর একটি সংস্করণ তৈরি করেছিলেন জ্যোৎস্না সিংহরায়। সংক্ষেপিত সংস্করণটি লেখক সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এবং বাজারে পাওয়া যায়। লেখক সমবায় সমিতি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁরা যে এই সংস্করণটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি যথোচিতভাবে আকর্ষণ করতে পারেননি, সেকথা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু মূল সংস্করণের অবর্তমানে এই সংক্ষেপিত রূপটিই যে বিকল্প হিসাবে বর্তমানে গ্রন্থকারের অনুমোদিত তা সংক্ষেপিত সংস্করণের ভূমিকায় নীহাররঞ্জন স্পষ্ট করে বলেছেন।

আর একটি কথা। নীহাররঞ্জন জীবিকা-নির্বাহের দায়ে 'দিল্লী প্রবাসী হয়ে' এবং 'ভারত সরকারের কি সব বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হয়েও' বাঙালীই আছেন এবং 'বাঙালীর ইতিহাস'কেও ভুলে যাননি। যতদূর জানি, দ্বিতীয় পর্ব রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজও তাঁর শেষ হয়ে আছে। তাঁর প্রাণের আবেগ বা ভালবাসার নেশা আগের মতো দুর্দম হয়তো নেই, কিন্তু তা এখন মমতায় আরো স্নিগ্ধ এবং প্রীতিতে আরো

প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পর্ব রচনার উপযোগী পরিবেশ যদি আমরা তাঁকে দিতে পারি, তা হলে এখনো হয়তো বাঙালী পাঠক তাঁর পরিণত জ্ঞানতপস্যার ফলভাগী হতে পারে।

সনাতন পাঠক নির্বাধ অবসর দানের জন্য যে কোন ছল-ছুতোয় নীহাররঞ্জনকে কারারুদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীন দেশে সে সুযোগ যখন আপাতত নেই, তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কী তাঁকে যোগ্য কোন পদে নিযুক্ত করে কলকাতায় ফিরে পাঠাতে পারেন না? কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী তো একজন বাঙালী। তিনি কি এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারেন না? বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা কি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই দাবি উত্থাপন করতে পারেন না? সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার প্রতি যে গভীর মমত্ববোধে আমরা বাংলাদেশের প্রতি দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছি, তাকে আক্ষেপ-লক্ষ্যিতে দৃঢ়মূল করার জন্য আমাদের কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই?

মনোরমা সিংহ রায়
কলিকাতা-১৪

অতুলপ্রসাদ

'দেশ'-এর বর্তমান সংখ্যায় (৩৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৫ ডিসেম্বর, '৭১), অতুলপ্রসাদ সম্পর্কিত শ্রীপবিত্রকুমার রায় মহাশয়ের সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটির একটি মন্তব্য প্রসঙ্গে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদ্বিজেন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের একটি পত্র মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিজুবাবুকে ধন্যবাদ জানাই। এঁদের মত প্রবীণ ব্যক্তিরা যদি এই সব ত্রুটি সংশোধনে এগিয়ে আসেন ত কাজটি সুগম হয়।

দ্বিজুবাবুর উক্তির যথার্থতা সম্পর্কে আমি শুধু একটি 'ঘটনা' সংযোজিত করতে চাই। উনি লিখেছেন, "... অতুলদার জীবিত-কালে এ গানটি মুদ্রিত হয়নি।" কথাটি ঠিক নয়। চল্লিশ বছর পূর্বে সে যুগের বিখ্যাত সঙ্গীত মাসিক "সঙ্গীত-বিজ্ঞান" পত্রিকায় গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। আমার পিতৃদেবের (শ্রীমনোরঞ্জন সেন) সংগ্রহে সেটি আছে। সেখানে মুদ্রিত আছে—

"কোথা মুখ তব, কোথা সে বনস্থলী;
আইলে হেথায় জেনে কি পথ ভুলি?"

এখন পবিত্রবাবুর কাছে অনুরোধ তাঁর করণীয় তিনি করুন। আর ব্রাহ্ম সমাজের এ পি সেন ট্রাস্টের কাছে নিবেদন—"আপনাদের যদি কিছু করণীয় বোধ করেন ত করুন।"

অতুলপ্রসাদের শতবার্ষিকীতে 'কাকলি'র সব কটি খণ্ড পাওয়া যায় না, এ আক্ষেপ কাকে জানাই।

তপনকুমার সেন
কলকাতা ৫

দেখা হয় নাই

দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেখা হয় নাই' শীর্ষক প্রবন্ধের 'বংশীহারী : বৈরাট' অধ্যায়টি পাঠ করিয়া একটি মূর্তির বর্ণনার মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম। পত্রিকার ৬৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সন্নলা গ্রাম হইতে প্রাপ্ত মূর্তিটি 'উমা-মহেশ্বর' মূর্তি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আলোকচিত্র দেখিয়া মূর্তিটিকে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমূর্তি রূপে গণ্য করা যায়। দেবী মূর্তিটির বামপার্শ্বে উপবিষ্ট দেব-মূর্তিটির উপরের বাম হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং নিম্নের বাম হস্তে শঙ্খ দৃষ্ট আছে। দেব-মূর্তির উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা রক্ষিত আছে দেখা যায়। দেবতার অন্য একটি আয়ুধ 'চক্র' সম্ভবত নিম্নের দক্ষিণ হস্তে আছে। উভয় মূর্তিদ্বয়ই ললিতাসনে পদ্মের উপর উপবিষ্ট, দেবী-মূর্তিটি দক্ষিণ করে সনাল পদ্ম ধারণ করে আছেন। সাধারণত এই ধরনের যুগল মূর্তির বাম পার্শ্বে দেবী-মূর্তি উপবিষ্টা থাকেন। আলোকচিত্র মুদ্রণ এবং প্রকাশনা কালে কোন ত্রুটি না থাকিলে এই প্রসঙ্গে দেবী-মূর্তিটির ডান দিকে উপস্থিতি চিত্তাকর্ষক।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত এবং বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে রক্ষিত এই ধরনের লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তির এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ঢাকা নগরীর নিকটবর্তী বাস্তা গ্রাম হইতে প্রাপ্ত একটি সুন্দর মূর্তি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার একাইল হইতে সংগৃহীত আর একটি লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি রাজসাহীর

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহালয়ে থাকিবার সংবাদ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক-কালে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ হইতে সংগৃহীত একটি লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি বর্তমানে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহালয়ের শোভা বর্ধন করিতেছে।

দেবকুমার চক্রবর্তী
অধীক্ষক প্রত্নতত্ত্ব অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ

কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া

দেশ পত্রিকার ৮ম সংখ্যায় (৩৯ বর্ষ) রঞ্জনের বাংলাদেশ ও ভারত প্রসঙ্গে রাজ-নৈতিক সমীক্ষার বিষয় আমি স্পষ্টাস্পষ্টি নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। তাঁর লেখায় দু একটি জায়গা আমার কাছে বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ রাজনৈতিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিসদৃশ লেগেছে বলেই আজ লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

'৭১-এর ২৫শে মার্চের রাত থেকে ঢাকা নগরীর বুকে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনী তাদের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে এবং এই উদ্দাম বীভৎস নৃত্যের পরি-সমাপ্তি ঘটে গত ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পরে। কাজেই এই কটি মাসের মধ্যে পূর্ব বাংলায় যে নারকীয় হত্যালীলা এবং অত্যাচার চলেছে, তার নজির যে ভারতের ইতিহাসে নেই, তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কাজেই রক্ত-কলঙ্কিত এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলার মাটিতে আজ একটা নতুন জাতি জন্ম নিয়েছে। এই নতুন জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি প্রতিবেশী রাজ্য ভারতবর্ষের ওপরেই বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করলে নির্ভর করছে। বিশেষ করে এপার গঙ্গার লোক আমাদের ওপরেই নির্ভর করছে এই নতুন জাতির ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর অনেক কিছু। এমনি বিশেষ মুহূর্তে এপার বাংলার প্রতিটি লেখক, প্রতিটি বুদ্ধিজীবীর লেখা এবং ভাব-ধারার বিকাশে প্রতিটি পদক্ষেপে বাঙালী জাতির সংহতি ও সংস্কৃতির দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করে চলা বাঞ্ছনীয় নয় কি?

রঞ্জনবাবু তাঁর নিবন্ধের প্রথম দিকে লিখেছেন 'বর্তমানে উষ্ণ বাঙ্গালী আলিঙ্গনে নিহিত থাকতে পারে কোন এক অবিশ্বাস্য শীতল বিচ্ছিন্নতা'। পূরবের সূর্যোদয়ের দিকে আজ তাকিয়ে কেন 'অবিশ্বাস্য' অথবা 'শীতল' অথবা 'বিচ্ছিন্নতা' কথাটা আনি? আজ মুক্তির আনন্দের দিনে ওপার বাংলার স্বাধীন বাঙ্গালী জাতির কর্ণ-কুহরে কেন এই ডিসেম্বরের শীতের হলকা আমরা ছড়িয়ে দিই?—আজকের আনন্দ-ধ্বনির মাঝে যে বস্তুটা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে, তাকে কেনই বা জনতার সম্মুখে টেনে আনা?

"আমরা চাইব বৃহত্তর বাজারের পূর্ণ সুযোগ নিতে। ক্রমে পূর্ববঙ্গে আসবে তিক্ততা ও প্রতিরোধ।" আমার বক্তব্য, বাংলা-দেশের ধ্বংসস্তূপে নতুন জীবনের উন্মেষে আমাদেরই বাজার সম্প্রসারিত করতে হবে। কেন না, চীন, মার্কিন ও অন্য সব দেশের দ্বার বাংলাদেশের কাছে রুদ্ধ। কাজেই 'বৃহত্তর বাজার' কথাটা কি এমনি সময়ে প্রাসঙ্গিক?—

"ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নামাবলী—" কথাটা ভীষণ শ্রুতিকটু বলে মনে হচ্ছে। বাংলা-দেশের জন্মমুহূর্তে বিশেষ কোন সম্প্র-দায়ের অবতারণা অবাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের মানুষের মনে আনন্দের ধ্বনির মাঝে আজ যে সব সংকীর্ণতা ডুবে গেছে অথবা যে বৃত্তি সুপ্ত হয়ে রয়েছে, তার তন্দ্রাভঙ্গ নিষ্প্রয়োজন। আজ আসুন, আমরা সবাই বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একটা বিশালতার স্বপ্ন দেখি। বাংলাদেশের মানুষ বাংলার মাটির পুণ্যে একটা নতুন জাতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা হয়ে ভারত উপমহাদেশে একটা নতুন চেতনায় উন্মেষ দিক। এই নবীন রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের পরিচয় হবে 'বাঙ্গালী' বলে। এই সত্যের সন্ধান আমাদের এপার বাংলার বাঙ্গালীদের সহায়তায় বাস্তব হোক।

রঞ্জনবাবু লিখেছেন—'শুনতে পাই কোন কোন অঞ্চলে শেখ মুজিবর রহমান ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া বলে বর্ণিত এবং বর্জিত।' শুনতে পাওয়া কথায় বিশ্বাস, কি? কোন রাজনৈতিক দল হয়তো আজকের বাংলাদেশের গণ-জাগরণে 'বঙ্গবন্ধু'কে 'বুর্জোয়া' বর্ণিত করে নিজেদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ নিতে চাইছে। এই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন বাংলাদেশ বিপ্লবের পূর্বে ছিল, কিন্তু ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত ইয়াহিয়ার পোষ্যপুত্র-দের নির্বিচার গণহত্যার পরে এই রাজনৈতিক প্রশ্নটি অসার হয়ে যায়। বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে, এই স্বার্থটার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব।

রঞ্জন নিবন্ধে দু' বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমৃদ্ধির একটা বাস্তব সেতু নির্মাণের যথেষ্ট উল্লেখ আছে এবং তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রকাশও রয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ভাব-ধারা বিকাশে শব্দ প্রয়োজনায় ও তার প্রতি-ধ্বনি সম্বন্ধে সজাগ হ'লে মনে হয় দু' বাংলার মধ্যে তথা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর বন্ধন কায়েম করতে সক্ষম হবে।

অমল গঙ্গোপাধ্যায়
গৌহাটি-১৫।

মুক্তমেলা

তিন বছর আগে ডিসেম্বরের শেষ শনিবার কলকাতা ময়দানের এক অংশে হঠাৎ মুক্তমেলা জমে উঠেছিল। দু' এক সপ্তাহের মধ্যেই সেটা হয়ে ওঠে কলকাতার অন্যতম চমকপ্রদ আকর্ষণ। ময়দানের পুকুর পারে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো লম্বা লম্বা কয়েকটা রেনট্রি বা শিরীষ গাছ, তার ধারে-কাছে এই অভিনব মেলা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা গোল আসর, কেউ সেখানে গান গাইছে, কেউ কবিতা আবৃত্তি করছে, কেউ বাজনা, কেউ হাস্যকৌতুক, কেউ অভিনয়। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে বা বসে অন্যরা শুনেছে, বাহবা কিংবা দুয়ো দিচ্ছে। এতে অংশ গ্রহণ করার জন্য কারুর কোনো যোগ্যতার দরকার নেই—একমাত্র শ্রোতা বা দর্শকদের খুশী করার ক্ষমতা থাকাই যোগ্যতা। যে-কেউ উঠে দাঁড়িয়ে কিছু করতে চেয়েছে, শ্রোতারা প্রথমে মন দিয়ে শুনেছে—ভালো না লাগলে হাততালি দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে, ভালো লাগলে আর একখানার অনুরোধ।

মনে আছে, মুক্তমেলায় কয়েকটি সপ্তাহ উপস্থিত থেকে কি বিমল আনন্দ পেয়েছিলাম। অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রাণভরে চেঁচিয়েছি—বুক ভরে হাসতে পেরেছি। এ রকম সুযোগ কলকাতার জীবনে সচরাচর আসে না। আশা করেছিলাম, মুক্তমেলা কলকাতার জীবনের একটা স্থায়ী অঙ্গ হবে। ভেবেছিলাম, এসটাবলিশমেন্ট-বিরোধী শিল্প সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে এই একটা প্রশস্ত উপায়। নানান ধরনের পত্র-পত্রিকার নীতি বা রেডিও সম্পর্কে অনেকের মনেই অনেক রকম অভিযোগ থাকে—এখানে কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার দরকার নেই—নিজের শিল্প বা সংগীত সরাসরি দর্শক বা শ্রোতাদের সামনে হাজির করার উপায় এখানে রয়েছে। টাকা খরচ করে হল ভাড়া করারও দরকার হচ্ছে না, বিজ্ঞাপনের ঝামেলা নেই। নিজস্ব মতবাদ বজায় রাখার এইটাই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়—কারণ এখানে কেউ কারুর মতবাদ দমন করার সুযোগ পাবে না, বরং নিজের মতবাদ প্রচার করার সুযোগ পাবে।

সাহিত্য সংবাদ

প্রথম কয়েক সপ্তাহ কয়েকজন নাম-করা গায়ক, অভিনেতা বা লেখক-কবি এতে অংশগ্রহণ করলেও—মুক্তমেলার প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিল অজানা-অচেনা শিল্পীরা। একটি চেক সার্ট পরা ছেলে (নাম জানি না) এমন অপূর্ব লোকসংগীত গেয়ে জমিয়ে রেখেছিল যে তাকে দেখলেই সোরগোল পড়ে যেত। আর একটি পাতলা চেহারার যুবক মুখে শুধু এক টুকরো কলাপাতা রেখে বিস্ময়কর শানাই বাজাতো। মুখচোরা হিসেবে পরিচিত কবি তুষার রায় এই মুক্তমেলাতেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আধুনিক কবিতাও যে লোকে মন দিয়ে শোনে—নানা কবির অংশ গ্রহণের পর এখানে সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। বাংলা কবিতা মূলত পাঠ্য, ঠিক শ্রাব্য নয়। আমার মনে হয়েছিল, এইখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাংলা কবিতা বেশ খানিকটা শ্রাব্যগুণ পাবে।

মুক্তমেলার পরিকল্পনা প্রথমে কয়েকজনের মাথায় এসেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এজন্য কেউ কোনোদিন কোনো কৃতিত্ব দাবি করেনি। কোনো দিনই এর কোনো পরিচালক ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবই এই মেলার প্রধান গুণ—এবং তা বিস্ময়কর ভাবে সার্থক হয়ে উঠেছিল।

এই সার্থকতাই এর কাল হয়। সার্থকতা শত্রু টেনে আনে। বস্তুত, হঠাৎ চতুর্দিকে মুক্তমেলার কঠোর সমালোচনা কেন শুরু হয়ে গেল—তা আমি আজও বুঝতে পারিনি। কেউ কেউ বলেছিলেন—এখানে মার্কিনী কালচার ছড়ানো হচ্ছে। এরকম উদ্ভট কথা যে, কোনো সুস্থ লোক বলতে পারে, আমার তা ধারণা ছিল না। মুক্তমেলার অনুষ্ঠানে থাকতো কবিতা পাঠ, গান-এর মধ্যে বাউল গান এবং লোকসঙ্গীতই বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল, তা ছাড়া কোরাসে রবীন্দ্রসংগীত, কেউ কেউ গণসংগীত বাজাতেন, কেউ মজার গল্প বলতেন। দু'একটি ছোটখাটো নাটকও হয়েছে—তাতে বামপন্থী সুরই প্রধান। এর মধ্যে মার্কিন কালচার কোথায়? তাছাড়া আমি যতদূর জানি, মার্কিন দেশে সঠিক কোনো কালচারই গড়ে ওঠে নি—ওরা সেই অসুখে ভুগছে। যা নেই, তা প্রচার করা হবে কি করে? ধরা যাক, যদি কেউ 'মার্কিন কালচার' নামক বস্তু প্রচার করার চেষ্টা করে—তবে তার বিরোধী সুস্থ কালচার প্রচার করারও তো ঐটা প্রকৃষ্ট জায়গা! যাই হোক, সেই সময়ই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় যে, কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় কী ধরনের মিথ্যে কথা লেখা হয়। যে-শনিবার আমরা সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলাম—গান ও কবিতা পাঠ শোনার অনাবিল আনন্দ নিয়ে ফিরেছি—সেই শনিবার সম্পর্কেই রিপোর্ট বেরুলো—ওখানে নাকি মেয়েদের শ্লীলতাহানি এবং নানাবিধ বেলেল্লা হয়েছে। দুটি ছেলেমেয়ে, তারা ভাই বোন, বয়েস পনেরোর নিচে, লোকদের দেখিয়েছিল [illegible] অশ্লীল টুইস্ট নাচ। শুধু এই ধরনের কঠোর অলীক সমালোচনাই শুধু নয়—মাঝে মাঝে সেখানে বোমাবর্ষণও শুরু হয়ে গেল। কোন রাজনৈতিক দল ঐ বোমা বর্ষণের জন্য দায়ী তা আমি জানি না বা অনুমানই করতে পারি না। কিন্তু যাঁরা মুক্তমেলার নিন্দা করতেন তাঁরা [illegible] বর্ষণের নিন্দে করেন নি। অবশ্য বোমা-বর্ষণেও মুক্তমেলা থামেনি, [illegible] ঠিক চলেছে। এক [illegible] আমার মোহ একটু বেশী [illegible]; [illegible] শুনেছিলাম, একটি [illegible] একটি আট বছরের [illegible] পায়ে [illegible] লেগেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে [illegible] বিশ্বাস হারাতে ইচ্ছে হলো।

হঠাৎ আজ একটি কাগজে [illegible] সেটি মুক্তমেলার তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। চমকে উঠার মতন ব্যাপার। মুক্তমেলা এখনও চলে এবং এই [illegible] হয়েছে, গত তিন বছরের মধ্যে এক শনিবারও থেমে থাকে নি। মুক্তমেলার গতি [illegible] ব্লাড ব্যাংক থেকে এখানে এসে রক্তও নিয়ে যাওয়া হয়েছে, শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য চাঁদা উঠেছে। বাংলাদেশের [illegible] কথা মনে পড়ে গেল। অবশ্য আমি আর কোনোদিন মুক্তমেলায় যাবো না। [illegible] বছরের মেলাটি আমার [illegible] অভিমান [illegible] গেছে। আমরা হঠাৎ [illegible] রাজনৈতিক ঝোঁকে বোমা ছুঁড়ে [illegible] শিশুর পা খোঁড়া করে [illegible] তার খোঁড়া পা সুস্থ করে দিতে পারবে না। শিশুটির দোষ, সে ময়দানে গান শুনতে গিয়েছিল।

সনাতন পাঠক

কবিতা।

নষ্ট আঙুরে ও অন্যান্য কবিতা। দেবতোষ বসু। সখীসংবাদ প্রকাশনী. ৪৬/৪ ব্রহ্মসমাজ রোড, কলকাতা-৩৪। তিন টাকা।

রৌদ্রের ভিতরে চিঠি। বাসুদেব দেব। কবিতা পরিষদ। ৬০/২/৮ লেক রোড. কলকাতা-২৯। তিন টাকা।।

সজনে নির্জনে আমি। অরুণাভ দাশগুপ্ত। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। দু টাকা।

বিহ্বল সিঁড়ি। বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। তিন টাকা।

এখনকার কবিতা ছন্দ-মিল বর্জিত এরকম অভিযোগ যাঁদের উপলক্ষ করে উত্থাপিত আলোচ্য চারজন কবি সুখের বিষয়, সেই দলে পড়েন না। অল্প-বিস্তর বর্তমান আলোচ্য কবিদের প্রত্যেকেই ছন্দে-মিলে বিশ্বাসের কিছু কিছু প্রমাণ তাঁদের কাব্যগ্রন্থে রেখেছেন। দু-একজন আবার দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু দুঃসাহসী পরীক্ষাও করেছেন। সে-পরীক্ষা কতদূর সার্থক সে-প্রসঙ্গে আপাতত না গিয়েও বলা চলে যে, ছন্দ-মিলের প্রতি এই আনুগত্য সুস্থ মনোভঙ্গিরই পরিচায়ক এবং আশ্বাসপ্রদ।

এই দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সম্ভবত দেবতোষ বসু। দেবতোষ বসু বহুকাল ধরে লিখছেন। 'অলীক চতুর্ভুজ'-এর পর এটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। দেবতোষ খুব বেশী লেখেন না, অন্তত কম কবিতাই তিনি প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু প্রকরণগত দিক থেকে তাঁর প্রতিটি কবিতাই আশ্চর্য নিপুণ। ছন্দের যাবতীয় সূক্ষ্ম কারুকাজ তাঁর দখলে। বলার ভঙ্গি একটু নির্মেদ, বেশ গভীর ভাবনার কারবারী তিনি। 'অলীক চতুর্ভুজ'-এর পর 'নষ্ট আঙুরে ও অন্যান্য কবিতা'য় তাঁর বিবর্তনের নির্ভুল চিহ্ন তিনি রেখেছেন:

'আমার দিনগুলি তাঁতকলের মতো দ্রুত
গড়িয়ে যায়...
দেখা আর না-দেখার মধ্য দিয়ে
এর ভালোবাসা আর ওর ঘৃণার মধ্য দিয়ে
দ্রুত গড়িয়ে যায়......
গড়িয়ে গড়িয়ে আমার দিনগুলি এখন
কালো চাদর হয়ে অমলে নীলিমাকে জড়াতে
থাকে।'

কিংবা 'অতীন্দ্রিয়' কবিতার টুকরো:

'কী আসে যায়? তৎপরতার চেয়েও অনেক
নয় কি ভালো স্তব্ধতার একটি ঝড়?
সব ভুলিয়ে নিয়েছ, তাই এখন আমি
নিঃস্ব এক তস্কর।'

এই কবিতায় উদ্ধৃত 'নিঃস্ব এক তস্কর' পঙ্‌ক্তিতে স্বরবৃত্তের চাল বেশ দুরূহ,

সন্দেহ নেই। **নষ্ট আঙুরে ও অন্যান্য কবিতা**র বহু ক্ষেত্রে দেবতোষ রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার পংক্তি ব্যবহার করেছেন, এ-রকম ব্যবহার দোষের নয়, বিষ্ণু দে-র এককালের কবিতায় দেখেছি, কিন্তু বেশী ব্যবহার কেমন যেন কানে লাগে! নিজস্ব কবিতা ছাড়াও কিছু অনুবাদ-কবিতার নমুনা আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। [illegible] এক কথায়, চমৎকার।

'রৌদ্রের ভিতর চিঠি' বাসুদেব দেব-এরও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'কবিতার জন্য'র কয়েকটি পংক্তি:

'আজ আমি কবিতার জন্য জন্ম নিয়েছি
শুধু কবিতার জন্য
আজ আমি অমর ও অমিতবীর্য......'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'শুধু কবিতার জন্য' কবিতাটিকে মনে পড়িয়ে দেয়। সুনীল লিখেছিলেন:

'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু
কবিতার......
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।'

সুনীলের ন' লাইনের কবিতাটিকেই কি

বাসুদেব দীর্ঘ করে লিখতে চেয়েছেন? তা যদি হয়, বাসুদেবের কবিতায় সুনীলের একটু উল্লেখ কিংবা উদ্ধৃতি থাকলে ভাল হত। বাসুদেব-এর নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা কবিতাও এই কাব্যগ্রন্থে কম নেই। 'দুঃখের ভিতর দিয়ে পথ', 'নষ্ট পুকুর রুপালি চুল', 'কালো ঘোড়ার খুরের তলায়', 'তীর্থযাত্রী' 'বেলা বয়ে যায়', 'তিরিশ পেরিয়ে' কিংবা 'সেতু উঠছে বলিদানে' ইত্যাদি বহু কবিতায় তিনি তাঁর বিশিষ্ট কবিসত্তাটিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর অন্যান্য কবিতাগুলি (একটি কি দুটি পংক্তির ঔজ্জ্বল্য বাদ দিলে) কেমন যেন ঢিলেঢালা, অসংবদ্ধ। মনে হয় একই কবিতার টুকরো টুকরো অংশ। সামগ্রিক আবেদন খুব স্পষ্ট হয়ে দাগ কাটে না।

অরুণাভ দাশগুপ্ত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই নিজস্ব একটি মেজাজ তুলে ধরতে পেরেছেন, ছন্দ-মিলের অনায়াস ব্যবহারের ক্ষমতাও। ছন্দ-মিল না থাকলেই যে কবিতা রসাতলে যায় এ রকম নালকসুলভ চিন্তা না করেও স্বীকার করা ভাল যে, সার্থক কবি ছন্দ-মিলকে ভয় পেয়ে ত্যাগ করেন না, ছন্দ তাঁর হাতে শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা। এখনকার তরুণ কবিরা ছন্দ-মিল এড়িয়ে কবিতা লিখতে চান বলেই কথাটা

মনে এল। অরুণাভ দক্ষ কবিতা লেখক সন্দেহ নেই। বলার কথাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলা যে শিল্পের অন্যতম শর্ত এ কথা তিনি ভোলেন নি। তাই পুরনো বক্তব্যও তাঁর বলার গুণে নতুন লাগে শুনতে:

আয়নার পিঠ থেকে কারা যেন শুষে নিচ্ছে
বিদেশী পারদ
প্রতিবিম্বে দেখে নিন দৃষ্টিপাতে পাপ
আছে কিনা
তেজস্ক্রিয় ধ্বংসবীজে বিবর্ণ আকাশ ছেয়ে
আছে
ফুসফুস ভরে নিন, যদি হাওয়া কোথাও
নিখাদ হয়ে থাকে
এই শেষবার এই অবেলায়
ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে রক্তের
গভীরে।'

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে অরুণাভর বক্তব্য পরিণত হবে এ-আশা করা যায়।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিহ্বল সিঁড়ি' কাব্যগ্রন্থে বেশ কিছু সুন্দর কবিতা ও সার্থক পংক্তি উপহার দিয়েছেন। 'মা নদী শিশির সন্ধ্যা ম্লান মুখে চলে গেল বেলা' অথবা 'আবহমানের নামই বাঁচা, ছড়ায় শিকড় যার… যাকে স্মৃতি বলি সে তো এই শিকড়েরই ফুটাফাল' কিংবা 'স্মৃতির রোদেশ উর ছড়াচ্ছিলা শিয়রে সন্ত্রাস'—এই জাতীয় পংক্তি প্রথম কাব্যগ্রন্থে খুব দুর্লভ। অরুণাভ দাশগুপ্তের মতোই বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দক্ষ কবিতা লেখক, প্রকরণগত দিকে বেশ মনোযোগী। তাঁর কবিতায় পঞ্চাশের কবিতার পরোক্ষ ছায়া আছে। তবু নিজস্ব কণ্ঠও কখনো কখনো স্পষ্টরূপে শোনা গিয়েছে। 'মণিকার প্রতি' সম্ভবত এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

প্রবন্ধ

কবিতা: চিহ্নিত ছায়া। বার্ণিক রায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা ৬। আঠারো টাকা।

সাম্প্রতিক কালের কবিতা ও কবিদের ওপর আলোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন এই বইখানি। কবিতার বিভিন্ন সমস্যা ও কাব্যতত্ত্ব প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। শেষের কয়েকটি লেখা তিরিশ, চল্লিশের দশক থেকে একেবারে হাল আমলের কবিদের সম্পর্কে। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিদেশী কবিতার ধারা ও তার প্রভাব প্রভৃতি উল্লেখ ও উদ্ধৃতিসহ আলোচনার মধ্যে স্থান পেয়েছে।

কবিতা কী এবং কেমন—এই তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা পাঠক সমালোচকদের মত কবিদের মনেও জেগেছে বারবার। দেশ ও কাল, রুচি ও প্রবণতা ভেদে শুধু এই প্রশ্নের চেহারা পালটেছে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও। তাই কারো কাছে কবিতা, অভিজ্ঞতার ইতিহাস—কারো চোখে বা এ নিতান্তই এক অনির্বচনীয় ইশারা। কেউ বা মনে করেন শব্দ ব্যবহারের যাদুই আসলে কবিতার সকল রহস্যের মূলে, আবার কারো কাছে কল্পনাপ্রতিভাই কবিতার প্রাণ বলে প্রতিভাত। অর্থাৎ অজস্র মত ও পথ কবিতার রহস্যভেদের। কবিতার দেহনির্মাণ নিয়ে বা শব্দ ধ্বনি চিত্রকল্পের সূক্ষ্ম আবেদন ও কার্যকারিতা নিয়েও মতবিস্তার বা মতান্তরও কিছু কম নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে কবিতা সম্পর্কিত এই জাতীয় বহু বিতর্ক, মত ও তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। যদিও প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নিজস্ব কোন দৃষ্টিকোণ বা লক্ষ্যটা খুব স্পষ্ট নয়। তিনি কিছু একটা বলতে চাইছেন এবং তার সমর্থনে বহু দেশীবিদেশী মূল্যবান মন্তব্যেরও সাহায্য নিচ্ছেন, এটা বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর মূল কথাটা বোঝা যায় না। সূচনায় অবশ্য তিনি বলে নিয়েছেন, "এই আলোচনাগুলো আমার পাণ্ডিত্যের প্রকাশ নয়, আসলে আমার সেন্সিবিলিটি বা সৃষ্টিশীল চৈতন্যকে সদা-জাগ্রত, সক্রিয় ও পরিচ্ছন্ন করতে চাই…।" কিন্তু অস্বীকার করা যায় না, শেষ পর্যন্ত পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনীই এবং অজস্র অপ্রযুক্ত উদ্ধৃতি, উল্লেখ আর গাদা গাদা ফুট নোট তাঁর 'চৈতন্যকে পরিচ্ছন্ন' করায় ভূমিকা নিয়েছে। এবং ভাষার অতি অলংকারের জন্যে সেই এলোমেলো প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করাও মুশকিল। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার বিষয়ে আলোচনা যদি কবিতার চেয়েও বহুগুণে দুর্বোধ্য হয়, তবে সে আলোচনায় ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

পত্রিকা

সাহিত্যতীর্থ। সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। ৬৭, পাথুরেঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ৩·০০

দুই পরলোকগত স্মরণীয় কবি, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও নরেন্দ্র দেব-এর স্মৃতির উদ্দেশে 'সাহিত্যতীর্থের' এই স্মারক সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি এই কবিদ্বয়ের উত্তরকালের সাহিত্যিকগণের শ্রদ্ধার্ঘ্যে সমৃদ্ধ। এঁদের মধ্যে আছেন, কালিদাস রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, অন্নদাশঙ্কর রায়, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ।

সহৃদয় কবি কুমুদরঞ্জনের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপূর্ণ রচনাগুলি সাহিত্য রসিকদের আনন্দ দেবে। এবং এঁদের ভালবাসার কবি নরেন্দ্র দেবের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সুরসিকদের অন্তরকে স্পর্শ দেবে। এই সব মৌলিক রচনা ছাড়াও আছে কিছু পত্রাবলী।

ডেনে বোলাররাই জি মাৎ করেছে

চিড়িয়াখানা, পিকনিক, বোটানিক, বাংলাদেশ সফর—বড়দিনের এসব গ তো ছিলই, বাড়তি আকর্ষণ ছিল ন আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা। গাও ছিল মহৎ। যাঁরা দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ বাড়িয়েছেন দেশের সম্মান, খেলার সেই জোয়ানদের জন্য কিছু অর্থ করা। অপরদিকে উইলোর তরবারি ক্রিকেট যুদ্ধে যাঁরা প্রথমে ওয়েস্ট কে এবং পরে ইংলণ্ডকে পরাজিত আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে ক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ইডেনে তাঁদের সমাগম। দেশের নেতৃবর্গেরও তো আজ বীরের

ই অবশ্য ইডেনে সমাগত হতে ... এঞ্জিনিয়ার, সুনীল ... বিদেশ সংবেদী অবশিষ্ট বিশ্ব ... অস্ট্রেলিয়া সফর করছেন। ... ও গোবিন্দরাজ অসুস্থ ... পারেননি। এরাপল্লী প্রসন্ন ... আগে কলকাতায় পৌঁছেও পারি-... কারণে পারেন নি খেলায় অংশ নিতে। ... তাদের দেখার জন্যও ... ক্রীড়ামোদিরা আগ্রহভরা দৃষ্টি ... ছিলেন। সেই সঙ্গে এসেছিলেন ... প্রথম সারির সব খেলোয়াড় যাঁদের ... মনসুর আলী খাঁ এবং ... দুরানি এখনো দর্শক আকর্ষণ, ... কথা।

কলকাতার বড় খেলার ব্যাপারই ... এখানকার ক্রীড়ামোদিদের পয়সা ... কার্পণ্য নেই। ক্রিকেটের জন্মভূমি ... যেখানে টেস্ট খেলায় আট-দশ ... বেশী দর্শক সমাগম হয় না ... কলকাতার এই প্রদর্শনী খেলাতে ... দিন ৩৫ হাজারের মত দর্শক সমাগম ... কিন্তু যাঁরা ইডেনে সমবেত হয়ে ... পুরনো বছরের বিদায় নতুন ... আবাহন সঙ্গীত শুনতে চেয়ে-... ব্যাট-বলের ঐকতানের মধ্যে দিয়ে ... তৃপ্তি পেয়েছেন? উত্তরে বলব ... পাননি। চারদিনের খেলাটি ... দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে ... পরিবেশে। পরে অবশ্য ৪০ ওভার ... ওভারের অতিরিক্ত প্রদর্শনী ... বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। ওই খেলাও ... হিসাব মত একদিনেরও আগে। ... দিন আধ ঘণ্টার বেশী খেলা চলেনি। ... আরম্ভ হয়েছিল লাঞ্চ বিরতির

কিছু আগে। মূল প্রদর্শনী খেলাটিতে রাবার বিজয়ী ভারতীয় দল ৭ উইকেটে অবশিষ্ট ভারতীয় দলকে পরাজিত করেছে। ৪০ ওভারের অতিরিক্ত প্রদর্শনী খেলাতেও রাবার বিজয়ী দল জয়ী হয়েছে ২৩ রানে।

বলা বাহুল্য ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম সারির সিকিশত খেলোয়াড় সমাগম সত্বেও দর্শকরা ভাল খেলা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন প্রধানত ইডেনে পিচ তৈরির ত্রুটিতে। পিচ ছিল স্পিন বোলারের স্বর্গ আর ব্যাটসম্যানের বধ্য ভূমিখণ্ড। যার ফলে প্রথম দুই দিনের খেলায় ১৬টি করে উইকেট পড়েছে। শেষ দিকে অবশ্য পিচ কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ফলে ব্যাটসম্যানদের হাত থেকে কিছু স্ট্রোকও বেরিয়েছে। হয়তো দর্শকদের সুদীর্ঘ দীর্ঘ-শ্বাসই পিচের আর্দ্রতা শুষে নিয়ে পিচকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছিল।

যে পিচ থেকে বোলার ও ব্যাটসম্যান সমান সুযোগ পেয়ে থাকে তাকেই বলা হয় স্পোর্টিং পিচ। সাধারণত সেই ভাবেই পিচ তৈরী করা হয়। কিন্তু সবক্ষেত্রে স্পোর্টিং পিচ পাওয়াও তো শক্ত। বৃষ্টির ফলেও পিচের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠতে পারে। সব রকমের পিচে খেলতে পারাও ব্যাটস-ম্যানের বাহাদুরী, বিশেষ গুণ। যে টেকনিক ও দৃঢ়তা আয়ত্তে থাকলে খারাপ পিচেও খেলা যায়, পিচের অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যাটসম্যানই তা দেখাতে দেখাতে পারেন নি। তাছাড়া ব্যাটিংয়ের কলা কৌশল ক্রিকেটের প্রধান আকর্ষণ হলেও বোলিংয়ের চাতুরী দেখাও তো কম লাভ নয়। সেদিক দিয়ে সত্যিই উন্নত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বেংকটরাঘবন, দিলীপ দোশী ও সেলিম দুরানি। অতিরিক্ত প্রদর্শনী খেলায় কিছুটা দীপংকর সরকারও।

মূল প্রদর্শনী খেলায় যে ৩৩টি উই-কেট পড়েছে তার মধ্যে ৩০টি উইকেটই পেয়েছে স্পিন বোলাররা। বেংকটরাঘবন পেয়েছে ৯৫ রানে ১০টি, সেলিম দুরানি ৮২ রানে ৮টি, দিলীপ দোশী ৯৫ রানে ৮টি, নৌসের মেহতা ৩টি এবং চন্দ্রশেখর ১টি। মিডিয়াম পেস বোলারদের ভাগে মাত্র দুটি উইকেট। একটি রান আউট। নিঃসন্দেহে বেংকটরাঘবন এবং দিলীপ দোশী কব্জির মোচড়ে চমৎকার ভাবে বল ঘুরিয়েছেন। কিন্তু সেলিম দুরানিও কম যাননি। বরং প্রথম দিন দুরানির বল খেলতেই ব্যাটস-ম্যানরা বেশী বেগ পেয়েছেন।

ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকের অভিমত দিলীপ দোশী এই খেলায় যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁর ভবিষ্যৎ টেস্ট দলে স্থান পাওয়া উচিত। পরি-সংখ্যানের দ্বারাও সে কথা প্রমাণিত হয়েছে। কেন না অবশিষ্ট দলের ৮৮ রানের প্রথম ইনিংসে বেংকট যেখানে পেয়েছেন ৪৩ রানে ৬ উইকেট, রাবার বিজয়ী দলের ১০৯ রানের প্রথম ইনিংসে দিলীপ সেখানে পেয়েছেন ৩৮ রানে ৬টি। কিঞ্চিৎ ভাল অ্যাভা-রেজ। তার চেয়ে বড় কথা, দিলীপকে বল করতে হয়েছে রাবার জয়ী দলের প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে। বেংকটরাঘবন বল করেছেন দ্বিতীয় সারির অবশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে।

ইডেনের এই খেলায় উঠতি তরুণদের পরিমাপ করাও ছিল ক্রিকেট বোর্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য। নির্বাচক সমিতির চেয়ার-ম্যান সি ডি গোপীনাথ, সমিতির একজন সদস্য, বোর্ডের সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষও উপস্থিত ছিলেন। বোর্ড সভাপতি শ্রীঅমর ঘোষ তো ছিলেনই। দিলীপ দোশী সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাঁরা ভাল ধারণা করতে পেরেছেন। অপর উঠতিদের মধ্যে নৌসের মেহতা, রামনাথ পার্কার আব্দুল ইসমাইলও তাঁদের হতাশ করেন নি।

ব্যাটসম্যানদের কথা বলতে হলে প্রথমেই বাংলার অম্বর রায়ের কথা বলতে হয়। মূল প্রতিযোগিতার প্রথম ইনিংসে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অম্বরই বেশী রান করেছেন। অতিরিক্ত প্রদর্শনীতেও তাঁর ২৩ রানের স্বল্প সময়ের ইনিংস দর্শকদের কয়েকটি সুন্দর মার উপহার দিয়েছে। মূল প্রদর্শনীর দ্বিতীয় ইনিংসে একমাত্র অম্বরই বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। খেলেছিলেনও নির্ভুলভাবে। অবশ্য তখন পিচ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। তবু দুরানি ও বেংকটরাঘবনের বলের বিরুদ্ধে তিনি ভুল করেন নি। তুলনায় রাবার বিজয়ী দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকর তিন চারটি চান্স দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট থাকার কৃতিত্ব সমেত ৯৩ রান করেছেন। প্রথম ইনিংসে স্পিন-সহায়ক উইকেটে অবশ্য ওয়াড়েকরের ৩২ রান প্রশংসার দাবি রাখে।

ক্রিকেটের সুনিপুণ শিল্পী হিসাবে পরিচিত গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথের আংশিক ব্যর্থতা সত্বেও তাঁর ... মনে রাখার মত।

ফলে প্রদর্শনী খেলাটির গতি দেখে কর্তৃপক্ষ যখন বুঝতে পারলেন, খেলাটি তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নভোজ বিরতির আগেই শেষ হয়ে যাবে তখনই তাঁরা অতিরিক্ত প্রদর্শনীর কথা ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতিতেই দেখা গেল, মালিরা দ্বিতীয় পিচের মাপজোক করছেন দ্বিতীয় প্রদর্শনীর জন্য। কিন্তু দুই অধিনায়ক পিচের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ওই পিচে খেলতে চাইলেন না। অতিরিক্ত প্রদর্শনী খেলাটিও হল একই পিচে। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় দিনের চায়ের পর পিচ অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের বক্তব্য, ৮০ ওভারের খেলায় ওই পিচে আমাদের মহারথী ব্যাটসম্যানেরা কেন চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেললেন না? কেনই বা অবশিষ্ট দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং জয়ের ঝুঁকি নিয়ে হাত খুলে ব্যাট চালালেন না? খেলার ওভার যেখানে নির্দিষ্ট এবং জয়পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সেখানে ড্র খেলার মনোবৃত্তি সমর্থন করা যায় না। দর্শকরা কিছু ভাল স্ট্রোক দেখতেই মাঠে গিয়েছিলেন। কিছু অবশ্য দেখেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ও দেখায় কেউ তৃপ্তি পাননি।

খেলাটির ধারাবাহিক পর্যালোচনার প্রয়োজন দেখছি না। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হয়েছে। খেলাটি থেকে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ টাকা। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, পূর্বাঞ্চলের সৈনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল অরোরা এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের নাম স্বাক্ষরিত একখানি ক্রিকেট ব্যাট নীলাম করেও ২৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে। ব্যাট নীলাম করেছেন রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস। কিনেছেন শিল্পপতি শ্রীশ্যামসুন্দর কানোরিয়া।

দুটি খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর :

অবশিষ্ট দল—প্রথম ইনিংস ৮৮ রান (অম্বর রায় ১৪, নৌসের মেহতা ১৩, পাতউদ্দিন মনসুর আলি ১২; বেঙ্কট-রাঘবন ৪৩ রানে ৬ উইকেট, সেলিম দুরানি ২৮ রানে ৪ উইকেট)

রাবার বিজয়ী ভারতীয় দল—প্রথম ইনিংস ১০৯ রান (অজিত ওয়াড়েকার ৩২, অশোক মানকড় ৩০; দিলীপ দোশী ৩৮ রানে ৬ উইকেট, নৌসের মেহতা ৪১ রানে ৩ উইকেট)

অবশিষ্ট দল—দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৭ রান (অম্বর রায় ৫৮, আবদুল ইসমাইল ৩৯, বেঙ্কটরাঘবন ৫২ রানে ৪ উইকেট, সেলিম দুরানি ৫৪ রানে ৪ উইকেট)

রাবার বিজয়ী ভারতীয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস ৩ উইঃ ১৫০ রান (অজিত ওয়াড়েকার নট আউট ৯৩, জয়ন্তীলাল ২১; দিলীপ দোশী ৫৭ রানে ২ উইকেট)

(রাবার জয়ী ভারতীয় দল ৭ উইকেটে জয়ী)

বিশ্বজয়ী বাঙালী মল্লবীর গোবর গুহ

৮০ ওভারের দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলা

রাবার জয়ী ভারতীয় দল—১৪৬ রান (জয়ন্তীলাল ৩৮, বিশ্বনাথ ৩৪, সেলিম দুরানি ২১; আবদুল ইসমাইল ২৩ রানে ২ উইকেট, দীপঙ্কর সরকার ৩৭ রানে ৩ উইকেট, দিলীপ দোশী ৫২ রানে ২ উইকেট।

অবশিষ্ট ভারতীয় দল—১২৩ (রামনাথ পার্কার ৩৬, অম্বর রায় ২৩, আসিফ আলি ২১; বেঙ্কটরাঘবন ৪৪ রানে ৪ উইকেট, সেলিম দুরানি ৩৩ রানে ৩ উইকেট।

(রাবার জয়ী দল ২৩ রানে বিজয়ী)

পরলোকে

মল্লবীর গোবর গুহ

৩ জানুয়ারী অফিসের টেবিলে বসে দেশ-এর সাপ্তাহিক লেখা প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় বন্ধুবর রবি বসু এসে জানালেন শেষ হয়ে গেল বাংলার মল্লক্রীড়ার ঐতিহ্য। মুখের দিকে তাকাতেই বললেন, কাল রাত ১টা ৫৫ মিনিটে গোবরবাবু মারা গেছেন হৃদরোগে। এবং মারা গেছেন তাঁর সেই শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী ১৯ নম্বর গোয়াবাগান স্ট্রীটের আখড়ার মাটিতে মল্লক্রীড়ার উপাস্য দেবতা হনুমানজীর মূর্তির সামনে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকারই কথা। ভাবতে পারছিলাম না এই সেদিনও যাঁর সঙ্গে তিন চার ঘণ্টা ধরে কথা বলে এসেছি, বর্তমানের খেলাধুলো সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছি, ৬ ফুট ১ ইঞ্চি মাথায় উঁচু সেই বিরাট পুরুষ আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ক্ষেত্রে একক কৃতিত্বে বিশ্বজয়ী একমাত্র বাঙালী এভাবে চলে যাবেন।

গোবরবাবু অবশ্য পরিণত বয়সেই পরলোকে চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। জন্ম ১৮৯২ সনের ১২ মার্চ। কিন্তু সেদিনও তাঁর মুখে চোখে আসন্ন মৃত্যুর ভ্রূকুটি দেখিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন আছেন? বললেন, বয়স অনুপাতে ভালই আছি। শুধু বাতের অসুখে একটু কষ্ট পাচ্ছি। সমস্ত খাট জুড়ে শুয়ে ছিলেন। মাঝে মাঝে তাকিয়ায় ভর দিয়ে কথা বলছিলেন। জীবনভোর লড়াইয়ের কথা, পাঁচ পুরুষ ধরে মল্লক্রীড়ায় ওদের বংশগত ঐতিহ্যের কথা। বিশ্ব-বিজয়ী বাঙালী মল্লবীর শিরোনামায় দেশ পত্রিকার ২ ও ৩নং সংখ্যায় (১৩ নভেম্বর ও ২০ নভেম্বর) সেসব কথা ছাপা হয়েছে। আজ নতুন করে সেসব কথা বলার মত মনের অবস্থা নেই। শুধু দুঃখ যে মানুষটি পিতামহ ও পিতৃব্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গায়ে মাটি মাখার সাধনা করেছিলেন। দেশের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে বিশ্বখ্যাত পালোয়ানদের পরাজিত করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মল্লচর্চার মধ্যে মেতে ছিলেন, শেষ জীবনে তিনি হা-হুতাশ করে গেছেন মল্লক্রীড়ায় বাংলার ছেলেদের অনীহা দেখে।

'গোবর গুহ' মল্ল জগতের শুধু একটি স্মরণীয় নামই নয়, ভারতীয় মল্ল ইতিহাসের এক অংশ। আমরা সবাই তাঁর ৫ পুত্র [illegible] কন্যা ও ১৪টি নাতি-নাতনীর শোকের সংগী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশ-[illegible] পিতাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন অমর মল্লবীরের স্মৃতি রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করেন।

দেবরাজ পুরি

দিল্লির টেলিভিসনে আগের রাতে বর্ষশেষের ক্রীড়া সমীক্ষা সেরে এসেছিলেন রেডিও কমেন্টেটর এবং অতীত দিনের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় দেবরাজ পুরি নতুন বছরের প্রথম দিনেই মাত্র ৫৬ বছর বয়সে পরপারে চলে গেলেন।

ওইদিনই ইডেনে বসে তাঁর স্মৃতিচারণ করছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। সেলিম দুরানির একটি জোরালো ওভার বাউনডারির বল রঞ্জি স্টেডিয়ামের উপর গিয়ে পড়তেই সহকর্মী সাংবাদিক বললেন ইডেনে এমন ওভার বাউনডারি [illegible] দেখেছি। তখনই ১৯৪৪-৪৫ সালে রণজি ট্রফির খেলায় দেবরাজ পুরির ছক্কা-মার

হলাপের কথা আরম্ভ হল। উঠলো অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের কিথ মিলারের দুড় মারের কথাও। ডাঃ জাহাঙ্গীর খাঁর কয়েকটি ওভার বাউনডারিও ইডেনে স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু মহীশূরের বিরুদ্ধে দেবরাজ পুরির ছক্কা মারার ঘটনা ইডেনের স্মৃতি হয়ে রয়েছে। গোটা পাঁচেক বাউনডারি মেরেছিলেন বাংলার পরাজয়ের মুখে। গোটা দুই উপর্যুপরি। আর গোটা দুই গিয়ে পড়েছিল হাইকোরট প্রান্তের উঁচু ঝাউগাছের উপর। এমন বলিষ্ঠ হাতের মার কাল-প্রাচীন ইডেনে আর দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। আর দেবরাজের সে মারে দর্শকদের কি উল্লাস! কান পাতলে আজও যেন সে ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি দেবরাজের বিদায় বাধার মধ্যে।

মহম্মদ নিসার, অমর সিং এবং সুঁটে ব্যানার্জীর সমসাময়িক কালের ফাস্ট বোলার দেবরাজ পুরি ১৯৩৫ সালে জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে আন-অফিসিয়াল টেস্ট খেললেও ১৯৩৬-এর ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় দলে স্থান পান নি। অবশ্য দেবরাজ নিজেই ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে নিয়মিত ক্রিকেটও খেলেছেন ইণ্ডিয়া জিমখানা ক্লাবে। তখন যে কতিপয় ভারতীয় এম সি সির সদস্য হয়েছিলেন দেবরাজ তাঁদের অন্যতম। ইংলন্ড থেকে ফিরে এসে তিনি কলকাতায় কালীঘাট ক্লাবে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ১৯৪৪ থেকে। তিনি ১৯৪৬ সালে কালীঘাটের ক্রিকেট অধিনায়ক ছিলেন। রণজি ট্রফিতে বাংলার পক্ষেও খেলেছেন কয়েক বছর। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফির সঙ্গেও দেবরাজের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। প্রতিযোগিতার প্রথম বছরেই দেবরাজের অধিনায়কত্বে লাহোর গভর্নমেনট কলেজ ট্রফি লাভ করে।

দীর্ঘদেহী দেবরাজ ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, সদালাপী এবং সদাহাস্যময় পুরুষ। একাই ক্লাবকে জমিয়ে রাখতেন। খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পর ক্রিকেট কমেন্টেটর হিসাবেও দেবরাজ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। বেতার শ্রোতাদের ভোটে একাধিকবার দেবরাজ শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট ভাষ্যকারের সম্মানও পেয়েছেন। ক্রিকেট সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দেবরাজ তাঁর ধারা বিবরণীর মধ্যে পাণ্ডিত্য ফলাবার চেষ্টা করতেন না। এটাই ছিল বিশেষত্ব।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আন-অফিসিয়াল টেস্ট হলেও যিনি ভারতের পক্ষে খেলেছেন, খেলা ছাড়ার পর ক্রিকেট এবং খেলাধুলোর সেবা করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও ইডেনের কর্তৃপক্ষ চতুর্থ দিনের প্রদর্শনী খেলা আরম্ভের আগে দুই মিনিট মৌন পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

একলব্য

দৌড়ে ভারত সেরা কিশোরী কন্যা

শালকিয়ার নন্দীপাড়ায় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের স্পোর্টসে ছোট্ট একটি মেয়ের দৌড়ের দম ও পায়ের স্টেপিং দেখে অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং অ্যাথলেটিক কোচ নিতাই সিংহ মেয়েটির বাবাকে বললেন, 'একে বড় স্পোর্টসে নামান না কেন?'

মেয়েটি উৎসাহ পেল। উৎসাহ পেলেন খেলাধুলোর অনুরাগী মেয়ের বাবাও। তারপর তিনি মেয়েকে ভরতি করে দিলেন গোলপার্কের মাঠের বয়েজ ট্রেনিং ক্যাম্পে। ভরতির দুদিনের মধ্যে কলকাতায় দ্বিতীয় জাতীয় সর্বাঙ্গীণ রেসে সকলকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটি চ্যাম্পিয়ন হল। তিন হাজার মিটার দৌড়ে সময় হল ১৩ মিনিট ১২·৬ সেকেণ্ড। অ্যাথলেটিকসে আনকোরা বারো বছর বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে সময়টা বিস্ময় রকমের কম। ওই দিনই সম্ভাবনাময় এই রীতা পালকে নিয়ে অ্যাথলীট বিশারদদের মধ্যে চিন্তার খোরাক জুটল। ওর শালকিয়া উষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয় এ সম্মানে পুরো ছুটি হয়ে গেল। এটা গতবছরের আটষট্টির কথা।

উনসত্তরে নানা স্পোর্টস ও রাজ্য অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে ১৪ বছর বয়সের কম মেয়েদের ইভেন্টে রীতা পাল দৌড়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। সিলেকশন পেয়ে ১৯৭০-এ গেল কটকের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে।

প্রায় অবাক কাণ্ড। ১৪ বছর বা ১৪ বছরের কম বয়সী মেয়েদের ৬০০ মিটার দৌড়ে সবার আগে বাংলার ছোট্ট মেয়েটি। সারা ভারতের মেয়েরা ওর পিছনে। সকলের আগে রীতা যখন ফিতে ছিঁড়ল, সময় রক্ষীরা ঘড়ির কাটায় চোখ রেখে বেশ কিছুটা বিস্মিত হলেন। ১ মিনিট ৪·৮৭ সেকেণ্ডে নতুন জাতীয় রেকর্ড। তাও খালি পায়ে দৌড়ে। রানিং শু ওর ছিল না। ১৩ বছর মেয়ের পক্ষে খালি পায়ের দৌড়ে ৬০০ মিটারে ওই সময় করা বিস্ময়ের ব্যাপার বইকি। অন্ততঃ ভারতীয় অ্যাথলেটিকস মানের বিচারে। ৬০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড করা ছাড়া ৮০০ মিটারেও রীতা দ্বিতীয় হয়েছিল কটকে।

কলকাতায় ফিরে আসার পরই রীতাকে নিয়ে আরম্ভ হল গবেষণা। রীতাই বাংলার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে প্রথম, বিজ্ঞান কলেজের শরীরতত্ত্ব বিভাগে দৈহিক সামর্থ্য সম্পর্কে 'আরগোমিটারে' যার পরীক্ষা হয়েছে। রীতার অনুশীলন, খাদ্যাভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং দৈহিক সামর্থ্য সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন শরীরতত্ত্বের গবেষক এবং 'কানোজি আংরের' সফল অভিযাত্রী শ্রীপিনাকী চ্যাটার্জী। উদ্যোগী ছিলেন সহকর্মী সাংবাদিক বন্ধু চিরঞ্জীব।

তিন মিনিট ধরে 'হারবার্ট' স্টেপ টেস্ট করার পর দেখা গিয়েছিল প্রতি মিনিটে রীতার হৃদস্পন্দন ১৪৪ বার। ওর বয়সী একটি পরিশ্রমী মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী। একজন প্রাপ্তবয়সী পুরুষকে পরীক্ষা করে

অ্যাথলেটিকসে ভারত সেরা কিশোরী কন্যা রীতা পাল

দেখা গিয়েছিল, তারও স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ বার। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, কিশোরী কন্যাটির হৃদপিণ্ড সুগঠিত এবং সুদৃঢ়।

তবে পরিশ্রমের পর রীতার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সময় লেগেছিল ৫০ মিনিট। আর ওই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন মাত্র আড়াই মিনিটে। এর দ্বারা কি

চোখে যখন নামে স্বপন...

আমার মুখে বিনাকা ডীপ ক্লীনজিং কোল্ড ক্রীম বেশ ভালো ক'রে লাগালাম আর সারাদিনের বাসী মেক্ আপ আর ময়লা যাতে একেবারেই না থাকে তার জন্যে সেটা তুলো দিয়ে মুছে ফেললাম।

শুতে যাবার আগে আবার একবার ওটা লাগালাম মুখে।

ঘুমে আমার চোখ বুজে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিনাকা ডীপ ক্লীনজিং কোল্ড ক্রীম কাজ করতে শুরু করল আমার ত্বকের গভীরে।

চোখে ঘনিয়ে এলো ঘুম......ঘুম......ঘুম......

প্রমাণিত হয়েছিল? স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে কেন এই অস্বাভাবিকতা? ডাক্তার বিজ্ঞানীর মত : পরিশ্রম অনুযায়ী রীতা যে খাবার পায়, সেটা তার প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

[illegible] পেশী-শক্তির পরীক্ষার জন্য অর্ধেক-ওঠা, অর্ধেক-বসা অবস্থায় রীতাকে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলায় রীতা দাঁড়িয়েছিল ৩০ সেকেন্ড। একজন [illegible] পুরুষ ২০ সেকেন্ডের বেশী ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। এতে প্রমাণ হয়েছিল, মেয়েটির পেশীর শক্তি অনেক বেশী।

দম বন্ধের পরীক্ষায় যেখানে একজন [illegible] এক মিনিট দম বন্ধ করেছিলেন, সেখানে রীতা দম বন্ধ করে থাকতে পেরে-ছিল পুরো দুই মিনিট। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল, রীতার ফুসফুসের সহনশীলতাও বেশী।

কিন্তু পরিশ্রমের পর হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল, তাতে রীতা যে শুধু প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য পায় না, শুধু সে কথাই প্রমাণিত হয়নি। আরও প্রমাণিত হয়েছিল পরিশ্রমের ফলে ওর শরীরের কিছু [illegible] কিছু ক্ষতি হচ্ছে।

হায় ভগবান, তুমি এত নিষ্করুণ কেন? যে মেয়েটিকে এত সহনশীলতার শক্তি দিলে, যার হৃৎপিণ্ড এমন সতেজ করে গড়লে তার উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করলে না কেন?

রীতার বাবা বিশ্বনাথ পাল ছা-পোষা মানুষ। সামান্য আয়। ৮ জনের সংসার। তার পক্ষে [illegible] চালানো শক্ত তিনি রীতাকে অ্যাথলে[illegible] প্রয়োজনীয় খাদ্য—দুধ, ডিম, মাংস যোগাবেন কিভাবে? তার উপর আবার বর্তমানে অর্ধ-বেকার।

এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও রীতা কিন্তু এগিয়ে চলেছে পল্লীর প্রতিবেশী ও শুভানু-ধ্যায়ীদের সাহায্যে। আর বাবা? প্রায় অচল সংসারের জোয়াল কাঁধে করা জীবন। তবু রীতার অ্যাথলেটিক চর্চায় প্রতি পূর্ণ সজাগ। প্রতি স্পোর্টসে রীতার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। ওর অনুশীলনে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। কোন স্পোর্টসের কোন ইভেন্টে কি সময় করল নোট-বুকে টুকে রাখছেন। নোট-বুক দেখেই সেদিন ওর রেকর্ড এবং সময়গুলো বলে গেলেন। রীতা বলল, 'বাবাই আমার অনুপ্রেরণা'।

উনিশশো একাত্তরে আমেদাবাদে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে রীতার ৬০০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড আরও উন্নত হয়েছে। আগের বছর যেখানে ছিল ১ মিনিট ৪৮·৭ সেকেন্ড সেখানে ১ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। ৮০০ মিটারে (১৬ বছর বয়সীদের ইভেন্টে) সময় করেছে ২ মিনিট ৩০·৪ সেকেন্ড। স্থান দ্বিতীয়। কেরলের রেকর্ড সৃষ্টিকারিণী মেয়ে বিজয়লক্ষ্মীর সময়ের চেয়ে মাত্র ১·৪ সেকেন্ড বেশী।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই ১৪ বছরের কিশোরী যখন সিনিয়রদের ৮০০ মিটারে দৌড়ল, তখন সময় হল অনেক কম। ২ মিনিট ২৭·৮ সেকেন্ড। সিনিয়রে স্থান হয়েছিল অবশ্য পঞ্চম।

সময় কমের কারণ জিজ্ঞাসা করতে বিশ্বনাথবাবু জানালেন, সিনিয়র ইভেন্টে প্রতিযোগিনীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ফলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। তাছাড়া জুনিয়র ইভেন্টে একদিনেই ৬০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়তে হয়। সিনিয়রে একদিন বিশ্রাম পাবার পর। আমেদাবাদে সিনিয়রদের ১৫০০ মিটারেও দৌড়েছিল রীতা। ওতেও পঞ্চম স্থান পেয়েছিল। সময় হয়েছিল ৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড।

বড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছোট মেয়েটির এই সাফল্য দেখেই ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের কর্তা ব্যক্তিরা ওকে ডাকলেন পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসে ট্রায়ালের জন্য। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইরানে অ্যাথলেটিক দল পাঠাবার ট্রায়াল। ৮০০ মিটারের ট্রায়ালে দ্বিতীয় হওয়ায় রীতা অবশ্য সিলেকশন পায়নি। কিন্তু ওর দৌড়ের শক্তি ও গতি দেখে কোচরা ট্রেনিংয়ের জন্য ওকে ৪৫ দিন ইনস্টিটিউটে রেখেছিলেন। এটা জুলাই-আগস্টের কথা।

ব্যাংকক এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালের জন্যও পাতিয়ালায় রীতা পালের ডাক পড়ে-ছিল। সেবার ক্যাম্প ছিল ২৬ দিন।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসের রেকর্ড তালিকায় একমাত্র সে বাংলার মুখ রেখেছে। হাওড়ার সেই কিশোরীর এখন দূরপাল্লার দৌড়ে পোক্ত হবার জন্য অনুশীলন অধ্যবসায় এবং সাধনা। কিন্তু ৮০০ মিটার এবং ১৫০০ মিটার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মত মেয়ে কোথায়? মাত্র তিন চারটি মেয়ে আছে। প্রতিযোগিনীর অভাবে অনেক স্পোর্টসেই ইভেন্ট বাতিল হয়ে যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাল্লা থাকে না। সময়েরও উন্নতি হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লাই যে সময় উন্নত করার সহায়ক এটা সর্বজন-স্বীকৃত। স্বনামধন্য সাঁতারু জনি উইসমুলার তার আত্মজীবনীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল্য বোঝাতে লিখেছেন : 'একবার সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় হাঙ্গারের তাড়া খেয়ে যেভাবে সাঁতার কেটেছিলাম, কোন রেকর্ড সৃষ্টির সময় ওভাবে সাঁতার কাটতে পারিনি। যদি কোন সময়-রক্ষক তাঁর ঘড়িতে আমার ওই গতিবেগের সময়টা ধরে রাখতে পারতেন, তবে তা বোধহয় অবিশ্বাস্য রেকর্ড হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকত'।

পিছু তাড়া করার প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলে সময়ের উন্নতি করা শক্ত। রীতাকে তাড়া করার মত প্রতিদ্বন্দ্বী কোথায়? ৮০০ ও ১৫০০ মিটারে ওর সময় আশানুরূপ উন্নত না হবার অন্যতম কারণ—বিশ্বনাথবাবু জানালেন—অনুশীলনের মাঠের অসুবিধা। গোলমোহর মাঠে মিলিটারির ক্যাম্প হয়েছে। অনুশীলনের জন্য ওকে [illegible] রোজ ছুটতে হয় বালি জুট মিলের মাঠে। জুট মিলের কর্তৃপক্ষ অবশ্য সুযোগ সুবিধা দিতে কোনরকম কার্পণ্য করেন না। প্রচুর উৎসাহও দিয়ে থাকেন। কিন্তু যাতায়াতে দুই পিঠের ভাড়ার জন্য রোজ ৪০ পয়সা খরচ করতে হয়। সে পয়সা বাঁচাতে পারলে সংসারের যথেষ্ট সাশ্রয় হয়।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে রেকর্ড সৃষ্টির জন্যই ভারত সেরা কিশোরী জাতীয় বৃত্তি পেয়েছে। মাসে ৫০ টাকা হিসাবে বছরে ৬০০ টাকা। কিন্তু টাকা এখনো আসেনি। কোন চিঠিপত্রও না। বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'কাগজেই খবরটা দেখেছি'।

টাকা হয়তো আসবে। কিন্তু অপুষ্টির জন্য রীতার শরীরের যে ক্ষতি হয়েছে, আশানুরূপ উন্নতি না হবার সেটাও আংশিক কারণ হতে পারে। [illegible] দেহের কাঠামোও কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকতে পারে। উপযুক্ত খাদ্য এবং পরিশ্রম অনুযায়ী পরিচর্যা পেলে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি মাথা উঁচু মেয়েটির দেহের উচ্চতা কিছুটা বাড়তে পারে। ফলে দৌড়ের পাল্লা শেষ করার সময় কমিয়ে আনাও হত কিছুটা সহজ। কিন্তু বাবার শিক্ষায় খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তিতেই ও জীবনের কঠিন পথকে মেনে নিয়েছে। সাধনায় ফাঁকি নেই। সাধনার দ্বারাই রীতা আন্তর্জাতিক ট্র্যাকে দৌড়বার স্বপ্ন সফল করতে চায়।

মুকুল

সংসার

নর্মদা পিকচার্স

রমণীর গুণে সংসার সুখের হয় সত্যি, তবে ছায়াছবিতে ওই সুখমুহূর্তের জন্য দর্শককে ক্লাইম্যাক্স অবধি অপেক্ষা করতে হয়। "সংসার" ছবিতেও রমণীর গুণ দেখা গেছে, তিন ভাইয়ের সংসারে [illegible] ছিল। তবে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি ও অভিমানের পর্বটা না থাকলে নাটক জমে না। কাহিনীকার-পরিচালক সলিল সেন নাটক জমিয়ে দিয়েছেন। মেজবৌ শান্তি সংসারের মধ্যমণি। শরৎচন্দ্রের কাহিনীর [illegible] অনুযায়ী বড়বৌ সতীর ছেলে বিনু তাকেই মা-মণি বলে ডাকে, মায়ের চেয়ে বড়মারই সে বেশি অনুগত। তবে এই সংসারে ভাইয়ে-ভাইয়ে ভুলবোঝাবুঝি হলো। শান্তি কী-ভাবে সংসারের মর্যাদা রাখতে চেয়েছিল সেটা বুঝতে পারেনি তার স্বামী ও ভাসুর।

এই ধরনের নাটকে কে যে কাকে কখন কেন ভুল বুঝবে তার সঠিক কারণ দর্শকের পক্ষে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অবশ্য এর দরুন যে নাটকীয় রসের সৃষ্টি হয় সেটা দর্শক নিশ্চয়ই উপভোগ করতে পারেন। আসলে নাটক তৈরির জন্য পরিচালক-কাহিনীকার কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি বা সঙ্গতির বাঁধুনি বেশ একটু ঢিলে করে দিয়েছেন। তা না-হলে সুভাষ (তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট) এবং মীরার (সুভাষের স্ত্রী ও ভালবাসার পাত্রী) মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ দেখা যেত না। প্রতিবেশী বড়লোকের [illegible] দেখে সুভাষ ক্ষুব্ধ। তাই বলে কি স এতদিনের বন্ধু মীরার দাদাকে কটু কথা বলে বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে দিতে পারে? সুভাষ ও মীরার মধ্যে মনের মিল দেখেই ওদের বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন মীরার দাদা, সুভাষের বৌদির কাছে। সুভাষের মেজদা সত্যেন তখন প্রতিবেশী [illegible] বড়লোক অজিতের কাছে প্রবঞ্চিত।

"নায়িকার ভূমিকায়" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে দীপ্তি রায় ও অপর্ণা সেন

তাদের সংসারে তখন এই নিয়ে ঘোর অশান্তি। হঠাৎ যদি একটা ভুল করেও থাকে সুভাষ, তবু পরে কেন সে মীরার কাছে গিয়ে সে-ভুল শুধরে নেবে না? সে তো তখনও ভালবাসে মীরাকে। সুভাষের আচরণ সর্বথা যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও রোমান্টিক উপাখ্যানটি রুচিসম্মত ও উপভোগ্য।

নাটকে জট পাকাবার ব্যবস্থাগুলি আসলে পাকা। তবে বুদ্ধি দিয়ে দেখলে যে-কোন জটের কারণই অযৌক্তিক মনে হয়। পাশের বড়লোকের বাড়ির কথাই ধরা যাক। ওই বাড়ির অজিত যতখানি পারে সুবোধদের ক্ষতি করেছে। পরে যখন অজিতের মামা সমরেন্দ্রবাবু বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন, যিনি অজিতের পরিচালনাধীন কোম্পানির প্রকৃত মালিক, তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সুবোধদের অশান্তি কমত। সমরেন্দ্রবাবু ছিলেন সুবোধ-সত্যেন-সুভাষের পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অথচ খলচরিত্র অজিতের কথা শুনে সুবোধরা অতি সহজেই ভুল বুঝল পিতৃবন্ধুকে। একবার সমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আসল মনোবৃত্তি জানাবার ইচ্ছা বা চেষ্টা সুবোধ বা সত্যেনের মধ্যে দেখা গেল না। এমনিভাবে এখানেও জট সৃষ্টি করা হয়েছে। ওইদিকে বিলেত থেকে ফিরে এসে সমরেন্দ্রবাবু কিছুতেই তাঁর ভাগ্নের শয়তানি বুঝে উঠে পারছেন না। অজিত গার্ল ফ্রেন্ড মলিকে তার বৌ সাজিয়ে মামাকে কিছুকাল ঠিকই ভুলিয়ে রাখে। কিছুদিন বাদে অবশ্য মামার মনে ভাগ্নের সততা নিয়ে সন্দেহ জাগে। তবে সেটা নিয়ে আর কোন জম-জমাট নাটক হয়নি। সমরেন্দ্র তো বাড়ি থেকে পালিয়েই গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে পাশের বাড়ির মেজবৌ শান্তির সঙ্গে দেখা হওয়াতে তিনি অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার মনোবল ফিরে পেলেন। অবশ্য সমরেন্দ্রবাবুর জয় এবং ভিলেনের পতন নিয়মমাফিক হঠাৎই দেখানো হয়েছে। সেখানে কোন চাঞ্চল্যকর ব্যাপার বা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি নেই।

"অপর্ণা" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যা

প্রকৃতপক্ষে তিন সংসারের গল্প "সংসার"। তাই চরিত্রসংখ্যাও অনেক। প্রধান শিল্পীরা সকলেই নাটকের প্রতি সুবিচার করেছেন। এ'রা হলেন সন্ধ্যারাণী (সতী), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (শান্তি), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (সুবোধ), নির্মলকুমার (সন্তোষ), সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (সুভাষ), শেখর চট্টোপাধ্যায় (অজিত) এবং বসন্ত চৌধুরী (সমরেন্দ্রবাবু)। এ'দের মধ্যে বসন্ত চৌধুরী তাঁর অভিনেয় চরিত্রে যে-ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন তা বিশেষ লক্ষণীয়। সুভাষের প্রণয়িনী মীরার চরিত্রে রয়েছেন নন্দিনী মালিয়া। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় তাঁদের চরিত্রে ভালই অভিনয় করেছেন। দর্শকদের বেশ হাসিয়েছেন জহর রায় ও হরিধন মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক-কাহিনীকার সলিল সেন তাঁর এই ছবিতে প্রমোদের উপকরণ অনেক রেখেছেন। বিশেষভাবে রয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত সুশ্রাব্য গান। যদিও গান যখন-তখন শোনা গেছে; তবে মোট তিন সংসারের গল্প পরিচালক স্বচ্ছন্দ গতিতে একটি বিন্দুতে এনে শেষ করেছেন যেখানে নাট্যামোদী দর্শকের চিত্তবিনোদনের প্রতিশ্রুতি।

শ্রীমান পৃথ্বীরাজ

তরুণ মজুমদার তাঁর নতুন ছবি "শ্রীমান পৃথ্বীরাজ"-এর কাজ শুরু করেছেন। সম্প্রতি শ্রীমজুমদার তাঁর ইউনিট নিয়ে বীরভূমের ইলামবাজার অঞ্চলে গেছেন।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবিতে অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত এবং কয়েকজন নবাগত অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছবির ক[...] গান রেকর্ড হয়েছে যেগুলি গেয়েছেন [...] মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, [...] সেন, ভবানী চট্টোপাধ্যায় ও [...] ছবিটি প্রযোজনা করছেন কে এন [...] ফিল্মস"।

"মেম সাহেব"-এর শুভ সূচনা

পাম্প ফিল্মস-এর তৃতীয় ছবি [...] সাহেব"-এর শুভ সূচনা গত ৫ই জা[...] টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে প্রযো[...] সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টা[...] সংগীত পরিচালনায় শুরু হয়েছে। [...] কণ্ঠদান করেছেন অসীমা ভট্টা[...] পিনাকী মুখোপাধ্যায় ছবির পরি[...] বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্ত[...] ও অপর্ণা সেন। এই মাসেই ছবির নি[...] চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

নির্জন সংলাপ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক[...] "জীবনের জটিলতা" অবলম্বনে [...] প্রোডাকসন্স "নির্জন সংলাপ" নামে [...] ছবি তৈরীতে হাত দিয়েছেন। [...] পরিচালনা করছেন অর্চন চক্রবর্তী। [...] ও সংলাপ সুবীর হাজরার। [...] ভূমিকায় থাকছেন বিবেক চট্টো[...] জয়শ্রী রায়, শ্যামল ঘোষাল এবং [...] ঊর্মিলা দে। আপাতত ছবির বা[...] গ্রহণের কাজ চলেছে।

প্রযোজক শাখার গর্ব ও আ[...]

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার [...] সিয়েশনের প্রযোজক-শাখা সম্প্রতি এ[...] গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তি স[...] সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করে কয়েকটি [...] পাশ করেছেন। একটি প্রস্তাবে [...] যখন দখলদার জঙ্গীশাহীর বর্বর অ[...]

আমাদের দোরগোড়ায় বর্বরতার জীবন্ত লাঞ্ছনা চলছিল এবং যখন লাখ লাখ মানুষ অত্যাচার জর্জরিত ভিটেমাটি ছেড়ে এই দেশে চলে এসেছিলেন, তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেনি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অসম সাহসিকতার সঙ্গে যে অকুতোভয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন এবং সার্থক নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায়ের অহংকার চূর্ণ করেছেন তার জন্য আমরা ভারতবাসী হিসেবে গর্ব অনুভব করি।

একটি প্রস্তাবে বলা হয় গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ একই ধ্যান ধারণার শরিক। একই কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে নতুন করে এমন এক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে—যা জীবনের সকল দিকে প্রতিফলিত হবে। বাংলাদেশের জনগণের এই অনমনীয় সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে, বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি অখণ্ড। সে দেশের ভাষা এবং সংস্কৃতি এক ও অবিচ্ছেদ্য। এই একতা সকল ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ব্যবধানকে স্বীকার করে না। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রপ্রযোজকরা তাই আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলা চলচ্চিত্র দুই বাংলার মধ্যে স্বাধীন সাংস্কৃতিক ভাবধারা বিনিময়ে সহায়ক হবে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের এই ডাকে বাংলাদেশের চিত্রসংস্থা ও সরকার সাড়া দেবেন এই শিল্প ও সংস্কৃতির মাধ্যমে এক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন—যে মহৎ উদ্দেশ্যে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রযোজক-শাখার সভাপতি শ্রীবিমল দে।

নাটক সমালোচনা

চোপ্, আদালত চলছে

বহুরূপী

প্রথমেই একটি প্রশ্ন জাগে—যেখানে "চুপ" বলা যেত কিংবা "আস্তে", কারণ আদালত চলছে, সেখানে শাসনের সুরে "চোপ্" কেন? মূল মারাঠি নাটকটির (রচনা: বিজয় তেণ্ডুলকর) নাম "শান্ততা, কোর্ট-চালু আহে"। "শান্ততা"-র জায়গায় কি "চোপ্"? সম্ভবত বাংলা নামকরণেই অনুবাদকরা (এস বি স্বামী ও নীতীশ সেন) নাটকটির মর্মকথা দর্শকদের জানিয়ে দিতে চেয়েছেন। নাট্যকার শ্রীতেণ্ডুলকর তাঁর নাটকে ব্যক্তি ও তার প্রতিপক্ষকে সহজেই চিনিয়ে দিয়েছেন। একদিকে ব্যক্তি, অপর দিকে সমাজ। সমাজ যে সময় সময় ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কতখানি বিরূপ ও নির্দয় হতে পারে নাটকে তারই আভাস। সমাজ ব্যক্তির কথা বুঝতে চায় না কিন্তু তাকে শাসন করবার জন্য সদা উদ্যত। "চোপ্" কি তবে সেই সমাজ-তর্জনী? "চোপ্" শুনতেও ভাল নয়, তাড়াতাড়ি গোড়াতেই ভাবার্থ স্পষ্ট করে লাভ কী?

বহু আলোচিত "শান্ততা, কোর্ট চালু আহে" নাটকের বাংলা অনুবাদ দেখে খুবই যে ভাল লাগল সে-কথাটাও আবার গোড়ায় উল্লেখ থাক। অনুবাদে যথাসম্ভব মূল নাটকের মেজাজ রাখা হয়েছে—ভাষায় ও চরিত্রদের নামে ও উপস্থিতিতে। অর্থাৎ "চোপ্ আদালত চলছে" মূল নাটকের অনুবাদই, রূপান্তর নয়। অথচ অনুবাদেও যে কিছু সৃষ্টি করা যায় ও কিছুটা মৌলিকত্ব নিয়ে আসা সম্ভব সেটা প্রমাণ করেছে বহুরূপীর প্রযোজনা বা প্রোডাকশন এবং শম্ভু মিত্রের নাট্যপরিচালনা।

নাটকটি বিষয়ের গর্বে তেমন গরবী নয়। এর গর্ব আঙ্গিকে বা ফর্মে, যা কাঠামোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। "মক ট্রায়াল" বা নকল আদালতের প্রমোদ-অনুষ্ঠান যে ক্রমে সত্যিকারের বিচারশালা হয়ে উঠেছে সেখানেই, ধরা যেতে পারে নাটকের আসল চমক কিংবা ফর্ম-ভিত্তিক আধুনিক কৌশল। প্রহসন যখন প্রকৃত বিচারের সওয়াল-সাক্ষ্য এসে দাঁড়িয়েছে, বিচিত্রানুষ্ঠানের দলের বেনারে বাঈয়ের ভূমিকা যখন পাল্টে গেছে, সাজাই যখন সে কাঠগড়ার আসামী, তখন দেখা গেছে ওই মামলায় সমাজই বাদীপক্ষ। বিবাদীপক্ষে একা দাঁড়িয়ে স্কুলের শিক্ষিকা অবিবাহিতা বেনারে বাঈ, ওই শৌখিন দলেরই এক অভিনেত্রী, যে ভ্রূণহত্যার দায়ে অভিযুক্তা। এই অপরাধ ও দণ্ডের বিষয়টি অনেক উপন্যাস-নাটকের বহুচর্চিত উপকরণ। বেনারে বাঈ আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক বলেছে, ওর সম্বন্ধে যা জানা গেছে তাতে ওই চরিত্রের জীবনভোগের বাসনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বেনারে বাঈ দলেরই পর পর দুজনকে জীবনসঙ্গী করবার জন্য প্রায় নির্লজ্জের মতই চেষ্টা করেছিল। একজন তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সে তার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সমাজে এক পুরুষের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল এতে চমকিত হবার কিছু নেই। বরং বেনারে বাঈয়ের ভিতরকার নারীর নিজস্ব ইচ্ছা ও বাসনা যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতেই নাট্যকারের সাহসের পরিচয়। ছোটোখাটো বেনারে বাঈ ও তার মামার ব্যাপারটা

বহুরূপীর "চোপ্, আদালত চলছে" নাটকে তৃপ্তি মিত্র ও রমলা রায়

'...বিলাপ' (পরিচালনা : রথীন্দ্র গুপ্ত) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শমিত্রা মুখোপাধ্যায়

উত্থাপনের মধ্যেও। অবশ্য পরে বেনারে বাঈ যা বলতে চেয়েছে তার মধ্যে এরকম অবস্থায় এক ধর্ষিতা নারীর মধ্যে যে অসহায়তা বা বিষাদ দেখতে পাব বলে আশা করি তাই দেখা গেছে। নাট্যকার তার বেনারে বাঈকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কিংবা সমাজের তর্জনীর বিরুদ্ধে রুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার শক্তি দেননি। আজকাল কোন এক উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েকে এই অবস্থায় এমন দুর্বল ভাবতেই যেন অবাক লাগে। প্রতিবাদ করার বা আত্মরক্ষার ভাষা এখনকার মেয়ে-দের অজানা নয়, বিশেষত যখন সে জানে অপরাধ তার প্রতিই করা হয়েছে।

হয়ত সমাজের একদেশদর্শিতা বা নির্মম শাসন দেখাবার জন্যই নাট্যকার তার কল্পিত আদালতে আসামীকে একেবারেই অসহায় করে রেখেছেন। তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার কেউ নেই। সামন্ত বলে একজনের যা সহানুভূতি দেখা গেছে সেও মেজরিটির চাপে নির্বাক। এই মামলায় আরও দুয়েকজন থাকতে পারত যারা বেনারে বাঈয়ের প্রতি অন্যায় করেছে। সেটা সম্ভবত নাট্যকারের পরিকল্পনার অন্তর্গত নয়। বাদীপক্ষ সমাজের অসহিষ্ণুতা বা নির্মমতা দেখানোই তার উদ্দেশ্য। নতুবা দলের সকলেরই বেনারে বাঈয়ের বিরুদ্ধে এমন ক্ষেপে উঠবে কেন? তবে এই বিচারে দণ্ডদাতা যদি দণ্ডিতের সঙ্গে সমান ব্যথায় কাঁদতে পারতেন তবে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হতে পারত।

এই সব বিষয়গত সমস্যার দিক বাদ দিলে নতুনত্বের স্বাদ অবশ্যই মেলে এই নাটকে। সেটা যেমন নাট্যরচনার বিশেষ আঙ্গিকে তেমনি এর প্রয়োগে। মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের দরজা ও কিছু অংশ নিয়ে নাটকটির প্রয়োগ-কল্পনা স্নিগ্ধ করে তুলেছেন পরিচালক শম্ভু মিত্র। নাটকের মূল ধারা ও রস—কৌতুকে ব্যাপ্ত বিষাদে যার পরিসমাপ্তি—অটুট থেকে গেছে। কোন মুহূর্তেই নাটকটি ক্লান্তিকর লাগেনি। এর অন্য একটি কারণ বহুরূপীর শিল্পীদের অভিনয়ের ঐকতান। তাঁরা দর্শকদের ইচ্ছা মতো হাসিয়েছেন, আবার স্তব্ধ রেখেছেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায়, দেবতোষ ঘোষ, শঙ্কর-প্রসাদ ঘোষ, অমিত মণ্ডল, উৎপল ভট্টাচার্য, রমলা রায় ও কুমার রায়—এঁরা প্রত্যেকেই অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই নাটকে। কৌতুকের অংশগুলি বিশেষভাবে উপভোগ্য করে তুলেছেন কুমার রায়। তাঁর অভিনয় অসামান্য। সকলের উপরে রয়েছেন বেনারে বাঈয়ের চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র। নাটকের সুরের সঙ্গে সঙ্গেই সহজ ও চঞ্চল বেনারে বাঈ ধীরে ধীরে কেমন জটিল ও স্তব্ধ হয়ে এল শ্রীমতী মিত্রর অভিনয়ে। একটা গোটা মানুষকে তার জটিলতা ও গভীরতার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম শ্রীমতী মিত্রর চরিত্র-চিত্রণে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দোষী সাব্যস্ত হবার পর তাঁর মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার মত। তবে নাটকে ক্লোজ-আপ চলে না, পেছনের সারির দর্শকরা তা কতখানি প্রত্যক্ষ করেছেন জানি না। তবে ক্লোজ-আপ না থাকলেও আলোকপাত ছিল।

নাটকের হাসির উপকরণগুলি ধীরে ধীরে করুণ ও সীরিয়স হবার ক্রমপর্যায়ে, যখন আদালত চলছে, দর্শকদের সব সময় চুপ করে থাকার উপায় নেই। তাঁদের জন্য নিশ্চয়ই "চোপ্" নয়। তাঁদের কখনও হেসে ফেটে পড়তে হয়, কখনও বা তাঁরা চুপ, স্তব্ধ।

বোম্বাই বিচিত্র

এখন থেকে বিশ বছর আগে অর্থাৎ উনিশশো একান্ন সালে কলকাতার চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন বোম্বাই-এ আসেন। প্রথম ব্যাচে মানে এক সঙ্গে একই ট্রেনে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন অসিত সেন (অভিনেতা), হৃষীকেশ মুখার্জি, কমল বোস, নাজির হুসেন, পল মহেন্দ্র, নবেন্দু ঘোষ। এঁরা সকলেই এসেছিলেন স্বনাম-ধন্য চিত্রনির্মাতা বিমল রায়ের সঙ্গে। পরবর্তীকালে বিমল রায়ের ছত্রছায়ায় ফলে ফলে সমৃদ্ধ হতে যাঁরা আসেন তাঁরা যথাক্রমে সুধেন্দু রায় এবং সলিল চৌধুরী। বিমল রায়ের বম্বে আসা এবং তার কিছু-দিনের মধ্যেই 'দো বিঘা জমীন' ছবি হওয়া হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে একটি বিশেষ ঘটনা। 'দো বিঘা জমীন' ছবিতেই বিমল রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাঁরা স্বীকৃতি পান তাঁদের মধ্যে সলিল চৌধুরী এবং হৃষীকেশ মুখার্জির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হৃষীকেশ মুখার্জি এখন পরিচালক হিসেবে হিন্দী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে একটি বিশিষ্ট নাম। নবেন্দু ঘোষ গল্প এবং চিত্রনাট্যকার হিসেবে শ্রদ্ধেয়। সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতও ভারত

খ্যাত। সুখেন্দু রায়ের শিল্প নির্দেশনা স্বীকৃত। বর্তমানে তিনি পরিচালকও হয়েছেন। নাজির হুসেন বিখ্যাত চরিত্র-অভিনেতা হিসেবে গণ্য। কৌতুক অভিনয়ে অসিত সেনের নামও বেশ। ক্যামেরাম্যান হিসেবে কমল বোসের বেশ কদর স্থানীয় ছবির বাজারে। এক কথায় বিমল রায়ের সঙ্গে যাঁরাই এসেছিলেন বম্বের ছবির বাজারে তাঁরা সকলেই এখন বেশ বাজারে জমিয়ে বসে আছেন। কেবল একজন ছাড়া। সেই একজন যিনি বাংলাদেশ এবং বোম্বাই-এর সেতু হয়ে বিমল রায়ের সঙ্গে এসেছিলেন এবং বিমল রায় যতদিন বম্বেতে ছবি করেছেন, ততদিন তিনি সেই সেতুর ভূমিকায় কাজ করে গেছেন, সেই পল মহেন্দ্র কয়েকদিন আগে কিছুদিন রোগগ্রস্থ থেকে ছন্নছাড়া আশাহীন জীবনের কাছ থেকে রেহাই নিয়েছেন। কয়েক লাইন আগে লিখেছি যে পল মহেন্দ্র বোম্বাই এবং বাংলাদেশের মধ্যে সেতুর মত ছিলেন। কথাটা পরিষ্কার করি। আসলে পল মহেন্দ্র সেতু ছিলেন হিন্দী ভাষা এবং বিমল রায় সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রায় ছ' ফুট লম্বা সুদর্শন পাঞ্জাবী পুরুষ পল মহেন্দ্র একেবারে বাঙালী ঢঙে ধুতি-পাঞ্জাবিতে সেজে যখন অত্যন্ত সহজ ঢঙে বাংলায় কথা বলতেন, তখন ওঁকে দেখে বাঙালী ভাবতে ভালো লাগতো। কোথায় যেন পল মহেন্দ্র বাঙালীই ছিলেন। বিমল রায়ের মৃত্যুর পর উনি ঘুরে ফিরে বাঙালী-দের সঙ্গেই কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু চেষ্টাই করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের আমলের লোক, ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অনেক বিখ্যাত ছবির হিন্দী ডায়লগ লিখেছেন, বিমল রায়ের ছবিতে ডায়লগ ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন, সবচেয়ে বড় কথা যাই করেছেন সসম্মানে করেছেন। কিন্তু বিমল রায়ের মৃত্যুর পরই সব যেন কেমন হয়ে গেল। বছর দুয়েক আগে মোহন স্টুডিওর আমতলায় বসে পল মহেন্দ্রর কথা শুনেছিলাম। উনি বলছিলেন "বিমলদা নেই, আর কিছুই ভাল লাগে না, রাজার অকাল মৃত্যুতে রাজ্যে যেমন অরাজকতা দেখা দেয়, ঠিক তেমনি হয়েছে আজকাল বম্বের ফিল্ম জগৎ। যাদের সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, যাদের সঙ্গ পেয়ে এবং দিয়ে সুখী হয়েছি, তারা এখন অন্য ভাষায় কথা কয়। ভাগ্যের দর্শন তো বিমলদাও পেয়েছিলেন কিন্তু তাতে তো ওঁর জীবনদর্শন পাল্টায় নি।" পল মহেন্দ্র এই দুপুরেও বেশ খেয়েছিলেন। আমার খারাপ লাগছিল। উনি সেটা বুঝেছিলেন, "আমি খুব দুর্বল বুঝলে, তাই মদ খাই, বিষ খেতে পারি না বিষ যারা খেতে পারে এক ধাক্কায় যারা আত্মহত্যা করতে পারে তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী, তারা প্রণম্য তারা হয় বাঁচে না হয় মরে, কিন্তু আমার মত দুর্বল যারা তারা বেঁচে থাকার জোড় সামলাতে পারে না, অথচ মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার যোগ্যতাও নেই, তারাই জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে মদের বোতল রেখে বসে। কখনো জীবনকে মদ খাওয়ায়, কখনো মৃত্যুকে। মাতাল যেমন আনপ্রেডিক্ট-এবল, আমার জীবন এবং মৃত্যুও দেখবে তাই। কখন কেটে যাবো টেরই পাবে না। ওয়ার ডিক্লেয়ার হবার আগেই হয়তো ব্ল্যাক আউট হয়ে যাবে।" হলো কিন্তু ঠিক তার উল্টো। পল মহেন্দ্রর মৃত্যুর সংবাদ শুনেই যেন বম্বেতে আলো ফিরে এলো। যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হল। বিমলদার ছোট মেয়ে বুবুন বললো, "পল কাকা এবং বাংলাদেশ এক সঙ্গে লিবারেটেড হল।"

সরল শর্মা

আরোহী ফিল্ম মেকার্স-এর "অনুভব" (পরিচালনা : বাসু ভট্টাচার্য) হিন্দী ছবিতে সঞ্জীবকুমার ও তনুজা—ছবিটির মুক্তি আসন্ন

চিৎপুর-চিত্র

বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান

নিউ আর্য অপেরা

শিল্পী স্বপনকুমার, চরিত্র 'মুজিবুর'—হালের যাত্রামোদীদের কাছে এর তুল্য আকর্ষক কিছু নেই। নিউ আর্য অপেরা এ-দুটিকে এক করে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এবং তারই ফল 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান' পালাভিনয়। যাত্রার আসরে তাই যতবার স্বপনকুমার মুজিবুর-রূপে এসেছেন, চেহারার হুবহু মিল দেখা না-গেলেও, দেখেছি দর্শক তুমুল হর্ষপ্রকাশ করেছেন। যেখানে আদৌ নাট্যবস্তু নেই, কেবল কথা আর কথা, দীর্ঘ আট মিনিট ধরে লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছেন মুজিবুররূপী স্বপনকুমার—সেখানে অনিবার্য ক্লান্তি, গতির অসম্ভব শ্লথতায় তবু যে বিরক্তির উদ্ভব হয় না তার কারণ এই শিল্পী—যাঁর নাম স্বপনকুমার। সুতরাং একা স্বপনকুমারই এর মূলে টান এবং সেই টান বহু দর্শককে শেষ পর্যন্ত পালা দেখতেও বাধ্য করায়—এই অবাক কাণ্ড অভিভূত হয়ে দেখেছি।

বাংলাদেশ নিশ্চয়। আজকের মানুষ বাংলাদেশ অর্থে মুজিবুরকেই বোঝেন, মুজিবুর অর্থে বাংলাদেশ। দুইয়ের মধ্যে এই যে অভিন্নতা, এই যে আত্মিক যোগ তাকে কেন্দ্র করেই পালা রচনার প্রয়াস। এ-কালের পালাকার সত্যপ্রকাশ দত্তের এই বোধটি 'বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান' পালায় পরিব্যাপ্ত। যে মানুষটি তাঁর নিজের দেশ ও ভাষা রক্ষার জন্য বারবার নিগৃহীত হয়েও অসত্যের কাছে মাথা নীচু করেন নি, বরং ন্যায়যুদ্ধে তাঁর জয় ঘোষিত হয়েছে সে কথাই পালার পরিণতিতে উচ্চারিত।

একেবারে হাল আমলের কথাও পালায় এসেছে। সে-কথা মুক্তিযুদ্ধের। এর আগে ইয়াহিয়া চক্রের সঙ্গে মুজিব ও আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর সংঘর্ষ পর্যায় এসেছে অনিবার্যভাবেই। এবং সেটাই দাঁড়িয়েছে মূল দ্বন্দ্বে। আবেগে ও উচ্ছ্বাসে ভরা এই কাহিনীটির বহু অংশ, অনেক মুহূর্তই সাগ্রহে উপভোগ করার মতন। আগে বলেছি, গতিতে শ্লথতা আছে। ঘটনার সিঁড়িটাও অনেক পুরনো বলে মনে হবে। কারণ পা দিতে গেলে অনেক ধাপই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোন্ টান তবু দর্শককে ধরে রাখে সে প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত।

পালা প্রয়োগে অভিনবত্ব আনার জন্য কয়েকটি অভিনব পরিকল্পনা কাজে লাগানো হয়েছে। চলচ্চিত্রে যেমন নেপথ্য কথার সঙ্গে মুখ মেলানো, এখানেও ঠিক তাই। বিশেষ করে দীর্ঘ বক্তৃতার অংশগুলি টেপ-রেকর্ডে বাজানো হয়, আসরে দাঁড়িয়ে

স্বপনকুমার কেবল মুখ মিলিয়ে যান। একেবারে পল্লীর দর্শকের কাছে এই পরিকল্পনা নিশ্চয় অবানকর। ঘটনার মধ্যে বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে অঘটন। অর্থাৎ ইয়াহিয়াশাহীর বর্বর এবং নৃশংস অত্যাচারের কিছু দৃশ্য এমন বাস্তবতার আসরে পরিবেশিত হয়, যা আমাদের নার্ভকে পীড়িত করে। কাহিনীতে কল্পনা প্রাধান্য পেলেও একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার সত্যপ্রকাশবাবুর গল্পটি যেন ভীষণ তৃষ্ণার মিষ্টি জলের জন্য আকুপাকু করে বেড়িয়েছে।

অভিনয়ে একা স্বপনকুমারই প্রায় সবটা জুড়িয়ে রেখেছেন। পালাটি আগাগোড়াই

মাইকে অভিনীত বলে, এই শিল্পীর সক্ষম গলার কাজ থেকে আমরা বঞ্চিত। তবু অসম্ভব পরিশ্রম করে স্বপনকুমার বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তাঁকে ঘিরে যে একটা দলগত অভিনয় ঐক্য গঠনের প্রয়াস, এখানে তা যথার্থ কার্যকরী। চণ্ডী ব্যানার্জির 'ইয়াহিয়া', মধু মল্লিকের 'রসিদ', রেবতী রায়ের 'সবুর', পুলিন স্বর্ণকারের 'জাহের', দুর্গা দাসের কালী মাস্টার, দিলীপ মুখার্জির মেজর খাঁ, নির্মল নাগের 'মতিন', সুব্রত চ্যাটার্জির 'প্রশান্ত', যবীন চক্রবর্তীর 'লালমিয়া' ব্যক্তিগত চরিত্রায়ণ হিসাবে প্রশংসা পাওয়ার মতন। স্ত্রীচরিত্রে ইরা চ্যাটার্জি ও আলপনা ব্যানার্জির অভিনয় নিশ্চয় স্মরণযোগ্য। ও'রা যথাক্রমে 'রোশনারা' ও 'মিনা' চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। সবিতা মিত্রের 'সালেয়া' সুন্দর। দীর্ঘকাল পরে বাবলীরাণীকে আসরে দেখলাম। শিল্পী এ-পালায় স্ত্রী ও পুরুষ দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তারক দাসের উদাত্ত গলার বিবেকী গান নিঃসন্দেহে এই প্রযোজনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

—সূত্রধার

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বাংলা নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ করে **সমকাল** নাট্য সংস্থা আগামী ১৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে "সিরাজদ্দৌলা" নাটক অভিনয় করবেন। নির্দেশনা ও নামভূমিকায় থাকবেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ঘসেটি ও আলেয়া চরিত্রে রূপ দেবেন যথাক্রমে নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবী ও বাসবী নন্দী।

প্রফুল্ল রায় লোকান্তরিত

প্রবীণ চিত্র-পরিচালক প্রফুল্ল রায় গত ২৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার তাঁর পাইকপাড়ার বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৮১ বছর বয়স হয়েছিল।

পরিণত বয়সে লোকান্তরিত এই চলচ্চিত্রকার নির্বাক যুগ থেকে শুরু করে বহু ছবি উপহার দিয়েছেন। তাঁর পরিচালনায় প্রথম নির্বাক ছবি "চাষার মেয়ে"। ছবিটি ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়। ওই একই বছরে তাঁর আর একখানি নির্বাক ছবি "অভিষেক"। উল্লেখ করার মত ব্যাপার, ওই ১৯৩১ সালেই বাংলা চলচ্চিত্রে সবাক ছবির আবির্ভাব ঘটেছে। প্রফুল্ল রায় প্রথম যে সবাক ছবি পরিচালনা করেন সেটির নাম "চাঁদ সদাগর"। ১৯৩৪ সালে। তারপর তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল "ঠিকাদার", "অভিজ্ঞান", "পাপের পথে" এবং রবীন্দ্রনাথের "মালঞ্চ।" তাঁর পরিচালনায় শেষ ছবি "ভাদুড়ী মশাই"।

এ ছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটি হিন্দী ও উর্দু ছবি পরিচালনা করেন।

প্রফুল্ল রায়

চলচ্চিত্র জগতে প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব অভিনেতা হিসাবে। ১৯২৫ সালে জার্মান পরিচালক ফ্রাঞ্জ অস্টেন পরিচালিত, গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন অবলম্বনে রচিত "লাইট অফ এশিয়া" ছবিতে প্রফুল্ল রায় দেবদত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ওই পরিচালকের পরবর্তী ছবি "সিরাজ"-এ একটি টাইপ চরিত্রে (ক্রীতদাসী ব্যবসায়ী) তাঁকে দেখা যায়। ফ্রাঞ্জ অস্টেনের "থ্রো অফ এ ডাইস" ছবিতে প্রফুল্লবাবু অভিনয় করা ছাড়াও পরিচালকের ভারতীয় সহকারী হিসাবে কাজ করেন।

প্রফুল্ল রায়ের লোকান্তরের অর্থ একটি অভিজ্ঞতার মৃত্যু। অনেক ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর কর্মময় জীবনে। চলচ্চিত্রে যোগ দেবার আগে তিনি মঞ্চাভিনেতা হিসাবে জীবন শুরু করেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নিকট। ১৯২৮ সালে "সীতা" নাটকে শম্বুক চরিত্রে তাঁকে প্রথম দেখা যায়। জীবনের শেষ ভাগ পর্যন্ত তিনি চিত্র ও নাট্যজগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। তিনি কিছুদিন সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর সভাপতি ছিলেন। বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বহন করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে নিজেকে এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে রঙ্গজগৎ অভিভাবক-সদৃশ একজন ব্যক্তিকে হারালাম। আমরা শ্রীরায়ের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি **এবং তাঁর পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।**

অরণ্যদেব লী ফক

অরণ্যের
অলিম্পিক!

বিজয়ী!

অরণ্যের-সীমান্তে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠছে--

ঢাকের বাদ্যির বদলে এসেছে কনসার্ট ....

অরণ্যের ভিতরটা
অবশ্য আগের মতই।
হাজার বছরেও তার
কোনও পরিবর্তন
ঘটেনি।

সেখানেও অবশ্য
অলিম্পিকের
অনুষ্ঠান হয়। বহু
বছর আগে এক
অরণ্যদেব যার
সূচনা করেছিলেন।

অলিম্পিকের উদ্দেশ্য: গোষ্ঠীতে
গোষ্ঠীতে ঝগড়া-বিবাদের
অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি
বাড়িয়ে তোলা।

যে-গোষ্ঠী জেতে, সে অরণ্যদেব-ট্রফি পায়!
অনুষ্ঠান শুরু
হোক!
এবারে আমরা—
উমগাম গোষ্ঠী
জিতব।

পরলোকে বৈজ্ঞানিক ডঃ বিক্রম সারাভাই বর্তমান সপ্তাহের মধ্যে আলোচ্য বিষয়। পরমাণু শক্তি কমিশন এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ বিক্রম সারাভাই ৩০ ডিসেম্বর ভোরে ট্রিভেন্দ্রাম হোটেল কোবালাম বীচ ভবনে ঘুমন্ত অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। ডঃ সারাভাইয়ের স্ত্রী বিশিষ্ট নৃত্য-শিল্পী শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাই। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। তিনি বিখ্যাত শিল্পপতি আম্বালাল সারাভাইয়ের পুত্র। চিকিৎসকদের অভিমত হলো : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই ডঃ সারাভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মরদেহ ৩০ নবেম্বর একটি বিমানে আমেদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরমাণু শক্তি কমিশন এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি গভীর শোক প্রকাশ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীর অকালে পরলোক-গমনে দেশ—এক মহান সন্তানকে হারাল। চিকিৎসকদের অভিমত হৃদরোগে আক্রান্ত গমনে দেশ—এক মহান সন্তানকে হারাল। ৩১ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালে হান্সলে ডঃ বিক্রম সারাভাইয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

দেশী সংবাদ

২৭ ডিসেম্বর—বিশ্বের নবীনতম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে মোট ছাব্বিশটি রাষ্ট্র এখনই স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত। এদের মধ্যে কুড়িটি রাষ্ট্র দিতে চায় কার্যত স্বীকৃতি এবং অন্যরা আইনগত স্বীকৃতি। ভারত সরকার কূটনৈতিক সূত্রে একথা জেনেছেন। বাংলাদেশকে এপর্যন্ত পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত ও ভুটান।

শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীর নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল বিধায়ক দল মন্ত্রিসভা ২০৯ দিন ক্ষমতায় থাকার পরে আজ রাত্রে পদত্যাগ করেছেন। ফলে বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন ও অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পথ পরিষ্কার হল।

২৮ ডিসেম্বর—গতকাল রাত্রে গঙ্গানগর সেকটরে ভারতীয় চৌকিগুলির উপর পাক-ফৌজ হঠাৎ পাকিস্তানের জালবালা ফাঁড়ি থেকে গোলা বর্ষণ শুরু করলে দুজন মেজর এবং তিনজন জওয়ান নিহত হয়। একজন ক্যাপটেন দুজন লেফটেনান্ট এবং ছাব্বিশজন জওয়ান আহত হন।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কি ধরনের ট্রানজিট চালু হবে, দুই-তিন দিনের মধ্যেই তা ঘোষণার সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে যাতায়াত সম্পর্কে নেপালের মত চুক্তি হতে পারে। বর্তমানে দুই দেশের সরকারের মধ্যে এর খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা হচ্ছে।

২৯ ডিসেম্বর—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ভারত কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না। বিদেশী সাহায্য বন্ধ করে দেবার হুমকিতে আমাদের কিছু এসে যাবে না।

যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ১৯৭২-এ নির্বাচন হওয়ার কথা, সেই সমস্ত স্থানে আগামী মারচের গোড়াতেই নির্বাচন হবে। নির্বাচন শুরু হবে ৫ মার্চ রবিবার এবং শেষ হবে ১১ মারচ শনিবার।

৩০ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নতুন ১২০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। এই বিদ্যালয়গুলিতে ৩৬০০ শিক্ষকের কর্মসংস্থান হবে। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ছাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে আরও ২০০০ অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগও মঞ্জুর করা হয়েছে।

শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কয়েকটি শরণার্থী স্পেশাল চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই [illegible] বৃহস্পতিবার থেকে অন্তত ৮টি

যাত্রীবাহী ট্রেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বাতিল করা হয়েছে। আজই বনগাঁ সেকশনের দুটি আপ ট্রেন বাতিল করা হয়।

৩১ ডিসেম্বর—দুই দেশের সরকারের উদ্যোগে ইংরাজী বছরের প্রথম দিন থেকে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ঘরে ফেরা শুরু হবে এবং গত নয় মাসে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৭৫ লক্ষ শরণার্থীর সমাগম ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ সাংবাদিক বৈঠকে জোরের সঙ্গে বলেছেন, ভারত বিদেশী সাহায্য ছাড়াই চলতে দৃঢ়সংকল্প এবং স্বয়ম্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সে তার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবেই। এখন ভারত সেই ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে।

১ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে আটক বন্দীদের অনেককেই বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। প্রায় ৮০০ বন্দীকে বৃহস্পতিবার কেরালা রাজ্যের কোট্টায়ামে পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই আর এক দফায় আরও অন্তত ৫০০ জনকে দক্ষিণ ভারতের কোন রাজ্যে পাঠানো হবে।

বি এ পরীক্ষার মারকশীটে নম্বর বাড়িয়ে এম এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন—এই অভিযোগে ২০ জনের মত ছাত্রছাত্রীর ডিগ্রী বাতিলের কথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন। এঁদের বিবরটি এখন বোর্ড অব ডিসিপ্লিনের বিবেচনাধীন।

২ জানুয়ারি—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতের উপর আবার কোন আক্রমণ এলে দেখা যাবে ভারত অপ্রস্তুত নয়। ভারত উপযুক্ত জবাব দেবে। তিনি আরও বলেন, যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। রোজই নতুন নতুন হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরী আজ কলকাতায় শিল্পপতিদের হুশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোন শিল্প অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া চলবে না। এমন কি এখানকার কোন শিল্প সংস্থার কোন অংশ এই রাজ্যের বাইরে কোথাও সম্প্রসারণ সরকার বরদাস্ত করবে না।

বিদেশী সংবাদ

২৭ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের হিন্দুদের লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফেরত পাইয়ে দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিবাহিনী গোটা বাংলাদেশে এক যৌথ অভিযান শুরু করেছেন। সর্বত্র ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে: যারা হিন্দুদের সম্পত্তি লুঠ করেছিল তাদের তা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। যারা হিন্দুদের বাড়িঘর দখল করে নিয়েছিল তাদের তা অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে। যে এই নির্দেশ অমান্য করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

২৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ পাক প্রেসিডেনট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোকে এই বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে আটক করে রাখার কোন অধিকার অন্য রাষ্ট্রের নেই। শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধান—রাষ্ট্রপতি।

২৯ ডিসেম্বর—জয়বাংলা ধ্বনির মধ্যে আজ বনগাঁ ও যশোরের মধ্যে সরাসরি ট্রেন চললে ভারত-বাংলাদেশ ট্রেন সংযোগ প্রথম স্থাপিত হয়। ছয় বছর আগে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর এই রেলপথের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল।

৩০ ডিসেম্বর—উত্তর ভিয়েতনামে আমেরিকার পাঁচদিনব্যাপী প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ আজ শেষ হয়েছে। তিন বছর ধরে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আমেরিকার বিমান ও নৌবাহিনীর তীব্র আক্রমণ চলে। উত্তর ভিয়েতনামের উপর এই রকম সহস্রাধিকবার বিমান আক্রমণ হয়।

৩১ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সরকার আজ আর এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করে দেশের সমস্ত বেসরকারী অফিস কোম্পানি ও শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও বেতনের সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০০ টাকায় নির্দিষ্ট করে দেন। কয়েকদিন আগে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ এক আদেশ জারি করা হয়েছে।

১ জানুয়ারি—আজ মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে প্রথম আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ঢাকাস্থ মারকিন প্রতিনিধি শ্রীস্পিভ্যাক বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআবদুস সামাদের সঙ্গে দেখা করেন। এই সাক্ষাৎকার আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল না। শ্রীস্পীভ্যাক তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে নতুন বছরের অভিনন্দন বিনিময় করেন।

২ জানুয়ারি—বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ তাঁর সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করে বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন, সেদিকে তাঁর সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্মরণীয় সাহিত্যসম্ভার

অন্নদাশঙ্কর রায়

রত্ন ও শ্রীমতী ১ম ৪·০০
ঐ ২য় ৬·০০
ঐ ৩য় ৮·০০
সত্যাসত্য (ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যে সুবৃহৎ উপন্যাস) ৩৬·০০
১ম খণ্ড যার যেথা দেশ ৬·০০
২য় খণ্ড অজ্ঞাতবাস ৬·০০
৩য় খণ্ড কলঙ্কবতী ৬·০০
৪র্থ খণ্ড দুঃখমোচন ৬·০০
৫ম খণ্ড মর্তের স্বর্গ ৬·০০
৬ষ্ঠ খণ্ড অপসরণ ৬·০০
আগুন নিয়ে খেলা ৩·০০
পুতুল নিয়ে খেলা ৩·০০
তৃষ্ণার জল ৬·০০
কন্যা ৩·৫০
না ৩·০০
সুখ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ৫·০০
রবীন্দ্রনাথ ৫·০০
খোলা মন খোলা দরজা ৮·০০
উড়কী ধানের মুড়কী (ছড়া) ৩·০০
প্রবন্ধ ১৬·০০
গল্প ৫·০০
আর্ট ৪·০০
দিশা ৮·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের সর্ববৃহৎ উপন্যাস
ছায়াপথ ২০·০০
বিপাশা ৪·০০
পঞ্চপুত্তলী ৫·০০
নাগিনী কন্যার কাহিনী ৫·০০
স্বর্গমর্ত্ত্য ৫·০০
মাটি ২·৫০

জরাসন্ধ

দেহশিল্পী ৬·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মায়ামৃগ ৪·৫০
আকাশের রঙ ৩·৫০
এপার গঙ্গা ওপার পদ্মা ৬·৫০
কালোছায়া ১ ২ ৩ ৪ ১১·০০
অভিশপ্ত পান্থ ১, ২ ৭·৫০
বৌরানীর বিল ৬·০০
ময়ূরপঙ্খী নাও ৩·৫০
মেঘমল্লার ৩·০০
হাড়ের পাশা ৩·০০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতিকথা ৩ খণ্ড প্রতিখণ্ড ৩·৫০

গোপালদাস মজুমদার সম্পাদিত

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ১ম ৬·০০
(ঐ ২য় ভাগ) ৭·৫০

নজরুল ইসলাম

এইমাত্র প্রকাশিত হল
সঞ্চিতা (সুলভ সং) ২·৫০
ঐ (রাজ সংস্করণ) ৬·৫০
অগ্নিবীণা ৩·০০
বিষের বাঁশী ২·৫০
দোলন চাঁপা ৩·০০
ভাঙার গান ১·৫০
বুলবুল ৩·৫০
বুলবুল ২য় ২·৫০
নজরুল গীতিকা ৪·০০
গীতিশতদল ২·৫০
রুবাইয়াত হাফিজ ২·৫০
নতুন চাঁদ ৩·০০
সুরসাকী ২·৫০
প্রলয়শিখা ২·৫০
চন্দ্রবিন্দু ২·৫০
শেষ সওগাত ৪·০০
চোখের চাতক ২·০০
ফণিমনসা ২·০০
গানের মালা ৩·০০
আলেয়া ও ঝিলিমিলি (নাটক) ২·৫০
মধুমালা ঐ ২·৫০
কুহেলিকা (উপন্যাস) ৩·০০
বাঁধনহারা ঐ ৩·৫০
মৃত্যুক্ষুধা ঐ ৩·৫০
রিক্তের বেদন (গল্প) ৩·৫০
শিউলি মালা ঐ ২·০০
রাজবন্দীর জবানবন্দী ·০৬
নজরুল স্বরলিপি ৫·০০
সুরমুকুর ৪·০০
সুর লিপি ৫·৫০
নজরুল সুরসঞ্চয়ন ১ম ৫·০০
ঐ ২য় (বলরে জবা-বল) ৫·৪০
ঐ ৩য় গোধূলী ৫·৫০

শঙ্কর ভট্টাচার্য

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ১৪·০০
বাংলা থিয়েটারে অভিনয় ৪·০০
কলিকাতায় থিয়েটার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আলোর ঠিকানা ৪·৫০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

পায়ে পায়ে বাঁক ১০·০০
চরণ দিলাম রাঙায়ে ৫·০০
একটি শিশির বিন্দু ৪·৫০

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও
বাঙালীর উত্তরাধিকার ১ম ১০·০০
২য় ১০·০০
শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা ১০·০০

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

সুরসপ্তক—সমগ্র কবিতা সংকলন ১৫·০০
এগুলিও আছে যন্ত্রস্থ
রূপকথা এবং তারপর ৪·০০
রঙ্গতুরঙ্গ ৩·০০
মহারানী ৩·৫০
গোপালদেবের স্বপ্ন ৬·০০
অগ্নীশ্বর ৪·৫০
ভুবন সোম ২·২৫
কষ্টিপাথর ৩·০০
ডানা ১ম ৩·৫০
ঐ ২য় ৪·৫০
ঐ ৩য় ৬·০০
নির্মোক ৪·৫০
নিরঞ্জনা ৫·০০
বিষম জ্বর ১·২৫
উদয় অস্ত ১ম ৬·০০
লক্ষ্মীর আগমন ৩·০০
শ্রীমধুসূদন (নাঃ) ৩·৫০
বিদ্যাসাগর (নাঃ) ৩·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চাঁপার গন্ধ ৩·৫০
পাতাল কন্যা ৪·৫০
নিশি যাপন ৩·৫০
ভস্ম পুতুল ৫·০০
নীল দিগন্ত ৩·০০
বিদিশা ৩·০০
সঞ্চারিণী ৩·০০
ভাড়াটে চাই (নাঃ) ২·০০
আগন্তুক (নাঃ) ২·০০
রামমোহন (নাঃ) ২·৫০
সাহিত্যে ছোট গল্প ১৫·০০
সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৩·৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র জগৎ ৮·০০

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ ৩য় ৬·৫০

শচীন্দ্রলাল রায়

বাবর নামায় ভারত কথা ৫·০০

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ১২·৫০
(গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

ইভান দেনো সোভিচের জীবনের একদিন ৫·০০
(এ বছর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)
নারদের ডায়েরী ৩·৫০

উৎকৃষ্ট ও বহু বিচিত্র গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক চিত্তের সেবা করাই আমাদের ব্রত।

ডি এম লাইব্রেরী : ৪২ বিধান সরণী কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

যখন যেখানে যেমনটি চাই থ্যাকারসে কাপড়ের তুলনা নাই
স্নিগ্ধ শ্যামল সন্ধ্যায় কি মোহ ছড়ায় দ্বিগুণ ক'রে ধরণী 'পরে—থ্যাকারসে বস্ত্রসম্ভার। তুষার শুভ্র স্নিগ্ধতা আর গভীর রজনীর মায়াঘেরা কালকা কেবল কটনের প্রিন্ট গুলোই নিয়ে দেখুন···মুগ্ধ হবেন মুগ্ধ করবেন। সব পরিবেশে সব উপলক্ষে ব্যবহারের উপযুক্ত থ্যাকারসে পপলিনস্, লনস্, ভয়েলস্, কেম্ব্রিক। আপনার মনের ছন্দে কইবে কথা, জাগিয়ে তুলবে রং'এর সুর—আর তিনি থাকবেন চেয়ে আপনার পানে আবেশবিহ্বল নয়নে। আপনার জীবন-ধারার সঙ্গে মিলে মিশে মাতিয়ে তোলে থ্যাকারসে শাড়ী, ড্রেস মেটিরিয়ালস্।
থ্যাকারসের টেবিলাইজড্ সুতির কাপড় পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোঁচ বা ভাঁজ পড়ে না আর স্যানফোরাইজড্—যার জন্য কাপড় খাটো হয় না।
থ্যাকারসে গ্রুপ অব মিলস
TF
১৬ অ্যাপোলো স্ট্রীট, বম্বে-১
ক্রাউন, হিন্দুস্থান ইউনিট নং ১, নং ২,

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়
COLGATE
DENTAL CREAM
কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!
মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!
দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৫ রকমের—প্রত্যেকের উপযুক্ত!
DCG 43 BN

মাত্র এক চামচ-
একাই একশো!
MENADEX
ভালো চোখের দৃষ্টি
এর জন্যে চাই ভিটামিন এ। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, চোখের দৃষ্টি ভালো রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ।
সুস্থ রক্ত
এর জন্যে চাই আয়রণ। অধিকাংশ ভারতবাসীর আহারে আয়রণের অভাব থাকে। মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এর আয়রণ এই অভাব পূরণ করে।
মজবুত হাড়
এর জন্যে চাই ভিটামিন ডি। এক চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ আছে, হাড় মজবুত রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি।
মনে রাখবেন, প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ মিনাডেক্স আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করে, আর এর কমলালেবুর স্বাদগন্ধ—বাচ্চার ভালো লাগবেই।
সিরাপ
মিনাডেক্স
মাত্র একচামচ—তিনগুণের এক টনিক
গ্ল্যাক্সো

খেটে খাই—
ষোল-আনা
তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা
সর্বাধিক দাম
৭০ পয়সায় ১০টি

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার ৩০ পৌষ ১৩৭৮
SATURDAY, JANUARY 15, 1972

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি

বাংলাদেশের যিনি মুক্তিকর্তা, যাঁর নেতৃত্বে আজ সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ মুক্ত। তাঁর সোনার বাংলায় তিনি ফিরে এসেছেন। তিনি স্বদেশে ফিরে আসবেন এই আশায় তাঁর স্বদেশবাসীরা মাসের পর মাস পথ চেয়েছিলেন। আমরাও। বিজয়ীর বেশে তিনি এসেছেনও। ওই বীরের, ওই মহান নেতার জয় হোক।

পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোকে বিচক্ষণ মনে করার কোনো কারণ নেই। তাঁর বাগাড়ম্বর, অদূরদর্শিতার জন্যে ইতিমধ্যে তিনি অনেক হারিয়েছেন। হয়তো আরও হারাবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে আটক রেখে ভুট্টো সাহেব যদি কোথাও কিছু সুবিধে আদায়ের চেষ্টা করে থাকেন তবে তার চেয়ে ভুল আর কিছু হবে না। এই রচনাটি যখন লেখা শুরু হয়েছিল, তখন পর্যন্ত পাওয়া খবরে জেনেছি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে লণ্ডনে পাঠানো হয়েছে। বোঝা যাচ্ছিল না, লণ্ডনে পাঠাবার দরকারটা কী ছিল? নিরপেক্ষ কোনো দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে তো সরাসরি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া চলতে পারত। তাতে কী ভুট্টো সাহেবের ইজ্জত থাকত না! বোধ হয় থাকত না। অন্তত পরবর্তী খবর যা তাতে জানা গেল, লণ্ডনে পাঠাবার আগে বঙ্গবন্ধুকে নাকি ভুট্টো সাহেব অন্যত্র পাঠাবার চেষ্টাও করেছিলেন যথাসাধ্য, মুজিবুর রাজী হন নি। অগত্যা ভুট্টো সাহেবের অন্য উপায় ছিল না। আশ্চর্য যে, শেষ সময়েও ভুট্টো তাঁর দুষ্টবুদ্ধি ছাড়তে পারেন নি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু মুজিবের যে মূল্য, ইদানীং কালের ইতিহাসে তার তুলনা বিশেষ দেখি না। তিনি শুধু নেতা নন, তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে এমন একটি আদর্শ ও ত্যাগের মূর্তি যা সচরাচর রাজনৈতিক নেতাদের থাকে না। নয়ত একটি মানুষের ডাকে এতবড় ইতিহাস ঘটে যেতে পারত না, এত মানুষ আত্মবিসর্জন দিতে পারত না।

মনে রাখতে হবে, মুজিব যেদিন স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন সেদিন তাঁর একমাত্র সম্বল ছিল দেশবাসীর আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও প্রেম। সেই আনুগত্যই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।

বাংলাদেশের হৃদয়ে মুজিবের আসনটি এমন করে গাঁথা হয়ে আছে যে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ তাঁর পথ চেয়ে আছে। তাঁর নেতৃত্ব বিনা এই রাষ্ট্রটির চলার পথ বিঘ্নহীন হবে না। বঙ্গবন্ধুকে আজ যেমন বাংলাদেশের প্রয়োজন সেই রকমই প্রয়োজন রয়েছে অন্যান্য রাষ্ট্রের --যারা বাংলাদেশের সঙ্গে বোঝাপড়া ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী। এমন কি সেই পাকিস্তান—যার হাতে বঙ্গবন্ধু নির্যাতিত, যার অনাচার আর অত্যাচারে বাংলাদেশ আজ শ্মশানে পরিণত—সেই পাকিস্তানের পক্ষেও শেখ মুজিব আজ একমাত্র সান্ত্বনা। পাকিস্তান আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে যেখানে মুজিবের করুণাভিক্ষা ছাড়া উপায় নেই। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ সরকার ধৈর্য সহিষ্ণুতার যথেষ্ট প্রমাণ দিলেও এখনও পাকিস্তানের দুষ্কর্মের অনেক নজির থেকে গেছে। তার অনেক দায় এখনও পড়ে আছে বাংলাদেশে। এ-সব থেকে উদ্ধার পেতে হলে বাংলাদেশ সরকারের কাছে নতজানু হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ভারতের পক্ষ থেকে নতুন করে বলার আর কিছু নেই। ভারত সর্বাগ্রে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করেছে। তিনি মুক্ত হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন আমরা আজ আনন্দিত। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক দীর্ঘ হোক দৃঢ় হোক।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১ থেকে
সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক ... টাঃ ৩২.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৮.২৬

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৩৭.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৪৫.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৮৪.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৫৭.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১৪.৭৬

লণ্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক ... টাঃ ১৫৪.০৪
ষাণ্মাসিক ... টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৩৮.৭৬

ঢেউয়ের পরে বাইব তরী
চলব গেয়ে গান—'
মার্চ-এ
নির্বাচন
সম্ভাবনা
কং(নব)
ইন্দিরাজীর জনপ্রিয়তার জোয়ার

শেখ সাহেব

বাংলাদেশ এখন পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করতে পারবে। এখন তাঁদের নেতা মুক্ত। এখন বাংলাদেশের জাতীয় নেতাই নিজ হাতে বাংলার নেতৃত্ব নিতে পারবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এখন পূর্ণাঙ্গ। যখন এই লেখা লিখছি তখনও ভারত ও ভুটান ছাড়া আর কোনও দেশ বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেননি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে ততদিনে দেখা যাবে আরও বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। জাতিসঙ্ঘে আসন পেতে বাংলাদেশের আরও কিছু দিন দেরি হলেও বিশ্বের দরবারে এখন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত।

ভুট্টো এতদিন পরে কিছুটা বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গোটা বিশ্বে অনেকেরই ভয় ছিল, ভুট্টো শেখ সাহেবকে নিয়ে আবার যেন কী করেন। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের মূর্খ এবং মাথামোটা নেতৃত্ব শেখের মুক্তির বিনিময়ে বহু মূল্য দাবি করবে। সবাই শংকিত ছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তান এই ব্যাপারে আবার একচোট তিক্ততা বাড়াবে—জল ঘোলা করবে। তাই গত শনিবার সকালে ঢাকার লোক যখন শুনলেন যে পাকিস্তানের একটি বিমানে শেখকে অজানা কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন সবাই ক্ষেপে উঠলেন। তাঁরা মনে করলেন, শেখকে নিয়ে ভুট্টোর খেলা এইবার পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার পর্যন্ত এই খবর পেয়ে শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন। আর আশংকা করেছিলেন, এই খবর শোনা মাত্র ঢাকায় একটা প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। তাই তাঁরা পাকা খবর পাওয়ার আগে পর্যন্ত ওই অজানা কোথাও নিয়ে যাওয়ার খবর প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, না, ভুট্টো এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্ব বড় রকমের আর কোনও মূর্খামি করতে সাহস

পেল না। তারা এর মধ্যেও যতটুকু সাহস পেল ততটুকু অবশ্য করল। শেখ সাহেবকে সুদূর লণ্ডনে পাঠিয়ে দিল। যাতে বাংলাদেশে পৌঁছতে, তাঁর নিজের মানুষের মধ্যে উপস্থিত হতে শেখ সাহেবের যতটা সম্ভব দেরি হয়। শেখ সাহেবকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ভুট্টোর আরও কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে কিনা তা অবশ্য এখনও বোঝা যায়নি।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বকে নিয়ে একটা বড় মুশকিল হয়ে গিয়েছে এই যে, তাদের স্বাভাবিক মানুষ বলে ধরে নিতে কেউই প্রায় রাজি নন। তাই কেউই ভরসা করতে পারেন না তাদের। কেউই বিশ্বাস করতে রাজি নন যে পাকিস্তানী নেতৃত্ব স্বাভাবিক মানুষের মত আচরণ করতে পারে। সেই জনাই শেখ সাহেবকে ছেড়ে দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সকলের প্রচণ্ড আশংকা ছিল। সেই জনাই শেখ সাহেবকে ওরা কেন লণ্ডনে নিয়ে গেল, তা নিয়েও জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। এখনও পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বকে পৃথিবীর খুব কম লোকই স্বাভাবিক মানুষ বলে গ্রহণ করতে রাজি।

*

শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি বাংলাদেশে কী আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে সেটা বাংলাদেশে না এলে বোঝা যায় না। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর নামে পাগল। গ্রামের বৃদ্ধ চাষীকে জিজ্ঞেস করেছি, শহরে গরীব মানুষের কাছে জানতে চেয়েছি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করেছি, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছি—শেখ সাহেব বলতে সবাই পাগল। গরীব-বড়লোক, যুবক-বৃদ্ধ, মহিলা-পুরুষ—শেখ সাহেব সকলের প্রিয়। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের নেতা। সবাই তাঁর নির্দেশ মানার জন্য প্রস্তুত। সকলে এতদিন অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছে। যাকেই যে সমস্যার কথা বলেছি, সবাই এক জবাব দিয়েছেন : শেখ সাহেব এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিনি স্রেফ রাজনৈতিক নেতা হয়েও জাতির পিতা। তিনি একটি দলের নেতা হয়েও সকলের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু। তিনি গোটা আওয়ামী লীগ পারটির কনিষ্ঠতম সদস্য থেকে আরম্ভ করে প্রধানতম সদস্যের কাছে শুধুই "লিডার।" তিনি বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

শেখ সাহেবের কাছে বাংলাদেশের বিরাট প্রত্যাশা। প্রত্যেকেই মনে করছেন, শেখ সাহেব এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। দেশে সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি আসবে। সব সমস্যা মিটে যাবে। সকল অভাব অভিযোগের সুরাহা হবে। কারু আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। বড়লোক বাঙালীও তাই মনে করছে। গরীব বাঙালীরও সেই আশা। আবার যুবকদের আশা, শেখ সাহেব তাঁদের ধ্যানের বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন; বৃদ্ধের আশা, শেখ সাহেব তাঁদের কল্পনামতই বাংলাদেশ গঠন করবেন। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, শেখ সাহেব আসলে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।

তাই শেখ সাহেবের আজ বিরাট দায়িত্ব। প্রথমত, এই ধর্ষিত, অত্যাচারিত এবং লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত এবং রিক্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশকে পুনর্গঠিত করতে হবে। তৃতীয়ত, সকল শ্রেণীর সকল বয়সের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার যতটা সম্ভব পূরণের চেষ্টা করতে হবে। আর চতুর্থত, বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি এখন বাংলা দেশের উপর নানাভাবে যে চাপ আনার চেষ্টা করবে তার ধাক্কা সামলাতে হবে।

এর কোনও কাজটাই খুব সহজ নয়।

*

প্রথম ব্যাপারটায় প্রথমে আসা যাক। গত নয় মাসে পাক বাহিনী বাংলাদেশের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। এই অত্যাচার যে শুধু পাক সেনাবাহিনী চালিয়েছে তা-ই নয়। এ

অত্যাচারে সক্রিয় এবং বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে বহু বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী পাক দালালও। পাক সেনারা এখন বন্দী। কিন্তু পাক দালালরা এখনও অনেকে কারাগারের বাইরে। তাদের কিছু লোককে অবশ্য ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সরকার গ্রেফতার করেছে। বিচারও তাদের হবে। কিন্তু যাঁরা ধর্ষিত, অত্যাচারিত এবং নিহত হয়েছেন তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা এখনই শাস্তি চান।

আমি কাল একজন মন্ত্রীর ঘরে বসে-ছিলাম। মন্ত্রীমহাশয়ের জেলা থেকে কয়েক-জন ছাত্র এসে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। সবাই উত্তেজিত, জেলার একজন বিশিষ্ট পাক দালালের নাম করে বললেন, অমুক মিয়াকে আপনারা জেলে নিয়েছেন। কিন্তু ওর মত লোকের আবার বিচার কি! ও নিজে কত লোককে খুন করেছে তার হিসেব নেই! আজই ওর শাস্তি চাই। এবং ও রকম লোকের একমাত্র শাস্তি হল রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলী করে মারা।

কোনও সরকারের পক্ষেই এই দাবি চট করে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রী মহাশয় তাঁদের বোঝালেন। বললেন : হ্যাঁ, ওর বিচার যাতে দ্রুত হয় আমি সেজন্য জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছি। সরকার এ ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। তারপর লিডার নিজেই তো আসছেন। সব বিচার তিনিই করবেন।

উত্তেজিত ছাত্ররা লিডারের নাম শুনেই তাঁর আগমনের প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আলোচনা তখন চলল, লিডার কখন আসছেন, কীভাবে আসছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ।

লিডার এলে কিন্তু তাঁরা আবার ওই অবিলম্বে শাস্তি দানের দাবি তুলবেন।

এ তো গেল একটা দিক।

শৃংখলাবোধটা ফিরিয়ে আনাও শক্ত কাজ। গত নয় মাসে একটা প্রলয়কাণ্ড চলেছে। তার আগেও গিয়েছে প্রলয়। পূর্ব-বাংলার ডামাডোল চলছে গত প্রায় এক বছর ধরে। ছাত্ররা, শিক্ষকরা, কলকারখানার শ্রমিকরা, সরকারী অফিস কাছারির কর্মীরা সবাই এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছেন। বাংলাদেশের নানা প্রান্তে লড়াইও চলেছে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ধরে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সেটাও বিরাট ব্যাপার। সাড়ে সাত কোটি লোক। এতটুকু দেশ। প্রতি বছর ২১ লক্ষ করে লোক বাড়ছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বছরের পর বছর ধরে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য তেমন কিছুই করেনি। তার উপর যুদ্ধেও নানা ক্ষতি হয়েছে। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কত হাজার ব্রিজ যে ধ্বংস হয়েছে এখনও তার পূর্ণ হিসাব হয়নি।

তারপর রয়েছে সর্বশ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রশ্ন। গরীব মানুষেরও বিরাট প্রত্যাশা। প্রত্যাশা রয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্তের। অবার প্রত্যাশা করে আছে উচ্চ মধ্যবিত্তও। সকলেরই আশা, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে, শেখ সাহেব এলে সব সমস্যার সমাধান হবে —প্রত্যেকের ভাল হবে।

মধ্যবিত্তরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গোড়া থেকেই বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। এই মধ্যবিত্তের একটা অংশ আবার আয়ুব খানের রাজত্বে আর্থিক দিক থেকে নানাভাবে লাভবান। পূর্ব বাংলার গরীব মানুষ কিন্তু সেই গরীবই থেকে গিয়েছে। মধ্যবিত্তের বিলাসদ্রব্যের বহু ব্যবস্থা হয়েছে, বিদেশ থেকে নানা রকমের জিনিসপত্র এসেছে—কিন্তু পাক রাজত্বে গরীব মানুষের জন্য খুব কম ব্যবস্থাই হয়েছে। নতুন বাংলায় এ জিনিস চলতে পারে না। গরীব মানুষ, যাঁরা পূর্ববাংলার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ তাঁদের দিকে আগে নজর দিতেই হবে। এবং ফলে মধ্যবিত্ত পরাধীন বাংলায় যে বিশেষ অর্থ-নৈতিক সুযোগ-সুবিধা পেত স্বাধীন বাংলায় তা পাবে না।

তারপর তো রয়েছে বৃহৎ শক্তিবর্গের ব্যাপার। বাংলাদেশের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সামরিক দিক থেকেও। রয়েছে রাজনৈতিক গুরুত্বও। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য নানা বৃহৎ শক্তি এখন নানাভাবে চেষ্টা করবে। ভারতের ক্ষতি করার জন্য যে চেষ্টা চলবে তারও অনেকটা তারা করতে চাইবে বাংলাদেশকে ঘাঁটি করেই। বাংলাদেশের উন্নতির জন্য বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন। আর বিদেশীরা সাহায্যের বিনিময়ে একটা মূল্য চাইবেন। কত কম মূল্য দিয়ে নিজের দেশের কতটা ভাল করে নিতে পারবেন সেটাও নির্ভর করবে শেখ সাহেবের নেতৃত্বের উপরই।

*

সমস্যা বেড়েছে। আবার সুবিধাও বেড়েছে।

সবচেয়ে বড় সুবিধা বাংলাদেশ আজ নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত। দ্বিতীয় সুবিধা, শেখ সাহেবের মত একজন অবিসংবাদী নেতা রয়েছেন। তৃতীয় সুবিধা, মুক্তি যুদ্ধের মধ্যে দেশের সব শক্তি অনেকটা সংগঠিত। চতুর্থ সুবিধা, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মোটামুটি শান্তিপ্রিয় এবং ভাল। পঞ্চম সুবিধা, প্রতিবেশী ভারতের বন্ধুত্ব। বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত। সীমান্তে শত্রু রাষ্ট্র থাকার অসুবিধা বাংলা-দেশের নেই। প্রতিবেশীর ভয়ে বাংলাদেশকে ভীত হতে হবে না।

শেখ সাহেব যদি বাংলাদেশের মানুষের নতুন উৎসাহকে সংগঠিত করে দেশ গঠনের সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে ইতিহাসে তিনি অমর স্বাক্ষর রেখে যাবেন।

পৃথিবীতে খুব কম নেতাই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে জয়ের পর দেশের পুনর্গঠনে যথাযথ নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছেন।

ঢাকা।
৯-১-৭২।

নবারুণ গুপ্ত

ইতিহাসের সন্ধানে

কৃষ্ণা বসু

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উপর একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য শ্রীমতী বসু আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে-ছিলেন। সেখানে এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে লেখিকা নেতাজী সম্পর্কে যে-সব দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারই অভিজ্ঞতার কাহিনী এই রচনা। নেতাজীর ৭৬তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ থেকে এই ভ্রমণকাহিনী নেতাজী সম্পর্কিত বহু অপ্রকাশিত ছবিসহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

গুলবাজ

দেবরাজ

মহামহিম ব্রিটিশ সম্রাটের পাত্রমিত্রদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিলিতী সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে মহম্মদ আলি জিন্না যে দিব্যি দু-মহল ইমারত বানিয়েছিলেন তা যে দু' যুগ কাটতে না কাটতেই এমন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে তা কে আর ভাবতে পেরেছিল? সমস্ত জিনিসটাই অবশ্য ছিল অস্বাভাবিক। যে রাষ্ট্রের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কোনও যোগ নেই—না জলপথে, না স্থলপথে সে রাষ্ট্রের দু' অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠা শক্ত। তার ওপর রাগ করে যদি নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যও বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে যে অসুবিধে দেখা দেয় তার ঠেলা সামলানোও দূর থেকে সহজ নয়। আর সে অসুবিধে যদি এক এলাকারই হয়, অন্য এলাকাটা যদি কেবলই নিজের কোলে ঝোল টানতে থাকে তবে সমস্ত ব্যাপারটা এমনই জট পাকিয়ে যায় যে তা ছাড়ানো অবস্থা গতিকে অসম্ভব হয়ে ওঠে। পাকিস্তানেও গোড়া থেকে তাই হয়ে এসেছে। তার পূর্ব অঞ্চলকেই যত ঝক্কি পোয়াতে হয়েছিল জোড়াতালি দেওয়া রাষ্ট্রের। আরামে দই মেরেছে পশ্চিমে নেপোর দল।

যে রাষ্ট্রের পত্তনের সময় থেকেই অন্যায় আর অবিচার কায়েম হয়ে বসেছে তার প্রশাসনে সে রাষ্ট্রের কাঠামোতে যে ঘুণ ধরবে সে আর এমন বেশী কথা কী? ধর্মের বুনিয়াদের ওপর জিন্না তাঁর পাকিস্তানী ইমারত খাড়া করতে চেয়েছিলেন বলেই সেটা ধ্বসে পড়লো এ কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। মধ্যযুগে লোকে ধর্ম নিয়ে যেরকম মাতামাতি করতো তা অবশ্য এ যুগে আর করে না। এক ধর্মের লোক সবাই যদি একই রাষ্ট্রে থাকতে চাইত তা হলে খৃস্টান ইউরোপে অতগুলো আলাদা রাষ্ট্র থাকতো না, পশ্চিম এশিয়াতে ইসলাম বিশ্বাসীরা অনেকগুলো রাষ্ট্র না গড়ে তুলে একটা অখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারতো। তবুও ধর্মের ভিত্তিতে একটা জোরদার রাষ্ট্র গড়া যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ দিয়েছে হালফিল ইহুদিরা। পশ্চিম এশিয়াতে তারা গড়ে তুলেছে যারা ইহুদি ধর্ম বিশ্বাসী তাদের জন্য ইস্রায়েল। ইসলাম-সাগরে ছোট্ট এক চিলতে দ্বীপের মতো হচ্ছে ইহুদিদের ওই নয়া রাষ্ট্র। প্রতিবেশী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে সে দেশ নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে আজ চব্বিশ বছর হলো।

কাজেই ধর্মের বাঁধনে বাঁধা পাকিস্তান টিঁকলেও টিঁকতে পারতো যদি সত্যিই সে বাঁধন পাকা হতো। বিভ্রাট বেধেছে তা হয়নি বলে। সে আলগা বাঁধন তাই ছিঁড়ে গিয়ে দু' টুকরো হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। যতদিন সে রাষ্ট্র অখণ্ড ছিল ততদিন সেখানে মোড়লি করেছে পশ্চিমীরা—বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা। বাঙালীদের তারা মানুষ বলেই গণ্য করেনি, মুসলমান বলেও নয়। তারা মনে করেছে তারা হচ্ছে খানদানী মুসলমান, যাকে বলে নৈকষ্য কুলীন। আর বাঙালীরা ধর্মে মুসলমান হলে কী হয়, কাফেরের সামিল, ইসলামী সমাজে অন্ত্যজ। যদিও মুসলমানেরা জাত মানে না, পাকিস্তানের পশ্চিমী মোড়লরা যা করেছিল তা জাত ভাগ করার বাড়া। বাঙালীদের তারা কলকে দেয়নি প্রশাসনে কী ব্যবসা বাণিজ্যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কিংবা বিদেশে দূতাবাসে। বাংলা দেশের সম্পদ ভাঙিয়ে তারা খেয়েছে কিন্তু বাঙালীদের পান্তাভাতও জোটেনি। দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা এনে দিয়েছে বাংলার পাট আর চা আর তা দু হাতে ছড়িয়েছে পাঞ্জাব, ছিঁটেফোঁটা জুটেছে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য সব প্রদেশের বরাতে। কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে শূন্য যদিও তারাই সংখ্যায় বেশী ছিল অখণ্ড পাকিস্তানে।

নিতান্তই প্রাণের দায়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল বাঙালীরা। পূর্ব বাংলায় জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোর মতো ক্ষমতালোভী কোনও নেতা মাথা চাড়া দেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ক্ষমতা তিনি চাননি মুরুব্বিয়ানা করার জন্যে। পাকিস্তানকে ভেঙে দেবার কোনও ইচ্ছেই তাঁর ছিল না সে জন্য কারুর সঙ্গে কোনও চক্রান্তও তিনি করেননি। পাকিস্তান থেকে বাংলা দেশকে টুঁটি টিপে ধরে বের করে দিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানী মোড়লরা—জিন্না থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া খাঁ-ভুট্টো পর্যন্ত সবাই। পাকিস্তানে যেই রক্ষক সেই ভক্ষক হয়েছে বলেই এত শাস্তির ভার এতেকাল হলো। ধর্মের ধুয়ো যে নেহাত ধাপ্পা তা বাঙালীরা যত দিন গেছে হাড়েই বুঝেছে। তাদের পরকালের ভাঁওতা দিয়ে ইহকাল যে ঝরঝরে করে দেওয়া হচ্ছে তা যখন আর গোপন রইল না তখনই ভেতো বাঙালীর রক্তও গরম হয়ে উঠলো।

তারা চেয়েছিল স্বাধীনভাবে নিজের দেশে শান্তিতে দিন কাটাতে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের গোলাম হয়ে তাদের পাত কুড়োবার সাধ তাদের কখনও ছিল না। কাঠ মোল্লাদের ফাঁকা বুলিতে না ভুলে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। তাই বিরোধ বাধলো পূবে পশ্চিমে।

সে বিরোধ মেটাবার কোনও চেষ্টাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে করা হয়নি। হুমকি দিয়ে কাজ সারতে চেয়েছেন সেখানকার প্রধানরা। বাঙালীর জাত মারবার চেষ্টা করা হয়েছে তাকে তার ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে। সে অপচেষ্টা যাঁরা ভণ্ডুল করেছেন তাঁদের শিরোমণি হচ্ছেন মুজিব। জঙ্গীশাহী যখন দেখলে তাতেও কুলোচ্ছে না তখন সে প্রয়োগ করলে চরম দাওয়াই। নরকের অন্ধকার টেনে নিয়ে এলো বাংলা দেশে, ধরে নিয়ে গেল মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর মগজ ধোলাই করার জন্যে। এই মহামারী কাণ্ডের জন্যে দায়ী ইয়াহিয়া খাঁ একা নন, জুলফিকার আলি ভুট্টোও। ১৯৭০-এর নির্বাচনের রায় মেনে নিতে যদিও বা ইয়াহিয়া খাঁ প্রস্তুত ছিলেন ভুট্টো সাহেব কিছুতেই তা মেনে নিতে রাজী হননি। রফা একটা ১৯৭১-এর গোড়ার দিকে হলেও হতে পারতো যদি ভুট্টো না বেঁকে বসতেন। তাঁর আপত্তির জন্যেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসতে পারেনি। আজ তিনি সাধু সাজলে কী হয়, কলকাঠি তাঁর ভরসাতেই ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় নরমেধ যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন গেল বছর পঁচিশে মার্চ রাতে।

বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভুট্টো। তা তাঁর উদারতার পরিচয় নয়, পরিচয় তাঁর কূটবুদ্ধির। বিশ্বজনমতের চাপে তিনি কাজটা করেছেন এও স্রেফ ভাঁওতা। ইয়াহিয়া খাঁ তো মুজিবের কবর সাজিয়েই রেখেছিলেন। তাতে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে গোর দেননি নিজেরই আখেরের কথা ভেবেই। পাকিস্তানে তাঁর গদি যে পাকা নয় এ তিনি বেশ বোঝেন। মুজিবকে ফাঁসি দিলে আর এক দফা লড়াই যদি বেধে যায় তা হলে আর কিছু হোক না হোক এত করে যোগাড় করা গদিটি তাঁর যাবে। সেই গদি বাঁচাতেই তিনি মুজিবকে ছেড়ে দিয়েছেন যদিও হয়রানি করতেও ছাড়েননি। ঢাকা-দিল্লিতে তাঁকে না পাঠিয়ে পাঠিয়েছেন লণ্ডনে খানিকটা তাঁকে অযথা হয়রানি করবার জন্যে, খানিকটা দেশের লোককে ধোঁকা দেবার জন্যে। তাদের বোঝাতে চেয়েছেন পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলা দেশ যাতে যোগ রাখে এমন একটা প্রতিশ্রুতি তিনি আদায় করেছেন। কিন্তু ঘরে ফিরে শেখ তাঁর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বাংলা দেশ কোনদিনই তার স্বাধীনতা খুইয়ে পাকিস্তানের অংশীদার হবে না স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

সহসা সংবাদ এলো মুজিবের মুক্তির

রঞ্জন

অন্য কী যেন নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম। কিছুটা এগিয়েছিল। শ্রান্ত লেখনীর সামান্য সন্তানও প্রত্যাখ্যান করতে বাধে। প্রতি ভ্রূণ হত্যায় আছে অপরিসীম মমত্ববোধ। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খবর এলো যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবশেষে মুক্ত বাঙালী হয়ে লণ্ডনে পৌঁছেছেন। অনতিবিলম্বে ঢাকায় আসবেন। বর্তমান মুহূর্তে তাই অন্য চিন্তার জন্য ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী। কোনো নিরপরাধ বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তিতে স্বাধীন মানুষের আনন্দ একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু মুজিবের মুক্তি যেন কোনো একক ব্যক্তির মুক্তি নয়, শুধু বাংলাদেশের বাস্তবতার বিকৃত স্বীকৃতি নয়। এ যেন একটা আদর্শের, একটা জাতীয়তার কারামুক্তি। সাড়ে সাত কোটি লোক নিষ্কৃতি চেয়েছিল স্বধর্মী কিন্তু পরদেশী ও পরভোগী শাসনের নির্যাতন থেকে। আজ তা সফল হয়েছে অন্তত আপাতত, ভবিষ্যৎ কে জানে? আমি গণৎকার নই। এমনকি গুণে গুণে দিন-যাপনও আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি শুধু হাসতে জানি। আমি শুধু কাঁদতে জানি। মুজিবের মুক্তিতে আজ আমি হাসব খুশিতে। কাঁদব তাদের জন্য যারা আর নেই।

মুজিব সম্বন্ধে আমি সামান্যই জানি। পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীন নির্বাচনে তাঁর অভ্যুদয় আমাকে বিস্মিত করে, কেননা আমি তখন বাইরে। ঘরোয়া ব্যাপার সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন। কিন্তু কী কারণে দূরে থেকে কাছে রইল। মুজিবকে মনে হলো সহবাঙালী। এর মধ্যে [illegible] আমার জানা। এর মর্ম আলাদা হলেও কোথায় যেন একটা মিল আছে। মনে কোথাও সন্দেহ ছিল না এমন বললে সত্যের অপলাপ হবে। সেই সন্দেহ আশঙ্কা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে এমন দাবিও করতে পারিনে, যেমন ভারত সরকার বাংলাদেশের [illegible] স্বাধীনতার পক্ষকালের মধ্যেই [illegible] অশান্ত থাকেনি। [illegible] আনন্দিত হওয়া উচিত। তবু এই মুহূর্তে বিতর্কে আমার রুচি নেই। আমি আনন্দিত মুজিবের মুক্তিতে।

★

ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এই কাহিনীর ঘৃণ্য অমানুষিক আচরণ বর্ণনাতীত। কিন্তু কেন ওরা খুন করেনি মুজিবকে বা মুজিবের পরিবারের বিক্ষিপ্ত সদস্যদের? সরল ব্যাখ্যা এই যে, **ওরা সাহস পায়নি। রাজনৈতিক ফলাফলের** হিসাবে মৃত মুজিব সহস্র গুণ ভয়াবহ হতো জীবিত মুজিবের চাইতে। দুর্বৃত্তের ভীতি সে তো জানা কথা। কিন্তু ব্যাপক পাশবিকতার নির্বিচারতাও তো সমান সত্য। ব্রিটিশ সরকার একদা গম্ভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীকে এডেন বা পূর্ব আফ্রিকায় চালান দিয়ে সেখানে উপবাসে আত্মহত্যা করতে দিলে কেমন হয়? এমন আলোচনাও হয়ে থাকবে যে নেতাজীকে [illegible] বা অন্য কোথাও মেরে ফেললে কেমন হয়? বিচারের প্রহসনের কিবা প্রয়োজন? ইসলামাবাদে এমন আলোচনা হয়নি কি? জানিনে।

কিন্তু সহজাত অবিশ্বাসপ্রবণতা সত্ত্বেও ভাবতে ভালো লাগে যে সর্বগ্রাসী বর্বরতার মধ্যেও কণামাত্র মনুষ্যত্ব কোথাও অবশিষ্ট ছিল ইসলামাবাদেও। ঢাকা বা [illegible] অন্যান্য জায়গায় সমস্ত হিন্দু [illegible] ইসলামাবাদের [illegible] আন্তরিক [illegible] এক কথা। পাঞ্জাবী, পাঠান বা বিহারী অনুচরেরা সেখানে তার লক্ষ্যের নাম জানে না, মুখ দেখেনি, [illegible]। এমন নিরস্ত্র লোককে নিধন অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আর জুলফিকার ভুট্টো তো সেদিনও মুজিবের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। পরিচিত ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে শীতল হত্যা অন্য প্রস্তাব। রাজনৈতিক ফলাফল নিশ্চয়ই ভীষণ হতে ভীষণতর হতে পারতো যদি মুজিব রাওয়ালপিণ্ডিতে দেহরক্ষা করতেন, কিন্তু ইয়াহিয়া যখন নিশ্চিতই জানলেন যে বঙ্গীয় সাম্রাজ্য তাঁর হস্তচ্যুত হয়েছে তখন আর তাঁর কী ভয় ছিল কী ভাবনার? [illegible] শত্রু করলে আর কী ক্ষতি হতে পারতো? মুজিবের উত্তরাধিকারীরা আরো বেশি উগ্রপন্থী হতে পারেন, সহজে মুজিবের বাঙালীয়ানা পরিহার না করেও [illegible] ঐক্যে [illegible] নিয়োজনে সম্মত হতে পারেন—এমন সকল সম্ভাবনা ইয়াহিয়ার মনে নিশ্চয়ই স্থান পেয়ে থাকবে। কিন্তু পরাজয়ের শেষ মুহূর্তে এ রকম রাজনৈতিক হিসাব নির্দয়তম স্বৈরাচারীর মনেও বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে বলে বিশ্বাস করিনে। **প্রশ্ন ছিল : মুজিব, ওকে যে আমি জানি।** ও আমার হাতে বন্দী। ওকে শেষ করার চাইতে সহজ কিছু নেই। এমন সহজ কাজ করে আমার হাত রাঙা হবে। আর কী হবে? থাক ও জেলখানায়।

★

জুলফিকার ভুট্টো সৈনিক নন। নীতি-জ্ঞানবিরহিত পলিটিশন মাত্র। তিনি স্বীকার করেছেন যে বিশ্বমত মুজিবের মুক্তি দাবি করেছিল আর তার কাছে নতি-স্বীকার না করে উপায় ছিল না। অর্ধ-সত্যের শ্রেয় দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। ইয়াহিয়ার পতনের পূর্বেও বিশ্বমত অজানা ছিল না, যদিও বিশ্বমত বস্তুটির সত্যকার অস্তিত্ব আমার কাছে এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ। এই বিশ্বমতের সমর্থনের জন্য তো ইন্দিরা নূপুরের মত বেজেছে চরণে চরণে। পণ্ডিতজী মরেছে হাজার মরণে। বিশ্বমতের প্রতি নির্বিচার অশ্রদ্ধা-সত্ত্বেও আমার অভিসন্ধির অংশমাত্র নয়। তাই বলে যেন অযাচিত অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতে পারবে না যে সাধুশীল সুবোধ জুলফিকার ভুট্টো বিশ্বমতের নৈতিক নির্দেশ সাগ্রহে মেনে নিয়েছেন। তাঁর বেলায় মুজিবের মুক্তি [illegible] অপেক্ষা বাধ্য। ইয়াহিয়াকে যে মানবিকতার [illegible] দিয়েছি ভুট্টোকে তাও দিতে আমি অক্ষম।

ইনি সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়। এঁর মাসতুতো ভাইয়ের সংখ্যাও কম নয়। [illegible] ইয়াহিয়া কল্পনাহীন সৈনিক বেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাজ-নীতিক রণাঙ্গনে, তাঁর অশিক্ষিতপটুত্বও ছিল অতি সামান্য। সম্মুখ সমরে পরাস্ত হলে সেনাবীর [illegible] ছিল না বললেই চলে। এমন মনে করবারও সঙ্গত কারণ আছে যে ইয়াহিয়ার অত্যাচারী নির্বুদ্ধিতার প্রধান উৎস ছিলেন জুলফিকার ভুট্টো। তিনি আজ খণ্ডিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হয়ে আদৌ অখুশী নন। বাংলাদেশের জন্য তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা নেই; একমাত্র মন্ত্র তাঁর ভারতবিদ্বেষ। [illegible] করবার উপায় নেই যে ভারতবর্ষেও [illegible] মুসলিম-নিগ্রহ আছে। ভুট্টো তাতে ইন্ধন জোগাবেন। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

ভারত আর বাংলাদেশকে দেখতে হবে যে ভুট্টোর খেলায় কেউই যেন খেলোয়াড় না হয়। দায়িত্ব দু ভাগেরই, কিন্তু মুজিবের মুক্তি আমাকে এনে দিয়েছে অপরিসীম আনন্দ—আর মুজিবকে এক অপরিমেয় দায়িত্ব। আমি যে বিশ্বাস করিনে শৌখীন সমঝোতায়।

বাংলা দেশ, নবতম মহাদেশ

জিয়া হায়দার

পৃথিবীর সুবিশাল মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র এক
বিন্দু হয়ে; অস্পৃশ্য বন্দীর মতো ছিলো অবজ্ঞাত—
রাত্রির আঁধারে যেন দৃষ্টিবহির্ভূত কোনো অহেতুক তারা,
কোনো জ্যোতির্বিদ যাকে গণনায় আনে নি কখনো
কিংবা আনতে করে নি ইচ্ছাও—

কিন্তু কি বিস্ময়! যেন কোনো এক নতুন ঈশ্বর
'অতএব মানচিত্রে নবতম বাংলা দেশ' এই অভিলাষে
নিজেকে দিলেন বলি, জানালেন 'আত্মাহুতি বিনা
কিছুই হয়নি সৃষ্টি'—এবং সহসা
অখ্যাত অজ্ঞাত এই অন্ধকারে আচ্ছন্ন নক্ষত্র এক জাগালো প্রলয়—
পৃথিবীর পেলব প্রচ্ছদ হলো বিখণ্ড চৌচির,
লক্ষ কোটি সূর্যাগ্নিও পারে নাই ছড়াতে এমন দাবদাহ;

পৃথিবীর সুবিশাল মানচিত্র আকস্মিক অভিঘাতে হলো
প্রকম্পিত; আর সেই মানচিত্রটার
কৌতূহলী প্রস্তুতকারক, তার প্রজাবৃন্দ যতো
উৎকণ্ঠা শংকায় দেখলো

অজ্ঞাত আঁধারে
পড়ে থাকা বাংলা দেশ আপনার রক্ত সৃষ্ট মাটির প্রদীপে
ব্রহ্মাণ্ডের জলস্থল অন্তরীক্ষে এনে দিলো সর্বাধিক আলো উজ্জ্বলতা;
কি প্রচণ্ড ইচ্ছার আঘাতে
অতি ক্ষুদ্র বিন্দু এক, বাংলা দেশ নাম যার, বর্ণনা দুঃসাধ্য যন্ত্রণায়
নীলকণ্ঠ, এবং সেহেতু
সপ্তকোটি বিস্ময়ের বিশেষণে নবতম মহাদেশ হলো,
একমাত্র পরিচয় তার—
বাংলা দেশ, পৃথিবীর সুবিশাল মানচিত্রে
সপ্তকোটি বিপুল বিস্ময়!
[ডিসেম্বর, ১৭, ১৯৭১]

আমার সোনার বাংলা

—আশরাফ সিদ্দিকী

এসো, আজ আমরা সবাই মিলে
চর্যাপদের গানগুলি আবার শুনি
শুনি : সেই বেহুলা আর লক্ষীন্দরের কাহিনী
শুনি : বৌদ্ধ নাথ আর বাউলের গীতি
শুনি : য়ুসোফ জুলেখা বদিওজ্জামাল ও হুসন্ বানুর কিচ্ছা
শুনি : মৈমনসিংহ গীতিকা
জারী, সারী, বাউল, ভাটিয়ালী,
মারফতী, মুর্শিদী, দেহতত্ত্ব, চটকা, ভাওয়াইয়া......
পড়ি : আমার দেশের কবি-শিল্পীদের কত কথা, গান আর
কাব্য কবিতা

বলি : "মোদের গরব মোদের আশা
আ' মরি বাংলা ভাষা"
বলি : কিছু প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার ছড়া
বলি : "নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত"
গড়ি : হৃদপিণ্ড দিয়ে এক অজর অমর মিনার
লিখি : রক্ত দিয়ে সেই স্মৃতিফলক :
"আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি"......

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

সমালোচনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও হিং টিং ছট্ বিতর্ক

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার স্বর্ণময় ঔজ্জ্বল্যে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার উদ্ভাসিত। একে একে তাঁর তেরটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। (দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫, কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬, মৃণালিনী ১৮৬৯, বিষবৃক্ষ ১৮৭৩, ইন্দিরা ১৮৭৩, যুগলাঙ্গুরীয় ১৮৭৪, চন্দ্রশেখর ১৮৭৫, রাধারাণী ১৮৭৭, রজনী ১৮৭৭, কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮, রাজসিংহ ১৮৮২, আনন্দমঠ ১৮৮২ ও সবে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত ত্রয়োদশ উপন্যাস দেবীচৌধুরাণী ১৮৮৪)। চতুর্দশ উপন্যাস 'সীতারাম' লেখার কাজে হাত দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মাজা-ঘষা ও রূপান্তরেরও যেন বিরাম নেই, * অন্য নানান ধরনের লেখার সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

সে সময় তাঁর "হিন্দুধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও আলোচনাসভায় ঐ প্রবন্ধগুলি রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কিন্তু তেইশ বছর বয়সী তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে ও ভারতীতে 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত করে যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন, তার তুলনা পাওয়া ভার! বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কটাক্ষ সমন্বিত এই প্রবন্ধটির তীব্র আঘাতে তৎকালীন বঙ্কিমভক্তরা ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁদের রাগের কারণ ছিল। সাময়িক উত্তেজনার বশে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যায় আঘাত দিয়ে অত্যন্ত হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঐ ঘটনার মাত্র কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর তারুণ্যের উষ্ণ রক্ত 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে অযথা বিষোদ্গারে তাঁকে প্ররোচিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর প্রত্যেকটি অভিযোগই ছিল যুক্তিহীন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে বলছেন

—"আশ্বিন মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদ গ্রহণ করার কিছুকাল পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধের সমগ্র অর্থ গ্রহণ না করিয়াই এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখিয়া ফেলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এমন কিছুই লেখেন নাই, যাহাতে ধর্ম নিন্দিত হইতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগগুলি যুক্তিহীন ছিল বটে, কিন্তু তাতে প্রখর বিদ্রূপের জ্বালা বড় কম ছিল না। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু ও ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে ইতিপূর্বেই তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আক্রমণ ছিল চতুর্থ।

বিচলিত বঙ্কিমচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। পাল্টা জবাব দিলেন 'প্রচার' পত্রিকায় "আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" প্রবন্ধে।

অতুলনীয় সে প্রবন্ধ। সাহিত্যসম্রাটের অসামান্য লিখনসৌন্দর্যে বেদনা, অভিমান, ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। একে একে বিপক্ষের প্রত্যেকটি যুক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে নিজ বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাঁর অনায়াস ক্ষমতা এযুগেও আমাদের মনে

---

* বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলির যে কি মাত্রায় মাজা-ঘষা ও রূপান্তর করতেন তা এ যুগে আমাদের কল্পনারও বাইরে। প্রায়ই দেখা যেত তাঁর উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ ও পরবর্তী সংস্করণে আশমান-জমিন ফারাক।

উদাহরণস্বরূপ, রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮২তে। তখন উপন্যাসটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৩। ১৮৯৩তে চতুর্থ সংস্করণে এটি বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩৮ পৃষ্ঠায়।

ইন্দিরার প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪৫, পঞ্চম সংস্করণে বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৭ পৃষ্ঠায়। ইত্যাদি।

রীতিমত বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে। অগ্নিগর্ভ সে প্রবন্ধের কিছুটা নমুনা—

"ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্রবাবু যখন ক খ শিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখদুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে), তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে। কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎস্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষত তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দু একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য।

তবে যে এই কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ এই রবির পেছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।"

এই "বড় ছায়া" বলতে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের কথাই বলতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এক জায়গায় উত্তেজিত হয়ে লিখেছিলেন,

"কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এই কথার উত্তরে ব্যঙ্গভরে বললেন "আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে কটাক্ষ করে লিখলেন, "অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূলে শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূলে শিথিল করিতে পারেন না।...... আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?"

বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করলেন পাল্টা রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, তখন সভাগৃহে নাকি উপস্থিত শ্রোতারা রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণের গুণে(?) মুখ্য লেখক কথাটির বদলে মূর্খ লেখক কথাটিই শুনতে পেয়েছিলেন।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্র জানতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, "কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, 'তোমরা ছাই ভস্ম সত্য আসাইয়া দাও — মিথ্যার আরাধনা কর'।"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে উল্লেখিত দুটি চরিত্রের সম্ভাব্যতায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে চরিত্র দুটি সম্পূর্ণ কল্পনা।

বঙ্কিমচন্দ্র জবাবে লিখলেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ যদি চাহেন আমি তাঁহাদের বাড়ি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি।"

প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করে বঙ্কিমচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ, তথা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ১২৯১ সনের (১৮৮৪ খৃঃ) শ্রাবণ মাস থেকে অক্ষয় সরকার মহাশয়ের সম্পাদনায় নবজীবন মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হতে থাকে। 'নবজীবন' মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় (অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে) 'সূচনা'য় বা সম্পাদকীয়-র কলামে বঙ্গদর্শন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা করা হয়।

প্রশংসার পাল্লাটি কিন্তু বঙ্গদর্শনের দিকেই ভারী হয়েছিল। যেহেতু তত্ত্ববোধিনী ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত পত্রিকা ব্রাহ্মরা সেহেতু এতে অপমান বোধ করলেন। তাঁদের ধারণায় 'তত্ত্ববোধিনী'ই সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা।

অবিলম্বেই ব্রাহ্মসমাজের "জনৈক প্রধান লেখক" নবজীবন পত্রিকার "সূচনা" ও সম্পাদককে গালাগাল দিয়ে "সঞ্জীবনী" সাপ্তাহিকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। চিঠিটি প্রকাশিতও হল।

"নবজীবনের" সম্পাদক এ পত্রের উত্তর দিলেন না বটে কিন্তু,

"আমার প্রিয় বন্ধু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল "র"।

লোকে কাজে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্রবাবুর লেখা। রবীন্দ্রবাবু ইতর শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাল্টাইয়া বলিলেন।"

•

এই আগ্নেয় রচনাটির প্রচণ্ডতায় বিধ্বস্ত রবীন্দ্রনাথ পরের মাসেই, অর্থাৎ পৌষ সংখ্যার ভারতীতে 'কৈফিয়ৎ' শিরোনামে লিখলেন,

"বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল। তাই আমার কর্তব্য কার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না, ভরসাও হয় না।"

সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের কৈফিয়তের আর কোন পাল্টা জবাব দেননি এবং এই নিতান্ত অপ্রীতিকর বিতর্ক থেকে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

আনন্দের কথা পরবর্তী কিছু কালের মধ্যেই তরুণ রবীন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন, সাহিত্যসম্রাটের প্রতি তিনি যে নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করেছেন, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অকপটে স্বীকার করতে তাঁর দেরি হয়নি।

সাহিত্যসম্রাটও তাঁর 'প্রাণাধিক প্রিয়' তরুণ রবিকে তৎক্ষণাৎ মার্জনা করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যিক বিতর্কের ও বিরোধের দ্রুত অবসান ঘটলেও অবিলম্বেই রবীন্দ্রনাথ অপর আরেকটি তিক্ত বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়লেন।

সেই সময়ে "বঙ্গবাসী" সাপ্তাহিকের খুব নামডাক! গোঁড়া, অতি গোঁড়া হিন্দুদের প্রায় মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিকটি। কাটতিও তার যথেষ্ট।

'বঙ্গবাসী'র গোঁড়ামি এমনি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, বাঙলা দেশে যেকোন প্রগতিধর্মী আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতাই সাপ্তাহিকটির মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪—১৯০৫) ছিলেন 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ক্ষুরধার ব্যঙ্গরচনায় এঁর দক্ষতা ছিল, তবে বহুক্ষেত্রেই রচনায় শালীনতার শেষ সীমানাও অতিক্রম করে যেতেন এই যা! তাঁর রচিত উপন্যাস "মডেল ভগিনী" (১৮৮৬-৮৮) এককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাঁচটি সংস্করণ-ধন্য এই উপন্যাসটিতে আগাগোড়াই প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজ ও নারীশিক্ষাকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। সে যুগের আরেক বিশেষ খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। হিন্দুধর্মের একজন প্রধান প্রবক্তা ও অতি গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তৎকালীন অনেক পত্রিকার সঙ্গে 'বঙ্গবাসী'তেও তিনি নিয়মিত লিখতেন।

রবীন্দ্রনাথ এই দুই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এক শক্তিশালী বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিকে "শ্রীমান দামু বসু ও চামু বসু সম্পাদক সমীপেষু" শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশ হল। লেখক রবীন্দ্রনাথ। বলাই বাহুল্য "শ্রীমান দামু বসু ও চামু বসু" যথাক্রমে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও চন্দ্রনাথ বসু।

বস্তুত এমন তিক্ত ও উদ্দেশ্যমূলক কবিতা রবীন্দ্রনাথ আর জীবনে কখনই লেখেননি। আগেও না পরেও না। ব্যক্তিবিশেষকে উদ্দেশ্য করে লেখা যে ধরনের আক্রমণাত্মক কবিতার সম্পূর্ণ টেকনিকগুলি এই কবিতাটিতে প্রয়োগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

এ যুগের পাঠকের কাছে তার কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া আবশ্যক।

শ্রীমান দামু বসু ও চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু

রব উঠেছে ভারতভূমে হিন্দু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নেইকো আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু!)
নাই বটে গোতম অত্রি যে যার গেছে সরে,
হিন্দু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
(আহা দামু, আহা চামু!)
লিখছে দোঁহে হিন্দু শাস্ত্র এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্ছে গাল।
(হায় দামু, হায় চামু!)
এমন হিন্দু মিলবে নারে সকল হিন্দুর সেরা,
বোস বংশ আর্য বংশ, সেই বংশের এঁরা।
(বোস দামু, বোস চামু!)

... .

দন্ত দিয়ে খুঁড়ে তুলছে হিন্দু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে বাজার হুলস্থূল।
(দামু চামু অবতার!)

ইত্যাদি ইত্যাদি

পরবর্তী কালে এই কবিতাটি সম্বন্ধে নিতান্ত লজ্জা অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটিকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন তিনি। তাই আমরা দেখতে পাই উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে "কড়ি ও কোমল"-এর প্রথম সংস্করণে যদিও কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, কিন্তু 'কড়ি ও কোমল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকেই এটিকে বাদ দিয়ে দেন, আর কখনও কোথাও এটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেননি তিনি।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রিয় বন্ধু" এবং যিনি ব্রাহ্ম সমাজের জনৈক লেখকের চিঠিতে "গালাগালির রকমটা" দেখে 'ইতর' শব্দটা নিয়ে একটু "নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন" ও রবীন্দ্রনাথ 'ইতর' শব্দটা যাকে পাল্টিয়ে বলেছিলেন, সেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই যে মসীযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, পরবর্তী

১৫ বছরের আগে তার থামার লক্ষণ দেখা গেল না।

বস্তুত অন্তত এই বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যে চিরকাল একটি অমর [illegible] হিসেবে পরিগণিত হবেন।

দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে কারো বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালানো রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি সর্বকালীন রেকর্ড। এই মসীযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসু সব সময় ন্যায়-যুদ্ধ চালিয়েছেন এমন কথা বলা যাবে না। সম্ভবত দোষের পাল্লা রবীন্দ্রনাথের দিকেই একটু বেশী ভারী।

এত বিভিন্ন বিষয়ে উভয় পক্ষ 'তুমুল যুদ্ধ' চালিয়ে গেছেন, তার তালিকা এযুগে নিতান্ত বিস্ময়কর ও কৌতুহলজনক বলে বিবেচিত হবে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

চন্দ্রনাথবাবুর চরিত্রটিও বড়ই [illegible] ও বহুমুখী। একদা বঙ্গসাহিত্যের [illegible] খ্যাতনামা সমালোচক ও প্রবন্ধকার চন্দ্রনাথ বসুর জীবনকাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেই জীবন প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ-ভাগের এক বিচিত্র অধ্যায় তাহলে আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হবে।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। [illegible] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে পরিগণিত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন পরবর্তী কালের [illegible] ইংরেজ অধ্যাপক ব্লকমান সাহেব। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু তাঁর বৃদ্ধ বয়সে [illegible] স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন একটি [illegible] সংলাপ,

"বঙ্কিমবাবু একবার আমাকে বলিয়া-ছিলেন, 'তুমি পরীক্ষায় ব্লকমান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকমান আইন-ই-আকবরী-র ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে?'

বঙ্কিমবাবু ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। —আমরা কেবল পরীক্ষাই দিতে পারি।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ বি এল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে এম এ পরীক্ষারও উত্তীর্ণ হন সসম্মানে।

অতঃপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চাকরি যান। ছ' মাস কাজ করার পর আর ভাল লাগল না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ছেড়ে দিলেন। এর পর রাজস্থানের জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করে জয়পুর যান। সেখানেও ভাল লাগল না কারণ "রাজসভার হাওয়া বড় ভাল নয় এবং আপন স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন।"

এ কাজও ছেড়ে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। এবার বেঙ্গল লাইব্রেরির

অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন ১৮৭৯ খ্রীঃতে। কয়েক বছর ঐ পদে আসীন থাকবার পর বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অনুবাদক বিভাগের সর্বময় কর্তার পদে উন্নীত হলেন। এই পদে একটানা কাজ করে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ষাট বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিল বটে, কিন্তু বাংলা ভাষায় কিছু লিখতে ভয় ও সংকোচ বোধ করতেন। ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ রচনায় তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। এমন কি ইংলিশম্যান ও স্টেটসম্যানেও তাঁর লেখার প্রশংসা করে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

সে যুগে ইংরাজী ভাষার একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল, নাম ক্যালকাটা রিভিয়ু, চন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকাটিতে বাংলা বইয়ের সমালোচনা করতেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের সমালোচনা পাঠ করে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র মুগ্ধ হন ও তাঁকে বাংলা লেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। বঙ্গদর্শন তখন সঞ্জীববাবুর হাতে। চন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ থেকে শকুন্তলা তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করে অচিরেই বাংলা রচনায়ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

এর পর তিনি জীবনে আর ইংরাজী ভাষায় কোন সাময়িক পত্রেই কোনরকম লেখা লেখেননি। তাঁর রচিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা চোদ্দটি। তার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় শকুন্তলা তত্ত্ব (১৮৮১), ফুল ও ফল (১৮৮৫), গার্হস্থ্য পাঠ (১৮৮৬), হিন্দু বিবাহ (১৮৮৭), বিধবা (১৮৯১), হিন্দুত্ব (হিন্দুর প্রকৃত ইতিহাস) ১৮৯২, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি (১৮৯৯)।

চন্দ্রনাথ যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত ঘোরতর প্রগতিবাদী ও আধুনিক ছিলেন। সমাজ সংস্কারেও তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। এমন কি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটির সভায় 'হাই এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে হিন্দুদের জাতিভেদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এর কিছু কাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটলো। সেই অসামান্য, অকল্পনীয় বিরাট ব্যক্তিত্বে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই চন্দ্রনাথ বসু সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর আগের মতবাদের পরিবর্তন ঘটে গেল সম্পূর্ণভাবে।

"তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর (জাতিভেদ প্রণালীর) যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়া 'নবজীবনে' জাতীয় চরিত্র ও বর্ণভেদ প্রণালী শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।"

সেই শুরু। এর পর জলস্রোতের মত সর্বরকমের গোঁড়ামির সমর্থনে তাঁর কলম থেকে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বার হয়ে আসতে লাগলো। হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন "যথার্থ ধর্ম" আছে—এ কথা তাঁর "বিশ্বাসেরও অযোগ্য"। একদিন আবার লিখে ফেললেন, হিন্দু ধর্মের বিয়েই আসল বিয়ে, খ্রীষ্টান মতে বিবাহ "বিশেষতঃ সাদা-চামড়া সাহেবদের বিবাহ আদৌ বিবাহ-ই নয়।"**

কলমটি ছিল কিন্তু বড় চমৎকার! বঙ্কিম ঢঙে লেখা সুন্দর দ্রুতগতি বাংলা আজও আমাদের বিস্ময় আকর্ষণ করে। প্রয়োজনে ঠিক বঙ্কিমের আদর্শ অনুযায়ী মন্থরগতি চিন্ময়ী ভাষার দ্যুতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি। তাঁর মূল্যবোধ ও সমালোচনা প্রণালীতে বঙ্কিমচন্দ্রের অতি দৃঢ় আস্থা ছিল।

একবার জনৈক সমালোচক 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, "আমার বোধ হয় যেন আপনার নাট্যসৃষ্টির শক্তি এখন বাড়িতেছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন তৎক্ষণাৎ,

"চন্দ্রবাবুও (চন্দ্রনাথ বসু) তাই বলেন, আমার নিজেরও তাই বোধ হয়।"

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সর্বপ্রকার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। চন্দ্রনাথ বসুর সাহিত্যপ্রতিভা থাকলেও অথবা সাহিত্যসম্রাটের বিশেষ আস্থাভাজন হলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে এল। মূলত ধর্ম প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূচনা হলেও কিছু কালের মধ্যেই বিরোধের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়ে যায়। ধর্মতত্ত্ব থেকে ধ্যানতত্ত্ব, সংগীত থেকে আহারপ্রণালী, চরিত্র গঠন থেকে সাহিত্যচিন্তা—প্রতিটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু হল।

যে-কোন বিষয়ে যে-কোন পত্রিকায় চন্দ্রনাথ বসু যে-কোন মত প্রকাশ করলেই, তরুণ, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতেন। তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় চন্দ্রনাথবাবুর প্রত্যেকটি মতের বিরুদ্ধাচরণ না করা অবধি তরুণ রবীন্দ্রনাথের স্বস্তি ছিল না।

উভয়ের মধ্যে এই তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা সে যুগে পাঠক ও চিন্তাশীল মহলে বিশেষ উত্তেজনার ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ সে যুগের বিভিন্ন মাসিক, সাপ্তাহিক

** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চন্দ্রনাথ বসুর অতিরিক্ত গোঁড়ামি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও শেষের দিকে খুবই অপছন্দ করেছিলেন।
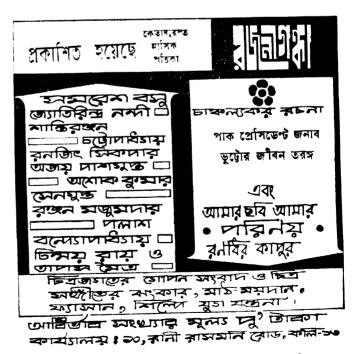
ও ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত মন্তব্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসুর তর্ক-যুদ্ধের উদ্দেশ্য করে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস সংখ্যার "সাহিত্যে" (সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত) ১৮৯২, নগেন্দ্র-নাথ গুপ্ত ছদ্মনামে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ রচনা করলেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১—১৯৪০) সে যুগের এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সাংবাদিক। ইংরাজী ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই সমানে কলম চালাতে পারতেন। করাচীতে 'ফিনিক্স' ও লাহোরে 'ট্রিবিউন' নামক দুটি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন।

'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধে অতি উপভোগ্য এবং সম্ভবত যথার্থ নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটির আংশিক উদ্ধৃতি এ যুগের পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হল।

তথ্যের দিক থেকে এই অংশটি অতি মূল্যবান।

তর্কবৈচিত্র্য

বঙ্গের দুইজন খ্যাতনামা লেখক কিছুদিন হইতে বিস্তর তর্ক করিয়া

আসিতেছেন।......বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গসাহিত্য সংসারে বিশেষ পরিচিত। উভয়ে গহৎস্বভাব, উভয়ে স্বদেশানুরাগী। ইঁহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে অতিশয় শান্ত ও সংযতভাবে তর্ক হইবার কথা, অন্যথা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, বাবু চন্দ্রনাথ বসু কোন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার প্রত্যুত্তর দেন। সেই অবধি চন্দ্রনাথবাবু যে-কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথবাবু সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিবারই তর্কের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথবাবু করিয়াছেন।...প্রতি কথায়, প্রতি মতে তর্ক কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর হইয়া উঠে......।

রবীন্দ্রনাথবাবু গত ভাদ্র মাসের সাহিত্যে লিখিয়াছিলেন—"চন্দ্রনাথবাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি।" জিতক্রোধ পুরুষ হইলে, রাগ করা সকল অবস্থায় অন্যায়। কিন্তু সহজ মানুষের শরীরে একটু আধটু রাগ থাকিবার কথা। রবীন্দ্রনাথবাবু যদি চন্দ্রনাথবাবুর অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি রাগ করিতেন কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাস্য।

......মানিলাম চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ, এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই কথা একবার বলিলেই তো রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন কি? ......চন্দ্রনাথবাবু রাগ করিলে কতক মার্জনীয় বোধ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথবাবুর রাগের কোনই কারণ নাই। কেননা, তিনিই প্রত্যেকবারে গায়ে পড়িয়া তর্ক তুলিয়াছেন।

'আষাঢ় মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন, "প্রবন্ধের (চন্দ্রনাথ বসুর 'লয় বিষয়ক প্রবন্ধ' (সাহিত্য জ্যৈষ্ঠ) উপসংহারে চন্দ্রনাথবাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনের মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে!!"

...এই কঠিন কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথবাবু কেমন কোমল কথা বলিলেন দেখা যাউক।... শ্রাবণ মাসের সাধনায় 'হিং টিং ছট' নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা রবীন্দ্রনাথবাবুর রচনা। রবীন্দ্রনাথবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন জানি না। চন্দ্রনাথবাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথ বসু...।

চন্দ্রনাথবাবু 'কড়াক্রান্তি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন, "অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময় যাপনের একটা উপায় বটে।"

স্বজাতিদ্রোহী কথাটা কঠিন হইল, আর এই কথাটা কঠিন হইল না!!

যদি সুশিক্ষিত উদারস্বভাব সুলেখকগণ মতভেদ প্রকাশকালে, বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে আর কে করিবে?

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্থির প্রত্যয়যুক্ত বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। কিন্তু 'হিং টিং ছট' প্রসঙ্গে একটি অতি অদ্ভুত তথ্য আলোচনা না করলেই নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে শশধর তর্কচূড়ামণি নামে এক রহস্যময় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়।

হিন্দু ধর্মের যাবতীয় আচারবিধি, সংস্কার ও কুসংস্কারের উদ্ভট উদ্ভট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। আচিরেই বহু ব্যক্তি তাঁর অনুরাগী হয়ে উঠলেন। টিকি, হাঁচি প্রভৃতি নানা খুঁটিনাটি প্রসঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণি বিচিত্র সব মৌলিক গবেষণা করে সকলকে তাক

জাগিয়ে দিলেন। এমনও দেখা গেছে কোন শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শশধর অতি জটিল ও আজগুবী সম্পূর্ণ অবোধগম্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 'জলের মত পরিষ্কার' বলে তা মেনে নিয়েছেনও তৎক্ষণাৎ।

এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও শশধর তর্কচূড়ামণির বাকচাতুর্যে ও উদ্ভাবনের মৌলিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন প্রথম প্রথম।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় বসে বসে গল্প করছেন, হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র শুধোলেন, "রবীন্দ্রবাবু, আপনি শশধর তর্কচূড়মানির বক্তৃতা শুনিয়াছেন?"

রবীন্দ্রনাথ জানালেন, না তাঁর শোনার সুযোগ ঘটেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, "একদিন সময় করিয়া শুনিবেন, বক্তৃতাগুলির মধ্যে জিনিস আছে।"

কয়েকদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে আগমন হল শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার বিষয়, হিন্দুর আচারবিধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রনাথ গেলেন আমন্ত্রিত শ্রোতা হিসেবে। কিছুক্ষণ শশধরের বক্তৃতা শুনেই তাঁর বুঝতে দেরি হল না যে, তথ্যগুলি নেহাৎই আজগুবী এবং শশধর তর্কচূড়ামণি হয় পাগল, নয় লোক ঠকাতে এসেছেন।

তবে বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, বঙ্কিমবাবুর মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি কি করে এসব বিশ্বাস করলেন?

কিছুকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্রও শশধর তর্কচূড়ামণির দৌড় বুঝতে পেরে গেলেন। শশধর তর্কচূড়ামণির ব্যাখ্যা যে অসম্ভব এবং টেকবার কোন সম্ভাবনা নেই, এ কথা ঘোষণা করতেও তাঁর দেরি হল না।

তবুও এই ঘটনার বেশ কিছুকাল পর পর্যন্ত শশধর কলকাতায় আসর জাঁকা[ইয়ে] রেখেছিলেন, অনুরাগীর সংখ্যাও তাঁর নেহা[ৎ] কম ছিল না। চন্দ্রনাথ বসুও তাঁর একজ[ন] অনুরাগী ছিলেন। "হিং টিং ছট" কবিতাটিতে হবুচন্দ্র রাজার স্বপ্নের অ[দ্ভুত] উদ্ভট ব্যাখ্যা শশধর তর্কচূড়ামণির স্মরণে রচিত। খর্বকায় বাঙালী পণ্ডিতটি আ[র] কেউ নয়—চন্দ্রনাথ বসু।

এই কবিতাটিকে উপলক্ষ করে তুম[ুল] ঝগড়ার সৃষ্টি হল বিভিন্ন সাময়ি[ক] পত্রাদিতে। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে অস্থি[র] হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' (২য় বর্ষ, ১[ম] ভাগ ১২৯৯-১৩০০) 'সাহিত্য পাঠকদে[র] প্রতি' শীর্ষক রচনায় লিখলেন,

"কিয়ৎকাল পূর্বে হিং টিং ছট্ নাম[ক] একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথবাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় 'সাহিত্য' পত্রের কো[ন] লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশ[য়] জাগাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবা[দ] 'সাহিত্য' সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দি[ই]। তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদে[র] অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্তব্য বো[ধ] করেন নাই। এই কারণে সাধনা পত্রে[র] আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত নহে, এব[ং] কোন সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে [যে] এইরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পা[রে] তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।"

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন [যে] রবীন্দ্রনাথের কথা সে যুগে কেউই বিশ্বা[স] করেনি। সকলেরই বদ্ধমূল ধারণ[া] হিং টিং ছট্ কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু[কে] বিদ্রূপ করার জন্যই রচিত।

এমন কি, ঐ ঘটনার বহু পরে র[চিত] 'রবীন্দ্র জীবনী'তে প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত অভিযো[গ] স্বীকার করে নিয়ে মন্তব্য করেছে[ন]। অতীতেও কয়েকবার "বেফাঁস" মন্তব্য ক[রে] ফেলে লোকের উৎপাতে আবার অস্বীকা[র] করতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেছে!!

চন্দ্রনাথ বসুর একটা বদনামই হ[য়ে] গিয়েছিল, হিং টিং ছট্। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার ও স্কুল পাঠ্যপুস্ত[ক] নির্বাচন পদ্ধতি প্রসঙ্গে চন্দ্রনাথ বসু[র] সঙ্গে কবি নবীনচন্দ্র সেনের গুরুতর মতা[ন্তর] হয়। চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন স্কুল পা[ঠ্য] পুস্তক নির্বাচন কমিটির একজন অ[তি] প্রভাবশালী সদস্য। চন্দ্রনাথ বসু না[কি] নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধের' স্কুল পাঠ্য সংস্করণটি বাতিল করে দিয়েছিলেন।

অতিশয় ক্রুদ্ধ নবীনচন্দ্র সেন তাঁ[র] 'আত্মস্মৃতি'তে যেখানেই চন্দ্রনাথ বসু[র] প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানেই হিং টিং ছট্ ব[লে] তীব্র বিদ্রূপ করেছেন! যেমন,

"তাহাকে তাঁহার কাব্যে রবিবাবু 'হিং টিং ছট্' উপাধি দিয়া এবং তাঁহার বামনরূপ বর্ণনা করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন।"

"যে আসনে আমরা (নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ) গুরুদাসবাবুকে বসাইব, সে আসনে বসিলেন হিং টিং ছট্।"

"রবিবাবু তাহার এমনই তৈলচিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন যে, আমি তাহার খর্ব লাঞ্ছিত রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া চন্দ্রধনের রঙ ফলাইতে চেষ্টা করিব না।"

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবার আমাদের জানতে ইচ্ছে করবে নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর কি অভিমত ছিল।

অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও একথা নিশ্চিত সত্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রপ্রতিভার একজন অন্ধ ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের কোন তুলনা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর মাত্র চন্দ্রনাথ বসু তখন একজন নাম করা উচ্চশিক্ষিত ও কলকাতার তরুণ সাহিত্যিক মহলের নমস্যনীয়। কিন্তু কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় চন্দ্রনাথ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের একটি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হত। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৭৬ খ্রীঃ জানুয়ারি) চন্দ্রনাথ ঐ সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই সভায় আগ্রহ করে কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ তখন "নামেমাত্র সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র।"

রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিখ্যাত 'মরকত কুঞ্জে' অনুষ্ঠিত এই সভাতেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বপ্রথম দেখবার সুযোগ পান।**

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৫, চন্দ্রনাথ বসুর ৩১, বঙ্কিমচন্দ্রের ৩৮।

বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দেখার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ জীবনে ভোলেন নি।

** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনার ঠিক ছ' বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে একটি অপূর্ব স্মৃতি বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৮৮২ খ্রীঃ জুলাইয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মেয়ে কমলার বিবাহে আমন্ত্রিত বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখামাত্র ছুটে মালা পরাতে গেলেন সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন ২১ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ। তিনিও আমন্ত্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলা থেকে মালা খুলে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে রমেশচন্দ্রকে বললেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ তুমি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পড়িয়াছ?"

এই সভাটিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতা পাঠ করেছিলেন।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই যে চন্দ্রনাথ বসু মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে মুগ্ধ ভাব তাঁর জীবনে কাটেনি। বরং দিনে দিনে তিনি আরও বেশী করে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শত উগ্র সমালোচনা চন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্রসাহিত্য অনুরাগে এতটুকু বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তরুণ রবীন্দ্রনাথের এক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হত, আর চন্দ্রনাথ বসু সব কাজ ফেলে উদগ্র আগ্রহে দিনের পর দিন ধরে সেই গ্রন্থ পাঠ করতেন।

'ক্ষণিকা' কাব্য গ্রন্থ পাঠ করে অভিভূত চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন, তার অপরূপ মাধুর্য এখনও আমাদের মনকে আপ্লুত করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩৯, চন্দ্রনাথের ৫৬।

কলিকাতা,
৫ নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ট্রীট
৩০শে শ্রাবণ, ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথ,

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।

'কণিকা', 'কথা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'—হাঁপিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানি—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষে পারি নাই। 'কণিকা' ছাড়িতে না ছাড়িতেই 'কথা' আসিল—'কথা' দিয়া তুমি আমার হাত হইতে 'কণিকা' কাড়িয়া লইলে—কণিকা-র সম্ভোগ তো আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না! এমনি করিয়া 'কল্পনা' দিয়া 'কথা' কাড়িয়া লইয়াছিলে—আমার ভোগে বাধা দিয়াছিলে আবার! এবার 'ক্ষণিকায়' চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ।

আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না, পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি, যেমন দ্রুত তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্ধ্বদেশের—মহাকাশের।

রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।

যে চারিখানির নাম করিলাম, সকলগুলিই মিষ্ট, হৃদয়স্পর্শী, সুগভীর, সুললিত, সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ম। কিন্তু 'ক্ষণিকায়' বঙ্গের পল্লীজীবনের, পল্লী-প্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি—পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। বোধহয় এ সৌরভ শিলাইদহ-জনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোনটার কথা বলিব? অনেকগুলিতে এ সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন, 'বিরহে'-র সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।

'ক্ষণিকা'র একটা বড় গুণপনা দেখিলাম। উহার আকৃতিও ক্ষণিকার ন্যায়। 'ক্ষণিকা'র প্রতি পৃষ্ঠায় দেখি ক্ষণিকা আঁকা রহিয়াছে।

তাই বলি তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।

ইতি—
চন্দ্রনাথ বসু

হৃদয়ের অকৃত্রিম আবেগ ও ভালবাসার উচ্ছ্বাসে ভরা চন্দ্রনাথের এই পত্রটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তো একেবারে অভিভূত! এই মুগ্ধ হৃদয়ের আনন্দের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে এমনই স্পর্শ করল যে, কি করবেন প্রথমটা যেন তিনি ভেবেই পেলেন না। শেষে থাকতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের কাছে চন্দ্রনাথবাবুর চিঠিখানি স্বহস্তে কপি করে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে নিম্নলিখিত ছোট্ট চিঠিখানি।

বন্ধুবরেষু,

আজ চন্দ্রনাথবাবুর একখানি চিঠি পেয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করলুম—সেইটে তোমাকে কপি করে পাঠালে তুমিও বোধ হয় খুশী হবে।

...এই চিঠিখানি পড়ে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই সংকোচ ও লজ্জা অনুভব করেছিলুম। প্রাপ্যের চেয়ে অধিক পেয়েছি সে বিষয়ে আমার নিজের মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। 'বিরহ' কবিতাটি আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়—সেইটে উনি বিশেষরূপে নির্বাচন করাতে আমি একটু বিশেষ খুশি হয়েছি।

ইতি—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের বিশে জুন চন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যু হয়।

পরম রবীন্দ্র ভক্ত অথচ রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সর্বাধিক সমালোচিত এই সাহিত্যিক ও সাহিত্য অনুরাগীর প্রতি আমরা সকলেই একটা সহানুভূতির স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করি।

আসলে একটা গোঁড়ামি ও পুরাতন যুগের বদলে একটা নতুন যুগের অভ্যুদয় আসন্ন হয়ে উঠেছিল। চন্দ্রনাথ ছিলেন বিগত পুরোনো যুগের প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথ নতুন যুগের। নতুন যুগের অরুণোৎসবের দিনে তাই চন্দ্রনাথকে কারোর মনে পড়ে নি। তিনি নীরবে বিদায় নিয়েছেন।

পুরাতন যুগ ও ধ্যান ধারণাকে ঝেড়ে ফেলে যে একটা নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে, চন্দ্রনাথ বসু কি তা বোঝেন নি? নিশ্চয় বুঝেছিলেন, নইলে মৃত্যুর আগে লিখবেন কেন,

"হিন্দুত্বে হিন্দুর মানসিক বিশেষত্বের এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দেশ করিয়াছি এবং জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহ প্রণালী, সাকার পূজা প্রভৃতির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল স্থানে এই সকল মতের প্রতিবাদ দেখিব মনে করিয়াছিলাম, সে সকল স্থানে এ পর্যন্ত প্রতিবাদ দেখি নাই। অথচ এই সকল মত গৃহীত হইবার লক্ষণ কোথাও দেখি না।"

বাংলা সাহিত্যের তথা বাঙালীর সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের যুগ-সন্ধিক্ষণে তরুণ রবির প্রখর দীপ্ত আলোক রশ্মির কাছাকাছি বঙ্কিমগোষ্ঠীর অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র চন্দ্রনাথ বসুর একটুখানি স্থান হবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসই দেবে। সে স্থান তিনি পান আর নাই পান তরুণ রবির সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী মসীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে চন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অমর চরিত্র হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

সংযোজন

পত্রপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ এই পত্রখানি শিলাইদহ থেকে চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে লিখে পাঠিয়েছেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

তীব্র মতভেদ চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ বসু—উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত ভাবেই হত। কারণটা বলাই বাহুল্য—তরুণ রবির উজ্জ্বল প্রভায় তখন বঙ্গভূমি যেমন আলোকিত, তেমনি চন্দ্রনাথ বসুও বঙ্গ-সাহিত্যের এক শক্তিমান সমালোচক ও প্রবন্ধকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের বা সভার অলংকার ছিলেন উভয়েই।

বিডন স্ট্রীটের চৈতন্য লাইব্রেরি (স্থাপিত ১৮৮৯ খ্রীঃ) ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সর্বস্তরের মনীষী তথা সাহিত্যিক ও

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নিবেদন —

আমার কোন আত্মীয়ের গুরুতর পীড়া হওয়াতে আমি একান্ত চিন্তিত ও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকাতে আপনাদের প্রেরিত গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। বলা বাহুল্য আপনাদের প্রতি কোনরূপ অসন্তোষের কারণ ঘটে নাই।

"শিক্ষা" গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিবার একটি প্রতিবন্ধক এই যে, আমার নিকট মূল ইংরাজি গ্রন্থখানি নাই — তাহা ছাড়া আরো দুই একটি অনুবাদ দেখিলে তুলনায় বিচার করিবার সুবিধা হইত। যাহা হউক গ্রন্থের বাংলা ভাষা আমার মনের মত হইয়াছে বলিতে পারি না। অনেক স্থলেই ইংরাজির গন্ধ পাওয়া যায়। যাহারা ইংরাজি ভাল জানেন না তাহাদের বুঝিবার পক্ষে শক্ত হইয়াছে।

কিন্তু ঠিক মনের মত অনুবাদ কখনও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ অতএব অধিক প্রত্যাশা করা কিছু নয়, অতএব অন্যান্য পরীক্ষকদিগের যদি অভিমত হয় তবে গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে আমার আপত্তি নাই জানিবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈতন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি

বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় বক্তৃতামালা, আলোচনাসভা, গবেষণা পত্র পাঠ এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা শুরু করেন। প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু নির্বাচন ও সেইগুলির পরীক্ষার জন্য সে যুগের বিশিষ্ট মনীষী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি পরীক্ষক সমিতি গঠিত হয়।

এঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার টমরি, রেভারেন্ড ফাদার লাফোঁ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান বিচারপতি স্যার কোমার পেথারাম, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও চন্দ্রনাথ বসু। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ তিনটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আহবান করেন, তার মধ্যে একটি বাংলা ভাষায়।

বিষয়বস্তু হার্বার্ট স্পেনসারের শিক্ষা'র বাংলা অনুবাদ। পুরস্কার একটি স্বর্ণপদক ও নগদ একশো টাকা।

পরীক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথ।

পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত আকারে ১৪খানি গ্রন্থ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঐ ১৪ খানি গ্রন্থের মধ্যে পাঁচখানি চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য মনোনীত করেন। চন্দ্রনাথ বসু কিন্তু একখানি গ্রন্থকেই একেবারে চূড়ান্ত নির্বাচিত করে রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেন। নির্বিরোধী দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ আপত্তি জানান নি এ ব্যাপারে। চন্দ্রনাথ বসু পরীক্ষক সমিতির নিয়ম যে ভঙ্গ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরীক্ষক স মি তি র নিয়মানুসারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী যাবতীয় প্রবন্ধ বা পাণ্ডুলিপি নিযুক্ত পরীক্ষকদের কাছে পৃথক পৃথক করে পাঠাতে হয়। যাই হোক বেশ কিছু দিনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ পরে ব্যাপারটা যখন জানতে পারলেন, তখন তাঁদের উদ্বেগের আর সীমা রইল না। তাঁরা নিশ্চিত ধারণা করলেন রবীন্দ্রনাথ দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

অতএব চিঠির পরে চিঠি। সম্পাদক ও সভাপতি (যথাক্রমে গৌরহরি সেন ও রেভারেন্ড আলেকজান্ডার টমরি) সবিনয়ে জানতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ অপ্রসন্ন হয়েছেন কিনা।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত এই চিঠিটি তাঁদের আশ্বস্ত করে।

চিঠির ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথবাবুর কাজে অপ্রসন্নই হয়েছিলেন, আর চন্দ্রনাথ বসু নির্বাচিত গ্রন্থটি যে তাঁর একেবারেই মনঃপূত হয় নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই পত্রটি পেয়ে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ গভর্নিং কমিটির একটি জরুরী অধিবেশন ডাকেন ও এই প্রতিযোগিতায় আসা সব ক'টি গ্রন্থকেই বাতিল ঘোষণা করেন।

কেউই পুরস্কৃত হননি।

মোহিনী

পঁয়ত্রিশ

অনেকদিন পরে আজ সকালে রোদ উঠেছিল। রোদ দেখে কার্তিককে বললাম, ঘর-দোরের দরজা-জানলা সব হাট করে খুলে দিতে। এখানকার বৃষ্টির এই ধরন, নামলে আর থামতে চায় না। এক শনিবার দুপুরে বৃষ্টি নামল, তারপর আরেক শনিবার পার হয়ে আজ দেখলাম আকাশে সূর্য উঠেছে। রোদের মুখ দেখে সকাল বেলাতেই মনটা ফুরফুরে লাগল।

রাতের বাসী কাপড় জামা ছেড়ে সংসারের মধ্যে আর ঢুকতে ইচ্ছে হল না। কমলা একাই সব দিক সামলে নিতে পারে, গিরির ক'দিন কয়েকের ছুটি নিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। আমার আর ভাঁড়ার নিয়ে বসবার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

চা খেয়ে ঘরদোরের কাজকর্ম নিয়ে পড়লুম। একটানা বর্ষাবাদলায় কী অবস্থাই হয়েছে সব। আসবাবপত্র, বিছানা-টিছানা স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে; ঠান্ডায় ছাতা পড়ার মতন হয়েছে যেন। একে ঘরদোরে মানুষজন নেই, এমনিতেই ফাঁকা পড়ে থেকে কেমন বিচ্ছিরী দেখায়, তার ওপর এই একটানা বৃষ্টিতে ভাল করে জানলা দরজাও খোলা হত না, বাতাস বইত না, রোদ ঢুকত না; কেমন এক গন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সকাল থেকেই ঘরদোরের কাজে নামলাম। প্রথমে জ্যাঠামশাইয়ের ঘর। বিছানা মাদুর উলটে-পালটে দিয়ে তোশকটা পাঠালাম রোদে। জানলার খড়খড়িতে কত রকমের ময়লা জমেছে, ঝড় বাদলায় উড়ে আসা খড়কুটো পর্যন্ত। জ্যাঠামশাইয়ের বইপত্র—আরও কত টুকটাক একপাশে জমেই আছে। হোমিওপ্যাথির বড় বাক্স। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে একটু বসেছি, দেখি ফটক খুলে কার্তিক আসছে। বাজারে গিয়েছিল, ফিরছে। তার সাইকেলের হ্যান্ডেলে তরিতরকারির থলেটা ঝোলানো।

কার্তিক বারান্দায় তার সাইকেল রেখে এসে আমায় খোঁজাখুঁজি করছিল। সাড়া দিতে ঘরে এল। এসে চিঠি দিল। বাজার ফিরতি পথে পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে এসেছে।

চিঠিগুলো হাতে নিয়ে দেখি, জ্যাঠামশাই আর সুহাস দুজনেই আলাদা করে দুটো চিঠি লিখেছে, আর একটা চিঠি অবিনের। সেটা ওজনে যেন বেশ ভারী। একই সঙ্গে তিনটে চিঠি পেয়ে একটু যেন অবাক লাগল।

অবিনের চিঠিটা সরিয়ে রেখে খাম ছিঁড়ে জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিটা প্রথমে পড়লাম। কলকাতার খবরাখবর এবারে তেমন একটা নেই। শচিদার কথা লিখেছেন সামান্য। সবচেয়ে বড় খবর, জ্যাঠামশাই ফিরে আসছেন জানিয়েছেন; শীঘ্রই ফিরে আসছেন; আয়নাও আসছে।

চিঠিটা পড়ে মনটা আমার হাঁফ ফেলল। সত্যি, আর আমি পেরে উঠছিলাম না। এমন করে একা-একা থাকা যায়! কতদিন হল জ্যাঠামশাইরা চলে গেছেন, অন্তত মাস দেড়েক। সেই আষাঢ়ে গিয়েছিলেন, আর শ্রাবণের মাঝামাঝি পেরিয়ে গেল। আমার ভাল লাগছিল না আর। এমন করে আমি কোনোদিন থাকি নি। এত বড় বাড়ি, এতগুলো ঘর, ওই মস্ত বারান্দা, দালান—এর মধ্যে আমি একটি মাত্র মানুষ মুখ বুজে বসে আছি। কার্তিক আর কমলা আছে তাই না রক্ষে, তারাও যদি না থাকত কী অবস্থাই হত আমার। তা ছাড়া, আমার নিত্যকার সংসারের কাজ যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই থাকলে তাঁর সেবাযত্ন দেখাশোনা করেও তো খানিক সময় কাটে, সেটা আমার কতকালের অভ্যেস; অভ্যেসটুকু না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আয়নাও নেই। আয়না থাকলে তবু তার সঙ্গে পাঁচটা কথা বলে বাঁচতে পারতাম। জ্যাঠামশাই কলকাতায় আছেন—এতেও আমার কম চিন্তা ছিল না। না জানি এই বয়েসে শরীরস্বাস্থ্য ভেঙে কি-একটা বাধিয়ে আসবেন। তখন যে আমি কি করে ওই বুড়ো মানুষকে সামলাব কে জানে!

এই দেড় মাসেই আমি বুঝতে পেরেছি, আর দেড়দিন পরে আমার কী অবস্থা হবে। জ্যাঠামশাই চিরকাল থাকছেন না। আয়নাও কিছু নয়। আমি তখন একা। আমার বাঁচার উপায় কী হবে তখন?

জ্যাঠামশাই যা লিখেছেন তাতে আমার
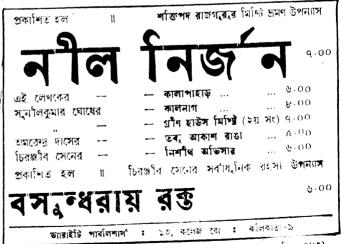
মনে হল তার ফিরতে ফিরতে এই মাসের শেষ হবে। দশ-বারোটা দিন আর।

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ জানলা দিয়ে বসে বসে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকলাম। আজকের রোদটি বেশ তাত আছে, রঙটিও উজ্জ্বল। বাগানে গাছপালা বর্ষার জলে সবুজ হয়ে গিয়েছে, ঘাস বেড়েছে হুহু করে, কলকে ঝোপের মাথায় সরু সরু ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে রোদ খাচ্ছে। এই এক-নাগাড় বৃষ্টিতে কাকের ডাক ছাড়া বড় কিছু কানেই পড়ত না। আজ পাখিটাখি ডাকছিল। বাইরের সব কিছুই যেন হাঁফ ফেলে বাঁচল এতদিন পরে।

সুহাসের চিঠিটার মুখ ছিঁড়ে ভাবলাম, যাই একটু বাইরে গিয়ে বসি। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের কাজও শেষ হয়েছে। আয়নার কুকুরটা কোথাও গিয়েছিল, কাদা মেখে বাগানে ছুটছে। হতভাগা কুকুরটাকে ডাকতে ডাকতে বাইরে এলাম। বারান্দায় রোদ লুটিয়ে আছে। বসার ঘরের খোলা জানলার পাশে রেন পাইপ বেয়ে দেওয়ালের গা ধরে উঠে যাচ্ছে। একরাশ পিঁপড়ে বেরিয়েছে জানলার কাঠ থেকে।

সুহাসের চিঠিটা বড় নয়, ছোট। ব্যস্ত মানুষের তাড়া রয়েছে চিঠিটায়। সুহাসের চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম, জ্যাঠামশাইদের ফেরার কথাটা পাকা। শচিদার কথাও লিখেছে সুহাস, বরং জ্যাঠামশাইয়ের চিঠিতে যা পরিষ্কার করে লেখা ছিল না, সুহাস বরং সেটা স্পষ্ট করেই আমাকে লিখেছে। শচিদার শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তার বাঁচার আশা আর কেউ করছে না। নিতান্ত যদি আয়ুর জোর থাকে অন্য কথা, নয়ত শচিদাকে আর বোধ হয় একটা মাসও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ডাক্তাররা খুব শীঘ্রই একটা কাটাকুটি করতে চাইছে। জ্যাঠামশাইকে তার আগে-ভাগেই সুহাস ফেরত পাঠাতে চায়।

এই সব কথাবার্তার পর সুহাস একটা অদ্ভুত কথা লিখেছে। আমি কিছু বুঝলাম না। লিখেছে, আয়নার বিয়ের জন্যে কলকাতায় আর সে পাত্র খুঁজে বেড়াবে না। দরকার নেই। জ্যাঠামশাইরা ফিরলেই নাকি আমি সব বুঝতে পারব।

সুহাসের এই কথা থেকে আমি ছাই কিছুই বুঝলাম না। সুহাস কী রাগ করে কথাটি লিখেছে? তা তো মনে হল না। তবে কলকাতায় আয়নার জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করতে গিয়ে সে যে বিরক্ত হয়েছে এটা আমি আগেই বুঝেছি। আমি ওর দোষ দিই না। মেয়েদের বিয়ের বারো আনাই কপাল। আয়নার কপালে ওই ছেলেটি জুটল না, এর বেশী আমি আর কি ভাবতে পারি।

সুহাসের চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। গিরির মা কলা-গাছের ঝোপের দিকে পুরোনো কুয়াতলায় বসে বসে সাবান কাচছে। রোদ যেন বেড়েই যাচ্ছিল। গাছপালার ভিজে ডালপাতা শুকিয়ে আসার পর কেমন যেন গন্ধ উঠছিল বাগানের দিক থেকে, মাটিও শুকিয়ে উঠছে।

অবিনের চিঠিটা তখনও আমার খোলা হয় নি। চিঠিটা না খুলেই আমি ভাববার চেষ্টা করলাম, ও কী লিখেছে? ভাবতে অবশ্য আমার ভয়ই করে। অবিন যে কী লেখে আর না লেখে আমি বুঝে উঠতে পারি না। মানুষ পাগল হলে তার জ্ঞানগম্যি থাকে না। অবিনের বেলায় দেখি তার লজ্জা সংকোচের বালাই নেই, কলমের ডগায় যা বেরুলো অক্লেশে লিখে ফেলতে পারল। তার জ্বালাতন আমার আর সহ্য হচ্ছিল না, শক্ত করে কড়া কথায় একটা চিঠি দিয়েছিলাম শেষে। এ বোধ হয় তার জবাব। জবাবটা যে নরম হবে এমন আমার মনে হল না।

আরও খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে আমি ঘরে গেলাম। আয়নার ঘরে।

আয়নার ঘরে সব হাট করে খুলে দেওয়া। জানলার গা দিয়ে রোদ আসছে। আলো বাতাসে ঘরের মরা ঝাপসা চেহারাটা এর মধ্যেই কেটে গেছে।

আয়নার ঘরে জিনিসপত্রের অভাব নেই। মার আসবাবপত্রের অনেকগুলোই তার ঘরে। আরও কত কি সে নিজের ঘরে জুটিয়ে রেখেছে। আজ না হয় সে নেই, কিন্তু যখন থাকে তখনও তার গোছগাছ পা দেখি না। বকাবকি করলে কমলাকে ডেকে বলে 'কমলাদি, আমার ঘরটা একটু গুছিয়ে দাও'। বড্ড কুঁড়ে, গা এলানো মেয়ে। এই মেয়ের বিয়ে হলে কি করে সংসার করবে কে জানে! আয়নার বিয়ের ব্যাপারে সুহাস যে কি ছাই লিখল আমি বুঝতে পারলাম না।

আয়নার ঘরের বিছানাপত্রগুলো রোদে বের করে দেবার দরকার থাকলেও আমার কেমন আলস্য লাগছিল। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম দু দণ্ড। একটা শুঁয়ো-পোকা এসেছে জানলায়। শুঁয়োপোকা দেখলেই আমার গা সিরসির করে। সরে এসে আয়নার খাটে বসলাম। বাইরে বাতাবী লেবুর গাছটা পাতায় পাতায় ভরে গেছে। অপরাজিতার লতা উঠেছে মানুষ সমান, বাতাসে লতা দুলছিল।

অবিনের চিঠিটা খুলব কি খুলব না করে খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেললাম। এই এক রোগ হয়েছে আমার। অবিনের চিঠি খুললেই বুকের মধ্যে কেমন দুরুদুরু করে। মানুষটাকে যখন চোখে দেখেছিলাম, কাছাকাছি ছিল—তখন তার মুখোমুখি হলেই ভয়ে মরেছি। এখন তো সে কলকাতায়, তার মুখের সামনে আমায় দাঁড়াতে হচ্ছে না, তবু এত ভয় কিসের।

ভয় যে কেন আমি তা বুঝতেও পারি। আমার সঙ্গে অবিনের তফাতটা মাত্র এই নয় যে, সে পুরুষ আর আমি মেয়ে। পুরুষ বলতে যদি আমার ভয়ের কিছু থাকত তবে আমি তো সেই মানুষটাকেই ভয় পেতে পারতাম—যে আমায় বিয়ের জোড়ের সঙ্গে গিঁট বেঁধে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আমার সামাজিক বাধাবাধকতা ছিল। তবু তাকে আমি ভয় পাই নি। তখন আমার কতই বা বয়েস, ভয় পাওয়ারই কথা। কই ভয় তো হয় নি। অবিন আর আমার মধ্যে মেয়ে-পুরুষের তফাত বলে আমি ভয় পাই এটা সত্যি নয়। আমি ভয় পাই অন্য কারণে। অবিন আর আমি এক জাতের মানুষ নয়। সে হল ছন্নছাড়া, ঘরছাড়া, মনছাড়া। তার কোথাও বন্ধন নেই। সে হল ঝড়ের বাতাস, হুহু করে বয়ে গেল, ভাঙল চুরলো তছনছ করল, ধুলোবালি ওড়াল, তার পালা ফুরিয়ে গেল। আমি তো তেমন বাতাস নই। আমি হলাম স্বাভাবিক বাতাস মানুষ যাতে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে। ঝড়ের বাতাসে দম আটকায়, তাতে বাঁচা যায় না। এ সংসারে আমি যদি ছন্নছাড়া হতে চাই তবে কে বাঁচবে! আমি, না জ্যাঠামশাই, না সুহাস আয়নারা।

অবিনের চোখের দোষ না থাকলে সে বুঝতে পারত, আমার একটা পাকাপাকি ঠাঁই আছে, শেকড় আছে। আমি সেখান থেকে নড়তে পারি না। জগতের কোনটা অবিনের পছন্দ আর কোনটা তার চোখের বিষ তা নিয়ে জগৎ চলে না। ও আমায় বার বার বোঝাতে চায় আমি ডানা গুটিয়ে বসে আছি, একবার যদি পাখা ঝাপটে উঠতে পারি তবে নাকি মুক্তির সুখটুকু বুঝতে পারব। ঠিক যে এইরকম কথাই অবিন আমায় লিখেছে তা নয়, তবে তার কথাবার্তার ধরনটা এর কাছাকাছি। আমি ভাবি, মুক্তি তো একটা বাইরে আসার ব্যাপার নয়, তা যদি হত—তবে কত রকমের মেয়ে পুরুষ কত ভাবেই না ঘর ছাড়ল, তারা কি মুক্ত হল।

অবিনকে আমি ভয় পাই সে বড় অবুঝ বলে। তার কাছে কাদায় গড়াগড়ি যাওয়াটাও সুখের। সে বুঝতে চায় না, আমার নিজের দুঃখটা আমি ভুলে থাকতে চাই। আমি যদি অবিন হতাম, তার স্বভাব পেতাম তবে অন্য কথা ছিল, আমি যে এ-বাড়ির মোহিনী।

আমি ভেবেছিলাম অবিনকে লিখব, সকাল বেলায় যে আলোটুকু ফুটে ওঠে সেই আলোতেই আমরা পুজোর ফুল তুলি। দুপুরবেলায় ফুল তোলার পাগলামী কেউ করে না। অন্তত আমি তো করব না।

কথাটা লিখতে গিয়েও লিখিনি। ভেবে-ছিলাম, ওটা যেন বড় বেশী স্পষ্ট হবে। অবিনকে অত স্পষ্ট করে বলার দরকার তো আমার নেই।

তবু বুঝতে পারছি, অবিন এখন আমার মধ্যে কেমন এক দ্বিধা এনে দিয়েছে। আমি এখন যা গড়ে তুলে দাঁড় করাচ্ছি, পরে আবার তাকে ভাঙছি। এই দ্বিধা আমার ছিল না। দ্বিধা জাগছে বলেই কি এত ভয় আমার? অবিন কি আমায় সেই দ্বিধায় ফেলছে বলে এত আতঙ্ক! কী জানি!

অনেকটা সময় চুপচাপ বসে থাকার পর আমি অবিনের চিঠিটা আস্তে করে বের করলাম। আমার হাত কাঁপছিল, আঙুলের ডগা ভিজে ভিজে লাগছিল। কী যে আছে চিঠিতে, আবার কত পাগলামী করেছে অবিন কে জানে! ওর অসাধ্য বোধ হয় *কিছু নেই।*

চিঠিটা ছোট নয়। গোটা গোটা করে লেখা অক্ষর, অবিনের মতন খাড়া মাথায় দাঁড়ানো হরফ। আয়না ঠাট্টা করে বলত, দিদি অবিনদার হাতের লেখা যেন রেলের সিগন্যাল, লম্বা লম্বা দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে পড়ায় আমার হাসি পেল। ভয়ের মধ্যেও হাসি।

অবিনের চিঠির প্রথমটুকু পড়েই আমার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বুঝলাম, এ হল আমার রুক্ষ চিঠির নিষ্ঠুর জবাব।

চিঠিটা প্রথমবার পড়ে আমার মাথায় চার আনা কথাও ঢুকল না। পরে আস্তে আস্তে পুরো চিঠিটাই পড়লাম।

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। অবিন আমার কাছে নেই, কিন্তু মনে হচ্ছিল সে যেন আমার পিঠের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে। নড়তে চড়তেও কত অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। তারপর বেহুঁশ ভাবটুকু কেটে গেল আমি উঠলাম। আয়নার পরদের গোছাবার ইচ্ছে আর আমার নেই। থাক, পড়ে থাক সব।

বাকি বেলাটুকু আমার কেমন করে কাটল আমি জানি না, আমি যেন ভেতর-বাইরের দুই মোহিনী হয়ে পাশাপাশি হাঁটাচলা করলাম, বসলাম দাঁড়ালাম, স্নান করলাম, তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকলাম। দুপুরের রোদ অনেক চড়া হবার পর গরম হচ্ছিল। জামগাছের পাতার ছায়া এসে আমার ঘরের জানলায় চুপটি করে বসেছিল। বসে বসে আমার দশা দেখছিল।

বিছানায় শুয়ে আছি কতক্ষণ ধরে। চোখের পাতা কখন বুজে এসে আবার যেন খুলে গেল, বুকের তলায় দম আটকে যাবার মতন ব্যথা। আমার মার শেষের দিকে এইরকম রোগ ধরেছিল। আমারও হয়ত ধরল। বলা তো যায় না।

উঠে বসে একটু জল খেতেই ব্যথাটা কমে গেল।

আবার এসে বিছানায় শুয়ে থাকলাম।

*অবিনের চিঠিটা এর মধ্যে বার তিন-*চার আমার পড়া হয়ে গেছে। নতুন করে পড়তে ইচ্ছে হল না আর।

অবিন যদি আমার কাছে থাকত, আজ আমি তাকে স্পষ্ট করেই বলতাম, তুমি আমায় যেমন করে দেখেছ সেটা আমার রূপ নয়। আমি তো কোনোদিন বলি নি আমি সংসারের সব কিছু জয় করে নিয়েছি। আমার সে অহংকার নেই। আমার যা আছে তার মূল্য আমার কাছে, তুমি তা বুঝবে না।

আমি তোমায় সত্যি করে বলছি অবিন, জন্মলগ্নে বসে যে নক্ষত্রটি আমার ভাগ্যকে দৃষ্টি দিয়ে বিঁধেছে তার বড় বাঁকা দৃষ্টি। সে আমায় সহজ পথে চলতে দিল না। তার আগাগোড়াই নজর ছিল যা ঘটার তাকে ঘটতে না দেওয়া। আমার অদৃষ্টকে অশুভ গ্রহের হাতে ধরে না দিলে আমার এ দশা হবে কেন!

মেয়েরা সংসারে এলে নাকি মার চোখে জল নামে। আমি যখন এসেছিলাম আমার মার চোখে জল এসেছিল কিনা আমি জানি না। জ্ঞান হয়ে দেখেছি, আমাদের সংসারে আমার জন্মের জন্যে কারও কোনো দুঃখ ছিল না। অথচ একদিন আমার কপালেই এমন ঘটনা ঘটল যার জন্যে এ-বাড়িতে সবচেয়ে বড় দুঃখ নেমে এল। ওটা না ঘটলেও পারত, কিন্তু ঘটল। আমার ভাগ্যে সেই হল জন্মলগ্নের সত্যিকার বাঁকা দৃষ্টি। মেয়ে বলেই কথাটা বলছি: আমাদের যে দুটো লগ্ন, একটাতে সংসারে আসি, অন্যটায় সংসারকে পাই। আমার পাওয়ার ঘরে থাকল শূন্য।

আমি আমার অদৃষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছি। যদি স্বীকার না করে নিতাম তবে আমায় ছটফট করে মরতে হত। তুমি বলবে, আমি কেন অদৃষ্টকে স্বীকার করলাম। যদি অদৃষ্টেই আমার বিশ্বাস থাকত তবে যে স্বামী-জীবটিকে আমি পেয়েছিলাম তার চরণামৃতে কী দোষ করল! তা তুমি বলতে পার। কিন্তু সব কাঁকি, সব আঘাত, সব অসম্মান যে সহ্য করা যায় না। যতটা যায় আমি করেছি। যখন শচিদার সঙ্গে আমার বিয়ে হল না তখন আমি কষ্ট পেয়েছিলাম কিনা সে কথা আমার মনে নেই। হয়ত পেয়েছিলাম। সব মেয়েই যেমন পায়। কিন্তু আমি কুয়ায় ঝাঁপ দিতে যাইনি। কেন যাব? আমি তো অসহায় ছিলাম। তাছাড়া যে পুরুষমানুষ ভাবে, ভালবাসার চেয়ে মরার ভয়টা বেশী তার ভালবাসার জোর আমি বিশ্বাস করি না। শচিদা আমাকে কতটুকু ভালবেসেছিল, আর কতটা নিজেকে ভালবাসত তার হিসেব তো সে দেখল না। যাকগে, ওটা অনেক পুরোনো কথা।

তারপর আমার কপালে যে কন্দর্প পুরুষটি স্বামীর বেশে এল তার কথা ভাবলেই আমার মনে হয়, ওই কটা মাস আমি নরকে গলা ডুবিয়ে বেঁচে ছিলাম। সেখান থেকে আমি নিজেকে উদ্ধার করেছি এই আমার সান্ত্বনা।

এরপর আর আমার করার কী ছিল? আমি তো নিজের হয়ে আর কিছু চাইতে পারি না। চাইতে গেলে আবার আমার কপালে কী জুটবে আমি জানতাম না। আমাদের সংসারে মেয়েদের চাওয়ার একটা মাপ আছে, তার বেশী চাওয়া যায় না।

ভগবান মেয়েদের হাতে অনেক রকম অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। আমরা যদি সর্বনাশী হতে চাই সংসারের সুখ শান্তি রসাতলে পাঠাতে পারি। কিন্তু অস্ত্র আছে বলেই তার ধার পরখ করার দুর্বুদ্ধি মেয়েদের থাকলে ঘর সংসার বলে কিছু থাকত না। আমাদের যেমন অস্ত্র আছে, সেই রকম মায়া মমতা করুণা স্নেহও তো আছে। মেয়েদের গায়ের আঁচল শুধু তার আড়াল নয়, ওটা যে পুরুষ জাতের আশ্রয়। আমায় তুমি সর্বনাশী হতে বলো না। আমি এই সংসারে বাঁধা পড়ে গিয়েছি। একদিন এখানে হয়ত আমি শুধু একলাই থাকব, আমার চারপাশ ফাঁকা হয়ে যাবে। সেদিনও আমার মনে হবে, আমাদের তিন পুরুষের পুণ্যটুকু আমি বাঁচিয়ে রেখেছি।

পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েদের একটা বড় তফাত, তোমরা যদি দড়িতে বাঁধা পড়তে না চাও তোমাদের কেউ বাঁধতে পারে না। আমরা কিন্তু জন্ম থেকেই বাঁধা। আমাদের নাড়িতে এই বাঁধার জট আছে বলেই আমরা বাঁধন নিয়ে বসে থাকি। তোমরা থাকো না।

আমার জন্যে এই সংসারের ক্ষতি হবে এ আমি কোনোদিন চাই নি। আজও চাইব না। তুমি যে আমাদের সংসারের কোথায় ভাঙতে চাইছ তা আমি বুঝতে পারছি না, তবে ভয় পাচ্ছি।

তোমায় আমার বড় ভয়। তুমি বড় নিষ্ঠুর। (ক্রমশ)

ডঃ বিক্রম অম্বালাল সারাভাই।

২৯ ডিসেম্বর ত্রিবন্দ্রমে থুম্বার কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে ওঁর শেষবারের মত কথাবার্তা হয় রাত প্রায় সাড়ে এগারটায়। পরদিন, অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রত্যূষের সংবাদ ঃ ডঃ বিক্রম সারাভাই লোকান্তরে গমন করেছেন। অপ্রত্যাশিত এই তিরোধান ভারতীয় বিজ্ঞান সংগঠনকে আবার একটি প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিল।

I would suggest that the primary task of fundamental research is to discover: of research and development is to optimise, and of industry to produce, and one of the main problems that are faced in the organisation of innovative institutions or establishments is to make the link between these three cultures and to provide for a basis by which transfer of knowledge, of men, of technology can proceed from one step to another interacting freely and also benefiting one from the other.—Sarabhai.

The Government of India and its able team of scientists, engineers and technicians, led by the internationally famous scientist, Dr. Vikram Sarabhai, have received the fullest appreciation of the international community.... —U Thant

২৬ অগাস্ট, ১৯৪৭ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা পর্ষৎ-এর প্রথম অধিবেশনে ওই পর্ষৎ-এর সভাপতি হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা মন্তব্য করেছিলেন ঃ পরমাণু কেন্দ্রিক শক্তিকে নিষ্কাশিত করে মানুষ যে কত বড় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, আগামী দিনের ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে। জাতীয় স্বার্থে এর উৎপাদন এবং ব্যবহার নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এর এক বছর পর প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের পরমাণবিক শক্তি কমিশন ডঃ ভাবারই নেতৃত্বে। এবং প্রতিষ্ঠার পরবর্তী মুহূর্তে এই কমিশনের প্রথম দায়িত্ব ছিল এমন একটি সংগঠন তৈরি করা যার মূল লক্ষ দুটি। এক, জাতীয় স্বার্থে পরমাণবিক শক্তিকে যথাযথ কাজে লাগানর জন্যে সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবন এবং তাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা। এর জন্যে রসায়নবিদ, পদার্থ বিজ্ঞানী, জীব বিজ্ঞানী, প্রযুক্তি এবং ধাতুবিজ্ঞানী প্রভৃতিদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়। ট্রম্বের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর ওঁরা কাজ শুরু করেন। দুই, প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তরুণ বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের স্বাধীনভাবে কাজ করার

জন্য উৎসাহ দেয়।
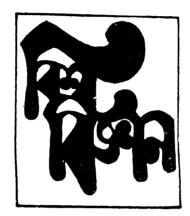
এবং ১৯৫৪ সাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার পর মাত্র ছয় বছরের মধ্যে পারমাণবিক গবেষণার কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়েই এই বিভাগটিকে একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকে রূপ দেওয়া হল। যার নাম রাখা হল ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটোমিক এনার্জি। এবং পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা।

দ্রুত লয়ে শুরু হয়ে গেল মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি নিয়োগের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। একের পর একটি পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ন। প্রয়োজন নিউট্রন-পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান। যার উপর নির্ভর করছে পারমাণবিক শৃংখল বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে আনার কাজ। বিকিরণ রসায়নের ওপর চাই নির্ভরযোগ্য তথ্য। কৃষি এবং জীববিজ্ঞানীদের জন্যে প্রয়োজনীয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। ডঃ ভাবার দূরদর্শিতা ছিল। উনি বুঝেছিলেন, ১৯৪৭-এর ভারত এবং ১৯৭০-এর ভারতের মধ্যে শিল্প এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্যবধান থাকবে অনেক। ওই সময় বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা বাড়বে। যার মোকাবিলা করার ব্যাপারে দেশকে পারমাণবিক শক্তির উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গেলে দরকার তেজস্ক্রিয় সামগ্রীর সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ। এবং ইত্যাদি। এর জন্যে এতটুকু দেরি করলে

২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ ডঃ সারাভাই শেষবারের মত কলকাতায় এসেছিলেন লবণ হ্রদে ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রকল্পের কাজ দেখতে। অতঃপর ডিসেম্বর ৩০, ১৯৭১—!

চলবে না। যা কিছু ভাবার এখনই ভেবে নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই। তারপর জোর কদমে এগিয়ে চল। ১৯৫৫ সালে ট্রম্বেতে ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এ সমস্ত প্রয়োজনের কথা ভেবেই। নিজেদের পরিকল্পনায় ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করলেন। অগাস্ট ৪, ১৯৫৬ অপসরা পারমাণবিক চুল্লির প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হল। সেই সঙ্গে ভারত উপনীত হল পারমাণবিক অধ্যায়ের প্রথম পাদে। কোন বৈজ্ঞানিক সাফল্যের একক কৃতিত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর আরোপ করা খানিকটা

রীতিবিরুদ্ধ এবং ভব্যতার বাইরে। তবু এ ক্ষেত্রে সকলেই স্বীকার করবেন, ভারতের পারমাণবিক প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দেবার কৃতিত্ব ডঃ হোমি জাহাংগীর ভাবার নিজস্ব প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এবং সেটা তাঁর অদ্ভুত-পূর্ব পরিচালনার গুণেই সম্ভব হয়েছে।

আর ওই একই সুরে সুর মিলিয়ে যদি বলা হয়, ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বও ভাবার মত আরও একটি মানুষের এবং তিনি আমেদাবাদের ভৌত গবেষণাগারের অধ্যাপক এবং বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় নোবেল বিজ্ঞানী সি ভি রামনের প্রিয়তম ছাত্র ডঃ বিক্রম অম্বলাল সারাভাই, হয়ত এতেও কেউ আপত্তি তুলবেন না।

বস্তুত, মহাকাশ গবেষণায় ভারতের আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি দীর্ঘকাল ধরে অসামান্য এক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এসেছে। ১৮৯৯-এ দক্ষিণ ভারতের কোদাইকানালে কাজ শুরু হয়েছিল সৌর-পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার। উল্লেখ্য, এখানকার মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরাই একদিন আবিষ্কার করেছিলেন, সৌরকলঙ্কের পরিমণ্ডলে গ্যাসীয় বস্তুর সঞ্চরণ। ভৌত-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যার নাম রেখেছেন, 'এভারসেড ইফেক্ট।' উত্তরকালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নক্ষত্রজগতের গ্যাসীয় মণ্ডলের আয়নয়ন বা আইয়োনাইজেশন এবং এস চন্দ্রশেখরের নক্ষত্রমণ্ডলীয় বলবিদ্যা মহাকাশ গবেষণায় নতুন দিগন্ত তুলে ধরল। চারের দশকের শেষাশেষি নিয়মিত গবেষণার কাজ শুরু হল মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই একই সময়ে সারাভাই মৌলিক গবেষণা চালান মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রার সময়গতিক পরিবর্তন এবং এর সংগে আবহাওয়া মণ্ডলের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের সম্পর্কের উপর। এই সূত্রে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী রামনাথনের সংগে যোগাযোগ ঘটল সারাভাই-এর। ১৯৪৮-এ আমেদাবাদে স্থাপিত হল ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারি। এখানে বসে তরুণ বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণার কাজ প্রচণ্ডভাবে সম্প্রসারিত করায় মনোনিবেশ করলেন।

মহাজাগতিক রশ্মির দৈনিক পরিবর্তিত চরিত্র প্রসংগে ডঃ সারাভাই মন্তব্য করেছেন, ১৯৪৮ সালে আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারিতে মহাজাগতিক রশ্মির সময়গতিক পরিবর্তন নির্ধারণের ব্যাপারে ধারাবাহিক গবেষণা চালনার সময় মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশেষ একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। ও'রা মনে করতেন, ভিন্ন নক্ষত্র জগৎ থেকে যে সমস্ত মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে তার প্রাবল্য বা তীব্রতা সব সময় সমান। তারা যদি ওপর থেকে মাথা বরাবর নেমে আসে অথবা পাশবরাবর মহাকাশের দিগন্তের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকেও আসে ওই তীব্রতার কোন পরিবর্তন হয় না।... ইংরেজিতে এই চরিত্রটিকে বলা হয় আইসোট্রপিক। অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবীতে আপতিত মহাজাগতিক রশ্মির প্রাবল্য যে কোন অক্ষ বা দিক বরাবর মাপা হোক না কেন তার পরিমাণ সব সময় সমান থাকে।... কিন্তু ১৯৪৮ সালে বাংগালোরে আবহাওয়ার মধ্যে বিচরণরত মৃদু শক্তিসম্পন্ন 'মিউ মেসন'-এর গতি প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অদ্ভুত একটি ব্যাপার চোখে পড়ল। পৃথিবীর বুকে আঘাতরত মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা সময়ের পরিবর্তনের সংগে কখনও বাড়ে কখনও কমে। আবার একই সময়ে বিভিন্ন দিক বরাবর তাদের তীব্রতা মাপলে দেখা যাবে তার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন এবং গোড়াতেই মনে হল বাতাসের চাপের সংগে এর যেন সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৫১, ১৯৫২ এবং ১৯৫৫ সাল থেকে যথাক্রমে আমেদাবাদ, কোদাইকানাল এবং ত্রিবন্দ্রমে 'মেসন' রশ্মির দৈনিক তীব্রতার উপর পর্যবেক্ষণ চালান হয়। পরে সূর্যের নিজস্ব তৎপরতার সংগে তার একটা সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া গেল। উল্লেখ্য, ১৯৪০ থেকে ৪৫, এই পাঁচ বছর সারাভাই রামনের অধীনে মহাজাগতিক রশ্মির এই রহস্যের উপর ধারাবাহিক গবেষণায় ব্রতী ছিলেন। এবং সম্ভব এখানেই মহাকাশ বিষয়ক তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

এ এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। বংশ সূত্রে বিক্রম যদি ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের একজন শ্রেষ্ঠতমের আসনে বৃত হতেন, আমরা বিস্মিত হতাম না। তাঁর মধ্য-জীবনে এমন নজিরও আমরা দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই বরপুত্র।

জন্ম ১২ অগাস্ট, ১৯১৯। আমেদাবাদ। পিতা বিশিষ্ট শিল্পপতি অম্বলাল সারাভাই। মাতা সরলা দেবী। ১৯৪২ সালে তিনি ভারতের বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী মৃণালিনীর সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কম বয়েস থেকেই বিক্রম ধীর, স্থির এবং বিনয়ী। তিনি জীবনের সমস্ত অর্থে বিচক্ষণ বিজ্ঞানীসুলভ মনোভাবের অধিকারী। শিক্ষা আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে। পরে কেম্ব্রিজের সেন্ট জন কলেজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বাংগালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এ স্যার সি ভি রামনের অধীনে গবেষক হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারে পরমাণু বিজ্ঞানের উপর গবেষণায় আত্মনিয়োগ। এখানে তাঁর গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'ফটো ফিশন' বা সালোকবিভাজন। ১৯৪৭ সালে অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৪৮ সালে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটারি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম থেকেই সেখানে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহাজাগতিক রশ্মি, পদার্থবিজ্ঞান ও কসমিক রে ফিজিকস-এর অধ্যাপক

৩০ মে, ১৯৬৮ বোম্বাই-এ সোভিয়েত দেশ এবং ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের দুই পুরোধা ডঃ আই ডি মরোকফ এবং ডঃ বিক্রম সারাভাই (ডানদিকে) পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন। ডঃ মরোকফের পেছনে দাঁড়িয়ে শ্রী এন এ টিটকফ এবং তাঁর পাশে শ্রী ওয়াই এমদাস। উল্লেখ্য, নিজেদের দেশের বাইরে একমাত্র ভারত ভূখণ্ড থেকেই সোভিয়েত দেশ তাদের নিজেদের তৈরি রকেট এম-১০০ উৎক্ষেপনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন

অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৮ এবং ১৯৬১ সালে তিনি পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে মার্কিন দেশের মেসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির পরমাণুকেন্দ্রিক বিজ্ঞান বা নিউক্লিয়ার সায়েন্স গবেষণাগারে গমন করেন।

তবু মূলত তাঁর স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাঁর তত্ত্বাবধানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিলেন। আমেদাবাদ, গুলমার্গ, কোদাইকানাল ত্রিবান্দ্রম এবং দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ায় অবস্থিত চাকালতাইয়ার বিভিন্ন ছাত্রদের সঙ্গে একযোগে গবেষণা চালিয়ে তিনি সৌরমণ্ডলের কার্যাবলীর সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রা পরিবর্তন বিষয়ক সম্পর্কের উপর নানারকম মৌলিক রহস্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫৩ সালে ডঃ সারাভাই এবং কানে সূর্যের প্রতি এগার বছরব্যাপী কার্যকালের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির দৈনন্দিন পরিবর্তনের যথাযথ সম্পর্কটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করে আন্তর্জাতিক মহলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হওয়ার সম্মান অর্জন করেছিলেন। এবং সম্ভবত উত্তরজীবনে কৃত্রিম উপগ্রহ এবং রকেটের সাহায্যে মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে যাঁর মধ্যে যে অদম্য উৎসাহ দেখা দেয়, তার সাকারের অংকুর এরমধ্যে নিহিত ছিল। ক্রমে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এত সবের মধ্যেও নিয়মিত গবেষণা পরিচালনার দিকটাও ব্যক্তিগতভাবে তিনি কখনই উপেক্ষা করেন নি। প্রচলিত অভিযোগ, বিজ্ঞানীরা প্রশাসনিকক্ষেত্রে নামলে তাঁদের গবেষণা পরিচালনার মত পারদর্শিতা তেমন আর নাকি থাকে না। কিন্তু অধ্যাপক সারাভাই এ ব্যাপারে মস্ত বড় এক ব্যতিক্রম। একাধারে সুনিপুণ প্রশাসক পরিকল্পনাকারী এবং সেই সঙ্গে দক্ষ গবেষণা পরিচালকরূপে তাঁর ভূমিকা অনবদ্যরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিশেষজ্ঞ-বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন একাধিকবার।

উল্লেখযোগ্য সম্মান। চেয়ারম্যান ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশন, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, জাতীয় মহাকাশ গবেষণা পরিষদ, থুম্বার নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপণ পরিষদ, ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের ইলেকট্রনিক কমিটি প্রভৃতি। ১৯৬৮ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বহির্জাগতিক গবেষণা বিষয়ক অধিবেশনের বিজ্ঞান বিষয়ক শাখার চেয়ারম্যান, ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি, লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটি এবং কেমব্রিজ ফিলজফিক্যাল সোসাইটির ফেলো ও আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য। ১৯৬২ সালে তিনি ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন।

এ ছাড়াও আমেদাবাদে বহু শিল্প গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি উৎসাহী ছিলেন। বস্তুত একমাত্র তাঁরই চেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি এর আংশিক সময়কালীন পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সঙ্গে কয়েকটি রাসায়নিক কারখানা পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর ওপর এসে বর্তায়।

কিন্তু তবু তাঁর প্রথম প্রেম মহাকাশ বিজ্ঞানের সঙ্গে। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত দেশ মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণায় যে নতুন সূর্যের উদয় হল এবং অবশেষে একে একে তার সাফল্য মহাকাশ রহস্য সম্পর্কে নিত্য-নতুন যে সমস্ত তথ্য উন্মীলিত করতে শুরু করল, তার প্রভাব এসে পড়ল ভারতীয় বিজ্ঞানীদেরও ওপর। কৃত্রিম উপগ্রহের প্রথম চমক অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁরাও বুঝলেন, মহাকাশ প্রযুক্তিবিজ্ঞানের এই বিশেষ অধ্যায় শুধু মাত্র প্রযুক্তিগত কলা-কৌশলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এর মূল্য অপরিহার্যস্বরূপে একদিন পরিগণিত হবেই। ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশন একথা ভেবেই অগাস্ট ১৯৬১ মানব কল্যাণে মহাকাশ গবেষণার জন্য প্রস্তাব দিলেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেশ রিসার্চ প্রতিষ্ঠার। ১৯৬২ সালে এই গবেষণা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হল। এর চেয়ারম্যান হলেন ডঃ বিক্রম সারাভাই। উদ্দেশ্য পুরোপুরি মানব কল্যাণমূলক কাজে মহাকাশ গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখা। ১৯৬৩ সালে ত্রিবান্দ্রমের ১৬ কিলোমিটার উত্তরে নীল আরব সাগরের বেলাভূমির উপর শুরু হল ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থুম্বার সাজসজ্জার কাজ। মূল লক্ষ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভারতীয় কুশলী এবং বিজ্ঞানীরা এখানে রকেট উৎক্ষেপণে দক্ষতা অর্জন করবেন, রকেটের সাহায্যে তাঁরা মহাকাশ বিষয়ক মৌলিক গবেষণা, যেমন মহাজাগতিক রশ্মি, গামা বিকিরণ, ভূ-চৌম্বক বল রেখার প্রকৃতি, আবহাওয়া প্রভৃতির উপর অনুসন্ধান চালাবেন। এর সঙ্গে ব্যবস্থা থাকবে ভারতীয় কুশলীরা ভারতীয় কাঁচামালে রকেট, রকেটের জ্বালানি, রকেট উৎক্ষেপণের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি যাতে তৈরি করতে পারেন, তার উপর কাজকর্ম চালানর। এবং

নতুন এই জ্ঞান দেশের বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক দিকটার সুরাহা করার চেষ্টা।

উন্নতিশীল দেশের পক্ষে এমন একটি প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বড় রকমের একটি চ্যালেঞ্জ। ডঃ সারাভাই তাঁর দক্ষ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং দূরদর্শিতার প্রমাণ দিলেন। তরুণ বিজ্ঞানী এবং কারিগরদের যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে তিনি ভারতীয় রকেট বিজ্ঞানকে শৈশব থেকে কৈশোরের পর্যায়ে উন্নীত করলেন।

ডঃ ভাবার লোকান্তর গত দশকের একটি বিপর্যয়কর আকস্মিক ঘটনা। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রাথমিক যে আশঙ্কা দেশবাসীর মনে দানা বেঁধে উঠেছিল, অল্প-দিনের মধ্যেই তার অবসান ঘটল। ভাবার পর পুরো পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে এগিয়ে এলেন ডঃ সারাভাই। এবং তার পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তারাপুরে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র উৎপাদন শুরু করল, আর্ভিতে স্থাপিত হল কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, উতকামণ্ডে বসল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। কাজ শুরু হয়েছে আরও কয়েকটি নতুন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের। শ্রীহরি-কোটায় বসেছে আরও একটি রকেট উৎক্ষেপণ মঞ্চ। এর সঙ্গে রাসায়নিক, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্যে আইসোটোপ তৈরির কাজও চলছে। এবং একই সঙ্গে প্রস্তুতি চলছে দেশের সঞ্চিত থোরিয়ামকে শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনে কাজে লাগানর। উল্লেখ্য, ভারতে থোরিয়ামের সঞ্চয় পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে
থোরিয়ামের সঞ্চয় পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে
যাতে করে ১৯৭৪-৭৫-এর মধ্যে ভারত তার নিজস্ব তিন উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপ করতে পারে, সেই লক্ষ্যের দিকে চেয়ে। উল্লেখ্য, ভারতীয় কুশলীরা ইতিমধ্য রকেট নির্মাণের ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন।

এত সব কথা বলার উদ্দেশ্য, এদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই সারাভাই-এর চিন্তা-ভাবনা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এবং এ সমস্ত সাফল্যের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব এখন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই, আছে সুশৃঙ্খলিত যোগ্যতম বহু ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে। পরমাণবিক শক্তি কমিশনের যে কোন কেন্দ্র, তা গবেষণাগারই হোক অথবা প্রশাসনিক কার্যালয়, সব জায়গাতেই আপনার চোখে পড়বে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা। সেখানে যিনি যে পদেই থাকুন, প্রত্যেকের কাছেই নিজের কাজ নিজস্ব দায়িত্ব। এবং সে দায়িত্ব পালনের যথাযথ অধিকারও তাঁদের দেওয়া হয়েছে। ডঃ ভাবা প্রসঙ্গে ডঃ সারাভাই বলেছিলেন, One of the greatest legacies left to us by Bhaba are the men and women, disciplined and trained, who can continue the task that he started . . . .

ব্যক্তি জীবনে ডঃ সারাভাই নিজেই তাঁর প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য......

. . . . India is fortunate in being rich in human material with long tradition of education and professional work.

হ্যাঁ আছেন। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রে ইতিমধ্যে যাঁরা যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্যও রেখেছেন। ওঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব শ্রী এইচ এন সেথনা, শ্রী এ এস রাও, ডঃ ব্রহ্ম প্রকাশ, ডঃ আর রামান্না, ডঃ এ আর গোপাল আয়েঙ্গার প্রভৃতি। আছেন আরও অনেকে। বস্তুত খুব কম সময়ের মধ্যে ডঃ ভাবার শূন্যতাকে দূর করে ডঃ সারাভাই সার্থক একটি কর্ম-যজ্ঞকে অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করার দিকে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর আকস্মিক এই লোকান্তর পরমাণবিক শক্তি কমিশনের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের আবার নতুন এক পরীক্ষার দিকে ঠেলে দিল।

শোকসভা

৩১ ডিসেম্বর কলকাতার লবণ হ্রদে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রোজেক্টের বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য কর্মী ডঃ সারাভাই-এর লোকান্তরিত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শোক প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ সারাভাইকে ভারতীয় মহাকাশ এবং রকেট বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারূপে অভিহিত করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাহা ইনসটিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর ডাইরেকটর অধ্যাপক ডি এন কুণ্ডু, অধ্যাপক এ কে সাহা, অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, শ্রী ডি মজুমদার, শ্রী বি দাস, শ্রী এ কে সরকার প্রভৃতি।

*

৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ কলকাতার সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর অধ্যাপক এবং কর্মীবৃন্দের এক সমাবেশে স্বর্গত ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন প্রসঙ্গে ইনস-টিটিউটের ডাইরেকটর অধ্যাপক ডি এন কুণ্ডু বলেন, মহাজাগতিক রশ্মির উপর ডঃ সারাভাই-এর মৌলিক গবেষণার আন্ত-র্জাতিক মূল্য অপরিসীম। প্রাইমারি বা মৌল মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার দৈনন্দিন পরিবর্তনের উপর আন্তঃগ্রহ তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের যে প্রভাব রয়েছে, এই সত্যটি তাঁর গবেষণায় প্রতিষ্ঠা পায়। ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের দায়িত্ব নেয়ার পর তাঁর মূল লক্ষ ছিল, এদেশের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন প্রয়াসকে কম খরচে অনেক বেশি কার্যক্ষম করে তোলা। এরই জন্যে তিনি সোডিয়াম শীতক প্রযুক্তি, থোরিয়াম প্রসূত ইউরেনিয়াম-২৩৩ জ্বালানি, অধিক পরিমাণে ভারি জল প্রভৃতির উপর বাস্তব সম্মত পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন। ব্যাপক একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে তাঁর অধীনে আমাদের মহাকাশ গবেষণা কার্যসূচী রূপ পরিগ্রহ করছিল।

স্বর্গত বিজ্ঞানীর পত্নী শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাই-এর কাছে এই সভা একটি শোক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

সমরজিৎ ক

॥ ৯ ॥

তা সেদিনকার সেই নারায়ণ এখন নরনারায়ণ হয়ে নবাবগঞ্জের জমিদার হয়েছে। তখন সকাল বেলা রোজ এসে কর্তাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো। আপত্তি করলে নারায়ণ বলতো—আপনি আমাকে পায়ে হাত দিতে আপত্তি করবেন না, আমার বাবা-মা নেই, আপনারাই আমার বাবা-মা, সব কিছু—

তখন কত বিনয়ী ছিল নারায়ণ। মাঝে মাঝে নানান কাজে বাড়ির মধ্যেও আসতো। এসে বাড়ির ছেলের মত ব্যবহার করতো। চক্রবর্তী মশাই-এর গৃহিণীর কাছে এসে ছেলেমানুষের মত খেতে চাইতো।

বলতো—মা-জননী, কিছু খেতে দিন আমাকে, আমার বড় খিধে পেয়েছে—

তখন অনেক সময় দিনের পর দিন কালিগঞ্জেই থেকেছে নারায়ণ। জমি-জমা-হিসেব-পত্র কিংবা মামলা-মকদ্দমার কাজে অনেক সময় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে বুক দিয়ে খেটেছে। কখনও মাইনে বাড়াতেও বলেনি। কর্তামশাই তার মাইনে বাড়ানও নি। তা মাইনের দরকারই বা তার কী ছিল। খাওয়া-দাওয়া-থাকা-শোওয়া থেকে শুরু করে জামা-কাপড় সবই তো কর্তা দিতেন। পাল-পার্বণে নারায়ণের কাপড়-জামা-গামছা ছিল বাঁধা।

কিন্তু সেই নারায়ণই আবার অন্য রকম হয়ে গেল কর্তামশাই-এর মৃত্যুর পর। মাঝে মাঝে মনে হতো অমন করে নায়েব মশাইকে বিশ্বাস না করলেই ভালো হতো হয়তো। কিন্তু তখন সেই বিপদের দিনে তিনি মেয়েমানুষ হয়ে বিশ্বাস না করেই বা কী করতেন।

একদিন গিয়েছিলেন নবাবগঞ্জে। দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এত বড় বাড়ি করেছে নারায়ণ! এত লোকজন। মনিবের বিধবা গৃহিণীকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন নারায়ণ।

বললেন—আপনি আবার এলেন কেন মা-জননী?

মা-জননী বললেন—না এসে কী করবো বাবা, কতবার তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছি, তুমি একবার দেখাও করলে না। তাই নিজেই এলুম—আমার জমিজমার হিসেব-টিসেবগুলো একবার দেখতুম। আমার কী আছে না-আছে তাও বুঝতে পারছি না। আমার যদি টাকা-কড়ি থাকতো বাবা তাহলে তোমাকে আর এমন করে বিরক্ত করতাম না বাবা—নেহাত বিপাকে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—

নারায়ণ বললেন—আপনি আজকে যান, আমি আপনাকে যা বোঝাবার একদিন কালিগঞ্জে গিয়ে বুঝিয়ে আসবো। আপনাকে আসতে হবে না—

নায়েবমশাই-এর কথায় বিশ্বাস করে সেদিন চক্রবর্তী গৃহিণী ফিরে চলে গেলেন। কিন্তু নারায়ণ আর এলো না। তাঁর কথা রাখলো না। তাঁর স্বামীর অত বড় সম্পত্তি যে কোথায় হাওয়ার মত উড়ে গেল, কেমন করে সব অদৃশ্য হয়ে গেল তা তিনি জানতেও পারলেন না। লোকে বলতে লাগলো—কালিগঞ্জের নায়েব জমিদারকে ঠকিয়ে নবাবগঞ্জে নিজের জমিদারি করেছে—

যারা ভালোমানুষ লোক তারা জিজ্ঞেস করলো—কালিগঞ্জের বউকে নায়েব ঠকালে কী করে? বউ জানতে পারলে না?

লোকে বললে—আরে, বউ তো ভালো মানুষ, ছেলে-মেয়ে-জামাই কেউ নেই, কী করে জানতে পারবে?

তা সত্যি কথা। কালিগঞ্জের বউ কি কোর্ট-কাছারি করবে? নায়েবের নামে কাছারিতে নালিশ করবে?

কিন্তু নরনারায়ণ চৌধুরীকে যত খারাপ লোক ভাবা গিয়েছিল তত খারাপ সে নয়। কালিগঞ্জের বউ যখন টাকার

আদাদায় আসতো তখন নারায়ণ একেবারে খালি হাতে ফিরিয়ে দিত না। কখনও দশ টাকা, কখনও পাঁচ টাকা, আবার কখনও বা পঞ্চাশ টাকাও দিয়েছে। বলেছে—আর তোমার এখানে আসতে হবে না মা-জননী, এবার আমি সব টাকাটা নিজে গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসবো—

কথাটা শুনে কালিগঞ্জের বউ-এর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

বলেছিল—তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এলে তো খুবই ভালো হয়, আমার তাহলে আর এ হেনস্থা হয় না।

নরনারায়ণও ভেবেছিলেন বুড়ি আর কতদিনই বা বাঁচবে! এই রকম স্তোক-বাক্য দিয়ে দিয়ে যতদিন কাটানো যায়। তারপর একদিন বউ মারা যাবে। তখন আর কেউই তাগাদা করতে আসবে না। তখন একেবারে চিরকালের মত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু কালিগঞ্জের বউ-এরও বোধ হয় অক্ষয় পরমায়ু। সেই নারায়ণের সন্তান হলো। সেই সন্তানের আবার বিয়েও হলো। তারও আবার ছেলে হলো। কিন্তু পাওনা টাকা কালিগঞ্জের বউ পেলে না। তখনও আসতো সেই কালিগঞ্জের বউ। তার আসার খবর পেয়েই নরনারায়ণ চৌধুরী রেগে যেতেন।

বলতেন—আবার এসেছে বুড়ি?

কৈলাশ গোমস্তা বলতো—চলে যেতে বলবো?

কর্তাবাবু বলতেন, হ্যাঁ হ্যাঁ চলে যেতে বলো। বলো আমার শরীর খারাপ, এখন দেখা হবে না।

সেই সময়েই একদিন ছোট একটা ছেলে পালকির কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। বলেছিল—আমি পালকিতে চড়বো—

কালিগঞ্জের বউ বলেছিল—এ কে গো? কার ছেলে?

দীনু বলেছিল—এই তো কর্তাবাবুর নাতি—

কালিগঞ্জের বউ সদানন্দকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বলেছিল—তুমি পালকি চড়বে?

সদানন্দ বলেছিল—হ্যাঁ—

সেদিন সদানন্দকে পালকিতে চড়িয়েছিল কালিগঞ্জের বউ। পালকি চড়ে সদানন্দ খুব খুশী। বলেছিল—আমাকে আরো দূরে নিয়ে চলো, একেবারে নদীর ঘাটের দিকে।

—নদীর ধারে গেলে যদি তোমার দাদু বকে?

সদানন্দ বলেছিল—বকুক গে। আমি বকুনিকে ভয় করি না—

সেইদিনই কালিগঞ্জের বউ ছোট ছেলে-টার সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীনু বলেছিল—খোকাবাবু কাউকে ভয় করে না, খুব দুষ্টু হয়েছে—

সেই-ই প্রথম পরিচয়। তারপর যতবার কালিগঞ্জের বউ নবাবগঞ্জে তাদের বাড়িতে এসেছে, ততবারই পালকি চড়বার বায়না ধরেছে। আর তাকে পালকিতে চড়িয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে কালিগঞ্জের বউ। পালকি চড়বার কেমন একটা নেশা হয়ে গিয়েছিল সদানন্দর। এলেই দৌড়ে যেত সদানন্দ। পালকিটা আসতে দেখলেই সদানন্দ চিনতে পারতো। ডাকতো-ও কালিগঞ্জের বউ কালিগঞ্জের বউ—

কালিগঞ্জের বউ পালকি থেকে নেমেই সদানন্দকে কোলে করতো।

বলতো—আমি যে কালিগঞ্জের বউ তা তোমাকে কে বললে খোকাবাবু?

সদানন্দ বলতো—তোমার নাম তো কালি-গঞ্জের বউ। আমাকে গৌরী পিসী সব বলেছে। তুমি কালিগঞ্জেই তো থাকো—

—তুমি কালিগঞ্জ যাবে? যাবে আমাদের কালিগঞ্জে?

—যাবো। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

—কিন্তু কালিগঞ্জে গেলে তোমার দাদু যে বকবে।

—দাদু বকুক! দাদু খুব দুষ্টু, দাদু তো আমাকে রোজ বকে! তবু আমি ভয় পাই না।

—তোমাকে কেন বকে দাদু?

সদানন্দ বলতো—আমি দুষ্টুমি করব না!

—কেন তুমি দুষ্টুমি করো?

সদানন্দ বলতো—বেশ কথা, দুষ্টুমি করবো! দাদু তোমাকে কেমন টাকা দেয় না!

কালিগঞ্জের বউ অবাক হয়ে যেত সদানন্দর কথা শুনে।

সদানন্দ বলতো—জানো, দাদু কাউকে টাকা দেয় না। দাদুর অনেক টাকা, তবু দাদু কাউকে টাকা দেয় না।

কালিগঞ্জের বউ কেমন অবাক হয়ে যেত ছোট ছেলের মুখের কথা শুনে। বলতো—তুমি কী করে বুঝলে দাদু আমাকে টাকা দেয় না?

সদানন্দ বলতো—গৌরী পিসী বলেছে—

গৌরী পিসী! কালিগঞ্জের বউ এ-বাড়ির লোকদের বিশেষ কাউকেই চিনতো না। অন্দর-মহলেও কোনও দিন ঢোকবার সুযোগ হয়নি। এ-বাড়ির সমস্ত লোকজন নবাবের মতো দেখলেই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যেত। জিজ্ঞেস করতো—গৌরী পিসী কে?

সদানন্দ বলতো—ও মা, গৌরী পিসীকে তুমি চেনো না? সে তো আমাকে খাইয়ে দেয়! ভাত খাইয়ে দেয়, দুধ খাইয়ে দেয়, মাছ খাইয়ে দেয়. আমি যদি না খাই তখন গৌরী পিসী আমাকে ভয় দেখায়—

—কী ভয় দেখায়?

—বলে ও জুজুবুড়িকে ডেকে ধরিয়ে দেব।

এত দুঃখের মধ্যেও কালিগঞ্জের বউ-এর মুখে হাসি আসতো ছোট ছেলের মুখে আধো-আধো কথা শুনে।

কালিগঞ্জের বউ-এর পালকিতে বসে সদানন্দর মুখে যেন কথার খই ফুটতো। বলতো—আমি যখন বড় হবো তখন তোমাকে টাকা দেব।

—আমাকে তুমি টাকা দেবে?

—হ্যাঁ তোমাকে টাকা দেব, আর সবাইকে টাকা দেব। দাদুর জমি আমি খাস করে নেব না। তোমাকে দেব, ধান দেব, গুড় দেব, তোমাকে সব দেব!

আশ্চর্য, ছোট বয়েসের মন আর ছোট মনের সংকল্প। কালিগঞ্জের বউ-এর মনে হতো ছোট বয়েসে বোধ হয় সবাই এই রকমই থাকে। ছোট বয়েসে সবাই-ই উদার হতে পারে, দাতা হতে পারে। তারপর বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যত স্বার্থ আর যত স্বার্থচিন্তা আর কুটিলতা এসে হাজির হয়, ছোট বয়েসে কালিগঞ্জের বউও তো সকলকে বিশ্বাস করতো। শুধু ছোট বয়েস কেন, অনেক বয়েস পর্যন্ত যে-যা চেয়েছে সবাইকে সব কিছু দিয়েছে কালিগঞ্জের বউ। সকলকেই বিশ্বাস করেছে। নইলে এই নায়েব মশাই-ই কি এমন করে তার সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারতো! দশটা আমবাগান, তিনটে বড় বড় ঝিল, আর জমি যে কত বিঘে তার কোনও হিসেবই রাখবার দরকার হতো না। আর তার হিসেব যে কোনওদিন রাখতে হবে তাও কখনও কালিগঞ্জের বউ স্বপ্নেও ভাবেনি। নায়েব মশাই-ই সব দেখতো আর নায়েব মশাই-ই সব আদায় করতো। খাজনা যেমন আদায় করতো, তেমনি খাজনা দিতও সরকারী কাছারিতে। জমিতে কত ধান হচ্ছে আর কত পাট, ছোলা কত হচ্ছে তার হিসেব নেবার দরকারও কখনও হয়নি কালিগঞ্জের বউয়ের।

কিন্তু শেষকালের দিকে কালিগঞ্জের বউ-এর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তবু সেই ভাঙা শরীর নিয়ে আসতো নবাবগঞ্জে।

একবার বড় হয়ে রাগ হয়ে গিয়েছিল। আর থাকতে পারেনি। বলে ফেলেছিল—তবে কি আমার টাকাটা তুমি ঠকিয়েই নিলে নায়েব মশাই? এই-ই ছিল তোমার মতলব? তাহলে আগে বললে না কেন?

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—কেন, আগে কি করতে?

—আগে বললে এই চৌধুরানিটা হতো না আমার। এই পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আমায় ঘোরাচ্ছো, ভোগাচ্ছো, মাথার ওপর ভগবান নেই?

নরনারায়ণ তখন শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন সব সময়। কথাটা শুনে তাঁর ভালো লাগলো না।

বললেন—কেন, ভগবান থাকলে আমার কী করবে?

কালিগঞ্জের বউ বললে—ভগবান তুমি মানো আর না মানো, কিন্তু আমি মানি। আমি সেই ভগবানের নাম করে বলে যাচ্ছি নায়েবের মেয়েকে তুমি ঠকিয়েছ, এতে তোমার ভালো হবে না নারাণ, তোমার সর্বনাশ হবে—

—তার মানে?

—তার মানে তুমি আমার যেমন সর্বনাশ করেছ, তেমনি তোমারও সর্বনাশ হবে!

নরনারায়ণ চৌধুরীর চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠলো। বললেন—তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বলছি—

তারপর ডাকতে লাগলেন—দীনু, ও দীনু—

কালিগঞ্জের বউ বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—দীনুকে ডাকছো কেন? আমাকে সে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে বলে?

—কী জানো, ডাকছি তো দীনু এলেই দেখতে পাবে, আমাকে আর মুখে বলতে হবে না। ও দীনু, দীনু—ও দীনু—

কালিগঞ্জের বউ বললে—তার আর দরকার হবে না। আমার দশ হাজার টাকার জন্যে তোমাকে আর মহাপাতক হতে হবে না। তার আগেই আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু...

বলতে বলতে যেন একটু দম নিয়ে নিলে কালিগঞ্জের বউ। বললে—কিন্তু আমি যদি বামুনের বংশে জন্মে থাকি, আর আমি যদি এক বাপের মেয়ে হই তো আমি এই তোমাকে শাপ দিয়ে গেলুম যে তুমি নির্বংশ হবে নারাণ তুমি নির্বংশ হবে, তুমি যাদের জন্যে টাকা জমিয়ে রাখছো এ কারো ভোগে লাগবে না, কারো ভোগে লাগবে না—

বলে কালিগঞ্জের বউ এক নিমেষে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সময় দীনুর সঙ্গে সদানন্দ এসে ঢুকলো।

—কালিগঞ্জের বউ, ও কালিগঞ্জের বউ!

কর্তাবাবু দীনুকে দেখে ধমকে উঠলেন—এই দীনু, আমি তোকে ডাকলাম, তুই আবার খোকাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি কেন এখানে?

সদানন্দ বললে—বেশ করেছে আমাকে নিয়ে এসেছে. তুমি বলবার কে? আমি কালিগঞ্জের বউকে দেখতে এসেছি—

তারপর কালিগঞ্জের বউ-এর দিকে চেয়ে বললে—আমাকে পালকি চড়াবে না কালিগঞ্জের বউ? পালকি চড়াবে না আমাকে?

কালিগঞ্জের বউ সদানন্দকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তারপরেই আবার যেমন সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল তেমনি সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল। সদানন্দও তার পেছন-পেছন ডাকতে ডাকতে চলতে লাগলো—ও কালিগঞ্জের বউ...

নরনারায়ণ চৌধুরী রেগে উঠলেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস দীনু? খোকাকে ধর, খোকা যে চলে গেল রে, খোকা যে চলে গেল কালিগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে, ধর ওকে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ওকে ধরে আন—

কিন্তু ততক্ষণে কালিগঞ্জের বউ বার-বাড়ির উঠোনে গিয়ে তার পালকিতে উঠে পড়েছিল। চারজন বেহারা পালকিটা কাঁধে তুলতে যাচ্ছে—

এমন সময় সদানন্দও পেছনে গিয়ে ডাকলো—আমাকে আজ পালকি চড়ালে না কালিগঞ্জের বউ?

বেহারা চারজন পালকিটা তুলতে গিয়ে একটু বুঝি থেমে গিয়েছিল। কিন্তু ভেতর থেকে কালিগঞ্জের বউ ধমক দিয়ে উঠলো—কই রে দুলাল, পালকি তোল—

—আজ্ঞে মা ঠাকরুণ খোকাবাবু যে পালকিতে উঠতে চাইছে—

কালিগঞ্জের বউ ধমকে উঠলো—যে-সে পালকিতে উঠতে চাইলেই অমনি ওঠাব

তোরা? না, ওঠাতে হবে না—আমি যা বলছি তাই কর—

দুলালরা আর দেরি করলে না। পালকি কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলে।

সদানন্দ কাঁদতে কাঁদতে পেছনে-পেছনে ছুটতে লাগলো—ও কালিগঞ্জের বউ কালিগঞ্জের বউ—

ছুটতে ছুটতে বোধ হয় সদানন্দ পালকির সঙ্গে বার-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল। ছোটবাবু চণ্ডী-মণ্ডপে বসে ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন—ওরে, খোকা যে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ ধর্ ওকে, ওরে কে আছিস, দীনু—

গৌরী ভেতর-বাড়ি থেকে দৌড়ে এল —ও খোকা, খোকা, কোথায় যাচ্ছো? ওদিকে যেতে নেই, আমি পালকি চড়াবো, তুমি এসো আমার কাছে—

বলে খপ্ করে সদানন্দকে ধরে ফেলেছে। সদানন্দও কেঁদে উঠেছে—কালিগঞ্জের বউ চলে গেল, আমাকে পালকি চড়ালে না—

গৌরীর কোলে উঠেও সে কাঁদে

লাগলো। আর ততক্ষণে দীনুও কর্তাবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বার-বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হয়েছে।

ছোটবাবু চণ্ডীমণ্ডপ থেকে দীনুকে দেখে বলে উঠলেন—কোথায় থাকিস রে তুই দীনু, আর একটু হলেই খোকা এখখুনি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছিল—

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই কৈলাশ গোমস্তা চণ্ডীমণ্ডপে এল দৌড়তে দৌড়তে। বললে—ছোটবাবু, কর্তাবাবু কেমন করছেন, আপনি একবার আসুন—

—বাবা? বাবার কী হয়েছে?

কৈলাশ গোমস্তা তখনও হাঁফাচ্ছিল। বললে—ওই কালিগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে রাগারাগি করে কথা বলতে গিয়েই কর্তাবাবু কেমন হাঁপিয়ে উঠেছেন, আমার সুবিধে মনে হচ্ছে না—

ছোটবাবু আর দাঁড়ালেন না। সোজা ভেতর-বাড়িতে ঢুকে একেবারে কর্তাবাবুর ঘরে চলে গেলেন। দেখলেন কর্তাবাবু চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছেন, চোখ দুটো বোজা। বুকটা জোরে জোরে উঁচু-নিচু হচ্ছে। যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কৈলাশ গোমস্তাও পাশে এসে দাঁড়ালো। দীনু এল। গৌরী পিসি এল। বাড়িময় খবর রটে গেল কর্তাবাবুর অসুখ হয়েছে।

তারপর রাণাঘাট থেকে ডাক্তার এল, কবিরাজ মশাই এল। ওষুধের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ডাক্তার কবিরাজ দুজনেই বলে গেল একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

তারপর থেকে নিয়ম হলো কালিগঞ্জের বউ যদি এর পর আসে তো আর তাকে কর্তাবাবুর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। কালিগঞ্জের বউ-এর জন্যেই এই বিপর্যয় ঘটলো।

কিন্তু সেই থেকেই সদানন্দের কৌতূহল হলো—ওই কালিগঞ্জের বউ কেন দাদুর কাছে আসে? কীসের টাকা চায়? কার টাকা? দাদু কালিগঞ্জের বউকে টাকা দেয়ই না বা কেন?

এমন প্রশ্নের কেউ-ই ঠিক মত জবাব দিত না।

দীনু বলতো—কালিগঞ্জের বউ খুব দুষ্টু—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করতো—কেন, কেন দুষ্টুমি করে কালিগঞ্জের বউ?

দীনু বলতো—যারা দুষ্টু লোক, তারা তো কেবল দুষ্টুমিই করে, আর তো কিছু করে না!

—কিন্তু দাদু তার টাকা দেয় না কেন? টাকা না পেলে কালিগঞ্জের বউ চাল কিনবে কী করে? কাপড় কিনবে কী করে?

যত দিন যেতে লাগলো এই সব প্রশ্নই তার মাথায় ঢুকতে লাগলো। তারপর বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই সে জানতে পারলো। জানতে পারলো দাদু শুধু কালিগঞ্জের বউকেই ঠকায় নি, কপিল পায়রাপোড়াকেও ঠকিয়েছে, মাধব ঘোষকেও ঠকিয়েছে। জানতে পারলো রাণাঘাটের সদরে তাদের উকিল-বাড়ি আছে, সেখানে তাদের উকিলটা কেবল মামলা করে। মামলা করে করে নবাবগঞ্জের লোকদের জমি-জমা নিলেমে ডেকে নেয়, বাকি খাজনার দায়ে প্রজাদের জমি খাস করে নেয়। বংশী ঢালীকে দিয়ে লাঠি-বাজি করায়। তারপর চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে অনেককে তালাচাবি বন্ধ করে উপোস করিয়ে মারে। সে সব কেউ টের পায় না। সদানন্দ অনেক দিন সেই দিকে যেতে চেয়েছে। কিন্তু জায়গাটা ঝোপ-ঝাড় ঘেরা বলে সন্ধেবেলা যেতে ভয় করতো তার খুব। তবু যখন বংশী ঢালীকে ওদিক থেকে আসতে দেখতো, তখন সদানন্দরও গা কেমন ছমছম করে উঠতো।

সে বংশী ঢালীকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ গো বংশী, ও ঘরে থাকতে তোমার ভয় করে না?

বংশী ঢালী হাসতো সদানন্দের কথা শুনে।

বলতো—ভয় করবে কেন খোকাবাবু, ওখানে তো আমি রাত্তিরে ঘুমোই—ওই তো আমার ঘর—

সদানন্দ আবদার ধরতো—আমি তোমার ঘরে যাবো বংশী—

—আমার ঘরে কী করতে যাবে? আমি গরীব লোক, আমার ঘরে থাকতে তোমার কষ্ট হবে—বলে ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেত। বলতো—চলো খোকাবাবু, তোমাকে আমি মাছ ধরা দেখতে নিয়ে যাই—

বলে বিলের ধারে খ্যাপলা জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখতে নিয়ে যেত।

এতদিন পরে কালিগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে সদানন্দ সেই সব বলতে-বলতেই অনেক রাত হয়ে গেল। কালিগঞ্জের বউ নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে দিলে সদানন্দকে। বললে—এবার বাবা তুমি নবাবগঞ্জে ফিরে যাও—তোমার দাদু এতক্ষণে তোমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে—

—না, আমি আর যাবো না।

কালিগঞ্জের বউ বললে—কিন্তু তুমি যদি না যাও বাবা তো আমার নামেই দোষ পড়বে। সবাই বলবে আমিই তোমাকে আটকে রেখেছি—আর তা ছাড়া, কাল তোমার বিয়ে। সকাল-বেলাই গায়ে-হলুদ হবে, তোমার শ্বশুর-বাড়ি থেকে আশীর্বাদের তত্ত্ব আসবে—

সদানন্দ বললে—সে আসুক, কিছুতেই যাবো না, আমি এখানেই শুয়ে রইলুম—

বলে কালিগঞ্জের বউ-এর বিছানাতেই গা এলিয়ে দিলে। একগুঁয়ে পাগল ছেলেকে নিয়ে মহামুশকিলে পড়লো কালিগঞ্জের বউ। দুলালকে ডেকে তোশক-বালিশ পেড়ে আবার তার জন্যে নতুন করে বিছানা করে দিতে হলো।

সে রাতটা এক রকম করে কাটলো। কালিগঞ্জের বউ ভাবলে ভোরবেলাই না-হয় দুলালকে দিয়ে নবাবগঞ্জে খবর পাঠিয়ে দেবে যে খোকা এখানে এই কালিগঞ্জে এসে উঠেছে।

দুলালও সেই রকম তৈরি হয়ে ছিল। কিন্তু সকাল বেলা থেকেই দুলালের নানা কাজ থাকে। সে কাজের মানুষ। ভোর রাতে উঠে তাকে গরুকে পানি দিতে হয়। তারপর তিন ক্রোশ হেঁটে গিয়ে বাঁশের কটা খুঁটি তৈরি করে আনবার কথা ছিল। তখনও রাত অনেক। দুলাল ভেবেছিল সকাল হবার আগেই বাঁশ কেটে আবার ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু বাঁশঝাড়ের মালিক বাড়ি ছিল না। তিনিও বুঝি কোন জরুরী কাজে রাত থাকতে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্যে বসে বসে যখন শেষ পর্যন্ত মালিক এল তখন রোদ উঠে গেছে।

সেই বাঁশ বাছাই করে কেটে যখন দুলাল আবার বাড়িতে ফিরে এল তখন দেখলে বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে।

দুলালকে দেখেই গিন্নীমা বলে উঠলো—হ্যাঁ রে দুলাল, তোকে আমি পই-পই করে বলেছিলুম নবাবগঞ্জে গিয়ে নায়েব-

বাড়িতে খবরটা দিয়ে আসবি যে খোকাবাবু এখানে এসেছে। আর তুই কিনা বাঁশ আনতে গিয়েছিলি? আজকেই তোর বাঁশ আনবার জন্যে এত দরকার পড়ে গেল? এখন আমি লোককে কী বলে কৈফিয়ত দেব? নবাবগঞ্জ থেকে যে লোক এসে হাজির হয়েছে সে আমাকেই দুষছে.....
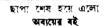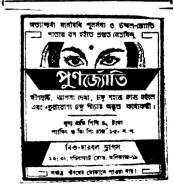
সত্যিই, দেখলে এক ভদ্রলোক বসে আছে বাড়ির উঠোনে একটা চৌকিতে—

কালিগঞ্জের বউ বললে—এই দেখ বাবা। এই দলালকে আমি ভোর বেলা নবাবগঞ্জে গিয়ে কর্তাবাবুকে খবর দিতে বলেছিলাম যে খোকাবাবু এখানে আছে—তা আমার তো ওই এক দলাল ভরসা আর তো কোনও লোক নেই যে তাকে পাঠাবো—

ততক্ষণে সদানন্দ ঘুম থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো।

প্রকাশ মামা রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কী রে তুই এখানে এসে লুকিয়ে আছিস! আজ তোর বিয়ে। অধিবাস হলো। কেষ্টনগর থেকে লোক এসে হাজির হয়েছে গায়ে-হলুদের সব রেডি আর তুই কিনা এই রকম পাগলামি করছিস! চল—চল—আর কথা বলবার সময় নেই আমার। চৌধুরী বংশের জাত চলে গেছে। কুটুমবাড়ির লোক সেখানে গিয়ে কী বলবে বল দিকিনি তারা কী ভাববে?

সদানন্দ বললে—ভাবুক গে আমার কী? আমি যাবো না, আমি এখানে থাকবো—

প্রকাশ মামা বললে—ইয়ারকি করার আর জায়গা পাসনি—

বলে সদানন্দর হাত ধরে টান দিলে একটা। টেনে বাইরের রাস্তার দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

সদানন্দ হাত ছাড়িয়ে নিলে। বললে—তুমি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছ প্রকাশ-মামা? আমি যাবো না তোমার সঙ্গে—কী করবে তুমি?

কালিগঞ্জের বউ বললে—আমি কাল থেকে ওই কথা ওকে বোঝাচ্ছি বাবা যে বিয়ের ব্যাপারে এমন করতে নেই। এখন সব জোগাড়-যন্ত্র হয়ে গেছে। এখন লোক হাসাহাসির ব্যাপার করা উচিত নয়। তা...

প্রকাশ-মামা ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—তুমি থামো, আমি তোমার সব মতলব ফাঁস করে দেব। দাঁড়াও, আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তখন যা করতে হয় আমি করবো—সে আমার মনেই আছে—

কালিগঞ্জের বউ বললে—আমি কী করলুম বাবা? আমার কী দোষ হলো?

—বলছি থামো, তবু আবার কথা বলছো? ভেবেছিলে আমার ভাগ্নেকে নিজের বাড়িতে ফুসলে এনে বিয়েটা ভেঙে দেবে? এত শয়তানি বুদ্ধি তোমার?

সদানন্দ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো—খবরদার বলছি প্রকাশমামা, কালিগঞ্জের বউকে তুমি অমন করে যা-তা বলতে পারবে না। তা হলে কিন্তু আমিও সব ফাঁস করে দেব।

প্রকাশ মামা বললে—তার মানে?

—তার মানে তুমি জানো না? তুমি জানো না এই কালিগঞ্জের বউ-এর কত সম্পত্তি দাদু গ্রাস করেছে? জানো, এই কালিগঞ্জের বউ এককালে কত সম্পত্তির মালিক ছিল? কে তার সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছে, কে তাকে পথের ভিখিরি করেছে আমি সে সব কথা জানি না বলতে চাও?

প্রকাশ মামা কথাগুলো শুনে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর একটু দম নিয়ে বললে—এই সব কথা তোকে বুড়ি বলেছে বুঝি? এই সব ফুস-মন্তর বুঝি দিয়েছে তোর মাথায়?

—আমাকে ফুস-মন্তর দিতে হবে না প্রকাশমামা। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বোঝবার মত যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে। বরং তুমি একটা বোঝ। যার পয়সায় তুমি এতদিন বাবুয়ানি করছো, জেনো সেটা তোমার ভগ্নিপতির নয়, সে সব এই কালিগঞ্জের বউ-এর—

প্রকাশমামা বললে—দ্যাখ্, এ সব কথার জবাব দেবার আমার সময় নেই এখন ওদিকে কুটুমবাড়ির লোক বসে আছে, তারপরে বিকেল বেলার ট্রেন ধরে আবার কেষ্টনগরে বিয়ে করাতে যেতে হবে। পরে আমরা তোর এ সব কথার জবাব দেব—

সদানন্দ বললে—না, জবাব দিলে এখনি জবাব দিতে হবে। আগে এর জবাব চাই তবে আমি তোমার সঙ্গে যাবো—

—তা কীসের জবাব চাস তুই বল? কবেকার পুরোন কাসুন্দি ঘাটবার এই সময়? এ সব কাসুন্দি তো পরে ঘাটলেও চলতো।

—না চলতো না। আগে আমি এর জবাব চাই। আগে তুমি বলো, আগে তুমি কথা দাও, দাদু এই কালিগঞ্জের বউ-এর পাওনা দশ হাজার টাকা মিটিয়ে দেবে?

—দশ হাজার টাকা?

—হ্যাঁ, দাদু পনেরো বছর আগে কথা দিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করবে, এই কালিগঞ্জের বউকে। এখনও কেবল ঘোরাচ্ছে। এখন দাদু এই কালিগঞ্জের বউ-এর সঙ্গে দেখাও করে না। আগে তুমি কথা দাও সেই টাকা মিটিয়ে দেবে?

প্রকাশমামা বললে—তোর দাদু টাকা মেটাবে কি না তার কথা আমি দেব কী করে? আমি নিজে কি টাকা নিয়েছি যে কথা দেব?

সদানন্দ বললে—তা হলে আমিও বিয়ে করতে যাবো না—

প্রকাশমামা বললে—ঠিক আছে, তা হলে তুই বাড়ি চল্, বাড়ি গিয়ে তোর দাদুকে সব বল্ গিয়ে। দাদু যদি তখন টাকা দিতে রাজী না হয় তখন না-হয় বিয়ে করতে যাস নি। আমাকে বাপু তুই এই দায় থেকে বাঁচা—

কালিগঞ্জের বউ এতক্ষণ কথা বলেনি। সদানন্দর দিকে চেয়ে বললে—সেই-ই ভালো কথা বাবা। তোমার মামা তো ঠিক কথাই বলেছে। আর আমার টাকা? আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন আমার টাকা দিলেও যা, না-দিলেও তাই। ও টাকার পিত্যেশ আর আমি করি না। কিন্তু তুমি বাবা আর দেরি করো না, যাও, তোমার গায়ে-হলুদের দেরি হয়ে যাবে—

সদানন্দ এতক্ষণে রাজী হলো। বললে—চলো—

তারপরে কালিগঞ্জের বউ-এর পায়ের কাছে মাথা নিচু করে প্রণাম করে বললে—তোমার টাকা আমি নিজের হাতে দিয়ে যাবো কালিগঞ্জের বউ, তুমি কিছু ভেবো না। টাকা না দিলে আমি বিয়ে করতেই যাবো না—

মনে আছে সদানন্দর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কালিগঞ্জের বউ-এর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সদানন্দর চোখের সামনেই আঁচল দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে ফেলেছিল।

★

কেষ্টনগরে বিয়েবাড়ির একপাশে একটা ঘরের ভেতরে প্রকাশমামা জিজ্ঞেস করলে—কী রে তুই কালিগঞ্জের বউয়ের ব্যাপারটা বাসরঘরে সকলকে বলে দিয়েছিস নাকি? নিরঞ্জন বলছিল—

সদানন্দ গম্ভীর মুখে বললে—না। বলিনি।

প্রকাশমামা সাবধান করে দিলে। বললে—না, বলিস নি।

সদানন্দ বললে—কিন্তু কালিগঞ্জের বউ-এর দশ হাজার টাকা? সেটা কিন্তু এখনও দাদু দিলে না, তুমি কথা দিয়েছিলে কিন্তু—

প্রকাশমামা বললে—তুই মিছিমিছি ও-সব নিয়ে ভাবছিস কেন? তোর দাদুর কাছে দশ হাজার তো হাতের ময়লা, দেবে যখন কথা দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই দেবে। দশ হাজার টাকা মেরে দিয়ে কি তোর দাদু বড়লোক হবে? নিশ্চয়ই দেবে, আমি তো সাক্ষী আছি—

সদানন্দ বললে—কিন্তু কালিগঞ্জের বউ-এর টাকা যদি দাদু না দেয়, তখন কিন্তু সর্বনাশ হবে, এই আমি বলে রাখছি—

ওদিক থেকে কন্যাকর্তার গলা শোনা গেল—কই বেয়াই মশাই কোথায়? সিগারেট পেয়েছেন তো?

(ক্রমশ)

দেখা হয় নাই

॥ ২৯ ॥

ক্ষীরপাই ঃ বাবর শা

বর্তমান সিরিজের প্রবন্ধগুলিতে বাঙালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিভিন্ন দিক থেকে উন্মোচিত করবার যে প্রয়াস (অক্ষম সন্দেহ নেই) সাধ্যমত চালিয়ে যাচ্ছি তাতে ইতিপূর্বে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়ে থাকলেও বাঙালীর আহার সম্বন্ধে এযাবৎ কিছুই লেখা হয়নি। অথচ যে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে তার খাদ্যের সঙ্গে অন্তত কিছু পরিমাণে সম্পর্কিত তাতে সংশয় নেই।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মোগলাই খানায় অভ্যস্ত বলদৃপ্ত মোগলের সঙ্গে তৎকালীন নিরামিশাষী নিরীহ ব্রাহ্মণের চরিত্রগত পার্থক্যের আর পাঁচটা কারণের মধ্যে আহার্যের প্রভেদও যে ছিল একটি তাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! আবার খাদ্য-প্রকরণের শেষ কথা হল মিষ্টান্ন—রসনা পরিতৃপ্তির জন্য যা শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। অতএব সব সমাজেই মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রণালী যে বেশ ইলাহী ও জটিল এক ব্যাপার তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বহুদিনের চর্চায় এ সুকুমার শিল্পটি বাঙালী সমাজে এতই বিশিষ্টতা ও স্ফূর্তিলাভ করেছে যে এবিষয়ে রীতিমত অধ্যয়ন হওয়া উচিত।

ছেলেবেলায় যখন ঢাকায় ছিলাম তখন সেখানকার প্রাণহরা ও ছানার অমৃতি আর পাঁচজনের মতেই স্বাদু ছিল আমারও কাছে। সে বয়সেই নাটোরের কাঁচাগোল্লা, পাবনার দই, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাঠা, মুক্তাগাছার মণ্ডা প্রভৃতির খ্যাতি কানে এসে পৌঁছেছিল। তারপরে, অনেক দিন 'দ্যাশ-ছাড়া' বলে বাংলাদেশের আর কোথায় কি কি মিষ্টান্ন পাওয়া যায় সেকথা আজ আর সঠিক বলতে পারব না। তবে পরবর্তী জীবনের প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গে কেটেছে বলে সেখানকার খবর কিছু কিছু রাখি।

জয়নগরের পরে ড্যাশ দিয়ে কেউ যদি বাকী শূন্য স্থান পূরণ করেন তবে তাবৎ পশ্চিম-বঙ্গবাসীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও বলব উত্তম—মোয়া। তেমনি কৃষ্ণনগরের পরে সরভাজা, সরপুরিয়া; বর্ধমানের পরে সীতাভোগ, মিহিদানা; জনাই-এর পরে

মনোহরা; মোল্লারচকের পরে দই আর বাগবাজারের পরে স্পঞ্জ রসোগোল্লা। তালিকার এখানেই শেষ নয়—আরও অনেক অনেক আছে। সব কটি নাম—আমি অন্তত যে কটি জানি—যদি উজাড় করে না বলি তাহলে ভোজনরসিকদের কাছে মহাপাতকের ভাগী হব। লালা-ক্ষরিত রসনায় তাঁরা যেসব অভিশাপবাণী উচ্চারণ করবেন তা শোনার থেকে ফর্দ'টা প্রকাশ করে ফেলাই ভাল। শক্তিগড়ের ল্যাংচা, সিউড়ির মোরব্বা, রাণাঘাটের পানতুয়া বা শান্তিপুরের নিখুঁতির নাম প্রথম কিস্তিতেই যে বলিনি সেজন্য অনেকেই হয়ত আমার দোষ ধরবেন। তেমনি বহরমপুরের কাশিমবাজারের ছানাবড়া, বেলদার কাজু-সন্দেশ, মালদহের ক্ষীরকদম্ব বা কানসাটের চমচমকে তৃতীয় কিস্তিতে নিয়ে আসবার অপরাধ অনেকের কাছে অমার্জনীয় হতে পারে। বস্তুত 'আপরুচি খানা' এই সূত্র অনুসারে একই মিষ্টান্ন যে সকলের সমান ভাল লাগবে এমন কোন কথা নেই। মুড়াগাছার ছানার জিলিপি, বেলেতোড়ের ম্যাচা, শিয়াখালার ছানার গজা বা আড়ংঘাটার রসোগোল্লার একান্ত অনুরাগীও যথেষ্ট আছেন। আবার এমন মিষ্টান্নরসিক হয়ত একেবারে বিরল নন যাঁরা শিলিগুড়ির ক্ষীরের সিঙাড়া, ধনেখালির খৈচুর, খানাকুলের কারকান্ডা বা চন্দননগরের তালশাঁস সন্দেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিছক বহুলায়তনের জন্য প্রসিদ্ধ এমন মিষ্টান্নও কিছু কিছু আছে—যেমন কামারপুকুরের জিলিপি ও তাঁতিপাড়ার (বীরভূম জেলা) বাতাসা ও কদমা। গুণ-গুণের থেকে পরিমাণ যাদের কাছে মূল্যবান এসব খাবারের প্রতি তাঁরা পক্ষপাতিত্ব দেখালে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মিঠাই তৈরীর ব্যাপারে বাঙালীর স্থান ভারতবর্ষের শীর্ষে। দেশের আর কোন অঞ্চলে এত রকমারি খাবার কল্পনাও করা যায় না। বাঙালীর স্বকীয় উদ্ভাবনী প্রতিভা তো এর পেছনে আছেই আর আছে উপকরণ নির্বাচনে গোঁড়ামির অভাব। শেষ কারণটির কথা আর একটু বুঝিয়ে বলি। বাঙলা দেশ ছাড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রান্তেই যে দুধ থেকে ছানা উৎপন্ন করা হয় না—অন্তত খুব সম্প্রতি-কাল ছাড়া যে করা হত না—সে কথা সকলেই জানেন। বাঙালীদের দেখাদেখি সেসব এলাকার প্রধান শহরগুলিতে হালে কিছু কিছু ছানা তৈরি করা হয় সত্য কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এখনও সনাতন রীতি বহাল আছে। এর কারণ, শুনেছি ধর্মীয়। গরু যেহেতু মাতা, তার দুধ সেজন্য পবিত্র। সেই পূত পানীয়কে বলপূর্বক বিকৃত ক'রে ("কেটে") ছানা তৈরি করা অতএব অতি গর্হিত কর্ম। পাঠক লক্ষ ক'রে থাকবেন, বাংলার বাইরে ছানার তৈরি মিঠাই-এর প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। সেখানকার ক্ষীর, রাবড়ি, পাঁড়া মণ্ডা প্রভৃতি বহুলব্যবহৃত মিষ্টান্নের কোনটিরই উপাদান ছানা নয়, দুধ জ্বাল দিয়ে বা ক্ষীরে পরিণত করে

"বাবর শা'র ভিয়েন

লেগুলি তৈরি কেননা তাতে দুধকে "কাটার" (বা হত্যা করার) দোষ বর্তায় না। বাঙালীর কাছে দুধ পরম উপকারী পানীয় সন্দেহ নেই, পবিত্র হলেও হয়ত হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে যে এতখানি ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে সে কথা তার মাথায় ঢোকেনি। ফলে আমরা ছানার মতো এক কামধেনু লাভ করেছি যার কাছে চাওয়া মাত্রই বাঙালী ময়রারা থরে থরে মিঠাই পেয়েছে। ওদিকে ঘন দুধ বা ক্ষীরকেও তারা অপাংক্তেয় করে রাখেনি। তাতে বাঙালীর মিষ্টান্নের তালিকা আরও দীর্ঘই হয়েছে।

কিন্তু উপকরণ উদ্ভাবনই সব কথা নয়। তার সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-নৈপুণ্য আবার বংশগত) মণিকাঞ্চনযোগ হওয়া চাই। ছানা তো এখন বাংলার বাইরেও উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু সেসব জায়গায় ময়রারা কি স্পঞ্জ রসোগোল্লা বানিয়ে বাগবাজারের ধারেকাছেও কখনো আসতে পারবেন? বাইরের হালুইকরদের কথা বাদ দিয়েও দেখতে পাই, বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সব বাঙালী কারিগরই প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নগুলির মতো উচ্চমানের মিঠাই তৈরি করতে পারেন না। দই কোথায় না তৈরি হয়? তবু পাবনা বা মোল্লারচকের এত নাম কেন? মোয়ার উপকরণ খুবই সুলভ; তৈরির প্রক্রিয়াও কিছুমাত্র জটিল নয়। তা সত্ত্বেও জয়নগর জয়নগরই। দৃষ্টান্ত আর না বাড়িয়ে একথা হয়ত বলা যায় যে মিষ্টান্ন-শিল্পে বিশেষ বিশেষ ঘরানার অস্তিত্ব আছে। সঙ্গীত জগতে এহেন স্থানীয় বা গোষ্ঠী-গত উৎকর্ষ তো আমরা মেনেই নিয়েছি। তেমনি মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রে কুমারটুলি-কৃষ্ণনগর, বয়নশিল্পে ঢাকা-টাঙ্গাইল-শান্তিপুর-ধনেখালি, শঙ্খশিল্পে ঢাকা-বিষ্ণুপুর, চিরুণীশিল্পে যশোহর-বৈঁচিচক, মাদুরশিল্পে সবং-রঘুনাথবাড়ি প্রভৃতি স্থানের শিল্পীগোষ্ঠী এক এক বিশেষ ঘরনার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। মার্গ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঘরানার আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। প্রধান কুটিরশিল্পগুলির গোষ্ঠীগত উৎকর্ষের অনুসন্ধানও হয়েছে অল্পবিস্তর। কিন্তু কেন জানি না, মিষ্টান্নশিল্পকে কুটির-শিল্পের মর্যাদা এখনও তেমন দেওয়া হয়নি বলে এ বিষয়ে আজ অবধি খুবই কম অধ্যয়ন হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে আমরা যতটা জানি, সরভাজা-সরপুরিয়ার কারিগরদের সম্বন্ধে তার থেকে জানি অনেক কম। অথচ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, প্রায় দু'শ বছর আগে এই মৃৎশিল্পী সম্প্রদায়কে নাটোর থেকে যখন কৃষ্ণনগরে এনে বসতি করান (সেরকমই জনশ্রুতি) তখন তাঁর মতো গুণগ্রাহী ব্যক্তির দৃষ্টি নাটোরের মিষ্টান্নশিল্পীদের দিকে যে একেবারেই পড়েনি সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়ত নাটোরের কাঁচাগোল্লা সে সময়েও প্রসিদ্ধ ছিল; হয়ত সেই সুবাদে, নাটোরের কয়েক ঘর ময়রা

কৃষ্ণনগরে আশ্রয় পেয়েছিলেন; হয়ত, পরবর্তীকালে অন্য কোন কারণে, তাঁরা সরভাজা-সরপুরিয়া প্রস্তুত করাটাই বেশী সমীচীন মনে করেন। এ সবই অনুমান যা অনুসন্ধানের ফলে সমর্থিত বা অগ্রাহ্য হতে পারে। দুঃখের বিষয় এ জাতীয় কোন গবেষণা কৃষ্ণনগর বা অন্যান্য মিষ্টান্ন-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে এখনও তেমন হয়নি।

কৃষ্ণনগরের মোদক সম্প্রদায়ের আদি বৃত্তান্ত সঠিকভাবে না জানা গেলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে সেকালের রাজা-মহারাজা বা বা ধনী ব্যক্তিরা নিজ নিজ কেন্দ্রে অন্যান্য কুটিরশিল্পীদের মতো নামকরা ময়রাদেরও এনে বসতি করাতেন। চাকরান জমি ও অপরাপর সুবিধার বদলে তাঁদের দায়িত্ব ছিল দৈনিক সরবরাহ ছাড়াও বারো মাসে তেরো পার্বণের মণ্ডা-মিঠাই তৈরি করা। এ প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমাদের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির নাম করেছি। সে-তালিকায় উল্লিখিত ঢাকা, নাটোর, মুক্তাগাছা, জয়নগর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, জনাই শান্তিপুর, বহরমপুর, কাশিমবাজার কানসাট, বেলেতোড়, শিয়াখালা, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে ছোটবড় নানা ভূস্বামী বা ধনী লোকের বাস ছিল। এতগুলি জায়গার ক্ষেত্রে এই যোগাযোগটা যে একেবারেই আকস্মিক এমন মনে হয় না। বরং আর পাঁচটা কুটিরশিল্পের মতো বিভিন্ন কেন্দ্রের মিষ্টান্নশিল্প যে স্থানীয় ধনী পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করেছে, এমনই মনে হয়।

এরকম এক জনপদ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই; ঘাটাল থেকে সাত-আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়ক এ গ্রামের মধ্য দিয়েই গিয়েছে। মেদিনীপুর শহরের দিক থেকে যাঁরা যেতে চান তাঁরা মেদিনীপুর-ঘাটাল রুটের বাসে আসতে পারেন। কলকাতার যাত্রীদের পক্ষে পাঁশকুড়া রেল স্টেশনে নেমে পাঁশকুড়া-ঘাটাল রুটের বাসে ঘাটাল হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত। চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল, দাসপুর প্রভৃতি সংলগ্ন এলাকা মুসলমান আমল থেকেই, সুতী কাপড়, রেশমী বস্ত্র ও তসরের জন্য বিখ্যাত। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মিঃ ও'ম্যালীর মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ার থেকে দেখছি, সতের-আঠারো শতকের তাঁতশিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র চন্দ্রকোণার উন্নতির মূলে যে ক্ষীরপাই-এর অনেকখানি অবদান ছিল এমন কথা বলা হয়েছে। আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগে, দু'জন রেসিডেন্টের অধীনে, সুতী, সিল্ক ও তসরের কারবার করবার জন্য ইংরেজ ও ফরাসীদের এখানে দু'টি বাণিজ্যিক কুঠি ছিল। ওলন্দাজরাও তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে এসব কুঠি থেকে খরিদপত্র করতেন।

তৈরি 'বাবর শা'

উনিশ শতকের শেষদিকেও ক্ষীরপাই-এর সমৃদ্ধি মোটামুটি বজায় ছিল কেননা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এ গ্রামকে এক মিউনিসিপ্যাল শহরে পরিণত করা হয়। তখন ক্ষীরপাই-এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ন' হাজার। তারপরে, বর্ধমান-জ্বরের প্রকোপে এ গ্রামের এত লোকক্ষয় হয় যে সে আঘাত সামলিয়ে ওঠা আর সম্ভব হয়নি। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরপাই-এর বাসিন্দা ছিল মাত্র ৪,২৪৬ জন আর ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৫,৮০৩।

সমৃদ্ধির দিনে, ধনী তন্তুবায়েরাই ক্ষীরপাই-সমাজের শীর্ষে ছিলেন। প্রধানত তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় 'বাবর শা' নামে যে মিঠাইটি এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে, পশ্চিমবঙ্গের দূরবর্তী জেলাগুলিতে তা তেমন পরিচিত নয়। 'বাবর শা'—এই অদ্ভুত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। নিজ গ্রামের কৌলীন্য বাড়ানোই যাঁদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য তাঁরা বলেন, মুঘল সম্রাট বাবর শাহ খুব তারিফ করেছিলেন বলেই নাকি এই নাম। মতান্তরে, বহুকাল আগে বাবু সা (সাহা) নামে এক স্থানীয় ময়রা এর উদ্ভাবন করেছিলেন বলে এ নাম হয়েছে। এ জনশ্রুতিও সত্য না হতে পারে। কেননা, বাবু সা'র সঠিক বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। বর্তমান মিষ্টান্ন শিল্পীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে

যতটা জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় ৭০।৭৫ বছর আগেকার বিখ্যাত কারিগর আশু ময়রা ও পরাণ ময়রাই নাকি এটির উদ্ভাবক। ক্ষীরপাই-এর মিষ্টান্ন ব্যবসায় আগে সাহা, ময়রা প্রভৃতি উপাধিধারী মোদক সম্প্রদায়ের হাতেই ছিল। কালক্রমে, স্থানীয় গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের শিল্পীরা তাঁদের কাছে কাজ শিখে এখন প্রাধান্যলাভ করেছেন। তাঁদের উপাধি—দত্ত, দে, হালদার, চন্দ্র ও নাগ। ক্ষীরপাই-এ এখন যে প্রায় তিরিশ ঘর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর বাস তার মধ্যে সাবেক মোদক সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৫।৬ ঘরের বেশি নয়; বাকিরা গন্ধবণিক। তাঁত শিল্পের মতো এ শিল্পটিরও অবনতি হয়েছে; ৩০।৪০ বছর আগেকার প্রায় পঞ্চাশ ঘর কারিগরের মধ্যে অনেকেই এখন অন্য জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন।

'বাবর শা' তৈরির উপকরণ খুবই সামান্য—ভাল ময়দা (কারিগরদের ভাষায় 'রোল ময়দা') ঘি (অভাবে বনস্পতি, যা এখন বহুলব্যবহৃত) ও চিনির রস। ময়দা ভালভাবে ময়ান দেখে জল মিশিয়ে উপযুক্ত ঘনত্বের সলিউশন করে নিতে হয় প্রথমে।

...র পরে, কোন ছোট বাটি কাত করে বা ফুটো পাত্র থেকে সে সলিউশন ফোঁটা ফোঁটা ফেলা হয় কড়ায়-চাপানো গরম ঘিয়ের (অথবা বনস্পতির) মধ্যে। ফোঁটাগুলি যাতে ছড়িয়ে যেতে না পারে সে জন্য ঘিয়ের মধ্যে এক লোহার বেড়ি ডোবানো থাকে। প্রথম স্তর ফোঁটা ফেলবার পর (সেগুলি ইতি-মধ্যে বোঁদের আকারে পরস্পরের সঙ্গে লেগে যায়), দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্তরের ফোঁটাগুলি এমনভাবে ফেলা হয় যাতে মধ্যখানটা স্তূপের মতো উঁচু হয়ে উঠলেও ঠিক কেন্দ্রের অংশটা ভরাট না হয়ে সেখানে একটা ফুটো থাকে। ভাজা শেষ হলে চিনির রসে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে নিলেই 'বাবর শা' তৈরি হয়। দেখতে অনেকটা মৌচাকের মতো ও খেতে মচমচে এ জল খাবারটি উত্তর মেদিনীপুর, দক্ষিণ বাঁকুড়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম হুগলী জেলায় খুবই জনপ্রিয়।

'বাবর শা'র নাম আগে শুনে থাকলেও ক্ষীরপাই-এ গিয়েছিলাম প্রধানত সেখানকার [illegible] টেরাকোটা মন্দিরগুলি কভার করতে ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর-বাড়ির দেশ দেখতে। গ্রামের হাটতলার পাশেই যে এক মন্দির আছে তাতেই মনোযোগ এত নিবদ্ধ ছিল যে, অদূরের দু'তিনটি খাবারের দোকানের দিকে প্রথমে নজর পড়েনি। মন্দিরের ছবি তোলা ও নোট লেখা শেষ হলে টের পেলাম বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে খুব। অতএব বঙ্কিম দত্ত মহাশয়ের দোকানের সামনের বেঞ্চিতে এসে বসলাম। তিনিই তখন ক্ষীরপাই-এর শ্রেষ্ঠ ময়রা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। (আশা করি তিনি এখনও জীবিত আছেন)। তাঁর ও আশপাশের দোকানের তাঁর সহকর্মীদের কাছে যা শুনেছিলাম তার সবটাই প্রায় বলেছি। বাকিটা চাক্ষুষ দেখলাম। ভিয়েন তখন চড়েছে; কিছু 'বাবর শা' রসে চোবানো আছে, কিছু ভাজা হচ্ছে। পটাপট কয়েকটা ছবি তুলতেই খাতির বেড়ে গেল। তার পরে নোটবই হাতে যখন বিস্তারিত বিবরণ লেখা শুরু হল, তখন আর সন্দেহ রইল না আমি নিশ্চয়ই খবর কাগজের রিপোর্টার। আজ হোক, কাল হোক, দত্ত মশায়ের কথা, তাঁর দোকানের কথা নিশ্চয়ই ছাপার অক্ষরে বেরোবে। ফল যা হল তাকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। বেশ বড় একখানা বগি থালায় চারটি প্রমাণ সাইজের 'বাবর শা' নিয়ে তিনি নিবেদনের ভঙ্গিতে আমার সামনে এনে ধরলেন। ক্ষুধানল তখন এতই উদ্দীপ্ত যে আপত্তি যেটুকু করেছিলাম তা নিতান্তই মৌখিক।

"পাত্রখানা শূন্য" করবার পর অল্প দু'একটা কথা হয়েছিল দত্ত মশায়ের সঙ্গে। তিনি সখেদে বললেন—বড় সাইজের কোন অর্ডার ছিল না বলে মাঝারি সাইজের 'বাবর শা'-ই আপনাকে দিতে বাধ্য হলাম। আমার পেট তখন টইটুম্বুর। অবিবেচক কোন খরিদ্দার বড় সাইজের আগাম অর্ডার দিলে বিপদেই পড়তাম। লোহার বেড়ির পরিধি বড় করে 'বাবর শা'র আয়তন বড় করা যায়। কুটুম্বিতার জন্য সেরকম বায়নাও পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে। আগেকার কালে ধনীদের উৎসবে অস্বাভাবিক বড় আকারের 'বাবর শা' তৈরির নানা কাহিনী এখনও এ অঞ্চলে বেশ প্রচলিত।

(ক্রমশ)

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

ভ্রম সংশোধন

গত ৯ পৌষের দেশ পত্রিকায় শ্রীদীপক ভট্টাচার্যের চিঠিতে (পৃঃ ৮১৬) 'দেখা হয় নাই' সিরিজের 'অনসং' নিবন্ধের দুটি অংশ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঙ্গত। প্রথমত, সিংলাবাজার ছোট রংগীত ও বড় রংগীতের সঙ্গমের কাছেই অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, গিয়েজখোলা (বা তিস্তাবাজার) থেকে রংপো অবধি সড়কের অবস্থান তিনি যেমন অনুমান করেছেন সেরকমই হবে।

এই সুযোগে, সমালোচনা হবার আগেই, আর দুটি অনভিপ্রেত ভ্রান্তির উল্লেখ করি। ২ পৌষ সংখ্যায় 'বংশীহারী : বৈরহাট্টা' নিবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তিটি উমা-মহেশ্বর মূর্তি বলে ও ১৬ পৌষ সংখ্যার 'চড়িদা' নিবন্ধে এক ভদ্রলোকের মুখোশ শুয়োরের মুখোশ বলে বর্ণিত হয়েছে। এই অনভিপ্রেত ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ওকে আমি ভীষণ ভালোবাসি! কেমন ক'রে বলবো ওকে?
এক মাস আগেও রাধা মোটেই চাইতো না, রমেশ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়··· এমনকি কাজেও। এখন সে রমেশের কাছেই যেতে চায় না। রমেশের মুখে দুর্গন্ধ, তাই।

"কি করি ভেবেই পাচ্ছি না। আমি কিন্তু মুখের দুর্গন্ধকে আমাদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করতে দেব না।"
"এই রাধা, অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন রে ?"
"রমেশের মুখে এমন বাজে গন্ধ ও আমার কাছে এলেই গন্ধটা আমাকে ঠেলে ফেলে দেয়।"
অথচ বিনাকা গ্রীন ব্যবহার করলে মুখের দুর্গন্ধ সহজেই দূর করা যায়। দুর্গন্ধ ও দন্তক্ষয়ের রোগজীবাণু নাশ করার জন্যে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী বিনাকা গ্রীন। তাছাড়া, এতে রয়েছে ক্লোরোফিল যা মুখের দুর্গন্ধ রোধ করার জন্যে মুখে জোগায় বাড়তি শক্তি।
"কিন্তু আমি যে ওকে ভীষণ ভালোবাসি! কেমন ক'রে বলবো ওকে ?"
"ধুৎ, বুদ্ধু! ওকে তোর কিছু বলার দরকার নেই। তোরা যে টুথপেস্ট ব্যবহার করিস, তার জায়গায় ব্যবহার কর বিনাকা গ্রীন।"
এক মাস পর—
"জানো রাধা, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন অনুভব করছি। অফিসের লোকেরাও আমাকে আরো বেশী পছন্দ করছে আর আমার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেছে।"
"হাঁগো, পরিবর্তনটা আমিও লক্ষ্য করছি।"
রাধা সব জানে। বিনাকা গ্রীনই তাদের দু'জনকে আরো বেশী কাছে নিয়ে এসেছে।
50g.
Binaca
Binaca
Green
CIBA Cosmetics
বিনাকা গ্রীনে রয়েছে ক্লোরোফিল—প্রকৃতির নিজস্ব দুর্গন্ধনাশক পদার্থ... সারা দিন আপনার মুখ তাজা মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করবে।
mcm/cg/13a ben

মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন ওঠে বৈদিক সঙ্গীতে রাগের মত কিছু ছিল কিনা এবং থাকলে সেটা কিরকমের ছিল। প্রশ্নটি চিত্তাকর্ষক কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি বললেই চলে। রাগ বস্তুটি পরিকল্পিত হবার আগে লৌকিক গীতের নানারকম রীতিনীতি ছিল, কিন্তু লোকরঞ্জনের নিমিত্ত বিশেষভাবে নানা লক্ষণসমন্বিত রাগ সংগীত রূপায়িত হয়। অপরপক্ষে বৈদিক সংগীতেও দেখা যায় সুরে এবং প্রয়োগে নানা বৈচিত্র্য ছিল। অবশ্য সেগুলি যথেষ্ট সীমিত কেননা রাগের মত তাদের ব্যাপকতা ছিল না; তথাপি যাগযজ্ঞে এবং বিবিধ ক্রিয়াকর্মে প্রযুক্ত হলেও তাদেরও বেশ কতকগুলি আঙ্গিক ও বৈচিত্র্য ছিল। সেগুলি যথার্থই অনুধাবনযোগ্য।

আসলে "সাম" বস্তুটি একটি বিশেষ গেয় মন্ত্রকে বোঝায় বা কেবলমাত্র তার সুরটুকুকেই বোঝায় সে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করা যায় না। একই মন্ত্র একাধিকভাবে গাওয়া হত এবং তার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। এইগুলিকেই বলা হত "সাম"। রাগসমূহ প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের নামে চিহ্নিত হয়নি, কিন্তু সামগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের নাম সামগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের নামে করেছেন সেভাবে তাদের নামকরণ হয়েছে। আর্যদের বিশ্বাস সাম বা মন্ত্রাদি কেউ রচনা করেননি, সেগুলি ব্যক্তিবিশেষের কাছে বিভিন্ন কারণে উদ্ভাসিত হয়েছে। এঁদের নামেই সামগুলি পরিচিত। আবার অনেক ঘটনাকে উপলক্ষ করেও সামগুলির

নাম নির্দেশ করা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ রথন্তর সামের উল্লেখ করি। এটিকে সব সামের অগ্রণী বলা যায় কেননা নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে এই সামটি গাওয়া হত। এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। এই সামটি হচ্ছে:—

অভি ত্বা শূর নোনুমোহদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র
তস্থুষঃ

হে শূর ইন্দ্র, তুমি এই জঙ্গম এবং স্থাবর জগতের স্বামী এবং সবাইকে পর্যবেক্ষ কর; দুগ্ধ প্রদান করেনি এমন ধেনুসমূহের কাছে যেমন লোকে গিয়ে নত হয় সেইরূপ আনত হয়ে আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

এই সামের মূল রূপটি একরকম এবং এর দুটি গ্রামগেয় রূপ অন্যরকম। আবার আরণ্যগেয় রূপটি আর একরকম। আসলে গ্রামগেয় বা আরণ্যগেয় রূপগুলিই গানরূপে অধিকতর প্রচলিত ছিল। এইসব রূপায়ণও অবশ্য হয়েছে বহু পরে। রামায়ণ, মহাভারতের যুগে যে সামগান প্রচলিত ছিল তা এই দুই পর্যায়েরই গান। অতএব দেখা যাচ্ছে একটি মন্ত্রের একাধিক সুর ছিল। এই সুরে অন্যান্য সামেও অর্পিত হত। কোনও একটি মন্ত্র যখন রথন্তর সামের সুরে গাওয়া হত তখন বলা হয়ত সেই সাম রথন্তরবর্ণে গাওয়া হচ্ছে।

রথন্তর সামের সঙ্গে বশিষ্ঠের নাম যুক্ত হয়েছে। তিনি এটি গেয়েছিলেন। এটি ধেনু, জল, রথ বজ্র এবং অগ্নিতে যে তেজ ও মহত্ত্ব রয়েছে তারই প্রতীক। আবার এও বলা হয়েছে যে প্রজাপতি রথন্তর সৃষ্টি করেন। এর ধ্বনি রথনির্ঘোষের তুল্য। এই সামটি আচরণ করবার সময় রথও নাকি চলতে থাকত—"তস্মাৎ রথন্তরস্য স্তোত্রে রথঘোষম্ কুর্বীত।"

এখানে দেখা যাচ্ছে এই সামটি দুটি নামে পরিচিত হয়েছে, যেমন—"বশিষ্ঠের রথন্তর" এবং রথের ধ্বনির জন্য "রথন্তর।"

এই সব সামের নানারকম বিকৃতি ঘটান হত গাইবার সময় এবং স্তোভ যোগ করা হত। কোনও কোনও বিশেষ বিকৃতি বা বিশেষ স্তোভ ছিল এক একটি সামের বিশেষত্ব।

দিবাকীর্ত্য হচ্ছে সেই রকমগুলি সাম যেগুলির সঙ্গে একটি ঘটনা যুক্ত রয়েছে। দৈত্যরাজ স্বর্ভানু সূর্যকে অন্ধকারে আবৃত করেছিলেন। এই সামগুলি গান করে সেই অন্ধকারকে অপসারিত করা হয়। দিবাকীর্ত্যই হচ্ছে সূর্যের রশ্মি যার সাহায্যে সূর্যকে অনুভব করা যায়।

এই রকম বিশেষ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আর একটি সাম আছে যাকে বলা হয়
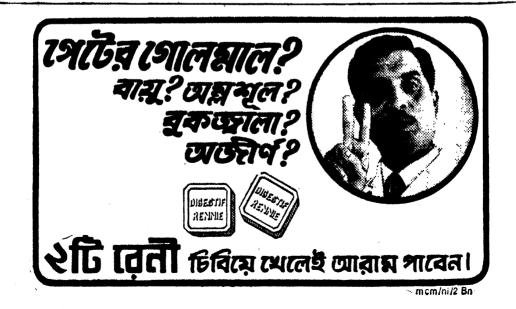
কালেয় সাম। দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে পৃথিবীর অধিকার নিয়ে কলহের সূত্রপাত হয়। দেবগণ প্রজাপতির শরণাপন্ন হলেন। প্রজাপতি তাঁদের এই সামটি প্রদান ক'রে বললেন—"এর সাহায্যে তোমরা অসুরদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে।" তাঁরা এই সামটি আচরণ করে পৃথিবী থেকে অসুরদের বিতাড়িত করলেন। তাঁরা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (অকালয়ন্ত) বলে এই বিশেষ মন্ত্রের নাম হল "কালেয়" সাম। এর অবশ্য অন্য উপাখ্যানও আছে।

ঋষিবিশেষের নামে বহু সাম বর্তমান। দু একটি কাহিনীর উল্লেখ ক'র। অঙ্গিরসের পুত্র শ্যাবাশ্ব একটি যজ্ঞ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁকে এক মরুভূমিতে নিয়ে আসেন যাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তখন একটি মন্ত্রকে দর্শন করলেন। এই মন্ত্রটি গান করে তিনি মরুর বুকে বৃষ্টি আনতে সক্ষম হলেন। অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে মোক্ষলাভ করলেন। তাঁর নামানুসারে এই সামের নাম রাখা হল শ্যাবাশ্ব। এরও উপাখ্যান ভেদ আছে।

অন্ধীগু নামক একজন গোসম্পদ লাভের জন্য একটি সাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটি গেয়ে তিনি এক সহস্র ধেনুলাভ করেন। এই সাম আচরণ করলে গোসম্পদ বৃদ্ধি পায়। এই সামের নাম "আন্ধীগব।"

একদা অঙ্গিরসবংশীয়া অকুপার নামক একটি স্ত্রীলোকের গাত্রচর্ম শুষ্ক হয়ে [illegible] ধারণ করেছিল। ইন্দ্র একটি সামগান করে তিনবার তাঁর চর্ম পরিমার্জনা করেন। এর ফলে স্ত্রীলোকটির গা সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তাঁর নামানুসারে এই সামের নাম হল "অকুপার" সাম।

এই রকম বহু কাহিনী এবং বহু নাম বহু সামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এইগুলি নানা সুরে নানা টেকনিকে গাওয়া হত। কিভাবে এইগুলি গাওয়া বিধেয় ছিল তার বিস্তৃত রীতিনীতি লিপিবদ্ধ আছে। এর প্রত্যেকটিই গান, যদিচ সে সব গানের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সম্বন্ধ নেই। তথাপি এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাগসমূহের মত সামেরও বহু বিচিত্র নাম ছিল এবং সেগুলি গাইবারও নির্দিষ্ট বিধান ছিল।

বশিষ্ঠ প্রবর্তিত রথন্তর সামের সুরের কাঠামো হচ্ছে এই রকমঃ—

[illegible], গা, মাগারাগা, মাগামা গা রা সারা মগারা সা, সাধ্া ন্া, ধ্া, মা।

অপর কোনও সামে যদি এই স্বরবিন্যাস আংশিকভাবে যোজিত হত, অথবা এই সামের পর্বভেদের মত সেটির পর্বভেদ হত, তা হলে বলা হত যে উক্ত সামের অমুক অমুক স্থানে রথন্তর-বর্ণ বা রথন্তরের পর্ব আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে স্তোভাক্ষর, যেমন হাই, অহোবা, হো, হো প্রভৃতি ধ্বনি, যেগুলি গেয় মন্ত্রের শেষে বা মধ্যস্থলে প্রযুক্ত হত, সেগুলিও সামগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করত। এক সামের স্তোভ সুরের মতই অন্যান্য সামেও যুক্ত হতে পারত।

কিন্তু, রাগের সঙ্গে এই সাদৃশ্য এমন নয় যে বলা চলে সামগায়নের সঙ্গে রাগের মিল আছে। এইটুকুই মিল যে বিভিন্ন রাগের মত বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত সামেরও অস্তিত্ব ছিল।

একটি সঙ্গীতবিষয়ক থিসিস

শ্রীমতী উৎপলা গোস্বামী তাঁর রচিত "ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" নামক একটি গ্রন্থ আমাদের আলোচনার জন্য প্রদান করেছেন। গ্রন্থটি তাঁর পি এইচ ডি'র গবেষণা। গ্রন্থে একেবারে আদি পর্যায়ের সঙ্গীত থেকে খেয়াল গান পর্যন্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। সঙ্গীতে গবেষণা সবেমাত্র শুরু হয়েছে, অতএব তথ্য এবং তত্ত্ব উভয় দিকেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে বর্তমান গবেষণাগুলি আদর্শ বলে বিবেচিত

হয়। অতএব সঙ্গীতবিষয়ক থিসিস গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যাতে সেটি নিছক একটি প্রবন্ধের পর্যায়ে না পড়ে। আরও একটি কথা—গবেষণামূলক রচনায় পরমতের উদ্ধৃতির চেয়ে গবেষক বা গবেষিকার নিজস্ব মতামত কি, সেটিই প্রমাণ সহ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এইটিই হচ্ছে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ণ। এই রকম সাহসিকতার পরিচয় পেলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হবে।

লেখিকা পরিশ্রম করে আটটি অধ্যায়ে তাঁর গবেষণাগ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছেন। এতে একটি ধারাবাহিক আলোচনা আছে। কিভাবে আমাদের কালানিবন্ধ সঙ্গীত ধ্রুপদ এবং খেয়ালে এসে পরিণত হয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অবশ্য তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের সঙ্গে কেউ কেউ একমত না হতেও পারেন তথাপি তাঁর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। উত্তম প্রচেষ্টাই গবেষণার মূল্য এবং সেদিক থেকে লেখিকা সাধুবাদ অর্জন করবেন।

শাঙ্গর্দেব

জনক জাতক জননী

সমীর রক্ষিত

কে একজন দক্ষিণদিক থেকে ছুটে এসে ফাঁকা হাটখোলার ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে উত্তর মুখে চলে গেল। তার পায়ের আওয়াজে মুহূর্তে কদমগাছের কয়েকটা কাক আচমকা ত্রাসে ডানা ঝটপটিয়ে কা কা করে ওঠে। রাত্রির জড়োসড়ো হাওয়া হঠাৎ নাড়া খেয়ে দোকানের ঝাঁপে এসে ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। তারপর ক্রমে ছুটন্ত পায়ের সে শব্দ দূরে বিশাল মাঠের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই আবার হাটখোলা এমন নিস্তব্ধ এমন শীতল হয়ে যায় যে, হঠাৎ সন্দেহ লাগে সত্যি কেউ গেল তো?
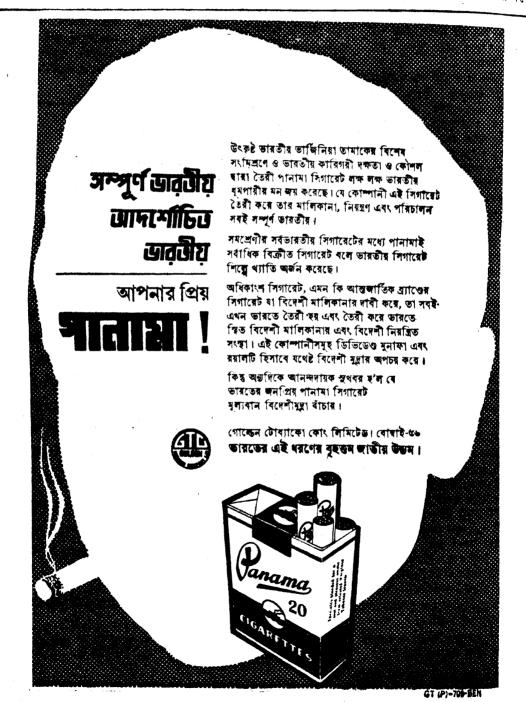
নিবারণ দরজাটা খুলে একবার দেখবে কিনা ভেবেছিল। কিন্তু তার কীরকম ভয় ভয় লাগল। দিনকালের গতিক তেমন ভাল নয়। ক'দিন থেকেই চারিদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব, কখন কী হয়!

এ সময় চকিতে গোপালের মুখটা আবার তার বুকের মধ্যে লাফিয়ে ওঠে। বস্তুত দুপুর থেকেই গোপালের জন্য তার মনটা ছটফট করছে। শুধু দ্রুত পায়ের চমকা আওয়াজে খানিকক্ষণের জন্য গোপালের ভাবনাটা চাপা পড়েছিল। বজ্জাত ছোঁড়াটা সেই যে পালাল দুপুরে তারপর থেকে একেবারে নিপাত্তা। এদিক সেদিক চারিদিকে তন্ন তন্ন করে গরু খোঁজা করা হল, তবু হদিস মিলল না। সেই থেকে নিবারণের মনে নানা আগরম বাগরম চিন্তা নানা কুভাবনা পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে, ভয়ে ডরে প্রাণটা তার শুকিয়ে এইটুকু হয়ে যাচ্ছে। পায়ের আওয়াজে মনটা আনচান করে উঠেছিল, কিন্তু সে শব্দ মিলিয়ে যেতে বুকটা আরো ভারী, শরীরটা আরো শিথিল হয়ে আসে তার।

ভাবনার কী অন্ত আছে তার? বিপদ তো কখনো একদিক দিয়ে আসে না!

কায়কারবারের অবস্থাও সংগীন। শনিবার থেকেই বিক্রিবাটা মন্দা. দেওয়ানগঞ্জের হাট মঙ্গলবারেই জমে বেশী। কিন্তু আজ হাটে না-লোক না-জন, যে দু'চারজন এদিক-ওদিক থেকে এসেছিল তারাও যেন পালিয়ে গেলে বাঁচে। আজ হলদিবাড়ি থেকে হাট-বাসও আসেনি। কোন দোকানেই হ্যাজাক পর্যন্ত জ্বলেনি—অবশ্য জ্বালানোও নিষেধ। মদন-লাল ব্রিজমোহনের কাপড়ের দোকান, খগেন ঘোষের মিষ্টির দোকান, বলাই কর্মকারের কামারশালা আর নিবারণের মুদিখানাতেও টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে, তাও ওই সাঁঝবেলায়—ধূপধুনো দেবার সময়টুকু। তারপর আঁধার গাঢ় হবার আগেই ঝাঁপ বন্ধ।

নিবারণ দোকানের এককোণে তক্তপোশের ওপরে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, তার কনুয়ের তলায় কাঠের ক্যাশবাক্স। সামনে সিলিং থেকে নামা তারে লণ্ঠন ঝোলে, টিনের বেড়ার গায়ে নিবারণের ঢাউস ছায়াটা কাঁপে। বড় একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে তার—হাটজমা দূরে থাকুক লোকে এখন হাতের মুঠোয় যে যার প্রাণ নিয়ে ঘরে সেঁধিয়েছে। ঘরেও কী ছাই বিশ্বাস আছে? বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছে যে যেদিক পানে পারছে, যাদের আত্মীয়স্বজন আছে উত্তরে হলদিবাড়ি জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি কিম্বা শিলিগুড়ির দিকে। কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্তও না। দেওয়ানগঞ্জ হাটের থেকে ওপার বাংলার বর্ডার বড়জোর তিন কী চার ক্রোশ; দিন তিনেক থেকে সেদিক পানে মিলিটারীর লাইনবন্দী ট্রাক চলেছে সারে সারে। বিশেষ করে রাত্রে—গোঁ গোঁ শব্দ উঠছে চারিদিকে, টালমাটাল বাতাস ছুটে ফিরছে সারাক্ষণ এ-গাঁ থেকে ও-গাঁয়ে।

হাটের পাশেই মেটে রাস্তা, দু' পাশে আবাদী জমি কাছে দূরে ধঞ্চের জঙ্গল আর মাঝে মধ্যে ন্যাড়া বাবলাগাছ। দূরে গাছগাছালির মধ্যে সুতোডাঙা নীরপুর দরগা গোরস্থান—ওইখানে রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিয়ে সোজা বর্ডারে। আর পিছনপানে ওই পথ নেতাজীনগর অরবিন্দ পল্লী ইস্কুল পোস্টাপিস হয়ে হলদিবাড়ির পাকা সড়কে পড়ে একটানে উত্তরে জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি।

হাটের এ তল্লাট সারাদিনভর ধুঁকছিল: চারিদিক খাঁ খাঁ—সুনসান ফাঁকা। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে দুপুরবেলায় হাটখোলা জ্বলছিল যেন, চোখ ঝলসে যায় এত তাপ, মাঠের ভেতর থেকে সাপের জিভের মত লকলকে গরম হাওয়া ছুটে আসছিল, হাটের শূন্য চালাগুলো যেন দম আটকে দাঁড়িয়েছিল, দোকানে একা ঠায় বসে বসে কখন ঢুলুনি এসে গিয়েছিল নিবারণের। হঠাৎ গৌরীর চীৎকারে ধ্বক্ করে উঠেছিল বুকটা, সেই সঙ্গে গোপালের দাপদাপানো চেঁচামেচি। খিটকেল ছোঁড়াটা আবার কোন কাণ্ড করল, দোকানের পেছনেই সামান্য তফাতে বাড়ি নিবারণের। চড়া গলায় গৌরীর উদ্দেশে —'আবার কী হইল তোমাগো?'—বলতে বলতে ছুটে গিয়েছিল সে। রান্নাঘরের দাওয়ায় গৌরী তখন হাঁপাচ্ছে—রান্নাঘরের ঝাঁপ হাট করে খোলা। গৌরীর দু' চোখ লাল সারা মুখ টসটসে, গালে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে দাগ—দাগের কোথাও কোথাও রক্তের ফুটকি।

'দেখ কী হা কইরা?'—গলা ভর্তি রাগ গৌরীর তখন। থতমত খেয়ে নিবারণ বলেছিল, 'গোপাইল্যার কীর্তি বুঝি?' 'আবার কার?'—ভ্রূকুটি করেছিল গৌরী। 'কোথায় গেল হারামজাদা?',কর্কশ গলায় চেঁচিয়েছিল নিবারণ তারপর ক্ষিপ্ত হাতে একটা চেলাকাঠ তুলে নিয়ে ছুটেছিল পেছনের সব্জি বাগানে। জামগাছের তলায় যেতে যেতে তার চোখে পড়েছিল—গোপাল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, খগেন ঘোষের বাড়ির পাশ কাটিয়ে আখ খেতের আল দিয়ে মাঠের ওপাশে বড় রাস্তায় হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

গৌরী নিবারণের পেছন পেছনই এসেছিল; 'ঘরে কী করচে দেখ আইসা!'—বলে নিবারণের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গৌরী। ঘরে পা দিয়ে গিয়ে থমকে গিয়েছিল সে—ঘরময় লণ্ডভণ্ড কারখানা। জলের মেটে কলসী ভগ্ন—ঘরময় জলের ঢল, আলনার কাপড়চোপড় মাটিতে তছনছ, পূবের দেয়ালে গৌরী আর নিবারণের বাঁধান ছবিটা টাল খেয়ে ঝুলছে। বিয়ের পরে জলপাইগুড়ি গিয়ে ছবিটা তুলিয়েছিল নিবারণ—গৌরীর মাথায় ঘোমটা একটু বেশীই টানা, মুখে চাপা ভয় মেশানো হাসি, নিবারণের গোঁফটা একটু বেশী রকম কালো—ছবির মাঝখানে ঢিল পড়ে খানিকটা তুবড়ে গেছে, কাচ ভেঙে চৌচির।

সমস্ত দেখেশুনে পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে গিয়েছিল নিবারণের, চুলের মুঠি ধরে হারামজাদাকে পেটাতে ইচ্ছে করছিল যাতে নাকমুখ দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যায়, যাতে কোনদিন আর ঢ্যাবনামি করতে সাহস না পায়। কোনদিন একেবারে খতম করে দেবে—চোয়াল শক্ত করে ভেবেছিল নিবারণ। তারপর ক্রমে হাতের মুঠি আলগা করতে করতে মন নরম হয়েছিল তার. মারতে তো কোনদিন কসুর করেনি সে—বেধড়ক ঠেঙিয়েছে কখনো বাখারি দিয়ে—কিলচড় লাথি তো আছেই কিন্তু আট ন' বছরের ওই বাচ্চা ছেলেটা—গায়ে যেন মোষের চামড়া, ঘাড় গুঁজে বসে মার খেয়ে যায়, টুঁ শব্দটি করে না। চোখ দিয়ে জল গড়ায়, মুখ লাল হয়ে যায়—নাকের পাটা ফুলে ঢোল—ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ফেলে কিন্তু চেঁচায় না। তাজ্জব কাণ্ড! যত দিন যাচ্ছে তত যেন ছোঁড়াটার জেদ বেড়ে যাচ্ছে। শরীরটা পাকিয়ে দড়ির মত হয়ে যাচ্ছে—চোখ দুটো খ্যাপা শেয়ালের মত, মাঝে মাঝে তার দিকে এমন চোখে
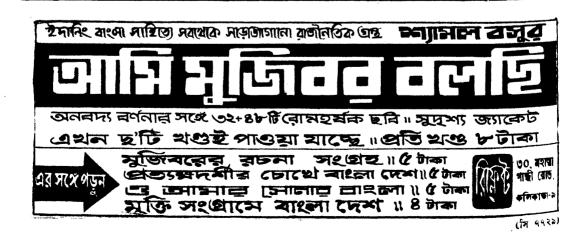
থাকায় ভয়ে নিবারণের বুকটা শুকিয়ে যায় ভেতরে ভেতরে।

'যেমন মা তার তেমনি ছা।'—গজ গজ করতে করতে হেঁসেলে ঢুকে গিয়েছিল গৌরী। কথাটা একটা সুঁচের মত খচ্ করে বিঁধেছিল নিবারণের বুকে। গৌরী দুলালীর পেটে। দুলালী তার প্রথম পক্ষ। দুলালী বেঁচে থাকতে গোপালকে মারধর করা দূরস্থান ধমকটি দেবারও জো ছিল না। তখন অবশ্য ছেলেটাও ছিল অন্যরকম। তখন নিবারণের সব ঝড় ঝাপটা যেত দুলালীর ওপর দিয়ে। নিবারণ তাকে দু' চোখে দেখতে পারত না। দিনরাত গালমন্দ করত খুঁটিনাটি নিয়ে, উঠতে বসতে গঞ্জনা দিত, চড়চাপড়ও বাদ যেত না। কিন্তু দুলালী রা কাড়ত না, মুখ বুজে সব সয়ে যেত। কারণ দুলালী জানত তাকে নিবারণের মনে ধরেনি। আর নিবারণ ছাড়া কেই বা নিত তার ফ্যাকাশে কুচ্ছিৎ হাড় জিরজিরে শরীরটা? নেহাৎ ডাক্তার জ্যাঠা ছিল।

ডাক্তার জ্যাঠা যখন বিয়ে ঠিক করে দেয়, নিবারণ দেখতেও চায়নি, তার উপায়ও ছিল না। ধারে কাছে তখন নিবারণের কেউ নেই। বাপ মারা যায় পাকিস্তানে ওপারেই দাঙ্গায়; আর মা অসুখে ভুগে এপারে এসে। মা আর দু' বোনকে নিয়ে বর্ডার পার হয়ে যখন সে এপারে এসেছিল তখন একেবারেই নিঃসম্বল। জ্যাঠাই টাকা-পয়সা দিয়ে ছোট-খাট একটা মুদি দোকান চালু করে দিয়েছে এই হাটখোলায়। বোনেদেরও পার করেছে সে-ই।

দেশ ভাগাভাগির আগের থেকেই জ্যাঠা ডাক্তারী করত হলদিবাড়িতে। একই গাঁয়ের লোক তারা। ডাক্তারীতে তার যা আয় তা বেরিয়ে যায় দশজনের পেছনেই। বিয়ের আগে থেকেই দুলালীর চিকিৎসা করত জ্যাঠা বিনা পয়সায়, একপাল ভাইবোন তারা, দাদা দরজিগিরি করত, দুবেলা জুটত কী জুটত না। জ্যাঠা বিয়ে ঠিক করল। বিয়ের আসরে দুলালীকে দেখে মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল নিবারণের। শুকনো চামড়া কুঁচকে হাড়ের সঙ্গে লেপটে আছে—গায়ে গতরে না মাংস, না রসকষ; পাটের আঁশের মত কয়েকগাছি চুল মাথায়—বিয়ের পর এসব খুঁটে খুঁটে দেখেছে আর মেজাজ বিগড়েছে নিবারণের। জ্যাঠা বলত—'কী ছেলে কী মেয়ে সময় মত বিয়ে না হলে কী শরীর ঠিক থাকে? দেখবি এখন—।' সত্যি সত্যি বিয়ের ক' মাসের মধ্যে দুলালীর অন্য চেহারা, একেবারে অন্যরূপ, ফুলেফেঁপে কলার থোড় ক'মাসের মধ্যেই। আহ্লাদে দুলালী আটখানা, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছেলে বিয়োল দুলালী—গোপালের জন্ম আট ন' বছর আগে।

তারপর আবার যে কে সেই, আজ মাথা ধরা, কাল শরীর ব্যথা জ্বর জ্বর এটা-ওটা সাতপাঁচ লেগেই থাকত। শরীরে না এক ফোঁটা রক্ত না বল, চোখমুখ ফ্যাকাশে হলুদ-বর্ণ, হাতে পায়ে শোথ আসত অমাবস্যা পূর্ণিমায়, বাতরোগের ডিপো একটা। সারা রাত নিবারণের পাশে শুয়ে কঁকিয়ে চেঁচিয়ে রাত কাবার করে দিত। তার আদরটা লুটে নেবার সামর্থ্যও ছিল না গায়ে, রাতবিরেতে নিবারণ যখন ভোগ করত তাকে, যেন দাঁতে দাঁত চেপে চিরতার জল গেলার মত করে পড়ে থাকত দুলালী। মাথায় আগুন ধরে যেত নিবারণের। তাকে হাড়েমাসে দীর্ঘকাল জ্বালিয়ে শেষমেষ একদিন টেঁসে গেল দুলালী। সারাদিনে বার কয়েক পায়খানা করে সন্ধ্যার দিকে পায়খানার কাঠের সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সে। ছেলের চীৎকার আর খগেন ঘোষের বউয়ের মড়াকান্নায় দোকান থেকে যখন ছুটে গিয়েছিল নিবারণ—তখন সব শেষ হয়ে গেছে। তারপর অন্ধকারে শ্মশানবন্ধুদের পেছনে পেছনে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেল নিবারণ শ্মশানে এবং ছেলের হাত ধরে নিজেই মুখাগ্নি করল দুলালীর। সেই মুহূর্তে যেন তার সব জ্বালা যন্ত্রণা আর ঘেন্নার বস্তায় আগুন জ্বালিয়েছিল সে।

এরপর ছ' মাস বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মৃত চরণ মণ্ডলের বৌ গৌরীকে ঘরে এনে তুলল নিবারণ। মণ্ডল বাড়িতে তার আনাগোনা ছিল আগে থেকেই—চরণের ভাই জীবন মণ্ডলের সাথে তার দোস্তি। এ নিয়ে নানাজনে নানা কথা বলে—গৌরীর সঙ্গে নাকি তার ফষ্টিনষ্টি চলছিল অনেক-দিন থেকেই। কাজেই দুলালীর মরার ব্যাপারেও নাকি একটা রহস্য আছে সবার ধারণা। এ নিয়ে চারিদিকে কানাঘুষো—কখনো আড়ালে আবডালে কখনো প্রকাশ্যে। খগেন ঘোষের সঙ্গে তার বনিবনা কম, সে ত বড় গলাতেই বলে বেড়ায়—'মরচে না অন্য কিছু—কেউ জানে?' নেতাজীনগর, অরবিন্দ পল্লী তামাম দেওয়ানগঞ্জে এই নিয়ে চিচি। সেই থেকে বড় একটা কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষে না, কারো সঙ্গেই তার ওঠবস নেই—সে প্রায় একঘরে। পারৎপক্ষে কেউ তার সঙ্গে কথাও বলে না। মরার আগে আগে দুলালীও বলত না, খুব রাত হত যেদিন মণ্ডলবাড়ি থেকে ফিরতে, রেগে যেত সে আর গজগজ করত, 'অত যদি পিরীত তয় থাকি রাইতটা অইখানে কাটাইলেই হয়?' 'যদি মনে লয় তো তাই করুম, তর কথায় নাকি হারামজাদী?'—নিবারণ ফুঁসে উঠত।

আজ আর কারো ওপর ফুঁসে উঠতে পারে না সে, একমাত্র গোপাল ছাড়া। সারা হাটে কে আছে তার সোদরবান্ধব? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লণ্ঠনের আলোটা হাত বাড়িয়ে চড়িয়ে দেয় নিবারণ। কিছুতে যেন অন্ধকার যায় না। অন্ধকার ঘোলাজলের মত পাকে পাকে ঘুরিয়ে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। নিজেকে ভীষণ একা, ভীষণ নিঃস্ব

লাগে তার। কেউ নেই তার যার কাছে মনের স্তূপাকার সুখদুঃখের কথাগুলো বলে বলে বুকটা হাল্কা করা যায়। চিন্তা ভাবনায় মাথাটা ভারী, দমটা খাটো হয়ে আসে। ছোঁড়াটা দৌড়তে দৌড়তে একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিল—মনে পড়ে নিবারণের, তারপর আরো জোরে ছুটেছিল। হয়তো তার মরমূর্তি দেখে আঁতকে উঠেছিল। কোথায় গেল, কী হল ছেলেটার কে বলবে?, পায়ের আওয়াজটা শুনে মুহূর্তে মনের মধ্যে একটা আশা ঝপ্ করে উঠে বসেছিল, কিন্তু পায়ের শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে আশাভঙ্গে ভেতরটা চৌচির হয়ে গেছে।

হাটখোলা এখন শ্মশানের মত নিস্তব্ধ। সুরেন কামারের হাপরের ফোঁসফাঁস নেই, হাতুড়ির ঠকাঠক আজ বন্ধ। নিজের দোকানের মাচার তলায় চিকচিক শব্দে ছুঁচো ছুটে বেড়াচ্ছে। আর কখনো কখনো মিলিটারী ট্রাকের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসছে দু' হাতে কারো গলা চেপে ধরলে যেমন গোঙানি তেমনি বুক কাঁপানো আওয়াজ। কখনো আচমকা হয়তো দুমদাম শব্দও কানে আসে। গতকালই

নাকি হলদিবাড়ির ওধারে ওপার থেকে কামানের গোলা এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে হেমবরে একঝাঁক শেয়াল রারা করে উঠছে। দিন রাত্রি রেডিও বলছে—যে কোন সময়ে লেগে যেতে পারে যুদ্ধ পাকিস্তানের সংগে। আর মুখে মুখে নানান গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং চারিদিক আতঙ্কে উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে। মদনলাল ব্রিজমোহন নাকি কাল সকালেই জলপাইগুড়ি তার সব মাল পাচার করে দেবে, মহাদেব সা'রও সেই মতলব। সবাই তাল কষছে, ষড় করছে, কে কোথায় পালাবে। ওপার থেকে কামান দাগলে দেওয়ানগঞ্জে এসে পড়তেই পারে।

ভয়চকিত শূন্য দৃষ্টিতে একবার নিজের দুখিনার মালপত্রের ওপর চোখ বোলাল নিবারণ। গৌরী ছাড়া তার আর কে আছে শলা-পরামর্শ করবার! সুখে দুঃখে এখন ভরসা শুধু গৌরী. গৌরী হয়তো এখন সামনে ভাত নিয়ে বসে আছে। কিংবা চিন্তা ভাবনায় সে-ও হয়তো ঘরবার করছে, রাগ করে হয়তো বা শুয়েই পড়েছে এতক্ষণে। নিবারণের পা সরে না বাড়ির দিকে যেতে: ছেলেটাকে সারা বিকেল ধরে খোঁজাখুঁজি করছে সে দেওয়ানগঞ্জের তল্লাক থেকে ওমুলুকে। সে কথা কী মানবে গৌরী? নাকি তার নিজের মনটাই মানছে? গৌরীর দোষ-ও কী কম! ছেলেকে না নিয়ে ফিরতে পারলে গৌরী কী তাকে এমনি ছেড়ে দেবে?

গৌরীর মনটা নিবারণ ভালভাবেই জানে। গোপালের প্যান্ট জামাটা কোথাও ছিঁড়ে গেলে অমনি সে সুচ-সুতো নিয়ে বসবে, নয়তো তাকে এসে ধরবে নতুন কিনে দাও। এ ব্যাপারে গৌরী নাছোড়। অথচ নিজের শাড়িটা ব্লাউজটা নিয়ে কোন কাড়াকাড়ি নেই। ছেলেটার চোখ একটু ছলছল করলে কিংবা গায়ে তাপ উঠলে—অমনি বলবে 'যাও হাসপাতাল থাইক্যা অষুধ লইয়া আস।' গোপাল রাগারাগি করে রাত্রে না খেয়েই মাঝেমধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে. কত দিন দেখেছে নিবারণ, রাত হলে ঘুমন্ত গোপালকে কোলে বসিয়ে গৌরী তাকে হাত ধরে খাইয়ে দিচ্ছে, তার চোখে-মুখে করুণ মমতা, গোপাল তখন ঘুমের ঘোরে হয়তো জানতেই পারে না, কিংবা সে তখন হয়তো ঘুমের মধ্যে দুলালীকে—তার মাকে স্বপ্ন. দেখতে থাকে।

ছেলেটা কী আর গৌরীর মনটা বোঝে? গৌরী ওর দুচোখের বিষ। ছেলেটা দিনরাত মুখিয়েই আছে—এই ভাত দিতে একটু দেরি হল. কী খাবার পছন্দ হল না, কিংবা গৌরী তাকে একটু ফাইফরমাস করল—অমনি চেঁচামেচি বাঁধিয়ে তুলকালাম করবে। ছুটে বাড়ির পেছনে শবজিক্ষেতে গিয়ে টিনের চালে ঢিল ছুঁড়তে থাকবে, গালি-গালাজ করবে আর অপেক্ষা করে থাকবে কখন গৌরী এক চিমটি রা-কাড়ে; তক্ষুনি খ্যাপা শেয়ালের মত তেড়ে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—দু হাতে কিলচড় ঘুষি মারবে, চুল টেনে ছিঁড়বে, চোখমুখ খামচে রক্তারক্তি কাণ্ড করে দেবে। তারপর ফের বাগানে গিয়ে জামরুল গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে থাকবে, বাখারি দিয়ে মাটি থেকে খুঁচিয়ে কেঁচো বার করবে কিংবা ব্যাঙ মারবে, তারপর হয়তো কখন ওখানেই ঘুমিয়ে পড়বে।

ওর মনের মধ্যে যেন আগুন—চোখমুখ ভর্তি আক্রোশ। সবাই যেন ওর শত্রু। বাবা বলে তাকে একটা ডাক পর্যন্ত দেয় না—কতকাল ওই ডাকটা শোনে না নিবারণ। মনটা বড় আঁকুপাকু করে তার। সে আদর করে ডাকলেও সাড়া দেয় না, বরং পাছে সে ডাকে এই ভয়ে যেন তফাতে থাকে, পালিয়ে বেড়ায় ছেলেটা। অথচ ওর মুখে যখন প্রথম বোল ফোটে, তখন ভরদিন শুধু—বা-বা-বা-বা করত। দুলালী দু হাতে ছেলেকে মুখের কাছে তুলে রাগের ভান করত—'বাপে তো পোঁছে না, হাঁদকে ছাওয়ালের মুখে শোন খালি বা-বা। কেন, মা মুখে আসে না?' দুলালীর হাত থেকে গোপালকে ছিনিয়ে নিয়ে নিবারণ তাকে আদরে আদরে তুমুল কাণ্ড করত—'হু হ বাপের ব্যাটা!' বলে তাকে উঁচুতে ছুড়ে আবার লুফে নিয়ে বলত—'ডাক্—ডাক্ দেখি, শুনি পরাণডা ভইর‍্যা!' কোথায় সে ডাক? হাঁকডাকের আর কোন বালাই নেই। উল্টে মাঝেমধ্যেই ওই দজ্জাল ছেলে তার মাথাটা খারাপ করে দেয়। কতদিন রাগে বেসামাল হয়ে বেদম পিটিয়েছে ওকে। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে অনুতাপে বুকটা ফেটে যায় তার, দু চোখ ছলছল করে ওঠে। তখন নিজের চুল নিজে টেনে ছিঁড়তে মন চায়, কী চণ্ডালের মত রাগ তার শরীরে? রাগ উঠলে আর মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

আর কী ফিরবে ছেলেটা? কার টানেই বা ফিরবে? কোথায়ই বা যাবে ছেলেটা? খুঁজে দেখার এতটুকু কসুর করেনি নিবারণ. সারা দেওয়ানগঞ্জ আঁতি পাঁতি করে খুঁজেছে দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। আজ রাস্তাঘাটে লোকজন কম, পাড়ায় পাড়ায় খালি বৈঠক আর গুটিচালা হচ্ছে। তবু যাকে সামনে পেয়েছে, তাকেই ছেলেটার কথা জিজ্ঞেস করেছে সে। কারো কাছে খবর পাওয়া দূরের কথা, কেউ একটু সান্ত্বনা দেয় না, গরজ দেখায় না। সারা দিনের হাঁটাহাঁটি ক্লান্তি আর উদ্বেগে যখন সে বিপর্যস্ত তখন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ইস্কুলের মাঠে ছোটখাট একটা ভিড় দেখে তার আশা জেগেছিল; অনেকে মিলে কিছু একটা আলাপ-আলোচনা করছিল। সে ভীরু পায়ে কাছে যেতেই গুঞ্জন থিতিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল. অস্বস্তিতে কয়মুহূর্ত নির্বাক দাঁড়িয়েছিল সে. তারপর বৃদ্ধ হীরু সরকারকে দেখতে পেয়ে কথা বলতে পেরেছিল—হীরাকা. খবর কী?' হীরু সরকার মুখটা এগিয়ে নিয়ে এসে বলেছিল—'কেডা, নিবারণ নি? খবর তো খুবই খারাপ, যুদ্ধ নাকি লাগবই! কোথায় যাইবা টাইবা ঠিক করব নি?' নিবারণ ক্লান্ত গলায় বলেছিল—'আমার আরেক বিপদ হইছে হীরুকা. ছাওয়ালডা পলাইছে দুপুর বেলায়. খুঁইজ্যা পাইতাছি না।' 'কও কী সাংঘাতিক কথা?' —হীরুকা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় থেকে কে যেন একটা বিকট হাসি হেসে উঠেছিল সজোরে. খগেন ঘোষই বোধ হয়। বুকটা কেঁপে উঠেছিল নিবারণের মুহূর্তে. আর দাঁড়ায়নি. 'আমি যাই হীরুকা।' —বলে সে যখন হাঁটতে শুরু করেছে পেছন থেকে বিদ্রূপমেশানো খগেন ঘোষের রূঢ় গলা সে শুনতে পেয়েছিল—'হালায় রাইফলসে লউডারে খাইচে. এইবার পোলাডারেও খাইব।'

সে দ্রুত পা চালিয়ে দিয়েছিল। আর খগেন ঘোষের কলজে-মোচড়ানো হাসি আর কথাগুলো যেন তাড়া করে নিয়ে এসে তাকে দোকানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নিঃশব্দে অপরাধীর মত দোকানে বসে আছে সেই থেকে। মাঝেমধ্যে দুলালীর ওপর অতিষ্ঠ হয়ে সে দুলালীকে ক্ষিপ্ত গলায় বলত—'এত লোকে মরে, তরে যমেও চোখে দেখে না।' দুলালীও তখন খ্যাপা গলায় বলত—'তুমিই আমারে খাইবা একদিন. তুমিই আমার যম।' —দুলালীর সেই হিংসাহিংস শব্দ এখন শুধু কানে বাজছে। রাত যত বাড়ছে, বাইরে সাড়াশব্দ যত কমে আসছে, তত যেন নিজের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে নিবারণ, অবসন্ন মাথার ভেতরে সব চিন্তা তার জট পাকিয়ে যাচ্ছে আর পেছনের দিন গুলো। হু হু করে ঝড়ো হাওয়ার মত ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে তার বুকের ভেতরে।

লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় কাঁপছে সেই সব পুরনো দৃশ্য।

এখন তার কানে দুলালীর শ্মশান থেকে উঠে-আসা সেই সাঁ সাঁ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, দুলালীর মুখটা ছাড়া আর যেন কিছু তার নজরে পড়ছে না। সামান্য হাঁ হয়ে আছে সে মুখ—ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে শুধু। সধবার মরণ, খগেন ঘোষের বউ দুলালীর পায়ে আলতা মাখিয়ে দিয়েছিল, কপালে লেপে দিয়েছিল সিঁদুর। সে সিঁদুর নাক চোখ গালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। রুক্ষ চুলগুলো ছড়িয়ে ছিল আলুথালু, কয়েক গোছা কপাল নাক পেরিয়ে বুকে এসে পড়েছিল। আর দুলালীর সর্বাঙ্গে একটা গাঢ় লাল শাড়ি জড়িয়ে দিয়েছিল খগেনের বউ, যেন সমস্ত শরীরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, একটা লোক খুন হলেও এত লাল দেখায় না—এমন ভয়ংকর। নিবারণের চোখে একবিন্দু জল ছিল না, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়নি, তবু দু চোখ মেলে তাকাতে পারেনি ভাল করে নিবারণ। হঠাৎ এ সময়ে কে একজন আচমকা 'বল হরি'—হেঁকে উঠতেই খগেন

ঘোষ, মহাদেব সা আরো আট দশটা ছেলে ছোকরা একসঙ্গে চেঁচিয়েছিল 'হরিবল।' তারপর ঘোর অন্ধকারে অনেক পথ হেঁটে গিয়ে মড়কখোলা। একগোছা পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে খগেন তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। চিতার ওপরে দুলালীর উলঙ্গ শরীর তখন কাঠ-চাপা। অন্ধকারে সেই আগুনে শুধুই তার মুখটা দেখা যায়—দু ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে—ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত চোখে পড়ে—চকিতে গোপালের দু হাত ধরে দুলালী। সেই হাঁ-মুখের মধ্যে আগুন গুঁজে দিয়েছিল নিবারণ ত্রস্ত হাতে। দেখতে দেখতে দুলালীর মুখের সে আগুন হা-হা করে ওপরে উঠে গিয়েছিল। সাঁ সাঁ শব্দে ছুটে এসেছিল বাতাস। আগুন আরো লেলিহান হাতেই কে যেন হাতের দীর্ঘ বাঁশের বাড়িতে দুলালীর মাথাটা চৌচির করে দিয়েছিল, আর ধ্বনি উঠেছিল 'বলহরি'।

গোপালকে বুকে চেপে ধরে কাঠ হয়ে দূরে বসেছিল নিবারণ। দুলালীর হাঁ-মুখে নিস্পন্দ দু ঠোঁটে তার শেষ কোন্ অভিযোগ, কোন্ অভিসম্পাত স্থির হয়ে ছিল? কোন্ কথা বলতে চেয়েছিল সে, কোন্ কথাটা সে শেষ করতে পারেনি? শরীরটা নিবারণের হাওয়ার ঝাপটায় শিউরে শিউরে উঠছিল।

আর শুধু সেদিনকার কথাগুলোই মনে পড়েছিল নিবারণের তখন। শেষ রাত থেকেই পায়খানা যেতে শুরু করেছিল দুলালী। সেদিন ছিল হাটবার। সকালে ধুঁকতে ধুঁকতে তাকে চা করে দিয়েছিল সে। দুপুরে খেতে গিয়ে নিবারণ দেখেছিল রোজকার মতই তার খাবার পরিপাটি করে ঢেকে রেখেছে দুলালী। শুধু রোজ যেমন কাছে এসে বসে থাকে তেমনি ছিল না, ঘরে চৌকিতে নির্জীব হয়ে পড়েছিল। খাবার পরে ঘরে ঢুকলে শালিখ ছানার মত চিঁ চিঁ করে দুলালী বলেছিল—'এক্ষণ হাসপাতালের থিক্যা এটটু আধটু আইনা দেও না।' 'অষুধ?'—নিবারণ ব্যঙ্গ করে হেসেছিল—'অষুধে তর রোগ সারব? অষুধ তো তুই কম খাস নাই।' বিমর্ষ এবং ক্ষীণ গলায় দুলালী বলেছিল—'বুকটা বড় ধড়ফড় করতাচে।' 'ভয় নাই তর'—ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নিবারণ বলেছিল—'অত সহজে তর মরণ নাই।' পেছন থেকে প্রায়অশ্রুত কণ্ঠে টেনে টেনে যেন কী বলেছিল দুলালী—বোধ হয়—'কথায় কথায় অত মরণ মরণ কইয়ো না—ভাল হইব না'—

কী ভাল হবে না, কী খারাপ হবে—এ সব শোনার জন্য আর দাঁড়ায়নি নিবারণ, কে জানে তখন আরো কী বলেছিল দুলালী, কে জানে শেষ নিশ্বাসটা ফেলার সময় কী ভেবেছিল সে? সেই মুহূর্তে কোন্ কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার দু ঠোঁট ফাঁক নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল?

দোকানে কেনা-বেচার ধান্দায় ডাক্তার ওষুধ এ সবের কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। সন্ধ্যার দিকে ভিড় যত কমে আসছিল, গমগমে হাট যত নিঝুম হয়ে উঠছিল, ততই তার মনে মণ্ডলবাড়ির রাস্তাটা ভেসে ভেসে উঠছিল। ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করছিল কখন ঝাঁপ বন্ধ করবে, সব সেরেসুরে দরজায় তালা দেবে, তারপর অন্ধকার পথে মণ্ডলবাড়ির দিকে ছুটবে। জলে-ভরাট নদীর মত টৈটম্বুর শরীরে আঁটোসাঁটো শাড়ি জড়িয়ে, টান টান চোখে চড়ুইয়ের ছটফটানি নিয়ে, মাথাভরা চুল খোঁপা বেঁধে তখন গৌরী অপেক্ষা করত হাস্যিমুখে। দেরি হলে অভিমান করত। তার মনটা পড়ে থাকত ওদিকেই। দুলালীর অসুখের কথা দিনমানে তার একবারও মনে আসেনি। ব্যস্ত হাতে ঝাঁপও বন্ধ করেছিল নিবারণ কিন্তু দরজায় তালা দেবার ঠিক আগেই হঠাৎ গোপালের চিৎকার আর খগেনের বউয়ের মড়াকান্নায় ধড়াস করে উঠেছিল তার বুকটা। ছুটে গিয়েছিল সে বাড়ি। পায়খানার কাছের সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল দুলালী আর ঠিক তক্ষুনি ওষুধ ডাক্তার—এ সবের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল নিবারণের।

ডাক্তার এসেছিল শেষ পর্যন্ত, তার হাতে ওষুধ আর ইন্‌জেকশনের ব্যাগটাও ছিল কিন্তু সে সবের আর কোন প্রয়োজন ছিল না তখন। —সব শেষ হয়ে গেছে তার আগেই। চোখে একফোঁটা জল ছিল না নিবারণের, তার বিশুষ্ক দৃষ্টি কেমন অনির্দিষ্ট উদ্‌ভ্রান্তভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল, বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসতেও যেন ভয় পাচ্ছিল, পাথরের মত ওজন হয়ে উঠেছিল বুকটার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কলজেটা দু ফাঁক করে দিয়ে ধারালো ছুরির মত একটা ভাবনায় রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল নিবারণ—

তবে কী তার জন্যই দুলালী শেষ হয়ে গেল?

বোঁ করে উড়ে গিয়ে একটা গুবরে পোকা কোথায় যেন ঝপ্ করে উল্টে পড়ে, লণ্ঠনের চিমনির চারিদিকে ফর্‌ফর্ করে মেঠো পোকা উড়তে থাকে। অন্ধকার মাঠের থেকে দমচাপা মানুষের গোঙানির মত অসংখ্য ঝিঁলটার ট্রাকের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ ডিগবাজি খেতে খেতে আসছে। গভীর ঘূর্ণিস্রোতের ভেতর থেকে সহসা যেন ভেসে ওঠে নিবারণ, তার দু হাতের শূন্য তালু ঘামে জব জব করছে, সারা মুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটে উঠছে। লণ্ঠনের আলোটা কমজোরি হয়ে আসছে। পাশে দেওয়ালের গায়ে নিজের ঢাউস ছায়াটার ওপর চোখ পড়তেই আঁতকে ওঠে নিবারণ। নিজের ছায়াটার ওপরে বিরক্তি ধরে যায়—নিজের শরীরটার ওপরেই রাগ হয় তার। এই মুহূর্তে চড়া গলায় বুক ফাটিয়ে নিজের ছায়াটাকে খিস্তিখেউড় করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কার্যত অসহায় ভঙ্গিতে নিজের চুলের ভেতর দিয়ে আঙুলগুলো চালিয়ে দিতে দিতে অকারণে চুলগুলো খামচে ধরে সে। ভারী মাথাটা যেন তার ধড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে।

কিছুতেই উঠতে ইচ্ছা করে না, যেন দীর্ঘকাল ধরে নিবারণ এইখানে বসে আছে এবং এমনি বসে বসে তার সমস্ত পরমায়ু নিঃশেষ করে দিতে পারলে যেন সে বেঁচে যায়। তবু বাড়ি তাকে ফিরতেই হবে। গৌরী হয়তো ছটফট করছে—আশা নিয়ে উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে। হয়তো তাকে একলা ফিরতে দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে, তাকে গালমন্দও করতে থাকবে। তবু গৌরী ছাড়া তার আর কে আছে? রোদে তাতল অকূল মাঠের মধ্যে গৌরী একমাত্র গাছের মত এখনো তার কাছে, তার কাছে ছাড়া আর কার কাছে সুখ-দুঃখ বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা সে বলবে? তবু সব কথা কী বলা যায়? এমন অনেক কথা আছে বুকের মধ্যে যা কোনদিন মুখফুটে কারোর কাছে বলা যাবে না, বলা যায় না, সে সব কথা শুধু ভেতরে ভেতরে তীক্ষ্ম নখে আঁচড় কেটে খামচে দিনরাত তার বুকটা রক্তাক্ত করে দেবে। অসহ্য জ্বালায়পোড়ায় তাকে খাক্ করে দেবে।

ক্লান্ত শীর্ণ হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে নিবারণ। লণ্ঠনটা নামিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলতেই সামনে মাটির ওপর লাফিয়ে পড়ে আলো—ভয়েডরে অন্ধকার নড়েচড়ে ওঠে, চিকাঁচক শব্দে ত্রস্ত ছুঁচো ছুটে বেড়ায়। তালা চাবি হাতে নিয়ে স্থির চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে সারা হাট খোলা কদমগাছের ওপাশের চালাটায় একদিন রাত্রে গৌরীর সঙ্গে রাগ করে এসে শুয়েছিল গোপাল। শেষে ভয়ে রাত্রে নিজেই আবার ফিরে গিয়েছিল বাড়ি। আর কী ভয়ডর আছে ছেলেটার? দরজায় তালা লাগাতে গিয়ে আনচান মনটা হঠাৎ মরা পাতার খসখস শব্দে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কেউ কোথাও নেই। শুধু অনেককাল আগের গোপালের ছেলেবেলার কথাটা মনের মধ্যে ছুটে আসে নিবারণের।

হাটবারের দিন বাড়ি ফিরতে তার রাত হত। বিক্রিবাটা শেষ করে ক্যাশ মেলানো—টাকা রেজগি খুচরো পয়সা সব আলাদা আলাদা গোনা সাজানো—রাত বাড়ত খেয়াল থাকত না। হঠাৎ তার চমক ভাঙাত দরজার বাইরে গোপালের আওয়াজ—'ঐ বাবা আয়, ঐ বাবা আয়—' হাতে ছোট্ট একটা বাতা—লাঠির মত ধরে যেন তাকে শাসন করত গোপাল। আর ওই একটা মুখস্থ করা কথাই বার বার উচ্চারণ করত। তক্তাপোশ থেকে লাফিয়ে নেমে দু হাতে ছেলেকে তুলে নিত, আদর করে তার গালে চুমু খেত নিবারণ—'বাপুই কী চাই তোমার?' ছেলে আদেশের মত করে বলত—'লজেন।' হাসতে হাসতে নিবারণ তার হাতে লজেন্স তুলে দিত, আর চুকচুক করে লজেন্স চুষত গোপাল। অদূরে কদমগাছটার তলায় লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকত দুলালী—বলত, 'আর আদরে কাম নাই, বাড়ি ফিরলেই হয় অথন।' নিবারণ দরজায় তালা লাগিয়ে গোপালকে কাঁধে বসিয়ে ভরাট মনে বাড়ি ফিরত।

গোপাল আর কোনদিন লজেন্স চাইবে না, কোনদিন আর তার কোলে কাঁধে উঠবে না, বাবা বলে আর ডাকবে কী কোনদিন? না ডাকুক তাকে, না বলুক তার সঙ্গে কোন কথা, তবু গোপাল থাক কাছাকাছি—বেঁচেবর্তে থাক তার চোখের সামনে, গোপাল যেন কোথাও পালিয়ে না যায়,

কোন অঘটন যেন না ঘটে গোপালের। আর তখুনি নিবারণের মনে হল, গোপাল যদি এখন এই মুহূর্তে ফিরে আসে আর যদি সে তার ছোটবেলার সেই হাতে ধরা বাতা কুড়িয়ে নেয়, কুড়িয়ে নিয়ে সে যেমন গোপালকে মারে তেমনি নির্মম হাতে যদি গোপাল তাকে পিটতে থাকে তবে নিবারণ স্বেচ্ছায় উবু হয়ে হাঁটু মুড়ে বসে সারা শরীরে সে মার আজ মাথা পেতে নেবে। গোপালের মতই টুঁ শব্দটি করবে না সে। এ রকম একটা দৃশ্য আজ মনে ভাবতে ভাবতে চোখের ভেতরটা কিচ কিচ করে ওঠে নিবারণের।

......

তালা লাগিয়ে লণ্ঠন হাতে দীর্ঘ নির্বাসনের পর জেল ফেরত একটা কয়েদীর মত—সর্বস্বান্ত একটা লোকের মত হাঁটতে থাকে নিবারণ। পায়ে পায়ে পরিত্যক্ত কাগজ আর মরা পাতার খস খস শব্দ হতে থাকে। মাঠের থেকে অন্ধকার বাতাসে দম চাপা মানুষের গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলো পড়ে কদমগাছের কাণ্ডে, পুরানো খাল-বাকলে আলো অন্ধকার ঝিলমিল করে ওঠে। পরিত্রাহি চীৎকারে প্রহর জানিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠে। কদমগাছে কা কা শব্দে কাক ডানা ঝাপটায়। মনটায় ধুকপুক করে নিবারণের। পা চালিয়ে দেয় সে, কদমগাছটার ওপাশে যে চালাটায় একদিন সন্ধ্যায় শুয়ে ছিল গোপাল সেদিকে মোড় ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে যায় নিবারণ। কদম গাছের উঁচু শিখরে আঁধার জমাট বেঁধে আছে। দু চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে তার। লণ্ঠনের আলোটা চাড়িয়ে দিয়ে দু'পা এগিয়ে লণ্ঠনটা বাড়িয়ে ধরতেই যেন তার দম বন্ধ হয়ে যায় সহসা।

আঁকাবাঁকা শিকড়ের ওপরে মাথাটা কাৎ করে শরীরটা মুচড়ে দুমড়ে জড়সড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে গোপাল। মশা উড়ছে অসংখ্য—তার শীর্ণ শরীরটা যেন বলহীন—অভুক্ত অশক্ত গোপালের দিকে কয়েক মুহূর্ত পলকহীন তাকিয়ে থাকে নিবারণ। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষকে কেমন অসহায় লাগে। গোপালকে দেখেও দু চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না নিবারণ। তার হাত পা মৃদু কাঁপতে থাকে। সত্যি সেই গোপাল—তার রাগী ছেলেটা—কম্পিত হাতে লণ্ঠনটা অবশেষে নামিয়ে রেখে উপুড় হয়ে দু-হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত গোপালের শরীরটাকে টেনে তোলে নিবারণ বুকের ওপরে। গোপাল হয়তো জেগে যায় কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত তার শরীর, সে কোন বাধাই দেয় না—নিস্তেজভাবে নিবারণের কাঁধে মাথা হেলিয়ে পড়ে থাকে। শুধু তার উষ্ণ চাপা নিশ্বাস নিবারণের পিঠে এসে পড়তে থাকে।

আর তখন যেন... অনেকদিনের একটা দৃঢ় বাঁধ হঠাৎ বুকের ভেতরে ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যায় নিবারণের—বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে জমে থাকা জল হু হু করে এসে তার দু-চোখ প্লাবিত করে দেয়। যে নিবারণ কোনদিন কাঁদেনি—এমন কি শ্মশানে একজনের রক্ত মাংসের শরীরটা চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও যার চোখে জল আসেনি, সেই নিবারণ বেভুল বেহুঁশ হয়ে কাঁদতে থাকে। গোপালের গালে গলায় কাঁধে মুখ গুঁজে বিলাপ করতে করতে কাঁদে নিবারণ—'গোপাল আমার গোপাল।' গোপালের হাত মুঠো করে ধরে নিজের কপালে মুখে স্পর্শ করতে থাকে আর নির্জন হাটখোলা গাঢ় অন্ধকারে নিজেকেই শুধু সাক্ষী রেখে নিবারণ গভীর শোকে ডুবে যেতে থাকে।

এ সময়ে—হয়তো নিবারণের কান্নার আওয়াজেই—লণ্ঠন হাতে ত্রস্ত পায়ে গৌরী বেড়ার গায়ে টিনের গেটটা খুলে সেখানে একমুহূর্ত দাঁড়ায় তারপর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দ্রুতপায়ে নিবারণের দিকে এগিয়ে আসে। আত্মবিস্মৃত নিবারণ হয়তো, সেসব কিছুই লক্ষ করে না, তার কান্না থামে না। গোপালের মুখের কাছে নিজের বিপর্যস্ত মুখটা নিয়ে অপরাধীর মত সে বলতে থাকে—'তর মায়ের বড় কষ্ট দিচি—তর মায়েরে আমিই মারচি রে গোপাল।' গৌরী থমকে যায়। বিলাপের কথাগুলো তার কাছে স্পষ্ট হয়। এই প্রথম সে নিবারণকে কাঁদতে দেখল, এই প্রথম তার মুখে বিলাপ শুনল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শিথিল হাতে অনুসন্ধিৎসু আলো তুলে সে একবার নিবারণের সারা শরীর, তার অশ্রুপ্লাবিত শোকার্ত মুখটা দেখল। তারপর নিবারণ সচকিত হতেই যেমন দ্রুত সে এসেছিল তেমনি দ্রুত পায়ে সে চলে গেল।

বিস্মিত নিবারণ অবাক হয়ে গৌরীর চলে যাওয়া দেখল। এরকম সে ভাবতে পারে নি, সে ভেবেছিল গৌরী সাধারণত যেমন করে থাকে তেমনি করবে। নিবারণের কোল থেকে গোপালকে তুলে নেবে তারপর ঘরে নিয়ে তার চোখে জল দিয়ে কিংবা না দিয়েই নিজের কোলে বসিয়ে ঘুমন্ত গোপালকে নিজে হাতে খাইয়ে দেবে গৌরী। তখন তার সারা মুখ করুণ দেখাবে অথচ প্রশান্ত দেখাবে। কিন্তু গৌরীর চলে যাওয়া দেখে বিপন্ন বোধ করল নিবারণ। তার কান্না থেমে গেছে। নীরবে ডান হাতে লণ্ঠন তুলে নিয়ে শঙ্কিত পায়ে বাড়ির দিকে এগোল নিবারণ।

ধীর পায়ে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দু পা এগিয়ে থমকে গেল নিবারণ। মেঝের ওপরে দুটো পিঁড়ি পাশাপাশি পাতা—জলের ঘটির মুখ গ্লাস দিয়ে ঢাকা—যেমন থাকে, রাতে সাধারণত শোবার ঘরেই খাওয়াদাওয়া হয়। গৌরী নিবারণ আর গোপালের জন্য সব গুছিয়ে পরিপাটি করে রেখেছে। কিন্তু গৌরীকে দেখে অবাক হয়ে গেল নিবারণ। ঘরের মাঝখানে লণ্ঠন গৌরী দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার সারা পিঠে খোলা গাঢ় কালো চুল ছড়িয়ে আছে—দেয়ালের গায়ে তার বিশাল ছায়া পড়েছে। হয়তো ওখানেই—গোপালের ঢিলে তার আর নিবারণের বাঁধানো কাচ ভাঙা তোবড়ানো ছবিটা টাল খেয়ে ঝুলছে। নিজের ছায়ার দিকে মুখ করে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। তার এমন রূঢ় রুক্ষ ভঙ্গি কখনো দেখেনি নিবারণ।

নিবারণের কাঁধে ক্লান্ত মাথা রেখে নিস্তেজ হয়ে গোপাল পড়ে আছে। তাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে পা দিতে গিয়ে অপলক চোখে গৌরীর কঠিন শরীরটা দেখে হঠাৎ নিবারণের মনে হল—গৌরী কী তার বিলাপ শুনতে পেয়েছে—সে কী বুঝতে পেরেছে নিবারণের আজকের কান্না দুলালীর জন্য? কিছুতেই পা তুলে চৌকাঠ পার হতে পারল না নিবারণ এপারেই ছেলেকে বুকে নিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তখন রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙেচুরে খান্ খান্ করে দিয়ে... অসংখ্য সাঁজোয়া গাড়ি ক্রুদ্ধ ঘর্ঘর শব্দ তুলে বিপজ্জনক সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। আর ক্ষিপ্ত বাতাসে সেই দুরন্ত শব্দ বিশাল মাঠ পেরিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে আসতে লাগল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

শওকত ওসমান

“এখানে শস্যের চেয়ে টুপি বেশী।” সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ফরাসী এবং ইংরেজী দুই ভাষায় অনূদিত তাঁর “লাল সালু” উপন্যাসে নোয়াখালি জেলার এক এলাকা বর্ণনাকালে, উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এই একটি পংক্তি মারফৎ তাঁর এক যুগের মানস-আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পাক-ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় প্যান-ইসলামের ঘোর আজও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের মুসলমানেরা ঠেকে শিখেছে। তাই মনে প্রাণে বাঙালী হওয়ার জন্যে হাতে হাতিয়ার তুলে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা ক্রমশ প্রকট। অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রথম পর্যায়ে বলা হত মুক্তিফৌজ। এখন তারা মুক্তিবাহিনী। অনেকের কাছে ফৌজ শব্দই অরুচিকর। কারণ, উর্দু-ফার্সি ঘেঁষা। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত চরম প্রান্তে পৌঁছতে হয়। নচেৎ ইতিহাসে হয়ত কলকে পাওয়া যায় না।

বাঙালী মুসলমানের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার পেছনে সত্যিকার চেতনা-নির্মাণের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁদের অন্যতম মহৎ কারিগর।

প্রথমেই যে-পংক্তি উদ্ধৃত, তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। মধ্যযুগীয় পারলৌকিকতার পেছনে লেখকের বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট। তাই শস্যের উপর জোর বেশী। টুপি মধ্যযুগীয় মানসিকতার প্রতীক। একদা কামাল আতা-তুর্ক ফেজ-টুপির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। অবশ্য সেইকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মন্তব্যও স্মরণীয় : “মাথার ভেতর কী আছে, তার বিরুদ্ধেই লড়া উচিত; উপরে কী আছে, তা নিয়ে নয়।” কিন্তু সমাজবিবর্তনে এমন দু'একটি সামগ্রী-প্রতীক নিয়েই দ্বন্দ্ব চলে যদিও বিরোধের ডালপালা আরো জটিলতায় বিস্তৃত এবং গোটা ব্যাপারটাই সমানভাবে বাইরের ও ভেতরের।

আজ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ওয়ালীউল্লার “লাল সালু” উপন্যাস ১৯৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত। মধ্যযুগীয়তা-বিরোধী ঐতিহ্যের শক্তিশালী পথিকৃৎ নজরুল এবং আরো কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু তা প্রধানত কাব্যে সীমাবদ্ধ। কথাশিল্পে উক্ত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে আরো পরে, তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে। এই ধারাবাহিকতা প্রথম দিকে বেশ জোরদার ছিল। কারণ, ভারতীয়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
জন্ম—১৫ই আগস্ট ১৯২২
মৃত্যু—১০ অক্টোবর ১৯৭১

স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তখন তেমন বড় ফাটল ধরেনি বা প্রতিপক্ষদল তেমন শক্তিশালী হয়নি। দেশাত্মবোধ মাটির কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। জসিমউদ্দীনের পল্লী এলাকা তখন জাঁক করে বসেছিল কাব্যের পাতায়, যেমন বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালি” গদ্যের ক্ষেত্রে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লার “লাল সালু”র পটভূমিও গ্রাম, পূর্বসূরীদের মত রোমান্টিক রঙে রঞ্জিত। মুসলমান সমাজের এক অন্ধ কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ‘লাল সালু’র আসল কাহিনী। সেদিক থেকে বিষয়বস্তু বাস্তব। কিন্তু লেখকের ভাষা স্বপ্নিল আচ্ছন্নতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই প্রবণতা সর্বতোভাবে রোমান্টিক। অবশ্য রোমান্টিকরা প্রশান্তি খুঁজতে প্রকৃতির স্মরণস্থ হতেন। ওয়ালীউল্লার নিসর্গ বন্দনা কিন্তু উপন্যাসের পটভূমি রচনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয়। বরং তা উপন্যাসের অলংকার বিশেষ। কথকতার বিরতি না দিয়ে যেন পাঠকের দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু—উপন্যাসে নয়, গল্পে—নিসর্গ কথকতার মোটিভ বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিধৃত। ওয়ালীউল্লার একটি প্রসিদ্ধ গল্পের নাম : পাগড়ী। খান বাহাদুরের তৃতীয় পক্ষের শাদী। বিবাহ-শেষে বউ নিয়ে বাড়ি-ফেরার সময় তুমুলে ঝড়বৃষ্টি নামল। খান বাহাদুরের কাপড়চোপড় সব ভিজে সপসপে। কেবল পাগড়ীটা তিনি ভিজতে দেননি। তা আস্ত রয়েছে, পূর্ববৎ। আবার তা কাজে লাগতে পারে। নানা ব্যঞ্জনাময় এই গল্পটি লেখক শেষ করেছেন অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের টানে। ওয়ালীউল্লার শিল্পী মনের এই এক বৈশিষ্ট্য। ইঙ্গিত, ব্যঞ্জনার উপর তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল।

ওয়ালীউল্লাহ গদ্যে রোমান্টিক ঐতিহ্যের অধিকারী, কিন্তু উচ্ছ্বাস-বর্জিত : বাস্তব জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ায়ের জন্য তাঁর তাগদ সব সময় মুখিয়ে থাকত। তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গল্প : একটি তুলসী গাছের আত্মকথা। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের চেহারা ছিল ফিউডাল। তাদের জোর সমর্থক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, মোল্লা-মৌলবী ইত্যাদি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই অরাজকতার মধ্যে কয়েকজন কেরানী এক হিন্দু ভদ্রলোকের পরিত্যক্ত দালান দখল করে বসল। তারপর কালনেমির লঙ্কাভাগ। কীভাবে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে দালানের কামরাগুলো ভাগ করা যায়—তার এলোপাতাড়ি হিসেব। এতদিন ফ্যামিলিসহ শহর-বাস নসীবে জোটেনি, এবার শয্যাসুখও পাকিস্তানের বদৌলতে মুঠোর ভেতরে। তখন সরকারী অফিস এবং তার চেয়ে জরুরী অফিসারদের কোয়ার্টার দুষ্প্রাপ্য ছিল। হঠাৎ একদিন রিকুইজিশন নোটিশ এলো : বাড়ি ছাড়ো। ওয়ালীউল্লাহ গল্প শেষ করেছেন : এবার ঐ জানালায় রঙীন রঙীন পর্দা ঝুলবে।

১৯৪৮ সালে লেখা এই গল্প যেন পাকিস্তানের গোটা ভবিষ্যতের ইশারা। কয়েকটি আঁচড়ে মাত্র গল্পকথক তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই গল্পের সব চেয়ে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে মানবিকতা-বোধ। হিন্দু বাড়ি। উঠানে তুলসী গাছ। কেরানীদের অনেকের কাছে উষ্মার ব্যাপার। উপড়ে ফেলার তাগিদে অনেকে ঘোর মুসলমান। কিন্তু শেষে দেখা যায়, যিনি পাক্কা নমাজী

এবং হৃৎমোগব্যাধিগ্রস্ত, তিনিও তুলসী গাছের গোড়ায় জল দেন প্রকৃতির শোভা হিসেবে গাছটা বাঁচিয়ে তুলতে এবং ভাবেন, মালিকেরা এখন কোথায়? কাঁকিনাড়া, লিলুয়া না অন্য কোন অঞ্চলে? শেষ পর্যন্ত ধর্মান্ধতা মানবিকতার কাছে পরাস্ত। অপূর্ব এই কাহিনী। স্বাধীন বংলাদেশের পত্তন যেন ওয়ালীউল্লাহ্‌ই পূর্বে মানসচক্ষে দেখেছিলেন।

সমাজ-সম্পর্কে এই তীক্ষ্ম চেতনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে আর কোনদিন পরিত্যাগ করেনি। মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে তিনি প্রচুরভাবে খড়্গহস্ত ছিলেন, যদিও এমন চৈতন্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানের উত্থান-পতন অদ্ভুতভাবে সংগতিহীন। বরং ভুল হবে না, যদি মন্তব্য করা যায়ঃ বেঢপ। নব্য মুসলমানেরা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ সেকালে কম উপভোগ্য ছিল না। পর্দাপ্রথা, দাড়ি প্রভৃতির বিরোধিতা। 'শিখা-গোষ্ঠী' নামে খ্যাত ঢাকায় তৃতীয় দশকের কিছু পূর্বে মরহুম আবুল হোসেন কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল প্রমুখ জনেরা যথেষ্ট বদনামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন তাঁদের পূর্বোক্ত লড়ায়ের জন্য। কিন্তু দেখা গেল, মরহুম কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল—এমন দু'একজন মানুষ ছাড়া অনেকে রণে ভঙ্গ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের আকৃতি অন্যদিকে বদলে গেল। সমাজজীবনে যাঁরা ছিলেন মোল্লা-বিরোধী, রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাঁরাই মোল্লারূপে প্রবেশ করলেন। এক কথায়, মুস্লিম-লীগের সমর্থকরূপে। দ্বিজাতি-তত্ত্বের ধ্যানাদর্শে তো মধ্যযুগীয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে এই অসংগতির ব্যাখ্যা হয়ত আছে, কিন্তু তার সরলীকরণ অত সহজ নয়।

চিন্তার ক্ষেত্রে এমন অসঙ্গতি ওয়ালী-উল্লাহকে কোনদিন পেয়ে বসেনি। তাঁর "তুলসী গাছের আত্মকথা" সব সময়ই সরব ছিল।

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেব ছিলেন অতি মার্জিত রুচি এবং অতিমাত্রায় খুঁতখুঁতে। যদিও পঁচিশ বছর তাঁর সাহিত্য সাধনার ব্যাপ্তিকাল, কিন্তু পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তিনখানা উপন্যাস, পঁচিশ কি তিরিশটা গল্প এবং খানতিনেক নাটক কুল্লে সম্বল। কিন্তু গুণগত দিকে কিছুই ম্লান নয়। এদেশে ফরাসী মেজাজের প্রবর্তক হিসেবে স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী খ্যাত। বহুকাল প্যারিস প্রবাসের ফলে, সৈয়দের রচনায় কন্টিনেন্টাল নানা তরঙ্গের অভিঘাত পাওয়া যায়। ফরাসী অস্তিত্ব-বাদীদের প্রভাব আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লার উপর বেশ কিছুদিন আচ্ছন্নতা বজায় রেখেছিল। কিন্তু তার ফলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্তের অনেক বিস্তৃতি ঘটেছে। ওয়ালীউল্লার অন্যতম উপন্যাস "চাঁদের অমাবস্যা" নিতান্তই অন্তর-পরিব্রাজনা; ব্যক্তির identity বা সত্তা-চিহ্নের প্রশ্নে আকীর্ণ। কিন্তু আঙ্গিক যা-ই হোক, ওই উপন্যাস নানা দিক থেকে মূল্যবান। "চাঁদের অমাবস্যা"র কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। এক স্কুল মাস্টারের সামনে একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত। সব বৃত্তান্ত তার জানা। কিন্তু ভদ্রলোকের সাহসের অভাব, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। এমন ব্যক্তির অন্তর-আকাশের চিত্র পৌনে দু'শ পাতার উপন্যাস। ১৯৬৩ সালে লিখিত এই উপন্যাস সম্পর্কে এক সমালোচক লিখেছিলেন যে, বহুদিন প্রবাস জীবনযাপনের ফলে, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন লেখক এবং তারই ফল এমন উদ্ভট উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাকে এই গোপাল ঠাকুর চিনতে পারেননি। এই উপন্যাসের একটি বিশেষ দিক ছিল ঃ ব্যক্তি গোটা দেশের জনসমাজের প্রতীক। সমালোচকের তা চোখে পড়েনি। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের অধীনে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমানরা অন্যায়-অবিচারের সম্মুখে বোবা, ভীরু এবং কাপুরুষ ছাড়া আর কী? আঙ্গিকের নতুনত্ব অনেকের বোধ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। এমন কী বইয়ের নামেও অনেক পাঠক বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'কাপুরুষের কাহিনী' নাম দিলে হয়ত সমালোচকের বিভ্রান্তি ঘটত না। এই উপন্যাসের আসল বৈশিষ্ট্য, কেবল নায়কের মানস-রঙ দিয়ে সমগ্র পরিমণ্ডল-সৃষ্টির চেষ্টা। সৈয়দ নিজে ছিলেন শৌখীন চিত্র-শিল্পী। বিখ্যাত প্রকাশন-সংস্থা স্যাটো এন্ড উইন্ডাস কর্তৃক প্রকাশিত ওয়ালীউল্লার 'লাল সালু'র ইংরেজী অনুবাদ 'Tree without Roots' (ট্রি উইদাউট রুটস') গ্রন্থের প্রচ্ছদপট তাঁর নিজেরই আঁকা। বাংলা উপন্যাসে নির্বস্তুক চিত্রশিল্পের ধারার কথকতার প্রবর্তন আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কনের পদ্ধতিতেই সাধারণত বাঙলা উপন্যাস লেখার রেওয়াজ চালু। কল্লোল যুগে মানস-পরিব্রাজনা শুরু হয়। কিন্তু তা ডালপালা মেলার খুব সুযোগ পায়নি। ওয়ালীউল্লাহ সেদিক থেকে এক প্রত্যন্ত সীমায় গিয়ে পৌঁচেছিলেন।

অবিশ্যি "লাল সালু"র যুগেই সৈয়দের মধ্যে এই প্রবণতার বীজ উপ্ত ছিল। পূর্বেই উল্লেখিত, স্বপ্নিল আচ্ছন্নতার দিকে আকর্ষী সৈয়দের ভাষা। কিন্তু সমাজিক ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি কড়া পাহারার মধ্যে। ওয়ালীউল্লার তিনটি নাটকের মধ্যে 'তরঙ্গ-ভঙ্গ' বিশেষ মূল্যবান। যিনি আসামী তিনিই বিচারক সেজে আছেন। আইয়ুব খানের শক্তি দখলের অব্যবহিত পরেই ওয়ালীউল্লাহ এই নাটক লেখেন। কর্মস্থল প্যারিস। প্রবাস-জীবন। কিন্তু মনের দিক থেকে দেশের অতি কাছাকাছি না থাকলে অমন অনুভব অসম্ভব। 'লাল সালু'র জগৎ সৈয়দ অতিক্রম করেছিলেন আরো গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়ে।

অতি অসহজ-পাঠ্য ওয়ালীউল্লার "কাঁদো, নদী কাঁদো" তিন শ' পাতার উপন্যাস। এখানে সব চরিত্র ছায়াভাব: কখনও যে-যার মনের, কখনও ঘটনার। কিন্তু তাদের রচিত পরিমণ্ডল বা জীবন-বেদ পাঠে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। সোজা-সুজি গল্পপাঠের রুচি বাঙালী সমাজে এমন চালু যে কঠিন পরিশ্রমে পাঠকের ঘোর অনীহা। এই ক্ষেত্রে লেখকের অপরাধ হয়ত আছে। মূল্যবান আস্বাদের জন্য প্রচুর মেহনৎ প্রয়োজন—লেখকের পক্ষে এমন দুঃসাহস দেখানো প্রায়ই বিরল। ওয়ালীউল্লাহ সীরিয়াস পরীক্ষার ঝুঁকি নিতে কোনদিনই পেছপা হননি।

পাকিস্তানী জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রের দাপটে বাংলা বইয়ের আমদানী দুই বঙ্গের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তাই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এখানে প্রায় অপরিচিত, যদিও তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়ন-চারা' এই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সনে। প্রকাশক ঃ পূর্বাশা সম্পাদক স্বর্গীয় কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য। রসিক ব্যক্তি তখনই এই উদীয়মান কথাশিল্পীকে চিনে ফেলেছিলেন। ওয়ালী-উল্লার "কাঁদো, নদী কাঁদো" উপন্যাস সমঝদারদের পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামমুখর পটভূমি বুঝতে তাদের বিলম্ব হবে না। "কাঁদো, নদী কাঁদো" উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র খাতিব মুনশী প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, তিনি তাঁর আজন্ম-অধ্যুষিত কুমারডাঙার অধি-বাসী। এ যেন বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আত্মজিজ্ঞাসার অগ্নিপরীক্ষায় আবিষ্কৃত বাংলাদেশ। আরব দেশের মরুভূমি, উট, খোর্মাবৃক্ষের প্রেমে দশ-দশা বাঙালী মুসল-মান স্বদেশের নদ-নদী নিসর্গ-বাহার শত শত বছরেও দেখতে শেখেনি। স্বৈরতন্ত্রের বেইজ্জতির হাটে তাই বেচা-কেনা গরু-ছাগলের দশা ছিল তার। নদীমাতৃক বাংলা-দেশ। তার সত্যিকার লেখক-সন্তান উপন্যাসের শেষ পংক্তিতে সখেদে বিলাপ রেখে যান, "কাঁদো, নদী কাঁদো"।

নদী আর ক্রন্দনমুখরা নয়। শত প্রহরণ-ধারিণী, উচ্ছল মাভৈঃ মন্ত্রের তরঙ্গ-প্রসবিনী। বাংলাদেশ আজ মুক্ত। পরম দুঃখ, আন্তর্জাতিক মনের অধিকারী ওয়ালীউল্লাহ যে-দেশের প্রতি এত অগাধ প্রেম পোষণ করতেন, তাকে ছিন্নশৃঙ্খল দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর সব সম্ভাবনার বিকাশ নেপথ্যে থেকে গেল।

ইয়াহিয়ার চল্লিশ সওয়াল

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪২ সালে এক্রামুদ্দিন আহমেদ আমাদের পাশের বাড়িতে ভাড়ায় এলেন। ভদ্রলোক ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্। মুখখানি সৌম্য। ক'দিন পর পর দাড়ি না কামালে একদম লর্ড স্যালসবারির মত দেখাত। ব্রিটিশ হিস্ট্রির বইতে সে রকম একখানা মুখচ্ছবির সঙ্গে বজলার বাবার খুব মিল ছিল। বজলুর রহমান আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ওর বড় ভাই ফেরদৌসদা মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠন করতেন। মেজ ভাই সামসুর বইয়ের দোকানে বসত আর ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে তৈরি হত। তারপর ফতিমাদি। আমরা বজলার দেখাদেখি ফতিমা বু বলে ডাকতাম।

তারপর বজলা—বজলুর রহমান। স্কুলে রাপিড রিডিংয়ে টেলস ফ্রম গ্রীক ট্র্যাজেডিস পড়ানোর সময় ডায়ানা আর বিষাদ আচ্ছন্ন আগামেমননের গল্প শুনতে শুনতে বজলার ছবি ভেসে উঠত চোখে। সাক্ষাৎ অ্যাপোলো।

তারপর সিরি। আমার বোনের বান্ধবী ছিল।

অবশেষে ছক্কু। ভাল নাম মুজিবর রহমান।

এদের নিয়েই ছিল এক্রামুদ্দিন আহমেদের সংসার। একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানের পরিবার। তিনি নিয়মিত রোজা রাখতেন। পায়ে তালতলার চটি পরতেন। বাড়িতে লুঙ্গি, বাজার যাওয়ার সময় উঁচু করে ঝোলানো কোঁচাসুদ্ধ ধুতি, স্কুল ইন্সপেকশনে বেরোলে ঢিলেঢালা ফুলপ্যান্টের ওপর গলাবন্ধ কোট চাপাতেন।

এবারে গিয়ে দেখি পাঠশালায় সেই ছোট্ট ছক্কু খুলনা দৌলতপুরে ব্রজলাল সরকারী কলেজে অংকের প্রফেসর মুজিবর রহমান। গম্ভীর, পোশাকে অনাড়ম্বর অথচ ফিটফাট। দেখলে সমীহ করতে হয়।

ফেরদৌসদা খুলনা ন্যাপের সভাপতি। দেহ কিছুটা জীর্ণ। বিষণ্ণ।

সামসুরেরা বইয়ের দোকানদার ও প্রকাশক।

ফতিমা বু ঢাকার ডাক্তার। ধানমণ্ডীতে থাকেন।

বজলা ঢাকায় সিদ্ধিরগঞ্জে ইলেকট্রিক পা ও য়া র হাউসে সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার।

সিরির বর মহাবুবর রহমান ডাক্তার। পশ্চিমবঙ্গের রিপন স্কুলের ছেলে। বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা ও চিকিৎসক।

এক্রামুদ্দিন আহমেদ বেঁচে নেই।

পারিবারিক সেই ভাড়াবাড়িতে শুধু মুজিবর রহমানকে পেলাম। পরিচয় দিতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। এই গুরুগম্ভীর যুবকটি সাবেক ও নতুন দুই খুলনা (জনসংখ্যায় ঢাকার পরেই সম্ভবত দ্বিতীয়) দেখেছে। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে পরিবর্তনটুকু চিনিয়ে দিচ্ছিল।

এক সময় বলে উঠল, আগে আমরা বলেছিলাম হিন্দুদের সঙ্গে থাকব না। এবার বলতে হল পশ্চিমার সঙ্গে থাকব না। ইন্ডিয়ায় বসে আমাদের ঝগড়াটা বাজে মনে হয়, তাই না?

বছর দশেকের ছোট। অংকে প্রথম হয়ে আয়ুবের কাছ থেকে মেরিট সার্টিফিকেট পেয়েছিল। রিসিভ করেনি। বিদেশে পাড়ি দেওয়ার স্কলারশিপ রিফিউজ করেছে। এসব কথা আমাকে নিজে থেকে বলেনি ছক্কু। দৌলতপুরে কলেজে অধ্যাপকদের কোয়ার্টারে বসে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

এক্রামুদ্দিন আহমেদের পরিবার সেই চিরন্তন বাঙালী মধ্যবিত্তের ফ্যামিলি। সেখানে বাড়ির কর্তা একা চাকরি করেন। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে পড়াশুনো করে। এক একজন এক এক রাস্তায় এগিয়ে যায়।

ছক্কু বলছিল, কারো গায়ে একটু গন্ধ থাকলে তাকেই ওরা শেষ করেছে। কে কবে একটা গান গেয়েছে, কিংবা প্রবন্ধ লিখেছে—সে-ই ট্রেটর!

হাসান আজিজুল হক দর্শন পড়ান। আত্মজা ও একটি করবী গল্পটি ওঁর। কলকাতায় বসে পড়তে পড়তে শুনেছি ভদ্রলোক নিহত।

পাক আর্মি সারেন্ডারের দু'তিন দিন আগে থেকে সন্নিহিত খালিশপুরে স্যাটেলাইট টাউনের অবাঙালী মুসলমানদের হাতে প্রচুর চাইনিজ রাইফেল, এল এম জি বিলি করেছে। সেগুলো ওরা ফেরত দেয় নি। ভারতীয় জওয়ানরা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। মাঝে মাঝেই কড় কড় কড় কড় আওয়াজ। মাথার ওপর দিয়ে আই-এফ-এর সি প্লেন যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। কখনো বিরাট ডাকঘুড়ির মত এয়ার ফোর্সের হেলিকপটারও উড়ছে আকাশে। ইন্ডিয়ান আর্মির শক্তিমান লরির পাশেই মুক্তি ফৌজ বোঝাই ট্রাক যাচ্ছে। পথে পথে তরুণ যোদ্ধা। দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা পড়ার যোগাড়। পিঠে চকচক করছে কালো রঙের সাবমেশিনগান। মিছিল থেকে ভারি পর্দায় ভেসে আসছে জোয় বাং—লা।' মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির স্বাদের কথা এমন পড়েছি আর লোকেদের বইতে।

আজিজুল হক বললেন, এখনকার অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবেন না। এপ্রিল, মে, জুন—ঝাড়া তিন মাস কোথাও এক

দিনের বেশি থাকিনি। রাতে মিলিটারি গাড়ি পাড়ার ভেতর দিয়ে পাস করত। লরিটা হয়ত চলে গেছে—কিন্তু শব্দটা পেছনে পড়ে থাকত। বিছানায় উঠে বসে ভাবতামঃ যায় না কেন? যায় না কেন?

আমরা একটা গানের দল খুলেছিলাম। সন্দীপন নাম ছিল আমাদের সঙ্ঘের। গান শেখাতেন, লিখতেন সাধন দে সরকার। দু' দিন হল তিনি ফিরে এসেছেন শহরে। বাংলাদেশে এক জায়গার লেখকের সংগে অন্য জায়গার পাঠক বা লেখককে পরিচয় করিয়ে দেবার মত অধিক প্রচারের কোন সাহিত্য-সংস্কৃতির মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা নেই। আমরা তাই যে যেখানে পেরেছি—লিখেছি, গান বেঁধেছি, গেয়েছি। পাক আর্মি সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমাদের খুঁজে বেড়িয়েছে। ইণ্ডিয়ান আর্মি আর ঘণ্টা চারেক দেরি করলে আমাদের আর দেখতে পেতেন না। পাঁচ শো লোকের লিস্ট হয়ে গিয়েছিল।

খুলনা রেডিও স্টেশনের একজন প্রোডিউসার বসে ছিলেন। বললেন, গত আট ন' মাস সব গান থেকে মুক্তি, নৌকো ইত্যাদি কথা এলোপাথাড়ি তুলে দিয়েছে ওরা।

ছকু বলল, গত পঁচিশ বছরে আমাদের এখানে একটা নিউ ক্লাশ তৈরি হয়েছে। তারা পাক জামহুরিয়তের কথা বলত। কেউ বলত ইসলামিক সোসালিজমের কথা। এরা স্বপ্নে করাচি, রাওয়ালপিনডির রাস্তায় হাঁটে। সরকারী দাক্ষিণ্যে ঠিকেদারি আর কমিশনের ব্যবসা করে লাল হয়েছে। এরাই সমাজে শিরোমণি হয়ে বসতে চাইছিল।

এরাই অনেকে সরকারী শান্তি কমিটিতে মাথা হয়ে বসেছিল।

যেমন, ব্যারিস্টার আহাদ। লোহার করাতে লোহা কাটলে যে আওয়াজ বেরোয় —আহাদের গলাও ছিল তাই। দুঃখ হয় জব্বার সাহেবের জন্য। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে জব্বার সাহেব সবার আগে বুক এগিয়ে দিয়েছেন। আহাদের নির্দেশে সেই জব্বারকে মিলিটারি ধরে নিয়ে গেল। আজও কোন খবর নেই।

শেষ দেখা যায় রেজ্জাক উকিলের বাড়ি। আজিজুল হক বললেন, রেজ্জাক উকিল দেশপ্রেমিক বুদ্ধিমান মানুষ। তাঁর স্ত্রী মাজেদা ভাবীর মুখে সব শুনেছি। একদিন গভীর রাতে মিলিটারি এসে রেজ্জাক উকিলের বাড়ি সার্চ শুরু করল। মাজেদা ভাবী ঘরের মাঝখানে দাঁড়ানো। মিলিটারি এক একখানা বই তুলে নিয়ে, কাগজপত্র তুলে নিয়ে একটা লোকের কাছে নিয়ে যায় আর সে দেখে মাথা নাড়ে। লোকটার পরনের লুঙ্গি কোমরে গোঁজা।
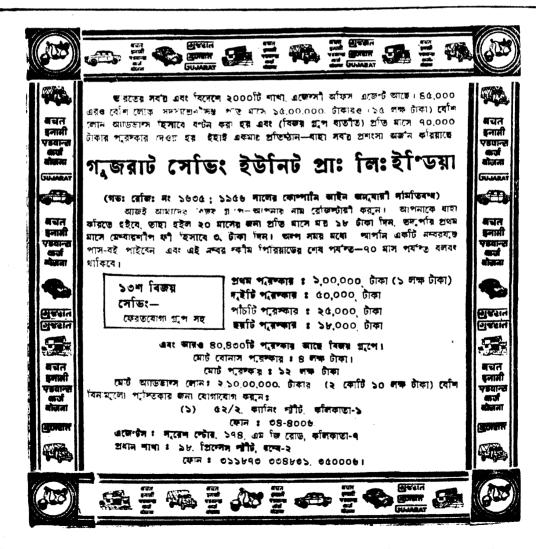
গায়ের ছেঁড়া গেঞ্জিটা কাঁধের কাছে কে আরও টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। মুখখানা মারের চোটে কাঁঠালের মত রোয়া তুলে ফুলে আছে। কিন্তু চোখ দেখে মাজেদা ঠিকই চিনতে পেরেছেন। জব্বর সাহেবের রসিক, উজ্জ্বল চোখ কারও ভুলবার নয়। জব্বার সাহেব কিন্তু এত পরিচিত মাজেদা খাতুনকে চিনতেও পারলেন না। মিলিটারি তাঁকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে নিয়ে গেল। সদাহাস্যময় জব্বর সাহেব অথর্ব বুড়োর মত খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন। তিনি আর ফিরবেন না।

কয়েকজন রিকশাওয়ালা রাজাকর হয়েছিল। জীবনের অন্য জায়গার ফ্রাসট্রেশন ওদের এই মগের মুল্লুকে এক একজন বাদশা করে তুলল। সম্পত্তি, জীবনের উপর ওদের অঢেল দখল। স্টেশন থেকে সেরকম একজন রাজাকর একদিন একজন মাস্টার মশাইর কান ধরে নিয়ে গেল বড় রাস্তা দিয়ে। কেউ বাধা দিতে গেলে সেও গ্রেফতার হবে।

দৌলতপুরে কলেজে একদিন পরীক্ষা হচ্ছে। হলের ভেতর টেবিলের ওপর বইপত্র জমা রয়েছে। মেজর বানার্জি ঘরে ঢুকে প্রিন্সিপালকে বলল, বইপত্র কেন এখানে? ভাবখানা, উনিশশতকে কোন ব্যারন তার জমিদারি দেখতে বেরিয়েছে। ২৭।২৮ বছরের ছোকরা। দিব্যি প্রিন্সিপ্যালকে ডিসিপ্লিন সম্পর্কে একটি দশ মিনিটের লেকচার দিয়ে দিল। তারপর বলল এরকম যেন আর না হয়। আই উইল আসক্ মাই মেন টু স্ন্যাপ ইউ। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব হজম করলাম।

ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন : আর্মি।

সেকেণ্ড ক্লাস : রাজাকর, মুসলিম লিগ ও জামাত ইসলাম।

খাদ্য : ১৪ থেকে ৩৬ বছরের মেয়েরা। এবং গবাদি পশু, খাসি পাঁঠা ও মুরগি।

অনুচর : পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতা : বিশেষভাবে অবাঙালী মুসলমান (বিহারীরাই বেশি)।

শিকারের বস্তু : প্রথমে হিন্দু পুরুষ আওয়ামি লীগ কর্মীবৃন্দ। তারপর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে কোন বাঙালী শিশু, যুবক, বৃদ্ধ।

বুঝলেন, কারও ঘরে আমরা কোন রেডিও রাখার অধিকারী ছিলাম না। রাখলেই ইণ্ডিয়ার স্পাই। কবিতায় আহল্লা কথাটা থাকলেই অপসংস্কৃতি! হিন্দুয়ানী। গত পঁচিশ বছর যে আমাদের কত প্রকারে খাঁটি মুসলমান করার চেষ্টা চলেছে। কোথাও কোথাও তা পাগলামিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ফিজিকসের প্রফেসর কালিপদ বিশ্বাস। আমেরিকায় ছিলেন কিছুকাল। বাঁচবার জন্যে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন মুসলমান বলে তাঁকে আলাদা শ্রেণীতে ফেলা হয়। বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ইণ্ডিয়ায় চলে যান।

ছক্কু বলল, এত করেও নিস্তার পাইনি। সামরিক বাহিনীর বড়কর্তারা এবং গেজেটেড অফিসার, প্রফেসর, সরকারী কর্মচারীর পরীক্ষা নিয়েছে। সার্কিট হাউসে পরীক্ষা হলে আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সে পরীক্ষায় ডিভিশনাল কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার থেকে সাব-রেজিস্ট্রারকেও বসতে হয়েছে।

সাইক্লোস্টাইল করা ৪০টি প্রশ্নের প্রশ্নপত্র। কোন নেগেটিভ উত্তর দেওয়া চলবে না। কোন প্রশ্ন বাদ দেওয়া যাবে না। মনে হয় মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা দফতর কিংবা সি আই এ নির্দেশিত প্রশ্নাবলী। কিংবা মার্কিন আদর্শে গঠিত সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা কর্তারা প্রশ্নের জবাব গুলো সর্ট আউট করে তাদের পক্ষে অবাঞ্ছিত লোকজন বাছাই করে লিকুইডেশনের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল।

যেমন : (১) মার্চের হাঙ্গামার পর থেকে এতদিন কোথায় ছিলেন? (যেন কবি জীবনানন্দের বিষাদ আচ্ছন্ন সেই বিখ্যাত প্রশ্ন)।

(২) ৬-দফার মধ্যে কোন দফা সবচেয়ে প্রিয় এবং কেন? (সামরিক কর্তারা শুনতে চেয়েছিল—কোন দফাই প্রিয় নয়। কিন্তু নেগেটিভ উত্তর চলবে না। যে দফাই পরীক্ষার্থীর প্রিয় হোক না কেন—সঙ্গে সঙ্গে সে সামরিক কর্তাদের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে যাচ্ছে)।

(৩) কোন্ রাজনৈতিক দল তোমার প্রিয় এবং কেন?

(৪) কোন নেতা তোমার প্রিয় এবং কেন?

(৫) মার্চ এপ্রিলে ব্যাপক অবাঙালী নিধনের কারণ কি?

(৬) বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এত সমর্থন পেল কেন? (প্রশ্নটির মজা বুঝুন! এর যে-জবাবই দেন, আপনি মেজর ক্যাপটেনদের চক্ষুশূল)।

গত জুন মাসে এই পরীক্ষা হয়েছিল খুলনার সার্কিট হাউসে। পরীক্ষায় কলেজ অধ্যাপকদেরও বসতে হয়েছিল। যেন কোন ক্যান্টনমেন্ট রিক্রুটিং অফিসার অ্যাপটিটিউড টেস্ট নিচ্ছেন। অবশ্য কিছু পার্থক্য ছিল। সার্কিট হাউসের কাছেই ভৈরব নদীতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লঞ্চ ভেড়ানোর ঘাট। তার পাশেই জেলখানা ঘাট। শহর ও আশপাশের এলাকা থেকে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান কশাই ভাড়া করেছিল। সেখানে জবাই করার ব্যবস্থাও [illegible] ছিল।

আকাশে মেঘ ও ঘন ঘন বৃষ্টি। মুক্তিবাহিনী পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। দেশে খাদ্য নেই। রাজাকর ও মিলিটারির গাড়ি এসে পছন্দ মাফিক লোকজন গেস্টাপো স্টাইলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরা আর ফিরে আসছেন না। সেই সময় এই পরীক্ষা।

(৭) আওয়ামি লিগ কিভাবে সরকারী কর্মচারীদের এতটা দলে টানতে পারল?

(৮) আওয়ামি লিগের ফাণ্ডে কত চাঁদা দিয়েছে?

(৯) সহকর্মীদের মধ্যে ৩জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম লেখ? (অর্থাৎ সেই তিনজনকে আলাদা আলাদা করে ইণ্টারোগেট করে বিপন্ন করার পাকা ব্যবস্থা)।

(১০) অফিসে রাজনৈতিক নেতা কে ছিল? স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার নাম লেখ। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কে রাজনৈতিক নেতা? (তার মানে যদি তেমন

কোন নেতা তখনো গা ঢাকা দিয়ে মিলিটারির বুলেট থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে থাকেন—তাকে এই প্রশ্নের ভেতর দিয়ে চিহ্নিত করার পাকা ব্যবস্থা)।

ছক্কু ও অন্য অধ্যাপকরা প্রশ্নগুলো স্মৃতি থেকে বলছিলেন। আমি টুকে নিচ্ছিলাম। প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষা হলেই জমা দিয়ে আসতে হয়েছিল।

(১১) সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে কোন্ অর্থনীতি পছন্দ? কোন্ কোন্ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা দরকার? (স্বাভাবিকভাবেই পাটের কথা চলে আসছে)।

(১২) জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কি? (মোক্ষম!)।

(১৩) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কতদূর চাও? ক্ষমতা হস্তান্তর চাও? কাকে করা উচিত? (এই সওয়ালের জবাব লেখার সময় সারা বাংলাদেশে ওই প্রশ্নেই কয়েক লক্ষ মানুষ মিলিটারির হাতে নিহত। ইয়াহিয়া তখন ভোটের প্রহসনে নেমেছে। চারদিকে আপনি মোড়ল গজাচ্ছে)।

(১৪) ইস্ট পাকিস্তান ও ইণ্ডিয়ার মধ্যে কি রিলেশন হওয়া উচিত? (ছক্কু বলল, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লিখেছিলাম—কনফ্রনটেশন। প্রশ্নে একটা চালাকি ছিল। ইস্ট পাকিস্তান ইণ্ডিয়ার সঙ্গে আলাদা কোন রিলেশন করতে পারে না। রিলেশন স্থির করতে পারে পাকিস্তান। ইস্ট পাকিস্তান তো অঙ্গরাজ্য)।

এবম্বিধ আরও অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল। সবগুলো ও'রা মনে করতে পারলেন না। সরকারী গেজেটেড্ অফিসারদের এই লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার পর মৌখিক পরীক্ষায় দাঁড়াতে হয়েছিল। ভাইভাভোসিতে খুলনার ডেপুটি কমিশনার (ভারতে যাকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলা হয়) রসিদুল ইসলামকে বলা হয়েছিল, ইউ আর এ সি এস পি অফিসার! ভেরি ইনটেলিজেন্ট! সি এস পি অফিসার হওয়া যেন বিদ্রুপের ব্যাপার। সি এস পি আমাদের এখানে আই এ এস।

ইসলামিক হিস্টির নতুম তরুণ [illegible], [illegible] আতঙ্ক এখনো যায়নি। আমার ছোট মেয়েটির ভয়, পাক আর্মি আবার যদি ফিরে আসে।

অন্য অধ্যাপকরা বললেন, তাহলে আর কারও নিস্তার থাকবে না। সবাই ধুয়ে মুছে সাবাড় হয়ে যাব।

অঙ্কের হেড্ অব দি ডিপার্টমেন্ট হারুণ অল রসিদ। শহরের প্রান্তে দোল খেলায় বাড়ি। সেদিক দিয়েই গল্লামারির খালে যাওয়ার পথ। সেখানেই ছিল গণ-জবাইয়ের ব্যবস্থা।

রসিদ সাহেবকে সবাই হারুণ ভাই বলে ডাকেন। তিনি বললেন, থার্ড ডিসেম্বর ব্রিগেডিয়ার হায়াত খান আমাদের ৭জনকে চায়ের নেমন্তন্নে ডাকেন। আমি কি কারণে যেন কলেজে আসিনি। জরুরী তলব পেয়ে আজিজুল হক ও'রা গিয়েছিলেন। তখন ও'রা জানতেন না ওই চা পান ও'দের পক্ষে 'না-জেনে শুনে বিষ করেছি পান' হয়ে দাঁড়াতে পারত। কেননা, স্থির ছিল, সেদিন ও'দের ডেকে নিয়ে জবাই করা হবে। পরে এ-খবর আমরা জানতে পারি। ডি সি রসিদুল ইসলাম সাহেব ও'দের প্রাণভিক্ষা করেছিলেন। পরে আমরা জানতে পারি। চায়ের টেবিলে ব্রিগেডিয়ার সাহেব পঠন-পাঠন সম্পর্কে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন মাত্র। শেষে বলেছিলেন—ডিসপার্স।

তখন ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিমান দিনে তিনবার বোমা ফেলতে আসত। সকাল ৮টায়, বেলা ১১টায় আর বিকেল ৪টায়। সকালের নাস্তা করে, দুপুরের ভাত খেয়ে আর বিকেলের চা খেয়েই যেন ইণ্ডিয়ান পাইলটরা রোঁদে বেরোতেন।

লিকুইডেশন, পার্জিংয়ের মানে কি হতে পারে আমরা ততদিনে বুঝে গিয়েছি। মক্কেল, উকিল, হাকিম কিছুই নেই। সারা শহরের ওষুধ, রোগী, ডাক্তার সবই হাওয়া। আছে শুধু রেডিও পাকিস্তান খুলনা থেকে ঘন ঘন ঘোষণা। মোছলমান, ব্রাহ্মণ্যবাদ ভারত, হিন্দু এটসেটরা। আর ছিল রেকর্ডের গান। তাতে পদ্মা সিন্ধু মিলিয়ে জোড়াতালির পদ্য। এ দেশ তোমার আমার পাকিস্তান—সোনার পাকিস্তান। সোনার বাংলার সাবস্টিটিউট তৈরি হয়েছিল।

আর কিছু সংহতি সাহিত্য গজিয়েছিল গত কয়েক বছরে। পশ্চিম পাকিস্তানে তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস বাংলায় তর্জমা হয়ে বাজারে বেরোলো : খোদা কি বান্দা। এই রকম আর কি! অপাঠ্য।

বিগত সিকি শতক কলকাতায় বসে বলেছি : আমাদের ভৈরব নদী বিরাট। আমাদের রূপসা নদী বিশাল। আমাদের খুলনা জেলা স্কুলের মাঠ—তার তুলনা হয় না। এবার গিয়ে দেখলাম ভৈরবকে যেন রোগা লাগছে। রূপসা তো তেমন চওড়া নয়। ছক্কুকে কথাটা বললাম। ছক্কু বলল, না ভৈরব, রূপসা ওরা তো এখনকার মত আগেও এরকম ছিল। তবে পাট কোম্পানিগুলোর জেটি নদীর ভেতরে গিয়ে পিলার পুঁতে নদীর ক্ষতি করেছে।

বুঝলাম, কারণ তা নয়। কিশোর বয়সের চোখে জিনিসগুলো বড় লেগেছিল। খুলনা জেলা স্কুলের মাঠ তত বড় কিছু নয়। এখন নদী বা মাঠ বোধ হয় আর বিস্মিত করে না।

একরামুদ্দিন আহমেদ (সাহেব বলতে পারছি না। ছেলেবেলায় আমরা মেসোমশায় বলতাম। তাই রীতি ছিল) রিটায়ার করে স্থানীয় মাদ্রাসায় হেড মাস্টার ছিলেন।

এই পঁচিশ বছরে ফেরদৌসদা লিগ থেকে বদলে বদলে ন্যাপ হয়েছেন। আত্মগোপন, পুলিসের ফেউ, কারাবাসে জীর্ণ হয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, এখনকার ছেলেমেয়েদের বুঝি না। ফাতিমার ধানমণ্ডীর বাড়িতে খাওয়ার টেবিল সাদা রঙের, চামচগুলো রঙীন, রান্নার যন্ত্রপাতি হরেকরকম। কিন্তু খাবার জিনিস স্বল্পস্বল্প। অথচ কায়দাকানুনে হাজারো।

আব্বা মারা গেলেন। বজলা এল না। ফাতিমা এসেছিল। ফেরদৌসদার কোথায় যেন একটা দুঃখ। কারণ বোধ হয় বউমা। প্রিয় ভাই প্রিয় বোনের কথা পরম আত্মীয়জ্ঞানে আমাকেই বলে ফেললেন।

ছক্কু গম্ভীর। চিন্তিত। আতঙ্ক মুক্তিতে দু'একবার উচ্ছ্বাস বেরিয়ে পড়ছিল অবশ্য। আবার গম্ভীর। সামসুদ্দো প্রকাশক। বদু ডাক্তার। সিরি ডাক্তারের ঘরণী। বজলা ইঞ্জিনীয়ার। ছক্কু অঙ্কের প্রফেসর।

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার যেমন হয়। বাড়ির বাবা আয় করেন একা। চার পাঁচ ভাইবোন স্কুল কলেজে পড়ে। বড় হয়। বুড়ো হয়। আলাদা হয়ে হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তাই।

ইন্সপেক্টর অব স্কুলস একরামুদ্দিন আহমেদের সংসারও তাই। বাড়িতে লুঙ্গি ও তালতলার চটি পরতেন। নিয়মিত রোজা রাখতেন। একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী হিসেবে আমার বাবার সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।

অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দিল্লী, কলকাতা ও দেশের অন্যান্য স্থানে শিল্পগুরুর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে এবং অনেক স্থলেই সুযোগমত তাঁর ছবির প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান হয়েছে। বলা বাহুল্য, কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, কারণ, শতবার্ষিকী কর্তৃপক্ষ যে ছবিগুলি নির্বাচিত করেছেন সেগুলি দেখেই বোঝা যায় যে যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক না কেন, সেগুলি সুসংরক্ষিত। তাছাড়া উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রশস্ত স্থানে বিরাট প্রদর্শনীটি সুচারুভাবে সাজানোর জন্য শতবার্ষিকী কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। প্রদর্শনীতে শিল্পগুরুর জীবনের বিভিন্ন কালে আঁকা বহু শিল্পনিদর্শন দেখা যায়, বিশেষ করে কাটুম-কুটুমের অনেক নমুনাও চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, চিন্তাধারা, জীবনব্যাপী শিল্পসাধনা ও আপন সৃষ্টি কৌশলের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পজগতে অবনীন্দ্রনাথ কিভাবে একটি নতুন মৌলিক চিত্রকলাধারার প্রবর্তন করেন, প্রদর্শনীটি পরিক্রমা করে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সুখের বিষয়, প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে প্রচুর জনসমাগম হয়। পরিচিত বহু ছবির মধ্যে শাজাহানের মৃত্যু, বণিক সিন্দবাদ, পুরীর সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্যদেব, নুরউদ্দীনের বিবাহ ও বিশেষ করে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-চিত্রমালা। কয়েকটি নিসর্গ চিত্রের নিদর্শন দেখে সকলেই মুগ্ধ হন, যেমন, মিক্স মেনস্ ভিলেজ, এনট্রান্স টু দি ক্যানাল।

প্রতিকৃতির মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বিশেষ করে শিল্পগুরুর পুত্র অলকেন্দ্রনাথের প্যাস্টেলে আঁকা প্রতিকৃতি বিশ্ব শিল্পক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রদর্শনীতে মুখোশ শিল্প নিদর্শন ও বিশেষ করে শিল্পগুরুর কাটুম-কুটুমের কয়েকটি নমুনা দেখে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। শেষোক্ত পর্যায়ে রাজহাঁস, নৌকা, ময়ূর, ঘোড়া, সজারু ও মাছ অপরূপ নিদর্শন। প্রদর্শনী চালু থাকাকালে শতবার্ষিকী কর্তৃপক্ষ একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি কর ও ক্ষিতীশ রায় শিল্পগুরুর সৃজনী প্রতিভার বিভিন্ন দিক বিষয়ে আলোচনা করেন। শিল্পগুরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব তথা শিল্পপ্রতিভা অবলম্বনে লিখিত খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি মনোজ্ঞ রচনা ক্ষিতীশ রায় পাঠ করেন। শতবার্ষিকী সমিতি এই উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পজীবন ও ভারতীয় শিল্পকলা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিষয়ে তথ্যপূর্ণ একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশিত করে সকলের ধন্যবাদভাজন হন।

*

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস-এর উদ্যোগে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনীতে ৩৪জন শিল্পীর, ভাস্কর্য কাজ সমেত ৭২টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। প্রদর্শনীটি মিশ্র জাতীয়। আধুনিক রীতির কয়েকটি কাজ দেখা গেলেও অধিকাংশ ছবিই ভারতীয় রীতির পর্যায়ে পড়ে। বিষয়বস্তু হিসাবে অনেকেই প্রচলিত পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে জলরঙ বা টেমপারায় ছবি এঁকেছেন। দু একজনের রচনায় দূরদৃষ্টি, সমকালীন ধারা ও পরীক্ষাস্পৃহা চোখে পড়ে। মাধ্যম হিসাবে সিরামিক টালি ব্যবহার করে কয়েকজন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দু' একজনের ভাস্কর্য নিদর্শনে চিন্তাশক্তির পরিচয় মেলে। ছবির দিক থেকে রুবেন দত্ত, বলাই কর্মকার, মুকুন্দ ভাদুড়ী ও প্রেমতোষ মুখার্জির কাজ প্রথমেই চোখে পড়ে যায়। প্রথমজনের রচনা রীতিমুখর, কাব্যছন্দ প্রধান ও সেই সঙ্গে আধুনিকও। এই প্রসঙ্গে গণেশ ও অপ্সরা, রাজকাহিনী, চতুষ্কোণভিত্তিক অবন পটুয়া ও বিশেষ করে মুনলাইট সোনাটার নাম করা যায়। লাল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সাদা ঘোড়া নীল আকাশ ও ভাসমান চাঁদ অবলম্বনে রচিত ছবিখানি কমপোজিশন হিসাবে প্রশংসা দাবী করে। স্পেস রিল্যাকস্ড্-এ বলাই কর্মকার গ্রাফিক প্রিণ্টের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। মুকুন্দ ভাদুড়ীর দি ক্রিয়েটার শিল্পীর পরিকল্পনা ও কারুকার্যকারকতার পরিচায়ক। জলপাই জাতীয় সবুজ রঙ ও নৌকা অবলম্বনে রচিত ...

[illegible] অ্যাপোক্যালিপ্‌স

ড্যুরের

[illegible] নিসর্গ দৃশ্য হিসাবে [illegible] এই [illegible] আর একটি ছবিও [illegible] করে—সমীর ঘোষের [illegible]। রীতিমুখর [illegible] একটি [illegible] নিদর্শন [illegible] ভারতীয় রীতির একটি ছবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইন্দ্র দুগারের পেণ্টিং (সিল্ক)। দ্বারকা চট্টোপাধ্যায়ের বেগম নাদিরাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাব-লিল রেখা অবলম্বনে রচিত ছন্দপ্রধান ছবিটি অনেকের ভাল লাগে। খগেন বাগের ব্ল্যাক ক্যাট (সিরামিক) প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশংসনীয়। ভাস্কর্য নিদর্শন হিসাবে [illegible] সেন রায়ের ফিডিং টাইম দ্রষ্টব্য। মুখ [illegible] খাদ্যকণা তুলে একটি পায়রা আর [illegible] শাবকের মুখে দিচ্ছে। দৃশ্যটি অতি পরিচিত, অথচ এটির শিল্প সম্ভাবনা বিষয়ে কেউ একালে চিন্তা করেছেন বলে জানি না। এক জাতীয় বিশেষ পাথর খোদাই করে ভাস্কর এই পরিচিত দৃশ্যটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। কবি দত্তর উওম্যানও (সিমেণ্ট) গঠন পদ্ধতির দিক থেকে উল্লেখ্য। প্রদর্শনীর অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে চিত্রিতা দে-র স্প্রিং ফায়ার (গুলমোহর), অমর নন্দনের স্কেচ নুলিয়া ও প্রভাত সেনের বিন্দুভিত্তিক ল্যাণ্ড-স্কেপ-এর নাম করা চলে।

*

বিশ্ববরেণ্য, খ্যাতনামা শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরের (১৪৭১—১৫২৮)-এর পাঁচশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব জার্মানীর সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, কলকাতাস্থ কনসুলেট ও ইন্দো-পূর্ব জার্মানী ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটির সমবেত উদ্যোগে অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর গ্রাফিক প্রিণ্ট প্রতিলিপির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে শিল্পীর প্রায় ১০০ শিল্প নিদর্শনের প্রতিলিপি দেখা যায়। কয়েক মাস পূর্বে ম্যাক্সমুলার ভবন কর্তৃপক্ষ শিল্পীর পাঁচশত জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়—সুতরাং সবিস্তারে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না। ১৪শ শতকের শেষভাগে উডকাটের প্রাচীনতম নিদর্শন দেখা গেলেও ড্যুরেরই এই মাধ্যমের পথিকৃৎ। ড্যুরের ছিলেন মানব প্রেমিক—দেশের অবহেলিত ও নিপীড়িত কৃষকদের জীবনযন্ত্রণা দেখে তিনি ব্যথিত হন ও দেশের নবজাগরণের পরি-প্রেক্ষিতে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তিনি বিপুল শিল্প-সম্ভার সৃষ্টি করে যান। তার ওপর তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে প্রকৃত খৃস্টান। পবিত্র বাইবেল উল্লিখিত কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন আলেখ্যও তিনি তাঁর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত করে নানা প্রতীকের মাধ্যমে দেশের সমকালীন দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা ও অশান্তির পরিবেশ ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ ও বিশ্ব-স্বীকৃত উডকাটমালা—অ্যাপোক্যালিপ্‌স, গ্রেট প্যাশন ও লাইফ অব দি ভার্জিন। এনগ্রেভিংয়ের মধ্যে এনগ্রেভড প্যাশন, সি মনস্টার, দি প্রডিগ্যাল সন, অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ, দি গ্রেট ফরচুন, দি নাইট, ডেথ অ্যাণ্ড দি ডেভিল, সেণ্ট জেরোম ও মেলাঙ্কোলি উল্লেখযোগ্য। অ্যাপোক্যালিপ্‌স পুস্তকখানির সমস্ত উডকাট নিদর্শন থেকে শুরু করে মুদ্রণ ও প্রকাশন তিনি স্বয়ং করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পীর কয়েকটি রঙীন ড্রয়িং ও সেই সঙ্গে কয়েকটি এনগ্রেভিং প্রতি-লিপিও দেখা যায় (অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ, মেলাঙ্কোলি, সেণ্ট জেরোম, ড্যান্সিং পেজান্টস, সি মনস্টার)। চিন্তাধারা, পরি-কল্পনা, বলিষ্ঠ ও নির্ভুল ড্রয়িং ও বিশেষ করে প্রয়োজনমত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খোদাই কাজের দিক থেকে ড্যুরের বিশ্ব গ্রাফিক শিল্পক্ষেত্রে আজও অদ্বিতীয়।

চিত্রপ্রিয়

পদ্মা পারানির কথা

সেদিন হঠাৎ দেখা হলো বেগম নজরুল ইসলামের সংগে। পাশের দেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পত্নী। তাঁকে ভি আই পি হিসাবে ব্যতিব্যস্ত যাতে না করে সেজন্য গা ঢাকা দিয়ে চট করে আজমীর শরিফের তীর্থ সেরে ঢাকা যাবেন এই ইচ্ছা। নজরুল ইসলাম সাহেব ঢাকা চলে গেছেন কয়েক দিন আগেই আজমীর মহাতীর্থ। সাতবার আজমীর যেতে গেছেন কয়েক দিন আগেই। আজমীর দরগা মোইনুদ্দিন চিসতি সাহেবের সমাধি সম্বলিত পুণ্য মন্দির। একবার বাৎসরিক উরস বা মেলার সময় দেখবার সুযোগ হয়েছিল। কি তার সার্বজনীক আবেদন! যে দেখেনি তাকে বোঝানো কঠিন। চিসতিরা অতীন্দ্রিয়বাদী বা mystic। ভারতের ঐতিহ্যধারায় যেদিন সুফীরা মিশেছিলেন সেদিনই প্রথম ইসলামের সহক্রিয়া মিশেছিল ভারতের একান্ত নিজস্ব ভক্তিতত্ত্বের গভীর ঐকান্তিকতায়। সুফী প্রভাবে কবীর, নানক সবাই পেয়েছেন প্রেমের প্রগাঢ় প্রভাবে ভরা কতশত গাথা। আজমীর শরীফে দেখেছিলাম পবিত্র মহিমার উদারতা। মূলত মুসলমানের তীর্থ। কিন্তু কত হিন্দু, কত পার্শী, কত খৃষ্টান, কত শিখ সে-তীর্থে সমাসীন তার সীমা নাই। চিসতি সাহেবের মকবরাতে মিন্নৎ বিফল হয় না। আকুল প্রার্থনা জানিয়ে সুতো বেঁধে যায় অসংখ্য নরনারী। কত প্রার্থনা পূর্ণ হয়। কারও বা হয় না। যার যাচঞা সার্থক হয় সে হয়তো দিয়ে যায় মর্মর ফলক। গৃহতল তাই সর্বজনীন কৃতজ্ঞতার চিহ্নে ভরা। সে নামে হিন্দু মুসলমান শিখ ঈশাই সব আছে। আজমীরের পাশেই পুষ্কর। হিন্দুর মহাতীর্থ। পুষ্করের পুণ্য সঞ্চয় করতে যাঁরা আসেন তাঁরা দরগা শরিফকেও ভক্তি নিবেদন করে যান। পুষ্কর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার পুণ্যস্থান। নীচে হ্রদ। পাহাড়ের উপর সাবিত্রী মন্দির। সাবিত্রী ব্রহ্মার পত্নী। যজ্ঞের জন্য

ব্রহ্মা পত্নীর অপেক্ষা করছেন। দেরী হওয়ায় তিনি গ্রহণ করলেন গায়ত্রীকে। গায়ত্রী আদিবাসী মেয়ে। আর্য দেবতা তাঁকে স্থান দিলেন পাশে। সাবিত্রী অবশ্য অভিমানে ক্ষুন্ন হয়ে দূরে পাহাড়ের উপর উঠে গেলেন। সেখানে হলো সাবিত্রীর ভিন্ন মন্দির। ব্রহ্মাণী গায়ত্রী গুজরী হয়েও হলেন যজ্ঞে সহধর্মিণী। কি সুন্দরভাবে আর্য সভ্যতায় ও কৃষ্টিতে অনার্যকে টেনে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে! আজমীরে আজও উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম একাকার হয়ে যায়; দক্ষিণী মন্দিরের গোপুরম-এর গায়ে উত্তরের আদি মন্দির। আজমীরের মাঝে যে ভারতের কৃষ্টি তা যেন ভারতের বিচিত্র ঐক্যের প্রতীক।

বেগম নজরুল ইসলাম সেই তীর্থে গেলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আদর্শও তা। ধর্ম ব্যক্তিগত জিনিস, রাষ্ট্র সমষ্টিগত ভাবনা। ধর্ম দিয়ে সমষ্টিগত ভাবনাকে উত্তেজিত করার দিন কেটেছে। সরল বাঙ্গালী সেদিন এক দাসত্ব থেকে অন্য দাসত্বে অবলীলাক্রমে ধরা দিয়েছিল। ইসলামের দোহাই দিয়ে কুটকপট মানুষগুলি তাদের ভুলিয়ে রেখেছিল দীর্ঘদিন। জানেন তো, আজকের মার্কিন কালো মানুষও এই কথাই বলে। গীর্জার প্রার্থনায় তারা নতজানু হয়ে শুনেছে এ জীবনে যত দুঃখ বরণ করবে, যত মাথা পেতে সহ্য করবে পরজন্মে তত সুখ, অথবা জন্মান্তরে না বিশ্বাস কর তো মরণের পর অক্ষয় স্বর্গবাস। এ জীবনে ফূর্তি করবে সাদা মানুষ। মার্কিন যাত্রায় বহু কালো মানুষ একথা বলেছে চিত্ত-বিক্ষোভের প্রগাঢ় আবেগে। প্রবঞ্চনা ধরা পড়লে প্রতারিত মানুষের বোধহয় এইরকমই ঠেকে। বেগম সাহেবার মুখে শুনলাম প্রবঞ্চনার মর্মন্তুদ কাহিনী। হৃদয়হীদের কে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে বছরের পর বছর বেদরদী বিশ্ব সেখানে এতটুকু চঞ্চল হয়নি। নারী ধর্ষণের এমন ব্যাপক নিষ্ঠুরতা পৃথিবীর ইতিহাসে জানা যায়নি। বলাৎকারের নাকি বয়সও ছিল না। আট ন' বছরের শিশু থেকে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রবীণাও বাদ যায়নি। বেগম সাহেবের দুটি শিশু কন্যা সংগে। তাদের নিয়ে পাটের ক্ষেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুকিয়ে থেকেছেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সামনে অন্ধকার, চারদিকে ভয় আর চিন্তা রাশি রাশি। এমনি করেই বোধহয় পুড়ে পুড়ে সোনা নিখাদ হয়। তাই বোধহয় বাংলার মেয়ে, বাংলার মা এগিয়ে দিয়েছে সন্তানকে সংগ্রামের সামনে। কারও বা একাধিক পুত্র প্রাণ দিয়েছে, অন্য পুত্র, এমনকি বালককে মা গামছার খুঁটে বেঁধে দিয়েছেন রুটি গুড় বা শুকনো চিঁড়ে দুমুঠো। স্নেহ ধারায় সিক্ত করে

আশীর্বাদ করেছেন দরিদ্র ঘরের জননী—যাও আগে যাও। দুশমনকে দেশের আর সর্বনাশ করতে দিও না। কোনও মা আঁচলের তলায় ছেলেকে পদে পদে নিষেধের ডোরে বাঁধেনি।

মেয়েরা কি দিয়েছে? তাদের ইজ্জৎ। এ যে মানের যুদ্ধ, জানের জঙ্গ। তাই তারা সৈনিকদের পুরোভাগে। যে প্রাণ দিয়েছে তার চেয়েও বেশী দিয়েছে বাংলার মেয়ে। সোনার বাংলার জননী জায়া জানের বাড়া যা তাই উৎসর্গ করেছে দেশ-জননীর পায়ে। শিশুরা কি দিয়েছে? দুধের বাছারা অত্যাচারে, নৃশংসতায় হার মানেনি। শুনলাম দশ বারো বছরের ছেলেকে পাক সৈন্য প্রশ্ন করেছে, 'বল দলের নেতার নাম।' কিশোর হাসিমুখে বরণ করেছে মরণ। বন্দুকের গুলি পেটে-পিঠে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গেছে তবু সে জয় বাংলা ভিন্ন আর কোন শব্দ উচ্চারণ করেনি। বৃদ্ধরা বয়েছে মুক্তি-বাহিনীর সামান্য আহার্য। বৃদ্ধা, অশীতিপরা অশক্ত শরীর, লাঠি ধরে চলেন পথে। তাঁকে তো পাক বাহিনীর পাপিষ্ঠরা সন্দেহ করবে না। তাই তিনি ভিক্ষের থলিতে বা আঁচলের আড়ালে নিয়ে পেঁছে দিয়েছেন ভাত্ত ডাল ম্যাট! শ্রীমতী বদরুন্নেসা আহম্মদ ছিলেন শ্রীমতী ইসলামের সঙ্গে। তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত এম পি। বাপের ঘর ছিলো বীরভূমে। বীরভূমি বীরভূমের পর শ্বশুর-বাড়ি কুষ্টিয়াতে রাজনীতিতে নেমেছেন আওয়ামী লীগের আহ্বানে। বদরুন্নেসা বলছিলেন, পানিতে যেমন মছলী, ঠিক তেমন ছিল দেশের গরিলা বাহিনী। শত্রুকে হয়রাণ করতো তারা আবার হারিয়ে যেতো কোন গভীরে। সেই হারিয়ে যাওয়ার হদিশ থাকতো ঘরের বউ-ঝিয়ের কাছে, মা-ঠাকুমার কানে কানে। দিনের পর দিন যদি তাঁরা ওদের জান বাঁচাবার কৌশল না করতেন তবে কি পানির মছলী পেত প্রাণের সাড়া?

শ্রীমতী ইসলামের সঙ্গে আরও একটি মহিলা এম পি ছিলেন। নাম তাঁর রাফিয়া আখতার সবাই তাঁকে ডলি বলে। রাফিয়া আখতার নূতন যুগের মানুষ। অল্প বয়স। আইন পড়ছেন। টাঙ্গাইল ছিল তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র। আওয়ামী লীগের মহিলা এম পি সাতজন। বেশীর ভাগই অল্পবয়সী আগামী যুগের মানুষ। রাফিয়া আখতার নাকি স্কুল জীবন থেকে মুজিব সাহেবের প্রেরণায় রাজনীতিতে আসেন। ছাত্র ও ছাত্রী মেয়ে আর ছেলে পাশাপাশিতে এসেছিল দলে দলে ঐ এক আহ্বানে। নদীর দেশের নারী। দুকূল ভাঙ্গা তাদের শক্তি, শ্যামল ছায়ার মত তাদের সৃষ্টি। লাল পাড় শাড়ি, কপালে সিন্দুর বিন্দু, তরঙ্গের মত উচ্ছল আবার স্থির সরোবরের মত শান্ত, বন্যার মত বেপরোয়া অথচ বর্ষার মত সজল। যখন ১৪৪ ধারা জারী হয়েছিল আর সভা, শোভাযাত্রা সব বাতিল তখন সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা সংসদ সমাজ সেবার নামে রাজ-নীতির কাজ চালিয়েছে এইসব দুর্নিবার নারীদের নিয়ে। তাঁদের এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা নির্যাতিত নারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। সমাজে তাঁদের সম্মান তুলে ধরতে হবে। অবাঞ্ছিত সন্তানের জননী হয়েছে কত মেয়ে, তাদের জন্য চাই নূতন দিনের আশা। সমস্যা একটি নয়। হাজার হাজার সমস্যা বিরাট গহ্বরের মত মুখব্যাদান করছে। মেয়েরা যদি বদ্ধপরিকর হন তবেই নারী সমাজ অপমানের গ্লানি মুছে ফেলতে পারবেন।

শ্রীমতী

কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন

কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন (The National Commission on Agri-culture) স্বীকার করেছেন যে, সমবায় ঋণদান ব্যবস্থা ছোট ছোট কৃষকদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই কমিশন তাঁদের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে সরকারের কাছে এই মর্মে সুপারিশ করেছেন যে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল কৃষকশ্রেণীর ঋণের প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা দরকার এবং দেশের অন্তত আটটি জেলায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ভূমিকা আরও সক্রিয় করে একটি নতুন ঋণদান ব্যবস্থা চালু করা দরকার। কৃষি ঋণদানের সুবিধা এমনভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত যাতে কৃষি-উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষিজাত সামগ্রীর বিক্রয়করণ পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়। ছোট ছোট কৃষকদের পক্ষে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা—বিশেষ করে ভাল বীজ, সার, গরু, লাঙ্গল প্রভৃতি সংগ্রহ করা, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঋণ পাবার সুবিধার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে সমবায় ঋণদান সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র কৃষকদের যতটা ঋণ দিয়ে থাকে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি এক্ষেত্রে যতটা ঋণ দিচ্ছে তাও সঙ্গতিবিহীন কৃষকদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের সুপারিশ হল কৃষিক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহের নীতি এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া প্রদত্ত এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি প্রদত্ত ঋণের অন্তত ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্র এবং সঙ্গতির প্রান্তিক সীমায় উপনীত কৃষকদের (Marginal Farmers) ও কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সুবিধার জন্য যেমন একটি শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Deve-lopment Bank of India) স্থাপিত হয়েছে, তেমনি কৃষিক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ ও ব্যাংকিং সুবিধার জন্য একটি কৃষি-উন্নয়ন ব্যাংক (Agricultural Development Bank) স্থাপন করা। কৃষিক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Agricultural Finance Corporation) এবং কৃষিক্ষেত্রে পুনঃ ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Agri-cultural Re-finance Corporation), প্রভৃতি সংস্থাকে একত্র করে কৃষি-উন্নয়ন ব্যাংকের আওতায় আনা উচিত বলে কমিশন মন্তব্য করেছেন।

দুধ উৎপাদন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ হল দেশের ১০৭টি জেলায় দুধ উৎপাদন বাড়াবার জন্য নয় থেকে দশ বছর মেয়াদী ২২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা। কৃষকেরা যাতে প্রতি লিটার মোষের দুধের জন্য ১ টাকা ২৫ পয়সা এবং গরুর দুধের জন্য প্রতি লিটারে ৯৫ পয়সা দাম পান সেদিকে লক্ষ্য রেখে দুধ উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। গরু, মোষ প্রভৃতির লালন-পালন কৃষি-উৎপাদনেরই অন্তর্গত এবং দেশের সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থায় তার গুরুত্ব খুবই বেশি, একথা ভুললে চলবে না।

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার সম্যক উপলব্ধি করা দরকার। বিশেষ করে যে দেশে শ্রমের প্রাচুর্য ও মূলধনের অভাব একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি-ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আমাদের দেশে এ যাবৎ কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াবার উপর অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে যদিও আমরা প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর্যায়ে এসে গেছি তবুও সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) হয়েছে এ কথা জোর করে বলা যায় না। কৃষি সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন কৃষি-ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে যে সুপারিশগুলি দিয়েছেন, তার কোনটিই অবৌক্তিক নয়। এই সুপারিশগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা এখনও পাই নি। যে সময়ে দেশে বিদেশী অর্থনৈতিক সাহায্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে, তখন দেশকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে হলে কৃষি ক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের দেশ মূলত কৃষিপ্রধান; আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, এবং আমাদের জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে।

নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন

সম্প্রতি দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের উদ্যোগে ৫৩তম নিখিল ভারত অর্থনৈতিক সম্মেলন হয়ে গেল। এ বছরের সভাপতি ছিলেন উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সদাশিব মিশ্র। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল : (১) Marxian Theory, (২) Ceiling on urban Property এবং (৩) Asian Economic Co-operation। মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত এবং একটি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মার্ক্সীয় তত্ত্বের আলোচনা করেন অধ্যাপক পি আর ব্রহ্মানন্দ। মার্ক্সের মূল্যতত্ত্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব সম্পর্কে পৃথক আলোচনা হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন শ্রী পি জে জে পিণ্টো। শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা সম্পর্কে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক এস সি জোসেপ। এই তিনটি বিষয় ছাড়াও আমাদের অর্থনৈতিক পরি-কল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন ডক্টর অশোক মিত্র ও ডক্টর ভি কে আর ভি রাও।

প্রতি বছর যে নিখিল ভারত অর্থ-নৈতিক সম্মেলন হয়ে থাকে তাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতিবিদগণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করার এবং অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নতুন তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে অথবা অর্থশাস্ত্রের নানা দিক সম্পর্কে যে নতুন গবেষণা হচ্ছে সে সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পান। এ বছর যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের শেষ নেই। অন্য কোন পুরাতনপন্থী অর্থবিজ্ঞানীর (Classical Economist) লেখা সম্পর্কে এত আগ্রহ বর্তমান সময়ে দেখা যায় না। বিশেষ করে ধনতন্ত্রের উন্নয়ন সম্পর্কে মার্ক্সের অভিমত এবং উন্নয়নশীল দেশ-গুলিতে তা এখনও কতটা প্রযোজ্য সে সম্পর্কে আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। শহরাঞ্চলে সম্পত্তির উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ
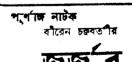
করা ভারতের অর্থনৈতিক নীতির একটি অন্যতম অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতে আয় ও ধনের বৈষম্য কমাবার জন্য এবং একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি গঠনের জন্য যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর সর্বাধিক সীমা ধার্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ দিকটির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাও বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিশেষ করে এশিয়ার উন্নয়ন ব্যাংক গঠিত হবার পর এই মহাদেশে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য আসা (সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে) বন্ধ হয়েছে; বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক সম্পদের আহরণ ও সদ্ব্যবহার করে ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কিভাবে এগোতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনাও সমালোচিত হয়েছে।

সুব্রত গুপ্ত

প্রথম যখন উড়লো

চণ্ডী লাহিড়ী

বিশ শতকের শুরুতে জাতীয়তাবাদ বেশ একটু চরমে পৌঁছেছিল। ফরাসী চিত্রকলা, সাহিত্য বা সাজপোশাকের উৎকর্ষ স্বীকার করে কোন ইংরেজ সে সময় লেখনী ধারণ করাকে পাপকার্য মনে করতেন। ফরাসীরাও ইংরেজী ভাষাকে দোকানদারের ভাষা বলে গণ্য করতেন, সে ভাষা তাদের মতে সাহিত্য-রচনার উপযোগী নয়। জার্মানদের বাখ্-বিটোভেন-শোপাঁর ঝংকারে মনে মনে মুগ্ধ হলেও ইংরেজরা মুখে প্রশংসা করত না, পাছে জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। আর এই উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগেই আকাশে ওড়ার চেষ্টা শুরু হল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রেষারেষির ভঙ্গিতে সে সময় কারটুনে আক্রমণ করা হত। বলা বাহুল্য, হাস্যরসের চেয়ে শ্লেষ ও বিদ্রূপের দিকে ঝোঁক ছিল সেকালের কারটুনে।

সত্তরের দশক যেমন মানুষের চন্দ্রাভিযানের দশক, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকও সেইরকম আকাশে ওড়ার দশকরূপে চিহ্নিত হতে পারে।

Pasquino.] [Turin.

John Bull : "God save the Channel!"

Pasquino, Turin. 1909

জন বুল ভেবেছিল ফরাসী বৈমানিক ব্লেরিয়ৎ ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারবেন না। তাঁর বিমান ভেঙ্গে পড়বে মাঝ দরিয়ায়। ইংরেজদের এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে কারটুন প্রকাশিত হল ইটালীর কাগজে। কিন্তু শকুনির শাপে গরু মরে না। ব্লেরিয়তের বিমান সমুদ্রে ভেঙ্গে পড়েনি। তিনিই সত্যিই ডোভারে অবতরণ করেছিলেন।

Minneapolis Journal, 1909

সত্যিই যখন ফরাসী বৈমানিকের বিমান ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ডোভারে এসে পৌঁছাল, জনবুলের রাতের ঘুম ছুটে গেল। ইংলণ্ডে যেন মশার উপদ্রব শুরু হয়েছে।

১৯০৮ সালে কাউন্ট জেপেলিন জার্মানীর আকাশে উড়েছিলেন। ১৯০৯ সালে রেমস শহরে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক বিমান প্রতিযোগিতা। বিশ্বের সমরনায়করা বুঝলেন, আগামী দিনের যুদ্ধে ভাগ্য নির্ধারিত হবে নৌশক্তির জোরে নয়, বিমানশক্তির জোরে। এই প্রতিযোগিতায় ফরাসী বৈমানিক ব্লেরিয়ৎ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে গর্ডন বেনেট কাপ জয় করেন। ১৫ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ডে তিনি সাড়ে বারো মাইল উড়েছিলেন। এই সময়ের সংবাদপত্রে নিত্য নূতন আকাশে ওড়ার খবর। নিত্য নূতন রেকর্ড সৃষ্টি।

এর আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নৌ-জাহাজ ড্রেডনট। দুর্ধর্ষ নৌ-জাহাজ ড্রেডনট তৈরি করে বৃটেন ভেবেছিল এবার সে অপরাজেয়। জার্মানী বা ফ্রান্স আর তার নাগাল পাবে না। আর ফ্রান্স ও জার্মানী যদি মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয় তাহলে ইওরোপ আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তার ঠেকায় কে? কিন্তু ১৯০৯ সালের ২৫শে জুলাই ফ্রান্স বৃটেনের গালে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে বিশ্বজন-সমক্ষে তার উঁচু মাথাকে নিচু করে দিল। ওই দিন ফরাসী বৈমানিক মঃ ব্লেরিয়ৎ তাঁর মনোপ্লেন চেপে সত্যিই ক্যালে থেকে ডোভারে অবতরণ করলেন। বিমানে এই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে সময় লেগেছিল ৪৫ মিনিট। আশ্চর্যের কথা, তাঁর বিমানে কোন কম্পাস ছিল না। কোন কারণে সমুদ্রে পড়লে সেখানে ভেসে থাকার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। [illegible]

Minneapolis Journal, 1909

জার্মানরা বিমান চালিয়ে রেকর্ড করেছে, ফরাসীরাও পিছিয়ে নেই। ইংরেজদের প্রেসটিজ যায় যায়। সপ্তম এডোয়ার্ড জাতির মুখ রক্ষার জন্য ঠিক করলেন তিনি বিমানে চড়বেন। মারকিন পত্রিকা জন বুলকে ব্যঙ্গ করে কারটুন প্রকাশ করল।

বিমানে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার ব্যাপারে তাঁর সামনে চ্যালেনজ ছিল। তাঁর প্রতিযোগী মিঃ ল্যাথাম। ইনি দুবার চেষ্টা করেছিলেন ডোভার থেকে ক্যালে পেঁছাতে। সংগে কম্পাস নিয়েছিলেন, সমুদ্রে প্লেন ভেঙে পড়লে বা অবতরণ করতে বাধ্য হলে দশ মিনিটকাল ভেসে থাকার মত ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। কিন্তু দুবারই তাঁর বিমান মাঝ সমুদ্রে অবতরণ করে। অথচ বৃটিশ সংবাদপত্র ল্যাথামের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টাকে অর্থাৎ ডোভার থেকে ক্যালে যাবার এই অভিযানকে ইংরেজদের ফ্রান্স জয়ের সমতুল্য বলেই গণ্য করেছিলেন। ওয়াটারলুর পর এতবড় একটা ঘটনা ইংরেজদের কপালে ঘটতে চলেছিল। কিন্তু বিধি বাম। দুবারই বিমান সমুদ্রে অবতরণ করতে বাধ্য হল। তারপর ফ্রান্স থেকে ব্লেরিয়ৎ আকাশ-পথে উড়ে ইংলণ্ডের মাটিতে অবতরণ করলেন।

সে যুগটাই ছিল জাতিগত প্রতিযোগিতায় অন্ধবিশ্বাসী। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক কল্যাণের কথা চিন্তা করার মানসিকতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনা।

কাউণ্ট জেপেলিনের এয়ারশিপ ১৮ জন যাত্রী নিয়ে ১৯০৮ সালের ১লা জুলাই আকাশে যখন উড়েছিল তখন জার্মানরা ভেবেছিল এবার আমরা বৃটেনকে টেক্কা দিয়েছি। তাদের নৌজাহাজ জার্মানদের ক্ষতি করতে পারবে না। জেপেলিনের এয়ারশিপ সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্ন, জুরিখ ঘুরে জার্মানীর নানা শহরের আকাশ দিয়ে উড়ে স্টাটগার্টের কাছে অবতরণ করে। মাটিতে অবস্থানকালেই আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করে

Lustige Blatter, Berlin ,1909

ইংলণ্ডের সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড ছিল, অত্যধিক মোটা। তাঁর পায়ের আগে ভুঁড়ি চলে। এডোয়ার্ড যখন তাঁর স্থূলবপু নিয়ে এরোপ্লেনে উঠলেন তখন জার্মান পত্রিকায় কারটুন প্রকাশিত হল। কাইজার—আমার ঐরকম দেহ হলে আমার স্ত্রী কিছুতেই ছাড়তেন না।

Pasquino, Turin 1909.

জার্মানীতে কাউণ্ট জেপেলিনের ও আমেরিকার রাইট ভ্রাতাদের সাফল্যের পর রেইম শহরে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক বিমান প্রদর্শনী। সমরনায়করা বললেন, আগামী দিনের যুদ্ধে ভাগ্য নির্ধারিত হবে নৌ-শক্তির ভিত্তিতে নয়, বিমান-শক্তির নিরিখে। ১৯০৯ সালে বসে ইটালীয় শিল্পী কারটুন আঁকলেন ১৯১৯ সালে কিভাবে সৈনিকরা বিমানে চেপে যুদ্ধে যাবে সেই দৃশ্য। তখনও স্থলপথে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে হত। ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গীতেই তাঁরা বিমানে চেপেছেন।

"The Flying Dutchman."

Kladderadatsch, Berlin, 1909

জেপেলিনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কাইজার ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য বিমানবহর তৈরী করছেন এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের নানাপ্রান্তে। আসল খবরের সঙ্গে রঙ চড়িয়ে কোন কোন কাগজে বিমান আক্রমণের বিভীষিকা, রক্তপিপাসু জার্মানদের প্রতিহিংসা পরায়ণতার গল্প বিভিন্ন দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জার্মান কারটুনে দেখানো হল,—বৃটিশ ঠাকুমা নাতিদের কাছে গল্প বলছেন জেপেলিনের। নাতিদের মুখে ভয়ের চিহ্ন। ইচ্ছা করেই ঠাকুমার চেহারা ভিক্টোরিয়ার মত করা হয়েছে।

In the Camp at Boulogne.

Le Rire, Paris, 1909

মঃ ব্লেরিয়তের সাফল্যে নেপোলিয়নের আত্মা আক্ষেপ করছেন—ব্লেরিয়ৎ, বড় দেরীতে এলে ভাই। আগে এলে ওয়াটারলুর যুদ্ধে এমন ভাবে ইংরেজদের কাছে হারতাম না।

এবং বজ্রপাতের ফলে এয়ারশিপটি ভস্মীভূত হয়। একালে চাঁদে পাড়ি দিতে গিয়ে রুশ অভিযাত্রী মারা গেলে মার্কিন সাধারণ নাগরিকও চোখের জল ফেলে। সেকালের **জাতীয়তাবোধ ছিল আরও সঙ্কীর্ণ। ফরাসীরা শেকসপীয়রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেনি কোনদিন।**

কাউণ্ট জেপেলিনের এয়ারশিপ পুড়ে ছাই হয়েছে শুনে জার্মানিরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ইংরেজদের কাছে প্রেসটিজ যায় যায় অবস্থা। তৎক্ষণাৎ পাড়ায় পাড়ায় জার্মানরা চাঁদা তুলতে শুরু করল, পথে পার্কে মিছিল আর জমায়েত। দেখতে দেখতে দেড় লাখ পাউন্ড সংগৃহীত হল। জার্মান সরকার দিলেন আরও পঁচিশ হাজার পাউণ্ড। কাউণ্ট জেপেলিন আবার নতুন করে এয়ারশিপ বানাতে বসে গেলেন। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য কাইজার তাঁকে 'জার্মানীর শ্রেষ্ঠ সন্তান' বলে সম্মানিত করলেন। ইংরেজরা এ খবর শুনে আবার দমে গেল। এদিকে খবর এল ফরাসীরা 'রিপাবলিক' নামধারী একটা এয়ারশিপকে প্যারিসের আকাশে দেড়ঘণ্টাকাল উড়িয়েছে।

অবশ্য ইংরেজরা 'নুলি সেকেণ্ডাস' নামে একটা এয়ারশিপ-জাতীয় কিছু তৈরি করতে শুরু করেছিল কিন্তু সেটা তখনও আকাশে ওড়েনি। এ সবই হল এয়ারশিপ, বেলুনের উন্নত সংস্করণ। আধুনিক এরোপ্লেনও কিন্তু এই সময়ে আকাশে উড়েছিল। সেই কৃতিত্বের অধিকারী আমেরিকার রাইট ব্রাদার্স।

Caricature in Native Chinese Papers.

Sin-cho-Shih-Pao, Shanghai.

এই দুর্লভ চৈনিক কারটুন আঁকা হয়েছিল জার্মানীতে কাউণ্ট জেপেলিনের সাফল্যের সংবাদের ভিত্তিতে। প্রথম অংশ,—প্রাচীন পদ্ধতিতে চীনাদের যুদ্ধ। ২য় অংশ,—রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করলে চীনারা জাপ-পদ্ধতি অনুকরণ করছে। ৩য় অংশ,—কাউণ্ট জেপেলিনের সাফল্যের সংবাদ শুনে চীনা সমরনায়ক কাইজারের কাছে গিয়েছেন বিমান-যুদ্ধ শিখবার জন্য।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ঘা‍ঝানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে হাঁপ ছেড়েছি! বড্ডো বাঁচন বাঁচা গেছে আজ। ঘোড়ার ক্ষুরে মাথা মুড়োতে হয়নি আমার।

মাথা বাঁচলে তো দেশের জন্যে মাথা ঘামাব। মাথা খাটাবো আমার। দেশের জন্য নিজের মাথা দিতে পারব কোনোদিন।

ঘোড়ার পায়ে মাথা দেবার কোনো মানে হয় না।

দেশোদ্ধার আমার মাথায় থাক মাথাটা আগে বাঁচানো যাক! দেশের কাজ পড়েই আছে জীবনভোর। করলেই হবে এক সময়, সব কিছু কোথাও পালাচ্ছে না।

হাওয়ার জন্য খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।...চিত্তরঞ্জন আমার মাথায় থাকুন বাবা!

স্বগতোক্তিটা অস্ফুট স্বরে ব্যক্ত হয়েছিল বুঝি, যে কিশোরটি জানালাটার কিনারায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, উঠে বসেছে আমার কথায়।

'কিছু বলছ নাকি আমাকে?' শুধিয়েছে সে।

'তোমায়? না তো। জায়গা খালি পেয়ে তার পাশটায় আমি বসলাম।—'তোমায় তো আমি চিনি না ভাই! কে তুমি?'

'বাঃ, এই মাত্তর আমার নাম করলে! আমার নামই তো চিত্তরঞ্জন।'

'ও মা! তুমিও চিত্তরঞ্জন? তাই নাকি? চিত্তরঞ্জন এখন ঘরে ঘরেই নাকি?' আমি বললাম—ঘরে ঘরেই প্রবাহিত গঙ্গা! এক চিত্তরঞ্জনের জন্য একটু আগে প্রাণটা খোয়া যাচ্ছিল আমার। সেই কথাই বলছিলাম। তোমায় কিছু বলিনি।...অচেনা একটা লোক সোজা তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে দেখে খুব অবাক হয়েছ বুঝি?'

'আমাদের বাড়ি কেন হবে? পাবলিক লাইব্রেরি তো এটা।' বলল ছেলেটি, 'এখানে বই নিতে আসে সবাই।'

তাকিয়ে দেখি তাই তো! লাইব্রেরিই তো বটে। অদূরে কাউণ্টার ঘিরে লোকরা দাঁড়িয়ে—লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে বইয়ের আদান-প্রদানে তটস্থ। চার ধারে পাশাপাশি সাজানো যত আলমারি—হাজারো বই ঠাসা।

'বাঃ! এখানেও একটা লাইব্রেরি! আরেকটা লাইব্রেরি এত কাছাকাছি রয়েছে জানতাম না তো!'

'সে কি! এমন নামকরা রামমোহন লাইব্রেরীর নাম তুমি শোনোনি?' সে অবাক হয়।

'আমি শুধু হীরণ লাইব্রেরী আর চৈতন্য লাইব্রেরী জানি কেবল। ওদের একটার আমি মেম্বর। তুমি এই রামমোহনের মেম্বর বুঝি?'

'না, ইস্কুল ছুটির পর আমি চলে আসি এখানে সটান। পছন্দমত বই নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পড়ি, তারপরে বাড়ি ফিরে যাই। পড়ার বই নিয়ে বসি তারপর। এখানে বসে পড়লে এরা অমনি বই দেয় পড়তে। কোনো কিছু দিতে হয় না কি মেম্বর হতে হয় না। আমি এই জানালাটার আলসেয় শুয়ে শুয়ে পড়ি রোজ।

'কিন্তু এটা কি এই আলসেমির সময় ভাই? দেশ আমাদের ডাকছে না এখন?'

কথাটায় একজনের টনক নড়ে বুঝি।—'কী বললে খোকা?' ভদ্রলোক লাইব্রেরিয়ান-দেরই কেউ হবেন হয়ত, পাশের আলমারির বই হাঁটকাচ্ছিলেন, তিনিই পাড়লেন কথাটা ফস্ করে—কোন ইস্কুলে পড় তুমি?

'আমি পড়ি টড়ি না' তীব্র প্রতিবাদ করি—'তাছাড়া, আমি কোনো খোকা নই।'

'কী করো তুমি তাহলে?'

'যা আমাদের করবার এখন। সবাই যা করছে। দেশের কাজ করি।'

'দেশের কাজ?' ভদ্রলোকের মুখে বক্র হাসি দেখা যায়—মুখর হয়ে থেকে দেশের

কাজ? তা করা যায় নাকি? আগে নিজেকে গড়া—তারপরই না দেশের মানুষের সকলের কাজ করা।'

পড়াশুনা তো পড়েই আছে, দেশের কাজ কিছু পড়ে থাকতে পারে না। আমি কষ্ট : 'কী বলেছেন মহাত্মাজী জানেন না? এডুকেশন মে ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যানট। সব নেতাই তো সেই কথাই বলছেন—বিপিন পাল সুভাষ বোস সি আর দাশ...।

'থামো থামো! ওই নেতারা কি মুখ্যু নাকি। সবাই ও'রা পণ্ডিত, রীতিমত পড়াশোনা করেছেন, তারপরেই' কিনা দেশের কাজে নেমেছেন তাঁরা। তাঁদের মত হবার চেষ্টা করো আগে, তার পরে দেশের কাজ কোরো। এই বয়সে পড়াশুনা করাটাই তোমাদের কাজ এখন। কাজ করার উপযুক্ত হও তারপর না কাজ করবে। যাও, এক্ষুনি ইস্কুলে ফিরে যাও, মন দিয়ে পড়োগে। যাঃ ও!

তিনি যেন মাছি তাড়ানোর মতই তাড়িয়ে দিতে চান আমায়।

আমার রাগ হয়ে যায়—'যান, পড়ব না আমি। আপনি কী করবেন আমার? কী করতে পারেন আপনি?'

'আমি আর কী করতে পারি। মুখ্যু হয়ে থাকবে, কষ্ট পাবে জীবনে এই মাত্র বলতে পারি। জীবনে চারটি মাত্র বন্ধু, বুঝেছ ভাই? বিদ্যে, স্বাস্থ্য, টাকা আর আর ভগবান হ্যাঁ, ঐ তোমার ভগবানও। এছাড়া আর কেউ কোথাও নেই কারো, সময়ে অসময়ে কেউ দেখার নেই ওরা ছাড়া। তাছাড়া এই কথাও আমি বলতে চাই, মুখ্যু হয়ে থেকে দেশের স্বাধীনতা আনা যায় না।" গড় গড় করে গড়িয়ে যান তিনি এক নিশ্বাসে—আর এত খারাপ লাগতে থাকে আমার যে 'তাও যদি হতো ভাই, তাহলে তো আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনাই তো ওই নিরক্ষর। তাহলে দেশ স্বাধীন হয়ে যেত কোন কালে! হচ্ছে না কেন? এত গাধা থাকতে, বুঝেছ এ দেশ কোনো দিন তা হবেও না।...

'গাধা থাকতে যদি না হয় তাহলে আপনার ঐ ঘোড়া থাকতেও দেশ স্বাধীন হবার নয়। যা সব ঘোড়া বাবা!' ভাবতেই আমার হৃৎকম্প হয়।

'মাউণ্টেড পুলিসদের কথা বলছ বুঝি? তাদের তাড়া খেয়েই পালিয়ে এসেছো এখানে?' শুনে তিনি হাসেন—'ও তাই বলো? ওই অশ্বদের টেক্কা দেবার মতলবেই অশ্বতর হতে চাইছ তাই?'

'অশ্বতর?'

'ঘোড়ার চাট তো ওই ঘোড়াতেই সইতে পারে। ঘোড়াকে তাদের থোড়াই কেয়ার। অশ্বতর হলে তুমিও পারবে। চাই কি দেশের নেতাও হয়ে যেতে পারো কোনোদিন বা! পলিটিশিয়ানরা তাই তো—গাধাদের চালিয়ে চরিয়ে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। এক নম্বরের অশ্বতর না হলে কি তা পারা যায় নাকি? চরানো যায় তোমার মতন গাধাদের কখনো?'

বইখানা বার করে নিয়ে ভদ্রলোক কাউন্টারের দিকে চলে গেলেন।

'ভদ্রলোক তোমায় গাল দিয়ে গেল।' চিত্তরঞ্জন বলল—'ওই অশ্বতর বলল তোমাকে। শুদ্ধ বাংলায় বলল তাই সাদা বাংলায় কথাটা ভাই মুখে আনা যায় না। আমি অন্তত আওড়াতে পারব না।'

'তোমায় বলতে হবে না। জানি আমি কথাটার মানে। খচ্চর বলেছেন ভদ্রলোক। উনি বললেই হবে? উনি বললেন আর আমি হয়ে গেলাম? গান্ধী চিত্তরঞ্জন সুভাষ বোস কি সবাই বুঝি তাই?'

'তাঁদের বলেননি ত? বলেছেন ঐ পলিটিশিয়ানদের। তাঁদের সঙ্গে এমন সব মৎলববাজ ধড়িবাজ লোক আছে না? বাবাও তো বলেন এই কথাই। তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন উনি মনে হয়।'

'বলুন গে, আমার বয়ে গেল! উনি খচ্চর বললেই আমি খচ্চর হবো নাকি? আমি তো আর পলিটিসিয়ান হতে যাচ্ছিনে, চাচ্ছিও না তাই হতে?'

'ছেড়ে দাও ও'র কথা। আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে এসো, কেমন?' সাকু'লার রোডের বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে সে বলল—'আমার নাম চিত্তরঞ্জন দে। চিত্ত চিত্ত বলে

ডাক দেবে নীচের থেকে, নেমে আসব তক্ষুনি।'

'চিত্তরঞ্জন দে? তুমি কি দেবেন দের কেউ হও নাকি? এই—ভাইটাই?'

'কে দেবেন দে? চিনিওনে আমি তাকে।'

'না চিনলেও তার অনেক চিহ্ন রয়েছে কিনা তোমার চেহারায়—অনেক মিল পাচ্ছি তোমাদের। তোমার হাসিটা ঠিক তার মতই আর তেমনি জ্বলজ্বলে বড় বড় চোখ! দেবেনের মতই তুমি দেদীপ্যমান, দেখছি কিনা!'

'তাই নাকি?' শুনে সে হাসে—তাহলে আসছো তো রোববার?'

'আসবো একদিন পরে হয়ত কখনো। এই রবিবার কি করে হবে? এখন তো আমার জেলে যাবার পালা, ঐ দেবেন দের সঙ্গেই। আরেক চিত্তরঞ্জনকে দেখতেই, বুঝেছ?' আমি জানাই—'দেশবন্ধু এখন যে জেলে রয়েছেন জানো না?'

ভদ্রলোকটি ফিরে এলেন সেই আলমারির কাছে। আবার কোনো বইয়ের তাগিদেই বোধ হয়। আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন যেন—

'সে কী! এখনো তুমি এখানে? যাওনিকো? এখনো এখানে বসে রয়েছো? না না, ইস্কুলে যেতে বলছিনে তোমায়। মীর্জাপুর পার্কেই যেতে বলছি গো? দেশ তোমায় ডাকছে না এখন? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—যাও। ঘোড়ার ভয়ে পিছিয়ে থাকলে কি চলে ভাই? ঘোড়া দেখে খোঁড়া হলে চলবে কেন?'

বক্তৃতার সঙ্গে তাঁর বাঁকা বাঁকা বুলি [illegible]।

'যাবই তো, যাচ্ছি তো?' বলতে বলতে উঠে পড়ি—'চললাম তো? ঘোড়ার ভয় থোড়াই করি নাকি মশাই? তাদের আমার থোড়াই কেয়ার!'

'আসতে হবে কিন্তু।' যাবার বেলায় পিছু ডাকে ছেলেটা—'মনে রেখ আমায়!'

ঘোরানো সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসি নীচেয়। ঘোড়াটা দোর গোড়ায় আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই আর। না থাক, আমি [illegible] বড় রাস্তা ধরছি না, ঘোড়াসঙ্কুল পথ ছেড়ে ঘোরালো পথে অলি গলি দিয়ে কেটে ডুব দিয়ে সেই মীর্জাপুর স্কোয়ারে।

যেতে যেতে মনের মধ্যে ছেলেটির সাড়া পাই, তার ওই পিছু ডাকা—মনে রেখ আমাকে।

মনে তো রেখেছি অনেককেই! মনের মধ্যেই রয়েছে তারা। মনেই রাখা যায়, কেবল—ফিরে আর চোখের দেখা হয় না তো তার সঙ্গে আর! সেই যে বাড়ির থেকে চুটকি কবিতাটা পাঠিয়েছিলাম না বসুমতীতে—জানি জানি সবাই সবে ছাড়বে/ [illegible]র পথে কে আর কবে/কার বা ছুমড়ে পড়বে।

আমার সারা জীবন যে ওই চুটকিই। তার মতই ছুটকো হয়ে ওঠা—সেই কবিতার টুকরোটার মতই টুকরো টুকরো টুটা ফাটা হয়ে ভেঙেচুরে যাওয়া!...কারো বেঁধে রাখা নয়/কোথাও বন্দী থাকাও নয়/কেনা দেনা/যাক চুকে না হোক ক্ষণিকের জয়!'

ভবিষ্যদ্বাণীর মতই এক বালকের কলমে যা একদা বেরিয়েছিল তাই বুঝি জীবনভোর সত্যি হয়ে দাঁড়ালো। তার কৈশোর জীবনে আজ তাই যথার্থ হয়ে উঠেছে।

মীর্জাপুরে পার্কের অতো ভিড়ের ভেতর দেবেনের দেখা পেলে হয় এখন।

ছেলেটি কিন্তু দেবেনের মতই দেখতে—একটু ছোট সাইজের এই যা। দীপশিখার মতই দপ্ দপ্ করে জ্বলছে তেমনি।

ওর বয়সের, বারো চোদ্দর সব ছেলেই আলোর মতন অমনি ঝলকায় আমি দেখেছি। অমনই ধারালো—অতই সপ্রতিভ। তার পরে যতই তারা বয়সে বাড়তে থাকে পড়াশোনার চাপে কি সংসারের তাপে—কী জানি কে জানে, কেমন করে কাঁরকমটা হয়ে যায় তারা দিনকের দিন! কালো হয়ে যায়, ভোঁতা হয়ে আসে, অকালে বুড়িয়ে যায় কেমন!

কেন এমনটা হয়? দেশ আমাদের পরাধীন বলেই নাকি?

দেশ স্বাধীন হলেই আমাদের সব দুঃখ দূরে হবে। ছেলেদের দুঃখ, বড়দের দুঃখ, চাষী-মজুরের—সবার। সবাই ভালো খেতে পাবে, পরতে পাবে, হাসখুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সবাই। জ্বলজ্বল করবে সারা জীবন।

সেদিন ধূমকেতুর পাতায় নজরুলের ইসলামের কবিতাটা পড়ছিলাম না? কারার ঐ লোহকপাট/ভেঙে ফেল করবে লোপাট/রক্ত জমাট/শিকলপুজোর পাষাণ বেদী/ওরে ও পাগলা ঈশান/বাজা তোর প্রলয়বিষাণ/ধ্বংসনিশান/উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি। ...পড়লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। ওঠে না?

ঐ জেলে গিয়েই জেলের শেকল ভাঙতে হবে, আমাদের—বলছিল দেবেন।

সেও নজরুলের একটা কবিতার পদ আউড়েছিল তখন—এই শিকল পরা ছল আমাদের/শিকল পরা ছল।/ ঐ শিকল পরেই শিকল তোদের/করব যে বিকল!

কিন্তু জেলে যাওয়াও খুব সহজ নয়, বলেছিল সে। জেলে একবার ঢুকলে যেমন তার থেকে বেরুনো বেজায় কঠিন, তেমনিই শক্ত নাকি ঐ জেলের মধ্যে ঢোকাটাও।

আমি শুধিয়েছিলাম, 'কেন, শক্তটা কিসের? গেলেই তো হয় জেলে।'

'অত সোজা নয় ভাই!' বলেছিল সে। মাঝপথে ঘোড়ার এই বাধার কথাটা ভেবেই বলেছে নাকি? —'আমি তিন তিনবার চেষ্টার পর তবে সাকসেসফুল হয়েছিলাম' জানো?

'কী রকম, শুনি তো?'

ধরে নিয়ে গেলেও তোমায় জেলে যেতে দেবে না। থানার থেকেই পত্রপাঠ ভাগিয়ে দেবে তোমাকে।

'থানার থেকেই? কেন হে? সরকারের আইন ভেঙে গেছি। যেতে দেবে না যে? আবদার নাকি? আমার প্রশ্ন: ল ইজ ল? তা কি কখনো হ য ব র ল হয়!

'হয়ই তো ভাই! প্রথমেই ওরা তোমার নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে, কেয়ার অফের কথা জানাতে হবে তোমাকে।'

'কেয়ার অফের কথা? কেয়ার অব আবার কি?'

'সেই যে খামের ওপর ঠিকানায় লেখা থাকে না কে/অ অমুকে? বাবা কি কাকা কি কারো নাম গো?' বলল দেবেন: 'ওরা আমায় যখন শুধালো তোমার নাম কি? তুমি কার কেয়ার অফ। আমার নামটা ঠিক বলেছিলাম, কিন্তু বাবার নাম কি বাড়ির ঠিকানা দিইনি। টের পেলে বাবা যদি ধরে আমায় ঠেঙায় তখন? তাই মামার নাম ঠিকানা দিয়েছিলাম আমি।'

'কী হলো তার পর?'

'থানার থেকে পাহারাওলা পাঠিয়ে খবর দিয়েছিল মামাকে। মামা তক্ষুনি ছুটে এসে আমার হয়ে মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল থানার থেকে আমায়।'

'মুচলেকাটা কী জিনিস ভাই?'

'কী তা কে জানে! হিন্দী কোনো কথা হয়তো।'

'ও বুঝেছি। মোচ লেখা! মোচ মানে হচ্ছে গোঁফ। একজন বলেছিল আমাকে। তোমার ওই গোঁফটোফের মতই কিছু হবে হয়তো।'

'তাই হবে বোধ হয়। ছেড়ে দিল তো সেবার আমায়। তার পরদিনই আমি আবার ধরা দিলাম—সেবারও আমায় ভাগিয়ে দিল থানার থেকে। আমার দাড়ি গোঁফ কিছু বেরয়নি বলে—আমি নাকি নাবালক এই ছুতোয়। নাবালকদের জেলে নেয়না কিনা।'

'তোমার নাবালকত্ব তুমি জাহির করতে গেলে কেন?'

'জাহির করতে হয় না। দারোগা গালে হাত বুলিয়ে দেখে নেয়...এমনি করে ভাই...' বলে সে গালে হাত দেয়। নিজের নয়, আমার গালেই।

'এটা কী হলো তোমার?'

'একটু আদর করলাম আর কি। কেন, তুমি কি আদর করবার মত নও?'

হেদোর দিঘির দীঘল আয়নায় ওর মুখের হাসি ভেসে ওঠে উছলে—দেখতে পাই। দেখে আমার চিত্তির জ্বলে যায়।

'বেশ, আমিও তোমার একটু করি তা হলে। তুমিও তো আদর করার মতই।'

'উঃ!' আদরের ঠেলায় ককিয়ে ওঠে সে —'এই কি আদর করা নাকি? এই তোমার আদর করার নমুনা? আমি কোথায় আলতো করে একটুখানি ছুঁয়েছি মাত্র আর তুমি কিনা, উঃ!'

'যার যেমন টিপ্ ভাই!' আমার টিপ্পণি রাখি; আমার টিপসই ওই রকম! আনাড়ির মার তো!'

আনাড়ি আমি সত্যিই—এ বিষয়ে। এর আগে আর কোনো ছেলেকে এভাবে আমি আদর করিনি—রিনির বাইরে আর কাউকে না—এ পর্যন্ত। মিথ্যে বলিনি সত্যিই!

'ইস্। এমন লেগেছে না আমার! তুমি যদি ভীমভবানী হতে না, তা হলে তোমার এই আদরের চোটে দাঁতগুলো আমার চুরমার হয়ে যেত। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ত এতক্ষণ।'

'ভালোই হোতো তাহলে। ঝুরিভাজা আর খেতে হোতো না জীবনে তোমায়।'

'রোসো এর প্রতিশোধ দেবে তোমাকে পুলিসে; আমি শাপ দিচ্ছি। কড়াপড়া হাতে কেউ এমন তোমায় টিপবে না...' শাপান্ত করে শান্তি পেয়ে সে শুধায় তারপরে— 'পুলিসে তোমার নাম ঠিকানা শুধালে কী বলবে তুমি তখন, বলবেটা কী?'

'ঠিক ঠিকই বলব, আবার কী? বলব যে আমার কোনো ঠিকঠিকানা নেই মশাই।'

'বললে তাই শুনবে নাকি? পাগল আর ভবঘুরে ছাড়া সেরকম কারো হয় না। তোমার নিজের না থাক, তোমার কেয়ার-অফের তো রয়েছে। কে তোমার কেয়ার অফ?'

'কেয়ার অফ ফুটপাথ। তার নামও যা ঠিকানাও তাই—' ঐ এক কথায় আমি প্রকাশ করি—ফুটপাথেই আমার বাড়ি আপাতত।'

'বেঁচে গেছ তাহলে। তোমার হয়ে মুচলেকা দেবার কেউ নেইকো আর।' তার স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে।

'মুচলেকা দিতে হবে কেন আমাকে? আমার মুচলেকা তো বেরিয়েই রয়েছে। দেখতে পাচ্ছো না!'

'মুচলেকা বেরিয়ে আছে! সে আবার কী?' সে অবাক।

'কেন, এই যে আমার মোচ!' আমার প্রদর্শনী দেখাই: 'আমার গোঁফের রেখা বেরিয়েছে যে দেখছ না? চোখে পড়ছে না তোমার? রোজ আমি আয়নায় দেখি যে। দাড়িটা বেরয়নি এখনো এই আমার দুঃখু।'

'এই তোমার মোচলেকা?'

'হাঁ, এই তো! এ দেখলেই তারা আমার গায়ে হস্তক্ষেপ করবে না। ভাববে যে দাদা রয়েছে যে-কালে, তার ভাইও আছে, গোঁফের ভাই দাড়িও রয়েছে কাছাকাছি। তোমার শাপ আর লাগবে না আমাকে।' আমি হেসে জানাই: 'দাড়ি বার করা ভারী শক্ত ভাই। গোঁফ নিজ গুণে দেখা দেয় কিন্তু দাড়িকে অনেক তোয়াজ করে অর্জন করতে হয়। নিত্য কামাতে হয় তাকে ঐ টাকার মতই। রোজ কামালেই দাড়ি বেরয় আর টাকা বাড়ে বুঝেচ? তা, না থাকগে দাড়ি, গোঁফ তো আছে সেই ঢের। এই গোঁফ জোড়াতে দিলে চাড়া তোমার মতন অনেক পাবো!' ও'র মুখের ওপর দ্বিজেন্দ্রলাল ছুঁড়ে ওকে হতবাক করে দি।

'গোঁফ না ডিম!' সে ভ্যাঙচায়।

'ডিমের মত হলেও তো বাঁচতুম! একটু একটু একটু তা দিতে পারতুম তাহলে! সান্ত্বনা থাকত। মোচের ডিম ফেটে চিকেন গোঁফ বেরুতো একদিন! তারপর তাই হয়ে উঠত HEN গোঁফ—এহেন গোঁফ?'...

বলে আমার যে গোঁফ নাকি নেই তাই আমি চুমড়ে দেখাই।

দেবেনকে ভিড়ের ভেতর পেলে হয় এখন! ভাবতে ভাবতে পার্ক লক্ষে আঁকা বাঁকা, অলিগলি পেরিয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছেছি!

ভিড় তখন আরো গভীর, জনতা আরো উত্তাল।

ঘোড়াদের দুর্জনতা আরো বেজায়। কিন্তু তাদের লম্ফ ঝম্প সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বড় রাস্তা ধরেই। ওদের ত্রিসীমায় কে যায়? সে পথ না মাড়িয়ে আমি পার্কটার অন্য ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সে ধারেও ভিড় আছে। অনেকেই খাড়া, তবে সে ধারে একটু কম। কিন্তু ভেতরে সেঁধুবার জো নেই কোনো ধারেই, ঘোড়া না থাকলেও পাহারোলারা চার ধার ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি।

ছেলেরা সব পার্কের রেলিং টপকে টপকে ঢুকছে—কেউ আটকাচ্ছে না। পাহারোলারা কোনো বাধা দিচ্ছে না। তাদের বাহুবেষ্টনী ভেদ করে চলে যাচ্ছে মাঝখানের সভায়। ভলাণ্টীয়ারদের ওপর তাদের কেমন যেন সহানুভূতি রয়েছে মনে হোলো। ঘোড়ার সোয়ারী গোরা সার্জেণ্টদের মত নয়।

'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!' জয়ধ্বনি দিয়ে তারা পার্কের ভেতরে টপকে পড়ছে গিয়ে।

পশ্চিমা পাহারোলারা বাধা দিচ্ছে না তাদের কাউকে। মনে হোলো সেই জয়ধ্বনির স্বরে তাদেরও ঠোঁট যেন নড়ে উঠছে একটু করে নিঃশব্দেই। নিঃশব্দে তারাও যেন আওড়াচ্ছে সেই কথাই। তারাও মনে মনে চাইছে ভারতের স্বাধীনতাই।

আমিও রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে দাঁড়াই। যা খাড়া রেলিং! পারব টপকাতে?

ওদিকের রেলিং টপকে কে একটা মেয়ে ভেতরে গেল না? ফ্রকপরা মেয়ে একটা? এই চোদ্দ পনেরর মতন?

একটা বাচ্চা মেয়ে টপকাতে পারে আর আমি পারব না? সে জেলে যাবে আর আমি পিছিয়ে পড়ে থাকব পেছনে?

আমিও টপকালাম। ছেঁচড়ে মেচড়ে ঢুকলাম কোনো গতিকে।

ইস্ এক কড়ারও বাহুবল বিধাতা দেননি আমায়! ভেতরে গিয়েই এক ছুটে সেই মেয়েটির মুখোমুখি গিয়ে পড়েছি।

দেখি ওমা! এ কে? রিনি নাকি? কাছাকাছি হয়ে চিনি, হ্যাঁ, রিনিই তো। রিনি তুমি এখানে? তুই এখানে কী করছিস রিনি? কী করতে এসেছিস তুই?'

ওমা, তুমি এসেছো অ্যাদ্দিনে? পৌঁছেচ তাহলে? যথাসময়ে যথাস্থানে? কথা-কাহিনীর সেই উপগুপ্তর মত সেই যে, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত/মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত...?'

'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন আসিবে সেদিন আসিবে!' আমিও রবীন্দ্রনাথ আউড়ে ওর কথার উত্তোর গাই।

'তা, তুই এখেনে যে! কী জন্যে এসেছিস শুনি?'

'তুমিও যেজন্যে আমিও ঠিক সেইজন্যেই। জেলে যেতে হবে না আমাদের এখন? এই দেশ স্বাধীন করবার যুদ্ধে মেয়েরা পিছিয়ে থাকবে নাকি? কী লিখেছিলাম তোমায়? অ্যাদ্দিন বাদে তুমি এলে।... একবার তোরা মা বলিয়া ডাক/জগতজনের শ্রবণ জুড়াক/হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক'...। সঙ্গে সঙ্গে রিনি একেবারে সুরধুনী।

(ক্রমশ)

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ায় খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০.১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

Clinic
SHAMPOO
Contains: 0.15% 3.4.4 Trichlorocarbanilide
Clears dandruff from hair and scalp

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে শোষণ কাজ করে।

ক্লিনিক এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে ঝকঝকে ও সুন্দর।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

একটি অসাধারণ কবিতা

এক সপ্তাহ আগে আমরা এই বিভাগে আঁদ্রে মালরো-র একটি চিঠির অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম। এই সপ্তাহে আমরা বাংলাদেশের মানুষ বিষয়ে অ্যালেন গীনসবার্গের একটি কবিতা মূল ভাষাতেই নিম্নে উদ্ধৃত করছি। সারা বিশ্বে পরিচিত লেখকদের মধ্যে অ্যালেন গীনসবার্গই প্রথম বাংলাদেশ-এর সাম্প্রতিক ঘটনা উপলক্ষ করে নিজস্ব রচনা প্রকাশ করলেন। কবিতাটিতে নিপীড়িত মানুষের জন্য বেদনা এবং আমেরিকার সরকারের জঘন্য হিংস্র নীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা ফুটে বেরিয়েছে। কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে, শুধু বাংলাদেশ বিষয়ক বলেই নয়, সামরিক শক্তির ভ্রষ্টাচার ও মানুষের অসহায়তা সম্পর্কে সাহিত্যে এ যাবৎ যা কিছু রচিত হয়েছে, এই কবিতাটি তার মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পাবার যোগ্য।

কবিতাটি লেখা হয়েছে অত্যন্ত সরল ভাষায়, বুদ্ধির মারপ্যাঁচ বা বিবেকের কাছে কারচুপির স্থান নেই। কবিতাটি রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমি অ্যালেন গীনসবার্গের সঙ্গে বনগাঁ-বয়ড়া সীমান্তে শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আর একজন বিদেশী পর্যটক ও কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের একটি সুদর্শন বুদ্ধিমান যুবক—এঁদের দুজনেরই নাম মনে করতে পারছি না। আমরা যখন যাই, তখনও সীমান্তে বিদেশীদের গমনাগমন নিষিদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু তখন ওখানে বন্যার তাণ্ডব চলছে। বনগাঁ শহরের মধ্যেই বড় রাস্তায় এক হাঁটু জল, যশোর রোডে নৌকো চলছে—শরণার্থী শিবিরগুলির মধ্যেও জলস্রোত। তাতে অবশ্য ঐ হেপোরা কমি নিরস্ত হননি, ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা জলের মধ্যেই হাঁটতে শুরু করি—প্রথমে পাৎলুন গুটিয়ে, তারপর মায়া ত্যাগ করে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরেছিলাম, কখনো কখনো নৌকোয় কিছু পথ ঘুরেছি—ডাব ও সিগারেট ছাড়া আর কোনো খাদ্য পানীয় ছিল না। কবিতাটির মধ্যে বন্যার উল্লেখ এই কারণে।

কবিতাটি রচনার প্রক্রিয়া এই রকম। অ্যালেন গীনসবার্গের সঙ্গে একটা টেপ রেকর্ডার ছিল, সর্বক্ষণ খোলা, যেকোনো ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়া টেপ রেকর্ডারকে শোনাচ্ছিলেন, কখনো আমরা সবাই মিলে যা আলোচনা করেছি—তাও টেপ-নিবদ্ধ হয়। কবিতাটির মধ্যে সেই সব কথাবার্তা সরাসরি স্থান পেয়েছে। মায়া বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছিল, মনে আছে।

কবিতাটি আগাগোড়া ছন্দ ও মিল রেখে লেখা। অ্যালেন গীনসবার্গের কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের কাছে বিস্ময়কর মনে হতে পারে। এখন চার দিকেই গদ্য কবিতার হাওয়া। কিন্তু অ্যালেন গীনসবার্গ এখন উইলিয়াম ব্লেকের কবিতায় নিমগ্ন। ব্লেকের কিছু কবিতা উনি নিজে সুর দিয়ে এবং নিজের

কণ্ঠে গান গেয়ে রেকর্ড করেছেন। সম্ভবত এরই প্রভাবেই তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় প্রত্যাশিত ছন্দ ও মিল এসে গেছে। তাতে, কবিতাটির সরল আবেদন বেড়েছেই বলা যায়।

অনুবাদ না করে মূল ইংরেজি কবিতাটি উদ্ধৃত করার দুটি কারণ। প্রথম কারণ, কবিতা অনুবাদে আমার অক্ষমতা। তা ছাড়া, কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে, অনুবাদে এর রস অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবার আশঙ্কা। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এবং ভিলেজ ভয়েস—এই দুটি কাগজে। আমার কাছে তিনি যে পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়েছেন, তাতে ওঁর নিজের হাতে কিছু কিছু সংশোধন করা ছিল। আমরা সেই সংশোধিত রূপটি এখানে প্রকাশ করলাম।

সনাতন পাঠক

SEPTEMBER ON JESSORE ROAD

Allen Ginsberg

Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road—long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts

Millions of fathers in rain
Millions of mothers in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sisters nowhere to go

One million aunts are dying for bread
One million uncles lamenting the dead
Grandfather millions homeless and sad
Grandmother millions silently mad

Millions of daughters walk in the mud
Millions of children wash in the flood
A Million girls vomit & groan
Millions of families hopeless alone

Millions of souls nineteen seventy one
Homeless on Jessore road under grey sun
A million are dead, the millions who can
Walk toward Calcutta from East Pakistan

Taxi September along Jessore Road
Oxcart skeletons drag charcoal load
Past watery fields thru rain flood ruts
Dung cakes on treetrunks, plastic-roof huts

Wet processions Families walk
Stunted boys big heads don't talk
Look bony skulls & silent round eyes
Starving black angels in human disguise

Mother squats weeping & points to her sons
Standing thin legged like elderly nuns
Small bodied hands to their mouths in prayer
Five months small food since they settled there

On one floor mat with a small empty pot
Father lifts up his hands at their lot
Tears come to their mother's eye
Pain makes mother Maya cry

Two children together in palmroof shade
Stare at me no word is said
Rice ration, lentils one time a week
Milk powder for weary infants meek

No vegetable money work for the man
Rice lasts four days eat while they can
Then children starve three days in a row
And vomit their next food unless they eat slow.

On Jessore road Mother wept at my knees
Bengali tongue cried mister Please
Identity card torn up on the floor
Husband still waits at camp office door

Baby at play I was washing the flood
Now they won't give us any more food
The pieces are here in my celluloid purse
Innocent baby play our death curse

Two policemen surrounded by thousands of boys
Crowded waiting their daily bread joys
Carry big whistles & long bamboo sticks
To whack them in line they play hungry tricks

Breaking the line and jumping in front
Into the circle sneaks one skinny runt
Two brothers dance forward on the mud stage
The guards blow their whistles & chase them in rage

Why are these infants massed in this place
Laughing in play & pushing for space
Why do they wait here so cheerful & dread
Why this is the House where they give children bread

The man in the bread door Cries & comes out
Thousands of boys & girls Take up his shout
Is it joy? Is it prayer? "No more bread today"
Thousands of Children at once scream Hooray

Run home to tents where elders await
Messenger children with bread from the state
No bread more today ! & no place to squat
Painful baby, sick shit he has got.

Malnutrition skulls thousands for months
Dysentery drains bowels all at once
Nurse shows disease card Enterostrep
Suspension is wanting or else chlorostrep

Refugee camps in hospital shacks
Newborn lay naked on mother's thin laps
Monkeysized week-old Rheumatic babe eye
Gastroenteritis Blood Poisoning thousands die

September Jessore Road Rickshaw
50,000 souls in one camp I saw
Rows of bamboo huts in the flood
Open drains, & wet families waiting for food

Border trucks flooded, food can't get past,
American Angel machine please come fast !
Where is Ambassador Bunker today?
Are his Helios machinegunning children at play ?

Where are the helicopters of U.S. AID?
Smuggling dope in Bankok's green shade.
Where is America's Air Force of Light?
Bombing North Laos all day and all night?

Where are the President's Armies of Gold?
Billionaire Navies merciful Bold?
Bringing us medicine food and relief ?
Napalming North Viet Nam and causing more grief ?

Where are our tears? Who weeps for this pain?
Where can these families go in the rain?
Jessore Road's children close their big eyes
Where will we sleep when Our Father dies?

Whom shall we pray to for rice and for care?
Who can bring bread to this flood foul'd lair
Millions of children alone in the rain !
Millions of children weeping in pain !

Ring O ye tongues of the world for their woe
Ring out ye voices for Love we don't know
Ring out ye bells of electrical pain
Ring in the conscious American brain

How many children are we who are lost
Whose are these daughters we see turn to ghost?
What are our souls that we have lost care
Ring out ye musics and weep if you dare—

Cries in the mud by the thatch'd house sand drain
Sleeps in huge pipes in the wet shit-field rain
waits by the pump well, Woe to the world !
Whose children still starve in their mother's arms curled.

Is this what I did to myself in the past?
What shall I do Sunil Poet I asked?
Move on and leave them without any coins?
What should I care for the love of my loins?

What should we care for our cities and cars?
What shall we buy with our Food Stamps on Mars?
How many millions sit down in New York
& sup this night's table on bone and roast pork?

How many million beer cans are tossed
In Oceans of Mother? How much does She cost?
Cigar gasolines and asphalt car dreams
Stinking the world and dimming star beams

Finish the war in your breast with a sigh
Come taste the tears in your own Human ey
Pity us millions of phantoms you see
Starved in Samsara on planet TV

How many millions of children die more
Before our Good Mothers perceive the Great Lord?
How many good fathers pay tax to rebuild
Armed forces that boast the children they've killed?

How many souls walk through Maya in pain
How many babes in illusory rain?
How many families hollow eyed lost?
How many grandmothers turning to ghost ?

How many loves who never get bread?
How many Aunts with holes in their head?
How many sisters skulls on the ground?
How many grandfathers make no more sound?

How many fathers in woe
How many sons nowhere to go?
How many daughters nothing to eat
How many uncles with swollen sick feet

Millions of babies in pain
Millions of mothers in rain
Millions of brothers in woe
Millions of children nowhere to go.

শিল্প বাণিজ্য

র‍্যাশনালাইজিং মেটিরিয়ালস ম্যানেজমেণ্ট, ১৯৭০। শ্রীঅনিলকুমার দত্ত। দি ওয়ার্লড প্রেস। ৩৭, কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। কুড়ি টাকা।

কোন দেশের শিল্প উদ্যোগের যথাযথ সাফল্য মুখ্যত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এক জাতি এবং আন্তর্জাতিক শিল্প সমৃদ্ধি এবং তাদের সম্প্রসারণ সম্পর্কে দূরদৃষ্টি। দুই, সম্ভাব্য শিল্প সম্পদ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবহারিক এবং বণ্টন সম্পর্কে বিচক্ষণতা। এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হলে, তবেই অর্থনীতির মূল কথা উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যে একটা সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।

যে কোন দেশের শিল্প উৎপাদনের দুটি দিক আছে। এক, দেশের প্রয়োজন মেটান। দুই, রফতানি বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা। এই শেষোক্ত বিষয়টির ভূমিকা অন্তর্দেশীয় অর্থনীতির পরিপূরক।

কিন্তু চাহিদা এবং উৎপাদনের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব সুষ্ঠু পরিচালনার। সম্প্রতি জনৈক অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন, সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে হাহাকার পড়ে গেছে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের ব্যাপারে। কিন্তু হাহাকার যতই ফুলিয়ে দেখান হোক, আসল কথা পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন মানুষকে ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী প্রোটিন যোগানর সামর্থ্য পৃথিবীর আছে। কিন্তু মুশকিল হল যথাযথ পরিচালনার অভাবে সব সময় ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিন জমা পড়ছে, নষ্ট হচ্ছে,

অথচ যানবাহন এবং সংরক্ষণের অবহেলায় অবশিষ্টরা বঞ্চিত হচ্ছে।

কথাটি ব্যাপকভাবে শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রেও সত্য। কারণ এখানে তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই দরকার— পরিমাণ, গুণগত উৎকর্ষ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ। এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজকের দিনে সম্ভবত সবচাইতে বড় সমস্যা। সাধারণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে মূল্য কমা উচিত। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মূল্য ধার্য করলে উৎপাদনকারী এবং ক্রেতা উভয়েই লাভবান হন। এও এক জটিল এবং বাস্তবমুখী প্রত্যয়। একমাত্র পরিচালনা বিষয়ক বিজ্ঞানীরাই এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন।

আলোচ্য গ্রন্থে এমন সব জটিল, তথ্যবহুল এবং অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে শ্রীদত্ত সংক্ষেপে অথচ পারম্পর্য বজায় রেখে আলোচনা করেছেন। দেশ বিদেশের সংখ্যায়নের ভিত্তিতে বক্তব্য পরিবেশন করায় তাঁর বিষয়বস্তু অনেকাংশেই স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতধর্মী। অর্থনীতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, শিল্প পরিচালনার গুরু দায়িত্ব যাঁদের ওপর অর্পিত, তাঁদের বইটি ভাল লাগবে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা, আয়তনের তুলনায় বইটির দাম অনেক বেশি বলেই মনে হল।

শ্রীদত্ত যে পরিমাণ সংখ্যায়ন ভিত্তিক নজির তুলে ধরেছেন, তার তুলনায় বিশদ ব্যাখ্যা খানিকটা দুর্বল বলে মনে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা কংক্রিট ভাবে তুলে ধরে বিষয়বস্তুটি বিশ্লেষণ করলে আমাদের মূল সমস্যা কী-কী সে সম্পর্কে পাঠক পাঠিকার ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হতে পারত।

(সি ৮৫৩৫)

উপন্যাস

তুফান। শংকরচন্দ্র বিশ্বাস। অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ। ৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

তিনটি তরুণ জীবনের ... শপথ করল, তারা গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করবে। একজন ... এ এস হয়ে প্রশাসন সংস্কারে উদ্যোগী হল। দ্বিতীয় জন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গ্রামের কাজে লাগল। এবং তৃতীয় জন ডাক্তার হল। ... ত্রিমুখী ভূমিকাই 'তুফানে'র বিষয়বস্তু। সম্ভবত এটি লেখকের নতুন প্রয়াস। ... ভুল ত্রুটি এবং সেই সঙ্গে অসংলগ্নতা চোখে পড়বে এর কাহিনী বিস্তারের ব্যাপারে। উপস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল। একটু ধৈর্য নিয়ে লিখতে পারলে শ্রীবিশ্বাসের রচনা প্রতিশ্রুতি অভিমুখী হতে পারত।

পত্রিকা

কালি ও কলম। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৩·৭৫।

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মরণে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'কালি ও কলম'-এর একটি স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাটিতে বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ তাঁর কয়েকটি স্মরণীয় রচনা সম্বন্ধে, তাঁর দৃষ্টিতে জীবন ও সাহিত্য নিয়ে, তাঁর গদ্য ভাষা, ছোটগল্প এবং তারাশঙ্কর ও রাঢ় দেশের সংস্কৃতি নিয়ে কিছু মূল্যবান নিবন্ধ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণা-

রঞ্জন বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সাহিত্য রসিকগণের কাছে এই সংখ্যাটি একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হতে পারে।

স-বল বাঙালী সুঁটে ব্যানার্জী

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত রাবার লাভ করায় ক্রিকেটের বিজ্ঞ সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ খেদ করে বলেছেন, 'এর উপর দলে যদি একজন ফাস্ট বোলার থাকত'। রাবার জয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকারও বলেছেন, 'যে করে হোক ফাস্ট বোলার আমাদের তৈরী করতেই হবে। ফাস্ট বোলারের অভাবে প্রতিপক্ষের টেল-এন্ডার্সরা বেশী রান করে যাবে তা আর আমরা হতে দেব না'।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ভারতে যখন সত্যিকারের ফাস্ট বোলার ছিল এবং ব্যাটিংয়েও ভারত ছিল রীতিমত শক্তিশালী তখন রাবার তো দূরের কথা, একটি টেস্ট জয়ও সম্ভব হয়নি কেন? তখন কি ভারতের ব্যাটিং শক্তি দুর্বল ছিল? নাইডু, উজির আলী, মারচেণ্ট, মুস্তাক আলী, অমরনাথ, অমর সিং, মহম্মদ নিসার, সুটে ব্যানার্জি প্রভৃতিকে নিয়ে তারকাখচিত ক্রিকেট দলের একটি টেস্ট না জেতার কারণ কি?

সুটে ব্যানার্জিকে অবশ্য তখন কোন টেস্ট খেলানো হয়নি। ১৯৩৬-এ এবং ১৯৪৬-এ দু'দুবার ইংলণ্ড সফরে গিয়েও একটিও টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি। ১৯৪৭-এ অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ও তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ তখনও তিনি ভারতের সবচেয়ে ক্ষিপ্রতম বোলার।

আমি বলছি না সুটে ব্যানার্জিকে দলে নিলেই ভারত তখন টেস্ট খেলায় জিতে যেত। তবে সুটে ব্যানার্জির যোগ্যতা অস্বীকারের মধ্য দিয়ে আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের তখনকার রাজনীতির কিছু পরিচয় পেয়ে যাব। অপ্রিয় হলেও বলতে হচ্ছে, ক্রিকেট খেলা নিয়ে তখন যে নোংরা খেলা চলেছে সেটা 'ক্রিকেট' নয়। এবং সুকৌশলে সুটে ব্যানার্জির যোগ্যতা উপেক্ষা ভারতীয় ক্রিকেটের এক নোংরা অধ্যায়। তবে হ্যাঁ, নির্বাচকদের পরিণত প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়েছে বইকি। সুটে ব্যানার্জিকে টেস্ট খেলতে ডাকা হয়েছে প্রায় বার্ধক্যে পৌঁছবার প্রাক্কালে। ১৯৪৮-৪৯-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলায় তাঁকে ডাকা হয়। 'ব্যাটসম্যানস' প্যারাডাইস নামে খ্যাত বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ওই খেলাতেই তিনি প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় দলকে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে। বিধি-বাম, আম্পায়ারের দুর্বোধ্য আচরণে মাত্র ৬ রানের অভাবে ওই টেস্ট ভারত জিততে পারেনি। ওভারের শেষ বল এবং দেড় মিনিট সময় বাকি থাকতে আম্পায়ার স্টাম্পের উপর থেকে বেল তুলে নিয়ে খেলার উপর যবনিকা ফেলেন। তখনো ভারতের হাতে দুটি উইকেট। তার আগে ভারতের মাটিতে দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের একমাত্র পরাজয়ের কার্যকরণও হয়েছিলেন সুটে ব্যানার্জি। এলাহাবাদে পূর্বাঞ্চলের পক্ষে পেয়েছিলেন ৬৭ রানে ৭টি উইকেট।

ফাস্ট বোলার হতে হলে চাই শরীরের শক্তি-সামর্থ্য এবং দৈহিক কাঠামো দুই-ই।

সুটে ব্যানার্জি

তার সঙ্গে আবার মানসিক দৃঢ়তারও দরকার। সবই ছিল সুটে ব্যানার্জির। ছিল হাতের নৈপুণ্য, ব্যাটসম্যানকে ভীত করার বিপুল বৈভব। স-বল সুটে ব্যানার্জি হচ্ছেন সবল বাঙালীর প্রাণের প্রতীক। হ্যাঁ প্রকৃতির অকৃপণ দানে এবং অধ্যবসায় সাধনা ও ঐকান্তিকতার গুণে সবই পেয়েছিলেন তিনি। পাননি শুধু ভাগ্যদেবীর করুণা আর ভারতীয় ক্রিকেটের ভাগ্য বিধাতাদের কাছ থেকে যথাযোগ্য ব্যবহার। সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যতম ক্রিকেট খেলোয়াড় সুঁটে ব্যানার্জি।

আবার সম্ভবত সর্বসাধারণের স্নেহধন্য ক্রিকেটারও সুটে ব্যানার্জি। নির্বাচকদের দ্বারা যত তিনি উপেক্ষিত হয়েছেন, টেস্ট নির্বাচকরা যত তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন তত তিনি সাধারণের কাছে সরে এসেছেন। ক্রিকেট থেকে আনন্দ পাওয়া এবং ক্রিকেটে আনন্দ দেওয়ার শক্তিতে সর্বসাধারণের সম্ভ্রম আদায় করেছেন অসীম প্রাণের ওই বিরাট মানুষটি।

রনজি প্রতিযোগিতার শুরু থেকে প্রথমে বাংলায়, পরে নবনগরে এবং মধ্য জীবনে বিহারে—যখন যেখানে খেলেছেন তখন সেখানেই সুটে ব্যানার্জি ক্রিকেটের এক বিশিষ্ট চরিত্র। কোয়াড্রাঙ্গুলারে পেণ্টাঙ্গুলারে জার্ডিনের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে, জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে এবং ১৯৪৫-এর অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে—কোথায় সুঁটে ব্যানার্জির কীর্তির চিহ্ন নেই?

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁর একমাত্র সরকারী টেস্ট খেলার কথা আগেই বলেছি। উল্লেখযোগ্য খেলাগুলিতে তাঁর কৃতিত্বের নজির খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাব তিনি লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে সি সি আই দলের পক্ষে খেলে এক ইনিংসে পেয়েছেন ৮১ রানে ৬টি উইকেট। যে খেলায় অমর সিং, অমরনাথ, মানকড়ের মত খেলোয়াড়রাও ছিলেন। ১৯৪১-৪২-এ দুবারের রনজি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাইকে নামিয়ে দিয়েছেন মাত্র ৩৯ রানে ২৫ রানে ৮টি উইকেট দখল করে। ১৯৪৫-এ অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে পেয়েছেন ৮৬ রানে ৪ ও ৮১ রানে ৪টি উইকেট। ১৯৩৫-এ ইডেনে জ্যাক রাইডারের দলের বিরুদ্ধেও [illegible] তাঁর সিংহ ভাগ। আর সরকারী বা বেসরকারী টেস্টে ভারতের সর্বপ্রথম জয়ের মূলেও রয়েছে তাঁর বড় অবদান। তবে বলে নয়, ব্যাটে। উজির আলীর নেতৃত্বে লাহোরের বেসরকারী টেস্টে জ্যাক রাইডারের দলের বিরুদ্ধে সুটে ব্যানার্জি ইনিংসের সূচনা করে করেছিলেন ৭০ রান।

সূচনাকারী ব্যাটসম্যান হিসাবে এই কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ ব্যাটসম্যান হিসাবে ইংলণ্ডে তাঁর রেকর্ডটিও স্মরণীয়। সে এক অদ্ভুত ইনিংস। ১৯৪৬-এ সারের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম দুজন ব্যাটসম্যান হাজারে ও মোদি শূন্য রানে আউট। শেষ দুজনের সেঞ্চুরী। সি টি সারভাতের নট আউট ১২৪, শরদিন্দু ব্যানার্জির ১২১। দুজনের জুটিতে দশম উইকেটের নতুন রেকর্ড ২৪৯। দশম উইকেটের নতুন রেকর্ড ইংলণ্ডের মাটিতে। সুটে ব্যানার্জির জন্মের আগে অর্থাৎ ১৯০৯ সনে উরস্টারের বিরুদ্ধে কেন্টের ফেয়ারার ও ডোয়েলীক যে ২৩৫ রানের রেকর্ড করেছিলেন সেটিই ভেঙে যায়। আজও ওই রেকর্ড অম্লান। একদিক দিয়ে ওটিকে বিশ্ব রেকর্ডও বলা যেতে পারে। কেননা ১০ নম্বর ও ১১ নম্বর খেলোয়াড় দুটি সেঞ্চুরি করার বোধ করি,

দ্বিতীয় নজির নেই। অন্তত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে।

সুটে ব্যানার্জির ওই খেলার পর রয়টারের স্পেশাল সংবাদদাতা বিশ্ব সমালোচক লিয়ারি কনস্টানটাইন লিখেছিলেন—

"Banerjee, whom gossip had made the hero of intriguing cricket politics at home, played a lion-hearted innings He gave the ball a new velocity, a new freedom of travelling ease and an unlimited space in flight all over the Oval. He did all this with the fluent grace of confident bat."

ইংলন্ডে ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার ক্রিকেট ভাষাকার অধ্যাপক দেওধর ১২ মে তারিখের প্রতিবেদনে লিখেছিলেন—

'India made cricket-history to-day when the last pair Banerjee and Sarwate put up 249 runs in partnership to beat the record of 235 runs for All England—the world record being 307 made by Kippax and Hooker in Australia in 1928.

"It was also a record for both the last player to score individual centuries."

প্রোফেসর দেওধর আরও লিখেছিলেন, শেষ ব্যাটসম্যান সুটে ব্যানার্জির ব্যাটিং দেখে ইংলন্ডের বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত। লিয়ারি কনস্টানটাইন লিখেছিলেন, টেস্ট দলে অল-রাউন্ডার হিসাবে সুটে ব্যানার্জির অন্তর্ভুক্তি অবধারিত। কিন্তু হায়—আগেই বলেছি—টেস্টে সুটে চান্স পাননি।

প্রধানত ফাস্ট বোলার হিসাবে সুটে ব্যানার্জির খ্যাতি। ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডার হিসাবে বা এমন খ্যাতি ক'জনের আছে? আর ফুটবলার হিসাবে।

আমরা ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় এবং নির্মল চ্যাটার্জিকে ভাল ফুটবলার হিসাবেও জানি। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ফুটবল দলটি পাটনা থেকে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার স্যার সুলতান আমেদ ট্রফিটি নিয়ে এসেছিল সুটে ব্যানার্জি ছিলেন সেই দলের অন্যতম ব্যাক। জুনিয়র ইণ্টারন্যাশন্যালেও সুটে ব্যানার্জি ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। হকিও খেলেছেন অল্পস্বল্প। কিন্তু প্রায় জীবনভোর ক্রিকেটের মধ্যেই ডুবে আছেন। সংগঠনে এবং প্রশিক্ষণেও। প্রথম যৌবনে নবনগরে। রনজি ও দলীপের স্মৃতিপূত নবনগরকে বলেছেন ক্রিকেটের তীর্থক্ষেত্র। ভরা যৌবনে বিহারকে ভারতের ক্রিকেট মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে দিয়েছেন। প্রৌঢ়ে ভিলাইতে খেলাধুলা সংগঠন করেছেন। এখন ডুবে আছেন পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণের মধ্যে। শিক্ষার্থীদের কাছে সুটে ব্যানার্জি অসীম প্রাণের একটি বিপুল আধার, নিরন্তর ফুটন্ত যেটা ফাস্ট বোলারের ধর্ম।

মুকুল

নতুন জাতির উষ্ম লগ্নে কল্পনা করে নিতে পারছি, শিক্ষাদীক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় চেতনার নব-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তাদের নিজের জায়গা করে নিতে পারবে। আবারই ফিরিয়ে আনতে পারবে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী খেলাধুলোয় তার অতীত ঐতিহ্য।

খেলাধুলোর ঢাকা অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী। অতীতে ঢাকার কত খেলোয়াড় এই কলকাতার মাঠের ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন তা কারো অজানা নেই। দল হিসাবেও ঢাকা উয়াড়ি, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, গান্ডারিয়া স্পোর্টিং প্রভৃতির সুনাম কম ছিল না। পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পর অবশ্যই ঢাকায় খেলাধুলোর চর্চা বেড়েছিল। একটি সুদৃশ্য স্টেডিয়ামও খাড়া হয়েছিল। কিন্তু ইসলামাবাদের অধিকর্তাদের ষড়যন্ত্রে পূর্ব-বাংলার খেলোয়াড়রা ছিল পাকিস্তানের জাতীয় দলে প্রায় অপাংক্তেয়। পরের উপনিবেশ থেকে পিন্ডির ক্রীড়া-পরিচালকরা যে কয়েকজন খেলোয়াড়কে জাতীয় দলে স্থান দিয়েছেন তাঁদের হাতে গোনা যায়। অথচ খেলাধুলোয়, বিশেষ করে ফুটবল খেলায় পূর্ব বাংলার খেলোয়াড়দের যোগ্যতা অনস্বীকার্য। স্বাভাবিকভাবেই আজ আশা করা যায়, স্বাধীন এবং সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্র খেলাধুলোর দিকেও নজর দেবেন এবং যুবক-যুবতীরাও খেলার মাঠে তাঁদের কৃতিত্ব দেখাতে সচেষ্ট হবেন।

আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এক দানবশক্তির বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামে যারা অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন খেলার মাঠেও তাঁরা বীরত্বের পরিচয় দেবেন এটা মোটেই দুরাশা নয়। এখন থেকেই যুবশক্তিকে প্রেরণা দেওয়া উচিত বলে মনে হয়। আজ স্বাধীন বাংলাদেশ যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দাবী করছে, দাবী করছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য পদ, তেমন বিশ্ব অলিম্পিকেও বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের দাবি জোরদার হওয়া উচিত বলেই মনে করি। অবশ্যই নতুন রাষ্ট্রের সামনে নানা সমস্যা। কিন্তু খেলাধুলোও জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং খেলার মাঠ জাতি গঠনের এক অঙ্গন।

*

জাতীয় টেবল টেনিস—হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে এবার ৩৩তম জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিসে মহারাষ্ট্রের জয়-জয়কার, অভূতপূর্ব সাফল্য। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার চারটি বিভাগের খেতাবেই মহারাষ্ট্রের মাথায় বিজয়ীর মুকুট, জাতীয় প্রতিযোগিতার সাতটি বিষয়ের মধ্যে ৫টি বিষয়ে বিজয়ীর পুরস্কার। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় কেইটি চান্দ্রমানের—সে পেয়েছে ট্রিপল ক্রাউন। এই লেখার শেষে ফাইনালের ফলাফল থেকে বিজয়ী ও বিজিতদের নাম পাওয়া যাবে।

ভারতের টেবল টেনিসে মহারাষ্ট্রের প্রাধান্য বহুদিন থেকেই। ১৯৫৮, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সনেও মহারাষ্ট্র আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু কোনদিন যে ঘটনা ঘটেনি এবার সেই অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে চারটি বিভাগেই মহারাষ্ট্রের জয়ের মাধ্যমে।

এবারকার প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখ করবার ঘটনা কোয়ার্টার ফাইনালে

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের সুদৃশ্য স্টেডিয়াম।

ভারতের এক নম্বর ও দুই নম্বর খেলোয়াড়ের পরাজয়। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ও এক নম্বর রেলওয়েজের জি জগন্নাথকে হার স্বীকার করতে হয়েছে মহারাষ্ট্রের উঠতি খেলোয়াড় নীরজ বাজাজের কাছে। দুই নম্বর এবং প্রাক্তন ভারত চ্যাম্পিয়ন অন্ধ্রের মীরকাশিম আলী হেরেছেন মহীশূরের বাদাগারে শৈকুমারের কাছে। শেষ পর্যন্ত বাজাজ এবং শৈকুমারই ফাইনাল খেলেছেন।

নতুন চ্যাম্পিয়ন শৈকুমার মুখ্যত ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়। এর আগের জগন্নাথও ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়। জাতীয় প্রতিযোগিতায় এদের সাফল্য কিন্তু প্রমাণ করছে ভারতের টেবল টেনিস মান নিম্নমুখী। কেননা, যত বড় ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়ই হন, অ্যাটাকিং খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে তাঁদের জয় বার বার সম্ভব হয় না। সমশক্তিসম্পন্ন একজন অ্যাটাকিং ও একজন ডিফেন্সিভ খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঁচবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে সাধারণ ডিফেন্সিভ খেলোয়াড় জিতবে একবার কি দুইবার, বাকি বার জিতবে অ্যাটাকিং খেলোয়াড়।

যাই হোক, নতুন চ্যাম্পিয়ন শৈকুমার অবশ্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। কিন্তু জগন্নাথের পরিণতি দেখে শৈকুমারের খেলার ধারা বদলাবার প্রয়োজন হতে পারে। ভারতের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়রাও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল—মহীশূরের শৈকুমার ২১—৭, ২৪—২২ ও ২১—৯ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রের নীরজ বাজাজকে পরাজিত করে।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের কেইটি চার্জম্যান ২১—১৯, ২১—১৯ ও ২১—১৬ পয়েন্টে বাংলার রূপা মুখার্জিকে পরাজিত করে।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের সুহাস কুলকার্নি ও কে এইচ বাচা ৩—২ খেলায় পরাজিত করে অন্ধ্রের মীরকাশিম আলী ও দিলীপ রাজ সাকসেনাকে।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের কেইটি চার্জম্যান ও কাশ্মীরা প্যাটেল ২১—১৮, ২১—১৮ ও ২১—১৪ পয়েন্টে হারায় রূপা মুখার্জি ও কলাবতী সীতারামকে।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল—কেইটি চার্জম্যান ও ফারুক খোদাইজি ২১—১৭, ২১—১৪ ও ২১—১৪ পয়েন্টে পরাজিত করে মহীশূরের ঊষা সুন্দররাজ ও কাবাড জয়ন্তকে।

বালকদের সিংগলস ফাইনাল—কেরলের বালচন্দ্রন অন্ধ্রের এ টি এম ইয়াহিয়াকে ২১—১৪, ২১—১১, ১৬—২১, ১৮—২১ ও ২১—৮ পয়েন্টে পরাজিত করে।

বালিকাদের সিংগলস ফাইনাল—মহারাষ্ট্রের নেয়ামৎ মোল্লা পরাজিত করে মহারাষ্ট্রেরই নন্দিনী কুলকার্নিকে।

বিশ্ব একাদশের জয়—অস্ট্রেলিয়া ও অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের তৃতীয় বেসরকারী টেস্টে বিশ্ব দল ৯৬ রানে বিজয়ী হওয়ায় সিরিজের আকর্ষণ বেড়েছে। প্রথম টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর পার্থের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ১১ রানে বিজয়ী হয়েছিল। তৃতীয় টেস্টের পর ১—১ জয়ে দুই দলের অবস্থা সমান। চতুর্থ টেস্ট এখন চলছে।

ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলির মারাত্মক বোলিংয়ে বিশ্বের একাদশের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৮৪ রানে শেষ হয়ে গেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক গ্যারি সোবার্সের অনবদ্য ব্যাটিং বিশ্ব দলকে জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছে। সোবার্স ২৫৪ রানের একটি অপূর্ব ইনিংস খেলেছেন। যে ইনিংস দেখে ক্রিকেটের প্রথম পুরুষ স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান পর্যন্ত বলেছেন অতুলনীয়। স্বভাবতই ব্র্যাডম্যান বচনে সংযত। কোন কিছুকে শ্রেষ্ঠ বলতে তাঁর সংস্কারে বাধে। সেই ব্র্যাডম্যানই বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার মাঠে বহু কৃতী ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং দেখেছি, কিন্তু সোবার্সের এই ইনিংসের মত একটিও চোখে পড়েনি। আত্মবিশ্বাস, হাতের নৈপুণ্য, স্ট্রোকে কব্জির জোর ও পেলবতা এবং সর্বোপরি যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সোবার্সকে ব্যাট করতে হয়েছে সে সব কথা বিবেচনা করেই স্যার ডোনাল্ড সোবার্সের চরম প্রশংসা করেছেন। প্রসংগত বলা প্রয়োজন, মেলবোর্ন মাঠে এটিই সোবার্সের প্রথম শতরান। শতরান নয়—২৫৪ রান। এই সেঞ্চুরির পর পৃথিবীর কোন বড় মাঠেই আর সোবার্সের সেঞ্চুরি করতে বাকি রইল না।

একলব্য

রাজ্জ্বর (হেমা মালিনী) মধ্যে প্রাক-বিবাহ রোমান্স দেখিয়ে দিয়েছেন। তবে এই উপাখ্যান খুবই সংক্ষিপ্ত। আসলে শংকর ও রাজ্জুর বিয়ে পাকা হবার পরই কাহিনীর মোড় ঘোরে, জটিলতা দেখা দেয়।

ডাকাত দলের হীরালাল পুলিসে ধরা পড়েছিল। সে জেল ভেঙে পালায় এবং প্রাক্তন সহকর্মী গোয়েন তথা বলরাজ সাহনীর খোঁজে সশরীরে এসে উপস্থিত হয়। সে জানে ডাকাতির লুঠের একটা মোটা অংশ—পাঁচ লক্ষ টাকা দামের অলংকার এবং লক্ষপতি চৌধুরীর একমাত্র কন্যা গোয়েনের কাছে রয়েছে। এদিকে গোয়েন যে সৎ-জীবনে ফিরে এসেছে এবং জেল-পলাতক হীরালালের (অজিত) উপস্থিতি আঁচ করার পর মেয়েকে তার বাবার কাছে অলংকারের বাক্স সহ পৌঁছিয়ে দিতে ব্যস্ত সেটা হীরালাল বুঝতে পারে নি। গোবিন্দরাম যদি সহজে তা পারতেন তবে কাহিনীও সহজ হয়ে আসত। বোধ হয় কাহিনীকার সুখেন্দু রায় এবং পরিচালকের সেটা মনঃপূত নয়। নায়িকা হেমা মালিনী তার পিতৃপরিচয় জানবার আগেই গোবিন্দ-রাম হীরালালের হাতে নিহত। এবং গোবিন্দরামের মৃত্যুর পর নায়িকা হেমা মালিনীর হাতে খুন হয়েছে হীরালাল। হীরালালকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে এ কথা আগেই ঘোষিত হয়েছিল। সে পুরস্কার পেয়েছে নায়িকা স্বয়ং।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল পিতার (অভী ভট্টাচার্য) কাছে তার নিজের মেয়ে পরায়া ধনই রয়ে গেল। নায়িকা তার পিতার পরিচয় পেল, দেখাও পেল, কিন্তু বাবাকে এই অনুরোধ জানাল যে গোবিন্দরামের অতীত ডাকাত-জীবনের কথা যাতে কেউ জানতে

না পারে তাই সে যেন তারই কন্যা হিসাবে আজীবন পরিচিত থাকে। কন্যাকে অদের কিছুই ছিল না পিতার, অতএব তিনি তথাস্তু বলে চলে গেলেন। তবে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, বিয়ের সময় যেন তাঁকে খবর দেয়। সেদিক থেকে নায়িকা তার বাবার কাছেও পরায়া ধন রয়ে গেল।

নাটকীয়তা ও অ্যাকশনের পর্যায়ক্রমে বলরাজ সাহনীর অভিনয়ই মনে বিশেষ-ভাবে দাগ কাটে। হেমা মালিনীকেও সময় সময় বেশ প্রাণবন্ত মনে হয়। এই সাজানো নাটকে গানের অবকাশও হয়েছে। রাহুল দেববর্মণ সুরারোপিত গানগুলি শুনতেও ভাল লাগে।

বোম্বাই বিচিত্রা

"মেরে আপনে" (পরিচালনা : গুলজার) ছবিতে শত্রুঘ্ন সিন্‌হা ও বিনোদ খান্না। ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

'এ দেশে' নাকি সাধারণ ছবির মান অসাধারণ রূপে সাধারণ এমন কথায় বিশ্বাস করেন ব্যবসায়বিশ্বাসী ফিল্মওয়ালারা। তাই নতুন কিছু করার প্রচেষ্টাকে তাঁরা হাস্যকর বলে হেসে থাকেন। কিন্তু ইদানীং কারো কিছু নতুন ধরনের ছবি দর্শক সাগরে কিঞ্চিৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করায় পরিবেশক মহল হঠাৎ নবতরঙ্গে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। এই নব তরঙ্গে বিশ্বাস এক নতুন ধরনের রঙ্গ সৃষ্টি করবে বলে মনে করছেন আর এক উন্নাসিক মহল। এই উন্নাসিক মহল আবার দুই দলে বিভক্ত। একদল যাঁরা অতি প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ দীর্ঘকাল সাফল্যের প্রস্তরে প্রতিষ্ঠিত যাঁদের প্রতিষ্ঠান, তাঁরা এই নব তরঙ্গের ঈষদোষ্ণ স্পর্শে একেবারেই বিচলিত নন এবং সেই কারণেই উন্নাসিক। অন্যদল একেবারেই প্রতিষ্ঠিত নন, অর্থাৎ যাঁদের চাল চুলো, কলা কাকে কিছুই নেই, এক কথায় যাঁদের কিছুই নেই তাদের নাক আছে সেজন্যই তারা উন্নাসিক। প্রথম দল প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠান প্রসূত কনভেনশনের শিকার, তাই তাঁরা চলতি কা নাম গাড়ির যাত্রী। তাঁদের যাত্রাপথ প্রচলিত পথে এবং সেই পথের সব কিছুই সুপথ্য বলে তাঁদের ধারণা। আর দ্বিতীয় দল প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠানহীন হওয়ায় প্রচলিত পথের বিপরীত পন্থী। তাঁরা কনভেনশনকে কানা চোখে দেখেন, প্রচলিত পথকে বিপথ বলে মনে করেন, তাঁরা মনে করেন 'যে পথে পথ নেই সেই পথই পথ'। তাঁরা স্বাভাবিককে অস্বাভাবিক মনে করেন, বাস্তবিকতার নামে নিজেদের কাল্পনিক বাস্তবিকতার জগতে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসেন। এঁদের কল্পনার জগতে কোনো বিকল্প নেই। এঁরা কি চান তা জানেন না, শুধু জানেন কি চান, না। এঁরা প্রণয়ে বিশ্বাসী কিন্তু পরিণয়-এর প্রতি এঁদের কোনো শ্রদ্ধা নেই। এঁরা যা কিছু বোঝা যায় না তা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চান না—যা বোঝা যায় তা বুঝতে এঁদের কোনো আগ্রহ নেই। আসলে এঁরা সারল্যকে ছেলেমানুষি মনে করেন এবং চালাকিকে মনে করেন চাতুর্য্যকর। এঁদের মানসিকতা সহজগ্রাহ্য সব কিছুকেই নাক কুঁচকে উড়িয়ে দেয়, কষ্ট-কল্পিত জটিলতার জট ছাড়াতে এঁদের অসাধারণ আগ্রহ এবং শেষ অবধি জট ছাড়াতে না পারলে তখন এঁরা সেই জটিল বস্তুটিকে শিল্প ভেবে মাথায় নিয়ে নাচা-নাচি করেন। এই জটিল কার্যে এঁদের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং সেই সুবাদে সরল শর্মা এঁদের শ্রদ্ধা করে থাকেন। যদিও এঁরা কাউকেই শ্রদ্ধা করেন না, বিশেষ করে যাঁরা শ্রদ্ধেয় তাঁদের তো একেবারেই নয়, তবু এঁদের শ্রদ্ধা করে এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় আজকাল। এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে ধান ভানতে শিবের গীত

'ইয়ার মেরা' (পরিচালনা : আত্মারাম) ছবিতে জিতেন্দ্র ও রাখী। ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে

কাটাতে হবে। সেটা আপাতত একেবারেই অসম্ভব নানা সামান্য কারণে। এখন শুধু কাজে করার স্পৃহা। কিন্তু কাজের লোকের সামনে বাজে বকার ধৃষ্টতা অন্তত আমার নেই। অথচ শেষ হবার আগে শেষ করলে কপালে অশেষ দুঃখ এমন কথা নাকি শাস্ত্র পুরাণে লেখা আছে। আমি সাধারণ মানুষ তাই বিশেষ কোনো শাস্ত্র-এ বিশ্বাস না করলেও প্রবাদে বিশ্বাস করি। উন্নাসিকদের উঁচু নাককে সমীহ করি, ফিল্মওয়ালাদের প্রতি আমার ফীলিং অতিমাত্রায়। তবু মাথা ছাড়াবার অধিকার আমার নেই, কাজের কথাতেও না, বাজে কথাতেও না।

*

এবার স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে নাকি অনেক ব্যবসা হবে এমন কথা শোনা যাচ্ছে। পরিবেশক মহলে ঐ অধুনা স্বাধীন ভূখণ্ডে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। কোনো কোনো অতি উৎসাহী পরিবেশক ঐ টেরিটোরির জন্য কিছু কিছু চলচ্চিত্রের মূল্য পর্যন্ত নির্ধারিত করে ফেলেছেন। এদেশে শহর কোলকাতায় ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের ছবি "জীবন থেকে নেয়া' দেখানো হচ্ছে। বাংলাদেশ কবে থেকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এদেশের নতুন ছবি দেখবে সেটা এখনো জানি না। সেইদিন যত শীঘ্র আসে তত শুভ।

সরল শর্মা

সংগীত সংহতি সম্মেলন

সুরেশ সংগীত সংসদ আয়োজিত তৃতীয় সংগীত সংহতি সম্মেলন আগামী

২২, ২৪ ও ২৬ জানুয়ারী, কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে। ২২ ও ২৪ রাত্রি ৮টা থেকে সারা রাত্রি ও ২৬ সকাল ৯টায়।

সুরেশ সংগীত সংসদের বার্ষিক সম্মেলনে এবারের বৈশিষ্ট্য হল ভারতের একাধিক বিখ্যাত সংগীত শিল্পীদের জন্মশত-বার্ষিকী পালন; তাঁদের মধ্যে আছেন পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর, ওস্তাদ আবদুল করিম খান, অতুলপ্রসাদ সেন, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালচাঁদ বড়াল। সম্মেলনের অংগীভূত এপার বাংলা ওপার বাংলা মৈত্রী অধিবেশন।

সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সংগীত শিল্পীদের মধ্যে আছেন, কণ্ঠ সংগীতে পণ্ডিত ডি এন পটুবর্ধন, ওস্তাদ আমিনুদ্দীন ডাগর, জগদীশ প্রসাদ, নিমাই বড়াল, মতি বাঈ (বড়), হীরাবাঈ বরদেকার, সরস্বতী রানে, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, মঞ্জু গুপ্ত। যন্ত্র সংগীতে থাকছেন ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, ওস্তাদ আমজাদ আলি খান, গোকুল নাগ, সুব্রত রায়চৌধুরী প্রভৃতি। সহযোগিতায় রয়েছেন পণ্ডিত শামতা প্রসাদ, গোপাল মিশ্র, লতিফ আমেদ, রামজী মিশ্র, আনন্দগোপাল ব্যানার্জি প্রভৃতি।

গান রেকর্ডিং-এর মধ্য দিয়ে "মেমসাহেব" ছবির শুভ সূচনা হয়। ছবিতে বাঁ দিকে চিত্রপরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় এবং চিত্র-প্রযোজিকা ও সংগীত পরিচালিকা অসীমা ভট্টাচার্যকে দেখা যাচ্ছে

চিৎপুর-চিত্র

পেশোয়া বাজীরাও

নবরঞ্জন অপেরা

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, যাত্রার কি আবার পুরনো যুগটাই ফিরে আসছে—উত্তরে অন্যে কি বলবেন জানি না, আমি অন্তত প্রতিবাদ করব না। কিন্তু ওই সংগে একটা কথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখব ঃ কোনো প্রাচীন বস্তুই হুবহু কখনও ফিরে আসতে পারে না। বিশেষ করে শিল্প। ধরা যাক, আজ যদি মতি রায় কি ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী অথবা তার আগের কোনো প্রাতঃস্মরণীয়ের পথ অনুকরণ করে পালা রচনা করা যায়, দর্শক কি তা নেবেন? বোধহয় না। কারণ সে যুগ থেকে সময়ের গাড়িটা এগিয়ে এসেছে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু যদি পুরনো কাহিনীটাই সমকালের রঙে রঙানো হয় অথবা সে যদি নির্দেশ করে বর্তমান কালকে; তবে? নবরঞ্জন অপেরার ইতিহাসাশ্রিত নতুন পালা 'পেশোয়া বাজীরাও' এর চমৎকার জবাব দিয়েছে। বলেছে ঃ অতীতের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যতের বীজ।

আমরা অবাক। মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে রাজা সাহু যখন অধিষ্ঠিত, সে সময়টা নিশ্চয় নাগালে পাওয়ার মতন নয়, অথবা দেখা নয় জীবিত কোনো বয়োবৃদ্ধের। তবু দূর অতীতের এই সন্ধিক্ষণ বারবার করে আমাদের আজকের দিনকে স্মরণ করায়। বীর রস তো বটেই ওই সংগে কাহিনীর চিরকালীন আবেদনের দিকটি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করার মতন। পালাকার দেবেন্দ্রনাথ নাথ সেন এর গতিপথ আঁকতে আঁকতে বারবার একটা কথা উচ্চারণ করতে চেয়েছেন ঃ দিন এখানেই সমাপ্ত নয়—এই দিন ভবিষ্যতের পটে বারংবার ফুটে উঠতে বাধ্য। বক্তব্য নিশ্চয়ই এই সংগে পালার শরীর গঠনেও আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে।

পেশোয়ার শূন্য আসনে সত্যি কারে কে বসবেন এই নিয়ে কাহিনীর সূচনা। বাজীরাও তখন যুবক মাত্র। কিন্তু তাঁর শৌর্যবীর্যের কথা সর্বত্রই সুবিদিত। প্রতিপক্ষে ছিলেন চন্দ্র সেন, শ্রীপৎ রায়, রোহিলাখণ্ডের নাব ও হায়দ্রাবাদের নিজাম। এই নিয়ে দ্বন্দ্বের অবতারণা এবং তীব্র সংঘর্ষের সৃষ্টি। কিন্তু পালাকার এমন কৌশলে কাহিনীর অগ্রগতি ঘটিয়েছেন যে, প্রতিবারই বাজীরাওয়ের প্রখর বুদ্ধি এবং বীরত্ব শত্রুপক্ষের কূটচক্রকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সত্যের জয়কেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বলাই বাহুল্য অভিনেতা নির্দেশক তপনকুমার পালার প্রত্যেকটি সিচুয়েশনকে অদ্ভুতভাবে কাজে লাগিয়েছেন। একদিকে বীরত্ব, অন্য দিকে প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র—পাশাপাশি রয়েছে ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, তাঁর পতিপ্রেম এবং উদাত্ত গলায় গাওয়া ভক্তিরস ও দেশাত্মবোধক গান—সব মিলিয়ে যে নাটকীয় ঘটনার ঘনঘটা, তা প্রায় নিরুদ্ধ নিশ্বাসে দেখবার মতন। অতএব বোধ হয় নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নবরঞ্জনের এই প্রযোজনা সকল রকম নাট্য সম্পদেই সমৃদ্ধ। ভক্তির মধ্যে দেশভক্তিই যে প্রধান 'পেশোয়া বাজীরাও' বার বার সে-কথা উচ্চারণ করেছেন।

দুরন্ত বাজীরাওকে দেখা গেল মস্তানীকে। রণোন্মাদনা তাকে অস্থির করে তুলেছে, অবৈধ প্রেমে সে খুঁজছিল শান্তির বিন্দু। পালায় এ-স্বল্পভাগও বিশিষ্ট। না, অসত্যের রাহু বাজীরাওকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করতে পারে নি। সতী পত্নীর পুণ্য ধর্মাচরণ তার স্বামীকে সকল গ্লানি থেকে মুক্ত করে এক নতুন জীবনসত্যে উপনীত করেছে।

পালার নাম ভূমিকায় শিল্পী তপনকুমার এ-চরিত্রের প্রত্যেকটি অংশকে নিখুঁত তুলিতে এঁকেছেন। বাজীরাওয়ের শৌর্য-বীর্যের ব্যঞ্জনা যেমন তাঁর অভিনয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি আশ্চর্য সাড়া এনেছে অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়ার পর তার অনুশোচনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অংশটুকু। আগে বলেছি শিল্পী নিজেই পালা-নির্দেশক। কয়েকটি আশ্চর্য নাট্যমুহূর্তে রচনায় তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় মেলে। রাজা সাহু ও রণজিৎ সিন্ধেয়া রূপে যথাক্রমে সুধীরকুমার বোস ও গোরাশশী মণ্ডলের অভিনয় সাথক শিল্পবোধের পরিচায়ক। বিপক্ষদলে রবীন মজুমদার (চন্দ্রসেন), বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি (শ্রীপৎ রায়), মণি চ্যাটার্জি (বংগজ খাঁ) সুবর্ণ সামন্ত (নিজাম), পালার স্বল্পভাগ গঠনে প্রায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। দুটি রসিক চরিত্রে অজিত দাস ও মহেন্দ্র ব্যানার্জির অভিনয়ক প্রায় তুলনারহিত বলা চলে। মেণ্টু

বোসের 'ছত্রশাল' বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে ভাস্বর। কানাই হালদার ও হরিগোপালের গান-গুলি দর্শকমনে রেখাপাত করবার মতন।

স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে মাতাজী রূপী বীণা ঘোষের অভিনয় বহুকাল মনে রাখার মতো। বাজীরাওয়ের স্ত্রীর ভূমিকায় ক্ষমা ভট্টাচার্যকে যেমন মানিয়েছে, তেমনি এই চরিত্রের অন্তর্বেদনা ও দ্বন্দ্বকে তিনি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাধবী চ্যাটার্জি'র 'মস্তানী'ও আকর্ষক। বিশেষ করে বাজীরাওকে সংপথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর আত্মত্যাগের মুহূর্তটি ভোলবার মত নয়। লতিকা পালের 'নন্দিনী' চরিত্রানুগ। 'বালক বালাজী' চরিত্রকে উত্তম-কুমার গান ও অভিনয় দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল।

সংগীতাংশের কথা আগে কিছু বলেছি। আবার বলি শীতল দত্তর দেওয়া প্রত্যেকটি সুরেই বৈচিত্র্য ছিল। শিল্পীরা দরদ দিয়ে গানগুলি গেয়েছেন।

—সূত্রধার

রেকর্ড-সঙ্গীত

কৃষ্ণচন্দ্রের গান

অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁর গানে সারা দেশ মাতিয়েছিলেন। শিল্পী আজ নেই, কিন্তু তাঁর গানগুলি এখনো আছে। গ্রামোফোন কোম্পানি সম্প্রতি এইচ-এম-ভি লং-প্লে রেকর্ডে কৃষ্ণচন্দ্রর বারোখানি কীর্তন গান পরিবেশন করেছেন। আজকের শ্রোতাদের কাছেও কৃষ্ণচন্দ্রর গানগুলি জনপ্রিয় হবে। তার একটি কারণ, নতুন রেকর্ডিং হয়েছে চমৎকার। মনেই হয় না অনেকদিন আগের গাওয়া গান। তেমনি সতেজ কণ্ঠ। এই রেকর্ড একটি বিরাট অভাব দূর করল।

সদ্য প্রকাশিত এল-পি রেকর্ডের বারোটি কীর্তনের মধ্যে রয়েছে চন্ডীদাসের দুটি গান—"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু" এবং "শতেক বরষ পরে"। বাকি গানগুলি শৈলেন রায়ের লেখা, "স্বপন দেখিছে রাধারাণী", "নবদ্বীপের শোভনচন্দ্র" প্রভৃতি। কৃষ্ণচন্দ্রর গানের বৈশিষ্ট্য, মন-মাতানো ধারা, মেজাজ ও তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। এই রেকর্ড ঘরে ঘরে আদৃত হবে নিঃসন্দেহে।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের শাস্ত্রীয় সংগীত

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া খেয়াল ও ঠুংরি গানের একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ড গ্রামোফোন কোমপানি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এল-পি রেকরড এই প্রথম। গত ১৯ ডিসেম্বর গ্রামোফোন কোমপানির দক্ষিণ কলকাতার রিহাবসাল রুমে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রেকরডখানি বাজিয়ে শোনানো হল।

তিনি এখানে খেয়াল গেয়েছেন [illegible] রাগে, বিলম্বিত এক তালে, দ্রুত অংশ তিন তালে। মধ্যমবর্জিত এই রাগের রূপটি সুন্দর ফুটেছে। সুরের ব্যাপ্তি আর কণ্ঠমাধুর্য, দুই-ই শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। দ্রুত অংশে তানগুলি চমৎকার আদায় হয়েছে। তাঁর বর্তমান শিক্ষাগুরু মুনাব্বর খাঁ-সাহেবের তালিমের ছাপ স্পষ্ট।

দুখানি ঠুংরির মধ্যে একটি [illegible], অপরটি শিবরঞ্জনী রাগের উপর। দুটি গানই আকর্ষক—ভাবরসের যেখানে [illegible] কাঞ্চন যোগ। শিল্পী যেমন সুরের মেজাজে গেয়েছেন, তেমনই মেজাজে এবং রসবোধের সঙ্গে তবলায় সংগত করেছেন ওস্তাদ কেরামত খাঁ।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ওয়েস্ট বেঙ্গল ...মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেডের পরিবেশনায় সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে শৈলেশ গুহনিয়োগীর হাস্যরসাত্মক কৌতুক নাটক "ফাঁস" মঞ্চস্থ হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীপি বি মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। দলগত অভিনয় উৎকর্ষে নাট্যানুষ্ঠানটি সেদিনের দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছে। এদিন ছিল অ্যাসোসিয়েশনের [illegible] বার্ষিক অনুষ্ঠান।

*

'বহুরূপী'-র চিত্রগ্রহণ শুরু

দীনেশ চিত্রম্-এর "বহুরূপী" ছবির কাজ ৪ জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে। কাহিনী প্রণব রায়ের। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। এ ছবির পরিচালক মিঠু চ্যাটার্জি, সুরকার অভিজিৎ দাস। বিশিষ্ট ভূমিকায় শিল্পী শুভেন্দু চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, নিরঞ্জন রায়, মণিকা মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জী, বিজন ভট্টাচার্য এবং বম্বের মধুছন্দা।

অরণ্যদেব

লী ফক

অরণ্যের অলিম্পিকে
ম্যারাথন
দৌড় ......

!

হার্ডল রেস আর লং জাম্প আগে যেমন ছিল...

এখন তেমন নয়। হার্ডল মানে এখন 'কাটার বেড়া,'
আর লং জাম্প দিতে হয় আগুনের উপর দিয়ে।

পোল ভল্টেও আগুন টপকাতে হয়.....

মল্লযুদ্ধ করতে হয় সংকীর্ণ
সেতুর উপরে .....

তিন বছর পর
পর হয়
অলিম্পিক
অনুষ্ঠান। বিজয়ী
গোষ্ঠী তিন
বছর ট্রফি
রাখতে পারে...
একদিন এ-ট্রফি
আমরা
জিতব—
হুঁম।
৫/২৩

অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বহির্বিশ্বের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। অরণ্যের
বাইরে কেউ এ-অনুষ্ঠানের খবর রাখে না।
কতদিন এটা গোপন
থাকবে?
২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারামুক্তি বর্তমান সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দীর্ঘ সাড়ে নয় মাস পাক কারাগারে বন্দী থাকার পর ৮ জানুয়ারি তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং পাকিস্তান ইনটার ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজের বিশেষ বিমানে রাওয়ালপিনডি থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি লনডনে পৌঁছেন। সেখানে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন : বিচারে তাঁকে ফাঁসি দিতে বলা হয়েছিল। তাঁর নিজের অনুরোধে তিনি রাওয়ালপিনডি থেকে লণ্ডনে এসেছেন, পাকিস্তানের এই উক্তি মিথ্যা। পাক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমার ইচ্ছায় কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের জনগণের এই সংগ্রামে ভারত, সোভিয়েট ইউ-নিয়ন, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেন যে সমর্থন জানিয়েছে তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেন : আর মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারছি না—দেশবাসীর কাছে ফিরে যেতে হবে। জীবন দিয়ে, নির্যাতন ভোগ করে আর কোন দেশবাসীকেই স্বাধীনতা অর্জনে এর চেয়ে চড়া দাম দিতে হয়নি। তিনি আরও বলেন পাক প্রেসিডেনট ভুট্টো আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য বিবেচনা করতে বলেছিলেন। আমি বলেছি—আমার দেশবাসীর কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই বলতে পারছি না। শেখ মুজিবুর ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন ১০ জানুয়ারি।

দেশী সংবাদ

৩ জানুয়ারি—বাংলাদেশে যেতে ভারতীয়দেরও পাসপোরট লাগবে। শুধু আইডেনটিটি স্লিপে আর চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এক জরুরী নির্দেশ দিয়ে এই স্লিপ-প্রথা বাতিল করে দেন। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ সম্পর্কে একটি চুক্তি হয়েছে। সেই অনুসারে ভারতীয় পাসপোরটে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য অনুমোদন থাকলেই সেখানে যেতে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ সরকার ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধিনিষেধ তুলে নিলেন। সাত বছর পর আবার দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হতে চলেছে। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এক আদেশে বলেছেন : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি রফতানিতে কোন বাধা থাকবে না।

৪ জানুয়ারি—শিয়ালদা বিভাগে অনিয়মিত ট্রেন চলাচল ও যাত্রী ভিড় সমস্যা নিয়ে তদন্ত ও সমাধান পন্থা বার করবার জন্য একটি বিশেষ কমিটির উপর ভার দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে উপমন্ত্রী মহম্মদ সফি কুরেশী লোকসভার সদস্য ও পূর্ব রেলের পদস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন। অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হবে পূর্ব রেলের চারজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে নিয়ে।

৫ জানুয়ারি—পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা থেকে অল্প মূল্যে যে খাদ্যশস্য আমদানি করা হতো, ভারত ১৯৭২ সাল থেকে তা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৬ বছর ধরে ভারত এই চুক্তি বলে নিয়মিত খাদ্যশস্য আমদানি করেছে। ১৯৭১ সালে ডিসেমবর পর্যন্ত ভারত আমদানি করেছে ৪৭৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য-শস্য।

৬ জানুয়ারি—আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআবদুস সামাদের দফায় দফায় যে আলোচনা হয়, তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ও প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। এছাড়া, উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়েও দুই দেশের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন।

৭ জানুয়ারি—ভারত ও উত্তর ভিয়েতনামের মধ্যে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় এই কথা কারে বহির্বিষয়ক দফতরের জনৈক মুখপাত্র বলেন, এর ফলে দুই দেশের মৈত্রীর সম্পর্ক আরও দৃঢ় হল। দুই দেশের রাজধানীতে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের পর্বটিও শীগ্‌গীরই সম্পন্ন হবে।

বাংলাভাষার বিশিষ্ট গবেষক সুপণ্ডিত শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বৃহস্পতিবার নীলরতন সরকার হাসপাতালে ৬৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন। তিনি বরিশাল ও কলকাতায় শিক্ষালাভ করেন। প্রবাসী, দেশ, মডারন রিভিউ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসাবে তিনি কাজ করেন। বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা চালিয়েছেন শ্রীবাগল তাঁদের অন্যতম।

৮ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লখনউতে এক বিরাট জনসভায় বলেন, ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ বিভাগ করে যে ভুল করা হয়েছিল—বাংলাদেশের মুক্তিতে তার সংশোধন হলো। যাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা এখন তাঁদের ভুল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।

৯ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে আগামী মার্চ মাসেই সাধারণ নির্বাচন হবে বলে আশা করা যায়। সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেস পারলামেন্টারি বোরডের এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা হবে। প্রকাশ:—ব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের এটিই প্রকৃষ্ট সময়।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি আজ সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছেন। বিহারের রাজ্যপাল শ্রী ডি কে বড়ুয়ার পরামর্শ অনুযায়ীই রাষ্ট্রপতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

৩ জানুয়ারি—সংবাদপত্রের খ্যাতনামা প্রবন্ধকার জ্যাক অ্যানডারসন হোয়াইট হাউসের গোপন নথিপত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন, "প্রেসিডেন্ট নিকসন 'ভারত-বিরোধী' নন বলে তাঁর মুখ্য রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ হেনরি কিসিংগার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের নিকট যা বলেছিলেন তা মিথ্যা।"

৪ জানুয়ারি—বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী নিধন অনুসন্ধান কমিটি ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের নিধন সম্পর্কে যে-সব চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন তার মধ্যে ১৩ জন পাক সামরিক অফিসারের নাম পাওয়া গিয়েছে। জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন, ইসলামী ছাত্র সংঘের জনৈক পান্ডা আবদুল খালেক মজুমদারের বাড়ি থেকে এই নামগুলি পাওয়া যায়।

৫ জানুয়ারি—বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় সরকারী কাজ এখন বাংলার মাধ্যমে পরিচালিত শুরু হয়েছে। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলি তাঁর বিভাগের অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন—ফাইলের সব নোট বাংলায় চাই।

৬ জানুয়ারি—সাংবাদিক জ্যাক অ্যানডারসন আরও একটি গোপন দলিল প্রকাশ করে বাংলাদেশ সম্পর্কে মারকিন নীতির ভণ্ডামি ও বিভ্রান্তি আরও কিছুটা উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। এই দলিলটি হল ভারতে নিযুক্ত মারকিন রাষ্ট্রদূত শ্রীকীটিং-এর একটি গোপন বার্তা, যাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে নিকসন প্রশাসনের নীতির যৌক্তিকতা কার্যত চ্যালেনজ করা হয়েছে।

৭ জানুয়ারি—দিনাজপুর শহরের সারদাবাড়ি এলাকায় বর্বর পাক ফৌজের ফেলে যাওয়া এক গোলাবারুদের গুদামে গতকাল পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটলে ২০০ জনের মত মারা যান আহত হন তিন শ'র মত। ঢাকায় পাওয়া এক খবরে একথা জানা গিয়েছে।

৮ জানুয়ারি—বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেনট সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ ঢাকায় বলেন যে, বাঙালীই হোক আর অবাঙালীই হোক যারা বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেছেন কিংবা কাজের সহায়তা করেছেন শুধু তাদেরই দণ্ডিত করা হবে।

৯ জানুয়ারি—সোভিয়েট কমুনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, মারকিন গোয়েন্দা বিভাগ সি আই এ পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাকে কাকে হত্যা করা হবে তার এক তালিকা প্রস্তুত করে। নাগা বিদ্রোহীদের প্ররোচনা দেওয়ার পেছনেও সিয়ার হাত আছে

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বাংলা পকেট বই

এযাবৎ ২১ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি-টির মূল্য দুই টাকা।

...র্ণো দেবীর—**দূরের জানলা**
...রে—**সাচ্চা দরবার**
...ান মুখোপাধ্যায়ের—**আলবী মানুষ**
... মিত্রের—**তবু মনে রেখো**
... গুপ্তের—**নিরালা প্রহর**
...নাথ ঘোষের—**ফাগুন কথনো যাবে না**
...য়ণ চট্টোপাধ্যায়ের—**স্বর্ণচাঁপার দিন**
...চ...কুমার সেনগুপ্তের—**অধরা মাধুরী**
... মুখোপাধ্যায়ের—**গুপ্তেশ্বর**
... আর গুপ্তের—**রূপ ও প্রসাধন**
... মিত্রের—**সুরের বাঁধনে**
...ের—**অর্গ নের দিন**
...ত্রের—**ফল ফটিক**
...েরে—**নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন**
...গোস্বামীর—**বেনামা চিঠি ও হীরের আংটি**
... বিশীর—**হিল্‌স উইদাউট টিয়ার্স**
...রের—**স্বপ্নের নবীন ও সে**
... মদারের—**ফেরারী**
... ঘোষের—**অপার্থিব**
...জের—**কোঁদলী মেলায়**
... গুপ্তের—**কন্যা কেশবতী**

॥ আগামী প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ॥

প্রমথনাথ বিশীর
পূর্ণাবতার

জরাসন্ধ
নিঃসঙ্গ পাথিক

বিমল মিত্রের
আমি ৭৲ স্ত্রী ৬৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পাও নাই পরিচয় ৪৲ কলকাতার কাছেই ৮৲

স্বাধীন বাংলা দেশের সমগ্র অধিবাসী-দের আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাই। নবজীবনের শুভ যাত্রাপথে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বাংলাদেশ অধিবাসীদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হোক এই কামনা করি।

॥ বর্তমানে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস
শতরূপে দেখা ১৪৲

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৬৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ রচনা
১৯৭১ ৬৲

তারাশংকর রচনাবলী

তারাশংকরের সমগ্র উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা রচনাবলী আকারে প্রকাশিত হইতেছে। আনুমানিক ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য আনুমানিক ১৫৲ টাকা। ১০৲ টাকা জমা নিয়ে গ্রাহক করা চলিতেছে। গ্রাহক হওয়ার শেষ তারিখ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ পর্যন্ত।

বিভূতি রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম ১৪৲

গ্রাহকগণ সত্বর অষ্টম খণ্ড সংগ্রহ করুন।

প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। দাম ১৬৲

নবম খণ্ড প্রকাশের পথে

॥ একটি বিশেষ সংবাদ ॥

বিভূতিভূষণের কিশোরদের জন্য রচিত সমগ্র রচনা শীঘ্রই রচনাবলী আকারে প্রকাশিত হইতেছে। আনুমানিক মূল্য ১২৲

ডাঃ এন. আর. গুপ্তের কেশ-চর্চার উপরে লিখিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

কন্যা কেশবতী ২৲ (স্ত্রী ও পুরুষের উভয়ের জন্য)

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ফোনঃ ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

হিণ্ডালিয়াম®
হিণ্ডালিয়াম ছাপমারা সমস্ত বাসনপত্র বহু বছরের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত উৎকৃষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরী। তাই এগুলি যেমন সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ তেমনি আপনার স্বাস্থ্যেরও সম্পূর্ণ অনুকূল।
হিণ্ডালিয়াম আপনার পক্ষে উৎকর্ষের গ্যারান্টি
HINDALIUM®
রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন লিঃ,
রেণুকূট (উত্তর প্রদেশ)
HINDALCO
হিণ্ডালিয়াম বাসনপত্র বাঁধা দামে বিক্রী হয়। দেখবেন বেশী দাম দেবেন না। প্রত্যেক বিক্রেতার কাছে অনুমোদিত মূল্যতালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।
Sobhagya HAC-371 BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র এক চামচ-
একাই একশো!
MINADEX
ভালো চোখের দৃষ্টি
এর জন্যে চাই ভিটামিন এ।
মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ
মিনাডেক্স-এ আছে, চোখের
দৃষ্টি ভালো রাখার জন্যে যথেষ্ট
পরিমাণে ভিটামিন এ।
সুস্থ রক্ত
এর জন্যে চাই আয়রণ।
অধিকাংশ ভারতবাসীর আহারে
আয়রণের অভাব থাকে। মাত্র
১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এর
আয়রণ এই অভাব পূরণ করে।
মজবুত হাড়
এর জন্যে চাই ভিটামিন ডি। এক চায়ের চামচ সিরাপ
মিনাডেক্স-এ আছে, হাড় মজবুত রাখার জন্যে
যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ডি।
মনে রাখবেন, প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ মিনাডেক্স
আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করে, আর এর
কমলালেবুর স্বাদগন্ধ—বাচ্চার ভালো লাগবেই।
সিরাপ
মিনাডেক্স®
মাত্র একচামচ— তিনগুণের এক টনিক
CMGM-4-244Ben
গ্ল্যাক্সো

অনেক সিগারেটই খেয়ে দেখলাম—
আসল তামাকের স্বাদে
উইল্‌স প্লেনের
তুলনা হয় না
(আর ৮০ পয়সা* প্যাকেট—দামের
সুবিধা ত' বটেই)

WILLS
NAVY CUT
MADE IN INDIA

উইল্‌স প্লেন খান
-ভাল লাগবে
*সর্বাধিক দাম স্থানীয় কর সাপেক্ষ
ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেডের
একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

৩৯ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২
শনিবার ৮ মাঘ ১৩৭৮
Saturday 22 January 1972

গণতন্ত্রের যাত্রা : বাংলাদেশ

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরই শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে মনঃসংযোগ করেছেন। এক সময় তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। এখন আর তিনি রাষ্ট্রপতি নন; নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রপতির আসনটি সর্বশীর্ষে, কিন্তু দায়-দায়িত্ব বর্তায় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও সংসদের ওপর। বঙ্গবন্ধু প্রতিশ্রুত ছিলেন, দেশকে তিনি গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রেখেছেন: বাংলাদেশে সংসদীয় ধরনের শাসন পদ্ধতি চালু হয়েছে: বঙ্গবন্ধু হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তিনি এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা নিয়মমাফিক শপথ গ্রহণ করেছেন। এবার কর্মারম্ভ।

বাংলাদেশের নতুন কাঠামোয় কাজ শুরুর দায় অনেক, দায়িত্ব আরও বেশী। প্রথমত, এই নতুন রাষ্ট্রটির উত্তরাধিকার বলতে যা আছে তাকে ভুলে যাওয়াই ভাল। একেবারে যা গোড়া, সেখান থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা, তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এ সবই হল প্রাথমিক কাজ। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন, দেশের মানুষের মুখে যদি অন্ন জোগাতে না পারা যায় তবে এই স্বাধীনতার মূল্য কী!

বলা বাহুল্য, বঙ্গবন্ধু এই দায়িত্ব থেকে সরে থাকতে চান নি। তিনি চেয়েছেন, তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের নিয়ে কর্মযজ্ঞে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে। তাঁর নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে সেই মন্ত্রিসভায় যোগ্যের অভাব নেই। আমরা আশা করব, বাংলাদেশের প্রাথমিক অসুবিধাগুলি অচিরেই দূর হবে। কিন্তু এর বাইরেও একটি মহৎ দায় বঙ্গবন্ধুর ছিল, দেশকে তিনি গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেই পথেই যাত্রা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের।

প্রশ্ন হবে, বাংলাদেশের এই গণতন্ত্রের চেহারাটি কি ধরনের। এই চেহারাটির সঙ্গে আমাদের ভারতীয় গণতন্ত্রের সাদৃশ সর্বরকমের। সম্ভবত এই কারণে যে, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আদর্শ হিসেবে ভারতীয় গণতন্ত্র বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের কাছে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অবশ্য আপাতত অনুপস্থিত। কিন্তু সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে, সংবিধান রচনাই হবে সরকারের প্রথম কর্তব্য। বিগত নির্বাচনে যাঁরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরাই রচনা করবেন সেই সংবিধান। দুই শ্রেণীর প্রতিনিধি রাজ্যের এবং কেন্দ্রের—উভয় প্রতিনিধি নিয়েই গঠিত হবে বাংলাদেশের গণপরিষদ।

আমরা মনে করি, সরকারী এই সিদ্ধান্তটি সর্বদিক দিয়েই গ্রহণযোগ্য। ইতিপূর্বে, কোনো কোনো অংশে বলা হয়েছিল, একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হোক এবং নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান হোক। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে ছিলেন। তখনও এ ধরনের কথায় কর্ণপাত করা হয় নি। বঙ্গবন্ধুর বর্তমানে এ ধরনের দাবি অর্থহীন। নির্বাচনের দিন ভবিষ্যতের জন্যে পড়ে আছে। এখন প্রয়োজন হল দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ। বঙ্গবন্ধু সেই কর্মভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর সহকর্মী ও অনুরাগীর তো অভাব নেই বাংলাদেশে। যে গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত সেই গৌরবের মর্ম হল, আত্মত্যাগ ও কর্ম। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশপ্রেম, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সততার মধ্য দিয়ে সে কর্মের সূচনা হোক।

আমরা এই প্রতিবেশী নব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির সাফল্য কামনা করি।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

দাম : ৬০ পয়সা
শুল্ক : ২ পয়সা

মোট : ৬২ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা–১ থেকে
সুপ্রিয়াংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

চাঁদার হার
(প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা হারে
অন্তঃশুল্ক সমেত)

কলিকাতায়
বার্ষিক ... টাঃ ৩২.০৫
ষান্মাসিক ... টাঃ ১৬.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৮.২৫

ভারতে
(অন্তর্দেশীয় ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৩৭.০৫
ষান্মাসিক ... টাঃ ১৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৯.৭৬

আসামে
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৪৫.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ২৩.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১১.৭৬

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৮৪.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ৪২.৫২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ২১.৭৬

বিদেশে
(জাহাজ ডাকে)
বার্ষিক ... টাঃ ৫৭.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ২৯.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ১৪.৭৬

লন্ডন অফিস মারফত
বার্ষিক ... টাঃ ১৫৪.০৪
ষান্মাসিক ... টাঃ ৭৭.০২
ত্রৈমাসিক ... টাঃ ৩৮.৭৬

পোষ মানাতে ওস্তাদ!

প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়াতে। উদ্দেশ্য — ওঁকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করা।

দুই বাংলা এক বাঙালী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, সংবাদে প্রকাশ, ঢাকায় ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২-এ অনুষ্ঠিত তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে এক প্রশ্নকর্তাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, "আমার সোনার বাংলা আমার থাকবে। পশ্চিম বাংলা ভারতে আছে, ভারতেই থাকবে।"

শেখ সাহেবের এই স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট উক্তির পর আসার অপেক্ষায় চায়ের কাপে যাঁরা তুফান তুলতে পারদর্শী, আশা করা যায়, তাঁরা এবার অন্য কোনও মুখরোচক বিষয়ে মনোনিবেশ করবেন।

উভয় বাংলা এক হোক, এর অর্থ যদি ভৌগোলিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাস মাত্রই বোঝায় তবে সেই এককালের জনপ্রিয় বাংলা গানের কলিটাকেই ফিরে গাইতে হয়, "মন না রাঙায়ে, কাপড় রাঙালে কী ভুল করিলে যোগী।"

দেশ বিভাগ সম্পর্কে অনেককেই যা হুতাশ করতে শুনি। কেউ এই দেশ বিভাগের জন্য বৃটিশ শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে দোষ দিয়ে থাকেন, কেউ দোষ দিচ্ছেন মরহুম মহম্মদ আলী জিন্নাকে, কেউ বা গান্ধীজীকে বা জওহরলাল নেহরুকে। কিন্তু এই দুষ্কার্য যদি একে দুষ্কর্ম বলা যায়। দেশ বিভাগকে আমার কখনোই আকস্মিক অভিশাপ বলে মনে হয়নি। পাকিস্তানের পত্তনেও সেদিনের কথা স্মরণ করে অযৌক্তিক বলে মনে হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, "হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।"—রবীন্দ্রনাথ, ব্যাধি ও প্রতিকার, ১৩১৪) আসামী যে বৃটিশ শাসক বা জিন্না বা নেহরু গান্ধী নন, আমাদেরই মনের সংকীর্ণতা এবং তৎসহ ভণ্ডামি, এই কথাটা আমরা আগেও বুঝিনি, আজও বুঝতে চাইনে।

বুঝতে চাইনে বলেই আজও আমরা আমাদের চারপাশটা চোখ খুলে দেখতে চাইনে। অবিশ্বাস, অপ্রেম, সন্দেহ, সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয়টাকে সত্যের প্রখর আলোয় এনে মেলে ধরতে ভয় পাই।

সত্য কী? সত্য এই যে, দেশ বিভাগ না হলে বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজ এত সত্বর ধর্মীয় গোঁড়ামির খোলসটা ছেড়ে ফেলতে পারতেন না।

বুদ্ধিজীবী বাঙালী মুসলমানের উদ্ভবও এত সত্বর ঘটত না।

সত্য এই যে, বাঙলা দেশের মুসলমান আজ আগে বাঙালী, তারপর মানুষ এবং তারপর মুসলমান হয়ে উঠেছেন। ("আমি বাঙালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান"—শেখ মুজিবের রমনার মাঠে প্রথম ভাষণ)। আনন্দবাজার পত্রিকার ঢাকা অফিসের প্রতিবেদক এই কথাটিকে একটু বদলে লিখেছিলেন, "আমি মানুষ, আমি বাঙালী, আমি মুসলমান।" আমার ধারণা বাঙলা দেশের লোকেরা মনের দিক দিয়ে এখনও কিছুদিন, আগে "বাঙালী" এবং তারপর "মানুষ"ই থাকবেন। এবং সেইটেই স্বাভাবিক। কারণ জাতির জীবনে উথাল পাথাল আবেগ থিতোতে সময় নেয়।

তবু আজ ওরা আগে "বাঙালী" তারপর "মানুষ" এবং তারও পরে "মুসলমান"। এইটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম জঙ্গীশাহীর প্রত্যক্ষ দান। বাঙলা দেশের মানুষ আজ বুঝতে পেরেছেন, ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব সীমার মধ্যে থাকলেই তার মাহাত্ম্য ফোটে ভাল, তার বাইরে তাকে যেতে দিলেই ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় এক সচতুর ছলনা। তাই ব্যক্তির বাইরে বাংলা দেশ ধর্মকে স্থান দেয়নি। আমার শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাই ব্যক্তির স্বাধীনতার গ্যারান্টি নয়, গণতন্ত্রই সে গ্যারান্টি। বাঙলা দেশ পারলামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে নাগরিকদের সে গ্যারান্টিও দিয়েছে।

আমরা সেকুলার আর গণতান্ত্রিক ভারতের নাগরিক, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা আর কী চাই? এপারে ওপারে মিলনে আর বাধাটা ঠেকছে কোথায়?

হ্যাঁ, একটু ঠেকছে বইকি?

সত্য এই যে, পঁচিশ বছর ধরে সেকুলারিজম চর্চা করার পরেও আমরা পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বড় অংশটি, আজও আগে "হিন্দু", তারপর "বাঙালী" এবং তারপর—তারপর কী—ভারতীয়? (বাঙলা ভাষার একজন জনপ্রিয় কবির সুভাষিত উক্তিটা বোধ হয় এ রকম ছিল যে, ভারতীয় ফৌজ যশোর দখল করার পর সেখানে গিয়ে তাঁর এই প্রথম মনে হল "ভারতীয়" হিসাবে তিনি গর্ববোধ করতে পারেন। তারই যদি এই দশা হয় তো অন্যে পরে কা কথা।)

আমরা যে আগে হিন্দু, এই চেতনাটা বসে-যাওয়া ঘামের মত ভিতরে ক্রিয়া করে বলে রোগটা অনেকেই অনেক সময় বুঝতে পারিনে। আমাদের উগ্রতা যতটা না বহির্মুখী আমাদের উদাসীনতা তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তর্মুখী। তাই আরও মর্মান্তিক। আমরা যারা বাঙলা দেশের মুসলমান সমাজের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছি এবং এপার বাঙলা ওপার বাঙলার মিলনের কল্পনায় আমাদের মধ্যে যাদের দেহে ও মনে ঘন ঘন স্বেদ কম্প হর্ষ দেখা দিচ্ছে, তাঁদের কজন এ বিষয়ে সচেতন যে পশ্চিম বাংলায় বাঙলা যাদের মাতৃভাষা সেই সব মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রতি পাঁচজনে একজন। প্রতি চারজন হিন্দু বাঙালী প্রতিবেশীর অনাদরে ও উপেক্ষায় ও ঔদাসীন্যে প্রতিটি পঞ্চম ব্যক্তি—বাঙালী মুসলমান—পশ্চিমবঙ্গে আজ এতই কোণঠাসা যে আমাদের কোনও কাজে কর্মেই তাঁদের আমরা পাশে পাইনে। অথচ তাঁরা আছেন।

তাই আজ সঙ্গত কারণেই আমাদের এই বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দু-বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের স্ববিরোধী কার্যকলাপে বিভ্রান্ত। এঁরা যখন দেখেন, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-বাঙালী তার ঘরের পাশে মুসলমান-বাঙালীকে কোনোদিন সম্মান জানায় না, মানুষ বলে গণ্য করে না, একবার উঁকি মেরে খোঁজ পর্যন্ত নেয় না, সেই তারাই আবার ওপারের বাঙালী মুসলমানদের দুঃখে বিগলিত এবং হর্ষে মুক্তকচ্ছ এবং তাঁদের নেতা শেখ মুজিবকে "রাজার রাজা" বলে নাচে চড়াচ্ছে, তখন স্বভাবতই এ সব তাঁদের কাছে প্রচণ্ড ভণ্ডামি বলে মনে হয়। এবং মিলনের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ বলেই আত্মরক্ষার খাতিরে যে কৃত্রিম মানসিকতা গড়ে তোলেন তাতে তাঁরা আগে "মুসলমান" এবং পরে ইত্যাদি ইত্যাদি হয়ে দাঁড়ান। এই ব্যাধির মূলোচ্ছেদের হাতিয়ার আমাদের হাতেই আছে। আসুন, নিজের ঘর সাফ করে ফেলি।

যারা দুই বাঙলা এক হবার খোয়াব দেখছি, তাদের বলি, এক পশ্চিম বাঙলাতেই যে দুই বাঙালী তফাৎ হয়ে আছে, আসুন, আগে এদের এক করি। তারপরে তো এপার ওপার পারাপারের কথা।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন

অবশেষে পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। মারচ মাসেই নির্বাচন হবে। এবং সম্ভব হলে মারচেই সরকার গঠন। অনেকেই আশা করছেন এবার পশ্চিম বাংলায় একটা দীর্ঘস্থায়ী নির্বাচিত সরকার গঠিত হবেই।

মাঝখানে কিছু লোক এবং নেতা কিছুটা অনিশ্চয়তার কথাবার্তা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ফেবরুয়ারি-মারচে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন নাও হতে পারে। কিন্তু সে সব বক্তব্যের পেছনে সম্ভবত কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, এটা গোড়া থেকেই ঠিক ছিল যে ডিসেমবর-জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেলে ফেবরুয়ারি মারচে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবেই। বাংলা দেশ সমস্যার চূড়ান্ত পরিণতির পর তাই বোঝাই গিয়েছিল, ফেবরুয়ারি-মারচে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবেই। হলও তাই।

কিছু সরকারী অফিসারের অবশ্য এখনই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কতকগুলি আপত্তি ছিল। তাঁরা বলেছিলেন,

প্রশাসন যন্ত্রকে যদি এখনই নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয় তাহলে শরণার্থীদের ফেরত পাঠাবার কাজটা সুষ্ঠু ভাবে হতে পারবে না। তাতে ব্যাঘাত ঘটবে।

তাঁরা আরও বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতিটা আরও একটু স্বাভাবিক করে নেওয়া দরকার। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের লড়াই চলার সময় নানা কারণে হামলাবাজরা একটু চুপচাপ ছিল। লড়াইয়ের শেষেই তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং আরও গণ্ডগোল বাড়াবে। নির্বাচনী উত্তাপে মারদাঙ্গা আরও বেড়ে যাবে। তাই তাঁরা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক হওয়ার আগে নির্বাচন করা উচিত হবে না।

অস্ত্রশস্ত্র আমদানির উপরও তাঁরা কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, বাংলাদেশের লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক নানাভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করবে। সেইজন্য গোটা সীমান্ত এলাকায় এখন পুলিসী ব্যবস্থা অত্যন্ত কড়াকড়ি রাখতে হবে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ছাড়াও দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চলে বহু পুলিস মোতায়েন করতে হবে। যদি নির্বাচনের জন্য পুলিস রাখতে হয় তাহলে এই কাজ সম্ভব হবে না। এবং তাহলে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে। আর তার ফলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার আশংকা থাকবে।

এইসব যুক্তি দেখিয়েই তাঁরা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে আপাতত নির্বাচন না হওয়াই ভাল। পশ্চিমবঙ্গে ডিসেমবর নাগাদ নির্বাচন করা যেতে পারে।

*

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নানা কারণে এখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আগ্রহী। তাঁরাও স্বীকার করেন, এখনই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কতকগুলি অসুবিধা আছে। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য সব সময়ই কিছু না কিছু অসুবিধা থাকবে। তাই অসুবিধার কথা ভাবতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে আবার কবে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে তা বলা কঠিন। এখন মোটামুটি একটা সুযোগ এসেছে। এবং এই সুযোগেই নির্বাচন করে নেওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের আরও যুক্তি : সরকার যদি কতকগুলি অসুবিধার কথা ভেবে এখন নির্বাচন না করেন তাহলে বিরোধী দলগুলি, বিশেষ ভাবে সি পি এম বলবেন, ইন্দিরা-সরকার পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র চলতে দিতে চায় না, ইন্দিরা-সরকার পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনই চিরস্থায়ী করতে চায়—তাই নির্বাচন করছে না। সুতরাং কেন্দ্রের বক্তব্য, প্রথম সুযোগেই নির্বাচন করা উচিত।

এটা অবশ্য সত্য যে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরু হওয়ার পরও যদি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ঘোষণা না করতেন তাহলে বিরোধী দলগুলি, বিশেষভাবে সি পি এম, সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার আরও জোরদার করতেন। পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিকেও তাঁরা জোরদার করে তুলতেন। শরণার্থী

থাকতেই তাঁরা নির্বাচনের দাবি তুলেছিলেন।

সরকার শুধু সি পি এমের ভয়ে বা এখনই পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে, আনার বিশেষ আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করছেন, সেটা অবশ্য কেউই মানতে পারেন না। এখনই নির্বাচন অনুষ্ঠানের আরও একটা কারণ আছে। সেই কারণটা হল, এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভের আশা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আশা করছেন, প্রায় পাঁচ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম কংগ্রেসের একক গরিষ্ঠতা লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ তাঁরা হেলায় হারাতে চান না। তাঁরা ভয় পান, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আবার হঠাৎ খারাপ হয়ে যেতে পারে, আবার নানা রকমের গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে, আবার রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রচণ্ডতা বাড়তে পারে। তার আগেই তাঁরা নির্বাচন করতে চান।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নব কংগ্রেসের সকলের আশা, এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের দল একক গরিষ্ঠতা পাবেই। এবং, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আবার পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এখনই সি পি এম ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

সেই জন্যই নব কংগ্রেস এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন প্রার্থী করছেন। তাঁরা সিদ্ধার্থবাবুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটা বেশ শক্ত গোছের মন্ত্রিসভা গড়তে চান। তাঁদের আশা, এই মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক স্থিরতা ফিরিয়ে আনতে পারবে। আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটাতে পারবে। এবং, তখন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও সহজ হবে।

কেন্দ্র তাই এখনই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করতে চান। এবং কেন্দ্রের বদ্ধমূল ধারণা, এবারের নির্বাচনে নব কংগ্রেস একক গরিষ্ঠতা পাবেই—একাই সরকার গঠন করতে পারবে।

✻

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্র এখনও বেশ শংকিত। তাঁরা সবচেয়ে বেশি ভয় পান সি পি এমকে। কেন্দ্রের আশংকা, সি পি এম একবার একক ভাবে ক্ষমতায় এলেই পশ্চিমবঙ্গে জোরদার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলবে—শেষ পর্যন্ত তারা পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই সি পি এমকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে দিতে রাজি নন।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এটাও জানেন যে, বর্তমান সংবিধান চালু রেখে পশ্চিমবঙ্গে চিরকাল রাষ্ট্রপতির শাসন চালানো যাবে না। এখনই হোক, আর দু বছর পরেই হোক পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন করতেই হবে। তাঁরা আরও জানেন যত বেশি দিন পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসন রাখা হবে ততই সি পি এমের লাভ। কারণ, সি পি এম ততই প্রচার করতে সুযোগ পাবেন যে, "দিল্লি পশ্চিমবঙ্গকে উপনিবেশ বা কলোনি করে রেখেছে।"

এই প্রচারটাকে দিল্লি দু-তিন বছর থেকেই ভীষণ ভয় পান। আগে যতটা পেতেন, এখন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর তার চেয়ে অনেক বেশি পান। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ জানেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এমনিতেই কেন্দ্রীয় অবহেলা এবং অ-বাঙালী প্রতিপত্তির ব্যাপারে একটা বেশ তিক্ত মনোভাব রয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর এই মনোভাব আরও বেশি দানা বেঁধে উঠবে।

তাই কেন্দ্র যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চান। এবং সে নির্বাচিত শাসন ব্যবস্থা যাতে নব কংগ্রেসী হয় তার জন্যও তাঁরা বিশেষ আগ্রহী। কারণ, এটা তাঁরা জানেন যে, নব কংগ্রেসীরা পশ্চিমবঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করবে না এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষণা করবে না।

এই সব হিসাব নিকাশের ভিত্তিতেই এবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হচ্ছে। এই হিসাব যদি ঠিক ঠিক মত মেলে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আবার একটা নতুন রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হবে। শুরু হবে একক নব কংগ্রেসী রাজত্ব।

গত দু বছরে শ্রীমতী গান্ধীর প্রায় সব হিসাব মিলেছে। এবার দেখার '৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবটা মেলে কিনা।

১৬।১।৭২।

বারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

নিধিরাম সর্দার

মুজিব ঘরে ফিরে শক্ত হাতে হাল ধরাতে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে শুধু খুশির বন্যা বয়ে যায়নি, সেখানকার লোকেদের বুকে বল এসেছে, নতুন ভরসা এসেছে মন্ত্রীদের মনে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী জেলে থাকার সময় যে স্বাধীন সরকার গড়ে তুলেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগীরা তাতে তাঁকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাঁরা ঠিক করেছিলেন যতদিন না মুজিব এসে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন ততদিন কাজ চালিয়ে যাবেন তাঁর জায়গায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসানো হয়েছিল তাজউদ্দীনকে। তখন লড়াইয়ের সময়। বর্বর জঙ্গীশাহীর সঙ্গে চলছে জীবন-মরণ সংগ্রাম। কেমন করে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে অত্যাচারী পাকিস্তানী ফৌজী সেনাদের দেশ থেকে উৎখাত করা যায় সে কথাই একমনে নেতারা ভেবেছেন। সাংবিধানিক খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবার সময় তাঁদের তখন ছিল না।

নইলে যে শাসনযন্ত্র তাঁরা খাড়া করেছিলেন তার অসঙ্গতি তাঁদের চোখে ঠিক ধরা পড়তো। গণতন্ত্রী শাসন পদ্ধতির দুটো ধারা দুনিয়াতে চলে আসছে। এক, সংসদীয় গণতন্ত্র, দুই রাষ্ট্রপতি-প্রধান গণতন্ত্র। প্রথমটা চালু রয়েছে বিলেতে, দ্বিতীয়টা আমেরিকাতে। সংসদীয় গণতন্ত্রে দেশের সর্বময় কর্তা পার্লামেন্ট অর্থাৎ সংসদ। প্রশাসন তাঁরা চালান না, চালান মন্ত্রিসভা—তাঁদের মধ্যমণি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। সব মন্ত্রীই সংসদ সদস্য—মায় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান বিলেতে রাজা বা রানী, কিন্তু আসল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর মন্ত্রীদের হাতে। আমেরিকায় নিয়মকানুন অন্য রকম। রাজা রাজড়া বা প্রধানমন্ত্রী সে দেশে নেই, আছেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। আসল ক্ষমতা তাঁর হাতেই। সেই জন্যেই এ শাসন ব্যবস্থার নাম প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন ব্যবস্থা। তাঁর পক্ষে একা কাজ চালানো অবশ্য সম্ভব নয়। তাঁর মন্ত্রিসভা একটা আছে, কিন্তু তাঁদের কেউ মার্কিন সংসদ অর্থাৎ কংগ্রেসের সভ্য নন, আবার সরকারী আমলাও তাঁরা কেউ হতে পারেন না।

ভারতবর্ষ দুটোর মধ্যে বেছে নিয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র। রাজারাজড়া এ দেশে বর্জিত। তাই আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান হচ্ছেন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তবে বিলেতের মতো প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর মন্ত্রিসভাই দেশ শাসনে সর্বেসর্বা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের সদস্যদের নামের তালিকা দেখে কেমন যেন খটকা বেধেছিলো। তাই তো তাঁরা "পার্লামেন্টারি" ব্যবস্থা চান না "প্রেসিডেন্সিয়াল?" নাকি দুটোর সমন্বয়ে নতুন কোনও শাসনতন্ত্র তৈরি করাই তাঁদের উদ্দেশ্য? বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর সব সন্দেহ মিটে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে চালু হবে ভারতবর্ষের মতোই সংসদীয় গণতন্ত্র। একটা ঘোষণায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নেতাদের এ সিদ্ধান্ত। মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন আবু সৈয়দ চৌধুরী। তিনি ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের প্রাণের কথা তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সারা দুনিয়া ঘুরে। দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে তাঁকে যোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন বাংলাদেশের নেতারা। শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশ এখন আর স্বপ্ন নয়, রীতিমতো বাস্তব। রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তার তো সবই আছে। সাড়ে সাত কোটি লোক যে দেশে বাস করে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার অর্থ জেগে ঘুমোনো। দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার অনেক দেশই তাই করছে। কেউ কেউ অবশ্য বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি না দিলেও তাকে কার্যত মেনে নিয়েছে। কিন্তু খিড়কির দরজা দিয়ে এ যাওয়া আসা কেন? সদর দরজা দিয়ে যেতে আপত্তি কিসের? ভারতবর্ষ, ভুটান, পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, ব্রহ্মদেশ আর নেপাল তো পথ দেখিয়েছে। সে পথ দিয়ে অপরদের যেতে বাধা কোথায়? বিশেষ করে আপত্তি দেখা যাচ্ছে সেই সব দেশের যারা গণতন্ত্রের ধবজা উড়িয়ে দুনিয়ার আম দরবারে হাততালি কুড়ায়। আমেরিকা নিজেকে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক বলে নিজেকে জাহির করে, স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচানোই নাকি তার ধনুকভাঙা পণ। অথচ সেই আমেরিকা বাংলাদেশের দিকে ফিরে তাকাতেও নারাজ। বরঞ্চ ভারত ছাড়া কেউ যদি সে দেশকে জবরদখল করে তাতেও তার আপত্তি নেই।

যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না তাদের তিনটে দলে ফেলা যায়। প্রথম হচ্ছে বিগ পাওয়ার অর্থাৎ বৃহৎ শক্তি। তারা নিজেদের স্বার্থের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিচ্ছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবি। দ্বিতীয় হচ্ছে এদের যারা বশংবদ রাষ্ট্র। ওরা তাকিয়ে আছে মুরুব্বি রাষ্ট্রের দিকে। তৃতীয় হচ্ছে পাকিস্তানের যারা স্যাঙাত, লড়াইয়ের সময় যারা পাকিস্তানকে মদত দিয়েছিল, এখনও দিচ্ছে। তবে কাজটা যে খুব অন্যায় হচ্ছে সে বোধ অনেকেরই হয়েছে। তাই সাফাই গাইছে কোনও কোনও দেশ এই বলে যে, ভারতীয় জওয়ানরা বাংলাদেশে থাকতে সে দেশকে স্বীকৃতি দেব কী করে? এ অবশ্য স্রেফ ভণ্ডামি। স্বীকৃতির ওই যদি নিরিখ হয় তাহলে তো ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে। বিদেশী সৈন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক দেশেই ছিল, এখনও আছে—তারা সবাই বিদেয় নেয়নি। কই তাতে তো তাদের স্বীকৃতি দিতে কারু বাধেনি। যত দোষ কী একা বাংলাদেশেরই?

হালে পানি না পেয়ে ভুট্টো সাহেব পশ্চিম জার্মানির ফেলে দেওয়া এঁটো পাতা চাটতে আরম্ভ করেছেন। আডেনাওয়ারের আমলে বন যে হলস্টাইন তত্ত্ব খাড়া করেছিল তেমনই একটা তত্ত্ব তিনিও চালু করেছেন। বলেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি যে দেশ দেবে তার সঙ্গে সম্পর্ক তিনি ছেদ করবেন। হুমকি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত নন, করছেনও তাই। অমনি করেছিল পশ্চিম জার্মানি। পূর্ব জার্মানিকে যে দেশ স্বীকৃতি দেবে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ রাখবে না বলে হুমকি দিয়েছিল। ভেবেছিল এই করে দাবিয়ে রাখবে পূর্ব জার্মানিকে। কিন্তু তারও ছিল গোড়ায় গলদ। রাশিয়ার সঙ্গে ওই অজুহাতে কূটনৈতিক গাঁটছড়া ছিঁড়ে দেবার মুরোদ দক্ষিণপন্থীদের আমলে পশ্চিম জার্মানির হয়নি। হালে তো এ তত্ত্ব বাতিল করে দিয়েছেন ব্রান্ডট। যখন এ তত্ত্ব ঘোষণা করেন আডেনাওয়ার ১৯৫৫ সালে বৈদেশিক দপ্তরের সচিব হলস্টাইনের পরামর্শে তখনই বিরোধী দল সোশাল ডেমোক্রাটরা আপত্তি জানিয়েছিল, বলেছিল অমন করে পূর্ব জার্মানিকে দাবানো যাবে না, দুই জার্মানিকে এক করা সম্ভব হবে না। হয়েছেও তাই। পশ্চিম জার্মানির তবু নিজের জোর ছিল। ভুট্টো সাহেবের তো ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। ওঁর হুমকির পরোয়া কে করে?

কবির কলহকাহিনী

রঞ্জন

গত সপ্তাহের "দেশ" পত্রিকায় সুজিতকুমার সেনগুপ্তের লেখা "সমালোচনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ ও হিং টিং ছট বিতর্ক" প্রবন্ধটি কবিজীবনের এক অর্ধবিস্মৃত অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিল আর সেই সঙ্গে মনে এলো অনুরূপ সাহিত্যিক বিতর্কের কথা। বলা বাহুল্য, বিতর্ক সর্বদা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ অজ্ঞাত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ একটা অংশ ছিল কবির লড়াইয়ের: ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবিকণ্ঠ ছিল অপেক্ষাকৃত মৃদু কিন্তু স্পষ্টভাষিতার তখনো হুঁকোবন্ধ হয়নি। সেই বাক্যবন্যার কিছু তরঙ্গ এসেছিল বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজের নেতৃবৃন্দ না ছিলেন নিরুত্তর না নিরুত্তাপ। তর্কপ্রবণতা বাঙালী চরিত্রে মজ্জাগত। তাই বহিরাগত অনুপ্রেরণার প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না। আমার সামান্য বক্তব্য এই যে, সমকালীন রাজনৈতিক বা অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে সাহিত্য সমাজে সবাক্ সজাগতা বিংশ শতাব্দীর সন্তান নয়। বরং আজকে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে অপরিমিত বিশ্লেষণ আর সামাজিক জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সমান উদাসীনতা। যদিও "ইনভলভড", "কমিটেড", "এনগেজড" ইত্যাদি কথাগুলির বহুল ব্যবহার সাম্প্রতিক।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু তাঁকে জানতেই হতো। জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ সমস্যার সঙ্গে। কিন্তু বিরোধ বাধতো সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নিয়ে। অতি তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের যে সমালোচনা করেছিলেন তাতে ধৃষ্টতার অভাব ছিল না। তেইশ বছর বয়সে কবির সাধ হলো বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হতে। সিদ্ধান্তটা দুঃসাহসিক বটে। কেবল সত্য ও একান্ত সত্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রণাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে তারুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, বিচক্ষণতার নয়। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তদানীন্তন তর্কে যোগদান না করে বোধহয় উপায় ছিল না। হিন্দু গোঁড়ামির উত্তর দিতে ব্রাহ্ম গোঁড়ামিকে আশ্রয় নিতে বাধেনি রবীন্দ্রনাথের। লক্ষণীয় এঁদের দুই শক্তিমান লেখকই পরজীবনে গোঁড়ামি পরিহার করেছিলেন। আরো লক্ষণীয় এই যে, মতভেদ সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ কটুভাষণের প্রয়োগ সত্ত্বেও, একের প্রতি অপরের অনুরাগ, প্রীতি ও শ্রদ্ধা কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

*

রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী ছিলেন না, অন্তত আজকের অর্থে। কিন্তু সহজিয়া পরমতানুসরণও ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। "হিং টিং ছট্" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুকে নিয়েই লিখেছিলেন কিনা তা পণ্ডিতরা স্থির করবেন। পোপ, ড্রাইডেন ব্রাউনিং—এঁরা সবাই কখনো না কখনো সমসাময়িকদের নিয়ে ব্যঙ্গ বা শ্লেষ করেছেন। সাহিত্যে এটা মার্জনীয় বলে মনে করি, অর্থাৎ সমালোচনা যদি সাহিত্যগুণসমন্বিত হয়। কিন্তু প্রচ্ছন্ন থাকা চাই প্রতিবাদের প্রেরণা। আমার ধারণা বা বক্তব্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি এমনকি ক্রোধ সঞ্চারিত না হলে এমন লেখা আসেই না। উগ্রতা রবীন্দ্র চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল না, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্তে রোষ দমন করায় তাঁর রুচি ছিল না। সে তো হতো কাপুরুষতারই নামান্তর। কবি কখনো কারাবাস করেননি, পুলিসের গুলির সম্মুখীন হননি। তবু অন্যায় অনুষ্ঠিত হলে, পৃথিবীর তা যেখানেই হোক, কবিকণ্ঠ কখনো নীরব থাকেনি। তাঁর প্রতিবাদগুলির একটা সুসম্বদ্ধ বিবরণ ঐতিহাসিক টীকা সম্বলিত, আজো প্রকাশিত হয়নি। বরং কোনো বিবাদ সম্বন্ধে নীরব থাকাই যেন বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী নীতি।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড বর্জন অনেকেরই জানা। এই ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্গত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখনও কবি ভয় পাননি তাঁর গণ-আন্দোলনের কয়েকটি দিক নিয়ে তীব্র সমালোচনা করতে। তার বিবরণ কই? এই ঐতিহাসিক বিতর্ক কেন আমাদের লুকোতে হবে? গান্ধীকে মহাত্মা আখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই, যেমন রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সশ্রদ্ধ মতভেদের মধ্যে লজ্জার কারণ নেই কোনো পক্ষেরই। আমার আপত্তি ইতিহাসের বিকৃতিতে। রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর মহত্ত্ব সামান্য ক্ষুণ্ণ হবে না যদি আজ আমরা স্মরণ করি যে দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে সত্যকার মতভেদ ছিল। দুজন একেবারে আলাদা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে। একজন প্রধানত কবি। অপরজন পলিটিশান, লক্ষ্য সীমিত এবং বহুলাংশে সমসাময়িক ঘটনাবলীর দ্বারা নির্ধারিত। আপন আপন ক্ষেত্রে দুই-ই মহান। কারোরই প্রয়োজন ছিল না অপরকে ছোট করে নিজেকে বড়ো করবার।

*

তারপর মনে পড়ে বন্দে মাতরম গানের অঙ্গচ্ছেদ নিয়ে তুমুল বিতর্ক। তারই বা একটা পক্ষপাতিত্বহীন বিবরণ কোথায়? কবি খণ্ডিত বঙ্কিমকে পরাস্ত করে নিজের জনগণমন অধিনায়ক রচনাটিকে জাতীয় সঙ্গীত করতে চেয়েছিলেন এমন অপবাদ আজো মাঝে মাঝে শোনা যায়। ১৯০৭ সালে আফ্রিকার খবর কেইবা রাখতো? কবি তখনই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। জনৈক পার্লামেন্ট সদস্য ভারত সম্বন্ধে নানা কটূক্তি করে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত প্রতিবাদ ব্রিটিশ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে কিপলিঙ্ যখন তাঁর পূর্বসূরীদের স্থান নিয়েছেন তখন ঔদ্ধত্যই প্রত্যাশিত। এসব বিতর্কের ইতিহাস কই?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। তার আগে য়োনে নোগুচিকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন চীনে জাপানী বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর ঘৃণা। কিন্তু ব্যাপকতর সভ্যতার সংকটের আসন্নতায় কবিহৃদয় তখন অস্থির। এই বক্তৃতার প্রতিটি অক্ষর অবিস্মরণীয়। স্মরণ করা দরকার কবির উত্তেজনার আসল উৎস। এ শুধু সাহিত্য নয়; এ যে ইতিহাস।

মহামতি মুজিবুর রহমান

শ্রীদিলীপকুমার রায়

"বঙ্গবন্ধু" উপাধি যে পেল ভালোবেসে "জয় বাংলা" মায়,
জয়জয়কার করি আজ তার আমরা উছল বন্দনায়।
উঠেছিল রাঙি' যে-হেম স্বপন তোমার প্রেমল আঁখি তারায়,
দিলে তারে রূপ জাগরণে—সঁপি', জীবন তোমার মায়ের পায়।
বাংলা মায়ের দীপ্ত দুলাল! মা গাহিছে শোনো : "আয় রে আয়!
কালো বেদনার মেঘে বিদ্যুৎ ফোটে দেখ্‌ তোর আরাধনায়।"

আমরা-যে বাঁধা পড়ি মোহপাশে—স্বার্থসিদ্ধি গণি' মহান্‌,
তাই ভুলে প্রীতি-স্নেহবাণী নিতি ঝরাই অশ্রু নিরবসান।
পরের দুঃখে যেমনি হৃদয় অসহ ব্যথায় দুলে ওঠে,
আকাশে বাতাসে শুনি : "নাই ভয়, নিশাবুকে ঐ উষা ফোটে!"
বাংলা মায়ের দীপ্ত দুলাল! মা গাহিছে শোনো : "আয় রে আয়!
কালো বেদনার মেঘে বিদ্যুৎ ফোটে দেখ তোর আরাধনায়।"

পথ চেয়ে থাকি পথহারা, কাঁদি : "কার সে-নিশান দেবে দিশা?
পরবশতার মরু তাপে কার নিঝরে মিটিবে প্রাণ তৃষা?"
ফুটিল যেমনি বাংলার বুকে এই ডাক—তুমি ঝঙ্কারি'
গাহিলে দিশারি চারণ : "মা ভৈঃ! এ-অপারে আছি আমি পারী।"
বাংলা মায়ের দীপ্ত দুলাল! মা গাহিছে শোনো : "আয় রে আয়!
কালো বেদনার মেঘে বিদ্যুৎ ফোটে দেখ্‌ তোর আরাধনায়।"

যমযন্ত্রণা সহি' দেশতরে চাহিলে দেশের স্বাধীনতা,
নিঃস্বেরো হতে সহায় বরিলে ত্যাগ, মহত্ত্ব, উদারতা।
"বাংলা ভাষাই মাতৃভাষা"—এই মন্ত্রে আনিলে যুগান্তর,
দিলে বাণী : "যদি সত্যেরে পূজি, মিথ্যারো হবে রূপান্তর।"
বাংলা মায়ের দীপ্ত দুলাল! মা গাহিছে শোনো : "আয় রে আয়!
কালো বেদনার মেঘে বিদ্যুৎ ফোটে দেখ্‌ তোর আরাধনায়।"

"সোনার বাংলা" তোমার কণ্ঠে ঝঙ্কুল মধুমূর্ছনায়,
তারি আহ্বানে মুক্তিবাহিনী অভিনন্দিল বাংলা মায়।
এসো ফিরে বীর গৌরবে, করো বাংলা মায়ের কোলে বিরাজ :
"ভাই ভাই" এই সুর বাংলায় জাগাও তোমার শঙ্খে আজ।
বাংলা মায়ের দীপ্ত দুলাল! মা গাহিছে শোনো : "আয় রে আয়!
কালো বেদনার মেঘে বিদ্যুৎ ফোটে দেখ তোর আরাধনায়।"

৮।১।৭২

(দ্বিজেন্দ্রলালের—'বঙ্গ আমার জননী আমার' সুরে গেয়)

এবারের বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটু অন্য ধরনের। বেড়াতে নয়, ঠিক পড়াশুনো করতেও নয়, চিকিৎসার জন্যও নয়, ব্যবসার খাতিরেও নয়—আমরা বিদেশে চলেছি কেন? না ইতিহাস খুঁজতে। তাও কিনা আবার নিজের দেশেরই ইতিহাস। এ কথা শুনে বন্ধুজনেরা যে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন .সে আর এমন আশ্চর্য কি!

চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর একটি সম্মেলনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ এল। প্রায় একই সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর বন শহর থেকেও ডাক এল আর একটি নেতাজী সম্মেলনে যোগ দেবার। এই দুটি সম্মেলনেই বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল—Problems of research on Subhas Chandra Bose. সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্ম নিয়ে যাঁরাই কিছু কাজ করেছেন তাঁরাই জানেন এ বিষয়ে গবেষণার পথে অনেক জটিল সমস্যা। তার মধ্যে একটি সহজবোধ্য সমস্যা হল ভৌগোলিক। পৃথিবীর খুব কম নেতারই জীবনকথা এমনভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, সমগ্র য়ুরোপ, ইংলণ্ড—সব দেশই ইতিহাসের ঘটনাচক্রে তাঁর বিপুল কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষ থেকে প্রাগ ও বন-এর সম্মেলনে যোগ দেবার সূত্রে অন্ততঃ য়ুরোপের কয়েকটি জায়গায় নেতাজী সম্বন্ধে যে তথ্য ছড়িয়ে আছে তার একটা ধারণা করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে একদিন কথা প্রসঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের জনৈক অফিসার নেতাজীকে বললেন, নেতাজী, এই যে আজ আমরা আমাদের দেশের জন্য সাধ্যমত করছি ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরীরা হয়তো এর কোন খবরই রাখবে না, আমাদের উচিত এর কিছু লিপিবদ্ধ করে যাওয়া। একটু চুপ করে থেকে তারপর ঈষৎ হেসে নেতাজী বলেছিলেন—এসো আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করি, ইতিহাস লেখার ভার অপর কেউ নেবে। নেতাজীর সেই ইতিহাস-সৃষ্টিকারী কীর্তিগাথা ছড়িয়ে আছে দেশে দেশান্তরে। য়ুরোপের অনেক জ্ঞানী গুণী, ভারত-তত্ত্ববিদ, ভারতপ্রেমিক তাই নিয়ে গবেষণা করছেন। পূর্ব ও পশ্চিম য়ুরোপে নেতাজী সম্বন্ধে এক নতুন আগ্রহ দেখা দিয়েছে। আজ তাই তাঁর কর্ম ও জীবনের ওপর বই বার হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে, কনফারেন্স বসছে। তারই কিছু আভাস পাবার সৌভাগ্যও এবারকার য়ুরোপ সফরে হল।

প্রাগ-এ নেতাজী সম্মেলন? ব্যাপারটা কি?—বলে অনেকেই সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন। ব্যাপারটা যে ঠিক কি তা গিয়ে উপস্থিত না-হওয়া পর্যন্ত আমিই কি জানতেম। তখন আমরা ভিয়েনাতে। নানা রাজনৈতিক এবং অ-রাজনৈতিক কারণে অস্ট্রিয়ানরা চেকদের সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে একটু শ্লেষ দিয়ে কথা বলে। ভিয়েনায় খাবার টেবিলে অস্ট্রিয়ান বন্ধুরা প্রায়ই বলছিলেন—"প্রাগ-এ যাচ্ছ? খেতে পাবে না। ইউ উইল স্টার্ভ। এখানে কদিন খাওয়া দাওয়া করে নাও।" প্রাগ-এ পৌঁছবার পর যখন আতিথেয়তা ও সমাদরের ধাক্কা সামলাচ্ছি, স্থির করছি তখন ভিয়েনায় চিঠি লিখে দিলাম, "মাই ডিয়ার—, উই ডিড নট স্টার্ভ।"

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ঠিক যাবার মুহূর্তে নিজেই একটু দ্বিধান্বিত ছিলাম স্বীকার করছি। ভিয়েনা এয়ারপোর্টে আচমকা দেখা হয়ে গেল কলকাতার এক পাশ্চাত্ত্য সংগীতজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে। খুশি হয়ে তিনি বললেন, চলো, চলো, প্লেনে বসে বেশ গল্পসল্প করা যাবে। কিন্তু চেক এরোপ্লেন এমন বিপুল গর্জন করে আকাশে উড়ল এবং যতক্ষণ আকাশে

প্রাগে সুভাষচন্দ্র (১৯৩৩)

মাইল গর্জন করেই চলল যে গল্প করা দূরে থাক প্রাগ-এ যখন নামলাম তখনো মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে। দু' হাতে দুটো বোঝা নিয়ে বিমান বন্দরের সুদীর্ঘ, ঢালু করিডর পার হয়ে ধীরে ধীরে উঠছি, পাশ থেকে ভিয়েনার এক সহযাত্রী বললেন, ভাবছ বুঝি এসকালেটর আছে, নেই কিন্তু। তা না থাক প্রাগ-এর এয়ারপোর্ট বেশ ঝকঝকে সুন্দর, আধুনিক। প্রাগ-এর ব্রিটিশ কনসাল ম্যাকেঞ্জি স্মিথ সাহেব (কলকাতার ভূতপূর্ব ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার) আমাদের সংগীতজ্ঞ বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে অন্য পথে উধাও হলেন, বোধ করি কোন ডিপ্লোমেটিক পথে। আমি তখন পাসপোর্ট কণ্ট্রোল-এ দাঁড়িয়ে আছি এবং পাসপোর্ট অফিসার মর্মভেদী দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আর একবার পাসপোর্টের ছবির দিকে তাকাচ্ছেন। অবশ্য নিয়মরক্ষা দেখাই নিয়ম তবুও ভাবছি অতটা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ কি একান্তই প্রয়োজন? কিন্তু পাসপোর্টের বেড়া ডিঙিয়ে ওপারে যেতেই দেখি প্রাগ-এর ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের ডাঃ মিরোস্লাভ ক্রাসা এবং তাঁর তরুণ সহকর্মী ডাঃ ভজোটেক চেঙ্কো এগিয়ে আসছেন, হাতে ফুলের তোড়া। 'ওয়েলকাম টু প্রাগ' বলে হাতে ফুলের গুচ্ছ ধরিয়ে দিলেন। হঠাৎ করেই যেন পরিবেশ সহজ ও অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। তখনো আমরা কাস্টমস্-এর ভিতর। কিন্তু সবকিছু ফর্ম্যালিটি বিনা বাধায় হয়ে গেল। অল্প-ক্ষণের ভিতরেই মস্ত টাট্রা গাড়ির সামনের বনেট তুলে পেটের ভিতর মালপত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ইনস্টিটিউটের বর্ষীয়ান ড্রাইভারকে ডাঃ ক্রাসা পথনির্দেশ দিচ্ছিলেন। পরদিনের কর্মসূচী নিয়ে কথা-বার্তা বলতে বলতে হোটেলে পৌঁছে গেলাম। হোটেলে পৌঁছতে একটি চেক তরুণী দু হাত জোড় করে এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল—নমস্কার, কেমন আছেন? আমি তো চমকে গিয়েছিলাম। ডাঃ ক্রাসা আলাপ করিয়ে দিলেন। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রী, প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত পড়েছে। বর্তমানে কাশী-রাম দাসের মহাভারত নিয়ে কাজ করছে। যোজেনা সেই থেকে প্রাগ এর কদিন আমাদের নিত্যসঙ্গী। পরদিনের কর্মসূচী বুঝিয়ে দিয়ে ডাঃ ক্রাসা, ডাঃ চেঙ্কো ও যোজেনা বিদায় নিল। ক্রাসা বললেন, কাল কিন্তু বেশ ভেজী প্রোগ্রাম। সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নিতে হবে। কষ্ট হবে না তো? জানো তো এদিকে রাত থাকতেই ভোরের আলো হয়ে যায়—দেখবে তাড়া-তাড়িই ঘুম ভেঙে যাবে।

সকাল সকাল ডাইনিং হলএ নেমে দ্রুত কনটিনেনটাল ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছিলাম তার আগেই যোজেনা এসে হাজির। যোজেনার সঙ্গে ইনস্টিটিউটের পথে চলেছি। প্রাগ শহর অনেকটা ভিয়েনার মতই—বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তবে কিছু ম্লান ও বিবর্ণ। ভিয়েনা এবার দেখে এলাম যেন বিশেষভাবে ঝকমক করছে। তবে প্রাগএ শহরময় ঘর-বাড়ীর চেহারা কিছু মলিন হয়ে থাকার

প্রাগ ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটে নেতাজী সেমিনার; উপবিষ্ট ডঃ ক্রাসা, ডানদিক থেকে দ্বিতীয়

সাঁড়, ওটা বর্নেদিয়ানার চিহ্ন। প্রাগএ আমাদের দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাশে মিঃ ঘোষ গল্প করছিলেন—জানেন এখানে লোকে নতুন বাড়ি করেও পারলে দু' পোঁচ কালো রং লাগিয়ে নেয়—কারণ ওটা আভিজাত্যের লক্ষণ। রোজেনা এটা-ওটা দেখাচ্ছিল, ন্যাশনাল থিয়েটার, দূরে পাহাড়ের ওপর প্রাগ কাস্‌ল। আমরা ভলটাভা নদী পার হলাম। ওপারের শহর কিছু পুরনো। যে এলাকায় এসে পৌঁছলাম তার নাম মালা স্ট্রানা, বেশ রোমাণ্টিক নাম মনে হল। শুনলাম তার মানে lesser town. এর একপাশ দিয়ে সরু রাস্তা বেরিয়েছে। তার ওপর ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় ডাঃ বসুর[১] পুরনো স্মৃতি মনে পড়ল। বহুকাল আগে বাবার সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় এসেছিলেন প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক লেসনির সঙ্গে দেখা করতে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের কথা। প্রাগ-এর আবহাওয়া তখন থমথমে। ডাঃ ক্রাসা বললেন, শরৎচন্দ্র বসু যখন প্রোফেসর লেসনির সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন আমি লেসনির সহকারী। সে সময় নিশ্চয় আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল।

ওপরের ঘরে সমবেত সহকর্মীদের সঙ্গে ডাঃ ক্রাসা আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন—বলে চলেছেন—ইনি অগাস্টাইন পালাট, এ'র বিষয় পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, ইনি পাভেল পুসা, এক সময় ইণ্ডোলজি বিভাগের প্রধান ছিলেন, এ'র বিষয় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, ইনি মেরহাউটভা, বিষয় হল ভারতের ধর্ম, ডাঃ বেচকা ইনি বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কাজ করছেন, আর শ্রীমতী ডাগমার বেচকোভা, এ'র বিষয় বর্মী সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ডাঃ চেলকোর বিষয় মডার্ন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি, ডাঃ হারজেরোভার বিষয় সংস্কৃত, গবেষণা করছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা নিয়ে, আর ডাঃ হোরাকোভার বিষয় হল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য পড়াচ্ছেন ডাঃ আনসারি। এত সুধীজনের সমাবেশে নিজেকে বেশ অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল। কে ভেবেছিল

১ ডাঃ শিশিরকুমার বসু, ডিরেক্টর, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা।

প্রাগ-এ একজন ভারতবর্ষ ও এশিয়া বিশেষজ্ঞের দেখা মিলবে। এদের অনেকেই আমাদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের চাইতে বেশীই জানেন। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের কর্মীরা মোটামুটি ইংরেজি সবাই জানেন। আমাদের সেমিনার ইংরেজিতেই হল। ভীড় ঠেলে একজন সৌম্যদর্শন চেক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। আমাদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'নমস্কার, আমি একজন প্রবাসী বাঙালী।'

ইনি ডাঃ দুশান যাভিটেল। কলকাতার অনেকেই তাঁকে চিনবেন। ইনস্টিটিউটের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইন্ডোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান। প্রাগের লোকে ওঁকে "দুশান বাবু" বলেই জানে। আমাদের কাছেও জেড্ দিয়ে শুরু যাভিটেল (Zbavitel) উচ্চারণ করার চাইতে দুশান বাবু ডাকাই সহজ মনে হল। কোপেন-হেগেনের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপিকা ডাঃ বেনেডিক্টে আইলিয়ার সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিল। মেয়েটি সুপণ্ডিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস তার নখ-দর্পণে। বর্তমানে দাক্ষিণাত্যের ভূমি-সংক্রান্ত অর্থনীতির উপর গবেষণা করছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে ওর আগ্রহ দেখে বললাম, তোমাকে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর প্রকাশিত কিছু বই পাঠিয়ে দেব'খন। সে সোৎসাহে বললে, নতুন কিছু বেরিয়েছে বুঝি? তোমাদের ব্যুরোর এই এই বই আমাদের ইনস্টিটিউটে আছে—বলে প্রায় পনেরো বই-এর তালিকা গড়গড় করে বলে গেল। ব্যাপার দেখে চুপ করে গেলাম। প্রাগ-এ আমাদের দূতা-বাসের পক্ষ থেকে আমাদের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাটাশে উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যাবেলার সেশনে সাধারণভাবে নেতাজীর জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হল। বিশেষ ভাবে আলোচনা হল নেতাজী সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা কি তাই নিয়ে। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের মত একটি অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা স্বভাবতই কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। ডাঃ বসুকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। ডাঃ ক্রাসা, ডাঃ যাভিটেল, ডাঃ বেনেডিকটে আইলিয়ে প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সময় অনেক ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন করে আমাদের অবাক করে দিলেন ডাঃ বেচকা। বার্মার স্বাধীনতা ওঁর বিষয় হওয়াতে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের কোন কোন দিকে ওঁর গভীর ইন্টারেস্ট ছিল।

(ক্রমশ)

বাংলাদেশ থেকে ফিরে / সন্তোষকুমার ঘোষ

যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়

যে অভিজ্ঞতা, যেন রূপকথা মনে হয়, বাংলাদেশ থেকে ফিরে প্রথম প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে বৃত্তান্ত বলেছি। আমি কি সেখানে ছিলাম, গিয়েছিলাম? এই তো সেদিন, সোনার ঢাকা। ইস্টিমারে চাঁদপুরে, বরিশাল ছুঁয়ে খুলনার বন্দর-শহরে। সেখান থেকে গাড়িতে পাড়ি—যশোর। তারপর ঝিকরগাছা, নাভারন। তারও পর? তারপর এই তো বেনাপোল চেকপোস্ট পেরিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে। দর্শনের জন্য কোনও দিন কোনও তীর্থে যাইনি, কিন্তু এবার ওই দেশ থেকে ফিরে তীর্থস্নানের শুচিতা অনুভব করছি। সাত কোটি মানুষের দেশ সাত দিনেরও কম সময়ে? অসম্ভব, সে অসম্ভব, যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

হরিদাসপুরের সীমান্তরেখা। আগে কতবার এসে দাঁড়িয়েছি, এদিকে তেরঙ্গা ওদিকে সবুজ, দুই দিকে দুই নিশান, মাঝখানে বেওয়ারিশ ভাঙা ফাটক। নিষেধের পরোয়া না করে একমাত্র যে এগিয়ে গিয়েছে, তার নাম যশোর রোড। দুই রাষ্ট্র, কিন্তু এক রাস্তা এক নাম। তৃষ্ণাতুর চোখ পিছু-পিছু গিয়েছে তার, হায় কতদূরে আর যাবে! হেঁটমাথা, ফিরে এসেছি কতবার। সেই আমি কিনা আজ বাংলাদেশের হৃদয়ে বিছানো পথ বেয়ে অবাধে চলে এলাম, একই সঙ্গে মৃত্যুর ছাপ আর চিরন্তন প্রাণের চিহ্ন চিনে চিনে! ইহজীবনে আর কখনও সম্ভব হবে, ভাবিনি।

তবু, অভাবিত কত-কিছুই তো এ-জীবনে ঘটল। স্বাধীনতা ছিল শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের কামনা, কিন্তু সেই প্রতিমা কিছুতেই মর্তে হতে চাইছিল না। ইতিমধ্যে আমার প্রাণেও তো যৌবনে বর্ষের পরও দশকাধিক কাল কেটে গেল। অবশেষে সে এল বটে, কিন্তু ছিন্নমস্তার আকারে, আমার জন্মভূমিকে পর করে দিয়ে। রূপান্তরিত তার আজব নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'—এও দেখলাম।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানও যে আবার নবরূপে অপরূপ 'বাংলাদেশ' হয়ে ফিরে আসবে, তা কি কখনও ভেবেছিলাম? সে কি আবার আমার হয়েছে? নাই বা হল। সেখানে যেতে তো পারছি, সেই ঢের। ভাঙা সেতু ফের জুড়ে গেছে, দেখে এসেছি। সত্তর মজে-পড়া নদী কপোতাক্ষের তীরে। নতুন শক্ত পোক্ত—সেতুবন্ধের প্রতীক—ভারতের জওয়ানদের কীর্তি। মাত্র দিন কয়েকের মধ্যে রচিত সেতুটির ফলকে লেখা "বিজয় সেতু—ডিসেম্বর, ১৯৭১"। বিজয় কার? আমাদের উভয়ের। ধর্মের নয়, রাজনীতির নয়, অবিভাজ্য মানুষের।

আর প্রকৃতিরও। একই জাতের গাছ দুই পারে, একই হাসিতে হলুদ হয়ে যাওয়া সর্ষেখেত, রুক্ষ খেজুরের বুক বেয়ে নেমে আসা একই রসের ধারা; একই মমতার নীল বাঁওর আর বিল, একই পাখি। বিভূতিভূষণের লেখায় এখন যাদের চিনে নিতে পারি এই পারে, দেখে এলাম তাদের অনেকখানিই থরে থরে সাজানো ছিল ওই পারেও। ওরা র‍্যাডক্লিফের ছুরির খবর রাখেন।

খালি দুই-একটা আগুনে ঝলসানো বৃক্ষ এখানে-ওখানে সাক্ষী, দধীচি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই-একটা গোলার-আহত দেওয়ালের ফোকর বিস্ফারিত অন্ধ চোখে নালিশ জানাচ্ছে। দেখে এসেছি। আর রাস্তার পর রাস্তার মোড়ে মোড়ে চেনাজানা শহরগঞ্জের দিক আর দূরত্বের নিশানা—ঝিনাইদা, সাতক্ষীরা, কাস্তারখালি, নড়াইল এবং অবশ্যই ঢাকা। ঢাকা মানে সেই রাজবাড়ি গোয়ালন্দ হয়েই তো, পদ্মাপারের ফেরি হয়েই তো? বুকের শিরে শিরে কেমন একটা টান লাগে টের পাই।

॥ ২ ॥ অবাস্তব ছিল সেদিনও যখন এই যশোর-খুলনাতেই আরও একবার আসি। ১৯৬১ সন, আয়ুবের আমলে। সহযাত্রী বিদেশী আর বিদেশিনীরা। আমরাও কমনওয়েলথ, সেই সুবাদে একমাত্র ভারতীয় সাংবাদিক হিসেবে আমিও হংসমধ্যে কাক যথা, ভিড়ে গিয়েছি।

এক মেমসাহেব তো এখানে মাটিতে পা দিয়েই ভরে-আসা কলসীর মতো গদগদ গলায় যা দেখেন তা-ই বলেন 'লাভলি'। আর আমার দিকে অপাঙ্গ নয়নে: তুমি আগে কখনও এ-দেশ দেখেছ? হায়

বিদেশিনী, তোমাকে আমি কী করে বোঝাই, আমার জন্ম যেখানে, সেখানকার পাখিরা নিত্য ডানা মেলে অনায়াসে আসে যশোরে —আসতে পারে।

সেবারের সেই এক যাত্রায় আমি আরও কিছু কিছু বুঝেছিলাম। অখণ্ড পাকিস্তানের ফাঁকিটা তখনও ধরা পড়েনি বটে, তবু ফুটতে শুরু করেছিল। নতুবা আমাদের তদারকির ভার যে-সব তরুণ বাঙালী অফিসারদের উপরে, তাঁরা সবাই বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ভারতীয় বাঙালী আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে ফিরবেন কেন? কিউঁয় জাহাজের কেবিনে আছি, থেকে-থেকেই দরজায় টোকা, "আসুন দাদা, এক হাত খেলা যাক। তাস চলে?" বাইরের পাটাতনে দিব্য পাটি পেতে আলস্যমি আর কর্মনাশা পেটাপেটি—মধুর বায়ে দিব্য রঙ্গে কটা দিন এবং ওই তরণীখানি ভেসে যাচ্ছিল।

আরও স্মৃতি আছে। ধরা যাক ইস্টিমারের সেই প্রধান বাবুর্চি। একদিন চুপে চুপে সে এসে আমাকে বলে, "সাহেব, আপনার আইজ রাইতে খাইতে খুব কষ্ট হইব।" কষ্ট কেন, না রাত্রের খানা-মেনুতে সাহেব-মেমেরা ঠিক করেছে সেদিন আসল কোর্স হবে স্টেক। আমার গায়ে কোনও ধর্মের নামাবলী নেই, তবু ওই বাবুর্চি কী করে জেনে গিয়েছে, আমি হিন্দু হই বা না-হই হিন্দু-সন্তান তো। অতএব তার ধারণা, গোমাংসে আমার আপত্তি অনিবার্য। আপত্তি ছিল কি ছিল না, সে-কথা অবান্তর। আসল কথা এই যে, ওই সাধারণ মানুষটি আমার রুচি-অরুচির কথা নিজে থেকেই বিবেচনা করেছিল। একটু পরে আর-একটু এগিয়ে আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে-নেড়ে সে বলতে থাকে, "ডর আপনে পাইবেন না। আপনার লাইগ্যা আমি মুর্গীর ছাল্কেন পাকাইয়া দিমু।"

চোখে জল-টল আজকাল বিশেষ আসে না, তবে সেদিন গড়িয়ে কাঁটা দিয়েছিল ঠিকই।

সবচেয়ে চমক লাগে স্টিমার-যাত্রার শেষ দিনে। গভীর রাতে ঘুম ছিল না কেবিনের ছিটকিনি খুলে তাই বেরিয়ে আসি। রাত-চরা পাখিগুলো, তাদের নাম জানি না, খুব নীচু হয়ে পাখসাট মেরে মেরে চরের দিকে চলে গেল। একটা মসলিন-জ্যোৎস্নায় নিজেকে ঢাকতে গিয়ে চরাচর আরও বিবৃত হয়ে গেছে। তলার পাটাতনে মাল্লাদের কানাকানি, জাহাজের গায়ে লাগা অনর্গল জল খুব চাপা গলায় সরগম তুলছে।

ঠিক তখনই কোন্ কোণা থেকে ভেসে উঠল সেই গান—"সুখে আছি, সুখে আছি সখা আপন মনে।" ওই সময়হীনতার শূন্যে তার সুখকে ঘোষণা করছে কে, এমন করুণ করে ছড়িয়ে দিচ্ছে? সেই তরুণ বাঙালী অফিসারদেরই কেউ—অবশ্যই। সুখটা তার, কিন্তু কথাটা কার? তখনই টের পাই রবীন্দ্রনাথ অবধারিত সোনার বাংলায়। গোটা জাতটাই ক্রমে ক্রমে প্রজা হয়ে পড়বে জোড়াসাঁকোর জমিদারবাবুর, যিনি কিছুকাল মোটে ছিন্নপাতায় সাজান তরণী ওখানকার জলে—ওই সব ছোট ছোট ঘটনা তারই সূচনা। বীজ নিশ্চয়ই তারও আগে উপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে।

সবশেষে ঢাকায়—সরকারী এক পার্টি, মহা ধুমধাম। চার দিকে চাই—নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বাঙালী কয়জন? এক রকম চোখেই পড়ে না। একটা বিস্ময় আর প্রশ্ন জাগে তখনই: বাংলাদেশে বাঙালীরা ব্রাত্য, অকুলীন—এই অলিখিত বিধান ওরা বরদাস্ত করবে কতদিন? সাংস্কৃতিক মুক্তি আর আর্থনীতিক স্থিতির আগ্রহ একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবেই, এই অস্পষ্ট ধারণাটা সেই দিন মনে লেখা হয়ে গিয়েছিল। আগ্রহ পরে রূপ নিয়েছে সত্যাগ্রহের। সত্যাগ্রহ পূর্ণতর মূর্তি পায় সংগ্রামে। তবু অকপটে বলি, সেদিনের সেই প্রতিপদে আজকের পরিপূর্ণ পূর্ণিমাটিকে ঠিক কল্পনা করতে পারিনি।

॥ ৩ ॥ গৌরচন্দ্রিকা থেকে এ-পর্যন্ত তাই ফিরে ফিরে বলছি, অবিশ্বাস্য মনে হয়। ঢাকায় আগেও এসেছি, দেশ বিভাগের পূর্বেও একবার। সেই যে সেবার সাত-সকালে চা-রুটি খেয়ে সোজা দমদমে ছুটেছি; দুপুরে দুটোয় বাড়ি ফিরে মাকে বললাম, "ভাত দাও।"

"এরই মধ্যে ঢাকা ঘুরে এলি? সত্যি?" —মা অবাক, বিশ্বাস করতে চাননি। জীবনে সেই আমার প্রথম আকাশে ওড়া।

সেই ডাকোটা এবারও। মাঝের এতগুলো বছরে হাওয়াই সফরের যে রোমাঞ্চ ঘুচে যেতে বসেছিল, তা যেন ফিরে পাচ্ছি আবার। ছেলে মানুষের মতো ঝুঁকে পড়ে জানালায় সেঁটে করে চোখ রেখে দেখছি—তট-রেখা জলরেখা কিছু কি চেনা যায়? এই নদীটা কী? মধুমতী, মধুমতী নিশ্চয় মধুমতী। তারপর...আর এই যে, জ্যামিতিক মাপে কাটা ফসলের খেতের পর খেত ফুরিয়ে যাওয়ার পরে প্রসারিত বিস্তার—এ তো অব্যর্থ পদ্মা। যমুনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করেছে কোথায়, বোধ হয় ওর কিছু পশ্চিমে, এখন আপন বেগে পাগলপারা ফুঁসে ফুঁসে ফুলে ফুলে ছুটেছে। আরও পূবে কিছুটা বা দক্ষিণে—এখান থেকে দেখা যাবে না—এই নদীই টেনে নেবে মেঘনাকে। অরুণচক্রনীলকে স্পর্শ করে সে অগাধ অপার হয়ে যাবে। দক্ষিণ বাংলা এক আশ্চর্য ভূভাগ, সেখানে নদীও সমুদ্র হতে জানে। কিন্তু তার আগেই আমরা পেয়ে যাব মাটি। ধলেশ্বরী পেরিয়ে ঢাকা।

॥ ৪ ॥ অনেক প্রশ্ন আমার—ছিল। আপনাদেরও অনেক প্রশ্ন—জানি এখনও আছে। তাই এই লেখার বাকিটাকে একবার ভাবছি প্রশ্ন আর উত্তরের আকারে সাজাই, আবার পরক্ষণেই তপ্ত খোলায় খৈ করে তুলছি।

ঢাকা। প্রথমেই বাংলায় লেখা অজস্র সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। (সাইনবোর্ডের বাংলা কী?) আমরা পবিত্র প্রস্তাব পাস করে বাংলাকে এই বঙ্গে সরকারী ভাষা করেছি। বাস, কর্তব্য শেষ। ওরা কর্তব্যের আর একটা মানে জানে। মুখের কথাকে চোখের ব্যাপার করে তুলতে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছে। (ভাষাকে ভালবাসার একটা জোয়ার অবিভক্ত বাংলাতেও আসে একবার—অন্তত সেই ত্রিশের দশকের ব্যাপারটা তো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেই তখনকার কথা, যখন একদিকে গড়ে উঠছে নতুন বালিগঞ্জ। তখন জুতোর দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান, চুল কাটার সেলুন সব কিছুরই দেশী নামকরণ ছিল নব্য বাগ-রীতি। কালে কালে ইংরেজি আবার হারানো জায়গা ফের দখল করে নিচ্ছে। নইলে বোধ হয় আমাদের মন ভরে না, নইলে যথেষ্ট ফ্যাশনদুরস্ত হয় না। ফিরিঙ্গি মার্কা স্কুলের কল্যাণে জাতিত্ববর্জিত একজাতীয় সংস্কৃতিতে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। ইংরাজ গেছে, কিন্তু ইংরাজিয়ানার—মনে রাখবেন ইংরাজির নয়, ইংরাজিয়ানার—দাপট বাড়ছে।)

কিন্তু এই যে ঢাকা, এখানে পেট্রল পাম্পেও বড় বড় বাংলা অক্ষরে লেখা থাকে "এসো-ও"। কথাটা যে চোখে "এসো"-র মতো ঠেকে, আগে কখনও খেয়াল করিনি, বোধ হয় বরাবর ইংরেজি হরফে পড়েছি বলে। ঢাকায় বাংলায় লেখা "এসো-ও"—যেন ঢাকা ডাকছে।

এ একটা নমুনা মাত্র। একটা চাল টিপে ভাতের হাঁড়ির খবর বোঝা। সবটাই যে সিদ্ধ হয়েছে এমন নয়, এখনও অনেক বাকি। তবু ওরা যা করেছে আর যতটুকু, তা প্রতিকূল শাসকদের ভ্রূকুটিকে পরোয়া না করেই। ধরা যাক, যেখানে উঠেছিলাম সেই হোটেলটা। জীবনে এই প্রথম

একটা আন্তর্জাতিক খানাইখানা দেখলাম যেখানে রুশ সাম্রাজ্য? "এক পট কফি পাঠিয়ে দিন তো" বলে আমার মাতৃভাষায় খানাপিনা প্রভৃতি ফরমাস করতে পারি। খাস কলকাতাতেও এটা অসম্ভব।

কলকাতাতে অসম্ভব তো আরও অনেক কিছু। বড় হোটেল-টোটেলে তো বটেই, পান কিনতে হিন্দী, রিকশায় চড়তে হিন্দী, ট্যাক্সির তো কথাই নেই। এটা আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা পারি বা না পারি, সকলের সঙ্গেই তার তার নিজের ভাষায় কথা বলতে গলদঘর্ম হয়ে মরি, এমন কি শিক্ষিতম্মন্য যে কয়জনা তাঁরাও পরস্পরের সঙ্গে ইংরাজি মিশানো খিচুড়ি ভাষা ছাড়া সংলাপ চালান না।

আরও চাঁচাছোলা করে বলি। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে বাংলা পড়ার অভ্যাসই বা কয়জনার? পশ্চিম বাংলার সাহিত্য চলছে প্রধানত মহিলাদের আনুকূল্যে—ছাপানো বইয়ের মলাটে 'লেডিজ্‌ ওনলি' লিখে দিলে মন্দ হয় না। অবশ্য কবিযশঃপ্রার্থী কিছু কিছু তরুণও আছেন ভাগ্যিস!—কুড়ি বাইশ কি পঁচিশ পেরিয়ে গেলে ছেলেরা পারতপক্ষে বাংলা বই ছুঁয়েও দেখেন না। প্রাতঃস্মরণীয় কবি মনীষীদের আসল সমাধি পাঠ্যপুস্তকে—আমরা বৃথাই পার্ক সারকাসের খৃষ্টীয় গোরস্থান কিংবা নিমতলার ঘাটে অনির্বাণ শিখা খুঁজে বেড়াই।

জানি, আত্মনিন্দা মহাপাপ। আমার এই আত্মবিলাপের সঙ্গে অনেকেই সায় দেবেন না, জানি। অনেকেই প্রাজ্ঞ পক্ক মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবেন, "ওদের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, তাই ওরা পাস করল, এমন কঠিন পরীক্ষায় আমাদের তো বসতে হয়নি। হলে তরে যেতাম আমরাও।"

কথাটা ঠিক—আংশিক। পরীক্ষা দিতে না হয় আমাদের এখনও হয়নি। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি? স্বাধীনতার এই সিকি শতক পরে এই বাংলায় চার দিকে চেয়ে তার কিছু কি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি? কোথায় দৈনন্দিন জীবনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সরকারী কাজকর্মে বাংলা ব্যবহারের ক্রম-প্রসার? সেখানে তো দূরের দিল্লি বাধা দিচ্ছে না, বা দেয়নি! আসলে একটি বিকৃত সামাজিক রুচি আর ইংরাজিনবিশ এক শ্রেণীর কর্তাদের অভিরুচি মাতৃভাষা প্রবর্তনের রাস্তা রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।
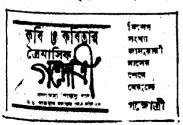
আমরা মধ্যের ভাষাকে বুকে তুলে নিইনি; উন্নাসিক উদাসীনতায় শিরোধার্য হিন্দী। সঙ্গে সঙ্গে আসলে ইংরাজীও জুলেছি; ফলে যেহেতু ইংরাজীরই বাজারদর বেশি, তাই আগামী কালের আসরে রাজ্যশ্রেষ্ঠ কলকে পাবে তারাই, যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, কিন্তু অ্যাংলো-স্কুলের ছাপ-মারা এক ছত্র সম্প্রদায়, যারা অভিজাত পাড়ার রেস্তোরাঁয় জ্যাম-সেশন জমায়, সর্বতোভাবে স্বাজাত্য-বর্জিত নীলবর্ণ-শৃগালকুল, যাদের মুখে অনর্গল কিচিরমিচির চি-চি ইংরাজী। এর জন্যে দায়ী তারা নয়, দায়ী, তাদের পিতা এবং মাতা, যাদের তারা বলে থাকে "ড্যাডি" আর "মামি।" তাঁদেরই অপূর্ণ ইচ্ছা-পূরণের এরা বলি।

এরাই ক্রমে-ক্রমে একটু বড় আর লায়েক হয়। কবিকুলে টেগোর "মেজর মাইনর", না "মাইনর মেজর" এই নিয়ে তুখোর তর্কে যখন টেবিল ফাটায়, তখন পাশের দেশে একটি জাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কোনও কবির গান কণ্ঠে নিয়ে বলে ওঠে, "আমি তোমায় ভালবাসি।"

এইভাবে বিশ্বাসে, সাহসে ওরা এগিয়ে যায়, আর ভ্রান্ত, সংশয়গ্রস্ত, ক্লান্ত, আমরা পিছিয়ে পড়ি।

॥ ৫ ॥ কিন্তু শিসের গীতেই বেলা যায়-যায়, আমি এবারে-দেখা বাংলাদেশের

স্মৃতি লিখব কখন? কবি হলে তেমন মুশকিল ছিল না—"কী দেখেছি, মধুর হাসি", লিখে দিতে পারলেই চুকে যেত। কিন্তু গদ্য-সন্দর্ভে দেখার কষ্টটাও পেশ করতে হয়।

কার কথা লিখব প্রথমে, নুরউদ্দিনের কথা, যে আমাকে ঘুরে-ঘুরে ঢাকা শহরের একটা ভাগ দেখিয়েছিল? ক্ষতিগ্রস্ত জগন্নাথ হল, কিংবা অভিশপ্ত রোকেয়া হল—যেখান থেকে বিবস্ত্র ছাত্রীদিগকে সৈন্যরা মার্চ করিয়ে ছাউনির দিকে নিয়ে যায়? সত্য মিথ্যা জানি না। নুরউদ্দিন বলেছিল। বলেছিল আরও অনেকেই। বাংলাদেশের সর্বত্র, যেখানেই গিয়েছি। আঙুল দিয়ে ওরা দেখিয়ে দিয়েছে কসাইখানার পর কসাই-খানা। কেবল হত্যা আর অত্যাচার—অত্যাচার আর হত্যার বিবরণী। নুরউদ্দিন বলেছিল "হিন্দুরা চলে গিয়েছিল। আমরা ওদের পালাতে সাহায্য করেছি, পার করে দিয়েছি। এখানে থাকলে ওরা বাঁচত না। থেকে গেছি আমরা। ভেবেছি যা হবার তা হবে।"

যা হবার তা হবে। যেন নিয়তির সেই পালাটির একটি কলি। কিন্তু ওরাই কি বেঁচেছিল? সবাই নয়। অসংখ্য পুরুষ প্রাণে নয়। সংখ্যাতীত নারীরা মান বা প্রাণ কোনটাতেই নয়। সারা বাংলাদেশে আজ এমন একটি পরিবারও মেলা দুষ্কর, যারা কিছু-না-কিছু—কখনও বা সর্বস্ব—না হারিয়েছে।

প্রাণকে হাতে করে একটি বোনের শিখা আমার মনে জ্বলা উচিত—জ্বলেও ছিল। তবু সেই আলোতেই অবার টঙ্গি স্টেশনে সার বেঁধে দাঁড় করানো খান-পাঠান সেনাদের ম্রিয়মাণ মুখগুলোকে ভেসে উঠতে দেখেছি কেন? এই তো আমার দুর্বলতা দেখ। কঠিন বিস্ময়ের সঙ্গেও তাকাতে দেখিনি কেন: নিরস্ত্র—সারবন্দী যুদ্ধবন্দীরা সকালের প্লাটফরমে। শূন্য দৃষ্টি, নিরুপায় নির্বিকার। নারায়ণগঞ্জে চালান হয়ে যাবে। সেখান থেকে? ওরা জানে না। অন্তত এই মুহূর্তে না। ওদের মধ্যে কবি শিল্পী কেউ কি আছে? এখন না-হয় বড় বড় বাংলা অক্ষরে "বাংলাদেশ রেলওয়ে" লেখা কামরায় বাধ্য সুশংবদ উঠে যাবে। কিন্তু তার পরে? দূরের কোনও রুক্ষ বন্ধুর পার্বত্য উপত্যকার পল্লীতে কে আছে ওদের—মা-বাবা, ভাইবোন, পত্নী প্রণয়িণী বা অন্য কোনও স্বজন—ওদের স্মরণে, ভাবনার শিহরণে, কারও কি চোখের পাতা এই ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে?

শীতের এই সকালে, সমতট-সমতল এই দূর দেশে কী ভাবনা ওদের মনে? কেন এসেছিল, কার জন্যে লড়েছিল (বা লড়েনি) ওরা জানে না! যদি কোনও শিল্পী বা কবি থাকে, তারা স্বদেশে যদি ফেরে, তবে এই কুহেলি-বিলীন বিষণ্ণ দিনটির ছবি তারা কোন্ তুলিতে আঁকবে, স্মৃতিকথাই বা সাজাবে কোন্ অক্ষরে? ওই যে একটি পাঠান ঝুঁকে পড়ে দেখছে, তার পাশের পাহারাদার ভারতীয় জওয়ানের হাতের একটি কেতাব—চিনতে পারছি, হরফটা উর্দু, তাই ওর এই আগ্রহ কৌতূহল ওর মনের কথাটা কী?—"এ-ও মানুষ, আমিও তাই, ওর যে বর্ণমালা, আমারও তাই, আশ্চর্য।"—এই কী?

আবার ওই যখন হিংসা আর হননের জগদ্দল রথ নয় মাস চালিয়েছিল, তখন এই সুন্দর অথচ বিপন্ন বিস্ময় কোথায় ছিল?

এই সব এলোমেলো ভাবনা আর ছবি আমার লেখাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে, আমার এই আমিটাকে নিয়ে আমি কী যে করি!

মনে পড়ছে সেই শোনা গল্পটাও—একক এক খান সেনার। তখন ঢাকায় তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। রোজ ভারতীয় বিমান বহর বোমা ফেলছে। আমাদের জওয়ানেরা ধসের মতো তিন দিক থেকে নেমে আসছে। সে-কথা ঢাকার সাধারণ মানুষও জেনে গেছে। পাকিস্তানের পক্ষে শেষের সেইসব ভয়ংকর দিনের একটিতে ওই খান সৈন্যটি কিনেছিল একটি মুরগি—বড় সাধ, আশ মিটিয়ে খাবে।

হাতে ঝোলানো মুরগী, দোকানে গিয়ে সে বলল, "গরম মশলা আছে?" থাকলেও তখন তাকে বেচে কে? দোকানী ঠোঁট উলটে বলে দিল—নেই। খান সেনাটি কাঁচু-মাচু, বলল, তবে আদ্রক? তা তো আছে? তাই দাও। দোকানী অম্লান-বদনে বলে দিল, আদ্রক, মানে আদাও নেই।

নেই? হাতে ঝোলানো পাখিটা নিয়ে বিরস মুখে পাক সৈন্যটি আস্তে আস্তে ফিরে এল।

এই মুহূর্তে আমি তার হতাশ মুখ-চ্ছবিও দেখতে পাচ্ছি। জাতির সঙ্গে জাতি লড়ে, জাতির উপরে জাতি অত্যাচার করে। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে আর একটি মানুষের সাধ-শখ-সুখে, ইচ্ছায়-আশায়-বাসনায় কোনও প্রভেদ নেই।

॥ ৬ ॥ একটি নতুন রাষ্ট্রের কথা প্রসঙ্গে যদি মানুষের কথা এনে ফেলি, তবে এই লেখা কখনও ফুরোবে না। এখনও আপনাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া, সংশয়ের নিরসন করা বাকী।

যেমন, আপনারা জানতে চাইছেন তো, ওখানে আইনের আমল আর শৃঙ্খলা কি ফিরে এসেছে? কিন্তু ফিরে আপনাদেরই বলি, হে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভ্রান্ত নৈকষ্য নাগরিক, এই প্রশ্ন করা কি আপনাদের সাজে? গত তিন বছরে আপনি বাস করেছেন কোন্ পরিবেশে? কিংবা এখনও করেন? এই ক' মাস আগেও সন্ধ্যার পরে ক'বার বাইরে বেরিয়েছেন, রাত্রে সিনেমা দেখেছেন, যদি আপনার বাড়ি হয় বেহালায়, গড়িয়ায় কি বেলঘরিয়ায়? যদি আপনি

শিক্ষক হন, কতদিন আপনার শিক্ষায়তনটি খোলা থেকেছে? যদি আপনার কর্মস্থল হয় কোনও কারখানা, তবে সেই কারখানাটি এখনও কি খোলা আছে? জানি, এই সমুদয় প্রশ্নের জবাব দিতে আপনি ঘাবড়ে যাবেন, জিহ্বা জড়িয়ে যাবে তোতলামিতে।

সোজা বুদ্ধিতে যা বুঝি, আমি তাই বলি, স্বচক্ষে যা দেখি, তাই লিখি। তত্ত্ব-টত্ত্বের আস্তাকুঁড় মাড়াই না।

যেমন, আমি থাকি মোটামুটি ভদ্র ও শান্ত ভবানীপুরে, তবু বেশ কিছুকাল ইদিক-সিদিক না চেয়ে রাস্তায় পা দিই না। সেই আমি কি না ঢাকায় গিয়ে, দিব্যি কখনও হেঁটে, কখনও সাইকেল রিকশায়, সারা দিনমান বেপরোয়া টো-টো করে ফিরলাম? ভবানীপুরে, কলকাতায়, এতটা সাহস হত না। তবু আপনি, সন্দিগ্ধ পণ্ডিত, জানতে চাইছেন, ওখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক কিনা?

নবাবপুরের গিজগিজে ভিড়ে দেখেছি, একা এক ভারতীয় জওয়ান ঘুরে ঘুরে সওদা করে ফিরছে। শ্যামবাজারের পাঁচ রাস্তার মোড়ে একা এক ভ্রাম্যমাণ সোলজার! —ভাবাই যেত না।

মনে রাখবেন, আমি লিখছি তখনকার অভিজ্ঞতার কথা, যখনও শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেননি। এবং এও ঠিক, তাঁর বিহনেও যে সরকার সিংহাসনে খড়ম বসিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন, তাঁরা এমন কিছু বিপন্ন বা অসহায় ছিলেন না। মন্ত্রী-দের কথায় ওখানে কাজ হচ্ছে না, এটা এখানে আমাদের জনকয়েক ধুরন্ধরদের বাসনা-পূরণ, এবং কল্পনা। শুধু ঢাকা নয়, আমি চাঁদপুর বরিশাল খুলনা যশোরও ঘুরে এসেছি। সর্বত্রই আওয়ামী লীগের হুকুমত বিদ্যমান।

স্বাভাবিক পরিস্থিতি আছে কি না? দেখুন, ফরাসী বিপ্লবের পরে প্যারিসে বলা বাহুল্য, উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আমার ছিল না। অকটোবর বিপ্লবের পর মস্কোতেও ছিলাম না আমি। সুতরাং পালা-বদলের অব্যবহিত পরে উক্ত নগর-দ্বয়ের রূপ কী-রূপ ছিল হলপ করে বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে এইটুকু জানি, বিপ্লবের পরে প্রকৃত অর্থে স্থিত হতে রাশিয়ার লেগেছে অন্তত ৩৫ বছর—১৯১৭ থেকে ১৯৫২-৫৩ অবধি।

কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় পাক্কা ৩৫ বছর কেন, পঁয়ত্রিশটা দিনও সবুর করতে আমাদের মন চাইছে না। কেন না, আমাদের হিসাবে যে মিলছে না।

পড়া বিদ্যা আর অন্ধ বিশ্বাস এবং আনুগত্য দিয়ে সব যাচাই করতে বসলে এমন অনেক কিছুই মেলে না। তবু খাঁটি হলে এখানে কংগ্রেস—তার যা সামাজিক এবং আর্থনীতিক নেতৃত্ব ও সংগঠন—অনেক দিনই ফৌত হয়ে যেত, তার কোনও ভূমিকাই থাকত না। অথচ আছে, এবং বিরোধী দলগুলির আত্মবিরোধী ক্রিয়া-কীর্তির কল্যাণে বেশ উত্তম তবিয়তেই বহাল আছে। হিসাবে মিলছে না। তেমনই হিসাব মিলছে না ওখানে আওয়ামী লীগের বিপুল, বিস্ময়কর নিঃসপত্ন জনপ্রিয়তাও। এই নেতৃত্ব নাকি মধ্যবিত্ত তথা পাতি-বুর্জোয়া।

হবে হয়তো। তবু অতি-বিপ্লবী তোহা-টোহার নাম যা শুনেছি, সব এই তল্লাটে; জাতি-বোধে উদ্বেলিত বাঙালী জাতির মধ্যে সব মত-পথের বিভিন্নতা মিশে গেছে; আপামর সর্বসাধারণ, আবালবৃদ্ধ-বনিতার মুখে একটিই ধ্বনি—'শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' আমরা এসব বুঝব না, কারণ হিসাবে মিলছে না।

তাই এখানে ফিরে এসে ইস্তক থেকে থেকে প্রশ্ন শুনি—ইনডিয়ান আর্মির উপস্থিতিতে ওরা ক্ষুব্ধ, সত্যি নাকি? জবাবে বলতে ইচ্ছা করি—সত্য। আপনাদের মনোবাঞ্ছায় আর কানাকানিতে। আমাদের জওয়ানেরা ওখানে দখলদার নয়, বরং বন্ধুর মতো। অপিচ তাদের উপস্থিতি অত্যন্তই সতর্ক এবং অপ্রত্যক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘাঁটি ছাড়া ওরা কোথাও নেই—শ্রীমতী গান্ধী থাকতে দেননি। এবং এখানকার সব সরস জল্পনাকে জব্দ করে তিনি তাদের ফিরিয়েও আনছেন, আনবেন। দেখছেন তো আজ পর্যন্ত কোনও হিসাবে তাঁর একচুল ভুল হয়নি?

॥ ৭ ॥ প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে লেখাটা বেড়ে যাচ্ছে, অতএব নিজেকে গুটিয়ে আনি। আপনি বিপদজাল গড়ে তুলে আপনি কেটে ফেলি। বক্তব্যের বাকীটা সাজাই প্রশ্ন আর উত্তরের ছকে।

প্রশ্ন (১): ওখানে পাল্টা হিংসা আর প্রতিশোধের পালা চলেছে, একথা কি ঠিক?

উত্তর: একেবারে গোড়ায়, এক দিন কি দুদিন। বিদেশী সাংবাদিকদের চটপট খবরের যা খোরাক যোগায়। তার পর থেকে সব সংযত। উত্তেজনার ঘটনা যা ঘটেছিল, তা পড়ে আমাদের রোমহর্ষ ঘটবে কেন, আমরা যারা অহরহ অপঘাতের পরিবেশে বাস করি? কারও ভাই নিহত, কারও মা-বোন ধর্ষিত বা অপহৃত, তবু ওরা সামগ্রিকভাবে যে ধৈর্য দেখাচ্ছে, তা কল্পনাতীত। পলাতক রাজাকারদের ধরে এনে শুধু জেলে জমা দিয়ে যাচ্ছে, বলুন তো ভাবা যায়? মুক্তি-সংগ্রাম আর জেগে ওঠা, ওরা যদি এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস রচনা করে থাকে, তবে সেই ইতিহাসেরই আর একটি অধ্যায় লেখা হচ্ছে এখন, এই সময়ে, উদারতায় আর ক্ষমায়। এও অবিশ্বাস্য।

শুধু এইটুকু না বলে পারছি না, ওখানকার জনমানসে আজ একটি 'কন্ট্রাস্ট' রেখা পরিদৃশ্য: যারা চলে এসেছিল এখন ফিরে যাচ্ছে, এবং যারা অহর্নিশ

আতঙ্কে পীড়িত হয়েও ওখানেই থেকে গেছে। এখন এক শ্রেণীর কেউ কেউ অপরভাগকে ভাবে "কোলাবরেটর"; আবার শরণার্থী বা পলাতকদের ক্লেশ মনোবেদনা কিংবা অসহায়তার খবর যারা রাখে না, তারা ক্ষুব্ধ অভিমানে ওদের বলে এসকেপিস্ট। এই ভুলবোঝাবুঝিটুকু স্বাভাবিক ও মানবিক। কিছুদিন জটিলতা আর তিক্ততার সৃষ্টি করবে। ক্রমে ক্রমে এই অবিশ্বাস ঘুচে যাবে, প্রাত্যহিক লেন-দেনে আর পরিচয়ে—পরস্পরের কাছে যখন নয় মাসের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হবে।

প্রশ্ন—(৩) : ওঁদের নেতৃত্বের এক ভাগ একদা কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না? তবু বলছেন, ওই রাষ্ট্র হবে সেকুলার?

উত্তর : বৃথা তর্ক, অনর্থক নীচু হয়ে ছিদ্রান্বেষণ। কে কবে কী ছিলেন সেই অতীতের জের টেনে এনে বর্তমানকে বিচার করতে বসা বাতুলতা। পূর্বাশ্রমের খোঁটা দিলে কোনও সন্ন্যাসীকেই যথার্থ বলে ধরা যাবে না, স্বয়ং সিদ্ধার্থও মিথ্যা বলে প্রতিভাত হবেন, কেন না তিনিও একদা ছিলেন গৃহী ও ভোগী। মানুষ ক্রমে ক্রমে বদলায়, মানুষের মোহমুক্তি ঘটে। মিঃ এম কে গান্ধী নামক ব্যক্তিটিও কি প্রথম যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সরকারের সহায়তা করতে উৎসুকী ছিলেন না? আঘাত পেলেন বলে, মোহভঙ্গ ঘটল বলেই তো তিনি মহাত্মাজী। সুভাষচন্দ্র আই সি এস চাকুরি ছেড়েছিলেন ঠিক। কিন্তু ছাড়ার মানে কি এ-ও নয় যে, পূর্বে কোনোকালে তিনি ওই বৃত্তিতেই প্রবৃত্ত হতে চেয়েছিলেন? অতীতে নয়, সত্যের অস্তিত্ব রূপান্তরে—বর্তমানে। বাংলাদেশের নব-নেতৃত্বের এই সত্য রূপান্তরকেই যেন নমস্কার করতে পারি।

প্রশ্ন—(৪) : ওখানকার ছাত্রসমাজ নেতাদেরও বশ মানছে না, বরং নেতাদেরই তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয়, এ-কথা কি ঠিক?

উত্তর : কথাটা অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত। তা ছাড়া দেখুন, সত্য হলেও ওখানকার ছাত্রদের এই অধিকার আছে। ওরা তা অর্জন করেছে। করেছে রক্তের মূল্যে। ওরা লড়েছে বুক পেতে দিয়ে। দুঃসাহসে, দুঃখের পণে। শুধু দেওয়ালে আলকাতরা লেপে অসতর্ক পথচারীকে পিছন থেকে ডাণ্ডা মেরে বৈপ্লবিক তারুণ্যের জাহির করেনি। অন্য, বিপথগামী গা-ঢাকা-দেওয়া কোনও নেতার কুসলানিতে অন্য কোনও রাষ্ট্রের "চাচা আমাদেরও চাচা" বলে ডাক পাড়েনি। সুতরাং তফাৎ আছে। প্রবল সবল অভিযানের সঙ্গে ছিঁচকে কাণ্ডকারখানার যে-তফাৎ সেই তফাৎ।

প্রশ্ন—(৫) : তা হলে বলতে চাইছেন, সেকুলার, ওরা সত্যি সেকুলার?

উত্তর : আজ ওদেশের বৃহত্তর অংশ সেকুলার তো বটেই। 'সেকুলার' মানে অবশ্য যদি হিন্দু-প্রাধান্য বোঝেন, তবে আমি নাচার। আপনিও ঠকবেন। গত পঁচিশ বছরে এদেশে মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে, গড়ে উঠেছে বিরাট এক মধ্যবিত্ত সুসংস্কৃত মুসলিম শ্রেণী। আজ তার বিপুল প্রভাব দেখা যাবেই, বেশভূষায়, আলাপে, ব্যবহারে—বিশেষ করে হিন্দুদের বিরাট একটি ভাগ যখন সরে এসেছে। না, আমি খালি দেশবিভাগের সদ্য সদ্য পরে দেশত্যাগী সংখ্যালঘুদের কথা বলছি না। ওই মাইগ্রেশনের কথা আমরা এখানে জোর গলায় বলে থাকি বটে, কিন্তু সেটাও প্রধানত রাজনৈতিক ঝাঁঝ আর ঝাল থেকে। আসলে অলক্ষ্য একটি স্রোত ওই বাংলা থেকে এই দিকে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বিশেষ করে কলকাতার যবে পত্তন হল তবে থেকে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের একটি ভাগ এদিকে আসতে শুরু করেছিলেন, বাস্তুত্যাগ করে—যেন কোনও মাধ্যাকর্ষের টানে, জীবিকা, শিক্ষা প্রভৃতির খোঁজে। পার্টিশন সেই প্রবাহকে আরও খরস্রোত করেছিল, এই মাত্র। যে-দেশ ছেড়ে এসেছি, সেদেশে আমার ভূমিকা থাকবে যথাপূর্বং এমন কথা ভাবাও ভুল। তবু যাঁরা রয়ে গেছেন, তাঁদের নিয়েই ওদেশে নতুন একটি জাতি জন্ম নেবে, তার আগমনী শুনে এসেছি। ভারত যেমন হিন্দুপ্রধান হয়েও সেকুলার, বাংলাদেশও তেমনই মুসলিম-প্রধান হয়েও সেকুলার। উভয়ের মধ্যে কোনও আত্মখণ্ডন বা সংঘাত নেই। আসল কথা, রাষ্ট্রীয় সংকল্প, আসল কথা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ। সেখানে দুই দেশই এক। আমি উৎসাহিত, আশান্বিত শুধু ওই কারণে। ধর্ম ওখানে আশা করা যায় অতঃপর হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, নিজস্ব বিশ্বাস আর আচরণের ব্যাপার। রাজনৈতিক স্বার্থে সামগ্রিকভাবে ধর্ম নিয়ে ওখানে আর কখনও মাতামাতি হবে না—এই সুস্থ লক্ষণটি দেখে ফিরে এসেছি। ধর্মকে সর্বস্ব করে ধ্বজায় উড়িয়েই একদিন পাকিস্তানের সৃষ্টি। আবার ধর্মের ঝাণ্ডাকে গোঁয়ার্তুমি করে উঁচু রাখতে গিয়েই পাকিস্তানের ধ্বংস। আমি অবশ্য ধর্ম বলতে ধর্মান্ধতা বোঝাতে চাইছি।

আপনাদের শেষ প্রশ্নটি অনুমান করে এবার শেষ উত্তরটি লিখে রাখি। আওয়ামী লীগ অতীতে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করেনি—ওঁদের প্রতি এই কটাক্ষের আজ আর অর্থ হয় না। ছয় দফার মধ্যে স্বাধীনতা ছিল না, ঠিক, কিন্তু স্বাধীনতার বীজ ছিল। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ কোনও দাবিপত্রই রচিত হয় না, দাবি তৈরি হয় আপন আবেগে, অমোঘ ঘটনাপ্রবাহে। এ-কাজ ইতিহাসই করে দেয় নিজের নিয়মে। আমাদের এই দেশেও করেছে। নইলে "হোমরুল" না 'স্বরাজ', 'স্বরাজ' না 'ডমিনিয়ন স্টেটাস', 'ডমিনিয়ন স্টেটাস' না 'পূর্ণ স্বাধীনতা'—এ নিয়ে আমরাই কি একদা কম কচকচি করেছি? জাতীয় মহাসভার পুরনো ফাইলগুলো বহু বিতর্কের সাক্ষী। তবু তো, শেষ পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন? বাংলাদেশও তাই—পূর্বের পরিকল্পনা না-ই বা ছিল, তাতে মহিমার হানি নেই।

আমি জানি, অন্য কোনও খুঁত খুঁজে না পেয়ে কেউ কেউ আচমকা একটা ওজর তুলবেন—"ভারত আর বাংলাদেশ, দুই-ই যদি সেকুলার, লক্ষ্যে এক, তবে মিলে যেতে বাধা কী? বলব, বাধা আছে, এবং প্রশ্নটাকে আর-একটি প্রশ্ন দিয়ে ফিরিয়ে দেব। বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, আর সোভিয়েট রাশিয়া ইত্যাদি পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রেরই তো আদর্শ এক। তবু তারা এক দেহে লীন নয় কেন? নয় এই কারণে যে, প্রত্যেকের মধ্যে আছে স্বতন্ত্র জাতিবোধ, যা রাষ্ট্রিক আদর্শের ঐক্যকে ছাপিয়ে আরও বড় সত্য। লক্ষ্যের ঐক্যের অর্থ নয় আত্মবিলুপ্তি। সুতরাং তা নিয়ে যেন বেশী মাথা না ঘামাই, সুন্দর একটি নতুন সম্পর্ককে খুঁচিয়ে না তুলি। বন্ধু বাংলা দেশের সঙ্গে এক তালে পদক্ষেপই আমাদের সাহস আর শক্তি দেবে বেশী। তা ছাড়া যৌথভাবে এই উপমহাদেশটি আবার সাকার হয়ে উঠল, এ-ও কি কম প্রাপ্তি? একদা অবশ্য এই উপমহাদেশের নামই ছিল ভারত। ভারত বলতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, কচ্ছ থেকে কোহিমা—ভাবমানসে এই প্রতিমাখানিই দেখা দিত। এই ভূভাগেই বিশেষ একটি রাষ্ট্রের নাম অতীতে ভারত তো কখনও ছিল না। অতীতে ছিল কাশী, কোশল, কাঞ্চী ইত্যাদি। পরেও, কী মৌর্য যুগে, কী বাদশাহী আমলে, এই সসাগরা সমগ্র "বর্ষ"টি কোনও দিন এক রাজ্যপাশে বাঁধা পড়েনি। ইংরাজ আমলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল "প্রিন্সলি ইন্ডিয়া।" এক রাষ্ট্র নয়, কিন্তু আগেই বলেছি, ধ্যানে ধারণায় একটি দেশ, একটি "কনসেপ্ট"—তার নাম ভারত। সেই মূর্তিটি খণ্ডিত হল যখন খণ্ডিত একটি ভাগের নাম হল 'ভারত'। এই নাম আমরাই তাকে দিয়েছি। বিশেষ একটি রাষ্ট্রের নাম যদি ভারত না হত, তবে ওঁরা—যাঁরা পূর্বে পাকিস্তানী থেকে আজ হয়েছেন বাঙালী—ভারতীয় হতেও নিশ্চয়ই হতেন সম্মত। সে শোচনা, সেই গবেষণা আজ এই শুভদিনে তোলা থাক। বিরাট এই উপমহাদেশ—হলই বা তা স্পষ্ট নামহীন—আবার তো ভাবলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সে-ই বড় মানি।

অবিন

ছত্রিশ

সকালে দাড়ি কামাবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে বসেছি হঠাৎ গলার সাড়া পেয়ে দেখি আমার ঘরের দরজায় আয়না দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে আয়নাকে দেখছি, ও শুধু হাসতে হাসতে বলল, "দেখলেন তো—।"

আমি বললাম, "সশরীরেই দেখছি। কিন্তু তুমি কেমন করে এলে?"

আয়না আমার ঘর দেখছিল। বলল, "আপনার হোটেল-বাড়ি দেখতে এলাম।"

"বেশ করেছ। কিন্তু—"

"দাদার সঙ্গে এসেছি। দাদা আমায় নামিয়ে দিয়ে কোথায় গেল খানিকটা পরে আসছে।"

দাড়ি কামাবার সরঞ্জামগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে আমি হেসে বললাম, "চমৎকার। বসো।"

"এই আপনার হোটেল-বাড়ি, অবিনদা?"

"কেন, পছন্দ হচ্ছে না?"

"মোটেও নয়। নীচে দোকান, দোতলায় একরাজ্য লোক, আর ওপরে আপনি। ঘরটার কী চেহারা!"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "এত আলো বাতাস, খোলামেলা, একা একটা ঘর নিয়ে রাজার মতন থাকি, এটা খারাপ হল!"

আয়না আমার বিছানায় গিয়ে বসল। খোলা জানলা দিয়ে রোদ আসছে। আকাশটাও চোখে পড়ে, খানিকটা নীলচে হয়ে আছে। আয়নার সাজগোজ একেবারেই ঘরোয়া, একরঙা শাড়ি, মাথায় এলোমেলো বিনুনি।

অনেকদিন ধরেই আয়নার শখ হয়েছিল আমার হোটেলবাড়ি দেখতে আসবে। আজ সুহাসের সঙ্গে চলে এসেছে।

"কোথায় গেল, সুহাস?"

"কী জানি! কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবে। আজ তো রবিবার।"

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন?"

"কাল বিকেল থেকেই আর জ্বর নেই।"

কলকাতার আবহাওয়া সহ্য না হবার জন্যেই হোক, কিংবা একটানা দুর্ভাবনা, হাসপাতালে আসযাওয়ার ধকলের জন্য হোক তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। হঠাৎ জ্বর মতন হয়েছিল। দিন দুই জ্বরের পর কাল জ্বর ছেড়ে গিয়েছে।

"তুমি তাহলে একটু চা-টা খাও," বলে আমি বাইরে কাউকে ডাকাডাকি করতে যাচ্ছি, আয়না বলল, দাদা আসুক না।

"দাদা এলে দাদার ব্যবস্থা হবে। তুমি বসো, আমি আসছি।"

দোতলায় গিয়ে চায়ের কথা বলে ফিরে এসে দেখি আয়না বিছানার ওপর আধখানা শরীর হেলিয়ে শুয়ে আছে। আমায় দেখে সোজা হয়ে বসল।

খানিকক্ষণ হাসিঠাট্টা মজার কথাবার্তার পর আয়না আসল কথায় এল। ওদের বাড়িতে আমার সঙ্গে আয়নার বেশি কথাবার্তা হয় না আজকাল, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সুহাসদের বাড়িতে রোজ যাওয়াও হয় না। মনে মনে আয়না তার দুশ্চিন্তা নিয়ে ছিল। কৌতূহলও ছিল।

চা এসেছিল, খাবারও এনেছে রতন।

আয়না বলল, "অবিনদা, আমরা তো ফিরে যাচ্ছি—।" বলে আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে থাকল। তার চোখ বলছিল, আমরা তো চলে যাচ্ছি—, তারপর?

চায়ে চুমুক দিয়ে আমি ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালাম। বাড়িতে আয়না আমার আড়ালে তেমন করে পায় না যাতে তার মনের কথা বলতে পারে। কখন কে এসে পড়বে, কী শুনে ফেলবে সেই ভয়টা তার আছে। তবু আমি তাকে গোপনে আশ্বস্ত করে রেখেছি। আজ সে আমার কাছে স্পষ্ট করে সব কথা শুনতে চায়।

আমি হেসে বললাম, "যাও না।...... আমরাও যাচ্ছি।"

"আপনিও যাবেন?"

"যাব না! বাঃ! প্যান্ডেল বাঁধতে হবে, মাথায় গামছা চড়িয়ে ভিয়েনে বসব, কলাপাতা কাটব......"

"যাঃ!" আয়না লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল। তার চোখ নীচু হয়ে থাকল।

আমি বললাম, "তবে পুজোর আগে কিছু হচ্ছে না। হিন্দুদের পাঁজি ব্যাপারটা যাচ্ছে তাই। কাছাকাছি কোথায় কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। সেই অগ্রহায়ণ-টগ্রহায়ণ।"

আয়নার মুখ যেন আরও নুয়ে গেল। অথচ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, ওর চোখেমুখে কেমন এক আবেগ এসেছে।

সামান্য চুপচাপ থেকে আয়না এবার একটু মুখ তুলে বলল, "আপনি দাদাকে বলেছেন?"

"তোমার দাদাকে না বললে হয়!"

"আপনি আমার নাম করে বললেন?"

"আমার যেমন করে বলার আমি বলেছি। তুমি আমার মক্কেল, তোমার উকিল কেমন করে মামলা লড়ছে তা শুনে তোমার দরকার কী!" বলে আমি লম্বা করে একমুখ ধোঁয়া টেনে আস্তে আস্তে গিলে ফেললাম। আয়নাকে দেখছিলাম হাসিমুখে। পরে বললাম, "তোমার দাদা হল লোয়ার কোর্ট, মানে ছোট আদালত। তার রায় খারিজ হয়ে যেতে পারে, তাই বড় আদালতে গিয়ে রায় নিয়ে নিলাম।"

"বড় আদালত?" আয়না আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

"জ্যাঠামশাই—।"

"জ্যাঠামশাই?" আয়না যেন, ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। তার চোখ কেমন দিশেহারা।

আমি বললাম, "জ্যাঠামশাইয়ের মত ছাড়া তো কিছু হত না, ভাই। তিনি তোমাদের মাথার ওপর রয়েছেন।"

শুকনো গলায় আয়না বলল, "ছি ছি, জ্যাঠামশাই কী ভাববেন!"

"তিনি কী ভাবলেন তা আমায় বললেন না। তবে ভাবলেন অনেক, তারপর মত দিলেন।"

আয়না আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, ভাবল আমি সবিস্তারে কিছু বলব। আমি কিছু বললাম না।

অপেক্ষা করে করে আয়না বলল, "অবিনদা?"

"বলো।"

"কিন্তু দিদি?"

"তোমার দিদির জন্যে ভাবতে হবে না। জ্যাঠামশাইয়ের যেখানে মত সেখানে দিদির না করার উপায় নেই। তোমার দিদি তা করবেনও না।"

"না, তবু দিদি—। দিদির অনেক অপছন্দ বাছবিচার আছে।"

"তোমার বেলায় থাকবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

"আমার কিন্তু ভয় করে।"

"কিসের ভয়! তুমি আমায় ঘটক ধরেছ। যা ঘটে আমি শুধু তারই ঘটক।"

আয়না আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আচমকা বলল, "দিদি আপনাকে কিন্তু বেশ ভয় করে", বলে হেসে ফেলল।

আমি হেসে বললাম, "আমি যে ভয়ংকর।"

আয়না আর কিছু বলল না, বসে বসে চা খেতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে আয়না হঠাৎ কেমন হেসে ফেলেই আবার চুপ করে গেল।

আমি বললাম, "হাসলে যে!"

আয়না লাজুক মুখ তুলে বলল, "একটা কথা মনে পড়ে গেল!"

"বলে ফেল!"

"বলব! বাঃ!"

"বলেই ফেল। কেউ তো শুনছে না।"

আয়না বলব কি বলব-না করে দ্বিধার মধ্যে থাকল একটু, তারপর বলল, "আমি যে তপুকে তুই বলি, অবিনদা—!"

আমি হাক ছেড়ে হেসে উঠলাম। আমার সেই অট্টহাসির মধ্যে আয়নাও কখন হেসে-মার্নুষের মতন গলা মিশিয়ে হাসতে লাগল।

হাসি থামলে আমি বললাম, "এবারে ফিরে গিয়ে খাতির করে আপনি বলো।"

আয়না মজার গলায় বলল, "বয়ে গেছে

[illegible]। [illegible] অবাক আপনি...।"

আরও খানিকটা সময় গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা করার পর সুহাস এল। এসে বলল, "অবিন, তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার।"

"বসো।"

"এখন আর বসব না। তুমি হাসপাতালে যাচ্ছ আজ?"

"যেতে পারি।"

"হাসপাতালেই এস। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি গিয়ে কথা হবে। জ্যাঠামশাই থাকবেন।"

"তা না হয় হবে। কিন্তু তুমি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছ যেন!"

"আমার তাড়া আছে। আয়নাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আরেক জায়গায় যাব। তারপর বাড়ি ফিরব। বেলা হয়ে যাচ্ছে।"

সুহাস আর বসল না; আয়নাকে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে আয়না আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

দুপুরে আজ গরম খানিকটা কম ছিল। কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুম ভাঙলে দেখি বিকেল হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চোখ মুখ ধুয়ে হাসপাতালে যাবার জন্যে তৈরী হলাম।

হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে পাঁচটা বেজে গেল। সুহাস ছিল। জ্যাঠামশাই কয়েকদিন আসতে পারছেন না। আজও আসেননি।

শচিপতিকে দেখলে ভালমন্দর তারতম্য বোঝা যায় না। কথাবার্তাও বলতে চান না আজকাল। আমরা কথা বলি, উনি শুধু তাকিয়ে থাকেন। কখনও কখনও মনে হয়, শচিপতি চোখের পাতা খুলেই যেন ঘুমিয়ে আছেন—এত নিঃসাড় থাকেন। বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। অস্বস্তি হয়।

এই কদিনের মধ্যে শচিপতিকে আজ একটু অস্থির মনে হল। শরীরের অস্বস্তির জন্যে হয়ত।

আজ খানিকটা আগে আগেই আমরা উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে সুহাস বলল, "অবিন, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আমার কদিন ধরেই কথা হচ্ছে। সেই যে সেদিন বলছিলাম—।"

"কী?"

"বাঁচবার যা অবস্থা তাতে সেকেন্ড অপারেশন খুব রিস্কি। ইনি বলছিলেন, ডাক্তাররা এইদিন অবজারভেশনে রাখার পরও কোনো ডিসিসান নিতে হয় পাচ্ছেন। আমি দুপুরে দত্তগুপ্তের কাছে গিয়েছিলাম। যেতে বলেছিলেন। উনি বলছেন, অপারেশনটা ইউজলেস। শচিদা স্ট্যান্ড করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি বা পারেও পোস্ট অপারেটিভ স্টেজে কী হয়, কিছুই বলা যায় না। অকারণ মানুষটাকে ছেঁড়াছিঁড়ি করে কি লাভ!"

আমি চুপ করে রাস্তা হাঁটছিলাম। শচিপতি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমার আশা ছিল, মানুষটি নিশ্চয় সুস্থ হতে পারবেন। অন্তত মোটামুটি। সে আশা আর আমার নেই। বরং যত দিন যাচ্ছে, হাসপাতালে পড়ে থাকতে থাকতে শচিপতি আরও অসুস্থই হয়ে পড়ছেন।

সুহাস একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে ডাকল। ট্যাক্সিতে উঠে সিগারেট ধরাল সুহাস; আমিও সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

"ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে দাঁড়াচ্ছে—" সুহাস বলল, বিষণ্ণ গলায়; "মোটামুটি কেন, মিনিমাম চান্সও যদি না থাকে তবে মানুষটাকে ফরনাথিং এই ট্রাবল দিয়ে কী লাভ। যে কদিন বাঁচে, আয়ুর জোর যতটুকু আছে, এমনিই বেঁচে থাক। কিছু করার যখন নেই—তখন। কী, কথা বলছ না যে!"

"কি বলব! আমিও তোমার মতন—"

"তবু, তুমিই শচিদাকে কলকাতায় টেনে এনেছিলে। আমি বারণ করেছিলাম।"

"তা হয়ত ঠিক। কিন্তু সুহাস, আমি তখন ভাবতাম, ভদ্রলোকের ব্যাধিটা কী আমরা তো জানি না। কী হয়েছে না জেনেশুনেই একটা মানুষকে মরতে দেওয়া উচিত নয়। এখন দেখছি, সবই অন্যরকম হয়ে গেল।"

"একেবারে অন্যরকম। কলকাতার আনটাই খারাপ হল। এখানে এসে পর্যন্ত মন ভেঙে গেল, এত পঞ্চাশ রকম ডাক্তারীতে নার্ভ গেল নষ্ট হয়ে, হাসপাতাল টাসপাতাল আরও ডিপ্রেস করে দিল। ওখানে থাকলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত এইভাবে ভেঙে পড়ত না। এনিওয়ে, ভালোর জন্যেই আনা হয়েছিল বুঝলাম, কিন্তু ভাল হল না। কপাল।"

"জ্যাঠামশাই কী বলছেন?"

"ওঁরও ওই মত। তুমি তো যাচ্ছ বাড়িতে, জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারবে।"

ট্যাক্সিটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সিগারেটের টুকরোটা জানলা

দিয়ে ফেলে দিলাম। "তুমি শচিবাবুকে কিছু বলেছ?"

"না, না। বলিনি। শুধু বলেছি, তোমার অপারেশনটা, বোধ হয় এখন হচ্ছে না।"

"ওখানে ফিরে গেলে তো বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে।"

"এর আর আলাদা চিকিৎসা কী! যেভাবে চলছে, চলবে। যে কদিন বেঁচে আছে শচিদা। তেমন কিছু হলে ডিমারির হাসপাতাল তো আছেই। মানুষটাকে মনের যতটুকু শান্তি দেওয়া যায় তাই দেওয়াই এখন ভাল।"

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করেছিল। মস্ত বড় একটা তেলের গাড়ি আমাদের সামনেটা আড়াল করে চলেছে, রাস্তায় খানিকটা জঞ্জাল বাতাসের দমকায় ঘূর্ণির মতন উড়ে গেল, অন্ধকার হয়ে আসছে, বাতি জ্বলে উঠেছিল রাস্তায়। সুহাস জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল।

আমারও এখন মনে হয়, শচিপতি তাঁর নিজের জায়গাতেই তবু ভাল ছিলেন। কিছুই যখন হল না তখন অকারণ আর কলকাতা কেন।

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে আটটা বাজল। আজ গরমটা কম, স্নানের পর আরাম লাগছিল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে কি না বোঝা যায় না, থেমে থেমে বাতাস দিচ্ছিল। আকাশে আশেপাশে কোথাও মেঘ নেই, একদিকে এক ফালি চাঁদ উঠে আসছে, অন্যদিকে তারা চিকচিক করছে। ছাদে সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে এসে বসলাম।

শচিপতিকে নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা হচ্ছিল না। জ্যাঠামশাই বোধ হয় ঠিকই বলেছেন, নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারলে শচিপতি মনের দিক থেকে একটা স্বস্তি পাবেন। সংসারের সকলকেই যেখানে হারাতে হয়েছে সেখানে হয়ত তাঁর কনো মায়া জড়িয়ে আছে। সেই মায়াই তাঁর পক্ষে এখন শান্তির।

ইজিচেয়ারে বসে বসে খানিকটা সময় কাটল, তারপর হাত পা ছাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। বাতিটাই বা অকারণে কেন জ্বলে? বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

নিজেকে নিয়ে ভাববার অভ্যেসটা আমি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। আজ আবার একবার ভাবতে হল।

নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসলে আমার মনে হয়, সুহাসেরা আমায় যতটা বিচিত্র করে দেখে আমি ততটা বিচিত্র নয়। জগৎটাকে ওরা যতরকমে সম্ভব জটিল করে দেখেছে, আমি দেখতে চেয়েছি সরল করে, ফলে লাভ হয়েছে এই—আমার সহজ কথাটা ওরা সহজ করে ভাবতে পারে না। ওদের অনেক দাসত্ব আছে, আমার নেই।

মোহিনী আমায় শেষ যে চিঠিটি দিয়েছেন, গতকাল সেটি আমার হাতে এসেছে। তিনি আমায় বারবার করে বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর মনের শান্তিটুকু আমি যে কেন নষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। মেয়েদের কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি, কোথায় তাদের মানমর্যাদা সম্মান—এ নিয়ে তাঁর পুরোনো কথাগুলো নতুন করে আবার আমায় মনে করিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন, মেয়েরা সর্বনাশী হতে চাইলে সংসার রসাতলে যায়, তিনি তো সংসার ভাঙতে আসেন নি।

তিনি যে সংসার বেঁধে রাখতেও আসেন নি, এটা তাঁকে বোঝানো গেল না। কে তাঁকে বলবে যে তাঁর জন্যে আয়নার এতকাল নিজের কিছু হল না। তিনি হয়ত এটাও বুঝতে পারেন না, সুহাস। তার দিদির সান্ত্বনার জন্যে নিজের সুখ বা ইচ্ছেটুকু নষ্ট করতে রাজী হয়েছে। মোহিনী যাকে বেঁধে রাখা বলেন সেটা হল বাধা। তিনি না চাইলেও ভাগ্যের দোষে আজ তিনি তাঁদের সংসারে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি ভেবে দেখেছি, মানুষ যখন মিথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন সত্যটা তার কাছে স্পর্ধার মতন মনে হয়। মোহিনী ভাবছেন, আমি যা বলতে চাই সেটা আমার স্পর্ধা।

মোহিনীকে আমি রূঢ় করেও এসব কথা লিখতে চাই না। সেটা অবিবেচনার বলমে বাধবে।

তবু, আমি তাঁকে বলতে পারি: আপনি যে-সংসারের কথা এত করে লিখেছেন একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। চোখ থাকলে দেখতে পাবেন, আপনি সত্যটাকে অস্বীকার করছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, মানুষের জীবনটা শুধু তার শৈশব নিয়ে নয়, নিতান্ত তার অপরিণতি নিয়েও নয়। সাধারণ কথাটা আবার আপনাকে বলি: গাছ যখন নিতান্তই চারা থাকে—তখন সামান্য মাটিতে পাশাপাশি অনেকের জায়গা হতে পারে। গাছের যেটা স্বাভাবিক বাড়—সেই বাড় যখন তার মধ্যে দেখা দেয় তখন তাকে মাটিনাড়া না করলে তার শেকড় ছড়াতে পারে না, মাথা ওঠে না খাড়া হয়ে, ডালপালা ঠিক মতন ছড়ায় না। সেটা গাছের বিকৃতি। মানুষের বেলায়ও এটা খাঁটি কথা। একটা বয়স পর্যন্ত সে একান্নবর্তী, তার নিজস্ব বলে কিছু নেই, পাঁচজনের ভিড়ে মিশে থাকতে তার বাধে না। তারপর তার নিজের বোধ, নিজের জীবন। এটা হল তার সত্তা, নিজের অস্তিত্ব। তার পরিণত ব্যক্তিত্বের সেটাই হল লক্ষণ। ছেলেবেলায় সুহাস যা ছিল, আয়না যেমন ছিল, আজও কী সেই রকমটি থাকবে? এটা কেউ আশা করে না। তাদের যে নিজের নিজের সুখ দুঃখ, ইচ্ছে অনিচ্ছে, ভালমন্দ লাগার জগৎ হয়েছে। তারা নিজের মতন আশা করতে পারে, নিজের মতন করে বেঁচে থাকতে চায়। আপনি যদি ভেবে দেখেন, দেখতে পাবেন, আপনার জগতের সঙ্গে ওদের জগতের মিলটা বেশী নয়। বরং বিরোধ। তবু আজ যখন তারা আপনার জন্যে মুখ বুজে থাকে তখন তাদের বাহবা, নিজেও ওদের দুঃখটা মিথ্যে হয়ে যায় না। আমি সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, তার নিজের ইচ্ছে যাই থাক আপনার জন্য সে চুপ করে থাকাই ভাল বলে মনে করেছে। সুহাসের পক্ষে এটা স্বার্থত্যাগ। আমি তাকে বলেছি, বেশ তো স্বীকার করছি তুমি এই ত্যাগটা করলে। কিন্তু এই ত্যাগের দুঃখ যে তোমার মনে কোথাও কাঁটা হয়ে ফুটছে না এটা তো ভাই সত্যি কথা নয়। চিরটাকাল তুমি ত্যাগের গৌরবে সুখী থাকতে পারবে তাও আমার মনে হয় না। তোমার দিদির ভবিষ্যতের নিঃসঙ্গ অবস্থাটির কথা ভেবে তুমি না হয় আজ স্বার্থত্যাগ করলে। কিন্তু যে মেয়েটিকে তুমি ভালবেসেছ তার উপায় কী? তাকে ভাসিয়ে দিয়ে তোমার কোন পৌরুষ বাঁচবে? তুমি দেখছ, তোমার ত্যাগটা গুণ। ত্যাগ যদি গুণ হয় মানুষের, তবে ভালবাসাটা কি গুণ নয়? একটাকে অত বেশী করে মূল্য ধরে দেওয়া কেন?

•

হঠাৎ দেখি মোহিনী আমার মনের পটে হাজির হয়েছেন। ক্ষুব্ধ; বিরক্ত। মোহিনী আমায় অভিযোগের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললেন, কে বলেছে সুহাসকে ত্যাগ করতে? আমি বলিনি। আমি বরং চেয়েছি—সুহাস বুলাকে বিয়ে-থা করুক; আমি খুশী হব।

আমি বললাম, সুহাস যে সেটা ভাবছে না। সে ভাবছে—সংসারে সবাই যদি নিজের সুখশান্তি খুঁজে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে আপনি কি করবেন?

আমার কি কিছুই করার নেই?

কী আছে! জ্যাঠামশাই আর দু-এক বছর, আয়না যাবে তার নিজের সংসারে। সুহাসও যদি ওখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে কলকাতায় তার সংসার গুছিয়ে বসে আপনি কী নিয়ে থাকবেন? তিন পুরুষের বাড়ি আগলে যক্ষের মতন—বসে থাকাটা আপনার কতকাল সহ্য হবে?

মোহিনী কথা বলছিলেন না। তাঁর চোখ বলছিল, তিনি যেন সেই দূরের দিনটি দেখতে পান না এমন নয়।

আমি বললাম, পুরুষদের কথা থাক, আপনার কথা বলুন।

উনি বললেন, আমার কোনো কথা নেই।

আমি বললাম, তাহলে আমার কথাটা আপনাকে বলি, শুনুন।

মাথা নেড়ে মোহিনী না না করছিলেন।

আমি হেসে বললাম, আপনার এই নিষেধটুকু আমি আগাগোড়াই অমান্য করেছি। আজও মান্য করলাম না।

মোহিনী বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার যা বলার আমি বলেছি। আর কেন?

আপনার কথা আমি শুনেছি। আমার আরও একটু বলার আছে।

মোহিনী আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি বললাম, মেয়ে পুরুষের যে তফাতটা জীবজগতে আগেই ঘটে গেছে তাকে আমি বিধাতার ষড়যন্ত্র বলে মনে করি না। ওটা নিতান্ত চুম্বকের আকর্ষণ নয়। কিন্তু আপনি যখন ভাবেন এই আকর্ষণটা সর্বনেশে তখন আমি বলি ওটাকে ছোট চোখে দেখলে সর্বনেশে, নয়ত তার সর্বনাশ কোথায়।

মোহিনী আপত্তি করে বললেন, মেয়েদের কাছে এর চেয়ে বেশী সর্বনাশ আর কি আছে!

আমি বললাম, ওটা আপনার ভয়। আপনার সর্বনাশ করব এমন কুবুদ্ধি নিয়ে আমি আসি নি। আমি আপনার দরজায় ঝোলানো আদিকালের তালাটাকে ভাঙতে চাই। এই তালাটা যে মরচে ধরা এ কি আপনার নজরে আসে না? যার সাহস নেই সে এই তালা দেখে থেমে থাকুক। আপনি কেন?

মোহিনী নীরবে আমায় লক্ষ করলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আমি নিতান্তই বোধহীন।

আপনাকে সত্যি করে একটা কথা বলি। আমি হলাম সোজা পথের মানুষ, বেঁকা রাস্তায় চলতে পারি না। আপনাকে নিয়ে আমার মনে দ্বিধা নেই। আপনি নিতান্ত মোহিনী হলে আমার মন আমায় বলে দিত ওটা জোয়ারের টান, জোয়ার কেটে গেলে ভাটা আসবে। কিন্তু দেবী, আমায় মুখ ফুটে আবার আপনাকে বলতে হচ্ছে, আপনি যে মনোমোহিনী, জোয়ার ভাটার বাইরেও আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাকে তুচ্ছ করতে পারি না।

মোহিনী আমার মুখের হাসি লক্ষ করতে করতে বললেন, কার কী আছে আমার জেনে কি লাভ? আমার কিছু নেই।

আমি বললাম, ওটা আপনার মনের কথা নয়। যার থাকে না সে নির্ভয় হয়। আপনার আছে বলেই এত ভয়।

মোহিনী যেন কী বলবেন বুঝতে না পেরে কাতর চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমি তো কিছু ভাঙতে চাই না। যেখানে আছি তার বাইরে যেতে চাই না।

আমি বললাম, ধরে থাকাটা নিয়ম নয়। অনেক বড় নিয়মে যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলে তাতে ভাঙন আছে তা কি আপনার চোখে পড়ে না? এই জগতটা যদি কোনো কালে সূর্যের কোল থেকে ছিটকে না আসত তার জন্মের ইতিহাস থাকত না। মেয়েরা যদি না ভাঙে তবে সৃষ্টি কোথায়?

মোহিনী বললেন, এ হল অনাসৃষ্টি। আমার ধ্যানধারণার বাইরে।

আমি বললাম, আপনার ধ্যান হল আত্মনিগ্রহের। ওটা ভীরুর ধ্যান। আপনি তো অতটা ভীরু নন।

মোহিনী বললেন, পুরুষের যা প্রেমের নেশা আমার অদেখা নয়। সে বড় নোংরা, কুৎসিত। তবু সে তার খুশীর নেশা করতে পারে, মেয়েদের ওটা করতে নেই।

পুরুষ মানুষের পক্ষে যে নেশাটা খারাপ আপনি শুধু সেইটেই দেখেছেন। তার অন্য নেশাও আছে।

মোহিনী হয়ত জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, সেই নেশাটা কী? তারপর যেন বুঝতে পারলেন, ওটা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি কোন নেশার কথা বলছি।

নীরবে মোহিনী দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর যেন আর সাহস হচ্ছিল না, মন্থর করে কিছু বল্লেন।

তারপর দেখি মোহিনী চলে গেছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মার্কিন আর্থিক সাহায্য বন্ধ—ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি কি ব্যাহত হবে ?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর তার কী প্রতিক্রিয়া হবে সে সম্পর্কে অনেকের মনেই নানা প্রশ্ন জেগেছে। ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী ডক্টর আই জি প্যাটেল বলেছেন, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালই আছে। বিগত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যতটা প্রতিকূল চাপ সৃষ্টি করবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল ততটা করেনি। ডক্টর প্যাটেল আশা প্রকাশ করেছেন, চলতি আর্থিক বছরে ঘাটতি অর্থসংস্থানের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকার (বাজেট অনুযায়ী) বেশি হলেও তার দ্বিগুণ হবে না; তা ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলেও আমাদের অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে না। এ বছর ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮০ মিলিয়ন ডলার পাবে বলে কথা ছিল; যদি এই সাহায্য না-ও পাওয়া যায় তবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Association) এবং কয়েকটি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র থেকে বর্ধিত সাহায্য পাবার আশা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য হারানোর ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হবে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। যদিও সাহায্য প্রদানের পূর্বচুক্তি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে সাহায্য প্রদান করা বন্ধ করেছে, তবুও এখন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের চুক্তি অনুযায়ী ভারত মার্কিনী ঋণ পরিশোধ করে যাচ্ছে। ভারত নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদানে বিরত না থাকার জন্য অনুরোধ করতে চায় না বলে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর জানিয়েছে।

ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে জিনিসগুলি আমদানি করে থাকে সেগুলি হল ফার্টিলাইজার, লৌহজাত নয় এরকম ধাতু, পেট্রোলিয়ামজাত জিনিস, যন্ত্রপাতি এবং নিউজপ্রিণ্ট। কান্দলা ফার্টিলাইজার প্রকল্প হচ্ছে ভারতে মার্কিনী সাহায্যপুষ্ট প্রধান প্রকল্প। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই আমদানি করা হয়ে গেছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিলেও প্রকল্পভিত্তিক সাহায্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন দেশ এখনও সাহায্য দেওয়া বন্ধ করেনি। জাপান নতুন সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রেখেছে। কিন্তু এজন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। গত কয়েক বছরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বেড়েছে। তার ফলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কিছু কমেছে। কর ব্যবস্থারও কিছু সংস্কার করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত কিছু লেভি ধার্য করা হয়েছে। আমদানী শুল্ক ও কর্পোরেশন কর থেকে সরকারের রাজস্বের পরিমাণও বেড়েছে। জাতীয় সঞ্চয় বাড়িয়ে আরও সম্পদ সংগ্রহের দিকে ভারত সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। বৈদেশিক লেনদেনেও ভারতের অবস্থা যে এখন অনেক উন্নত হয়েছে তার প্রমাণ হল, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার বৈদেশিক লেনদেনের (Balance of Payments) ক্ষেত্রে ভারতের বাৎসরিক ঘাটতি ছিল প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান বছরে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতির পরিমাণ হবে ৩০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ডলার (অথবা ৭৫০ কোটি টাকা)। চতুর্থ পরিকল্পনায় গত বছর বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৭১৮ মিলিয়ন ডলার; ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হয়েছে ১,১৭০ মিলিয়ন ডলার। তা ছাড়া ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Monetary Fund) ৪৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২২০ মিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে এবং তার মধ্যে আগেকার ১০৬ মিলিয়ন ডলার মার্কিনী ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী দুই বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতি বছর ১২০ মিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। পাবলিক ল-৪৮০ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণও ৫০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১২৫ থেকে ১৩০ মিলিয়ন ডলারে কমে এসেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পি-এল—৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার পর্যায়ে এসে গেছে; এখন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করার দরকার নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক (Export Import Bank) থেকে ভারত প্রতি বছর ৩০ মিলিয়ন থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলার ধার করে থাকে বটে; তবে মার্কিনী সরকারের নির্দেশে যদি এই ধারও বন্ধ হয়ে যায় তা হলেও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এবং এটাই প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ভারতকে সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেওয়ার কারণ। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হওয়ায় উভয় দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান হবে। ইতিমধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মত শক্তি ও সাহস ভারত অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ঠিকই বলেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধে জয়লাভ করার পিছনে রয়ে গেছে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা অর্জনের অক্লান্ত প্রয়াস এবং এখন থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ভারতকে যুদ্ধ করতে হবে; সেই যুদ্ধ হবে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সব উন্নতিকামী দেশকেই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। আধুনিককালে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশ যৌথভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখনই অর্থনৈতিক সাহায্যের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা যায় তখনই যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রুদ্ধ না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা গোড়া থেকেই করা দরকার। সেজন্য যে কোন উন্নতিকামী দেশেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো; এজন্য প্রয়োজন রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে আমদানির বিকল্প জিনিস তৈরী করা। রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যে কোন উন্নতিকামী দেশের অন্যতম অর্থনৈতিক নীতি হওয়া উচিত। রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িয়ে এবং চিরাচরিত জিনিসের বাইরে নতুন ধরনের রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়িয়ে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো, ব্যয় এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমানো যায় তা-ই নয়;—এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করা যায়, জাতীয় আয় বাড়ানো যায় এবং উন্নতি ও স্থিতিশীলতার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। ভারতকে আজ তা-ই করতে হবে।

সুব্রত গুপ্ত

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি। মনে হচ্ছে বাড়িটা অপ্রসন্ন?

পদ্মাপারের নীলকুঠি

অরুণ বাগচী

কুঠিবাড়ি বলি আমরা—আপনি, আমি—পুঁথি পড়ে যারা জানি শিলাইদহের ওই লালবাড়িটা আদিতে ছিল একটা নীলকুঠি। নীলকর সাহেবরা পাততাড়ি গোটালে কার-ঠাকুর প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ওটা কিনে নেন সেই ১৮৩৩ সালে।

আশপাশের সব 'গ্রামের লোকেরা বলে: ঠাকুরবাবুর বাড়ি যাবেন? ওই সোজা চলে যান।' একথা বলবেও অবশ্য আপনাকে, আমাকে, যাদের দেখে মনে হবে না পাকিস্তানী অনুরাগী। গত ন' মাসে অপরিচিত কেউ তাদের কাছ থেকে পথনির্দেশ আদায় করতে পারত না। কুঠিবাড়ির দিকে আঙুল তুলে পাকিস্তানী সৈন্যরা জিজ্ঞেস করেছে, ওটা হিন্দুদের সম্পত্তি? ওরা সজোরে মাথা নেড়ে বলেছে না—না, পাকিস্তান গবর্মেন্টের সম্পত্তি। কথাটা মিথ্যেও নয়। সরকারী সম্পত্তিই বটে শিলাইদহের কুঠি—পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে রক্ষিত কীর্তি। রীতিমত নোটিশ টাঙানো আছে বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায়। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথ যে অতিশয় ডেন্‌জারাস ব্যক্তি, এই জ্ঞান উঁচু কো পাক সৈন্যদের মধ্যেও কিছু কিছু প্রবেশ করেছিল বইকি। আর ঠাকুরবাবু, যে খুব দয়ালু ধর্মপ্রাণ জমিদার ছিলেন, গ্রামীণ মানুষেরা সেকথা মনে রেখেছেন, সম্ভবত পিতা-পিতামহের মুখে পুরোনো দিনের গল্প শুনে।

যশোহর থেকে পাক খেতে খেতে দুপুরের পর কুষ্টিয়া জিলা পর্ষদের অতিথিশালায় পৌঁছলাম, আমাদের বাঁধা ফোটোগ্রাফার বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত এবং আমি। যাকেই বলি শিলাইদহ কুঠিবাড়ি যাব, তিনিই মাথা নাড়েন। যেতে চান সেতো উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু যাবেন কীভাবে?

কেন, রাস্তা কি বিপজ্জনক? এখনও কি লুকিয়ে রয়েছে বাঁশবনের আড়ালে খান সেনা অথবা ঘৃণ্য রাজাকার? নাকি ছড়িয়ে আছে জ্যান্ত মাইন এবং ফেটে পড়তে উৎসুক মেইড-ইন-চায়না মেইড-ইন-ইউ এস বোমা, যেমনটা দেখে এসেছি হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে, পদ্মার চরে?

না না। হেসে ফেললেন ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী। নিতান্ত অল্প বয়স, সন্দেহ হয় আচমকা সার্চ করলে প্যান্টের পকেট থেকে মার্বেল গুলি, [illegible] লাটু, বেরিয়ে পড়বে। হেসে বললেন, প্রবলেম হল যে রাস্তাই নেই। এমনিতেও যে রাস্তা ছিল তাতে গরুগাড়ি, ঘোড়াগাড়ি, জিপ মোটামুটি চলত। ১৯৬১ সালে শতবার্ষিকীর সময় ঢাকা থেকে সব শিল্পীরা এসেছিলেন। সবাই শিলাইদা গিয়েছিলেন গরুগাড়ি চেপে। এবারের কলান্তক বন্যায় সেই রাস্তাও গেছে। নৌকা করে বেশ খানিকটা ঘুরে যেতে পারেন। অনেক টাইম লাগবে। সাইকেলে—

আর পদব্রজে? ইসলাম সাহেব গম্ভীর হলেন। হেঁটে এতখানি রাস্তা? বড্ড কষ্ট হবে।

বেশী দূর অবশ্য নয়। স্কেল ফেলে মেপে দেখুন ম্যাপের ওপর। মাত্র ছয় সাত

"অনেক রাত্রে জেগে উঠে জ্যোৎস্নায় বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে"—মৃণালিনী দেবীকে লিখিত কবির চিঠি

হয় মাইল। শহর থেকে গড়াই নদী পেরিয়ে ওপারে শানিয়াগ্রাম। তারপর কালুয়া, কোমরকান্দি, ছোট বড় কয়েকটি ছবির মত গ্রাম পেরিয়ে চলে যান শিলাইদহ।

সাত সকালে উঠে গড়াই নদীর ঘাটে গিয়ে বসে আছি! টাটকা এবং নির্ভেজাল খেজুর রসের সঙ্গে আপ্তাসেদ্ধ দিয়ে প্রাতঃরাশ সারতে হয়েছে। সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সঙ্গী বেশ কিছু উদ্বিগ্ন, আমাদের নৌকারও দর্শন মিলছে না, এমন সময় ওপার থেকে খেয়া এসে এপারে যাত্রী খালাস করে দিল। শীতকালের নদী, চর থেকে অনেক দূরে থেমে গেছে নৌকা। এক বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে ব্যালান্সের খেলা দেখাতে দেখাতে যাত্রীরা আসছেন। সবুজ লুঙ্গী পরনে বৃদ্ধ, বোচকা মাথায় ব্যাপারী, স্টেনগান হাতে মুক্তি বাহিনীর ছেলে। যশোর সেনাবাসে মাস্টারী করতেন, এখন বেকার মোক্তাদী। জল ভেঙে বাঁক কাঁধে এল দইঅলা। শুনলাম পদ্মা আর গড়াই, দু দুটো নদী পেরিয়ে পাবনা থেকে আসছে সে। ছোট ছোট পাতিলে জমজমাট দই নিয়ে। পাঁচ সিকি মূল্যের পাতিল। ভাল কথা, পাবনার দই চেখেছি সেই ছোট-বেলা, মামাবাড়ির দাওয়ায় বসে। দেখা যাক টেস্ট করে। পাশে মাথা কাত করে দাড়ি চুলকে মিঞা ইরফান মিঞা। তারপর মৃদু হেসে জানালে, এ দই সে দই নয়। সে নিজে পাবনার লোক।-তবে গরুগুলো সব কুষ্ঠিয়া জিলার। পদ্মার চরায় ঘোষেদের খাটির গরু সব। সেই দুধ কিনে সে দই পেতেছে।

গড়াই নদীর বুক থেকে কুষ্ঠিয়া শহরের প্যানোরামা দেখছি। সব দৃশ্য ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে মোহিনী মিলের চিমনী। দেখাতে পাচ্ছিনে,- অনুভব করতে পারছি, ওই বন্ধ মিল পেরিয়ে একটু এগিয়েই রয়েছে লালন ফকিরের মাজার। গুজব রটেছিল পাক. সেনারা ধ্বংস করেছে ওই পবিত্র মন্দির। কিন্তু না, সৌভাগ্যক্রমে লালন শা-র মাজার অটুট। তার বিরাট চত্বরে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ঘাঁটি করেছে। চারদিক থেকে উদ্ধার করে আনছে লুটের মাল, গৃহস্থকে ভয় দেখিয়ে যা তার অনুপস্থিতির সুযোগে গুণ্ডারা যা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, ছোট জলচৌকি থেকে রেডিও পর্যন্ত সবই সেই মালের পাহাড়ে, আসল মালিকদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়।

মাঝি ধারাবিবরণী দিচ্ছিল। ডাইনে ওই বাড়িটা হল ডিসি সাহেবের পুরানো বাংলো। ওর কাছে নদীর ধারে ছিল কসাইখানা, বন্দীদের ধরে এনে রাজাকাররা জবাই করত। কুকুর, শকুনী আর দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরে থাকত।

মাঝি আরও বলছিল, এই গড়াই নদী কুষ্ঠিয়াকে বার বার বাঁচিয়েছে। গোলমালের আশংকা দেখা দিলেই শহরের অর্দ্ধেক লোক নদী পেরিয়ে গা ঢাকা দিত। পাকসেনারা জলভীতু ছিল। নদীর ধার পর্যন্ত এসে মাটিতে কাঁধ মারত। চট করে জলে পা দিত না। আবার উল্টো-দিকের গ্রামে হামলা দেবার আগে তাদের নদী পেরুবার বিরাট তোড়জোড় দেখে মানুষ সাবধান হয়ে যেত। মেয়েরা শরীর বাঁচিয়ে পালাত বনেবাদাড়ে। জোয়ানরা উবে যেত। মার খাবার জন্য পড়ে থাকত হুঁকো হাতে বুড়োরা। অবশ্য কপালের জোর সর্বদা থাকত না। রাত্রের অন্ধকারে আচমকা হানা দিত ডাকাতরা। তখন যা সর্বনাশ ঘটবার, পুরোপুরিই ঘটত।

নদীর উপর এমন চমৎকার রোদ্দুরমাখা শীতের নরম সকাল। চলেছি রবিতীর্থে। সব মন-খারাপ করা কথা এড়াতে চাইলেই কি পারা যায়? পুরো নটি মাস এইসব মানুষ যে বিভীষিকা নিয়ে ঘর করেছে, আমরা তার কতটুকু জানি? দুঃখদিনের স্মৃতি ফাটা রেকর্ডের মত, চোখ বুজে থাকলেই কি কোকিল-তান শোনা যায়? কোমরকান্দির গ্রামপ্রধান বলছিলেন, তাঁর একমাত্র ছেলেকে কুপিয়ে কেটেছে পাক-সেনা। তাতে যে কম বেদনা। কিন্তু গাঁয়ের সব ক'জন মেয়ের যে বার বার বেইজ্জতী হয়েছে, যা তিনি রুখতে পারেননি, সেই যন্ত্রণা তাঁর শান্তিহরণ করে অহরহ। নিজেরই অভিজ্ঞতা, ফুলের-মত-মুখ মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিতে হয়, মেরুদণ্ড হিমবাহের দাঁড়া হয়ে যায় যে!

এপারে পা দিয়েই মালুম হল কেন সবাই অত নিরুৎসাহ করছিলেন। রাস্তা একটা ছিল, বোঝা যায়। একটা পাগলা জন্তু যেন তাকে কামড়ে কামড়ে শেষ করে দিয়েছে। বিন্দুর সাইকেলের সীটটা

আবার জনুপের-র আঁকা ঘোড়ার মত থেকে থেকেই শনুন্যে মনুখ তোলে। আধমাইল যাবার আগেই বেচারার অবস্থা করনুণ হয়ে এল। স্থানীয় সাংবাদিক বন্ধনু কৌসের জাপানী হনন্ডা মোটরবাইক বীরত্ব আদায় করার ভংগীতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, জাক্ তাতি উপস্থিত থাকলে তাঁর কামেরায় আমাদের যাত্রাপথের এক পরম হাস্যকর ডকুমেন্টারী তুলে রাখতে পারতেন।

(একদা) বাঁধিক্‌নু কালনুয়া গ্রাম ছাড়াতেই পদ্মা চলে এল কাছে, সঙ্গে সঙ্গে চলল সেই শিলাইদহ অবধি। মনে পড়ছে কবির বর্ণনা—"অপর পারে চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না। গ্রাম নেই, লোক নেই, তরনু নেই তৃণ নেই এবং "পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সনুন্দরী, কত প্রশস্ত প্রাণে এবং গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না।"

ঘনুরে ঘনুরে, হোঁচট খেতে খেতে অবশেষে বাঁক নিয়ে কুঠিবাড়ির বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। অনেক, অনেক দিন বাদে দনুজন ভারতীয়। রোদ্দনুরে পোহানো লাল তেতালা বাড়িটা, নিশ্চল ছবির মত, মনে হচ্ছিল শান্ত ছবিই যেন, বইয়ের পাতায় ধরা। ঠিক যেমনটি দেখেছি ছবিতে, তেমনই। বয়েস বাড়েনি একরত্তি। দোতলার কাঠের বারান্দায় শনুধনু দীর্ঘদেহ গনুহস্বামীর এসে দাঁড়ানোর অপেক্ষা। মৃণালিনী দেবী নিশ্চয় রান্না-ঘরের দিকে। লরেন্স সাহেব একতলার ছোট ঘরে অক্ষয় মৈত্রের ফেলে যাওয়া রেশমী গনুটিপোকা নিয়ে তন্ময়। ছেলে-মেয়েদের পড়া ধরছেন জগদানন্দ আঙনুলে চুল জড়াতে জড়াতে। বালক রথীন্দ্রনাথের ডান হাতে জারমান কলম, বাঁ হাতে পকেটে 'বিলিতী সনুপারী'-র চারা ধরে রেখেছে। বেলা—

তেতালায় ছাদের কোণায় অনেকগনুলি তরনুণ মনুখ দেখা দিল। একজনের হাতে হালকা স্টেন গান। মনুক্তিবাহিনীর ছেলে অবশ্যই। ছাদের উপর থেকে পৎপৎ করে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। কদিন আগেও ওখানে নিশ্চয় পাকিস্তানী নিশান ছিল।

চত্বরে ঢনুকলাম। বাড়ির সীমানা বেড় দিয়ে ঢেউ খেলানো কোমরলমান প্রাচীর। চতুর্দিকে গাছগাছালি। মেহগনী গাছ-গনুলো আগেই কাটা পড়েছে। স্মৃতিতে দাগ পড়ল হয়তো। কিন্তু ভয়ঙ্কর সব গনুজবকে মিথ্যা প্রমাণিত করে রবীন্দ্রস্পর্শ-বিজড়িত এই বাড়িটা অক্ষতদেহ দাঁড়িয়ে আছে, এই আনন্দ সব কিছনুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

দরজার মনুখে দেখা দিলেন সাড়ে চারফনুট লম্বা মহম্মদ গোলাম মনুস্তাফা। কুঠি-বাড়ি স্টাফের সাতজন কর্মীর একজন।
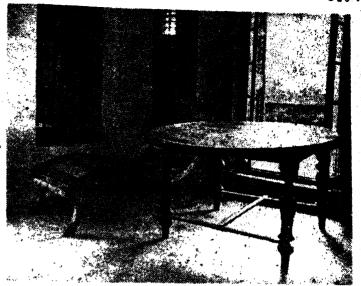
রবীন্দ্রনাথের আরাম-কেদারা আর টেবিল। তেতালার কুঠনুরীঘরে আজও রয়ে গেছে। বাড়ির এই ঘরটিই তাঁর বেশী পছন্দ ছিল

লাইব্রেরী অ্যাসিস্টাণ্ট। সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। কলকাতা থেকে এসেছি কুঠিবাড়ি, দেখতে, স্টাফের বড়রা কেউ নেই, ত্রনুটি হলে অপরাধ যেন না নিই, ইত্যাদি।

বড় হলঘরে ঢনুকতেই মনুক্তিবাহিনীর ছেলেরা, নেমে এসেছে উপর থেকে। নানান আলোচনা, প্রশ্ন, উত্তর। তাজা তরনুণ মন, উৎসাহে উদ্দীপনায় ঝলমল করছে। মনুজিব কবে ছাড়া পাবেন, শান্তিনিকেতন দেখতে কেমন। ইত্যাদি।

তারা চলে যেতেই কুঠিবাড়ি আবার স্তব্ধ। বাইরে থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে। হলঘরের দেয়ালে ছবির পর ছবি। পনুরোনো ছবি নয় অবশ্য। রবীন্দ্র রচনাবলী এবং অন্যান্য বই থেকে কপি করে নেওয়া ফোটো। একই ছবির একাধিক কপিও রয়েছে। প্রায় সব ছবিতেই রবীন্দ্রনাথ। ঘরে ঢনুকে প্রথমেই অবশ্য নজরে আসে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর সনুপরিচিত ছবি। বিষণ্ণ দনুই চোখ। পাকিস্তানী হানাদাররা ঘরে ঢনুকে ছবি
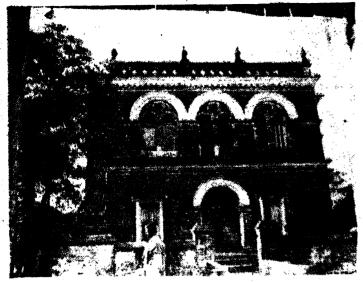
কুষ্টিয়ার এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসে উঠতেন। ফটকে লেখা—Tagore & Co— আলকাতরা বুলিয়েছে ভাষা আন্দোলনের উৎসাহী ছেলেরা, ইংরাজি লেখা তারা চায় না

দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছিল—কে এই জেনানা? গোলাম মুস্তাফার এক সহকর্মী ত্বরিত জবাব দিয়েছিলেন, উনি ছিলেন এই বাড়ির বেগম সাহেবা। বহুদিন আগে মারা গেছেন। আশ্চর্য, সেনারা একবারও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করেনি। করবে, এই ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল বাঙালী কর্মচারীরা সবাই।

২৫ মার্চের পর থেকে নয় মাসে পাকিস্তানী সৈনরা কুঠিবাড়িতে হানা দিয়েছিল তিন চারবার। তারা এসেছিল মুক্তিবাহিনীর সন্ধানে। তাদের চরের মুখে খবর পেয়ে। এই অঞ্চলে আটজন রাজাকার ছিল, কেউই ঠিক শিলাইদহের পুরোনো লোক নয়। তাদের দাপটে সবাই তটস্থ থাকত। মুক্তিযোদ্ধাদের খবর পাবার জন্য তারা অত্যাচারও করেছে। কখনও কিছু আদায় করতে পারেনি। কয়েকজন মুক্তিসেনা অবশ্য ধরা পড়ে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা সেজন্য দায়ী নয়। কুঠিবাড়ি এই অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। পাকিস্তানীরা সন্দেহ করেছিল যে মুক্তি-বাহিনী এটা ব্যবহার করে অবজারভেশন পোস্ট হিসাবে। অনুমান অভ্রান্ত। কিন্তু তিনবার হানা দিয়েও কাউকে ধরতে পারেনি পাকিস্তানীরা।

তবু কুঠিবাড়ি আটুট থাকাটা একটা মিরাকল। সৈন্যরা যখনই কোথাও হানা দিত, গেরিলাদের কাউকে পাক বা না পাক, সেই জায়গাটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। কুঠিবাড়ির বেলা অন্যথা হল কেন, এর অর্থ বোঝা ভার।

শেষ হানাটা দিয়েছিল তারা ৯ই ডিসেম্বর তারিখে, ভোররাতে। হলঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিলেন স্টাফের লোকেরা। দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা আর গালাগালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভয়ে সবার প্রাণ উড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে দিলেন কেউ। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সৈন্যরা। দুদ্দাড় করে একদল উঠে গেল দোতলায় তেতলায় সার্চ করতে। কিলচড়ের সঙ্গে প্রশ্নবর্ষণ হচ্ছে কর্মচারীদের উপর। কোথায়, কোন কোণায় মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে আছে, তুরন্ত বাৎলাও—শালা দেহি তো।

হাতজোড় করে জবাব দিল এরা—এখানে মুক্তিবাহিনী এখনো নেই, এখানে কখনও থাকে না। আর রাজাকার চর একটা গর্জন করছে—আলবৎ থাকে, তার কাছে খবর আছে ঠিকঠাক, ইবলিশের বাচ্চাগুলো নির্ঘাৎ ঘাপটি মেরে আছে কোথাও।

আর তন্ন তন্ন করে তল্লাশ চলেছে। হলঘরের ডান পাশের ছোট্ট কামরায় সাজানো রয়েছে আলমারী, ঠাকুর পরিবারের পোশাক থাকত—কতবার নিজে হাতে রেখেছেন কবিপত্নী, অথবা পরবর্তীকালে রথীন্দ্রনাথ আর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী।—বুটের লাথি মেরে তার পাল্লা খুলে দেখা হল, কেউ লুকোচুরি খেলছে কিনা। একটা ঘরে কবির ব্যবহার্য সব জিনিসের সমাবেশ। কাঠের বাক্স। সেকালের পালকি, যা ঠাকুর পরিবারকে কুষ্টিয়া থেকে বা পদ্মাপার থেকে নিয়ে আসত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও আসতেন পালকিতে। ছোট্ট একটা চার-বেহারার পালকি। বার্ন অ্যান্ড কোং, রাণীগঞ্জ-মার্কা পরিস্রুত জলের ফিলটার। মার্কিনী চাউডেন কোম্পানীর (১৮৭৭) দামী বজরা। সেটার ঠিক মাঝখানে সেই বেঞ্চি যাতে হেলান দিয়ে পদ্মার বুকে কেটেছে জ্যোৎস্না রাতের জমিদারীর কাজে। এই সবের দিকে বন্দুকের নল দেখিয়ে পাকিস্তানীরা জানতে চেয়েছে, এগুলো কী? কর্মীরা বলেছে, সব পুরোনো ভাঙাচোরা জিনিস। ফেলে দেওয়া হবে আজও!

জোর খোঁজাখুঁজি চালিয়ে কাউকে যখন ধরা গেল না, তখন সৈন্যদের নজর আবার পড়ল কর্মচারীদের উপর। মেজর সাহেব হুকুম দিলেন লাইন হো যাও। লাইব্রেরীর সামনে দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল সাতজন নিরীহ বাঙালীকে—লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্ট, কেয়ারটেকার, বাগানের মালী, ঝাড়ুদার, কুঠিবাড়ির কর্মী সব। তাদের পেছনে বন্দুক হাতে দাঁড়াল একজন সৈন্য। রাজাকার মহাপ্রভু বলল, আর কি, হয়ে গেল তোমাদের, আল্লার নাম নাও বেইমানরা সব।

ঠিক এমনি সময় লোকটিকে বাঁচালো সিনেমার যেমনটা ঘটে, দূর থেকে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল হঠাৎ। ডাকাত লাগল গ্রামের কুকুরগুলো। একজন দৌড়ে এসে পাক মেজরকে খবর দিল, মুক্তি-

বাহিনী ধরা পড়েছে গ্রামের ভিতর। দিশপতীর আদেশে।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেজর তাঁর গ্রুপকে আদেশ করলেন গ্রামের দিকে রওনা দিতে। যাবার আগে শাসিয়ে গেলেন, ফিরে এসে দেখাচ্ছি তোদের।

মেজর চলে গেলেন। পাহারা কুঠিবাড়ি ঘিরে সৈন্যরা ছিল, চলে গেল। কুঠিবাড়ির অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা সাতটি প্রাণী। তারা অসাড় হয়ে গিয়েছিল, নইলে নিশ্চয় পালাত। হত্যাকারীদের ফেরার অপেক্ষায় অসহায় পুতুল হয়ে থাকত না। সিকি মাইল দূরের গ্রাম থেকে ঘন ঘন গর্জনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। বাড়িপোড়া আগুনে আকাশ লাল হয়ে উঠল।

এক সময় কান্নার আওয়াজও থেমে গেল। সব চুপচাপ। ভোর হল নিঃশব্দে। বইয়ের ছেঁড়াপাতা উড়ছিল আঙিনা জুড়ে।

এক ঝাঁক চড়ুইপাখি নেমে পড়ল বাগানে। তখন হঠাৎই, সবার সাড় ফিরে এল।

ঘুরে ঘুরে বারো-কামরার বাড়িটা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। স্মৃতি, স্মৃতি, স্মৃতির নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। জমিদারীর কাজ দেখবার জন্য এই বাড়িতে বাস করতেন দেবেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে সৌদামিনীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এই বাড়িতেই তিনি মারা যান। কবে? রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা বিশেষ দিন সেটা—৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩—ওইদিন তাঁর বিয়ে হয়েছিল মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। বাংলার সব দিকপালরা এসে উঠেছেন বিভিন্ন সময়ে। আচার্য জগদীশচন্দ্র লোকেন পালিত (যশোরের জেলা জজ তিনি তখন), নাটোরের মহারাজা, প্রমথ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সস্ত্রীক, মোহিত সেন, ঠাকুর পরিবারের বড় বড় লোকরা, আরো কতজন! শান্তিনিকেতনে বসন্ত রোগ দেখা দিলে গোটা ব্রহ্মচর্যাশ্রম উঠে এসেছিল শিলাইদহে পাঁচ মাসের জন্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এসেছিলেন তরুণ নন্দলাল, সুরেন কর, আর মুকুল দে-কে। তিনি নিজেও এইখানে ছবি আঁকা শুরু করেন ১৯০০ সালে।

রবীন্দ্রনাথের আপন পরিবার এখানে দীর্ঘকাল বাস করে গেছেন। জোড়াসাঁকোর আবহাওয়ায় ছেলেপিলেরা মানুষ হবে না এই আশংকায় কবি তাদের শিলাইদহে রাখতে চেয়েছিলেন। মৃণালিনী দেবীর কিন্তু শিলাইদহের নির্জন নিঃসঙ্গ (কবি একটানা কদিনই বা থাকতে পেরেছেন?) জীবন ভাল লাগেনি। চিঠিপত্রে স্বামীকেও তা জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন : "অনেক রাত্রে জেগে উঠে

ষোল বেহারার পালকি। কুষ্টিয়া টু কুঠিবাড়ি বহুবার যাতায়াত করেছে

জ্যোৎস্নায় বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে—আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।" লিখেছিলেন, "তোমার সন্দেহজনক মনের ভাবে আমার কি কোনো অধিকার নেই। আমি কি কেবল নিজের খেয়ালের?" ১৩০৮ সালে শিলাইদা বাস উঠে গেল ঠাকুর পরিবারের।"

এই বাড়িতে বসেই রবীন্দ্রনাথ খবর পান আমেরিকার পাঠ সাঙ্গ করে রথীন্দ্রনাথ ইয়োরোপ এসেছেন। তাঁকে টাকা পাঠিয়ে চিঠি দিয়েছেন দ্রুত দেশে চলে আসবার জন্য। ঠিক হল সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথ এবং মীরা দেবী ও নগেন গঙ্গুলী কুঠিবাড়িতে বাস করবেন। বহু টাকা খরচ করে বাড়ি মেরামত করালেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলে-মেয়ের সংসার পেতে দিলেন। অপ্রসন্ন বাড়িটা আবার আনন্দনিকেতন হয়ে উঠবে, এই আশা তাঁর। রথীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্র-নাথ দুজনে কবির পল্লী উন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন প্রভৃতি প্রিয় বিষয় নিয়ে আপন আপন জ্ঞানের আলোকে অনেক কাজ করেছেন হাতে কলমে। মার্কিনী গম, মাদ্রাজী সরু ধান—বাংলার মাটিতে এগুলির ফলন নিয়ে গবেষণা করেছেন, শিলাইদহে। সয়েল টেস্টিং-এর জন্য খোলা হয়েছিল ল্যাবরেটরী।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দুর্বলতা ছিল শিলাইদহ সম্পর্কে। কাশ্মীর দেখেও তাঁর মন ভরেনি। লিখছেন—"আসলে আমার পদ্মার বালির চরে বোটের কাছে কেউ লাগে না।...কেবল ওখানে বিষয়কর্মের যে গন্ধ আছে সেইটেতে আমাকে তাড়া দেয়—নইলে সেই জলের ধারে চুপচাপ করে পড়ে থাকতুম" (১৩২২)।

পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনীও আছে। কত অজস্রধারে লিখেছেন তিনি শিলাইদহে বসে। সোনার তরীখানি অংশ। প্রজাপতির নির্বন্ধ। অসংখ্য আশ্রম (চিত্রাঙ্গদা)। অচলায়তন। রাজা। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, ক্ষণিকা, বলাকা, নৈবেদ্যের কত কবিতা, কত গান। বুকের রক্ত দিয়ে লেখা কত বেদনাবিদ্ধ রক্তিম হৃদয় নিয়ে পদ্মাপারে এসেছেন জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ শুশ্রূষার আঁচলাবে! সব, সব, এই বাড়ি আগলে রেখেছে ইতিহাসের জন্য।

বেরিয়ে চলে যাচ্ছি কুষ্টিয়ার দিকে। গোলাম মুস্তাফা বলছে, আবার আসবেন আপনারা। বাগের জন্যে বাগান মরে গিয়েছিল। মালিরা পুরোদমে কাজে লেগে গেছে। আবার ফুল দিয়ে রবীন্দ্রকুঠি ফিরে পাবে এই সাজসজ্জাতে, এখন ইঁটের টুকরো সাজিয়ে লিখতে হয়েছে, কী লজ্জা! লজ্জা? তবে গর্ব করব কোন উপাদান সাজিয়ে?

গেটের বাঁ দিকে বাঁধানো চত্বর। উত্তরায়ণের টেনিস কোর্টের ধারে সেই চত্বরটার কথা মনে পড়ে যায়। ১৯৬১ সালে ওইখানে ঘটা করে জন্মোৎসব হয়েছিল, ঢাকা থেকে শিল্পীরা এসেছিলেন কষ্ট স্বীকার করে। আগামী ২৫শে বৈশাখ ওই কোণটা সমেত গোটা কুঠিবাড়ি আবার জমজমাট করবে। ডানহাতার দীঘির ধারে আঁচলপাতা গিয়ে বসবেন, যেমন একদা বসতেন মৃণালিনী দেবী তাঁর মেয়েদের নিয়ে।

[আলোকচিত্র শ্রীবিশ্বরঞ্জন রক্ষিত কর্তৃক গৃহীত]

শীতে আপনার ত্বক শুকিয়ে যায়...
নিভিয়া ক্রীম দিয়ে তাকে
স্নিগ্ধ, মসৃণ রাখুন
NIVEA
creme
FOR THE CARE OF THE SKIN
শীতকালে আপনার ত্বকের বিশেষ পরিচর্য্যা দরকার— তা শুধু নিভিয়া ক্রীমই করতে পারে। কারণ, শুধু নিভিয়াতেই আছে ত্বক কোমল রাখবার অনন্য উপাদান 'ইউসেরাইট'। নিভিয়া আপনার ত্বকের রুক্ষতা দূর ক'রে আপনার মুখশ্রী সুন্দর ক'রে তুলবে।
নিভিয়া—
সুস্থ, সুন্দর ত্বকের রহস্য!
স্মিথ অ্যাণ্ড নেফিউ-এর তৈরী

॥ ৯০ ॥

বলতে বলতে কালিকান্ত ভট্টাচার্য এসে পড়লেন। বললেন—এই যে, এখানে বাবাজীবনও আছে দেখছি। তা সিগারেট-টিগারেট সব পাচ্ছেন তো বেয়াই মশাই?
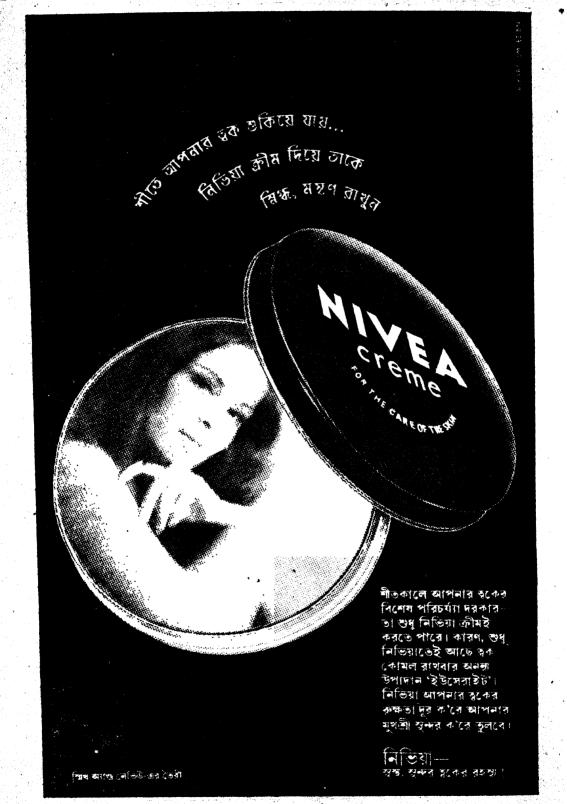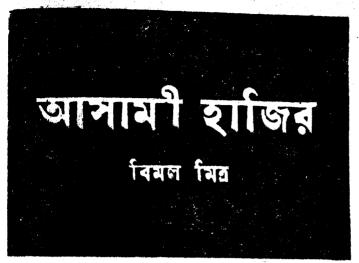
প্রকাশমামার মুখে তখন সিগারেট জ্বলছিল। সুতরাং উত্তর আর তাকে দিতে হলো না। শুধু বললে—এবার যাত্রার বন্দোবস্ত করুন বেয়াই-মশাই, আমি বর-কনেকে একবার নবাবগঞ্জে পৌঁছিয়ে দিতে পারলেই আমার ছুটি। তারপর আপনার ভাগ্য আর আপনার মেয়ের হাতযশ—

তা প্রকাশমামা করিতকর্মা লোকই বটে! করিতকর্মা লোক না হলে কি এ বিয়ে হতো নাকি? বিয়ে তো প্রায় আটকেই গিয়েছিল কাল সকালবেলা। বাড়িময় সোরগোল উঠেছিল। নবাবগঞ্জে কথাটা প্রায় ছড়িয়েই গিয়েছিল। সবাই-ই জানতে পেরেছিল যে চৌধুরী-মশাইএর ছেলে পালিয়ে গিয়েছে। তাকে আর কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। একে গ্রাম দেশ তার ওপর ছোট গ্রাম নবাবগঞ্জ। কার বাড়িতে জামাই এসেছে, কার বাড়ির মেয়ে কার সংগে ফষ্টি-নষ্টি করেছে, তা আর কারো জানতে বাকি থাকে না। তা ছাড়া নেমন্তন্ন হয়েছে মোটামুটি সব বাড়িতেই। তারা ক'দিন ধরেই খাবে। শুধু খাবে না, একেবারে গাণ্ডে-পিণ্ডে খাবে। তার ওপর ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবে। ক'দিন আগে থেকেই তারা বাড়িতে কম খেয়ে খেয়ে চালাচ্ছে যাতে পেটে কিছু জায়গা খাবার জন্যে খালি থাকে। কিন্তু সদানন্দর পালিয়ে যাবার খবর পাওয়ার পর তাদের সব উৎসাহে যেন ভাঁটা পড়লো। তাহলে? তাহলে খাওয়াটা কি মাটি হলো?

বারোয়ারিতলায় নিতাই হালদারের দোকানের মাচার ওপর রীতিমত সভা বসেছে।

পরমেশ মৌলিক তখনি সেই খবরটা নিয়ে এসেছেন। খবরটা শুনে সকলের মুখই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বললে—তাহলে খুড়োমশাই, আজকে কি খাওয়া হবে না?

পরমেশ মৌলিক বললেন—কী জানি কে কপালে কী আছে! মাছ-দই-মিষ্টি সব কিছুর বন্দোবস্ত হয়ে গেছে।

—কী-কী কী মিষ্টি হয়েছিল? শুনেছি নাকি কেষ্টনগর থেকে সরভাজার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল?

শুধু সরভাজা নয়। ক'দিন থেকেই এ-ওয়ার আইটেমগুলো নিয়ে আলোচনা করে করে সকলের সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। মাছ, মাংস, মাছের মুড়িঘণ্ট, ধোঁকার ডালনা, বেগুন ভাজা, নিরামিষ আর আমিষ দু'রকম চপ, দই, রসগোল্লা, পান্তুয়া, আরো অনেক কিছু।

এমন সময় দেখা গেল হন্ত-দন্ত হয়ে শালাবাবু আসছে। সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল সেদিকে। কাছাকাছি আসতেই সবাই এগিয়ে গেল।

—শালাবাবু, কী খবর? পেলেন নাকি?

শালাবাবুর মুখটা গম্ভীর। বললে—না হে, পেলুম না, দেখি একবার কালিগঞ্জের দিকে গিয়ে—

—কালিগঞ্জে? কালিগঞ্জে সদা কী করতে যাবে?

শালাবাবু বললে—রাণাঘাট-ফাণাঘাট, গোল-বাজার, নবাবপুর, সব তো দেখে এলুম, এবার কালিগঞ্জের দিকটাই বা বাকি থাকে কেন?

বলে আর দাঁড়ালো না। হন্ হন্ করে সামনের দিকে চলতে লাগলো।

কেদারের হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। আসল কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেল। বললে—ওই যাঃ, আসল কথাটাই তো জিজ্ঞেস করতে ভুল হয়ে গেল—

নিতাই জিজ্ঞেস করলে—কী কথা?

—খাওয়ার কথা।

বলে দৌড়তে লাগলো। শালাবাবু তখন অনেক দূর চলে গেছে। কেদার দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে ডাকলে—ও শালাবাবু, শালাবাবু—

শালাবাবু পেছন ফিরে তাকালো। ভাবলে হয়ত সদাকে পাওয়া গেছে, সদার সন্ধান দিতে আসছে কেদার। বললে—কী রে, সদাকে পেইছিস?

কেদার কাছে গিয়ে হাঁফাচ্ছিল। হঠাৎ কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। তারপর বললে—না, সদার কথা নয়, নেমন্তন্নর কথা বলছি। আমাদের নেমন্তন্নটার তাহলে কী হবে? সেটাও মারা যাবে নাকি?

কেদারের কথা শুনে শালাবাবুর পিত্তি জ্বলে গেল। বললে—দূরে হ্, ভোর যাও

থেকে সদাকে খুঁজে খুঁজে আমার পায়ের রং-শিকল খুলে গেল আর উনি এসেছেন নেমন্তন্নর খবর নিতে—দূর হ, দূর হ—

বলে রাগে গর গর করতে করতে শালাবাবু আরো জোর-পায়ে এগোতে লাগলো।

সভার সবাই খুব ম্রিয়মান হয়ে গেল কথা শুনে। বরকে না-হয় না পাওয়া গেল, কিন্তু খাওয়াটা বন্ধ হবার কথা ভেবে সবাই যেন কেমন নিঝুম হয়ে গেল। এ ক'দিন অনেক ছিলিম তামাক পুড়েছে, অনেক সময় তর্কাতর্কি করেছে। রেল-বাজারের গৌরের দোকানের রসগোল্লা ভালো না রাণাঘাটের হরিহরের দোকানের রসগোল্লা ভালো তাই নিয়ে তর্ক করে কতদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে, কতদিন সেই তর্ক করতে করতে শেষকালে সেটা মারামারিতেও পরিণত হয়েছে, তবু তর্কের মীমাংসা হয়নি। সকলেই ওই বিয়ের তারিখটার দিকে চোখ রেখে এতদিন জীবন-যাপন করে এসেছে, হঠাৎ সেই পরম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে সবাই বিমর্ষ হয়ে রইল।

কিন্তু বিকেল পড়বার আগেই সবাই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কেদারই খবর পেয়েছিল প্রথমে। সে দৌড়তে দৌড়তে এসে খবরটা দিলে গোপাল হাটকে। গোপাল হাট তখন গোয়াল-ঘরে গরুকে জাবনা দিচ্ছে। কেদারের গলা শুনেই চেঁচিয়ে উঠলো—কী রে, কী খবর রে?

কেদার রাস্তা থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো—ওরে, সদাকে পাওয়া গেছে—আর ভয় নেই—

গোপাল হাট বললে—পাওয়া গেছে? তাহলে খাওয়া?

—খাওয়া হবে।

বলে আর দাঁড়ালো না। অন্য দিকে চলে গেল! বললে—যাই নিতাইকে খবরটা দিয়ে আসি, সে খুব মন-মরা হয়ে গেছে—

কথাটা শুনে পর্যন্ত গোপাল হাটের বুক থেকে যেন একখানা ভারি পাথর নেমে গেল। গরুর জাবনা দেওয়া ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরোল। এতক্ষণে সবাই-ই নিশ্চয় জেনে গেছে। সোজা বারোয়ারিতলার দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু সেখানে তখন আগেই সভা বসে গেছে। নিতাই, কেদার সবাই হাজির। সবার মুখেই উত্তেজনা। নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে সবাই-ই যেন বেশ ধাতস্থ। সবাই-ই জেনে গেছে সদাকে পাওয়া গেছে। কালিগঞ্জ থেকেই শালাবাবু নাকি তার ভাগ্নেকে ধরে এনেছে।

—কিন্তু পালিয়েছিল কেন? কিছু বলছে না সদা?

কথাটা সবাইকেই ভাবিয়ে তুললো।

বিয়ের নামে কেউ পালায়? বরাবর তারা দেখে এসেছে। সদাকে ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেনি কেউ কখনও। ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে এই বারোয়ারিতলা দিয়েই সে বাড়ি ফিরেছে। হাটের দিনও অনেক সময় হাটে এসেছে সে। কিন্তু কেমন যেন ভুলো-ভুলো মন সব সময়ে। আর বেশির ভাগই শালাবাবুর সঙ্গে থাকতো। চৌধুরী-মশাই অনেকদিন ছেলেকে এনে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়েছেন। বলেছেন—একদিন তো তোমাকে এই কাজকর্ম সবই দেখতে হবে, এখন একটু জেনে-শুনে নাও—

অতি সুবোধ বালকের মত সদানন্দ চুপচাপ শুনে গেছে বাবার কথা।

চৌধুরী মশাই বলতেন—এই দেখ, এইগুলোর নাম পরচা, এই হচ্ছে দাখিলে, আর এই হলো নকশা। এই নকশার ওপর নম্বর দেওয়া রয়েছে। এইগুলো হচ্ছে দাগ-নম্বর—

এক-এক করে চৌধুরী মশাই সেরেস্তার নথি-পত্র সব বোঝাতেন। কীসের কী মানে, কীসের কী গুরুত্ব। এককালে যখন দাদু থাকবে না, বাবা-মা কেউ-ই থাকবে না, তখন তাকে নিজেকেই এই সব দেখতে হবে। নায়েব-গোমস্তার ওপর ভরসা করে আর যা-ই করা যাক জমিদারি-সেরেস্তার কাজ চলে না। তোমার নিজের জিনিস, তোমাকে নিজের হাতেই সব করতে হবে। উকিল তোমাকে ঠকাতে চাইলেও তুমি কেন ঠকবে? মামলা-মকদ্দমার সময় তোমাকে নিজেকে কাছারিতে যেতে হবে। কাঠ-গড়ায় সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ-রকম চুপ করে থাকলে চলবে না। উকিলের জেরায় ভয় পেলে চলবে না। নিজের স্বার্থ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে শিখবে। আর প্রজা ঠ্যাঙাতে যদি না পারো তো জমিদারি কোর না। এ ভালোমানুষির কাজ নয়, বুঝলে?

এত যে উপদেশ, এত যে পাখি-পড়ানো সব কিন্তু বৃথা হয়েছিল।

বলতেন—কিছু বুঝলে? কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? বুঝলে কিছু?

সদানন্দ বলতো—না—

চৌধুরী-মশাই চটে যেতেন। বলতেন—কেন? এতে না-বোঝবার কী আছে? লেখা-পড়া শিখেছ তুমি, তোমার কাছে এ-সব কথা তো শক্ত হবার কথা নয়। এই কৈলাশ গোমস্তাকে দেখ তো, ও তো লেখা-পড়ার কিছুই জানে না, কিন্তু আমাদের কত নম্বর পরচায় কত বিঘে কত ছটাক জমি আছে সব ওর মুখস্থ—ও ম্যাট্রিক-পাশও নয়, আই-এ পাশও নয়,—

তারপর যেন চৌধুরী-মশাইএর খেয়াল হতো খোকা কিছুই শুনছে না। অন্য দিকে চেয়ে আছে। তারপর ছেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে রজব আলী তাদের গোরুটাকে জোরে জোরে মারছে।

চৌধুরী-মশাই ধমকে উঠতেন—ওদিকে কী দেখছো? আমি কাজের কথা বলে যাচ্ছি আর তুমি রজব আলীকে দেখছো! রজব আলীর দিকে দেখে তোমার কী লাভ?

কিন্তু না, তার লাভ ছিল। রজব আলীকে দেখেও তার লাভ ছিল। কথা নেই বার্তা নেই সেই অবস্থাতেই সদানন্দ সেখান থেকে উঠে গেল। উঠে রজব আলীর হাত থেকে লাঠিটা এক মিনিটের মধ্যে কেড়ে নিলে। বললে—মারছিস কেন গোরুটাকে? কী করেছে গোরুটা?

রজব আলী তো ভয়ে অস্থির। গাড়ির গোরুকে মেরেছে, তাতে এমন কী কসুর করেছে সে যে খোকাবাবু তার পাঁচন-বাড়ি কেড়ে নিলে!

কিন্তু ব্যাপার বুঝে চৌধুরী-মশাই সেখানে এসে হাজির হলেন।

বললেন—এ কী করছো? এ কী করছো?

সদানন্দ বলল—ও গোরুটাকে মারছে কেন? গোরুটা কী করেছে ওর?

চৌধুরী-মশাই বললেন—তা দরকার হলে গোরুকে মারবে না? বদমায়েসি করেছে তাই মেরেছে। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন?

সদানন্দ বললে—তাহলে আমিও রজবকে মারবো, ও-ও তো বদমায়েসি করেছে—

চৌধুরী-মশাই ছেলের বেয়াড়া বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে হয়ে এ-রকম বেয়াড়া বুদ্ধি কেন হলো। এমন বুদ্ধি হলে এত সম্পত্তি রাখবে কী করে? চিরকাল তো আর তিনি থাকছেন না। একদিন তো এই ছেলের হাতে এই সমস্ত সম্পত্তি তুলে দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। তখন?

সেইদিন থেকেই চৌধুরী-মশাইএর আর এক ভাবনা শুরু হলো। সেইদিন থেকেই তিনি ছেলেকে নিজের কাছে কাছে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চণ্ডীমণ্ডপে নিজের কাছে বসিয়ে সব কিছু দেখাতে বোঝাতে লাগলেন। সদানন্দ কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকতো বটে, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে থাকতো কে জানে।

খানিকক্ষণ পরেই বলতো—আমি যাই—

চৌধুরী-মশাই বলতেন—কোথায় যাবে আবার?

সদানন্দ বলতো—আমার ভালো লাগছে না—

—ভালো লাগছে না তো যাবে কোথায়?

সদানন্দ বলতো—বাইরে—

—বাইরে কোথায় তা বলবে তো?

কিন্তু সদানন্দ বাইরে যে কোথায় যাবে তা সে নিজে জানলে তবে তো বলবে?

রাত্রে চৌধুরী-মশাই গৃহিণীকে বলতেন

—খোকা কি এখনও প্রকাশের সঙ্গে মেশে নাকি?

গৃহিণী অবাক হয়ে যেতেন। বলতেন —প্রকাশের সঙ্গে মিশলে কী হয়েছে?

চৌধুরী-মশাই বলতেন—কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে যেন বেশি মেলা-মেশা না করে। এই তোমাকে সাবধান করে দিলুম।

প্রীতিলতাও জমিদারের মেয়ে। বাপের বাড়ির লোকের নিন্দে সহ্য করবার মত মেয়ে সে নয়।

বলতো—তুমি তো প্রকাশকে দেখতে পারবেই না। সে তোমার কী ক্ষতি করেছে শুনি?

চৌধুরী-মশাই একটু নরম হয়ে বলতেন—না, আমি তা বলছি না। চিরকাল ওই রকম আড্ডা দিয়ে বেড়ালেই চলবে? সেরেস্তার কাজ-কর্মও তো একটু-একটু করে রপ্ত করে নিতে হবে! আমি আর ক'দিন—

এর পরে এ-প্রসঙ্গ আর বেশিক্ষণ চলতো না। কিন্তু চৌধুরী মশাই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতেন সদানন্দকে নিয়ে। ঠিক যেমন ছেলে তিনি চেয়েছিলেন সদানন্দ তেমন ছেলে হলো না। বাবার কাছে আসতেই যেন তার অনিচ্ছে। বাবার চোখে পড়বার ভয়ে সে যেন কোথাও লুকিয়ে থাকে। তাঁর দৃষ্টির আড়ালে সে ঘুরে বেড়ায়।

চৌধুরী-মশাই প্রায়ই গৃহিণীকে প্রশ্ন করতেন—খোকা কোথায় গেল?

প্রীতিলতা বলতো—গেছে নিশ্চয়ই কোথাও—

চৌধুরী-মশাই বলতেন—কিন্তু কোথায় গেছে সেটা বলবে তো?

প্রীতিলতা বলতো—কোথায় গেছে তা আমি কী করে বলবো? তার বয়েস হয়েছে, সে নিজের খুশী মতো যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবে। আমাকে সে বলে যাবে নাকি?

এর জবাবে চৌধুরী-মশাই কী আর বলবেন! নিজের অভিলাষের অপূর্ণতার দুঃখটা নিজের মনেই হজম করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এমনি করে আর বেশিদিন চললো না। শেষকালে সমস্ত রোগের একমাত্র উপশম হিসেবে যখন খোকার বিয়ের প্রসঙ্গটা উঠলো তিনি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন। ভাবলেন, হয়ত বিয়ের পরই সব কিছু সহজ-স্বাভাবিক হয়ে যাবে। যেমন সবার হয়ে থাকে।

কিন্তু সেই বিয়ের দিনেই যে খোকা এমন কাণ্ড করে বসবে তা কে কল্পনা করতে পেরেছিল। প্রকাশই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল সুতরাং তারই যত দায়িত্ব! সে-ই ছুটলো চারদিকে। চারদিকে সকলকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, দই, মাছ, মিষ্টি সব কিছু তৈরি। অধিবাস নিয়ে কুটুম-বাড়ি থেকে লোক এসে গেছে অথচ বর নেই। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো চৌধুরী-মশাই-এর। কুটুম-বাড়ির লোককে কী জবাব দেওয়া হবে!

কিন্তু না, প্রকাশ করিৎকর্মা লোক বটে! বেলা তখন দ্বিতীয় প্রহর উৎরে গেছে। হঠাৎ খোকাকে নিয়ে এসে হাজির!

চৌধুরী-মশাই খবর পেয়েই দৌড়ে নিচেয় গেছেন।

গিয়ে বললেন—কী হলো, কোথায় পেলে ওকে?

প্রকাশ বললে—সেসব কথা এখন থাক জামাইবাবু, সে অনেক কাণ্ড!

—অনেক কাণ্ড? অনেক কাণ্ড মানে কী, খুলে বলো! বেলা তিনটেয় বাড়ি থেকে বর নিয়ে বেরোতে হবে। হাতেও আর সময় নেই। এদিকে কুটুম-বাড়ি থেকে লোক এল, অধিবাসের তত্ত্ব নিয়ে যারা এসেছিল তারা দেখে গেছে যে বরের গায়ে-হলুদ হয়নি—

প্রকাশ বললে—তাদের বললেন কেন যে গায়ে-হলুদ হয়নি—

চৌধুরী-মশাই বললেন—বলতে হবে কেন? তাদের চোখ নেই? তারা তো সবই দেখতে পেলে—

প্রকাশ তাতেও ভয় পাবার লোক নয়। তার হাতে যখন সব কিছুর ভার দেওয়া হয়েছে তখন সেটা তারই দায়। বললে—ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নেই, আমি বরকে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে হাজির করাবোই, আমার ওপর ভার দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

দিদিও খবর শুনে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বললে—হ্যাঁ রে প্রকাশ, খোকাকে কোথায় পেলি তুই?

প্রকাশ বললে—তুমি এখন কথা বলতে এসো না দিদি, তুমি গায়ে-হলুদের জোগাড় করো গে, বিকেল তিনটেয় আমরা বর নিয়ে যাত্রা করবো। নইলে ট্রেন ধরতে পারবো না। আমার একটা জরুরী কথা আছে জামাইবাবুর সঙ্গে, তুমি এখান থেকে যাও—

তারপর চৌধুরী-মশাইকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল প্রকাশ।

বললে—একটা কথা আছে জামাইবাবু, সদাকে পেয়েছি কোথায় জানেন? কাউকে যেন বলবেন না, পেয়েছি কালিগঞ্জে—

—কালিগঞ্জে?

—হ্যাঁ, কালিগঞ্জের বউ-এর কাছে গিয়ে উঠেছিল সদা। জানি না কালিগঞ্জের বউ সদাকে কী ফস্-মন্তর দিয়েছে, দশ হাজার টাকা না দিলে সদা বিয়ে করতে যাবে না—

—দশ হাজার টাকা? কালিগঞ্জের বউকে দিতে হবে?

—হ্যাঁ, তা না দিলে সদা বিয়ে করতেই যাবে না। ওর দাদু কালিগঞ্জের বউকে কথা দিয়েছিল। সেই কথা এখন রাখতে হবে!

চৌধুরী-মশাইএর বিস্ময়ের ঘোর যেন তখনও কাটেনি। বললেন—সে-সব তো অনেক কাল আগেকার কথা। ওই কালিগঞ্জের বউ-ই তো আমাদের নামে মামলা করেছিল। তখন বাবা কথা দিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে সব মিটিয়ে নেবে—তা খোকা এ-সব জানলো কী করে?

প্রকাশ বললে—কী জানি কী করে জানলে। সেখান থেকে তো সদা কিছুতেই আসতে চায় না, শেষে আমি বললুম যে, নবাবগঞ্জে গিয়ে তোকে টাকা দেওয়া হবে, তবে এলো। এখন টাকাটার একটা বন্দোবস্ত করুন—

চৌধুরী-মশাই বললেন—এখনই টাকা দিতে হবে?

প্রকাশ বললে—হ্যাঁ—

—টাকা না দিলে?

—টাকা না দিলে ও বিয়ে করতে যাবে না।

—তা টাকা পরে দিলে চলবে না? বিয়ে-টিয়ে আগে মিটে যাক তারপর না হয় ভেবে চিন্তে টাকা দেওয়া যাবে।

প্রকাশ বললে—তা বোধ হয় শুনবে না সদা, ও যা বেয়াড়া ছেলে আপনার। একবার যখন গোঁ ধরেছে তখন টাকা না দিলে ছাড়বেই না।

মহা ভাবনায় পড়লেন চৌধুরী-মশাই। ওদিকে বেশি ভাববারও সময় নেই। বেলা তিনটের ট্রেন, সেই ট্রেন ধরে রাণাঘাটে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার কেষ্টনগর।

শেষকালে আর কিছু না ভেবে পেয়ে বললেন—দেখি, একবার বাবাকে গিয়ে বলে আসি—

বলে চৌধুরী-মশাই ওপরে চলে গেলেন।

প্রকাশমামা সদানন্দর কাছে এল। সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো?

প্রকাশমামা বললে—হচ্ছে, টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। জামাইবাবু তোর দাদুর কাছে টাকা আনতে গেছে। তুই কিছু ভাবিস না। দাদুর টাকার অভাব? দশ হাজার টাকা তোর দাদুর হাতের ময়লা—

সদানন্দ বললে—ঠিক আছে, দাদু যদি টাকা দেয় তো ভালো, কিন্তু টাকা না দিলে আমি কিন্তু বিয়ে করতে যাবো না, এ আমি তোমায় জানিয়ে রাখছি—

ততক্ষণে ওপর থেকে ডাক এলো। ওপরে যেতে হবে দুজনকে।

সদানন্দ আগে আগে আর পেছন-পেছন প্রকাশমামা। দাদুর ঘরে তখন কৈলাশ গোমস্তা আর চৌধুরী-মশাই রয়েছে। বিছানার ওপর আধ-শোওয়া অবস্থায় দাদু।

সদানন্দকে দেখেই দাদু বললেন—কী সব পাগলামীর কথা শুনছি তোমার? তোমার না বয়েস হয়েছে। এই বয়সে কি তোমার ছেলেমানুষী এখনও গেল না?

সদানন্দ কিছু উত্তর দিলে না। চুপ করে রইল।

—কথা বলছো না যে? যাও, বিয়ে করতে যাও। শেষকালে কি ট্রেন ফেল করবে নাকি?

সদানন্দ বললে—কিন্তু টাকা?

নরনারায়ণ চৌধুরীও, তেমনি লোক। বললেন—টাকা কি হুট বললেই আসে? তুমি বললে টাকা দাও আর আমিও অমনি টাকা দিয়ে দিলুম, তাই কখনও হয়, না হয়েছে? টাকা দেওয়া হবেখন। তুমি এখন যা করতে যাচ্ছো তাই করতে যাও—শেষকালে কি লোক হাসাবে নাকি?

সদানন্দর মুখে সেই একই জবাব। বললে—টাকা না দিলে আমি যাবো না—

নরনারায়ণ চৌধুরীর জমিদারি মেজাজ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো—বলছি তো টাকা আমি দেব। আমার কথার একটা দাম নেই? তোমার জিদ্‌টাই বজায় থাকবে?

—কিন্তু কখন টাকা দেবেন?

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—তুমি কাল বিয়ে করে ফিরে এলেই দেব—

—যদি না দেন?

এতক্ষণে চৌধুরী-মশাই কথার মধ্যে মুখ খুললেন। বললেন—আর তুমি কথা বাড়িও না খোকা, দাদু যখন বলছেন টাকা দেবেন তখন তার ওপরে আর কথা বলো না। আর এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করলে ওদিকে গায়ে হলুদের দেরি হয়ে যাবে, ট্রেনও ফেল করবো আমরা—

সদানন্দ বোধহয় এতক্ষণে একটু নরম হলো। বললে—তোমরা সবাই কথা দিচ্ছ তাহলে? আমি এখন যাচ্ছি বটে, কিন্তু তোমরা সাক্ষী রইলে! টাকা না দিলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে, এই বলে রাখলুম, চলো—

এতক্ষণে যেন চৌধুরী-মশাই নিশ্চিন্তের হাঁফ ছাড়লেন। সব মিটে গেল। কর্তাবাবু ছেলেকে আলাদা করে ডেকে বলে দিলেন—তুমি সঙ্গে যাচ্ছো তো, একটু নজর রেখো, যেন আবার কোনও গণ্ডগোল না করে বসে সেখানে। তুমি কন্যে-কর্তার বাড়িতে রাত্তিরে থেকো—

চৌধুরী-মশাই বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সঙ্গে যাচ্ছিই, রাত্রে সেখানেই থাকবো, সম্প্রদান পর্যন্ত দেখবো, তারপর নিরঞ্জন রইল প্রকাশ রইল, ওদেরও একটু পাহারা দিতে বলবো—

নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—ছেলে-মানুষের মন, কেউ হয়ত নানা রকম মতলব দিয়ে ওর মাথাটা গরম করে দিয়েছে, ও নিয়ে তুমি ভেবো না। ছেলে-বয়সে বিয়ের আগে ও রকম সকলেরই মাথা গরম হয়। তারপর বিয়ে-থা হয়ে গেলে আবার যেমন-কে-তেমন, ও-সব আমার অনেক দেখা আছে—

তা এর পর আর কোনও গণ্ডগোল হয়নি। তাড়াহুড়ো করে গায়ে-হলুদ হয়েছে সদার, জামা-কাপড় বদলে নিয়ে সবাই দুর্গা-দুর্গা বলে যাত্রা করেছে। তারপর বিয়েও হয়েছে, বাসর-ঘরও হয়েছে। সদানন্দ কোনও বেয়াড়াপনা করেনি।

একবার শুধু প্রকাশমামাকে সদানন্দ রাস্তায় জিজ্ঞেস করেছে—দাদু টাকা দেবে তো ঠিক প্রকাশমামা?

প্রকাশমামা বলেছে—আরে তুই অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? টাকা পেলেই তো তোর হলো?

নতুন বউকে নিয়ে ট্রেনে উঠেছে সবাই। সঙ্গে প্রকাশমামা আছে। প্রকাশমামা বর-কর্তা। আর আছে নিরঞ্জন। আসবার সময় বেয়াই মশাইএর চোখ দুটোও জলে ভরে এসেছিল। একমাত্র সন্তান, এই নয়নতারাই ছিল তাঁর সব। মেয়েও যত চোখের জল ফেলেছে, মেয়ের মা-বাবাও তত। ট্রেন ওঠবার সময় কালিকান্ত ভট্টাচার্য আর থাকতে পারেন নি। একেবারে প্রকাশমামার হাত দুটো জাপটে ধরেছিলেন।

বলেছিলেন—আমার মেয়েকে একটু দেখবেন বেয়াই মশাই, ও-মেয়ে সংসারের কিছুই জানে না, দোষ-ত্রুটি যা-কিছু সব ক্ষমা করে নেবেন।

প্রকাশমামা বলেছিল—আপনি কিছু ভাববেন না বেয়াই মশাই, আপনার মেয়ের অনেক পুণ্যফলে অমন শ্বশুর-শাশুড়ি পেলে। অমন শ্বশুর-শাশুড়ি কোনও মেয়ে পায় না—

তারপর ট্রেন ছেড়ে দিলে। নয়নতারা অনেকক্ষণ ধরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর যখন বাবাকে আর দেখা গেল না তখন ঘোমটার আড়ালে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বর-কনে যখন নবাবগঞ্জে এসে পৌঁছলো তখন বেলা পড়ো-পড়ো। বাড়ির ভেতর থেকে উলুর শব্দ উঠলো, শাঁখ বেজে উঠলো। নতুন বউ এসেছে চৌধুরী-বাড়িতে। চৌধুরীবাড়ির প্রথম লক্ষ্মী এসেছে। এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে লোকজন মেয়ে-পুরুষ একেবারে ভেঙে পড়লো।

বারোয়ারিতলার নিতাই হালদারের দোকানের মাচায় তখন রীতিমত সভা বসে গেছে।

কেদার বললে—বউ কী রকম দেখলি রে গোপাল?

গোপাল ষাট বললে—আমি আর কখন দেখলাম, বউ গিয়েছিল, বললে একেবারে জগদ্ধাত্রীর মত রূপ! বড়লোকের ছেলের বউ, আমাদের মতন ঘুঁটে-কুড়ুনী বউ হবে নাকি?

—কেন, তোর বউকে কি খারাপ দেখতে?

গোপাল ষাট বললে—খারাপ বলে খারাপ, একেবারের রক্ষেকালীর বাচ্চা ভাই, যখন আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তখন তো তোরা সে-চেহারা দেখিস নি—

সবাই হেসে উঠলো। নিতাই বলে উঠলো—ওরে তা নয়, আসলে পরের বউকে সকলেরই ভালো লাগে। যার সঙ্গে ঘর করতে হয় সে তো পুরোনো হয়ে যায়—

কেদার বললে—ওরে, এই আমার কথাই ধর না। আমি যখন বিয়ে করেছিলাম তখন সবাই বউ দেখে বললে পরী। তারপর বছর-বছর ছেলে বিইয়ে বিইয়ে চেহারাটা এমন করে ফেলেছে যে তার দিকে এখন চাইতে ঘেন্না করে আমার। বউ নয় তো যেন কাঁটাল গাছ—

নিতাই বললে—তা কাঁটাল গাছের কী দোষ, কাঁটাল গাছের গোড়ায় অত জল ঢাললে ফলন তো হবেই।

কথাটা শুনে আর এক চোট হাসি উঠলো।

কিন্তু তখন চৌধুরী-বাড়ির ভেতরে ভিড় একটু করে পাতলা হয়ে আসছে। প্রকাশমামাই সকলকে তাড়া দিতে লাগলো। বললে—সরো সরো বাপু তোমরা, একটু ভিড় পাতলা করো, কাল সারা রাত বউ ঘুমোয়নি—সরো, একটু হাঁফ ছাড়তে দাও—

সদানন্দ একটা ফাঁকা জায়গায় খোলা আকাশের নিচেয় গিয়ে দাঁড়ালো। একটা অস্বস্তিকর অবস্থার আবহাওয়া তাকে যেন এতক্ষণ গ্রাস করেছিল। এবার সে মুক্তির নিশ্বাস ছাড়লো। হঠাৎ মনে হলো পেছনে কে এসে দাঁড়ালো। সদানন্দ পেছন ফিরে দেখলে। কিন্তু চিনতে পারলে না।

—কে?

লোকটা জবাব দিলে না।

সদানন্দ আবার জোর-গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে, তুই?

—আমি!

—আমি! আমি কে! নাম কী তোর?

—সদা!

—সদা মানে?

উত্তর এলো—সদা মানে সদানন্দ।

সদানন্দ! সদানন্দ চৌধুরী! সদানন্দর মনে পড়লো লোকটা বহুবার এমনি করে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ কোনও পরিচয় দেয়নি। সদানন্দের কেমন সন্দেহ হলো। বললে—কী দরকার তোর আমার কাছে?

হঠাৎ আওয়াজ হলো—আরে, তুই এখানে? আর আমি তোকে খুঁজে খুঁজে মরছি—

প্রকাশমামা কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—তোকে যে সবাই খোঁজা-খুঁজি করছে—আয়—

সদানন্দ জিজ্ঞেস করলে—আমাকে কী দরকার, এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে।

প্রকাশমামা বললে—তোর মেজাজ এমন তিরিক্ষে কেন রে? বিয়ে করে এলি সুন্দরী বউ হলো তবু তোর তিরিক্ষে মেজাজ গেল না, আয় আয়—

সদানন্দ বললে—কিন্তু আমার টাকা?

প্রকাশমামা বললে—আরে, টাকা কি তোর পালিয়ে যাচ্ছে।

সদানন্দ বললে—না, দাদু বলেছিল আমি বিয়ে করে আসার পর টাকা দেবে। আমি সেই টাকা নিয়ে এখনই কালিগঞ্জের বউকে গিয়ে দিয়ে আসবো—

প্রকাশমামা বললে—তাহলে তোর দাদুকে গিয়ে তুই বল্—দাদু তো বলেই ছিল টাকা দেবে—

সদানন্দ বললে—আমি এখনই যাচ্ছি—

নরনারায়ণ চৌধুরীর মেজাজটা তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। এমনিতে সম্পত্তির ঝঞ্ঝাটে মেজাজ তাঁর সহজে ঠাণ্ডা থাকে না। নতুন বউ তাঁকে এসে প্রণাম করে গেছে। তিনি তাকে আশীর্বাদ করেছেন। আশীর্বাদ করেছেন যেন সে এ-বংশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে। যেন বংশ-পরম্পরায় চৌধুরী-বংশের অক্ষয়-কীর্তি অমর করে রাখে। আর নতুন বউএর রূপ দেখেও তিনি খুশী হয়েছিলেন। রূপ বটে! যেমন রূপ তিনি আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি। আর শুধু রূপ নয়, লক্ষণও ভালো। তিনি ভালো করে বউএর মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। সর্বসুলক্ষণযুক্ত যাকে বলে ঠিক তাই। এ পারবে! এ তার নাতির বেয়াড়াপনা দূর করতে পারবে।

হঠাৎ সামনে যেন ভূত দেখলেন। বললেন—কে?

সদানন্দ বললে—আমি সদানন্দ—

—ও, তা কী চাও?

সদানন্দ বললে—আমার টাকা—

(ক্রমশ)

জা-কে বাতাস কোল দেয়, দোল দেয় অনন্যকণ্ঠের সম্মাননায়। স্টীমারের হুইসেল আদমের ছেলেরাই বানায়। বাই-বাই ঝড়ে আকাশ মাতাল যখন টলে টলে পড়ে, তার ধকল যায় লঞ্চ স্টীমারের উপর দিয়ে। যেন সাঙাতে-সাঙাতে অনিয়ম মশকরা। তালেবের পানের দোকান পুড়ে গেছে। সে ভেতরেই ছিল। বাইরে বেরুলে মেশিনগানের গুলি খেয়ে জান যায়। পুড়ে মরে যাওয়ার ছেলে সে নয়। ফেরৎ যখন আসেনি, মরনের হদিস আউড়ে মুনাফা কোথায়? বাতাস গুমরে-গুমরে কাঁদে মসিমন খালার মত, নির্বাক পাথর। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন... বেশক এলাহির জিনিষ আবার এলাহির কাছেই ফিরে আসে...। জাহাজের স্টিয়ারিং হুইল ধরে দরিয়ার বহমান চাতালে চোখ রেখে রেখে তালেবের মুখ আঁকবার চেষ্টা করা যায়। দুরন্ত ঢেউ সব মুছে দিতেই যেন অমন দাবড়ি মেরে ওঠে। এত পানী দেখলাম সেই জওয়ানকাল থেকে। বয়লার থেকে শুরু হুইলে শেষ হচ্ছে। চোখের পানী আর কতো ভয় দেখাতে পারে? সব পানী শুকিয়ে যাক, সব অশ্রু শেষ হয়ে যাক। মরুভূমি হোক বাংলাদেশ। আর কেউ মক্কায় যাবে না অত খরচ করে। একটা খাহেস ছিল। কোম্পানীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বড় দরিয়া পার জেদ্দা, মক্কা যাওয়ার একটা রঙীন হাজী-তোয়ালে কাঁধে ফেলে, মুন্সী পাড়ার নসরউদ্দীন হাজী মুরগীর পালে মোরগের মত বুক চেতিয়ে-চেতিয়ে কী হাঁটে! আল্লার মরজির উপর কোন চারা নেই। কিন্তু সীনা চেতিয়ে হাঁটার দিন চলে গেল এক ফুঁয়ে। এত চীৎকার চতুর্দিকে! এত বাঁশের লাঠি আকাশমুখী। গুণতির বাইরে। হাজার, লক্ষ, কোটি। ঝিরিঝিরি ঢেউয়ে যেন স্টীমার দুলছে। এত উম্মাদনা কোথায় ছিল এতদিন? কাওন ধানের চারা জমিনের ভেতর লুকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দ্যাখো রাতারাতি সব মোতায়েন দাঁড়িয়ে গেছে গণ্ডায় গণ্ডায় নয়, লাখে লাখে কাতারবন্দী, সুরুজের রোশ্-নাইয়ে গা ধুচ্ছে। কাওন ধানের ছাওয়াল শেখ মুজিবের দ্যাশের মানুষ। ঝিরিঝিরি ঢেউয়ে লঞ্চ দুলছিল। তারপর ঝড়ের সঙ্গে আড়ি, নোঙর ছিঁড়ে দৌড় দিলে সমান-পাল্লা। এক সঙ্গে এত মানুষ আর কোনদিন দেখা যায়নি। সব আল্লার আসমানের তলায়। যেন কারো ঘর নেই। ঘর নেই, কিন্তু দেশ আছে। তাই বেরিয়ে এসেছে কাওন ধানের চারা-পুঞ্জ মাটির আঁকড় ঠেলে। অথচ দমকা ঝড়ে আবার সব লণ্ডভণ্ড। কিন্তু লাখ লাখ লাঠি যা আস্পর্ধা, হিমাকতের মত উঁচিয়ে উঠেছিল, তা কী ফুৎকারে নিবে যেতে পারে? তালেব বেঁচে নেই। বেঁচে নেই অনেকে। মাঝিপাড়ার গনেশ মালো। শহরে ছোট দোকান দিয়েছিল। পেছনে খুপরি ঘরে বউ-ছেলে নিয়ে থাকত। মাত্র গত মাসে সবাই গেল। বর্ষা কালে যাতায়াতের কষ্ট। তাছাড়া দোকান বন্ধ যায়। মা লক্ষ্মী রাগ করে। গনেশ মালোরা আর শীতলপুরের গাঁয়ে কোনদিন আসবে না। বংশ ধ্বংস। আল্লার ইনসাফ আছে? তরীক, মসিয়র, গফুর, বামা মাইতি, ইনাম মৃধার ভাই রাসেদ, অমিত, অমিয়, গোলাম, কাসেম, বশীর ...শীতলপুরে আর তালশহর দুই ইউনিয়নে আড়াই শ' মানুষ মারা গেল মাত্র পাঁচ দিনে......। তালেব লাঠি ছেড়ে বন্দুক ধরতে বাইকি! ত্রিপুরা, দিনাজপুরে, গারো পাহাড়, সিলেট সুনামগঞ্জে যারা বন্দুক রাইফেল নিয়ে লড়ছে, তাদের সকলে নাম দিয়েছে মুক্তিফৌজ। এত লাখ লাখ লাঠির আস্পর্ধা কী বৃথা যেতে পারে? কাওন ধানের চারা অত নরম, তবু ঝড় বাতাসের সঙ্গে লড়ে বৈকি। বাঁচার জন্যেই লড়ে। সব লণ্ডভণ্ড-ভাব সাময়িক, যেন হুজুগ। দরিয়ায় কী রোজ তুফান ছোটে? কুতুবদিয়ার বাতিঘর হয়ে যায় কোন কোন মানুষ। কালো অন্ধকারে সার্চলাইট ফেললেও আর দিকশূল দেখা যায় না। আকাশে তারা কিছু সাহায্য করতে পারে। তা-ও যখন গায়েব, তখন বাতিঘরের দপদপ জ্বলা এবং নেবা আলোই একমাত্র কাণ্ডারী। বদরপীরের দরুদ পড়ার কথা সব সময় খেয়াল থাকে না। আল্লা যদি মেহেরবান থাকেন, একবার শেখ মুজিবকে চোখে দেখতে যেন পাই। বড় সাহেব সময়-মত ছুটি দিয়েছিলেন, তাই না এক সঙ্গে অত মানুষ দেখার নসীব হলো। সাড়ে সাত কোটি লোক। তার ক' হাজার আর সারাজীবনে দেখা সাক্ষাতের ভাগ্য হয়? এক সঙ্গে লাখ লাখ বড় সভায় শহরের লোক দেখে। তারা ডাঙায় থাকে। কিন্তু পানীর বাসিন্দা প্যাসেঞ্জার দেখে বটে, তা আর একনে কতো? দু' শ' ধরে এই স্টীমারে। চাপাচাপি গাদাগাদি সাড়ে তিন শ' হয়। সে এই স্টীমারের হৃদের ভিতর। অনেক জায়গা জুড়ে অনেক লোক আর ক'জনে দেখে? দেশ ত মানুষ গাছপালা নদনদী আরো কত কী মিলে। একজন মানুষের ডাকে যখন লাখ লাখ লোক জড়ো হয়, আরো কোটি কোটি সাড়া দেয়, যে যেখানেই থাক, সেই মানুষটাকে দেখলেই ত সব পাওয়া হয়ে যায়। আল্লা যেন নসীবে তা রাখেন। না, কিছুই রাখেননি। এই দুঃখ কী কোনদিন মিটবে? বড় সাহেবের কাছে আর ছুটি নেওয়ার জন্যে যেতে হবে না। বাঙালীদের মধ্যে জাহাজ কোম্পানীর বড়ো সাহেব! তাই তিনিও শহীদের দলে। পাঞ্জাবীরা তাঁকে গুলি করে মেরেছে। লঞ্চ আর নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা কী কোন ঘাটেই আর নিয়ে যাব না। সেঁতা ছোট নদীর ভেতর দূরে নির্জনে কোথাও নোঙর করে রাখব, কিছু পার্টস খুলে, যেন কেউ আর চালাতে না পারে। আবার ডাঙার মানুষ ডাঙায় ডাঙায় মরবে। সেখানেও কি নিশ্চিন্ত? দাউ দাউ আগুন, পোড়া গ্রাম, জানের ডর। বন্দরের আকাশ কতো বদলে গেল একদিন পানীর উপর ভাসা শেষ হলো। সাউদাম্পটন, লিভারপুর, ব্রিন্দিসি, এথেন্স......তরহেতর মানুষ, ভাষা, আচার, গাছপালা। কিন্তু দেশের জন্য মন-পোড়ানি কী শেষ হয়? তাই ত দেশী কোম্পানীর খাতায় আবার কর্মচারী হিসেবে নাম লেখানো। এই নদীর কলকলানি কে কানে অহরহ ঢেলে ঢেলে দেবে? কে দেবে এই বালুচরের চকচকে মাদুর, শীতের ভোরে যেখানে কুমীর শুয়ে থাকে? শ্যামা মেঘনা শ্যামাসংগীত। বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের আওতায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় কী থাকে অপরে তা কি জানবে? তাই ত দূর-দেশের ঝলমলে শহর শেষ পর্যন্ত আর টেনে রাখতে পারে না। একটি উঠান, লাউয়ের মাচাও কলসীর চুন-মাথা কানা, তিন চারঘর প্রতিবেশী চর অঞ্চলের কলরব, ধানের ক্ষেত, মিঠা আলুর সটান-শোয়া গাছ, অনেক কাকের ডাক—যখন লঞ্চের আওয়াজে হুইসেলে সহসা চঞ্চল। অদৃষ্ট কাছাকাছি কত কী না এনে দিয়েছিল। বেসুমার নয়। কিন্তু অভাব দাঁত বের করে হাসতে পেত না কোথাও। না মনের কাছে, না উঠানের উপর। চুড়ির রিনরিন আওয়াজ ত দুনিয়ার সকল সুরের আদি। বয়সের ছাটা হলো অস্থিরতা আনেনি জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার সীমানায়। জাহাজের সারেঙ। সারেঙ, সারেঙ সাহেবের সম্বোধনে হামবড়া আঁচ থাকত না এত-টুকু। শহরের হেড আপিস মাথা-ঘোরা সিঁড়ি গিসগিস লোক, কেরানী ঝাড়ুদার—কতো মানুষ। ডাঙা শক্ত নিরেট। শহর আরো নিরেট, কঠিন। পানীর তরতরানি দ্যাখো লোকের চলাফেরায়, হুশ-শব্দ গাড়ির চম্পটে। সবই সেখানে শক্ত। কোমলতা পানীর ধর্ম। বালিকা কন্যার মুখ। স্নেহ, মমতা। বেড়ার গায়ে নীল রঙ উইপোকা থেকে বাঁচায়। রাস্তার লোক চেয়ে চেয়ে দেখে। সারেঙ সাহেবের বাড়ি। আর অদৃষ্ট-গুনে সহকর্মী কী সব জুটেছিল। জব্বর, রাশেদ, আইনু, মহিউদ্দিন, জলিল......। আইনুর গোটা গ্রাম এখন খাঁ খাঁ পড়ে আছে। পাঞ্জাবী সিপাইদের অত্যাচারে কে কোথায় গেছে, তার জানা নেই। 'সারেঙ সাব ছেলের মত ভালবাসে', নিজেই সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত। গোটা ফিরে এসেছে। ছাদের সুখ্যাম বেলার কয়লা মরত যেন অস্থির, তবু সাথে গান। ক্রমশ কাজ শিখেছে, উপরের দিকে উঠছে। কাজের শুধু এক ছায়া যায়নি, গোটা পরিবার সহ বাঁচা নেই তার

একটি বিশেষভাবে ব্লেণ্ড করা
'টেরিন' স্যুটিং

থেকে ডেকের নিকটস্থ রেলিঙ টপ্‌কায়। এক সঙ্গে অনেক গুলির শব্দ। জব্বারের গায়ে কিংবা পিঠে লেগেছে, আর হিসাবের রকম হয়নি। কারণ তারপরই সোলেমান সারেঙ নিজেও মেঘনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। গুলি লেগেছিল বগল ঘেঁষে পিঠের উপর। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসছে। সুতরাং পানকৌড়ির মত হঠাৎ ডুব, হঠাৎ ভাসা কায়দা আর কতক্ষণ সহায় হতে পারে? সোলেমান সারেঙের এক সময় বুঝতে দেরি হয়নি কাঁধের উপর গুলি গলার একাংশ চামড়া-সহ বিদায় দিয়েছে।

তারপরই অথৈ অন্ধকারে হামাগুড়ি। স্মৃতির থাবায় বন্দী। সব মনে পড়ে যায় বইকি। প্রবীণ সারেঙকে বন্দুকের নলের মুখেই এক গ্রাম থেকে ধরে এনেছিল স্টীমার চালানোর জন্যে। আবার প্যাসেঞ্জার বইতে হবে। কিন্তু এই যাত্রী বন্দুকধারী পাঞ্জাবী।

তিন চার প্ল্যাটুন। মুসলীম লীগের দালালরা তার খোঁজ দিয়েছিল। নচেৎ সহকর্মীসহ এইভাবে ধরা দেওয়ার বান্দা সোলেমান সারেঙ নয়। ডেকের উপর সে নামাজের অন্তে দোয়া মাঙবার সময় সকলের কল্যাণ-প্রার্থী রূপে আল্লার কাছে সেজদা দিয়েছে কতো না দিন। কুলিয়ারচর থেকে ভাটিতে বৈদ্যেরবাজার এলাকায় এই সৈন্যদের বয়ে নিয়ে যাবে স্টীমার। কতো অস্ত্রশস্ত্র। ছোট ছোট কামান পর্যন্ত ডেকের উপর সাজানো। সোলেমান সারেঙ স্টীয়ারিং হুইলে গিয়ে হাত দিয়েছিল। এ আর এক মুসিবত। কলকব্জা সবই ঠিক আছে। টিন টিন ডিজেল অয়েল মজুদ। কিছুই এই জলযানকে অনড় করতে পারবে না। সাদা দাড়ির ভেতর আঙুল চালিয়ে চালিয়ে সোলেমান সারেঙ কত কী না ভেবেছিল, যখন স্টীমার ভেসে চলেছে মেঘনার স্রোত কেটে কেটে। পুরাতন সহকর্মীরা সবই আছে। স্টীমারও বর্তমান। কিন্তু কারো তুফানে আকাশ মেঘ নৌকা পাখি। সব পার্বের মত সমাজের [illegible] মধ্যে চিরাচরিত ধারায় যেন [illegible] পালনে ব্যস্ত। সেও তার জীবিকা ফিরে পেয়েছে এক মাস পরে। এই ত স্বাভাবিক। কিন্তু আর ঘাটের পর ঘাট আসবে না। যাত্রীদের হাঁকডাকের কথা অবান্তর। হুইশেল-টানার প্রয়োজন নেই পর্যন্ত। শুধু ইঞ্জিন ঘরের সঙ্গে কিছু যোগাযোগ। সহকর্মীরা যে-যার কাজ ঠিক রেখে এক একবার সারেঙের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। আর ঘন-ঘন সিগারেট বা বিড়ি ফোঁকার কথা কারো মনে ওঠেনি।

পাশে পাঞ্জাবী সিপাইটা রেলিঙে হেলান দিয়ে চারিদিকে তাকায়, সিগারেট টানে। একবার সারেঙের দিকে একটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাথা নেড়ে জানিয়েছে যে ধূমপায়ী নয়, মুখ খোলেনি। অপর পক্ষ যে-কোন কারণে হোক, কথা বলতে চায়। ভাষা দেওয়াল। তা-ও সারেঙ ইশারায় জানিয়েছে।

—ও বইদ্‌বাজার কিৎনা দূর?

—দূর?

সারেঙ এই শব্দ বোঝে, জবাব দিয়েছিল, তিরিশ মাইল।

—তিরিশ কিয়া? কিৎনা?

—তিরিশ।

আর কথা কী দিয়ে এগোবে? আঙুলের সাহায্যে সংখ্যা গণনার একটা চেষ্টার পর সিপাইটা ক্ষান্ত দিয়েছিল। তারপর চুপচাপ। যে-যার ডিউটি পালন করছিল নিজের মনে।

অনেক কথা মনে পড়ে বইকি। মেঘনার বিস্তার এখানে আকাশের কিনারায় ঠেকেছে যায়। দু' দিকে ছ' মাইল কি বোধ হয় আরো বেশী। ঘন ঘন বৃষ্টিপাতে চরগুলো সব ডুবে গেছে। তাই সমুদ্রের আভাস এখানে। সাদা গাংচিল কেবল মাঝে মাঝে বিন্দুর মত দৃষ্টির বাধা ঘটাচ্ছে নচেৎ শূন্যতাই এখানে সর্বেসর্বা। হঠাৎ [illegible] আওয়াজ [illegible] হয়েছিল। এই আওয়াজের [illegible] ত সারেঙ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আল্লার কাছে শোকর, বাংলাদেশের রাজারা প্রজাদের ভাষা বোঝে না। তাই এবার চট্টগ্রামী উপভাষা: [illegible] [illegible] নল আছে যে ইঞ্জিনের মুখ খুলে দিবি। [illegible] অর্থেক অইলে তোরা বেগগুন [illegible] ঝাঁপ দিস। [illegible] কী [illegible]? [illegible] নল-মুখ খুলে দিবি। পানী পাওয়ার অর্থেক হলে সকলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বি। বেজন্মার দল পেয়েছে কী? ফুড পট পায় জাহাজ।

ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী বিক্ষুব্ধ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালুফি করেছিল, যখন লাল হয়ে উঠেছিল পানীর সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে। এক সময় তলিয়ে যেতে হয় অনন্ত বারিরাশির স্নেহের ভেতর। যখন নির্বাক হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগত। তারই মধ্যে ধরা দেওয়ার পূর্বে সোলেমান সারেঙের বুকে পরিতৃপ্তির ঘনঘটা, ঠোঁটে হাসির আঁচড় লেগেছিল বইকি। আর ঈষৎ সময় থোড়া অন্ত। সুটবুটধারী, এমনিতে ভারী—প্রায় দেড় শ' বিদেশী শত্রু মেঘনার থাবার মুখে কুকুরের মত চীৎকার দিয়ে উঠবে অপমৃত্যুর অপচ্ছায়া দেখে।

নীলাজল স্বচ্ছ মেঘনা। খাকী রঙ দিয়ে লেপ করতে দেবে না তার বুকের বর্ণসমতল।

আর থোড়া অন্ত।

ক্ষীরপাই

॥ ৩০ ॥

গত প্রবন্ধে ক্ষীরপাই-এর প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন 'বাবর শা' সম্বন্ধেই প্রধানত আলোচনা করেছি বলে সেখানকার অন্য কোন বিষয়ে লেখবার অবকাশ পাইনি। অথচ ক্ষীরপাই নানা দিক দিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য গ্রাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে তো বটেই, পূর্ববর্তী মুসলমান আমলেও সুতী ও রেশম বস্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে ক্ষীরপাই-এর খ্যাতি ছিল দূর-বিস্তৃত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের দেওয়ানী লাভের আগেই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা এখানে এক বাণিজ্যিক কুঠি

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থাপন করে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সে কুঠি উঠে গেলেও একাদিক্রমে দশ-এগারো বছর ফরাসীরা এখানে ফলাও কারবার করে গিয়েছে। ইংরেজদের কুঠিও কম যায়নি। এই দুই কুঠি থেকে আবার ওলন্দাজরা দালাল মারফত পণ্য খরিদ করত। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে ক্ষীরপাই-এর স্বর্ণ যুগ গিয়েছে বলা যায়। আট মাইল পশ্চিমের চন্দ্রকোণা ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে অনেক বড় হলেও তার সমৃদ্ধি যে অনেকাংশে ক্ষীরপাই-এর উপর নির্ভরশীল ছিল সে কথা মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে (১৯১১) বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। "বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি/ তবে বলি চন্দ্রকোণায় এলি" এই প্রবচনটি থেকেই সে জনপদের সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। সে সমৃদ্ধি কাছাকাছি আর যেসব উৎপাদন-কেন্দ্রের সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে ক্ষীরপাই একটি। চন্দ্রকোণার সুতী ও রেশমী বস্ত্র, ঘি, বাসনকোসন, চিনি প্রভৃতি নানান জিনিসের ব্যবসায়ে শুধু প্রথমটির ক্ষেত্রে 'স্যাটেলাইট টাউন'-এর স্থান অধিকার করে ক্ষীরপাই রীতিমতো ধনী শহরে পরিণত হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, মিউনিসিপ্যালিটি বলে ঘোষিত হবার সময়ে, ক্ষীরপাই-এর জনসংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার বা তার কিছু বেশি। এত অল্প লোকবসতি নিয়ে পৌর প্রতিষ্ঠানের পত্তন কদাচিৎ হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষীরপাই-এর ক্ষেত্রে যে তা হয়েছিল তার প্রধান কারণ এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই তাঁত শিল্পের প্রসাদে যথেষ্ট বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।

সে ধনাঢ্যতার কাহিনী এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। চন্দ্রকোণা-ক্ষীরপাই-এ তখন লক্ষপতির ছড়াছড়ি। তাঁদের একজন— চন্দ্রকোণার ধনকুবের গুরুদাস করদত্ত— তাঁর ছেলের বিয়ে দিলেন ক্ষীরপাই-এর আর এক শিল্পপতির মেয়ের সঙ্গে।

রাম ও হনুমান : রাধা-দামোদর মন্দিরের 'টেরাকোটা' নক্সা

কৃষ্ণকালী : রাধা-দামোদর মন্দিরের অলংকরণ

[illegible] বর্ষাকাল। বরের শোভাযাত্রায় যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য চন্দ্রকোণা থেকে ক্ষীরপাই অবধি আট মাইল পথ শুধু চালা দিয়ে ঢেকে দেওয়াই হল না, মাঝে মাঝে ঝাড়লণ্ঠনও টাঙিয়ে দেওয়া হল। হাতি-ঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজ, বাজনাবাদ্যি, আলোকসজ্জা নিয়ে সে শোভাযাত্রার জাঁকজমক এখন এক দূরাগত কল্পনা মাত্র। আজ চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই-এর জনবহুল পল্লীর ভগ্ন, পরিত্যক্ত, লতাগুল্মে আকীর্ণ অট্টালিকাগুলির নীরব হাহাকারের ওপার থেকে সে সব মহাসমারোহের কাহিনী স্বপ্নের মতো ভেসে আসে।

অতীত সমৃদ্ধির স্মারক আর প্রায় সবই গেছে এ দুটি জনপদের; আছে শুধু অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মন্দির—কালস্রোতে বিলীন এক উজ্জ্বল যুগের মিছিল থেকে পিছিয়ে-পড়া এক দল ক্লান্ত, অবসন্ন পদাতিক। চন্দ্রকোণায় তারা এতই অগণিত যে পশ্চিমবাংলায় এক বিষ্ণুপুর ছাড়া আর কোথাও সমসংখ্যক পুরাকীর্তি আছে কিনা সন্দেহ। বারান্তরে সে বিষয়ে লিখব। আজ ক্ষীরপাই-এর তিনটি 'টেরাকোটা' মন্দিরের কথা বলি যার মধ্যে একটি, এদেশে অলংকরণ-চর্চার শেষ পর্বের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে আমার ধারণা। গ্রামের পূব প্রান্তে, মাঝপাড়ায়, চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়কের পাশে: পূবমুখী, পঞ্চরত্ন, এ দেবালয়টি সাধারণের কাছে রাধাদামোদর মন্দির নামে পরিচিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫ ফুট ৪ ইঞ্চি ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট এ ইমারতের সামনের ঢাকা বারান্দাটির ছাদ 'ভল্ট'-এর ও গর্ভগৃহের ছাদ কোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর স্থাপিত। ঠাকুরঘরে প্রবেশের জন্য উত্তর দিকের দেওয়ালে যে অতিরিক্ত দরজাটি আছে তার দুপাশে প্রায় আড়াই ফুট উচ্চতায় দুই 'টেরাকোটা' দেহালাবাদিকার মূর্তি। পোড়ামাটির এ রকম বড় আকার দ্বাররক্ষী মূর্তি একদা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব ও সংলগ্ন হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। নিরেট গড়নের এ মূর্তিগুলির হাঁটু, কোমর ও গলার কাছে জোড় থাকত ও পৃথক অংশগুলি ভাটিতে পোড়াবার সময় আলাদা করেই পোড়ানো হত। হুগলী জেলার গোঘাট থানার নকী-

দেওয়ানগঞ্জ ও মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার শ্যামসুন্দর পাটনা, মাংলোই প্রভৃতি গ্রামে এ জাতীয় নিদর্শন প্রচুর দেখা যায়। পোড়ামাটির সজ্জা মন্দিরটির কেবল সামনের দিকেই নিবদ্ধ কিন্তু তাও প্রথানুযায়ী সর্বত্র নয়। ভিত্তির সমান্তরাল এক বা একাধিক সারিতে সামাজিক চিত্র বা শিকার-দৃশ্য ইত্যাদি এখানে অনুপস্থিত; থামের গায়েও বিশেষ কোন অলংকরণ নেই। অথচ, বহুল-অলংকৃত অধিকাংশ মন্দিরের এসব অংশে 'টেরাকোটা' টালির প্রচুর সমাবেশই সাধারণ রীতি। কিন্তু সজ্জা-প্রকরণের এই আপেক্ষিক অভাব বহুগুণে পূরণ করে দিয়েছে তিনটি ফুলকাটা খিলান শীর্ষের বিশদ প্যানেলগুলি ও তাদের উপরের ও দু পাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য ও ফুলকারি নকশার অজস্র সমারোহ। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১৫৫ বছর আগে। অলংকরণগুলি সেজন্য এখনও যথেষ্ট সজীব আছে, ক্ষয়ে যেতে আরম্ভ করে নি। খুব সাধারণভাবে এ কথা হয়ত বলা যায় যে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির সূত্রপাত হয়। কিন্তু সে অবনতি যে যুগপৎ সর্বব্যাপী হয়নি তার প্রমাণ ক্ষীরপাই-এর এ মন্দিরটি ও মেদিনীপুর জেলার রামচন্দ্রপুরের পরিত্যক্ত মন্দির, মাংলোই গ্রামের অষ্টকোণা রাসমঞ্চ এবং লাওদা গ্রামের বাঁকারায় মন্দির; হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের পাল-পরিবারের মন্দির; হুগলী জেলার আরামবাগের অদূরে পারুল গ্রামের বিশালাক্ষী মন্দির, বালী-দেওয়ানগঞ্জের দামোদর মন্দির ও ডিহি-বয়রার স্বরূপনারায়ণ মন্দির; বর্ধমান জেলার কালনার প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির; বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির এবং বীরভূম জেলার তারাপীঠের মন্দির ও ইলামবাজারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ইত্যাদি। তালিকা অনাবশ্যকভাবে আর না বাড়িয়ে একথা বলা যায় যে, মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির যুগেও এগুলি (ও আরও অনেক মন্দির) উৎকৃষ্ট কারিগরি দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। সেজন্য কুশলী 'টেরাকোটা' শিল্পীগুলি যে উনিশ শতকের প্রায় শেষ অবধি এখানে-সেখানে সক্রিয় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলি থেকে আমার বক্তব্য হয়ত আরও স্পষ্ট হবে। একথা হয়ত সত্য যে 'টেরাকোটা' অলংকরণের এই শেষ যুগে আদি বা মধ্য পর্যায়ে অনুসৃত সারল্য ও সুকুমার প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তে নিরেস কারিগরির
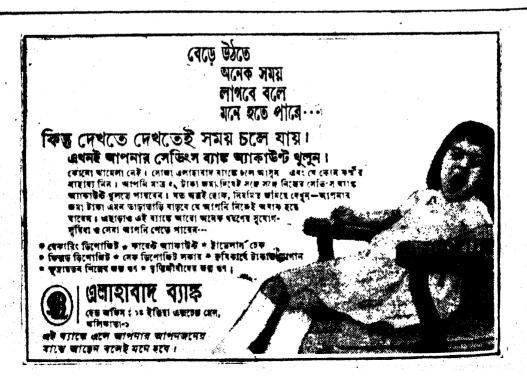
চুল নিঙড়ানো : রাধা-দামোদর মন্দির

বেশি। কিন্তু সে সাধারণ প্রবণতাকে অতিক্রম করে কিছু কিছু অসাধারণ 'টেরাকোটা' মন্দিরও নির্মিত হয়েছে সে কালে। ক্ষীরপাই-এর এ দেবালয়টি সেই অসাধারণত্বেরই নিদর্শন।

এ মন্দিরের কেন্দ্রীয় খিলানের কিছু

আটচালা কুটির ও আটচালা ঘটেশ্বর শিবমন্দির

উপরে পোড়ামাটির ফলকে যে প্রতিষ্ঠা-লিপিটি নিবদ্ধ আছে তার পাঠ হুবহু নিম্নরূপ :

শ্রীশ্রী শ্রাধা	শ্রীশ্রী জীউ
দামোদর :	সিতলা মাতা
তব চরণ	তব চরণ ভ
ভরসা	রসা গো

শকাব্দা ১৭৩৯ সন ১২২৪
সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ
শ্রীমদনমোহন দত্ত।

লিপির তিনটি অংশ পৃথকভাবে সাজানোর পদ্ধতিটি লক্ষণীয়। মেদিনীপুর জেলার আরও কিছু মন্দিরে লিপি বিন্যাসের এই বিশেষ রীতিটি দেখা যায়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর বহুলপঠিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৯১) লিপিটির নিম্নলিখিত একটানা পাঠোদ্ধার করেছেন :

"শ্রীশ্রী শ্রাধা শ্রীশ্রী কৃষ্ণদামোদর
শীতলা মাতা চরণ তব চরণ ভরসা গো
শকাব্দা ১৭৩৯, সন ১২২৪ সাল
তারিখ ১০ বৈশাখ শ্রীমদনমোহন দত্ত।"

ফলে, প্রথম লাইনের 'কৃষ্ণ' কথাটি প্রক্ষিপ্ত ও দ্বিতীয় লাইনের গঠন বিশৃংখল হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, পাঠোদ্ধারের সময় বানান, লাইন সংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তন না করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহলে সমকালীন বানান ও পংক্তি সাজানোর রীতির ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা। সে যাই হোক, দত্ত পদবীধারী এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যে স্থানীয় বণিককুলের বিত্তশালী কেউ ছিলেন এমনই মনে হয়। আমার অনুসন্ধান অনুসারে, সে পরিবার লুপ্ত হবার পর এই উৎকৃষ্ট মন্দিরটি যখন অবহেলায় জীর্ণ হচ্ছিল তখন স্থানীয় হেলথ সেণ্টারের জনৈকা নার্স এটির সংস্কার করিয়ে, বিগ্রহের নিত্য পূজার জন্য এক পুরোহিত নিযুক্ত করে, অন্যত্র বদলি হয়ে যান। এই মহানুভব মহিলার আমি সন্ধান পাইনি। পেলে, নিজে গিয়ে সাধুবাদ করে আসতাম। আর দশজনে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে পশ্চিম বাংলায় অন্তত কিছু মন্দির হয়ত রক্ষা পেত।

এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির সঠিক পাঠোদ্ধার ও খুব কাছ থেকে অলংকরণ-গুলির ছবি তোলবার জন্য সদয় পড়শীরা যেসব টেবিল, চেয়ার, মই প্রভৃতি যোগাড় করে এনেছিলেন তা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে চন্দ্রকোণা-ঘাটাল সড়কবরাবর উত্তর দিকে পা বাড়াতেই এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়ল। অদূরেই আটচালা খড়্গেশ্বর শিব মন্দির আর তার গা ঘেঁষে খড়ে-ছাওয়া-এক আট-চালা কুটির। আমাদের চিরকালের দোচালা, চারচালা ও আটচালা কুটিরের আদলেই যে বাঙালীর নিজস্ব চালা-মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে সেকথা

বোঝাবার জন্য ইতিপূর্বে (যেমন, আমার 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে) এক জেলার চালা-ঘরের ছবির সঙ্গে দূরবর্তী আর এক জেলার চালা-মন্দিরের ছবি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি যেহেতু একই আদলের কুটির ও মন্দিরের সহাবস্থান খুবই বিরল। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত পঞ্চম ছবিটি সেদিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

খড়্গেশ্বর শিব মন্দিরটির স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও আকর্ষণীয়। দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২৩ ফুট ২ ইঞ্চি ও ২১ ফুট ৪ ইঞ্চি ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ ঃ—

"শ্রীশ্রী খড়্গে
সর শিবঠাকুর
সকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১
সন ১২৬৮ সাল
শ্রীগঙ্গাধর দত্ত।"

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" পুস্তকে (পৃঃ ৩৯১) লিপিটির পাঠোদ্ধার এইভাবে করেছেন ঃ—

"শ্রীখড়্গেশ্বর শিবঠাকুর
শকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১
সন ১২৬৮ সাল শ্রীগঙ্গাধর দত্ত।"

খড়্গেশ্বর শিবমন্দিরের কারুকার্য

বিনয়বাবুর বর্ণিত লিপিতে সাল-তারিখের কোন ভুল না থাকলেও পাঁচ লাইনের লিপিটিকে তিন লাইনে পরিবর্তন ও প্রাচীন বানানের নবীকরণের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেই যে যুক্তি দেখিয়েছি তা এখানেও প্রযোজ্য।

১৭৮৩ শকাব্দের পঞ্চম (ভাদ্র) মাসের ২১ তারিখে উৎসর্গীকৃত এ দেবালয়ের ইংরেজী মতে প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে হবার কথা। এটি সেজন্য প্রায় ১১০ বছরের মতো প্রাচীন ও প্রথম মন্দিরটি থেকে ৪৪।৪৫
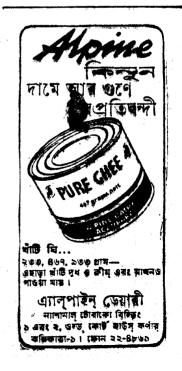
দ্বারে-দরজায় দ্বারী ঃ রাধা-গ্রামের মন্দির

বছর পরে নির্মিত। এই নতুনত্বের ফল-স্বরূপ এ মন্দিরের 'টেরাকোটা' অলংকরণ পরিমাণে অনেক কম, কারিগরি নৈপুণ্যেও নিরেস। তা ছাড়া পোড়ামাটি ও পঙ্কের অলংকরণের যুগপৎ ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন্দির 'টেরাকোটা' শিল্পের অবনতির কালে যে এই দ্বিতীয় প্রকারের সজ্জার যথেষ্ট প্রচলন হয়েছিল সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু, সাধারণভাবে বলতে গেলে মেদিনীপুর জেলা ছাড়া অন্যত্র এই দু' রকম অলংকরণ পদ্ধতি কম ক্ষেত্রেই একই দেবালয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত পঞ্চম ছবিটিতে, লক্ষ্মী মূর্তি ও তার চারদিকের অলংকরণ পোড়ামাটির কিন্তু দূরের ফুলকারি নকশাগুলি পঙ্কের। 'টেরাকোটা' সজ্জার বিষয় প্রথাগত—কৃষ্ণ-লীলা, দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতি। খিলান শীর্ষের অলংকরণগুলিকে (লক্ষ্মীমূর্তিটি তার অন্যতম) ঘিরে ছোট ছোট খোপের মধ্যে বসানো হয়েছে, একই রকম যে ৬৪টি 'টেরাকোটা' গোপিনীমূর্তি নিবদ্ধ আছে তাও অভিনিবেশযোগ্য। কেননা, পোড়া-মাটির টালিগুলি সাধারণত খোদাই করে তৈরি করা হলেও একই রকমের বহু টালির যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন যে সেগুলিকে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হত, এই নিদর্শন থেকে তা প্রমাণ হয়।

গ্রামের হাটতলার উত্তরে, দক্ষিণমুখী, আটচালা, শিব মন্দিরটির অন্য দুটি দেবালয়ের তুলনায় হীন। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, শ্রী শীতলানন্দ জীউর স্মরণে জনৈক অদ্বৈতচরণ পানি ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) এটি নির্মাণ করেন। পঙ্কের অলংকরণ নেই, 'টেরাকোটা' সজ্জাও অপেক্ষাকৃত কম। প্রথম মন্দিরটি থেকে ২২ বছর পরে নির্মিত হলেও পোড়া-মাটির কারুকার্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষয়িত হয়েছে। অন্য দিকে, দ্বিতীয় দেবালয়টি থেকে ২২ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এ মন্দিরের 'টেরাকোটা' ভাস্কর্য তুলনায় অনেক অমার্জিত। এ থেকে হয়ত আর এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আজকের দিনের যাত্রার দলের মতো, সেকালের 'টেরাকোটা' গিল্ড্‌গুলিরও নৈপুণ্যের তারতম্য ছিল, এবং বিভিন্ন কৃতিত্বের তিনটি পৃথক দল সম্ভবত ক্ষীরপাই-এর এ মন্দির-গুলি নির্মাণ করে থাকবেন।

আর একটি পাথরের প্রাচীন মন্দির ছিল এ গ্রামে। কিন্তু খেয়ালখুশি মতো আমূল সংস্কারের ফলে তার বর্তমান চেহারা এতই ঐতিহ্যবর্জিত যে আজকের আলোচনা থেকে সেটিকে বাদ দিলে কিছু ক্ষতি হবে না। (ক্রমশ)
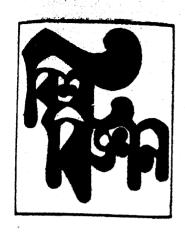
[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

রাক্ষসী সুনামি

১ এপ্রিল, ১৯৪৬, সুনামি ঝাঁপিয়ে পড়ে হাওয়াই-এর হিলো বন্দরের একটি গুদাম ঘরের ওপর। গুদাম ঘরের ওপাশে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। গুদাম পুরোপুরি খতম। সম্মুখের বাঁ পাশের লোকটি সেকেন্ডের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে যায়। একটি জাহাজের ডেক থেকে মর্মান্তিক এই ঘটনার ছবিটি তোলা হয়েছিল।

না, এ অভিজ্ঞতা কল্পকাহিনীর দৈত্যদানব সম্পর্কিত নয়, নিতান্ত বাস্তব ঘটনা। মুহূর্তগত। কিন্তু তার শাসন মহাকালের মতই অমোঘ। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা কদাচিৎই ঘটে থাকে। তবু তেমন কোন মুহূর্ত যদি কখনও আপনার জীবনে আসে তাহলে সেই মুহূর্তটি আপনি ঠিক এইভাবে প্রত্যক্ষ করবেন :

পুরী বা অনুরূপ কোন সমুদ্র বেলায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ আপনি লক্ষ করলেন, সম্মুখে দিগন্ত প্রসারী সমুদ্র যেন মুহূর্তের জন্যে অস্বাভাবিক রকমের শান্ত হয়ে গেল। আপনার পায়ের কাছের নিস্তরঙ্গ ফেনীল জলরাশি সবেগে পিছু হটে চলেছে। দূরে, ক্রমে আরও দূরে। জল এবং আপনার ব্যবধান বাড়ছে। একশ ফুট পাঁচশ, হাজার। সামান্যতম সময়ে, এই দূরত্ব এক মাইলেও গিয়ে দাঁড়াতে পারে। রীতিমত ভোজবাজির মত কাণ্ড যেন। মনে হবে অজ্ঞাত কোন শক্তি মুহূর্তে সমুদ্রের জল শুষে নিচ্ছে। চারপাশের বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে।" দূরের জলাশয় নিস্তরঙ্গ। পিছু হঠা জলরাশির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভুল করেও আপনি সমুদ্রের দিকে এগোবেন না। জলমুক্ত বালুর বুক থেকে শামুক ঝিনুক কুড়োনোর লোভ সম্বরণ করে তখন আপনার কাজ হবে নিরাপদ কোন জায়গায় আশ্রয় নেয়া।

কারণ এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর, হয়ত কয়েক মিনিটও হতে পারে, দেখা যাবে, দূরে সমুদ্রের বুকে তুলোর মত সাদা ফেনা শূন্য থেকে যেন আছড়ে পড়ছে। পলকে আপনার চোখের সামনেই আপনি দেখতে পাবেন নীলাভ-কালো ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে তটভূমির দিকে এগিয়ে আসছে। একটি। তার পেছনে আরও একটি। একের পর এক তারা আছড়ে পড়ছে। অবশেষে কূলের কাছে এসে যখন তারা আঘাত করল, ঠিক সেই সময় ঢেউগুলি মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল পঞ্চাশ, একশ কখনও বা দেড় শ ফুট। সমুদ্রের বুকে এই ঢেউ-এর বিস্তার ঘণ্টায় প্রায় সাতশ কিলোমিটার বেগে। আর সমুদ্রের উপকূলে যা কিছু সম্মুখে পড়ে নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে ধুয়ে মুছে সব কিছু নির্মূল করে দেয়। কারণ সাতশ কিলোমিটার অর্থাৎ জেট প্লেনের গতি নিয়ে অমন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, বড় বড় বোমার আঘাতের চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী। জাপানী ভাষায় একেই বলা হয় "সুনামি"। যার বাংলা অনুবাদ পর্বত প্রমাণ ঢেউ। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বা প্রবল-ঘূর্ণী সাধারণত ঝড় অথবা জোয়ারের ফলেই হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের রাক্ষুসে ঢেউ-এর পেছনে তাদের প্রত্যক্ষ কোন হাত আছে বলে জলবিজ্ঞানীরা মনে করেন না। এ ছাড়া এ ধরনের ঘটনা কচিৎ ঘটে বলে এর মূল উৎস সম্পর্কে তাঁদের মনে কিছুদিন আগেও বেশ কিছুটা দ্বিমত ছিল। বিশেষ এই প্রাকৃতিক ঘটনার উপর বছরের পর বছর শত শত বই ছাপা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর ভয়ঙ্কর বিবরণ পাওয়া যাবে এই সমস্ত বই-এ। যদিও পারতপক্ষে মূল কারণ বর্ণনার ব্যাপারে অনেকেই খুব কম কথা বলার সুযোগ পেয়েছেন।

সুনামি। জাপানের অধিবাসীদের কাছে এ এক জীবন্ত বিভীষিকা। ১৮৯৬ সালে সুনামির জলোচ্ছ্বাস মাত্র এক মিনিটের মধ্যে প্রায় তিরিশ হাজার জাপানীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এবং তার গ্রাস থেকে একজনও রেহাই পায় নি। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপান কামচকাটকা, কুরাইলস, হোনসু দ্বীপ, আলাস্কা এবং কানাডার উপকূলবর্তী অঞ্চলে বহুবার এর আগ্রাসী ফণা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের নথিপত্রে আজ পর্যন্ত এক হাজারের কিছু বেশি এমন ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তবে এর উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে মাত্র দুই দশক আগে। এবং নিশ্চিত কারণ সম্পর্কে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ মাত্র এক দশকের ঘটনা। এখানে তথ্য বলতে বোঝাচ্ছি, পৃথিবীর কোথায় ঠিক কী কারণে সুনামির সৃষ্টি হয়েছে বা হতে পারে, তার সম্ভাব্য গতিপথ এবং আঘাত করার ক্ষমতা প্রভৃতির উপর নির্ভরযোগ্য খবরাখবর। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সুনামির যখন আবির্ভাব ঘটে, উপকূল থেকে দূরে গভীর সমুদ্রে বিচরণরত জাহাজের নাবিকদের পক্ষে তখন তার উপস্থিতি অনুমান করা শক্ত। কারণ ওই সময় সমুদ্রের বুকে যে তরঙ্গ দেখা যায়, তার দৈর্ঘ্য কোন কোন সময় দুশ থেকে তিনশ কিলোমিটারের মত হয়ে থাকে' উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ মিটার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোন তরঙ্গের উপর দিকে ঠেলে ওঠা কুঁজের সবচাইতে উঁচু বিন্দু থেকে তার পাশের তরঙ্গের অনুরূপ বিন্দুর দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলা হয়। এবং উপরে ঠেলে ওঠা কুঁজের সবচাইতে

হিলোয় আঘাত করার পর ভূ-কম্পনজনিত তরঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগরে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, দেখান হল। শকওয়েভ কত ঘণ্টায় কতটা পথ অতিক্রম করেছিল লক্ষ করুন

উঁচু বিন্দু থেকে পাশে নিচের দিকে ঢালু অংশের গভীরতম বিন্দুর দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গের গভীরতা বা উচ্চতা। সমুদ্রের কোন একটি স্থানে দাঁড়িয়ে অনুমান করা শক্ত ওই তরঙ্গের ঢাল শেষ পর্যন্ত কতটা উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে। সেখানে ভাসমান কোন জাহাজের নাবিকের কাছে মনে হয়, জলের এক প্রস্থ ঢাল এক থেকে পাঁচফুট পর্যন্ত উঁচু। গভীর সমুদ্রে জলে কোন আলোড়ন থাকে না। অতএব ভয় পাওয়ার মত কোন কারণও নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ঢেউ-এর শীর্ষদেশ যখন দানবের মত থাবা বাড়িয়ে উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়, বরং বলা চলে যখন উপকূলের উপর আছড়ে পড়ে, তখন তার আসল করাল রূপটি ধরা পড়ে। ওই সময় কখনও তার উচ্চতা গিয়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ মিটারের মত। উঁচু সেই জলের পাহাড় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের মত আঘাত হেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং নিমেষে উপকূলের উপর যা কিছু থাকে, বড় বড় অট্টালিকা, পাঁচিল, ছোটখাটো পাহাড়, বসতি সমস্ত ধুয়ে মুছে সাবাড় করে দেয়।

মুশকিল হল, এই প্রলয় মুহূর্তটিকে সহজ চোখে প্রত্যক্ষ করা সোজা। কিন্তু এর সম্পর্কে যথাসময়ে ভবিষ্যৎবাণী করা শক্ত। কারণ আসল রহস্য আত্মগোপন করে থাকে সমুদ্রের গভীরে। জানা গেছে, সাধারণত উপকূল থেকে দূরে, সমুদ্রের গভীরে যখন ভূ-কম্পন ঘটে, ওই কম্পন তখন মুহূর্তে একটি প্রবল ধাক্কা সৃষ্টি করে আশপাশের জলের মধ্যে। ভূ-কম্পনের কারণ : এক, হঠাৎ সমুদ্রের গভীরে ভূ-ত্বক বসে গিয়ে এমনটি ঘটতে পারে। মনে করুন হঠাৎ কোন জায়গায় চিড় ধরল। তারপর ব্যাপক একটি অংশ মুহূর্তে বসে গেল। এর ফলে বিরাট গর্তের মত জায়গায় প্রবলবেগে জল এসে জমতে থাকবে। এ ছাড়াও ভূ-ত্বকের এই-ভাবে বসে যাওয়ার ফলে প্রচণ্ড কম্পনের সৃষ্টি হবে। দুই, সমুদ্র গর্তের আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের ফলেও এমনটি ঘটা সম্ভব।

কারণ যাই হোক, ঘটনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঠিক রহস্য উদ্ঘাটন করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। ভূ-বিজ্ঞানী-দের পক্ষে এখনও পর্যন্ত আগে থেকে বলা শক্ত, ঠিক কোন সময়ে এবং কী কারণে সুনামির আক্রমণ ঘটতে পারে, এবং কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে ভূ-কম্পনের অভিঘাতজনিত তরঙ্গ বা 'শকওয়েভ' সমুদ্রের জলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। আদিকাল থেকে ভূ-কম্পনজনিত দুর্বার এই জলস্রোত, মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং মহাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে একের পর এক আঘাত হেনেছে। সেই সঙ্গে সম্মুখে যা কিছু পেয়েছে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে শুধু ধ্বংস, একের পর শুধু ধ্বংসের চিহ্ন রেখে গেছে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক যখন প্রথম হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন, তার আগে ওই দ্বীপপুঞ্জে কম করেও তিরিশবার সুনামি আঘাত করেছিল।

১ এপ্রিল, ১৯৪৬ ইউনিমাক দ্বীপে প্রচণ্ড রকম ভূকম্পন ঘটে। দ্বীপটির অবস্থান ৫৩.৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৬৩ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ বরাবর, আলাস্কা থেকে আশি মাইল দূরে অলেউটিয়ান খাদে। এখানকার সমুদ্র প্রায় ১২০০০ ফুট গভীর। ভূকম্পনের প্রায় চারঘণ্টা চৌত্রিশ মিনিট পর হাওয়াই-এর ওয়াহু-দ্বীপের উপর আছড়ে হানল প্রথম ভূকম্পন-জনিত তরঙ্গ। উল্লেখ্য, ইউনিমাক থেকে এই দ্বীপটির দূরত্ব প্রায় ২৫০০ মাইল। অর্থাৎ অভিঘাত জনিত তরঙ্গ ওই সময় ঘণ্টায় ৪৯০ মাইল বেগে অগ্রসর হয়েছিল। ওই সময় ওয়াহুর উত্তরাঞ্চলে বেলাভূমির কাছাকাছি একটি কটেজে প্রখ্যাত সামুদ্র-ভূবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস পি শেপার্ড এবং তার স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। দিনের দিকে হঠাৎ জোরাল একটি হিশ হিশ শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জানালার কাছে ছুটে গেলেন। সেখান থেকে দেখতে পেলেন, দূরে সমুদ্রের বুকে দৈত্যাকার একটি ঢেউ গর্জন করতে করতে যেন তাঁদের কুটিরের দিকে ধেয়ে আসছে। এতটুকু দেরি না করে শেপার্ড পাশের ঘরে গিয়ে ক্যামেরাটি তুলে নিলেন। তারপর দরজার কাছে এগোতেই ছবি তোলার ব্যাপারে হতাশ হতে হল। দেখলেন যৎসামান্য এই সময়ের মধ্যেই ঢেউটি অদৃশ্য হয়েছে। পরিবর্তে বেলাভূমির কাছাকাছি সমস্ত জল সজোরে পিছু হটে চলেছে গভীরতর অঞ্চলের দিকে। অল্প-ক্ষণের মধ্যে সেখানকার সমুদ্রের গভীরতা প্রায় তিরিশ ফুটের মত কমে গেল। এবং এরপর আরও কয়েকবার ধরে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। অর্থাৎ জোয়ারের মত জল একবার ফুলে ওঠে, আবার ভাটার মত তার উপরের জল গভীর খাদে নেমে যায়।

জলাশয়ের বুকে ঢিল ফেললে, ঢিল যেখানে গিয়ে আঘাত করে, সেই স্থানটিকে কেন্দ্র করে একের পর এক যেমন ঢেউ-এর সৃষ্টি হয় তারপর সেই অভিঘাত ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে ক্রমেই সম্প্রসারিত হতে থাকে, ঠিক তেমনি ইউনিমাকে সংঘটিত ভূকম্পন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চার-দিকে বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় একশ মাইলের মত। এবং সেই তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশ মাইল বেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দুটি তরঙ্গের কুঁজের দূরত্ব এত বেশি হওয়ায় সমুদ্রের বুকে ভাসমান কোন জাহাজীর পক্ষে তাদের সঠিক উচ্চতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু উপ-কূলের সান্নিধ্যে এসে সত্যিকারের বিভীষিকা ধরা পড়ল। তাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বড় বড় এক একটি ঢেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ওয়াহুর কাছে এই উচ্চতা এসে দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ ফুট। পরে ভূ-কম্পনজাত ওই তরঙ্গ দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম কূলের

দিকে এগিয়ে যায় এবং উৎপত্তির আঠারো ঘণ্টা পর প্রায় আট হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে চিলের তালপারাইসোর উপকূলে গিয়ে আঘাত করে। অবশ্য ততক্ষণে তার শক্তি অনেকটা কমে এসেছে। ভালপারাইসোতে ঢেউয়ের উচ্চতা দাঁড়িয়েছিল মাত্র পাঁচ ফুট। সেখান থেকে ওই অভিঘাত আবার প্রত্যাগমন করে এবং হাওয়াই-এ এসে উপস্থিত হয় পরবর্তী আঠারো ঘণ্টা পর। এবং এইভাবে মূল কম্পনের পর বেশ কয়েকদিন ধরে তার প্রতিক্রিয়া চলতে চলতে অবশেষে সমুদ্র আবার শান্ত হয়ে আসে।

শুধু আলাস্কাই নয়, এ ধরনের ঘটনা প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কিছু কিছু জায়গায় ঘটে থাকে। বিশেষ করে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাপানের আশপাশের অঞ্চল যেখানে সমুদ্র-গর্ভে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব বর্তমান ওই সমস্ত অঞ্চলে সুনামি়ের আবির্ভাব যে কোন মুহূর্তেই ঘটার সম্ভাবনা থাকে। ওই সমস্ত আগ্নেয়গিরির অনেকেই সুপ্ত। তবু মাঝে মাঝে অনিবার্য কোন কারণে তাদের কোন একটিতে যখন বিস্ফোরণ ঘটে, মুহূর্তে সেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আঘাত সমুদ্রের বুকে

সৃষ্টি করে সুনামি। সুনির্দিষ্ট হল ঠিক কী ধরনের কম্পন এই বিশেষ ধরনের তরঙ্গ তৈরি করে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও একমত হতে পারেন নি। এবং যতক্ষণ না এটা সম্ভব হচ্ছে, জনসাধারণকে আগে থেকে সতর্ক করা সম্ভব নয়।

গত এক দশক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক এই বিপর্যয় সম্পর্কে নানাভাবে অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়েছেন। কুমিচি আইইদা নামে জনৈক জাপানী বিজ্ঞানী সমুদ্র গর্ভের ভূমিকম্পের উপর ধারাবাহিক পরিসংখ্যান তৈরি করেন। তিনি লক্ষ করেছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওই সমস্ত ভূমিকম্পের মূল কারণ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ অথবা ভূ-স্তরে ধস নামা। এরা সমুদ্রের জলে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার একটি ছকও তিনি তৈরি করেছেন। এই ছক মিলিয়ে মোটামুটিভাবে অনুমান করা সম্ভব, ঠিক কোন ধরনের ভূ-কম্পন সুনামি সৃষ্টি করবে, কোন ধরনের ভূকম্পন করবে না। অতএব ভূকম্পন-মাপক যন্ত্রে কম্পনের আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস যোগান সম্ভব হবে। নিশ্চয়ই, এ ব্যাপারে জাপানী বৈজ্ঞানিকদের ভূমিকা অনেক বেশি ব্যাপক। তাঁরাই সর্বপ্রথম এমন একটি দুর্দৈবের উপর আগাম সংবাদ যোগানর ব্যাপারে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশেও নানারকম পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যেমন ধরুন মার্কিন দেশ অথবা দক্ষিণ আমেরিকা। সমুদ্রে কোথাও কোন রকম আলোড়ন ঘটলেই সেই আলোড়ন তার মূল উৎপত্তি কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই আলোড়ন দৈনিক জোয়ার ভাটার দরুন ঘটতে পারে, আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ অথবা সমুদ্র গর্ভের কঠিন ভূস্তরে ধস নামার দরুনও ঘটতে পারে। যে কারণেই ঘটুক আলোড়নের ফলে জলের চাপের মধ্যে তারতম্য দেখা দেয়। চাপের পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে, সেটা দেখে আপাতত ওঁরা সুনামি সম্পর্কে পূর্বাভাস যোগানর চেষ্টা করছেন।

প্রাকৃতিক এই দুর্দৈবটি সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভূমিকা আরও খানিকটা ব্যাপক এবং বাস্তবতার অভি-মুখী। ওঁদের বক্তব্য, শুধু সমুদ্র গর্ভের ভূমিকম্পের উপরই সুনামির উৎপত্তি নির্ভর করে তটভূমির কাছাকাছি সমুদ্রের গভীরতা এবং তটভূমি অঞ্চলের গঠনের উপর। ওঁরা লক্ষ করেছেন, সমুদ্র যেখানে সরু খাদের মত, সেখানে বিপদের সম্ভাবনা অনেক বেশি। সোভিয়েত দেশের শাখালিন গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডঃ সার্গেই সোলোভিয়েভ এবং অন্যতম বিজ্ঞানী সার্গেই ভোইতভ অবদান এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য গবেষণা পরিচালনা করেন। যন্ত্রগণকের সাহায্যে হিসেব নিকেশ চালিয়ে তীরভূমি থেকে কত দূরে কোন ভূকম্পন ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত পড়তে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা পূর্বাভাস যোগানর পদ্ধতি বের করেছেন। এই পূর্বাভাসে সমুদ্রের ঢেউ-এর উচ্চতা কম্পনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কত দূরে কতটা পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে তারও মোটামুটি একটি হিসেব যোগান সম্ভব হয়েছে। গাণিতিক হিসেব কষে ওঁরা লক্ষ করেছেন, ঠিক যে জায়গাটিতে ভূকম্পন ঘটে, 'শকওয়েভ' যদি সেখান থেকে উলম্বভাবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া সব সময় মারাত্মক হয়ে থাকে। কুরাইলস এবং কামচাটকার যে সমস্ত সুনামির উপর তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালান তাঁদের ক্ষেত্রে এই হিসেব পুরোপুরি মিলে গেছে।

সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞান আকাদেমির ইনস্টিটিউট অভ আর্থ ফিজিক্স-এর জনৈক গবেষক সের্গেই পদিয়াপোলস্কি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোক-পাত করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, সমুদ্রের নিচেকার ভূত্বকের ঠিক যে জায়গাটিতে ভূকম্পন ঘটে থাকে সেই জায়গাটির উপরও নির্ভর করে সুনামির আবির্ভাব ঘটবে কী না। তিনি দেখেছেন ভূ-স্তরের চল্লিশ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত কোন অঞ্চলে যদি 'শক ওয়েভ' দানা বাঁধে, তাহলে সেই 'শক ওয়েভ' এমন একটি কাণ্ড অবশ্যই ঘটাবে। কিন্তু ভূকম্পনের কেন্দ্র যদি ভূ-স্তরের পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটার গভীরে থাকে সেক্ষেত্রে সুনামির আবির্ভাবের সম্ভাবনা কম।

এ ছাড়াও এই ধরনের দুর্বিপাক সম্পর্কে

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময়

কিরণকুমার রায়

এক ॥ ঢাকা

সবাই আছেন ঘরে, শ্বশুর শাশুড়ি ছেলেমেয়ে জামাই। রেডিও বাজছে। দিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন সকাল আটটায়, ভারতীয় সময়; আমাদের সময় সাড়ে আটটা। আকাশবাণী থেকে ধারাবিবরণী শুরু হয়ে গেছে। দিল্লির পালাম বিমান-বন্দরে অসংখ্য জনতা, এসেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, চঞ্চল-কণ্ঠে বিবরণী ভেসে আসছে। "এখনও বিমান দেখা যায় নি, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবে—"

চোখের জল আজ বাধা মানতে চায় না। শুধু অশুভ ছায়া ভিড় করে আসে মনে। দীর্ঘ আকাশপথ, তাঁকে বিনাশ করার জন্য কত পাক চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। তিনি নির্বিঘ্নে ঘরে এসে পৌঁছাতে পারবেন তো! আল্লা, তোমার অসীম করুণা, আস্থা রা।

"বিমান দেখা যাচ্ছে। সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে রুপালি পাখির মত বিমান, এগিয়ে আসছে, শেখ সাহেব আসছেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-জনক।"

ঘোষকের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত। জনতার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে 'জয়বাংলা।' আঃ, মন শান্ত হও, বিপদে বা আনন্দে স্থির থাকো। তিনি বলতেন। তিনি আসছেন, আসছেন তিনি।

"বিমানটিকে খুব কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে। রয়াল এয়ারফোর্সের বিমান, কমেট বিমান, কথা ছিল আমাদের বিমানে আসবেন, কিন্তু সেটি নয়।"

তবে?

বুড়ো [illegible]-এর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল, খোকা আসছে।

"বিমানটি আমার মাথার উপর দিয়ে চক্কর দিয়ে ঘুরে গেল।"

লণ্ডনের হোটেল থেকে শনিবার তিনি ফোন করেছিলেন। সেই ভরাট গলা, সেই আবেগ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বর। কান্না কোনটা হাতে তুলে নিয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ভাল আছ? জিভ ঠোঁট সব অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সেই গলা, সেই মানুষ। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ভাল আছ তো? কোনমতে জবাব দিতে পেরেছিলাম, হ্যাঁ, ভাল আছি। আমার সারা শরীর তখন কাঁপছিল। পঁচিশে মার্চের সেই কালরাত্রি, ন' মাস ধরে এই ঢাকায় বীভৎস হত্যা আর গুলি আর আগুন আর কার্ফু, মিলিটারির জুলুম, ধানমণ্ডীর এই বাড়িতে খান সেনাদের হাতে বন্দী, কী ভয় আর যন্ত্রণা, আবার তোমার কথা শুনতে পাব, আল্লা জানেন, আল্লা জানেন, দু' চোখ ভরে যদি জল টলটল করে ওঠে, আমি কী করতে পারি বলো? বলো তুমি!

"বিমানের দরজা খুলে গেছে। না এখনও শেখ সাহেব নামেন নি।' ক্যামেরাম্যানরা দৌড়ে কাছাকাছি যাচ্ছেন। জনতা উত্তাল হয়ে উঠেছে, একজন নামলেন, না ইনি শেখ সাহেব নন। আমার ঘড়িতে এখন আটটা দশ মিনিট, এই যে, হ্যাঁ, সেই দীর্ঘ-

দিল্লীর পালাম বিমানবন্দরে ভারতীয় সামরিক বাহিনী কর্তৃক গার্ড-অব-অনার অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবুর রহমান

ললাট, ঘন কালো-সাদা চুল, উজ্জ্বল চোখ, শেখ সাহেব বেরিয়ে আসছেন, শেখ মুজিবর রহমান, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি।"

তিনি এসেছেন। আঃ, শান্তি। ভুট্টো যখন তাঁকে মুক্তি দেবার কথা বলেছিলেন, তখনো ভয়টা পুরোপুরি দূর হয়নি। মার্চ মাসে এই ভুট্টোই তো পদে পদে তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন, নির্বাচনের রায়টাকে বানচাল করে, চক্রান্ত করে, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশটাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য মদৎ দিয়েছিলেন ইয়াহিয়াকে। এত সহজে তিনি ভালমানুষ সেজে যাবেন? রাজনীতি? রাজনীতি তো শেখ সাহেব সারা জীবন ধরেই করছেন। মানুষের মঙ্গলের জন্যই তো তাঁর রাজনীতি। তিনি তো ভ্রমেও কারও অহিত চাননি, শুধু দেশের জন্য, দেশের মানুষের সুখের জন্য শান্তির জন্য, নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন নিপেষণের সম্মুখে, বছরের পর বছর কেটেছে জেলে, 'বিশ্বাসঘাতক' 'দেশদ্রোহী' বলে তাঁকে চিৎকার করে গালাগাল করেছে সেই ইস্কান্দার থেকে ইয়াহিয়া পর্যন্ত সব মিলিটারি ডিক্টেটররা। তবু তিনি তো কোন হীন ষড়যন্ত্র, কোন অন্যায় পথে একদিনও চলেননি। ওদের কাছে রাজনীতির অর্থটাই ভিন্ন। ওদের কাছে রাজনীতি হচ্ছে শোষণ, পীড়ন, দমন, অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, হীনতা। ওরা কি শেষ পর্যন্ত সত্যি মুক্ত করবেন ওই মানুষটিকে? যে মানুষটির কাছে বাংলা মায়ের মুক্তি আর মঙ্গল হচ্ছে প্রাণের থেকেও বেশি মূল্যবান? তাঁকে ছেড়ে দেবে ওরা? ওই রাজনীতির নামে যারা বর্বরতার চর্চা করে? সুখবর শুনে সবাই তখন হাসছিল, কামাল জামাল হাসিনা রেহানা। রাসেল হাততালি দিয়ে নাচছিল, আব্বা আসছে। কিন্তু আমার মন থেকে ভয় দূর হয়নি।

না, রাজনীতি আমি বুঝি না। রাজনীতিকের বেগম হয়েও না। আমার কাছে এই সংসার, তিনি, ছেলেমেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ি, চার ননদ, ভাইসাব আর আত্মীয় স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশী, রান্নাবান্না। সবাই যেন সুখে থাকে, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া, অসুখে শুশ্রূষা, পড়াশোনা সকলের বিলিব্যবস্থা কাজকর্ম, আমি আর কিছু বুঝি না, আল্লা আমাকে আর বেশি ক্ষমতা দেননি, আমি এ নিয়েই তৃপ্ত। কিন্তু পাকিস্তানের পত্তন থেকে শাসনকর্তারা আমাকে স্বস্তি দেননি, শান্তি দেননি, কতবার তাঁকে জেলে পুরে রেখেছেন, তারপর যখন সারা দেশ তাঁকে বিজয়মাল্য দিল, ইয়াহিয়া, জহ্লাদ, নৃশংস, দুর্বৃত্ত, ওরা কি মুসলমান?

"স্বদেশপ্রত্যাগতকে অভিনন্দিত জানাবার জন্য রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পেছনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভ্যগণ, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন, দিল্লির আকাশে উজ্জ্বল সূর্যালোক, বঙ্গবন্ধু ন' মাস কারাজীবন কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর সোনার বাংলায়, স্বাধীন সার্বভৌম, প্রজাতন্ত্র।"

সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে উঠছে কেন? চোখের জল আজ বাধা মানবে না। খোদার অসীম দোয়া, তিনি আসছেন। রবীন্দ্র সংগীত তাঁর খুব প্রিয়, বলেন কথার সঙ্গে সুরের এমন আশ্চর্য মিল আর কোথায়ও নেই। সব থেকে প্রিয় গান তাঁর, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। আরো অনেক গানই তাঁর প্রিয়। দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না, একদিন তিনি গুণ গুণ করে গাইছিলেন। রাসেল তাঁর পায়ের কাছে তিন চাকার সাইকেল চালাচ্ছিল। আমি এক গেলাস হরলিকস নিয়ে ঢুকেছিলাম, ঘরে কেউ নেই। তিনি গাইছিলেন গুণগুণ করে, আমি ভয় করব না ভয় করব না ভয় করব না।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

দীর্ঘ নমাস পর ঢাকার বাড়িতে স্বজন পরিবৃত বাংলা দেশের প্রধানমন্ত্রী

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। বলেছিলাম, তুমি কাউকে ভয় কর নাকি?

তিনি হেসেছিলেন, ভয় করি না আবার? ভয় করি আল্লাকে, বাংলা মাকে, দেশের মানুষকে। তাই তাঁদের সাধ্যমত সেবা করি। এই মানুষটিকে দেখে আসছি কবে থেকে। সাদির পর এত বছর কেটে গেল। মানুষকে এমনভাবে ভালবাসার মত বিচিত্র মানুষ, দুঃখেও যাঁর সংস্থৈর্য হারায় না, ক্ষমাশীল, কোমল অথচ দৃঢ় নির্ভয়, অক্লান্ত পরিশ্রমী. এঁকেই ওরা বন্দী করে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, বাংলাদেশটাকে লুটেপুটে ধ্বংস করে ইজ্জত নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাড়িয়ে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিল যথেচ্ছভাবে। আল্লা তাদের শাস্তি দিয়েছেন, তিনি আসছেন, বিজয়ী বীর।

হাসিনা হাপুস নয়নে কাঁদছে। বেটি তার আব্বাকে দারুণ ভালবাসে। শুধু বেটি কেন, সবাই, সারা দেশের লোক। নির্বাচনের সময় দেখেছি মানুষের ভালবাসায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। কে একজন বলেছিল, তিনি যাচ্ছিলেন একটা গাড়িতে চড়ে মিটিং-এ বক্তৃতা দেবার জন্য। সঙ্গে নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আমেদ আরো অনেকে। একটি যুবক রাস্তা থেকে ছুটে এসে লাফিয়ে চড়েছিল গাড়িতে। দু হাত দিয়ে সে শেখ সাহেবকে জড়িয়ে ধরেছিল, চুমু খেয়েছিল, জনতা উল্লাস করে উঠেছিল। শেখ সাহেব বিব্রত মুখে সস্নেহে যুবকটিকে সামান্য সরিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। জনসাধারণের অফুরন্ত ভালবাসার কত অভিব্যক্তি রোজই দেখতে পাই।

রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণের পর বঙ্গবন্ধু এসে দাঁড়িয়েছেন মাইকের সামনে। তিনি কাগজে লিখে এনেছেন এখনি পড়বেন।...
"...This journey is journey from darkness to light, from captivity to freedom, from desolation to hope."

সেই গলা, গম্ভীর, ভারী, জোরালো কণ্ঠস্বর। অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দীত্ব থেকে স্বাধীনতায়, ধ্বংস থেকে প্রত্যাশায়। অন্ধকার, বন্দীত্ব, ধ্বংস? আজ এই সকালে সেই বীভৎস রাত্রির কথা বারবার মনে পড়ছে, পঁচিশে মার্চ, রাত্রি পৌনে একটা। ইয়াহিয়ার আলোচনার খেলা শেষ হয়ে গেছে, গাড়ি গাড়ি সৈন্য এসেছে ঢাকা শহরে। মিথ্যা কথার স্তূপ, নানা ফন্দী ফিকির, ভুট্টোর কারসাজি সব শেষ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল আজ কিছু একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটবে। এতদিন ধানমণ্ডী রোডের বত্রিশ নম্বর বাড়িটাই যেন ছিল আওয়ামী লীগের আসল হেড কোয়ার্টার্স। নেতা, উপনেতা, কর্মী, সাধারণ মানুষে বাড়িটা সব সময় গিসগিস করত। মার্চ মাসের প্রথম থেকেই দেশবিদেশের সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান এখানে বাংলাদেশের হৃদয়ের কথা জানার জন্য ভিড় জমাতেন। সব সময়ই মানুষ আসছে, যাচ্ছে। কাজের ব্যস্ততায় তাঁর তখন নাওয়া খাওয়ার ঠিকমত অবসর ছিল না। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে তিনি যখন পঁয়ত্রিশ দফা নির্দেশ জারি করে শাসন ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সারা দেশে সে কি আলোড়ন। ছুটে এসেছিলেন ইয়াহিয়া, ভুট্টো, পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে নানা নেতৃবৃন্দ। ঢাকা শহর জ্বলছে সে কি প্রত্যাশার আগুনে জ্বলেছিল। ইয়াহিয়া আলোচনার খেলা চালিয়ে যেতে লাগলেন, মনে হল, তিনি বুঝি একটা আপোসে আসবেন, ছ দফা দাবি মেনে নেবেন। কিন্তু সেটা যে শুধুই টালবাহানা, সময় কাটাবার ফিকির, সেটা বোঝা গেল পঁচিশে মার্চ তারিখ বিকেলে। সৈন্যদল রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করল, রাত্রি যত অন্ধকার হতে শুরু করল, সৈন্যদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলতে লাগল। তিনি ইয়াহিয়াকে ফোন ধরতে চাইলেন, এ কী ব্যাপার হচ্ছে? কিন্তু ধরতে পারলেন না। বসবার ঘর থেকে তিনি যখন উপরে উঠে এলেন, সদাপ্রসন্ন তাঁর মুখখানি যেন মেঘে পড়েছে ছাইছে।

বললেন, রেণু, আজ একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে পারে।

ভয়ঙ্কর ব্যাপার, আমি অতটা বুঝতে পারিনি। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটাবেন ইয়াহিয়া, জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দেবেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের খারিজ করে দেবেন? এতো পাকিস্তানে নতুন নয়। গোলাম মোহম্মদ, ইস্কান্দার সবাই করেছেন, আয়ুব খান মিলিটারীতন্ত্র চালিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা বানচাল করে নিজ কলোনি করে রাখবেন, তার বেশি কী! পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুরা তো চব্বিশ বছর ধরে এই ষড়যন্ত্রই করে আসছে।

নামমাত্র খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা দোতলায় শোবার ঘরে এসেছি। জামাল, রাসেল ও আমি বিছানায় বসে আছি। তিনি বুকে ক্রসবিদ্ধ হাত রেখে পায়চারি করে চলেছেন।

রাস্তায় সৈন্য ভর্তি ভারী গাড়ির ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা যেতে লাগল। ক্রমে শুরু হল গোলাগুলির আওয়াজ। মানুষের আর্তনাদ, অনবরত গুলির তীক্ষ্ণ শব্দ, তিনি পায়চারি করে চলেছেন। যেন এক আহত সিংহ।

রাত্রি পৌনে একটার সময় আমাদের বাড়ির সামনে সৈন্য ভর্তি কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। ঝটপট নেমেই সৈন্যরা বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করল। কয়েকটা বুলেট আমাদের ঘরের দেওয়ালে বিদ্ধ হল। নিরস্ত্র একটা পরিবারকে বিনা অপরাধে কি ওরা মেরে ফেলতে এসেছে? খোদা তালার কি তাই ইচ্ছা? আমরা খাটের তলায় আশ্রয় নিলাম, নইলে যে কোন সময় গুলি এসে আমাদের গায়ে লাগতে পারত। কিন্তু ওদের বেপরোয়া গুলি কিছুতেই থামছে না। তিনি তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অবিরত গুলির মধ্যেও তিনি অবিচলিত।

তিনি বললেন, তোমরা সবাই এ ঘর থেকে চলে যাও।

তুমি? আর্তনাদ করে উঠলাম।

যাও। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর; এ আদেশ অমান্য করি আমার সাধ্য নেই। আমরা বাথরুমের ভেতর গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ছেলেরা আমার সঙ্গেই ছিল, জামাল ক্রোধে ফুঁসছিল।

তিনি তখন চেঁচিয়ে বললেন, আমি বাইরে আসছি। আমাকে ধরবে তো? ধরে নিয়ে যাও, বাট আই সে, স্টপ শুটিং।

কিন্তু তখনই একটা বোমা বিস্ফোরণ হল, বিকট আওয়াজে তাঁর কথা ডুবে গেল। তখন, সৈন্যরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গুলি চালাতে চালাতে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে ছুটে আসছে। সারাটা বাড়ি ওরা ঘিরে রেখেছে। একদল ছুটে গেছে ছাদে,—সবুজ, লাল, সোনার বাংলাদেশের পতাকায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

বাচ্চা চাকরটা ভয়ে কাঁদছিল। তিনি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোখের জল মুছিয়ে দিলেন, সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, কাঁদিস না বাপ, কালই তোকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। তিনি সৈন্যদের চিৎকার করে বললেন, হোল্ড ইয়োর ফায়ার, আই অ্যাম ইন মাই রুম। সেই বজ্রকণ্ঠের হুকুম, সৈন্যরা গুলি চালান বন্ধ করল।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন, অফিসারের খোঁজ করলেন। আমি তখন বাথরুম থেকে শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি। তিনি অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন, কি কথা হল জানি না। তিনি ঘরের মধ্যে এসে আমাকে বললেন, রেণু, আবার বন্দী হলাম, আমার নিত্যব্যবহারের সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে দাও।

তিনি আবার বাইরে গেলেন। অফিসারের কাছে এই বেপরোয়া গুলি-বর্ষণের কারণ জানতে চাইলেন। অফিসার নিশ্চুপ। আমি তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি, আমার বুকের মধ্যে কান্না, কালবৈশাখী ঝড়ের ঝড়, আমার হাত আড়ষ্ট হয়ে আসছে।

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কতবার জেলে গেছেন, কিন্তু এমনভাবে সারা শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে বাড়ি আক্রমণ করে কখনো সৈন্যদল তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়নি।

তিনি এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকালেন। ঠোঁট একটু কাঁপলো, অস্ফুট বাক্য আর ধ্বনিত হল না। তিনি ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন। সৈন্যদলের গাড়িগুলি তাঁকে নিয়ে চলে গেল, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন।

ন' মাস তোমার খবর জানি না। আমাদের বন্দী করে রেখেছিল ওরা। কামাল জামালেরও খবর পাইনি। পাক সেনাদের কড়া পাহারায় আমাদের দিন কেটেছে। আবার কোনদিন যে আলোর মুখ দেখতে পাব, ভাবিনি; স্বাধীনতা, সুখ, শান্তি, তুমি বলতে তোমার অগাধ বিশ্বাস ছিল, খোদা আমাদের নিশ্চয়ই বঞ্চিত করবেন না। আহা হা, তুমি এসেছ দিল্লীতে, তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি, এই যে তুমি বাংলায় বলছ প্যারেড গ্রাউণ্ডের সমাবেশে, তুমি বলছ, "কী চেয়েছিলাম? —বাঁচবার অধিকার চেয়েছিলাম, তার প্রতিদানে পেয়েছিলাম বন্দুক, বুলেট, গুলি। আজ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।" আল্লা তোমার স্বপ্ন সফল করেছেন; তুমি এসেছ, ওগো, আজ চোখের জলে ভাসতে ভাসতে, নিজের কাছে লজ্জা না করে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছে কবিগুরুর সেই কবিতা, ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়!

দুই ॥ বিমানে, ঢাকার পথে

আমি মুজিব, কী চেয়েছিলাম আমি? ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মেছি, দেখেছি মানুষের উপর কী নিদারুণ অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, হিংসা। আমার চোখ পানিতে ভরে গেছে। খোদা, সভ্যতার এত কাল পেরিয়ে এসেও মানুষই মানুষকে জানোয়ারের মত এমনভাবে পীড়ন করতে পারে! নদী নালায় জলভরা শস্যশ্যামল আমার জন্মভূমি, মাটির মতই এদেশের মানুষের মনও বড় কোমল। আকাশে পানি, খালে বিলে পানি, মানুষের চোখেও পানি। দুঃখের পানি—আনন্দের পানি বড় দুর্লভ।

আজ আমার দু চোখ ভরে পানির ধারা। এক চোখে আনন্দের, এক চোখে শোকের। সোনার বাংলা আজ স্বাধীন; কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হল লক্ষ লক্ষ প্রাণ, মা বোনের ইজ্জৎ, গ্রামের পর গ্রাম,

ঢাকায় ফিরে রমনার ঐতিহাসিক রেস-কোর্স মাঠে সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণরত শেখ মুজিব

বাড়ি থামার ইস্কুল হাসপাতাল কলকারখানা সব আজ ধ্বংসস্তূপ।

গোপালগঞ্জের ইস্কুল থেকে পাস করে পড়তে গিয়েছিলাম কলকাতায়, থাকতাম বেকার হস্টেলে। দেশ তখন পরাধীন, বাংলায় মুসলিম লীগ, তার আগে শের-এ বাংলা মন্ত্রিত্ব করলেও, তাঁদের ক্ষমতা কতখানি? ইংরেজ গভর্নর, ইংরেজ আমলা, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাই সর্বেসর্বা। তখনো যুদ্ধ চলছে, কলকাতার পথেঘাটে গোরাসৈন্য, জীবনের অপচয়, তারই মাঝখানে দেখেছি কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। দেখেছি গোরা পুলিসের ঘোড়ার সামনে অসমসাহসী নিরস্ত্র যুবক যুবতীকে ছুটে যেতে।

না। আমি তখন সে সংগ্রামের সামিল ছিলাম না। আমি ছিলাম মুসলিম লীগের গোঁড়া কর্মী। আমি মুসলমান, আমি বাঙালী। বাংলাদেশে সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে নিরস্ত্র নিরক্ষর মূঢ় মানুষ তখন কোটি কোটি বাঙালী মুসলমান। ঐশ্বর্যবান, এমনকি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান তখন আঙুলে গোনা যেত। মুসলমান আর নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তখন সবচেয়ে দুঃখী, দরিদ্র, শোষিত, অত্যাচারিত। আমি তখন স্বভাবতই মুসলিম লীগের ছাত্রকর্মী। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি তখন আমার নেতা। পাকিস্তানের স্বপ্ন তখন আমার চোখে রঙীন। বাঙালী মুসলমানের কষ্টের দিন শেষ হবে। আসবে নতুন প্রভাত। নতুন সূর্য।

চৌদ্দ অগাস্ট, উনিশশো সাতচল্লিশ। সে খুশির দিনটি ভুলব না কোনদিন। ইংরেজের পতাকা নেমে গেল, উঠল স্বাধীন পাকিস্তানের পতাকা। আমার চোখে পাকিস্তান ছিল হিন্দু-মুসলিম সমস্যার স্থায়ী সমাধান। পাকিস্তানে মুসলমান সংখ্যাগুরু, ভারতে হিন্দু। কিন্তু দুই স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানেও থাকবে হিন্দু, ভারতে মুসলমান। সংখ্যালঘু হলেও তাঁরা সকলের সঙ্গেই চিরস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করবেন।

ভারতের উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। কলকাতায় এবার নামা হল না, ঢাকায় সরাসরি পৌঁছতে হবে। দুপুরের উজ্জ্বল আলোয় নিচে দেখা যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ, বাড়িঘর গ্রাম, নদী, দূরে দূরে শহর, কলকাতা আরো দূরে। কামাল তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। কামালও আমার সঙ্গে পাকিস্তানে নির্জন কারাবাসের নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

কলকাতা পেরিয়ে গেলে ঢাকা পৌঁছতে কতক্ষণ? ইসলামিয়া কলেজ, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, মৌলালি, পার্কসার্কাস ময়দান এখনও সে রকম আছে কি? কলকাতা থেকে এসেছিলাম ঢাকায় আইন পড়তে। কিন্তু পাকিস্তানের কর্তারা আমাকে পড়তে দিল না, কলেজ থেকে রাস্টিকেট করে দিল।

কেননা, আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে কর্তারা যে আমাদের নতুন গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়, সেই ষড়যন্ত্রটা আমরা ধরে ফেললাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে জিন্না সাহেব বললেন, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাঙালী ছাত্ররা সমস্বরে বলে উঠল, নো নো। এই নো নো, না না চব্বিশ বছর ধরে বাংলার আকাশে বাতাসে মুখর হয়ে উঠেছে। ওরা বুলেট চালিয়েছে, বাঙালী আর্তনাদ করে বলেছে না আ আ; ওরা জেলে পুরেছে বাঙালী তীব্রস্বরে বলেছে না আ আ; ওরা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়েছে, বাঙালী বলেছে না আ আ; ওরা নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মেরেছে, বরকৎ সালেম মুক্তাজরী কণ্ঠে গর্জন করে উঠেছে, না না না। এ হতে দেব না।

ওরা লাহোরে গৃহীত পাকিস্তানের প্রস্তাব কবর দিয়ে আমাদের বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল ক্রীতদাস। আমাদের থেকে ওরা

পশ্চিমাঞ্চলে, হাজার মাইল দূরে, জলপথে তিন হাজার মাইল। ওদের ভাষা ভিন্ন, খাদ্য পানীয় পোশাক পরিচ্ছদ, আদবকায়দা সব ভিন্ন। তার উপর ওরা লোকসংখ্যায় কম। পাকিস্তানের প্রায় ষাট শতাংশের ভাষা বাংলা, মানুষ বাঙালী, রাজস্বসম্পদ বাংলাদেশের। তবুও ওরা মাথার উপর কায়েম হয়ে বসেছিল। সেখানেই রাজধানী, সংখ্যালঘুর ভাষা রাষ্ট্রভাষা, ওদেরই মাটিতে সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ। ওরা এই অস্ত্রবলে আমাদেরকে চিরকালের জন্য গোলাম বানিয়ে রাখার দিবাস্বপ্ন দেখে দাড়িতে আতর ঘষছিল।

কেন না, ওদের চোখে আমরা নাকি আধা-মুসলমান, আমরা কাফের, আমাদের গায়ের রং কালো, ভাত-মাছ খাই, মুখবাজ নই, আমরা বড়ই নিরীহ নির্বিরোধ ভাল-মানুষ। মাতাল গবর্নর ফিরোজ খান নুন তো এ কথা স্পষ্টই বলেছিলেন। [illegible] ঈদ নামাজ পড়তে গিয়ে মওলানা হক সাহেব তো আল্লার কাছে দোয়া মেঙে-ছিলেন, পাকিস্তানের খাঁটি ইস্ট পাকি-স্তানের মুসলমানদের যেন দমন [illegible] ওঠে। ডিক্টেটর আইয়ুব খান তো তাঁর 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স' গ্রন্থে শের-এ-বাংলা থেকে শুরু করে বাঙালীর কেচ্ছা গেয়ে শেষ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানদের ঠিকুজি সম্বন্ধে পণ্ডিতী ফলিয়ে দিয়ে ছিলেন, আমাদের উৎপত্তি নাকি বহুযুগের পরপদানত, অনুন্নত ও নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে। আমরা এখনও স্বাধীনতার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। অথচ কী আশ্চর্য, ওরা রোজার দিনে খানা খায়, মদ খায়, আমরা শুদ্ধাচারী, তবু ওরাই মুসলমান আর আমরা আধা-আধি! আমরা স্বাধীনতার মর্ম বুঝি না।

তাঁরা দয়া করে আমাদেরকে স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবার জন্য- আমরা যে বাঙালী, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি যে বাংলা, এ কথাটা বিলকুল ভুলিয়ে দেবার জন্য কিছুমাত্র কসুর করেন নি। [illegible] বাতিল করে [illegible]। [illegible] বুকে যে মাঝি প্রাণের আবেগে গান গেয়ে ওঠে, মা আমার গরীব কত, তাকে স্বপ্ন দেখতে হবে রুক্ষ মরুভূমির, তাকে বলতে হবে দুর্বোধ্য কৃত্রিম ভাষা এক বাংলায় যা, যে ভাষায় বাংলার অনুবীক্ষণ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়।

কেননা, ওরা আমাদের বাঙালীর জাতীয়তাবোধ মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এটি নির্মূল করতে না পারলে আমাদের রুজিরোজগার লুঠ করা যাচ্ছিল না; ভারত-জুজুর ভয় দেখিয়ে ইসলাম বিপন্ন জেহাদ তুলে রাইফেল স্টেনগান কামানের দাপটে চিরকালের জন্য আমাদেরকে ক্রীতদাস করা সম্ভব হচ্ছিল না।

আমাদের জাতীয়তাবোধ যত প্রসারিত হচ্ছিল, ওরা সাংবিধানিক [illegible] তত সংকুচিত করছিল। শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী মিলিটারি শাসন এলো। ইস্কান্দার, আইয়ুব, ইয়াহিয়া, [illegible] শরমটুকুও আর রাখলেন না।

মিলিটারী রাজত্ব, সাধারণ মানুষের সমস্ত স্বাধীনতা লুণ্ঠিত। ওরা ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল ছড়িয়ে দিল সারা দেশে। ভয়ে আতঙ্কে দেশটা যেন বোবা হয়ে যায়, আর কিছু ভিক্ষা ছুঁড়ে দিল যেন কিছু তোষামোদী চাটুকার দেশদ্রোহী তোতাপাখির মত তাদের শেখানো বুলি আওড়াতে পারে।

কিন্তু...

সারা বাংলাদেশের একটিমাত্র আওয়াজ, না না না। হতে দেব না, না না না। সত্তর সালের নির্বাচন একথা প্রমাণ করে দিল। সমস্ত পৃথিবী সাক্ষী।

বাংলাদেশের ছ'দফা দাবি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, নিজস্ব বাণিজ্য ও রাজস্ব এবং আপন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

আমরা পল্টনের ময়দানে খোলাখুলি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করলাম, চন্দ্রসূর্য যতদিন থাকবে, ততদিন কেউ আমাদেরকে এই ছ'দফার দাবি থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

পারবে না, কেউ না। ইয়াহিয়া আলাপ-আলোচনার ছদ্ম আবরণ নিয়ে ছুটে এলেন ঢাকায়। আমি বললাম, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে তোমরা দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

ওরা ছদ্ম পোশাক খুলে রেখে আসল স্বরূপে বেরিয়ে এল পঁচিশে মার্চ নিশীথ নগরী ঢাকায়। আমাদের শুরু হল মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ওরা আমাকে বন্দী করে রেখেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে। সামরিক বিচার চালিয়েছিল। ফাঁসির হুকুম হয়ে গিয়েছিল, কবর খোঁড়াও বাকি

ছিল না। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে ওরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তাতে আমার ক্ষোভ থাকত না: কেননা দেশের মুক্তির জন্য আমি প্রাণ দিতে চেয়েছিলাম। পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায় যখন ধানমণ্ডীর বাড়িতে আমাকে আত্মগোপন করার জন্য তাজউদ্দিন কাঁদছিল অবিরল ধারায়, বলেছিলাম,—না, তোরা একুনি চলে যা, নির্দেশ মত সংগ্রাম চালিয়ে যা। সে সংগ্রাম আজ সফল হয়েছে।

কিন্তু চোখে আজ পানি কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না, মগো! লক্ষ লক্ষ লোককে ওরা নৃশংসভাবে খুন করেছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, মা-বোনদের ইজ্জৎ নিয়েছে। শয়তান, কাপুরুষ, ইতর, বর্বর, পাকিস্তানের নামে এই তোদের জালিয়াতির রাজনীতি?

কলকাতা পেরিয়ে এসেছি। রাজ্যপাল ডায়াস শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কলকাতায় এবার নামা হল না। ঢাকার হাজার লোক অপেক্ষা করছেন, বীর আত্মীয়বৃন্দ, আবার দেখা হবে।

এই যে নিচে দেখা যাচ্ছে আমার সোনার মা বাংলা, আঃ, এতদিনে জীবন সার্থক হল। ইন্দিরা গান্ধী তোমাকে নমস্কার, ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী জিন্দাবাদ। কি মধুর হাওয়ার পরশ লাগছে, আঃ কি আনন্দ! সারা আকাশ ভরে আজ আলোর মায়া; রেণু, আজ গুণগুণ করে গান গাইতে ইচ্ছে করছে, এই আকাশে আমার মুক্তি, আলোয় আলোয়।

তিন ॥ কলকাতা

দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর ফিরে যাচ্ছি দমদম বিমানবন্দর থেকে। শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় নামলেন না। তিনি সোজা ঢাকা চলে যাচ্ছেন। প্রতীক্ষা অসফল, তবু ক্ষোভ করব না, মুক্ত মুজিব মুক্ত ঢাকায় ফিরে যাচ্ছেন।

ভোর বেলায় ট্রানজিস্টারটি খুলেই পুরে দমদমে এসে হাজির হয়েছিলাম। একটু চোখের দেখা দেখব বিজয়ী বীরকে। লোকারণ্য বিমানবন্দর, নানা দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও এখনকার গণ্যমান্য লোকেরা হাজির। সকলেরই আশা ছিল, শেখ সাহেব আধ-ঘণ্টার জন্য হলেও দমদমে নামবেন।

ট্রানজিস্টর খুলে দিল্লিতে মুজিব সম্বর্ধনার ধারাবিবরণী শুনেছিলাম উল্লসিত মনে। তাঁর বাংলা ভাষণ, তাঁর আবেগ, তাঁর দেশপ্রাণতা মুগ্ধ করে রেখেছিল।

সালাম শেখ সাহেব। আপনি যে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন, সে দেশেই আমার জন্ম, আমার কৈশোর আমার প্রথম যৌবনের মধুর দিনগুলি সেখানেই কেটেছে। আমার জন্মভূমি, আমার মা। সেখানে আমার শিক্ষক ছিলেন গফুর সাহেব, হক সাহেব। ইস্কুলের বন্ধু সিদ্দিক, নুরু, মুস্তাফা। আমরা হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ জানতাম না। যখন ছোট ছিলাম কংগ্রেসের ডাকে লোকনাথ দীঘির মাঠে হাজির হতাম, খবরের কাগজে পড়তাম রাজনৈতিক, দলাদলির সংবাদ। গাজী ছিল মুসলিম লীগের পাণ্ডা। তার প্রাণের বন্ধু ছিল শশধর বণিক। সিদ্দিক, আমি, গাজী, শশধরে কোন প্রভেদ ছিল না, লুঙ্গি আর ধুতি ছাড়া; বন্ধুর বেশি ভাই। কিন্তু খবরের কাগজের হেডিংগুলো বড়দের রাজনৈতিক কাণ্ডকারখানা আমাদের সব কিছুতে মিল রেখেও মিটিং-এর ময়দানে আলাদা করে দিল। কলকাতায় পড়তে এসে আপনি যখন বেকার হোস্টেলে, আমি ওয়ান হোস্টেলে; স্বাধীনতা এল। পরের বছর গিয়েছিলাম জন্মভূমিতে; ফয়েজ, সালাউদ্দিন, আখতারুজ্জামান, মতি, বিশ্বনাথ মিলে সংস্কৃতি মজলিস, নজরুল ইসলাম, নাট্যাভিনয়। তারপর যেন শূন্যতা।

আসা যাওয়া বন্ধ, মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

দুই বাংলাকে পাকিস্তানের তরবারি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আপনাকে নিয়ে উজিরে আজম ফজলুল হক সাহেব কলকাতায় এসে যখন বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দুভাগ হয়েছে সত্য, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বাংলার মাঝে কোনই ফারাক নাই।' মনে আছে, লাফিয়ে উঠেছিলাম। একথার জন্যই হক সাহেবের মন্ত্রিত্ব না থাক, সে তো যেতই তাঁকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা নিয়ে ঢাকার বাড়িতে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল।

ইংরেজ যে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িকতাকে স্ফীত পরিপ্লাবিত করেছিল, পাকিস্তান তাকে বাঁচবার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আশ্রয় করেছিল। ধর্মের বিদ্বেষ যে কত মারাত্মক, 'আলবদরের' হিংস্র, নির্মম, পাশবিক কাণ্ডকারখানায় তা দেখা গেছে।

শেখ সাহেব, আপনি চব্বিশ বছর ধরে একনাগাড়ে এই ভূতের মূলোৎপাটন করার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এই ভূতের বিরুদ্ধে, জুলুমবাজির বিরুদ্ধে, মিলিটারী দস্যুতার বিরুদ্ধে। আমরা সে খবর বেশি পাইনি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আইয়ুবের পতন থেকে আপনাকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারছি। নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, অসহযোগ আন্দোলন। তখন থেকেই আপনার পেছনে সমস্ত ভারতীয় মমতা প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অন্ধকার গ্রাস করল বাংলাদেশকে, বিশ্ববিবেক জেগে উঠেও বিশ্বনায়কদের কপটনিদ্রা ভাঙাতে পারল না। প্রতি মুহূর্তে আমরা যন্ত্রণা ভোগ করেছি: প্রতিটি বাংলাদেশীয়ের হত্যা ও উৎপীড়নে আমরা আহত হয়েছি। তাঁদের মুক্তি আমাদেরও মুক্তি। চোদ্দদিনের যুদ্ধের পর বিষাক্ত নাগিনীদের দলিত করে আপনি মুক্ত, বিজয়ী বীর ফিরে যাচ্ছেন মাতৃক্রোড়ে। আমাদের কৈশোরের নৈরাশ্য, যৌবনের ভয়, আপনি তরবারির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে আমাদের স্বপ্ন সফল করেছেন। এ যে কত বড় বিজয়, রাজনীতির নয় মনুষ্যত্বের, বাংলাদেশে যার জন্ম হয়নি সে পুরো উপলব্ধি করতে পারবে না।

বেলা পৌনে একটায় খবর এল, আপনি সোজা ঢাকা চলে যাচ্ছেন। আমাদের প্রতীক্ষা সফল হয়নি, না হোক, খেদ নেই, স্বাধীন দেশে আপনাকে যে পুনর্গঠনের নতুন সংগ্রাম শুরু করতে হবে। অনেক দিনের অনেক জঞ্জাল জমা হয়ে আছে, অনেক বিষাক্ত সাপ রাতারাতি খোলস বদলে প্রয়োজনীয় দড়ির চেহারা নিয়ে মন ভোলাতে চাইছে। এক যুদ্ধ জয়ের পর নতুন যুদ্ধ। ক্ষোভ ছাড়াই এই ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর অভুক্ত দেহে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। সালাম মুজিব, জয় বাংলা।

চার ॥ ঢাকার উপকণ্ঠ

রাণী, অনেক রাইত হইল, এখন ঘুমাও।

ঘুম আইতাছে না।

এমনে কইর না। মুজিভ ভাই ত আইয়া গেছেন। সেই ভোর থনে বইসা ছিলাম রেসকোর্সে, দেইখ্যা পরানডা ভইরা গেল। আহাহা, কান্দে না, কান্দে না, রাণী সব ঠিক হইয়া যাইব। বঙ্গবন্ধু আইসা গ্যাছেন। রাণী অত কান্দ কেন? এ কি তুমার একলা? তুমার মত কত মাইয়া.....শুনে শুনে ব্যাকুল হইও না; এবার ঘুমাও, সুনা।

খোদা—

কাইন্দ না রাণী, রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধু কাইন্দা ভাসাই দিলেন। দেশের মানুষরে কত ভালবাসেন তিনি, খানরা যে আমরারে মাইরা ধ্বংস করছে, এই শোক তিনি সামলাইতে পারতাছিলেন না। শুনছ ত রেডিওতে।

হুঁ।

চব্বিশটা বছর ধইরা পাকিস্তানীরা যে অত্যাচার করছে বঙ্গবন্ধু বুক দিয়া আটকাইতে গ্যাছেন। কতবার জেল, পুলিসের মার, কত কিছু ভোগ করছেন। এতটুকু টলেন নাই, আইজ তিনি কাইন্দা ভাসাইছেন। রাণী, এমন মানুষ আর হয় না, আল্লার দোয়া, এমন মানুষ আমরার লীডার। আরে বোকা, কান্দে না, বাংলা সরকার ঘোষণা করছেন, তুমরা মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা।

মন মানে না—

খানরা ত দাশটারে ছারখার কইরা দিছে। ওরা ত শত্রু, তুমি কি একলা, কোন্ পরিবারটা সুস্থ আছে ক ত। কার বাড়িঘর ঠিক আছে, আত্মীয় স্বজন সব জীবিত আছে, কও তুমি। দুঃখ কইর না, এবার নতুন দিন আইব। শিকল ভাইঙ্গা লীডার আইসা গেছেন, আর কষ্ট নাই।

তুমি—

জান, বঙ্গবন্ধু ময়দানে খালি কানতেছিলেন। কইলেন—

আমি সব শুনেছি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছি।

রাণী এবার আর কান্দা না, এবার ঘুমাও, এমন নিশ্চিন্তে আর কোনদিন ঘুমাই নাই। নয়টা মাস দক্ষযজ্ঞের পর মুজিব ভাই দ্যাশে ফিরছেন, এখন আর ভয় নাই, দ্যাখো।

মুজিব ভাই—

মুজিব ভাই আইসা গ্যাছেন, রাণী, আমরার সব দুঃখ ঘুচব। সব স্বাধীন মুজিব, আমরা, আমরার পোলাপানরা মানুষের মত মানুষ হইব। খোদা মেহেরবান।

হানা মোরি ইন্ডিয়া

শ্রীমতী পুপুল জয়াকর সেদিন বললেন, বিদেশের "সোনা" দোকানগুলিতে এখন থেকে বিক্রী আরম্ভ হবে হানা মোরি ইন্ডিয়া। এ বিচার অতি বিচক্ষণ নির্ধারণ। অনেক আগেই আমাদের রপ্তানীর বিশেষজ্ঞদের মনে হবার কথা ছিল। বিদেশে আজও ভারতীয় চায়ের রসিক খদ্দের আছে। তাদের আমি দেখেছি দোকানে-পাটে ঘুরে ভারতীয় চা খুঁজতে। লিপটনের চা আছে, ব্রুকবণ্ডের চা আছে; কিন্তু ভারতীয়তার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কই? হয়তো বা খদ্দেররা ঠিকই বলেন। চায়ের নিলামে কেনা গাদা গাদা চা যখন বিদেশের বাজারের জন্য মেশানো হয়, সব সময় শুধু ভারতীয় চায়ের মিশ্রণ নাও হতে পারে। ভারতীয়তার identification বা সনাক্তকরণ সব ভারতীয় পণ্যের জন্য বিশেষ দরকার। সাধারণ খদ্দের কি করে জানবে, কি করে চিনবে যদি চিনে নেবার কোন চিহ্ন না থাকে? কাপড়ের বেলাতেও তাই।

ভারতীয় কাপড় দিয়ে, ভারতের রেশম আর সুতীর হাতে বোনা অপূর্ব সৃষ্টি দিয়ে বিদেশী dress-designer অর্থাৎ পোশাকশিল্পী সৃষ্টি করছেন নিত্য নূতন বাহার। এই তো সেদিন পিয়ের কার্দাঁ কিনে নিয়ে গেলেন খাদির সুতীর হাতে বোনা কাপড়। নাম হয়েছে তার Gandhi cloth। তারপর দেখলাম পিটার গোল্ডিংকে। তিনিও সেই ভারতীয়তার সন্ধানে এসেছিলেন। ক'দিন আগে এলেন মাদাম হানা মোরি। পিয়ের কার্দাঁ, পিটার গোল্ডিং-এর সমকক্ষ শিল্পী। তাঁর জন্য পোশাক পর্বে টোকিও প্যারিস্, লণ্ডন বা নিউইয়র্ক কারও চেয়ে কম নয়। তার উপর তিনি পুরুষ পোশাকে ও মহিলা পোশাকে সমানভাবে সৃষ্টিব নূতনত্ব দেন। তাঁর দলটিও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত মোরি। তিনি দেখেন ব্যবসায়ের দিক। কেমন করে বাজার সামলানো যায় তা তিনি ভাল করে জানেন। বাজারের ব্যাপারে মাদাম মোরি মাথা ঘামান না। হানা মোরির বোন শ্রীমতী মুরাকামি মাদামকে সাহায্য করেন কেনা-কাটায়। মুরাকামির কাজ পছন্দ করার প্রথম দায়িত্ব। ঘুরে ফিরে বেছে দিলে মাদাম হানা মোরির পক্ষে কাজ সহজ। চট করে মন স্থির করতে পারেন। এমন একটি পারিবারিক ব্যবসায় ব্যবস্থা জাপানী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। আমার কিন্তু বার বার মনে হচ্ছিল কাটা কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরী ভারতীয় মেয়েরা আরম্ভ করেন নি তা নয়। তাঁরা কলকাতায় এবং অন্যান্য বড় শহরে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভও করেছেন। শুনেছিলাম, একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের

প্রতিষ্ঠা তেমন হয়নি। জানি না, কেউ সে বিষয় চিন্তা করেছিল কিনা। বিদেশের রূপরসিক কিন্তু পোশাক অনেক ক্ষেত্রে ভারতেই তৈরী করান। আমাদের শিল্পী যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদেশের

হানা মোরি

বাজারের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেন এবং বিদেশের ভারতীয়তার প্রতি এই আকর্ষণ থাকতে থাকতে বাজারে খ্যাতিলাভ করেন তবে সৃষ্টি-কেন্দ্র থেকে পরিবেশন কত সহজ হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার হাল আমাদের অত্যন্ত আশাপ্রদ। গত তিন বছরে বেড়েছেও বেশ। মার্কিন দেশের তথাকথিত aid-এর সুদ শুধে করে আমরা ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছি। কাজেই তাঁদের চোখরাঙানি আমাদের কাবু করতে পারছে না। কিন্তু ভারতের নূতন রূপের জন্য চাই আরও বৈদেশিক মুদ্রা। বৈদেশিক মুদ্রার স্বোপার্জিত অংশ বেড়ে যাবে অনেক বেশী যদি আমাদের মেয়েরাও নূতন নূতন পথে এসে নূতন দিনের সূচনায় অধিকতর অংশ গ্রহণ করেন।

পোশাক রচনা এক শিল্প। এ শিল্পের শিল্পী, শিল্পীমন ভারতে মিলবে না কেন? হানা মোরি জাপানের যুবরাজবধূ মিচিকোর জন্য বেনারসী শাড়ি দিয়ে সান্ধ্য সাজ রচনা করেছেন। এমন সাজ যে দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। এমন সৃষ্টি-বিভ্রান্তকারী রচনা নিশ্চয়ই আমাদের পোশাকশিল্পী একদিন করবেন। নামের মায়ায় আমাদের শিল্পী কখনও কাজ করেননি একথা সত্য। ঐতিহ্যে শত ইতিহাসে কোথাও তাঁরা স্বাক্ষর রেখে যাননি, কারণ আত্মপ্রচার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যে শিল্প ব্যবসায়ে পরিণত হবে তার জন্য প্রচার এক অঙ্গ বিশেষ। পোশাক রচনায় স্বীকৃতি হবে উচ্চ মহলে তবেই হবে শিল্পের কীর্তি। হানা মোরির তাই ধন্য। তাঁর পোশাক নাকি পরেন রাজপরিবার মাত্র নয়। প্রধানমন্ত্রীর গৃহিণীর পোশাক রচয়িত্রীও তিনিই। কাজেই উচ্চ কোটির অভিজাত মহলের স্বীকৃতিও সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের জওয়াহর কোট জগত জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে কারণ পণ্ডিত নেহেরু পরতেন বলে। অথচ সেই জওয়াহর কোটের অজ্ঞাত শিল্পী অজ্ঞাতই রয়ে গেল। মহম্মদ ওমর যদি identification বা সনাক্ত করার চিহ্ন দিয়ে পরিচিতি জানাতেন, আজ তিনিও এক পিয়ের কার্দাঁ বা পিটার গোল্ডিং-এর পর্যায়ভুক্ত শিল্পী বলে খ্যাত হতেন।

তাই বলছিলাম এ সুযোগ ছাড়বেন কেন? রূপশিল্পী জাপানের নূতন শিল্প হয়ে উঠেছে পোশাক। পোশাক রচনায় আবার মেয়েরা আসছেন এগিয়ে। ফুল-সাজানো বা পুতুল তৈরী, অপূর্ব চিত্রকলা বা অদ্ভুত কারিগরীর মত মেয়েদের নিপুণ দুখানা হাত গড়ে তুলছে বিশ্বসভার যোগ্য করে। সৌন্দর্য রচনায় ভারতীয় মেয়েদের প্রতিভা কিছু কম নয়। এ নূতন মাধ্যম তাঁরা অনায়াসে বরণ করতে পারেন। একটু কর্মপ্রচেষ্টার অভিযান চাই। তৎপরতা ও বিদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে সচেতনতা, ফ্যাশন সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি একত্র করতে পারা চাই। ফ্যাশন শুধু শিল্প নয়, ফ্যাশন এক পূর্বানুমান বা forecast। দেখেছি ফ্যাশনের জন্ম। আরও দেখেছি ফ্যাশন ফ্যাক্টরি কেমন হইচই করে সময়মত ফ্যাশন-মাফিক জিনিসটি উপযুক্ত বাজারে পেশ করেছে। পেশ করার ক্ষণটি পর্যন্ত যেন হিসেব করা। আফ্রিকার উষ্ণ স্থিরবৃত্তি কোথায় ফ্যাশনের হাওয়া বইবে। হংকং-এর

বাজারে যেন এক ভবিষ্যদ্বাণী। কেমন করে আগেই পরিকল্পনা নেয়। বাজারে জিনিস সময়মত হাজির। তৈরী কিন্তু কোন সুদূরে। ছাপমারা পোশাক, তৈরী হংকং-এ। নমুনা নকশায় মনভোলানো।

ভারতীয় কাটছাট-এর ঐ সুবিধা আছে। পশ্চিমে দরজী-বাড়ির দারুণ কদর। কাজেই পোশাক শিল্পী এখানে সেলাই করিয়ে খরচা বাঁচান যেমন বাঁচান তাঁরা হংকং-এ। সে সুযোগ আমরা নিজেরাও কিছু কিছু নিতে পারি। সাক্ষাৎ সংযোগ হবে শিল্পী আর কারিগরে। ধন্য হবে রূপ-দক্ষতার এক অভিনব প্রকাশ। বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডাকতে হবে না। হানা মোরি যেমন, এশিয়াবাসিনী কিন্তু দোভাষীর মাধ্যমে জয় করেছেন পশ্চিমের পোশাকপাগল দুনিয়া। কালো প্যান্ট স্যুট পরা ভিতরের কামিজটি ঘোর লাল—হানা মোরি স্বয় জাপানী মেয়ে। ওঁর আচার আচরণে প্রাচ্যের মাধুরী। অমনি করেই একদিন ভারতীয় মেয়ে হয়তো রূপ দেবে ফ্যাশনের স্তরে স্তরে।

শ্রীমতী

একশো বিশ রাতের একরাত

আমিনুর রশীদ চৌধুরী

আজ আট দিন আমি পাকিস্তান সেনা-বাহিনীর হাওলায়। ছয়ই আমাকে ছলনা করে শ্রীমঙ্গল মিলিটারী ক্যাম্পে আনা হয়। আমার অপরাধ অনেক—আমি আজীবন হিন্দুদের বন্ধু—আমার কাছে মুসলমানেরা আমল পান না। আমি এককালের কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী। আমি নাকি ঘটা করে প্রত্যেক বছর রবীন্দ্রনাথের পূজো আমার বাড়িতে করাই। হিন্দুদের সব কিছুতে নাকি আমায় পাওয়া যায়। আমাদের প্রেসে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এমন এক প্রচারপত্র ছাপা হয়েছিল যাতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিস বাহিনী ও সৈন্য বিভাগে কর্মরত বাঙালীদের বিদ্রোহ করতে বলা হয়েছিল। আমার স্ত্রী রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের কাছে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য মনোনয়ন প্রার্থী হয়েছিলেন। তদুপরি এপ্রিল মাসে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বহু গাড়ি ট্রাক ট্রাক্টর চা-বাগানগুলি থেকে যোগাড় করে দিয়েছি। এবং সর্বোপরি মুক্তিবাহিনীর জন্য একদিনে নব্বই হাজার টাকা যোগাড় করে দিয়েছি।

শ্রীমঙ্গল থেকে মৌলবীবাজার, ওখান থেকে সিলেটে সাল্‌টিকর বিমানঘাঁটির কাছে মডেল স্কুলের এক বাড়ির দোতালায় সাতফুট পাঁচফুট এক ঘরে আমি বন্দী। ঘরের জানালা পশ্চিমমুখো—অর্থাৎ দুপুরের পরেই ঘরে রোদ ঢুকে তন্দুরের মত গরম হয়ে ওঠে। পরনে যে কাপড় পরে ঢুকেছিলাম তাই রয়েছে। ঘুমুতে হয় মেঝেতে। আর বালিশ? নিজের হাত তো রয়েছেই। স্নানাগার বলতে নেই—স্নান করিনি আট দিনে একবারও।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা, অসহ্য গরম—তার উপর মশার যন্ত্রণা। ঘুম আসার কোন লক্ষণই নেই। এদিকে এখানে সেখানে একটু পরে পরেই আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এখানকার ভাষায় দেশপ্রেমিকদের "মালিশ" করা হচ্ছে। কীল, ঘুষি, লাথি তো আছেই, তার উপর ফাউন্ডস্বরূপ আছে জানালার গ্রীলের সাথে বেঁধে প্রায় লটকে রেখে দুজনে মিলে সারা গায়ে রুল চালানো। সারা গায়ে আলপিন ঢুকিয়ে দেওয়া। সিগারেট টেনে সারা গায়ে ছাঁকা দেওয়া—এই দুটো গোপনাঙ্গেও ব্যবহার করতো। বুট পায়ে সেপাইকে দিয়ে মাটিতে শুইয়ে ডলাবার ব্যবস্থাও ছিল। অতএব চিৎকার ছাড়া ক্ষণে ক্ষণে আর কি শুনতে পাবো? একদিন আগে সিলেটের ভালো-মানুষ অ্যাডিশনাল এস পি মিঃ মুস্তাফাকে দিনের বেলাই মালিশ দেওয়া হয়েছিলো। বুড়ো নিরীহ ধর্মভীরু মানুষটি এক ফাঁকে আমাকে বলেছিলেন They have physically assaulted me. ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে। ওকে সিলেটের নূতন এস পি নিজেই মিলিটারীর হাওলায় দিয়েছিলেন।

> লেখক 'যুগভেরী' পত্রিকার সম্পাদক। গত মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্পে বন্দিদশায় থাকা অবস্থায় এক রাত্রির মর্মন্তুদ ঘটনা এই লেখায় তুলে ধরেছেন। সেপ্টেম্বরেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডের এসেক্স-এ চিকিৎসাধীন আছেন। লেখাটি সেখান থেকেই প্রেরিত।

আমাদের ক্যাম্পের অফিসের অফিসার বোধহয় নায়েক বা হাবিলদার হবে। নাম খান মোহম্মদ। সরু কালো বিশ্রী চেহারা, জিভটা সব সময় লক লক করে। সাদা শালওয়ার ও পাঞ্জাবী পরে বলে পদ বুঝবার উপায় নেই। জিজ্ঞেস করলেও বলে না। এসে বললো, মেজর সাহেব এসেছেন। আমিও প্রায় দিগম্বর। গরমের জন্য শুধু আন্ডারওয়ার পরে আছি। তাড়াতাড়ি কাপড় পরতে লাগলাম। ইতিমধ্যে মেজর আব্দুল কাইয়ুম এসে হাজির। একটু বেঁটে রকম, কোঁকড়ানো চুল, রুক্ষ চেহারা। প্রথম দিনেই আমার সাথে অভদ্র ব্যবহার করেছে। এসে বললো, হিন্দুকা বাচ্চা, Will you tell the truth? মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ—কাছে এসেই প্রথমেই আমার পেটে এক লাথি। আমি উত্তর দিলাম, আমাকে মিথ্যা কথা বলা শেখানো হয় নি—কি জিজ্ঞেস করবেন? ডান হাতটা সোজা করে সব কটি আঙ্গুল লোহার মত করে নিয়ে জাপানী কারাতে প্রথায় আমার গলার মাঝখানে গায়ের জোরে আঘাত করলো কাইয়ুম বাঁদিক থেকে ডান দিকে করে—তারপর জিজ্ঞেস করলো, Tell me the Truth—where and when did you handover Mr. Akram Hussain and his son to the Mukties? আমি জিজ্ঞেস করলাম, Which Akram Hussain? আর একবার অনুরূপ-ভাবে আমার গলায় মেরে বললো, Do not try to fool me. He is your neighbour. Where did you get him killed with his son?

আকরম হোসেন পাঞ্জাবী। ১৯৪১ সাল থেকে সিলেটে বসতি। ব্যবসা করেন। আমার প্রতিবেশী। এপ্রিল মাসের আট তারিখে সিলেট শহর ছেড়ে যাওয়ার সময়ে সাদিপুরের খেয়ায় এক বাস হতে নামতে দেখেছিলাম। এর পরে নাকি শেরপুরে ওদের বাস হতে নামিয়ে নেওয়া হয়েছিলো। আমি তো ততক্ষণে মৌলবীবাজারে পৌঁছে গেছি। এই

কথাই বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলো, শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নির বিয়েতে গিয়েছিলে কেন? আমি উত্তর দিলাম, শেখ সাহেবের সংগে আমার ও আমার ভাইদের পরিচয় বহুদিনের। কিন্তু আমি তো ওঁর ভাগ্নির বিয়েতে যাইনি। কাইয়ুম খান মোহম্মদকে ইশারা করলো, সংগে সংগেই আরো দু-তিনজন সেপাই এসে গেল, হাতে কাঠের বেঁটে লাঠি ও দড়ি। অত্যন্ত ইতর ভাষায় আমাকে গালাগালি করে ওদের বললো, তোমরা তোমাদের কাজ কর। দুজনে এসে আমাকে ক্রশে বিদ্ধ করার ভঙ্গিতে জানালার গ্রীলের সংগে বেঁধে লটকে দিল পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড় করিয়ে। তারপর কাইয়ুম বললো, বোল ঝুটা—আজ সাচ বাত বোল। সেই সঙ্গে দুজন দু-দিক থেকে আমার সারা গায়ে কাঠের লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো বেদম। যন্ত্রণার চোটে বাঁ হাত খসিয়ে ফেলেছিলাম বাঁধন থেকে,—হনুদুতেরা খোলা বাঁ হাতে মার দিয়ে দিয়ে দুটি আঙুলে অচল করে দিয়েছে। আবার বাঁ হাত বাঁধা হলো, আবার মার। জিজ্ঞেস করলো, নির্মল চৌধুরীর (সিলেটের বিখ্যাত জনসেবক, দাতা) সংগে আমার কি সম্বন্ধ? পাঁচু সেনের সংগে কি সম্পর্ক? (মিঃ বিমলাকান্ত সেনগুপ্ত, সিলেটের বিখ্যাত দাতা ও কন্ট্রাক্টর—লেখকের বিশেষ বন্ধু)। বাড়িতে ঘটা করে রবীন্দ্রনাথের পূজা করি কেন? ইকবালের জন্য কিছু করিনি কেন? হিন্দুরা কি আমার বাপ? আমি ইন্দিরা গান্ধীরও পূজা করি। ভারতীয় গুপ্তচর আমি। আমি হিন্দুস্থানের সমর্থক আর আমার স্ত্রী লোভাবায়ার সব পাঞ্জাবীদের মেরে ফেলবার শ্লোগান দিয়েছেন বহুবার। সব হিন্দু রাতে আমার বাড়িতে মদ খায়। মেজর কাইয়ুম আমার পেটে লাথি মেরে বললো, জীবনে যত মদ খেয়েছিস সব বের করে ফেলবো।

আমার বাড়িতে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েছি। এপ্রিলের শেষে শ্রীমঙ্গল ও মৌলবীবাজার এবং হিন্দুস্থানের কমলপুরে গিয়ে ভারতীয়দের সংগে ষড়যন্ত্র করেছি। আজ বোল বাহাঙ্গোৎ জয় বাংলা। আমি বললাম, বলবোই তো—বলে গলার জোরে বললাম, জয় বাংলা—। আমি বয়সকালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে বন্দে মাতরম্ বলে পুলিসের হাতে কতবার মার খেয়েছি। মানা করলে আরো চেঁচিয়ে বলেছি, আরো মার খেয়েছি। "বেত দিয়ে কি মা ভোলাবি আমরা কি মা-র সেই ছেলে?" গান গেয়েছি। সিলেটের টাউন দারোগা মুনাওর আলীর স-লৌহ শলাকা বুটের আঘাতে Tail bone ভেঙে গিয়েছিলো, কিন্তু আমাকে টলাতে পারেনি কেউ। মেজর কাইয়ুমের দেওয়া গালি ও মন্তব্যগুলো অশ্রাব্য পাঞ্জাবী মিলিটারীসুলভ এবং ছাপার যোগ্য নয় বলে লেখা হলো না। আজ এর মতলব মোবারক ও শাহজালালের নাম নিয়ে ততবার জয় বাংলা বলেছি। অবশ্য মারের চোটে কতবার অজ্ঞান হয়েছি বলতে পারবো না। জ্ঞান হলে ওরা আমায় মেরেছে, আবার চেঁচিয়ে জয় বাংলা বলেছি। ওরা আমাকে বলেছে মেরে মেরে আমাকে মুসলমান করা হবে, না হয় মেরে ফেলা হবে।

ইতিমধ্যে কাইয়ুম বাইরে গিয়ে একটা কাগজ নিয়ে এসে বললো, ঝুটা কাঁহাকা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের বোনের মেয়ের বিয়েতে যাও নি? আমার মনে পড়লো মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ (এম এন এ)-এর মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর সবাইকে তো চিনি—উনি আবার বঙ্গবন্ধুর বোন হবেন কি করে? তবে পাশাপাশি পড়শী ও ব্যক্তিগত সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সংগে ভাই সম্পর্ক তো আছেই। কিন্তু কাকে বলি এ কথা? ওরা তো আমাকে মারবেই। আরো মার খেলাম। ভোর হওয়া পর্যন্ত ওইরূপে ঝোলানো অবস্থায় ওরা আমাকে রেখে চলে গেল আবার আসার বলে। আমি এইভাবে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, হয়তো বা আবার অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। বেলা প্রায় দশটায় শাহজামান নামে একটি তরুণ পাঠান সেপাই আমাকে আরেকজনের সাহায্যে দড়ি খুলে ভূমিশয্যায় শুইয়ে দিল। ও আমাকে বলেছিল, বাহাঙ্গোৎ কাইয়ুমে নে তুমকো মারা হ্যায়। হাম উসকো গোলি করকে মারেঙ্গে। সেই দৈত্যকুলে শাহজামান শুধু আমাকেই নয়, আরো অনেককেই সাহায্য করেছে। হরদাস ময় পাঠান, ওকে বড় কষ্টে নিরস্ত করেছি। না হলে হয়তো মেরেই দিত। ও তো বলতোই ওদের বলা হয়েছে যে, হিন্দুদের মারার জন্য ওদের এদেশে আনা হয়েছে। কিন্তু ও তো এখানে হিন্দু খুঁজে পাচ্ছে না। আর হিন্দুকেই বা মারবে কেন? এসব পাঞ্জাবীদের চালবাজি।

প্রায় পাঁচ-ছয়দিন মাটিতে পড়ে কাটাতে হয়েছে ব্যথার চোটে। শাহজামান এসে বাথরুমে নিয়ে যেত ধরাধরি করে—।

কিন্তু আশ্চর্য, আমার স্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেছেন সিলেটে সামাদ সাহেবকে আর আমাকে নিয়ে তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে দোসরা মার্চে—এসব তো ইন্টেলিজেন্সের জানা। মনে হয়, ওরা ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট দেখেনি। শুধু জামাত-ই-ইসলামী, মুসলিম লীগের দালালদের কথাতেই আমাকে সন্দেহ করেছে।

সর্বমোট একশো ত্রিশ রাত পাকিস্তানী সেনাদের হাওলায় ছিলাম। কত দেখেছি—কত মার খেয়েছি—কত অপমান সহ্য করেছি। ইংরেজের আমলেও সরকারবিরোধী বলে নির্যাতিত হয়েছি—জেলে গিয়েছি—কিন্তু এরকম বর্বরতার সম্মুখীন হইনি। ইংরেজের আমলে মুনাওর আলি দারোগার স-লৌহ শলাকা বুটের আঘাতে আমার Tail bone ভেঙে গিয়েছিল। তার জের আজও টানছি—এদিকে পাঞ্জাবীর হাতের অত্যাচার বাঁ হাতের অচল আঙুল দুটো ওদের বর্বরতার সাক্ষী হয়ে রইল।

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শিল্পী শ্রীমতী শানু লাহিড়ী তাঁর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ২০টি নিদর্শন দেখা যায়।

দেশের কয়েকজন মহিলা শিল্পীর মধ্যে শানু লাহিড়ী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ইতিপূর্বে বহু প্রদর্শনীতে তিনি যোগদান করেছেন, এমন কি বিদেশেও একটি প্রদর্শনীতে পিকাসো প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পবৃন্দের ছবির সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিও স্থানলাভ করেছে। কলকাতায়ও দু' বছর আগে তিনি একটি একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। শানু লাহিড়ীর শিল্পকর্মে তাঁর নিজস্ব একটি ধারা চোখে পড়ে। যাঁরা এই শিল্পীর রচনাধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, তাঁর ইতিপূর্বে

রাধা ও কৃষ্ণ —শানু লাহিড়ী

রচিত রচনাবলীতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপরিচিত শিল্পী নীরদ মজুমদারের কিছু প্রভাব ছিল। সুখের বিষয়, শিল্পীর সাম্প্রতিক নিদর্শনগুলি দেখে বোঝা যায় যে, এখন তিনি সেই প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছেন। কয়েক বছর আগেও রঙীন কাচের বৈশিষ্ট্য তাঁর ছবিতে বিশেষভাবে ফুটে উঠত। সাম্প্রতিক কয়েকটি ছবিতে সেই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লেও সবগুলিই এই শ্রেণীতে পড়ে না। শিল্পীর সাম্প্রতিক রচনাবলী এক্সপ্রেসানিস্টিক জাতীয়, বিশেষভাবে অঙ্কনরীতির দিক থেকে বিচার করলে সেগুলিকে আত্মকেন্দ্রিক মনে হয়। অধিকাংশ স্থলেই শিল্পী চাপা কোনও রঙের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রুশের ছোট ছোট পরিমিত আঁচড়ের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে আকার সৃষ্টি করেছেন ও নীল, লাল, হলদে এবং ছাই রঙ ব্যবহার করে এক একটি ছবির সম্পূর্ণ

রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। আঁকাবাঁকা, অথচ অর্থব্যঞ্জক ব্রুশ ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কয়েক ক্ষেত্রে এই জাতীয় রঙের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে শিল্পী নানা অলংকারের সৃষ্টি করেছেন, কালো রেখা, রঙ ও অলংকারে কয়েক স্থানে নিছক কারোর ছন্দঝঙ্কার বেজে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমলীলা অবলম্বনে শিল্পী তাঁর প্রথম আটটি ছবি এঁকেছেন। ছবিগুলির মূল বক্তব্য অনাবিল আনন্দ ও সেই আনন্দকে কেন্দ্র করে নৃত্যলীলার বহুবিকাশ। এক্সপ্রেসানিস্টিক রীতিতে শিল্পী আমাদের দেশের প্রাচীন ও শাশ্বত ঐতিহ্য সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। ছবিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিছক সরলতা। ব্রুশের ছোট ছোট আঁচড় ও হাল্কা রঙ ব্যবহারের ফলে কয়েকটিতে এক অপরূপ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে লর্ড কৃষ্ণ অ্যান্ড গোপিনস ও কৃষ্ণ টেকস রাধা অ্যালোন এর নাম করা যায়। বিশেষ করে পরিকল্পনা ও অঙ্কন কৌশলের জন্য দি লাভ ড্যান্স বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ছবির অন্তর্নিহিত গতিবেগ দ্রষ্টব্য। অন্যান্য ছবি রাধা-কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন পরিচিত ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। এগুলির মধ্যে গারল্যান্ডিং প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিমিত নীল ও হলুদ রঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিল্পী মালাদানের শুভমুহূর্তটি যেন সজীব করে তুলেছেন। সরলতার দিক থেকে বিউটি অব রাধা ও রাধা ড্রেসিং আপ-এর নাম করা যায়।

*

নিখিল ভারত হস্তশিল্প সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উদ্যোগে ডিজাইন সেন্টারে পটুয়াদের মুখোশের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

ধর্ম, সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব তথা লোকাচারকে ভিত্তি করেই দেশের লোকচিত্রশিল্প গড়ে ওঠে। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই লোকচিত্রশিল্প নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে—কখনও বা দেওয়ালের ওপর আঁকা রেখাভিত্তিক সরল চিত্রগুলির মধ্যে, কখনও বা অঙ্গনের আলপনার মধ্যে, আবার কখনও হয়ত হাঁড়ি, কুঁজো বা সরার ওপর আঁকা রঙীন ছবির মধ্যে, বা কাঁথার অপূর্ব সূচিশিল্পের মধ্যে বা সরল একটি মুখোশের মধ্যে। বলা বাহুল্য, বৃটিশ রাজত্বকালে আমাদের দেশের অতীতের নানা লোকচিত্রশিল্পই লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। সুখের বিষয়, হস্তশিল্প সংস্থার কল্যাণে দেশের লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে।

মুখোশ শিল্পের কেন্দ্রস্থল হিসাবে পুরুলিয়ার নাম বিশেষ পরিচিত। সেরাইকেলা ও নিকটস্থ অঞ্চল প্রাচীন ছো নৃত্যের জন্য বিখ্যাত এবং ছো নৃত্যের প্রধান উপকরণ মুখোশ। প্রধানত স্থানীয় বিভিন্ন ছো নৃত্য সম্প্রদায়ের চাহিদা মেটাবার জন্য পুরুলিয়া জেলার চোরিদা, বাঘমুণ্ডি ও ডুমরুদিহিতে ৩০টি পরিবারের প্রায় ১০০ জন কারিগর এই মুখোশ শিল্পে নিযুক্ত আছেন। সাধারণ মাটি ও কাগজের মণ্ড দিয়ে একটি পাত তৈরী করা হয়। পরে প্রয়োজনমত বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে বিভিন্ন আকার তৈরী হয়—শেষে নানা রঙ ও বার্নিশ ব্যবহার করা হয়। পুরুলিয়ার মুখোশ রঙ ও আকারবৈচিত্র্যের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রদর্শনীতে নানা আকারের বহু নিদর্শন দেখা যায়। পরিকল্পনা, গঠনপ্রণালী ও বিশেষ করে প্রয়োজনমত রঙ ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে, যাঁরা এগুলি তৈরী করেন

পুরুলিয়ার মুখোশ

তাঁদের শিল্পীসুলভ চোখ আছে ও সেই সঙ্গে আছে কারুকুশলী হাত। বিশেষ করে কয়েকটি মুখোশে রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা দেখে শিল্পীকারিগরের চিন্তাশীল মন ও কারুকার্যকুশলতার পরিচয় মেলে। ছোট বড় নানা আকারের বহু নিদর্শনই প্রদর্শনীতে ছিল—সবগুলিই সুন্দর। তাহলেও বিশেষ করে হনুমান, রাবণ ও মহাদেবের মুখোশ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুখোশগুলি গৃহসজ্জার চমৎকার উপকরণ। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। বলা বাহুল্য, এজাতীয় মুখোশ শিল্পের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ তাঁরা যেন বাইরের বিভিন্ন স্থানে এই মুখোশ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে দিল্লীতে, এ জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলে শুধু যে পুরুলিয়ার মুখোশের চাহিদা বাড়বে তা নয়, উপরন্তু মুখোশশিল্পে যাঁরা নিয়োজিত আছেন পরোক্ষে তাঁদেরও যথেষ্ট উপকার হবে।

*

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জন্মশত-বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের নানা শহরে সভাসমিতির আয়োজন করা হয়েছে ও শিল্পগুরুর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। কয়েকজন তরুণ ছাত্র কলকাতা শহরের বাইরে দূরে থেকেও বাঁকুড়ায় কিভাবে এজাতীয় একটি সভা ও তথা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন সেইরূপ একটি সংবাদ আমি ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছি। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও শিল্পগুরুর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এই তরুণ দল কিভাবে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের বিভিন্ন ছবি, বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথের ভারত মাতা, শাজাহানের মৃত্যু, অভিসারিকা, [illegible], শিল্পগুরুর হস্তাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী; নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ইন্দু রক্ষিত, গোপাল ঘোষ ও অন্যান্য পরিচিত শিল্পীর ছবির প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন ও সেই সঙ্গে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করেন তা জেনে আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছি ও সেই সঙ্গে শ্রীরাম বিশ্বরূপ প্রমুখ তরুণদলকে আমার সাধুবাদ জানাই। শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে তাঁরা সকলে মিলে কবি অতুলপ্রসাদেরও জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন। স্মরণ সভায় শিল্পাচার্য ও অতুলপ্রসাদের কর্মবহুল জীবন ও তাঁদের অবদান বিষয়ে নানা আলোচনা হয় ও সেই সঙ্গে গান ও কবিতা পাঠেরও ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনায় অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, অধ্যাপক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও স্থানীয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যোগদান করেন। ব্যক্তিগত পত্র মারফত সংবাদটি পেলেও বর্তমান যুগের তরুণদলের এই সার্থক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার বহুলতর প্রচার বাঞ্ছনীয় মনে করে সংবাদটি পাঠকসম্প্রদায়ের গোচরে আনলাম।

চিত্রগুপ্ত

॥ তেতাল্লিশ ॥

'কবে তোমায় লিখেছি চিঠি! সে কি আজকে?' বলছিল রিনি—'এত করে লিখলাম—তোমার যে চটপট চলে এসো কলকাতায়। দুজনে মিলে দেশের কাজে লাগব—তোমার সঙ্গে এক সাথে জেলে যাব, লিখিনি? তা, না-তুমি এলে, না-দিলে চিঠির একখানা জবাব!'

রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলাম দুজনায়। —'জবাব দেব কি করে? তোর ঠিকানা জানলে তো?' আমার সাফ জবাব।

'কোনো ঠিকানা-মিকানা ছিলো নাকি তোর চিঠিতে?'

'জানতে না তুমি? চাঁচল ছাড়বার দিন তোমায় বলে আসিনি আমার ঠিকানা? আহিরিটোলার আমাদের বাড়ির ঠিকানা বলে আসিনি তোমাকে?'

'বলেছিলিস বটে, কিন্তু আমার মনে থাকবে তো?'

'এতো যদি তোমার ভুলো মন হয় কি করে পরীক্ষা পাশ করবে গো?'

'করিনি তো পাশ। করব না তো। সব পরীক্ষার পাশ কাটিয়ে এসেছি আমি। দ্যাখ রিনি, তোদের মেয়েদের এই একটা বড্ডো দোষ। তোদের ধারণা তোদের মতন তোদের বাড়ির নম্বর টম্বরও ছেলেদের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। আমি আরো অনেক মেয়ের দেখেছি এই রকম।'

'কটা মেয়ের দেখেছ এ রকম শুনি? কজনার সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছে গো?'

'এ পর্যন্ত একজনার সঙ্গেও না। আর ওই জন্যেই তো। আমার ভাগনি, সুশীলাদির মেয়ে প্রতিভা, অন্নপ্রাশনের সময় তার নামকরণটা আমিই করেছিলাম।' এইটুকুন মেয়ে। কিন্তু এই বয়েসেই মেয়েদের সব দুর্লক্ষণ তার মধ্যে বর্তমান। তাদের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে চিঠি দিয়েছিল আমাকে। ঐ প্রথম চিঠিটাতেই যা ঠিকানা দেয়া ছিল—তার পরে আর যত চিঠি লিখেছে তার কোনোটাতেই কোনো ঠিকানা নেই। প্রথম চিঠিটা কি করে যে হারিয়ে গেল—তার কোনো চিঠিরই আর উত্তর দেওয়া হলো না তাই। কি করে হবে? সে বোধ হয় ভেবেছিল প্রথমখানায় ঠিকানা দিয়েছি সেই ঢের—তার পর নিশ্চয় আমি তার মতন তার ঠিকানাটাও মুখস্থ করে ফেলেছি...আমার স্মৃতিপটে তার মতই আঁকা হয়ে রয়েছে।'

'তাকেও মুখস্থ করা হয়েছে বুঝি তোমার?' কেমন ধারা চোখ করে সে তাকায়।

'বা রে! ভাগনি না আমার? ভাগনি কি আদরের জিনিস নয়? এইটুকুন তো।'... সত্যি, তুই ভারী সন্দেহবাদী, দারুণ সন্দিগ্ধচেতা।'

'ঠিকানা মনে রাখতে না পারো তো তোমার ইতিহাসের পরীক্ষার বেলায় করতে কি? রাজা বাদশা লাটবেলাটদের জন্মমৃত্যুর সাল তারিখ লেখবার বেলাতে?'

'যারা মেমারি রাখে তাদেরই ওসব মুখস্থ থাকে। তারিখ টারিখের কোনো উল্লেখ না করে আমি মন থেকে সব বানিয়ে বানিয়ে দিতাম। সব রাজা গজা লাট বেলাটের সত্যবাদিতার কাহিনী প্রায় এক ধারার—সবাই হিতৈষী পরোপকারী প্রজারঞ্জক ইত্যাদি ইত্যাদি—কোনো ইতরবিশেষ নেই কারো। সাল তারিখ না দেওয়ার জন্য কিছুটা নম্বর কাটা যেত অবশ্যই—কী আর করা? আরে, ইতিহাস পাশ করা তো সবচেয়ে সোজা রে!'

'বানিয়ে বানিয়ে লিখতে ইতিহাস!' সে হাসে—'সে একটা নতুন ইতিহাস হতো নিশ্চয়।'

'ইতিহাস তো সব মন গড়া ব্যাপার রে! যে কালে ওসব কাণ্ড ঘটেছিল সে সময় কি এখনকার কেউ থেকেছিল, দেখেছিল? সব ইতিহাসই তাই।'

'তোমায় বলেছে।' বলতে বলতে সভার মাঝখানে শোরগোল উঠল খুব। 'নেতা-টেতা এলেন বোধ হয়' বলল সে।

গান্ধীটুপি মাথায় বয়স্ক কয়েকজনকে আসতে দেখা গেল সভা স্থলে—তাদের ঘিরে জয়ধ্বনি হতে লাগল।

'কে জানে কে। আমি তো চিনিনে সবাইকে।' আমি বলি—'এবার বোধ হচ্ছে শুরু হবে সভাটা। চল সভার মাঝখানে বসি গে।'

'দাঁড়াও না। এখন কী। এখনই কী। পুলিস পাকড়াবার সময় এলে তখন। ততক্ষণ গল্প করা যাক না!...বক্তৃতা শুনতে আসিনি, বক্তৃতা করতেও নয়। জেলে যাবার জন্যেই এসেছি তো!'

'জেলে যাওয়া অতো সোজা নয় মশাই! জেলের থেকে বার হওয়া যেমন শক্ত ব্যাপার জেলের মধ্যে ঢোকাটাও তেমনই! একটা ছেলে বলছিল না আমায়...সে তো আজ...'

'বলতে হবে না কাউকে, আমার জানা।' রিনি জানায়—'কদিন ধরেই তো চেষ্টা করছি আমি। কিছুতেই যেতে পারছি না। নিচ্ছেই না আমাকে। ধরলে মাত্রই ছাড়ছে নয়তো থানায় নিয়ে গিয়ে—'

'কেন, ছেড়ে দিচ্ছে কেন তোকে?'

'মেয়েছেলে বলে, তাই। কেন মেয়েরা কি মানুষ নয়? তাদের কি দেশ না? তারা কিছু করতে পারে না দেশের জন্যে?'' বলতে বলতে সে উসকে ওঠে—'ছেলেরা জেলে যাবে আর আমরা যেতে পাব না? আজও যদি না নেয় আমায় তো কাল আমি আসব আবার—একেবারে ভোল পালটে—একটা ছেলে হয়ে, তুমি দেখো।'

'কি করে ছেলে হবি?' শুনে তো আমি হতবাক—'তা হওয়া যায় নাকি কখনো?'

'ফ্রক খুলে হাফ প্যান্ট পরব, চুল কেটে ফেলব ছোট করে—এই লম্বা বিনুনি আমার ছেঁটে ফেলব দেখো না!'

'না না না!' আমি চেঁচিয়ে উঠি—'খবর্দার না, দেশের জন্য আর যা করিস কর কিন্তু—তোর নিজের কোনো অঙ্গহানি করতে দেব না।'

ওর এক চুল এদিক ওদিক হওয়াটা যেন আমি সইতে পারি না। ওর বেণীসংহারে আমার আপত্তি।

'দেশের জন্য এক চুল স্বার্থ ত্যাগ করতে পারো না এই তোমার দেশকে ভালোবাসা?' তার দু চোখ যেন জ্বলে ওঠে।

'আমার চুল হলে করতাম। আমি ন্যাড়া হয়ে যেতে পারি দেশের জন্য। কিন্তু তোর চুলের স্বার্থ ত্যাগ করা আমার পক্ষে ভারী শক্ত। না, তুই ও কাজ করতে পাবিনে।'

'এখনো এ চুল তোমার হয়নি মশাই। আমার যা ইচ্ছে করব। তুমি কে বলবার?'

কথাটায় আমি একটু চোট খাই। মনে কেমন লাগে। ওর একচুলের তফাত আমার অসহ্য, আর ও কিনা এক কথায় আমায় সাত হাত সরিয়ে দিল। নস্যাৎ হয়ে গেলাম।

'তাহলেও তুই ধরা পড়ে যাবি—হাজার চুল ছোট করে ছাঁটলেও। তুই যে মেয়ে তা একটুতেই টের পেয়ে যাবে সবাই!' আমি সেই একটুখানির প্রতি কটাক্ষ করে কই—হাজার তুই চেষ্টা কর্ না, লুকোতে পারবি না কিছুতেই।'

'তাও আমি ভেবে রেখেছি।' আমার অপাঙ্গদৃষ্টি লক্ষ করে সে বলে—'বাবার কাছে ব্যাণ্ডেজ আছে না? তাই দিয়ে বেশ টাইট্ করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নেব, একাকার করে ফেলব দেখো না তুমি।'

'তাহলে আর দেখবার কী থাকবে। আমার মতে সেটাও তত ভালো হবে না। তবে তেমনটা হলে কেউ টের পাবে না হয়ত না, কিন্তু সেটা কেবল ওই তোর পক্ষেই সম্ভব। তুই আর সব মেয়ের মত নয়তো ঠিক...তুই বোধ হয় তত বড় হোস্‌নি এখনো, নইলে আর সব মেয়েদের যেমন... যেমনটা কিনা...তোর এটা একটা খুঁতই বে বোধ হয়।' একটুখানি আমার খুঁৎ খুঁতুনিই থেকে যায়।

রিনির ওই ইতরবিশেষ লক্ষ্য করেই আমার বলা। 'কিন্তু সেহেতু তার বিশেষ দুঃখ দেখা যায় না—'এই তো ভালো বেশ। তেমনটা হলে আমি ফ্রক পরতে পেতুম না আর দিদির মতন আমাকেও শাড়ি পরতে বাধ্য করত মা—অ্যাদ্দিন আমার বিয়ে হয়ে যেতো তাহলে।'

'শাড়ি হলেই শ্বশুর বাড়ির সুখ থাকে কপালে? তাই বুঝি?' আমি বলি—

'সুখের সঙ্গে শাড়ি জড়ানো ? তবে হ্যাঁ, জানি, শুকস্মার বলে থাকে কথায়।'

'তবে তবে? এবার আমার দোসরা শ্বশুর বাড়ি আটকায় কে?' আমার সবিস্ময় দৃষ্টি দেখে সে কয়—'জেলখানাকে দ্বিতীয় শ্বশুরবাড়ি বলে জানো না বুঝি?'

'তাহলেও এই বিয়ের যেমন বর নেই'—আমি প্রকাশ না করে পারি না—'তেমনি সেই শ্বশুরবাড়ির সুখও নেই তোর বরাতে। থানায় নিয়ে গিয়েই তোকে ছেড়ে দেবে আবার দেখিস।'

'কেন, ছাড়বে কেন? আমি তো আর মেয়ে নই, ছেলেই তো তখন।'

'ছেলে হলে কী হয়? ছেলেদের গালেও এমনি করে তারা হাত বুলিয়ে দ্যাখে...' আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করি—'এই ভাবে?'

'দাড়ি বেরিয়েছে কিনা দেখে নেয়। আর না বেরুলেই তারা ছেলের সঙ্গেও ঐ মেয়ের মতই ব্যবহার করে থাকে। থানার বার করে দেয় ধরে।'

'দিলেই হোলো। আমার গায়ে...মানে, আমার গালে হাত দিতে দেব কেন তাদের?'

'তোর বাধা তারা মানছে কি না। পুলিস কারো কথা শোনে! তবে কারো গালে হাত দেওয়াটা উচিত নয় তা বটে,...বিশেষ করে গালের মতন গাল হলে। আমিই যে এখন একটু হাত বুলিয়ে নিলাম সেটাই কি ঠিক হোলো নাকি? গাল হস্তক্ষেপের জায়গা নয় জানি, হাত হচ্ছে হাতাহাতির জন্য, আর গাল হচ্ছে...গাল হচ্ছে গিয়ে...কিন্তু এখন এখানে তোর সঙ্গে গালাগালি করলে সেটা কি ভালো দেখাবে? বলবে কি লোকে!'

'রাখো!...ঐ দ্যাখো, একজন আইন ভঙ্গ করছে...বেআইনি সভায় বক্তৃতা করতে উঠেছে দ্যাখো!'

গান্ধী টুপি-পরা লোকটা দু'একটা কথা বলতে না বলতেই একজন ইনস্পেক্টর এসে তাকে অ্যারেস্ট করেছে...তক্ষুনি উঠেছে আরেকজন...তাকেও তৎক্ষণাৎ! তৃতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বন্ধুগণ পর্যন্ত সম্ভাষণ করতেই না, ধরা পড়ে গিয়েছে সেও। এরপর পরের পর একজন করে উঠে দাঁড়ায় আর ধরা পড়ে—ধরা দিয়ে যায় পরম্পরায়।

ডজনখানেক ধরে ইনসপেকটার তাদের সভার বাইরে নিয়ে যায়, সেখানে পাহারাওয়ালাদের জিম্মা করে দেয়। পুলিসরা একটা গণ্ডীর ভেতর তাদের ঘিরে রাখে। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা বন্দেমাতরম্, গান্ধী মহারাজ কি জয়! দেশবন্ধু কি জয়! ইত্যাদি হাঁকতে থাকে।

এমনি করে মাথা মাথা জনাপঞ্চাশেককে পাকড়ে পার্কের বাইরে নেয়। সেখানে সারি সারি প্রিজনভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তার ভেতরে ভরতে থাকে। তারপরও সভার কার্যশৃঙ্খলা যারা বাকী ছিল, তারাও সর্ব্বজন পদাঙ্ক অনুসরণে একে একে খাড়া হতে থাকে—ভারতের স্বাধীনতা চাই। মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়। ইত্যাদি বহুৎ বাগবিস্তার করলেও পুলিস তাদের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। পায়ের গোদাদের পাকড়ে নিয়ে চলে যায়। সেদিনকার সভাটা সেখানেই সমাপ্ত।

'দূর। এ কী হোলো। ধরলই না তো আমাদের...' রিনি বলল—'আইন ভাঙবার সুযোগই পেলাম না আমরা।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলাম কেবল... ধরা পড়লাম কোথায়!' আমিও আক্ষেপ করলাম।

'দাঁড়াও, চেষ্টা চরিত্র করে দেখা যাক না। প্রিজনভ্যানে গিয়ে উঠে পড়ি না কেন? ফাঁক পেলেই উঠে পড়ব, কেমন?' রিনি পথপ্রদর্শন করে—আমরা প্রিজনভ্যানগুলোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই—'আমি আগে উঠব, বুঝলে? তুমি তার পরেই এসো।... আমি আগে, আমাকে যদি না নেয় তুমি ধরা পড়তে যেয়ো না যেন। কেমন?'

'তুই না গেলে কিসের জন্যে যাবো শুনি? কোন্ সুখটা আছে আমার সেখানে?'

'তোর বিহনে জেল তো আমার কাছে অন্ধকার! কে আছে সেখানে আমার?'

ওর পিছু পিছু আমিও প্রিজনভ্যানের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াই। তটস্থ হয়ে থাকি দুজনাই।

রিনি একটুখানি ফাঁক পেতেই না এগিয়ে প্রিজনভ্যানের হাতল ধরে টুক করে লাফিয়ে উঠে পড়ে—কেউ বাধা দেবার আগেই।

এইবার দেবেনকে এগিয়ে আসতে দেখি।

এতক্ষণ তাকে দেখতেই পাইনি। রিনির আলোয় চারধার যেন অন্ধকার হয়ে ছিল, নজরে পড়েনি তাই আমার। এবার সে এগিয়ে এল।

এগিয়ে এসে একটু তাকে পিছিয়ে যেতে দেখলাম। একটু পিছিয়েই না, দৌড়ে এসে হাইজাম্প দিয়ে সে ভ্যানের ভেতরে গিয়ে পড়ে। বাঘরা শুনেছি এমনি নাকি লাফ মারার আগে একটুখানি পেছোয়।

আমিও তার পিছু পিছু গিয়ে হাতলটা পাকড়াই—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সামান্য বহরবলে আমার কিছুতেই আর নিজেকে টেনে তুলতে পারি না। হাতল ধরে ভ্যানের দরজায় ঝুলতে থাকি। বুঝতে আমার জেলে যাওয়ার এই ভ্যানিটি কেবলই আমার মনে হয়।

কাছেই একটা গোরা সার্জেণ্ট দাঁড়িয়েছিল, সে না আমার পেছন থেকে এইসা এক শুট্ মারলে না......!

তার সেই ধাক্কাতেই দরজা গলে ভ্যানের ভেতরে গিয়ে ছিটকে পড়েছি অবলীলায়। এই অযাচিত সাহায্যের জন্য সার্জেণ্টকে 'থ্যাংকিউ' বলে যে ফিরে ধন্যবাদ জানাবো তার ফুরসৎ পাই না।

(ক্রমশ)

যন্ত্রগণক ও বীরবল অথবা মানুষ যেদিন হাসবে না

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

শত্রুঘ্ন মেনন একটু ভেবে নিলেন, লিস্ট করা থাকলেও কাজে হাত দেবার আগে একটু চিন্তা করে নেওয়াটা তাঁর বহুকালের অভ্যাস। তারপর তাকালেন তাঁর সামনে খাড়া বিশালকায় ধাতব মস্তিষ্কবান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যন্ত্রগণকের দিকে। গণকটি লম্বায় প্রায় দশ মাইল। যাবতীয় খবর নেবার, রাখবার, সাজাবার ও উত্তর বার করার এত রকম ব্যাপার এর মধ্যে আছে যে এতবড় কম্পিউটার চালনা করার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আছেন কোটিতে গুটি কয়। শত্রুঘ্ন মেনন তাঁদেরই একজন।

সুবিধের জন্য এই কম্পিউটার বা যন্ত্রগণকের নাম দেওয়া হয়েছে অচিন্ত্য।

মেনন অচিন্ত্যকে বলে গেলেন, "একদিন সম্রাট আকবর সভায় এসে বললেন—আচ্ছা বীরবল, বলো তো তোমার সঙ্গে একটা গাধার কতটা তফাত? বীরবল চট করে সেলাম করে নীচু হয়ে তাঁর থেকে বাদশার মাঝখানের মাটি মেপে উঠে দাঁড়ায় আবার কুর্নিশ করে বললে "আজ্ঞে মাত্র বারো হাত জাঁহাপনা।"

পিছনে কার পায়ের শব্দ হল। বিরক্ত হয়ে মেনন তাকালেন। সার্কিটটা নিউট্রাল করে দিলেন তাড়াতাড়ি। "ঘরে ঢোকবার সময় জিগোস করলেও তো পারো"—তাঁর স্বরে বিরক্তি গোপন থাকে না। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত মহিমা শত্রুঘ্ন মেননের, কারণ তিনি না থাকলে অচিন্ত্য অচল এবং সেই সঙ্গে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় কাজও বন্ধ, সুতরাং তিনি যাকে যা খুশি বলার অধিকার রাখেন।

ঘরে ঢুকেছিল সিনিয়র অ্যানালিস্ট নরেন্দু, মেননের মেজাজের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত সে।

"দরজায় নক করেছিলাম সার, আপনি শুনতে পান নি। ব্যস্ত ছিলেন মনে হয়।" তারপর ঈষৎ অন্তরঙ্গতার সুরে—"গল্প বলছিলেন নাকি অচিন্ত্যকে?" দপ করে জ্বলে উঠলেন মেনন। "বলছিলাম বেশ করছিলাম। তোমার কোনো বিশেষ দরকার আছে এখানে?"

"দরকার অবশ্য ছিল, তবে তেমন কিছু নয়। আপনি যখন কাজ করছেন তখন তো—" কথা শেষ করার প্রয়োজন ছিল না,

হাত থেকে রিস্টওয়াচ নীচে পড়ে গেছে।... নেমে এসে উপরের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে
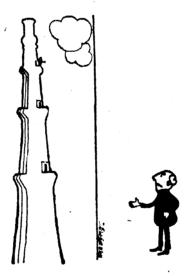
কারণ শত্রুঘ্ন মেনন কাজ করছেন, এর পরে আর কথা কী! তাঁর কাজই তো সব থেকে বেশি জরুরী কারণ অচিন্ত্যকে চালাবার মত বুদ্ধি যে মুষ্টিমেয় কজনের আছে তাঁরাই এখন পৃথিবীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। প্রধানমন্ত্রীকেও তাঁদের সমঝে চলতে হয়।

এইসব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিধরদের নিয়ে অবশ্য অন্য বিপদও আছে। সমস্যাটা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত। এঁদের শ্রেষ্ঠত্বের চাপে কিছুদিনের মধ্যেই এঁরা নিজেরাই বিচ্ছিন্নতা বোধে আক্রান্ত হন। কাদের সঙ্গে কথা বলবেন এঁরা। এঁদের সঙ্গে সমানভাবে কথা বলার যোগ্য কেউ থাকলে তো। ফলে অনেক সময় মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় এঁদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মেনন অবশ্য এই সমস্যার একটা চমৎকার সমাধান নিজেই বার করে ফেলেছেন, যদিও তাকেও এক ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতির পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা এই নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে একটা মতবিরোধ আছে। কারো সঙ্গে দেখা হলেই যেমন বলবেন, "ওহে শোনো, শোনো, এটা শুনেছো নাকি। সেই যে কুতুব-মিনারের উপরে উঠে লোকটির হাত থেকে রিস্টওয়াচ নীচে পড়ে গেছে। সে তো হুড়োতে-পাড়োতে নেমে এসে উপরের দিকে তাকিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই জিগোস করে ব্যাপারখানা কি। কুতুব-মিনারের নীচে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছো কেন? না, আমার ঘড়িটা ওপর থেকে পড়ে গেছে। ঘড়ি পড়ে গেছে তো এখন এমনিভাবে দাঁড়িয়ে কেন? সে কি এখনো পড়ছে নাকি? পড়বেই তো—আসলে আমার ঘড়িটা দশ মিনিট স্লো ছিল কিনা।

এই গল্পটি শোনার পর সকলকে হো হো করে হাসতেই হয়, সুতরাং সহজ হতে কোনো বাধা থাকে না। মেননের এই চৌকিনক অবশ্য সকলের পরিচিত এবং অনেক সময় শোনা গল্প আবার শুনেও কষ্ট করে হাসতে হয়, মেনন যে ভুলে গেছেন গল্পটা একবার বলা সেটা তো তাঁকে কোনমতেই জানতে দেওয়া যায় না!

নরেন্দু ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই মেনন আবার সার্কিটটা চালু করলেন। সহকর্মীদের যখন তখন এসে সব কিছুতে নাক গলাবার অভ্যাস! জাহান্নামে যাক সব! অচিন্ত্যর মুখোমুখি বসলে তিনি অবশ্য পর মুহূর্তেই এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হন—এক সীমাহীন বিরাটত্বের সামনে এলে যেমন অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় নিজেকে, সেইরকম, কিন্তু অচিন্ত্যর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলার যোগ্যতা। তাও কি কম। তাই বা

মেনন অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি।

"প্রশ্ন দুটো কি বলার আগে একটু বিশদ বিবরণ দিতে হবে। লক্ষ করে দেখবেন কোন হাসির গল্পই মৌলিক নয়। সকলে বলে—এটা শুনেছেন কি সেই যে একজন ...

ইত্যাদি। সকলেই এই ধরনের গল্প অন্য কারো মুখে শুনেছে, শুনে সেটা অপরকে চালিয়ে দিচ্ছে। এইভাবেই লোক পরম্পরায় এই সব গল্প চলে আসছে। আমার প্রশ্ন হল, এই সব গল্পের স্রষ্টা কে?"

বিজয় মেহতা শুনে মনে মনে হাসলেন। নরেন্দু বোধ হয় ঠিকই বলেছিল। না হলে মেননের মত এ রকম অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি এই সামান্য বিষয় নিয়ে এত উত্তেজিত হন।

"নরেন্দু যদি খালি থাকে তাহলে কালই আমি এই প্রশ্ন দুটো অচিন্তাকে দিয়ে তার উত্তর পেতে চাই। ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।"

"সানন্দে।"

অচিন্তার মত বিশাল যন্ত্রগণককে একা কেউ চালাতে পারে না, এমনকি স্বয়ং মেননও না। গণককে প্রশ্ন দিলে তা যান্ত্রিক উপায়ে নানারকম সূত্রে বদলে গিয়ে অচিন্তার বিরাট জঠরে প্রবেশ করে এবং উত্তর যখন বেরোয় তা মানুষের বোধগম্য ভাষাতে আসে না। তাকে আবার ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নানা ব্যবস্থা থাকে। ভাষান্তরিত করার কলকব্জা নাড়ার ব্যাপারে নরেন্দু একজন দক্ষ কর্মী। তাকে যতই অপছন্দ করুন, তাকে ছাড়া মেনন এক পাও চলতে পারেন না। সুতরাং পরের দিন স্বয়ং মেনন বিজয় মেহতাকে নিয়ে যখন অচিন্তার সামনের দিকের ঘরে উপস্থিত হলেন নরেন্দু ততক্ষণে কাজে বসে গেছে।

মেহতার কাছে সমস্ত জিনিসটাই মনে হচ্ছিল একটা দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত। একটা বিরাট ফিতে খুলে যাচ্ছে—তার মধ্যে নানারকম ফুটো দিয়ে প্যাটার্নের মত, নরেন্দু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই ফিতে দেখে যাচ্ছে এবং হেডফোন ও মাউথপিসের সাহায্যে অন্য ঘরে সহকর্মীদের কাছে দুর্বোধ্য কি সব নির্দেশ পাঠাচ্ছে। সেখানে তারা নানারকম ইলেকট্রনিক জটিলতার মধ্যে থেকে অচিন্তার ভাষা উদ্ধার করে আবার নরেন্দুকে ফেরত পাঠাচ্ছে। এক ঘণ্টা কেটে গেল। নরেন্দুর মুখ ভ্রূকুটিকুটিল।

"এর কোনো অর্থ নেই।" একবার বলল সে।

মেহতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

"পুরো উত্তরটা আরো দেরীতে আসবে। আমি একটু আভাস দিতে পারি।"

"আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল প্রচলিত হাসির গল্পগুলির উৎস কে বা কি?" বললেন মেনন।

"অচিন্তা বলছে—অবশ্য আমার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে—বলছে পৃথিবীর বাইরে এদের উৎস। বহির্বিশ্ব থেকে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এগুলি মানুষের চেতনাতে প্রবেশ করিয়ে তার ফলাফল লক্ষ্য করছে, যেমনভাবে আমরা গোলক ধাঁধার মধ্যে ইঁদুর ছেড়ে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি। সুতরাং ঐ সব বুদ্ধিমান জীবের কাছে আমরা কেবল একসপেরিমেন্টের মালমশলা জোগাচ্ছি, ইঁদুরের মত কিংবা গিনিপিগের মত।"

বিজয় মেহতা বলে উঠলেন, "মিস্টার মেনন, আপনি এরকম অদ্ভুত উত্তরে বিশ্বাস করছেন?" মেনন তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নরেন্দুকে জিগ্যেস করলেন,

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল হাসির গল্পের উৎস জেনে যাবার পর মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া কি রকম হবে?"

"এ রকম প্রশ্নের অর্থ কি?" অত্যন্ত কর্কশ ভাবে মেহতা বলে উঠলেন।

"প্রশ্ন করতেই হবে। উত্তরটা আমি জানতে চাই বলে।"

নরেন্দু খানিকক্ষণ নীরবে কাজ করে গেল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, মুখ দেখে মনে হয় দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে। আরো এক ঘণ্টা কাটল। হঠাৎ নরেন্দু ভাঙা গলায় হেসে উঠল।

"কি বলছে অচিন্তা। তোমার ব্যাখ্যা শুনতে চাই না, অচিন্তা কি বলছে, বল শিগগির।"

"শুনুন তবে। অচিন্তা বলছে কোন একজন মানুষও যদি জেনে ফেলে এই উৎসের কথা তাহলে একসপেরিমেন্ট হিসেবে এটা সেই বাইরের প্রাণীদের কাছে হয়ে যাবে সম্পূর্ণ নিরর্থক।"

"তার মানে সব হাসির গল্প ফুরিয়ে যাবে?" উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলেন বিজয় মেহতা।

"অচিন্তা বলছে, সেই একসপেরিমেন্টের পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। এখন, এই মুহূর্তেই। এবার তারা অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে।"

সকলে স্তব্ধ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রথমে কথা বললেন মেনন।

"অচিন্তা ঠিকই বলেছে।"

"আমারও তাই মনে হয়।" বললেন, বিজয় মেহতা।

"ঠিক হতেই হবে।" প্রতিধ্বনির মত বললে নরেন্দু।

"আমি এতক্ষণ ধরে একটা হাসির গল্প ভাববার চেষ্টা করছি, 'কিন্তু কি আশ্চর্য, একটাও মনে পড়ছে না। তোমরা যদি একটা গল্প শোনাও তবু মনে হয় আর হাসি পাবে না। কারোরই হাসি পাবে না। কোন দিন পাবে না।"

সেই দিন থেকে মানবজাতি হাসতে ভুলে গেল, হাসি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল চিরকালের মত।

[আইজাক অ্যাসিমভের একটি গল্পের ভাবানুবাদ]

সুরের সূর্য কৃষ্ণচন্দ্র

"দেশ 'বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮"এ প্রকাশিত শ্রীমান্না দে'র 'সুরের সূর্য কৃষ্ণচন্দ্র" বাংলা সাহিত্যে স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে একটি অসামান্য সম্পদ হয়ে থাকবে। কেষ্ট-বাবুর মতই তাঁর বড় আদরের ভাইপো সঙ্গীতসাধনা ও সাহিত্যানুভূতির যুগ্ম-ধারার সংগমে স্নান করে পূত হয়েছেন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। গভীরতম আন্তরিকতায় অভিসিঞ্চিত এই রচনাটি পড়ে বার বার নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। কেষ্টবাবু আমায় অত্যধিক স্নেহ করতেন, হয়ত সেটাও আমায় অভিভূত হওয়ার অন্যতম কারণ। মান্নাবাবু তখন বোম্বাই-এ থাকেন; আমি কেষ্টবাবুর সুবিখ্যাত বৈঠকখানার নিয়মিত ভাগ্যবান অতিথি। গ্রামোফোন কোম্পানী ও বেতার কেন্দ্রের গীতিকার এবং সঙ্গীত সম্পর্কীয় প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে কেষ্টবাবু আমাকে তাঁর খুবই কাছে টেনে নেন। কত গর্বই না তিনি অনুভব করতেন ভাইপোদের খ্যাতিলাভে। আত্মীয় হিসাবে মান্নাবাবু "বাবুকাকা"র মহত্ত্বের কথা কিছুটা অতিরঞ্জিত করেছেন বলে যদি কোনও পাঠক মনে করেন, সে ধারণা খুবই অসংগত হবে—এই কথা বলার জন্য কেষ্টবাবুর অন্যতম গুণগ্রাহী আমার এ চিঠি লেখা। তাঁর অনুল্লিখিত কীর্তি ও চরিত্র-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতে গেলে প্রবন্ধ লিখতে হয়, তাই শুধু দু'একটি কথার উল্লেখ করছি। পাশ্চাত্ত্য সংগীত ও অভিনয়-কলা বিষয়ে কেষ্টবাবুর সুগভীর জ্ঞান দেখে যুগপৎ বিমুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়েছি। শিশিরবাবু, নরেশবাবু প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁর এই সব অসাধারণ গুণের কথা জানতেন। কত কথাই মনে পড়ছে; কিন্তু থাক্। এই প্রবন্ধ পড়ে মন ভরে গেছে। মান্নাবাবু দীর্ঘজীবী হোন্। "দেশ"-এর নব নব সাহিত্যসৃষ্টি প্রচেষ্টা অক্ষয় হোক্!

প্রভাত বসু
কলিকাতা-১৪

মানুষ অতুলপ্রসাদ

পাহাড়ী সান্যালের লেখা "মানুষ অতুলপ্রসাদ" আমরা সবাই অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে চলেছি। বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ-এর লোকেদের কাছে এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। অজানা অনেক কথা আমরা জানতে পারলুম।

অতুলপ্রসাদের অসামান্য প্রতিভা, বিরাট ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধিদীপ্ত অমায়িক ব্যবহার সে সময় লক্ষ্ণৌ শহরে একটা ক্যালচারাল বা ঐতিহ্যের জোয়ার এনেছিল। তাঁকে মধ্যমণি করে সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে, মজলিশে এক বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত সংস্কৃতির অন্যতম অগ্রনায়ক। অতুল-প্রসাদকে তার সুযোগ্য সহচর বা প্রীতি-ভাজন সতীর্থ বলা যেতে পারে। বহু বিশিষ্ট গুণগ্রাহী হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ তাঁর গৃহে নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করতেন। তা ছাড়া একটা বড় জিনিস ছিল যে, সে সময় লক্ষ্ণৌ শহরে বাস করতেন সব ধুরন্ধর, দিকপাল বাঙ্গালীরা। ধূর্জটী-প্রসাদ, নির্মল সিদ্ধান্ত, রাধাকমল, রাধা-কুমুদ, বিনয় দাশগুপ্ত প্রভৃতি সবাই ছিলেন এক-একটি ভাস্কর, যাঁদের প্রতিভার কদর ছিল সারা ভারতবর্ষে। এঁরা সব নিয়মিত-ভাবে আসতেন সেনসাহেবের বৈঠকে। সেন-সাহেবের উচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্য সকলকে অভিভূত ও আপ্লুত করে রাখত। তাঁর বাড়ি হয়ে উঠেছিল একটা শিল্পকলার পীঠস্থান।

পাহাড়ী সান্যাল যে সময় সেনসাহেবের সান্নিধ্য ও স্নেহলাভ করেন, সে সময় তার বয়স ছিল অল্প আর বুদ্ধি ছিল অপরিণত। এমন অবস্থায় সামান্য বালকের মাথা গরম হওয়া বিচিত্র নয়। তখন বালক বন্ধু অনেকের মুখেই মন্তব্য শুনা যেত "সেন-সাহেব পাহাড়ীকে মাথায় তুলছেন, ছোকরার পরকালটা ঝরঝরে হবে।" পাহাড়ী সান্যালের কিন্তু মাথা গরম হয় নি। তিনি অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করে শিল্পকলায় সোপানের পর সোপান অতিক্রম করে চলেছিলেন।

'সভ্যতা' অর্থে আমরা বুঝি "সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি"। পাহাড়ী সান্যালের লেখার মধ্যে পাই কিভাবে, ধীরে ধীরে তিনি অতুল-প্রসাদের সান্নিধ্যে এই চিত্তশুদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছিলেন।

আজ পাহাড়ী সান্যালের নাম আসমুদ্র হিমাচলে নিজ প্রতিভায় ব্যাপ্ত। প্রীতিমুগ্ধ লক্ষ্ণৌ-এর বাঙ্গালী ত তাকে সব সময় সসম্ভ্রমে স্মরণ করেই আছে।

মাণিক ঘোষ
লখনৌ

বিনোদন সংখ্যা

গত ২৩ পৌষ তারিখের দেশ পত্রিকায় বিনোদন সংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা মারফত শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয় "আমার নয়ন মুদিলে......" গানটির সম্পূর্ণ রূপ জানাইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। গানটি আমি স্কুলে পাঠরত অবস্থায় আমাদের স্কুলের একটি ছেলের কণ্ঠে শুনি। উহা আমার মনে এরূপ রেখাপাত করিয়াছিল যে, অদ্যাবধি উহা আমার সম্পূর্ণ মনে আছে। যদিও গান গাইতে জানি না, তবু এ গানের সুরটি আজও আমার মনে আছে। গানটি এই :

আমার নয়ন মুদিলে দেখা যদি পাই
অন্ধ করিয়া দাও গো।
ব্যথা সুত দিলে যদি প্রেম মিলে
কেড়ে নাও কেড়ে নাও গো।
চাহি না ধন মোহ মোহন
চাহি না গরব রূপ যৌবন
যাহা পেলে হায় হৃদি ভরে যায়
কণিকাটি তারই দাও গো॥

এই গানটি স্বর্গত দে মহাশয়ের জীবনের গতি ফিরাইতে পারিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক কি?

শ্রীবিমলচন্দ্র রায়চৌধুরী
গড়িয়া, ২৪ পরগণা

আনোয়ার পাশা সম্পর্কে

এতদিন খড়কুটোর মতো আশা আঁকড়ে ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আনোয়ার পাশার মৃত্যুর খবরটা গুজব হয়তো। কিন্তু গতকালকার স্টেটস-ম্যানে নিশ্চিত খবর পাওয়া গেল মীরপুরের কবরখানায় অন্য দু'জন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর মৃতদেহ সনাক্ত করা হয়েছে। আনোয়ার আমার সহপাঠী বন্ধু ছিল, আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে বাংলায় এম এ পরীক্ষা দিই। দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না। মৃত্যুর সম্ভাব্যতা জেনে ক'দিন থেকেই তাঁর স্মৃতি মনে আসছিল। অপরিচিতের মৃত্যু স্ট্যাটিসটিকসের আড়ালে ঢাকা পড়ে, পরিচিত প্রিয়জনের মৃত্যু সমস্ত মর্মান্তিকতাকে ভয়ানকভাবে স্পষ্ট করে দেয়।

আনোয়ারের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর একটি কবিতা পেলাম। কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ প্রকাশিত 'একতা'-র ১৯৫৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অন্যতম সম্পাদক ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ঐ সংখ্যায় সদ্য ঘটে-যাওয়া পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন বিষয়ে দুটো রচনা ছিল, যে আন্দোলনের মধ্যে বীজ ছিল আজকের

বাংলাদেশের। আনোয়ারের কবিতাটি এই চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম, 'দেশে' পুনর্মুদ্রণের দ্বারা তার স্মৃতিতর্পণ করলে বাধিত হবো।

দীপগুলি

আনোয়ার পাশা

এল লাল ধূমকেতু আকাশে
অনেক আগুন দিল ছড়িয়ে!
আমাদের দীপগুলি আম্মা গো
নেবে না কি সে আগুনে ধরিয়ে?

দীপ তো রয়েছে ঘরে বাছারে!
একটুও তেল নেই জ্বলতে—
আগুনে কি আলো দেবে যাদু রে?
কেবলই পোড়াবে সে যে সলতে!

যে আগুনে আলো দেবে
সে আগুন কই মা?
তোরই তারা-চোখে যাদু,
তোরই চাঁদ-মুখে সে!
যে আগুনে প্রাণ দেবে
সে আগুন কই মা?
সে যে তোর বুকে যাদু,
তোরই পাঁজরে সে!

আমাদের দীপগুলি আম্মা গো
তুলে ধরো এই ভব আগুনে॥

অশ্রুকুমার সিকদার
শিলিগুড়ি

এ দুর্লভ প্রেম

অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার অধিকারী আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ মাঝে মাঝে আমরা দেশ পত্রিকায় পড়বার সুযোগ পাই—যা বুদ্ধি জ্ঞান ও অনুভূতির ত্রিধারা রঙে বিশেষভাবে চিত্রিত। 'এ দুর্লভ প্রেম', এ জাতীয় এক দুর্লভ সংযোজন।

'শ্যামা' নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিগুলোর মধ্যে অন্যতম। শ্যামা, বজ্রসেন ও উত্তীয়ের চরিত্র বিশ্লেষণে প্রবন্ধকার বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় প্রেমিক উত্তীয়ের প্রাণদান প্রসঙ্গে সম্প্রতিকালের যে মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা প্রবন্ধের সামগ্রিক সৌন্দর্য কিছুটা ব্যাহত করেছে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে যেন না ঘটলেই ভাল ছিল। হয়তো ঘরের কাছে গত কয়েক মাসের ঘটনার প্রতিফলনে আমরা এত বেশী আলোড়িত হয়েছি যার ছায়া মানসিক পথে প্রবন্ধকারের মনেও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে মাতৃস্নেহ ও প্রেমের পার্থক্য তিনি নিজেই করেছেন, তবু পার্থক্য থেকেই যায়। উত্তীয় শ্যামার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত এবং শ্যামা তা জানে; অন্যদিকে শ্যামার প্রেম বজ্রসেনকে ঘিরে এবং তা পারস্পরিক। প্রেমের এই ত্রিকোণ জটিল আবর্তে নাটকটির সমস্ত ঘটনা এগিয়ে গেছে। অথচ ঘটনার মুসলমান যুবকটি সামাজিক দায়িত্বে পুরুষোচিত মানবিকতায় মেয়েটির রক্ষার্থে প্রাণ-বিসর্জন করেছে—এখানে প্রেম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। এরকম ঘটনা আমাদের এই সামাজিক কাঠামোতে রকমফের হয়ে কতভাবেই না ঘটে চলেছে। তার মধ্য থেকে সাহিত্যের উপকরণ উঠে আসে স্বাভাবিক নিয়মে কিন্তু ঘটনাগুলো সাহিত্য নয়—তা সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদ মাত্র।

উত্তীয়ের বলিষ্ঠ আত্মদান, নিজের হৃদয় বাঁচাতে শ্যামার হৃদয়-হীন পরিকল্পনা, অবশেষে অন্যায় অনুতাপের অনলে জর্জরিত এক প্রেমিকা-সত্তার বেদনা এবং বজ্রসেনের প্রেম ও নৈতিকতার প্রতিফলন ট্রাজেডির সুরকে ঘনীভূত করেছে। শ্রেয়ো সাধনার পথ কঠিন ও দুর্গম—একপক্ষে একমাত্র মহামানবেরা এগিয়ে যেতে পারেন—যেমন বুদ্ধ যীশু, এবং খুব কাছে রামকৃষ্ণ ইত্যাদি। আবার প্রেয়ো সাধনার পথও সহজ সরল নয়। এখানেও পদে পদে বাধা কিন্তু এক্ষেত্রে হৃদয়ের ধর্ম যার প্রবল হয় সেজন্যই শ্যামার অন্যায় সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সুগভীর বিশ্বাস ছিল মানুষ অন্যায় করে যদি অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে অনুতাপ-দগ্ধ আত্মা তাঁর ক্ষমা পায়। Browning-এর মধ্যেও এমন এক প্রত্যয়ের প্রতিফলন দেখা যায়। সুগভীর ভাবগম্ভীর বিশ্লেষণাত্মক অপূর্ব আলোচনার জন্য প্রবন্ধকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

কমলা ঘোষ
জামসেদপুর-৫

দরবার নটী কলাবন্ত

এ পর্যন্ত শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়ের 'দরবার নটী কলাবন্ত' প্রবন্ধে রাণা হাম্বির ও মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রসঙ্গটি নিয়ে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং দিলীপবাবুরও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়েছে বিগত ২৫শে ডিসেম্বরের সংখ্যায়। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের (১৩২৫-৫১) নীতি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিশদ গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক মাহদী হোসেন তাঁর Rise and fall of Mahammad Bin Tughlaq গ্রন্থে এবং পরে তাঁর Tughlaq Dynasty গ্রন্থটিতে। পরবর্তী গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৬৩। এতেও তিনি সুলতান ও মহারাণার সংঘর্ষের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:—

The ascendancy of Mewar which became an outstanding feature of the sixteenth century had a long story . . . It seems that the long succession of victories encouraged the Rajput bands, anxious to extol their idol Hamir, to fabricate the story of Sultan Muhammad's defeat and imprisonment. It can safely be inferred that Sultan Muhammad having refrained unlike Alauddin Khilji and from waging war with the Rajputs and Hindus allowed great latitude to Rana Hamir . . . Neither did he meet the latter in fight nor did he send or allow the despatch of his troops for any action in Mewar. That is one of the reasons why Sultan Muhammad became unpopular with the warrior chieftains among the orthodox Muslems and why Isami denounced him as an admirer of Hinduism and supporter of Hindus. Obviously he did not look upon Rana Hamir as an enemy for he was kind to the Hindus as a rule and had an affection for Hinduism.

এর নির্গলিতার্থ এই যে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে রাণা হাম্বীরের কোনও বিরোধ বা সংঘর্ষ হয়নি এবং হাম্বীরের বিজয় কাহিনী পরবর্তী কালের মেবারের আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুত চারণ কবিদের স্বকপোলকল্পিত। প্রকৃত ব্যাপার এই যে মহম্মদ বিন তুঘলক হিন্দুদের প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন ছিলেন এবং এইজন্য হাম্বীরের স্বাধীনতা ঘোষণাকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেননি।

এই অভিমত বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যে সুলতানের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধে (১৩৩৫ খৃঃ) পৌনঃপুনিক বিদ্রোহ ও সেগুলির দমন প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়েছিল এবং যিনি ছিলেন একজন সোৎসাহী যুদ্ধবিশারদ তিনি যে স্বেচ্ছায় বা নিছক হিন্দু প্রীতির বশবর্তী হয়ে রাজপুতদের স্বাধীনতা ঘোষণাকে নিরুদ্বেগ ও উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করবেন নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া একটু কঠিন। এটা মনে রাখতে হবে যে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সুলতান সব বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁরই রাজত্বকালে সফল বিদ্রোহের মাধ্যমে অভ্যুদয় হয়েছিল বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যদ্বয়ের।

এমনও হতে পারে রাণা হাম্বীরের সঙ্গে সুলতান মহম্মদের সংঘর্ষ যখন হয়েছিল তখন সুলতানের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের ফলে সামরিক শক্তি দ্বিধাবিভক্ত এবং শিথিল হয়ে পড়েছিল।

সুতরাং রাণা হাম্বীরের সঙ্গে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে সুলতানের পরাজয়ের কাহিনী নিছক

চারণকবির রূপকথা বলে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলেই আমার বিশ্বাস।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
বারাসত

ফেরা যায় না, তবু যেতে চাই

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের 'ফেরা যায় না, তবু যেতে চাই' (দেশ. সংখ্যা ১০) পড়লাম। প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক-সাংবাদিকের আলোচ্য রচনাটি মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, ব্যাকুল করে তোলে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পট-ভূমিকায় একটা খুব সুন্দর কথা লেখক তাঁর রচনায় স্বীকারোক্তির ছলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন : 'দুয়ে পরিহাস বলে একেই। আমি যে বাঙাল সেটা চাপা দিতে একদিন চেষ্টার কসুর ছিলো না। তুখোড় অস্বীকারের ফুঁয়ে সবকটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছি। আর আজ তাকে ফিরিয়ে আনতে কী মর্মান্তিক সাধাসাধি। বড়াই করে বলে বেড়াই, আমারও জন্ম পূর্ববঙ্গে—বাংলা-দেশে। এত যে বিলেত ফেরতাগিরির জাঁকজমক—হঠাৎ ঝুটা হয়ে গেছে।'

এই ধরনের বড়াইয়ের কারণ হিসেবে লেখক পরক্ষণেই ফের জানিয়েছেন : '"বাঙালী"—বলে প্রধান একটা জাতির নাম ওরা জগৎসভায় বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছে। বাঙালী বলতে অতঃপর প্রধানত ওদেরই বোঝাবে, আত-চাকাক, অতি-চালবাজ, আত্মমর্ষক, কলহক্লান্ত বুদ্ধি-অভিমানী আমাদের নয়। এই সারকথা বুঝতে পেরেছি।'

যদিও আমার জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ ঐ সোনার বাংলার নয়, যদিও ঢাকা, যশোর, ময়মনসিংহ, খুলনা, চট্টগ্রাম সবই আমার কাছে অচেনা, বিদেশ—তবু কেমন যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পাই। ওপারের সঙ্গে নিজের অন্তরের আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করি।

অশোককুমার চক্রবর্তী
কলকাতা-২

"বাঙালীর ইতিহাস" প্রসঙ্গে

"বাঙালীর ইতিহাস" প্রসঙ্গে মনোরমা সিংহরায় লিখিত পত্র ('দেশ' ৮ জানুয়ারী, ৭২) মনোযোগ সহকারে পড়লাম। "যত-দূর জানি দ্বিতীয়পর্ব রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ তাঁর শেষ হয়েছে।" 'বাঙালীর ইতিহাস' দ্বিতীয়পর্ব তা হলে সত্যিই প্রকাশিত হবে?

দু' সপ্তাহ আগে শ্রীযুক্ত সনাতন পাঠক এ বইয়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন : "এই বই এখন ছাপা নেই...এটা একটা অবিশ্বাস্য অন্যায় ঘটনা।" শ্রীমতী সিংহরায় লিখছেন : "কথাটি সত্য, কিন্তু ঘটনাটি অবিশ্বাস্য বা অন্যায় নয়।" এবং তার সঙ্গে যোগ করছেন : "লেখক, প্রকাশক বা সরকার কেউ তার জন্য দায়ী নয়।" বাস্তবিক ১৩৫৬ সালে মূল গ্রন্থ প্রকাশের পর (বিশেষত শুশুনিয়া পাহাড়, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, বেড়াচাঁপা ইত্যাদি স্থান খননের ফলে) বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্ব সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। আর তাই "নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক হিসাবে সংযোজন ও সংশোধন ছাড়া নীহাররঞ্জন" যে "স্বভাবতই মূল সংস্করণটি পূর্ববৎ প্রকাশ করার অনুমতি" দিতে কুণ্ঠা বোধ করবেন তা আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষিত পাঠকদের পক্ষেও সম্পূর্ণ বোধগম্য—মনোরমা দেবীর "আলোকপাত" বিনা-ই।

কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকেই যায় : প্রয়ো-জনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহ বইটি প্রকাশে অসুবিধা (একাধিক প্রকাশক এগিয়ে এসেছিলেন) ঠিক কোথায় ছিল? (মনোরমা দেবী যদি এদিকে একটু আলোক-পাত করতেন!) তাই সনাতন পাঠকের বিক্ষুব্ধ উক্তিকে "ক্ষিপ্র" অভিধাযুক্ত করায় আমাদের আপত্তি।

লেখক সমবায় কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর সংস্করণটিতে সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজন থাকলেও তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো। ঐ সমিতি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলে তাঁরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঠকদের দৃষ্টি যথোচিত ভাবে আকৃষ্ট করতে পারেননি—এটা ঠিক কি? আমি অন্তত ওঁদের বিজ্ঞাপন দেখেই অবহিত হই ও বইটি কিনে ফেলি।

কিছু দিন আগে "ভারত কোষ" নাড়া-চাড়া করতে করতে জানতে পারি যে হিউ-এন-সাঙ কথিত বিখ্যাত লো-তো-মো-চি বা রক্তমৃত্তিকা বিহার এবং গৌড়াধিপ-শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থান ব্যান্ডেল-বারহারোয়া (পূঃ রেলওয়ে) লাইনের চিরুটি স্টেশনের নিকটবর্তী রাজ-বাড়ি ডাঙাতে। ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঐ অঞ্চলে খননের ফলে এ তথ্য জানা যায়। কিন্তু এই নতুন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (১৯৬৮)টি পাঠ করলেও মনে হবে যে বেভারিজের ধারণাই (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটিই কর্ণসুবর্ণ) বুঝি বর্তমানেরও প্রচলিত ধারণা। সুতরাং "রদবদলের প্রয়োজন নেই এমনভাবে সংস্করণ তৈরি করেছিলেন জ্যোৎস্না সিংহরায়"—এর অর্থ বুঝতে পারলাম না।

মনোরমা দেবী তাঁর চিঠির শেষাংশে বলতে চেয়েছেন যে, বাঙালীর ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব (যার তথ্য সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে) লিখে ফেলার জন্য আচার্য নীহাররঞ্জনের পক্ষে কলকাতায় থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত তিনি তিনটি প্রশ্নও করেছেন ১ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় কি তাঁকে কোন যোগ্য পদে নিযুক্ত করে কলকাতায় পাঠাতে পারেন না?

২ একজন বাঙালী হিসাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন কিনা?

৩ বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কি এই দাবি জানাতে পারেন না?

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের যা করণীয় করুন। কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমাদের ২।১টি বিনীত প্রশ্ন : 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রকাশের পরও দীর্ঘকাল অধ্যাপক রায় কলকাতাতেই ছিলেন। তারপরও বেশ কিছুকাল সিমলায় উচ্চপদে নিযুক্ত থেকে, যতদূর জানি, সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। এখনও "যোগ্য পদ?" কলকাতায় আসার শর্ত-হিসাবে? প্রায় সত্তর বছর বয়সে? পদের দায়িত্বও আছে। বই লিখবেন কখন? শ্রীমতী সিংহরায় বোধ হয় এদিকটা ভেবে দেখেন নি।

সনাতনবাবু আচার্য রায়কে পথ ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বাঙলা ভাষায় বাঙালীর জাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ করবার আহ্বান জানিয়ে-ছেন। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বাঙালী ('এপার বাংলা ও ওপার বাংলায়') এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাবেন। আর এ বিষয়ে সরকার শ্রীযুক্ত রায়কে যথোচিত ও উপযুক্ত সাহায্য করলে, (জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করে বা অন্যভাবে) সকলেরই ধন্যবাদভাজন হবেন—তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

অরুণকুমার রায়চৌধুরী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ।
বীরভূম

ভারতী মুখার্জির উপন্যাস

কলকাতার মেয়ে ভারতী মুখার্জি ইংরেজিতে একটি উপন্যাস লিখেছেন, এবং সেটি বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে। উপন্যাসটির নাম 'দা টাইগারস ডটার'। ভারতী মুখার্জি কলকাতার এক শিল্পপতির কন্যা, এখানে পড়েছেন মিশনারি স্কুলে, বাংলার চেয়ে ইংরেজির দিকেই ঝোঁক বেশী, শিক্ষাসূত্রে বহুদিন আমেরিকা প্রবাসী, কিছুদিন আয়ওয়া শহরে ছিলেন। বিয়ে করেছেন একজন আমেরিকানকে। বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি।

মূল উপন্যাসটি আমরা এখনো পড়িনি। 'নিউজ উইক' পত্রিকায় দীর্ঘ সমালোচনা দেখলাম। আমাদের শহরের মেয়ের বিদেশে প্রশংসা হলে, আমাদের আনন্দিত হবারই কথা।

উপন্যাসটি আত্মজীবনী ধরনের। এর মুখ্য চরিত্রের নাম তারা ব্যানার্জি। তারার বাবা কলকাতার একজন বড় ব্যবসায়ী, লোকমুখে তাঁর ডাক নাম 'বেঙ্গল টাইগার'। তারা কলকাতা থেকে আমেরিকায় যায় পড়াশোনা করতে, সেখানেই একজন মার্কিন যুবককে বিয়ে করে। সাত বছর বাদে সে ফিরে আসে কলকাতায়। সে তার কৈশোরের শহর এবং যে-জগৎকে ছেড়ে অনেকদিন দূরে ছিল, তাকে আবার ফিরে পেতে চায়। তারার সঙ্গে তার স্বামী আসেনি, সে একা—তবু সে কলকাতার জগতে আর মিশতে পারলো না। তাদের বাড়ি উঁচু দেয়ালে ঘেরা, জানলার খসখসে গোলাপজল ছড়ানো হয় রোজ—বাইরের ফুটপাথে ভিখিরিরা ঘুমোয়, মানুষ খুন হয়, গুণ্ডারা হুল্লোড় করে। তারা ব্যানার্জি এ-সবের থেকে অনেক দূরে। সে আলাদা হয়ে গেছে। শুধু সে একা নয়, তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গও কলকাতার এই জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে, তারা নামী হোটেলের বারান্দায় এসপ্রেসো কফিতে চুমুক দিয়ে সময় কাটায় কিংবা মার্কিন পত্রপত্রিকার পুরোনো সংখ্যার পাতা ওল্টায়।

আমেরিকার প্রবাস জীবনের চেয়েও তারা ব্যানার্জির কাছে কলকাতার কৈশোরের জীবন বেশী আকর্ষণীয়, কিন্তু ফিরে এসে সে দেখলো দীর্ঘ প্রবাস তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে দিয়েছে। কলকাতার রুক্ষ জীবনের সঙ্গে সে মিশে যেতে পারছে না—আবার তার উঁচু সমাজের বন্ধুদের সঙ্গেও তার মিল নেই। শেষ পর্যন্ত যখন সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন তার গাড়িতে ইট মেরে কলকাতার মানুষ তাকে সম্বর্ধনা জানায়।

ডেভিড ম্যাকাচ্চিওন

কলকাতায় অনেকেই তাঁকে চিনতেন। সাইকেল চেপে একজন শীর্ণকায় বৃটিশ যুবা ঘুরতেন এই শহরের রাস্তায় রাস্তায়। ডেভিড ম্যাকাচ্চিওন বিলেত থেকে প্রথম এ দেশে আসেন বিশ্বভারতীর ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে। পরবর্তীকালে যাদবপুরে কমপ্যারেটিভ লিটারেচার বিভাগে অধ্যাপক হন। যে-কারণেই হোক, বাংলাদেশের মন্দিরের স্থাপত্য সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মে যায়। প্রায় পাগলের মতনই তিনি বাংলার মন্দিরে মন্দিরে ঘুরেছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের মন্দিরটিও বাদ যায়নি। পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মন্দিরের নির্মাণশৈলী সম্পর্কে তিনি নোট নিয়েছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ডেডিকেটেড বা নিবেদিত। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনার তুলনা নেই। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যতদূর সম্ভব কম ব্যয় করে মাইনের টাকা থেকে বাঁচিয়ে তিনি ঘুরেছেন মন্দির সম্পর্কিত রচনার উপকরণ সংগ্রহের কাজে।

তাঁর উপকরণ সম্ভারের তুলনা নেই। নিজস্ব নোট সংগ্রহ ছাড়াও, গত পনেরো বৎসরে তিনি দুদিকের বাংলার সমস্ত মন্দিরের স্লাইড তুলে রেখেছেন। এমন মন্দিরের চিত্র তাঁর কাছে ছিল, যা এখন ধ্বংসোন্মুখ বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

এবার তিনি ভেবেছিলেন, ঐ সব উপকরণ নিয়ে বই লিখতে বসবেন। অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে এই রচনা সমাপ্ত করা শক্ত, তাই তিনি আগামী এপ্রিল মাস থেকে চাকরি ছেড়ে শুধু লেখার ব্যাপারেই নিজেকে নিয়োজিত করবেন ভেবেছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এজন্য স্কলারশিপও পেয়েছিলেন।

কিন্তু লেখা হলো না। গত মঙ্গলবার ডেভিড ম্যাকাচ্চিওন মারা গেছেন। হঠাৎ পোলিও রোগ এসে এই মহৎ বিদেশীটিকে চিরকালের মতন ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

—সনাতন পাঠক

চিঠিপত্র

॥ ১ ॥

আপনার "বাঙ্গালীর ইতিহাস" শীর্ষক আলোচনা পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। "বাঙ্গালী জাতির এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বাঙালীর সম্পূর্ণ ইতিহাস পাঠ করার চেয়ে বড় কাজ আর কি থাকতে পারে।"—এ অভিমত বাঙালী মাত্রই সমর্থন করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিলাপ করে বলেছিলেন,—"সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই।......বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না।" বঙ্কিমোত্তর যুগে অবশ্য এ অভাব খানিকটা মিটেছে।

কিন্তু নীহাররঞ্জনের "বাঙ্গালীর ইতিহাস" সম্পর্কে আপনার অভিমতের একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। গ্রন্থটি নিশ্চয়ই একটি তথ্যপূর্ণ, মূল্যবান ও ব্যাপক সামাজিক ইতিহাস—তবে এ এক নতুন ধরনের ইতিহাস কি না তা বিবেচনা সাপেক্ষ। পুস্তকটির প্রথম প্রকাশকাল মাঘ, ১৩৫৬। এর বেশ কয়েক বছর আগে এ ধরনের আরেকটি বৃহৎ সামাজিক ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষায় সেটি একটি 'পাইওনীয়র ওয়ার্ক' বলা চলে। গ্রন্থটি দীনেশচন্দ্র সেনের "বৃহৎ বঙ্গ"।

প্রকাশকাল ১৩৪১। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এ পুস্তকটি বাঙ্গালী জাতির ব্যাপক সামাজিক ইতিহাস। এ ছাড়াও এ প্রসঙ্গে আরেকটি বইয়ের অন্তত উল্লেখ করা চলে। গ্রন্থটির কলেবর অত্যন্ত ক্ষীণ। কিশোরদের জন্য রচিত। প্রকাশকাল আরও পূর্বে— ১২৮৯ সালে। বইটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালীর ইতিহাস"। পুস্তকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে মন্তব্য করেছিলেন,—"মুষ্টিভিক্ষা বটে, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোট ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু উদৃশ, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"

নীহাররঞ্জনের গ্রন্থটির নিরপেক্ষ সমালোচনার পথ সুগম নয়। এতে পর্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করেছেন আচার্য যদুনাথ। পুস্তকটির পরিচয়পত্রে তিনি লিখেছিলেন, —"ছিদ্রান্বেষী হইলে তেমন ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু কিছু ধরা পড়িবে, বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই ধরনের দৃষ্টি লইয়া এই গ্রন্থ যাহারা পড়িবেন, তাহারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হইবেন ....সেই মহিমাই বিচারের বস্তু ছিদ্রগুলি নয়।" বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাঠকমনের স্বাধীনতায় এ ধরনের গণ্ডি টানার নজির আর আছে কিনা, জানি না। আচার্য যদুনাথের নির্দেশ অমান্য করার মত ঔদ্ধত্য বর্তমান পত্রলেখকের নেই। তবুও পাঠক হিসেবে নীহাররঞ্জনের গ্রন্থটি বারংবার পাঠ করে মনে হয়েছে, মাত্র তাঁহার রদবদল করে 'কাঁচি ও আঠার' যে পরিমাণ ব্যবহার করা হয়েছে, সে তুলনায় ঋণ স্বীকারে কার্পণ্য রয়েছে। এ বিষয়ে পাঠকজনের দৃষ্টি নিবেদনপক্ষে দুটি গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ করব। একটি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বিনয়চন্দ্র সেনের "Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal" আর অন্যটি দীনেশচন্দ্রের "বৃহৎ বঙ্গ"।

রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "History of Bengal"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ দেশবিভাগের পর সম্পাদকের বিনানুমতিতেই প্রকাশিত হয়েছিল। চলতি বছরে কলকাতার জনৈক প্রকাশক রমেশচন্দ্রের "History of Ancient Bengal" পুস্তক প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ইতিহাসের অনুসরণে রচিত একটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
কলকাতা

॥ ২ ॥

একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে এই চিঠিতে আমি 'দেশ' পত্রিকার ওপর কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করতে চাই। কিছুদিন আগে আপনার নিজস্ব বিভাগে আপনি 'দেশ' পত্রিকার সমালোচনা করেছেন। অবিশ্যি তাকে সমালোচনা বলা যায় কিনা সেটা একটা বিতর্কের বিষয়, কেননা প্রশংসাবাক্য ছাড়া অন্য কিছু তো আপনি হাতের কাছে খুঁজে পাননি, কিংবা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছেন। আপনার কিছু বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত, এবং কিছু বক্তব্যের বিরোধী।

'দেশ' পত্রিকা হাতে পাবার পর প্রথমেই আমি পড়ি সাহিত্য-সংবাদ। খুশি হবেন না, কারণ আপনার লেখা সম্পর্কে আমি কিন্তু কোনো প্রশংসা করিনি। আপনার সাহিত্য-সংবাদ অত্যন্ত হালকাভাবে লেখা, কোনো গভীরতা ওতে নেই। তা ছাড়া মাঝে মাঝে আপনি এমন কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন, যেগুলো কখনোই সাহিত্য-সংবাদের বিষয়বস্তু হতে পারে না।

এবারে কবিতা। কবিতা পড়বার আগে ওপরের বিষয়গুলো পড়ি এইজন্য যে ধীরেসুস্থে কবিতাগুলোকে সম্ভোগ করা যাবে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই নিরাশ হতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা চলছে, সমবেদনাও। এ ক' মাসে বাংলাদেশের অনেক কবির কবিতা 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সব কবি-ই—আল মাহমুদ বা শামসুর রাহমান নন। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকায় যখন দেখি...'আমি আমার ডান দিকে তাকিয়ে/আল মাহমুদকে দেখতে পাই।/ কিন্তু বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে/শামসুর রাহমানকে খুঁজে পাই না।'...তখন বাংলা কবিতা সম্পর্কে এক ধরনের ভয় এবং দুঃখ আমাকে আচ্ছন্ন করে। এই সমস্ত কথা জানাবার জন্য সত্যিই কি কবিতা ছাপাবার প্রয়োজন ছিল?

ধারাবাহিক উপন্যাসের ব্যাপারে আমিও ধৈর্যহীন। জ্যোতিরিন্দ্র আমার অন্যতম প্রিয় লেখক, তাই তাঁর লেখাটি পড়তে শুরু করেছিলাম, কিন্তু বেশী দিন নিষ্ঠাবান থাকা সম্ভব হয়নি। শিবরামের আত্মজীবনীতেও ভেজালের গন্ধ পাচ্ছি।

বর্তমানে 'দেশ' পত্রিকার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ বিমল করের 'অসময়'।

গণেশ মজুমদার
যাদবপুর

॥ ৩ ॥

শ্রীপাঠককে এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। গত আলোচনাটা আমায় বিচলিত করেছে। শ্রী পাঠককে এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। গত বছরও আমি প্রায় প্রত্যেক শনিবারে মুক্তমেলায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। কয়েকটা ঘণ্টা একটা নির্দোষ আনন্দ বিনিময় করে হালকা মনে ঘরে ফিরেছি। প্রতি সপ্তাহে "রুটিন মাফিক" কাজকর্মের পর মুক্তমেলা আমার দেহ-মনের ক্লান্তি মুছে দিত। কাজেই, শ্রীপাঠকের সঙ্গে আমারও বলতে ইচ্ছে করছে, "স্বতঃস্ফূর্ততার উৎসবই এই মেলার প্রধান গুণ এবং তা বিস্ময়করভাবে সার্থক হয়ে উঠেছিল। যখন মুক্তমেলার ভেতরে ও বাইরে আমরা সমালোচনা করছিলাম—কি করে মুক্তমেলাকে আরও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা লক্ষ্য করছিলাম, আড়ষ্টতা বা লজ্জার জন্য অনেক গুণী তরুণ-তরুণী মুক্তমেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারছিলেন না!— একদল যুবক তখন থেকে ঘুষি পাকিয়ে মুক্তমেলা ভাঙতে ছুটে এলেন—মার্কিনী কালচার হটানোর যুক্তি দেখিয়ে। কিন্তু মুক্তমেলা বাঙালীর নিজস্ব অনুষ্ঠান। তবে আমার মনে হয়, অভিযোগকারীদের মার্কিন কালচার সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। বিশেষত লোকজন দেখে তাঁরা যখন টুইস্টের খোয়াব দেখেন। মুক্তমেলা এক বাস্তব হোক, অর্থাৎ এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হোক—যেখানে মুক্তমেলার সাহায্যে প্রমাণ করতে পারবেন— খাস কলকাতাতে পুলিসী সাহায্য ছাড়া নির্বিঘ্নে আমরা সাংস্কৃতিক উৎসব করে চলেছি।

আমি বিশ্বাস করি, তাদের একদিন শুভ-বুদ্ধি ফিরবেই। বোমা মেরে, একটা বাচ্চা মেয়ের পা নষ্ট করে লাভ তো কিছুই নেই বরং সবদিক দিয়ে এক অপূরণীয় ক্ষতি —এ সত্য তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

পার্থ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা।

॥ ৪ ॥

কানাডা কাউন্সিল এবার ন' দিনের একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন শেকসপীয়র-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় শ-পাঁচেক প্রতিনিধিকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কেউ পেপার, কেউ ফিল্ম্ নিয়ে এসেছিলেন। একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল। খরচ বহন করেছে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একরকম একটা অনুষ্ঠান কী হতে পারে না! আমাদের হয়তো অত সাহস নেই, পয়সা তো নেই-ই। কিন্তু ভারতবর্ষের তাবৎ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এরকম একটা অনুষ্ঠান কী করা যায় না? না-হলে শুধু বাঙালীরাই এই সম্মেলনে আসুক। খুব ছোট করে হোক। ওরা ন' দিন করেছে, আমরা তিন দিন করবো; একদিন নাটক হবে, একদিন সিনেমা, একদিন পেপার। রবীন্দ্রনাথের উপর শুধু বাংলা বইয়ের সংখ্যাই শ-চারেক, কিংবা পেরিয়ে গিয়েও থাকতে পারে। প্রয়োজন হলে বিবলিয়োগ্রাফি আমরা করে দেবো।

নিমাই ঘোষ

গবেষণা : বঙ্কিমচন্দ্র ,

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা, ১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মূল্য বারো টাকা।

"বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-পত্রিকা — বঙ্গদর্শন।" পৃ. ৯৯

"১২৭৯ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, মাসিক বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম চার বৎসরের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। অর্থাৎ ১২৭৯র বৈশাখ থেকে ১২৮২র চৈত্র পর্যন্ত।" পৃ. ১৩৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে বইটি একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনাগ্রন্থ। গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনা আরম্ভ করার কারণ আছে। এই বছর বঙ্গদর্শন পত্রিকার শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে, এ কথা স্মরণ করাই হচ্ছে এই কারণ।

এই রকম সময়ে এই বই হাতে আসায় আমরা লাভবান হয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন—যেন প্রায় সমার্থক। এতে বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন এবং তৎকালীন লেখকগোষ্ঠী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সমাকৃত দেখে আমরা আনন্দলাভ করেছি। আনন্দ লাভ করার অন্য কারণও অবশ্য আছে—তা হচ্ছে তরুণ লেখকের নিষ্ঠার পরিচয়; এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে তা পরিস্ফুট। তথ্য সংকলনের নিপুণতাও যেমন আছে তেমনি আছে গভীর অধ্যয়ন ও মননের পরিচয়। গবেষণার নামে অনেক ছেলেখেলা আজকাল হচ্ছে, এটি যে তেমন বস্তু হয়নি—এটা আনন্দের কথা। বইটি লেখকের বহু পরিশ্রমের ফল ও গভীর নিষ্ঠার ফসল। এ কথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

বইটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা—বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাসাহিত্য চিন্তা, বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গদর্শনের সাহিত্য-সমালোচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা, বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনা, বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী, বঙ্গদর্শনের কালানুক্রমিক সূচী।

প্রতিটি অধ্যায়ই সমান যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে লেখা। অমিত্রসূদন যে বঙ্কিমসাহিত্য মন্থন করেছেন, তার প্রমাণ আছে প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনাতেই, বিশেষ ক'রে প্রথম অধ্যায়ে — বঙ্কিমসাহিত্যের পাঠান্তর অধ্যায়ে। কোন্ বইয়ের কি পাঠ ছিল তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি লক্ষ করেছেন, এবং পরবর্তী কালে কোন্ সংস্করণ থেকে বঙ্কিম কোন্ পাঠ পরিবর্তন করেছেন কিভাবে, অমিত্রসূদন তা আমাদের দেখিয়ে দিতে পেরেছেন। বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁর কোন্ কোন্ উপন্যাসের কয়টি করে সংস্করণ হয় তারও যেমন উল্লেখ আছে, সেই সঙ্গে কোন্ সংস্করণের কোথায় পাঠের বদল করা হল তার বিশদ বর্ণনাও আছে। এমন কাজ এর আগে হয়েছে কি না—আমাদের সঠিক জানা নেই। 'কপালকুণ্ডলা'র শেষাংশের পরিবর্তন, 'ইন্দিরা'র পরিবর্ধন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ মৃত গোবিন্দলালের পরবর্তী সংস্করণে পুনর্জন্ম প্রাপ্তি, এই উপন্যাসেই রোহিণীর আমূল পরিবর্তন—যে ছিল চোর ও পাপিকা, সে আর তদ্রূপ নয়। এরূপ খুঁটিনাটি ক'রে অনেক বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিচার করাও হয়েছে। সব কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়। মোট কথা এই যে, বিশেষ ক'রে এই অধ্যায়টি লেখকের মনন অন্বেষণ অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছে। আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরকম কাজ ও আলোচনা হল না,—এটা আমাদের আক্ষেপ।

বাংলা সাহিত্যে নীতিবাক্য সম্বন্ধে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র; নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনীর আলোচনা-সূত্রেই' বঙ্কিম এ কাজ করেন, কাব্যরসের সামগ্রী কি, কাব্যমধ্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান কোথায় ও কতখানি—এ সবের নির্দেশও করেন বঙ্কিমচন্দ্র। এর উল্লেখ এ বইয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যশিল্পী হলেও মূলত তিনি কবি, এইজন্যই বাস্তবেক কাব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে 'বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা' অধ্যায়ে।

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যেসব সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, এর মধ্যে বেশির ভাগই কাব্যগ্রন্থ। এসব আলোচনা মূল্যবান। এ গ্রন্থে সেসবই সমাহৃত হয়েছে। সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্যও তুলে ধরা হয়েছে।

মোট কথা, সাহিত্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানধারণার নিখুঁত পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দ পেয়েছি। স্পষ্ট কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় কিছুটা রূঢ় ও নির্মম হতে হয়, বঙ্কিমকেও তেমন হতে হয়েছে। এর জন্যে তিনি সেকালে অনেকের অপ্রীতিভাজনও হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর পক্ষে সব ব্যাপারে সায় দিয়ে যাওয়া সাজে না।

বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনা এবং বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী ও তার কালানুক্রমিক সূচী অনেকেরই কাজে লাগবে। হাতের কাছে এরকম তৈরি জিনিস পেলে সকলেরই খুশি হবার কথা। বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী বিষয়ে আলোচনা অনেকটা যেন বিস্মৃতপ্রায় লেখকদের পুনরুদ্ধার করা। কাজটা আমাদের খুব মনঃপূত হয়েছে।

পরিশিষ্টে বঙ্গদর্শনের নিয়মাবলী, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার সমালোচনা সংযুক্ত আছে। তৎসহ আছে নির্দেশনা। এবং বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের নামপত্র সহ কয়েকটি পৃষ্ঠার চিত্রও মুদ্রিত হয়েছে।

সমগ্রভাবে বইটি একটি সুসম্পূর্ণ আলোচনা।

কবিতা

বৈরী মন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পরিণত কবি মঙ্গলাচরণের গত তেরো বছরের সংগৃহীত ফসল এই কাব্যগ্রন্থ। যে বিদ্রোহ, সমাজচেতনা ও রোমান্টিক স্বপ্ন নিয়ে তাঁর কাব্যপ্রতিভা সূচনা করেছিল বাঙলা কাব্যের চল্লিশের যুগে সেই প্রতিভা সমাজ পরিবর্তনের নানা ছায়াপাতে এখনও সজীব, তবে আরও অন্তর্মুখী, আরও সুস্থির পরিবর্তনের পক্ষপাতী, 'স্বপ্ন স্বপ্নতপ্ত স্বপ্ন-নবায়ন স্বপ্নপ্রণোদিত'-এর মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বরূপ সৃষ্টিতে এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতিমধ্যে আরও দুটি দশক কেটেছে। মানুষের মূল্যবোধ ভেঙেছে, গড়েছে আবার ভেঙেছে এবং এইভাবেই 'নৈরাশ-আশার টানা পোড়েন সুতোয়' দিনরাত্রি সন্ধ্যা কালিকাকে এগিয়ে চলেছে সেই চেতনার ইতিহাসের 'তীর বিলম্বিত' আদর্শের দিকে। কবির এই ইতিহাস চেতনা, এই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার ধৈর্য, মানুষের ভাঙা অস্তিত্বের

পরিমাপ-চেষ্টা তাঁকে বিচিত্র সামাজিক আতংককেও অবিচলিত রেখেছে. তাঁর মানসিক স্ফূরণ অবাধে এগিয়ে গিয়ে তাঁর অমর অমেয় শক্তিকেই প্রমাণ করেছে। অবিচলিত মিছিল, পাপড়ি-খোলা শতদল, মোহানার দিকে পথ, গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা-আলো, শিকড়ের নখে-বেঁধা যন্ত্রণার ভূমি ইত্যাদি চিত্রকল্পের দ্রুতচলমানতায় সেই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণই অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিতাগুলির শরীরে এমন দ্রুত সঞ্চালনের শিহরন আছে, যে শিহরন বিচিত্র ছবি, স্বপ্ন অভিজ্ঞতাকে এক সহজ প্রত্যয়ে সুস্থ সমাজে কবিকে পেঁছে দিতে চায়। কবি হয়তো বোঝেন যে সেই সুস্থ-চেতনাকে পেতে গেলে দীর্ঘ পথ পার হতে হবে, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী মন সমস্ত দ্বন্দ্ববাদকে দ্রুত সামঞ্জস্যে এনে এক অদ্বৈত চেতনায় উত্তীর্ণ হতে চায়। মঙ্গলাচরণ তাই আধুনিক সময়, সমস্যা, জীবনকে গভীর-ভাবে ছুঁয়েও কালাতীত ঐক্যে বলিষ্ঠ স্বপ্ন-চেতনায় একটা স্থায়ী আধ্যাত্মিক দীপ্তিতে সমকালের কবিদের প্রেরণাস্থল সন্দেহ নেই। তাঁর বৈরী মন আসলে বিদ্রোহী মনেরই নামান্তর, যে মন এযুগের স্বভাব-ধর্মকে গ্রহণ করেও এক অখণ্ড প্রত্যয়ে স্থিত হতে চাইছে। ১৩২/৭১

গল্পগ্রন্থ

সম্রাটের ছবি। আবদুল গাফফার চৌধুরী। মুক্তধারা, ৯ অ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। দাম ছ টাকা।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'বাংলাদেশ' কথাটা বর্তমানে সম্ভবত একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। পশ্চিম বাংলার সাহিত্যও তো বাংলা সাহিত্য! বাংলাদেশের গল্প বা সাহিত্য বলতে এখন রীতিমতো সমস্যা এসে পড়ছে। যাই হোক, এই বিভ্রান্তি এড়ানোর একটা উপায় সাহিত্য আলোচনায় পূর্ব বা পশ্চিম বাংলা কথাটা ব্যবহার করা। রাজনীতিকরা অনেক সময় শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমনি সব অদ্ভুত সমস্যা সৃষ্টি করে বসেন।

বারোটি গল্পের সংকলন 'সম্রাটের ছবি' প্রায় তেরো বছর আগে ঢাকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কলকাতা সংস্করণ। আবদুল গাফফার চৌধুরী ও বাংলার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক। এই গল্পগুলি পড়লে তাঁর মানসিকতা বা মেজাজ ও রুচির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে অবশ্যই তিনি কনভেনসনের অনুগামী। তা সত্ত্বেও কয়েকটি গল্পে বিষয়বস্তু, পটভূমি ও চরিত্রে নতুনত্বের প্রকাশ আছে। স্বাদেও বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু কাহিনীপ্রধান ছোট গল্পের যা দোষ—নাটকীয়তা, মেলোড্রামা, কিংবা অন্ত-চমক—তা অল্পবিস্তর এ সব গল্পে রয়েছে। মোটামুটিভাবে গ্রাম ও শহর—দুই পটভূমিতে গল্পগুলি লেখা। সেদিক থেকে গ্রামের গল্পগুলিতেই শ্রীচৌধুরীর স্বভাবসিদ্ধ কুশলতা চোখে পড়ে। সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প 'দুই শরিক।' 'উপাখ্যান' গল্পটিতে উপন্যাসের ইঙ্গিত আছে। 'বিনিদ্র' গল্পে সমাজ ও মানুষের মধ্যে ট্রাজিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গভীর নৈতিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। 'কুমকুম' মমতার মধ্যে দিয়ে প্রেমে উত্তীর্ণ হওয়ার সুন্দর নিদর্শন। কয়েকটি গল্পে কিছুটা কাঁচা হাতের স্বাক্ষর আছে। এবং বেশির ভাগে গল্পের নামকরণ সন্তোষজনক মনে হয় না। তা ছাড়া আধুনিক ছোট গল্পের যে বৈশিষ্ট্য—মানুষকে খুব ভিতর থেকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা—তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। তবু পাঠক যদি গল্পগুলি পড়ার সময় মনে রাখেন যে, এগুলি পূর্ব বাংলার আধুনিক ও তরুণ মুসলিম প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর, তা হলে তাঁর রসপথ হতে দেরি লাগে না। দেশ ভাগের পর নতুন মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার ও চরিত্রের পরিচয় এখানে মেলে। তাঁদের মানসিকতা ধরা পড়ে। অবশ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোট গল্প বিচারে এই ধরনের সমাজতান্ত্রিক মাপকাঠির কোন শিল্পগত মূল্য নেই।

দুই বাংলার সেরা গল্প। শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত। বাক্‌ সাহিত্য লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম আট টাকা।

'বাঙলাদেশে' স্বাধীনতার রক্তাক্ত সংগ্রাম পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে ঐক্যসূত্রে গেঁথেছে। গত দশকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাপ্রবাহকে নতুন প্রাণ দিয়ে পূর্ব বাঙলার মানুষ পৃথিবীতে এক নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। ভাষাই যে জীবন এবং সে জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে প্রয়োজন হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত দিয়ে দেওয়া যায় এমন দৃষ্টান্ত কটা আছে? পূর্ব বাঙলার মানুষ শত অত্যাচারের মধ্যেও গল্প-উপন্যাস কবিতায় তাঁদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়ে চলেছেন এই দু-দশক ধরে। অথচ পশ্চিম বাঙলার মানুষ সে সাহিত্যের খবর পায়নি। সেই আক্ষেপ এখন মিটছে কিছু কিছু সাহিত্য-সংকলন প্রকাশের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য সংকলন এই রকম একটি সংকলন যাতে দুই বাঙলার পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কিছু প্রতিনিধি-স্থানীয় গল্প লেখকদের কিছু ভালো গল্পের একত্র সমাবেশে বাঙালী পাঠক তৃপ্তি পাবেন।

পূর্ব বাঙলার ছোট গল্পের মধ্যে পূর্ব বাঙলার জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয়। বোরহানউদ্দিন খান, জাহাঙ্গীর, শওকত ওসমান, রাবেয়া খাতুন, আতাউর রহমান ইত্যাদির গল্পে ছোট গল্পের ফর্ম সম্পর্কে তীক্ষ্ম মনোযোগ, গল্পের স্বাভাবিকতা, চরিত্র-মনোযোগী কাহিনী, গল্পের অন্তর্লীন-নির্দেশক তীক্ষ্ম ভঙ্গি, প্রাণের ভিতরমুখী টান, প্রকৃতি ও মানুষের অভিন্নসত্তা আমাদের কাছে গত দশকের ব্যবধানের ফলে জীবনের গভীর ও নতুন স্বাদ নিয়ে আসে তীব্রভাবে। পশ্চিম বাঙলার তরুণ গল্প লেখকদের কয়েকটি স্মরণীয় গল্প এ সংকলনে আছে। শীর্ষেন্দুর 'ঘরের পথ', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক হাত গণ্ডারের ছবি', বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকবেলা', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মাটি', মতি নন্দীর ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন' অনুভাবে, অভিজ্ঞতায় ও প্রতীকী বাঙলায় সাম্প্রতিককালের স্মরণীয় গল্প। বোধহয় রিক্ততা আর তিক্ততার স্বাদ এ বাঙলার গল্পে বেশি। তবে দুই বাঙলার সম্মিলিত সাধনায় জীবনের এই অসুখের ওপর মমতার স্পর্শ লাগবে আশা করি।

কিশোর সাহিত্য

পাত্তাবাহার। সত্যেন সেন। মুক্তধারা, ৯ অ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৯। মূল্যঃ পাঁচ টাকা।

নামেই বোঝা যাচ্ছে, এটি ছোটদের বই। বইটি চার বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ এখনকার বাংলাদেশে। লেখক ওখানকার যশস্বী শিশু-সাহিত্যিক। খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা তাঁর যে অকারণে হয়নি, এ-বইটি পড়লে তা বুঝতে দেরি হয়না। তাঁর কৃতিত্বের তালিকায় অবশ্য আরো বই আছে। উপকথা এবং রূপকথার ধরনে তিনি এ-বইয়ে গল্পগুলি বলেছেন। বলার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন। কখনো রূপ-কথাকে রূপক মনে হতে পারে। মাছ, মুরগী, ভালুক, কাঠুরে, রাজা-রাণী, শুক-পাখি—এমন কি শনশনে বাতাস পর্যন্ত সবাই এ-বইয়ের চরিত্র। তবু লেখক কল্পনা এবং অসম্ভবের সঙ্গে বাস্তবতার সুন্দর মিতালি করাতে পেরেছেন। গল্পে চালু ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ছড়াও তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রায় গল্পেই একটি প্রচ্ছন্ন মাতৃবোধ কাজ করেছে। সেটি কী তা এই পরিবর্তিত অবস্থায় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে 'ভালুকের মা' গল্পটি খুবই মর্মস্পর্শী।

২৪৭/৭১

ব্যাডমিণ্টন বাড়ির মেয়ে

দীপু, গোরা, রমেন, রবীন, রঞ্জন ও সন্দীপ্তা—স্বর্গীয় সুশীলকৃষ্ণ ঘোষের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে পাঁচজনই সবাই ব্যাডমিণ্টনে সুপরিচিত। দীপু ও রমেনের পরিচিতি ও খ্যাতি তো আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনেও। মেয়ে সন্দীপ্তাও আস্তে আস্তে পরিচিত হতে আরম্ভ করেছে।

পাঁচ ভাইয়ের ছোট বোন। একমাত্র বোন। সম্ভবত সেই জন্যই সন্দীপ্তা সকাল সকাল কোর্টে নেমে তালিম নেওয়ার সুযোগ পায়নি। ভাইয়েরা ভেবেছিল বোনকে বিয়ে তো দিতেই হবে। পড়াশুনায় ভাল, গানের দিকে আগ্রহ রয়েছে, আঁকারও হাত ভাল। সুতরাং একসঙ্গে সব শিখতে গেলে তাল-গোল পাকিয়ে যাবে। তাই ছোটবেলায় সন্দীপ্তাকে দাদাদের র‍্যাকেট, সাটলকক আর প্রতিযোগিতা থেকে পাওয়া রাশি রাশি প্রাইজ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। খেলার সুযোগ আসেনি। অথচ ছোটবেলায় ওদের চন্দননগরের বাড়িতেই ব্যাডমিণ্টনের ঐকতানের মধ্যে বেড়ে উঠেছে সন্দীপ্তা। বাড়িতেই কোর্ট ছিল। সবচেয়ে উৎসাহী খেলোয়াড় ছিলেন বাবা। মাও মাঝে মাঝে কোর্টে নেমে পড়তেন। একদিকে মেজদাদা গোরা ও বাবা অন্য দিকে দাদা (দীপু) ও মা। জোর খেলা চলত। কম্পিটিশনের খেলার মতই সে খেলার গুরুত্ব। অবশ্য সবই সন্দীপ্তার ঝাপসা স্মৃতি। ১৯৬৩ সালে বাবা যখন মারা যান তখন ওর বয়স দশ কি এগারো।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে বিজয়ীর সম্মান তিন-চারবার অল্পের জন্য হাতছাড়া হবার পর ১৯৭০-এ দীপু ঘোষ যখন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলেন তখন আকাশবাণীর সংবাদ বিচিত্রার প্রতিনিধি দীপুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই মুহূর্তে কার কথা বেশী করে মনে পড়ছে? উত্তরে দীপু বলেছিলেন, বাবার কথা।

আজ সন্দীপ্তারও দুঃখ, বাবা বেঁচে নেই। থাকলে এর মধ্যে ও অনেক এগিয়ে যেতে পারত। বাবার মৃত্যুর পর ওর শিক্ষা শুরু এবং ১৯৬৪-তে প্রথম রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে রানার্সের সম্মান। ফাইনালে পরাজিত চিত্রতারকা সৌমিত্র চ্যাটার্জির সহধর্মিণী দীপা চ্যাটার্জির কাছে।

খেলাধুলা মহলের অনেকেই হয়তো জানেন চ্যাটার্জি পরিবারের সঙ্গে ঘোষ পরিবারের একটা সখ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ব্যাডমিণ্টনের মাধ্যমে। সেই সূত্রে সন্দীপ্তার সঙ্গে দীপা চ্যাটার্জির সম্পর্কও ননদ-ভাজের মত। আবার ওদিকে মিক্সড ডাবলসের ফাইনালেও অরুণ ব্যানার্জি ও সন্দীপ্তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দেবর-ভাজ দীপু ঘোষ ও দীপা চ্যাটার্জি। তাই

সন্দীপ্তা ও দীপা চ্যাটার্জির ফাইনাল খেলার ফলাফল সম্পর্কে দীপুর ছিল দারুণ ঔৎসুক্য। জীবনের প্রথম প্রতিযোগিতায় সন্দীপ্তা কি করে—শুধু সে জন্যই নয়, ননদের কাছে হেরে গেলে ভাজের মুখের ভাব কি-রকম হয় তা দেখবার জন্যও বটে।

সন্দীপ্তা ঘোষ

তা হলে দাদা-ভাই দুজনে মিলে দীপা বউদির পেছনে লাগা যাবে। আর জিতলে আদায় করা যাবে চীনে খাবার। খাবার অবশ্য মিলেছিল, সন্দীপ্তাও তার ভাগ পেয়েছিল।

বাংলার ব্যাডমিণ্টনে ভাল মেয়ে খেলোয়াড়ের অভাবেই প্রথম বছর সিনিয়রে রানার্সের সম্মান পেলেও সন্দীপ্তা তখন জুনিয়র খেলোয়াড়। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৫-তে দার্জিলিংয়ে মিতা চ্যাটার্জিকে ফাইনালে হারিয়ে সন্দীপ্তা পেল জুনিয়রে চ্যাম্পিয়নের সম্মান। তারপরই ব্যাডমিণ্টনের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। প্রধানত পড়াশুনোর প্রয়োজনে।

আগেই বলেছি, সন্দীপ্তা পড়াশুনোয় চিরদিনই ভাল। চন্দননগরের সেণ্ট জোসেফস কনভেণ্টে একবার ডাবল প্রমোশনও পেয়েছিল। ১৯৭০-এ লরেটো থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে ইতিহাসে অনার্স সহ। তাই দাদারা খেলার মধ্যে টেনে এনে ওর পড়াশুনোয় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাননি। অবশ্য সেণ্ট জোসেফস কনভেণ্ট এবং লরেটোয় সন্দীপ্তা কিছু কিছু ব্যাডমিণ্টন না খেলেছে এমন নয়। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর ওর সাহিত্যপ্রীতির মধ্যেও অলক্ষ্যে ব্যাডমিণ্টন এসে গিয়েছে। একদিন দেখা গেল, ওর কবিতার খাতায় দীপু ঘোষ সম্পর্কে লিখে রেখেছে—

"Dada is an excellent badminton
player
But his body is built of a
very thin layer."

আর একদিন দেখা গেল, সেজদাদা রমেন সম্বন্ধে লিখেছে—

He is playing very well
His smashes bombastic
his drop shots good

• • •

May he climb the ladder of success
And shine throug'h talents of his
And one day when he is a
world class player
We all shall be so pleased.

এ সবই ওর কাঁচা হাতের লেখা। পরে বহু কবিতা লিখেছে সন্দীপ্তা এবং অনেক কবিতার মধ্যে ব্যাডমিণ্টন এসে গিয়েছে। ব্যাডমিণ্টনের সঙ্গে যে ওদের রক্তের সম্বন্ধ, নাড়ির টান।

১৯৭১-এ ইতিহাসে এম এ পড়ার বদলে সন্দীপ্তা যখন ম্যাক্সমুলার ভবনে জার্মান ভাষা শেখার ক্লাসে ভর্তি হল তখন মায়ের অনুরোধেই দাদারা ওকে সিরিয়াস ব্যাডমিণ্টনে তালিম দিতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গীও জুটে গেল সুস্মিতা মুখার্জি নামে একটি মেয়ে, যে মেয়েটি গত বছরই জুনিয়র রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গার্ডেনরিচ রেল কলোনীতে বি এন আর অফিসার্স ক্লাবে গেলে দেখা যাবে রোজ সন্দীপ্তা ও সুস্মিতা অনুশীলন করে চলেছে। দাদারা বেশী সময় পান না। তাই চন্দননগর থেকে রোজ আসে ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় মদন চক্রবর্তী ওদের খুঁটিবিচ্যুতি শুধরে দিতে। মদন অবশ্য সন্দীপ্তার আর এক দাদা। ওই ঘোষ পরিবারের ষষ্ঠ ছেলে।

১৯৭১-এ তোমার অ্যাচিভমেণ্ট কি? 'না খেলে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন'—সলাজ হাসির সঙ্গে সন্দীপ্তার উত্তর। তার মানে? 'মাকে ফাইনালের প্রতিদ্বন্দ্বী অনুরাধা সরকারের সঙ্গে খেলতে হয়নি। ওই সময় হঠাৎ ওর বাবা মারা যাওয়ায় অনুরাধা খেলতে

মাসেনি, আমি ওয়াক ওভার পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ডিব্রুগড়ে আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফল? 'আমরা সেমি-ফাইনালে পি অ্যান্ড টি-র কাছে হেরেছি। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য আমি জিতেছি পি অ্যান্ড টি-র মিস গোদাবরীর বিরুদ্ধে। মাদ্রাজের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে কি করবে? বাংলার হয়ে তুমি আর সুস্মিতাই তো ওখানে যাচ্ছ?

এবার এগিয়ে এলেন দীপু ঘোষ। বেশী কিছু করতে পারবে বলে আশা রাখি না। কেননা ভারতের আট-নটি মেয়ে আছে যারা এখন ওর চেয়ে ভাল খেলে। তবে ব্যাডমিন্টনে ওর যা আগ্রহ দেখছি এবং যেভাবে অনুশীলন করছে তাতে আমার দুঃখ হচ্ছে। একটু আগে ওকে তালিম দিলে খুবই ভাল ফল করতে পারত।"

বেশ একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। তবে বোনের সাফল্য সম্পর্কে দীপু খুবই আশাবাদী। বললেন, 'ওর মারের মধ্যে অসম্ভব জোর, ট্রিমেন্ডাস পাওয়ার। অনেক সময় ভুল হয় কোন মেয়ের হাতের মার কি না। আগে কোর্টে মুভমেন্ট স্লো ছিল। এখন একতারি কর্নারে মুভ করতে পারে। তবু পদক্ষেপে আরও চটুলতা আনতে হবে।'

ব্যাডমিন্টনের শীর্ষে উঠতে সুদীপ্তা সদাসচেতন। উচ্চাশাই সাফল্যের সিঁড়ি ভেঙে শীর্ষে উঠতে সাহায্য করে। জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হবার প্রায় এক যুগ পরে দাদা অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ব্যাডমিন্টন বাড়ির মেয়ে হয়ে সুদীপ্তাই বা পারবে না কেন?

মুকুল

শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হল। যেহেতু শারীর শিক্ষা এবং খেলাধুলো শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ সেহেতু এই দুটি বিষয় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে আমাদের দেশের শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলো কি সংগতিপূর্ণ?

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষাবিদদের অস্থিরচিত্ততা, দশ কি এগারো ক্লাস, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স কি চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের পরীক্ষা নিরীক্ষা, তেমন শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের ভাব। কলেজের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। বাংলার পাঁচ হাজারেরও বেশী মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে কটি স্কুলে খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষার শিক্ষক আছেন? অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও বহু বিদ্যালয়ে একজন করে শারীর শিক্ষক রাখার ব্যবস্থা ছিল। আগের চেয়ে এখন খেলাধুলোর আওয়াজ বাড়া সত্ত্বেও শিক্ষায়তনে খেলাধুলো এবং শারীর শিক্ষা অবহেলিত। এখন অবশ্য স্কুল কলেজে পুরস্কার লাভের প্রবণতা আছে আর সেই প্রবণতার ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হচ্ছে।

আমি খেলাধুলোর ব্যাপারে অসাধু উপায় অবলম্বনের কথাই বলতে চাইছি। স্কুল-কলেজের ছাত্র নয় কিংবা অনেক আগেই যাদের বয়সের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে এমন মেকি ছাত্রদের নিয়ে দল গড়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। এর দ্বারা অন্য ছাত্রদের সামনে আমরা যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি সেটা কোনমতেই শিক্ষাদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। অথচ শিক্ষাদর্শের সঙ্গে সংগতি রেখেই স্কুল-কলেজে খেলাধুলো ও শারীর শিক্ষার চর্চা সম্ভব।

সাধারণ শিক্ষা এবং শারীর শিক্ষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশ এবং চরিত্র গঠনের সুযোগ আসে। শুধু ক্লাস রুমেই এই গুণাবলীর স্ফুরণ হয় না। বিজ্ঞানের ছাত্ররা যেমন থিওরিতে জ্ঞান লাভ করার পরে লেবরেটরীতে গিয়ে হাতে-কলমে জ্ঞান লাভ করে, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ছাত্ররাও তেমন খেলাধুলোর মাধ্যমে সামাজিকতা, সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহযোগিতার শিক্ষা পায়। তাদের সাহস বাড়ে, নেতৃত্বে বিশ্বাস আসে। এক কথায় বলা যায়, সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে শারীর শিক্ষা এবং খেলাধুলোই শিক্ষায় পূর্ণতা আনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিন্তু আমাদের দেশের স্কুল-কলেজে সে প্রচেষ্টা কোথায়?

প্রচুর সাজসরঞ্জাম, বড় মাঠ এবং বড় জিমন্যাসিয়াম ছাড়াও স্বল্প পরিসরের মধ্যে ছেলেমেয়েদের আনন্দদায়ক খেলাধুলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। তার জন্য খরচেরও বেশী প্রয়োজন হয় না। যেমন পাঠক্রমের মধ্যে থেকে সময় করে নিয়ে সপ্তাহে একদিন কি দুই দিন প্লে ডে-র ব্যবস্থা করা—যার মধ্যে থাকবে দশ-বারো রকমের আনন্দদায়ক খেলার ব্যবস্থা। প্রতি খেলায় থাকবে একটি করে শ্রেণী বা দল। ১৫ মিনিট অন্তর শ্রেণী বা দলকে খেলা বদল করতে হবে। ফলে ছেলেমেয়েরা খেলার মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাবে, আনন্দ পাবে। খেলাগুলো হচ্ছে সফট বল, ভলিবল, ডজ বল, নেট বল, ওয়াকিং ফুটবল, লাইন ফুটবল, সার্কেল ফুটবল, ফুটবল-ক্রিকেট, টেনিকয়েট, প্যাডল টেনিস ইত্যাদি। আরও নানা রকমের খেলা হতে পারে। ভারত সরকার প্রকাশিত এন এফ সি হ্যাণ্ডবুকে এবং এইচ ই রইটের লেখা ট্রেনিং ও কোচিং বইয়ের মধ্যে চিত্র-সহ—এ ধরনের খেলাধুলোর নিয়মকানুনের হদিশ পাওয়া যাবে।

শারীর শিক্ষকের খেদ

সেদিন কথা হচ্ছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅমিয় সাহার সঙ্গে। ভদ্রলোক পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস এবং গোয়ালিয়রের শারীর শিক্ষার কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর শারীর শিক্ষার কর্মসূচীকে বিদ্যালয়ে কিভাবে কার্যকরী করা যায় তার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। এই উদ্দেশ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি টি কলেজে বিভিন্ন স্কুলের ১৯ জন উৎসাহী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়ে ১৪ দিনের একটি কোর্স পরিচালনা করা হয়। কম পয়সায়, কম জায়গায় এবং কম সময়ে কিভাবে খেলাধুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বেশী আনন্দ দেওয়া যায় সেটাই ছিল শিক্ষাকোর্সের মূল উদ্দেশ্য। কোর্স শেষে শিক্ষক-শিক্ষিকারা দুটি প্লে ডে প্রোগ্রামের আয়োজন করেন। একটি নৈহাটির নিকটবর্তী গরিফা গার্লস স্কুলে, আর একটি হরিণঘাটার আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। দুটি জায়গাতেই ছাত্রছাত্রীরা অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখিয়ে নতুন ধরনের ক্রীড়া-আয়োজনে সাড়া দেয়।

কিন্তু দুঃখের কথা—অধ্যাপক অমিয় সাহা খেদ প্রকাশ করে বললেন—'বাংলার একটি বিখ্যাত কাগজে এই খেলাধুলোকে

হ-য-ব-র-ল শিরোনামায় উপহাস করা হয়েছে।' খেলাধূলোর প্রক্রিয়াগুলি যে মোটেই অবাস্তব নয় এবং আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী খুবই উপযোগী সেটা বুঝেই ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্পোর্টস থেকে পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

যাই হোক, পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ছাত্রদের উপর যথেষ্ট চাপ রয়েছে। অনেক ছেলে-মেয়ের বয়স অনুপাতে বইয়ের বোঝা বহন করাই শক্ত। এই অবস্থার মধ্যে অবশ্যই তাদের কিছু মনের খোরাকের প্রয়োজন। খেলাধূলোর মুক্ত মাঠেই সে খোরাক আসতে পারে এটা আমরা যেন ভুলে না যাই।

শৈলারোহণ শিক্ষা-শিবির

কলকাতার হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম বার্ষিক শৈলারোহণ শিক্ষা শিবির গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে, দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে।

প্রায় আট বছর আগে হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনই সমস্ত পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম এই ধরনের শিক্ষা শিবির পরিচালনা করে। এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, কলকাতার কাছেই অল্প সময়ে ও অল্প খরচে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের আওতায় থেকে পর্বতারোহণ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা ও শৈলারোহণের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কায়দাগুলি রপ্ত করা। এ ছাড়া শৈলারোহণকে খেলাধূলোর অন্যতম মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

চার দিনের এই শিবিরে রোজ সকালে শিক্ষার্থীরা চলে যেত পাহাড়ের ওপরে। ওখানে শেখানো হয়েছে সহজ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন শিলায় আরোহণ, দড়ির সাহায্যে বিভিন্ন কায়দায় অবরোহণ। পাহাড়ের ছোট ফাটলের একদিকে পিঠ ও একদিকে পা দিয়ে ওঠা ও নামা, অসুস্থ ব্যক্তিকে কি করে উপর থেকে নামিয়ে আনতে হয় তার উপায়, বরফের ফাটলে পড়ে গেলে কিভাবে উদ্ধার পেতে হয় ইত্যাদি। দুপুর অবধি চলত এই শিক্ষাদান। তারপর নিচে নেমে এসে খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু হত পর্বতারোহণের নানা বিষয়ে পুঁথিগত শিক্ষা। রাত্রিতে হত ক্যাম্প-ফায়ার। এর মাঝে একদিন সন্ধ্যাবেলা শৈলারোহণ ও পর্বতারোহণ সম্বন্ধে তিনটি তথ্যচিত্রও শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়। এবারের শিক্ষাক্রমে এর আগে এখান থেকেই শৈলারোহণের শিক্ষা পেয়েছে এমন কিছু ছেলেমেয়েও ছিল। তাদের জন্য একই সঙ্গে একটি

শুশুনিয়া পাহাড়ে শৈলারোহণ শিক্ষায় জনৈক শিক্ষার্থী

রিফ্রেশার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শিক্ষাক্রমে ৬ জন মহিলা সমেত মোট ৩৫ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। শিক্ষক হিসাবে ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের বিখ্যাত শেরপা শিক্ষক শ্রীনিমা তাসি ও শ্রীসেরিং তাসি, কলকাতার শ্রীপ্রবীর লাহিড়ী, শ্রীমতী দিপালী সিনহা ও শ্রীবিদ্যুৎ সরকার। শিবিরপ্রধান ও অন্যতম শিক্ষক হিসাবে ছিলেন শ্রীমানিক ব্যানার্জি।

হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এই শিক্ষা শিবির ছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থা এই শিক্ষা শিবির চালু করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায়, শৈলারোহণ বা রক ক্লাইম্বিং বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বে-সরকারী টেস্ট

সিডনীতে অস্ট্রেলিয়া ও বিশ্ব একাদশের চতুর্থ বেসরকারী টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় দুই দল এখনো ১—১ জয়ে সমান অবস্থায় রয়েছে। পঞ্চম টেস্টের উপর নির্ভর করছে বেসরকারী রাবারের প্রশ্ন।

চতুর্থ টেস্টে বৃষ্টিই বিশ্ব একাদশকে হারের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির ফলে পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা হয়নি। হলে বিশ্ব একাদশের পরাজয় এড়ানো শক্ত হত। কেননা, আগের দিন দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের পাঁচটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল ১৭৩ রানের মধ্যে—তখনো রানের ঘাটতি ছিল ৪০৮।

আরও বলবার কথা, ৬১০ মিনিটে ৫৮১ রান করলে জয় হবে এই অবস্থায় বিশ্ব একাদশ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত তোলে বিনা উইকেটে ১১২ রান। কিন্তু তাদের পাঁচটি উইকেট ঝপঝপ পড়ে যায় মাত্র ৯ রান যোগ হবার মধ্যে। এই অবস্থায় কি তারা শেষ দিন খেলা হলে পরাজয় এড়াতে পারত।

চতুর্থ টেস্টের উল্লেখ করবার মত ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে চ্যাপেল ভ্রাতৃদ্বয় ইয়ান ও গ্রেগের সেঞ্চুরি। সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় এই প্রথম দুই ভাই একই ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি করল। অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল ১১৯ রান করে আউট হয়। কিন্তু গ্রেগ এগিয়ে যায় ডাবল সেঞ্চুরির মুখে। গ্রেগের দুর্ভাগ্য, মাত্র ৩ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি করতে পারেনি নট আউট থেকেও। পারলে এক হাজার ডলার পুরস্কার পেত।

আমরা জানি, আমাদের ক্রিকেটের নতুন তারকা সুনীল গাভাসকারের সময় অস্ট্রেলিয়ায় ভাল যাচ্ছে না। ব্যর্থতাই বেশি। কিন্তু চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সুনীলের নট আউট ৬৮ রান প্রশংসার দাবি করতে পারে।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৩১২ (কিথ স্ট্যাকপোল ১০৪, জন বেনো ৫৪, আর মার্শ নট আউট ৭৭; বিষেন সিং বেদী ৮৬ রানে ৪ উইকেট, ইন্তিখাব আলম ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ—প্রথম ইনিংস—২৭৭ (ইন্তিখাব আলম ৭৩, টনি গ্রেগ ৭০, জি পোলক ৩৭, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৩৬; বব ম্যাসি ১১০ রানে ৭ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ৫৪৬ (গ্রেগ চ্যাপেল নট আউট ১৯৭, ইয়ান চ্যাপেল ১১৯, কিথ স্ট্যাকপোল ৯৫, ওয়াকার ৫৪; ইন্তিখাব আলম ১৩২ রানে ৪ উইকেট, বিষেন সিং বেদী ১৪৪ রানে ২ উইকেট)

বিশ্ব একাদশ—দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইঃ ১৭৩ (একারম্যান ৮৭, সুনীল গাভাসকার নট আউট ৬৮; ওয়াকার ৩৪ রানে ৩ উইকেট, ইনভেরারিটি ৩১ রানে ২ উইকেট)

একলব্য

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যের অলিম্পিক!
বিঘ্নবহুল দৌড় প্রতিযোগিতা!
উংগান গোষ্ঠীর চ্যাম্পিয়ন
ওবিজু!

ওবিজু!

অরণ্যের অলিম্পিক!
উংগান টিমের ওবিজু, তোমার দলই এবারে চ্যাম্পিয়ন, এই নাও ট্রফি!
উংগান! ওবিজু!

অরণ্যের অলিম্পিক অনুষ্ঠান শেষ হল!
ওবিজু-উংগান!
ওবিজু-উংগান!

গ্রামে-গ্রামে তরুণেরা তৈরী হচ্ছে পরবর্তী অলিম্পিকের জন্য —
5/50

কিছু তরুণ চলে যাচ্ছে গ্রামে কিংবা শহরে অন্য কাজে —

চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট ওবিজু!
অরণ্যের অলিখিত আইন, এই অলিম্পিকের কথা বহির্বিশ্বে কাউকে জানানো চলবে না।

কিন্তু আইন কি সবাই মানে?
ওবিজু বলছে, ও আগুনের উপরে পোল-ভল্ট করেছিল!
বলছে, ও নাকি চ্যাম্পিয়ন!
আমি… আমি প্রমাণ দিতে পারি!

পরলোকে অনুভা ঘোষ

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম সারির শিল্পী শ্রীমতী অনুভা ঘোষ আর নেই। গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে এগারোটায় তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪০। এই অকালমৃত্যুর জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার চলচ্চিত্রলোকে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে আসে। পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীরা শ্রীমতী ঘোষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার উদ্দেশে শনিবার সকালে কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত হন। অনেকে শিল্পীর বাড়িতেও যান। পরলোকগতা শিল্পীর স্বামী শ্রীরবি ঘোষকে গিয়ে সমবেদনা জানান। শ্রীমতী ঘোষের মৃত্যুতে শনিবার সকল স্টুডিওর কাজ বন্ধ রাখা হয়।

শ্রীমতী অনুভার মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রের যে ক্ষতি হল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়। সত্যি বলতে কী বাংলা ছবিতে অনুভা ঘোষ নেই এটা যেন ভাবাই যায় না। দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন কঠিন ভূমিকায় তিনি যে অসামান্য অভিনয় করে-ছেন তা দর্শকরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। ব্যক্তিগত জীবনে সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি চলচ্চিত্রলোকে সকলকে আপন করে নিয়েছেন। শুধু অভিনয়ই নয়, জনহিতকর কাজেও তাঁকে পুরোভাগে দেখা যেত। অভি-নয়-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পরও তিনি মঞ্চে অভিনয় করেছেন। তাও দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য। তিনি ছিলেন মহিলা শিল্পী মহলের

একজন একনিষ্ঠ কর্মী। শুধু অভিনয় ক্ষেত্রেই নয় রঙ্গালোকের নানা ক্ষেত্রেই তাঁর অভাব দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠবে। তাঁর মৃত্যুতে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

পুরুষের ভূমিকায় মহিলা শিল্পী মহলের নাটকে

বিভিন্ন ছবিতে নানা ভূমিকায় অনুভা

"ছন্দপতন" (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবিতে অনুভা ঘোষ ও সমিত ভঞ্জ

শ্রীমতী ঘোষের শিল্পীজীবন শুরু হয় নেপথ্য গায়িকা হিসাবে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫। তিনি "সন্ধি", "কর্ণার্জুন" 'সম্রাট অশোক' প্রভৃতি ছবিতে গান গেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভের পর ১৯৪৬ সনে তিনি সিনেমায় যোগ দেন। তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি "সমর্পণ"। তারপর থেকে তিনি অসংখ্য ছবিতে অভিনয় করেছেন। খ্যাতির আলোয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অল্পকালের মধ্যেই। 'কবি', 'রত্নদীপ' "শ্রীশ্রীমা", "হাঁসুলি বাঁকের উপকথা," "শেষ পর্যন্ত", "কাঞ্চনজঙ্ঘা." "পলাতক" "দিবা-রাত্রির কাব্য" "নিমন্ত্রণ" প্রভৃতি অনেক ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আগামী কয়েকটি ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে। এখন 'ছদ্মবেশী' চলছে, এতেও তিনি চমৎকার অভিনয় করে গেছেন।

মঞ্চে তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা দেখা গেছে ইদানীং চলাচল প্রযোজিত একাধিক নাটকে। সাধারণ রঙ্গালয়েও তিনি এক সময় নিয়মিত অভিনয় করেছেন। আগে বলেছি, রঙ্গলোকের অনেক স্তরেই তাঁর অভাব দিনে দিনে অনুভব করবেন সকলে। চমৎকার কবিতা আবৃত্তির জন্য তাঁর ডাক পড়তো নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। সেই পরিশীলিত ও মধুর কণ্ঠ আর শোনা যাবে না। চলচ্চিত্রে কিংবা রঙ্গমঞ্চে তাঁর অননুকরণীয় চরিত্রচিত্রণ আর দেখা যাবে না। অকাল মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চের এক অতুলনীয় অভিনয় সম্পদ।

১৯৬৪ সালে তিনি জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীদিলীপ সেনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

মেরে আপনে

উত্তম চিত্র

বাংলা "আপনজন" ছবির রি-মেক হলেও "মেরে আপনে" হিন্দীচিত্রে কিছুটা উপরিপাওনা আছে। সেটা ইস্টম্যান কালার অবশ্যই নয়; কারণ এ ছবি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট-এ আরও ভাল লাগত। ছবিতে (মূল রচনা : ইন্দ্রমিত্র) যারা আপনজন তাদের মারামারি ও দাংগা-হাংগামার "অ্যাকশন" স্বভাবতই এই হিন্দীছবিতে খুবই রোমাঞ্চকভাবে দেখানো হয়েছে। এই রোমাঞ্চই দর্শকের অতিরিক্ত পাওনা।

'মেরে আপনে' ছবির স্ক্রিপট-এও খণ্ড খণ্ড ফ্ল্যাশব্যাক, অনেকটা বাংলা "আপনজন"-এর স্ক্রিপট-এর মত। তবে গুলজার তাঁর প্রথম চিত্রপরিচালনায় এই ছবিতে বেশ সংযত ও পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শ্যামের প্রণয়-কাহিনীর ফ্ল্যাশব্যাকটি সুন্দর, মার্জিত ও পরিমিত। গুলজার কাহিনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে আগাগোড়া সচেতন ছিলেন সেটা ছবির অনেক দৃশ্যের বিন্যাসেই বোঝা যায়। তবে তিনি কাহিনীর আরও গভীরে যেতে পারতেন। সমকালীন সমস্যার এই কাহিনীতে তরুণদের কেবলই মস্তান মনে হয়েছে। শ্যামের নৈরাশ্য ও বিপথগমনের কারণ হিসাবে একটা ব্যর্থ প্রণয়ের গল্পের অবতারণা আছে। ওই পরিপ্রেক্ষিতে শ্যাম দর্শকদের সমবেদনা ও সহানুভূতি অনেকটা পেয়ে যায়। কিন্তু অন্যরা আপনজন হতে পারল না। শ্যামের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ছেনো যেন প্রথম থেকেই হিন্দীছবির তথাকথিত ভিলেন-মার্কা। এই চরিত্রে শত্রুঘ্ন সিনহার অভিনয়ের ধরনটাও সেই রকম। নাকি শিল্পী দুর্বল চিত্রনাট্যের শিকার?

বিবদমান দুই দলের মাঝখানে, বিশেষত শ্যামের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন নানীমা (মীনাকুমারী)। গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা এই অশান্ত পরিবেশে এসেছেন মায়া, মমতা ও সততার মূল্যবোধ নিয়ে। তাকে কেন্দ্র করে মূল্যবোধের সংঘর্ষ আরও তীব্র করা যেত। নানীমা অবশ্য ছেলেদের অতীতের কথা শুনিয়েছেন কিন্তু অতীতের আদর্শ পথভ্রষ্ট তরুণদের সামনে রেখে তাদের সংশয়-ক্লিষ্ট করে তুলতে পারেননি। তবে নানীমার স্নেহ-মমতা—ছেলেদের এবং দুই অনাথ শিশুর প্রতি—নিয়ে পরিচালক অনায়াসেই নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া, মীনাকুমারী এই ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন চমৎকার। তবে তাঁর বেশবাসের প্রতি পরিচালক আর একটু নজর দিতে পারতেন, যাতে সত্যিই তাঁকে বৃদ্ধা মনে হয় সেই দিকে।

নাটক যে ছবিতে জমেছে তার আর একটি কারণ শ্যামের চরিত্রে বিনোদকুমারের অনুভূতিদীপ্ত অভিনয়। শিল্পী এই চরিত্রের স্বৈতরূপটি অনুভব করেছেন। তবে ছবির ক্লাইম্যাক্স যেন হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে গেছে নানীমাকে ঘিরে যে-নাটক একটু একটু করে গড়ে উঠছিল সেটা আবেগে তীব্র হতে না হতেই একটি বড় দাঙ্গার পর ছবি শেষ। নানীমা দাঙ্গায় নিহত।

ত্রুটির দিক ছবিতে আছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দীছবির তুলনায় গুণের দিকও কম নয়। সোজাসুজি কিংবা ফ্ল্যাশব্যাকে পরিচালক যে ঘটনাই বিন্যাস করেছেন তা পরিমিত। নানীমার নতুন বিবাহিত জীবনের ঘটনাগুলি চমৎকার। পরিচালক গুলজার তথাকথিত

"সামার অব ফর্টি টু" (নিউ এম্পায়ার) ছবিতে জেনিফার ওনীল

হিন্দীচিত্রের নিয়ম-বিধি কোনটাই এ-ছবিতে নিজের প্রয়োগ করেননি। গানও ছবিতে অল্প। দুটি গান সলিল চৌধুরীর সুর-রচনায় শুনতে ভাল লাগে। সলিলবাবু আবহসুর রচনাতেও এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, বিশেষ করে অ্যাকশনের দৃশ্যে। পরিচালক-চিত্রনাট্যকার কাহিনীস্থল বেছে নিয়েছেন যুক্তপ্রদেশের কোন একটি শহর। হয়ত সেখানেও ছাত্র-অসন্তোষ বা যুব-অস্থিরতা দেখা যায়। তবে ছবির অনেক দৃশ্যই পরিচালক সেটে তুলেছেন। এমন-কী শহরের পথ-ঘাটের দৃশ্যও। ছবিটি সেখানে অনেকখানি বাস্তবতা হারিয়েছে।

অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র

পরিত্যক্ত পান্থশালা ও ওরা চারজন

অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি এদেশে খুব একটা হয় না, যাও হয় তা তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণিক। সেদিক থেকে পরিচালক নির্মাল্য সেনগুপ্তের ইংরেজি নামের ও সংলাপের "দ্য ডেজারটেড ইন অ্যান্ড দে ফোর" (আকাদমী অব আর্টস অ্যান্ড কালচার প্রযোজিত) ছবিটির সংবাদ দর্শকদের বিশেষভাবে দেওয়া যেতে পারে। ছবির নাম ও সংলাপ ইংরেজি সম্ভবত এই কারণে যে চিত্রনির্মাতারা বিদেশের অথবা অবাঙালী দর্শকদের কথাও ভোলেননি। তাছাড়া ওরা চারজন বাঙালী নয় সেটা পোশাকেই বোঝা গেছে।

ছবিটিতে সুন্দর ফটোগ্রাফি (বীরেন মুখার্জি-কৃত) দেখা গেছে। সম্পাদনাও (দিলীপ ভট্টাচার্য) বেশ ভাল। পরিচালক আউটডোর দৃশ্য তোলায় সুন্দর জায়গা বেছে নিয়েছেন। ভিস্যুয়াল সম্পদ ছবিটির আছে। তবে যা দেখার বস্তু তা কিন্তু একই সংগে অনুভবের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি। টাইটেল পড়ার আগে কেন পরিচালক অযথা "জুম"-এর ব্যবহার করেছেন সেটা দুর্বোধ্য। সংগীত বা ধ্বনি (কুমার কিশোর-কৃত) সম্পর্কেও একই কথা। আলাদাভাবে শুনতে ভাল। দৃশ্যবস্তুর সংগে এর যোগ ক্ষীণ।

একটা গল্পের ভিত্তিতেই (কল্যাণ সেন রচিত) ছবিটির পরিকল্পনা। তবে পরিচালক যদি ছবিতে নিছক গল্প বলতে না চেয়ে থাকেন এবং শুধুই কয়েকটি চরিত্রের "অ্যাটিচুড" এবং যন্ত্রণা, অসহায়তা ও অক্ষমতা দেখানোই ছবির উদ্দেশ্য হয়, তাতে আপত্তির কারণ নেই। যাই হোক, গল্পের উপাদান থাকলেও ছবিতে গল্প নেই। আছে চারটি চরিত্র, এক পরিত্যক্ত পান্থশালার ঘরের অন্ধকারে দেখা গেছে। একটি মোমবাতির আলোতে ওদের মুখগুলো উদ্ভাসিত। ওদের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথই যেন ওরা খুঁজছে। অভিব্যক্তি প্রকাশের কাজটি চারজন শিল্পীই চমৎকার দেখিয়েছেন। ওঁরা হলেন গৌরী-শঙ্কর, আশিস ব্যানার্জি, অরুণ সেন ও দেবানন্দ চ্যাটার্জি।

ওই পান্থশালায় এসেছে একটি মেয়ে। দেখবামাত্র মনে হয় পরিচালক তাকে দেব-দূতীর মতই ওদের সামনে এনে হাজির করেছেন। কিন্তু দেখা যায়, মেয়েটিও কী যেন খুঁজছে। সেও বিপন্ন, চারজনের মতই অন্ধকারের বন্দিনী। মেয়েটি ও ওরা চারজনের মধ্যে কোন কমিউনিকেশন তেমন বোধগম্য হল না। মেয়েটির অভিব্যক্তিতেও জীবনরহস্যের পরিচয়। সেটা সুচিত্রা রায় সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন।

আসলে পুরো ব্যাপারটাই রহস্য বা অস্পষ্টতায় আবৃত। এই আবরণ দর্শক হয়ত ভেদ করতে পারতেন। কিন্তু পরিচালক যে কিছুই কমিউনিকেট করতে পারলেন না।

"নয়া মিছিল" ছবিতে নবাগতা শাওলী মিত্র

চলচ্চিত্র-সংবাদ

সিনে ক্র্যাফটের প্রথম ছবি "ফেরারী" অসীম ব্যানার্জির পরিচালনায় প্রায় শেষ হতে চলেছে। গত কয়েক দিন একটানা শ্যুটিং করার পর ইউনিটের সদস্যরা সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ছবিতে অনেকগুলি নতুন মুখ দেখা যাবে, তাঁদের কয়েকজন হলেন সত্যেন গাংগুলী, কচ মুখার্জি, অসিত ব্যানার্জি, বন্যা ভট্টাচার্য, পাপিয়া মুখার্জি, গার্গী বসু, বিভূতি ভট্টাচার্য, প্রসাদ চ্যাটার্জি। সংগীত পরিচালনা করছেন সরোজ কুশারী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক নিজে।

স্টারে নতুন নাটক "মঞ্জরী"

স্টার থিয়েটারে ২১ জানুয়ারি থেকে মঞ্চস্থ হচ্ছে "মঞ্জরী"। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে "মঞ্জরী"-র নাট্যরূপ

দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। নাট্যপরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। তত্ত্বাবধানে রয়েছেন শিশির মল্লিক। এই নাটকের সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কমলেশ মৈত্র। অভিভারত দত্ত, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, অপর্ণা দেবী, সুখেন দাস, গীতা দে প্রভৃতি নাটকের বিশিষ্ট শিল্পী।

বাংলাদেশের সংগ্রামের গান

বাংলা দেশে মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ও সুরারোপিত দুটি গান গেয়েছেন দেবব্রত বিশ্বাস। হিন্দুস্থান রেকর্ডে গান দুটি পরিবেশিত। গান দুটির প্রথম করেকটি কথা হ'ল যথাক্রমে, "ঐ তারা চলে দলে দলে মুক্তিপতাকা তলে" এবং 'শোন বাংলায় জনসমুদ্রে জোয়ারের হুংকার।' শ্রীবিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠে গান দুটি প্রাণবান। গানের সুর ও কথাও সুন্দর। শ্রীবিশ্বাস জানিয়েছেন এই রেকর্ড বাবদ তাঁর প্রাপ্য রয়ালটি তিনি বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় জোয়ানদের সাহায্যে দান করবেন।

চিৎপুর-চিত্র

চিৎপুরের ভাগ্যাকাশে বছর দুই আগে যে কালো মেঘ জমে উঠেছিল—যাই যাই করেও তার আর যাওয়া হয়ে উঠল না। না হল ঝড়, না প্রবল বারিপাত। হলে অন্তত এটা নির্দেশ করত যে, নিশাবসানে অথবা দুর্যোগের পর নতুন সূর্য আশার আলো বিকিরণ করবে। কিন্তু যে-আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সুযোগই পেল না, তার আবার নতুন প্রভাত কিসের।

'কথাটা উঠছে, না উঠে উপায় নেই বলে। চিৎপুরের ওপর দিয়ে এক-একটা দুর্যোগের রাত পার হচ্ছে আর তামাম যাত্রাশিল্পের মানুষেরা প্রার্থনার ভঙ্গিতে পূর্ব গগনে স্থির দৃষ্টি রাখছেন। প্রার্থনা : ঊষার সোনার আলোক সকল বাধাবিপত্তির কালো অন্ধকারকে দূরীভূত করে নতুন দিনের শুভ সূচনা করুক। কিন্তু চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? গোটা যাত্রাশিল্প বছর দুয়েক ধরেই তো আকুল গলায় চেয়ে আসছে, তবে কেন তার সামনে সুদিনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না?

অস্বীকার করা যায় না, এ-মরসুমের শুরুতে এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যে, যাত্রাশিল্পের সুদিন সত্যি ফিরে আসবে। দর্শক এবং এ-শিল্পের অনুরাগীরা জানেন যে, 'চকিত-চপলা' পালা দিয়ে দর্শকদের মাত করার চেষ্টা অন্তত ৭১-৭২ সালের মরসুমের ছিল না। বাংলাদেশ সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে আমাদের যাত্রা সেদিকেই ঝুঁকে পড়ল বেশী করে। লোকনাট্য, নিউ আর্য, শিল্পীতীর্থ, নিউ প্রভাস, ভাণ্ডারী প্রভৃতি দল একসঙ্গে এগিয়ে এল দায়িত্বশীল প্রযোজনার কাজে। হয় ইয়াহিয়া-মুজিব সংঘর্ষ, নয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ—অত্যন্ত সমকালীন এই বিষয় নিয়ে রচিত পালাই হল প্রধান। নট্ট কোম্পানি এই সমকালের কথা বললেন অতীতের পটে। বাকি প্রযোজনার মধ্যে নবরঞ্জন অপেরার শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ তুলে ধরলেন আফ্রিকাবাসীদের স্বাধীনতার তীব্র দাবি; তরুণ অপেরা আর বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজ উপহার দিলেন জীবননাট্য, অম্বিকা নিবেদন করলেন কাশ্মীর সমস্যা এবং সত্যাম্বর অপেরা কয়েকদিন আগেকার রাজনৈতিক অবস্থার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বলতে চাইলেন দোষী কে? এই যে বিচিত্র বিষয়সম্ভার দিয়ে যাত্রাগানের যাত্রা শুরু হল, তা কি সত্যি অব্যাহত আছে?

গত সালের অকাল বর্ষণের ফলে 'তীর আকাশ' পার হলে বণ্ঠীর বিজয় বাদ্য বাজল। কেউ আসাম, কেউ বিহার, কেউ ডুয়ার্স রওনা হলেন। কিন্তু সকলের মনেই ছিল পুরো আশা আর ভয়ানক উদ্যম। না, আসামের ডুয়ার্সের ভয়ানক অনাহার, এমন কি জরুরী অবস্থার দরুণ হঠাৎ ব্ল্যাক-আউটের ঘোষণা একের পর এক আসা সত্ত্বেও যাত্রা কিন্তু ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে পড়েনি। তার ওপর আবার আসছে নির্বাচন। তারিখটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, একে কেন্দ্র করে ১০।১২ দিনের বায়না পর পর বাতিলের খবর আসছে। বোঝা যাচ্ছে না, এই শেষ ধাক্কাটা সত্যি যাত্রা সামলে উঠতে পারবে কিনা।

এর মধ্যে কয়েকজন মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা বললেন, বোঝার ওপর শাকের আঁটি সত্যি, কিন্তু এ কথাও সত্যি নির্বাচনও আমরা চাই। কারণ, গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার শিকার হয়ে পড়ার পর, আমরা চাই একটি স্থায়ী সরকার, পশ্চিমবঙ্গে। না হলে বুঝি যাত্রাশিল্পের মাথার ওপরকার কালো মেঘটি কিছুতেই কাটানো যাবে না। শিল্পীদের জিজ্ঞেস করলাম। ওঁরা বললেন, কার্তিক থেকে নো ওয়ার্ক নো পে চলছে যখন, এ-কদিনে আর কতটুকুই বা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে!

—সূত্রধার

'বহুরূপী' (পরিচালনা : মিন্টু চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে মধুছন্দা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

শনিবারের বিকেল

অনুভব নাট্যসংস্থা প্রযোজিত 'শনিবারের বিকেল' কিঞ্চিৎ প্রহসনধর্মী নাটক, যা আগাগোড়া একটা লঘু আবরণে মোড়া এবং অন্তরালে একটি চমৎকার সত্যের দীপ্তি। নাট্যকার দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন সাবলীল গতিতে নাটকটিকে টেনে নিয়ে গেছেন উপভোগ্যতার দিক থেকে যা রীতিমতো তৃপ্তিদায়ক। নাটকের নায়ক সুব্রত একজন সাংবাদিক, নেশায় এবং পেশায় সাংবাদিক হলেও তার একটি বিশেষ শখ ছিল। শখটি হচ্ছে রেসের বই নিয়ে বসে সে খাতায় কলমে স্পেকুলেট করত কোন ঘোড়াটা জিতবে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, তার নির্দিষ্ট ঘোড়াগুলো বরাবরই জিতত। যদিও রেস খেলার প্রতি তার কোন আসক্তি ছিল না এবং সে কখনো মাঠেও যায়নি।

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি ক্রমে জানাজানি হয়ে যায়, ফলে সুব্রতকে নিয়ে শুরু হয় নানা মহলে টানাটানি। নাটকের আসল মজা এই পর্যায়ে। অর্থলোলুপ মানুষের অন্যায় চাহিদার কাছে সুব্রত হয়ে দাঁড়ায় সাক্ষাৎ দেবতা, নিজেদের ভাগ্য ফেরাবার জন্যে তাই তাকে অনেক লাঞ্ছনা মেনে নিতে হয়। যা ছিল সুব্রত'র কাছে একটা আনন্দদায়ক খেলা, তাই যেন হয়ে দাঁড়ায় তার যন্ত্রণা। চারিদিকে লোভের হাতছানির সামনে বিচলিত সুব্রত বন্দী, অসহায়।

নাটকের কাহিনীর অংশে যে অবাস্তবতা তাকে এক্ষেত্রে স্বীকার করে নিতেই হয়, কারণ ঐ অবাস্তবতাটুকুই নাটকের প্রাণ। অতএব বাস্তবতা এবং যুক্তি এইসব প্রশ্ন উহ্য রেখে নাটকটি দেখতে বসলে দর্শকরা হতাশ হবেন না। অনুভব গোষ্ঠীর প্রযোজনা এবং শিল্পীদের দলগত অভিনয় আমাদের খুশি করবার পক্ষে যথেষ্ট। নাটকের শেষ দৃশ্যটির পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণে শিল্পবোধের পরিচয় আছে। অভিনয়ে প্রত্যেকেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন তাপস দত্তগুপ্ত, মায়া ঘোষ, বেনীমাধব

চট্টোপাধ্যায়, রতন চক্রবর্তী মন্দিরা দাস, সত্যপ্রিয় ঘোষ এবং নাট্যকার স্বয়ং। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বও ছিল নাট্যকারের। নাটকটির সাম্প্রতিক অভিনয় পরিবেশিত হল মুক্ত অঙ্গনে।

নাট্যসমালোচক

মল্লার নিবেদিত "দেখি ভুবনখানি" "খেলনাবুড়ো"

মল্লার শিল্পিগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রযোজনায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। সম্প্রতি তাঁরা রবীন্দ্রসদনে "দেখি ভুবনখানি" এবং "খেলনাবুড়ো" পরিবেশন করলেন।

"দেখি ভুবনখানি" রবীন্দ্রসংগীতেরই অনুষ্ঠান। তবে গানের সঙ্গে ভাষ্যপাঠ ছিল। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ, যোগব্রত চক্রবর্তী ও জ্যোতিভূষণ চাকী পর্যায়ক্রমে যা পাঠ করেছেন তাতে উপনিষদেরই বাণী ও ভাবনা এবং তারই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের গান। এই পরিকল্পনা সময় সময় ক্লান্তিকর লাগতে বাধ্য, কারণ বৈচিত্র্যের অভাব। অতি উচ্চ ভাব ও ভাবনা পরিবেশনেও একটা পরিমিতির দরকার। বিশেষত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাজানো-গোছানো কথাই যত গোল বাধায়। অনুভূতির দরজা খুলে দেয় গান, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা নয়। অবশ্য সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, সুমিত্রা রায় (মুখার্জি) সুপ্রকাশ চাকী প্রমুখ শিল্পীদের গান শুনতে খুবই ভাল লেগেছে। "দেখি ভুবনখানি" পরিচালনা করেছেন জ্যোতিভূষণ চাকী।

উপভোগ্যতার দিক থেকে মল্লার-এর "খেলনাবুড়ো" শিশুনৃত্যনাট্য বিশেষ উপভোগ্য। শিশু শিল্পীরাই নেচেছে।

মল্লার-এর অনুষ্ঠানে সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও পিয়ালী সেনগুপ্তা

নাচের কিছুটা ভুল থাকতে পারে তবে যে তারা মল্লারে থেকে ভাল নাচ শিখছে সে প্রমাণ অবশ্যই মিলেছে। এই কৃতিত্ব নৃত্য পরিচালিকা রুবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অতি ছোট শিশুরাও এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। খেলনাবুড়ো ও রাজপুত্রের ভূমিকায় যথাক্রমে সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও পিয়ালী সেনগুপ্তা চমৎকার নেচেছে।

"খেলনাবুড়ো" রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জ্যোতিভূষণ চাকীর উপর। তিনি তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন।

মায়া মহল

ম্যাজিক বলতে যা দেখা যায়, যাদুকর যাদু কাঠির সাহায্যে মঞ্চে একটির পর একটি খেলা দেখিয়ে যাবেন—যোগী যাদুকর মৃণাল রায়ের "মায়া-মহল" (যা মহাজাতি সদনে গত ৩ জানুয়ারি থেকে দেখানো হচ্ছে) কিন্তু সে ধরনের নয়। এতে সংগীত, রকমারি সাজ-পোশাকে রকমারি নাচ, সুন্দর সুন্দর দৃশ্যপট, স্লাইড, সিনেমা সবই দেখতে পাওয়া যাবে। আসলে

শ্রী রায় তাঁর এই প্রদর্শনীকে নিতান্ত সাদাসিধেভাবে পরিবেষণ করতে চাননি (চাইলে অবশ্য ব্যাপারটা সুখপ্রদ হতো), সম্ভবত সেই কারণেই তিনি এর মধ্যে একটি কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। সেইদিক থেকে "মায়া মহল"কে যাদু-নাটক বলা অন্যায় হবে না। তাছাড়া মায়ামহল নামটার মধ্যেও যাদু-যাদু আভাস স্পষ্ট।

এই কাহিনীর নায়ক একজন যুবক। শহরে সে কোন কাজ না পেয়ে শহরেরই এক প্রান্তে এসে গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। গাছের ছায়ায় সে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে এবং স্বপ্ন দেখে সে এক যাদুর রাজ্যে এসে হাজির। এই রাজ্যটির নামই "মায়া মহল"। যাদুর রাজ্য, অতএব চারিদিকে অসংখ্য মায়াপরী। স্বভাবতই, পরীদের রাণীর যুবককে ভাল লাগে। রাণী তখন তার সমস্ত যাদুমন্ত্র যুবককে দিয়ে দেয়। আর কী, যুবক তখন রীতিমত যাদুকর।

ওই রাজ্যে তখন সে একের পর এক খেলা দেখিয়ে গেছে। তার যাদু-ক্রীড়া। অসাধারণ কিছু না হলেও সাধারণ মানের চাইতে খানিকটা উন্নত। খেলার মধ্যে "ফুলের বাগান", "আগুনের বলের খেলা", "ঐশ্বরীয় মমি", "ইলিউশন বক্স", "পায়রা ধরা", "শূন্যে ভাসমান তরুণী", "ভারতীয় দড়ির" এবং "হর-বধূ" উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শূন্যে ভাসমান তরুণী খুবই রোমাঞ্চকর।

মায়া-মহল থেকে ফেরার পথে পরী রাণীর সঙ্গে যুবকের আবার সাক্ষাৎকার। ওরা পরস্পরের প্রতি তখন অনুরক্ত। আমরা, দর্শকেরা যখন সানাইয়ের সুর শোনার অপেক্ষায়, ঠিক তখনই যুবকের ঘুম ভেঙে গেল—সুরও গেল থেমে। যাদু নাটক তো, তাই শেষ পর্যন্ত সবই যাদু।

স্বঃ ব

ফ্রম রাশিয়া উইথ্ লভ্

কিছুকাল পূর্বে সেতারশিল্পী সুরশ্রী কল্যাণী রায় 'তপনজ্যোতি' নামে একটি রাগ বয়ন করেছিলেন। রাগটির নাম এবং সেটির প্রেরণার মধ্যে একটা সুন্দর বোঝাপড়া আছে। ইংরেজীতে যাকে 'পিয়েস্ দোকাসিও' (কথাটা অবশ্য ফরাসীদের থেকে ধার নেওয়া) বলা হয়, তপনজ্যোতি মোটামুটি সেই পর্যায়ভুক্ত। লেনিনের স্মৃতির উদ্দেশে রাগটিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। শ্রীমতী রায়ের তপনজ্যোতি পরে রাসখন্দের বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। এবং তাসখন্দের বেতার ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী রায়ের এই অভিনব প্রচেষ্টাকে সম্মানিত করার জন্য কিছু উপহার পাঠান। সম্প্রতি 'সাংবাদিক' হাউসে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'কলিকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের ভাইস কন্সাল, শ্রী এম মীরকাশিমভ্ সেই উপহারগুলি শ্রীমতী রায়ের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ শ্রীমতী ছবি চট্টোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গের গান এবং ডঃ রজনীকান্ত চতুর্বেদীর সেতারবাদনের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত মীরকাশিমভ্ তাঁর বক্তৃতায় শ্রীমতী রায়ের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংগীতের মাধ্যমে দুটি দেশের মধ্যে সম্বন্ধ সৃষ্টির এই প্রচেষ্টাকে তিনি অত্যন্ত তাৎপর্যময় বলে বর্ণনা করেন।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সিমফনি অর্কেস্ট্রায় স্বাধীনতা সংগ্রাম

তিমিরবরণ সিমফনি অর্কেস্ট্রা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জয়লাভের ঘটনার সাংগীতিক রূপে পরিবেশন করছেন ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কলামন্দিরে। তিমিরবরণের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন যন্ত্রশিল্পী অর্কেস্ট্রায় যোগ দেবেন। এই অনুষ্ঠানের প্রযোজনা করছেন শ্রীরণজিৎমল কাংকারিয়া। অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলা দেশের সাহায্যে দান করা হবে।

বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে সংগীতানুষ্ঠান

টালিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ সাহায্যকল্পে সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠান, নৃত্য, আবৃত্তি ও মূকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। যে-সব বিশিষ্ট শিল্পী সানন্দে অনুষ্ঠানে যোগ দেন তাঁরা হলেন সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (আবৃত্তি), রবি বন্দ্যোপাধ্যায় (নৃত্য), প্রদীপ ঘোষ (আবৃত্তি), পূরবী দত্ত, ধীমান বসু এবং যোগেশ দত্ত (মূকাভিনয়)। উপভোগ্যতার দিক থেকে সান্ধ্য অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে থাকে। শিল্পীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁদের সাধুবাদ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনতন্ত্র গঠন এই সপ্তাহের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১২ জানুয়ারি ওই শাসনতন্ত্র বাস্তব রূপ নিয়েছে। এদিন বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে শ্রীআবু সয়ীদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শপথ গ্রহণ করেন। বারজন সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভাও এদিন শপথ গ্রহণ করেছেন। এই মন্ত্রিসভায় পুরনো মন্ত্রী সকলেই আছেন। নতুন এসেছেন দু'জন। একজন ডাঃ কামাল হোসেন—বঙ্গবন্ধুর সাংবিধানিক উপদেষ্টা এবং আর একজন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম পূর্বে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেনট এবং প্রেসিডেনট শেখ মুজিবের অনুপস্থিতির দরুন অস্থায়ী প্রেসিডেনট। শপথ গ্রহণের এই শান্ত এবং ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানটি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার সচীব জানান বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা বিচারপতি শ্রী আবু সয়ীদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করেছেন। এ সময়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন ঘোষণা করেন তাঁর ও তাঁর মন্ত্রিসভার নয়জন সদস্যের পদত্যাগের কথা।

দেশী সংবাদ

১০ জানুয়ারি—বিশ্বের কনিষ্ঠতম স্বাধীন সার্বভৌম জাতির রাষ্ট্রপতি শ্রেষ্ঠতর বাঙালী শেখ মুজিবর রহমানকে ভারত আজ জানিয়েছে অভূতপূর্ব রাজকীয় অভ্যর্থনা আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত ও বাংলা দেশের মধ্যে অক্ষয় মৈত্রী বন্ধনের।

দিল্লি শেখ মুজিবর রহমানকে দেখার জন্য সত্যিই আজ পাগল হয়ে যায়। বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখে জয়ের হাসি দেখতে চলেছেন বঙ্গপিতা মুজিবর রহমান। লনডন থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য তিনি দিল্লিতে ছিলেন।

১১ জানুয়ারি—আগামী ১২ মারচ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা। প্রদেশ কংগ্রেসের (নব) নেতৃবৃন্দেও কেন্দ্রের কাছে ১২ অথবা ১৯ মারচ নির্বাচনের দিন ধার্য করার প্রস্তাব করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র দফতর সেনাবাহিনী ও প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত সরকারী অফিসের এবং সকল শ্রেণীর ভারতীয় নাগরিককে বিদেশী সরকারের খেতাব গ্রহণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। খেতাব গ্রহণের আগে পররাষ্ট্র দফতরের অনুমতি নিতে হবে এবং অনুমতি পাওয়া গেলেও ভারতে ওই খেতাব বা ব্যাজ ব্যবহার করা চলবে না।

১২ জানুয়ারি—বাংলা দেশ থেকে আগত অসহায় নারী ও অনাথ শিশুদের সন্তোষজনক পুনর্বাসন ব্যবস্থা বাংলা দেশ সরকার করতে না পারা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে সরকারী আশ্রয়-শিবিরগুলি চালু রাখা হবে।

প্রতিদিন প্রায় ২,৫০,০০০ শরণার্থীকে বাংলা দেশে পাঠান হচ্ছে। এই হারে পাঠানো চললে এবং ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হবার আগেই এক কোটি শরণার্থীকে স্বদেশে প্রেরণ সম্পূর্ণ হবে। এ পর্যন্ত ২০ লক্ষ ১০ হাজার উদ্বাস্তুকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৩ জানুয়ারি—পাঁচ শতাধিক হনুমানের এক 'বাহিনী' হাওড়া জগৎবল্লভপুর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামে হানা দিয়েছে। তাদের অত্যাচারে গ্রামবাসীরা উত্যক্ত, রবিশস্যের ক্ষেত তছনছ। লড়াই করে গ্রামবাসীরা সাতটি হনুসেনাকে ঘায়েল করেছেন।

আগামী দুই বছরে রাজ্য সরকারের গৃহনির্মাণ দফতর নিম্ন-মধ্যবিত্ত, দরিদ্র এবং শিল্প-প্রকল্প সব মিলিয়ে নতুন পাঁচ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করবে বলে স্থির করেছে। এ পর্যন্ত এ রাজ্যে এ রকম পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে। এই ফ্ল্যাটগুলির শতকরা পঁচাত্তর ভাগই বৃহত্তর কলকাতা এলাকায়।

১৪ জানুয়ারি—তথ্য ও বেতার দফতর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, অল ইনডিয়া রেডিওতে নিযুক্ত সব ধরনের আর্টিস্টদের বেতনের হার বৃদ্ধি করা হবে। রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য প্রকাশ করে বলেন, এর ফলে এই সব আরটিসট সরকারী কর্মচারীদের তুল্য ভাতা প্রভৃতি পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে না হতেই আজ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি জোর তোড়জোড় শুরু করেছেন। আসন বণ্টনের ভিত্তিতে নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে তোলা নিয়ে সকাল থেকে রাত্রি নানা দলের মধ্যে দফায় দফায় আলোচনা চলেছে।

১৫ জানুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী জোট বাঁধাবাঁধির চেহারাটা নতুন মোড় নিচ্ছে। নব কংগ্রেস, সি পি আই এবং ফরওয়ারড ব্লকের জোট গঠন যেমন একরকম নিশ্চিত, তেমনিই সি পি এম এবং ইউ এল এফের সঙ্গে এস ইউ সি ও আর এস পির নতুন ফ্রনটও পাকা। কোনও দল এবার একা লড়াই চালাতে ভরসা পাচ্ছে না।

ভারতের স্থল নৌ ও বিমান—এই তিন বাহিনীর প্রধানকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ভারত রত্নের পর পদ্মবিভূষণ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান। পদ্মভূষণ উপাধি পেয়েছেন ৭ জন লেঃ জেনারেল ও একজন মেঃ জেনারেল, দু'জন ভাইস অ্যাডমিরাল এবং দু'জন এয়ার মারশাল।

১৬ জানুয়ারি—জাতীয় সমেলনের কর্ম সমিতি আজ ওই সংস্থাটি ভেঙে দেবার সিদ্ধান্ত নেন এবং দলের সকল কর্মীদের জম্মু-কাশ্মীরের কংগ্রেস দলে যোগ দেবার নির্দেশ দেন। আজ এই মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সৈনাবাহিনী পাকিস্তানের যে সব জায়গায় আছে সেসব জায়গা থেকে সরে আসবে না।

বিদেশী সংবাদ

১০ জানুয়ারি—বঙ্গবন্ধু আবার তাঁর ভালবাসার সোনার বাংলায় ফিরে এসেছেন, ফিরে এসেছেন মুক্ত ঢাকায় তাঁর ভালবাসার মানুষের কাছে। প্রথমে তেজগাঁও বিমান বন্দর, তারপর রমনা ময়দান। মাঝে বিস্তীর্ণ পথের সর্বত্র, সমগ্র ঢাকায় জনস্রোত উদ্বেল উত্তাল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন।

১১ জানুয়ারি—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আজ রাত্রে ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সাংবিধানিক নির্দেশ জারি করেছেন। এই নির্দেশ অবিলম্বে বলবৎ হবে। এই নির্দেশে বাংলাদেশে সংসদীয় ধরনের সরকার গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে।

১২ জানুয়ারি—বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কি হবে তা ঠিক করতে তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভাল বাসি'—রবীন্দ্রনাথের এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

১৩ জানুয়ারি—ব্রহ্মদেশ সরকার আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। বাংলাদেশকে একের পর এক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দানের খবরে পাকিস্তান ক্ষেপে আগুন। রাগে বেসামাল। এরই জের টেনে পাকিস্তান সম্পর্ক ছিন্ন করল বুলগেরিয়া, পোল্যানড ও মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে।

১৪ জানুয়ারি—সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, করাচীর কাছে একটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণ সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়।

১৫ জানুয়ারি—পাক প্রেসিডেনট শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টোকেও স্বীকার করতে হলো যে, বাংলাদেশে পাক সেনারা বর্বরের মত আচরণ করেছে। তিনি একথা আজ কবুল করেছেন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান নাম করলে তিনি দায়ী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।

১৬ জানুয়ারি—নেপাল আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। এ পর্যন্ত যেসব দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছে, নেপাল তাদের মধ্যে অষ্টম এবং এশিয়ার মধ্যে চতুর্থ রাষ্ট্র। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হল ভারত ভুটান পূর্ব জারমানী, পোল্যানড, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও ব্রহ্ম।